সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

॥ মাসিক বসুমতী ॥
॥ বৈশাখ, ১৩৭১ ॥

(জলরঙ)

বুদ্ধের জন্ম

—শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্ত্তী

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪৩শ বর্ষ | প্রথম খণ্ড

বৈশাখ ১৩৭১ | প্রথম সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

কথামৃত
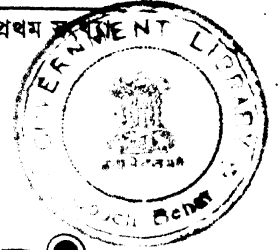
ঠাকুর-দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থি । দর্শনলাভে তাহার যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল । তখন সে—বুঝি আদান-প্রদান সামঞ্জস্য করিবার জন্য—গীত আরম্ভ করিল । দালানের এককোণে থামে হেলান দিয়ে চোবেজি ঝিমাইতেছিলেন । চোবেজি মন্দিরের পূজারী, পাহলওয়ান, সেতার—দুই লোটা ভাঙ্ দু'বেলা উদরস্থ করিতে বিশেষ পটু এবং অন্যান্য আরও অনেক সদগুণশালী । সহসা একটা বিকট নিনাদ চোবেজির কর্ণপটহ প্রবলবেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায়, সম্বিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজির বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষস্থলে 'উংগায় হৃদি লীয়ন্তে'—হইল । তরুণ-অরুণ-কিরণ-বর্ণ ঢুলু ঢুলু দু'টি নয়ন ইতস্তত বিক্ষেপ করিয়া, মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধায়ী চোবেজি আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজির সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া, কর্মবাড়ির কড়া মাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে—নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক—কলাবতগুষ্টির সপিণ্ডিকরণ করিতেছে । সম্বিদানন্দ উপভোগের প্রত্যক্ষ বিঘ্নস্বরূপ পুরুষকে, মর্মাহত চোবেজি তীব্র বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'বলি, বাপু হে—ও বেসুর বেতাল কি চীৎকার করছ ?'

ক্ষিপ্র উত্তর এলো—'সুর তানের আমার আবশ্যক কি হে ? আমি ঠাকুরজির মন ভিজুচ্ছি ।'

চোবেজি—'হুঁ, ঠাকুরজি এমনই আহাম্মক কি না ? পাগল তুই—আমাকেই ভিজুতে পারিস্ নি—ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশি মূর্খ ?'

ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু করবার দরকার নাই, আমি তোমায় উদ্ধার করিব । ভোলাচাঁদ তাই লোকের কাছে শুনে মহাখুশি ; থেকে থেকে বিকট চীৎকার—আমি প্রভুর শরণাগত, আমার আবার ভয় কি ? আমার কি [illegible] কিছু করতে হবে ? ভোলাচাঁদের ধারণা—ঐ কথা[illegible] বিটকেল আওয়াজে বারম্বার বলতে পারলেই যথেষ্ট ভক্তি [illegible] তার উপর মাঝে মাঝে পূর্বোক্ত স্বরে জানানও আছে [illegible] সদাই প্রভুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত । এ [illegible] যদি প্রভু স্বয়ং না বাঁধা পড়েন, তবে সবই মিথ্যা । [illegible] চারটা আহাম্মকও তাই ঠাওরায় । কিন্তু ভোলাচাঁদ প্র[illegible]টিও দুষ্টামি ছাড়তে প্রস্তুত নন । বলি, ঠাকুরজি কি এম[illegible]ম্মক ? এতে যে আমরাই ভুলি নি !!

ভোলাপুরি বেজায় বেদান্তী—সকল কথাতেই তাঁর ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে পরিচয়টুকু দেওয়া আছে । ভোলাপুরির চারিদিকে যদি লোকগুলো অন্নাভাবে হাহাকার করে—তাঁকে স্পর্শও করে না ; তিনি সুখ-দুঃখের অসারতা বুঝিয়ে দেন । যদি রোগে, শোকে, অনাহারে লোকগুলো ম'রে ঢিপি হয়ে যায়, তাতেই বা তাঁর কি ? তিনি অমনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব চিন্তা করেন ! তাঁর সামনে বলবান দুর্বলকে যদি মেরেও ফেলে, ভোলাপুরি—'আত্মা মরেনও না, মারেনও না' এই শ্রুতিবাক্যের গভীর অর্থসাগরে ডুবে যান । কোনও প্রকার কর্ম করতে ভোলাপুরি বড়ই নারাজ । পেড়াপীড়ি করলে জবাব দেন যে, পূর্বজন্মে ওসব সেরে এসেছেন । এক জায়গায় ঘা পড়লে কিন্তু ভোলাপুরির আত্মৈক্যানুভূতির ঘোর ব্যাঘাত হয়,—যখন তাঁর ভিক্ষার পরিপাটিতে কিঞ্চিৎ গোল হয় বা গৃহস্থ তাঁর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পূজা দিতে নারাজ হন, তখন পুরিজীর মতে গৃহস্থের মত ঘৃণ্য জীবজগতে

আর কেহই থাকে না এবং যে গ্রাম তাঁহার সমুচিত পূজা দিলে না, সে গ্রাম যে কোন মুহূর্তমাত্রও ধরণীর ভার বৃদ্ধি করে, এই ভাবিয়া তিনি আকুল হন।

ইনিও ঠাকুরজিকে আমাদের চেয়ে আহাম্মক ঠাওরেছেন।

'বলি, রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার উপর নেশা-ভাঙ এবং দুষ্টামিগুলাও ছাড়তে পার না, কি ক'রে জীবিকা কর বল দেখি?'

রামচরণ—'সে সোজা কথা মহাশয়—আমি সকলকে উপদেশ করি।'

রামচরণ ঠাকুরজিকে কি ঠাওরেছেন?

লক্ষ্ণৌ সহরে মহরমের ভারি ধুম! বড় মসজেদ্ ইমামবাড়ায় জাঁকজমক রোশ্‌নির বাহার দেখে কে! বেসুমার লোকের সমাগম। হিন্দু, মুসলমান, কেরাণী, আহুদী, ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, ছত্রিশ বর্ণের হাজারো জাতের লোকের ভিড় আজ মহরম দেখতে। লক্ষ্ণৌ সিয়াদের রাজধানী, আজ হজরত ইমাম্ হাসেন হোসেনের নামে আর্তনাদ গগন স্পর্শ করছে—সে ছাতিফাটান মর্সিয়ার কাতরানি কার বা হৃদয় ভেদ না করে? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ ফের জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। এ দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হইতে দুই ভদ্র-রাজপুত তামাসা দেখতে হাজির। ঠাকুর সাহেবদের—যেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের হ'য়ে থাকে—বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ। সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সমেত লস্করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা কাবা চুস্ত পায়জামা তাজ মোড়াসার রঙ-বেরঙ সহর-পসন্দ ঢঙ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর সাহেবদের স্পর্শ ক'রতে আজও পারে নি। কাজেই ঠাকুররা সরল সিধে, সর্বদা শিকার ক'রে জমামরদ কড়াজান আর বেজায় মজবুত দিল্।

ঠাকুরদ্বয় ত' ফটক পার হ'য়ে মসজেদ মধ্যে প্রবেশোদ্যত, এমন সময় সিপাহী নিষেধ ক'রলে কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে সে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ খাড়া দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মার, তবে ভিতরে যেতে পাবে।

মূর্তিটি কার?

জবাব এলো—ও মহাপাপী ইয়েজিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরৎ হাসেন হোসেনকে মেরে ফেলে, তাই আজ এ রোদন, এ শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদ মূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ ত' নিশ্চিত খাবে।

কি কর্মের বিচিত্রগতি—উল্টা সমঝ্‌লি রাম—ঠাকুরদ্বয় গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ মূর্তির পদতলে কুমড়ো গড়াগড়ি আর গদ্গদস্বরে স্তুতি—'ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অন্য ঠাকুর আর কি দেখব? ভল বাবা অজিদ, দেবতা তো তুঁহি হ্যায়, অস্ মারা শারোকো কি অভিতক্ রোবত।' (ধন্য বাবা ইয়েজিদ, এমনি মেরেচো শালাদের—কি আজও কাঁদছে!!)

সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেথা নাই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হোতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সুয্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুচদেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি নাই কি? আর বেদ-বেদান্ত দর্শন পুরাণতন্ত্রে ঢের মাল আছে, যার এক একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটি লোক সেদিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতূহল হোল, আমিও ছুটলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুণ্ড, একশত হাত, দু'শ পেট, পাঁচশ' ঠ্যাঙওলা মূর্তি খাড়া। সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরে যে সকল ঠাকুর দেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই—যিনি দ্বারদেশে; আর ঐ যে বেদ-বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, শাস্ত্র সকল দেখছ, ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এঁর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা ক'রলুম—তবে এ দেবদেবের নাম কি?—উত্তর এলো, এঁর নাম 'লোকাচার'। আমার লক্ষ্ণৌয়ের ঠাকুর সাহেবের কথা মনে প'ড়ে গেল, 'ভল বাবা 'লোকাচার' অস্ মারো' ইত্যাদি।

গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য—মহাপণ্ডিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার; বন্ধুরা বলে তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড় কুড়ি ছেলে হ'লে ঐ রকম চেহারাই হ'য়ে থাকে। যাই হোক্ কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিষটিই নাই, বিশেষ টিকি হ'তে আরম্ভ ক'রে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বুকশক্তির গতাগতি বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুণ দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হ'তে মায় কাদা পুনর্বিবাহ দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ প্রয়োগ—সে তো বালকেও বুঝতে পারে, তিনি এমনি সোজা ক'রে দিয়েছেন। বলি ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়, কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে!!! অতএব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন, তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চা হচ্চে, লোকগুলো একটু চম্‌চমে হোয়ে উঠেছে, সকল জিনিষ বুঝতে চায়, চাকতে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ক'রছি, তোমরা যেমন ছিলে, তেমনি থাক। নাকে সরিষার তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা ব'ললে—বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু! উঠে ব'সতে হবে, চ'লতে ফিরতে হবে, কি আপদ!!! 'বেঁচে থাক্ কৃষ্ণব্যাল' বোলে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর করতে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে! তাই না কৃষ্ণব্যাল দলের আদর! 'ভল্ বাবা 'অভ্যাস' অস্ মারো' ইত্যাদি!

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে

অখণ্ড অমিয় No 36

শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৬৮

রঘুনাথ আর অন্দরমহলে যায় না, বাইরে দুর্গামণ্ডপে পড়ে থাকে। সেইখানেই প্রহরীরা পাহারা দেয়। আর রঘুনাথ একান্তে ভাবে কবে আসবে সেই সুবর্ণসুযোগ।

গৌড়ের গৌরভক্তরা নীলাচলে চলেছে, তাদের সঙ্গ ধরা কত সহজ হত! কিন্তু তাদের পথ সকলের জানা, প্রহরীরা ঠিক ধরে আনত তাকে। এমন সুযোগ কি আসে না যখন অন্ধকারে পা-ঢাকা দিয়ে অজানা পথ দিয়ে চলে যাওয়া যায়?

চারদণ্ড রাত্রি বাকি আছে, একদিন মণ্ডপে যদুনন্দন আচার্য এসে হাজির।

যদুনন্দন রঘুনাথদের কুল-পুরোহিত, দীক্ষাগুরু অদ্বৈত প্রভুর মন্ত্রশিষ্য।

রঘুনাথের ঘুম ভেঙে গেল। যদুনাথকে দণ্ডবৎ করে দাঁড়াল নীরবে।

'আমার যে পুজুরী ছিল সে আর পূজো করতে আসছে না।' বললে যদুনন্দন, 'তুমি যদি তাকে বলে-কয়ে পাঠিয়ে দিতে পারো তবে ভালো হয়। সে ছাড়া আর ব্রাহ্মণ নেই।'

রঘুনাথ প্রহরীদের দিকে তাকাল। তারা সুখ-নিদ্রায় অচেতন।

রঘুনাথ বললে, 'বেশ তো, আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যাই।'

যদুনাথ ভাবলে, প্রহরী ছাড়া একাকী যাবারই অনুমতি চাইছে রঘুনাথ। বললে, 'যাও।'

রঘুনাথ গুরু-আজ্ঞায় আবৃত, নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ল। যদুনাথ কল্পনাও করতে পারল না, এই ছলনার সুযোগ নিয়ে রঘুনাথ নীলাচলে পালাবে।

প্রভুই তো শান্তিপুরে রঘুনাথকে বলেছিলেন, 'এখন ঘরে ফিরে যাও, অলিপ্ত হয়ে বিষয়কর্ম করো। আমি ইতিমধ্যে নীলাচল থেকে ফিরে আসি, তারপর কোনো ছলে তুমি আমার কাছে এসে হাজির হও। ভয় নেই, কৃষ্ণই সেই ছল রচনা করে দেবেন।'

ছলে বলে কৌশলে যে করে হোক পৌঁছুনো নিয়ে কথা।

পথ ছেড়ে উপপথ ধরল রঘুনাথ। গ্রাম ছেড়ে বনজঙ্গল। পথ যাই হোক, গন্তব্য চৈতন্যচরণ। গোপন পথ হলেও, পাছে প্রহরীরা ধরে ফেলে, ছুটে চলেছে। ত্বর সয় না, ছুটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

রঘুনাথ পালিয়েছে, রঘুনাথকে পাওয়া যাচ্ছে না—এদিকে রব উঠেছে বাড়িতে। খবর পেয়ে যদুনন্দন তো হতবাক। গোবর্ধন পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই নালাচলের পথে গৌড়ের ভক্তদের সঙ্গে ভিড়েছে। শিবানন্দকে পত্র দিয়ে লোক পাঠাল গোবর্ধন। দয়া করো, আমার ছেলেকে ফেরত পাঠিয়ে দাও।

ওদিকে পনেরো ক্রোশ হেঁটে সন্ধ্যাকালে এক গোয়ালার বাথানে এসে পৌঁচেছে রঘুনাথ।

'চোখমুখ শুকনো, সারাদিন কিছু খাও নি মনে হচ্ছে।' জিগগেস করল গোয়ালা, 'দুধ খাবে?'

রঘুনাথ হাসল।

গোয়ালা দুধ এনে দিল। তাই খেয়ে সারারাত বাথানে পড়ে রইল রঘুনাথ।

ভোরে উঠে, এতক্ষণ পুব দিকে যাচ্ছিল, রঘুনাথ দক্ষিণ দিকে চলল।

শিবানন্দের কাছে পত্র পৌঁছুল। কোথায় রঘুনাথ! কই আমাদের সঙ্গে আসে নি তো! কাকে ফেরাব ?

গোবর্ধনের লোকই ফিরে চলল।

আর ওদিকে রঘুনাথ সমানে হাঁটছে, হেঁটে চলেছে। কখনো চর্বণ, কখনো রন্ধন, কখনো দুগ্ধপান, কখনো বা নিরম্বু উপবাস। [illegible] অহোরাত্রের ক্ষুধা—একমাত্র চৈতন্যচরণ। [illegible] নিবৃত্তি হবে কবে ?

বারো দিন পরে—[illegible]নের মধ্যে তিন দিন শুধু ভোজন হয়েছে—[illegible]ষোত্তমে পৌঁছুল।

'এই যে রঘুনাথ [illegible]' উছলে উঠল রঘুনাথ।

'এসেছ ? এস।' [illegible]ঠে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, [illegible]পা সবচেয়ে বলিষ্ঠ। তোমাকে বিষয়কূপ [illegible] করে নিয়ে এল।'

রঘুনাথ বললে, 'আমি কৃ[illegible] জানি না, আমি শুধু তোমাকে জানি। তোমার কৃপাই আমাকে নিয়ে এল এখানে।'

'এর বাপ আর জেঠা,' সকলকে লক্ষ্য করে বললেন প্রভু, 'বিষয়বিষকেই সুখসেব্য বলে মনে করে। এদের অনেক দান ধ্যান, কিন্তু এদের কৃষ্ণকামনা নেই, নেই বা অনন্যা কৃষ্ণভক্তি। বিষয়ের এমনি স্বভাব, মানুষকে অন্ধ করে রাখে, এমন কর্ম করায় যাতে ভববন্ধন আরো দৃঢ় হয়। তোমাকে সেই বিষয় থেকে কৃষ্ণ উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। কিন্তু দেখেছ, ছেলেটার শরীর কি রকম কৃশ হয়ে গেছে, মুখখানি ম্লান। স্বরূপ, তুমি এর ভার নাও, একে তুমি তোমার ছত্র-ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করো। আজ থেকে এর নাম হল, 'স্বরূপের রঘুনাথ'।' বলে রঘুনাথের হাত ধরে স্বরূপের হাতে তুলে দিলেন।

স্বরূপ বললে, 'তাই হবে।'

প্রভু তারপর গোবিন্দকে বললেন, 'কতদিন উপবাসে থেকেছে, তুমি ভালো করে খাইয়ে এর তৃপ্তিবিধান করো।' রঘুনাথকে লক্ষ্য করলেন: 'তুমি যাও সমুদ্রস্নান সেরে জগন্নাথকে দর্শন করে এস।'

পাঁচদিন গোবিন্দের তত্ত্বাবধানে রইল রঘুনাথ। প্রভুর অবশেষ-পাত্র খেল পেট ভরে। ভাবল, এও তো সেই বাড়ির মত আদর যত্নেই আছি, দিব্যি মুখের কাছে অনায়াস খাবার এসে জুটছে। তবে তো সেই আত্মসুখস্পৃহাতেই আবদ্ধ রইলাম। না, ফিরিয়ে দিল গদাধরকে, বললে, 'ভিক্ষে করে খাব।'

ভিক্ষার্থী হয়ে মন্দিরের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়াল রঘুনাথ। যদি কিছু জোটে খাব, না জোটে তো থাকব উপোস করে। আর সর্বক্ষণ নামকীর্তন করব।

গোবিন্দ প্রভুকে গিয়ে বললে, 'রঘুনাথ আর খাচ্ছে না আমার থেকে। সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা মেগে খাচ্ছে।'

এই তো নিষ্কিঞ্চন বৈরাগীর লক্ষণ। প্রভু বললে, 'বা খুব ভালো করছে।'

যে বৈরাগী সে অবিচ্ছেদে নামকীর্তন করবে। আহারের জন্যে উদ্বিগ্ন হবে না, সঞ্চয়—সংস্থান কিছু করবে না। ভিক্ষে করে যেটুকু পায় তা দিয়েই দেহরক্ষা করবে, দেহরক্ষা না হলে ভজনকীর্তন হবে কিসে ? ভিক্ষান্নেই অহঙ্কারমুক্ত, ভিক্ষান্নেই কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদগন্ধ।

> 'বৈরাগী করিব সদা নামসঙ্কীর্তন।
> মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
> বৈরাগী হইয়া যেবা করে বারাপেক্ষা।
> কার্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
> বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
> পরমার্থ যায় তার, হয় রসের বশ॥
> বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসঙ্কীর্তন।
> শাকপত্র ফলমূলে উদর-ভরণ॥
> জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
> শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥'

একদিন স্বরূপকে ধরল রঘুনাথ। বললে, 'বলুন আমার কী কর্তব্য। প্রভু আমাকে ঘর ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন, তাঁর উদ্দেশ্য কী ?'

প্রভুকে বিশেষ সম্ভ্রম করে, তাই সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হয়। স্বরূপকে দিয়ে বলে পাঠাল। স্বরূপ বললে, 'রঘুনাথ জানতে চেয়েছে কী তার করণীয়।'

রঘুনাথকে ডেকে পাঠালেন প্রভু। বললেন, 'স্বরূপকে তোমার উপদেষ্টা করে দিয়েছি, ওর কাছ থেকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিখে নাও। ও যত জানে আমার তত জানা নেই। তবু আমার বাক্যে যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তোমাকে বলি, কখনো গ্রাম্যবার্তা

শুনবে না, কখনো বলবেও না। ভালো খাবার-পরবার লোভ করবে না। অমানীমানদ হয়ে সর্বদা কৃষ্ণনাম নেবে আর মানসব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করবে। আমি সংক্ষেপে বললাম, বিশদ-বিশেষ জেনে নেবে স্বরূপের থেকে।'

'গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানীমানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥'

গৌড়ভক্তেরা এসে পড়েছে, পূর্ববৎ সুরু হল আনন্দলীলা।

শিবানন্দ রঘুনাথকে বললে, 'তোমার বাবা তোমার সন্ধানে লোক পাঠিয়েছিল, আমরা তাদের ফিরিয়ে দিলাম। বললাম, রঘুনাথ আমাদের সঙ্গে আসে নি। কোথায় আছে কী করে বলব। তুমি যে আগে থেকেই এখানে চলে এসেছ তা কে জানে?'

উৎসবান্তে, চার মাস পরে, গৌরভক্তেরা গৌড়ে ফিরে এল। তাদের কাছে যদি খবর পাওয়া যায় সেই আশায় শিবানন্দের কাছে লোক পাঠাল গোবর্ধন।

'গোবর্ধনের ছেলে রঘুনাথকে কি নীলাচলে দেখলেন?'

'দেখলাম বৈ কি। প্রভু তাকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।'

'সে কি বাড়ি ফিরবে?'

'মনে হয় না।' বললে শিবানন্দ, 'তাকে বৈরাগ্য আচ্ছন্ন করেছে। তার ভক্ষ্যে পরিধানে দৃষ্টি নেই। দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলির পর সে সিংহদ্বারে এসে দাঁড়ায়, যদি কেউ ভিক্ষে দেয় তো খায়, না দেয় তো খায় না, উপোস করে থাকে।'

গোবর্ধন শুনল সব বিবরণ। বেঁচে আছে এতে তার আনন্দ কিন্তু আর যে ফিরবে না এটাই দুর্বিষহ যন্ত্রণা।

ছেলের পরিচর্যার জন্যে চাকর আর টাকা পাঠাতে মনস্থ করল গোবর্ধন। শিবানন্দ বললে, 'এখন কোথায় যাবে, কার কাছে পৌঁছুবে ঠিক নেই। এখন থাক, পরের বছর আমি যখন যাব তখন সঙ্গে দিয়ে দেবেন।'

তাই ভালো। পরের বছর গৌড়ভক্তরা যখন যাচ্ছে তখন শিবানন্দের সঙ্গে গোবর্ধন লোক আর টাকা পাঠিয়ে দিল। লোক বলতে দুই চাকর এক ব্রাহ্মণ আর টাকা চার শো মুদ্রা।

যথারীতি পৌঁছুল সকলে নীলাচলে। রঘুনাথের সাক্ষাৎ পেল। এই নাও, এই সব আরাম-সম্ভার তোমার বাবা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রঘুনাথ সমস্ত অগ্রাহ্য করে দিল।

ব্রাহ্মণ আর ভৃত্য দেশে ফিরল না, নীলাচলেই অপেক্ষা করতে লাগল।

রঘুনাথ ভাবল, তবে এক কাজ করি। বাবার দেওয়া টাকা থেকে মহাপ্রভুকে মাসে দু'দিন মহাপ্রসাদ খাওয়াই।

গৌরহরি নিমন্ত্রণ নিতে রাজি হলেন। মাসে দু'দিন।

দু'দিনের মহাপ্রসাদ কিনতে আটপণ মাত্র কড়ি লাগে। সেই মাত্র আটপণ কড়িই রঘুনাথ. বাবার ভৃত্যদের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। কদাচ এক কড়ি বেশি নয়। অর্থাৎ এক কপর্দকও নিজের জন্যে নয়। যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেইটুকু, তাও প্রভুর জন্যে। তাও এক মাসে আট পণ্ডা।

টানা দু'বছর এ ভাবে প্রভুর সেবা করল রঘুনাথ।

তারপর হঠাৎ একদিন নিমন্ত্রণ বন্ধ করে দিল।

'কী ব্যাপার?' স্বরূপকে জিগগেস করলেন প্রভু, 'রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করল কেন?'

স্বরূপ বললে, 'রঘুনাথের মনে একটি বিচার উপস্থিত হয়েছে, তাই বন্ধ করেছে নিমন্ত্রণ।'

'কী বিচার?'

'বিষয়ীর দ্রব্য দিয়ে প্রভুকে সেবা করছি এতে প্রভুর মন নিশ্চয়ই প্রসন্ন নয়। এতে আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর তো কোনোই ফল দেখছি না। রঘুনাথ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে মহাপ্রসাদ দিচ্ছে—শুধু এই অহঙ্কার দিয়ে কী হবে? আমার প্রার্থনা না মানলে আমি দুঃখ পাব তারই জন্যে প্রভু নিমন্ত্রণ নিতে রাজি হয়েছিলেন—কিন্তু এতে তাঁরও প্রসন্নতা নেই আর আমার মনও মালিন্যময়।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়। আর মলিনচিত্তে কৃষ্ণস্মৃতি স্ফুরিত হয় না। বিষয়ীর হচ্ছে রাজস-নিমন্ত্রণ। দম্ভ আর প্রতিষ্ঠা লোভই এই নিমন্ত্রণের হেতু। এতে দাতা-ভোক্তা দুয়েরই সঙ্কোচ ঘটে। আমি যে এতদিন রঘুনাথের নিমন্ত্রণ নিয়েছি তার কারণ ওকে দুঃখ দিতে

াই নি। ও যে নিজের থেকে বুঝেছে, নিজের ইচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে, এই আমার আনন্দ।'

রঘুনাথ তারপর সিংহদ্বারও ছেড়ে দিল, ছত্রে গিয়ে ভিক্ষে করতে লাগল।

'হ্যাঁ হে, রঘুনাথ নাকি ভিক্ষের জন্যে আর সিংহদ্বারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না?' প্রভু জিগগেস করলেন স্বরূপকে।

'কে দেবে, কে না দেবে, এই আশা-নিরাশায় চিত্ত চঞ্চল হয়ে থাকে বলে দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছে।'

'ঠিক করেছে।' প্রভু সমর্থন করলেন: 'সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। ছত্রে যথালাভ উদরভরণ অনেক ভালো। সেখানে আর মনে-মনে আশায়-নিরাশায় আন্দোলিত হওয়া নেই, তদ্‌গত মনে সুখে কৃষ্ণকীর্তন করতে পারবে। স্বরূপ, এই শিলা আর মালা নিয়ে যাও, রঘুনাথকে দিও।'

শঙ্করারণ্য সরস্বতী গোবর্ধনের শিলা আর গুঞ্জামালা নিয়ে এসেছিল বৃন্দাবন থেকে। প্রভুকে উপহার দিয়েছিল। লীলাস্মরণের সময়ে ঐ মালা প্রভু গলায় পরতেন আর ঐ শিলা কখনো মাথায় রাখতেন, কখনো বুকে, কখনো তার ঘ্রাণ নিতেন আর কখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে চোখের জলে তাকে স্নান করিয়ে দিতেন। এ তো সামান্য শিলা নয়, এ আমার কৃষ্ণকলেবর। তিন বছর এই শিলা-মালা ধারণ করেছেন, আজ তা রঘুনাথকে দিয়ে দিলেন।

বললেন, 'রঘুনাথ, এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ, এর তুমি সাত্ত্বিক পুজো কর। একপাত্র জল নাও আর নাও আটটি তুলসীমঞ্জরী, তাই দিয়ে তুমি শুদ্ধভাবে, শ্রদ্ধায়, নিবেদন করো শিলাকে, তুমি অচিরেই কৃষ্ণ-প্রেমধন পেয়ে যাবে।'

স্বরূপই সব জোগাড় করে দিল। শিলার বসবার জন্যে একখানি পিঁড়ি, আচ্ছাদনের আধ হাত বস্ত্র আর জলের জন্যে একটি কুঁজো।

প্রাণ-মন ঢেলে পুজো করতে লাগল রঘুনাথ। এ আর কেউ নয়, প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্ধন-শিলা। যতই প্রভুর এই করুণার কথা ভাবে ততই রঘুনাথ প্রেমাশ্রুতে ভেসে যায়। এই জল-তুলসীর পূজায় যত সুখ তত সুখ তো সাড়ম্বর ষোড়শোপচার পূজায় নেই। আর এ শিলা কোথায়, স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন এসে দাঁড়িয়েছে।

স্বরূপ বললে, 'আট কড়ির খাজা সন্দেশ নিবেদন করো শিলাকে। যদি শ্রদ্ধা করে দাও সেই খাজা সন্দেশই অমৃতের সমান হয়ে উঠবে।'

স্বরূপের আদেশে গোবিন্দই নিয়ে আসছে সেই খাজা সন্দেশ। রাজৈশ্বর্যে পালিত রঘুনাথ সর্বস্ব-ত্যাগের পরমদৈন্যে সেই খাজা সন্দেশ দিয়েই বিগ্রহের ভোগ দিচ্ছে।

আর শুধু কৃষ্ণ কোথায়? সঙ্গে যে রাধাঠাকুরাণী। শিলা দিয়ে প্রভু আমাকে গিরিগোবর্ধনের চরণে সমর্পণ করলেন আর গুঞ্জামালা দিয়ে রাধিকার চরণে। প্রভু তাই যুগলকিশোরেরই ভজনা করতে বলছেন।

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ হল। প্রভুই তো আমার যুগলকিশোর!

কী কঠিন নিয়মে বন্দী রঘুনাথ। কোথাও এতটুকু সময় ভঙ্গ নেই, নেই ছন্দচ্যুতি। 'রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।' পাষাণের রেখা যেমন নিটুট তেমনি রঘুনাথের নিয়মনিষ্ঠাও অভঙ্গ। দিন রাত্রির আটপ্রহরের মধ্যে সাড়ে সাত প্রহরই সে ভজন করে, আহার ও ঘুমের জন্যে বরাদ্দ মোটে চারদণ্ড। কোনো কোনো দিন ভজন-আবেশে সে এত তন্ময় হয়ে যায়, আহার-নিদ্রার অবকাশই থাকে না।

জিহ্বাকে কোনোদিন রসস্পর্শ দিল না, ছেঁড়া কাঁথা-কানি ছাড়া কিছু ঠেকাল না গায়ে, আর আহার শুধু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। ভালো না-খাওয়া আর ভালো না-পরার আদেশ রাখল প্রাণপণে। আর সর্বক্ষণই নিজেকে নির্বেদ-বচন শোনাচ্ছে। হায়, আমি দারুণ হতভাগ্য, আমি নিজের স্বরূপ ভুলে দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করছি। এখনো আমি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করছি, এখনো আমার অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন! ঘুরে ফিরে আমারও এখন সেই আত্মসেবা!

যে জ্ঞানদুতাশয়, অর্থাৎ জ্ঞানবলে যার বাসনা নাশ হয়েছে, সে নিজেকে দেহ থেকে ভিন্ন বলে জেনেছে, সে কিসের আশায় কোন অভিসন্ধিতে দেহে আসক্ত হয়ে দেহকে পোষণ করে বেড়াবে?

কয়েকদিন পরে রঘুনাথ ছত্রে গিয়ে মেগে খাওয়াও ছেড়ে দিল। এতেও পরাপেক্ষা আছে। কতক্ষণে ছত্রের মালিক বা মালিকের কর্মচারী ভিক্ষান্ন নিয়ে

আসে তারই জন্যে থাকতে হয় উৎকণ্ঠিত হয়ে। সুতরাং সেই চাঞ্চল্যভোগও বিসর্জন দাও।

রঘুনাথ ফেলে-দেওয়া বাসি পচা প্রসাদান্ন খেতে লাগল কুড়িয়ে।

আনন্দবাজারে প্রসাদান্ন সমস্তই রোজ বিক্রি হয় না। বাসি অন্নও থেকে যায় কিছু-কিছু। দু'-তিন দিনের বাসি হয়ে গেলে সে অন্ন আর কেউ কেনে না। তখন সে পচা দুর্গন্ধ অন্ন গরুর সামনে ফেলে দেয়। অনেক সময় অন্নের এমন দুরবস্থা, গরুও তা মুখে তোলে না। সেই গলিত প্রসাদান্নই রঘুনাথ মাটি থেকে ঘরে তুলে নিয়ে আসে, জল দিয়ে ধুয়ে গলিতাংশ বাদ দিয়ে শক্ত-শক্ত ভাত ক'টি নুন মেখে খায়।

প্রসাদ কি কখনো পচে না দুর্গন্ধ হয়? প্রসাদ তো চিদবস্তু। সে বাসিও হয় না, বিকৃতও হয় না। সে চিরন্তন অমৃতস্বরূপ হয়ে থাকে। আগুন কি কখনো ঠাণ্ডা হয়? তুষার কি কখনো উষ্ণ হয়? তেমনি প্রসাদও তার ধর্ম ছাড়ে না, সে চিরকাল অবিকৃত থাকে। প্রাকৃত লোকের দৃষ্টি বিচারেই প্রসাদকে বাসি দেখায়, গলিত দেখায়। প্রাকৃত চক্ষুতে চিন্ময় ভগবদ বিগ্রহকেও যেমন দেখায় সামান্য প্রতিমা। চিন্ময় বৃন্দাবনকে সামান্য তীর্থ। তাই প্রাকৃত জনের কাছে যাই হোক, রঘুনাথের কাছে এ প্রসাদ বাসিও নয়, বিকৃতও নয়—অপূর্ব সাত্বিক সম্পদ।

একদিন স্বরূপ দেখতে পেল রঘুনাথের প্রসাদ খাওয়া।

'বা, আমাকে কিছু দাও।' স্বরূপ হাত বাড়াল। খেয়ে বললে, 'তুমি রোজ-রোজ এই অমৃত খাও, আমাদের দাও না কেন? এ তোমার কেমন স্বভাব?'

গোবিন্দের কাছ থেকে প্রভুও জানতে পেলেন।

'সে কী?' নিজেই চলে এলেন রঘুনাথের কাছে: 'নিজেরা লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছ, আমাকে ভাগ দিচ্ছ না কেন?' বলেই ত্বরিতে একগ্রাস মুখে পুরলেন

আরো এক গ্রাস নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন, স্বরূপ বাধা দিল। বললে, 'না, এ তোমার যোগ্য নয়।

প্রভু বললেন, 'কী যে বলো তার অর্থ নেই। কত প্রসাদ খেয়েছি এমন সুস্বাদু প্রসাদ আর কখনো খাই নি।'

রঘুনাথের বৈরাগ্যে প্রভুর অশেষ সন্তোষ।

আমি কুজন, পতিত ও ঘৃণিত, গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু গ্রন্থে বলছে রঘুনাথ, তবু আমাকে যিনি ভোগসুখের দাবানল থেকে কৃপা করে উদ্ধার করলেন, নিজের বুকের প্রিয় গুঞ্জাহার আর গোবর্ধনশিলা দিয়ে দিলেন উপহার, সঁপে দিলেন স্বরূপগোস্বামীর হাতে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে আনন্দময় হয়ে বিরাজ করুন।

রঘুনাথ আর কা করে? রাত্রিকালে সকলের অগোচরে প্রভুর পদসেবা করে, লীলাবেশে প্রভু যখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন তখন করে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ। ষোল বছর সমানে সে এই অন্তরঙ্গ সেবা করে এসেছে। স্বরূপের অন্তর্ধান হলে বৃন্দাবন চলে এল। ঠিক করল রূপ আর সনাতনকে দর্শন করে গোবর্ধন পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব।

রূপ সনাতনের সঙ্গে দেখা হতেই তারা তাকে আটকে রাখল, মরতে দিল না। বললে, তার চেয়ে আমাদের কাছে প্রভুর লীলাবিহার বর্ণনা করো। এত দিন তাঁর সঙ্গ করলে, শোনাও তাঁর সে-সব চিত্তচমৎকার কাহিনী।

তাই ভালো। তাই বলি।

অন্নজল ত্যাগ করল রঘুনাথ, ত্যাগ করল অন্য কথন। আর গ্রাম্যবার্তা নয়, শুধু গৌরবার্তা। তিন ছটাক মাঠাই তার সারা দিনের আহার। প্রত্যহ নাম করে এক লক্ষ, দণ্ডবৎ এক হাজার। আর বৈষ্ণবদের উদ্দেশে দুই সহস্র প্রণাম। আর রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের মানসসেবা। রাধাকুণ্ডে তিনসন্ধ্যা স্নান, আর ব্রজবাসী বৈষ্ণব দেখলেই আলিঙ্গন। দিবারাত্রির আট প্রহরের মধ্যেই সাড়ে সাত প্রহরই ভজন আর চারদণ্ড মাত্র নিদ্রা—তা-ও সব দিন নয়। যেদিন লীলাবেশে মত্ত থাকে সেদিন তার ঘুমই ঘুম যায়।

কিন্তু এবার কে এল নীলাচলে?

এ যে কাশীর সেই বল্লভ ভট্ট। কী চায়? কী বলে?

[ক্রমশ।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী

ষষ্ঠোঽনুবাক

অসন্নেব স ভবতি·····তৎসত্যমিত্যাচক্ষতে।
তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি।

যে মনে করছে ব্রহ্ম অসৎ
নিজে সেও জেনো মিথ্যা।
যে জানে হৃদয়ে, ব্রহ্ম সত্য,
জ্ঞানীরা তাকেই সত্যস্বরূপ বলে।

'অসঙ্গ সেই জ্ঞানের আত্মা,'—এ-কথা শ্রবণ করে, শিষ্য প্রশ্ন করছে—

মৃত্যুর পরে আনন্দ-লোকে,
অবোধ কি যেতে পারে?
না কি পারে না?
জীবনাবসানে,—(আত্মসাধনে)
জ্ঞানীই কি লাভ করে,—
সে মহাসত্য চির আনন্দ,—
সে পরম আত্মাকে?—
না কি করে না?—

(শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরদানের জন্যে ভূমিকা করছেন গুরু)—

বহু হব আমি,—জন্ম লভিব, নানা রূপে-রূপে,—
কোটি বিচিত্র জীবনে,—
এই হোল তাঁর কামনা।
এই কামনায় তপ করলেন তিনি।
তপ করে করলেন,—
এই চরাচর সৃষ্টি।
সৃষ্টি করে, তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করলেন।
প্রবেশ করে তিনি এই সমস্তই হলেন।
(কার্যকারণে ভেদ রইল না আর)
এই সৃষ্টিকে সব দিক্ দিয়ে,
ব্যাপিয়া সর্বরূপে।—
বিরাজ করেন তিনি।—
এই যত কিছু দৃশ্য এবং অদৃশ্য রূপরাশি,
এই যাহা কিছু অমূর্ত আর মূর্ত;
কথিত এবং অকথিত ভাব,—
অনাশ্রয় আর আশ্রয়,—
এই যাহা কিছু (সাধারণভাবে) সত্য এবং মিথ্যা,—
সকলি তাঁহাতে পূর্ণ।
যাহা কিছু আছে সকলি ব্রহ্মময়।
ব্রহ্মবাদীরা তাই তাঁর নাম
'সত্য' বলিয়া জানে।
এ-বিষয়ে জেনো, আর একটি শ্লোক আছে।

সপ্তমোঽনুবাক

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ।·····
ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি। যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি।

আগে এ জগৎ অসৎরূপেই ছিল।—
অসৎ হইতে সত্য জন্ম নিল।—
অসৎ হইতে সত্যে তাঁহার (প্রকাশের চিরলীলা!)
নিজেই নিজের রূপকার,
তাই 'সুকৃত' তাঁহার নাম।
যিনি সুকৃতম, তিনিই পরম রস।
সেই রসভরে এই জীবকুল
চির আনন্দে মগ্ন।
(রয়েছেন তিনি, আকাশে বাতাসে,
অণুতে অণুতে লিপ্ত)
আনন্দরসে,—মর্মে মর্মে,—
এ আকাশ আছে সিক্ত।
না হলে কেই বা প্রাণে ও অপানে,
শ্বাসে প্রশ্বাসে বাঁচত!

(তিনি রসস্বরূপ বলেই জীবের জীবনে আনন্দ আছে। সেই পরম রসের ক্ষুদ্র, বৃহৎ, তুচ্ছ, মহৎ, শোক, দুঃখ, আশা, আনন্দ বিভিন্ন উপলব্ধিতে জীবের বিচিত্র সুখ।)

(ব্রহ্ম সত্য,—রয়েছেন তিনি! কারণ)
সাধক যখন অভীক চিত্তে নিজেকে স্থাপিত করে,
বচনাতীত আশ্রয়াতীত অভয় ব্রহ্মমাঝে,—
পরম অভয় চিত্তে গ্রহণ করে,—
তখনি সে হয় পূর্ণ ব্রহ্মভাবে।
দ্বিতীয়বিহীন সর্বব্যাপী অভয় ব্রহ্মমাঝে,
মুগ্ধ অবোধ অবিবেকী জীব যখনি করেছে,
বিন্দুও ভেদ কল্পনা,—
তখনি তাহার হয়েছে মৃত্যুভয়।
মননবিহীন ভেদদর্শীর কাছে,
অভয় ব্রহ্ম ভয়ের মতন লাগে।
এ-বিষয়ে আরো একটি শ্লোক আছে। ২।৭

[ক্রমশ।

অনুবাদিকা—চিত্রিতা দেবী

পৃথিবী বিখ্যাত জ্যামিতিক

ইউক্লিড

তীরন্দাজ

ইউক্লিড

মানব-সভ্যতার বিকাশ যেমন সর্বত্র সমানভাবে হয় নি, তেমনি কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতিও দীর্ঘদিন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত রাখতে পারে নি। তার কারণ, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রাচীন পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের একাধিক পীঠস্থান আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন, কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় নবীনতর নগর বা দেশ প্রতিযোগিতায় তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

প্রাচীন ভারতে যেমন ছিল নালন্দা, তক্ষশিলা এবং বারাণসী—পশ্চিমেও তেমনি ছিল যথাক্রমে এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া এবং রোম। পাশ্চাত্যের তিনটি স্থানের মধ্যে প্রথম দু'টি অর্থাৎ এথেন্স এবং আলেকজান্দ্রিয়া কার্যত একই জ্ঞানবৃক্ষের দু'টি মূল ছিল বলা চলে, অর্থাৎ গ্রীক। এথেন্সে চলতো প্রধানত দর্শন এবং সাহিত্যের চর্চা আর আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রধানত চলতো ব্যবহারিক বিষয়বস্তুর চর্চা। যার বেশির ভাগই আজকের দিনে 'বিজ্ঞান' হিসেবে আখ্যালাভ করেছে। আমাদের বর্তমানে আলোচ্য ইউক্লিডের কর্মস্থানও ছিল এই আলেকজান্দ্রিয়া।

বিশ্ববিখ্যাত বিজয়ী-বীর আলেকজান্দার খৃঃ পূর্ব ৩৩২ সালে বিজিত মিশরে ভূমধ্যসাগরের কূলে নিজের নামানুসারে এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। কি স্থলপথ, কি জলপথ উভয় দিক দিয়ে যাতায়াতের সহজ উপায় ছিল বলেই অল্পকালের মধ্যেই আলেকজান্দ্রিয়া সে যুগের পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি অদ্বিতীয় হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এথেন্স নিভে আসবার পূর্বেই আলেকজান্দ্রিয়ার এই যে প্রতিষ্ঠা এর মধ্যে একটা নতুন দিকও ছিল। ত' হলো এই বন্দর নগরটির আন্তর্জাতিক চরিত্র। এথেন্স যেমন ছিল সর্বৈব গ্রীক, আলেকজান্দ্রিয়া ঠিক তেমনি ছিল গ্রীক ভাষার আশ্রয়ে সারা বিশ্বে জ্ঞানের আলো আদান-প্রদানের কেন্দ্র। এথেন্স ছিলো প্রধানত গ্রীসের একান্ত নিজস্ব মননশীল সৃজনী প্রতিভার প্রকাশক্ষেত্র। আর আলেকজান্দ্রিয়াতে মূলত যে গ্রীক প্রতিভাই পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে ভাবধারণার আদান-প্রদানের সুযোগ পেয়ে একটা নতুন সভ্যতার পত্তন করেছিল বলা চলে। এ সভ্যতাকে গ্রীক বললে যেমন একেবারে ভুল বলা হয় না, তেমনি আলেকজান্দ্রিয় বললেও তেমন কিছু বাড়িয়ে বলা হয় না। আলেকজান্দ্রিয় বলতে প্রাচীন যুগের আন্তর্জাতিকতার চরম প্রকাশ বোঝাত সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু জনবসতির দিক দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া প্রধানত তিনটি জাতির মিলিত নগরী ছিল বলা চলে। সে তিনটি জাতি হলো যথাক্রমে গ্রীক, ইহুদী এবং মিশরীয়।

আলেকজান্দার দেহত্যাগ করেন খৃঃ পূর্ব ৩২৩ সালে, অর্থাৎ এই নগরীর প্রতিষ্ঠার মাত্র নয় বৎসর পরে। আলেকজান্দারের দেহত্যাগের পরে নানা দেশে তাঁর অধিকৃত দেশগুলির বেশির ভাগই কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে এবং বিভিন্ন দেশে প্রধানত স্থানীয় সেনাপতি-গণের মধ্যেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য বাঁটোয়ারা হয়ে যায়। আলেক-জান্দ্রিয়া সহ মিশরের বিরাট অংশটি অধিকার করে নিয়েছিলেন আলেকজান্দারের অন্যতম প্রধান সেনাপতি টলেমী (প্রথম)।

জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্যে আলেকজান্দ্রিয়ার যে প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি তার পেছনে প্রথম টলেমীর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ এই টলেমীই আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত মিউজিয়ম ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মিউজিয়মটি থেকেই পরবর্তীকালে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই একদিকে সে যুগের পৃথিবীতে সমস্ত সভ্যদেশ থেকে ছাত্র আসতো অধ্যয়নের সুযোগ পাবার আশায়। অন্যদিকে আবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিদ্যাচর্চার এমন একটা আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, দর্শন এবং বিজ্ঞানের নানা বিভাগের শিক্ষকতার জন্যেও বলতে গেলে ইয়োরোপ, উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সেরা অধ্যাপকগণের একটা বড়ো অংশ আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে যে, সেই সুদূর অতীতকালেও প্রায় ৭,৫০,০০০ বই সংগৃহীত হয়েছিল এই নগরের লাইব্রেরীতে। সে যুগের বই মানে প্যাপিরাসের রোল।

আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে কখনো যুক্ত ছিলেন এ রকম যে সমস্ত জ্ঞানীগুণিগণ পরবর্তীকালে অমর হয়েছেন তাঁদের কীর্তির জন্যে তাঁদেরই অন্যতম হলেন ইউক্লিড। ইউক্লিড জাতিতে ছিলেন গ্রীক। ইউক্লিডের জীবনের প্রথম চল্লিশটা বছর স্বদেশের রাজধানী এথেন্সেই কেটেছিল বলে জানা যায়। আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকগণের অন্যতম ছিলেন এই ইউক্লিড। অনেকের মতে ইউক্লিডই ছিলেন

আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান ব্যবস্থাপক। প্রাচীন পৃথিবীতে ইউক্লিডই সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদ ছিলেন কি না সে বিষয়ে সকলে একমত নন, যদি শুধু জ্যামিতির দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ যে কেউই ছিলেন না একথা সে সময়ে, তারপরের দু'পাঁচশ' বছর পরে এমন কি আজকের দিনেও সকলে স্বীকার করে থাকেন।

অধ্যাপনার সময়ে ছাত্রদের সঠিকভাবে জ্যামিতির বিষয়বস্তুটি কি ভাবে বোঝানো যায় এটা জ্যামিতির প্রত্যেক অধ্যাপকেরই একটা দুর্ভাবনার বিষয় ছিল সে যুগে; কারণ সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক বলতে যা বোঝায় তা যেমন ছিল না কিছু তেমনি বিষয়টিও এতই দুরূহ ছিল যে, অনেক প্রবীণ অধ্যাপকও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুরুদ্ধ হয়েও জ্যামিতির কোনও পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব নিতে রাজী হন নি। কিন্তু নিজের বিষয় সম্পর্কে ইউক্লিড এতই আস্থা রাখতেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় জ্যামিতির একখানা পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

জ্যামিতিশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল অবশ্য ইউক্লিডেরও কয়েক হাজার পূর্বে—সেই সুদূর ব্যাবিলন ও প্রাচীন মিশরের গৌরবময় যুগে। কিন্তু সেই সময় থেকে কয়েক হাজার বছর এই শাস্ত্র ছিল ব্যক্তিবিশেষের অধিকারের বিষয়। অর্থাৎ কেউ কেউ বহু ইচ্ছা, আগ্রহ এবং অধ্যবসায়ের ফলে এই শাস্ত্র কোনও প্রকারে আয়ত্ত করতে পারলেও তাঁরা সে জ্ঞান যেভাবেই হোক না কেন তাঁদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন—কদাচ অপরে শিখে নিতে পারে এমন কিছু করতেন না—অর্থাৎ অপরের শিক্ষার সুযোগ করে দিতেন না। চলছিল এইভাবেই, ইউক্লিডই সর্বপ্রথম এই দুরূহ শাস্ত্রটিকে পাঠ্যপুস্তকের সূত্রাবলীর মধ্যে বন্দী করে সাধারণের আয়ত্ত করবার পথ সুগম করে দিলেন।

ইউক্লিডের বইয়ের ইংরেজী নাম Elements of Geometry. Elements-এর প্রথম থেকে ষষ্ঠ ভাগে প্লেন জিওমেট্রির সূত্র শিক্ষা করবার পদ্ধতি রয়েছে; পঞ্চম ভাগে অনুপাত প্রোপোরশনও রয়েছে। সপ্তম, অষ্টম এবং নবম ভাগে রয়েছে পরিমাণ বিষয়ক সূত্রাবলী এবং দশম থেকে ত্রয়োদশ ভাগে রয়েছে সলিড জিওমেট্রির সূত্রাবলী।

প্রায় আট-নয় শত বছর আলেকজেন্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নামডাক এবং প্রতিষ্ঠা অম্লানভাবেই চলেছিল কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর অনেক জায়গার মতো আলেকজান্দ্রিয়াতেও নেমে আসে অন্ধকার। ক্রমে আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানীগুণিগণ যথোপযুক্ত সমাদরের অভাবে এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিদায় নিতে লাগলেন। নতুন প্রতিভার বাইরে থেকে আগমনও কার্যত বন্ধ হয়ে গেলো—কারণ ইসলামের জ্ঞানের পরে বিজ্ঞানের বা অন্য কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভূত হতো না।

ইসলামের যে প্রধান দেশ অর্থাৎ আরব—সেখানে কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক দিক বিশেষ করে অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট চর্চা হতো। ইসলামের আবির্ভাবের পরে সেখানেও কার্যত অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। ইসলামের এ অন্ধকারের প্রভাব কাটিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞানভাণ্ডারকে সাত-আট শ' বছর আত্মগোপন করেই থাকতে হয়েছিল। তারপর মধ্যযুগে আবার নতুন করে ইউক্লিডের সূত্রাবলী ইয়োরোপে প্রচারিত হলো।

ইউক্লিডের সূত্রাবলী ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে। ইংরেজী ভাষায় এ রচনার প্রথম প্রকাশলাভ করে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে—স্যার হেনরী বিলিংগসলীর এ অনুবাদের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

শান্তির ঘুম

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

পৃথিবীর করুণ মাটির মতো
উজ্জ্বল এক কামনায়
একাগ্র কান-পাতা ছিলো:
কিংবা হলুদ প্রজাপতির
ডানার—ছায়ায়
পরম শান্তির ঘুম
চেয়েছিলো
পৃথিবীর মানুষ।
কিন্তু সে মাটিতে দুর্বার
পাশব শক্তি
কেড়ে নেয় শান্তির ঘুম।
অশ্রুস্নাত আঁখি
সততার ঢেউ তুলে যায়
শান্ত সমুদ্র বক্ষে
উদ্বেল জলে ধারায়—
মনে হয়
সেই-ই আগামী দিনের শান্তির ব্যঞ্জনা।

এ রাত তোমার নামে

গোবিন্দ হালদার

এ রাত তোমার নামে জেগে জেগে গান লিখে যাই:
নক্ষত্রের লিপি দিয়ে যদি তার কথা বোনা যায়—
সাগর কল্লোল তার সুর হ'লে কেমন শোনায়
মিলন রাগিণী নয়, বিচ্ছেদের করুণ শানাই।

এ রাত জাগার স্বপ্ন: এই রাত কবিতা লেখার
যে আসবে না কোনদিন শুধু তার পদধ্বনি শোনা—
হাওয়াদের শব্দ পেলে অকারণে মিছে কাল গোণা,
হারানো স্মৃতির ঘরে মৃত সব মমিকে দেখার।

এ রাত একাকী আমি অন্ধকার সঙ্গী শুধু যার—
অনিদ্র সাগর আছে বক্ষে মোর অতলান্ত সুর:
রাতের নক্ষত্র সব শব্দ হ'লে আমার ভাষার
তোমার হৃদয়ে তারা কোনদিন হবে কি বিধুর?

এ রাত তোমার নামে জেগে তাই গান লিখে যাই:
মিলনের রাগে নয়, বাজে সেথা করুণ শানাই।

আঁদ্রে জিদের সংগে

লেয়ঁ পিয়্যার-কঁ্যা

প্রচণ্ড শীত। দুর্গম বেন্ট কারী পথ। রাস্তা সারাবার দিকে মালিকের কোন মনোযোগ নেই।·· আমি 'মঁমরামি'-র দিকে চলছি। দূর থেকে বাড়ির জানালাগুলোকে মনে হচ্ছিল চিলেকোঠার জানালার মত···যেন সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গিয়েছে। পরিত্যক্ত একটি বাগানের খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাড়ির এমন কি হল-ঘরের দরজাও খোলা।··দূর থেকে একটি আদেশব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর ভেসে এল—'দরজা বন্ধ করে দাও। আমি এখুনি আসছি।'

একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন—গায়ে ওভারকোট, মাথায় টুপি।

আমি—'আপনি কি বেরিয়ে যাচ্ছেন'

—'না, আমার 'ফ্লু' হয়েছে।'

তৎক্ষণাৎ তিনি আমায় সাদর অভ্যর্থনা করে বললেন—'আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম'।

রাত আটটা। সকালে টেলিফোনে তাঁর কম্পিত কণ্ঠস্বর তখনও কানে বাজছিল—'কি ব্যাপার? কি চাই?'

ঘরের এককোণে আগুন জ্বলছে। জিদ মাঝে মাঝে আগুনের কাঠগুলো ঠিক করে দিচ্ছেন। ঘরটা এত বড় যে, ঐ আগুনেও যথেষ্ট গরম হয় নি। স্বল্পালোকে ঘরের সিলিং বা দেয়াল-কাগজগুলোও ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। মেঝেতে কার্পেট নেই—সর্বত্র পাথর। এককোণে একটি খেলবার টেবিল—তার ওপর জিদ্ নোটবই ইত্যাদি রেখেছেন। টেবিল আর আগুনের মাঝখানে দু'টি চেয়ার। 'Si Le Grain ne meurt' গ্রন্থখানির সমালোচনা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে লাগলাম।

ঘণ্টা বাজল। জিদ আবার পরিব্রাজকের টুপি আর কোটটা পরে দরজা খোলবার অভিযানে চললেন। না, কোন পরিচারক নয়—তাঁর ভাই আর মার্ক। ওঁরা চা তৈরি করছেন। মার্ক খাতা-পত্তর সরিয়ে রেখে চায়ের কাপগুলো টেবিলের ওপর রাখলেন। নোটবইগুলো স্থানচ্যুত হওয়াতে জিদ্ আপত্তি করলেন। মুচকি হেসে মার্ক বললেন—'আমি আবার ঠিক করে রাখব।'···এঁরাই তাঁর সাথী, এঁদের নিয়েই তাঁর সংসার।···

আমার সংগে কথা বলতে বলতে জিদ একটা হল-ঘরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললেন। সেখানে একটা ভারী কাঠের টেবিলের চারদিকে চার-পাঁচজন তরুণকে উপবিষ্ট দেখলাম। এই টেবিলের ওপরে বৈদ্যুতিক ঝাড়বাতির পরিবর্তে দেখতে পেলাম আবরণহীন শুধুমাত্র একটি বাল্ব। দেয়ালের সংগে লাগানো একটি ট্রাংক। বাড়িটা যেন সত্যিকারেরই একটা ক্যাম্প, আর বাড়ির কর্তা অভিযাত্রী।

টেবিলের ওপর রয়েছে টুকিটাকি অনেক জিনিস—ফিল্মের টুকরো, ধাতুর ববিন, প্রজেক্টার, কয়েকখানা বই—এক কপি Revue de France.

আমাকে এক কপি 'Numquid et tu' উপহার দেবেন বলে আবার টুপি আর কোটটা গায়ে চাপিয়ে ওপরে উঠে গেলেন—বাইরের ঠাণ্ডা সিঁড়ি দিয়ে নয়—ভেতরের ছোট্ট সিঁড়িটা দিয়ে।···বন্ধুরা সবাই তাঁর অস্বাচ্ছন্দ্যের সমান অংশীদার।··শেষে আমরা একটা ঘরে এসে বসলাম।

'আমি একসংগে অনেকগুলো কাজের ভার নিয়েছি। 'Nourritures Terrestres'-এর ওপর আরও খানিকটা লিখব। আমি যে সত্যিই প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছি সে বিষয়ে একটা বই লিখব। আমার বিশ্বাস, কেউ কখনও সত্যিকারের সুখের কথা বলেন নি·· কখন যথেষ্ট···এই বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় নোট রয়েছে আমার কাছে।' এই বলে তিনি কয়েকটা পড়ে শোনালেন।

'একজন মহিলার কাগজে আমি কিছু লিখতে চাই। পরিবার, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে লিখব। আমি যখন আত্মবিশ্লেষণ করি তখন লোকে বলে 'নার্সিসিজম' (আত্মপ্রেমিক)। কি পরিহাস!'

ক্ষণিকের স্তব্ধতা।···একটু দ্বিধাগ্রস্তভাব···জিদ তাঁর আসনটা আমার আরও কাছে নিয়ে এলেন।

'আপনার সংগে আলোচনা করবার আগে বলতে চাই যে, আমার ভয় হয় যদি আপনি আঘাত পান।'

'তারপর ধর্ম সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?' এই প্রশ্ন তুলেই আমি বলে চললাম—'তের বছর বয়সে মনে সন্দেহ জাগে, সেই থেকে আমার কাছে আর ধর্মের স্থান নেই। তবুও কিছুকাল স্রষ্টা ভগবানের সংগে বাস করেছি। একদিন তিনিও তালিয়ে গেলেন। আজ—'

জিদ, আমার দিকে ঝুঁকে, অখণ্ড মনোযোগ তাঁর।

'বলুন, আপনাকে অনুরোধ করছি। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে আপনার কথা শুনছি।' বললেন জিদ্।

আমি—'এসব ব্যাপার এত পুরোণ যে মনে হয় যেন আমার ধর্ম-জীবন শুরু হয়েছিল মায়ের কোল থেকেই। সেসব অন্য প্রশ্ন। আজ আমায় যা ভাবিয়ে তুলছে—'

—'তাহলে আপনার মন আর অশান্ত নয়? প্রশ্ন করলেন জিদ।

এই কথাতেই তিনি আসতে চেয়েছিলেন। জিদের সামনে শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন: কারও মন অশান্ত কি না?

—'একটুও অশান্ত নয় আমার মন।' বললাম আমি।

—'আমারও নয়। এখন আর অশান্ত হই নে। যখন অনাসক্তি, সাম্যবস্থা বা উচ্চাবস্থার কথা বলি, তখন এই কথাই বলতে চাই। কিন্তু অন্য আরও একটা ব্যাপার আছে। সেই জন্যেই এই বিষয়ে আমি কিছু লিখি নি। এই প্রশ্ন আমায় বিদ্রোহী করে তোলে এবং বিনা উত্তেজনায় এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারি না। আমার কিছু সংখ্যক বন্ধু-বান্ধব এবং স্ত্রী যদি আঘাত পান সেইজন্যে এ বিষয়ে আমি কিছু লিখি নি। Gospel সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা আমি মেনে নিতে পারি না। বলা হয়েছে যথার্থ খৃষ্টান

ন্ম হলেও ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই এবং ক্যাথলিকদের ব্যাখ্যাই একমাত্র যথার্থ ব্যাখ্যা। একটা বই লিখবার ইচ্ছে আছে যার শিরোনামা হবে—'খৃষ্টের বিরুদ্ধে গীর্জা'। কিন্তু বিষয়টি এত পুরোণ যে আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। এ বিষয়ে অনেক নোট আছে আমার।

Gospel-এর ভাষ্য করেছি বলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। আমি বলতে চাই যে খৃষ্টের বাণী-প্রচারকরা সুখী-ই ছিলেন। খৃষ্টের প্রথম অলৌকিক ঘটনা জল মদে রূপান্তরিত করার মত তাঁর প্রথম বাণীটিও ছিল এই :···'সুখী তারা যারা··সুখী···।' এখানেই বাণী-প্রচারকদের আলো। আমি কোন ব্যাখ্যা করি নি শুধু আমার মনোভাব প্রকাশ করেছি মাত্র। বাণী-প্রচারকদের আমি ভালবাসি···তাদের সংগেই আমি বাস করি।

ক্ষণিকের স্তব্ধতা। আবার শুরু করলেন জিদ্ : 'পলিক্রাতেসের গল্প জানেন? আমি বাইবেল আর গ্রীকপুরাণ আত্মসাৎ করেছি। আমি ব্যাখ্যা করবার কোন প্রচেষ্টা করি না শুধু জানতে চাই গভীর ভাবে—যেমন করেছি L' enfant prodigue'-এর জন্ম।'

হ্যাঁ, আপনাকে বলছিলাম পলিক্রাতেসের গল্পের কথা। আস্তে আস্তে পলিক্রাতেস তার যা কিছু ছিল সব বিলিয়ে দিতে লাগল। যতই সে বিলিয়ে দেয় ততই অনুভব করে অপার সুখ। শেষে একমাত্র বিয়ের আংটি ছাড়া আর সব কিছুই বিলিয়ে দিল। তারপর এই আংটি নিয়েই শুরু হল তার যন্ত্রণা।···একদিন সেটাও দিল ফেলে জলে, কিন্তু একটা মাছ ফিরিয়ে এনে দিল তাকে সেই আংটিটা।··· বলতে চাই বিবাহ-বন্ধন কখনও ভেঙে যায় না।···

আমার মনে হল মনের অশান্তভাবের অনুপস্থিতির জন্যই অশান্ত হয়ে উঠলেন তিনি। দেখলাম তাঁর ধার্মিক মন এখনও পরাজয় স্বীকার করে নি।

জিদ্ উঠে পড়লেন। ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে আমি সেই পাঁচজন তরুণকে দেখতে পেলাম। আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে গেল। তিনি আমার দুই হাত ধরে জোরে চাপ দিয়ে কোন কথা না বলে শুধু একটু হেসে আমায় বিদায় দিলেন।*

অনুবাদ : সুধীরকান্ত গুপ্ত

---

* মূল ফরাসী রচনা থেকে অনূদিত।

উদার আকাশে

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

ভিজে মাটি মাঠে মাঠে ছড়িয়েছি আশাদের বীজ,
বিশ্বাস মনের মধ্যে, কামনা আনন্দে গিজ গিজ
অবশ্য করবে জানি কোনদিন কোন আশ্চর্যের
স্বপ্নভাঙা সূর্য আলো ছড়ানো সকালে অনন্তের!

দুদণ্ডে বুঝেছি দিন আলো আর আশা বীজ ভরা,
সেখানে মাটিই চায় ফসলের কচি শিষ ধরা
সবুজ দোলন যেন হাওয়ার সাগরে খেলা করে,
দেখে দেখে চোখ ভরে মন ভরে আশার হাপরে।

সুন্দর বীজের যদি দোলা লাগে মনের কিনারে
মাঠে আর সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে কোন প্রকারে;
বিকল্পে তখন ভাবি—এই চাই, আর কিছু নয়,
শুধু থাক হৃদয়ের সত্য মূল্যে অল্প পরিচয়।

অল্পে আশা অনেকের মাঝে মাঝে জেগে উঠে থাকে
বাসনা বিস্তীর্ণ কোন পথ ছেড়ে চায় সুখটাকে,
প্রতিবাদ আর যত বাধাভরা জীবনের শ্বাসে—
দীর্ঘ-শ্বাস উঠে উঠে সংকীর্ণই গণ্ডীর আকাশে।

সে আকাশ ছেড়ে দাও,—উদার আকাশে এসো চলে
ওপরের নীল আর নিচেরই সবুজ অঞ্চলে;
যেখানে সীমান্তরেখা ক্রমে ক্রমে বেড়ে বেড়ে যায়
কতই ঔদার্যে মন ভরে ওঠে ঊর্ধ্বমুখাতায়।

ভিতরে বাইরে মন পদযাত্রীর গতি উজানের
চঞ্চল জীবনযাত্রা;—স্রোতটুকু নির্মল প্রাণের
অফুরন্ত আশাপ্রদ অনুভূতি, ছোট ছোট ঢেউ
একটু একটু নিয়ে চলেছে তাইতো সত্যি কেউ।

ভৌগোলিক বা আবহাওয়ার কারণের জন্যে পৃথিবীতে এ রকম অনেক দেশ আছে যেখানে মদ খাওয়াটা বেঁচে থাকবার পক্ষে একান্তই অপরিহার্য। যারা সর্বক্ষণ বাড়ির বদ্ধ পরিবেশের মধ্যে থাকে, যেমন অল্পবয়স্কেরা কিম্বা অতিবয়স্কেরা, তাদের বাদ দিয়ে আর সমস্ত নর-নারীকেই এই সমস্ত দেশে মদ খেতে হয়। বলাই বাহুল্য, এ সব দেশগুলি সবই শীতপ্রধান অঞ্চলের। কাজেই এ সমস্ত দেশে এই যে প্রয়োজনবশত মদ খাওয়া, এইটেই ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ঠিক যেটুকু শরীর রক্ষার জন্যে প্রয়োজন তার চাইতে অনেক বেশিই তারা খাচ্ছে। এই সমস্ত দেশে জনসাধারণের মধ্যে মদের নেশাটা কিছুটা অতর্কিতভাবেই হয়ে যায় বলা যেতে পারে। কিন্তু আবার এ রকম অনেক দেশ আছে যে সমস্ত দেশ ভৌগোলিক বা আবহাওয়ার কারণের জন্যে মদ খাওয়ার প্রয়োজন নেই বললেই চলে, অর্থাৎ মদ খেয়ে শরীর গরম রাখবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তবু যদি দেখা যায় এ সমস্ত দেশেও জনসাধারণের মধ্যে মদ খাওয়াটা ক্রমশ বাড়তির দিকেই আছে তা' হলে ব্যাপারটা আশঙ্কাজনক বলে স্বীকার করতেই হবে।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের মদ খাওয়ার একটা হিসেব পাওয়া গেছে। এটা ১৯৬২ সালের হিসেব। ১৯৫২ সালের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই একদিকে যেমন মদ খাওয়ার অভ্যাস ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করছে, মাথাপ্রতি তার পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। ধরে নেওয়া হয় যে ১৫ বছরের নীচে যারা, তারা মদ্যপান করে না; তা' হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে মাথা প্রতি বাৎসরিক মদের খরচটা দাঁড়ায় নিম্নরূপ :—

	৫·৭৫	গ্যালন
আলাস্কা	৩·৫৪	„
নিউ হ্যাম্পশায়ার	৩·৫৩	„
কনেকটিকাট	৩·০২	„
নিউ জার্সি	২·৯৭	„
ডেলাওয়ার	২·৮৪	„
ফ্লোরিডা	২·৭১	„
ক্যালিফোর্নিয়া	২·৬৫	„
ম্যাসাচুসেটস	২·৬৩	„
নিউ ইয়র্ক	২·৫৭	„
মেরিল্যাণ্ড	২·৪৯	„
ইলিনয়	২·৪৫	„
ভারমণ্ট	২·২২	„
কলর‍্যাডো	২·১৭	„
লুইসিয়ানা	২·১৫	গ্যালন
মিনেসোটা	২·০৭	„
ভার্জিনিয়া	২·০২	„
উইসকনসিন	২·০১	„
ওয়াইওমিং	১·৯২	„
ওয়াশিংটন	১·৯১	„
রোড আইল্যাণ্ড	১·৮৫	„
মনটানা	১·৭৯	„
নেব্রাস্কা	১·৭৪	„
মিশৌরী	১·৭৩	„
ওরেগন	১·৭৩	„
সাউথ ড্যাকোটা	১·৭১	„
মিচিগান	১·৬৮	„
অ্যারিজোনা	১·৬৭	„
ওহিও	১·৬৫	„
নর্থ ড্যাকোটা	১·৬৪	„
সাউথ ক্যারোলিনা	১·৫৫	„
জর্জিয়া	১·৫৪	„
পেনসিলভানিয়া	১·৫১	„
নিউ মেক্সিকো	১·৪৮	„
সাউথ ক্যারোলিনা	১·৪৫	„
কেনটাকী	১·৪০	„
ইদাহো	১·৩৬	„
কানসাস	১·৩৩	„
টেক্সাস	১·২৯	„
ওকলাহোমা	১·২৮	„
ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া	১·২৫	„
উটা	১·২৫	„
ইণ্ডিয়ানা	১·২০	„
আইওহা	১·১০	„
টেনেসী	১·০৬	„
আরকানসাস	১·০১	„
আলবামা	১·০০	„

এর মধ্যে হাওয়াই এবং মিশিশিপি রাজ্যের সংখ্যা নেই। কারণ হাওয়াইয়ের সংখ্যা পাওয়া যায় নি। আর মিশিশিপি রাজ্যে মদ তৈয়ারি বা তার বিক্রি আইনত হতে পারে না, অর্থাৎ সেখানে প্রহিবিশন। কাজেই এ রাজ্যের নাগরিকেরা সরকারের মতে মদ পান করে না।

বলাই বাহুল্য এ রাজ্যের প্র হিবিশন পৃথিবীর অনেক অঞ্চলের হিবিশনের—তাই একটা হাস্যকর ব্যাপার। কারণ এই সময়ে, র্থাৎ ১৯৬২ সালে বাইরে থেকে প্রায় দশ লক্ষ গ্যালন মদ আমদানী রা হয়েছে এবং এই আমদানী থেকে রাজ্য সরকারের ৩৩,০২,৩৮৫ নার কর আদায় হয়েছে।

একটি কথা বলা দরকার। ওপরে আমরা বিভিন্ন রাজ্যের গরিকদের যে মদ্যপানের পরিমাণ পেয়েছি তা বিশুদ্ধ মদ, অর্থাৎ কার, বিয়ার জাতীয় হাল্কা পানীয় নয়।

বিয়ার পানের আলাদা হিসেব পাওয়া গেছে। মার্কিন দেশবাসীরা ১৯৬২ সালে গড়ে জনপ্রতি ১৫'১ গ্যালন বিয়ার পান করেছেন।

মার্কিন দেশে মদব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে সরকার তথা সমাজসেবী সকলেরই বিশ্বাস যে, মদ এবং বিয়ার এই দুই জাতীয় পানীয়েরই একদিকে যেমন প্রচলন বাড়ছে অন্যদিকে তেমনি এটা যাদের পুরনো অভ্যাস তাদের মধ্যেও এর প্রতি ঝোঁকটা ক্রমশ বাড়ছে। এই অবস্থাটা ওদেশের সামাজিক তথা নৈতিক জীবন সম্বন্ধে কি ইঙ্গিত করছে?

—সুরসিক

ছিটগ্রস্ত কে নয়?

যদি বলি আমি ছিটগ্রস্ত তা' হলে তাতে অন্য কারো অসুখী হবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। যদিও কথাটা ঠিক া হলো কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যাবে, কারণ মনোবিজ্ঞানীরা ন যে, যাঁরা প্রকৃতই ছিটগ্রস্ত তাঁরা কদাচিৎ সে কথা বুঝতে পারেন ; প্রায়ই দেখা যায় যে, সে সত্যটা বুঝতে পারার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গ্রস্ত ব্যক্তির 'ছিট'-এর পরিমাণ প্রায় বারো আনা কমে গেছে। হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমি প্রকৃতই ছিটগ্রস্ত নই বা নো থেকে থাকলেও বর্তমানে আমার ছিট-এর বারো আনা কমে ছ।

তবু বর্তমানের আলোচনার প্রয়োজনে ধরে নিলাম আমিই গ্রস্ত। তা' ছাড়া আর কাকেই বা বলা যায় সে কথা। আমার পাঠীরা কেউ ছিটগ্রস্ত এ কথা বললে রক্তারক্তি হয়ে যাবে—যদি আমার বন্ধুরা অনেকেই ছিটগ্রস্ত তা' হলেও গরীব লেখকের গ্য বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটবে ; যদি বলি আমার প্রতিবেশীরা কেউ ছিটগ্রস্ত হলে এখুনি কুরুক্ষেত্র আরম্ভ হয়ে যাবে—আর যদি বলি আমার ঈষৎ ছিটগ্রস্তা তা হলে তো বুঝতেই পারছেন, যা হবে তা ক্ষেত্রেরও বেশি। তাই বলছিলাম, অন্য কেউ নন—আমি নিজেই গ্রস্ত।

অবশ্য একটা কথা বুক ঠুকে বলা যায়। তা হলো এই যে, আমার পাঠী, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশিগণ বা আমার স্ত্রী বা আপনারা কেউ গ্রস্ত না হলেও পৃথিবীতে ছিটগ্রস্ত আরো অনেকেই আছেন। বিরাট পৃথিবীটাতে আমি একাই ছিটগ্রস্ত নই—আরো নকেই আছেন ; চাই কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে গোটা বীর নানা দেশে জীবনযাত্রায় যে সমস্যা এবং জটিলতা দেখা ছে, তাতে আজকের দিনে ছিটগ্রস্তের অভাব নেই বলেই কে মনে করেন। অবশ্য এ রকম বেয়াড়া লোকও কিছু দেখা যায় যাঁরা প্রকাশ্যেই বলে থাকেন যে ছিটগ্রস্তের সংখ্যা া সেটা কোন সমস্যা নয়। আসল কথা হচ্ছে কে ছিটগ্রস্ত নয় সেইটে নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারা। এ শ্রেণীর বেয়াড়া লোকদের ডিঙিয়ে যে কোনো রকমের হাঙ্গামা-হুজ্জুতের ঝক্কি নিয়ে এরকম কথাও সরাসরি অনেকে বলে থাকেন যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষই কমবেশি ছিটগ্রস্ত—অর্থাৎ কি না শুধু ডিগ্রির তফাৎ।

কথাটা বললে শুনতে খুব ভালো শোনায় না—তবু মনে হয় শেষোক্ত কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। অর্থাৎ আমরা সকলেই ছিটগ্রস্ত তফাৎটা শুধু ডিগ্রির।

পনেরো-ষোলো বছর আগে আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক নিতান্ত ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছিলেন : মশাই, ডাক্তারী কমবেশি যা হোক কিছু কিছু শিখেছি। কিন্তু সে বিদ্যেটা আর দেখাবার সুযোগ বছরে ক'বারই বা পাই, যদিও রোগী দৈনিক গড়ে অন্তত তিরিশটা দেখে থাকি। আমাদের দেশের লোকেরা একজন ডাক্তারের কাছ থেকে শুধু সেইটেই আশা করেন যা একমাত্র ভগবানের পক্ষেই করা সম্ভব। অর্থাৎ মরা বা প্রায়-মরা নিদেনপক্ষে পনেরো আনা পরিমাণ মরা লোককে ডাক্তারবাবু বাঁচিয়ে তুলবেন এইটেই সবাই আশা করেন। বাড়ির একশ' কি দু'শ গজের মধ্যে হাসপাতাল থাকলেও অনেক সময়ই দেখা যায় যাকে হাসপাতালে শেষ পর্যন্ত আনা হলো সে মুহূর্তে তার উপযুক্ত স্থান ছিলো তুলসীতলা। তখন রোগীর যা করবার তুলসীরূপী নারায়ণই করে থাকেন। ডাক্তারবাবুরা কিছু করতে পারেন না।

অর্থাৎ কি না ডাক্তারবাবু বলতে চান যে, আমাদের দেশের লোকেরা রোগ সম্বন্ধে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট সচেতন নন। বা সচেতন থাকলেও চিকিৎসার জন্যে সাধারণত যে পরিমাণ অর্থ বা সময় ব্যয় করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে সাধারণ অসুখ-বিসুখের জন্যে তা তাঁরা করতে চান না। এখানে অসুখ বলতে আমরা শারীরিক অসুখের কথাই বলছি। রোগটা যখন বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তখন আমরা ডাক্তার ডাকি বাধ্য হয়ে।

কিন্তু যে সমস্ত ব্যাধি শরীরের সীমার মধ্যে থেকেও ঠিক শারীরিক

নয়, অর্থাৎ মানসিক গোলমাল সে জন্যে ডাক্তার দেখাবার অভ্যাস এখনো আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই দেখা যায় না। মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের অবস্থা আমাদের খুব সম্ভব কলেরা, বসন্ত, যক্ষা বা ক্যান্সার রোগগ্রস্তদের চাইতেও শোচনীয়। ঐ সমস্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা অপরের সাহায্য বা অনুকম্পা লাভ করে থাকে। কিন্তু মানসিক রোগগ্রস্তরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরের সাহায্য বা সহানুভূতি তো লাভ করেই না, উপরন্তু উপহাসের শিকার হয়ে পড়ে। এই রকম চলতে চলতে আজকের দিনে সাধারণ লোকের মধ্যে এই রকম একটা ভাব দেখা যাচ্ছে যে, পরিবারের কারো যদি মানসিক ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায় তা হলে সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের আর পাঁচজন চেষ্টা করতে থাকেন ব্যাপারটা চেপে যেতে, যাতে পাড়াপড়শীরা কেউ না বুঝতে পারে ব্যাপারটা। যখন ডাক্তারের সাহায্য নিলে অচিরেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে, ঠিক তখনি কি না লোকে হাসবে এই কথা মনে করে আমরা প্রিয়জনকে ডাক্তার না দেখিয়ে বাড়ির পেছনের ঘরে সরিয়ে দিই। অর্থাৎ এমন ভাবে তাকে 'ম্যানেজ' করা হয় যাতে অপরের সংস্পর্শে এসে তার সামান্য বিকৃতিটা ধরা পড়ে না যায়। এর ফলে দেখা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগী 'একা' হয়ে পড়ে। এই যে নিঃসঙ্গতা এই অবস্থাটা তার সামান্য রোগটাকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ লক্ষণীয়ভাবে বাড়িয়ে দেয় এবং প্রায়শই দেখা যায় আজ যাকে দেখা গেলো একটু যেন কেমন কেমন—দুই, তিন কি চার সপ্তাহের মাথায় সে একেবারে 'পাগল' হয়ে গেছে। তখন আর ব্যাপারটা চেপে রাখা যায় না। অথচ এ লোকের পাগল হবার কথা ছিলো না। পরিবারের লোকজনের অহেতুক লজ্জা বা নির্বুদ্ধিতা এবং পাড়া-পড়শীর সাধারণ মানবিক সহানুভূতির অভাবে একটা মানুষকে 'পাগল' করে দেওয়া হয়েছে। যে রোগী, তার সঙ্গে আমরা সবাই মিলে অপরাধী বা আসামীর মতো ব্যবহার করেছি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। অথচ আমরা একবারও একটা সহজ, সরল কথা বুঝবার চেষ্টা করি না যে, শারীরিক কোন ব্যাধি হলে (যৌন ব্যাধি ছাড়া) যেমন লজ্জার কোনো কারণ থাকে না, মানসিক ব্যাধির বেলায়ও ঠিক সেই কথাটাই প্রযোজ্য।

—মনস্তাত্ত্বিক

অনেক রোগের একই কারণ

একজন বিশেষ নামডাকওয়ালা ডাক্তারবাবু একবার হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলেন। কি করে বলছি শুনুন।

একদিন সকালবেলা যথানিয়ম চেম্বারে এসে বসবার কিছুক্ষণ পরেই এক ভদ্রলোক এলেন একটি কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে। ডাক্তারবাবু তাঁর চেম্বারের সামনের ঘরটায় বসেছিলেন। সেখান থেকে রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়। উনি লক্ষ্য করছিলেন বেশ কিছুটা দূর থেকেই বয়স্ক ভদ্রলোক আসছেন কিশোরটির হাত ধরে। ওঁরা যে শেষ পর্যন্ত তাঁরই চেম্বারে আসতে পারেন তা আদৌ মনে হয় নি ডাক্তারবাবুর। কারণ কোনোরকম রোগেরই কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো না। ভদ্রলোকের শরীর স্বাস্থ্য ভালো, কিশোরটিও বয়সের অনুপাতে বিশেষ সুস্থ বলেই মনে হয়েছিলো ডাক্তারবাবুর।

কিন্তু ওঁরা ডাক্তারবাবুর চেম্বারেই ঢুকলেন। উনি প্রথমটা মনে করলেন যে নিশ্চয়ই 'কল' দিতে এসেছেন। কিন্তু না, তা নয়। ক্রমে জানা গেলো ঐ কিশোরটাই রোগী। রোগটা কি? না, সর্দি। প্রথমটা ডাক্তারবাবু মনে মনে একটু বিরক্তই বোধ করলেন। কারণ, ওঁরা থাকেন দূরে, বেশ কিছুটা দূরে। সেখান থেকে এই পর্যন্ত আসতে ওঁদের অন্তত তিরিশ কি চল্লিশটা ডাক্তারখানা পেরিয়ে আসতে হয়েছে। সে সমস্ত ডাক্তারখানার যে কেউ, অর্থাৎ যে কোনো ডাক্তারবাবুই তো পারতেন ছেলেটির সর্দির একটা উপশমের পরামর্শ দিতে। এ জন্যে আবার আমার মতো একজনের কাছে আসা কেন? মনে মনে ভাবলেন ডাক্তারবাবু।

বয়স্ক ভদ্রলোক বিনীতভাবে জানালেন আপনার নামডাক অনেক শুনেছি তাই এলাম। আমার এই ছোটো ছেলেটির জন্যে।

—কি হয়েছে?

—সর্দি-কাশি। প্রায় বছরখানেক হলো ভুগছে।

—অ্যাঁ?

এতক্ষণে টনক নড়লো ডাক্তারবাবুর। মুহূর্তের মধ্যেই ডাক্তারদের স্বভাবসিদ্ধ উপস্থিতবুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিলেন যে, কিছু একটা জটিল ব্যাপার। এতক্ষণে মনে যে হাল্কা ভাবটা ছিল সেটা নিমেষে লোপ পেলো। এখন ডাক্তারবাবু তাঁর সমস্ত দেহমন নিয়ে অতিমাত্রায় সজাগ। কিশোরটির দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করে বললেন: এক বছর ধরে ভুগছে?

—আজ্ঞে হাঁ। আট-দশজন ডাক্তারবাবু দেখেছেন ওকে। তাঁরা তো কেউই ডাক্তার হিসেবে খারাপ নন। অনেক ভারি অসুখ তাঁরা অনেকেই সারিয়েছেন, দেখেছি এবং শুনেছি। কিন্তু আমারই দুর্ভাগ্য বলতে হবে, ছেলেটার এ সর্দি-কাশিটা কিছুতেই সারছে না।

বলতে বলতে ভদ্রলোক একটা প্যাকেট খুলে একতাড়া প্রেসক্রিপশন এবং বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল টেস্টের রিপোর্টগুলি তুলে দিলেন ডাক্তারবাবু হাতে, সেইসঙ্গে একখানা এক্স-রে প্লেটও।

একে একে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ডাক্তারবাবু। প্রেসক্রিপশনগুলির পরে বুকের এক্স-রে প্লেটখানাও দেখলেন। দেখলেন কয়েকজন 'সাধারণ' ডাক্তারবাবু সাধারণ সমস্ত রকম ওষুধপত্র দিয়েই চিকিৎসা করেছেন ছেলেটির। সর্দি-কাশির প্রায় সমস্ত রকম ওষুধেরই পরীক্ষা শেষ হয়েছে কিশোরটির ওপর। শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের বিশেষ কোনো দুর্বলতাজনিত ব্যাপার আশঙ্কা করে এক ডাক্তারবাবু ফুসফুসের প্লেট তুলিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও কোনোরকম সূত্র পাওয়া যায় নি, যা থেকে ওর এই স্থায়ী সর্দি-কাশির কোনও সম্ভাব্য কারণ পাওয়া যায়।

ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন যে, তাঁর নামডাক হাত-যশের বিরুদ্ধে সত্যি চ্যালেঞ্জস্বরূপ একটা জটিল কেস এসে পড়েছে—যদিও শুনতে

সর্দি-কাশি—যানে আজকের দিনে যার জন্যে বিভিন্ন কোম্পানীর অন্তত একশ' রকমের বিভিন্ন ওষুধ আছে।

বয়স্ক ভদ্রলোককে ডাক্তারবাবু বললেন : সারিয়ে তুলতে পারবো আশা করি, তবে সময় দিতে হবে, অন্তত দু' মাস।

ভদ্রলোক রাজী হলেন তাতেই, আর সেইদিন থেকেই সুরু হলো চিকিৎসা—পরীক্ষামূলক চিকিৎসা, যাকে বলে থেরাপিউটিক এক্সপেরিমেণ্ট (অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের ওষুধ দিয়ে তার প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা)।

দু'দিন বাদে এলো আর এক রোগী। তরুণ যুবক, বয়স তিরিশের বেশি নয়। ক্রমশ শরীর দুর্বল হয়ে আসছে। মাস আষ্টেক ধরে নানাবিধ চিকিৎসার পরেও রোগ নির্ণয় করাই সম্ভব হয় নি পাঁচ-ছয়জন ডাক্তারবাবুর পক্ষে। এক্ষেত্রেও ডাক্তারবাবু থেরাপিউটিক এক্সপেরিমেণ্ট আরম্ভ করলেন—বলে-কয়েই।

আরো কয়েকদিন পরে এলো এক রোগিণী। বাহ্যত বিকৃতমস্তিষ্ক বলেই মনে হয়, কিন্তু কোনো রকম ওষুধেই কোনো ফল এ ক্ষেত্রেও পাওয়া যায় নি। এমন কি প্রচুর ঘুমের ওষুধ দিয়েও রোগিণীকে ইচ্ছানুরূপ ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারেন নি কোনো ডাক্তারবাবু।

বলাই বাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও [illegible]রবাবু তাঁর থেরাপিউটিক এক্সপেরিমেণ্ট সুরু করলেন।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ভিটামিনের প্রতিক্রিয়া, রক্ত দেওয়া, অটোভ্যাকসিন ইত্যাদির পরে আরম্ভ করলেন গ্ল্যাণ্ড এবং হর্মোনের পরীক্ষা। একটি একটি করে গ্ল্যাণ্ডগুলির কার্যক্রম পরীক্ষা করবার পরে এক জায়গায় এসে থেমে গেলেন। থামতে হলো ডাক্তারবাবুকে। থামতে যে পারলেন এ জন্যে তিনি নিজেও কম খুশি হলেন না। কারণ তাঁর নামডাক হাতযশ—সবকিছু প্রকৃতই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো।

তিনটি ভিন্ন জাতের ব্যাধির জন্যে ডাক্তারবাবু একই জায়গায় কারণ খুঁজে পেলেন—থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের গোলমাল। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড—গলার মধ্যের ছোট্ট চাকতির মতো এই বস্তুটি যথেষ্ট হর্মোন নির্গত করছে না। আর তার ফলে এক-একজনের ভেতর দেখা দিচ্ছে এক-এক রকম ব্যাধি।

এরপর থেকে আরো অনেক ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে দেখেছেন ওপরে যে তিনটি ধরণের ব্যাধি আমরা দেখলাম তা ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরণের ব্যাধি—যেমন প্রায়ই মাথা ধরে, কোষ্ঠকাঠিন্য, হঠাৎ এক এক সময় চোখে ঝাপ্সা দেখা, অকালে দাঁতের ক্ষয়, খসখসে চামড়া ইত্যাদি অনেক রকম ব্যাধিরই একটি মাত্র কারণ থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের গোলমাল।

আজকের দিনের বেশিরভাগ ডাক্তারবাবুকেই তাই দেখা যায় এই থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড সম্পর্কে সব সময় সতর্ক থাকেন। —নার্স মিত্র

সরষেতে যদি ভূত ঢোকে

আজকের পৃথিবীতে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা বোধ হয় আর কোনো কিছুর সঙ্গেই তুলনীয় নয়। শিল্প, সাহিত্য এবং দর্শন ও নীতিশাস্ত্র কোনোমতেই বিজ্ঞানের সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে এগুতে পারছে না এবং কয়েক বছর আগে, মনে পড়ে প্রখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক জন ডিউই এই জিনিসটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই বলেছিলেন যে, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্রষ্টাদের এই যে অক্ষমতা এর ফলেই জ্ঞানগরিমার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে না এবং তার ফলেই হঠাৎ অতিমাত্রায় বেড়ে-ওঠা বিজ্ঞান আজকের দিনে মানুষের অন্য সমস্ত দিকের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারছে এবং কখনো কখনো নিজেকে সম্পূর্ণ ভুল পথে অর্থাৎ যুদ্ধের পথে পরিচালিত করছে। কথাটা নিঃসন্দেহে ভাববার মতো। আমরা এই গুরুগম্ভীর তথ্যটা অবশ্য অন্য কারণে অবতারণা করলাম। সেই কথাতেই আসছি এবার।

আজকের দিনে যা বিজ্ঞানের অমোঘ-সত্য এমন অনেক বিষয়ই পঞ্চাশ-ষাট কি একশ' বছর আগে প্রস্তাবিত বিষয়মাত্র ছিল। নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবার পরে ক্রমশ ঐ পরীক্ষামূলক বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত হয়েছে। কাজেই আজকের দিনে যা প্রস্তাবিত সত্য, অদূরভবিষ্যতে যে তা সত্যে পরিণত হলেও হতে পারে এমন কথা মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে।

বর্তমানে আমরা মানুষের মনের এমন কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে বক্তব্য, যা এখনো একেবারে সর্বসম্মত বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে সর্বত্র গৃহীত হয় নি—কিন্তু এর সবগুলিই কালে কালে সত্য বলে স্বীকৃত হলেও হতে পারে।

মানুষের মন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের প্রকাশিত ধারণাগুলি অনেক সময় জনসাধারণ খুব ভালোভাবে নেন না। অনেকেই মনে করেন যে, মন অর্থাৎ আত্মা সে তো ভগবানের অংশ, সে কি আর বিজ্ঞানের বাঁধাধরা ছকের মধ্যে ধরা দিতে পারে কখনো। এর উত্তরে একটি রূঢ় কথা আগেই বলে নেওয়া ভালো। ত' হলো এই যে, আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে মাথা আর না ঘামানোই ভালো। ভগবান যেমন মানুষকে ত্যাগ করেছেন মানুষের আত্মা নামক পৃথক বস্তুটিও তেমনি মানুষকে পরিত্যাগ করেছে। আজকের দিনে যা আমরা পাচ্ছি সে নিছক 'মন'—বিজ্ঞানের ভাষায় চেতনা বা ব্যক্তিসত্তা। কারো কারো শরীরে এই মনই হয় তো কখনো কখনো আত্মায় উন্নীত হয় বটে—কিন্তু তবু সে মনই—পৃথক কোনো সত্তা নয় এবং এ আত্মাকে বিজ্ঞানের আলোচনায় বিষয়ীভূত হবার পক্ষেও আমরা কোনো বাধা আছে বলে মনে করি না।

মানুষের এই মন যতক্ষণ স্বাভাবিক থাকে ততক্ষণ সে কোনো আলোচনার বিষয়ই নয়। কিন্তু অস্বাভাবিকতার কিছুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করলেই এ মন আলোচনা এবং গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে।

মানুষের মনের যে অস্বাভাবিকতা তা এ যুগে কিছু নতুন দেখা দেয় নি। স্মরণাতীতকাল থেকেই চলছে এ জিনিসটা। শোনা যায়, গ্রীসের পুরাকাহিনীর অন্যতম নায়ক ওডিসিয়ুস একবার কোনো একটা যুদ্ধে যাতে অংশগ্রহণ করতে না হয় সেইজন্যে উন্মাদ হয়ে যাবার ভাণ করেছিলেন। অর্থাৎ কি না, সেই সুদূর অতীতেও মানসিক অস্বাভাবিকতা একটা স্বীকৃত ব্যাধিই ছিলো। তবে এ ব্যাধির

প্রাদুর্ভাব প্রাচীনকাল তো দূরের কথা দু'শো-একশ' বছর আগেও ততোটা ছিল না। শিল্পসভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে যে কৃত্রিম দিকগুলির সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত তারই জন্যে, অর্থাৎ তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই মানসিক অস্বাভাবিকতা ব্যাধির আজ এতো বাড়-বাড়ন্ত—এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।

এই অবাঞ্ছিত কিন্তু সত্য অবস্থাটার প্রতি নজর পড়তেই বিগত শতাব্দীর শেষের দিকেও নিছক দর্শনশাস্ত্রেরই একটি শাখা হিসেবে পরিগণিত মনোদর্শন মনোবিজ্ঞানের রূপ নিতে থাকে ক্রমশ। দার্শনিকগণের ধ্যানের বিষয় বৈজ্ঞানিকগণের ল্যাবরেটরীতে আর পাঁচটা 'আইটেম'-এর পাশে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। ব্যাপারটা হঠাৎ মনে হলে অবশ্যই প্রায় শোকাবহই মনে হয়। যে মন আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাও কি না বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার বিষয় হবে? কিন্তু সত্যের সঙ্গে আপোষ করায় কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পাবার আশঙ্কা নেই—তাই বলতে হয়—দোষ কি তাতে? যে মন নিয়ে এতো টানা-হেঁচড়া তা যে ঐ বৈজ্ঞানিকগণেরও শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে তাঁরা নিজেরাও মনে করেন। কাজেই মন নিয়ে পরীক্ষা চালাবার ফলে যদি মনের কিছু অমর্যাদা সত্যি হয় তা হলে বৈজ্ঞানিকগণের মনও তার থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অসুন্দরকে সুন্দর করবার দায়িত্ব, অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করবার গুরুদায়িত্ব বহন করে যে মন, তার মধ্যেই যদি অস্বাভাবিকতার লক্ষণ প্রকাশ পায় তা' হলে করণীয় কি? অবশ্যই বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিতে হবে।

ব্যাপারটাকে যাঁরা খোলা মনে নিতে পারেন (যাঁরা পারেন তাঁদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তির দিকে) তাঁদের জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা একটা সহজ সরল ফর্মুলা উদ্ভাবন করেছেন। এই ফর্মুলায় ফেলে যে কেউ নিজে নিজেই পরীক্ষা করতে পারেন তাঁর মনটা কি পরিমাণ স্বাভাবিক বা তাঁর মনে কোনো রকমের অস্বাভাবিকতা বাসা বাঁধছে কি না। আর বাসা যদি সত্যি বাঁধতে আরম্ভ করে থাকে তো তারই বা পরিমাণ কতোটা।

ফর্মুলাটি খুবই সহজ বলতে হবে। কারণ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই যে কোনো ব্যক্তি সৎভাবে চেষ্টা করলে তাঁর নিজের মানসিক অস্বাভাবিকতার একটা মোটামুটি ইঙ্গিত পেতে পারে—এই ব্যক্তির যদি যথেষ্ট মানসিক দৃঢ়তা থাকে—সোজা কথায় যাকে বলে মনের জোর—তা হলে নিজের পূর্ণাঙ্গ রোগনির্ণয়ও তাঁর পক্ষে করতে পারা এমন কিছু অসম্ভব নয়।

আসুন এবার ফর্মুলাটি পরীক্ষা করা যাক :—

১। আপনি কি নিজেকে স্পর্শকাতর মনে করেন?

২। নতুন মানুষজনের সঙ্গে পরিচিত হতে আপনি কি আগ্রহশীল?

৩। সামাজিক মেলামেশা আপনার ভালো লাগে কি?

৪। আপনি কি দীর্ঘসময় নিঃসঙ্গ থাকতে চান?

৫। আপনি কি নিজের প্রতি করুণা পোষণ করেন?

৬। আপনি কি প্রায়ই নিজের প্রতি দোষারোপ করে থাকেন?

৭। আপনি কি সর্বদাই নিজের দোষ ঢাকতে ব্যস্ত থাকেন?

৮। আপনার বিবেচনা শক্তিটা কি খুবই বেশি বলে আপনার ধারণা?

৯। আপনি কি মনে করেন যে, জীবনে দাঁড়াবার জন্যে যথেষ্ট সুযোগ আপনি পান নি?

১০। কারণ জানা না থাকা সত্ত্বেও আপনার কি প্রায় সময়ই মনে হয় যে সামনে খুব শীগ্‌গিরই কোনো বিপদ আসছে?

১১। আপনি কি কোনো কাজ করবার সময় এই কথাটাকেই প্রাধান্য দেন যে অন্যে কি ভাববে?

১২। ন্যায্য প্রমাণ ছাড়াই আপনি কি একে দৃঢ় নিশ্চয়তা বোধ করে থাকেন যে আপনি নিজে আর পাঁচজনের চাইতে ছোট কি বড়?

১৩। নিজেকে কি আপনি আত্মসচেতন মনে করেন?

১৪। আপনি কি স্বভাবতই সন্দেহপ্রবণ?

১৫। আপনি কি বন্ধুবান্ধবদের ভাগ্যের প্রতি ঈর্ষাবোধ করেন?

১৬। অপরকে সমালোচনার জন্যে সবসময়ই আপনি একটা উদগ্র প্রেরণা বোধ করেন কি ভেতরে ভেতরে?

১৭। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে বা নতুন বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আপনার অসুবিধে হয় কি?

১৮। সামান্য ব্যাপার বাড়িয়ে বলতে আপনার ভালো লাগে কি?

১৯। আপনি কি নিজেকে একটু অতিমাত্রায় আশাবাদী বলে মনে করেন?

২০। আপনার কি মাঝে মাঝেই মনে হয় যে আপনার মাথাটা খারাপ হয়ে গেলেও যেতে পারে?

২১। কোনো তরুণ-তরুণীকে একত্রে দেখলেই কি আপনার মনে নানা বিশ্রী চিন্তা দানা বাঁধতে আরম্ভ করে?

২২। (নারী হলে) আপনি কি নারী-বন্ধুর সঙ্গই বেশি কামনা করেন?

২৩। (পুরুষ হলে) আপনি কি পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গই বেশি কামনা করেন?

২৪। বিয়ে জিনিসটাকে আপনি খারাপ মনে করেন কি?

২৫। ছোট ছেলেমেয়ে দেখলে আপনার রাগ হয় কি?

২৬। আপনি কি মনে করেন যে আপনার কোনও স্বপ্ন আপনার নিজের কোনো চেষ্টা ছাড়াই অলৌকিকভাবে পূর্ণ হবে?

২৭। চলতি দুনিয়ার ব্যাপার-স্যাপার দেখে আপনি বিরক্তবোধ করেন কি?

২৮। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি কি একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছেন?

২৯। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে আপনি কি আপনার বিরোধীদের কথা শুনতে একেবারেই নারাজ?

৩০। অপরের খারাপ দিকটা, দোষের দিকটাই কি আপনার প্রথম নজরে আসে?

৩১। উচ্চাশা পোষণ করাটা কি আপনি নিরর্থক মনে করেন?

৩২। বয়স অনুপাতে দায়িত্ব নিতে আপনি কি নিজের আগ্রহে অভাববোধ করেন—বয়স আরো কিছুটা কম হলে (অর্থাৎ দায়িত্ব না নিতে হলে) ভালো হতো মনে হয় কি?

৩৩। আপনার কি কেবলই মনে হয় যে আশেপাশের সবাই প্রায় সময়েই আপনার কিছু একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছে?

৩৪। আপনার কি অতিরিক্ত ফিটফাট থাকতে ভালো লাগে?

৩৫। আপনার কি প্রায় সময়েই মনে হয় যে কেউ আপনার বন্ধু নেই, কেউ আপনার ভালো চায় না বা কেউ আপনার সম্পর্কে আগ্রহশীল নয়?

৩৬। নিজেকে কি আপনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করেন?

প্রায় দেড়শ'টি প্রশ্নের মধ্য থেকে বাছাই করে ৩৬টি এখানে দেওয়া গেল। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, এর অর্ধেক উত্তর যাঁর 'হ্যাঁ' হবে তিনি অস্বাভাবিকতার দিকে এগোচ্ছেন মনে করতে হবে; যাঁর অর্ধেকের বেশি 'হ্যাঁ' হবে তাঁর অবিলম্বে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন; যাঁর ৯ থেকে ১২টি 'হ্যাঁ' হবে তাঁর পক্ষে একটু সতর্ক থাকলেই চলে; আর যাঁর ৯টি বা তার কম 'হ্যাঁ' উত্তর হবে তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—যে ডাক্তারবাবুরা মনের রোগের চিকিৎসা করেন তাঁদের মতোই স্বাভাবিক, হয় তো তাঁদের চেয়েও বেশি স্বাভাবিক, কাজেই নির্ভাবনায় থাকতে পারেন। একটু সাহস করে দেখুন না—আপনার 'হ্যাঁ'-এর সংখ্যা ৯-এর কম হবার খুবই সম্ভাবনা।

—অনুসন্ধানী

কচি-প্রতিভার কার্যকলাপ দেখে বহুকাল থেকেই মানবমন তথা নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিস্মিত হয়েছেন এবং নানা জনে নানাভাবে বাহ্যত বুদ্ধির অগম্য এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বাস্তবিক যদি দেখা যায় আড়াই কি তিন বছরের কোনো শিশু যদি বাইবেলের সমস্ত গল্পগুলি আপনাকে মুখে মুখে শুনিয়ে দিতে পারে, তা হলে আপনি বিস্ময়ে বাক্যহারা হবেন না কি? নিশ্চয়ই হবেন, সকলেই হবে। শিশু, বালক বা কিশোরের মধ্যে আশ্চর্য প্রতিভার এই যে আকস্মিক প্রকাশ এটাকে কেউ বংশগত ধারা বলে ব্যাখ্যা করেছেন, কেউ বা বলেছেন এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত জীবনের একটা আকস্মিক ঘটনা। হঠাৎ এর প্রকাশ ঘটে তারপর আবার তেমনই হঠাৎই এর শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে আবার এ জিনিসটা অল্প বয়সেই শেষ হয়ে যায় না; সারা জীবন ধরেই এর প্রকাশ ঘটতে থাকে, অথচ পূর্বপুরুষগণের কারো মধ্যে এ রকম অসাধারণ কিছু দেখা যায় নি। এই শেষোক্ত অবস্থাও বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বেলাতে ঘটতে দেখা গেছে বলেই অনেকে মনে করেন যে, এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ—কাজেই সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

এর কোন্‌টা যে সত্যি তা আজ পর্যন্ত নিশ্চয় করে বলার কোনো উপায় নেই। তবে মনোবিজ্ঞানের যে রকম দ্রুত উন্নতি ঘটছে, তাতে হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই এ সম্পর্কে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা হবে।

কেন হচ্ছে, কি রকম করে সম্ভব হচ্ছে তা না জেনেও যে আশ্চর্য ব্যাপারগুলি ঘটে গেছে কয়েকজন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনে, তার মধ্য থেকেই কয়েকটি দেখা যাক।

গ্যালিভার্স ট্রাভেলস-এর অমর রচয়িতা জোনাথান সুইফ্‌ট-এর জীবনে দেখা গিয়েছিল যে বয়স তিন বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই তিনি বাইবেলের সমস্ত কাহিনী মুখে মুখে বলতে পারতেন এবং নির্ভুলভাবে পড়তেও পারতেন তার যে কোনো অংশ। স্বনামধন্য স্যামুয়েল জনসন দু'বার কানে শুনলে বা পড়ে ফেললে যে কোনো জিনিস মুখস্থ করে ফেলতে পারতেন।

প্রখ্যাত জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনে দেখা গেছে যে বয়স আট পূর্ণ হবার আগেই উনি বিস্তর বই পড়ে ফেলেছেন তাও আবার নানা বিষয়ে। এইটা দেখে একজন উক্তি করেছিলেন যে মিলের হাতে-খড়িটা নিশ্চয়ই মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থাতেই হয়ে থাকবে। তা না হলে মাত্র আট বছর বয়সের একজন বালক দু'শোখানা বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের কথা জানতে পারে কি করে? আসল কথা হলো ইতিহাসকারের ছেলে হিসেবে মিল কয়েক মাস বয়স হবার পর থেকেই গল্প শুনতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন—এবং গল্প হিসেবে পড়লে বা শুনলে কেউ সহসা তা ভোলে না। অবশ্য তাই বলে মিলের স্মৃতিশক্তি যে কচি-প্রতিভা হিসেবে কিছুদিনের জন্যে সক্রিয় ছিলো তা নয়—প্রায় সারা জীবনই তিনি বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন।

বায়রনও খুব অল্পবয়স থেকে পড়াশুনো আরম্ভ করে যখন পাঁচ বছরে পড়লেন তখন প্যারাডাইস লস্ট-এর দুরূহ সমস্ত জায়গার ব্যাখ্যা করতে পারতেন—গ্রীক ও রোমান পৌরাণিক উদাহরণসহ।

জার্মানীর লুবেক শহরে ক্রিশ্চিয়ান হাইনেকার নামে এক ভদ্রলোকের আবির্ভাব হয়েছিলো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ইনি তিন বছর বয়সেই মাতৃভাষা ছাড়া আরো তিনটি ইয়োরোপীয় ভাষা—যথা গ্রীক, ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষায় রীতিমতো দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। এই চারটি ভাষা ছাড়াও ইতিহাস এবং ভূগোলেও আশ্চর্য দখল হয়েছিল। আর সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় এর যখন তিন বছর বয়স পূর্ণ হলো তখনই একদিন শিশুটি ভবিষ্যদ্বাণী করলো নিজের মৃত্যু সম্পর্কে। বললো যে, আগামী বছর অমুক দিন আমি মারা যাবো—আর ঠিক তাই-ই সত্যে পরিণত হয়েছিলো।

বিখ্যাত জার্মান সুরকার মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই নিজে সঙ্গীত রচনা করে তাতে সুরারোপ করে কুড়ি-বাইশ জন বাদক নিয়ে কনসার্ট পরিচালনা করতেন।

স্বনামধন্য জার্মান সঙ্গীত-বিশারদ মৎসার্ট তাঁর ছয় বৎসর বয়সের সময়ে বেহালা, পিয়ানো এবং অর্গ্যান বাজাতে এতোই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন যে, ইয়োরোপের বড়ো বড়ো শহর থেকে তাঁর আমন্ত্রণ

আসতো অনুষ্ঠান করবার জন্তে। মৎসার্ট মারা যান তাঁর একত্রিশ বছর বয়সে এবং তিন চার বছর বয়স থেকে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি একদিকে যেমন নিজস্বতায় ভাস্বর, তেমনি তা হতো অভিনব।

ব্যারিংটন মেকলে (লর্ড) তাঁর সাত বছর বয়সেই একখানা পৃথিবীর ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বৃহৎ আকারে রচনার কাজে হাত দেবার আগে উনি যে সংক্ষিপ্ত রচনাটি করেছিলেন, অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে তাতে উল্লেখযোগ্য এবং প্রধান কোনো ঐতিহাসিক তথ্য বাদ পড়ে নি।

কচি-প্রতিভার প্রকাশ যেমন শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তেমনি দেখা যায় অঙ্কের ক্ষেত্রে। বিরাট বিরাট অঙ্ক দশ কি বারো বছরের বালক মুখে মুখে করে দিলো এরকম অনেক ঘটনাই নিশ্চয় অনেকের জানা আছে। এবার বলছি শুনুন একটি অদ্ভুত ব্যাপারের কথা। ট্রুমান স্যাফোর্ড নামে আট বছরের একটি বালক। অঙ্কে, বিশেষ করে গুণ অঙ্কে তার এমন আশ্চর্য প্রতিভা ছিলো যে, তার সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা নানা কাহিনী প্রচারিত হয়ে ছিলো এবং একদিন এক গণিত-বিশেষজ্ঞ তার বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: খোকা, বলতে পারো ৩৬৫,৩৬৫৩৬৫৩৬৫৩৬৫ সংখ্যাটিকে ঐ সংখ্যাটি দিয়ে গুণ করলে গুণফল কি হবে? উপস্থিত সবাই বিশেষ করে বালকটির বাড়ির লোকজন একটু বিব্রতবোধ করল। কারণ অতো বড়ো অঙ্ক ঐটুকু বালক মনে মনে কি করে করবে। বালকটিও প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গেলো। তারপর কি হলো শুনুন। ঠিক এক মিনিট সময় ওর লেগেছিল উত্তরটি তৈরি করতে। এই এক মিনিট ধরে ও যেন পাগল হয়ে গেছে এমনিভাবে কখনো মাথা চুলকোতে লাগল, কখনো হাসতে লাগল, কখনো লাফাতে লাগলো এবং সবার শেষে মেজের গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করল। তারপর আস্তে আস্তে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বাঁদিক থেকে একটি একটি করে সংখ্যা বলে গুণফলটি জানিয়ে দিলো: ১৩৩.৪৯১,৮৫০,২০৮,৫৬৬,৯২৫,০১৬,৬৫৮,২৯৯,৯৪১,৫৮৩,২২৫।

সবাই তো অবাক। অবাক হবারই কথা।

এখন পর্যন্ত যা বললাম এ সবই বইপত্র ঘেঁটে জানা—এর দু'চারটে, হয় তো বা এগুলির চাইতেও চমকপ্রদ দু'চারটে অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে বা ভবিষ্যতে পড়বে। কিন্তু এঁরা সকলেই আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরের লোক—এঁরা অতীতের ইতিহাস।

সব শেষে আসুন আপনাদের একটি ব্যক্তিগত জানা-শুনোর মধ্যের ঘটনা বলি। কোলকাতার টালীগঞ্জ অঞ্চলে একটি বছর নয়েক বয়সের ছেলে আছে। এর মধ্যে আজ কিছুদিন ধরে একটা আশ্চর্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সায়েন্স কলেজের ফিজিক্স-এ ডক্টরেট এক অধ্যাপিকাও বালকের এই ক্ষমতাটির রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হন নি। এই বালকটিকে ছয়-সাত মাস আগের বা পরের যে কোনো মাসের যে কোনো তারিখের কথা বললেই দশ কি পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যে সে বলে দিতে পারে সেদিন কি বার ছিলো। বালকটি যে মুখস্থ করে রেখেছে সব তা মনে হয় না—কারণ আমরা পাঁচ-সাত জন মিলে ঝড়ের বেগে একজনের পর একজন বিভিন্ন তারিখ বলে দেখেছি প্রতিবারেই সে নির্ভুলভাবে সেই সমস্ত তারিখগুলি কি কি বার ছিলো তা বলেই আমাদের বিস্মিত করেছে। —তথ্যান্বেষী

শেক্সপীয়রের সনেট

বসন্তের দিবা কি গো তুলনা তোমার,
তুমি যে সুন্দরী আরো, অয়ি লজ্জাশীলা!
ব্যস্ত করে দস্যু হাওয়া ফুলদলে, আর
'মধু'র পত্তনি থাকে অতি অল্প বেলা।
কখনো প্রতপ্ত অতি স্বর্গের নয়ন,
বরণ তাহার প্রায় মনে হয় ম্লান;
হারায় সৌন্দর্য ক্রমে সৌন্দর্যের ধন,
পরিবর্তনের ফেরে হয় ম্রিয়মাণ।
কিন্তু তব অনন্ত বসন্ত কোনো দিন
হ'বে না মলিন; হারাবে না এই দান,
গর্বে তোমা মৃত্যু নাহি বলিবে অধীন,
অমর সঙ্গীতে তুমি র'বে বর্তমান!
মানব রহে গো যদি এ মর ধরায়,—
র'বে ইহা;—সঞ্জীবিত করিতে তোমায়।

অনুবাদ—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অজর আমার কাছে তুমি সদা সুদর্শন সখা:
যে সৌন্দর্যে শুভদৃষ্টি হয়েছিল আপাততন্ময়,
আজও তা তোমাতে দেখি: অথচ বনশ্রী পলাতকা
ইতিমধ্যে তিনবার, মাধবের মদির সঞ্চয়
তিনবার হৃত শীতে, তিনবার ঋতুর বিকারে
হেমন্তের অনুগত বসন্তের শ্যাম সমারোহ,
সুগন্ধী ফাল্গুনত্রয় পরিণত জ্যৈষ্ঠের অঙ্গারে:
এখনও অক্ষুণ্ণ শুধু সদ্যোজাত তোমার সম্মোহ।
তবু, শম্বুপটসম, সুন্দরের ললাটফলকে
কালের কীলক, হায় অগোচর চৌর্যে ঘূর্ণমান;
হয়তো তোমার কান্তি ক্ষ'য়ে যায় পলকে পলকে,
আসক্তির আধিক্যেই প্রবঞ্চিত আমার নয়ান।
অজাতবার্ধক্যবন্ধু, তাই বলি অতীতপ্রত্যয়
সে-মৌল মাধুর্য আজ, তুমি যার উত্তরপুরুষ।

অনুবাদ—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

রাণী

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

পূবের আকাশ রাঙা হয়ে উঠল।

ঘরের ভেজানো দরজা খুলে বাইরে আসতেই কানে এলো ওদিকের টোল থেকে কয়েকটি ছাত্রের অধ্যয়নের সুর। উঠোনের চারদিকে ছড়িয়ে-পড়া রক্তিম আলো দেখেই বুঝতে পারলো অন্য দিনের চেয়ে উঠতে আজ একটু বেলা হয়ে গেছে। সাত তাড়াতাড়ি ছোট্ট উঠোনটা ঝাঁট দিয়েই এটা-সেটা টুকিটাকি জরুরী কাজগুলো সেরে গামছা নিয়ে পর্ণকুটির থেকে বেরিয়ে পড়লেন পণ্ডিত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পত্নী। সর্পিল মেঠো পথ যেখানে ঘাটে যাবার প্রশস্ত রাস্তায় এসে মিশেছে, সেই সঙ্গমে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ-পত্নী একটু অবাক্ হয়ে দেখলেন—ঘাটের পথে আজ এত ভিড় কেন? আজ কোন উৎসব অনুষ্ঠান বা পালা-পার্বণের দিন, সহসা মনে করতে পারলেন না। তিনি ঘাটের দিকে চলতে সুরু করলেন। হঠাৎ মনে পড়ল আজ কি যেন এক ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাণী গঙ্গাস্নান করতে আসবেন। রাণীর গঙ্গাস্নান উপলক্ষে ঘাটে প্রস্তুতি চলছে গতকাল থেকে। কৃষ্ণরাম-পত্নী গতকাল স্নান করতে গিয়ে দেখে এসেছেন, ঘাটের খানিক অংশ চাঁদোয়া আর সামিয়ানা দিয়ে ঘেরা হচ্ছে। গঙ্গাস্নানে পুণ্য সঞ্চয় করার লোভে এলেও, তিনি মহারাণী, অন্য সকলের চেয়ে পৃথক্, অন্য সকলের চেয়ে মর্যাদাসম্পন্না। তাই ঘাটে এই বিশেষ ব্যবস্থা।

ঘাটের কাছে পাল্কি আর বেহারা-বরকন্দাজ দেখে কৃষ্ণরাম-পত্নী বুঝতে পারলেন রাণী এসে গেছেন। আস্তে আস্তে তিনি মেয়েদের ঘাটে এসে দেখলেন সখী, দাসী পরিবৃতা মহারাণীকে। মুগ্ধ হলেন তাঁর বেশভূষায়, অলঙ্কার-আভরণ আর সৌন্দর্যে। পা-পা করে সোপান বেয়ে নেমে এসে ডুব দিলেন গঙ্গায়। পাশেই স্নান করছেন মহারাণী। আরও অনেকেই আছেন—এ পাশে ও পাশে। কেউ রাণীকে দেখছেন সোজাসুজি, কেউ বা আড়ে। কারও চোখে বিস্ময়, কারও চোখ বিমুগ্ধ, আবার কারও চোখে ঈর্ষা।

তিনি আবার দেখলেন রাণীকে, চোখ ভরে দেখলেন, বুক-জলে দাঁড়ানো রাণীর মাথায় রূপোর ঘটি করে দাসীরা জল তুলে ঢালছে, দেখলেন রাণীর সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য। দেখে দেখে আপন মনে একটু হেসে ফেললেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে রাণীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করতে লাগলেন।

স্নান সেরে আহ্নিক করতে করতে হঠাৎ তাঁর আচমনের জল ছিটিয়ে পড়লো রাণীর গায়ে। রাণীর জ্রূজোড়া এক হয়ে গেল। বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে তিনি চাইলেন। দাসীরা হৈ-হৈ করে উঠলো, তাদের মধ্যে প্রধানা যিনি তিনি একটু তাচ্ছিল্যস্বরে বললেন—তুমি কার গায়ে জল ছিটালে জান—চেনো না এঁকে? ইনি নবদ্বীপের মহারাণী। যাও যাও সরে যাও।

মৃদুস্বভাবা কৃষ্ণরাম-পত্নীর আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। তিনি সগর্বে উদ্ধতস্বরে বললেন—রাণী! রাণী আবার কে? আমিই নবদ্বীপের রাণী—যতদিন আমার হাতে শাঁখা ও সিঁথিতে সিঁদুর জলজ্বল করবে ততদিন আমিই রাণী। এই বলে আর কোনও দিকে না চেয়ে তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে এলেন। তাঁর অপসৃয়মান উদ্ধত গতিভঙ্গি অঙ্কিত রইল রাণীর ললাটে। বক্রনেত্র কিছুক্ষণ তাঁর অনুগমন করল গতিপথে।

ঘরে এসে স্বামীর কাছে সমস্ত কথা বললেন। কৃষ্ণরাম নিজ গৃহিণীকে চিনতেন। চিনতেন তাঁর অপরিমিত কথার জন্য। স্বভাবসিদ্ধ মৃদুকণ্ঠে ভর্ৎসনা করলেন। এর বেশি কিছু করা কৃষ্ণরামের স্বভাববিরুদ্ধ। পণ্ডিত কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য পরম বৈষ্ণব, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, বৈষ্ণবোচিত সকল গুণই তাঁর মধ্যে বিরাজিত। বৈষ্ণবোচিত সকল আদর্শকে তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। সেগুলিকে তাঁর জীবনের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। অত্যন্ত বিনয়ী, নির্লোভী, নিস্পৃহ শাস্ত্রবিদ্ কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য। বিদ্বজ্জন সমাজে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর সমুজ্জ্বল। তাঁর কত ছাত্র অর্থ আর যশের চূড়ায় অধিষ্ঠিত। কত ছাত্র দেশ বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তিনি দারিদ্র্য সত্ত্বেও নির্লোভী, অর্থের প্রতি নিস্পৃহ। এই দীন পর্ণকুটিরে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। মাঝে মাঝে এখান সেখান থেকে দু-একটি ছাত্র আসে। এলে দু-একটি প্রাণী বাড়ে। এই পর্যন্ত। তাঁরা এতেই সুখী। একজন শাস্ত্রালোচনা আর পুঁথি নিয়ে থাকেন আর একজন সাংসারিক শত অনটনের মধ্যেও হাসিমুখে সংসারের হাল ধরে থাকেন। কখনও কোন অভিযোগ বা অনুযোগ করেন না।

মহারাণী স্নান সেরে মনে চিন্তা নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন। চিন্তা— মহারাজকে খবরটা জানাতে হবে আর ব্রাহ্মণী সম্বন্ধে সমস্ত কিছু অনুসন্ধান করতে হবে।

মধ্যাহ্নভোজন সেরে বিদ্যোৎসাহী ও প্রজারঞ্জন মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় প্রতিদিনের অভ্যাসমত এলেন শয়নকক্ষে বিশ্রাম করতে। এই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করলেন মহারাণী। একথা সেকথার পর একে একে আজকের কাহিনী ব্যক্ত করলেন খুব স্বাভাবিকভাবে। শেষে মহারাণী একটু কটাক্ষভরে বললেন—শুনতে পাই, মহারাজ নাকি নবদ্বীপের পণ্ডিতদের যথেষ্ট অর্থ ও জমি দান করে নবদ্বীপের অধিপতির সুনাম কিনেছেন। কিন্তু আজকের এই ব্রাহ্মণ-পত্নীকে দেখে সে-কথা তো মনেই হল না, তার মধ্যে তো স্বচ্ছলতার কিছুই দেখতে পেলুম না। এমন কি তার গায়ে একরত্তি রাংও নেই। সোনাদানা তো দূরের কথা। তাকে দেখেই বেশ বোঝা যায় আপনার রাজত্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কি রকম অবস্থা! যাক্ আমার অনুরোধ, ঐ ব্রাহ্মণীকে আপনি কিছু আর্থিক সাহায্য করুন, আমার মনে হয় দারিদ্র্যে, অভাবে-অনটনে ক্লিষ্ট দুঃখী ব্রাহ্মণী হঠাৎ

আমার ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষিত হয়ে আমাকে অমনভাবে ঐ রকম কথা বলেছেন।

মহারাজা ধীরভাবে মহারাণীর কথাগুলি শুনলেন। ব্রাহ্মণীর অনুসন্ধান করতে মহারাজকে বাধ্য করলো মহারাণীর কটাক্ষ। অধিক সন্ধান করতে হলো না—সহজেই শাস্ত্রবিদ পরমবৈষ্ণব কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্যের ব্রাহ্মণীর সংবাদ পেলেন।

সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি সহস্র মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে পণ্ডিত কৃষ্ণরামের পর্ণকুটিরে উপস্থিত হলেন মহারাণীর অনুরোধ রক্ষা করতে।

কৃষ্ণরাম তখন অধ্যাপনায় ব্যস্ত। মাটির দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে বসে ছাত্ররা অধ্যয়ন করছে, এমন সময়ে স্বয়ং মহারাজা এসে হাজির।

মহারাজকে তাঁরই কুটিরে দেখে কৃষ্ণরাম তো অবাক্। তাড়াতাড়ি শশব্যস্তে মহারাজকে অভ্যর্থনা করলেন। কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। মনে মনে ভাবলেন—এই দীনের কুটিরে মহারাজের আবির্ভাব কেন? তবে কি? গঙ্গার ঘাটের কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল তাঁর স্ত্রীর ব্যবহারের কথা। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুঃখিত হলেন। স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের জন্য নিজেই মহারাজার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন—স্বল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মণী মহারাণীর মর্যাদা রাখতে পারেন নি, সত্যই আমি দুঃখিত, আমি তাঁর হয়ে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আপনার কাছে। মহারাজ এসেছেন শুনে ব্রাহ্মণীও দরজার পাশে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মহারাজ বললেন—পণ্ডিত মশাই, আমার কাছে ক্ষমা চাইবার দরকার নেই। আপনার গৃহিণী তো কোন অন্যায় কথা বলেন নি, বরং সত্য কথাই বলেছেন। আমারই নানা দিক থেকে ত্রুটি রয়ে গেছে আপনাদের কাছে।

কৃষ্ণরাম বললেন—সে কি মহারাজ, আপনি বিদ্যোৎসাহী, প্রজারঞ্জন, মহাপ্রতিপালক। আপনার কোন ত্রুটি তো আমরা উপলব্ধি করতে পারি নি।

মহারাজ—হ্যাঁ, প্রতিপালনের ত্রুটি হয়ে গেছে, আপনি দয়া করে আমার কথা রাখুন—তা হলেই আমার ত্রুটি সংশোধন হবে। আমি আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি যে আপনার স্ত্রীর অঙ্গে কিছুমাত্র আভরণ নেই। আপনার মত বিদ্বজ্জনের যদি সাংসারিক বিষয়ে আবদ্ধ থাকতে হয়, তো সে ত্রুটি রাজার। আপনার কেন? তাই আমি অতি বিনীতভাবে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ এনেছি—যদি তা গ্রহণ করেন, তবে আমি ও আমার স্ত্রী উভয়েই খুব খুশি হব।

ব্রাহ্মণ মহারাজের অযাচিত দানে মানসিক দৈন্য অনুভব করতে লাগলেন। করজোড়ে বিনীতভাবে বললেন—মহারাজ, অর্থের প্রার্থী আমরা নই, টাকা আমাদের প্রয়োজন নেই, আমরা এমনিতেই বেশ সুখে আছি। আর টাকা থাকারও অনেক বিপদ, একে চোর ডাকাতের ভয়, টাকা রাখলে তাকে আগলে নিয়ে থাকতে হয়, তাতে শাস্ত্রালোচনার ব্যাঘাত ঘটবে। শাস্ত্রালোচনার পরিবর্তে অর্থ বৃদ্ধির কামনাই জাগবে। না, মহারাজ নিরাপদে টাকা রাখার জায়গা আমাদের নেই, আপনি টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যান।

ব্রাহ্মণী অন্তরাল থেকে তাঁদের কথা শুনছিলেন—স্বামীর মুখে টাকা রাখার স্থান নেই শুনে তিনি আর থাকতে পারলেন না—মহারাজের উদ্দেশ্যে অলক্ষ্য থেকেই একটু চেঁচিয়ে বললেন—মহারাজ, টাকা রাখার আমাদের যথেষ্ট জায়গা আছে, কিন্তু টাকা আমাদের নেই।

ব্রাহ্মণ তো অবাক, এ কি করলে ব্রাহ্মণী, লোভ, টাকার লোভ, এতদিন এইভাবে সংসার করে এখন এই সামান্য টাকার লোভ, ছিঃ! ছিঃ! তিনি দুঃখিত ও লজ্জায় অধোবদন হলেন—আর ব্রাহ্মণীকে তিরস্কার করলেন।

কিন্তু মহারাজ বুঝলেন—ব্রাহ্মণী টাকা চান আর টাকা নিতেও রাজী তাই এগিয়ে এসে সবিনয়ে বললেন—দেবি, আপনিই টাকা রাখুন, আপনার কাছে টাকা থাকলে তার সদ্ব্যবহারই হবে। আমি পণ্ডিত মশাইকে বুঝিয়ে বলছি।

ব্রাহ্মণী অন্তরাল থেকেই বললেন—দাঁড়ান মহারাজ, একটু অপেক্ষা করুন। আমি টাকা রাখার পাত্র নিয়ে আসি—সেই পাত্রেই আপনি নিজ হাতে টাকা রেখে দেবেন।

এই বলে ব্রাহ্মণী ছুটে পাড়ার যত গরীব দুঃখীদের কাছে গিয়ে বললেন—ওরে টাকা নিবি তো আয়, মহারাজা টাকা দিতে এসেছেন আমার বাড়িতে আয়।

রাজার আসার সংবাদে—রাস্তায় আগে থেকেই অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। নিমেষে টাকা পাবার কথায় বহু লোক তাঁর কুটিরের সামনে জড়ো হল।

ব্রাহ্মণী ফিরে এসে মহারাজকে বললেন—মহারাজ আমার টাকা রাখার পাত্র আমি এনেছি। এই লোকেদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে টাকা রাখুন। তাহলেই আমার টাকা নিরাপদেই থাকবে। চোর ডাকাতের সাধ্য হবে না—সে টাকা কেড়ে নিয়ে যেতে—আর স্বামীরও শাস্ত্রালোচনার বিঘ্ন হবে না, টাকা নিরাপদেই থাকবে।

মহারাজা ব্রাহ্মণীর কথায়, ব্রাহ্মণীর এই উপস্থিত বুদ্ধিতে, স্তম্ভিত ও আশ্চর্যান্বিত হলেন। ব্রাহ্মণীর কথামত প্রত্যেককে একটি করে টাকা দিলেন। জনতা আর ফুরোয় না—টাকা নিঃশেষ হয়ে গেল। তখনও অনেক লোক। ব্রাহ্মণী মহারাজকে শুনিয়ে বললেন—মহারাজ, এখনও টাকা রাখবার অনেক জায়গা আছে। কিন্তু টাকা আমাদের নেই।

মহারাজ পরাজিত হয়ে ফিরে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন—ব্রাহ্মণীর ঔদার্য, লোভহীনতা আর উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা আর মনে মনে বললেন—হে বাঙলার মহীয়সী নারী তোমাকে শতকোটি প্রণাম। তৃণাচ্ছাদিত গৃহে তোমার বাস, অভাবসঙ্কুল সংসারের পীড়নে দেহ ক্ষীণ, দারিদ্র্যবশত শাঁখা আর সিন্দুর তোমার আভরণ—তবুও তোমার মনের দিক থেকে তুমি শুধু রাণী নও—একচ্ছত্রা সম্রাজ্ঞী। তাই তোমাকে আবার প্রণাম।

রেজাউল করীম

মিশরের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে—তিনজন দেশপ্রেমিকের দান অপরিসীম—মুফতী আব্দহু, সাদ জগলুল পাশা এবং অন্ধকবি ডাঃ মোহম্মদ তাহা হোসেন। সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানির অন্যতম শিষ্য মুফতী আব্দহু মিশরের আদর্শ ও চিন্তাধারার পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁরই প্রভাবে মিশর মধ্যযুগের আদর্শ অতিক্রম করে নতুন যুগে পদার্পণ করে। সাদ জগলুল পাশা মিশরের রাজনৈতিক চেতনা সম্পাদন করেন; তিনি বহু দিক দিয়ে মিশরকে বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্ত করেন। এই দুইজনই আজ পরলোকে। ডাঃ মোহম্মদ তাহা হোসেন এখনও জীবিত আছেন। তিনি পণ্ডিত, কবি ও পরম বিদ্যোৎসাহী। তিনি মিশরে ব্যাপক শিক্ষা-প্রসারের ব্যবস্থা করেন। সারা মিশরে 'অজ্ঞজনের অন্ধ-গুহায়' তিনি করেছেন আলোক বিস্তার। মিশরের রাজনৈতিক গণ্ডগোলের মধ্যেও তাঁর প্রভাব একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি।

অন্ধকবি তাহা হোসেন শুধু কাব্যচর্চাই করেন না, তিনি সক্রিয়ভাবে দেশের সংগঠনের কাজেও আত্মনিয়োগ করতে কুণ্ঠিত নন। এজন্য যতটুকু রাজনীতি চর্চার প্রয়োজন ততটুকু তিনি ক'রে থাকেন। কবি আর রাজনীতি এ-যুগে একই জনে প্রায় দেখা যায় না। তাহা হোসেন তার ব্যতিক্রম। মিশরের সাম্প্রতিক সামরিক বিপ্লবের পূর্বে তিনি কিছুদিন শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর অধিকার করেছিলেন। আজ তাঁর হাতে কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু তবুও তিনি সকল দলের শ্রদ্ধার পাত্র। জেনারেল নেজিব তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। নেজিব রাজতন্ত্র রহিত ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু এখনও মিশরের শাসনতন্ত্র রচিত হয় নি। সেনাদলের হাতেই মিশরের শাসনভার ন্যস্ত। একদিন নেজিব তাঁর সেনাদলের বড় বড় অফিসারদের নিয়ে এক সভা আহ্বান করেন। আর এই চৌষট্টি বছরের অন্ধকবি তাহা হোসেনকে অনুরোধ করেন, তাদেরকে কিছু বলবার জন্য। এই সভায় স্বাধীনচেতা কবি গণতন্ত্র সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ভাষণদান করেন। তিনি সেনাদলকে সাবধান করে দেন যে, কেবল শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা যথেষ্ট নয়। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যে কোন সরকার শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে। কিন্তু অস্ত্রের সাহায্যে যে সরকার শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা আদায় করে, সে সরকার জনসাধারণের কল্যাণ করতে পারে না। এই ধরণের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার চাপে মানুষ অমানুষ হয়ে পড়ে। কারাগারের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা থাকে, স্বাধীন দেশের জনসাধারণের মধ্যে সেই ধরণের আনুগত্য ও শৃঙ্খলার নিয়ম প্রবর্তন করলে জাতির আত্মা নির্জীব হ'য়ে পড়ে।

তাঁর এই অমূল্য উপদেশ সেনাদলের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করল কি না জানা যায় নি। তবে তাঁর সংসাহসকে ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে যে, তিনি সেনাদলের সামনে সত্যকথা বলতে একটুও কুণ্ঠিত হন নি। জেনারেল নেজিব কিন্তু তাঁর ভাষণ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি সেনাদলকে আহ্বান করে বললেন: 'আমি আশা করি আপনারা ডাঃ তাহা হোসেনের কথাগুলি মুখস্থ করবেন। তাঁর এই কথাগুলি আমাদের সংগ্রামের প্রধান ভিত্তি হওয়া উচিত।'

প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ডাঃ তাহা হোসেন মিশরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নানা প্রভাব বিস্তার ক'রে আসছেন। একদিকে অজ্ঞতা দূর করবার জন্য তাঁর অক্লান্ত সাধনা, আর অন্যদিকে শাসক-শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর অবিরাম সংগ্রাম। রাজা ফারুককে

বসুমতী ঃ বৈশাখ '৭১

...র তাহা হোসেন

...ত করতে তিনিও কম সাহায্য করেন নি। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ... প্রবন্ধ লিখে তিনি দেশবাসীর মনোভাবের পরিবর্তন করেন। ...যন্ত্রের স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজনীয়তা—... ত্রিবিধ স্বাধীনতার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। আর এইজন্য ...নি রাজশক্তির চক্ষুঃশূল হ'য়ে উঠেছিলেন। প্রত্যেক মিশরবাসীকে লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেষ্টার ফলে সর্বসাধারণের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। সমগ্র আরব জগতে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের এইটাই প্রথম প্রচেষ্টা।

ডাঃ তাহা হোসেন দরিদ্র কৃষক-পরিবারের সন্তান। যখন তাঁর বয়স মাত্র তিন বছর, তখন তাঁর চোখ দু'টি চিরকালের তরে নষ্ট হ'য়ে গেল। কিন্তু অন্ধ হয়েও তিনি হতাশ হন নি। মিশরে পল্লী অঞ্চলে আধুনিক ব্রেল প্রথায় অন্ধ বালকের লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণ চক্ষুষ্মান বালকের সঙ্গে তিনি লেখাপড়ার অভ্যাস করতে লাগলেন। তাঁর ছিল অদম্য উৎসাহ ও কঠোর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা। অন্ধত্ব তাঁর বিদ্যার্জনের পথরোধ করতে পারল না। তিনি তাঁর আত্মকাহিনীতে বলেছেন :

'অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমি কোনদিন হতাশ হয়ে পড়ি নি।'

শৈশবে তাঁর দেহ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল। তিন বছর বয়সেই ভাইবোনদের কথাবার্তা শুনে তিনি উপলব্ধি করলেন যে জগতে এমন জিনিস আছে, যা তাঁর নিকট অদ্ভুত ; যা তাঁর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। পরে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তারা দেখতে পায় আর তিনি অন্ধ। মিশরের গ্রামাঞ্চলের বহু ছেলেদেরই চক্ষুরোগ হয়, আর তার ফলে তারা চির অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তাহা হোসেনকে অন্ধত্ব-জ্ঞানান্বেষণে বাধা দিতে পারল না। বরং বলা যেতে পারে যে, অন্ধত্বের জন্যই তাঁর জ্ঞানের আগ্রহ খুব বেড়ে গেল। দরিদ্র পরিবারের এই অন্ধ বালকটি প্রথমে স্থানীয় পাঠশালায় প্রেরিত হলেন। তাঁর গৃহে অপরে পড়ে যেত, আর তিনি শুনে শুনে পড়া তৈয়ার করতেন। এইভাবে সমস্ত কোরান-শরীফ মুখস্থ হয়ে গেল। এমন প্রতিভাবান বালকটিকে কেউ অবহেলা করতে পারল না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মিশরের বিখ্যাত শিক্ষানিকেতন 'আল আজহারে' প্রেরিত হলেন। সেখানে বহু পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। একটা বৃত্তিও পেলেন। তারপর কাইরো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। এখান থেকে ১৯১৪ সালে তিনি পি এইচ ডি উপাধি পেলেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্য ফ্রান্সে প্রেরণ করল। সেখানেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পি এইচ ডি উপাধি লাভ করলেন। তারপর একজন ফরাসী মহিলার পাণিগ্রহণ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেই তিনি কাইরো বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। তাঁর শিক্ষার ধারা ছিল প্রচলিত ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর পূর্বে কোন অধ্যাপকই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার কথা বলতেন না। কিন্তু ডাঃ তাহা হোসেন চিরাচরিত প্রথা ভেঙ্গে দিলেন। তিনি ছাত্রদের চিন্তাশক্তি জাগ্রত করতে সাহায্য করতে লাগলেন। সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মের মান্ধাতার আমলের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য বর্তমান যুগের তরুণ মনকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। তারা চায় বৈপ্লবিক আদর্শ ও বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা। তাহা হোসেন ছাত্রদের চিন্তার মধ্যে সেই বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন।

তিনি এই উপদেশ দিলেন যে, প্রত্যেকটি বিষয় নিজের স্বাধীন মত দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। তোমাদের মন যদি প্রচলিত ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করতে বলে, তবে তাই করবে, তবুও অপরের মতকে গ্রহণ করবে না। তোতাপাখির মত অপরের বুলি আওড়ানো অপেক্ষা নিজের মতের মূল্য অনেক বেশি—নিজের সে মত যদি ভুল হয় তবুও। মিশরের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরণের শিক্ষা দিবার রীতি ছিল না। সেখানে স্বাধীন চিন্তার স্থান ছিল না। যুগ যুগ থেকে যে সব বিশ্বাস সকলেই বিনা বিচারে মেনে আসছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ছাত্রগণকে তাই শিক্ষা দিতেন। কোথাও তার ব্যতিক্রম হ'ত না। ইসলামের পৌরাণিক উপকথাগুলি লোকে আপ্তবাক্যের মত বিশ্বাস করত। তার বিরুদ্ধে কারুর কিছু বলবার অধিকারও ছিল না, ক্ষমতাও ছিল না। কিন্তু এই অন্ধ অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ধারাকে একেবারে বদলিয়ে দিলেন। এই সময় তিনি একখানা বই লিখলেন তাতে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারকে কঠোরভাবে আক্রমণ করলেন। এই গ্রন্থে তিনি অসীম সাহসে ঘোষণা করলেন যে, আরবদের মধ্যে প্রচলিত বহু কথা গালগল্প ব্যতীত আর কিছুই নয়।

রক্ষণশীল সমাজ এই প্রকার স্বাধীনচেতা মানুষকে সহ্য করতে পারে না। সুতরাং অল্পকালের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ হল। বাধ্য হ'য়ে সরকার একটা তদন্ত কমিশন গঠন করলেন। এই তদন্ত কমিশন দেখল যে, ডাঃ তাহা হোসেনের রচনাবলী সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত ; আর খাঁটি সত্য। কিন্তু রক্ষণশীল দল তাতে সন্তুষ্ট হল না। মিশরের পার্লামেন্টের একদল সদস্য দাবী করল এই সব রচনা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু অপর একদল সদস্য তাহা হোসেনকে সমর্থন করল। ফলে পার্লামেন্টে তুমুল বাদানুবাদ আরম্ভ হল। মন্ত্রিমণ্ডল এই ইশুতে আস্থার প্রস্তাব দাবী করলেন। ভোটে মন্ত্রিমণ্ডলই জয়ী হ'লেন। এইভাবে ডাঃ তাহা হোসেনের প্রভাবে মিশরে স্বাধীন চিন্তার পথ অনেকটা প্রসারিত হল।

১৯৩০ সালে ডাঃ তাহা হোসেন কাইরো বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর (Rector) নির্বাচিত হলেন। তিনি বাক্-স্বাধীনতার চরম সমর্থক ছিলেন। আর এই ইশু নিয়ে তাঁর সঙ্গে মিশরের প্রধানমন্ত্রী সিদকী পাশার বিরোধ দেখা দিল। তিনি দাবী করলেন যে, ডাঃ তাহা হোসেনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেক্টরের আসন থেকে সর্বপ্রকার সরকারী কার্যের সমালোচনা বন্ধ করতে হবে অথবা পদত্যাগ করতে হবে। কিন্তু ডাঃ তাহা হোসেন একটুও বিচলিত হলেন না।

তিনি দৃঢ়ভাবে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন, 'মহাশয়, আপনি বৃথাই ক্রোধ প্রকাশ করছেন :—স্বাধীন চিন্তা আমার প্রাণবায়ু, স্বাধীন চিন্তা ব্যতীত মিশরের উন্নতি নাই।—'

কিন্তু সিদকী পাশার ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। তিনি ডাঃ তাহা হোসেনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই দুর্ব্যবহারে তিনি দমে গেলেন না। তিনি দিনেকের

ত্বেও তাঁর আদর্শ বর্জন করলেন না। অতঃপর দেশের শিক্ষা-ক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করলেন। নানা স্থানে ভা-সমিতি ক'রে তাঁর আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন, আর সেই সঙ্গে পুস্তকাদি লিখে দেশময় একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন। এই সময় তাঁর আয়ের পরিমাণ ছিল অতি সামান্য। পীড়িত সন্তানদের পরিচর্যায় তাঁর অধিকাংশ আয় খরচ হয়ে গেল। তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

তিনি এই ব'লে মনকে প্রবোধ দিলেন: দরিদ্রকে তার ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট হ'তে হবে—তা না হলে কেমন করে সে তার ভাগ্যের পরিবর্তন করবে। দারিদ্র্য, অভাব ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তিনি তাঁর আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হবেন না। তিনি স্বাধীন চিন্তার অধিকার চাইলেন শুধু নিজের জন্য নয়—সমগ্র দেশবাসীর জন্য। তিনি অক্লান্তভাবে সমাজ-প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে লাগলেন। রক্ষণশীল সমাজ তাঁকে নানাভাবে অপদস্থ করতে উদ্যত হ'ল। কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দিলেন না; ধীরে ধীরে তাঁর সমর্থক সংগ্রহ করতে লাগলেন। মিশরে একটি বলিষ্ঠ দল গড়ে উঠল—যারা তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। মিশরের সর্বত্র শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ডাঃ তাহা হোসেন যে চেষ্টা ক'রে আসছিলেন, এতদিন পরে তা কিছুটা সফল হ'ল।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে যখন নূতন পার্লামেণ্ট আহূত হ'ল, সেই সময়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা ঘোষিত হ'ল।

ঘোষণাটি এই: আজ থেকে সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হবে। কিন্তু তাহা হোসেন এই সামান্য সংস্কারে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, অন্তত মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া উচিত।

ইতিমধ্যে তাঁর বিরোধী দলের প্রভাব হ্রাস পেতে লাগল। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর অধীনে 'টেকনিকাল' পরামর্শদাতা নিযুক্ত হলেন। এই পদে থাকাকালীন তিনি কয়েকটি নূতন সংস্কার প্রবর্তন করলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের জন্য সরকারী ব্যয়ে টিফিন বা জলযোগ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। আলেকজান্দ্রিয়াতেও একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা প্রায় আট হাজার।

১৯৫০ সালে আবার যখন নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হল, তখন ডাঃ তাহা হোসেন শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে অনুরুদ্ধ হ'লেন।

তিনি বললেন: 'মিশরের জন্য যে-ধরণের শিক্ষার দরকার যদি আমাকে সে বিষয়ে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়, তবেই মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করব।'

ডাঃ তাহা হোসেনের নামের মহিমার জন্য নূতন প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রস্তাব সানন্দে স্বীকার ক'রে নিলেন। মন্ত্রিত্বপদ পাওয়া মাত্র ডাঃ তাহা হোসেন সমগ্র দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক বলে ঘোষণা করলেন। সেই সঙ্গে আর একটা আইন পাশ করিয়ে নিলেন যার ফলে পনেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক মিশরবাসীর জন্য শিক্ষালাভ করা বাধ্যতামূলক হল। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান নীতি গ্রহণের ফলে একটা নূতন সমস্যা দেখা দিল—এর জন্য চাই হাজার হাজার শিক্ষক—কোথায় এত শিক্ষক পাওয়া যাবে? কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি পশ্চাদ্‌পদ হলেন না। দেশব্যাপী একটা বিরাট প্রোগ্রাম করে ফেললেন। কতকগুলি গ্রামে মডেল স্কুলঘর তৈয়ার করালেন। কোন কোন অঞ্চলে বাসোপযোগী ঘরকেই স্কুলঘরে পরিণত করলেন। এইভাবে অল্পদিনের মধ্যে এই নূতন ধরণের স্কুলের সংখ্যা ছাব্বিশ শ'য়ে দাঁড়াল। উপযুক্ত শিক্ষক যোগাড় করবার জন্য নানাস্থানে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। আঠারো মাসে প্রায় ১২০০০ হাজার শিক্ষক তৈয়ার হ'য়ে গেল। একটা কৃপণ সরকারের নিকট থেকে অর্থ আদায় করবার জন্য তাঁকে অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হল। অর্থ আদায়ের শ্রেষ্ঠ কৌশল এই ছিল যে, তিনি সব সময়ে পকেটে পদত্যাগপত্র রেখে দিতেন। সরকার অর্থের অভাব দেখালে সেই পদত্যাগ-পত্র দাখিল ক'রে সমস্ত দায় থেকে মুক্তি চাইতেন। একবার মন্ত্রিমণ্ডল তাঁর শিক্ষাখাতে অতিরিক্ত ২৫০০০ পাউণ্ড দিতে অসম্মত হলেন। এই টাকা নূতন শিক্ষকদের বেতনের জন্য প্রয়োজন ছিল। তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে সেই মুহূর্তে পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। সুতরাং মন্ত্রিমণ্ডল আর দ্বিরুক্তি না করে তাঁকে সেই টাকাটা দিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে ডাঃ তাহা হোসেন আরও অনেক ভাল কাজ করেছেন। মিশর ও পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক-বন্ধন দৃঢ় করবার জন্য তিনি নানা চেষ্টা করতে লাগলেন। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার অনেক ভাল ভাল গ্রন্থের আরবী অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। হাজার হাজার মিশরীয় ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। এইসব সংস্কৃতিমূলক কাজ করবার সময় তিনি প্রধান বাধা পেয়েছিলেন মিশরের রাজা ফারুকের নিকট থেকে। এই রাজা ছিলেন অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর পূর্বপুরুষ মহম্মদ আলির কোন গুণই তাঁর মধ্যে ছিল না। কিন্তু দৃঢ়চেতা ডঃ তাহা হোসেন এ-হেন দাম্ভিক রাজাকেও পরোয়া করতেন না। তিনি প্রয়োজন হলে ফারুকের এবং সাঙ্গোপাঙ্গদের কঠোরভাবে সমালোচনা করতেন। তাঁর পরিচালিত সংবাদপত্র 'দি ইজিপশিয়ান স্ক্রাইব' স্বাধীন সমালোচনার জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। এই পত্রিকাখানি এরূপভাবে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার করত যে, রাজদরবার ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত। এই সময় ডাঃ তাহা হোসেন এই পত্রিকায় 'অনেস্টি ইন গভর্নমেণ্ট' (শাসনকার্যে সততা) এই শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধটির ফলে তিনি সরকারের বিরাগভাজন হলেন। রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক লেখার জন্য তিনি ধৃত হলেন এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। রাজা ফারুক তাঁকে অপদস্থ করবার কোন সুযোগ ছাড়তেন না। একবার রাজার মনোনীত একটি কমিটি ডাঃ তাহা হোসেনকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু রাজা তাঁকে সে-টাকা ত' দিলেনই না, তদুপরি সেই কমিটিকে ভেঙ্গে দিলেন।

শিক্ষা বিস্তারের প্রধান শত্রু ছিলেন রাজা ফারুক। তিনি ক্রমেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু তাঁর এই স্বৈরাচার বেশিদিন টিকল না। ১৯৫২ সালে জেনারেল নেজিব ফারুককে পদচ্যুত করেন। এই পদচ্যুতি গণ-বিপ্লবের ফলে হয় নি—হয়েছে সামরিক বিপ্লবের ফলে। এর পেছনে ডাঃ তাহা হোসেনের কোন হাত ছিল না। যখন রাজা পদচ্যুত হলেন, তখন ডাঃ তাহা হোসেন ইউরোপে

ছিলেন। তবে একথা সত্য যে, ডাঃ তাহা হোসেন দীর্ঘদিন ধরে রাজা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অক্লান্ত-অভিযান চালিয়ে আসছিলেন। দেশের জনসাধারণ রাজতন্ত্রবিরোধী হয়ে উঠেছিল তাঁরই প্রচারকার্যের ফলে। সেইজন্য দেশবাসীর মন থেকে ফারুকের প্রভাব কমে গিয়েছিল। মিশরের বর্তমান সরকার একেবারে ডিক্টেটোরিয়াল। কবি তাহা হোসেন নেজিব সরকারকে সমর্থন করেন। তার কারণ এই যে, নেজিব সরকার দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়েছে যে, অদূরভবিষ্যতে মিশরে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবে। নেজিব গণতান্ত্রিক শাসন রচনা করবার জন্য যে কমিটী গঠন করেছেন, তাতে ডাঃ তাহা হোসেন অন্যতম সদস্য মনোনীত হয়েছেন। জেনারেল নেজিব এই অন্ধকবির একজন গুণমুগ্ধ সমর্থক। কবি অবৈতনিক উচ্চশিক্ষার জন্য যে স্কীম রচনা করেছেন, নেজিব তাকে বাস্তবরূপ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বর্তমানে কয়েকটি কমিটীর সদস্যপদ তিনি গ্রহণ ক'রে শান্তভাবে কাজ করছেন। তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখন তিনি মিশরের একটি দূরবর্তী শান্ত অঞ্চলে সাদাসিধেভাবে বাস করেন। তাঁর ঘরে গ্রীক, ফরাসী, আরবী ভাষার হাজার হাজার গ্রন্থ আলমারীতে সাজান আছে। প্রতিদিন কেউ না কেউ তাঁকে এইসব বই পড়ে শোনায়—বৃদ্ধবয়সে মিলটনকে যেমন বই প'ড়ে শোনান হ'ত। মিলটনের মতই তাঁর একটি প্রিয় জিনিস হচ্ছে সঙ্গীত। তিনি আরবী ও পাশ্চাত্য গান ভালবাসেন। তাঁর ঘরে সঙ্গীতের সরঞ্জামের অভাব নেই।

মিশরের নূতন শাসনতন্ত্র রচনার কাজ আরম্ভ হয়েছে। ডাঃ তাহা হোসেন এই কাজে বহু সাহায্য করেছেন। প্রবন্ধ, কবিতা, রচনা —এসব কাজও সমান তালে চলছে। তদুপরি আছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সপক্ষে বক্তৃতা। একবার নেজিবই বলেছিলেন, অন্য কোন আমোদ-আহ্লাদে সময় কাটানো অপেক্ষা ডাঃ তাহা হোসেনের বক্তৃতা শুনলে অনেক লাভ হবে। লেখার জন্য মিশরের বাইরেও তাঁর যথেষ্ট সমাদর আছে। ১৯৪৭ সালে যখন আঁদ্রে জিদ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, নোবেল প্রাইজ পেতে পারে এমন ক'জন কবি ও শিল্পীর নাম করতে পারেন?

উত্তরে আঁদ্রে জিদ বলেছিলেন,—'I have but one choice—Taha Hossain.'

বাস্তবিকই তিনি মিশরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি। তাঁর খ্যাতি পাশ্চাত্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত। অক্সফোর্ড,রোম প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারী ডিগ্রী প্রদান করেন। গত বৎসর UNESCO তাঁকে একটি শাখার ডিরেক্টার জেনারেল করতে চেয়েছিল। কিন্তু নেজিব তাঁকে ছাড়তে রাজী হন নি। নেজিবের ইচ্ছা যে,শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মিশর তাঁকে কোথাও যেতে দিতে পারে না।

শেক্‌স্‌পীয়র প্রসংগে

ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি শেক্সপীয়রের প্রণীত ভ্রান্তি প্রহসন পড়িয়া আমার বোধ হইয়াছিল, এতদীয় উপাখ্যানভাগ বাংলা ভাষায় সঙ্কলিত হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে। শেক্সপীয় পঁয়ত্রিশখানি নাটকের রচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত নাটকসমূহে কবিত্বশক্তির ও রচনা-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেক, তিনি চারিখানি খণ্ডকাব্যের ও কতকগুলি ক্ষুদ্রকাব্যের রচনা করিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি যে কেবল ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, এরূপ নহে, এ পর্যন্ত ভূমণ্ডলে যত কবি আবির্ভূত হইয়াছেন, কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বা পক্ষপাতবিবর্জিত কি না, মাদৃশ ব্যক্তির তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন মাত্র। ভ্রান্তি প্রহসন কাব্যাংশে শেক্সপীয় প্রণীত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট; কিন্তু উহার উপাখ্যানটি যারপরনাই কৌতুকাবহ। তিনি এই প্রহসনে হাস্যরসোদ্দীপনের নিরতিশয় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকালে হাস্য করিতে করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়। ভ্রান্তিবিলাসে শেক্সপীয়রের সেই অপ্রতিম কৌশল নাই; সুতরাং ইহা দ্বারা লোকের তাদৃশ চিত্তরঞ্জন হইবেক, তাহার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালা পুস্তকে ইয়ুরোপীয় নাম সুশ্রাব্য হয় না; বিশেষত যাঁহারা ইঙ্গরেজী জানেন না, তাদৃশ পাঠকগণের পক্ষে বিলক্ষণ বিরক্তিকর হইয়া উঠে। এই দোষের পরিহার বাসনায় ভ্রান্তিবিলাসে সেই সেই নামের স্থলে এতদ্দেশীয় নাম নিবেশিত হইয়াছে। উপাখ্যানে এবংবিধ প্রণালী অবলম্বন করা কোন অংশে হানিকর বা দোষাবহ হইতে পারে না। ইতিহাসে বা জীবনচরিতে নামের যেরূপ উপযোগিতা আছে, উপাখ্যানে সেরূপ নয়। [১৮৬৯]

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ফার্দিনান্দের সহিত প্রণয় ব্যাপারেই মিরান্দার প্রধান পরিচয়। আর ঝড়ের সময় ভগ্নতরী হতভাগ্যদের জন্য ব্যাকুলতায় তাহার ব্যথিত হৃদয়ের করুণা প্রকাশ পাইয়াছে। শকুন্তলার পরিচয় আরো অনেক ব্যাপক। দুষ্যন্ত না দেখা দিলেও তাহার মাধুর্য বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠিত! তাহার হৃদয়লতিকা চেতন অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিতবেষ্টনে সুন্দর করিয়া বাঁধিয়াছে! সে তপোবনের তরুগুলিকে জলসেচনের সঙ্গে সঙ্গে সোদরস্নেহে অভিষিক্ত করিয়াছে। সে নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আপনার কোমল হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। শকুন্তলা যখন তপোবন ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাইতেছে তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পদে তাহার বেদনা। বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক সকরুণ হইতে পারে, তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়। টেম্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতি এরিয়েলের মধ্যে মানুষ-আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তবু সে মানুষের আত্মীয়তা হইতে দূরে রহিয়াছে। মানুষের সঙ্গে তাহার অনিচ্ছুক ভৃত্যের সম্বন্ধ। সে স্বাধীন হইতে চায়, কিন্তু মানবশক্তি দ্বারা পীড়িত আবদ্ধ হইয়া দাসের মতো কাজ করিতেছে। তাহার হৃদয়ে স্নেহ নাই, চক্ষে জল নাই। মিরান্দার নারীহৃদয়ও তাহার প্রতি স্নেহ বিস্তার করে নাই। দ্বীপ হইতে যাত্রাকালে প্রস্পেরো ও মিরান্দার সহিত এরিয়েলের স্নিগ্ধ বিদায় সম্ভাষণ হইল না। টেম্পেস্টে পীড়ন, শাসন, দমন—শকুন্তলায় প্রীতি, শান্তি, সদ্ভাব। টেম্পেস্টে প্রকৃতি মানুষের আকার ধারণ করিয়াও তাহার সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে বদ্ধ হয় নাই—শকুন্তলায় গাছপালা-পশুপক্ষী, আত্মভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়াছে। [১৯০২]

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লণ্ডনের ন্যাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারী

ডক্টর শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাণী আলেকজান্দ্রা (১৮৪৪-১৯২৫)
—স্যার লিউক ফিল্ডস অঙ্কিত

কোন জাতই তার অতীতকে অস্বীকার করে বড় হতে পারে না। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, কৃষ্টি, কলা ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তার সংরক্ষণের মাধ্যমেই সেই দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিপূর্তি লাভ করে। আধুনিক দুনিয়ায় ইংরেজরা জাত হিসাবে বোধ হয় এ কথার সত্যতা সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেছিল।

জগতের এক প্রাচীন সভ্যতার দেশ থেকে আমরা এখানে আগন্তুক। কিন্তু এদেশে আসার আগে কখনো বুঝতে পারি নি যে প্রাচীনের প্রতি আমাদের অবহেলা কত গভীর! যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি যে যা' কিছু প্রাচীন, যা কিছু স্মরণীয়, যার পেছনে কোনও একটু ইতিহাস আছে, তাকেই সযত্নে রক্ষা করার জন্য এদের কি অকুণ্ঠ প্রয়াস! ছোট বড় যে-কোন শহরেই সরকারী-বেসরকারী অসংখ্য গ্যালারী, মিউজিয়াম দেখলে আমাদের আত্মধিক্কার আসারই কথা!

যাক সে সব কথা! আজ বরং আমরা বিখ্যাত ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারী নিয়ে কিছু আলোচনা করি।

লণ্ডনের প্রাণকেন্দ্র, কর্মচঞ্চল 'ওয়েস্ট এণ্ডের' মধ্যে দিয়ে সোজা চলে গেছে জনবহুল রাস্তা চেয়ারিং ক্রশ রোড। 'টটনম্' কোর্ট রোড টিউব স্টেশন থেকে সুরু হয়ে লেস্টার স্কোয়ার স্টেশনের পাশ দিয়ে সোজা গিয়ে পড়েছে 'স্ট্রাণ্ডের' ওপর। স্ট্রাণ্ডের পাশেই বহু প্রচারিত 'ট্রাফালগার স্কোয়ার'। এখানে গগনচুম্বী স্তম্ভের ওপর বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি লর্ড নেলসনের বিশাল মূর্তি। সারা ট্রাফালগার স্কোয়ার জুড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রাদের আসা-যাওয়া দাঁড়িয়ে দেখার মত দৃশ্য।

স্কোয়ারের চারপাশের রাস্তায় সর্বক্ষণ গাড়ির ভিড় লেগেই আছে। কর্মব্যস্ত মানুষ শশব্যস্ত হয়ে চলাফেরা করছে। কৌতূহলী পর্যটকের দল ফটো তুলতে ব্যস্ত। সব মিলিয়ে একটা জীবন্ত ভাব!

এই ট্রাফালগার স্কোয়ারের এক পাশেই লণ্ডনের বিশ্ববিখ্যাত দু'টি জাতীয় চিত্রশালা অবস্থিত। একটি হ'ল ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারী আর তার পাশেই ন্যাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারী। এদেশের এবং বিদেশের সেরা শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন রাখা আছে ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারীতে।

পৃথিবীর সর্বকালের বিখ্যাত প্রতিকৃতি-চিত্রকলার সংগ্রহ হিসাবে ন্যাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারী প্রায় অদ্বিতীয় বলা চলে।

প্রতিকৃতি-চিত্রের দিকে ইংরেজদের ঝোঁকটা বরাবরই বেশি। শুধু ধনী বা অভিজাতই নয়, সাধারণ স্বচ্ছলগৃহস্থও চাইতো বাপ-মা আর পরিবারের ছবি আঁকিয়ে রাখতে। দশম-একাদশ শতক থেকেই এ-বিষয়ে এদেশের লোকেদের আগ্রহ দেখা যায়। তখন ক্যানভাস, কাঠ, কাগজ বা অন্য-কিছুর ওপর ছবি আঁকার রেওয়াজ এদেশে চালু হয় নি। তাই এ-সময় শিল্পীরা গ্রাহকদের বাড়িতে গিয়ে বাড়ির দেওয়ালেই পরিবারের ছবি এঁকে আসতেন। কিন্তু দুর্গ, ঘর-বাড়ি পুরোনো হয়ে ধ্বংস হয়ে গেলে সেই সংগে ছবিও নষ্ট হয়ে যেত। তাই সে-সময়কার এ ধরণের শিল্প-নিদর্শন প্রায় দুষ্প্রাপ্যই বলা চলে।

ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিক থেকে ইংলণ্ডে ডাচ ও অন্যান্য বিদেশী শিল্পীদের আসা-যাওয়া সুরু হ'ল। এঁরা সাধারণত ভাগ্য অন্বেষণের আশাতেই এদেশে উপস্থিত হতেন। কিন্তু এদেশের ধনী ও অভিজাত সমাজে এঁরা সাদরেই গৃহীত হলেন। এঁরাই এদেশে প্রথম ক্যানভাস বা অন্যান্য উপাদানের ওপর ছবি আঁকার প্রবর্তন ঘটান যা' সহজেই ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা যেত। এঁদের ছবি আঁকার রীতিও ইংলণ্ডের শিল্পধারাকে বিশেষ প্রভাবিত করলো।

লণ্ডনের ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারী

শুধু তাই নয়, চিত্রের সমঝদার হওয়া এ-সময়ে ইংলণ্ডের অভিজাতদের মধ্যে একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেক ধনী ও অভিজাত পরিবারের ছেলেদের শিক্ষার অন্যতম অংগ ছিল শিল্প-কলায় পারদর্শিতা লাভ করা। চিত্রকলার ওপর ঝোঁকটা ছিল সবচেয়ে বেশি।

এই জন্যে দেশে লেখাপড়া শেষ করেই এ-দেশের বড়ঘরের ছেলেরা বেড়াতে যেতেন ইটালীতে। ইটালীর ফ্লোরেন্স, ভেনিস, নেপল্‌স নগরী তখন চিত্রশিল্পের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী আর শিল্পরসিকরা তখন গিয়ে সমবেত হতেন ইটালীতে। ইংলণ্ডের এই শিক্ষিত যুবকরা ইটালীতে গিয়ে শুধু যে শিল্পের চর্চাই করতেন তা নয়, দেশে ফিরে আসার সময় ইটালার সমসাময়িক শিল্পীদের আঁকা কিছু ছবিও তাঁরা কিনে আনতেন পরিবারের সংগ্রহ হিসাব।

এর ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই চিত্রশিল্প ও চারুকলার ওপর বেশ জ্ঞান ও আগ্রহ আছে এমন অসংখ্য পরিবার দেখা দিল। বিখ্যাত ডাচ শিল্পী হান্স হলবিন যখন অষ্টম হেনরীর চিত্রশিল্পী হয়ে ইংলণ্ডে এলেন, শিল্প সম্বন্ধে ইংরাজদের গভীর আগ্রহ ও রসবোধ দেখে তিনি গভীরভাবে মুগ্ধই হয়েছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই এদেশে চিত্রশিল্পের নতুন জন্ম বলতে হবে। তার আগে আঁকা প্রায় সব ছবিই নষ্ট হয়ে গেছে। আবার হান্স হলবিনের আসার সংগে সংগেই এদেশে প্রতিকৃতি চিত্রকলায় নিত্য-নতুন ধারার প্রবর্তন হ'তে থাকল। হলবিন, তাঁর ছেলে, স্যার এ্যান্টনী ভ্যান ডাইক, স্যার পিটার লেলী ও উইলিয়াম জোফানীর মত বিখ্যাত বিদেশী শিল্পীর দল ইংলণ্ডে একের পর এক এসে হাজির হলেন। সেই সংগে যাদুকরী ক্ষমতা নিয়ে জন্মালেন স্যার টমাস লরেন্স, স্যার জোসুয়া রেনল্ড্‌স, রামসে, হগার্থ টার্নারের দল। এঁরা যুগপৎ রাজা ও দেশের আপামর জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করলেন। ফলে পঞ্চদশ শতক থেকে প্রতিকৃতি চিত্রের ক্ষেত্রে সেই যে নতুন নতুন জোয়ারের দেখা দিল, তা আজও অব্যাহত রয়েছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সব শিল্পীদের আঁকা সমস্ত ছবিই ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন পরিবারে, অভিজাতদের দুর্গ প্রাকার বা রাজার নিজস্ব সংগ্রহশালায়। তাদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার কথা কেউ কখনো চিন্তা করে নি। যত্নের অভাব ও অন্যান্য নানা কারণেও অনেক মূল্যবান ছবি নষ্ট হয়ে যেতে লাগলো।

এই সমস্ত ছবির যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ও জনসাধারণের কাছে তা' প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ১৮৪৫ সালে স্বনামধন্য কার্লাইল সাহেব প্রথম এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ পঞ্চম আর্ল স্ট্যানহোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ছিলেন গুণী লোক। শিল্পের প্রতিও তাঁর ছিল একনিষ্ঠ অনুরাগ। তিনি কার্লাইলের অভিমতটি তুলে ধরে একটি জাতীয় প্রতিকৃতি চিত্রশালা গড়ে তোলার জন্যে আন্দোলন সুরু করেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স এ্যালবার্ট ও তখনকার প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ বেঞ্জামিন ডিস্‌রেইলী তাঁদের সক্রিয় সমর্থন জানিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেন।

লর্ড স্ট্যানহোপের আন্দোলনের তীব্রতায় সরকারের টনক নড়ল। ১৮৫৬ সালে প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারী প্রতিষ্ঠার জন্য পার্লামেন্টে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করিয়ে নিলেন। এর পরিচালনার জন্য উপযুক্ত অর্থও পার্লামেন্ট সাদরে মঞ্জুর করলো। এক শক্তিশালী কমিটির ওপর এর পরিচালন-ব্যবস্থা ন্যস্ত করা হ'ল। ঐতিহাসিক প্যালগ্রেভ, লর্ড সল্‌সবেরী, লর্ড পামারস্টোন, কার্লাইল সাহেব প্রভৃতি জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য হলেন। প্রথম সভাপতির পদে বৃত হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা লর্ড স্ট্যানহোপ।

প্রায় সুরু থেকেই ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারীর ওপর দু'টো দায়িত্ব এসে পড়লো। প্রথমত দেশের বিখ্যাত লোকদের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করা। সেখানে দু'টো কথা তাঁদের মনে রাখতে হয়েছে। প্রথমত স্বনামধন্য সমস্ত মনীষীদের কথা। তাঁদের অনেক প্রতিকৃতি আছে যা' কোন নামকরা শিল্পীদের দিয়ে করানো নয় অথচ যার শিল্পমূল্য ও ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট বলতে হবে। তাঁদের সংগ্রহের এটাই হ'ল অন্যতম মাপকাঠি।

তাঁদের সংগ্রহের দ্বিতীয় মাপকাঠি হ'ল, সেরা শিল্পীদের যে কোন কাজ, তা রাজা-মহারাজার প্রতিকৃতিই হোক বা সাধারণ মানুষের ছবিই হোক। তার মধ্যে দিয়ে তাঁরা শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাজের গুণাগুণ বিচার করতে চাইলেন।

কিন্তু আগেই আমরা বলেছি সংগ্রহ ছাড়াও আর একটা দায়িত্বও ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারীর হাতে এসে পড়েছিল। সেটা হ'ল চিত্রসম্বন্ধে জনসাধারণের জিজ্ঞাসার যথোপযুক্ত উত্তর দেওয়া এবং শিল্প সম্বন্ধে ব্যক্তিগত নানা দাবী-দাওয়ার সন্তুষ্টবিধান করা।

উইলিয়াম ওয়ারহাম (১৪৫০ ?—১৫৩২)
হান্স হলবিন অঙ্কিত বলিয়া অনুমিত

কোনো ভদ্রলোক হয় তো সতেরো বা আঠারো শতকের কোন একটা ছবি এনে গ্যালারীতে হাজির করলেন, তাঁকে বলে দিতে হবে কে এই ছবি এঁকেছেন, ঠিক কোন সময়ের ছবি বলে এটিকে তাঁরা আন্দাজ করেন, ছবিটির শিল্পগুণই বা কেমন ইত্যাদি নানারকমের প্রশ্ন। সুরু থেকেই ন্যাশনাল গ্যালারীর কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে সতর্ক অনুসন্ধান চালিয়ে এসেছেন এবং তার সঠিক উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ মূল্যবান প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার হয়েছে।

ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারীর শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে কয়েকবছর আগেই। এমন আর একটি গ্যালারীর কথা আমার জানা নেই। এডিনবরা, প্যারিস কিংবা রোমের মিউজিয়াম দেখে তাদের নানাধরণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা আমার মনে হয়েছে। কিন্তু প্রতিকৃতিচিত্রের এমন সুবিপুল সংগ্রহ এবং শিল্প নিয়ে পড়াশুনো করার জন্য এরকম স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থাগারের জুড়ি বোধ হয় নেই।

সৌভাগ্যবশতই এখানে এক দায়িত্বপূর্ণ পদে আমার কিছুদিন কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। তখন চিত্র সংগ্রহ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে এখানকার আধুনিক ব্যবস্থা দেখে আমি অবাক হয়েছি। সারা পৃথিবীতে কোন্ চিত্রকর বা ভাস্করের কোন কোন কাজ কোথায় রাখা আছে এখানকার চিত্রতালিকা দেখে তা' খুঁজে বার করতে আপনার যথেষ্ট বিলম্ব হবে না। এ-তো গেল পরিচালনার একটা দিক মাত্র।

যদি মুন্সিয়ানার কথা বলেন তা'হলে বলবো, ধুয়ে-মুছে ঝাপসা হয়ে গেছে এমন সব ছবিকে পরীক্ষা করে অনতিবিলম্বেই এখানকার বিশেষজ্ঞরা বলে দিতে পারেন যে কোন্ শিল্পী কোন্ সময় মাপাদ ঐ ছবিটি এঁকেছিলেন।

এই প্রসংগে একটা কথা বলা সমীচীন বোধ করছি। ইদানীং কালে ন্যাশনাল গ্যালারীর যে জগৎজোড়া প্রতিষ্ঠা তার পেছনে অলক্ষ্যে কাজ করেছে এর বর্তমান 'কিপার ও ডিরেক্টার' সার কিংসলী এ্যাডামসের জীবনভোর পরিশ্রম ও সাধনা। এই শুভ্রকেশ, সৌম্য-দর্শন, সুপণ্ডিত ভদ্রলোকটি আজও যে গভীর মমতা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, তা' দেখলে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। এপস্টেইন সাহেবের কয়েকটি ভাস্কর্য সংগ্রহ করে একদিন তিনি যেন তাঁর খুশি ধরেই রাখতে পারছিলেন না। এ-রকম মানুষ সারা প্রতিষ্ঠানকেই অনুপ্রাণিত করে থাকেন।

ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারীর ব্যয়ভার সরকারই বহন করে থাকেন। এ-ছাড়াও নতুন নতুন সংগ্রহের জন্য সরকার প্রত্যেক বছরই অর্থ সাহায্য করে থাকেন। এ-ছাড়াও অনেক সদাশয় ভদ্রলোক তাঁদের পারিবারিক চিত্রসংগ্রহ এই প্রতিষ্ঠানকে দান করে যান। এমনি করেই ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারীর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জগতে আজ আর তা'র জুড়ি নেই।

আমাদের দেশের বহু ছবিই তো অযত্নে নষ্ট হয়ে গেছে। রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের কথা নয় ছেড়েই দিলাম, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, বংকিমচন্দ্র, মদনমোহন তর্কালংকার, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতির কোন ভাল প্রামাণ্য তৈলচিত্র আছে কি না আমাদের জানা নেই। থাকলেও তার যথোপযুক্ত সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত আমরা করি নি। ন্যাশনাল গ্যালারীর মত জাতীয় চিত্রশালার পত্তন যত বিলম্বিত হবে দিনে দিনে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যও ততই লুপ্ত হতে থাকবে। সেই সমূহ ক্ষতির হাত থেকে আজ দেশকে কে-ই বা রক্ষা করবে!

ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারীতে রাখা শিল্পী জোফানীর আঁকা কয়েকটি ছবিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের ইংগ-বংগ সমাজের সামাজিক চিত্রটি ফুটে উঠেছে। তৎকালীন অনেক কথাই তার থেকে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

রবি বর্মা, অবনীন্দ্র ঠাকুর, যামিনী রায়, নন্দলাল বোস, অতুল বোস প্রভৃতির আঁকা বহু মূল্যবান ছবি আছে যা' পৃথিবীর যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শনের সংগে একাসনে বসতে পারে। এই সব শিল্পীদের জীবনব্যাপী সাধনার ফল যা'তে নষ্ট না হয়ে যায় এবং আমাদের দেশের জনসাধারণ যা'তে তাঁদের সৃষ্টির সংগে পরিচিত হতে পারেন, তার জন্যে অবিলম্বেই কোন ব্যবস্থা হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?

—লণ্ডন বি বি সি বেতার বিচিত্রার সৌজন্যে।

চায়ের টেবিলে সপরিবারে রাজা ষষ্ঠ জর্জ
—জেমস গান অঙ্কিত (১৯৫০)

কাঠ ও কাঠের আসবাবপত্র

আশীষ বসু

পশ্চিম বাঙলার জঙ্গলে কাঠ পাওয়া যায় না একথা বলবো না, তবে আধুনিক আসবাব প্রস্তুতের জন্য যে কাঠ বেশি লাগে অর্থাৎ সেগুন তা আসে মধ্যপ্রদেশের, উড়িষ্যার আর আসামের জঙ্গল থেকে। বাঙলায় হয় আম, জাম, শিশু, আবলুস, শাল, দেবদারু, ছাতিম, কদম, সুঁদরী ইত্যাদি গাছ। ভারতের জঙ্গলে বছরে প্রায় ত্রিশ কোটি ঘনফুট কাঠ পাওয়া যায়—যার অবশ্য অতি অল্প এক অংশই হয় বাঙলায়, তবু আসবাব তৈরির কাজ বাঙলাতেই হয় বেশি আর তার খানদানীয়ানাও অনেকদিনের।

কাঠের ব্যবহার বাঙলা দেশে হয়েছে নানাভাবে। জাহাজ আর নৌকো তৈরির কাজে, কাঠ খোদাইয়ে, ঘর তৈরি করার কাঠামোয়, গরুর গাড়ির চাকা, জানলা, দরজা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস বানাতে, কাঠের খেলনায় এবং সবশেষে কাঠের আসবাবপত্রের জন্য।

কথিত আছে, চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙার এক-একখানি ডিঙা তৈরি করতে ষোল শ' কারিগরকে পুরো এক বছর করে পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ভোজ প্রণীত 'যুক্তি কল্পতরু' গ্রন্থে সেকালের অনেকগুলি জাহাজের নাম পাওয়া যায়। যেমন প্লাবিনী, গামিনী, সত্বরা, লোলা, ভীম', মধ্যমা, ক্ষুদ্রা ইত্যাদি। ফা-হিয়েনের মতো পর্যটক বলেছেন যে, তাম্রলিপ্তের চেয়ে বড়ো বন্দর তিনি এদিকে দেখেন নি। বাঙলার জাহাজ তৈরি হত 'তেহরু' নামক একপ্রকার কাঠ দিয়ে। পর্যটকদের মতে ভিনিসীয় জাহাজের চেয়েও বাঙলার জাহাজ ছিল বেশি মজবুত।

বাঙলার সূত্রধর বা কাঠের কারিগরের হাতের একচালা, দোচালা, চৌরী আর আটচালা পদ্ধতির ঘর তৈরির বিশেষত্ব সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত হয়েছে। ঘর তৈরি ছাড়াও সেকালের সূত্রধর নানা ছোটখাট কাজে সদাই ব্যস্ত থাকতো। যেমন বইয়ের বা পুঁথির মলাট তৈরি, নানারকম কাঠের জিনিস—যেমন চাকি-বেলুন, বারকোশ, পিঁড়ে, জলচৌকি, হাতা ইত্যাদি সংসারের প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি এমনি ছিল সব কাজ।

আসবাবের ব্যবহার যদিও যথেষ্ট পুরোনো, তবু তাকে একেবারে প্রাগৈতিহাসিক বলা চলে না। কাঠকে আসবাবের কাজে লাগানো হয়েছে কবে একথা সঠিকভাবে বলা শক্ত।

সূত্রধরেরা সারা বাঙলা জুড়েই বসবাস করছে। কাঠের কাজই তাদের প্রধান উপজীবিকা। বর্ধমানের হরিপুর, মঙ্গলকোট, কাটোয়া, জামুরিয়া, পূর্বস্থলী, কালনা, দাঁইহাট। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, হাপানিয়া-গুশুনিয়া ইত্যাদি। হুগলীর শ্রীরামপুর, চন্দননগর, মশাট, ইলিপুর। হাওড়ার আমতা; মুর্শিদাবাদের খাগড়া, বেলডাঙা। চব্বিশ পরগণার ভাটপাড়া, কাঁচড়াপাড়া। মেদিনীপুরের দাসপুর, কোলাঘাট, নাড়াজোল। বীরভূমের রাজনগর, করিধ্যা, দুবরাজপুর, খয়রাশোল, শিউড়ী। কলকাতার চাঁপাতলা, এণ্টালী। এরা কাঠের কাজ করে, তবে সবাই যে কাঠের ফার্নিচারই বানায় তা নয়।

কাঠের তৈরি যেসব আসবাবপত্র কলকাতার বাজারে বিক্রি হয় তার একটি অতি বৃহদংশ আসে কলকাতার আশপাশ এবং মফস্বল থেকে। যেমন জামাকাপড় বিক্রি হয় কলকাতার সর্বত্রই, সেলাই হয় মেটেবুরুজেই বেশি। কাঠের আসবাবের মধ্যে তেমনি চন্দননগর থেকে আসে বসবার চেয়ার, হাওড়ার আমতা থেকে আসে খাট, পালঙ্ক।
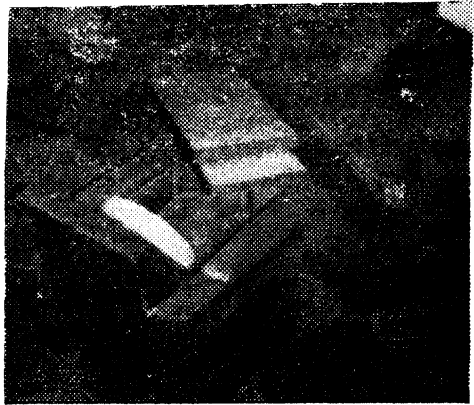
বসবার ঘরের জন্য অতি সৌখীন সোফাসেট—তিন পিসের। ৩" ডানলোপিলোর গদিসহ, স্প্রিং দেওয়া ডানলোপিলোর বালিশ, ট্যাপেস্ট্রির কাপড় মূল্যবান—দাম ১৮৫০৲ টাকা। সঙ্গে একসেট তিন পিসের কফি টেবল, একটি ৩ ফুট লম্বা ও পাশের দু'টি পেগ টেবল—দাম ২৭৫৲ টাকা

বুককেস—৪´×১৪´×৩´৬´´, নকক্ষ বিশিষ্ট, ওপরের দু'টিতে কাচ লাগানো, নীচেরটিতে কাঠের স্লাইডিং ডোর। প্রতিটির দাম ৪২৫৲ টাকা

ডিসপ্লে ক্যাবিনেট—৩০´´×১৪´´×৪´ প্লেট কাচের সেলফ্। সামনে প্লেট কাচ, দু'দিকে দরজা। প্রতিটির দাম ৪৫০৲ টাকা।

াট আসে মেদিনীপুর থেকেও। কলকাতার দোকানদারেরা পাইকারী ামে তা কেনেন এবং খুচরো বেচেন ক্রেতাদের কাছে।

আসবাবপত্র কেনাবেচার ব্যবসার কেন্দ্রস্থল হিসাবে কলকাতার বচেয়ে প্রসিদ্ধ হল বৌবাজার, ওয়েলিংটন, পার্ক স্ট্রীট, শিয়ালদা অঞ্চল। য়েকটি পুরোনো দোকানের নাম জানতে নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো াগবে। যেমন পি সি শীল এ্যাণ্ড কোম্পানী, মতিলাল দাস এ্যাণ্ড কাম্পানী (চন্দননগর), লীলা কোম্পানী, মহেশচন্দ্র ঘোষ কোম্পানী, রনীকান্ত দে, এস জি হোসেন, মডার্ন ফার্নিচার্স, চ্যাটার্জি ফার্নিসিং কাম্পানী, প্রবর্তক ফার্নিচার্স, স্ট্যাণ্ডার্ড ক্যাবিনেট, এ সি নন্দী এ্যাণ্ড কাম্পানী ইত্যাদি। এদের মধ্যে দু-একটি দোকান উঠেও গেছে।

এই কলকাতার আসবাবের কাজে নাম করে গেছেন দয়াল পাল, গুরুস্বামী, জেঠা ভালজে, আলিবর্দি মিস্ত্রী, আলাবক্স মিস্ত্রী, সুরেন্দ্রন, মাইতি, নিতাই বাটালীওয়ালা, হরিগোপাল মিস্ত্রী প্রভৃতি যাঁদের হাতে কাজের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

প্রসঙ্গক্রমে ল্যাজারাম, স্মিথ প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নাম করতে হয়। এ শিল্পটির উন্নতিতে এদের দানও কম নয়।

কাঠের আসবাব তৈরি করতে লাগে সাধারণ কয়েকটি যন্ত্র। যেমন র‍্যাঁদা, করাত, বাটালী, তুরপুন, মাটাম ইত্যাদি। আর লাগে হাত, আসল কারিকুরি সেই হাত দু'খানিরই।*

* সঙ্গে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মডার্ন ফার্নিসার্স থেকে গৃহীত। প্রত্যেকটি জিনিস তাদের তৈরি অতি মূল্যবান সেগুন কাঠের ফ্রেম ও সেগুন ভিনিয়ার্ড সলিড বোর্ড দিয়ে। উত্তম পালিশসহ। ছবি তুলেছেন শ্রীসুধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

শেক্স্‌পীয়র প্রসংগে

পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু সন্দেহ হয় কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থ দুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না; কিন্তু শেক্সপীয়রের নাম মনে রাখিয়াও অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ মহাদেশেও একবারের বেশি হোমারের জন্ম হয় নাই। [১১২৪]

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ব্যবিলনের আইন

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

সুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। সুমের (Sumer) থেকে ইউফ্রেটিস নদীর গা' বেয়ে বেশ কিছুটা উপরে উঠে ব্যবিলনে 'সভ্যতা' এল ভরা-যৌবন নিয়ে। সংযম যেমন মানুষের যৌবনকালকে সুশ্রী করে তোলে, তেমনি আইন ও শৃঙ্খলা সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার বা পূর্ণতা দান করার সবচেয়ে বড় মৃতসঞ্জীবনী। উপযুক্ত রক্ষা ব্যবস্থার অভাবে কচি-কিশলয়ের মৃত্যুর মতো অনেক প্রাচীন সভ্যতা বিশৃঙ্খলা আর ব্যভিচারের অসীম শাসনের জন্য আজ অতলান্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত। ইতিহাস বড় জোর তাদের জন্য দুঃখ করেছে, না হয় তো চার লাইনের প্রশস্তিতে তার কাজ শেষ করেছে।

ব্যবিলনে যখন সভ্যতার শিকড় আমূল প্রসারিত তখন সেখানকার রাজা হামুরাবি (খৃঃ পূঃ ২১২৩—খৃঃ পূঃ ২০৮১) প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজকে ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে লিখিত আইন প্রয়োজন। প্রথা শুধু মানুষকে সুবিধা দান করে, কিন্তু সমষ্টির কল্যাণের জন্য মাঝে মাঝে প্রথাগত সুবিধাকে খর্ব করতে হয়।

এই আইনগুলি মৃৎখণ্ডে লিখিত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যবিলনের দেবতা মারডুকের মন্দিরের চত্বর খুঁড়ে বার করেছে। এই মৃৎখণ্ডের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। অর্ধেকের উপর বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। বহু বৎসরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই মৃৎখণ্ডের লেখাগুলি পাঠ করা সম্ভব হয়েছে।

আইনের শুরুতেই বলা হয়েছে, ব্যবিলনের সর্বোচ্চ বিচারক হচ্ছেন রাজা। আইনগুলি ঠিকমতো প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা বিচারের ভার পুরোহিতের হাতে ন্যস্ত। প্রতিশোধই হচ্ছে বিচারের অন্তর্নিহিত ভাব। বোধ হয় এইজন্য আইনের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের শুরুতেই লেখা আছে—

'আই ফর এন আই, টুথ ফর এ টুথ'

কেউ অলস্ত বাড়ি থেকে চুরি করলে তাকে পুড়িয়ে মারা হতো। মন্দির থেকে চুরি করা হলো জঘন্যতম অপরাধ—বাড়ি ভেঙ্গে বাড়ির মালিক মারা গেলে, সেক্ষেত্রে রাজমিস্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করা হতো। কিন্তু বাড়ির মালিকের ছেলে মারা গেলে সেক্ষেত্রে রাজমিস্ত্রীর ছেলেই শাস্তিযোগ্য ছিল। নাবালিকা ধর্ষণকারীকে তার দু'পায়ের গোড়ালী হারাতে হতো। চব্বিশ নম্বর মৃৎখণ্ডে স্পষ্টই লেখা আছে—

'কোন ধাত্রী যদি কোন নারীর সদ্যোজাত সন্তানকে অপর কাহারো সদ্যোজাত সন্তানের সংগে পাল্টে দেয় তবে তাকে প্রকাশ্য রাজপথে তার স্তনদ্বয় ঘাতকের হস্তে হারাতে হবে। বিবাহিতা নারী অপর পুরুষের সংগে যৌনসংসর্গে লিপ্ত হলে সারাজীবন বিবস্ত্র অবস্থায় কাটানোই ছিল আইনের বিধান।'

যুদ্ধে কাপুরুষতা দেখানো, অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর মৃত্যু ঘটানো বা কোন পুরোহিতের স্ত্রীর মদের দোকানে প্রবেশ ইত্যাদি হলো কঠোর শাস্তিযোগ্য।

ব্যবিলনবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে, সততা ও নিরপরাধ সব সময় ভালো সাঁতারুর পক্ষে থাকে। এইজন্য অভিযুক্ত পুরুষ বা নারীকে তার অপরাধের অসারতা প্রমাণের জন্য ইউফ্রেটিস নদী সাঁতরে পার হতে হতো। ডুবে মরলে মৃতের সম্পত্তি অভিযোগকারীর প্রাপ্য ছিল।

দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড কার্যকরী করার প্রথাও ছিল অদ্ভুত। তখনও জেলপ্রথা, ক্রুশবিদ্ধ করা বা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো প্রচলিত হয় নি। সামান্য অপরাধের জন্য অঙ্গহানি করা হতো। অপরাধের মান অনুযায়ী অপরাধীকে পুড়িয়ে মারা, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জলে ফেলে দেওয়া বা মাটিতে আদ্ধেক পুঁতে নরখাদক জন্তু দিয়ে খাওয়ানো বা প্রতিদিন কিছু কিছু করে অঙ্গচ্ছেদ করা ছিল স্বাভাবিক নিয়ম।

পরবর্তী যুগে ব্যবিলনের শাসকগণ ক্রমবর্ধমান সামগ্রীর মূল্য, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার ও যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির সংগে পাল্লা দেওয়ার জন্য সমস্ত অপরাধই অর্থের বিনিময়ে মকুব করে দিতে সুরু করেন। আবার শ্রেণিগত বিরোধের সুযোগ নিয়ে শাসকগণ অপরাধীর শ্রেণিগত অবস্থা অনুযায়ী অর্থ দাবী করলেন। যেমন একজন দাস একজন পদস্থ কর্মচারীর দাঁত ভেঙ্গে দিলে তাকে দিতে হতো ষাট সেকেল (ব্যবিলনের প্রচলিত মুদ্রাকে সেকেল বলা হতো)। আবার একজন পদস্থ কর্মচারী দাসকে হত্যা করলে তাকে দিতে হতো পাঁচ সেকেল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুরাণ্টের মতে, প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই ভবিষ্যতের শ্রেণিগত বিরোধের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল।

ব্যবিলনের সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথমা কন্যাকে ওদের ভগবান মারডুকের সেবায় নিযুক্ত করার জন্য মন্দিরে পাঠানো ছিল অবশ্যকর্তব্য। তাদের গর্ভজাত সন্তানরা ভগবানের সন্তান নামে পরিচিত হতো। হামুরাবি প্রথম দিকে পুরোহিতদের এইভাবে ধর্মের নামে নীতিহীন ভোগোন্মত্ততা বন্ধের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি সফল হন নি। তবে আইন করে এই সব আইনের উর্ধ্বে ভগবানের সন্তানদের আইনের আওতায় এনে পুরোহিত শ্রেণীর যথেচ্ছাচার ও ভোগ-সম্ভোগের স্পৃহাকে সংযত করেন।

সমাজ জীবন তখনও চিন্তার জটিল আবর্তে ও কুটিলতার অন্ধকারে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয় নি বলে, সত্য কথা মানুষ বলতো, পরলোকের ভয় তাদের সততা ভীষণভাবে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাই ব্যবিলনের আইনে দেখা যায়, কেউ যদি ভগবানের নামে শপথ করে বলে যে তার বাড়িতে চুরি হয়েছে এবং চোর ধরা যায় নি, তবে তার হিসেব মতো অপহৃত জিনিসগুলির মূল্য চাঁদা তুলে দিতে নগরবাসীরা বাধ্য থাকতো। টাকা ধার নিয়ে তার সুদ না দেওয়া হলো বড় ধরণের অপরাধ। একটি মৃৎখণ্ডে বিচারালয়ের একটি মামলার শুনানী লিপিবদ্ধ আছে। মামলার বিবরণে জানা যায়, একজন প্লেবিয়ান ('অনেকটা আমাদের দেশের প্রাক্তন জমিদারের মতো) নিজের

ন্দুক থেকে নিজেই কিছু টাকা ঋণ নেয়। কিন্তু ঠিক ময়ে সুদসহ ঐ টাকা সিন্দুকে না রাখতে পেরে আদালতে জের বিরুদ্ধে নিজেই মামলা রুজু করে বিচারকের কাছে বিচার ার্থনা করে।

অবশ্য ঐতিহাসিকগণ ঠিক পরবর্তী মৃৎখণ্ডে অর্থাৎ যাতে সম্ভবত মলার 'রায়' লেখা ছিল সেটার সন্ধান পায় নি বলে তাদের পক্ষে মলার 'নিষ্পত্তি' জানা সম্ভব হয় নি।

আগেই বলেছি, বিচারের মূল অন্তর্নিহিত ভাব ছিল প্রতিশোধ। ফেসর 'হল' যে মৃৎখণ্ডটি সম্প্রতি পাঠোদ্ধার করেছেন তাও একটি মলার শুনানী। এই শুনানীতে এই 'প্রতিশোধ' স্পৃহাটি বেশ ষ্ট। মামলার বিবরণীতে দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি তার ছাদের র থেকে ঝুঁকে এক ভদ্রলোকের সংগে কথা বলতে গিয়ে তার থার উপর পড়ে। ফলে, তলার ভদ্রলোক মারা যায়! সেই মৃত লোকের পুত্র সেই ছাদের উপরের ভদ্রলোককে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত র আদালতে উপস্থিত হয়। বিচারক রায় দিলেন যে, এখন মৃত ক্তর পুত্র ঐ ছাদ থেকে ঠিক ঐ জায়গায় হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ক্তর মাথায় পড়বে।

এমনি ধরণের আরও অনেক ব্যাবিলনের আদালতের বিচিত্র কাহিনী শের অপেক্ষায় আছে।

ব্যাবিলনের শেষ স্বাধীন নৃপতি মদমত্ত অবস্থায় যে 'দেওয়াল লিখন' ধছিলেন তা আর কিছুই না—যে আইন ও শৃঙ্খলায় দেশ ও জকে বেঁধে তাঁদের দেবতা 'মারডুকের' যে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, শেষ নৃপতি বেল সাজার হারাচ্ছেন। বিলাস আর ঐশ্বর্যে গা য়ে ব্যভিচার আর অত্যাচারকে ব্যাবিলনের সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ করে ইহুদী দেবতা 'জেহভোর' পবিত্র সোনার পাত্রে মদ ঢেলে নিজের আর দেশের সর্বনাশ টেনে এনেছিলেন। বেল সাজার বুঝতে পারেন নি, মানুষের অপমানে দেবতা রুষ্ট হয়। তাই এ দেওয়াল লিখন ভগবান 'মারডুকের' অভিশাপ।

পরের দিন পারসিয়ানরা বেল সাজারকে হত্যা করেছে—লুণ্ঠন করেছে নগরী। চলেছে অবাধ হত্যা। রক্তনদীতে স্নান করে নিজেদের ধ্বংসের কবলে আশ্রয় দিয়ে বেল সাজার আর ব্যাবিলনের নাগরিকরা নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো।

পারস্যবাসীরা ব্যাবিলন থেকে যা নিয়ে গেছে তার হয় তো কিছুই নেই। কিন্তু যুগ যুগ ধরে হস্তান্তরিত হয়েছে ব্যাবিলনের প্রথম দিকের নৃপতিদের তৈরি সমাজ বন্ধনের উপায়—সেই আইনগুলি।

এখনও ঐতিহাসিকগণ বা ভ্রমণকারীরা জ্যোৎস্নারাতে নির্জন সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে 'মারডুক' আর হামুরাবির মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে যেন অস্ফুটস্বরে শুনতে পায়, যেখানে আইন নেই, যেখানে আইনের যথার্থ প্রয়োগ নেই—সেখানকার ধ্বংস মৃত্যুর মতই অনিবার্য। পৃথিবীতে ক্রমাগত বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিকদের সেদিকে খেয়াল নেই। তারা প্রাচীনকালের প্রাপ্ত জিনিসগুলি পরীক্ষা করে চলছে, মানুষ যেমন পিতা বা পিতামহদের অনাবিষ্কৃত কীর্তি-কাহিনী শুনতে পেলে উল্লসিত হয় তেমনি প্রাচীন-কালের কোন কিছুর মধ্যে প্রগতিশীলতার কোন সন্ধান পেলে এই সাধনায় নিমগ্ন প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিকদের আনন্দের আর গর্বের সীমা থাকে না। ব্যাবিলন নিয়ে আজও পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ হয় নি। আরও কিছু পাবার আশায় ব্যাবিলনের সবকিছু তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান চলছে।

শেক্‌স্‌পীয়র প্রসংগে

কবিদিগের আশ্চর্য কৌশল দেখ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া ন্তলা ও মিরন্দা চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে ট চিত্র প্রণীত করিলে যে রূপ হইত, ঠিক সেই রূপ হইয়াছে। একজনে দুইটি চিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার য়-লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়-লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি তেন যে শকুন্তলা সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব ার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; । মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না, অতএব ার প্রণয়-লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক পৃথক প্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে।···যখন ওথেলো ণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথ-শয্যাশায়িনী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে 'বধ ব' বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান —অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, তবে । আমাকে রক্ষা করুন। যখন দেস্‌দিমোনা, মরণভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া এক দিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্তের জন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না—তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালে যখন ইমিলিয়া আসিয় তাঁহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কার্য কে করিল' তখনও দেস্‌দিমোনা বলিলেন, 'কেহ না আমি নিজে। চলিলাম! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও! আমি চলিলাম!' শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষাদি বাত্যায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল উর্মিমালা—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ-প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতি, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীত—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ। [১৮৮৭] —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
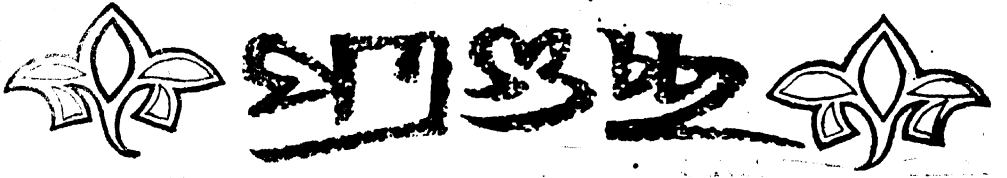
দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

অগ্রজ দেশনায়ক শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

(শেষাংশ)

বাঙ্গলা সরকার এখন আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন। আমি যখন স্বাধীন ছিলাম, তখনই বা আমার কি গতিবিধি ছিল? ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে আমি মাত্র দুইবার কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম। প্রথম খুলনা জিলা কনফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য এবং দ্বিতীয় নদীয়া জিলার কাউন্সিল নির্বাচনে একজন সভ্যপদ-প্রার্থীর পক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবরের মধ্যে আমি একবারও কলিকাতার বাইরে যাই নাই। আমাকে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সের সহিত জড়াইবার নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কনফারেন্সের সময় আমি কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসাররূপে মিউনিসিপ্যাল কার্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক কনফারেন্সের সময় কলিকাতায় ঝাড়ুদারদিগের ধর্মঘটের সম্ভাবনা হওয়ায় আমার পক্ষে এক মিনিটের জন্যও কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে হইতে অক্টোবর পর্যন্ত আমি যাহা করিয়াছি তাহা সকলেই অবগত আছেন। সে সময় আমার সর্বপ্রকার গতিবিধির কথা সরকার জানিতেন। আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করাই আমাকে যদি গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, আমাকে গ্রেপ্তার করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মিস্টার মোবার্লী একটি বিষয় বিশেষ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। সরকার জানেন যে, প্রায় আড়াই বৎসরকাল আমি নির্বাসিত আছি—এই সময়ের মধ্যে আমি আমার কোন আত্মীয়, এমন কি পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, আমাকে আরও আড়াই বা তিন বৎসরকাল বিদেশে থাকিতে হইবে, সে সময়েও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের কোন সুবিধা হইবে না। ইহা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের পক্ষে আরও অধিক কষ্টদায়ক। প্রাচ্যের লোকেরা তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের সহিত কিরূপ গভীর স্নেহের বন্ধনে জড়িত থাকেন, তাহা পাশ্চাত্য দেশীয় কাহারও পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নহে। আমার মনে হয়, এই অজ্ঞতার জন্যই সরকার এইরূপ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশীয়েরা মনে করেন, যেহেতু আমার বিবাহ হয় নাই, অতএব আমার পরিবার থাকিতে পারে না এবং কাহারও প্রতি আমার ভালবাসাও থাকিতে পারে না।

গত আড়াই বৎসর আমাকে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, সরকার বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি কষ্ট পাইয়াছি—তাঁহারা নহেন। বিনা কারণে তাঁহারা এতদিন ধরিয়া আমাকে আটক রাখিয়াছেন। আমাকে তবু বলা হইয়াছিল যে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রভৃতি আমদানী, সরকারী কর্মচারী হত্যা প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমি অপরাধী। ঐ সম্বন্ধে অনেকে আমার বক্তব্য জানাইতে বলিয়াছিলেন। আমি উত্তরে জানাইতেছি যে আমি নির্দোষ। আমার বিশ্বাস পরলোকগত স্যর এডওয়ার্ড মর্শাল হল বা স্যর জন সাইমন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়বার অভিযোগগুলি আমার নিকট উপস্থিত করা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এত লোক থাকিতে পুলিশ আমাকে ধরিল কেন? আমার মনে হয়, উহাই সন্তোষজনক উত্তর। আমার গ্রেপ্তারের পর হইতে বাঙ্গলা সরকার আমার অধীন ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালনের জন্য বা আমার গৃহাদি রক্ষার জন্য কোনরূপ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন নাই।

ঐ বিষয়ে আমি বড়লাটের নিকট আবেদন করিলে বাঙ্গলা সরকার সে আবেদন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর আবার আমাকে তিন বৎসর বিদেশে থাকিতে বলা হইতেছে। ইউরোপে নির্বাসনের সময় আমার নিজের খরচ নিজেকে যোগাইতে হইবে। এ কিরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব, তাহা বুঝিতে পারি না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আমার যেরূপ স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আমাকে অন্তত সেইরূপ স্বাস্থ্যবান করিয়া সরকারের মুক্তিদান করা উচিত। কারাবাসের জন্য আমার স্বাস্থ্যহানি হইলে সরকার কি তাহার ক্ষতিপূরণ দিবেন না? ইউরোপে যতদিন হৃতস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত না হই, ততদিন আমার সকল খরচ সরকারের বহন করা উচিত। কতদিন সরকার এই সকল বিষয়ে অনবহিত থাকিবেন? সরকার যদি ইউরোপ যাইবার পূর্বে আমাকে একবার বাড়ি যাইতে দিতেন, যদি ইউরোপে আমার সকল ব্যয়ভার বহন করিতেন ও রোগমুক্তির পর আমাকে বিনাবাধায় দেশে ফিরিতে দিতেন, তাহা হইলে এই দান সহৃদয়তার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতাম।

মিঃ মোবার্লী বলিয়াছেন, সরকার ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই বুঝিতে পারিতেছেন যে, অর্ডিনান্স আইনের কার্যকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকার সুভাষচন্দ্রকে আটক রাখিতে পারেন। এ বিষয়ে আমি মিঃ মোবার্লীর সহিত একমত। আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে যতদিন ইচ্ছা আমাকে আটক রাখিতে পারেন। অর্ডিনান্স আইনের কার্যকাল শেষ হইলে তাঁহারা আমাকে তিন আইনে বা অন্য যে কোনও উপায়ে আটক রাখিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা যতই লাফালাফি করুন না কেন বা শাসন পরিষদের সদস্যদিগের সফরের ব্যয় না-মঞ্জুর করুন না কেন, আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা

করিলে আমাদিগকে যাবজ্জীবন আটকাইয়া রাখিতে পারেন। সরকার আমাকে চিরকাল আটক রাখিতে চাহেন কি না তাহাই আমি জানিতে চাই। পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ মহাশয় আমাকে যুবক-বৃদ্ধ বলিয়া ডাকিতেন। তিনি আমাকে নৈরাশ্যবাদী স্থির করিয়াছিলেন। একটি বিষয়ে আমি নৈরাশ্যবাদী বটে, কারণ আমি সকল ঘটনার অশুভটাই বড় করিয়া দেখি। বর্তমান ঘটনার সর্বাপেক্ষা মন্দ ফল কি হইতে পারে, তাহাও আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমি মন স্থির করিয়াছি, জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্য নির্বাসন অপেক্ষা জেলে থাকিয়া মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়। এই অশুভ ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াও আমি নিরুৎসাহ হই নাই। কারণ, কবির উক্তিতে আমি বিশ্বাস করি:—

গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়।

সরকারের প্রস্তাবের পক্ষে ও বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা আমি সবই বলিয়াছি। আমার মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলিয়া কেহ যেন দুঃখিত না হয়েন। পিতামাতার কষ্ট সর্বাপেক্ষা অধিক। সে জন্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। মুক্তিলাভের পূর্বে আমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি নিজে শান্তিতে আছি এবং সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে সকল অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমাদের সমগ্র জাতির কৃতপাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি—ইহাতেই আমার তৃপ্তি। আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হইয়া থাকিবে—আমাদের ভাবধারা জাতির স্মৃতি হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের প্রিয় কল্পনার উত্তরাধিকারী হইবেন, এই বিশ্বাস লইয়া আমি চিরদিন সকল প্রকার বিপদ ও অত্যাচার হাস্যমুখে বরণ করিয়া লইয়া কাল কাটাইতে পারিব।

অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রের উত্তর শীঘ্র দিবেন।

ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখিত

The Union Society
Cambridge.
২রা মার্চ, ১৯২১

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন,

কয়েকদিন পূর্বে আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছি—আশা করি যথাসময়ে তাহা পাইয়াছেন।

আপনি বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমি চাকুরী ছাড়া সম্বন্ধে একরকম কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমি কি কি কাজের জন্য উপযুক্ত হইতে পারি তাহা আপনাকে পূর্বপত্রে জানাইয়াছি। দেশে এখন কি রকম কাজের সুবিধা আছে তাহা এখান হইতে ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা এখন কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আছেন—সুতরাং আপনারা খুব ভালরকম জানেন কি রকম কাজের সুবিধা এখন আছে এবং এখন কি রকম কর্মীলোকের দরকার।

আমার এই অনুরোধ যে, যে পর্যন্ত আমার চাকুরী ছাড়ার খবর না পাইতেছেন, সে পর্যন্ত যেন এ বিষয় কাহাকেও কিছু না বলেন। চাকুরী ছাড়িলে আমি জুন মাসের শেষে দেশে ফিরিতে ইচ্ছা করি অবশ্য যদি সময় মত Passage পাই। দেশে ফিরিয়া কি রকম কাজে হাত দিতে পারিব তাহা জানিবার জন্য উৎসুক আছি—কারণ মনটাকে সেইভাবে প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি। তা ছাড়া দেশে গিয়ে যে রকম কাজ আরম্ভ করিব, তদুপযোগী লেখাপড়া এখানে থাকিতে করাও সম্ভব। আশা করি, আপনি যত শীঘ্র পারেন এ বিষয়ে একটা উত্তর দিবেন।

আমার নিজের কতকগুলি মতলব মনে আসিতেছে—আপনাকে তাহা জানাইতেছি।

(১) 'জাতীয় কলেজে' আমি শিক্ষকতা করিতে পারি। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র আমার যৎকিঞ্চিৎ পড়া আছে।

(২) আপনারা যদি কোন দৈনিক খবরের কাগজ ইংরাজীতে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি Sub-Editorial Staff-এ কাজ করিতে পারি

(৩) আপনারা যদি 'কংগ্রেসের' সংক্রান্ত একটা Research Department খোলেন, তাহা হইলে আমি তাহাতেও কাজ করিতে পারি। আমার গত পত্রে আমি এ সম্বন্ধে খানিকটা লিখিয়াছি। আমার মনে হয়, একদল Research-Students আমাদের চাই। তাহারা জাতীয় জীবনের এক একটা অংশ লইয়া সেই সম্বন্ধে facts সংগ্রহ করিবে। কংগ্রেস তারপর একটা Committee নিযুক্ত করিবে—এই Committee সেই সব facts বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে কংগ্রেসের একটা policy ঠিক করিবে।

Currency and Exchange সম্বন্ধে আমাদের Congress-এর কোন বিশিষ্ট policy নাই তারপর Labour and Factory Legislation সম্বন্ধেও কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট policy নাই। তারপর Vagrancy and poor Relief সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেসের কোনও বিশিষ্ট Policy নাই, তারপর 'স্বরাজ' পাইলে আমাদের Constitution কি রকম হইবে, সে সম্বন্ধেও বোধ হয় কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট policy নাই। আমার নিজের মনে হয় যে, Congress League Scheme একেবারে পুরানো হয়ে গেছে। স্বরাজের ভিত্তির উপর আমাদের এখন ভারতের Constitution তৈয়ারী করিতে হইবে

আপনি অবশ্য বলিতে পারেন যে Congress এখন existing order ভাঙিতে ব্যস্ত সুতরাং ভাঙার কার্য সম্পূর্ণ না হইলে constructive কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব কিন্তু আমার মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের যে-কোন সমস্যা সম্বন্ধে একটা policy ঠিক করিতে গেলে অনেক দিনের চিন্তা এবং গবেষণা চাই। সুতরাং এখন থেকেই গবেষণা আরম্ভ করা দরকার। কংগ্রেস যদি complete programme প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে যেদিন আমরা 'স্বরাজ' পাইব সেইদিন কোন বিষয়ে কোন policy-র জন্য আমাদের ভাবিতে হইবে না।

তারপর কংগ্রেসের একটা Intelligence Department চাই—যেখানে দেশের সব খবর পাওয়া যেতে পারে। এই

Department থেকে ছোট ছোট বই প্রকাশ করা দরকার। এক একটা বইতে এক একটা বিষয় থাকিবে। যথা—গত দশ বৎসরের মধ্যে কত জন্ম এবং কত মৃত্যু হইয়াছে এবং কোন কোন রোগে কত মৃত্যু হইয়াছে।

তারপর, গত দশ বৎসর ভারতবর্ষের আয় ও ব্যয় (Revenue and Expenditure) কত হইয়াছে—কোন কোন দিক থেকে আয় হইয়াছে—এবং কোন কোন বিষয়ে ব্যয় হইয়াছে তাহা আর একটা বইতে প্রকাশিত হইবে। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবনের সব দিককার খবর ক্ষুদ্র পুস্তকের ভিতর দিয়া দেশময় প্রচার করিতে হইবে।

(৪) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দিক দিয়া কাজ করিবার অনেক সুবিধা আছে। এই কাজের সঙ্গে Co-Operative Banks প্রতিষ্ঠা করাও আবশ্যক।

(৫) Social Service.

আমার নিজের মনে হচ্ছে যে, এই কয় বিষয়ে কাজ করিবার সুবিধা আছে। কিন্তু আপনাকে বিবেচনা করিতে হইবে, আপনি আমাকে কোন বিভাগে চান। আর শিক্ষকতা এবং Journalism বোধ হয় আমার মনের মত কাজ হইবে। এই নিয়ে আমি এখন আরম্ভ করিতে পারি তারপর সুবিধামত অন্য কাজেও হাত দিতে পারি। আমার পক্ষে চাকরী নাও মানে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করা, সুতরাং বেতন সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না, খাওয়া-পরা চলিলেই আমার যথেষ্ট হইবে।

আমি যদি বন্ধুপরিকর হইয়া কাজে নামিতে পারি, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, আমি আমার সঙ্গে এখানকার দুই-একজন বাঙ্গালী বন্ধুকেও এই কাজে টানিতে পারিব।

স্বদেশ সেবার যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে আপনি তাহাতে বঙ্গদেশের প্রধান পুরোহিত। আমার যাহা বক্তব্য আমি তাহা শেষ করিয়াছি—এখন আপনি আমাকে আপনার বিপুল কাজের মধ্যে স্থান দিন।

আমি চাকরী ছাড়িলেই এখানে পাঁচজনে জিজ্ঞাসা করিবে আমি দেশে ফিরিয়া কি কাজ করিব। সুতরাং নিজের সন্তোষের জন্য এবং পাঁচজনের কাছে Self Justification-এর জন্য আমি জানিতে উৎসুক আপনি আমাকে কি কাজ দিতে পারেন।

আশা করি আপনি এসব কথা আপাততঃ গোপন রাখিবেন।

আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি— বিনীত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবীকে লিখিত

Censored and Passed
স্বা: অস্পষ্ট
1/2/26
for D. I. G., I. B, C. I. D.
Bengal

Mandalay Jail
C/O D. I. G., I. B. C. I. D.
(Bengal)
13, Elysium Row
(Calcutta)
23. 1. 26.

শ্রীচরণেষু—

মা, অনেকদিন যাবৎ আপনার কোনও খবর পাই নাই। দুই-তিনদিন পূর্বে মেজদাদার পত্রে আপনার খবর পেলুম। অনেকদিন থেকে আপনাকে পত্র দিবার ইচ্ছা হচ্ছে—উত্তর পাবার জন্য নয়—যদিও উত্তর পেলে যারপর নাই সুখী হব। পত্রটা লিখলে হয় তো মনটা হাল্কা হবে—এই জন্য। কিছুদিন পূর্বে আপনার খবর পাবার জন্য মিঃ হালদারকে পত্র দিই। তিনি উত্তর দেন কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে পত্র পুলিশ কর্তৃক আটক হয়। জানি না আপনার খবর পাবার জন্য আমার মন কেন উতলা হয়।

মধ্যে আমার ইচ্ছা হয়েছিল সরকারের নিকট একটা দরখাস্ত দিই আপনার সহিত একবার দেখা করার অনুমতির জন্য। রাজবন্দীদের মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের সহিত দেখা করতে দেওয়া হয়—এমন কি পাঁচ-সাত দিন পর্যন্ত বাড়ীতে থেকে আসতে দিয়েছে আমি জানি। কিন্তু ভেবে দেখলুম দরখাস্ত করে কোনও লাভ নাই কারণ সে সৌভাগ্য আমার ভাগ্যে ঘটবে বলে ভরসা হয় না। প্রার্থনা করাই সার হবে—আর লাভের মধ্যে মনকে আরও উদ্বিগ্ন করা হবে এবং বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে একটা অর্থহীন আপত্তি করা হবে। তাই অনেক চিন্তার পর দরখাস্ত করার প্রস্তাব মন থেকে দূর করেছি।

আপনার শরীর অত্যন্ত দুর্বল এবং স্বাস্থ্য খুব খারাপ শুনে খুব চিন্তিত হয়েছি। কি করি আমরা এত নিঃসহায় যে, কিছুই করিতে পারি নাই। আমাদের কপালে যে কি আছে তাহাও জানি না। কত কথা বলতে ইচ্ছা করে—কত কথা বলবার আছে—কিন্তু বলবার সময় এখনও আসে নাই। এ পত্রও অনেক দ্বিধার পর লিখতে বসেছি—কারণ এ পত্র অনেক হাত দিয়ে যাবে।

খবরের কাগজে কংগ্রেসের নিকট আপনার বাণী পাঠ করলুম। ঐ করুণামাখা Pathos পরিপূর্ণ কথাগুলি আমার হৃদয়তন্ত্রীকে কি ভাবে স্পর্শ করেছে তা বলতে পারি না। নিজের পর্বত-প্রমাণ বিপদ ও দুঃখরাশি পায়ে ঠেলে যিনি পরের জন্য কাঁদেন তাঁর প্রতি লোকে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে না। অপর কেহ যদি ঐ বাণী পাঠাতেন, তা হলেও আমি কৃতজ্ঞ হতুম এবং কৃতজ্ঞতা জানাতুম—কিন্তু এক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নাই, কারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মত সম্বন্ধ এ নয়। এত বড় হৃদয়ের পরিচয় না পেলে আপনার দেশবাসী আপনাকে 'মা' বলে সম্বোধন করবে কেন? যাঁকে মা বলা হয়, তাঁহাকে কি কৃতজ্ঞতা জানান যায়? মায়ের প্রাণ যদি সন্তানের জন্য না কাঁদে তবে কার প্রাণ কাঁদবে? কৃতজ্ঞতা জানালে কি মাতা-সন্তানের পবিত্র সম্বন্ধকে অপমান করা হয় না? আশা করি আপনার সকল শোক ও বিপদের মধ্যে আপনি ভুলিবেন না বাঙলার কত সন্তান আপনাকে 'মা' বলে থাকে। হয় তো এ কথা মনে পড়লে আপনি কিছু সান্ত্বনা পেতে পারেন। তারা নিঃস্ব ও নিঃসহায় হলেও আপনার বিপদকে তারা নিজেদের বিপদ বলে মনে করে নিয়েছে।

আজ আপনার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা আপনার দেশবাসীকে—আমাদের সকলকে—ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিচ্ছে। আপনি যদি এত সহিতে পারেন, আমরা কি তার কিয়দংশও সহিতে পারব না? আশীর্বাদ করুন—যত বড় বিপদ আসুক না কেন—যেন সঙ্গে সঙ্গে সহ্য করবার শক্তিও আসে। ভগবানের কৃপায় আজ পর্যন্ত এই শক্তি পেয়ে আসছি—চিরকাল যেন এই শক্তি পাই, এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার জীবনে আর নাই। আজ তবে আসি মা।

আর কি লিখিব? কি লিখিতে কি লিখেছি জানি না।

Srijukta Basanti Debi
C/0 Mr. Justice P R Das.
Patna

ইতি—
আপনার সেবক
শ্রীসুভাষ

স্বর্গীয়া বিভাবতী বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মান্দালয় জেল
৭।৮।২৫

পূজনীয়া মেজবৌদিদি,

আমি অনেকদিন হ'ল আপনাকে কোনও পত্র দিই নাই। এ-সপ্তাহে মেজদাদাকে লেখবার মত কিছু নাই তাই আপনাকে লিখতে বসেছি। আপনাকে কাজের সম্বন্ধে লেখবার প্রয়োজন নাই তাই অকাজের সম্বন্ধে লিখব।

আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে—মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ। অর্থাৎ যেখানে মধুর অভাব, সেখানে গুড় দিয়ে মধুর কাজ সারা উচিত, তাই ছোট ছেলেপুলের অভাব এখানে বেড়ালছানা দিয়ে মেটান হয়। আমি ছোট ছেলেমেয়ে খুব পছন্দ করি; কিন্তু বেড়ালছানা আমার ভাল লাগে না—বিশেষত যেখানে সব কয়টা বেড়ালই বদরঙের। তা' আমার কথা কেহ শুনতে চায় না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বেড়াল ভালবাসে,—আর যে সব গরীব কয়েদীরা আমাদের গৃহস্থালীর কাজ করে, তারাও বেড়াল ও বেড়ালছানাকে আদর করে। এই সব লোকের বেড়াল-প্রীতির ফলে এখানে বেড়ালের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখানে বেড়াল সবচেয়ে ভালবাসে যে লোকটি মেথরের কাজ করে—তাকে সবাই 'ময়লা-লু' বলে, তার আসল নাম 'লবানা।' আর ময়লা সাফা করে বলে তার নাম সবাই রেখেছে 'ময়লালু'—বর্মা ভাষায় 'লু' মানে 'লোক' বা 'মানুষ।' সে ময়লা সাফা করে, অতএব তার নাম 'ময়লালু।' 'ময়লালু' কথাটা ভাল লাগে না বলে 'মলয়ালু'—তার থেকে তার ভাল নাম দাঁড়িয়ে গেছে 'মলয়।' আমাদের 'মলয়' যখন শোয়—তখন তার মাথার কাছে বেড়াল, বুকের উপর বেড়াল, পায়ের কাছে বেড়াল। চতুর্দিকে বেড়ালের পরিবারের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সে ঘুমোয়। নিজের খাবারের অংশ থেকে সে খাবার বাঁচিয়ে বেড়ালকে খাওয়ায়—আর আমাদের কাছ থেকে দুধ চেয়ে নিয়ে বেড়ালছানাকে দুধ খাওয়ায়। আর সে যখন একবার তু বলে ডাক দেয়, রাজ্যের বেড়াল তার কাছে ছুটে আসে। ইতি বেড়াল কাহিনী সমাপ্ত।

আমাদের গৃহস্থালী নেহাৎ ছোট নয়। পরিবারের সংখ্যা নয়জন। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, সকলেই পুরুষ। চাকর-টাকর নিয়ে মোট বিশ জনের বেশি বৈ কম নয়। জেলের মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র জেলে আমরা বাস করি। এখানকার লোকেরা কি বাবু কি চাকর—জেলের অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে মিশতে পায় না। আমাদের সংসারের মধ্যে বাবুর্চী, মশালচী, মেথর, ঝাড়ুদার ইত্যাদি সব রকম লোক আছে। বসতবাটি ছাড়া এই ক্ষুদ্র জেলের মধ্যে রান্নাঘর, পুকুর, খেলবার জন্য টেনিসকোর্ট প্রভৃতি আছে। স্নানের ঘর গত ছয় মাস ধরে তৈরি হচ্ছে কবে তৈরি শেষ হবে তা শ্রীভগবান ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বলতে পারে না।

বুঝতেই পারছেন যে, এই বৃহৎ সংসারে সকলেই কয়েদী—কেহ দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী, আর কেহ আমার মত বিনা বিচারে সরকারের হুকুমে কয়েদী। আপনারা চোর-ডাকাতের নাম শুনে বোধ হয় নাক সিঁটকোবেন, কিন্তু এখন জেলের কয়েদীদের উপর আমার আর ঘৃণার ভাব নাই। এদের মধ্যে অনেকে বিপদে পড়ে অথবা বাধ্য হয়ে অন্যায় করে এবং অনেকেই বিনা অপরাধে দণ্ডিত হয়। তাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয় আছে এবং ভাল অবস্থায় পড়লে তারা যে ভাল হতে পারে, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে বলে—'গৃহিণী গৃহং উচ্যতে' অর্থাৎ গৃহিণী না থাকলে গৃহ না কি গৃহই নয়। আমাদের এখানে গৃহ আছে, কিন্তু গৃহিণী নাই। গৃহিণীর অভাবে আমাদের একজন ম্যানেজারবাবু নিযুক্ত করা হয়েছে—বলা বাহুল্য যে, ম্যানেজারবাবু আমাদের মত একজন বিনা বিচারে কয়েদী। তিনি হিসাবপত্র রাখেন; দৈনিক বাজারের ফর্দ তৈরি করে দেন এবং গৃহস্থালীর কাজ সম্বন্ধে তিনি সর্বে-সর্বা, আমাদের এই বিশাল সংসার তাঁর অঙ্গুলি-চালনায় চলে। খাওয়া-পরার জন্য তাঁকে আমরা দায়ী করি এবং খাওয়া খারাপ হলে তাঁকে গালাগালি দিতে ছাড়ি না। আমাদের এই সংসারের নাম রাখা হয়েছে—অমুক বাবুর হোটেল।

এখানকার খাওয়া-দাওয়া সাধারণত মন্দ নয়—তবে আজ কয়েকদিন হ'ল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোল বেঁধেছে। ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে, তা এখন বুঝতে পারছি না। বাঙ্গালীর মিষ্টান্ন বাদে এখানে জিনিষপত্র মন্দ পাওয়া যায় না—তবে জিনিষপত্রের দাম বড় বেশি। ম্যানেজারবাবুর কৃপায় এখানে আমাদের উঠানের এককোণে মুরগীশালা খোলা হয়েছে—এই ঘরের মধ্যে কতকগুলি মোরগ ও মুরগী স্থান পেয়েছে। সকাল সন্ধ্যা এই সব পক্ষবিশিষ্ট জীবের 'কক্কর কোঁ' শব্দে আমি অস্থির হয়ে উঠি—কিন্তু এই মধুর রব না শুনলে ম্যানেজারবাবুর না কি ঘুম হয় না।

উঠানের মধ্যে একটা ছোট পুকুর আছে। তাতে আমাদের নাক পর্যন্ত জল ধরে। সেই পুকুরের জল পরিষ্কার থাকলে আমরা লম্ফঝম্ফ করে একটু সাঁতার কাটবার চেষ্টা করি। অবশ্য যেখানে ডোববার ভয় নাই—সেখানে সাঁতার ভাল হয় না। কিন্তু আমি গোড়ায় বলেছি, মধুর অভাবে লোকে গুড় খায়—আমরাও নদীর অভাবে বড় চৌবাচ্চায় সাঁতার দিয়ে মনকে প্রবোধ দিই।

ম্যানেজারবাবুর চেষ্টায় এই উঠানের মধ্যে কতকগুলি ফুলের গাছ লাগান হয়েছে। তবে তার মধ্যে গন্ধহীন সূর্যমুখী ফুলই বেশি, এ-রাজ্যে সুগন্ধি ফুল পাওয়া সহজ নয়। জানি না এটা দেশের গুণ কি জেলের গুণ। জেলের মধ্যে যে সব রজনীগন্ধা ফুল ফোটে সেগুলোর সুগন্ধি নাই বলে মনে হয়।

আমার কাহিনী আজ এখানেই অসমাপ্ত রাখতে হবে—তা না হলে এ সপ্তাহের ডাক যাবে না। কাহিনী সকলকে পড়ে শোনাবেন, মেজদাদাকেও। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে বাড়িতে পত্র দিই। যদি কোনও সপ্তাহে আমার পত্র না পান তবে এখানকার সুপারিন্ট্যাণ্ডেন্টকে পত্র বা টেলিগ্রাম দিয়ে আমার খবর নেবেন।

আপনারা সকলে কেমন আছেন—এবং আমার কাহিনী ভাল লাগল কি না জানাবেন। যদি ভাল লাগে তা হলে আমি আরও লিখতে পারি। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

সুভাষ

[এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত ও শিশিরকুমার বসু কর্তৃক সঙ্কলিত সুভাষচন্দ্র বসুর পত্রাবলী হইতে গৃহীত]

অজিত দত্ত

[প্রথিতযশা কবি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক]

বাঙলা কাব্যের রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে তোলার গুরুদায়িত্ব পালনে যাঁরা পরিপূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও বিদগ্ধ শিক্ষাব্রতী অজিত দত্ত তাঁদেরই পংক্তিতে স্থানাধিকারী।

বিক্রমপুরে আদি নিবাস। পিতামহ স্বর্গত রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর ছিলেন একজন যশস্বী ও স্বনামধন্য পুরুষ। বাবা স্বর্গত অতুলকুমার দত্তকে মাত্র চার বছর বয়সে অজিত দত্ত হারান। পিতামহের স্নেহচ্ছায়া পিতৃহীন শিশুর মনে সান্ত্বনার প্রলেপ এনে দেয়। ৬ই আশ্বিন ১৩১৪ (২৩এ সেপ্টেম্বর ১৯০৭) কবি অজিত দত্তের জন্ম।

ঢাকার কিশোরীলাল জুবিলি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯২৪ সালে। ১৯২৬ সালে কৃতিত্ব অর্জন করলেন আই-এ পরীক্ষাতেও। কলকাতায় এলেন বি-এ পড়তে। ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে বি-এ পড়তে থাকেন। তারপর পারিবারিক জীবনে ঘনিয়ে এল ঘন দুর্যোগ। অগ্রজ হলেন লোকান্তরিত (১৯২৬), ঢাকায় ফিরে যেতে হল বেদনাবিহ্বল অনুজকে। মা শোকে দিশাহারা। পারিবারিক অনেক দায়িত্ব এসে গেল উনিশ বছরের সম্ভাবনাময় আশাবাদী এক স্ফুটনোন্মুখ তরুণের উপর। কলকাতার পড়ার বাসনা ত্যাগ করতে হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত ও বাঙলায় অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হলেন বি-এ পরীক্ষায় (১৯২৯), পরের বছর ঐ বিষয়েই স্নাতকোত্তর পরীক্ষাতেও হলেন সমুত্তীর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন নিয়ম ছিল যে, অনার্স নিলে বি-এ পড়তে হবে তিন বছর, আর এম-এ এক বছর। আসলে পাঠ্য সময় একই ছিল তাই ১৯৩০ সালেই তিনি অর্জন করলেন এম-এ উপাধি। ডঃ শহীদুল্লা গেলেন বিদেশে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর শূন্য আসনে মাত্র তিন মাসের জন্য অস্থায়িভাবে অভিষিক্ত হলেন অজিত দত্ত। সাহিত্যরথী স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনধন্য 'নায়ক'-এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন স্বর্গীয় কুমার কার্তিক মল্লিক। নায়কের নব রূপায়ণের জন্য তাঁর দিক থেকে ডাক এল। নবরূপায়িত নায়কের সম্পাদনভার গ্রহণ করলেন কবি অজিত দত্ত এবং স্বর্গত সাংবাদিক অমূল্যচন্দ্র সেন। ১৯৩২ সালে তিনি যুক্ত হলেন রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজিয়েট স্কুলে বাঙলাভাষার প্রধান শিক্ষক হিসাবে। বিদ্যালয় থেকে কর্তৃপক্ষ তাঁকে সমাসীন করলেন অধ্যাপকের আসনে তাঁদের মহাবিদ্যালয়ে।

তারপর কর্মজীবনে পথ পরিবর্তনের সময় এল। শিক্ষাজগৎ থেকে ভিন্ন এক জগতে। ইণ্ডিয়ান টি সেস কমিটির প্রচারবিভাগে যোগ দিলেন। ১৯৪৪ পর্যন্ত সেখানে যুক্ত ছিলেন। তারপর প্রচার-অধিকর্তা হলেন ক্যালকাটা ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের। আনুমানিক ১৯৪৯ সালে দিগন্ত পাবলিশার্স-এর তিনি পত্তন করলেন। তাঁর পরিচালনায় প্রকাশনীর ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট সাফল্য এবং সুনাম অর্জন করেছিল। আজকের দিনে বহু জনপ্রিয় লেখকের প্রথম গ্রন্থ এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ইরাবতী, সন্তোষকুমার ঘোষের কিনু গোয়ালার গলি, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অন্য নগর প্রভৃতি পাঠক সমাদৃত গ্রন্থসমূহ প্রকাশের গৌরব এই প্রতিষ্ঠানের অধিকারভুক্ত। দিগন্ত পাবলিশার্স থেকে একটি করে সুপাঠ্য এবং রুচিশোভন বার্ষিকীও প্রকাশিত হোত।

আবার আহ্বান এল শিক্ষাজগত থেকে। শক্তিমান কবিকে চাইল শিক্ষাজগৎ দেশের শিক্ষাধারার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে। ১৯৫৪ সালে নিযুক্ত হলেন চন্দননগরের সরকারী কলেজে, সেখান থেকে বদলী হলেন বারাসতে, সেখান থেকে এলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯৫৬ সালে যোগ দিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর আজ আট বছর অতিক্রান্ত হতে চলল, আজও তিনি সগৌরবে সেখানে অধিষ্ঠিত।

জীবনের প্রথম পর্বেই সাহিত্যের মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত। সরস্বতীর আরাধনা তাঁর শুরু হয়েছে জীবনের বোধনলগ্ন থেকে, কিন্তু আজও সে সাধনায় বিরতি নেই, আর সেই একনিষ্ঠ সাধনার ফলে বাঙলার কাব্যলোক উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে জাতির রসপিপাসু অন্তরের সঞ্চয় বিবর্ধিত হয়ে চলেছে। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনও ছেলেবেলা থেকে। ছাত্রজীবনে দুই বন্ধু সম্পাদনা করতেন 'প্রগতি' নামক পত্রিকাটি। আই-এ পড়ার সময় তাঁর চেয়ে এক বছরের পূর্ববর্তী ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৯৩০ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমের মাস' প্রকাশিত হল। পাতাল কন্যা, নষ্ট চাঁদ, পুনর্নবা, ছায়ার আলপনা, জানালা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি তাঁর সৃজনীশক্তির এক-একটি অসামান্য নিদর্শন। জনান্তিকে ও মন পবনের নাও নামক রম্যরচনা গ্রন্থ দু'টির প্রণেতা তিনি। বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরস নামক গ্রন্থটিও জন্ম নিয়েছে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী থেকে। তাঁর কবিতাবলীর একটি সঙ্কলন বর্তমানে আত্মপ্রকাশের দিন গুণছে।

কবি অজিত দত্তের পুরো নাম অজিতকুমার দত্ত। নামের মধ্যাংশ বর্জন করা বা নামকে সংক্ষিপ্ত করার পক্ষপাতী তিনি নন কিন্তু তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে 'অজিতকুমার দত্ত' নামধেয় আর একজন লেখকের আবির্ভাব ঘটায়—নাম-সমস্যার সমাধান স্বরূপ নামের মধ্যাংশ বর্জন করতে তিনি বাধ্য হন—তবে তা শুধু সাহিত্য-ক্ষেত্রেই। অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি তাঁর চিরকালের আদর্শই অনুসরণ করে চলছেন।

প্রেমেন্দ্রকুমার সেন

[গ্রামোফোনশিল্পের প্রসারের ইতিহাসে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব]

যাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সুদক্ষ পরিচালনা দেশের গ্রামোফোন-শিল্পকে সমৃদ্ধির শিখরপ্রান্তে উপনীত করেছে সেই তালিকায় শ্রীপ্রেমেন্দ্রকুমার সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। এ দেশের গ্রামোফোনশিল্পের অগ্রগতি ও প্রসারে তাঁর অভিনন্দনীয় প্রচেষ্টা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবীদার।

আদি নিবাস বিক্রমপুর। জন্মস্থান শিলং। ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে জন্ম। প্রেমেন্দ্রকুমারের যখন দু' বছর বয়েস সেই সময়ে পিতৃদেব ব্রজেন্দ্রনাথ সেন বদলী হয়ে যান লাহোরে। সিমলায় বাল্যকালীন বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন তিনি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন লাহোর থেকে। আনুমানিক ১৯২৮ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় হন সসম্মানে উত্তীর্ণ।

তারপর তৎকালীন নর্দেন্দ্রগুলের পরিসংখ্যান বিভাগে এবং ডেরাডুনের একটি সুগার মিলের সঙ্গে কিছুকাল কর্মসূত্রে জড়িত থেকে ১৯৩৮ সালে গ্রামোফোন কোম্পানীতে (বিক্রয় বিভাগ) যোগ দিলেন। ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে রেকর্ডিং-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন। হিন্দী রেকর্ডিং এর ভার নিলেন ১৯৪১ সালে। কলাম্বিয়া শাখার দিল্লী-ম্যানেজার হয়ে দিল্লী গেলেন ১৯৪৬ সালে। ১৯৪৯ সালের শেষভাগে বদলী হলেন বোম্বাইয়ে কলাম্বিয়ার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বদলী হয়ে এলেন কলকাতায়। গ্রহণ করলেন যাবতীয় রেকর্ডিং-এর ভার—তদুপরি সর্বভারতীয় এলাকায় কলাম্বিয়ার সেলস ম্যানেজারের দায়িত্বভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত হ'ল। ১৯৫৪ সালের প্রারম্ভে তিনি বদলী হলেন দমদমে এক্সপোর্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের ভারপ্রাপ্ত হয়ে। রেকর্ডিং এ্যাডমিনিস্ট্রেটার হিসাবে যাবতীয় রেকর্ডিং সংক্রান্ত ভার তাঁর প্রতিই অর্পিত হ'ল—সারা ভারতবর্ষ তাঁর কাজের এলাকা হিসাবে নির্দিষ্ট হ'ল।

প্রেমেন্দ্রকুমার সেন

এরপর তাঁর অধিকৃত পদের নামান্তর ঘটল, তার ফলে তিনি অভিহিত হতে থাকলেন এ এ্যাণ্ড আর (আর্টিস্টস এ্যাণ্ড রিপার্টয়ার) ম্যানেজার হিসাবে। কপিরাইট এবং রয়্যালটি সংক্রান্ত কার্যগুলি এঁর দপ্তর থেকেই পরিচালিত হয়। রোমে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো, আই এল ও এবং বার্ন ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত ডিপ্লোমাটিক কনফারেন্স ফর দ্য ইণ্টারন্যাশানাল প্রোটেকশান অফ দ্য রেকর্ডস ম্যানুফ্যাকচারার্স, ব্রডকাস্টিং অরগানিজেশানস এ্যাণ্ড আর্টিস্ট-এ যোগদান করেন ইণ্টারন্যাশানাল ফেডারেশান অফ দ্য ফোনোগ্রাফিক ইণ্ডাস্ট্রীর (লণ্ডন) প্রতিনিধিরূপে (১৯৬০), এই সূত্র ধরে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো এবং বার্ন ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে তিনি যোগ দেন। উক্ত ইণ্টারন্যাশানাল ফেডারেশান অফ দ্য ফোনোগ্রাফিক ইণ্ডাস্ট্রীর একমাত্র প্রতিনিধিরূপে। এই সম্পর্কেই লণ্ডনে আয়োজিত আগামী বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণও তিনি পেয়েছেন কিন্তু এ আমন্ত্রণ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করেন নি।

প্রখর ব্যবসায়িক দক্ষতা এবং প্রগাঢ় শিল্পচেতনার তাঁর মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর পরিচালনাধীনে গ্রামোফোনশিল্প সঙ্গীতপিপাসুদের অন্তর কানায় কানায় ভরিয়ে দেশের সংস্কৃতির মহিমা যে উত্তরোত্তর বিবর্ধিত করে চলেছে সে সম্বন্ধে দ্বিমত হওয়ার কোন অবকাশ থাকে না। ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথের অমর গানগুলির প্রচারে এবং লং প্লেয়িং রেকর্ডগুলির মাধ্যমে দেশবাসীর সাংস্কৃতিক অনুরাগকে বর্ধিত করে তোলার ক্ষেত্রে গ্রামোফোন রেকর্ডসের তথা শ্রীসেনের কৃতিত্ব এবং গৌরবময় ভূমিকা মুঠো মুঠো সাধুবাদ ও প্রশংসার নিঃসন্দেহে অধিকারী।

গ্রামোফোন রেকর্ডসের মাধ্যমে তিনি যেভাবে দেশবাসীর সাংস্কৃতিক পিপাসা ভরিয়ে তুলে দেশবাসীকে উত্তরোত্তর সঙ্গীতসচেতন করে তুলছেন—তা তাঁর প্রতিভা ও দক্ষতা এবং সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগেরই এক উৎকৃষ্ট পরিচায়ক।

শিবানী ঘোষাল

[স্বনামধন্যা সমাজসেবিকা]

বাংলাদেশের নবগঠনে এবং গৌরববিবর্ধনে বিশ্ববন্দিত ঠাকুর পরিবারের দিগ্বিজয়ী পুত্রদের মত কন্যাদের অবদানের গুরুত্বও অল্পমূল্যের নয়। ঠাকুরবংশের একাধিক দুহিতা আপন আপন ক্ষেত্রে যে অসাধারণ প্রতিভা এবং শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন বা দিয়ে চলেছেন তা জাতির সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে কতখানি সহায়তা করেছে তার মূল্যায়নের ভার ইতিহাসের। স্বর্ণকুমারী দেবী, ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী, লেডী প্রতিভা চৌধুরী, সুনয়নী দেবী, কবি লীলা দেবী, ডঃ বাণী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সেই তালিকায় এক-একটি স্মরণীয় নাম। বিশিষ্ট সমাজসেবিকা শ্রীমতী শিবানী ঘোষাল সেই তালিকারই আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম। সংসারধর্ম পালনরত একজন গৃহবধূর একক সাধনার এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এক জন-কল্যাণধর্মী সুমহৎ প্রতিষ্ঠান কি ভাবে গড়ে উঠে, বিরাট বিশাল এলাকা জুড়ে ব্যাপ্ত প্রসারিত হয়ে বহু নারীর জীবনে প্রতিষ্ঠা ঘটাল,

বহু শিশুর ভবিষ্যতের রুদ্ধদুয়ার অর্গলমুক্ত করে দিল—শিবানী ঘোষালের জীবন তারই বিচিত্র ইতিহাস।

অমরকীর্তি যুবরাজ দ্বারকানাথের স্বনামধন্য বৈমাত্রেয় অনুজ রত্নপ্রসূ ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাত প্রথম স্মরণীয় বাঙালী পুণ্যশ্লোক মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের পৌত্রের পৌত্র স্বর্গীয় অরবিন্দনাথ ঠাকুর এবং প্রথম মহিলা চিত্রশিল্পী স্বর্গগতা সুনয়নী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া অনুজা দেবীর কন্যা শিবানী দেবীর জন্ম ৫ই অগ্রাণ ১৩২৪ (নভেম্বর ১৯১৭)।

যথাসময়ে বাল্যশিক্ষা সুরু হ'ল। তারপর একদিন মহারাজা রমানাথের ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত প্রাসাদে এক মাঘের সন্ধ্যায় শাঁখ বেজে উঠল। উলুধ্বনি শোনা গেল, একটি তেরো বছরের মেয়ের জীবন চিরকালের মত জড়িয়ে গেল এক বাইশ বছরের তরুণের আনন্দ, বেদনা, ভাব, অনুভূতির তরঙ্গে-তরঙ্গে। ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে শিবানী দেবীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হ'ল আড়িয়াদহের সুপ্রসিদ্ধ ঘোষাল পরিবারোদ্ভূত এবং দানবীর স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের অন্যতম দৌহিত্র-পুত্র শ্রীযুক্ত অসিতকুমার ঘোষালের সঙ্গে। বাঙলা দেশের চলচ্চিত্রজগতে সুবিখ্যাত ঘোষাল ভ্রাতৃত্রয় অসিতকুমারের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র।

তারপর একটানা কুড়ি বছর গৃহধর্মই পালন করে গেছেন শিবানী দেবী বাঙলা দেশের অন্যান্য কুলবধূর মত। অবশ্য বিরাট পরিবারের কন্যা এবং অভিজাত পরিবারের বধূ—তাই গৃহকর্মের ফাঁকে ফাঁকে অধ্যয়ন ও সাংস্কৃতিক চর্চায় ছেদ অবশ্য কোনদিনই পড়েনি, তবে ১৯৫০ সাল তাঁর জীবনে এনে দিল এক বিরাট পরিবর্তন, ঐ সময়ে তাঁর জীবনের গতি এক বৃহত্তর পটভূমির দিকে মোড় ফেরল। মধ্যমগ্রামে তাঁদের বাগানবাড়ি। ঐ সময় বাগানে কিছুদিন বাস করেন। পল্লীর নিসর্গ শোভা, তার শ্যামসমারোহ, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ একদিকে যেমন মনকে কানায় কানায় ভরিয়ে দেয় আবার অন্যদিকে নিঃসঙ্গতার মৌন বেদনা সমানভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন শিবানী দেবী, প্রত্যেকটি সংসারের জীবনযাত্রা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তাদের সুখ, দুঃখ অনুভূতির ভাগ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে থাকলেন। তাঁর সন্ধানী চোখে তখন তাদের জীবনযাত্রার একটি নিখুঁত আলেখ্য ফুটে উঠল। তিনি দেখলেন এরাও বহু গুণের অধিকারী। এদের গুণগুলির যথাযথ বিকাশ ঘটলে এরাও যেমনই মর্যাদা পায় আবার সেই সঙ্গেই বহু সমস্যার সমাধান হয়, বহু পরিবারের মঙ্গলসাধন করে। এরা যে যা জানে তারই এক প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন (১৯৫১-৫২)। এদেরই নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন গঙ্গানগর মহিলা শিল্পশিক্ষা মন্দিরের (১৯৫৩), তার উদ্বোধন করলেন তদানীন্তন শিল্প-অধিকর্তা। এই প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলা, জীবিকার ক্ষেত্রে পুরুষের পিছনে না থেকে তারা যেন পুরুষের পাশে স্থান পায় তারই শক্তি সরবরাহ করা। প্রায় এক শজন মহিলা আজ এখানে বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন কাজ শিখিয়ে যাচ্ছেন, শিশুদের জন্যেও এঁদের একটি পৃথক বিভাগ আছে। এতদ্ব্যতীত কাঁথা প্রস্তুত, তাঁত বোনা এবং ঝুড়ি নির্মাণ প্রভৃতি কাজগুলিও নির্দিষ্ট শিক্ষণ সময়ের মধ্যে শেখানো হয়ে থাকে। বাঙলার আদিশিল্প কাঁথার উৎকর্ষ সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষৎ এই প্রতিষ্ঠানকে এককালীন দশ হাজার টাকা দিয়েছেন। ডাইরেক্টরেট অফ ইণ্ডাস্ট্রি এবং সেনট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড এই প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করে থাকেন। পরলোকগত জননায়ক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেন ও তার কার্যাবলী ও পরিচালন পদ্ধতি তাঁকে বিশেষভাবে প্রীত করে। বিরাট বিশাল এলাকা জুড়ে এর স্ফীতি। এর এই ব্যাপক উন্নতি ও আশাতীত সাফল্য শিবানী ঘোষালের অনন্য সংগঠনপ্রতিভা, অক্লান্ত কর্মশক্তি ও প্রখর সমাজচেতনার আশ্চর্য ফল। অতি অল্পসময়ের মধ্যে বহুজনের কল্যাণ সাধন করে এই প্রতিষ্ঠানটি আজ যে ব্যাপক সমৃদ্ধির সম্মুখীন হয়ে চলেছে তা তাঁরই ফলপ্রসূ নেতৃত্বের এবং দক্ষতার এক প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

শিবানী ঘোষাল

১৯৫৪ সালে শিবানী ঘোষাল সেনট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অন্তর্গত স্টেট বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টিং কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত এই আসনে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। পুনর্বাসন বিভাগের অন্তর্গত মধ্যমগ্রাম ট্রেনিং সেন্টারের সচিবের আসনেও ইনি ছিলেন সমাসীনা। বর্তমানে তিনি আকাশবাণী (পল্লীমঙ্গল বিভাগ) শ্যামাদাস বিদ্যাপীঠ, ব্যারাকপুর অবজারভেশন হোম, উত্তর কলিকাতা মহিলা সমিতি, বেঙ্গলের ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড সারদা-সঙ্ঘ (উত্তর কলিকাতা শাখা) মধ্যমগ্রামের দুই নং ব্লক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে অন্যতম উপদেষ্টা হিসাবে যুক্ত। বিশিষ্ট শিশু প্রতিষ্ঠান মুকুলবীথির তিনি সভানেত্রী। বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা ও সুচিন্তিত, সারগর্ভ, সমাজকেন্দ্রিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়ে থাকে। জনজীবন সম্বন্ধে তাঁর প্রধান বক্তব্য যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তিনি যুক্ত থাকুন তার জন্যে কিছু কাজ করা তাঁর বাসনা, শুধু নামেই কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকা তাঁর অভিপ্রায় নয় তাই আরও বহু প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে তিনি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সাড়া দিতে পারেন নি।

সাগরময় ঘোষ

[স্বনামধন্য সাংবাদিক ও সাহিত্যসেবী]

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে যাঁদের সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং শান্তিনিকেতনের ইতিহাস গঠনে যাঁদের অবদান অপরিসীম স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ সেই তালিকায় একটি অত্যুজ্জ্বল নাম।

অর্ধশতাব্দীকাল আগের কথা। কালীমোহন সেদিন পশ্চিমের যাত্রী। জাহাজ ভেসে চলেছে অথৈ জলের উপর দিয়ে। বাঙলা দেশ থেকে খবর গেল তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা মনোরমা ঘোষ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন চাঁদপুরের ভবনে (৭ই আষাঢ় ১৩২০, জুন ১৯১৩)। সোনার বাঙলা, জননী জন্মভূমি গরীয়সী বাঙলা, ভুবনমনোমোহিনী বাঙলা থেকে কালীমোহন সেদিন ভৌগোলিক বিচারে অনেক—অনেক দূরে, তাঁর সামনে সেদিন শুধু জল, অগাধ সমুদ্র, সীমাহীন সাগর, উত্তাল ঊর্মি মাথার উপর বিরাট আকাশ ছাড়া পরিপার্শ্ব সবই সাগরময়। নবজাতকেরও তাই নামকরণ হল সাগরময়—আজকের দিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও সুলেখক শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ। বিদগ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শান্তিদেব ঘোষ ও সম্প্রতি অকালে পরলোকগত শক্তিমান সাংবাদিক ও দক্ষ লেখক শুভময় ঘোষ যথাক্রমে তাঁর অগ্রজ ও অন্যতম অনুজ।

শান্তিনিকেতনে আই এ, পর্যন্ত তিনি লাভ করেছেন শিক্ষা। সিটি কলেজ থেকে তিনি সসম্মানে হন বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ছাত্রজীবনেই জড়িয়ে পড়লেন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে। কারাবাসও ঘটেছে ছ মাস।

তদানীন্তন অবিভক্ত বঙ্গ-সরকারের শিক্ষাবিভাগে শুরু হ'ল তাঁর কর্মজীবন। সরকারী চাকুরী ধরে রাখতে পারল না তাঁর সাহিত্যরসপুষ্ট পিপাসুচিত্তকে। গতানুগতিকতা, ছকে বাঁধা বৈচিত্র্যবিহীন জীবন কোন আবেদন জাগাতে পারল না জীবনপিয়াসী এই তরুণের মনে। রূপ-রসের অসীম আকাশে যে তরুণ পাড়ি জমাতে চায় ফাইল কণ্টকিত সরকারী দপ্তর কি তার মন ভরাতে পারে? পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের বেঙ্গল ইমিউনিটিতে যোগ দিলেন সাগরময়। সেখানেও প্রথমে মনোমত কাজ পান নি। নরেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন এই তরুণ জীবনের অপ্রাপ্তি। নবশক্তি পত্রিকার তিনিই ছিলেন স্বত্বাধিকারী। স্বর্গীয় অদ্বৈত মল্লবর্মণের সঙ্গে সম্পাদকীয় কার্যে সহযোগিতা করার জন্য নরেন্দ্রনাথ বন্ধুপুত্রকে পাঠালেন 'নবশক্তি'তে। বেঙ্গল ইমিউনিটির প্রচার অধিকর্তার আসনে সেদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর কাছে প্রভূত উৎসাহ সেদিন পেয়েছিলেন সাগরময়। যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গেও সেদিন নরেন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন অন্যতম অংশীদার হিসাবে। নরেন্দ্রনাথ সাগরময়কে পাঠালেন যুগান্তর পত্রিকায় অন্যতম সহকারী সম্পাদক হিসাবে। কথাশিল্পী প্রবোধকুমার সান্যাল, সাহিত্যিক যাযাবর, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সেদিন যুগান্তরের সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িত। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 'দেশ' পত্রিকায় যোগ দিলেন সাগরময়। কর্তৃপক্ষ সংবাদদাতার, সংবাদ বিভাগের এবং 'দেশ' পত্রিকার—এই তিনটি কাজের ভার তার সামনে মেলে ধরলেন। বললেন যে কোন একটি বেছে নিতে, বলা বাহুল্য সাগরময় শেষেরটিই বেছে নিলেন। প্রথম দিন অবশ্য সংবাদদাতার কাজই তিনি করেছিলেন, সাহিত্যরথী দীনেশচন্দ্র সেনের পরলোকগমনে আয়োজিত স্মৃতিসভার সংবাদ প্রকাশ করার ভার পড়ল সাগরময়ের প্রতি।

আজ পঁচিশ বছর (অর্থাৎ তাঁর জীবনের অর্ধাংশ) তিনি দেশের সঙ্গে যুক্ত। 'সাপ্তাহিক দেশ'-এর সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি এবং ব্যাপক প্রসিদ্ধির মূলে তাঁর প্রতিভা ও নৈপুণ্য যে কতখানি দায়ী সে সম্বন্ধে পাঠকসমাজে কিছুই অজানা নেই। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ব্যাপী তাঁর এই পত্রিকাটিকে উত্তরোত্তর আরও উন্নত করে তোলার অবিরাম সাধনা সাহিত্য-সমাজে আজ অফুরন্ত সাধুবাদ ও স্বীকৃতিতে বিভূষিত।

সাগরময় ঘোষের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় বিচিত্রায়। প্রবাসীতেও তারপর তাঁর একাধিক রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। অষ্টাদশী, পরম রমণীয়, শতবর্ষের শতগল্প, অনেক দিনের অনেক কথা প্রভৃতি সংকলনগ্রন্থগুলি তাঁর সম্পাদনা কৃতিত্বের এক একটি প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর। সম্পাদকের বৈঠকে ও একটি পেরেকের কাহিনী গ্রন্থ দুটি তাঁর মৌলিক রচনার সার্থক দৃষ্টান্ত। তাঁর দণ্ডকারণ্যের বাঘ নামক উপন্যাসটি ছোটদের জন্যে রচিত।

১৯৪৭ সালে শ্রীমতী আরতি সরকারের সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তাঁরা একটি কন্যা ও একটি পুত্রের জনক-জননী।

সাহিত্যসেবী এবং সাংবাদিক হিসাবে তিনি সমধিক পরিচিত হলেও কেবল তার মধ্যেই তাঁর দক্ষতা সীমাবদ্ধ নয়। অভিনয়, সঙ্গীত এবং খেলাধুলাতেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি গুরুরূপে পেয়েছেন স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একাধিক রবীন্দ্রনাট্যে অংশগ্রহণ করেছেন। শান্তিদেব ঘোষের পরিচালনায় 'তাসের দেশ' এ তাঁর পাঞ্জার ভূমিকায় অভাবনীয় অভিনয় দর্শকদের স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে আছে। ১৯৬১ সালে তিনি ইয়োরোপ পরিভ্রমণ করেন।

মাসিক বসুমতী তিনি নিয়মিত পড়ে থাকেন। প্রাচীন ঐতিহ্যকে পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখে ও সম্মান দিয়ে মাসিক বসুমতীর নতুনের আবাহন অর্থাৎ নব নব পটভূমিতে নিত্য পদক্ষেপ তাঁকে আনন্দ দেয় তাঁর মতে সেইখানেই সম্পাদকের কৃতিত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং কুশলতা।

সাগরময় ঘোষ

মাসিক

বসুমতী

বৈশাখ / '৭১

ফুলের মেলা

—বিনয় মুখোপাধ্যায়

দই চাই ?

—ভোলানাথ দেব

পথ ভুলে

—কাতিকচন্দ্র ঘোষ

মুক্তির আহ্বান

—ভোলানাথ দেব
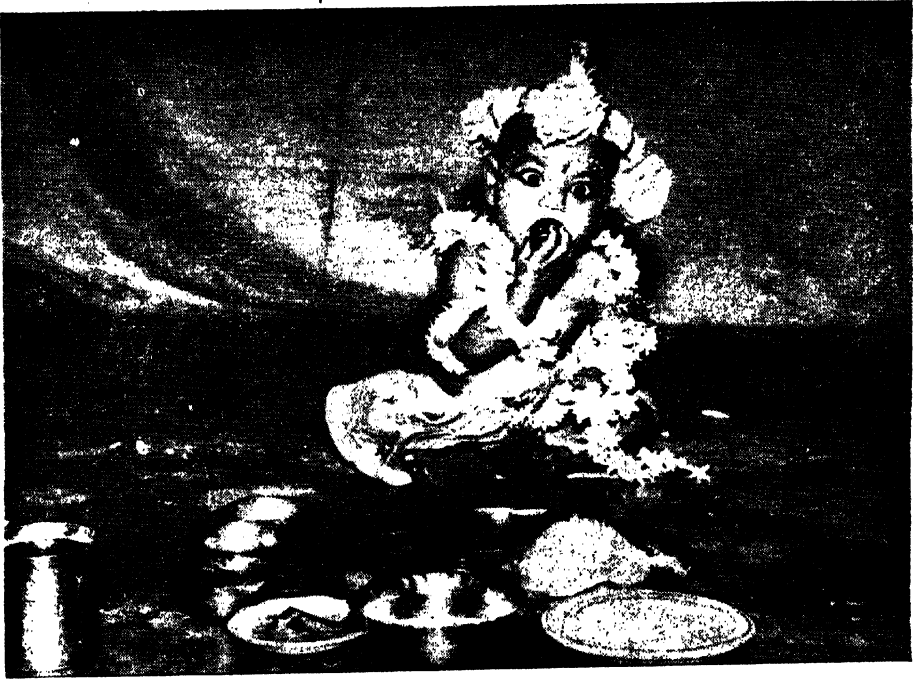
নারায়ণের

—তারাপদ দা

মাসিক
বসুমতী
বৈশাখ / '৭১

হে ভারতবাসী—

—দেবু দাস

অশ্রুকণা

—আশুতোষ সিংহ
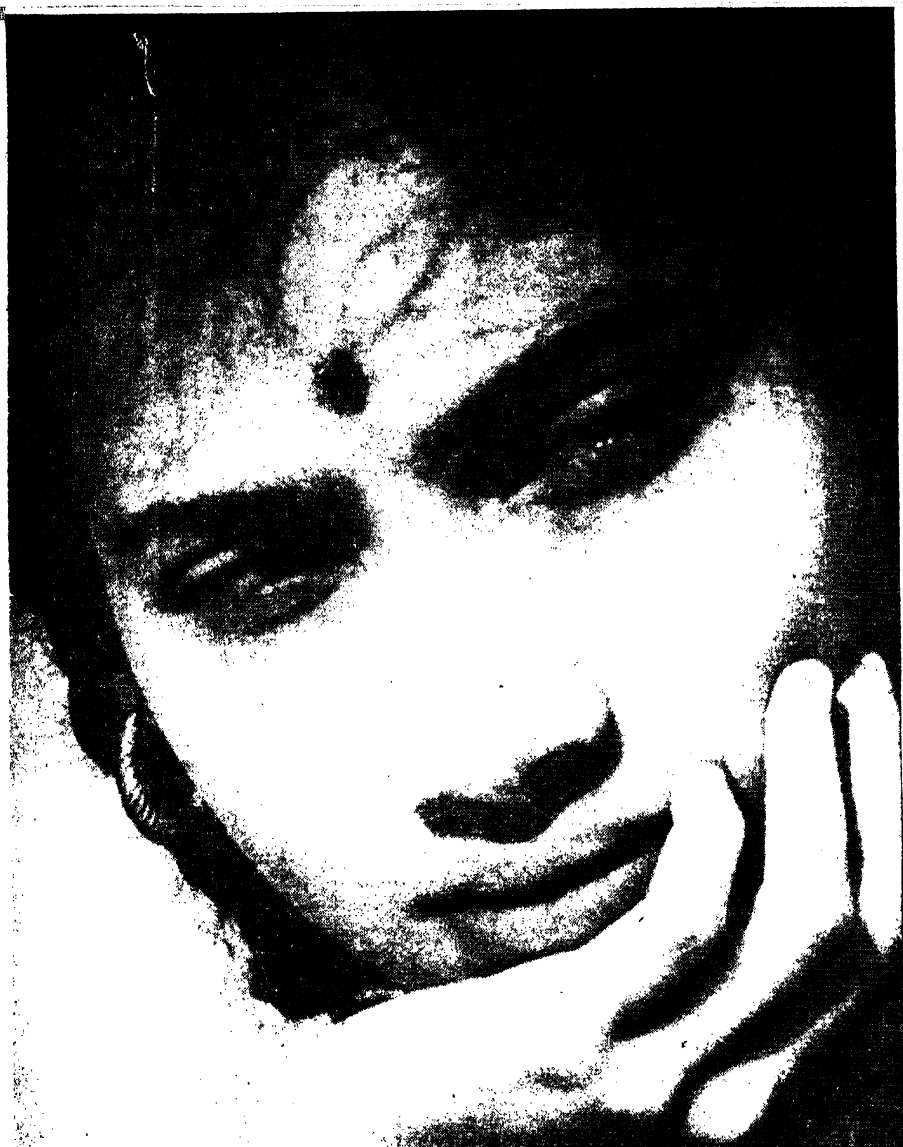
সবুজ দ্বীপ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রতিভা গুপ্ত

আন্দামানে দু'শো চারটি দ্বীপের মধ্যে মাত্র কুড়ি-পঁচিশটি দ্বীপে মানুষের বসতি আছে এবং অন্যান্য দ্বীপগুলি এখনও জনমানবহীন হয়ে পড়ে রয়েছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্টব্লেয়ার রীতিমত আধুনিক সহর। বিজলী বাতি, পাকা রাস্তা, হাইস্কুল, হাসপাতাল, রেডিও স্টেশন, সিনেমা হাউস সবই এখানে আছে। অল্পদিনের জন্য পোর্টব্লেয়ারে এলে চমৎকার লাগে। অনেক ভদ্রলোক যাঁরা সরকারী কাজে সাতদিনের জন্য প্লেনে করে এসে প্লেনে করে ফিরে যান তাঁরা বলেন, আন্দামান স্বর্গের থেকেও সুন্দর। সুন্দর, খুবই সুন্দর আন্দামান। এত সুন্দর একটা দেশ ভারতবর্ষের এত কাছে আছে, অনেকে তা ভাবতেও পারেন না। দূরত্ব হিসাবে কাছে হলেও যাতায়াতের অসুবিধার জন্য আন্দামানকে অনেক সময় বিলেতের থেকেও দূর মনে হয়।

মি: আয়েঙ্গার আন্দামান সম্বন্ধে বলেছেন, 'There are many parts which are lovelier than several famed beauty spots in the world with lagoons that looked like dream pictures, enchanting forests and fine sandy beaches'.

সৌন্দর্য আছে ঠিকই তবে কতদিন আর প্রকৃতির শোভা দেখে মন ভরে? বেশিদিন থাকতে হলে ক্লান্তি এসে যায়। সেই একই লোকজন, একই কথাবার্তা দিনের পর দিন। ভাল কোন সিনেমার বই আসে না। কদাচিৎ দুই একটি ভাল বই আসে। একটি সিনেমা হল আছে, বেশির ভাগই সেখানে 'হাণ্টারওয়ালী' 'সাইকেলওয়ালী' জাতীয় বই আসে। সিনেমার ম্যানেজার বাঙালী। তাঁকে বলেছিলাম, 'ভাল বই আনেন না কেন?'

তিনি জবাব দিলেন, 'ভাল অর্থাৎ serious বই এখানে চলে না। আমাদের বেশির ভাগ দর্শক শ্রমিক সম্প্রদায়। সিরিয়স বই আনলে আমাদের আর্থিক ক্ষতি।' কাজেই মানসিক খোরাক কিছু নেই। ক্লাব অবশ্য আছে অনেকগুলি। বাঙালীদের 'অতুল স্মৃতি সমিতি', তামিলদের 'তমিল্লির সঙ্গম্', তেলেগুদের 'অন্ধ্র এসোসিয়েশন', মালয়লীদের 'কেরেলা সমাজ' ছাড়া আছে হিন্দী সাহিত্য কলামন্দির ও অফিসারদের 'আন্দামান ক্লাব'। কালে ভদ্রে এই সব ক্লাব থেকে আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত হয়।

স্বাধীনতার পর কয়েদী উপনিবেশ তুলে দেওয়া হলে পর দেখা গেল, যে সব কয়েদীরা জমিজমা নিয়ে বাস করছিল তারা দেশে ফিরে যাওয়াতে সেই সব জমিজমা খালি পড়ে রয়েছে। এই জমি যাতে নষ্ট না হয় এই সদিচ্ছায় ভারত সরকার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের, বিশেষ করে চাষাশ্রেণীর লোকেদের এখানে পুনর্বাসনের প্রস্তাব করলেন। দ্বীপান্তরের দেশ কোথায় সেই আন্দামান? প্রথম দিকটায় উদ্বাস্তুরা একটু আপত্তি করেছিল, কিন্তু শেষে তারা দলে দলে এখানে আসতে লাগল। মনে আছে ১৯৪৯ সনে প্রথম দলটি যখন আন্দামানের উদ্দেশ্যে রওনা দিল, কাগজে সে খবর পড়ে আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল কি হতভাগ্য এই লোকগুলি যাদের নির্বাসন দেবার জন্য আন্দামানে পাঠিয়ে দিল। আজ পর্যন্ত ১৬ হাজার উদ্বাস্তু নরনারী এখানে এসেছে। তারা এখানে settlers বলে পরিচিত। প্রথমে পোর্টব্লেয়ারের আশে পাশে তাদের জমি দেওয়া হয়েছিল। এখন আর জমি না থাকায় দূরে দূরে এবং অন্যান্য দ্বীপে তাদের বসতি করে দেওয়া হয়েছে। এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন আর এক অধ্যায়।

পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলি থেকে ছিন্নমূল হয়ে এরা এসে পড়ল কলকাতায়। আর একবার ছিন্নমূল হয়ে এল বাংলা দেশ থেকে আন্দামানের জঙ্গলে। এলো এরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে। টাকা নেই, পয়সা নেই, সহায়-সম্বল, আত্মীয়-স্বজন কিছু নেই। অজানা অচেনা জায়গায়

চীফ কমিশনারের কাছে অভিযোগরত উদ্বাস্তুদল

শুধু ভাগ্যের ওপর ভরসা করে নূতন করে বাঁচবার আশায় এতদূরে সাগরপারে এসে পড়ল। সরকার থেকে তাদের সর্বপ্রকারের সাহায্য করা হয়েছে। প্রথমদিকে তাদের থাকবার জন্য ব্যারাকের মত ঘর করে দিয়েছে, প্রতি পরিবারে বয়স্কলোককে ৩০৲ ও শিশুকে ১৫৲ হিসাবে ডোল দেওয়া হয়েছে। চাষ করার জন্য বলদ ও বাড়ি করার জন্য মালপত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন আবহাওয়ায় চেনা জগৎ ছেড়ে লোকগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে পড়ল, এই সমুদ্রঘেরা অচেনা জগতে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এ দেশের চেহারা আলাদা, মানুষ আলাদা, ভাষা আলাদা। কিসের ভরসায় তারা বুক বাঁধবে? কিন্তু উপায় কি, বাধ্য হয়ে ধীরে ধীরে তারা এখানকার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করল। সরকার থেকে জঙ্গল কেটে জমি পরিষ্কার করে দিল, কিন্তু এই পাহাড়ী অঞ্চলে পাথর ও অজস্র শিকড় ভরা জমি পরিষ্কার করে চাষবাসের উপযোগী করতে এদের প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হল। সব উদ্বাস্তুই কিন্তু চাষাশ্রেণীর ছিল না, তাদের মধ্যে কিছু শিক্ষিত লোকও ছিলেন। জীবনে তাঁরা কোদালি ধরেন নি, বাধ্য হয়ে তাঁদের কোদালি হাতে মাঠে নামতে হল।

আন্দামানের জমিতে ধান হয় প্রচুর পরিমাণে। বছরে একবার ফসল ফলে, কিন্তু এত অপর্যাপ্ত পরিমাণে হয় যে, সারা বছর খেয়ে বিক্রী করেও বেশ টাকা উপার্জন হয়। পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক দেশ। সেই নদী-নালায়ভরা দেশ থেকে উদ্বাস্তুরা প্রথম যখন আন্দামানে এল, পাহাড়ী জমি দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল। বাংলা দেশের জমি আর আন্দামানের জমি তাদের কাছে মনে হল আকাশ-পাতাল তফাৎ। এখন অবশ্য এরা এখানকার আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ছাড়াও তাদের লড়াই করতে হয়েছে স্থানীয় লোকেদের বিরুদ্ধে। লোকাল বর্নদের ধারণা তারা আন্দামানের লোক, son of the soil, এখানেই তাদের জন্ম কর্ম সব, কাজেই আন্দামানের উপর তাদের পূর্ণ অধিকার। উদ্বাস্তুরা তাদের দেশে অনধিকার প্রবেশ করেছে। সাধ্যমত তারা প্রতিটি বিষয়ে উদ্বাস্তুদের উত্যক্ত করেছে। বিশেষ করে সাউথ আন্দামানের লোকাল বর্নরা উদ্বাস্তুদের সেখানে কিছুতেই থাকতে দিতে রাজী হয় নি। তদানীন্তন হোম সেক্রেটারী গোপালস্বামী আয়েঙ্গারকে লোকাল বর্নদের দ্বারা গঠিত 'আন্দামান এসোসিয়েশন' জানাল, সাউথ আন্দামান আমাদের, আজ একশ বছর ধরে আমরা এখানে আছি। তোমরা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মিডল আন্দামান ও নর্থ আন্দামানে বসাও।' তাদের সে আপীল গ্রাহ্য হয় নি। রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন আন্দামানে এলেন, লোকাল বর্নরা তাঁকে বলল, 'আমাদের দেশে আমরা উদ্বাস্তু চাই না, তোমরা তাদের এখানে পাঠিও না।'

'রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন, এক ভাই বিপদে পড়লে অন্য ভাই সাহায্য না করলে কি চলে? স্বাধীনতার জন্য পূর্ববঙ্গের দান বাঙালীদের অনেকখানি।'

পূর্ব বাঙলার এই লোকগুলি ধীরে ধীরে তাদের অজান্তে পরিণত হচ্ছে আন্দামানের অধিবাসীতে। তারা কথা বলে পাঁচটা হিন্দী শব্দ মিশিয়ে। ছেলেমেয়েরা কথা বলে হিন্দীতে, পড়াশোনা করে হিন্দীতে। কতদিন কত বাঙালী ফিরিওয়ালা আমাদের বাড়ি এসেছে, কথা বলেছে হিন্দীতে। আমি কতজনকে ধমক দিয়ে বলেছি বাংলায় কথা বল না কেন? হিন্দী বলতে লজ্জা করে না? তারা সঙ্কুচিত হয়ে জবাব দিয়েছে, 'অভ্যাস হইয়া গেছে মা, হিন্দী না কইলে আমাদের অসুবিধা হয়।'

এখানে আসার পর থেকেই উদ্বাস্তু-কলোনীগুলি দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম। কেমন করে এতদূরে আমাদের দেশের নিরীহ চাষী ভাইরা বসবাস করছে, নিজের চোখে তাদের দেখবার সুযোগ খুঁজছিলাম। অনেক চেষ্টার পর একদিন রওনা দিলাম পোর্টব্লেয়ারের আশেপাশে ম্যংলুটন, শৌলদারী, হার্বাটাবাদ, তিরুর এই সব গ্রামগুলি দেখবার জন্য। এই অঞ্চলের উদ্বাস্তু বসতিগুলি বেশ ভালো হয়েছে। কলোনী বলতে যা বোঝায় এগুলি কিন্তু ঠিক তা নয়। তিন-চারটি করে উদ্বাস্তু পরিবার এক এক জায়গায় বসানো হয়েছে। আবার হয়ত মাইলের পর মাইল জঙ্গল, আবার তিন-চারটি উদ্বাস্তু পরিবার। যেখানে যেখানে ধানী জমি পাওয়া গিয়েছে, সেখানে সেখানে কয়েকটি করে পরিবার বসানো হয়েছে। আমাদের দেশের মত ক্ষেত থেকে চাষীরা দূরে থাকতে পারে না। রাত্রিবেলা হাতী ও হরিণের পাল ক্ষেত নষ্ট করে দেয়। পঞ্চাশ বছর আগে একজন ফরেস্ট অফিসার চার জোড়া হরিণ এনে সখ করে আন্দামানের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই চার জোড়া থেকে পঞ্চাশ বছরে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি হরিণ আন্দামানের জঙ্গল ছেয়ে ফেলেছে। চাষীরা হরিণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। হরিণ মারবার জন্য দুইটি চিতাবাঘ এনে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের কোন খোঁজখবর আর পাওয়া যায় নি।

আন্দামানে বাঙলার বধূ

বর্তমানে কোন বাঘ বা কোন হিংস্র জন্তু আন্দামানের জঙ্গলে আনা সরকারের ইচ্ছা নয়, কারণ জঙ্গলের কাছেই সব উদ্বাস্তু-কলোনীগুলি। জারোয়ার ভয় তো আছেই, তার ওপর বাঘের উৎপাত হলে আর রক্ষা নেই। চাষীদের জমির কাছাকাছি থাকতে হয়। টিয়াপাখীও বড় অত্যাচার করে। পঙ্গপালের মত ক্ষেতে ঝাঁকে ঝাঁকে বসে সমস্ত শস্য শেষ করে দেয়।

আমরা অনেক বাড়িতে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ করলাম। আমাদের দেখে সকলে খুব খুশি। বেশিরভাগ উদ্বাস্তুরা বরিশাল ও খুলনা জেলার লোক। আমাদের বসতে পিঁড়ি পেতে দিল, ঘরের ভাজা মুড়ি এনে দিল। একপাশে ঢেঁকিঘর, একপাশে রান্নাঘর, মাঝখানে শোবার ঘর। উঠানটি মাটি দিয়ে নিকোনো ঝকঝকে, পাশে গোলাভর্তি ধান। ঠিক যেন বাংলা দেশের গ্রামের একটি বাড়ি। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম 'তোমাদের এখানে মন বসেছে তো?' সে জবাব দিল, 'মন কি আর বসে মা, তবে আপনাদের আশীর্বাদে খাওয়া-পরার দুঃখ আমাদের নাই।' সমস্ত আন্দামানের মধ্যে যতগুলি উদ্বাস্তু-কলোনী দেখেছি, তার মধ্যে সাউথ আন্দামানের হাটাটাবাদ, মংলুটন, মিড্‌ল আন্দামানের রঙ্গত ও নর্থ আন্দামানে ডিগলিপুরের বসতি সবচেয়ে ভালো লেগেছে। এদের মধ্যে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারও আছে। সাউথ আন্দামানে শৌলদারীও আমার খুব ভালো লেগেছে। এটাই বোধ হয় সব চেয়ে বড় উদ্বাস্তু-কলোনী। প্রায় তিনশ' পরিবারের বাস, বেশির-ভাগ লোক বরিশাল জেলার নমঃশূদ্র।

আমাদের নিজেদের দেশ পূর্ববঙ্গে, তাই উদ্বাস্তুদের ওপর আমাদের খুব দুর্বলতা আছে। যত উদ্বাস্তু অঞ্চলে গিয়েছি, বরিশালে বাড়ি শুনে সকলে মিঃ গুপ্তকে ছেঁকে ধরেছে যেন তাদের কত আপনজনকে পেয়েছে। অসঙ্কোচে সকলে নিজেদের সুবিধা-অসুবিধা, অভাব-অভিযোগের কথা প্রাণখুলে বলেছে। তিন-চারটি কলোনীর মধ্যে একটি করে বাংলা ভাষায় প্রাইমারী স্কুল আছে। পোর্টব্লেয়ারের আশে-পাশের গ্রামের লোকেরা সুখেই আছে। সহরের সঙ্গে যোগাযোগে তাদের কোন অসুবিধা নেই, রেগুলার বাস সার্ভিস আছে। এদের পরিবার পিছু দশ একর জমি দেওয়া হয়েছে। পাঁচ একর ধানের জন্য, পাঁচ একর বসতবাটি ও বাগবাগিচার জন্য।

আবার এমন সব দূর-দূরান্তের দ্বীপগুলিতে পুনর্বসতি হয়েছে, যেখানে নিকটতম সহরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা ছয় মাসেও হয় কি না সন্দেহ। কুড়ি-পঁচিশ মাইল জলপথে ও স্থলপথে গেলে তবে পরের লোকালয়ে পৌঁছাতে পারে। অনেক দ্বীপে জলের দারুণ অভাব। সারা গ্রীষ্মকাল জলের জন্য লোকগুলি হাহাকার করে। টিউবওয়েল বসালে নোনা জল ওঠে, কুয়া খুঁড়লে কখন নোনা জল ওঠে, নয়ত গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়। একবার Havelock Island-এ গিয়েছিলাম। সেখানকার উদ্বাস্তুরা বলেছিল, তারা সমস্ত গ্রীষ্মকালে স্নান করতে পাবে না জলের অভাবে। যা জল তারা পায়—রান্না করে আর খেয়ে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না।

নর্থ আন্দামানে Smith Island বলে একটি দ্বীপে পঁচিশ থেকে ত্রিশ ঘর উদ্বাস্তু বসানো হয়েছিল। ঘরে বসে বড়কর্তারা ম্যাপ দেখে আর বই পড়ে পুনর্বসতির চার্ট তৈরি করেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁদের কারুরই থাকে না। স্মিথ আয়ল্যাণ্ডে একটি ঝরণা আছে এই সংবাদের ওপর ভিত্তি করে সেইখানে উদ্বাস্তুদের বসানো হল। একটি ঝরণা আছে ঠিকই, তবে কলোনী থেকে বহু দূরে পাহাড়ের নীচে গিয়ে তবে জল আনতে হয়। সব সময় সেখান থেকে জল আনা সম্ভব নয়। তাই কলোনীর কাছে কুয়ো কেটে দেওয়া হয়েছিল। গ্রীষ্মকালে সব কুয়ো শুকিয়ে গেল, জল নেই কোথাও, লোকগুলি জলের অভাবে ছটফট করছে, কিন্তু পোর্টব্লেয়ারে খবর পাঠানো যাচ্ছে না। অনেক কষ্টে যখন তারা পোর্টব্লেয়ারে খবর পাঠাল, তখন কয়েকজন অফিসার গেলেন স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখে আসবার জন্য। তার মধ্যে মিঃ গুপ্তও ছিলেন। সেখানে গিয়ে সকলের চক্ষুস্থির। জল কোথায়? কুয়োগুলি শুকনো খটখটে। লোকগুলি বাধ্য হয়ে নোনাজল খাচ্ছে, ফলে শরীরের চামড়া ফেটে ফেটে গিয়েছে। বাঙালী দেখে, মিঃ গুপ্তের কাছে এসে কয়েকজন হাতজোড় করে কেঁদে বলল, 'কর্তা, আমরা তো মরছিই আমাগো পোলাপানগো বাঁচাইবেন।' এই অবস্থা দেখে উদ্বাস্তু পরিবার কয়টিকে অন্য দ্বীপে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্মিথ আয়ল্যাণ্ডের বসতির পিছনে যে টাকা খরচ হয়েছে তা ব্যর্থ হয়েছে।

রজনী সরকার একজন উদ্বাস্তু ভদ্রলোক। এখন আন্দামান Advisory Committee-র একজন সভ্য। ইনি ১৯৪৯ সনে দ্বিতীয় দলের সঙ্গে আন্দামানে আসেন। তিনি একদিন বলছিলেন, 'আমি সারাজীবন ধরে কংগ্রেসের কাজ করেছি, চট্টগ্রামে আমাকে কে না চেনে? আমরা যখন কলকাতার বাইরে উদ্বাস্তু-ক্যাম্পে ছিলাম, একদিন কয়েকজন কংগ্রেসের নেতা সেখানে গিয়ে আমাদের বললেন, 'আন্দামান খুব ভাল জায়গা, আমরা নিজেরা দেখে এসেছি, তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

আমরা যখন আন্দামানের জাহাজে চড়লাম, সকলে কান্নাকাটি শুরু করল। কোন অনির্দিষ্ট পথে পাড়ি দিচ্ছি ভেবে আমরা সকলেই খুব উদ্বিগ্ন হলাম। জাহাজ কর্তৃপক্ষ আমাদের বেশ ভালমত দেখা শোনা করেছে। পোর্টব্লেয়ারে এসে জেটিতে নামবার আগেই আমাদের দলে দলে ভাগ করে দিল। তারপর এখানে আসার পর নৌ সহর,

উদ্বাস্তু গৃহ ও ধানী জমি

বংলুটন, হক্ফেগঞ্জ, ওয়াণ্ডুর, মানবুর ও কলিনপুরের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিল। প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও ধীরে ধীরে আমাদের সব অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। চাষী না হয়েও আমাদের লাঙল ধরতে হয়েছে এই যা দুঃখ। সরকার আমাদের সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। অনাবাদি জমি আবাদি করে দিয়েছেন, তবে সেই জমি নিয়ে প্রথম দিকে আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। এখানে এসে আমাদের দেশের মত কোকিলের ডাক, বৌ-কথা কও পাখির ডাক শুনেছি, মন আমাদের উদাস হয়ে গিয়েছে। 'রূপচাঁদা' মাছ খেয়ে দেশের জন্য মন কেঁদেছে। মনকে বুঝিয়েছি আমাদের চট্টগ্রামও তো এই রকমই দেখতে—

'শৈলসম্ভূতা, সাগরচুম্বিতা, নদীমেখলা।'

সরকার থেকে উদ্বাস্তুদের সর্বপ্রকার সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা-ঘাট, স্কুল, ডিসপেন্সারি, যা যা প্রয়োজন। অনেক বিষয়ে এদের অভিযোগ থাকলেও নিজস্ব জমিজমা পেয়ে, বাড়ি-ঘর করে পূর্ববঙ্গের ভাগ্য-বিতাড়িত মানুষগুলি আবার নূতন করে বেঁচে উঠেছে।

আন্দামানের জঙ্গল এত গভীর কিন্তু কোন হিংস্র জন্তু নেই। বাও দুইটি চিতাবাঘ আনা হয়েছিল, তারও কোন খোঁজ নেই। সাপ আছে প্রচুর কিন্তু বিষাক্ত সাপ নেই। প্রথমটায় বিশ্বাস হয় নি, সাপের কামড় আবার বিষাক্ত হয় না সেটা কি করে সম্ভব? আমরা যখন গেস্ট হাউসে ছিলাম একদিন রাত্রিবেলা কেয়ার টেকারকে সাপে কামড়াল, রান্নাঘরে কাজ করার সময়।

আমরা তো ভয়ে মরি। কেয়ার টেকারের কিন্তু কোন ভয় দেখলাম না, খানিকটা গরম জল নিয়ে পায়ের ওপর ঢেলে কি সব লাগাল। খানিক পরে উঠে কাজ-কর্ম শুরু করল। সাপ হয়ত বিষাক্ত নেই আন্দামানে কিন্তু যা একটি সাংঘাতিক বিষাক্ত প্রাণী আছে তার তুলনা হয় না। সেটি হল 'কানখাজুরা', আমাদের দেশের 'চালা' জাতীয়, কিন্তু বিরাট বড়, প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া। কানখাজুরার কামড় সাপের কামড়ের থেকেও যন্ত্রণাদায়ক। শিশুদের কামড়ালে আর রক্ষা নেই। হলফ করে বলতে পারি মহাভারতের কর্ণ যদি আন্দামানের কানখাজুরার কামড় খেতেন তবে পরশুরামের মাথা কোলে করে তখন বসে থেকে তাঁকে আর বাহাদুরি নিতে হত না। আর আছে আন্দামানের সমুদ্রে অসংখ্য হাঙর। যেখানে-সেখানে কেউ সমুদ্রে নামতে পারে না। একমাত্র করবাইনস্ কোভে হাঙর নেই তাই সমুদ্রে স্নান করতে হলে সকলে সেখানেই যায়। এখানকার জঙ্গলে বেতগাছ হয় অসংখ্য। এক রকমের বুনো বেত গাছ আছে যার ডগা কাটলে চমৎকার পানীয় জল বেরোয়। বর্মা দেশে এই বেতগাছকে বলে life saver. দুধনাথ তেওয়ারীর দল এই বেতগাছের জল খেয়ে বহুদিন পথ চলেছিল। অনেক ফরেস্ট অফিসারের কাছে গল্প শুনেছি জঙ্গলে কাজ করার সময় অনেক সময় তাঁদের পাঁচ-ছয় দিন পর্যন্ত এই বেতগাছের জল দিয়ে রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া সব করতে হয়।

আন্দামানের ম্যানগ্রোভের জঙ্গল দেখবার মত। প্রত্যেকটি খাড়ির দুই পাশে অসংখ্য গাছ, ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের। জোয়ারের সময় গাছগুলি অর্ধেক পর্যন্ত জলের নীচে চলে যায়। বোট করে যাবার সময় কতবার ইচ্ছা হয়েছে, যেখানে যেখানে ম্যানগ্রোভের ফাঁকে ফাঁকে খালের মত দেখা গিয়েছে, তার ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত ঢুকে যাই। অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করেছি ম্যানগ্রোভের জঙ্গলের। ম্যানগ্রোভের গাছ এখানে জ্বালানী কাঠের জন্য ব্যবহার হয়। আন্দামানে কয়লা পাওয়া যায় না, রান্না করতে হয় কাঠ দিয়ে। প্রথম প্রথম অনভ্যাসের ফলে নাকের জলে চোখের জলে হতে হয় সবাইকে। জিওলোজিস্টরা বলেন, ম্যানগ্রোভের জঙ্গল না থাকলে সমুদ্র কোনদিন আন্দামানকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত তার ঠিক নেই। ম্যানগ্রোভের ফাঁকে ফাঁকে জলা জায়গাগুলি বড় সাংঘাতিক। সন্ধ্যার পর যখন অসংখ্য sand fly ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায় তখন সেখানে দাঁড়ায় কার সাধ্য। পোকাগুলি খুব ছোট্ট তার কামড়ের জ্বালা লাল পিঁপড়ের থেকেও বেশি। গল্প শুনেছি বহু আগে পেনাল সেটলমেন্টের সময় অবাধ্য কয়েদীদের শাস্তি দেবার জন্য রাত্রিবেলা ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে বেঁধে রাখা হত। এক রাত্রি স্যাণ্ড ফ্লাইয়ের কামড় খেয়েই তারা সম্পূর্ণরূপে বদলে যেত।

আন্দামানের খাড়ি

পোর্টব্লেয়ারের বাইরে অন্যান্য দ্বীপে যেতে হলে সাধারণত ফেরী স্টিমার 'চলুঙ্গা'তেই সবাই যাতায়াত করে। সরকারীকাজে অফিসাররা যখন যান তখন প্রত্যেকের নিজের নিজের department-mental বোটেই যাতায়ত করেন। বেশিরভাগ সময় তিন-চারজন অফিসার মিলে একসঙ্গে 'ট্যুর প্রোগ্রাম' ঠিক করেন।

রঙ্গতে সেবার বিশেষ কাজ পড়ায় গুপ্ত সাহেবকে একাই যেতে হল। সেই সুযোগে আমিও তাঁর সঙ্গে রওনা দিলাম। রঙ্গতের উদ্বাস্তু-কলোনীগুলি দেখার ইচ্ছা ছিল বহুদিন ধরেই। এই সুযোগ আর ছাড়লাম না। রাত্রিবেলা খেয়েদেয়ে মোটর বোটে গিয়ে শুয়ে রইলাম। মাঝরাত্রে রওনা দিয়ে ভোরবেলা এসে Long Island-এ পৌঁছালাম। লং আয়ল্যাণ্ড খুবই ছোট্ট দ্বীপ। ফরেস্ট ছাড়া এখানে অন্য কোন বিভাগের বিশেষ কোন কাজ নেই। অল্প কয়েক ঘর লোক। জেটি থেকে সিঁড়ি দিয়ে অনেকখানি উঠে তারপর বাড়ি-ঘর আরম্ভ। সমুদ্রের ধারেই ফরেস্টের খুব সুন্দর একটি ডাকবাংলো। ওখানকার ফরেস্ট অফিসার মিঃ ভাটীর বাড়ি ব্রেকফাস্ট খেয়ে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে লং আয়ল্যাণ্ড দেখা শেষ করে আমরা রওনা দিলাম রঙ্গতের দিকে। রঙ্গত থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে মোটর-বোট থেকে নেমে ট্রাকে করে কাঁচা রাস্তা দিয়ে এসে তবে রঙ্গতে আসতে হয়। ভারি সুন্দর একটি উপত্যকা। দুই পাশে সব উদ্বাস্তুদের বাড়ি-ঘর। এখানে পি ডব্লিউ ডি'র প্রচুর কাজ। পূর্বের জনমানবহীন দ্বীপটি ধীরে ধীরে বেশ একটি বর্ধিষ্ণু লোকালয়ে পরিণত হচ্ছে।

রঙ্গতের উদ্বাস্তুদের সকলেরই বেশ স্বচ্ছল অবস্থা। প্রচুর তরী-তরকারী ও ধান এখানে জন্মায়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে অনেকের সঙ্গে আলাপ করলাম। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, সুযোগ পেলে তোমরা দেশে ফিরে যেতে চাও?

সে উত্তর দিল, 'এক্ষুণি, এই মুহূর্ত সব ছেড়ে চলে যাব। দেশে গিয়ে আধপেটা খেতে হয় তাও খাব। পরাণটা আমাদের সেখানেই পড়ে আছে যে মা।'

রঙ্গত থেকে গেলাম বেটাপুর (Betapur). বেটাপুর যাওয়াটা আমরা খুব উপভোগ করেছিলাম। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ট্রলি করে অনেক দূর যেতে হয়। দুই ধারে ঘন জঙ্গল, গায়ের ওপর মাঝে মাঝে গাছের ডালপালা এসে লাগছে, তারই মাঝখান দিয়ে ট্রেনের মত ট্রলি ছুটে চলেছে। বেটাপুরেও ফরেস্টের কাজই বেশি।

রঙ্গতের গেস্ট হাউসটি পাহাড়ের ওপর ঘন জঙ্গলের মধ্যে। ধারে-কাছে কোন বাড়িঘর নেই। রঙ্গতে কোন বিজলীবাতি নেই। সন্ধ্যার পর চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। ডাইনে, বাঁয়ে, পিছনে নিবিড় জঙ্গল। রাত্রিবেলা গেস্ট হাউসের ওপরতলায় রইলাম আমরা দু'জন ও আমাদের ছোট্ট মেয়ে দোলন। নীচে আউট হাউসে পিওন ও ওখানকার চৌকিদার। কি অন্ধকার, লণ্ঠনের আলোয় যেন সে অন্ধকার আরও গাঢ় দেখাচ্ছে। রাত্রি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা গা ছমছম্ ভাব মনে আসছিল। কেমন একটা uncanny ভাব চারদিকে। মনের কথা প্রকাশ করতেই ওঁর কাছে বকুনি খেতে হল। কি আর করা যায় সারারাত ভয়ে ভয়ে প্রায় জেগেই কাটালাম। ভোরবেলা উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। রাতের কথা মনে করে তখন বেশ লজ্জাই করছিল।

পরদিন সকালে রওনা দিলাম আমরা মায়া বন্দরের দিকে। দুপুরবেলা মায়া বন্দর পৌঁছলাম। পোর্টব্লেয়ারের পরই নাম করতে হয় মায়া বন্দরের। এইটি হল আন্দামানের দ্বিতীয় সহর। সহরে যদিও বিজলীবাতি নেই, মোটর গাড়ি চালাবার রাস্তা নেই, সিনেমা হল নেই, তবুও মায়া বন্দর এখানকার একটি বর্ধিষ্ণু সহর। মায়া বন্দরকে বলা যায় কাঠের দেশ বা Timber Town. কাঠের জন্যই মায়া বন্দরের প্রসিদ্ধি। মিড্‌ল আন্দামানের যত কাঠ সব চালান যায় মায়া বন্দর থেকে। এখানেই জঙ্গলের কাজ সবচেয়ে বেশি। শ্রীযুত পি সি রে সমস্ত মিড্‌ল আন্দামানের জঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকে ইজারা নিয়েছেন। মায়া বন্দরের আকাশে-বাতাসে কাঠের গন্ধ। চারিদিকে খালি নানা ধরণের কাঠ। কাঁচা কাঠ, ভেজা কাঠ, চেরা কাঠ, কাঠের গুঁড়ি ও কাঠের গুঁড়ো—এ ছাড়া মায়া বন্দরে আর কিছু নেই। জেটির গায়েই একটি Saw Mill. তারপর খানিকটা উঁচুতে পি ডব্লিউ ডি'র এবং পি সি রে কোম্পানীর গেস্ট হাউস। মায়া বন্দরও খুব ছোট্ট জায়গা। মিড্‌ল আন্দামান ও নর্থ আন্দামানের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার, বেশ কয়েকজন সরকারী অফিসার এবং পি সি রে কোম্পানীর ম্যানেজার এখানে থাকেন। মায়া বন্দরে পানীয় জলের বড় অভাব।

এরপর আমরা গেলাম মায়া বন্দরের কাছেই বর্মীদের 'ওয়েবি' গ্রামে। বর্মীরা খুব খাতির করে চা খাওয়াল, তাদের স্কুলে নিয়ে গিয়ে বর্মীভাষায় গান শোনাল। এখানকার কারেনরা সকলেই হিন্দী বলতে পারে। 'ওয়েবি'তে প্রচুর কমলালেবু জন্মায়।

পরদিন ভোরবেলা চললাম ডিগলিপুর। পোর্ট কর্নওয়ালিসের জেটি থেকে কাঁচা রাস্তা দিয়ে ট্রাকে পাঁচ মাইল পাহাড়ী পথে উঠে তবে ডিগলিপুর। এখানকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড় Saddle Peak (২৪০০ ফিট) আন্দামানের মাউণ্ট এভারেস্ট। ডিগলিপুরে যেতে পথে একটি ছোট নদী পড়ল। জল অবশ্য তখন প্রায় ছিলই না,

মায়া বন্দর

[আ]মাদের ট্রাকটি জলের ওপর দিয়েই পার হল। বর্ষাকালে এই নদী [যখ]ন জলে টইটম্বুর হয়ে ওঠে, তখন সুরু হয় কুমীরের উৎপাত। প্রতি [বছ]র কত লোক যে কুমীরের পেটে যায় তার ঠিক নেই, বিশেষ করে [উ]দ্বাস্তুরা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রায়ই মারা পড়ে। আবার [উ]দ্বাস্তুরা প্রতি বছর অনেক কুমীর শিকারও করে।

ডিগলিপুরের উদ্বাস্তু বসতি বেশ ভাল লাগে দেখতে। গ্রামে [ঢু]কতেই প্রথমে বাজার। দুই ধারে দোকান পাট সারি সারি। কথায়-[বা]র্তায়, চাল-চলনে এখানে পূব-বাঙলার আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার [বো]ঝা যায়। উদ্বাস্তুদের তরফ থেকে আমাদের চা আর বিস্কুট [খা]ওয়াল। আমি একটি ছেলেকে বললাম, 'তোমাদের এখানে এসে [চা]-বিস্কুট খাব কেন? মুড়ির মোয়া, চিঁড়ের মোয়া খাওয়াবে না?'

ছেলেটি বলল, 'পরের বার আপনাকে নিশ্চয়ই মোয়া [আ]র নাড়ু খাওয়াব মা।'

পোর্ট কর্নওয়ালিসের বন্দরটি বোধ হয় সারা আন্দামানে সবচেয়ে [সু]ন্দর বন্দর। সমুদ্র ছয় মাইল ভেতরে ঢুকে গিয়েছে, চওড়ায় প্রায় এক মাইল। তিনদিকে ঘেরা পাহাড়। কয়েদী উপনিবেশের গোড়া থেকে সেই ১৯৫৮ সন থেকেই এখানে naval arsenal [খো]লার প্রস্তাব হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে নি। ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার প্রথমবার জরিপ করতে এসে এই বন্দরটি দেখেই বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ নেভির প্রায় অর্ধেকই এখানে ভিড়ানো যায়।' গভর্নমেন্টের পরিকল্পনা আছে পোর্ট কর্নওয়ালিসে আবার জেটি তৈরি করে পোর্টটি চালু করার। এখানে জেটি তৈরি হলে আর আন্দামান ট্রাঙ্ক রোড সাউথ আন্দামান থেকে নর্থ আন্দামান পর্যন্ত সম্পূর্ণ হলে কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ারের দূরত্ব দু'শো মাইল এবং সময় একদিন কমে যাবে।

ডিগলিপুরে আসার আগে গিয়েছিলাম Interview Island. এককালে এই দ্বীপে বহু আন্দামানী বাস করত। এখন একটি প্রায় একশ' বছরের বৃদ্ধা আন্দামানী স্ত্রীলোক এখানে আছে। আর আছে ফরেস্টের কাজে কিছু বর্মী লোক। ইন্টারভিউ দ্বীপে দুইটি জিনিষ আমাকে মুগ্ধ করেছে। এটি হল অদ্ভুত একটি দীঘি। বিরাট একটি গুহার মধ্যে অপূর্ব এক জলাশয়, মাথার ওপর আচ্ছাদনের মত একটি অতিকায় পাথর, তার নীচে টলটলে মিষ্টি জল। সমুদ্র থেকে অল্পদূরে। মাটির নীচে থেকে অনবরত জল উঠছে আর সে জল মিষ্টি জল। প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেয়ালে সত্যি আশ্চর্য হতে হয়। একবার এক ফরেস্ট অফিসার জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আবিষ্কার করেন দীঘিটি। আর দেখেছি এখানে সমুদ্রের জলের মধ্যে নানা রঙের নানা আকারের কোরাল (coral) ফুলের মত, পাতার মত গাছের মত অজস্র কোরাল। ভাঁটার সময় জল নেমে যাওয়ায় গুপ্তসাহেব নিজেই জলে নামলেন কোরাল তোলার জন্য। কাঁচা অবস্থায় কোরালগুলি স্পঞ্জের মত নরম থাকে। শক্ত না হলে সমুদ্র থেকে তোলা যায় না। নানারকম কোরাল তুলে বোটে রাখা হল। মনের আনন্দে কোরাল তো অনেক তোলা হল তারপর তার দুর্গন্ধে বোটে টেকা দায়। অসম্ভব আঁশটে গন্ধ। বাড়ি এনে মাসের পর মাস রোদ আর বৃষ্টির জল খাইয়ে তবে কোরালগুলি ঘরে রাখবার উপযুক্ত হল।

আন্দামানের অনেক দ্বীপে এখনও মানুষের পা পড়ে নি, এমন কি পোর্টব্লেয়ারের কাছাকাছি গভীর জঙ্গলের মধ্যে কি আছে না আছে অনেকেই খবর রাখেন না। প্রত্যেক বছর জিওলোজিস্ট পার্টি আন্দামানের জঙ্গলের মধ্যে জরিপ করার জন্য ঘুরে বেড়ান। অনেক সময় তাঁদের কাছে নূতন নতুন জায়গার খবর পাওয়া যায়। এ বছর জিওলোজিস্ট পার্টি এসে চীফ কমিশনারকে বলেছিলেন, পোর্টব্লেয়ার থেকে দূরে মানার ঘাটের কাছে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা খুব সুন্দর একটি 'ওয়াটার ফলস্' দেখতে পেয়েছেন। তবে রাস্তা খুবই খারাপ।

[ব্য]ারেন আয়ল্যাণ্ডে যাত্রীদল

এক ছুটির দিনে আমাদের বিরাট একটি দল রওনা দিলাম ঝরণা দেখার উদ্দেশ্যে। মানার ঘাটের কাছে রাস্তার ওপর গাড়ি রেখে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরলাম। রওনা দেবার আগেই শুনেছি রাস্তা খুব খারাপ আর জঙ্গলে অসম্ভব জোঁক। দলের ভদ্রলোকেরা সকলেই গামবুট পরে তৈরি, আমরা মেয়েরা সকলেই চটি পরে রওনা দিলাম। রাস্তা যে এত খারাপ আগে বুঝতে পারি নি। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম দুরু দুরু বক্ষে। জোঁকের প্রতিষেধক হিসাবে নুনের পোঁটলা ও ডেটলের শিশি সঙ্গে নিয়ে। আগের রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তাঘাট জলে-কাদায় ভর্তি। যেতে যেতে সকলেই একবার করে উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠছে। 'আহা কি সুন্দর দৃশ্য'। আমার কিন্তু প্রথম থেকেই জোঁকের ভয়ে চোখ মাটির দিকে, আশেপাশে তাকাবার সময় কোথায়? আধমাইল বেশ নিরাপদেই এলাম। তারপরেই

সুরু হল জোঁকের রাজত্ব। একজনকে জোঁকে ধরে, চীৎকার করে লাফালাফি করে সকলে অস্থির, অবশ্য গামবুট পরা ভদ্রলোকেরা বেশ বুক ফুলিয়েই হেঁটে যাচ্ছিলেন। নুন দিয়ে জোঁক ছাড়িয়ে আবার পথ চলা সুরু হল। একজন সঙ্গীর পরামর্শে পায়ের পাতায় খুব করে ডেটল ঘসে নিলাম।

এবার সুরু হল চড়াই। চলেছি তো চলেছি! পিছিল পথ এক পা উঠলে তিন পা পিছিয়ে আসতে হয়। লাঠিতে ভর দিয়েও পিছল পাহাড়ে পা রাখা যাচ্ছে না। থেমে থেমে যে উঠব তার উপায় নেই। থামলেই জোঁক কিলবিল করে ধরবে। হাতের কাছে যা পাচ্ছি গাছের শিকড়, ঝোপঝাড় তাই ধরে ধরেই পাহাড়ে উঠছি। ঘামে ততক্ষণে নেয়ে উঠেছি! ওপরে চেয়ে দেখছি খাড়া পাহাড় উঠে গিয়েছে। কতদূর? আর কতদূর? সবাই বলে এখনও অনেক দূর। রাস্তার কষ্ট যত না হোক আমার যত আতঙ্ক জোঁকে। যত এগোচ্ছি তাদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে; রাস্তার মধ্যে পাতার ফাঁকে ফাঁকে কিলবিল করছে। চেহারাটা দেখলেই গায়ের মধ্যে শিরশির করে! কখন যে পায়ের পাতায়, হাঁটুতে, হাতে বেয়ে বেয়ে উঠছে টেরই পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় প্রতি পাঁচ মিনিট পরে আমি বলছি, 'ফিরে যাই আমি, আর পারছি না'।

উনি বলতে থাকেন, 'সবাই যাচ্ছে, তোমাকে নিয়েই যত মুস্কিল।'

চেয়ে দেখি দলের সকলেই এমন কি আমার বাচ্চা মেয়েটা পর্যন্ত জোঁকের কামড় ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে যাচ্ছে। অগত্যা আমি আর না গিয়ে কি করি? দুর্গম চড়াই প্রায় এক মাইল ওঠার পর আমাদের পথপ্রদর্শক বলল ভুল রাস্তায় আসা হয়েছে। এবার উপায়? আবার সেই পাহাড়ী পথে নামতে সুরু করলাম। কতবার যে গড়িয়ে কাদার মধ্যে আছাড় খেলাম তার ঠিক নেই। সবচেয়ে শত্রুতা করেছিল আমার পায়ের চটিজোড়া। বার বার কাদার মধ্যে বসে যাচ্ছিল। প্রতি পদক্ষেপে যদি মনে হয় এই বুঝি জোঁকে ধরল তা হলে আর চলার আনন্দ থাকে কোথায়? অনেকটা নেমে এসে অন্য পথ ধরে এগোতে লাগলাম। এ পথটা অপেক্ষাকৃত ভাল। আরও প্রায় এক মাইল এসে খানিকটা নেমে 'ফলস্'টির সামনে দাঁড়ালাম। কি অপূর্ব দৃশ্য। কত উঁচু থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে পাথরের ওপর দিয়ে বেগে ঝরণার জল নীচে পড়ছে। অনবরত ঝর-ঝর করে জল পড়ার আওয়াজ হচ্ছে। আশপাশের পাথরগুলি শ্যাওলা পড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। নীচে অনেকখানি জায়গা জুড়ে জল জমে রয়েছে তার পরেই উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে কলকল শব্দে জলের স্রোত নীচের দিকে নেমে গিয়েছে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। চীফ কমিশনার ঝরণাটির নামকরণ করলেন 'বহুধারা'। আমার কিন্তু ইচ্ছে করছিল নাম দিই 'পাগলা ঝোরা।'

পিছন পানে নাইকো বাধা
পিছনে টান নাইকো মোটে।
পাগলা ঝোরার পাগল নাটে
নিত্য-নূতন সঙ্গী জোটে।
লাফিয়ে পড়ে ধাপে ধাপে
ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্চ হতে।
চড়চড়িয়ে পাহাড় ফেড়ে
নৃত্য করে মত্ত স্রোতে।

আন্দামানের একমাত্র আগ্নেয়গিরি Barren Island. এখন অংশত নির্বাপিতপ্রায়। ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার যখন ১৭৮৯ সনে ব্যারেন আয়ল্যাণ্ডের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি তখন এখানে অগ্ন্যুৎপাত হতে দেখেছিলেন। তারপর আর কোন লেখকের বই থেকে অগ্ন্যুৎপাতের খবর আর পাওয়া যায় নি। আর একটি সম্পূর্ণ নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি Narkondam Island. কবে এখান থেকে আগুন বের হতে দেখা গিয়েছে, কেউ বলতে পারেন না। ব্যারেন দ্বীপের মুখ থেকে এখনও ধোঁয়া বের হয়।

প্রথম দর্শনে অদ্ভুত লাগে আগ্নেয়গিরি ব্যারেন আয়ল্যাণ্ড দেখতে। ঠিক পিরামিডের মত কোণাকৃতি গাছপালা শূন্য একটি পাহাড়। ওপরে ওঠা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমাদের দলের সকলে লাঠিতে ভর দিয়ে, থেমে, জিরিয়ে, পাথরের খাঁজে-খাঁজে পা রেখে অতি কষ্টে ওপরে উঠলাম। এই আগ্নেয়গিরির মুখে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। কবে শেষ অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল জানি না, চারদিকে পড়ে রয়েছে ছড়ানো লাভার স্রোত পাথরের মত শক্ত অবস্থায়। ওপরে যাও বা ওঠা হল—নীচে নামা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কত কসরৎ করে যে নামা হল তার ঠিক নেই। অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় সে রাত্রি ব্যারেন আয়ল্যাণ্ডেই কাটানো হল, কেউ বোটের ভেতর, কেউ বোটের বাইরে।

নারকোণ্ডামও সোজা সমুদ্র থেকে পিরামিডের মত উঠে

আগ্নেয়গিরি ব্যারেন আয়ল্যাণ্ড

গিয়েছে। কোন জীবিত প্রাণীর চিহ্নও কোথাও নেই। ব্যারেন আয়ল্যাণ্ডে প্রচুর ছাগল দেখতে পাওয়া যায়। নারকোণ্ডামে কিছুই দেখা যায় না। মিঃ পোর্টম্যান বলেছেন হয়ত নরক অন্দম থেকে এখানকার নাম হয়েছে নরকন্দম বা নারকোণ্ডাম। করমণ্ডল উপকূলের ব্রাহ্মণরা নাকি এই দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় এই অদ্ভুত গঠনের নির্জন পাহাড়ী দ্বীপটি দেখে নরকের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'নরকন্দম্।' কে বলতে পারে হয়ত এই 'অন্দম্' কথা থেকেই পরে সারা অঞ্চলের নাম হয়েছে আন্দামান।

পোর্টব্লেয়ারে ফিরে আসার পথে গেলাম Oral Kachcha. ক্রীকের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট একটি জেটিতে গিয়ে মোটর-বোট থামল। ওরাল কাছায় পাহাড়ের ওপর ফরেস্টের ডাকবাংলো। কাজকর্ম যা হয় সব ফরেস্টের। চারদিকে কি গভীর জঙ্গল। সব জারোয়া অধিকৃত অঞ্চল। ডাকবাংলোর বারান্দা থেকে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। ওরাল কাছার কাছেই Spike Island. এই দ্বীপে প্রায়ই জারোয়ারা আসা-যাওয়া করে। প্রতি বছর সরকার থেকে নানারকম উপহারসামগ্রী এখানে রেখে যাওয়া হয়। জারোয়ারা সুযোগ বুঝে সেগুলি নিয়ে যায়। আমরা যখন গেলাম, আগের বারের দেওয়া জিনিষপত্র কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। বোঝা গেল—জারোয়ারা সে সব জিনিষ নিয়ে গিয়েছে। নূতন করে আবার বালতি, চা, দেশলাই, দা, লাল-কাপড় সব রেখে দেওয়া হল। লাল-কাপড় জারোয়াদের খুব প্রিয়। চিরাচরিত প্রথায় এখনও চেষ্টা করা হচ্ছে—উপঢৌকন দিয়ে জারোয়াদের বশ করতে। বহুবার জিনিষপত্র দেওয়া হয়েছে, বহুবার তারা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছে; কিন্তু মাপোষ করতে রাজী হয় নি আজও. কোনদিন হবে কি না, সন্দেহ!

Local Administration—চীফ কমিশনার আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্বময়কর্তা। তাঁকে সাহায্য করার জন্য আছেন একজন ডেপুটি কমিশনার ও দুইজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। এ-ছাড়া ফরেস্ট, পি ডব্লিউ ডি, মরিন, এগ্রিকালচার, কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি, মেডিসিন, এডুকেশন এবং আরও অন্যান্য বিভাগীয় অফিসাররা আছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য প্রচুর চেষ্টা করছেন। প্রত্যেক বিভাগের সিনিয়র অফিসারদের ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে তিন বছরের জন্য ডেপুটেশনে পাঠান হয়। যাঁরাই ডেপুটেশনে আসেন তাঁরাই শতকরা ৩৩⅓ শতাংশ বেশি বেতন আন্দামান-অ্যালাউয়েন্স হিসাবে পান।

ফরেস্ট—১৮৮৩ সনে প্রথম বন-বিভাগ দপ্তর খোলা হয়। আন্দামানের অরণ্য বন্যসম্পদে পরিপূর্ণ। এখানকার প্যাডক, গর্জন, মার্বল উড পৃথিবীবিখ্যাত। এই সব কাঠ দিয়ে বাড়ি-ঘর, জাহাজ-নৌকা, আসবাবপত্র খুব ভালো তৈরি হয়। এত অপর্যাপ্ত বনসম্পদ বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। কাঠের জন্য একদিকে জঙ্গল কাটা হচ্ছে, অন্যদিকে নূতন করে গাছ লাগান হচ্ছে। জঙ্গল যাতে একেবারে নিঃস্ব হয়ে না পড়ে সেদিকে সরকারের তীক্ষ্ণ নজর আছে। জঙ্গল যদি রক্ষা করা না হয়, তবে বিপদের সম্ভাবনাও আছে। অতিরিক্ত গাছ কাটার ফলে soil erosion-এর আশঙ্কা আছে, যার ফলে একদিন হয়ত দেখা যেতে পারে—সমুদ্রের বুকে এক সারি রুক্ষ পাথর ছাড়া কিছু নেই। তাই গাছ কাটার সঙ্গে সঙ্গে নূতন গাছ লাগানোর কাজও পুর্ণোদ্যমে চলছে। আরও একটা বড় কথা, আন্দামানের লোকেরা বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে। সমস্ত দ্বীপগুলি যদি অরণ্যহীন হয়ে পড়ে, তবে বৃষ্টির অভাবে এখানকার লোকেদের বেঁচে থাকাই দুষ্কর হবে। জঙ্গলের কাজে হাতীকে ভারি সুন্দরভাবে কাজে লাগান হয়। গাছ কাটার পর সেগুলি নিপুণভাবে শুঁড় দিয়ে যখন সরিয়ে নিয়ে ট্রলিতে তুলে দেয়, দেখতে ভারি মজার লাগে।

কর্মরত হাতী

পি ডব্লিউ ডি—পি ডব্লিউ ডি আন্দামানের সবচেয়ে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উন্নতির জন্য পি ডব্লিউ ডি প্রচুর কাজ করছে। বহু বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল, জেটি, রাস্তা সব তৈরি হয়েছে। সাউথ আন্দামান থেকে নর্থ আন্দামান পর্যন্ত একটি বিরাট রাস্তা তৈরি হচ্ছে Andaman Trank Road. লম্বায় প্রায় আড়াইশ' মাইল হবে। ভবিষ্যতে 'উইক-এণ্ড' করার জন্য নর্থ আন্দামান থেকে সাউথ আন্দামান পর্যন্ত যাওয়া তখন খুব সহজসাধ্য হয়ে যাবে। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, পাহাড়ের বুকের ওপর দিয়ে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে এই রাস্তা তৈরি হচ্ছে। অনেক জায়গায় জারোয়া এলাকার পাশ দিয়ে রাস্তা তৈরি করবার সময় অনেক পি ডব্লিউ ডি'র মজুররা জারোয়াদের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

সেণ্ট্রাল পি ডব্লিউ ডি থেকে ইঞ্জিনীয়াররা সকলে এখানে ডেপুটেশনে আসেন। আন্দামানে ইঞ্জিনীয়ারদের কাজকর্ম করা খুবই অসুবিধাজনক।

সমস্ত মালপত্রের জন্য মেনল্যাণ্ডের ওপর নির্ভর করতে হয়। কবে জাহাজ আসবে, কবে মালপত্র আসবে তবে কাজকর্ম হবে। তার ওপর বর্ষা নামলে তো কথাই নেই। সব বন্ধ। সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে মজুর নিয়ে। রাঁচি ও মাদ্রাজ থেকে মজুরেরা এক বছরের চুক্তিতে কাজ করতে আসে। তারা ফিরে গেলে আবার নূতন দল আসে। স্থানীয় লোকেদের মধ্যে কোন মজুর পাওয়া যায় না। এত নানারকম প্রতিবন্ধক যে, কোন ঠিকাদার এখানে কাজ করতে ভরসা পান না।

জেটির অভাবে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যাওয়ার এতদিন খুবই অসুবিধা ছিল। পি ডব্লিউ ডি'র কল্যাণে অনেক ছোট ছোট জেটি তৈরি হওয়ায় সে অসুবিধাগুলি দূর হয়েছে। বিশেষ করে দূর-দূরান্তের দ্বীপগুলির উদ্বাস্তুদের পায়ে হেঁটে নয়ত ডিঙ্গি করে মাইলের পর মাইল এসে তবে অন্য লোকালয়ে আসতে হয়েছে। জেটির অভাবে সে সব দ্বীপে ফেরীবোট যেতে পারত না। এখন জেটি হওয়ায় সপ্তাহে একদিন করে ফেরীবোট করেই সকলে পারাপার হয়। যে সব উদ্বাস্তু-কলোনীর দ্বীপে জেটি তৈরি হয়েছে তা হলো :—

(১) কদমতলা
(২) উত্তরা
(৩) শ্যামকুণ্ড
(৪) দুর্গাপুর
(৫) কালারা।

রঙ্গতের জেটিও প্রায় শেষ হয়ে এল।

মেরিন—আন্দামানের যানবাহনের মধ্যে জলযানই আসল। কলকাতা বা মাদ্রাজ থেকে আসতে হলেও জাহাজ, আর এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতে হলেও মোটরবোট। জাপানীরা চলে গেলে মেরিনে কয়েকটি ভাঙা-চোরা বাড়িঘর, কয়েকটি ছোট বোট এবং কিছু পুরোনো সাজসরঞ্জাম ছাড়া কিছুই ছিল না। এখন এখানে একটি ছোট ড্রাই ডক আছে, বেশ ভালো একটি কারখানা আছে এবং ছোট বড় অনেক বোট আছে। 'চলুঙ্গা' Cholunga নামে একটি ছোট স্টীমার Inter-Island-Fery-Service করে। রাত্রিবেলা কোন বোট চলাচল করে না, চারদিকে এত পাহাড় যে ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা আছে। যে দুইটি জাহাজ মেনল্যাণ্ড ও পোর্টব্লেয়ারের মধ্যে যাতায়াত করে, তাতে সরকারী লোক ছাড়া বেসরকারী লোকের প্যাসেজ পাওয়া দুরূহ ব্যাপার।

এগ্রিকালচার—আন্দামানের প্রধান শস্য ধান। প্রচুর ধান জন্মায় এখানে। নারকেল ও সুপুরি হয় অপর্যাপ্ত। পেনাল সেটেলমেণ্টের গোড়া থেকেই নারকেলের চাষ আরম্ভ হয়। হাজার হাজার নারকেল গাছ সরকার থেকে এখনও প্রতিবছর লাগান হয়। সরকারী Coconut Plantation ছাড়া অনেক প্রাইভেট কোম্পানীরও এখানে নারকেলের ও সুপুরির বাগান আছে। এত ধান হওয়া সত্ত্বেও আন্দামানের পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। বেশিরভাগ খাদ্যদ্রব্যের জন্য মেনল্যাণ্ডের ওপর নির্ভর করতে হয়। জাহাজ যদি কখনও আসতে দেরি করে তবে বাজারে চাল, ডাল, তেল, ঘি, আলু, পেঁয়াজ কিছুই পাওয়া যায় না। আন্দামানের জমিতে ধান ছাড়া তরি-তরকারীও প্রায় সবই জন্মায়, তবে বহু চেষ্টা করেও আলু, পেঁয়াজ জন্মানো যাচ্ছে না, শীতের তরকারীও আশানুরূপ হয় না। ফুলও খুব ভালো হয় না।

কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি—কাঠের দেশ বলে খুব সুন্দর সুন্দর কাঠের আসবাব তৈরি হয়। সমুদ্রের শঙ্খ ঝিনুক দিয়ে নানারকম সৌখীন জিনিষ তৈরি হয়। আগে শোণের ব্যবসা করে অনেকে প্রচুর রোজগার করেছেন। এখন আন্দামানের সিপি অর্থাৎ শেল-এর ব্যবসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নারকেলের ছোবড়ার পাপোষ, কার্পেট, বেতের ঝুড়ি, চেয়ার, টেবিল এ সব জিনিস খুবই সুন্দর তৈরি করে।

মেডিসিন—পোর্টব্লেয়ারে এবং অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপে বেশ ভাল সরকারী হাসপাতাল আছে। চিকিৎসার দিক দিয়ে এখানে খুব সুবিধা। ডাক্তাররা সকলেই বেশ অভিজ্ঞ এবং বেশ যত্ন নিয়ে দেখাশোনা করেন। কোন প্রাইভেট ডাক্তার এখানে নেই। সেলুলার জেলের একটা উইং-এ এতদিন হাসপাতালটি ছিল। সম্প্রতি নূতন হাসপাতাল খোলা হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'গোবিন্দবল্লভ পন্থ' হাসপাতাল। সরকারী ডাক্তাররা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন না বলে সাধারণ লোকেদের খুব অসুবিধা হয়। রোজ রোজ অসুস্থ ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া খুবই কষ্টকর। পোর্টব্লেয়ারে একটি ভাল টি-বি হাসপাতাল আছে।

এডুকেশন—পোর্টব্লেয়ারের দুইটি হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে, একটি মেয়েদের ও একটি ছেলেদের। শিক্ষার মাধ্যম হিন্দী ও

আন্দামানের নারিকেল বাগিচা

উর্দু। স্কুলগুলি সবই অবৈতনিক। প্রত্যেক দ্বীপেই হিন্দী প্রাইমারী স্কুল আছে, উদ্বাস্তু-কলোনীগুলিতে বাংলা প্রাইমারী স্কুল আছে। কিন্তু পোর্টব্লেয়ারে কোন বাংলা হাইস্কুল নেই। পঞ্চম শ্রেণীর পর বাঙালী ছেলেমেয়েদের হিন্দী পড়তে হয়। স্থানীয় বাঙালী ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগ বাংলা শেখে না। উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদেরও একই অবস্থা। আশঙ্কা হয় কুড়ি-পঁচিশ বছর পর এই ষোল হাজার পূর্ববঙ্গের বাঙালী নিজেদের ভাষা, নিজেদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভুলে যাবে, তাদের মধ্যে বাঙালীত্ব কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানকার হাইস্কুল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকলেও বাঙলা শেখার কোন বন্দোবস্ত নেই। শিক্ষকের সমস্যাও প্রবল। যদিও মেনল্যাণ্ডের থেকে অনেক বেশি বেতন দেওয়া হয় তবুও কোন ভাল কোয়ালিফাইড শিক্ষক এখানে আসতে চান না। এক বছরের বেশি হল স্থানীয় বাঙালীদের চেষ্টায় একটি বাঙলা স্কুল পোর্টব্লেয়ারে স্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষার্থে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'রবীন্দ্র বাঙলা বিদ্যালয়।' সকলে মিলে চাঁদা তুলে স্কুলের খরচ চালানো হচ্ছে। সরকারী স্কুলগুলি অবৈতনিক হওয়াতে বাঙলা স্কুলও অবৈতনিক রাখতে হয়েছে কিন্তু এরকমভাবে চাঁদা তুলে স্কুল চালানো খুবই কঠিন। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উৎসাহে বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়।

আন্দামানে পানীয় জলের বড় অভাব। যদিও চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে কিন্তু গ্রীষ্মকালে পোর্টব্লেয়ারের এমন অবস্থা হয় যে, রান্না হয় তো স্নান হয় না, স্নান হয় তো রান্না হয় না। সম্প্রতি পি ডব্লিউ ডি ডেয়ারী ফার্মের কাছে বিরাট একটি Reservoir তৈরি করেছে। আশা করা যায় এর পরে পোর্টব্লেয়ারে জলের খুব অভাব হবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী রিজারভারটির উদ্বোধন করেন এবং নামকরণ করেন 'জহর সরোবর'।

আন্দামানের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। এখানে আসতে হলে প্রথমদিকেই সকলকে যা হাঙ্গামা পোহাতে হয়, যেমন, টীকা নেওয়া ইনজেকসন নেওয়া ইত্যাদি তারই ফলে ছোঁয়াচে রোগ এখানে প্রবেশ করতে পারে না।

সম্প্রতি পোর্টব্লেয়ারে All India Radio-র উদ্বোধন হল এবং আধুনিকতার দিকে আন্দামান আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

উদ্বোধন উপলক্ষে বিরাট আয়োজন। সহরের গণ্যমান্য অতিথিদের নিমন্ত্রণ হয়েছে। রেডিও স্টেশনে জায়গা কম থাকায়, বাঙালীদের ক্লাব অতুল স্মৃতি সমিতিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। সমস্ত অনুষ্ঠানটি টেপ রেকর্ডিং করে রেডিও স্টেশন থেকে রীলে করা হবে।

সাড়ে ছয়টার সময় উৎসবের সুরু হল। উদ্বোধন সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম'-এর পর স্টেশন ডাইরেক্টর এবং চীফ কমিশনার ভাষণ দেন। তাঁদের ভাষণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল টিনের চালের ওপর বৃষ্টির চড়চড় শব্দ ও বাতাসের আছাড়ি-পিছাড়ি। ভাগ্য ভালো—ভাষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি ধরে এল। অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে বাংলা, হিন্দী, তামিল, মালয়ালীজ ভাষায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ছিল। বাংলায় 'আমাদের যাত্রা হল সুরু' দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। শেষ হল কবি শ্রীবেসারিয়ার আন্দামানের ওপর লেখা একটি গান দিয়ে:

'কালে কালে বাদল, নীলা হ্যায় জলধি জল,
যাদুয়ালা টাপুও কি হাওয়া বড়ি চঞ্চল।
ধূপ হ্যায় স্বর্ণাহারি, চাঁদনী রূপাহারি
ভোর হ্যায় আঙ্গুরি, শাম হ্যায় সিন্দুরি
খাড়ি খাড়ি নাচাত হ্যায় নারিয়েলকি জঙ্গল।'

পোর্টব্লেয়ারে এলে এখানে নানান দেশের লোক, নানান দেশের ভাষা, নানান দেশের সংস্কৃতি দেখে মনে হয় এও ছোটখাট একটি ভারতবর্ষ। জনপ্রিয় holiday resort বানাবার জন্য, টুরিস্টদের সুবিধার জন্য আন্দামান সরকার প্রভূত চেষ্টা করছেন। ভারতবর্ষের লোকদের অবশ্য মনে হবে, অতদূরে অজানা দেশে কে যায়? তার চেয়ে ধারে কাছেই তো কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। আন্দামান যে কত সুন্দর, তা এখানে না এলে কেউ বুঝতে পারবেন না। কবিত্ব করে বলতে ইচ্ছা করে—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ শঙ্খের বলয় পরে, প্রবালের মালা গলায় দিয়ে, সবুজ বসনাঞ্চল ছড়িয়ে তার অফুরন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার খুলে বসে আছে কিন্তু তার সে সৌন্দর্যে সাড়া দেয় কয় জন? যে সুদূরে সমুদ্রের কোলে সে বসে আছে, সেখানে পৌঁছান সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন সবুজের সমারোহ, এমন সুনীল সবুজের নিবিড়, মিলন, এমন চির সবুজের দেশ ভারতবর্ষে আর কোথায় আছে কি না জানি না। ঋতুর পরিবর্তন হয়, গাছের পাতা বিবর্ণ হয়, তারপর ঝরে পড়ে। এখানে তা টেরও পাওয়া যায় না। গাছে পুরোণো পাতা থাকতে থাকতেই নূতন পাতা গজিয়ে ওঠে। পৃথিবীর evergreen forest-এর মধ্যে নাকি আন্দামানের নামও পড়ে। দূরত্ব যদিও অনেক বেশি, যাতায়াতের খরচও অত্যধিক, তবুও আশা করি নূতনের আশায় অদূর ভবিষ্যতে অনেকে ছুটির সময় পুরী, দার্জিলিং-এর দিকে না গিয়ে আন্দামানের দিকে পাড়ি দেবেন। এমন সবুজ দ্বীপ দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যাবেন। সবুজ, সবুজ, চির-সবুজের দেশ এই Happy Island, —আন্দামান।

সমাপ্ত

জাগ্রত আমি

কৃষ্ণা ঘোষ

চেয়েছো অবাধে দিই নি কিছুই এমন নয়,
দিয়েছি স্পর্শ পেয়েছি হারিয়ে অন্ধকার।
সেই ভালো আমি যদিও জেনেছি দুঃসময়
চক্রবৎ যা প্রথম প্রহরে আমারই মন।

আঁধারে তখনও অনুভূত, তবু স্পর্শ কার
ক্রমশ মাটিতে, বীজ থেকে শুভ উত্তরণ।
নতুন জীবনে সেই মতো সে তো কেন্দ্রানুগ,
শেষ থেকে শুরু প্রথম প্রহরে চক্রবৎ
জাগ্রত আমি; কালপুরুষের আরেক যুগ।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

কিংশুকরাগিনী

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

১৯

মান যে বেড়েছে তা দীনু দত্ত জানলেন মুকুন্দপুরে গিয়ে।

মুকুন্দপুরে কুঞ্জ রাহারও সেদিন মিটিং করার কথা ছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণবশত তা হল না। ফলে দীনু দত্তর সভায় আশাতীত লোক সমাগম হল। সভায় প্রথমে বক্তৃতা দিলেন স্থানীয় কয়েকজন বক্তা তারপর উঠল মানব পাল। হাতের আস্তিন গোটাতে গোটাতে জনতাকে সম্বোধন করে বললে—বন্ধুগণ, আপনারা জানেন আজ পাশেই আরও একটা সভা হবার কথা ছিল। কিন্তু কর্মকর্তারা সে সভা আজ করলেন না, অনিবার্য কারণ দেখিয়ে সে সভা বন্ধ রাখলেন। কিন্তু কি অনিবার্য কারণ তা আপনারা জানেন কি? বলে কোমরে হাত দিয়ে উত্তরটা শোনবার জন্যে থেমে গেল।

জনতার মধ্যে দীনু দত্তর লোক ইতস্তত ছড়ান ছিল, তারা জবাব দিলে—না, না, কারণ জানি না।

মানব বললে, জানবেন কি করে? তবে শুনুন।—বলে সকালবেলা কুঞ্জ রাহা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নিজের একমাত্র মেয়ের কি সর্বনাশটা করতে যাচ্ছিলেন তা ফলাও করে সকলকে শুনিয়ে বললে—বন্ধুগণ, আমাদের অনেকেরই ঘরে শিক্ষিতা অনূঢ়া কন্যা আছে অর্থাভাবে যাদের বিয়ে আমরা দিতে পারছি না। কিন্তু তাই বলে এইভাবে তাদের সর্বনাশ করার কথা স্বপ্নেও আমাদের মনে আসে কি?

সভার ভেতর থেকে ধ্বনি উঠল—না, না, না।

অথচ আজ এমন একটা জঘন্য লোকের সাক্ষাৎ মিলল, যে এম এল এ হবার জন্যে বংশের মর্যাদা, কন্যার সম্মান, তার ভবিষ্যৎ সব কিছুই ধূলোয় মিশিয়ে দিতে যাচ্ছিল। এম এল এ হবার জন্যে যে লোক এত নীচে নামতে পারে মন্ত্রী হবার সুযোগ পেলে সে কি চোরাকারবারী, সমাজবিরোধীদের সঙ্গে হাত মেলাবে না?

—মেলাবে, মেলাবে, মেলাবে।

—তবে? আপনারা কি এই রকম লোককে এ জেলা থেকে এম এল এ করে পাঠাতে চান?

—না কখনই না।

—তবে কাকে পাঠাবেন? কাকে আপনারা ভোট দেবেন?

—দীনু দত্তকে, দীনু দত্তকে।

—কেন দীনুবাবুকে ভোট দেবেন?

—কারণ আছে, কারণ আছে।

—কি কারণ?

—আপনি বলুন, আপনি বলুন।

—তবে শুনুন। চুল দাড়ি কাটলেই মানুষ ছোট হয়ে যায় না, কারণ কোন কাজই ছোট নয় কোন মানুষই নীচ নয়। তাই বলে সব মানুষই সমান নয় তার মধ্যে স্তর আছে তর-তম আছে। মানুষ তার শিক্ষা, দীক্ষা ও রুচি অনুসারে এক এক শ্রেণীর হয়। রাস্তায় বসে যে লোকটা জুতো সারাচ্ছে, চলতি কথায় তাকে আমরা বলি মুচি, সে যদি স্বজাতি হয় তবুও তার সঙ্গে নিজের ঘরের মেয়ের বিয়ে দিতে আমরা হামলে পড়ি না, কিন্তু সেই লোক যদি বিদেশ থেকে ট্যানিং-এ ডিগ্রি নিয়ে জুতো তৈরি বা সারাবার কারখানা খোলে তখন কি হবে—?

উত্তর এল—হামলে পড়বো, হামলে পড়বো।

—ঠিক, হামলে পড়বো। কেন না সে তখন আমার সমান হয়েছে। তেমনি কুঞ্জ রাহা যার হাতে মেয়েকে সঁপে দিচ্ছিলেন তার যদি চুল দাড়ি ছাঁটা বিষয়ে বিদেশী 'এম সি' বা 'মাস্টার ক্লিপার' ডিগ্রী থাকতো তা হলে আমাদের বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু সে লোকটা অত্যন্ত সাধারণ একজন নাপিত। অথচ আপনারা জানেন কুঞ্জ রাহার মেয়ে মেম সাহেবদের স্কুলে লেখাপড়া শিখছে, সুন্দরী, আপনারা কি বলতে চান যে রাহা মশায়ের কন্যার ঐ নাপিতের চেয়ে ভাল পাত্র জুটতো না?

সভার এককোণ থেকে জবাব এল—কেন আপনিই তো হাতের গোড়ায় ছিলেন। এই কথায় সভায় কিছুটা হট্টগোলের সৃষ্টি হল। যেদিক থেকে কথাটা শোনা গিয়েছিল মানবের চেলারা সেইদিকে গেল। নিরীহ কয়েকজন লোকের ওপর চোটপাট হল বটে, কিন্তু আসল আসামী ধরা পড়ল না।

মানব পাল বলতে লাগল—বন্ধুগণ, সাধারণ মানুষ হিসেবে দীনুবাবুর করবার কিছুই ছিল না বাপ তার মেয়েকে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে কি বলি দিচ্ছে এমন তো রোজ হয় আমরা দেখেও দেখি না। কি দরকার পরের ব্যাপারে নাক গলাবার? প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দীনুবাবুর বরং এতে মজা দেখাই উচিত ছিল, সাধারণ মানুষ হলে তিনি তাই করতেন। কিন্তু বন্ধুগণ, দীনু দত্ত এই জেলার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। তিনি শুধু বড়লোকই নন বড়মানুষও বটেন। ক্রোধান্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁকেই জব্দ করবার জন্যে নিজের একমাত্র কন্যার সর্বনাশ করতে যাচ্ছে দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সেই মেয়েকে তিনি উদ্ধার করলেন এবং তাঁকে পুত্রবধূ করে নিজের সংসারে গ্রহণ করলেন। ক'টা লোক এ-কাজ করে, ক'টা লোক এ-কাজ পারে?

আবার সভার ভেতর থেকে জবাব এল—কেউ পারে না, কেউ পারে না।

মানব পাল গর্জে উঠল—কেউ পারে না নয়, অন্তত একজন যে পেরেছেন তা তো আমরা দেখলামই, তবে ও কথা বলছেন কেন? বলুন, কোটিতে একজন পারে।

—কোটিতে একজন পারে, কোটিতে একজন পারে।—সভা থেকে জবাব এল।

মানব খুশি হয়ে বললে—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আপনারা। কিন্তু আমরা কানাঘুষোয় শুনেছি দীনুবাবুর বিরুদ্ধে মেয়ে ফোসলানোর মামলা আনবার তোড়জোড় চলছে।

কথাটা শুনে দীনু দত্ত ভয় পেলেন। মানবের সার্ট ধরে টান মেরে তাকে থামিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু মানব থামবার পাত্র নয়। বলতে লাগল—এ কথাটা বলি এটা দীনুবাবু চাইছেন না। তিনি বলতে চাইছেন যে যাই হোক তিনি মাথা পেতে নেবেন। কোনও রকম পুরস্কারের আশায় তিনি এ কাজ করেন নি মানুষ হিসেবে মানুষের কর্তব্য করেছেন মাত্র। কাজেই মামলার কথা না তোলাই ভাল। আমি বলি, না, দীনুবাবু যেমন তাঁর কর্তব্য করেছেন তেমনি আমাদেরও কর্তব্য আছে। যদি নারীত্রাতা পরার্থে উৎসর্গপ্রাণ এই মহান ব্যক্তিকে ফুসলানোর দায়ে আদালত প্রাঙ্গণে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে আমরা কি করব?

গগনভেদী ধ্বনি উঠল—হরতাল, সর্বাত্মক হরতাল।

—ঠিক। সর্বাত্মক হরতাল। তবে সে পরের কথা। মামলা হলে তবেই হরতাল। এখন কথা হচ্ছে আমাদের ভাগ্যক্রমে যখন আমরা এমন একজন মহামানবকে আমাদের জেলার প্রতিনিধি করে পাঠাবার সুযোগ পেয়েছি তখন সে সুযোগ যেন আমরা আর পাঁচজনের কথায় না হারাই। সুতরাং আমাদের আর কোনও দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকা উচিত নয়। দীনুবাবু ও তাঁর গরু মার্কা বাক্স ছাড়া আর কোনও কিছু যেন আমাদের চোখের সামনে না ভাসে, মনের কোণে ঠাঁই না পায়। আসুন, এই সভায় আমরা দীনুবাবুকে কথা দিই যে, তাঁকেই আমরা ভোট দেব। ভোট ফর—।

—দীনু দত্ত।—সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন, এমন কি দীনুবাবু নিজেও।

—এই তো চাই। এবার বলুন, নারীত্রাতা দীনু দত্ত—।

—জিন্দাবাদ।

আগে শীতকাল বলে সাতটা না বাজতে বাজতেই হেমেন ডাক্তার, হেড পণ্ডিত-মশাই, গুঁই চাটুজ্যে, বিছে উকীল ইত্যাদি মহা মহারথীরা উঠি-উঠি করতেন এবং সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই শিবির ত্যাগ করতেন। কিন্তু সেদিন সাড়ে আটটা বাজলেও কেউ ওঠবার নাম করলেন না বরং অবস্থা দেখে কেউ যে সেদিন উঠবেন এমনটিও মনে হল না।

অবস্থা শোচনীয়। দুপুর থেকেই দীনু দত্তর সতীলক্ষ্মী স্ত্রীর কথা সহরের লোকের মুখে-মুখে ফিরছে। লোকে ধন্য ধন্য করছে, হ্যাঁ স্ত্রীলোক বটেন—সাক্ষাৎ দেবী। এমন দেবীর পতি দানব হতে পারেন না, অতএব দীনু দত্ত সাক্ষাৎ দেবতা। 'অ্যাডাল্ট ফ্রানচাইস' এর কল্যাণে অনেক ভুষিমাল ভোটার হলেও দেবতা ফেলে দানব বা মানবকে ভোট দেবে এমন ষাঁড় এই ধর্মপ্রাণ দেশে বড় একটা নেই। সুতরাং কুঞ্জ রাহার অবস্থা কি হবে তা না বললেও চলে। ফলে, যাঁর জন্যে রাহামশায়ের এই হাল হল সেই বিছে উকীলের ওপর সবার আক্রোশ দুপুর থেকে বার বার হুল ফুটিয়ে চলেছে।

বিছে উকীল নিঃশব্দে অনেকক্ষণ বাক্যবাণ হজম করলেন, কিন্তু বার বার একই কথা শুনতে শুনতে শেষে অতিষ্ঠ হয়ে বললেন—এখন তো সবাই আমায় দুষছেন, তখন দেখে বার বার বলছিলেন, উকীলবাবু একটা ব্যবস্থা করুন,—উকীলবাবু একটা ব্যবস্থা করুন। তাই তো আমি—

গুঁই চাটুজ্যে উত্তেজিত হয়ে বললেন, কে বলছিল? আপনারা বলে বেড়াজালে সবাইকে জড়ালে চলবে না, নাম করুন।

—আপনি, ডাক্তারবাবু।

—আমি!—গুঁই চাটুজ্যের আর বাক্‌স্ফূর্তি হল না।

হেমেন ডাক্তার গরম হয়ে বললেন, আমি আপনাকে বলেছি যে ও বিয়ে কাঁচিয়ে দিন? শুনুন কুঞ্জবাবু।—

—কুঞ্জবাবু শুনবেন কি? মটরে করে কলকাতায় পালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন নি? তাতে কি বিয়ে পাকা হ'ত?—বিছে উকীল রীতিমত গলা চড়িয়ে বললেন—চুপ করে কেন? আমিই বরং তখন আইন তুলে বলেছিলুম যে আইনত এ বিয়ে বন্ধ করবার আমাদের কোনও অধিকার নেই, চাটুজ্যেমশাই তখন তো শকুন বানিয়ে গো-ভাগাড় দেখিয়ে ছেড়ে ছিলেন।

কি? গুঁই চাটুজ্যে মশাই জবাব দিতে যাচ্ছিলেন তার আগেই হেড পণ্ডিতমশাই বললেন—থাক্ গে পুরোন কাসুন্দী ঘেঁটে লাভ নেই। এখন এক কাজ করুন কুঞ্জবাবু অখিলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিন। এ বিয়ে বলতে গেলে বিয়েই নয়। কোথাকার কে এসে ঘরের মেয়েকে টেনে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে সিঁদুর পরিয়ে দেবে অমনি তাই যদি মেনে নিতে হয় তা হলে সমাজ থাকে না। আজ যদি চাটুজ্যেমশাই আমার পরিবারকে টেনে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে সিঁদুর পরিয়ে বলেন যে এ আজ থেকে, আহা চটবেন না চাটুজ্যেমশাই ওটা আমি কথার কথা বললুম।

—চটি নি পণ্ডিত। ওটা যে উপমা দিচ্ছ তা বোঝবার মত ক্ষমতা তোমাদের চাটুজ্যে মশায়ের আছে। কালিদাস কিছু কিছু এককালে পড়েছি।...তাই কর কুঞ্জবাবাজী তাই কর। আমিও ঐ কথাটাই ভাবছিলুম, তা পণ্ডিত আগেই বললে। তাই কর। আমি ব্রাহ্মণ তোমার গুরুজন, আমি বলছি এতে তোমার কোনও পাপ হবে না।

কুঞ্জ রাহা হাত জোড় করে বললেন; তা হয় না গুঁইকাকা, মায়ের সামনে মেয়ে যখন একজনকে গ্রহণ করেছে তখন অন্য লোকের সঙ্গে আর তার বে' দিতে পারব না। আমার একমাত্র মেয়ে তাকে ত্যাগ করতে হবে, সমস্ত সম্পত্তি পাবলিককে দান করতে হবে, তা হোক, তবুও মায়ের সামনে সে যাকে গ্রহণ করেছে তাকে নাকচ করতে পারব না। মা-র ইচ্ছেই বোধ হয় এটা। আমি কে? ভাবছি আমার যদি আজ আরও গোটা কয়েক মেয়ে থাকতো তা হলে তাদের একটাকে অখিলের সঙ্গে।—উঃ! ভগবান সে পথও মেরে রেখেছেন।

—তা কি আর জানি না বাবাজী, সবই জানি। মায়ের কত বড়
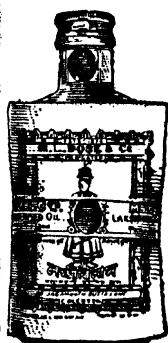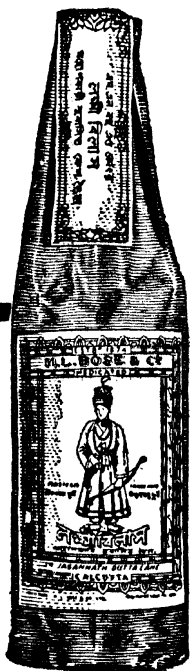
চুল সম্বন্ধে
কি খুব
চিন্তিত?

ভক্ত তুমি। কিন্তু পোড়া মন মানে না তাই এটা-সেটা পাঁচ রকম বলি। আজ বাদে কাল ভোট, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ হয়েছে সব বরবাদ হয়ে গেল। মনের জোর আছে বলেই এখনো সিধে হয়ে বসে আছ আমি হলে টাল খেয়ে পড়তুম—গুঁই চাটুজ্যে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন।

এটা চাটুজ্যে মশাই ঠিকই বলেছিলেন। ভেতরে ভেতরে রাহা মশাই সত্যিই টাল খেয়েছেন। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে যে কাজ করতে যাচ্ছিলেন ঠাণ্ডা মাথায় তার পরিণামের ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠলে তিনি শিউরে উঠেছিলেন। এই চরম সর্বনাশের হাত থেকে যিনি তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন সেই বৌ-ঠাকরুণের উদ্দেশ্যে মাথাটা তাঁর বার বার নুয়ে পড়ছিল। বৌ-ঠাকরুণ শুধু তাঁকে বিপদ থেকেই উদ্ধার করেন নি যা তাঁর মনে মনে বাসনা ছিল অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে যে বাসনা আজ বলে নয় ভবিষ্যতেও পূর্ণ হ'ত কি না সন্দেহ—সেই মনোবাঞ্ছাও অযাচিতভাবে পূর্ণ করেছেন। ইচ্ছে করছিল ছুটে গিয়ে বৌ-ঠাকরুণের পায়ের ধুলো নিয়ে আসেন, কিন্তু সাঙ্গোপাঙ্গরা তা হলে টিট্‌কারী দিয়ে ধুলধাপ্পি উড়িয়ে দেবে এই ভয়ে সে কাজটা করতে পারছিলেন না। মনে মনে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে রাহা মশায় বললেন, বৌঠান আমায় তুমি ছোট ভাই-এর মত স্নেহ কর, ভালবাস তা' জানতুম, কিন্তু সেটা যে এত গভীর তা' জানা ছিল না। ছেলের বৌ করে কেবল রাগিণীকেই নয় আমাকে আমার চোদ্দপুরুষকে···নাঃ···অতটা বলা ঠিক হবে না, আমি অবধি বলাই ভাল, মেরে কেটে না হয় আর এক পুরুষ···থাক্ গে ও কথা না তোলাই ভাল। হ্যাঁ···আমার গিনী তোমার ছেলে শুকদেবের··· মেজাজটা আবার খিঁচড়ে গেল। ছেলে হিসেবে শুকদেব অবশ্য মন্দ নয় কিন্তু শুধু তো মায়ের ছেলেই নয়, বাপেরও। আর বাপের বেটা ও সিপাহীর ঘোড়া উভয়েই থোরা থোরা গুণ ইন্‌হেরিট্ করে। কাজেই দীনু দত্তের নষ্টামির কিছুটা শুকদেবের মধ্যেও থাকবে। কুঞ্জ রাহা চিন্তিত হলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বার করলেন যে মাটি যেখানকারই হোক ছাঁচ যদি ভাল হয়, মালও তা হলে ভাল হবে। রাহামশাই আরও কিছু চিন্তা করে বার করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় কাদা ঘোষাল এল।

কাদার প্যান্ট ধুলো মাখা, কোমরে র‍্যাপার জড়ান, সার্ট-এর জায়গায় জায়গায় পানের পিক, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দু'টো আধখোলা অত শীতের মধ্যেও কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম।

হেড পণ্ডিতমশাই কোনও কথা না বলে নাকে চাদর দিলেন। গুঁই চাটুজ্যে মনে মনে বললেন, গুয়োটা টেনেছে দেখছি।

হেমেন ডাক্তারও মনে মনে বললেন—নুইসেন্স।

বিচ্ছে উকীল জিজ্ঞেস করলেন—এত দেরি যে। আর সব কোথায়?

কাদা কোনও জবাব না দিয়ে ফরাসের একপাশে ধপ্ করে শুয়ে পড়ে হাঁফাতে লাগল। হেমেন ডাক্তার বললেন—কি হে উকীলবাবুর কথার জবাব দিলে না যে।

কুঞ্জ রাহা বললেন—দিচ্ছে দিচ্ছে, দেখছেন না কেমন হাঁফাচ্ছে একটু বিশ্রাম করুক।

কাদা অতি কষ্টে উঠে বসে বললে—বলুন তো স্যর। ডাক্তারবাবু যেন সব সময় তাঁর বেতো ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে বসে আছেন। জ্বালা জ্বালা। বলুন স্যর উকীলবাবু কি বলছিলেন।

হেড পণ্ডিতমশাই বললেন—বল দেখি কি খবর, সেই তখন থেকে হা-পিত্যেস করে সব বসে আছি। বল, কা চ বার্তা।

কাদা বুড়ো আঙুল নেড়ে বললে—বারত্তা আপনার কাঁচকলা।

কুঞ্জ রাহা বললেন—এত দেরি যে! আর দু'জন কোথায়! কার্তিক, গজেন—

—জোশীদা মুকসুদপুরেই রয়ে গেল, কেতো আর বিষ্টু ড্রাইভার গাড়িতেই ঘুমুচ্ছে। কেতো তবু কিছুক্ষণ আগে অবধি জেগেছিল, কিন্তু বিষ্টুর কথা আর বলবেন না। শম্ভু শুঁড়ির দোকান ছাড়তে না ছাড়তেই ঢুলতে আরম্ভ করলে, গাড়ি চালাবে কি। আমি তো স্যর ভয়েই মরি, গাছের সঙ্গেই ভিড়িয়ে দেয় কি খানায় নামিয়ে দেয় কে জানে। কোনও রকমে ফষ্টিনষ্টি করে শালাকে জাগিয়ে গাড়ি নিয়ে এসে পৌঁছেচি।

গুঁই চাটুজ্যে বললেন—মুকসুদপুরের মিটিং-এ ছিলি?

—ছিলুম না মানে? তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলুম?

—ছিলি তো সেই কথা বল না। সেই কথার জন্যে সব বসে আছে, আর ও নিয়ে এল ফষ্টিনষ্টির কথা। এত দেরি হল কেন, তাই বল না।

কাদা আবার ফরাসে শুয়ে পড়ে বললে—সেকথা জিজ্ঞেস করে আর লজ্জা দিও না দাদু।—বলে কুঞ্জ রাহাকে হাতজোড় করে বললে—সে বড় লজ্জার কথা স্যর শুধোবেন না।···আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

কুঞ্জ রাহা দেখলেন এর মতে মত দেওয়াই ভাল, বললেন—বেশ তো, ঘুম পাচ্ছে ঘুমোও। গুঁইকাকা ওকে আর বিরক্ত করে কাজ নেই। ও ঘুমোক।

কাদা আস্তে আস্তে উঠে বসে বললে—না স্যর, বিরক্ত আর কি। ঘুমটুম পরে হবে'খন। দেরি হল কেন বলছেন? সবে ডাকবাংলোর মাঠ ছাড়িয়েছি, অমনি গাড়ির বারোটা বেজে গেল। আমি আর কেতো মিলে ঠেলছি তো ঠেলছি, গাড়ি শালার আর তাত্‌বার নামটি নেই। বিষ্টু বললে, চ' শালাকে ফেলে রেখে হেঁটে মেরে দি, কাল সকালে এসে নিয়ে যাব।—তারপর হেসে বললে—আপনার ভূতের ভয় আছে কি না জানি না স্যর কিন্তু আপনার গাড়ির বোধ হয় ভূতের ভয় আছে, ফাঁকা মাঠে পড়ে থাকবার ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে গর গর করে উঠল। বেশ চলতে লাগল কিন্তু কপালে লিখিতং গেরো কোন শালা কি করিষ্যতি। আবার দ্রুম আওয়াজ, টায়ার গেল, গাড়ি কেৎরে খেয়ে পড়ল, তবে বাঁচোয়া কাছেই শম্ভু শুঁড়ির দোকান, লোকে গিজ গিজ করছে। দু'বেটাকে মাল খাওবার লোভ দেখিয়ে বিষ্টুর সঙ্গে লাগিয়ে দিলুম, ওরা টায়ার ঠিক করতে লাগল। আমি আর কেতো দোকানে ঢুকে মুখে দানাপানি দিয়ে চাঙ্গা হলুম, মেহনতটা তো স্যর কম হয় নি। তারপর আবার অখিলের দোকানে এসে গাঁজালুম, তা তাতেও ঘণ্টাখানেক গেল। এখন আপনিই বলুন দেরি হবে কি না।

কুঞ্জ রাহা মনে মনে চটে গেলেও মুখে বললেন—তা তো বটেই। হ্যাঁ ভাল কথা গজেন মুকসুদপুরে রয়ে গেল কেন সে কথা তো বললে না।

কাদা বিরসবদনে বললে—জোশীদা একবার শেষ চেষ্টা করবে

[illegible] যদি লোকজন জুটিয়ে কাল একটা মিটিং করা যায়। [illegible]পুরে যা হয়েছে তা বলবার নয়।

কুঞ্জ রাহা বললেন—কি হয়েছে?

—আপনার ছাদ্দ হয়ে গেছে।

এই কথায় সকলে সিধে হয়ে বসলেন যেন শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেতে বসেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বসে থেকে সকলের মেজাজই আবার গরম হল। কারণ, পরিবেশনকারী কথাটা বলেই সেই যে আবার শুলেন আর সহজে যে উঠবেন এটা মনে হল না।

কুঞ্জ রাহা এবার কড়া স্বরে বললেন—কাদা, উঠে বল কি হয়েছে।

কাজ হল। কাদা উঠতে উঠতে বললে—বলছি স্যর, কি বলব আর ন্যাজামুড়ো ভেবে ঠিক করবার জন্যেই গড়িয়ে নিচ্ছিলুম।

যতটা সম্ভব বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে কাদা বললে—মানব পালের হুড়ড হিং হয়েছে। শালা বলে কি না কুঞ্জ রাহা জঘন্য লোক, মেয়ের সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল, নাপ্‌তের সঙ্গে বে দিতে যাচ্ছিল। বেশ করছিল, তাতে তোর বাবার কি রে। এই বলে দিলুম স্যর, শালাকে ঠিক ছোবল মারব।

কুঞ্জ রাহা রাগে ফুলতে ফুলতে বললেন—আর কি বললে?

কাদা যতটা সম্ভব বিস্ফারিত চোখে বললে—বলবার আর কি বাকি রইল স্যর, শুধু বাপ তোলে নি। ও হ্যাঁ, তারপর বললে, দীনু দত্ত দেবতা, অনেক ঝুঁকি নিয়ে পরের মেয়েকে বাঁচিয়ে নিজের ছেলের বৌ করেছে। কত বড় হারামী দেখুন স্যর, একবারও বললে না যে, বাপ-বেটা মিলে অনেক দিন থেকেই তালে ছিল কি করে মেয়েকে হাত করে স্যরের সম্পত্তি বাগানো যায়।

—হুঁ। তারপর, আর কি বললে?

—আর কি বলবে ঘোড়ার ডিম। সবাইকে বলে দিলে মহামানব দীনু দত্তকে ভোট দিতে। একদিন যেন দীনু দত্ত আর গরু এ দু'টো কথা সবাই জপ করে। আর হ্যাঁ···এ শালার মাথায় কিছুই নেই। আর একটু হলে ভুলেই মেরে দিতুম। মানব পাল বললে যে, তারা নাকি কানাঘুষোয় শুনেছে দীনু দত্তের নামে স্যর মেয়ে ফুসলোনোর মামলা আনবে। শুনে সব শালা তেড়িয়া-মেড়িয়া হয়ে এই মারে তো সেই মারে,—বলে স্বর নামিয়ে বললে—আর স্যর, এইখানে আপনার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করেছে।

সবাই বললে মামলা হলে সব্বনেশে হরতাল হবে। শেষকালে সবাই মিলে গলা ফাটিয়ে বললে, নারীতাতা দীনু দত্ত জিন্দাবাদ। জোশীদা' বললে—

হেডপণ্ডিত মশাই বাধা দিয়ে বললেন—নারীতাতা নয়—নারীত্রাতা।

—তা হবে। জোশীদা' বললে, কাদা তোরা ফোটে গিয়ে খবর দে, আমি রাতটা থেকে দেখি কাল মিটিং-ফিটিং করা যায় কি না। কি বলব রাস্তা দিয়ে আসছি শুনি লোকে চেল্লাতে চেল্লাতে বাড়ি যাচ্ছে, নারী—পণ্ডিত মশাই যা বললে তাই, দীনু দত্ত জিন্দাবাদ।

কুঞ্জ রাহা ফরাসের ওপর ঘুঁষি মেরে বললেন—নারীত্রাতা! দেখাচ্ছি মজা। মানব পালের কথাই ফলিয়ে দেবো। বিচ্ছেবাবু কালই মামলা দায়ের করুন, দীনু দত্ত আমার মেয়েকে ফুসলে বার করেছে। বেটাকে ঘানি টানিয়ে ছাড়বো। বড় অখিলকে দিয়ে ডায়েরী করিয়ে নাজেহাল করেছিল, এবার দেখাব মজা।

বিচ্ছে উকীল মাথা চুলকে বললেন—মামলা কি করে হবে? মেয়ে তো আপনার ঘরেই আছে।

গুঁই চাটুজ্যে বললেন—আপনি তো মশাই আচ্ছা উকীল। উকীলরা হাওয়ার সঙ্গে মামলা করে, আর আপনি এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল তবু বলছেন কি না মামলা কি করে হবে?

—না—মানে মেয়ে যদি দত্তদের বাড়িতে থাকতো তা হলেও কথা ছিল। তা ছাড়া বৌদি নিজেই মেয়েকে ও বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর দাঁড়িয়ে থেকে মায়ের মন্দিরে—মানে—ঠিক বিয়ে নয়, ঐ আর কি, তাই দিয়েছেন—।

কুঞ্জ রাহা বললেন—গুঁইকাকা আমি আবার মেয়ের বে' দেবো।

—আলবাৎ দেবে। কেন দেবে না শুনি—এবার চাটুজ্যে মশাই ফরাসে ঘুঁষি মারলেন।

হেমেন ডাক্তার বললেন—মেয়ে রাজী হবে তো।

কাদা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—ফুঃ! মেয়ের বাপ রাজী হয়ে বসে আছে, আর মেয়ে রাজী হবে না। কিন্তু স্যর পাত্তরটি কে?

—অখিল।

কাদা মাথা নেড়ে বললে—ওর বাপ রাজী হতে পারে কিন্তু ও রাজী হবে না।

—হবে না কেন?

—ঐ যে বললুম স্যর আসবার পথে অখিলের দোকানে গেঁজিয়ে এসেছি তাতেই বুঝলুম ও রাজী হবে না। এ আমাদের জোশীদা' পেঁয়াজী নয়। মিটিং শুনছে, সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান আঁটছে। আমায় বললে, যাবার সময় নাপ্‌তে শালাকে আবার বিয়ের টোপ ফেলে দেখিস্ তো। শুনে আমার তো চোখ ট্যারা, বললুম—বল কি জোশীদা'! বললে—যা বলছি কর না। ঐ অখিলের সঙ্গে রাগিণীর বে' দিলে তবেই দীনু দত্ত টিট্ হবে। তুই গিয়ে কুঞ্জবাবুকে মিটিং-এর খবর দে' তাহলেই দেখবি সব শুনে বলবে মেয়ের আবার বে' দেব।

হেমেন ডাক্তার গদগদ কণ্ঠে বললেন—নিজের ভাই বলে বলছি না, গজুর মত বুদ্ধি সারা বাংলা দেশে খুব কম ছেলেরই আছে। তোমার আগে থেকেই বলে দিলে যে অখিলকে আবার টোপ ফেলে দেখ কাদা। কি বুদ্ধি দেখেছ!

—না জোশীদা'র বুদ্ধি হবে না, আপনার হবে। কাদা খিঁচিয়ে উঠল, তারপর নরম সুরে কুঞ্জ রাহাকে বললে—অনেক করে বললুম স্যর, কিন্তু নাপ্‌তে শালাকে পটানো গেল না। বললে, অখিল নাপিত হতে পারে কিন্তু তার ইজ্জৎ আছে। সে এঁটো পাতে ভাত খায় না। মানেটা বুঝুন স্যর, ঐ যে মা কালীর সামনে বলেছে যে, আমি দীনু দত্তর ব্যাটাকে···ঐতেই শালা ধরে নিলে এঁটো পাত। কথাটা শুনে আমারও মেজাজ বিগড়ে গেল, মেরেই দিতুম, কিন্তু শালা ক্ষুর নিয়ে তেড়ে এল তাই পালিয়ে আসতে হল। সময়টা খারাপ যাচ্ছে আমাদের, তাই আর কিছু বললুম না, ভোটটা কাটুক, ঠিক ছোবল মারব শালাকে।

কুঞ্জ রাহা কয়েক সেকেণ্ড ভাবলেন—তারপর বললেন—ঠিক আছে। বিচ্ছেবাবু, আপনার বৌদিকে বাড়ি গিয়ে বলবেন, আমি রাজী

াছি। কালই আমি নিজে—না কাল নয় এখনই চলুন আপনার দার কাছে যাই। হাঁ করে রইলেন কি, আপনার ভাইপোর সঙ্গে ানীর বে' দেব।

বিছে উকীল আমতা-আমতা করে বললেন—হলে মন্দ হ'ত না। ন্তু···

—কিন্তু কি?

—প্রফেসর মণ্ডলের মেয়ে বীথির সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

হেমেন ডাক্তার বললেন—ওরা তো খৃস্টান।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দাদা আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ধোপে টেকে নি। াদির মেয়ে পছন্দ হয়েছে। তা ছাড়া প্রফেসারের হাতে পয়সা-কড়ি ছে আর আমার ভাইপো বাবাজীরও—।

গুঁই চাটুজ্যে বললেন—হিঁদু হয়ে শেষকালে খৃস্টান মেয়ে ঘরে নিবেন? জাত জন্ম আর রইলো না দেখছি।

কাদা ঘোষাল বললে—যা বাবা! এ যে সেই নল-দমন্তী প্রে া। পোড়া শোলমাছও জলে গেল। সব বরই একে একে কেটে চ্ছে। শেষকালে দেখছি আমাকেই না বরের পিঁড়িতে বসতে হয়।

কথাটা শুনেই কুঞ্জ রাহা একদৃষ্টিতে কাদাকে দেখতে লাগলেন। কাদা সেটা লক্ষ্য করে বললে—দোহাই স্যর, কথাটা বললুম বলে মাকে যেন বকে বসবেন না, তা হলে আম্মোও কিন্তু কেটে পড়ব। াব ছেড়ে দিন। যা হবার হয়ে গেছে। এখন মেয়েকে ও বাড়িতে ত দেবেন না আর ছোঁড়াটাকেও এ বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। ুক দু'জনে দু'দিকে লায়লা-মজনুর মত। বছরখানেক ঘুরলেই বেন শুকদেব ছোঁড়া বে'র জন্যে খেপে উঠেছে, বয়েস যাবে খায়। দীনু দত্ত ঠিক তখন ছেলের আবার বে' দেবে। ব্যস পনিও মেয়ে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভাল পাত্তর দেখে ঝুলিয়ে া। হাতে আর মোটে সময় নেই এখন ল্যাজ গুটিয়ে থাকলে বে না। কাল থেকে আদা-জল খেয়ে লাগতে হবে। তবে াবেন স্যর মেয়ে যেন ও বাড়িতে না যায় আর ছোঁড়াটাও যেন এ ঢুকতে না আসে। মানে শুনেছি ওদের নাকি···থাকৃগে।

কুঞ্জ রাহা বললেন—মিশবে কি, মেয়েকে ঘরে তালা দিয়ে রাখব ত বেরোতে না পারে।

বিছে উকীল তাড়াতাড়ি বললেন—খবরদার, খবরদার অমন টি করবেন না। একেই তো মেয়েকে বলি দিতে যাচ্ছিলেন বলে াম রটেছে, তারপর যদি শোনে যে ঘরে তালা দিয়ে রেখেছেন হলে এ জেলায় বাস করা দায় হবে। কাদা ঠিকই বলেছে, বেন যেন ও বাড়িতে না যায় বা শুকদেবের সঙ্গে না মেশে। াাাপি করবেন না, হিতে বিপরীত হতে পারে।

হেড পণ্ডিত বললেন—উকীলবাবু ঠিক বলেছেন। গায়ে মাথায় বুলিয়ে মেয়েকে বশে রাখতে হবে। তারপর ভোট কেটে গেলে ন্ন করা যাবে'খন।

গুঁই চাটুজ্যে বললেন—তুমি থামো দেখি পণ্ডিত, যদি মেয়ে না শোনে তখন কি হবে? কুঞ্জবাবাজী যা করতে চাইছে তাই ই উচিত। বদনাম যা হবার তা হয়েইছে আর বেশি কি ? তুমি দরজা বন্ধ করেই রেখো।

কাদা বললে—তুমি থামো দাদু, উকীল স্যর ঠিকই বলেছে। তুমিও নেহাৎ খারাপ কথা বলো নি, যদি কথা না শোনে তো কি হবে। তার চেয়ে এক কাজ করুন স্যর, ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ঘুমের ওষুধ নিয়ে খাইয়ে দিন, তারপর ঘুমুলে মাথা ন্যাড়া করে দিন। মেয়েছেলে ন্যাড়া মাথা নিয়ে আয়নায় মুখ দেখবে না, চৌকাট পার হওয়া তো দূরের কথা।

গুঁই চাটুজ্যে বিরক্ত হয়ে বললেন—মুখ্যুটার কথা শোন। মেয়ের মাথা ন্যাড়া করে দিয়েছে শুনলে লোকে ফুল-চন্দন দিয়ে কুঞ্জবাবাজীকে পুজো করবে, না।

—তা' উকুন হলে মাথা ন্যাড়া করে না তো কি করে? লোককে তাই বলা হবে যে বড্ড উকুন হয়েছিল তাই কামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর নিসিংহ বিছানা পাত, কেতোকে গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আয়। আমি স্যর আজ এখানেই খাব।

এর পর সভা ভঙ্গ হল।

২০

পরদিন মিটিং করতে গিয়ে বোঝা গেল যে অবস্থা সুবিধের নয়। মিটিং-এ লোক হল বটে, কিন্তু তারা খালি টিটকিরী দিতে লাগল। ফলে, বক্তৃতা জমল না, কাদার দলবলের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগল। কিন্তু তাতেও কাদা সুবিধে করতে পারলো না। দত্ত বনাম রাহার এই গজ-কচ্ছপের লড়াইতে লাভ হল প্রাণবল্লভের। তিনি দু'জনকেই এক পাল্লায় চাপিয়ে পোস্টার ছাড়লেন, একটি মেয়ের সর্বনাশ করতে চেয়েছে আর একটি সেই মেয়েকে হাত করে সম্পত্তি মারবার তালে আছে। দু'টোই সমান। অতএব, ভো: ভো: ভোটারবৃন্দ, ওদের দু'জনের দিকে ফিরেও তাকিও না, প্রাণবল্লভই তোমাদের একমাত্র বল্লভ হোক।

কুঞ্জ রাহার বৈঠকখানার অবস্থা সেদিন বড় করুণ। রথী-মহারথীরা সব নীরবে বসে আছেন। কার্তিক নৃসিংহ প্রভৃতি কাদার শিষ্যরা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিস্ করে কথা বলছে। জি-ও-সি গজেন ও কাদা ঘরে নেই। সবাই তাঁদেরই অপেক্ষায় আছেন।

অবশেষে ওরা এল। গজেন ঘরে ঢুকেই চলে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াতেই গুঁই চাটুজ্যে বললেন—ও কি চললে যে, খবর-টবর বল।

—কি খবর চান?—নির্বিকারভাবে গজেন বললে।

গুঁই চাটুজ্যে বিপদে পড়লেন, কি জবাব দেন? আমতা-আমতা করে বললেন—এই মানে ধর মিটিং—।

—মিটিং-এর খবর শুনে আর কি হবে। ও-সব ভোট-ফোট ভুলে যান। দাদা, বাড়ি যাবে তো না তোমার আসতে দেরি আছে।

—না দেরি আর কি। তোর কি শরীর খারাপ হয়েছে।

—না। কাদা, তুই থাক, যা জানিস বল।—গজেন চলে গেল।

—লাও ঠ্যালা। ছুমুখের কম্মোটা আমার ঘাড়েই পড়ল।—কাদা হতাশ হয়ে বললে।

গজেনের অমন ভাবে চলে যাওয়াতে সবাই শঙ্কিত হলেন। গজেন বরাবরই কম কথা বলে ইদানীং ভোটের ব্যাপারে ক্যাম্পেনিং-এর জি ও সি হওয়াতে পদ-গৌরবের চাপে একেবারেই বাকরোধ হয়ে

গিয়েছিল। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা তো বলতই না, আর যাও বা বলত দু'চারটে কথা, তা-ও কাদার সঙ্গে। সেই গজেন একসঙ্গে এতগুলো কথাই শুধু বললে না, ভোট ভুলে যাবার পরামর্শও দিয়ে গেল, সুতরাং অবস্থা যে শোচনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেনাপতির ওপরেই যুদ্ধের হারজিত নির্ভর করে। রাজার কাজ তো খালি রাজদণ্ডটি সামলান আর বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা পাচার করা। সেই সেনাপতি যদি যুদ্ধ ভুলে যাবার উপদেশ দেয় তা হলে রাহা মশাইকে রুদ্ধনিশ্বাসে পিণ্ড গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, কুঞ্জ রাহা অবশ্য আগেই মনে মনে ভোটের আশা ছেড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দলের কারো কারো তখনও আশা ছিল। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

হেমেন ডাক্তার বললেন—কি হে কাদা, কি ব্যাপার বল দেখি। মুখখানা তোলই না। মাথা নীচু করেই বসে রইলে যে।

—কি আর করব বলুন? যদি কেটে ফেলা যেত তা' হলে বাদ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম। আপনাদের পাঁচজনের দয়াতে কাদা ঘোষালের মাথা আর নজর বুক-পকেটের নীচে এর আগে নামে নি, কিন্তু আজ একেবারে 'ভুঁয়ে' মিশিয়ে গেল। স্রেফ্ এই ভোটের জন্যে।

ভোট মানেই কুঞ্জ রাহা। তিনি ভ্রূ কুঁচকে বললেন—আবার কি হল?

—কি হবার আর বাকি রইল স্যর। পই পই করে সবাই মিলে বললে মেয়েটার ওপরে নজর রাখবেন, যেন ঐ ছোঁড়াটার সঙ্গে না মেশে, তা হল কই? তা আপনারই বা অপরাধ কি? আপনার এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। ভোট সামলাবেন, না মেয়ে সামলাবেন।

কুঞ্জ রাহা রেগে গিয়ে বললেন—হেঁয়ালী রেখে স্পষ্ট করে বল।

—সেই তো স্যর আমে-দুধে মিশে গেল। শুকদেব ছোঁড়ার সঙ্গে—।

—কে বললে?

—কে আবার বলবে স্যর, নিজের চোখে জুবিলী ট্যাঙ্কে আড্ডা মারতে দেখলুম। বিশ্বাস না হয় জোশীদাকে ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞেস করুন। ওদের দেখে জোশীদা' বললে, কাদা এ প্রাণ আর রাখবো না, তুই বাড়িতে খবর দিস্, জলে ডুবেই মরব। ঝাঁপ দেয় আর কি, অনেক কষ্টে হাতে পায়ে ধরে বাগে আনি। মুখে রক্ত তুলে খাটছে জোশীদা, তাই চোটটা খুব লেগেছে। তা ছাড়া অত করে বলা হল মেয়ে ঘরে রাখবার জন্যে। আজ একটা হয়ে যেত। তবে এও ঠিক জোশীদা'র কিছু হলে কাদা ঘোষাল লঙ্কাকাণ্ড করে ছাড়ত, বাপের খাতিরও রাখত না।

হেমেন ডাক্তার যেন চোখের সামনে ভাই-এর জলে ডোবা লাশ দেখলেন, রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—কি সর্বনাশ, তারপর?

—বাঃ বাব্বা আরে মশাই সব্বনাশ আর হল কোথায়। হলে কি এখন এখানে থাকতুম। জানেন স্যর, তবে সত্যি কথা বলি, জোশীদা বার বার বলেছে, কাদু মেয়েটা ছোঁড়াটার সঙ্গে মিশবে না তো? মিশলে কিন্তু পেজটিজ টিলে হয়ে যাবে। বললুম, না, স্যর ঠিক আটকে রাখবে। জোশীদা' মাথা নেড়ে বললে, ও মা আঁচালে বিশ্বাস নেই। তুই বরং তক্কে তক্কে থাকিস্। না হয় কারুকে দিয়ে নজর রাখ। জোশীদার কথা ঠিক ফলে গেল। ভাগ্যে শিটেকে কেষ্টবাবুর চায়ের দোকানে বসিয়ে রেখেছিলুম। শুকদেবকে মহাবীরের সঙ্গে বেরুতে দেখে শিটেও তাদের পেছু নেয়। তারপর কিছুদূর গিয়ে দেখে কবরেজের মেয়ের সঙ্গে অনুপান আসছে।

বিছে উকীল বিস্মিত হয়ে বললেন—কবরেজের মেয়ের সঙ্গে অনুপান! সে আবার কি?

কাদা ম্লান হেসে বললে—অতি দুঃখেও হাসি আসে। কবরেজের মেয়ে হচ্ছে ভস্মকা আর অনুপান হচ্ছে স্যরের মেয়ে। শিটে শালার দেওয়া নাম। কবরেজের বড়িতে অনুপান লাগে তো, তাই বললে। শিটে বেটা যাত্রার দলে ছিল কি না, তাই মাঝে মাঝে এইসান্ পিনিক কাটে যে শুনে মরা মানুষকেও দাঁত বার করতে হবে।

কুঞ্জ রাহা বললেন—শিটে দেখেছে?

—শুধু শিটে কেন, আমরাও দেখেছি। সাইকেল চেপে ঘুরে ঘুরে আমাদের খুঁজে বার করে। ভাগ্যি ভাল যে আমাদের পায়, নইলে ওর কথা আমরাও বিশ্বাস করতুম না।

—তোমরা দেখলে?

—শুধু দেখলুম, কথা অবধি বলেছি। শুকদেব মহাবীর দু'জনেই কথা বললে। আপনার মেয়ে অবিশ্যি মাথা নীচু করে ছিল। কবরেজের মেয়েও কথা বললে। মহাবীর ছোঁড়ার আবার ইংরিজী ছাড়া বুলি ফোটে না। ভোটটা থামুক, ছোঁড়াটাকে নোব একহাত। তবে আপনার জামাই, মানে—।

—কাদা—কুঞ্জ রাহা গর্জে উঠলেন।—কি—মানে—স্যর।

—তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। ঐ জামাই কথাটা যেন দ্বিতীয়বার না শুনি।—বলে গট্-গট্ করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

রাগিণী শুয়ে ছিল, বাবাকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে বসল। মেয়ের দিকে না তাকিয়ে বাপ জিজ্ঞেস করলেন—বিকেলে জুবিলী ট্যাঙ্কে গিয়েছিলি?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—বেড়াতে।

—বেড়াতে! না বেড়ালে রাজকন্যের ঘুম হয় না। বারণ করি নি? পাজী, বদমাইস্।

রাগিণী অবাক হয়ে বাপের মুখের দিকে চেয়ে রইল, এমন কথা এর আগে বাপের মুখে শোনে নি। সে অস্ফুটস্বরে বললে—বাবা!

—খবরদার বাবা বলে ডাকবি না, আমি তোর বাবা নই। লোকের কাছে আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই। একটা লম্পট ছোঁড়া তার সঙ্গে আমার মেয়ে—।

রাগিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে—বাবা, ভুলে যেও না তিনি আমার স্বামী। মা কালী সাক্ষী রেখে আমার মা তাঁর হাতে আমাকে তুলে দিয়েছেন, আর আমিও তাঁকে স্বামী বলে গ্রহণ করেছি।

—ও-সব কালী-কালী আমি মানি না। আমরা বৈষ্ণব, কৃষ্ণ আমাদের দেবতা।

—তুমি না মানতে পার, আমি মানি। তিনিই আমার স্বামী।

—স্বামী। বাপের সামনে স্বামী-স্বামী বলতে লজ্জা করছে না। চলে যা' তোর স্বামীর কাছে, দূর হ' আমার বাড়ি থেকে।

—বেশ।

রাগিণী খাট থেকে নেমে দু'পা যেতে না যেতেই কুঞ্জ রাহা তার হাত ধরে এক হেঁচকা টান মেরে বললেন—কোথায় যাচ্ছিস? এত তেজ!

রাগিণী আর্তনাদ করে উঠল।

ওপরে কি হচ্ছে শৈলজা প্রথমটা বুঝতে পারেন নি, খেপী এসে চুপি চুপি বলতেই হাতের কাজ ফেলে তিনি ওপরে উঠে এলেন। ওপরে এসে দেখলেন কুঞ্জবাবু যা' মুখে আসছে তাই বলে যাচ্ছেন আর রাগিণী নীরবে তাই মুখ বুজে শুনে যাচ্ছে।

শৈলজা বললেন—আচ্ছা, এই নিশুতি রাতে লোক না হাসালেই কি হ'ত না। কি পাগলামো করছ?

—আমি হাসাচ্ছি, না তোমরা মায়ে-ঝিয়ে হাসাচ্ছো। পাগলামো! আমি পাগল হই এই তো তোমরা চাও।

—আমরা চাইব কেন, চায় তোমার ঐ বৈঠকখানার ভূতের দল। যারা ভোট-ভোট করে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে নিজেদের পকেট ভারি করছে।

—খবরদার, মুখ সামলে কথা বলবে। আমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি যে, ঐ সব মানী লোক আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন।

—মানী লোক না ছাই? খ্যাংরা মারি অমন মানের মুখে।

—তা তো মারবেই। কি ঘরের মেয়ে দেখতে হবে তো। মানী ঘরের মেয়ে হ'তে তো বুঝতে পারতে মান কি জিনিষ।

—দেখ, আমাকে যা ইচ্ছে তাই বল, কিন্তু আমার বাপ ভাইকে গালাগাল দিও না—ভাল হবে না। কোন ঘরের কি মান তা আমার জানা আছে। তোমার যদি মানের ঘরই হোত তা হলে নাপিতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে ছুটতে না।

—কেন ছুটেছিলাম তা তোমরা কি বুঝবে। ও যদি আমার মেয়ে হোত তাহলে ঘরের মান রেখে বাপের কথা মুখ বুজে মেনে নিত, এইভাবে এক বদমাইস লম্পট ছোঁড়ার সঙ্গে জুবিলী ট্যাঙ্কে গিয়ে ঢলাতো না।

—বাবা। তোমাকে আবার বলছি আমার স্বামীর সম্বন্ধে ওভাবে কথা বলবে না।

—শুনছ মেয়ের কথা, বাপকে শাসাচ্ছে স্বামীকে পুজো না করলে ভাল হবে না। কই এখন তো একটা কথাও মেয়েকে বলছ না। আমি তখন একটা কথা বলতে না বলতেই তো ফোঁস করে উঠেছিলে যে, আমার বাপ ভাইকে গালাগাল দিও না। এখন যে মেয়ে তার বাপের শ্রাদ্ধ করছে,—কিছু বল।

—পারি না বাপু তোমার সঙ্গে তর্ক করতে।

—তা পারবে কি করে। পাগল তো এখনও হই নি যে তর্কে হারাবে, যদিও মায়ে-ঝিয়ে চাইছ যে পাগল হয়ে যাই। তা না হলে যা আমি ঘেন্না করি, ঠিক তাই বেছে বেছে করতে না দু'জনে। দু'বেলা যারা আমার বাপ-ঠাকুদ্দার নিন্দে না করে জল খায় না তুমি কি না আমার পরিবার হয়ে সেই বাড়ির বৌ-এর পায়ে ধরে বললে যে আমার মেয়েকে বাঁচাও, মেয়ে যেন তোমার জলে পড়েছিল। আমায় যারা বলে খনে দানো, এ বাড়ির নাম যাদের মুখে আনতে ঘেন্না করে বলে পাঁঠা-বেচা ঘর, তারা করবে তোমার মেয়েকে ছেলের বৌ? তাই যদি করবার ইচ্ছে থাকত তাহলে আজ বিকেলে অমন ভাবে হাটের মাঝে আমায় গালমন্দ দিত না। ওসব সম্পত্তি হাতাবার ফিকির। বলেই মেয়ের মুখের সামনে আঙুল নাড়তে নাড়তে বললেন—এই তোমায় বলছি আমায় কঠিন হতে বলো না। কাদার মত ওঁচা লোক সেও যে বলবে নিজের মেয়েকে যে কন্‌ট্রোলে আনতে পারবে না সে একটা কাছাছাড়া লোক—তা আমি আর সহ্য করব না। তোমার স্বাধীনতায় আমি হাত দেব না, যেমন চলে ফিরে বেড়াচ্ছ, কলেজ যাচ্ছ—যাও, বিশ-পঞ্চাশ টাকা হাতখরচা করছ কর, শাড়ি গয়না কেন; কিন্তু খবরদার ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে মিশতে পারবে না, দেখা হলে কথা কইতে পারবে না, যা হয়েছে তা ভুলে যেতে হবে। মনে থাকে যেন—বলেই পাছে কোনও জবাব শুনতে হয় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে পা বাড়াতেই কানে এল—আমি তা পারব না।

ফিরে আসতে হল, বললেন—পারবি না?

—না।

···চোপরও!—কুঞ্জ রাহা গর্জে উঠলেন।

মেয়ে চুপ করে গেল বটে কিন্তু বাপ কি বলবেন খুঁজে পেলেন না। গর্জনের পর বর্ষণ না হলে লজ্জায় পড়তে হয়। রাহা মশায় ভেবেছিলেন যে, কাদার মত লোকও তাঁকে কথা শোনায় বললে মেয়ে বাগে আসবে। তিনি জানতেন মেয়ে তাঁর কাদাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। সেইজন্যেই তিনি কাদার কথা তুলেছিলেন। কিন্তু তাতেও কাজ হল না দেখে বিপদে পড়লেন। রাহামশায় জানতেন মেয়ের ঘৃণা যেমন তীব্র নিজের গোঁ বজায় রাখবার বেলায় মনও তেমনি দৃঢ়। কাজেই একবার যখন 'না' বলেছে তখন কোনমতেই হ্যাঁ বলান যাবে না। ছেলে নয় যে কষে উত্তম মধ্যম দিয়ে বাড়ির বার করে দেবেন, আপদ বিদায় হবে। এখানে সে দাওয়াই প্রয়োগ করলে কেলেঙ্কারী বাড়বে ছাড়া কমবে না। মেয়েছেলে···মেয়েছেলে···বার দুই কথাটা কুঞ্জবাবু আওড়ালেন। মেয়েছেলে যখন তখন মেয়েলী অস্ত্রপ্রয়োগ করলে কেমন হয়? যখন কিছুতেই কাজ হচ্ছে না তখন চেষ্টা করতে দোষ কি। বললেন···যদি ঐ ছোঁড়াটার সঙ্গে মিশিস্ তা হলে যেন আমার মরা মুখ দেখিস।

শৈলজা বললেন—এ তুমি কি বললে?

স্ত্রী ও কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে কুঞ্জবাবু বুঝলেন যে কাজ হয়েছে। বললেন—ঠিকই বলেছি।—বলে বীরদর্পে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

যথাসময়ে খবরটা দীনু দত্তর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল এবং দত্ত মশাইয়ের কানেও উঠল। খবরটা শুনেই তিনি জ্বলে উঠলেন, এত বড় স্পর্ধা। হুঙ্কার ছাড়লেন, শুকদেব, শুনে যাও।

সে হুঙ্কার শুধু কিংশুকই নয় তার মাও শুনলেন এবং আওয়াজটার যথেষ্ট আকর্ষণী শক্তি থাকাতে ছেলের সঙ্গে তিনিও ওপরে উঠে এলেন।

কিংশুক ঘরে পা দিতেই দীনুবাবু বললেন—খবরদার মিশতে পারবে না।

কিংশুক অবাক, কার সঙ্গে মিশতে পারব না? বললে—মানে?

—মানে আবার কি? এর মধ্যে কোন্ কথাটা বোঝ না যে মানে বুঝতে ধারাপাত খুলতে হবে। গাধার মত প্রশ্ন।

—কার সঙ্গে মিশব না তা বলবে ত'।

—কার সঙ্গে আবার,—বোঝে না যেন কিছু। পাঁঠা-বেচাদের মেয়ের সঙ্গে, খবরদার যদি শুনি তা হলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

—কেন, কি হল আবার?

—কেন আবার কি, আমার হুকুম।···কোথায় তোর মেয়েকে ছেলের বৌ করে কেলেঙ্কারীর হাত থেকে বাঁচালুম, চিরজীবন কেনা গোলাম হয়ে থাকবি তা নয় বলে কি না সম্পত্তি হাতাবার ফিকির।

তরুবালা বললেন, ও তোমাদের ভোটের ব্যাপার। ভোট থেমে যাক এ কাদা ছোড়াছুড়িও থামবে।

—থামবে? কাদা ছোড়া না হয় বন্ধ হল কিন্তু দিব্যিটা? মেয়েকে যে বলেছে যদি ওর সঙ্গে মেশে তবে বাপের মরা মুখ দেখবে তার কি হবে।

কিংশুক বললে—যত মেয়েলী দিব্যি।

—মেয়েলী ফেয়েলী বুঝি না। আমিও বলছি যদি ঐ মেয়েটার সঙ্গে মিশবি তবে আমার মরা মুখ দেখবি।

—আমি মানি না এসব! কিংশুক মাথা ঝেঁকে উত্তর দিলে।

তরুবালা তাড়াতাড়ি ছেলের মুখ চাপা দিয়ে বললেন—ছিঃ বাবা, এ কথা বলতে নেই।

কিংশুক মার হাত সরিয়ে বললে—এ সব কুসংস্কার, যা লোকে বলে তাই কখনও হয়!

—হয় বাবা হয়, কখনও কখন ঠিক তাই হয়।

দীনুবাবু দমে গেলেন। এ তো আচ্ছা ছেলে! এত বড় একটা দিব্যির উত্তরে অম্লানবদনে বললে কি না—আমি মানি না এসব। এখন যদি সত্যই মেশে আর স্ত্রার আশঙ্কামত যদি কথাটা ঠিক ফলে যায়। তা হলে!!! দীনুবাবু চোখে অন্ধকার দেখলেন। বললেন, তা মানবি কেন? আমি মুখ্যু বাপ, মেয়েলী দিব্যি দিই। আমি মরে গেলেই বা কি বেঁচে থাকলেই বা কি। বলি লেখাপড়া তো শিখছিস্ এটা পড়িস্ নি যে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমনস্তাপ পিত—

তরুবালা বললেন—পর মনস্তা। নয় পরম—

দীনুবাবু ধমকে উঠলেন—থাম থাম তোমাকে আর ভবতারণের পরিবারের মত শ্লোক আওড়াতে হবে না। এই আমি বলে রাখছি শুকদেব আমায় জ্বালিও না, আজ বাদে কাল ইলেকশ্যন্—আমার মাথার ঠিক নেই। শেষকালে দু'চোখ যেদিকে যায় সেদিকে চলে যাব। যা বলেছি সেটা খেয়াল থাকে যেন।

কিংশুক মুখ ফিরিয়ে বললে—আর আমি যদি বলি যে তোমার কথা ফিরিয়ে না নিলে আমার মরা মুখ দেখবে, তা হলে?

তরুবালা ক্লিষ্টস্বরে বললেন—শুকদেব!

—শোন, গুণধর ছেলের কথা শোন। বলে কি না আমি যদি বলি···বলেই দীনুবাবুর খেয়াল হল যে এখনও পাকাপাকি ভাবে কথাটা বলে নি, যদি দিয়ে একটা হুমকি ছেড়েছে মাত্র। পাছে যদিটা লোপ করে বাকিটুকু বলে বসে এই ভয়ে আর মুহূর্তকাল অপেক্ষা না করে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

তরুবালা ছেলের হাত দু'টো ধরে বললেন—আমার কথা দে বাবা, ওঁর কথার অবাধ্য হবি না।

—মা, তুমি—।

—লক্ষ্মী, বাবা আমার। রাগটা পড়ুক, আমি ওঁকে বুঝিয়ে মত করাব। ওঁর কথার অবাধ্য হস্ নে।

—বেশ, তাই হবে।···জগতটা ভীষণ স্বার্থপর, সবাই নিজের স্বার্থ দেখে। মা-ও ছেলের পানে তাকায় না।

কিছুক্ষণ পরে একটা মিশির কৌটো থেকে দু'টিপ মিশি দাঁতে উঠল, খবরও চলাচল হ'ল।

পরদিন পড়ার ঘরে বসে কিংশুক চিঠি লিখছিল, মহাবীর এল। চিঠি শেষ করে কিংশুক বললে—তোর কথাই ভাবছিলুম।

—গুড হেভেনস! গিনী ফেলে শেষে এই নয়ে পৈসের চিন্তা!

কিংশুক ম্লান হেসে বললে—ঠিক বলেছিস্। শোন, তোকে একটা কাজ করতে হবে।

—কি?

—তনুকাকে দিয়ে এই চিঠিটা ওর কাছে পৌঁছে দিতে হবে আর জবাবটাও তনুকাকে দিয়ে আসতে হবে।

—তোর সঙ্গেই তো একটু বাদে দেখা হবে, তুই নিজেই দিস্।

—দেখা হবে না।

চোখ কপালে তুলে মহাবীর বললে—মানে! কি হল আবার?

—কি হবে শুনে। তুই বরং চিঠিটার ব্যবস্থা করে দে'।··· দেখা আর এ-জীবনে হবে না', বাবা এমন কি মারও ইচ্ছে নয় যে দেখা করি।

—মা! মানে কাকীমা? কি বলছিস যা-তা!

কিংশুক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলো।

—কাকীমাও বললেন ঐ কথা!

—তাই ত' শুনলাম।

মহাবীর রেগে গেল, বললে, সাধে বলি ব্রাদার যে থ্যাঙ্ক গড আমার বাপ-মা বেঁচে নেই। কিছু মনে করো না ব্রাদার, আমি হলে এ আদেশ মানতুম না—নো, নেভার। রাগিণী দেখবি মানবে না।

—মানবে। বাপ-মার মরা মুখ দেখতে কে চায়?

—কে মরবে না শুনি। ডোণ্ট মাইণ্ড, তুমি মরবে না? এগেন ডোণ্ট মাইণ্ড, দীনুকা' মরবেন না? তবে? দু'দিন আগে আর পরে। জেনারেলি যাঁরা বড় তাঁরা আগে মারা যান। বাপ-মা বয়সে বড় হন কাজেই তাঁরা আগে চোখ বোজেন, অফকোর্স উল্টোটাও হয়। মরাটা যখন সার্টেন তখন তোদের দেখাশোনায় দোষ কি? তোরা না দেখা সাক্ষাৎ করলে যদি দীনুকা' অমর হয়ে থাকতেন তা হলে না হয় কথা ছিল। দূর দূর। ওসব কথায় কান দিস্ নি। মরা মুখ দেখবি! বল হ্যাঁ, তাই দেখব। বেশ তো একটা এক্সপেরিমেন্টই কর। তুই পথে বসবি না। ওপন্‌লি না হয় সিক্রেটলি মেলামেশা কর। আমি লিখে দিচ্ছি কিস্সু হবে না।

—তা হয় না। আমি মাকে কথা দিয়েছি। তুই চিঠিটার ব্যবস্থা করে দে ভাই।

দরজায় টোকা পড়ল। মহাবীর উঠে দরজা খুলে দিলে মামা ঢুকল।

মহাবীর বললে—ঠিক টাইম্-এ এসেছিস্। এদিকে কারবার হয়ে গেছে তা শুনছিস্। দীনুকা' ভোটে ছেড়েছেন।

—কি ছেড়েছেন?

—ফরগেট্ ইট। ভোটে কি তোকে বোঝাতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। সর্ট-কার্ট-এ বলি—বলে ব্যাপারটা শুনিয়ে বললে,—একটা ব্যাবস্থা করবি না চুপচাপ বসে থাকবি।

ব্যবস্থা করবার কথায় মামা তাড়াতাড়ি বাঁ হাতটা এগিয়েই আবার সরিয়ে নিলে। মহাবীর সিগারেট দিতে যাচ্ছিল হাত টেনে নেওয়াতে বললে—আবার বাখারিটা টেনে নিলি কেন?

মামা ডান হাতে সিগারেট নিয়ে বললে—আর বলিস্ কেন, জজ সাহেবকে দেখে বিড়ি লুকোতে গিয়ে তালুতে ছ্যাঁকা লেগে ঘা হ'য়ে গেছে।

—তা হলে তো হয়ে গেল। কাজকর্ম করছিস্ কি করে? তোর তো বাঁ হাতে খোঁচা না খেলে ব্রেন খোলে না।

—চালাচ্ছি কোনও রকমে কিন্তু সত্যিই মাথাটা তেমন খেলছে না। তবে শুকিয়ে এয়েছে।

—এদিককার কি হবে? মঙ্গলবার ইলেকশন্ শুক্রুরবারে রেজাল্ট বেরুবে। একজন কাৎ হবেনই দু'জনও হতে পারেন। তারপর আর এগোন যাবে এ ব্যাপার নিয়ে?

—কুঞ্জ রাহার কোনও আশা নেই। দীনুকা'ই জিতবেন তবে লড়তে হবে প্রাণবল্লভের সঙ্গে।

—তুই কি মনে করিস্ হেরে যাবার পর কুঞ্জবাবু এসে বলবেন দীনুদা' যা হবে গেছে হয়ে গেছে, এস এইবার পাঁচজন ডেকে একটা হৈ-হৈ করে সম্বন্ধটা পাকা করি।' তারপর ধর গড ফরবিড যদি দীনুকা'ই হেরে যান, ভোটের কথা কিস্স্যু বলা যায় না তখন বলতে পারবি, যে কাকা যা হবার হয়ে গেছে এবার ছেলেটার দিকে নজর দিন, কুঞ্জবাবুর কাছে গিয়ে গলবস্ত্র হয়ে দাঁড়ান। মাথায় যাও বা দু'এক ড্রপ মাল ছিল বাঁ হাতটা যাওয়াতে তাও উবে গেছে দেখছি।

কিংশুক এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি, এবার বললে—তোদের কিছু করতে হবে না। যা' আমাদের অদৃষ্টে আছে তাই হোক্।

মহাবীর বললে—তোদের অদৃষ্টের বাইরে নিয়ে যাবার ক্ষমতা স্বয়ং বিধাতা পুরুষেরও নেই আবার তো ছার। আমরা তাদের জন্যে কিছু একটা করব এটাও যদি তোদের অদৃষ্টে লেখা না থাকে তা হলেও কছু হবে না।'

—ওসব বুঝি না, তোরা চুপ করে থাক।

—আর তোরা আধমরা হয়ে থাক, কেমন?—মহাবীর রেগে গেল।

—উপায় কি।

মামা বাঁ হাতটা মাথায় বুলিয়ে বললে—তা হলে আর আধমরা কেন, পুরোই মর। ল্যাটা চুকে যাক।

মহাবীর বললে—বাঁ হাত মাথায় বুলোতে বুলোতে এত বড় একটা কথা যখন বললি তখন মনে হচ্ছে মাথায় কিছু মাল ফেরৎ এসেছে। ভাল করে খুলে বল দেখি।

—ও রাজী হবে কি না আগে জিজ্ঞেস কর।

—তুই বল না। ও রাজী হবে না ওর ঘাড় রাজী হবে। অফকোর্স যদি ওর অদৃষ্টে রাজী হওয়া লেখা থাকে। বল।

খামের ওপরে কোনও নাম লেখা ছিল না, তাই খামটা হাতে নিয়ে রাগিণী তমুকাকে জিজ্ঞেস করলে—কি রে?

—তোর চিঠি। শুকদেবদা' লিখেছে।

—ওঃ।—নিবিড়ভাবে দু'হাতের মধ্যে খামটাকে ধরে রাগিণী বললে—তোর সঙ্গে দেখা হল বুঝি?

—না, বীরু গিয়েছিল তাকে দিয়ে পাঠিয়েছে। শুনেছি সব। তুই পড়ে জবাব লিখে দে, আমি ততক্ষণ মাসীমার কাছে গিয়ে বসি।

—কেন—তুই—না হয়—থাক না, যাবি কেন?

—না, থাকতে নেই। বলে নীচে চলে গেল।

তমুকা চলে যাবার পর রাগিণী সন্তর্পণে খামের একপাশ ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে চোখের সামনে খুলে ধরল। দীর্ঘ চিঠি, মনের নানা কথা দিয়ে ঠাসা। চিঠি নয় যেন পরিপক্ক একটা কাঁঠাল, এক একটা লাইন এক একটা কোয়ার মত রসে ভর্তি. রাগিণী না পড়ে চিঠিটা হাতে করে বসে রইল। পড়লেই তো শেষ হয়ে যাবে। তার চেয়ে এই বেশ। এইভাবে চিঠি হাতে নিয়ে অনন্ত সম্ভাবনাকে হাতে করে বসে থাকি। বসেও থাকত হঠাৎ স্মরণে এল তমুকা নীচে বসে আছে একটু বাদেই এসে হাজির হবে।

চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে যেটুকু লেখা আছে তাও ছোটখাট একটা চিঠি। যে চিঠির শেষে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা থাকে সে চিঠি পড়লে মনে হয় পত্রলেখকের মনের সবটা জুড়ে আমি নেই, ঐ চিঠির ফাঁকা জায়গার মত ওর মনের অনেকখানি জায়গায়ই ফাঁকা পড়ে আছে যেখানে আমি নেই। কিন্তু যে চিঠি বিয়ের পর কন্যার প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবার মত এক পা এগিয়েই ফিরে ফিরে মার বুকে কান্নায় ভেঙে পড়ার মত শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না, বার বার পুনশ্চ-র বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মনের কথা জানায় সে চিঠি পেলে মন ভরে ওঠে, বোঝা যায় মনের কোথাও ফাঁক নেই, সবটা জুড়ে আমি আছি। রাগিণী বার বার চিঠির 'পুনশ্চ' অংশটুকু পড়তে লাগল।

বুদ্ধিটা দিয়েছিল মামা। কিংশুক আলাদা আরও একটা চিঠি লিখতে যাচ্ছিল। মামা বললে—আলাদা চিঠি লিখবি কেন? তোর ঐ চিঠিতে জায়গা নেই?

—আছে।

—তা হলে চিঠিটা বার করে পুনশ্চ দিয়ে লেখ। মেয়েদের চিঠিতে 'পুঃ' থাকলে ওরা ভারি খুশি হয়। বলে 'পুঃ' দেওয়া চিঠি আর দুধের চাঁচি দুই-ই এক জিনিষ, রসে টইটম্বুর। লেখ, পুঃ দিয়ে আরম্ভ কর।

কিছুক্ষণ পরে নীচে থেকে তমুকা এসে দেখে চিঠিটা হাতে নিয়ে রাগিণী চুপ করে বসে আছে! তমুকা বললে—পড়েছিস্?

যেন সম্বিৎ ফিরে পেল এমন ভাবে রাগিণী বললে—কি?

—পড়েছিস্?

—হ্যাঁ। বলে একটু হেসে বললে—তোকে বলতে পারলুম না তমু, কিছু মনে করিস না।

তমুকা লক্ষ্য করল আগের সেই মনমরা ভাবটা আর নেই। বললে—খুশি হয়েছিস্, দেখছি।

—কেন হব না? চিঠিতে খুশির খবর আছে যে।

—খুশির খবর না ছাই। বীরু ঠিকই বলেছে, তোরা ভারি ভীতু। আমরা হলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম।

—তাতে একসঙ্গে থাকতে পারতিস্ বটে কিন্তু আমাদের মত নিবিড় ভাবে পরস্পরকে পেতিস্ না।

—সামর্থ্য যাদের নেই তারাই কবিত্ব করে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকে।

রাগিণী হেসে বললে—সামর্থ্য আছে কি না সে পরিচয় দেবার সময় তো পালিয়ে যায় নি।

—আচ্ছা, তুই কি ঠান্‌দিদিদের মত বিশ্বাস করিস যে—

—না করি না। কিন্তু মা বিশ্বাস করেন, জেঠিমা বিশ্বাস করেন, মাসীমা বিশ্বাস করেন, তাঁদের বিশ্বাসে আঘাত দিতে চাই না। তবু, আঘাত দিয়ে ঘর বাধলে সে ঘর ভেঙ্গে যায়।

—তা হলে এইভাবেই থাকবি?

—দেখা যাক্...তোর রোমিও জুলিয়েটের গল্প মনে আছে।

তমুকা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে—তা' আর নেই। লেসলী হাওয়ার্ড, নর্মাশিয়ারার, জনব্যারিমুর, বেসিল র‍্যাথবোর্ন। কি ফাইন বই বলত, স্পেশালী ব্যালকনীর সিনটা।

—গল্পটার কথা বলছি।

তমুকা আমতা-আমতা করে বললে, গল্পটা মানে...বিয়ে হল গোপনে, বাড়ির অমতে...পরপর রাত্তির বেলা ব্যালকনীতে মিলন হ'ত, শেষকালে দু'জনেই সুইসাইড করলে, তাই না?

রাগিণী মৃদু হেসে বললে...মনে আছে দেখছি। শেষকালে দু'জনেই সুইসাইড করলে।

—তোদের তো বাড়ির অমতে কিছু হয় নি।

—সেইখানেই আমাদের ট্রাজিডি।

—তোদের ট্রাজিডি নিজেদের হাতে গড়া। আমরা হলে ট্রাজিডি ঘুচিয়ে কমেডি করতাম। নে ও' সে বসে আর ট্রাজিডি কমিডি করতে হবে না, ঘুরে আসি।

—কোথায় যাব?

—কোথায় আবার, জুবিলী ট্যাঙ্কে। বীরু শুকদেবদা'কে নিয়ে আসবে বলেছে।

—না থাক, তুই ওঁকে বলিস, হ্যাঁ।

—হ্যাঁ!

—হ্যাঁ। ও বুঝবে। শুধু 'হ্যাঁ' বলবি, আর কিছু নয়। এই আমার চিঠির জবাব।

জিতবেন যে এতে দীনু দত্তের কোনও সন্দেহ ছিল না। ভবতারণ কুষ্ঠি গণনা করে দেখেছেন যে সময়টা অতীব শুভ, দত্তমশায় যা করবেন তাতেই সফলকাম হবেন। সময় শুভ সন্দেহ নেই। চালের দর বেড়ে গেছে, গুদামে হাজার দশেক চাল ধরা আছে। ছেলেটা চুপচাপ ছিল এখন উঠে এসে বাপের পাশে দাঁড়িয়েছে, খুব খাটছে। দেবতারা যাতে বিগড়ে না বসেন সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মার বাড়ি গত সপ্তাহ থেকে পুজো পাঠান হচ্ছে রেজাল্ট বের হওয়া অবধি চলবে। প্রাণবল্লভ আর কুঞ্জ রাহাও পুজো পাঠাচ্ছেন। কাজেই মা শেষ অবধি কি করেন বলা যায় না। মনে হয় তিনি তিন জনের পুজো খেয়ে স্রেফ চেপে যাবেন। কারণ, তিনজনেই তাঁর সন্তান কাজেই মা-র পক্ষে কোনও একজনের ওপর কৃপাদৃষ্টিপাত সম্ভব নয়। কিন্তু দৈব বলই শ্রেষ্ঠ বল। তাই বাড়িতেও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ যজ্ঞ করা হবে। উঠোনে যজ্ঞের আয়োজন করছেন ভবতারণ দু'তিন জন ব্রাহ্মণ তাঁকে সাহায্য করছেন। স্নান করে পট্টবস্ত্র প'রে দীনুবাবু আসনে বসে তদারকি করছেন। এক কোণে সামিয়ানার তলায় ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন চলছে। হৈ-হৈ ব্যাপার।

ভোটের পর বাইরে থেকে পুলিশ পাহারায় ব্যালট বাক্সগুলো একে একে ট্রেজারী অপিসে এসে জমা হতে লাগল। ফিল্মস্টারদের দেখবার জন্যে যেমন ভিড় হয়, ব্যালট বাক্স দেখবার জন্যে তেমনি ভিড় জমে গেল ট্রেজারী অপিসের সামনে। 'গরু মার্কা' বাক্স এল বলে কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, অমনি গরুর দলের হাম্বা ধ্বনি শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে জল্পনা-কল্পনা চলে বাক্সটা হাল্কা না ভারি। ভেতরে ক'টা ব্যালট পেপার আছে এই গবেষণায় একসঙ্গে গোটা কয়েক মাথা ঘামতে থাকে। কিছুক্ষণ বাদেই গবেষকের দল ব্যালট পেপারের নির্ভুল সংখ্যাটা বলে দেন।

ভোট গণনা সুরু হল। বাক্স খুলতে না খুলতেই মানব পাল সাইকেলে চেপে চোঙা নিয়ে চেঁচাতে সুরু করলে, দীনু দত্ত লীডিং বাই থাউজেণ্ড ভোটস্। ঐ সময়টুকুর মধ্যে হাজার ভোটে যদি দীনু দত্ত জিততে থাকেন তা হলে তাঁর 'রাইভেল'রা বসে থাকবেন এটা আশা করা যায় না। প্রাণবল্লভের দলের চোঙা গর্জে উঠল, প্রাণবল্লভ নট অন্‌লি লীডিং বাট গ্যালপিং। এর পর নিতান্ত মরা মানুষ ছাড়া আর কেউ চুপ করে থাকবে না। কুঞ্জ রাহা আশা ছাড়লেও কাদা ঘোষালের দল আশা ছাড়ে নি। তবে তারা চোঙা নিয়ে বের হল না। গজেন পোস্টার ছাড়বার হুকুম দিলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল বিরাট এক পোস্টার ঝুলছে, তাতে লেখা—কুঞ্জ রাহা লীডিং বা গ্যালপিং নন, তিনি 'জেটিং।' 'জেটপ্লেনের' মত বেগে জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

বেলা গোটা তিনেক নাগাদ খুশি মনে দীনু দত্ত বাড়িতে এসে আসর জাঁকিয়ে বসলেন। না, আর ভয় নেই। এখনও দু'টো সেণ্টারের বাক্স খোলা হয় নি বটে, কিন্তু তাতেও ভয়ের কোনও কারণ নেই। সে দু'টো ব্যবসাকেন্দ্র, সবাই জানাশোনা। ভোট সব কব্জার মধ্যে। প্রাণবল্লভ দু'হাজার ও কুঞ্জরাহা পাঁচ হাজার ভোটে পেছিয়ে আছেন। আর দেখতে হবে না। দত্তবাড়িতে স্ফূর্তির ফোয়ারা ছুটল, বাড়ির সামনে সারি সারি মটর গাড়ি এসে জমল। ব্যাণ্ডপার্টির দল এল। শেষ খবর আসবে আর দত্তমশায়ও গাড়িতে চাপবেন নগর পরিক্রমায়। তবে ভূত-ভোজনের আয়োজন সুরু হয়ে গেল।

পাকা খবর ক্রমশ লাগল। আসতে দীনুবাবু প্রথমটা নবাবী কায়দায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে হাসি হাসি মুখে খবর শুনছিলেন, তারপর দেখা গেল উঠে বসেছেন এবং মুখের হাসিটি মিলিয়ে গিয়ে এক পোঁচ করে কালি পড়ছে। বাড়ির কোলাহলও ধীরে ধীরে থেমে যেতে লাগল। পাকা খবর এল বলে। সাড়ে ছ'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই

পাকা খবর এল। ফতেপুরের ভোটে প্রাণবল্লভ কেল্লাফতে করেছেন দীনু দত্ত শুনলেন এবং শোনার শেষে এ্যাঃ এ কি হল! বলে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়লেন। খবর পেয়ে তরুবালা ওপর থেকে নেমে এলেন এবং শ্রীকান্তকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে মামাকে বললেন—শুকদেব কোথায়? তাকে ডাকো। মহাবীর সবাইকে বাইরে যেতে বল।

বাইরে কোলাহল এবং সেই সঙ্গে ব্যাণ্ডের বাজনার আওয়াজ কানে এল। তরুবালার কথায় যারা বাইরে গিয়েছিল তারা আবার হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। সদর দরজা এবং বাইরের ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ করে দেওয়া হল। কি ব্যাপার? না, ভোটজয়ী বিজয়োল্লাসে মেতেছেন। তাঁর দলবল খেউড় ছুড়াতে ছুড়াতে নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে দত্তবাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে।

রাস্তায় ব্যাণ্ডবাজ ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে দীনু দত্তর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হল। পাশেই ঘরের মধ্যে দত্তমশাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, ডাক্তার এসে পৌঁছয় নি, শিয়রে স্ত্রী। রাস্তায় কুশপুত্তলিকা জ্বলছে আর তার পাশেই এক ছোকরা স্ত্রীলোক সেজে বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করে বিলাপ করছে, পাছে স্ত্রীলোকটিকে চিনতে কষ্ট হয় এই জন্যে তার বুকে পিঠে কাগজ এঁটে দেওয়া হয়েছে, তাতে লেখা রয়েছে গরুর স্ত্রী। লরীতে সং সাজান হয়েছে। একজন প্রাণবল্লভ সেজে বসে আছেন, তাঁর পা দু'টো সামনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা দু'জন লোকের মাথার ওপরে। দত্তবাড়ির সামনে এক ঘণ্টার ওপর উদ্দাম হৈ-হল্লার পর বিজয়ীদল রাহাবাড়ির দিকে রওনা হল। সহরের লোক দেখা গেল বেশ রসিক। তারা প্রাণবল্লভের উচ্চপ্রশংসায় আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলল। ভাগ্যে তারা প্রাণবল্লভকে ভোট দিয়েছিল, তাই না এমন শোভাযাত্রা দেখতে পেল! কিন্তু দু'একজন বেরসিক ছিলেন যাঁরা মনে মনে ছিঃ ছিঃ করতে করতে নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগলেন! তা এমন বেরসিক সব সময় সব দেশেই আছে!

ডাক্তার এসে দেখে অষুধ দিলেন। কিছুক্ষণ পরে দীনু দত্ত চোখ খুললেন। তরুবালা বললেন—আমায় চিনতে পারছ?

—পারছি। কি হয়ে গেল!—দীনু দত্ত আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন। দেখা গেল অজ্ঞান হলেও আসল বিষয় ভোলেন নি!

তরুবালা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—কিছুই হয় নি। সবেতেই হারজিত আছে। অমন মুষড়ে পড়লে চলে? এবারে হয় নি, সামনের বারে হবে।

মামা শুকনো মুখে দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখে তরুবালা বললেন—শুকদেবকে পেলে?

দীনুবাবু বললেন—শুকদেবের জন্তেই এই শাস্তি হল। ছেলের মনে কষ্ট দিয়েছি, সেই জন্তেই এই কষ্ট পেলুম। শুকদেব কোথায়?

মামা মাথা নীচু করে বললে—তাকে তো কোথাও পেলুম না।

হাঁপাতে হাঁপাতে খেঁদী এল।

—সব্বনাশ হয়েছে মা, সব্বনাশ হয়েছে। গিনীদিদি আর তোমাদের শুকদেবদাদাবাবু গলায় দড়ি দিয়েছে।

তরুবালা চীৎকার করে বললেন—কি বলছিস তুই?

—গিনীদিদি চিঠি লিখে গেছে—আমরা মরতে চল্লুম।

খেঁদীর কাছে মরতে চলা মানেই গলায় দড়ি দেওয়া।

—শুকদেব! আর্তনাদ করে তরুবালা মূর্চ্ছিত হলেন।

সাড়ে সাতটা বাজল।

শীতকালের সাড়ে সাতটা, বেশ রাত। তারপর জুবিলী ট্যাঙ্কের আশে পাশে তাকালে তো কথাই নেই, মনে হবে রাত দুপুর। দূরে বড় রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে এক-আধজন লোক যাচ্ছে। পথের ধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা কুকুরগুলো পথচারীদের উদ্দেশে মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে উঠছে। ট্যাঙ্কের পূবদিকে কিছুটা দূর দিয়ে রেল লাইন, তার ওপাশে লম্বা একটা উঁচু টিলা, টিলার মাথার ওপর দিয়ে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের রক্তচক্ষুটা দেখা যাচ্ছে। থেকে থেকে শেয়ালের দল ডেকে উঠছে। মাঝে মাঝে ট্যাঙ্কের শান্ত জলে মাছের লেজের ঝাপ্টা বৃত্ত এঁকে দিচ্ছে। নীড়চ্যুত কোনও কোন পাখী হঠাৎ মাথার ওপর এক চক্র পাক খেয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বাতাস বইছে, মনে হচ্ছে যেন কারা ফিসফিস করে কথা কইছে। ভূতের ভয় অবশ্য কিংশুকের নেই, কিন্তু ভূতের ভয়ে না হোক ঠাণ্ডার ঠেলাতেই দাঁতকপাটি লাগবার জোগাড়।

অন্ধকারে কিংশুকের ঘড়িটা জ্বলছে, রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ি আই এ পাশ করার পর বাড়ি থেকে পেয়েছিল। ঘড়িটা দেখে কিংশুক দাঁতে দাঁত চাপতে চাপতে বললে—রাস্কেল!

রাগিণী কিংশুকের হাঁটুর ওপর মাথা রেখে চোখ বুজে কাত হয়ে ছিল, বললে—কিছু বললে?

—না, বড্ড মশা!

রাগিণী আবার চোখ বুজল। রাগিণী জানে, তাকে চিঠিতে জানান হয়েছে চিরমিলনের পরম লগ্ন এসেছে। সে জানে আজ মর্ত্যলোকের সব বন্ধন কাটিয়ে অমরলোকে, প্রেতলোকেও বলা যেতে পারে, চলে যাবে। কিংশুকের কথা অনুযায়ী সে বাড়িতে চিঠি লিখে এসেছে—বাবা, ভোট গোণার চরম উত্তেজনায় তোমরা যখন ডুবে থাকবে তখন আমি মায়ের মন্দিরে জীবনের সাথী বলে যাকে বরণ করেছি, তারই হাত ধরে জুবিলী ট্যাঙ্কের ঘন নীল জলের তলায় আশ্রয় নিয়ে চিরমিলনের রাজ্যে চলে যাব। যেখানে বাধা নেই, বিচ্ছেদ নেই, মাথার দিব্যি নেই। ভোটে তোমাদের একজনের না একজনের হার হবেই। শপথের যে কঠিন শৃঙ্খলে আমাদের শৃঙ্খলিত করেছ তা থেকে উদ্ধারের কোনও আশা নেই। তা ছাড়া আমরা চাই নে যে আমাদের জন্যে তোমাদের কোনও একজন অপরের কাছে মাথা নীচু কর। তোমাদের যে-কোনও একজনের মাথা নীচুতে আমাদের দু'জনেরই মাথা কাটা যাবে, তাই এ পথ বেছে নিলেম। পার যদি আমাদের ক্ষমা ক'রো।—ইতি, তোমাদের গিনী।

কিংশুক জানে যে যদিও সময় সাতটায় ঠিক করা হয়েছে তা হলেও পনের-বিশ মিনিট গ্রেস দিতে হবে। সভা-সমিতি হলে আরও বেশি সময় গ্রেস দিতে হ'ত, কিন্তু এত বড় একটা সাংঘাতিক ব্যাপারে মিনিট কুড়িই যথেষ্ট। কিন্তু, একি হ'ল সাড়ে সাতটা বেজে গেল! আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়? রাগিণীকেই বা কি বলে ভোলাবে? ওর ধৈর্য আর বাধা মানছে না। মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে

পারলে ও যেন বাঁচে। ওর যা অবস্থা তাতে না শেষকালে কোনও কথা না শুনে হাত ধরে টানতে টানতে···ভাবতেও কিংশুক কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে ঘেমে উঠল। শেষকালে কি সত্যাই···

—এই!—রাগিণী মদিরকণ্ঠে ডাকল।

—উঁ:!—কিংশুকের শুকিয়ে যাওয়া গলার ভেতর দিয়ে কোনও রকমে আওয়াজ বেরিয়ে এল।

—আর দেরি কেন? লগ্ন যে বয়ে যায়। শুনতে পাচ্ছ না আমাদের ডাকছে।

—কে?

—ট্যাঙ্কের ঐ শান্ত গভীর নীল জলের ভেতর থেকে দু'খানি অদৃশ্য হাত আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঐ দেখ, তুমি দেখতে পাচ্ছ না?···আসছি গো, আমরা আসছি।

কিংশুকের দেহের রক্তস্রোত থেমে গেল, হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাও আবার অদৃশ্য হাত! বললে—ধ্যাৎ!—তারপর বিড়বিড় করে আপন মনে বললে—কি হবে। এখনও কারুর পাত্তা নেই।

—কি বলছ?

—না, কিছু না।···আচ্ছা, তোমার ভয় করছে না।

—কিসের ভয়?

—ধর। এই মৃত্যুভয়। জলে ডুবে মরাটা শুনেছিলুম ট্রাবলসাম্। নিশ্বাস নেওয়া যায় না, জল খেয়ে পেট ফুলে ঢোল হয়ে যায়। তোমার খুব কষ্ট হবে।

—আমার কষ্টের জন্তে ভাবি না। তবে তুমি কষ্ট পাবে তাতেই আমার কষ্ট। জল খেয়ে তোমার পেট ফুলে উঠবে, নিশ্বাস নিতে পারবে না, ছটফট করবে! অথচ আমি তোমার পাশেই থাকব, তবুও কিছু করতে পারব না।

—নিশ্বাস নিতে পারব না। ছটফট করব! মানে···বলছিলুম কি···মানে তোমার ভয় করছে না।

—একটুও না, তুমি পাশে থাকবে আমার ভয় কিসের?

—না, ধর, মরবার সময় আমি হয়ত তোমার পাশে রইলুম না, ছিটকে সরে—।

—তা' কি করে যাবে। তোমার হাত শক্ত করে ধরে থাকব, ছিটকে যাবে কি, হাতই ছাড়াতে পারবে না।

—হাত ছাড়াতে পারব না?

—না, ইহলোক থেকে অমরলোকে আমি তোমার হাত ধরেই পৌঁছব। যারা ট্যাঙ্কের মাঝখান থেকে আমাদের দেহ দু'টো তুলবে তারা দেখবে আমি তোমার হাত ধরে আছি।

—ট্যাঙ্কের মাঝখানে আমি যাব কি করে? আমি ত' সাঁতার জানি না।

—আমি জানি, আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

—ও হাাঁ। তুমি ত' সাঁতার জান। ভাল সাঁতারই জান না

—নিশ্চয়ই। হানড্রেড ইয়ার্ডস্ ব্রেস্ট স্ট্রোক্ আর ফোর্ ফর্টিটি ইয়ার্ডস্ ফ্রী স্টাইলে আমার স্কুল রেকর্ড আছে। আমি তোমাকে

মাঝখানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। তুমি ত' সাঁতার জান না, তোমার তলিয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। মুশকিল হবে আমার।

—কেন?—যতটা সময় কথা বলে নেওয়া যায়, কিংশুক মনে মনে বললে।

—আমি যে সাঁতার জানি। যতক্ষণ দম থাকবে ততক্ষণ ডুবতে পারব না। তোমার এদিক থেকে ভারি সুবিধে, তলিয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না। শোন, আমি তোমার হাত ধরব যখন, তখন তুমিও শক্ত করে আমায় ধরে থেক। তা হলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাড়াতাড়ি তলিয়ে যেতে পারব। নইলে মুশকিল হবে। সাঁতার কাটতে হবে।

—কতক্ষণ একনাগাড়ে সাঁতার কাটতে পার?

—তা ঘণ্টাখানেক ত' পারবই। আগে আরও পারতুম।

—এর মধ্যে বাড়ি থেকে যদি টের পেয়ে এসে যায় তা হলে তোমায় জল থেকে টেনে তুলবে।

—তা পারে। ঐ কাদা খোবাল আবার জলের পোকা। ওর সঙ্গে পারব না।

—তোমায় টেনে তুলে নিয়ে যাবে আর আমি একলা জলের তলায় পড়ে থাকব!

রাগিণী তাড়াতাড়ি বললে—ঠিক বলেছ তবে আর দেরি নয়। এস, জলে নামি।

—জলে নামব'!

—হ্যাঁ। এখনও বাড়ির লোক টের পায় নি। আর দেরি করলে সব মাটি হয়ে যাবে। এস।

—আর—আর একটু বসি।

—না, এখানে বসলে দেরি হয়ে যাবে। বসব সেই অমরলোকে গিয়ে। কয়েক মিনিটের ত' ব্যাপার। ওঠ।

—তা-তা-বটে। তবে বলছিলুম কি, শেষ বিদায় নেবার আগে এই সুন্দর সৃষ্টিকে আর একটু—গুরুদেব বলেন নি, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। আমিও তাই বলছিলাম যে।—

—মরিতে—চাহি না? তবে আমরা এলাম কেন?

—না, না, তা নয়; (মনে মনে,—এখনও কারুর পাত্তা নেই। সাতটা পঞ্চাশ)।

মরবার আগে এই সুন্দর সৃষ্টিকে আরও একটু উপভোগ করি। তা তুমি যখন বলছ তখন আর দেরি।—

দূরে বড় রাস্তা দিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে দু'খানা মটরগাড়ি আসছে দেখা গেল। গাড়ি দু'খানা ট্যাঙ্কের ভেতর ঢুকল। ওরা নিশ্চয়ই। এবার তা হলে মরা যেতে পারে! কিংশুক বললে—তাহলে আর দেরি করা কেন, এস।

রাগিণী হতাশার সুরে বললে—লাভ নেই। গাড়ি আসছে দেখছ না, ওরা ঠিক আমাদের খুঁজে বার করবে। ভজুকাকা আমাদের বসবার জায়গা জানে।

—তবে চল অন্য জায়গায়—ঐ ঘন ঝোপের আড়ালে লুকোই।

—লাভ নেই। উঠে দাঁড়ালেই হেডলাইটের আলোয় দেখা যাবে।

—তা হলে কি হবে? কিন্তু ফিরব না কিছুতেই, মরণ পণ করে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, তখন মরতেই হবে। এসো জলে নামি।

কিংশুক হাত ধরে টান মারলেও রাগিণী নড়ল না। মটরগাড়ি দু'টো এসে পড়েছে। কিংশুক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু এ কি! গাড়ি দু'টো তো থামল না। সোজা রেল লাইনের দিকে চলে গেল। রেল লাইন পার হল তারপর তালডাঙার রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিংশুক অপস্রিয়মান গাড়ি দু'টোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললে—চলে গেল!

গাড়ি দু'টো চলে যাবার পর রাগিণী খুশিতে ডগমগ হয়ে বললে—জান, আমি একমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলুম, এ গাড়িতে যেন আমাদের কেউ খুঁজতে না আসে। ভগবান আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। মৃত্যুতে আর আমাদের কোনও বাধা আসবে না। নাও, ওঠ—বলে জলের ধারে গিয়ে জুতোজোড়া খুলে শাড়িটা আঁট করে পরে আঁচলটা ভাল করে কোমরে জড়িয়ে তৈরি হয়ে বললে—ওঠ।

কিংশুক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—হ্যাঁ, উঠি। চপ্পলটা খুলে ফেলি কি বল?

বড় রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। কিংশুক আর ও মরীচিকার পানে তাকাতে রাজী নয়। জুতো খুলে উঠে জলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে রাগিণী ওর বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে—একটা চুমু খাও।

—অ্যাঁ!

—মৃত্যুর আগে পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে আমাদের প্রথম ও শেষ চুম্বন।

—চুমু খাব?

—হ্যাঁ, অ্যাক্টারদের মত।

—অ্যাক্টারদের মত?

—হ্যাঁ। ইংলিশ ফিল্মে দেখ নি, হীরো কেমন করে চুমু খায়।

—কিন্তু আমি তো মানে—কোনও দিন চুমু—

একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠে ডাক শোনা গেল—গুরুদেব, গিনী, কিং—

কিংশুক লাফিয়ে উঠে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে গাড়িগুলো থেমেছে আর তার ভেতর থেকে সবাই নেমে প্রাণপণে ওদের দিকে ছুটে আসছে। কিংশুক একবার সামনের জলের দিকে তাকিয়ে দেখলে, ওর জানা আছে যে পাড় থেকে পাঁচ-সাত হাত অবধি ডুব-জল হবে না, লোকেরা দাঁড়িয়ে স্নান করে। রাগিণীর হাত ধরে একটা টান মেরে বললে—চলে এস।

রাগিণী তৈরি ছিল না। আচমকা হ্যাঁচকা টান সামলাতে না পেরে সে কিংশুকের গায়ের ওপর পড়ে গেল এবং টাল সামলাবার জন্যে কিংশুককে জড়িয়ে ধরল, তারপরেই দেখা গেল দু'জনেই জলে গড়িয়ে পড়েছে।

অল্পজল হলে কি হয়, কিংশুক পড়ল নীচে তার ওপরে রাগিণী। রাগিণী পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই উঠতে পারল না তার নিজের উঠে দাঁড়াতে এবং কিংশুককে টেনে তুলতে কিছুটা সময় লাগল। সেই অল্পকালের মধ্যেই দমবন্ধ হয়ে জল খেয়ে জলে ডুবে মরাটা যে কি জিনিষ তার আন্দাজ পেল কিংশুক পেল।

দীনু দত্ত ও কুঞ্জ রাহা দলবলে এসে হাজির হলেন। একসঙ্গে গোটা দশ-বারো টর্চের আলো এধারে-ওধারে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে

কিংশুকদের গায়ের ওপর পড়তেই প্রায় সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন—ঐ যে ঐ যে। বেঁচে আছে।

দা ঘোষাল গায়ের সোয়েটারটা খুলে জলের দিকে ছুটতে ছুটতে —মা শেতলা, মুখ রাখিস্ মা! স্যরের মেয়ে জামাইকে যেন অনতে পারি. বলেই ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েই আর্তনাদ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—দূর শালা, এ যে পায়ের চেটোও না দেখছি। ঝুটমুট ভিজে মলুম।

দীনুবাবু কিংশুককে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। কুঞ্জ রাঙা রাগিণীর হাত দু'টো ধরে বললেন—তোর এই অধম বাপের অপরাধের কথা ভুলে যা মা। আমি কথা দিচ্ছি তোর আর শুকদেবের মধ্যে কোনদিনই বাধা হয়ে দাঁড়াব না। শুকদেব আমার পরম আদরের জিনিষ, সে আমার জামাই। দীনুদা' গিনীকে আশীর্বাদ করুন।

দীনুবাবু চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন—আশীর্বাদ করার যোগ্য আমি নই। আমার ঘরের লক্ষ্মীকে আমি অপমান করেছি আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। এখন গিন্নী-মা যদি তার নিজের ঘর বুঝে নেয় তাহলে বুঝব কিছুটা পাপ কমল। তাড়াতাড়ি চল, শুকদেবের মা কেমন আছেন কে জানে।

কিংশুক শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল, কোনও রকমে বললে—মা-র কি হয়েছে?

—অজ্ঞান হয়ে আছেন।··মামা বললে।

—অজ্ঞান! কেন!

—তোমাদের কথা শুনে।—দীনু দত্ত বললেন।

কিংশুক ও তার বন্ধুরা এক গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছাড়বার পর পকেট থেকে বিড়ি বার করে মামা বললে—খাবি, আবদুলের দোকানের মিঠেকড়া লাল সুতোর বিড়ি। এক টান মারলে ঠাণ্ডা বাপ বাপ বলে পালাবে

—না। তোদের এত দেরি হল যে। সাতটার ভেতর আসবার কথা ছিল না? আর একটু লে যে হয়ে গিছল।

মহাবী বললে—তা'হয়ে গেলে আর কি করব। পর পর ডবল পতন ও মূর্চ্ছা। প্রথমে দীনুকা' তারপর কাকামা।

—বাবাও অজ্ঞান হয়েছিলেন?

মামা বললে—হ্যাঁ। ভোটে হেরে গেছেন।

হেরে গেছেন!

মাসকেল বললে—প্রাণবল্লভ শেষকালে ফু ফু করে বেরিয়ে গেল। তা ভালই হয়েছে। কুঞ্জবাবু, দীনুকা' দু'জনে হেরেছেন ভালই হয়েছে।

মামা বললে—শেষ খবর যখন এল তখন সাড়ে ছ'টা। বলতে যাব যে তোকে পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক সেই মুখে দীনুকা' পড়ে গেলেম। জল আন, ডাক্তার আন। নাড়ী দেখি কনুই-এর ওপর উঠেছে। কি করি! চোখে কানে পথ দেখছি না। সত্যি সত্যিই চোখের সামনে যখন একজন মরতে বসেছে তখন কি আর যারা মরবার জন্যে ছেলেখেলা করছে তাদের কথা মনে থাকে। বল তুই-ই বল। ডাক্তার এসে ফোঁড়াফুঁড়ি করে তবে দীনুকা'র নাড়ী বাগে এল। চোখ খুললেন, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। তখন তোদের কথা—মাইরী বলছি মনেই ছিল না।

কিংশুক বার দুই হেঁচে বললে—তা থাকবে কেন? আমরা মরি আর বাঁচি তাতে তোদের কি। কিন্তু এ প্ল্যানটা তুই-ই দিয়েছিলি।

—তুই মিথ্যে রাগ করছিস। ঐ অবস্থায় পড়লে লোকে নিজের হাত পা খুঁজে পায় না। তবে হ্যাঁ ভগবান আছেন, ঠিক ঐ সময়ে ও বাড়ির খেপী এল। সে যখন বললে যে তাদের দিদিমণিকে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন মনে পড়ল তোদের ত' সাতটায় মরবার কথা। বা বাবা:। এতক্ষণে বোধ হয় কারবার হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বেরুতে যাব খুড়ীমা পড়ে গেলেন। বোঝ কি গেরো! গেল আরও প্রানের বিশ মিনিট।

মাসকেল বললে—তাহলেই বল, আমাদের অপরাধ কোথায়। ওয়াইফ-এর পরই যাঁরা আপনার লোক সেই বাপ মা তাঁরাই যদি অবুঝের মত আনটাইমলি অজ্ঞান হন তাহলে—

মহাবীর মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করে বললে—সাধে বলি ব্রাদার যে থ্যাঙ্ক গড আমার—।

শেষ

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাণু ভৌমিক (দাস)

ব্যাগে রুমাল ভরতে ভরতে পুতুল ভাবে—হ্যাঁ, সব প্রশ্নেরই উত্তর পেয়েছিল। কিন্তু কত ধীরে ধীরে। আজও শেষ হয় নি উত্তরের পালা। লোকটাকে এখনও সম্পূর্ণ চিনতে পারলো না সে।

পরদিন গিয়ে লোকটির দিকে তাকায় নি কিংবা তার মনের জটিলতার কথা ভেবে মনের সময় নষ্ট করে নি। কাজ করতে এসেছে—কাজ করে যাবে। ব্যস।

—ওর ব্যস্ততা দেখে হেসে বলেছিল আরে, অত ব্যস্ত কিসের।

—কাজগুলি জেনে নিতে পারলে আমার পক্ষে সহজ হবে!

—কাজের মালিককে জেনে নিতে পারলে আরও সহজ হতো না?

—একটি লোককে জানা কি অতই সহজ। পুতুল তির্যকভাবে তাকায়।

জ্বলে উঠেছে। ঝকঝকিয়ে জ্বলে উঠেছে লোকটির মুখ। জ্বলে উঠেই নিভে যায়। ঠাণ্ডা বিদ্রূপে বলে, পৃথিবীতে সব মানুষকেই জানা খুব সহজ। একই ফরমূলায় পড়ে। বাকি শুধু কয়েকজন।

ক-য়ে-ক-জ-ন থেমে থেমে টেনে টেনে উচ্চারণ করে বৃত্তের মত নরেশের চারিপাশে ঘুরে গেল কথাটা।

—কাজ কিছুই না, গাদা গাদা লেখা নকল করা। এধারে-ওধারে টুকরো কাগজে ছড়িয়ে আছে গল্প, গান, কবিতা। সুন্দর বাঁধান খাতায় সেগুলিকে নকল করতো পুতুল। পুরাণো লেখাগুলি ফাইলে সাজিয়ে রাখতো।

—ভাগ্যিস হাতের লেখাটা ভাল ছিল নইলে তো আর চাকুরী পেতাম না—পুতুল বলেছিল একদিন।

—চাকুরী দিতাম। যে কোন একটা—হাতের লেখার কাজ, না হলে মন্দ লেখার কাজ—

চমকে তাকায় পুতুল। নবযৌবনা নারীর সন্দিগ্ধ চোখ।

একদৃষ্টে তারই দিকে তাকিয়ে আছে নরেশ। মুখের ভাষার সঙ্গে সে দৃষ্টির কোন সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য নেই। বিরক্তিতে তাকিয়ে আছে দু'টি চোখ—

পুতুলের মুখের লজ্জার লালিমা, দ্বিধা অসহায় কারুণ্যের দিকে অনেকক্ষণ একাগ্রভাবে তাকিয়ে থাকে সেই চোখ দু'টি। ঘষা কাচের মত দু'টি চোখ।

তারপর পুতুল যখন স্থির হয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছে তখনই শুনতে পায়—লেখা দিয়ে চাকুরীতে বহাল করি নি—চাকুরী দিয়েছি লেখিকাকে দেখে।

এবারে পুতুল চোখ তুলতেই পারে না। মনে হয়, চোখ তুললেই ও দেখবে মুগ্ধ রাক্ষুসে ক্ষুধাভরা দু'টি চোখ। কলম থেমে যায়। কি এর পর? এখনই হয় তো এগিয়ে আসবে লোকটা—তারপর···

বইয়ে পড়া সিনেমায় দেখা কতগুলি ছবি। বই-খাতা-টেবিল উল্টে ফেলে একটি তরুণী ছুটে চলছে। পেছনে দু'টি হাত—দুটি চোখ—অক্টোপাশের দৃঢ় বাঁধন আর রাক্ষুসে ক্ষুধা।

পালাও ··পালাও··দূরে··আরো দূরে··বহুদূরে। নেই—পেছনের কালো ছায়া সরে গিয়েছে··স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে থাকে সে। কিন্তু··দাঁড়াতেও সে পারে না। পায়ের তলায় মাটি নেই—চাকুরী নেই তার।

অনেকক্ষণ ওভাবে স্থির হয়ে বসে থাকে পুতুল। কলমটা শরীরের চাপে ঢুকে যায় কাগজে। কিন্তু না···

নেই কোন পদশব্দ। কোন স্পর্শ।

মুখ না তুলেই ভ্রূ দু'টি তুলে তাকায় পুতুল। সেই চোখ—ঘষা কাচের মত দু'টি চোখ। সে চোখে মুগ্ধতা নেই, বিস্ময় নেই, শ্রদ্ধা নেই। তবু, চকচক করছে চোখ দু'টি। কিসের আলো ওখানে প্রতিফলিত?

আলো! কোন আলো!

অনেকদিন পরে এই আলোর রং চিনতে পেরেছিল পুতুল।

—একটি কবিতা বলছি লিখে নিন—সহজ সাধারণ কণ্ঠে আদেশ।

তাকিয়ে দেখে পুতুল। চোখ দু'টিও সহজ সরল হয়ে উঠছে।

—কেমন হয়েছে?

—খুব ভাল। আচ্ছা, আপনি লেখা ছাপেন না কেন?

—কেন ছাপবো? পাল্টা গম্ভীর প্রশ্ন। কণ্ঠে অপমানিতের উগ্রতা।

—মানে···এই সবাই তো ছাপে···

—সবাই ছাপে বলেই আমি ছাপবো না। সবাই যা করে আমি তা করি না। সবাই যা বলে আমি তা বলি না। সবাই যা চায় আমি তা চাই না।

এত গাম্ভীর্যে, এত জোরে কোনদিন কোন কথা বলে নি নরেশবাবু। সাধারণত ওঁর সমস্ত কথাগুলিই একটু হাল্কা—একটু আলগা।

সমগ্র ঘরময় সেই গম্ভীর গলার কথাগুলি ঘুরে বেড়ায়। সবাই যা বলে আমি তা বলি না···সবাই যা করে···আমি তা করি না···

অনেকক্ষণ পরে পুতুল আবার বলে, কিন্তু লেখাগুলি তো নষ্ট হয়ে যাবে।

—ধুলোর চেয়ে বাতাস ভাল।

—মানে?

—এক টাকা···দু'টাকা···আট আনা···শেষটা সের দরে বিক্রীত হওয়া—সেলফে, টেবিলে উনুনে ছাই হওয়া—এই তো ছাপা বইয়ের ইতিহাস-ভাগ্য। তার চেয়ে না-ই বা গেল সে লোকের দুয়ারে দুয়ারে···শূন্যে হাওয়া হয়ে থাক···যে জানতে চায় সেই শুধু জানুক···

—কি করে?

—এখানে। এই ঘরে। এই ঘরে সাজিয়ে রাখব আমার সব লেখা। যে জানতে চায় সে আসবে এখানে—দেখবে আমার মূর্তি, কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক আর আপনার হাতের অনুলেখনে লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস মিলিয়ে দেখবে তারা। সমগ্র হয়ে উঠবে লেখার রূপ।

মাঝে-মাঝে এমনিভাবে কথা বলতো নরেশ। শক্তিভরা সৌন্দর্যময় বাক্য। মাঝে মাঝে ভালো লেখা লিখতো নরেশ। কিন্তু প্রায় সময়ই তার লেখা বাজে। মনের কতগুলি নোংরা ছাপ।

আর কখন কখন অকারণেই আঘাত করতো পুতুলকে। লাল হয়ে উঠতো পুতুল লজ্জায়, অসহায় ব্যথায়।

ইজিচেয়ারে শুয়ে একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতো নরেশ। ঘষা কাচের মত দু'টি চোখে জ্বলতো সেই আলো—যে আলোর রং পুতুল চেনে না।

পুতুলের চাকুরী ছেড়ে না দিতে পারার অসহায় যন্ত্রণার দিকে তাকিয়ে ঝকঝকিয়ে উঠতো এই আলোর রং।

পাঁচ মিনিটের যন্ত্রণা—তারপরেই কি শান্তি···অন্তত পাঁচ দিন। কোন একটা আঘাত দিয়েই চুপ করে যেত নরেশ। ও চোখের আলো নিয়ে শান্ত সুন্দর হয়ে উঠতো চোখ দু'টি। একদম বদলে যেত সে। সাদা, বিষণ্ণ চেহারা। দূষিত খানিকটা বাষ্প বের করে দিয়ে সুস্থির হয়েছে সে।

দু'দিন, তিন দিন বেশ চলে যায়। চমৎকার ভদ্রলোক।
কিন্তু অলক্ষিতে জমছে বিষ—একফোঁটা দু'ফোঁটা···তারপরেই হঠাৎ বিস্ফোরণ···

চাকুরীতে যোগ দেবার তিন-চারদিন পরেই একটা কবিতা নকল করতে দিয়েছিল নরেশ। কবিতাটার নাম ছিল—যৌবন দেখিয়ে চাকুরী করতে এসেছিল যে মেয়েটি। অশ্লীল শব্দে ভরা—অপাঠ্য কবিতা।

প্রথম দু' লাইন নকল করেই কলম থেমে গিয়েছিল পুতুলের। নাম নেই কিন্তু পুতুলের বিবরণে ভর্তি কবিতাটা। একটা শিশুও বুঝতে পারবে···

অপমানে, লাঞ্ছনায় চোখ জলে ভরে উঠেছিল পুতুলের। কোনদিকে তাকাতে পারে নি সে। গোপনে চোখ মুছতে মুছতে নিজ হাতে, ঝকঝকে কালিতে নকল করেছিল সেই অপমানকর কবিতা।

—এ সবই আমার প্রাপ্য। চাকুরী-জীবনের মাশুল···

চোখ নীচু করে কবিতাটা নকল করে ভিজে ভিজে নীচু চোখেই বাড়ি চলে গিয়েছিল সে। বাড়িতে গিয়ে কথা বলে নি কারো সঙ্গে—অনেকক্ষণ একা কেঁদেছিল। আর যাব না—ওখানে আর যাব না—বারবার নিজের মনেই বলেছিল—সুরুতেই শেষ করে দেব এই যন্ত্রণা···

কিন্তু···

চারিপাশে কতগুলি মুখ, পুতুলের চাকুরীর সংবাদে আনন্দে ঝকঝকিয়ে উঠেছিল মুখগুলি। কি করে সেই মুখের আলো নেভাবে পুতুল আর কেনই বা।

—কেন? কি কারণে? তার চাকুরীদাতা তাকে গালি দেন নি, শুধু একটা কবিতা লিখে ব্যঙ্গ করেছেন। সে কবিতায় তার নাম নেই, তবে কেন ইচ্ছে করে সেই ব্যঙ্গ গায়ে মাখিয়ে নিচ্ছে পুতুল।

জল শুকিয়ে গেছে—চোখের নীচে শুধু কঠিন দু'টি রেখা। হাতের তালু দিয়ে রেখা দু'টি মুছে নেয় পুতুল—মন নিয়ে এ সস্তা সেণ্টিমেণ্টাল হবার সময় আমার নেই। মনকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েই চাকুরী করতে যাব আমি। তালাবন্ধ আলমারীর কোণে অনেক কাপড়ের নীচে রেখে যাব মনকে। তা হলে, কোন অপমানই গায়ে লাগবে না আমার।

পরদিন ওখানে গিয়ে দেখলো ঘর খালি। পাখা খুলতেই একটুকরো কাগজ উড়ে এসে পড়ে ওর সামনে—ক্ষুধা-নয় যৌবনের জ্বালা—চাকুরী ছলনা···

তার নিজের হাতে কপি করা কালকের কবিতার একটু টুকরো। এ কি? তাকিয়ে দেখে টুকরো কাগজের বাক্সে নরেশের লেখা মূল কবিতাটি এবং তার লেখা কপি দু'টোই টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে।

মনকে আলমারী বন্দী করে রেখে এলেও মন একটু অবাক হয়ে ভাবে—আশ্চর্য! কিন্তু, তখনই তাকে সংযত করে পুতুল। এখানে তোমার ভাবনার বা সমালোচনার কোন প্রয়োজন নেই; তুমি শুধু মরার মত শুয়ে-শুয়ে দেখে যাও।

কিছুক্ষণ পরেই নরেশ চাকর দিয়ে কতকগুলি কাজ পাঠিয়ে দিল ওকে। কতগুলি চিঠি লেখা। কতগুলি কাজ করা। সেই ছিন্ন কাগজগুলির উপর আরো অনেক কাগজ পড়লো—একটু পরে পুতুল নিজেই ভুলে গেল···ভুলে গেল কবিতাটির কথা—ভুলে গেল সেই অপমান, বেদনা।

আকাশের মতই মন। ক্ষণে ক্ষণে বদলায় তার রং।

কয়েকদিন কেটে গেল কাজের ব্যস্ততায় নয়, কাজের আনন্দে।

বেশ লাগে এখানে কাজ করতে, সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কাজ। কখন চিঠি লেখা, কখন গল্প, কবিতা, উপন্যাস নকল করা, কখন বা বই থেকে কিছু পড়ে শোনানো, কখন পাতার পর পাতা শুধু অনুবাদ করা।

সেদিন কাগজে মার্জিন দেবার জন্য লাল পেন্সিলটা সরু করে কাটছিল পুতুল···কতগুলি শব্দ কানে গেল—ঠিক অর্থবোধ না হলেও কেমন যেন বেসুরো ঠেকলো কথাগুলি। মুখ ফিরিয়ে তাকাল পুতুল···

আর সেইদিনই প্রথম দেখলো নরেশের ঘষা কাচের মত দু'টি চোখ। দেখলো আর চমকে উঠলো—এ কয়দিনের মুখ নয়—নতুন একটা মুখ নিয়ে বসে আছে নরেশ—নাকটা ফুলে উঠেছে একটু—সমগ্র মুখে হিংস্রতার মৃদু আভা।

—চাকুরী করাই বিরক্তিকর—নরেশ বলে।

—কেন? বিস্মিত হয় পুতুল। ভয়ও পায় একটু। কাজে কোন ত্রুটি হয়েছে কি?

—চাকুরী করবে কুলি, মজুর—কালো, কুৎসিত, বুড়োরা; আপনার মত সুন্দরী, নবযৌবনা মেয়ে কেন কাজ করবে! ধীরে ধীরে জিভের রসে জারিয়ে-জারিয়ে কথাগুলি বলে নরেশ।

এই আকস্মিক অভাবিত আঘাতের অর্থবোধ করতে পারে না পুতুল। শুধু বেদনায় মুখখানা নীল হয়ে ওঠে।

—বিশেষত···নরেশ আবার সুরু করে।

'বিশেষত' কি তা শুনতে চায় না পুতুল। যেটুকু শুনেছে তাতেই ভরা পূর্ণ হয়ে গেছে তার। কিন্তু সে শুনতে না চাইলে কি হবে? নরেশ তাকে শোনাবেই।

—বিশেষত যারা স্বামী ত্যাগ করে আসে—

নীল হয়ে গেছে পুতুলের সমগ্র দেহ। বেদনার প্রতিমূর্তির মত স্থির হয়ে বসে থাকে সে। আরও অপমান, আরও লাঞ্ছনা সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত করে নেয় মনকে। কিন্তু না। সমগ্র ঘরে শান্ত নীরবতা।

সেই নীরবতার কারণ জানবার জন্য তাকিয়ে চমকে ওঠে পুতুল। চকচকে দু'টি চোখ লেহন করছে তার সর্বাঙ্গ। প্রাগৈতিহাসিক একটি হিংস্র জন্তু দুর্দম ক্ষুধায় অস্থির হয়ে উঠেছে।

বিস্ময়ের অভিঘাতে অপমানের বেদনাও ভুলে যায় পুতুল। অবাক-চোখে দেখে সেই আদিম জন্তুর ক্ষুধানিবৃত্তির আনন্দ।

কয়েকদিনের শান্ত পরিবেশের পর আবার সেই ক্ষুধা। হিস্টিরিয়ার মত কয়েকদিন পরে পরে সুরু হয় তার আক্রমণ। কোন না কোন বিষয় নিয়ে আত্মাকে অপমানিত করে শতমুখে পান করে সেই বেদনার ধারা।

একদিন বেলা তিনটের সময় একটি ছোট ছেলে দোরের সামনে এসে দাঁড়ায়। পুতুল আগেই শুনেছিল নরেশবাবুর দু'টি বোন এখানে থাকে—একটি বিধবা অপরা সধবা। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী। তাদেরই কেউ হবে—ছেলেটিকে চিনতে না পারলেও এটুকু বোঝে পুতুল।

বেশ দেখতে ছেলেটি। একবার তাকিয়ে এটুকু ভেবে নিজের মনে কাজ করতে থাকে পুতুল। প্রায় দশ মিনিট পরে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়—নরেশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি—কালো চোখ দু'টিতে ভীত অসহায় আর্তি।

মুখ তুলে একবারও তাকায় নি নরেশ; পড়ে চলেছে একমনে; ছেলেটিও দাঁড়িয়ে আছে একভাবে। দুটি পাথরের মূর্তি।

না তাকালেও নরেশের মুখভাবে ঈষৎ পরিবর্তন। মৃদু হিংস্রতার আভায় ছেয়ে গেছে সেই মুখ।

—তা হলে আমি শুধু একা নই—পুতুল ভাবে, আরও অনেক শিকার আছে নরেশবাবুর।

আরও কিছুক্ষণ এভাবে কাটাবার পর নরেশ যেন হঠাৎ তাকিয়ে দেখতে পায় ছেলেটিকে। বলে, কি রে ভানু আয় ভেতরে আয়।

আশ্চর্য। এই একটি কথাতেই সহজ হয়ে ওঠে ভানু; দ্রুতপায়ে ঘরে এসে ঢোকে—সংসার খরচের টাকা চেয়েছে ওর মা। ভানুর হাতে কতকগুলি টাকা দিয়ে দেয় নরেশ। সংসারের সহজ এক ছবি।

সেদিন, পরদিন, পুতুল শুধু এই দৃশ্যটির কথা ভাবে। ও বুঝতে পারে নরেশ অসুস্থ। বেদনার রস ভিন্ন নিবৃত্ত হয় না সেই অসুস্থ ক্ষুধা। আর এই ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়োজনানুযায়ী এক ক্ষমতা রয়েছে তার স্বভাবে। সে জানে, কাকে কিভাবে আঘাত করলে সে ব্যথা পাবে সর্বাধিক।

গোড়া থেকেই পুতুলের চরিত্রের একটা দিক বুঝে নিয়েছে সে। পুতুলের দুর্বলতা—কোন কোণে সামান্য আঘাত করলেও বেদনায় নীল হয়ে উঠবে পুতুল। এবং সেই একটি দিকেই থেকে থেকে বারবার তার আঘাতের প্রবৃত্তি। তৃষ্ণার্ত হলেই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রস বের করে।

একদিন পুতুলের কাজ, কাজের ধরণ এমন কি কাজ করতে বসবার ধরণ পর্যন্ত নিয়ে গভীর বিরক্তি প্রকাশ করছিল নরেশ। শেষে সহ্য করতে না পেরে পুতুল বলে, তা হলে আমাকে রেখেছেন কেন?

—তোমাকে রেখেছি কাজের জন্য, তোমাকে রেখেছি তোমারই জন্য। আবার সেই এক ধরণের কথা। যে কথায় কিছুমাত্র সত্য নেই। নরেশ তা ভালভাবেই জানে এমন কি পুতুলও বুঝে নিয়েছে তা।

সম্বোধন নেমেছে আপনি থেকে তুমিতে। এ যন্ত্রণা দেবারই একটা উপায়। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা সত্ত্বেও পুতুলের মুখে কালো ছায়া ঘনিয়ে ওঠে।

সেইদিকে তাকিয়ে উৎফুল্লকণ্ঠে নরেশ বলে, বুঝলে, যা আমার ভাল লাগে তা কাঞ্চন মূল্যে কিনে নি।

—না। না। না। বারবার মনে জপতে থাকে পুতুল। কিছুতেই সংযম হারাব না আমি। কিছুতেই মুখে ফুটতে দেব না বেদনার ছায়া—ওর ক্ষুধা মেটাব না। কিন্তু সামনে আয়না থাকলে দেখতে পেত সমস্ত মুখ ওর বেদনায় নীল-কালো হয়ে উঠেছে।

অনেকদিন ভেবেছে পুতুল। কাজ করতে করতে নরেশের দিকে তাকিয়ে কলম থেমে গিয়েছে—খেতে বসে অন্যমনস্কভাবে হাত গুটিয়ে নিয়েছে সে—অস্পষ্টভাবে সামনে ভেসে উঠেছে নরেশের মুখ আর ছায়া ছায়া ভয়···কেন? এমন অদ্ভুত লোক···নরেশ···কেন···কেন···কি চায় ও—

দুইটি প্রশ্ন! কেন এমন করে? কি চায় ও? বারবার মন দোলায়িত হয়ে উঠেছে তার—

তারপর একদিন সবই জানতে পারল।

অফিস-বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে পুতুল। এই ছায়াঢাকা সবুজ পথের শেষ সীমানায় প্রকাণ্ড মাঠের মাঝেই নরেশের বাড়ি।

ক্লান্ত হয়ে গাছের তলায় দাঁড়ায় পুতুল। সহর থেকে অনেকটা দূরে এককোণে এই বাড়ি। হাঁটতে হাঁটতে যখন মনে হয় আর পারছে না। ভাবে রিক্সা করে এলে বেশ হতো তখনই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে পৌঁছে গেছে—

—এসে গেছি, আর দু' চার মিনিট—পুতুল ভাবে, কিন্তু এই কয় মিনিটের পথ···

কাল সম্পূর্ণ নূতন ধরণের আক্রমণ ছিল নরেশের। বেরিয়ে আসবার একটুক্ষণ আগে হঠাৎ সুরু করে সে, পাড়ার লোকরা কি বলছে কে জানে?

—কি বিষয়ে? জিজ্ঞাসা করেছিল পুতুল।

—তোমার আমার বিষয়ে।

আর কোন কথা বলে নি পুতুল। তাকায়ও নি। 'তুমি' সম্বোধন-শুনেই সে, বুঝতে পেরেছে নরেশের মনোভাব। হিংস্র ক্ষুধা জেগে উঠেছে—তার মনে।

প্রথম দিনের অকস্মাৎ 'তুমি' সম্বোধনের পর বহুদিন কেটে গেছে। নরেশ 'আপনি'ই বজায় রেখেছে সব সময়ে। শুধু মাঝে কয়েকবার এমনি হিংস্র ক্ষুধার জ্বালায় আপনি নামিয়েছে তুমিতে।

—বলবেই তো, নরেশ বলে, এ রকম ব্যবহারে বলবে না··

ঘড়িতে ঢং-ঢং শব্দে চারটে বেজে ওঠে।

—আমি যাই। পুতুল বলে। উত্তরের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে পড়ে সে। অফিস টাইম শেষ হয়ে গেছে—এখন সে মুক্ত।

আজ পুনরায় সেই অফিসে ঢুকবার মুখে দাঁড়িয়ে মন ভয়ে বিকল হয়ে ওঠে। পা দু'টো কেঁপে ওঠে থরথরিয়ে। নিশ্চয়ই কালকের চেপে রাখা আক্রমণ আজ সুরু হবে দ্বিগুণ বেগে।

নীল আকাশের নীচে খানিকটা সবুজ রং। বাদামী কাণ্ডে হেলান দিয়ে সেই সবুজের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে পুতুল। হাওয়া বয়ে যায়—একরাশ উজ্জ্বল হাসি হেসে ওঠে সবুজ পাতাগুলি।

হাসি। সবুজ হাসি। রুক্ষ পৃথিবীর বুকে, সীমাহীন হৃদয়হীন নীলাভার নীচে দাঁড়িয়ে আছে এই গাছ। তবু সে হাসছে···

হাসি···

উজ্জ্বল সবুজ হাসি ··

শক্ত হাতে ব্যাগ ধরে এগিয়ে যায় পুতুল। নরেশের দিকে না তাকিয়েই গতদিনের অসমাপ্ত কাজ করতে সুরু করে। মনে মনে এক কঠিন সংকল্প করেছে সে।

—কেনই বা বলবে না, নরেশের গলা শোনা যায়, গতকাল কথা যেখানে ছেদ পড়েছিল ঠিক সেখান থেকেই সুরু করেছে সে। যেন কাল নয় এখনই এই মুহূর্তে কথা সুরু হয়েছিল। শুধু একবার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিল পুতুল তাই ছেদ পড়েছিল ক্ষণিকের।

আশ্চর্য! টেবিলের কোণে চোখ রেখে পুতুল ভাবে, আশ্চর্য। কালের সেই ঘটনার পর কেটে গেছে পুরো একটি রাত, পূর্ণ প্রায় একটি দিবস। কত পরিবর্তন ঘটে গেল সমগ্র পৃথিবীতে। সারা দিনের উত্তপ্ত জ্বলে যাওয়া সূর্য অপরাহ্নে সাতটা রং ছড়িয়ে আকাশকে রাঙিয়ে অস্ত গেল। শান্ত স্তব্ধ ধূসর সন্ধ্যা—নীরব নগ্ন মোহময় রাত্রি—নতুন প্রভাতের নতুন ঔজ্জ্বল্য—

আর ও কি না স্থির হয়ে বসে রইলো ওর সেই বিদ্বেষবৃত্তের মধ্যবিন্দুতে।

—সেক্রেটারীর সঙ্গে 'বস'-এর প্রেমকাহিনীর ঘটনা লোকে স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নেয়। পুতুলের কানে এ কথাটা যেতেই চিন্তা ভুলে চমকে ওঠে। বুঝতে পারে মাঝখানের অনেকগুলি কথা শুনতে পায় নি সে।

—কাজেই তোমাকে ওরা আমার প্রেমিকা ভাববে তাতে আশ্চর্য কি! কথা শেষ করে নরেশ প্রত্যাশাভরা দু'চোখ মেলে তাকায়।

শান্ত স্থৈর্যে বসে আছে পুতুল। ভ্রূ দু'টি একটু কুঁচকে উঠেছে। কিন্তু মুখে যন্ত্রণার কোন ছাপ নেই বরং একটু বিদ্রূপের আলো।

বিহ্বলতার ছায়া নামে নরেশের মুখে। হতাশ হয়ে গেছে—একটু যেন ভয়ও পেয়েছে। ঠিক যা ঘটা উচিত ছিল তা ঘটছে না···কেন···

—সকলেই যখন আমাদের প্রেমিক-প্রেমিকা ভাবছে তখন আমাদের পবিত্র থেকে কি লাভ? কণ্ঠে জোর দিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে নরেশ।

জোরে হেসে ওঠে পুতুল। প্রাণ খোলা উচ্চ হাসি। সে রকম হাসি আজ পর্যন্ত কখনও হাসে নি পুতুল। বিষণ্ণ নীল আকাশের নীচে একরাশ সবুজ···পাপড়ির হাসি···

সেই হাসির সামনে একান্ত অপ্রতিভ হয়ে কুঁকড়ে লুটিয়ে যায় নরেশ। হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে গেছে ও। আর সেই অসহায়, অক্ষম, আক্রোশের দিকে তাকিয়ে দু'চোখ জলে ভরে ওঠে পুতুলের। নিজের যন্ত্রণা লোকে মেটাতে চায় অপরের মুখের যন্ত্রণার ছবি দেখে। যে পায়ে জুতো জোটাতে পারে না সেই পথে পথে খুঁজে বেড়ায় পদহীন মানব।

প্রায় দুই ঘণ্টা কেটে যায়। পুতুল নিজের মনে কাজ করছে। নরেশ মুখ ফিরিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

—হাসছিলেন কেন? হঠাৎ মুখে ফিরিয়ে প্রশ্ন করে নরেশ। কণ্ঠে সেই পুরাণো আক্রোশ, কিন্তু চোখে একটু ভয়ের ছায়া।

—এমনি।

—এমনি কেউ হাসে না। শুধু···

—কি?

—শুধু পাগল আর নির্বোধরা অকারণে হাসে।

—তবে আমি হয়তো তাই।

—কি?

—পাগল কিংবা নির্বোধ। কিংবা, দুই-ই।

—না, আপনি পাগল বা নির্বোধ নন। এবং···

পুতুল মুখ ফিরিয়ে কাজ করতে থাকে। অসমাপ্ত কথা শুনবার আগ্রহ দেখায় না।

—এবং অকারণে হাসেন নি আপনি।

—তা হলে, আপনি জানেন আমি কেন হেসেছি? ইস্পাতের মত দু' চোখ পুতুলের। ক্রোধের আগুনে ঝলকে ওঠে সেই দুই চোখে।

—আমি···ই···জা···নি···।

পুতুল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নরেশের দিকে। ঝলকে ওঠা ইস্পাতের মত উজ্জ্বল কঠিন দুই চোখের আলোতে ভেসে ওঠে ঈষৎ

বসুমতী : বৈশাখ '৭১

পাতলা চুল—ক্লান্ত দুটি চোখ। তীক্ষ্ণ বেঁকে আসা নাক, দু' গালের দু'টি গর্ত। বলিষ্ঠ বুক···আরও···আরও নীচে নেমে আসে পুতুলের চোখ। পোষাকের আবরণ ভেদ করে সবই দেখতে পাচ্ছে সে···

···কোমর-দু'টি পা—আর চেয়ারের চারটি পায়া···আর···তারপরে মুখ ফিরিয়ে কাজ করতে থাকে। আর তাকায় না।

পাথর নয় বরফের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে থাকে নরেশ। সমস্ত শরীরে কি যেন এক শীতল শিহরণ। ঠিক সেদিন যেমনি লেগেছিল—সেদিন···

এই মুহূর্তে চোখ তুলে তাকালে চমকে উঠতো পুতুল—কি অদ্ভুত এক ভাব ফুটে উঠেছে নরেশের চোখে—ওর কুয়াশাধূসর দুই চোখে মৃত্যু-শাতলতা, ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতো পুতুল, একি আপনি মরে যাচ্ছেন নাকি?

মৃত্যু! নরেশ ভাবে, কতটুকু যন্ত্রণা তুমি দিতে পার? কতটুকু! তোমাকে পার হয়ে এসেছি আমি। ঈশ্বর, তোমাকে খুঁজেছি পৃথিবীর কোণে কোণে, আকাশে-বাতাসে। কোথাও পাই নি। তোমাকে ডেকেছি বার-বার। তুমি সাড়া দাও নি। কতবার প্রতিপক্ষরূপে আহ্বান জানিয়েছি তোমাকে। ভীরু, কাপুরুষ, সামনে এসে দাঁড়াও নি তুমি। তারপরে বুঝেছি, পচে, গলে বীভৎস বিকৃত হয়ে গেছ তুমি। তুমি অসুস্থ, তুমি অক্ষম। তাই তুমি স্থাণুর মত পর্দার আড়ালে বসে আছ।

বরফের মত ঠাণ্ডা চোখ দু'টি বুজে ফেলে নরেশ···সেই মৃত্যু-শীতল রাজ্যে কতগুলি ছায়া···কঙ্কাল···আর ছায়া···

···দীর্ঘ, ঋজু চেহারা···একটু বাঁকান মাংসল নাক···আর ঠোঁট দু'টো···সেই ছোট ছেলে নরেশও ভাবতো···বাবার ঠোঁট দু'টো যেন কেমন···ঠিক অপরের মত নয়—বড় হয়ে একটা বিশেষণ খুঁজে বের করেছিল সে sensuous...

বাবাকে দিনের মধ্যে কতটুকুই বা দেখতে পেত নরেশ। অনেক রাতে বাড়ি ফিরতেন তিনি—উঠতেন খুব দেরিতে···নিজের ঘরেই বসে ব্রেকফাস্ট খেয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতেন···ফিরতেন আবার সেই রাতে···রবিবারও সেই একই প্রোগ্রাম—ন'টার পরিবর্তে হয়তো দশটা—কারণ রবিবার ঘুম থেকে উঠতেই দেরি হয়ে যেত···

কাজেই মাকে ঘিরেই সব। আদর আবদার···মাকে খুব ভালই বাসতো নরেশ। প্রথম সন্তান···বোনেরা হয়েছে অনেক পরে···মায়ের মুখে সব সময়ই কি রকম বিষাদ আর কারুণ্যের ছায়া ঘিরে থাকতো—ছোট নরেশ মায়ের কাছে কাছে ঘুরতো আর ভাবতো, মা বোধ হয় এখনই কেঁদে ফেলবে···

মাকে এতটুকু কষ্ট দিতে চাইতো না সে। এমন কি কোন-কিছু চাইতে হলে আগে ভেবে নিত—মায়ের এতে অসুবিধে হবে কি না! কতদিন, কত জিনিষ কিনতে খুব ইচ্ছে হয়েও মাকে বলে নি··· নিজের মনেই চেপে রেখেছে শিশুমনের সেই একান্ত আকাঙ্ক্ষা।

একদিন ভোরে উঠে দেখল বাবার ঘরের সামনে ভিড়··ডাক্তারের নাম লেখা তিনটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দুয়ারে···ছুটাছুটি করছে চাকররা···মাকে দেখতে পেল না কোথাও···পুরো দু'দিন মাকে দেখল না সে···তৃতীয় দিনে একটি চাকর এসে ওকে কোলে নিয়ে বাবার ঘরে গেল···সাদা চাদরে ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছেন বাবা···তাঁকে ছাড়িয়ে ওর চোখ খুঁজে বেড়ায়···কোণে মা···বোজা চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা···মাকে কাঁদতে দেখে ও নিজেও কেঁদে ওঠে···

মায়ের সেই কান্না থামলো দু'মাস পরে। তখন তিনি যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেলেন···বিষাদের ছায়া চলে গেল।

সব সময় তিনি ব্যস্ত সম্পত্তির হিসেব নিয়ে। আর এই কাজে তার একমাত্র সহকারী নরেশ। কাজের সহযোগিতায় হৃদয়ের বাঁধন আরও নিবিড়তর হল।

সেই মাকেই কিনা শেষটা অপমানিত করলো নরেশ। আর তা কার জন্য? সেই মেয়েটি! ডাস্টবিনে জন্মান সেই মেয়েটির জন্য।

মীরাকে প্রথম যেদিন দেখেছিল তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে নরেশ। একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে—গাড়িতে ফেরবার পথে দেখতে পেল সহপাঠী অমল দাঁড়িয়ে আছে বাস-স্টপে। বাসে ওঠা অসম্ভব—তবুও কোন দুরাশায় দাঁড়িয়ে আছে ও। নরেশ ওকে ডাকতেই, খুশিমুখে এগিয়ে এসে বলে, বাঁচালি ভাই—একা হলে তো যেমনি ভাবে হোক যেতে পারতুম। সঙ্গে যে একটা পুঁটলি—

পুঁটলি কোথায়? নরেশ অবাক হয়ে ওর খালি হাত পা এবং চারিপাশ দেখে।

সচল পুঁটলি। আমার বোন মীরা।

মীরার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিল অমল এবং মীরারই একান্ত অনুরোধে ওদের বাড়িতে নামতে হল। সোফারকে বলে দিল, দু' ঘণ্টা পরে এসে নিয়ে যেতে··

সেদিন নরেশ প্রথম বুঝেছিল, মানুষ কত গরীব। হাতলভাঙা কাপে ওকে চা খাইয়েছিল মীরা। মেয়েটার মনে যেন একান্ত জেদ—নরেশকে দেখাবেই দারিদ্র্যের নগ্নতা। বেশ লেগেছিল মীরাকে।

আরও অনেকদিন ওখানে গিয়েছিল নরেশ। প্রথমদিন ভেবেছিল, কি করে মানুষ এত গরীবভাবে বাঁচে। পরে ভাবতো, এই দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও মীরা কি করে এত সুন্দর হল!

সত্যই বড় সুন্দর ছিল মীরা। দাঁতে দাঁত চেপে নরেশ ভাবে, হ্যাঁ, মীরা সুন্দরই ছিল—পৈশাচিক সৌন্দর্য। ওর কালো চোখে, উজ্জ্বল রংয়ে একটা লালসার ব্যাপ্তি—

আজ তাই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু তখন! তখন মীরার চোখে, চেহারায় দেখেছিল আগুনের দীপ্তি।

আট বছর। পুরো আট বছর তারা কাটিয়েছিল এভাবে। নরেশ যেত—কখন কোন সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে যেত হাতে করে। মীরাকে জোর করে কিনে দিত শাড়ি ব্লাউজ, গয়না। এইভাবেই কেটে গেল আট বছর।

মা সবই জানতেন। তবুও তিনি না জানার ভান করে নানা রকম বিয়ের প্রস্তাব তুলতেন। নরেশ নানা বাজে অজুহাতে সম্বন্ধগুলি নাকচ করতো।

দু'জনেই জানতো—মীরার কথা উঠলেই সংঘর্ষ বাঁধবে। কাজেই এড়িয়ে চলাই ভাল। কিন্তু এড়িয়ে থাকতে দিল না মীরা। মান-অভিমান, চোখের জল, কথা বন্ধ করা, ভীতি প্রদর্শন। বিষ খাবো, গলায় দড়ি দেব, আরও কত কি। অতিষ্ঠ করে তুললো জীবন।

মনে মনে স্থির করে নরেশ, যেভাবেই হোক বলতে হবে মাকে। বিয়ের কথা তুললেই চট্ করে বলে দেবে মীরার কথা। কিন্তু মা আর বয়ের কথাই তোলেন না।

দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বিয়ে হয়েছে। সেই গল্পই বলছিলেন মা। বউটি সুন্দরী, শিক্ষিতা···

—ওর চেয়ে সুন্দরী বউ এনে দেব। আচমকা বলে ওঠে নরেশ।

একটু অবাক হয়ে তাকান মা। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করেন না। তবু নরেশ দমে না। কোণের পরী-মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে বলে, হাঁ, ভেবে দেখলাম বিয়ে করাই ভাল। এ ভাবে ছন্নছাড়া হয়ে থেকে লাভ কি।

—যা হোক, তবু যে সময় থাকতে তা বুঝছ তাও আমার ভাগ্য—একটু হাসেন মা।

—তাহলে পাত্রী দেখি। পরমুহূর্তেই প্রশ্ন।

—পাত্রী! এই···না···ভয়ানক লজ্জা করে নরেশের। তবু সে হেসে বলে, না···মানে পাত্রী ঠিকই আছে।

—তাই বল। বিদ্রূপ বেজে ওঠে মায়ের কণ্ঠে। বউয়ের পরে বিয়ে—বিয়ের পরে বউ নয়।

কয়েক মিনিটের স্তব্ধতা।

—পাত্রীটি কে শুনি? মায়ের স্বর একটু রুক্ষ। নিশ্চয়ই তোমার বন্ধুর সেই অসভ্য বোনটা নয়? ও মেয়েকে ঘরে আনব না আমি।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল নরেশ। তারপরে যা কখনও কল্পনা করে নি, তাই করে বসল। মায়ের স্থির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করল সে।

—মেয়েটি অসভ্য কেন বলছ মা? শান্তকণ্ঠেই বলতে চায়। তবু বুঝতে পারে ওর গলা রুক্ষ হয়ে উঠেছে।

—অসভ্য নয় তো কোন্ মেয়ে বিয়ের আগে এভাবে মিশতে পারে পুরুষের সঙ্গে।

—সে তো আমার সঙ্গে মিশেছে। দ্বিধায় স্বর জড়িয়ে আসে তবু বলে নরেশ।

—যে মেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে মিশতে পারে, সে দশজনের সঙ্গেও পারে।

—মা। চেঁচিয়ে ওঠে নরেশ।

—তুমি চেঁচালে কি হবে? আমি যা সত্য বলে বুঝবো তাই বলবো। তুমি কি করে জানো, তোমার অবর্তমানে সে কি করছে!

—ওর বাড়িতে আরো লোকেরা রয়েছে না?

—লোকেরা রয়েছে। চিবিয়ে চিবিয়ে মা বলেন, যেসব লোকরা একটা লোকের সঙ্গে মিশতে দিচ্ছে তারা আরও পাঁচটার সঙ্গেই বা দেবে না কেন?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে স্তব্ধ বিকৃতকণ্ঠে নরেশ বলে, মা, তুমি যাই বল না কেন, মীরাকে আমি বিয়ে করবই।

তারপরেই পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে যায়। কোন কথা নয়—এমন কি নিঃশ্বাসের শব্দও নয়। সব চুপ। হঠাৎ ঢং-ঢং করে বিকৃত বিকট শব্দে ঘড়িটা বাজতে থাকে। বাজতে সুরু করে আর থামতে চায় না। বেজেই চলেছে···

আর সেই শব্দের সঙ্গে মিশে যায় মায়ের কণ্ঠ, তা হলে, তুমি তোমার পছন্দমতই বিয়ে কর। আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রইলো না।

ঘড়ির শেষ ঘণ্টা শেষ হবার আগেই বেরিয়ে গেলেন মা। এক কথায় সব শেষ হয়ে গেল।

শেষ! নরেশ ভাবে, সব শেষ। এতদিনের ভালবাসা—মাতৃ-পুত্রের নাড়ির বাঁধনের চেয়ে বড় হয়ে গড়ে উঠেছিল যে হৃদয়ের বাঁধন—সবই শেষ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। এক কথায়।

তেতলার ঘরে আশ্রয় নিলেন মা। কিছুদিন পরে তিনি তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর নামের সম্পত্তি থেকে মাসে মাসে তাঁকে টাকা পাঠাবেন সরকারমশাই।

—আমি যাই। চারটে বেজে গেছে। পুতুল উঠে দাঁড়ায়।

—ও:। হ্যাঁ। উত্তর দেয় নরেশ। অতীত থেকে এক মুহূর্তে চলে আসে বর্তমানে।

পুতুলের গতিপথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। টাকার জন্যে কি না করে লোক, বিশেষত মেয়েরা। এই মেয়েটি একশ'টি টাকার জন্য দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত কাজ করছে—কত অন্যায় অপমান সহ্য করছে।

—কিন্তু, কেন অকারণে পুতুলকে অপমানিত করে সে। কেন! নিজেকেই প্রশ্ন করে নিজেই জবাবদিহি চায়।

—কেন? না করে পারে না সে। যে কোন মেয়েকে দেখলেই মনে হয় মীরার কথা। যে মেয়ে পুরো দশটি বছর অভিনয় করেছিল মিথ্যা প্রেমের।

প্রেম! অভিনয়। আর সে কিনা বিশ্বাস করেছিল সবই সত্য! মীরার মুখের প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করেছিল সে। বিশ্বাস করেছিল তাকে মীরা নিজের জীবনের চাইতেও ভালবাসে। তাকে নইলে

বাঁচবে না সে। বিবাহ-পূর্বে একদিন পরিহাসভরে নরেশ জিজ্ঞাসা করেছিল, যদি আমি মরে যাই তবে তুমি কি করবে ?

—সহমরণে যাব। উত্তর দিয়েছিল মীরা। ওর কালো চোখের তারার দিকে তাকিয়ে নরেশ বিশ্বাস করেছিল সে কথা। কি অদ্ভুত। কি অসম্ভব সেই কল্পনা, পাথরের বুকে ফুল—মরুর গায়ে ঝর্ণা।

ভেবেছিল, মীরা তারই···একান্তই তার। জীবনে প্রতি সূত্র তাদের একত্রে গেঁথে তুলবে—মরণকে পরাজিত করবে তাদের অমর প্রেম। পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পেয়েছিল সে।

অহঙ্কারে মাথা উঁচু হয়ে উঠেছিল তার। আকাশ, বাতাস, মাঠ, মাটি সব তার। একজনের প্রেমে সব কিনে আবার বিলিয়ে দিয়েছে সে।

সব শেষ হয়ে গেল। ত্রিশ বছর বয়সেই সব শেষ হল। ত্রিশ বছর। সে বয়স যৌবন-কামনার পরিপূর্ণতা আসে জীবনে—দুধ ধীরে ধীরে ক্ষীরে পরিণত হয়েছে—সেই বয়সেই সব শেষ।

একদিন···

ডাক্তার বললো, সিফিলিটিক প্যারালিসিস।

নরেশ বিস্ময়-বেদনা ভরা দু' চোখে তাকায় ডাক্তারের দিকে নয় মীরার দিকে। দু' হাত বাড়িয়ে মীরাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলো বুকে। ওর মনে হল, একবার শুধু একবার যদি সে মীরাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারে তবেই ব্যাধির এই বীভৎসতা থেকে মুক্তি পাবে সে। মানবের জীবনে এমন এক-একটি মুহূর্ত আসে যখন সে যুক্তি ভুলে শুধু ভাবের সমুদ্রে ভেসে থাকতে চায়।

—মীরা···আকুল কণ্ঠে ডাকলো নরেশ।

জানলার কাছে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে মীরা। নরেশের মন গলে গেল। তারি দুঃখে দুঃখিত হয়ে কাঁদছে সে।

—মীরা···মীরা···

কোন উত্তর নেই।

—মীরা, একবার কাছে এস। নরেশ আবার আহ্বান জানায়। উঠতে চেষ্টা করে। অসম্ভব। কোমর থেকে পা পর্যন্ত পাথর হয়ে গেছে।

ততক্ষণে মুখ ফেরায় মীরা, সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ঝলসে যায় নরেশ। আগুনের মত ঘৃণা জ্বলছে সেই মুখে।

—তোমার লজ্জা করে না ! তীব্র তীক্ষ্ণ বিদ্বেষভরা কণ্ঠ।

—লজ্জা। কেন

—কেন ? একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করলে তুমি।

ভ্রূ কুঁচকে অবাক হয়ে তাকায় নরেশ। এই একটি কথায় সুস্পষ্ট ছবি দেখতে পায় মীরার মনের। দশ বছরের প্রেম যে মনের চারিপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে সেই মনের দুয়ার খুলে যায়—

—স্বার্থপর। চেঁচিয়ে ওঠে নরেশ, তুমি শুধু নিজের কথা ভাবছ। একবারও ভাবছ না আমার কথা।

—তোমার নিজের দোষে তুমি শাস্তি পাচ্ছ।

—আমার নিজের দোষ। আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে নরেশ, কোথায় আমার দোষ!

—তোমার না হোক, জন্মসূত্রে পেয়েছ তুমি এই ব্যাধি।

—হ্যাঁ। জন্মসূত্রে পেয়েছি। কিন্তু জন্মসূত্রে যে সম্পদ পেয়েছি তা কি সমান তালে ভাগ করে নিই নি আমি। কোথায় থাকতে তুমি এতদিন। ডাস্টবিনে জন্মেছিলে পচে গলে শেষ হয়ে যেতে।

আর কোন কথা বলে না মীরা। বেরিয়ে যায়। সেদিন আর সে ঘরেই ঢুকলো না। অনেকবার তাকে ডাকলো নরেশ—চাকর দিয়ে বারবার ডেকে পাঠাল—কিন্তু মীরা এল না।

শুধু সেদিন নয় তার পরের দিনও মীরা এল না ও ঘরে। তৃতীয় দিনে জানতে পারল, মীরা চলে গেছে।

অবাক হল না নরেশ। সে যেন জানত। সেদিনের মীরার মুখ এই আভাষই দিয়েছিল তাকে। কাউকে কোন খোঁজ করতে বললো না সে। সরকারমশাইকে ডেকে শুধু একটা টেলিগ্রাম করতে বললো মাকে।

—বউদিমণি, আমার কাছ থেকে কালই এক হাজার টাকা নিয়েছিলেন আপনার অসুস্থতার জন্য—ভীরু অপ্রতিভ মুখে সরকার বলে।

—তবে তো কমই নিয়েছে। গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দেয় নরেশ।

কম নেয় নি। মা এলে সিন্দুক খুলে জানা গেল গয়না একটিও নেই। মূল্য দশ হাজারের কম নয়। নরেশের চোখ দু'টো চকচকিয়ে ওঠে।

—দশ বছর প্রেম করেছে দশ হাজার নিয়েছে—এমন আর বেশি কি? কঠিন বিদ্রূপে বলেছিল সে।

দেয়াল থেকে একটা টিকটিকি ধপ করে মাটিতে পড়ে; চেয়ার একটু ঠেলে টিকটিকিটার কাছে যায় নরেশ। লাঠি দিয়ে উল্টে দেয় ওকে। নিজের মনে বিড়বিড়িয়ে বলে, আমি শত্রুকে ভালবাসি, কিন্তু বন্ধুকে নয়। ঘৃণা চাই প্রেম না। ঈশ্বর, তোমাকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না আমি। আমার অসুস্থতার প্রথম দিনে তোমাকে বারবার আমি ডেকেছিলাম—একবার, শুধু একবার শক্তি দাও আমাকে। মীরার মুখের ঐ ঘৃণ্য নিবিড় ছবি দু'হাতে মুছে নেব আমি। আমার প্রার্থনা তুমি শোন নি।

মানবকে ভালবেসেছিলাম আমি। বিশ্বাস করেছিলাম মানবীর প্রেম। কিন্তু এখন দেখছি সবই মিথ্যা, ভালবাসার অস্তিত্ব শুধু চারটি অক্ষরে সীমায়িত। ভালবাসা শুনতে ভাল, পড়তে ভাল, ভাবতে ভাল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে ভালবাসা নেই। আছে শুধু স্বার্থপরতা। বুদ্ধি দিয়ে, কথা দিয়ে সেই ঢেকে রেখে মিথ্যা প্রচার করার নামই ভালবাসা।

আমি ঘৃণা করি পৃথিবীকে। ঘৃণা করি পৃথিবীর সমস্ত নরনারীকে। ঘৃণা করি পৃথিবীর ধূলিকণা। ঘৃণা করি নিজেকে। ঘৃণা করি সেই দিনটা যেদিন আমি জন্মেছিলাম। ঘৃণা করি বেঁচে থাকার দিনগুলি। ঘৃণা করি মৃত্যুর আগামী দিবসটি। ঘৃণা করি এই অসুস্থ ব্যাধিকে। কেন সে আমার দেহ পঙ্গু করে দিল? ঘৃণা করি আমার সুস্থ মনকে। কেন সে নিজে পঙ্গু হল না? ঘৃণা···ঘৃণা···ঘৃণা···আকাশকে আমি কালো করে তুলবো, বাতাস হয়ে উঠবে ঘৃণার বিষে ভারী, আর পৃথিবী পুড়িয়ে দেব ঘৃণার আগুনে। ঘৃণা···ঘৃণা···ঘৃণা···মুষ্টিবদ্ধ দু'হাত আকাশের দিকে তুলে চেঁচিয়ে ওঠে নরেশ। উঠে দাঁড়াতে চায় সে। ধূমকেতুর মত তীব্র এক জ্বালা বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে চায় নীল আকাশের শূন্যতায়। কিন্তু···এক আর্ত অসহায় চিৎকারে মাটিতে ভেঙে পড়ে সে।

কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে। একটা লোককে মাঝখান থেকে কে যেন ভাঁজ করে দিয়েছে। দুটো হাত পা মিলে গেছে একসঙ্গে—বিস্তৃত এক জীব। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে এক সঙ্গে পিঠ ও পেট—

—মিশে যাক। সব এক হয়ে যাক···বিড়বিড়িয়ে বলে নরেশ, একই দেহে এই তফাৎ সইতে পারছি না আমি।

অবশ পা দু'টিতে ঘষতে থাকে মুখ ও মাথা। পায়ের বিষ ঢুকে যাক চোখে, নাকে, মুখে মাথায়। সঞ্চারিত হোক সমগ্র দেহে। যাক্ সব এক হয়ে যাক···

কিছু না। শুধু জ্বালা···জ্বালা···চোখে, ঠোঁটে, নাসিকার অগ্রভাগে জ্বালা···যে জ্বালায় শুধু যন্ত্রণা মরণ নেই···যে জ্বালা দাহ করে ভস্ম করে না···

একটুক্ষণের শান্তি আর স্তব্ধতা। পরক্ষণেই বিপুল তীব্রতায় চেঁচিয়ে ওঠে নরেশ—উঃ, আমি আর পারি না। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সে। যন্ত্রণার চাপে বুজে আসে চোখ দু'টি—মণি দু'টি ভেতরে ঠেলে ঢুকে যেতে চায়—ভিতরে আরও ভিতরে কালো গহ্বরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে দু'টি কালো···এ কি!

—পাশে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে নরেশ। তখনও তার মন যন্ত্রণার উত্তেজনাময় সেই রাজ্যে। হঠাৎ তাকিয়ে চিনতে পারে না···

এক···দুই···তিন···মন ফিরে এসেছে সেই পুরানো পৃথিবীতে। কর্তব্য, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনার শক্ত আবরণে ঘেরা পৃথিবী।

পুতুল···! পুতুল···বসু···

আর হঠাৎই যেন চোখ দু'টি স্থির হয়ে যায়। পুতুল বসু···তারই অধীনে একশ' টাকা মাইনের কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। শুধু এই মুহূর্তে নয়—বহুক্ষণ ধরে। সে দেখেছে—তার নগ্ন আত্মাকে দেখেছে সে। পুতুলের শান্ত, স্থির, আত্মস্থতা, ঘৃণা লজ্জার আগুন ধরিয়ে দেয় তার মনে। রাগে মুখ কালো হয়ে যায়। ভ্রূ ওঠে কুঁচকে। মনের জমানো সমস্ত ক্রোধ ও প্যাশন্ একসঙ্গে ঠেলে বেরুতে চায়।

—কেন দাঁড়িয়ে আছ এখানে? কোন অধিকারে? বিশ্রী ভাবে চেঁচিয়ে বলে ওঠে সে।

কোন উত্তর দেয় না পুতুল। শুধু ওর চকচকে কালো চোখ দু'টি আরও বড় হয়ে ওঠে।

—কোন অধিকার অনধিকার প্রবেশ করেছেন আপনি? চোর! চুপিচুপি আমার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে আছ। রাগে অন্ধ হয়ে পাগলের

মত চেঁচাতে থাকে সে। চরিত্রহীনা···একটি পুরুষের নগ্নতা দেখতে লজ্জা করে না তোমার। আমার আত্মার নগ্নতা দেখবার জন্য তুমি ···তু···আপনি···এ কি আপনি কাঁদছেন।

কালো চোখ দু'টিতে শ্রাবণ রাতের বর্ষণ।

—হাঁ। আমি কাঁদছি পুতুল বলে। আমি কাঁদছি। কিন্তু আমি নিজের অপমানে বা আপনার দুঃখে কাঁদছি না। কাঁদছি পৃথিবীর দুঃখে।

—পৃ-থি-বী-র দুঃখে। নরেশ ধীরে ধীরে অজ্ঞানিতেই বলে। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে ওঠে, পৃথিবীর দুঃখে। পৃথিবীতে কোন দুঃখ নেই—আছে শুধু ঘৃণা···নির্জলা ঘৃণা···

—ঘৃণা! পুতুল উত্তর দেয়, না! ঘৃণার হাওয়ায় পৃথিবী পূর্ণ থাকলে মানুষ সর্বপ্রথম নিজেকে হত্যা করতো।

—হত্যা করতো!

—হাঁ। আপনি ভাবেন নিজেকে আপনি ঘৃণা করেন। যদি তাই সত্য হত তবে একমুহূর্ত দেরি না করে আত্মহত্যা করতেন আপনি, দুঃখ আছে আপনার মনে। তাই অপেক্ষা করছেন মৃত্যুর—পরিণতির। বলতে পারেন, কি তফাৎ পশু ও মানবে?

—কি? স্খলিতস্বরে নরেশ বলে।

—মানব দুঃখ অনুভব করে, পশু করে না। পশুর ক্ষুধা আছে, কাম আছে কিন্তু···

—কিন্তু?

—কিন্তু দুঃখবোধ নেই। এখানেই সে মানব থেকে পৃথক। মৃতশিশুর স্মৃতি বুকে নিয়ে পশুমাতা সমস্তজীবন কাটায় না। শোকে দুঃখে ওরা ত্যাগ করে না আহার নিদ্রা মৈথুন। আরও আশ্চর্যের বিষয় কি জানেন?

স্বপ্নাচ্ছন্ন ব্যক্তির মত মুখ তোলে নরেশ—যেন বক্তব্যে কতকটা বুঝতে পারছে সে, সবটা বুঝতে পারা অসম্ভব।

—আশ্চর্য এই যে, আনন্দ আছে ওদের মনে। আনন্দ অনুভব করতে পারে ওরা কিন্তু দুঃখ—ঠিক তেমনি অর্থবোধ্য চোখে তাকিয়ে থাকে নরেশ।

—দুঃখের সোনালী আপেল মানব একা খেয়েছে। তাই তাকে এভাবে ঘিরে ধরেছে—দুঃখের সৌন্দর্য, দুঃখের মহিমা, দুঃখের শক্তি, দুঃখের ব্যথা, দুঃখের মৃত্যু। দুঃখকে ছেড়ে বাঁচতে পারে না সে, দুঃখকে বাদ দিয়ে বাঁচতে চায় না সে।

—দুঃখহীন জীবন তো পশুর জীবন। একটু থেমে যোগ করে পুতুল।

স্বপ্নভরা চোখ দু'টি বুজে যায়।

—কত দুঃখ আমাদের। খেতে পাবার দুঃখ, খেতে না পাবার দুঃখ, অকাজের দুঃখ, বেঁচে থাকার দুঃখ, মৃত্যুর দুঃখ, দুঃখের দুঃখ··

—আবেশে চোখ বুজে উঠেছে আপনার। হঠাৎ ভেচে ওঠে নরেশ, যেন কত আনন্দ পাচ্ছেন।

—আনন্দ? হাঁ, দুঃখে আনন্দই পাই আমরা। তাই দুঃখকে বয়ে নিয়ে বেড়াই, একটু একটু করে বড় হতে থাকে সে—শিশুর মত তাকে লালন করি বুকের মধুতে। কখন সে বলিষ্ঠ মূর্তিতে সামনে

এসে দাঁড়ায়। তার দিকে তাকিয়ে মনে পাই, শক্তি, সাহস, আত্মপ্রত্যয়···

—কিন্তু, যখন সে বিরাটাকার দৈত্যের মত তোমাকে গ্রাস করতে চায় তখন···? বিদ্রূপে তৈলাক্ত হয়ে ওঠে নরেশের কণ্ঠ।

—হাঁ। স্বীকার করে পুতুল। কখনও সে বড় হয়ে ওঠে··· অনেক···অনেক বড়। তার মাথা আকাশে ঠেকে, কালো হয়ে ওঠে সমস্ত পৃথিবী তার দেহ ছায়ায়। হুঙ্কার দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সে, কেন? কেন মুক্তি দিলে আমায়? এবারে, আমি তোমাকে শেষ করবো। আমার এই হাতের মুঠোয় পিসে, গলিয়ে দেব তোমাকে।

—শুধু বলেই থামে না, পিষে চূর্ণ করেই দেয়। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে নরেশ।

—না। তা দেয় না। শান্ত গাম্ভীর্যে উত্তর দেয় পুতুল। ক্ষণতরে বিহ্বল হয়ে যাই আমরা, কিন্তু তখনই মন স্থির করে সেই দৈত্যকে পুনরায় বন্দী করে সেই ছোট মাটির পাত্রে—ফেলে দিই সমুদ্রে।

—সমুদ্রে? রাগ ভুলে, বিহ্বলকণ্ঠে বলে ওঠে নরেশ?

—হাঁ সমুদ্রে। নীলজলে ভেসে চলে যায় সেই দৈত্য। তীরে দাঁড়িয়ে থাকি আমরা—মাথার উপরে নীল আকাশ—পেছনে সবুজ মাঠ।

—ওপরে নীল আকাশ পেছনে সবুজ মাঠ, বিদ্রূপে ভেংচে ওঠে নরেশ।

একটু পরে আবার বলে, কি করবে সেই লোক? যার মাথার ওপর নেই নীলাকাশ, পেছনে সবুজ মাঠ।

—সকলেরই আছে। কার নেই অসীমব্যাপ্তিভরা নীল মন? কার নেই সবুজ জীবন?

নিজের মনেই বলতে থাকে পুতুল, এখানে এসে দেখি আপনার দুঃখ। ভাগ্যের নিষ্ঠুর কশাঘাতে আপনি আজ পঙ্গু। চার চাকার একটি গাড়িতে আপনার পৃথিবী সীমায়িত। সেই পৃথিবীকে ঘিরে বিদ্বেষ, বিরক্তি, অপমানের জ্বালা।

—আপনার কত টাকা। কিন্তু অর্থ আপনাকে মুক্তি দিতে পারে না পঙ্গুতা থেকে। তব এই অর্থই এনে দিয়েছে আপনার চারিপাশে অসহায় কতগুলি মানব। যারা অঙ্গহীন না হয়েও শক্তিহীন। তাদের অপমানিত করেই গায়ের জ্বালা মেটান আপনি।

—আর, এটুকু পথ পেরিয়ে এগিয়ে যাই আমি। একটি ছোট বাড়ি দুটো ঘর অনেক লোক। সেখানে দেখি দুঃখের আর এক রূপ। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে এসে আমার বোন ছোট একটি বাটিতে শুকনো মুড়ি চিবোচ্ছে। ছোট বোনগুলি তাকিয়ে আছে লোলুপদৃষ্টিতে। ওদের নির্দিষ্ট অংশ ওরা পেয়েছে, কিন্তু ওদের খিদে মেটে নি। খিদে কখনও মেটে না ওদের। উনুনের ধারে বসে মা বিনা তেলে রাঁধবার প্রাণান্ত প্রয়াস করছেন। আর একটি মেয়ে ফিরে এসে অফিস থেকে সবে পাওয়া লাঞ্ছনার কথা ভাবছে আর অনাগত অপমানের হিসাব করছে।

নরেশ স্তব্ধভাবে তাকিয়ে থাকে।

—টাকা। কিছু টাকা। তাদের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারতো কিছু টাকা। যে টাকা আপনার কোন উপকারে আসে নি, যে টাকার জোরে আপনি শুধু অপমান করেছেন অপরকে, সেই টাকার অভাবেই তাদের এত দুঃখ। যুবতী মেয়ের মনে প্রেম নেই, আনন্দ নেই, শিশুর মনে সরলতা নেই, চাঞ্চল্য নেই। তারা শুধু ভাবে··· অভাব, অনটন, অর্থলোলুপতা এই নিয়ে গড়ে উঠেছে তাদের পৃথিবী। হাত, পা, নাক, চোখ, মুখ, দেহের কোন অঙ্গের কথাই ভাবে না তারা—তারা শুধু ভাবে পেটের খিদের কথা।

বাড়ির সামনে এসে পুতুলের মনটা কিন্তু হোঁচট খায়। একগাদা লোক দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে। দূর থেকে অতগুলি লোকের জটলা দেখে কি যেন এক অজানা আশঙ্কায় মন কেঁপে ওঠে পুতুলের। সে নিজেও কারণ জানে না, কিন্তু ওর মনে হয় যে ব্যাপারটা তাদের বাড়ি সংক্রান্ত।

পা দুটো কি রকম ভারী হয়ে উঠেছে। তবুও অনেক কষ্টে সেই পাথরের মতো পা দুটো টেনে টেনে পুতুল এগিয়ে যেতে থাকে।

কয়েকটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকে সেই দলটি একদৃষ্টে তাকায়। ওদের মুখে বিরক্তির কুঞ্চন। শুধু একটি ছেলে দাঁড়িয়েছিল একটু এদিকে। তার উদাস মুখের দিকে চোখ পড়তেই···

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

বিজ্ঞান বার্তা

এস্পিরিন

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার

এস্পিরিনের নাম শোনে নি বা এস্পিরিন ব্যবহার করে নি এমন লোকের সংখ্যা বেশি নয়। সারা পৃথিবীর লোকে এই বস্তুটিকে যে পরিমাণে ব্যবহার করে, তা শুনলে অবাক হতে হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই ১৯৬২ সালে আড়াই কোটি পাউণ্ডের বেশি এস্পিরিন তৈরি হয়। প্রায় ১৫০০ কোটি এস্পিরিনের বড়ি এই বৎসরে ব্যবহার হয়। তা ছাড়া, কেফিন বা কোডিনের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় এর ব্যবহারও প্রায় এই পরিমাণ হবে। সচরাচর জ্বর, বেদনা এবং শরীরের কোন স্থানে প্রদাহ কমাবার জন্যই এর ব্যবহার হয়, একথা সকলেই জানে।

এস্পিরিনের রাসায়নিক নাম এসেটিল স্যালিসিলিক এসিড। জার্মান ভেষজনির্মাতা বায়ার কোম্পানি এই ব্যবসায়িক নামটি প্রথমে দেন। বর্তমানে শুধু এই নামে নয় আরও অনেক নামে এটি বিক্রি করা হয়।

এস্পিরিন তৈরির অনেক আগেই স্যালিসিলিক এসিডের ও তা থেকে তৈরি নানা ভেষজের উপকারিতা জানা ছিল। উইলো নামক গাছের ছালের কাথ যে নানা জ্বরের উপশম করতে পারে একথা ১৭৬৩ সালে এডওয়ার্ড ষ্টোন নামক একজন ইংরাজ পুরোহিত লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশ করেন। নানারকম জ্বরের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরেও এর ব্যবহারে কিছু উপকার হোত! কারণ এতে অবস্থিত স্যালিসিন শরীরে স্যালিসিলিক এসিডে পরিণত হয়। অবশ্য এই উইলো গাছের ছালে কুইনিন না থাকায় ম্যালেরিয়ার নিরাময় ঘটত না। সিঙ্কোনা ছাল দামী হওয়ায় অনেকে তার ভেজাল হিসাবে উইলো ছাল ব্যবহার করত।

১৮২৯ সালে লেরো নামক একজন ফরাসী ভেষজবিদ্ এই ছাল থেকে স্যালিসিন নামক গ্লুকোসাইড পৃথক করেন। এই বস্তু স্যালিসিন এলকোহল ও গ্লুকোজের রাসায়নিক সংশ্লেষের ফল। এ থেকে স্যালিসিলিক এসিড তৈরি করেন ইতালীয় রাসায়নিক পিরিয়া ১৮৩৮ সালে। এর আগে জার্মান রাসায়নিক লুইগ 'মেডোস্যুইট' নামক একটি সুগন্ধি গুল্ম থেকে এই এসিড তৈরি করেন। ১৮৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রক্টর ও ফরাসী দেশে কাহুর 'উইন্টার গ্রীণ' নামক গুল্ম থেকে মেথিল স্যালিসিলেট নামক সুগন্ধি উদ্বায়ী তেল পৃথক করেন এবং তা থেকে স্যালিসিলিক এসিড তৈরি করেন। এই এসিডের যৌগিক পরে অন্য অনেক গাছেও পাওয়া যায়।

১৮৫২ সালে গার্লাণ্ড ও ১৮৫৯ সালে কোল্‌বে এই এসিডের প্রচুর প্রস্তুতির সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৮৭৪ সালে স্কচ ডাক্তার ম্যাকলাগান নিজের শরীরে স্যালিসিন প্রয়োগ করে প্রমাণ করেন যে বস্তুটির বিষক্রিয়া নাই। পরে তিনি একটি বাতজ্বরের রোগীকে ঔষধটি প্রয়োগ করে আশ্চর্য সুফল পান। ১৮৭৬ সালে রাইস এবং ষ্ট্রীকার জার্মানীতে এই রোগের চিকিৎসায় স্যালিসিনের উপকারিতার কথা প্রকাশ করেন। পরের বৎসরে সে নামক ফরাসী ডাক্তার সন্ধিবাতে এবং নিউর‍্যালজিয়া ও মাথাধরায় এর উপকার প্রমাণ করেন।

স্যালিসিলিক এসিডের এই সব গুণ থাকলেও তার একটি প্রধান দোষ এই যে, গুঁড়া বা বড়ির আকারে খাওয়ার পরে পাকস্থলীতে অল্পবিস্তর প্রদাহ ঘটে এবং পরিমাণ বেশি হলে মুখ ও গলায়ও কিছু প্রদাহ হয়। এই দোষ দূর করার জন্য এর সোডিয়ামঘটিত লবণ ব্যবহার সুরু হয় কিন্তু তার স্বাদ মিষ্ট হ'লেও অরুচিকর। সরল রাসায়নিক পরিবর্তনে এই এসিড থেকে এসেটিল স্যালিসিলিক এসিড প্রথমে তৈরি করেন গেরহার্ট ১৮৫৩ সালে। এই পরিবর্তন ঘটাবার অতি সহজ এবং সস্তা উপায় আবিষ্কার করেন জার্মান বায়ার কোম্পানীর ডাক্তার হফ্‌মান। ঐ কারখানায়ই ড্রেসার নামক ভেষজবিদ্ এই বস্তুর উপকারিতা ভালভাবে প্রমাণ করেন এবং মাঝে মাঝে নিজের প্রস্রাবে কতখানি এস্পিরিন নির্গত হচ্ছে তা নির্ধারণ করে দেখান যে, এস্পিরিন অপরিবর্তিত অবস্থায়ই শরীরে রোগলক্ষণের উপশম করে স্যালিসিলিক এসিড তৈরি করে নেয়।

জার্মানীতেই ১৮৯৯ সালে প্রথমে এই ওষুধের ব্যবহার হয়। পাকযন্ত্রে প্রদাহ উৎপাদন করে না এবং স্বাদও অপ্রীতিকর নয় এই দুই গুণেই এর আদর বাড়তে থাকে। ১৯০০ সালে উইট্‌গাওয়ার প্রমাণ করেন যে বেদনা দূর করতেও এস্পিরিন যথেষ্ট শক্তিশালী। মাথাধরা, আধকপালে এবং ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণা দূর করার জন্য এর ব্যবহার বাড়তে থাকে।

জার্মানীতে উইট্‌গাওয়ার এবং ওপ্‌লেমুট ১৮৯৯ সালে চিকিৎসায় এস্পিরিনের ব্যবহারের বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁরা স্যালিসিলিক এসিডের প্রদাহকারিতা এবং সোডিয়াম স্যালিসিলেটের অপ্রিয় স্বাদের কথা উল্লেখ করে বলেন যে এস্পিরিন এই দুইয়ের চেয়ে অনেক ভাল। এস্পিরিনের অদ্ভুত বেদনানাশক শক্তির বিষয়েও উইট্‌গাওয়ার জোর দেন। দাম খুবই সস্তা হওয়ায় এই সময় বহু চিকিৎসক এই বিষয়ে বহু গবেষণা ও পরীক্ষা করেন। মাথাধরা, আধকপালে মাথাধরা এবং ক্যান্সারের বেদনা দূর করার জন্য এর ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

এস্পিরিনের বড়ি গিলে খাওয়া যে উচিত নয়, গুঁড়া করে জলের বা লেবুর জলের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত, এই সতর্কবাণী অনেক লোকে অগ্রাহ্য করায়, পাকস্থলীর প্রদাহে কষ্ট পেতে থাকে। এস্পিরিনের সোডিয়াম বা ক্যালসিয়ামঘটিত লবণ ব্যবহারে অসুবিধা

হয় না। অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহারে এস্পিরিন বা স্যালিসিলিক এসিড পাকস্থলীতে ক্ষত উৎপাদন করতে পারে।

কোন কোন লোকের এর ব্যবহারে এলার্জির লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রধানত জ্বর কমান, বেদনা নাশ, বাতের কষ্ট লাঘব এবং প্রস্রাবে ইউরিক এসিড নিঃসরণের জন্যই এর ব্যবহার। মর্ফিনের বেদনানাশক ক্রিয়া আরও প্রবল হ'লেও তার প্রধান অসুবিধা এই যে, তার ব্যবহার দু' একবারের পরে অভ্যাসে দাঁড়ায়, তখন আর মর্ফিন না হ'লে চলে না। চর্মের ঘর্ম নিঃসরণ বাড়ায় বলে এস্পিরিন জ্বর কমাতে সাহায্য করে। গ্রন্থিতে বাতের প্রদাহ ও বেদনা দূর ক'রে আক্রান্ত অঙ্গের সচলতা ফিরিয়ে আনে। সাধারণ বাতে প্রস্রাবের সঙ্গে ইউরিক এসিডের নিঃসারণ বাড়িয়ে গাঁটের নড়াচড়া ফিরিয়ে আনে।

যদিও ওষুধের আকারে এস্পিরিন সমান ওজনের সোডিয়াম স্যালিসিলেটের মতই ফল দেয়, তবু এর নিজস্ব কতকগুলি গুণ আছে। শুধু শরীরে স্যালিসিলিক এসিড উৎপাদনের উপরেই এই গুণগুলি নির্ভর করে না। ব্যবহারের দু' ঘণ্টার মধ্যে রক্তে অবিকৃত আকারে একে পাওয়া যায় এবং এই দুই ঘণ্টাই এর বেদনানাশক ক্রিয়া অব্যাহত থাকে। প্রদাহের কোন কোন ক্ষেত্রে এস্পিরিনের উপকার স্যালিসিলেটের উপকারের চেয়ে বেশি হয়। ফেনিল বিউটাজোন নামক যে ঔষধ সম্প্রতি বাতের জন্য ব্যবহার হচ্ছে, তার চেয়েও এস্পিরিনের প্রদাহনাশক শক্তি বেশি। অবশ্য এস্পিরিনের কতক অংশ শরীরে স্যালিসিলেটে পরিণত হয় বলে তার উপকার মাত্রা অনুসারে পুরাপুরি ঘটে না। কোন নূতন আবিষ্কৃত ঔষধের উপকারিতা প্রমাণ করার জন্যে গোড়াতেই মানুষের উপরে পরীক্ষা করা অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপদ নয়। এজন্য যে রোগের জন্য ঔষধটি ব্যবহার হবে বলে আশা করা যায়, সেই রোগ লক্ষণগুলি কোন ক্ষুদ্র প্রাণীতে তৈরি করতে পারলে পরীক্ষার সুবিধা হয়। জ্বর, গ্রন্থিবাত এবং বেদনা এইভাবে পরীক্ষাধীন কয়েকটি প্রাণীতে উৎপন্ন করা যায়। জ্বর উৎপাদন সবচেয়ে সহজ। নানারকম ব্যাক্টিরিয়ার পোষক দ্রাবণ থেকে 'পাইরোজেন' নামক বিষবস্তু সহজেই আলাদা করা যায়। প্রোটিয়াস ব্যাক্টিরিয়া থেকে পাওয়া এই বস্তু অতি সূক্ষ্ম-মাত্রায় (১ গ্রামের ২০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ) প্রাণীশরীরে সূচি-প্রয়োগ ক'রে খরগোসের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি বাড়ান যায়। পরীক্ষার আগে এস্পিরিন খাওয়ালে এ জ্বর ঘটে না। তেমনি ইঁদুরের শরীরে কোন প্রাণীর প্লীহা থেকে প্রাপ্ত কোষের সঙ্গে যক্ষ্মার জীবাণু অল্পমাত্রায় সূচিপ্রয়োগ করলে কয়েক সপ্তাহ পরে গ্রন্থিবাতের সব লক্ষণ প্রকাশ পায়। লেজের এবং অন্যান্য সন্ধিস্থানে ফুলা এবং প্রদাহ কয়েকমাস পর্যন্ত থেকে যায়। শুধু যক্ষ্মা বীজাণু বা তার নির্যাস সূচিপ্রয়োগ করলেও এই ফল দেখা যায়। সম্ভবত মানুষের বাতও এইরকম ব্যাক্টিরিয়া থেকে উৎপন্ন বিষবস্তুর বিক্রিয়াতেই ঘটে।

বহু পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, গ্রন্থিবাতে এড্রিনাল গ্রন্থি থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি বহুমূল্য হর্মোনই সবচেয়ে ফলদায়ক হয়। সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল কেমিকাল ইণ্ডাস্ট্রী-জর নিউবোল্ড দেখিয়েছেন যে, এস্পিরিন, সোডিয়াম স্যালিসিলেট, ফেনিল বিউটাজোন এবং এমিনোপাইরিন মানুষের ও ইঁদুরের বাতে যথেষ্ট উপকার দেয়। আবার সেরিং কর্পোরেশনের দু'জন ডাক্তার দেখিয়েছেন যে, এস্পিরিন বেদনা-নাশক হিসাবে মর্ফিনের ১[illegible] থেকে [illegible] ভাগ ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ মর্ফিনের ১০ গুণ ওজনের এস্পিরিন দিলেই সমান ফল পাওয়া যায়। এতে আপত্তিকর কিছুই নাই, কারণ এস্পিরিনের দাম মর্ফিনের ৫০ ভাগেরও কম। আর এ বস্তু মর্ফিনের মত 'নেশা'য় পরিণত হয় না।

শরীরে আঘাত বা প্রদাহের ফলে বেদনা কেন বা কিভাবে জন্মে এ বিষয়ে পরীক্ষায় জানা গেছে যে, এই অবস্থায় আহত স্থানে কতকগুলি বিশেষ পলিপেপটাইড বা 'কিনিন' সৃষ্ট হয়। ডাঃ লিম দেখিয়েছেন যে, এস্পিরিন স্নায়ুর উপরে কিনিনের ক্রিয়া প্রতিরোধ করতে পারে। ব্রেডিকিনিন নামক এই বস্তু পেটে যে মোচড়ান বেদনা উৎপাদন করে, এস্পিরিনে তার নিরাময় সহজেই হয়। কোন কোন ফুলের রেণু বা কোন কোন প্রাণীর লোম বা পালকের সূক্ষ্মকণা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদাহক বস্তু শ্বাসনালীতে ঢুকে যে হাঁপানির মত শ্বাসকষ্টের সৃষ্টি করে, তা শরীরের আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির অস্বাভাবিক প্রবল ক্রিয়া বলা যায়।

গিনিপিগের শরীরে অল্পমাত্রায় ডিমের শ্বেত অংশ বা ঘোড়ার রক্তরস প্রথম সূচিপ্রয়োগে সচরাচর বেশি কুফল দেখা যায় না। কিন্তু কয়েকদিন বাদে আর একবার একই বস্তু দ্বিতীয়বার সূচিপ্রয়োগ করলে শ্বাসনালীতে অতিরিক্ত প্রদাহ, শ্লেষ্মা নিঃসরণ এবং আক্ষেপ দেখা যায়; এই শ্বাসকষ্ট এত গুরুতর হতে পারে যে এতে প্রাণীটির মৃত্যু ঘটে। এই অবস্থাকে anaphylactic shock বলে। প্রথম সূচিপ্রয়োগের ফলে রক্তে যে এণ্টিবডি তৈরি হয়, দ্বিতীয়বারে সূচি-প্রয়োগের পর সেই এণ্টিবডি পূর্বের এণ্টিজেনের সঙ্গে প্রবল ক্রিয়ায় মিলিত হয়। 'শক' তারই পরিণাম। ডিমের শ্বেতাংশের দ্রাবণ কণায়িত আকারে মানুষের শ্বাসনালীতে ঢুকিয়ে এই রকম হাঁপানি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এর অনেক আগে ১৯১০ সালে ইংলণ্ডে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হেনরি ডেল ও প্যাট্রিক লরেন্স দেখান যে, হিস্টামিন নামক বস্তুর দ্রাবণ সূক্ষ্মমাত্রায় সূচিপ্রয়োগ করলে 'শকের' অবস্থা তৈরি করা যায়। তাঁরা বিজাতীয় প্রোটিনের (যেমন ডিমের শ্বেতাংশ) ক্রিয়া এবং হিস্টামিনের ক্রিয়ায় বিশেষ তফাৎ করা যায় না। ১৯৩২ সালে নানা দেশে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে, শক অবস্থায় গিনিপিগের শরীরে হিস্টামিনের আধিক্য ঘটে। কয়েকটি কৃত্রিম হিস্টামিন-রোধক বস্তুর প্রয়োগে যে হিস্টামিনের এই বিষক্রিয়া রোধ করা যায়, তা ১৯৩৭ সালে বোভে ও স্টাউব দেখিয়ে দেন। তবে হিস্টামিন ছাড়া শক উৎপাদক অন্য বস্তুর সন্ধান ক'রে S. R. S-A (Slow Reacting Substance in Anaphylaxis) নামক আর এক বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। এর রাসায়নিক প্রকৃতি এখনও সঠিক জানা যায় নি। ১৯৬১ সালে এডিনবরায় ব্রকলহার্স্ট ও লাইড়া পূর্বে উক্ত কিনিন জাতীয় কোন কোন বস্তু পৃথক করেন। ১৯৬২ সালে লণ্ডনে হলগেট এবং কলিয়ার দেখান যে S. R. S-A বা কিনিনের ফলে যে শ্বাসকষ্ট জন্মে, অল্পমাত্রায় এস্পিরিন দিয়ে রাখলে তা নিবারণ করা যায়। তবে হিস্টামিনের ক্রিয়া এস্পিরিনের প্রয়োগে বন্ধ করা যায় না। সুতরাং এস্পিরিনের সঙ্গে এণ্টি-হিস্টামিন একত্র প্রয়োগেই এই পূর্ণ সুফল পাওয়া যায়। কলিয়ার ও তাঁর সহকর্মীরা এই বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। মানুষের ক্ষেত্রেও এই বিষয়ে অনেক পরীক্ষা চলছে।*

---

* 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে এই প্রবন্ধের প্রধান তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ্যাস টার্বাইন চালিত অভিনব মোটর গাড়ি

অমুসন্ধানী

আমেরিকার ক্রাইসলার কর্পোরেশন একটি বিশ্ববিখ্যাত মোটর নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গ্যাস টারবাইন চালিত গোটা পঞ্চাশেক মোটর গাড়ি তৈরি হয়েছে। এই সব নতুন ধরণের গাড়ি তিন মাস ধরে চালিয়ে এদের দোষ-ত্রুটি ও গুণাগুণ—যেমন কতটা টেকসই হবে ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখার জন্য কোম্পানী কর্তৃপক্ষ দু'শো লোককে আমন্ত্রণ করেছেন। গাড়িগুলি দেখা শোনা পরিচর্যা এবং ইনসিওর ইত্যাদি করে থাকেন ঐ কোম্পানীই। যাঁরা তিনমাস ধরে ঐ সব মোটর গাড়ি ব্যবহার করবেন, তাঁদের দিতে হবে কেবল ইন্ধনের বা তৈলের মূল্য আর কিছু নয়।

গ্যাস টারবাইন চালিত মোটর গাড়ি আর প্রচলিত মোটর গাড়ির শক্তি উৎপাদনী যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। প্রচলিত মোটর গাড়ির ইন্টারনাল কম্বাশান ইঞ্জিনে গ্যাসোলিন ও বায়ুর মিশ্রিত উপাদান গাড়িটিকে চালিত করে। এটিই শক্তির উৎস এবং পিস্টনসমূহকে ধাক্কা দেয়। আর টার্বাইন ইঞ্জিনের উত্তপ্ত গ্যাস প্রেরণ করা হয় টার্বাইনের চাকার মধ্যে ...। তাই চাকাটিকে ঘোরায়. ঐ গ্যাসই টার্বাইন ইঞ্জিনের শক্তির উৎস।

এই অভিনব গাড়ি উদ্ভাবনের মূলে রয়েছেন জর্জ জে হুয়েবনার। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন: প্রচলিত মোটর গাড়ি থেকে বাতাস দূষিত হওয়ার যে সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনা নতুন পদ্ধতিতে অনেকখানি দূর করা হয়েছে। নূতন গাড়ির ইঞ্জিন ধোঁয়া, কার্বন ডায়োকসাইন এবং হাইড্রোকার্বন ছাড়বে না এবং বাতাসও দূষিত হবে না। কেরোসিন, ডিজেল তেল অন্যান্য যে সব উপাদান পাইপের মাধ্যমে পরিবাহিত হতে পারে ও বাতাসের সংস্পর্শে জ্বলে উঠে সে সবই এই গ্যাসটার্বাইন ইঞ্জিনেও ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এই সব ইন্ধনের সাহায্যে এ সব গাড়ি সুষ্ঠুভাবেই চালিত হবে।

কালো রং-এর এই গাড়িটির নক্সা ও যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা করেছেন ক্রাইসলার এবং ইতালীর ঘিয়া কোম্পানী এটি তৈরি করেছেন। কালো রং-এর এই গাড়িটির ছাদটি কাল ভিনাইল দিয়ে তৈরি এতে চারজন বসতে পারে। এটি দৈর্ঘ্যে ২০১'৬ ইঞ্চি, প্রস্থ ৭২'৫ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৫৩ ইঞ্চি। সামনের চাকার থেকে পেছনের চাকার দূরত্ব ১১০ ইঞ্চি। এই গাড়িগুলি দেখতে ১৯৬৩ সালের 'ফোর্ড থাণ্ডার বল্ট' গাড়ির মতো।

এই সব গাড়িতে ব্যবহৃত হয় ১৩০ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন। ক্রাইসলার এই ইঞ্জিন সম্পর্কে বলেছেন: কাজের দিক থেকে দু'শো হর্স পাওয়ারের ভি ৮ ইঞ্জিনের সমশক্তি বিশিষ্ট এই সব ইঞ্জিন। ঐ ভি ৮ ইঞ্জিনের সঙ্গে শক্তি উৎপাদনের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামও যুক্ত থাকে। ক্রাইসলারের পিস্টন চালিত গাড়ি যে ট্রান্সমিশন ব্যবস্থা রয়েছে তা সামান্য অদল-বদল করে ঐ স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ব্যবস্থা ১৩০ হর্স পাওয়ারের ঐ সব নতুন ইঞ্জিনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারদের ধারণা প্রতি গ্যালন ইন্ধনে ঐ গাড়ি ভাল রাস্তায় ১৮ মাইল পর্যন্ত চলবে।

পিস্টন ইঞ্জিনে যে পরিমাণ যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয় তার এক পঞ্চমাংশ থাকে টার্বাইন ইঞ্জিনে। এতে হাত লাগানো মাত্রই যে তাপমাত্রায় গাড়িটি চালু হতে পারে সেই তাপমাত্রায় এর গ্যাস পৌঁছে যায়। সব আবহাওয়ায়ই কালবিলম্ব না করে এটি চালু করা যায়। তারপর ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করার জন্য এতে জলেরও কোন প্রয়োজন হয় না। "স্পার্ক প্লাগ' আছে মাত্র একটি। এর বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা খুবই সহজ ও সরল। নির্দিষ্ট সময়ান্তর এতে তেল বদলাবারও কোন প্রয়োজন হয় না। ঐ সব গাড়ির চালক গাড়ি চালাবার সময়ে দৃষ্টি রাখেন বাঁ দিকের পায়রোমিটারের মাঝখানের স্পীডোমিটারের এবং ডান দিকের ট্যাকোমিটারের উপর। পায়রোমিটার নির্দেশের ইঞ্জিনের তাপমাত্রায় স্পীডো মিটার দেয় গতির মাত্রায়। প্রতি মিনিটে টার্বাইনের ঘূর্ণনের মাত্রা করে ট্যাকোমিটার। সামনের দু'টি আসনের মাঝখানে থাকে একটি বাক্সর মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ও গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করার অন্যান্য যন্ত্রপাতি।

রাস্তায় নামানো মাত্র এই গাড়ির স্বচ্ছন্দ চলার গতি ইঞ্জিনে কোন রকম ঝাঁকুনি না দিয়ে চলা, মন্দ গতিতেও ইঞ্জিনের প্রচণ্ড ক্ষমতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

আকাশ ও মাটি

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়

এ পৃথিবী থেকে আকাশ অনেক দূর—
আকাশের কাছে, মাটির অনেক ঋণ,
যদি না আকাশ ছুড়ে দেয় রদ্দুর,
রাতের পৃথিবী বাঁচবে না কোনদিন।

মাটির তৃষ্ণা আকাশ শুধুই জানে,
অঝোর ধারায় ঝরে তৃষ্ণার জল—
কৃতজ্ঞ মাটি চেয়ে থাকে দূর পানে,
কিছু দিতে চায়, কোথা তার সম্বল ?

ভালোবাসা আমি অনেক দেখেছি আর
শুনেছি অনেক কাহিনী ভালোবাসার।
কাছেতে পাবার কোন আশা নেই জেনে,
আপনার বলে কে কবে নিয়েছে মেনে ?

নিঃশেষ করে আপন সুরভি ঢেলে—
করেছে আকাশ এ মাটিকে সুন্দর,
আকাশ মাটিতে তবু কি কোথাও মেলে,
ভালোবাসাতেই ভরে আছে অন্তর।

অগ্নি-শিশু প্রসঙ্গে

অমিয় ভট্টাচার্য

আবার ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় ও বাল্যসঙ্গী ললিতবাবুর অলিগঞ্জের বাসায় এসে বসেছি। এ দিনটি ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন। ১১ই আগস্ট। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ললিতবাবু বললেন,—'ক্ষুদিরামের জন্মদিনটি তবু কোথাও কোথাও পালন করা হয়। কিন্তু আজকের দিনটি বুঝি অনন্তকালের গর্ভে হারিয়েই গেছে। দেশবাসী কোনোই মর্যাদা দেয় না একে। অথচ এই দিনটিই তো অগ্নি-দীক্ষার দিন। মামা তো শুধু নিজের জ্বালা আগুনে নিজেকেই আহুতি দেয় নি, সে যে জাতিকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে গেছে তার মহান আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে। জাতির প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম,—অথচ জাতি তার শহীদ হবার দিনটিকেই স্মরণ করে না কোনো স্মৃতিসভায়। এ দিনটি ইতিহাসের পাতায় থেকেও যেন একটি বোবা তারিখ হয়ে রইল।'

কিছুক্ষণ দম নিয়ে বৃদ্ধ আবার বলতে সুরু করলেন,—'অবশ্য আমাদের দুঃখ কোনদিনই ভোলবার নয়। ফাঁসির আগে একবার তাকে দেখতে পেলাম না। শেষ যেদিন দেখা হয়, মামা বলেছিল, 'আবার ফিরে আসবো। বোনের বিয়ের জোগাড় কর।' সবই হল, মামা ফিরে এল না। দেশবাসী শুনল, আমাদের সঙ্গে ক্ষুদিরাম দেখা করতে পারল না শেষ মুহূর্তে।···কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। আমাদের দেখা করতে না পারার পেছনে বিধাতার যে কত বড় একটা ইঙ্গিত ছিল, তা কে বুঝবে? হয়ত অগ্নিশিশু আমাদের মমতার বাঁধনে বদ্ধ হয়ে বুকের আগুন হারিয়ে ফেলে জড় মৃত্তিকার শিশুতে পরিণত হবে,—হয়ত মৃত্যুকে মহীয়ান করতে পারবে না নিজের তপঃশক্তিতে, তাই বিধাতা আমাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্ভব করে তোলেন নি। কিন্তু আমরা নেহাতই মাটির মানুষ, তাই চিরকাল বিচ্ছেদের দুঃখই অনুভব করছি।···কেমন করে ভুলবো সেই দিনগুলি, যখন মামার ফাঁসির পর উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি মেদিনীপুরের অলিতে-গলিতে, যেখানে মামার স্মৃতি তখনো জ্বল জ্বল করছে চোখের সম্মুখে। সতীঘাটে এসে বসে আছি একা, দেখছি চেয়ে, ঐ তো সেই ছোট মাঠটি, যেখানে মামা লাঠিখেলার মহড়া দিত জ্ঞানেন্দ্র বসু, সত্যেন বসুর সঙ্গে, গোলকুয়ারচকে এসে দাঁড়িয়েছি,—ঐ তো সেই ঘরটি যেখানে মৃন্ময়ী কালীমূর্তির সামনে বিপ্লবীদের দীক্ষা হত শ্রীমদ্ভগবদগীতা মাথায় নিয়ে,—পুরোনো কেল্লার মাঠে একা বসে আছি, বাউল গেয়ে চলেছে,—

'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি,
হাসি হাসি পরব ফাঁসি,' দেখবে জগৎবাসী!'···

দু' চোখ জলে ভরে উঠেছে, ঝাপসা দেখছি সব, হঠাৎ বেজে উঠল মামার কণ্ঠ—'হাবল মরতে ভয় পাবি কেন? গীতা পড়িস নি?' ঠিক যেমন করে বলতো সে আমাকে গভীর নিশীথে আমাদের মাণিকপুরের সেই ছোট্ট বৈঠকখানা ঘরে।

বৃদ্ধ আর বলতে পারলেন না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। অনর্থক ওঁকে অতীতে টেনে নিয়ে দুঃখ দেওয়ার লজ্জায় আমিও স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

ললিতবাবু বললেন—'ছিঃ, আমি বড় দুর্বল। বয়সের ভার বইতে না পেরে একটুতেই ভেঙ্গে পড়ি। আমাকে ক্ষমা করবেন!'

প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাবার জন্য আমি বললাম,—'আজ আপনার কাছে এসেছি ক্ষুদিরামের বাল্যের আরো কাহিনী শুনবো বলে। যদি আপনার কষ্ট না হয়—'

—'না, না।' বাধা দিয়ে বললেন ললিতবাবু। 'কষ্ট কিসের? চোখে জল আসে সত্যি, কিন্তু এ অশ্রু বড় পবিত্র। নিজেকে শুদ্ধ মনে হয় মামাকে স্মরণ করে কাঁদলে, কেন না, মামা নিজেই ছিল অগ্নিশুদ্ধ। জীবনের শেষ ক'টা দিন তার স্মৃতিতেই উজ্জ্বল হয়ে থাকুক, এই আশীর্বাদ করবেন।' হঠাৎ সোজা হয়ে বললেন বৃদ্ধ, চোখ দু'টি কিসের আবেশে স্তিমিত হয়ে এল, সুন্দর অতীতে যেন ডুবে গিয়েছেন, ডুবুরীর মতন রত্ন কুড়িয়ে আনতে!

অবশেষে বললেন,—'মামার কাহিনী বলতে কত কথাই না মনে পড়ে। কিন্তু সবচেয়ে ব্যথা পাই, যখন মনে হয়, মামার শেষ দু'টি বাসনার কোনোটাই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করেন নি। ফাঁসির আগে মামা দু'টি ইচ্ছাই জানিয়েছিল,—একটি, জন্মভূমি মেদিনীপুরকে শেষবারের মত প্রত্যক্ষ করা, আর একটি, মাতৃসমা বড়দিদি অপরূপা দেবী (আমার মা) এবং অন্যান্য আত্মীয়সহ এই হতভাগোর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ। মজঃফরপুরের জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ফাঁসির আগে ক্ষুদিরামের শেষ ইচ্ছা জানিয়ে আমার পিতৃদেব ৺অমৃতলাল রায়কে এক পত্র লেখেন। পিতৃদেব আমাদের সবাইকে নিয়ে মজঃফরপুর যাত্রার সব ব্যবস্থা করে ওঁর উপরিতন কর্মচারী জেলাজজ ফরেস্টর সাহেবের কাছে কয়েকদিনের ছুটির আবেদন জানিয়ে দরখাস্ত দিলেন।

ফরেস্টর সাহেব ভ্রূকুটিকুটিল নেত্রে পিতৃদেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, **'Is your wife loyal?'**

আপনারা হয়ত জানেন না, কিন্তু আমি তো জানি, একদিকে বিপ্লবী শ্যালকের প্রতি স্নেহ, অন্য দিকে জীবিকার জন্য রাজানুগত্য, এই দুই বিরুদ্ধ-শক্তির দ্বন্দ্বে পিতৃদেবের মনে অহর্নিশি কি এক ঝড় বয়ে যেত তবুও স্বাধীনচেতা পিতৃদেব বেদনা-দিগ্ধ কণ্ঠে বিদ্রূপ মিশিয়ে সাহেবে প্রশ্নের উত্তরে বলে বসলেন,—**'I am loyal. Hindu wome are loyal to their husbands. So, she is loyal.** পিতৃদেবের স্পষ্টোক্তি সাহেবকে বিচলিত করল। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ছুটির দরখাস্তখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গর্জন করে উঠলেন,— **'Why leave for few days? Why not for good?'**

মামার বাসনার সমাধি ঘটে গেল। আমাদের কেউই উপস্থিত হতে পারলাম না, তাঁকে শেষ দেখতে। বিস্মিত আতঙ্কে দেশবাসী শুনল, ক্ষুদিরামকে কোন আত্মীয়ের সঙ্গেই ফাঁসির আগে দেখা করতে দেওয়া হয় নি।'

'হ্যাঁ, আতঙ্ক!' উদ্গত অশ্রু কোনো রকমে চেপে বৃ

বলতে স্থুরু করলেন, 'সে কি আতঙ্ক! ক্ষুদিরামের ফাঁসীর আগে থেকেই সারা দেশে, বিশেষত এই মেদিনীপুর সহরে সে কি ধরপাকড়! বৃটিশসিংহের সে কি রুদ্ররোষ! ঘরে ঘরে থানা-তল্লাস। ঘরে ঘরে বিভীষিকা! মেদিনীপুরের পুলিশ রাজা থেকে স্থুরু করে ভিখারী পর্যন্ত প্রায় সব শ্রেণীর ১৫০ জন ব্যক্তিকে এক বোমা তৈরির ষড়যন্ত্রের মামলায় অভিযুক্ত করল। ১৯০৮ সালের ৮ই জুলাই, মীরবাজারে সন্তোষ দাস নামে এক পুলিশ কর্মচারীর বাড়ির ড্রেন থেকে আবিষ্কৃত হল এক মারাত্মক বোমা। সন্তোষ দাসের সঙ্গে বিশিষ্ট নাগরিক যোগজীবন ঘোষ, স্থুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কবে কোন দিন, প্রায় এক বৎসর আগে ক্ষুদিরামের একান্ত সহযোগিতায় জমিদার অবিনাশচন্দ্র মিত্র মেদিনীপুরে জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যদের আহার ও বাসস্থানের আয়োজন করেছিলেন,—শুধু এই জন্যই, অবিনাশবাবুকে বিনা জামিনে এক মাসের উপর জেল হাজতে থাকতে হল। এদিকে ঘটল আবার আর এক কাণ্ড! লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নামে এক দরিদ্র ব্যক্তিকে ক্ষুদে মামা একখানা শাল দিয়েছিল। (সে কাহিনী পরে বলছি।) সে বেচারা গিয়েছে সেখানা বাজারে বেচতে। অমনি তার উপর প্রশ্ন বর্ষিত হল, 'কোথায় পেলে এ শাল?' উত্তরে লক্ষ্মী বলেই ফেলল, 'ক্ষুদিরামবাবু গায়ে দিতে দিয়েছেন!' ব্যস আর যায় কোথায়? শ্যেনদৃষ্টি পড়ল লক্ষ্মীনারায়ণের গতিবিধির উপর। মজার কথা শুনুন। একদিন কোন এক বাড়িতে গিয়ে লক্ষ্মী ভিক্ষে চাইছে, 'বৌমা, দু'টি ভিক্ষে দাও না!' পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন লালমোহন দারোগা। তিনি 'বৌমা' শুনতে শুনলেন 'বোমা'। ব্যস্, সহরে শুরু হল প্রচণ্ড ধরপাকড়। মামলার পর মামলা সাজানো হল। আমাদের বাড়িও থানা-তল্লাসী হল। পিতৃদেব রক্ষা পেলেন কুসুম মাসীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। সে সব কাহিনী আপনাকে বলেছি।* মোটের উপর, সরকারী কর্মচারীরা প্রহ্লাদের সর্বজীবে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শনের মত সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে যেন বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে দেখতে লাগলেন। বোমাতঙ্ক, ক্ষুদিরামাতঙ্ক, দুই আতঙ্কে বেসামাল হয়ে উঠল বৃটিশসিংহ। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা কোনো নেটিভকে তাঁদের বাংলোয় ঢুকতে দিতেন না। প্রত্যেক কর্মচারীর সঙ্গে থাকত দু'টি পাঠান শরীর-রক্ষী, হাতে টোটাভরা রিভলভার।

আজ ভাবি,—প্রথম সেই আন্দোলনের ধাক্কা কেমন করে আমরা কাটিয়ে উঠেছিলাম? কে দিয়েছিল আমাদের সেই শক্তি? কোন প্রস্তুতি ছিল না, মানসিক কাঠামো ছিল অপরিণত, অথচ কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে একটা সহরের অধিবাসী নীরবে সহ্য করল সেই অভাবনীয় নির্যাতন,—একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের উপক্রমণিকা রচনা করতে? সে যেন ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের এক তেজঃগর্ভ স্তব্ধতা। মনে হত, ক্ষুদে মামাই যেন সুদূর মজঃফরপুর থেকে ডাক দিয়ে আমাদের বলছে,—'আমার জীবনে লভিয়া জীবন, জাগো রে সকল দেশ!'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর প্রশ্ন করলাম,—'আচ্ছা ললিতবাবু, মেদিনীপুরে রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হয়েছিল, তাতে ক্ষুদিরামের অংশ কি ছিল?'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সোজা হয়ে বসলেন ললিতবাবু। যেন অতীত হাতড়ে একটি রত্ন পেয়েছেন, এমনি উল্লাস।

—'সেদিনের কথা ভুলব কেমন করে? ১৯০৭ সালের ৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সেই অধিবেশন স্থুরু হল। এই উপলক্ষে কলকাতা থেকে এলেন স্থুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জেঃ চৌধুরী, মৌলভী দেদার বক্স, মৌলভী দীন মহম্মদ প্রভৃতি দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ। কিন্তু প্রথম থেকেই স্থুরু হল,—বিচ্ছেদ। দুইটি দল,—নরমপন্থী ও চরমপন্থী। শেষোক্ত দলের নেতা শ্রীঅরবিন্দ, আর তাঁরই নির্দেশে চালিত হল ক্ষুদেমামা ও সত্যেন বোস। সে কি প্রচণ্ড উল্লাস ও উৎসাহ! মামার সেই তেজোদৃপ্ত ভঙ্গীটি এখনো মনে আছে। নবীনের উদ্যম ও প্রবীণের বুদ্ধি। কোন সমঝোতা নয়, চরম লক্ষ্য স্বাধীনতা আদায় করতেই হবে, তা' সে যে পথেই হোক্!···এই হল চরমপন্থীদের শ্লোগান। নরমপন্থীদের আপোষমূলক মতবাদের সঙ্গেই বাধল প্রচণ্ড বিরোধ। দুই জায়গায় দুই সভা। মল্লিকবাবুদের রাসমঞ্চের আঙিনায় বসলো নরমপন্থীদের সভা, সভাপতি ক্ষীরোদবিহারী দত্ত। আর টাউনস্কুলের সম্মুখস্থ ময়দানে বসল চরমপন্থীদের সভা,—সভাপতি আবদুল হক। প্রথম দিনেই বিচ্ছেদ, কোলাহল। আর ক্ষুদেমামা সেই বিরোধের কুরুক্ষেত্রে যেন সংশপ্তক সৈন্যের সেনাপতি। পাঞ্চজন্য নিনাদ করলেন শ্রীঅরবিন্দ। শুধু তাই নয়, সভাভঙ্গের পর প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন ক্ষুদিরামকে।

আর এই ঘটনার পনেরো দিন পরেই স্থুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের বিরোধ যে দৃশ্যের অবতারণা করল, ইতিহাসের পাতায় তা' এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ মামা কবচের মত বুকে ধরে রাখত। তাই তো মেদিনীপুরের রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের পর মামা যখন কঠিন আমাশয় রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল, কোনো চিকিৎসায় কোনো ফল হল না, মা আর আমি আকুল হয়ে ৺সিদ্ধেশ্বরী মাতাকে ডাকতে লাগলাম,—তখন মামা হঠাৎ বলে উঠল: 'কোনো ব্যাধিরই সাধ্য নেই আমাকে মারে। আমি কিছুতেই মরব না, ভয় নেই তোমাদের। আমাকে শ্রীঅরবিন্দ আশীর্বাদ করেছেন।

তাঁর সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমি ভুলতে পারি না। আমার মধ্যে যে শক্তি তিনি দিয়েছেন, যে কোনো রোগকেই তা ঠেকিয়ে দিতে পারে। মামাকে সেই আমি শেষ সেবা করেছি। এখনো সে দিনটি আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমি বললাম,—'ক্ষুদিরাম ঠিকই বলেছিল ললিতবাবু। কিছুই তাকে মারতে পারে নি। মৃত্যুও তাকে মারতে পারে নি। ভারতের ম্যাকস্থইনী যতীন দাসের আত্মোৎসর্গের পর কাজী নজরুল ইসলামের লেখা সেই কয়টি লাইন মনে পড়ে,—

'যে জীবন কেহ লইল না, তাহা মৃত্যু লইল আসি।'

কি অদম্য সাহস ছিল ক্ষুদিরামের, ভাবলে অবাক হতে হয়। আট বছরের ছেলে ক্ষুদিরামকে জ্যাঠতুতো ভাই অবিনাশবাবু

* 'মাসিক বসুমতী'র ১৩৬৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

তমলুক থেকে নিয়ে এলেন আনন্দপুরে ভগ্নী নন্দীবালার বিবাহ উপলক্ষে। বিবাহের পর অবিনাশচন্দ্র ক্ষুদিরামকে আনন্দপুরের স্কুলেই ভর্তি করে দিলেন, তমলুকে পাঠালেন না।

এক বৎসর কোনরকমে কাটল। কিন্তু তারপরই ক্ষুদিরামের মন চঞ্চল হয়ে উঠল মাতৃসমা বড়দিদি অপরূপা দেবীর জন্য। তমলুকে যেতেই হবে তাকে—মেদিনীপুর হয়ে। তা সে যেমন করেই হোক্।

আনন্দপুর থেকে মেদিনীপুরের দূরত্ব ষোল মাইল। তখনকার দিনে গো-যান ছাড়া অন্য কোন যান ছিল না মেদিনীপুরে আসতে। পথের দু'ধারে শ্বাপদসংকুল দুর্গম অরণ্য, মাঝে মাঝে জনহীন প্রান্তর। নয় বছরের ছেলে ক্ষুদিরাম বড়দিদির কাছে ছুটে আসছে, একা, পদব্রজে। গভীর, অন্ধকার রাত। হাতে নিত্যসঙ্গী বাঁশের লাঠি, মুখে ৺সিদ্ধেশ্বরীর শঙ্কাহরণ নাম, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, লক্ষ্য মেদিনীপুর···আর মেদিনীপুরও পেরিয়ে তমলুকে বড়দিদির স্নেহাঞ্চল।

অন্ধকার বিদীর্ণ করে পথের পাশে শেয়ালের দল হেঁকে উঠল—'ক্যা হুয়া! ক্যা হুয়া!'

হা হা রবে হেসে উঠে ক্ষুদিরাম জবাব দিল—'কুছ নেহি হুয়া! মৎ ডরো ভেইয়া!'

অত জোনাকি জ্বলছে কেন? দু'ধারের ঝোপ-জঙ্গলে অজস্র জোনাকি যেন আলোর আসর জমিয়েছে। বড়দিদি বলতেন, বাঘ যেখানে থাকে, জোনাকি ভিড় করবেই সেখানে! তা'হলে কি—

চিন্তা কি? লাঠি আছে। হঠাৎ দু'টো লাফ দিয়ে, 'কালী মায় কি জয়' বলে ক্ষুদিরাম বন্ বন্ লাঠি ঘোরাতে লাগল। বিদ্যুদ্বেগে ঘুরছে। কোন দুশমনের সাধ্য নেই, তার সামনে এগোয়। অথচ ক্ষুদিরাম অবলীলাক্রমে এগিয়ে চলছে সামনের দিকে দীর্ঘ দূরত্বকে খণ্ড খণ্ড করে দিচ্ছে লাঠির ঘায়ে।

প্রত্যূষে যখন ক্ষুদিরাম,—দুর্দান্ত ক্ষুদিরাম—মেদিনীপুরে পিতৃবন্ধু কৃত্তিবাস বসুর বাটীতে উপস্থিত হল, তখনো আকাশে শুকতারা জ্বল জ্বল করছে। পাখীর কাকলী সুরু হয় নি। সহর নিঝুম।

কড়া নেড়ে ক্ষুদিরাম জাগালো সবাইকে।···কৃত্তিবাসবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। বললেন,—'আমি কি স্বপ্ন দেখছি? এতটুকু ছেলে তুই, ষোলো মাইল পথ হেঁটে চলে এলি? তাও গভীর অন্ধকার রাত পেরিয়ে?'

দৃপ্তকণ্ঠে ক্ষুদিরাম বলল, 'হাঁ কাকাবাবু, তবু আমি এতটুকু ক্লান্ত হই নি। আরো ষোলো মাইল আমি এখনো হাঁটতে পারি।··· বড়দিদির কাছে যে আমাকে যেতেই হবে।'

আর এক রাত।

অপরূপা দেবী দাসপুর থেকে গো-যানে পুত্র-কন্যাদের নিয়ে মেদিনীপুরে আসছেন। সঙ্গে অভিভাবক দশ বছরের ছেলে ক্ষুদিরাম। একজন বিশ্বস্ত মুসলমান গাড়োয়ানের পরিচালনায় দীর্ঘপথ অতিক্রম করছে এই ক্ষুদ্র দলটি। আর সে কি পথ! শুধু দীর্ঘই নয়, ভয়াবহ। অরণ্যময়, দস্যু অধিকৃত। যে কোন মুহূর্তে সগর্জনে দস্যুরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে গাড়ির উপর। এরূপ ঘটনা বিরল ছিল না, তখনকার দিনে—যখন দস্যুরা পথিকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাকে হত্যা করে না পালাতো।

গাড়ির ভেতরে বসে ক্ষুদিরাম, শিশুকন্যা কোলে অপরূপা ও কিশোরীমোহন (ললিতমোহনের ছোট ভাই)।

ফাল্গুনের দ্বিপ্রহর। জনহীন পথ। ছায়াবঞ্চিত দগ্ধ দিনকে সচকিত করে মাঝে মাঝে শুধু দূর গ্রাম থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসছে।

কেশপুর থানার প্রান্তর-সর্বস্ব একটি গ্রামে গাড়ি পৌঁছতেই গাড়োয়ান ফাজিল বলে উঠল,—'সামাল মা ঠাকরুণ! আমড়াকুচি!'

আমড়াকুচি! তখনকার দিনের এক কুখ্যাত আতঙ্ক! নাম শুনলেই গা শিউরে ওঠে।···ঐ পুলের নীচে ডাকাতে কাটা কত মানুষের মুণ্ড এখনো গড়াগড়ি যাচ্ছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, জনমানবের বসতি নেই। দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে যেন এক অশুভ ছায়া কেঁপে কেঁপে উঠছে পিঙ্গল বিভীষিকার আকার নিয়ে।

তবু এখানেই থামতে হবে, উপায় নেই। যাত্রীরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছে। অবশেষে আমড়াকুচির মাইলটাক দূরে গাড়ি থামিয়ে ফাজিল বলল,—'ভয়ের জায়গাটা পেরিয়ে এসেছি মা ঠাকরুণ। আপনারা এখানেই একটু বিশ্রাম করুন। আমিও পাশের গাঁ থেকে নাস্তা সেরে আসি।'

তাই হল। একটা গাছের ছায়ায় সবাই নেমে বসল। ফাজিল চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরই, এ কি! এগিয়ে আসছে ওরা কারা? ভীষণ দর্শন তিনটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি, হাতে মজবুত লাঠি। তৈলাক্ত দেহে রোদের ঝিলিক ধারালো হিংস্রতায় ঝলকে উঠল। গর্জে উঠল দস্যুরা, 'মাল সাফ করো। মার, মার, মার।'

অপরূপা দেবী অসহায় দৃষ্টিতে ক্ষুদিরামের দিকে তাকালেন। নিঃসহায়ের সহায় দশ বছরের কিশোর ক্ষুদিরাম।

উপায় স্থির করতে তার এক সেকেণ্ডের বেশি সময় প্রয়োজন হল না। তৈলসিক্ত প্রিয় সহচর লাঠিগাছটা নিয়ে মালকোঁচা দিয়ে কাপড়খানা পরে অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম দু'বার লাফ দিয়ে বলে উঠল—'আয় ডাকাত। জয় মা!'

লাঠিখেলায় বরাবরই ওস্তাদ। ভাগিনেয় কিশোরীমোহনকে নিয়ে মেদিনীপুরের আখড়ার সেই মহড়া, সে কি বৃথা যাবে? সেই যে,—অবিরল ইটপাটকেল ছুড়ছে কিশোরী আর সমান চোটে ক্ষুদিরাম প্রতিহত করছে প্রত্যেকটি আঘাত,—একটি ঢিলও তার গায়ে লাগছে না, সবাই দেখে অবাক হয়ে ভাবছে, মহাভারতের পাতা থেকে বীর অভিমন্যু বেরিয়ে এল বুঝি!

সেই তাক, সেই কসরৎ দেখাতে হবে ডাকাত বেটাদের!

—'এই কিশোরী!' হুঙ্কার দিল ক্ষুদিরাম।—ছুড়ে দে আমার দিকে যা পাস, আমি লাঠি চালাই,—সেই যেমন আমরা করতাম সহরে!'

কিশোরী আদেশ পালনে একটুও বিলম্ব করল না। হাতের কাছে ঢিল, পাটকেল, নুড়ি যা পেল ছুড়তে সুরু করলো মামার দিকে, আর ক্ষুদিরাম প্রত্যেকটি ঢিল প্রচণ্ডবেগে লাঠি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিল! ঠক্, ঠক্, ঠক্। সে কি বেগ! যেন গুলী ছুটছে লাঠি থেকে। চেয়ে থাকা যায় না। বুক কেঁপে ওঠে।

অপরূপা দেবীর আর ভয় নেই। জয় মা সিদ্ধেশ্বরী! শক্তি

ফিরে পেয়েছেন তিনি। ঘন ঘন উৎসাহ দিতে লাগলেন ক্ষুদিরামকে। তিনটি প্রাণীর মধ্যে সাহস যেন আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছে। কে এগোবে তাদের কাছে?

ঝাঁকড়া চুল উল্টিয়ে, চোখে আগুন ছুটিয়ে ক্ষুদিরাম লাঠি ঘোরাচ্ছে বন্ বন্, ডাকাতেরা তাকিয়ে দেখছে অবাক্ বিস্ময়ে, ঢিলগুলো লাঠির গায়ে লেগে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে,—ঐ কিশোরটির গা কি একটি ঢিলও স্পর্শ করতে পারবে না?

—'কেয়া তাজ্জব!'

সর্দার হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'সাবাস্ বাবু সাহেব।' পরক্ষণেই দু'হাত তুলে এগোতে এগোতে বলল—'থামান; থামান বাবু! ডর নেই। মায়ের দিব্যি, কিছু বলবো না!'

দৃঢ়মুষ্টিতে লাঠিগাছটি ধরে ক্ষুদিরাম এগিয়ে এল।

সর্দার কিন্তু লাঠি ছুড়ে ফেলে দিল দূরে, হুঙ্কার দিয়ে সঙ্গীদের বলল,—'সেলাম কর খোকাবাবুকে, হতভাগারা! ফেলে দে লাঠি।'

পরমুহূর্তেই সঙ্গীরা লাঠি ফেলে দিয়ে সেলাম করতে করতে এগিয়ে এল।

সর্দার গদগদকণ্ঠে ক্ষুদিরামকে বলল,—'কেয়া কসরৎ খোকাবাবু! কার কাছে শিখেছেন আপনি লাঠিখেলা? এ যে ভেল্কির মত মালুম হচ্ছে বাবুসাহেব!'

ঘর্মাক্ত কলেবর ক্ষুদিরাম মাটিতে বসে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—'বিষ্ণুপুরের এক ওস্তাদ শিখিয়েছে আমাদের। যা কসরৎ দেখলে, এ সব তাঁরই!'

হেসে উঠে সর্দার বলল,—'আপনারা লেখাপড়া শিখে বড় হবেন, জজ-ম্যাজিস্টর হবেন, এ সব লাঠিখেলা শিখে কি করবেন, বাবু?'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো ক্ষুদিরাম। মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হল। নাসা হল বিস্ফারিত। মাংসপেশী স্ফীত হয়ে উঠল। সগর্জনে বলল,—'আমাদের দেশ পরাধীন জানো না? জানো না, ইংরেজ ফিরিঙ্গীরা নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পলাশীর যুদ্ধে ফাঁকা কৌশলে হারিয়ে আমাদের দেশ কেড়ে নিয়েছে এখন আমরা হিন্দু মুসলমান, সবাই মিলে আমাদের দেশ ফিরিঙ্গীর কবল থেকে উদ্ধার করব।···হ্যাঁ, উদ্ধার করতেই হবে। এর জন্য চাই শক্তি, চাই বাহুবল···'

সর্দার আর স্থির থাকতে পারল না। কচি এক ছেলের মুখে সে যেন শুনলো বিবেকের বাণী। বাধা দিয়ে বলে উঠল,—'তোবা! তোবা! আমাদেরও একটা বড় দল আছে খোকাবাবু, এই কেশপুর থানায়। আমরা সবাই আপনাদের সাহায্য করব। লড়াই করব জান দিয়ে। জানেন বাবু, আমাদের একজন ওস্তাদ আছেন, মেদিনীপুরের অলিগঞ্জে, তাঁর নাম আবদুল রহমান···'

উল্লসিত হয়ে ক্ষুদিরাম বলে ওঠে,—'আরে, তিনি তো আমাদেরই মহল্লার এক নামকরা ওস্তাদ। আমরাও তো তাঁরই সাকরেদ! তা হ'লে তোমরা তো আমাদের গুরুভাই—'

মুহূর্তে দুই বীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হল।

—'মেদিনীপুরে আমার সঙ্গে দেখা করবে, সর্দার। ভুল হয় না যেন।' অপরূপা দেবীর দিকে চাইল ক্ষুদিরাম। অর্থ বুঝলেন স্নেহময়ী দিদি। গাড়ি থেকে নামলো চিঁড়ে, গুড়, মুড়ি কড়াই ভাজা। কিশোরী কোমর বেঁধে লেগে গেল পরিবেশন করতে। ডাকাতের দল হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'জয় খোকাবাবু কী জয়।' তারপর চলল সোল্লাস ভোজনোৎসব।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ললিতবাবু বললেন,—'মামার সাহসিকতার এই ঘটনার শেষ সাক্ষী কিশোরীমোহন এই সেদিন পরলোকে চলে গেছে মামার সঙ্গে মিলতে। স্বর্গের কোন এক নিভৃতপ্রান্তে হয়ত আজও অগ্নি-কন্দুক নিয়ে মামা কিশোরীকে তালিম দিচ্ছে। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে আমি কবে সেখানে গিয়ে মিলবো, বলতে পারেন?'

আবেগে বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

ক্ষুদিরামের বুকে ছিল আগুন,—কিন্তু অন্তরের নিভৃতে ছিল মমতার অমৃত। তারই একটি কাহিনী:

বাক্সে একখানা দামী শাল ছিল ক্ষুদিরামের। ওর বাবা ত্রৈলোক্যনাথকে নাড়াজোলের রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ শালখানা উপহার দিয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম ব্যবহারই করত না সেখানা আর তার শাল গায়ে দেবার ফুরসতই বা কোথায়? সারাদিন কাটে ওর ঘর্মাক্ত কর্মোৎসবের মধ্যে, আর রাত কাটে বিপ্লবীদের আগ্নেয় সম্মেলনে!

শীতের এক নিস্তেজ মধ্যাহ্ন। নবীনাবাগের লক্ষ্মীনারাণ দাস কাঁপতে-কাঁপতে যাচ্ছে পথ দিয়ে; ক্ষুদিরাম তখুনি বাড়ি ফিরেছে স্নান করতে যাবে। লক্ষ্মীনারাণকে বসে পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করল: 'কি রে, নারাণ, কি হয়েছে? শীত করছে খুব?'

কাঁপতে কাঁপতেই লক্ষ্মীনারাণ বলল, 'আজ্ঞে, আমাদের জীবনে তো অন্য কোনো কাল নেই, সব সময়ই আমাদের শীতকাল। তাই সব সময়ই আমরা কাঁপি।'

—'তার মানে?' অস্ফুট আর্তনাদের মত শোনালো ক্ষুদিরামের প্রশ্নটা।

—'আজ্ঞে, খেতে পাই না, পরতে পাই না, শীত তাই তো আমাদের পেয়ে বসে বেশি ক'রে!···

হঠাৎ ক্ষুদিরাম চলে গেল অন্দরে। বাক্স থেকে দামী শালখানা নিয়ে এল। তারপর নারাণের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দ্যাখ্, এবার শীত একটু কমেছে তো?'

লক্ষ্মীনারাণ যেন গ্রহণ করতে পারছে না এই অদ্ভুত পরিস্থিতিটিকে, বিশ্বাস করতে পারছে না এই আকস্মিক বদান্যতাকে। তাই ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অস্ফুটস্বরে বলল, সত্যি দিচ্ছেন খোকাবাবু?'

—'সত্যি নয় তো কি মিছেমিছি? তুই শীতে কাঁপবি, আর আমি শাল বাক্সে রেখে দেবো পোকার খাবার হবার জন্যে? যা—যা—পালা শীগ্গির।'

সুড়সুড় করে বিস্মিত লক্ষ্মীনারাণ শালখানা গায়ে দিয়ে পথ ধরলো। ক্ষুদিরাম নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল পথে-পথে ভিক্ষে করে ফেরা শীর্ণ ব্যক্তিটির দিকে। লক্ষ্মীনারাণ অদৃশ্য হয়ে গেল চোখ ফিরিয়েই দেখল, সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন অপরূপা দেবীর দেবরের স্ত্রী। তিনি সবই দেখেছিলেন আড়াল থেকে। এবার চেঁচিয়ে উঠলেন,—'আচ্ছা, এ কি পাগলের মত কাণ্ড করলি বল্ তো? তুই ভাবছিস, ওই শাল গায়ে দেবে লোকটা? ও তো এক্ষুণি বেচে ফেলবে। তা ছাড়া,

তুই কি জানিস না, শালখানা ছিল তোর বাবার স্মৃতি? এমনি করে তাঁর অপমান করলি?'

দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলল ক্ষুদিরাম, 'আমি জানি ছোড়দি' লোকটা শালখানা বিক্রি করে ফেলবে। কিন্তু বিক্রি করে যা পাবে, তা দিয়ে কয়েকটিদিনের জন্যও ওর পরিবারের সবার গ্রাসাচ্ছাদন চলবে।...আর বাবার স্মৃতি? সেই স্মৃতির প্রতি কি বেশি সম্মান দেখানো হবে, যদি শালখানা বাক্সে বন্ধ থেকে অবশেষে পচে ছিঁড়ে যায়?'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল অগ্নিশিশু। তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে দু'টি মুষ্টি সামনের দিকে ছুড়ে দৃপ্তকণ্ঠে বলল,—'ওই শালের বদলে, বরং যদি একটি প্রাণও রক্ষা পায় যদি একটি সংসারের দুইবেলার অন্নও জোটে, ধন্য হবে বাক্সে রাখা আমার বাবার শাল। বাবার স্মৃতিকে এর চেয়ে বড় মর্যাদা আমি কোনদিনই দিতে পারব না।'

কিছুক্ষণ থেমে আবেগাপ্লুতকণ্ঠে বলল ক্ষুদিরাম,—'সত্যি আমি পাগল হয়ে যাই ছোড়দি', যখন দেখি, রাস্তার দু'পাশে কঙ্কালসার কাঙালীর দল গরম কাপড়ের অভাবে থরথর করে কাঁপছে, অনাহারে কুঁকড়ে-ওঠা দেহগুলি মৃত্যুর প্রত্যাশা করে প্রহর গুণছে, আর যখন তারই পাশে দেখি, বিলাসী ছোকরার দল বুক ফুলিয়ে দামী শাল গায়ে দিয়ে সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে চলেছে, আর সেই সিগারেটের আগুন সেই কাঙালীদের দিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুড়ে দিচ্ছে...'

হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল ক্ষুদিরাম,—'কিন্তু জানে কি ঐ স্বার্থপর বিলাসী বাবুর দল, যে একদিন ঐ আগুনই দাবানল হয়ে জ্বলে উঠে, গোটা শোষক সমাজকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।'

এইরকম গোপন দান যে কতবার করেছে ক্ষুদিরাম, তার হিসেব কেউ রাখে নি। নিজে থাকত একটা ছেঁড়া কামিজ গায়ে দিয়ে, প্রসাধনের কোন বালাই ছিল না। অবিন্যস্ত কেশদাম, অস্নাত, অভুক্ত ক্ষুদিরাম কতদিন যে কাঙালীদের বাড়ি গিয়ে তাদের সেবা করে এসেছে, আহার্য বিতরণ করে এসেছে, তার সঙ্গী যাঁরা এখনো জীবিত আছেন, সবাই জানেন।

একদিনের ঘটনা। ১৯০৪ সাল। কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে ক্ষুদিরাম। শিক্ষক অনন্তলাল সাহু ঐ শ্রেণীতে ইতিহাস পড়ান। তাঁর শাস্তিবিধান ছিল নানারকম—তার মধ্যে একটি হচ্ছে, পড়া মুখস্থ না হলে, ছাত্রের কোন কৈফিয়ৎ না নিয়েই তাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করানো।

একদিন ক্লাস বসবার আগে, ক্ষুদিরাম ঘরে ঢুকেই এক কাণ্ড করে বসল। কোন কথা না বলে সটান বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই অবাক। কিন্তু ক্ষুদিরামের ব্যক্তিত্বের প্রভাব এমনি, কেউ কোন প্রশ্ন করতেও সাহস পাচ্ছে না। অনন্তবাবু ক্লাসে ঢুকেই ক্ষুদিরামকে ঐ অবস্থায় দেখে কিছুক্ষণ স্তম্ভিতদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন; তারপর বললেন—'কি রে ক্ষুদে, ব্যাপার কি? মেঘ না চাইতেই জল। পড়ানোই শুরু করলাম না, আগেই দাঁড়িয়ে গেলি?'

নিরুত্তাপকণ্ঠে ক্ষুদিরাম জবাব দিল,—'আজ আমার ইতিহাসের পড়া মুখস্থ হয় নি। তা' পড়া না হলে আপনি তো কৈফিয়ৎ না নিয়েই বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেন। তাই আমি আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছি। এখন বেতটা পিঠের উপর পড়ুক, তারই অপেক্ষা আছি।'

গম্ভীর মানুষ অনন্তবাবু। তবু তিনিও ক্ষুদিরামের কথায় হেসে উঠলেন—'বেশ! বেশ! তা পড়াটা হয় নি কেন, বল তো বাপু কৈফিয়তটা না হয়, তোমার বেলায় জিজ্ঞাসাই করলাম!'

—'বিশ্বাস করবেন, যা বলব?' ক্ষুদিরামের কণ্ঠে খুব কঠিন জোরালো আওয়াজ।

অনন্তবাবু এবার বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। কোন ছাত্রের কাছ থেকে তিনি তাঁর শিক্ষকজীবনে এমন জোরালো প্রশ্ন শোনেন নি। ঋজু, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে অনন্তবাবু আচ্ছন্নের মত বললেন,—'আর কারো কথা বিশ্বাস না করলেও, তোমার প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করব!'

—তবে শুনুন স্যার। আমাদের বাসার পাশে একটা ভাঙা ঘরে এক বুড়ি থাকে। মুড়ি বেচে তার দিন চলে। কাল সন্ধ্যায় তার বোনপো'র হল কলেরা! বাড়িতে আর কেউ নাই। ডাক্তার ডাকবে কে? শুশ্রূষাই বা করবে কে? যখন ঢুকলাম তার বাড়িতে, দেখি, বুড়ি বসে শুধু 'হায় হায়' করছে। ওদিকে রোগী ভেদবমির মধ্যে অসাড় হয়ে পড়ে আছে।...দৌড়ে ডাক্তার ডেকে আনলাম। তারপর ওষুধ পথ্য দেওয়া, নোংরা পরিষ্কার করা, বুড়িকে সান্ত্বনা দেওয়া—সারারাত কাটলো সেখানে। সকালেও সেখানেই ছিলাম। রোগী একটু সুস্থ হতে চলে এসেছি। আপনার ইতিহাসের পড়া পড়বো কখন বলুন, স্যর?'

ক্ষুদিরামের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। বোধ হয়, চোখের সামনে তার ভেসে উঠেছে, ঐ রকম কত অগণিত রোগী দেশের অলিতে-গলিতে বিনা শুশ্রূষায়, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, লোকচক্ষুর অন্তরালে কত ফুল কুঁড়িতেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে, দেশের কত স্বপ্ন, কত ভবিষ্যৎ, এমনি করেই শোচনীয় অতীতে পরিণত হচ্ছে।

অনন্তবাবু স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ ক্ষুদিরামের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর স্খলিতকণ্ঠে বললেন,—'হাঁ ক্ষুদিরাম, তুমি আমার ইতিহাসের পড়া আর পড়বে না, তুমি নিজেই রচনা করবে এক ইতিহাস। আমি বুঝেছি। তুমি এবার বেঞ্চ থেকে নেমে বোসো তো বাবা। নইলে আমাকেই বসে পড়তে হবে, কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে।'

কঠিনের কুঁড়ি থেকে ফুটে উঠেছিল আগুনের ফুল,—ক্ষুদিরাম। যেখানে অন্যায়, উৎপীড়ন, সেখানে তার অগ্নি-শাসন, আবার যেখানে নির্যাতিতের বেদনা, সেখানে তার কুসুম-পেলবতা। একটি ছোট ঘটনা...

ঐ কলেজিয়েট স্কুলেরই এক দরোয়ান ছিল স্কুল এবং কলেজের অধ্যক্ষ মৈত্র মহাশয়ের খুব প্রিয়পাত্র। ছাত্রদের সঙ্গে ঐ দরোয়ান অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করত। সময় সময় তার উৎপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে যেত। ছাত্রেরা মৈত্র মশাইয়ের কাছে অভিযোগ করেও কোন ফল পেত না। ফলে দরোয়ানের স্পর্ধা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। চরমে উঠল সেইদিন, যেদিন সে বিনয়কৃষ্ণ দে নামে ক্ষুদিরামের একজন সহপাঠীকে অকথ্য, অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিল। বিনয়কৃষ্ণ মেদিনীপুরের বিশিষ্ট এক ভদ্রপরিবারের সন্তান। এক

অশিক্ষিত, অসভ্য দরোয়ান তাকে চূড়ান্ত অপমান করবে, তা সে সইবে কেন ?

ক্ষুদিরামের কাছে বিনয়কৃষ্ণ অভিযোগ করল। বলল—'তুমি ছাড়া কেউ পারবে না ও ব্যাটাকে শায়েস্তা করতে।'

ক্রোধে জ্বলে উঠল ক্ষুদিরামের উদ্দীপ্ত যৌবন। দুর্দান্ত যৌবন হিতাহিত মানে না, বিচারের অপেক্ষা রাখে না। শালীনতা, শোভনতা দু'পায়ে মাড়িয়ে একটি অভদ্রলোক সম্ভ্রান্ত একটি ভদ্র-সন্তানকে অপমান করেছে,—এই সংবাদই যথেষ্ট। স্কুলের ফটকের সামনে দৌড়ে এসে দরোয়ানকে পাকড়াও করল ক্ষুদিরাম। তারপর বেদম প্রহার! সে কি নিপীড়ন। ক্রুদ্ধ সিংহ যেন, শিকারের উপর লাফিয়ে পড়েছে। সবাই স্তম্ভিত। এমন কি মৈত্র-মহাশয়ও।

নির্দয় প্রহারে দরোয়ানকে প্রায় অচৈতন্য করে ক্ষুদিরাম ছুটে গেল মৈত্র মহাশয়ের কাছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল,—'শাস্তি দিন আমাকে। আমি দোষী। হাঁ, মেরেছি আমি দরোয়ানকে।··· শাস্তিই আমার প্রাপ্য। আমি যতটা মেরেছি, আমাকে তার চেয়ে বেশি মারলেও আমি মুখ বুজে সহ্য করব, কেন না, সে তো আমার পাওনা। পাওনা পেলে কেউ কি দুঃখ পায়? কিন্তু স্যার, ঐ দরোয়ানকে আপনি দয়া করে সতর্ক করে দেবেন, সে যেন ভবিষ্যতে কোনো ছাত্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে।'

মৈত্র মহাশয় কিছুক্ষণ নীরব থেকে কি যেন চিন্তা করলেন। পরে বললেন,—'আচ্ছা, তুমি বাড়ি যাও।'

স্কুল বসবার পর ক্ষুদিরামের ডাক পড়ল অধ্যক্ষের ঘরে। সহপাঠীরা বলাবলি করল,—'ক্ষুদের এবার আর রক্ষে নেই। পিঠের ওপর ক'খানা বেত ভাঙেন প্রিন্সিপ্যাল, কে জানে?'

ক্ষুদিরাম কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভঙ্গীতে অধ্যক্ষের কামরায় এসে দাঁড়াল। প্রশান্ত মুখমণ্ডল। নির্ভীক কণ্ঠস্বর,—'ডেকেছেন কেন, স্যার?'

মৈত্র মহাশয় গম্ভীর। ক্ষুদিরামের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে হঠাৎ মৃদুহেসে বলে উঠলেন—'তুমি কি চাও?'

—'শাস্তি।'

—'শাস্তি তোমাকে আমি দেব না ক্ষুদিরাম। অন্যায়ের প্রতিকার করতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়াই ন্যায়সঙ্গত। বিশেষত উদ্দাম যৌবন ঐ রকম নির্দয়ভাবেই অন্যায়ের শাস্তি দেয়। তাই স্বাভাবিক। তোমাকে আমি শাস্তি দিতে পারি না। ন্যায়ের বিরুদ্ধে শাস্তিবিধান করাও তো অন্যায়। তুমি ঠিকই করেছ। দরোয়ানকে আমি সতর্ক করে দিয়ে বলেছি,—এরপরও তার আচরণের যদি পরিবর্তন না হয়, তবে তার চাকরি থাকবে না।'

চলে এলো ক্ষুদিরাম। কিন্তু এ কি! হঠাৎ নির্ভীক প্রশান্তমুখে বিষাদের ছায়া কেন? তবে কি অধ্যক্ষের বিচারে সে ক্ষুব্ধ হয়েছে?

না, তা নয়। শক্তিমান যৌবনকে যতই গৌরব সে দিক, তবু হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, বেপরোয়া যৌবনকে সে ক্ষমা করতে পারবে না। যে যৌবন মানবতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তার আবার কিসের গৌরব? সে তো ভঙ্গুর এক স্থূলশক্তি। নিঃসহায় দরোয়ানকে নির্দয়ভাবে প্রহার করায় গৌরব কি? পৌরুষ কি? মানবতার আদালতে ক্ষুদিরাম তাই অপরাধী; তাকে শাস্তি অধ্যক্ষ দেন নি, নিজেকেই সে ভার নিতে হবে।

সন্ধ্যায় পুরোনো কেল্লার মাঠে বসে অঝোরে কাঁদল ক্ষুদিরাম। হাল্কা হল মন। অনেকটা ক্লেদ যেন ধুয়ে গেল।

পরদিন ভোরে আনন্দপুরে প্রস্তুত একখানি তসরের চাদর নিয়ে চুপি চুপি দরোয়ানের ঘরের দরজায় ঘা দিল।

দরোয়ান বেরিয়ে এল। ক্ষুদিরামকে দেখে সভয়ে পিছিয়ে আসতেই ক্ষুদিরাম জড়িয়ে ধরল তাকে।

এ কি-! এ তো প্রহার নয়, এ যে উপহার! বিস্ময়ে দরোয়ান যেন পাথর হয়ে গেছে। চাদরখানা আদর করে দরোয়ানের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে ক্ষুদিরাম বলল,—'বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে ভাই। তুমি আর আগের সে লোক নও। আমাকে ভালোবাসবে তো ভাই এখন থেকে? আমার ওপর রাগ নেই তো?'

কেঁদে উঠল দরোয়ান—'বাবু, আমি গোপালজীর নাম লিয়ে বলছি, কোনো লেড়কার উপর খারাবি বাত কভি বলব না।'

—'আমি জানি, তুমি খুব ভাল লোক। এই চাদরখানার সঙ্গে আমাকেও মনে রেখো ভাই তোমার দোস্ত, বলে, কেমন?'

চোখের জলে দরোয়ানের হাসি যেন মুক্তোর মত জ্বলে উঠল।

—'আপনাকে আমি দেওতার চেয়েও বেশি ভালোবাসব বাবু।'

ক্ষুদিরামের কাহিনী শুনে ললিতবাবুর বাসা থেকে যখন পথে বেরিয়ে পড়লাম, রাত তখন গভীর। পাড়া নিঝুম। কোথায় যাবো? বাসায়? কোন্ পথে? অনেক পথ। আর সব পথেই তো ক্ষুদিরাম। মেদিনীপুর ক্ষুদিরামকে যেন দরোয়ানকে দেওয়া উপহারের চাদরের মতই জড়িয়ে রেখেছে। উদভ্রান্তের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ছোটবাজার, নিমতলার চক, কর্নেল গোলা,—অবশেষে গোলকুয়ার চক। ঐ তো, ঐ তো সেই জায়গাটা, যেখানে ছিল কালীমন্দির, যেখানে ক্ষুদিরাম, সত্যেন বোস, জ্ঞানেন্দ্র বোস লাঠি খেলার মহড়া দিত,—স্বাধীনতার শপথ নিত। আজ সেখানে কিছু নেই, শুনতে পাচ্ছি, রিক্ততার হাহাকার, অবহেলার অনুশাসন, আর—

পেছনে কতগুলি ছেলের কলরব শুনলাম। সিনেমার শেষ শো দেখে ফিরছে—

—'বৈজয়ন্তীমালার ড্যান্সটা দেখলি—ওয়াণ্ডারফুল মাইরি। কাটারি মেরে দিয়েছে রে!'

—'কেন দেব আনন্দকে বুঝি তোমার ভালো লাগলো না? কি নাইস্ ফিগার! যেন এ্যাপোলো—'

—'যাই বলো, আশা পারেখের সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না। এ্যাক্টিং-এই মেরে দেয়! উফ্—

—'যা যা যা—ক'টা ছবিই বা দেখেছিস, তুলনা করতে আসছিস।'

সবাই আমাকে দেখে দাঁড়ালো। কয়েকজন আমাকে চেনে। একজন বলল, 'এখানে কি করছেন, স্যর?'

বললাম—'ললিতবাবুর বাসা থেকে ফিরছি।···তা, তোমরা কি সিনেমা দেখে এলে?'

—'হ্যাঁ স্যার। দেখবেন ছবিটা—ওয়াণ্ডারফুল হয়েছে। যেমন ডিরেকশন, তেমনি গান স্যার।'

—'তা হোক। আচ্ছা তোমরা শক্তিচর্চা কিছু করো না?…এই ধরো, লাঠিখেলা, কুস্তি…'

আস্তিনের আড়ালে সবাই হাসতে লাগলো, বেশ বুঝলাম। রাস্তার পাশেই একটা কঙ্কালসার ভিখারী বোধ হয় জ্বরে ধুঁকছে। তার অস্পষ্ট গোঙানির সঙ্গে, ছেলেদের হাসিটা কেমন যেন এক বেখাপ্পা পরিবেশের সৃষ্টি করল। আমি অভিভূতের মত ক্ষুদিরামের শক্তিচর্চার আখড়ার জায়গাটার দিক তাকিয়ে রইলাম।

হঠাৎ একটা কুলি শ্রেণীর লোক পাশের বস্তি থেকে বেরিয়ে এলো কাঁদতে কাঁদতে। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল—'আপনারা বিচার করুন বাবু? ওই শালা ভোগলু আমার বিটির দিকে খারাপ চোখে তাকাইছিল, আমি তাকে গাল দিইছি, আর সে আমাকে এমন করে মারল—' বলেই আবার হাঁউমাউ কান্না।

ছেলেগুলো সমস্বরে বলে উঠল—'তা বাবা, থানায় যা না, আমরা কি করব?'

কয়েকজন নাক সিঁটকিয়ে বলল—'আর এই সব বস্তিগুলোও হয়েছে একটা গোলমালের আখড়া—কেবল ঝগড়া, মারামারি,—মিউনিসিপ্যালিটির উচিত'—

বলতে বলতে এগিয়ে চলল ছেলের দল। কুলিটা কাঁদতে-কাঁদতে আবার গিয়ে তার নোংরা কোটরে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু আমি তো কোথাও চলতে পারছি না। মনে হল, কোন এক দৈবশক্তি আমাকে গোলকুয়ার চকের এই ফাঁকা জায়গাতে বন্দী করে রেখেছে। মনে হল, আমাকে ঘিরে আছে এক অগ্নিবলয়, কতগুলি অগ্নিময় মুখ আমার দিকে চেয়ে যেন বলছে, আমরা আছি, আমরা যুগে-যুগে থাকব আমাদের নিষ্ঠা নিয়ে, কর্মশক্তি নিয়ে, আদর্শ নিয়ে: যখনই জাতি হবে নির্বীর্য, আদর্শচ্যুত, যখনই দুর্বলের উপর চলবে নির্যাতন, তখনই আমরা আনবো বিপ্লব, দেশকে নিয়ে যাব অগ্নিতীর্থে, সেইখানে সবাইকে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করাবো,—তবেই তো খাঁটি মানুষ গড়ে উঠবে—'

তাই নিয়ে চল, ওগো বিস্মৃত অগ্নি-সাধকের দল, নিয়ে চলো অগ্নিতীর্থে,—কেউ না জানুক, আমি জানব, আমি বলবো সবাইকে,—বেঁচে আছে অগ্নিশিশু, তার খেলা আজও শেষ হয় নি।

বারৌণী জংশনে কাক

শক্তি মুখোপাধ্যায়

এখন মধ্যাহ্নপুর। সমস্তিপুরের গাড়ি ছেড়ে গেল।
কিছুক্ষণ প্লাটফরম নিঝুম।
অত্যধিক অলসতা চতুর্দিকে আবরণে মোড়া।
মুহূর্ত বিশ্রাম নিয়ে চা'ওলা ছুটে গেল, শেষ ঘণ্টা বেজেই চলেছে।
উত্তর সামান্তযাত্রী ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল;
গাড়ি আসবে হয়তো এখনি।

বাইরে ভীষণ রৌদ্র।
জ্যৈষ্ঠের আলোতে দগ্ধ রেললাইন অনেক উজ্জ্বল।
এখন মধ্যাহ্নপুর। পাখাগুলো অবিশ্রাম ঘুরছে ওপরে;
উত্তপ্ত হাওয়া আসছে। একটা নিটোল কালো কাক
লোহার রেলিঙে বসে ডাকছে কা…কা'…।

ওধারে প্লাটফরমে গাড়ি আসছে; ব্যস্ত হয়ে উড়ে গেল কাক—
কা……কা……কা……
কাছাকাছি কিছুক্ষণ ঘুরে শ্রান্ত হয়ে
অস্থায়ী নীড়ের কাছে ফিরে এল সে।

কাকটা খুঁজছে কাকে? কেউ কি হারিয়ে গেছে?
মনের প্রেয়সী।
অন্য কোন পরদেশীর ডাকে
হয়তো ট্রেনের সংগে উড়ে উড়ে চলে গেছে
…নপুর…গোরক্ষপুর…গোণ্ডা…বেরিলি।

গভীর শোকের মধ্যে ডুব দিয়ে ডানা মুড়ে লোহার রেলিঙে
ঠোঁটটাকে নিচু করে চুপ দিয়ে আছে;
দু'চোখে অবসন্ন দুপুরের বিবশ চাউনি।
উত্তপ্ত হাওয়া আসছে। পাখা ঘুরছে। ক্লান্ত দেহ এখন পরবাসী।

উত্তপ্ত হাওয়া আসছে। আর একটা ট্রেন ছাড়ল
নববধূ জানলার ধারে
বসে বসে কাঁদছে হ্যাপো, আত্মীয়-স্বজনের দিকে চেয়ে।
কিছুক্ষণ হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি…তারপর…প্লাটফরম নিঝুম।
অদৃষ্ট চেয়ে আছে কাকটা হারিয়ে যাওয়া গাড়ির পিছনে।

অনির্বাণ মনের দীপশিখাতে
নীরব এক যন্ত্রণার জ্বালা বুকে নিয়ে
ভাবনার সমুদ্র উপকূলে
অসময়ে মৃত্যুকে ডেকে এনে কি লাভ!

বাতাসী মঞ্জিল

অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[৺ নটবর মিত্তিরের ডায়েরি থেকে]

আজ রাত্রেই বাতাসী বিবির সঙ্গে দেখা হইবে, বৃদ্ধ বোমভোলা পাঠকের মুখে এই প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা শুনিবামাত্র মন চঞ্চল হইয়া উঠিল—উদ্বেগে, আশঙ্কায়, উদগ্রীব কৌতুহলে। সে চাঞ্চল্যে সম্ভবত কিছুটা আনন্দও মিশ্রিত ছিল—এক অসাধারণ, অদ্ভুত, রহস্যময় বস্তু চোখের সামনে দেখিবার সুযোগ পাইব, সেই চিন্তার আনন্দ। বাঁচিয়া থাকিতেই লোকের মুখে মুখে যে কিম্বদন্তী হইয়া উঠিয়াছে, সেই সৃষ্টি ছাড়া 'জেনানা' বাতাসী বিবিকে চাক্ষুষ করিব, জীবনে একটা অভিজ্ঞতার মতন অভিজ্ঞতা হইবে। এ অভিজ্ঞতা আমি চাহি নাই, বিধাতাই আপন খেয়ালে আমার উপর চাপাইয়া দিতেছেন। বিধাতার পাতা ফাঁদ হইতে আমি বেচারী এ্যাটর্নী। যত পালোয়ানই হই না কেন, রেহাই পাইব কিরূপে? কিন্তু এত লিখিয়াও আমার তখনকার মনের ভাবনা ঠিকমত ফুটাইতে পারিতেছি না। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমবাবু এ অবস্থায় পড়িলে পারিলেও পারিতে পারিতেন। বিছানায় শুইয়া-শুইয়া আমার কেবলই মনে পড়িতেছিল, বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের নায়ক জগৎ সিংহের কথা। জগৎ সিংহও লড়াই করিতে করিতে আঘাত পাইয়া অচেতন হইয়াছিলেন এবং পরে প্রথম চোখ মেলিয়াই দেখিয়াছিলেন, তিনি এক অপরিচিত ঘরে বন্দী। আমার অবস্থাও তেমনি। উপন্যাসটি পড়িবার সময় ভাবিয়াছিলাম অমন ব্যাপার বুঝি-বা কেবল উপন্যাসেই ঘটে, বাস্তব জীবনে নহে। কিন্তু আমার অবস্থা দেখিয়া নিজের মনে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, তবে কি আমি কোনও উপন্যাস কাহিনীর নায়ক হইতে চলিয়াছি? অমনি মনে আবার চট করিয়া খটকা লাগিল। আবার মনের ভিতরে নানারকম ভাবনার ঝড় বহিতে লাগিল। তা হোক, তবু মনে মনে স্থির করিলাম মনের কোণে যে ভয়ের আভাসমাত্র আছে, তাহা বাতাসী বিবিকে কোনো মতেই জানিতে দিব না। সে যত বড় দাপটের স্ত্রীলোকই হোক না কেন, আমি পুরুষসিংহ তাহার কাছে এতটুকু হার মানিব না, এতটুকু খাটো হইব না। জীবনে কখনও কাহাকেও পরোয়া করিলাম না, কখনও কোনও ভয়েই এ হৃদয় কম্পিত হইল না। আজ তুচ্ছ একটা স্ত্রীলোককে পরোয়া করিব, তাহার ভয়ে হৃদয় কম্পিত হইবে? ছিঃ! এরূপ ভাবিয়াই মনে প্রশ্ন জাগিল 'ঠাকুরঘরে কে?' জবাবে 'আমি তো কলা খাই না'-র মতো এই সব অবান্তর কথাই বা আমার মনের ভিতর ভিড় করিতেছে কেন? তবে কি আমি ভিতরে ভিতরে ভয় পাইয়াছি। কিন্তু নিজের কাছেও তাহা স্বীকার করিতে চাহিতেছি না?

বোমভোলা পাঠক আমার মনের ভিতরের গোলমাল কিছু কিছু শুনিতে পাইয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না। তিনি বলিলেন, 'বাবুজি, আজ ভোরে এই বিষম চোটটা যে শ্যামসনের হাতে আপনি খাইয়াছেন, আপনার হাতে শ্যামসন খায় নাই, ইহা আপনার বড় সৌভাগ্য জানিবেন।'

কথাটা বড় অদ্ভুত লাগিল। বলিলাম, 'কেন?'

পাঠক মহাশয় বলিলেন, 'আপনার আঘাতে শ্যামসনের এইরূপ—অবস্থা হইলে আপনার প্রাণসংশয় ঘটিত।'

'সে কি?'

'বাতাসী আপনাকে ক্ষমা করিত না। স্যামসন তাহার বড়ই প্রিয়পাত্র, কলিজার টুকরা। স্যামসনের উপর বাতাসী যেমন খুশি। বাতাসীকে তেমন খুশি আর কাহারও উপর দেখি নাই।' সঙ্গে সঙ্গে আমার কল্পনার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল নওজওয়ান স্যামসনের সুপুরুষ রূপ। অসামান্য মল্লযোদ্ধা হইলেও যুবক স্যামসনের মুখমণ্ডলে রুক্ষতা নাই, অসামান্য লাবণ্য আছে। অথচ সেই লাবণ্যে পৌরুষ জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। স্যামসন অসিতবরণ নহে, গৌরাঙ্গ। কুস্তি লড়িবার সময় তাহার শক্তির রুদ্রতা ও অহঙ্কারটাই এত বেশি চোখে পড়িয়াছে যে, উহার লাবণ্যের দিকটা আদৌ খেয়ালে আসে নাই। বোমভোলা পাঠকের কথা শুনিয়া সে দিকে খেয়াল হইল। মনে পড়িল পদাবলী কীর্তনে শুনিয়াছি :

'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।'

স্যামসন সম্পর্কে বৈষ্ণব কবির পদ মনে পড়াটা একটু বাড়াবাড়ি, কারণ স্যামসন দুর্ধর্ষ কুস্তিগীর, ঢল ঢল নহে এবং বৈষ্ণব নহে। কিন্তু যাহা মনে পড়িয়াছিল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। মন নিরঙ্কুশ, সে কখন হঠাৎ কি ভাবিয়া বসিবে তাহার উপর কাহারও হাত নাই। বুঝিলাম স্যামসন-মুগ্ধা বাতাসী বিবি স্যামসনের মর্মান্তিক আঘাতকারীর প্রতি নৃশংস হইতে দ্বিধা করিত না।

'কিন্তু আমার প্রাণসংশয় ঘটিত, এ কথার অর্থ ?'

'বাতাসী খুব সম্ভব আপনাকে হত্যা করাইত।'

বোমভোলা পাঠক কথাটা এত অনায়াসে, এত সহজ নির্লিপ্ততার সুরে বলিলেন, যেন মানুষের প্রাণনাশ অতি তুচ্ছ, সহজ, সাধারণ, দৈনন্দিন ব্যাপার ; ইহাতে শিহরিত, চমকিত, ভীত হইবার কিছুই নাই। খুব সহজভাবে বলিলেও কথাটা বোমভোলা পাঠক যে কিছু বাড়াইয়া বলে নাই, তাহাও সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিলাম। তবু সহজ নির্লিপ্ততার ভাণ করিয়া এবং মৃদু হাসিবার চেষ্টা করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলাম : 'কিন্তু এটা তো মগের মুলুক নয় পাঠকজি, ইংরাজের রাজত্ব।'

বোমভোলা পাঠক অম্লানবদনে বলিলেন, 'বাতাসীর তাহাতে কিছু যায়-আসে না, বাবুজি। ইংরাজ সরকারের আইন, শাসন সবই পাকা, খুব কড়া ; কিন্তু তাহাকে অনায়াসে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার ক্ষমতা, সাহস, বুদ্ধি, সঙ্গতি সমস্তই বাতাসীর আছে। যদি সৌভাগ্য হয়, তাহার প্রমাণও আপনি দেখিতে পাইবেন।'

মনে মনে বলিলাম, 'সেই দুর্ভাগ্যে আমার প্রয়োজন নাই।'

অনুভব করিলাম বাতাসী বিবিকে বৃদ্ধ বোমভোলা পাঠক যেমন বয়সে কন্যাস্থানীয়া হিসাবে স্নেহ করেন, তেমনি অন্যভাবে আবার ভয়, শ্রদ্ধা, সম্মান ইত্যাদিও কম করেন না। মনে হইল তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস বাতাসী বিবি অলৌকিক শক্তিসম্পন্না অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যাদুকরী। সেই যাদুকরীর বিশেষ প্রিয়পাত্র সুপুরুষ যুবক স্যামসন! কিন্তু পাঠক মহাশয়ের মুখে আগে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহার সহিত এ কথাটা যেন খাপ খাইতেছে না বলিয়া মনে হইল। বলিলাম : 'পাঠকজি, আপনি বলিতেছেন বাতাসী বিবি স্যামসনের খুব ভক্ত। তাহা হইলে সে তাহাকে এত সহজে, এত হঠাৎ, এমন খামখেয়ালী ভাবে বাতিল করিয়া দিতে পারিল কিরূপে ?'

বোমভোলা পাঠক বলিলেন, 'বাতাসীর কাছে বেইমানী আর বিশ্বাসঘাতকতার কোনো ক্ষমা নাই। এই দু'টি অপরাধকে সে যে কি বিষম ঘৃণা করে তাহা আপনাকে বলিয়া বুঝাইতে পারিব না বাবুজি। এ ইঙ্গিত তো একটু আগেই আপনাকে দিলাম।'

আশ্চর্য! ঐ অবস্থাতেও র কবিতা মনে পড়ল। কবি ভারতচন্দ্রের কবিতা :

'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।'

অদ্ভুত, অস্থির, চঞ্চল, দ্রুতপরিবর্তনশীল এই ভীষণা নারীর মতিগতি। যে ছিল তাহার একান্ত অনুগ্রহভাজন, যাহার প্রতি অনুগ্রহের মাত্রা আরো বাড়াইবার জ সে তাহাকে এইখানে এই ঘরে পরম আদরে আশ্রয় দিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, সেই আদরের স্যামসনকেই এমন অনায়াসে, পরম অনাদরে বাতিল করিয়া দিল বাতাসী বিবি! আমি নিমন্ত্রিত অতিথি। সাময়িক উত্তেজনার বশে এবং নেহাতই ইজ্জতের দায়ে স্যামসন আমার প্রতি আতিথেয়তা এবং ভদ্র-কুস্তির নীতি ভঙ্গ করিয়া বেইমানী করিয়া ফেলিয়াছে, সেই অপরাধ বাতাসী বিবির কাছে এমন দুঃসহভাবে অমার্জনীয় হইয়া উঠিল যে, অন্তরের অন্দর হইতে সে একটানে স্যামসনকে ধুলায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল ? একটা মস্ত অপরাধ-সংঘটনী দলের সর্দারণীর এমন কঠোর নীতিজ্ঞান ?

বোমভোলা পাঠক মনে মনে কি যেন কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। বাতাসী বিবির চরিত্র-রহস্য সম্বন্ধে যে আমি মনে মনে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলাম, তাহা কি তিনি টের পাইয়াছিলেন ? মনে হইল—কেহ আড়ি পাতিয়া শুনিতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্যই চারিদিকে একবার তাকাইয়া নিয়া তিনি আমার আরো একটু কাছে আগাইয়া আসিয়া, যেন শুধু আমিই শুনিতে পাই, এইরূপ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, 'বাবুজি, বৃদ্ধের কথায় অপরাধ লইবেন না এবং দয়া করিয়া বৃদ্ধের অনুরোধটা রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাসেই আপনাকে বলিতেছি। বাতাসীর মেজাজে বা মর্যাদায় যাতে এতটুকু ঘা লাগে এমন কিছু আপনি বলিবেন না বা করিবেন না। আপনি বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান পুরুষ, আমার ইঙ্গিত বুঝিয়া লইবেন।'

ইঙ্গিতটা বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরের রকম হইতেই বুঝিতে পারিলাম। পরিষ্কার বোধ হইল, আমি বাতাসী বিবিকে খুশি করিতে পারিলে আমার মঙ্গল, না পারিলে অমঙ্গল এবং এই অমঙ্গলের মাত্রাটা নির্ভর করিবে বাতাসী বিবির অখুশির মাত্রার উপর। অর্থাৎ এই পুরীতে আমার বিপদের আশঙ্কা আছে, যদি দোর্দণ্ডপ্রতাপশালিনী ভয়ঙ্করী বাতাসী বিবির সহিত সাক্ষাৎকারের সময়ে বুদ্ধিভ্রংশতা-বশত বেফাঁস কিছু বলিয়া বা করিয়া ফেলিয়া তাহাকে চটাইয়া দিই।

'কিন্তু আমি অতিথি। অতিথির প্রতি কি বেইমানী করিবে বাতাসী বিবি ?' নিজেকে প্রশ্ন করিলাম।

'তা না করিতে পারে। কিন্তু এখানকার আতিথ্য যখন ফুরাইবে, তখন ?' পাল্টা প্রশ্ন করিলাম নিজেকেই।

পাঠকজি বলিলেন, 'আপনার অকারণ ভীতির কারণ হইতে চাহি না, বাবুজি। কিন্তু এই কথাটা মনে রাখিবেন, ক্ষণিকের ভুলে আপনার অজানিতেই আপনি নিজেকে বিপন্ন করিয়া তুলিতে

পারেন। আপনি নিতান্তই দৈবক্রমে এই পরিস্থিতিতে আসিয়া পড়িয়াছেন, ইহার সহিত আপনি একেবারেই পরিচিত নহেন; এখানকার হালচাল সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নাই! এবং বাতাসীর মতো অদ্ভুত নারী-চরিত্রের সঙ্গেও আপনার পরিচয় নাই। তাই আপনাকে সাবধান করিয়া দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন মনে করিলাম। এত কথা আপনাকে বলিতাম না, আপনার সম্বন্ধে এত বেশি উৎসাহ নিতাম না, যদি না—'

বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন বোমভোলা পাঠক। বলিলাম, 'বলুন, পাঠকজি!'

পাঠকজি বলিলেন, 'যদি না আপনার মুখের চেহারায় একটি আশ্চর্য বিশেষত্ব দেখিতে পাইতাম। এতক্ষণ আপনাকে বলি নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না বলিয়া পারিলাম না। বাবুজি, আপনি কি পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন?'

শেষের প্রশ্নটি বড় হঠাৎ, বড় অদ্ভুত, বড় চমক-লাগানো। কলেজ-জীবনের কথা মনে পড়িয়া গেল। শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটক অধ্যাপক নাগ পড়াইতেন, সেই কথা। একটি দৃশ্যে রোমের সর্বজন-সম্মানিত মহান চরিত্রের নাগরিক ব্রুটাস এবং কূটচক্রী সীজার-বিদ্বেষী ক্যাসিয়াস মুখোমুখি, মঞ্চে আর কেহ নাই। একথা সেকথা বলিতে বলিতে ক্যাসিয়াস হঠাৎ ব্রুটাসের মুখের উপর একটি চমক-লাগানো প্রশ্ন ছুঁড়িয়া মারিলেন:

'টেল মি, ব্রুটাস, ক্যান ইউ সী ইয়োর ফেস?' (Tell me, Brutus, can you see your face?) অদ্ভুত প্রশ্ন: 'তুমি কি নিজের মুখ দেখিতে পাও?' এমন প্রশ্ন ক্যাসিয়াস ছাড়া বোধ হয় আর কাহারও মাথায় কখনও ঢোকে নাই।

এমন বেখাপ্পা প্রশ্ন শুনিয়া ব্রুটাসও প্রথমটা ধাঁধায় পড়িলেন। তারপর ব্যাপারটা একটু তলাইয়া বুঝিয়া জবাব দিলেন, 'না ক্যাসিয়াস, নিজের মুখ তো আমি দেখিতে পাই না। শুধু আয়নার সামনে দাঁড়াইলে আয়নায় আমার মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই।'

মুখের প্রতিবিম্ব মাত্র, মুখ নহে। প্রতিবিম্ব দেখা আর মুখ দেখা এক কথা নহে। আয়নার বুকে প্রতিবিম্বে আমার মুখের চেহারার স্বরূপ দেখিতে পাই না। ডান দিকটা বাঁ দিকে এবং বাঁ দিকটা ডান দিকে দেখি। সুতরাং অন্যে আমার মুখের যে চেহারা দেখে, আমি আমার মুখের সে চেহারা দেখিতে পাই না।

কিন্তু বোমভোলা পাঠক আমার মুখে কি আশ্চর্য বিশেষত্ব দেখিতে পাইলেন? ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল। আয়নায় তো রোজই অন্তত একবার নিজের শ্রীমুখখানি দেখিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে আশ্চর্য তো দূরের কথা, কোনো রকম বিশেষত্বই দেখিতে পাই না। নিজের আয়নায় দেখা চেহারা মনশ্চক্ষে দেখিতে দেখিতে তাহাতে বিশেষত্ব খুঁজিয়া পাইবার চেষ্টা করিলাম। চেষ্টা বিফল হইল।

আমার চেষ্টা বিফল হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একখানা বড় আশ্চর্য সুন্দর বড় পবিত্র মুখ মনে পড়িয়া গেল, যাহার বিশেষত্বের তুলনা ছিল না, আমার মনে হয়, তুলনা কোনদিন মিলিবেও না। সঙ্গে সঙ্গে সারা হৃদয় বড়ই বিষাদে ভরিয়া উঠিল। এমন গভীর বিষাদ—এত বেদনাময়, অথচ এত মধুর—যেন আর কোনোদিন অনুভব করি নাই।

মনোরমা, সেই আশ্চর্য মুখখানি তোমার। জানি না—এই অনন্ত বিশ্বে তুমি এখন কোথায়। বলিতে লজ্জা করিব না, অনেকদিন তোমায় ভুলিয়া ছিলাম; অনেকদিন পরে তোমার মুখখানির কথা তোমার কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল কাল সন্ধ্যায়, বাতাসী বিবির ডেরায় বাধ্যতামূলক শয়নাবস্থায় বোমভোলা পাঠকের একটিমাত্র কথায়। বোমভোলা পাঠক আমার মুখে আশ্চর্য বিশেষত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন শুনিয়া প্রথমে মনে লাগিয়াছিল বিস্ময়ের দোলা, তার পরেই মন চলিয়া গিয়াছিল সেই দূরের অতীতের সন্ধ্যায়, যে সন্ধ্যায় তুমি অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া আমার কণ্ঠে বরমাল্য পরাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলে, আমাকে ধন্য করিয়াছিলে। সেই শুভদৃষ্টির লগ্নেই আমি তোমাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম মনোরমা এবং তোমার ঐ আশ্চর্য সুন্দর, স্বর্গীয় সুষমা-মাখানো মুখখানা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। হাতে স্বর্গ পাইয়া আশাতীত আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলাম। দিনের পর দিন তিল তিল করিয়া যে তিলোত্তমা-রূপিণী মানসীর প্রতিমূর্তি কল্পনায় গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আমার সেই মানসী প্রতিমূর্তি তোমার সঙ্গে তুলনায় তুচ্ছ হইয়া গেল।

তুমি সেই সুদূর অতীতে আমার মুখে আশ্চর্য বিশেষত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলে, মনোরমা! কতবার লক্ষ্য করিয়াছি তুমি অপলকে আমার মুখের পানে তাকাইয়া আছ, যেন আমার মুখের রূপ দুই চোখ দিয়া পান করিতেছ। ধরা পড়িয়া গিয়া কতবার লজ্জা পাইয়াছ, যেন বিষম অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছ। তবু অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিত, বার বার লজ্জা পাইয়াও তুমি বার বার অপরাধ করিতে। কৈশোর হইতেই শুরু করিয়া যৌবনেও আমি ছিলাম শক্তির পূজারী, শক্তির সাধক, কুস্তি লড়ার একাগ্র নেশায় মাতিয়া থাকিতাম। দেহে অসাধারণ শক্তি আছে এই মহানন্দে মগ্ন থাকিয়া, দেহে বা মুখের চেহারায় রূপ আছে কি না সে প্রশ্ন একবারও চিন্তা করি নাই। পিতৃদেবও ছিলেন শক্তিমান পুরুষ; আমি পালোয়ান হইতেছি এই আনন্দে তিনিও আমার রূপের কথা একেবারেই ভাবেন নাই। আমরা বংশানুক্রমে সুপুরুষ, চেহারাটা অনায়াসে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, তাহার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা বা সাধনার প্রয়োজন হয় নাই, তাই ও-কথা চিন্তাই করি নাই। মনোরমা, আমি তোমার চোখে প্রথম আবিষ্কার করিলাম—আমি সুন্দর, আমি সুপুরুষ।

ফুলের মত সুন্দর তুমি, আমার ভয় হইয়াছিল কি জানি, তুমি হয় তো আমি নিয়মিত কুস্তি লড়ি বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু তুমি করিয়াছিলে ঠিক তাহার বিপরীত। তুমি লুকাইয়া, চুরি করিয়া একদিন আমার কুস্তি দেখিয়াছিলে এবং মুগ্ধ হইয়াছিলে। তাহা তোমারই মুখে শুনিয়াছিলাম। আজ এখনও যেন পরিষ্কার কানে শুনিতে পাইতেছি তোমার মধু-ঝরানো কণ্ঠের সেই কথা: 'কুস্তির মাটিতে কি সুন্দর তোমাকে দেখাচ্ছিল। আমি দেখছিলাম লুকিয়ে লুকিয়ে, আর চোখ ফেরাতে পারছিলাম না' আমার এত সুন্দর দেহে এত শক্তি কি করিয়া লুকাইয়া থাকে তাহা ভাবিয়া তুমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলে, মনোরমা।

আমরা দু'জনেই দু'জনকে পাইয়া আশাতীত সুখী হইয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই সুখ বিধাতার সহিল না। বেশিদিন আমরা দু'জনে দু'জনকে পাইলাম না। শিশু নিমাইকে মাতৃহীন করিয়া তুমি চলিয়া

গেলে, যাইবার আগে আমার পদধূলি মাথায় নিয়া প্রার্থনা জানাইয়া গেলে জন্ম-জন্মান্তরে যেন আমি তোমার স্বামী হই। জন্মান্তর আছে কি না এবং থাকিলেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আমার থাকিবে কি না তাহা জানিতাম না। কিন্তু বাধ্য হইয়া চোখের জলে তোমাকে বিদায় দিলাম। কিছুতেই তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলাম না। তোমার আমার বড় আদরের নিমাই অতি শৈশবেই তোমাকে হারাইল। অসহ্য আঘাতে মনে হইল আমার হৃদয় চূর্ণমার হইয়া গিয়াছে, এ জীবনে তাহা আর জোড়া লাগিবে না, আনন্দ কাহাকে বলে তাহা এ জীবনে আর কখনো জানিতে পারিব না।

কাজে এবং কুস্তিতে মশগুল থাকিয়া দুঃখের দুঃসহতা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম এবং দু'জনের ভালবাসা একা বাসিবার চেষ্টা করিতে করিতে তোমার আমার একমাত্র সন্তান নিমাইকে মানুষ করিতে লাগিলাম। নিমাইয়ের যত্ন করিয়া শান্তি পাইতাম। জানিতাম, নিমাইকে তুমি ভালবাস এবং নিমাইয়ের মধ্যে তুমি আছ। কুস্তি লড়িয়া শান্তি পাইতাম। কারণ আমার কুস্তি দেখিয়া তুমি খুশি হইয়াছিলে, কুস্তি তোমার ভালবাসায় ধন্য হইয়াছে। দিনরাত যেন তোমারই প্রভাবাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় বাস করিতাম। তারপর মাছ যেমন জলের মধ্যে থাকিতে থাকিতে জলের কথা ভুলিয়া যায়, হাওয়ার বিরাট মহাসমুদ্রের মধ্যে থাকিয়াও আমরা হাওয়ার উপস্থিতিটা খেয়াল করি না, তেমনি তোমার স্মৃতি-আচ্ছন্ন আবহাওয়াতেই তোমাকে যেন ধীরে ধীরে ভুলিয়া গেলাম, ভুলিয়া রহিলাম। তোমার স্মৃতি মনের গহনে ঘুমাইয়া পড়িল, ঘুমাইয়া রহিল। তার অনেকদিন পর তোমার কথা ঠিক মনে পড়ার মতো মনে পড়িল—গতকাল বাতাসী বিবির ডেরায়, বোমভোলা পাঠকের কথা শুনিয়া। এমন অদ্ভুত সম্ভাবনার কথা স্বপ্নেও কি কোনোদিন কল্পনা করিতে পারিয়াছিলাম?

কিন্তু পুনর্জন্ম বিশ্বাস করি কি না, এ প্রশ্ন বোমভোলা পাঠক করিলেন কেন? তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম। পাঠকজি বলিলেন, 'আপনার মুখের দিকে তাকাইয়া আমার মঙ্গল ভাইয়ার মুখের কথা মনে পড়িয়া গেল, বাবুজি। মঙ্গল ভাইয়ার চেহারার সঙ্গে আপনার চেহারার বড় আশ্চর্য মিল মনে হইতেছে।' বলিয়া আবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন বোমভোলা পাঠক। সুদূর অতীতে, ১৮৫৭ সালে ব্যারাকপুরের মিলিটারি ছাউনিতে যে প্রথম বিদ্রোহী সিপাহীর ফাঁসি হইয়াছিল, ভারতে বিদেশীর হাতে প্রথম ভারতীয় ফাঁসির শহীদ সেই মঙ্গল পাণ্ডের মুখের চেহারার সঙ্গে আমার মুখের চেহারার সাদৃশ্য দেখিতেছেন বৃদ্ধ বোমভোলা পাঠক, কিশোর বয়সে যিনি স্বচক্ষে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি দেখিয়াছিলেন! আমার জীবনে সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, বিচিত্র শিহরণময় অনুভূতি।

'বাবুজি, সেইজন্যই আপনার জন্য আমি এত মাথা ঘামাইয়াছি, ঘামাইতেছি।' বলিলেন বোমভোলা পাঠক। 'আপনি এই বিছানায় বেহুঁশ ছিলেন তাই টেরও পান নাই কিভাবে বৃদ্ধ আপনার সেবা করিয়াছে। এই হাত দু'টি শুধু মানুষ মারিতে, মানুষকে জখম করিতে আর আইন ভাঙিতেই শেখে নাই, রোগী ও আহত মানুষের সর্বপ্রকার সেবা-শুশ্রূষা করিতেও শিখিয়াছে। আপনার সেবা আমি নিজের হাতে করিয়াছি, বাতাসী তাহা দেখিয়াছে, খুশিও হইয়াছে।'

আমার মুখে শহীদ মঙ্গল পাণ্ডের মুখের কিছুটা বা অনেকখানি আদল সত্যই ছিল, না উহা বৃদ্ধের খেয়ালী মগজের কল্পনা তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু বোমভোলা পাঠকের কথায় বুকের ভিতরে বেশ একটু ভরসা অনুভব করিলাম। ভাবিলাম যাক, এই বেজায়গায় আমার একজন অন্তত নির্ভরযোগ্য বন্ধু আছে। এরূপ ভাবনা আগেও একবার ভাবিয়াছিলাম; ভাবনাটা এইবার একটা শক্ত, নির্ভরযোগ্য ভিত্তির আশ্রয় পাইল।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ আমাকে নানা কথায় আশ্চর্য সুন্দরভাবে ভুলাইয়া রাখিলেন। দেখিলাম হাতের দক্ষতার চাইতে তাঁহার মুখের দক্ষতাও কিছুমাত্র কম নহে। কথাতেও যাদুকর এই বোমভোলা পাঠক। তাঁহার কথা মুগ্ধচিত্তে শুনিতে শুনিতে কোথা দিয়া যে কতটা সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, মন তাহার হিসাব রাখিতে পারিল না। তারপর যখন তিনি বলিলেন, 'বাবুজি, এবার আমি বিদায় নিব।' তখন বুঝিলাম সন্ধ্যা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, রাত্রি আসিয়াছে। বিদায় নিবার আগে আমাকে তিনি এক গেলাস পানীয় পান করাইয়া গেলেন—নানাবিধ ফলের রস একত্রে মিশ্রিত, স্বাদে ও গন্ধে পরম উপাদেয়। মনে হইল পানীয়ে কোনরূপ শক্তিশালী অথচ সুস্বাদু তরল ঔষধও মিশ্রিত আছে, কারণ পানীয়টি পান করিয়া যেমন স্নিগ্ধ তেমনি সুস্থ ও সতেজ বোধ করিলাম, এতক্ষণ শুইয়া-শুইয়া যে ঈষৎ বিরক্তির ভাব হইয়াছিল তাহাও যেন দূর হইয়া গেল। আমি বেশ আরাম বোধ করিতে লাগিলাম।

বলিলাম, 'পাঠকজি, আমাকে একা ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন, লম্বা রাত সামনে পড়িয়া রহিয়াছে। আমার যদি কখনও কিছু দরকার হয়? যদি—'

পাঠকজি বলিলেন, 'আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। সে ভাবনা আপনার নয়।'

'তবে কাহার?'

'আপনি যাহার অতিথি, তাহার।' বলিয়া বিদায় নিয়া চলিয়া গেলেন বোমভোলা পাঠক।

নিরালা ঘরে একা শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্যের প্রবেশ, সন্ধ্যায় যে ঘরের দীপগুলি জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল, সে বলিল বিবিসাহেবার হুকুমে এ ঘরের দীপগুলি সে নিভাইয়া দিয়া যাইতে আসিয়াছে, কারণ, বিবিসাহেবা বলিয়াছেন, আলোতে আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিবে। উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলাম, 'ঘর একেবারে অন্ধকার থাকিবে?'

'না সাহেব। বাহিরে চাঁদের রোশনি আছে।' অর্থাৎ বাহিরের জ্যোৎস্না ঘরের ভিতরের অন্ধকারকে কিছুটা হাল্কা করিবে।

ভৃত্য ঘরের দীপগুলি নিভাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। সেই প্রায়ান্ধকার এক ঘরে শুইয়া-শুইয়া আমার বার বার মনে হইতে লাগিল যেন কাহার মৃদু পদধ্বনি এইদিকেই আগাইয়া আসিতেছে। [ক্রমশঃ।

নিষ্ঠুর পরিহাস

শিবানী ঘোষ

নানাদিক থেকে নানাভাবে ললিতাকে দেখেছে উদিতেন্দু। কখনও দূর থেকে, কখনও খুব নিকটে এসে। কখন উজ্জ্বল সূর্য-কিরণে, কখনও স্তিমিত দীপালোকে। কখনও নির্জনে, কখনও বহুজনের মাঝখানে। কিন্তু প্রতিবারই একটা নীরব দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছে তার বক্ষ ভেদ করে। উদিতেন্দুর আশা ছিল—তার স্ত্রী হবে গৌরবর্ণা। কিন্তু তা হয় নি। তার নব-বিবাহিতা স্ত্রী ললিতা কালো। যে কোন অবস্থায় যে কোন পরিস্থিতিতেই দেখা যাক না কেন, তাকে কালো ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

বিয়ের আগে উদিতেন্দু নিজের চোখে দেখে নি ললিতাকে। মায়ের দেখাতেই সে মত দিয়েছিল বিবাহে। তাঁর মুখেই সে শুনেছিল মেয়েটি গৌরবর্ণা। কিন্তু বিবাহের পর সে দেখলো মায়ের কথা প্রকৃত সত্য নয়। মেয়েটি শ্যামবর্ণা। বলা যেতে পারে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা।

অবশ্য এ নিয়ে কোনদিন মুখ ফুটে কোন কথা প্রকাশ করে নি উদিতেন্দু। কারণ তাতে অন্তরে আঘাত পাবেন তার মা এবং হয়ত ললিতাও। বিনা কারণে অপরকে আঘাত দেওয়াটা মার্জিত-রুচি-সম্পন্ন উদিতেন্দুর বিবেকে বাধে।

এ কথাটা অন্তরে চেপে রাখলেও উদিতেন্দুর মনস্তত্ত্ব ললিতা যে একেবারে উপলব্ধি করতে পারে না, তা নয়। তার রূপ নই এটা বিশেষ পীড়া দেয় তার স্বামীকে, এটা সে বুঝতে পারে সহজেই। সত্যি তার গায়ের রংটা যদি একটু ফর্সা হত, তা হলে এদিক থেকে অন্তত তার স্বামী অসুখী হতেন না। এটা ললিতার পক্ষেও আনন্দের হত। কারণ স্বামীর সুখেই স্ত্রীর আনন্দ। তবু ললিতা তার রূপহীনতার গ্লানি চেপে আপন গুণের সাহায্যে কিছুটা প্রসন্নতা আনে তার স্বামীর অন্তরে। উদিতেন্দু খুশি হয়। তবু এক এক সময় মনটা বেদনাতুর হয়ে ওঠে। মনে হয় ললিতা যদি আর একটু ফর্সা হত।

বম্বে থেকে কলকাতায় ফেরার পথে উদিতেন্দু সেই পুরোনো কথাগুলোই ভাবছিল ট্রেনে বসে। সে মেডিক্যালের ছাত্র। স্কিন স্পেশ্যালিস্ট। 'পিগমেন্টেশান' নিয়ে সে পড়াশোনা করেছে বিস্তর। কিন্তু তবু মানুষের গায়ের রং কি করে ফর্সা করা যায়, তার কোন হদিসই সে পায় নি।

আজ কিন্তু সেই জিনিষই এসে পড়েছে উদিতেন্দুর হাতের মুঠোয়। মাত্র ক'টা ইঞ্জেকসন নিতে হবে। তাতেই যে কোন মানুষ বেশ খানিকটা ফর্সা হয়ে যাবে। এটা পশ্চিম দেশের একটা নতুন আবিষ্কার। আর এটি যাঁর আবিষ্কার তাঁর অধীনেই রিসার্চ করার সৌভাগ্য ঘটেছিল উদিতেন্দুর। আর সেই গবেষণার জন্যই সে গিয়েছিল ওয়েস্ট-জার্মানী।

দীর্ঘ দু'বছর পরে আজ বাড়ি ফিরছে উদিতেন্দু। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে দেখে নি ললিতাকে। কয়েকটা চিঠি অবশ্য আদান-প্রদান হয়েছিল। কিন্তু তাও প্রথম দিকে। শেষ দিকে ললিতা তাকে আর চিঠি দেয় নি। কারণটা কি—তা আজও অস্পষ্ট রয়েছে। বছরখানেক আগে লেখা ললিতার শেষ চিঠিটা পকেট থেকে বের করে উদিতেন্দু আর একবার পড়ে,—

প্রিয়তম, ক'দিন হল কি প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে যে দিন কাটাচ্ছি তা তুমি ধারণা করতে পারবে না। তোমার বিদেশ যাওয়ার দুশ্চিন্তা অবশ্য খুবই আছে। কিন্তু এই দুশ্চিন্তা তার চেয়েও সাংঘাতিক। আমার কেবলই মনে হচ্ছে—আমার মতো বিশ্রী মেয়েকে কেন তুমি বিয়ে করতে গেলে। বিয়ের আগে তুমি যদি একটিবার আমাকে দেখতে যেতে, তা হলে খুবই ভাল হত। আমার মত রূপহীনা কালো মেয়েকে তখন তুমি অনায়াসেই অপছন্দ করতে পারতে। তোমার মত বহুগুণসম্পন্ন সৎ-স্বামী আমার দিক থেকে হয়ত গর্বের বস্তু হয়েছে, কিন্তু যখন তোমার দিকটা চিন্তা করি তখন অন্তরটা বেদনায় মুষড়ে যায়। মনে হয়—তুমি বড় বেশি বঞ্চিত হয়েছো। তারপর কিছুদিন হল আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে শিউরে উঠছি। মনে হচ্ছে আমাকে আরও বিশ্রী দেখতে হয়ে যাচ্ছে। ওগো, আমার এ কি চরম শাস্তি! তুমি এলে এ মুখ আমি তোমাকে কেমন করে দেখাবো? আমার যে বুক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে ···

এই পর্যন্ত পড়ে চিঠিটা ভাঁজ করে জানলার দিকে মুখ ফেরায় উদিতেন্দু। এর পর আর বিশেষ কিছু লেখা নেই। শুধু ভালবাসা জানিয়ে তার নামটা লেখা।

এই চিঠিটা পেয়েই উদিতেন্দু পত্র লিখেছিল ললিতাকে। সেই পত্রে সে তাকে জানিয়েছিল তার আন্তরিক সান্ত্বনা। লিখেছিল ললিতা কালো বলে তার জীবনে কোন ক্ষোভ নেই, কোন দুঃখ নেই। এ নিয়ে সে যেন মিথ্যা দুশ্চিন্তা না করে। আর বছরখানেক পরেই সে বাড়ি ফিরবে। তখন বিজ্ঞানের নব-আবিষ্কৃত এমন একটা জিনিষ সে সংগে নিয়ে যাবে, যার সাহায্যে তার দেহের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল কাঞ্চনবর্ণে পরিণত হবে। কাজেই উপস্থিত সে যেন এ বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করে।

এই পত্রের উত্তর আর পায় নি উদিতেন্দু। এর পরেও সে আরও চার-পাঁচটা চিঠি দিয়েছে ললিতাকে, কিন্তু তারও কোন জবাব আসে নি। ললিতার চিঠি না দেওয়ার কারণ কি হতে পারে, এই নিয়ে সে অনেক চিন্তা করেছে। কিন্তু তার কোন কূল-কিনারা পায় নি। অবশ্য বাড়ির অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের চিঠি উদিতেন্দু নিয়মিত পেয়েছে এবং তার জবাবও দিয়েছে। তাতেই সে বার বার জানতে চেয়েছে ললিতার কথা। তার কি হয়েছে, কেন সে চিঠি দেয় না, ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই সে করেছে। কিন্তু তাঁদের সকলের জবাবী-চিঠিতে উদিতেন্দু ঐ একই কথা জেনেছে যে, ললিতার তেমন কিছুই হয় নি। শুধু মিথ্যে একটা দুশ্চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে, সেই কারণেই সে চিঠি দেয় না।

ললিতার দুশ্চিন্তাটা কি, এই নিয়েও সে প্রশ্ন করেছে সকলকে। কিন্তু তারও কোন সঠিক উত্তর সে পায় নি। এক একবার মনে হয়েছে—তবে কি ললিতার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে—তাই যদি হবে, তবে

তাকে জানাতে লোকে সঙ্কোচ বোধ করবে কেন? অন্তত তার বৌদি, কাকীমা কিংবা জামাইবাবু চিঠিতে সে কথা নিশ্চয়ই জানাতেন। বহু চিন্তার পর উদিতেন্দু অনুমান করে, ললিতার দুশ্চিন্তাটা আসলে আর কিছুই নয়। সে কালো, এই আত্মধিক্কার তার চিরকালই আছে। বর্তমানে সেটাই একটু বেড়েছে। কারণ উদিতেন্দু এখন এসে পড়েছে ফর্সা মানুষের দেশে। এ অবস্থায় কোন শ্বেতাঙ্গিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ললিতাকে পরিত্যাগ করার দুশ্চিন্তা যে-কোন সাধারণ মেয়ের মনে জাগাই স্বাভাবিক। ললিতারও তাই হয়েছে। কথাটা ভেবে মনে মনে হেসেছিল উদিতেন্দু। ললিতা তাকে আজও চিনতে পারে নি। আপন স্ত্রীকে অবহেলা করে পরস্ত্রীতে আকৃষ্ট হওয়ার মানুষ উদিতেন্দু নয়। কাজেই এ কথা জানিয়ে এবং বুঝিয়ে সে পত্র দিয়েছিল ললিতাকে। কিন্তু সে-চিঠিরও জবাব এল না কেন, সেটাই ভাববার বিষয়।

হু-হু করে ট্রেনটা ছুটে চলেছে বম্বে থেকে কলকাতা অভিমুখে। জানলার ধারে মুখ রেখে আপেক্ষিক চলমান গাছপালার পানে তাকিয়ে উদিতেন্দু মনে মনে রোমন্থন করে চলে সেই সব কথাগুলোই।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে হাওড়া স্টেশনে গাড়ি থামতেই মালপত্র নিয়ে নেমে আসে উদিতেন্দু। তাকে অভিনন্দন জানাতে স্টেশনে ইতিমধ্যেই এসেছিলেন তার বৌদি, কাকীমা, জামাইবাবু এবং আরও অনেকে। সে গাড়ি থেকে নেমে পদধূলি নেয় গুরুজনদের। কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে বিস্মিত হয়। কৈ ললিতা তো আসে নি। উদিতেন্দুর মনে পড়ে দু'বছর আগে বিদেশ যাওয়ার উদ্দেশ্যে যেদিন সে এই স্টেশনে এসেছিল সেদিন ললিতা তার সাথে না এসে থাকতে পারে নি। তার সেদিনের অশ্রুসজল চোখ দু'টো এবং বিরহ-বেদনা মাখানো মুখমণ্ডল আজও উদিতেন্দুর মনে আছে। কিন্তু আজ ললিতার কি হল? এই [illegible] প্রবাসের পর আজ সে প্রথম ফিরলো, এমন দিনে সে কি এব[illegible]র স্টেশনে আসতে পারতো না? কথাটা সে জিজ্ঞেস করে বৌদি এবং কাকীমাকে। তাঁরা উভয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন যে, তাকে আনবার জন্যে তাঁরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে এল না।

মোটরে বাড়ি ফেরার পথে অভিমানের পুঞ্জীভূত মেঘ জমে ওঠে উদিতেন্দুর অন্তরে। ললিতা যদি আজকের দিনেও তাকে এইভাবে এড়িয়ে চলে তবে সেও এর প্রত্যুত্তর দেবে একইভাবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে পুনরায় হাল্কা করে নেয় তার মন। ললিতা অবুঝের মতো কাজ করলেও আজকের দিনে সে অন্তত সে রকম আচরণ কারও সাথেই করবে না। যাই হোক না কেন, আজকে সে সহজভাবেই দেখা করবে ললিতার সাথে।

বাড়ি পৌঁছে উদিতেন্দু প্রথমে পদধূলি নিল মায়ের। তারপর একথা সে কথার পর সে জানতে চায় ললিতার কি হয়েছে।

তার মা এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুধু বলেন—পাশের ঘরে বৌমা রয়েছে; তুই গিয়ে ত্যাখ, সব বুঝতে পারবি।

মায়ের কথাটা কেমন যেন একটা সন্দেহের খোঁচা মারে উদিতেন্দুর অন্তরে। তবে কি সত্যি ললিতার কিছু হয়েছে? আর বেশি চিন্তা করতে পারে না উদিতেন্দু। সে দ্রুত চলে যায় ললিতার ঘরে। সেখানে গিয়ে দেখে সে বালিশে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে বিছানায়। উদিতেন্দু তার পিছন থেকেই বলে—ললিতা, ফিরে ছাখো আমি এসেছি।

এর কোন জবাব দেয় না ললিতা, সে একইভাবে শুয়ে থাকে বিছানায়। উদিতেন্দু আর একটু এগিয়ে এসে বলে—ললিতা, তুমি কালো বলে অনেক দুঃখ করেছো এবং এখনও হয়ত ঐ একই কারণে আমাকে মুখ দেখাচ্ছো না। কিন্তু এ নিয়ে আর দুঃখ করো না। আমি এমন একটা জিনিষ এনেছি যার সাহায্যে কালো মানুষকে অনায়াসেই ফর্সা করা চলে। তুমি হয়ত কথাটা বিশ্বাস করতে পারছো না। কিন্তু জেনে রাখো, এটা বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার। দু'দিন পরে এই ওষুধের যখন বহুলপ্রচার হবে তখন একথা সকলেই বিশ্বাস করবে। কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। মাস খানেকের মধ্যেই তুমি যে যথেষ্ট ফর্সা হয়ে যাবে, একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

কথাটা শুনে ডুকরে কেঁদে ওঠে ললিতা। বিস্মিত হয় উদিতেন্দু। ওর কি হয়েছে? অমন করে মুখ ঢেকে কাঁদছে কেন? উদিতেন্দু এগিয়ে এসে জোর করে ফিরিয়ে দেখে ললিতার মুখ। হঠাৎ দেখেই সে চমকে উঠেছে। এ কি, ললিতার এ কি হয়েছে! ঠোঁটে গালে কপালে সাদা সাদা দাগ! এ যে ধবল। ইস্, কি বিশ্রী হয়ে গেছে তার মুখখানা!

উদিতেন্দু সেখানেই বসে পড়ে আড়ষ্ট হয়ে। তার মনে হল এ যেন বিধির এক নিষ্ঠুর পরিহাস। সে ললিতাকে ফর্সা করতে চেয়েছিল। আড়ালে বসে বিধাতা হয়ত তা শুনেছিলেন। তাই নিজের হাতে তিনি তাকে গৌরবর্ণা করে চলেছেন। আজ উদিতেন্দুর প্রথম মনে হল শ্যামবর্ণা ললিতা কত না সুন্দরী ছিল।

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে উদিতেন্দু। তারপর স্যুটকেশ খুলে সে বের করে নেয় বিদেশ থেকে আনা তার ওষুধগুলো। সেগুলোর পানে অনেকক্ষণ সে তাকিয়ে থাকে। কালো মানুষকে ফর্সা করার জন্য তার চিন্তার অন্ত ছিল না। এ নিয়ে সে অনেক পড়েছে, অনেক গবেষণা করেছে। আজ মনে হল সে এই নিয়ে পণ্ডশ্রম করেছে। এর চেয়ে শ্বেতমানুষকে কালো করার অব্যর্থ ওষুধ যদি আবিষ্কৃত হত তা হলে সমগ্র মানব জাতির একটা পরম উপকার হত। এই কথা মনে উদয় হওয়ার সাথেই সে ডাস্টবিনের দিকে ছুড়ে ফেলে দেয় বিদেশ থেকে আনা তার ওষুধগুলো। মনে হ'ল এগুলোর সাথে বিশ্ববাসীর পরিচয় না হলেও কোন ক্ষতি নেই।

একটি রাত্রি দু'টি মন

শ্রীঅনিতা সরকার

আকাশে মেঘ নেই—বাতাসও নেই একফোঁটা কোথাও, অসহ্য গুমোট। চার দেওয়ালের মধ্যে হাঁফিয়ে উঠছে মানুষগুলো—অসহ্য এই প্রতীক্ষার গুরুভার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুলারীবাঈ।

ফতেচাঁদ জগৎ শেঠের সুবিশাল প্রাসাদের অন্দরমহলের ছাদে মনে নেই কতক্ষণ—বোধ হয় একযুগ ধরে, হয়ত বা তারও বেশিক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে দুলারীবাঈ—শেঠজীর বড় আদরের বিধবা কন্যা—ঐ দেবদারু গাছটার মতই নিথর-নিস্পন্দ। অনেক ভাবছে—কিন্তু কি ভাবছে জানে না, এই ভাবনার কারণও স্পষ্ট নয় তার কাছে। শুধু এইটুকু বুঝছে—বাইরের স্তব্ধতা ভারসাম্য রক্ষা করছে ভেতরের চঞ্চলতার। কেন এই চঞ্চলতা? যুদ্ধের সংবাদ? দুলারীবাঈ, তুমি কি জানো কোন সংবাদে খুশির বন্যায় উচ্ছল হয়ে উঠবে তোমার মন? সিরাজের বিজয় সংবাদ?

শিউরে ওঠে শ্রেষ্ঠীকন্যা।

না—না! আর না। বাংলার বুকে কোন অভাগীর চোখের জল যেন আর না ঝরে। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে সারা দেশটা তাদের অশ্রুর আগুনে। এখনই ত' জ্বলছে—আর না। বন্ধ হোক এই অভিশপ্ত অশ্রুধারা—শান্তি আসুক দেশে—আসুক নিশ্চিন্ততা। স্বামীর বুকে মাথা রেখে শান্তিতে মরার সৌভাগ্যটুকু অন্তত ফিরিয়ে দাও বাংলার লক্ষ মেয়ের কাছে।

কিন্তু—!

দুলারী, তোমার কালো চোখে ও কিসের আলো? জানি সেই নারীর মত সুকুমার মুখমণ্ডলটা ভেসে উঠছে মনের পর্দায়। কি কচি কি মিষ্টি কিন্তু কি ভয়ঙ্কর। কীটদষ্ট গোলাপ—দূর থেকে কতই না মনোহর—জানি দুলালীবাঈ, তুমি চোখ বুজছ তার কাছের বীভৎসতায়।

হঠাৎ পিছন ফিরে বুঝতে পারে নি কিছুই। এক অনিন্দ্যসুন্দরীর আকস্মিক উপস্থিতিতে বিস্মিতই হয়েছিল—বুঝতে পারছিল না কি করবে। কে এ। তাদের হারেমে নেমে এসেছে এই অপ্সরী।

বেশিক্ষণ সময় দেয় নি সিরাজ—সেদিনের ভাবী নবাব। তার পেশীবহুল হাতটায় টেনে নিয়েছিল দুলারীর সুপবিত্র হাত দু'খানা।

—আমি সিরাজ। তোমার রূপের কথা শুনে দিল আমার দেওয়ানা, পিয়ারী।

কে জানে, ভয়ে না বিস্ময়ে—ঘৃণায় না আনন্দে—একটা তীক্ষ্ণ শব্দ ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল দুলারীর কুমারী-হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে। ছুটে এসেছিল আশপাশ থেকে দাসীর দল। সমূহ বিপদ দেখে সিরাজও দেরি করে নি বেরিয়ে যেতে। তারই মধ্যে দু'একজন দাসীর চোখে ধরা পড়েছিল ছদ্মবেশী আগন্তুকের সত্য পরিচয়। সারা বাড়ি চাপা হৈ-চৈ-এর মধ্যে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল দুলারী।

তোর কোন—শেষ করতে পারেন না উদ্বিগ্ন উদভ্রান্ত জগৎ শেঠ।

ঘাড় নেড়ে জবাব দিয়েছিল দুলারী।

বোঝা যায় নি, কতটা বিশ্বাস করেছিলেন শেঠজী, কিংবা আদৌ বিশ্বাস করেছিলেন কি না। তবু নিশ্চিন্ত হওয়ার চেষ্টার সুযোগ পেলেন নিশ্চয়।

লজ্জা করো না, মা। সস্নেহে হাত রাখেন একমাত্র মেয়ের মাথায়।

না, বাবা। দুলারীর অস্ফুট কণ্ঠ বুঝি হারিয়ে যায় বাবার প্রশস্ত বুকে।

শেঠজীর বুক ভিজে যায় মেয়ের চোখের জলে।

তবে কাঁদছিস্ কেন?

জানি না।

এই ভয়ঙ্কর জানিনার দুঃসহ পীড়নে বুঝি পাগল হয়ে যাবেন জগৎ শেঠ। ফুলের মত সুন্দর দুলারীর মুখে হাসি নেই।

কেন?

জানি না।

সম্পদের সমুদ্রে সাঁতার কেটেও শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হচ্ছে ধনকুবেরের আদরের দুলালী।

কেন?

জানি না।

কোন অসুখ করেছে?

জানি না।

বৈদ্য হাকিম একই জবাব দেন।

কি জানি, কিচ্ছুই বুঝছি না, শেঠজী।

এ বয়সের ব্যাধি শেঠজী, জামাই খুঁজুন। সব শুনে বলেছিলেন বন্ধু রাজা রাজবল্লভ রায়।

থমথম করে শেঠজীর মুখ।

তবে কি—?

ঠিক তাই। সেদিন না বুঝলেও আজ বোঝে বৈ কি জীবনের প্রথম প্রেম-সম্ভাষণে আমূল দুলে উঠেছিল একটা অনাঘ্রাত কুমারী মন। ভীত হয়েছে নিজের সম্ভাব্য পরিণাম ভেবে—সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেছে ভাবী নবাবের ন্যক্কারজনক চৌর্যবৃত্তির। কিন্তু—

লজ্জা হয় স্বীকার করতে নিজের কাছেও—মনে আকাশের তারা, পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা উৎকর্ণ তার অশ্লীল স্বীকারোক্তি শুনতে—চারিদিক থেকে ছুটে আসছে অন্তহীন ধিক্কারধ্বনি—তবু আজও চোখ বুজলেই শুনতে পায় সেই দুঃসাহসী উচ্ছৃঙ্খল তরুণের আর্তি—আমার দিল দেওয়ানা, পিয়ারী।

খেতে-শুতে, উঠতে-বসতে নিদ্রায়-জাগরণে সিরাজের নিষ্ঠুর মিষ্টি কথাগুলো তাড়া করে বেড়াত দুলারীকে। উঃ! সে এক দুঃস্বপ্ন। আচমকা ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল যে নারী, সে চিনতে পারে নি নিজেকে—আপন নাভির গন্ধে পাগলা মৃগী ভীরু সচকিত দৃষ্টিতে ঘুরে-ফিরে দেখতে চেয়েছে নিজের পরিবর্তনকে—আর্শিতে-আর্শিতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেছে নিজের প্রস্ফুটিত যৌবনকে, সবিস্ময় লজ্জায়। তবু দিশা পায় নি।

সত্যই কি তাই?

দুলারী, আজ অঙ্গে অঙ্গে তোমার যৌবনের পশরা—কিন্তু তুমি বঞ্চিতা। জগতের কোনো মধুকরকে তুমি আমন্ত্রণ জানাতে পারবে না, পান করতে তোমার অন্তরের মধু। আজ স্বীকার করো—শুভদৃষ্টির স্মরণীয় মুহূর্তে তোমার দু'টি ব্যাকুল চক্ষু কি খোঁজে নি সেই নারীর সুকুমার কিন্তু কামনাপঙ্কিল মুখটি জীবনের ভাবী সঙ্গীর মুখে?

ভয় পাও?

তবে থাক। দিও না উত্তর এ প্রশ্নের। জানি জবাবও নেই এই জিজ্ঞাসার। সব প্রশ্নের কি উত্তর আছে—সব সমস্যার সমাধান? তার মধ্যে থাক তবে এটাও। সারা রাজপুতানা খুঁজে রূপবান জামাই এনেছিলেন শেঠজী। তার সবল বাহুর নিবিড় আলিঙ্গনে যদি অন্য কারও চকিত স্পর্শের ছায়া ভেসে ওঠে, তবে, থাক সে ছায়া হয়েই। কাজ কি তাকে রঙে-রেখায় ফুটিয়ে তোলার?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুলারীবাঈ।

আজ সিরাজের ভাগ্যপরীক্ষা। কে জানে হয়ে গেল কি না।

রাত এখন কত? বৃশ্চিকের বাঁকা পুচ্ছ মধ্যরাত্রির ইঙ্গিত দেয়।

ধীর পায়ে নীচে নেমে আসে দুলারী।

নিজের শোবার ঘরে যাওয়ার আগে বাবার ঘরের দিকে পা বাড়ায় সে। কি করছেন বাবা? ঘুমোন নি নিশ্চয়। একটু শোন নি কি? নতুন নবাবের কাছ থেকে অভিনব উপঢৌকন পাওয়ার পুর থেকে রাতটা যে ঘুমোবার জন্যে, তা ভুলে গেছেন বোধ হয়।

সুবে বাঙলার নবাবের নবাবী রক্ষা হয় যাঁর টাকায় তাঁর বাড়ি উপঢৌকন আসবে বৈ কি নতুন নবাবের কাছ থেকে। পাঠিয়েও ছিলেন নবাব উল-মুলুক সিরাজউদ্দৌল্লা-হায়বৎ জঙ্গ বাহাদুর শেঠজীর পদমর্যাদার উপযুক্ত আধারে মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণপাত্রে জরির কাজকরা টকটকে লাল ভেলভেটে মোড়া বহুমূল্যবান উপহার—আপন পুত্রের চেয়ে প্রিয়তর জামাই-এর ছিন্নশির।

না মূর্ছিত হন নি জগৎ শেঠ—মূর্ছা ভাঙানোর চেষ্টাও করেন নি দুলারীবাঈ-এর—শুধু রাতের পর রাত পায়চারী করেছেন সুদীর্ঘ বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। শুকনো চোখে তাকিয়ে দেখেছেন একদিন নয়, দু'দিন নয়, তিনদিন তিন রাত পরে হাকিম-বৈদ্যের অনেক চেষ্টার ফলে চোখ মেলেছে বিধবা দুলারী। একবার হাতটা তুলে ধরেন নি মেয়ের মাথায়। তাঁর হাতটাই যে অশুচি হয়ে গেছে চিরজন্মের মত। এই হাত দিয়েই ত' গ্রহণ করেছিলেন নবাবের উপঢৌকন। হায় রে! ভেবেছিলেন, নবাব হয়ে সুবুদ্ধি হয়েছে মির্জার।

সুবুদ্ধি!

হ্যাঁ তা হয়েছে বই কি—তা হলে বুঝল কি করে জগৎ শেঠ স্বেচ্ছায় বাদশাহী ফরমান আনার চেষ্টা করেন নি। তাই প্রকাশ্য দরবারে জগৎ শেঠের চূড়ান্ত অপমান—তাঁর গালে চড় মারলেন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা।

চমকে উঠেছিল সমস্ত দরবার। সিরাজের সিংহাসনখানাও বুঝি কেঁপে উঠেছিল সে শব্দে।

কিন্তু শেঠজী কি একে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন? অন্তত দুলারীর সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তাঞ্জাম থেকে যখন নামলেন শেঠজী তখন একটা বাঁকা হাসির আভাষ ছিল তাঁর ঠোঁটে। ভেবেছিল কোন সুসংবাদ আছে বুঝি। কোন কিছু বুঝি শেঠজীকে মনে করিয়ে দিয়েছে—জীবনটা শুধু কান্না নয়, হাসির স্থান আছে। দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গিয়েছিল দুলারী বাবার কাছে।

সিরাজ আজ প্রকাশ্য দরবারে আমায় চড় মেরেছে দুলারী। আবার সেই হাসি।

চমকে উঠেছিল দুলারী—না, সংবাদের অস্বাভাবিকত্বে নয়—বাবার বলার ধরণে। যেন একটা মজার মত মজা হয়েছে এতদিনে। কিছুক্ষণ কথা ছিল না পিতা-পুত্রীর মুখে।

চল বাবা আমরা চলে যাই।

এঁ্যা!

এখানে থাকা আর নিরাপদ নয় বাবা।

জানি। কিন্তু যাবো কোথায়।

কেন দেশে—রাজস্থানে। আমাদের অভাব ত' নেই বাবা। পারবো না ফুল ফোটাতে রাজস্থানের মরুভূমিতে?

না মা, না—গাছ মরে গেছে, ফুল আর ফুটবে না।

তবে?

মরা গাছ—গাছ নয় কাঠ, তা দিয়ে আগুন জ্বলে, ফুল তাতে ফোটে না।

তুমি কি বিদ্রোহ করবে?

বিদ্রোহ আমি করব না মা, করবে অন্যে। আমি শুধু আমার শুকনো হাড় ক'খানা দিয়ে আগুন আরও জোরে জ্বালিয়ে তুলব তা' হলেই ব্যস্।

বাবা!

থাক্ মা, ভবিষ্যৎ অন্ধকারের গর্ভেই থাক্। আমায় এখন ঘরের টাকা দিয়ে সিরাজের জন্যে কিনে আনতে হ'বে বাদশাহী ফরমাস।

তবে যে বললে—

পাগলী বিদ্রোহ ত' নবাবের বিরুদ্ধে। সিরাজ নবাব হোক্, তবে ত'। ভয় নেই মা, রাজপুত জগৎ শেঠ প্রতিজ্ঞা করছে তোর কাছে—তোর স্বামীর প্রতিবিন্দু রক্তের ঋণ সিরাজকে শোধ করতেই হ'বে। আমি বেণে—সুদ ছাড়া আর কলজে ছেঁড়া সমান কথাই। এবার তুমি যাও। এখনই সিপাহসালার আসবেন এখানে।

তারপর থেকে আসছে—কেবল আসছে। সিপাহসালার, রাজা রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, ওয়াটস আরও কত। ক'জনকে জানে দুলারী। জগৎ শেঠের প্রাসাদ নবাবী দরবারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল না কি? এ দরবারে সবাই এসেছে শুধু সিরাজ আসে নি দ্বিতীয়বার।

বাবা!

চমকে উঠেন ধনকুবের—সামনে খোলা টাকা আনার খতেন।

তুমি এখনও হিসেব দেখছ? জানো, এখন কত রাত?

হিসেব? হ্যাঁ তা হিসেব বৈ কি। তবে দেখি নি—করছি।

বেশ করছ—এখন গুটিয়ে রেখে শোবে চল। খাতাপত্র বন্ধ করতে থাকে দুলারী।

খাতা বন্ধ করলে যে হিসেব বন্ধ হয় তা অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছে ফতেচাঁদ জগৎ শেঠ, মা, এ হিসেবের খোলাও নেই বন্ধও নেই এ রাবণের চিতা, শুধুই জ্বলে নেভে না।

তুমি আবার ঐ সব ভাবছ ত'।

আমি ত' ভাবি না মা, সে নিজেই আসে। হঠাৎ একসময় দেখি ধরা পড়ে গেছি তার হাতে। সে যাক, তুমি এখনও শোও নি কেন, মা?

কি জানি, কেমন যেন লাগছে।

হুঃ! দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে শেঠজীর বুক থেকে।

বাবা।

কি মা?

কাজটা কি ভাল হোল?

কোন কাজটা মা?

এই ইংরেজের সাহায্য নিয়ে সিরাজকে পদচ্যুত করার চেষ্টা?

উপায় আর নেই।

কেন? আলির মত মীরজাফর কি পারতো না সিরাজকে পদচ্যুত করতে?

না।

কেন? জাফরআলিই ত' সিপাহসালার!

না মা, জাফরআলি সিপাহসালার হ'তে পারে কিন্তু, সে আলীবর্দি নয়। নর্তকীর পদসেবী জাফরআলির শক্তি কোথায় নিজের শক্তিতে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে?

তবু তোমরা তাকেই বসাতে চাইছ বাংলার মসনদে।

ঐ ত' বললুম, উপায় নেই মা।

আবার নীরবতা নেমে আসে পিতা-পুত্রীর মধ্যে। একই খাতে বইছে দু'টি ধারা—একপাড় প্রতিশোধ কামনায় দুর্বার, অন্যপাড়ে নারীহৃদয়ের সমস্ত দুঃখ মথিত অমৃতধারা—করুণায় শ্যামল, ক্ষমায় সুন্দর।

তোমার কি মনে হয় ক্লাইভ জিতবে?

নিরানব্বই কেন একশ' ভাগ বিশ্বাস তাই ছিল। কিন্তু—

এর মধ্যে আর কিন্তু কোথায় বাবা? প্রায় সমস্ত সৈন্যই তোমাদের হাতে, কেবল মীরমদন মোহনলাল কি পারবে ক্লাইভের দুর্ধর্ষ ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে!

কি জানি মা, ঠিক বুঝতে পারছি না। যাবার সময় ওদের চোখে যে আগুন দেখেছি তাতে বুঝতে পারছি না ওরা গজ-ঘোড়া, না মন্ত্রী। না মা, শেষ খবর না আসা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়ার মত মনের বল অনেকদিন হারিয়েছি। আর বিশ্বাস নেই—আছে শুধু চিন্তা। আর না, যাও মা রাত ভোরের দিকে ঢলে পড়েছে।

ওঠার চেষ্টা করে না দুলারী।

কি কিছু বলবি?

না, ভাবছি রাণীমার কথাই ঠিক কি না। শেষ পর্যন্ত তোমাদের কাটা খাল কুমীরের পথ না হয়।

হোক কুমীর, জ্বলে ওঠে জগৎ শেঠের রাজপুত রক্ত। তবু হাঙ্গরকে আর সুযোগ দোব না শত শত নিরপরাধের জীবনে দাঁত বসাতে। আমার গালের দাগ অনেকদিন আগেই মুছেচে, তোর সাদা সিঁথিটা ত' কোনদিন লাল হ'বে না দুলারী। তবে কিসের আশায়, কোন ভবিষ্যতের সূর্যোদয় দেখার জন্যে আমি ভাববো অগ্র-পশ্চাৎ? দেশ? পাঁচশ' বছর মুসলমান শাসনে যদি আমরা স্বাধীন থাকতে পারি, তবে ইংরেজও আমাদের এর চেয়ে বেশি

পরাধীন করতে পারবে না। চামুণ্ডার রক্ততৃষ্ণা মেটে শিবের বুকে পা দিয়ে—নিজের কল্যাণকে ধ্বংস করেই তৃপ্ত হবে আমার প্রাণ।

আমি সেকথা বলি নি, বাবা। বাবার এ রূপ দেখে নি কোনদিন।

জানি, তুমি কি বলতে চাও। মসীজীবী বেণে জগৎ শেঠের সবচেয়ে বড় শত্রু, অসিজীবী বেণে ইংরেজ। জানি, আমার ব্যবসা যাবে, আমার টাকা যাবে, আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যাবে অদূর ভবিষ্যতে—তবু থামতে পারে না পিতা জগৎ শেঠ, ভুলতে পারে না মানুষ জগৎ শেঠ চরম অসম্মান, রাজপুত জগৎ শেঠ, শেঠ হলেও শান্তি নেই তার সিরাজের রক্ত ছাড়া।

মাথা নীচু করে উঠে যায় দুলারী। ভুলে যায় সে এসেছিল বাবাকে ঘুমোতে বলতে। জগৎ শেঠের মনে চকিতে একটা অবসাদায়ক অশুভ চিন্তা উঁকি মেরেই আত্মগোপন করে—।

রাজপথে অশ্বক্ষুরের শব্দ। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব।

না—থামল না। পার হয়ে গেল তাঁর সদর দরজা। হয় তো কোন প্রহরী টহল দিতে বেরিয়েছে—অরক্ষিত নগরীর পথে পথে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। এখনও এলো না কোন সংবাদবাহী দূত! মোহনলাল মীরমদন কি তবে তাঁর আশঙ্কাকেই সত্যি ক'রে তুললো? তাদের চোখের আগুন কি সিরাজের আকণ্ঠ পাপকেও পুড়িয়ে খাঁটি ক'রে তুলতে পারে? মীরজাফরের বেইমানী কি তবে আফিমের নেশায় লুটিয়ে পড়লো নতুন কোন বাইজীর আঁচলের তলায়? আরও একদিন রয়ে গেল সিরাজের নবাবী! হা ভগবান! জগৎ শেঠের বিনিদ্র চোখে কি ঘুম আর আসবে না—খোলা চোখেই কি তাকে জমাতে হবে শেষ পাড়ি?

না—এ অসম্ভব! হিসেব নিয়েই কারবার তাঁর—তাঁর হিসেবে ভুল অসম্ভব। ধনকুবের জগৎ শেঠ ভুল ক'রতে পারে, কিন্তু ভুল নেই সর্বহারা জগৎ শেঠের।

খট্—খট্—খট্...

হ্যাঁ, আবার!

হ্যাঁ, থেমেছে, তাঁর দেউড়িতে থেমেছে সুবে বাংলার নতুন নবাব মীরজাফরের দূত—কে জানে, হয় তো ভবিষ্যতের বাংলার ভগ্নদূত। হোক, তবু—

কে? রামসিং?

সিপাহসালার সংবাদ পাঠিয়েছেন।

বহুৎ আচ্ছা! আজ নয়, কাল শুনবো। দূতের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও।

ও-ঘরে বিনিদ্র দুলারী চমকে ওঠে মধ্যরাত্রির দেউড়িতে ঘোড়ার পায়ের শব্দে। দ্রুত উঠে আসে বাবার ঘরে। বিছানায় যাওয়ার সময় হয় নি শেঠজীর—বহু বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তি লুটিয়ে দিয়েছে তাঁকে গদির ফরাসেই।

ঘুমোক্। গভীর ঘুমের প্রলেপে দূর হ'য়ে যাক হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা।

পা টিপে বেরিয়ে যায় দুলারী।

শুধু এক ফোঁটা চোখের জল বেইমানী ক'রে গড়িয়ে পড়ে মেঝের বহুমূল্য কার্পেটে—জল শুষে নেয় সেই মুহূর্তেই, কিন্তু দাগ কি মোছে?

হাফেজ্

[Richard Le Gallienne-এর অনুবাদ হইতে]

প্রতিমা রায়

গোলাপ ত' সে গোলাপ নহে
তুমি না দেখিলে প্রিয়ে
বসন্ত বহে সুরার বিরহে
সহিব তারে কি নিয়ে?

কুসুমতুল্য কপোল ফুল্ল,
বিহনে কুঞ্জ মাঝে,
অবাধে মলয় যে সুষমা বয়
লাগে তাকি কোন কাজে?

গোলাপী বাহুর বাঁধন রাহুর
যদি নাহি নিতে পাই
আঁখির তৃষায় সে রূপ দিশায়
আগুনে জমিবে ছাই।

তোমার ও রক্ত অধরাসক্ত—
মধু সে মধুর নয়,
ওষ্ঠে যদি এ ওষ্ঠ মিলায়ে
না করিনু মধুময়।

দখিনার বায় যে পুলক ছায়
চিরশ্যাম তরু শাখে,
কুহু যদি তায় স্তুতি নাহি গায়
বৃথা বলি আমি তাকে।

চিত্তে আমার কোন রূপ আর
কোন স্মৃতি নাহি জাগে,
সে শুধু জাগায় প্রিয়ার কায়ায়
নানা রূপে নানা রাগে।

সুরার সুধার প্রণয় আধার
সেও সখী তব দানে
জীর্ণ মনের শেষ চয়নের
সার্থকতা বয়ে আনে।

হাফেজ্, তোমার হৃদয় সোনার
আখরে নরত আঁকা,
পরম প্রিয়ার মুখখানি আর
কোর না তাহাতে বাঁকা।

১২

করিডর দিয়ে চলে আসছেন ফাদার ভেরময়লেন, মনে হবে যেন যীশুর বড় শিষ্যদের কেউ। আগে না দেখলেও এঁর যে আসার সম্ভাবনা আছে তা জানত, কিন্তু দেখে মনে হ'ল না যদি জানত তা হলেও দেখামাত্রই চিনতে পারত এঁকে। বুঝতে পারত এই প্রিস্টই কুষ্ঠ-কলোনির 'সাদা সাধু' বলে খ্যাত। তিনি ডাকলে নাকি অরণ্যের সব মানুষ তাঁর পায়ে এসে পড়ে। কেন পড়ে তাই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্কুলের আর্টের প্রফেসর সিস্টার মনিক একবার বর্ণনা দিয়েছিলেন তাঁর মাইকেলেঞ্জেলোর আঁকা মোজেজের সজীব সংস্করণ বলে।

লম্বা-চওড়া মানুষটি, পরণে সাদা সুতি আলখাল্লা আর মাথায় *একটা মস্ত বড় টুপি—সূর্যের তাপ এড়ানো যায় তাতে। পায়ে* ভারি বুট। চওড়া বুকে মস্ত লম্বা তুষারশুভ্র দাড়ি, বাঁকা দু'টি মোটা ভ্রূর নীচে কুচকুচে কালো একজোড়া চোখ। এমন সুন্দর, করুণাভরা চোখ কখনও দেখে নি সে।

এত লম্বা, কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, নিজের সংগে তুলনায় তাঁকে একটা স্তম্ভের মত উঁচু লাগছে 'নিষ্কলুষ একটা স্তম্ভের মত।

চোখ তুলে তাঁর দিকে চেয়ে হাসল সে, ফাদার ভেরময়লেন, আপনাকে আমরা আশাই করছিলাম। আমি এখানে নতুন, আপনার শেষবারের পরীক্ষার পর এসেছি—আমি সিস্টার লুক।

—সিস্টার লুক! আমি তোমার কথা শুনেছি।

কালো চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি। গম্ভীর কণ্ঠস্বরে অনাবশ্যক জোর পড়ে না কখনও, ধীর, প্রশান্ত।

—ঐ ড্রামের খবর থেকেই জেনেছেন সিস্টার। ওর ভাবা তো উনি খবরের কাগজের মত পড়ে ফেলেন কি না।

সচকিত হয়ে হেয়ার ড্রেসারটির দিকে চাইল সিস্টার লুক, এতক্ষণ তাকে সম্ভাষণ করতেও মনে ছিল না।···লোকটাকে দেখলে অশ্রদ্ধা হয় কেমন। বেশ রাগবিপুল ছোটখাট মানুষটা, দেখলেই পাশ কাটিয়ে সরে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এখন আর সম্ভব নয় তা—যে মানুষটির সংগে এসে ও দাঁড়িয়েছে তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত কালো মানুষগুলোকেও এড়িয়ে চলেন না। তাদেরই সংগে তাঁর বাস।

সুতরাং চেষ্টারত একটু হাসি টেনে আনতে হ'ল মুখে, ম'সিয়ে এটিনে, আপনার খরিদ্দার মাদাম গুজেন্স মেটারনিটির বাইশ নম্বর ঘরে আছেন। যদি বলেন তো এমিলকে ডেকে দিতে পারি—আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

চোখ দু'টো নাচালো একবার লোকটা, গোঁফটায় চাড়া দিল।

—ও না সিস্টার, ধন্যবাদ। পথ আমার চেনা। সারা কলোনিতে এমন ঘর নেই যেখানে আমি যাই নি, অবশ্য—

থেমে গিয়ে নীচু হয়ে অভিবাদন করল একটা, আপনাদের *সংক্রামক রোগের প্যাভেলিয়নটার ছাড়া—আপনারা তো কড়া নিয়মে ওটা একেবারে আলাদা করে রেখেছেন।*

আর একটা জায়গা আছে তেমন—নানদের ডরমিটোরি। এই উপনিবেশের একভাগ মেয়ে অন্তত ওর ঐ অন্যায় কৌতূহলীদৃষ্টির আওতার বাইরে থাকতে পেরেছে, ভগবানকে ধন্যবাদ। লোকটা যেন ছোট্ট একটা নোংরা পাখি—কলোনিময় ঘুরে ঘুরে খবর জোগাড় করছে খুঁটে-খুঁটে, ঠুকরে ঠুকরে ছড়াচ্ছে তারপর চারদিকে।

এটিনে ফাদার ভেরময়লেনকে শুভেচ্ছা জানালো, টেস্টগুলোর ফলাফল আপনার ভাল হোক ফাদার। এখানে থাকতে থাকতে দাড়িটা যদি একটু-আধটু ছেঁটে-টেঁটে আঁচড়ে নিতে চান তো আমি খুশি হয়ে করে দেব।

ফাদার ভেরময়লেন মুখ টিপে হেসে মাথা নাড়লেন।

—উঁহু! উঁহু! ও রকম একটু-আধটু অদল-বদলও মেনে নিতে রাজী হবে না আমার ছেলেরা।

সিস্টার লুক মনে মনে বলছে আমিও না, ও মুখে এটিনের কৃত্রিমতার স্পর্শ আমারও সইবে না।

মেটারনিটির দিকে শশব্যস্তে পা বাড়াল এবার এটিনে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ক্যাথরিন হিউম্
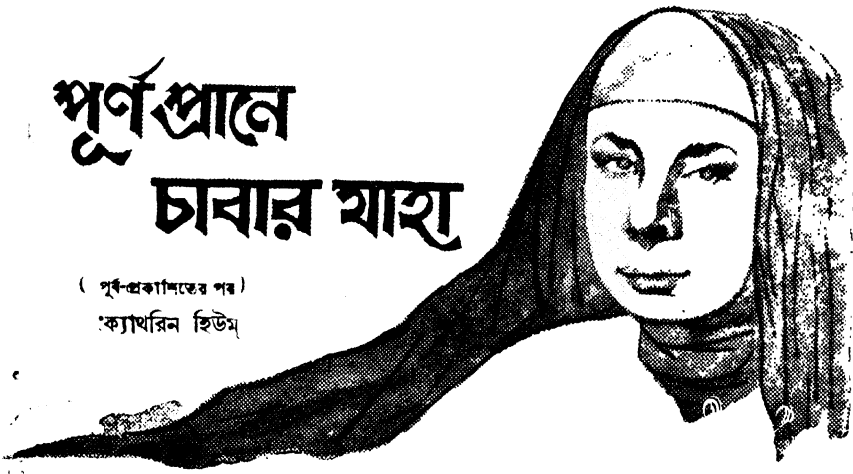
—কিছুক্ষণ পরে একবার আসবেন সিস্টার, দেখে যাবেন অগ্নি-পরীক্ষার আগে কি সুন্দর আমি করে দিয়েছি তাঁকে।

আসবেন কি না প্রশ্ন করা নয়, বলে গেল যেতে।

উত্তর কিছু দেয় নি সে, নীরবে ফাদার ভেরময়লেনের সংগে ল্যাবোরেটোরির দিকে পা বাড়িয়েছে—টেস্ট শুরু করবে। সব টেস্টগুলো শেষ করতে দু' সপ্তাহ লাগবে।

ওঁর চলার গতির সংগে তাল রেখে চলা শক্ত। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে চলতে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল প্রায়। সেদিনই পরে যখন তাঁর অতীত-কাহিনী শুনল নিশ্বাস ফেলে ভাবল গুরুবল, সকাসে মনের কথাটা প্রকাশ করে বলে নি। যে কথা ভেবে ক্ষণপূর্বের মনোবেদনা ও ভুলেছিল, ভাগ্যে সেটা ব্যক্ত করে নি। ভাবছিল যে ক'দিন আছেন এখানে নিশ্চয়ই একটা-দু'টো ম্যাস পরিচালনা করবেন উনি। ঐ আশ্চর্যসুন্দর গলায় স্যাক্রিফাইস গাইবেন—আগেকার দিনে এমনি উদাত্ত ভরাট গলাতেই এ গান গাওয়ার রীতি ছিল। সলেমনের সন্ন্যাসীরা এখনও নিশ্চয় এমনি করেই গা'ন···দরদভরা কণ্ঠ, বিকৃতি নেই কোথাও, ব্যস্ততা নেই। ধীর, ভাবগম্ভীর, সুস্পষ্ট।

ল্যাবোরেটোরিতে এসে ফাদার ভেরময়লেন টুপিটা খুললেন। চুলগুলো ঠিক তাঁর দাড়ির মতই সাদা। ঐ সাদা চুল আর সাদা দাড়ি তাঁর কালো ভ্রূ আর উজ্জ্বল কালো চোখে দ্বিগুণ বিচিত্রিতা এনেছে। বার্ধক্য তাঁর কোন কোন অংগে এসেছে কেবল শুভ্রতার রং নিয়ে, অন্যান্য অংগকে স্পর্শও করে নি।

হাত শ্লাইডগুলো ঠিক করছে আর মন ভাবছে এই মানুষের সন্ন্যাসজীবনে কি এমন ঘটনা এমন মানসিক আঘাত দিল তাঁকে··· ঐ সাদা রং যে স্বাভাবিক নিয়মে লাগে নি তা তো নিশ্চিত। পথ তৈরি হয়েছে যতদূর তারও বহুদূরে জংলী গাঁয়ে একা থাকেন তিনি। ভাগ্যবিড়ম্বিত দেশীয় কুষ্ঠরোগীদের দেহের সেবার সংগে মানসিক উন্নতিবিধানের দায়িত্বও তাঁর কাঁধে। ডাক্তারের কাছে শুনেছে শতাধিক রোগী আছে সেখানে, অধিকাংশেরই এমন গুরুতর অবস্থা যে নিজেদের জাতের লোকেরা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে।

এমন বিপদসংকুল কর্মক্ষেত্র কেন বেছে নিয়েছেন ফাদার, সে প্রশ্ন অর্থহীন। সে নিজে নান, কাজেই খুব ভাল করেই জানে শুধু ভগবৎ প্রেমেই এ কাজ বেছে নিয়েছেন তিনি।···খুব কষ্টের মধ্যে, বিপদের মধ্যে কাজ করার লোভ তার নিজের মনেই কি নেই! তবে নানদের নিজস্ব ইচ্ছার কোন মূল্য নেই, এই যা।

বিকেলে এটিনে দেখল সিস্টার লুক ডেস্কে বসে ফাদার ভেরময়লেনের কেস-রেকর্ড দেখছে।

দেখে আহতকণ্ঠে অভিযোগ জানাল, আপনি তো এলেন না সিস্টার!

স্মিতহেসে চোখ তুলে তাকাল সিস্টার লুক, রুল বলেছে হাসিমুখে থাকবে সর্বদা, কাজে তোমার মাধুর্য বা শিষ্টাচারের অভাব না ঘটে।

—ব্যস্ত ছিলাম বড়।

—অপূর্ব সুন্দর করে দিয়েছি তাঁকে তাঁর অগ্নিপরীক্ষার আগে।

—অগ্নিপরীক্ষা কিসের মঁসিয়ে এটিনে? একেবারে স্বাভাবিক ডেলিভারি হবে ওঁর।

এটিনে তার ডেস্কে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়, হ্যাঁ···তা হবে হয় তো। কিন্তু আর একটা মেয়ে যদি হয়···আমি তো সেই অগ্নিপরীক্ষার কথাই বলছি সিস্টার। এবারও যদি ছেলে না হয় তা হলে মঁসিয়ে গুজেল হয় নিজের গলা কাটবেন নঃ তো বৌয়ের। কিংবা হয় তো আর একটা বিয়ে করে বসবেন। একটি ছেলের জন্যে কি আকুল প্রার্থনা তাঁর যদি দেখতেন! তাঁর ব্যাংক-ব্যবসার উত্তরাধিকারী চাই তো। মাদামেরও ঐ এক প্রার্থনা। এই সবই তো বলছিলেন আমাকে এতক্ষণ—চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছিল।

—ভগবানের যা ইচ্ছে তাই মেনে নিতে হবে, উপায় কি। হয় তো সেই সময়টার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছেন, তাই কেঁদেছেন···অথবা আপনার অতি-সহানুভূতি থাকায়।

নিজের গলার সুরে ব্যংগের আভাস নিজের কানেই বাঁধল। ভয়ে-আতংকে মনটা আড় মুহূর্তেই।

সম্মুখস্থ মূর্তিটি কিন্তু খেয়ালও করে নি। বরং যেন মস্ত একটা প্রশংসা করা হয়েছে, নীচু হয়ে সবিনয়ে একটা অভিবাদন করে ফেলল।

চকিতে একবার চার্টটার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বলল, হ্যাঁ সিস্টার, ও গুণটা আমার আছে। ফাদার ভেরময়লেনের উপর···এত সহানুভূতি হয় আমার। দেখুন, টুঁ শব্দটি না করে কি কঠিন প্রায়শ্চিত্তে জীবন কাটাচ্ছেন।

—প্রায়শ্চিত্তে!

চুপ করে থাকবারই ইচ্ছা ছিল, অফুরন্ত বিস্ময়ে কথাটা আপনিই বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

—ও! আপনি তা হলে জানেনই না। কিন্তু ওঁর সেবাযত্নের ভার যখন নিয়েছেন ওঁর অতীতের কাহিনীটা জানাও আপনার উচিত সিস্টার।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল এটিনে, আর কেউ না শুনে ফেলে।

ওকে থামিয়ে দেওয়া উচিত এখনও—মন বলছে। কণ্ঠে স্বর ফুটছে না।

ছোট কালো ব্যাগেভরা চুল কোঁকড়ানোর সরঞ্জাম, কামানোর ক্ষুর, আর মলম-টলম—তারই সংগে এখানকার খোসগল্পের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ায় লোকটা।···কিন্তু এখন যে কাহিনী বলতে শুরু করেছে ও তার জাত আলাদা। যখন যুবক ছিল, হঠাৎ এ কাহিনী কানে এসেছিল তার। বলতে গিয়ে বেধে-বেধে গেল বারবার, খোসগল্পের পর্যায়ে পড়ে না বলেই গেল। এ কাহিনী পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার নয়।

কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য সমবেদনার সুর ফুটেছে মানুষটার, এত যে হাত-মুখ নাড়ছিল এতক্ষণ, কোন ব্যথার মন্ত্রে সব চপলতা হারিয়ে সেই মানুষ আপনি স্থির হয়ে গেছে।

অনেকবছর আগে একজন ফাদার এক প্রচার-মিশনে জংগলের মধ্যে সফরে গিয়েছিলেন। হঠাৎ এক গ্রামে তিনি একটি শ্বেতাংগ মানুষ দেখতে পেলেন। প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, একদল বান্টু ছেলেমেয়ের সংগে খেলছেন। দেখে মনে হ'ল না আর কোন শ্বেতাংগ মানুষ থাকেন এখানে, এই জংলীদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় একা—ব্যাপারটা দুর্বোধ্য কেমন। শ্বেতাংগ মানুষটি এগিয়ে এলেন··· চোখভরা প্রীতি, সেই সংগে কি একটু শংকারও আভাস মিশে আছে।

সন্ধ্যায় নিজের কুঁড়েঘরে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁকে, একটু কথাবার্তা বলবেন।···ওঁদের কথাবার্তা সারারাতে বোধ হয় থামে নি···শ্বেতকায় মানুষটি বলেছিলেন একদিন তিনিও একজন প্রিস্ট ছিলেন, কংগোয় এসেছিলেন যখন তখনও রাস্তা তৈরি হয় নি, টেলিফোনের লাইন বসে নি। নানা কাজে মাসের পর মাস এই দেশে ঘুরেছেন—ব্রাদারদের সংগে কোন যোগাযোগ ছিল না, সভ্যতার সংগে সব সম্পর্কই ছিন্ন। ক্রমে ক্রমে ভয়ংকর একটা নিঃসংগতার অনুভূতি গ্রাস করে ফেলতে লাগল তাঁকে, বছর দু'য়েক পরে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। সব ছেড়ে দিয়ে জংগলে চলে গেলেন একদিন, তাঁর সেই বহুদূরের মিশনের সংগে যোগাযোগ করার ব্যর্থ চেষ্টা আর করলেন না। ওদিকে তারাও শেষ পর্যন্ত ধরে নিল তিনি হারিয়ে গেছেন আর না হয় তো জংলীদের হাতে বন্দী হয়েছেন। আর তা যদি না হয় তো শিকারী বেড়ালের পেটে গেছেন। এমনধারা তখন প্রায়ই ঘটত। তারপর করুণাপরবশ হয়েই হোক, নিঃসংগতার জন্যই হোক, কিংবা ভালবেসেই হোক তিনি ঘর বাঁধলেন একটি দেশীয় মেয়েকে নিয়ে। তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল।

—কেউ অবিশ্যি জানে না সেই ফাদারটি কি বলেছিলেন, তবে জনশ্রুতি ক'সপ্তাহ পরে সেই শ্বেতকায় মানুষটি এক বুশ-মিশনে এসে তিনটি কালো বাচ্চা দিয়ে গেলেন, নানরা তাদের মানুষ করবেন, লেখাপড়া শেখাবেন।

সশ্রদ্ধকণ্ঠে বলতে বলতে এটিনে থামল একবার।

সিস্টার লুকের মনটা দ্বিধাবিভক্ত—একটা দিক আগ্রহাতিশয্যে থরথর করে কাঁপছে, অধীর হয়ে ভাবছে এটিনে বলে চলুক···অন্য দিকটা লজ্জিত সেজন্য—বারে বারে প্রার্থনা করছে ঈশ্বর যেন তাকে ক্ষমা করেন।

তারপর সেই প্রাক্তন প্রিস্টটি আবার উধাও হয়ে গেলেন কোথায়।

অনেকগুলো মাস কেটে গেছে, এমন সময় জংগলে গুঞ্জন শোনা গেল সেই সাদা চামড়ার মানুষটিকে আবার দেখা গেছে—ইয়োরোপ থেকে ফিরে এসেছেন, সম্ভবত রোম থেকে, আর আবারও তিনি প্রিস্ট হয়ে গেছেন। মনে হয় ধর্মীয় ওপরওয়ালাদের কাছে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বাকি জীবনটা কুষ্ঠরোগীর সেবায় উৎসর্গ করবার অনুমতি প্রার্থনা ক'রেছিলেন। অনুমতি মিলেছিল, সেই সংগে আবার ম্যাস উচ্চারণের অনুমতিও।

গলা খাটো করল এটিনে, তা হলেও তিনি বোধ হয় কোনদিনই কুষ্ঠ-কলোনীর বাইরে ম্যাস উচ্চারণ করবেন না। সেখানে সবাই তাঁকে পুজো করে সিস্টার—আপনার একবার দেখে আসা উচিত। একবার এক কেতাদুরস্ত শিকারীদলের সংগে আমি যাচ্ছিলাম ঐ কলোনীর পাশ দিয়ে—সবাই ভয় পেয়েছিল, আমি কিন্তু গিয়েছিলাম সিস্টার ভেতরে···

থেমে গেল, আর কথা সরছে না মুখে। মনে হচ্ছে এবার বুঝি কেঁদে ফেলবে মানুষটা!

—আপনার একবার যাওয়া দরকার সিস্টার···

এটিনে চলে যেতে চার্টগুলোর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বসে রইল, চেষ্টা করছে ল্যাবোরেটোরি টেস্ট-রিপোর্টের সংকেতগুলোর দিকে মন দিতে।

···নেইজাল—নেগেটিভ।···ব্লাড নেগেটিভ।···ফিজিক্যাল—নার্ভ পুরু হয় নি, চামড়ার সংবেদনশীলতা অক্ষুণ্ণ আছে।···

প্রথম পর্যায়ের রেকর্ডগুলো এত পুরোনো যে প্রায় পড়ার অযোগ্য। কতকাল ধরে এই দুরূহ সেবায় ব্যাপৃত আছেন ফাদার ভেরময়লেন, আর কতদিন এইভাবে ল্যাব্ টেস্ট করিয়ে আসছেন—ওরাই তার নীরব সাক্ষী।

প্রায়শ্চিত্তের চূড়ান্ত একেই বলে। কিন্তু এ সুযোগও আসে না সবার। এভাবে আত্মগ্লানি মোচনের সুযোগ দেবানুগৃহীত ক'জনের ভাগ্যেই কেবল মেলে।

ডাক্তার কখন করিডর পেরিয়ে এসেছেন ওকে খুঁজতে, টেরও পায় নি। নানরা যেমন মৃদু একটু তুড়ির শব্দে পরস্পরের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, তেমনই একটা অস্ফুট শব্দে তন্ময়তায় ছেদ পড়ল ওর, চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল ডাক্তার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে।

—ফিজিক্যালটাও লিখে ফেলতে পারেন, এখন অবধি নেগেটিভ—অলৌকিক কাণ্ড বাবা!

শুনে যে ও স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁচল চেষ্টা সত্ত্বেও গোপন করা গেল না তা।

একপলক তাকে দেখলেন ডাক্তার অভিনিবেশ সহকারে, হুঁ! গল্পটা জানা হয়ে গেছে দেখছি।

অল্প একটু মাথা নেড়ে শুধু স্বীকৃতি জানাল ও। দেখতে পাচ্ছে ডাক্তারের চোখে সেই অবজ্ঞার দৃষ্টিটা ফুটছে। ধর্ম-জীবনের কোন *প্রসংগ এসে পড়লেই ঐ অবজ্ঞার দৃষ্টি ফুটবে ওঁর মুখে, জানা কথা।*

—মনে হচ্ছে সিস্টার, ত্যাগের নামে এই নির্ভেজাল পাগলামিটারও পুরো অর্থ আছে আপনার কাছে!

সিস্টার লুকের শান্তদৃষ্টির আভাস কণ্ঠে ফুটল তার, আছে ডক্টর। আমি ঈর্ষা করি ওঁকে। ভগবানের অসীম ভালবাসা ওঁর ওপর···

সেই থেকে দেখছে বছরে দু'বার ফাদার ভেরময়লেন হাসপাতালে আসেন লেপ্রসি চেক্ করাতে—মার্চে একবার, গরমকালের বর্ষাটা যখন শেষ হয়ে যায় আর একবার সেপ্টেম্বরে, বৃষ্টিহীন শীতের শেষে। কিপুসির ওধার থেকে আসেন—খানিকটা পথ তাঁর বয়রা তাঁকে নৌকো বেয়ে পৌঁছে দেয়, তারপর নদীটার কাছাকাছি কোথাও থেকে ভিকার জেনেরেলের মোটর তুলে নেয় তাঁকে।

প্রতিবার ক্লিনিক্যাল রিপোর্টটায় নেগেটিভ ফলাফল লিখতে লিখতে সিস্টার লুক শংকিত বিস্ময়ে ভাবে, এ রকম আর কতদিন চলতে পারে!

ডাক্তার বলেন, কেবল আর কিছুদিন সময়ের ওয়াস্তা সিস্টার, এর বেশি কিছু নয়। বলেন যখন, কণ্ঠস্বরে ক্রোধ থাকে, আন্তরিক মমতায় মুখখানা কোমল।

মার্চ আর সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রায়ই তাঁর কথা ওর মনে পড়ে। এমন পরিপূর্ণ সুখী মানুষ ধর্মজীবনে সে আর দেখে নি, এমন কোমল দয়ালু মনও না। শুধু ধর্মজীবনে কেন পূর্বজীবনেও দেখে নি।

একদিন তাকে বলেছিলেন, মানুষের কল্যাণরূপের মাঝেই ঈশ্বরের প্রকাশ সমধিক আর এই রূপই সবচেয়ে সহজে মানুষকে হিংসা ভুলিয়ে দিতে পারে।

তিনি যে সম্পূর্ণ একা নিরস্ত্র হয়ে অমিত্র উপজাতিদের মধ্যে থাক

তাদের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোকগুলোকে জোগাড় করে আনতে, তবু কেন তাঁর নিজের কিছু হয় নি কোনদিন—প্রসংগটা উঠেছিল তাই নিয়ে, তবু সে জানে উনি যে কথা বললেন সে ওঁর ধর্মবিশ্বাসের কথা। এই ওঁর নীতি, ওঁর জীবনদর্শন···যখন যেখানে থাকেন যার সংগে, তারই ওপর ওঁর নীতির প্রভাব পড়ে। ফাদার ভেরময়লেন যখন হাসপাতালে থাকেন আবহাওয়াটাই বদলে যায়। ডাক্তার একেবারে অন্য মানুষ হয়ে ওঠেন। হেয়ার ড্রেসার এটিনে রোজ দেখা করতে আসে তাঁর সংগে আর হরেকরকম গল্প বলে যায়—উপনিবেশ-জীবনের অনেক ছোট ছোট সত্য কাহিনী, পরচর্চার কালি তাতে নেই। রিক্রিয়েশনে বলা চলে এমন সব গল্প।

হাসপাতালে থাকতে সুরু করে ফাদার ভেরময়লেনের সংগে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হ'ল। রাউণ্ডে ঘুরতে ঘুরতেও দেখা করে যায়, এমনভাবে কথা বলে যেন কত বছর কোন মানুষের সংগে কথা বলে নি।

প্রথম যখন দেখা হয় তাঁর সংগে, তার মাস ছয়েক পরে মাদার ম্যাথিল্ডা নানদের ডরমিটোরি থেকে তাকে হাসপাতালের ছোট একটা ঘরে বদলি করেছেন। কনভেন্টের কোন নিগূঢ় প্রথানুসারে দিনের বেলা ডরমিটোরিতে চাবি দেওয়া থাকে, ফলে হাসপাতালের কাজের মধ্যে বিকেলের দিকটায় সুবিধে পেলে যাতে সে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে তার একমাত্র উপায় হাসপাতালেই তার শোবার বন্দোবস্ত করা। এ রকম একটু-আধটু বিশ্বাসের পরামর্শ ডাক্তার দিয়েছেন সুপিরিয়রকে। এ রকম স্বল্পক্ষণ বিশ্রামও বিশেষ দরকার, তাকে সুস্থ রাখতে যদি চান। এখনও দিনে সে যোল ঘণ্টা ডিউটি দিচ্ছে, ফলে ভোরবেলা সার্জারিতে এ্যাসিস্ট করার আগে রাত্রে প্রায়ই চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি ঘুমুতে পায় না।

বিধানটা অসাধারণ কিছু, অবাক হবার মত কিছু। সেদিন তাই শুধু অবাকই হয়েছিল, সম্প্রতি একদিন যে নিজের ওপর সমস্ত সংযম হারিয়ে ভেঙে পড়েছিল তার সংগে এ বিধানের সামান্যতম কোন যোগাযোগও যে থাকতে পারে ভাবে নি।

সেদিন সকালে খাবারঘরে একাই ছিল সে, দু'টো অপরেশন সেরে এসে দেরিতে প্রাতরাশ খাচ্ছিল। কফির বাটিটা হঠাৎ হাত ফসকে পড়ে ভেঙে গেল, সমস্ত সাদা হ্যাবিটটা কফির ছিটেয় বাদামি হয়ে গেল একেবারে। সিস্টার লুক ভুলে গেল অন্যে সার্ভিং জানলা দিয়ে চেয়ে আছে। হতবুদ্ধি হয়ে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ভাঙা বাটিটার দিকে—নতুন একটা প্রায়শ্চিত্তের পথ খোলা হ'ল। হঠাৎ কি হ'ল—মুখটা নীচু করে দু'হাতের পাতায় ঢেকে ফেলে অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। অন্যে ভীত-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখল একপলক, এক দৌড়ে মাদার ম্যাথিল্ডাকে খবরটা দিতে ছুটল তারপর। কোন নানকে কাঁদতে কখনও সে দেখে নি।

তারপর একসময় আদেশটা এল। সেই সংগে অনুরোধ, কাজের চাপ না থাকলেই ডিউটি থেকে সরে এসে সে যেন একটু ঘুমিয়ে নেয়। বিস্ময়ে সিস্টার লুক হতবাক একেবারে—তার জন্য মাদার ম্যাথিল্ডা উদ্বেগ কমিউনিটি থেকে তার আংশিক বিচ্ছেদের ঝুঁকিও মেনে নিচ্ছে।

—বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হ'ল। তোমাকে বলবার আগে কিভাবে ভগবানের কাছে নির্দেশ প্রার্থনা করেছি আমি বিশ্বাস করতে পার। যতক্ষণ আমি সরিয়ে রাখি তোমাকে, বঞ্চিত করে রাখি তোমার কমিউনিটি-জীবন থেকে—এই যে সামান্য ক'ঘণ্টা ঘুমের মত পর্যন্ত হাত বাড়াতে হয়েছে আমায়—তার প্রতিটি ঘণ্টা ক্ষতিকর···আমাদের সবার পক্ষেই—আর তোমার পক্ষে তো বিশেষ করে।

মাদার ম্যাথিল্ডার মুখের ম্লান হাসিটুকু সিস্টার লুক দেখল চেয়ে চেয়ে।

—আমি বুঝতে পেরেছি মাই মাদার। সুপিরিয়র যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তার চাইতেও একটু বেশিই বুঝেছে। আবার ঝুঁকি নিচ্ছেন মাদার ম্যাথিল্ডা, এ ঝুঁকির তীক্ষ্ণতা আরও বেশি। রাত্রে কোন নানের শূন্য সেল যেমন চোখে পড়ে তেমন আর কিছু নয়। আর রিক্রিয়েশনে সুপিরিয়র যখন প্রসংগত বলবেন—যেন অতি তুচ্ছ একটা কথা—একটি নার্সিং সিস্টার কাজের সুবিধার জন্য কিছুদিন হাসপাতালে শোবে, অনেকগুলো তির্যকদৃষ্টির আঁচ লাগবে দেহে—পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তাতে।

তার কারণ সুপিরিয়র যাই বলুন, কনভেন্টে আলাদা শুতে পাবার অর্থ বঞ্চিত হওয়া নয়। বরং গুরুতর অসুস্থ না হয়ে পড়া সত্ত্বেও ছোট্ট একটা সাদা ঘরে থাকতে পাওয়া বিশেষ অনুগ্রহের পর্যায়ে পড়ে।··· চারপাশে আর বিশটা মেয়ের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে হবে না তোমায়, গরমে তারা এপাশ-ওপাশ করায় তাদের খড়ের বিছানার খসখস্ আওয়াজও না। কমিউনিটি-স্নানঘরের সামনে লাইন না দিয়ে অন্ধকার প্রত্যূষে একা একা স্নান করে নেওয়া, একা প্রার্থনা করতে পাওয়া, একা ভাবতে পাওয়া···মুক্তির আস্বাদ বয়ে আনবে ওরা।

আশীষ নিতে নতজানু হ'ল সিস্টার লুক।

—প্রার্থনা কোর আমার সংগে যেন এ বছর শেষ হবার আগেই রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েল ট্রপিক্যাল মেডিসিন পড়া একটি নানকে পাঠিয়ে দিতে পারেন। আহা, নতুন বাড়িটা শেষ হবার আগেই আমরা যদি নার্সিং সিস্টারটি পেয়ে যেতাম···

প্রার্থনা করার প্রতিজ্ঞা করে মাথা নেড়েছে সিস্টার লুক। কিন্তু এমন একটা নিজস্ব ঘর পাবার পর সে প্রার্থনা পুরাপুরি আন্তরিক হবে কি! অন্তত যতদিন দু'টো কাজই একা চালিয়ে নেবার শক্তি আছে! নিজেও সে নিশ্চয় করে বলতে পারবে না।

কিন্তু সে তার মনের সামান্য ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েও ফাদার ভেরময়লেনের সংগে আলোচনা করে। ভাণে না যে এটা সোজাসুজি তারই মনের সমস্যা, সতর্কভাবে ঘুরিয়ে বলে। যেন মঠের সম্বন্ধেই বলছে সাধারণভাবে, যেন ব্রতী-জীবনের সব সিস্টার আর ব্রাদারদের সমস্যা নিয়ে আলাপ করছে।

উত্তরে ফাদার ভেরময়লেনের মতামত আর মন্তব্যগুলো সর্বদা একই সুরে বাঁধা থাকে।

—আমরা সকলেই তাঁর সন্তান,—ভাউ যারা নিয়েছে তারাও যেমন, যারা নেয় নি তারাও তেমনই। আমাদের ভালর জন্যে যা ঘটা উচিত তিনি তাই ঘটান।···

ছ'মাস অন্তর অন্তর তিনবার ফাদারের ক্লিনিক্যাল রেকর্ড তৈরি

...য়া হয়ে গেল। নেগেটিভ। চার্ট ভর্তি শুধু নেগেটিভ চিহ্ন—...ব টেস্টের ফলাফল নেগেটিভ।

ডায়রি রাখার অনুমতি নানদের নেই, তবু এই ক্লিনিক্যাল রেকর্ডগুলো এক ধরণের ডায়রিই বলতে গেলে। এতটুকুও জায়গা ...ষ্ট না করে অল্প জায়গায় নিজের হাতে লেখা তারিখগুলোর দিকে ...াকিয়ে তাকিয়ে অনেক কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় কানবার কোন প্রসংগগুলো জমিয়ে রেখেছিল সে মনের মধ্যে ফাদার ...লে আলোচনা করবে বলে। পড়তে পড়তে পিছিয়ে যেতে যেতে ...রোনো প্রসংগগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে যত, ধীরে ধীরে একটা প্রত্যয় ...াসছে নিজের মনে। বুঝতে পারছে অবশেষে তার সুখের দিন শুরু ...য়েছে এবার। নিখুঁত সমন্বয়ের জীবনে এবার প্রবেশ করতে পেরেছে ...—প্রকৃত নানের জীবন যা হওয়া উচিত সেই জীবনে। মন শান্ত ...য়েছে অনেক, চিন্তায় আর ভূত-ভবিষ্যতের উৎপীড়ন নেই।

তার হাতের প্রথম এনট্রি—সেপ্টেম্বর, '৩৩ সাল। সেবারই ...র কমিউনিটিতে ঘুমোনো বন্ধ হয়। কমিউনিটি-জীবনের প্রতি ...ণের তপশ্চারণ নিয়ে ওর যেসুইট কাকার এক সরস মন্তব্য ফাদারকে ...নিয়েছিল ও—কথাটা এত বেশি সত্য, ওরা হেসেছিল প্রাণভরে। ...জনে যেন কি একটা ষড়যন্ত্র করেছে আর আশীর্বাদের মত ছোট্ট ...কটুখানি নির্জনতা স্বাধিকারে পেয়েছে মুহূর্তের জন্য, সেখানে আর ...উ নেই!

'৩৪ সাল, মার্চ। বানর-প্রসংগ আলোচনা করেই কেটেছিল ...াধ হয় সেবার। সে তখন বানর-বহুল জায়গা দিয়ে পরিদর্শন-সফরে যেত কি না। দেখত গাছের ডালে বাঁদর বসে আছে দেখে তাকিয়ে থাকলে কিংবা সেকথা উচ্চারণ করলে এমিলদের মতো আলোকপ্রাপ্ত লোকও আতংকে শিউরে ওঠে। এই প্রসংগে ফাদার ভেরময়লেনের কাছে বৃদ্ধা সিস্টার ইউচ্যারিস্‌সিয়ার গল্প করেছিল। তাঁরই সংগে যেত সে অধিকাংশ সময়—বাঁদর দেখলেই ড্রাইভারকে তিনি বলাবেনই ইয়াম্বো—শুভদিন! সেই সংগে তাকে টুপি উঁচু করতে হবে। তাঁর বিশ্বাস তাঁর প্রচার-মিশনের এই বিশেষত্ব এ দেশের মানুষগুলোর কুসংস্কার দূর করবে। শিক্ষিত করে তুলবে।

আর এদিকে বাঁদরদের শুভেচ্ছা জানাবার পরই কুষ্ঠকায় মানুষগুলো অসুস্থ হয়ে পড়বে ঠিক! অদ্ভুত অসুখ—জ্বর, কাশি, মাঝে মাঝে থুথুতে 'পাস্' পর্যন্ত!

শেষবার ফাদার ভেরময়লেন এসেছিলেন—সেপ্টেম্বর '৩৪। সেবার ও তাঁর কুষ্ঠরোগীদের কথা বলেছিল অনেকেরই নাম ধরে ধরে। কারণ ইতোমধ্যে সে অন্য অন্য কনগ্রেগেশনের আর তিনজন নানের সংগে তাঁর কলোনি ঘুরে এসেছে। অগোপন গর্বে ফাদার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাঁর ছেলেদের সংগে, সাহায্য করবার জন্য যাদের নিজের হাতে তৈরি করে নিয়েছেন তিনি।... সেই থেকে যখনই মাইক্রোস্‌কোপ টিউব দিয়ে নলাকৃতি মাইকোব্যাক্‌টেরিয়াসের দিকে তাকিয়েছে, প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে দু'খানি তামাটে বলিষ্ঠ হাত—অংগহীন কালো মানুষগুলোকে স্নান করাচ্ছে, ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছে, আঙুল নেই যাদের তাদের খাইয়ে দিচ্ছে চামচ দিয়ে।

আর এই এখন মার্চ, '৩৫। ফাদারের আসবার সময় হয়েছে আবার। বর্ষার অবস্থাটা দেখে, সে প্রার্থনা করে নিরাপদে যেন নদীপথটা পার হয়ে আসতে পারেন তিনি। এলেন যখন সেই সবে বর্ষার পালা চুকেছে। বর্ষার কালো মেঘ এখানে ধেয়ে আসে কেপটাউনের দিক থেকে। মহাদেশটার এ প্রান্ত থেকে ঝড়ে পড়তে পড়তে বিষুবরেখার দিকে চলে যায়। যেখানে থাকে যতদিন শীত আর রুক্ষতা আনে, পেরিয়ে চলে গেলে গ্রীষ্ম আসে, ফুল ফোটে।··· আর যেতে যেতে ঐ বর্ষার ধারাটা গিয়ে বিলীন হয়ে যায় কোন সুদূরে সেই চিরশ্যামল বনানীর অস্পষ্টতার মধ্যে। তবু চোখের আড়ালে গিয়েও কল্পলোক থেকে সরে না মুহূর্তও।···এমিল বলে ঐ বনে সব ঋতু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ফাদার ভেরময়লেনকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে জানাল, ফাদার অগ্রে ফিরেছেন। কেনিয়া সফরে গিয়েছিলেন, ইয়ম্ হয়েছে বলে চিকিৎসার জন্যে এখানে এনেছি তাঁকে আমরা। এবার আপনি এসে গেলেন যখন, দাবা খেলতে খেলতে পথ্য-টথ্যগুলো তবু বোধ হয় একটু রুচবে তাঁর।

—সব সময় তোমাকে কি বলি সিস্টার?

মুখভরা হাসি, গলার স্বরটা গাঢ়। দুই হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন সামনে উত্তরটা যেন সোজাসুজি তাদেরই দিতে হবে।

নার্সের চোখ, স্বভাবতই তীক্ষ্ণ হয়ে তাকিয়েছে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে। না, মসৃণ দু'খানি হাতে বিকৃতি কিছু নেই, কোন অসুস্থ দাগও না— ভিতরের কোন ভাঙনের প্রকাশ নেই কোথাও।

সুখী হয়ে চোখ তুলে তাকাল।

—বলি নি যা ঘটা চাই তাই তিনি ঘটান—এ ক্ষেত্রে যেমন যা ঘটেছে শুধুই আমার ভালর জন্যে! দাবাখেলার পুরোনো বন্ধুটি ফিরে এসেছে আবার। একে তুচ্ছ বলে ভাবি কি করে! ঈশ্বর ক্ষমা করুন আমায়, কিন্তু আমার তো রীতিমত কৃতজ্ঞ লাগছে তাঁর প্রতি।

সেদিন বিকেলে ফাদার অগ্রের জন্য একটা বিশেষ 'ড্রিঙ্ক' তৈরি করে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ওঁদের খেলা দেখছিল সে। বাইরে বজ্রপাতের আগে বিদ্যুতের আলো ঝলসে উঠছে বারবার, এদিকে ঘরের মধ্যে রেষারেষির উত্তেজনায় আগুন ঠিকরোচ্ছে বাতাসে। খোলা বাজারে বসে আরবরা যেমন করে খেলে, তেমনি করে খেলছেন ফাদাররা— গুটিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছেন কখনও, মাথার ওপর দু' হাত তুলে ফেলছেন কখনও বা।

ফাদার অগ্রে তিন ঘর লাফিয়ে ফাদার ভেরময়লেনের রাজার ঘরে গিয়ে বসলেন।

···কড়্‌কড়্‌ শব্দে বাজ পড়ল।

বিস্ফারিত চোখে এমিল ছুটে এল হঠাৎ।

—এ্যাম্বুল্যান্স-কল মামা লুক···হঠাৎ একটা বন্যার তোড় এসে তিনটে লোক, ডুবে যাচ্ছে···

যে হাতে রাজার সারিতে গিয়ে বসেছিলেন, সেই হাতেই বোর্ড থেকে ঘুঁটিগুলি সব তুলে নিয়ে বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিলেন ফাদার অগ্রে, সম্ভবত একজন প্রিস্ট, তোমার লাগবে সিস্টার। এমিল, আমার কনভেন্টে ফোন কর, ফাদার জোর্কে ডাক।

—করেছিলাম, তিনি নেই।

ফাদার অগ্রে খেলার সংগীটির দিকে চাইলেন এবার, তা হলে তুমি যাও।

সংগীটি বলার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছেন।

—যদি দরকার হয় আমি না হয় সাহায্যদলের সংগে একজন সাধারণ ব্রাদার পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদের পেছনে।

···নীচু কর···চাপ দাও···ছেড়ে দাও···উঁচু কর···নিজের ডেস্কের কাছে দ্রুতপদে যেতে যেতে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার পদ্ধতিটা মহড়া দিয়ে নিল সিস্টার লুক।

সিস্টার অরেলিকে বলল, মাদার ম্যাথিল্ডাকে বলে দিও, প্লীজ।

শুনে তার চোখে যে সতর্ক সংকেত ফুটল দেখেও দেখল না, সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে ভুল হ'ল তার। ভাবল ও বলতে চাইছে সতর্ক থেক।

···বিপন্ন ঐ প্রাণগুলোর কাছে সময় থাকতে গিয়ে যদি পৌঁছোতে পারে সতর্ক থাকবে কেমন করে নিজের জন্য?···চিন্তার ধারাটা এই খাতেই বয়ে গেল, একবারও বুঝল না ঐ শান্ত দু'টি চোখ ব্যাকুল সন্ত্রাসে বলছে এতদিন পরে এ কি অবিমৃষ্যকারিতা তোমার!

উঁচু-নীচু অসম রাস্তা, এ্যাম্বুল্যান্সটা ঝাঁকানি খেতে খেতে চলেছে। স্থির হয়ে বসাই শক্ত।

···'শেফার' পদ্ধতিতে রোগীকে উপুড় করে দিয়ে মুখটা নীচু করে দেবে রোগীর, তার কোমরের দু'দিকে দু'টো হাঁটু দিয়ে বসে দু'হাতে নীচের পাঁজরগুলোর পিছন দিকটার ওপর জোরে চাপ দিতে হবে।

···নীচু কর···চাপ দাও···ছেড়ে দাও···উঁচু কর···প্রতি পাঁ সেকেণ্ডে।

ফাদার ভেরময়লেন বসে আছেন, পাহাড়ের মত নিশ্চল, সুদৃঢ়। তাঁর মিসালের পত্রচিহ্নটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্যাক্রামেণ্টের অংশটায় রাখলেন।

এমিলের তোতলামির মধ্যে থেকে পুলিশ-চীফের দেওয়া খবরটা উদ্ধার করা গেছে কোনরকমে। খনি থেকে তিনটি ইতালীয় যুবক হাঁস শিকার করতে গিয়েছিল। হঠাৎ অলক্ষিতে নলখাগড়ার বনের মধ্যে দিয়ে দেওয়ালের মত উঁচু একটা বন্যার তোড় এসে উল্টে দিল তাদের ভেলা, ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাদের। লোকগুলো এসে পড়ল মাঝনদীতে বালির চড়ায়। তারই ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে এগুতে গিয়ে ভারি রবারের বুট ক্রমেই ডুবে যেতে লাগল, বালির চড়াগুলো সবই চোরাবালি। এমনি সময়ে একটি দেশীয় ছেলে শহরে ফিরছিল···

ফাদার ভেরময়লেন চোখ তুলে না তাকিয়েই বইয়ের নিশানাটা কয়েকপাতা পিছিয়ে এনেছেন, সে জানে কোথায়। অন্তিমকালে উপনীত মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর আত্মাদের জন্য প্রার্থনা আছে যেখানে।

প্রথমে ওদের দেখে মনে হচ্ছিল বালির তৈরি আবক্ষ-মূর্তি বুঝি। দু'জন নীচু হয়ে বুটগুলো খুলে ফেলতে চেয়েছিল, হাতগুলো পাতলা কাদায় মাখামাখি। সবারই মুখগুলো হাঁ করা, তীরের মানুষদের ছুড়ে দেওয়া গাছের ছোট ছোট ডালগুলো ধরার চেষ্টায় বারেবারে চেঁচিয়ে উঠছিল তারা।

হঠাৎ দেখা গেল ফাদার ভেরময়লেন নদীর ধারে কাদার ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছেন। পুলিশ-চীফ জোর করে টেনে ফেরালেন।

ঝড়ের ওপর গলা তুলে চেঁচিয়ে বললেন ওদের কাছে যাবার জন্য সব রকম উপায় পরীক্ষা করে দেখেছেন তাঁরা, নিরাপদে কোথাও পা রাখবার জায়গা পর্যন্ত নেই।

স্রোতের তোড়ে ওরা তীরমুখো হয়েছে এবার। চোরাবালির চাপে মুখগুলো সিঁদুরের মত রাঙা, এত কাছে এসে গেছে যে তীর থেকেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসের ঝাপটায় ওদের আর্তনাদ আছড়ে এসে পড়ছে তীরে।···হঠাৎ প্রচণ্ড একটা বাজের শব্দ সেই ভয়ংকর শব্দ ডুবে গেল। শুধু দেখা যাচ্ছে ওদের আতংকিত মুখগুলো···নিষ্ফল ক্ষোভে ওরা নলখাগড়ার গাছগুলো উপড়ে তীরের দিকে ছুড়ছ···ঐ যেখানে লোকগুলো বৃথাই দড়ি ছুড়ে ছুড়ে তাদের নাগাল পাবার চেষ্টা করছে, ঝড়ে দড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বারবার।···

ক্রমেই ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে কেমন, উন্মত্ত প্রয়াসে অতলের পথ ত্বরান্বিত করে আনছে আরও।···অকস্মাৎ ওদের চোখে পড়ল ফাদার ভেরময়লেন ক্রুশচিহ্ন করছেন জলের ওপর। এপাশে সরে আসবার যে আপ্রাণ চেষ্টা চলছিল এতক্ষণ, মুহূর্তে থামল সেটা···বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি প্রিস্টটির মুখে নিবদ্ধ।

···মুক্তি প্রার্থনায় বিমোহিত তিনি।

···এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া এবার অমানুষিক একটা আর্তরব বয়ে নিয়ে এল তীরে।

ফাদার ভেরময়লেনের কণ্ঠস্বর ঝড়ের ওপরে উঠেছে, ব্রোঞ্জের ঘণ্টার ধ্বনির মত গম্ভীর, উদাত্ত কণ্ঠস্বর।

কাদা শিকারীদের কাঁধ ছুঁয়েছে।

—সর্বশক্তিময় স্রষ্টার নামে, পরম পিতার নামে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাও খৃশ্চান আত্মাগণ···

জীবনে আরও একবার এই ধরণের মুখ দেখেছিল সিস্টার লুক···উন্মাদাশ্রমে, টবের ঢাকনার ফাঁক দিয়ে।

—ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাও এঞ্জেল ও আর্কেঞ্জেলের নামে, আর সেই রাজাধিরাজের নামে···

কাদা ঠেলে উঠেছে চিবুক পর্যন্ত ···চোখগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কোটর থেকে। এবার ঐ কাদা গড়িয়ে ওদের খোলা মুখে ঢুকবে, সিস্টার লুক চোখ দু'টো বন্ধ করে ফেলল—তার আগেই।

গম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে এতটুকু কম্পনও নেই। প্রার্থনাগুলো কানে বাজছে একের পর এক, শেষ নিবেদনে এসে পৌঁছেছেন ফাদার ভেরময়লেন।

—উহারা কম্পিত হইতেছে, সেজন্য উহাদের ক্ষমা করিও, উহারা ক্রন্দন করিতেছে, সেজন্য উহাদের ক্ষমা করিও তোমার ঐ মিলনতীর্থে উহাদের গ্রহণ করিতে বিমুখ হইও না।

ইস!

চারপাশে অস্ফুট আফশোষের গুঞ্জন বলে দিল মাথাগুলো অন্তর্হিত হয়ে গেছে। চোখ মেলে তাকাল সিস্টার লুক।

সামনে বালির চড়া একখানা রেশমী কাপড়ের মত বিছানো, নিটোল, মসৃণ।

এমিল পাশে দাঁড়িয়েছিল গুটিসুটি মেরে, নীচু গলায় তাকে বলল দেহগুলো না তোলা পর্যন্ত পুলিশের সংগে থাকতে। ওরা বলেছে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে।

—এ্যাম্বুল্যান্স আমি সোজা ফেরং পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সে আর ফাদার ভেরময়লেন ফিরে এলেন কনভেন্টে। দু'জনেই নির্বাক, স্তব্ধ।

উত্তরকালে যখনই মনে পড়ত ঘটনাটা চোখের সামনে ভাসত শুধু বৃষ্টিস্নাত জীবন্মৃত সেই তিনটি মুখ···নলখাগড়ার বনে বাতাসের কান্না। সেই সমস্ত সময়টা নিজে সে যে কি করেছিল তা কিন্তু একেবারে বিস্মরণ হয়ে গেছে। নিজেকে তার মনে পড়ে কনভেন্টে ফেরার পর থেকে।

প্রথমেই গেল সুপিরিয়রের কাছে প্রত্যাবর্তনের আশীর্বাদ নিতে, খবরাখবর জানাতে। বাগানটা পেরিয়ে যেতে যেতে বক্তব্যটা মোটামুটি গুছিয়ে নিল। মাদার ম্যাথিল্ডা কংগোর মৃত্যুকে সব ভয়ংকররূপেই দেখেছেন, বিস্তারিত বিবরণ কিছু জানতে চাইবেন না। সেজন্য সে কৃতজ্ঞ।

মাদার ম্যাথিল্ডার নিরুত্তাপ ভাবটাও প্রথম খেয়াল করে নি। বৃষ্টিতে-ভেজা হ্যাবিটটা দেখেও একটা সহানুভূতির কথা নয়, ফিরে এসেছে দেখে স্বস্তির হাসি নয় একটু। রিপোর্ট দাখিল করতে গিয়ে

সবে এইটুকু জানিয়েছে আজ সন্ধ্যায় হাসপাতাল মর্গে তিনটি লাশ আসবে বলে মনে হয়, মাদার ম্যাথিল্ডা হাতটা একটু তুললেন।

অদ্ভুত বিকৃত গলায় বললেন, ঘটনাটা আমি জানি সিস্টার লুক। ঘণ্টাখানেক ধরে টেলিফোনে পুলিশের সংগে, ইটালীয় কনসালের সংগে, এমন কি খবরের কাগজের সংগে কথা হয়েছে আমার।

মাদার ম্যাথিল্ডার গম্ভীর থমথমে মুখ সদ্য-সমাপ্ত বিয়োগান্ত নাটকটার ওপর যবনিকা টেনে দিল।

—কাজেই ও কথা থাক, তুমি শুধু তোমার কাজের কৈফিয়ৎ দাও—আমার কাছে অনুমতি না নিয়ে কেন তুমি কনভেন্টের বাইরে গিয়েছিল?

—কিন্তু মাই মাদার, সিস্টার অরেলির ওপর তো আপনায় বলে দেবার ভার দিয়ে গিয়েছিলাম আমি।

···ভার দিয়ে গিয়েছিলাম! কথাটা বলে প্রথম চৈতন্য ফিরল তার।···এ কি করেছে সে!

ধরে নিয়েছিল যাবার অনুমতি পেয়েই গেছে, নিয়মানুগ অনুমোদনের অপেক্ষা না করে চলে গেছে তাড়াহুড়ো করে। কিন্তু এও না বলে যাওয়ারই সমতুল্য, কাজেই এটা কোন অজুহাত নয়। কোন নান কোন কারণেই তার সুপিরিয়রের অনুমতি ছাড়া কনভেন্টের বাইরে যাবে না, এটাই রীতি। চারপাশে সারা সহরে যদি আগুন লেগে সব ধ্বংস হয়ে যায় কি বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে যায়, হাজার লোক যদি রাস্তায় পড়ে সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করে···না, তবুও না। তুমি কখনও তোমার কনভেন্টের চৌহদ্দি পেরোবে না সুপিরিয়র যতক্ষণ না যাত্রার আশীর্বাদ দিয়ে বলেন, যাও···।

···বাধ্যতার অভাব, হে ঈশ্বর, এই এতদিন পরেও···

মাদার ম্যাথিল্ডার বলায় ছেদ পড়ল না, ওর বিস্মিত অভিব্যক্তিটা যেন শোনেন নি।

—শুধু যে অনুমতি না নিয়েই কনভেন্টের বাইরে গেছ তুমি তাই নয়, তার ওপর—এবং তাতেই আরও বেশি দুঃখ পাচ্ছি আমি—বদান্যতারও এত অভাব তোমার মধ্যে!

···বদান্যতা! উদ্ধারের এই একটাই পথ চোখে পড়েছিল, কথাটা তারই মূলে ছুরির ফলার মত এসে বিঁধল।

—আমি হয় তো এর দায়িত্ব সিস্টার অরেলির ওপর দিতাম, কিংবা আর কারো ওপর, তোমার অধীনে যারা কাজ করে—কত সপ্তাহ তারা বাইরে যায় নি। তুমি সিস্টার লুক, ঝুঁকি আর উত্তেজনার গন্ধে সবাইকে ফেলে এগিয়ে গেছ একা, একবারও সিস্টারদের কথা ভাব নি। একবারও ভাব নি নতুন কোন অভিজ্ঞতার জন্যে তাদের কতটা বাসনা হ'তে পারে—তা হ্যাঁ···এখানে যেমন ঘটে গেল সে রকম দুঃখের ঘটনার ক্ষেত্রেও কথাটা অস্বীকার করা যায় না। একবারও ভেবে দেখ নি যে কোন সিস্টার এই ঘটনার ছোট খবরটুকু কেটে নিয়ে পারিবারিক স্ক্র্যাপবুকে রাখবার জন্যে বাড়িতে পাঠাতে কতটা আনন্দ পেত। কাগজের অফিস থেকে এর মধ্যেই তোমার নামটার জন্যে আমায় ফোন করেছিল।···বুঝতে পারছি প্রথমে জীবন রক্ষা করতে ছুটে চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল তোমার, কিন্তু বুঝতে পারছি না সেই প্রথম মুহূর্তের চিন্তাটাই এত বড় হ'ল কি করে তোমার কাছে, পরে সব দিকগুলো ভেবে তুমি সংযত হলে না কেন!

বুঝতে পারছে না এমন নয় যে তার মনের ভালমন্দ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন না হলে সুপিরিয়র এমন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলতে পারতেন না। তবুও প্রতিটি কথা ছুরিকাঘাতের বেদনার মত লাগছে। সুপিরিয়র থেমেছেন, তবু চোখ তুলে তাকাতে পারে নি। চোখের জলে নিজের জন্য করুণা ভিক্ষা করে নেবে না সে কিছুতেই। চোখ তুলে তাকালে চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতেও পারবে না কিন্তু।

তথাপি কি ছিল ওর মুখে, সুপিরিয়রের তুহিন-শীতল কণ্ঠস্বর একটু তরল হ'ল।

—কাজের মধ্যে উদারতা দেখানো সহজ অনেক, সবাই সাক্ষী থাকে, দেখে, মুগ্ধ হয়। সাংসারিক মানুষও প্রশংসার লোভে, বিশিষ্টতার লোভে উদার হতে পারে সময় সময়। সবার অলক্ষ্যে নীরবে যে চিন্তা ঔদার্যের মন্ত্র দেয়—যার জোরে সব কাজে অন্যদের এগিয়ে দিয়ে সব শেষে নিজে ঠাঁই নেবার মত শক্তি আসে মনে···আজ তারই অভাব ঘটেছে তোমার মধ্যে।

সেখান থেকে সোজা চ্যাপেলে চলে এল। নিজেকে শান্ত করে নিতে হবে। হাসপাতালে ফিরবে যখন, দেখে মনেও হবে না কোন কিছু ঘটেছিল। চোখের জল শুকিয়ে গেছে, শুধু চাবুক-খাওয়া চৈতন্যে নিজের পতনের রূপটা ঐ ক্ষমাহীন চোরাবালির মত নীচের দিকে টানছে তাকে।

বিষাক্ত একটা মাকড়শা। কালো, রোমশ। বেদীর ধাপে গুটিসুটি মেরে রয়েছে।

সিস্টার লুক একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওটার দিকে।

···লাফিয়ে পড়···লাফিয়ে পড়···আমি নড়বোও না···

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে মনটা।

···কেন আবার এ অবমাননার মধ্যে টেনে আনলে তুমি আমায়? মনে করেছিলাম পরীক্ষা তোমার শেষ হয়েছে বুঝি। ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত তোমাকে খুশি করতে পেরেছি এবার, এটা তারই সংকেত।··· কেন সব দিক বিবেচনা করে দেখলাম না আমি? কেন তুমি দয়া করলে না আমায়? ··কেন? কেন?··তুমি তো জানতে আমার মন, তুমিই তো বিশ্বাস করিয়েছিলে স্বার্থের প্রলোভনে ছুটছি না আমি··· তবু কেন এমন বেদনা দিলে আমায়··কেন মাদার ম্যাথিল্ডার মুখে ঐ কাঠিন্যের আবরণ আমায় দেখতে হ'ল···

মনে হচ্ছে মাকড়শাটা চেয়ে চেয়ে দেখছে বুঝি তাকে।

···এর চেয়ে ওটা আমার ওপর লাফিয়ে পড়ুক না, কেন তুমি করাচ্ছ না তা? নাকি আমাদের মত অযোগ্যদের নিয়ে অন্য উদ্দেশ্য আছে তোমার।··হে প্রভু, তাঁকে আমি অপমান করেছি, এ দুঃখ রাখবার আমার জায়গা নেই।

নির্মেঘ আকাশে অপরাহ্নের সূর্য দীপ্যমান। চ্যাপেল থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে সিস্টার লুক হাসপাতালের দিকে এগুলো।

লগ্‌বুকের পাতায় সিস্টার অরেলির ছাপা হরফের মত সুন্দর হাতের লেখাটা জ্বলজ্বল করছে, তার অনুপস্থিতিতে যা কিছু ঘটেছে সব নোট করা। পড়তে গিয়ে খবরের কাগজের সংবাদটার কথা মনে পড়ে গেল।···তীব্র একটা যন্ত্রণার অনুভূতি ঠেলে উঠতে চাইছে। মিশনের কোন নানের উল্লেখ করতে হ'লে সন্ন্যাস-জীবনের নামের সংগে পূর্বজীবনের পদবীটাও উল্লেখ করা হয়···

সিস্টার লুক ভ্যানডিমালের পরিবর্তে ওটা সিস্টার অরেলি ডিলেটাওয়ার হতে পারত। কল্পনায় দেখছে ডিলেটাওয়ারদের বাড়িতে স্ক্র্যাপবুকখানা বার করা হয়েছে, কাটাংগার একটা কাগজের কোন একটা স্তম্ভের ক'ইঞ্চির একটা খবর কেটে নিয়ে আটকে রাখতে হবে তাতে। তার মূল্য অনেক, নিঃসংগ বাবা-মাকে নতুন আশ্বাস দেবে ওটা···ঈশ্বরে সমর্পিতা কন্যাটি তাঁদের লোক-চক্ষুর অন্তরালে চিরতরে হারিয়ে যায় নি।

চিন্তাটা ক্রমেই পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে মনটাকে, জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সিস্টার অরেলির দিকে তাকাল।

—সিস্টার অরেলি, মেটারনিটিতে ফিরে যাবার পথে ইলুংগাকে একটু বলে দেবে চ্যাপেলে মস্ত বড় একটা বিষাক্ত মাকড়শা রয়েছে। সিস্টাররা কেউ কেউ ভয় পেতে পারেন দেখে।

ডিউটিতে ফিরল, সই করল লগে।

বলল, কেউ যদি খোঁজে আমায়; ল্যাবে আছি।

ল্যাবোরেটোরিটা উত্তপ্ত হয়ে আছে খুব, নির্জনও। ডাক্তার চলে গেছেন আজকের মত। ফাদার ভেরময়লেনের ল্যাবটেস্টের শ্লাইডগুলো নিয়ে বসে মাইক্রোস্কোপ হাই পাওয়ারে সেট করল।

হাত দু'টো কাজ করে চলেছে, মনের সংগে তার যোগ কমই। মনটা বারে বারে সারা দিনটার ওপর দিয়ে ঘুরে আসছে। নিজের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের খতিয়ান দেখছে। বিশ্লেষণ করে করে দেখছে, বাধ্যতার ব্রত থেকে তার আজকের এই স্খলনটাকে, দেখছে মনের কোন্ অন্ধকার কোণ এই বিচ্যুতির প্ররোচনা যোগাল !···অথচ এই তিন বছরে দিনের পর দিন কতবার মাদার ম্যাথিল্ডার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, আমি কি এটা করতে পারি। কনভেণ্ট থেকে বেরোতে হলেই জিজ্ঞাসা করেছে, এ্যাম্বুল্যান্স কল এলেও ব্যতিক্রম ঘটে নি। তিন বছর এখানে, তার আগে আরও পাঁচ বছর।

···আমি কি পারি মাই মাদার ?···

এ সপ্তাহে চার নম্বর রুমাল একখানা ব্যবহার করতে পারি মাই মাদার ? তিনটে রুমালে কাজ চালাতে পারি নি।

দু'টো মিলের মধ্যে এক গেলাস জল খেতে পারি মাই মাদার ?

দেশীয় হাসপাতালে ঠাণ্ডা করা ফল আজও কি নিতে পারি মাই মাদার ?

মাই মাদার, এই মেডিক্যাল জার্নালখানা ডক্টর দিয়েছেন পড়তে, পড়ব তো ?

শুধুমাত্র এই বাধ্যতার নামে কতবার এমনি ছোটখাট অনুমতি প্রার্থনা করেছে তার ইয়ত্তা নেই ! চট করে একফাঁকে সরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসার ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও কোনদিন জানতে দেয় নি ডাক্তারকে। জানে জগতের চোখে এটা সম্পূর্ণ অর্থহীন, হয় তো দাসীসুলভ।···কিন্তু সে কথা যাক, সে নিজে কতবার জিজ্ঞাসা করেছে ? এতবার এবং এত ঘন ঘন যে এর সংগে সে নিজের মনের দাম্ভিক দিকটার একটা বিরোধ বাধা স্বাভাবিক ছিল তাও সে ভুলেছে নিজেই।

শ্লাইডগুলো পরিষ্কার করে রাখল।

রাত্রে একবার ঘুম থেকে উঠে মঁসিয়ে ভাইডেবটকে দেখতে যেতে পারি মাই মাদার ? আজকের রাত বোধ হয় আর ওঁর কাটবে না।

বলতে ভুলে গিয়ে সেই যে অপরাধটা করেছিলাম, কুলপায় শুনে আপনি যে প্রায়শ্চিত্ত ঠিক করে দিয়েছেন তার বাইরে সেজন্যে একবারের খাওয়া বাদ দিতে পারি ?

ভাবনাগুলো স্বগতোক্তির মতো লাগছে। সংসারের সীমানায় দাঁড়িয়ে নানের অন্তরটা পড়ার মত।···একটা শুকনো শ্লাইড তুলে নিয়েছে।···মনটা বিশ্লেষণমুখী।···ফাদার ভেরময়লেনের মত আত্মারা বাধ্যতার ধর্ম হতে একবারইমাত্র চ্যুত হতে পারে, তা সে চ্যুতি যত বড়ই হোক। আর তারপর বহুতর ক্ষুদ্র বিচ্যুতির কুটিল পথ ছেড়ে চিরতরে সরল একমুখী প্রায়শ্চিত্তের পথ বেছে নেয়।

প্রথম শ্লাইডখানা ঢুকিয়ে দিয়েছে মাইক্রোস্কোপের নীচে। স্থূল পদার্থটা ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘের মত, দেখতে না দেখতে বিভক্ত হয়ে গেল। একটা খুব সরু কি এঁকেবেঁকে চলে গেল—মিউকাস মেনব্রেনের এই একটাই অলফ্যাক্টরী সেল।

কিছু না, কিছু না। নেগেটিভ।

শ্লাইডটায় টিক দিয়ে সরিয়ে রাখল।

মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কাজ করতে করতে সব সময়ই যেমন হয়, মনটা আপনিই শান্ত হয়ে আসছে। এঞ্জেলাসের আগে আরও খান-কয়েক শ্লাইড দেখে নেবার সময় পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় শ্লাইডটা লাগিয়ে মাথাটা নীচু করে আই-পীসের ওপর ঝুঁকল।···গভীর সমুদ্রের ছবি যেন—নলাকার মাইকোব্যাক্টেরিয়াম কাঠের লাঠির মত ভাসছে ওপরে···লেপ্রসি ব্যাসিলাসের দু' পাশে সমান ব্যবধানে কালো দাগধরা কণিকাগুলো ছড়ানো !

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। হাতটা কাঁপছে। জোর করে স্থির রাখতে চেষ্টা করেছে, এ্যাডজাস্টমেণ্ট স্ক্রুটা ঠিকমত ঘোরাতে স্থির সূক্ষ্মতা চাই।

···আমার ভুল হয়ে থাকতে পারে···ভুলই হয়েছে আমার···

আরও সূক্ষ্ম ফোকাস ঘুরিয়ে পরীক্ষাধীন বীজকোষটাকে তার নীচে আনল—কুষ্ঠ বীজাণুর সনাক্তকরণ উপাদানটা ধরা পড়বে।

পড়ল। আরও তিনটে দেখা যাচ্ছে।

মাইক্রোস্কোপের ওপর হাতটা বুঝি জমে গেছে তার, আপনার অজান্তেই হাতটা ঘুরছে এ্যাডজাস্টমেণ্ট স্ক্রুটার ওপর···নিষ্ঠুর ভবিতব্যের মতন ঐ ভীষণ পদার্থগুলো একবার করে আসছে ফোকাসের মধ্যে, একবার করে বাইরে চলে যাচ্ছে।

ফিল্মের নীচে তিনটে, ওপরে একটা।

···হে প্রভু, কোথায় তোমার দৈবানুগ্রহ ? আজই নদীতীরে যে মানুষটি তোমার স্তব করছিলেন, প্রতিদানে এই কি তাঁর প্রাপ্য ছিল ! ···আত্মপক্ষ কি করে সমর্থন করবে তুমি ? এ কি ন্যায্য বিচার !

মনে হ'ল ফাদার ভেরময়লেন এসে দাঁড়িয়েছেন ল্যাবোরেটোরিতেই তার পাশে, গলাটা এতই স্পষ্ট।

বলছেন, আমাদের ভালোর জন্য আর তাঁর অধিকতর গৌরবের জন্য যা ঘটা চাই তাই ঘটান তিনি। জানে টেস্টের ফলাফল যখন জানাবে তাঁকে ঠিক এই কথাই বলবেন তিনি। পরিপূর্ণ বিশ্বাসে বলবেন, যেমন বলেন সর্বদা—নির্ভরতা চিড় খাবে না কোথাও।

চোখ দু'টো জ্বালা করে জল ভরে এল। ফিল্ডের ওপর ঐ মারাত্মক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজাণুগুলো ঝাপসা লাগছে।

এঞ্জেলাসের শান্ত আহ্বান এসে পৌঁছোলো। ঘণ্টা বাজছে। [ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

শিবানী যে নিবিষ্টতার সঙ্গে কাগজপত্র গুছিয়ে বসে কাজে মন দিয়েছিল সেই নিবিষ্টতা ছিঁড়ে দিয়ে গেল মিঃ বোস। মিঃ বোস চলে গেলেও আর মন দিতে পারলে না হাতের কাজে। কলমের বন্ধ মুখটা কলমের ভেতরই ঘোরাতে ঘোরাতে নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে লাগল শিবানী।

মিস জেনি কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বারকয় লক্ষ্য করল তাকে। তারপর বাঁ হাতের তালুর উপর কফির পেয়ালাটা প্রায় ঠোঁট ছোঁয়াবার ভঙ্গিতে মুখের কাছে ধরে রেখেই বলল, আচ্ছা মিসেস সেন—বলেই নেমে গেল মিস জেনি।

শিবানী কলমের মুখ ঘোরানো বন্ধ করে জেনির দিকে তাকালো।

মিস জেনি তার ইংরেজী উচ্চারণে টেনে টেনে বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা কোরবো মিসেস সেন তোমায়?

করো।

কিছু মনে কোরবে না?

না।

তবু যেন একটু ইতস্তত করতে লাগল জেনি কথাটা বলার আগে। কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করাটা ওদের সমাজে একেবারেই ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

'প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রীতি রাখো, কিন্তু তার বাড়ির বেড়া ডিঙিও না'—ইংরেজ দেশের প্রবাদ।

বোধ হয় সেইজন্যই একটি বাঙালী সঙ্গিনী হলে যেভাবে কথাটা মনে হওয়া মাত্র ঝপ করে বলে ফেলত, মিস জেনি তা পারলে না। দ্বিধা করলো একটু। তারপর দ্বিধাটা ঝেড়ে ফেলে বলল, মিসেস সেন, মিঃ বোসকে যে পছন্দ করো না তুমি—এ তো সত্য?

না।

সত্য নয় এ?

না সত্য নয়।

মিঃ বোসকে পছন্দ করো তুমি?

তাও করি না।

পছন্দ করো না অপছন্দও করো না।

না।

তবে করো কি?

কিছু যে একটা করতেই হবে তার মানে কি?

মিস জেনি চুপ করে রইল।

চুপ করে রইল শিবানীও।

ঠাণ্ডা কফিটা এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে জেনি বলল, না, মিসেস সেন, তুমি যাই বলো—আমি নিশ্চয় জানি যে মিঃ বোসকে তোমার ভালো লাগে না।

মিস জেনি, তুমি কিন্তু শব্দ পাল্টে ফেললে।

কি রোকম?

পছন্দ-অপছন্দ কথা দু'টো ভাসমান শব্দ। ও কথার উত্তর ভাসা কথায় দেওয়া চলে। কিন্তু ভালো লাগা কথাটা অনেক গভীরের। ওখানে ভাসা কথায় উত্তর চলে না। তুমি যদি পছন্দ করা না-করার কথা জিজ্ঞাসা না করে ভালো লাগা না-লাগার কথা জিজ্ঞাসা করতে তবে ঐ উত্তর আমি দিতাম না।

তবে কি উত্তর দিতে? আমি যদি জিজ্ঞাসা করতাম মিঃ বোসকে যে তোমার ভালো লাগে না, এ তো সত্য—তবে কি বলতে মিসেস সেন?

বলতাম সত্য।

ডোণ্ট মাইণ্ড—কিছু মনে করো না মিসেস সেন। তবে তুমি খেলছো কেন মিঃ বোসকে নিয়ে?

খেলছি!

খেলছো না?

একেবারেই না মিস জেনি—একেবারেই না। না-এর ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে-দোলাতে শিবানী বলল, একেবারেই খেলছি নে আমি। খেলাটাই কি জীবনে কম আনন্দের স্থান, না কি—যদি সত্যিকারের

খেলার সঙ্গী মেলে? কিন্তু সত্যিকারের জীবনসঙ্গী মেলার মত সত্যিকারের খেলার সঙ্গী মেলাও দুর্লভ। ও মেলে না। আর তাই যদি না মিলল তবে খেলে আনন্দ কি? ব্রেটমেন কি বেট ধরবেন তোমায় আমায় প্রতিপক্ষ দেখলে? এ খেলা নয়। এ কেবল যখন চতুর্দিক গড়ের মাঠ ঠেকে তখন যদি কেউ ডেকে বলে, চলো, একটু গড়ের মাঠটা ঘুরে আসি—তখন 'চলো' বলে উঠে পড়া। এখানে খেলা নেই। পছন্দ নেই, অপছন্দও নেই। কিছুই নেই। থাকে যদি তো আছে একটু বেড়ানো। তা-ও বড় করুণ।

'মিসেস' কথাটাই বলে দিচ্ছে শিবানী বিবাহিতা। তারপর শিবানী স্বামীর কথাও বলেছে। তবে কেন শিবানীর চারদিক শূন্য— কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। বেড়া ডিঙিয়েছে কিন্তু বেডরুম ডিঙোতে পারে না মিস জেনি।

মিস জেনি গালে হাত রেখে খুব মনোযোগ দিয়ে শিবানীর কথা শুনছিল।

শিবানী একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, কি বললাম বুঝলে?

জেনি মাথা নেড়ে জানাল সে বুঝেছে।

কিন্তু শিবানীর সন্দেহ গেল না। এতগুলি বাংলা কথা—যতই স্পষ্ট উচ্চারণে ধীরে ধীরে সে বলে যাক, জেনির পক্ষে বোঝা সহজ নয়। বলল, বলত কি বলেছি?

মিস জেনি ইংরেজিতে শিবানীর কথাগুলি গড়গড় করে বলে গেল।

শিবানী চেয়ার থেকে উঠে একটু ঝুঁকে জেনির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আঃ! চমৎকার—চমৎকার!

জেনি হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করল শিবানীর সঙ্গে।

শিবানী চেয়ারে পিঠ ছেড়ে বসে বলল, আমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছি মিস জেনি। কিন্তু আমার কাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও যেন বাংলা বলা ছেড়ে দিও না—বুঝলে?

মিস জেনির কানে শিবানীর পরের কথাগুলি ঢুকলই না। সে একরকম আঁতকে উঠে বলল, কাজ ছেড়ে দেবে তুমি মিসেস সেন! কেনো?

ভালো লাগে না।

না, না তা হবে না—মিস জেনি ব্যাকুলকণ্ঠে বলল। কিসের জোন্য ছাড়বে? মিঃ বোসের জোন্য? লোকটা উত্যক্ত কোরছে? আমি তাকে ঠিক করে দেবে।

শিবানী বলল, না জেনি সেজন্য নয়। আমার চাকরী করতে ভালো লাগে না।

বিষণ্ণমুখে জেনি বলল, আমি জানে তুমি ধনী-লোকের স্ত্রী আছো।

হ্যাঁ, সেইজন্যই তো চাকরী করা।

না, আমি বুঝতে পারছে সে জোন্যই তুমি কাজ কোরবে না। দরকার না থাকলে কোরবে কেন। এখনই ছেড়ে দেবে?

না। কবে ছাড়ব ঠিক বলতে পারছি নে।

আমার খুব খারাপ লাগবে তুমি চলে গেলে।

আমারও তোমার কথা খুব মনে হবে—বলেই হেসে শিবানী বলল, এমন দুঃখু-দুঃখু মুখ করে আমরা চিরবিদায়ের সুরে কথা বলছি কেন মিস জেনি বল তো? তুমি আমার ছাত্রী। তুমি যাতে বাংলা বলা ছেড়ে না দাও, ভুলে না যাও—এ যে আমায় দেখতেই হবে। আচ্ছা, মিস জেনি বলত আমার বাড়িতে যদি আমি একটা বাংলার ক্লাশ খুলি তবে কেমন হয়? তুমি ছাত্রী যোগাড় করে আনতে পারবে না?

উৎসাহে লাফিয়ে উঠল মিস জেনি—সে বেশ হবে। অনেক নিয়ে আসব আমি ছাত্রী।

অত উৎসাহ বোধ করো না মিস জেনি, ছাত্রী যোগাড় কাজটা সহজ হবে না। তাদের আসবার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে আমাদের। কি করে ওদের উৎসাহিত করা যায় বল তো? যারা নিয়মিত ক্লাশ করবে তাদের ভালো ভালো শাড়ি উপহার দেব আমরা—কেমন হয়?

মিস জেনি হাসিমুখে বলল, শাড়ি! ওঃ, সে বড় সুন্দর উপহার —লোভনীয় উপহার হবে। দেখবে দলে দলে ছাত্রী আসবে তোমার কাছে। আমি তো একদিনও গর-হাজির হোব না। রাঙানো নখে বব্‌চুলের ভেতর হাত চালাতে-চালাতে বলল, কিন্তু এই বব্‌চুলে শাড়ি ভালো লাগে না। খোঁপা করব তোমাদের মতো চুল রেখে! তোমাদের শাড়ি আর খোঁপা দু'টোই ভারি সুন্দর জিনিস মিসেস সেন।

তুমি যেদিন মিস থেকে মিসেস হবে সেদিন তোমাকে খোঁপা বেঁধে বেনারসী পরিয়ে দেবো আমি—

খুশিতে ঝলমল করে উঠল মিস জেনি। বলল, তোমাদের কনে-পোষাক সত্যি বড় সুন্দর। আমিও বিয়ের সময় তোমাদের পোষাক পরব। তুমি করে দেবে—ঠিক?

ঠিক। শিবানী কলম খুলে কাগজপত্র কাছে টেনে আবার কাজে বসবার যোগাড় করতে লাগল।

মিস জেনি টাইপ মেসিনের ভেতর কাগজ ঢোকাতে-ঢোকাতে বলল, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে মিসেস সেন তুমি আর অফিসে আসবে না।

না মিস জেনি—আরো কিছুদিন আমি কাজ করব।

অফিস থেকে ফিরে বেশ তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো শিবানী।

শিবানী এখন নিঃসঙ্কোচে গিয়ে সোজা ইন্দ্রনাথের ঘরে ঢুকে পড়ে। তার বিছানায় শুয়ে পড়ে অনর্গল কথা বলে যায়। অফিস, অফিসার, মিঃ বোস, মিস জেনির কথা থেকে দরোয়ানটার বৌর অসুখ, বেয়ারাটা বোকা ওর দেশের জমি ওর ভাই ঠকিয়ে নিয়েছে, কেরাণী সুধীরবাবুর শালীর গামের মাস্টারের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার কথা, কিছু বাদ থাকে না।

উড়বার মুখেই যেমন চড়ুই পাখিগুলি কেবল এ-ডালে, ও-ডালে, সে-ডালে উড়ে উড়ে বেড়ায় শিবানীর কথাগুলিও যেন তেমনি মনের সুখে কেবল কথার এ-ডালে, ও-ডালে, সে-ডালে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ইন্দ্রনাথ অভিনিবেশ সহকারে কখনো সিগারেট টানতে টানতে, কখনো ড্রিঙ্কের গেলাসে শান্ত চুমুক দিতে দিতে শুনে চলে। হঠাৎ মাঝপথে
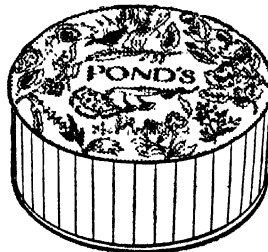
হয় তো শিবানী হেসে উঠে বলে, কেমন সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেছি আমরা! তাই না?

ইন্দ্রনাথ বলেছে, তোমার কি এতদিন আমাদের সম্পর্কটাকে মিথ্যা মনে হয়েছে?

একেবারে। ইন্দ্রনাথের মাথার লম্বা লম্বা চুল হাতের আঙুলে জড়াতে জড়াতে শিবানী বলেছে।

তখন ইন্দ্রনাথকে যেন কিছু আনমনা দেখিয়েছে। আবার বলেছে যে, একেবারেই মিথ্যা মনে হয়েছে তখন আমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটাকে তোমার?

হ্যাঁ, একেবারেই মিথ্যা মনে হয়েছে। শিবানীর এই জবাবের পর সূর্যের উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া একখণ্ড কালো মেঘের মতো একটা মেঘের ছায়া যে ইন্দ্রনাথের চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেছে তা শিবানী দেখে নি বা দেখলেও না দেখার ভাণ করেছে। ইন্দ্রনাথের এই পরিবর্তনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় কি ওর মনেই নেই।

ইন্দ্রনাথ বলেছে, আমার ত্রুটি ঘটতে পারে। তখন আবার ফের তোমার আমাদের সম্পর্কটা মিথ্যা মনে হবে।

হাওয়ার শুকনো পাতা ঝরাবার মতো ঘর ভরে কথা ছড়িয়ে দিয়েছিল সেদিন শিবানী। বলেছিল, বাঃ, যা-তা বললে সম্পর্ক যা-তা হয়ে যাবে না? চাল-চলন ব্যবহার যত শোভন হবে ততই না সম্পর্ক সুন্দর হবে। মা-বাবা, ভাই-বোনের যে রক্তের সম্পর্ক তাই মিথ্যে হয়ে যায় যদি ব্যবহার না জানে, আর এতো পাতানো সম্পর্ক। যাবে না মিথ্যা হয়ে তুমিই বলো? রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেকে কি লিখেছিলেন জানো? লিখেছিলেন, স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারেরও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে তা জানতে হবে তোমাকে। জানতে হবে স্ত্রীর জীবনযাত্রার বিচিত্র খাদ্য স্বামীকেই যোগাতে হয়। জানতে হবে, স্বামীর ইচ্ছা বা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনবোধের সমাপ্তিতেই স্ত্রীর ইচ্ছা বা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনবোধের সমাপ্তি ঘটে না। তার মন বলে একটা নিজস্ব মন আছে। সে মনকে পাওয়া বা হারানোর প্রশ্ন আছে—

তোমার মুখস্থ!

কোথায় মুখস্থ। একি মুখস্থ বললাম। যেমন যেমন মনে এলো বলে গেলাম। বেশিটাই ভুলে গেছি। আচ্ছা আমি রবীন্দ্রনাথের চিঠিটা পড়ে শোনাব'খন। দেখো কি অপূর্ব চিঠি। জীবনটা সুন্দর করে তোলা যে একটা মস্ত সাধনার ব্যাপার—যেন সেই সাধনার বাণী ঐগুলি।

বাণী মানুষের মনে স্থায়ী কাজ করে বলে তোমার মনে হয়?

ইন্দ্রনাথের চোখে চোখ রেখেছিল শিবানী। আস্তে বলেছিল, হয়।

আমার হয় না। ইন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গে বলেছিল।

পাল্টা প্রশ্ন করেছিল শিবানী, বীজ থেকে গাছ হয়?

প্রশ্নটা ধরে উঠতে না পেরে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, বুঝতে পারলাম না প্রশ্নটা।

সোজা তো। বুঝতে না পারার কি আছে। বীজ থেকে গাছ হয় কি না বল না।

হয়।

হলো না। এক কথায় ওভাবে বীজ থেকে গাছ হয় বলা চলে না। মাটি সরেস না হলে বীজ থেকে গাছও গজায় না, ফলও মেলে না। মনীষীদের বাণীও সেই রকম। যে ক্ষেত্রে পড়ে সে ক্ষেত্রটির ওপর নির্ভর করে—কাজ হওয়া, ফল মেলা। কাজেই যদি না আসত তবে মনীষীদের বাণী আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবার জিনিস হতো।

আমার জমিটা কি তোমার তৈরি জমি মনে হচ্ছে!

দুষ্টু চোখে মিটি মিটি হেসেছিল শিবানী। বলেছিল, জমি সব সময় তৈরি না-ও পাওয়া যেতে পারে। অনেক সময় তৈরি করে নিতেও হয়।

শিবানী জানে না ইন্দ্রনাথ সেদিন মনে মনে বলেছিল কি না যে, তাই নাও শিবানী। কিন্তু হঠাৎ আদরে আদরে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ শিবানীকে।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে আজ শিবানী ইন্দ্রনাথের ঘরে সোজা ঢুকে গেল না। গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি নেই। তার মানে ইন্দ্রনাথ এখনও ফেরে নি। মিঃ বোস এসে যে ওর কাজের মনোযোগটা নষ্ট করে দিয়েছিল, তারপর আর শিবানী কাজ করতে পারে নি। গোটা'ক'য় চিঠির জবাব লিখে মিস জেনির হাতে দিয়ে পাঁচটার আগেই চলে এসেছে।

স্নান করল শিবানী গুনগুন সুরে গান করতে করতে। প্রসাধন করল বারান্দায় বসে পিঠে চুলের বোঝা ছড়িয়ে কাচ্চির সঙ্গে গল্প করতে করতে। তারপর একটা বই নিয়ে এসে বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে বলল, দে কাচ্চি আর এককাপ চা দে। আর আলোটা জ্বেলে দিয়ে যা।

কাচ্চি আলোর সুইচে টিপ দিল। নিয়ন আলো বার দুই দপ দপ করে জ্বলে উঠল। শিবানী বই মেলে বসল আর কাচ্চি গেল চা আনতে।

কয়েক পাতা পড়ে চোখ তুলে দূরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল শিবানী। রাস্তার বাতিগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। এবার সন্ধ্যা হলো। হাতের বইটা রেখে উঠে শিবানী গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়ালো। ইন্দ্রনাথ এলে আজও তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে। ললিতাদের বাড়ি থেকে দেরি করে এলে প্রতীক্ষারত ইন্দ্রনাথ সেদিন যেভাবে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল আর ওর মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মতো বড় দেওয়া আর কিছু নেই।

কাচ্চি চা এনে দিল।

এতক্ষণে তুই চা নিয়ে এলি!

যেন কেউ শুনে ফেলবে এমনি চুপি চুপি গলায় কাচ্চি বলল, নতুন ম্যানেজারবাবু কোনদিনও চা'র সঙ্গে কিছু খান না। দিলেও ফিরিয়ে দেন। আজ বলে পাঠিয়েছেন কিছু খাবার পাঠাতে। আবদুল বলল, দুপুরে নাকি খাওয়া হয় নি ম্যানেজারবাবুর।

কেন?

তা বলতে পারব না। কিন্তু তোমার বাড়িতে মা কেবল কেক-পেটি, বিস্কুট-রুটি—ও সবে কি ভাতের ক্ষিধে মেটে! তোমাদের বাবুর্চি যত রান্নাই জানুক লুচি ভাজতে জানে না। দিলাম আমি চট করে ক'খানা লুচি ভেজে। তোমাকে এনে দি মা, গরম দু'খানা?

গরম লুচি যদিও বাসি লুচির মতো লাভলি নয়, তা—নিয়ে আয় দু'খানা।

লাভলি শব্দটার অর্থ না বুঝলেও ওটা যে প্রশংসাসূচক শব্দ এটা জানে কাচ্চি। বলল, তোমার যা—কথা মা। বাসি লুচি গরম লুচির চাইতে ভালো এমন কথা শুনি নি।

তুই কি করে শুনবি? রমলাকে চিনিস তুই? তার কথা শুনেছিস তুই?

রমলা গরম লুচির চাইতে বাসি লুচিকে ভালো বলে? এমন মেয়ে তো দেখি নি বাবু।

তুই দেখবি কি করে। এ মেয়ে তো ভগবানের সৃষ্টি নয়। সাহিত্যিকের সৃষ্টি। তাকে দেখতে হলে পড়তে-জানতে লাগে—তা সাহিত্যের ভালো লাগা আর বাস্তবের ভালো লাগা সব সময় এক নাও হতে পারে। তাই গরম লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগে নিয়ে আয়।

কাচ্চি চলে গেল।

শিবানী চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে ফের গিয়ে চেয়ারে বসল। মনের ভেতরে একটা চঞ্চলতা যেন হঠাৎ আসা-যাওয়া লাগিয়ে দিয়েছিল। লক্ষণটা ভালো নয়। ইন্দ্রনাথের এবার এসে যাওয়া উচিত। এতটা দেরি এর ভেতর আর সে করে নি।

মেমসাব—আবদুল এসে সেলাম দিয়ে জানাল, ম্যানেজার সাহেব বললেন সাহেব খবর দিয়েছেন একটু দেরি হতে পারে আসতে।

যা বোঝবার বোঝা হয়ে গেল শিবানীর। কিন্তু এই মুহূর্তে যে ভেতরটা ওর জ্বলে উঠল তা—আর কিছুর জন্য নয়, ইন্দ্রনাথের সাধারণ ভদ্রতাটুকুর অভাবে। ম্যানেজারের মুখে খবর পাঠানো! আজ তার মাথায় ফের এসে শয়তান চেপেছে। তাই সাহস হয় নি চিঠি লিখবার। নিজেকে সংযত করে জিজ্ঞাসা করল, ম্যানেজার কোথায়।

আবদুল জানাল, হলঘরে চা খাচ্ছেন।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আবদুল চলে গেল।

শিবানী যে কিছু ভাবতে লাগল তা নয়। চুপচাপ শুধু বসে রইল। একবার কেবল তার মনে হলো কাচ্চি নিশ্চয়ই আবদুলের কথা শুনেছে। নইলে গরম লুচি নিয়ে আর এলো না কেন। প্রথমে ভেবেছিল ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাবে। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে নিজেই নীচে নেবে গেল সে।

অরুণ তখন সবেমাত্র প্লেট কাছে টেনে খাবার উদ্যোগ করছিল, শিবানীকে দেখে প্লেট থেকে হাত টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর দু'হাত এক করে নমস্কার জানালো।

অরুণের সবিনয় নমস্কারের বিনিময়ে অতি সংক্ষেপে দায়সারা ভঙ্গিতে একটা প্রতিনমস্কার দিল শিবানী। এমন দায়সারাভাবে নমস্কারের বিনিময় কিছুটা অহঙ্কার প্রকাশের জন্যই করল শিবানী। আজকের এই আসাটা তাকে ছোট করছিল। সে বড় হলো।

অরুণকে সে এর আগে দেখে নি। সে শুনেছে নতুন ম্যানেজার বা ইন্দ্রনাথের নতুন পি এ-র কথা—ব্যস্, এই পর্যন্ত। এই প্রথম দেখল। দেখে অবাক হল। প্রথম ধাক্কার অবাকটা অবশ্যি শিবানীর অরুণের পোষাকের উপর দিয়েই গেল। ধুতি, পাঞ্জাবী-পরা চপ্পল পায়ে এমন বাঙালী ছেলেকে ইন্দ্রনাথের ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত দেখবে, এটা আশা করে নি। তারপর অবশ্যি অরুণ ওকে অনেক বিস্মিতই করল।

খাওয়া ফেলে উঠে পড়েছে—আর একটু সময় পার করে আসা উচিত ছিল ওর। কিন্তু ম্যানেজার সাব চা খাচ্ছেন—আবদুলের এ কথা খেয়াল ছিল না। কিন্তু এখন আর—'আচ্ছা, আপনি খেয়ে নিন। আমি পরে আসছি' বলে শিবানীর চলে যাওয়া চলে না। যেভাবে এসে ঘরে ঢুকেছে, ঠিক সেইভাবে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা না করলে ফিরে গিয়ে ঘুরে এসে আর জিজ্ঞাসা করা যায় না, ও যা জানতে চায়। ও জানতে চায় ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ম্যানেজারের বাড়ি ফেরবার আগে কখন দেখা হয়েছিল। কিছুই না। কোন মানে নেই এ জিজ্ঞাসার। কোন সম্মান নেই এ জিজ্ঞাসায়। তবু যে শিবানী এটা জানবার জন্যই এসেছে, এ কেবল ওর অধৈর্য চরিত্রের প্রতিক্রিয়া। উত্তেজনা ঘটলে কিছু না করে ও শান্ত থাকতে পারে না। কাজটা আত্মমর্যাদায় বাধছে, তাই আত্মমর্যাদাকে সে অহঙ্কারের বর্ম দিয়ে আবৃত করে রেখেছে।

অবহেলার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, মিঃ সেনের সঙ্গে আপনার কখন দেখা হয়েছে?

আমি বাড়ি আসবার আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই ছিলাম অফিসে।

আপনি কখন বাড়ি এসেছেন?

আধঘণ্টা হবে।

মিঃ সেন আপনাকে যে সংবাদ আমায় দিতে বলেছিলেন সে সংবাদটা নিজে গিয়ে না দিয়ে বেয়ারাকে দিয়ে বলে পাঠালেন কেন?

অরুণ সোজা হয়ে পাঞ্জাবীর দু'পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, সেজন্য আমি সত্যি দুঃখিত।

মিঃ সেন কোথায়?

আমি যখন এসেছি তখন পর্যন্ত অফিসে ছিলেন।

এ পর্যন্ত একরকম ছিল। এবার মাত্রজ্ঞানকে একেবারেই জলাঞ্জলি দিল শিবানী।

মিঃ সেন এখন কোথায় গেছেন আপনি বলতে পারেন ?

অরুণ চুপ।

তার মানে অরুণ জানে কিন্তু বলতে দ্বিধা করছে ? খুবই স্বাভাবিক। শিবানী গম্ভীর গলায় বলল, আপনি জানেন কি—তিনি কোথায় গেছেন ? জানলে বলুন। যেন গলার গাম্ভীর্যের চাপে অরুণের দ্বিধাকে গুঁড়িয়ে দিতে চাইল।

কিন্তু অরুণ তেমনি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এর মানে কি ? অরুণের না বলাটা দ্বিধা নয় ? সে জানে কিন্তু বলবে না—এই বোঝাতে চায় সে ? মাথার ভেতর যেন আগুন জ্বলে উঠল শিবানীর। কঠিনকণ্ঠে বলল, আমি জানতে চাইছি—আপনি বলুন। যেন আদেশ করল শিবানী।

এবার এতক্ষণে খুব স্পষ্ট করে শিবানীর দিকে একবার তাকাল অরুণ। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শান্তগলায় বলল, তা হয় না।

তা হয় না !! উত্তরটায় যেন জমে গেল শিবানী। বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল অরুণের দিকে। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। তারপরই দৃঢ়পায়ে বাইরের দিকে যেতে যেতে আদেশ করল অরুণকে, আসুন আমার সঙ্গে—রাস্তায় এসে ট্যাক্সি করবে'—শরীরের গতিতে এ জোর নিয়ে আঁচলটা শক্তমুঠিতে ধ'রে হল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল শিবানী।

কিন্তু থামতে হ'লো তাকে, গাড়ি-বারান্দায় ইন্দ্রনাথের প্রকাণ্ড ডিমলারটা। আজ নিজের গাড়ি ছেড়ে নিয়ে বেরিয়েছেন ইন্দ্রনাথ। তলার খুঁটটা বাঁ'দ দিয়ে চেপে ধরল—তারপরে প্রশস্ত গাড়ি-বারান্দার সিঁড়িগুলি টপ টপ করে নেমে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে অরুণকে বলল, আপনি গিয়ে উঠে বসুন। মিঃ সেনকে বিশেষ জরুরি দরকার আমার। আমায় সেখানে নিয়ে যাবেন।

অরুণ এতক্ষণ কিছুই বুঝছিল না। কেবল নীরবে শিবানীকে অনুসরণ করছিল। এবার নির্দেশ শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু দাঁড়াবার সময় ছিল না। ড্রাইভার ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়েছে। শিবানী উঠে বসেছে। অরুণকেও সামনের আসনে গিয়ে উঠে বসতে হলো।

ড্রাইভার গাড়ি বের করে এনে জানতে চাইলো কোথায় যাবে।

শিবানী অরুণের পেছনের দিকে একলক্ষ্যে তাকিয়ে থেকে আদেশ করলে, বলুন কোথায় যাবে।

এক মুহূর্ত—

তারপরেই ড্রাইভারের আসনের দিকে সরে আসতে আসতে অরুণ বললে, আপ উতার যাইয়ে লালাজী। হাম্ চালায়েঙ্গে।

[ক্রমশ।

শেক্‌স্‌পীয়ার প্রসংগে

অন্য প্রদেশের কথা সঠিক বলতে পারব না তবে বাংলা দেশের ও সাহিত্যের কথা কিছু বলতে পারব। মহাকবির প্রভাব উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর রচনায় নানান ভাবে পড়েছে. মহাকবির সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনাও কম হয় নি। মোটামুটি বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগকে তিনটি ভাগে বোধ হয় ভাগ করা চলে। প্রথম মহাকবির রচনার অনুবাদ, দ্বিতীয় মহাকবির উপর রচনা, তৃতীয় মহাকবির রচনার প্রভাবে প্রভাবিত রচনা। এই সমগ্র যোগাযোগটিকে বাংলা দেশে শেক্সপীয়ার চর্চা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাংলা দেশে শেক্সপীয়ার সোসাইটিও কম দিন স্থাপিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে একটি বিচিত্র ঘটনা মনে আসছে। আমি সপরিবারে কলকাতায় বসবাস করছি ১৯৪০ সাল থেকে! সেই সময়েই যে পাড়ায় প্রথম বাসা করেছিলাম সেই পাড়ারই একখানি বাড়িতে একটি মার্বেল ট্যাবলেটে কালো অক্ষরে লেখা দেখেছিলাম—শেক্সপীয়ার সোসাইটি। ট্যাবলেটটি সেই ১১৪০ সালেই প্রাচীন হয়ে এসেছিল। বাড়িটাও পুরনো, জীর্ণ হয়ে এসেছে। তারই একতলার দরজার পাশে, রাস্তার ধারেই ট্যাবলেটখানি। তাতে তখন ময়লা ধরেছে, খোদিত অক্ষরের মধ্য থেকে কালো মসলা জায়গায় জায়গায় উঠে গিয়েছে মোট কথা সেই ১৯৪০ সালেই সে যথেষ্ট প্রাচীন হয়েছে। শেক্সপীয়ার-চর্চা বাংলা দেশে যে পরিকল্পনা মত কিছু আরম্ভ হয়ে ছিল তা নয়। সহজ স্বাভাবিক চিত্তের আবেগের ও স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তার মধ্য দিয়েই সে কাজ আরম্ভ হয়েছিল। বিভিন্ন পথেই বিভিন্ন জন আলোচনা করেছেন।

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো বিশেষ ভাষার সমগ্র কাব্যের ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিলেও একটি বিশেষ কবির কাব্যের রসাস্বাদ করবার পক্ষেও ...সমালোচনা তেমন অনুকূল নয়। গেরভিনুস (Gervinus) অথবা ডাউডেনের (Dowden) সমালোচনা পড়ে ক'জন পাঠক শেক্সপীয়ারের কাব্যের রসগ্রাহী হয়েছেন। জগদ্বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে কাব্যসমালোচকদের বিদ্রূপ করে বলেছেন, পৃথিবীতে কোনো দেশে কোনো কালে মানবজাতি কি তোমাদের সার্টিফিকেটের উপর আস্থা রেখে কাউকে কবি বলে স্বীকার করেছে, না, লোকমতে যাঁরা বড় কবি বলে গণ্য ও মান্য, তাঁদের সম্বন্ধেই তোমরা মুখর হয়ে উঠেছ ? ইতালীতে দান্তে ও বিলাতে শেক্সপীয়ার লোকমতে বড় কবি বলে গণ্য হবার পরেই না তোমরা তাঁদের বিষয়ে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেছ! শেলি শেক্সপীয়ারের ফিলসফি নিয়ে ইংলণ্ডে কত না আলোচনা হয়েছে। এমন কি ফিলসাফ অব রবীন্দ্রনাথ নামক একটি গ্রন্থ আছে। অপরপক্ষে উপনিষদ, কাব্য কি দর্শন, তা আজও মনীষিবৃন্দ ঠিক করতে পারেন নি; আমাদের নিত্যকর্মের ভাষার সঙ্গে কবির ভাষার যে একটি স্পষ্ট প্রভেদ আছে, তা সকলেই জানেন। দৈনিক সংবাদপত্রের ইংরেজি ভাষা ও শেক্সপীয়ারের ভাষা যে এক নয়, তা যে কোনো সংবাদপত্রের একপৃষ্ঠা পড়ার পরে শেক্সপীয়ারের নাটকের একপৃষ্ঠা পড়লেই সকলের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। [১৯২৭]

—প্রমথ চৌধুরী

নামে কি যায় আসে

জ্যোতিপ্রসাদ বসু
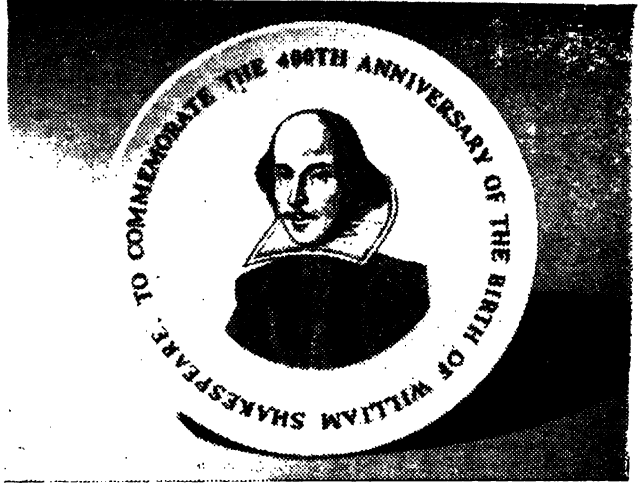
শেক্সপীয়রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় Lamb লিখিত শেক্সপীয়রের রচনার সারাংশ কাহিনীর মাধ্যমে। তার ফলে শেক্সপীয়রের অমর রচনাবলীর আখ্যানভাগটুকু আমি আয়ত্ত করতে পেরেছি, কিন্তু তাঁর প্রকৃত সাহিত্য-প্রতিভার সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় হয় নি। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আমার এমনিতেই অল্প, ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি ত' বটেই। তাই আমাকে অকপটে স্বীকার করতেই হবে যে, শেক্সপীয়র সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন আমায় করলে আমার অবস্থা দাঁড়াবে অনেকটা ল্যাম্বেরই মত। যে ল্যাম্বের বানান ছোট হাতের l দিয়ে।

Lamb-এর দয়ায় যেমন শেক্সপীয়রের প্রধান প্রধান কাহিনী ও চরিত্র সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারণা জন্মে গেছে, তেমনই লোকমুখে শুনতে-শুনতে শেক্সপীয়রের দু'টো-চারটে নাটকীয় উক্তিও আজ আমার কণ্ঠস্থ। সময়ে-অসময়ে সেগুলি আমি কাজেও লাগিয়ে থাকি। যেমন ধরুন—কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে 'টু-বি' বাসের দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধেয় কথাকার শিবরাম চক্রবর্তীর ভঙ্গিতে আমার মনে পড়ে যায়—'টু বি অর নট টু বি,'—শেক্সপীয়রের সেই এক অবিস্মরণীয় উক্তি। কোন নাটকে, কি পরিবেশে, কোন নায়কের মুখ থেকে এই বাণী নিঃসৃত হয়েছিল, সে প্রশ্ন আমায় করলে আমার অবস্থা হবে সেই ল্যাম্বের মত যার বানান ছোট হাতের l দিয়ে। কিন্তু কেন জানি না কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে উক্তিটি আমার মনে পড়ে যাবেই। 'টু-বি' বাসে যাবো কি যাবো না, এই প্রশ্ন মনে জাগার সঙ্গে সঙ্গে Lamb-এর বইয়ের প্রথম পাতায় আঁকা শেক্সপীয়রের ছবিটি আমার মনে জলজল করে উঠবে।

সেই চিন্তায় আমি যখন মসগুল, দু'টো একটা বাস সেই ফাঁকে চলে যাবে আমার নাকের সামনে দিয়ে। তারপর হঠাৎ আমার সম্বিৎ ফিরতেই নিজের দেহটাকে কোনমতে ঠেলেঠুলে নিক্ষেপ করব সামনের বাসটির মধ্যেই। আজকাল ট্রামে-বাসে নিজে থেকে ওঠা-নামা ছেড়েই দিয়েছি প্রায়। ভিড়ের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করতে পারলে ওঠা-নামা, এলিভেটরের সাহায্যেই যেন আপনা থেকেই হয়ে যায়।

বাসের মধ্যে কলেজ-ইউনিভার্সিটি ফেরত ছাত্র-ছাত্রীদের বেদম ভিড়ে শেক্সপীয়রকে আবার মনে পড়ে, এদের চোখে রোমিও জুলিয়েট বা এ্যান্টনি-ক্লিওপেট্রা বা ট্রয়লাস-ক্রেসিডার ছায়া দেখে। এরা নিশ্চয়ই শেক্সপীয়র পড়ে। অধ্যাপকদের নিরস কচকচিতে তেঁতো হয়ে যাওয়া লেবুর মতই শেক্সপীয়রের স্বাদ এদের পিপাসার্ত রসনায়। ঠিক আমাদের কালেরই মত। হলিউডের সেক্স-এ্যাপীলের ফরমূলায় ফেলা শেক্সপীয়রের ছবি এরা হয়ত এখন দেখছে।···

চল্লিশ জন বসবার জায়গায় চারশো জনের অকথ্য চাপাচাপিতে শ্বাসরুদ্ধ কফিনের মত এই বাসে চল্লিশ-এর চোখ দিয়ে চারশো বছরের পুরনো শেক্সপীয়রকে দেখবার চেষ্টা করি আমি। কেবল সে যুগের চামড়া-আঁটো জামা, ছুঁচোর মত সরু মুখ জুতো এদের আবার স্পর্শ করেছে। অতীতের পোশাকে এরা যেন বর্তমানে থেকেই যুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

এ যুগের যারা তরুণ তারা রবীন্দ্রনাথকে দেখে নি, তবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মশতবার্ষিকী দেখেছে। ঠিক তেমনই শেক্সপীয়রকে আমরা কেউই দেখি নি. তাঁর চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী দেখছি। প্রথম শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথকে যতখানি চেনা গেছে (!) অঙ্কের হিসেবে শেক্সপীয়রকে তার সিকিভাগও কি আমরা চিনতে পারব? অথচ, শেক্সপীয়রের চতুর্থ-শততম শ্রাদ্ধের জন্ত এদেশের বালখিল্যদের আগ্রহের সীমা নেই। টম-ডিক-হ্যারি এমন কি আজ উৎসাহী পল্লোরাও শেক্সপীয়র সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছে! এ যেন তাদের ভগবানদত্ত অধিকার। শেক্সপীয়রকে নিজের নামডাকে কতখানি কাজে লাগানো যায়, তার জন্ত এদের অশেষ ব্যাকুলতা শেক্সপীয়রের ট্রাজেডিকেও ছাড়িয়ে গেছে।

অথচ, এই নাম সম্পর্কে কত উদাসীন ছিলেন শেক্সপীয়র। তিনিই বলেছেন, নামে কি যায় আসে। তাঁর চতুর্থ-শততম

শ্রাদ্ধবাসরে তাঁর আত্মা যদি উপস্থিত হ'ত তা হলে বুঝত যে এ যুগে নামই সব, নামের জন্যই যা-কিছু। নাম-মাহাত্ম্যেই আমরা বেঁচে আছি এবং নামের জন্য যতদূর সম্ভব নামতে রাজী আছি আমরা। নেমে গিয়ে নাম করতে পারাই এখন জীবনের চরম সার্থকতা।

কি নাম হবে, কি করে নাম হবে, এই হল জীবনের প্রদোষে ও অপরাহ্নে আমাদের—বিশেষত বাঙালীর, একমাত্র চিন্তা। আজকে যে-কোনও নবজাতকের নামের বহর দেখলে আমার চমক লাগে। যত ছলা-কলা আর বাহাদুরী আমাদের শুধু নামেই। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সিনেমা···সবকিছু থেকে বেছে বেছে আমরা নাম রাখি। এই নাম দিয়ে দিয়ে যেন নামাবলী তৈরি করছি আমরা।

এত নাম, এত বিচিত্র ধরণের নাম কোথা থেকে আসে? শুধু ব্যক্তিগত নাম নয়, দোকানের নাম, বাড়ির নাম, ব্যবসায়ের নাম, পত্রিকার নাম, উপন্যাসের নাম, পোষা কুকুরের নাম···নামের আর অন্ত নেই, অন্ত নেই বৈচিত্র্যের, বহুকৃত কল্পনার! অনেক ক্ষেত্রে, যেমন দোকান বা বাড়ি বা ব্যবসা বা পত্রিকা···,একটা নাম ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ভেবে রাখতে হয় আর একটি নাম লাগবে। দু'ভাগ থেকে তিন ভাগ, তিন থেকে চার···এ-রকম চলতেই থাকবে। নামের সাহায্যে নাম ভেবেও শেষ করে উঠতে পারবেন না আপনি।

শুধু নামকরণেই নামের শেষ নয়। পরবর্তী জীবনে চলবে নাম নিয়ে কেনা-বেচা। এ বাজারে সুনামের চেয়ে দুর্নামের দর বেশি। ওতে তাড়াতাড়ি ফল দেয়। কতটা নাম, সুনামই হোক আর দুর্নামই হোক, আপনি কিনতে পারলেন তার ওপরই নির্ভর করবে জীবনের সাফল্য। যেমন করে হোক একবার নাম কিনতে পারলেই হ'ল। তারপর সেটা বেচেই চলবে। আপনি যত বেচবেন আপনার অধস্তনেরা তত কিনবে, কিনে কিনে তারা ওপরে উঠবে। আপনাকে বেয়ে বেয়েই উঠবে। এমনই করে চলবে পরম্পরা।

এমনি করেই চলছে; সত্যি বলতে কি নাম ভাঙিয়েই আমাদের যা-কিছু। উনবিংশ শতাব্দীতে যে দিকপালেরা জন্মেছিলেন তাঁদের কীর্তির প্রসাদে আমাদের এখনও কোনোমতে চলছে। তাঁদের শতবার্ষিকী নিয়ে তাই আমরা উঠে-পড়ে লাগি। শতবার্ষিকীর নাম শুনলে আমরা স্থির থাকতে পারি না। (সৌভাগ্যের কথা যে, আজকাল প্রতি বছরেই একটা-না-একটা শতবার্ষিকী লেগেই আছে!) তখুনি তার জন্যে সমিতি, উপসমিতি, চাঁদা, সরকারী খয়রাতি, নাচগানের আসর, সুভেনিয়রের বিজ্ঞাপন আদায়···ইত্যাদি বাঁধা ফরমুলায় কাজ সুরু করে দিই। তাই শেক্সপীয়র বিদেশী হলেও তাঁর চারশততম জন্মবার্ষিকীতে আমাদের প্রবল উৎসাহ। তার ওপর তিনি ছিলেন নাট্যকার। এতে আমাদের বড় সুবিধে। নাচগানের আসর জমাতে একটুও সময় লাগবে না।

কিন্তু এই নামাবলীর দেশে শেক্সপীয়রকে সহ্য করা যায় কি ক সেইটেই এল প্রশ্ন, বিশেষ করে যে শেক্সপীয়র লিখেছেন, নামে কি য আসে? শেক্সপীয়র নিজে কি নাম করেন নি? তা না করলে তাঁ নাম ভাঙিয়ে আজ চারশো বছর পরেও আমরা টিকিট বেচছি করে, কি করে চাঁদা তুলছি?

অবশ্য, শেক্সপীয়র যখন ঐ উক্তি করেছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয় বাঙালীর কথা জানতেন না, সুতরাং ভবিষ্যৎ বাঙালীর কথা ভেবে তিনি লেখেন নি। আবার এমনও হতে পারে যে, তিনি তাঁর নিজের কথা ভেবেই করেছিলেন ঐ উক্তি। কারণ, তখনকার দিনে এমন একটা সন্দেহ খুব প্রচলিত হয়েছিল যে, শেক্সপীয়র নামে কোনো লেখকই নেই আসলে ঐ লেখাগুলো শেক্সপীয়রের গুরু ক্রিস্টফার মার্লোরই। যে-ই লিখুক না কেন, লেখাগুলো যে অনবদ্য সে বিষয়ে দ্বিমত ছিল না। লেখকের আসল নামে কি যায় আসে?

সে যাই হোক, আমাদের কাছে এই নাম-সর্বস্ব বাঙালী জাতির কাছে নামই সব। নাম গানই আমাদের ধর্ম। ইষ্ট ও অনিষ্ট দু'য়েরই নাম আমাদের জপ করতে হয়। অতীতের নাম ভাঙিয়ে এবং বর্তমানে সেই অতীতের নামকে ভাঙিয়ে আমরা করে খাচ্ছি। নাম করতে করতেই নিঃশেষ হয়ে যাব আমরা একদিন। তবে বৃহত্তর জগতে আমাদের নাম প্রায় শেষই হয়ে এসেছে বলতে পারেন। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এক রিফিউজি প্রসঙ্গ ছাড়া আমাদের নাম ওঠে না বললেই চলে। সেটা ঈর্ষার জন্যই বলুন, ভীতির জন্যই বলুন, আর যে-কারণেই বলুন। সেদিক থেকে বলতে গেলে আমরা নামমাত্র জাতিতে পরিণত হয়েছি বলা যায়।

ভেবে দেখবেন যে, নামেই আজ বাঙলা দেশ। কিন্তু তার অর্থনৈতিক বনিয়াদে বাঙালী নেই। অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে যে বাদ গেল, এ-যুগে তার আর কি থাকে? একদা যে বাঙালীর নামে গর্ব ছিল, আজ সেখানে শুধুই লজ্জা আর গ্লানি। সত্যিই শেক্সপীয়র মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি ঠিকই বলেছেন, নামে কি যায় আসে? নামে বাঙলার শিল্প, কিন্তু তার মালিক কে? সেখানকার শ্রমিক কে? নামে বাঙালীর সংস্কৃতিকেন্দ্র এই কোলকাতা শহর, কিন্তু তার জমি আর তার সৌধের প্রধান মালিকানা কার?

তবু, এখনও হয়ত ছিটেফোঁটা ঐতিহ্য আছে, অধিকার আছে। যত শতবার্ষিকীর নাচেগানে আমরা বিভোর হ'ব ততই আমাদের ভবিষ্যৎ ফর্সা হ'বে। তখন আমরা হ'ব বাঙালী জাতির নামান্তর মাত্র। সত্যিই কি তাই হবে? টু বি অর নট টু বি। তাই নিয়েই ভাবনা!

অসহায়, শ্বাসরুদ্ধ ডেসডিমোনার মত 'টু বি' বাসের গহ্বরে, বৈশাখের অপরাহ্নের ভ্যাপসা গরমে, এণ্টনি-ক্লিওপেট্রা, রোমিও-জুলিয়েট আর ট্রইলাস-ক্রেসিডাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সেই প্রশ্নই আমার মনে আসে।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল। আলোকচিত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীশম্ভু সাহা।

এটা ঠিক গল্প নয়। গল্পের নামান্তর। আমার গল্পও নয় ঠিক। এক উদীয়মান তরুণ লেখকের কাহিনী।

একটা বয়েস আছে—যে বয়সে গোঁফ আর সাহিত্য একাধারে দেখা দেয়। সকলেরই সেই বয়সটা এসে থাকে, যথা সময়েই আসে, যখন সে সেফ্‌টি রেজর আর পার্কার কলম নিয়ে পড়ে। একসঙ্গে চর্চা করে দুয়েরই। গাল-গল্পের দিকে (গাল আর গল্প দুদিকেই) ঝোঁক দেখা যায় তার।

কলেজ-জীবনেই এটা হয়ে থাকে। ব্যাঙাচির লেজ খসে যেমন সে ব্যাঙ হয় তেমনি কলেজ-জীবনে (বা কলেজ ত্যাগের ঠিক আগেটায়) ছেলেদের প্রবীণত্বের ভেক দেখা দেয়। সেইটাই তার সাহিত্য। সাহিত্য-সৃষ্টি।

যেমন আমাদের মানসের এখন দেখা দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে একটি গল্পও দেখা দিয়েছে। অনিবার্যরূপেই।

গল্পটা সে আমার কাছে দিয়ে গেছে তার একটা নামকরণের জন্য। জুতসই একটা নাম দিতে হবে লেখাটার। গল্প লেখা সহজ কিন্তু তার নাম দেওয়া নাকি তত সোজা নয়। ছেলেমেয়েদের নামকরণের সময় কেমন বেগ পান বাপ-মারা। কিন্তু তার আগে কি অতোটা উদ্বেগবোধ করেছিলেন? তেমনি গল্পের আমদানির সময় খেয়াল থাকে না, খামখেয়ালে কলম চালাও কিন্তু পরে নামদানির সময়েই ঠ্যালা!

কিন্তু কি নাম দিই? লেখক আমাকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন, নামটা যেন যথোচিত হয়। ঠিকমতো নাম না হওয়ার জন্যই অনেক ভালো গল্পের বদনাম হয়ে থাকে। যেমন অনেক ভালো ছেলে, রূপে-গুণে নিখুঁত, শুধু কেবল বিচ্ছিরি নামের জন্যেই কোনো মেয়ের ভালোবাসা পায় না। দামোদর, গোবর্ধন, গদাধরচন্দ্রকে কোন্ আধুনিকা ভালোবাসতে যাবে? আপনারাই বলুন।

মানসের এই গল্পটা নাকি ডিটেকটিভ।

তাই অনেক ভেবে-চিন্তে—আপনারাও ভাবুন—যদি, ধরুন, এটার নাম দেয়া যায়—

কে? কি? কবে? কেন? কোথায়?

রাত তখন তিনটে। কলিকাতা নগরী শুব্ধ। মাঝে মাঝে দূর থেকে দু-একটা ঘেয়ো কুকুরের আর্তনাদ ভেসে আসে। বীটের কনষ্টেবল বুটের আওয়াজ করতে-করতে ডিউটি থেকে ফেরে। এমন সময়ে নিস্তব্ধ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে দেখা দেয় একটা লোক—কালো পোষাকে তার সর্বাংগ ঢাকা—এগিয়ে চলেছে। লোকটি একটা তেতলা বাড়ির সামনে এসে থেমে গেল। হঠাৎ দূর থেকে একটা তীক্ষ্ণ শিসের আওয়াজ শোনা যায়। লোকটা দেওয়ালের সঙ্গে একেবারে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বীটের কনষ্টেবল ভজন সিং তখন পাহারা থেকে ফিরছে। লোকটা যদ্দূর সম্ভব গা সেঁটে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। পাশের ঘুমানো কুকুরটা ঘা খেয়ে চীৎকার করে উঠল।

: কোন্ হ্যায় ? পরেশ দেখতে পেয়েছে। নিস্তব্ধ······

: কোন্ হ্যায় ?—পরেশ এগোয়, লোকটিও পেছোয়।

: সুখদেও ভেইয়া হো······!—পরেশ চীৎকার করে ওঠে।

গুড়ুম্, গুড়ুম্···পরেশের আর্তনাদ···নিস্তব্ধ। বুটের আওয়াজ—জানায় সুখদেও এসে গেছে। কিন্তু লোকটা—তখন সে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

: কেয়া হুয়া, পরেশ ভেইয়া ? সুখদেব প্রশ্ন করে।

: সাহেব······। পরেশের গোঙানি চিরতরে শুব্ধ হয়ে যায়।

: আরে! গোলি কিয়া! সুখদেও বিস্মিত হয়ে থানায় ছোটে।

: স্যার, ফের সেই ফিরিঙ্গি জন্ সাহেব ফিরে এসেছে। এর মধ্যেই সে একটা কনষ্টেবলকে খুন করেছে···রায়বাহাদুর বসুর বাড়িতে ডাকাতি করেছে। বহু মণি-মুক্তো রায়বাহাদুরকে হারাতে হয়েছে।···লালবাজারের CID রুমে বসে ডিটেকটিভ অর্ধেন্দু মুখার্জীকে ডিপার্টমেণ্ট হেডের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়।

: একটু মন দিয়ে চেষ্টা করুন। এবার যেন জন্ পালাতে না পারে।—হেড্ বলেন।

সান্নুভেলী হোটেল। পুলিশের খাতায় এর নাম আছে। একটা কোণে কনসার্ট বাজছে রেডিওতে। একটা মৃদুগুঞ্জন শোনা যায়। এক ফিরিঙ্গি সাহেব ট্যাক্সি থেকে নেমে রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে পড়লেন।

: বয়! কফি। বয় ছুটল কিচেনরুমে। সাহেবের দৃষ্টি একটু অস্বাভাবিকভাবেই যেন চারিদিক ঘোরাফেরা করছে। পাশেই দু'টি লোক—দেখে সভ্য শ্রেণীর বলেই মনে হয়—নিম্নস্বরে কথাবার্তা করছে। সাহেব কফিতে চুমুক দেন, কিন্তু পাশের লোক দু'টির কথা শুনতে তাঁকে বড় উৎসাহিত বলেই মনে হয়।

: না, আজ আর হবে······। আজ জমের কাছে এখনই······। একটা লোকের অস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা যায়। লোকটা উঠে পড়ে,···সাহেবও যেন অতিব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে। লোকটা বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে কি যেন বললে।···ট্যাক্সিও ছুটল। সাহেবও নিজের কারটায় উঠে আগের ট্যাক্সিটাকে অনুসরণ করে। এমন সময়ে ঐ হোটেলের সামনে একটা ভিক্ষুককে ট্যাক্সি থামাতে দেখা যায়। ভিক্ষুক পিছনের সীটে উঠে বসে···ট্যাক্সি ড্রাইভার ভীষণ আপত্তি তোলে। কিন্তু ভিক্ষুকের হাতে একটা দশ টাকার নোট দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরি হয় না।

: তাড়াতাড়ি, আগের ট্যাক্সিটাকে ধরতেই হবে। ···ভিক্ষুক বলে ওঠে।

: জী হুজুর।···বলে ট্যাক্সি ড্রাইভার চাবি ঘুরোয়।

ছুটছে তিনটে ট্যাক্সি।···কিন্তু শেষেরটা একটু পেছনে।

: আরো জোরে চালাও।···ভিক্ষুক বলে ওঠে। ড্রাইভার পিছন ফিরে সাদা চামড়া দেখে অবাক হয়ে যায়। আগের ট্যাক্সির পিছনের নম্বরটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আরও ···আরও কাছে। গুড়ুম্···দ্বিতীয় ট্যাক্সিটা কাত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় ট্যাক্সির সাহেব বেরিয়ে আসে। এমন সময়ে শেষের ট্যাক্সিটা গা ঘেঁসে সাঁৎ করে বেরিয়ে যায়।

: ওঃ, জন্। আচ্ছা দেখা যাক্ কে হারে কে জেতে, সাহেবের মুখে একটু তীক্ষ্ণ হাসি মিলিয়ে যায়। তখন শেষের ট্যাক্সিটা বাঁক ঘুরে একটা গলিতে ঢুকে পড়েছে।

পাশেই ফুটপাথের উপর একটা মোটর-সাইকেল···। সাহেব তাতেই উঠে ষ্টার্ট দেয়। মোড় ফিরেই সাহেব দেখে দূরে আগের গাড়িটা ফের একটা মোড় ফিরল। সাহেব একহাতে মুখোশটা খুলে ফেলে দেয়।···কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় আগের ট্যাক্সির পিছনে নীল চশমা পরে এক মাদ্রাজী মোটর-সাইকেলে এগুচ্ছে। ট্যাক্সি এসে থেমে যায় একটা দোতলা বাড়ির সামনে। সাহেব বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল। মাদ্রাজীও মোটর-সাইকেল থেকে নেমে বাড়ির পিছন দিকে যায়। পাঁচিল টপকে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ছোট্ট একটা লন। তারপর বাংলো প্যাটার্নের একটা দোতলা বাড়ি। চারিদিক নিস্তব্ধ। মাদ্রাজী হাতে ছোট্ট একটা ব্রাউনিং পিস্তল নিয়ে আস্তে আস্তে উপরে ওঠে। একটা ঘর, দরজা ভেজানো···নাঃ, কিছু নেই। খুট্ করে একটা আওয়াজ···। মাদ্রাজী পিছন ফিরে দেখে সাহেব তার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

: হ্যালো, মুখার্জী! কি মনে করে এখানে? তোমায়

মত অতিথির অভ্যর্থনা ঠিক ভদ্রভাবে হলো না বলে, সত্যি বলছি, অত্যন্ত দুঃখিত। চোরের ওপর বাটপাড়ি করা আমার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। সাহেব হো হো করে হেসে ওঠে।

: কিন্তু জন, তুমি ভুলে গেছ যে তোমারও লীলা এখানেই শেষ। পুলিশ জেনে গেছে।

: কি রকম?

অর্ধেন্দু জনের পিছনে তাকিয়ে যেন একটু উপহাসের হাসি মুখে টেনে আনে। সন্দিগ্ধ জন পিছনে তাকায় বারেকের জন্য। পাশেই একটা ঘর···দরজা খোলা। অর্ধেন্দু চট করে ঢুকে পড়ে। জন্ এবার হাসিমুখে দৃষ্টি ফেরায়···কিন্তু! অর্ধেন্দু কোথায়?

জন্ বারান্দায় নীচে দৃষ্টি ফেরায়···না, নেই ত'। ঘরে ঢোকে···।

: হ্যাণ্ডস আপ। এইবার তোমার পালা।—দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে অর্ধেন্দু জনকে অবাক করে দেয়।

: তুমি আমাকে ধরবে? হাঃ, হাঃ হাঃ। এমন সময়ে জন অবিশ্বাস্যভাবে এক উল্টা-ডিগবাজি দেয়। গুড়ুম্···না লাগে নি। জন্ তার ঠিক পিছনের খোলা জানালা দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে একেবারে নীচে। গর-র্-র্-র্-র্-র্ গোঁ···মোটর আওয়াজ করে ওঠে। অর্ধেন্দু জানালা দিয়ে দেখে একটা মনোপ্লেন খানিকটা ছুটে গিয়ে আকাশে উঠে পড়ে।

অর্ধেন্দু ফোন ধরে···'লালবাজার'।···অর্ধেন্দু টেবিলের কাগজপত্র হাতড়াতে থাকে। একটা চিঠি···

মিষ্টার জন্, সুন্দরবন

এখানে সব ঠিক। জাহাজ স্বর্ণমতীতে
···ল্যাটিচিউড।···লঙ্গিচিউডে অপেক্ষা
করছে। তাড়াতাড়ি এসো। ইতি—

রমেশ।

বাইরে মোটরের আওয়াজ। অর্ধেন্দু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

: আ রে অরুণ যে! ঠিক সময়েই এসে গেছো। এদের হাবিলদারকে ঘরটা সার্চ করতে বল, আর তুমি দু'জন ভাল সার্জেণ্ট নিয়ে আমার সঙ্গে···তাড়াতাড়ি। অর্ধেন্দু যেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

অস্তমুখী সূর্যের আলো স্বর্ণমতীতে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা মোটরবোট···দেখা যায় অবিশ্বাস্যগতিতে এগিয়ে চলেছে।

: আরো জোরে···আরও। অর্ধেন্দু ড্রাইভারকে তাড়া দেয়।···

: ঐ যে, জাহাজ। দেখেছো অরুণ? অর্ধেন্দু চিৎকার করে ওঠে। তারা তীর ঘেঁসে চলে, যাতে জাহাজের লোকেরা দেখতে না পায়। ক্রমে জাহাজে···। মৃত্যুনিথর নিস্তব্ধ চারিদিক। মাঝিমাল্লারা বোধ হয় পারে গেছে। তারা উপরের ডেকে যায়। একটা দরজা ঈষৎ ভেজানো। ভিতরে চাপা ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ। অর্ধেন্দু ইসারা করে অরুণকে। সবাই এসে দরজায় লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। একজন সার্জেণ্ট যায় পিছনের জানলার দিকে। জনের দিগ্‌বাজিতে সঙ্গে অর্ধেন্দুর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

: প্লেনটা এখন কি করা যায়।

: ওটা এখন এখানকার আড্ডাতেই থাকুক।

: চিঠিটা এনেছো?

: কৈ না! যাঃ ভুলে গেছি।

: তা হলে ত' সর্বনাশ। পুলিশ সব জানতে পেরেছে। আর আমাদের বাঁচোয়া নেই।

: ভেবো না তুমি রমেশ, আর আধঘণ্টার ভিতরই আমি India leave করছি।

: কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি, তোমার সে ইচ্ছাপূরণ হলো না।—বলতে বলতে অর্ধেন্দু ঘরে ঢোকে। তাকে দেখে জন্ চমকে ওঠে।

গুড়ুম্, গুড়ুম্···অরুণের আর্তনাদ। গুড়ুম্—দেখা যায় জন্ অস্ফুট আওয়াজ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

: জন্ তোমার সঙ্গে আজ বহিঃপ্রকৃতি বিচ্ছিন্ন হলো।···

শ্রীমানসকুমার সিংহ

* * * * *

কেমন লাগলো আপনাদের?

না না, গল্পের কথা বলছি না। আমার নামকরণটা কেমন হয়েছে তাই আমার জিজ্ঞাস্য।

গল্পের কে যে কোনটি, আর সে যে কি করছে, কোথায় করছে আর কেনই বা করছে তার কিচ্ছুটি কি বোঝা যায়?

যায় না। যাবার কথাও নয়। কারণ এটি একটি ডিটেক্‌টিভ গল্প যে।

সাধারণ একটা মুণ্ডহীন দেহ নিয়ে গোয়েন্দা কাহিনীর সুরু হয়ে থাকে। একটি লোকের মাথা নেই (তা বলে সে গরু নয়) অবহেলিত পরিত্যক্ত হয়ে কোথাও পড়ে আছে তাই নিয়ে পুলিশের মাথাব্যথা হয়। গোয়েন্দারা তার পেছনে লাগে।

তেমনি গোয়েন্দা কাহিনীর বেলায় হচ্ছে দেহহীন মুণ্ড। গল্প-দেহের মাথাটা অর্থাৎ নামটা—যেটা লেখার শীর্ষদেশে থাকে—সেটা ঠিক থাকলেই হোলো। দেহের বালাই নাই বা থাকলো, গল্পের হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হদিশ নাই মেলে যদি, কোনো ক্ষতি নেই। নামটা যদিও চমকদার নয়, গোয়েন্দা কাহিনীটিও চমৎকার! সে-বই কাটবে বেশ।

আবার ভাবছি, মানসের এই গল্পটার নামান্তর করে যদি 'সিংহনাদ' রাখা যায়?

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ভূদেব ছিলেন সিনিয়ার স্কলার—কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র, অধ্যাপকগণের পরমপ্রিয়—চাকরীর জন্য কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়ালেন, কোথাও তা' জুটল না।

সংসারে অর্থাভাব—সদ্য বিয়ে করেছেন। বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লেন ভূদেব।

একদিন সন্ধ্যাকালে নানা জায়গায় ঘুরে ঘরে ফিরেছেন···শুনতে পেলেন বাবা-মার কলহ।

মাতা বলছেন : বৌকে এবার আনতে হ'বে।

বাবা জবাব দিচ্ছেন : সে কি করে হয়, ঘরে যে একসের চালও নেই। আমি আধপেটা খাই, বৌমাকে এনে কি খাওয়াব। ছেলের তো আজ ও চাকরী হল না। শক্তি হলো না বৌ আনবার।

মা আরো বললেন : আমি নিজে না খেয়েও বৌকে ঘরে আনবো।

বাবার কথা ভূদেবের বুকে শেলের মতো বাজল। আর ঘরে না ঢুকে আবার বেরিয়ে পড়লেন—যেদিকে দু' চোখ যায়। হাতে একটি পয়সা নেই, পায়ে হেঁটেই চুঁচুড়া এসে পৌঁছুলেন। ভূদেব মনে মনে সঙ্কল্প করে বেরিয়েছেন, চাকরী না পেলে জীবন আর রাখবেন না গঙ্গার জলেই প্রাণ বিসর্জন দেবেন। যেমনি মনে মনে স্থির করা—অমনি গঙ্গায় একগলা জলে ডুব দিলেন। সর্ব শরীর ঠাণ্ডা জলে শীতল হয়ে গেলো—চাদর দিয়ে মাথা মুছে তীরে উঠলেন। আত্মহত্যার চিন্তা আর রইলো না।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। ভূদেব আপন মনে চুঁচুড়ার পথে পথে ফিরছেন। একমাত্র লক্ষ্য···চাকরী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেল—ক্ষিধে তেষ্টায় দেহ ক্রমেই ক্ষীণ হচ্ছে। এক হালুইকর ব্রাহ্মণের দোকানে লুচি ভাজা হচ্ছে—তার গন্ধ আকাশে-বাতাসে ভেসে আসছে। দোকানের কাছে এসে যেখানে লুচি ভাজা হচ্ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন। যে বামুন ভাজছিল তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। হাতে যে একটি পয়সা নেই কি করে খাবেন। তাই ধীরে ধীরে সেখান হতে চলে এলেন।

দুই

ক্ষিধের জ্বালা—বড় জ্বালা। ভূদেবের উদর জ্বলে উঠলো।

হাঁটতে হাঁটতে দূরে এক প্রকাণ্ড দালান দেখে তার ভেতর ঢুকে পড়লেন। বাড়ির কর্তা বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। তাঁর গলায় যজ্ঞোপবীত। ভূদেব ম্লানমুখে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মনে করুণার উদ্রেক হলো। জিজ্ঞেস করলেন : কে তুমি বাপু। কি চাও, তোমার মুখ এমন শুকনো কেন ?

ভূদেব বললেন : দেড়দিন যাবৎ আমার খাওয়া হয় নি। আমি ভাত খেয়ে পরে বলবো।

বৃদ্ধ বললেন : এসো, বস! বালতিতে জল আছে হাত-পা ধুয়ে নাও।

তাঁর পায়ে ছিল না জুতো—পা ভর্তি ধুলো।

বৃদ্ধ নিজেই বললেন : তুমি অতি সুপুরুষ। তোমার শরীরের গঠন অত্যন্ত সুলক্ষণযুক্ত। তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান যুবক বলে মনে হচ্ছে। বাড়ি হতে বুঝি বাবা-মার সঙ্গে রাগ করে বেরিয়েছো।

ভূদেব বললেন : না তো!

বৃদ্ধ শুধোলেন : তোমার নাম কি!

তিনি উত্তর করলেন : আজ্ঞে, আমার নাম ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বৃদ্ধ আর বিশেষ কিছু না বলে ভেতর থেকে এক গেলাস সরবৎ আনিয়ে তাঁকে পান করতে দিলেন।

এক গেলাস বেলের সরবৎ আসার সঙ্গে সঙ্গে ভূদেব স্বতন্ত্র আসনে বসে পান করলেন।

এক ঘণ্টার মধ্যে অন্ন প্রস্তুত হলো। রাত্রি তখন প্রায় আটটা বেজে গেছে। বৃদ্ধ আপন ছেলেদের সঙ্গে ভূদেবকে সাদরে খাবার জায়গায় নিয়ে গেলেন। ছেলেদের সম্বোধন করে বললেন : কার্তিকসদৃশ রূপবান এই ব্রাহ্মণ যুবকটি আজ প্রায় দেড়দিন যাবৎ অনাহারে আছে। আজ আমাদের অতিথি। এখানে অন্ন গ্রহণ করবে।

বৃদ্ধের কথা শুনে বাড়ির বৌ-ঝিরা এবং গৃহকর্ত্রী স্বয়ং যুবকটিকে দেখবার জন্য উপস্থিত হলেন। গৃহকর্ত্রী আজ স্বয়ং রান্না করেছেন। তিনি নিজে রূপোর থালে অন্ন, দুগ্ধ, ক্ষীর, ঘৃত, পায়েস, সন্দেশ, দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। তা' ছাড়া নানারকম ব্যঞ্জনের অভাব ছিল না।

ভূদেব আসনে বসলেন। এত জিনিস এবং আদরযত্ন দেখে তাঁর দু'চোখের কোণে জল গড়িয়ে পড়লো। তিনি ভাতে আর হাত দিতে পারলেন না।
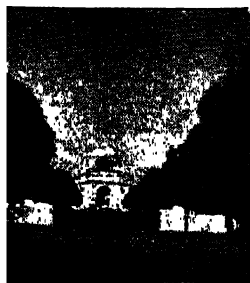
পুতুল স্নান

—ডাঃ সৌমেন গুপ্ত

কালের প্রহরী

—প্রবাল ভট্টাচার্য

দার্জিলিং দুহিতা

—নবীন সরকার

কিশোরিণী

—জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

—শকুন্তলা বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসিক
বসুমতী
বৈশাখ / '৭১

পারঘাট
—সুধীন রায়

শীত-বসন্ত —সুপর্ণা দাশ

ঘোড়সওয়ার —অসিত মিত্র

ওস্তাদ —রুবী মল্লিক

খাদ্য-অন্বেষণ
—পি জি দাশ
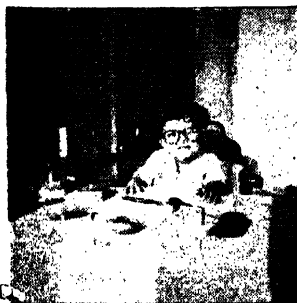
অফিসার —গৌতম মুখোপাধ্যায়

বৃদ্ধ এরূপ অবস্থা দেখে মিষ্টিস্বরে বললেন : তুমি কাঁদছো কেন। তুমি খাও। কান্না কিসের।

ভূদেব কাঁদতে কাঁদতে বললেন : আমার মা খেতে পান না, বাবা খেতে পান না, স্ত্রী খেতে পান না। আমি কি করে নানাবিধ সামগ্রী দিয়ে সাজানো ভোজ্যদ্রব্য উদরে দেবো।

বৃদ্ধ অনেক বোঝালেন : তখন ভূদেব অন্নাহার করলেন। কিন্তু বেশি খেতে পারলেন না।

ঐ গৃহে তিনি বৃদ্ধের ছেলে এবং নাতনীগণের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। ঠিক হলো তিনি ওখানে আহার, পোশাক ইত্যাদি ছাড়া মাসিক আট টাকা করে বেতন পাবেন। তখনকার দিনের আট টাকা, এখনকার ত্রিশ টাকার সমান হবে। প্রতি মাসে ঐ টাকা কয়টি ভূদেব পিতাকে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন, সংসার বেশ ভালভাবেই চলতে লাগলো।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আর্থিক সাহায্যে শীঘ্রই চন্দননগরে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি সে স্কুলে মাসিক ষোলো টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। এখন চব্বিশ টাকা আয়ে সংসার আগের চেয়ে সুখে ও স্বচ্ছলভাবে কাটতে লাগলো। ভূদেবচন্দ্র পরে ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেছিলেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি তাঁর এক প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে এই ঘটনাটি বলেছিলেন।

শ্রীঅমল সেন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ভারতবর্ষ থেকে জাপানে গিয়েছিল একজন বৌদ্ধ শ্রমণ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে, একজন জাপানী-বৌদ্ধকে সে একখানা আয়না দিয়েছিল। আয়নাখানা ছিল ভালো ক'রে কাপড় দিয়ে মোড়া। সে জাপানী-বৌদ্ধকে সেই আয়না নিরাপদে লুকিয়ে রাখতে ব'লেছিল। জাপানী-বৌদ্ধটি আবার তা তার স্ত্রীর কাছে দিয়ে নিরাপদে লুকিয়ে রাখতে ব'ললো। কৌতূহল মেয়েদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, একথা আর কে না জানে? স্ত্রীর মনে, মেয়েদের মনের সেই চিরন্তন কৌতুহল জেগে উঠলো। সে ভাবলো, কি এমন জিনিস যা আমারও দেখতে মানা! দেখতে হবে তো! জাপানী ভদ্রলোক কাজে বেরিয়ে যেতেই স্ত্রী সেই কাপড়ের মোড়ক খুলে ফেললো। আয়নাটা বেরিয়ে পড়লো। জীবনে কখনো সে আয়না দেখে নি। জিনিসটা হাতে নিয়ে সে অবাক হ'য়ে দেখলো তার মধ্যে একটি সুন্দর মেয়ে ব'সে আছে। দেখে হিংসায় তার গা জ্ব'লে গেল—ও এই ব্যাপার! লুকিয়ে লুকিয়ে এই মেয়ের সঙ্গে প্রেম ক'রে আমাকে আবার সোহাগ জানানো হ'চ্ছে। বিশ্বাসঘাতক! রাগে সে আয়নাখানা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। তা সেই মুহূর্তে টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙে গেল। এমন সময়ে তার স্বামী এসে ঘরে ঢুকলো। এ কি কাণ্ড! আয়না জিনিসটা সেও জীবনে কখনো দেখে নি। একটুকরো আয়না মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সে চোখের সামনে ধ'রলো, আয়নায় ভেসে উঠলো দিব্যকান্তি এক পুরুষের মূর্তি। সে যে তার নিজেরই চেহারা স্বামী বেচারাও তা বুঝলো না। সেও রেগে উঠলো। স্ত্রীকে ভর্ৎসনা ক'রে ব'ললো—এই তুমি, যাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, আদর-সোহাগ করি! একজন পরপুরুষের সঙ্গে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম ক'রছো! দু'জনে লেগে গেল তুমুল ঝগড়া। লড়াই যখন খুব জোর চ'লছে তখন সেই ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ এসে ঢুকলেন ঘরে, তিনি লড়াই থামিয়ে দিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা ক'রলেন। আয়নাই যে তাদের ঝগড়ার আসল কারণ সেটা বুঝতে দেরি হ'ল না। তিনি স্বামীকে আয়নার রহস্য বুঝিয়ে ব'ললেন—

'আয়নায় যে পুরুষের মূর্তি তুমি দেখেছ, সে তোমার নিজেরই ছবি,—তোমার স্ত্রী যাকে ভালোবাসে সে তো তুমি। স্ত্রীকে বললেন, আয়নায় যে মেয়েটিকে তুমি দেখেছ, যাকে তোমার স্বামীর প্রেমিকা বলে তুমি সন্দেহ করেছ, সে মেয়েটি তো তুমি ছাড়া অন্য কেউ নয়। তারপরে তিনি তাদের দু'জনকে আয়নায় মুখ দেখবার কায়দা শিখিয়ে দিলেন। গোলমাল মিটে গেল।

নিরামিষভোজী ও আমিষভোজীদের একটা লড়াই চ'লে আসছে বহুকাল ধ'রে। খাঁটি নিরামিষভোজী যারা তারা আমিষভোজীদের বরদাস্ত ক'রতে তো পারেই না, অচ্ছুৎ ও অস্পৃশ্যদের মতো ঘৃণা করে।—দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ঘৃণা তীব্রভাবে প্রকাশ

পেতে দেখেছি। আসাম, বাংলা ও উড়িষ্যা বাদে ভারতের প্রায় সর্বত্রই সব রাজ্যের লোকেরা মাছ-মাংস যারা খায়, তাদের যথেষ্ট ঘৃণা করে। আমি বাঙালী—মাছ খাই। মাছ খাবো না এই অঙ্গীকার করাতে দিল্লীতে আমি বাড়ি ভাড়া পেয়েছিলাম। মহাভারতে আমিষ ও নিরামিষ-ভোজীদের দ্বন্দ্ব নিয়ে একটা বড় সুন্দর গল্প আছে।

শ্রীকৃষ্ণের একদিন ইচ্ছা হ'ল—নিরামিষভোজীদের মনে নিরামিষভোজই যে সবচেয়ে পবিত্র ভোজ ব'লে একটা ধারণা আছে, তাদের সেই ধারণার অসারতা বুঝিয়ে দেবার। তিনি কৌশল ক'রে এক নিরামিষভোজীর পায়ে একটা বড় কাঁটা বিঁধিয়ে দিলেন। নিরামিষভোজীর পা দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। কাছাকাছি একটা নদী ছিল, সে সেখানে পা ধুয়ে সুস্থ হবার জন্যে গেল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বালকের বেশ ধরে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

এ কি তোমার রক্তের রং লাল কেন? আমি ভেবেছিলাম, তোমরা মাছ-মাংস খাও না। খাও তো শুধু ফল-মূল, শাক-সব্জী!—তোমাদের রক্ত সাদা রক্তকণিকায় তৈরি—তাই তার রং হবে সাদা। তা না হ'য়ে আমিষ-ভোজীদের মতই লাল রক্ত হ'ল। এ কি আশ্চর্য ব্যাপার!

ইসপ্‌স ফেব্‌লের সেই 'যার কাজ তারে সাজে অন্যের পিঠে লাঠি বাজে' নীতিমূলক কুকুর ও গাধার গল্পটি সকলেরই জানা গল্প। ধোপার গাধার কাজ হ'ল কাপড়ের বোঝা বওয়া—কুকুরের কাজ হ'ল বাড়িতে চোর ঢুকলে ঘেউ ঘেউ শব্দে চোর তাড়ানো এবং মনিবকে সতর্ক ক'রে দেওয়া। কুকুর তার কাজ না ক'রে চুপ ক'রে বসেছিল দেখে গাধা গিয়েছিল কুকুরের কাজ করতে। গভীর রাত—ধোপা ছেলে-মেয়ে-বৌ নিয়ে শান্তিতে ঘুমুচ্ছে, এমন সময়ে বাড়িতে চোর ঢুকলো। মনিবের উপর কুকুরের রাগ ছিল ব'লে কুকুর চুপ ক'রে রইলো। গাধা ভাবলো, এ কিরকম ব্যাপার হ'চ্ছে? মনিবকে সজাগ ক'রে দেওয়া তো দরকার। সুতরাং সে ডাকতে সুরু করলে। চোর অবশ্যই পালালো এবং ধোপা তার আসার কথা কিছু জানতেও পারলো না। সে এসে শান্তির ঘুম নষ্ট করার জন্য একটা লাঠি নিয়ে গাধাকে বেদম প্রহার করলো।

ক্ষমতার লালসা মানুষকে অনেক সময় এমন অন্ধ করে দেয় যে, তার বিচার-বুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ পায়। শেষকালে সে অন্ধ বেগে বিনাশের স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে অবলুপ্ত হয়। এই নীতিকথাই একটা রূপকের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পঞ্চতন্ত্রে।

এক বনের রাজা ছিল এক সিংহ, তার অত্যাচারে অন্যান্য পশুরা অস্থির। এক শেয়ালের মনে সিংহের এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার—শুধু তাই নয়, সিংহের অত্যাচার চিরতরে বন্ধ করার একটা ফন্দী জাগলো। একদিন সে সেই সিংহের কাছে গিয়ে বললো, মহারাজ, আপনার রাজত্বে আমরা বেশ সুখে শান্তিতেই তো ছিলাম, কিন্তু কয়েকদিন হ'ল কোথা থেকে আর একটা সিংহ এই বনে এসে আমাদের ওপর ভয়ানক অত্যাচার সুরু ক'রেছে।

সিংহ তো এই কথা শুনে রেগে অস্থির। তার রাজত্বে দ্বিতীয় রাজার আবির্ভাব। শেয়ালকে সে বললো, চলো তো দেখে আসি কোথায় সে পাষণ্ড!

বুদ্ধিমান শেয়াল একটা জলপূর্ণ কুয়োর পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো সিংহকে নিয়ে, সিংহের ছায়া প'ড়লো জলের মধ্যে। সেই ছায়াটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে শেয়াল বললো, ঐ দেখুন মহারাজ সেই সিংহ। মূর্খ সিংহ তার কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীর ছায়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো অন্ধ রাগে এবং কুয়োর জলে তলিয়ে গেল।

পঞ্চতন্ত্রে আর একটা গল্প আছে 'শূন্যে সৌধ নির্মাণ।' কল্পনা-বিলাসী মানুষ কল্পনা ক'রতে ভালোবাসে, কল্পনার জগতে বিচরণ করে আনন্দ পায়। মানুষ জেগে থেকেও স্বপ্ন দেখে, যে স্বপ্ন মিথ্যা, অলীক এবং ভিত্তিহীন। তারপর একদিন যখন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তার সে স্বপ্ন ভেঙে যায় তার তখন আর দুঃখের অবধি থাকে না। এই তত্ত্বটাই ব্যাখ্যা ক'রে বলা হ'য়েছে 'শূন্যে সৌধ নির্মাণ' গল্পের মধ্য দিয়ে।

এক ব্রাহ্মণ যুবক যজমান বাড়ি থেকে ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ সেরে দক্ষিণা বাবদ একসরা ছাতু নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। ব্রাহ্মণভোজনটা একটু গুরুভোজন হ'য়ে গিয়েছিল, ভারি পেট নিয়ে চ'লতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। একটা বড় বটগাছ দেখতে পেয়ে ভাবলো, গাছের ছায়ায় ব'সে একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। গাছের তলায় সে ব'সলো ব'সে থাকতে থাকতে তার মনে চিন্তার উদয় হ'ল। সে কল্পনার রাশ খুলে দিল। এই এক সরা ছাতু নিয়ে সে কি ক'রবে? বাজারে গিয়ে বিক্রি ক'রবে। বিক্রি করে যে টাকা পাবে তাই দিয়ে সে অনেকগুলি গরু কিনবে। গরুর দুধ বিক্রি ক'রে যখন তার অনেক টাকা হবে তখন সে হাজার বিঘা জমি কিনবে, আর একটা প্রকাণ্ড বাড়ি তুলবে। তখন তো সে দস্তুরমতো বড়লোক হ'য়ে যাবে। একটি সুন্দরী মেয়েকে তখন সে বিয়ে ক'রবে, আর তার একটি ছেলে হবে। তারপর···তার কল্পনার বেগ উদ্দাম হ'য়ে উঠলো··· একদিন সেই কান্না সুরু ক'রবে। ছোট ছেলেমেয়েদের কান্না সে মোটে সহ্য ক'রতে পারে না। স্ত্রীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রবে ছেলে কাঁদছে কেন? স্ত্রী মুখঝামটা দিয়ে উত্তর দেবে, জানি না। তখন তার হ'য়ে যাবে ভয়ানক রাগ, সে স্ত্রীকে মারবে লাথি। কল্পনার সঙ্গে তার হাত-পাও কাজ ক'রে যাচ্ছিল। সত্যি সত্যিই সে পা তুলে মারলো এক লাথি,

আর সেই লাথি লেগে ছাতুর সরা উল্টে গিয়ে সমস্ত ছাতু মাটিতে ছড়িয়ে প'ড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার শূন্যে নির্মিত সৌধও ভেঙে গেল।

সমগ্র জগৎ আজ এক মহা সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। শস্ত্রপাণি দুইটি মহা শক্তিশালী জাতি আজ ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ হ'য়ে পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে। কখন যে যুদ্ধ বাধবে তার ঠিক নেই। তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি সত্য সত্যই বাধে তবে আধুনিক যে সমস্ত পৃথিবী-বিধ্বংসী মহাস্ত্র আবিষ্কৃত হ'য়েছে তার কল্যাণে গোটা পৃথিবী রসাতলে যেতে কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় লাগবে না। তখন কোথায় থাকবে দেশের সীমানা, ভাগ নিয়ে কোন্দল, মানুষের শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড়াই? এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান যে কত মিথ্যা, কত অর্থহীন, যুদ্ধ যে বিনাশ ডেকে আনে যুযুধানদের সেই সত্যই প্রমাণিত ক'রেছেন লীলাবতী সমান শক্তিশালী ও সমান দীর্ঘ দুইটি গোখরো সাপের মারাত্মক লড়াইয়ের গল্পের মধ্য দিয়ে। একটি সাপ অপর সাপটিকে লেজের দিক থেকে গিলতে সুরু ক'রলো, দ্বিতীয় সাপটিও প্রথমটিকে একই রকমভাবে গিলতে আরম্ভ ক'রলো, ফল কি হ'ল? দু'জনের কারুরই অস্তিত্ব রইলো না। আজকের দিনে যুদ্ধের ঘনায়মান কালো মেঘ দেখে লীলাবতীর এই গল্প থেকে আমাদের সতর্ক হবার উপদেশ নেবার প্রয়োজন আছে।

অনেক সময় সামান্য কারণে বা বিনা কারণেই আমরা ঝগড়া করি, ঝগড়া ক'রে নিজেদের শক্তিক্ষয় করি, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনি নিজেদের। অথচ একটু ধৈর্য ধরে যদি আমরা চিন্তা করি, একটু যদি পরমতসহিষ্ণু হই তবে আমরা বেঁচে যেতে পারি। কিন্তু তা হয় না, আমাদের সে বুদ্ধি যোগায় না। এই উপদেশই দিয়েছেন আমাদের একজন গল্পকার তাঁর একটি গল্পে। দু'টি লোকের মধ্যে ঝগড়া সুরু হ'ল—আধ ডজন বেশি না ছ'টা বেশি। একজন ব'লছে, ছ'টা আধ ডজনের চেয়ে বেশি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ব'লছে, কিছুতেই নয়, তা হ'তেই পারে না।

সমস্যার মীমাংসা আর কিছুতেই হয় না। তখন দু'জনের মধ্যে লড়াই আরম্ভ হ'ল এবং সে লড়াই শেষ হ'ল দু'জনের মৃত্যুতে। ঝগড়ারও শেষ হ'ল।

বাংলায় একটা কথা আছে 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী', সংস্কৃতেও অনুরূপ একটা কথা আছে 'গণ্ডুষ জল মাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে।' এর অর্থ হ'ল যার বিদ্যা যত কম সে তত বেশি নিজেকে বিদ্বান ব'লে জাহির করার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। এ ছাড়াও অনেকে সামান্য লেখাপড়া শিখে মনে করে অনেক শিখে ফেলেছি, প্রচুর জ্ঞানলাভ হ'য়েছে। আসলে সে যে একেবারেই কিছু শেখে নি একথা তার বুঝবার উপায় থাকে না, ফলে অল্প জ্ঞান নিয়ে অতিরিক্ত অহঙ্কারের অসারতা কোন কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়লে প্রমাণিত হয়, এইটেই একটা গল্পের মধ্য দিয়ে বলা হ'য়েছে। এক ছুতোর মিস্ত্রীর মনে মনে ভারি অহঙ্কার ছিল। সে ফুট-গজ-ইঞ্চির হিসাব খুব ভালো জানে, গড়পড়তা কোন জিনিসের কতটা হয় তা তার মতো আর কেউ হিসাব ক'ষে বের করতে পারে না। একদিন সেই ছুতোর মিস্ত্রী কাজ উপলক্ষে আর একটা গ্রামে যাচ্ছিল, পথে একটা নদী পড়লো। খেয়া পার হ'তে হবে খেয়ানৌকোয়, কিন্তু পয়সা ব্যয় ক'রতে, বিশেষ করে খেয়া-নৌকোর মাঝিকে অনর্থক পয়সা দিতে সে যাবে কেন? সন্ধ্যা পর্যন্ত সে নদীর ঘাটে ব'সে রইলো। অন্ধকার যখন গাঢ় হ'ল তখন সে জলে নামলো। সে সাঁতার জানতো না, কিন্তু জলের গভীরতা গড়পড়তা কতটা তা সে মনে মনে আগে থেকেই হিসাব করে রেখে দিয়েছিল, মনে ক'রেছিল হেঁটেই নদী পার হতে পারবে। হিসাবটা এই রকম—নদীর দুই পাড়ের দিকে জলের গভীরতা হ'চ্ছে ছয় ইঞ্চি ক'রে। আর মাঝখানের গভীরতা হ'চ্ছে দশ ফুট। তা হ'লে জলের গড়পড়তা গভীরতা দাঁড়াচ্ছে মাত্র ৩½ ফুট। ছুতোর মিস্ত্রী নিজে ছিল পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা। হিসাব-টিসাব ক'ষে মিস্ত্রী তো জলে নামলো এবং নদীর গভীর জলে সে নিমেষের মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেল! এতো যে গভীর তার হিসাব-জ্ঞান তা তাকে রক্ষা করতে পারলো না।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ভগবানকে নিয়েও মানুষের মতদ্বৈধতার অন্ত নেই। যুগে-যুগে, দেশে-দেশে, মুনি-ঋষি ও মহাপুরুষেরা ভগবানের রূপ ধ্যান ক'রেছেন, ফলে বিভিন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হ'য়েছে। ভগবানের সামগ্রিক রূপ কি তা কেউ স্পষ্ট ক'রে বলতে পারে না। একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণই উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'যত মত, তত পথ।' ভগবান মহাসাগরের মত অসীম, তাঁর অন্ত কেউ পায় না। দেশ দেশ থেকে বিভিন্ন নদীর স্রোত যেমন গিয়ে মহাসাগরে মিলে যায় তেমনি মানুষ আপন আপন জ্ঞান বিশ্বাস নিয়ে যে ধর্মমতই অনুসরণ করুক ভগবানের চরণেই তার শেষ আশ্রয় মিলবে। শুধু ভগবানের নয়, কোন জিনিসেরই সামগ্রিক রূপ একবারে মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। অংশবিশেষই আমরা দেখি। আমাদের দেখা যেমন অসম্পূর্ণ, আমাদের জ্ঞানও তেমনি অসম্পূর্ণ। অথচ সেই অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়েই আমাদের জ্ঞানের বড়াই, আমরা সবজান্তা সেজে বসি। এমনি ক'রে অবতারবাদে আমাদের দেশ ছেয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে অন্ধদের হাতী দেখার গল্প মনে পড়ে। হিন্দুস্থানের আটজন অন্ধকে একটা হাতীর কাছে দাঁড় করিয়ে হাতীটাকে পরীক্ষা ক'রে তার চেহারা কেমন বলতে

বলা হ'ল। প্রথম অন্ধ লোকটি হাতীর পায়ে হাত দিয়ে ব'লে উঠলো,—হাতী দেখতে থামের মতো। দ্বিতীয় লোকটি হাতীর পিঠে হাত দিয়ে ব'লে উঠলো হাতী দেখতে দেওয়ালের মতো। তৃতীয় অন্ধ লোকটি লেজে হাত দিয়ে বললো, হাতীর চেহারা মুষলের মতো। এমনিভাবে হাতীর শরীরের যেখানটায় যার হাত প'ড়লো সে সেইভাবে হাতীর চেহারার বর্ণনা দিল, কিন্তু কারুর বর্ণনাই পূর্ণাঙ্গ সত্যকে প্রকাশ ক'রতে পারে নি। এমনিই হয়, অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণ, কোন জিনিসের সবটা দেখতে পায় না সে, তবুও সে না দেখে দেখার ভাণ করে, না জেনে জানার ভাণ করে।

আধুনিক রূপকগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'চ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অহিংস সাপের গল্প। এক সাধু একটি জাত সাপকে অহিংস হবার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন। সাপ সেই উপদেশ একান্তভাবে মেনে চলে, কারুকে সে দংশন করে না—এমন কি হিস্‌হিস্ শব্দ পর্যন্ত করে না। সাপের এই অবস্থা দেখে পাড়ার ছেলেরা বেশ মজা পেয়ে গেল। তারা তাকে নানারকমভাবে জ্বালাতন করতে সুরু ক'রে দিল। কেউ লেজ ধরে টানে, কেউ মাথায় ঠোকা দেয়, কেউ বা দূর থেকে ঢিল ছুড়ে মারে। কিন্তু সাপ সব সহ্য করে। কারুকে কিছু বলে না।

অবস্থা তার দিনের পর দিন কাহিল হ'য়ে উঠলো। হয় তো বা মারাই যাবে শেষ পর্যন্ত। তখন সে সেই সাধুর কাছে গিয়ে হাজির হ'য়ে বললো, প্রভু, আর যে সহ্য করতে পারছি না।

সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, কেন, কি হ'ল?

সাপ বললো, ছেলেগুলো আমাকে আর বাঁচতে দেবে না, নানারকমভাবে তারা আমার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।

সাধু বললেন, তোমাকে অহিংস থাকতে বলেছি, কারুকে কামড়াতে নিষেধ করেছি সত্য, কিন্তু হিস্‌হিস্ করতে তো নিষেধ করি নি। হিস্‌হিস্ করো, দেখবে কেউ আর তোমার ধারে-কাছেও ঘেঁসবে না।

সাপ সেইদিন থেকে হিস্‌হিস্ শব্দ ক'রতে আরম্ভ করে দিলে, ছেলেরা ভয় পেয়ে দূরে পালিয়ে গেল।

আর একটা আধুনিক গল্পে আছে এক বক তার সুন্দর সাদা ধবধবে ছানাটাকে তুলে এনে কাককে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো—এ রকম সুন্দর সাদা ছানা তোর কখনো দেখেছিস?

কাক তার নিজের ছানাটাকে এনে বকের মুখের সামনে তুলে ধরে বললো—আমার ছানার মতো এমন কুচকুচে কালো একটা ছানা তোর দেখা তো!

বস্তুত এই রূপকথার প্রতিপাদ্য কথা হচ্ছে প্রত্যেক মায়ের চোখে তার নিজের সন্তানই সবার চাইতে সুন্দর। সন্তান দেখতে যেমনই হোক সব মা'ই তাঁর নিজের সন্তানকে স্নেহের ধারায় অভিষিক্ত করে কোলে তুলে নেন। আর একটা গল্প আছে এক সিংহ-শাবক এবং কুকুরের বাচ্চার। সিংহ-শাবকের চেহারার মধ্যে এমনই একটা গাম্ভীর্য ও তেজস্বিতা ফুটে বেরুচ্ছে যা স্বতই তাকে রাজ-মর্যাদায় ভূষিত করে। তার জন্যে তাকে সোনার শিকল গলায় পরতে হয় না। অলংকার গায়ে দিতে হয় না। কিন্তু কুকুরকে সোনার শিকল পরিয়ে সোনার অলংকার দিয়ে সাজালেও সিংহের মতো তার কখনো চেহারা হয় না। সিংহের মর্যাদা কুকুর কখনো পেতে পারে না, পায় না। সিংহের আসন চিরদিন উপরে।

পারস্য দেশে তিন নেশাখোরের একটা মজার গল্প আছে। তিনজন নেশাখোর—একজন খেয়েছে মদ, একজন গাঁজা এবং তৃতীয় ব্যক্তি আফিং। তিনজনই নেশায় বুঁদ। রাতের বেলা তারা তিনজনে গিয়ে প্রাচীরঘেরা ইস্পাহান শহরের সদর ফটকের কাছে দাঁড়ালো। ফটক ভিতর থেকে বন্ধ। কি ক'রে ঢুকবে তারা? কি ক'রে ভিতরে ঢোকা যায় তিনজনে ভাবতে বসলো ও খানিকক্ষণ পরে মাতাল ব্যক্তি তার সঙ্গীদের বললো, 'এসো এক কাজ করা যাক। ঝটিকার বেগে এসো আমরা ফটকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, তা হ'লেই ফটকের খিল খুলে যাবে।' কিন্তু হাজার লোক একসঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও সে দরজা এতটুকু নড়ানো যেতো কি না সন্দেহ।

আফিংখোর বললো, 'এসো রাতটা আমরা ফটকের বাইরে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই। ভোর হ'লে পরে শহরে ঢোকা যাবে।

আর তৃতীয় লোকটি, যে গাঁজা খেয়েছিল সে বললো—'এসো আমরা চাবির গর্তের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি মেরে শহরে ঢুকে পড়ি।'

পৃথিবীর নানান দেশে, বিশেষত প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে কত যে অসংখ্য রূপক, রূপকথা, গল্প ও কাহিনী ছড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। সে সব গল্প ও কাহিনী কিভাবে এবং কোথায় যে সৃষ্টি হ'ল তা জানা যায় না, যেমন জানা যায় না—কে প্রথম রান্না করার পন্থা আবিষ্কার করেছিল কিংবা যুদ্ধে তীর-ধনুকের ব্যবহার করার বুদ্ধি প্রথম কার মাথায় এসেছিল! সমস্ত বড় বড় আবিষ্কারের মূলে একই রহস্য, একই প্রক্রিয়া কাজ করছে। পৃথিবীকে সমৃদ্ধ ক'রে চলেছে এমনিভাবে যুগে যুগে মহা মহা সভ্যতার দান—এই সভ্যতাই মানুষকে তার আদিমতম অন্ধকারময় পশুজীবন থেকে হাত ধ'রে এনে পৌঁছে দিয়েছে আজকের এই আলোকোজ্জ্বল সভ্যতার মণিকোঠায়, পশু থেকে মানুষকে উন্নীত করেছে দেবতায়। আজ আমরা আণবিক সভ্যতার সিংহদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

একবিংশ স্তবক

রাস-বিলাস

তারপরে এল বসন্তকাল।

যে খেলাটি এই সময় উৎসব-সাজে সেজে উঠে চারুতর করে তোলে লোকাচারগুলিকে, তার নাম 'হোলাকা'। এই খেলা সকলের প্রিয়। ক্রীড়াপ্রিয় স্বর্গের দেবতারাও দেখতে ভালবাসেন, খেলতে ভালবাসেন সেই খেলা। ব্রজমণ্ডলে এ খেলা যখন নববলে বলীয়ান্ হয়ে আরম্ভ হয়, তখন নিয়মের বালাই থাকে না একফোঁটাও। তখন সকাল বিকেল সন্ধ্যে রাত্তির জ্ঞান থাকে না খেলোয়াড়ের।

বেণুখানি হাতে নিয়ে সেই খেলায় আজ মেতে উঠেছিলেন বনমালী। সঙ্গে তাঁর কুতূহলী হলী···অগ্রজ শ্রীবলরাম। উৎসবের মহিমায় লজ্জার স্থান ছিল না বৃন্দাবনে। কৃষ্ণকে ঘিরে কৃষ্ণগান গাইতে গাইতে খেলায় মেতে উঠেছিলেন কৃষ্ণের অনুরাগিণীরা, আর রামগান গাইতে গাইতে বলরামকে ঘিরে মেতে উঠেছিলেন তাঁরও অনুরাগিণীদের দল। একটি মণ্ডলেই দুই ভ্রাতা পৃথক্ পৃথক্ বিহার করছিলেন···মান ও ঔচিত্য বজায় রেখে। দু'জনেই হরণ করছিলেন নিজের নিজের ক্রীড়াসঙ্গিনীদের মন। কৌতুকেরও অমৃতরসে চিকণ হয়ে উঠেছিল মণ্ডল। বসনে ভূষণে অলঙ্কারে দু'জনেই সাজাচ্ছিলেন মনোরমাদের। চমৎকৃত হয়ে উঠেছিলেন সেই বিদগ্ধ মুগ্ধ সুচতুর সুন্দরী-সমাজ, দু'জনেরি প্রেমালাপে; এবং দু'জনেই অক্ষত আনন্দে শুনছিলেন সুন্দরী কণ্ঠের সপ্তস্বর, মূর্চ্ছনা ও কম্পনের বিমোহন দক্ষতা।

দেশাচার-অনুসারে দুই ভাইয়েরি ক্রীড়াসঙ্গী হয়েছিলেন তাঁদের প্রণয়ী সহচরেরা। এ খেলায় তাঁরাও হর্ষমুখর হয়ে উঠেছিলেন,···অবশ্য এঁদের বশ্যতা স্বীকার না করেই। বাদ্যের তালে তালে তাঁরাও দিচ্ছিলেন কর্ণ-রম্য করতালি, ঝঙ্কার দিয়ে উঠছিল তাঁদেরও হস্তবলয়, অনুকূল বোল তুলছিল মধুরতার। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কণ্ঠে ফুটে উঠছিল চর্চরী-রাগের দ্বিপদিকা। এ যেন এক কস্তুরীমাখা কান্ত-গানের মহোল্লাস। পরিজনেরাও যোগ দিচ্ছিলেন সেই গীতোল্লাসে।

ময়ূর-ডাকা মধুরাত। তরুণ-তরু গহন রমণীয় কানন। জ্যোৎস্নার শান্তি। হোলি খেলছিলেন দুই ভাই।

নৃত্যগীত-কুতূহলী হলীর তখন এক বিচিত্র মত্ত অবস্থা। চৌদিকে তাঁর প্রেমিকাদের ভিড়, আর সেই রূপের নীড়ের মাঝখানটিতে তিনি নাচছেন,···গণ্ড-মণ্ডল-চলৈক-কুণ্ডলঃ,···বারুণী-মদ-বিঘূর্ণিতেক্ষণঃ।

হিমগৌর অঙ্গ থেকে খেয়াল নেই কখন খসে পড়ে গেছে ঘন নীল উত্তরীয়। আধখানা বুক খোলা। তিমির-ঘেরা দূর শশাঙ্কের যেন প্রতিচ্ছবি।

তিনি নাচছিলেন। চর্চরী-দ্বিপদিকাদি গীতের তালে তাল রেখে তিনি নাচছিলেন। এ যেন এক প্রমদ-বিহ্বল মূর্তিমান মদ্যের নৃত্য-প্রকাশ। নাচছিলেন আর হাসছিলেন, হাসছিলেন আর গাইছিলেন, গাইছিলেন আর প্রেয়সীদের সঙ্গে খেলছিলেন, খেলছিলেন আর ছুড়ছিলেন আবীর-গুলাল···যেন শ্রীমদনের সুরভি-সিন্দুর।

চন্দ্রাবলী এদিকে তাঁর আপন সখীদের নিয়ে ঢেউ তুলেছেন হাসির; ললিতাদি আপন সখীদের নিয়ে রাধা বাণ ছুড়েছেন পরিহাসির; যূথপাদের নিয়ে হাস্য-পরিহাসে গা ভাসিয়েছেন শ্যামা আর ভদ্রা। হাসি-ঠাট্টা-তামাসার বিলাসে এবং মদিরার প্রকোপে যখন টানা টানা ও বিশাল হয়ে উঠল সকলের চোখ, তখন তাঁরা ইনি ওঁর গায়ে উনি এঁর গায়ে ছুড়তে আরম্ভ করে দিলেন সৈন্দুর-রেণু আর কৌঙ্কুম-রেণু। আর রঙ্গে রঙ্গে রঙ্গিলা হতে হতে বীণায় বীণায় ঝঙ্কার তুলে সকলে মিলে আরম্ভ করে দিলেন দ্বিপদিকায় মত্ত গান।

নীরব থাকতে পারলেন না কৃষ্ণ। অধরে মুরলী ধরে তিনি তখন প্রকাশ করলেন তাঁর মুরলীর ভাষা। সে ভাষার অস্ফুট মধুরতায় কোথায় যেন পালিয়ে গেল সখীদের সুচির-সঞ্চিত গীত-গর্ব। তাঁরা গান ভুললেন, ঘিরলেন তাঁকে এবং ঘিরতে ঘিরতে আমোদের দুরন্ত আবেগে ছুড়তে লাগলেন কাশ্মীররেণু···একত্রে।

মদবিহ্বল কলভ-রাজ যেমন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে যায় গান শুনে, তেমনি হল শ্রীকৃষ্ণের দশা। তিনি মুখ নীচু করে···নিষ্পন্দ-মহিমায়···সহ্য করতে বাধ্য হলেন ঝঙ্কৃত-কঙ্কণ করতলের সেই কুঙ্কুমের আক্রমণ। সে আনন্দে প্রমদাদের ভুরু যেন আর নাচে না। আরো নাচে না কেন জানেন? তাঁরা বিস্ময়ে বিলীন হয়ে শুনতে পেলেন,···চর্চরীরাগের সোহাগে, ···ও যে থামে না, ও যে থামে না শ্রীহরির ঐ বেণুগান।

২। শ্রীবলরামকে অবলম্বন করে নিতান্ত উন্মদার মত আবীর-খেলায় মেতে উঠেছিলেন যে সব সুন্দরীরা, খেলার বিক্রমক্রমে সবিভ্রম ভ্রমণ করতে করতে তাঁরা যখন সান্নিধ্যে এসে পড়লেন কৃষ্ণমণ্ডলের, মদান্ধ কুঞ্জরসিংহের মত বলরাম তখনও নাচছেন। তাঁর খেয়ালই নেই, তিনি এসে পড়েছেন তাঁর ছোট ভাইটির নর্মলীলার এলাকায়। কিন্তু তালে ভুল

করলেন না তাঁর অনুরাগিণীর দল। তাঁদের চোখে ঝিলিক খেলে গেল রসিকতার। তাঁরা যেমন গাইতে লাগলেন তেমনি আবার গাওয়াতেও লাগলেন; আর তালে তালে উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল তাঁদের হাতের চঞ্চল বলয়ের লয়দার ঝঙ্কার। তাঁরা যেমন নাচতে লাগলেন তেমনি আবার নাচাতেও লাগলেন; আর তাঁদের চরণে চরণে ফুটতে লাগল মঞ্জু-মঞ্জীরের ভৃঙ্গ-হুঙ্কার। আর সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক উপহাসের মাধবী-বর্ষণে তাঁরা অদূর থেকেই দেবরের অঙ্গে সকৌতুক বিকীর্ণ করতে লাগলেন কৌঙ্কুমী কেলিধূলি।

আর যায় কোথায়। কৃষ্ণাপাঙ্গের ইঙ্গিত এল, আর উদ্দাম হয়ে উঠলেন তাঁর সহচরেরা। তাঁরা একসঙ্গে এমন বিক্রমে ওড়াতে লাগলেন লাল সাদা আর হলুদ রঙের সুগন্ধি ফাগুয়া, যে রঙের ঝড়ে সত্যিই বুঝি বলরামের সখীরা উড়ে যান! কৃষ্ণের গম্ভীর মুখের স্নিগ্ধতায় ও মুগ্ধতায় নীরবে নাচতে লাগল নানান ধরণের হাসি; বাজতে লাগল বেণু···পরিহাস ছড়িয়ে। কিন্তু কৃষ্ণবধূরা নীরব থাকবার মেয়ে নন। তাঁদের মণ্ডল থেকে সবল-স্বননে ভেসে আসতে লাগল কেকোৎকণ্ঠী কত পরিহাসের পারিপাট্য, হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ···কত হাততালির হাস্য!

৩। এ আবার কোন হাল হালে প্রচণ্ড হৈ-হৈ! ···জ্ঞান হল মদমত্ত রোহিণী-সুতের। রেগে উঠলেন তিনি মাতাল হাতীর মত। খেলাই হয়ে উঠল সংগ্রাম। কেলিধূলি বিক্ষেপ করতে করতে তিনি ছুটলেন।

৪। তাঁকে আসতে দেখেই, সরে পড়লেন কৃষ্ণ-বনিতারা;···সিংহাবলোকন ন্যায়ে লজ্জাদেবী যেমন করে সরে পড়েন দু'পা এগিয়ে একবার ফিরে, জয়াকাঙ্ক্ষী প্রতিভা যেমন করে সরে পড়ে অপ্রতিভ হয়ে। ওমা, উনি যে ভাসুর-শ্রেণীর,···ওঁর সঙ্গে কি খেলা চলে? অতএব, সরে পড়লেন কৃষ্ণের বনিতারা।

কিন্তু এগিয়ে এলেন কৃষ্ণের সহচরেরা। তাঁরা এগোতেই, অনন্তনাগের মত তাঁর বিপুল বাহু মেলে, হাসতে হাসতে ভুজোপপীড়-বন্ধনে তাঁদের প্রত্যেককে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন এক-কুণ্ডলী ভগবান শ্রীবলরাম। তাঁদের রঙিন করে দিলেন কেলিধূলির সন্দৃপ্ত বর্ষণে।

৫। কিন্তু সহচরেরাও কেউ কম যান না। চক্রপাণি কৃষ্ণের তাঁরা না সহচর? শ্রীবলরামের বিরাট ভুজবন্ধন থেকে সবলে নিজেদের মুক্ত করে নিয়ে তাই তাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে আক্রমণ করলেন বলরামকেই। এ-সব খেলায় কি গণনার মধ্যে ধরতে আছে বড়দের মর্যাদা বা গৌরব? অতগুলো সুন্দর মুখের রম্য হুঙ্কারে হকচকিয়ে গেলেন শ্রীবলরাম। আবীরের বীরত্বে তাঁকে স্বীকার করতেই হল পরাজয়।

৬। নন্দকুমার তো হেসেই আকুল। তাঁর মুরলীধর রাঙা অধর যেন স্নান করে বসল জ্যোৎস্নায়। তিনি না না করে বারণ করতে করতে বললেন,—

'এ তোমাদের ভারী অন্যায়। আদবেই রুচিবর নয়। একদিকে আর্য একলা, আর একদিকে তোমরা সকলে। এ জয় জয়ই নয়, এতে আছে, অনার্য মনের পরিচয়।'

শুনেই সেখানে ছুটে এলেন শ্রীবলরামের নিতান্ত অনুরাগবতীরা। তাঁরা তো বলরামের চেহারা দেখে অবাক্।

প্রথমা বলে উঠলেন,—'কি রূপ গো সই কি রূপ! একটা হীরের থানকে যেন ছুঁইয়ে দিয়েছে পদ্মরাগমণির জৌলুষ।'

দ্বিতীয়া বলে উঠলেন,—'না না, অত ধোয়া রঙ নয়, অত নরম রঙ নয় গো সত্যিই যেন একটি মহাস্ফটিকের অঙ্কুরের উপর উজাড় হয়ে ঢলে পড়েছে জবাফুলের রাঙা আবেগ।'

তৃতীয়া বলে উঠলেন,—'না না, কে বলেছে ঢলে পড়েছে ওঁর রঙ? কি রূপ লো সই, কি রূপ! যেন তুষার পাহাড়ের মাথায় অরুণ আভা লেগেছে প্রভাত-রবির।'

চতুর্থী বললেন,—'কি যে তোদের উপমার ঢঙ। অমন রগ্‌রগে সিঁদুরে আবীর দেখেও তুষারের উপমা ভাবতে পারলি? আমার কি মনে হচ্ছে জানিস সই? উনি যেন একটি শ্বেতকমল, আর ওঁকে আক্রমণ করেছে চক্রবাক্-ওড়া কোকনদের রক্তকানন।'

পঞ্চমী বলে উঠলেন,—'আর থাক খুব হয়েছে। সত্যিই উনি যেন সন্ধ্যার রক্তিমা-লাগা ভরা চাঁদের ছবি।'

আনন্দে নাচতে-নাচতে গাইতে-গাইতে, বাজনা বাজাতে-বাজাতে, তাঁরা ঝুম-ঝুম করে এগিয়ে এলেন, ঘিরে ফেললেন সিন্দুর-রেণু-রুষিত তাঁদের প্রিয় নায়ককে। বলরাম তখনও নাচছেন, মত্ততা ও কৌতুক তখনও তাঁকে নাচাচ্ছে।

তারপরে দু'পক্ষেরই অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেল আবীর কুঙ্কুম গুলালের অস্ত্র নিয়ে কেলি-যুদ্ধের। কৃষ্ণের আনন্দ আর ধরে না।

হোলিখেলায় বিক্রম দেখাতে দেখাতে যখন একটু অন্তরালে সরে গেছেন বল-পক্ষীয়েরা তখন কৃষ্ণ-পক্ষীয়া একটি মহিলা···কাপিশায়ন—মদিরা পান করে কাম-হেলায় তখনও যাঁর বিহ্বল তনু···উৎসবীকণ্ঠে বলে উঠলেন,—

৭। 'সারা গায়ে অগুরুর গন্ধ উড়িয়ে কৃষ্ণ আমার কি বাঁশরীই না বাজাচ্ছেন!···কেমন করে সরানো যায় ঐ বাঁশরী? ঐ ছোট্ট বাঁশরী। ওটিকে সরালেই কৃষ্ণের আমার খতম হয়ে যাবে সব উল্লাস। উঃ, ওটির যেই সংযোগ হয় অধরে, যেই বাজে, অমনি আমাদের গানের বুকে ঢিপ

টিপ পড়তে থাকে শেল। ঐ বাঁশীটিকে বশে আনবার একটা বার করতেই হবে উপায়।'

বলতে বলতে ভাবতে ভাবতে তিনি পৌঁছে গেলেন এক সখীর কান থেকে আর এক সখীর কানের কাছে। মন্ত্রণা ও সুচারু নিপুণতার উদ্ভাবনে তিনি ব্যতিব্যস্ত। ফিস ফিস করে বলতে লাগলেন,—

'সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ওঁর হাত থেকে যে ছিনিয়ে নেব মুরলী তা অসম্ভব। আর মুরলীটিরও বিরাম নেই, বিবশ হতেও জানে না। তা হলে এখন কেমন করেই বা এই চুরি বিচ্ছেটি ঘটাই?'

মুচকি হেসে হেসে, কানে কানে কথা কইতে কইতে, চোখ বড় বড় হয়ে উঠল সকলের···ফোটা পদ্মের মত।

৮। 'পুরুষ-পুষভটিকে কেমন করে বশে আনা যায়'···এই প্রশ্নটি মনের মধ্যে আলোড়ন করতে করতে, তাঁরা উপস্থিত হয়ে গেলেন বৃষভানুনন্দিনীর কাছে। নিভৃতে তাঁকে বললেন, 'ও বাঁশীটির উপর যে আপনার লোভ আছে, ও বাঁশীটিকে যে আপনি বশে আনতে চান তা আমাদের অজানা নেই। ওটিকে যদি পেতে চান, তা হলে এখন একটু ছল করে মানিনী সেজে বসে থাকুন। কৃষ্ণের বংশী-বাদন-প্রগলভতা ঘুচে যাবে; আর আমাদেরো ফলাও হবে সঙ্গীতের অতি নৈপুণ্য।'

সখীদের এই নিভৃত আলাপচারী যদিও কর্ণগোচর হল না কুসুমাসবের, তবুও যিনি প্রতিভাধর তাঁর সহজাত বাচালতার ফুল ফুটতে গন্ধ ছুটতে আর কতক্ষণ! তাঁর তো আর কাউকে ভয়ের বালাই নেই। সখীদের গুজগুজুনি ফিসফিসিনি দেখেই তিনি সটান পৌঁছে গেলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। বললেন, 'বয়স্য, মুরলীর গানের সঙ্গে এক চালে চলতে পারছে না ঐ মহিলাগুলির সঙ্গীত। তাই বোধ হচ্ছে, ষড়যন্ত্র চলেছে মুরলী-চুরির। অতএব মুরলীটি মদীয় হস্তে সমর্পণ করে কণ্ঠযোগেই গান চালান। আমার ব্রহ্মণ্য-প্রতাপের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারবেন না ওঁরা।'

কৃষ্ণ বললেন,—'বয়স্য, বসন্তোৎসব তো আপনারি। আর আমারো তো অদেখা নয় ব্রাহ্মণের প্রভাব ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তির বিরাট ছটা। আজ মুরলীটাকে রক্ষা করবার ক্ষমতা যে একলা আপনারি সবচেয়ে বেশি, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।'

উত্তর এল,—'কি যে বলেন বয়স্য! যাঁর মন্ত্রণার গুণে আপনি আজ সর্বোৎকর্ষশালী শালীনতার শেষধাপে চড়েছেন, তিনি···সেই আমি···মুরলী রক্ষা করতে পারব না, সেটা কি একটা কথার কথা হল? ব্রহ্মাও চোখ চমকিয়ে দেখতে পাওয়া দূরে থাক্ ধরতেও পারবেন না আমাকে এই সংসারে। আমার মত জনৈক প্রিয়পাত্রে অবিশ্বাস-স্থাপন করাটা উচিত হবে কি বন্ধু?'

কৃষ্ণ বললেন,—'আহা তাও কি হয় বন্ধু! কিন্তু এই মহোৎসবের তৃপ্তি-সলিল অথৈ গভীর, আর প্রমদারাও নিতান্ত গরবিনী। এখন তাঁরা যদি আপনার করতল থেকে ছিনিয়ে নেন মুরলী, তখন মহাশয় কি উপায় আবিষ্কার করবেন শুনি? শ্রীমতী মুরলীদেবীটিকেই বা ফিরে পাওয়া যাবে কেমন করে?'

'তা হলে দর্শন করুন আমার তপঃপ্রভাব।'···এই বলেই কৃষ্ণের হাত থেকে নিঃসঙ্কোচে মুরলীটি ছিনিয়ে নিয়ে, বগলদাবা করে, কুসুমাসব বলে উঠলেন,—'বয়স্য, কণ্ঠযোগেই এবার গান চালান।'

'যেমন আপনার অভিরুচি'···এই বলে কৃষ্ণ উপক্রম করলেন গাইতে।

যে মুহূর্তে চর্চরী-রাগিণীতে শ্রীকৃষ্ণের বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে আবির্ভূত হল কলগানের অতিমাধুর্য, সেই মুহূর্তে স্তম্ভিত হয়ে নিস্তরঙ্গ হয়ে গেলেন কালিন্দী, অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন বৃন্দাবনের তরুলতা এবং কান খাড়া করে গান শুনতে লাগলেন বনের হরিণীরা। শুনতে শুনতে তাঁদের দু'কানের পাশ দিয়ে দরদরধারে ঝরে পড়তে লাগল ঘাম; এবং সেই স্বেদাম্বুকে গীতমাধুরীর ধারা-ক্ষরণ ভেবে হরিণীরা লেহন করতে লাগলেন পরস্পরের কান···হর্ষ-শিহরিত আবেশে। [ক্রমশ।
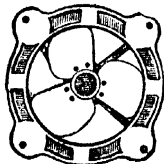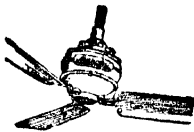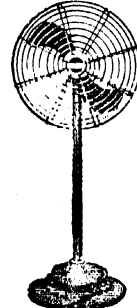
শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি কালবিজয়ী নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং সৌষ্ঠববিবর্ধনের ক্ষেত্রে তাঁর অনবদ্য অবদান সম্বন্ধে আজকার দিনে নতুন কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। তাঁর সম্বন্ধে এ যাবৎ কত আলোচনাগ্রন্থ যে রচিত হয়েছে তারও তুলনা মেলে না। এই গ্রন্থটি সেই তালিকার একটি সংখ্যাবৃদ্ধি করলেও গ্রন্থটি যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আপন পটভূমি অনুযায়ী গ্রন্থটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বললেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থটিতে শরৎচন্দ্রের প্রত্যেকটি কাহিনীর সারাংশসহ তাদের রচনা-ইতিহাস পরিবেশন করা হয়েছে। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রের রচনাদির বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের, তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচনামূলক রচনাদির এবং বিভিন্ন লেখক রচিত তাঁর জীবনীগ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে। পাঠকের যাবতীয় শরৎ-জিজ্ঞাসার অবসান ঘটাতে এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করবে বলে আশা করা যায়। একটি গ্রন্থের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের প্রত্যেকটি রচনার কাহিনী এবং তাদের ইতিহাসের সন্নিবেশ—পাঠকের কাছে এক অসাধারণ লাভ। সঙ্কলক স্বনামধন্য সাহিত্যিক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। গ্রন্থটি সম্পাদনে তিনি যে অভাবনীয় কুশলতা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন তা তুলনাবিরল। শরৎ-সম্পর্কিত সাহিত্যভাণ্ডারে এক অপূর্ব সংযোজন যুগপৎ বৈশিষ্ট্যের ও বৈচিত্র্যের অধিকারী। সাধারণ্যে শরৎ-চর্চার প্রসার ব্যাপকতর করে তোলার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের সহায়তা অপরিহার্য। প্রকাশক—শিল্পী সংস্থা, ১৬৩, আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা—৫। দাম—ছয় টাকা।

আনন্দ ভৈরবী

আধুনিক কবিকুলে প্রমোদ মুখোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর পঁয়ত্রিশটি প্রেমের কবিতা সমষ্টিবদ্ধ হয়ে এই গ্রন্থের রূপ নিয়েছে। কবিতাগুলি তাঁর সৃজনীশক্তির এক বলিষ্ঠ পরিচায়ক। মানবজীবনের প্রেমকে এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর স্বচ্ছ কবিদৃষ্টিতে প্রেমের এক বিচিত্র রূপ প্রতিভাত হয়ে তাঁর অনুভূতিমগ্ন হৃদয়ে এক অভিনব চেতনার সঞ্চার করেছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর অনবদ্য কাব্যে। ছন্দে, লালিত্যে ও প্রসাদগুণে কবিতাগুলি ভরপুর। তাঁর ভাবে প্রগাঢ়তা সুনিপুণ ব্যঞ্জনায় এবং অনুভূতির স্নিগ্ধতা কবিতাগুলিকে যথেষ্ট রসসমৃদ্ধ করে তুলেছে। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং তীব্র জীবনসচেতনতা কবিতাগুলিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। প্রকাশক—এম্ সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—দু'টাকা।

বাড়ি পালিয়ে

পিল্লা সুব্বারাও তেলেগু সাহিত্যের একটি সুপরিচিত নাম। বর্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় করানোর বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য যেসব অনুবাদকারী অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বর্তমান গ্রন্থটির অনুবাদক অন্যতম। আলোচ্যগ্রন্থটি একটি কিশোর উপন্যাস। ভারতীয় বা বাংলা সাহিত্যে কিশোর উপন্যাস-এর সংখ্যা খুবই অল্প। অনুবাদ কর্মটি তেলেগু ভাষায়। একটি বাড়ি পালানো কিশোরকে কেন্দ্র করে এই কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। ঘটনি একটি কিশোর, পিতার শাসনের ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কত চোর, বদমাস, গুণ্ডা ও সমাজবিরোধী লোকের কবলে পড়েছিল এবং তাদের কবল থেকে কিভাবে নিজে উদ্ধার পেলো ও একটি বালিকাকে নরঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা করলো, সেই কাহিনীটিই লেখক এতে সুন্দর ও মনোরমভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এ ধরণের অনুবাদ যে-কোন সাহিত্যের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। অনুবাদকের আন্তরিকতা ও সাবলীল ভাষা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। গ্রন্থটির বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—পিল্লা সুব্বারাও। অনুবাদ—বোম্মানা বিশ্বনাথন। প্রকাশনায়—শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী; ইস্ট লাইট বুক হাউস। ২০, স্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা—১। দাম—এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

অমৃত সঞ্চয়

বর্তমান সাহিত্যজগতে যে কয়জন স্বনামধন্যা লেখিকা আছেন, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের পরিচয় নতুন করে দেওয়া বাহুল্য। ১৮৫৬ থেকে ১৮৯১ সালের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে এই আলেখ্য উপন্যাসটি। ভূস্বামী, তালুকদার, সিপাহী, কৃষক বিক্ষোভ, বাঙলা ও বিহারে নীলকরদের অত্যাচার; অশিক্ষা কুসংস্কার ক্ষমতা লোভ, ঐশ্বর্যের আভিশয্য। হিন্দু-মুসলমান ও ইঙ্গসমাজের সভ্যতার কোলাহল। ভারতবর্ষে যে বিরাট বিক্ষোভের দানা বেঁধে উঠেছিল সেই সময়কার কাহিনীটি লেখিকা সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। উপন্যাস রচনা করতে গেলে একটি নিশ্চিত গল্পের প্রয়োজন হয় কিন্তু সেই গল্পটুকু ছাড়া ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস, সাধারণ মানুষের চরিত্র, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, প্রজা-সংস্কার, যানবাহন-পোশাক-পরিচ্ছদ, তুচ্ছ ও উচ্চ মানবিক ক্রিয়া ও প্রক্রিয়াকে ফুটিয়ে তুলতে সাধ্যমতো যত্নের কসুর করেন নি। বিদেশী-দেশী প্রায় একশ'টি চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে এই গ্রন্থটিতে। তাদের মধ্যে বিদেশী ম্যাকমোহন ও ভারতবাসী ভবানীশংকর দু'টি স্বতন্ত্র চরিত্র। হতভাগ্য [illegible] সাহেবের চরিত্রটি

সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ভাগ্যহীনা সুরজকুঁয়ারী চরিত্রটি বড়ই মর্মস্পর্শী। চম্পা, চিত্তলারী, চন্দন, দুর্গা প্রভৃতি চরিত্রগুলিতে লেখিকার মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটি প্রণয়নে তিনি যথেষ্ট শ্রম, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বহু শ্রমের বিনিময়ে তিনি বহু দুর্লভ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থ সন্নিবেশিত করেছে এবং রাজপুতযুগের চিত্র পরিবেশনে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ মনোরম। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম—আট টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

স্বামী বিবেকানন্দ স্মারকগ্রন্থ

স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্মজয়ন্তীবর্ষ সম্প্রতি শেষ হ'ল! সমগ্র বিশ্বে বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দের শতবর্ষপূর্তি বহু বিচিত্র সমারোহে উদযাপিত হয়েছে। মেদিনীপুর কলেজ কর্তৃক সেই মহামানবের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ আলোচ্য পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটিতে স্বামীজী সম্পর্কে বহু মূল্যবান ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনা বাঙলায় ও ইংরাজীতে প্রকাশ করে সম্পাদক মহাশয় সত্যই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। পত্রিকাটিতে যাঁরা প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন তাঁদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হ'ল সর্বশ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, জীবনকৃষ্ণ শেঠ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রভৃতি। পত্রিকাটির বহুল-প্রচার কামনা করি। সম্পাদনা—শ্রীমনোমোহন দত্ত। প্রকাশনায়——সম্পাদক স্বয়ং, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর। দাম—দুই টাকা।

নবনাট্যরূপে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মায়াবসান

অমর নাট্যকার ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি নাটককে নব-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেছেন লেখক। বলা বাহুল্য বেশ কিছুদিন ধরেই নাট্যানুষ্ঠান ও নাট্যান্দোলনের যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আলোচ্য রচনা তারই অন্যতম ফসল; এ ধরণের প্রয়াসে অভিনয়োপযোগী নাটকের সন্ধান মেলা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে ওঠে এবং সেদিক থেকে দেখতে গেলে এ ধরণের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মূল নাটকের বক্তব্য কোথাও ক্ষুণ্ণ না করে যেভাবে বর্তমান নাট্যকার নাটকটিকে ঢেলে সাজিয়েছেন, তাতে তিনি বিশেষ সাধুবাদের অধিকারী। নাট্যসাহিত্যের পরিসরে তাঁর এই অবদান একটা চিহ্নিত স্থানের দাবী করতে পারে স্বচ্ছন্দেই। ছাপা, বাঁধাই ও অপরাপর আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। লেখক—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নবনাট্যরূপ—অমর মুখোপাধ্যায়—প্রকাশনায়—এস সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স, প্রাঃ লিঃ, ১ সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২, দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

Sarat Chandra Chatterjee

শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জীর রচনা সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান আলোচনা করেছেন লেখক বর্তমান গ্রন্থের মাধ্যমে। শরৎচন্দ্রের রচনার সাহিত্যিকমান যদিও কোন নতুন মূল্যায়নের মুখাপেক্ষী নয়, তা হলেও আলোচ্য রচনা বিদগ্ধ পাঠকের সামনে এক নতুন দিগ্‌দর্শনের সন্ধান দেবে, প্রাজ্ঞ লেখকের চোখে নতুন করে শরৎ-সাহিত্যের রসমাধুর্য ধরা দেবে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে। ইংরেজী ভাষায় লিখিত হওয়ায় বিদেশী পাঠকও স্বচ্ছন্দে এর মর্মে প্রবেশ করতে পারবেন; শরৎচন্দ্র দেশ-কালের অতীত সাহিত্যশিল্পী, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে বিদেশীর পাঠযোগ্য ভাষায় এ ধরণের রচনা রচিত হওয়ার প্রয়োজনও সমধিক। প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থ নিঃসন্দেহে মূল্যবান এক সংযোজন। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—হুমায়ুন কবির, প্রকাশনায়—শিল্পী সংস্থা, ১৬৩ আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা—৫। দাম—তিন টাকা (ভারতে) দাম—ছয় শিলিং (বিদেশে)।

দৃশ্যান্তর

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি ছোট গল্প সংকলন। বর্তমানে ছোট গল্পের চাহিদা এবং প্রচলন সমধিক, সেজন্যই বহু নবাগত ছোট গল্প লেখকও সাহিত্যজগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থটির লেখক তাঁদের অন্যতম। শুধু পরিমাণ নয় গুণগত উৎকৃষ্টতাই এই গল্পগুলির প্রধান বিশেষত্ব। মহান ঐতিহ্যের সঙ্গে নূতন রচনাশৈলীর সার্থক পরিণয় ঘটিয়ে লেখক বাংলা গল্পকে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন এই সংকলনটিতে। রচনারীতির কারুকার্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ঘটনা সংস্থাপনের স্বাভাবিকতায় প্রতিটি গল্প সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মোট এগারোটি গল্প স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতে, আন্তরিকতায় ও ঔজ্জ্বল্যে প্রতিটি রচনাই সমভাবেই অনন্য, মানুষের অন্তরের গভীরে যেসব আকাঙ্ক্ষা, ঘাত-প্রতিঘাত ও বেদনার আলোড়নের সৃষ্টি করে, লেখকের বলিষ্ঠ লেখনীতে ফুটে উঠেছে তারই প্রতিচ্ছবি, আর সেজন্যই রচনাগুলি হয়েছে সফল ও সার্থক। গ্রন্থটির প্রচার কামনা করি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—চিত্ত ভট্টাচার্য। প্রকাশক—শ্রীরামপদ পাল, ২৪এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

চিত্রলেখা

জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যকার আনাতোল ফ্রাঁসের 'থেইস্' নামক উপন্যাসটিই বর্তমান গ্রন্থের মূল উৎস। মূল রচনার মতই এতেও পাপ ও পুণ্যের চিরন্তন প্রশ্নটির সমাধান খুঁজেছেন লেখক। তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়েছে কি না এ কথা এক্ষেত্রে অবান্তর, কারণ তিনি একান্তভাবেই আন্তরিক আর এটা তো প্রায় স্বতঃসিদ্ধই যে, আন্তরিক প্রচেষ্টা কখনই সম্পূর্ণ বিফল হয় না। লেখক চরিত্র সৃষ্টিতেও নিপুণ, চিত্রলেখা, কুমারগিরি বিশাল দেব প্রভৃতি চরিত্রগুলি যথেষ্ট উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত, তাঁর ভাষারীতিতেও বেশ একটা সহজ সুষমা রয়েছে, যদিও বর্তমান মূল হিন্দী থেকে ভাষান্তরিত অনুবাদকর্ম মাত্র, তবু সম্ভবত অনুবাদকের দক্ষতায় মূল রচনার ভাষা-লালিত্য অনেকটাই ধরা দেয়। বাঙলা সাহিত্যের অনুবাদ-শাখাটি যে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলেছে, বর্তমান রচনা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রচ্ছদশিল্প সুষম, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—ভগবতীচরণ বর্মা, অনুবাদ—অমল সরকার। প্রকাশক—এস সি সরকার এণ্ড সন্স, প্রাঃ লিঃ, ১সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অরণ্য - ভারত (শিকার-কাহিনী)

বন বা বন্যদের নিয়ে কিম্বা শিকারের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে পূর্বে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অরণ্য-ভারতের লেখকের চোখে অরণ্য অনুপম হয়ে ধরা দিয়েছে ও অরণ্যচারী শ্বাপদও সবুজ প্রকৃতির মধ্যে সুন্দর হয়ে উঠেছে। অরণ্যের হিংস্র কল্পনার রাজ্য ছেড়ে বাস্তবে চিত্রিত হয়েছে। শুধু সুন্দরবন নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের শিকারের কাহিনীও বিদ্যমান এই গ্রন্থটিতে। লেখকের দীর্ঘ দুঃসাহসিক চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর অরণ্য-জীবনের অভিজ্ঞতার ঘটনাগুলি বড়ই মর্মস্পর্শী। সেই মনোরম অরণ্যানীর পরিবেশ মনকে আনন্দে অভিভূত করে তোলে। অরণ্য-ভারত সত্যই একটি অপূর্ব শিকার-কাহিনী। লেখকের বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর, ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। চিত্রগুলি গ্রন্থটিকে সুশোভিত করেছে নিঃসন্দেহে। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—বিকাশকান্তি রায়চৌধুরী। প্রকাশনায়—শ্রীমতী শিপ্রা রায়চৌধুরী। ৮৪ সি, নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৫। পরিবেশনায়—দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শেষ বসন্ত

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু একটু নতুন ধরণের। এক বৈজ্ঞানিকের থিয়োরীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এর পাত্র-পাত্রী। বর্তমান স্নায়বিক বিপ্লবকেই যেন আক্রমণ করেছেন লেখক ছদ্মবেশী মেঘনাদের মতন। বৈচিত্র্যের একটা নতুন স্বাদ পাওয়া যায় রচনাটির মাঝে—যা সত্যই কৌতূহলপ্রদ। অঙ্গসজ্জা শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—অভিজিৎকৃষ্ণ বসু, প্রকাশক—রূপা এ্যাণ্ড কোং, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা।

পঞ্চশর

আলোচ্য রচনায় বিষয়বস্তু বিদেশী এক নামকরা নাটক থেকে গৃহীত। হাল্কা হাসির ছোঁয়ায় উজ্জ্বল নাটকটি পাঠকের মনোরঞ্জন করবে বলেই মনে হয়, নাট্যকারের সাবলীল শৈলীও বেশ উপভোগ্য। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শেখর চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—দীপ্তেন রায়, ৪৪।২বি, হাজরা রোড, পরিবেশক—গ্রন্থালোক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম—দু'টাকা।

পঞ্চমাঙ্ক

'আগাথা ক্রিষ্টি' রহস্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ এক চিহ্নিত নাম, বস্তুত একমাত্র কনান ডয়েলের অমরসৃষ্টি 'শার্লক হোমস্' ব্যতীত রহস্য-রোমাঞ্চের পরিসরে শ্রীমতী ক্রিষ্টির অবদান 'হার্কুলি পারে' প্রায় অনন্য; কি ঘটনা সংস্থাপনে কি রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টিতে শ্রীমতী ক্রিষ্টি অতুলনীয়া এবং সেজন্যই আজ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক অধিবাসীর কানে 'আগাথা ক্রিষ্টি' এই নামটি শুধু সুপরিচিতই নয়, সুমধুরও ঠেকে। এই সুবিখ্যাতা লেখিকার রচনার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় করানোর ভার নিয়েছেন 'ত্রিবেণী প্রকাশন'। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁদের এই প্রচেষ্টার পঞ্চম ফসল, মূল রচনার ভাবমাধুর্য প্রায় অবিকল বজায় রয়েছে, অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই যে আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যায় বর্তমান রচনা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, বলা বাহুল্য এজন্য যে কৃতিত্ব তা সর্বাংশেই অনুবাদকের প্রাপ্য। অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। বইটির অঙ্গসজ্জাও শোভন। লেখিকা—আগাথা ক্রিষ্টি, অনুবাদক—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রকাশনায়—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

মানুষের মুখ

বর্তমান গ্রন্থে লেখক একাধারে শিল্পী ও সাহিত্যিক, গ্রন্থের অঙ্গসজ্জাই যাঁর পেশা তাঁর হাতে বিষয়বস্তুও যে সমানভাবে শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে, আলোচ্য উপন্যাসটি তারই স্বাক্ষরবাহী। এক গ্রাম্য যুবকের জীবনায়ন করতে চেয়েছেন লেখক, বর্তমান রচনায় তাঁর সে উদ্দেশ্য খণ্ডিতভাবে সফল, কারণ এতে নায়ক অশ্বিনীর প্রথম যৌবনের বাসনা ও বাধামেশা দিনগুলির কথাই শুধু বিবৃত হয়েছে। লেখক সংক্ষিপ্ত একটুকরো ভূমিকায় জানিয়েছেন যে, উপন্যাসটি এখানেই শেষ নয়, এর জের চলবে পরবর্তী খণ্ড পর্যন্ত; আশার কথা, কারণ আলোচ্য খণ্ডে তিনি পাঠকের ঔৎসুক্য ও মনোযোগ এ দু'টোই সমানভাবে জাগাতে পেরেছেন। আন্তরিকতা ও বলিষ্ঠ শৈলী এক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক। আমরা বইটি পড়ে খুশি হয়েছি। প্রচ্ছদ শোভন, অপরাপর আঙ্গিক ভাল। লেখক—পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রকাশনায়—ত্রিবেণী প্রকাশন। ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আদি থেকে আধুনিক

আলোচ্য গ্রন্থটি এক একাংক নাটক, নাট্যকারের তত্ত্বব্যাখ্যা সহজ, তত্ত্বের পথে কেমন করে মানব থেকে দেবতা হওয়া যায় নাট্যকারের মূল বক্তব্য সেটাই। নাট্যের গতি শ্লথ ও দুর্বল, নাট্যকার যে পরিণতি লাভ করলে সার্থক হয়ে উঠতে পারেন, এক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—শম্ভুনাথ ভদ্র, প্রকাশক—চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স, ১-১-১ এ-বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—এক টাকা।

এই যে স্নিগ্ধসুন্দর সুগভীর জলরাশি সুমিষ্ট কলস্বরে দুই তীরকে স্তনদান করিয়া চলিয়াছে ইহারই শীতল ক্রোড়ে তাপিত শরীর সমর্পণ করিয়া দিয়া ইহাকে মা বলিয়া আহ্বান করা, অন্তরের এমন সুমধুর উচ্ছ্বাস আর কি আছে। এই ফলশস্য-সুন্দরা বসুন্ধরা হইতে পিতৃ-পিতামহ সেবিত আজন্ম পরিচিত বাস্তুগৃহ পর্যন্ত যখন স্নেহ-সজীব আত্মীয়রূপে দেখা দেয় তখন জীবন অত্যন্ত উর্বর-সুন্দর-শ্যামল হইয়া উঠে।

—রবীন্দ্রনাথ

॥ ১৩৭০ সালের উল্লেখযোগ্য বই ॥

প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও প্রবন্ধ সংকলন

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ২·৫০ মনোরঞ্জন গুপ্ত
আপেক্ষিকতার তত্ত্ব (এল লান্দাও, ওয়াই রুমান)
১·৫০ বিনয় মজুমদার অনূদিত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ১০·০০ যোগেশচন্দ্র বাগল
কবিগুরু ৪·৫০ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
কথাসাহিত্য ৫·০০ নারায়ণ চৌধুরী কনটেম্পোরারী পাবলিশার্স
কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ৮·০০ ডঃ সুধাকর চট্টোঃ এ মুখার্জি এণ্ড কোং
কবিস্বরূপের সন্ধ্যা ৪·০০ ডঃ রণেন্দ্রনাথ দেব বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ
আত্মা ও কাব্য ৫·০০ হরিহর মিশ্র বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ
ঘরে চলো ৪·৫০ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ ৩·০০ স্বামী সুন্দরানন্দ বিবেকানন্দ সোসাঃ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১০·০০ ডঃ সুশীল রায় জিজ্ঞাসা
নন্দলাল বসু ৬·৫০ কানাই সামন্ত কথাশিল্প প্রকাশনী
নাট্যতত্ত্বমীমাংসা ১৩·০০ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাঃ বিদ্যোদয় লাইঃ
নৈরাজ্যবাদ ১০·০০ ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু রূপা এ্যাণ্ড কোং
বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ৩·০০ গোপালচন্দ্র রায় সাহিত্য সদন
বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠ ১০·০০ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র
বাংলার লোকসাহিত্য (২য় খণ্ড) ১২·৫০ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলা ছোট গল্প ৬·০০ ডঃ শিশিরকুমার দাশ বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ
বাংলায় নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা ৫·০০ অসিতকুমার ভট্টাচার্য
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৫·০০ ভূদেব চৌধুরী বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ
বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি ৬·০০ ক্ষুদিরাম দাস বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ
বাংলা ছন্দের নানা কথা ৩·০০ দুলালচন্দ্র দাস মডার্ণ বুক এজেন্সি
বিশ্ববিবেক ১০·০০ অচিন্ত্য বন্দ্যোঃ শংকরীপ্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত বাক্ সাহিত্য
বিশ্ব-সাহিত্যের লেখক ৫·০০ ভবানী মুখোপাধ্যায় এম্ সি সরকার
বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে ৬·৫০ আশা রায় মিত্রালয়
ভক্তকবি মধুসূদন রাও উৎকলে নবযুগ ৬·০০ সবস্তী দেবী
ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন ৬·০০ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রূপা এণ্ড কোং
মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প ১০·০০ ক্ষেত্র গুপ্ত
মহারাণী কুন্তী ২·৭৫ যোগেন্দ্রনাথ বাগচী শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩·০০ নিতাই বসু
মার্কসবাদ ১·৫০ সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
মুজফ্ফর আহমদ ·৫০ „
মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী ১·৭৫ প্রমথ গুপ্ত „
মেঘনাদবধ কাব্য ৪·০০ ভোলানাথ ঘোষ সম্পাদিত
যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ২·০০ প্রণবকুমার দাশগুপ্ত
রসশেখর রাজশেখর ১·০০ নিতাই বসু
রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ৫·০০ তারকনাথ ঘোষ ওরিয়েণ্ট বুক কোং
রবীন্দ্রনাট্য পরিচয় (১ম খণ্ড) ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ
রূপদর্শিকা ১০·০০ অসিতকুমার হালদার „
লক্ষ্মী ও গণেশ ৪·০০ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ পুরোগামী প্রকাশনী
শিল্পী স্বাধীনতা ও সমাজ ৪·৫০ শান্তি বসু
শুভ বিবাহ কথা ৪·০০ দিব্যদর্শী মিত্রালয়
সমাজ শিক্ষা প্রসঙ্গ ৬·০০ মন্মথনাথ রায় বাক্-সাহিত্য
সাম্প্রতিক ৮·৫০ অমিয় চক্রবর্তী নাভানা
সাহিত্যসাধক বিবেকানন্দ ৩·০০ ডঃ অধীর দে কল্লোল প্রকাশনী
সাহিত্য ও সমাজ চিন্তা ৩·৫০ নিখিলরঞ্জন রায় গ্রন্থপ্রকাশ
সাহিত্যকোষ (নাটক) ৫·০০ অলোক রায় সম্পাদিত বাগার্থ
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী ১০·০০ কমলা দাশগুপ্ত
স্মরণীয় শতবর্ষ ৩·৫০ নিখিলরঞ্জন রায় আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স
হুগোর ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ৮·০০ বার্ণিক রায়

উপন্যাস

অনিমিত্রা ৪·৫০ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এম সি সরকার
আভাস ৫·০০ চতুর্মুখ সুপ্রকাশ প্রাঃ লিঃ
আবর্তন ৪·৫০ বিমল কর
আবর্ত ৬·০০ বিশ্বনাথ রায় বাক্-সাহিত্য
আলোর সহোদর ৪·০০ মিহির আচার্য
আইসেলো বেলা ৬·৫০ নালবন্ঠ সুপ্রকাশ প্রাঃ লিঃ
উপনায়িকা ৪·০০ বারীন্দ্রনাথ দাশ করুণা প্রকাশিনী
ঋতুসংহার ৫·০০ নারায়ণ দাশশর্মা সুপ্রকাশ প্রাঃ লিঃ
এস, এল, পাম্পা ৭·০০ শ্রীপারাবত আনন্দধারা প্রকাশনী
এক সুলতান এক বেগম ৯·০০ বারীন্দ্রনাথ দাশ ক্যালকাটা পাব্লিঃ
একক দশক শতক ১৪·০০ বিমল মিত্র মিত্র ও ঘোষ
একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে ৬·০০ তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ বাক্-সাহিত্য
একটি সোনা মন ৬·০০ তপতী রায় শ্রীগুরু লাইব্রেরী

বই	দাম	লেখক	প্রকাশক
কষিত কাঞ্চন	৪.৫০	মনীন্দ্রনারায়ণ রায়	বাক্-সাহিত্য
কনখল	৭.০০	মনীশ ঘটক	বিদ্যোদয় লাইব্রেরী
কত রঙ	৪.০০	প্রভাত দেবসরকার	গ্রন্থপীঠ
কাঁচ-কাটা হীরে	৩.৭৫	প্রবোধকুমার সান্যাল	মিত্র ও ঘোষ
কাগজের দেওয়াল	৩.৫০	মিহির সেন	
কেউ নায়ক কেউ নায়িকা	৪.০০	বিমল মিত্র	গ্রন্থপ্রকাশ
কল্যাণী লোকাল	৫.০০	চতুর্মুখ	সুপ্রকাশ প্রা: লি:
খড় কুটো	৪.০০	বিমল কর	আনন্দ পাব্লি: প্রা: লি:
গঙ্গা হৃদি	৬.৫০	শক্তিপদ রাজগুরু	
গড় নাসিমপুর	৮.০০	বারীন্দ্রনাথ দাশ	ক্লাসিক প্রেস
গীতাকাপুরের আত্মহত্যা	৫.০০	গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	বাক্-সাহিত্য
গোপনপত্র	৪.০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	মিত্র ও ঘোষ
তুমুল	৪.০০	বিজন চক্রবর্তী	
গিবিকন্যা	২.৭৫	শিশির সরকার	বিদ্যোদয় লাইব্রেরী
গ্রীষ্ম বাসর	২.৭৫	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	ত্রিবেণী প্রকাশন
ছায়া দিগন্ত	৪.০০	নির্মল সরকার	
জলছবি	৪.০০	আশাপূর্ণা দেবী	
জঙ্গলগড়	৪.০০	তারাশঙ্কর বন্দ্যো:	গ্রন্থপ্রকাশ
জিয়া ভরলি	৫.০০	সুবোধ ঘোষ	আনন্দ পাব্লি: প্রা: লি:
জীবনস্বাদ	৪.০০	আশাপূর্ণা দেবী	গ্রন্থপ্রকাশ
জ্বালামুখী (অনন্তগোপাল শিষড়ে)	২.৫০	সুধাকান্ত রায়চৌধুরী অনূদিত	পাবলিকেশন ডিভিসন, ভারত সরকার
ঝড়	৭.০০	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	মিত্র ও ঘোষ
টুনি মেম	৭.৫০	সৈয়দ মুজতবা আলী	মিত্র ও ঘোষ
তমসা	২.৫০	তারাশঙ্কর বন্দ্যো:	মুকুন্দ পাব্লি:
তপতীর তৃষ্ণা	৪.০০	রমাপতি বসু	
তারার আলো	৩.৫০	সনৎকুমার বন্দ্যো:	গ্রন্থপ্রকাশ
তারুণ্যের কাল	২.৯০	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যো:	রবীন্দ্র লাইব্রেরী
তিন কাহিনী	৬.০০	বনফুল	গ্রন্থপ্রকাশ
তিমির বিদার	৩.০০	সমর বসু	কনটেম্পোরারী পাব্লি:
দুই পাখি	৩.৫০	প্রবোধকুমার সান্যাল	বাক্-সাহিত্য
দুই অরণ্য	৬.০০	সমরেশ বসু	আনন্দ পাব্লি: প্রা: লি:
দোলনা	৫.০০	আশাপূর্ণা দেবী	,,
দৈনন্দিন	৩.০০	বিভূতিভূষণ মুখো:	বাক্-সাহিত্য
দৃশ্য দৃশ্যান্তর	৩.০০	চিত্তরঞ্জন ঘোষ	
দ্বি নায়িকা	২.০০	সৌরীন্দ্র মজুমদার	
দ্বিচারিণী	২.৭৫	দিলীপকুমার রায়	বাক্-সাহিত্য
দ্বিতীয় অন্তর	৯.৫০	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যো:	বাক্-সাহিত্য
ধূসর গোধূলি	৪.৫০	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	মিত্র ও ঘোষ
নতুন হাওয়া	৪.৫০	বিমল কর	ত্রিবেণী প্রকাশন
নকল মানুষ	৪.৫০	শক্তিপদ রাজগুরু	সাহিত্য জগৎ
নজরানা	১০.০০	অমরেন্দ্র দাস	সুরভি প্রকাশনী
নিষাদ	২.৫০	চিত্ত সিংহ	সৃজনী
নিশিকুটুম্ব	১ম পর্ব ৭.৫০ ; ২য় পর্ব ৮.০০	মনোজ বসু	গ্রন্থপ্রকাশ
মিশিরঙ্গ	২.৫০	প্রবোধবন্ধু অধিকারী	
নীল আগুন	৬.৫০	সরোজ রায়চৌধুরী	বাক্-সাহিত্য
নীলকণ্ঠী	৭.৫০	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	গ্রন্থপ্রকাশ
নূরজাহান	৬.০০	সুকন্যা	করুণা প্রকাশনী
পরম্পরা	৪.৫০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	গ্রন্থপ্রকাশ
পাহাড়ী সন্ধ্যা	২.৫০	প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	রিডার্স কর্ণার
পদ্ম-পলাশ	৪.০০	সুধাংশু সরকার	গ্রন্থলোক
পায়ে পায়ে প্রহর	৭.৫০	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	
পারাবার	৩.০০	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	
পাত্র পাত্রী	২.৫০	শংকর	বাক্-সাহিত্য
পাহাড়তলির দুই কন্যা	২.০০	বীরু সরকার	লোক সাহিত্য সংসদ
পাঁচ নম্বর ঘরের বাসিন্দা	২.৫০	বুদ্ধ চক্রবর্তী	স্মরণি
পীতাম্বরের পুনর্জন্ম	৩.৫০	বনফুল	ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড
প্রতিধ্বনি	৩.০০	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	বসু চৌধুরী
প্রথম পদক্ষেপ	৩.৫০	রামপদ মুখো:	আধুনিক সাহিত্য ভবন
প্রেম ও প্রয়োজন	৪.৫০	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ত্রিবেণী প্রকাশন
বহিরঙ্গ	৩.৭৫	আশাপূর্ণা দেবী	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
বহ্নিকন্যা	২.৫০	বিশ্বনাথ রায়	
বধূ মল্লার	৫.০০	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	
বর্ণালী	৩.০০	সুবোধ ঘোষ	রবীন্দ্র লাইব্রেরী
বসন্ত রজনী	২.৫০	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	সেকাল-একাল
বঁসোয়ার দাঁসও	৫.৫০	বিক্রমাদিত্য	বাক্-সাহিত্য
বাসর স্বপ্ন	৮.৭৫	হরিনারায়ণ চট্টো:	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
বাজীকর	৮.০০	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	কথাকলি
বিধাতা	৪.৫০	অজিতকৃষ্ণ বসু	বিহার সাহিত্য ভবন
ভাবি এক হয় আর	৮.৭৫	দিলীপকুমার রায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
ভিজা মাধবী	৩.০০	সুবোধ ঘোষ	ত্রিবেণী প্রকাশন
মনচোরা	৩.০০	শরদিন্দু বন্দ্যো:	আনন্দধারা প্রকাশনী
মগ্ন মৈনাক	৪.৫০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	মিত্র ও ঘোষ
মাংসমোতো	৩.৫০	প্রতিভা বসু	সুরভি প্রকাশনী
মেঘমুক্তি	২.৫০	সনৎকুমার বন্দ্যো:	আর এন চ্যাটার্জি
মেঘের উপর প্রাসাদ	৭.০০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স
মেঘ কালো	৪.০০	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	গ্রন্থপ্রকাশ
মৃদঙ্গার	৪.৫০	কালীপদ ঘটক	মিত্র ও ঘোষ
মাটি ও মানবী	৫.০০	প্রবোধ সরকার	সুপ্রকাশ প্রা: লি:
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ	৪.৫০	শংকর	বাক্-সাহিত্য
যৌবন সরসী নীরে	৩.৫০	প্রেম চট্টোপাধ্যায়	
রাতের গাড়ি	৪.০০	নবেন্দু ঘোষ	
রাজ্যচ্যুত ঈশ্বর	৫.৫০	অচ্যুত গোস্বামী	
রাত্রির সীমানা	৫.০০	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	
রাত্রির সংলাপ	৪.০০	অজিত মুখোপাধ্যায়	পেলিক্যান প্রেস
রূপে অরূপে মহামায়া	৯.০০	অমরেন্দ্র দাস	ক্যালকাটা পাব্লি:
ললিতা প্রসঙ্গ	৮.০০	দীপক চৌধুরী	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:

লড়াই থেকে ফরা	৪·৫০	বরেন বসু	
ললিতা	২·৫০	নীলকণ্ঠ	গ্রন্থ প্রকাশ
লক্ষ তারার অন্ধকার	৩·০০	বিনয় চৌধুরী	কনটেম্পোরারী পাব্লিঃ
লকেল্লা	১৪·০০	প্রমথনাথ বিশী	মিত্র ও ঘোষ
লোহার বাসর	২·০০	আশা দেবী	
শাহানী একটি মেয়ের নাম	২·০০	আব্দুল আজীজ আল-আমান	
সর্বহারা	৪·০০	নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	এম সি সরকার
সন্ধ্যাদীপের শিখা	৪·০০	তরুণকুমার ভাদুড়ী	মিত্র ও ঘোষ
সপ্তস্বরা পিনাকিনী	৩·০০	অবধূত	ন্যাশনাল পাব্লিশার্স
সাধের শারিকা	৮·০০	প্রফুল্ল রায়	
সিংহ সেনাপতি	৮·০০	রাহুল সংকৃত্যায়ন	আর এন চ্যাটার্জি
সীমান্ত শিবির	৮·০০	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	গ্রন্থ প্রকাশ
সুনন্দা	৩·০০	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্র লাইঃ
সেদিন রাত্রে	৩·৫০	সুকুমার বিশ্বাস	আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স পাব্লিঃ
সেতুবন্ধ	৩·০০	প্রতিভা বসু	আনন্দধারা প্রকাঃ
সোহাগ-রাত্ত	৪·০০	সুমথনাথ ঘোষ	মিত্র ও ঘোষ
স্তব্ধ প্রহর	৫·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	গ্রন্থ প্রকাশ
হৃদয়ের রঙ	৪·০০	জ্যোতিবিন্দ্র নন্দী	

গল্প ও গল্প সংকলন

অলোকদৃষ্টি	৩·৫০	সতীনাথ ভাদুড়ী	বাক্-সাহিত্য
আলোর বৃত্ত	৩·৫০	সমরেশ বসু	বেঙ্গল পাব্লিঃ
আয়না	২·০০	তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ	রবীন্দ্র লাইঃ
আধুনিক রুশ গল্প	৫·০০	ইলা মিত্র অনূদিত	ন্যাশনাল বুঃ এঃ
উত্তরকালে গল্প-সংগ্রহ	১০·০০	মানিক বন্দ্যোঃ	ন্যাশনাল বুঃ এঃ
গল্প-সমগ্র	১০·০০	রমাপদ চৌধুরী	আনন্দ পাব্লিঃ
গল্প-পঞ্চাশং	২০·০০	তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ	মুকুন্দ পাব্লিঃ
গোলাপ কাঁটা	৩·০০	পারিজাত মল্লিক	
চিত্রালী	৬·০০	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স
ছবি	৪·০০	জরাসন্ধ	মিত্র ও ঘোষ
জোনাকী মন	২·০০	পরিতোষ মজুমদার	মণ্ডল বুঃ হাঃ
দ্বিবচন	৩·০০	রেবন্ত বসু	
প্রেমের গল্প	৩·০০	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোঃ	বিভূতি প্রকাঃ
বিন্দু ও ত্রিভুজ	৩·২৫	চিত্রিতা দেবী	ডি এম লাইঃ
বিদেশিনী (অনুবাদ)	১০·০০	মীনাক্ষী দত্ত সম্পাদিত	নঃ সাঃ ভবন
বৌ	২·৫০	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	
ব্যথার দান	৩·৫০	নজরুল ইসলাম	
ভাসো আমার ভেলা	১২·০০	বুদ্ধদেব বসু	এম সি সরকার
মহাযুদ্ধের পরে	২·৫০	কৃষ্ণ চক্রবর্তী	
লেখিকা-মন	৮·০০	বাণী রায় সম্পাদিত	সাহিত্যায়ন
সাজবদল	২·০০	আশাপূর্ণা দেবী	
সুখ নামে শুক পাখি	৪·০০	নবেন্দু ঘোষ	বাক্-সাহিত্য
স্ত্রী মানেই ইস্ত্রী	২·৫০	শিবরাম চক্রবর্তী	গ্রন্থপ্রকাশ

বিবিধ রচনা

অপরূপা চাম্বা	৬·০০	দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত	কনটেম্পোরারা পাব্লিশা
আমেরিকার ডায়েরী	৭·৫০	দেবজ্যোতি বর্মণ	বাক্ সাহি
আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন	৪·৫০	প্রমদারঞ্জন ঘোষ	
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে	১·০০	(ফিলিপ ইয়াং) রাখালচন্দ্র ভট্টাচ	এশিয়া পাবলিশিং কে
আমাদের গুরুদেব	৩·৫০	সুধীরঞ্জন দাস	বিশ্বভার
আচার্য সত্যেন্দ্র বসুর জীবনী	২·০০	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	
ইতিহাসের নায়িকা	২·৫০	অংশুমান মিত্র	
ইন্দ্রজিতের আসর	৩·০০	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	আনন্দ পাব্লি
ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী	৫·০০		বাক্-সাহি
উইলিয়াম ফক্‌নার	১·০০	কৃষ্ণগোপাল চট্টোঃ	এশিয়া পাব্লি
একটি পেরেকের কাহিনী	২·০০	সাগরময় ঘোষ	এস গুপ্ত ব্রাদা
এভারেস্ট ডায়েরী	৯·০০	সুধাংশুকুমার দাস	আনন্দ পাব্লিশা
এরা অভিযুক্ত আসামী	৩·৫০	চিত্রগুপ্ত	
কিন্নর পাহাড়ী	৬·০০	ব্রজমাধব ভট্টাচার্য	
গুরুদেব	৫·০০	রাণী চন্দ	বিশ্বভার
চকিত চমকে	২·৭৫	বিনয়জীবন ঘোষ	ইণ্ডিয়ান অ্যাসে
চোখের আলোয় দেখেছিলেম	৫·০০	অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
ঠগী	৫·০০	শ্রীপান্থ	
টমাস উলফ (হিউ হলম্যান)	১·০০	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য অনূদিত	এশিয়া পাব্লিশিং কে
দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড)	১২·৫০		সাহিত্য সং
নরনারায়ণ পরিচিতি	২·৫০	ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত	বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লি
নটনটীদের বিচিত্র কাহিনী	৩·০০	দেবনারায়ণ গুপ্ত	গ্রন্থপ্রকা
নিজে ব্যবসা করুন	৩·০০	শিল্পকুশলী	আর্ট এণ্ড লেটার্স পাব্লি
নীল দুর্গম	৬·৫০	শঙ্কু মহারাজ	মিত্র ও ঘে
পলাশীর পর বক্সার	৭·৫০	তপনমোহন চট্টোঃ	ত্রিবেণী প্রকাশ
পত্রাবলী	৮·০০	সুভাষচন্দ্র বসু	এম সি সরক
প্রাগিতিহাসের মানুষ	৮·০০	শচীন্দ্রনাথ বসু	
বরণীয় মানুষ, স্মরণীয় বিচার	৫·০০	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	গ্রন্থপ্রকা
বাংলা-ডয়েটস্ পাঠমালা	৫·০০	সাধনা সোম ও লুসি কর্ণেল সেন	
বাঙ্গলার বিবেকানন্দ	২·০০	স্বামী শ্রদ্ধানন্দ	বিবেকানন্দ স
বিষয়-শিরোনাম (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান)	৫·০০	কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য	
বিচিত্র মানবী	৫·০০	শ্রীপান্থ	গ্র
বিখ্যাত শিকারী-কাহিনী	৮·৫০	বিশু মুখোপাধ্যায়	দি নিউ বুক এম্পোরিয়
বিষ্ণুপুর ঘরাণা	৫·০০	দিলীপ মুখোঃ	বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লি
বীর সাধক বিবেকানন্দ	২·০০	সুজিতকুমার নাগ	আদিত্য প্রকাশাল
ভারতদর্শন	৮·০০	কমল বন্দ্যোপাধ্যায়	

ারতের যাদুঘরে ১৫˙০০ বোধিসত্ত্ব

ারতের নৌ-শিল্প ১৫˙০০ রাধাকুমুদ মুখো: কিতাব মহল

হাযুদ্ধের অন্তরালে ৪˙০০ চিন্ময়ীব সেন

হাত্মা গান্ধী ৬˙৫০ ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র সেন

ন মধুকর ৮˙০০ নির্মলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

াষ্কোর চিঠি ৪˙০০ শুভময় ঘোষ গ্রন্থপ্রকাশ

্যানহাটান ও মার্টিনী ৫˙০০ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়
কনটেম্পোরারী পাবলিশার্স

মবার পতনের ভূমিকা ২˙৫০ ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত
বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ

বীন্দ্র অভিধান (৩য় খণ্ড) ৬˙০০ সোমেন্দ্রনাথ বসু "

হস্যময়ী প্যারিস ৩˙০০ দিলীপ মালাকার গ্রন্থপ্রকাশ

বার্ট ফ্রস্ট (লরেন্স টমসন) ১˙০০ বাণী রায় অনূদিত
এশিয়া পাবলিশিং কোং

ামায়ণ-সার ৬˙৫০ আচার্য যতীন্দ্র রামানুজ দাস
শ্রীবলরাম ধর্মসোপান খড়দহ

াশ্বত ভারত (দেবতার কথা) ৫˙০০ সুবোধকুমার চক্রবর্তী এ, মুখার্জি

শল্পীর আত্মকথা ২˙৫০ সাধনা বসু
(অনুলেখক কল্যাণাক্ষ বন্দ্যো:) গ্রন্থপ্রকাশ

শিশির-সান্নিধ্যে ৬˙০০ রবি মিত্র দেবকুমার বসু গ্রন্থজগৎ

শবঠাকুরের আপন দেশে ৪˙০০ রাণু সান্ন্যাল আনন্দ পাবলিশার্স

মমকালের কথা ২˙০০ মুজফফর আমেদ
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার ৫˙০০ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যো: জেনারেল প্রিন্টার্স

সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয় ২˙০০ হরিহর শেঠ চন্দননগর পুস্তকাগার

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য় খণ্ড) বিনয় ঘোষ সম্পাদিত বীক্ষণ

স্বর্গের সন্ধানে মানুষ ৩˙০০ শৈল চক্রবর্তী
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড

হস্তরেখা অভিধান (কিরো) পরীক্ষিৎ অনূদিত আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স

কণদর্শন ৪˙৫০ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মিত্র ও ঘোষ

ক্রীড়াসম্রাট নগেন্দ্রপ্রসাদ
সর্বাধিকারী ৪˙০০ শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ
এন পি সর্বাধিকারী স্মারক সমিতি

Old Bengali Language
and Text ১২˙০০ ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

কাব্য ও কাব্যসংকলন

অদৃষ্টচর ২˙০০ রঞ্জিত সিংহ

অদূরে জলের শব্দ ২˙০০ পরেশ মণ্ডল

অরণ্য নীলিমা ২˙৭৫ আহসান হাবীব

আশ্বিনের ফেরিওয়ালা ২˙৫০ হরপ্রসাদ মিত্র সিগনেট বুক শপ

উত্তর-পঞ্চাশ ৫˙০০ সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টা:
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৬˙০০ কলিকাতা বুক হাউস

কবিতা : ১৯৫৬-৬১ ৪˙০০ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যো: কবিপত্র প্রঃ ভবন

কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা ২˙০০ করুণাসিন্ধু দে গ্রন্থজগৎ

কাচের মানুষ ৩˙০০ দিনেশ দাস ত্রিবেণী প্রকাশন

কাছেই জানালা ৩˙০০ অনিলেন্দু চক্রবর্তী
নিউ বুক এম্পোরিয়াম

ঘনিষ্ঠ তাপ ৩˙০০ অরুণ মিত্র ত্রিবেণী প্রকাশন

চেরি ২˙০০ সুনীতিকুমার মুখো: বিহার সা: ভবন

ছায়া হরিণ ২˙৭৫ আহসান হাবীব

নাগকেশর ১˙৫০ সাত্যকি ডি এম লাইব্রেরী

নির্বাসন ২˙০০ পরিমল চক্রবর্তী কবিপত্র প্রঃ ভবন

নীল পাখি ধূসর আকাশ ২˙০০ শান্তিভূষণ রায় এশিয়া পাব্লি: কো:

প্রেমের কবিতা ৩˙০০ সুকুমার ঘোষ ও রাণা বসু সম্পাদিত
ঘরোয়া

প্রথম ভালোবাসা ২˙০০ সরিৎশেখর মজুমদার গ্রন্থজগৎ

ফিরে ফিরে ১˙২৫ গৌর পাল

বসন্ত বিলাপ ৪˙০০ চিত্তরঞ্জন মাইতি রূপা এ্যাণ্ড কোং

মাতৃবন্দনা ৫˙০০ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত
এস সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স

সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
(অনুবাদ) ১২˙০০ শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
সম্পাদিত নতুন সাহিত্যভবন

সাত রং সাত আকাশ
(বিদেশী কবিতা) ৩˙০০ শান্তিভূষণ রায় অনূদিত এশিয়া পাব্লি:

স্বকাল-পুরুষ ৫˙০০ আনন্দ বাগচি

স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ ৫˙০০ বিষ্ণু দে সম্বোধি পাবলিকেশানস্

অনুবাদ সাহিত্য

অমৃতের পুত্র ৫˙৫০ গীতা মুখোপাধ্যায়
(ক্রনো আপিৎস)

অশ্রুত এক রাগিণী (সুন্দরী আসসানদাস উত্তর চন্দানী)
২˙৫০ বোম্মানা বিশ্বনাথন রেখা প্রকাশনী

ঋগ্বেদ সংহিতা ৪০˙০০ রমেশচন্দ্র দত্ত

কার্ল মার্ক্স (ই, স্তেপানোভা) ২˙০০ কল্পতরু সেনগুপ্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী

ডা: জিভাগো (পাস্তেরনাক) ১২˙৫০ দীপক চৌধুরী
বেঙ্গল পাবলিশার্স ও রূপা অ্যাণ্ড কোং

তার্তুফ (মলিয়ের) ৪˙৫০ লোকনাথ ভট্টাচার্য

প্রতিবেশিনী ৪˙৫০ বোম্মানা বিশ্বনাথন
ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং

প্রদোষের প্রান্তে
(মেরি এলেন চেজ) . ˙০ রাণু ভৌমিক অনূদিত
এশিয়া পাবলিশিং কোং

পঞ্চমাঙ্ক (আগাথা ক্রিস্টি) ৪˙৫০ নীরেন্দ্রনাথ চক্র: ত্রিবেণী প্রকাশন

বেণুবনে মূর্খ (চেন চি-ইং) ১˙২৫ রাণু ভৌমিক পরিচয় পাব্লি:

বেদনাহত (শেখভ) ৪˙০০ গোপাল ভৌমিক জ্ঞানতীর্থ

শার্লক হোমস ফিরে এলেন (কোনান ডয়াল)
১০.০০ অদ্রীশ বর্ধন আলফা. বিটা পাব্লিঃ
জ্ঞানেশ্বরী (জ্ঞানদেব) ২০.৫০ গিরিশচন্দ্র সেন
সেই বৃদ্ধা রূপসী (উইলো ক্যাথার)
২.০০ রাণু ভৌমিক এশিয়া পাবলিশিং কোং

নাটক

উত্তরফাল্গুনী ২.৫০ মাণিক সরকার
উদ্বাসিকা ২.৫০ সুশীল মুখোপাধ্যায়
ওরা থাকে ওধারে ২.৭৫ প্রেমেন্দ্র মিত্র
আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স
কথা কও ২.২৫ সুনীলচন্দ্র সরকার বাক্-সাহিত্য
খর নদীর স্রোতে ২.০০ সুনীল দত্ত জাতীয় সাঃ পরিঃ
গেটম্যান ২.০০ জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়
জগাখিচুড়ী অনিলকুমার মুখোঃ বরেন্দ্র লাইঃ
ডিরোজিয়ো ২.৫০ চিত্তরঞ্জন ঘোষ
নারী ১.০০ কালীপদ চক্রবর্তী বিশ্ববার্তা প্রেস
নাম নেই ২.০০ কিরণ মৈত্র সিটি বুক এজেন্সি
প্রতিধ্বনি ১.০০ কালীপদ চক্রবর্তী বিশ্ববার্তা প্রেস
বিয়ের বাজার ২.০০ প্রকাশচন্দ্র বসু বরেন্দ্র লাইব্রেরী
বিপ্লবী বিবেকানন্দ ১.৫০ অমল সরকার শ্রীভারতী পাব্লিঃ
বিপ্লবী ২.৫০ অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
মহাক্ষুধা ২.০০ মণ্ট গঙ্গোপাধ্যায়
শরৎ নাট্যসংগ্রহ (১ম) ৫.০০ শরৎচন্দ্র চট্টোঃ বাক্-সাহিত্য
শৃগস্ত ১.৭৫ বনফুল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
সৈনিক ২.৫০ ধনঞ্জয় বৈরাগী বাক্-সাহিত্য

শিশু-সাহিত্য

অঙ্কের খেলা (ইয়াকভ
পেরেলম্যান) ৩.০০ বিমলেন্দু সেনগুপ্ত অনূদিত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
অ্যাণ্ডারসেনের অমর গল্প ১.৭৫ দেবদাস দাশগুপ্ত অনূদিত বাক্-সাঃ
আকাশ যেখানে মাটির কাছে ২.০০ অনিলেন্দু চক্রবর্তী
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১.০০ রাণা বসু বাক্-সাহিত্য
আবার ঘনাদা ২.৫০ প্রেমেন্দ্র মিত্র ইণ্ডিয়ান অ্যাসোঃ
আবিষ্কারের অভিযানে ৫.০০ সমরজিৎ কর অনূদিত
(রানেফ ইল্যাপ) এশিয়া পাবলিশিং কোং
আশা দেবীর হাসির গল্প ১.৫০ এ কে সরকার অ্যাণ্ড কোং
ঈশপের গল্প ১.২৫ সুখলতা রাও শিশু সাহিত্য সংসদ
উপেন্দ্রকিশোর ৩.৫০ লীলা মজুমদার
গল্প বলি শোন ১.৫০ প্রসূন পাল অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিঃ
ছোটদের কেনেডী (ক্রসলী) ২.০০ পরীক্ষিৎ অনূদিত আর্ট অ্যাণ্ড লেঃ
ছোটদের ব্যাসদেব ২.০০ শশিভূষণ দাশগুপ্ত শিশুসাহিত্য সং
রচিত মহাভারত
তোতাপাখির পাকামি ২.০০ শিবরাম চক্রবর্তী ইণ্ডিয়ান অ্যাসোঃ
নতুন পৃথিবীর অভিযাত্রী অধীর রাহা অনূদিত
(এডিথ ম্যাককাল) এশিয়া পাব্লিশিং কোং
নানান দেশের রূপকথা ৩.০০ সুখলতা রাও মিত্র ও ঘোষ
যুগর্ষি বিবেকানন্দ ২.৭৫ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ইণ্ডিয়ান অ্যাসোঃ
রাত যখন নিঝুম ১.৫০ সুজিতকুমার নাগ সাহিত্য ভবন
রায়বাড়ির রহস্য ১.৫০ ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী ন্যাশনাল পাব্লিঃ
বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ২.০০ জয়ন্ত চৌধুরী অনূদিত এশিয়া পাব্লিশিং
হানাবাড়ির কারখানা ২.৫০ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এম সি সরকার
সোনালী রূপকথা ৩.০০ বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত এশিয়া পাব্লিশিং

শেক্‌স্‌পীয়ার প্রসংগে

...কাব্যে যে মূর্তিটি ফুটিয়া ওঠে, তাহার ব্যক্তিত্ব এত নিখুঁত, এত স্পষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন যে—তাহার তুলনা সে-ই : তাহা যেন আর্ট নয় স্বয়ং প্রকৃতি। পুত্রহন্তা আকিলিসের হস্ত চুম্বন করিবার সময়ে হতভাগ্য বৃদ্ধ রাজা প্রিয়ামের মুখে যে আর্ত-চীৎকার শুনি, সে যে কোনও পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ পিতার বিলাপধ্বনি নয়, সে সেই একমাত্র ট্রয়রাজ প্রিয়ামেরই শোকোচ্ছ্বাস। ওই বিলাপভঙ্গী ঐরূপ অবস্থায়, কোপন-স্বভাব অবুঝ লিয়ারের মুখে মানায় না। শেক্সপীয়ারের নাটকগুলিতে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। হ্যামলেট নাটকের প্রথম অঙ্কের একটি দৃশ্য লওয়া যাক্। হ্যামলেট এই প্রথম হোরেসিওর মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার পিতার প্রেতাত্মা দুর্গমধ্যে দেখা দিয়াছে। কয়েকটা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের দ্বারা এই অলৌকিক ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট জ্ঞাতব্য কথা জানিয়া লইয়া হ্যামলেট বলিয়া উঠিলেন, 'আমি যদি সে সময়ে সেখানে থাকিতাম।' ইহার উত্তরে হোরেসিও নিতান্ত প্রাকৃতজনের মতই বলিল, 'তাহা হইলে আপনি খুব বিস্মিত হইতেন।' এইবার হ্যামলেট যাহা বলিলেন তাহাতে কি অপূর্ব নাটকীয় কল্পনার পরিচয়!—বলিলেন, 'খুব সম্ভব, খুব সম্ভব—বেশিক্ষণ ছিল কি?' শ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী ব্যতীত আর কোনও কবির রচনায় এখানে কি দেখিতাম? যে ঘটনা হ্যামলেটের নিকট দশটা নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হওয়া অপেক্ষাও বুদ্ধিভ্রংশকারী, তাহারই সম্পর্কে হোরেসিওর এই অতিক্ষুদ্র প্রশ্ন শুনিয়া হ্যামলেট নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিতেন, 'কি বলিলে?—বিস্মিত হইতাম।' তারপর, ইহা তাহার পক্ষে কতখানি বিস্ময়কর সেই দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু কবি এখানে নিজেই হ্যামলেট হইয়া গিয়াছেন—কবি-প্রেরণার দিব্যশক্তি তাঁহাকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে যে, হ্যামলেটের মত চরিত্রের অন্তরনিরুদ্ধ ভাবাবেগ ব্যক্ত করিবার ভাষা জুটিল না—তাই এরূপ প্রশ্নের উত্তরে হ্যামলেট যেন আত্মগত পরিহাসের ছলে কতকটা মনে মনেই বলিয়া উঠিলেন, 'খুব সম্ভব, খুব সম্ভব।' এই হ্যামলেট ভিন্ন আর কেহই এরূপ অবস্থায় ওইরূপ উত্তর এমনভাবে দিতে পারিত না। [১০৩০ (?)]

—মোহিতলাল মজুমদার

ভারতের প্রাচীন সংগীত প্রসঙ্গে

কল্যাণ গুহ

সংগীত বলতে কি বুঝি ! এও এক প্রশ্ন, প্রথম থেকেই আরম্ভ করবো, ভারতের প্রাচীন সংগীতের ইতিহাস যখন জানতে সুরু করলাম তখন সেই জানাকে আর শেষ করতে ইচ্ছে করে না। কত সুর, কত ছন্দ, কত বাদ্য, কত গান কত রূপ, সুন্দরের আলোয় আর সৃষ্টির আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত। আমার দৃষ্টিতে যেভাবে প্রাচীন সংগীতকে দেখেছি বা দেখছি তারই কিছু আপনাদের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করবো।

আমরা যেমন নানান সংগীতের ঝলকানিতে বেশ মশগুল হয়ে আছি ও আধুনিকতার নামে যে কনকনানি চলেছে, আগের দিনের সংগীত কি এই পরিণতির দিকে চেয়ে বসেছিলেন ? পুরানো ইতিহাস থেকে এ বিষয় কিছু খবরাখবর পেতে ইচ্ছে হয়। বাদশাহ আলাউদ্দিন বা আকবরের আমল থেকেই ধরা যাক। ('যদিও আলাউদ্দিন বা আকবরকে প্রাচীনকালের বলে ধরা যায় না—যেমন বুদ্ধদেব বা বিক্রমাদিত্যকে ধরা যায়') আকবরের আমল থেকেই সংগীত চিন্তার সুরু হয়, এর আগের ইতিহাসে শুধু পাওয়া যায়—গায়ক, বাদক, নর্তক। প্রাচীন সংগীতের বহু কথা, বহু পাণ্ডুলিপি ভারতের অনেক গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়—আবার অনেক অদৃশ্য।

ভারতের নাট্যশাস্ত্র, নারদ প্রণীত সংগীত মকরন্দ, মতঙ্গর বৃহদ্দেশী, শার্ঙ্গদেব প্রণীত সংগীত রত্নাকর, লোচন পণ্ডিতের রাগ-তরঙ্গিণী, দামোদর প্রণীত সংগীত দর্পণ, অহোবলের সংগীত পারিজাত। এই সব বই বহু মূল্যবান চিন্তামূলক কথায় ভরা। যেন প্রাচীন সংগীতের মধু-ঝরণা।

প্রাচীনত্ব বলতে আমরা বুঝব—সংগীতের যা কিছু আয়োজন, নিশ্চয় তা কোনও উদ্দেশ্যমূলক। সংগীত ক্ষেত্রে এমন অনেক কিছু আছে যা চিরদিনের সত্য, সেখানে প্রাচীনত্ব বা আধুনিকত্ব বলে ভাগ করা চলে না।

সংগীত বলতে গান, বাজনা, নাচ (গীত, বাদ্য, নৃত্য) তিনের—সমন্বয় হচ্ছে সংগীত। এখানে বলতে পারি—গীতবাদ্য বা নৃত্যবাদ্য হলেও সংগীত—তবে শুধু নৃত্যকে যদি সংগীত মনে করি তা হলে প্রচণ্ড ভুল হবে।

এক কথায় বা অল্পে বলতে গিয়ে বলতে হয়—সংগীতের প্রধান অংশ হল গান-বাজনা ও নাচ হল সহকারী।

ভারত বলেছেন—মেয়েরা গান করবে আর ছেলেরা বাজনা বাজাবে, কারণ— বামাকণ্ঠ' মধুর হয়। অবশ্য রত্নাকরে দেখতে পাওয়া যায় গায়ক-গায়িকার উভয়েরই কথা আছে। দোষগুণও বেশ ভালো ভাবে বোঝানো আছে।

এখন বাদ্যের কথায় আসি।

বাজনা চার রকমের, তারের বাজনা যাকে 'তত' জাতীয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মৃদঙ্গ জাতীয় বাজনাকে বলা হয়েছে 'অবনদ্ধ'। অবনদ্ধ হচ্ছে গান বা নৃত্যকে যে বোলের মাধ্যমে সজীবতা দান করে। বাঁশি, বেণু, মুরলী ইত্যাদি ফুৎকার বাদ্যগুলিকে শুষির এবং কাংস্য (আধুনিক কাঁসি) জাতীয় ধাতুময় (solid) বাদ্যগুলিকে ঘন বাদ্য বলা হয়েছে।

বীণাকে বাজনার মধ্যে উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে—'সর্বদেবময়ী তস্মাদ বীণেয়ং সর্বমঙ্গলা।'

বীণা বলতে এক রকমের বীণা বোঝায় না। রত্নাকরে এগারো রকমের বীণার কথা লেখা আছে, যেমন—একতন্ত্রী, নকুল, চিত্রতন্ত্রিকা, চিত্রা, বীণা, বিপঞ্চী, মত্ত কোকিলা,—আলাপিনী, কিন্নরী, পিনাকী, নিঃশঙ্কবীণা।

সংগীত মকরন্দে আবার প্রায় কুড়ি রকমের বীণার কথা আছে। কিন্তু দুঃখের কথা এত রকম বীণার রূপ বর্ণনা এখনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না (যতদূর অনুসন্ধানে জেনেছি)। রত্নাকরে কিছু বীণার রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। শুধু বীণার কথা লিখে পাতার পর পাতা ভরানো যায়।

নকুল বীণা দুটি তারের যন্ত্র, একতন্ত্রী ও ত্রিতন্ত্রিকা এক তার ও তিন তারের যন্ত্র, চিত্রা সপ্ততন্ত্রী, বিপঞ্চী নবতন্ত্রী। চিত্রা ও বিপঞ্চী মনে হয় আমাদের সেতার ও সুরশৃঙ্গার।

পিনাকী বীণার কথা পড়ে মনে হয়—পিনাকী আমাদের এসরাজের আগের রূপ।

এখন 'ঘন' বাদ্যের কথা।

প্রায় পনের রকম বাঁশীর রূপ দেখতে পাই।

ঐ পনের রকম বংশী বা বাঁশীর রূপ ছাড়াও—পাব, পাবিকা, মুরলী, মধুকরী, কাহল, তুণ্ডকিনী, চুক্কা, শৃঙ্গ ও শঙ্খের—বর্ণনাও সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। মধুকরী বর্ণনা পড়তে পড়তে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

মধুকরী—তামার তৈরি, 'বিশিষ্ট মুখরন্ধ্র ব্যাপারের কথা পড়লে মনে হয়—আধুনিক পাশ্চাত্য ক্লারিওনেট জাতীয় বাদ্য,' কাহলও তামার হয়ে থাকে—ধুতুরার ফুলের মত এর বদন, তিন হাত দীর্ঘ।

এবার বলি মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যের কথা।

মৃদঙ্গ জাতীয় বাজনার ভেতর অনেক রকম ভেদ পাওয়া যায়। যেমন—পটহ (মার্গও দেশী দু'রকম), মর্দল, হুড়ুক্কা, করটা, ঘট, ঢক্কা, প্রভৃতি। পটহ হচ্ছে একরকম প্রকাণ্ড ঢোলক। (একে কিন্তু আধুনিক ঢাক বলা যাবে না) মর্দল, মৃদঙ্গ এবং মুরজের বিষয় রত্নাকরে গ্রন্থকার বলেছেন—

'এবং জল ধরো ধ্বনি—

গম্ভীরো ভবতি ধ্বনিঃ'।

এর ধ্বনি মেঘধ্বনির মত গম্ভীর হবে। কালিদাসের মেঘদূতে এই ধ্বনির বহুবার উল্লেখ আছে। উপরের বাজনা ছাড়াও আরো কয়েকটি বাজনা সংগীতে ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে আছে—ঋড়স, ঘটবাদ্য, ঢক্কা, হুড়ুক্কা, কুডুবা, ঝল্লরী, ডমরু, মণ্ডি, ডক্ক, ডক্কুলী, সেল্লুকা, ঝল্লরী, ভাণ, ত্রিবলী, দুন্দুভি ভেরী, এমন ঝল্লরীর ব্যবহার আছে।

পশ্চিম ভারতে 'লাউনি' নামে যে গান প্রচলিত আছে সেই গানের সংগে ও গজলের সংগে বাজানো হয়। এত বাদ্যের সমারোহ দেখে মনে হয়—প্রাচীনেরা যেমন গায়কবৃন্দ বলতো তেমন বাদ্যবৃন্দ বললেও দোষ হোত না।

প্রাচীনেরা উন্মুক্ত ধ্বনিকেই ভালবাসতেন।

খোলা আওয়াজ ছিল।

আধুনিক মৃদঙ্গ-বাদকেরা মনে করেন, 'খুলি আওয়াজ' ও 'মুদি আওয়াজ' দু'রকম আছে। তিনের সমন্বয় চাই বংশীধ্বনি, বীণাধ্বনি ও কণ্ঠধ্বনি। প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য গীত দু'রকমভাবে ভাগ করা হয়েছে, একটি হল মার্গ, অপরটি দেশী।

'ব্রহ্মমার্গ সংগীতকে চতুর্বেদ থেকে আহরণ করছেন, ভরত তাকে নির্বাচন করে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন যাতে সংগীত সুশ্রাব্য মনোরম ও উপাদেয় হয়।'

সংগীত রত্নাকরে দেখা যায় প্রাচীনেরা দু'রকম ফল কল্পনা করে নিয়েছিলেন—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। দৃষ্ট ফল হচ্ছে—'মনোরঞ্জন রসভাবাদির দৃষ্টি ও অদৃষ্ট ফল হলে—'বিশেষ পারলৌকিক মঙ্গল সাধন।' প্রাচীনেরা বেশ জোরের সংগেই বলে গেছেন—যেমন মার্গ দরকার তেমন দেশীও দরকার।

রাগ-রাগিণীর কথা এলেও প্রাচীনকে স্মরণ করতে হয়, শ্রদ্ধা করতে হয়। বহু রাগ-চিন্তার খোরাক পাই।

অত্যাধুনিক যুগে রাগ চিন্তা আস্তে আস্তে নির্দিষ্টরূপ গ্রহণ করেছে।

প্রাচীনের সংগে আধুনিকের একটা যুগসূত্র রয়ে গেছে, যেমন দেখুন—'বৈজুবাওরা ও তানসেনের সময় ধ্রুপদ গান পরবর্তীকালের আলাপ ও খেয়ালগান।'

আস্তে আস্তে রাগ-রাগিণী কল্পনাপ্রসূত ধ্যানমূর্তি ধারণ করেছে। এবার আমরা একটু গীত-এর কথায় আসি—

ভরত যাকে 'গীত' বলেছেন, শার্ঙ্গদেব তাকে গান বলেছেন, গীত ব্যাপারে রঞ্জকস্বর-সমাবেশ থাকবে। রাগ, গেয়কার (বাক্যপদাদি) থাকবে এবং যেহেতু সমস্ত সংগীতই তালে প্রতিষ্ঠিত অতএব তালও থাকবে। গীতের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'রঞ্জক স্বরসন্দর্ভই গীত।'

সমস্ত মানুষের মধ্যে 'রাগ' নামে একটি সংস্কার (Instinct) আছে যার জন্য মানুষ কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় বা প্রবৃত্ত হয়। তাই এই রাগকে আলাদা করে দেখার উপায়—একেবারেই নেই।

যখন এই 'রাগ' সংস্কারকে উজ্জীবিত করে এবং অন্তঃকরণের মধ্যে একটি আলোড়ন হতে আরম্ভ করে, এই আলোড়নের অবস্থাই হল 'রঞ্জনা'।

আরো অনেক বাকি থাকলো। আশা করছি বিদগ্ধ পাঠকদের সামনে পরের প্রবন্ধে আরো কিছু হাজির করতে পারবো।

রেকর্ড-পরিচয়

'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' ও 'কলাম্বিয়ায়' প্রকাশিত নতুন রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

এইচ্ এম্ ভি

এন ৮৩০৫৬—'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে' ও 'এসো দু'জনে খেলি হোলী'—অতুলপ্রসাদের দু'খানি বাছাই করা গান। দরদী কণ্ঠে পরিবেশন করেছেন শিল্পী কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

এন ৮৩০৫৭—'মোর পাখীকের বুঝি' ও 'মনে রয়ে গেল মনের কথা'—রবীন্দ্রগীতি দু'খানি মধুক্ষরা কণ্ঠে পরিবেশন করেছেন শিল্পী সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়।

কলম্বিয়া

জিই ২৫১৭২—'হাতের প্রতি রেখায় রেখায়' এবং 'বন্ধু, কাউ বিনা কিছু চলে না'—কৌতুকগীতি দু'খানি পরিবেশন করেছেন মিন্টু দাশগুপ্ত।

জিই ২৫১৭৩—রবীন্দ্রগীতি-সাধিকা ধীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দু'খানি রবীন্দ্রগীতি—'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়' ও 'একদিন চিনে নেবে তারে'। পরিবেশনে অনবদ্য।

আমার কথা (১১০)

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক দিনের সঙ্গীত প্রতিভা ও জনপ্রিয়তার বিচারে যে শিল্পীদের আসন নির্ধারিত হয়েছে পুরোভাগে শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের নাম সেই তালিকায় লিপিবদ্ধ হওয়ার এক সুযোগ্য দাবীদার।

১৯৩৫ সালের ১লা অক্টোবর কলকাতায় তাঁর জন্ম। সুগায়ক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা তিনি। গায়ক হিসাবে হরেন্দ্রনাথের দক্ষতা ও প্রসিদ্ধি রসিকসমাজে অজানা নয়, সম্প্রতি পরিণতবয়সে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত মহানগর-এ একটি বিশিষ্ট চরিত্রে তাঁর অসাধারণ অভিনয় দর্শকসমাজের ভোলবার নয়। বালিগঞ্জ গার্লস স্কুলে শিক্ষালাভ করেছেন শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়। স্কুলের পড়াশুনো ছাড়া বাবার অভিনায়কত্বে ছেলেবেলা থেকেই গানের চর্চা করে আসছেন। বাড়ির সামগ্রিক পরিবেশই ছিল সঙ্গীতধর্মী। সেই আবহাওয়ায়পুষ্ট তাঁর মন তাই বাল্যকাল থেকেই গানের রসে বিভোর। সঙ্গীত তাই তাঁর অন্তরে এত সহজে বাসা বাঁধতে পেরেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অতুলপ্রসাদের গান এখনও তিনি শিখে আসছেন বাবার কাছে।

১৯৬১ সালে দক্ষিণী থেকে তিনি সঙ্গীতকার পরীক্ষায় যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণা হন। ১৯৫৭ সালে তাঁর গাওয়া দ্বিজেন্দ্রলালের দু'টি গানের প্রথম রেকর্ড হয়। গান দুটির প্রথম কথাগুলি—'মলয় আসিয়া কয়ে গেল কানে' এবং 'সে কেন দেখা দিল রে'। রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর সময়ে তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রনাথের 'না না গো না' এবং

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

'না বলে যায় পাছে সে' গান দু'খানি রেকর্ডে ধরে রাখা হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সেই তাঁর প্রথম রেকর্ড। লং প্লেয়িং রেকর্ড গৃহীত রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ'-এর টেক্কানির চরিত্রটির তিনি রূপ দেন এবং সাজাহানে পিয়ারার ভূমিকায় গানগুলি গান। এ ছাড়া আরও বহু রেকর্ডে তাঁর অনুপম সুরলালিত্য ও কণ্ঠমাধুর্য ধরা আছে—যা শ্রোতৃসাধারণকে অকৃপণভাবে মুঠো-মুঠো আনন্দ বিতরণ করে পিপাসুকগণকে পরিতৃপ্তিতে ভরপুর করে দেয়। পিতৃদেব ছাড়াও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল হোম, শুভ ঠাকুরতা এবং দিলীপ রায় (দুই) প্রভৃতি বিদগ্ধ গায়ক-গায়িকার নিকট গানের পাঠ নিয়েছেন। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রনাথের, দ্বিজেন্দ্রলালের এবং আধুনিক গানের রেকর্ডগুলির সঙ্গে সাধারণের আজ আর অপরিচয় নেই, তবে তাঁর গাওয়া নজরুলগীতির রেকর্ড এখনও সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নি। নির্মীয়মাণ ছায়াছবি 'অনুষ্টুপ ছন্দ'তে তিনি অতুলপ্রসাদের গান পরিবেশন করেছেন। সুরসাধক দিলীপকুমার রায়ের গানও তিনি গেয়ে থাকেন। শিল্পিজীবনে তিনি অফুরন্ত অনুপ্রেরণা এবং অকৃত্রিম উৎসাহ লাভ করেছেন শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রকুমার সেন (পি কে সেন নামে সমধিক পরিচিত) এবং শ্রীযুক্ত পবিত্র মিত্রের কাছ থেকে। এই উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা তাঁর জীবনে অবিস্মরণীয় এবং এক বিশেষ মূল্যবাহী।

১৯৬৩ সালে বিশিষ্ট চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত মিহির রায়ের সঙ্গে শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধা হন।

নীলকণ্ঠ

ছেচল্লিশ

'ঈশ্বরই যোগী, যোগীই ঈশ্বর'

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ : তৃতীয় ভাগ :
লীলা কথা [পূর্বার্ধ]

আমার বন্ধু রামপরায়ণ রায় তখন ব্যাংকের ম্যানেজার। সেই সময় একটি লোক তাকে ঠকায়। শেষ পর্যন্ত রামপরায়ণ তাকে ধরতে পারে। রামপরায়ণের বুদ্ধি, পরিশ্রম, জেদ, লেগে থাকা, লক্ষ্যশক্তি অনেক কিছুই তাকে সাহায্য করে। কিন্তু এর মধ্যে একটি বুদ্ধির অতীত কৃপা ছাড়া রামপরায়ণের এই সব গুণ কত কাজে লাগত বলা সহজ নয়। কারণ, লোকটিকে যেদিন কলকাতায় আবিষ্কার করে রামপরায়ণ সেদিনই সে দার্জিলিং থেকে এসেছে এবং সেদিনই আবার কলকাতা ত্যাগ করবে। কয়েকঘণ্টা মাত্র সে কলকাতায় ছিল। ধরা পড়ার পর সে রামপরায়ণকে প্রশ্ন করে: আপনি আজই আমাকে খুঁজতে এখানে এলেন কেন? রামপরায়ণ বলে যে এর জন্যে দায়ী একটি কালীভক্ত ডোম। মধ্য কলকাতার এই অবাঙালী ডোমটির নাম ছিলো বাঙালী। সে রামপরায়ণকে বলে, যাকে খুঁজছিস সে এখন কলকাতায় আছে. মা বলেছে তোর বাড়ির উত্তর দিকে সে আছে, তুই তার দেখা পাবি।

রামপরায়ণ আজও ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়। কিন্তু এ দু'টি অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা বুদ্ধি দিয়ে সে করতে পারে নি আজও। এই সততা, এই স্বীকৃতি, এই সত্যভাষণের জন্যে আমি মনে করি তার চেয়ে বড় ঈশ্বরভক্ত কেউ নয়। সত্যকে যে অস্বীকার করে না, ঈশ্বর তাকেই শিকার করেন সর্বাগ্রে।

রামপরায়ণের প্রথম ও দ্বিতীয় অলৌকিক বৃত্তান্ত উপস্থিত করবার মাঝখানে আমি একবার কাশী ঘুরে এসেছি। আরেকবার। যাঁর উদ্দেশে এবার বেরিয়েছিলাম তাঁর নাম বীতরাগানন্দ। কাশীতে তিনি কারুর কাছে [illegible]বাবা, কারুর কাছে বামপুরিয়া বাবা। আমার পৌঁছবার আগেই তিনি মরদেহ ত্যাগ করেন। সুদীর্ঘজীবী বীতরাগানন্দের বিচিত্র জীবন ও বাণী বার্ধক্যে বারাণসীর পাতায় আমি প্রকাশ করব পরে। এখন ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের গুরু শ্রীবিশুদ্ধানন্দের কথা বলি। বিশুদ্ধানন্দের কাছেই গোপীনাথ দীক্ষা নেন। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, গোপীনাথ আনন্দময়ী মায়ের শিষ্য। তিনি আনন্দময়ী মা-কে ভক্তি করেন। তাঁর সংগে কলকাতায় অথবা অন্যত্র যান কখনও কখনও, কিন্তু তাঁর গুরু ওই বিশুদ্ধানন্দ।

একদিন ডক্টর গোপীনাথের বাড়ির দোতলায় যেখানে তাঁর সংগে সকলে দেখা করেন, গিয়ে দেখি, দরজা বন্ধ। গোপীনাথ তখনও পুজো থেকে ওঠেন নি। সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, পুজো করতে কতক্ষণ লাগে?

পুজা তো একমিনিটেই হয়ে যায়,—আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি ইত্যাদিতেই সময় যায়।

আপনার মরদেহত্যাগী গুরুদেবের সংগে এখনও যোগাযোগ আছে?—

না হলে তো বাঁচাই যেত না—

পল ব্রান্টনের বইতে বিশুদ্ধানন্দকে 'ম্যাজিসিয়ান' বলায় আমি আপত্তি করি। গোপীনাথ বলেন: না। ম্যাজি বলতে এক সময়ে সিদ্ধপুরুষকেই বোঝাতো।

পল ব্রান্টন,—বিশুদ্ধানন্দর যে অলৌকিক বিভূতির কথা তাঁর ইংরেজি বইতে বলেছেন, গোপীনাথ আমায় এবার কাশীতে বলেছেন যে, তা তাঁর গুরুদেবের ক্ষমতার আংশিক পরিচয়ও নয়। সূর্যকে দেশলায়ের আলোয় দেখার তুল্য। কুড়ি বৎসর প্রায় মরদেহী গুরুদেব-সংগ করেন গোপীনাথ। এত অজস্র অলৌকিক ঘটনা তাঁর এবং অন্যান্য গুরুভাই ও ভক্ত-আগন্তুকের সামনে ঘটেছে যে, তাঁর গুরুদেবের যে পাঁচ খণ্ডে জীবন-বৃত্তান্ত তিনি প্রকাশ করেছেন তাও অকিঞ্চিৎকর। গোপীনাথ আরও বলেছেন যে, মহাপুরুষের জীবনী রচনা করা যায় না। বিশুদ্ধানন্দ তাঁর জীবন যেভাবে রচনা করেছেন, মনুষ্য-কলমের সাধ্য নেই সে জীবনী-রচনার। কৃষ্ণের জীবনী লিখতে গিয়ে বংকিম সাফল্য লাভ করেন নি,—এ কথা নির্দ্বিধায় বলেছেন ডক্টর গোপীনাথ।

এরপর যেকথা তিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গে লিখেছেন

সেকথাই মুখে বললেন আমাকে। তখনও তিনি দীক্ষা নেন নি শ্রীগুরুচরণে, নেব-নেব করছেন। একদিন যোগী কে এ জিজ্ঞাসার উত্তরে গোপীনাথ-গুরু গন্ধবাবা,—বিশুদ্ধানন্দ বললেন : যে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন তিনিই যোগী।

গোপীনাথ বললেন : এ কি বলছেন? যা ইচ্ছে করতে পারেন যিনি তিনি তো ঈশ্বর।

বিশুদ্ধানন্দ বললেন : ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

'যোগী পার্ এক্সেলেন্স' কথাটা আমাকে বলবার সময় ব্যবহার করেছিলেন ডক্টর গোপীনাথ, ঈশ্বর সম্পর্কে বিশুদ্ধানন্দর বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। ঈশ্বরকে যোগী বলায় গোপীনাথ আবার বলেন : যোগী তো উপাস্য নয়, যোগী তো উপাসক—

ঈশ্বরও উপাসক?

কার?

তোমরা যাঁকে মা বলো,—তাঁর!

নাভিপদ্মের যে কথা শাস্ত্রে লেখা আছে তা প্রতীক না, সত্যি সত্যিই মনুষ্যদেহের মধ্যে স্থূলপদ্ম দল মেলবার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে, এই শিষ্য-জিজ্ঞাসার জবাবে বিশুদ্ধানন্দ বলেন : কুণ্ডলিনী জাগলেই নাভিপদ্ম ফোটে। এ পদ্ম সকলের শরীরেই আছে—কিন্তু মুদ্রিত হয়ে আছে। কুণ্ডলিনীর জাগরণ আর অন্ত সূর্যের উদয় একই কথা। এই জ্ঞানসূর্যের উদয়ে পদ্ম আপনিই ফোটে। একটু থেমে গোপীনাথ-গুরুদেব বলেন আবার : আমরা প্রত্যক্ষবাদী। প্রত্যক্ষ ভিন্ন আমরা কিছু মানি না।

বলতে বলতেই নাভিগ্রন্থি উন্মোচিত হয়,—বেরিয়ে আসে রক্তকমল।

গোপীনাথ বলেছেন যে, সেই পদ্মর দল তিনি গুণবার চেষ্টা করেন। কয়েকটি গুণেও ছিলেন। খানিকটা উঠে পদ্ম আবার অন্তর্প্রবেশ করে। গোপীনাথ জিজ্ঞেস করেন তাঁর গুরুদেবকে : যদি হাত দিয়ে পদ্মটি চেপে ধরতাম তা হলে কী হতো?

হাতসুদ্ধ, সেঁধিয়ে যেত পেটের মধ্যে—এনার্জীতে পরিণত হতো হাত।

প্রত্যক্ষ-দর্শনের পর বিশুদ্ধানন্দ-বাণী মন্দ্রিত হয় :

'বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি—এসব পৌরাণিক বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কুণ্ডলিনী না জাগিলে এই কমল ফুটে না। নাভিতে গ্রন্থিবন্ধন আছে, ইহার উন্মোচন ভিন্ন সিদ্ধিলাভের আশা দুরাশা মাত্র।'

[শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ :
তৃতীয় ভাগ : লীলা-কথা : পূর্বার্ধ]।

একটি ফুলকে আরেকটি ফুলে, পদ্মকে জবা, জবাকে পদ্ম করা বিশুদ্ধানন্দর খেলা ছিলো। এই খেলার কথায় ডক্টর

গোপীনাথ পতঞ্জলির লেখার কথায় এসে পড়েন একদিন। গোপীনাথের মতে—পাতঞ্জল দর্শন ও তাঁহার যোগভাষ্যর মতো গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় বিরল।

বিশুদ্ধানন্দ বললেন: গ্রন্থ থেকে জ্ঞান জন্মায় না। শুধু জ্ঞানের কোনই মূল্য নেই।

গোপীনাথ থামলেন না। এক পদার্থের অন্য পদার্থে রূপান্তরকে জাত্যন্তর-পরিণাম বলে। পাতঞ্জল দর্শন ও ব্যাস-ভাষ্যে তার কারণ রহস্যের উপাদান আছে।

বিশুদ্ধানন্দ হাসেন: তুমি কি বলিতে চাও, পাতঞ্জল দর্শন পড়ে কেউ যোগী হতে পারবে?

১৯১৮ সালে গোপীনাথ দীক্ষিত হন। গন্ধে ভুবন ভরে যখন-তখন যেখানে-সেখানে আবির্ভূত হতেন তাঁর গুরুদেব।

গোপীনাথ লিখছেন, ১৯২২ সালে সিঁড়ি থেকে পড়ে ছত্রিশ ঘণ্টা যখন জীবন মরণ সমস্যার মধ্যে তাঁর গুরুকে পুরীতে তার করেন তিনি। দেড়ঘণ্টার মধ্যে রোগিণীর ঘর পদ্মগন্ধে সুবাসিত হয়। বোঝা যায় গুরুদেব এসেছেন। রোগিণী ঘুমিয়ে পড়লো। রোগমুক্ত হলেন গোপীনাথ-পত্নী।

কেন সারান গুরু এভাবে রোগ, তার উত্তর হচ্ছে বিশুদ্ধানন্দ-বাণীতে:

'বৎস, গুরু যে কি বস্তু তোমরা এখনও চিনিতে পার নাই। যোগী ভিন্ন কেহ গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। শিষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার কল্যাণের ভার গুরু স্বহস্তে গ্রহণ করেন।...আমি সর্বদাই তোমাদের প্রত্যেকের নিকটে রহিয়াছি। তোমরা ক্রিয়াতে উন্নত হইলে তাহা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিবে।'

[শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ:
তৃতীয় ভাগ; লীলা কথা: পূর্বার্ধ]

ডঃ গোপীনাথের উপস্থিতিতে একজন অধ্যাপক বিশুদ্ধানন্দকে বলেন, বিশুদ্ধানন্দের শরীর ও অধ্যাপকের শরীরে কোনও তফাৎ নেই অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মতোই যোগীর শরীরেরও ক্ষুধাতৃষ্ণা সমান। যোগীকেও খাহে-পেচ্ছাব করতে হয়।

বিশুদ্ধানন্দ হেসে তাঁর একখানা হাত দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে ওপারে চালিয়ে দিলেন। তাঁর হাতে একটি পান ছিলো। অধ্যাপককে বললেন, পানটি নিয়ে আসতে। অধ্যাপক বাইরে গিয়ে পানটি নিয়ে এলেন। অর্থাৎ দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেবার ব্যাপারটা যে সম্মোহন নয়, বাস্তব সত্য তাই দেখানোই পানটি নিয়ে আসতে বলার মধ্যে নিহিত ছিলো। তারপর অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করলেন বিশুদ্ধানন্দ: তুমি পার এ রকম করতে। পার না। তা হলে বল না, যোগীর শরীর আর সাধারণ শরীরে কোনও পার্থক্য নেই। আছে। যোগীর এই শরীরই অঘটন-ঘটন পটীয়সী।

গোপীনাথ বলেছেন, তাঁর গুরুদেবের শরীর তীব্র সাধনায় পরিণত হয়ে যায়। যা হতে পারত শব তাই হয়ে উঠেছে নিত্য-নব উৎসব। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে বাহ্য বায়ুর প্রয়োজন হয় নি। নাক দিয়ে শ্বাস ফেলা অথবা টানা কোনও কিছুরই তিনি তোয়াক্কা করতেন না। আভ্যন্তর সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ বায়ুই তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করত। সে বায়ুর পদ্মগন্ধে সুবাসিত হতো চতুর্দিক। তাঁর গায়ের ঘামেও সেই একই সুবাস,—যে কোনও গন্ধ জল যার তুলনায় তুচ্ছ। তাঁর শরীরে এত তড়িৎশক্তি ক্রিয়া করে যে গায়ে বোলতা বসলে পুড়ে মরে যায়। তাঁর চোখ দিয়ে যে তেজ বেরোয় তাতে হিংস্র পশু মুখ ঢাকে; জ্যোতির্ময় কঠিন শিবলিঙ্গ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। একবেলা অতি অল্প আহার এবং প্রায় নিদ্রাহীন থাকা তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর সিদ্ধিসংখ্যা অগণ্য। গোপীনাথকে মহাসিদ্ধির মর্মোদ্ঘাটনে বিশুদ্ধানন্দ তাঁর তর্জনীকে এত বড় এবং স্ফীত করেছিলেন যা বিস্ময়েরও বিস্ময়।

এর একটি কথাও আমার নয়। স্বয়ং গোপীনাথকে তাঁর গুরুদেবের চরিত-কথায় প্রকাশ করেছেন।

গোপীনাথ-গুরুদেব বিশুদ্ধানন্দ, লোকে যাকে অলৌকিক বলে তাকে অলৌকিক বলেন নি। বলেছেন, সূর্য-বিজ্ঞান। মানুষ মাত্রই সাধনায় শবকে সব করতে পারে। তবে শুধু বই পড়ে তা সম্ভব নয়। যোগক্রিয়ায় তা সম্ভব। যোগকেই তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষকার বলেন। এই পুরুষকারে প্রারব্ধকেও পরিবর্তিত করা যায়, একথা তিনি বলেছেন।

পুরীতে বিশুদ্ধানন্দের কাছে বসে আছেন ডক্টর গোপীনাথ। দু'একজন ভক্ত আহ্নিক-সন্ধ্যসমাপ্ত গুরুদেবকে বাতাস করছেন। গোপীনাথের মনে শ্রীকৃষ্ণের অংগ-গন্ধের কথা ভেসে আসছে ('মৃগমদ নীলোৎপল')। সংগে সংগে গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করছেন গোপীনাথ: গোবিন্দলীলামৃতে কৃষ্ণের গায়ের যে গন্ধের কথা রয়েছে সে গন্ধ কেমন?

গুরুদেব বললেন: বলে যাও কি কি উপাদানের সংযোগে ঐ গন্ধের আভাস পাওয়া যায় বলে লেখা আছে? গোপীনাথ একেকটি উপাদানের নাম করেন, বিশুদ্ধানন্দ শূন্যে হস্ত সঞ্চালন করেন। নীলপদ্ম, কস্তুরী ইত্যাদি সব উপাদান উল্লেখ করা হলে, গুরুদেব হস্তমুঠি গোপীনাথকে আঘ্রাণ করতে বলেন। দিব্যগন্ধে ঘর ভরে গেছে তখন। বাতাস মাতাল হয়েছে, আকাশ আকুল।

গোপীনাথের প্রশ্ন অতঃপর: নাম শোনামাত্র এত বিভিন্ন পদার্থ কি করে আকর্ষণ করলেন?

গুরুদেবের উত্তর: এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যতদূর পর্যন্ত সূর্যরশ্মির বিস্তার আছে, ততদূরে যা কিছু থাক তাকেই টেনে আনা যায়। সমস্ত জগৎ বিধাতার যে কৌশলে চলে তা যেদিন ধরতে পারবে, সেদিন বুঝবে, একটি ব্রহ্মাণ্ড রচনাও অসম্ভব ব্যাপার নয়।

গোপীনাথ বলেছেন: তাঁকে সূর্যরশ্মি থেকে সচেতন

আনন্দের
দিনে
উপভোগ্য
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
KOLAY
Glucose
KOLAY
QUALITY SWEETS
LACTO BONBON
KOLAY
TOFFEE
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১০

জীব পর্যন্ত সৃষ্টি করতে দেখেছি। মাছি, শতপদী ও চামচিকে আমার চোখের সামনে তৈরি হয়ে উড়ে যেতে দেখেছি। মনুষ্য-সৃষ্টি এখনও সম্ভব হয় নি বটে, তবে চেষ্টা করলে কালে তাও অসম্ভব হবে না।

তাঁর গুরুদেব এর অপরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে—বাস্তবিক পক্ষে কোনও বস্তুরই বিনাশ হয় না। একখানা বই অগ্নিতে ভস্মসাৎ করে ফেলে দেশান্তরে ও কালান্তরে যদি ঠিক সেই পুস্তকই পুনরায় উৎপন্ন করা যায় এবং যদি তা দৃষ্টিভ্রম না হয়ে স্থায়ী বস্তু বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে কোনও বস্তুরই যে ঐকান্তিক বিনাশ হয় না, একথা না মেনে উপায় কি? যদি গঙ্গার ঘাটে একবটি দুধ নিক্ষেপ করা যায় এবং অন্য ঘাট থেকে বিশ্লেষণপূর্বক ঠিক সেই দুধই বার করে দেখানো যায় তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে স্বরূপনিবৃত্তি কখনই হয় না কোনও জিনিসের। এইজন্যেই জীব লোক-লোকান্তরে, এমনকি ব্রহ্মলোকে গেলেও ক্ষমতাশালী বিজ্ঞানবিৎ তাকে আকর্ষণ করে আনতে পারেন।

একথা কি অন্ধবিশ্বাসের না বাস্তব বিজ্ঞানের?

বিশুদ্ধানন্দর কথাই তো কবিরও কথা:

শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?

ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের গুরুদেব বিশুদ্ধানন্দ কাশীতে যাঁর প্রিয় নাম ছিলো গন্ধবাবা, তিনি ওখানেই থামেন নি।

তিনি আরও এগিয়ে এসে বলছেন: চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তি, কামাদি রিপু, জ্বরাদি রোগ, গ্রীষ্মাদি ঋতু, প্রেমভক্তি প্রভৃতি ভাব পর্যন্ত—বিজ্ঞানের আলোকে স্পষ্ট দেখা যায়।

একটি কথা বিশুদ্ধানন্দ তবুও বলেন নি। সেকথাও সত্য। সেকথা হচ্ছে, সূর্যবিজ্ঞানে সব করা যায়, কিন্তু বিশুদ্ধানন্দ কী এবং কে, তা ধরা যায় না। সূর্যবিজ্ঞান তাঁর খেলা। কবি বলেছেন যে, দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে। ধ্যানী বলেছেন যে, তুমি কেবল গানের ওপারে নও, জ্ঞান ও বিজ্ঞান দু'য়েরই ওপারে তুমি দাঁড়িয়ে। বিশুদ্ধানন্দ কেবল উদ্‌যোগী নন; তিনি যোগী। তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।

বিশুদ্ধানন্দ তাঁর জীবনে তাঁর বাণীকে মূর্ত করেছেন। বহু আশ্চর্য ঘটনার উৎপাদক তিনি। বহু আশ্চর্যতর ক্ষমতার তিনি অধীশ্বর। বস্তুত, তিনি যত সাধারণ পরিভাষায় যাকে অলৌকিক ঘটনা বলে তার নায়ক। এমন আর বো[illegible] হয় কেউ নন। তার দ্বারা আমি একথা বলতে চাইছি ন[illegible] যে, অন্যান্য যোগীরা তাঁর মতো শক্তিমান ছিলেন না। না। তা আমার বক্তব্য নয়। তাঁরা ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তবে বিশুদ্ধানন্দের মতো এত ক্ষমতার অবা[illegible] প্রদর্শন আর প্রায় দেখা যায় না। কেন?

কেউ কেউ মনে করেন বিভূতি দেখানো উচিত নয়। কারুর ধারণা,—বিভূতি তুচ্ছ জিনিস। তার প্রতি শ্রদ্ধা করবার কারণ নেই। বর্তমান ভারতের পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ এ বিষয়ে যা বলেন সেইটেই শেষ কথা:

যোগবিভূতি সম্বন্ধে এই সকল ধারণাই অস্পষ্ট বলে মনে হয়। লোকোত্তর ব্যাপার মাত্রেই বিভূতির নিদর্শন বটে, কিন্তু তা যোগবিভূতি নয়। পরম পদার্থের সংগে সংযোগ হলে জীবভাব অভিভূত হয়ে যে ঐশ্বর্যভাব জাগে তা-ই যোগবিভূতি।

অন্যত্র গোপীনাথ বলছেন:

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, অধ্যাত্মপথে সিদ্ধির কোনও সার্থকতা আছে কি না? অন্যকে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে বিশ্বাস স্থাপনের উপযোগিতা ছাড়াও সিদ্ধিলাভে নিজের কোনও কল্যাণ হয় কি? এর উত্তর হচ্ছে,—নিশ্চয়ই হয়। ভোগ না করে ত্যাগ যেমন কপটাচার মাত্র, তেমনই ঐশ্বর্য লাভ না করে আত্মসমর্পণ অসম্ভব।

আবার:

'তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, প্রকৃত ঐশ্বর্যের উদয় মায়ার অতীত না হওয়া পর্যন্ত হয় না। যোগিগণ পরমপদার্থে যুক্ত হইয়া জগতের কল্যাণার্থ এবং স্বেচ্ছাক্রমে ঐশ্বর্য প্রকাশ করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন।'

[শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ: তৃতীয় ভাগ: লীলাকথা; পূর্বার্ধ]

বিশুদ্ধানন্দ সূর্যবিজ্ঞান প্রত্যক্ষশিক্ষা দেবার জন্যে লেবরেটরি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে ছিলেন। লোকে বলে বিজ্ঞান সকলের সামনে তার বক্তব্য প্রমাণ করতে পারে। যোগীরাও যে তা পারেন, মহত্তম মানবতীর্থ ভারতবর্ষে তার প্রমাণ আজও আছে। টেলিভিসন তা দেখায় না। তার জন্যে চাই ভিসান।

[ক্রমশ।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবীণা কুণ্ডু

ছায়া সুনিবিড় কাজল দিঘীর তাল গাছ ঘেরা তীর,
তুলসী মঞ্চ, মাধবী কুঞ্জ, নদী সরোবর নীর
বঙ্গবধূর মধুর মূরতি, পল্লী মায়ের ছবি
তোমায় মনের পরতে পরতে মধু যোগায়েছে কবি,

বিশ্বমাতার প্রাঙ্গণতলে বঙ্গমায়ের বাণী,
পূত প্রভাতে কাকলীর মত তুমিই শুনায়েছ জানি।
ভারতের সেই পবিত্র গাথা ঋষি কণ্ঠের স্বরে
কে শোনাবে আজি তেমনি আবার নিখিল লোকের তরে।

তপতী রায়

আর এক আকাশ

(সম্পূর্ণ উপন্যাস)

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

সত্যব্রতর প্রথম জীবন সত্যিই নিদারুণ সত্য আর বাস্তবতায় ভরা।

সে বাস্তব বুঝি কোনদিনই ভোলবার নয়।

সত্যব্রতর বাবা ছিলেন স্কুল-মাস্টার। কিন্তু তাঁর চালচলন ছিল বেশ ধনীর মত। চালচলন বলতে তাঁর নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ আর বিলাসিতা নয়।

খরচ, অসম্ভব খরচ করতেন তিনি তাঁর পরিবারের জন্য, পাড়ার জন্য, প্রত্যেকটি লোকের জন্য।

ফল যা হয়। আয়ের বেশি ব্যয় হওয়ার জন্য মাত্র তিনদিনের জ্বরে হঠাৎ যখন তিনি মারা গেলেন তখন সত্যব্রত সবে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন, অবিবাহিতা দু'টি বোন আর বিধবা মা তহবিলশূন্য বরং প্রচুর ঋণের বোঝা।

পাড়ার লোকেদের পরামর্শে এরও ওপর ঋণ করে বাবার মত মহৎ লোকের শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে দেবার পর সে যখন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলো তখন আশ্রয় করবার মত কোন তৃণগাছিও খুঁজে পেলো না, বরং চারদিক থেকে প্রচুর সমালোচনাই কানে আসতে লাগল।

বাবার মত নির্বুদ্ধি লোক যে হয় না এখন তারাই সমস্বরে প্রচার করতে লাগল, যারা একদিন তাঁরই কাছে উপকার পেয়ে কৃতজ্ঞতায় চিরদিন কেনা রইল ব'লে জানিয়ে গেছে।

চোখে অন্ধকারদেখল সত্যব্রত।

আর পড়াশোনা চালানর কথা ভাবা তো পাগলাম। কি করে যে এই চারটি প্রাণীর চার বেলার আহার জুটবে সে ভাবনাই তাঁকে প্রায় পাগল করে তুলল।

কাজের সন্ধানে সব জায়গায় ঘুরতে লাগল সে। কিন্তু চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময়ও যে নেই তার হাতে। আদর্শবাদী বাপের শেখান কিছু কিছু আদর্শতে ইতিমধ্যেই অবিশ্বাস এসে গেছে তার। কিন্তু তখন সৎপথে জীবনযাপনের আশা ত্যাগ করে নি সে।

ইতিমধ্যে সে দু'টো টুইশানি করে মাসে তিরিশ টাকার মত রোজগার করছিল। কিন্তু সমুদ্রে এক আঁজলা জলের মত সেটা কোন কাজেই লাগছিল না।

ভাল লাগছিল না তার সেই ষোল বছরের ছেলের এই নিত্য গ্লানিময় জীবন। কিন্তু কি-ই বা করা যেতে পারে। যে দিদির বিয়ে হয়ে গেছে তার দারিদ্র্যের সংসারেই পাঠিয়ে দিল দু' বোনকে। তবু যা হোক পেটে দু'টো খেতে পাবে। মা গেল না। তা হলে সত্যব্রতকে দেখবে কে ?

বাবার ভাড়া করা সুন্দর বাড়িটি ছেড়ে তারা উঠে এল বস্তির মধ্যে খাপরার চাল দেওয়া একখানা ঘরে।

আর এখানেই সে নতুন জীবনের দেখা পেল।

তাদের পাশের ঘরেই থাকত কমলা বলে একটি মেয়ে তার মাসীর সঙ্গে। অসম্ভব দরিদ্র তারা, কিন্তু ঐ খোলার ঘরেও তাদের খাওয়া দাওয়া আর কমলার সাজসজ্জা দেখে অবাক লেগে যেত সত্যব্রতর। স্বভাবধর্মে ঘৃণা করত সে এদের। মাকে এখানে এনে তুলতে হয়েছে ভেবে নিজের ওপর ধিক্কার আসত তার। কতবার ভেবেছে আত্মহত্যা করে এই জঘন্য জীবনের শেষ আনবে। কিন্তু পারে নি। এত সহজে জীবনের কাছে হার মানবে ? হ'তে পারে না।

বছরের পর বছর গড়িয়ে গেছে।

এর মধ্যে কতরকমের জীবিকার সন্ধানই না করল সত্যব্রত, কিন্তু অবস্থা যে কে সেই। মায়ের শরীর খারাপ হয়েছে আরও বেশি, পরিশ্রমে, দুশ্চিন্তায় আর অনাহারে।

শেষের দিকে অবশ্য সে একটা কারখানায় চাকরি পেয়েছে আর সেই বস্তির বাড়ি ছেড়ে ভদ্র পাড়ায় চলে এসেছে। কিন্তু ভদ্রতার আবরণটুকু বজায় রাখতে, তাকে না করতে হয়েছে এমন কাজ নেই।

ঐ বাড়িতেই মায়ের মৃত্যুসময়ে বন্ধু হ'য়ে পাশে এসে দাঁড়াল ওদেরই পাশের বাড়ির পরিমল ঘোষরা। সত্যব্রতর আশা হ'ল পৃথিবীতে তবু ভাল লোক আছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে জগৎ সম্বন্ধে তার সমস্ত ধারণা বদলে গেছে। আদর্শবাদের কথা তো চিন্তাও করে না। আয়ের পথ হিসেবে যে সব চিন্তা করে তার কোনটাই ভদ্রোচিত নয়।

পরিমল ঘোষরা এই সময় সত্যিই নানা সাহায্য করে তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, মা মারা যাবার পর দেশ থেকে ছোট বোন সবিতাকে এনে নিয়েছে। মেজ বোনের বিয়ে দিদিই দিয়েছে তার এক খুড়তুত দেওরের সঙ্গে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ঘোরে সত্যব্রত নানা কাজের জন্য। কি করে কোথায় যায় তা জানে না সবিতা, শুধু জানে দাদাকে বড় বেশি পরিশ্রম করতে হয়। দাদাকে তত আঁকড়ে ধরে সে। ওদের অভিভাবক হিসেবে যে পিসিমাকে দেশ থেকে সত্যব্রত আনিয়েছে তিনিই সামলাবার চেষ্টা করেন ওদের ভাঙা জোড়াতালি দেওয়া সংসারটা।

কিন্তু সেই পরিমলেরই বুড়ো কাকা, যখন একদিন সবিতাকে আঁচল টেনে ধরে তাঁর লুব্ধতা প্রকাশ করে বসলেন তখন সবিতা কেঁদে ভাসাল সারাসন্ধ্যা আর সত্যব্রত এক নতুন সত্য আবিষ্কার করলেন।

তাই যখন ধনীপুত্র ব্রজদুলালের সঙ্গে তাঁর আলাপ হ'ল তখন সবিতার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেবার জন্য তৎপর হলেন তিনি।

তিনি জেনেছেন সবিতা শুধু মেয়ে নয়, তার মধ্যে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা আছে তা না হ'লে পরিমল ঘোষের কাকার মত মান্যগণ লোকও তাকে চাইবে কেন?

তারপর চলল নতুন খেলা।

দিনের পর দিন সবিতাকে সামনে রেখেই ঐ ব্রজদুলালকে দোহন করা। পাড়ার লোকে ছি ছি বলল, মানুষের চামড়ায়, এ কাজ কেউ পারে না বলে ধিক্কার দিল, কিন্তু সত্যব্রতর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি তখন মরিয়া। অনেক সহ্য করেছেন আর নয়। সহজ উপায়ে টাকা রোজগারের পন্থা জেনে গেছেন তিনি। নিশ্চিন্ত আরামে গা ছেড়ে দিয়ে একে একে ঋণ শোধ করলেন তিনি।

উদ্দেশ্য তাঁর ভালই ছিল। সবিতার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া।

কিন্তু সবিতাই গোল বাঁধাল।

পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করল তাঁদেরই পাড়ার মিউনিসিপ্যালিটির কেরাণী, রাজনীতি করা রুগ্ন গোবিন্দ বোসকে।

বোনের সেই নির্বুদ্ধিতা আর মূঢ়তা জীবনেও ক্ষমা করেন নি তিনি। জন্মের মত তাঁর জীবন থেকে ছেঁটে ফেলেছিলেন তাঁর বড় স্নেহের পাত্রী সবিতাকে।

হ্যাঁ তাই তাঁর সিদ্ধান্ত।

এরপর থেকে তাই তিনি করে আসছেন।

প্রয়োজন নেই বলে পিসিমাকে পাঠাতে হয়েছে দেশে আর খুড়তুত ভাই রবীন আশ্রয় পেয়েছে, রবীনকে সত্যব্রতর প্রয়োজন ব'লে।

সবিতাকে তিনি সত্যিই ভালবাসতেন, খুবই ভালবাসতেন। সুখে-দুখে সময় কাটছিল তাঁর ওরই মধুর সাহচর্যে। কিন্তু নিজেই সে ভালবাসায় ছেদ ঘটিয়েছে সবিতা।

জীবনে বহু পোড়-খাওয়া সত্যব্রতর জীবনে নির্বুদ্ধিতা আর আবেগের স্থান নেই আজ।

রবীনের সঙ্গে সত্যিই অরুণার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে।

রবীন শিল্পী, তার ওপর ছোটবেলা থেকেই সে বেশ একটু আত্মকেন্দ্রিক, তাই বোধ হয় তার পক্ষে সত্যব্রতর সংসারেও নিজেকে নিয়ে শান্তির সঙ্গে থাকা সম্ভব হল।

অরুণাও খুব মিশুকে নয়। কিন্তু কেমন করে দু'টি অমিশুক লোক বেশ মিশে গেল।

রবীনের ওপর কেউ লক্ষ্য রাখে না। নিজের প্রডাকশানের প্রয়োজনে তাকে কাছে রেখেছেন সত্যব্রত। কাজ ছাড়া ডেকে কথাও বলেন না তিনি। রবীনও যেন বেঁচে গেছে। সে তার সিঁড়ির নীচের ছোট ঘরটিতে বসে নিজের মনে ছবি এঁকে যায়।

অরুণার সঙ্গে তার বেশ বন্ধুত্ব, কিন্তু ইলার সঙ্গে নয়।

ইলাকে সে বহুদিন দেখেছে লম্বা বেণী দুলিয়ে স্কুলের বাসে চড়ে স্কুলে বেরিয়ে যেতে, মাঝে মাঝে এ-ঘরে ও-ঘরে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আলাপ হবার কোন সুযোগ পায় নি, তার মনেও আসে নি আলাপ করার কথা। তাই ইলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে তেমন সজাগ হয় নি।

ঠিক দুপুরেই তার ওপরে যাবার অধিকার। অরুণা তাকে এই সময়ই আসতে বলেছে। রবীন বুঝেছে অরুণার মনোগত ইচ্ছা নয় যে রবীন অরুণা ছাড়া আর কারও সঙ্গে আলাপ করে।

এ ইচ্ছেটুকুর রবীন অমর্যাদা করতে চায় না। স্নেহকাঙাল এই ছেলেটা অরুনাকে ভালবাসে ভক্তি করে। কোনকালেই মুখ ফুটে কিছু বলা তার স্বভাব নয়। কিন্তু অরুণার কাছে চাইতে হয় নি। সে তার ব্যক্তিত্বের সম্মান দিয়েছে। তাকে একজন মানুষ বলে গণ্য করেছে, তার কাছে সময়মত পরামর্শ চেয়েছে, তাকে শিল্পী বলে সম্মান করেছে।

অরুণার কাছে সে কৃতজ্ঞ।

রবিবার সকাল বেলাতেই কাজ থেকে ফিরে, একগোছা রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে সোজা ওপরে উঠে এল রবীন।

অরুণা রজনীগন্ধা ভালবাসে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই ওর সঙ্গে দেখা হল ইলার।

সদ্য স্নান করে লম্বা কালো চুল এলিয়ে দিয়েছে ইলা। একটা হাল্কা গোলাপী শাড়ি আর সেই রং-এরই ব্লাউজ পরেছে সে। কপালের মাঝখানে একটি টিপ।

মুগ্ধ হয়ে গেল রবীন।

এই কিশোরীকে সে আজ দেখল না, যেন আবিষ্কার করল। রজনীগন্ধার মতই তার ছড়ান শরীর যেন অপূর্ব স্নিগ্ধতায় রবীনের শিল্পিমনকে ভরিয়ে দিল।

মুখোমুখি হ'তেই অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসল রবীন। আর ওপরে যাওয়া হল না। কি ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নীচ নেমে এল, একেবারে তার নিজের ঘরে, তার ছোট্ট নীড়টিতে।

রজনীগন্ধার গোছাটা পাশে রেখে চুপ করে বসে রইল রবীন। হঠাৎ একটা শূন্যতা যেন তাকে ঘিরে ফেলল।

কতক্ষণ এমন ভাবে বসেছিল খেয়াল নেই।

হঠাৎ কি মনে হতে তার অসমাপ্ত ছবিটা শেষ করবার জন্য তুলিতে রং তুলে নিল।

রবীনকে হঠাৎ ফিরে যেতে দেখে ইলাও যেন একটু অবাক হয়ে গেল। প্রথমে ভাবল অরুণাকে ডাকবে, তারপর কি ভেবে নিজেই নীচে নেমে এল।

একমনে ছবি আঁকছে রবীন।

আগে অনেকবার দেখেছে রবীনকে ইলা। ঐ বড় বড় চুল আর চোখের মালিক শ্যামবর্ণ ছেলেটির ভেতর আকর্ষণীয় কিছু খুঁজে পায় নি ইলা। এর কথা ভাবেও নি কোনদিন, কিন্তু আজ তার দৃষ্টিতে সে অবাকই হল। নেমে এসে রবীনকে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল ইলা।

আধ ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা বিরাট ক্যানভাসের ওপর একমনে তুলি চালিয়ে যাচ্ছে রবীন। ছবিটা রো দেখা যাচ্ছে না।

কিসের ছবি ?

ভাল করে দেখবার জন্য আরও একটু এগিয়ে এল ইলা। একেবারে দরজার কাছে সরে এল। একেবারে চোখোচোখি হয়ে গেল রবীনের সঙ্গে। একটু তুলিতে শেষ টান দিয়ে তুলিটা রাখতে গিয়েই রবীন দেখতে পেল ইলাকে।

দেখতে পেল নয়, আবিষ্কার করল বলা চলে।

চিরকালের লাজুক রবীন সোজা তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ ইলার অবাক হয়ে যাওয়া মুখের দিকে।

ইলা এবার লজ্জা পেল।

আপনি বুঝি এ ঘরে থাকেন ?

ঈষৎ হেসে নীচু গলায় বলল। হ্যাঁ।

সম্বিৎ ফিরে পেল রবীন, উঠে দাঁড়াল। আসুন না,···বসবেনই বা যে কোথায়।

একটিমাত্র কেরোসিন কাঠের বাক্স উপুড় করে তারই ওপর বসে ছবি আঁকে রবীন, সারাদিনই সে এই ঘরে ছবি আঁকে আর কাজ থাকলে বাইরে। রাত্রে করিডরের একটা কোচে শুয়ে ঘুমটুকু সেরে নেয়।

তবু এ সবে কোন অসুবিধে বোধ করে নি সে। সুবিধে অসুবিধের কোন অনুভূতিই বুঝি নেই তার। কিন্তু আজ তার সত্যিই মনে হ'ল একটা বসার জায়গার বড় অভাব।

একটা চেয়ার···

ঠিক আছে,···ব্যস্ত হবেন না। আমি তো বসব না।

ইলা অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে।

কেন বসুন না।

রবীন আবার অনুরোধ করল। না, বৌদি এখনই ডাকবে ! ··আমি ছবিটা দেখছিলাম।

ছবিটার খুব কাছে সরে এল ইলা। একটু সরে দাঁড়ালেও ওর প্রায় বুকের কাছে দাঁড়িয়ে ছবিটা দেখতে চেষ্টা করল ইলা।

ওর সদ্য স্নান করা চুলের আঘ্রাণ আর স্নান শেষের দেহসৌরভ রবীনের অনুভূতিকে যেন প্রবলভাবে নাড়া দিল। একটি নারী তার অতি সন্নিকটে দাঁড়িয়ে আছে তার সমস্ত মাধুর্য আর রহস্য নিয়ে।

রবীন অনাস্বাদিত অনুভূতিতে বিহ্বল হল।

কি আঁকছেন এটা ? মুখ নেই অথচ শাড়ি জামা পরা ? এ আবার কি ?

আপন মনেই হাসল ইলা।

মুখ খুঁজে পাচ্ছি না—

ইলার মুখের ওপর থেকে চোখ না নামিয়েই উত্তর দিল রবীন।

খিল খিল করে হেসে উঠল ইলা।

নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সান্নিধ্যে কখনও আসে নি ইলা। আজ রবীনকেও তার সঙ্কোচ নেই কোন। আসলে সঙ্কোচ যেন ওর স্বভাবের মধ্যেই নেই, অরুণা ঠিকই বলে ও ব. হরিণী।

রবীনের কথার জবাবে তাই সে অত্যন্ত সহজগলায় বলে উঠল ওমা সেকি ? মুখ নেই মানুষ ? স্কন্ধকাটা নাকি ?···

হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল ইলা।

আর অবাক হয়ে ওকে দেখতে লাগল রবীন।

ইলা···ইলু !

ওপর থেকে বিনয়ের ডাক এল।

যাই দাদা ডাকছে।···শেষ হোক আবার এসে দেখব।

একটু দাঁড়ান।

রজনীগন্ধার গুচ্ছটা ওর হাতে তুলে দিল রবীন। সমস্যাটার একটা সমাধান হ'ল যেন।

কি ব্যাপার? ফুল?

কেন ফুল ভালবাসেন না?

ওর দিকে গভীর চোখে তাকাল রবীন। ভালবাসি।···কিন্তু তখন তো না দিয়েই চলে এলেন।

এখন দেওয়াটাই ভাল হ'ল না?

ইলা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল, এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে রবীন।

সে দৃষ্টির সামনে এই প্রথম লজ্জা পেল ইলা।

আমি যাই।···

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ইলা।

ওর বুকটা যেন নড়ে উঠেছে হঠাৎ। তুলিটা হাতে নিয়ে আবার প্যাকিং বাক্সটার ওপর গিয়ে বসল রবীন।

এবার সে মুখ আঁকবে।

সত্যব্রতর নিজের কোম্পানীর প্রথম চিত্রার্ঘ হিসেবে কাগজে কাগজে নাম ঘোষিত হল।

'জীবনতৃষ্ণা'।

দর্শকদের কাছে প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত হল সত্যব্রতর ছায়ালোক কোম্পানী।

নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজের ভণ্ডদের মুখোস খুলে দেখাবেন সত্যব্রত এ ছবিতে, আর নায়িকার ভূমিকায় থাকবেন স্বয়ং সুচরিতা!

দীর্ঘ দু'বছর পর আবার তিনি চিত্রজগতেই ফিরে আসছেন—তাঁর স্বামীরই প্রযোজিত ও পরিচালিত বই-এ।

এ নিয়ে সাড়া পড়ে গেল চিত্রজগতে। দেখলেন তো? তখনই বলেছিলাম আবার ফিল্মে নামবে সুচরিতা!

ডিরেক্টর বোস বললেন ধনঞ্জয় চৌধুরীকে। আরে এর ধাতই আলাদা।

বোসের টিন থেকে ধনঞ্জয় চৌধুরী সিগারেট টেনে নেন। চৌধুরীকে নাকি নিজের টিন থেকে সিগারেট খেতে কেউ কখনও দেখে নি।

শুনেছ চৌধুরী।

বোস গা এলিয়ে বসলেন।

কি?

আরে আসল খবরটাই শোন নি?

কি তোমার আসল খবর?

আরে, শুধু নামছে না, এবার একটা নাচের রোলে আছেন সুচরিতা।

নাচ? বলেন কি? প্রায় আঁতকে উঠলেন ধনঞ্জয়।

তা অবাক হবার কি আছে?

সমর বারিক বললেন।

সি ওয়াজ আনডাউটেড্‌লি এ মোস্ট ট্যালেনটেড্‌ স্টার, তাঁর পক্ষে যে-কোন রোলই ভালভাবে এবং বেশ সাকসেসফুলিই করা সম্ভব।

এই তো সব ভুল করেন আপনারা। ধনঞ্জয় চৌধুরী প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

কিসের ভুল ?

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন সময় বারিক।

আরে এইসব মেয়েরা ভাবে নায়িকা হ'লেই বুঝি যে-কোন চরিত্রেই নামা চলে। কেন ? না···তিনি একজন স্টার।··· অথচ জানেন ? এ-সব বিষয়ে কত ভাবতে হয়। হোয়েন আই ওয়াজ ইন্ বম্বে তখন মিঃ ওয়াদিয়া······

রাখুন মশাই আপনার ওয়াদিয়া···

ঝাঁপিয়ে উঠলেন যেন সময় বারিক। আপনার বম্বে আর মিঃ ওয়াদিয়া শুনে শুনে তো কান আমাদের ঝালাপালা হ'য়ে গেল।···নতুন কিছু বলুন তো মশাই, কিছু নতুন শোনান।

আপনাকে নতুন কিছু শুনিয়ে আমার লাভ ?

মনে-মনে জ্বলে উঠলেও, মুখে নিস্পৃহভাব এনে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন ধনঞ্জয় চৌধুরী।

আমি ভাবছি অন্য কথা।···

সে কথায় কোন নজর না দিয়ে বারিক বললেন—

কি ?

ডিরেক্টর বোস কৌতূহলী হ'লেন।

আমাদের স্বার্থের কথা ভেবেছেন ?

আমাদের স্বার্থ ?

রীতিমত অবাক হলেন বোস।

একটা কথা কি আপনাদের মনে হয়েছে ?

কি ?

সুচরিতা আবার ফিরে এল এটা ভাল কথা। ওর অবশ্যই এখনও মার্কেট ভ্যালু আছে। বিশেষ করে ওর আশা প্রায় সকলেই ছেড়ে দিয়েছিল, বিয়ের পর কতদিন বাদে এই যে নামল তাতে ওর চাহিদা বেড়েছে বেশি।

তাতে কি ?

বাঃ, এইসময়—আমাদের নেক্স্ট বইটার জন্য যদি কনট্র্যাক্ট করে রাখি তা হলে কেমন হয় ?

ভাল প্ল্যান সন্দেহ নেই। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ?

কেন ?

বিয়ের ইমিডিয়েট পরে সুচরিতার সেই কাণ্ড মনে আছে তো ? মিস্তির অবশ্য কিছু ভাঙে নি, কিল খেয়ে কিল চুরি করল।···কিন্তু আমার বিশ্বাস ও টাকা খোকা মিত্তিরের পকেট থেকেই গেছে।

কিসে বুঝলে ?

খুব সহজ বোঝা, সত্যব্রতকে যে জানে, সেই বুঝবে। ক্ষতিপূরণ দেবার মত কাঁচা ছেলে সত্যব্রত নয়।

সে আর বলতে ?

কথাটা ধনঞ্জয় চৌধুরীর খুব মনে ধরল। আমি লোকচরিত্র চিনি মশাই বুঝলেন! আর লোকচরিত্র না বুঝলে, অমন সব বাস্তব চরিত্র সৃষ্টি করি কি করে ?···তা ছাড়া কিছু পড়াশুনো তো

SUNLIGHT
নতুন ফর্মুলার
সানলাইটে
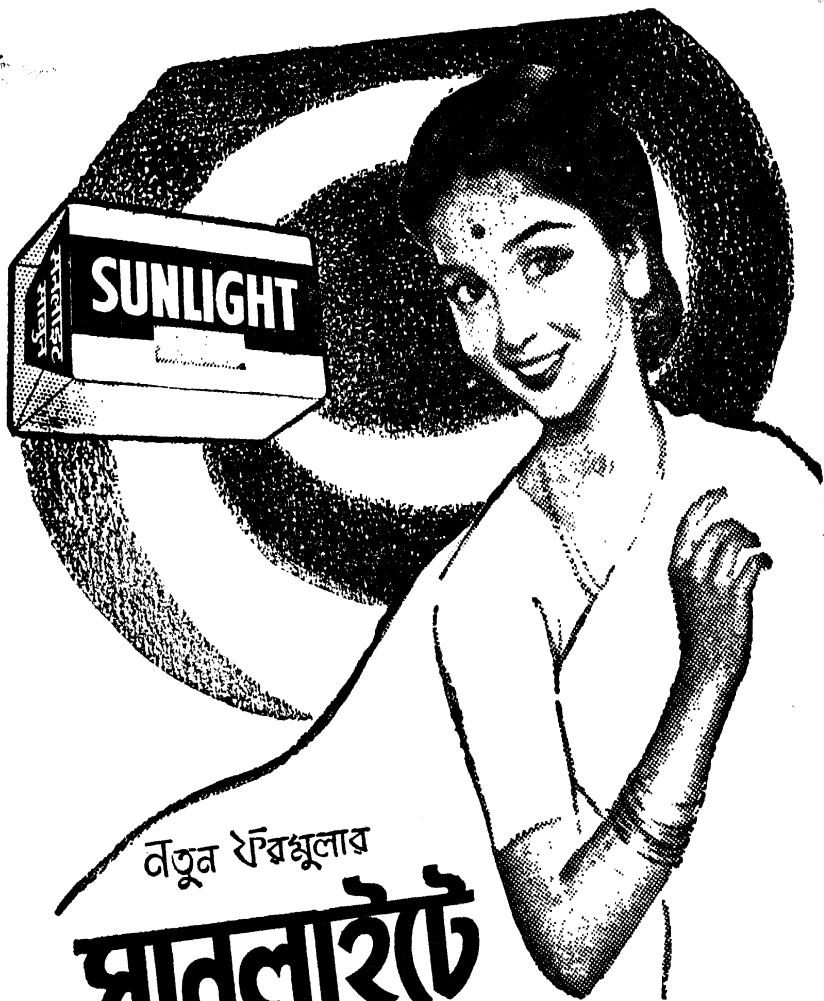
আছেই। প্র্যাকটিক্যালি কোন বিদেশী নভেল তো আর আমার অজানা নয়।

লোকে বলে সেটাই তো নাকি আপনার কাল।

বাঁকা হেসে বললেন বারিক।

মানে ?

রীতিমত চটে গেলেন চৌধুরী।

মানে আর কি ? তারা বলে, আপনি নাকি যত রাজ্যের ইংরেজী আর বাংলা গল্পের জোড়াতালিতে আপনার সব কাহিনীগুলো সৃষ্টি করেন।

হু সেজ দ্যাট ?

যেন গর্জে উঠলেন চৌধুরী। হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে গেল।

বা:। পারটিকুলারলি আর কার নাম করব ? কেন আপনিই তো জানেন সেদিন ঐ সিনেমা পত্রিকাতে আপনার সম্বন্ধে লেখে নি ?

ইয়েস আই রিমেম্বার। দোজ ফুলস্...

ইউ স্যাড্ রিমেম্বার মুচকি হাসলেন বারিক।

হাসছেন কি ? ভাবছেন ছাড়ব ওদের ? ওদের সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করব আমি।...আমি ওদের এগেনস্টে কেস আনব।...একেবারে মানহানির মামলা।

বোসের টিন থেকে আবার একটা সিগারেট নিলেন তিনি। আর এইজন্যই কলকাতায় আমার ভাল লাগে না। এরা বড় বেশি চালাক ভাবে নিজেদের।...বাঙালীর স্বভাবই এই—খালি পেছনে লাগা। ...হোয়েন আই ওয়াজ ইন বম্বে।...

সত্যি দু:খ হয় আপনার জন্য, কেন যে এ দুর্ভাগা বাংলা দেশে...

বারিক খোঁচা মারলেন আবার। আর বেশি চটে তার উত্তরে কটমট করে তাকিয়ে কি বলতে গেলেন চৌধুরী, ডিরেক্টর বোস ওদের থামিয়ে দিলেন।

আচ্ছা ছেলেমানুষ তো আপনারা, কি নিজেদের মধ্যে তর্ক ক'রে সময় নষ্ট করছেন।...আর তো সময় বেশি নেই।

কিসের ?

চৌধুরীর চমক ফিরল যেন।

বা:, আর আধঘণ্টার ভেতরই বাজোরিয়া আসছে, ঝগড়া ভুলে মনে রাখবেন ওকে ফাঁসানো চাই-ই আমাদের।

সে আর বলতে। নড়েচড়ে বসেন চৌধুরী।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে বাজোরিয়ার মস্তিষ্কপ্রসূত গল্পটি কেমন হবে তাই ভাবছি।

অত ভাববেন না। বারিক আবার বললেন।

আপনার পক্ষে বলা সহজ, কিন্তু আমাকেই তো আফটার অল্ সিনারিও করতে হবে, সুতরাং ভাবতে আমাকে হবে বৈ কি।

আরে ভাল লাগাতেই হবে যে কোন উপায়ে। পাঁচ লাখ খরচ করবে এই বইটাতে বাজোরিয়া মাইণ্ড দ্যাট্।...এত বড় দাঁও ছাড়া যায় না।

সে তো বটেই।

চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে সিগারেট টানতে থাকেন ধনঞ্জয় চৌধুরী।

আধঘণ্টার আগেই বাজোরিয়া এসে উপস্থিত। ঠিক কাঁটা মিলিয়ে সাড়ে পাঁচটা। বাইরে অপেক্ষা করছিল না কি লোকটা ?

তিনজনে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছরের ছাপ-পড়া মেদবহুল দেহ নিয়ে সবিনয়ে জোড়হাতে মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকলেন বাজোরিয়া। বহুদিন বাংলা দেশে আছেন। বেশ ভাল বুঝতে পারেন বাংলা, ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতেও পারেন।

বোসেন, আপনারা সব বোসেন।

গোলটেবিল ঘিরে সকলে ঘন হয়ে বসলেন।

বোসের সিগারেটের টিন খুলে বাজোরিয়ার সামনে ধরলেন ধনঞ্জয় চৌধুরী। বোস মনে মনে হাত কামড়ালেন। তাঁরই পয়সায় কেনা টিনে ধনঞ্জয় প্রথমেই বেশ ফিল্ডটা করে নিলেন। এ সব ব্যাপারে সত্যিই চৌধুরী একেবারে সিদ্ধহস্ত।

মাপ করিবেন। ও সব হামি খায় না।

হাতজোড় করে দাঁতের মাড়িগুলো সব বার করে হাসলেন বাজোরিয়া। যেন সিগারেট না খেয়ে বিশেষ অপরাধ করে ফেলছেন তিনি।

তাই নাকি ? খুব ভাল।

নিজে একটা সিগারেট তুলে ধরালেন ধনঞ্জয়। এ সব সংযম ক'জনের আছে ? বিশেষ করে এ লাইনে ? সত্যি এ্যাডমিরেবল্...

ওঁর কথাই আলাদা। উনি পাঁকে থেকেও পাঁকাল মাছ।

সুযোগটা হারাতে চাইলেন না বোস।

কথাটা কি হ'ল ?

হাসিমুখে তাকালেন বাজোরিয়া।

অর্থাৎ আপনাকে উনি প্রশংসা করছেন। আপনি সিদ্ধপুরুষ, মহাপুরুষ এই আর কি।

বেশি বলছেন আপনারা...হেঁ...হেঁ...বিশেষ খুশির সঙ্গে বাজোরিয়া প্রতিবাদ করলেন।

না না সত্যি। আপনার মত একাধারে অর্থের সঙ্গে প্রতিভার এমন সংমিশ্রণ কোথায় পাওয়া যায় ?

এগিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললেন বোস। ধনঞ্জয় সোজা করে টানটান হয়ে বসলেন, বোস বেশ বলেছেন কথাগুলো। তাই বলে উনি কি বাদ যাবেন ? মুখে একটা শ্রদ্ধার ভাব এনে বললেন, সত্যি মি: বাজোরিয়া, আপনি নিজে কাহিনী লিখেছেন শুনে অবধি উৎসুক হয়ে আছি। নিজে সাহিত্যিক হ'য়ে সাহিত্যিকের প্রতি আলাদা একটি দুর্বলতা আছে আমার। হোয়েন আই ওয়াজ ইন...

তা হলে আমাদের কাজ সুরু করা যাক।

বোস তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন।

হ্যাঁ। এখন আমি আপনাদেরকে হামার স্টোরিটা সর্ট-এ বলিয়েবে।

সে তো নিশ্চয়ই। আপনার অমূল্য সময়। সর্টেই বলুন। আমরা একটু আঁচ পেলেই বুঝে নেব।

বাজোরিয়া নড়েচড়ে বসলেন। মুখটা হঠাৎ ছুঁচোল করে চশমাটা একবার খুললেন। চশমাটা হাতে ধরাই রইল। বাজোরিয়া চোখ বুজলেন।

এঁরা সকলে চোখোচোখি করলেন। ইসারা হ'ল।

হঠাৎ চোখ খুললেন বাজোরিয়া আর অমনি সকলে দেহগুলোকে এগিয়ে নিয়ে এলেন। চোখে সকলের ঔৎসুক্য ফুটে রইল।

মেরা আইডিয়া এ হ্যায় কি···

বাজোরিয়া আরম্ভ করলেন। পহেলা, এক ট্রেন চল্‌ রহি হ্যায়···উস্‌কি কাম্‌রামে এক্‌ আদমি সো রহা হ্যায়।

আচ্ছা আচ্ছা···

গল্প যেন প্রথমেই বেশ জমে উঠেছে।

···এক্‌ স্টেশনপর এক্‌ লেড়্‌কী··বহুৎ—খুপ্‌সুরত···

বাজোরিয়া চোখ বুজলেন।

কল্পনায় যেন দেখতে পাচ্ছেন সেই বহুৎ খুপসুরত লেড়কীর পাতলা উড়ন্ত ওড়না আর অপূর্ব দেহবল্লরী। শুধু বাজোরিয়া নয় সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ভাবতে বসে গেলেন।

গল্প এগোতে লাগল এইভাবে।

বাজোরিয়ার নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে বসতে লাগলেন চৌধুরী, বোস আর ক্যামেরাম্যান বারিক।

বাজোরিয়া আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলে যাচ্ছেন, আর সকলে মাঝে মাঝে আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ, আহা এর কি তুলনা হয়, ইত্যাদি ভক্তি সহযোগে শুনে যাচ্ছেন।

হঠাৎ বাজোরিয়া থেমে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা আপলোগ বলিয়ে তো এবার কি হোবে?

চমক ভাঙল সকলের। কিসের কি হবে? কেউই তো শুনছেন না, কেবল সিগারেটের টিন ঘুরছে হাত থেকে হাতে।

এবার সত্যিই ভাবিয়ে তুললেন আপনি?

ডিরেক্টর বোস হঠাৎ পা নাচাতে সুরু করলেন। এ রিয়েল সাস্‌পেন্স।

দু'হাতের আঙুল জুড়ে কোলের ওপর রেখে পা নাচাতে লাগলেন তিনি।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন বারিক। চোখ বুজে মাথাটাকে পেছনে হেলিয়ে দিতে দিতে বললেন, আমি ভাবছি অদ্ভুত একটা অ্যাংগল্‌ হবে—ক্যামেরার।

কপালে হাত চাপা দিয়ে গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন তিনি।

আর মাড়িগুলো সব বার করে হাসতে লাগলেন বাজোরিয়া পরম আত্মপ্রসাদে।

আমার মনে হয় এখন হিরো···সিগারেটের বাকি অংশ ফেলে দিয়ে বললেন চৌধুরী।

ওঃ নেহি নেহি···

প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন বাজোরিয়া। অভি হিরো কা কেয়া কাম্‌?

না না—হিরোইন আই মীন···

ও বিলকুল নেহি···

আবার সজোরে প্রতিবাদ করলেন বাজোরিয়া।

হামি কি ভাবছি জানেন?

সকলে একসঙ্গে তাকালেন বাজোরিয়ার দিকে।

হামি ভাবছি, এই টাইমমে উ যো নাচনেওয়ালী হ্যায় না? উনকি এক গানা সুরু হো যায়েগা···কেয়া?
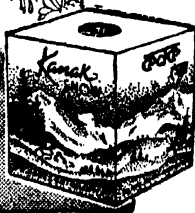
স্টিল বেটার, স্টিল বেটার।···রিয়েলি চমৎকার।

বারিক প্রশংসা করলেন।

বোকা বোকা মুখ করে বসে রইলেন ধনঞ্জয়। বড্ড চাল চালল ওরা। কিছু না বললেই হোত, শুধু একটা মতামত আর ওরিজিন্যালিটি দেখাবার লোভ সামলাতে না পেরে এভাবে অপ্রস্তুতে পড়লেন তিনি।

আচ্ছা আবার সুযোগ খুঁজতে হবে।

গল্প শেষে বাজোরিয়া নিজেকে একটু সহজভাবে ছেড়ে দিলেন গদীতে। ভাবটা এই তাঁর কর্তব্য সারা, এবার এই বিরাট সমস্যামূলক কাহিনী নিয়ে ওরা কি করে দেখা যাক।

এঁরাও সত্যি সমস্যায় পড়লেন, গল্প নিয়ে নয়, গল্পের মাথামুণ্ড তাঁদের বোধগম্যই হয় নি। তাঁদের সমস্যা এখন কিভাবে আর কি কথা এগোবে, আসল কথায় আসা যাবে কখন।

ডিরেক্টর বোসের মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বাজোরিয়া, আচ্ছা, আভি বলিয়ে তো, আপনারা হিরো কাকে লিভেন সমঝেছেন ?

বেশ গর্বিতভাবেই বললেন বোস এ হেন একটা সাজেশন্ দিতে পারার জন্য।

কোন ?

ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন বাজোরিয়া।

জয়ন্তকুমার।

প্রমাদ গণলেও পুনরুক্তি করতে দ্বিধা করলেন না বোস ?

কেন না, বইটার হিন্দী ভার্সান তো হবে, এখন ফিল্ম লাইনে মানে বাংলা স্ক্রীনে ওর মত হিন্দী উচ্চারণ আর কারই বা আছে ?

কেন মোহনলাল ?

বারিক ব্যাপারটা বুঝেছেন। অন্য নাম সাজেস্ট করা ভাল। সুতরাং আবার বললেন, মোহনলাল তো বেশ ভাল হিন্দী বলে। ইফ নট বেটার দ্যান তোমার জয়ন্তকুমার, তা ছাড়া দেখতেও বেশ সুপুরুষ।

জয়ন্তর কাছে লাগে না।

তা হোক, অতটা না হ'লেও, ওরও একটা ডিফারেন্ট মার্কেট ভ্যালু আছে।

দু'জনের তর্কের ভেতর কোন কথা না ব'লে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন বাজোরিয়া।

আচ্ছা, আপনার কি মত ?

বোস প্রশ্ন করলেন।

আমার ?

চোখ বুজে হাসলেন বাজোরিয়া।

হ্যাঁ, আপনার মতই তো প্রধান, আপনার থেকে কে বেশি বুঝবে ?

বারিক মোক্ষম কথা বলে ফেলার মত গর্বিত হাসি হাসলেন।

তা হলে শোনেন মিঃ বোস।

বলুন।

হামি বলি, আমাদের উচিত হোবে কি, মার্কেট ভ্যালুর হোতে অধিক ভাবতে হোবে নিউ ফাইও কোন হিরোর।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো বটেই। দেখুন, এত বড় কথাটা আমাদের মাথাতেই আসে নি।

হেঁ হেঁ। হাসতে লাগলেন বাজোরিয়া।

আমাদেরও তাই মত। কি বল ?

চৌধুরী আর বারিকের দিকে তাকিয়ে ইসারা করলেন তিনি।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এ আর বলতে। দু'জনেই সমর্থন করলেন।

তা যদি বলেন, সেও আমাদের একটি ছেলের খোঁজ আছে।··· সুরজিৎ ব'লে একটি ছেলে আসে এখানে। তার মা বাঙালী, বাবা পাঞ্জাবী। ও যেমন বাংলা বলে তেমনি চমৎকার হিন্দী, পাঞ্জাবী। আর চেহারাখানাও অপূর্ব। ওকেই নিলে হয়, চমৎকার হবে, কি বল তোমরা ?

আবার ইসারা করলেন তিনি চোখের ইঙ্গিতে। কিন্তু নিরাশ করলেন ওদের বাজোরিয়া।

না মোশয়, ও-সব হোবে না। হামি একটা হিরো ঠিক করিয়েছি। আজকালকার দিনে সোব দিক বুঝে তো কাম করতে হোয়। কেন না সমঝিয়ে, হিরোর কোদর খুবই তো বেশি।

আপনি নিজে ঠিক করলে তো কথাই নেই। সে তো সব থেকে ভাল।

কে বলুন তো ?

রহস্যময় হাসি হাসতে লাগলেন। আর সকলে ভাবতে বসে গেলেন।

সেই রাজকুমার ?

বোস সোৎসাহে বললেন হঠাৎ।

মিটিমিটি হেসে মাথা নাড়লেন বাজোরিয়া। ঐ খুপসুরত হিরোইনের সঙ্গে তো মানানো চাহি।

হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো বটেই।

আমি জানি···আই নো···

বারিক মুখ খুললেন। আপনার সঙ্গেই ঘোরে···দ্যাট্ জেন্টল-ম্যান···কি যেন নাম ? ফর্সা লম্বা মত·····

না—

এবার গম্ভীর গলায় বললেন বাজোরিয়া, তারপর চোখ বুজে চশমাটা খুলে ফেললেন। ভাবতে গেলেই চোখ বুজে চশমা খোলাই বোধ হয় বাজোরিয়ার অভ্যাস।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন চশমা পরে নিয়ে। সকলে নিশ্বাস বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করছেন।

ম্যায় সোচ্‌তা।···

কা ?

ইয়ে ফিল্ম মে ম্যায় খোদ এ্যাপিয়ার হো যাউঙ্গা, কেয়া আচ্ছা নেহি ?

হাঁ হ'য়ে গেল সকলের মুখ। বলে কি লোকটা ? ক্ষেপে গেল নাকি ? এই ঘটোৎকচের মত চেহারা নিয়ে ফিল্মে ? আয়না দেখে নি নাকি কোনদিন ?

তবু ভাব দেখালেন অন্য রকম।

যেন কৃতার্থ হ'য়ে গেলেন সবাই। এ হেন আশাতীত খবর পেয়ে ধন্য হলেন যেন সকলে এমন ভাব।

ঠিক এই কথাই আমি ভাবছিলাম, আর সেইজন্যই আপনাদের মত সব বাজে নাম সাজেস্ট করে সময় নষ্ট করি নি। [আগামীবারে সমাপ্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দিগন্তে কুহেলী—শ্রীপার্থ বর্ণিত :

ঠিক রাত সাড়ে এগারটায় ফোন বাজল।

বেশ কিছুদিন ধরেই এমন নিয়মিতভাবে ঠিক এই সময়টাতেই বাজছে যে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে নেওয়া যায় বললেই হয়।

সত্যি কথা বলতে গেলে এই সময়টায় বেশ অস্বস্তির মধ্যে কাটাই। এক একদিন মনে হয় ফোনটা আর ধরব না। বেজে বেজে ক্লান্ত হয়ে থামুক। আর কাউকে দিয়ে আমি কলকাতায় নেই বা ঘুমিয়ে পড়েছি গোছের মিথ্যে কিছু বলিয়ে দিতেও ইচ্ছে করে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারি না। এখনো অন্তত পারি নি।

ফোনটা কোন এক অপ্রতিরোধের তাগিদে গিয়ে তুলে নিতে হয়।

কে ফোন করছে জেনেও হ্যালো বলে কৌতূহল প্রকাশ করি তারপর।

দেবরাজের ঈষৎ ধরাগলায় সেই কুণ্ঠিত প্রশ্ন শোনা যায়,—ঘুম ভাঙালাম?

না, এখনো শুতে যাই নি।

লিখছিলে বুঝি?

না, রাত্রে আমি লিখি না ত' জানো!

ও: হ্যাঁ। গলার স্বরেই দেবরাজের মুখের অপরাধীর মত ইতস্তত ভাবটা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটু চুপ করে থেকে আবার দ্বিধাজড়িত ভাবে বলে,—তোমায় এখন বিরক্ত করতাম না ভাই। কিন্তু একটা কথা হঠাৎ মনে এল···

প্রায় প্রতিদিনই হঠাৎ এমনি একটা দেবরাজের মনে আসে রাত এগারটার পর আর আমায় ধৈর্য ধরে তা শুনতে হয়।

ধৈর্য ধরে বলাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রথম প্রথম বেশ আগ্রহ ভরেই শুনেছিলাম। তার বক্তব্যের মূল বিষয় সম্বন্ধে কৌতূহল এখনো বেশি বই কম নয়। কিন্তু দেবরাজের প্রতিদিন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই স্মৃতির পাতা ওল্টানো একটু ক্লান্তিকর হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আমার কাছে এসব কথা তুলে সে যে সহানুভূতিটুকু চায় তা আন্তরিক ভাবে দেবার সাধ্য আমার নেই বলেই আরো অস্বস্তি বোধ করি।

সহানুভূতি তার প্রতি নেই এমন নয়, কিন্তু সে তার হতাশ নি:সঙ্গতার জন্যে শুধু। তাকে সমর্থন করে তার সমব্যথী না হতে পারলেও রাত এগারটার পর কেন সে আমার উৎসাহের অভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়েও দ্বিধাভরে ফোন না করে পারে না তা আমি বুঝি।

ফোন ছাড়া আর কিছু করা যেন তার সাহসের বাইরে।

প্রথম প্রথম কয়েকবার তাকে সোজাসুজি এসে দেখা করতে বলেছি। বলেছি ফোনে কি সব কথা শোনা বা বলা যায়। বহুকাল তোমায় দেখি নি। একদিন চলেই এসো না। আমার বাড়িতে আসতে অসুবিধে হয় তোমার বাসায় যেতে পারি। না হলে অন্য একটা কোন জায়গা ঠিক করো। সন্ধ্যের সময় সেখানে গিয়ে বসা যাবে। আমারও অনেক কথা শোনবার আছে, তোমারও বলবার।

দেবরাজ আপত্তি করে নি। জায়গা আর সময়ও পরস্পরের সুবিধে বিচার করে ঠিক করেছি। কিন্তু দেবরাজ আসে নি।

কয়েকদিন তারপর লজ্জাতেই বোধ হয় ফোনও করে নি।

কিন্তু সে আর কতদিন? হপ্তাখানেক যেতে না যেতে আবার সেই মাঝরাতের ডাক।

প্রথমেই ক্ষমা চাওয়া।—আমি বড় লজ্জিত পার্থ। সেদিন কিছুতেই কথা রাখা সম্ভব হ'ল না। একটা জরুরী কাজে সকালেই কলকাতার বাইরে চলে যেতে হল।

প্রথমবার তার এ কৈফিয়ৎ একরকম বিশ্বাসই করেছিলাম। বলেছিলাম, থাক তাতে আর কি হয়েছে? কাল বরং ওই রেস্তোরাঁতেই এসো না। ঠিক ছ'টা থেকে আমি অপেক্ষা করব।

না, না ও রেস্তোরাঁয় নয়।—দেবরাজের গলায় যেন আতঙ্ক,—ওখানে বড় ভিড়!

ভিড় ছ'টার পর আর থাকে না!—দেবরাজকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, সিনেমার শো আরম্ভ হয়ে গেলে চৌরঙ্গীর প্রায় সব রেস্তোরাঁই খানিকক্ষণের জন্যে বেশ ফাঁকা হয়ে যায়।

হ্যাঁ তা যায়, তবে—তবে···কি জানো—বেশ একটু ইতস্তত করে দেবরাজ বলেছিল,—ও রেস্তোরাঁ-টেস্তোরাঁয় ঠিক প্রাণখুলে কথা বলা যায় না। কখন কে ঠিক পাশের সীটে এসে বসে পড়বে তার ত' ঠিক নেই! বেশ, তা হলে এসপ্লানেডে ট্রাম কোম্পানীর কন্ট্রোল-বিল্ডিংএর তলায় অপেক্ষা করব। ঘড়িটার ঠিক নিচে। ছ'টা থেকে সওয়া ছ'টার মধ্যে এলো

দেবরাজ রাজী হয়েছিল তৎক্ষণাৎ।

কিন্তু সেবারও ছ'টা থেকে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরিয়ে থেকেও তার দেখা পাই নি। মনে মনে তার মুণ্ডপাত করতে করতে বাড়ি ফিরেছিলাম।

না, শুধু রাগই করি নি—বেশ একটু বিস্ময়বিমূঢ়ও হয়েছিলাম। ফোনে যে নিত্য আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ব্যাকুল সে আমার সঙ্গে সামনা-সামনি সাক্ষাৎ কি এড়িয়ে চলতেই চায়? তার কারণই বা কি হতে পারে!

সেদিন রাত্রেই আবার ফোন বেজেছিল যথাসময়ে।

ফোন তুলেই কোনো সম্ভাষণের জন্যে অপেক্ষা না করে সরাসরি মনের ঝাঁজ প্রকাশ করেছিলাম,—কি ভেবেছ তুমি বলো ত'! আমি কি তোমার খাস তালুকের প্রজা না তোমার কাছে চাকরীর উমেদার। দু'দিন দু'দিন কথা দিয়ে এরকম খেলাপ করার মানে কি?

ওধার থেকে জড়িত স্বরে কি একটা বলবার চেষ্টা করেছিল দেবরাজ। তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম,—আর কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা কোরো না। তার বদলে সত্যি করে বলো ত' আমার সঙ্গে দেখা করতে কেন তোমার আপত্তি!

কয়েক মুহূর্ত একেবারে স্তব্ধ। ওদিকের ফোনে যেন কেউ নেই।

তারপর ধীরে ধীরে প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে বলেছিল দেবরাজ,—দেখা করতে আমায় বোলো না পার্থ। আমি পারব না।

অবাক হয়েছিলাম শুধু তার কথায় নয়, তার গলার অপ্রত্যাশিত অসীম কাতরতাতেও।

রাগ-অভিমান সব ভুলে গিয়ে বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার মানে? তুমি আমায় ফোন করতে পারো অথচ দেখা করতে পারো না আমার সঙ্গে? বেশ, কোথায় তুমি আছো বলো। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব: দশ বছর বাদে তোমার গলার স্বরই শুধু ফোনে শুনছি, চোখে তোমাকে দেখি নি! বলো কোথায় তুমি আছ! কি তোমার ঠিকানা?

আবার খানিকক্ষণের নীরবতা। তারপর দেবরাজের যন্ত্রণা-কাতর স্বর,—ঠিকানাও আমি বলতে পারব না। দোহাই তোমায় জিজ্ঞাসা কোরো না।

ঠিকানা জিজ্ঞাসা করব না! একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলেছিলাম,—এ ত' আচ্ছা মজার ব্যাপার দেখছি! তুমি যে রীতিমত একটা রহস্য গল্প বানিয়ে তুলছ দেবরাজ। দশ বছর তোমার সঙ্গে দেখা নেই। তারপর হঠাৎ একদিন রাত্রে ফোন করে বসলে। সেই থেকে নিত্যই প্রায় ফোন করে যাচ্ছ। পুরোণ স্মৃতির রোমন্থনই তোমার বিলাস বলে বুঝেছি। তোমাদের সে জীবনের সঙ্গে আমারও যত ক্ষীণই হোক সম্পর্ক একটা ছিল। তাই তোমার সেদিনকার ভূমিকা যতটুকু আমি জানি তা সমর্থন না করতে পারলেও তোমার তরফের কথা শুনতে উৎসুক হয়েছি। কিন্তু ফোনে কথা বললেও সামনা সামনি

তুমি কেন আসতে পারো না, কেন জানাতে পারো না তোমার ঠিকানা! তুমি ত' ফেরারী আসামী নও দেবরাজ! যাই তুমি করে থাকো তার বিচার শুধু তোমার নিজের কাছে।

সেই বিচারই আমি করতে চাইছি পার্থ! তাই করবার জন্যেই তোমায় ফোনে ডাকি। একমাত্র তুমিই আমায় সাহায্য করতে পারো। আমাকে বিমুখ তুমি কোরো না।

দেবরাজের কণ্ঠের এ করুণ মিনতির পর আর বিরূপ হয়ে থাকা সম্ভব হয় নি। বলেছিলাম,—তা করব না। কিন্তু তুমি তা হলে আমার কাছে শুধু অশরীরী ধ্বনি হয়েই থাকবে! সে ধ্বনিও আমার একরকম অচেনা।

কেন? দেবরাজের গলার স্বর যেন একটু তীক্ষ্ণ শুনিয়েছিল।

হেসে বলেছিলাম, দশ বছর আগেকার তোমার গলার স্বর যা মনে আছে ফোনের যান্ত্রিক বিকৃতির ভেতর দিয়ে তা মিলিয়ে নেওয়া যায় না বলে। আচ্ছা তবু তোমার শর্তই না হয় মেনে নিলাম দেবরাজ, কিন্তু কেন তোমার এ রকম অদ্ভুত আত্মগোপন তাও কি বলতে পারো না!

না, তাও জানতে চেয়ো না। জানাবার সময় যদি হয় আমি নিজেই জানাবো। দেবরাজের কণ্ঠে অসহায় কাতরতাই ফুটে উঠেছিল।

সহানুভূতির সঙ্গেই এবার হেসে বলেছিলাম, তোমার সব কথাই মেনে নিচ্ছি দেবরাজ। কিন্তু আমার অবস্থাটাও আশা করি বুঝতে পারছ। আমাকে শ্রোতা ও সাক্ষী হিসেবে রেখে জীবনের একটা অধ্যায় তুমি বিচার করতে চাও, অথচ আমার কাছেই নিজেকে তুমি অর্ধেকটা ঢাকা দিয়ে রাখছ। এ যেন এমন একটি বই-এর সমালোচনায় সাহায্য করতে আমায় ডাকা যার অনেকগুলো পাতা আমার পড়া বারণ বলে বই থেকে সম্পূর্ণ ছিঁড়ে রাখা হয়েছে। সেই অজানা গোপন পাতাগুলো সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল মনের মধ্যে চেপে রেখে দিয়ে দিনের পর-দিন তোমার অশরীরী ধ্বনিমূর্তির সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যেতে হবে। এ যন্ত্রণা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতেও ত' পারে।

তা আমি বুঝি পার্থ! বুঝি তোমার ওপর এ একরকম অত্যাচার,—দেবরাজের কণ্ঠ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল,—কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে যে এ সব কথা শোনাতে পারি না। সেদিন ক'টা জীবনের সুতো যেখানে জট পাকিয়ে গিয়েছিল সেখানে তুমিই ছিলে একমাত্র দরদী দর্শক। আমাদেরও অগোচর কিছু খেই হয়ত তোমার-ই জানা থাকতে পারে। তুমি ছাড়া আর কেউ সে দুশ্ছেদ্য গ্রন্থির জটিলতা বুঝবে না। আমার,—না', শুধু আমার নয়, আমাদের সকলের খাতিরে তোমাকে তাই একটু ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে পার্থ।

সেই পরীক্ষাই দিয়ে এসেছি এ পর্যন্ত।

দেবরাজ প্রায় প্রতিদিনই ফোন করেছে রাত এগারটার পর। মাঝে মাঝে অবশ্য কয়েকদিনের জন্যে নীরবও হয়ে গেছে একেবারে। যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে সুরু করেছিল তেমনি অকস্মাৎ দেবরাজ হয়ত এই বিচিত্র স্মৃতিমন্থনের পালায় ছেদ টেনে দিয়েছে অনুমান করে কিছুটা স্বস্তি পেলেও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারি নি। রাত এগারটার পর থেকেই একটা অস্থিরতা অনুভব করেছি। কানের সঙ্গে মনটাও ওই ফোনটার দিকেই অস্বস্তিকরভাবে সজাগ হয়ে থেকেছে।

তারপর আবার একদিন ফোন বেজে ওঠায় খুশি না উত্যক্ত বোধ করেছি নিজেই বলতে পারব না।

দেবরাজ ফোনে সব সময়ে যে দীর্ঘ আলাপ করেছে এমন নয়। এক-একদিন বলার মত কোন কথা না থাকলেও শুধু আমার উপস্থিতির আশ্বাসটুকু পাবার জন্যেই যেন সে ফোন করছে বলে সন্দেহ হয়েছে।

স্মৃতির খেই টেনে টেনে দেবরাজ যে-সব কথা আমায় শুনিয়েছে তার আকর্ষণ যতই থাক দেবরাজের নিজের চরিত্রের দুর্বোধ পরিণতিই আমাকে উদ্বিগ্ন উৎসুক করেছে আরো অনেক বেশি। সবকিছু মিলিয়ে তার বর্ত্তমানের নানা অদ্ভুত আচরণের মানে বোঝবার চেষ্টায় আকাশ-পাতাল ভেবেও কোন কূল পাই নি।

এ কি এক ধরনের অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ! কিন্তু তা ভেবে নিলেও যেন সব রহস্যের মীমাংসা হয় না।

আজই কিন্তু রাত এগারটার পর তার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে মনের মধ্যে একটা চকিত বিদ্যুতের ইঙ্গিত যেন ঝিলিক দিয়ে গেল।

ফোন বাজল ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই।

ফোনটা তুলে ধরে ওদিকের সম্ভাষণের জন্যেই নীরবে অপেক্ষা করে রইলাম।

হ্যালো! কে পার্থ!

হ্যাঁ।

আমার নিরুত্তাপ কণ্ঠ লক্ষ্য না করবার মত নয়। ওদিকে সেই কুণ্ঠিত স্বর আরো একটু কাতর শোনাল,—আজ নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলে? না?

না, ঘুমোই নি। তোমার ফোনের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

ও—তাই নাকি!—ওধারে বাধিত হওয়ার চেয়ে গলার স্বরে কি রকম একটা থতমত খাওয়া ভাব।

—তোমার গলাটা কেমন ভারি ভারি শোনাল প্রথম। তাই ভাবলাম ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি।

একটু থেমে দেবরাজ আবার বললে,—কাল তোমায় দীঘওয়ারার যে ঘটনার কথা বলেছি তা শুনে কি তোমার মনে হচ্ছে? তা থেকে কিছু কি ভেবে পেলে?

হ্যাঁ পেলাম। শুধু ওই ঘটনা থেকেই নয়, এ পর্যন্ত যা কিছু তুমি বলেছ করেছ সে সবকিছু থেকেই একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কি!—আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা মেশানো কণ্ঠস্বর।

ধীরে ধীরে দৃঢ়স্বরে বললাম,—তুমি দেবরাজ নও!

আমি দেবরাজ নই!—ফোনের ওধারে একটা চমকিত বিহ্বলতা গলার স্বরে ফুটে উঠল,—কি তুমি বলছ পার্থ?

ঠিকই যে বলছি তা তুমি জানো। তুমি দেবরাজ নও, তাই তুমি আমার সঙ্গে সামনা-সামনি দেখা করতে পারো না, তাই তোমাকে গভীর রাত্রে শুধু ফোনে আমার কাছে স্মৃতির জ্বলন্ত ক্ষতগুলো মেলে ধরতে হয় দেবরাজ সেজে।

কিন্তু—কিন্তু—দেবরাজ সাজার এ ছলনা কেউ করতে যাবে কেন?

যাবে সে অম্বর বলে। পৃথিবীর সেই চিরন্তন ত্রিভুজ নাটকে একটি অসামান্য ভূমিকা যে নিজের মূঢ়তায় ব্যর্থ করার গ্লানিতে দগ্ধ হচ্ছে বলে।

ফোনের ওধারে অস্ফুট একটা শব্দ হতেই আবার বললাম,—বৃথা প্রতিবাদ করবার চেষ্টা কোরো না। আমি জানি তুমি অম্বর। তুমি আমায় এ ক'দিনে যা যা বলেছ এক অম্বর চৌধুরী ছাড়া আর কারুর তা অত বিশদভাবে জানবার কথা নয়। দেবরাজ ভালোমন্দ দোষত্রুটি সবশুদ্ধ মিলিয়ে সাধারণ মানুষের খুব বেশি কিছু নয়। সস্তা কাঠের মত সে দপ করে জ্বলে উঠতে পারে, কিন্তু নিভতেও দেরি লাগে না। এত অনির্বাণ দাহও দেবরাজের হৃদয়ে থাকতে পারে না। তোমাদের তিনজনকেই কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে আমি জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম অম্বর। বাইরে থেকে দেখতে তুমিই ছিলে সবচেয়ে কঠিন নির্বিকার, কিন্তু ওই মুখোশের তলায় যে মানুষটি ছিল তার কিছু আভাস আমি পেয়েছি। আত্মবিচারের এ যন্ত্রণা সাধ করে বরণ করবার উৎসাহ একমাত্র তোমারই হতে পারে আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। দশ বছর তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি অম্বর। সবাই জানে তুমি স্বেচ্ছায় নিজের ব্রতের খাতিরে এমন নির্লিপ্ততার শিখরে নিজেকে নির্বাসিত করেছ কোনো হৃদয়াবেগের ঢেউ যেখানে পৌঁছোয় না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি কিছুই তুমি ভোলো নি দীঘওয়ারার সেই অরণ্যবাস, দেবরাজ আর নীনা আজও তোমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে। নিজেকে তুমি ক্ষমা করতে পারো নি তাই দেবরাজ সেজে তোমাদের কাহিনীর সঙ্গে কিছুটা জড়িত একটিমাত্র মানুষের কাছে নিজেকে মেলে ধরে আত্মবিচারের চেষ্টা তোমার না করলে নয়।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে থামলাম।

ওধারের ফোনটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখবার শব্দ শোনা গেল।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ তীব্র একটা অনুশোচনা জাগল মনে। কথাগুলো অন্য কোনভাবে বোধ হয় বলা উচিত ছিল।

সন্দেহ হল রাত এগারটার পর এমন করে ফোন আর অনেকদিন বোধ হয় বাজবে না। কোনদিন আর বাজবে কি না কে জানে।

নীনা অম্বর আর দেবরাজ।

কাহিনী প্রধানত এই তিনজনকে নিয়েই।

সেই চিরন্তন ত্রিভুজেরই তিনটি বাহু বললে কিন্তু একটু ভুল বোঝানো হয়। ভালোবাসা আর ঈর্ষার দ্বন্দ্বের সেই মামুলী ত্রিভুজ ঠিক নয়। বেশ একটু পার্থক্য আছে। পার্থক্য প্রধান চরিত্রগুলি ঠিক সাধারণ মাপের নয় বলে। কোন সুস্পষ্ট সরল রেখায় তাদের বোঝানো যায় না।

এ কাহিনীর মধ্যে আমার জড়িয়ে পড়াও বোধ হয় নিয়তির নির্দেশ।

কারণ কাহিনী যেখানে সুরু হয়েছে সেখানে আমি অনুপস্থিত, যখন তাতে ছেদ পড়েছে তখনও আমি ছিলাম না। মাঝখানের কয়েকটা অধ্যায় শুধু আমার সামনে উদ্‌ঘাটিত।

সে ক'টি অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যও আমার হত না, যদি না নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অত্যন্ত দুর্যোগের একরাত্রে প্রায় দুরুদুরু বুকে সাগর ডিঙোবার একটি হাওয়াই জাহাজে আমায় রওনা হ'তে হ'ত। সেই উদ্যোগপর্ব থেকেই সুরু করা বিধেয়।

এয়ার পোর্টে পৌঁছোতে পারব এমন আশা ছিল না।

হরলিক্স-এর একটি বিশিষ্ট নজির :

সর্বনাশ! নতুন শিল্পোদ্যোগে চট ক'রে পদোন্নতি হবে, আর এও আশা করেছিলাম যে তাড়াতাড়ি বদলি হব। স্ত্রীকে যখন বললাম যে তা হবার জো নেই, সে গজগজ করতে লাগল। আমি তাকে বললাম, 'বহৎ আচ্ছা, ঘরে এবার তোমার মুখনাড়া শুরু হল—কারখানায় যেন যথেষ্ট হয়নি।' শুনে সে বলল, 'বদলির কথা ভাবছি না, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা। কিছুদিন থেকেই দেখছি, তুমি যেন উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছ, যেন বড় বেশী ক্লান্তিতে পেয়ে বসেছে। কারখানার ডাক্তারবাবুকে একবার দেখাও না।'

আমার স্ত্রী খাঁটি কথাই অবশ্য বলেছে। পরদিনই আমি কারখানার ক্লিনিকে গেলাম। দেবু ডাক্তার বললেন, 'মানসিক দুশ্চিন্তা আর একটানা খাটুনির দরুণ তোমার শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে, এই যা। পুষ্টি বাড়াতে পারলেই শরীরে বল পাবে। আমি বলি, তুমি হরলিকস খাও।'

আশ্চর্য গুণ বলতে হবে হরলিক্সের! খাঁটি দুধের সঙ্গে পেষাই করা গম আর মল্টেড বার্লির পুষ্টিকর সারাংশ মিশিয়ে তৈরী হয় হরলিক্স। তাই খেয়ে দেখতে দেখতে আমি শক্তিসামর্থ্য ফিরে পেলাম। অল্পদিনের মধ্যেই আমার পদোন্নতি হল, অন্য জায়গায় বদলিও হলাম। আমার স্ত্রীর আর আমার সে কী আনন্দ! বেঁচে থাক্ আমার হরলিক্স!

হরলিক্স অতিরিক্ত শক্তি গড়ে তোলে!

কথার পিঠে কথার তোড় খানিকটা বাঁধা দস্তুর মেনে চলে বলে-ই আশা শঙ্কটা কলমে পিছলে এসে গেল, নইলে মনের সত্যিকার ভাবটা সম্পূর্ণ বিপরীতই বোধ হয় ছিল।

এয়ার পোর্টে সে রাত্রে সময়মত পৌঁছোতে না পারলে হতাশ হয়ে খুব ভেঙে বোধ হয় পড়তাম না। যাকে অনিবার্য কারণ বলে সে রকম একটা কিছুর ফলে প্লেন-এ চড়া সেদিন বন্ধ হলে বোধ হয় খানিকটা স্বস্তি-ই পেতাম। যে রকম অবস্থায় বাড়ি থেকে দু'পা যেতে হলে ভাবতে হয়, তাইতে একেবারে আরব-সমুদ্র লঙ্ঘন করার কল্পনায় তেমন উৎসাহ বোধ না করা এমন কিছু অস্বাভাবিক বোধ হয় না। তার ওপর এক হিসেবে এ ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি। আকাশ-পথে এমন দীর্ঘ সাগরপাড়ি আগে কখনও দিই নি। দুর্যোগটায় তাই একটা অশুভ সঙ্কেতের আভাস-ই পেয়ে মনটা যে একটু দমে গেছল তা অকপটে স্বীকার করছি।

সাধারণ দুর্যোগ ত' নয়, যেন প্রলয়েরই কিছুটা নমুনা।

সকাল থেকেই সুরু হয়েছিল হাওয়ার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। দুপুরে বৃষ্টি থেমে হাওয়ার বেগ বাড়ায় ধারণা হয়েছিল সন্ধ্যের দিকে আকাশের চেহারা কিছুটা প্রসন্ন হতেও পারে। তার বদলে বিকেল থেকেই বৃষ্টি নেমেছিল মুষলধারে।

বোম্বাই-এর বর্ষার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই তাদের এ বৃষ্টির প্রচণ্ডতা বোঝানো যাবে না। এ যেন কোন আদিম যুগের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া আকাশের ঝাঁঝরা দমকলের জলের তোড়ে আকাশের কোন দানব যেন হিংস্র আক্রোশে মাটির পৃথিবীকে ধুয়ে ভাসিয়ে দিতে চায়।

একবার সুরু হলে সে বৃষ্টির কোপ যেন কিছুতে শান্ত হবার নয়। এ আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরুপায় নগর মুহ্যমান হয়ে নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত। তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিকল বিপর্যস্ত।

বোম্বাই শহরের সুবিখ্যাত একটি হোটেলেই জায়গা দেওয়া হয়েছিল আকাশপথের সাগরপারের যাত্রী হিসাবে। সেখান থেকে হাওয়াই জাহাজ কোম্পানীর কোচ এয়ার পোর্টে পৌঁছে দেবে এই ব্যবস্থা।

রাত সাড়ে আটটায় কোচ আসবার কথা। শরীরটা সারাদিন ভালো ছিল না। রাত্রের খাওয়াটা বাদ দিয়েই নিচের লবীতে গিয়ে অপেক্ষা করছি! সঙ্গে আমারই মত ওই প্লেনের একজন সহযাত্রী। তিনি আমার চেয়েও বেশ একটু উদ্বিগ্ন মনে হ'ল। এ রকম দুর্যোগে প্লেন ছাড়ে কি না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার জিজ্ঞাসা করলেন। আমি যে তাঁর চেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল নই এ কথাটা ভালো করে বোঝাতে না পেরে শেষকালে দূরের চেয়ে কাছের ভাবনাটাই যে বড় হয়ে উঠেছে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

বললাম,—প্লেন ছাড়ুক বা না ছাড়ুক, এয়ার পোর্টে ত' আমাদের পৌঁছোন দরকার। তারই-ত' কোন ভরসা দেখছি না। রাত নটা বাজে, এখনও ত' কোচের দেখা নেই!

কোচ আসবে না না কি!—ভদ্রলোক একেবারে আঁতকে উঠলেন। তারপর নিজেকেই যেন ভরসা দেবার জন্যে বললেন, কিন্তু কোচ ত' আসতে বাধ্য। আমাদের সময় মত এয়ার পোর্টে পৌঁছে দেওয়া ত' প্লেন কোম্পানীরই দায়। আমাদের না নিয়ে কি প্লেন ছাড়তে পারে না কি!

প্লেন কি করতে পারে না পারে তার প্রমাণ পাবার আগেই খোঁজ নিয়ে যা জানলাম তাতে একেবারে হতবুদ্ধি। সাধারণত এ সব ব্যাপারে যা প্রায় অবিশ্বাস্য কারুর না কারুর ভুলে বা অবহেলায় সেই ধরণের গাফিলতিই ঘটেছে। উড়োজাহাজ কোম্পানীর কোচ নাকি কিছু পূর্বে আমাদের হোটেলে এসেছিল এবং আমরা দু'জন লবীতে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও কোন খোঁজখবর না করে অন্য কয়েকজন দিল্লী-কলকাতার যাত্রীদের নিয়ে ফিরে গেছে।

আমাদের অবস্থাটা এবার অনুমান করা যেতে পারে।

নিজেই আমি অসহায় আনাড়ি, তার ওপর ততোধিক দিশাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় এক সহযাত্রী।

কি হবে মশাই! আমাদের ওই একরাশ ভাড়ার টাকা মারা যাবে! এয়ার পোর্টে একবার ফোন করা যায় না! একটা ট্যাক্সির চেষ্টা করুন না!

চেষ্টা যা করবার করতে কিছু বাকি রাখলাম না। কিন্তু ওই অসম্ভব দুর্যোগের মধ্যে কোথায় ট্যাক্সি? ট্যাক্সি জুটলেও ওই প্রলয় তাণ্ডবের মধ্যে সুদূর স্যান্টাক্রুজে জল থই থই রাস্তায় আধা জলযান হয়ে যেতে রাজী হবে কি না সন্দেহ।

এয়ার পোর্টে ফোন করেও কোন সুরাহা হল না।

তাঁরা নিরুপায় ভাবে জানালেন যে, আমাদের আনতে যে 'কোচ' হোটেলে এসেছিল তা এখনও এয়ার পোর্টে ফেরে নি! সুতরাং তাঁদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কোচ এয়ার পোর্টে ফেরবার পর আর আমাদের নিতে আসার যে সময় থাকবে না তা তাঁরা উহ্য রাখলেও বুঝতে অসুবিধে হ'ল না।

সত্যিই শোচনীয় অবস্থা। মনে মনে এই রাত্রে প্লেনে চড়ে সাগর পার হওয়া সম্বন্ধে যত আশঙ্কাই থাক এ রকম লজ্জাকরভাবে 'কোচ'-এর তাচ্ছিল্যে যাত্রাভঙ্গ হওয়াটা নিশ্চয় চাই নি।

হতাশ হয়ে যখন হাল ছেড়ে দিয়েছি তখনই প্রায় অলৌকিক এক অঘটন ঘটল।

হোটেলের লবীর যে কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে ফোন করছিলাম তার একপাশে একটি শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে রিসেপসনিস্ট মেয়েটির সঙ্গে দু' একবার কি জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসতে ইতিপূর্বে দেখেছি।

সহযাত্রীটিকে নিয়ে কাউণ্টার ছেড়ে ট্যাক্সির জন্যে শেষ চেষ্টা করতে চলে আসবার সময় পেছন থেকে তাঁরই আহ্বান শুনে চমকে ফিরে দাঁড়ালাম।

মাফ করবেন! আপনারা কি এয়ার পোর্টে যেতে চান! সাড়ে এগারটার ফ্লাইট?

বয়স্কা বৃদ্ধা নয় কোন সুন্দরী যুবতী শ্বেতাঙ্গ মেয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত দু'জন ভারতীয়কে নিজে থেকে এ-রকম সম্ভাষণ করা তখনকার দিনে ভারতের মাটিতে অন্তত আমার কাছে কল্পনাতীত।

একটু থতমত খেয়েই তৎক্ষণাৎ কিছু বলতে পারি নি।

আমার সহযাত্রীর কিন্তু ও-সব বিস্ময় বিমূঢ়তার বালাই নেই।

তিনি ব্যাকুলভাবে বিচিত্র ইংরাজীতে আমাদের বিপন্ন অবস্থার কথা সবিস্তারে জানাতে সুরু করলেন।

মেয়েটি বাধা না দিলে কতক্ষণ যে খেদোক্তি চলত বলা কঠিন।

একটু হেসে সে বললে,—কোন ভাবনা নেই। আমি ওই ফ্লাইটেই যাচ্ছি। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

নীনার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত সেইখানেই। [ক্রমশ।

উস্টিনোভ বরঞ্চ চেকভের অক্ষমতাকে প্রশংসাই করেছেন যেন চেকভ, সর্বদা সেগুলি খুঁজে বেড়াতেন না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্যার সমাধানে অক্ষম হয়ে জনগণকে ঠকাবেন না বলেই তিনি তাদের কি অবশ্য কর্তব্য তা বলতে পারতেন না। নাটকগুলি মহৎ সৃষ্টি—কারণ যদিও তারা কোন উত্তর দিতে পারে নি, কিন্তু প্রাণপণে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে এবং এইভাবে একটি একটি ঐতিহাসিক জগতকে দৃশ্যমান করেছে। মানুষের গুণাবলী বিস্ময়ের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে কোন লাভ নেই। 'চেরী অর্কাডে'র কথা মনে পড়ছে—তাঁর সমসাময়িক ইতিহাস। যেখানে জমিদার কুঠার দিয়ে চরিত্রের সুন্দর কিন্তু নিষ্ফলা মূলদেশে আঘাত করছে—সেখানে চেকভ যে শুধুমাত্র চিত্রোপম তীব্রতা প্রকাশ করেছেন তাই নয়, সেই স্থূল বাস্তবতা একটা যুগকে চিহ্নিত করছে। শূন্যতার মধ্যে এই চরিত্রগুলি নিষ্ফল নয়। নূতন শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা নিষ্ফল ; এবং চেকভও তাদের জন্য কাঁদতে রাজী নন। তাঁর নাটক কর্মজীবন আরম্ভ করবার এবং যেভাবেই হোক এই ফলপ্রসূ সমাজে অংশগ্রহণ করে নূতন সুন্দরতর জগৎ সৃষ্টি করবার জন্য বক্তৃতায় পূর্ণ। এই প্রিয় ব্যক্তিগণও যে শক্তি তাদের সরিয়ে দিচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে

মনরো-মিলার সাক্ষাৎকার-৪

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

হেনরি ব্রাগুন

তিনি কোন একটা সামঞ্জস্য করতে চেয়েছিলেন। নাট্যকার যেভাবে প্রশ্ন করেন, যে অদ্ভুত সংঘাতের মধ্যে চরিত্রদের স্থাপন করেন তাতেই তাঁর উত্তর নিহিত থাকে। উস্টিনোভ বলতে চেয়েছেন যে, তিনি উদ্ভট আবিষ্কার করতে ভালোবাসেন, কিন্তু চেকভ নিষ্ঠুর নন—আর জীবনের প্রকৃত উদ্ভটত্ব হচ্ছে নিষ্ঠুর ক্রুশ যা পেরেকে বিদ্ধ করতে হবে। বরঞ্চ অনুকম্পাভরে পীড়িত তার মন জোর করে অন্বেষণ করিয়েছে এবং উদ্ভটত্ব গ্রহণ করিয়েছে এবং এভাবেই জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পেতে চেয়েছেন। উস্টিনোভের চরিত্রসৃষ্টি থেকে বিচার করলে আমার মতে চেকভ ওর চেয়ে অনেক চিন্তাশীল লেখক।

এই সব মত শুনলে কল্পনা করতেও অসুবিধে হয় যে, চেকভ শাখলিন গারদের জীবনযাত্রা দেখবার এবং প্রকাশ করবার জন্য স্বাস্থ্য বিপন্ন করেও রাশিয়া পার হয়ে গিয়েছিলেন। এটা, আমার নিকট সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক, তাঁর শিল্পিমনোচিত অনুভূতির প্রকাশ। যদি তিনি টলস্টয় ও ডস্টয়ভস্কির মনুষত্বের প্রতি নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকেন তবে নির্দেশদানই তার কারণ নয়—কারণ হচ্ছে যে, সেই নির্দেশ তাঁর নিকট অত্যন্ত গায়ে পড়া ও অন্যায় মনে হয়েছে।

আপনি জানেন, ছোট ছোট রচনাতেও চমৎকার চরিত্র সৃষ্টি করা যায়। আমার মনে হয় উস্টিনোভের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার মতের প্রায় মিল হবে যে উপন্যাস লিখলে মোঁপাসা মহত্তর সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। চেকভ নাটক না লিখলে তাঁর সাহিত্যিক মন আরও নীচে নেমে যেতো। আমি ক্ষুদ্রতার নিন্দা করছি না—শুধুমাত্র পৃথকীকৃত করতে চাইছি। খুব-ই ভালো লেখক কিন্তু একটু নীচের দিকের। পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত রাখবার এবং চরিত্রসৃষ্টির জন্য শুধুমাত্র ভালো মনোবিকলনকারী অথবা নাট্যকার হলেই চলে না। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, জগতের কষ্ট তুমি তোমার নাটকে এনেছো এবং রূপ দিয়েছ। নিশ্চয়ই

গৃহকোণে মনরো

চেকভ উত্তর খুঁজেছিলেন এবং তিনি যতটা জানেন ততটা বলেছেন। তিনি যে উত্তর দেন নি তা নয় কিংবা উত্তর দেওয়া অসুন্দরও ভাবেন নি, কিন্তু সেই পরম অজানার সামনে গিয়ে তিনি থেমে গিয়েছেন•••এটুকু তফাৎ এটা সাধারণ নম্রতা—উর্স্টিনোভের বক্তব্যের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র মিল নেই। চেকভ লিখেছেন—যে সচেতন জীবনের পেছনে কোন নির্দিষ্ট দর্শন নেই তা জীবন-ই নয়—একটা ভারী বোঝা—একটা দুঃস্বপ্ন। যে লেখক সারাজীবন ধরে 'উত্তর' খোঁজবার ও দেবার চেষ্টা করেন নি তিনি কখনও এ কথা লিখতে পারেন না। এই উক্তির সঙ্গে যাঁরা উত্তর খুঁজে পেয়েছেন অর্থাৎ যাঁরা এক আঘাতে সব নিয়ম সমাধান করতে চান তাঁদের প্রতি বিরক্ত মনোভাবের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

পূর্বকল্পিত দর্শনের সঙ্গে জীবন মিলিয়ে যারা নাটক রচনা করতে চায়, তাদের প্রতি আমিও বিরক্ত বোধ করি। কিন্তু অস্তিত্বের বিশৃঙ্খলা প্রকাশ করাই যে সাহিত্যর সর্বোত্তম কাজ তা না দেখলেও অন্ধতা। যদি কোন লেখক ইয়োনেস্কোর মতো আদর্শবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং নিজের জন্য কাজ করতে থাকে তা হলেও সে একটা আদর্শবাদ-ই অনুসরণ করছে। মানবজীবনের শেষ স্তর বিশৃঙ্খলা এই ধারণাও মানবজীবনের শেষে বিশেষ কোন অন্তর্নিহিত অর্থ নেওয়া যা আদর্শবাদেরই নামান্তর।

উর্স্টিনোভ যা ইঙ্গিত দিয়েছেন সে রকম কোন আদর্শবাদের কথা আমি বলছি না। আমি শুধু এমন একটি রঙ্গমঞ্চ চাইছি যেখানে জীবনধর্মী সাবালক তরুণ এমন একটি নাটক দেখতে পাবে, যা তাকে যুগ-সচেতন করে তুলবে, যা সর্বদিকে সব বিষয়ে অনুভূতি ছড়িয়ে দিয়েছে। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির জন্যই অভিনয়—আমার ভালো লাগে না। মানুষকে কতগুলি স্নায়ুর সমষ্টি দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। সেটা ডাক্তারীশাস্ত্রের ব্যাপার এবং আমরা প্রায় সেই অবস্থাতেই পৌঁছেছি।

আপনি যা বলেছেন তা থেকে আমি যদি উর্স্টিনোভের মতবাদ বুঝে থাকি তবে তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসুন্দরের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয় বরং সমাজ ও সাহিত্যের ভেদরেখার জন্য চিন্তা। তিনি সাহিত্যকে সম্পূর্ণ পৃথক—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে দেখেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে চেকভ একজন অনুভূতিসম্পন্ন আলেখ্যকার, যাঁর মনে দয়া করুণা এবং আরও অনেক গুণ আছে। আমিও তাই বলি কিন্তু করুণাই তাঁকে বিবেকবান করেছে এবং সে করুণা ব্যক্তিত্বে ছাড়িয়ে মানবতায় পৌঁছেচে। অবশ্য মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য এটা একটা অতি প্রয়োজনীয় সূত্র নয়—গেটের মধ্যে এরকম নেই কিন্তু চেকভ করেছেন এবং আমি দেখছি এটা তাঁর লেখার চমৎকার গুণ এবং কোনভাবেই বাধা নয়।

আমি মনরো

ব্রাগুন। মিসেস মিলার, আপনার সম্বন্ধে শেষ কথা যা বলা হয় তা হচ্ছে যে, আপনি সমাজ থেকে হস্তান্তরিত। আপনি কি কোন ছবিতে নিজেকে অধিকতর আমেরিকান ভেবেছেন।

মনরো। ভেবে দেখি•••হ্যাঁ 'এ্যাসফাল্ট জাঙ্গল'•••'সাম লাইক ইট হট'•••বলতে গেলে, 'দি প্রিন্স এণ্ড দি সো গার্ল'-এও আমি আমেরিকান ভাবে ভাবিত হয়েছিলাম। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, চিত্রনাট্যানুসারে আমাকে বলতে হবে, আমি চটপট করে গিয়ে মিকিকে শুভরাত্রি বলে আসব। আমি স্যর লরেন্স অলিভারকে বললাম, আমেরিকাবাসী হয়ে একথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব—যদি আমি বৃটিশদের মতো ভাবভঙ্গী না করি এবং তা হলেও সবাই আমাকে উপহাস করবে।

তিনি বললেন, না না, আপনি এটা বলুন। আমি বললাম, সোজা এই। ঠিক এই। তখন আমি বললাম, দেখুন আমি চটপট করে গিয়ে বলতে পারি না, কারণ 'সিপ' অর্থ কোন খাদ্য কামড়ে নেওয়া অথবা পানীয় থেকে একচুমুক খাওয়া—'চুমুক'। একটু 'চুমুক'—কিন্তু 'সিপ ডাউন' বলতে পারি না—তা হলে দেশের কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না।

ব্রাগুন। তুলনায় নিজেকে প্রকৃত আমেরিকান মনে হচ্ছিল•••

মনরো। হ্যাঁ, অনেক আমেরিকানকে দেখেছি। যারা ইংলণ্ড থেকে বৃটিশ উচ্চারণ নিয়ে ফিরে আসে। কাজেই আমার মনে হল•••হ্যাঁ, এই সেটে আমিই তো একমাত্র আমেরিকান—আমাকেই খেয়াল রাখতে হবে।

মিলার। সমস্ত চরিত্রগুলিই শ্রেণী হিসাবে এখানে অপরিচিত এবং তারা অভিজাত হাবভাব ও সুন্দর কথাবার্তার সাবান ফেনায় ভেসে বেড়ায়•••

ব্রাগুন। যখন আপনি অলিভারের বিপরীতে অভিনয় করছিলেন তখন কি তা এখানকার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক মনে হয়েছিল।

মনরো। হ্যাঁ। আমি ওঁকে চাই এবং শুধু ওঁকেই।

ব্রাগুন। কেন?

মনরো। কারণ, আমি স্যর লরেন্স ও আমাকে একসঙ্গে দেখতে চাই। এজেন্টদেরও একথা বলে দিয়েছি। আমি বলেছি, আর অন্য কোনভাবেই নিজেকে দেখতে চাই না।

ব্রাগুন। আপনি কি ক্ল্যাসিকাল স্কুলের অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করবার জন্য উৎসুক।

মনরো। না বর্তমানকালে বসে ক্ল্যাসিক ট্রেনিং-এর জন্য ব্যস্ত নই। আমি ভেবেছিলাম—মিলিতভাবে এটা ভালো—একটু বেখাপ্পা মজাদার এবং ঠিক যেন জীবনের মতো।

ব্রাগুন। ঐ লেডি-চ্যাটার্লীর লাভারের উল্টো রকম আর কি!

মনরো। ও-কথা আমার মনে হয় নি।

ব্রাগুন। বেশ। আমি ভাবছিলাম যে আপনি হয় তো ঐ যাকে বলে উচ্চাঙ্গের স্তর—সেখানের একজন অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করে দেখতে চেয়েছিলেন কি রকম লাগে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা আপনার মনোগত ইচ্ছা ছিল না•••

মনরো। না। আমি কখনও কি রকম লাগে দেখবার জন্যে অভিনয় করি না—তা কোন চরিত্রই হোক কি কোন অভিনেতার সঙ্গেই হোক। জীবনের ক্ষেত্রেই কোনটি কি রকম তা দেখতে পাওয়া যায়। আর, কাজ করা হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্যরকম ব্যাপার।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি জানি অভিনেতাদের শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডের ক্ল্যাসিকাল থিয়েটার খুবই চমৎকার, কিন্তু কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলাও দরকার। অভিনেতার পথে সে শিক্ষাও শুভকর—ইংলণ্ডে যার অভাব আছে বলে আমার স্বামী বলেন। তিনি অভিনয়ের জন্য আমেরিকানদের খুঁজছেন না, অথবা আমেরিকান হতে চাইছেন না—তিনি সাধারণ, প্রতিদিনের লোক খুঁজছেন। কিন্তু অভিনেতারা অন্য শ্রেণীর হয়ে গেছে—তা তারা জীবনের যে শ্রেণী থেকেই আসুক না কেন—এবং তা তাদের অভিনয়কে প্রভাবিত করে।

কিন্তু অলিভারের সঙ্গে কাজ করা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার এবং আমি অনেক কিছু শিখেছি মানে—পর্যবেক্ষণ করে।

ব্রাগুন। কি ধরণের জিনিস?

মনরো। জানি না—সে সব আমার মনের মধ্যে রয়েছে—আমি দুঃখিত যে আমি সে-সব প্রকাশ করতে পারছি না—কিন্তু নূতন একটা কিছুর জন্ম হয়েছে।

ব্রাগুন। আপনি কি বৃটিশ অভিনেতাদের আমেরিকানদের চেয়ে বেশি রীতিসম্পন্ন মনে করেন?

মনরো। আমার প্রিয় অভিনেতা মার্লন ব্রাণ্ডো। আমার মতে তিনি যে-কোন রীতিতে অভিনয় করতে পারেন। কিন্তু, বর্তমানে তিনি ঠিক পথে যাচ্ছেন না।

ব্রাগুন। এই কি আপনার অভিনেত্রী মনের অথবা নারীমনের প্রতিক্রিয়া?

মনরো। দু'টোই। যদিও, বেশিমাত্রায় অভিনেত্রীর।

ব্রাগুন। অনেক সমালোচক বলেন যে 'রাগী যুবক দল' আমেরিকা দ্বারা প্রভাবিত।

মিলার। আমার মতে তাদের লেখায় আমেরিকার সুর আছে। তাই বলে এ-কথা বলতে চাইছি না যে, লুক ব্যাক ইন এ্যাঙ্গার-এর মতো বই আমেরিকার প্রভাব ছাড়া লেখা যেতো না—কিন্তু ঐ সব সাহিত্যে এমন একটা সহজ ঋজুতা এমন কি বুকজ্বলা ভাব জোর করে চাপানো আছে যার সুর আমেরিকার—এবং যা ইংলণ্ডের সঙ্গে মেলে না—কারণ তা তির্যক ও সুদূর—অন্তত গত দুই দশকের ধারাবাহিকতায় তাই দেখছি। এই লেখাগুলি আমার অত্যন্ত বেশি ঘরোয়া মনে হয়। আমাদের দিক থেকে, এটা মার্ক টোয়েনের সময় থেকে খুবই সাধারণ পর্যায়ে নেমে গিয়েছে এবং এখন সে ভাবেরই পুনরাবিষ্কার। সেই যে তিনি এঁকেছেন সাধারণ লোকরা ভদ্রলোকদের জব্দ করে দিচ্ছে এবং এই ভাবেই চিরাচরিত শ্রেণী বিভাগ নষ্ট করে দিয়েছেন—তার কথা বলছি। এ যেন গ্রামের ছেলের রাজা আর্থারের কোর্টের বিরুদ্ধে জয়লাভ।

আমেরিকার নাটকগুলি খুব বেশিমাত্রায় ঘটনাপ্রধান তুলনায় চিন্তাশীলতা অপেক্ষাকৃত কম। যা ঘটনায় দেখানো যায় না এমন কোন বিষয় এ নেয় না। খুব কমই নিজের সম্বন্ধে মন্তব্য করে। বাস্তব লোকদের মতো এরাও ভাণ করে যেন কি করছে তা জানে না। এটা কোন-কিছুর বিষয় হতে চায় না নিজেই সেই বিষয় চায়। কিন্তু যে নাটকে দু'টোই একসঙ্গে পাওয়া যায় তারই মান উঁচুতে ওঠে। এটা করা কঠিন, কিন্তু বর্তমান সময়ে আমার মতে এই সবচেয়ে ভালো।

আমি জানি না জন ওয়েন, কিংসলী এমস্, জন অসবোর্নের মতো লেখক এ-সম্বন্ধে সচেতন কি না—তাদের হবার কোন কারণও নেই কিন্তু তাদের সব সৃষ্টিতে এরই প্রতিধ্বনি।

ব্রাগুন। আপনি তো ধর্মমূলক নাটক শুনতে অভ্যস্ত নন—তা হলে গ্রেহাম গ্রীন কি রকম লাগে?

মিলার। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, নাট্যকার হিসেবে তাঁর কাজ একটু করমূল্য ঘেঁষা মনে হয়। তাঁর দর্শন শাস্ত্রানুযায়ী ধাঁধা প্রকৃত কিন্তু তা যেন একটা বাজে স্বীকৃতিতে শেষ হয়েছে। তিনি ধর্মান্তরণের যে দৃশ্যগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করেন সেগুলি পড়ে আমার একপ্রকার নাটকের কথা মনে হয়েছে বাইরের দিক থেকে হয় তো সম্পর্ক নেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আছে; এ হচ্ছে ত্রিশ দশকের বামপন্থীদের ধর্মান্তরের নাটক। তিনি দু'টো যন্ত্রের মধ্যে আটকে গেছেন। একদিকে তাঁকে এক সমান স্তরে লেখা রাখতে হয়েছে কারণ তাঁর রচনারীতি ও বর্তমান জীবনযাত্রার মান এই স্তরের। অন্যদিকে তাঁকে আধ্যাত্মিক সমাধান করতে হয়েছে—যার সঙ্গে নাটকের গতির কোন সম্পর্ক নেই। ঈশ্বর বাস্তববাদ থেকে পালিয়ে বেড়ান ইঙ্গিত সত্য বলে প্রমাণ করা কঠিন। তাই, যতক্ষণ না তিনি তাঁর মতে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ—লাফিয়ে অন্য এক অনুভূতির জগতে প্রবেশ করা—না পৌঁছন ততক্ষণ পর্যন্ত নাটকটা ভালোই লাগে। উদাহরণ স্বরূপ, 'পটিং সেড' নাটকটির কথা মনে হচ্ছে; নাটকানুযায়ী তোমাকে আগে থেকেই একটা জগতের অস্তিত্ব ভেবে নিতে হবে। তিনি সাধারণ মনস্তত্ত্ব নিয়ে লিখছেন—কিন্তু আমার মতে সাধারণ মনস্তত্ত্বের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক বিধয় চালানো যায় না। তাঁর এই বাস্তবপ্রধান আকারে কি করে এই আধ্যাত্মিক উল্লম্ফন সম্ভব। এটা করতে হলে প্রথম থেকেই একটা প্রেরণাময় জগৎ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তা হলে তা বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে। হয় তো তা ব্যাখ্যা করতে পারি না, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু তিনি যে রকম মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছেন অর্থাৎ যা স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব তাতে এরকম প্রেরণাময় পরিণতি খাপ খায় না। আমি তাঁর বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করি—এমন কি তাঁর সঙ্কটকে। কিন্তু তিনি যেন শেষের দিকে একটা জ্যামিতিক অঙ্ক করেছেন। সবাই এভাবে অনুভব করে না। তারা ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে, কিন্তু এমন হতে পারে যে ওঁর অভিজ্ঞতাকে দিনের আলোয় আলোকিত পৃথিবীর দিক থেকে দেখতে হবে কারণ গ্রীনের দৃষ্টিভঙ্গী উজ্জ্বল দিনের।

মেরিলিন—পিছন থেকে

[আগামী সংখ্যায় চলবে] অনুবাদিকা—রাণু ভৌমিক

চারুলতা

কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের সুতীব্র জীবনচেতনা ও প্রখর হৃদয়ানুভূতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তাঁর অমর লেখনীনিঃসৃত যে ছোটগল্পগুলির মধ্যে—নষ্টনীড় তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। ১৩০৮ সালে নষ্টনীড় প্রথম প্রকাশিত হয়। সেদিন রবীন্দ্রনাথের বয়েস চল্লিশ। চারু, অমল ও ভূপতি—জীবনের এই তিনটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবিকে কেন্দ্র করে জীবনপিপাসু স্রষ্টা তাঁর অনবদ্য সৃষ্টির ভাণ্ডার করে গেলেন আরও সমৃদ্ধ। গভীর হৃদয়চেতনা এবং সূক্ষ্ম জীবনবোধ থেকে জাত এই চরিত্র তিনটির ভিতর দিয়ে কবি জীবনের চাওয়া-পাওয়ার এক অপূর্ব হিসাব মিলিয়েছেন।

এই চাওয়া-পাওয়ার বঞ্চনা এবং বেদনার মধ্যে দিয়ে জীবনের যে বিচিত্র আলেখ্য ফুটে ওঠে তারই সার্থক প্রকাশ ঘটেছে কবি-লেখনীতে। শুধু সাহিত্যের বা ব্যাকরণের ভাষাই নয়, এই জীবনচিত্রের পরম প্রকাশে কবি আশ্রয় নিয়েছেন হৃদয়ের ভাষার, সেই কারণেই তাঁর রচনা নিত্য-নতুন, চিরঞ্জীবন্ত।

নষ্টনীড়ের চলচ্চিত্রায়ন ঘটেছে দিকপাল পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায়। সত্যজিৎ রায় ইতঃপূর্বে যে ছবিগুলি উপহার দিয়েছেন, এই ছবিটি শ্রেষ্ঠত্বে ও উৎকর্ষে তাদের প্রত্যেকটিকে গেছে অতিক্রম করে। চলচ্চিত্রে নষ্টনীড়ের নাম পরিবর্তিত করে নায়িকার নামানুসারে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'চারুলতা'। অমর সাহিত্যের পৃষ্ঠা থেকে দক্ষ পরিচালকের কুশলী হাতের স্পর্শে এই কাহিনীর সার্থক রূপান্তর ঘটেছে রূপালী পর্দায়। রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ের মূল সুর যে উচ্চগ্রামে বাঁধা ছায়াছবিতে সে সুর কোথাও বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয় নি, কাহিনী পরিবেশনে পরিচালকের আশাতীত দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং যথেষ্ট স্বকীয়তার পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথ যে রসসঞ্চার করে গেছেন তাঁর কাহিনীতে সেই রস যথাযথভাবে সঞ্চারিত হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্মে। কাহিনী পরিচর্যায়, বিন্যাসে এবং সর্বোপরি প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সত্যজিৎ রায় এক যুগপৎ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটিতে রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের গানের সুষ্ঠু প্রয়োগ ছবিটির মর্যাদাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। ছবিটির শিল্পকর্ম প্রশংসার দাবী রাখে।

অভিনয়াংশে প্রথমেই উল্লেখ করি শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের নাম। প্রখ্যাত অভিনেতার স্বনামধন্য পুত্র তিনি। এ যাবৎ বহু চিত্রে এবং নাটকে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন, 'চারুলতা'র ভূপতির বলিষ্ঠগম্ভীর চরিত্রটি রূপায়ণের ভার পড়ল তাঁর উপর। বলা বাহুল্য সেই দায়িত্ব তিনি সগৌরবে পালন করে এক অভিনন্দনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের চারুলতা যেমনই জীবন্ত তেমনই বিস্ময়কর। চরিত্রটির ভাব ভাষা তিনি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অমল' যথেষ্ট সাধুবাদের দাবী রাখে। তাঁর অভিনয় ব্যক্তিত্বের স্পর্শবাহী। গভীর উপলব্ধির মধ্যে চরিত্রটিকে তিনি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, দর্শকসমাজে এই তিন শিল্পীর অনবদ্য অভিনয় যে আবেদন জাগিয়েছে তার প্রভাব সহজে অতিক্রম্য নয়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

বাঙলাভাষায় জীবনীচিত্র নির্মাণে যাঁরা প্রভূত প্রসিদ্ধি অর্জন এবং যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন প্রবীণ চিত্রকার মধু বসুর আসন তাঁদের পুরোভাগে। তাঁর নবতম চিত্রাবদান 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'। ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনীকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ছবিটিতে স্বামীজীর নররূপ পরিগ্রহ থেকে তাঁর বিশ্ববিজয়ের প্রস্তুতি পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক ভারতের অন্যতম প্রণম্য রূপকার। বিদেশের দরবারে ভারতের শাশ্বত মহিমার প্রচারে এবং বিদেশী সমাজে ভারত-চেতনার জন্মদানে তাঁর অবদানও অনন্য। পৌরুষের প্রতিমূর্তি এই পুণ্যপুরুষের দিব্যজীবনী রূপায়ণে যতদূর নিষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতা এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন এই ছবিটিতে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শককে অফুরন্ত পরিতৃপ্তি দেওয়ার উপকরণ বিদ্যমান। কাহিনী গ্রন্থনায়, ব্যঞ্জনায়, চরিত্র পরিচর্যায়, ঘটনাবিস্তারে তথা সামগ্রিক প্রয়োগ কুশলতায় ছবিটি সবিশেষ সাধুবাদের দাবী রাখে। একাধিক ঐতিহাসিক চরিত্র এই ছবিতে সমাবিষ্ট হয়েছে, তাদের পরিচর্যা ও বিশ্লেষণও হয়েছে যথাযথ। বিবেকানন্দের পৌরুষদৃপ্ত, ব্যক্তিত্ববান, রসগম্ভীর চরিত্রটি সার্থকভাবে অঙ্কিত হয়েছে। এই জাতীয় ছবি শুধু নিছক আনন্দ বিতরণই করে না, আজকের পথহারা দিকভ্রষ্ট

ও সি গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'কিনু গোয়ালার গলি'র স্যুটিং-এ নায়িকা সুমিত্রা দেবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন সহকারী পরিচালক শশাঙ্ক সোম।

ধ্বংসোন্মুখ জাতির সামনে তার অতীতের মহিমার ও ঐতিহ্যের এক মহান আলেখ্য তুলে ধরে তাকে নতুন করে জাগার মুঠো মুঠো প্রেরণা জোগায়। সেই দিক দিয়ে এই ছবিটিও এক বিশেষ স্বীকৃতির অধিকারী।

ছবিটির সংলাপ যেমনই বিষয়োপযোগী তেমনই মনোরম আবার তেমনই সময়োপযোগী বলিষ্ঠ। সংলাপরচনার কৃতিত্ব সহ-পরিচালক বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। সুরকার অনিল বাগচী অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন শ্রীমতী ইভা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাম ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছেন অমরেশ দাস। স্বামীজীর ভূমিকায় এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব নয়। এই ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য যথেষ্ট প্রশংসা তাঁর অধিকারগত হয়েছে। এই ছবিটিতে তাঁর অভিনয় আরও উন্নত, আরও বলিষ্ঠ, আরও প্রাণবন্ত। ভগবান রামকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ভুবনেশ্বরী দেবীর ভূমিকায় মলিনা দেবীর অভিনয় মর্মস্পর্শী। অন্যান্য চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত মিহির ভট্টাচার্য, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, প্রেমাংশু বসু, গঙ্গাপদ বসু, চন্দ্রশেখর দে, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, জীবন ঘোষ, শ্রীপতি চৌধুরী, গোপাল মজুমদার, পতাকী মুখোপাধ্যায়, বুবু গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত সেন, প্রীতি মজুমদার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা দেবী, শীলা পাল।

সামগ্রিকভাবে ছবিটি দর্শকচিত্তে এক ভক্তি ও শৌর্যসমন্বিত মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি করে এবং তার আবেদন গভীরভাবে দর্শকের হৃদয়ে রেখাপাত করে।

শৌভনিক নিবেদিত 'ঝাঁসীর রাণী'

গত শতাব্দীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যে মহীয়সী তরুণীর আবির্ভাব দেশের মুক্তিসাধনার ইতিহাসে এক বলিষ্ঠ অধ্যায় যুক্ত করে—সেই প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের ত্যাগোজ্জ্বল, মহিমা সমন্বিত, উৎসর্গিত জীবনকাহিনী আজকের দিনের দর্শক সমক্ষে নাট্যাকারে উপস্থাপিত করে প্রভূত অভিনন্দনের অধিকারী হলেন বিখ্যাত নাট্যসংস্থা শৌভনিক। শতাধিক বৎসর পূর্বে লক্ষ্মীবাঈয়ের পুণ্য আবির্ভাব, তাঁর বলিষ্ঠ ঘোষণ—'মেরে ঝান্সী নেহি দুঙ্গে' দুর্দান্ত বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর আরামনিদ্রা ঘুচিয়ে দিয়ে তাদের রীতিমত ত্রস্ত চকিত করে তুলেছিল। জাতীয় মুক্তিযজ্ঞে তাঁর আত্মাহুতি ভাবীকালের অসংখ্য

শৌভনিক নিবেদিত 'ঝাঁসী-কী-রাণী'র একটি আবেগসমৃদ্ধ দৃশ্যে অশোক মিত্র ও নিবেদিতা দাস

মুক্তিসাধকের মনে যে প্রেরণা ও উদ্দীপনা জুগিয়েছে, তার তুলনা মেলে না। আজকের এই জাতীয় ঘোর দুর্যোগের দিনে এই সব পবিত্র জীবনকাহিনীর প্রচার যত ঘটে ততই দেশের মঙ্গল। আজকের পথভ্রষ্ট মানুষকে লক্ষ্মীবাঈয়ের মত এই পুণ্যব্রতা ও অসাধারণ শক্তিসম্পন্না নারীদের জীবন নতুন পথের দিক নির্দেশ দেবে, অন্ধকার চলার পথ অতিক্রম করার আলোকবর্তিকার সন্ধান দেবে, নতুন আদর্শে উদ্বোধিত করবে।

তিন অঙ্কে এবং একটি দৃশ্যে নাটকটি পরিবেশিত। নিবেদিতা দাস রচিত এই নাটকটির মধ্যে যুগপৎ বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। নাটকটির গতি কোথাও শিথিল নয়। সর্বপ্রকার জড়তা, অস্পষ্টতা এবং কৃত্রিমতা থেকে নাটকটি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। নাটকটির আবেদন দর্শকচিত্ত স্পর্শ করার যোগ্যতা বহন করে। নাটকটির পরিচালনা, প্রয়োগনৈপুণ্য, উপস্থাপন কুশলতা প্রশংসার অধিকারী। আলোকসম্পাত ও আবহসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। নাম ভূমিকায় নিবেদিতা দাসের অভিনয় অনবদ্য। গভীর উপলব্ধির দ্বারা এই তেজস্বিনীর চরিত্রটি সর্বাঙ্গসুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় কৃষ্ণ কুণ্ডু, বীরেশ মুখোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, গোপেন মুখোপাধ্যায়, সুমিত্র মিত্র, গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, নমু ভৌমিক, অলকা পাল প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দের সম্মিলিত অভিনয়কৃতিত্বও নাটকটির সার্থকতার ক্ষেত্রে অনেকখানি দায়ী।

সংবাদ বিচিত্রা

১৯৬৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশী ও বিদেশী ছবিগুলি সম্বন্ধে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশান তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এঁদের বিচার ও সিদ্ধান্ত অনুসারে মহানগর, নির্জন সৈকতে, সাত পাকে বাঁধা, পলাতক, উত্তরফাল্গুনী, নিশীথে এবং ছায়াসূর্য 'শ্রেষ্ঠ' বাঙলা ছবি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবিগুলির মধ্যে বছরের শ্রেষ্ঠ পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, সহ-অভিনেতা, সহ-অভিনেত্রী, সঙ্গীত পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার হিসাবে ঘোষিত হয়েছেন যথাক্রমে তপন সিংহ (নির্জন সৈকতে), অনুপকুমার (পলাতক), সুচিত্রা সেন (উত্তর ফাল্গুনী), বিকাশ রায় (উত্তর ফাল্গুনী), রুমা গুহঠাকুরতা (পলাতক), হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (পলাতক)।

বাঙলা ছবির দর্শকসমাজে বর্তমানে যে সংবাদটি যথেষ্ট আনন্দ সঞ্চারের ক্ষমতা রাখে, সেটি বৈজয়ন্তীমালার বাঙলা চিত্রে অবতরণ। প্রখ্যাত চিত্রনির্মাতা শ্রীবনসালের সঙ্গে অতুল জনপ্রিয়তার অধিকারিণী বিশিষ্ট শিল্পী বৈজয়ন্তীমালা এই সম্পর্কে একটি চুক্তিতে আবদ্ধা হয়েছেন। বাঙলা ছবিতে ইতঃপূর্বে তিনি কখনও আত্মপ্রকাশ করেন নি। শ্রীবনসালের অন্যতম আগামী অবদানে তাঁর বাঙলা ছবিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটবে। চুক্তিতে স্থির হয়েছে যে, এই ছবির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণরূপে না হওয়া পর্যন্ত শ্রীমতী বৈজয়ন্তীমালা

সুপ্রিয়া চৌধুরী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় : কথোপকথনরত

মাধবী মুখোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে

অন্য কোন বাঙলা ছবিতে অভিনয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না।

বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে রাজ্যসরকার নিযুক্ত তদন্ত কমিটী উক্ত বিষয়ে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে জানা গেছে যে, তাঁদের মতে বাঙলা চলচ্চিত্রের অবস্থা শোচনীয়। আর্থিক দুরবস্থাই এর প্রধান কারণ। এই বিরাট শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ কুশলী কর্মীদের পারিশ্রমিক তিনশ' টাকারও কম, তদুপরি তাঁদের কর্মের কোন স্থায়িত্বও থাকে না। অগণিত কলাকুশলীর জীবিকা এই ছায়াচিত্রশিল্পে অর্থ বিনিয়োগে প্রযোজকদের তরফ থেকেও আশানুরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। প্রকাশিত রিপোর্টটি চিত্রপ্রেমিক-মহলে যে এক সুগভীর হতাশার সঞ্চার করবে, এ বিষয়ে কোনপ্রকার সংশয় থাকতে পারে না। চলচ্চিত্র সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। ছায়াছবি শুধু আমোদ-প্রমোদেরই অন্যতম উপকরণ নয়, লোকশিক্ষারও অন্যতম বাহন। তাকে বিপন্মুক্ত করার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন জাতীয় কর্তব্যেরই এক নামান্তর। এ বিষয়ে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আজকের দিনের চিত্রজগতে শ্রী আর. ডি. বনসাল এক সুপরিচিত নাম। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রের প্রযোজক হিসাবে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। বাঙলা ছবিতে বৈজয়ন্তীমালার প্রথম আবির্ভাব ঘটানো ছাড়াও তাঁকে কেন্দ্র করে আরও একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বিপুল অর্থব্যয়ে তিনি একটি ভোজপুরী চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। এই ছবিটিতে বাঙলা ও বোম্বাই—উভয় রাজ্যেরই তারকাদের সমাবেশ ঘটবে। ছবিটির নামকরণ হয়েছে—মোরে মন মিঠুয়া।

কোন নাটকের বা ছায়াছবির অন্তর্গত কাহিনী এ নয়—এক সত্য ঘটনা। বাস্তব হলেও রূঢ় বাস্তব। এ কাহিনীতে কল্পনার লেশমাত্র নেই। মায়ের বিরুদ্ধে মেয়ের অভিযোগ আজ আদালত প্রাঙ্গণ অবধি পৌঁচেছে। কাঠগড়া পর্যন্তুকুই এখনও বাকি। বিগতযুগের সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী শোভনা সমর্থ (৪১) এর বিরুদ্ধে সই জাল করবার অভিযোগ এনেছেন তাঁরই কন্যা বর্তমানকালের অন্যতমা বিশিষ্টা অভিনেত্রী নূতন সমর্থ (২১)। অভিযোগও একটি নয়, একাধিক। তন্মধ্যে কুড়ি হাজার টাকা ফাঁকি দেওয়ার দায়ও অনুপস্থিত নয়। বিচিত্র এই জগৎ আর বিচিত্র সেই বস্তুটি—যাকে ছাড়া জীবনে এক মুহূর্ত চলেও না, আবার যার জন্যেই এত অনর্থ! মাতা-পুত্রীর সুপবিত্র স্নেহবন্ধনও যার কাছে তৃণবৎ ভেসে যায়।

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তর বহুকাল পূর্বেই একটি

শর্মিলা ঠাকুর : খেলার মাঠে নিঃসঙ্গ দর্শক

রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক প্রাপ্ত অসমীয়া, মহারাষ্ট্রীয় ও তামিল ভাষায় গৃহীত শ্রেষ্ঠ ফিচারফিল্ম যথাক্রমে 'মণিরাম দেওয়ান', 'হা মাজা মর্গ একালা' ও 'নন্নুম ওরু পেন' ছবি তিনটির এক-একটি দৃশ্য
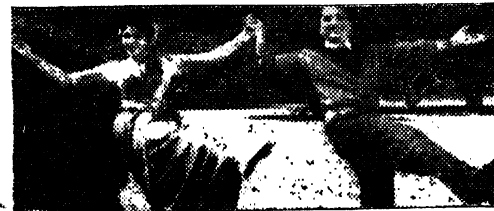
জাতীয় সংগ্রহশালা গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু জাতীয় বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তাবটি মুলতবী রাখতে বাধ্য হতে হয়। বর্তমানে পরিকল্পনাটি রূপায়ণের ব্যাপারে সরকারী দপ্তর সচেষ্ট হয়েছেন বলে জানা গেল। পুণার ফিল্ম ইনস্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ার এই সংগ্রহশালা সংগঠিত হতে চলেছে। এই সংবাদ চিত্রামোদীদের দরবারে যথেষ্ট আনন্দ বহন করবে এবং আমরাও পরিকল্পনাটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

বর্ণবৈষম্য অবসানের সাম্প্রতিক ইতিহাসের উজ্জ্বলতম নাম মহান রাষ্ট্রনায়ক কেনেডির আকস্মিক এবং করুণ মৃত্যুর বছর ১৯৬৩-র শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অস্কার লাভ করলেন নিগ্রো অভিনেতা সিডনী পয়টার (৩৭)। অস্কারের ৩৬ বছরের ইতিহাসেও এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ প্রথম এই একজন নিগ্রো শিল্পী এই সম্মানে বিভূষিত হলেন। নিগ্রোদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যে মহান সাধনায় প্রেসিডেণ্ট কেনেডি আত্মোৎসর্গ করে গেলেন, এই ঘটনা সেই সাধনারই অন্যতম ফলস্বরূপ বলা যেতে পারে। এই ঘটনা চলচ্চিত্ররাজ্যের ইতিহাসে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করল।

১৯৬৩ সালের শ্রেষ্ঠ কমেডি অভিনেত্রী হিসাবে এক্সিবিটার ম্যাগাজিন লরেল এ্যাওয়ার্ড পেলেন সাতাশ বছর বয়স্কা অভিনেত্রী জেন ফঁডা। এক্সিবিটার ম্যাগাজিনের প্রকাশক জে. ইমানুয়েলের দ্বারা এই পুরস্কারটি প্রতি বছর প্রদত্ত হয়ে থাকে। চিত্রামোদীদের অনেকেরই জ্ঞাত আছে যে, কুমারী ফঁডা বিশিষ্ট চিত্রতারকা হেনরি ফঁডার (৫৯) কন্যা।

নাইরোবি থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী অঞ্চলে 'মিস্টার মোসে'র চিত্রগ্রহণকালে গ্যাস সিলিণ্ডারগুলির এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে যায়। গত ৫ই এপ্রিল এক অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্যগ্রহণের সময়ে এই দুর্ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। এই দুর্ঘটনার অন্যতম শিকার চিত্রতারকা রবার্ট মিচাম (৪৭) এবং ক্যারল বেকার (৩৩) নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহে কোনক্রমে রক্ষা পান।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

আরোহী

প্রখ্যাত কথাশিল্পী বনফুলের দু'টি গল্প অবলম্বনে বিখ্যাত পরিচালক তপন সিংহের পরিচালনায় 'আরোহী' ছবিটি রূপায়িত হচ্ছে। সুরযোজনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিকাশ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাগত অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, শিপ্রা মিত্র প্রভৃতি শিল্পিবর্গ বিভিন্ন চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করবেন।

একটুকু বাসা

তরুণ পরিচালক তরুণ মজুমদারের আগামী অবদান 'একটুকু বাসা'। শক্তিমান সাহিত্যিক মনোজ বসুর লেখনী এর গল্পাংশের জন্মদাতা। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, রবি ঘোষ ও সন্ধ্যা রায় প্রমুখ শিল্পীদের এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করতে দেখা যাবে।

মধু বসু পরিচালিত 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চিত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের রূপসজ্জায় যথাক্রমে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমরেশ দাস

বিভাস

সাহিত্যিক সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত 'বিভাস' ছবিটি অল্পকাল পূর্বে কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়েছে। সম্প্রতি সেন র‍্যালে এ্যাণ্ড এ্যাসোসিয়েটস্ রিক্রিয়েশান ক্লাবের কর্মী-শিল্পীরা 'বিভাস'-এর নাট্যরূপ নিবেদন করলেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন বিজন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ, রথীন দাশগুপ্ত, বিমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত, প্রবীর ভট্টাচার্য, দিলীপ সেনগুপ্ত, বরেণ্য মুখোপাধ্যায়, রবীন বসু, তাপসকান্তি লাহিড়ী, অজয় দাশগুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র দে, মিতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, বেব সাহা প্রভৃতি।

পরশমল দীপচাঁদ প্রযোজিত 'অন্তরাল' ছবিটির চিত্রায়ন দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রগুলির রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিকাশ রায়, তরুণকুমার, অনুপকুমার, দিলীপ রায়, ছায়া দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, দীপিকা দাস প্রমুখ তারকার দল।

হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত 'সন্ধ্যাদীপের শিখা' চিত্রের প্রধান ভূমিকায় সুচিত্রা সেন

সৌখীন সমাচার

চরিত্রহীন

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'কে মঞ্চে উপস্থাপিত করলেন পি এ্যাণ্ড টি রিক্রিয়েশান ক্লাব। বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হন সরোজ রায়, উপেন রায়, প্রভাস চক্রবর্তী, অচিন্ত্য বসু, অজিত চট্টোপাধ্যায়, রাণু রায়, প্রতিমা চক্রবর্তী, শাশ্বতী রায়, নমিতা দত্ত প্রভৃতি। নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন সামু চট্টোপাধ্যায়।

গণ্ডার

ইউজ ইউনেস্কোর 'ল রাইনোসারাস' বিদগ্ধ নাট্যকার মহারাজকুমার সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর দ্বারা বঙ্গীকৃত হয়ে 'গণ্ডার' নামে অভিনীত হ'ল বঙ্গীয় নাট্য সংসদের সদস্যদের দ্বারা। চরিত্রগুলির রূপদান করলেন সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, আদিৎ কুণ্ডু, দিলীপ রুদ্র, চিনু গোস্বামী, রমেন লাহিড়ী, অম্বুজাক্ষ সেন, ষোড়শী মজুমদার, প্রদীপ গুপ্ত, মিনতি ঘোষ, ইন্দু চট্টোপাধ্যায়, মায়া রুদ্র প্রভৃতি।

[বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল ভট্টাচার্য, শান্তিময় সান্যাল ও বীরেন ধর কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।]

বাঙলা দেশের জনপ্রিয় চিত্রতারকাদের মধ্যে সুপ্রিয়া চৌধুরী একটি বিশেষ উল্লেখনীয় নাম। বলিষ্ঠ এবং প্রাণবন্ত অভিনয়ে দর্শক সমাজে তিনি একটি বিশেষ আসন অর্জনে সমর্থা হয়েছেন। বোম্বাইয়ের চিত্রজগত থেকেও তাঁর আহ্বান এসেছে। 'আপ কী পরছাইয়াঁ' চিত্রের একটি প্রেমমধুর দৃশ্যে ধর্মেন্দ্রের সঙ্গে তাঁকে দেখা যাচ্ছে

স্বাগত নববর্ষ

নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত কাল পূরণ করিয়া ১৩৭০ সাল বিদায় লইল। কিন্তু যে ইতিহাস রাখিয়া গেল তাহার সহিত জাতির জীবনের সংযোগ অবিচ্ছেদ্য। জাতীয় জীবনের অসংখ্য আনন্দ, বেদনা, সুখ, দুঃখ, ঘাত, প্রতিঘাত, নব নব কীর্তি, ঝঞ্ঝা, দুর্যোগের সাক্ষী হইয়া ইতিহাসে অন্যান্য বিগত সালগুলির মত ১৩৭০ও একটি অক্ষয় অমরত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হইল।

১৩৭১ সাল তাহার আগমনবার্তা ঘোষিত করিয়াছে। আমরা এই নবীন বর্ষকে অন্তর হইতে স্বাগত জানাই। নববর্ষ শুধু বাঙলার নয় সমগ্র বিশ্বের নর-নারীর নিকট একটি বহু-প্রতীক্ষিত, আনন্দময়, জাতীয় উৎসবের দিন। ইহা পৃথিবীর সর্বত্রই যথেষ্ট পবিত্রতার সহিত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। ইহার আবাহনে দিকে দিকে সাড়া পড়িয়া যায়, বিভেদ-বিদ্বেষ ক্ষণকালের জন্য মানুষের অন্তর হইতে নির্বাসিত হয় এবং মানুষের মন ভরিয়া উঠে এক অনির্বচনীয় মিলনানন্দের রসঘন অনুভূতিতে। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সেদিন এক জাগতিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনে পরস্পর পরস্পরের নিকট ধরা দেয়।

বাঙলা দেশেও সুপ্রাচীনকাল হইতে বর্ষারম্ভ এক বিশেষ উৎসবের দিন বলিয়া পরিগণিত। বাঙলার ঘরে ঘরে নববর্ষোৎসব তাহার 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'-এরই অন্যতম। এইদিন বাঙালীর ঘরে ঘরে যে প্রাণের স্পন্দন আভাসিত হয় তাহার তুলনা মেলা ভার। যে অভূতপূর্ব প্রাণপ্রাচুর্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অতুলনীয় বলিলেই চলে। নগরে, গ্রামে, দেবালয়ে, প্রাসাদে, পর্ণকুটিরে, সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই তাহার আবাহনে ভরপুর, তাহার জয়ধ্বনিতে মুখর।

পয়লা বৈশাখের নবারুণরাগোদ্ভাসিত পুণ্যপ্রভাতে তাহার নিকট আমরা নবজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করি। বর্ষদেবতার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করিয়া আমরা লাভ করি জড়তা, দীনতা, সংশয়ের অগভীর অন্ধকূপ হইতে মুক্তির পুণ্যমন্ত্র; আলোর, সত্যের, শক্তির পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জীবনের সীমাহীন চলার পথে পদার্পণের শক্তিসঞ্চয় করি। বুদ্ধ-রবীন্দ্রের আবির্ভাবধন্য বৈশাখ সর্বপ্রকার নির্জীবতার, স্থবিরতার এবং দুর্বলতার অবসানের এক অসামান্য আশ্বাস। কখনও সে শান্ত তাপস, সৌম্য সন্ন্যাসী, কখনও সে রুদ্রভৈরব, ভয়ালভীষণ। কখনও সে বৈরাগ্যের মন্ত্রে শান্তিপাঠে তপোমগ্ন, কখনও তাহার প্রলয়পিনাকে সমগ্র জগৎ ভীত, ত্রস্ত, প্রকম্পিত। তাহার প্রখর উত্তাপের অগ্নিতে জগতের যত দুর্বলতা, নির্জীবতা ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে অন্যদিকে শূন্য, শুষ্ক, ধূসর পৃথিবীর উপর তাহার আবির্ভাব নূতন সৃষ্টির ইমারৎ গড়িয়া তুলিতেছে। তাহার আবির্ভাবে সমগ্র ধরণী হইতে মুছিয়া যায় জরা, ঘুচিয়া যায় গ্লানি, পৃথিবী শুচিস্নিগ্ধ হয় পুণ্যস্নানে। বৈশাখ নূতন জীবনের বার্তাবহ। নব নব স্বপ্ন, নব নব প্রতিশ্রুতি, নব নব সম্ভাবনার স্বর্গরাজ্যের শক্তিমান দূত। তাই প্রথম উষার প্রণবধ্বনির মতই বাঙালীর মর্মমূল হইতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়—'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো।'

নিয়তির বিধানে বাঙালীর ভাগ্যের গতিপথ আজ পরিবর্তিত হইয়াছে। ভাগ্যের যে আকাশ একদিন ছিল নীলে নীলে ঘননীল, অফুরন্ত আলোয় ভরপুর, অসংখ্য তারায় সমাকীর্ণ সে আকাশে আজ ঘোর কৃষ্ণ মেঘের মিছিল, ঝটিকা-ঝঞ্ঝার দুরন্ত গর্জন, বজ্রের হুঙ্কার আর বিদ্যুতের ঝিলিক। বাঙালীর ঘরে ঘরে আজ বুকভরা হাহাকার। বাঙলার নর-নারী আজ যেন বেদনার প্রতিমূর্তি। অভাবে, অনটনে, বেকারীত্বে, বঞ্চনায় বাঙালীর প্রাণ আজ ওষ্ঠাগত। পূর্ববঙ্গের নরপশুদের হস্তে চরমতম কুৎসিত পাশব লাঞ্ছনায় বাঙালী আজ এক সর্বনাশা ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন। অন্ন, বস্ত্র, রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, প্লাবন, বিপর্যয়, মহামারী আবার চীন ও পাকিস্তানের ঘৃণ্য, শত্রুতা, সীমান্ত লঙ্ঘনের আশঙ্কা, দেশের অভ্যন্তরে সমাজ-বিরোধী দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের বিবেকবর্জিত কার্যকলাপ সমগ্র বাঙালীর জীবন হইতে শান্তি ও স্বস্তির তিলমাত্র স্পর্শটুকুও কাড়িয়া লইয়াছে। সহস্র সমস্যা জর্জরিত, বেদনাপ্রপীড়িত বাঙালীর জীবন হইতে হাসির ঝিলিক, গানের সুর, আনন্দের উৎস কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই।

তাই, এই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিনটিতে আমাদের অন্তরের প্রার্থনা যে—যে বেদনা, বঞ্চনা, জ্বালা, লাঞ্ছনা, ক্ষয়, ক্ষতি, শূন্যতা, হাহাকার আজ বাঙলার জীবনযাত্রাকে দুর্বহ করিয়া তুলিয়াছে তাহার অবসান ঘটুক। একদা শৌর্যে, বীর্যে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সর্বপ্রকার নৈপুণ্যে, কুশলতায়, দক্ষতায় যে বাঙলা অতুলনীয় ছিল—যাহার অপরিমাপ্য অবদান ভারতকে সর্বদিক দিয়া সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে; জ্ঞানে, গরিমায় জগতের বুধ-সমাজে যাহার কল্যাণে ভারতের পক্ষে একটি শীর্ষ আসন অর্জন করা সম্ভবপর হইয়াছে, যাহার কালজয়ী সন্তানদের জ্ঞানে, কর্মে ও সাধনায় নব নব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটিয়াছে সেই বাঙলার পূর্ব গৌরব, ঐতিহ্য ও সম্মান পুনরায় ফিরিয়া আসুক। সমগ্র বাঙলা আবার পরিপ্লাবিত হউক নব নব সৃষ্টির জোয়ারে, উদ্দীপিত হউক এক নবতম চেতনায়, জাগ্রত হউক অফুরন্ত শক্তিকে মূলধন করিয়া। বাঙলা দেশের প্রতিটি গৃহ পরিপূর্ণ হউক আনন্দে, হাসিতে, গানে; সুশোভিত হউক লাবণ্যে, দীপ্তিতে, সুষমায়; উদ্ভাসিত হউক আলোয়, প্রাচুর্যে এবং সজীবতায়। এই শুভদিনটিকে কেন্দ্র করিয়া আমরা আমাদের অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী ও পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশে সর্বৈব শুভকামনা জানাই এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের দীর্ঘজীবন, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং সর্বাঙ্গীণ শান্তি একান্তভাবে কামনা করি।

জয়তু শেক্সপীয়ার

নিত্যসৃষ্টি ও নিত্যধ্বংসের মধ্যেই জগৎস্রষ্টার বিশ্বলীলার পরম প্রকাশ। অনিত্য এই জগতে চিরকালের জন্য কিছুই থাকে না। ভাঙাগড়ার মধ্যেই জগতের অগ্রগমন। নব নব সৃষ্টির তাড়নায় ধ্বংসের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। পৃথিবীর নির্দিষ্ট নিয়মে সবকিছুই মহাকালের অতল গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই জগতের স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু মহৎসৃষ্টি চিরকালই এই নিয়মের বাহিরে। মহৎসৃষ্টির মৃত্যু নাই। মহাকাল পারে না এই সৃষ্টিকে জয় করিতে। তাহার অবস্থান কালের পরিধি হইতে বহু দূরে। মহৎসৃষ্টির মধ্যেই মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকেন মহৎস্রষ্টার দল। যাঁহারা নিয়ত পাড়ি জমান রূপ হইতে রূপাতীতে, সীমা হইতে অসীমে, অরূপ হইতে অপরূপে; ক্ষুধার সরোবর অতিক্রম করিয়া সুধার মহাসমুদ্রে যাঁহারা হন উত্তীর্ণ, জীবনের মধ্যে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা করেন জীবনাতীতের, নীরের ভিতর যাঁহারা সন্ধান পান ক্ষীরের, ইন্দ্রিয়সর্বস্বদের নিকট যাঁহারা আনিয়া দেন অতীন্দ্রিয়ের ঠিকানা সেই কথাচিত্রী এবং চিত্রলেখকের দলের নিকট চিরকালের ভিত্তিতেই কাল পরাজিত। তাঁহাদের চরণপ্রান্তে কাল প্রণামে অবনত। সেই কারণেই শেক্সপীয়ার অমর। সম্প্রতি তাঁহার চতুর্শতাব্দী পূর্ণ হইল। সময়ের এই দুস্তর ব্যবধান পারে নাই তাঁহার পুণ্যস্মৃতিকে বিন্দুমাত্র ম্লান করিতে। বরং সময়ের ধাপে ধাপে অগ্রসরণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই পুণ্যস্মৃতি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে। বিশ্ববাসীর হৃদয়ের গভীরে তাঁহার অটল আসন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে।

একদা আভন নদের তীরে নবজীবনের যে মহান বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল, আভনের স্রোতে স্রোতে দেশকাল সময়ের সীমা ছাড়াইয়া সেই নবজীবনবাণী ছড়াইয়া পড়িল সমগ্র বিশ্বে। সেই নবজীবন বেদের পবিত্র পংক্তি সারা বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। স্ট্রাটফোর্ডের আকাশে সেদিন যে অশেষ শক্তিমান জবাকুসুম সঙ্কাশ মহাদ্যুতিমান সূর্য উদিত হইলেন, তাঁহার অনন্ত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ প্রসন্ন রশ্মি আজ সমগ্র বিশ্বে বিকিরিত হইয়া দূরীভূত করিয়াছে জগতের মানসিক তমঃ। আভনের তীরবর্তী যে আলো সেদিন পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে সঞ্চারিত হইল, তাহারই রশ্মিতে জীবনের এক বৃহত্তর ও মহত্তর রূপ আজ আমাদের সম্মুখে প্রস্ফুটিত।

শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে উদ্ভাসিত যে ইংল্যাণ্ডকে আজ আমরা দেখিতেছি, সেই ইংল্যাণ্ডের গঠনকার্য সুরু হইয়াছিল প্রথম এলিজাবেথের সময়ে, অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এলিজাবেথের সময়ে সকল দিক দিয়া ইংল্যাণ্ডে যে ব্যাপক নবজাগরণ সূচিত হইয়াছিল শিক্ষিতসমাজে সে বিষয় আজ আর কিছুই অবিদিত নাই। সেদিন যে দিকপালের দল নূতন জীবনের, নূতন প্রতিশ্রুতির, নূতন সম্ভাবনার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে উত্তরসাধকের দল তাহারই উপর ইমারত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এলিজাবেথের সময়ে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা মহাকবি শেক্সপীয়ারের আবির্ভাব। সমগ্র ইংল্যাণ্ড সেদিন সন্ধান পাইল এক অত্যুজ্জ্বল [illegible]। জাতীয় মনোভূমিতে আসিল সেদিন নব নব সৃষ্টির এক দুর্বার প্লাবন, জীবনপ্রকাশের এক স্রোতোন্মুখ সেদিন কি এক অভূতপূর্ব যাদুর স্পর্শে খুলিয়া গেল। সাংস্কৃতিক জগতে পদার্পণ করিয়াই শেক্সপীয়ারও যেন বলিলেন—VINI, VIDI VICI.

তাহার পর সময়ের ঝড় বহিয়া গেল; কত ভাঙাগড়ার মধ্যে অগ্রসর হইতে থাকে পৃথিবী; কত সাম্রাজ্যের পতন-উত্থান ঘটিল; কত বন্যা, ঝড়, প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী পৃথিবীকে ওলট-পালট করিয়া দিল; কত যুদ্ধ, রণোন্মত্ততা, ধ্বংসোন্মুখী অভিযান পৃথিবীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করিয়া দিল; কত সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল আবার কত নূতন চেতনা, নূতন স্বপ্ন, নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি হইল; কত নব সভ্যতা গড়িয়া উঠিল, কত নব নব কল্পনা মানুষের চিত্তে জন্ম লইয়া রূপ পরিগ্রহ করিল—কিন্তু মানুষের হৃদয়ে শেক্সপীয়ারের যে আসন—সহস্র জাগতিক পরিবর্তন সেই আসন হইতে তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই। শেক্সপীয়ার আজ শুধু ইউরোপের নন, আজ তিনি সমগ্র জগতের। বিশ্বজোড়া ব্যাপ্তি তাঁহার, আমাদের জীবনে তাঁহার স্বাক্ষর অমলিন। দিক হইতে দিগন্তরে, কাল হইতে কালান্তরে তাঁহার অভিসারও অব্যাহত। তাঁহার কালজয়ী রচনা তাঁহাকে আজ সারা পৃথিবীর হৃদয়ের ধন, মনের মানুষ এবং একান্ত আপনার করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার কাব্য, তাঁহার নাটক, তাঁহার অবিস্মরণীয় সংলাপসমূহ নিখিল বিশ্বের নরনারীর মনে-প্রাণে মিলিত হইয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে। তাই আজ জগৎজোড়া তাঁহার আসন। তাঁহার নবজীবনের উদাত্ত আহ্বান, নূতন জীবন সংহিতার শুভ মন্ত্রোচ্চারণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় আভনের স্রোতে স্রোতে গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে মিলিত হইয়া বাঙালীর পিপাসুচিত্তে এক অভিনব সুরঝঙ্কার তুলিয়াছে। বাঙালীর নিকট তিনি বিদেশী নন। বাঙলায় শেক্সপীয়ার-চর্চার ইতিহাসও কম সমৃদ্ধ নহে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাঙলার অসংখ্য কবি, গুণী ও রসিকদের অপূর্ব ব্যাখ্যায়, বিচিত্র বিশ্লেষণে তিনি আজ বাঙলার একেবারে গৃহের আঙ্গিনায় উপনীত হইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা, বর্ণনা, বিশ্লেষণের আলোয় বাঙালীর জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি আজ এক বিচিত্র দীপ্তিতে প্রদীপ্ত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি যে, বর্তমান যুগে আমাদের নাট্যকলায় যথেষ্ট দৈন্য দেখা দিয়াছে। নাটকের আঙ্গিকের বিকৃতিসাধন বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই দুরবস্থা হইতে মুক্তির চাবিকাঠির সন্ধান আছে শেক্সপীয়ারের নাটকে। আমাদের দেশের নাট্যকারগণ আঙ্গিকের ক্ষেত্রে শেক্সপীয়ারের ধারা অনুসরণ করিলে বাঙলার নাট্যসাহিত্য নিঃসন্দেহে লাভবান হইবে।

তাঁহার শুভ জন্মদিনের পরম ক্ষণে সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধাবনত প্রণাম আজ তাঁহার উদ্দেশে বিশেষভাবে উৎসর্গিত হইতেছে। তাঁহার বন্দনায় আজ দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত, সংস্কৃতির প্রতিটি মন্দিরে প্রতিটি তীর্থে আজ তাঁহার পূজা; এই পরমলগ্নে জগতের প্রণামের মালায় আমাদেরও একটি প্রণামের ফুল যুক্ত করিয়া দিতেছি। শেক্সপীয়ারের জয় হউক।

শেখ আবদুল্লার মুক্তি

কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা বর্তমানে মুক্তি পাইয়াছেন। দীর্ঘ একাদশ বৎসর কারাবাসের পর তিনি মুক্ত হইয়াছেন। মধ্যে ১৯৫৮ সালে একবার তাঁহার সম্মুখ হইতে কারাদুর্গের লৌহকপাট অর্গলমুক্ত হইয়াছিল কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই পুনর্বার তাঁহাকে সরকারী আদেশে কারান্তরালেই বাসা বাঁধিতে হয়।

শেখ আবদুল্লার এই মুক্তিলাভ কাশ্মীর সমস্যার ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করিল। এই অধ্যায়টি গৌরবের কি বেদনার, ইহাতে অফুরন্ত আনন্দের স্বাক্ষর কি অবিরাম বেদনার ক্ষতপ্রলেপ—দেশের রাজনীতিকজগৎ এবং বুদ্ধিজীবীজগতে সেই প্রশ্নই আজ সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

শেখ আবদুল্লার এই মুক্তিকে আমাদের রাষ্ট্রীয় মহলের যাঁহারা কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের অন্যতম সহায়ক বলিয়া গণ্য করিতেছেন—তাঁহাদের এই চিন্তাধারার মধ্যে দুঃখের বিষয় কোন বুদ্ধির দীপ্তি উঁকি মারিতেছে না। এই জাতীয় চিন্তাধারার মধ্যে কোন প্রখর রাজনৈতিক জ্ঞানের ছাপ অনুপস্থিত, এই ধারণাকে 'সোনার পাথরের বাটি'র সহিতই তুলনা করা চলে। শেখ আবদুল্লাকে কারাভ্যন্তরে রাখিলে কাশ্মীর সমস্যা ক্রমশই জটিল হইতে থাকিবে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন—এই ঘোর জাতীয় দুর্যোগের দিনে—সারা দেশের এক চরম মুহূর্তে তাঁহাকে মুক্তি দিলে সমস্যা যে জটিলতর হইবে—বুদ্ধিমান রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণের মস্তিষ্কে সে চিন্তাটি কি বারেকের তরেও উদিত হয় নাই? আবদুল্লা এক রাজনৈতিক চরিত্র। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা যাঁহাদের দ্বারা পূর্ণ হয় ইনি তাঁহাদেরই একজন। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইঁহার মুখের কথার সহিত মনের কথার আকাশ-পাতাল ব্যবধান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইঁহার কথায় এবং কাজে গরমিল। যাঁহার নিজেরই কথা ও কাজে সংহতি নাই তাঁহার দ্বারা বৃহৎ রাষ্ট্রের বা জনপদের সংহতিসাধন কিভাবে ঘটিতে পারে তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। তিনি নিজেকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া ঘোষণা করেন আবার তিনিই উপদেশ বর্ষণ করেন 'সাচ্চা মুসলমান' হইতে। তিনি নিজেকে গান্ধীশিষ্য বলিয়া দাবী করেন আবার তাঁহারই শোভাযাত্রার পুরোভাগে বিভূষিত হয় জিন্না ও আয়ুবের প্রতিকৃতি। তদুপরি ইঁহার চরিত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য নিজের ক্রিয়াকলাপকে নির্দ্বিধায় অস্বীকার করা। ইঁহার অভিধানে 'ন্যায়', 'নীতি', 'বিবেক' প্রমুখ শব্দগুলি যিনি খুঁজিতে থাকিবেন, বলা বাহুল্য, তাঁহার অভিলাষ পূরণ হইবে না, তাঁহাকে বরণ করিতে হইবে সর্বাঙ্গীণ ব্যর্থতা। ভারতবর্ষের বর্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থা কাহারও অজানা নয়। বহির্ভারতে ভারতীয়রা স্থানে স্থানে কিভাবে নির্যাতিত হইতেছেন, সে সম্বন্ধেও কাহারও কোন অস্পষ্টতা নাই। ঘরের এবং বাহিরের সহস্র সমস্যা ও দুর্যোগ এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণের চরম ব্যর্থতা—ভারতকে সর্বনাশের প্রায় শেষবিন্দুতে উপনীত করিয়া তুলিতেছে। শেখ আবদুল্লা কেন গ্রেপ্তার বরণ করিয়াছিলেন, তাহাও কাহারও অজানা নাই। এই দীর্ঘকায় শেরওয়ানী পরিহিত মানুষটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন স্বতন্ত্র কাশ্মীরের। স্বতন্ত্র কাশ্মীর অর্থে ভারতের

অখণ্ডতার অবসান। আমরা যে আদর্শ অখণ্ড ভারতেরই রূপ কল্পনা করিয়া থাকি, তাঁহার চিন্তাধারা এবং অভিসন্ধি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা চিন্তায়, কল্পনায়, স্বপ্নে কাশ্মীরকে ভারতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়াই জানি, আমরা ইতিহাসের ভিত্তিতে বিশ্বাস করি কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ।

শেখ সাহেবের স্বপ্ন, চিন্তা, কল্পনা এ ক্ষেত্রে একেবারে বিপরীত। কাশ্মীরকে যদি স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য করিতে হয় তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলিও যদি একযোগে বা একের পর এক আপন আপন স্বাতন্ত্র্য দাবী করিয়া বসে তাহা হইলে ভারতের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব কি করিয়া বজায় থাকিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তার আবশ্যক আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শেখের স্বপ্নকে একটি সর্বনাশা চক্রান্ত বা ভারতের ঐক্য, সংহতির বিরুদ্ধে এক কুৎসিত ষড়যন্ত্রের সহিত তুলনা করিলে বিন্দুমাত্র অযৌক্তিক হয় না।

শেখ সাহেব পাহাড়-পর্বত-উপত্যকাদি ডিঙাইয়া ভারতের মাটিতে পদার্পণ করা মাত্রই ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলের সহিতই সাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আছেন মির্জা আফজল বেগ এবং মৃদুলা সারা ভাই। আজ তাঁহার একনিষ্ঠ সাহায্যকারিণী শ্রীমতী মৃদুলার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া তাঁহার প্রতিটি গতিবিধি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আবদুল্লার এই দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলিতে বাধা নাই, আমাদের সন্দেহের পাত্র এবং পাত্রী। আফজল বেগ সম্বন্ধে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, কিন্তু মৃদুলা সারা ভাই ভারতের কন্যা ইহাও সত্যের খাতিরে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আবদুল্লা রাজাজীর সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতের সেই প্রবীণ নেতার সহিত আবদুল্লার যোগাযোগও উপেক্ষণীয় নয়। কেহই অনবগত নন, যে দক্ষিণ-ভারতে আজ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এক চাপা অসন্তোষ বহুকাল ধরিয়াই পুঞ্জীভূত হইতেছে, কখনও কখনও এই অসন্তোষ চাপাও থাকিতেছে না, এ-ক্ষেত্রে প্রবীণ রাজাজীর সহিত আবদুল্লার যোগাযোগ কেহ যদি সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে দোষারোপ করা চলে কি না বুদ্ধিজীবীমহল তাহার বিচার করিবেন।

এক্ষণে, এই সঙ্কটঘন পরিস্থিতিতে আমরা দেখিতেছি আবদুল্লার মুক্তি সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে সমস্যার বিবর্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। অতএব, তাঁহার গতিবিধি, বক্তৃতাদি এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে কড়া নজর রাখা হউক এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে তাঁহার রাজনৈতিকজীবন পরিচালিত হউক নচেৎ ভারতের ভাগ্যাকাশে সর্বনাশের কালো মেঘ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিবে, যাহার পরিণতি হইবে আরও ভয়াবহ।

২২এ বৈশাখ ১৩৭১।

॥ শোক-সংবাদ ॥

নির্বাণীতোষ ঘটক

চন্দননগরের সুপ্রসিদ্ধ ঘটক-পরিবারের স্বর্গত আশুতোষ ঘটকের কনিষ্ঠ পুত্র এবং ব্যবসায় জগতের অন্যতম দিকপাল স্বর্গত ভবতোষ ঘটকের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র বিশিষ্ট শিল্পপতি নির্বাণীতোষ ঘটক গত ১৪ই বৈশাখ মাত্র ৪২ বছর বয়েসে পরলোকগত হয়েছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। দীর্ঘকাল বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের কর্মাধ্যক্ষের আসনে ইনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের বিখ্যাত লৌহপ্রতিষ্ঠান কে, সি, ঘটক এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কুসুমিকা আয়রন এ্যাণ্ড কনষ্ট্রাকসান ওয়ার্কস, চন্দননগরের জ্যোতি টকীজ প্রমুখ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত ইনি সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় এবং অক্লান্ত কর্মক্ষমতায় এই প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট উন্নত এবং সমৃদ্ধ হয়েছে। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা সুলেখিকা ভক্তি দেবীর সঙ্গে ইনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন। মৃত্যুকালে ইনি সহধর্মিণী, একটি পুত্র শ্রীমান শুভতোষ, একটি কন্যা কুমারী সুচেতা এবং আরও অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও অনুরাগী বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি ও সদ্গতি কামনা করি।

লেডী কাদম্বিনী সরকার

নব্যভারতের ইতিহাসচর্চার জনক আচার্য স্যার যদুনাথ সরকারের সহধর্মিণী লেডী কাদম্বিনী সরকার গত ৬ই বৈশাখ ৮৩ বছর বয়েসে লোকান্তরিতা হয়েছেন।

লেডী বিন্ধ্যবাসিনী সিংহরায়

স্বর্গীয় স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়ের সহধর্মিণী লেডী বিন্ধ্যবাসিনী সিংহরায় গত ১২ই বৈশাখ ৬৫ বছর বয়েসে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

লীলা চৌধুরী

বাঙলার জাতীয় জীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিকপাল চৌধুরী ভ্রাতৃবৃন্দের অন্যতম স্বনামধন্য স্বর্গীয় মন্মথনাথ চৌধুরীর সহধর্মিণী লীলা চৌধুরী গত ১৭ই চৈত্র কুনুরে গতায়ু হয়েছেন। এঁর জননী ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা সৌদামিনী দেবীর কন্যা। বিগত যুগের স্বনামধন্যা চিত্রতারকা শ্রীমতী দেবিকারাণী এঁর কন্যা এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী তাঁর দেবরপুত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

৫৮ [দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীতুকুমার ভড়মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

পাঠক পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা-সমালোচনা

মান্যবরেষু —গত মাঘ সংখ্যায় আপনার সম্পাদকীয় মন্তব্য 'দিল্লীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী' পড়ে খুবই আনন্দ বোধ করলাম, এই ভেবে যে, বাংলার এত সংবাদ পত্র-পত্রিকার মধ্যে তবু একজন আছেন যিনি এ বিষয় চিন্তা করেন। এর জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ বাংলা ও বাঙালীর চরম দুর্দশার দিন। তারা ক্রমে ক্রমে সর্বভারতীয় সরকারী-বেসরকারী সর্ব বিষয় হতে অপসারিত হচ্ছে, কিন্তু কেন? সত্যই কি বাঙালী আজ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনুপযুক্ত? যেমন আজ ১৭ বছরের মধ্যে এক ডঃ হরেন মুখার্জী ছাড়া আর একজনও লাট সাহেব উপযুক্ত হন নি বা নেই? এই রকম অন্য বিভাগেও সেই একই ব্যাপার, বাংলা দেশে কোনও নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা দূরে থাকুক, একে একে বহু সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। অথচ উদ্বাস্তু ও কর্মহীন বাঙালীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সরকারীভাবে এর প্রতিকারের কি রকম চেষ্টা হচ্ছে, তা অন্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়। সেখানে 'Son of the soil' এর কড়া পাহারা। যাই হোক আমার মনে হয় বাংলা দেশের সমগ্র সংবাদপত্র ও পত্রিকা এই বিষয়ে আন্দোলন করে দেশবাসীকে সচেতন করে দেবেন যাতে তাঁরা এই জীবন প্রতিযোগিতার জন্য সক্ষম হ'তে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। নমস্কারান্তে, ইতি—শ্রীডাসি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮, থার্ড এভিনিউ, কুপ্টি, ইস্টার্ন রেলওয়ে।

মহাশয়, এই পত্রের সর্বাগ্রে আপনি ও 'মাসিক বসুমতীর' সমস্ত কর্মিবৃন্দের জন্যে রইল আমার ভালোবাসা। 'মাসিক বসুমতী' যে আধুনিক যুগের মাসিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। সত্যি আজকের 'মাসিক বসুমতীর' উন্নতির পদক্ষেপ দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারি না। আমি আজকের পাঠক নই—পনের বছর ধরে আমি এর অনুরক্ত পাঠক একজন। তাই সেই পনের বছর আগেকার 'মাসিক বসুমতীর' সঙ্গে আজকের 'মাসিক বসুমতীর' কোন বিষয়ে তুলনা করা চলে না—কি ছাপায়, কি পাতায়, কি অন্যান্য বিষয়ে সেই মাসিক বসুমতী কালের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ঘুরপাক খেতে খেতে আজকে সে যে রূপ নিয়েছে তা অভাবনীয় তাই আজও তার সর্বত্র জয়গান। বর্তমানে প্রকাশিত উপন্যাস নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'তালপাতার পুঁথি' মনোরম উপন্যাস। সুবোধ চক্রবর্তীর 'মৌন মন' আশা করি পাঠকমহলে ইতিমধ্যে সাড়া জাগিয়েছে —'চারজন' বিভাগটি প্রশংসার দাবী রাখে। আগামী বৈশাখ সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের নভোনীলের জন্যে ধন্যবাদ (অবশ্য আপনি ধন্যবাদের প্রত্যাশী নন)। একটা অনুরোধ যদি পারেন এর পরে বিমল কর বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস ছাপাতে চেষ্টা করবেন। নমস্কারান্তে—অরুণ বসু, মায়াপুরী নূতন পল্লী, বর্ধমান।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়, আমি আপনার মাসিক পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। প্রায় আট বছরেরও বেশি হইতে চলিল আমি আপনাদের এই বহুলপ্রচারিত পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িত। পূর্বের চাইতে বর্তমানে ইহার অনেক উন্নত হইয়াছে। বিশেষত এর 'সম্পাদকীয়', 'রঙ্গপট' ও 'আলোকচিত্রগুলি' যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচায়ক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করিতেছি যে, গত কয়েকটি সংখ্যা হইতে ইহার 'খেলাধূলা,' 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি' এবং 'দিনপঞ্জী' (দেশে-বিদেশে) বিভাগগুলিকে একেবারেই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির স্বাদ কিছুটা সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে পাইলেও, 'খেলাধূলা' বিভাগটি সম্পূর্ণ উঠিয়া যাওয়াতে খুবই হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। তাই আমি যথেষ্ট আশা রাখি যে, আপনি উপরোক্ত বিভাগটি পুনঃসংযোজন করাইয়া পত্রিকাটিকে আরও সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক করিতে এবং আমাদের সুখী করিতে এতটুকু কার্পণ্য করিবেন না। নমস্কারান্তে—ইতি, শ্রীকল্যাণ রায়, পোঃ রানাঘাট, চুড়ি পাড়া, জেঃ—নদীয়া।

বেচতে চাই

মহাশয়, দয়া করিয়া মাসিক বসুমতী পত্রিকা মারফৎ আপনার অগণিত পাঠক-পাঠিকাকে জানাইবেন যে, নিম্নলিখিত বৎসরের মাসিক বসুমতী পত্রিকাগুলি আমি প্রতি কপি একটাকা করিয়া বিক্রয় করিতে চাই। এই পত্রটি আপনার মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার চিঠি-বিভাগে বিজ্ঞাপিত হইলে বাধিত হইব। আপনার মূল্যবান উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম—

১। ১৩৫৯ জ্যৈষ্ঠ—কার্তিক, মাঘ—চৈত্র।
২। ১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ—আশ্বিন, অগ্রহায়ণ—চৈত্র।
৩। ১৩৬১—৬২ বৈশাখ—চৈত্র।
৪। ১৩৬৩—৬৪ বৈশাখ—ফাল্গুন।
৫। ১৩৬৫ হইতে ১৩৬৮ বৈশাখ—চৈত্র।

সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—শ্রীফাল্গুনী বসু 'উমা নিকেতন' ১১।এস্।১।২।এইচ রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা—৩৭।

মহাশয়, আপনার জনপ্রিয় 'মাসিক বসুমতী মারফৎ পূর্ব পাকিস্তান-এর গ্রাহকদের কাছে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন যে, আমি নিম্নলিখিত বৎসরের মাসিক বসুমতীগুলি বেচিতে চাই। কেহ কিনিতে চাহিলে নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করুন। আপনার পত্রিকা মারফৎ এই পত্রখানা প্রচার করিলে বাধিত হইব।

মাঘ হইতে চৈত্র ১৩৬৭ বাং
বৈশাখ „ „ ১৩৬৮ „
„ „ „ ১৩৬৯ „
„ „ আষাঢ় ১৩৭০ „

পত্রিকাগুলি তিনকপি করিয়া বাঁধান অবস্থায় আছে। নমস্কারান্তে ইতি—শ্রীরবীন্দ্র ভৌমিক, পোঃ-কাঞ্চনগর, জেলা-কুমিল্লা, পূর্ব-পাকিস্তান।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায় অব: আর এন মুখোপাধ্যায়, ২২ ইউ এফ, তানসেন মার্গ, নিউ দিল্লী * * * শ্রী টি কে মুখোপাধ্যায়, অব: এমপ্রো ইণ্টার ন্যাশানাল লি:, ডাক—চিনচোয়াড়, জেলা পুণা—১৯, মহারাষ্ট্র * * * শ্রীমতী অঞ্জলি বোস, ৪।৩৩ ডব্লিউ ই এ কারোল বাগ, নিউ দিল্লী—৫ * * * সচিব, অভেদানন্দ গ্রন্থাগার, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ডাক—দুবরাজপুর, জেলা—বীরভূম * * * শ্রীবিজয়কুমার চক্রবর্তী, ন্যাশনাল ডেয়ারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ডাক—কাকুয়াল, পূর্ব পাঞ্জাব * * * শ্রীমতী প্রতিমা রায়, অব: শ্রী এন রায়, ডেপুটি সি সি এস (এস-ই রেলওয়ে) ৭।১।১ এ, নফর কুণ্ডু রোড কলিকাতা-২৬ * * * শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ অব: এন-সি ঘোষ এ্যাণ্ড সন্স, (ওয়েলডিং বিভাগ), ১, এ এল দাঁ রোড, ডাক—বজবজ, ২৪ পরগণা * * * শ্রী এস আর দত্ত, এস বি এ আই এন এইচ এস কল্যাণী, ভিশাখাপত্তম, ন্যাভাল বেস, এ পি * * * শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্ল এম-এল-এ বারাণসী ঘোষ রোড, ডাক—তালপুকুর, জেলা—২৪ পরগণা * * * শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মুরুলীয়া কোলিয়ারী, ডাক—মাহুদা, জেলা—ধানবাদ * * * শ্রীমতী সুশীলাবালা সাহা, অব: শ্রীঅজিতকুমার সাহা, ১৩০, নেতাজী সুভাষ রোড, ডাক—খাগড়া, জেলা—মুর্শিদাবাদ, প: বঙ্গ * * * প্রধান শিক্ষক, দেউলপাড়া বুদরীনাথ বিদ্যা নিকেতন, ডাক—দেউলপাড়া, জেলা—হুগলী, (তারকেশ্বর হয়ে) * * * শ্রীঅমূল্যরতন ভৌমিক, অফিস অফ দি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, পূর্ব মেদিনীপুর ডিভিসন, ডাক ও জেলা—মেদিনীপুর, * * * শ্রীশিবচরণ চক্রবর্তী, ১।৬, ওলাইচণ্ডী রোড, কলিকাতা-৩৭ * * * শ্রীদীপক চৌধুরী, সহকারী ম্যানেজার, নিউ এক্সপ্লোসিভ ফ্যাক্টরী, ডাক—সরভাত্রানগর, জেলা—ভাণ্ডারী, মহারাষ্ট্র * * * সচিব, শৈল জাগৃতি পাবলিক গ্রাম্য গ্রন্থাগার, ডাক—সোনাখালি, জেলা—মেদিনীপুর * * * কুমারী প্রতিমা ধর, ৩৭।১।এ, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ * * * শ্রীমতী বেলা মজুমদার, ১৪, দেশপ্রিয় পার্ক রোড, কলিকাতা-২৬ * * * শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ অবধায়ক—মেসার্স এন সি ঘোষ এণ্ড কোং, ডাক—বোটানিক্যাল গার্ডেন, পোদ্রা, জেলা—হাওড়া * * * শ্রীমতী ছবি সরকার, ১৩১বি, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ * * * শ্রী এ কে পালিত বি-এ, উকিল, ডাক—আস্কা, জেলা—গঞ্জাম, উড়িষ্যা * * * সচিব, বি ইউ সি গ্রন্থাগার, ৫১বি, গরচা রোড, কলিকাতা-১৯ * * * শ্রীঅমিয়কান্ত চক্রবর্তী, মাসিলি টি-বি হাসপাতাল, Dakara-ya Project, ডাক—মাসিলি, জেলা—কোরাপুট, উড়িষ্যা * * * শ্রী এস, এন, দত্ত, অধ্যক্ষ টেকনিক্যাল স্কুল, ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, বেনারস, ইউ-পি * * * শ্রীমতী বাণী মিত্র, ৫৬, ডানলপ স্টাফ কোয়ার্টার ডাক—সাহাগঞ্জ, জেলা—হুগলী * * * ডা: ডি বড়ুয়া, এম-বি-বি-এস, পি-সি-এফ-এস Asstt. Surgeon i c পি আর, ডিস্পেন্সারী, ডাক—নিরমুন্দ (সিমলা হিলস্ হয়ে) জেলা—কুলু (পাঞ্জাব) * * * শ্রীমতী মায়া বসু, ৪৫, গলফ্ ক্লাব রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩ * * * শ্রীমতী দীপা বসু, অব:—ডা: সরোজকুমার বসু এম-বি-বি-এস, [illegible]রোড, বিহার * * * প্রধান শিক্ষক, কাইজুরি উচ্চ বিদ্যালয়, [illegible] (বসিরহাট হয়ে), জেলা—২৪ পরগণা।

বৈশাখ (১৩৭১) হইতে চৈত্র পর্যন্ত মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। দয়া করিয়া প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী উষারাণী ঘোষ, অবধায়ক—ডাক্তার জি, সি ঘোষ এম-বি, ডাকঘর—শিলিগুড়ি, জেলা—দার্জিলিং।

আমি মাসিক বসুমতীর প্রায় ৩৬ বৎসর গ্রাহিকা আছি। বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। বাহিরে ছিলাম বলিয়া চাঁদা পাঠাইতে কিছু দেরি হইয়া গেল। পত্রিকা পূর্ববৎ নিয়মিত পাঠাইবেন। শ্রীমতী নলিনী দিন্দা, কলিকাতা।

Herewith remitting Rs. 15/- for the renewal subscription of the Monthly Basumati for one year. Please send the magazine every month. —The Librarian, Kendrapara Public Library, Po. Kendrapara, Cuttack.

I send herewith the annual subscription to the Monthly Basumati for the current session. Please send the magazine regularly.—The Secretary, Bharati Bhaban Sadharan Pathagar, Kaligaon. Malda, W. Bengal.

Sending Rs. 15·00 being the annual subscription for one year. Please enlist me a subscriber from the month of Baisakh.—Sri. Pranati Mukherjee, C/0, Sri R. N. Mukherjee 22, U F, Tansen, Marg, New Delhi.

We have remitted the annual subscription of Rs. 15·00 Kindly send the magazine regularly, B. Bhattacherjee, Special Officer, Pearaaherra Tea Estate Po. Pearacherra, Dt. Tripura, India.

১৩৭১ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন ও প্রতি মাসে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। শ্রীমতী শান্তিলতা পাল। খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

Please accept the subscription of Rs. 15·00 for the year 1964-65 and send the Monthly Basumati every month.—Sm. Ava Bose C/0 Shree Srish Chandra Bose, Chandni Chawk, Cattack—2.

I am remitting the annual subscription of Rs. 15·00 for the year 1371 B.S. Please acknowledge receipt. Sm. Lilarani Dey C/0. Ajit Kumar Dey. Vill & Po.—Kashiara, Dt. Burdwan.

১৩৭১ সালের আমার বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন এবং পূর্ববৎ নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন। এ কে করণ, 'আশীর্বাদ', ডাকঘর—জনকা, মেদিনীপুর।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের এই প্রথম
অভিনব রহস্য-রচনার সংকলন।

রহস্যের স্বাদ

সুবন্ধু ভট্টাচার্য সম্পাদিত

এতে লিখেছেন :—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বনফুল ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুবোধ ঘোষ ॥ বিমল মিত্র ॥ নবেন্দু ঘোষ ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥ বিমল কর ॥ সমরেশ বসু ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ প্রবোধবন্ধু অধিকারী ॥ চিরঞ্জীব সেন ॥ অদ্রীশ বর্দ্ধন ॥

এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্কার-ধন্য
শঙ্করনাথ রায়ের

ভারতের সাধক

১ম—৬·৫০ (৪র্থ মুঃ), ২য়—৬·৫০ (৩য় মুঃ)
৪র্থ—৬·৫০ (২য় মুঃ), ৫ম – ৬·৫০ (২য় মুঃ)
তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় মুদ্রণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

নীলকণ্ঠের স্মরণীয় গ্রন্থ

বার্দ্ধক্যে বারাণসী ৫·৫০

(প্রথম পর্ব)
প্রথম পর্বের দ্বিতীয় মুদ্রণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

দ্বারেশ শর্মাচার্যের

মায়াকঙ্কণ ৩·৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের **অজ্ঞাতবাস ৫৲**
ইস্কাবনের সাহেব হরতনের বিবি ৪·৫০ (২য় মুদ্রণ)

সৌরীন সেনের সুন্দর উপন্যাস

অন্য কোনখানে ৫·৫০

C.F. Andrews-এর What I owe to Christ-এর সার্থক অনুবাদ

ঋণাঞ্জলি ৪৲৫০

অনুবাদক – নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর
কনকদীপ ৩৲

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের
ত্রিশঙ্কু ৩৲

শিবনাথ শাস্ত্রীর Men I have seen-এর সার্থক অনুবাদ
মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে ৩·৫০
অনুবাদিকা—মায়া রায়

॥ আসন্ন প্রকাশ ॥
স্বপ্ন কি সত্য হয়? স্বপ্নে দেখা এক প্রেগলভার আত্ম-কথার রোমান্টিক উপন্যাস!
প্রাণতোষ ঘটকের **স্বপ্ন-অভিসার**

নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা রতন সান্যালের

নদী প্রান্তর

॥ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত একটি আশ্চর্য আর অপূর্ব ঐতিহাসিক উপন্যাস ॥
সুদীপ্ত আচার্যের **ভারতের বাঙ্গী বেগম** প্রথম পর্ব মোঘল আফগান
॥ মোঘল আফগান ইতিহাসের তথ্যের ভিত্তিতে যত প্রেমের পূর্ণ কাহিনী ॥

শঙ্করনাথ রায়ের
অসামান্য প্রতিভার
একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর

ভারততীর্থ

প্রকাশের
প্রতীক্ষায়

৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রাম বাঙলা

—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

(জলরং)

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪৩শ বর্ষ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

প্রথম খণ্ড
দ্বিতীয় সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

কথামৃত

শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত।

'সত্য' দুই প্রকার। (১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়।

'বেদ'-নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন।

এই অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম 'বেদ'।

এই ঋষিত্ব ও বেদদ্রষ্টৃত্বলাভ করাই যথার্থ ধর্মানুভূতি। যতদিন ইহার উন্মেষ না হয়, ততদিন 'ধর্ম' কেবল 'কথার কথা' ও ধর্মরাজ্যের প্রথম সোপানেও পদস্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে।

সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, বা কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে।

সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র 'বেদ'।

অলৌকিক জ্ঞানবেতৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদিদেশীয় ধর্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্যজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ 'বেদ'-নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রমাণভূমি।

আর্যজাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদনামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে, তাহাই 'বেদ'।

এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফল, মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশ-কাল-পাত্রাদি-নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতিনীতিও এই কর্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবে। লোকাচার সকলও সৎশাস্ত্র এবং সদাচারের অবিসংবাদী হইয়া গৃহীত হইবে। সৎশাস্ত্রবিগর্হিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হওয়াই আর্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্তভাগই—নিষ্কামকর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায় মুক্তিপ্রদ এবং মায়া-পারনেতৃত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশ-কাল-পাত্রাদির দ্বারা অপ্রতিহত বিধায়—সার্বলৌকিক, সার্বভৌমিক ও সার্বকালিক ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হই[illegible]

মেয়ে ফাঁদ

(সত্য ঘটনা)

বীরু চট্টোপাধ্যায়

নির্মম অত্যাচারই শুধু নয়,—বিবিধ ধরণের অনাচার, বিশেষ করে মেয়েদের প্রতি জঘন্য আক্রমণের জন্য অচিরেই কুখ্যাত হয়ে উঠল নাৎসী কর্নেল রেইন হার্ড ভন মেলজার। জার্মান অধিকৃত ফরাসীদেশের ছোট শহর, কোলমার। মাত্র হাজার পঁয়তাল্লিশ অধিবাসী। এই শহরটির হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে যেদিন তিপ্পান্ন বছরের প্রৌঢ় অতি নিষ্ঠুর-স্বভাব কর্নেল এল, সেদিন থেকে লোকেদের আর শান্তি রইল না। শিহরিত আতঙ্কে প্রত্যেকের দিন-রাত্রি প্রায় বিনিদ্র অতিবাহিত হতে লাগল, বিশেষ করে তরুণী মেয়েদের। সুন্দরী তরুণী দেখলে আর রক্ষে নেই। অমনি কর্নেলের লালসাসিক্ত নখর-দংষ্ট্রা তাকে আঘাত হানবেই।

১৯৪০-এর ১৬ই আগস্ট! যথানিয়মে সন্ধ্যের কিছু পূর্বে কর্নেল তার রেঞ্জ গাড়িতে করে টহল দিচ্ছিল। সহসা ফুটপাথ দিয়ে যাওয়া একটি সুন্দরী কিশোরীর দিকে তার নজর পড়ল। মেয়েটির নাম জেনেভিভ্, বছর ষোল-সতের বয়েস। দেহাকৃতি অতীব সুন্দর।

—গাড়ি থামাও! কর্নেল হাঁকলো। শোফার মুহূর্তে ব্রেক কষলো।

তারপর পার্সোনাল বডিগার্ড জনৈক সার্জেন্ট ও শোফার দু'জনে গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল। জেনেভিভ ওদের পূর্বেই দেখেছিল। দেখেই নিকটবর্তী বাড়ির দরজার দিকে দৌড়ল। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পূর্বেই সার্জেন্ট তাকে মুখ চাপা দিয়ে ধরে ফেললো। দু'জনে মিলে প্রায় পাঁজাকোলা করে এনে গাড়ির পেছনের সিটে কর্নেলের পাশে বসিয়ে দিল, বললে, চুপ করে বসে থাকো··· চীৎকার করবার চেষ্টা করো না বা কর্নেলকে আঘাত করবার চেষ্টা করো না। মেয়েটি ফ্যাকাশে হওয়া চোখে পাশেবসা কামাসক্ত কর্নেলের দিকে তাকালো। তারপর যখন মনে পড়লো পরিণতির কথা তখন অঝোরভাবে কাঁদতে লাগল।

সেই রাত্রে মিউনিসিপাল বিল্ডিং-এর উপরতলায় কর্নেলের কোয়ার্টারে মেয়েটির প্রতি অবর্ণনীয় অত্যাচার সংঘটিত হল। পরদিন কিশোরী জেনভিভ আত্মহত্যা করে অপমানের জ্বালা জুড়াল।

—আমার মেয়েকে যে অত্যাচার করে মেরেছে সেই জানোয়ারটাকে আমি হত্যা করবই। সঙ্গত-ক্রোধে গর্জে উঠে শপথ নিল পিতা এলবার্ট।

চশমাপরা নিরীহ ধরণের ছাপোষা মানুষটি, কি অস্ত্রই বা আছে এত বড় একটা বাঘ, কর্নেলকে নিহত করবার! জীবনে সে কখনো কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছুঁয়ে দেখে নি। মিউনিসিপাল বিল্ডিং-এ লুকিয়ে ওঠবার মুখে সে ধরা পড়ে গেল। দু'জন গেস্টাপো এজেন্ট-এর অকথ্য অত্যাচারে সে সব স্বীকার করল। সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল বিচারের রায় দিলো। তবে বেশ নাটকীয়ভাবে ও উন্মুক্তস্থানে শাস্তি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল কর্নেল। তার দ্বারা লোকেদের মনে ভীতির সঞ্চারও করা যায়।

তাই পরদিন সেন্ট জোসেফ চার্চের সম্মুখে শত শত শহরবাসীর চোখের সামনে এলবার্টকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

সেদিন রাত্তিরে রেস্টুরেন্টের মালিক এবং ঐ শহরের দেশপ্রেমিক গুপ্তদলের পাণ্ডা পিয়ারে সেদিলত তার সহকারীকে বললে, এলবার্ট যা করতে গিয়েছিল, তা যে-কোন বাপের পক্ষেই করা উচিত। কিন্তু সে একটি মূর্খ। তাকে সাধারণ ভদ্রভাবে হত্যা করলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু ওভাবে সদর রাস্তায় ফাঁসি দেওয়া অসভ্য জংলীর কাজ।

পিয়ারের চোখে আগুন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অসহ্য ক্রোধে। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল, মানবতার নামে শপথ করছি, ঐ কর্নেল ভন মেলজারকে হত্যা করবই আমি এবং অনতিবিলম্বেই করব।

—খুব সহজ হবে না সে কাজ, অপর এক সহচর চিন্তিতমুখে বললে।

কি ভাবে কার্য হাসিল হবে সে পরিকল্পনা খুলে বলতে সহকর্মীরা স্বীকার করল যে, হ্যাঁ এভাবে করলে সম্ভব। সেদিলত বললে, তা হলে আর দেরি নয়। একটি সুন্দরী তরুণী সংগ্রহ কর। যে টাইপ করতে জানে এবং যে মেয়ে নাৎসীদের প্রাণের থেকে ঘৃণা করে।

দু'দিন বাদে অপূর্ব রূপসী একটি মেয়ে এসে উপস্থিত হল সেদিলতের কাফেতে। তেইশ বছরের বিধবা মিমি আউড্রি। স্বামী দেশপ্রেমিক গুপ্তদলের সদস্য ছিল। শত্রুর হাতে নিহত হয়েছে সে।

মেয়েটিকে ঘরের এককোণে টেবিলে নিয়ে গিয়ে সেদিলত বললে, কর্নেল একজন মেয়ে টাইপিস্ট ও পার্সোনাল সেক্রেটারীর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে, আসল উদ্দেশ্য অবশ্য মিসট্রেস্ রাখা। তুমি সে বিজ্ঞাপনের উত্তরে আবেদন কর। তারপর সময়-সুযোগ উপস্থিত হলে ছুরিকাবিদ্ধ করবে জানোয়ারটাকে।

একটি লিপস্টিকের মত দেখতে স্প্রিং-এর ছুরি ওর হাতে দিয়ে বললে, আমি তোমায় শিখিয়ে দেব কি ভাবে এই ক্ষুদ্র অস্ত্র দিয়ে এক আঘাতেই নিমেষে ও নিঃশব্দে হত্যা করা যায়।

পরদিনই মিমি আবেদন করল চাকরীর। অসাধারণ লাবণ্যময়ী মেয়ে। কর্নেল দেখামাত্র তাকে নিযুক্ত করে নিল। কিন্তু দুনিয়ার কাউকেই সে বিশ্বাস করে না। চীফ অফ সিকিউরিটি অফিসারকে মিমির দেহতল্লাসীর আদেশ দিলে। নাৎসীদের নিখুঁত তল্লাসী-কালে আবিষ্কৃত হয়ে পড়ল যে লিপস্টিকটি একটি লুক্কায়িত অস্ত্র।

পরদিন সেই একই স্থানে, চার্চের সামনে মিসেস মিমি আউড্রির ফাঁসি হয়ে গেল। তার মৃতদেহে একটি কাগজ লটকে দেওয়া হল, তাতে লেখা: নাৎসীদের সঙ্গে এরকম বজ্জাতি যে করবে, একই পরিণতি হবে তার।

এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে গিয়ে, দ্রুতপায়ে সহকারী গিয়ে সেদিলতের কাফেতে ঢুকে এককাপ কফির অর্ডার দিল। সেদিলত কফি দিতে এলে নিম্নস্বরে মিমির ফাঁসির সমস্ত কাহিনী বলল তাকে।

শুনে তাজ্জব হয়ে গেল সেদিলত। নাৎসীদের অত্যাচার বড় ভয়াবহ। তবে কি ফাঁসি দেওয়ার পূর্বে মিমির কাছ থেকে গুপ্তদলের অন্ধিসন্ধি সব জেনে নিয়েছে ওরা।

—আমি তা হলে কিছুদিন গিয়ে গুহায় থাকি। বেটারা না আমার অনুসরণ করে। তুমি আমার পিছুপিছু যাবে। যদি কোন চরের সন্ধান পাও তো সহসা চীৎকার করে উঠবে 'আমার মানিব্যাগ চুরি গেছে' বলে। সেই গোলমালের মুখে আমি লুকিয়ে পড়ব।

—ঠিক আছে, সহকারী বললে, আগে বাইরের রাস্তাটা আমি একবার দেখে আসি। কফি শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট বাদেই দ্রুতপায়ে ঘুরে এল। টোবাকো কাউন্টারে গিয়ে বললে,—সিগারেট কিনতে ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর যখন দেখলে কেউ কাছে নেই তখন ফিসফিস করে বললে, সর্বনাশ হয়েছে পিয়ারে। নাৎসীরা এই এলাকাটাকে ঘিরে ফেলেছে।

চমকে উঠল সেদিলত, চাপাস্বরে বললে, এক্ষুণি পালাও। নিজেকে গ্রেপ্তার করিয়ে কোন লাভ হবে না। বলে এক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে পয়সা নিল।

—ভয় নেই পিয়ারে সব সময়ই তোমার পেছনে আমরা আছি, বলে সহকারী দ্রুত কাফে ত্যাগ করল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নাৎসীসৈন্যগণ এবং গোমড়ামুখো এক তরুণ অফিসার দরজা ঠেলে কাফেতে প্রবেশ করল। সেদিলত এক মুহূর্ত তাদের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর এগিয়ে গেল। সে জার্মানদের বোঝাতে চায় ফরাসীরা ভীরু কাপুরুষ নয়, যে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে তারা সক্ষম।

চৌত্রিশ বছরের দেশপ্রেমিক যুবক সেদিলতের কর্মব্যস্ততা শুরু হয় সেদিন থেকে যেদিন ১৯৪০-এর জুনে নাৎসীবাহিনী এসে প্রবেশ করে প্যারিস নগরীতে।

হিটলার ফরাসীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন—'আপনারা আজ থেকে আমাদের অনুগত হয়ে থাকবেন।'

এর ক'দিন পরেই কোলমার শহরে অশুভ পদার্পণ করে কর্নেল ভন মেলজার। এসে ঘোষণা করে সে হল এখানকার রাইখসৃকমিশার। হাউট-রীন (রাষ্ট্র) বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ। তাদের কার্যাবলী অলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করাই আছে: লুণ্ঠন আর অত্যাচার দিয়ে বিজিত-জনশাসন। কর্নেল ফরাসীদের সর্বাধিক ঘৃণা করত, কেন না এই জাতের গুপ্ত-প্রতিরোধকারীদের দৌরাত্ম্যে তার মহান বাহিনীর বহু সৈন্যের প্রাণ গেছে ও যাচ্ছে এবং সংখ্যাতীত সামরিক বস্তু ধ্বংসস্তূপে বিনষ্ট করে দিচ্ছে ওরা। সেই প্রতিহিংসায় সন্ত্রাসের রাজত্ব করে তুলেছে এ শহরটিকে, ধনে-প্রাণে-অপমানে জর্জরিত ও বঞ্চিত করে তুলেছে জনজীবনকে।

কিছু কিছু ঘৃণ্য সহযোগিতা, বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা যে নেই এমন নয়। কিন্তু অধিকাংশ ফরাসীই গোপনে শপথ নিয়েছে নাৎসীদের সর্বপ্রকারে হয়রানি করবার, ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করে তোলবার জন্য। ক্রুদ্ধ জার্মান সামরিক-বিভাগ এই উৎপাতের প্রতিশোধে আদিম বর্বর ও অকথ্য নির্মম অত্যাচার চালিয়ে দমন করবার চেষ্টা করছে প্রতিরোধ দলকে। সেই অকল্পনীয় অত্যাচারে মাঝে মাঝে এমন অবস্থা দেখা দিচ্ছে, মনে হচ্ছে প্রতিরোধ শক্তি বুঝি যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। ■

এরপর সহসা অদৃশ্যভাবে এক দুর্দম সংঘশক্তি জেগে উঠল সারা অধিকৃত ফরাসী দেশে। গেরিলা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। কোলমার শহরে গুপ্তদলের ভার পড়ল প্রাক্তন বক্সার ও রেস্টুরেন্টের মালিক পিয়ারে সেদিলতের উপর। অসীম মনোবল ও শক্তিধর যুবক সে।

বহুকালপূর্বে পুড়ে-যাওয়া একটি বাড়ির 'সেলার'-এ ওরা হেড-কোয়ার্টার করল। বর্তমানে সে স্থানটি মিউনিসিপ্যালিটির জঞ্জাল ও ভাঙা কাচে পূর্ণ, আগাছা জন্মেছে। কারুর সাধ্য নেই যে, সন্দেহ করে ওরই মাটির তলার ঘরে গুপ্তদলের ঘাঁটি, গুদাম ও হেড-কোয়ার্টার। খাদ্য, পানীয়, অস্ত্রশস্ত্র গোলা-বারুদ সমস্ত কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চিত সেখানে। এ স্থানের নাম দিয়েছে ওরা 'গুহা'। এখান থেকেই ও নাৎসীসৈন্য বধ করে, নাৎসী গাড়ি নষ্ট করে, সরবরাহ ধ্বংস করে এবং বাইরে চালান যাবার জন্যে গুদামে জমা বস্তুসমূহে অগ্নি সংযোগ করে।

এদের জ্বালায় নাৎসীসৈন্যগণ বিব্রত, ভীত হয়ে উঠেছে। যা কখনো নাৎসীবাহিনীতে শোনা যায় নি তা-ও হয়েছে, অনেক সৈন্য পালিয়েছে। কর্নেল মহা ক্ষেপে গেছে, গর্জন করে আদেশ দিয়েছে সৈন্যদের ক্ষতি করলে সাংঘাতিক পরিণাম হবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। দলবলসহ সেদিলত বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কোন ভয়কে তোয়াক্কা না করে।

কিন্তু মিমি আউড্রির ফাঁসি একটা চরম আঘাত এনেছে তার মনে। সাংঘাতিক অনুতাপ এসেছে। তার জন্যেই বুঝি মেয়েটা প্রাণ হারালো। এ দুঃখ রাখবার স্থান নেই। আগেই বোঝা উচিত ছিল মিমি ধরা পড়বে। কেন সে আরও সাবধান করে দেয় নি। আফশোষের আর সীমা রইল না তার। ঐ ঘৃণ্য কর্নেলটা যে নিশ্ছিদ্র পাহারায় থাকে একথা তার ভাবা উচিত ছিল।

নাৎসী লেফটেন্যান্ট কর্কশকণ্ঠে জিগ্যেস করলে, তুমিই কি এ কাফের মালিক ?

—হ্যাঁ স্যার, সেদিলতের মনে সেই মুহূর্তে জেগে উঠল এক বাসনা। দেবে না কি ঝাঁপ। ওর পকেট থেকে পিস্তল বের করে শেষ করবে না কি এ কয়টা নাৎসীকে !

—আমরা তোমার এ দোকান তল্লাসী করব, লেফটেন্যান্ট বললে, গতকাল এখানে যে সেন্ট্রি নিহত হয়েছে তার অস্ত্রশস্ত্র এখানে আছে কি না দেখব।

সমস্ত এলাকা ঘিরে ফেলে প্রতিটি বাড়ি তল্লাসী করতে করতে চলেছে তারা। সেদিলত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে ভেবে যে, ওরা তা হলে তাকে গ্রেপ্তার করতে আসে নি। সে টোবাকো কাউন্টারে ফিরে গিয়ে সব সেরা দু'টো সিগার নিয়ে এল। একটা লেফটেন্যান্টের হাতে দিয়ে দেশলাই জ্বাললে।

—ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট সিগার ধরিয়ে বললে, আমাদের ঘৃণা করে না এমন একজন ফরাসীর সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দিত হলাম।

পরদিন সকালে সহকারী কফি খেতে এলে সেদিলত বললে, আমার আরেকটি পরিকল্পনা আছে···এর জন্যেও চাই সুন্দরী একটি মেয়ে···তবে এবার আর তাকে ঐ জংলীদের হাতে মরতে হবে না।

পরদিন সন্ধ্যায় দলীয় আইন-ব্যবসায়ী এক যুবকের সঙ্গে কাফেতে এসে প্রবেশ করল অপরূপা একটি মেয়ে। তেইশ বছরের মার্গো সার্ডিন, একজন লাইব্রেরীয়ান। দু'-দু'বার মত্ত নাৎসীসৈন্যের দ্বারা পথে সে ধর্ষিতা হয়েছে ইতিপূর্বে। ফলে নাৎসীদের যে কোন অনিষ্ট করতে সে সব সময় রাজী।

সেদিলত সব খুলে বলল মেয়েটিকে। প্রথমবারের বিফলতা, তার ভয়াবহ পরিণাম।—এবার মেয়েটি শুধু টোপ-এর কাজ করবে। আমি ও আমার সহকর্মীরা হত্যাকাণ্ড সমাধা করব।

—কি ভাবে, মনোরম ভুরু তুলে প্রশ্ন করে মার্গো।

—তা বলব না। ধরা পড়লে তোমার কাছ থেকে ওরা কোন কথা পাবেও না।

—তা হলে এবারও প্ল্যানটা বিফল হবে !

—তা হতে পারে। কেন না নাৎসীরা মূর্খ নয়। তোমার এটা জেনে নিতে হবে যে, সামান্য একটু ভুল হলেই ওরা সন্দেহ করবে এবং অকথ্য অত্যাচার করে সব কথা আদায় করে নেবে। সে অত্যাচার তুমি কল্পনাও করতে পার না !

মেয়েটি কিছুক্ষণ গভীরভাবে ভাবল। তারপর সহসা বলে উঠল, ঠিক আছে। আমি রাজী।

—বেশ, সেদিলত নিশ্চিন্ত হল, তুমি চাকরীর আবেদন করবে। কর্নেলের পার্সোনাল সেক্রেটারীর চাকরী। পরে তুমি আবেদন প্রত্যাহার করবে, চাকরী করবার তোমার সময় হবে না, একথা কর্নেলকে জানাবে। তৎপূর্বে তোমার রূপ-যৌবনের মোহিনী মায়া প্রয়োগ করবে জানোয়ারটার ওপর। তুমি তোমার ফ্ল্যাটে কর্নেলকে আমন্ত্রণ জানাবে।

—তা হলে আপনি বলছেন সত্যি সত্যি ঐ পাশব প্রবৃত্তির লোকটাকে নিয়ে আমি···।

—হ্যাঁ। শুধু এক রাত নয়, বহু রাত। প্রথম, দ্বিতীয় এমন কি অনেকদিন পর্যন্ত ওর সন্দেহ থাকবে যে এর পেছনে তোমার কোন ষড়যন্ত্র আছে তাই সঙ্গে আনবে প্রহরী। তারা এসে সমস্ত তোমার ফ্ল্যাট তল্লাসী চালাবে গুপ্ত অস্ত্র বা গুপ্তদলের সন্ধানে। তারপর এক সময় যখন সে ভাববে তুমি প্রকৃতই বিশ্বাসী ঠিক সে সময় আমরা গিয়ে ওকে হত্যা করব।

মার্গোর মুখাবয়ব ঘৃণায় কঠোরভাব ধারণ করল, বলল, ও লোকটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা চিন্তা করলেই গায়ে কাঁটা দেয়·····ঠিক আছে, তবুও আমি রাজী। সীমাহীন ঘৃণা আমার ওদের ওপর।

পরদিন চাকুরীর আবেদন করল। কিন্তু ইতিপূর্বে লুক্কায়িত ছুরির ঘটনাটি হওয়ায় পুরোপুরি তল্লাসী করবার পূর্বে কর্নেল কোন আবেদনকারিণীকে দেখা পর্যন্ত দিচ্ছে না। যারপর-নাই অশালীন ও অশোভন প্রক্রিয়ায় তল্লাসী চালালো সিকিউরিটি অফিসারেরা। মার্গো দাঁত-মুখ চেপে আরক্তিম অবস্থায় তা-ও মেনে নিল। তারপর যথারীতি কর্নেল দর্শন এবং মোহিনীশক্তি প্রদর্শন।

সে রাত কর্নেল মার্গোর ফ্ল্যাটে কাটাল।

পরবর্তী ক'দিন ধরে কর্নেল-এর সঙ্গে একই গাড়িতে করে শহরময় টহল দিয়ে বেড়ালো মার্গো এবং প্রতি রাত্রে কর্নেল এসে বসবাস করতে লাগল মেয়েটির ফ্ল্যাটে।

দিন দশেক ধরে কর্নেল সমভিব্যাহারে এই রকম ভ্রমণের পর

একদিন মার্গো রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে আসছিল সেদিলতের কাফেতে কফি খেতে, অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল সেদিলতকে সংবাদাদি দেওয়া। সহসা রাস্তার মাঝে একদল লোক মার্গোকে ধরে ফেলে এবং কর্নেলের সঙ্গে ঘোরবার জন্য ভেবে নিল সে বিশ্বাসঘাতিনী দেশদ্রোহী নারী, ফলে বারোয়ারী প্রহারে তাকে হত্যা করে ফেলল। পরে উলঙ্গ মৃতদেহকে ল্যাম্পপোষ্টে পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল—সঙ্গে স্বস্তিকাচিহ্নিত একটি ন্যাকড়া কোমরে বেঁধে দিল। তারপর উন্মত্ত জনতা হাওয়া হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগল না।

কয়েক মিনিট বাদে যখন কানে এল এ ঘটনা সেদিলত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। একটা আকুল কান্না এসে গলায় আটকে গেল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, ফের আমারই জন্যে মেয়েটা প্রাণ হারালো, ছি! ছি!

একহপ্তা বাদে দুর্দমনীয় এই দেশপ্রেমিক যুবক কর্নেলকে হত্যা করবার আরেকটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলল। এটাতেও টোপ হিসেবে একটি সুন্দরী তরুণীর প্রয়োজন। সহকারীদের কাছে বলল, তোমরা বল আরেকটি মেয়ের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া কি আমার উচিত হবে? তারপর সবার মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে বললে, যদি নিইও তা হলে কে হবে সেই মেয়ে? সমস্ত ফরাসী মেয়েরা জানে মিমি আর মার্গোর দশা কি হয়েছিল!

আইন-ব্যবসায়ী যুবকটি বললে, আমি একটি মেয়েকে জানি যে আমাদের চেয়েও তীব্রভাবে ঘৃণা করে নাৎসীদের, মেয়েটির ভাই ও স্বামীকে ঐ জানোয়ারটা হত্যা করবার আদেশ দিয়েছে। কারণ? চৌদ্দ বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণোদ্যোগী মত্ত নাৎসীসৈন্য ক'জনকে তারা প্রহার করেছিল। এই অপরাধে তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়।

পরদিন মেয়েটি এল। নাম ইওভনে মিটজিঙ্গার। পরিহাস ছলে বললে আমার আর কি ক্ষতি করবে ওরা। যা করবার তা করেছে, আমার প্রিয় স্বামী, ভাই দু'জনাকে খুন করেছে ওরা।

দু'দিন বাদে পরিকল্পনা মাফিক ইওভনে প্রলোভিত করে নিয়ে এল কর্নেলকে তার ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটটি সেদিলতই ওর নামে ভাড়া নিয়েছিল। কিন্তু সেখানে যাবার আগে ছয় জন নাৎসীসৈন্য তন্ন তন্ন করে ফ্ল্যাটটি তল্লাস করে।

কর্নেল ভন মেলজার নিয়মিত রাত্রিবাস করতে লাগলো মেয়েটির সঙ্গে তার ফ্ল্যাটে। নবম রাত্রিতে সেদিলত তার চারজন সহকারী নিয়ে, এস-এস গার্ডদের পোষাক পরে একটি পেট্রলকার চালিয়ে এসে উপস্থিত হল ইওভনের বাড়ির দরজায় (গতরাত্রে চারজন জার্মান সৈন্যকে হত্যা করে তাদের পোষাক ও গাড়িটি নিয়ে নেয়)।

বাড়ির দরজার জার্মান প্রহরীকে সেদিলত চোস্ত জার্মান ভাষায় বললে, একজন পলাতক আসামীর খোঁজে এসেছি আমরা। কর্নেলের আদেশে দাঁড়ানো এই প্রহরীটি কিঞ্চিৎ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি।

—এ বাড়িতে কোন পলাতক আসামী নেই, প্রহরী বলে ওঠে।

—তুমি এতটা নিশ্চিত হলে কি করে?

—ঘণ্টাখানেক আগে আমরা বাড়িটা তল্লাসী করেছি।

—তা হলে অবশ্য আমাদের আর তল্লাসীর প্রয়োজন নেই, সেদিলত বললে, অবশ্য এমনও তো হতে পারে, সে লোকটা দোতলায় লুকিয়ে আছে!

—অসম্ভব! প্রহরী বললে, দোতলায় আরও দুজন প্রহরী রয়েছে।

—এত প্রহরী! সেদিলত কপটবিস্ময়ে জিগ্যেস করলে, কি ব্যাপার হয়েছে এ বাড়িতে?

—কর্নেল ভন মেলজারের বর্তমান মেয়েবন্ধু এখানে থাকে। এবার যা জোগাড় করেছে কর্নেল, বলতে নেই, বহুৎ আচ্ছা চীজ। উঃ কি লাভলি ফিগার···

কথা শেষ হল না তার। সেদিলত তার বুকে একটি ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করে দিল। তারপর সদলবলে দোতলায় উঠে এল। দোতলায় দু'জন প্রহরী আছে এটা জানা গেছে।

সিঁড়ি থেকে উঁকি মেরে দেখে সবাই একযোগে সহসা উঠে এল বারান্দায়। একটি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন প্রহরী। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো,—কি ব্যাপার! তোমরা ওপরে কেন? নীচের ঐ গাড়োলটা বলে নি কিছু? যাও, গেট আউট!

সেদিলতের রিভলবার গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী দু'জন মেঝেতে পড়ে গেল।

অবশেষে সহকারী একজন এক লাথি মেরে দরজা খুললে সবাই ঢুকে পড়ল ঘরে। সুইচ টিপে আলো জ্বালালো একজন।

কর্নেলের অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থা ও পরিবেশ। আরক্তিম মুখে, বিস্ময় বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকালো ওদের দিকে।

সেদিলত বলে উঠল, হে ফরাসী ভদ্রলোক, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

—আমি ফরাসী নই···কি···কি ব্যাপার কি···কোন ইডিয়ট তোমাদের এখানে পাঠিয়েছে?

ইওভনের দিকে ফিরে সেদিলত বললে, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও, নয়ত তোমাকেও আমরা গ্রেপ্তার করব, বলে চোখ ইসারা করে মৃদু হাসল সে। মেয়েটি নতমস্তকে বেরিয়ে গেল।

তারপর সেদিলত কর্নেলকে হাতকড়া পরাবার আদেশ দিল সহকর্মীদের। পিঠমোড়া করে হাতকড়া লাগানোকালীন ক্রুদ্ধ গর্জন করতে লাগল কর্নেল। কেবলই বলতে লাগলো এই অনধিকার প্রবেশের জন্য, এই ভুলের জন্য তাদের পরে অকল্পনীয় পরিতাপ করতে হবে।

কর্নেলের মুখে একটা কাপড় গুঁজে দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে এল ঘরের বাইরে! রাস্তায় এসে পেছনের সিটে বসিয়ে দিল। তারপর ছুরিকাহত একতলার প্রহরীর দেহটা টেনে এনে গাড়িতে তুললো। গাড়ি ছেড়ে দিল।

দু'মিনিটের মধ্যেই রাস্তায় দেখা গেল একদল সুরামত্ত নাৎসী সৈন্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতে করতে পথ চলছে। গাড়ি থামাল সেদিলত। ঐ সৈন্যদের দিকে চেয়ে বললে, বন্ধুগণ দেখে যাও এই ফরাসী লোকটা আমাদের এক সাঙাৎকে হত্যা করেছে। বলে কর্নেল ও প্রহরীর মৃতদেহটা নির্দেশ করল।

—বন্ধুগণ এস এ লোকটাকে ফাঁসি লটকে ঝুলিয়ে দিই। আমাদের কর্নেল ভাববে এ লোকটাকে দেশদ্রোহী ভেবে ফরাসীরাই লটকে দিয়েছে।

মত্ত সৈন্তরা চিৎকার করে উঠল—বহুৎ আচ্ছা। চালাও এক্ষুণি খুনী ফরাসীটাকে ঝুলিয়ে দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্নেল ভন মেলজারের মৃতদেহ একটা ল্যাম্প-পোস্টে গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে লাগল। সেদিলত ও তার সহকর্মীরা ইত্যবসরে গাড়ি চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরমুহূর্তে ঝুলন্ত দেহের কাছে এসে একটি প্রকৃত গাড়ি থামল ও সুরামত্ত সৈন্তদের গ্রেপ্তার করল।

দু'দিনবাদে কর্নেলকে যে ঝুলিয়ে দিয়েছিল তার মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল।

সেদিলত-এর কাফেতে এসে সেই লেফটেনাণ্ট বলছিল একদিন, সৈন্তগুলি এক আজগুবী মিথ্যা কথা বলছিল। কর্নেল ও মৃত এক সৈন্তসহ নাকি আমাদের এক পেট্রলকার ওদের কাছে গিয়েছিল। অবশ্য কেউই ওদের কথা বিশ্বাস করে নি।

লেফটেনাণ্টকে কফি দিতে দিতে হেসে সেদিলত বললে, ওরকম আজগুবী কথা কেউ বিশ্বাস করে! যতসব গাঁজাখুরি কাহিনী, হুঁ।

হেরিডিটি বা বংশানুক্রমিকতা

অভিজ্ঞ চিকিৎসক 'অগাস্ট উইসমান' একদা ঘোষণা করেন যে, কোন মানুষ জীবিত থাকাকালে যদি কোন পীড়া বা কু-অভ্যাসের শিকার হয়, তা'হলে তার প্রভাব বংশানুক্রমিক হওয়ার আশঙ্কা নেই বলাটাই সঙ্গত। ১৮৯২ সালের জনমানসে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের ঐ ধরণের মন্তব্যে একটা বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়াই দেখা দিয়েছিল সেদিন; 'বংশগত' কথাটার গুরুত্বই যেন উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। সচারাচর হেরিডিটি বা বংশানুক্রমিকতা বা উত্তরাধিকারকে সবদেশে এবং সবকালেই মানুষ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে, যার জন্য পাগল বা কোন দুরারোগ্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পুত্রকন্যারাও সমাজের চোখে একরকম পারিয়া বা অস্পৃশ্য বলেই গণ্য হয়, খুব বিবেচক ও হৃদয়বান মানুষও এ ধরণের ছেলেমেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলেমেয়ের বিবাহ দিতে চান না সহজে, এটা ধরেই নেওয়া হয় যে আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ ও সহজ মনে হলেও ঐ ধরণের ছেলেমেয়েরা অলক্ষ্যে বংশগত রোগ বহন করেই এবং যদি বা কদাচ তা না-হয় তা হলেও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা যে করবেই তাতে সন্দেহমাত্র নেই; অর্থাৎ কাঠে ঘুণ ধরলে একদিন না একদিন যেমন সমস্ত কাঠটা বরবাদ হয়ে যেতে বাধ্য, ঘুণধরা বা কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বংশও তাই। কিন্তু 'ডাঃ অগাস্ট উইসমান' প্রথম প্রতিবাদ করলেন এ-ধরণের মতবাদের, বলিষ্ঠকণ্ঠে জানালেন যে, এ ভুল, এ অন্যায়, কোন ব্যাধি বা অনিষ্টকর অভ্যাস কখনও কখনও যে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পেয়ে থাকি, তা মেনে নিলেও একথা কখনই সত্য নয় যে, সে-রকমটাই ঘটা অনিবার্য। নর-নারীর এমন অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অনেক সময়ই তাদের সন্তান-সন্ততিতে অর্শায়, আবার অনেক ক্ষেত্রে উত্তরপুরুষের মাঝে তার পূর্বপুরুষের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না; এজন্যই খুব সাধারণদর্শন দম্পতির কোলেও মাঝে মাঝে দেখা দেয় অপূর্বদর্শন শিশু, আবার অত্যন্ত সুদর্শন দম্পতির পুত্র-কন্যারাও মাঝে মাঝে হয় শুধু সাধারণ রকমেরই নয়—অসাধারণ রকমের কুৎসিত। এর মধ্যে আবার মতভেদও দেখা যায়, কোন কোন পণ্ডিতের মতে ল-অফ-হেরিডিটি বা উত্তরাধিকার, খানিকটা স্বাভাবিক ব্যাপার হলেও যে ক্ষেত্রে পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যগুলি অভ্যাসগত সে ক্ষেত্রে তা বংশানুক্রমিক হওয়ার কোন আশা বা আশঙ্কা নেই; অর্থাৎ জীবদ্দশায় পিতা বা মাতার কোন একজন যদি মদ্যপানের অভ্যাস করে বা কোন দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিতে ভোগে তা'হলেই তাদের পুত্র-কন্যার জীবনেও যে উত্তরকালে তার প্রভাব পড়বে এমন কোন কথা নেই। উত্তরাধিকারকে একেবারে অস্বীকার না করেও অনেকে এই মত প্রকাশ করেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফেরে মানুষ যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, তার প্রভাব কখনই বংশানুক্রমিক হয় না। যেমন, কোন ব্যক্তির জনক-জননীর মধ্যে একজন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও অপরজন কৃষ্ণবর্ণের অধিকারী হলে সন্তানের বর্ণ বাদামী বা শ্যামল হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু কোন ব্যক্তির বর্ণ সূর্যালোকের অবারিত দাক্ষিণ্যের প্রভাবে মলিন হয়ে এলে তার প্রভাব মোটেই বংশানুক্রমিক নয়। যে কোন ব্যাধি সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে, কোন শিশু যদি বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়, তা হলে যেমন বলা চলে না যে, তার পিতা-মাতার মধ্যে কারুর অঙ্গহীনতার দোষ আছে—তেমনই পাগল বা মৃগী রোগগ্রস্ত বা যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত পিতা বা মাতার সন্তানের মধ্যেও যে উত্তরকালে ঐ রোগগুলি আত্মপ্রকাশ করবেই, এ কথারও কোন ভিত্তি নেই। অগাস্ট উইসম্যানের চাঞ্চল্যকর ঘোষণার প্রায় দশ বছর আগে আর এক সুখ্যাত বিজ্ঞানী 'রবার্ট কক্' এ বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন; বার্লিন শহরে চিকিৎসা ও মনো-বিজ্ঞানের এক মহতী সভায় তিনি ভাষণদান প্রসঙ্গে বলেন যে, 'টিউবারকুলোসিস্' বা যক্ষ্মারোগ বিশেষ এক ধরণের জীবাণুর আক্রমণে মানবদেহে সংক্রামিত হয়ে থাকে, উত্তরাধিকার বা বংশানুক্রমিকতার এ ক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই নেই। অবশ্য এ রোগ যে সংক্রামক সে ক্ষেত্রে কোন দ্বিমত নেই। ক্যান্সার রোগের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সকলেই অবহিত, প্রকৃতপক্ষে এর চেয়ে ভীষণ শত্রু মানুষের বোধ হয় আর কিছু নেই, কিন্তু বংশানুক্রমিক হওয়া তো দূরের কথা—ক্যান্সার রোগ যে সংক্রামকও নয়, এ কথা আজ এক প্রতিষ্ঠিত সত্য, তবু নিজেদের অজ্ঞতাবশতই অনেক সময় আমরা নিকট আত্মীয়ের মধ্যে এরূপ দেখা দিলে সংক্রমণের আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে পড়ি। পাগলামী বা উন্মত্ততা বহুদিনাবধিই বংশানুক্রমিক ব্যাধি হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে, কিন্তু এ ধারণাও ভুল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবেই এ ব্যাধির আবির্ভাব ঘটে এবং সে সব ক্ষেত্রে অন্তত এ ব্যাধিকে বংশানুক্রমিকতার অভিযোগে চিহ্নিত করা সঙ্গত নয়। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপরই নির্ভর করে, আজ মানুষকে আশ্বাস ও আশা দেয় যে হেরিডিটি বা বংশানুক্রমিকতা একটা কথার কথা মাত্র, কোন রোগ বা বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় মানুষের জীবনকে অভিশপ্ত করতে সক্ষম নয়।

একাগ্রতা

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একাগ্রতা বলতে আমরা সাধারণত কোন একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া বুঝি, কিন্তু মনো-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কথাটির একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। একাগ্রতা কিভাবে সম্ভব তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণার শেষ নেই। তাঁরা মনে করেন একাগ্রতা সম্পূর্ণ অভ্যাস-নির্ভর নয়—তার পেছনে কিছুটা সহজাত অনুপ্রেরণা আছে।

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন কোন অধীত বিষয়ের প্রতি মন যখন একান্তভাবে প্রক্ষিপ্ত হয় তখনই তাকে মনের একাগ্রতা বলা যায়। একাগ্রতা সামান্যমাত্র পরিশ্রমের ফল নয়। এমন অনেকে আছেন যাঁরা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মনকে একাগ্র করতে পারেন না—বিপরীতে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা সহজে একটি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারেন। তাই এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, একাগ্রতা যেমনই নয় পুরোপুরি অভ্যাসনির্ভর, তেমনই নয় সম্পূর্ণ সহজাত।

একাগ্রতার মূল কথা মনোযোজন বা concentration (১) (অর্থাৎ সমস্ত চিন্তাশক্তি একটিমাত্র বিষয়ে নিয়োজিত করা)। কোন বিজ্ঞান-বিষয়ক চিন্তা নিয়ে আমি যখন মগ্ন থাকি তখন অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আমার মন থাকে উদাসীন অর্থাৎ ঠিক সেই মুহূর্তে আমি স্নানাহারের কথা ভুলে যাই। তাই একাগ্রতাকে বলা হয়—

'The state of consciousness, that degree of being consciousness, which guarantees the best results of mental labour.'

কোন বিষয়ের প্রতি মনের একাগ্রতা স্থাপনের জন্যে দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়।

ক॥ কেন্দ্রীকরণ

খ॥ অপসারণ

মনের একাগ্রতা উপরের দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। মনের কেন্দ্রীকরণ বলতে বোঝায় বাহিক জগতের নানা ঘটনার ভিড় থেকে মনকে সরিয়ে এনে একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর মনকে কেন্দ্রীভূত করা। এই কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াই মনোযোজন বা প্রথম স্তর। যতক্ষণ না কোন বিষয়ের প্রতি মনের কেন্দ্রীকরণ সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা আনয়ন অসম্ভব। দ্বিতীয় স্তরে আমরা নির্বাচিত বিষয়টির চেতনার কেন্দ্রে মনকে স্থাপন করি। একাগ্রতার তৃতীয় স্তর অপসারণ বা displacement। অপসারণ বলতে বোঝায় মনের বিভিন্ন ঘটনাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। বহির্জগতের নানা প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় ঘটনা মনের কোণে স্থান পাতে। সেই ঘটনাগুলো দূরে সরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একাগ্রতা সম্ভব হয়।(২) ঘটনাগুলো দূরে সরিয়ে দেওয়া বললে একেবারে নিশ্চিহ্ন হওয়া বোঝায় না। কেন না কোন ঘটনাই সহজে অচেতন মনের গহন কোণে হারিয়ে যায় না—তা অর্ধচেতন (sub-conscious) মনে অবস্থান করে। তারপর আবার যখন প্রয়োজন হয় পুনরায় তখন সেগুলিকে চেতন-মনের কেন্দ্রে স্থাপন করা যায়। সুতরাং অপসারণ প্রক্রিয়ার ফলে কোন কিছু ভুলে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্। কোন একটি ছাত্র পড়ার টেবিলে রসায়ন শাস্ত্রের বই নিয়ে বসেছে—কিন্তু পড়ায় কিছুতেই মন বসছে না। কেবলই মনে পড়ে যাচ্ছে সদ্য দেখা ফুটবল খেলাটির কথা। এখন ছেলেটি পড়তে চাইলেও পারবে না, যতক্ষণ না সে খেলার কথা মন থেকে সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এই খেলা দেখার চিন্তাকে মন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার নাম অপসারণ বা withdrawal এবং পাঠ্যবিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার নাম কেন্দ্রীকরণ। মনের কেন্দ্রীকরণ যে মুহূর্তে সমান হয় তখন সচেতন মন কেবলমাত্র একটি বিষয়ের প্রতিই নিবিষ্ট থাকে এবং তখন কোন কিছুই মনকে সহজে একাগ্রতা থেকে সরাতে পারে না।

১। প্রত্যক্ষ একাগ্রতা (voluntary attention) প্রধানত ছ'রকমের—(ক) উত্তেজনার পুনরাবৃত্তি (repetition of stimuli); (খ) নূতনত্ব (novelty); (গ) চরম উত্তেজনা প্রয়োগ (intensive stimuli); (ঘ) গুণ (quality) (ঙ) গতির পরিবর্তন (movements); (চ) মনের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে বাইরের জগতের মিল (congruity)।

২। ..'Attention appears in the human mind at three stages of development : as primary attention ; determinded by various influences that are able to produce a powerful effect upon the nervous system ; as secondary attention, during which the centre consciousness is held by a certain perception on idea, but is held in face of opposition ; and lastly as derived primary attention which this perception on idea has gained an undisputed asendency over its rivals—'

কোন বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা স্থাপন কয়েকটি হেতু বা condition-এর ওপর নির্ভর করে। মনোবিজ্ঞানে এই হেতুগুলিকে মানসিক, শারীরিক এবং জাগতিক এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথমত যে বিষয়ের ওপর আমাদের যত বেশি অনুরাগ বা interest সেই বিষয়ের ওপর আমাদের একাগ্রতা তত বেশি নির্ভরশীল। যে পড়াশুনায় বেশি অনুরাগী—যে এক মনে লেখাপড়া করতে পারে, আবার যার খেলাধুলার প্রতি বেশি অনুরাগ সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলা নিয়ে আলোচনা করতে পারে।(৩)

দ্বিতীয়ত, একাগ্রতার আর একধরণের হেতু আছে যা একান্তই শরীর-নির্ভর (শারীরিক)। দেহ যদি সুস্থ হয় তা হলে সহজেই আসক্ত-বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া যায়। যেমন সকালে উঠে পড়লে তা বেশ ভালো মনে থাকে, কেন না রাত্রের একটানা বিশ্রামের পর মস্তিষ্ক সতেজ থাকে। অফিসে প্রথম দিকে যেমন মন দিয়ে কাজ করা যায়—দিনের শেষে আর তেমন একাগ্রতা থাকে না ক্লান্ত শরীরের জন্যে।

তৃতীয়ত একাগ্রতার আর একটি প্রধান হেতু হল, চিরাচরিত ঘটনার মধ্যে নূতনত্বের আমেজ। জাগতিক-ক্ষেত্রে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে নূতনত্ব নেই—কিন্তু হঠাৎ যদি কোন নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটে, তখন তার প্রতি দৃষ্টি তথা মন আকৃষ্ট হয়।

মনোবিদ্যায় একাগ্রতার নানা বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে :—
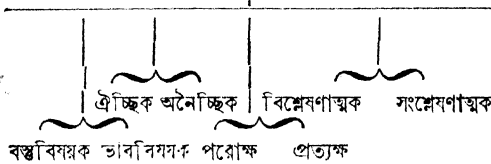
বস্তুবিষয়ক একাগ্রতার উপাদান আসে বহির্জগৎ থেকে—বিপরীতে ভাববিষয়ক একাগ্রতার উপাদান আসে অন্তর্জগৎ থেকে। যেমন বাইরে কেউ হঠাৎ কেঁদে উঠলে সেদিকে যখন আমরা একাগ্র হই তখন তা বস্তুবিষয়ক একাগ্রতা। কিন্তু অতীত দিনের চিন্তা ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন ভাববিষয়ক একাগ্রতার দৃষ্টান্ত।

কোন কিছুতে সাফল্যলাভের জন্য যদি চেষ্টা করা হয় মনেপ্রাণে তখন তা ঐচ্ছিক (Active) একাগ্রতার দৃষ্টান্ত—কিন্তু পড়ায় ইচ্ছা নেই, অথচ পরীক্ষার জন্য পড়তেই হবে—এটি অনৈচ্ছিক (Passive) একাগ্রতা।

চিত্তাকর্ষক বিষয় প্রত্যক্ষ একাগ্রতার অন্তর্ভুক্ত। মনোরম উপন্যাস পড়তে যত ভালো লাগে, তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের বই পড়তে সকলের মধ্যে তত বেশি অনুরাগ দেখা যায় না। পরোক্ষ একাগ্রতা বিষয়ের ওপর যত বেশি না-নির্ভরশীল, তার চেয়ে অনেক বেশি তার মাধ্যমের ওপর। ক্রিকেট ব্যাট দেখার প্রতি অনুরাগ নেই—কিন্তু ব্রাডম্যান ব্যবহার করেছেন এমন ব্যাট দেখার জন্যে আগ্রহের সীমা থাকে না।

বিশ্লেষণাত্মক একাগ্রতার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে একাগ্রচিত্তে বিশ্লেষ করা বোঝায়। যেমন একটি ব্যাটেলিয়ানের প্রত্যেক সৈনিককে পৃথক পৃথক করে দেখা। বই ছাপাবার সময় প্রুফ দেখাও এই জাতীয় একাগ্রতার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। প্রুফ দেখবার সময় প্রত্যেকটি বানানকে, প্রত্যেকটি অক্ষরকে একমনে মিলিয়ে দেখতে হয়। সংশ্লেষণাত্মক একাগ্রতার বৈশিষ্ট্য হল অংশসমূহের সমষ্টি ও সম্পূর্ণতা। ভালোভাবে পড়তে শিখে গেলে তখন আর বানান করে পড়বার প্রয়োজন হয় না।

একাগ্রতার এই বিভিন্ন রূপই শরীরের ওপর নির্ভরশীল। কোন বিষয়ের প্রতি একাগ্র হতে হলে বিষয়টির ওপর লক্ষ্য স্থির রাখতে হয়, চোখ খোলা রাখতে হয়, কোন কিছু শোনবার জন্যে কান খাড়া করে রাখতে হয়, নিশ্বাসের সাহায্যে গন্ধ উপভোগ করতে হয়। এগুলি সমস্তই শারীরিক ক্রিয়া। একাগ্রতার শারীরিক লক্ষণ-গুলোকে পারিভাষিক সংজ্ঞায় একাগ্রতার শারীরিক সহভাবী (concomitant) বলে।

একাগ্রতার জন্য সব সময়েই পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। মনোবিজ্ঞানে এই পূর্বপ্রস্তুতি Spare of Attention নামে পরিচিত। এই প্রস্তুতি শারীরিক ও মানসিক উভয় রকমেরই হয়। দৈহিক পরিবর্তন এই জাতীয় প্রস্তুতির প্রধান লক্ষণ। যেমন কোন একটি অভিনয় দেখবার জন্য দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে সজাগ হতে হয় এবং সেগুলি একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গান শোনার ব্যাপারটি দেখা যাক। সুরের তরঙ্গ গিয়ে প্রথমে কর্ণপটহে আঘাত করছে এবং তা ক্রমশ মস্তিষ্কের শ্রবণ বেখায় গিয়ে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। তখন মনের একাগ্রতা প্রখর হয়ে গান শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠছে। আবার ছায়াছবি দেখার সময় চোখ এবং কান—উভয়ই একাগ্রতার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মনকে কোন বিষয়ের প্রতি কেন্দ্রীভূত করার সময় দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। যেমন কোন একটি অজানিত বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য—ধরা যাক বাঘ শিকারের জন্য অরণ্যে গিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে হয়। তখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার ফলে চো[খ] পলকহীন এবং বিস্ফারিত হয়েছে, মুখে রক্তের আভা দে[খা]

৩। '—Interest is latent attention'—Mcdongall

দিয়েছে—দাঁতে দাঁত চেপে বসেছে। এ সবই হর্মোন বা উত্তেজক রসের কাজ।

মনের একাগ্রতা শক্তি কিভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে গবেষণার শেষ নেই।—অনেকে মনে করেন একাগ্রতার শক্তি কিছুটা সহজাত, ফলে অনেকের পক্ষেই কোন একটি বিষয়ের প্রতি মনকে স্থির করা সম্ভব হয় না। সব সময়েই তাঁদের মন ভ্রাম্যমাণ—ফলে কি শিক্ষার ক্ষেত্রে, কি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে—সব ক্ষেত্রেই অসুবিধেয় পড়তে হয়। আবার অনেকের একাগ্রতার ক্ষমতা স্বভাবানুসারী, সেজন্য তাঁরা যে বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা স্থাপন করেন, তা অল্পক্ষণেই তাঁদের মনে গেঁথে যায়।

নব্য আফ্রিকার একটি কবিতা

আফ্রিকা : ডেভিড দিওপ

[কবিতার মূল ভাষা ফরাসি। কবির দেশ 'সেনেগাল'। কবির জন্ম ১৯২৭ সালে। ইনি একটি বিমান দুর্ঘটনায় ১৯৬০ সালে নিহত হন।]

আফ্রিকা আমার আফ্রিকা
গর্বিত সিপাইদের আফ্রিকা সাতপুরুষের ভিটের
যে আফ্রিকার গান আমার ঠাকুমা গাইতেন
দূরের নদীটির তীরে
কখনো তোমাকে জানলাম না
কিন্তু আমার শিরায় বইছে তোমার রক্ত
তোমার অনুপম কালো রক্তেই তো সিঞ্চিত হচ্ছে ভূমি
রক্ত তোমার স্বেদের
স্বেদ তোমার শ্রমের
শ্রম তোমার দাসত্বের
দাসত্ব তোমার সন্তানের
আফ্রিকাই বলেছে আমাকে আফ্রিকার কথা
কুঁজো পিঠ এই কি তুমি
যে পিঠ ভেঙে পড়ছে অপমানের পাহাড়ে
যে পিঠ রক্তক্ষত নিয়ে থরথর করে কাঁপছে
থর মধ্যাহ্নে চাবুককে নিচ্ছে মেনে
কিন্তু একটি গভীর কণ্ঠ জবাব দিলে আমায়
প্রবল মানবক বৃক্ষ ওই দৃঢ় শ্যামল
বৃক্ষ ওইখানে
বিস্মিত একাকিত্বে সাদা এবং ফ্যাকাসে ফুলের মণ্ডলে
ওই তো আফ্রিকা তোমার আফ্রিকা
বাড়ছে ধৈর্যে একরোখা।

অনুবাদক—পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

● ● ●

এ হৃদয় গাঁথা ছিল

রুপার্ট ব্রুক

এ হৃদয় গাঁথা ছিল সুখে-দুখে, মর্ত্য-মানবীয়,
অপরূপ ব্যথা-ধৌত, রসসিক্ত, ঊর্মিক কণায়—
পেয়েছে-সে সময়ের-অঙ্গ হ'তে সকাল-সন্ধ্যায়
পৃথ্বীর বর্ণালী বিভা, অনুকম্পা অনির্বচনীয়!—
উপলব্ধ গতি-রাগ, জাগরণ, সঙ্গীত, তন্দ্রিমা,
প্রেমের প্রতীতি আর বন্ধুত্বের নিবিড় গৌরব—
আজ সব অনুদ্দাম—নির্জন-আসঙ্গ, পুষ্পোৎসব—
পশমের স্পর্শ-সুখ, সুকোমল কপোল-লালিমা!—

হেথা জল তরঙ্গিত হাস্যভঙ্গে দোদুল বাতাসে
বুকে নিয়ে' জ্যোতির্মালা অহর্নিশ!—মায়া-কুজ্ঝটিকা
অতঃপর প্রসারিত, রুদ্ধ করি' উচ্ছল নাচন
ভ্রাম্যমাণ রূপের-ভঙ্গিমা, রাখে সেথা কি-আশ্বাসে
নিরংস মহিমা এক, ঘনীভূত দ্যুতি-বিচ্ছুরিকা,
মহাব্যাপ্তি, মহাশান্তি বিছায়ময়ী—রাত্রির-গুণ্ঠন!—

অনুবাদক—শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ।

● ● ●

বিবাহিতা স্ত্রী

নর-নারীর মিলনকে যেদিন থেকে সমাজের স্বীকৃতি দেওয়ার আইন প্রচলিত হয়েছে, অর্থাৎ বিবাহ-প্রথার আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিবাহিতা পত্নীর সামাজিক অবস্থা বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে।

আদিতে পুরুষের কাছে পত্নী একটা প্রয়োজনীন অস্থাবর সম্পত্তি রূপেই গণ্য হত, যাকে সে হরণ করে বা ক্রয় করে দখল করে নিয়েছে।

আদিযুগের স্বামীর চোখে পত্নী তাই একটা সম্পত্তি, একটা ক্রীতদাসী ও শয্যা-সঙ্গিনী ব্যতীত আর কিছু ছিল না; সম্ভবত সে কথা মনে রেখেই নারীর অধিকার সম্পর্কীয় আন্দোলনের এক মুখপাত্র একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, 'স্ত্রী-ই মানুষের আদিতম গৃহপালিত জীব।'

ক্রমে ক্রমে যখন নাগরিক সভ্যতার রস আস্বাদন করতে শিখল মানুষ, তখনই পুরুষের কাছে স্ত্রীর প্রয়োজন অনেকাংশে হ্রাস পেতে লাগল, উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, প্রাচীন এথেন্স নগরীতে ও আজকের দিনের যে কোন শহরের মত পয়সা খরচা করলেই রাত্রির আনন্দ ও পেটভরা ভোজ্যপেয় জুটে যাওয়ার পক্ষে কোন অসুবিধা ছিল না।

অতএব তখন থেকে বিবাহিতা স্ত্রীকে রাষ্ট্র ও পিতৃপুরুষের জন্য এক ব্যয়সাধ্য কর্তব্য পালন করার দায়িত্বস্বরূপই মেনে নেওয়া হল।

তখন অবধি স্ত্রীর রাষ্ট্রীয় অধিকার বলতে অবশ্য কিছুই ছিল না। প্রায় একটা শিশুর সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অধিকারেরই সমগোত্রীয় ছিল পূর্ণবয়স্কা যে কোন পত্নীর অধিকার, বিষয়-সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার ছিল না, ঋণ দেওয়ার বা গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল না এবং কারুর বিরুদ্ধে আইনের সাহায্য গ্রহণ করারও উপায় ছিল না কোন, প্রকৃতপক্ষে সে ছিল সর্বতোভাবেই স্বামীর অধীন সজীব অথচ নিষ্ক্রিয় এক জীব বিশেষ।

রোমে ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে একটা নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে বাঁধা পড়ল, শাসক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা থাকায় তারাই দেশের সমৃদ্ধির মোটা অংশীদার হয়ে দাঁড়ানোতে ক্রমে এমন হল যে, ধনী ব্যক্তিরা এমনভাবে কন্যার দাম্পত্যজীবন গড়ে দিত যাতে তারা বরাবর পিতার অধীনেই পরিচালিত হতে পারে এবং এর ফলে স্বামীর বদলে পিতা বা পিতৃবংশীয় পুরুষরাই পরিবারস্থ রমণীদের প্রভু হয়ে উঠল।

এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মেয়েরা স্বামীকে আর ততটা প্রাধান্য দিতে চাইল না এবং ক্রমে ক্রমে প্রাচীন রোমের বিলাসী ধনী-সম্প্রদায়ভুক্তারা স্বামীর প্রভুত্ব সরাসরি অস্বীকার করে চলতে সুরু করল। কিন্তু মাত্রা ছাড়ানোর জন্যই এ অবস্থাও স্থায়ী হতে পারল না, ক্রীশ্চান ধর্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের আবার শাসিত করার তোড়জোড় সুরু হয়ে গেল নবোদ্যমে, রমণী ঈশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করার মতই স্বামীর আনুগত্য মেনে নাও।'

বিধান দিলেন তখনকার ক্রীশ্চান ধর্মের অন্যতম প্রধান হোতা 'সেণ্ট পল'।—ক্রীশ্চান ধর্মের আদিযুগে পত্নীর নিজস্ব বলতে আর কিছুই রইল না বটে কিন্তু তাও পুরুষকে কাঙ্ক্ষিত সুখস্বস্তি কিছুই এনে দিতে পারল না। মেয়েদের শয়তানের দ্বারপাল বলে অভিহিত করে ফতোয়া দিলেন তৎকালীন ধর্মীয় হর্তা-কর্তা-বিধাতারা এবং নিজের স্ত্রীকেও ইচ্ছামত সম্ভোগ করলে দেশে দশের চোখে ধিকৃত হল পুরুষ।

'যে অত্যধিক মাত্রায় স্ত্রীকে ভালবাসে, সে পুরুষ লম্পট ব্যতীত আর কিছুই নয়'—বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন সেণ্ট জেরোম —মধ্যযুগে এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিল 'শিভ্যালরী নামে এক নতুন কথা, এক নতুন ধারণা; জোর-জবরদস্তির বদলে নারীর প্রতি সম্মানে, শ্রদ্ধায় গদ্‌গদ্ হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা দিল পুরুষের মনে, একটি চুম্বনের আশায় মাসের পর মাসও অকাতরে পার করে দিতে কুণ্ঠিত ছিল না সেদিনের সেই শিভ্যালরাস পুরুষের দল, বিপন্না কুমারীকে রক্ষা করার জন্য মধ্যযুগীয় শিভ্যালরাস নাইটের সৃষ্টি হল রাতারাতি। রমণীর মুখের একটুকরো হাসিতেই সেদিন বহু বীরপুরুষের বক্ষরক্ত উত্তাল হয়ে উঠত, যুদ্ধক্ষেত্রে, মৃগয়ায় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন থেকে নানাবিধ ললিতকলায় পারদর্শিতা প্রমাণের জন্যও ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ির সীমা রইল না এবং এসবেরই মূলে রইল একটাই আকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষিতা প্রিয়তমার চিত্ত প্রসাদন; অবশ্য এখানে চুপি চুপি বলে নেওয়াই ভাল যে, প্রায়শ সেই কাম্যকামিনীটি হতেন নিজের স্ত্রী নয় পরস্ত্রীই।

বলা বাহুল্য মাত্র এ যুগের মত সে যুগেও পরনারী থ্রম্বসিস নামক রোগটির প্রতাপ বড় কম ছিল না। 'বিবাহিতা স্ত্রী তখন নেহাৎই অপরিত্যাজ্য এক সামগ্রী মাত্র, অপরের স্ত্রীই জাগাত অনুপ্রেরণা। সঞ্চারিত করত ভাবাবেগ পুরুষহৃদয়ে, মাতিয়ে তুলত তার কল্পনাকে, তাতিয়ে তুলত তার দেহের প্রতিটি তন্ত্রীকে।

রেনেসাঁর যুগে আবার একটা পরিবর্তনের আভাস দেখা দিল, বিবাহ-পূর্ব প্রেমের পদ্ধতি চালু হল অর্থাৎ বিবাহের জন্য প্রেম নয়, প্রেমের জন্যই বিবাহ এই ভাবধারা জন্মলাভ করল।

'ভালবাসার জনের হাত ধরেই যাব বিবাহবেদীতে নইলে নয়।' এই প্রতিজ্ঞা ধ্বনিত হল প্রায় প্রতিটি তরুণ হৃদয়ে।

প্রেমজ-বিবাহ প্রথায় প্রচলনও এই যুগ থেকেই। প্রাচীন ধারায় অভ্যস্ত সমাজ প্রথমে চমকে গেল, শাসনের প্রচেষ্টায় দৃঢ় হল, অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মেনে নিল নর-নারীর যৌথজীবনের এই নব পদ্ধতিকে।

কিন্তু এইবার পুরুষ কিছুটা অসুবিধায় পড়ে গেল, জোর করে বা ক্রয় করে যে নারীকে এতদিন সে নিজের সম্পত্তিরূপে পেয়ে এসেছে তার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনযাপন করাটা যত সহজসাধ্য হয়েছে—এই প্রেমজ-বিবাহের পত্নীর সঙ্গে চলাটা দেখা গেল তত সহজ নয়, মেয়ে-ধরে বশ মানানোটা যে এক্ষেত্রে অচলই এই মোটা কথাটা বুঝতে মোটাবুদ্ধি পুরুষেরও দেরি হল না, অথচ কি করলে যে এই আপাত-সুকুমার জীবটিকে পুরোপুরি আয়ত্তে পাওয়া যায় সেটাও ঠিক করে সমঝে উঠতে পারল না সে।

দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশেভরা অসংখ্য যে সব রচনাদি এ সময় প্রকাশিত হতে সুরু হয় তাতেই বোঝা যায় যে, এই সময় থেকেই 'বিবাহিতা স্ত্রী'কে নিয়ে প্রথম সমস্যায় পড়ে যায় পুরুষ এবং হালে পানি না পেয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বারস্থ হয় সে এযুগেই প্রথম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই তো অবস্থা চরমেই উঠে গেল, মেয়েরা তারস্বরে অভিযোগ করতে সুরু করলেন যে, যেহেতু তাঁরা কোমলা, অবলা ও স্বামীর অধীনা, সেহেতু অনেক অন্যায়-অত্যাচার

মুখবুজে সয়ে এসেছেন অদ্যাবধি কিন্তু আর তাঁরা তা সইতে প্রস্তুত নন ; অতএব উত্তাল হয়ে উঠল নারীপ্রগতির আন্দোলন, মেয়েরা শিক্ষার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ও রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবীতে তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি করে শেষে জয়যুক্তা হলেন ; প্রথম প্রথম একটু-আধটু তড়পালেও শেষপর্যন্ত পুরুষ সহজেই সবকিছু মেনে নিল। পুরুষের এই বশ্যতার আর যে কারণই থাক না কেন, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যুগ-যুগান্ত ধরে নারীর উপর কর্তৃত্ব করাটা বোধ হয় তাদের নিজের কাছেই ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল, আর সেজন্যই অবস্থাটার একটু পরিবর্তন হোক্ এসম্বন্ধে তাদের অবচেতন মনেই একটা তাগিদ দেখা দিয়েছিল। আজকের পুরুষ তাই আর স্বামী নয় সখা মাত্র। ভালবেসে নিজের সাথীকেই পাশে পেতে চায় যে, 'স্ত্রী'ও তাই আজ স্বামীর সম্পত্তিমাত্র নয়। প্রকৃতার্থেই জীবনসঙ্গিনী।

আজকের বিবাহিতা স্ত্রী কারুর দাসী নয়, সম্পত্তি নয়—স্বাধিকারের দীপ্তিতে উজ্জ্বল এক অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ মানুষ। —শ্রীমতী

বোবা রাতে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বোবা রাতের নরম নিকষ-কালো আঁধারে
শুনেছ কি কোনোদিন কান পেতে
অন্তরের অতল থেকে উৎসারিত
গভীর নিঃসীম শূন্যতার শব্দহীন আর্তনাদ ?
গৃহকপোতের পাখার ঝাপ্টায়
আর ঝরাপাতার মর্মরে কোনোদিন—কোনো বিনিদ্র ব্যাকুল মুহূর্তে
জেগে উঠে নি মগ্নচৈতন্যের কেন্দ্রস্থলে
দুর্বার বেদনার নৈর্ব্যক্তিক ধূসর হাহাকার ?
জান্তব জীবনের অর্থহীন অস্তিত্ব,
সৃষ্টির মর্মমূলের অন্তর্লীন কারুণ্য
অতন্দ্র রাতের ঝিল্লিমন্দ্রমুখর ক্লান্ত প্রহরে
তোমাকে ক'রে তোলে নি উৎক্ষিপ্ত বিবশ বিহ্বল—
কোনোদিন—কোনো স্তব্ধ, ধ্যানমৌন মুহূর্তে ?
স্খলিত স্ফটিকপাত্রের মতো তোমার কোমল সুষুপ্তি
আর সুরভিত, স্বর্ণাভ নৈশ স্বপ্ন ভেঙে হয় নি শতচূর্ণ ?
অন্তরের নিভৃত অন্তস্তলে জেগে উঠে নি
অনন্ত অভিনব উতরোল উন্মুখর সংশয়শঙ্কুল জীবন-জিজ্ঞাসা,
নক্ষত্রের অগ্নি-অক্ষরে মেলে নি যার কোনো উত্তর,—
যা' শুধু জমাট, নির্মম নৈঃশব্দ্যের বুকের উপর
অতৃপ্ত প্রেতাত্মার মতো নিষ্ফল হাহাকারে মাথা কুটে ম'রেছে ?
শান্ত জীবনের মূঢ় অসঙ্গতি কোনো নিদ্রাহীন দুঃসহ রাতে
তোমাকে করে তোলে নি অস্থির, উন্মাদ, উৎসুক, চঞ্চল ?
ঈশ্বরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—
তবু অন্ধ, উদাসীন, দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতির অসহায় ক্রীড়া-কন্দুক !
পশুত্ব আর দেবত্বের অদ্ভুত সমাবেশ,—
এই তো তুমি আর আমি !
মরণের বেলাবালুকায় ব'সে অবোধ শিশুর মতো
রাঙা বাঁশি বাজিয়ে চলা !
যৌবনের পুষ্পিত প্রলাপের পাশে জরার মোহমুদ্গর,—
এই তো ক্ষণক্ষীয়মান দুর্লভ জীবন !
এই দুঃসহ প্রহসন, এই দুর্বোধ্য প্রচণ্ড প্রহেলিকা,
এই নির্বোধ, অচিন্ত্য অসঙ্গতি
তোমার হৃদয়ের সুলভ শান্তিকে করে নি বিঘ্নিত, ব্যাহত—
কোনোদিন—কোনো নিঝুম, নিরুত্তর
বোবা রাতের উদাসীন অন্ধকারে ?

● ● ●

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা

জ্যোতির্ময়ী রায়

অন্তরের অন্তস্তল হ'তে শোনা যায় ডাক !
'আসে শোন, পঁচিশে বৈশাখ।
বাজা তোর শুভ্র নব শাঁখ।
নব বরষের এই শুভদিনে,
ধ'রেছিল অঙ্কে বসুমতী সে চিরনবীনে।
জনমের পুণ্যদিন তাঁর আসে ফিরে,
সহস্র সহস্র সৃষ্টি,—স্মৃতিমালা ঘিরে।
ভুলিবার নাই কোন ফাঁক।
বরে নে রে—পঁচিশে বৈশাখ।
বাজা, ওরে বাজা নব শাঁখ।'
আকাশের গ্রহরাজ—রবি,—
আলো করে দান,
জীয়ায় জগৎ, আর বাঁচায় পরাণ।
বিশ্বের বিস্ময়কর দীপ্তোজ্জ্বল 'রবি'—
জ্ঞানালোক জ্বালিয়াছে ঘরে ঘরে,
আনন্দের হাট বসায়েছে, লেখনীতে কবি।
যার যাহে শখ, সাধ, যাহা প্রয়োজন—
নিতে পারে দেখে শুনে বিবিধ রতন।
ভরা আছে তারে তারে,—সে মহা ভাণ্ডারে—
জীবন-শোভন।
'ঘুচাতে আঁধার আর ভরাতে ভুবন। -
তুইও ভরে রাখ,
সে মহামণির কণা মনের কোণেতে
তোরও তোলা থাক—জীবনের ধন।
মহিমান্বিত দিন ঐ এলো—পঁচিশে বৈশাখ।
বাজা ওরে, বাজা শুভ শাঁখ।'

জীবন মানেই সমস্যা

মানুষের জীবনে এমন কতকগুলি সমস্যা আছে যা প্রকৃতই কঠিন এবং দুরূহ। সহজ-সরল এমন কোনো ফর্মুলা নেই যার সাহায্যে এই সমস্ত সমস্যার প্রকৃত এবং স্থায়ী সমাধান হতে পারে। স্থায়ী বলতে একেবারে চিরস্থায়ী অবস্থা তো আমরা নিশ্চয়ই বুঝবো না—এমন কি হাজার বছরের কথাও নয়—এই পঞ্চাশ, ষাট কি বড়ো জোর একশ' বছরের মতো কোনো একটা সমস্যার সমাধান করতে পারলেই (বিশেষ করে সমস্যাটি যদি মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে হয়) আমরা মনে করতে পারি যে, সমস্যাটার স্থায়ী সমাধান হয়েছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে কোনো সামাজিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান বলতে আসলে আমরা যা বুঝে থাকি তা হলো এই যে, সমাজের কাঠামোতে বড়ো রকমের কোনো একটা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তার দ্বারাই আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়।

মানুষের সমস্যা সমাধানের অমোঘ উপায় হিসেবে পৃথিবীর নানা দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন থিয়োরীর উদ্ভব হয়েছে। যে-গুলিকে প্রায় সমস্ত সময়েই অমোঘ উপায় বলে প্রচার করা হয়েছে বা এখনো হয়ে থাকে—কিন্তু যা প্রকৃতই অমোঘ নয়। যেমন নর-নারীর সম্পর্ক। কখনো দেখা গেছে কোনো মহাপণ্ডিত বলছেন যে, নারীকে পুরুষের কাছ থেকে যতো দূরে রাখা যায় ততোই মঙ্গল—যেমন এককভাবে উভয়ের পক্ষে তেমনি সমগ্রভাবে সমাজের পক্ষে। আবার ঠিক তার পরের যুগেই দেখা গেছে নামডাক কিম্বা পণ্ডিতী ডিগ্রির ভারে প্রায় সমানভাবে আনত অন্য কোনও পণ্ডিত একেবারে সমান জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, নর-নারীর সম্পর্ক কোনো সমস্যার সৃষ্টিই করতে পারে না যদি তাদের একেবারে প্রথম থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ দেওয়া যায়। এরা যতই পরস্পরের কাছে থাকতে পারে ততই মঙ্গল। প্রথমোক্ত পণ্ডিতগণের সহভায় যেমন সন্দেহের কিছু থাকতে পারে না, এই শেষোক্তগণের মধ্যেও ঠিক তেমনি নয়। যে সমস্ত যুক্তি এবং তর্ক এঁরা নিজ নিজ থিয়োরীর সমর্থনে উত্থাপন করে গেছেন তা সবই যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি সবই আবার অসার নয়। আসল কথা হলো তাঁদের থিয়োরীর ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে নানা দোষত্রুটি ধরা পড়েছে।

নর-নারীর সম্পর্কের চূড়ান্ত যে অবস্থা অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কজনিত সমস্যা, এ ব্যাপারেও আমরা দেখেছি যুগে যুগে নানা বিচিত্র থিয়োরীর কথা বলা হয়েছে একেবারে অভ্রান্ত এবং অমোঘ সমাধান হিসেবে। কখনো আমরা শুনেছি যে খ্রীষ্টধর্ম ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর নানা জটিল সমস্যার নিশ্চিত সমাধান হতে পারে না। কখনো শুনেছি শুধু খ্রীষ্টধর্ম নয়, সেইসঙ্গে চাই স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপক প্রচার—তা হলেই যাবতীয় দাম্পত্য সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তব রূপায়ণের পাঁচ-দশ বছরের মধ্যেই স্থায়ী সমাধান হিসেবে এ দু'টো মতেরই অসারতা প্রতিপন্ন হয়ে গেছে। তারপর শোনা গেছে—শুধু ধর্ম বা শিক্ষা কি করতে পারে, আসল কথা হলো মানুষের সমা সামন্ততন্ত্ররূপ বিলিব্যবস্থা একটা অভিশাপ, সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটলে স্বামী-স্ত্রীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আমরা দেখেছি তারপরে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে একে একে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটতে লাগলো, তখন স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা সমাধানের সূত্রের সন্ধান চলতে লাগলো স্টীম ইঞ্জিনের মধ্যে; অর্থাৎ কি না ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে যাবার ফলে ক্রমশ যে শিল্পব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটলো তার মধ্যে। আজ এক শতাব্দীর ওপর হয়ে গেল আমরা শুনে আসছি যে, শিল্প-ব্যবস্থা এবং তার যে সংগঠন অর্থাৎ ধনতন্ত্র-এর অবসান ঘটিয়ে কমিউনিজমের প্রবর্তন করতে পারলেই সমস্ত সমস্যার মতো স্বামী-স্ত্রীর সমস্যারও অবসান ঘটবে।

ভাগ্যের কথা যে, গোটা পৃথিবীর সমস্ত দেশে একদিনে রাতারাতি রাষ্ট্রব্যবস্থা কমিউনিস্টদের হাতে চলে যায় নি—কারণ তা হলে আজকের দিনে আর কারো পক্ষেই ব্যক্তিগত মত প্রকাশের সুযোগ থাকতো না। কমিউনিস্ট এবং ফ্যাসিস্টদের মধ্যে একটা আশ্চর্য মিল দেখা যায়। উভয়েই সমস্যা-সমাধানের একটা অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছে। অন্তত বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে আমরা এই জিনিসটাই দেখে আসছি। কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্টরা কর্ণধার এ-রকম বেশিরভাগ রাষ্ট্রেই সমস্যা বলে বিশেষ কিছু নেই, সমস্যার কথা সেখানে কেউ-ই বড়ো একটা উচ্চারণ করে না, কারণ তা হলে তার বা তাদের (সংখ্যায় তারা যতোই হোক না কেন) গলাকাটা যাবার সমূহ সম্ভাবনা। এই উপায়ে সমস্যার সমাধান করতে পারলে যাঁরা খুশি হতে পারেন তাঁদের কথা আলাদা, তা ছাড়া আমরা অন্য সবাই কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট দেশগুলির ভেতরকার নানা সামাজিক সমস্যার কথা যা জানতে পেরেছি, তা থেকেই বুঝতে পারি যে পূর্ববর্তী উপায়গুলির মতোই কমিউনিজম মানুষের সমাজব্যবস্থার ক্রমবিকাশের একটা ধারা বিশেষ—যতোই না কেন তাকে বিকাশের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ বৈপ্লবিক আখ্যায় ভূষিত করা হোক।

একটা কথা বলা দরকার। তা' হলো এই যে, মানুষ তার কোনো সমস্যারই সমস্ত দিক একেবারে বুঝতে পারে না। তা সম্ভবও নয়; কারণ, নূতনতর অবস্থায় পুরনো সমস্যারই অনেক নূতন দিক ধরা পড়ে, আর নূতন সমস্যার সৃষ্টি তো হয়ই। কাজেই একথা বলা চলে যে খ্রীষ্টধর্ম, স্ত্রী-শিক্ষা, সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব বা তার অবসান, ধনতন্ত্র, কমিউনিজম বা ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি প্রত্যেকটি পরিবর্তনই মানুষের নানা সমস্যার (সমস্যার যে দিকগুলি সম্পর্কে আমরা পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলাম) কিছু না কিছু সুরাহা করেছে বটে, কিন্তু নতুন আরো বিস্তর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর থেকে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তা' হলো—সামাজিক সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী কোনো সমাধান সম্ভব নয়। অর্ধেক পৃথিবীর

মানুষ কমিউনিজমের আস্বাদ পায় নি এখনো—কিন্তু এরই মধ্যে কমিউনিজমের পরে কি হতে পারে বা হওয়া উচিত সে সম্পর্কে শুধু আলোচনা নয়—সমাজতত্ত্ববিদগণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হয়ে গেছে।

সমাজের এই যে একটা সদা-পরিবর্তনশীল অবস্থা—এই যে একটির পর একটি থিয়োরীর আংশিক ব্যর্থতা এবং সর্বদা একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা যায় সর্বত্র, এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো অনেকের পক্ষেই একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়ে, কারণ আমরা সকলেই ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি যে, এইবার আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে—অর্থাৎ অমুক জিনিসটা হলেই হ'ল আর কি, ব্যস্, তা' হলে আর ভাবতে হবে না। কিন্তু তা' সত্যি নয়। সমাজের সমস্যার পরিমাণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে এবং চলবে। আজকের দিনের মানুষকে তাই এই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনযাত্রাকে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে এবং আগামী দিনের মানুষকেও ঠিক সেইভাবেই তৈরি করতে হবে। আমাদের ঠাকুরদার আমলে জীবনযাত্রা যে রকম ছিলো—আজকের দিনে আমাদের জীবন সে তুলনায় অনেক জটিল, কাজেই আমাদের পরে যারা আসছে তাদের জীবন যে আরো অনেক—অনেক—অনেক বেশি জটিল হবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। —তথ্যান্বেষী

সংবাদপত্র ও জনচেতনা

খবরের কাগজ পড়বার অভ্যাসটি আমাদের জীবনের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যে, মনে হয় কখনো যদি একটানা সাত দিন পৃথিবীর সমস্ত খবরের কাগজ প্রকাশ বন্ধ যায় তা' হলে 'কি হলো পৃথিবীর'—এই কথাটা ভেবে ভেবেই লক্ষ লক্ষ মানুষ পাগল হয়ে যাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ম্যাক্স নোর্দো একখানা বই লিখেছিলেন 'ডিজেনারেশন'। সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং রুচি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব গভীর চিন্তার ছাপ রয়েছে এ বইতে। তাঁর সময়ে প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রচার ও প্রসার যে হারে বেড়ে চলছিলো তা দেখে নোর্দোর কিছুটা সিরিয়াস ধরণের ভাবুক মনটি বিচলিত হয়ে উঠেছিল। নোর্দোর আশঙ্কা ছিলো যে, খবরের কাগজ পড়বার দিকে সব দেশেই ঝোঁকটা এমন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে যে, অচিরেই সিরিয়াস বই পড়া একদম বন্ধ হয়ে যাবে এবং খবরের কাগজ-পড়া জ্ঞান নিয়েই মানুষ নিজেকে যথেষ্ট জ্ঞানী এবং ভাগ্যবান মনে করবে।

'ডিজেনারেশন' প্রকাশিত হবার পরে একাত্তর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর সমকে যে সমস্ত খবরের কাগজের প্রচার-সংখ্যা দুই, তিন কি চার লক্ষ ছিলো আজকের দিনে সেই সমস্ত কাগজই বিশ, ত্রিশ কি চল্লিশ লক্ষে পৌঁছেচে। তা' ছাড়া আরো শত শত খবরের কাগজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জন্মলাভ করেছে—যাদের অনেকেরই প্রচার-সংখ্যা বিশ-পঁচিশ হাজার থেকে আরম্ভ করে পনেরো-বিশ লক্ষে পৌঁছে গেছে। মানুষের রুচিগঠনে খবরের কাগজের যে প্রভাব নোর্দো দেখেছিলেন তা প্রধানত ইওরোপ এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। তারপর থেকে এই দু'টি অঞ্চল বাদ দিয়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই অনেক নতুন নতুন খবরের কাগজের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আমাদের ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। আমাদের দেশে বর্তমানে কিছু কমবেশি যে সাড়ে তিনশত দৈনিক খবরের কাগজ আছে, তার ভেতর পাঁচ-সাতখানা বাদ দিয়ে আর সবগুলিই সৃষ্টি হয়েছে বিগত একাত্তর বছরের মধ্যে এবং এই সময়ের মধ্যেই ভারতের মতো একটা বিরাট দেশে শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকগণ ঔপনিবেশিকতার অভিশাপ, শাসকজাতির অন্ধ অনুকরণ বর্জন করে একটি বিশুদ্ধ এবং শক্তিশালী জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় 'সিরিয়াস' বইয়ের প্রচারও কিছু কম হয় নি। কাজেই নোর্দোর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় নি বলেই মনে হয়।

অবশ্য এখানে একটি কথা বলা দরকার। সত্তর কি আশি বছর আগে যেমন, ঠিক তেমনি চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর আগেও, পশ্চিম-ইওরোপ বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের খবরের কাগজগুলির সামনে আমাদের দেশের মতো কোনো জাতীয়-মুক্তি অর্জনের সমস্যা ছিলো না, কাজেই চটকদার এবং মুখরোচক খবর পরিবেশন করাই তাদের প্রধান কাজ ছিলো। নোর্দো খবরের কাগজের দ্বারা মানুষের রুচি-বিকৃতি ঘটবার যে আশঙ্কা করেছিলেন তা মূলত খবরের কাগজের ঐ হাল্কা দিকটা দেখেই।

এ্যারিস্টটল মানুষকে 'রাজনৈতিক জীব' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন বাইশ শত বছর আগে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, তারও অন্তত বাইশ শত বছর আগে থেকে মানুষ কার্যত রাজনীতিচর্চা করে আসছে। কিন্তু তা ছিলো খুবই সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ দেশেই কয়েকটি পরিবার রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন থাকতো। ক্রমশ রাজনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়তে বাড়তে ফরাসী বিপ্লবের সময় দেখা গেছে দেশের বেশিরভাগ মানুষ প্রাণের দায়ে দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন। আর রুশ বিপ্লবের পর থেকে তো রাজনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ নেই এ রকম মানুষ খুঁজে বের করতে হবে। সবাই আজ তার দেশের তো বটেই গোটা পৃথিবীর রাজনীতি সম্বন্ধেই কমবেশি সচেতন—অর্থাৎ কি না তফাৎটা শুধু ডিগ্রির।

আজকের পৃথিবীতে সজাগ মানসিকতার জন্যে তাই খবরের কাগজের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। আর, বাস্তবিকপক্ষে যে কোনো দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে খবরের কাগজের প্রচার-সংখ্যা

দেখে সে দেশের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। এদিক দিয়ে ইওরোপ, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার দাবী অগ্রগণ্য। পশ্চিম-জার্মানী, ফ্রান্স, বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডাতে দেখা যায় প্রতি হাজারজন নাগরিক প্রায় *তিনশ'* পঞ্চাশখানা খবরের কাগজ প্রত্যহ কিনছেন। সে তুলনায় রাশিয়াতে হাজার প্রতি খবরের কাগজ কেনেন মাত্র দু'শো জনে। এশিয়া এবং আফ্রিকার মধ্যে জাপানই হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে খবরের কাগজের প্রচার পশ্চিম-জার্মানী, বৃটেন বা ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনীয়।

খবরের কাগজের প্রচার অবশ্য দু'টো জিনিসের ওপর নির্ভর করে। প্রথমত জনগণের শিক্ষা এবং দ্বিতীয়ত তাদের আর্থিক অবস্থা। জাপান যেমন খবরের কাগজের প্রচার বিষয়ে পৃথিবীর প্রথম সারির দেশগুলি অর্থাৎ পশ্চিম-জার্মানী, বৃটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ, শিক্ষার ব্যাপারেও ঠিক তেমনি। ঐ সমস্ত দেশের মতোই জাপানে অশিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা দু'জন। এদিক থেকে এই সমস্ত দেশগুলি রাশিয়ার চাইতেও বেশ কিছুটা এগিয়ে আছে; কারণ, রাশিয়ার অশিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা আটজন। সাড়ে নয় কোটি মানুষের দেশ জাপানে প্রত্যহ তিন কোটি ষাট লক্ষখানি খবরের কাগজ বিক্রি হয়, অথচ বাইশ কোটি মানুষের দেশ সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রত্যহ সাড়ে চার কোটি খবরের কাগজ বিক্রি হয়।

জাপানকে বাদ দিলে গোটা এশিয়া এবং আফ্রিকাতে আর একটি মাত্র দেশ পাওয়া যায় যেখানে শিক্ষার প্রসার পৃথিবীর প্রথম সারি দেশগুলির সমপর্যায়ে পৌঁচেছে। দেশটি খুবই ছোট, আয়তনেও, জনসংখ্যার দিক থেকেও। কিন্তু সব ব্যাপারেই এর উন্নতি বিস্ময়কর ১৯৫৬ সালের হিসেবে দেখা গেছে এদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬,৫০,০০০ শতকরা নিরক্ষরের সংখ্যা সাতজন। দেশটি হলো ইস্রায়েল। ইস্রায়েলে প্রত্যহ প্রায় ২,৬৮,০০০ খানা খবরের কাগজ বিক্রি হয়।

এখন পর্যন্ত দেখা যায় শিক্ষার প্রসার ইওরোপে—সবচাইতে কম হয়েছে পর্তুগালে। এদেশে এখনো শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন নাগরিক নিরক্ষর। কিন্তু পর্তুগালেও প্রতি হাজারে প্রত্যহ ষাটখানা কাগজ বিক্রি হয়। দুই আমেরিকার মধ্যে নিরক্ষরতা সবচাইতে বেশি দক্ষিণ আমেরিকার বোলিভিয়াতে। এ দেশে এখনো শতকরা পঁচাত্তর জন মানুষ নিরক্ষর। প্রত্যহ হাজারে কুড়ি জনে এ দেশে খবরের কাগজ কিনে থাকেন।

ইওরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা—পৃথিবীর এই চারটি মহাদেশে সংবাদপত্রের প্রচার সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা হলো। আসুন এবার আফ্রিকা এবং এশিয়ার অবস্থা দেখা যাক।

আফ্রিকার তিনটি দেশ—মিশর, আলজিরিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতে সংবাদপত্রের প্রচার মোটামুটি ভালো বলা যায়। কারণ, দক্ষিণ-আফ্রিকাতে শতকরা পঞ্চাশ জন নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও প্রতি হাজারে বাহান্ন জন নাগরিক প্রত্যহ খবরের কাগজ কিনে থাকেন। মিশরে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা পঁচাত্তর জন, খবরের কাগজের প্রচার হাজারে আটাশখানা। আলজিরিয়াতে নিরক্ষর শতকরা আশিজন, খবরের কাগজ কেনেন হাজারে পঁচিশজন। মরক্কো, লিবিয়া এবং টিউনিসিয়া দীর্ঘকাল ধরে ইওরোপিয়গণের সান্নিধ্যলাভ করা সত্ত্বেও যেমন ব্যাপক নিরক্ষরতা দূর করতে পারে নি, তেমনি খবরের কাগজের প্রচারও জনসাধারণের মধ্যে খুবই কম। কোথাও হাজারে একখানা কোথাও বা দু'খানা। আফ্রিকার নতুন দেশগুলি যারা বেশিরভাগই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে স্বাধীনতালাভ করেছে—তাদের মধ্যে বেশিরভাগ দেশেই জনগণকে শিক্ষিত করে তুলবার জন্তে ব্যাপক সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। আশা করা যায়, আগামী দশ কি পনেরো বছরের মধ্যে ঐ সমস্ত দেশের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে। তবে এখন পর্যন্ত এই সমস্ত দেশে গড়পড়তা প্রতি তিন হাজারে একখানা খবরের কাগজ বিক্রি হয় ধরে নেওয়া যায়।

এশিয়ার মানচিত্র খুললেই প্রথম যে দেশগুলির প্রতি চোখ যায় সে হলো আয়তনে বড়ো কয়েকটি দেশ। যথা: চীন, ভারত, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, পারস্য, পাকিস্তান এবং সৌদি আরব। চীনের জনসংখ্যা বাহাত্তর কোটি ছিল ১৯৬১ সালে। বর্তমানে নিশ্চয়ই আরো বেড়ে গেছে। '৬১ সালে দেখা গেছে এ দেশে প্রতি হাজারে চৌদ্দখানা খবরের কাগজ প্রত্যহ প্রচারিত হয়। সে তুলনায় ভারতের অবস্থা খারাপই বলতে হবে, কারণ ভারতে প্রতি হাজারে খবরের কাগজ প্রচারিত হয় মাত্র নয়খানা। পাকিস্তানে খবরের কাগজ চলে হাজারে মাত্র দু'খানা। নিরক্ষরের সংখ্যা চীনে শতকরা পঞ্চাশ জন, ভারতে প্রায় আশি জন আর পাকিস্তানে পঁচাশি জনেরও বেশি। বার্মায় নিরক্ষরের সংখ্যা চীনেরই মতো যদিও, কিন্তু খবরের কাগজের প্রচার-সংখ্যা সেখানে হাজারে মাত্র আটখানা—এর একটি প্রধান কারণ জনসাধারণের দারিদ্র্য। ইন্দোনেশিয়ায় সংবাদপত্রের প্রচার হাজারে মাত্র ছ'খানা এবং নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা প্রায় ষাট জন। পারস্যে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা প্রায় নব্বুই. খবরের কাগজ চলে প্রতি হাজার জনে মাত্র তিনখানা। এরপর বলতে হয় মুস্লিম জগতের শিরোশোভা সৌদি আরবের কথা। এখানে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা প্রায় আটানব্বুই এবং গড়ে প্রতি দেড় হাজার জন নাগরিক একখানা খবরের কাগজ কিনে থাকেন।

কিন্তু আর্থিক অক্ষমতা যে খবরের কাগজ কিনে পড়বার পক্ষে একটা খুব মারাত্মক প্রতিবন্ধক নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কোরিয়া এবং ফিলিপাইনের তুলনা করলে। সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা কোরিয়ার চাইতে ফিলিপাইনে অনেক ভালো; নিরক্ষরতায় হারও কোরিয়াতে যেখানে শতকরা ষাট, ফিলিপাইনে সেখানে শতকরা পঁয়ত্রিশ, কিন্তু তবু দেখা যায় ফিলিপাইনের চাইতে কোরিয়াতে প্রত্যহ খবরের কাগজ বিক্রি হয় অনেক বেশি। দু' কোটি দশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মানুষের দেশ ফিলিপাইনে মোট বাইশখানা খবরের কাগজের ৪,১৫,০০০ কপি প্রত্যহ বিক্রি হয়; অথচ কোরিয়াতে দেখা যায় দু' কোটি চৌদ্দ লক্ষ মানুষের মধ্যে পঁয়তাল্লিশখানা খবরের কাগজের দশ লক্ষ কপি প্রত্যহ বিক্রি হচ্ছে। গড় সংখ্যায় আনলে দেখা যাবে ফিলিপাইনে, যেখানে গড়ে প্রতি হাজার জন মানুষ কুড়িখানার মতো খবরের কাগজ কিনছেন প্রত্যহ—সেখানে কোরিয়াতে কিনছেন প্রায় পঞ্চাশখানা।

প্রসঙ্গত বলতে হয় সিঙ্গাপুরের কথা। জনসংখ্যায় ফিলিপাইনের দশ ভাগের একভাগ এই ছোট্ট বন্দরে প্রত্যহ ফিলিপাইনের সমসংখ্যক অর্থাৎ ৪,১৫,০০০ হাজার খবরের কাগজ বিক্রি হয়ে থাকে। অবশ্য

এর মধ্যে একটা কথা রয়ে গেছে। পৃথিবীর অন্য যে কোনো জায়গা থেকে সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি বন্দর-রাজ্যের অবস্থা কিছুটা ভিন্ন। এ সমস্ত অঞ্চলে বেশিরভাগই কর্মব্যস্ত ব্যবসায়ী বা অন্য কোনো না কোনো উপায়ে রোজগারের সন্ধানে ব্যস্ত মানুষের বসবাস; এই সমস্ত জায়গায় মানুষ বাস করে শুধুই অর্থের লালসায়, তার পেছনে অন্য কোনো মায়া-মমতা বা দেশপ্রেমের প্রশ্ন নেই। কাজেই তাকে সদাসতর্ক থাকতে হয় বলেই খবরের কাগজ তার পক্ষে দৈনন্দিন আহার্যের মতোই একটা জিনিস হয়ে পড়ে। সিঙ্গাপুরে প্রতি হাজার জন নাগরিকের মধ্যে প্রত্যহ প্রায় চারশোখানা খবরের কাগজ বিক্রি হয়: আর হংকং-এ সাড়ে তিন শয়ের কিছু কম।

আমাদের দেশে ইদানীং এক শ্রেণীর লোক দেখা যাচ্ছে (এরা বেশির ভাগই হতাশ রাজনৈতিক কর্মী) যারা কিছুকাল ধরেই এই রকম একটা কথা প্রচার করছে যে, পাকিস্তানে বিপ্লব হলো বলে, আর বেশি দেরি নেই। এটা যে কতো অমূলক ধারণা—ও দেশে খবরের কাগজের প্রচার দেখলেই তা বোঝা যায়। খবরের কাগজের প্রচার যদি জনচেতনার কিছুটা পরিচয়ও বহন করে থাকে, তা হলে মনে হয় যে, পাকিস্তানের আভ্যন্তরিক রাজনীতিতে কখনো কিছু পরিবর্তন ঘটলেও তার গতি নীচের দিকেই হবে, উপরের দিকে নয়। যে দেশে প্রতি হাজারে দু'জন মানুষ খবরের কাগজ কেনে, সে দেশের মানুষের মনের পাপান্ধকার দূর হবে কিসে?

ভারতবর্ষের অবস্থাটাও কিন্তু ভাবা দরকার। নিরক্ষরতার অনুপাত সমান এ রকম দেশ ইরাক এবং সিরিয়াতে দৈনিক গড়ে প্রতি হাজারে প্রায় তিরিশখানা খবরের কাগজ বিক্রি হয়ে থাকে। কাজেই, অন্য কোনো ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে তুলনা না করেও বলা চলে যে, ভারতবর্ষে খবরের কাগজের প্রচার অন্তত বর্তমানের চারগুণ হলে আমাদের হয় তো খুব দুঃখিত হবার কারণ থাকতো না। বর্তমান অবস্থা যে অতিশয় দুঃখদায়ক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি! মনে রাখা দরকার যে, আমাদের ঘৃণিত শত্রুর দেশ চীনেও খবরের কাগজের প্রচার হাজার প্রতি আমাদের প্রায় দ্বিগুণ।

ভারতে খবরের কাগজের প্রচার আশানুরূপ বাড়ছে না কেন? পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে 'প্রেস' স্বাধীন, তার অন্যতম হলো ভারতবর্ষ। এ দেশে খুবই উন্নত ধরণের সাংবাদিকতার ছাপ বহু কাগজই বহন করে থাকে। ইংরেজী এবং হিন্দী ছাড়া আঞ্চলিক ভাষাতেও খবরের কাগজের কোনই অভাব নেই। রাজনীতি সম্পর্কে, দেশ-বিদেশ সম্পর্কে, চাই কি গোটা ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমরা এতোই উৎসাহী যে আমাদের সমকক্ষ না কি খুঁজে পাওয়া ভার—এমন কথাও অনেক ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতা বলে থাকেন—কিন্তু তবু ভারতে খবরের কাগজের প্রচারের অবস্থাটা এতো শোচনীয় কেন? —সাংবাদিক

বেশ কিছুকাল আগের কথা। একেবারে ছেলেবেলা নয়, কিশোর বয়সের কথা। মনে পড়ে কয়েকজন বন্ধু মিলে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম, কলকাতা থেকে কুড়ি-বাইশ মাইল দক্ষিণের একগ্রামে। সেখানেই যে যেতে হবে এমন কোনো কথা ছিলো না। একটা 'ভ্যান'-এ করে যাচ্ছিলাম আমরা। যেতে যেতে ডানদিকে নজরে এলো বেশ কয়েক মাইল একটা জঙ্গলের মতো। সবাই মিলে ঠিক করেছিলাম, বনভোজন যথার্থই বনভোজন হোক। তখুনি ভ্যান থামিয়ে যে যার নেমে পড়লাম। জিনিসপত্রের মোটঘাট সব যে যার হাতে-কাঁধে-বগলে করে ঢুকে পড়েছিলাম বনের মধ্যে। সবারের এ পিকনিকের খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হুল্লোড় হয়েছিলো যাকে বলে স্মরণীয়—ফিস ফ্রাই, কালিয়া, মাংস, পোলাও, কি নয়। কিন্তু এ সমস্তের ওপরেও ঘটেছিলো একটা ব্যাপার যে কারণে আজকের অম্লশূল, পিত্তশূল, স্নায়ুশূল প্রভৃতির সংমিশ্রণের ত্রিশূলরোগী আমি সব চাইতে বেশি আশ্চর্য হয়ে যাই। একদা খ্যাটের বিষময় ফলস্বরূপ হয় তো শীঘ্রই আমার খাটিয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়তে পারে, কাজেই খ্যাটের কথায় আজ গা ঘিন-ঘিন করে—কিন্তু সে ব্যাপারটা আর কোনোমতেই ভোলা চলে না। ব্যাপারটা হলো—আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, সত্যি বলছি বিশ্বাস করুন আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম—সেই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে। খাস কলকাতার ষোলো বছরের রীতিমতো চালাক-চতুর জোয়ান ছোকরা আমি, হারিয়ে গিয়েছিলাম সেই জঙ্গলে।

আরো আশ্চর্যের কথা এই যে, আমি যে হারিয়ে গেছি এ কথাটা বুঝতে পারবার চারঘণ্টা পরেও আমাদের দলের অন্য এগারোজন বন্ধুবান্ধব মিলে আমাকে খুঁজে পায় নি। ভয় পাবেন না, বাঘের পেটে আমি যাই নি। আমাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো ঘণ্টা পাঁচেক পরে এবং যে ব্যক্তি খুঁজে পেয়েছিল সে আমি নিজে।

ব'লছি শুনুন এবার ব্যাপারটা কি হয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে খানিকটা হুল্লোড় করে হয়রান হয়ে কি জানি কেন ইচ্ছে হয়েছিল একখানা কাটারী হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম জঙ্গল দেখবার আশায়। অনুমান ঘণ্টাখানেক পরে আমি নিজেই বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি হারিয়ে গেছি। প্রথমটা যাকে বলে একটু 'নার্ভাস' হয়েই পড়েছিলাম। কিন্তু তারপর এলো লজ্জা। মনে হলো কি ভাববে সবাই যদি বুঝতে পারে যে হারিয়ে গেছি। তাই নিঃশব্দে চলতে লাগলাম আমাদের ঘাঁটির দিকেই যাচ্ছি মনে করে।

কিন্তু এইভাবে ঘণ্টাখানেক চলবার পরেও যখন ঘাঁটির সন্ধান মিললো না, তখন একটু-একটু করে ভয় দানা বাঁধতে আরম্ভ করলো মনে। তারপর চীৎকার আরম্ভ করলাম। নানা জনের নাম ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করলাম। বোধ হয় মিনিট পনেরো সমানে চেঁচিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের দলবলের কারোরই গলা ভেসে এলো না উত্তরে। এদিকে তখন সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এসেছে। ঠিক এমনি সময় কিছুটা দূরেই মনে হলো যেন একটা বাঘ গোঙাচ্ছে। এরপর মনে হলো যে চীৎকার করাটা নেহাৎ বোকামি হচ্ছে। জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারদের সব ডেকে ঘুম ভাঙানো হচ্ছে। এইটা মনে হতেই এবার জামা-কাপড় সব শরীরের সঙ্গে আঁটো-সাঁটো করে জড়িয়ে নিলাম; প্রতি পদক্ষেপেই যে আমি নতুন দিকে পা বাড়াচ্ছিলাম এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ ছিল না। কাটারীখানা মুঠোর মধ্যে রেখে বনবাদাড় ভেঙে চলতে লাগলাম আমি। একে ছোটো এবং মাঝারী গাছপালার জঙ্গল তায় কৃষ্ণপক্ষের রাত, কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ দু'টোর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলো। ডাইনে-বাঁয়ে দু'পাশ থেকেই নানা জন্তু-জানোয়ার এদিক-ওদিক চলাফেরা করছিল রকমারি শব্দ এবং নানা অশ্রুতপূর্ব ডাক শুনে বুঝতে পারছিলাম। ওরা বোধ করি আমাকে ওদের রাজত্বের নতুন কোনো বাসিন্দা ধরে নিয়েছিলো। বাঘের শুধু গোঙানি নয় এবার দু' একটা গর্জনও কানে এলো। আমি ততক্ষণে সমস্ত রকম দুশ্চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে গেছি। টালীগঞ্জ, খুড়ি, যাকে বলে টলিউডের একেবারে খাস স্টুডিয়ো পাড়ার ছেলে আমি টার্জন থেকে বাহাদুর কা খেল কোনো 'খেল'ই বাদ যায় না—এ হেন আমি, হাতে যখন কাটারী রয়েছেই একখানা—বাঘই হও আর ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব যে-ই হও বাপু এক-আধটা ঘাতে বসাতে পারি আমি শুধু সেই চিন্তায় বিভোর।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সুযোগ আর হয়ে উঠলো না। ঘণ্টা দুয়েক নিরুদ্দিষ্টের মতো চলতে চলতে একসময় নজরে এলো একটা আলো—মিটমিটে আলো। আরো খানিকটা এগোতে বুঝলাম, আলোটা স্থির। সেই বরাবর আরো খানিকটা এগিয়ে বুঝলাম একটা ঘরের বারান্দার আলো জ্বলছে।

এবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলাম আলো লক্ষ্য করে। বনবাদাড় মাঠঘাট পেরিয়ে এগোতে-এগোতে ঘরটার পেছন দিকে গিয়ে পৌঁছতে বুঝলাম, বড় রাস্তার পাশের একটা দোকানঘর। পাঁচ-ছয়জন লোক বসে রয়েছে সামনের দিকে। কানে এলো ওদের কথা—আমারই কথা বলছিলো ওরা: আরে, কলকাতার ছেলে—এই গভীর জঙ্গল—আরে সে কি আর আছে এখনো—গ্যাঁট হয়ে বসে থাক কত আর খুঁজবি, বাবুরা এলে বলবি দেখে এলাম দু'টো বাঘে টেনে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা বললেই বা কি—বাঘের পেটে তো ওকে যেতেই হবে।

বুঝলাম আমার বন্ধুবান্ধবরা এদেরই নিয়োগ করেছিলো ঐ জঙ্গল থেকে আমাকে খুঁজে বার করবার জন্যে। এবার যদি সামনা-সামনি আমাকে দেখে তা হলে ওদের কার কি দুর্মতি হয়ে যায়—এই আশঙ্কা করেই আমি নিঃশব্দে আরো কয়েক মাইল এগিয়ে একটা থানায় এসে রাতের মতো আশ্রয় নিয়ে ছিলাম।

পরে অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছিলো যে, আমি ক্রমবর্ধমান বৃত্তাকারে (spiral) গোটা জঙ্গলটা ঘুরে রাস্তায় এসে পড়েছিলাম।

কেন যে এমনটা হয়েছিলো তা অনেক সময়ই বুঝবার চেষ্টা করেছি কিন্তু বুঝতে পারি নি। মানুষ হারিয়ে গেলে বা তার চোখ বেঁধে দিলে কেন যে ক্রমবর্ধমান বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে সে কথা কখনো ভেবেছেন কি?

কিছুদিন পূর্বে ঠিক এই সম্পর্কে একখানা বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকায় ব্যাপারটা সম্বন্ধে এক বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষালব্ধ ফল দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।

আমেরিকার কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর শেফার নানা জাতের কীটাণু এবং বীজাণু নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, প্রত্যেকেরই চলার ফলে এক একটি ক্রমবর্ধমান বৃত্তের সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ ওদের ধারাটাই ঐ রকম।

মানুষের বেলায় ব্যাপারটা ঘটে একটু অন্য কারণে। আমাদের প্রত্যেকেরই ডান আর বাঁ এ দু'দিকের অঙ্গ অসম। কারো ডান পায়ে জোর বেশি, কারো বাঁ পায়ে। কারো ডান পা-টা একটু খাটো কারো বা বাঁ পা-টা। ফলে কি হয়—একবার মানুষ হারিয়ে গেলে কোন দিকে যেতে হবে সেই লক্ষ্য যদি ঠিক না থাকে, তা হলে যে পা-খানায় বেশি শক্তি বা বেশি লম্বা, সাধারণত দেখা যায় সেই পা-ই আমাদের তার নিজের দিকে ঘোরাতে থাকে—অর্থাৎ ডান পা ডান ক্রমবর্ধমান বৃত্তে, বাঁ পা বাঁ ক্রমবর্ধমান বৃত্তে।

কিশোর বয়সে হারিয়ে যাওয়ার ঐ ব্যাপারটার জন্যে মাঝে মাঝেই নিজের কাছে লজ্জাবোধ করতাম—কিন্তু এতদিনে বৈজ্ঞানিকের ব্যাখ্যা পাবার পরে বুঝতে পাচ্ছি আমার হারিয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক হয়েছিল। —শিকারী

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুচি একজন মেয়ে

মেয়ে মুচি দেখেছেন? খুব সম্ভব দেখেন নি। অথচ পৃথিবীর সেরা মুচি একজন মেয়ে। নাম তার বির্জিত স্টিগ্‌লমাইয়ার, বয়স ২৮, থাকে মিউনিখে। সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের ব্ল্যাকপুলে আন্তর্জাতিক জুতো মেরামত প্রতিযোগিতায় যে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বছর বছর যে জুতো মেরামত প্রতিযোগিতা হয়, এই বছরেই একজন মেয়ে তাতে প্রথম হ'ল। কাগজে প্রতিযোগিতার আইনকানুন পড়ে শ্রীমতী স্টিগলমাইয়ার তার বিয়ের জুতোজোড়ার ছেঁড়া তলি, গোড়ালি এবং অন্যান্য অংশ এমন দক্ষতার সঙ্গে মেরামত করলে যে, কার সাধ্য বোঝে সেই জুতোজোড়া পুরোনো, সারিয়ে নতুন ক'রে তোলা হয়েছে। সেই জুতোজোড়া সে ইংল্যাণ্ডের প্রতিযোগিতায় পাঠিয়ে দিলে আর প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী শত শত মেরামত করা জুতোর মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর বির্জিতের মেরামত করা জুতোজোড়াই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করলেন। অথচ বির্জিত না মুচির মেয়ে, না মুচির বৌ, তার স্বামী একজন ব্যবসাদার। ১৯৬২ সালে নুরেমবার্গের জুতো মেরামত প্রতিযোগিতাতেও বির্জিত প্রথম হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড থেকে সোনার মেডেল পেয়ে সে সাংবাদিকদের বলেছে যে, 'জার্মানীতে তৈরি' উক্তির সম্মান রক্ষা করতে পেরে সে আজ সত্যিই গর্বিত। [ডি এ ডি] —বিএস

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৬৯

বল্লভ প্রভুর চরণবন্দনা করলে।

আর প্রভু তাকে ভাগবতবুদ্ধিতে অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্তজ্ঞানে আলিঙ্গন করলেন।

বল্লভ বললে, 'কত দিন থেকে বাসনা তোমাকে আবার দেখি। জগন্নাথ সে বাসনা পূর্ণ করলেন। সন্দেহ কী, তুমিই ব্রজেন্দ্রনন্দন। তোমাকে স্মরণ করলে লোকে পবিত্র হয়। দর্শন করলে যে হবে তা বলাই বাহুল্য। তুমিই সংসারে কৃষ্ণনাম আনলে। কৃষ্ণের নিজের শক্তি ছাড়া কার সাধ্য তার নাম প্রবর্তন করে। সুতরাং তুমি কৃষ্ণশক্তির আধার। তোমাকে যে দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমিক হয়ে ওঠে। কৃষ্ণশক্তি ছাড়া কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ হয় না। একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমদানে সমর্থ, আর কেউ নয়। সুতরাং তুমি যখন সকলের মনে কৃষ্ণপ্রেমের তুফান তুলছ তখন তুমি কৃষ্ণছাড়া আর কী।'

'কলিকালে ধর্ম—কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনে নহে তার প্রবর্তন॥
তাহা প্রবর্তাইলে তুমি, এই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন॥
জগতে করিলে কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা—শাস্ত্রের প্রমাণে॥'

প্রভু বললেন, 'তোমার ভুল হচ্ছে, আমি কৃষ্ণভক্ত নই, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। যদি কৃষ্ণভক্ত কেউ থাকে সে হচ্ছে অদ্বৈত আচার্য। তাঁর সঙ্গ করেই আমার মন নির্মল হয়েছে। তাঁর কৃপার এমন শক্তি যে, ম্লেচ্ছকেও কৃষ্ণভক্ত করে দিতে পারে। আর নিত্যানন্দের কথা কী বলব? সে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। ভক্তির কথা সে বলতে পারে। আর বলতে পারে সার্বভৌম। ষড়দর্শনে সে পণ্ডিত আবার সে ভাগবতোত্তম। সেই আমাকে বোঝাল কৃষ্ণভক্তিই সমস্ত সাধনের সার কথা। আরেক ভক্ত রামানন্দ। সে বোঝাল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান আর প্রেমভক্তিই জীবের পুরুষার্থ-শিরোমণি। আর এই প্রেমভক্তি শুধু রাগমার্গে। সে আমাকে রাগমার্গের ভজন শেখালে। কিন্তু শিখলাম কই?'

বল্লভ ভট্ট সবিস্ময়ে তাকাল প্রভুর দিকে। মনে মনে বললে, 'শেখবার আর বাকি কী।'

'রামানন্দই বোঝালে,' বললেন প্রভু, 'ঐশ্বর্য-জ্ঞানে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না। স্বয়ং লক্ষ্মী বক্ষোবিলাসিনী হয়েও ব্যর্থ হল। সে তো গয়লার মেয়ে নয় সে যে সম্রাজ্ঞী। কিন্তু ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ প্রেমছাড়া কৃষ্ণকে বাঁধবে কে? শুধু পেয়েছিল যশোদা, পেয়েছিল তার সাথির দল।

'শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করিল বন্ধন॥'

ঐশ্বর্য দেখলেও, যে শুদ্ধ ভক্ত, সে ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয় না। তার কেবলা-প্রীতি। আর এই কেবলা-প্রীতিতেই কৃষ্ণ বশীভূত। এই সব নিরৈশ্বর্য প্রেমের কথা রামানন্দ শিখিয়েছে আমাকে। রামানন্দ তো শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নয়, সে রসবেত্তা।'

বল্লভ ভট্ট মাথা হেঁট করল। এ বুঝি তারই

প্রতি ইঙ্গিত। এর অর্থ বোধ হয় এই যে সে শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞানে কিছু হবার নয়, চাই রসানুভূতি। রামানন্দ জ্ঞানে-রসে-তত্ত্বে-প্রেমে অনর্গল।

'আর দামোদর স্বরূপ? সে তো মূর্তিমান প্রেমরস।' প্রভু বললেন বিহ্বলস্বরে, 'ব্রজের মধুর রসের সংবাদ আমি দামোদরের কাছেই জেনেছি। জেনেছি কাকে বলে গোপীপ্রেম। কামগন্ধের লেশমাত্র নেই, কৃষ্ণসুখই একমাত্র উদ্দেশ্য আর কৃষ্ণকে মাননীয় বলতে মর্যাদাবান বলতে তাদের অসম্মতি। এই তো গোপীপ্রেমের লক্ষণ। ভালোবাসার ভৎর্সনা করতে পর্যন্ত তারা প্রস্তুত। এই সর্বাতিশায়ী প্রেমের কথা দামোদর আমাকে বলেছে।'

বল্লভ মুগ্ধের মত তাকাল প্রভুর দিকে।

'আর হরিদাস আমাকে নাম শিখিয়েছে। ভাগবত-প্রধান হরিদাস, দিনে তিন লক্ষ নাম করে। তার প্রসাদেই আমি জানলাম নামের কী মহিমা! তারপরে বৈষ্ণবভক্তের দল—আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি, গদাধর জগদানন্দ, দামোদর, বক্রেশ্বর, শঙ্কর, কাশীশ্বর, বাসুদেব, মুরারি। এরাই জগতে অকুণ্ঠকণ্ঠে নাম প্রচার করল, এদের থেকেই শিখলাম কৃষ্ণভক্তি।'

বল্লভ ভট্টের মনে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার ছিল, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত আমিই ভালো জানি, ভাগবতের অর্থও আমার মত কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না। নিজের বিদ্যাবত্তা প্রচার করতেই বোধহয় তার এখানে আসা। প্রভু তা টের পেয়েছেন। কই তাকে তো কোনো বিষয়েই পারঙ্গম বলে তিনি স্বীকার করছেন না। তাঁর পার্ষদদেরই গৌরব দিচ্ছেন। যেন বলছেন, আমি কোন ছার, আমার থেকেও আমার পার্ষদেরা বেশি অভিজ্ঞ, বেশি রসগুণাকর।

'আপনার সে সব বৈষ্ণবেরা থাকে কোথায়?' ক্ষুব্ধস্বরে জিগ্গেস করল বল্লভ।

'এখানে যখন এসেছ তখন দেখতে পাবে।'

দেখা পেতে দেরি হল না। প্রভু সকাশে এসে পড়ল বৈষ্ণবেরা। কী তাদের দেহজ্যোতি, বল্লভ বিশীর্ণ হয়ে গেল, ওদের কাছে সে সূর্যের কাছে খদ্যোতের মত।

প্রভু সকলের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিলেন। এবার তবে প্রসাদ লাগাও।

মহাপ্রসাদের আয়োজন করল বল্লভ। গৌড়-ভক্তেরা অঙ্গনে বসল সারি-সারি। প্রভুর এক পাশে অদ্বৈত আরেক পাশে নিত্যানন্দ। বল্লভ নিজেই পরিবেশন করতে লাগল। চতুর্দিকে উঠল হরিধ্বনি। নামানন্দের গর্জন।

রথযাত্রার দিন প্রভু কীর্তন করলেন, আর কীর্তনের সঙ্গে সে কী ভুবনভুলানো নৃত্য! সে কী প্রেমোদয়। বল্লভের মনে আর সন্দেহ রইল না, ইনিই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ।

যাত্রা-অন্তে বল্লভ প্রভুর কাছে গিয়ে নিবেদন করল, 'ভাগবতের কিছু টীকা লিখেছি, আপনাকে শোনাতে চাই।'

প্রভু বললেন, 'ভাগবতের অর্থ বুঝি আমার এমন সামর্থ্য নেই। তা'ছাড়া আমি অধিকারীও নই যে, ভাগবতের অর্থ শুনি। আমি শুধু কৃষ্ণনাম নিই, তা-ও রাত্রিদিনে আমার সংখ্যা পূরণ হয় না।'

সর্বজ্ঞ প্রভু বুঝতে পেরেছিলেন বল্লভের টীকা সারশূন্য। বিদ্যাবুদ্ধির জোরেই সে টীকা লিখেছে, ভজনান্বিত ভক্তির থেকে নয়। ভক্তিতে চিত্ত যদি নির্মল না হয় তা'হলে ভাগবতের অর্থ তাতে স্ফুরিত হবে কী করে?

'আমার টীকায় আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ করেছি।' বল্লভ অনুরোধ করল, 'তুমি একবার শোনো দয়া করে।'

প্রভু বললেন দৃঢ়স্বরে, 'আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ মানি না। এক অর্থ শুধু মানি। সে হচ্ছে শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন। আর যদি কোনো অর্থ থাকেও তাতে আমার দরকার নেই।'

বিমনা হয়ে বল্লভ ঘরে ফিরে গেল। অভিমান পুঞ্জিত হয়ে রইল হৃদয়ে।

যেহেতু প্রভু উপেক্ষা করেছেন, নীলাচলজন কেউ বল্লভের টীকা শুনতে রাজী হল না।

লজ্জিত ভট্ট দুঃখিত হয়ে গদাধর পণ্ডিতের শরণ নিল। বললে, 'তুমি কৃপা করে আমাকে বাঁচাও। শোনো আমার নামব্যাখ্যা। অন্তত তুমি যদি শোনো তাহলেও আমার এ কলঙ্কের স্খালন হয়।'

গদাধর সঙ্কটে পড়ল। কেউ যখন শুনল না, আমি শুনি কী করে?

কোনো মতামত পাবার আগে বল্লভ নিজের থেকেই পড়তে সুরু করল। দেখি কেমন না শোনো! গায়ের জোরে শোনাব।

গদাধরের সঙ্কট গুরুতর হল। অথচ শালীনতার খাতিরে বাধাও দিতে পারল না বল্লভকে। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, হে কৃষ্ণ, রক্ষা করো। প্রভুকে আমার ভয় নেই, তিনি অন্তর্যামী, তিনি বুঝবেন আমার অবস্থা—আমি শুনতে না চাইলেও আমাকে জোর করে শোনাচ্ছে, আমার অনিচ্ছাকে গ্রাহ্য করছে না। আমি বিনয়ী বলেই চুপচাপ আছি।

কেন চুপচাপ থাকবে? পার্ষদরা ক্ষমা করল না। কেন তুমি নিষেধ করবে না? নিষেধ করতে না পারো, স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে কী বাধা ছিল? এ কেমনতরো বিনয়, কেমনতরো চক্ষুলজ্জা?

গদাধর জানে এ তাদের প্রণয়রোষ, সত্যিকারের ক্রোধ নয়। তারা ছাড়া আর কে বেশি জানে গৌরের প্রতি তার কী দারুণ ভালোবাসা!

বল্লভ তবু নিরস্ত হয় না। শুধু শাস্ত্রজ্ঞানই বা মন্দ কী! বেশ, সেই শাস্ত্রজ্ঞানেরই বিচার হোক। তোমরাও তো সকলেই পণ্ডিত, বৈয়াকরণিক। এস, বিদ্যাবিচার করা যাক। ভক্তির কথা পরে দেখা যাবে, আগে যুক্তির কথা হোক।

পার্ষদদের তর্কে আহ্বান করল বল্লভ। দেখি তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞানের দৌড়।

অদ্বৈত আচার্যকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল: 'জীব তো কৃষ্ণের প্রকৃতি বা স্ত্রী। তাই জীব কৃষ্ণকে পতি বলে মানে। কী, যথার্থ তো?'

'যথার্থ।' বললে অদ্বৈত।

'যে স্ত্রী পতিব্রতা সে পতির নাম নেয় না। তোমরা কোন ধর্মে তবে কৃষ্ণের নাম নাও?'

অদ্বৈত বললে, 'তোমার সামনে যে মূর্তিমান ধর্ম বসে আছেন, তাঁকে জিগ্‌গেস করো।' প্রভুর দিকে ইঙ্গিত করল। 'তিনিই সমাধান করে দেবেন।'

প্রভু বললেন, 'পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্মই হচ্ছে স্বামী-আজ্ঞা পালন করা। এখানে স্ত্রীকে স্বামী আদেশ করেছে, নিরন্তর আমার নাম নাও। পতিব্রতা স্ত্রী সেই আদেশ পালন করছে, লঙ্ঘন করছে না। নাম নিচ্ছে আর তার ফল পাচ্ছে। ফল কী? ফল হচ্ছে প্রেমফল।'

বল্লভের মুখে আর কথা নেই। দুঃখিত হয়ে সে আবার বাড়ি ফিরল। প্রত্যহই আমি পরাজিত হই, এমন কি একদিনও হবে না যে আমার কথাই প্রবল হবে।

আরেক দিন গেল বল্লভ। দেখি এবার আমাকে কী করে ঠেকায়।

কে না জানে শ্রীধর স্বামীই ভাগবতে সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার, ভক্তিপ্রেমের প্রচারক। প্রভুও তাই স্বীকার করেন, তাঁর পার্ষদরাও তদ্রূপ। সেই টীকা আমি খণ্ডন করেছি, যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগ করে দেখিয়েছি তাঁর সিদ্ধান্তে দোষ হয়েছে। বেশ তো, বোসো স্থির হয়ে, শোনাচ্ছি এখুনি তারপর একবার যখন আমার ব্যাখ্যা স্থাপিত হবে তখন দেখব তোমরা কী বলো। আমার প্রাধান্য তখন স্বীকার না করে যাও কোথায়?

'আমি ভাগবতে শ্রীধর ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছি।' গর্বভরে বললে বল্লভ, 'দেখিয়ে দিচ্ছি তাঁর ব্যাখ্যায় পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই। আমি স্বামী মানি না।'

> ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
> লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান বচন॥
> সেই ব্যাখ্যা করে যাঁহা যেই পড়ে জানি।
> একবাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি॥

প্রভু উপেক্ষার হাসি হাসলেন। বললেন, 'যে স্বামী মানে না, তাকে তো বেশ্যার মধ্যেই গণনা করা হয়।'

> 'প্রভু হাসি কহে—স্বামী না মানে যেই জন।
> বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥'

অর্থাৎ যে শ্রীধর স্বামীর টীকা মানে না শাস্ত্রার্থের দিক থেকে সে ব্যভিচারী।

বল্লভ স্তব্ধ হয়ে গেল।

তার গর্ব চূর্ণ করে দিলেন প্রভু। মঙ্গলে-মাধুর্যে জগতের শোধন করবেন বলেই গৌর অবতীর্ণ। তাই নানা অবজ্ঞা-উপেক্ষায় বল্লভের অভিমান নাশ করলেন। গিরি গোবর্ধন ধারণ করে কৃষ্ণও একদিন ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণ করেছিলেন। গর্বান্ধ জীব প্রথমে বুঝতে পারে না, পরে যখন অন্ধতা ঘুচে যায়, চোখ খোলে, তখন বোঝে কোথায় তার মঙ্গল। বোঝে আঘাতই প্রভুর হিতস্পর্শ।

বল্লভ বুঝল। আগে প্রয়াগে প্রভু আমাকে কত কৃপা করলেন, এখন আমার প্রতি কেন তাঁর বৈরূপ্য? প্রভুর সভায় বিদ্যা বিচার করবো, আমি জয়ী হবো, এই গর্বেই আমি ভরপুর ছিলাম, আমার প্রতি

প্রভুর যে উপেক্ষা তা শুধু এই ঔদ্ধত্যকে শাসন করবার জন্যে। সকলের হিত করাই ঈশ্বরের স্বভাব, আমি মূর্খ, তাই আমি তাঁর হিতৈষণাকে সম্মান করি নি। ঠিক হয়েছে, আমাকে তিনি অপমান করেছেন।

'অপমান করি সর্ব গর্ব খণ্ডাইলা।'

এই অপমানই আমার মঙ্গল মহৌষধ।

প্রভুর চরণে এসে পড়ল বল্লভ। বললে, আমি অজ্ঞ, তোমার সামনে আমি পাণ্ডিত্য প্রকট করতে চেয়েছিলাম। তোমার কৃপাঞ্জনে আমার গর্বান্ধতার মোচন হল। কৃপা করে আমার মাথায় তোমার চরণ রাখো।'

প্রভু কোমলার্দ্র নয়নে দৃষ্টিপাত করলেন। বললেন, 'তুমি একাধারে পণ্ডিত ও মহাভাগবত। পাণ্ডিত্য আর ভাগবততা এই দুই গুণ যার মধ্যে বর্তমান, সে গর্বিত হয় কী করে? শ্রীধর স্বামীর টীকার আনুগত্য স্বীকার করেই ভাগবত-ব্যাখ্যা সম্ভব। তুমি তাঁকে নিন্দা কোরো না, অতিক্রমও কোরো না। অভিমান ছেড়ে কৃষ্ণভজন করো, নিরপরাধে করো কৃষ্ণকীর্তন।'

'যদি আমার উপর প্রসন্ন হলে', বললে বল্লভ, 'তবে আরেক দিন আমার নিমন্ত্রণ নাও। স্বগণসহ এস আমার কুটিরে।'

তাই গেলেন প্রভু।

প্রণয়স্থলে গদাধরের প্রতি রোষ প্রকাশ করলেন। কেন সে সেদিন বল্লভ ভট্টের টীকা শুনেছিল? ভেবেছিলেন উত্তরে গদাধরও বোধহয় রোষ প্রকাশ করবে। বলবে, আমি কী করব, জোর করে শোনালে আমার কী করবার আছে? কিন্তু গদাধরের রুক্মিণী-স্বভাব, সরল স্বভাব, তার রোষ না হয়ে ত্রাস হল।

রুক্মিণীরও তাই হয়েছিল। কৃষ্ণ বললে, 'তুমি কী ভেবে যে আমাকে মনোনীত করলে বুঝতে পাচ্ছি না। কত বিভূতিশালী রাজা তোমাকে প্রার্থনা করেছিল—শিশুপাল, শাল্ব আর জরাসন্ধ। কত তারা ধনী-মানী, রূপে-বলে সুসমৃদ্ধ। আমি তো নিতান্ত গুণহীন। রাজাদের ভয়ে আমি সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছি, বল-বুদ্ধি বলতে আমার কিছু নেই। আমি নিষ্কিঞ্চনেরও নিষ্কিঞ্চন। তুমি রূপোত্তমা, উত্তমে-অধমে মিত্রতা হয় না, পরিণয় তো দূরের কথা। বিদর্ভনন্দিনী, তুমি দূরদর্শিনী নও, তাই আমার মতন অভাজনকে বরণ করছ। আমি গৃহে-দেহে উদাসীন, স্ত্রী-পুত্রে আমার কামনা নেই, আমি আত্মলাভেই পরিপূর্ণ। সুতরাং কোনো ক্ষত্রিয় বীরকে ভজনা করো। আমাকে ভজনা করলে তোমার সুখ কোথায়?

রুক্মিণী কৃষ্ণের পরিহাস বুঝল না। সে ভয় পেল। তার হাতের বালা শিথিল হল, তার হাতের ব্যজন খসে পড়ল মাটিতে।

বালগোপালের উপাসনা করত বল্লভ, গদাধরের সঙ্গপ্রভাবে কিশোর-গোপালের উপাসনা করতে ইচ্ছে হল। গদাধরকে বললে, 'আমাকে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দিন।'

গদাধর বললে, 'আমি পরতন্ত্র, প্রভুর অধীন। আমার প্রভু গৌরচন্দ্রের আদেশ ছাড়া দীক্ষা দিতে পারব না। তুমি যে আমার এখানে আস তাইতেই তিনি অসন্তোষ দেখান।'

স্বরূপ বললে, 'তোমার প্রতি প্রভুর যে রোষ সেটা কৃত্রিম। শুধু তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই তাঁর এই পরিহাস। তিনি দেখতে চান তুমিও ক্রুদ্ধ হও কি না।'

'আমি তাঁর সঙ্গে বিবাদ করব? তাঁকে দেখাব আমার ক্রোধ?' গদাধর বিমর্ষ হয়ে গেল। বললে, 'তিনি যা দেন, প্রেম বা উপেক্ষা, ক্রোধ বা অনুরাগ, সবই শিরোধার্য করি। তিনি সর্বজ্ঞের শিরোমণি, তিনি জানেন আমার অন্তরে কী আছে!'

শুধু এতে হল না, গদাধর কাঁদতে-কাঁদতে প্রভুর চরণে গিয়ে পড়ল।

প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'আমি তোমাকে খেপাতে চেষ্টা করলাম, তা, তুমি একটুও খেপলে না। কিছু বললেও না রাগ করে। সরল ভাবেই কিনে নিলে আমাকে।'

গদাধরের ভাবমুদ্রা প্রভুর বড়ই রুচিকর। প্রভুই আমার জীবনসর্বস্ব, গদাধরের ভাবে-ব্যবহারে তাই পরিস্ফুট। তারই জন্যে প্রভুর এক নাম 'গদাধর-প্রাণ-নাথ'। আরেক নাম 'গদাইয়ের গৌরাঙ্গ'।

এক ভুবনপাবনী গঙ্গা থেকে যেমন শত ধারা প্রবাহিত, তেমনি প্রভুর এক লীলায় বহুতত্ত্বের প্রকাশ। সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা, দৃঢ়প্রেমমুদ্রা, অভিমান-প্রক্ষালন। বল্লভ যখন জোর করে তার টীকা পড়ছে, সৌজন্য-বশতই গদাধর তাকে নিরস্ত করতে পারে নি। আর

ব্রাহ্মণের প্রতি যথার্থ মর্যাদাবোধের থেকেই এই সৌজন্যের উৎপত্তি। নিষেধ করলেই বরং ব্রাহ্মণকে অসম্মান করা হত। তৃতীয়ত প্রভুর উপেক্ষাতেও গদাধরের প্রেম ম্লান হল না, শিথিল হল না। আর সবচেয়ে বড় শিক্ষা, উপেক্ষাতেই বল্লভের অভিমান-পঙ্ক ধৌত হয়ে গেল।

বাইরের উপেক্ষাতে কী এসে-যায় যদি প্রভুর অন্তরে অনুগ্রহ থাকে।

নিগূঢ় চৈতন্যলীলা কে বোঝে? গৌরে যার দৃঢ় ভক্তি তার কাছেই সমস্ত অর্থ পরিচ্ছন্ন।

প্রভুর সম্মতি মিলে গেল। বল্লভ গদাধরের কাছ থেকে কিশোর গোপালের মন্ত্র নিলে।

এ আবার কে এল নীলাচলে?

এ যে দেখি রামচন্দ্র পুরী। পরমানন্দ পুরী তো আগেই এসেছে, সে ও দেখি এখন উপস্থিত।

রামচন্দ্র আর পরমানন্দ দু'জনেই মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। রামচন্দ্র আগেই দীক্ষা নিয়েছিল বলে জ্যেষ্ঠ-বুদ্ধিতে পরমানন্দ তাকে প্রণাম করলে। প্রভুও তাকে দণ্ডবৎ করলেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ। তিনজনে তারপরে কতক্ষণ ইষ্ট-গোষ্ঠী করলে, কৃষ্ণকথার আলাপন করলে।

জগদানন্দ এসে নিমন্ত্রণ করলে। জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে এল, প্রচুর প্রসাদ। এদেরকে নিন্দা করবার উদ্দেশে রামচন্দ্র অত্যধিক ভোজন করলে। অবশেষ-প্রসাদ জগদানন্দকে খেতে দিলে জগদানন্দও খেল পেটভরে।

তারপরে রামচন্দ্র নিন্দা সুরু করলে—অতি-ভোজনের নিন্দা। শুনেছি চৈতন্যের লোকেরা বেশি খায়, তাই অতিথি-সন্ন্যাসীদেরও বেশি খাওয়ায়। স্বচক্ষে তাই দেখলাম এখন। বেশি খেয়ে ও বেশি খাইয়ে নিজের ও অন্যের দু'জনেরই ধর্মনাশ করে।

যে বেশি খায় তার বৈরাগ্য কোথায়? তাতে বৈরাগ্যের আভাসও নেই। বেশি খেলে শরীরে অবসাদ আসে, ব্যাধি আসে। আর দেহ যদি অবসন্ন বা ব্যাধিগ্রস্ত থাকে তা হলে বৈরাগ্য হবে কী দিয়ে?

'বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ।'

নিজে আগ্রহ করে অত্যধিক খেল, অত্যধিক খাওয়াল, দোষ চাপাল জগদানন্দের উপর।

এমনি নিন্দক-স্বভাব রামচন্দ্রের।

মাধবেন্দ্রের অন্তকালে শিষ্য রামচন্দ্র এসেছিল। 'মথুরা পেলাম না—মথুরা কোথায়' বলে আক্ষেপ করছেন মাধবেন্দ্র। রামচন্দ্র তাঁকে উপদেশ করতে লাগল। শিষ্য হয়ে গুরুকে উপদেশ—কত বড় ঔদ্ধত্য। রামচন্দ্র ও-সব চিন্তা করেও দেখল না, বললে, 'তুমি কেন কাঁদছ? তুমি তো নিজেই পূর্ণব্রহ্মানন্দ, তোমার কিসের অভাব? যে চিদব্রহ্ম সে কি কখনো কাঁদে?'

শুনে মাধবেন্দ্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তিনি ভগবানের দাস, ভক্ত, তাঁকে কি-না অভেদ জ্ঞান করতে বলছে? 'দূর হ পাপিষ্ঠ।' মাধবেন্দ্র তিরস্কার করে উঠল: 'কৃষ্ণ পেলাম না, মথুরা পেলাম না বলে আমি আপন দুঃখে মরছি, এ কোথা থেকে জ্বালা বাড়াতে এল? আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিতে এসেছে। আমার দৃষ্টির থেকে বার হয়ে যা।'

রামচন্দ্রের দুর্বাসনা জাগল। আমি ব্রহ্ম—এই জ্ঞান লাভ করব তবে ছাড়ব। শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেল। কৃষ্ণের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখল না। আর অবিমিশ্র নিন্দুক হয়ে উঠল।

আরেক শিষ্য ঈশ্বরপুরীকে দেখ। অহোরাত্র মাধবেন্দ্রের সেবা করছে, মলমূত্র মার্জন করছে স্বহস্তে। নিরন্তর কৃষ্ণ-কথা বলছে, কৃষ্ণ-শ্লোক পড়ছে, কৃষ্ণ-স্মরণ সমুদ্রে নিমগ্ন করে রাখছে। পরম পরিতুষ্ট হয়ে মাধবেন্দ্র তাকে বর দিলে, 'কৃষ্ণে তোমার প্রেমধন হোক।'

মহতের নিগ্রহ ও অনুগ্রহের কী ফল তাই রামে-ঈশ্বরে দেখালেন মাধবেন্দ্র। রামচন্দ্র নিন্দার সাগর আর ঈশ্বর প্রেমের সাগর হয়ে উঠল।

পৃথিবীতে প্রথম প্রেমাঙ্কুর রোপণ করে চলে গেলেন মাধবেন্দ্র। সে অঙ্কুর পুষ্ট হল ঈশ্বর-পুরীরূপে। তারপরে ঈশ্বরপুরী থেকে দীক্ষা নিয়ে চৈতন্য ঠাকুর হয়ে দাঁড়ালেন পরিণত বৃক্ষ।

আর রামচন্দ্র কী করছে? সে শুধু পরের ছিদ্র সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। এদিকে নিজের থাকা-খাওয়া সম্বন্ধে স্থিরতা নেই, সন্ধান করে ফিরছে কে কোথায় থাকে বা কী খায়? বিশেষ করে প্রভুর স্থিতি-গতি ভোজন-ভ্রমণই তার লক্ষ্যের বস্তু।

আর কিছু দোষ পেল না, একদিন প্রাতে গিয়ে

দেখল প্রভুর ঘরে পিঁপড়ে হাঁটছে। আর যায় কোথা! রামচন্দ্র তখুনি সিদ্ধান্ত করল, কাল রাত্রে এ-বাড়িতে মিষ্টান্ন আনা হয়েছিল, তাই এই পিপীলিকার সার। মিষ্টান্ন আর কার জন্যে আনা হবে? নিশ্চয়ই কৃষ্ণচৈতন্যের জন্যে। কৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী হয়েও মিষ্টান্ন খাচ্ছে! মিষ্টান্ন খেলে ইন্দ্রিয় দমন হবে কী করে?

ঢাক পিটতে লাগল রামচন্দ্র। সন্ন্যাসী হয়েও মিষ্টান্ন খায়!

নিন্দে করে বেড়াচ্ছে, আবার কী নির্লজ্জ, নিত্য আসছে প্রভুর কাছে। আর প্রভু তাকে গুরুবুদ্ধিতে সম্ভ্রমসম্মান করছেন। প্রভু জানেন রামের কী ব্যবহার, তবু তাকে আদর করতে তাঁর কার্পণ্য নেই।

একদিন তো রাম মুখের উপর সরাসরিই বলে বসল। ঘরে যখন পিঁপড়ে হাঁটে তখন নিশ্চয়ই তুমি মিষ্টান্ন খাও। বিরক্ত সন্ন্যাসীর এ-কী ইন্দ্রিয়-লালসা!

পিঁপড়ে স্বভাবতই যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, তা নিয়ে আবার তর্ক কী। আর যে নিন্দা ভিত্তিহীন তাকে কেই বা মূল্য দেয়? কিন্তু, না, তবুও, প্রভুর মন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। গোবিন্দকে ডাকিয়ে বললেন, 'আজ থেকে আমার ভিক্ষে হবে পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি মাত্র, আর ব্যঞ্জন পাঁচ গণ্ডার। এর একতিল বেশি আনবে না। বেশি এনেছ দেখলেই আমি নীলাচল ছেড়ে চলে যাব।'

শুনে বৈষ্ণবেরা সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসল। পিণ্ডাভোগ তো নিতান্ত ক্ষুদ্র অন্নের পাত্র। এত অল্পে প্রভুর জীবনধারণ হবে কী করে? সকলে রামচন্দ্র পুরীকে তিরস্কার করতে লাগল। কিন্তু উপায় কী?

তারপরে বরাদ্দ সেটুকু আনা হল, তারও অর্ধেক মাত্র প্রভু গ্রহণ করলেন। বাকি অর্ধেক গোবিন্দের জন্যে।

প্রভু অর্ধাশনে রইলেন। গোবিন্দও অর্ধাশনে। ভক্তবৃন্দ বললে, আমরাও তবে কোন সুখে পেটভরে খাই!

গোবিন্দ আর কাশীশ্বরকে প্রভু বললেন, 'তোমরা অন্যত্র ভিক্ষে করে খিদে মেটাও।'

'তোমাকে ক্ষীণ দেখছি, অর্ধাশনে আছ না কি?' রামচন্দ্র প্রভুসকাশে এসে বিদ্রূপ করল: 'অর্ধাশনে থাকাও সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। অর্ধাশনে থাকলে শুষ্ক-বৈরাগ্য দেখা দেয় আর শুষ্কবৈরাগ্য তো ভজনে বিঘ্ন ঘটায়। যথাযোগ্য আহার না পেলে শরীর রক্ষা হবে কী করে, ক্ষুধারই বা কিসে নিবৃত্তি হবে? আহারে-বিহারে নিদ্রায়-জাগরণে সমস্ত কর্মচেষ্টায় নিয়মিত হওয়াই তো যোগীর কাজ।'

'আমি অজ্ঞ।' বললেন প্রভু, 'আপনি যে আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন তাই আমি ভাগ্য বলে মানছি।'

পরমানন্দ পুরী এসে বসল। বললে, 'রামচন্দ্রের কথায় আপনি অন্ন ছাড়বেন কেন? ও নিন্দুক, ওর কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নেই। খাইয়ে ও খাওয়ার নিন্দে করে, খেয়ে করে খাওয়ানোর নিন্দে। গুণের মধ্যে মিথ্যে করে দোষের আরোপ করে।'

'তোমরা কেন তাঁর দোষ ধরছ?' বললেন প্রভু, 'যতি হয়ে জিহ্বালম্পট হওয়া অন্যায়। প্রাণধারণের জন্যে যেটুকু দরকার সেটুকু মাত্রই সে গ্রহণ করে।'

'হ্যাঁ, তাই তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।' বললে ভক্তদল, 'রামের শাসনে তুমি যে সঙ্কোচ ঘটিয়েছ তা দেহরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়!'

ভক্তেরা পরিমাণ কিছু বাড়িয়ে দিল। আমাদের বাড়িতে-বাড়িতে তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি, আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের ইচ্ছামতই তোমাকে খেতে হবে! ভক্তদের আনন্দিত করতেই তো তোমার অবতরণ।

[ক্রমশ।

বিচ্ছেদের পর

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

রূপের ডালি চাঁদ উঠেছে
শিমুলবনের ফাঁকে,
তোমার দুটি দীঘল আঁখি
আমায় কেন ডাকে?

নদীর পারে খুশির লহর,
মাদল বাঁশী বাজে;
আমার কাছে আসবে না আর—
ভাবতে পারি না যে॥

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী

অষ্টমোঽনুবাকঃ

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ·····

·····তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। ২।৮।১

স একো মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দঃ·····স একো আজানজানাং

দেবানামানন্দঃ ২।৮।২

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য তে যে শতমাজানজানাং·····

·····স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ। ২।৮।৩

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য·····স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ

শ্রোত্রিয়স্যচাকামেহতস্য। ২।৮।৪

স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে·····

এতমানন্দময় মত্মানমুপসংক্রামতি তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥২।৮।৫

তাঁরি ভয়ে ভয়ে বাতাস বইছে।

সূর্য উঠছে আকাশে—

অগ্নি ও চাঁদ জ্বলছে তাঁহারি নিয়মে।

তাঁরি ভয়ে ভয়ে, মৃত্যু ছুটছে জীবনের পশ্চাতে॥ (কঠ ২।৩।৩)

(সৃষ্টিকে প্রবাহিত রাখবার জন্যে, আত্মা আপন অন্তর্নিহিত তত্ত্বের মধ্যে বিচিত্র সব নিয়মের সৃষ্টি করেছেন।—সেই নিয়মের শাসনে অথবা ভয়ে বিশ্বসংসার চলছে সত্য।—কিন্তু তাঁর দ্বারা এ-কথা অপ্রমাণ হয় না, যে, আত্মা মূলত আনন্দস্বরূপ)।

সেই আনন্দের এই রূপ ;—

যদি সে বয়সে যুবা হয়,

জ্ঞানী আর গুণী

শ্রেষ্ঠ দৃপ্ত হয় বলিষ্ঠকায়।

ধনময়ী এই বসুমতী যদি তারই নিজের হয়।—

তবে, তার সেই মহানন্দ মানুষের চিরকাম্য। ২।৮।১

মানুষের সেই আনন্দ যদি শতগুণে বেড়ে যায়,—তবে সেই সুখে নর-গন্ধর্বের ও কামনাহীন শ্রোত্রিয়ের একটিমাত্র ভোগ। তাদের তেমনি শত আনন্দে পিতৃগণ ও কামহীন শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ। তাদের তেমনি শতগুণ সুখে, কর্মদেব ও কামহীন শ্রোত্রিয়ের একটিমাত্র সুখ ;—তাদের তেমন শত আনন্দে বৃহস্পতির ও কামনাহীন শ্রোত্রিয়ের একটিমাত্র সুখ। তাদের তেমন শত আনন্দে বৃহস্পতির ও কামহীন শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ। বৃহস্পতির শত আনন্দে প্রজাপতির ও কামহীন জ্ঞানীর একটি আনন্দ। প্রজাপতির তেমন শত আনন্দে ব্রহ্মা অথবা হিরণ্যগর্ভের এবং কামহীন জ্ঞানীর একটি আনন্দ। সেই যে আনন্দ, যা এই পুরুষে,—

আর যা ওই সূর্যে,—তারা এক।

যে এ-রকম জানে,—সে এই ভোগলোক

পার হয়ে,—প্রথমে অন্নময় কোশে

প্রবেশ করেন। পরে ক্রমশ

প্রাণময় কোশ ও মনোময় কোশের মধ্যে

স্বানুভব লাভ করেন।

তারপরে বিজ্ঞানময় ও তা থেকে

আনন্দময়ে সঞ্চরণ করেন।

এ-বিষয়ে আরো একটি শ্লোক আছে। ২।৮.৫

নবমোঽনুবাকঃ

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।

এতং হি বাব ন তপতি····· ইত্যুপনিষৎ।

কথা যেথা হতে ফিরে আসে ঘুরে,

মনও যাকে খুঁজে পায় না।—

ব্রহ্মের সেই পরমানন্দ,

যে জেনেছে, তার কিছুতেই নেই ভয়।

কেন ভালো কাজ করি নি গো, আমি,—

কেন অন্যায় করেছি ?—এই অনুতাপ

জ্ঞানীকে তাপিত করে না।

এই দুইরূপে স্থির অভিন্ন

আত্মাকে লাভ করে,

নন্দিত হয় সে।

(এই বল্লীর) এই তো উপনিষৎ। ২।৯

* * *

জ্ঞানীর পক্ষে পুণ্য-পাপে ভেদ নেই সত্য। তাঁদের ব্রহ্মময় অন্তরে সবই ঈশ্বরের প্রকাশ। কিন্তু সেইজন্যেই এই শ্লোকটিকে আবার বিশেষ করে 'উপনিষৎ' বলে বলা হয়েছে। এটা রহস্যবিদ্যা, উপনিষদের গোপন কথা। অধিকারীর কাছে এ বাণী অমৃতস্বরূপ,—কিন্তু অনধিকারীর কাছে বিষ।

পুণ্য পাপ তুল্য মূল্য এ কথা মনে করে মানুষ যথেচ্ছ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হবে, এ শ্লোকের সে অর্থ নয়।—পরমজ্ঞানের মধ্যে সমস্ত বিপরীত বুদ্ধি এক হয়ে মিলেছে,—এই হোল এ শ্লোকের তাৎপর্য।

ভৃগুবল্লী

(শান্তি পাঠ)

প্রথমোঽনুবাকঃ

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ,—পিতরমুপসসার।·····

·····স তপোঽতপ্যত।—স তপস্তপ্ত্বা।১

বরুণপুত্র ভৃগু এলেন পিতার কাছে। বললেন,—'হে ভগবন্,—আমায় ব্রহ্মের বাণী বল।'

পিতা বললেন,—

এই দেহ, এই প্রাণ, এই চক্ষু, কর্ণ,—

এই বাক্য এবং মনেই (ব্রহ্মের প্রকাশ ;—

এরাই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার।)

তিনি আরো বললেন,—

'যা হতে জন্ম নিয়েছে বিশ্ব,—
যার দ্বারা বেঁচে আছে,—
প্রলয়ে আবার যাহার মধ্যে,—
নিঃশেষে হবে লয়।
তারি সন্ধান কর,—তুমি জেনো,—
তিনিই পরম ব্রহ্ম।'

এই উপদেশ পেয়ে,—তিনি তপস্যা করলেন। তপস্যা করে,—৩।১

দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ·····তপস্তপ্ত্বা।

তিনি জানলেন অন্ন ব্রহ্ম ;—
অন্নেই প্রাণ লভেছে জন্ম।
অন্নই প্রাণ বাঁচছে,—
অন্ন আবার ফিরে যায় শেষে,
প্রলয়ের মহালগ্নে।
(অন্নরূপ জড়সংঘাতেই বিশ্বরূপের জন্ম)

এই জ্ঞান লাভ করে তিনি আবার গেলেন, পিতা বরুণের কাছে ; বললেন—
ভগবন্, ব্রহ্মোপদেশ দাও গো আমায়,
বল ব্রহ্মের বাণী !

তিনি বললেন,—
তপস্যা করে ব্রহ্মের তুমি
লও পরিচয় জানি ! তপস্যাই ব্রহ্ম !
তিনি তপস্যা করলেন। তপস্যা করে,—৩।২

তৃতীয়োঽনুবাকঃ

প্রাণো ব্রহ্মেতি·····তপস্তপ্ত্বা। ৩।৩

জানলেন,—
প্রাণই ব্রহ্ম !
প্রাণেই জন্ম লভেছে বিশ্ব,—
প্রাণেই রয়েছে বেঁচে,
প্রাণেই আবার ফিরে চলে যাবে,
মহাপ্রলয়ের শেষে !

এই কথা জেনে তিনি পিতৃসকাশে গেলেন আবার, বললেন,—
ভগবন্,—ব্রহ্মোপদেশ দাও গো আমায়
বল ব্রহ্মের বাণী !
তিনি বললেন,—তপস্যা করে ব্রহ্মের তুমি।
লও পরিচয় জানি।—তপস্যাই ব্রহ্ম !
তিনি তপস্যা করলেন। তপস্যা করে,—৩।৩

চতুর্থোঽনুবাকঃ

'মনো ব্রহ্মেতি·············তপস্তপ্ত্বা। ৩।৪

জানলেন,—মনই ব্রহ্ম !
এ মহাবিশ্ব জন্ম নিয়েছে মনে,—
জাতক বিশ্ব মনেই রয়েছে বেঁচে।
মনেই আবার এবারে গিয়ে তারা
মনে মনে হয় লীন !

এই কথা জেনে তিনি,—
আবার গেলেন পিতৃসকাশে ;—বললেন,
ভগবন, ব্রহ্মোপদেশ দাও গো আমায়,
বল ব্রহ্মের বাণী !
তিনি বললেন,—তপস্যা করে।
ব্রহ্মের তুমি লও পরিচয় জানি।
তপস্যাই ব্রহ্ম !
তিনি তপস্যা করলেন,—তপস্যা করে,—

পঞ্চমোঽনুবাকঃ

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ·····স তপস্তপ্ত্বা।। ৩।৫

জানলেন,—জ্ঞানই ব্রহ্ম।
এই ভূতরাশি জ্ঞানেই জন্মে,
জ্ঞানেই রয়েছে বেঁচে।
সৃষ্টির শেষে,—আবার তাহারা
জ্ঞানেই প্রলীয়মাণ।
এই কথা জেনে তিনি,
আবার গেলেন, পিতা বরুণের কাছে,—বললেন,—
বলো বলো মোরে বলো ভগবন,
বলো ব্রহ্মের বাণী।

তিনি বললেন,—তপস্যা করে,
লও ব্রহ্মেরে জানি। তপস্যাই ব্রহ্ম।
তিনি তপস্যা করলেন। তপস্যা করে,—৩.৫

ষষ্ঠোঽনুবাকঃ

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ·····
মহান কীর্ত্যা ৩.৬

জানলেন,—আনন্দই ব্রহ্ম !
আনন্দরসে জন্ম নিয়েছে
নিখিল ভুবনরাশি।
সেই আনন্দে জীবন রয়েছে বেঁচে।
আনন্দে ফিরে চলবে আবার,
আনন্দে হবে লীন।

ভৃগু যাকে জেনেছিলেন,—
বরুণ যাকে বলেছিলেন,—
এই সেই ভার্গবী, সেই বারুণী বিদ্যা।
অন্নময়কোশ (স্থূলদেহ) হতে,
হৃদয়াকাশের আনন্দবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতা।

অন্ন হতে আনন্দে সঞ্চারিণী এই বিদ্যাকে,
যে এমনি করেই জানে, সার্থক তার প্রতিষ্ঠা। (ব্রহ্মে)
সে অন্নবান্, অন্নভোক্তা, ধনজনপুত্রপশুপরিবৃত।
ব্রহ্মতেজোদীপ্ত মহান।—মহান তার কীর্তি। [ক্রমশ।

অনুবাদিকা—চিত্রিতা দেবী

জওহরলাল ও বাঙলা

আজকের সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে যে দু'-তিনজনের নাম উল্লেখের দাবীদার তাঁদেরই মধ্যে একটি উজ্জ্বলতম নাম—জওহরলাল নেহরু। তাই, জওহরলালের প্রয়াণ বিশ্বরঙ্গমঞ্চ থেকে মহানায়কের মহাপ্রস্থানের সঙ্গে তুলনীয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কোটি কোটি নরনারী ব্যাকুল প্রত্যাশায় যে দু'-তিনজন কর্ণধারের দিকে তাকিয়ে আছে সারা ভারতের গর্ব ও গৌরব নেহরু তাঁদেরই একজন। নেহরু কি বলবেন—নেহরুজীর এ বিষয়ে মত কি—আচার্য নেহরু এ সম্বন্ধে কি উপদেশ দেন—এই চিন্তায় বিশ্ববাসীর আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাঁর অটুট ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বিশ্বসমাজে তাঁকে বিপুল শ্রদ্ধা ও পরম সমাদরের আসনে অধিষ্ঠিত করতে বেশি সময় নেয় নি। কিন্তু, এই বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তার সপ্তস্বর্গে সমারূঢ় থেকেও বিশ্বব্যাপী পটভূমির উপর তাঁর কর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্তর থেকে বাঙলা দেশ বিন্দুমাত্র স্থানচ্যুত হয় নি, তাঁর সহস্র কর্মব্যস্ত মনে বাঙলা দেশ সম্বন্ধে যে মনোভাব ছিল, তা তাঁর জীবনালোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বাঙলার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়, কোনপ্রকার রাজনীতির সম্পর্কের সূত্র ধরে নয়। সে সম্পর্ক হৃদয়ের। সে যেন এক নাড়ীর টান।

বাঙলা দেশের সঙ্গে নেহরু পরিবারের সম্পর্কের সূচনা করেছিলেন তাঁর দেশপূজ্য পিতৃদেব মোতিলাল নেহরু। অতএব দেখা যাচ্ছে এই সম্পর্ক পুরুষানুক্রমিক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সখ্যতার সূত্রে জড়িত ছিলেন মোতিলাল। দেশবন্ধুর সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব কম দৃঢ় ছিল না। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন। ১৯২৮ সালের কংগ্রেসের ঐতিহাসিক যে অধিবেশনে মোতিলাল পৌরোহিত্য করেন সুভাষচন্দ্রকে সেই অধিবেশনে দেশবাসী দেখেছেন সর্বাধিনায়করূপে। বাঙলার চিকিৎসককুলের সঙ্গে নেহরু-পরিবারের সংযোগ কম নয়। ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি দেশবিশ্রুত চিকিৎসকদল নেহরু-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বিধানচন্দ্রের চিকিৎসক হিসাবে নেহরু-পরিবারে আবির্ভাব পরবর্তীকালে রূপ নেয় অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে। নেহরু-রায়ের সম্পর্ক প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর ছিল না। ব্যক্তিগত অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের পারস্পরিক বন্ধনে পরস্পর ধরা দিয়েছিলেন। তাঁকে নাম ধরে ডাকবার অধিকার বাঙালী রাষ্ট্রনীতিবিদদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই ছিল। মৃত্যুর পূর্বে সহস্র চিন্তার মধ্যেও বিধানচন্দ্র খোঁজ নিতে ভোলেন নি নেহরুর স্বাস্থ্যের। জিজ্ঞেস করেছিলেন—নেহরুর শরীরটা কেমন যাচ্ছে—তাঁর প্রয়াণে নেহরু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন—'নিজেকে বড় অসহায় বোধ করছি।'

বাঙলা দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি নেহরু চিরদিনই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। সে সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। নতুন ভারতের রূপকার হিসাবে তিনি শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করেছেন রামমোহনের উদ্দেশে। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশে রচনার মাধ্যমে নেহরু যে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছেন তা শুধু নিছক ভাষার সমাবেশ বা উচ্ছাসসর্বস্ব নয়—সেই শ্রদ্ধার্ঘ তাঁর গভীর উপলব্ধি ও অনুভূতির পরিচয় সর্বতোভাবে বহন করছে। তাঁর শ্রদ্ধার আলোয়, ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতায় এবং বিশ্লেষণের কল্যাণে শ্রদ্ধার্ঘ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

গান্ধী-শিষ্য নেহরু রাষ্ট্রনেতা হিসাবে বিশ্ববরেণ্য হলেও প্রকৃতির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, চিন্তানায়ক, মনীষী। তিনি অকপটে বলেছেন যে, রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধী তাঁর দীক্ষাদাতা হলেও অন্তরের দিকে তিনি রবীন্দ্র অনুগামী। রবীন্দ্রভাবধারায় পুষ্ট তাঁর মন। এ কালের শ্রেষ্ঠপুরুষ নেহরু সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের চরণপ্রান্তে বসে জীবনের দীক্ষা নিয়ে নিজেকে ভরিয়ে তুলেছেন। কন্যা ইন্দিরাকে শিক্ষালাভের জন্য পাঠিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। পরম আগ্রহ সহকারে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছেন

বাঙলার দোসর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
['ইকনমিষ্ট' পত্রিকার সৌজন্যে]

রবীন্দ্রসঙ্গীত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করেছেন রবীন্দ্রবাণী। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে তিনি তরুণ ভারতের ঋতুরাজ। যত কিছু নির্জীবতা, প্রাণশূন্যতা, শুষ্কতা—তারই মধ্যস্থলে গুরুদেবের মতে জওহরলাল অফুরন্ত সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি, অনন্ত প্রাণের বার্তাবহ। বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের প্রাণ পুরুষ ছিলেন জওহরলাল। সহস্র কাজের ব্যস্ততায়, সারা বিশ্বের ভাবনার মধ্যে জড়িত থাকা সত্ত্বেও বছরে একবার করে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন তাঁর বন্ধ হয় নি। মহানগরীতেও তাঁর আগমনে কখনও ছেদ পড়ে নি। শান্তিনিকেতনে প্রতিবারই আচার্যের আনুষ্ঠানিক কাজগুলি শেষ করে সাক্ষাৎ করেছেন প্রিয়বন্ধু শিল্পাচার্য নন্দলালের সঙ্গে, করেছেন বন্ধুপত্নী শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে। রথীন্দ্রনাথ ছিলেন জওহরলালের বিশিষ্ট বন্ধুদের অন্যতম। পারিবারিক দিক দিয়েও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের আত্মীয় না হলেও তিনি কুটুম্ব পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। নেহরুর মন্ত্রিত্বকালে বিশ্বভারতী পরিণত হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত সরকার জাতীয়সঙ্গীত হিসাবে নির্বাচিত করলেন জনগণমন।

দেশবন্ধুর সম্বন্ধেও নেহরুজীর অন্তরে ছিল সুগভীর ভক্তি কলকাতায় এলেই স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ করতেন শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবীর সঙ্গে। তাঁর মৃত্যুতে বাসন্তী দেবী বলেছেন যে জওহরলাল ছিলেন তাঁর পুত্রতুল্য। মিহিজামে চিত্তরঞ্জনের পুণ্য নামযুক্ত ভারত-বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি নেহরু সরকারের এক উজ্জ্বল কীর্তি।

বসু-পরিবারের সঙ্গেও নেহরুর যোগাযোগ কম ছিল না। স্বাধীনতার পূর্বে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুও যোগ দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র আর জওহরলালের বন্ধুত্ব এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পরিণত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ধৃত সৈনিকদের স্বপক্ষে সওয়াল করেছিলেন ব্যারিস্টার জওহরলাল আর সেইদিনই দীর্ঘকাল পরে এবং শেষবারের মত ব্যারিস্টারীর গাউন তাঁর অঙ্গে শোভা পেয়েছিল। সুভাষচন্দ্রও বন্ধু হলেও জওহরলালকে অগ্রজের আসনে বসিয়ে সম্মানিত করেছেন।

১৯৫৭ সালে ডিসেম্বার মাসে কলকাতায় বাঙলার সাহিত্যিকবৃন্দ আয়োজিত নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে ভাষণদান করে গেছেন নেহরু। আধুনিক বাঙালী কলাসেবীরাও তাঁর সস্নেহ সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত নন। বাঙালী চলচ্চিত্র সেবীদের মধ্যে দেবিকারাণী, বিমল রায়, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ দিকপালের দল তাঁর প্রীতি ও স্নেহের সার্থক অধিকারী। বিশ্বখ্যাত শিল্পী রবিশঙ্করেরও একটি বিরাট ভাগ আছে এই প্রীতি ও স্নেহের মধ্যে। প্রথিতযশা কথাশিল্পী রাজ্যসভার সদস্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর প্রীতির প্রগাঢ়তা বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

নেহরু তাঁর মন্ত্রিসভায় একাধিক বঙ্গসন্তানকে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী,'' অশোককুমার সেন, হুমায়ুন কবির, সুরেন্দ্রকুমার দে, অরুণচন্দ্র গুহ, মনমোহন দাস অনিলকুমার চন্দ, পূর্ণেন্দুশেখর নস্কর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বাঙলার মেয়ে মনস্বিনী সরোজিনী নাইডুর পরিবারের সঙ্গেও নেহরুদের ছিল গভীর ঘনিষ্ঠতা। নেহরুজীর আমলে বাঙলার মেয়ে সরোজিনীকে দেখা গেল উত্তর প্রদেশের প্রদেশপাল রূপে, দেখা গেল বঙ্গসন্তান সুচেতা কৃপালনী ও বীরেন মিত্রকে উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী রূপে। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা রূপায়ণের ভার পড়ল সুকুমার সেন ও তাঁর মৃত্যুর পর শৈবাল গুপ্তের প্রতি। রাজধানীর মেয়রের আসন অলঙ্কৃতা করলেন অরুণ আসফ আলি,' স্থল ও বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়কের আসন অলঙ্কৃত হল যথাক্রমে জয়ন্তনাথ চৌধুরী

গুরু-শিষ্য : পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক সম্মেলনে, দীঘা খ্রী১১৩৩।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা। রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রতিনিধিত্বের ভার পেলেন বি এন চক্রবর্তী। ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব অর্পিত হল ডঃ বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় এবং ডক্টর সুধীরঞ্জন দাসের প্রতি। অডিটার জেনারেলের সম্মান অর্পিত হল অশোককুমার চন্দ এবং অরুণকুমার রায়ের প্রতি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হলেন পি সি ভট্টাচার্য, কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বগ্রহণ করলেন অতুল্য ঘোষ, বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক আকাশের একটি উজ্জ্বল তারকা। স্মরণ থাকতে পারে যে, কিছুকাল পূর্বে দমদম বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করেই নেহরুজী সরাসরি উপস্থিত হন রোগশয্যায়-শায়িত অতুল্য ঘোষকে দেখতে। এ ছাড়াও প্রশাসনিক ও কূটনৈতিকক্ষেত্রে নেহরুর আমলে আরও অসংখ্য বাঙালী মর্যাদা ও স্বীকৃতিলাভ করেছেন। এ ছাড়াও এই সতের বছরে তাঁর সরকার বহু বাঙালী গুণিজনকে তাঁদের সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ নানাভাবে সম্বর্ধিত করেছেন।

নেহরুজী আজ নেই। তাঁর প্রয়াণে সারা বাঙলা আজ শোকস্তব্ধ। স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম অক্লান্ত যোদ্ধা মহানায়ক নেহরুর অভাবে বাঙলার বেদনা আজ অবর্ণনীয়। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ভারতের অবিসম্বাদিত কর্ণধার, বাঙলার পরমবন্ধু জওহরলাল নেহরুর অমর স্মৃতির উদ্দেশে আমরা সুগভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করি।

—সুকল্যাণ শর্মা।

নেহরু-হত্যা-রহস্য

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পরলোকগমনে আমার মনে এক নিদারুণ আশঙ্কার ছায়া পড়েছে। আপনারা বলবেন, আশঙ্কা তো' সকলেরই মনে। পণ্ডিতজী স্বাধীনতা-উত্তরকালে গত সতেরো বছর ধরে অদ্বিতীয় সূর্যের মতই আমাদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সর্বজন-সম্মত একক নায়করূপে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছিলেন আমাদের ভাগ্য। গান্ধীজীর যথার্থ উত্তরসাধক জওহরলালের নিশ্চিত নেতৃত্বের ছায়ায় আমরা পরম শান্তিতে ছিলাম। কী দেশের অভ্যন্তরে, কী বাইরে, নেহরু ছিলেন ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি। এই নিধিকে হারিয়ে ভারতের জনগণ আজ শোকার্ত ও বিচলিত। সকলের মনেই আজ এক আশঙ্কা, এরপর কী হবে? এই দেশ কী আবার এক বিশ্বস্ত অধিনায়ক খুঁজে পাবে? কে সেই শক্তিধর? নেহরুর পর কে?

নেহরুর পর K, সেইটিই বড় কথা। কেনেডি বিদায় নিয়েছেন,

স্বর্গত প্রধানমন্ত্রীর মরদেহের সম্মুখে শোকসন্তপ্তা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয়কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

নেহরুও চলে গেলেন। বাকি আছেন ক্রুশ্চেভ বা সংক্ষেপে যিনি K। শান্তির দুই দূত যখন তিরোহিত, তখন অনিবার্যভাবেই তিনি অপ্রসাঙ্গল। নেহরুর পর তাই K, সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই, থাকতে পারে না।

আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন, অকারণে কথাটা ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে, সমস্যাটা তা ঠিক নয়। নেহরুর পর কে মানে হ'ল তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে। তার জবাবে বলতে হয় যে এটা কোনও সমস্যাই নয়। নেহরু নেই প্রধানমন্ত্রীরূপে এটা একটি ঘটনা, আর তাঁর অবর্তমানে অন্য এক ব্যক্তি আসবেন সেই পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এটা একটি দুর্ঘটনা মাত্র। দুর্ঘটনা এই কারণে যে, পণ্ডিতজীর বিকল্পরূপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এমন কোনও ব্যক্তি ঠিক এই সময়ে ভারতবর্ষে নেই, অন্তত নেই রাজনৈতিক জগতে। চার্চিল অবসর গ্রহণ করার পর ইংলণ্ডে প্রধানমন্ত্রী আসছেন, যাচ্ছেন, কিন্তু চার্চিলের সমকক্ষ কে এসেছেন? কে আসতে পারেন?

আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রচলিত। শুধু গণতন্ত্র নয়, এদেশের গণতন্ত্র পার্টি-গণতন্ত্র। কাজেই, এক প্রধানমন্ত্রীর স্থলে আর এক প্রধানমন্ত্রী আসবেন, আসবেনই নিয়মানুমিক পদ্ধতিতে। দলপতি নির্বাচনে নেতাদের মধ্যে যতই প্রচ্ছন্ন স্বার্থান্বেষণ থাকুক না কেন, কার্যকালে সকল বিরোধী শক্তিকে হতাশ করে, প্রতিটি মূর্খ সমালোচককে নির্বাক করে এক সর্ববাদিসম্মত অদ্বিতীয় দলপতি সকালের পূর্বের মতই নিশ্চিন্তে দেখা দেবেন। (আমার এ লেখা পড়ার সময় এই কথার প্রমাণ আপনাদেরই হাতে থাকবে!) বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসকে যাঁরা ভিতর থেকে জানেন, যাঁরা ভিতরে ভিতরে জানেন, তাঁদের ভিতরে এই নিয়ে কোনও উদ্বেগ নেই, নেই কোনও শঙ্কা! কাজেই, আমার আশঙ্কা সেদিক থেকে নয়।

আমার আশঙ্কার মূল অনুসন্ধান করতে হলে চলে যেতে হবে ষোলো বছর আগেকার এক বিষ শীতের সন্ধ্যায়, দিল্লী নগরীরই এক প্রাসাদ-উদ্যানে—ইতিহাসকে সচকিত করে যেদিন গান্ধীজীকে আমরা হত্যা করেছিলাম। অতি অকস্মাৎ, অতি সংক্ষেপে তিনটি মাত্র গুলীতে ত্রিশ কোটিরও বেশি মানুষের প্রাণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘাতক নাথুরাম ছিল আমাদেরই মধ্যে একজন, নিমিত্তমাত্র। তার পিছনে ছিল আরও অনেকে। ত্রিশ কোটি জনতার ভিড়ে তাদের সকলকে চিনতে পারা সম্ভব হয় নি।

সেইদিনই রাত্রে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পণ্ডিতজী বলেছিলেন, Light is out. এই কথাটা যে আমরা এত lightly নেবো, নিশ্চয়ই সেটা ধারণা করতে তিনি পারেন নি সেদিন, পরবর্তীকালেও বোধ করি, না। যদি তা না হ'ত তা হলে আজ ষোলো বছর পরে আমরা একই শোকাবহ দৃশ্যের পুনরভিনয় করতে পারতাম না। গান্ধীজীর পর যে আলো জ্বালাতে চেয়েছিলেন তাঁর মানসপুত্র জওহরলাল, সে আলো নিভিয়ে দিতাম না এমন করে।

এত নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুরভাবে আমরা হত্যা করতে পারতুম না আমাদের পরমপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীকে।

যতই আপত্তিকর শোনাক না কেন কথাটা, আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে নেহরুকে আমরা হত্যা করেছি। গান্ধীজীর মত সর্বসমক্ষে আকস্মিক ক্ষিপ্রতায় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় নি। এই ঐতিহাসিক

শ্রীনেহরুর মৃতদেহবাহী শকট প্রধানমন্ত্রীর ভবন হইতে বাহির করা হইতেছে

নিধন-যজ্ঞ বহু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গান্ধীজীকে অবলীলাক্রমে আর পণ্ডিতজীকে অবহেলাক্রমে হত্যা করেছি আমরা। দিনে দিনে, তিলে তিলে, এই মহানায়ক নিয়ে চলেছিলেন আমাদের মহিমান্বিত জীবনের দিকে, আর দিনে, দিনে তিলে তিলে, এক মর্মান্তিক মৃত্যুর দিকে তাঁকে আমরা ঠেলে দিয়েছি। আমরা তাঁকে উত্যক্ত করেছি ছোট-বড় অধিকারের দাবীতে, যুক্তিহীন প্রশ্নে ক্লান্ত করেছি তাঁর চিন্তাশক্তিকে, প্রতিবাদের প্রতিবন্ধকে দুর্গম করেছি তাঁর যাত্রাপথ। তিনি মহাসৈনিক, তাই তিনি বিশ্রাম চান নি। আর আমরাও রাতের পর রাত তাঁর নিদ্রাহরণ করেছি। গান্ধীজীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গিয়েছিল। দারুণ অন্ধকারে আমাদের নজরেই আসে নি এসব।

আর আজ? শান্তিঘাটের চিতার আগুনে অনেক কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যায়। সে আগুন নেভাতে শোকোচ্ছ্বাসের প্লাবন দিকে দিকে। শান্তির দূত নেহরুর তিরোধানে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবে, তাই বিদেশী কণ্ঠে আজ গভীর উৎকণ্ঠা। তাঁর আরব্ধকর্ম সম্পূর্ণ করতে হবে, তাই দেশী-অন্তরে কঠোর প্রতিজ্ঞা। শত্রুমুখে আজ আপোষের বাণী বিভেদ ও অবিশ্বাস ভুলে যাওয়ার আবেদন। অথচ, জীবনকালে নেহরুর শান্তির বাণী বারবার উপেক্ষিত হয়েছে, এমন কি রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারেও। নিজ দেশে দেশ গঠনের কাজে বারে বারে পদে পদে সৃষ্টি হয়েছে বাধা, সক্রিয় অসহযোগ। গণতন্ত্রের প্রধান উদ্গাতার দেশে গণতন্ত্রের নামে স্বার্থান্বেষণ, গণ-আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলার অহরহ প্রকাশে যাদের ছিল অনলস প্রচেষ্টা—তাদের মুখেও আজ শোকবার্তা, তাদের চোখেও আজ কুম্ভীরাশ্রু! সেদিনকার ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা একটি নাথুরামের মতই, আজ কত নাথুরাম আপনার-আমার চারপাশে মিশিয়ে আছে। আপন-পর চেনা দায়।

অফুরন্ত প্রাণের সম্পদে মৃত্যুর বিপদকে ম্লান করে রেখেছিলেন তিনি। বিশ্বাসঘাতক চীনের মুখোস খোলার পর থেকেই যেন মুখোস দিয়ে ঢেকে গেল তাঁর মুখ। চির-যৌবনের প্রতীক নেহরুর মুখে বয়সের মুখোস প্রত্যক্ষ করলাম আমরা। দেখলাম পর পর—কোলকাতার ময়দানের শেষ সভায়, ভুবনেশ্বরের কংগ্রেসী আসরে… ছায়াচ্ছন্ন তাঁর সেই সূর্যমুখ। দেখলাম, তিনি কত বদলে গেছেন।

কিন্তু, দেখেও দেখলাম না আমরা। কেন দেখলাম না? কেন তাঁকে বিশ্রাম দিলাম না? কেন আমরা তাঁর আরব্ধকর্ম পূরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হলাম না তাঁকে সামনে রেখে, তাঁকে পিছনে

প্রধানমন্ত্রীর গৃহের রুদ্ধ-দুয়ারের পিছনে উদ্বেগাকুল নর-নারীর ভিড়

রেখে যা করব বলে আজ এত সোরগোল তুলছি? হঠাৎ কেন তাঁকে হেরাছুনের উন্মুক্ত উচ্চতা থেকে নামিয়ে আনা হল দিল্লীর উষ্ণ কারাগারে? (রক্তের চাপবৃদ্ধির ফলেই তাঁর আকস্মিক লোকান্তর সম্ভব হয়েছে! রক্তের চাপ কেন বাড়ে, কি কি কারণে বাড়ে তা আপনার-আমার অজানা নয়!) এ দায়িত্ব কার? কাদের? কোন, কোন নাথুরামের? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

হয় তো ইতিহাস দেবে একদিন। কাল-ই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, নির্ভুল কষ্টিপাথর! আজ হয়ত আমরা ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না সব কিছু। আমরা আমাদের উদ্বেল হৃদয় নিয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গে আছড়ে পড়েছি প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহের তোরণ-দ্বারে, তাঁর শোকযাত্রার কিনারায়-কিনারায়। সেখানেও যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা ও অশালীনতা প্রকাশ পেয়েছে আমাদের আচরণে। শেষ পর্যন্ত ঘাতক-জনতার মধ্য থেকে ভিড়ে পিষ্ট হয়ে লুটিয়ে পড়েছে তিনটি মৃতদেহ, নাথুরামের হাত থেকে নিঃসৃত গান্ধী-ঘাতী তিনটি বুলেটের খোলের মতই।

ষোলো বছরেও আমরা বদলাই নি। আমাদের জহ্লাদ-বৃত্তি আজও গেল না। তাই আমার শঙ্কা। বিষণ্ণ শীতের সন্ধ্যায় নয়, অবসন্ন গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নেই এবার আঁধার নেমেছে। নিভে গেছে আলো। এবারের ঘাতক কে? কে, কে? পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আমরা খুঁজে মরছি।

ষোলো বছর আগেকার তিনটি বুলেটের খোল আর আজকের এই তিনটি মানুষের খোলে চরিত্রগত কোনও ভেদ নেই। সেই অকৃত্রিম তিন, একই ত্র্যহস্পর্শ। তিনে-তিনে ছয় বা নয়, আঙ্কিক হিসাবে দু'টোই খাঁটি। আমাদের ভাগ্যে বুঝি এবার একসঙ্গে নয়-ছয়ের পালা।

শুধু তাই নয়। হিউজ-কোসিগিন-রাঙ্কের ত্র্যহস্পর্শে দিল্লী নগরীতে মৃদু ভূমিকম্প ইতিমধ্যেই অনুভূত হয়েছে। ত্রিমূর্তি মার্গে অমরমূর্তি নেহরুর অন্তিম শোকযাত্রার পাশে এই ত্রিমূর্তির ত্র্যহস্পর্শ সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। তারও জন্ম আমার মনে আশঙ্কার ছায়া।

—জ্যোতিপ্রসাদ বসু

প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ লণ্ডনের সংবাদপত্রে কিভাবে প্রকাশিত

সেই স্মরণীয় দিনগুলি

(নেহরু-জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনা)

[গভীর দুঃখের সঙ্গেই লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে যে, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠমানব আচার্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লোকান্তরিত হয়েছেন। নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। মানুষের বিচার, বিশ্লেষণ, নিন্দা, স্তুতি থেকে নতুন ভারতের রূপকার জনগণবন্দিত এই মহান দেশনায়ক আজ বহু উর্ধ্বে। তাঁর পঁচাত্তর বছরের জীবন দেশমুক্তির দুর্বার তপস্যার অক্লান্ত কর্মের এবং নবভারত রূপায়ণের এ অসামান্য প্রামাণ্য ইতিহাস। সেই ত্যাগব্রতী ঘটনাবহুল প্রেরণাদায়ক জীবনের বিস্তারিত বিবরণ অল্পপরিসরে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। তাই স্বর্গত মহান দেশনায়কের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ তাঁর মহান জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরা হ'ল।—স]

১৮৮৯—১৪ই নভেম্বর জন্ম। জন্মস্থান—এলাহাবাদ। পিতা—মতিলাল নেহরু। মাতা—স্বরূপরাণী নেহরু।

১৯০০—ভগ্নী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের জন্ম।

১৯০৫—উচ্চ শিক্ষার্থে বিলাত যাত্রা।

১৯০৭—ভগ্নী শ্রীমতী কৃষ্ণা হাতী সিংয়ের জন্ম। কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যোগদান।

১৯১০—প্রকৃতি বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ।

১৯১২—শিক্ষা সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯১৬—কমলা দেবীর সহিত বিবাহ। লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান। মহাত্মা গান্ধীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ।

১৯১৭—কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম।

১৯১৮—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য হিসাবে মনোনীত।

১৯২২—প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষে আগমনের বিপক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও কারাবরণ। আগষ্ট মাসে মুক্তিলাভ এবং অক্টোবর মাসে বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও পুনর্বার গ্রেপ্তারবরণ।

১৯২৩—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক নির্বাচিত। আইন অমান্য আন্দোলন ও গ্রেপ্তারবরণ।

১৯২৭—মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে স্বাধীনতার দাবী পেশ। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯২৯—কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচিত।

১৯৩০—লবণ সত্যাগ্রহ ও কারাবরণ।

১৯৩১—পিতৃবিয়োগ।

১৯৩২—উত্তর-প্রদেশের ভূমি আন্দোলন এবং কারাবরণ ও দুই বছর গ্রেপ্তারবরণ।

দম্পতী নেহরু

১৯৩৪—কলিকাতায় আপত্তিজনক ভাষণদানের জন্য দুই বছর কারাদণ্ড।

১৯৩৬—পত্নীবিয়োগ। নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৩৭—মাতৃবিয়োগ। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিপদে পুনর্নিয়োগ।

১৯৪০—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ এবং কারাবরণ।

১৯৪১—জেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মুক্তিলাভ।

১৯৪২—বিখ্যাত আগস্ট আন্দোলন সুরু হবার প্রাক্কালে কারাবরণ। কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিবাহ।

১৯৪৪—ভগ্নীপতি রঞ্জিত পণ্ডিতের মৃত্যু।

১৯৪৫—তিন বছর পর বন্দিত্ব থেকে মুক্তিলাভ। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বীর সৈন্যদের বিচার। নেহরুর সওয়াল।

১৯৪৬—নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচিত। দিল্লীতে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান।

১৯৪৭—ভারত বিভাগ। বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা লাভ। দিল্লীতে এশিয়া সম্মেলন আহ্বান। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ।

১৯৫০—পাক-ভারত বিরোধ অবসানের জন্যে করাচী গমন। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি।

পিতৃবিয়োগে শোকসন্তপ্তা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

১৯৫১—নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত। সভাপতির বক্তৃতাদান।

১৯৫৩—ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে ভাষণ।

১৯৫৪—ডাক-টিকিট শতবার্ষিকী উদ্বোধন। পাঞ্জাবে ভাকরা নাঙ্গাল খালের উদ্বোধন। চীন গমন। উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিনের সহিত সাক্ষাৎকার। নেহরু ও চৌ এন লাই-এর যুক্ত বিবৃতি। পঞ্চশীল ঘোষণা

১৯৫৫—ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে আফ্রিকা ও এশিয়ার উনত্রিশটি রাষ্ট্রের সম্মেলন। নেহরু কর্তৃক ভাষণদান ও অংশগ্রহণ। পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণ। সোভিয়েত দেশ যাত্রা। নেহরু কর্তৃক নয়াদিল্লীতে ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিনের সম্বর্ধনা 'ভারতরত্ন' সম্মানলাভ।

১৯৫৬—নেহরু কর্তৃক লোকসভায় বৃটেন ও ফরাসীদের সুয়েজ খাল আক্রমণের নিন্দা।

১৯৫৭—দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন ও কংগ্রেসের নেতা হিসাবে নেহরুর মন্ত্রিসভা গঠন। স্বাধীনতা সংগ্রাম শতবার্ষিকী উৎসবে নেহরুর বক্তৃতাদান। মাইথন বাঁধ ও দামোদর করপোরেশনের উদ্বোধন।

১৯৫৮—দিল্লীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নূনের সহিত আলোচনা ও সীমান্ত সম্পর্কে যুক্ত ইস্তাহার। নয়াদিল্লীতে ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি মিনের সহিত সাক্ষাৎকার। দিল্লীতে নেহরু ও তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডারেস সাক্ষাৎকার।

১৯৫৮—দালাই লামার ভারত আগমন। নেহরু কর্তৃক আশ্রয়-দান। ম্যাকম্যাহন লাইনকে চীন-সরকার ভারত-চীন আন্তর্জাতিক সীমারেখা বলে মানতে রাজি নয় বলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট চীনের প্রধানমন্ত্রীর পত্র প্রেরণ।

১৯৬০—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারের ভারত সফর। নেহরুর সহিত আলোচনা। বিলাত গমন। কায়রোতে নেহরু-নাসের আলোচনা। নেহরুর পশ্চিম-পাকিস্তান সফর। সিন্ধুনদের জলচুক্তিতে স্বাক্ষর। রাষ্ট্রসভার সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্যে নিউইয়র্ক গমন। জামাতা ফিরোজ গান্ধীর মৃত্যু।

১৯৬০-৬১—কমনওয়েলথস প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের জন্য লণ্ডন গমন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো ভ্রমণ। বেলগ্রেড নিরপেক্ষ শীর্ষ-সম্মেলনে যোগদান।

১৯৬২—তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন ও তৃতীয়বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত। আকস্মিক অসুস্থ ও বিশ্রামের জন্য কাশ্মীর গমন। কলম্বো যাত্রা, চীনকে ভারত থেকে বিতাড়নের কঠোর নির্দেশ। চীনের ভারত আক্রমণ, নেহরুর বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ।

১৯৬৩—কামরাজ পরিকল্পনায় আগ্রহ।

১৯৬৪—ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে অসুস্থ। নেহরুর সাংবাদিক-সম্মেলন। ২৭শে মে, ৭৫ বছর বয়সে নয়াদিল্লীতে মহাপ্রয়াণ।

—তথ্যবিদ সংগৃহীত

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

সাতাশ

বাহিরের বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসে কাঠুরে চৌধুরী দময়ন্তীর কথা ভাবছিল। রাঁচি থেকে ফিরে আসবার পরে সে আরও গম্ভীর আরও বিষণ্ণ হয়েছে, আরও কম সময় সে এই বারান্দায় এসে বসে। মাঝে মাঝে সে নিচের কাঁকরের রাস্তার উপরেও নামত। বিকেলবেলায় হেঁটে বেড়াত খানিকক্ষণ। অনেকদিন সে তার গুদাম থেকে ফেরার সময় তাকে বাহিরেই দেখতে পেয়েছে। আজকাল আর তাকে বাহিরে দেখতে পাওয়া যায় না। আজকাল সে ঘরের ভিতরে জগদীশের পাশেই বেশি বসে থাকে। কাঠুরে চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে অত্যন্ত গুণে গুণে।

দময়ন্তীর এই পরিবর্তনের কারণ কি, বসে বসে সে তাই ভাবছিল। হাতে চুরুট আছে, সে চুরুট পুড়ে ছাই হচ্ছে, সেদিকে তার লক্ষ্য নেই। তারই কোন অপরাধ হল কি না সেই কথাই কাঠুরে চৌধুরী ভাবছিল।

কোন অপরাধের কথা কাঠুরে চৌধুরীর মনে পড়ল না। ছোটখাট অপরাধের তো হিসেব থাকে না, আর অজ্ঞানে যে অপরাধ হয় তার খবরও কেউ রাখে না। মানুষের কথা হল সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস। এই কথার জন্যেই মানুষ মানুষের প্রিয়-অপ্রিয় হয়, কথা দিয়েই মান-অপমান, কলহ-সন্ধি হয়, রাগ-অনুরাগও প্রকাশ করে কথা দিয়ে। কথা না থাকলে মানুষের সমাজ চলত না। কাঠুরে চৌধুরী মনে করতে পারে না, এই কথা দিয়ে সে কোনদিন তাকে আঘাত করেছিল কি না।

বোধ হয় করেছে। সে কোনদিন ভেবে কথা বলে না। যা মনে আসে তাই সে বলে ফেলে। এই দোষের জন্য তার বন্ধু হয় না, বিবাদ হয় সকলের সঙ্গে। অথচ তার বিবাদ করবার বাসনা তো কারও সঙ্গে নেই। যাদের সঙ্গে শুধু কাজের সম্বন্ধ তারা তাকে ভালবাসে। ঠাকুরসাহেব তাকে ভালবেসেছিলেন, ভালবেসেছিলেন গ্রে সাহেব। তার গুদামের লোকেরাও তাকে ভালবাসে। যে ফাঁকি দেয় তাকে যেমন লাথি মারে, তেমনি যে কাজ করে তাকে নেয় বুকের ভিতর টেনে। কাজের পরিমাণ দেখে যেমন মজুরি দেয়, তেমনি উপরি পয়সা দেয় কাজে অনুরাগ দেখে। কাজ করতে যারা ভালবাসে, কাঠুরে চৌধুরীর কাছে তাদের অফুরন্ত আদর।

কাঠুরে চৌধুরী ভেবে দেখল, জগদীশকেও সে কোন অপ্রিয় কথা বলে নি। শুধু তাদের চলে যেতে বাধা দিয়েছে। সে তো নিজের ইচ্ছায় দেয় নি, দিয়েছে ডাক্তারের কথায়। ডাক্তার সেন বলেছেন এখন তাকে নড়ানো উচিত হবে না। এখন একভাবে শুয়ে থাকা ভাল। আর দময়ন্তী যখন এখানে আছে, তখন তার কিসের কষ্ট। সে তো সবই জানে, সবই পারে, বোঝেও সবই। জগদীশকে সে কি বোঝাতে পারে না!

কাঠুরে চৌধুরীর মনে হল, দময়ন্তী নিজেই তাকে ভুল বুঝেছে। হয় তো তার কোন কথায় কিংবা আচরণে সে আহত হয়েছে। প্রতিবাদ করে নি, শুধু মুখ বুজে সয়ে গেছে। ছিঃ ছিঃ! একজন অসহায় মহিলার সম্মান সে রাখতে পারল না! তার আশ্রয়ে আছে বলেই তাকে অপমান করল! ধিক তাকে। এর চেয়ে নীচ কাজ আর কি হতে পারে! গ্রে সাহেবও এই কথা বলতেন, আশ্রয় দিয়ে যে দাম চায় সে শয়তান। আশ্রয় কাউকে দিও না, দিলে তার পূজো করবে দু'বেলায়। সেই তোমার দেবতা।

খৃস্টান গ্রে সাহেবের মুখে এ কথা শুনে কাঠুরে চৌধুরী আশ্চর্য হত। অতিথি নারায়ণ, এ হল হিন্দুদের কথা। দীর্ঘদিন এদেশে থেকে গ্রে সাহেব কি হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন!

বুড়ো এ কথাও বলতেন যে এ যুগে ভালমানুষের কোন দাম নেই। ভালমানুষি তোমার বাড়িতে রেখে বের হবে। বাহিরের পৃথিবীতে ভালমানুষি দেখিয়েছ কি মরেছ। লোকে তোমাকে বোকা ভাববে, ঠকিয়ে নেবে, তারপর বদনাম করবে। কাজে কড়া হও, কঠিন হও, নিষ্ঠুর হও। লোকে তোমার সুখ্যাতি করবে। দয়ার একটু ছিটেফোঁটা পেয়েই লোকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে।

গ্রে সাহেব বলতেন, এ নিয়ম তোমার-আমার জন্যে। সমাজে যদি প্রতিষ্ঠা চাও তো অন্য নিয়ম। তার জন্যে দল পাকাও, মিথ্যা বল, দুনিয়ার সমস্ত অন্যায়কে অন্ধভাবে প্রশ্রয় দাও। পারবে না?

কাঠুরে চৌধুরী এ প্রশ্নের উত্তর দিত না।

সাহেব বলতেন: চৌধুরী, ক্ষমতার লোভই সবচেয়ে বড় লোভ। সে লোভের এমন নেশা যে কোন প্রলোভনেই মন ভোলে না। মদ, মেয়েমানুষ, টাকা সবই ঐ ক্ষমতার লোভের কাছে মাথা হেঁট করে। মার না খেলে এ লোভ যায় না। সে নিন্দার মার নয়, চাবুকেরও নয়, সে মার যমের মার। যম যখন মাথার শিয়রে এসে দাঁড়ায়, বলে উঠেছ কি এই দণ্ড দেখ। শুধু তখনই হয় লোভের ফণা নিচু!

কাঠুরে চৌধুরী বলেছিল: তাতেও বোধ হয় হয় না।

ঢক-ঢক করে আরও খানিকটা মদ খেয়ে গ্রে সাহেব বলেছিলেন:

ঠিক বলেছ। অতর্কিত মৃত্যুকে তারা ভয় পায় না। ভয় পায় মা হত্যার ষড়যন্ত্রকে।

তবে ?

কঠিন রোগে যখন শয্যাশায়ী হয়, আর ডাক্তার বলে, না, উঠেছ কি মরেছ, তখনই পরিবর্তন আসে।

একটু থেমে গ্রে সাহেব বলতেন: ভগবানের লোভের চেয়ে ক্ষমতার লোভ এইখানেই খাটো। যমদূত এসে যখন মাথার শিয়রে দাঁড়ায়, তাকে তখন ভয়ঙ্কর মনে হয় না। হাতজোড় করে বলে হে সুন্দর, তুমি কি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে এসেছ ?

ক্ষমতার লোভ ছিল না কাঠুরে চৌধুরীর, ভগবানের লোভও না। কিসে তার লোভ, আজও সে কথা সে ভেবে পায় নি। বোধ হয় কোনদিন ভেবেও দেখে নি। নিতান্তই সাময়িক তার বাসনা, কামনা। তাকে লোভ বলে না। কাজ নেই, এই বারান্দায় বসে বসে আকণ্ঠ মদ গিলেছে। ওরাঁওরা নিমন্ত্রণ করেছে তাদের গ্রামে, সে তাদের সঙ্গে মদ খেয়ে নেচে এসেছে। জঙ্গল যখন ভাল লাগে নি, তখন শহরে গেছে। পুরুষের সান্নিধ্য যখন তিক্ত মনে হয়েছে, তখন ডেকেছে মেয়েমানুষ। যখন সবকিছুতে ঘেন্না হয়েছে, তখন ভগবানের কথা ভেবেছে। পৃথিবীতে কি ভগবান নেই ? কে দেখেছে ভগবান ? ভগবান যেন ভূতের মতো। সকলেই আছে বলে, কিন্তু দেখে নি কেউ। ভূত থাকলে গ্রে সাহেব কি ভূত হয়ে সামনে আসতেন না ? তাঁর এত সাধের ব্যবসার কথা কি একেবারেই ভুলে যেতেন !

তার মনের গোপনে কোন গভীর বাসনা লুকিয়ে আছে কি না, কাঠুরে চৌধুরী তা ধরতে পারল না। দময়ন্তীরা কি তার সততায় সন্দেহ করছে !

কাঠুরে চৌধুরীর হঠাৎ অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ল। বোধ হয় সে তাদের দুর্ঘটনার দু' একদিন পরের কথা। অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে দময়ন্তী বলেছিল: আপনাকে একটা অনুরোধ করতে আমার খুবই লজ্জা করছে।

এই রকম কথার উত্তরে কি বলা উচিত কাঠুরে চৌধুরী তা ভেবে পায় নি। বলেছিল: বলুন না।

আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

নিশ্চয়ই না।

দময়ন্তী তবু সঙ্কোচ করেছিল বলতে। আর কাঠুরে চৌধুরী করুণ-ভাবে বলেছিল: আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না।

না না, বিশ্বাসের কথা নয়, এ বড় লজ্জার কথা। আমার প্রস্তাব শুনে আপনি হয় তো হাসবেন।

হাসব না।

দময়ন্তী একটু সহজ হবার চেষ্টা করে বলেছিল: আপনার সঙ্গে যে আমার পুরনো পরিচয়, এ কথা প্রকাশ করবেন না।

এই কথা। এর জন্যে এত লজ্জা !

প্রতিশ্রুতি দিতে কাঠুরে চৌধুরী একমুহূর্ত দ্বিধা করে নি। কিন্তু এই অনুরোধের অর্থ সে আজও বোঝে নি। এতো তাদের কলঙ্কের কথা নয়, পূর্বরাগেরও কাহিনী নয়। এ শুধুই পরিচয়ের কথা। প্রকাশ হলে কি দময়ন্তীর ক্ষতি হবে! কে জানে।

মানুষের চরিত্র যে কত বিচিত্র হতে পারে কাঠুরে চৌধুরী সেই কথাই ভাবছিল। নরোত্তম খেমকানির বাড়িতে এই দময়ন্তীকে দেখে যে তাকে কত সরল কত কোমল ভেবেছিল। তাকে আজ কোনমতেই চেনা যায় না। মেয়েটা সত্যিই বদলে গেছে। শক্ত হয়েছে, কঠিন হয়েছে। বুদ্ধিও হয়েছে আগের চেয়ে পাকা। কাঠুরে চৌধুরী আজ আর তার মনের থৈ পাচ্ছে না।

এর জন্যে দময়ন্তীকে দোষ দেওয়া যায় না। জীবনের শুরুতেই সে অনেকগুলো কঠিন ধাক্কা পেল। স্বামী যদি পঙ্গু হয়ে যায় তো তার জীবনটাই তো শুকিয়ে যাবে। কি নিয়ে বাঁচবে সে, কেমন করে বাঁচবে।

কিছুদিন থেকে এই দময়ন্তী তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। হাসে না, ভাল করে কথা কয় না, আগের মতো তার কাছে এসেও বসে না। কি একটা হয়েছে, কি একটা নূতন বেদনা। সেই বেদনার কথা বলতে না পেরে যন্ত্রণা বুঝি আরও বেড়েছে।

কাঠুরে চৌধুরীর মনে হল দময়ন্তী আজও ছেলেমানুষ আছে আগের মতোই। কেঁদে যে হাল্কা হওয়া যায়, সে কথাও তার মনে আসছে না। তাকেও সে এ কথা মনে করিয়ে দেবার সুযোগ দিচ্ছে না। এ কার উপরে অভিমান!

সহসা কাঠুরে চৌধুরী দেখল, দময়ন্তী তার ঘর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসছে। বারান্দার ওধারটায় অন্ধকার বেশি। খোলা দরজা দিয়ে যে আলো আসছে, সেই আলোতে দময়ন্তীকে দেখা গেল।

কাঠুরে চৌধুরীর কি মনে এল সেই জানে, লাফিয়ে উঠে এগিয়ে এল। খপ করে দময়ন্তীর একটা হাত চেপে ধরে বলল: আসুন এইদিকে।

দময়ন্তী এই আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। চমকে উঠেছিল, কিন্তু আর্তনাদ করে ওঠে নি। কাঠুরে চৌধুরীকে চিনতে পেরে নিঃশব্দে একটা অনুরোধ করেছিল। সে কথায় নয়, সে কাজে। যে হাতখানা মুক্ত ছিল, সেই হাতের তর্জনী ঠেকাল নিজের ঠোঁটে। নিঃশব্দ অনুরোধ—কথা বলবেন না।

বারান্দার অপরপ্রান্তে টেনে এনে দময়ন্তীকে কাঠুরে চৌধুরী একটা ডেক-চেয়ারে বসিয়ে দিল, নিজে বসল অন্যটায়। কিন্তু আর কোন কথা কইল না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দময়ন্তী বলল: আপনাকে কথা কইতে কেন বারণ করলাম জিজ্ঞেস করলেন না ?

উত্তর সে নিজেই দিল: ও একটু ঘুমিয়েছে। জাগলেই আমাকে তার পাশে গিয়ে বসতে হবে।

কাঠুরে চৌধুরী আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। জগদীশ এই কথা বলেছে, না দময়ন্তী স্বেচ্ছায় এ কাজ করে!

দময়ন্তী অন্য কথা বলল: খানিকক্ষণ আপনি জোরে জোরে হাসবেন না।

সংক্ষেপে কাঠুরে চৌধুরী বলল: বুঝেছি।

বোঝেন নি আপনি বুঝতে পারবেন না।

দময়ন্তীর গলার স্বর কান্নার মতো থমথমে শোনাল। কাঠুরে চৌধুরী প্রতিবাদ করতে পারল না।

অনেকক্ষণ পরে দময়ন্তী বলল : আপনি তো সুস্থ মানুষ, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আমি কি ভুল বুঝেছি আপনাকে ?

তা না হলে আপনি আমার ওপর কেন রাগ করলেন ?

কই, আমি তো রাগ করি নি।

করেছেন। আমার ওপরেই আপনি রাগ করেছেন। কিন্তু আমার কথা একবার ভেবেছেন কি ? কত অসহায় আমি ! কত নিরুপায় !

দময়ন্তী দু'হাতে তার মুখ ঢাকল।

বিস্ময়ে কাঠুরে চৌধুরী আজ হতবাক হয়ে গেছে। এত ব্যথা ছিল, এত অভিমান ছিল দময়ন্তীর মনে। কিছুই সে জানতে পারে নি।

উত্তেজনায় কাঠুরে চৌধুরী উঠে দাঁড়াল, খামখেয়ালির মতো পায়চারি করল অল্প একটু জায়গায়, তারপর বসে পড়ল।

দময়ন্তী কাঁদছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার কাছে যেতে কাঠুরে চৌধুরীর ইচ্ছা হল। তার মুখ তুলে চোখের জল মুছিয়ে দেবার ইচ্ছা হ'ল কিন্তু পারল না। হাত বাড়িয়েও সে হাত গুটিয়ে নিল। দময়ন্তীরা সভ্য-জগতের মানুষ, তাকে ভুল বুঝবে।

মানুষ কেন মানুষকে ভুল বোঝে ? কেন তার কাজের বিচার করে না কাজ দিয়ে ? কেন সবকিছুর কার্যকারণ বিচার করে একটা সাধারণ ঘটনারও উদ্দেশ্য বার করে ? পরের হাসি দেখে কি আমরা হাসি না, না পরের দুঃখ দেখে কখনও কাঁদি না। কারও চোখের জল মুছিয়ে দেওয়া কি পাপ ! কাঠুরে চৌধুরীর মনে হল, এই সমাজটাই মানুষকে অমানুষ করেছে। সভ্যতার নামে আমরা মনুষ্যত্বকে বর্জন করেছি।

নিজেকে সামলাতে দময়ন্তীর অনেক সময় লাগল। খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বলল : জীবনে যা সবচেয়ে ঘৃণা করেছি, তাই আমার জীবনে সত্য হল।

কি সেই কথা ?

এই লুকোচুরি।

কাঠুরে চৌধুরী আশ্চর্য হয়ে বলল : লুকোচুরির কি আছে ?

কিছু নেই।

দময়ন্তী হাসল, সে হাসি মনে হল কান্নার চেয়েও করুণ। কাঠুরে চৌধুরী আরও কিছু শোনবার প্রত্যাশায় দময়ন্তীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। দময়ন্তী নীরব হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল : আপনার সঙ্গে আমি সহজভাবে মিশতে পারি নে, পারি নে সহজভাবে কথা কইতে। হাসতে পারি নে, কাঁদতেও পারি নে। এমন করে কি মানুষ বাঁচতে পারে ?

কিন্তু কেন পারেন না ?

আমার স্বামী আমাকে ভুল বুঝবেন।

কাঠুরে চৌধুরী চমকে উঠল, বলল : ভুল বুঝবেন আপনাকে !

সেই তো সবচেয়ে বড় ক্ষোভের কথা। জীবনে কি এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আছে ?

নেই।

কাঠুরে চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। পৃথিবীটাই তার কাছে মিথ্যা মনে হচ্ছে। স্বামী যদি স্ত্রীকে সন্দেহ করে তা হলে সাধারণ মানুষ নারীকে কি চোখে দেখবে ! জগদীশ এত নীচ।

দময়ন্তী বলল : আমি সব বুঝি। বিছানা শুয়ে শুয়ে মানুষটা এইরকম হয়ে গেল। আরও কত নীচে নামবে, সেই ভেবে আমার ভয় করছে।

না না, নীচে নামতে তাকে দেবেন না। দরকার হলে—

কি করবেন ?

আমি এখান থেকে সরে যাব।

দময়ন্তী হাসল, বড় বিষণ্ণ হাসি।

কাঠুরে চৌধুরী বুঝি লজ্জা পেল, বলল, না না, হাসবার মতো কথা আমি বলি নি। প্রয়োজন হলে আমি আমার কারখানায় গিয়ে থাকব, আপনার অপমান হতে দেব না। আমার এইটুকু উপকার আপনি করবেন।

একি আপনার উপকার মিস্টার চৌধুরী ?

কাঠুরে চৌধুরী হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল, বলল : আমার মায়ের কথা আপনি জানেন না। আমার বাবার অত্যাচারে তাঁকে মরতে হয়েছিল। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

দময়ন্তী সোজা হয়ে বসল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : তখন আমি নিতান্তই শিশু। যদি আমার মায়ের দুঃখ বুঝতে পারতাম, তা হলে তাঁকে মরতে হত না। আমার বাবাকে খুন করে মাকে আমি বাঁচাতাম।

কাঠুরে চৌধুরীর দু'চোখের দৃষ্টি বাঘের মতো জল জল করে উঠল। দময়ন্তীর মনে হল, এখনও এই লোকটার সমস্ত অন্তর জ্বলছে। আজও সে তার মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারে। কিন্তু কাঠুরে চৌধুরীকে দময়ন্তী আর ভয় পায় না। বলল : কি হয়েছিল ?

জানি নে। শুধু এইটুকুই জানি যে, আমার মা খুব অপমানিত বোধ করেছিলেন। তারপর তিনি আর বাঁচতে চান নি। আপনিই বলুন, স্ত্রীকে যে অপমান করে সে মানুষ ? তাকে বাঁচতে দেওয়া উচিত ?

দময়ন্তী শিউরে উঠল। তার মনে হল, এই লোকটার কাছে সব কথা বলা উচিত হবে না। জগদীশ তাকে অপমান করেছে জানলে সে তার গলা টিপে ধরতে দ্বিধা করবে না। আর কিছুদিন পরে জগদীশ যে তাকে অপমান করবে তাতে সন্দেহ নেই। যে নিজের পিতাকে আজও ক্ষমা করতে পারে নি, সে কি জগদীশকে ক্ষমবে !

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। তারপর দময়ন্তী বলল : একটা কথা আপনি আমার কাছে লুকিয়েছিলেন।

কি কথা ?

আমার বাবার কাছে আপনি খবর পাঠিয়েছিলেন।

কে বলল আপনাকে ?

আমি জানতে পেরেছি।

নিশ্চয়ই আপনাকে ওরা বলেছে।

বললে ভাল করত।

তবে ?

আমি নিজেই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

কাঠুরে চৌধুরী যেন আকাশ থেকে পড়ল : আপনি গিয়েছিলেন তাঁর কাছে ? কবে গিয়েছিলেন ?

সেদিন রাঁচি থেকে ফেরার পথে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছি।

কি বললেন তিনি?

বললেন, আমার মতামত তো আগেই আমি জানিয়েছি। আপনি আমাকে বলেন নি বলে আবার আমাকে বললেন।

আর কিছু বললেন না?

একটা ভাল উপদেশ দিলেন।

আগ্রহে কাঠুরে চৌধুরী দময়ন্তীর মুখের দিকে তাকাল।

দময়ন্তীর ঠোঁট কাঁপছিল থর-থর করে।

কি উপদেশ দিলেন?

বললেন, বিষ দাও ঐ হতভাগাকে।

উত্তেজনায় কাঠুরে চৌধুরী উঠে দাঁড়াল। বলল: আপনি কোন উত্তর দিলেন না? দিয়েছি। বলেছি, পাঠিয়ে দিও।

বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে দময়ন্তী কেঁদে উঠল।

বড় অসহায় দেখাল কাঠুরে চৌধুরীকে, বড় বেদনার্ত। দময়ন্তীর জন্যে এখন তার কষ্ট হচ্ছে না। কষ্ট কেন হচ্ছে তা সে বুঝতে পাচ্ছে না। বুকের ভিতর একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছে। মনে হচ্ছে তার হৃৎপিণ্ডটা কেউ উপড়ে ফেলতে চাইছে। নরোত্তম খেমলানি কি দময়ন্তীর পিতা?

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে কাঠুরে চৌধুরী স্থির হয়ে দাঁড়াল। দময়ন্তীও তাকাল মুখ তুলে। জগদীশের ঘুম ভেঙেছে, যন্ত্রণায় সে বুঝি কাতরাচ্ছে।

উঠে দাঁড়িয়ে দময়ন্তী বলল: আমাকে ক্ষমা করবেন।

তারপর আর দাঁড়াল না। ছুটে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আটাশ

ডাক্তার সেন মাঝে মাঝে জগদীশকে দেখতে আসেন। জিজ্ঞাসা করেন: কেমন আছেন?

জগদীশের আর উত্তর দিতে ভাল লাগে না। বলে: দেখুন।

ডাক্তার সেনের দেখবার কিছুই নেই। যা দেখবার, তার জন্যে ড্রেসার আসে। পরিষ্কার করে পাউডার মাখিয়ে যায়। বেড সোর বড় খারাপ জিনিস, বড় কষ্টদায়ক। প্লাস্টারবাঁধা শরীরে সারাক্ষণ শুয়ে থাকলে বেড সোরের হাত থেকে অব্যাহতি নেই। সেইজন্যেই ড্রেসারের দরকার। জগদীশ ভালই আছে।

ডাক্তার বললেন: একটু চীয়ারফুল থাকুন।

আর চীয়ারফুল!

জগদীশের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় সে যেন ভেংচি কাটল।

দময়ন্তী তাড়াতাড়ি বলল: সারাদিন শুয়ে থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছে।

ডাক্তার বললেন: সে তো সত্যি কথা।

আর বেঁধেছেনও আষ্টেপৃষ্ঠে। কোনখানটা বাদ রাখেন নি।

ডাক্তার হেসে বললেন: ওপর দিকটা তো খুলেই রেখেছি। শিরদাঁড়ায় সামান্য আঘাত দেখলে গলা থেকেই বেঁধে দিতাম।

জগদীশ বলল: খাটিয়ায় তুলে দিলে আরও ভাল করতেন।

ছিঃ! ছিঃ!

দময়ন্তীর কষ্ট হয় এ সব কথা শুনতে। কিন্তু বারে বারে বলতেও জগদীশের কষ্ট হয় না।

ডাক্তার তাঁরও পুরনো কথা আবার বললেন: ফিমার ফ্র্যাকচারে এত বাঁধাবাঁধি করতে হয় না। তার নেকটা ভেঙেই গোলমাল বেধেছে, কাবু হয়েছে হিপ জয়েন্ট। তাড়াতাড়ি যাতে উঠে দাঁড়াতে পারেন, তার জন্যেই এত সাবধান হয়েছি।

জগদীশের উরু ভেঙেছে একদিকের, কিন্তু দু'টো দিকই তিনি বেঁধে দিয়েছেন। যেদিকটা ভেঙেছে সেদিকটা বেঁধেছেন কোমর থেকে পায়ের ডগা পর্যন্ত, অন্যদিকটায় হাঁটুর উপর পর্যন্ত। নিত্যকর্মের জন্য নিচের দিকটা খানিকটা খোলা রেখেছেন। কোমরটা শক্ত করে বাঁধা। নড়াচড়ার জন্য তাকে দময়ন্তীর সাহায্য নিতে হয়। মাসখানেক যন্ত্রণা ছিল, এখন আর ব্যথা নেই। এখন শুধু শুয়ে থাকা, আর কোন রকমে সময় কাটানোই কাজ। কাঠুরে চৌধুরী তার জন্য নানা রকমের বই আনিয়ে দিয়েছে। ডিটেকটিভ বই-এর নেশা আছে বলে ঐসব বই-ই বেশি—ক্রিস্টি, গার্ডনার, চেইনি, কাঠুরে চৌধুরী নাম শোনে নি এমন সব লেখকেরও বই এনে দিয়েছে। কিন্তু জগদীশের মন সেদিকে যায় নি। মন তার ফিরে ফিরে অন্যদিকে যায়। অশান্ত হয়, বিরক্ত হয়, কলহ করে দময়ন্তীর সঙ্গে।

ডাক্তার বললেন: বড় কষ্টকর বুঝি, কিন্তু উপায় কি বলুন।

জগদীশ বলল: আর কতদিন এই রকম করে শুইয়ে রাখবেন?

বলেছি তো, আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে।

ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে।

আপনি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। আপনার ধৈর্য হারানো উচিত নয়।

দময়ন্তী এই উপদেশের গুরুত্ব বোঝে। ডাক্তারের কাছে সে খোলাখুলি সব জেনে নিয়েছে। বলেছিল: আমাকে আপনি ফাঁকি দেবেন না ডাক্তারবাবু, আমাকে সব খুলে বলুন।

ডাক্তার ইতস্তত করেছিলেন।

তাই দেখে দময়ন্তী বলেছিল: আপনি তো সব দেখতেই পাচ্ছেন, বুঝতেও পাচ্ছেন সবই। মিস্টার চৌধুরীর আমরা আত্মীয় নই, আশ্রিত। আজ হোক, কাল হোক, নিজেদের পায়ে আমাদের দাঁড়াতেই হবে।

ডাক্তার আর দ্বিধা করেন নি, বলেছিলেন: হাড়টা বড় বেয়াড়া জায়গায় ভেঙেছে। ভবিষ্যৎ বড় অনিশ্চিত।

দময়ন্তীর বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠেছিল, শুকিয়ে উঠেছিল গলা। বলেছিল: কোনদিনই কি উঠে দাঁড়াতে পারবেন না?

না না, সে ভয় নেই। উনি নিশ্চয়ই দাঁড়াবেন।

তবে?

সহজভাবে চলাফেরা করবেন, না লাঠির সাহায্য নিতে হবে, তা এখন বলতে পারি নে।

কবে পারবেন?

আরও মাস দু'য়েক পরে একবার খুলে দেখব, যদি বুঝতে পারি বলব। তা না পারলে হাড় জোড়া লাগবার পরেই বোঝা যাবে।

দময়ন্তী জেনে নিয়েছে যে জগদীশকে মাস দু'য়েক শুয়ে থাকতেই হবে। তারপরেই তার ভবিষ্যৎ জানা যাবে সঠিকভাবে। দময়ন্তীর শেষ প্রশ্নের উত্তরও সেদিন পেয়ে গেছে। ডাক্তার সেনকে জিজ্ঞাসা করেছিল: আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর পেলেই আমি আর আপনাকে জ্বালাতন করব না।

বলুন।

উনি কোনদিন তাঁর চাকরিতে যোগ দিতে পারবেন না?

ডাক্তার ইতস্তত করেছিলেন এ কথার উত্তর দিতে।

দময়ন্তী বলল: দ্বিধা করছেন কেন, বলুন আপনি। দরকার হলে আমি রোজগারের চেষ্টা করব।

ডাক্তার সেনের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল: তাই করুন।

চীৎকার করে দময়ন্তী কেঁদে উঠল না, ভেঙে পড়ল না আগের মতো। শুধু স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

দময়ন্তীকে ডাক্তার সেন সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, বললেন: বসে বসে উনি সব কাজই করতে পারবেন, কিন্তু ওঁর পুরনো চাকরিতে যোগ দিতে পারবেন বলে মনে হয় না। ওতে দৌড়-ঝাঁপের কাজই তো বেশি।

দময়ন্তী বুঝেছে যে জগদীশ খোঁড়া হয়ে থাকবে সারাজীবন। লাঠি যদি নাও নিতে হয়, তবু সে খুঁড়িয়ে হাঁটবে। এ যুগের জীবন-যুদ্ধে খোঁড়া মানুষের কোন স্থান নেই। দময়ন্তীকেই এবারে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

এ কথা জানবার পরে দময়ন্তীর বুকের ভার অনেকটা নেমে গেছে। এই রকম শুয়ে থাকাই জগদীশের জীবনের শেষ নয়, তাকেও চিরদিন একটা পঙ্গু স্বামীর পরিচর্যা করতে হবে না। প্রত্যহ বেডপ্যান ঘাঁটা একটা অসহ্য কাজ। কাঠুরে চৌধুরী এ কথা বুঝেছিল। এ কাজের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিল অন্য কাউকেও। কিন্তু দময়ন্তী নিজেই রাজী হতে পারে নি। একজন মেথর তাকে এই কাজে সাহায্য করে।

দময়ন্তী আরও একটু আশ্বাস পেয়েছে। সে নিজে একটা কাজ পেয়ে গেলে কাঠুরে চৌধুরীর আশ্রয় অনায়াসে ছাড়তে পারবে। জগদীশ আর কিছু না পারুক, নিজের ভারটা তো নিজে বইতে পারবে। তা হলেই দময়ন্তীর চলবে। সে লেখাপড়া শিখেছে, নিজে রোজগার করে কি সে তার পঙ্গু স্বামীকে সুখে রাখতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। এই ক'দিনেই সে মনের বল সংগ্রহ করেছে অনেকখানি।

ডাক্তার সেনকেও সে অনুরোধ করেছে একটা চলনসই কাজ জুটিয়ে দিতে। যে কোন কাজ। মোটা ভাত-কাপড়েই তারা সন্তুষ্ট থাকবে। ডাক্তার সেন বলেন নি যে এ কঠিন কাজ। বলেছেন: দেখি চেষ্টা করে।

দময়ন্তী তার বন্ধুবান্ধবকে কোন চিঠি লেখে নি। তারা হয় তো কলকাতায় ব্যবস্থা করবে। সেখানে খরচ বেশি, জগদীশকেও এখন নিয়ে যাওয়া যাবে না। এ অঞ্চলে হলে অসুবিধা নেই। একটা এ্যাম্বুলেন্স যোগাড় করে জগদীশকে সরানো চলবে। ডাক্তার সেন নিজে এ দায়িত্ব নিতে পারবেন বলেছেন।

কিন্তু যে মানুষটা শুয়ে আছে—সে কোন স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছে না। জেগে জেগেও সে যা দেখছে তা দুঃস্বপ্ন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার মনের বল হারিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তার মেরুদণ্ডটাই গেছে ভেঙে। এই ভাঙা মেরুদণ্ড তার কোনদিন জোড়া লাগবে না, কোনদিন সে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। জগদীশের মনে হয়েছে যে

ডাক্তার তাকে মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছে, আর দময়ন্তী সেবা করছে অকারণে? দেহটাই যদি বিকল হয়ে যায় তো শুধু প্রাণ নিয়ে সে কি করবে। দময়ন্তীই বা তার পঙ্গু দেহটাকে কতদিন শ্রদ্ধা করবে।

ভালবাসা।

জগদীশ হাসে এই ভালবাসার নামে। একটা খোঁড়াকে কেউ ভালবাসতে পারে, না ভালবেসেছি বলেই সেই খোঁড়াকে সারাজীবন আঁকড়ে থাকা যায়! কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে এ অসম্ভব। দময়ন্তী তাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছে। তার দুর্বলতা সে ধরা দিতে চায় না। এ পতিভক্তি নয়, এ সৌজন্য। দময়ন্তীর শিক্ষার স্বভাবে যে সৌজন্য আছে, এ তারই প্রমাণ। জগদীশ নীরবে সব দেখে।

এরপর ডাক্তার সেন কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। জগদীশ গুম হয়ে শুয়ে ছিল, আর দময়ন্তী মাথা নীচু করে তাকে দেখছিল।

ডাক্তার সেন কাঠুরে চৌধুরীর অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় সে ফিরে আসে। এ সময় এলে তার সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয় খানিকক্ষণ। লোকটার আকার-প্রকার যেমনই হোক, প্রাণ আছে অপর্যাপ্ত, প্রাণের উত্তাপ আছে। তাই অমন প্রাণখুলে হাসতে পারে। কাঠুরে চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে ডাক্তার সেন ফিরবেন।

সহসা বাহিরে কাঠুরে চৌধুরীর চীৎকার শোনা গেল: মেরে ফেলব, খুন করে ফেলব তোকে।

এ ঘরের সবাই একসঙ্গে চমকে উঠলেন। দময়ন্তী ছুটে বেরুল, ডাক্তারও বেরুলেন তার পিছনে। বেরিয়েই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন।

লবাটের বৌকে কাঠুরে চৌধুরী শূন্যে তুলে ধরেছে। দু'টো শক্ত মুঠিতে ধরেছে তার দুই বাহু, যেন ছুড়ে ফেলে দেবে এমনিভাবে দুলিয়ে বলল: আমি মেমসাহেব বলি বলে কি তুই সত্যিই মেমসাহেব হয়েছিস।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লবাট ঠকঠক করে কাঁপছিল, সাহস পাচ্ছিল না কিছু বলবার।

দৌড়ে এসে দময়ন্তী চেঁচিয়ে উঠল: কি করছেন আপনি! ছেড়ে দিন, নামিয়ে দিন ওকে।

কাঠুরে চৌধুরী যেন তার সমস্ত শক্তি সহসা হারিয়ে ফেলল। ধপ করে নামিয়ে দিল মেয়েটাকে। হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল, কোন কথা কইল না।

ছাড়া পেয়ে লবাটের বৌ পালিয়ে গেল। লবাটও অদৃশ্য হল।

ডাক্তার সেন এগিয়ে এসেছিলেন। কাঠুরে চৌধুরীকে বললেন: বসুন।

আর দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বললেন: আপনি একটু মিস্টার মেহতার পাশে গিয়ে বসুন।

দময়ন্তী আর অপেক্ষা করল না। নিজের ঘরে ফিরে গেল। এঁরা দু'জনে বসলেন মুখোমুখি হয়ে।

ডাক্তার সেন বললেন: একটা চুরুট আছে?

নিঃশব্দে কাঠুরে চৌধুরী তার চুরুটের বাক্স এগিয়ে দিল।

ডাক্তার সেন একটা চুরুট নিলেন, দেশলাই বার করলেন নিজের পকেট থেকে। তারপর সেটা ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কি হয়েছিল?

কিছু না।

ডাক্তার সেন অনেকক্ষণ ধরে চুরুট টানলেন, তারপর বললেন: অন্যায় কিছু বলেছিল বোধ হয়?

কাঠুরে চৌধুরী কোন কঠিন উত্তর দিল না। বলল: জগদীশবাবুকে কেমন দেখলেন?

ভাল।

আরও কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন, বললেন: আজ আসি।

আসুন। বলে কাঠুরে চৌধুরী নমস্কার করল।

ডাক্তার সেন নিজের গাড়িতে এসেছিলেন। নিজেই গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন। [ক্রমশ।

টিক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

ছোট একটি কালো কুকুর মাত্র ছিল সে। অথচ মিত্রবাহিনীর হাজার হাজার সৈন্যরা চিনত তাঁকে। অনেকের জীবন পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছিল তা'র জন্য।

আফ্রিকার এল আলামিন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিল টিক। পথেঘাটে ঘুরে বেড়ানই ছিল তা'র একমাত্র কাজ।

হঠাৎ এক আরবের চোখে পড়ে গেল সে। তা'কে তুলে নিয়ে বৃটেনের অষ্টমবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কিংস রয়াল রাইফ্‌ল কর্পস্‌-এর ফার্স্ট ব্যাটেলিয়নের তাঁবুর কাছে গেল আরবটি।

সে সময় চা খাচ্ছিলেন সবাই। টিককে দেখে বড় ভাল লেগে গেল কর্পোরাল জন সেইন্সবির।

—ওকে দেবে আমাকে? চা খাওয়াব, বললেন তিনি।

রাজী হয়ে গেল লোকটি।

কয়েক সপ্তাহ পরেই সেইন্সবি বাড়ি ফিরে গেলেন। টিককে দিয়ে গেলেন টমি ওয়াকারের হাতে।

টিক এবং ওয়াকারের মধ্যে অচিরেই অত্যন্ত গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবার জন্য ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ন যখন যাত্রা করল, তখন টিকও গেল ওয়াকারের সঙ্গী হয়ে। উত্তর আফ্রিকায় ফিল্ড মার্শাল রোমেলের আফ্রিকা কর্পসের পিছু ধাওয়া করল মিত্রবাহিনী—সেই সময় টিক তার অদ্ভুত ক্ষমতার বলে কয়েকবার ওয়াকার এবং তার সঙ্গীদের প্রাণরক্ষা করল।

গোলা আসছে কি না তা' টিক অস্ত্রাস্তদের চাইতে অনেক আগেই বুঝতে পারত। গোলার শব্দ পেলেই সেইদিকে টিক মাথা ঘুরিয়ে বসে থাকত। ওয়াকার এবং তার সঙ্গীরাও সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ত মাটিতে। এইভাবে বহুবার তারা রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল।

মনোবল ফিরিয়ে আনবার কাজে টিক অনবদ্য ছিল। একবার ওয়াকার তীব্র গোলাগুলী বর্ষণ সত্ত্বেও আহতদের সরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য এগিয়ে গেল। সঙ্গে গেল টিক।

একটি নিকটবর্তী ট্রেঞ্চে কয়েকজন সৈন্য লুকিয়ে ছিল ভয়ে। টিককে এইভাবে নির্ভয়ে বেড়াতে দেখে একটু যেন লজ্জিতই হ'লেন তাঁদের লেফটেন্যাণ্ট। ডেকে বললেন সবাইকে—উঠে এসো তোমরা। দেখছ না, এই কুকুরটা পর্যন্ত ভয় পায় নি। আর তোমরা কি না ট্রেঞ্চের ভেতরে বসে আছ?

অগত্যা উঠে এল সবাই।

ফায়েঞ্জাতে থাকবার সময় একবার প্রাণসংশয় হ'ল টিকের। টিককে একটা খালি বাড়িতে রেখে আহতদের তুলে আনবার জন্য গেল ওয়াকার, ফিরে এসে দেখতে পেল যে সে অত্যন্ত গুরুতররকম জখম হয়েছে একটা বোমার আঘাতে। দরদর করে রক্তপাত হচ্ছে নাক দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটল ওয়াকার।

—অসম্ভব, বললেন ডাক্তার, বরং ওকে মেরে ফেল গুলী করে।

মেরে ফেলবে? অসম্ভব। ওয়াকার ক্যাম্পে ফিরে গেল ওকে নিয়ে। শরীরের মধ্য থেকে সবগুলো কাচের টুকরো বের করল এক এক করে। নিজের জামা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ তৈরি করে দু'মাস শুশ্রূষা করল সে টিকের। অবশেষে টিক সেরে উঠল।

সুস্থ হয়ে উঠবার পরই সে ওয়াকারকে মিলিটারী মেডাল পেতে সাহায্য করল।

একদিন রাত্রিবেলা ইটালী-অস্ট্রিয়া সীমান্তে তীব্র গোলাগুলীর সম্মুখীন হতে হ'ল ওয়াকারের ব্যাটেলিয়নকে। টিককে সঙ্গে নিয়ে পুরো নয় ঘণ্টা ধরে অসীম সাহসের সঙ্গে ওয়াকার আহতদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করল। সবশুদ্ধ তিরিশ জন আহত সৈন্যকে সরিয়ে নিয়ে এল ওরা।

পুরো পাঁচ বছর রণাঙ্গনে থাকবার পর ছাড়া পেল ওয়াকার। দেশে ফিরে গেল সে টিককে নিয়ে।

ইতিমধ্যে বহু লোকের কাছে পরিচিত হয়ে গেছে টিক। সারা বৃটেনের মানুষ তাকে দেখবার জন্য উদগ্রীব। বহু প্রদর্শনী করা হ'ল তাকে নিয়ে। পশু-চিকিৎসালয়ের জন্য বহু টাকা সংগ্রহ করে দিল সে।

টিকের কাজের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি সে পেল ১৯৪৯ সালে। ওয়েম্ব্লি স্টেডিয়ামে একটি কুকুরের প্রদর্শনীতে দশ হাজার মানুষের সামনে সে ডিকিন মেডেল লাভ করল। ভিক্টোরিয়া ক্রসের সমতুল্য এই মেডেল প্রাপ্তি তাকে বৃটেনের সর্বশ্রেষ্ঠ চতুষ্পদের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিল।
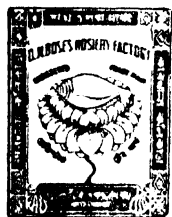
দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

জননী প্রভাবতী বসুকে লেখা

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কটক

পরম পূজনীয়া, শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী

রবিবার

শ্রীচরণকমলেষু

মা, ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোক-শিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে ২ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ। দেখ মা, ভারতে যাহা চাও সবই আছে—প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, ভীষণ বৃষ্টি আবার মনোহর শরৎ ও বসন্তকাল, সবই আছে। দাক্ষিণাত্যে দেখি—স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া গোদাবরী দুই কূল ভরিয়া তর তর কল কল শব্দে নিরন্তর সাগরাভিমুখে চলিয়াছে—কি পবিত্র নদী! দেখিবামাত্র বা ভাবিবামাত্র রামায়ণের পঞ্চবটীর কথা মনে পড়ে—তখন মানসনেত্রে দেখি সেই তিন জন—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, সমস্ত রাজ্য ও সম্পদ ত্যাগ করিয়া, সুখে, মহাসুখে, স্বর্গীয় সুখের সহিত গোদাবরী-তীরে কালহরণ করিতেছেন—সাংসারিক দুঃখের বা চিন্তার ছায়া আর তাঁহাদের প্রসন্ন বদনকমলকে মলিন করিতেছে না—প্রকৃতির উপাসনা ও ভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহারা তিনজনে মহা আনন্দে কাল কাটাইতেছেন—আর এদিকে আমরা সাংসারিক দুঃখানলে নিরন্তর পুড়িতেছি। কোথায় সে সুখ, কোথায় সে শান্তি! আমরা শান্তির জন্য হাহাকার করিতেছি! ভগবানের চিন্তন ও পূজন ভিন্ন আর শান্তি নাই। যদি মর্ত্ত্যে কোনও সুখ থাকে তাহা হইলে গৃহে গৃহে গোবিন্দের নামকীর্ত্তন ভিন্ন আর সুখের উপায় নাই। আবার যখন ঊর্দ্ধে দৃষ্টি তুলি, মা, তখন আরও পবিত্র দৃশ্য দেখি। দেখি—পুণ্য-সলিলা জাহ্নবী সলিলভার বহন করিয়া চলিয়াছে—আবার রামায়ণের আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে। তখন দেখি বাল্মীকির সেই পবিত্র তপোবন—দিবারাত্র মহর্ষির পবিত্র কণ্ঠোদ্ভূত পূত বেদমন্ত্রে শব্দায়িত—দেখি বৃদ্ধ মহর্ষি অজিনাসনে বসিয়া আছেন—তাঁহার পদতলে দুইটি শিষ্য—কুশ ও লব—মহর্ষি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। পবিত্র বেদধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রুর সর্পও নিজের বিষ হারাইয়া, ফণা তুলিয়া নীরবে মন্ত্রপাঠ শুনিতেছে—গো-কুল গঙ্গায় সলিল পান করিবার জন্য আসিয়াছে—তাহারাও একবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র মন্ত্রধ্বনি শুনিতেছে—শুনিয়া কর্ণদ্বয় সার্থক করিতেছে। নিকটে হরিণ শুইয়া আছে—সমস্তক্ষণ নিনিমেষ দৃষ্টিতে মহর্ষির মুখপানে চাহিয়া আছে। রামায়ণে সবই পবিত্র—সামান্য তৃণের বর্ণনা পর্যন্তও পবিত্র, কিন্তু হায়! সেই পবিত্রতা আমরা ধর্মত্যাগী বলিয়া আর এখন বুঝিতে পারি না। আর একটি পবিত্র দৃশ্য মনে পড়িতেছে। ত্রিভুবনতারিণী কলুষ-হারিণী ভাগীরথী চলিয়াছেন—তাঁহার তীরে যোগিকুল বসিয়া আছেন—কেহ অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে প্রাতঃসন্ধ্যায় নিমগ্ন—কেহ কাননের পুষ্পরাজি তুলিয়া প্রতিমা গড়িয়া, চন্দন ধূপ প্রভৃতি পবিত্র সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া পূজা করিতেছেন—কেহ মন্ত্রোচ্চারণে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছেন, কেহ গঙ্গার পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতেছেন—কেহ গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে ২ পূজার জন্য বনফুল তুলিতেছেন। সকলই পবিত্র—সকলই নয়ন ও মনের প্রীতিকর। কিন্তু হায়! যখন ভাবি সেই পুণ্যশ্লোক ঋষিকুল কোথায়? তাঁহাদের সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ কোথায়? তাঁহাদের সেই যাগ-যজ্ঞ, পূজা-হোম প্রভৃতি কোথায়? ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! আমাদের ধর্ম নাই, কিছুই নাই—জাতীয় জীবন পর্যন্তও নাই। আমরা এখন এক দুর্বল শরীর পরদাসত্বব্যবসায়ী, নষ্ট-ধর্ম, পাপিষ্ঠ জাতি! হায়! পরমেশ্বর! সেই ভারতের এখন কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! তুমি কি আমাদের উদ্ধার করিবে না? এ ত তোমারই দেশ—কিন্তু দেখ ভগবান, তোমার দেশের কি অবস্থা! তোমার অবতারগণ যে সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা কোথায়? আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যগণ যে জাতি এবং যে ধর্ম গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা এখন ছারখার হইয়াছে। দয়া কর, রক্ষা কর, ওহে দয়াময় হরি।

মা, আমি যখন চিঠি লিখিতে বসি তখন পাগলের চেয়েও পাগল। কি লিখিব ভাবিয়া লিখিতে বসি এবং কি বা লিখিতে পারি তাহা জানি না। মনে যে ভাবটি আগে আসে তাহাই লিপিবদ্ধ করি—ভাবি না কি লিখিতেছি বা কেন লিখিতেছি। ইচ্ছা হয় তাই লিখি, মন বলে—লেখ—তাই লিখি। যদি কিছু অসঙ্গত লিখিয়া থাকি তবে আমাকে মার্জনা করিবেন।

পূজ্যপাদ স্বর্গীয় গুরুদেব মহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তির বিষয় যখন ভাবি তখন দুঃখিত হইব কি আনন্দিত হইব তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। মনুষ্য যখন এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তখন যে কোথায় যায় বা কিরূপ অবস্থা ভোগ করে তাহা আমরা জানি না। তবে চরমদশায় আমাদের জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত বিলীন হইয়া যায়—সেইদিন আমাদের পক্ষে মহা আনন্দের দিন—কোনও দুঃখ নাই—কোনও কষ্ট নাই—পুনর্জন্ম-কষ্ট আর আমাদের ভোগ করিতে হয় না—তখন আমরা নিত্যানন্দে বিরাজ করি। যখন ভাবি তিনি সেই

নিত্যানন্দ ধামে গিয়াছেন—তিনি অমরগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া স্বর্গীয় সুধা পান করিতেছেন, তখন আর দুঃখিত হইবার কারণ দেখি না। তিনি যখন সেই সদানন্দপুরে গিয়া মহাসুখে আছেন তখন আমরা যদি তাঁহার সুখেই সুখী হই তবে আমাদের শোকগ্রস্ত হইবার কোনও কারণ নাই। দয়াময় ভগবান্ যাহা করেন জগতের মঙ্গলের জন্যই করেন। আমরা প্রথমে ২ বুঝিতে পারি নাই, কারণ তখন ফল ধরে নাই। যখন ফল পাকে তখন আমরা হৃদয়ের ভিতরে বুঝিতে পারি 'বাস্তবিক দয়াময় হরি যাহা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন।' ভগবান যখন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমাদের নিকট হইতে তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছেন তখন মিছামিছি আমাদের শোকাকুল হওয়া উচিত নহে—কারণ জিনিস তাঁহারই—তাঁহার ইচ্ছা হইলে অমনি তিনি কাড়িয়া লইলেন—আমাদের তাহাতে অধিকার কি আছে।

আবার ভগবানের ইচ্ছায় তিনি যদি তাঁহার বিপদগামী ভ্রাতৃবৃন্দকে ধর্মপথ দেখাইবার জন্য এবং পবিত্র সনাতন ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য পুনরায় মানবদেহ ধারণ করিয়া থাকেন বা শীঘ্রই করিবেন তবে তাহাতেও আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। যাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে, আমরা ত' তাহার বিরোধী হইতে পারি না। জগতের মঙ্গলই প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর। আমরা ভারতবাসী—অতএব ভারতের মঙ্গলই আমাদের মঙ্গল। তিনি যদি পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভ্রাতৃকল্প ভারত-সন্তানদিগকে ধর্মনিষ্ঠ করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের যারপরনাই আনন্দিত হওয়া উচিত। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

'দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।'

আমরা সকলে ভাল আছি। তাঁহার হাতেই আছি—তিনি যেরূপ রাখিয়াছেন সেইরূপই আছি। আমরা সকলে তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলী—আমাদের ক্ষমতা কতটুকু—সবই তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করে। আমরা বাগানের মালী—বাগানের মালিক তিনি। আমরা বাগানে কাজ করি, কিন্তু বাগানের ফলে আমাদের কোনও অধিকার নাই। আমরা বাগানে কাজ করি বাগানে যাহা ফল উৎপন্ন হয় তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দিই। কার্যে আমাদের অধিকার আছে—কার্যে আমাদের কর্তব্য—কিন্তু ফল তাঁহার—আমাদের নয়। তাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

লিলি এখন কোথায় ও কেমন আছে? জানি না কোথায় আছে তাই পত্র দিলাম না। মামিমা ও বৌদিদিরা কোথায় ও কেমন আছেন? দাদারা কেমন আছেন? অন্যান্য সকলে কেমন আছেন ও আছে? আপনি ও বাবা কেমন আছেন? আপনারা আমার প্রণাম জানিবেন। মেজদাদার খবর কি? দুই-তিন মেলে আমি কোনও পত্র পাই নাই। নূতন মামাবাবু কেমন আছেন?

শুনিলাম ছোটমামিমার বড় অসুখ হইয়াছে। তিনি কেমন আছেন? সাবদা কি বলে? ইতি—

আপনারই সেবক
সুভাষ

রাঁচি
রবিবার

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণেষু—

মা,

অনেকদিন হইল কলিকাতার কোন সংবাদ পাই নাই—আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন—বোধ হয় সময়াভাবে পত্র দিতে পারেন নাই।

মেজদাদা কি রকম পরীক্ষা দিলেন। আপনি কি আমার চিঠির সমস্তটা পড়িয়াছেন? যদি না পড়িয়া থাকেন, তবে আমি বড় দুঃখিত হইব।

মা, আমার মনে হয় এ যুগে দুঃখিনী ভারতমাতার কি একজন স্বার্থত্যাগী সন্তান নাই—মা কি প্রকৃতই এত হতভাগ্যা! হায়! কোথায় সেই প্রাচীন যুগ! কোথায় সেই আর্যবীরকুল যাঁহারা ভারতমাতার সেবার জন্য হেলায় এই অমূল্য মানব জীবনটা উৎসর্গ করিতেন।

মা, আপনি ত' মা, আপনি কি শুধু আমাদের মা? না মা আপনি ভারতবাসী মাত্রেরই মা—ভারতবাসী যদি আপনার সন্তান হয় তবে সন্তানদের কষ্ট দেখিলে মার প্রাণ কি কাঁদিয়া উঠে না? মার প্রাণ কি এতটা নিষ্ঠুর। না কখনই হইতে পারে না—মা ত' কখনও নিষ্ঠুর হইতে পারেন না। তবে সন্তানদের এই শোচনীয় দুরবস্থার সময়ে মা কি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন! মা, আপনি ত' ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন—ভারতবাসীর অবস্থা দেখিলে এবং তাহাদের দুরবস্থার কথা ভাবিলে আপনার প্রাণ কি কাঁদে না? আমরা মূর্খ—আমরা স্বার্থপর হইতে পারি কিন্তু মা ত' কখনও স্বার্থপর হতে পারেন না—মার জীবন যে সন্তানের জন্য! যদি তাহাই হয় তবে সন্তানের কষ্টের সময়ে মা কি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন! তবে কি মা স্বার্থপর! না, না, কখনই হতে পারে না—মা কখনও স্বার্থপর হতে পারে না।

মা, শুধু দেশের কি এরূপ শোচনীয় অবস্থা! দেখুন ভারতের ধর্মের কি অবস্থা! কোথায় সেই পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম, আর কোথায় আমাদের অধঃপতিত ধর্ম! কোথায় সেই পবিত্র আর্যকুল—যাঁদের পদধূলি লইয়া পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে—আর কোথায় আমরা তাঁহাদেরই অধঃপতিত বংশধর! সে পবিত্র সনাতন ধর্ম কি লোপ হইতে চলিল! দেখুন না চারিদিকে নাস্তিকতা, অবিশ্বাস এবং ভণ্ডামি—তাই ত' লোকের এত পাপ, এত কষ্ট, দেখুন না সেই ধর্মপ্রাণ আর্যজাতির বংশধর এখন কিরূপ বিধর্মী ও নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে! যাঁহার নাম, গুণগান ও ধ্যানই জীবনের একমাত্র কর্তব্য ছিল তাঁহার নাম সমস্ত জীবনে ভক্তির সহিত একবার কয়জন লোক আজকাল ডাকে! মা এসব দেখিলে এবং ভাবিলে, আপনার প্রাণ কি কাঁদে না, আপনার চক্ষে কি জল আসে না? সত্য সত্যই কি আপনার প্রাণ কাঁদে না—কখনই হইতে পারে না। মার প্রাণ ত' কখনও নিষ্ঠুর হয় না!

মা, একবার চক্ষু খুলিয়া দেখুন, আপনার সন্তানদের কি দুরবস্থা! পাপে, তাপে, সংপ্রকার কষ্টে, অন্নাভাবে, ভালবাসার অভাবে—এবং হিংসা ও স্বার্থপরতার জন্য এবং সর্বোপরি ধর্মের অভাবের জন্য তাহারা যেন নরকের অগ্নিকুণ্ডে অহোরাত্র জ্বলিতেছে। আর দেখুন, সেই

পবিত্র সনাতন ধর্মের কি অবস্থা! দেখুন, সেই পবিত্র ধর্ম এখন লোপ পাইতে চলিল। অবিশ্বাস, নাস্তিকতা এবং কুসংস্কারে আমাদের সেই পবিত্র ধর্ম এখন কতদূর অধঃপতিত ও অপভ্রষ্ট হইয়াছে। তার উপর, আজকাল ধর্মের নামেই যত অধর্ম হইতেছে—তীর্থস্থানেই যত পাপ! দেখুন না পুরীর পাণ্ডাদের কি ভীষণ অবস্থা। ছি! ছি! ছি! প্রাচীনকালের সেই পবিত্র ব্রাহ্মণকে দেখুন, আর আধুনিক কালের পাপী ব্রাহ্মণকে দেখুন! আজকাল যেখানে ধর্মের নাম সেইখানে যত ভণ্ডামি এবং যত অধর্ম।

হায়! হায়! আমাদের কি অবস্থা! আমাদের ধর্মের কি অবস্থা!

মা, এসব কথা যখন আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন কি আপনার প্রাণকে আকুল করিয়া ফেলে না? আপনার প্রাণ কি কাঁদে না?

আমাদের দেশের [illegible] কি দিন দিন এইরূপ অধঃপতিত হইতে থাকিবে—দুঃখিনি ভারতমাতার কোন সন্তান কি নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া মা-এর জন্য নিজের জীবনটা উৎসর্গ করিবে না?

মা, আমরা আর কয়দিন ঘুমাইয়া থাকিব? আর কয়দিন আমরা পুতুল লইয়া খেলিতে থাকিব? [illegible]র ক্রন্দন কি আমাদের কর্ণে আসছে না? আমাদের লুপ্তপ্রায় সনাতনধর্ম কাঁদিতেছে—তাহার ক্রন্দন কি প্রাণকে অস্থির করিতেছে না?

বসিয়া ২ আর কয়দিন দেশের এবং ধর্মের এই অবস্থা দেখিব? আর বসা চলে না—আর ঘুমান চলে না—এখন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্মসাগরে ঝাঁপ দিতে হইবে, কিন্তু হায়! এ স্বার্থপর যুগে নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া কয়জন স্বার্থত্যাগী সন্তান মা-এর জন্য কর্মসাগরে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত? মা, আপনার এ সন্তান কি প্রস্তুত নহে?

চুরাশি জনমের পর আমরা এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি—বুদ্ধি, বিবেক, আত্মা প্রভৃতি পাইয়াছি, কিন্তু এ সমস্ত পাইয়াও যদি পশুর ন্যায় আহার-নিদ্রায় পরিতুষ্ট থাকি—পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব স্বীকার করি—পশুর ন্যায় স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকি—পশুর ন্যায় যদি ধর্মহীন জীবন অতিবাহিত করি তবে কেন এই মনুষ্য হইবে আমাদের জন্ম? পরের জন্য জীবনই প্রকৃত জীবন!

মা, এসব আপনাকে কেন লিখিতেছি—জানেন? আর কাহাকেই বা বলিব? কে বা শুনবে? কে বা এ সমস্ত হৃদয়ে পোষণ করিবে? যাহাদের জীবন স্বার্থময়—তাহারা ত' এ সমস্ত কথা ভাবিতে পারে না—বা ভাবিবে না—কারণ তাহাতে তাহাদের স্বার্থের হানি হইবে কিন্তু মার জীবন ত' স্বার্থময় নহে! মার জীবন ত' সন্তানদের জন্য—দেশের জন্য! যদি ভারতের ইতিহাস পড়েন ত' দেখিবেন কত ২ মা, ভারতমাতার সেবার জন্য জীবনযাপন করিয়াছেন এবং উপযুক্ত সময়ে প্রাণও দিয়াছেন। দেখুন অহল্যাবাঈ মীরাবাঈ, দুর্গাবতী,—আর কত আছেন—আমার নাম মনে নাই। আমরা মাতৃস্তন্যে পুষ্ট—সুতরাং মাতৃ-উপদেশ এবং মাতৃশিক্ষা আমাদের যত উপকার ও উন্নতি করিতে পারে—আর কিছুতেই তত হয় না।

মা যদি সন্তানকে বলেন—তুই স্বার্থ লইয়া বসিয়া থাক—তবে আর কি! বুঝিব সন্তানই হতভাগ্য! তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এ কলিযুগে ভাল লোকের আর আবির্ভাব নাই। বুঝিতে হইবে ভারতের যাহা কিছু ছিল সবই নষ্ট হইয়াছে—আর কিছুই নাই! আর কিছু হবে না! চারিদিকে নৈরাশ্য! যদি তাহাই হয়—যদি প্রকৃতই আর কোন আশা নাই—যদি বসিয়া ২ কেবল অধঃপতন ও অবনতি দেখিতে হইবে—তবে এত কষ্ট কেন? তবে যদি এ জীবনে আর কিছু করিতে পারিব না—তবে এ জীবনে আর কাজ কি

আমি যেন চিরকালই সকলে সেবক হয়ে থাকিতে পারি। আশা করি ওখানকার কুশল। এখানে সব মঙ্গল। আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। পত্রের উত্তর দিবেন। এ পত্রের উত্তর দিবেন।

ইতি—
আপনার
চিরস্নেহাধীন
সেবক
সুভাষ

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

রাঁচি
রবিবার

পরম পূজনীয়া
শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণেষু

মা,

আপনার পত্র অনেকদিন হইল পাইয়াছি—তাহার উত্তরও লিখিয়াছিলাম কিন্তু পরে যখন পড়িয়া দেখি যে, আবেশের ঘোরে অনেক বাজে কথা লিখিয়াছি—তখন আর পাঠাইবার ইচ্ছা হইল না—তাই ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। আমার এক অভ্যাস পত্র লিখিতে বসিলে সংযম রাখি না—তাহাতে হৃদয় ঢালিয়া দিই। বিষয় কথা-পূর্ণ পত্র আমার লিখিতে বা পড়িতে ভাল লাগে না—তাই আমার এইরূপ অভ্যাস—আমি চাই ভাবপূর্ণ পত্র। আমার পত্র লিখিবার ইচ্ছা না হইলে লিখি না আর যখন ইচ্ছা হয় তখন উপরি ২ অনেক পত্র লিখি।

শারীরিক সুস্থতা জানান আমি অনেক সময়ে আবশ্যক মনে করি না—ভগবানের উপর বিশ্বাস করিয়া থাকিলে কোনও চিন্তা, উদ্বেগ বা ভয় আসে না। আর যদিও কাহারও অমঙ্গল ঘটে তাহাতেই বা আমরা কি করিতে পারি। আমাদের এমন কোনো শক্তি নাই যে, ইচ্ছামত কাহাকেও আরোগ্য করিতে পারিব। তবে আর মিছে ভাবনা কেন? আমরা যাঁহার ক্রোড়ে আছি তিনিই ত' আমাদের রক্ষয়িত্রী—যখন ত্রিলোকধারিণী বিশ্বজননী স্বয়ং আমাদের রক্ষয়িত্রী তখন এত চিন্তা এত ভয় কেন? অবিশ্বাসই দুঃখের এবং সর্বপ্রকার বিপদের কারণ কিন্তু মানুষ তাহা বুঝিতে চাহে না—এবং মনে করে যে ইচ্ছা করিলে কাহাকে ভাল করিয়া [illegible]তে পারে, হায় রে মূর্খতা!

মেসোমহাশয় আট-নয় দিন হইল কলিকাতায় গিয়াছেন এবং সেখানে ভাল আছেন। তিনি খুব ডাব ভালবাসেন এবং বর্তমা[illegible] অবস্থায় ডাব তাঁহার খুব উপকারী। কিন্তু কলিকাতায় ভাল ডাব

আনাইয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে তিনি বড় উপকৃত হন, তিনি এ বিষয়ে আপনাকে লিখিতে বলিয়াছেন।

এখানকার মঙ্গল জানিবেন। আপনারা সকলে ভাল আছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। মেজদাদা কবে ফিরিবেন?

বোধ হয় মে মাসের মাঝামাঝি আমাদের পরীক্ষার খবর বাহির হইবে। কতদূর সত্য জানি না—তবে শুনিয়াছি ইতিমধ্যে অনেকে নম্বর পর্যন্ত জানিতে পারিয়াছে!

সেজদিদিরা কি আসিবেন?

আমি এই অমূল্য ক্ষণস্থায়ী মানুষ জীবনের এত সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলাম, তজ্জন্য মনে দিনরাত্র ভয়ানক কষ্ট হয়। সময়ে সময়ে অসহ্য বোধ হয়।

যদি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া মানুষজীবনের উদ্দেশ্য না সফল করিতে পারিলাম—যদি গন্তব্যস্থানে পঁহুছিতে না পারিলাম তবে আর কি হইল? যেমন সকল নদীর গন্তব্যস্থান সমুদ্র, সেইরূপ সমস্ত জীবনের গন্তব্যস্থান—ঈশ্বর। যদি মানুষ ঈশ্বরলাভ না করিতে পারে তবে মানুষজন্ম বৃথা—আর পূজা, জপ, ধ্যান সবই বৃথা—সব কেবল ভণ্ডামি। এখন আর বাজে কথায় পর্যন্ত সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না—ইচ্ছা হয় কেবল একটা ঘরে বন্ধ হয়ে থাকি আর সমস্ত দিন সমস্ত রাত ধ্যান, চিন্তা এবং পাঠে অতিবাহিত করি। দিন দিন যে আমরা যমমন্দিরের নিকটবর্তী হইতেছি, কবে আর আমরা সাধনা করিব আর কবেই বা তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শান্তি সুখ ও বিশ্রাম করিব। সে আনন্দময়কে না পাইলে কিছুতেই আনন্দ নাই। লোকে যে কি করিয়া টাকা ধন-সম্পত্তি বিষয় প্রভৃতি লইয়া সন্তুষ্ট থাকে তাহাও আমার নিকটে সময়ে সময়ে এক বিষম সমস্যা বলিয়া বোধ হয়। যিনি আনন্দের নিধি তাঁহাকে বাদ দিলে যে আর কিছুতেই আনন্দ থাকে না। যিনি আনন্দের আকরস্বরূপ তাঁহাকে ধরা চাই—তবে ত' আনন্দ পাইব।

যদি চৈতন্য না হয়—যদি ভগবদ্দর্শন না হয়—তবে সমস্ত জীবনটাই বৃথা গেল। পূজা, জপ ধ্যান উপাসনা প্রভৃতি আমরা যাহা করি—তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—ভগবদ্দর্শন বা ঈশ্বরলাভ। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে সব বৃথা। যে একবার সেই অমৃতের খনি পাইয়াছে—সে আর সংসার-গরল পান করিতে যায় না।

তিনি আমাদের সংসার-খেলনার দ্বারা ভুলাইয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদিগকে মায়াবদ্ধ জীব করিয়া ফেলিয়াছেন। মা সংসারের কাজে ব্যস্ত—ছেলে খেলনা লইয়া খেলিতেছে যতক্ষণ পর্যন্ত ছেলে খেলনা দূরে ফেলিয়া 'মা-মা' বলিয়া ব্যাকুলভাবে না ডাকে ততক্ষণ মা ছেলের কাছে আসে না। মা মনে করে—ছেলে ত খেলিতেছে আমি আর কেন যাইব। কিন্তু যখন ছেলের ক্রন্দনধ্বনি মার কানে বাজে তখন মা আর থাকিতে না পারিয়া দৌড়িয়া আসে। আমাদের বিশ্বজননী আমাদের লইয়া ঠিক সেইরূপ খেলিতেছেন। ভগবানে ষোল আনা মন না দিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না—যদি ভগবানের চরণে দুই-চার আনা মন দিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইত তবে বিষয় মধুপানমত্ত লোকেরা ভগবানকে পায় না কেন? তাঁহাকে না পাইলে সব বৃথা—সব বৃথা—মানুষ জীবন এক বিড়ম্বনা—এক অসহ্য ভার।

আপনি কি বলেন?

তাঁহাকে না পেলে কি লইয়া দিন কাটাইব—কি লইয়া চিন্তা করিব—কাহার সহিত আলাপ করিব—এবং কোথা হইতে আনন্দ পাইব। যিনি সব বস্তুরই আকরস্বরূপ তাঁহাকে ধরা চাই—তাঁহার দর্শনলাভ করা চাই।

তাঁহাকে পাইতে হইলে—সাধনা চাই—ব্যাকুলভাবে ডাকা চাই—গভীর ধ্যান চাই—তাহা হইলে খুব শীঘ্র এমন কি দুই তিন বৎসরের ভিতর তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। কেবল চেষ্টা করা চাই—পারি না পারি সে ইচ্ছা তাঁহার। কাজ আমার হাতে—কিন্তু ফলদাতা তিনি—ফল পাই না পাই—সে ইচ্ছা তাঁহার—তবে আমাদের কাজ করা চাই—চেষ্টা করা চাই। যে একবার তাঁহাকে পাইয়াছে—তাহাকে আর কাজও করিতে হয় না—সাধনাও করিতে হয় না বা চেষ্টাও করিতে হয় না। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি—

আপনারই সেবক

সুভাষ

[এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত ও শিশিরকুমার বসু কর্তৃক সঙ্কলিত সুভাষচন্দ্র বসুর পত্রাবলী হইতে গৃহীত]

তোমাকেই ভাবি

রসুল গামজাতফ

[রসুল গামজাতফ বিশিষ্ট সোভিয়েত কবি। কিছুকাল আগে ভারতে এসেছিলেন। এ দেশের সংশ্লিষ্ট সুধীমহলে তাঁর নাম বিশেষভাবে পরিচিত]

যখন বর্ষণ নামে তখনও তোমাকে ভাবি আমি,
অর্কিড শাখায় ধরে থাকা থোকা যখনও তুষার;
তোমাকেই ভাবি এলে শীতল কামজ ছায়া নামি',
এবং রৌদ্রের দাহে যখন চৌদিক ছারখার;

তোমাকেই আমি ভাবি চারকেরা হলে মুখোমুখি,
আবার বিদায়বেলা যখনও—তোমার ভাবনাই;
যখন ঝড়ের আগে তেজদৃপ্ত স্থামলিম সুখী,—
কৃতজ্ঞ শীতের বেলা, আমি কিন্তু তোমাকেই চাই।

আমি চাই অহর্নিশি প্রতি দণ্ড যদি তোমাকেই—
তুমিও অনন্ত প্রেমে আমার একান্ত হবে—প্রত্যাশিত নেই।

অনুবাদ : অরুণাচল বসু

নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

[কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র, বিধানসভার সদস্য এবং প্রখ্যাত শিল্পনায়ক]

বাঙলার বাণিজ্যিক সুনাম ও ঐতিহ্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যাঁদের নৈপুণ্য সবিশেষ উল্লেখনীয় শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদের সেই তালিকার একটি উজ্জ্বল নাম। সমকালীন রাজনীতি ও মহানগরীর পৌরশাসনের ইতিহাসেও তিনি একটি বিশেষ চরিত্র।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত পুরুলিয়া গ্রামে মুখোপাধ্যায়দের আদি নিবাস। ব্যবসায়ী হিসাবে মুখোপাধ্যায়রা ছিলেন যথেষ্ট স্বীকৃতির অধিকারী। ব্যবসায়িক দক্ষতা নরেশনাথের উত্তরাধিকারসূত্রেই লব্ধ। পূর্বপুরুষের ইতিহাস খুললে দেখা যাবে যে এক অলৌকনীয় ব্যবসায় সাফল্য তাঁদের করতলগত। এই বংশের স্বনামধন্য সন্তান নীলকমল মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিগতযুগের এক খ্যাতনামা পুরুষ, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিবান। গ্রন্থকার হিসাবেও শক্তির অধিকারী। নবভারতের অন্যতম রূপকার যুবরাজ দ্বারকানাথ ঠাকুরের অন্যতমা পৌত্রী স্বর্গীয়া কুমুদিনী দেবীর সঙ্গে ইনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কুমুদিনী ছিলেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের পিতৃস্বসা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কুমুদিনী দেবীর ঘরে টাঙানো পৌরাণিক চিত্রগুলিই শিশু অবনীন্দ্রের মনে সর্বপ্রথম শিল্পের অনুপ্রেরণা এনে দেয় এবং তাঁর মন শিল্পসচেতন করে তোলে। এঁদের পৌত্র স্বর্গীয় নবনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নরেশনাথ তাঁদের ২৯ নং বেনিয়াপুকুর রোডস্থ বাসভবনে ১৩০৭ সালে ১১ই চৈত্র (২৫এ মার্চ ১৯০১) জন্মগ্রহণ করেন। নরেশনাথের জননী স্বর্গীয়া ঊর্মিলা দেবী ছিলেন দানবীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের অন্যতমা দৌহিত্রী।

১৯১৬ সালে সেণ্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র হিসাবে সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রিপন কলেজের (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ছাত্র হিসাবে ডিস্টিংশানসহ বি-এ পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করেন ১৯২১ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ও আইন পড়া শুরু হ'ল। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য এবং অর্থনীতি ছিল তাঁর প্রিয় পঠিতব্য বিষয়।

১৯২২ সালের শেষভাগে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ায় ছেদ টানতে হল নরেশনাথকে। বিদেশীর শৃঙ্খলাবদ্ধ দেশজননীর বন্ধনমোচনকল্পে জনগণনায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আহ্বান দিলেন দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে এই মহান মুক্তিযজ্ঞে অংশগ্রহণ করার। দেশবন্ধুর আহ্বানে সেদিন যাঁরা সাড়া দিয়ে তাঁর ছত্রছায়ায় এক অফুরন্ত সম্ভাবনা আর দুর্বার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সমবেত হলেন নরেশনাথ তাঁদেরই একজন। রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশবন্ধু তাঁর দীক্ষাগুরু। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল একযোগে কাজ করেছেন নরেশনাথ।

লৌহ-ব্যবসায়ীরূপে ব্যবসায় জগতে ১৯২২ সালে প্রবেশ করেন নরেশনাথ। ১৯২৮ সালে লৌহশিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত ট্যারিফ কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তিনি নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৪ সালের এই কমিশনেই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়িবৃন্দ তাঁকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। জাহাজী ব্যবসায়ে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন ১৯২৯ সালে। আজকের দিনে জাহাজী

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তিনি একটি শীর্ষস্থানে সগৌরবে সমাসীন এবং বিপুল খ্যাতি ও অসাধারণ প্রসিদ্ধির সঙ্গে তিনি আজ হাত মিলিয়েছেন। কলকাতার স্টিভেডোর্স এ্যাসোসিয়েশান ও শিপস কনট্রাকটার্স এ্যাসোসিয়েশানের তিনি বর্তমানে সভাপতি, বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্স, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স, লণ্ডন চেম্বার অফ কমার্সের তিনি একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য।

কংগ্রেসী সদস্য স্বর্গত ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়কে পরাজিত করে নির্দলীয় সদস্য হিসাবে নরেশনাথ পৌরসভায় নির্বাচিত হন ১৯৩৬ সালে। নির্বাচনের পর নরেশনাথ কংগ্রেসে যোগ দেন এবং দেশনায়ক শরৎচন্দ্র বসু ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৬ সালে ইনি সহ-পৌরপাল নির্বাচিত হন। পুনরায় ১৯৫২ সালে সহ-পৌরপালের আসনে তিনি সমাসীন হন। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে তদানীন্তন পৌরপাল জননায়ক নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের পরলোকগমনে সহ-পৌরপাল নরেশনাথ পৌরপালের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মহানগরীর পৌরপালের আসনে অধিরূঢ় ছিলেন শিল্পপতি নরেশনাথ। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত

নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

পৌরসভার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেন। স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরলোকগমনের পর চৌরঙ্গী কেন্দ্র থেকে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন নরেশনাথ। বলা বাহুল্য, সগৌরবে জয়লাভ করেন (১৯৬৩)।

নরেশনাথকে শুধু দেশসেবী এবং শিল্পপতি বললেই সব বলা হয় না। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর পর্যটকও। তিনি কয়েকবার সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছেন। মেয়র হিসাবে তিনি মার্কিন ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রিয়া, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং চীন কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। ১৯৫২ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত প্যাসিফিক মেয়র্স কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি আহ্বান পান। টোকিওর গভর্নর তাঁকে 'গোল্ডেন কী অফ টোকিও' প্রদানে সম্মানিত করেন। ভারতীয়দের মধ্যে এই সম্মান প্রথম যাঁরা লাভ করেন নরেশনাথ তাঁদের অন্যতম। যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি যথেষ্ট প্রখর। এই দুরন্ত ব্যাধির কবল থেকে নগরীর মানুষকে মুক্ত করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়। আমেরিকা, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার স্যানিটোরিয়ামগুলি পরিদর্শন করে সেখানকার চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি অনুধাবন করে দেশে ফিরে এসে কলকাতায় চারটি টি-বি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। মেয়র হিসাবে কলকাতার বহুবিধ নাগরিক উন্নয়নের জন্য তিনি দায়ী। টালিগঞ্জের জন্য বৃহৎ পরিকল্পনা, জল সরবরাহ বৃদ্ধি করা প্রমুখ বহুবিধ জনকল্যাণকর কার্যাদির মূলে তাঁর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বস্তী সংস্কার এবং অন্যান্য সমাজ-কল্যাণকর কার্যাদিতে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ।

অসংখ্য ব্যবসায়িক এবং লোককল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত। সাহিত্য, সঙ্গীত, ললিতকলাকেন্দ্রিক প্রয়াসমূহ তাঁর পৃষ্ঠপোষণ থেকে বঞ্চিত নয়। রোম আর প্যারিসে প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইনি যথেষ্ট অনুশীলন করেছেন।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য দেশবিশ্রুত শিক্ষাবিদ স্বর্গত ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দৌহিত্রী এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুধীবর পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীযুক্তা শ্যামরাণী দেবীর সঙ্গে ইনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ।

তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিজীবনের সদালাপিতা, বন্ধুবাৎসল্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাব প্রভৃতি গুণাবলীও কোনক্রমেই অনুল্লেখ্য নয়।

শশাঙ্কশেখর সান্যাল

[বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান-পরিষদের সদস্য]

প্রাক্ স্বাধীনতার কাল হইতে বর্তমান বিভক্ত বাংলার আইন সভায় আসন বসিয়া যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক নেতাকে সুতীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নবাণে মাঝে মাঝে সরকার পক্ষকে বিচলিত করিতে দেখা যায়, বিধান-পরিষদের নির্দলীয় সদস্য শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল তাঁহাদের অন্যতম।

গণতান্ত্রিক দেশে আইন সভাই যদি গণতন্ত্র রক্ষার ধারক ও বাহক হয় তবে শ্রীসান্যালের মত সাংবিধানিক জ্ঞানসম্পন্ন লোকের আইনসভায় উপস্থিতি অপরিহার্য। ছাত্রজীবনে প্রবন্ধ রচনায় এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তাঁহার কৃতিত্ব পরবর্তী জীবনে আইনসভার আসনে বিশেষভাবে প্রমাণিত।
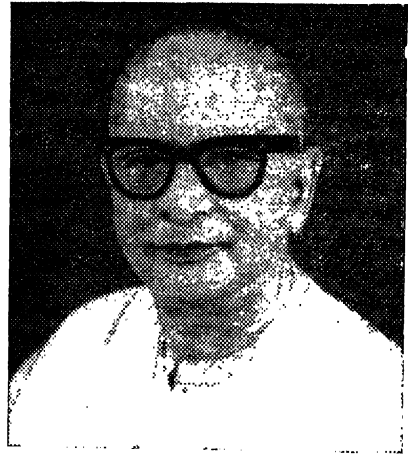
শশাঙ্কশেখর সান্যাল

স্বর্গত ভবতারণ সান্যালের পুত্র শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল ১৯০১ সালে বহরমপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বহরমপুর শহরেই বাল্যের শিক্ষা আরম্ভ করিয়া মাত্র পঞ্চদশ বৎসরে ১৯১৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী হন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তদানীন্তন প্রচলিত আইনে ১৭ বৎসরের কম বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া দুই বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া ১৯১৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯১৯ সালে সর্বভারতীয় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তর্কশাস্ত্রে সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়া ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেন।

অতঃপর শ্রী সান্যাল ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স লইয়া ডিগ্রি ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯২১ সাল ডিগ্রি পরীক্ষার বৎসর। অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনে ছাত্র সমাজ উদ্বেলিত। ১৯২১ সালের পরিবর্তে ১৯২২ সালে অনার্স সহ ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। ডিগ্রি লাভ করিবার পরে ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ ক্লাসের ছাত্র শ্রীসান্যাল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিলেন প্রবন্ধ রচনায়। রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনের সম্পর্ক অভিন্ন এই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত রচনার খাতায় তাঁহার নম্বরই ছিল সর্বোচ্চ। এম-এ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আইনের ডিগ্রিও লাভ করিয়াছিলেন তিনি। শিক্ষা শেষে প্রবেশ করিলেন আইন ব্যবসায়ে। ১৯২৬ সালের তরুণ আইনজীবী আজ পরিণত বয়সেও পশ্চিম বাংলার আইন ব্যবসায়ীদের অন্যতম। ১০ বৎসর কাল আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার পর ১৯৩৭ সালে রাজনীতিক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে ১৯৩৭ সাল হতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তদানীন্তন বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৪৫ সালে বাংলার কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন স্বর্গত নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সহিত

সেণ্ট্রাল এসেমব্লীতে মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ স্বীকৃতির প্রতিবাদে কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন শ্রীসান্যাল। অতঃপর ১৯৫৮ সালে নির্দলীয় সদস্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তদবধি নির্দলীয় সদস্য শ্রীসান্যাল পশ্চিমবঙ্গের আইন-সভার আসনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

শুধু রাজনীতিবিদ এবং আইনজীবী হিসাবেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি তিনি। কি খেলায় কি গানে বাজনায় এবং এমন কি নৃত্যেও তাঁহার দক্ষতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। গানে এবং নৃত্যে দক্ষতার প্রমাণস্বরূপ পদক লাভ করিয়াছেন কয়েকবার। কর্মবহুল জীবনের শেষ ধাপে পৌঁছাইয়াও জ্ঞান পিপাসা তৃপ্ত হয় নাই শ্রীসান্যালের। মৌলিক অধিকার সমন্ধে ডক্টরেট লাভের উদ্দেশ্যে বর্তমানে তিনি সাধনারত।

গীতা মুখোপাধ্যায়

[প্রখ্যাতনাম্নী সমাজ সেবিকা]

যাদের জীবনের সকল আলো নিভে গেছে, চারপাশে শুধু আঁধারের সমারোহ, ভাগ্যের আকাশ ভরে আছে ঘন কৃষ্ণ মেঘে হাসি মিলিয়ে গেছে, সংগ্রাম সঙ্কুল পরিবেশের মধ্যে করতে হয় জীবনের পথ পরিক্রমা সেই সব অসংখ্য দৃষ্টিহারা, চলচ্ছক্তিহীন বিকলাঙ্গদের সহস্র বেদনা, অপরিসীম জ্বালা ও অপার বঞ্চনা আবৃত করে দিয়েছেন মাতৃজাতির যে প্রতিনিধিরা সীমাহীন স্নেহের প্রলেপে তাদের কল্যাণ সাধনের পুণ্যকর্মে যাঁরা নিজেদের করেছেন উৎসর্গ শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়ের নাম সেই তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। সেই সর্বহারা অসহায়দের জীবন যখন একেবারে শুকিয়ে যায় এই কল্যাণময়ী জননীদের তখনই তাদের জীবনে করুণাধারার মত আবির্ভাব, তাদের জীবন আলোয় আলোয় ভরিয়ে তোলাই এঁদের সাধনা।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বংশধর স্বনামধন্য স্বর্গীয় রায়বাহাদুর মল্লিনাথ রায়ের কন্যা গীতা দেবীর জন্ম ১৩২৮ সালের বোধনদিবসটিতে (এপ্রিল ১৯২১)। সুপ্রবীণ ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত সতীনাথ রায় তাঁর জ্যেষ্ঠতাত। বিচারপতি অজিতনাথ রায় তাঁর পিতৃব্যপুত্র। স্বর্গীয়া সরলা দেবী চৌধুরাণী প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণভামিনী নারী শিক্ষামন্দিরে তিনি পাঠ নিতে থাকেন। ১৯৩৪ সাল থেকে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে ভর্তি হলেন বেথুন কলেজে। ১৯৩৮ সালে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পরীক্ষায় সসম্মানে হন উত্তীর্ণা। আই-এ পরীক্ষার পর কুমারী গীতা রায় বিবাহসূত্রে আবদ্ধা হন খড়দহের সুপ্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় পরিবারোদ্ভূত স্বর্গীয় বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আজকের দিনের প্রথিতযশা বিচারপতি, সাহিত্যরসিক, পণ্ডিতপ্রবর প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় সেদিন একজন উদীয়মান ব্যারিস্টার।

কলেজজীবনে তিনি ইউনিয়ন সেক্রেটারী ছিলেন এবং ১৯৩৫-এর শেষভাগে কে পি টমাস আয়োজিত ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে অনুষ্ঠিত ইংরাজী ভাষায় অল ইণ্ডিয়া ইণ্টার-কলেজ ডিবেটে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কর্মময় জীবন শুরু হল বলতে গেলে ১৯৫৪ সালে। গার্ল গাইড আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। সীমাবদ্ধ গৃহকোণ থেকে বৃহত্তর পটভূমিতে পদার্পণ, নানা কাজের ব্যস্ততায় শুরু আরম্ভ এক নতুন জীবনের। তবে, এই প্রসঙ্গে যে কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হোল কর্মের সহস্র ব্যস্ততা ও সমারোহের মধ্যে সংসারধর্ম পালন থেকে তিনি বিন্দুমাত্র বিচ্যুতা হন নি। বাইরের জগতের বিরাট পরিসর তাঁকে তাঁর নিজস্ব সংসার থেকে সরিয়ে দিতে পারে নি। সেইখানেই তাঁর সবিশেষ কৃতিত্ব। ১৯৫৫ সালে যুক্ত হলেন রেডক্রসে। ১৯৫৮, '৫৯ ও '৬০ সালে তিনি রেড ক্রসের ভাইসচেয়ারম্যান ছিলেন। ওয়েস্টবেঙ্গল জুনিয়ার রেডক্রসের চেয়ারম্যানের আসনে তিনি অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে রেডক্রস শতবার্ষিকী সুবর্ণ পদক দিয়ে সম্মানিতা করলেন এ সংবাদ অতি অল্পকালপূর্বেই ঘোষিত হয়েছে। সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্স এ্যাসোসিয়েশনের (পশ্চিমবঙ্গ শাখা), দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের সোস্যাল-সার্ভিস শাখার, উইমেনস ইণ্টারন্যাশানাল ক্লাবের, ভারতসেবক সমাজের মহিলা শাখার তিনি সভানেত্রী। কলকাতা শিল্পমেলার মহিলা-শাখার তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্সের নার্সিং ডিভিসানের মহিলা ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার হিসাবে তিনি লেফট্যানাণ্ট কর্নেলের সমান পদমর্যাদার অধিকারিণী। মহিলাদের মধ্যেই তিনিই প্রথম যিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক এবং লেফট্যানেণ্ট

শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়

কর্নেলের পদমর্যাদার অধিকারিণী। ১৯৬১ সালে রাণী এলিজাবেথের কলকাতা পরিদর্শনের সময় রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু তাঁকে প্রসিদ্ধা সমাজসেবিকা হিসাবে রাণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। গার্লস গাইডের সঙ্গে তিনি বর্তমানে এ্যাসিস্টান্ট স্টেট কমিশনাররূপে জড়িত। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের পরিদর্শন কমিটীর, এল আই সি পূর্বাঞ্চলের ও জাতীয় সঞ্চয় উপদেশন সমিতির এবং বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল অফ উইমেনের তিনি সদস্যা। 'রিফিউজ'-এর এবং লাইট হাউস ফর দ ব্লাইণ্ডের কার্যকরী সমিতির তিনি সদস্যা।

তাঁদের একমাত্র সন্তান পার্থবিহারী প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র এবং এন সি সির সেকেণ্ড বেঙ্গল আর্মার্ড স্কোয়াড্রনের করপোরাল।

সাহিত্যের তিনি একনিষ্ঠ পাঠিকা। কাব্যরচনায় তিনি সিদ্ধহস্তা। থিওসফিক্যাল সোসাইটির দ্বিভাষিক মুখপত্র 'ব্রহ্ম বিদ্যা' পত্রিকার তিনি সম্পাদিকা।

বলাইলাল মুখোপাধ্যায়

[প্রতিভাধর শিল্পী]

নিজেকে প্রচারের সম্পূর্ণ অন্তরালে রেখে বাংলা দেশে যে ক'জন শিল্পী একাগ্রচিত্তে শিল্প সাধনা করে চলেছেন উত্তরপাড়ার বলাইলাল মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম, অর্ধশতাব্দী ধরে পট ও তুলির মধ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন বলাইবাবু, সাধনার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে যে হাজার হাজার সম্পদ তার আদর এদেশে যত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে বিদেশে। বাংলা দেশে খুব কম শিল্পরসিকই জানেন এই প্রতিভাধর শিল্পীর নাম; তার কারণ 'নীরবে কাজ করে যাও, কোনদিকে তাকিয়ো না' —মহর্ষি রমণের এই নীতিবাক্য তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে উত্তরপাড়ার এক নিভৃত, নিরালা কুটিরে বসে বছরের পর বছর শুধু এঁকেই চলেছেন।

উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার বংশের সন্তান বলাইলালের জন্ম উত্তরপাড়াতেই ১৯০০ সালে। পিতামহ স্বর্গত মনোহর মুখোপাধ্যায়ের নাম জানেন না বাংলা দেশে বোধ করি এমন লোক কেউ নেই। একদিকে দাদুর স্নেহাশীষ আর একদিকে স্কুলের তদানীন্তন অঙ্কন শিক্ষক ক্ষীরোদ ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণায় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র বলাইলাল র‍্যাফেলের ছবি এঁকে ছাত্রজগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন। ইউরোপীয় স্কুল-ইন্সপেক্টর স্কুল পরিদর্শনে এসে শুধু যে বলাইলালের আর্টের তারিফ করলেন তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে রায় দিয়েও গেলেন এ সব ছেলেকে স্কুলে রেখে নষ্ট করে লাভ নেই, এর আর্ট স্কুলে যাওয়া উচিত।

মাত্র পনেরো-ষোল বৎসর বয়সেই বলাইলাল মানুষের বিভিন্ন ভঙ্গিমা সম-কদারে আঁকা আয়ত্ত করে নিলেন: তারপর '১২০ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত শিবব্রত সমরত্ন ও পি কে কুণ্ডুর শিক্ষকতায় তিনি আরও নূতন নূতন আর্ট শিখে ফেললেন।

১৯২৮ সালে একটি দোকানে বসে ক্যালেণ্ডারের পাতায় তদানীন্তন বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসনের ছবি স্কেচ করে বাড়িতে নিয়ে এলেন, তারপর তৈলচিত্রে সেই ছবিখানি এঁকে দিল্লীর একটি প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দিলেন। গভর্নর দিল্লীতে গিয়ে তাঁর নিজের

বলাইলাল মুখোপাধ্যায়

তৈলচিত্র দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। অভিভূত হবার আরও কারণ ছিল এই কারণে যে শিল্পী তাঁকে দেখেন নি, অথচ এতো প্রাণবন্ত ছবি আঁকলেন কি করে! খোঁজ পড়লো বলাইবাবুর; লাটপ্রাসাদে তাঁকে ডেকে আনা হল। গভর্নর বললেন—ও ছবি তাঁর চাই-ই, কত মূল্য লাগবে?

বলাইবাবু কোন মূল্য নিলেন না, শিল্পী হিসেবে তিনি যে স্বীকৃতি পেয়েছেন, এইটুকুই তাঁর যথেষ্ট মূল্য। গভর্নরকে তিনি ছবিটি উপহার দিলেন, বিনিময়ে গভর্নর তাঁকে একটি সার্টিফিকেট দিলেন। সেই সার্টিফিকেটই উত্তরকালে বলাইবাবুকে বিদেশীদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর আঁকলেন তিনি মহাত্মা গান্ধীর একটি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র; কলিকাতা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে সেটি গেল তেহরাণে। ব্যাঙ্কক-এ ভারতীয় বণিক সভা তাঁর আঁকা আর একটি মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি ন্যাশনাল পোর্টেট গ্যালারীতে রাখলেন।

শিল্পী বলাইবাবুর আর একটি অপূর্ব কীর্তি ল্যাণ্ডস্কেপ। হিমালয়ের এভারেস্ট থেকে সুরু করে যে কোন পর্বতসঙ্কুল স্থান তাঁর তুলির আঁচড়ে এতোই স্বাভাবিক রূপ পেয়েছে যে দেখলে বোঝাই যায় না যে, এটা ছবি দেখছি না সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশ থেকে প্রতি বছর অসংখ্য ভ্রমণকারী ভারতবর্ষ দেখতে আসেন; হিমালয় শুধু দেখেই তাঁদের আশ মেটে না; যাবার সময় তাঁরা ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি খোঁজ-খবর করে নিয়ে যান। বলাইবাবুর ছবি তাই আজ বিদেশে সমাদৃত এবং বাস্তববাদী শিল্পী হিসেবে তাঁর সুনাম সর্বত্র স্বীকৃত।

মাসিক বসুমতী

জ্যৈষ্ঠ / '৭১

কাজের ফাঁকে —কুমার ঘোষ

গোপালকৃষ্ণ —শান্তিময় সান্যাল

শহর কলকাতা

—এস ধর

গুরু-শিষ্য সংবাদ

—বৈদ্যনাথ ভড়

স্পোর্টসম্যান

—সাগর রক্ষিত

ফলমচি —মধু চক্রবর্তী

ক্ষুদ্রগৃহিণী —দেবু দাস

পার্বত্য লেক ভারত সরকার (প্রচার বিভাগ)

স্থাপত্য
—সুনীল দে

স্নানার্থী
—কুমার ঘোষ

অতীতের রাসমঞ্চ
—নবগোপাল সিংহ

মজুরাণীর দল

—রামকিঙ্কর সিংহ

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে আপনার নাম,

দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার

দ্বীপময় ভারতে অন্তত দু'শো পঞ্চাশটি ভাষা এবং উপভাষা বিদ্যমান, কিন্তু এই সমস্ত ভাষার মধ্যে একমাত্র যবদ্বীপীয় ভাষারই একটি বিশিষ্ট প্রাচীন সাহিত্য বর্তমান আছে। পূর্বে এই ভাষাকে কবি-ভাষা বলা হইত, কিন্তু অনেকে এই পরিচয় বা অভিজ্ঞানের পক্ষপাতী নহেন; কারণ ইহা দ্বারা আবহমানকাল প্রচলিত (traditional) এমন একটি সাহিত্যিক রীতিকে বুঝাইতেছে, যাহা প্রাচীন এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক, রচনার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং পণ্ডিতগণ জাভার সুপ্রাচীন ভাষার আখ্যা দিয়াছেন প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা। তবে এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণীয় [illegible]পহিত-যুগে সম্ভবত এই সংস্কৃতবহুল প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার [illegible]বি-ভাষা নামেই আখ্যাত করা হইত। কারণ, নাগরকৃতাগমের ২৫ সর্গের [illegible]য় শ্লোকে ডঙ্গ আচার্য উত্তর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি ছিলেন 'বি[illegible]ঙ্গ আগম ক্র কবি:।' অর্থাৎ তিনি ছিলেন আগমশাস্ত্রে বিদগ্ধ এবং [illegible] কবি (ভাষা) জানিতেন। মধ্যযুগে এই ভাষা কবি-ভাষা অথবা অন্য যে কোন নামেই পরিচিত হউক না কেন, বর্তমান যুগের পণ্ডিতগণ প্রাক্-মুসলিম এই সাহিত্যকে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা নামে আখ্যাত করিয়াছেন এবং আমরাও ইহাকে এই নামেই অভিহিত করিব।

প্রাচীন যুগের এই যবদ্বীপীয় সাহিত্য গদ্য এবং পদ্য উভয় শৈলীতেই রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দোবদ্ধ কবিতা বা কাব্যগুলি কাকাবিন নামে বিখ্যাত। এই কাকাবিনগুলির স্বকীয় একটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং ইহাদের প্রকৃতি ও পরিণাম একই প্রকারের। কাকাবিন-সাহিত্যের এই বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে এই শ্রেণীর সমস্ত গ্রন্থ নিষ্ঠাসহকারে অধ্যয়ন করিতে হইবে, নতুবা মনের মধ্যে একটি বিকৃত বা অসম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইবে। কেবলমাত্র একটি কাকাবিন-গ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করিলে গ্রন্থগুলির তাৎপর্য ও বিশেষত্ব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

এই কাকাবিনগুলির পরিণামও বিস্ময়করূপে একই প্রকার। ইহাতে যে শতাধিক ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, আজ তাহার স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে। কাকাবিন-সাহিত্যের এই বিশেষত্বের দিকে পূর্ববর্তী কোন কোন লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।(১)

যবদ্বীপের বহু উচ্চপদস্থ নর-নারী এবং বিভিন্ন নরপতি প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব যবদ্বীপাধিপতি ধর্মবংশ, কামেশ্বর, জয়োভয়, হয়ম ভুরুক প্রভৃতি রাজগণ এই বিষয়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। রাজান্তঃপুরের মহিলাগণও যে এই বিষয়ে জহুরী ছিলেন তাহার পরিচয় রহিয়া গিয়াছে নাগরকৃতাগমের ১৫ সর্গে। কাহারো কাহারো আবার পুঁথিপত্রাদি সংগ্রহ করিবারও বাতিক ছিল। প্রপঞ্চ তাঁহার ঐতিহাসিক কাব্যে তাঁহার কবিবন্ধুর দুর্লভ পুস্তকসংগ্রহ করার বাতিকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (২১ সর্গ)।

কাকাবিন-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই শ্রেণীর আরো দু'-একটি শাখা সাহিত্যের উল্লেখ করিব। নাগরকৃতাগমকাব্যে (৯৩২) একপ্রকার বর্ণনামূলক কবিতার উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার নাম হইল ববচন। শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত 'বচ্'—ধাতু হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। এইগুলি সাধারণত স্বদেশী ছন্দে বিরচিত হইলেও ইহাতে সম্ভবত সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগ করিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। এতদ্ব্যতীত আরো এক প্রকার ছন্দোবদ্ধ কাব্য বিদ্যমান ছিল; উহার নাম ছিল লম্বঙ্গ। আমরা তন্তুলার বিরচিত সুতসোম নামক কাব্যের (চতুর্দশ শতাব্দী) শেষের দিকের একটি চরণে পাইতেছি 'কবি গীত লম্বঙ্গ' অর্থাৎ গীত এবং লম্বঙ্গের কবি। ডঃ [illegible] [illegible]মান করিয়াছেন যে, এই লম্বঙ্গ শ্রেণীর কবিতা বা প্রশস্তি সম্ভবত ক[illegible]বিনের মতই সংস্কৃত ছন্দে বিরচিত হইত। তিনি নাগরকৃতাগমের ১৭ সর্গের দুইটি বিপরীত মাত্রার অর্ধচরণকে ইহার দৃষ্টান্তস্থল ব[illegible] অনুমান করিয়াছেন।(২)

তবে ইহা স্বীকার্য [illegible] এই সমস্ত ববচন এবং লম্বঙ্গ পর্যায়ের কবিতা বা প্রশস্তি বর্তমানে দুষ্[illegible] যে সমস্ত প্রাচীন যবদ্বীপীয় পুঁথি এখনো পঠিত কিংবা আলো[illegible]য় নাই, তাহার মধ্যে এই শ্রেণীর রচনা আছে কি না তাহা [illegible]সন্ধান করা কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত কাকাবিনের সহিত ববচন এবং [illegible]ম্বঙ্গের কি সম্বন্ধ ছিল বা আদৌ ছিল কি না, তাহা নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বিষয়।

যবদ্বীপের বাহিরে মালয় অঞ্চলে এবং বলিদ্বীপেও একটি সাহিত্যের জগৎ বিদ্যমান ছিল। ইহা[illegible] প্রাচীনতম নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে প্রাচীন মালয় এবং প্রাচীন ব[illegible]পীয় ভাষায় বিরচিত অনুশাসন লিপিগুলিতে। কেবলমাত্র শিলা[illegible]পি বা তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ হইয়াছে অথবা ইহা অলঙ্কারবিহীন এই অপরাধে যদি আমরা ইহাদিগকে সাহিত্যিক পদমর্যাদা দিতে কু[illegible] হই, তাহা হইলে সম্ভবত অন্যায় হইবে, কারণ যে উপকরণেই লিপি[illegible]লিখিত হইয়া থাকুক না কেন উহা যে সেই যুগের রচনার নিদর্শন সে[illegible]ন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং রচনায় উৎকর্ষ বা মূল্যায়ন দিয়া সাহিত্যিক প্রচেষ্টার এই প্রথম নিদর্শনকে স্বাগত জানানো সঙ্গত হইবে না: সাহিত্যের অপটু প্রথম প্রয়াস হিসাবেই ইহাদিগকে[illegible]

১। Teeuw, Het Bhomakavya, Groningen, 1946, p. I; C. Hooykaas, VKI, 16 (1955, pp. 6-7

২। ছন্দ বিপুলাবক্ত্র: VV-VV--V/V--VV-VV

অভ্যর্থনা জানাইতে হইবে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে আমাদিগকে প্রাচীনতম শিলালেখ-তাম্রশাসনগুলির তারিখগুলি স্মরণে রাখিতে হইবে। সুমাত্রায় প্রাচীন মালয় বা প্রাচীন মালয়ের মত ভাষায় রচিত সর্বপ্রাচীন লিপিটি (শিলালিপি) ৬০৫ শকাব্দে (৬৮৩ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার আরম্ভে আমরা পড়িতেছি :

'স্বস্তি শ্রী শকবর্ষাতীত ৬০৫ একাদশী শুক্লপক্ষ বুলন্ বৈশাখ ডপুন্ত হিয়ম্ নায়িক দি সাম্বৌ মঙ্গলপ, সিদ্ধযাত্র দি সপ্তমী শুক্লপক্ষ বুলন জ্যেষ্ঠ ডপুন্ত হিয়ম মরলপস্ দরি মিনাঙ্গ তাম্বন্ মমাব য়্ বল দুত্র লক্ষ দঙ্গন্ কো দুত্র রতুস্ চার দি সাম্বৌ দঙ্গন্ জালন্ সরিবুৎলুরাতুস্ সপুলু দুত্র বত্তকত্র দালম্ দি মত জপ, সুখ চিত্ত দি পঞ্চমী শুক্লপক্ষ বুল (ন্)···লঘু মুদিত দাতম্ মরুবু অং বনুঅ—লঘু মুদিত দাতম্ মরুবু অং বনুঅ···শ্রীবিজয় সিদ্ধযাত্র সুভিক্ষ—'

অনুরূপ ভাষায় রচিত আরো দুইটি অনুশাসনলিপি ৬০৬ এবং ৬০৮ শকাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।(৩)

ইহার প্রথমটি পাওয়া গিয়াছিল সুমাত্রার পালেম্বাঙ্গ অঞ্চলে, দ্বিতীয়টি বঙ্কদ্বীপের কোটাকাপুর নামক স্থলে। এই সমস্ত অনুশাসন-লিপির সংস্কৃত শব্দগুলি সহজেই বোধগম্য, কিন্তু ইহার অপরাপর অংশের ভাষা পণ্ডিতগণের নিকট অনেকটা দুর্বোধ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। লিপিগুলিতে ব্যবহৃত এই ভাষার নাম প্রাচীন মালয় কিংবা কিউয়েন লুয়েন যাহাই দেওয়া হউক না কেন, এই ভাষা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনো একান্তই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। যদি আমরা ইহাকে প্রাচীন মালয়-ভাষার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করি, তাহা [illegible] আমরা বলিব যে, প্রাচীন মালয়-সাহিত্যের আদিপর্বের ন[illegible] ৬৮৩ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

বলিদ্বীপের তারিখ-সম্বলিত সর্বপ্রাচীন [illegible]শাসনলিপিটি ৮১৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহা বলি[illegible]পীয় ভাষাতেই রচিত হইয়াছে।(৪) এই সমস্ত অনুশা[illegible]কে আমরা প্রাচীন মালয় বা প্রাচীন বলিদ্বীপীয় সাহিত্যে[illegible]প্রথম নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করিলেও একথা স্বীকার্য যে, [illegible] ভাষাতে লিখিত প্রাচীনতম নিদর্শন লোপ পাইয়াছে অথবা দীর্ঘকাল এই ভাষাতে কোন পুঁথি লিখিত হয় নাই। সুতরাং দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য বলিতে আমরা সাধারণত প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি বুঝিয়া [illegible]কি।

এই সাহিত্য আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা যবদ্বীপীয় লিখনরীতি বা হস্তাক্ষর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। খুব প্রাচীনকালের হস্তলিখিত পুঁথি এখন আর বিদ্যমান নাই, সুতরাং যবদ্বীপের প্রাচীন অক্ষরগুলির নিদর্শন খুঁজিতে গেলে তাম্রপত্র এবং শিলালেখগুলির সাহায্যই লইতে হইবে। ৭৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যবদ্বীপের সর্বপ্রাচীন অনুশাসনলিপিগুলি পল্লবগ্রন্থ হস্তাক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পূর্ণ বর্মণের শিলালিপিগুলি, তুকমাসের শিলালিপি এবং সঞ্জয়ের চঙ্গললিপিটি দক্ষিণ ভারতের পল্লবগ্রন্থ হস্তাক্ষরেরই স্বাক্ষর বহন করিতেছে। ৭৬০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ দিনজলিপিতে আমরা প্রাচীন যবদ্বীপীয় হস্তাক্ষরের সর্বপ্রথম নিদর্শন পাই, ইহা পল্লবগ্রন্থ হস্তাক্ষরের বিবর্তিত রূপে এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এই লিপিকে অনেকে কবি-লিপি আখ্যা দিয়াছেন।

শুধু লিপি বা হস্তাক্ষরেই এই পরিবর্তন পর্যবসিত হয় নাই। ইহার কিছুকাল পর হইতেই অনুশাসনলিপিতেও স্বদেশী ভাষা ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে পর্যায়ক্রমে প্রাকৃত, প্রাকৃত-সংস্কৃতের মিশ্রণ এবং সর্বশেষে বিশুদ্ধ সংস্কৃত অনুশাসন-লিপিগুলিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পল্লবশাসিত দক্ষিণ ভারতের অনুশাসনলিপি[illegible] প্রতিফলিত হইয়াছে, কিন্তু সপ্তম শতাব্দী হইতেই পল্লবগণের অনুশাসনলিপি রচনায় অনেক[illegible] তামিল ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা একান্ত আক[illegible] ব্যাপার না-ও হইতে পারে যে প্রায় একই সময়ে সুমাত্রায়, প্রাচীন মালয়, কাম্বোডিয়াতে খেনর, চম্পাতে চাম এবং যবদ্বীপে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা ব্যবহৃত হইতে লাগিল।(৫)

প্রাক-মুসলিম যুগের এই হস্তাক্ষরকে স্থানীয় লোকেরা অক্ষর-বুদ বলিয়া থাকেন। ডঃ গণ্ডা ইহার অর্থ করিয়াছেন 'অক্ষর বুদ্ধ' বা বৌদ্ধহস্তলিপি।

এই হস্তাক্ষরকে 'বৌদ্ধহস্তলিপি' কেন বলা হইবে তাহার কারণ বোঝা দুঃসাধ্য। প্রথমত যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্মের প্রতাপ তান্ত্রিক শৈবধর্মাপেক্ষা কখনো প্রবলতর ছিল না। দ্বিতীয়ত এই হস্তাক্ষর যদি শৈব দিনজ-অনুশাসনলিপির বিবর্তিত রূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহাকে অক্ষরা-শৈব বলাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। সুতরাং ইহাকে বৌদ্ধহস্তলিপির সহিত সংযুক্ত করা অসঙ্গত। আমার মনে হয় যে, অক্ষর-বুদ দ্বারা অক্ষর বোধ বা অক্ষর সম্বন্ধে জ্ঞানকেই বুঝাইতেছে। আজিও বাংলা দেশের প্রথম শিক্ষার্থীদের পুস্তকের নাম বোধোদয়, বর্ণবোধ ইত্যাদি দেখা যায়। অক্ষর-বুদ শব্দগুচ্ছ অক্ষর-বেদ শব্দের বিকৃত রূপ হওয়াও অসম্ভব নহে। প্রাচীন যবদ্বীপে পল্লবগ্রন্থ এবং কবি-হস্তাক্ষর ব্যতীত আরো একটি হস্তাক্ষর কিছুদিনের জন্য প্রচলিত হইয়াছিল। ডঃ বস্ ইহার নাম দিয়াছেন প্রাক্-নাগরী হস্তাক্ষর। এই হস্তাক্ষর দিনজ-অনুশাসনের প্রায় সমসাময়িক কলসন (৭৭৮ খৃঃ), কেলুরক (৭৮২ খৃঃ) প্রভৃতি লিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াতে কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে, উত্তর-ভারতে, নেপালেও এই হস্তলিপির পরিচয় পাওয়া যায়।(৬) যবদ্বীপে এই

৩। এই সমস্ত অনুশাসনলিপি সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : Coedes in BEFEO, XXX, pp. 29—80; Ferrand in J. As, 1932, [illegible] 271—326; Van Ronkel in Acta Ori[illegible]a, Vol. II, p. 12; Krom in TBG, 59, p.[illegible]; Kern, VG VII, p. 205, See also Coedes, Les etats etc, p 142 ff.

৪। তারিখ-সম্বলিত অনুশাসনলিপিগুলির তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য : Van Stein Callenfels, OV, 1924, pp. 28-35, Stutterheim, Oudheten van Bali I (1929) pp. 190 ff.

৫। Vide Chhabra in ASBLI (1935) p. 63.

৬। Bosch in TBG, vol 68 (1928) pp, 1ff,

প্রাক্-নাগরীর আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, ইহার বিলয়ও তেমনি আকস্মিক। কারণ পরবর্তী যবদ্বীপীয় লিপিগুলি কবি-হস্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। এই কবি-হস্তাক্ষর দিনজলিপির যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে আধুনিক যবদ্বীপীয় হস্তাক্ষরে পরিণত হইয়াছে।(৭)

এই লিপি হইতেই আবার সুন্দনীজ, মাদুরীজ এবং বলিদ্বীপীয় হস্তাক্ষরের জন্ম হইয়াছে। মধ্যযুগের সুমাত্রার হস্তাক্ষরও কবিলিপির বংশধর। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে, মধ্যসুমাত্রার বটক হস্তাক্ষর ইন্দোনেশীয় পল্লব-হস্তাক্ষরের প্রকারভেদ মাত্র। এমন কি, দক্ষিণ সুমাত্রার রেজঙ্গ এবং লম্পোঙ্গ হস্তলিপির সহিত এই কবিলিপির যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইন্দোচীনের চম্পাদেশের চাম-হস্তাক্ষরও ভারতবর্ষ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই চাম ভাষার সহিত ইন্দোনেশীয় ভাষার নিকট সম্পর্ক ভাষাতত্ত্ববিদগণের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, যবদ্বীপের লিখিত ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হইল সংস্কৃত ভাষায় রচিত অনুশাসনলিপিগুলি। যবদ্বীপের প্রাচীন গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে সংস্কৃতশ্লোক এবং অসংখ্য [illegible] হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, যবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষার গভীর অনুশীলন হইত। পার্শ্বস্থ দ্বীপ সুমাত্রাতেও আমরা সংস্কৃতের প্রচলন দেখিতে পাই। সুমাত্রার পালেম্বাঙ্গ অঞ্চলে [illegible]কন বুকিতের যে অনুশাসন-লিপিটি আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা [illegible] সুমাত্রার সভ্যমানুষের জীবনে সংস্কৃতের কি স্থান ছিল তাহা উপলব্ধি হইবে। এই অনুশাসনলিপিটির প্রারম্ভিক শব্দগুলি এবং 'বুলন' শব্দ ব্যতীত অন্যান্য সময়-পরিমাপক শব্দগুলি বিভক্তি-বিহীন সংস্কৃতে বিরচিত। পরবর্তী তালাঙ্গ তুবো অনুশাসনলিপিটিতেও অনেক সংস্কৃত শব্দ পরিবেশিত হইয়াছে। অনুশাসনলিপিগুলির কথা বাদ দিলেও যবদ্বীপ ও সুমাত্রায় যে গভীরভাবে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন হইত, তাহার আরো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে।

ইৎসিঙ্গ শ্রীবিজয়ে (দক্ষিণ-পূর্ব সুমাত্রায়) দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি ৬৮৫ হইতে ৬৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চারি বৎসর কো-চি'তে (শ্রীবিজয়) অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি সংস্কৃত ভাষায় লেখা অনেক বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্যান্টন হইতে কয়েকজন সহকর্মী সংগ্রহ করিয়া লইয়া শ্রীবিজয়ে আসেন এবং সেখানে দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন।

এই দুইখানি গ্রন্থই মুখ্যত তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত।(৮) অতঃপর ৬৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি পাণ্ডুলিপিগুলি চীনে প্রেরণ করিলেন এবং ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বয়ং সেখানে উপনীত হইলেন। ভারতবর্ষ এবং চীনের মধ্যে যাতায়াত করিবার সময় ইৎসিঙ্গ শ্রীবিজয়ে ছয় মাসকাল থাকিয়া শব্দবিদ্যা বা সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত য়ুন্-কি, ত-ৎসিন, চেঙ্গকৌ, তও-হোঙ্গ, ফ-লঙ্গ প্রভৃতি চীনা পণ্ডিত শ্রীবিজয়ে দীর্ঘকাল থাকিয়া স্থানীয় ভাষা কৌএন-ফুয়েন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রধান কার্য ছিল বৌদ্ধগ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া উহা অধ্যয়ন করা এবং অনুবাদ করা। ইৎসিঙ্গ বলিয়াছেন যে, চীনাতীর্থযাত্রী হুইনিঙ্গ ভারতবর্ষে যাওয়ার পথে তিন বৎসরকাল হোলিঙ্গ (মধ্যজাভা) নামক স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় পণ্ডিত জ্ঞানভদ্রের সহযোগিতায় তিনি কয়েকখানি বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন।(৯) হুইনিঙ্গ এবং জ্ঞানভদ্রের এই সহযোগিতার ফলে বুদ্ধদেবের নির্বাণসংক্রান্ত আগমের অনুবাদ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, পালি ধর্মশাস্ত্রে যাহা নিকায় নামে পরিচিত, সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রে তাহাই আগম নামে সুপরিচিত। সুতরাং বুদ্ধদেবের নির্বাণসংক্রান্ত গ্রন্থের অনুবাদে গভীর সংস্কৃত-জ্ঞান অপরিহার্য ছিল। ইৎসিঙ্গ আরো বলিয়াছেন যে, এই দ্বীপাঞ্চলে অশ্বঘোষের সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত বুদ্ধচরিত ভারতবর্ষের মতই জনপ্রিয় ছিল। দ্বীপময় ভারতের এই বৌদ্ধধর্ম মুখ্যত ছিল হীনযানের মূল সর্বাস্তিপদশাখার। এই শাখার গ্রন্থাবলী প্রধানত সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় যবদ্বীপে এবং দ্বীপময় ভারতের অন্যত্র পালি ভাষায় রচিত [illegible]ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থাদি দুর্লভ। শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের কল্যাণে সুমাত্রা[illegible] [illegible]তচর্চা যে গতিবেগ সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যা[illegible] ছিল। কারণ আমরা সুঙ্গবংশের ইতিবৃত্তে পড়িতেছি যে, ১০১৭ খৃষ্টা[illegible] চীনাদূতগণ এই স্থল হইতে অনেক সংস্কৃত পুঁথি স্বদেশে লইয়া গিয়া[illegible]লেন। এই সময়ে সুমাত্রার যিনি নরপতি ছিলেন, তাঁহাকে সুঙ্গ[illegible]বৃত্তে হিয়-চে-সৌ-বৌ-চ-পৌ-মি অর্থাৎ হস্তি সমুদ্রভূমি (সুমাত্রার রা[illegible] অভিধানে ভূষিত করা হইয়াছে।(১০) ক্রমে ভারতবর্ষে মুসলমান [illegible]ধান্য স্থাপিত হওয়ায় এই সংস্কৃত-চর্চায় ছেদ পড়িল। সেই[illegible] সুমাত্রায় অবস্থিত অদ্বয়বর্মণের 'পুত্র কনকমেদিনীন্দ্র'।(১১) [illegible]আদিত্যবর্মণের (১৩৪৩ খৃঃ)

B R Chatterji, Indian Cultural influence in Combodia, p, 110.

৭। Kern, VG VII, p 67 ff , Krom, Geschiedenis², p 5, Gonda, Sanskrit in Indonesia, p 32.

৮। (ক) Memoire compose a l' epoque de la grande dynastie T' ang sur les Religieux Eminents qui allerent chercher la loi dans les pays d'occident par I-tsing. Translated by E. Chavannes, Paris, 1894. (খ) A. Record of the Buddhist religion as practised in India and the Malay Archipelago (671-695) by I-tsing . Translated by J. Takakusu (Oxford, 1896).

৯। E. Chavannes, Religieux eminents, [illegible]0.

১০। Grœneveldt, Notes, p. 65 ; Ferrand, J. As., 1922, pp 19-20 ; Krom, Geschiedenis², p. 249.

১১। Kern, VG VII p. 219.

বটুবেরগুঙ্গ, অমোঘপাশ শিলালিপি প্রভৃতি 'উত্কট সংস্কৃতে' রচিত হইয়াছে।(১২)

সুমাত্রার সংস্কৃতচর্চায় ক্রমশ ভাটা পড়িলেও মধ্য যবদ্বীপে ইহার স্রোত দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। এই স্থলের সর্বপ্রাচীন অনুশীলন-লিপিগুলি যে কেবলমাত্র সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাই নহে, ঐ সংস্কৃত ভাষা শিখাইবার জন্য আবার অনুশীলনী পুস্তক, ব্যাকরণ, ছন্দশাস্ত্র, অভিধান প্রভৃতি প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় অথবা মিশ্র সংস্কৃত—যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত রামায়ণ-মহাভারতের প্রাচীন যবদ্বীপীয় সংস্করণ ঐ সমস্ত কাব্যাশ্রয়ী বিভিন্ন কাকাবিন গ্রন্থ, ধর্ম ও পুরাণ সাহিত্য, বয়াঙ ও রূপকথা এত অধিক সংখ্যায় রচিত হইয়াছিল যে, যবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন শাখায় গভীর অনুশীলন ব্যতীত ইহা সম্ভবপর ছিল না। ডঃ হুইকাশ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, কবি যোগীশ্বরের যবদ্বীপীয় রামায়ণ গ্রন্থাদি ভট্টিকাব্যের আংশিক অনুবাদ এবং আংশিক মূলানুসারী স্বকীয় সৃষ্টি। এই সমস্ত গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা যথাসময়ে করিব।

যবদ্বীপের আদিম ভাষা কিরূপ ছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করিবার মত পর্যাপ্ত উপাদান বিদ্যমান নাই। তবে বিভিন্ন দ্বীপে প্রচলিত ইন্দোনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর বাক্যশৈলীর রূপ অনুধাবন করিলে ইহা মনে হইবে যে, প্রাচীন যবদ্বীপীয় নরনারী সহজ সরল ছোট ছোট বাক্যদ্বারা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করিত। বস্তুত কেবলমাত্র প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার নহে, প্রাচীন মালয় ভাষারও আদিম রূপ এইরূপ সহজ, নিরাভরণ এবং জটিলতাবর্জিত ছিল। [illegible] বচন, বিভক্তি, ক্রিয়া ও অক্রিয়ার পার্থক্য বিদ্যমান ছিল [illegible] বলিলেই হয়; ইহার জটিলবাক্য সৃষ্টি করিবার সাধ্য একান্ত সীমিত ছিল। এই সীমিতসাধ্য যবদ্বীপীয় ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রখর সূর্যালোক আসিয়া নিপতিত হইল। ইহার ফল হইল অসাধারণ; কারণ এই সাংস্কৃতিক সংঘাত ও সহযোগিতার ফলে যে অমৃত উঠিয়াছিল তাহাই যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের সাহিত্যে [illegible] তদ্রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, প্রথম যুগে সংস্কৃত ও প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার মধ্যে যে সহযোগিতা বা সংঘাত ঘটিয়াছিল তাহার স্বরূপ বুঝিবার কোনো দিগ্‌দর্শন নাই। সুতরাং এই যুগের দুই ভাষার মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘাতের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে আমরা কেবল অনুমান করিতে পারি, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিবেশন করা সম্ভবপর নহে। পরোক্ষ প্রমাণ যাহা বিদ্যমান তাহার মধ্যে প্রধান হইল: (১) প্রাচীনতম শিলালেখ—তাম্রশাসনে ব্যবহৃত যবদ্বীপীয় ভাষা এবং উহাতে পরিবেশিত সংস্কৃত শব্দগুলির বানান; (২) মধ্য যবদ্বীপে রচিত গ্রন্থাবলী এবং [illegible] আলোচ্যবিষয়। প্রমাণের স্বরূপ দেখিয়া স্বভাবতই মনে [illegible] যে, এইরূপ শিথিল ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন অচল সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর নহে। এই কথা অতীব সত্য; সুতরাং এই বিষয়ে এস্থলে যাহা বলা হইবে তাহাকে সুসঙ্গত অনুমানের বেশি মর্যাদা দেওয়া সম্ভবপর নহে।

আমরা একথা হয় তো সহজেই স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে, যবদ্বীপে যে সমস্ত হিন্দু বৌদ্ধ ঔপনিবেশিক ব্যবসায়ী বা অভিযাত্রিক আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন না। তাঁহাদের ভাষা ছিল প্রাদেশিক ভাষা অর্থাৎ তাঁহারা ভারতবর্ষের যে অঞ্চল হইতে গিয়াছিলেন সেই অঞ্চলের ভাষাতেই তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কথোপকথন বা ভাবের আদান-প্রদান করিতেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষার জননী সংস্কৃত; সুতরাং এই সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার শব্দাবলী সংস্কৃতবহুল হওয়ার জন্য সম্ভবত তাঁহাদের ভাবের আদান-প্রদানে বিশেষ কোন বাধার সৃষ্টি হইত না। এই সমস্ত ভারতবাসীরা আবার যখন দ্বীপময় ভারতের অধিবাসিগণের সঙ্গে আলাপ করিতেন তখন তাঁহারা সম্ভবত সংস্কৃত মিশ্রিত ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রাচীন মালয় বা প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন।

এই সংস্কৃত শব্দগুলি সম্ভবত ছিল প্রাদেশিক ভাষার কথ্য সংস্কৃত শব্দ। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত ভারতবাসী দ্বীপময় ভারতের নারীগণকে বিবাহ করিয়া ঐ অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া [illegible] ঐ ভাষার আংশিক ব্যুৎপত্তিলাভ করি[illegible] ভারতবর্ষাগত অপর [illegible] ঔপনিবেশিক বা ব্যবসায়িগণকে [illegible] ভাষায় দীক্ষিত করিতেন। সম্ভবত অতি প্রাচীন যুগে [illegible] ভাষার শব্দসংখ্যাও বিপুল ছিল না; [illegible] করিতে দীর্ঘকাল লাগিবার কথা নহে।

এ কথা আমরা সহজেই স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে, দ্বীপময় ভারতের অগণিত নর-নারী তাঁহাদের স্বদেশী ভাষাতেই কথাবার্তা বলিতেন। সুতরাং বিদেশী লোকের পক্ষে নূতন দেশে আসিয়া তথাকার প্রচলিত ভাষায় কোন মৌলিক পরিবর্তন করা অসম্ভব ছিল। এই পরিস্থিতিতে সংস্কৃত এবং দেশীভাষার সহযোগিতায় ও সংঘাতে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার অবলুপ্তি ঘটিল না, ঘটিল উৎকর্ষসাধন। ইহারই স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে উচ্চস্তরের ভাবের জগতে। সেখানে সংস্কৃতের সাহায্য অপরিহার্য ছিল এবং এই সাহায্য গ্রহণ করিয়াই যবদ্বীপীয় ভাষার জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণীত হইল। আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি যদি সত্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা সংস্কৃত এবং যবদ্বীপীয় ভাষার মিশ্রণ নহে: ইহা হইল ইন্দোনেশীয় বাক্য এবং রচনাশৈলীর মধ্যে সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ। এই অনুপ্রবেশ কোন কোন গ্রন্থে সীমিত ভাবে হইয়াছে, কোন কোন গ্রন্থে হইয়াছে বিপুলভাবে। বস্তুত যবদ্বীপীয় গ্রন্থগুলিতে আমরা সংস্কৃতের যে দিগ্বিজয়ী রূপ দেখিতে পাই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে ডঃ যুইনবল কর্তৃক সংকলিত এক যবদ্বীপীয় ডচ্ ভাষার অভিধান গ্রন্থে। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে, ঐ অভিধানে ৬৭১০টি সংস্কৃত শব্দ আছে এবং যবদ্বীপীয় শব্দের সংখ্যা হইল ৬৯২৫টি। মালয় অভিধানগুলিতেও সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা ৭৫০টির কম হইবে না।(১৩) ডঃ গণ্ডা যবদ্বীপের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের কথা

১২। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Kern, VG VII pp. 163, 219; TBG, 1921, pp. 199-200; Kern in OV 1912 pp. 51-2.

১৩। দ্রষ্টব্য Gonda, Sanskrit in Indonesia, pp. 115-6.

আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, উহার কোন কোন পৃষ্ঠায় সংস্কৃত ও দেশী শব্দের আনুপাতিক সংখ্যা যথাক্রমে ৪ ও ১। প্রাচীন যবদ্বীপীয় কাব্যগুলিতে এই অনুপাত ১ : ৪ বা ২ : ৭।(১৪) মধ্যযুগের কিদুঙ্ সুন্দের রচনায় সংস্কৃত ও দেশী শব্দের হার যথাক্রম ১ : ৪ হইবে।(১৫)

বহুদিন পূর্বে ডঃ ব্র্যাণ্ডেস (১৬) যবদ্বীপীয় ভাষায় বিরচিত প্রাচীনতম শিলালেখ তাম্রপত্রে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহাতে সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং উহার বানানও শুদ্ধ নহে। পরবর্তী যুগের অনুশীলন লিপিগুলিতে সংস্কৃত শব্দসংখ্যার যেমন বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি উহার বানানও প্রায় নির্ভুল। ইহা হইতে এই অনুমান করাই স্বাভাবিক যে, (ক) সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ প্রথম যুগ অপেক্ষা দ্বিতীয় যুগে ব্যাপকতর হইয়াছিল ; (খ) দ্বিতীয় পর্বে সংস্কৃত ভাষার গভীরতর অনুশীলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুগের সংস্কৃত শব্দ শ্রুতিলিখন পর্যায়ের নহে ; (গ) তৃতীয় এবং শেষ পর্বে আমরা যবদ্বীপ এবং সুমাত্রায় সংস্কৃত রচনার যে নিদর্শন পাই, তাহাতে ব্যাকরণ, বানান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক ভুলভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হয়। [illegible] মজপহিত যুগে যে অজস্র সংস্কৃত শব্দ দৈনিক কথ্যভাষায় ব্যবহৃত [illegible] তাহা সম্ভবত যবদ্বীপীয় কথ্য রীতির সহিত যথাসম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণ করি[illegible] উচ্চারিত হইত।(১৭) অর্থাৎ এই যুগের সংস্কৃত শব্দ যবদ্বীপের [illegible]সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কথ্যভাষার প্রভাবে এ[illegible] বহুল রূপান্তর ঘটিয়াছে।

২

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দু-আধিপত্যের যুগে যবদ্বীপের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র প্রথমে পশ্চিম যবদ্বীপে ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিরচিত পূর্ণবর্মনের সংস্কৃত অনুশাসনলিপি এই রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিচায়ক। তাঁহার রাজধানী ছিল তারুম নগরে। এই তারুম রাজ্যটি সম্ভবত ৭ম শতাব্দীতেও বিদ্যমান ছিল। কারণ, ত্যাঙবংশের নূতন ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তো-লো-মো বা তারুম হইতে ৬৬৬—৬৬৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীন দেশে দূত প্রেরিত হইয়াছিল।(১৮) এই দুইশত বৎসর পশ্চিম যবদ্বীপের রাজদরবারে সংস্কৃতচর্চা আদৌ হইত না, ইহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য, কিন্তু ইহা প্রমাণ করাও আবার অসম্ভব।

পশ্চিম যবদ্বীপের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র অবশেষে মধ্য যবদ্বীপে চলিয়া গেল ; ইহা সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর ঘটনা। যে তারুম রাজ্যটিকে আমরা পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি বিস্ময়চকিত নেত্রে দেখিয়াছিলাম তাহা সপ্তম শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে একবার দেখা দিয়া কালসমুদ্রে বিলীন হইয়া গেল। এই সময়েই ঘটিল হো-লিঙ্গ বা মধ্য জাভার অভ্যুত্থান। পশ্চিম যবদ্বীপের নেপথ্যগমন এবং মধ্য জাভার উত্থানের মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কি না এবং থাকিলে তাহার তাৎপর্য কি, তাহা বর্তমানে আর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এস্থলে শুধু এইটুকু স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, তুকমাস শিলালিপির ব্রাহ্মণ্যধর্ম, ডিয়েঙ্গ উপত্যকার স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য, হুইনিঙ্গ-জ্ঞানভদ্রের শাস্ত্রালোচনা যে সংস্কৃতির স্বাক্ষর, তাহাতে মনে হয় যে মধ্য যবদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ লাভ করিবার পরিবেশ যথেষ্ট অনুকূল ছিল। এই স্থলে ইন্দোনেশীয় এবং ভারতীয় সভ্যতার সংঘাতে একদিকে ভাষা ও সাহিত্য এবং অন্যদিকে শিল্পের সৃষ্টি হইল। সামাজিক জীবনেও সম্ভবত এই সময়ে এক বিপুল আলোড়ন দেখা দিয়াছিল। এই আলোড়ন ছিল সুদূরপ্রসারী এবং ইহা প্রায় তিন শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া উচ্চতর সমাজ-জীবনে, চিন্তায় এবং আদর্শে বিপুল পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল। সম্ভবত ভাষা ও সাহিত্য-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ব্যাকরণ, অভিধান রচনা, সংস্কৃত শিখিবার অনুশীলনী পুস্তক মধ্য যবদ্বীপের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকালেই সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই যুগে কোন কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে বলিবার উপায় নাই। মধ্য জাভার প্রাধান্যকাল যদি আমরা ৬৫০—৯২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করি তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই যুগে সম্ভবত তিনখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই বিষয়েও অবশ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে অমরমালা নামক কোষ গ্রন্থখানি অন্যতম এবং ইহা রাজা জিতেন্দ্রের নির্দেশানুযায়ী রচিত হইয়াছিল বলিয়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। এই সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা আমরা পরে করিব।

পূর্ব জাভার প্রা[illegible] স্থাপিত হয় দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হইতে, কিন্তু এই সময় হইতে রাজা ধর্মবংশের শাসন কালের পূর্ব পর্যন্ত (৯২৫—৯৯০ খৃষ্টাব্দ) আর কোন যবদ্বীপীয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কি না তাহা আজ বলিবার উপায় নাই। দশম শতাব্দীর শেষভাগে ধর্মবংশের রাজত্বকাল হইতে যবদ্বীপীয় সাহিত্যের উন্নতির যুগ আরম্ভ হইল। এই যুগ আনুমানিক [illegible] খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। এই যুগে কা[illegible], সিঙ্গসরি এবং মজপহিত রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্য উন্নতির চরম-শিখরে আরোহণ করে। এই সাহিত্যসৃষ্টিতে পূর্ব যবদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন স্তরের লোক সহযোগিতা করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ গ্রন্থই তারিখবিহীন এবং ইহাদের রচনাস্থল কোথায় তাহাও নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। এই অনিশ্চয়তার জন্য এই সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতির ইতিহাস লেখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং ইহার সময়ও সম্ভবত সমাগত হয় নাই। যাহাই হউক মজপহিত যুগের পরেও এই ভাষায় আরো প্রায় দুই[illegible] কাল অর্থাৎ ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সাহিত্যের প্রাণ ছিল না। প্রাক্ মুসলিম যুগের এই সাহিত্যই

১৪। Ibid, pp 119, 120

১৫। Ibid, p. 121

১৬। TBG XXX11 (1889) p.112 ff, 129 ff, Krom, Geschiedenis², p. 94.

১৭। G. Pigeand, Java in the fourteenth century, Vol. IV. p. 181.

১৮। Pelliot, Deux itineraires, BEFEO, IV, p. 284

—ঘটনাটা জানা দরকার। বলেছিলেন বিজয়বাবু।

—ঘটনা তো সবাই জানে। তুমিও জান।

হ্যাঁ জানেন। অস্বীকার করতে পারেন না বিজয়। ম্যানেজার এসে বলেছিল—মৃগেনবাবুর স্ত্রীও নেই।

—নেই তাই কি! উনি হয় তো কোথাও গিয়েছেন।

কোথাও গিয়েছেন তো নিশ্চয়ই—কিন্তু কোথায় তা কেউ জানে না।

ম্যানেজারবাবু ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, লোকে বলছে···মানে মৃগেনবাবুদের ওখানে ওঁর খুব যাতায়াত ছিল। মৃগেনবাবুর স্ত্রীও খুব সুন্দরী—কাল থেকে তিনিও অনুপস্থিত এই সব মিলে···দুয়ে-দুয়ে চার···

—না। আমি বিশ্বাস করি না। জোর দিয়ে বলেছিলেন বিজয়বাবু।

কিন্তু, দিনের পর দিন কেটে যায় মৃগেনবাবুর স্ত্রী ফিরে আসেন না—মৃগেনবাবুও সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব তখন ধীরে ধীরে বিজয়বাবুর বিশ্বাসের জোর ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। কিন্তু, তবুও···

এখনও তিনি বিশ্বাস করেন না যে অসিত ভণ্ড, অসিত চরিত্রহীন। কিছু একটা ঘটেছে—কোন একটা বিশেষ ব্যাপার—যে জন্য···

তাই তিনি দিনরাত ভাবতেন, কেন ও এমন করলো? কি চেয়েছিল ও! ভাবতেন আর বলতেন—বলতেন আর ভাবতেন—

শেষটায় সরোজ একদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিল, রাত্রিদিন তুমি ঐ লোকটার কথা বল কেন?

—'ঐ লোকটা!' চমকে উঠেছিলেন বিজয়বাবু, তোর বাবা—

—না। গম্ভীরকণ্ঠে সরোজ বলে, যে স্ত্রীপুত্রের দায়িত্ব অস্বীকার করে, সে পতি নয়, পিতা নয়। এই সব দায়িত্বহীন, উচ্ছৃঙ্খল লোকদের শাস্তি দেবার জন্যই আমাদের এই সমাজকল্যাণ-সমিতি।

—সে আবার কি?

—তুমি বুঝতে পারবে না? শুধু এটুকু জেনো, মানুষকে আর উচ্ছৃঙ্খল হতে দেব না আমরা। এই রকম শত, শত, লক্ষ, লক্ষ, সমিতি গড়ে উঠবে। অসামাজিক মানবকে সংযত করবে সামাজিক মানব।

বি-এ পাশ করবার পরে সরোজের বিয়ে দিতে চেয়েছিল।

—বিয়ে-টিয়ে করা আমার পোষাবে না, ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল সরোজ।

—ও কথা সবাই বলে। হাল্কা পরিহাসে বিজয় বলেছিলেন।

—আর, তোমরা তা বিশ্বাস করো না। কঠিনকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল সরোজ। অসিত রায়ের কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেছ?

একটু অবাক চোখে সরোজের দিকে তাকিয়ে ছিলেন বিজয়বাবু। এই প্রথম সরোজ তাঁর সামনে পিতার নাম উল্লেখ করলো, কিন্তু, কি নিবিড় ঘৃণা ফুটে উঠেছে ওর কণ্ঠে। বিজয়বাবুর চোখ হঠাৎ জলে ভরে ওঠে।

—মানুষের নিজের ইচ্ছাশক্তি ছাড়াও আর একটা জিনিস আছে, যা হচ্ছে পারিপার্শ্বিক—আমার মনে হয় তেমনি কোন পারিপার্শ্বিক···

—তুমি একটা আশ্চর্য লোক, সরোজ অবাককণ্ঠে বলে, যে তোমার এত ক্ষতি করেছে, তার পক্ষে ওকালতি করছ। কেন?

সেদিন বিজয় কিছু বলেন নি। পরে একদিন বলেছিলেন—তখন তিনি আরও বুড়িয়ে গেছেন—হাত দু'টো আপনা থেকেই থরথরিয়ে নড়তে থাকে—কথাও মাঝে মাঝে অসংলগ্ন হয়ে যায়···কিন্তু, অসিতের কথা উঠলে যেন নূতন মানুষ হয়ে যান—

বয়স যত-ই বাড়ছিল ততই অসিতের কথা আরও বেশি বলতেন। নিন্দেও নয়, প্রশংসাও নয়, শুধু নাম ধরে বলে যাওয়া—যেন স্বগতোক্তি করছেন।

সেই সময় একদিন সরোজ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিল, ওর সম্বন্ধে তুমি রাতদিন বক কেন?

—কেন? নিষ্প্রভ চোখে তাকিয়েছিলেন বিজয়, তারপরে হঠাৎ সরোজের মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলেছিলেন, কেন জানিস? ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—কৃতজ্ঞ? অবাক হয়েছিল সরোজ।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওর স্বভাব ঐ রকম ছিল বলে, ও ছেড়ে দিয়েছিল বলেই না আমি পেলাম তোকে। তোকে···তোকে···তোকে···দু'হাতে সরোজকে জড়িয়ে ধরেন বিজয়, নইলে আমার কিসের অধিকার। মাতামহ! কিন্তু, আমি তোকে পেয়েছি একান্তভাবে, সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে—এ যে কত বড় পাওয়া—আবেগে বিজয়ের শরীর কাঁপতে থাকে।

স্নেহের এই উগ্র উচ্ছ্বাসে সরোজের চোখে জল এসে যায়। কিন্তু, সামলে নিয়ে বলে, ছেলেবেলার সেই দৃশ্যটা আমার মনে পড়ে। আমি ছিলাম উঠোনের এককোণে, মা বসেছিল ঘরে তক্তপোষের ওপরে, তুমি···তুমি সেদিন···মাকে বকছিলে যে সে কেন অসিত রায়কে ধিক্কার দেয় না। তুমি নিজেই যদি তাকে এত ভালোবাসো তবে কেন মা'র নীরবতায় দুঃখিত হও।

—কেন? অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন বিজয়বাবু, আমি-ও একথা ভেবেছি। শেষটায় মনে হয়েছে, আমি তো আমার প্রাপ্য পুরোমাত্রায় পেয়েছি—বলতে গেলে প্রাপ্যের চেয়েও বেশি কিন্তু মেয়েটা কি পেল? স্বামী নেই, সংসারের প্রতি কোন আসক্তি নেই, সন্তানের প্রতি নেই ভালোবাসা। কে এর জন্য দায়ী? যে দায়ী কেন ও তার বিরুদ্ধে একটিও কথা বলবে না!

সেদিন সরোজ কোন কথা বলে নি, কিন্তু অনেকদিন পরে রমা'র মৃত্যুর পরে, রমার চিঠিটা পড়ে ওর এই কথা-ই মনে হয়েছিল, কে দায়ী। রমার জীবন নষ্ট হওয়ার মূলে কে!

বিজয়বাবু বুঝতে পেরেছিলেন সরোজকে দিয়ে ব্যবসার কোন কাজ হবে না। তাই তিনি আর বাড়াবার চেষ্টা না করে যা ছিল তাই রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন।

বিজয়বাবুর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই একরাত্রে সমাজকল্যাণ সমিতির কাজ সেরে ফিরে এসে সরোজ দেখলো, শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের প্রাইভেট সাইকেল-রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে।

একটু অবাক হয়ে দ্রুতপায়ে বাড়িতে ঢুকতে যেতে-ই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। তিনি বেরিয়ে আসছিলেন।

—কোথায় গিয়েছিলেন? ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করেন ডাক্তারবাবু।

—এই একটু কাজে···।

—ওঃ। আপনার সেই সমাজকল্যাণ··ডাক্তার যেন স্পষ্টতই বিদ্রূপ করেন।

সরোজ একটা রূঢ় প্রত্যুত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তখনই ভেতর থেকে পুরোণ ঝি বাসুর ভাঙা গলার চীৎকার ও কান্না ভেসে আসে, দিদিমণি গো···ও দিদিমণি···

···হ্যাঁ। শেষ হয়ে গেল। সরোজের সপ্রশ্ন ব্যাকুলদৃষ্টির উত্তরে ডাক্তারবাবু বলেন। অদ্ভুত ভাগ্য ভদ্রমহিলার—পতি-পুত্র পরিত্যক্তা।

কয়েকদিন ডাক্তারবাবুর কথাটা মনের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে সরোজের—পতি-পুত্র পরিত্যক্তা। সত্যই তো মায়ের প্রতি কোন কর্ত্তব্যই সে করে নি, তাই অনুতপ্তচিত্তে মায়ের জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেরিয়ে এল।

প্রত্যেকেই আমাকে দোষ দিচ্ছে, সমালোচনা করছে, বিশেষত বাবা। বাবা রীতিমতো গালাগালি দিচ্ছেন আমায়। কিন্তু আমার দোষ কি!

আমার স্বামীকে আমি ভালবেসেছি, তা যদি অপরাধ না হয়ে থাকে তবে একে ভালবাসি তাতে কি অপরাধ। চপলচিত্ততার ভর্ৎসনা করা সম্ভব, কিন্তু এরা আমাকে গালি দেয় আমার অচপল-চিত্ততার জন্য—আমার অন্তরের ভাবের একনিষ্ঠতার জন্য।

লোকের কাছ থেকে এ রকম বিপরীত ব্যবহার আমি আশা করি, বিশেষত বাবার কাছ থেকে।

মাতৃহীনগৃহে আমি বাবার হাতেই বড় হয়েছি। তিনি বার বার আমার মৃত মায়ের কথা সশ্রদ্ধে উচ্চারণ করেছেন—তাঁর আদর্শে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

মায়ের আদর্শবাদ অন্তত যা আমি বাবার মুখ থেকে পেয়েছি, তাতে পতিপ্রেম ছিল প্রধান কথা—একমাত্র বলা যেতে পারে।

বাবার বক্তব্যকে শ্রদ্ধা করে, মায়ের স্মৃতিকে পুজো করে আমার শৈশব কেটেছে। যৌবনের প্রারম্ভে বাবা বিবেচনা করে যাঁর হাতে আমাকে সম্প্রদান করেছেন, তাকেই আমি পতি বলে গ্রহণ করেছি। শুধু পতি নয়, প্রিয়।

তাঁকে আমি ভালবেসেছিলাম বাবার দেওয়া অন্যান্য স্নেহের দানের মতই তাঁকে আমি গ্রহণ করেছিলাম উন্মুখ মনে, বিনত শ্রদ্ধায়। তারপর, ধীরে ধীরে তাঁর চেহারা, তাঁর ব্যবহার আমার মনের ভালবাসাকে গভীর থেকে গভীরতর করে তুলেছিল।

তাঁকে ভালবাসা যেমন আমার অপরাধ নয়, আমাকে না ভালবাসতে পারাটাও তাঁর অপরাধ নয়। দোষ আমি তাঁকে দিই না। বরং, তিনি যে অন্তত কয়েকটি দিন তাঁকে ভালবাসবার সুযোগ আমাকে দিয়েছিলেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞ, হ্যাঁ, সত্য কথা। আমি শুধু প্রেমে মুগ্ধা নই, আমি কৃতজ্ঞা বিনীতা।

তোমরা আমাকে গালি দাও—তোমরা অবাক হয়ে ভাবো—এ মেয়েটি কি। যে স্বামী তাকে সন্তানসহ পরিত্যাগ করে গিয়েছে, তার সম্বন্ধে কোনদিন কোন অভিযোগ নেই—একটি কঠিন বাক্যও সে বলে নি কখনও। এর কি মন বলে কোন পদার্থ নেই।

এতদিন আমি কোন উত্তর দিই নি। তোমাদের মিথ্যা দোষারোপ কান পেতে শুনে গেছি, তোমাদের ভুল ধারণায় মনে মনে হেসেছি। আজ আমি উত্তর দিচ্ছি।

আমার মন অত্যন্ত গভীর এবং প্রবল বলেই সেই মন জানে—ভালবাসার ব্যাপারে দু'পক্ষ কখনই পরস্পরকে সমানভাবে ভালবাসতে পারে না। একপক্ষ ভালবাসে—অপর ভালবাসতে দিয়ে ধন্য করে। আমি তাঁকে ভালবেসেছি—তিনি আমাকে সেই অধিকার দিয়ে ধন্য করেছেন—এই তো আমার জীবনের পরম লাভ।

অধিকার! শব্দটা মনে পড়তেই তোমাদের কতগুলি কথা মনে পড়লো, তোমরা বারবার বলো—তাঁকে আমার আটকে রাখা উচিত ছিল। কি অধিকারে—না স্ত্রীর অধিকারে।

স্ত্রীর অধিকার। তিনি কি সে অধিকার দিয়েছেন আমাকে। না। আমার বাবা তাকে কিনে নিতে চেয়েছিলেন—রূপার জালে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলেন তাঁকে—আবার তিনিই আজ ক্রুদ্ধ হচ্ছেন যেহেতু রূপের মোহে বন্দী হয়েছেন আমার স্বামী।

আমি নিজে এই অভিযোগে বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি—আমার স্বামী রূপা বা রূপ কিছুর মোহতেই ভুলবেন না। তিনি জীবন-শিল্পী। জীবন উপভোগ করতেই নবপথে যাত্রা করেছেন।

অবশ্য, তোমরা বলবে, আমার স্বামীর পক্ষে জেনে শুনে এই ভাবে বিয়ে করাটা কি অন্যায় নয়। তিনি তো জানতেনই যে পাত্রীর রূপ নেই। তিনি তো জানতেন যে তিনি পাত্রীর জন্য নয়, পাত্রীর পিতার অর্থের জন্য বিয়ে করেছেন। তবে! কেন এই মিথ্যাচারণ। আমার পিতার পক্ষে স্বামীকে কেনা এবং স্বামীর পক্ষে নিজেকে বিক্রিত করা দুই-ই সমান অন্যায় ও হেয়। তবু কাউকে বিচার আমি করবো না।

আমি জানি, তোমরা আমাকে বল আদর্শবাদী। আড়ালে বিদ্রূপ করো আমাকে। তুলনা কর সীতা-সাবিত্রীর সঙ্গে।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ, আধুনিক স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে যে একটি ভণ্ড ও চরিত্রহীন (তোমাদের মতে) স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করে না—তাকে উপহাস করা ভিন্ন আর কি কোন পথ খোলা আছে।

কিন্তু, আমি আদর্শবাদী নই—আমি পরিপূর্ণ বাস্তববাদী। একটুকরো হীরে একস্তূপ তামার পয়সার চেয়ে অনেক দামী। আমি সেই হীরে খুঁজে পেয়েছি—আমার দুই বছরের দাম্পত্য ইতিহাস আমার সমস্ত জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। ভালবেসে আমি সুখী হয়েছি—আর কিছু আমি চাই না।

লেখাটা পড়ে অনেকক্ষণ অবাক হয়ে বসে থাকে সরোজ। লেখা তো নয় যেন একটুকরো হীরে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাকে যে ভাবেই রাখ না কেন দীপ্তি ঠিকরে পড়ে।

মায়ের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ছিল না ওর। কোন সহানুভূতিও ছিল না। কারণ, সে ভাবতো মা অন্যায়ভাবে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে। মা যে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে, অত্যন্ত দুঃখ পাচ্ছে—উগ্রভাবে এ বোধ তার মনে ছিল—কিন্তু সে ভাবতো কেন দুঃখ পায়। ঐ রকম একটা বাজে লোকের জন্য দুঃখ পেতে লজ্জা হয় না। অপমান বোধ হয় না। মনের যে ভাবকে 'দূর' করে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত সেই ভাবকেই ডেকে এনে ঘরে বসায়. এ তো শুধু নির্লজ্জতা নয় এ যে অন্যায়—অসিত রায়ের পথ চেয়ে যে বসে থাকে তাকে আর যাই হোক সরোজ রায় কখনও ক্ষমা করতে পারবে না।

মাঝে মাঝে ও মাকে সন্দেহ করতো। ও ভাবতো ওর মা-ই বোধ হয় ওর বাবাকে সরিয়ে দিয়েছে। ওর মায়ের কঠিন ঔদাসীন্য এবং একান্ত আত্মকেন্দ্রিকতায় অসিত রায় কখনই নিজের স্থান করে নিতে পারে নি। হয় তো ওর মায়ের রুক্ষ গম্ভীর বিসদৃশ ব্যবহারে দুঃখিত হয়ে সেই দরিদ্র নিঃসহায় লোকটি বহু বহুদূরে অজানা জগতে চলে গেছে—

বয়স বাড়বার পরে মায়ের এই মনোভাবের জন্য অনুকম্পা বোধ করতো সে, প্রথম জীবনের ঘৃণা বিরক্তি রাগ শেষে পরিণত হয়েছিল একটু সজল অনুভূতিময় করুণায়।

কিন্তু, সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত করুণা ছাপিয়ে মনে কি যেন এক বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিরক্তির প্রলেপ। মাঝে মাঝে ওর মাকে বিদ্রূপ করতে ইচ্ছে হতো—যদি বিদ্রূপের আঘাতেও তার সম্বিৎ ফেরে।

কিন্তু পারতো না। রমার শান্ত সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে তার গলার স্বর যেন নিজে থেকেই রুদ্ধ হয়ে যেত—কালো মুখে বড় বড় দু'টি নিবিড় কালো চোখ—মাথার ওপর অগোছালোভাবে উল্টে রাখা একগাদা কালো চুল—পায়ের প্রান্তে লুটিয়ে শাড়ির কালো পাড়—কালো সীমারেখা ঘেরা এই কালো মেয়েটিকে দেখে অবাক হয়ে যেত সে—

অবাক হতো—ভয় জাগতো মনে—নামহীন এক অদ্ভুত ভাব—বুঝিয়ে বলতে সে পারে না—মনে হতো ও যেন এক রুদ্ধ গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—ভেতরে ঢোকা দূরের কথা, বাইরে দাঁড়িয়ে একটি কথা বলবার সাহসও তার নেই—

তখনই মনে হয়েছিল জীবনে অনেক জিনিস আছে বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা চলে না, যুক্তি দিয়ে যার বিচার চলে না—প্রজ্ঞাপন্ন সুরুচির উপরে—বহু উপরেও একটা জিনিস আছে।

রমাকে কোনদিন ভালোবাসে নি সরোজ। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে মনে বলে, মা, তোমাকে আমি চিনতে পারি নি। আমাকে ক্ষমা কর। চারিদিকে খুঁজতে থাকে মায়ের একটি ছবি।

কিন্তু কোথাও নেই। ছোট রমা, অবিবাহিতা রমা, বিবাহিতা রমা, স্বামী পরিত্যক্তা রমা—কারো কোন ছায়ার ছাপ নেই ঘরে। রমার মনের ছাপ যেমন কোন মনে ফোটে নি, তেমনি তার দেহের ছাপও ফোটে নি ঘরের কোথাও।

শুধু পড়ে আছে চিঠিটা—মৃতা মানবীর মনের একটুকরো ছাপ আর ছবিটা—মৃতা মানবীর স্বামীর ছবি।

শান্ত নিরুদ্বেগ প্রশান্তিতে তাকিয়ে আছে ছবিটা। মিটি মিটি হাসছে—যেন রমার দুঃখ, রমার মৃত্যু তার কাছে কিছুই নয়।

রাগে শরীর জ্বলে ওঠে সরোজের। ফ্রেম থেকে খুলে নেয়—টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে ছবিটা—তারপর সেই টুকরোগুলিকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে—সেই পোড়া ছাই জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কৃত করবে।

ছিঁড়তে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। ওর মনে হয় রমা যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—তেমনি বোজা চোখের কালো পাতা, তেমনি মাথার ওপরে তোলা ঘন কালো ওল্টানো চুল—

সরোজ দু' হাতে ছবিটাকে দু' টুকরো করতে উদ্যত হওয়ামাত্রই সে মাথা নেড়ে ফিসফিসিয়ে বলে—না···ওর চুল খুলে ছড়িয়ে পড়ে—খুলে যায় চোখের পাতা—নিবিড় কালো তারা দু'টি চঞ্চল হয়ে ওঠে—

চিরমৌনা, চিরস্তব্ধা নারী ব্যাকুল বিবশ ত্রস্তস্বরে বলে—না। আমিই যে এই···

'আমি-ই যে এই'—নিজের মনেই একবার বলে সরোজ—সত্যই তো এই ছবিতেই তো মিশে আছে তার মা। কত প্রসন্ন প্রভাতে, কত মনোরম দ্বিপ্রহরে, কত গোধূলিরঞ্জিত অপরাহ্ণে, কত নিবিড় নিশীথে তার মা এই ছবিখানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছে।

দরজা খুলে বারান্দায় বের হয় সরোজ। পূবদিকে আলোর আভাস। কি বলেছেন কবি? সূর্যের আগমনে উষা পালিয়ে যাচ্ছে। না, উষা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সূর্য যে সহস্র প্রকার কর্তব্যের বিধি-নিষেধে বাঁধা—উষার কাছে এগিয়ে যাবার সময় তার নেই।

সেই ভোরের আলো-ঘেরা বারান্দায় কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে বসে সরোজ।

সমাপ্ত

তীরন্দাজ

শুনতে মোলায়েম এবং রহস্যঘন অনেক কিছুই ইদানীং ক্রমশ বিস্ময়কর এবং 'সলিড' বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে। চাঁদের বুড়ির চরকা থেমে গেছে অনেককাল, শান্ত, সৌম্য চাঁদের বুকে কবে কখনো হয় তো ঝড় উঠে থাকবে, বুড়ি নিজেও সেই ঝড়ের শিকার হয়ে আজ বিস্মৃতির প্রাসাদের নিজের নির্দিষ্ট কক্ষে সুখনিদ্রায় মগ্ন। এ নিদ্রা আর টুটবে না, কোনোদিনই না। অনেকটা এই রকমই, আমাদের এককালের নিকট প্রতিবেশী, নিকটতম সম্পর্ক ছিল যার সঙ্গে—সেও আজ আশ্রয় পাল্টেছে—তবে চাঁদের বুড়ির মতো অপরিমাপ্য দূরত্বে নয়, মাত্র ফুটখানেক দূরে। কিন্তু আমাদের ঐ প্রতিবেশীর আশ্রয়ের এই ফুটখানেক দূরত্ব আমাদের জীবনের অনেক 'চার্ম'-ই' নষ্ট করে দিয়েছে।

দিয়েছে বৈ কি! হৃদয়ে যে আজ আর হৃদয় নেই। আমাদের কারোই নেই। কথাটা সরলভাবে ভেবে দেখলে মনে হয়—কবি-সাহিত্যিকের ভাষায় আমরা সকলেই হৃদয়হীন হয়ে গেছি—একেবারেই হৃদয়হীন। যেন যুগের সঙ্গে টেক্কা দিতে গিয়েই এ যুগের 'হৃদয়' নিজেকে একটি যন্ত্রে পরিণত করেছে। এর আজকের নাম হৃৎপিণ্ড, কেউ কেউ খোলাখুলি হৃদযন্ত্রও বলে থাকেন। এঁরা বলবেন, আর কাব্যের পরশ লাগাবার প্রয়োজন কি? যন্ত্রকে যন্ত্র বললে, সত্য কথা তো বলা হবেই, আর তাতে যে নতুন 'যান্ত্রিকতা'বোধ সৃষ্টি হবে, আমাদের মনে তার ফলে ভবিষ্যতে কঠোরতর সত্যকেও আমরা সহজভাবে নিতে পারবো।

চাঁদের যেমন বুড়ি নেই, হৃদ্‌যন্ত্রেও তেমনি আর 'হৃদয়' নেই। চাঁদের বুড়ির নতুন ঠিকানা বিস্মৃতির রাজ্য আর 'হৃদয়ের' স্নায়ু-মণ্ডলী। কিন্তু 'হৃদয়হীন এই হৃদযন্ত্রটির' ব্যাপার-স্যাপার কিন্তু একদা-বিস্ময়করা চাঁদের বুড়ির কার্যকলাপের চাইতেও বিস্ময়কর।

অতো বড়ো হিমালয়টা পড়ে আছে তো পড়েই আছে। নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করবার জন্যে তার যে আর কিছু করা প্রয়োজন অন্তত তার ভাবসাব দেখে তা মনে হয় না। পড়ে আছে তো পড়েই আছে—যাকে বলে একেবারে নট নড়নচড়ন। আর আমাদের এই হৃদ্‌যন্ত্রটি পাছে আমরা তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে বসি, বোধ করি সেই জন্যেই দিনে লক্ষাধিকবার নড়েচড়ে ওঠে। লক্ষাধিকবার বলতে হয় তো সবাই আমরা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝি না সেই জন্যেই

বিজ্ঞান বার্তা

বলতে হয়: একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষের হৃদযন্ত্র চব্বিশ ঘণ্টায় এক লক্ষ চার হাজারবার থেকে এক লক্ষ দশ হাজারবার নড়েচড়ে ওঠে। আর স্বাস্থ্যবতী নারীর ক্ষেত্রে (বোধ করি নারীস্বভাবের চঞ্চলতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই) ঐ নড়াচড়ার সংখ্যাটা দাঁড়ায় সর্বক্ষেত্রে ঘণ্টায় এক লক্ষ দশ হাজারবারের বেশি। এতো মেহনত করে কেউ নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে থাকে কি?

এই যে হৃৎপিণ্ড যা ঘণ্টায় লক্ষাধিকবার স্পন্দিত হচ্ছে, এর সবচাইতে বিশিষ্ট কাজটি কি? আমাদের যে বাঁচিয়ে রাখে তা তো অবশ্যই সত্য, কিন্তু এই আশ্চর্যজনক ব্যাপারটার সঙ্গে এতো বেশি ঘনিষ্ঠ আমরা যে, বর্তমানে এই বেঁচে থাকবার ব্যাপারে আশ্চর্য আমরা আর বড়ো একটা বোধ করি না। একজন প্রাপ্তবয়স্কের শরীরে বিভিন্ন শিরা-উপশিরা দিয়ে সারাদিনে মানবদেহের রক্তপ্রবাহকে প্রায় ১৬,৮০,০০,০০০ মাইল ভ্রমণ করে। কিন্তু এর ফলেও তার [illegible] কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখা যায় না, দেখা দিলে চলতে পারে না। কারণ, পরদিনও ঐ পরিমাণ দরত্ব বেড়িয়ে-টেড়িয়ে [illegible]।

ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কমতে কমতে মিনিটে যতটি স্পন্দনে নেমে আসে—আবার বাড়তে বাড়তে দু'শোটিতে পৌঁছয়।

গুলী করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত একটি অপরাধীর বেলায় দেখা গেছে দণ্ডলাভের পূর্বে তার হৃৎ-স্পন্দন ছিলো মিনিটে ৭২ কিন্তু বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার পরে কয়েক মিনিট পর্যন্ত দেখা গেছে তার হৃৎ-স্পন্দন মিনিটে ১৮০ পর্যন্ত উঠেছে।

প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ডের ডান প্রকোষ্ঠ থেকে বাঁ প্রকোষ্ঠে প্রায় তিন গ্যালন রক্ত প্রবাহিত হয় এবং সারাদিনে হৃৎপিণ্ড থেকে মোট প্রায় ৪৩২০ গ্যালন রক্ত পাম্প করে সারাদেহে প্রবাহিত করা হয়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে, একজন সুস্থ ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড সারাদিন কাজ করবার জন্যে (অর্থাৎ রক্তপ্রবাহকে চালু রাখবার জন্যে) যে শক্তি (এনার্জি) ব্যয় করে থাকে তা একত্র করলে এক টন ওজনের একটি ইস্পাতখণ্ডকে অনায়াসে জমি থেকে ৮২ ফুট উঁচুতে তোলা সম্ভব হতে পারে।

সাধারণত ধারণা করা হয় যে, মানবদেহে হৃৎপিণ্ডই একমাত্র যন্ত্র যার কখনো কোনোরকম বিশ্রাম জোটে না। ধারণাটা কিন্তু মোটেই সত্য নয়। একটি রেলগাড়ি যেমন স্টেশনে এসে থেমে যায় হৃৎপিণ্ড সে রকম থামা অবশ্য মাত্র একবারই থামে। কিন্তু তবু হৃৎপিণ্ড তার কাজের ফাঁকে বিশ্রাম প্রচুরই পায় বলতে হবে। কারণ, একটু থেমে থেমে এক মিনিটে হৃৎপিণ্ডের যে ৭২টি স্পন্দন হচ্ছে এটা যদি না থেমে থেমে ঘটানো যায় তা' হলে দেখা যাবে যে একটি হৃৎপিণ্ডের ৭২টি স্পন্দনের জন্যে বাস্তবিকপক্ষে মাত্র আট কি নয় সেকেণ্ড সময় লাগে। অর্থাৎ মোট সময়ের আট ভাগের একভাগ সময় মাত্র হৃৎপিণ্ডকে সচল রাখে, বাকিটা সময় চলে বিশ্রাম।

পুরুষদের তুলনায় নারীদের হৃৎ-স্পন্দন গড়পড়তা মিনিটে আটবার বেশি হয়—এটা এমন কি মনুষ্যেতর জীবের পক্ষেও সত্য। একটি ষাঁড়ের হৃৎ-স্পন্দন যেখানে মিনিটে ছ'চল্লিশ বার হয়ে থাকে সেখানে দেখা যায় যে কোনো গাভীর হৃৎ-স্পন্দন হয় মিনিটে ছাপান্ন বার।

দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টিদান:
কর্নিয়া সংরক্ষণের নতুন উপায়

আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে কর্নিয়া বা অক্ষি-গোলকের স্বচ্ছ-আবরণ সংরক্ষণের একটি নতুন পদ্ধতি সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে। ঐ পদ্ধতিতে কেবলমাত্র কয়েক সপ্তাহ নয়, কয়েক মাস পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখা যাবে।

কোন দুর্ঘটনার ফলে অথবা চোখের রোগের দরুণ যাঁদের ঐ স্বচ্ছ-আবরণ নষ্ট হয়ে গেছে, যাঁরা দৃষ্টিহারা হয়েছেন••কোন মৃত-ব্যক্তির চোখের ঐ জিনিসটি সরিয়ে এনে ঐ সব রোগীর চোখে ঐটি জুড়ে দিলেই তাঁরা আবার দৃষ্টি ফিরে পেয়ে থাকেন। যে-সব হাসপাতাল এটি সংগ্রহ করে থাকে, বহু ব্যক্তি তাঁদেরই চোখের ঐ জিনিসটি মৃত্যুর পূর্বেই সেখানে দান করে যান।

কর্নিয়া সংরক্ষণের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বে দাতার মৃত্যুর ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই এটিকে কাজে লাগাতে হত, নইলে এটি নষ্ট হয়ে যেতো।

আইওয়ার চিকিৎসকেরা গ্লিসারিনের মধ্যে এটিকে তিন পর্যন্ত রেখেছেন এবং ছত্রিশ ঘণ্টার পরেও অন্ধ ব্যক্তির চোখে জুড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সফলকাম হয়েছেন। তাঁদের অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ঐ পদ্ধতিতে কর্নিয়াটিকে অবিকৃত অবস্থা যাবে। চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার না করলে এটির এখ নষ্ট হবার আশঙ্কা নেই।

এইভাবে কর্নিয়া সংরক্ষণের সুবিধা অনেক। দুর্ঘটনায় যাঁর হারান তাঁদের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে ঐ কর্নিয়া-ভাণ্ডার সহায়ক হয়ে থাকে।

আইওয়ার আইব্যাংক বা কর্নিয়া-ভাণ্ডার গঠিত হয় ১৯৫৫ স এই ভাণ্ডার আমেরিকার অন্যান্য স্থানের আরও পঁয়ত্রিশটি আইব্যা সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি জাতীয় সমিতি গড়ে তুলেছে। এ আরও উন্নতিসাধন, কাজকর্মের সম্প্রসারণ এবং নির্দিষ্টমান রাখা ভাণ্ডারের কর্মপদ্ধতি নিরূপণ প্রভৃতি কাজকর্মের উদ্দেশ্যেই সমিতি গঠন করা হয়েছে।

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কোন ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত কি না, তা নিরূপণ করার একটি প্রক্রিয়া সম্প্রতি আমেরিকার নে বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎস বলেছেন, রক্তে তামার মাত্রা নিরূপণ করেই কে এই রোগপ্রব কোন ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার বহুপূর্বেই বলে দেওয়া পারে। অন্তত যাঁরা একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁ রক্ত এবং তাঁদেরই সমবয়সী সুস্থ ব্যক্তিদের রক্ত পরীক্ষা চিকিৎসকেরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা দেখে হৃদরোগে যাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের রক্তের মধ্যে সুস্থ ব্যক্তি তুলনায় তামার পরিমাণ অনেক বেশি। রক্তবহানালীর মধ্যে পদার্থ জমলে ঐ সব নালী কঠিন হয়ে পড়ে। রক্তে তামার আ এ ব্যাপারে সাহায্য করে, ফলে হৃদরোগ দেখা দেয়। আর এ মত—মৃদু জল বা সফ্ট ওয়াটারের মধ্যে তামার পরিমাণ অনেক থাকে। হৃদরোগে মৃত্যুর হারের সঙ্গে এই মৃদু জলপানের স আছে বলে তাঁরা বলেছেন। পথ্য বিচার এবং ওষুধপত্রাদির সাহ রক্তে এই তামার পরিমাণ হ্রাস করা এই রোগ থেকে অব্যা পাওয়ার অন্যতম পথ বলে তাঁদের [illegible]।

ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ
নির্মূল করার অভিনব পদ্ধতি

ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার জন্য মা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-দপ্তরের বিজ্ঞানী ও গবেষকরা কতক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। ক্ষেতে-খামারে-বাগানে পরী করে দেখা গেছে যে পদ্ধতিটি খুবই কার্যকর।

দু'টি পদ্ধতিতে কীটপতঙ্গের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করে ক্রমে তাদের বি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্ত্রী ও পুরুষ যাতে পর মিলিত হতে না পারে, তার এক বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে

পরীক্ষাগারে গবেষণা করে মেথিল ইউজিনল নামে এক যৌ পদার্থ প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলের পক্ষে ক্ষতিকর একজাতীয় মাছির কাছে এই পদার্থটির এক দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। গুরা

নিকট প্রশান্ত সাগরীয় রোটা দ্বীপে এই মাছির প্রবল উৎপাত। এখানে মেথিল ইউজিনল পরীক্ষা করে দেখা হয়। মেথিল ইউজিনল সমস্ত পুরুষ-মাছিকে আকৃষ্ট করে ফলের বাগান থেকে নিয়ে গেল বহুদূরে অন্য এক অঞ্চলে, যেখানে কীটনাশক ওষুধ ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল। ফলে সমস্ত পুরুষ-মাছি এখানে এসে মৃত্যুবরণ করল। পুরুষ-মাছি ধ্বংস হওয়ায় ঐ জাতীয় মাছির উৎপাত ও বংশবৃদ্ধি বন্ধ হল। ক্রমে ঐ দ্বীপটি থেকে এই মাছি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

এই ধরণের আকর্ষক পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে করতে স্ত্রী-কীটপতঙ্গের দেহ থেকে নিষ্কাশিত আকর্ষকেরও আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। বসতবাড়িতে যে সব স্ত্রী-মাছি দেখা যায় তাদের দেহে এবং বাঁধাকপি ও পীচফলের দেহে এই পদার্থ পাওয়া গেছে। এদের দেহ থেকে এই আকর্ষক পদার্থ নিষ্কাশন করে নিয়ে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয় এবং পরে তা কৃত্রিম উপায়ে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হয়।

দ্বিতীয় ওষুধটি কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে প্রস্তুত বা পুরুষ-কীটের প্রজনন ক্ষমতা বিনষ্ট করে। এইভাবে পুরুষের ব্যাপক নির্বীজন সম্ভব করতে পারলে কীটপতঙ্গের বংশবৃদ্ধি বন্ধ হবে এবং ক্রমে ঐ জাতীয় কীটপতঙ্গ সম্পূর্ণ নির্মূল হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে এই নির্বীজন পদ্ধতি প্রয়োগ করে স্ক্রু-ওয়ার্ম মাছি নির্মূল করা হয়েছে। বর্তমানে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে। ১৯৬৩ সালের হিসাবে দেখা গেছে এই স্ক্রু-ওয়ার্ম মাছি গবাদি-পশুর উৎপাদকদের প্রায় কোনই ক্ষতি করতে পারে নি। অথচ পূর্ববর্তী বছরগুলিতে ক্ষতির পরিমাণ ১০ কোটি ডলার পর্যন্ত হয়েছে।

ফসলের পক্ষে বিপজ্জনক কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার আর একটি নতুন অস্ত্র হল ভাইরাস। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন এক- জাতীয় ভাইরাস আছে যা বাঁধাকপি ও ভুট্টার পোকাকে আক্রমণ করে। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, সামান্য পরিমাণ এই কীট-পতঙ্গ ভাইরাস অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অঞ্চলে ঐ জাতীয় কীট ধ্বংস করতে পারে।

আরও গবেষণায় দেখা গেছে, কোন কোন গাছপালার মধ্যে এমন পদার্থ আছে—যা নিষ্কাশিত করে রাসয়নিক পদার্থে সংমিশ্রণে কীটঘ্ন ওষুধে পরিণত হতে পারে।

তুলা গাছ থেকে নিষ্কাশিত এই ধরণের এক পদার্থ মহাক্ষতিকারক তুলাবীজের কীট ধ্বংস করতে পারে। পুরুষ-কীটের দেহ থেকে নিষ্কাশিত অকৃত্রিম আকর্ষকের সাহায্যে এই কীট নির্মূল করা সম্ভব হতে পারে।

কোন কোন ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের স্বাভাবিক শত্রু আছে। নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যে প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ এমন এক জাতীয় কীট ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যারা প্রধানত জিপসি মথের ডিম খেয়ে বেঁচে থাকে। কতকগুলি ক্ষতিকারক গাছ-গাছড়া ধ্বংস করার কাজেও কীটপতঙ্গ নিয়োগ করা হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দু' জাতীয় কীট ছেড়ে দিয়ে একশ্রেণীর আগাছা ধ্বংস করা হয়েছে; ঐ কীট প্রধানত ঐ শ্রেণীর আগাছা খেয়ে বেঁচে থাকে। —অনুসন্ধানী

ঘুম—আয়—আয়

প্রত্যেক মানুষের জীবনে সুনিদ্রা বা ঘুমের ভূমিকা বড় কম নয়। ঘুম কেন হয় বা কেন হয় না এ সম্বন্ধে বিস্তর তর্কাতর্কি হয়ে এসেছে এবং হচ্ছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারেন নি, শুধু এটুকুই জানা গেছে যে, সুস্থ জীবনযাপন করতে হলে সুনিদ্রার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। বর্তমান যুগে নিদ্রাহীনতা ব্যাধি স্বরূপ দেখা দিয়েছে, অনেকেই বিশেষত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিশেষ ভাবেই এ রোগে ভোগেন, চিকিৎসকরাও নিদ্রাহীনতার নানাবিধ প্রতিষেধক ব্যবস্থাপত্রে লিখতে তৎপর, কিন্তু প্রশ্ন এই যে এইসব কৃত্রিম উপায়ে কি সত্যকার সুনিদ্রা হওয়া সম্ভব? ঘুমের বড়ি সেবনে বা অন্য কোন উপায় অবলম্বনে যে নিদ্রাকে আমরা সাময়িকভাবে আবাহন করে আনতে সক্ষম হই সে নিদ্রাকে কি সত্যই সুনিদ্রা বলে অভিহিত করা চলে? এর উত্তর নিশ্চয়ই নেতিবাচক। কারণ জাগরণের মতই নিদ্রাও মানব শরীরের এক স্বভাবজ ধর্ম, কৃত্রিম উপায়ে তাকে আয়ত্ত করাতে স্থায়ী কোন সুফলের আশা করা কখনই সম্ভব নয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রাহীনতা শরীরের অপরাপর অঙ্গের চেয়েও মস্তিষ্কের পক্ষেই বেশি ক্ষতিকর, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এর জন্য মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত ঘটতেও দেখা গিয়েছে, বস্তুত মস্তিষ্ক বিশ্রাম পায় এই নিদ্রারই মাধ্যমে আর সেজন্যই মাথার কাজ যাঁদের করতে হয় যত বেশি সুনিদ্রার প্রয়োজনও তাঁদের সমধিক। নিদ্রার মাধ্যমে মস্তিষ্কের উত্তেজিত পেশীসমূহ শিথিল হয়ে পূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ করে, যার ফলে আমাদের সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা স্নিগ্ধতা সঞ্চারিত হয়ে যায়, ক্লান্ত মানুষের ক্লান্তি দূর করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম তাই ঘুম। সচরাচর স্বাভাবিক নিয়মেই ঘুম নেমে আসে আমাদের চোখে। সাধারণ মানুষ জীবন ও জীবিকার তাগিদে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়, তার ফলেই স্বাভাবিকভাবেই ঘুম নেমে আসে যথা সময়ে তার দু'চোখ জুড়ে; এজন্যই দেখা যায় যে সচরাচর খেটে-খাওয়া মানুষরা নিদ্রাহীনতার শিকার হয় না, কায়িক শ্রম যাঁদের একেবারেই করতে হয় না, ভোগবিলাসের আধিক্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যাঁদের বানচাল হওয়ার উপক্রম, তথাকথিত ভাগ্যবানেরাই প্রধানত এর কবলে পড়েন; আর পড়েন আর একদল মানুষ অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনা করাই যাঁদের জীবিকা। নিদ্রাহীনতার অভিশাপ বড় ভয়ানক এমন কি এর থেকে মস্তিষ্কবিকৃতির সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না, বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তাই এ রোগটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছেন, আবহমানকাল থেকে ব্যবহৃত ঘুমের বড়ির ব্যবস্থা দেওয়া তো আছেই কিন্তু তার সঙ্গে আরও বহু উপায় অবলম্বন করে নিদ্রাহীনের চোখে ঘুম ডেকে আনার প্রচেষ্টায় তৎপর তাঁরা। প্রিন্সেটন এন জে তে এক ধরণের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বিত হচ্ছে নিদ্রাহীনতা দূর করার জন্য, যা সত্যই অভিনব; সেখানে নানারকম ঔষধ মিশ্রিত সুগন্ধি জলে ভরা বাথটবে শুইয়ে নানা ধরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়, এই প্রণালীর আবিষ্কারকদের প্রধান শ্রীক্যামেরনের মতে অতি ভয়ানক অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও এই প্রণালীতে দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। সে যাই হোক সুনিদ্রার জন্য স্বাভাবিক মানুষের প্রয়োজন মোটামুটি সংযত জীবনযাপন, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম অভ্যাস ও সাদাসিদে খাদ্য গ্রহণ, এই কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত থাকলে, নিদ্রাহীনতার অভিশাপ থেকে তাঁরা দূরে থাকতে পারবেন বলেই মনে হয়।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

গুরুপত্রা—তিন্তিড়ী বৃক্ষ ॥ শব্দরত্না° ॥

গুরুবর্চোঘ্ন—পাতিলেবু ।

গুরুশিংশপা—শিংশপ বি° ।

গুর্দলশিম (দেশজ)—dolichus lablab,

গুল—euphorbia terucalli.

গুলআনার—এক প্রকার দাড়িমগাছ । পারস্যজাত ।

গুলখীরা - [ই° holly-hock) althoea rose.

গুলগা—nipa fruticans.

গুলঞ্চ—[ফা° গুল-আ-চীন, ই° Spanish jassemine] তগরাদিবর্গের পুষ্পতরু বি°, plemeria acuminata. গাছ আঁকা বাঁকা । ফুল সাদা, ভিতর দিক হলদে রং, বাহিরে লাল, সুগন্ধি । প্রকারভেদ—(১) সাদা গুলঞ্চ—ফুল সাদা, p. alba. (২) লাল গুলঞ্চ—ফুল লাল, p. rubva, গুড়ুচী দ্র° ।

গুলঞ্চ কন্দ—কন্দ বি°, কুলী

গুবাক, গুয়া—পূগ দ্র° ।

গুয়া বাবলা—Acacia farnesiana গুয়াবাবুল দ্র° ।

গুল্‌দাউদি (পারস্য)—Pyrethrum indicum, crysenthemum i.

গুল্‌নরগিশ (পারস্য)—narcissus tazetta.

গুল্‌ফিরিঙ্গি (পারস্য)—Venca rosea.

গুলবাঁশ—একপ্রকার বাঁশ ।

গুলমখমল—gonephrena globosa

গুলমেন্দি—এক প্রকার ফুলগাছ, impatiens balsamina,

গুলর (দেশজ)—এক প্রকার গাছ, ficus gooloorei,

গুলল (দেশজ)—বৃক্ষ বি° ।

গুলা—সুহী বৃক্ষ, সিজ ।

গুলাল তুলসী—দুলাল তুলসী । তুলসী দ্র° ।

গুলাশ্যাম (দেশজ)—eranthemum pulchellum.

গুলাসকর—(ই° Three Styled flax) একপ্রকার বাহারি লতা linum trigynum.

[illegible]বাগুন (দেশজ)—একপ্রকার ক্ষুদ্র বেগুন, Solanum

গুল্মা (দেশজ)—একপ্রকার বৃক্ষ ।

গুল্মকেতু—অম্লবেতস, থৈখড় ॥ রাজনি ॥

গুল্মমূল—আদা ।

গুল্মবল্লী—সোমলতা ।

গুল্মিনী—লম্বলতা (?) । পর্যায়—বীরুৎ, উলুপ, বিরুধা, অবরুৎ ।

গুল্মী—১ আমলকী, ২ এলাচী, ৩ গৃধ্রসীবৃক্ষ, গুড়কাওনী ॥ শব্দচ° ॥

গুবাক—সুপারি, স্থান বিশেষে গুয়া, areca catechu. পর্যায়—ঘোণ্টা, পূগ. ক্রমুক, খপুর, গুবাক, পূগবৃক্ষ, দীর্ঘ পাদপ, বল্কতরু, দৃঢ়বল্ক, চিক্কণ, পূগী, সুরঞ্জন, গোপদল, রাজতাল, ছটাফল । বাঙলায় চারি প্রকার সুপারি আছে—দেশাল খড়ে, ২ ভেটেল, ৩ চিকি, ৪ রামপূগ, ৫ জাহাজে সুপারী । সুপারী দ্র° ।

গুহা—১ সিংহপুচ্ছীলতা, ২ পৃশ্নিপর্ণী লতা, চাকুলে ।

গুহপুষ্প—অশ্বত্থ বৃক্ষ ।

গুহবীজ—ভূতৃণ, গন্ধ খড় ।

গূঢ়পত্র—১ আঙ্কোট বৃক্ষ, ২ করীর বৃক্ষ ।

গূঢ়-পুষ্পক—বকুল বৃক্ষ ।

গূঢ় ফল—বদর বৃক্ষ ।

গূঢ় বল্লিকা, গূঢ় বল্লী—অক্ষোঠ বৃক্ষ ।

গৃধ্রা—[স° ফলেপুষ্পা] ক্ষুদ্র বৃক্ষ বি° । [আরব—জফৎ, পারস্য-গোৎলু, ব্রহ্ম-মূলদোবেং]

গৃঞ্জন, গৃঞ্জস—১ মূল বিশেষ, চলিত কথায় শালগম বা গাজর (?) brassica sapa পর্যায়—শিখিমূল, যবনেষ্ট, বর্তুল, গ্রন্থিমূল, শিখাকন্দ, কন্দ, ডিণ্ডীর-মোদক; ২ রসুন, ৩ লাল রসুন ।

গৃধ্রনখী—১ কাকাদনী বৃক্ষ, কালিয়া কড়া, ২ কুল গাছ ॥ সুশ্রুত ॥

গৃধ্রপত্রা—ধূমপত্রা বৃক্ষ ।

গৃধ্রান, গৃধ্রানী—ধূমপত্রা বৃক্ষ ।

গৃষ্টি—বদর বৃক্ষ ।

গৃহকূলক—চিচিঙে শাক।

গৃহদ্রুম—১ মেঢ়্রশৃঙ্গ বৃক্ষ, ২ শাক বৃক্ষ, শেগুন গাছ।

গৃহাশয়া—পানের গাছ।

গেঁটিবন (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

গেঁদা, গাঁদা—[স° কন্দুক, হি° গেঁদা, গেণ্ডক, ও° গেণ্ডু পারসী—গুলজফাবি, ই° French mary-gold, African mary-gold বা calendula] সোমরাজিবর্গের পুষ্পতরু, tagetes patula, t. erecta. প্রকার ভেদ—(১) দেশী গাঁদা—গাছ লম্বা, ফুল তামাটে বর্ণের, (২) চীনে গাঁদা—patula, গাছ ছোট, ফুল হলদে রংয়ের লাল আমেজ, (৩) বড় গাঁদা—t. erecta, (৪) বিলাতী গাঁদা—calendula গাছ ছোট, ফুল বড় বড় হলদে রংয়ের।

গেছি-শিম—এক প্রকার শিম, lablab macrocarpum.

গেহব—excœcaria agallocha

গৈর—লাঙ্গলী বৃক্ষ।

গৈরিকাক্ষ—জলমধুক বৃক্ষ।

গোআনিয়া—এক প্রকার ঘাস, andropogon punctapum.

গোআনিয়া লতা (দেশজ)—এক প্রকার লতা cissus vitiginea.

গোঁড়ালেবু—লেবু দ্র°।

গোকণ্ট, গোকণ্টক—গোক্ষুর বৃক্ষ। গোক্ষুর দ্র°।

গোকর্ণী—মূর্বালতা।

গোক্ষুর—স° ত্রিকণ্টক, হি° গোখুরা, ছোট গোখরু, গোরখুল, ও° গোখরু, তে° পালেরু। ও° গোখরা, ফা° তুরম্বেখার খস্ক, আ° বজ্রুলখস্ক, বকলতলখার খমুক গোখরি, গোখুর, গোখুরু, গোখুরা, tribulus terrestris, t. lanuginosus বর্ষায়ু শাকবি°, ঘাসের মাঝে জন্মে। প্রকার ভেদ—(১) ক্ষুদ্র গোক্ষুর—পাতা ছোলাপাতার মত, ফুল পীতবর্ণ, ফলে ৬টি কাঁটা আছে, (২) বৃহৎ গোক্ষুর—পাতা শ্বেতাভ, ফুল শাদা ও পীত, ফল পাঁচকোণা, ৪ কোণে ৪টি কাঁটা। পর্যায়—শ্বদংষ্ট্রা, বন শৃঙ্গাট, কণ্টফল, ক্ষুরক, চণকদ্রুম, ক্ষুর, গোক্ষুরক, স্বাদুকণ্ট, গোকণ্ট, ইক্ষুগন্ধিকা।

াখরি—গোক্ষুর দ্র°।

াচাণ্ডালী (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

াচ্ছাল—ভূদেম্ব, চাকুনিয়া।

াজা—গোলোমিকা বৃক্ষ।

াজারিক—কণ্টকার বৃক্ষ।

াজপর্ণী—দুগ্ধ ফেনীবৃক্ষ॥ রাজনি°॥

াজিয়া—লতাবি°।

াজিহ্বা—গোজিয়ালতা, দারিয়া শাক, premna esculenta পর্যায়—দার্বিকা, দর্বিকা, দার্বিপত্রিকা, খরপত্রী, বাতোলা, অধোমুখা, অধোজিহ্বা, অধঃপুষ্পী, গোজিহ্বিকা।

গোজী—গোজিহ্বালতা।

গোটা—সুপারি।

গোডুম্ব—শীর্ণবৃন্ত তরমুজ॥ মেদিনী॥

গোত্রবৃক্ষ—ধম্বন বৃক্ষ॥ ভাবপ্র°॥

গোথুবি (দেশজ)—একপ্রকার ঘাস [ই° one headed cyper grass] anosperum monocephalum. ছোট গোথুবি—cyperus dubis.

গোদুগ্ধদা, গোদুগ্ধা—চণিকা তৃণ॥ রাজনি°॥

গোধাজিহ্ব—গোয়ালে লতা।

গোধাপদিকা—গোধাপদী লতা।

গোধাপদী—গোয়ালিয়া লতা, গোয়ালে লতা দ্র°।

গোধাবতী, গোধাবল্লী—গোধাপদী।

গোধীশ—দ্রোণপুষ্পী।

গোধূম—গম দ্র°।

গোপকর্কটিকা—রাখাল শশা।

গোপঘোণ্টা—১ শেয়াকুল, ২ হস্তিকোলি, ৩ বৈঁচ।

গোপদল—গুবাক বৃক্ষ।

গোপন—তেজপাতা।

গোপভদ্রা—কাশ্মরী বৃক্ষ।

গোপভদ্রিকা—গম্ভারী বৃক্ষ।

গোপবল্লী—১ মূর্বা, ২ শ্যামালতা, ৩ অনন্তমূল।

গোপা, গোপিনী—শ্যামালতা।

গোপাঙ্গনা—অনন্তমূল।

গোপানকর্কটি—রাখাল শশা।

গোপানী—রাখাল শশা।

গোপুটা—বড় এলাচী।

গোপুরক—কুন্দুরক বৃক্ষ।

গোমক—[স° গোডুম্বা, গবাক্ষী, চিত্রা] তরমুজের মত ফল বৃক্ষ, খরমুজ দ্র°।

গোময়ছত্র, গোময়চ্ছত্রিকা—কোঁড়ক ছাতা। পর্যায়—দিলীর, শিলীন্ধ্রক, উচ্ছিলীন্ধ্র।

গোময়প্রিয়—গন্ধ খড়।

গোময়োদ্ভব—আরগ্বধ, সোঁদাল বৃক্ষ।

গোমরী—রাম বেগুন।

গোমূতী—arenga saccharifera.

গোমূত্রিকা—তৃণবিশেষ। পর্যায়—রক্ততৃণ, ক্ষেত্রজা, কৃষ্ণ ভূমিজা।

গোয়ালে লতা—[স° গোধাপদী, গোধাবতী, হংসপাদী, গুহালিক, ও° তিন আঙ্গুলিয়া] লতা বি°, Vitis pedata, cissus P. এই লতার মূল কিংবা পত্রের সাদৃশ্য পক্ষে মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন পাতা ত্রিদল বিশিষ্ট (হাঁসের মত)। কেহ বলেন পাতার মূল হাঁসের পায়ের মত লাল। পাতা হিসাবে তিন প্রকার—(১) বড় গোয়ালে। পাতা

রোমশ ও পাতা ৭টি পর্ণ, (২) ছোট গোয়ালে—এক বৃন্তে ৩টি দল ও প্রত্যেক দলের পাশে ক্ষুদ্র ছেদ দেখা যায় ও (৩) ছয় আঙ্গুলে গোয়ালে। পর্যায়—সুবহা, গোধাঙ্ঘ্রি, ত্রিফলা, ত্রিপদী, মধুস্রবা, হংসপাদিকা, হংসাঙ্ঘ্রি, রক্তপাদী, ত্রিপদা, ঘৃতমণ্ডিকা, বিশ্বগ্রন্থি, কীটমারী, কর্ণাটী, তাম্রপাদী, বিক্রান্তা, ব্রহ্মাদনী, পদাঙ্গী, শীতাঙ্গী, স্রুতপাদিকা, সঞ্চারিণী, পদিকা, প্রহ্লাদী, কীটপাদিকা, ধার্তরাষ্ট্রপদী, গোধাপদিকা, বলীহ্বদলা, হংসবতী।

গোরক্ষকর্কটী—চিচিটা।

গোরক্ষ চাউলা—[সং গোরক্ষ তণ্ডুলা, নাগবলা] জবাদি বর্গের ক্ষুপ বিং, sida spinosa. পাতায় ৩টি শিরা বোঁটার কাছে ৩টি আব থাকে। পাতার নীচের পিঠ পাঁশুটে। ফুল ছোট শাদা। ফল পঞ্চকোষ। বেড়েলা গাছের মত কিন্তু তাহাতে ১০টি কোষ আছে।

গোরক্ষ চাকুল্যা—Uraria lagopodioides.

গোরক্ষ জম্বু—১ গোধূম, ২ গোরক্ষ চাকুলে, ৩ ঘোণ্টাবৃক্ষ।

গোরক্ষতণ্ডুলা—পর্যায়—গাঙ্গেরুকী, নাগবলা বাসা, হ্রস্ব গবেধুকা, খরবল্লিকা, বিশ্বদেবা।

গোরক্ষদুগ্ধা—অমৃতসঞ্জীবনী বৃক্ষ।

গোরক্ষী—[সং সুদণ্ডিকা, সর্পদন্তী] মালব দেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুপ বিং, solanum rubrum erythropyrenum.

গোরখা—বৃক্ষ বিং।

গোরমা (দেশজ)—গন্ধখড়।

গোলকাঁকড়া—গোল কাঁকরোল momordica cochirochinensis.

গোলখয়রা—[ইং holly hock] গুলখৈরা—althœa rosea.

গোলমলঙ্গা—cyperus rox.

গোলপাতা—তালাদিবর্গের ক্ষুপ বিং nipa fruticans. পাতায় সুন্দর ছাতা হয় ও ছাউনি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

গোলমরিচ—[সং মরিচ, ঊষণ, ধর্মপত্তন, হিং কালীমরিচ, মং চোকামরিচ, আং জালুক, কং মেনসু, তেং মরিয়া, তাং মিল গুভলী, ফাং ফিল্‌ফিল্‌-ই-সিয়া, অং ফিলফিলি অস্‌বদ, ইং black pepper] তুলাদিবর্গের ভূলুণ্ঠিত লতাবিং piper nigrum আসাম ও কোচবিহারে মরিচের লতা জন্মায় বটে, কিন্তু বাংলার মত ফলপ্রসূ নয়। ফলের নাম গোলমরিচ।

গোল মেথি—cyperus seminudes.

গোল মোহিনী (দেশজ)—একপ্রকার গাছ duringia celosioides.

গোলাপ, গোলাব—[ইং rose] পূর্বে বাংলাদেশে ছিল না। আজকাল প্রায় শতাধিক গোলাপ দৃষ্ট হয়। গোলাপ অত্যন্ত সুখী পুষ্পবৃক্ষ। সযত্নে পালন করিতে হয়। (১) বসরাই গোলাপ [ইং Bussorah rose] rosa centifolia. r. damascena. বসোরা গোলাপফুল বৎসরে একবার বসন্তকালে ফোটে। গাছ কণ্টকপূর্ণ। শাদা ও লাল দুই রকমের ফুল হয়। (২) দেশী গোলাপ—সেঁয়তি rosa moschata. ফুল শাদা রংয়ের—অল্প মৃগনাভির গন্ধ আছে।

গোলাব জাম—[ইং rose apple] জাম দ্রং, engenia jambosa.

গোলাস—শিলীন্ধ্র (?)।

গোলীঢ়—ঘণ্টাপারুলি।

গোলোমিকা—গোলোমী, শ্বেত দূর্বা। পশ্চিমে গোধূমা। পর্যায়—গোধূমী, গোজা, ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা, গোসম্ভবা, প্রস্তরিণী।

গোবরা—anesomeles ovata.

গোবরা-নটি—amarantus lividus.

গোবরা ফিঙ্গ্যাটা (দেশজ)—একজাতীয় বৃক্ষ, alliacea.

গোবরিয়া-চাঁপা—plumiera acuminata.

গোশীর্ষক—দ্রোণপুষ্পী বৃক্ষ।

গৌরিল—শ্বেতসর্ষপ।

গৌরী—১ শ্বেত দূর্বা, ২ তুলসী, ৩ মল্লিকা, ৪ সুবর্ণ-কদলী, ৫ আকাল মাংসী।

গ্রন্থি দূর্বা—গাঁট দূর্বা।

গ্রন্থিপর্ণ—(হিং গঠিবন) গাঁঠিয়ালা। কুকশিমা জাতীয়, নেপালে হয়। পর্যায়—শুক, বর্হিপুষ্প, স্থৌনেয়, কুক্কুরবর্হা, বর্হ, শুকবর্হ, কুশপুষ্প, গুল্মক, বিশীর্ণাখ্য, গ্রন্থিক স্বারামগুচ্ছ, শুকপুচ্ছ, শুকচ্ছদ, কাকপুষ্প।

গ্রন্থিপর্ণা—জতুকালতা।

গ্রন্থিফল—১ কপিত্থ, ২ মদনবৃক্ষ, ৩ শাকুরণ্ড বৃক্ষ।

গ্রন্থিমৎফল—লকুচবৃক্ষ, মান্দার।

গ্রন্থিমূলা—মালা দূর্বা।

গ্রন্থিল—১ পিপ্পলী মূল, ২ আদা, ৩ বঁইচ, ৪ করীর বৃক্ষ, ৫ তণ্ডুলীয় শপক।

গ্রন্থিলা—১ ভদ্রমুস্তা, ২ মালা দূর্বা।

গ্রহনায়ক—অর্ক বৃক্ষ।

গ্রহনাশ, নাশক—শাক বৃক্ষ।

গ্রহপতি—অর্ক বৃক্ষ।

গ্রহাক্ষয়—ভূতাঙ্কুশ বৃক্ষ।

গ্রামীণা—১ নীলী বৃক্ষ। পর্যায়—নীলী, নীলিনী তুলী, কালদোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেলী, ২ পালঙ্ক্য শাক।

গ্রাম্যকন্দ—বন ওল।—কর্কটি—কুষ্মাণ্ড।—বল্লতা—পালঙ্ক্য-শাক।

গ্রাব-রোহক—অশ্বগন্ধা বৃক্ষ।

গ্রাহিন্—কপিত্থ।—ণী—১ ক্ষুদ্র দূরালভা, ২ ক্ষীরুই।

গ্রাহিফল—কপিত্থ বৃক্ষ।

গ্রীষ্মজা—নবমল্লিকা।—ধান্য—বোরোধান।—পুষ্পী—করুণ পুষ্পবৃক্ষ।—সুন্দর—গিমেশাক।

ঘটালাবু—গোললাউ॥ রাজনি°॥

ঘটিসেওড়া—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ।

ঘণ্টক—ক্ষুপবিশেষ।

ঘণ্টকর্ণ—ক্ষুপবিশেষ, ঘটকান।

ঘণ্টা—বৃক্ষবিশেষ, bignonia snaveoleus.—পাটলি,—পারুল—অরণ্যবিশেষ [হি° গোটা] bignonia snaveoleus, schrebra swietcniodes. ফুল হলদে রংয়ের, খয়ের রংয়ের আমেজ আছে। ফল প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা, ঘণ্টার মত। পর্যায়—গোমীচ, ঝাটল, মোক্ষ, মুষ্কক, গোলিহ, ক্ষারদ্রু, কালমুষ্কক, পাটলি, ঘণ্টাক, ঝাটি, তীক্ষ্ণ, কাষ্ঠপাটলি, কালাস্থলী, কাচস্থলী।—রবা, রবী—বনশন, স্থানবিশেষে ঝন্‌ঝনিয়া, শণপুষ্পী।—লিকা,—লী—কোষাতকী।—বীজ—জয়পাল বৃক্ষ।

ঘণ্টিনীবীজ—জয়পাল বৃক্ষ।

ঘন—মুথা, cyperus rotundus.—চ্ছদ—শিগ্রু।—জম্বান—ঘনসেয়ালা॥ ত্রিকাণ্ড॥—ত্বচ্—শিগ্রু।—দ্রুম—বিকণ্টক বৃক্ষ।—পত্র—১ পুনর্ণবা, ২ শিগ্রু।—পল্লব—সজনে।—ফল—বিকণ্টক বৃক্ষ।—রস—মোরট বৃক্ষ।—বল্লিকা—অমৃতস্রবা লতা।—বাস—কুষ্মাণ্ড।—সার বৃক্ষ বিশেষ।—স্কন্দ—কোশাম্র বৃক্ষ।—স্বন—তণ্ডুলীয় শাক।

ঘনা—মাষপর্ণী।—ময়—খর্জুর বৃক্ষ।—মল—বাস্তুক শাক।

ঘর্ষণী—হরিদ্রা॥ ত্রিকাণ্ড°॥

ঘলঘসা—[স: কলস, দ্রোণপুষ্পী, উ: গাইস্র] খলঘসিয়া, হলঘসা lenceas linifolia. তুলস্যাদিবর্গের আরণ্য ক্ষুপ বিশেষ। ফুলের আকার ডোঙার মত, রং শাদা। প্রকারভেদ—১ ছোট ঘলঘসা—l. aspera. ফুলের বহিরাবরণ মসৃণ। বৎসরে দুইবার ফোটে। বর্ষাকালে ও শীতকালে। ২ বড় ঘলঘসা—l. caphalopes ফুলের বহিরাবরণ রোঁয়াযুক্ত।

ঘণ্টিক—ধুস্তুর।

ঘাস [ইং grass]—। চীনে ঘাস—জাপান ও সিংহলের সমুদ্রজাত শৈবাল বিশেষ, gelidium, gracilaria,—কচু—typponium flagelli-frome.

ঘিকুমারী—ঘৃতকুমারী দ্র°।

ঘিতরই—একরকম ক্ষুদ্রবৃক্ষ।

ঘিনটিনাটি—amorantus tennifolius.

ঘিনালিতা পাট (দেশজ)—corchorus capentaris.

ঘিরপুরণ্যা (দেশজ)—একপ্রকার গাছ, luffa pentanda.

ঘুণপ্রিয়া—উডুম্বর বৃক্ষ।

ঘুলঞ্চ—ধানবিশেষ, গড়গড়ে ধান।

ঘুকাবাস—শেওড়া গাছ।

ঘৃণাবাস—[illegible]।

ঘৃতকরঞ্জ—ঘিয়াকরমচা। পর্যায়—প্রকীর্য। ঘৃতপর্ণক, স্নিগ্ধপত্র, তেজস্বী, বিষারি, স্নিগ্ধশাক, বিরোচন।

ঘৃতকুমারিকা—ঘৃতকুমারী দ্র°।

ঘৃতকুমারী—[অজরা, গৃহকন্যা, কুমারী, সুকণ্টকা, হি° ঘিউকুমারী, বনভস্তকী, কুঠবেপাট, কো° ঘিত্বকঞ্চন, ম° কোরকড, কোরফান্টা, গু° কুনার, ক° লোয়িমর, তে° পিন্নগোরিকণ্টলবন্দ, ফা° দরখতেসিন্ন, অ° মুসবর, ই° Indian alœ] রজনীগন্ধাদিবর্গের শাক বিশেষ, aloe indica, a. perfolicata, a. vern, a. chineusis. পাতা মোটা দু'পাশে কাঁটা আছে ও মধ্যে পিচ্ছিল রসযুক্ত। ঘৃতকুমারীর রস হইতে 'মুসব্বর' হয়। মুসব্বর চারি প্রকার—(১) সক্রোটাইন, (২) আরবিক, (৩) জাফিরাবাদ, (৪) মহীশূর।—পর্ণক,—পূর্ণক—ঘৃতকরঞ্জ দ্র°। মণ্ডনিকা—হংসপদী বৃক্ষ।—মণ্ডা—বায়সোলী বৃক্ষ, মাকড়া হাতা।

ঘৃতাচীগর্ভসম্ভবা—বড় এলাচী।

ঘৃষ্টি—চামর আলু।

ঘৃষ্টিলা—চাকুনিয়া।

ঘেঁচু—[স° ঘেঞ্চুলিকা] কচবাদিবর্গের শাক বিশেষ, spathium chinense, typhonium trilobatum. বনে ঝোপে ঘাসের মধ্যে জন্মায়।

ঘেঁটু—[সঃ ঘণ্টাকর্ণ] ভাট দ্র°।

ঘোটিকা—১ বৃক্ষ বি°, পর্যায়—কর্কটি, তুরঙ্গী, চতুরঙ্গ, ২ লোনী শাক।

ঘোড়করণ—বড় গাছ, ailanthus excelsa.

ঘোড়ানিম—(দেশজ)—melia azadirachia—মুগ—phaseolus sublobatus.

ঘোণ্টা—১ ঘোয়াকুল। পর্যায়—বদর, গোপঘণ্টা, শৃগাল, কোলি, কপিকোলি, হস্তিকোলি, বদরীচ্ছদা, কর্কন্ধু, ২ পূগবৃক্ষ।

ঘোরা—দেবতাড়ী লতা, ঘোষালতা।

ঘোলমন্থনী—ঘোলমৌনী গাছ।

ঘোলমহনি—অপামার্গাদিবর্গের ক্ষুপবিশেষ। deeringia indica, deeringa celosioides. গাছে জড়াইয়া ওঠে। ফুল ছোট, ফলও ছোট, শাঁসযুক্ত, গোলাকার।

ঘোলি, ঘোলিকা, ঘোলী—এক প্রকার পত্র শাক।

ঘোষ—কোশাতকী দ্র°।—কাকৃতি—১ শ্বেত কোষাতকী লতা, ২ মাকাল।

ঘোষা—১ মৌরী, ২ শত পুষ্পা, ৩ কোষাতকী, ৪ কাঁকড়া শৃঙ্গী (?)। লতা (স° ঘোষক) কোশাতকী দ্র°। [ক্রমশ।

বস্টন প্রবাসের দিন

কৃষ্ণা বসু

পূর্বকথা

দেখতে দেখতে বেশ কিছুদিন হয়ে গেল, কিন্তু মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা। বস্টন-প্রবাসের দিনগুলির স্মৃতি মনের মধ্যে ম্লান হয়ে যায় নি এতটুকুও। অ্যাটলান্টিকের ওপর ঝড়ো আবহাওয়ায় কাহিল হয়ে পড়াতে আমাদের এরোপ্লেন গ্যাণ্ডার এয়ারপোর্টে নামল। নয়ত লণ্ডন থেকে যে ওভার-নাইট ফ্লাইটে আমরা নিউইয়র্ক যাচ্ছিলাম, পথে তার কোথাও থামবার কথা ছিল না। গ্যাণ্ডার এয়ারপোর্টে প্লেন যখন নামল আমাদের হাতঘড়িতে তখনো রাত গভীর, কিন্তু লোক্যাল টাইম অনুসারে ভোর হয়ে গেছে।

যাত্রীদের সামনে ব্রেকফাস্ট ট্রে বসিয়ে দিয়ে গেল এয়ার হোস্টেস। আমেরিকান লাইনের এরোপ্লেন, ব্রেকফাস্টের প্রাচুর্য প্রচুর। সামনে ট্রে নিয়ে বসে এরোপ্লেনের ছোট্ট কাচের জানলা দিয়ে বাইরের অস্পষ্ট আলো-আঁধারের দিকে তাকিয়ে মনে হল আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরেই নিউইয়র্ক!

কিন্তু এ কি হল? মন থেকে কোন সাড়া পাচ্ছি না কেন? আশ্চর্য হয়ে দেখলাম আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌছে যাব আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, এতে উৎসাহিত হওয়া দূরে থাক যেন শংকিত হয়ে উঠেছি মনে মনে। কেবলি মনে হচ্ছে দেশটা আমার সম্পূর্ণ অজানা। লোকগুলো কেমন, সে সম্বন্ধে ধারণাও খুব স্পষ্ট নয়। আমি তো রাষ্ট্রনেতা বা সাংবাদিকদের মত কোস্ট-টু-কোস্ট ট্যুর করতে যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি অন্তত কিছুদিনের মত ঘর বাঁধতে। অজানা দেশে, অপরিচিত পরিবেশে নিজেকে কল্পনা করে উৎসাহিত হবার বিশেষ কোন কারণ খুঁজে পেলাম না।

এরই জন্য গত কয়েকমাস ধরে এত ব্যস্ততা, এত আয়োজন, এত ছুটোছুটি কারণে এবং অকারণে। কতবার অধীর হয়ে উঠেছি থেকে থেকে। এক একবার যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে আসে অমনি উপস্থিত হয় কোন একটা বাধা। 'শ'-র পুরোন পাসপোর্ট বাতিল হয়ে গেছে দেখা গেল, রিনিউ করার কথা মনে ছিল না। নতুন পাসপোর্ট হয়ে হয়েও হতে চায় না। শোনা গেল প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে, অবাঞ্ছনীয় লোকের তালিকায় নাম ছিল 'শ'-র, তারই জন্য এত দুর্ভোগ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির একযুগ পরেও! তবু ভাগ্য ভাল ফরেন্ এক্সচেঞ্জের হাঙ্গামা ছিল না কোন।

সেদিন আমেরিকান এক্সপ্রেসের কলকাতা আপিসে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল তিনি আমাদের এ সৌভাগ্যের কথাটা না জানাতে

আজকাল তো নিয়ম হয়ে গেছে স্বামী যখন কাজে যাবেন বিদেশে স্ত্রীরা তখন ঘরেই থাকবেন। হঠাৎ রাগ হয়ে গিয়েছিল আমার। মনে হল বলি, আজকাল স্ত্রীরা বুঝি ঘরে থাকেন কখনো? বরং স্বামীরাই থাকেন দরকার হলে, স্ত্রীরা বেরিয়ে পড়েন। সত্যিই তো, যুক্তরাষ্ট্রেই তো পরে দেখলাম কত ভারতীয় মহিলা—পড়ছেন হয়ত হার্ভার্ডে বিজনেস এ্যাডমিনস্ট্রেশন বা পাবলিক হেলথ। ছেলেমেয়ে রেখে এসেছেন দেশে। কার কাছে রেখে এলেন—জিজ্ঞেস করলে জবাব পাই, কেন উনি তো আছেন।

যাবার আয়োজন প্রস্তুত। বুক করা হয়ে গেছে এরোপ্লেন। শেষ মুহূর্তের জিনিসপত্র কেনাকাটা, প্যাক করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম ক'দিন খুব। শরীর খারাপ লাগছিল মাঝে মাঝে কেমন যেন অহেতুক। এটা-সেটা ট্যাবলেট খেয়ে ফেলি নিজে নিজে টুকটাক। কাউকে কিছু আর জানিয়ে দরকার নেই, আবার বাধা পড়ে যাক আর কি। কিন্তু হায়। শেষরক্ষা করা গেল না। আধ-প্যাক করা জিনিসপত্র ঠেলে রেখে শয্যা নিলাম একদিন। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে মনে হল শেষটা যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে আরো কোন দূরদেশে পাড়ি দিতে হবে নাকি? দীর্ঘ একমাস কেটে গেল রোগশয্যায়।

নতুন করে আবার শুরু হল প্রস্তুতিপর্ব। বুক করা হল এরোপ্লেন। ফিরে প্যাক করলাম জিনিসপত্র। অবশেষে একদিন যাবার দিন এসে গেল। বিকেল তিনটেয় দমদম থেকে ছাড়বার কথা। টেলিফোন এল এরোপ্লেনের আপিস থেকে। ঝড় হয়েছে সিডনীতে না সিঙ্গাপুরে কোথায় যেন। প্লেন তাই লেট হবে অনেক, নির্দেশ এল প্রস্তুত হয়ে বসে থাকবার, যেই খবর আসবে বেরিয়ে পড়তে হবে।

বসে বসে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। বন্ধুজন যাঁরা সোজা দমদম চলে গিয়েছিলেন ঠিকমত খোঁজ না নিয়ে তাঁরা কিছু শুকনো শুকনো ফুল হাতে ঘুরে এলেন বাড়িতে রাগ করতে করতে। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি হল, রাত্রি গভীর হয়ে চলল। এমন সময় নিশীথরাত্রে টেলিফোন বেজে উঠল ঝন্‌ঝন্ করে। এল বহু প্রতীক্ষিত নির্দেশ। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হর্ন বেজে উঠল কয়েকটা। কয়েকখানা মোটরগাড়ি উডবার্ন পার্কের গেট পার হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

আমাদের যাত্রা শুরু হল।

দলে আমরা আড়াইজন। শ, আমি আর বু—পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যার দু'বছরেরও কম। চারদিকের ব্যাপার দেখে সে সবচাইতে বেশি উৎসাহিত। গান করতে করতে, ছড়া বলতে বলতে উঠে পড়ল এরোপ্লেনে। ঘুরে একবার বলল সকলকে, তোমরা এবার ছাদে চলে যাও। ছাদের কাছাকাছি দিয়েই তো এরোপ্লেন উড়ে উড়ে যায়, সেখান থেকেই ভাল দেখা যাবে সব কিছু, এই তার বিশ্বাস।

রাত তখন তিনটে। এরোপ্লেনের ভেতরটা 'ছবি শুরু হয়ে যাওয়া' সিনেমা হাউসের মত অন্ধকার। ছোট ছোট নাইট লাইট জ্বালিয়ে যাত্রীরা ঘুম দিয়েছে। হঠাৎ গর্জন করে প্লেন টেক্ অফ্ করতেই আমার বুকে মুখ লুকিয়ে বু বলে উঠল, মাম্মা বাড়ি যাব! তাড়াতাড়ি বলি, ঐ দেখো কেমন লাল আলো। সামনে 'ফ্যাসেন সীট বেল্ট'

আলো', নীল আলোতে শান্ত করতে পারি না তাকে। কেঁদে বলে, আমি বাড়ি যাব।

সেদিন গ্যাণ্ডার এয়ারপোর্টে বসে প্লেনের কাচের জানলার বাইরে ভোররাত্রের আলো-আঁধারের দিকে তাকিয়ে আমারও বুক দুরু-দুরু করে উঠল অজানা ভবিষ্যৎ-এর শংকায়। মনে হল আমার যদি হত ওর বয়স, তবে কে জানে আমিও হয়ত কেঁদে বলতাম বাড়ি যাব।

কিন্তু সত্যিই কি এত দ্বিধার কিছু ছিল? আমেরিকা-য়ুরোপের প্রবাসজীবনে যে সত্য সবচেয়ে বড় করে জানলাম তা হল সবদেশেই সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মূল সুরটি এক। জীবনের মৌলিক অনুভূতির ক্ষেত্রে ওরা এবং আমরা এবং নিশ্চয়ই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তারা সকলেই সকলের নিতান্ত আপন। সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায় একইভাবে জীবন কাটায় মানুষ দেশে দেশে। এই সামান্য, সহজ সত্য মনে থাকলে আমরা কেউ কাউকে আঘাত করতে পারতাম না। পৃথিবীতে এত যুদ্ধ-বিগ্রহ, মন কষাকষি চলতে পারত না।

আমার আমেরিকান সই হ্যারিয়েটের চিঠি এসেছে দিনকতক আগে। লিখেছে, আমার প্রিয় কবি রবার্ট ন্যাথানের কবিতা তোমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়া হয় নি কখনো তুমি যখন এখানে ছিলে। আজ তোমাকে ক'লাইন লিখে পাঠালাম। আশা রইল, এ ক'টি কবিতার লাইন তোমার হৃদয়ে পৌঁছে যাবে যেমন পৌঁছেছে আমার হৃদয়ে অনেকবার—

It is a matter for joy almost a matter for rapture
That here on this earth, between the two
freezing poles
Not altogether burned by the sun or drowned
by the wind
In hunger and pain and sickness and fear of death
Man lives, builds cities, grows wheat and goes
to church
Do not be fooled, do not make any mistake—
We cannot afford to murder each other,
even with flags and bugles,
For it those of us of one blood and mind were
ever to destroy
Finally and irreparably, once and for all, for ever,
Those others whose differing blood or ideas
lash us to fury
How bare would earth seem, how lonely her hills
and watercourses.

প্রথম পরিচয়

আইডল্‌ ওয়াইল্ড এয়ারপোর্টে যখন এসে নামলাম, তখন চারদিকে ঝক্‌ ঝক্‌ করছে সকালবেলাকার রোদ্দুর, সুন্দর নীল আকাশ। কিন্তু সেসব দিকে মন দেবার অবসর কোথায়? বিমান-বন্দরের বাঁধা-ধরা নিয়মকানুন পালন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এ-কাউণ্টার থেকে ও-কাউণ্টারে যাচ্ছি, লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ছি এদিকে-ওদিকে। কোথাও পাসপোর্ট, কোথাও কাস্টমস্‌, কোথাও হেল্‌থ্‌, নানা রকম চেকিং চলছে।

হেলথ্‌ কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ‘শ’-র এক্স-রে ফিল্ম-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করছেন একজন অফিসার। পাশের অন্য অফিসারটির দিকে ফিল্মটা ঠেলে দিয়ে একসময় বলে উঠলেন, দেখো তোমার কি মনে হয়, হোয়াট্‌ ডু ইউ থিংক্‌ অ্যাবাউট ইট্‌? দু’ নম্বর অফিসার চোখ বুলিয়ে নিল একবার তারপর বললে, আই থিংক আই উইল বাই ইট। যার সোজা বাংলায় মানে দাঁড়ায়, তা আমি এটা কিনব।

আমেরিকান ভাষা বুঝতাম না তখনো ভাল। চোখ বড় করে চেয়ে রইলাম তাই। এক্স-রে ফিল্ম কিনবে? তার মানে! পরে বুঝেছিলাম বাইং আর সেলিং-এর উপমা না দিয়ে কথা বলতে পারে না আমেরিকানরা। ভাবের আদান-প্রদান নিয়ে কথা তা-ও কেনা-বেচার টার্মস্‌-এ বলে। কেউ হয়ত নূতন কোন ভাবধারার প্রচার করতে চায়, সে বলবে সে আইডিয়াটা বেচতে চায়, কেউ হয়ত কিনবে সে আইডিয়া—কেউ কিনবে না।

কিছুদিনের মধ্যে আমাদেরও রপ্ত হয়ে গেল ভাষা। অজ্ঞাতসারে নিজেরাও সুরু করে দিলাম বাইং আর সেলিং-এর ব্যবহার। হয়ত কোন নিমন্ত্রণে গিয়েছি কোন পার্টিতে। হোস্টেসকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলাম। ন্যাপকিনের বোঝা হাতে তুলে নিয়ে বললাম, দাও এগুলো বেচে দিই। অর্থাৎ কি না বিলিয়ে দিই অভ্যাগতদের মধ্যে। কিন্তু সে অনেকদিন পরের কথা।

আইডল্‌-ওয়াইল্ড থেকে নিউইয়র্ক যেতে উৎসুক চোখে দেখছিলাম দু’ধারে। কোথাও ছোট ছোট বাড়ি, তার কিচেন গার্ডেনে কাপড় শুকোতে দিচ্ছে মেয়েরা। কোথাও হঠাৎ একটা বিরাট পার্কিং স্পেস জুড়ে পড়ে আছে একঝাঁক গাড়ি। ঠিক যেন কাচের পাত্রে ঢেলে রাখা একরাশ ক্যাণ্ডি। চাকচিক্য আর উজ্জ্বল রঙের জন্য আমেরিকান মোটরগাড়িগুলোকে দেখায় লজেন্সের মত। ক্যাণ্ডির মহাভক্ত সব আমেরিকানরা। যে-কোন আমেরিকান লিভিং রুমে অর্থাৎ বসবার ঘরে ফুলদানীতে যেমন থাকে ফুল, দেয়ালে ছবি, তেমনি টেবিলের একপাশে কাচের জারে ভরতি থাকে ক্যাণ্ডি। আমাদের পান-মশলার মত অভ্যাগতদের সামনে এগিয়ে দেওয়া হয় যখন-তখন। একরঙা, দু’রঙা, তিনরঙা চকচকে মোটরগাড়িগুলোর দিকে তাকালেই জার-ভরতি লজেন্সের কথা মনে পড়ে যায়।

একসময় অন্যমনস্কভাবে পার হয়ে গেলাম একটা কবরখানা। খাড়া খাড়া পাথরের স্ল্যাব বসানো আছে, তাতে নাম খোদাই করা আছে মৃতের। গাড়ির স্বচ্ছন্দগতির সঙ্গে প্রায় ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। এমন সময় একটা বাঁক ঘুরতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল—ওটা কি? আরো একটা কবরখানা না কি! প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড খাড়া পাথরের স্ল্যাব উঠে গিয়েছে যেন আকাশ ভেদ করে। গাড়ির আরোহীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। সকলেই কাছে টেনে নিচ্ছে ওভারকোট, হাতব্যাগ। এই তবে নিউইয়র্ক? আমি যেন আশা করেছিলাম রঙে ও রেখায় অপূর্ব কবিত্বময় হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠবে ম্যানহাটানের স্কাইস্ক্রেপারশ্রেণী ঠিক জন ম্যারিনের আঁকা ছবির মত। তার বদলে নিউইয়র্কের ধূসর, স্থূল স্কাইলাইন দেখে কেন মনে হল, এখুনি পিছনে ফেলে-আসা কবরখানারই যেন একটি বড় সংস্করণ?

অল্পক্ষণের মধ্যে গাড়ি ঢুকে পড়ল শহরে। দু’ধারে বিরাট অট্টালিকার চাপে কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। মনে হল যেন পরে আছি গলার কাছে আঁট করে বাঁধা কোন জামা। দেখতে দেখতে আমরা হারিয়ে গেলাম নিউইয়র্কের কোন এক বড় হোটেলের অগুণতি তলার একটি তলায়, হাজার ঘরের একটি ঘরে। বিশালকায়া নিগ্রো পরিচারিকা ছুটোছুটি করে ট্রেতে বয়ে আনল খাদ্যসম্ভার, শয্যায় পেতে দিল সদ্য ধোপ-ভাঙা রঙিন চাদর দেয়ালের রঙের সঙ্গে তাল বজায় রেখে। এই মার্কিন রঙের আসক্তি আমাদেরও পেয়ে বসেছে। তাই কলকাতার বেশিরভাগ বাড়িরই আজকাল দেয়ালে-জানলায়, আসবাবে-পর্দায়, চাদরে-কুশনে রামধনুর মত রঙিন। শীতের দেশে যত ভাল লাগত এই রঙের ব্যবহার, আমাদের দেশে বিশেষত গ্রীষ্মকালে ঠিক তেমনটি লাগে কই?

একই দিনে সেই হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলেন ব্রেজিলের কোন এক কূটনীতিক। তাঁর নামের সঙ্গে আমাদের নামের ছিল আশ্চর্য মিল, উচ্চারণগত নয় বানানগত। ফলে বেশ একটা কমেডি অব এরর্‌ সৃষ্টি হল। আমাদের জন্য আসা যত কিছু খবর সেই ব্রেজিলিয়ান্‌ ডিপ্লোমেটের ঘরে সরবরাহ করে দিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ—আমেরিকান কর্মনিপুণতার এই প্রাথমিক পরিচয়ে রাগ না হয়ে বেশ একটু আরামবোধ হল। যাক্‌, এরাও তা হলে আমাদেরি মত।

‘শ’-কে তখুনি ছুটতে হল কর্মস্থলে। এদিকে আমি চিন্তিত হয়ে ভাবছি নিউইয়র্কের সব বন্ধুদের হল কি? কারু কোন খোঁজ নেই। নিজেই খোঁজ নেব মনে করে টেলিফোন ডিরেকটরি হাতে নিয়ে বসলাম এসে সদ্যপাতা রঙিন বিছানায়। অমনি কলকাতা-নিউইয়র্ক দীর্ঘ পথশ্রমের যত ক্লান্তি একসঙ্গে জড়িয়ে ধরল যেন। টেলিফোনের বই-এ মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল টেলিফোনের ঝনঝনানিতেই তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে নিউইয়র্কে।

পথে পা দিতেই আলো ঝলমল করে উঠল নিউইয়র্ক। রাত্রের নিউইয়র্কের মোহিনীরূপ আমার মন হরণ করল। সকালবেলায় কর্মব্যস্ত যে শহরকে মনে হয়েছিল নবাগত বিদেশীর প্রতি নিতান্ত শীতল—কেমন যেন একটা উপেক্ষার ভাব—রাত্রের মেজাজ দেখলাম তার অন্যরকম। আলোকিত পথঘাট, সাজানো দোকান, রেস্তোরাঁ পথচারীদের শাড়ি দেখে ফিরে-ফিরে তাকানো সবকিছুতেই একটা সাদর বন্ধুতার আশ্বাস।

ততক্ষণে আমাদের সঙ্গী হয়েছেন নিউইয়র্কবাসিনী আমার এক আমেরিকান আত্মীয়া। আণ্টি বলেই উল্লেখ করা যাক তাঁকে। বস্টনের মেয়ে ইনি, খাঁটি নিউইংলণ্ডের কালচারেল আবহাওয়ায়

মানুষ? তারপর একদিন ভারতবর্ষকে ও বিশেষ একজন ভারতীয়কে ভালবেসে সুদূর বস্টন থেকে এসে ঘর বাঁধেন কলকাতায়। সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা। দীর্ঘ দশ বছর বসবাস করে ভারতবর্ষ যখন তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমিতে পরিণত হয়েছে তখন আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্বামীকে হারালেন। অনেক দুঃখ-বেদনার মধ্যে নিজের দেশে ফিরে আসেন। এই পনেরো বছরে এতটুকুও ভুলতে পারেন নি শোকের আঘাত। এই চিরবিরহিণী নারীকে দেখলেই মনে হয় এ কেমন আমেরিকার মেয়ে?

আণ্টি বললেন, তোমরা আজ আমার অতিথি। চল আগে আমার বাড়িটা দেখবে তারপর কোন রেস্তোরাঁয় বসে গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে। ওয়েস্ট উনপঞ্চাশ স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে ফিফথ এভেনিউ পার হয়ে ইস্ট উনপঞ্চাশ স্ট্রীটে পড়লাম। সেপ্টেম্বরের রাত্রি ওদের এখন ফল অর্থাৎ শরৎকাল আবহাওয়া যাকে বলে মাইল্ড অর্থাৎ কি না শীতও নয়—গরম তো নয়ই নিতান্ত আরামপ্রদ। নিউইয়র্কের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বড় ভাল লেগেছিল সে রাত্রে।

আণ্টির ছোট্ট এপার্টমেন্টে পা দিয়েই মনে হল রুপার্ট ব্রুকের কবিতা ঈষৎ পাল্টে নিয়ে বলি,—

Here is a corner in some foreign land that is forever India.

বসবার ঘরের ফরাস-চাদর-তাকিয়া থেকে সুরু করে দেওয়ালের ছবি, জানলার পর্দা সবই বিশিষ্টভাবে ভারতীয়। দার্জিলিঙ, ঢাকা, দিল্লী, কলকাতা নানান জায়গা থেকে আহরণ করা জিনিস। তবে সাজ-সজ্জায় ভারতীয় হলেও জাতে খাঁটি আমেরিকান এপার্টমেন্ট। একখানা বড় ঘরই তিনটুকরো করা, শোবার ঘর, খাবার ঘর আর লিভিং রুম মানে বসবার ঘর। একপাশে কিচেন, বাসন-ধোওয়ার সিংক, রান্নার ওভেন, ফ্রিজ সবকিছু হাতের কাছাকাছি।

রেস্তোরাঁয় বসে খেতে খেতে কাজের কথা হল। 'শ' খবর দিলে বস্টনে আমাদের কর্মস্থল নির্দিষ্ট হয়েছে। উপরওয়ালা বলেছেন এখুনি যেতে পারলে ভাল তবে আমরা নিশ্চয় ক্লান্ত, ক'দিন নিউইয়র্কে বিশ্রাম করেও যেতে পারি। আমার মনে হল নিউইয়র্ক আর যাই হোক বিশ্রাম করার জায়গা নয়। ওটা বস্টনে গিয়েই করা যাবে। নিউইয়র্কের সঙ্গে পরিচয় অসম্পূর্ণ রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বস্টনে চলে যাওয়াই স্থির হল।

বস্টনের পথে

'টু বস্টন, টু বস্টন—টু হ্যাভ সাম্ ফান···' আমার শিশুপুত্রকে কোলে বসিয়ে পা নাচিয়ে-নাচিয়ে গান করতেন আণ্টি! কোলাহল-মুখর, কর্মব্যস্ত গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল স্টেশন পেছনে ফেলে ট্রেন যখন এগিয়ে চলল ট্রেনের চাকায় চাকায় যেন বাজতে লাগল সেই গানেরই প্রতিধ্বনি।

ট্রেনে বসে চোখ কান সজাগ করে মেলে রাখলাম ভেতরে-বাইরে। পাছে কিছু দেখতে-শুনতে বাদ পড়ে যায়। নতুন দেশ যা দেখি তাই ভাল লাগে। ট্রেনের দু'পাশে একটু বাদে বাদে নজরে পড়ে পুরোন মোটর গাড়ির লোহালক্কড়ের স্তূপ। মনে হয় এও বেশ; বছর বছর নূতন মোটরগাড়ি কেনে লোকে। পুরোন বাতিল-হয়ে-যাওয়া গাড়িগুলোর গতি হবে কি? তাই অবাঞ্ছিত লোহালক্কড়ের স্তূপ জমে ওঠে।

কামরার ভেতর ডাইনিংকার থেকে এটা-সেটা নিয়ে ফিরি করতে আসে থেকে থেকে—হ্যাম স্যাণ্ডউইচ, চীজ স্যাণ্ডউইচ, দুধ, কফি, কোকোকোলা। ট্রেনে উঠলেই খিদে পায় বরাবর। মাঝে মাঝে ডাকি স্যাণ্ডউইচওয়ালাকে। গলা ভিজিয়ে নিতে দরকার হয় কফি কিম্বা কোক।

কোচ ট্রেন। দীর্ঘ কামরা, দু'জনের বসবার সীট মুখোমুখি করে সাজানো। কামরার প্রান্তে একটুকরো জায়গা কাচের দেয়ালে ঘেরা, স্মোকিং লাউঞ্জ। 'শ' উসখুশ করলে খানিক তারপর অদৃশ্য হল কাচের ওপাশে। আমেরিকাতে যেন ছেলেদের চাইতে মেয়েরাই ধূমপান করে বেশি। স্মোকিং লাউঞ্জে মহিলাদেরই মনে হল সংখ্যাধিক্য।

দেখতে দেখতে এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে ভাব জমে উঠল শ'র। ভারতবর্ষের প্রতি অশেষ টান। নাতনী বারবারা ছিল চারবছর ভারতবর্ষে ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসে। সে সময় তার পরিচিত সব ইণ্ডিয়ান হোম-এ তাকে ঠিক নিজের মেয়ের মত গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় আতিথেয়তা তাদের মুগ্ধ করেছে। বারবারা এখন আছে স্পেনে কিন্তু বারবারার মা অর্থাৎ বৃদ্ধার মেয়ে বস্টনেই থাকেন।

শীতের বস্টন

ইণ্ডিয়ান দেখতে পেলে তাড়া করে গিয়ে ভাব করেন। তাদের জন্য কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। মনে করেন ঋণ শোধ করছেন কৃতজ্ঞতায়। বারে বারে বলতে লাগলেন বুড়ি, আমাদের ওখানে আসতে হবে কিন্তু, নিশ্চয় আসবে। আমার মেয়ে লরা কত খুশি হবে। কাঁপা-কাঁপা হাতে নোট বইয়ে লিখে দিলেন নাম-ঠিকানা।

পৃথিবীতে কোথায় কার আপনজন ছড়িয়ে থাকে ভেবে পাই না। ওয়েলজ, পরিবারের সঙ্গে সেই যে আলাপের সূত্রপাত হল ট্রেনে, ধীরে তা পরিণত হয়েছিল পরমাত্মীয়তায়। কতবার এসেছি-গিয়েছি ওদের সেন্ট লুই ষ্ট্রীটের বাড়িতে। কত দরকারে ছুটে এসেছেন মিসেস্ ওয়েলজ, তাঁর অতিপরিচিত গাড়িখানা চড়ে। প্রথম দিনেই বলে রেখেছিলেন, যখন যা প্রয়োজন আমাকে বলতে যেন সংকোচ করো না, আমার গাড়িটা তো রয়েছেই, আই লিভ ইন মাই কার। হৈ-চৈ করতে করতে দল বেঁধে গিয়েছি বর্স্টনের বাইরে—সালেম্, রিভিয়ের বীচ, নয় ত' স্টারব্রিজ ভিলেজ।

ট্রেন এসে থামল প্রভিডেন্স-এ। এরপর আসবে বর্স্টন। সাউথ স্টেশন হল বর্স্টনের বড় স্টেশন। কিন্তু তার আগে আছে একটা ছোট্ট এক মিনিটের স্টেশন ব্যাক বে। ব্যাক বে-তে হুড়মুড় করে নামতে না-নামতে ট্রেন ছেড়ে দিল। কোনমতে নেমে পড়ে আমরা তখনো হাঁফাচ্ছি। মনে পড়ল মিহিজাম তখনো চিত্তরঞ্জন হয় নি, সে সময় এরকম এক মিনিটের থামা ছিল স্টেশনে। উঃ, নামবার সময় কি তাড়াহুড়োটাই না লাগত। তারপর দেখা যেত নির্ঘাৎ কিছু না কিছু ফেলে আসা হয়েছে ট্রেনে। ছাতা, লাঠি, টুপি কোন একটা ঝোলানো রয়ে গেছে হুকে, নয় ত' সাবানটা কেসশুদ্ধ পড়ে আছে বাথরুমে।

আমাদের দেশের মফস্বল স্টেশনের মতই ছোটখাট, নীরব, নির্জন স্টেশন ব্যাক্ বে। বিকেলবেলার নরম রোদ্দুরে স্নিগ্ধ চেহারা। পা দিয়েই মনটা খুশি হয়ে উঠল। নিউইয়র্কের আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি আর হট্টগোলে ভরা পথঘাটের পর বর্স্টনকে মনে হল অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। বর্স্টনের সঙ্গে আমার প্রথম দর্শনে প্রেম। ব্যস্তসমস্ত নিউইয়র্কবাসীর পাশে বর্স্টনিয়ানদের মনে হল অনেক বেশি ঢিলে-ঢালা, সুস্থির।

ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে এসে দাঁড়ালো একজন পোর্টার। আমাদের আমেরিকা প্রত্যাগত সব বন্ধুরা আসবার সময় বেজায় ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলেন। মালপত্র সব কম নাও, হাল্কা করে নাও। ওদেশে কুলি-টুলি পাবে না। সবই নিজেদের ঘাড়ে করে বইতে হবে। আমার তো বেশ ভয় ধরে গিয়েছিল। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম, মস্ত বড় স্যুটকেস মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেটে-স্টেটে। এ অভিজ্ঞতা যে একেবারে না হয়েছিল তা নয়। তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, অবস্থা অতটা ভীতিপ্রদ নয়। কুলি আছে, তবে প্রয়োজনের চাইতে সংখ্যায় কম। তাই অসুবিধায় পড়তে হয় মাঝে মাঝে। মাথায় করে মোট বয়ে নিয়ে যাওয়া নেই কোথাও। পুশকার্ট বা ঠেলাগাড়ি আছে সেজন্য। লাগেজ-পিছু দক্ষিণা দিতে হয় বেশ।

বর্স্টনের লোকেরা যেন আগে থাকতে পণ করে বসেছিল আমাদের প্রতি বন্ধুবৎসল হবে। নবাগন্তুকের প্রতি সকলেই সৌজন্য প্রকাশ করতে চায়, সাহায্য করতে উৎসুক হয়ে ওঠে সকলেই। মালগুলো গুণে গুণে তুলে দিচ্ছি পোর্টারের গাড়িতে, পেছন থেকে একজন সহযাত্রী চাপাগলায় বললেন, করছ কি, ঐ ছোট ব্যাগগুলো নিজেরা নাও, এক একটা পঁয়ত্রিশ সেন্ট করে পড়বে যে। খানিকটা লজ্জিত হয়েই ছোট ব্যাগ দু'-একটা নামিয়ে নিলাম। ট্যাক্সিওয়ালা জুটল সেও পরম সদালাপী। বলে কলকাতা থেকে আসছ, বেশ বেশ। আমিও দেখেছি ক্যালকাটা, কোরিয়ার যুদ্ধের সময় একবার কলকাতা হয়ে যেতে হয়েছিল—সে কেঁদে বসল এক দীর্ঘ কাহিনী।

নিউইয়র্কের ট্যাক্সিওয়ালারা রূঢ় হয় অনেক সময়। ট্যাক্সির প্রাপ্য ভাড়া ছাড়াও 'টিপ্‌স' দিতে হয়। টিপসের পরিমাণের কম-বেশির ওপর নির্ভর করে চালকের মেজাজ। কিন্তু বর্স্টনে আমাদের ভাগ্যে যে কি করে সবসময় নেহাৎ একাডেমিক, ইনটেলেকচুয়াল ক্যাবম্যান জুটত ভেবে পাই না। পথ চলতে আলোচনা করতে হত প্লেটো, নয়ত টেগোরের গীতাঞ্জলি। নিউ ইংলণ্ডের হাওয়ায় বোধ হয় ছড়িয়ে আছে কালচারের বীজ। একবার একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার আলোচনা করেছিল গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ নিয়ে। দুঃখ করে বলেছিল 'গ্যাণ্ডি'র মত 'গাই' তাকেও কি না মার্ডারড হতে হল, সত্যিই মানবজাতির আশা নেই কোন।

'শ' একদিন ফিরে এল কর্মস্থল থেকে ট্যাক্সিতে চেপে। ঈষৎ পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত চেহারা। বললাম, কি হল, কাজের চাপ পড়েছিল বুঝি খুব। 'শ' বললে হ্যাঁ, খাটুনি গেছে বেশ, তার ওপর সারাটা পথ আলোচনা করতে হল অজন্তা-ইলোরার চিত্রকলা ও ভাস্কর্য নিয়ে। অনেক দেশ যদিও ঘোরা হয়েছে, অজন্তা-ইলোরা দেখা হয়ে ওঠে নি 'শ'-র তখনো।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া।
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া।···

এদিকে যে আমেরিকান ট্যাক্সি ড্রাইভার ঘুরে এসেছে অজন্তা ইলোরা। যুদ্ধের সময় বম্বেতে ছিল কি না। কি বিপদ!

সন্ধ্যা নেমে আসার আগেই বর্স্টনকে একবার দেখে নিতে চাই। কোনমতে মোটঘাটগুলো ঘরে ফেলে রেখে পথে বেরিয়ে পড়লাম। হান্টিংটন এভেনিউর চওড়া পথের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে স্ট্রীটকারের লাইন, দু'পাশে যাচ্ছে-আসছে বাস-মোটরগাড়ি। আমি বড় হয়েছি কলকাতায়, রাসবিহারী এভেনিউতে। ঠন্ ঠন্ করে এসে ঘটাং ঘটাং আওয়াজ তুলে ট্রাম থামে বাড়ির সামনে। বিকট, কর্কশ আওয়াজ করে হঠাৎ ব্রেক কষে নীল দোতলা বাসগুলো দোরগোড়ায়। হান্টিংটন এভেনিউ আমার ভাল লেগে গেল। মনে হল এসে পড়েছি বাপের-বাড়ির পাড়ায়।

রাস্তা পার হওয়ার আর্টটা শিখতে হল নতুন করে। চিরদিনের অভ্যাসমত কেবলই আগে ডানদিকে দেখে পরে বাঁদিকে দেখি পার হতে গিয়ে। এখানে দেখতে হয় আগে বাঁ-য়ে পরে ডাইনে। ভুল হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়—যা দ্রুতবেগে গাড়ি চলে। কমন-ওয়েলথ এভেনিউর ওপর এই ভুল করে 'শ' একদিন ধাক্কা খেলো মোটরগাড়ির। ভাগ্যক্রমে গাড়িটা ছিল ছোট ফোকসওয়াগন, সামান্য ছড়ে-যাওয়া আর গা-হাত-পা ব্যথার ওপর দিয়ে কেটে গেল ফাঁড়া।

ঘটনাটা অবশ্য বেমালুম গোপন করে গিয়েছিল আমার কাছে শ' দীর্ঘকাল।

অনেককাল পরে কলকাতায় বসে যেদিন প্রথম ঘটনাটা শুনলাম আতংকগ্রস্ত হয়ে বললাম, পড়ে গিয়ে কি করলে তুমি?

শ' তার স্বভাবসুলভ নির্বিকার হাসি হেসে বললে, হাত-পা ঝেড়ে উঠে পড়ে বললাম, আমারই ভুল, আপনার নয়!

এতে চালক নিতান্ত অবাক হয়ে গেল, কারণ এ রকম স্পিরিট পথচারীর কাছে নাকি আশাই করা যায় না ওদেশে। চাপা পড়ে যদি মরতেই হয় এরা সাবধানে 'জেব্রা-ক্রসিং'-এ চাপা পড়ে মরে। তা হলে খেসারত আদায় করা যায় চালকের কাছে। জীবনের সব ক্ষেত্রে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন আমেরিকান নাগরিক। গাড়ি চাপা পড়ে চালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা অভিনব। খুশি হয়ে শ'-কে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছিলেন চালক।

কর্মসূত্রে আমাদের বাসস্থান নির্বাচন করতে হল হাসপাতাল পাড়ায়। সামনেই হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের বাড়িঘর। পাবলিক হেলথ স্কুলবাড়ির গা বেয়ে একটা নাম-না-জানা লতা উঠেছে। ওপাশে পিটারবেণ্ট ব্রিগহাম হাসপাতাল, ট্রেমণ্ট স্ট্রীট আর হাণ্টিংটনের মস্ত বড় মোড়টার নাম তাই পিটার ব্রেণ্ট-ব্রিগহাম সার্কেল। কর্মচঞ্চল, জমকালো চেহারা পিটার ব্রেণ্ট ব্রিগহাম সার্কেল। চারপাশ ঘিরে রেস্তোরাঁ, চুলকাটার দোকান, কাপড় কাচার দোকান, গোটা দুই সুপারমার্কেট আর ড্রাগ স্টোর্স। আমেরিকান সভ্যতার একটা বিশেষ অঙ্গ এই ড্রাগ স্টোর্স। ওষুধ-বিষুধ ছাড়াও এখানে পাওয়া যায় খাদ্য, পানীয়, পাঠ্য, খেলনা, লিখবার সরঞ্জাম—কি নয়। পথ চলতে প্রতি দু'মিনিট অন্তর চোখে পড়বে একটা করে ড্রাগ স্টোর্স।

বড় রাস্তা ছেড়ে দু'একটা ছোটখাট রাস্তা এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ালাম খানিক। উই-গলসওয়ার্থ স্ট্রীট, ওয়াদিংটন স্ট্রীট। এক ধরণের দেখতে বাড়ি দু'পাশে। প্রত্যেক বাড়ির সামনে ছোট একটুকরো বাগান, ফুল ফুটে আছে নানান রঙের। বৃ ফুল দেখে খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল। সামনের বাড়ির সিঁড়িতে বসেছিল এক বৃদ্ধ। আর এক বৃদ্ধা বাগানে ফুলগাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ শিশুকণ্ঠের উচ্ছ্বাসে চমকে তাকালো দু'জনেই। কাঁচি হাতে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বৃদ্ধা বললে 'হা-ই'। সামান্য কিছু ফুল কেটে এগিয়ে দিল আমাদের দিকে। বস্টনের প্রথম অভ্যর্থনা প্রসন্নমনে গ্রহণ করলাম। [আগামী সংখ্যায় হানিমুনের পর।

মৌন বন্ধন

শ্রীমতী মীরা রায়

জানলা থেকে সরে এসে দাঁড়াল মাধবী। ঘড়ির কাঁটাটা মধ্যরাত্রির দু'টোর ঘর ছুঁই-ছুঁই করছে। নিস্তব্ধ নিদ্রিত পৃথিবীর অন্তহীন নীরবতার মাঝে ডুব দিয়ে মাধবী মনের আনাচ-কানাচগুলো হাতড়াবার চেষ্টা করল খানিকক্ষণ। কিন্তু তার মনের প্রবৃত্তিগুলো অবিরাম অভিযোগের কোলাহল তুলে তাকে টেনে নিয়ে গেল তার মনোরাজ্যের অশান্ত অনুভূতির আবর্তের মাঝে। বিগত সারাটা জীবনের দেনা-পাওনার হিসাব খতিয়ান করে দেখতে গিয়ে মাধবীর অশ্রুভারাক্রান্ত দৃষ্টির সামনে পাওনার ঘরের বিরাট শূন্যটা যেন মুখ হাঁ করে গিলতে এল। কি পেয়েছে সে সারাজীবনে? আজীবন যাকে চেয়েছিল সমাজের নিষ্ঠুর বিধি তাকে সরিয়ে দিল তার জীবন থেকে। সে বঞ্চনার জ্বালা ভুলতে যাকে বরণ করে নিল স্বামীরূপে তার শমনরূপটিই দিন দিন মাধবীর বিবাহোত্তর জীবনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

মনীষের সঙ্গে তার বিবাহের দিনটি পরিষ্কার মনে পড়ে। তার অন্তর্যামীর আর্তনাদ সেদিন চাপা পড়ে গিয়েছিল মৃত চৌদ্দপুরুষের কল্পিত আশীর্বাদ আহবানে, শিলা নারায়ণের সামনে উচ্চারিত সবচেয়ে বড় প্রবঞ্চনাময় বিবাহের মন্ত্রধ্বনিতে। 'তোমার হৃদয় আমার হোক আমার হৃদয় তোমার হোক' উচ্চারণ করেছিল মনীষ, সেটা যে কত বড় প্রহসনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে তাদের পরবর্তী জীবনে তখন কি ঘূণাক্ষরেও কেউ জানতে পেরেছিল? সেদিনের সানাই-এর করুণ সুরটা আজ রাত্রির নীরবতার মাঝে বড় আর্তস্বরে বাজতে লাগল মাধবীর কানে। বিয়ের পরে না-পাওয়া জীবনটাকে সে উপেক্ষাই করেছিল, সাধারণভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল একটি শান্তির সংসার, এ গড়ে তোলাকে সার্থক করতে চেয়েছিল তার নারীজীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে।

কিন্তু তার জন্মের সূতিকাগৃহে ভাগ্যবিধাতার কলম দিয়ে যে ব্যর্থতার ছাপটাই তার ললাটে আঁকা হয়ে গিয়েছিল তাকে এড়াবার কোন পথই সারাজীবনে মাধবী খুঁজে পায় নি।

বিয়ের প্রথম বছরটা তবু মন্দ কাটে নি। নতুনত্বের মোহে মনীষ কিছুদিন মশগুল ছিল, কিন্তু এর খোলস খুলতে বেশি দরি লাগল না। মনীষের কাছে মাধবী অর্থ কৌলিন্যের মাপকাঠিতে বহু নীচে ছিল, মনীষের স্বার্থপর লুব্ধ মনটাকে পরিতৃপ্ত করতে গেলে মাধবীর বাপের বাড়ির যে পরিমাণ অর্থদণ্ড দেওয়া উচিত ছিল, তা তারা দিতে সক্ষম হয় নি—ওদিকে তার স্তিমিত রূপের করুণ আবেদন মনীষের ক্ষুব্ধচিত্তে দিন দিন বিরক্তি ও রাগই সঞ্চার করেছিল। রূপের বিকিকিনির হাটে ওর সৌন্দর্যের পসরা বড় অল্প ছিল। মনীষের ক্রুর মনের নগ্নপ্রকাশে ক্রমেই মাধবী ত্রস্ত হয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু নিরুপায় সহনশীলতার সঙ্গেই মেনে নিচ্ছিল মনীষের অবজ্ঞা অত্যাচার নিপীড়ন। মাধবীর জীবন প্রভাতের পাপড়ি মেলে ফুটে ওঠা পাতাগুলো অকাল 'মধ্যাহ্নের খরতাপে ক্রমেই শুকিয়ে ঝরে পড়েছিল, শুধু যার এদিকে নজর দেওয়ার কথা ছিল, সে ফিরেও তাকাল না বা জানলও না কোথা দিয়ে মাধবী ফুলের স্বল্পায়ু সৌরভটুকু বড় অনাদরে লোকচক্ষুর অন্তরালে মিলিয়ে গেল পৃথিবীর ধূলাবালির মাঝে। ইদানীং প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে মনীষের মাধবীকে লাঞ্ছনা ও অপমান করা স্বাভাবিক রীতিতে দাঁড়িয়েছিল। মাধবীকে সে সরিয়ে দিয়েছিল তার জীবন থেকে অনেক দূরে। যদিও এখন মুখ ঘোরাতেই মাধবীর নজরে পড়ল ঘরের কোণে ভিন্ন খাটে গভীর নিদ্রায় মগ্ন মনীষ। হ্যাঁ নজরের মধ্যেই তো স্বামী-স্ত্রীর নিয়মানুযায়ী একঘরে তারা শুচ্ছে, সমাজ, আত্মীয়স্বজন সকলেই তো জানছে মনীষ তার কত কাছে রয়েছে তবে এ মনগড়া দুঃখ মাধবীর কেন? মনগড়াই বটে! হাসি পেল তার, যে ব্যবধানটা সমাজের নর-নারীর চোখে পড়ে না তার গভীরতাটা যদি সমাজ বুঝত। মাধবীর বুক চিরে একটা

অলস্ত তপ্তনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, কাছেই আছে বটে মনীষ। অভিনয়ের প্রহেলিকার মধ্যে যে সমাজের অস্তিত্ব তার কাছে এই বাহ্যিক স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের খোলসটুকুর নিশ্চয় দাম আছে। অন্তরের সত্যকে বিচার করবার মত সত্যাশ্রয়ী দৃষ্টি এ সংকীর্ণ সমাজের কোথায়? এ সমাজ শুধু মানুষকে বেঁধেছে মিথ্যায়, শঙ্কায়, বন্ধনে, শাসনে। এখানে মুক্তির, সত্যের, বিচারের অবকাশ নেই, এটুকু মাধবী নিজের জীবন দিয়ে হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে।

জানলা থেকে সরে এসে মাধবী নিজের খাটে এসে শুয়ে পড়ল, পাশেই ঘুমিয়ে আছে তার একমাত্র সন্তান বাবলু। আট বছরের নিষ্পাপ বাল্যের পবিত্রতার একটি ছোট্ট বিন্দু যেন ও। মায়ের গ্লানিময় জীবনের কালো অক্ষরগুলোর সঙ্গে এখনো ওর পরিচয় ঘটে নি। মাধবীর স্পর্শে পরম নিশ্চিন্তভাবে নিজেকে ঘুমন্ত সঁপে দিল মাধবীর কোলের মধ্যে। তাদের যৌথ-জীবনের একটি ক্ষীণ সেতু যেন বাবলু। বাবলুর গা ঘেঁষে শুয়েও মাধবীর অবাধ্য চোখ দুটো কিছুতেই বুজতে চাইল না। এ আজ নতুন নয়, বহুদিনই নিঃসঙ্গ রাত্রিতে নিজেকে একাটি পেয়ে নিজের মুখোমুখি হতে পেরেছে তখনই তার বেদনার সমুদ্র উথাল-পাথাল হয়ে জেগে উঠেছে, দেহের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রগুলো টান-টান হয়ে জেগে উঠে বিশ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ফুঁপিয়ে ওঠা দারুণ ক্ষোভ বার বার জানিয়ে দিয়েছে জীবনের ব্যর্থতাকে, তখন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে নি, নিদ্রামগ্ন ধরিত্রীর অতন্দ্রপ্রহরীর কাছে একমাত্র নিজের দুঃখকে অশ্রুজলের উপচারে নিবেদন করেছে, শুধু নিপুণ শিকারী মনীষ ফিরে দেখে নি তার অস্ত্রক্ষেপণের পারদর্শিতা কতদূর ক্রিয়াশীল হয়েছে তার শিকারের ওপর। আজও মনীষ নিশ্চিন্ত হয়েই ঘুমোচ্ছে, শুধু মাধবীর বিনিদ্র প্রহরগুলো কাটতে লাগল আগামী ভোরের রুটিন-বাঁধা জীবনযাত্রার কথা ভেবে।

সেই সকালে উঠতে হবে, মনীষ উঠবে, চা খাবে, কাগজ পড়বে। তারপর একটু বেলা হলে স্নান সেরে অফিসে বেরিয়ে যাবে, মাধবীও গতানুগতিক কাজের চাকায় ঘুরবে। সন্ধ্যায় মনীষ বাড়ি ফিরে অফিসের জামা-কাপড় ছেড়ে চা-টা খেয়ে আবার বেরিয়ে যায়। ক্লাব বন্ধু বান্ধব আড্ডা ইত্যাদি সেরে বাড়ি' ফিরতে রাত দশটা, তারপর বিছানায় এসে যখন আশ্রয় নেবে তখন শ্রীমতী মাধবীর জীবনদর্শন অধ্যয়ন করবার মত অত্যুগ্র স্বামীপ্রেম তার আর থাকবে না, ঘুমের ঘোরে কোথায় তলিয়ে যাবে। নিঃসঙ্গ নিঃশব্দের একঘেয়েমি ঘোচাবার জন্য কয়েকবার মাধবী অযাচিতভাবেই এগিয়ে এসেছে মনীষের সান্নিধ্যে—পরিবর্তে পেয়েছে বারংবার প্রত্যাখ্যান। গত সকালেই তো মনীষের ভোজ্যতালিকায় কিছু ঘাটতি পড়েছিল সব রাগটা তার গিয়ে পড়ল মাধবীর ওপর। মেয়েমানুষের রান্নাবান্না বিষয়েও কি একটা সুবন্দোবস্ত করবার মত গুণ নেই? রূপ ও রূপোর অভাবের সঙ্গে রুচিরও অভাব। এ-নিয়ে মনীষ প্রথমে খাবার টেবলে ঝড় তুলল, অতিষ্ঠ হয়ে শেষে মাধবীও বেশ দু'টো-চারটে কড়া বুলি শুনিয়েছিল। মোটা দড়িও টানতে টানতে ক্ষয়ে যায়, তার শেষ তন্তুটুকুও আর সংযোগরক্ষা করতে পারে না। মাধবীর সহনশীলতাও সেই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। মনীষের অসন্তোষের মুখে সে-ও মুখ খুলে তার 'অবৈধ' নারীসত্তার কিছুটা প্রকাশ ঘটিয়েছিল, ওদিকে বারুদের স্তূপেও আগুন লেগেছিল। খাওয়া ফেলে মনীষ রুদ্রমূর্তিতে ছুটে এসেছিল ওর দিকে।

ওর ঐ ভীষণ মূর্তি দেখে মাধবী হতচকিত হয়ে চমকে উঠেছিল।

কি মারবে না কি? এতদিন তো গায়ে হাত তোল নি, এবার কি সেই অভাবটাও পূর্ণ করতে চাও?

মারমুখো হয়ে উঠেছিল মনীষ, সারা জীবন তো জ্বালাচ্ছ, কিছু তো বাপের বাড়ি থেকে আনতে পার নি। না রূপ না রূপো; কিন্তু বাক্যির হুলটুকু আমদানী করলে কোথা থেকে?

মাধবীও অসহ্য হয়ে বলেছিল, ভোঁতা অস্ত্র তোমার হাতে পড়েছিলাম, আজ যে শাণিত হয়ে উঠেছি এতো তোমারই কৃতিত্ব। দিনের পর দিন তোমার অবিচার অত্যাচার আমার বাক্যিতে হুল জুগিয়েছে, এ হুলের জ্বালা থেকে তো তোমার নিষ্কৃতি হতেই পারে না।

আর কোন কথা সে বলতে পারে নি, উদ্গত অশ্রুটা লুকোবার জন্যই সেখান থেকে সরে যাচ্ছিল, কিন্তু মনীষের সবল দু'টো বাহু তার কাঁধে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

সত্যি কথা আমার শোন মাধবী, তোমার মত একটা নিষ্ফল বোঝা আমি আর বইতে পারছি না, তুমি সরে যাও আমার পথ থেকে, আমায় মুক্তি দাও। কি আছে তোমার মধ্যে? রূপ? কি এনেছ তুমি পৈত্রিক সম্পদ? যা চেয়েছিলাম, বিয়ে করে তার কিছু পাই নি তোমার মধ্যে। তোমার মাঝে কোন আমার অনুভূতি পাই না, আমার জীবনে তোমায় কল্পনা করলেও ব্যর্থতায় সমস্ত মনটা জ্বলে ওঠে। আমার খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, জীবনযাত্রাপ্রণালীর কিছুতে তুমি কথা বলতে এসো না। তুমি কি বুঝতে পার না কতখানি অকিঞ্চিৎকর তুমি আমার জীবনে? কোন কথা তুমি আমায় শোনাতে এসো না,'সরে যাও আমার সামনে থেকে, আমার জীবন থেকে। যেখানে পার চলে যাও আমায় মুক্তি দিয়ে, সমাজের বুকে বসে আমি আর এ অভিনয় চালাতে পারব না।

বজ্রাহত তালগাছ যেমন তার মাথার সর্বস্ব খুইয়ে শুধু একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মাধবীও বোধ হয় মনীষের জন্য আজও ঠিক সেইভাবেই সহ্য করেছিল। দাঁড়িয়ে সবই সে শুনল, তাকে সর্বস্বান্ত করে, রিক্ত করে মনীষ যে তাকে কোথায় নামিয়ে দিয়ে গেল, মনীষের এই উলঙ্গ আক্রমণে সেইটাই বিশেষকরে প্রকাশ পেল।

এতদূর বাঁধন কেটে গেছে? মনীষ তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য অনায়াসে যেখানে খুশি তাকে চলে যেতে বলছে? মিথ্যা এ স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়? সাতপাকের বাঁধন না কি জীবনেও খোলা যায় না? মাধবীর মনে হল বিয়ের মালার ফুলগুলো কবে ঝরে গেছে, শুধু সুতোটা এখন মোটা কাছি হয়ে তার কণ্ঠনালীর শ্বাসরোধ করে টিপে জড়িয়ে আছে, তার থেকে মুক্তি নেই। কেললে মুক্তি নেই? মনীষ তো সহজেই মুক্তি দিচ্ছে সেও কি মনীষকে দ্বৈতজীবন থেকে মুক্তি দিতে পারে না? সেও আর ঐ কাছির বন্ধন স্বীকার করবে না, বাবলুকে নিয়ে আলাদা চলে যাবে, থাক মনীষ তার এই সংসার নিয়ে। ধর্মের নামে একি অসত্যের প্রতিষ্ঠা জীবনে? সমাজের বিকৃত শবে সত্যের অপলাপ করে, এ কি বীভৎস পচনক্রিয়া চলছে? এর পূতিগন্ধে কি সমস্ত সমাজ-জীবন বিষিয়ে উঠবে না? আর যে কেউ এটা মেনে নিক, মাধবী আর এটা মেনে নিতে পারবে না, সেও

মনীষকে মুক্তি দিয়েই চলে যাবে। তার অভিমানাহত নারীত্ব দ্বিগুণ-বেগে ফুঁসিয়ে উঠল। জীবনের জুয়াখেলায় মাধবীর চরম পরাজয় ঘটলো।

সাতপাকের বাঁধনের মধুরতা যখন বেড়ির কঠোরতার রূপ নেয় সে নিরুপায় দুর্ভোগের দাসত্ব বহু যুগ থেকে এদেশের মেয়েরা নীরবে মেনে নিয়ে এসেছে।

এযুগের মেয়ে হয়ে মাধবী কিছুতেই ঐ অবস্থাকে নীরবে মেনে নেবে না, নিজের বাঁচবার পথ নিজেই খুঁজে নেবে। বিড়ম্বিত জীবন থেকে তাদের দু'জনেরই মুক্তি হোক। সন্ধ্যায় মনীষ বাড়ি ফিরতেই সে তাই বিনা দ্বিধায় তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

তুমি আমার কাছ থেকে মুক্তি চেয়েছিলে না? আমিও তোমার কাছ থেকে মুক্তি চাই। আমাদের এ মিথ্যা অভিনয় শেষ হোক। আমার একটা আমার সংস্থান যোগাড় করে নিতে দাও, তারপর তোমার চিরজীবনের মতই মুক্তি দিয়ে যাব। কোনদিনও মাধবীর অস্তিত্ব তোমার জীবনে খুঁজে পাবে না।

এ সুমতিটা আরও আগে হলে খুশি হতাম মাধবী, শ্রান্তগলায় মনীষ উত্তর দিল, কিন্তু দেখো চলে গিয়ে যেন আইন-আদালত করে আমার জব্দে ফেলবার চেষ্টা কোর না, কারণ তাতে উল্টে তোমারই মুস্কিল বেশি হবে। তুমি নিজে থেকেই সরে যাচ্ছ, এতে আমি তোমার মাসিক আর্থিক সাহায্য দিতে বাধ্য নই। তোমার নিজের ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। তা সত্ত্বেও যদি আমার পেছনে লাগতে আস, আইনের প্যাঁচে ফেলে তোমায় বিপদে ফেলতে আমায় বেশি বেগ পেতে হবে না। যাক—আমি কিছু সময় তোমায় দিলাম, এর মধ্যে তুমি তৈরি হয়ে নাও।

এরপর মাধবীর আর সেখানে দাঁড়াবার প্রবৃত্তি হয় নি, মনীষেরও ক্লাবে যাওয়ার তাড়াটা তখন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে নাটকটার পালা শেষ হয়ে গেল, রাত্রি ২টা পর্যন্ত জেগে মাধবী সেইটারই পর্যালোচনা করছিল। মনীষ তার সঙ্গে দেনা-পাওনা সব চুকিয়ে দিচ্ছে এবার তার তল্পিতল্পা গোটানোর পালা। মনীষ আইন-আদালত করতে সাবধান করছে, অর্থাৎ সে মনীষের অর্থসাহায্যের জন্য আইনের দ্বারস্থ হবে। আইনের শক্তিতে সে জোর করে মনীষের ঘরে বসবাস করতে পারে—মনীষের শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কিন্তু না; মনের বন্ধনই যখন কেটে গিয়েছে তখন বাহ্যিক ও বন্ধনটা বোঝা স্বরূপ সে বহন করতে পারবে না। আইনের শাসন ঘর করার, প্রেমের বাঁধন ঘর ভরার। সে মনীষের কাছ থেকে কোনরকম অনুগ্রহলাভের জন্য আইনের সাহায্যপ্রার্থী হবে না। এইসব ভাবতে ভাবতে যখন তার চোখে ঘুমের প্রলেপ পড়ল তখন পৃথিবীর ঘুম সবে ভাঙছে।

সকালে উঠতে মাধবীর একটু দেরিই হয়েছিল। সে যখন চায়ের টেবলে এসে বসল মনীষের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, সে তখন অফিস প্রস্তুতিপর্ব সাজ করছে। ঘড়িতে নয়টার ঘরে বড় কাঁটাটা গিয়ে যে সমকোণ রচনা করেছে, মাধবীর দৃষ্টি সেইখানে কেন্দ্রীভূত হওয়ার রাজ্যের লজ্জা এসে জড় হল তার সর্বাঙ্গে। গতকালের ঘটনার পর থেকে মনীষ স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যব্যয়ে বড় হিসাবী হয়ে উঠেছে, মাধবীর এই বিলম্বের হেতু জানবার জন্য তার পক্ষে কোন ঔৎসুক্যই দেখা গেল না। সে নিজে তৈরি হল, সেইসঙ্গে খোকার মাকে ডেকে বাবলুকে তৈরি করে দিতে হুকুম দিল। এর একটু পরেই গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে বাবলুকে ভেতরে বসিয়ে নিয়ে মনীষ বেরিয়ে গেল, কোথায় গেল মাধবীকে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করল না। মাধবী পিছু পিছু এসে বাইরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল, কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না, মনীষের ছুঁড়েমারা এই তাচ্ছিল্যটা হজম করতে তার বেশ একটু সময় লাগল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে গেল নিঃসীম একাকিত্বের মাঝে।

এরপরই আগমন ঘটল খোকার মা'র, তার কাছে। খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, বৌদি, আমার কাজ তো শেষ হল, এবার নতুন জায়গায় চাকরীর জন্য চেষ্টা করতে হবে তো?'

একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই মাধবী প্রশ্ন করল, কেন খোকার মা, বাবলুর কাছে তুমি এতদিন কাজ করছ, তাকে এত বড় করে মানুষ করলে, সে তোমায় কত ভালোবাসে, তুমি আজ হঠাৎ কাজ ছেড়ে দেবার কথা বলছ কেন?

ওমা তাও জান না বুঝি বৌদি খোকনবাবুকে যে বাবু বোর্টিং-এ ভর্তি করে দেবার তরে আজ নিয়ে গেছেন, আজ সব দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়ে আসবেক, তারপর তো ও মাসের পয়লা থেকে গিয়ে খোকনবাবু থাকবেক। ওখানে না কি খোকনবাবুর নেকাপড়া ভালো হবেক, বাড়িতে বড় দুষ্টুমী করে তাই বাবু বোর্টিং-এ রাখবেক। এরপর আমার আর এখানে থাকার কি দরকার বৌদি?

তুমি জানলে কি করে খোকার মা এত কথা?

ওমা, আমি যে শুনলুম চা খেতে বসে খোকনবাবুর সঙ্গে বাবু এইসব কথা বলছিলেন। বলছিলেন, বাবলু তোমায় বোর্টিং-এ রেখে আসব, ভালো করে নেকাপড়া করবে, সেখানে তোমার মত কত ছেলে আছে তাদের সঙ্গে খেলা করবে, আনন্দ করবে থাকবে, এখানে একলা থাক সেখানে কত বন্ধু পাবে, কত হৈ হৈ, কত মজা, যাবে সেখানে? আমাদের খোকনবাবু তো বন্ধুর কথা শুনে ভারী খুশি। বলে, বাবা আমাকে এখুনি সেখানে নিয়ে চল আমি খুব খেলা করব নতুন বন্ধুদের সঙ্গে। আমি আড়াল থেকে শুনে ভয়ে মরি।

বৌদি, শুনেছি বোর্টিং-এ না কি ভয়ানক মারধোর করে? এইটুকু বাচ্চা, কোথায় সেখানে একলা গিয়ে থাকবে বল তো? অবিশ্যি নেকাপড়া শিখে বড় হতে গেলে সব কষ্টই গেরাহ্য করতে হবে।

চকিতে সমস্ত চালটাই মনীষের মাধবী বুঝতে পারল। তার কাছ থেকে বাবলুকে সরিয়ে দিতে চায় মনীষ। তবুও মুখে হাসি টেনে এনে বলল, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন খোকার মা? ছেলেকে ভালো করে লেখাপড়া শেখাতে গেলে বোর্ডিং-এ রাখাই ভালো, দেখছ তো বাড়িতে থাকলে কি রকম দুরন্ত হয়ে যায়, সমস্তক্ষণ দেখবার জন্য তো বাড়িতে কেউ থাকে না, কিন্তু বোর্ডিং-এ সমস্তক্ষণ ছেলেদের পেছনে মাস্টারদের ব্যবস্থা আছে। ওখানে ছেলেদের খুব যত্ন করেই রাখা হয়। কত বড় বড় লোকের ছেলেরা ওখানে গিয়ে থাকছে। আর বাবলু তো মাঝে মাঝে আসবে। তারজন্য তোমায় চাকরী ছাড়ার কি প্রয়োজন? যাও যাও এখন নিজের কাজে যাও, কোথায় কি তার ঠিক নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামিও না।

এ কথায় খোকার মা আশ্বস্ত হল কি না বোঝা গেল না, বিড় বিড় করতে করতে সে উঠে গেল।

মাধবীর চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীর রংটা যেন নিমেষে পাল্টে গেল। তাকে জানিতে না দিয়ে মনীষ এইজন্যই বাবলুকে নিয়ে বেরিয়েছে। মনীষকে মাধবী সেদিন বলেছিল মুক্তি দিয়ে যাবে, তাই কি সে নিজে বিদায় নেবার আগেই ছেলেকে তার কাছ থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে? মনীষ নিঃশব্দে তার চলে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। মনীষের নিজের কাছ থেকে সে বহুদিনই সরে গেছে, এবার মনীষের সংসার থেকে তার সরে যাবার পালা, মনীষ তার মাতৃত্ব থেকেও তাকে বঞ্চিত করতে চায়।

না: হিন্দুবিয়ের খোলসটুকু এবার ভেঙে পড়ছে, একে ধরে রাখার চেষ্টা মানে বাতুলতা। স্ত্রীর অস্তিত্ব যেখানে বোঝাস্বরূপ, বিয়ে যেখানে নিরুপায় ঘানিটানার স্বীকৃতি, মাতৃত্বও যেখানে অস্বীকৃত, সেখানে ঐ খোলসের মিথ্যা মর্যাদাটুকু বয়ে বেড়াবার মত মনোবল আর মাধবীর নেই। আপাতত এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে তার দাদার বাসায় গিয়ে উঠতে হয়, তারপর সেখান থেকে একটা চাকরী-বাকরী দেখে সে নিজের ভার নিজেই নেবে। কারুরই গলগ্রহ হয়ে থাকবে না সে। মনের ধিক্কারে লজ্জায় মাধবী আর সেদিন মনীষ ফিরলে পরে তার সামনে বার হল না। বাড়ি ফিরেই বাবলু দুপ্ দাপ্ শব্দ করে মাধবীর অন্ধকার ঘরে এসে দাঁড়াল। মাধবী আলোটা জ্বেলে দিতেই তার শিশুকণ্ঠ কলকলিয়ে উঠল।

মা, জান মা, আজ বাবা আমায় কোথায় নিয়ে গিয়েছিল? একটা বিরাট বাড়ি সেখানে কত ছেলে রয়েছে মা। বাবা বলল, আমি না কি ঐ বাড়িতে থাকব, ঐ সব ছেলেদের সঙ্গে খেলা করব—কত আনন্দ করব, কি মজা হবে না মা? ও-বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করব আর ছুটি হলে তোমার কাছে এ-বাড়িতে আসব। মা তুমি কাঁদবে না তো আমায় ছেড়ে থাকতে?

মাধবী সস্নেহে ওর মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে বলল, বাবলু সোনা তুমি বুঝি নতুন বাড়িতে পড়াশোনা করতে যাচ্ছ? বেশ তো খুব ভালো কথা, লেখাপড়া শিখে জজ হবে, কত বড় হবে। নতুন বাড়িতে কত নতুন বন্ধু পাবে—কত খেলা করবে। আমি তোমার জন্য কাঁদব কেন, আমার তো শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে, ছুটি হলে এ-বাড়িতে আসবে, আমি মাঝে মাঝে তোমার বড় বাড়িতে গিয়ে তোমায় দেখে আসব কেমন? একলা এ-বাড়িতে তুমি থাক তোমার কোন খেলার বন্ধু নেই, ওখানে কত বন্ধু পাবে, কত মজা হবে বল তো?

মাধবীর হাত ধরে টানতে টানতে বাবলু খাটে এনে বসিয়ে দিল, একটুখানি নিস্তেজকণ্ঠে বললে, এ-রকম একখাটে তোমার সঙ্গে শুতে তো পাব না মা, রাত্রে কার কাছে শোব বল তো?

ওমা শোবার লোকের ভাবনা? কত ছেলে একসঙ্গে শুচ্ছে দেখবে, কত গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বে, আমার কথা তখন তোমার মনেই থাকবে না। তখন দেখবে আর আমার কাছে এসে শুতে চাইবে না।

ও-কথা বলো না মা, তোমার কাছে শুতে যে-রকম ভালো লাগে, এ-রকম আর কিছুতেই লাগবে না, সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করতে ভালো লাগবে, রাত্রে কিন্তু তোমায় চাই—মাধবীকে জড়িয়ে ধরে বাবলু খাটে জোর করে শুয়ে পড়ল।

বাবলু ঘুমিয়ে পড়ার অনেকক্ষণ পরে যখন মনীষ রাত্রে শোবার জন্য ঘরে ঢুকল, মাধবী কোনরকম ভণিতা না করেই বলল, বাবলুকে আমার কাছ থেকে এভাবে সরিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি তোমায় সেদিন বলেছিলাম না—তোমায় আমি মুক্তি দিয়ে যাব। সেটা আমি তোমায় মিথ্যা আশ্বাস দিই নি। সত্যিই আমি তোমায় একেবারেই মুক্তি দিয়ে যাব। আগামী রবিবারই আমি দমদমে দাদার বাসায় চলে যাব, তারপর ওখান থেকে যা হয় একটা কাজকর্ম দেখেশুনে নেব, তোমার কাছ থেকে একটা কানাকড়িও নিয়ে যাব না। শুধু বাবলু ছুটি হলে আমার কাছে গিয়ে থাকবে।

মনীষ পরম ঔদাসীন্যভরে শুধু উত্তর দিল, বেশ তো তোমায় পথ তো খোলাই, ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পার, আমি তোমায় একটুও বাধা দেব না। কিন্তু যাবার আগে তোমার কাছ থেকে আমার কিছু বুঝে নেবার আছে, আমার সে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে তবে তোমার সম্পূর্ণ মুক্তি।

মাধবী মনে মনে একটু হাসল, মনীষ বোধ হয় তার সংসারের জিনিসপত্র কিছু বুঝে দেখে নিতে চায়।

দৃপ্তকণ্ঠে সে বলল, নিশ্চয় তোমার সব জিনিস তোমায় বুঝিয়ে তোমার হাতে দিয়ে যাব। তোমার বাড়ি থেকে একটা কোন জিনিসই আমি নিয়ে যাব না। যদি তোমাকেই ছাড়তে পারলাম তোমার সামান্য জিনিস আমি সঙ্গে নিয়ে যাব—ছিঃ। এতটা হীনমনোবৃত্তি আমার নেই।

মাধবী শুনেছিল, বাবলু সোমবার বোর্ডিং-এ চলে যাচ্ছে তাই সে স্থির করেছিল রবিবার দিন সে দমদমে চলে যাবে। তার অনভিপ্রেত সেই রবিবারটা আসতে মোটেই বিলম্ব করে নি। সকালে উঠেই যাবার জন্য মাধবী প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছিল, গুছিয়ে নিয়েছিল তার জৈবিক দাবীপূরণের স্বল্পপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো। তার এতদিনের সাজানো সংসার, তাতে যতই ফাঁক থাকুক না, আজ তা ছেড়ে যেতে মনের কোন অজানা তন্ত্রীতে একটা নিবিড় বেদনার সুর না উঠে পারে নি। সংসারের বন্ধন যতই কঠিন হোক তবুও সেটা বেদনামধুর, তার গণ্ডী কাটাতে গেলে বত্রিশনাড়ির টানে যেন আঘাত লাগে। খোকার মা দমদমে তার দাদার বাসা পর্যন্ত গিয়ে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে, মাধবীর বিসর্জনের উপসংহারটুকু মনীষ এইভাবেই পালন করছে। এর ভেতরেও স্বামিত্বের দয়াটুকু রয়েছে বৈ কি!

মাধবীর স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে খোকার মা নিচে দাঁড়িয়ে আছে, মাধবী নেমে এলে একসঙ্গে গিয়ে গাড়িতে উঠবে। এ সংসারের মায়া মাধবী কাটাতে চায়, চলেই যখন যাচ্ছে—যত শীঘ্র যেতে হয় ততই ভালো। বেলা বাড়ছে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। মনীষ তার কাছ থেকে কি বুঝে নিতে চায় দেখবার জন্য মাধবী যাত্রাপর্বের আয়োজন শেষ করে মনীষের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

গম্ভীরস্বরে বলল, আমার যাবার আগে তুমি আমার কাছে থেকে কি বুঝে নিতে চেয়েছিলে—এখন বুঝে নাও, আমার যাবার সময় হয়ে এল।

আনন্দের
দিনে
উপভোগ্য
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
KOLAY
KOLAY Glucose
KOLAY QUALITY SWEETS LACTO BONBON
KOLAY TOFFEE
Kb
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১০
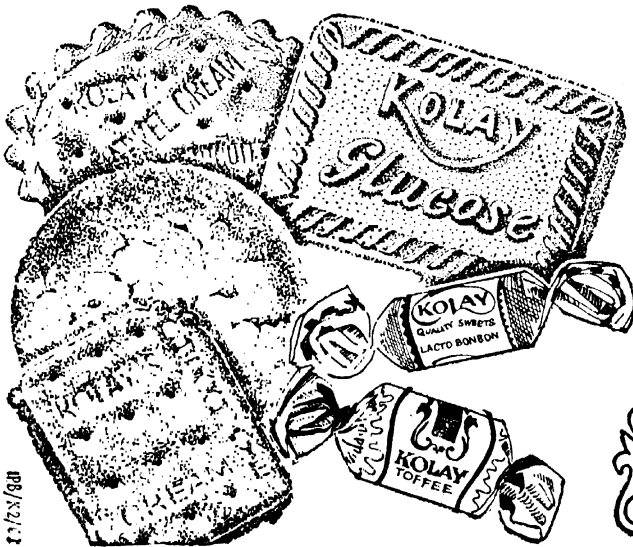
মনীষ বোধ হয় আগে থেকে প্রস্তুত হয়েই ছিল, একখানা কাগজ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, স্বামীর যখন সবই ছেড়ে চলে যাচ্ছ, তখন স্বামীর দেওয়া সবচেয়ে বড় জিনিসটাও তোমার বিনাসর্তে ছেড়ে দিতে হবে। এর ওপর তোমার আর কোনদিন কোন অধিকার থাকবে না, এই নাও এই অঙ্গীকার পত্রে সই কর।

মাধবী দ্রুতহস্তে কাগজটা টেনে নিল, তার বিস্মিতদৃষ্টি লেখাগুলোর ওপর দিয়ে এক মিনিটে ছুটে চলে গেল। কাগজটায় লেখা ছিল,—'আমি আমার স্বামীর অঙ্গস্র সম্পত্তির সহিত তাঁহার ও আমার পুত্র শ্রীমান বাবলুর উপর সব অধিকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিতেছি। ভবিষ্যতে উহার মালিকানা দাবী করিয়া কোনদিন আইনের বা আদালতের সাহায্য লইব না। যেহেতু আমি তাহার উপযুক্ত শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম, সেইহেতু তাহার পিতার তত্ত্বাবধান হইতে তাহাকে কোনদিন সরাইতে চেষ্টা করিব না।' ইতি—এর পর সই-এর স্থানটা শূন্য আছে।

গুরুগম্ভীর স্বরে মনীষ বলল, আমার সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে গেলে আমার ছেলেকেও তোমায় সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে চলে যেতে হবে, কোনদিনও তুমি আর ওকে কাছে পাবে না, বাবলুকে এমনভাবে মানুষ করব—সে জানবে [illegible] না মায়ের স্নেহ। এর জন্য আইন-আদালতের সাহায্য নিলে তোমার [illegible] হবে না। জেনে রেখো, বাবলুকে আমার কাছে রাখবার জন্য আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করব, তুমি কিছুতেই পাবে না তাকে।

মাধবীর কানে মনীষের সব কথাগুলো বোধ হয় ভালো করে ঢুকল না, সমস্ত পৃথিবীটা ওর চোখের সামনে দুলতে লাগল। বাবলুর হাসমাখা মুখখানা স্পষ্ট হয়ে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল, ক্রমে সেটা দূরে, অনেক দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। নিষ্ফল চেষ্টায় মাধবী ওর হাত [illegible] তুলে তাকে যেন ধরতে গেল, পারল না ধপ করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বাবলু এমনি করে হারিয়ে যাবে! চিরদিনের মত ঐ রকম মিলিয়ে যাবে তার জীবন হতে? স্নেহ-মায়া-মমতা সবকিছু উপড়ে ফেলে দিয়ে মনকে পাথর করে তুলতে হবে? জীবনের মরুভূমির মাঝখানে মনীষ তাকে দাঁড় করিয়ে দিতে চায়। কোথাও কোন আশ্রয় নেই, অবলম্বনের কিছু নেই, যেদিকে ফিরে তাকাও নিঃসীম রুক্ষতা, একাকিত্ব, সারাজীবনব্যাপী হতাশার বিরাট শূন্যতা, ভবিষ্যতের যেটুকু স্নেহের নীড় সে আশা করছিল, সেটুকুও সমূলে উৎপাটিত করে চলে যেতে হবে? না, না, না, ওগো আমি পারব না। তুমি আমায় সব শাস্তি দাও, হানো আমার বুকে শক্তিশেল সব সইব, তবু পারব না নিঃসর্তে পুত্রের ওপর সব অধিকার ত্যাগ করতে। আমি যে মা! দুনিয়ার মা'র স্থান যে সকলের ওপরে, সে একাই একক মহিমময়ী। তার উচ্চারণে শুধু এক শব্দ 'মা', তার পাশে দ্বিতীয় শব্দ বসবার পর্যন্ত স্পর্ধা নেই, এ মহিমময়ী পদকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না আমার সমস্ত নারীসত্তা। আমার সব অভিমান পরাজিত হোক এর কাছে, আমি কোথাও যেতে পারব না—বাবলুকে নিঃসর্তে বিলিয়ে দিয়ে, আমার লাঞ্ছিত অপমানিত নারীত্ব মাতৃত্বের শুকতারা হয়ে আমার অনাগত জীবন-প্রভাতে জ্বলজ্বল করুক।

মনীষের এতদিনের বিরাগের হিমতুষার মাধবীর মাতৃত্বের স্নেহের উত্তাপে গলতে সুরু করল? সে তাড়াতাড়ি তার পায়ে লুণ্ঠিত মাধবীর অবশ দেহটাকে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে দিতে গেল, কিন্তু তার সংজ্ঞাহীন দেহটা এতদিন পরে স্থান পেয়েছে মনীষের বুকের ওপর।

ভাবনা থেকে—

কৃষ্ণা ঘোষ

আর কখনো খেলাঘর ধুলোবালি উড়বে না,
ধোঁয়ার গন্ধে সকাল সন্ধ্যে গুমটি ঘরে রাখবে যা
অনিচ্ছাতেই। অনেক কষ্টে পোড়া শরীর পুড়বে না।

বাসি ছাইয়ের হৃদয় থেকে ক্লান্ত ব্যথা স[illegible]নে,
ফুঁ দিয়ে ওই আগুনটাকে জ্বালিয়ে নিয়ে নিভিয়ে দিতে
অনিচ্ছেতেই—অনেক কাজে চোখের জলকে ছিটিয়ে দে।

আমি এখন ধুলো ঝেড়ে
হাত দু'টোকে যত্নে ধরে।
দিনরাত্রির ভাবনা থেকে
চোখ জুড়ালে পড়বো শুয়ে।

যাযাবর

প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়

বন্য অশ্বের পিঠে
সংসার বয়ে নিয়ে চলেছে
কাশ্মীরী যাযাবরের দল।
দুর্নিবার যৌবন আর উদ্দাম রক্ত
তাদের শিরায় শিরায়।
ওরা থাকে পাহাড়ের চূড়ায়
জঙ্গলে জঙ্গলে—
নগরে বাঁধে না কো ঘর
ঘৃণ্য চোখে তাকিয়ে থাকে
সভ্যতার দিকে।

ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্বল ক্ষীণকায় মানুষ
নীড় বাঁধে ইটের দেওয়াল
আর কুটিরের মাঝে।
ভয় পায় আকাশকে, ঝড়কে
আর উন্মুক্ত মুক্তিকে।

ওরা যাযাবর।
ওরা চলেছে এক পাহাড় থেকে
আর এক পাহাড়ের দিকে।
ওই যেথা দুর্গম গিরিশৃঙ্গ
গেছে মিশে পাইন বন আর
নীল আকাশের মাঝে—
সেখানে লক্ষ্য ওদের।
অশ্বের খুরে উড়ছে ধূলি
চলেছে যাযাবরের দল।

মিস শেলী দত্ত

রণজিৎকুমার সেন

সুবীর বোসের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার খুব বেশি হলে বছর দশেকের হবে। প্রথম শ্রেণীর মার্জিত রুচিবোধের মানুষ হলে যে রকম হয়, সুবীর ঠিক তাই। বি-কম পাশ করে চার্টার্ড একাউন্টেন্সির সুবিধে না পেয়ে সুবীর এসে কাজে ঢুকলো ক্রুক এ্যাণ্ড মিলার কমার্শিয়াল ফার্মে। তাতেও স্টার্টিং মোটামুটি মন্দ পেলো না। থাকতো বৌবাজারের একটা বোর্ডিংয়ে। বললো: 'মেস বোর্ডিংয়ের রান্না খেয়ে খেয়ে স্টমাকের বারোটা বেজে গেল। ভালো একটা মেয়ে খুঁজে দে, বিয়ে করে ঘর বাঁধি।'

অত্যন্ত ন্যায্য প্রস্তাব। তাই খানিকটা তৎপর হলাম। ভাগ্য ভালো যে, দু'এক যায়গায় খোঁজখবর নিতেই একটি চাকুরিয়া মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। জিজ্ঞেস করলাম: 'চলবে কি না দেখ।'

সুবীর বললো: 'ভালই তো। যা দিন কাল, তাতে একটু ভালোভাবে থাকতে গেলে একার রোজগারে চালানো মুস্কিল। চাকুরিয়া মেয়ে হলে এদিক থেকে আমার বরং অনেকটা সুবিধেই হবে।'

অতএব সোজা গিয়ে এবারে মেয়ের সঙ্গেই কথা বলতে হলো। কারণ, এখানে তারও নিজের বলতে কেউ নেই। থাকে লেডিস হোস্টেলে। প্রায় সুবীরেরই অবস্থা। কিন্তু আলাপ করে দেখলাম—চলতি বাঙালী ঘরের মেয়েদের মতো নিতান্তই ভাগ্যের পায়ে মাথা খুঁড়ে চলবার মতো মেয়ে নয় শেলী। এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে—যা অনেকের মধ্যেই বিরল। তেমনি স্মার্ট। কেউ চালিয়ে নেবে, তবে সে চলবে এ তার স্বভাবের বাইরে। সংসারে সুস্থভাবে চলতে হলে এমনি মেয়েই তো দরকার!

সুবীরকে এসে বললাম: 'শেলী দত্তকে একদিন চায়ের রেস্তোরাঁয় ডাকি, তুই তার সঙ্গে আলাপ করে দেখ—ভালো লাগে কি না। শেষপর্যন্ত কিছু ঘটলে আমাকে যে দায়ী করবি, তা চলবে না।'

প্রথমটা কি রকম ইতস্তত করলো সুবীর, তারপর রাজি হলো। রেস্তোরাঁর টেবলের দু'পাশের মুখোমুখি দু'টো চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো ওরা; আমি মাঝখানে। কথা সুরু হলো অফিস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে, তারপর সেক্সপীয়র থেকে গ্রেটা গার্বো এবং গ্রেটবৃটেন থেকে রেড চায়না পর্যন্ত এসে যখন আলোচনা কিছু মুখর হলো, আমি ওদের ব্যক্তিগত কথাবার্তার সুযোগ ক'রে দিতে উঠে প'ড়ে ব'ললাম: 'কিছু মনে করবেন না মিস দত্ত, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, ছ'টা পঁয়তাল্লিশে ওয়াটগঞ্জে আমার একটা এনগেজমেণ্ট আছে। এখন না উঠলে গিয়ে অপ্রস্তুত হবো। আপনারা ধীরে সুস্থে চা খান, আমি চলি; পরে আবার কোনোদিন আপনাকে অফিসে বা বোর্ডিং-এ রিং ক'রে যোগাযোগের ব্যবস্থা ক'রবো।'

কোনোরকম বিচলিত না হ'য়ে 'ঠিক আছে' ব'লে আমাকে বিদায় দিল শেলী।

এর ঠিক দু'সপ্তাহ বাদে ওরা কোর্টে গিয়ে রেজিষ্ট্রারের কাগজে সই ক'রে এলো।

ব'ললাম: 'তবে আর কি, এবারে ঘর বাঁধো।'

দু'জনে বোর্ডিং-এর বিল চুকিয়ে এবারে উঠে এলো চারু এভেন্যুর ছোট একটা ফ্ল্যাটে।

গিয়ে এক সময় জিজ্ঞেস ক'রলাম: 'কি, দু'জনে খুশি তো?'

সুবীর ব'ললো: 'তুই যেখানে ঘটক, সেখানে খুশি না হ'য়ে উপায় আছে!'

শেলী ব'ললো: 'বসুন, এ বেলা এখান থেকে খেয়ে তবে যাবেন।'

আপত্তি ক'রলাম না, দেখলাম—রান্নাতেও চমৎকার হাত শেলীর। ব'ললাম: 'ভালো মুখ করিয়ে দিয়ে কিন্তু ভালো ক'রলেন না মিসেস বোস, এরপর যখন-তখন এসে নিজে থেকেই পিঁড়ি পেতে ব'সে প'ড়বো।'

—'সে তো আমার সৌভাগ্য।' ব'লে মুখে হাসি টেনে নিল শেলী।

সুবীর ব'ললো: 'আমার জন্যে তুই তো অনেক করলি, এবারে শেলীর জন্যে একটা ঝি দেখে দে। নইলে ঘরের কাজ সামলে চাকরী করা ওর পোষাবে না।'

তিরস্কারের কণ্ঠে এবারে শেলী ব'ললো: 'নিজে ঠুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে ব'সে থেকে রতন ঠাকুরপোকে আর কত খাটাবে বলো?'

সুবীর ব'ললো: 'তাঁতে রতন কিছু মনে ক'রবে না; কিছু মনে ক'রবার মতো ছেলেই নয় রতন।'

শুনে হাসি পাচ্ছিল, কোনোরকমে নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে সেদিনের মতো উঠে এলাম সুবীরের ঘর থেকে। জানতাম—বৌয়ের মতো ঝি সংগ্রহ করাও তার নিজের দ্বারা সম্ভব হবে না। দেখে শুনে দিন কয়েকের মধ্যে তাই ঝি-ও একটি সংগ্রহ ক'রে দিলাম।

সুবীর ব'ললো: 'তুই না থাকলে আমি যে কি ক'রতাম, তাই ভাবি।'

হেসে ব'ললাম: 'বোর্ডিং-এ জীবন কাটিয়ে দিয়ে শেষ বয়সে কোনো মঠে-আশ্রমে গিয়ে নিতিস। তোকে নিয়ে হ'য়েছে মুস্কিল। এবার থেকে একটু চটপটে না হ'লে গিন্নীর কাছে তুই উঠতে-বসতে বকুনি খেয়ে মরবি।'

হয় তো এবারে শেলীর চিরকালের গেঁতো-স্বভাবটাকে পরিবর্তন ক'রে নেবার জন্যে কিছুটা তৎপর হ'য়ে উঠতে চেষ্টা ক'রলো সুবীর।

এমনি ক'রেই কিছুকাল কেটে গেল।···

একদিন সন্তান এলো শেলীর কোলে। সুবীরের বিবাহিত জীবনের প্রথম ফল। ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। ছেলেই চেয়েছিল সুবীর।

ব'ললাম: 'এবারে ঘর তোর পূর্ণ হ'লো।'

—'হয় তো হ'লো। কিন্তু—'

—'আবার কিন্তু কি রে?'

সুবীর ব'ললো: 'শেলীর ইচ্ছে ছিল না, একেবারেই ইচ্ছে ছিল না যে আমাদের সন্তান হয়।'

—'তবু হ'লো।' ব'ললাম: 'তা—ছেলেকে কোলে পেয়ে এবারে তো খুশি তোর স্ত্রী?'

সুবীর ব'ললো: খুশি হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হতাম, কিন্তু কেমন যেন সবসময় ছেলেকে ও এড়িয়ে চ'লতে চায়। আগে যদি এতটা বুঝতাম—'

—'তবে বাপ হতিস না, এই তো?'

—'কিন্তু সন্তান পেয়ে কোনো মেয়ে খুশি হয় না, এটা আমার ধারণা ছিল না।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম: 'বিয়ের পর এ ব্যাপারে তোরা কোনো আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংয়ে এসেছিলি?'

—'মনে পড়ে না।' সুবীর ব'ললো: 'তবে এটা বুঝেছিলাম—শেলী সবসময় ফ্রি থাকতে চায়। পারিবারিক মেয়েদের মতো এক জায়গায় স্থাণু হ'য়ে থেমে থাকতে চায় না সে।'

ব'ললাম: 'কিন্তু আমি যখন তাকে কন্‌ট্যাক্ট ক'রেছিলাম, তখন তো এ রকম কোনো মনোভাব তার মধ্যে লক্ষ্য করি নি। সে-ও তো সংসারই চেয়েছিল!'

ভারীকণ্ঠে সুবীর ব'ললো: 'হয় তো কোনো পুরুষের সাহচর্যে গৃহজীবন চেয়েছিল, কিন্তু সন্তান চায় নি।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম: 'ছেলে কি তা' হলে ঝিয়ের কাছে থাকে, মায়ের বুকের দুধটুকু অবধি পায় না ছেলে?'

এবারে আমার মুখের উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মাথা নিচু ক'রে নিল সুবীর।

বুঝলাম—ব্যাপারটা কিছু জটিল। কিন্তু আমার নিজের উপরেও লজ্জা এলো বড় কম নয়। বিয়েটা আমিই ঠিক ক'রে দিয়েছিলাম; শেষ পর্যন্ত সুবীর যদি সুখী না হয়, তবে—

ব'ললাম: 'ও-সব কিছু না, দু'দিনেই ঠিক হ'য়ে যাবে। আমি বরং সামনের র'ববার তোর স্ত্রীর সঙ্গে মিট্ ক'রবো।'

কিন্তু র'ববার অবধি কাটলো না। বুধবারের পর শুক্রবার সন্ধ্যায় ছুটতে ছুটতে আমার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে প'ড়লো সুবীর।

জিজ্ঞেস করলাম: 'কি ব্যাপার? ঘামে যে একেবারে নেয়ে উঠেছিস!'

রুদ্ধকণ্ঠে সুবীর বললো: 'শেলী চলে গেছে।'

—'চলে গেছে মানে?'

সুবীর বললো: 'শেলীর তো ছুটিই চলছিল, আমি অফিস থেকে এসে ওর আর খোঁজ পেলাম না। ঝি বললো—মা সেই যে কখন বেরিয়েছেন, আর ফেরেন নি।—ব'লে একটা মুখবন্ধ-করা খাম আমার হাতের সামনে এগিয়ে ধরলো ঝি। খুলে পড়েই মাথাটা ঘুরে গেল। শেলী লিখে রেখে গেছে: আমি তোমার এখান থেকে চলে যাচ্ছি। চাকরীতেও রেজিগ্‌নেশন দিলাম। মিছেমিছি আমার কোনো খোঁজ করতে চেষ্টা কোরো না। খোকন রইল, ও একান্তই তোমার, আমার নয়। পারো তো আমাকে তুমি ডাইভোর্স কোরো। তোমার উপর আমার কোনো দাবী থাকলো না।'

আকাশ থেকে পড়ে বললাম: 'বলিস কি? কখনও ঝগড়া করিস নি তো?'

সুবীর বললো: 'ঝগড়া ক'রতে চেয়েও আজঅবধি তার অবকাশ পেলাম কোথায়? আজঅবধি শেলীকে তো শুধু ভালই বাসলাম রে!'

—'সো আনফরচুনেট ইউ আর।' বললাম: 'কিন্তু তোর পক্ষে চুপ করে থাকা উচিত হবে না। অন্তত থানায় এভাবে একটা ডায়রী ক'রে রাখা উচিত হবে যে, ছেলে হবার পর থেকে শেলীর মাথায় কি রকম গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল, হঠাৎ সে এই চিঠি রেখে নিরুদ্দেশ হয়েছে।'

তাই করলো সুবীর। আমাকে ওর ছায়াসঙ্গী হ'য়ে ঘুরতে হ'লো। রেডিও-এ্যানাউন্সমেণ্ট আর মিসিং স্কোয়াডে খবর দেওয়া থেকে সুরু করে থানায় ডায়রী করা অবধি কোনো চেষ্টারই ত্রুটি রাখা হলো না।

কিন্তু দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও কোথাও খোঁজ পাওয়া গেল না শেলীর। সুবীরের ছেলের দায়িত্ব এবারে বাধ্য হ'য়ে কিছুটা আমার পরিবারে এসে প'ড়লো। এ ছাড়া সুবীরের ও দ্বিতীয় পথ ছিল না।

কিন্তু ডাইভোর্স'ই কি করতে পারলো সে শেলীকে? তার জন্যে শেলীর উপস্থিতি চাই, বোঝাপড়া চাই; কিন্তু কোথায় শেলী?

নেই। যে এন্‌ফোর্সমেণ্টের ভয়ে সারা দেশ কাঁপে, তারাও কোনো হদিস এনে দিতে পারলো না শেলীর।

এমনি ক'রেই অনেককাল কেটে গেল। সেই সঙ্গে হয় তো সুবীরের মন থেকে শেলীর অস্তিত্বও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এলো।...

সেদিন দুপুর না গড়াতেই আমাকে এসে টেনে নিয়ে বেরুলো সুবীর ঘর থেকে।

জিজ্ঞেস করলাম 'কোথায় যাবি?'

সুবীর বললো: 'চুপচাপ ঘরে পড়ে থাকতে ভালো লাগছিল না। ভাবলাম—চৌরঙ্গীপাড়ার কোনো হাউসে কিছু একটা লাইট হিন্দী ছবি দেখে কাটাই। মনটা হাল্কা হবে। দু'টো টিকিট কেটে নিয়ে এলাম তাই 'দুনিয়াকা নাম পান্থশালার'। চল, বেরিয়ে পড়ি।'

সাধারণত হিন্দী ছবি আমি দেখি না। রুচিতে বড় বাধে। তবু সুবীরের জন্যেই বেরোতে হলো।

পর্দার যে দু'টো প্রধান নাম পাওয়া গেল, তাদের একজন নবাগতা ললিতা আনন্দ, আর একজন দেবশ্রী পারেখ।

ছবি সুরু হলো ললিতা আনন্দের ভূমিকা দিয়ে। পর্দায় তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমি আর সুবীর দু'জনেই চম্‌কে উঠলাম। বললাম: 'এ কি, এ যে অবিকল শেলী!'

সুবীর বললো: 'অবিকল নয়, শেলী নিজেই। হয় তো এই ভবে ওর ইচ্ছে ছিল। ছেলেকে ফেলে রেখে নাম ভাঁড়িয়ে তাই ও গিয়ে বোম্বের ফিল্মে নেমেছে।'

জিজ্ঞেস করলাম: 'শেলী সম্পর্কে তুই তবে কোনো সন্দেহই আর রাখিস না?'

—ছবি দেখবার পর আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।' থেমে সুবীর বললো: 'আমি অনায়াসে ওর এগেনস্টে কোর্টে এখন কেস আনতে পারি।'

বললাম: 'তাতে যত না লোক হাসাবি, তার চাইতেও ছোট হবি তুই নিজে।'

শুনে অনেকক্ষণ কথাটা নিয়ে ভাবলো সুবীর তারপর হঠাৎ সিট ছেড়ে উঠে পড়ে বললো: 'ছবি দেখা আমার হয়ে গেছে, চল, বেরিয়ে পড়ি।'
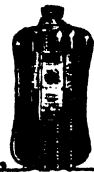
বললাম: 'শেষ পর্যন্ত দেখে গেলে ক্ষতি ছিল কি?'

উত্তরে সুবীর কিছু একটাও আর না বলে বাইরের পথে পা বাড়ালো। বাধ্য হয়ে আমাকেও উঠে পড়তে হলো। সুবীরের কেনা টিকিটে সুবীরের সঙ্গে ছবি দেখতে এসে আমি দেখবো, সুবীর দেখবে না, সে কি হয়!

বাইরে এসে একবার সুবীরের মুখের দিকে তাকালাম।

ওর চোখ-মুখ দিয়ে তখন আগুন ছুটছে, বললো: 'খোকন কি হতভাগ্য ভেবে দেখ, আজ যদি ওকে এনে এ ছবি দেখাই, তবু খোকন ওর মাকে চিনতে পারবে না।'

কৃত্রিম সান্ত্বনার কণ্ঠে বললাম: 'একদিন শেলীকে তোর কাছে আবার ফিরে আসতে হবে, এ তাকে আসতেই হবে। সেদিন তোর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাবার তার সাহস হবে না।'

সুবীর বললো: 'ওকে আমার আর প্রয়োজন নেই, খোকনেরও না।'

—'কিন্তু শেলী এসে যদি খোকনকে কোলে ক'রে দাঁড়ায়, তখন কি তার কোল থেকে খোকনকে তুই ছিনিয়ে নিতে পারবি? পারবি না।'

সুবীর কেমন যেন এবারে বোকার মতো আমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল, কিছু একটা বলতে চেয়েও বলতে পারলো না।

এমনি ক'রে আরও প্রায় ছ'মাস কেটে গেল।

এই ছ'মাসে সুবীরের খোকন আরও অনেকটা বড় হ'য়েছে, পরিচিতমহলে সে এখন আর শুধু খোকন নয়, শিবাজী বোস। তাকে গ'ড়ে তুলতে সুবীরের চেষ্টা, পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ের শেষ নেই। তার পৃথিবীটাকে আজ অনেকখানি ছোট করে নিয়েছে সে; সারাদিন অফিসে অফুরন্ত কাজের মধ্যে ডুবে থাকে, বাড়ি ফিরে সারাক্ষণ কেবল খোকন আর খোকন। ওকে গান শেখাবে, আর্টিস্ট ক'রবে, অনেক বড় ক'রে তুলবে সুবীর?

ইতিমধ্যে একদিন তরুণ-শিল্পী হিমাদ্রি রায়ের আর্ট একজিবিশনের কার্ড পেয়ে সুবীরকে বললাম; খোকনকে নিয়ে চল, একজিবিশনের ছবি দেখে এখন থেকেই ওর চোখ কিছুটা অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে, খুশিও হবে ছবি দেখে।'

কথাটা মনে ধ'রলো সুবীরের এবং সঙ্গে সঙ্গে খোকনকে জামা-জুতো পরিয়ে নিজেও তৈরি হ'য়ে নিল।

আর্টিস্ট্রী হাউসের গেটে এসে পৌঁছতেই হিমাদ্রি আমাদের সমাদর ক'রে ভিতরে নিয়ে গেল। দেখলাম—শুধু ছবি নয়, তাকে কেন্দ্র ক'রে চমৎকার একটি শিল্পী-পরিবেশ তৈরি ক'রে নিয়েছে হিমাদ্রি। কোনো কোনো পত্রিকা থেকে রিপোর্টার এসে তথ্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গেল। সত্যিই বড় চমৎকার হাত হিমাদ্রির: ভ্যানগগ, রোরিক আর পিকাশোর কম্বিনেশনে ওর আর্টে এমন একটা নতুন ঢং এসেছে—যা শুধু চোখকে তৃপ্তই করে না, সেইসঙ্গে ভাবিয়েও তোলে।

একটি নারীর পোর্ট্রেটকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল—কি জীবন্ত! ভেবেছিলাম—খোকনকে নিয়ে সুবীর আমার পাশেই আছে। ছবির দিকে দৃষ্টি রেখেই ব'ললাম: 'দেখ, তাকিয়ে দেখ—হাউ লিভিং এ্যাণ্ড ওয়াণ্ডারফুল!'

পাশ থেকে অকস্মাৎ একটি নারীকণ্ঠ এসে কানে বাজলো: 'হাউ ওয়াণ্ডারফুল দিস ল্যাণ্ডস্কেপ!'

তাকাতে যেতেই হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো: 'মিসেস বোস আপনি!

ততক্ষণে সুবীর এসেও আমার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তার হাতের মুঠোর খোকনের হাত। শেলীকে চিনতে তারও বিন্দুমাত্র দেরি হয় নি। সঙ্গে তার খুব সম্ভব পাঞ্জাবী কি বোম্বেওয়ালা এক ভদ্রলোক।

হঠাৎ এবারে সুর্মাটানা চোখ দু'টোকে আমার মুখের দিকে তুলে ধরলো শেলী। তারপর আধো বাংলা আধো উর্দু মিশিয়ে বললো: 'কাকে বলছেন? বোধ হয় ভুল করছেন আপনি!'

সুবীরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—দু'সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘামে সে স্নান করে উঠেছে। কিছু বলতে চাচ্ছে না, অথবা বিসুভিয়াসের মতো হঠাৎ ফেটে পড়তে চাচ্ছে, কিন্তু পারছে না।

এবারে খোকনের দিকে ইঙ্গিত করে শেলীকে বললাম: 'আমি ভুল ক'রলেও আপনি বোধ করি খোকনকে ভুল করবেন না; ওর মুখে রয়েছে আপনার মুখের আদল, ওর শরীরে রয়েছে আপনার দেহের রক্ত।'

—'আপনার কি মাথা খারাপ? এসব কি বলছেন আপনি?' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তার সঙ্গীটিকে বললো: 'লেট আস গো নাউ আনন্দ, প্লিজ কুইক।' বলেই সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে বাইরের ফাঁকা লনে গিয়ে একটা মোটরে চেপে বসলো।

খোকনকে কোলে তুলে নিয়ে বললাম: 'ঐ যে মা চলে যাচ্ছে, ডাক না?'

খোকন হাত বাড়িয়ে ডাকল: 'মা'।

কিন্তু তবু শেলী ফিরলো না, গাড়ি নিয়ে লন ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণ যে নারী পোর্ট্রেটটার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল—লিভিং এ্যাণ্ড ওয়াণ্ডারফুল, এবারে মনে হলো—সি ইজ নাথিং বাট ডেড এ্যাণ্ড আগলি।

অভিনয়ের নায়ক

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

পর পর তিনটে 'টেক্' নষ্ট হল। 'কাট্' এই শব্দটা শেষের বারে অত্যন্ত বিকৃতভাবে উচ্চারণ করল দিবাকর। ফরেন এক্সচেঞ্জের এই কড়াকড়ির যুগে পাঁচ-শ' ফিটের মত 'র' ফিল্ম নষ্ট হওয়া মানেই গায়ের রক্ত জল হওয়া। প্রডিউসার দীপচাঁদ আগরওয়ালা সামনে দাঁড়িয়ে শুটিং দেখছিলেন। গোমড়া মুখ করে তিনিও দাঁড়িয়ে রইলেন।

পেইণ্ট-বক্স নিয়ে মেক-আপ-ম্যান নিতাই দাস এগিয়ে এল। ঘেমে উঠেছে হিরোইন রত্না রায়। ফর্সা গাল চুঁয়ে চুঁয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁটের লিপস্টিকের লাল রঙ চিবুকে গড়িয়ে একাকার। নিতাই দাস তাড়াতাড়ি পেইণ্ট বক্সে হাত দিল। হিরোইন রত্না রায়ের মুখটাকে আবার মেরামত করে তুলতে হবে।

: হচ্ছে না। একদম হচ্ছে না। প্রদ্যোৎকুমারের দিকে তাকিয়ে বলল দিবাকর। গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী আর ধুতিপরা হিরো প্রদ্যোত-কুমার তখন একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল। একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসল।

: অভিব্যক্তি' শব্দটা কি আপনার অভিধান থেকে উঠে গেল না কি মশায়? ইংরাজীতে যাকে বলে এক্সপ্রেশন। দিবাকর বলতে লাগল। সিচুয়েশানটা কিছুতেই আপনাকে বোঝাতে পারলুম না। পণ্টু, এদিকে এস তো একবার।

ফাইল হাতে প্যাংলুনপর' একটা বছর পঁচিশেক বয়সের ছেলে এল। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর পণ্টু সেন। সিনটা আর একবার পড়তো পণ্টু।

পাঁচ মিনিটের একটা টেক। হিরো তার স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে এসেছে এই সমুদ্র-নিবাসে। অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে এক ভ্রমণকারী ভদ্রলোকের। দিনে দিনে তাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। একদিন সমুদ্রের ধারে অবিশ্বাসিনী স্ত্রী আর আর সেই ভদ্রলোক এসে বসেছে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। এমন সময় সেখানে

আসবে স্বামী। স্ত্রীকে সেই অবস্থায় দেখে ওর চোখ দু'টো নেকড়ের মত জ্বলে উঠবে। আর তখনই সে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে লোকটির ওপর।

ফাইলটা বন্ধ করল পণ্টু সেন। দিবাকর বলল: এবার বুঝতে পারলেন, আপনার সমস্ত এক্সপ্রেশন ফুটিয়ে তুলতে হবে চোখে। ত্রিশ সেকেণ্ড আপনার চোখের ক্লোজ-আপ নেওয়া হবে। দরকার হলে আরও বেশি সময় আমি দিতে রাজি। কিন্তু মাইণ্ড ছাট আপনার চোখ। বুঝতে পারলেন না, যাকে সবচেয়ে ভালবাসতেন, সে অবিশ্বাসিনী, পরপুরুষের কোলে মাথা রেখে বসে আছে। সে অবস্থায় একজন পুরুষের এক্সপ্রেশন যা হওয়া উচিত।

রুমাল বার করে মুখ মুছল দিবাকর। কথা বলতে বলতে হাঁফিয়ে উঠেছে।

: এককাপ চা খেয়ে নেই দিবাকরবাবু। একটু সবুর করুন।

নিখিল সান্যাল। এ ছবির ভিলেন। হিরোইন রত্না ভিলেন নিখিলের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকবে।

চট্‌পট্ করে নিন নিখিলবাবু। রোদ্দুরটুকু চলে গেলে আবার হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে।

হিরোইন রত্না রায়ের সঙ্গে চাকর আছে। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে চাকর এগিয়ে দিল চায়ের কাপ। রত্না রায় বলল: আরও দুটো প্রদ্যোত খাবে, নিখিলবাবু খাবে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রদ্যোতকে বলল রত্না।

: আজ দেখছি কাজে তোমার মন নেই।

: কি করে বুঝলে? একটা সীন তিনবার টেক করতে হলে কার মেজাজ ঠিক থাকে। ডিরেক্টর যেন আমরা আর কোনদিন দেখি নি। ও নিজেকে মনে করে ফেলিনি বা আইজেনস্টাইন। এমন জানলে এ ছবির কাজ নিতুম না আমি।

: ও কথা বোল না প্রদ্যোত। এক বছর তুমি কাজ পাচ্ছিলে না। তুমি বলেছিলে বলেই না আমি দিবাকরবাবুকে ধরে ব্যবস্থা করিয়ে দিলাম। দিবাকরের ছবিতে হিরোর চান্স পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

আবার মুখটাকে বিকৃত করল প্রদ্যোত। যত সব!

সমুদ্র এখন শান্ত। হাওয়া নেই। তাই শুটিং হতে পারছে। আকাশের ভাবগতিক ভাল নয়। মেঘ করতে পারে। দিবাকর তাড়া লাগান: বি-রেডি, বি-রেডি।

প্রডিউসার দীপচাঁদ বলল: দেখবেন দিবাকরবাবু। এবার যেন আর 'র' ফিল্ম নষ্ট না হয়।

দীপচাঁদের কথার উত্তর দিল না দিবাকর। এ কথার উত্তর হয় না। ওরা ওরকম বলে। শিল্পের ধার ধারে না। পুরোপুরি ব্যবসাদার।

রেডি রেডি।

তাড়া লাগায় দিবাকর। আবার সিচুয়েশন আর সিকোয়েন্স বোঝাবার জন্যে খাতা নিয়ে আসে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর পণ্টু সেন।

আগে রিহার্স্যালটা হয়ে যাক। সমুদ্র-সৈকত। সামনে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। সৈকতে বসে আছে নিখিল। পরনে পাজামা, পাঞ্জাবী, চটি। তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে রত্না।

নিখিল বলবে: তোমার চুলে আজ কি তেল মেখেছ সন্ধ্যা?

রত্না বলবে: রোজ যে তেল মাখি।

ফিলিপ্স

নিখিল : কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তোমার চুলের বনে গন্ধরাজেরা মেলা বসিয়েছে।

রত্না : আচ্ছা কেন এমন হয় বলতে পার?

নিখিল : কিসের কথা বলছ কি করে জানব?

রত্না : এতদিনের তৈরি হিসেব সব কেন এমনি করে ভুল হয়ে যায়।

ঠিক এই সময় ঢুকবে প্রদ্যোত।

: ব্যস, ব্যস। ঠিক হয়েছে প্রদ্যোতবাবু। এতেই চলবে। নিন এইবার শুরু করা যাক।

: সাউণ্ড?

: রেডি।

: ক্যামেরা?

: রেডি।

: স্টার্ট।

ক্ল্যাপস্টিকটা বাড়িয়ে ধরল পল্টু সেন। মাইক এগিয়ে গেল ওদের মুখের কাছে। ক্যামেরার ঘর ঘর আওয়াজ উঠল।

: কাট।

আর্তনাদ করে উঠল দিবাকর। ক্যামেরা থেমে গেল। সাউণ্ডভ্যান নিথর, নিস্তব্ধ। নিখিলের কোল থেকে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল রত্না রায়।

আর সেই মুহূর্তে দীপচাঁদ আগরওয়ালার মুখ দেখলে মনে হত তিনি বুঝি এখনই কেঁদে ফেলবেন। কি ডিরেক্টরের পাল্লায়ই যে পড়েছেন দীপচাঁদ। 'বেলাভূমির গান' ছবির পাঁচ হাজার ফিট তোলা হয়েছে, তার মধ্যে দু'হাজার ফিট বরবাদ। কিছুতেই আর পছন্দ হয় না দিবাকরের।

: আজ থাক। আজ আর হবে না আপনার।

বিব্রত প্রদ্যোত সসঙ্কোচে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার বিরক্তি তার চোখে।

: আজ আর নয়। আজকের মত শুটিং শেষ। দিবাকর চেঁচিয়ে বলল।

ক্যামেরাম্যান তার ইউনিট নিয়ে প্যাকিং করছে। সাউণ্ডভ্যান স্টার্ট নিল।

শুধু পল্টু সেন কাছে এসে বলল : আর কিছু দরকার আছে দিবাকরদা'।

: না। চারজন এক্সট্রা জোগাড় করতে হবে কাল। চারজন জেলে। সমুদ্রে মাছ ধরার এক সীন আছে। কাল সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ।

: কাল রাতের ট্রেনে হামি চলিয়ে যাবে।

ফিরে তাকাল দিবাকর—দীপচাঁদ।

: ফিলিম একটু কম খরচ করুন দিবাকরবাবু। গভর্নমেন্ট তো কোটা করে দিয়েছে। এদিকে আমার আর চারখানা ছবি পড়ে আছে। পরশু দিল্লি যাচ্ছি। রেড্ডী সাহেবের সঙ্গে বাতচিত হবে।

দিবাকর উত্তর দিল না। শুধু সিগারেটের টিনটা এগিয়ে ধরল দীপচাঁদের সামনে।

: লেকিন রত্না দেবী, কুছ মনে করছেন না তো? এই যে পাঁচটো টেক বরবাদ গেল। অবশ্য উনি খুব ভাল আদমি আছেন। বোম্বের শ্যামলীর মত না। শ্যামলীর যা মেজাজ মশায়! বললে বিশওয়াস করবেন না। একদিন হল কি—

বক বক করছে দীপচাঁদ। দিবাকর এসব কথার পাত্তা দেয় না। প্রডিউসারদের খুব পাত্তা দিতে নেই। তা হলে ডিরেক্টরদের তারা চাকর মনে ভাবে। দিবাকর চাকর নয়—সে শিল্পী। ক্যান ফেস্টিভ্যালে তার তোলা ছবি তিনবার প্রথম হয়েছে। একবার বেস্ট অ্যাক্টিং, দু'বার বেস্ট ডাইরেকশন। চারবার তার ছবি অ্যাকাদামি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

প্রদ্যোতকুমারকে চান্সটা দেওয়াই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু রত্না রায়ের জন্যে। প্রদ্যোত ওরই সাজেসান। নয়ত প্রদ্যোত যে ছবিটাকে ডোবাবে তা জানত দিবাকর।

এককালে ক'খানা ছবিতে ভালই নাম করেছিল প্রদ্যোতকুমার। শেষের ক'টা ছবি ফ্লপ করল।...প্রদ্যোতকুমারকে এখন আর কেউ ডাকে না।

প্রদ্যোত এখন রত্নার অনুগৃহীত। এককালে ওরা দু'জনে পর পর ক'খানা ছবিতে অভিনয় করেছিল। সেই থেকে প্রদ্যোতের ওপর রত্নার দুর্বলতা। কেউ কেউ রটিয়েছিল, রত্না আর প্রদ্যোতের বিয়ে হয়েছে গোপনে। কিন্তু না সে সব মিথ্যা কথা। তবে প্রদ্যোত এখন রত্নার কাছেই থাকে। রত্নার আশ্রিতের মত।

মধ্যে পড়ে নিখিলের অভিনয়টা হয়ত ফুটবে না। ষাট হাজার টাকার হিরোইন রত্নারও নয়। নিখিলেরও নাম আছে বাজারে। তার রেট পঁচিশ হাজার। নেহাৎ বয়সটা বেশি বলে নায়ক সাজতে পারে না—কিন্তু উপনায়ক হিসেবে তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি।

টি-পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে হিরোইন রত্না জিজ্ঞাসা করল : আপনার ক'চামচ?

দীপচাঁদ বলল : হামি তো সুগার খাই না।

দিবাকর বলল : দুই।

নিখিল বলল : তিন।

: আপনি তো বড় বেশি মিষ্টি খান। হিরোইন রত্না বলল।

: তুমি হাতে করে দিলে অবশ্য মিষ্টি না দিলেও চলে। একটু হেসে বলল নিখিল।

দিবাকর লক্ষ্য করল হাসলে ভাল দেখায় নিখিলকে। বেশ সুন্দর অ্যাঙ্গেল আসে। এই অবস্থায় যদি একটা মিড শট নেওয়া যায়।

বেলাভূমির গানে একমাত্র রত্না রায় ছাড়া আর কাউকে নিয়েই আগে কোন ছবি করার নি দিবাকর। প্রদ্যোত নতুন, নিখিলও নতুন তার ছবিতে।

নিখিলের সঙ্গে রত্নার যে এত ঘনিষ্ঠতা আছে তা জানত না দিবাকর। ফিল্মের দুনিয়ায় অনেক কিছুই জানা যায় না। কাছে থেকেও অনেক কিছু বোঝা যায় না।

হোটেলের এই চা-চক্রে প্রদ্যোত নেই। দিবাকরের রাগ এখন একটু পড়েছে। ভাবল : বেচারা—এককালের ডাকসাইটে হিরো আজ কি অবস্থা! একদিন বোম্বাই থেকেও ডাক এসেছিল প্রদ্যোতকুমারের। প্রদ্যোত যায় নি।

লোকে বলত : রম্ভাই যেতে দেয় নি।

সমস্ত দিনটা কোথা থেকে কেটে গেল দিবাকরের। এখনও চারদিন ইউনিট এখানে থাকবে। আর একসেট অভিনেতা-অভিনেত্রী এসে পৌঁছবে কালকের ট্রেনে। কয়েকটা লোকেশান ঠিক করতে হবে। ক্যামেরা, সাউণ্ডযন্ত্র, রিফ্লেক্টার, কুলিদের মজুরি। হিরোইন রম্ভা রায় রাতে গাওয়া ঘি-এর লুচি আর কচি পাঁঠার মাংস খান—তার বন্দোবস্ত।

মাঝে মাঝে সিনেমাকে আর্ট বলে মনে হয় না। ইণ্ডাস্ট্রি বলে মনে হয়। আর সে যেন সেই ইণ্ডাস্ট্রির ম্যানেজার। ঠক্ ঠক্ করে দরজায় শব্দ হয়। কে নক করছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। টাকার হিসেব করছিল ঘরে বসে। দিবাকর বিরক্ত হয়ে দরজা খুলল—প্রত্যোতকুমার।

: কি ব্যাপার? সারাদিন কোথায় ছিলেন?

: শুয়েছিলাম ঘরে। মাথা ধরেছিল খুব।

: এখন কেমন আছেন? কাল সুটিং করতে পারবেন তো?

: করতেই হবে। আমি দুঃখিত দিবাকরবাবু। আপনার ডিরেকশন বুঝতে পারছি না। মানে আমি ঠিক—।

: নিন সিগারেট খান। শুধু সিগারেট কেন? ড্রয়ার থেকে চ্যাপ্টা বোতল বার করল দিবাকর। কাচের গ্লাসে ঢেলে এগিয়ে দিল। ভাল জিনিস মশায়। সেবার ক্যান থেকে এনেছিলুম। এইটুকু বাকি ছিল।

রাতের বয়স বাড়ছে। সাতটা-আটটা।

: চলুন একটু ঘুরে আসি। সমুদ্রের ধারে এই জ্যোৎস্না রাতে—বুঝেছেন না? প্রস্তাবটা করল প্রত্যোত।

সমর্থন করল দিবাকর : মন্দ না। হাতে কাজকর্ম নেই এখন।

: অভিব্যক্তিটা ঠিক আসছে না। বুঝতে পারছি আমি। তবে কি জানেন, কেমন যেন মুড আসছে না। যেতে যেতে বলল প্রত্যোত।

সমুদ্রের এখন উত্তাল। চাঁদের আলো পড়েছে ঢেউয়ের ওপর। রূপোর পাতের মত জ্বল জ্বল করছে। আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছে প্রত্যোত। কিছু হল না বুঝলেন। কত আশা ছিল। এমন করে যে কেন গেঁজে গেলাম। পঞ্চাশ হাজারের কম ছবি করি নি। এখন পাঁচশ' টাকা পেলেও করি।

কারা বসে আছে সমুদ্রের ধারে। দূর থেকে ছায়ার মত দেখায় একজন পুরুষ। তার কোলে মাথা রেখে নারী একজন।

ঠিক সকালে এই দৃশ্যটাই সুটিং-এ ছিল। কাছে এগিয়ে গেল ওরা। মূর্তি দু'টি নিথর নিস্পন্দ। পুরুষের গলাটি দু'টি কোমল বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে নারী।

আরও কাছে এগিয়ে গেল ওরা। আরও কাছে। কি আশ্চর্য। যারা বসে আছে, তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই পিছনে। সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে ওরা।

এবার নিকটতম সান্নিধ্য থেকে ওদের দেখল দিবাকর। ষাট হাজার টাকার হিরোইন রম্ভা রায়। আর নিথর নিস্পন্দ পুরুষ মূর্তিটা নিখিল।

সেই মুহূর্তে প্রত্যোতের মুখের দিকে চাইতে গিয়ে নির্বাক হয়ে গেল দিবাকর। প্রত্যোতের চোখ দু'টো নেকড়ের চোখের মত ধক ধক করে জ্বলছে। আর সেই চোখ থেকে মুঠো মুঠো ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। একটা জানোয়ারের মত মনে হচ্ছে প্রত্যোতকে। এখনই যেন জানোয়ারটা লাফিয়ে পড়বে।

আর সমুদ্রের সেই ক্ষুব্ধ গর্জনের মাঝে চিৎকার করে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা করল দিবাকরের। কি অদ্ভুত সুনিপুণভাবেই না নেকড়ের মত চোখ দু'টো জ্বলে উঠেছে প্রত্যোতের। পর পর চারটে টেক করেও যে অভিব্যক্তিটুকু ওর চোখে-মুখে ফুটে ওঠে নি—সেই অভিব্যক্তিটুকুই অত্যন্ত নিখুঁত হয়ে ওর মুখে এখন ফুটে উঠেছে।

১৩

একটা বছর ঘুরে এল। লেণ্ট ঘুরে এসেছে আবার।

সিস্টারদের আত্মরুচ্ছতার সময় এটা। আর দেশীয়দের মধ্যে ভয় আর চাপা উত্তেজনার। প্রতি মুখে কংগো-গ্রীষ্মের নিদারুণ শ্রান্তির ছাপ পড়েছে। তবু ক'জন নার্সিং সিস্টারের মত আর কারো মুখেই নয়। সংখ্যায় তারা এখনও বড় কম।

সেজন্য মাদার ম্যাথিল্ডার উদ্বেগের সীমা নেই। প্রচণ্ড গরমের এই ক'মাসে নিয়মিত ওদের এক একজনকে সফরের সংগিনী করেছেন, যাতে ওদের মনটা অন্তত কিছুটা বিশ্রাম পেতে পারে। টিচিং নানদের কাছে সব সময় আভাস দিয়ে রাখেন যে একটা ক্লিনিক পরিদর্শনে যেতে হবে, অথবা টিকা দেবার পদ্ধতি শেখাবার ডাক এসেছে একটা স্কুল-মিশন থেকে। স্কুল-মিশনটার ওপর সাধারণ্যে টিকা দেবার ভার পড়েছে।

এই বছরের মধ্যে সিস্টার লুক দু'বার গিয়েছে তাঁর সংগে। গিয়ে দেখতে পেয়েছে তার স্বপ্নে-দেখা আফ্রিকার রূপ। কুয়াশাচ্ছন্ন নদীপথ পেরিয়েছে যখন পিয়াওয়াতে চড়ে, দু'ধারের তীরে দেখেছে নিবিড় অরণ্য। কালো মাঝির দল লগি মেরে নৌকো বেয়ে নিয়ে যেতে যেতে একঘেয়ে সুরে গান গায় একটানা। মাদার ম্যাথিল্ডা অনেক সময়ই সামনেটায় এসে দাঁড়াতেন সমুখপানে মুগ্ধদৃষ্টি মেলে··· যেন সবার আগে উপভোগ করতে চান···নদীর বাঁকে বাঁকে যে রমণীয় স্বর্গশোভা উদ্ঘাটিত হচ্ছে দাঁড়ের আঘাতে তার নিস্তব্ধতা ভংগ হবারও আগে। গন্তব্যস্থানে নৌকো ভিড়লে ছোটছেলের মত ক্ষুণ্ন হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। যাত্রার এই সমাপ্তিটা তিনি সইতে পারেন না কিছুতে—অন্তরঙ্গ সুরে একবার বলেও ফেলেছিলেন কথাটা।

সিস্টার লুকের অন্তরে গোপন আশার ভাঙা-গড়া। ইয়োরোপীয়ানদের এই হাসপাতালে দায়িত্বকাল তার শেষ হয়ে গেলে নিশ্চয়ই শুধু দেশীয়দের সেবা-মিশনে বদলি হবে সে। আর বছর কয়েকের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে আপনা হতেই বদলি পাওনা হবে তার। যে নিয়ম কোন বিশেষ কমিউনিটি, কোন বিশেষ কাজ, কোন বিশেষ জায়গার প্রতি তাদের অতিরিক্ত আসক্তি রদ করে তারই বলে।··· ক্ষতির মধ্যে এক মাদার ম্যাথিল্ডাকে হারাতে হবে। তবে ঐ নিয়মটা সুপিরিয়রদের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য, নির্দিষ্ট সময়ান্তে তাঁদেরও নতুন কমিউনিটির ভার নিতে হয়। কাজেই তাদের এই ক্ষুদ্র জগতে পুনর্মিলনের সম্ভাবনা থাকেই।

এখন সে কয়ারে নান হয়েছে। এখানে আসার পর এই কমিউনিটির ক্যান্টাট্রাইস্ আর স্কুলের গানের টিচার সিস্টার মারভিয়েনস্ তার কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। কিন্তু তার ডবল ডিউটির জন্য মাদার ম্যাথিল্ডা রাজী হন নি তাকে কয়ার দলে যোগ দিতে দিতে। দেশের ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেই গায়িকা নানদের রীতিমত শক্তিক্ষয় হয়।

আর এখন সে প্রায় বছরখানেক ধরে কয়ারে গাইছে। ফাদার ভেরময়লেনের শেষ আগমনের সময় থেকে হিসেব করে তারিখটা সে বলে দিতে পারে।

···সেই শেষবার ফাদার ভেরময়লেনের আসা। টেস্টগুলোর ফলাফল জানানোর দায়িত্বটা সুকঠিন মনে হয়েছিল।

অন্তরটা যখন অসহায়ভাবে সে দায়িত্ব পালনের জন্য শক্তি সংগ্রহে লিপ্ত, তিনি নিজেই প্রসংগ তুলে কথাটা সহজ করে দিলেন।

—কি হ'ল সিস্টার, এখনও নয়? মনে মনে আমি কুষ্ঠরোগী, দেহটাই বা না হবে কেন বল তো?

মাদার ম্যাথিল্ডাকে কথাটা বলতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের এই অবোধ্য প্রকাশে আস্থা করবার মত কিছু খুঁজে পায় নি, ক্ষোভটুকু অপ্রকাশও থাকে নি।···এর অল্পদিন পরে কয়ারে স্থান পেল সে।

উত্তরকালে অনেক সময় নিজেই সবিস্ময়ে ভেবেছে দু'টোর মধ্যে যোগাযোগ কিছু ছিল কি না।

এবার প্রথম ইস্টারের অনুষ্ঠানে সে গাইবে।

···আকাশের রংটা লালচে, যখন-তখন হঠাৎ একপশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয়।···
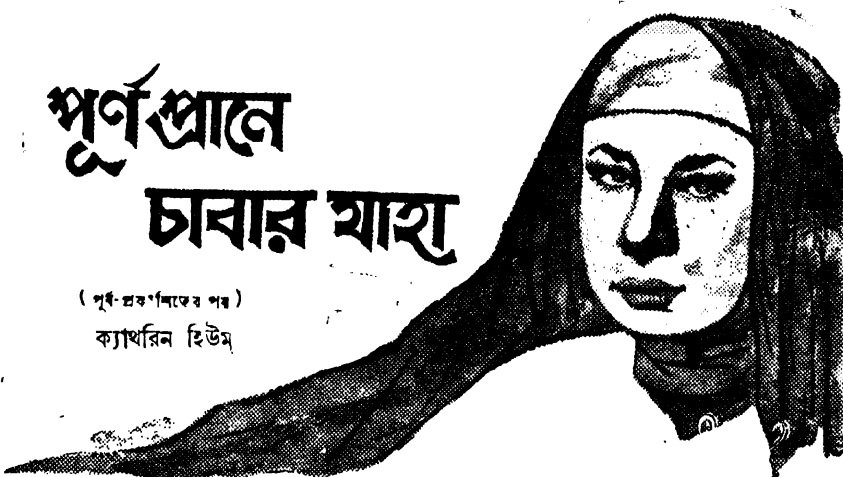
প্রত্যহ সকাল দশটা থেকে এগারোটা একপ্রস্থ আর বিকেলে তিনটে থেকে পাঁচটা একপ্রস্থ ওরা গানের সময় দম রাখা অভ্যাস করে।

করে যখন মাঝে-মাঝেই হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে আসতে চায় কেন যেন :··যেন দেখে দেশীয় ছেলেদের নিয়ে গান গাইছে জংগলের মধ্যে বসে।···গান গাইতে গাইতে কণ্ঠে আরও বেশি আবেগ যোগ করে দেবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে মন, ক্যাণ্ট-ট্রাইসের প্রতি বিরূপ সমালোচনায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে চায়।··· পরক্ষণেই সম্বিৎ ফেরে যখন, আপনার অধিকারের গণ্ডীর ওপর চেতনার আলো এসে পড়ে। এই প্রাচীন সংগীতের কতটুকু জানে ও যে মতামত ব্যক্ত করবে ?

শুধু গান গাইবার সময় বলে নয়, বেশ অনুভব করতে পারে সামগ্রিক একটা পরিবর্তন আসছে তার মধ্যে। ছোটখাট ব্যাপারে অনুভূতিগুলো দপ্ করে জ্বলে উঠতে চায়। কৃপায় যখন কোন সিস্টার অভিযুক্ত করে আজকাল দেখে প্রত্যুত্তরে হাসতে আগের চেয়ে শক্ত লাগে, সে যে তার একটা অপূর্ণতা স্মরণ করিয়ে দিল সেজন্য কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে তাকাতেও '···রাতের স্বপ্নগুলো উদ্দাম, বিক্ষুব্ধকর। নাইট ডিউটির সিস্টারটি রাত্রিশেষে বিছানার চাদরে মৃদু আকর্ষণ করে ডেকে দেয় যখন, 'যীশুখৃষ্টের জয় হোক—চারটে বেজেছে সিস্টার লুক'—প্রায়ই বিছানার ওপর ঝুঁকে-পড়া স্নিগ্ধ মুখখানি চিনতে একটু দেরি হয়ে যায়, স্বপ্নের ঘোরটা কাটাতে সময় লাগে।

একবারও মনে আসত যদি তার লোহায়-গড়া স্বাস্থ্যের কোনখানটা ভেঙে পড়তে পারে ছোট-বড় এইসব মানসিক পরিবর্তনগুলো আর দুর্বোধ্য ঠেকত না চোখে। এরপর এগুলো মনে করে করে অসুস্থতার ক্রমিক বিবরণগুলো নিজের হাতে এত সহজে লিখে ফেলতে পেরেছিল যে নিজেরই অবাক লেগেছিল একের পর এক এই সাবধান সংকেতগুলো কি করে নজর এড়িয়ে গেল তার। একটি ড্রেসিং-বয়ের আকস্মিক বীভৎস মৃত্যু পর্যন্ত সব সংকেত।

দুর্ঘটনাটা যেদিন ঘটে ভোর থেকেই হাসপাতালে সবকিছুই বেসুরো চলছিল যেন। পাঁচটায় অপরেশন টেবিলে ডাক্তারের হাতে প্রাণ গেল একটি। প্রথম থেকে সব লক্ষণগুলো প্রতিকূলই ছিল। তবুও এটা পরাজয়ই—তার এবং ডাক্তার—উভয়েরই।

তারপরই এমিল খবর দিল, একজন বয় বেহেড মাতাল হয়ে এসেছে। কাজ করবে কি, দাঁড়াতে পারছে না।

তখনই মঁসিয়ে মারসেলকে ফোন করল, বয়দের নিয়ে তার সব সমস্যা থেকে তিনিই উদ্ধার করেন।

কিন্তু তিনি জানালেন, শহরের জেলখানার সব সেল ভর্তি।

—কোথাও একটা রেখে দিন না, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কোথাও না জায়গা পান, এমিলকে বলুন বাগানে কোথাও একটা আনাড় জায়গা খুঁজে বার করতে। একটা দিন ঘুমুলেই ওর নেশা ছুটে যাবে সিস্টার।

এমিলকে সেই আদেশই দিল।—এবার কে, এমিল।

—বানজা। নেশা কাটুক ওর, বেত মারবার হুকুম দেব আমি।

—কিন্তু শাস্তি ঠিক করার আগে কারণগুলো খোঁজ করতে হবে তোমায়।

—ভদ্র কারণ কিছু নেই মামা লুক—ঐ সব মেয়েমানুষের ব্যাপার কেবল। গাঁয়ের কার কাছে খবর পেয়েছে ওর বৌ একটা শিকারীর সংগে পালিয়ে গেছে। কিন্তু বানজার আর একটা বৌ আছে—আরও কাঁচা বয়েস, একঘর ছেলেপিলে তার। তবু—

এমিলও পিছন ফিরল আর সেও বানজার কথা ভুলল, কাজের এত চাপ। মেটার্নিটিতে নতুন তিনটে কেস এসেছে আজ, ব্যথা উঠেছে। সে দায়িত্ব শুধু নয়, তাদের উদ্বেগাকুল স্বামীদের সান্ত্বনা দেবার দায়িত্বও আছে। কনটেজিয়াসে দু'টো টাইফয়েড কেস। আর জেনারেল ওয়ার্ডে তো তিলধারণের স্থান নেই—স্কিন গ্রাফ্‌ট্‌ ও সাপে কামড়ানো কেস। আর ম্যালেরিয়া কেস এত যে কাঁপুনি সুরু হলে বোধ হয় দেওয়ালগুলোকে অবধি কাঁপিয়ে দিতে পারে।

আর গরমও তেমনি পড়েছে।···

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সিস্টার অরেলিকে আজকের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হ'ল না। মাদার ম্যাথিল্ডার সংগে কিভুর পার্বত্য অঞ্চলে সফরে গেছে সে। সেখানকার আবহাওয়ায় শীতেরই আমেজ বরং।

বার দু'য়েক এমিল গিয়ে দেখে এসেছে বানজাকে। ফিরে এসে খবর দিয়েছে সে অঘোরে নাক ডাকাচ্ছে জন্তুর মত।

—ও যে মানুষ তা মনে করিয়ে দিতে অন্ততঃ বিশ ঘা চাবুক মারা দরকার।

কালো মুখখানা ঘামে ভিজে চকচক করছে—বানজার এই পদস্খলনে দৃশ্যতই বেদনাহত। বানজা যেন ঘাট, জাতটার প্রতিটি বিশ্বাসভংগ করেছে।

—সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর এমিল।

পরদিন সকালে চ্যাপেল থেকে বেরিয়েই দেখল এমিল অপেক্ষা করছে তার জন্য।···সারারাত বৃষ্টি পড়েছে, আর এখন সাদা কুয়াশায় ঢেকে আছে চারদিক। সেই কুয়াশা ভেদ করে ভোরের প্রথম আলো দেখা দিচ্ছে, হলদেটে আলো ছড়িয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে।

এ যেন সেই প্রথম সৃষ্টির প্রত্যূষ···প্রার্থনা সংগীতের সুরটা এখনও বাজছে কানে···এ যেন তারই বহিঃপ্রকাশ।

—যাও, খুলে আমার কাছে নিয়ে এস তাকে, তোমার সামনে আমি কথা বলব। শাস্তি ঠিক করার আগে ওর কথাগুলো শুনে নেওয়া দরকার।

তার ডেস্কের কাছে এমিল ফিরে এসে দাঁড়াল যখন, তাকে চেনা যাচ্ছে না—ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে মুখ, চোখ দু'টো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হাঁফাচ্ছে ও।

—মামা, দেখবেন আসুন···আর বলতে পারল না, ঢোক গিলে থেমে গেল।

কথা না বাড়িয়ে দ্রুতপায়ে হাসপাতাল-বিল্ডিংয়ের বাইরে এল সে এমিলের সংগে। বাগান পেরিয়ে যেতে যেতে অনুমান করবার চেষ্টা করল কি ঘটে থাকতে পারে।

মামা দেখুন, মামা দেখুন···ভীতি-বিহ্বল সরু গলায় এমিল বলছে।

ফরাসীতে বলেই আবারও কিসওয়াহিলিতে সেই একই কথা বলল, মামা দেখুন···

হাসপাতালের পিছন দিকে একটা করোগেটেড লোহার শেডে বাগানের যন্ত্রপাতি থাকে। এমিল তার দরজাটা দু'ফাঁক করে খুলে ফেলেছে।

নোংরা মেঝের ওপর একটা মনুষ্যাকৃতি হোয়াইট এ্যান্টের স্তূপ, বানজাকে নিঃশেষে খেয়ে ফেলেছে তারা। কংকালটি পড়ে আছে শুধু, খুলিতে একগাছা চুলও অবশিষ্ট নেই!

আতংকে স্তব্ধ সিস্টার লুক। দীর্ঘকায় মাংসাশী পিঁপড়েগুলোর দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু—কংকালটাকে জীবন্ত সাদা চাদরের মত ঢেকে রেখেছে ওরা।

কতটা সময় কেটেছে, কি করে ফিরে এসেছে হাসপাতালে নিজেও জানে না।

টেলিফোনে পুলিশ-চীফের বেশ একটু সময় লাগল বুঝতে কে কথা বলছে। বিপদটার একটু আভাস চাইলেন, সাহায্যের ধরণটা আন্দাজ করে নিতে পারেন যাতে।

সিস্টার লুক আপ্রাণ চেষ্টা করছে স্থির হতে, বিকৃত স্বরটাকে স্বাভাবিক করে নিতে।

কোনক্রমে বলল, ফোনে আপনাকে বলতে পারব না মাঁসেল, একলা একবার আসেন যদি।—সনির্বন্ধ অনুরোধের সুর, তাঁর মনে পড়ে যাতে কলোনার টেলিফোনগুলোর যোগ আছে সংবাদ-ড্রামের সংগে, যে কোন গুরুতর খবর নেটিভ সুইজ-বোর্ড থেকে সোজা জংগলে চলে যায়।

তাতেও ওর মনের অবস্থা ঠিক উপলব্ধি করেন নি পুলিশ-চীফ। মিনিট দশেকের মধ্যে সপ্রতিভ হাসিমুখে ওর ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ঋজু পেশাদারী ভংগী। কিন্তু ওর মুখের চেহারা দেখে থমকে গেলেন।

এমিলকে ও ইসারা করেছে সেই শেডে তাঁকে নিয়ে যেতে। ওকের ইতস্ততঃ করতে দেখে অনুচ্চকণ্ঠে জানিয়েছে সে আর সেখানে ফিরে যেতে পারবে না।

যা করছে যা বলছে সবটাই কেমন যেন ভাবের ঘোরে, মুখের প্রশান্ত ভাবটাও চেষ্টাকৃত।

মারসেলের ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে চার্টগুলো দেখবার চেষ্টা করছে যত, চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই বীভৎস দৃশ্যটা।

···মনুষ্যাকার স্তূপ একটা···বীভৎস একটা সরীসৃপ গতি।···

মিথ্যা স্তোকে নিজেকেই ভোলাতে চাইছে নিজে—অন্তর জুড়ে যে বিক্ষুব্ধ হাহাকার উঠছে, নিজের মনকে বোঝাতে চাইছে বিবেকের কান্না সেটা নয়, বর্ষা-শেষে পোকা-মাকড়গুলো বেরিয়ে এসেছে গর্ত থেকে, তাদেরই একঘেয়ে ডাক কানে বাজছে বুঝি!

মারসেল ফিরলেন যখন, মৃদু একটু কেরোসিনের গন্ধ ভেসে এল। বেশ একটুক্ষণ তিনি কথা বলার পর ওর মগজে ঢুকল, যে ভাষাটা শুনছে সেটা চলিত ফ্রেঞ্চ—সুপরিচিত, ঘরোয়া, আশ্চর্য সান্ত্বনায় সুর জড়ানো।
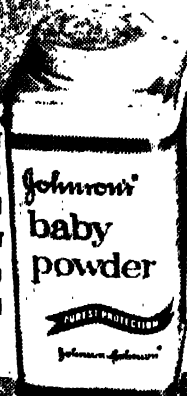
—এমিলকে বলে এলাম মশালের আগুন দিয়ে পিঁপড়েগুলোকে তাড়াতে। আমার ড্রাইভারটাকে ফেরৎ পাঠিয়েছি শহরে একটা কফিন নিয়ে আসতে। শেড থেকে সেটাই সবাই বার করে আনতে দেখবে—খ্রীশ্চান কবরের নিয়মমাফিক কফিন, দেশীয় লোকদের দেখাতে হবে তাই। বানজা তো একজন কনভার্ট ছিল, তাই না?

অস্ফুটে সম্মতি জানাল সিস্টার লুক, হ্যাঁ, আমারই কয়।

—ড্রামের খবরে কি যে রটবে কেউ জানে না, সার্টিফিকেটে কিন্তু লিখতে হবে অজ্ঞাতকারণে মৃত্যু।

থামলেন একটু, ওর নির্বাক মূর্তিটা দেখলেন। যেন সে আপত্তি করেছে এইভাবে যুক্তি দেখাতে লাগলেন তারপর।

—জ্যান্ত ওকে পিঁপড়েতে খেয়ে ফেলেছে কি করে বলা যেতে পারে বলুন? আমরা ভাল করে জানি যখন বন্ধ করে দেওয়া হয় সে যেহেতু মাতাল ছিল। এই তো, গত সপ্তাহে একটা গাঁয়ে যেতে হয়েছিল এক বান্টু পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে—সে লোকটাও এমনি অজানা কারণে মরেছে। অজানা মানে—শুনলুম যখন সারা সন্ধ্যে লোকটা শিখা গিলেছিল, অজানা কারণ আর অজানা রইল না তখন। বোঝাই তো যাচ্ছে সিস্টার, বিষক্রিয়ায় মৃত্যু। মদ ভাল মতন চোলাই না করার দরুণ প্রায়ই এমনিধারা অঘটন ঘটে যায়।

কথা বলার ফাঁকে ওকে নিরীক্ষণ করে দেখছেন মারসেল।—

—ক্যাসাভার শেকড় দু'রকমের হয়—মিঠে আর তেঁতো। তেঁতো যেগুলো সেগুলো খুব চড়া আঁচে ভাল করে জ্বাল না দিলে হাইড্রোসিয়ানিক এ্যাসিড থেকে মৃত্যু ঘটতে পারে অনায়াসে।

মুহূর্ত পরে পেশাদারি ভংগিটা ফিরে এল গলায় আবার, ক্ষণপূর্বের অন্তরংগ স্বরটা যেন আর কারো।—খুব সম্ভবত আপনার ঐ বয়টি বিষেই মারা গেছে সিস্টার, পিঁপড়েগুলো ওর কাছে যাবার আগেই। সেই কথাই এমিলকেও বলছিলাম—সে তো কেবলই বুক চাপড়াচ্ছে আর নিজেকে শাপ-শাপান্ত করছে। কিন্তু আপনার ঐ এমিল সিস্টার ···অনেকদিন জংগল থেকে চলে এসেছে তাই ভুলে গেছে অনেককিছু —না হলে এমন ঘটনা আকছার ঘটছে।

শুনতে শুনতে সমস্ত শক্তি দিয়ে চোখের জল ঠেকিয়ে রেখেছে সিস্টার লুক। এমিলের মত তাকেও কি আত্মগ্লানি মুক্ত করতেই কথাগুলো বলছেন না মারসেল? ঈশ্বর জানেন ঐ রুক্ষ সাধাসিধে মূর্তিটি সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষুব্ধ অন্তরটাকে দেখতে না পাওয়ার ভাণ করছে কি না।

কোনক্রমে ক্ষীণ একটু হেসে ধন্যবাদ জানাতে পারল অনেক চেষ্টায়।

প্রত্যুত্তরে সপ্রতিভ একটা স্যালুট করলেন মারসেল।

মাদার ম্যাথিল্ডা সফর সেরে ফিরতেই সিস্টার লুক দেখা করল তাঁর সংগে। ঘটনাটার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে দোষটা সব নিজের ওপর নিল।

—সময় করে নিয়ে এমিলের সংগে গিয়ে দেখে আসা আমার উচিত ছিল মাই মাদার। বানজাকে মাটিতে ফেলে না রাখার কথা ভাবা উচিত ছিল নিশ্চয়ই···

মাঝপথে থেমে গিয়ে কাশল। রুমাল দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলল তারপর।

মাদার ম্যাথিল্ডা স্থিরচোখে দেখছেন তাকে।

পুলিশ-রিপোর্টটা তুলে নিয়েছেন হাতে, ওকে শোনাবার জন্য জোরেই পড়লেন, 'কারণ অজ্ঞাত'।···আমি এর সংগে একমত। মারসেলের মত আমিও শিখার বিষে মৃত্যু এত দেখেছি যে এ রকম কিছু ঘটলে সব সময় এটাকেই সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ বলে মনে করি আমিও। তোমাকেও তাই মনে করতে হবে সিস্টার। বুঝতে পারছি প্রথমে কতটাই আঘাত পেয়েছিলে তুমি মনে আর কিভাবে নিজেকেই সম্পূর্ণ দায়ী করেছ। শুধু তুমি কেন, আমাদের মধ্যে যে কেউই এই-ই করত।

একটু থেমে আবারও একটু নিরীক্ষণ করে দেখলেন তাকে, মুখে মৃদুহাসির আভাস।

দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, এবার কিন্তু এই আত্মগ্লানি কাটিয়ে উঠতে হবে তোমাকে, নিজেকে দোষী ভাববে না আর। তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, এ ধরণের আত্মকেন্দ্রিকতায় প্রশ্রয় দিও না।

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। সুপিরিয়র বলে দিয়েছেন আত্মকেন্দ্রিকতায় প্রশ্রয় দিও না। সে নিজে কিন্তু কিছুতেই নিজের অপরাধবোধটা ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছে না। পারছে না ব'লে নিজেরই বিস্ময়ের অবধি নেই তার। তার ঐ দুর্বোধ্য মানসিক পরিবর্তনটাই কি দায়ী এর জন্য?

এমন হ'ল অনবরত চোখে জল আসতে চায়। পরের ক'টা সপ্তাহ শুধু প্রাণপণে উদ্গত কান্না রোধ করে করে কাটল। ওর কাজের সুবিধার জন্য ডাক্তার হয় তো নিজের কাজের গণ্ডীর বাইরে কিছু করে দিলেন স্বেচ্ছায়, উত্তরে এমন একটা আবেগপ্রবণ মন সাড়া দিতে চায়, যে তার নিজের কাছেও সম্পূর্ণ অপরিচিত।

এই সময় একদিন ল্যাবোরেটোরিতে শ্লাইড দেখছিল বসে। হঠাৎ কাশি আসতে মাইক্রোস্কোপ থেকে মুখটা সরিয়েই দুর্দমনীয় ইচ্ছে হ'ল নিজের স্পুটামটা একবার টেস্ট করতে।

মন বলছে কিছুদিন থেকেই দেখছি যত অদ্ভুত খেয়াল আমার মাথায় চাপে—এটাও যেমন! বলছে বটে, হাত দু'টো কিন্তু শ্লাইড একটা তৈরি করে ফেলেছে ততক্ষণে। ইচ্ছে করে কেশে কাচের ওপর স্পুটাম স্যাম্পেল তুলে নিয়ে হাই-পাওয়ার লেন্সের নীচে রাখল।

ফিল্ডের ওপর লালচে বেগুনি রঙের নলাকার একটা যক্ষ্মার বীজাণু কাঁপছে।

প্রথম প্রতিক্রিয়ায় ভারি একটা স্বস্তিবোধ করল।···সবকিছুর পিছনে তা হলে এই।

·· তাই সব সময় ক্লান্ত আমি, ক্লান্ত আর ভাবপ্রবণ।

···তাই বানজার মৃত্যুটা কোনমতেই ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছি না।

ক'টি মুহূর্তের আলোড়নে অন্য কথা এসেছে মনে। সাদা চামড়ার কোন মানুষের যক্ষ্মা হলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাকে—প্লেনে হোক, জাহাজে হোক। এখানে এই গ্রীষ্মমণ্ডলীর আবহাওয়া অসুখটার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। ওর জায়গায় যে নান কাজ করতেন এই অসুখ নিয়েই তিনি ফিরেছেন।···জাহাজে সিস্টার অগস্টিন বলেছিলেন যক্ষ্মা হওয়ার অর্থ কংগো-সার্ভিসের সমাপ্তি।

···দেশে ফেরার টিকিট কাটা হ'ল আমার।

দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে···এখনই যেন কনভেণ্টের দেওয়াল-গুলো চেপে আসছে চারদিক থেকে।

ব্লেসেড লর্ড! এমন যেন না ঘটে।

কিন্তু ঘটেছে। ফিল্ডের ওপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙিন নলাকার পদার্থ-গুলো ভাসমান···ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ গুণতে শুরু করল আপনা হতেই। ···মাইক্রোস্কোপের তলা থেকে স্লাইডটা টেনে নিয়ে ওয়েস্ট-বাস্কেটে ফেলে দিল হঠাৎ।

সমস্ত ঘটনাটার ওপরই ছেদ টেনে দিতে চায়।

একঘণ্টা একটানা নিজের কাজ করে গেল। মাইক্রোস্কোপের কাজ শেষ করল, বৈকালিক রাউণ্ডের জন্য ওষুধপত্রের ট্রে তৈরি করে রাখল, মাদার ম্যাথিল্ডাকে ফোন করল দু'বার—ক'জন রোগীর রিপোর্ট জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

চঞ্চলতা কিছু নেই, কিছু ঘটে নি ভাবতে খুব কঠিন লাগছে না।

অন্য একটা মন কাজের ভার নিয়েছে। সে মনটা অপরিচিত।

সেই অপরিচিত মনটা পরামর্শ দিচ্ছে ও ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলে দিতে।—এ রোগের ধরণ-ধারণ সবই তো জান, যা করবার নিজেই কর। কেউ টেরও পাবে না। বিকেলের দিকে রক্তোচ্ছ্বাসে মুখ লাল হয়ে উঠলেও তোমার ঐ রোদে-পোড়া চামড়ায় ধরা পড়বে না তা! রোগীদের তো প্রায়ই বল চেষ্টা করে কাশির বেগ দমন করতে, তুমি নিজেও করতে পার তাই। চেষ্টা করে ক্ষিদেও বাড়াতে পার—অতিরিক্ত ডিম তোমার যতটা খাওয়া প্রয়োজন, এমিল এনে দিতে পারে বাজার থেকে। আর কাজের ফাঁকে অবসরমত বিকেলের দিকে একটু ঘুমিয়ে নেবার অনুমতি তো ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছ।··· ঘুমিয়ে আর খেয়ে তোমার ক্ষয়টুকু পূরণ করে নিতে পার তুমি, সুস্থ হয়ে উঠতে পার।

ঘণ্টাখানেক পরে সিস্টার অরেলি এল একটা চার্ট নিয়ে, আলোচনা করতে চায়।

—তোমার ডায়াগনিসিস করার ক্ষমতাটা অদ্ভুত সিস্টার লুক··· দেখ তো এটা তোমার গ্যাসট্রিক হেমারেজ বলে মনে হয় না?

কালচে বাদামি বমি, আলকাতরার মত কালো পায়খানা।

এণ্ট্রিগুলো পড়ে মাথা নাড়ল সিস্টার লুক। কথা বলতে যাচ্ছিল, সিস্টার অরেলির রোদে-পোড়া বাদামি মুখখানা ঈষৎ ব্যগ্রতায় ঝুঁকে এসেছে কাছে···ঘণ্টাখানেক আগে দেখা স্লাইডের সেই ছবিটাই আবার প্রকট হয়ে উঠল সামনে। কথা বলা হ'ল না, তড়িৎস্পৃষ্টের মত পিছিয়ে সরে গেল।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, বরফের বল কেবল ভাঙা বরফ দিতে। বেশ একটু চেষ্টা করে বলতে পারল, গলাটা যেন কে চেপে ধরেছে।

হাসিমুখে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল সিস্টার অরেলি স্যাবে টোরি ঘরের দরজা খুলে।

সিস্টার লুক নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে—এইমাত্র যেখানটায় সিস্টার অরেলি এসে দাঁড়িয়েছিল ব্যগ্রমুখে।
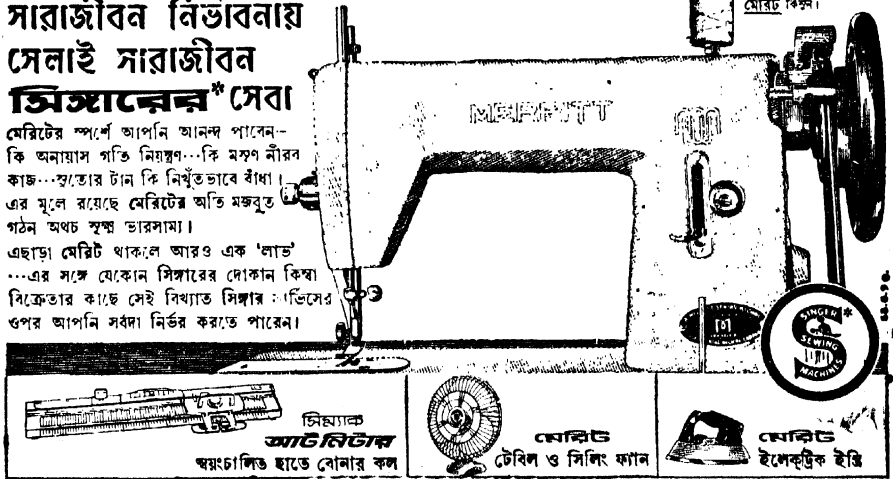
মনে হচ্ছে সেই একই জায়গায় কমিউনিটির সব সিস্টাররা এসে দাঁড়াচ্ছে একে একে—প্রথমে নার্সরা, তারপর বয়স্ক নানরা। ফিস্‌ফিস্ করে ওরা বলছে কি···এত সতর্ক যে কি বলছে শুনতে হ'লে কয়েক কয়েক ঠেকে যাওয়ার মত কাছাকাছি আসতে হবে;···

ল্যাবোরেটোরি থেকে সার্জারিতে প্রায় উড়ে এসে পৌঁছোল। ডাক্তার গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে গাইতে মাইক্রোসকোপের ওপর ঝুঁকে আছেন।

—কি যে করব বুঝতে পারছি না ডক্টর, সব সময় এত ক্লান্ত লাগে। আমার অসুখ করেছে।

পিছনে ওর গলা শুনে ড্রু-টিউব লাইটটা বন্ধ করে ঘুরে চাইলেন ডাক্তার।—ক্লান্ত হলেই লোকে ভাবে অসুখ করেছে। কি হ'ল কি?

—আমার টি-বি হয়েছে।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন ডাক্তার, এটা কি ঠাট্টার জিনিস নাকি?

—ঠাট্টা তো করি নি।

একটুক্ষণ বসে থেকে যেন সেটাই উপলব্ধি করতে চাইলেন।

উঠে এসে দু'কাঁধে হাত রাখলেন তারপর। কি এক অনির্বচনীয় ভাবের প্রকাশে চোখের দৃষ্টিটা ওকে অবশ করে ফেলছে প্রায়।

—কে বললে?

উত্তর না পেয়ে একটা ঝাঁকানি দিয়ে গলা চড়ালেন, বললে কে?

—স্লাইড, মাইক্রোসকোপ—আমার নিজের স্প্যুটাম।

ওর চোখকে অবিশ্বাস করেন না কোনদিন, আজও করলেন না। পরুষ হাতে তেমনিভাবে ধরে রইলেন তাকে পুরো একটা মিনিট, দৃষ্টির ভাবে মনে হবে যেন বিশ্বাসভংগের অপরাধে অভিযুক্ত করতে চান তাকে।

—সারা কংগোয় কেবল আপনার সংগেই কাজ করতে পারি আমি···আপনাকে না হ'লে আমার চলবে বলে তো মনে হয় না!

ডাক্তারের গলার অসহায় সুরটা অস্বস্তিকর। সার্জারির চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন, অনুধাবন করতে চান যেন সে যখন থাকবে না কি রকম হবে ঘরখানা।

কাঁধ ছেড়ে দিয়ে স্টেথস্কোপটার জন্য হাত বাড়ালেন।

—হ্যাবিট খুলুন—খুলে ফেলুন···লাঙ্গস দু'টো দেখতে হবে।

অনেকগুলো জামা বোতাম খুলে আলগা করতে হবে—স্ক্যাপুলার, সুতি সেমিজ, আঁট বডিসটা···আঙুলগুলো কাঁপছে।

···ভুল হয়ে থাকতে পারে তার, ক্লান্ত চোখ দু'টো ভুল দেখেছে হয় তো!

টেবিলের ওপর বসল, খেয়াল নেই ভেলটা সরায় নি।

কাঁধের ওপর দিয়ে ডাক্তার সামনের দিকে সরিয়ে দিলেন।

কর্কশ কণ্ঠের হুকুম আসছে একের পর এক।

—কাশুন। লম্বা নিশ্বাস নিন। বলুন থার্টি থ্রি···

—কিছু একটু আছে সত্যি, মনে হচ্ছে বাঁ দিকের লোবে। সামনের দিক থেকে শুনবেন বলে ঘুরে সামনে এলেন। ঝুঁকে দাঁড়াতে মুখটা পাশের দিকে সরিয়ে নিল সিস্টার লুক। ডাক্তার একাগ্র হয়ে শুনছেন আর ও প্রায় নিশ্বাস রোধ করে বসে আছে।

দেখা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন সোজা হয়ে, উদ্বিগ্ন মুখে হাসি ফুটেছে।—হয়েছে একেবারে ওপরে—সামিট লেপবে···জিনিসটা সামান্যই। এ তো সহজেই সেরে যাবে।

লোবের সামিট বা সর্বোচ্চ অংশ মানে যেখানে অক্সিজেন এসে প্রথম ঢোকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ···ওঃ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

পরক্ষণেই খেয়াল হ'ল অনাবৃত বক্ষে বসে আছে। ওর বিব্রত চোখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার ঘুরে দাঁড়ালেন। দু'জনেই জানেন আর একজন সিস্টারের উপস্থিতি ছাড়া কোন নানকে পরীক্ষা করা নিষিদ্ধ। মুহূর্তের উত্তেজনায় কারোরই সেকথা মনে ছিল না।

একে একে খোলা বোতামগুলো আটকে পোশাকটা ঠিক করে দিচ্ছে। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার কথা বলে চলেছেন।

—গোল্ড ট্রিটমেণ্ট আপনার সহ্য হবে সিস্টার। কিডনির পক্ষে ওটা ক্ষতিকর বটে, কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য খুব ভাল। আমি দায়িত্ব নেব—

কিন্তু ওকে তো মাদার ম্যাথিল্ডাকে বলতে হবে। বলতে হবে তৃতীয় কারো অনুপস্থিতিতে এই পরীক্ষার কথা, বলতে হবে প্রথমেই ও ডাক্তারের কাছে ছুটে এসেছিল।

—মাদার ম্যাথিল্ডাকে বলতে হবে আমায়!

মৃদু মন্তব্যটুকু শুনেই চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তার, কেন?

উত্তরের জন্য অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা একপলক।

পরক্ষণেই রুদ্ধকণ্ঠে সেই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি শোনা গেল, কেন?

—বাধ্যতার নিয়ম। আমাকে বলতেই হবে—

—বললে ওরা দেশে পাঠিয়ে দেবে।

—জানি—দু'ফোঁটা অশ্রু কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

ডাক্তার মেকে উঠলেন। রোগের কোন নতুন উপসর্গ দেখতে পেয়েছেন যেন হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত কোন উপসর্গ। মনস্তাত্ত্বিকের মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন ওকে কিছুক্ষণ, কুঞ্চিত চোখ দু'টো বিশ্লেষণরত। সিস্টার লুক অনুভব করছে ওর চিন্তান্তরের নীচে নীচে যে লেখা লুকোনো ঐ গভীর দৃষ্টি সেইখানে গিয়ে পৌঁছেচে।

কিছুক্ষণ পরে বেশ শান্তভাবে বললেন, আপনি ভয় পেয়েছেন সিস্টার। কিন্তু দেশে যদি পাঠিয়ে দেয় ওরা, কনভেণ্ট আপনার সইবে না।

সিস্টার লুক নীরবে চলতে শুরু করল এবার।

ডাক্তারও আসছেন পিছন পিছন কথা বলতে বলতে। ধীর, সংযত, বৈজ্ঞানিকসুলভ।

—আপনার সম্বন্ধে এমন কিছু বলতে যাচ্ছি যা সম্ভবত নিজেও আপনি জানেন না। তবে নানদের আমি ভালমত চিনি তা জানেন তো? ছুরি হাতে নেওয়ার দিন থেকে কোনদিন সাধারণ নার্স নিয়ে কাজ করি নি;···কনভেণ্টের ছাঁচে-ঢালা আপনি নন সিস্টার, হতেও পারবেন না কোনদিন। যাকে জাগতিক নান বলে আপনি তাই—সাধারণ মানুষের পক্ষে আদর্শ, রোগীদের পক্ষে তো বটেই, কিন্তু কনভেণ্ট যা চায় তা নন।···একদিকে আপনার মানসিক গঠন, আর একদিকে আপনার কনভেণ্ট আদর্শ—দু'টোকে এক করবার জন্যে দিন-রাত লড়াই চলেছে আপনার মনে। আপনার অসুস্থতা সেটাই সিস্টার—টি-বিটা, তার নেহাৎ গৌণফল!

কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া বড় সামান্য নয়। ডাক্তারের লক্ষ্য এড়ায় নি যে প্রতিক্রিয়া ও ঢাকতে চেষ্টা করছে। অনুত্তেজিত নীরবতায় নিজেকে গোপন করে রাখার আপ্রাণ প্রয়াসের পরিশ্রমে হঠাৎ কাশতে শুরু করল।

ডাক্তার দেখছেন শুধু। অপেক্ষা করে আছেন।

হঠাৎ সপ্রতিভভাবে বললেন, যাই হোক, চান যদি তো ঐ গৌণ ব্যাপারটা আমি সারিয়ে দিতে পারি।

অজান্তেই বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে, আমি থাকতে চাই। এতক্ষণের সংযম নিঃশেষে ভেসে গেছে কোথায়, তবু তারই শেষ রেশটুকুর প্রভাবে কণ্ঠস্বর অকারণ রুক্ষতায় রূঢ় শোনাল।

ডাক্তারের চোখ দু'টো জ্বলে উঠেছে তবু, কণ্ঠস্বরে ব্যগ্রতা মিশেছে।

আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দিন তা হলে। আমি প্রথম মাদার ম্যাথিল্ডাকে বলব—দেখবেন আমি বলার পর তিনি আর আপনায় পাঠিয়ে দিতে পারবেন না। মাসের পর মাস আপনাকে এইভাবে কাজ করানোর জন্যে তিনি আর আমি দু'জনেই দায়ী—দিব্যি শুকনো আদর্শের বুলি আওড়ে কাজ হাসিল করা হয়েছে, আপনার স্বাস্থ্যের দিকটায় কেউ ফিরেও চাই নি।···গোল্ড-ডাস্ট কিওরের জন্যে আপনাকে এখানে রাখলে অভিনব কিছু করা হবে না। আর একবারও নিয়ম ভেঙেছিলাম আমরা—মাদার ম্যাথিল্ডা আর আমি। এই সব কলোনীর ব্যাপারের এক হর্তাকর্তার বেলা—তিনি এমন কাজের লোক যে ছ' মাস ছুটি নিলেও নাকি সৃষ্টি রসাতলে যাবে। সুতরাং···তাও সে অনেক বেশি এডভান্সড কেস। মাদার দেখেছিলেন তাঁকে টেনে-টুনে সারিয়ে তুলেছিলাম—না পারতাম যদি তো দু'জনেরই গর্দান যেত আর কি!

ডাক্তারের মুখে বিকৃত একফালি হাসি। সার্জারিতে অনেক আলো। যন্ত্রপাতির ক্যাবিনেটের ওপর বিচ্ছুরিত সূর্যালোক তাকের ওপরের সারবন্দী বীকারগুলোর গায়ে গিয়ে পড়েছে—চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে প্রায়।···ডাক্তারের হলদেটে মুখের চারপাশে একটা অপার্থিব লাল আলোর বৃত্ত। জ্যোতির মত কিছু নয় তা বলে, এ আলোর জাত আলাদা।

—আবহাওয়াটা আমরা খুব ভাল পাচ্ছি সিস্টার—ঝরঝরে, ঠাণ্ডা। বন্দীদের প্যাভেলিয়ানটায় থাকবেন আপনি। দেখেছেন তো জায়গাটা—একেবারে যাকে বলে গাছের মাথায় ঘুমুতে পারবেন। ডিম, সার্ডিন আর সাদা মাংসকাট মদ···ডায়েট লিখে দেব আমি। তিন মাসে—আরও কম লাগতে পারে—

—কাজ করতে পারব আমি?

—সকালে আমাকে এ্যাসিস্ট করবেন কেবল। কিন্তু সিস্টার, একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমার কাছে—এমন করে শক্তিক্ষয় করা চলবে না। ঐ যা বলছিলাম—টি-বি'টা নেহাৎ গৌণ ব্যাপার—আসল অসুখটা তো আমি সারাতে পারব না, নিজেকে সারাতে হবে আপনায়।

অদ্ভুত একটুকরো হাসিতে মুখখানা প্রায় প্রশান্তই দেখাচ্ছে। একটু থেমে আবার বললেন, নিজেকে নিখুঁত নান করে তোলার জন্য আপনার ঐ দিন-রাত্রিরের লড়াইটা ছাড়তেই হবে সিস্টার।··· বিশ্রাম করুন, বিশ্রাম করা দরকার আপনার।

গাউনটা টেনে খুলে ফেলে জ্যাকেটটা পরে নিলেন। দরজার কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যংগভরে হাসলেন, যেমন অভ্যাস।

—আপনার অতি-সচেতন বিবেককে ভাবমুক্ত করতে রেভারেণ্ড সিস্টার, মাদার ম্যাথিল্ডাকে বলতে যাচ্ছি আজ সকালে আমিই আবিষ্কার করেছি আপনার অসুখটা আর আপনায় কোন সুযোগই দিই নি তাঁর কাছে আগে গিয়ে বলবার—আমায় তো তিনি ভালই জানেন। আসার আগে নিজে যা-কিছু জেনেছিলেন ভুলে যান একেবারে—অবশ্য মাইক্রোসকপিস্টের দম্ভ যদি পথ আগলে না দাঁড়ায় আপনার।

পরবর্তী তিন মাস তার জীবনের রংগমঞ্চে ক্ষুদ্র একটি নাটকের অভিনয় হয়ে গেল, মনে রাখবার মত নাটক একটা। উত্তরকালে যখনই এই সময়টার দিকে ফিরে তাকিয়েছে, মনে হয়েছে ধর্মজীবনের সাদা-কালোর মধ্যে এই তিন মাস একটা সোনায় মোড়া পথ।

যে ছেলেবেলাটাকে কোনদিনও পায় নি, সেটাই যেন ধরা দিয়েছে এসে। শিশুর স্বপ্নের জীবনে আছে যেন···একেবারে গাছের ওপর বসবাস, সংগী একটা ছোট্ট সুন্দর বাঁদর—ঝকঝকে সবুজ ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলো ধরে ধরে খায় সে। মনটাও শিশুরই মত শুদ্ধ-নিষ্পাপ, গ্লানি নেই, দ্বন্দ্ব নেই কোথাও। সবকিছু কাছে আসছে অনুভূতির মধ্য দিয়ে, ঈশ্বর-চেতনা পর্যন্ত। খড়ের চালের ওপর দিকে টিকটিকি আসা-যাওয়ার সর্-সর্ শব্দ···বুনো ফুলের সুবাস···ঝোড়ো বাতাসে কলাগাছের পাতায় পাতায় মাতামাতি—সবের মধ্যে তাঁরই প্রকাশ।···আর অন্ধকার নামে যখন, সৃষ্টি আর ধ্বংসের গর্জন বনের অন্তস্তল পর্যন্ত আলোড়িত করে তোলে সেই উচ্চগ্রামে বাঁধা মুখরতার সুরে আফ্রিকা-রাত্রির ঐকতান শোনান তিনি। সেই বিচিত্র পরিবেশ ওল্ড টেস্টামেন্টের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে সত্যের রূপ দেয়।

সবকিছুই অবিশ্বাস্য কেমন! ডাক্তারের মুখে খবরটা পেয়ে মাদার ম্যাথিল্ডা কোনক্রমে চোখের জল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন—অভিভূতকর এই সংবাদটা অবধি মিশিয়ে সবকিছুই অবিশ্বাস্য। ডাক্তারের সংগে আলোচনান্তে, একঘণ্টা চ্যাপেলে কাটিয়েছেন সুপিরিয়র।

তারপর ওর ডাক পড়েছে।

—ঈশ্বরের সহায়তায় স্থির করেছি তোমাকে এখানে রাখব—ঝুঁকিটা যে খুব বেশি তা তুমিও বুঝছ, আমিও বুঝছি—আশা করছি সেরে উঠবে তুমি, আর কার্যক্ষেত্রে হয় তো হারাতে হ'ল তোমায়!

রক্তাভ দু'টি চোখ-ভরা স্নেহ আর উদ্বেগ। মুহূর্ত থেমে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে অবিচলিত দৃঢ়কণ্ঠে বলতে শুরু করেছেন আবার!

বিশেষ বিধান কেবল সকালের দিকটায় কাজ করবার অনুমতি দিচ্ছে তাকে—সার্জারিতে ডাক্তারকে এ্যাসিস্ট করবে আর নার্সদের সারাদিনের ডিউটি-চার্ট তৈরি করে দেবে। সেই চার্ট অনুসারে কাজ করিয়ে নেবে সিস্টার অরেলি। নিজের ঘরে একা খাবে এখন থেকে, খাবার ঘরের বাসনপত্র যাতে ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়। কমিউনিটি উপাসনায় যোগ দেবে না, যদিও নিজের মনে প্রতিটি উপাসনাই করবে নিয়মিত! ম্যাসে যোগ দিতে পারে, তবে কয়ারে আর গাইবে না। বন্দীদের প্যাভেলিয়নের ওপরতলায় থাকবে•

—গাছের ডালে পাখির মত—মাদার ম্যাথিল্ডা এতক্ষণে আবার নতুন করে হাসলেন।

উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে আলিংগন করার উদগ্র বাসনাটা দমন করতে নিজের সংগে যুদ্ধ করল সিস্টার লুক।

জাহাজে আসতে আসতে যে বুশ-স্টেশনের স্বপ্ন দেখত, বন্দীদের প্যাভেলিয়নে তারই প্রতিচ্ছবি। হাসপাতালের শেষপ্রান্তে দোতলা এই বাড়িটা পরে তৈরি হয়েছে। দেশীয় শৈলীতে তৈরি, জংগল-মুখী বাড়িটা, মাথায় খড়ের চাল। নীচেরতলায় শহরের জেলের কয়েদীদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসার দরকার যাদের তাদের থাকবার ব্যবস্থা। আর থাকে হিন্দুরা, ধর্মগত আর খাওয়া-দাওয়ার বাঁধাবাঁধির কারণে মূল হাসপাতালে রেখে যাদের চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। খড়ের চালার নীচে ওর গোল ঘরখানার দেওয়ালে খুব পাতলা জালের আবরণ। এত পাতলা যে ঘরে আলো জ্বাললে তবেই চোখে পড়ে। রাতে মথগুলো ভেলভেটের মত বড় বড় বাদামি ডানা দিয়ে বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে যায় সেই পাতলা জালের ওপর।

সাধারণ দৈনন্দিন খাবারের ওপর টি-বি রোগীদের জন্য ডাঃ ফরচুন্যাটির অতিরিক্ত ডায়াটের ব্যবস্থা আছে, নিজে তিনি তার নাম দিয়েছেন 'প্রেরির ওপর অয়েস্টার'। সে ডায়াটের আওতায় তাকেও পড়তে হয়েছে। রান্নাঘরে সেইমত খাবার দেবার হুকুম দিয়েছেন ডাক্তার। প্রথম দিন নিজে এলেন 'অয়েস্টার' কেমন করে খেতে হবে দেখিয়ে দিতে। মাদার ম্যাথিল্ডার কাছ থেকে একজোড়া উৎকৃষ্ট স্ফটিকের পানপাত্র চেয়ে এনেছেন, দু'টোতেই একটা করে কাঁচা ডিমের কুসুম, কুঁচোনো পার্সলে কিছু আর লেবুর রস। উচ্চপদস্থ কোন পরিদর্শক এলে এই পানপাত্র দিয়ে আপ্যায়ন করতেই অভ্যস্ত ছিল এতদিন।

একদৃষ্টে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মৃদু মৃদু হাসছেন ডাক্তার।

—অসুস্থ সিস্টারকে সবকিছুই উপহার দেওয়া চলে। দু'হাতে দু'টো গেলাস ধরে এগিয়ে এলেন কাছে:—খেয়ে ফেলুন দেখি কুসুমগুলো—চোখ বুজে গিলে ফেলুন—ভাবুন অয়েস্টার খাচ্ছেন।

নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া ছাড়া দিনে দু'বার এটা খেতে হবে, আর রাত দশটার সময় ঘুম থেকে তাকে ডেকে তুলে সার্ডিনের স্যান্‌ড্‌উইচ আর দু' গেলাস হোয়াইট মাসকাট মদ খাওয়ানোর হুকুম হয়েছে!

ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। নেড়েচেড়ে দেখলেন বিছানার গদি, চাদর, বালিশের ওয়াড়, বরফের বাক্সে রাখা বিয়ারের বোতলগুলো—যেমন যেমন হুকুম দিয়েছিলেন ঠিক সেই রকমই হয়েছে সবকিছু।

—বেশ। যত পারেন খান-দান, ঘুমোন। কোনরকম ভাবনা-চিন্তা নয়—যদি না এই গোল্ড কিওর থেকে প্রথম কিড্‌নি নিয়ে বেরুতে চান।

—মুখ ধোয়ার বেসিনের স্ট্যাণ্ডটার নীচে মাইক্রোসকোপটা লুকিয়ে রাখা, হঠাৎ চোখ পড়ে গেল। কোন কথা না বলে গম্ভীরভাবে

সেটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে। ওটা থাকলে যখন তখন নিজের স্পটাম টেস্ট করবে, সেই উদ্দেশ্যেই এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বুঝতে সময় লাগে নি।

তিনমাসব্যাপী আলস্যের জীবনের সেই সূচনা। পার্থিব জীবনের চরম প্রাচুর্যের মধ্যেও এমন অবসরের বিলাসসুলভ নয় খুব। কমিউনিটির সহৃদয় স্নেহস্পর্শ ঘিরে রেখেছে চারপাশ থেকে, ইতোমধ্যেই তার নিরাপদ আরোগ্যের জন্য সিস্টাররা ম্যাস উৎসর্গ করেছে একটা। হয় তো কারো কারো মনে প্রশ্ন জেগেছে সত্যই তার অসুখটা অতি পরিশ্রমের দরুণ কি না, নাকি কোন মানসিক দ্বন্দ্বের ফল—যে দ্বন্দ্বের নিরসন করতে পারে নি সে! কিন্তু ও জানে প্রার্থনায় তারা মনোনিবেশ করেছে যখন, মার্জিত মুখে সে ভাবনার লেশমাত্রও ফোটে নি।

সিস্টার ইউচ্যারিস্‌সিয়া প্রথম দেখতে এলেন তাকে, তারপর একে একে আর সবাই। বৃদ্ধা নানটি বাচ্চা একটা বাঁদর এনেছেন। বোর্ডিং স্কুলের একটি ছেলের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি, সিস্টার ইউচ্যারিস্‌সিয়া কথা দিয়েছিলেন তাকে বাঁদরটার জন্য ভাল একটা থাকবার জায়গা খুঁজে দেবেন।

লম্বা লেজওয়ালা ছোট্ট জীবটা ভয় পেয়েছে বেজায়।

সিস্টার লুক সাগ্রহে দু' হাতের মধ্যে তুলে নিল তাকে, মাদার ম্যাথিল্ডা কি অনুমতি দেবেন আমার কাছে রাখতে?

সিস্টার ইউচ্যারিস্‌সিয়া সহাস্যে বললেন, তুমি যা চাও তাই পাবে, যা করতে চাও তাই করবে। বেলজিবাব যে তাঁকে বলেছেন তোমার সুস্থ হয়ে ওঠা নির্ভর করছে তার ওপর।

কোথাও বিদ্বেষের স্পর্শ নেই এতটুকু, দৃষ্টিতে পরম সন্তোষ। এমন আশ্চর্য, অশ্রুতপূর্ব স্বাধীনতা তাঁদের মধ্যে একজনের ভাগ্যেও ঘটেছে অন্তত।

অসুখের খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ঠেকানো গেল না। কলোনীর যেসব রোগীরা মনে রেখেছে তাদের জীবনের সংকট-ক্ষণে রাত্রির নিভৃতযামে প্রার্থনারতা এই নানটিকে, তাদের কার্ড দেওয়া মদ, শ্যাম্পেন মাদার ম্যাথিল্ডার অফিসে এসে পৌঁছোতে লাগল। ভেসিং-বয়দের বৌরা এনে দিচ্ছে ডিম, মুরগীর ছানা, মাঝে মাঝে এক-একটা শিকার-করা জন্তুর মাংস। দেখতে খরগোসের মত, মাথাটা নেই, থাকলে বেড়াল বলে চিনতে পারা যেত। বার্তাবাহী ড্রাম সংবাদটা জংগলে পৌঁছে দিয়েছে। ফলে দাদার ভেরমরলেনও জানতে পেরেছেন। চিঠি দিয়েছেন একখানা —মনে করিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর তাই ঘটাবেন তার মংগলের জন্য যা ঘটা চাই। আর জানিয়েছেন তাঁর ছেলেরা হাতীর দাঁতে খোদাইয়ের কাজ করছে, যথাসময়ে সে উপহার রাণারের হাতে পৌঁছোবে তার কাছে।

বাঁদরটার নাম ফেলিক্স। ট্রি-হাউসে যখন মাসখানেক কেটেছে, ততদিনে তাকে সে নানের মত ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে নিয়েছে। তার ডাইনিং টেবিলের একাকিত্বও সেই ঘোচায়—পাশে বসে নিজের ন্যাপকিনটা বাঁধে গলায়, প্লেট থেকে ভদ্রভাবে খাবার তুলে খায়। বিকেলের দিকে ও যখন ঘুমোয়, খড়ের চালে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার সন্ধানে ঘোরে। তারপর যখন বোঝে উঠে পড়বার সময় হয়েছে ওর, এখন উঠে অফিস পড়তে হবে, এসে ছোট ছোট কালো হাতে গায়ের চাদর ধরে টানে। ও যখন নতজানু হয়ে সান্ধ্যপ্রার্থনা করে, উঁচু হসপিটাল-বেডটায় বসে থাকে দু'হাত দিয়ে নিজের পা দু'টো ধরে। প্রার্থনা-সমাপ্তির অপেক্ষায় বিচিত্র দু'টি ছোট ছোট সোনালী চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে, দেখে কতক্ষণে ক্রুশচিহ্ন করে। যেই ক্রুশচিহ্ন করা হয়ে যায় অমনি একলাফে কোলে এসে লম্বা লম্বা তারের মত হাত দু'টো দিয়ে যথাসাধ্য জোরে গলাটা জড়িয়ে ধরে।

গ্র্যাণ্ড সাইলেন্সের পর কখনও সিস্টার লুক কথা বলে না ফেলিক্সের সংগে। তবে তাকে কোলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় অনেক সময়—পর্দার গায়ে রাত্রে মথগুলো মালার মত ঝুলে থাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাই, হাসে ওর দিকে চেয়ে। আর আলোর সুইচটা একবার নিভিয়ে দিলে মুহূর্তে অরণ্যের প্রাণকেন্দ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ওরা দু'জনেই—কৃত্রিম আলোটা সরে যাওয়ার সংগে সংগে বাইরের অকৃত্রিম জীবনটার সংগে ব্যবধান ঘুচে যায়···আরণ্যকের দল যেন নিকট সান্নিধ্যে এসে দাঁড়ায়··· তীক্ষ্ণরবে, আর্তনাদে, গানে অরণ্যের জীবনটাকেই ওদের ঘরের মধ্যে টেনে আনে। পাতার ফাঁক দিয়ে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে চাঁদ হাসে। এমনি পরিবেশে গ্রাম-গ্রামান্ত থেকে ভেসে-আসা মাদলের সুরে দ্রুতলয়ের আমেজ লাগে।

দু'মাসে দশ পাউণ্ড ওজন বেড়েছে। সযত্ন বিবেচনায় নিজের নার্সিং করে সে, ত্রুটি ঘটতে দেয় না কোথাও। অসুখটার মানসিক প্রতিক্রিয়া সুতীব্র, আত্মকেন্দ্রিক, আবেগপূর্ণ ভালবাসায় ভরিয়ে তুলেছে তাকে—অসুখ করার আগে কালে-ভদ্রে প্রশংসা করেছে যার, আবেগের আতিশয্যে তার সংগেও এখন শান্তসংযমে কথা বলা রীতিমত কষ্টকর। তবে এ অবস্থা যে আসবে অনুমানই করেছিল, তাই অবস্থাটাকে আয়ত্তে আনাও সহজ হয়েছে অনেকটা। আশাবাদের সুরটাও খুব চড়ায় বাঁধা এখন—নীরোগ হয়ে উঠবে বলেই নয়, সে বিষয়ে একেবারে স্থিরনিশ্চয় সে, ভবিতব্য সবকিছু সম্বন্ধেই মনটা আপাতত সুখস্বপ্নের ঘোরে আছে। এও এ রোগেরই লক্ষণ তা জানে। তবু সব জানাকে ছাপিয়ে একটা অনুভূতি জোরালো হয়ে ওঠে মাঝে মাঝেই, সে অনুভূতিটা বলে অসুখ সেরে গেলেও এ সব উচ্চাশা মিলিয়ে যাবে না তার।

ডাক্তার তার মানসিক অসুস্থতা নিয়ে মতামত প্রকাশ করেছিলেন —অযৌক্তিক মতবাদটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছে। তাঁর আদেশমতই বিশ্রাম করছে, প্রতি দিনটাকে সেই দিনের সংগেই শেষ করে দিচ্ছে। ভাবনা-চিন্তাগুলো আপাতত প্রতিদিনের সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত। তার এই নতুন জীবনের সাধনা তাকে নতুন অভিজ্ঞতা দিয়েছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখছে জীবন কত অনাড়ম্বর হতে পারে। দেখছে প্রতি দিনটিকে পরমেশ্বরের দান বলে নিলে কি অপরিমেয় সুখ পাওয়া যায়। দেখছে যত বিস্ময় বাড়ছে।

একদিন বিকেলে ঘুম থেকে উঠে পর্দা-দেওয়া জানলার ধারে দাঁড়িয়ে অফিস অব্‌ লড্‌স্‌ আবৃত্তি করছিল। হঠাৎ খেয়াল হল সমস্ত অন্তরটা তার অনাবিল আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে—থি চিলড্রেন ফ্রম ড্যানিয়েলের অনুচ্ছেদগুলো ওর বড় প্রিয়···আলো ও অন্ধকারকে

আহ্বান জানাচ্ছে প্রভুকে আশীর্বাদ করতে, আহ্বান জানাচ্ছে গিরি-পর্বতকে, নদী সমুদ্রকে—ওদের জলের তলায় যা কিছু লীন সব কিছুকেই···আশীর্বাদ কর, হে পশুকুল, গাভীগণ, আশীর্বাদ কর প্রভুকে···

মন বলছে নানকে তো এমনই হতে হবে। হওয়া উচিত। ঈশ্বরের শিশু হওয়ার অর্থ এই-ই।

পূর্ণ অন্তরে বাইরের শ্যামলতায় দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে অনেক সুখী নানের মুখ মনে পড়ছে, বুদ্ধি দিয়ে কোনদিন তাঁদের বুঝতে পারে নি। যা কিছুই ঘটে বিনা প্রশ্নে পরিপূর্ণ প্রশান্তিতে গ্রহণ করেন তাঁরা—মাঝে মাঝে এটা নেহাৎ ছেলেমানুষি মনে হ'ত। আজ নিজের মনের সেই অবজ্ঞার হাসি নিজের গায়েই লাগছে ফিরে।

সুখী ঐ মুখগুলো ওকে বলছে যেন, প্রতিদিন নতুন করে বাঁচার অর্থ এখন তুমি জেনেছ, জেনেছ দিন-শেষের সংগে দিনটাকে শেষ করে দেবার মূল্য কতখানি।···বন্ধুর পথে বাধা যত কিছু তাকে সরিয়ে দিয়ে পথ করে নেবার শক্তি প্রভু স্বয়ং যোগান।

বাঁদরটাকে বলল, অসুখ না করলে এ কথা জানা হ'ত না আমার। জ্বর দেখছিল। ফেলিক্স ওর স্কার্টটা আঁকড়ে ধরে ঝুলে আছে।

রোজ এই সময়টায় জ্বর ওঠে। আজ প্রথম থার্মোমিটারটা নরম্যাল শো করছে।···থার্মোমিটারটা ঝাড়তে ঝাড়তে ঘরটার চারদিকে ঘুরছে, উত্তেজিত মনের পরশ লেগেছে কোর ছন্দে।

পরদিন অপরেশনের পর মাইক্রোসকোপের নীচে নিজের স্পুটাম টেস্ট করছিল, ধরে ফেললেন ডাক্তার।

সস্নেহে হাসতে লাগলেন, তাড়াহুড়ো করে লাভ কি? তাড়াহুড়ো করলেই কি কমিউনিটিতে ফেরা সহজ হয়ে যাবে? তা হবে না সিস্টার, বৃথা চেষ্টা।

আরও সপ্তাহখানেকের মধ্যে সব স্লাইডগুলো তার নেগেটিভ শো করল।

কমিউনিটিতে ফিরে মনে হ'ল অপূর্ব সুন্দর এক নিস্তব্ধ নির্জন দেশে বেড়িয়ে ঘরে ফিরল যেন। এই ছোট্ট কমিউনিটিটাকে এতদিন মনে হ'ত একেবারে স্তব্ধ, নির্বাক। আজ মনে হ'ল ভুল জেনেছিল এতদিন—যথেষ্ট সাড়াশব্দ আছে জায়গাটায়, প্রাণের সাড়া একটু কান পাতলেই মেলে। ট্রি-হাউসের মত নিস্তরংগ জনহীন নয়।

[ক্রমশ।

অনুবাদিকা— প্রণতি মুখোপাধ্যায়

কবি কর্ণপুর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

একবিংশ স্তবক

রাস-বিলাস

১৩-১৬। সেই গান শুনতে শুনতে, সেই গানের সুখে, সেই গানের স্বরগ্রাম শ্রুতি জাতি ইত্যাদির অদ্ভুত কৌশলে, একান্ত সচেতন হয়ে উঠলেন কুসুমাসব। খরগর্বে ফুলে উঠল তাঁর ছাতি। চীৎকার দিয়ে উঠলেন,—'ললিতে উ ললিতে, প্রাণের স্যাঙাৎ আমার কি গানখানাই না গাইছেন···চর্চ্চরীতে! বয়েসকালেও শুনি নি এমন সুখের ফুল ফোটানো গান! অসাধ্য, হ্যাঁ, আপনাদের মত গরবিনীদের গলায় তোলা অসাধ্য।'

সঙ্গীতবিদ্যা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন,—'একরত্তি চর্চা নেই, কেবল ক্যাঁচ-ক্যাঁচ। শাণিয়ে রেখেছেন বুদ্ধিটিকে। চর্চ্চরীর চেয়েও যদি সুরেলা গান গাইতে আমাদের এই ললিতা, তা হলে হে মূর্তিমান স্থুলবুদ্ধি! আপনাকে হারাতে হবে মুরলী। আসুন বাজি ফেলুন।'

কুসুমাসব বললেন,—সঙ্গীতবিদ্যে, আপনি দেখছি বলতে চান···এই সঙ্গীতবিদ্যা আপনিই একলা বোঝেন,··এঁর ধ্যান-ধারণাও আমাদের পক্ষে দুরূহ,···বাজি ফেলেই এঁকে বুঝতে হয়। তা হলে কিন্তু আমাকেও বলতে হয়, গান ভালো লাগা না-লাগাটা দৈবতের ব্যাপার!'

সঙ্গীতবিদ্যা বললেন,—'বিপ্রবটু, এটি বেদগান নয় যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞদের প্রশস্তির প্রতীক্ষা করতে হবে। বলি, এসব গানের বিচারে আপনি কে মহাশয়?'

১৭। ঠিক এই সময়ে কৃষ্ণও হাসতে-হাসতে গাইতে-গাইতে এমন চোখে চাইলেন বয়স্যের দিকে যে, সে চোখ দেখে কুসুমাসবের আর বুঝতে বাকি রইল না তিনি কি চান। তাই পুনর্ভাষণ ছাড়লেন,—'অয়ি গরবিনী ধনী···তা বেশ তা বেশ। ধরেই নিচ্ছি আমি কেউ নই; সঙ্গীতের যে আমি একমাত্র সমঝদার একথা আপনি মানেন না। ভালো! কিন্তু আশা করি আপনি লক্ষ্য করেছেন, আমার বয়স্য গান গেয়ে উঠতেই স্তব্ধ হয়ে গেল যমুনার জল, তরুলতা আনন্দে কাঁদলো, খগমৃগ পর্যন্ত শিউরে উঠল হর্ষে। আপনাদের গানে যদি তাই ঘটত তা হলে কথঞ্চিৎ সমতার একটা প্রশ্ন উঠলেও উঠতে পারত; তবে সমীচীনতার তো নয়ই। অতএব আসুন, আমিও প্রস্তুত। সিদ্ধগান নিয়ে যদি পাশা পাড়তে চান, তা হলে একদিকে এই রইল আমার মুরলী-পণ, আর অন্যদিকে আপনারো থাকুক প্রিয়সখী-পণ। করুন।'

১৮। চমকে উঠলেন ললিতা, বললেন,—'কি কুবুদ্ধি গো কি কুবুদ্ধি। এই সব বুদ্ধিতেই তো পৃথিবী পুড়ে খাক্ হয়ে যায়। পাশা খেলায় পণাপণি আছে সবাই জানে; তা বলে এমনধারা পণ! কাচ-কাঞ্চনের সমতা?'

কুসুমাসব।—'কী যে বলছেন আপনি! আমার প্রিয় বয়স্যের মুরলী হল কাচ, আর আপনার সখী হলেন কাঞ্চন?'

ললিতা।—'নিশ্চয়, এতে সন্দেহ কোথায়? যদি সাম্যই চান, তা হলে বিনি-ক্ষোভে পণ রাখুন আপনার বয়স্যটিকে।'

কুসুমাসব।—'বেশ তবে গান ধরুন। হিতৈষীদের আমি শিরোমণি। আমি এই পণ ধরলেম আমার বয়স্যকে।'

১৯। ললিতা আরম্ভ করলেন গান।

প্রথমেই তিনি আলাপ করলেন···কেদার রাগ···অতিললিত, অতি-উদার। গন্ধর্বী-গর্ব খর্ব করে,· গরিমায় ও মাধুরীতে বিকশিত হয়ে উঠল তাঁর গান্ধার-গ্রামে সন্ধাপিত রক্তকণ্ঠে গা রে মা ধা রে। ত্রিস্থান স্পর্শ করে অনেকরকম গমকের ব্যবহার দেখিয়ে খেলতে লাগল আলাপ। অমন ভুরু নাচিয়ে আলাপ জমালে, আর আলাপের মধ্যে অমন ব্রীড়ারসের ক্রীড়া দেখালে, শ্রোতাদের যে সাহস ও উৎসাহে ভাঁটা পড়বে সে তো স্বতঃসিদ্ধ।

২০। কেদার রাগে আলাপ করেই লয়ের খেলা দেখিয়ে শৌরসেনী ভাষায় গান ধরলেন ললিতা,—

"সকল কলামৃত মণ্ডল ও,
বর্ধিত-প্রেমক সমুদ্র ও,
পত্নমিণি হরষণ পণ্ডিত ও,
রাজতে শ্যামল-চন্দ্র ও।
অমুয়া-মঞ্জরী শিরপর আলা,
ফাল্গুন রাজকি খেলন ও
বৃন্দাবন-প্রিয় কোকিল কালা,
অবলা জনে কাঁহে হেলন ও।'

২১। গান শুনেই সগর্বে চেঁচিয়ে উঠলেন কুসুমাসব,—
"হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ···হেরে গেছেন, হোঃ হোঃ'
হোঃ হোঃ···হেরে গেছেন ললিতাদেবী।"

বলতে বলতে দুবাহু তুলে ভাবের ঘোরে সে কি তাঁর উদ্দাম নৃত্য! জানতেই পারলেন না কুসুমাসব, বগল থেকে কখন খসে পড়ে গেছে তাঁর মুরলী, জানতেই পারলেন না কখন নিমেষের মধ্যে সকলের চোখে যেন ধুলো দিয়েই টুক করে মাটি থেকে মুরলীটিকে সরিয়ে ফেলেছেন শ্রীমতী সঙ্গীতবিদ্যা। গোলেমালে গণ্ডগোলে একটি প্রাণীও জানতে পারল না, কি হল মুরলীর। সঙ্গীতবিদ্যাও এ বিষয়ে আর টুঁ শব্দটি করলেন না। বরং উল্টে মুখ ঝামটা দিয়ে কুসুমাসবকেই বলে উঠলেন,—

'আচ্ছা তো; কোন কারণই নেই, হঠাৎ এমন··আহ্লাদে মাতালের মত নেচে উঠছেন কেন? যিনি সত্যিই পারেন সেই আপনার বয়স্যটিই বিচার করে বলুন·· কার জয়।'

২২-২৪। উত্তর দিলেন কুসুমাসব,—'নিজেকে ঘোর পণ্ডিত বলে বিবেচনা করেন দেখছি। আমার তো মনে হয়, সরাসরি হার হয়ে গেছে আপনাদেরি। সোজা কথা···বাজি ফেলা হয়েছিল চর্চ্চরী গান নিয়ে, ইনি গাইলেন দ্বিপদিকা-খণ্ড। আবার হাসছেন যে! নিজেই বিচার করুন, হার হয়েছে কি না।'

শুনেই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন সুন্দরীরা। তাঁরা ছড়া কাটতে লাগলেন কবিতায়। তারপরে একটু জিরিয়ে নিয়ে বললেন,—

'বেরসিক মহাশয়, চর্চরী হোক, দ্বিপদী হোক জম্ভলী হোক, নামের বৈচিত্র্যে কি আসে যায়। গানে দেখতে হয় স্বরগ্রাম মূর্চ্ছনার খেলা।

চোখ চেয়ে দেখুন ললিতাদেবীর গীত-মাধুর্যের মহিমাটি ;—

এই পাষাণগুলি···মণীন্দ্রদেহ নিয়ে যাঁরা আলবাল রচনা করেন বৃক্ষের, তাঁরা সকলেই দ্রব হয়ে গেছেন, উদ্গীরণ করছেন জল। ঐ দেখুন, সেই জলও আবার স্তম্ভিত হয়ে জমে গেছে, কঠিন হয়ে প্রত্যেক বৃক্ষের মূলে মূলে রচনা করেছে নিবিড় বেদী।

কালিন্দী দেবতাত্মা, বৃন্দাবনের তরুলতা জ্ঞানময়, খগমৃগ সকলেই চিন্ময়। আপনার বয়স্যের গান শুনে তাঁরা যে হাসবেন কাঁদবেন, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু এঁর গানের এইটেই বৈশিষ্ট্য যে, পাষাণও গলল। তাই বলছি, জিতেছি আমরাই। আপনি এখন দয়া করে নিজের বয়স্যটিকে নিজে হাত ধরে নিয়ে এসে আমাদের হাতে সমর্পণ করে দিন।'

২৫। এবার সুবল এগিয়ে এলেন, বললেন,—'অয়ি সঙ্গীত-বিজ্ঞে, অবিজ্ঞার মত আজ এ জড়ত্ব কেন আপনার? আপনি তো আর তাঁর মত নন! ইনি কেমন করে কৃষ্ণকে নিয়ে আসবেন? অধীন তার প্রভুকে টেনে নিয়ে আসবে, এমন কথা তো বেদেও নেই।'

কৃষ্ণ বললেন,—'কুসুমাসব, এখন তোমার মান বাঁচানো দায়। [illegible]সব-মদমত্তা এই বরবর্ণিনীরা এই বিজয়-গরবিনীরাই···জিতেছেন। এঁদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে তুমি পারবে না। যত চেষ্টা করবে আরো অনর্থই ঘটবে, একশেষ হবে দুরবস্থার। অতএব দাও আমাকে আমার মুরলী। নইলে তোমার সঙ্গে মুরলীটিও যাবেন।'

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন কুসুমাসব,—

'কী যে বল সখা!···জিতেছি, আমিই জিতেছি।
আপনি এখন দয়া করে গা তুলুন, প্রচণ্ড হর্ষে
সমানয়ন করুন এঁদের প্রিয় সখীটিকে।'

২৬-২৭। ললিতা রুখে দাঁড়ালেন, বললেন,—'ওরে নির্লজ্জ পত্র-পশু, এতটুকুও ঘটে বুদ্ধি নেই,···গান নিয়ে হল পণ, আর নিজে কি না গগন ফাটাচ্ছেন···আমার জয় আমার জয় বলে চেঁচিয়ে!'

কুসুমাসব কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—'জানি না বাবা, কিসের লোভ হয়েছে আপনার। নিজের সিদ্ধান্তই যেখানে সিদ্ধান্ত নয় সেখানে আর বলবার কীই বা থাকে! নিন আপনার মুরলী, আমি পালাই।'

এই বলে মুরলীটি দিতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, নেই, মুরলী নেই। কুক্ দিয়ে উঠলেন,—'ভো বয়স্য, পালিয়েছেন, প্রথমেই আমার বগলদাবা থেকে ভয়ে অস্থির হয়ে মুরলীদেবী পালিয়েছেন, বোধ হয় অক্ষত লতার উদ্যানে···তিনি পালিয়েছেন।' হাসির কথা, রসের কথা।··হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন সকলে।

২৮। ঠিক এই সময়টিতে কৃষ্ণমণ্ডলের কিছুদূরেই আবীরের নিবিড় রমণীয়তায় রঙ্গমত্তা হয়ে বিলাস করছিলেন বলরামপক্ষীয়া বরবর্ণিনীরা। হোলিখেলা চলেছে, হঠাৎ সেখানে ঘটে গেল এক বীভৎস ব্যাপার। কোথা থেকে এলেন জানি না, কোথায় লুকিয়ে ছিলেন তাও জানি না, মৃত্যুর নিমন্ত্রণ পেয়েই যেন হঠাৎ তাঁদের মাঝখানে লাফিয়ে পড়লেন এক কুবেরের অনুজীবী,···শঙ্খচূড় তাঁর নাম···যক্ষাধম, জীবনধারীদের মধ্যে অধমেরও তিনি অধম। উদ্দেশ্যটি কিন্তু তাঁর মহৎ···রাম-রামাদের মধ্যে যিনি রত্ন তাঁকে তিনি হরণ করে নিয়ে সট্‌কাবেন। কি প্রচণ্ড লম্ফ দিয়েই না তিনি এলেন। উল্লম্ফনই বটে।

ধরুন, কোনো স্থানে পড়ে রয়েছে একখান চিক্কণ কনকশিলা, চকচক্ করছে মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের কিরণ-মরীচিকায়। সেটিকে যদি নির্মল জলে তড়াগ ভেবে, কোনো রোদে-পোড়া মূঢ়···গাছের মগডাল থেকে ঝাঁপ দেয় সবেগে!!···এই লম্ফও সেই রকমের।

ধরুন কোথাও গনগনে আগুন জ্বলছে, লক্‌লক্ করছে শিখা; সেটিকে দিব্যৌষধির কম্পিত কানন ভেবে, চুরির লোভ সামলাতে না পেরে, যদি কোনো পতঙ্গ তাতে লাফ মারে!!···এঁর লম্ফটিও সেই ধরণের।

ধরুন বনের মধ্যে কোথাও সোনার রঙের কেশর ফুলিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে সিংহ; সেটিকে পাকা ধানের আঁটি ভেবে হঠাৎ যদি লাফ মারে বুভুক্ষু এক বন্য মহিষ!···এনার লম্ফটিও সেই ধরণের।

সাপের মাথার মণি চুরি করতে গেলে ব্যাঙের যা দুর্দশা হয়, এঁরও যে তাই হবে তাতে আর সন্দেহ কি।

২৯। তাঁকে দেখে, তাঁর অতিকরাল মাথায় আবার একখান জ্বলজ্বলে মাণিক জ্বলছে দেখে, তরঙ্গুর চোখের সামনে চমূরুদের যে দশা

হয় তাই হল বিলাসিনীদের। তাঁরা সিঁটিয়ে উঠলেন। সন্ত্রাসে মুখ উঁচিয়ে চীৎকার দিয়ে উঠলেন,—

'কোথায় রাম, কোথায় কৃষ্ণ, রক্ষা কর আমাদের রক্ষা কর।'

৩০। নিজের আনন্দাবেগে বলরাম তখনও নাচছিলেন। কিন্তু আর্তস্বর কানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই লাফিয়ে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণ। মধ্যপথেই থেমে গেল তাঁর গান। তিনি ছুটলেন। ধরায় পা পড়ে পড়ে কি না পড়ে···এত দ্রুত ছুটলেন, দুর্বৃত্তটাকে ধরতে পাছু পাছু ছুটতে ছুটতে এলেন শ্রীবলরাম, গনগন করছে ক্রোধ, হৃদয়টাকে যেন রুগ্ন করে দিয়েছে প্রত্যাঘাতের নেশা।

৩১। কৃষ্ণ-বলরাম···দুই বীর-প্রবর প্রচণ্ডবেগে ছুটে আসছেন দেখে পামরটার জ্ঞান হল। তবে কি এবার আমায় উৎকট অবমাননায় শূলে চড়তে হবে? মেরে ফেলবেন না তো? প্রাণটা আগে বাঁচানো দরকার। অতএব রমণীমণ্ডলীদের ছেড়ে দিয়ে পামর পালালেন। পলায়ন বলে পলায়ন! আকাশ চিরে যেন ছুটলেন

৩২। একদিকে সিংহের মত ছুটছেন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, অন্যদিকে মত্ত হস্তীর মত পলায়ন করছেন যক্ষাধম শঙ্খচূড়। ক্রমে দম ফুরিয়ে গেল অধমের। একদিকে ক্রোধ অন্যদিকে খেদ; দুটি বেগের সংঘাতে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়লেন পামর। তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন কৃষ্ণ, কাকের মাথায় যেন শ্যেন। গরুড় যেমন সাপ মারে তেমনি আয়াসহীন বিক্রমে কৃষ্ণ তাঁর পদ্মহস্তের মুঠির মধ্যে পামরটার কেশ জড়িয়ে নিয়ে মারলেন টান। উপড়ে এল, বুড়ো কচ্ছপের পিঠের মত শক্ত সেই অন্ত্য-কল্যাণটার মস্তক। তারপরে শঙ্খচূড়ের মস্তক থেকে কৃষ্ণ উৎপাটন করে ফেললেন সেই জলজ্বলে প্রসিদ্ধ মণি।

ব্যাপার দেখে ব্রজাঙ্গনাদের তো চোখের পাতা আর পড়ে না। মণি তো নয় যেন তাঁদের বিরাট আনন্দের প্রতিমূর্তি। মণিটিকে হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন বিজয়ী। দাদা বলরামকে উপহার দিলেন সেটি প্রমোদ-সমুদ্দাম দামোদর।

৩৩-৩৬। তারপরে তিনি ফিরে এলেন তাঁর অসমাপ্ত মহোৎসবের আবেশের মধ্যে। রসের বিলাসক্রীড়ায় যাঁরা তাঁর ধ্যানের ধন, সেই তাঁর নিকষ রমণীমণ্ডল যদিও তখনো স্বর শ্রুতির মনোহারিতায় গেয়ে চলেছিলেন গান, যদিও তখনো আনন্দ প্রকাশ করে চলেছিলেন তাঁর সখারা, তবুও কৃষ্ণর মনে হল, কেমন যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে উৎসব।

তাই এসেই, কোথাও যেন কিছুই ঘটে নি, তেমনি একটা ভাব দেখিয়ে, এমন তোলপাড় করে তুললেন উৎসব যে মনে হল···নিভন্ত দীপ যেন জ্বলল জ্বলন্ত সায়র যেন ভরল, পড়ন্ত দালানের যেন চুনকাম হয়ে গেল নতুন করে। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল···কোথায় মুরলী কোথায় মুরলী। আর···তুমি চোর, তুমি চোর, তুমি সরিয়েছ, তুমিই চোর···চোরী চোরী,···বলতে বলতে কৃষ্ণ ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেইখানে, প্রেমের আবেশে অঙ্গ এলিয়ে যেখানে তাঁর নিতম্বিনী সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে বসেছিলেন চন্দ্রাবলী···ভরা-মনে। বাধার অবসর না দিয়েই, যখন তিনি তাঁদের প্রত্যেকের বুকের আঁচল সরিয়ে সরিয়ে খুঁজতে লাগলেন মুরলী, তখন প্রথমে পরিহাসে ললিত হয়ে উঠল তাঁদের ভ্রূ, তারপরে ঢেউ তুলল ভ্রূকুটি, শেষে কুটিল হল চক্ষু। ভৎর্সনার সুরে তাঁরা বললেন,—

'বলি ও কুসুমাসবের সহচর, এ অবিচার তোমাকেই সাজে। তোমার হাত থেকে উধাও হয়ে আমাদের ওড়নার মধ্যে ঢুকবে কেমন করে মুরলী? তোমার ঐ মন-মজানো মুরলী যদি আমরাই চুরি করে থাকি, তাহলে দাও আমাদের সমুদ্দণ্ড দণ্ড; আর তা যদি না হয়, তাহলে আমরা ছিনিয়ে নেব তোমার স-কৌস্তুভ কণ্ঠহার। এই রইল আমাদের পণ।'

চন্দ্রাবলী ঝঙ্কার দিয়ে বললেন,—

'অবলা হলেও আমরা কারো গায়ের জোরে টলি না। আমরা মুরলী চুরি করতে পারি···এই বুঝিয়ে তো তোমার হাত থেকে কুসুমাসব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন মুরলী। সেটুকুও দেখছি স্মরণে নেই।'

কুসুমাসব বললেন,—

'আমরা চুরি করতে পারি'···এই বাক্যটুকু থেকেই প্রমাণ হচ্ছে, আপনারা চুরি করেছেন মুরলী। আমি যে ছিনিয়ে নিয়েছি মুরলী, তার প্রমাণ কই? কই, দেখান।'

চন্দ্রাবলী বললেন,—

'প্রমাণ আবার কি, এঁরা সকলেই প্রমাণ।'

বেঁকে দাঁড়ালেন ব্রাহ্মণবটু, বললেন,—'ওঁরা সকলেই আমার বিপক্ষে।'

চন্দ্রাবলী। 'আপনার বয়স্যই আমার প্রমাণ।'

কুসুমাসব। 'না, তা হতেই পারে না। তাই যদি হবে, নির্দয় বেচারী, তিনি কেন আপনাদের ওড়না তল্লাস করতে যাবেন?··· আহা, অমন মুরলী, সেরার সেরা মুরলী···নিঃসন্দেহে আপনারাই অপহরণ করেছেন; আপনাদের ব্যাহৃতি অতএব অলীক।'

৩৭। কুসুমাসবের উক্তিতে অপ্রতিভতা বা ভীতির কোনও গন্ধই ছিল না। নিছক সত্য কি কখনো নিছক মিথ্যে হয়? কৃষ্ণ বললেন,—'দেখ বয়স্য, বেণুটিকে তো তোমার পদ্মহাতের সঙ্গী হয়ে থাকতেই আমি দেখেছি। আমার মন বলছে, সঙ্গীতবিদ্যাই ওটিকে সরিয়েছেন, এঁরা নন।'

শুনেই সঙ্গীতবিদ্যা···অতিনৈপুণ্যের যিনি খনিবিশেষ···নিজের সচকিত নয়নের সীমানায় রূপ করে ফুটিয়ে তুললেন ছলছলে একটা ছলনার ভাব এবং হাল্কা পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে ললিতার পাশ দিয়ে চলতে চলতে তাঁর হাতে টুক্ করে চালান করে দিলেন মুরলী।

৩৮। তাঁর আকার-বিকার যে একটু বিশেষ প্রকারের,···লক্ষ্য এড়াল না ব্রাহ্মণবটুর। ঘাড় ঘুরিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি কৃষ্ণকে বললেন, —'বয়স্য, যিনি করালা মুরলী-তস্করা তিনি নিজেই অভিব্যক্তা হয়ে পড়েছেন। সঙ্গীতের যিনি আগমাধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁকে উদ্দেশ করে ঐ সেই তখন কিঞ্চিৎ পরিহাস করেছিলেম কি না, তাই শুনে কি বলে···নিজের উপরেই ঐ তাঁর প্রমাণসিদ্ধ হয়ে গেছে আশঙ্কা, সঙ্কোচের এখন কল্যাণ করতে ছুটেছেন। এ বাবা চোরের লক্ষণ।'

ললিতার হাতে মুরলী চালান করে সদর্পে এগিয়ে এলেন সঙ্গীতবিদ্যা। অধরে বিস্মিত হাসির অগ্নিরেখা টেনে তিনি ঠুকলেন,— 'এসব কি বকছেন বটুমহাশয়? নিঃসন্দেহে আপনি একটি কাপট্যের কূপ। ফাগ নিয়ে খেলতে খেলতে, কখন আমি আবার চুরি করলেম মুরলী? আর যার হৃদয় এত কঠিন, কোন প্রয়োজনেই বা লাগবে তার মুরলী? মিথ্যে বদনাম দেওয়া দেখছি আপনার স্বভাব।
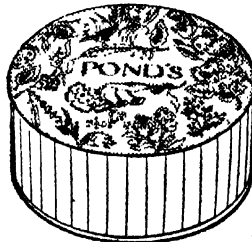
এমন করলে অদূর ভবিষ্যতে আপনি যে একটি কলঙ্কের পুষ্পস্তবক হয়ে ফুটবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশা রাখি আর বেশি প্রশ্রয় দেবেন না নিজের নীতি বিগর্হিত বাচালতার। যাক্, দয়াবশতঃই এবার শাস্তি বিধান করা হল না আপনার।"

৩৯। হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন সকলে।

মুরলীর অপহরণ নিয়ে এই রণ, এই সাহস, এই হাসি, অবলাদের উপর এই বলপ্রয়োগ, এবং প্রেমোৎসবের চেয়েও অনেক বেশি উপভোগ্য এই অসম আমোদ ও সরস আহ্লাদ,...এক মধুর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল বনমালীর কাছে; তবুও তিনি পারলেন না...কিছুতেই পারলেন না... মন টলাতে মান ভাঙাতে মানিনীদের, তাঁর মণ্ডলের ঐ সাধের সুন্দরীদের। মনটা কেমন যেন নরম হয়েই গেল।

অতএব ক্রমশ তিনি একের পর এক উপস্থিত হতে লাগলেন তাঁর সখীদের কাছে। যেখানেই যান সেখানেই...প্রত্যাখ্যান! পাওয়া যায় না মুরলী, সখীরা যান এড়িয়ে। এমনি করে ঘরতে ঘরতে তিনি যখন ললিতার কাছে এসে পৌঁছুলেন, এবং যখন ভ্রমর-রীতিতে স্পর্শ করতে গেলেন সেই পদ্মটিকে, তখন হাসির দমকে একটু অসাবধানা হয়ে পড়া সত্ত্বেও, নবলব্ধ সৌভাগ্যের গর্বিত আনন্দে ললিতাদেবী...রসপাণ্ডিত্যে যিনি অতি ললিতা...তিনি নিঃসঙ্কোচ, যেন কৃষ্ণের স্পর্শ এড়াতে, পৌঁছে গেলেন বৃষভানুনন্দিনার বরাশ্রয়ে, এবং অলক্ষিতে তাঁর হাতে মুরলীটি সঁপে দিয়ে, ফিরে এসে নির্ভয়ে বলে উঠলেন,—

৪০-৪১। ভালবেসে রেসে অত আর হাসতে হবে না। ঠেলাটি বুঝতে পারবেন যদি আমাকে ছোন। দেমাকে আর পা পড়ে না। এই দেখুন আমার কাছে মুরলী নেই, মিথ্যুক নয় ললিতা।" বলতে বলতে তিনি নাড়াতে লাগলেন ওড়না; এবং হাসির ঝিলিকে জ্যোৎস্না হাসিয়ে পুনর্বার বলে উঠলেন,—

"ভালবাসায় মানুষ কি সব ভুলে যায়? মনে করে দেখুন, কুবেরের অনুচরের পিছনে আপনি ছুটছিলেন,...তখন মাটিতে পড়ে যায় নি তো আপনার ছোট বাঁশীটি? বৃথা, বৃথা, আপনার এই চোর খোঁজা এই পরমাসুন্দরীদের মধ্যে।'

কুসুমাসব ফিসফিস করে বললেন,—

'বুঝেছেন বয়স্য, সুন্দরীদের পরমাটিই তাহলে বেণুচোর।'

কৃষ্ণ বললেন,—

'হতেও পারে। বয়স্য কী উদ্ভট কী সূক্ষ্ম তোমার বুদ্ধি! পারিশেষ্য প্রমাণ বলে ঐ ওঁতেই তো গিয়ে শেষ হচ্ছে তর্ক। চল যাই, খোঁজা যাক।'

এই বলে পীতাম্বর যেই মণ্ডপ-নাট্যে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে এগোবার উপক্রম করলেন রাধার দিকে, অমনি তিনি সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন, যে মণিটি দাদাকে তিনি ভেট দিয়েছিলেন, সেই মণি, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির সিদ্ধির চেয়েও সুখদ সেই মণি, উঃ কি সুখরঞ্জন কি অনুপম তার জ্যোতি,...সেই মণিটিকে হাতে নিয়ে বলরামপ্রিয়া জনৈকা উৎসবরসিকা তাঁর রাধার সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন!

তারপরে কৃষ্ণ কানে শুনতে পেলেন, বলরাম-প্রিয়া তাঁর রাধাকে বলছেন,—

'অয়ি গুণ-গরবিনী রাধিকে, দামোদরের অগ্রজ এই মণিখানি আপনাকে উপহার পাঠিয়েছেন, গ্রহণ করুন।'

৪২। তারপরে কৃষ্ণ দেখতে পেলেন, বলরাম-প্রিয়ার নিবেদন শুনে খুসীতে ভরে উঠল রাধার অন্তর, হাসির কিরণ লাগল দন্তে, এবং মণিটি গ্রহণ করবার আগ্রহে যেই তিনি সত্বর প্রসারিত করলেন দুখানি ফুলের পাপড়ির মত করযুগ, আর মরি মরি, সুতরাং শিথিল হল যেই সুন্দরীর উত্তরী, অমনি...ওমা...ওকি...মাটিতে পড়ে গেল যে তাঁরি মুরলী।

৪৩-৪৪। দেখেই, হাসতে গিয়ে দেখলেন, সিঁদুরের মত টকটকে লাল হয়ে গেছে কুসুমাসবের বদন; ঘাড় ঘুরিয়ে বগল বাজিয়ে সাঙ্গভঙ্গে তিনি নাচছেন; সহচরদের সঙ্গে মিলে হি-হি করে হাসছেন; করতালির করতাল বাজিয়ে হৈ হৈ করে গাইছেন। হাসতে হাসতে কৃষ্ণ তখন ললিতাকে পরিহাস করে বললেন,—'বসি ও ললিতে, তখন আমায় আপনি বলেছিলেন...কুবেরের অনুচরের পিছনে ছুটতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেছে মুরলী। এখন দেখছি, যা বলেছিলেন, তা সত্যি। তা না হলে কি এমন হয়? বাৎসল্য-কুতূহলী আমার হলধারী দাদা আদর করে উপহার পাঠালেন মণি, আর যেই সেটি গৃহীত হল, অমনি অবহেলায় ক্ষুণ্ণ হয়ে সুতীব্র নবরোষে জ্বলে উঠলেন মুরলীদেবী। তিনি মান করে যে ভূতল-নিপতিতা হবেন...এতো হবারই কথা!'

কুসুমাসব বললেন,—'অহো অহো, আশ্চর্যের নয় কিছুই। প্রিয়-বয়স্যের আমার ছিদ্রহীন শুভবুদ্ধিটি এতই গভীর, যে শত চেষ্টা করেও গুরুদেব বৃহস্পতি নিজের বয়সকালে ডুব মেরে তল ছুঁতে পারলেন না সে সাগরের। সেই বুদ্ধিটিকে যিনি চুরি করেন, নবীন তস্কর-বিদ্যা-স্বরূপিনী সেই বৃষভানুনন্দিনী যে একটা ছেঁদো, অমঙ্গলে মুরলী চুরি করবেন, যা নিখিল জনমানসকে রসাতলে ডুবিয়ে মারবার একটি যন্ত্রবিশেষ, তাতে আর কপালে চোখ তোলার আছে কি! ওহে আমার তমালবরণ বন্ধু, তুলে নিন আপনার মুরলী। ভেবেছিলেন, আমি নিয়েছি; কিন্তু ভুল বয়স্য, ভুল। নীতির তো আপনার বালাই নেই।'

৪৫। বাঁশীখানি কুড়িয়ে নিয়ে কুসুমাসব সঁপে দিলেন কৃষ্ণের করকমলে। আদর করে দামোদর অধরে ধরলেন বাঁশরী। বাঁশী বাজলো। নিবিড় উল্লাসে ছড়িয়ে পড়ল আমোদের ফুলকি।

বাঁশী বাজলো। প্রেমে নির্বাক হয়ে গেলেন আনন্দময়ীরা। ভাবের অস্ফুট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, অঙ্গে অঙ্গে, আকারে-ইঙ্গিতে বিকশিত হয়ে উঠল বাসন্তী বর-লাবণ্য।

মহোৎসবের হল অবসান। [ক্রমশ।

ইতি মুরলীচৌর্যবিলাসো নাম একবিংশ স্তবকঃ।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বাতাসী মঞ্জিল

[৺নটবর মিত্রের ডায়েরী থেকে]

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিলাম সে আমার আপন হৃদযন্ত্রেরই ধুকধুকানি, কাহারও পদধ্বনি নহে। ভুল-ভঙ্গে মনটা খুশি হইল না, উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার মেয়াদ বাড়িয়া গেল। বড়ই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। সেই পরিস্থিতিতে নানারূপ চিন্তা আসিয়া মগজে ভিড় করিল।

ভাবিতে লাগিলাম সত্যই কি আলোতে আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া 'বিবিসাহেবা'র হুকুমে ভৃত্য এ ঘরের সমস্ত আলো নিবাইয়া দিয়া গেল? না কি ইহার পিছনে অন্য কোনো কারণ আছে? সে কারণটা কি আমার পক্ষে বিপজ্জনক বা উদ্বেগজনক? ব্যাপারটা একটু রহস্যময় মনে হইল। স্মরণ করিলাম বোম্‌ভোলা পাঠকের উক্তি। তিনি যাইবার সময়ে বলিয়া গিয়াছেন:

'আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ঠিক করিলাম নিশ্চিন্তই থাকিব। চিন্তা করিয়া যখন কোনো সুরাহা হইবে না, তখন নিশ্চিন্ত থাকিলে ক্ষতি কি? আরেকটা অদ্ভুত কথাও মনে পড়িল—বোমভোলা পাঠক আমার মুখের চেহারার সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহীদ ৺মঙ্গল পাণ্ডের মুখের চেহারার মিল দেখিতে পাইয়াছেন! কিন্তু তাহার সহিত আমার এই বাধ্যতা-মলক আতিথ্যের সম্পর্ক কি?

ঘরের ভিতরটা যতখানি সম্ভব চোখ বুলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না, কারণ বাহিরে চাঁদের আলো দেখা গেলেও সে আলো সোজাসুজি ঘরের ভিতরে ঢুকিতেছিল না। ঘরের ভিতর অতি আবছা আলো, অথবা ঝাপ্‌সা অন্ধকার।

আমি ধীরে ধীরে চোখ বুজিলাম। নির্ভাবনায়, বেশ আরাম করিয়া চোখ বুজিলাম। বোমভোলা পাঠকের দেওয়া আশ্বাসের সুরে সুর মিলাইয়া ভাবিলাম এখন আর আমার ভাবনা আমার নহে, আমি যাহার অতিথি, তাহার। অর্থাৎ বাতাসী বিবির।

কতক্ষণ ঐভাবে চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলাম বলিতে পারি না। ঘুমাইয়া পড়ি নাই, এইটুকুই বলিতে পারি। হয় তো বা আরেকটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িতাম, এমন সময় কেমন করিয়া জানি না, আমার শয্যার অনতিদূরে কাহার উপস্থিতি অনুভব করিলাম। সে যেন এক অতি রহস্যময়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। হয় তো আগন্তুকের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনি আমার কানে গিয়া থাকিবে। আমি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া প্রশ্ন করিলাম: 'কে?'

সুললিত বামাকণ্ঠে জবাব আসিল: 'আপনার বাঁদী, বাবুজি!'

এ ধরণের বিনয়-বিগলিত বুলি বহুদিন শুনি নাই। তাই বলিলাম, 'আমার বাঁদী???'

জবাব শুনিলাম, 'বাঁদীর নাম বাতাসী বিবি!'

চমকাইয়া উঠিয়া বলিলাম, 'বাতাসী বিবি!!!'

এতক্ষণ—কতক্ষণ জানি না—যাহার প্রতীক্ষায় শুইয়া ছিলাম, সেই রহস্যময়ী আমার অনতিদূরে! তাহার মোহময়ী কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, কিন্তু সেই কম আলো বেশি অন্ধকারে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না, ঝাপ্‌সা ছায়ামূর্তির মত দেখিতে

পাইতেছিলাম মাত্র। এইবার বুঝিলাম অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে বলিয়াই বাতাসী বিবি ভৃত্যকে হুকুম করিয়াছিল এ ঘরের সবগুলি আলো নিবাইয়া দিয়া যাইতে। ভাবিলাম সে কি কুরূপা বলিয়াই আলোতে আমার দৃষ্টিগোচর হইতে চাহে নাই? কিন্তু শুনিয়াছিলাম বাতাসী বিবি কোমলা সরলা অবলা না হইলেও তাহার রূপের অভাব নাই। তবে কি আমার চোখে সে রহস্যময়ী হইয়াই থাকিতে চায় বলিয়া তাহার এই অন্ধকারের আড়ালে আশ্রয়?

অসাধারণ ক্ষমতাবতী এই রমণীর এহেন বৈষ্ণব বিনয়ই বা কেন? নিজেকে আমার বাঁদী বলিয়া পরিচয় দিয়া সে কি আমাকে উপহাস করিতেছে? অথবা অতিথির প্রতি ইহা তাহার স্বাভাবিক সৌজন্য মাত্র!

অন্ধকারে তাহাকে দেখিতে পাইতেছিলাম না, দেখিবার জন্য দুই চোখ কৌতূহলে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল এইক্ষণে যদি একমুহূর্তের জন্যও বাহিরে বিদ্যুৎ চমকাইত তাহা হইলে বড় ভাল হইত, ঐ মুহূর্তের বৈদ্যুতিক আলোতেই ভয়ংকরী রহস্যময়ীকে দেখিয়া নিতাম। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাইল না। ঘরের ভিতরে ঝাপ্‌সা আলো-অন্ধকার রহস্যময়ীকে রহস্যের ঝাপ্‌সা আড়ালেই রাখিয়া দিল।

'বাবুজি এখন বেশ আরাম বোধ করিতেছেন তো?'

'হাঁ, বিবিসাহেবা।'

'বাঁদীকে সাহেবা বলিবেন না, বাবুজি। নাম ধরিয়াই ডাকিবেন। আপনার মুখে সাহেবা শুনিলে আমার বড় অপরাধ হইবে।'

এই কথাটা ভাঙাচোরা বাংলায় ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে বলিল বাতাসী বিবি। ঐ বিকৃত উচ্চারণই কানে বড় মধুর লাগিল। মুখে কিছু বলিলাম না। বাতাসী বিবি বলিল: 'আজ ভোরবেলা বড় ভয় পাইয়াছিলাম, বাবুজি। তারপর সারাদিন বড় ভয়ে ভয়ে কাটিয়াছে। বিকালবেলা হেকিম সাহেবের মুখে হাসি ফুটিল, তিনি বলিলেন বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, মোক্ষম দাওয়াই কাজ করিয়াছে, আর ভয় নাই। তিনি বলিলেন এইবার আপনাকে আপনার বাড়িতে পাঠানো যাইতে পারে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি, বাতাসী বিবি?'

নামটা উচ্চারণ করিব বলিয়া ভাবি নাই, আপনা হইতেই কিভাবে উচ্চারিত হইয়া গেল।

'আমিই আপনাকে যাইতে দিলাম না, বাবুজি।'

'কেন?'

'ভাবিলাম ঘরে আপনার বিবি নাই, একটা রাত্রি আপনি এখানে বিশ্রাম করিয়া গেলে কোনো লোকসান হইবে না। আমিও প্রাণে শান্তি পাইব। আমার অপরাধ নেবেন না, বাবুজি।'

বাতাসী বিবির কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। আমার ঘরের খবর তাহার অজানা নহে। বলিলাম. 'না না, অপরাধ কিসের?'

বাতাসী বিবি বলিল, 'এক হিসাবে আমিই আপনার এভাবে আহত হইবার জন্য দায়ী। কারণ আমাকে আপনার কুস্তি দেখাইবার জন্যই বাদশা পালোয়ান আপনাকে তাঁহার আখড়ায় নিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের গরজে নহে। আপনার কুস্তি আড়াল হইতে চুরি করিয়া দেখিলাম, কারণ পালোয়ানজী বলিয়াছিলেন, জেনানাকে দেখাইবার জন্য আপনি কুস্তি লড়িতে রাজি নহেন। আচ্ছা বাবুজি, জেনানা জাতটাকে কি আপনি তুচ্ছজ্ঞান করেন, ঘৃণা করেন?'

'ছি ছি, সে কি কথা? এই জেনানা জাতের একজনকেই তো বিবাহ করিয়াছিলাম। তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম, শ্রদ্ধাও করিতাম।'

বহুদিন বাদে মনোরমার কথা এই প্রথম মনে পড়িয়া বুকের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

বাতাসী বিবি সেই দীর্ঘশ্বাস লক্ষ্য করিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। সে বলিল, 'তবে জেনানার দৃষ্টিগোচরে কুস্তি লড়িতে আপনার আপত্তি কেন? তাহাতে কি আপনার কুস্তির মর্যাদাহানির আশঙ্কা?'

বলিলাম, 'মর্যাদাহানির প্রশ্ন নহে। কুস্তি অত্যন্ত রুক্ষ, কঠোর ব্যাপার, আর নারীজাতি স্বভাবত কোমল, কমনীয়—'

বাতাসী বিবির সুস্পষ্ট মৃদু হাসির আওয়াজ আমার বাক্য-সমাপ্তিতে বাধা দিল। বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, 'বাবুজি, জেনানা মাত্রেই নরম, দুর্বল, ভীরু, আপনার মনে এরূপ ধারণা হইল কেন? এই জেনানার হাতটি দয়া করিয়া একবার পরখ করিয়া দেখিবেন কি?'

বাতাসী বিবি তাহার বসিবার আসনটিকে টানিয়া আমার শয্যার আরো কাছে আগাইয়া আসিয়া আমার সামনে তাহার ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিল। লক্ষ্য করিলাম তাহার বসিবার আসনটি একটি আরাম-কেদারা, অথবা সোফা। এই সোফাটি কখন নিঃশব্দে এ ঘরে আসিয়া হাজির হইয়াছে টের পাই নাই। বাদশা পালোয়ান যে মোড়ার উপর বসিয়াছিলেন, বিবিসাহেবার বসিবার উপযোগী আসন সেটি নহে বলিয়াই এই সোফা আসিয়াছে।

বাহিরের চাঁদের আলো ঘরের ভিতর আরেকটু বেশি ঢুকিয়াছিল কি? না আমার চোখ দু'টি প্রায়ান্ধকার নামমাত্র আলোতে দেখিতে আরেকটু বেশি অভ্যস্ত হইয়াছিল? যাহাই হউক, সেই ক্ষীণ আলোতেও নিকটবর্তিনীর দিকে তাকাইয়া দেখিতে পারিলাম কোনো গাঢ় রঙের (সম্ভবত কৃষ্ণবর্ণ) দেহাবরণের তলায় তাহার সম্পূর্ণ দেহ গোপন, বোরখা-জাতীয় আবরণে মুখ ঢাকা, শুধু চোখ এবং নাক খোলা রহিয়াছে, মুখের চেহারা বা দেহের গঠন সম্বন্ধে কোনরূপ স্পষ্ট আন্দাজ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

আমার বুকের কাছাকাছি বাতাসী বিবির বাড়ানো ডান হাতের পাতা, ললিত ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় কর-কমল। আমি অস্বস্তিবোধ করিতেছিলাম। পর-নারীর হস্ত-ধারণে আমি অভ্যস্ত নহি। বিশেষ করিয়া এই রহস্যময়ী অপরিচিতার হাত ধরিবার জন্য আমার হাত উঠিতেছিল না।

বাতাসী বিবি আমার সংকোচকে ভয় বলিয়া ভুল করিল কি? তাহার হাসি শুনিয়া মনে সেই সন্দেহই হইল। বাতাসী বিবি বলিল, 'জেনানার হাত ধরিতে ভয় করিতেছেন, বাবুজি?'

'না না, ভয় করিব কেন?' বলিয়া আমার ডান হাতে বাতাসী বিবির ডান হাতটি গ্রহণ করিলাম, বাড়ানো হাত প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার অমর্যাদা করিতে মন সায় দিল না। হাতে

হাত মিলাইয়া বিস্মিত হইলাম। দস্যু-সর্দারণীসুলভ রুক্ষ-কঠিন হাত তো নয়, সে হাতে নারীহস্ত সুলভ কোমলতা, মসৃণতা, কমনীয়তার কিছুমাত্র অভাব নাই। কিন্তু ইহার পরই যে বিস্ময় অনুভব করিলাম, তাহা অন্যরূপ। বাতাসী বিবি তাহার হাত শক্ত করিয়া আমার হাতের উপর যে চাপ দিল, তাহা হইতে আমার কুস্তি-কশরং-অভ্যস্ত কঠিন হাতেও বুঝিতে পারিলাম ঐ আপাত-নারী-সুলভ হাত ইচ্ছামাত্রেই কত কঠিন, কত শক্তিমান হইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম হাতের কব্জিতেও অসাধারণ জোর বাতাসী বিবির।

'জেনানাকে খুব দুর্বল বলিয়া মনে হইল কি, বাবুজি?'

বলিলাম, 'না। বুঝিলাম জেনানা মাত্রেই দুর্বল নহে।'

বাতাসী বিবির হাত বাতাসী বিবি ফিরাইয়া নিয়া গেল, কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল আমার হাতে ঐ আশ্চর্য হাতের কোমল-কঠিন স্পর্শ যেন তখনও লাগিয়া রহিয়াছে। ভাবিলাম বাতাসী বিবিকে এ ভাবে আমার হাত ধরিতে দিয়া ভাল করি নাই, কারণ এ জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা নানারকমের তন্ত্রমন্ত্র তুকতাক জানে। কে জানে ঐভাবে একটা অজুহাতের ছল করিয়া আমার হাত-ধরা কোনরূপ তুকতাকেরই অঙ্গ কি না? এরূপ সন্দেহের কারণ এই যে, তাহার পর হইতেই বাতাসী বিবির প্রতি আগেকার বিরূপ ভাব আশ্চর্যরকম দূর হইয়া গেল। শুধু তাহাই নহে, তাহার কণ্ঠস্বরেও কি এক আশ্চর্য যাদু ছিল—জানি না, ঐ কণ্ঠস্বরের অধিকারিণীকে সাংঘাতিক স্ত্রীলোক বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন মনে হইল। কিন্তু, পরেই আবার ভাবিলাম, শয়তান প্রকৃতির লোকও যখন অতি অমায়িক হাসি হাসিয়া মন ভুলাইতে পারে, তখন ভীষণ প্রকৃতির স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরে মোহিনী-যাদু থাকিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? বরং ইহাও তাহার নানা অস্ত্রের অন্যতম অস্ত্র। যাহাই হউক, ঠিক করিলাম কণ্ঠস্বরের ছলনায় না ভুলিলেই হইল, কণ্ঠস্বর শুনিতে বাধা কি? ভাবিলাম ইহাকে আরো কথা বলাইতে হইবে।

কিন্তু বাতাসী বিবিকে কিভাবে সম্বোধন করিব? আপনি বলিব, না তুমি বলিব? বোমভোলা পাঠককে 'আপনি' সম্বোধন করিয়াছি, তিনি ব্রাহ্মণ এবং আমা হইতে বয়সে অনেক বড়। কিন্তু এই বাতাসী বিবি? উহার সঠিক বয়স জানা ছিল না, কণ্ঠস্বর শুনিয়া অনুমান করিলাম বয়স আমার অপেক্ষা বেশি নহে। আর মর্যাদা? একটা বিরাট বে-আইনী দলের অজ্ঞাতচরিত্রা সর্দারণীকে 'আপনি' বলিয়া সম্মান দিব আমি, বাংলার সেরা শহরের নামজাদা এ্যাটর্নী? কিন্তু আমি তাহাকে মর্যাদার যোগ্যা মনে না করিলেও এমন হইতে পারে যে তাহার আত্মমর্যাদার দম্ভ অতি প্রবল, আমি আমার মর্যাদার দম্ভে তাহাকে যথোচিত মর্যাদা না দিয়া ইচ্ছাপূর্বক তাহাকে অসম্মান করিতেছি, এরূপ সন্দেহ করিলে সে ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিতে পারে। মনে পড়িয়া গেল বাতাসী-চরিত্রে অভিজ্ঞ বোমভোলা পাঠকের হুঁশিয়ারি; তিনি বলিয়াছিলেন বাতাসী বিবির মত অদ্ভুত নারী-চরিত্রের সহিত আমার পরিচয় নাই, আমি যেন আমার নিজের অজানিতে ক্ষণিকের ভুলে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া না তুলি। মনে হইতে লাগিল আমার সম্মুখে যেন অজস্র বালু, তাহার মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে চোরাবালি আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে করিতে হইবে যেন চোরাবালিতে না পড়িয়া যাই। ভালয় ভালয় এখান হইতে বাহির হইতে না পারা পর্যন্ত খুবই সাবধান থাকিতে হইবে, বিবির আত্মমর্যাদাবোধে যেন ঘা না দিয়া বসি। তাই ভাবিলাম বাতাসী বিবির বয়স বা পদমর্যাদা সম্পর্কিত বিচারে আমার প্রয়োজন নাই, অপরিচিতা মহিলার প্রতি ভদ্রসমাজে যেরূপ সৌজন্য প্রদর্শন প্রচলিত আছে তাহাই করিব, বিবি সাহেবাকে 'আপনি' বলিয়াই সম্বোধন করিব।

বাতাসী বিবি বলিল, 'জেনানাটি এইরূপ জানিলে বোধ করি তাহাকে দেখাইবার জন্য কুস্তি লড়িতে আপত্তি করিতেন না?'

বলিলাম, 'বোধ হয় করিতাম না।'

কি করিতাম না করিতাম বিবেচনা না করিয়া যে উত্তর শুনিলে বাতাসী বিবি খুশি হইবে মনে হইল তাহাই দিলাম। বুঝিলাম উত্তরে যথার্থ কাজ হইয়াছে। বাতাসী বিবি খুশি হইয়াছে।

একটুক্ষণ চিন্তা করিয়া বাতাসী বিবি বলিল, 'বাবুজি, আমার অনেক কথা বলিবার আছে। অনেক ভিক্ষা চাহিবার আছে। প্রথম ভিক্ষা, স্যামসনকে আপনি তার বেইমানির জন্য দয়া করিয়া ক্ষমা করুন।'

চিন্তা না করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, 'দোষ করিয়া থাকিলে তাহাকে ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু স্যামসনের উপর আমি রাগ করি নাই, কারণ লড়াইতে অমন হইয়াই থাকে। আমারই বরং আরেকটু সতর্ক থাকা উচিত ছিল।'

'ঠিক বলিয়াছেন, বাবুজি। সেই অপরাধের শাস্তি আপনি স্যামসনের হাতে পাইয়াছেন এবং স্যামসন আপনার উপর যে বেইমানি করিয়াছিল তাহার শাস্তি আমি তাহাকে দিয়াছি। কিন্তু আপনার ক্ষমা না পাইলে সে তাহার পাপ হইতে মুক্তি পাইত না। আপনার বড় মেহেরবানি, বাবুজি।'

আমি যে স্যামসনকে ক্ষমা করিয়াছি সেজন্য যেন তাহার কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই, এইভাবে বাতাসী বিবি আমার ডান হাতটি তুলিয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে তাহার দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই যেন নিজের ছেলেমানুষিতে লজ্জা পাইয়া সে আমার হাত আমারি বিছানার উপর ফিরাইয়া দিল। আমি নিঃসন্দেহে অনুভব করিলাম ইহা তাহার মিথ্যা অভিনয় নহে, অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত অকপট অভিব্যক্তি। তাহার এই ক্ষণিক উচ্ছ্বাসের আকস্মিক বিজলী চমকে যেন এই রহস্যময়ীর হৃদয়-রহস্যের অনেকখানি এলাকা মুহূর্তেকের জন্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম স্যামসনের যাদুতে বাতাসী বিবির সারা হৃদয় আচ্ছন্ন, তাহার বুক চিরিয়া ফেলিলে দেখা যাইবে তাহার ভিতরে লেখা আছে স্যামসনের নাম; বেইমানির অমার্জনীয় অপরাধে স্যামসনকে নির্বাসন দণ্ড দিতে বাধ্য হইয়া বাতাসী বিবির সারা অন্তর হাহাকার করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, মনে হইল বাতাসী বিবির মনে একটা বদ্ধমূল সংস্কার আছে—তাহাকে কুসংস্কার বলিব কি না জানি না—যাহার ফলে তাহার ধারণা আমার ক্ষমা না পাইলে স্যামসন চির-অভিশপ্ত হইয়া থাকিবে, যে অবস্থাকে ইংরাজিতে বলে ইটার্ন্যাল ড্যামনেশন (eternal damnation)। অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া স্যামসনকে সেই ভয়াবহ 'ইটার্ন্যাল ড্যামনেশন' অর্থাৎ চির-অভিশপ্ততা হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছি, এ কারণে আমার প্রতি বাতাসী বিবির কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।

মুক্ত অঙ্গনে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা
—শম্ভু সাহা

হনুমানের স্বপ্ন

—শান্তিময় সান্যাল

গ্রীষ্মস্নান

—দেবু দাস

প্রাতরাশ
—অরুন্ধতী রায়চৌধুরী

তৃষিতা
—এস এম হায়দার

বন্যা প্লাবিত (মৃৎশিল্প) —শিল্পী শ্রীকান্থ পাল

বলিলাম, 'স্যামসনকে আমি ক্ষমা করিয়াছি, আপনিও শাস্তি ফিরাইয়া নিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন।'

বাতাসী বিবি যেন আহত হইয়া বলিল, 'বাঁদীকে 'আপনি' বলিয়া লজ্জা দিবেন না বাবুজি, মনে হইবে আমাকে উপহাস করিতেছেন।'

বলিলাম, 'ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। আমাকে মাফ কর। এ ভুল আর করিব না। কিন্তু স্যামসনকে যে শাস্তি দিয়াছ, তাহা তুমি ফিরাইয়া লও।'

বাতাসী বিবি ব্যথিত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, 'তা হয় না, বাবুজি। বাতাসী বিবি যে দণ্ড একবার দেয় তাহা আর ফিরাইয়া নেয় না। আপনি স্যামসনকে ক্ষমা করিয়া বড় ভাল করিয়াছেন, বাবুজি। নহিলে'—

—নহিলে কি হইত, বাতাসী বিবি তাহা বলিল না, আমি সে বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিতেও ভরসা পাইলাম না। কিন্তু অনুমান করিলাম তাহার নেকনজরের পাত্র স্যামসনকে আমি ক্ষমা না করিলে বাতাসী বিবি আমাকে ক্ষমা করিত না, দণ্ড বিধান করিত এবং সেই দণ্ড হইতে কিছুতেই আমাকে রেহাই দিত না। স্যামসনকে আমার যে ক্ষমা করিবার সুমতি হইয়াছিল সেজন্য ভাগ্যদেবতাকে ধন্যবাদ দিলাম। নহিলে এই ভয়ংকরীর বিধানে কি দুর্গতি ভোগ করিতে হইত কে জানে? তারপরই আমার মনে প্রশ্ন জাগিল: তবে কি আমার মুখ হইতে স্যামসনের ক্ষমা আদায় করিয়া নিবার জন্যই বাতাসী বিবি আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল? স্ত্রী-জাতির চরিত্রই রহস্যময়; এই জাতীয় স্ত্রীলোকের চরিত্র তো আরো বেশি রহস্যময়, সে রহস্য ভেদ করা আমার মত পুরুষ এ্যাটর্নীর কর্ম নহে।

স্যামসন-প্রসঙ্গ আবার তুলিতে যাইতেছিলাম, বাতাসী বিবি থামাইয়া দিল। বলিল, 'যে বাতিল হইয়া গিয়াছে সে বাতিলই হইয়া গিয়াছে, বাবুজি। উহার কথা আর নয়। বেইমানি করিয়া সে আপনার কাছে হারিয়া গিয়াছে।'

কুস্তির মাটির উপর স্যামসনের অখেলোয়াড়োচিত নোংরামির জন্য তাহার প্রতি ক্রোধ এবং ঘৃণা জন্মিয়াছিল বটে, তবু আমিই তাহার বড় ক্ষতির কারণ হইয়াছি জানিয়া আমার মন দুঃখ বোধ করিল এবং যে কারণেই হোক আমার প্রতি এই ভয়ংকরী রমণীর এত মনোযোগ আমার মানসিক অস্বস্তিরই কারণ হইল। কিন্তু অস্বস্তির ভাবটা যথাসাধ্য গোপন রাখিলাম, পাছে অস্বস্তি বোধ করিতেছি জানিলে বাতাসী বিবি অপমান বোধ করিয়া অসন্তুষ্ট এবং রুষ্ট হয়।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য বলিলাম, 'বাতাসী বিবি, এখন রাত কত? মধ্যরাত্রি কি?'

বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, 'চিন্তিত হইবেন না। মধ্যরাত্রির এখনো কিছু বাকি আছে।'

'আমি তোমার অসুবিধার কারণ হইয়া বড় সংকোচ বোধ করিতেছি, বাতাসী বিবি। তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাইতেছি। ঘুমের সময় হইয়াছে, ঘুমাইতে যাও।'

বাতাসী বিবি বলিল, 'আমি কি এখানে থাকিয়া আপনার
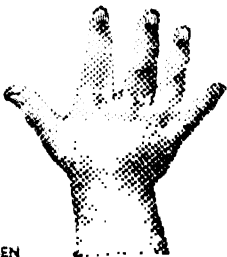
বিরক্তির কারণ হইতেছি, বাবুজি ?' তাহার কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বেদনার সুর—সেটা বাস্তব না অভিনীত বলিতে পারি না। যাহাই হউক, জ্ঞাতসারে কাহাকেও ব্যথা দেওয়া আমার স্বভাব বা পছন্দ নহে। বাতাসী বিবির—সে যতই ভয়ংকর চরিত্রের নারীই হোক না কেন—মনে ব্যথা দিয়াছি ভাবিয়া মনে ব্যথা পাইলাম।

বলিলাম, 'না না। একা পড়িয়া থাকিতাম, একজন কাছে থাকিলে, কথা বলিলে তো এ অবস্থায় ভালই লাগে। কিন্তু তোমার তো ঘুম আছে, বাতাসী বিবি ?'

'বাতাসী বিবির রাত জাগা অভ্যাস আছে বাবুজি।' মনে হইল বাতাসী বিবি পরম কৌতুকের চাপা হাসি হাসিতেছে। অবশ্য তাহা আমার কল্পনাও হইতে পারে।

বলিলাম, 'কিন্তু আমার জন্য রাত জাগিয়া তুমি শরীর খারাপ করিবে কেন, বাতাসী বিবি ?'

বাতাসী বিবি এইবার সত্য সত্যই হাসিল; ইহা নিঃসন্দেহে আমার কল্পনা নহে। বলিল, 'বাবুজি আমার শরীর দেখেন নাই, তাই অমন কথা বলিতেছেন। এ শরীর সহজে খারাপ হইবার নহে। তা ছাড়া আপনি আমার সম্মানিত অতিথি, না জানিয়া আমাকেই কুস্তি দেখাইতে আসিয়া বেইমানি আঘাতে আহত হইয়াছেন, আপনার জন্য আমি রাত জাগিব না তো কে জাগিবে, বাবুজি ?'

'কেন, তোমার তো দাস-দাসীর নিশ্চয়ই অভাব নাই, বাতাসী বিবি।'

'তা নাই সত্য। কিন্তু কোনো দাস বা দাসীর হাতে সম্মানিত অতিথিকে সারারাত দেখাশোনার ভার ছাড়িয়া দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবে, বাতাসী বিবিকে এমন বেতমিজ ভাবিতেছেন কেন, বাবুজি ?'

বলিয়া সামান্য কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়াই বাতাসী বিবি আবার বলিল, 'না না বাবুজি, আপনাকে অপর কাহারো হাতে রাখিয়া গেলে আমার সারারাত ঘুম হইবে না।'

বাতাসী বিবির ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল সে এ ঘরেই সারা রাত কাটাইবে। তবে কি আমার বিপদ আশংকার মেয়াদ কাটিয়া গিয়াছে, সে কথা সত্য নহে, আমাকে নিরুদ্বিগ্ন করিবার জন্য একটা ভাঁওতা মাত্র ? তবে কি রাত্রে আমার অবস্থা হঠাৎ খারাপের দিকে যাইতে পারে, হেকিম সাহেব বাতাসী বিবিকে সেইরূপ কোনো ইঙ্গিত দিয়াছেন, সেজন্যই বাতাসী বিবির এই উদ্বেগ ? সেইজন্যই সারারাত আমার শয্যার পাশে নিজে জাগিয়া আমার উপর নজর রাখিবে এবং প্রয়োজন বোধ হইলেই হেকিম সাহেবকে জাগাইয়া নিয়া আসিবে ? আসল ব্যাপারটা হয় তো তাহাই, বাতাসী বিবি আমার কাছে গোপন করিতেছে।

শুইয়া থাকিতে যে খুব খারাপ লাগিতেছিল এমন নহে, তবু নিজের অবস্থাটা একবার পরখ করিয়া দেখিবার জন্যই উঠিয়া বসিবার চেষ্টার উদ্যোগ করিলাম। উদ্যোগেই আমার চেষ্টা বন্ধ করিয়া দিয়া বাতাসী বিবি বলিল, 'উঠিবেন না বাবুজি। সাবধানের মার নাই। চল্লিশ ঘণ্টার মেয়াদ পার হইতে দিন।'

চেষ্টা বন্ধ করিলাম। বাতাসী বিবির কথা রাখিলাম। ভাবিলাম প্রবল প্রতাপান্বিতা গৃহকর্ত্রী যদি আমার তত্ত্বাবধানে থাকে, তাহা আমার পক্ষে ভালই, ঘুম পাইলে অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগে ঘুমাইয়া পড়া যাইবে। কিন্তু আরামপ্রদ শয্যায় আমি পরম আরামে নিদ্রা উপভোগ করিব, আর আমার শয্যাপার্শ্বে সোফায় বসিয়া বসিয়া আমার আশ্রয়দাত্রী গৃহস্বামিনী সারারাত জাগিয়া কাটাইবে, একথা ভাবিয়াও বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

আলস্যের এমন আশ্চর্য মাধুরী বহুদিন উপভোগ করি নাই। তাহারই নরম হাতে নিজেকে পুরাপুরি সঁপিয়া দিলাম। স্তব্ধ নিশীথ রাত্রি; গৃহের অন্যান্য সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই সন্দেহ হইতেছিল, নীরবতা এমনই গভীর। আকাশে চাঁদের অবস্থান পরিবর্তনের ফলে ঘরের ভিতর চাঁদের আলো ঢুকিয়া তাহার কিঞ্চিৎ আভাস রহস্যাবৃতা বাতাসী বিবির নাগাল পাইয়াছিল। ফলে যাহার কণ্ঠমাধুর্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহাকে চাক্ষুষ দেখিবার কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল। আমি বাতাসী বিবির বসনাবৃত মুখের দিকে তাকাইলাম।

[ক্রমশ।

ঐ প্রেম আজ নয়

দিলীপ দাশগুপ্ত

স্থিরদৃষ্টি পাতে দেখ, এই চোখে জ্বলে কোন আলো,
চাঁদ-ফুল-হাসি-গান অকস্মাৎ কে যেন নিভালো!
কে যেন অদৃশ্য হাতে মুছে দিয়ে মুখের প্রলেপ
বলিরেখাসমন্বিত আমার 'মমি'-কে অনিমেষ
দেখে নিয়ে স্থিরপ্রাজ্ঞ। তাই যেন অশান্তের ডাকে
ফাগুনকে পায়ে দলে' রুদ্রবেশে প্রচণ্ড বৈশাখে
গর্ভবতী কুমারীর জীবনের ট্র্যাজেডিকে নিয়ে
অতীতের সোনারাঙা আশাদীপ্ত দিনকে উড়িয়ে
হয়েছে যে সিদ্ধকাম। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে
আশ্বিনের মহোৎসবে সর্বার্থক ধন্য-গণ্য পণে

পেয়েছি পরমধন—সেই ধন যদি পারো নিতে
সবকিছু পার হয়ে এসো তুমি ঐ প্রেম দিতে।
এতদিন মেরু-শৈত্য প্রেম যেন পঙ্গু করে ধরে!
সূর্যস্নানে মোহমুক্ত আজ তাই মহাসমাদরে
পেতে চাই দেশপ্রেমে অভিষিক্তা অনন্যা সে নারী,
মধুময়ী-আত্মশ্রী-ধ্যাননম্রা আমি হবো তার-ই
একান্তসচিব-মিত্র শ্মশানে ও প্রমোদ-বাসরে।
আত্মা তাই বারবার দেহপ্রান্তে বহুবার মরে
অমরত্ব চেয়ে চেয়ে। আমি তবু তত্ত্বতীর্থে বসে
দেখছি অপরাজিতা স্বর্গ থেকে কার পড়ে খসে'।

মনরো-মিলার সাক্ষাৎকার-৫

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হেনরি ব্রাণ্ডন

ব্রাণ্ডন। আমেরিকার থিয়েটারের কোন ধর্মীয় সন্তোষ নেই। এর কি কোন ব্যাখ্যা আছে।

মিলার। আমি জানি না—তবে আমেরিকান মনের ভেদচ্ছেদে সম্ভবপর সূত্র থাকতে পারে। শুনেছি আমেরিকান লোকদের শতকরা নব্বই জন গির্জায় যায় অথবা গির্জার সভ্য। ইতিহাসে আমরাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি গির্জায় গমনেচ্ছু জাতি। কিন্তু গির্জায় যাওয়া এক কথা এবং সে ভাবে ভাবা অর্থাৎ সচেতনভাবে জীবনের গূঢ় অর্থ খোঁজা আর এক কথা—আর কোন বস্তুতান্ত্রিক অর্থনৈতিক জীবনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই রকম বাস্তববাদী, দক্ষ জাত আর পাওয়া যাবে না।

সেই সত্যকে উপশম অথবা সমর্থন করবার কোন চেষ্টা নেই। এটা অর্থনৈতিক জীবনের দিকে ব্যবহারিকভাবে অগ্রসর হওয়া।

কিন্তু, রবিবার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বদলে যায়। কয়েকঘণ্টার জন্য আমরা লাভ ও ক্ষতির কথা ভুলে যাই—এবং শুভ চিন্তা করি। এভাবে কাটানো জীবনে ধর্মের আদর্শবাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না—শুধুমাত্র সপ্তাহে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়া।

এখন, স্বভাবতই আমাদের নাটক সেই জীবনযাত্রার রীতিই প্রতিফলিত করবে। আমেরিকার লোকদের থিওরী সৃষ্টির ধৈর্য নেই। এইমাত্র আমি যা বললাম—ধর্ম হচ্ছে রবিবারের, বাকি সপ্তাহ লোকে আর কিছু করে—তার মধ্যে ওরা কোন পরস্পরবিরোধী ভাব দেখতে পায় না। ওদের মতে এতে কোন ভুল নেই। আমাদের রঙ্গমঞ্চের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এলো যখন ক্রমবর্ধমান এই উদ্ভট পরস্পর বিরোধিতাকে নাটকের ক্ষুদ্রাকারে সূত্র যা কিছু ভালো যা কিছু মন্দ দেখায় স্থান দেওয়া সম্ভব হয় নি। মন্দ প্রলোভগুলি এতো বিস্তারিত ও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমাদের নায়কের শত্রুদের আমরা ধরে নিয়েছি—যেন ওর শত্রুর অদৃশ্য। হতভাগ্য নায়ক হতভাগ্যরূপেই সামনে উপস্থিত হয়।

মানব তার পারিপার্শ্বিকতার এমন মগ্ন হয়ে উঠেছে যে, আমরা তার সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই জানতে পারি না। প্রায় প্রতিটি প্রসিদ্ধ নাটকের গল্পই হলো যে কি করে প্রধান চরিত্রগুলি তাদের দোষগুলি থেকে মুক্ত হলো। ও'নীল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আমাদের প্রধান ধারা পূর্ণতার প্রশ্নের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। শুধুমাত্র নীতিগত পূর্ণতা নয়—ব্যক্তিত্বের পূর্ণতাও। সেই সমগ্রতা সাধনে যা বাধা দিচ্ছে সেই শক্তি খুঁজে বের করা কঠিন। আমাকে বিশ্বাস করে নিতে হবে যে, তারা আছে এবং তাদের আবরণ উন্মোচন করা যায়। শুধুমাত্র অনুসন্ধানের সূত্র থাকাই সব নয়। তার একটা কারণ এই যে এটা খুব বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। অন্ততপক্ষে পুরনো কথা ফিরে বলা প্রয়োজন।

এই রকম মানসিক অবস্থায় আমি 'দি ক্রুসিবল' লিখেছিলাম। ঘটনাক্রমে ম্যাকার্থিজমের সময়ে এটা ঘটেছিল যখন এক ধরণের ব্যক্তিত্বের বিচূর্ণন আবার আমাদের মধ্যে বিরাজিত ছিল। এতে আমি পুরাতন সৌন্দর্যময় এবং নাট্যোচিত শৃঙ্খলা পুনর্জীবিত করতে চেষ্টা করেছিলাম—বলতে চেয়েছিলাম যদি সে নিজে সাধারণ অপরাধে অপরাধী হয় তবুও কেউ হাত-পা গুটিয়ে বসে নিজের সৃষ্ট জগতকে ধ্বংস হতে দিতে পারে না। আমি একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে আহ্বান করতে চেয়েছিলাম, আমি বলতে চেয়েছিলাম অন্যায়েরও কতগুলি দিক আছে এবং আমাদের জগতের নিরবয়বতার কারণ এই যে আমরা ভয়ে এর সুন্দর রেখাগুলি খুলে ধরতে পারি না।

মনরো—বিভিন্ন ভঙ্গীতে

চল্লিশের নাটকগুলি যা জগতে আত্মবিশ্লেষণ নিয়ে শুরু হয়েছিল ক্রমে জগতকেই বাদ দেবার কৌশল আয়ত্ত করে। অর্থনীতি রাজনীতি

নর্তকী মনরো

এইসবই বিষয়বস্তু হয়। এইভাবেই আত্মকরুণা ভাবপ্রবণতা ও যৌন-অনুভূতিবাদ শুরু হয়। এ হচ্ছে নাটকের মধ্যেই প্রতি নাটক এবং এতে অনেক বড় বড় লোকের মতবাদের ছায়া আছে—যাঁরা অনুভব করেন যে, জীবনের গতি বর্তমানে এইরকম। চরিত্রগুলি অত্যাচারিত কিন্তু অত্যাচারীর হদিস মিলছে না—হয় তো সে সেখানে নেইই। আমার মনে হয় যারা এই প্রকার বাতাস আমাদের মধ্যে ছড়াচ্ছে তাদের সঙ্গে বাজী ধরে আরও সুন্দর কাঠামো সৃষ্টি করি।

ব্রাগুন। আমেরিকার নাট্যসাহিত্য অত্যন্ত অর্বাচীন। আপনি এর পরিবাদ কি করে দেখলেন!

মিলার। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত আমাদের সামান্য কয়েকটি দিশী নাটক ছিল। তার মানে হচ্ছে যে, আমেরিকার হাবভাব, আমেরিকার জীবন কোনরকমে রঙ্গমঞ্চে বেঁচে ছিল। জীবনের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের কোন সম্পর্ক ছিল না। নাটকগুলি, দু'একটি বাদে সবই অতি-নাটকীয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এই দেশে প্রকৃত আধুনিক নাটক সৃষ্টি করবার চেষ্টা হলো—যে নাটকে সমকালীন জীবনের ছাপ পড়ে এবং আমার মতে ও'নীলকে এই প্রধান স্রোতের একপাশে রেখে দেওয়া উচিত। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য প্রায় আর সব লেখকদের মতো ঘটনার সাংবাদিক রিপোর্ট নয়।

ব্রাগুন। কাদের কথা বলতে চাইছেন!

মিলার। যেমন, 'হোয়াট প্রাইস গ্লোরী', 'স্যাণ্ড পেজ' ষ্ট্রীট সীনে'র খুব প্রভাব ছিল। সেই প্রথম শ্রদ্ধাহীনতার সুর শুরু হলো যা বর্তমানে যুক্তরাজ্যে খুব-ই চলছে। ভাবপ্রবণ আদর্শবাদের পুরাতন হুকুম বাতিল হয়ে গেল। সেই প্রথম রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধ পুরাতন নাটকের দৃষ্টিভঙ্গী—যা একে কোন না কোনভাবে গৌরবমণ্ডিত করে তুলতো—ছাড়া বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। যুদ্ধকে খুব সহজ সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা আরম্ভ হোল—যেন একটা নোংরা ব্যাপার। একটা নূতন ভাব—প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, সমসাময়িককে ব্যঙ্গ এবং উল্লাস সাহিত্যে প্রবেশ করলো।

আমার মনে হয় স্বভাববিদ বেলাস্কো প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন—যাঁকে আমাদের পায়ের কড়ার মতো মনে হয়, কারণ তাঁর প্লটগুলি রীতিমতো ভীতিপ্রদ··তাঁর নাটকে অনেক দৃশ্য আছে—নায়ককে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে এমন সময়ে নায়িকা একটা আমেরিকার পতাকা হাতে নিয়ে ছুটে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো ও সেটা তার ওপরে ছুড়ে দিল এবং স্বভাবতই যুক্তপ্রদেশীয় সৈন্যরা পতাকার ওপর দিয়ে গুলী করতে পারলো না। এইভাবেই নাটকের উপসংহার হোল, যা হোক নাটক প্রযোজনা করতে তিনি প্রচুর স্বাভাবিক জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি রঙ্গমঞ্চে আগ্নেয়গিরি করেছিলেন; জলপ্রপাত করেছিলেন; এবং তিনি শিশুদের রেস্টুরেণ্ট নামক একটা জিনিস করেছিলেন তাতে 'মিন্সপাই'র ওপরে মাছিটিও ছিল। এখন এসব নিয়ে কথা বলা বোকামী—শুধু এটুকু বলতে পারি যে, স্টানিস্লাভস্কি এটা দেখেছিলেন এবং অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বেলাস্কোকে খুব বড় পরিচালক ভাবতেন। তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন গল্প ও চরিত্রগুলির অস্বাভাবিকত্ব সত্ত্বেও স্বাভাবিকতার জন্য—এবং তা তদানীন্তন উচ্ছ্বাসপ্রধান, ভাবাতিরেকভরা অভিনয়ের একদম উল্টো।

…বস্তু বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম—তা তদানীন্তন জীবনযাত্রানুযায়ী। …ক চরিত্রগুলি কিম্ভূত। ওরা অকিঞ্চিৎকর কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি ওদের এমনভাবে পরিচালনা করেছেন যেন ওরা খুব সুখী এবং তিনি ওদের দিয়ে সামাজিক টীকা-টিপ্পনী ও নীতিগত গল্প বলিয়েছেন। …হোক তিনি একটা যন্ত্র নিয়েছিলেন যা আমেরিকার রঙ্গমঞ্চে ছিল—…শোবাদ অভিনেতা যদিও তা তাঁর হাতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বেজেছিল। এর পরে যা হয়েছে তা অন্য গল্প—যা দিন দিন-ই দর্শকদের পরিচিত জগতের কাছাকাছি থাকছিল। রবার্ট শেরউড, ম্যাক্সওয়েল এণ্ডারসন, এস এন বেরম্যান, ফিলিপ ব্যারী, এল্মার রাইস, জর্জ কেলী, সিডনী হাওয়ার্ড এরা সকলেই আরম্ভ করেছে অথবা তাদের মূল বিংশ শতাব্দীতে আছে। ওরা যুগকে টেনে এনেছে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—বানু ভৌমিক

প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ভারতীয় মনীষার অবিস্মরণীয় অবদান সংস্কৃত সাহিত্য। সংস্কৃত সাহিত্যের রসধারা আকণ্ঠ পান ক'রে নিখিল বিশ্বের নিরবধিকালের রসিকসমাজ আজও সন্তুষ্ট। বিখ্যাত বিদেশী মনীষী আচার্য হোরেস্ হেমান উইল্সনের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে উক্তিটি বিশেষ স্মরণীয়—

'ন জানে বিদ্যতে কিং তন্ মাধুর্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্॥
যাবৎ ভারতবর্ষং স্যাদ যাবদ বিন্ধ্য-হিমাচলৌ।
যাবদ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্।

সংস্কৃত আলংকারিকরা কাব্যকে দৃশ্য এবং শ্রব্যভেদে মোটামুটি দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই দৃশ্যকাব্যকেই আমরা সাধারণত বাংলায় নাটক বলে চিহ্নিত করি। কাব্যতাত্ত্বিকদের ভাষায় দৃশ্যকাব্যকে বলা হয় রূপক। নায়ক-নায়িকা, বিষয়বস্তু এবং রসের পার্থক্য অনুসারে সংস্কৃতে দশপ্রকারের রূপক রয়েছে, নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ঈহামৃগ, অংক, বীথি এবং প্রহসন যার অন্যতম হচ্ছে নাটক। অভিনয়ের মাধ্যমে ঘটনাকে রূপায়িত করে তোলার জন্যই দৃশ্যকাব্যকে বলা হয় রূপক—'রূপারোপাত্তু রূপকম্'—এই হোল বিশ্বনাথের বিশ্লেষণ।

জীবনের জীবন্ত অনুকরণ বলেই নাটক শ্রেষ্ঠকাব্য। আমাদের আলংকারিকরা বলেছেন—'অবস্থানুকৃতির্নাট্যম্', বলেছেন—'লোকবৃত্তানুকরণম্'। নাটকের লক্ষ্য—চরিত্রের বিকাশ, যার আত্মপ্রকাশ হল আচরণে। সমাজে ও সংসারে নিজেকে সাধ্যমত সংযত করে রাখার চেষ্টা করে মানুষ। কিন্তু, সে স্বতন্ত্র হয়েও কোন্ এক অদৃশ্য দৈবশক্তির অধীন। স্বভাবের প্রেরণা, প্রবৃত্তির উত্তেজনা, রিপুর দুরন্ত আবেগ মানুষের সংযমের বাঁধকে যখন তৃণের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং বাইরের বাধায় প্রবলতর হয়ে ওঠে, চরিত্র তখনি হয় নাটকীয় বিকাশের উপযোগী। ঘটনাচক্রে মানুষ এমন বিষম সমস্যায় পতিত হয় যে, তার একটিমাত্র পদক্ষেপে সমগ্র জীবনের গতি নির্ধারিত হয়ে যায়। এই প্রথম পদক্ষেপেই নাটকের সূচনা। সমগ্র নাটকটি সেই এক মুহূর্তের পল্লবিত বিকাশ।

জীবনের কর্মক্ষেত্রে কর্মফল অলংঘনীয়। এই জগতে কার্য এবং কারণ দুচ্ছেদ্য শৃংখলে বাঁধা। বিনা উদ্দেশ্যে মানুষ কোনো কাজই করে না এবং শুভাশুভ আচরণে সে আপনার পরিণাম আপনিই ডেকে আনে। নাট্যকার সংসারের এই চিত্রটিই অংকিত করেন। জটিল সমস্যার সংকল্প-বিকল্পে মনের হেলাদোলা, উভয় সংকটে অন্তর্দ্বন্দ্ব, জীবনের সঙ্কটসংকুল পথ নির্বাচন, সংশয়ে নিশ্চয় নিরূপণ, দ্বিধায় কর্তব্য-বিমূঢ়তা, অবস্থার এবং চরিত্রে এই রকমের দ্বন্দ্ব-সৃষ্টিই নাটকের মজ্জাগত প্রাণ। আশায়-নিরাশায়, ভয়ে-ভরসায়, হর্ষ-বিমর্ষে, অপূর্ব ছায়ালোক-সম্পাতে, অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে, পুরুষকারের প্রচেষ্টায়, দৈবের নির্বন্ধে, বিচিত্র ছন্দে নাটকীয় কাহিনীর বিকাশ। ঘটনায় অনুকূল ও প্রতিকূল আচরণে নাটকীয় গল্পের সৃষ্টি, অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকীয় রসের পুষ্টি। কখিতে, ঘটনাবৈচিত্র্যে, চরিত্র-চিত্রে বিপরীত ও বিসদৃশের সমাবেশ ঘটিয়ে নাট্যকার দর্শকের কল্পনা, কৌতূহল এবং সহানুভূতি করেন উদ্রিক্ত। তখন, রজ্জুতে সর্পভ্রমের

'নিশাচর'-এর সহ নায়িকার ভূমিকায় মনীষা অধিকারী।

মতো নকল আসলের সংগে সমভাবাপন্ন হ'য়ে ওঠে এবং সত্যের সংসারে যে নগ্নচিত্র সাধারণত দর্শকের চিত্তকে আকর্ষণ করে না, কবিত্বের প্রভাবে, কল্পনার পরিচ্ছদে রংগমঞ্চে তাই সুন্দরতররূপে প্রতীয়মান হয়।

দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে অভিনীত হওয়ার মাধ্যমেই নাটকের সার্থকতা। এই অভিনয় প্রদর্শনের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ ও রংগমঞ্চ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন প্রাচীন ভারতীয় মনীষার অতুলনীয় অবদান শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়, তেমনি এই প্রেক্ষাগৃহ এবং মঞ্চকল্পনার ক্ষেত্রেও তাঁদের সুগভীর চিন্তা এবং অভূতপূর্ব রসসৃষ্টি আজও বিস্ময়ের সঞ্চার করে। যদিও আমাদের আধুনিক রংগমঞ্চ তৈরি হয়েছে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, তবুও ভারতীয় রংগমঞ্চের ইতিহাস সুরু হয়েছে প্রায় স্মরণাতীতকাল থেকেই। কালের করাল আক্রমণে এবং বৈদেশিক আক্রমণকারীদের উন্মত্ত তাণ্ডবে প্রাচীন ভারতের বহু অমূল্য নিদর্শন ধ্বংস হয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদ এবং দেবমন্দিরের সন্নিধানেই তৎকালে সাধারণত রংগমঞ্চ নির্মিত হ'ত। আর রাজপ্রাসাদ ধ্বংস এবং দেবমন্দির ধুলিসাৎ করার মধ্যেই এই বর্বর আক্রমণকারীরা পেতো সর্বাধিক আনন্দ। ফলে, সভ্যতার এই শত্রুদের নির্মম অত্যাচারে প্রাচীন ভারতের কোনো সুগঠিত রংগমঞ্চের অস্তিত্ব বর্তমানকাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে নি। মন্দিরে-মন্দিরে তখন থাকতো সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। সেই সবও ভস্মীভূত করে তাঁরা অনুভব করেছেন পৈশাচিক আনন্দ। ফলে, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অগণিত গ্রন্থগত এবং বাস্তব নিদর্শন আজ বিলুপ্ত। তবুও এই সব বিপর্যয়ের হাত এড়িয়ে পল্লীতে-পল্লীতে বৈভবরিক্ত বিদ্যাব্যসনী যে সংস্কৃতপণ্ডিতবর্গ প্রাচীন বিদ্যার ধারাকে নিজেদের জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করে চলেছিলেন, তাঁদেরি কাছে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থমালা আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রধানত সেগুলোই ঘোষণা করছে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অতুলনীয় সমৃদ্ধির কথা।

বাংলার প্রবীণ [illegible] প্রদীপকুমার

নাট্যকলা নিয়ে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, শারদাতনয়ের ভাবপ্রকাশ, নারদের সংগীতমকরন্দ, ভোজের সমরাংগনসূত্রধার, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, বাসবরাজের শিবতত্ত্বরত্নাকর, ধনঞ্জয়ের দশরূপক, বিশ্বনাথের সাহিত্য-দর্পণ, মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থমালার মধ্যে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ হচ্ছে আচার্য ভরত রচিত 'নাট্যশাস্ত্র'। দৃশ্যকাব্য, শ্রব্যকাব্য, সংগীত এবং নৃত্যসম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-সমন্বিত এমন অপূর্ব একটি পূর্ণাংগ গ্রন্থ জগতে দুর্লভ। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক হ'তে খৃষ্টীয় ৩য় শতকের মধ্যে এই গ্রন্থটি রচিত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এই গ্রন্থপাঠেই জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে সুপরিকল্পিত প্রেক্ষাগৃহ এবং সুপরিণত রংগমঞ্চ অভিনয়কালে ব্যবহৃত হত। নাট্যশাস্ত্রই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার যথাযথ অনুশীলন হত, নাট্যাভিনয়ের সমুন্নত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং প্রেক্ষাগৃহ ও রংগমঞ্চের গঠনকৌশলে সাধিত হয়েছিল যথেষ্ট উৎকর্ষ। সুতরাং অন্তত দুই সহস্র বৎসর পূর্বের সমুন্নত ভারতীয় নাট্যকলার গৌরবময় উত্তরাধিকার আমরা বহন করে চলেছি। এইজন্যে আমরা যথার্থ গৌরব অনুভব করতে পারি। পরবর্তীকালে নাট্যকলার এই ধারা যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করেছিল, অবশ্য ভারত যতদিন স্বাধীন ছিল। নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরণ করে অসংখ্য অলংকার গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং তাদের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যকলার যথেষ্ট আলোচনা। সেই সব গ্রন্থে কোথাও কোথাও তত্ত্বগত মতভেদ থাকলেও সবাই মোটামুটি আচার্য ভরতপ্রবর্তিত পন্থাই কিন্তু অনুসরণ করেছেন।

তাই আচার্য ভরতপ্রোক্ত রংগমঞ্চের বিবরণেই বর্তমান আলোচনা অনেকটা সীমিত। মঞ্চাভিনেয় নাটককে ভারতীয় সমাজে যথেষ্ট সম্মান দান করা হ'য়েছিল, দান করা হ'য়েছিল সর্বজনমান্য বেদের মর্যাদা। আচার্য ভরতের মতানুসারে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য চতুর্বেদের জ্ঞান হ'তে বঞ্চিত জনসাধারণকে চতুর্বেদ-নিহিত জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ধর্মার্থযশস্কর, উপদেশসমন্বিত, সর্বশাস্ত্রার্থ সম্পন্ন এবং সর্বশিল্পপ্রবর্তক 'নাট্যবেদ' নামক পঞ্চমবেদ সৃষ্টি করেন।—

'ধর্মমর্থং যশস্যং'চ সোপদেশ্যং সসংগ্রহম্।
ভবিষ্যতশ্চ লোকস্য সর্বকর্মানুদর্শকম্॥
সর্বশাস্ত্রার্থসম্পন্নং সর্বশিল্পপ্রবর্তকম্।
নাট্যাখ্যং পঞ্চমংবেদ সেতিহাসং করোম্যহম্।
এবং সংকল্প ভগবান্ সর্ববেদাননুস্মরণ।
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাংগসম্ভবম্।
জগ্রাহ পাঠ্যম্ ঋগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বনাদপি।
বেদোপবেদৈঃ সম্বদ্ধো নাট্যবেদো মহাত্মনা।
এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মণা সর্ববেদিনা।' (না-শা ১।১৪-১৮)

এই পবিত্র নাট্যবিদ্যাকে তিনি তেরোটি ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন। নাট্যবিদ্যায় পারদর্শী হ'তে হ'লে এই ত্রয়োদশবিষয়ে জ্ঞানার্জন অপরিহার্য।

'রসাভাবা হ্যভিনয়াঃ ধর্মীবৃত্তি প্রবৃত্তয়ঃ।
সিদ্ধিঃ স্বরাস্তথাতোত্তং গানং রংগশ্চ সংগ্রহঃ।
উপচারস্তথা বিপ্রা মণ্ডপাশ্চেতি সর্বশঃ।
ত্রয়োদশবিধো জ্ঞেয়ঃ হ্যাদিষ্টো নাট্যসংগ্রহঃ।'

(১) রস, (২) ভাব, (৩) অভিনয়, (৪) ধর্মী, (৫) বৃত্তি, (৬) প্রবৃত্তি, (৭) সিদ্ধি, (৮) স্বর, (৯) আতোদ্য, (১০) গান, (১১) রংগ, (১২) উপচার, (১৩) মণ্ডপ—এই তেরোটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ ক'রলে পূর্ণ হয় নাট্যবিদ্যা-শিক্ষা।

(১) শৃংগার, হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত—এই আটটি হ'ল নাট্যরস। (২) রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা এবং বিস্ময়—এই আটটি হ'ল স্থায়ী ভাব। নির্বেদ, গ্লানি, শংকা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্ত, বিবোধ, অমর্ষ, অবহিত্থা, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক প্রভৃতি ৩৩টি হ'ল ব্যভিচারী ভাব। আর স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভংগ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়—এই আটটি হ'ল সাত্ত্বিক ভাব—অর্থাৎ মোট ৪৯টি হ'ল ভাব। (৩) আংগিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক এই চার প্রকারের হ'ল অভিনয়। (৪) লোকধর্মী এবং নাট্যধর্মী এই দুই প্রকারের হ'ল ধর্মী। (৫) ভারতী, সাত্বতী, কৈশিকী আরভটী—এই চারটি হ'ল বৃত্তি। (৬) আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, ওড্র, মাগধী, পাঞ্চালী এবং মধ্যমা এই পাঁচ প্রকারের হ'ল প্রবৃত্তি। (৭) সিদ্ধি হ'চ্ছে দৈবিকী এবং মানুষী এই দুই প্রকারের। (৮) ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত পঞ্চম এবং নিষাদ এই সপ্তবিধ হ'ল স্বর। (৯) তত, অবনদ্ধ, ঘন এবং সুষির—এই চার প্রকারের হ'ল আতোদ্য বা বাদ্য। (১০) প্রবেশ, আক্ষেপ, নিষ্ক্রাম, প্রাসাদিক এবং অন্তর—এই পাঁচ প্রকারের হ'ল গান। (১১) রংগ বিজ্ঞান (১২) বাহ্য ও আভ্যন্তর—এই দুই প্রকার হ'ল উপচার। (১৩) বিকৃষ্ট, চতুরস্র এবং ত্র্যস্র—এই তিন প্রকারের হ'ল রংগমণ্ডপ। আরো নানা বিভাগসমৃদ্ধ হ'চ্ছে এই অখিল নাট্যবিদ্যা।

এখন প্রাচীন ভারতীয় রংগমঞ্চের বিশিষ্ট রূপটি জানতে হ'লে তার কতকগুলি অংশ রংগপীঠ, রংগশীর্ষ, নেপথ্য, মত্তবারণী এবং প্রেক্ষামণ্ডপ সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। এই পাঁচটি অংশ নিয়ে আচার্য ভরত যথেষ্ট আলোচনা ক'রেছেন। নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার, সুবিখ্যাত রসভাষ্যকার আচার্য অভিনব গুপ্ত তাঁর ভাষ্য 'অভিনবভারতীতে' ভরতের উক্তির যথাযথ বিশ্লেষণ ক'রেছেন। দীর্ঘকালের ব্যবধান এবং সেই প্রাচীনবিদ্যার ধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে মহর্ষি ভরতের কোনো কোনো উক্তি এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তাই সেই সব স্থলে মতভেদের সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। তবে মহর্ষির মূল উক্তি, আচার্য অভিনব গুপ্তের ভাষ্য এবং প্রাপ্ত নাটকাবলীর নাটকীয় নির্দেশাদি আলোচনা করে প্রাচীন ভারতীয় রংগমঞ্চের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা যাক্।

নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায় নাট্যগৃহ নির্মাণের একটি পৌরাণিক ইতিহাস মেলে। মহেন্দ্রবিজয়োৎসবে দেবাসুর যুদ্ধের অনুকৃতিকে অবলম্বন ক'রে যখন প্রথম নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল, তখন অসুরেরা বিঘ্ন উৎপাদন ক'রে অভিনয় পণ্ড ক'রে দেয়। এই বিঘ্নকারীরা রংগপীঠের ওপর আরোহণ ক'রে সূত্রধার এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রহার ক'রে সংজ্ঞাহীন ক'রে দিয়েছিল। তখন ইন্দ্র জর্জরদণ্ড দিয়ে বিঘ্নকারী অসুরদের বিতাড়িত করেন। এই অবস্থায় ভরত ব্রহ্মার নিকট নাট্যরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের আবেদন জানালে ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে নাট্যবেশ্ম অর্থাৎ নাট্যগৃহ নির্মাণের নির্দেশ দান করেন। ফলে নিরুপদ্রবে নাট্যাভিনয় চলতে লাগলো।

চিত্র সাংবাদিকদের বিচারে বছরের সেরা অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন

এই কাহিনী থেকে এই কথাই অনুমান করা যেতে পারে যে, একেবারে প্রথমে হয় তো বর্তমানের যাত্রার মতো উন্মুক্ত স্থানে মুক্ত-অংগনেই অভিনয় হ'ত। তাতে রসাবিমুখদের নানা উৎপাতে সময় সময় অভিনয় পণ্ড হ'য়ে যেতো। ফলে, সুরক্ষিত আবৃত স্থানে অভিনয়ের প্রয়োজন দেখা গেল এবং তারই জন্যে নির্মিত হ'ল নাট্যমণ্ডপ। নাট্যগৃহের আকৃতি এবং পরিমাণ সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে লিখিত রয়েছে—

'বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব তু মণ্ডপঃ।
তেষাং ত্রীণি প্রমাণানি জ্যেষ্ঠং মধ্যং তথাবরম্।

ললিতা চট্টোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে

অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠং চতুঃষষ্টিস্তু মধ্যমম্।
কনীয়স্তু তথাবেশ্ম হস্তা দ্বাত্রিংশদিষ্যতে।
দেবানাং তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠং নৃপাণাং মধ্যমং ভবেৎ।
শেষাণাং প্রকৃতীনাং তু কনীয় সংবিধীয়তে।
প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং ত্রিপ্রকারো বিধিঃ স্মৃতঃ।
বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব প্রয়োক্তৃভিঃ।
কনীয়স্তু স্মৃতং ত্র্যস্রং চতুরস্রং তু মধ্যমম্।
জ্যেষ্ঠং বিকৃষ্টং বিজ্ঞেয়ং নাট্যবেদপ্রয়োক্তৃভিঃ।'

এই পরিকল্পনা অনুসারে নাট্যমণ্ডপ তিন প্রকারের—বিকৃষ্ট, চতুরস্র এবং ত্র্যস্র অথবা ভাষান্তরে যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম এবং অবর। জ্যেষ্ঠ হবে ১০৮ হাত দীর্ঘ, মধ্যম হবে ৬৪ হাত এবং অবর হবে ৩২ হাত। এই ত্রিবিধ নাট্যগৃহের মধ্যে দেবতাদের জন্য জ্যেষ্ঠ, রাজাদের জন্য মধ্যম এবং জনসাধারণের জন্য অবর গৃহকে নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। অস্র শব্দের মানে হচ্ছে কোণ। ত্র্যস্র বলতে ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রকে বোঝানো হ'য়েছে। মহর্ষি ব'লছেন—

'ত্র্যস্রং ত্রিকোণং কর্তব্যং নাট্যবেশ্ম প্রয়োক্তৃভিঃ।
মধ্যে ত্রিকোণমেবাস্য রংগপীঠং তু কারয়েৎ।
দ্বারং তেনৈব কোণেন কর্তব্যং তস্য বেশ্মনঃ।
দ্বিতীয়ঞ্চৈব কর্তব্যং রংগপীঠস্য পার্শ্বতঃ।'

ত্রিকোণাকৃতি এই নাট্যগৃহের মধ্যে ত্রিকোণ রংগপীঠ নির্মাণ করতে হবে। এতে দ্বার থাকবে দু'টি। একটি প্রেক্ষাগৃহের কোণে আর একটি রংগপীঠের পশ্চাতে।

তবে চতুরস্র তথা মধ্যমটি মর্ত্যের মানুষের বিশেষ অভিনয়োপযোগী। কারণ, তার যথোপযুক্ত গঠন সংস্থানের জন্য অভিনয়ের গান এবং সংলাপ অধিকতরভাবে সুখশ্রাব্য হয়। অতিরিক্ত বড় নাট্যমণ্ডপ নির্মাণ করলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অস্বাভাবিক উচ্চৈঃস্বরে সংগীত এবং সংলাপ প্রয়োগ করতে হবে। ফলে, বেসুরো শোনাবে। আর, সকল প্রযত্ন কণ্ঠেই প্রয়োগ করার জন্য ভাবের অভিব্যক্তি চোখেমুখে সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হবে না। তাই, চতুরস্র প্রেক্ষাগৃহই প্রশস্ত ব'লে তার পরিমাপ এবং কারণ নির্দেশ ক'রে ভরত বলছেন—

'চতুঃষষ্টিকরান কুর্যাদ্দীর্ঘত্বেন তু মণ্ডপম্।
দ্বাত্রিংশতঞ্চ বিস্তারান মর্ত্যানাং যো ভবেদিহ।
অত ঊর্ধ্বং ন কর্তব্যং কর্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ।
যস্মাদব্যক্তভাবং হি তত্র নাট্যং ব্রজেদিতি।
মণ্ডপে বিপ্রকৃষ্টে তু পাঠ্যমুচ্চারিতস্বরম্।
অনিঃসরণধর্মত্বাদ বিস্বরত্বং ভৃশং ব্রজেৎ॥
যশ্চাপ্যাস্যগতো ভাবো নানাদৃষ্টি সমন্বিতঃ।
স বেশ্মনঃ প্রকৃষ্টত্বাদ ব্রজেদব্যক্ততাংপরাম্।
প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং তস্মান্মধ্যমমিষ্যতে।
যাবৎ পাঠ্যঞ্চ গেয়ঞ্চ তত্র শ্রব্যতরং ভবেৎ।'

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

মাসিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে শ্রীসত্যজিৎ রায়

মাসিক বসুমতীর সম্পাদকীয় কক্ষে মাসিক বসুমতী পাঠরত শ্রীসত্যজিৎ রায়।

ধূলিঝঞ্ঝার সঙ্গে বজ্রপাত!

আমাদের অনেক সাধের, শখের, সৌখীন কলকাতার বিকালের আকাশ দেখতে দেখতে কাকচক্ষু রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। কলকাতার রাজপথের ধূলার ঝড় দেখে মনে পড়ে গেল রাজস্থানের মরুভূমির আঁধি। বাতাসের প্রবল বেগে বিভ্রান্ত পথের পথিককুল যে যে দিকে পারে ছুটতে সুরু করেছে। একটা কোথাও আশ্রয় চাই নয় তো জানলার কপাট, দোকানের সাইনবোর্ড, চালাঘরের টিন উড়ে এসে আঘাত হানতে পারে অতর্কিতে। তবুও, কলকাতার বাসিন্দারা সেদিন এই প্রকৃতির তাণ্ডবলীলাকে সাদরে বরণ করেছে। ক'দিন ধরে অসহনীয় গ্রীষ্মের দাবদাহে কলকাতার লোক উদ্‌ভ্রান্ত বললেই ঠিক বলা হয়। যার সঙ্গেই দেখা হয়, মুখে সেই এক কথা···উঃ! কি গরম, বৃষ্টির দেখা নেই। তাই সেদিন কলকাতাবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা সেই ঘনঘোর কালবৈশাখীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে। মেশিনগানের মত গুমগুম আওয়াজে মেঘ ডাকাডাকি সুরু করল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অযুতসহস্রধারায় বারিবর্ষণ। সেদিন হয়তো ছিল ১০৬ ডিগ্রী তাপমাত্রা। (নেপথ্যে জানিয়ে রাখি, আমাদের আলিপুরের আবহাওয়া অফিসের ঘোষণায় জানানো তাপমাত্রা কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তাপমাত্রা সমান নয়—এই কথাটি আমাদের জানিয়েছিলেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের বর্তমান কর্ণধার ডক্টর সেন।)

বসুমতী কার্যালয়ের ঘরে-ঘরে হলে-হলে তখন অসময়ে আলো জ্বলে উঠছে। কেন না, বর্ষার ঘনঘটায় আঁধার ছড়িয়েছে দিকে দিকে। ১০৬ ডিগ্রী থেকে হঠাৎ তাপমাত্রা নেমে গেছে ৯০-এর কাছাকাছি। বৃষ্টির হিমসিক্ত ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস চলেছে ঝড়ের বেগে। কালবৈশাখীর কালো আকাশ দেখতে দেখতে সাউজে দাঁড়িয়ে আমাদেরই এক সাংবাদিক-সহকর্মী তাজা একটি সিগারেট ধরিয়ে গুনগুন সুরে কাব্য আওড়াতে সুরু করলেন—

'তোমারে বারণ করি সাধ্য তো নাই,
তুমি যাবেই যখন—
দূর বাবলা গাছের ফাঁকে বাঁকা চাঁদটাই
বৃথা জাগায় স্বপন।
হোথা আকাশ ঝুলিয়া যেন,
পড়েছে মেঘে—
ক্ষ্যাপা আশ্বিনে ঝড় আসে—
ঝড়ের বেগে।

ট্রেন ছুটবে আঁধারে আমি শুনব জেগে
খালি তারি ঝন ঝন'

সাংবাদিক-বন্ধু সিগারেটে একটি সজোর টান দিয়ে বললেন—কার লেখা বলুন তো?

—??? তবেই তো চিত্তির চড়কগাছ! আমার আবার কবিতা-টবিতা আসে না। আমি চিরকাল ইকনমিক্স-এর ছাত্র। এ লেখা কি আপনাদের ঐ বুদ্ধদেব বসু কিম্বা সমর সেনের?

—উঁহু! না—

—বিষ্ণু দে কিম্বা সুধীন দত্তর?

—উঁহু!

অধীর আগ্রহের প্রশ্ন, ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে—তবে কার? রবীন্দ্রনাথের?

সাংবাদিক-বন্ধু এপাশে-ওপাশে মাথা দোলালেন।

—বলুন, আপনিই বলুন। আপনি সাংবাদিক। সাংবাদিক মানেই সবজান্তা।

—না ভাই, আমি ঠিক তা নয়। হাম সব কুছকা কুছ কুছ জানতা। হার মানছি, এখন বলুন কার লেখা?

—বাঙলা সাহিত্যের ড্রাইডেন, বাংলা দেশের পোপ সজনীকান্ত দাসের লেখা।

এ হেন দুর্যোগে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে—চিত্র-শিল্পী, পরিচালক বাঙলার সুসন্তান সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাব। ঠিক ঝড়ের মতই তাঁর আগমনের গতি। বর্তমান চিত্র-দুনিয়ার প্রথম দ্বাদশ জন বিশ্ববিশ্রুত ও স্বীকৃত পরিচালকদের মধ্যে অর্থাৎ আইজেনস্টাইন, বার্গম্যান, হুস্টন, ফেলিনি, ডি'সিকা, হিচকক, ডি ল বেস্তিস প্রভৃতিদের সঙ্গে সমমর্যাদায় যিনি আর একটি আসন দখল করেছেন তাঁর নাম সত্যজিৎ রায়।

ঝড়ের মত গতি তাঁর। দ্রুতগমনে চলেছেন মাসিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে। সুইংডোর সরিয়ে ঘরে ঢুকে একটি চেয়ার দখল করে বসে পড়লেন শ্রীরায়। এই আসা এবং আসন গ্রহণের মধ্যে যেটুকু সময় তার মধ্যে শ্রীরায় একটি প্রশ্ন করলেন,—আপনাদের পত্রিকার সব কপিই কি exhausted (নিঃশেষিত) হয়ে যায়?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কোন কোন particular সংখ্যা হয় তো দু'-এক কপি পেতে পারেন।

প্রশংসার সবিস্ময় চাহনি শ্রীরায়ের ধ্যানস্তিমিত সুদীর্ঘ চোখে। বললেন,—বাঃ! খানিক থেমে আবার কথা ধরলেন,—আমার কিন্তু মাসিক বসুমতীর কয়েকটি পুরোনো কপি চাই। একটু থেমে থেমেই কথা বলেন শ্রীরায়। খানিক থেমে বললেন—একজন তাঁর লেখা পড়ানোর জন্য আমাকে মাসিক বসুমতী দিয়েছিলেন কয়েকখানি। আমার রাশি রাশি বইয়ের স্তূপে কোথায় যে তা হারিয়ে গেছে তা আর খুঁজে পাচ্ছি না।

—কোন্ কোন্ সংখ্যা আপনার প্রয়োজন?

মাসিক বসুমতীর সেই পুরাতন সংখ্যাগুলির অনুসন্ধানে লোক ছুটল।

পৃথিবী-বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় অবরে সবরে মাঝে-নিশেলে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে (বর্তমানে বসুমতী প্রাইভেট

বি এফ জে-এর বার্ষিক উৎসবে সমাগত শিল্পিবৃন্দ। প্রথম সারিতে শ্রীসত্যজিৎ রায়কে দেখা যাচ্ছে

লিমিটেড) এসে থাকেন। বসুমতী থেকে প্রকাশিত অমূল্য গ্রন্থসমূহ কিনে নিয়ে যান।

—চা দিতে বলব?—সম্পাদকের জনৈক সহকর্মীর প্রশ্ন।

—খবরের কাগজের অফিসের চা কি উনি খেতে পারবেন!

শ্রীরায় বললেন—হ্যাঁ, চা একটু আমাদের বেশিই খেতে হয়। স্টুডিওতে যখন কাজ করি তখন প্রায় প্রতি ঘণ্টাতেই আমাদের চায়ের দরকার হয়।

—স্টুডিওতে কি ভাল চা পাওয়া যায়?—সম্পাদকের প্রশ্ন।

শ্রীরায়।—হ্যাঁ, এন, টির 'দু' নম্বর স্টুডিওতে আজকাল বেশ ভাল চা হচ্ছে, সেখানে ভাল চা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

এমন সময় শ্রীরায়ের হাতে মাসিক বসুমতীর বৈশাখ সংখ্যা ধরিয়ে দেওয়া হল।

সম্পাদকের সহকর্মী বললেন, এই সংখ্যায় আপনার 'চারুলতা'র সমালোচনা আছে।

শ্রীরায়।—ও, তাই না কি!—কথার শেষে পত্রিকার পাতা উল্টে তাঁর সাম্প্রতিক ছবির সমালোচনা পড়তে শুরু করলেন।

—আপনার 'চারুলতা' তো এখনও বেশ ভালই চলছে। আমি জানি, মফস্বলের কয়েকটি হাউসে খুবই ভাল সেল পাচ্ছে। সম্পাদক বললেন।

শ্রীরায়।—হ্যাঁ, আমার এই ছবিখানি স্ট্যাণ্ডার্ড সেল পাচ্ছে।

বেয়ারা চায়ের কাপ বসিয়ে দিয়ে গেল। পৃথক রেকাবিতে দু'খানি গোল্ডেন পাফ বিস্কুট। শ্রীরায় একটি বিস্কুট তুলে নিলেন, চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, বাঙলা সাহিত্যের মান কি রকম বুঝছেন? আমার তো মনে হয় বাঙলা সাহিত্যের মান অত্যন্ত নীচে নেমে গিয়েছে।

সম্পাদক বললেন—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, আগের তুলনায় বাঙলা লেখার মান নীচে নেমে গেছে। মৌলিক সাহিত্য কিছুই তেমন হচ্ছে না আজকাল।

সহকর্মীর প্রশ্ন, আপনার 'মহাভারত' ছবির কাজ কি শুরু করেছেন?

শ্রীরায়—না, মহাভারতের পরিকল্পনা বৃহৎ, কাজ শুরু হয় নি। বর্তমানে একটু rest নিচ্ছি।

এ কথা, সে কথার পর রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল। শ্রীরায় বললেন, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র মিউজিয়মে এখনও বহু মূল্যবান লেখা আছে যা কোথাও প্রকাশিত হয় নি। আমি নিজেও গিয়ে দেখে এসেছি ঠাকুর-পরিবারের সেই বিখ্যাত 'পারিবারিক খাতা' যাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতির অনেক মূল্যবান লেখা আছে। এমন কি, ঠাকুর-পরিবারের বন্ধু যাঁরা (তারক পালিত, লোকেন পালিত, অক্ষয় চৌধুরী, কবি বিহারীলাল প্রভৃতি) তাঁদের অনেকেরই রচনা দেখতে পেলাম। এ সব লেখাই লেখকদের স্বহস্তে লেখা। অনেকেই হয় তো জানেন না এই পারিবারিক খাতায় লিখতে হলে লেখকদের

'কাশ্মীর কি কলী' সুটিং-এর অবসরে ভোজনেরত শাম্মী কাপুর ও শর্মিলা ঠাকুর।

দাঁড়িয়ে লিখতে হোত। কারণ খাতাটি থাকত অনেক উঁচুতে। খানিক থেমে শ্রীরায় বললেন—আমার কাছে একটি টেপ রেকর্ড আছে যাতে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কণ্ঠ ধরা আছে। এই রেকর্ডে তাঁর গাওয়া গান, বলা গল্প, ছড়া আর হাসি-তামাশা অনেক কিছুই আছে।

সহকর্মীর প্রশ্ন, আপনি প্রেসিডেন্সী কলেজের কোন সালের? আপনার সহপাঠীদের মধ্যে নাম করতে পারেন এমন কে কে ছিলেন?

শ্রীরায়। ইং ১৯৪০। আমার সহপাঠীদের মধ্যে নাম করা যায় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, খেলোয়াড় নির্মল চট্টোপাধ্যায় (ক্রিকেট), প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী।

কথা বলতে বলতে শ্রীরায় টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিজের গৃহে সহধর্মিণীকে ফোনে ডাকতে চেষ্টা করলেন। টেলিফোন বেজে চলল, কারো কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। শ্রীরায় হাসতে হাসতে বললেন,—হয় তো বৃষ্টি নেমেছে তাই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সুইংডোরের তলায় প্যান্ট পরিহিত দু'এক জনের দেখা-অদেখা, ভিতর থেকে লক্ষ্য করা যায়। হাওয়ায় হাওয়ায় রটে গেছে শ্রীরায় এসেছেন এখানে। ঘরে ঢুকব কি ঢুকব না, বসুমতীর স্টাফ ফোটোগ্রাফারদের সসংকোচ প্রতীক্ষা।—আসুন, ভিতরে আসুন।

ক্যামেরা আর ফ্ল্যাশ লাইট হাতে আমাদের নিজস্ব ফোটোগ্রাফার প্রবেশ করলেন। তাঁর মুখে অমায়িক হাসি, বসুমতীতে শ্রীরায়কে ছবির মাধ্যমে ধরে রাখতেই হবে। ঘরের কোথায় দাঁড়ালে ঠিকমত ছবি তোলা যায় ক্যামেরাধারী খানিক যথাযোগ্য দৃষ্টিকোণ খুঁজতে থাকেন। শ্রীরায় হাসতে হাসতে বললেন,—আমার কিন্তু ভাই হাতে খুব বেশি টাইম নেই।

ততক্ষণে ক্যামেরাধারী একখানি শূন্য চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়েছেন। চোখে ক্যামেরা তুলে চিত্রশিল্পী বললেন—না, খুব বেশি দেরি হবে না। এবং সঙ্গে-সঙ্গে ফ্ল্যাশ লাইটের বিদ্যুৎগতি সোনালী আলোয় ঘর ভরে উঠল। ছবিপর্ব সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীরায় গমনোন্মুখ হলেন।

বিশ্বখ্যাত চিত্রপরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত হৃদ্যতা আমাদের আজকের নয়, অনেক দিনের—তবে, সেদিন ঐ দু'ঘণ্টা সময়ে তাঁর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় নানা ধরণের গল্পে যে বলিষ্ঠ চিন্তাধারা, অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী এবং আশাবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেল—তা আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে গেল।

ধীরে ধীরে বিদায় নিলেন সত্যজিৎ রায়। আমাদের চোখ পড়ল হঠাৎ তাঁর হাতের দিকে। দেখলাম সে-হাতে শোভা পাচ্ছে মাসিক বসুমতীর ১৩৭১ সালের বৈশাখ সংখ্যা। যার প্রচ্ছদে দেখা যাচ্ছে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকে চলেছেন।

[বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী নৃপেন দত্ত, শান্তিময় সান্যাল ও বীরেন ধর কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।]

[illegible]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

এক এক সময় যেমন ইঞ্জিনের গতি বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন উপস্থিত হয়—তার স্পিডোমিটারের কাঁটাটা একলাফে গিয়ে শত সংখ্যায় দাঁড়িয়ে গতির চাপে থরথর করে কাঁপতে থাকে—চিন্তারও তেমনি এক একটা সময় এসে উপস্থিত হয় একটানে গতি বাড়িয়ে দেওয়ার। তখন সময় থাকে না সময় নিয়ে ভাবতে বসবার। অরুণের এখন সেই অবস্থা। ড্রাইভার রাস্তায় গাড়ি বের করে এনে জানতে চাইছে, কোথায় যাবে।

শিবানী ওকে বলতে বলছে, বলুন কোথায় যাবে। কিন্তু কোথায় যেতে বলবে অরুণ ?

অরুণ কি আগরওয়ালার রডন ষ্ট্রীটের সুরম্য ফ্ল্যাটে নিয়ে হাজির করতে পারে শিবানীকে !

নির্জন সাহেব পাড়ার নির্জনতম কোণে—চারিদিকের বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যে নয়তলা বাড়ির সর্ব-উপরতলার সুসজ্জিত রম্য ফ্ল্যাটটি মিঃ আগরওয়ালার। বসে বসে প্রতি মাসে হাজার টাকা করে ভাড়া আর তিন শ' টাকা করে বেয়ারাদের মাইনে গোণে আগরওয়ালা। সজ্জিত বাড়ি খালি পড়ে থাকে। বেয়ারাগুলি ঝকঝকে সোফাসেটির উপর ঝাড়ন বুলায় আর হাই তোলে ঘুমায়। কিন্তু আগরওয়ালাকে যারা চেনে, তারা জানে ব্যবসার মূল চাবি কাঠিই হলো আগরওয়ালার এই ঘর। লিফটের অটোমেটিক চাবি টিপে উঠে এসে এঘরে আপ্যায়িত হয়ে ফের লিফটের অটোমেটিক চাবি টিপে নেবে যান যাঁরা, তাঁদের হাত দিয়েই অটোমেটিকভাবে মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্ক লোন এসে যায় আগরওয়ালার হাতে। এসে যায় মোটা অঙ্কের কনট্রাক্ট। ইনকাম ট্যাক্সের লক্ষের ঘরের নোটিশ, আদায়ের বেলা নেবে আসে দশ-পাঁচ হাজারে। আগরওয়ালা বলে এটা তার লক্ষ্মীর ঘর। তারপর মুচকি হাসি হেসে বলে, মা-লক্ষ্মীদের রাখি কি না, তাই পুজাটা ভালই পাওয়া যায়। প্রায় যা চাওয়া যায় তাই মিলে যায়।

ইন্দ্রনাথের ব্যবসার একটা সোল এজেন্সি আগরওয়ালার চাই। সে চাওয়াটাও তাকে তাই ইন্দ্রনাথকে এ ঘরে এনেই চাইতে হবে। সেদিন মদের বাক্স ভেট দিয়ে গোড়াপত্তন করে এসেছিল। তারপর থেকে চেষ্টা করে আসছে ইন্দ্রনাথকে তার রডন ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটে আনার। কিন্তু ইন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করছিল তাকে। 'এ সব আর নয়' এ মনোভাব দিয়ে পুরো না হোক, একটা না, না, না—দিয়ে যে ইন্দ্রনাথের অন্তরটা ভরা ছিল অরুণ তা জানত। কারণ অরুণকেই ফোন করে আগরওয়ালাকে বলতে হয় ইন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ গ্রহণের অসমর্থতার কথা। কিন্তু আগরওয়ালা অত সহজে হার মানবার লোক নয়। যদি তাই হতো তবে তিন তিনবার ব্যবসায় গণেশ উল্টিয়ে ফেলেও আবার এমন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না।

শান্তা কাউল—খাস কাশ্মীরী মেয়ে। মেয়ে নয় যেন কাশ্মীর উপত্যকার আপেল বনে মাটিতে পড়ে-থাকা আপেল একটা। আগরওয়ালা যখন এই শান্তাকে নিয়ে ইন্দ্রনাথের অফিস কামরায় সেদিন ঢুকেছিল তখনও যেন তার গোলাপী রং-এর গালে, গলায়, শরীরে কাশ্মীরের গ্রামের মাটি মাখা ছিল। আগরওয়ালা যেন স্নানটাও করতে দেয় নি শান্তাকে—পাছে মাটি ধুয়ে গিয়ে চেহারার বন্যতা চলে যায়। সদ্য মাটি থেকে তুলে আনার চিহ্ন নষ্ট হয়ে যায়। পোষাকও ছিল অপরিচ্ছন্ন। তার পরা সালোয়ার পাঞ্জাবী দু'টোই ছিল ময়লা। গায়ের পাঞ্জাবীটা একেবারে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে ছিল ঘামে ভিজে। বুকের দু'পাশে ঝুলছিল দু'টো লম্বা লম্বা বেণী। সে দু'টোও যেমন উসকো তেমনি ধূলোবালি জর্জরিত। যেন তিন চার দিনের ট্রেনের পথ লোর ধুলো আর কয়লার গুঁড়ো তার মাথায় জমে আছে। একদিন বেণী খোলা হয় নি। চিরুণী পড়ে নি। পোষাক বদল হয় নি।

এয়ার কণ্ডিশন কামরার দরজা ঠেলে আগরওয়ালা যখন এ হেন মাটিমাখা শান্তাকে নিয়ে ইন্দ্রনাথের তকতকে ঝকঝকে অফিস

কামরায় প্রবেশ করল তখন বিস্মিতই হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। সে তখন সবেমাত্র এক লাঞ্চপার্টি থেকে ফিরেছে। বিদেশীদের সঙ্গে পার্টি ছিল। তাই সাধারণত লাঞ্চে যতটা ড্রিঙ্ক করে তার চাইতে কিছুটা বেশিই হয়ে গিয়েছিল ড্রিঙ্ক করাটা। ইন্দ্রনাথের চোখের দৃষ্টিতে ঈষৎ লালের সঙ্গে একটা স্বপ্নালু ঘোর মিশেছিল। শান্তার উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আগরওয়ালাকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করছিলো, কি ব্যাপার মিঃ আগরওয়ালা?

মনে মনে একটু হাসল আগরওয়ালা। শান্তাকে নিয়ে আসবার সময়টা যে আগরওয়ালা লাঞ্চের পর বেছে নিয়েছিল তা কি এমনি এমনি। বিদেশীদের সঙ্গে পার্টি থাকা আর ড্রিঙ্ক করাটা বেশি হয়ে যাওয়া আগরওয়ালার ভাগ্য। কিন্তু লাঞ্চের পর কিছুটা যে নেশাধরা মাথা ইন্দ্রনাথের থাকবেই—এ তার হিসেবের মধ্যেই ছিল। আগরওয়ালা নমস্কার জানিয়ে ইন্দ্রনাথের অর্ধচন্দ্রাকৃত অফিস-টেবিলের উল্টো দিকে খুশিমনে আসন গ্রহণ করল। তারপর শান্তাকে দেখিয়ে বলল, মিঃ সেন সন্থ-কুলুভ্যালি থেকে তুলে নিয়ে এসেছি একে—এইমাত্র ট্রেন থেকে নামল—বেটি নমস্কার জানাও বাবুকে।

শান্তা টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ কুঁচকে ছোট করে ইন্দ্রনাথকে দেখছিল—দু'হাত এক করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, নমস্তে জী।

অরুণ ইন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী। সাহেবদের প্রাইভেট জীবনের—অর্থাৎ গোপন জীবনের ভার তো তাদের প্রাইভেট সেক্রেটারীদের হাতেই থাকে। অরুণ বুঝল ওর উপস্থিতি নিয়ে তাই আগরওয়ালা মাথা ঘামাচ্ছে না।

কিন্তু অরুণ উঠে গিয়েছিল।

আগরওয়ালা শান্তাকে নিয়ে চলে গেলে ডেকে পাঠিয়েছিল ইন্দ্রনাথ আর অরুণ গিয়ে দেখেছিল ইন্দ্রনাথ যেন ক'দিন আগের ইন্দ্রনাথ আর নেই কিন্তু সে কথা অন্য কথা। তা ভাববার সময় নেই এখন অরুণের। এখন ড্রাইভার ওর দিকে তাকিয়ে আছে, তাকে কোথাও যাওয়ার নির্দেশ না দিলেই নয়। কিন্তু কোথায় যেতে বলবে সে তাকে! রডন স্ট্রীটের ওই ফ্ল্যাটে তো শিবানীকে নিয়ে যেতে পারে না সে। মাথার স্পীডোমিটারের কাঁটা শূন্যের ঘরে পড়েছিল। ভাবনা-চিন্তা না করেই একটানে কাঁটাটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে অরুণ অবজ্ঞি ড্রাইভারকে বলল, আও উতার যাইয়ে লালাজী, হাম চালায়েঙ্গে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ড্রাইভার ওর হাতে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে নেবে গেল। অরুণ ফার্স্ট গিয়ারে পা রেখে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ি চালিয়েও দিল কিন্তু মানুষের মাথাটা যন্ত্র নয় যে, চিন্তার গতি একবার বাড়িয়ে দিলে সেই একই গতিতে চলতে থাকবে। ফের চিন্তার কাঁটা হাত-পা ছেড়ে অসহায়ভাবে যেন শূন্যের ঘরে ঝুলে পড়ল অরুণের। ড্রাইভারের কাছে নয় মান বাঁচানোর পথ বের করা গেল কিন্তু এখন কোথায় যাবে সে!

জর্জকোর্ট রোডের নিয়ন আলোসজ্জিত মসৃণ পথ চোখের সামনে পড়ে রয়েছে। এর কত ধারা কত দিকে চলে গেছে। কোন দিকে যাবে সে। যে দিকেই যাক না কেন যাবে সেদিকে? কোথায় গিয়ে থামবে। গাড়ি, ট্যাক্সি আর পথ-চলতি মানুষকে এদিকে-ওদিকে পাশ কাটাতে-কাটাতে নিরুপায় হাতে ডিমলার গাড়ির বিশাল দেহটা শম্বুকগতিতে চালিয়ে নিয়ে চলতে চলতে ভাবতে লাগল অরুণ।

আর গাড়ির ভেতরে বসে জয়ের অহংকার বোধ করতে লাগল শিবানী। ও জিতে গেছে। এই জিত্‌টা যদি ও অরুণের সঙ্গে না জিততে পারত তবে এতক্ষণে ওর মর্যাদাকে কেওড়াতলার ঘাটে শ্মশান যাত্রায় পাঠিয়ে দিতে হতো। ড্রাইভারকে নামিয়ে দিয়েও ভালই করেছে লোকটি। শিবানী দেখেছে, বেয়ারা-বাবুর্চি-ড্রাইভার এরা যতই ফসিলের মতো মুখ করে থাক—সব বোঝে।

রাস্তার আলো কখনও এসে পড়ছে শিবানীর মুখের উপর, কখনো সরে যাচ্ছে। মনের ভেতরে যেন ওর যুদ্ধ চলছে। এদিকে অরুণের কাছে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দুরন্ত জেদ কাজ করছে, অন্যদিকে নিদারুণ উত্তেজনা বোধ করছে ইন্দ্রনাথের কাছে যেতে। ইন্দ্রনাথকে কোথায় দেখবে কে জানে। কি অবস্থায় দেখবে তাই বা কে জানে। নানা সম্ভাব্য ছবি সে কল্পনায় দেখতে লাগল আর ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় ঠোঁট কামড়াতে লাগল বসে বসে।

আজ শিবানী বড় যত্ন করে সেজেছিল। তার আজকের সান্ধ্য সাজের ভেতর ঐশ্বর্যের উগ্রতা ছিল না, ছিল যুঁই ফুলের শুভ্রতা। ইন্দ্রনাথ সাদা পোষাক একেবারেই পছন্দ করে না—এ খেয়াল তার ছিল। কিন্তু আজকের গোমট গরম আবহাওয়ায় রং যে একেবারেই অচল। এই সাদা দিয়েই আজ ইন্দ্রনাথকে সে মুগ্ধ করবে—এ ইচ্ছাই সে মনে রেখেছিল। সাদা পোষাকের ওপর সাদা মুক্তোর হার পরতে-পরতে শিবানী যেন ইন্দ্রনাথের কণ্ঠের 'বাঃ' শব্দটাও শুনতে পেয়েছিল।...

গাড়ি নিয়ে কি অরুণ নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছে না ইন্দ্রনাথই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ হলো তো অরুণ চলছেই—কেবল চলছেই। কতবার লাল আলো জ্বলে উঠল দেখে গাড়ি থামল। নীল আলো জ্বললে গাড়ি চলল। কতবার ফাঁকা রাস্তা পেয়ে গাড়ির গতি বাড়ল, কতবার ট্রাম, বাস, মানুষ, রিক্সার ভিড়ে থেমে থেমে এগুলো কিন্তু এমন কোন ঠিকানায় যাচ্ছে অরুণ যে এখনও ঠিকানা মিলল না!

অরুণও বুঝছিল কোন একটা জায়গায় এখন গাড়ি নিয়ে দাঁড় না করালেই আর চলছে না। এভাবে আর কত ঘুরবে। একবার বিরক্তির সঙ্গে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে ভাবলে দেবে নিয়ে ছেড়ে আগরওয়ালার ফ্ল্যাটেই শিবানীকে। তারপর যা ঘটে ঘটুক। ওর কি। চাকরী ওর চলে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ওর ট্রেন ধরবার কথা ছিল। ইন্দ্রনাথের কাছে আনুগত্যের প্রশ্নই নেই। তবে সে ভূতের মতো ঘুরে মরছে কেন? তা ছাড়া অনেক আগেই অরুণ তার কাজ চলে যাওয়ার কথা বলে শিবানীর হাত থেকেও তো বাঁচতে পারত। যে পথে যাচ্ছিল সে পথ থেকে হঠাৎ মোড় ঘুরে সোজা রডন স্ট্রীটের দিকে চলল অরুণ।

শিবানীকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে সে সোজা হাওড়া স্টেশনে পালাবে। এ আবহাওয়া ওর সইবে না।

রডন স্ট্রীটের অভিজাত সাহেবপাড়ায় ফ্ল্যাটে-ফ্ল্যাটে তখন আলো জ্বলছে। শান্ত নির্জন স্তব্ধ পরিবেশ। মনে হয় যেমন জনশূন্য পথ তেমনি বুঝি জনশূন্য বাড়িগুলিও। কেবল বাড়িগুলির আলো বলছে, না মানুষ আছে। আগরওয়ালার নরতলা ফ্ল্যাটের সামনে দিয়ে একবার

পার হয়ে গেল অরুণ। এখানেই এখন ইন্দ্রনাথ আছে। কিন্তু থামতে পারলে না। গাড়ি শিবানীকে বলতে পারলে না, সোজা লন পার হয়ে ভেতরে ঢুকে যান। নাম বললেই দারোয়ান আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।

না. তা হয় না।

শিবানীকে যে জবাব দিয়েছিল, নিজেকেও সেই জবাব দিতে হলো অরুণের।

আপনি কি আমাকে পথে-পথে ঘোরাচ্ছেন নাকি? শিবানীর তীক্ষ্ণ-কর্কশ কণ্ঠের আচমকা প্রশ্নে একটু চমকেই গিয়েছিল অরুণ।

ক্ষিপ্রগতিতে অপ্রস্তুতকণ্ঠে বলে উঠল, না—না। আমি আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছি—

জবাবটা অরুণ কিছু একটা জবাব দেবার জন্য আর এ ছাড়া কিছু বলবার নেই বলেই দিয়েছিল। কিন্তু জবাবটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওকে একেবারে বিস্মিত আনন্দিত করে দিয়ে একটা বাড়ি ভেসে উঠল ওর চোখের উপর। এতক্ষণ যে কেন শিবানীকে ওখানে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেবার কথা মনে হয় নি, বুঝেই উঠতে পারলে না অরুণ। সে জায়গাটার কথাই তো তার সর্বপ্রথম মনে হওয়া উচিত ছিল। গাড়ি চালিয়ে দিল অরুণ।

শিবানী ওকে না চিনুক, না দেখুক, শিবানীকে অরুণ এই ছ'মাসের চাকরী জীবনে অনেক দেখেছে এবং অনেক দেখা দিয়ে একটা মানুষকে যতটুকু চেনা যায় তা চিনেছে। কার সঙ্গে শিবানীর হৃদ্যতা—কার বাড়ি যেতে, কার সঙ্গে গল্প করতে শিবানী বেশি ভালবাসে সে কথা সে জানে এবং জানে ললিতা তার ভেতর প্রধান। ললিতা এখন যে বাপের বাড়ি এ কথাও অরুণের অজানা নয়। কালকেই কালীনাথকে ওরা নামিয়ে দিয়ে গেছে এখানে।···ইস্ কখন ও শিবানীকে এখানে নিয়ে আসতে পারত!

গাড়ি যেখানে থামল স্তম্ভিত হয়ে শিবানী দেখল সেটা ললিতাদের বাড়ি। অসহ্য রাগে-অপমানে কি যে সে করবে বুঝে উঠবার আগেই ললিতা গাড়ি থামবার শব্দে বসবার ঘর থেকে মুখ বাড়ালো। শিবানীকে দেখে দৌড়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

নামতে হলো শিবানীকে।

শিবানীর দুই হাত জড়িয়ে ধরে ললিতা বলল, কি সৌভাগ্য আমার। ভাবতেই পারছি নে তুমি নিজে নিজে চলে এসেছো!

চলতে চলতে শিবানী বলল, বাঃ তোমার কাছে আমার জন্মদিনের শাড়িটা রয়ে গেছে না? দিয়েছো সেটা আমাকে? আর পড়ে থাকলে ঠিক এক সময় লোভ সামলাতে পারবে না। পরে ফেলবে। তাই নিয়ে যেতে এলাম।

তুমি শাড়ি নিতে এসেছ? অবিশ্বাসের সঙ্গে বললে ললিতা।

অবশ্যই।

কিন্তু শিবানী এ কথা ললিতাকে বিশ্বাস করাতে পারলে না। সে মাথা নেড়ে বলল, তা কখনও হয়। এমন রমণীয় সন্ধ্যায় এমন রমণীয় সাদা সাজে সেজে মুক্তোর মালা গলায় পরে তুমি বেরিয়েছ—আমার কাছ থেকে শাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য—

শুধু শাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য বেরুব কেন। বেরিয়ে ছিলাম, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম—

ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল দু'জনে। ললিতা হেসে বলল, এখান দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে তা আর জিজ্ঞাসা করব না। আরো কিছু আবোল-তাবোল বলে বসবে। অপ্রস্তুত অবস্থায় এমনি হয়। এমন কথা বেরিয়ে আসে যে তার জবাব দিতে গিয়ে আরো অপ্রস্তুতের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। নইলে তো দিব্য বলতে পারতে, সেজে-গুজে তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম ললিতা। এমন অবিশ্বাস্য মনে হতো না।

বসল দু'জনে।

শিবানী সত্যি নিজেকে স্বাভাবিক করে ফেলতে পারছিল না।

ললিতা শিবানীর দিকে তাকিয়ে সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলল, কি ব্যাপার? মনে হচ্ছে যেন তুমি আচমকা এসে পড়েছ—কেউ এনে তোমাকে হঠাৎ এখানে ছেড়ে দিয়েছে।

শিবানী ললিতার সে কথার জবাব দিল না, মাথার ওপর নূপুরের ঝমঝম শব্দ হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করল, নাচছে কে?

সখীরা।

নাটক তো হচ্ছে লক্ষ্মীর পরীক্ষা। তাতে সখীদের নাচ কোথায়?

ওরা ঢুকিয়েছে। ক্ষিরো যখন রাণী হলো তখন তার রাজসভায় ওরা নাচ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তা রাণীর কাছে নাচ—এ সন্দেশের তবক-মোড়ানো সোনালী-রুপালী পাতের মতো। শোভা বাড়ে বৈ কমে না। তাই আপত্তি করি নি। শিবানী যখন অন্য কথায় চলে গেল, ললিতাও তখন আর ও কথায় গেল না। বলল, বোস মাদের খবর দিয়ে আসি।

ললিতা চলে গেল।

শিবানীর ভেতরটা যেন অপমানের যন্ত্রণায় জ্বলতে লাগল। ইন্দ্রনাথকে দিয়ে তাড়াবে লোকটাকে। কিন্তু অরুণ যখন এমন বিশ্বস্ত অনুচর ইন্দ্রনাথের, তখন ইন্দ্রনাথ ওর কথা শুনবে কেন। ইন্দ্রনাথের মতো চরিত্রহীন লোকদের সবারই অরুণদের মতো একজন করে অনুচর থাকে। তাদের উন্নতি আরো ধাপে-ধাপে বেড়ে চলে। ইন্দ্রনাথ কখনই তাড়াবে না ওকে। আরো হয় তো পুরস্কৃত করবে অরুণের মুখে ঘটনা শুনে। [ক্রমশ।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর একটি স্মরণীয় আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি উৎসবে গুরুদেবের কলিকাতাস্থিত বাসভবনে ও নিজকক্ষে শিষ্য জওহরলাল নেহরু শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছেন। আলোকচিত্র মোনা চৌধুরী কর্তৃক গৃহীত

নিতান্তই সে এক বিজলী আলোর মিস্ত্রি।

কিন্তু তার ট্যাংরা অঞ্চলের খুপরি ঘরটি কোনো-দিনই আলোর মুখ দেখতে পায় না!

চারদিকে আর আশেপাশে উঁচু উঁচু বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। একটা দিকে একটা কারখানার লম্বা সেড। তার চিমনিগুলি সারাদিন আকাশের মুখে কালো ধোঁয়া মাখিয়ে দেয়।

পাড়াটার এককোণে সবাইকার বিষদৃষ্টি এড়িয়ে কোনো-মতে টিকে আছে একটা খেটে-খাওয়া মানুষদের বস্তী।

এমনিতেই ত' আঁধারে মাথা গুঁজে থাকে। তার ওপর নিবারণ নিজের ওই ছোট খুপরি ঘরখানিতে আলো জ্বালবে না!

আশেপাশের সবাই ওকে ঠাট্টা করে বলে, আচ্ছা নিবারণ, সারা 'পৃথিবী'ময় তুমি আলো জ্বেলে বেড়াও, আর নিজের ঘরে এককোঁটা আলো নেই? এ তোমার কি রকম ব্যবস্থা বলো দেখি? ওই একরত্তি মেয়েটা যে দিন-রাত আঁধারে পচে মরে—সেটা কি তুমি চোখ মেলে দেখতে পাও না?

পাড়া-প্রতিবেশীদের কথা শুনে নিবারণ রাগ করে না,—মিটিমিটি হাসে শুধু!

মাঝে মাঝে জবাব দেয়, আরে ভাই, তোমরা বোঝ না! ওই বোনটার জন্যেই ত' আলো জ্বালবার উপায় নেই! আমার আর তিন কুলে কে আছে বলো? থাকবার মধ্যে ওই আট বছরের বোন টুনী। এত দস্যি মেয়ে—বুঝলে?—সব দিয়ে ওর কাজ। ও যে কখন কি অনর্থ করে বসে তার ঠিক কি? ধরো, আমি থাকি সারাদিন বাইরে বাইরে। কখন জামায় আগুন লাগিয়ে বসবে—পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যাবে!

প্রতিবেশীরাও নাছোড়বন্দা। তারাও আপত্তি তুলে বলে, আহা, তুমি ঘরে আলগা খোলা আলো রাখবে কেন? তুমি নিজে ত' বিজলী আলোর মিস্তিরি,—তাই না হয় খাটিয়ে দাও ঘরে।

নিবারণ শিউরে উঠে উত্তর দেয়, ওরে বাবা, সে আরো বিপদের। কখন 'শক্' খেয়ে পড়ে মরে থাকবে—কাক-পক্ষীতে জানতেও পারবে না।

এই আলো নিয়ে ভাই-বোনের সঙ্গেও নিত্যি ঝগড়া।

টুনী বলে, আচ্ছা দাদা, চিরটাকাল আমি আঁধারঘরে থাকবো?, সারা রাজ্যে তুমি আলো জ্বেলে বেড়াও, আর নিজে এত অন্ধকারে থাকতে ভালোবাস?

নিবারণ মিটি-মিটি হাসে।

—ওরে দস্যি মেয়ে, আঁধারে থাকি কি আর সাধে? তুই যে একেবারে হাতে-পায়ে লক্ষ্মী! তুই আর একটু বড় হ'—তখন দেখবি—এই ঘরে একশ' পাওয়ারের আলো জ্বেলে একেবারে রোশনাই করে দেবো।

টুনীও ছাড়বার মেয়ে নয়। সে এগিয়ে এসে অত বড় দাদাকে হুমকি দেয়। আমি কবে বড় হবো—তার কি কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে? তার চাইতে তুমি আমাকে একটা বৌদি এনে দাও—সে ঘরে আলোও জ্বালতে পারবে,—আর তোমাকেও খুব শাসনে রাখতে পারবে।

দাদা ছুটে গিয়ে টুনীর চুলের মুঠি ধরে দুম-দুম্ করে কিল বসিয়ে দেয় পিঠে।

টুনী খিল খিল করে হেসে ওঠে।

ও জানে দাদা ওকে কতখানি ভালোবাসে।

পাছে আলোর দিকে কিছু অঘটন ঘটে—তাই কিছুতেই সে ঘরে আলো জ্বালবার ব্যবস্থা করবে না।

বস্তীতে ওর বয়েসী মেয়েরা কত পিদিম জ্বালায়, কেউ কেউ দিব্যি রান্না করতেও শিখে গেছে। কোমরে শাড়ি জড়িয়ে বাপ-ভাইদের রান্না করে কেমন খাইয়ে দেয়। নিবারণ কিন্তু ওকে আলোর কাছে যেতেই দেবে না।

কি যে ওর আগুনে ভয়—বুঝতে পারে না টুনী। নিজে হাত পুড়িয়ে ছ'বেলা রান্না করবে,—কিন্তু টুনীকে কখনো উনুনের ধারে যেতে দেবে না। এর জন্যে ওর সমবয়সী মেয়েরা ওকে 'পটের বিবি' বলে ঠাট্টা করে। ওর চোখ দু'টি ছলছল করে ওঠে। তবু দাদাকে কিছু বলতে পারে না।

টুনী ত' জানে দাদা ওকে কত ভালোবাসে।

যেদিন কাজ শেষ করে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়—সেদিন সে পাশের ঘরের পালুদের বৌদির কাছে গিয়ে বসে থাকে। অন্ধকার ঘরে ওর একটু-একটু ভূতের ভয়ও করে। কিন্তু দাদার কাছে বলতে সে লজ্জা পায়।

বেশি রাত্তির হয়ে গেলে নিবারণ একেবারে দোকান থেকে রুটি-মাংস কিনে নিয়ে আসে। সেদিন আর উনুনে আঁচ পড়ে না। ভাই-বোন পাশাপাশি বসে খেয়ে নেয়।

নিবারণ জানে, টুনী রুটি-মাংস পেলে আর কিছু চায় না। কিন্তু সেই রুটি-মাংস ঘরে তৈরি করতে গেলে—অনেক সময় যাবে, অনেক পয়সা বাড়তি খরচ হবে। তাই শিখদের দোকান থেকে মাঝে-মাঝেই নিবারণ রুটি-মাংস কিনে এনে টুনীকে খুশি করে।

যত রাতই হোক—নিবারণ ফিরে না-আসা পর্যন্ত টুনীর কুপি জ্বালবারও হুকুম নেই। অন্ধকার ঘরে বসে-বসে আর কতক্ষণ মশার কামড় খাওয়া যায়? তাই অসহ্য লাগলেই টুনী সোজা পালুদের ঘরে গিয়ে ওদের পড়াশোনা শোনে।

টুনীরও খুব ইচ্ছে,—সে পালুর মতো ইস্কুলে পড়ে,—নানা রঙের বই ব্যাগে পুরে বেণী দুলিয়ে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ইস্কুলে যায়।

কিন্তু লজ্জায় সে সব মনের কথা তার দাদাকে বলতে পারে না। সারাদিনের মধ্যে দাদা যে-কোন সময় খেতে আসবে—তা সে নিজেও জানে না। বোনটিকে পাশে বসিয়ে না খেলে আবার নিবারণের পেট ভরে না।

তাই ইচ্ছে থাকলেও টুনী তার আকাঙ্ক্ষার কথা দাদার কাছে খুলে বলতে লজ্জা পায়।

হঠাৎ কলকাতার শহরে একটা সাড়া জাগল। বিদেশের এক প্রধানমন্ত্রী এই দেশ সফর করতে আসছেন। তাই চারদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে সুরু করে জ্ঞানী-গুণী সবাই নতুন নতুন পরিকল্পনায় মেতে উঠলেন।

কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা একটি বিশেষ আলোচনা সভায় মিলিত হয়ে স্থির করলেন,—সারা শহরকে আলোকমালায় অভিনবরূপে সজ্জিত করতে হবে।

বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে প্রস্তাব গৃহীত হল।

কর্পোরেশনে যত বিজলীবাতির মিস্ত্রি ছিল—তারা ত' সঙ্গে সঙ্গেই কোমর বেঁধে কাজে লাগল। গোটা শহরের বড় বড় রাজপথগুলি আলোকমালায় ঝলমল করে তোলা ত' সহজ কথা নয়।

কাজেই বাইরের বিজলী-মিস্ত্রিদেরও এই আলো জ্বালানোর কাজে লাগানো হল।

নিবারণও অন্যান্য মিস্ত্রিদের সঙ্গে এই কাজে লেগে গেল। দিন নেই, রাত নেই—ওরা শুধু বিজলী-তার নিয়ে কাজ করে চলেছে। খুব চড়া পাওয়ারের বাল্বগুলি ঝলবে এইসব রাজপথে।

একদিকে চলেছে তোরণ তৈরির কাঠের মিস্ত্রির হাড়ভাঙা পরিশ্রম,—আর একদিকে এগিয়ে চলেছে বিজলী-তার ঝোলানোর অবিরাম ঝামেলা।

নিবারণ যে দুপুরবেলা খেতে আসবে তারও ফুরসৎ পায় না। কাজের জায়গাতেই অন্যান্য মিস্ত্রিদের সঙ্গে বরাদ্দ খাবার খেয়ে হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটে। কিন্তু টুনীর রান্না করবার হুকুম নেই। তাই দাদাকে না জানিয়ে সে কোনোদিন তেলেভাজা মুড়ি চিবিয়ে খিদে মেটায়—আবার কোনোদিন বা পাড়া থেকে কচুরী আর তরকারী কিনে খায়। শিখের দোকান ওদের পাড়ায় নেই,—কাজেই দাদা না হলে মাংস-রুটি কে কিনে আনবে?

নিবারণ দিন-রাত খাটছে। ওইখানেই মাঠের ধারে ওদের কয়েকটি তাঁবু খাটানো হয়েছে। সেইখানে তাদের যন্ত্রপাতি থাকে। আর পালা করে মিস্ত্রিরা কিছু কিছু সময় ঘুমিয়ে নেয়। বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসবার ফুরসৎ মেলে না। যারা গোটা শহরে আলো জ্বালাবে—তাদের ঘর দিন কয়েক অন্ধকার থাকুক না!

হঠাৎ একদিন সকালের দিকে নিবারণ বোনের খোঁজখবর নিতে এসেছে। হাতে কিছু ফল আর বান রুটি।

টুনী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, এ কি চেহারা হয়েছে তোমার দাদা? তুমি কি খাও না—আর ঘুমোও না? ও-রোজগারে তোমার দরকার নেই, আজই কাজ ছেড়ে দিয়ে এসো।

নিবারণ টুনীর মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, শুধু আজকের দিনটা রে টুনী। আজই আমাদের সব কাজ শেষ হবে। আজ আলো জ্বলবে—হাজার হাজার দামী আলো। দেখিস গোটা পথ দিন-বরাবর হয়ে যাবে। একটা ছুঁচ পড়ে থাকলেও কুড়িয়ে নেওয়া যাবে। কাল ত' সেই বিদেশী অতিথি আসবে—কাল রাস্তাঘাটে দারুণ ভিড়। আজই রাত্তিরে এসে তোকে রিক্সা করে নিয়ে যাবো। হাজার-হাজার আলো জ্বলছে দেখে আসবি নিজের চোখে। তারপর আমরা করবো কি জানিস? শিখের দোকানে বসে গরম-গরম রুটি-মাংস খেয়ে আবার সেই রিক্সা চেপে ঘরে ফিরে আসবো। রাত্তির বেলা রিক্সা চাপতে কি আরাম দেখবি তখন। কেমন ঝিরঝিরে হাওয়া দেয়—মন-প্রাণ একেবারে মাতিয়ে তোলে।

নিবারণের কথা শুনে টুনীও খুব মেতে ওঠে। কোনোদিন ত' আর ঘরের বাইরে যেতে পায় না। টুনী মনে-মনে স্বপ্ন রচনা করতে লাগলো। তার বন্ধু পালুর কাছে দাদার কেরামতির কথা কতভাবে গল্প করলে সারাদিন ধরে। এমন'কি পালুকে নেমন্তন্নও করলে—আলোর মালা দেখবার জন্যে।

সেইদিন রাত্তিরে আলো জ্বলবে। ঠিকাদার, সুপারভাইজার সবাই

এসে হাজির। মিস্ত্রিরা আজ তাদের আলোর মালার মোহময় স্বপ্ন রচনা করবে।

সব দিকে সবাই প্রস্তুত।

মিস্ত্রিরা বলছে, তাদের দিক থেকে সব কাজ শেষ হয়েছে—এখন বিজলী প্রবাহের সংযোগ হলেই আলো জ্বলে উঠবে।

কনট্রাক্টর, ঠিকাদার, সুপারভাইজার······মিস্ত্রির দল সবাই উল্লসিত!

তাদের এতদিনকার পরিশ্রম আজ সার্থক হবে। তাদের মুখগুলো আজ আলোর মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সুপারভাইজারের আদেশ হল,—সুইচ্ 'অন' করে দাও—

মিস্ত্রিরা সঙ্গে-সঙ্গে সেই রকম কাজ করলে। কিন্তু আলো তাতে জ্বলল না।

ঠিকাদার বললে, ও-হে নিবারণ, তুমি ত' সেরা মিস্ত্রি—সবাই সে-কথা বলে। তুমি একবার ওপরে উঠে দেখ না, কোথায় কি গড়বড় হয়েছে! তোমার ত' এক মিনিটের কাজ। যাবে,—টুক্ করে কাজটা হাঁসিল করবে,—আর তোমার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আলো জ্বলে উঠবে।

নিবারণ এগিয়ে এসে বললে, আমি ওপরে উঠতে পারি স্যার, কিন্তু ওই কাঠের লম্বা সিঁড়িটা বড্ড নড়বড়ে। যদি চারজন লোক নীচে শক্ত করে ধরে—তা হলেই আমি ওপরে উঠতে সাহস পাই।

ঠিকাদার বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ধরবে বৈ কি। তখন ঠিকাদার চারজন কুলিকে ডেকে এনে সেই উঁচু লম্বা কাঠের সিঁড়িটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললে।

যথারীতি ব্যবস্থা হলে নিবারণ তর্তর্ করে সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

কিন্তু কাজটাকে সে যত সহজ মনে করেছিল তা নয়। ওটা সারাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে।

নিবারণ ওপর থেকে হাঁক দিয়ে বললে, চট্ করে হবে না স্যার—বেশ খানিকটা সময় নেবে—

নীচে থেকে ঠিকাদার জবাব দিলে, আচ্ছা, তুমি কাজ চালিয়ে যাও—আমরা সবাই আছি—তোমার কোনো ভয় নেই।

কাজ চলছে।

অনেকটা সময় কেটে গেল,—তবু নিবারণ সেটা সারিয়ে তুলতে পারলে না।

ঠিকাদার অসহিষ্ণু হয়ে বললে, আর কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে কে জানে! তারপর একটা কুলির দিকে তাকিয়ে বললে, চা নিয়ে আয় ত' কয়েক কাপ। যাবি আর আসবি। অন্য তিনজন কুলি তাতে আপত্তি জানিয়েছিল। ঠিকাদার হুমকি দিয়ে বললে, তোরা তিনজন শক্ত করে ধরে থাক্। দু'বেলা ডাল-রুটি মারিস নে?

একটা লোক বেরিয়ে আসতে—ওরা টাল সামলাতে পারলে না। হুড়মুড় করে অত উঁচু কাঠের সিঁড়ি কাৎ হয়ে ভেঙে পড়ল। আর নিবারণের দেহটা তড়িতাহত হয়ে অত উঁচুতে মোটা বিদ্যুতের তারে প্রাণহীন হয়ে ঝুলতে লাগল।

সেই সময় টুনী নতুন ফ্রক পরে ভাবছে,—কখন দাদা ফিরে আসবে, আর কখন তাকে রিক্সা করে হাজার-হাজার আলোর মেলা দেখাতে নিয়ে যাবে!

একদিন যা হয়েছিল

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(রূপকথা)

এক রাজা। রাজ্যের নাম বা সে-রাজার নাম ইতিহাসে পাই নি, তবে রাজা রাজাই,—তাঁর নামধামের কি এমন প্রয়োজন। এ রাজার বয়স বেশি নয়। রাজার মন্ত্রী আছেন, সেনাপতি আছেন, পাত্রমিত্র অমাত্য আছেন—পুরোহিত, খাজাঞ্চি, রক্ষী—সব আছেন আর আছে বিরাট তোষাখানা এবং অসংখ্য প্রজা।

তিন হাজার বছর পূর্বে সূর্যবংশের কোন রাজা এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—এবং বংশানুক্রমে এ রাজ্য এঁরাই চালিয়ে আসছেন। তিন হাজার বছর পূর্বে যে সব আদব-কায়দা, আইন-কানুন চলেছিল, আজ পর্যন্ত ত' এ রাজ্যের রাজা-রাজড়া পালন করে আসছেন। বেশে-ভূষায় আহারে-বিহারে সেদিনের কসাবে বিধিনিষেধের আজ পর্যন্ত একতিল ব্যতিক্রম ঘটে নি। সকলে নিজের নিজের কর্তব্য পালন করে আসছেন। সেই সব বিধিনিষেধ মেনে রাজা ওঠেন, বসেন, খানদান, শাসন পালন করেন।

সকালে পাঁচটায় নহবৎখানায় ভোরের সানাই বাজে,—সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদকক্ষে বৈতালিকেরা বন্দনা গান শুরু করলে রাজা মন্ত্রী জেগে ওঠেন। বিছানা থেকে উঠেই রাজা প্রাতঃকৃত্য সারেন। তারপর নাপিত এসে দাড়ি কামিয়ে দেয়, রাজা আসেন স্নানের ঘরে—সেখানে শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চায় গন্ধজলে ভৃত্যেরা রাজাকে স্নান করিয়ে দেয়—তারপর রাজবেশ পরে রাজা এসে বসেন চা খেতে—চায়ের পর্ব শুরু হয়েছে দেড়শো বছর আগে থেকে—সে এক কাহিনী।

রাজ্যের সব বিষয়ে পরামর্শদাতা কুল —যা

ছিল—বশিষ্ঠের প্রতিপত্তি, এ রাজ্যে তেমনি কুলগুরুর প্রতিপত্তি। একবার সেই দেড়শো বছর আগে কুলগুরুর ভীষণ সর্দি হয়েছিল কিছুতে সে সর্দি সারে না—বৈদ্যেরা বড়ি-পাঁচন খাইয়ে সারাতে পারল না, অ্যালোপাথিকরা কোন মিকশ্চারে সারাতে পারলো না—শেষে এক সাধুবাবা আসাম হিমালয় পর্বত থেকে নির্দেশ দেন কুলগুরুকে পাহাড়ী চায়ের পাতার ক্বাথ খেতে। তাতেই কুলগুরুর সর্দি সারে। কুলগুরু তখন এই চায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে পুঁথির পাতায় সে শ্লোক এঁটে দেন—শ্লোকটি হলো—

সুখদা কলিযুগে চা শুভদ বুদ্ধিকারিকা—
ত্রিসন্ধ্যা যো পিবেৎ এই চা
সো দীর্ঘায়ুর্ভবেৎ ধ্রুবম্।

সেই থেকে এ রাজ্যে চায়ের প্রচলন।

চা-পানের পর রাজা রাজসভায় বসেন বেলা বারোটা পর্যন্ত, তারপর রাজা আপন অন্দরে রাজমাতার সামনে বসেন ভোজনে, ভোজনের পর বিশ্রাম—বিশ্রামের পর বিকালে অস্ত্রাগার পরিদর্শন, তারপর চা পানান্তে ঘোড়ায় কিম্বা হাতীতে চড়ে বাঘ শীকার ভ্রমণ—ফিরে এসে সান্ধ্য আসর, গীতবাদ্য, অভিনয় দর্শন এবং রাত্রি নটায় ভোজন, সাড়ে নটায় শয়ন। তিন হাজার বছর ধরে এতদিন পালন করে আসতেন রাজারা এ বিধি। তার ওলট-পালট নেই। রাজ্যপরিচালনায় বেশ শৃঙ্খলা আছে—এ সবের অন্তরালে যে বিরাট পৃথিবী সে পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে কত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হচ্ছে এ রাজ্যের রাজা থেকে কি প্রজারা তার কোন খবর রাখে না।

কিন্তু একদিন ঘটলো এর ব্যতিক্রম—সেই কাহিনীটি বলছি। সেদিন চা-পান শেষ করে রাজা বিশ্রাম করছেন, মন্ত্রী এসে বললেন—মহারাজ!

রাজা বললেন—কি সংবাদ মন্ত্রী?

মন্ত্রী বললেন,—মহারাজ! আবার ভুলে পাশের রাজ্যের রাজা আমাদের রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করেছে।

রাজা অবাক! বললেন—হঠাৎ তার এমন স্পর্ধা!

মন্ত্রী বললেন—আমাদের একদল প্রজাদের পরিবর্তন—মামুলি আচার-বিধি তারা ভেঙ্গে দিতে চায়। তাই পাশের রাজ্যের রাজার সাহায্য চেয়েছে।

রাজা বললেন—তোপ দাগো—তোপের মুখে সব উড়িয়ে দাও।

মন্ত্রী বললেন—যথা আজ্ঞা মহারাজ।

সে আজ্ঞা যথারীতি পালিত হলো।

দু' মাস পরে মন্ত্রী এসে জানালেন—প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে, সকলে একজোট। তারা সনাতন বিধি-নিষেধের প্রাচীর চূর্ণ করে দিতে চায়।

রাজা বললেন—বারবার তোপ দাগলে রাজ্য প্রজাশূন্য হবে—তখন কাদের নিয়ে রাজ্য চালাবো?

মন্ত্রী বললেন—ঠিক কথা মহারাজ।

রাজা বললেন—তা হলে উপায় কি বলো!

মন্ত্রী বললেন—আপনার পাঠাগারে সেদিন আরব্য উপন্যাস পড়ছিলুম মহারাজ—তাতে লেখা আছে—বোগদাদের খালিফ হারুণ অল রসিদ ছদ্মবেশে রাজ্যের আশেপাশে ঘুরে প্রজাদের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। প্রজারা যা চাইতো তিনি তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করতেন—তারা তাঁকে খুব মানতো।

আপনি যদি তাই করেন—

রাজা বললেন—চমৎকার প্রস্তাব। আমি তাই করবো—কিন্তু কথাটা গোপন রাখা চাই—শুধু তুমি জানবে, আর কেউ না।

মন্ত্রী বললেন—তাই হবে মহারাজ।

রাজা বললেন—কুলগুরুকে জানানো হবে না।

মন্ত্রী বললেন—না মহারাজ! রাজ্য রক্ষা করা হলে প্রজাদের রক্ষা করা চাই। কুলগুরু শুধু পুঁথি জানেন প্রজাদের জানেন না।

গভীর রাত্রে মন্ত্রীর হাতে রাজমুকুট দিয়ে দীনবেশে রাজা বেরুলেন খিড়কী দিয়ে পুরী ত্যাগ করে রাজপথে। মন্ত্রী বললেন, কাল রাত্রে এই দ্বার দিয়েই আপনি পুরী প্রবেশ করবেন।

রাজা বললেন বেশ!

রাজা সঙ্গে নিয়েছেন ছোট থলি ভরে একরাশ মোহর। কাল সারাদিন খেতে এবং থাকতে খরচ করতে হবে তো!

মন্ত্রী বললেন—একজন রক্ষী যাবে সঙ্গে—

রাজা বললেন—না না। তা হলে জানাজানি হতে পারে।

মাঠে-ঘাটে-সরাইয়ে মানুষের কি জটলা—এদের মেলামেশায়, হাসি-কলরবে এতটুকু জটিলতা নেই,—অতি সরল-সহজ তাদের আচরণ।

নিশ্বাস ফেলে বিদেশী ভাবলো চমৎকার আছে এরা! ঘড়ির কাঁটা ধরে বসা-দাঁড়ানো যায়।

স্নানাহারের পর···নিঃসঙ্কোচ আচরণ। নদীর জনহীন তীরে জীর্ণ একখানি ঘর। সকালে স্নান করতে এসে সকলে দেখে সে ঘরে দীনবেশ এক বিদেশী আশ্রয় নিয়েছে। নদীর জলে স্নান করে দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেয়ে বিদেশী পথে বেরিয়ে ভিড়ে মিশল।

সরাইয়ে লোকজনের কি অন্তরঙ্গতা, প্রাণখোলা আলাপ। কারো কথায় এতটুকু জটিলতা নেই, কায়দা মেনে চলার ইঙ্গিত নেই। যেমন খুশি গল্প, গান, হাসি, তামাসা—এ-যেন আর এক পৃথিবী! গম্ভীর মুখে নিস্পন্দভাবে কেউ এখানে থাকে না! চমৎকার! এরই নাম বুঝি জীবন?

নিশ্বাস ফেলে বিদেশী ভাবলে, এদের পায়ে শিকল নেই, কাজেও কোনো বাঁধা নিয়ম নেই।

সরাই ছেড়ে বিদেশী বার হলো। সরাইওয়ালার চাকর বললে—আবার এসো ভাই।

কি দরদ! রাজা বললেন—আসবো বৈ-কি।

রাজা পথে বার হলেন। রাজপুরীর বাইরে আনন্দ যেন হাওয়ার মত মুক্ত লহরে বয়ে চলেছে! লোকজনের মুখে-চোখে সে আনন্দ কি দীপ্তিই না ফুটিয়ে তুলেছে। ঐ তাঁর ক'জন অমাত্য পথে চলেছে। তারা বেশ হাসি-মুখে খোশ-গল্পে মশগুল হয়ে চলেছে তো! কারো মুখে গাম্ভীর্য নেই! গুরুভাব নেই! এরাও হাসতে জানে, প্রাণখুলে গল্প করতে জানে! তাঁর সভায় তবে অমন মুখ গোমড়া করে এরা থাকে কেন?

আনন্দ যা কিছু তা তবে রাজপুরীর বাইরেই ?···

মাথার উপর নীল আকাশ, পাখির গান, ফুলের গন্ধ-ভরা বাতাসের মুক্ত অবাধ প্রবাহ···সবই অপরূপ!

রৌদ্র পড়ে আসছিল। মাঠে-ঘাটে ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি, রাখালের বাঁশী, মাদলের সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে চাষী-মজুরদের নাচ-গানের মেলা ও ভিড়ে তিনিও যদি মিশতে পারতেন! ওদের ওই আনন্দে নিজের আনন্দ মেলাতে পারতেন!

ক্রমে সন্ধ্যা নামলো। মন্দিরে-মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টার রোল···

বিদেশীর বেশে রাজা চলেছেন।···নগরের প্রান্তে বনের ধারে প্রজাদের কি একটা উৎসব চলেছে। রাজাকে দেখে তারা চীৎকার করে উঠলো,—আয় রে! তোকে বিদেশী দেখছি। আজ আমাদের এ উৎসবে তোর মলিন মুখ দেখতে পারবো না। আয় খাবি আয়···

গরীব কাঠুরিয়া···কাঠ বেচে ক'পয়সা সে পায়! সেই পয়সায় অতিথিকে ডেকে এমন আদরে আসর মাতায় এমন অসঙ্কোচ আনন্দে···

রাজা বললেন—কি দেবে, দাও।

বুড়া কাঠুরিয়া লাড্ডু এনে দিলে; বুড়ি বাতাসা দিলে; বুড়ার ছেলে মুড়ি নিয়ে এলো; পাতায় ভরে মেয়ে নিয়ে এলো ঝর্ণার জল। রাজা তাদের সেবায়-যত্নে শ্রান্তি দূর করলেন।···রাত্রে পুরীতে ফেরবার কথা। রাজা ফিরলেন।

দ্বার খুলে মন্ত্রী বললেন, কে?

রাজা বললেন—এক বিদেশী আমি।

মন্ত্রী বললেন—আসুন মহারাজ। বৈতালিকেরা প্রস্তুত আপনার বন্দনা-গানের জন্য···

রাজা বললেন—আমাকে ছুটি দাও মন্ত্রী। আমি আজ বাইরে থাকতে চাই। এখানকার এই বিধি-নিয়ম, আদব-কায়দার বাঁধাবাঁধির কথা মনে হলে প্রাণ যেন হাঁফিয়ে ওঠে।

মন্ত্রীর বিস্ময়ের সীমা নেই। মন্ত্রী বললেন—মহারাজ···

রাজা বললেন—আনন্দ যা কিছু, তা বাইরেই। সে-আনন্দ পাবার জন্য আমি সিংহাসন ত্যাগ করতে পারি···

মন্ত্রী আবার বললেন—মহারাজ···

রাজা বললেন—জীবন ক'দিনের জন্য মন্ত্রী? জীবনে আনন্দ যদি না মেলে, তবে কিসের জন্য জীবন?···কতকগুলো নিয়মের বাঁধনে বন্দী হয়ে থাকার কোনো সুখ নেই। বন্ধনে আনন্দ নেই মন্ত্রী, তাই আমি স্থির করেছি···

মন্ত্রী বললেন—কি স্থির করেছেন মহারাজ?

রাজা বললেন—ঐ বিদ্রোহীদের ডাকবো। ওরা মুক্তি চায়। ওরা চার দেওয়ালের দুর্ভেদ্য অন্তরালে যে-অন্ধকার জমে আছে, সে অন্ধকার দূর করতে। আমিও তাই চাই। দুর্ভেদ্য কারাপ্রাচীর ভেঙ্গে ওদের রাজা আজ মানুষের মতো ওদের সঙ্গে মেলামেশা করবে। তোমরা যদি তাতে রাজী না হও, তা হলে সিংহাসনের অন্ধকূপে আর কোনো হতভাগ্যকে এনে বসাও, কায়দা-কানুনের বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধ তাকে। আনন্দ কি তা আমি বুঝেছি। আদব-কায়দার বাঁধন আর মানব না—মানতে পারবো না।

মন্ত্রী বললেন—মানতে হবে না, মহারাজ! এ দুর্ভেদ্যতা ভেঙ্গে রাজপুরীকে আজ নগরের মুক্ত-প্রান্তরের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। তাতে কারো দুঃখ থাকবে না।···

রাজা বলিলেন···তাই হোক মন্ত্রী—তুমি সেই ব্যবস্থাই করো।

ভালো আবৃত্তি করতে হ'লে

সুশীল মণ্ডল

আবৃত্তি করতে কার না ভালো লাগে। কিন্তু সবার আবৃত্তি যে শুনতে ভালো লাগে তা বলতে পারি না। গান করা, ছবি আঁকা, বক্তৃতা করা, বাজনা বাজানো এ সমস্তই হ'চ্ছে অনুশীলনের ওপর নির্ভরশীল। ভালো অনুশীলন করলে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন যে গান গায় সে বড় গায়ক হ'য়ে উঠবে। তেমনি আবৃত্তিও। আবৃত্তি যে করে সে যদি নিয়মিতভাবে বাড়িতে অনুশীলন না করে তা হ'লে কোনদিন-ই ভালো আবৃত্তিকার হ'য়ে উঠবে না।

মাঝে মাঝে এমন আবৃত্তি শুনেছি যে, মনে হয়েছে সত্যি সত্যি আমি যেন কবিতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি। দুঃখের কবিতা শুনে চোখ দিয়ে জল পড়েছে। আবৃত্তি যদি অন্তরকে নাড়া দিতে না পারলো তবে আর আবৃত্তি কিসের! কিন্তু এমন আবৃত্তি কদাচিৎ শোনা যায়।

সুন্দর আবৃত্তি করার জন্য কতকগুলো বিশেষ বিশেষ জিনিসের ওপর জোর দিতে হয় বেশি। প্রথমত মুখস্থ। কবিতাটিকে জলের মত মুখস্থ করতে হবে। যেন মুখস্থের মধ্যে কোথাও এতটুকু খুঁৎ না থাকে। কারণ কবিতাটি যে শুনবে সে যদি শোনার মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হয় তা হ'লে তার কবিতা শোনার 'ভাব'টি (mood) যায় নষ্ট হ'য়ে। সে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে, ফলে কবিতাটির যা উদ্দেশ্য তা হয় ব্যর্থ। সেইজন্যই প্রথমে দরকার জলের মত মুখস্থ।

এরপর আসে উচ্চারণ। কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে এটির সম্বন্ধে অত্যধিক সাবধানতা প্রয়োজন। কারণ উচ্চারণের দোষে কবিতা সম্পূর্ণ জলের মত মুখস্থ থাকলেও শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। শ্রোতা বিরক্তি বোধ করে।

এ দেশের (পশ্চিমবঙ্গের) লোকেরা সাধারণত 'স'—উচ্চারণের ক্ষেত্রে ইংরাজী 'এস'-এর মত 'স'-কে উচ্চারণ করে। এটা কিন্তু দোষের। এ ছাড়া 'র'-কে 'ড়' বলে অনেকে। এ উচ্চারণের দোষ আবার বেশি ক'রে দেখা যায় পূর্ববঙ্গীয় লোকদের মুখে। তা ছাড়া 'উ'-কার উচ্চারণের ক্ষেত্রেও অনেকে 'উ'-কার উচ্চারণ করে। যেমন, 'যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে'র ক্ষেত্রে যু · গে—যূ—গে' টেনে টেনে উচ্চারণ করে।

তাই সুন্দরভাবে কবিতা আবৃত্তি করতে হলে উচ্চারণের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। যতদূর সম্ভব উচ্চারণকে স্পষ্ট এবং শুদ্ধ করার জন্য আবৃত্তিকারকে সচেষ্ট হ'তে হবে।

তৃতীয়ত আবৃত্তিকারকে সব সময়ে ভাবতে হবে যে সে আবৃত্তি করছে, অভিনয় করছে না। অনেকে আবৃত্তি করার সময় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গি করে। এগুলি কিন্তু মারাত্মক দোষের।

স্বরের মধ্যে যদি জড়তা থাকে তবে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। জড়তা থাকলে কবিতা শুনতে খারাপ লাগে। বলার ভঙ্গিটাও হবে মার্জিত।

অবশেষে এ কথাও ঠিক যে, সূক্ষ্ম রসবোধ না থাকলে কবিতা আবৃত্তি করা যায় না। কবিতাকে মন দিয়ে বুঝতে হবে সবার আগে।

সাহিত্য পরিচয়

বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কিশোর নাটক, অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীর পাঠ ও অভিনয়যোগ্য নাটক। স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যজীবনী অবলম্বনে রচিত নাটকটি অভিনয়োপযোগী তো বটেই তা ছাড়া এর নিজস্ব একটা অবদানও আছে, তা হল এর সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিশীলতা, কিশোর-কিশোরী তো বটেই, বয়স্ক পাঠকেরও মন আকর্ষণ করার মত 'সঙ্গতি' আছে এ রচনার। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রবোধ সরকার, প্রকাশনায়—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২, দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বিচিত্র বিবেকানন্দ

'বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী' উপলক্ষে যে সব রচনা আজ অবধি প্রকাশিত হয়েছে, বর্তমান রচনাও তার অন্যতম! উনবিংশ শতাব্দী বাঙালী জাতির পক্ষে চিরস্মরণীয়, কারণ এই শতাব্দীই বাংলাকে উপহার দিয়েছে এমন সব মানুষ যাঁদের জন্য বাঙালী আজও বিশ্বসভায় জাতি হিসাবে গণ্য ; এবং বলা বাহুল্য মাত্র যে 'স্বামী বিবেকানন্দ' তাঁদের মধ্যে ও পুরোধা শ্রেণীর। বর্তমান গ্রন্থে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখক এই মহৎ চরিত্র সম্বন্ধেই কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন। 'স্বামী বিবেকানন্দের' চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ।। চিন্তাকে বুঝতে আলোচ্য রচনা যথেষ্ট সহায়তা করবে আর সেটাই এ গ্রন্থের রচয়িতার মূল উদ্দেশ্য। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। লেখক—ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী। প্রকাশনায়—বাক্-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—দু' টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

বিশ্বনাথ শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামী

মহাপুরুষ শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামীর জীবনী অবলম্বনে রচিত এই রচনা নানা কারণেই উল্লেখ্য। হিন্দুমাত্রই এই অবিস্মরণীয় মানুষটির নামের সঙ্গে পরিচিত, সাধন জীবনে এমনই উচ্চমার্গের পথিক ছিলেন তিনি যে, তাঁকে 'সচল বিশ্বনাথ' বলেই অভিহিত করা হত। 'তৈলঙ্গস্বামী' সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত আছে, বর্তমান গ্রন্থেও তার কয়েকটি সন্নিবেশিত করেছেন লেখক, বস্তুত এই মহাত্মার জীবন-কাহিনী প্রায় রূপকথার মতই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অবিশ্বাস্য, অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষের প্রাণসত্তাই যেন বিকশিত হয়েছিল এঁর মধ্যে ; এই পূত জীবনকথা পাঠ করতে করতে পাঠক ভারতের মহিমময় অতীতকে যেন উপলব্ধি করতে পারেন, শত শত যোগী, জিতেন্দ্রিয় মহামানব দ্বারা অধ্যুষিত ভারতবর্ষকে যেন চিরন্তন মহিমায় স্বীয় পটভূমিতে আবিষ্কার করেন নতুন করে। বিশ্বাসী বুধজনের কাছে এ গ্রন্থের অবশ্যই সমাদর হবে। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রকাশক—কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—চার টাকা।

আমাদের বিশ্বকবি

রবীন্দ্রজীবন ও বাণী সম্বন্ধে লেখা এই রচনার মূল উদ্দেশ্য হল বাংলার কিশোর-কিশোরীর মনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা। লেখক শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর সুপরিচিত কর্মী, বিশ্বকবির সান্নিধ্যলাভের সুযোগেও ধন্য হয়েছিলেন তিনি একদা, সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে যদিও তিনি রচনার মাঝে ছড়িয়ে দেন নি, তবু বলা যায় যে হয়ত বা সেজন্যই তাঁর রচনা এতটা প্রোজ্জ্বল, এতটা আন্তরিক হয়ে উঠতে পেয়েছে। লেখকের ভাষারীতি অত্যন্ত সুষম ও সাবলীল, সহজভাবে বর্ণনা করেছেন তিনি রবীন্দ্র-জীবনীর মূল তথ্যগুলিকে, বিশ্বকবির জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে একটা সুসংহত ধারণা জন্মায় বইটি পড়লে ; কিশোর-কিশোরীর জন্য লেখা হলেও অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রই এ রচনা পাঠে উৎসুক হবেন। আমরা এই গ্রন্থের সাফল্য কামনা করি। আঙ্গিক শোভন ও পরিচ্ছন্ন। লেখক—ক্ষিতীশ রায়। প্রকাশনায়—ডিরেক্টর পাব্লিকেশনস্ ডিভিশন, মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং, ওল্ড সেক্রেটারিয়েট, দিল্লী-৬। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

জনগণের রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহুবিধ রচনাদি প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে, তার মধ্যে যে ক'টি রচনা প্রকৃতার্থে প্রামাণ্য এই আখ্যায় অভিহিত হওয়ার দাবী করতে পারে আলোচ্য গ্রন্থ তারই অন্যতম। এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় জনগণ বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্যের সংযোগ। শুধু সাহিত্যই নয় জীবন ও কর্মের মাঝ দিয়েও রবীন্দ্রনাথ সাধারণের জন্য যা যা করে গেছেন তাও বিশ্লেষিত হয়েছে এই রচনার মাধ্যমে। বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধের উপস্থাপনা করে নিপুণভাবে লেখক রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ দিকটি সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করে তুলেছেন, বইটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে জনগণের সঙ্গে বিশ্বকবির যে আত্মিক বন্ধন ঘটেছিল তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, অনুসন্ধিৎসু ও বোদ্ধা এই উভয়বিধ পাঠকই যে বর্তমান গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। বাংলা প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ রচনা এক মূল্যবান সংযোজন। লেখকের আন্তরিকতায় তাঁর বক্তব্য আরও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। প্রচ্ছদ অতি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—সুধীরচন্দ্র কর। প্রকাশনায়—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—দশ টাকা।

বার্নার্ড শ'

বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী 'বার্নার্ড শ' সম্বন্ধে আজ অবধি যত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে যে ক'টি বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা দাবী করতে পা.র আলোচ্য গ্রন্থ তারই অন্যতম। বর্তমান রচনায় শ'র ব্যক্তিজীবন অপেক্ষা তাঁর জীবনদর্শনের দিকটাতেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, শ'র সাহিত্যচেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির একটা নিখুঁত পরিচয়ে উজ্জ্বল এ রচনা সুধী পাঠককে খুশি করে তুলবে বলেই মনে হয়। গ্রন্থকারের ভাষা সহজ, আপন বক্তব্যকে স্বচ্ছন্দে অগ্রসর করে নিয়ে গেছেন তিনি, বইটি পড়তে তাই ভাল লাগে, বিষয়বস্তুর গুরুত্বও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। জীবন ও জীবনীমূলক রচনার আসরে বর্তমান রচনা মূল্যবান এক সংযোজন বলেই বিবেচিত হবে। প্রচ্ছদ সংযত-সৌন্দর্যে মণ্ডিত, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—ঋষি দাস। প্রকাশনায়—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—ছয় টাকা।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা

'রবীন্দ্রনাথ' তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তারই অন্তরঙ্গ এক পরিচয়ে উজ্জ্বল এ রচনা নানা কারণেই উল্লেখ্য। বর্তমান গ্রন্থে শান্তিনিকেতন বা অধুনা প্রসিদ্ধ বিশ্বভারতীর পূর্ব ইতিহাসের বিবিধ উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, রচনাকার স্বয়ং এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহুদিনাবধি জড়িত, তাঁর শিক্ষা, দীক্ষা ও কর্ম এখানেই—সুতরাং এ রচনাকে প্রামাণ্য বলাটা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। রবীন্দ্রনাথের বহু অপ্রকাশিত চিঠিপত্র এতে সংকলিত হয়েছে, বহু ঘটনা ও বিবরণ বা বিস্মৃতপ্রায় তাও স্থান পেয়েছে এতে—সুতরাং অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে এ গ্রন্থ যে মূল্যবান বলেই গণ্য হবে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। 'শান্তিনিকেতন' যে গুরুদেবের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী তাও বোঝা যায় বর্তমান রচনাটির সঙ্গে পরিচয় ঘটলে, বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শেরই মূর্তপ্রতীক যেন এই শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীকে চেনা দরকার, জানা দরকার, বর্তমান রচনার মাধ্যমে আমাদের সেই চেনা-জানার পথেই কিছুটা এগিয়ে দিয়েছেন লেখক। প্রচ্ছদ অতি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—সুধীরচন্দ্র কর। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—দশ টাকা।

সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ
ভাষা-দীপিকা (২য় ভাগ)

আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত ভাষার পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ এক ব্যাকরণ রচনার উদ্যমে ব্রতী হয়েছেন লেখক, বর্তমান খণ্ডটি তারই দ্বিতীয় ফসল। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পক্ষে এ ধরণের পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে, লেখকের যত্নে ব্যাকরণের মত কঠিন বিষয়ও বেশ সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে, শিক্ষার্থীর কাছে বর্তমান গ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলেই মনে হয়। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—শ্রীবসন্তকুমার শাস্ত্রী। প্রকাশক—শ্রীবসন্তকুমার শাস্ত্রী, ৩১ বি, লেক টেম্পল রোড, কলিকাতা—২৯। দাম—তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

শেক্সপীয়রের গল্প

মহাকবি শেক্সপীয়রের অমরকাব্য নাটকগুলির পরিচয় নতুন করে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে তাঁর নাটকগুলির বিষয়বস্তু শুধু মহৎ সাহিত্যেরই রস প্রদান করে না তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কয়েকটি নিটোল কাহিনীও; বর্তমান গ্রন্থ সেইরকম ক'টি গল্পকেই পরিবেশন করা হয়েছে সহজবোধ্য শৈলীর মাধ্যমে। এই গল্পগুলি থেকে মহাকবির অমর রচনাবলীর সাথে পরিচয় ঘটে পাঠকের, মূলত ছোটদের জন্য রচিত হলেও বয়স্ক পাঠকও যে এগুলি পাঠে তৃপ্ত হবেন এমন আশা করা অসঙ্গত নয়। শিশু সাহিত্যের ভাঁড়ারে এ গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য অবদান। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—শিশিরকুমার নিয়োগী, প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—দুই টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

মন্ত্রমুগ্ধ

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি কৌতুক নাটিকা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পীর অপরিমেয় দক্ষতায় ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে রচনাটি সত্যই উপভোগ্য। প্রথমেই বলা ভাল যে, এই নাটকখানি লেখকের নবীন কোন রচনা নয়, বহু পূর্বেই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এর, সে সময় পাঠকচিত্তের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করার সৌভাগ্যও ঘটে এর কপালে, বস্তুত সেদিন রসজ্ঞজনমাত্রই এই নাটক পড়ে ও অভিনীত হতে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, বহুদিন পরে নাটকটিকে সুষ্ঠুভাবে নবকলেবরে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে তাই এর প্রকাশক সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। নাটকের বিষয়বস্তু যে বৈচিত্র্যপূর্ণ একথা আগেই বলেছি, কারণ এর অন্যতম প্রধান চরিত্র একটি সারমেয় এবং তাকে কেন্দ্র করে যে হাস্যমধুর কাহিনী বিবৃত হয়েছে তা সহজেই মন কেড়ে নেয়। সরসোজ্জ্বলদীপ্ত সংলাপ এ রচনার আরেক ঐশ্বর্য! স্বামীকে মন্ত্রদ্বারা কুকুরে পরিণত করা হয়েছে ভেবে নায়িকা শুভঙ্করী কুকুরটিকে যেভাবে পরিচর্যা করতে থাকেন তার বর্ণনা পড়তে পড়তে সত্যই হেসে লুটোপুটি খেতে হয়, শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পকার হিসাবেই যাঁর অনন্যসাধারণ খ্যাতি সেই বনফুল যে নাট্যকার হিসাবেও নগণ্য নন, এ রচনায় তার স্বাক্ষর মেলে। একটি অতি মনোরম রসনাটিকা হিসাবেই উল্লেখ্য এ রচনা যে আজকের পাঠকচিত্তকে জয় করে নেবে আগের মতই সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। প্রচ্ছদ—বিষয়োচিত, অপরাপর আঙ্গিক ভাল। লেখক—বনফুল, প্রকাশক—বাক্-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা।

জয়ন্তী

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের আসরে 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' এক চিহ্নিত নাম, ভাষার দীপ্তিতে ও ভাবের ব্যঞ্জনায় তিনি সহজেই চমক জাগান পাঠক মননে, অতএব তাঁর রচনামাত্রই যে প্রত্যাশার

সঞ্চার করে তার পরিমাণও বড় কম নয়। আলোচ্য উপন্যাস সে প্রত্যাশা সফল করবে। প্রেমের এক বিচিত্র রূপ প্রকাশ পেয়েছে এই গ্রন্থের কাহিনীর মাধ্যমে, নায়িকা বাসন্তী একদা ভালবেসেছিল আশিসকে আত্মবিস্মৃত হয়েই কিন্তু আত্মতৃপ্তির সহজ পথটা ছেড়ে যে ত্যাগের পথটা সে বেছে নিল, তারই করুণ মধুর সুর এ রচনাকে দিয়েছে এক অভূতপূর্ব মর্যাদা, সত্যকার প্রেম যে কত নিঃস্বার্থ, কত মহীয়ান সে কথাটাই যেন নতুন করে ধরা পড়ে এই রচনার সঙ্গে পরিচিত হলে, জয়তী এক নারীর জীবন-জিজ্ঞাসায় আলোড়িত হয়ে ওঠে অন্তর, মথিত হয় মন। লেখকের দীপ্তোজ্জ্বল শৈলী বিষয়বস্তুকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে, রসজ্ঞ পাঠক বইটি পড়ে এক অনাস্বাদিত আনন্দলাভ করে ধন্য হবেন। আঙ্গিক রুচিপূর্ণ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা।

শিশু পরিবেশ

আলোচ্য গ্রন্থটি শিশু-মনস্তত্ত্বমূলক। লেখক যথেষ্ট সহজ ও সাবলীলভাবে শিশুদের মনের নানা বৈচিত্র্য ও তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। শিশুর মনকে সাধারণত কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অঙ্কুরকে যথোচিত যত্নের দ্বারা লালন না করলে যেমন তার থেকে মহীরুহের উদ্ভব আশা করা যায় না, শিশুকেও তেমনই সতর্ক সাবধানতার সঙ্গে পালন না করলে ভবিষ্যতে সুস্থ সবল মনঃশক্তি সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ মানুষকে লাভ করা যায় না, আর এরজন্য শিশুর দেহ ও মন এই দু'টি বস্তুকেই যত্ন করা প্রয়োজন, না হলে তার ক্রমবিকাশও স্বাভাবিক পথে ঘটে না। শিশুর মনের প্রবণতা তার একান্ত সাবধানতার সঙ্গেই পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, আলোচ্য রচনা এ সম্বন্ধেই আলোকপাত করে। মনে হয় বহু উদ্বিগ্ন পিতামাতা এ লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তৃপ্তিলাভ করবেন ও উপকৃত হবেন। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—সাত টাকা।

একটি বেগমের অশ্রু

সাম্প্রতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'নিগূঢ়ানন্দ' এক পরিচিত নাম। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। বর্তমান গ্রন্থে তিনি একটি নারীর জীবনের ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ, দুঃখের কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছেন। আন্না বেগম, আলিকুলি, বুলবুল বেগম, সফদরজঙ্গ, সুজা, ইমাদ প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলি লেখক সুন্দর ও মনোরমভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। লেখনীর যাদুতে কাহিনীটি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। লেখক যে একজন সিদ্ধকথক তাঁর রচনা পাঠে সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। উপন্যাসটি সর্বতোভাবে সুখপাঠ্য, আনন্দদায়ক ও রসসমৃদ্ধ। উপন্যাসটি সম্পূর্ণরূপে জড়তামুক্ত এবং কৃত্রিমতাশূন্য। ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। গ্রন্থটির বহুলপ্রচার কাম্য। লেখক—নিগূঢ়ানন্দ। প্রকাশনায়—জ্ঞানতীর্থ, ১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—ছয় টাকা।

পৌষ ফাগুনের পালা

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস লেখা হচ্ছে কমই, সেজন্য সত্যকার ও সার্থক কোন উপন্যাসের আবির্ভাব হলে স্বতঃই সাহিত্যানুরাগীর চিত্তে একটা চমক লাগে, বর্তমান উপন্যাসটি সম্বন্ধে এ কথা খাটে; বস্তুত এ রকম পূর্ণাঙ্গ ও মনোরম উপন্যাস পাঠের সুযোগ বর্তমান যুগের পাঠকের ভাগ্যে যে একান্তই বিরল এ কথাও অনস্বীকার্য। আলোচ্য গ্রন্থের পাত্র-পাত্রী বাঙালী পাঠকের কাছে নতুন আগন্তুক নয়, এর আগে আরও দু'টি উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক এদের উপস্থিত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে বর্তমান রচনা এক এপিক উপন্যাসেরই শেষ খণ্ড, কিন্তু সে সত্ত্বেও এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বড় কম নয়, আগের দু'টি উপন্যাস পড়া না থাকলেও এই রচনার রস গ্রহণ করাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। স্বয়ং সম্পূর্ণ এক মহৎ উপন্যাস পাঠের তৃপ্তিতেই আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে পাঠকের মন আর সেটাই এ গ্রন্থের রচয়িতার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। একান্নবর্তী পরিবারের যে ঘরোয়া ছবি এঁকেছেন লেখক তা আজকের দিনে প্রায় স্মৃতিতে পর্যবসিত। আর হয়ত সেজন্যই তার আবেদন প্রায় রূপকথারই মত অবিশ্বাস্যভাবে আকর্ষণীয়; কোন স্টান্ট নেই, বিভ্রান্তি বা চমক লাগাবার সামান্যতম কোন প্রচেষ্টাও নেই, শুধু ফেলে আসা দিনের এক অন্তরঙ্গ ও প্রামাণ্য পরিচয়ে মণ্ডিত হয়ে এ রচনা আত্মপ্রকাশ করেছে, যা পাঠ করতে করতে হারিয়ে ফেলতে হয় নিজেকে, গ্রন্থোক্ত চরিত্রগুলির সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার সঙ্গে কখন নিজেরও অজ্ঞাত একাত্ম হয়ে উঠতে হয়। গ্রন্থকারের আন্তরিকতা ও দক্ষতায় বাঙালীর পূর্বতন সমাজ ও সামাজিক জীবনের যে পরিচয় এই রচনার ছত্রে ছত্রে বিধৃত তাকে মূল্যবান এক দলিল বললেও বড় একটা অত্যুক্তি করা হয় না। আর সেজন্যই সাহিত্যের আসরে এ রচনার মূল্যায়ন করার নিরিখ শুধু সাহিত্যরসই নয় এর ঐতিহাসিকতাও, কারণ শুধু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনেই ইতিহাস রচিত হয় না, যে কোন জাতির যে কোন ব্যক্তির সমাজ জীবন ও অন্তরঙ্গ জীবনও ইতিহাসের বিষয়বস্তু। লেখকের শৈলী আশ্চর্যভাবেই পরিণত ও সাবলীল। এমন অনায়াস কুশলতায় টেনে নিয়ে গিয়েছেন তিনি কাহিনীকে যে এতবড় দীর্ঘ রচনা পাঠ করতেও মুহূর্তের জন্য ক্লান্ত হয়ে ওঠে না মন, ঔৎসুক্য থাকে উদগ্র, কৌতূহল অব্যাহত। এমন একটি লোভনীয় রচনা প্রকাশের জন্য, প্রকাশকও নিঃসন্দেহেই পাঠকের প্রভূত ধন্যবাদের অধিকারী। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম—পনেরো টাকা।

স্বাধিকার

আলোচ্য ক্ষুদ্রায়তন ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রটি, কতিপয় ছাত্র ও তরুণ সাহিত্য অনুরাগীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। কয়েকটি গল্প ও কবিতা আত্মপ্রকাশ করেছে এর মাধ্যমে, লেখকরা সকলেই নবাগত হলেও তাঁদের কয়েকজনের মধ্যে কিছুটা প্রতিশ্রুতির ইসারা পাওয়া যায়। পত্রিকাটির আঙ্গিক সম্বন্ধে উৎসাহী হওয়ার কোন কারণ নেই। সম্পাদনা—জিয়াদ আলী। প্রকাশনা—জিয়াদ আলী, বাউড়িয়া স্টেশন রোড, বুড়িখালী, হাওড়া।

শুভদৃষ্টি

মামুলী ধরণে লেখা মামুলী বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য না থাকলেও একটা সহজ সৌন্দর্য আছে। বুদ্ধির দীপ্তি বা চমকের চেয়ে যাঁরা সোজাসুজি বলা সাধারণ কাহিনী পছন্দ করেন, তাঁদের কাছে এ রচনা উপভোগ্য বলেই প্রতীয়মান হবে। লেখকের শৈলী পরিচ্ছন্ন ও আন্তরিক। প্রচ্ছদ—সাধারণ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—প্রভাত প্রকাশন, ৩০, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাসর লগ্ন

ছোট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসাবে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম আজ বাংলা সাহিত্যের আসরে সুবিদিত। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় নতুন করে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। লেখকের সাম্প্রতিক উপন্যাস বাসরলগ্ন সম্পূর্ণরূপে তাঁর সৃজনীশক্তির প্রধান পরিচায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাসর লগ্নের আখ্যানবস্তু এমন এক মরমী রসে আলিপ্ত যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠককে অভিভূত করে রাখে। বিশেষ রমলা চরিত্রটি অঙ্কনে লেখক তাঁর অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও বলিষ্ঠ লেখনীর পরিচয় দিয়েছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। জয়ন্ত, শান্তনু, সতী এবং এদের ঘিরে আর যে অন্যান্য চরিত্র ভিড় করেছে উপন্যাসটিতে তাদের মধ্যে সব ক'টি প্রধান চরিত্রই বাস্তবের রেখায় অঙ্কিত। চরিত্র চিত্রণে, কাহিনী বিন্যাসে, প্রকাশ ভঙ্গিমায় তিনি অভূতপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। উপন্যাসটিতে লেখক এক বলিষ্ঠ জীবনদর্শনের ভাষ্য রচনা করেছেন। কাহিনীটির গতি সাবলীল, লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে জীবনের নানারূপ ধরা পড়েছে—সেই মনোরম জীবন চরিত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। প্রকাশনায়—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৯, দাম—আট টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

আরুণি

বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই সাহিত্যপত্রটি বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক বুনিয়াদী বিদ্যালয় নরেন্দ্রপুর থেকে বর্তমান স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে, এতে প্রকাশিত রচনাদির অধিকাংশই ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণের; সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধগুলি স্বামীজীর মহান নীতি ও কর্মের ব্যাখ্যাস্বরূপ, তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি কথাও দু'-একটি রচনার মাঝে সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইংরাজীতে যে সব প্রবন্ধাদি রচিত হয়েছে সেগুলিও ভাবে-ভাষায় অনন্য, কয়েকটি মূল্যবান আলোকচিত্রও গ্রন্থের মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে, বস্তুত আঙ্গিকের পারিপাট্যে, রচনার উৎকর্ষে আলোচ্য স্মারক গ্রন্থটি যেন এক রূপে রসে ভরা পূর্ণ শতদল। প্রকাশক—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা।

পীতাম্বরের পুনর্জন্ম

সাহিত্যজগতে যে কয়জন প্রথম সারির লেখক আছেন তাঁদের মধ্যে বনফুল (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) অন্যতম। তাঁর অবদান বাংলা সাহিত্যকে যে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উপন্যাস। একজন কৃপণ ব্যবসায়ীকে কেন্দ্র করে এই কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। পীতাম্বর জীবনে টাকা ছাড়া অন্য কোন পার্থিববস্তু পৃথিবীতে যে থাকতে পারে তা তাঁর কল্পনারও বাইরে ছিল। অর্থের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সারাজীবন তিনি অতি সাধারণভাবেই অতিবাহিত করেছেন; কাউকেই তিনি কখনই সাহায্য করেন নি। মানুষের জীবনে কখন কোন সময় এবং কিভাবে যে পরিবর্তন আসে তা বলা কঠিন? একদিন রাত্রে নিদ্রায়, অবচেতন অবস্থায় আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন এবং আত্মারা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তাঁর মনের আসল পরিবর্তন ঘটায়। কাহিনীতে অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক জগতের ছায়াপাত হওয়ায় সব পাঠক-পাঠিকারই কৌতূহল জাগ্রত হয়, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কৌতূহল অব্যাহতও থাকে। চরিত্র সৃষ্টিতে, ঘটনা সংস্থাপনে লেখকের সৃজনী ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। একটি সুপাঠ্য রচনা পড়ার আনন্দে পাঠকের মন ভরে ওঠে আর সেটাই লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—বনফুল, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

তবে কেমন হত

আলোচ্য পুস্তকটি এক ক্ষুদ্রায়তন নাটক। নারী আদালতে নারীর দ্বারা সর্বকার্য পরিচালিত হলে কেমন রগড় জমে সেটাই দেখানো। নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বর্তমান নাটকখানিকে প্রহসন বলেই উল্লেখ করা উচিত। নাট্যকারের ভাষা ঝরঝরে, ভঙ্গী সহজ, হাল্কা হাসির ছোঁয়াভরা নাটকটি পড়তে ভালই লাগে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখক—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রকাশনায়—জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে

শিশু ও কিশোরদের মনোমুগ্ধকারী কাব্যরচনার ক্ষেত্রেও যে প্রতিভাধর কবিরা যথেষ্ট শক্তির স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থটি কিশোর সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। মোট বারোটি কবিতা ও একটি শিশু-উপভোগ্য নাটক স্থান পেয়েছে এই কাব্য-গ্রন্থটিতে—যার প্রত্যেকটি উপভোগ্য ও সরস। প্রকৃতপক্ষে কবির মজাদার শৈলী পাঠক মনকে যেন চুম্বকের মতই আকর্ষণ করে। গ্রন্থটি হাতে পড়লে প্রত্যেক ছেলেরাই যে খুশি হবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—কাজী নজরুল ইসলাম। প্রকাশক—ষ্টাণ্ডার্ড পাবলিশার্স। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা—১২।

রাগসংগীত কোন্ পথে ?

মন্মুজ গুপ্ত

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে আমাদের সামাজিকজীবনে যে সঞ্জীবনী শক্তির প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল, নানা কারণে তা' হয়ে উঠতে পারে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে, ভারতীয় রাগসংগীতের মাঝে এক ঘুম-ভাংগা ভাব লক্ষ্য করা গেছল গত কয়েক বছর। মনে হয়েছিল রাগসংগীতে ভারতের যে গভীর মননশীলতা আছে সেটা যেন প্রকাশ পাবে। কি জনচেতনায়, কি শিল্পচেতনায় উভয় দিকেই এমন এক উদ্দীপনা প্রকাশ পেয়েছিল, যাতে আশা হয়েছিল রাগসংগীতের সংস্কৃতিগত নবীন জীবনের সূত্রপাত হোল এবং এ বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু দুঃখের সাথেই বলতে হবে যে, বর্তমান কয়েক বৎসরে সেই উদ্দীপনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। মনে হচ্ছে যেন যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এর সুরু হয়েছিল তা' যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেছে—যেন পথ খুঁজে পাচ্ছে না কোন পথে গেলে প্রকাশ স্বাভাবিক হবে। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় রাগসংগীত যেন নূতন যুগের ধারায় মিল খুঁজে পাচ্ছে না এবং তার বক্তব্য তুলে ধরতে পারছে না।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নাম নিয়ে এখন পর্যন্ত রাগসংগীতের কিছু কিছু আবেদন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবার প্রচেষ্টা চলছে কিন্তু তাও যেন কৃত্রিমতার ছাপ পরে দায়সারা গোছের হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা কেন হোল ? এর কারণ বুঝতে হবে, খুঁজে বের ক'রতে হবে এর ভেতরের গলদকে। প্রত্যেক রাগসংগীত শিল্পীকে নূতন এই ধারাকে বুঝতে হবে নিজের আত্মসমালোচনার দ্বারা। এর মাঝের এই অবক্ষয়ের ধারাকে বন্ধ করতে হলে, নূতন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হলে কোনও প্রকার আত্মসন্তুষ্টির বেড়া দিয়ে নিজেদের ঘিরে রাখলে চলবে না—তাতে এই শিল্পের চূড়ান্ত সমাধি রচনা করা হবে, সাথে নিজেদেরও। ফলস্বরূপ এই ঐতিহ্যময় শিল্পধারায় এমন কিছু আসবে, যাকে আর নিজের বলে দাবী করবার উপায় থাকবে না—যার প্রভাব এখনই কিছু কিছু বুঝতে পারা যায়। কোনরূপ রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে একথা বলা হচ্ছে না। একথা বলার কারণ শিল্পের চরিত্রকে রক্ষা করার ভেতর সেই জাতের চরিত্র ও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পায়। শিল্পে উদারতা আছে, প্রগতি আছে কিন্তু চরিত্রকে নষ্ট করে কখনও নয়।

রাগসংগীতের এই অবক্ষয়কে অনেকে আমাদের সামাজিক জীবনের অভিপ্রকাশ মাত্র বলতে পারেন। তাঁরা বলবেন এর কারণ অর্থনৈতিক। এ বিষয়ে বিতর্কের মাঝে না যেয়ে এবং একে মেনে নিয়েও এ কথাই বলব যে, একদিনের এত ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্প আজ হঠাৎ এমন কি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মাঝে পড়ল যাতে চরিত্রের পরিবর্তনটা (যেটা সহনীয়) চরিত্রহীনতায় পর্যবসিত হওয়ার মত হোল! ইতিহাস কিন্তু এর থেকেও বড় বিপর্যয়ের সাক্ষ্য দেয় যেখানে রাগসংগীত তার চরিত্রকে হারায় নাই। তার উত্তরে হয়ত অনেকে বলবেন—পৃথিবী তখন এত বড় ছিল না। শিল্পের ক্ষেত্রে সেটা আপেক্ষিক মাত্র। আমাদের এর কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আরো গভীরে যেতে হবে। আমাদের বর্তমান শিক্ষা, নূতন সমাজ চেতনা, সংস্কার, পারিপার্শ্বিকতা এসব কিছুর মাঝেই রাগসংগীতের উপযোগিতা খুঁজে বের করতে হবে। কোনও বিষয়ে উদাসীনতা অথবা উপেক্ষা ইহার পক্ষে যেমন ক্ষতিকর তেমনি অতি আগ্রহও সমান ফল দেখাতে পারে।

আজকাল রাগসংগীতের প্রচার ও প্রসারের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যমের অভাব আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু তবুও জনচেতনায় সাড়া পড়ছে না। আজ থেকে দশ বছর আগে যে উৎসাহ আমরা দেখেছি তা' হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেল কেন ? সংগীতের উপযোগিতা, পাঠ্যতালিকায় স্থান, সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি সরকারী প্রচেষ্টায় যা কিছু হওয়া উচিত তাতে বিশেষ কিছু অভাব বা উদাসীনতা আছে মনে হয় না। বেসরকারী প্রচেষ্টাগুলিও রাগসংগীতকে বাঁচাবার পক্ষে নগণ্য নয় তবুও রাগসংগীতের মরণদশা যাচ্ছে না একথা মানতেই হবে। সেখানেই খুঁজে দেখতে হবে দোষ কার ? সরকারী বা বেসরকারী উদ্যমের নিকট আমরা সব সময় বিশেষজ্ঞের জ্ঞান দাবী করতে পারি না। তাঁরা যতটুকু করছেন তাকে হাতে রেখে শিল্পী ও শ্রোতাদেরও কিছু করণীয় আছে, একথা ভাবতে শিখলেই মনে হয় এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

বর্তমানে রাগসংগীত শিল্পীদের মাঝে যে দোষগুলি প্রকট হয়ে শিল্পকে ক্রমশ এই অবস্থার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলির বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে মনে করি। আজ থেকে পনের অথবা কুড়ি বৎসর আগে পর্যন্ত যে আবেগ ও মন নিয়ে রাগসংগীত শিল্পী আসতেন সেই মন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বর্তমানে (যুগের প্রভাবেই হয়ত) প্রত্যেক শিল্পী তাঁর মোক্ষলাভের খতিয়ানে যেটাকে প্রধান করে দেখেন তা' অর্থকরী। শিল্প সাধনার যে কোনও অবস্থাতেই যদি অর্থকরী

মনোভাবের প্রাধান্য থাকে তবে তা' যে কখনও সুস্থ শিল্প সৃষ্টি করতে পারে না একথা সকলেই মানবেন। আজ শিল্পী হওয়ার পেছনে আছে এক ব্যবসায়ী মন যা জনচেতনার অন্তরে প্রবেশ না করে ইন্দ্রিয় ও রিপুগ্রাহ্য মনোরঞ্জক শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু এই শিল্প যে সাময়িক এই বোধ যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ সুস্থ মননশীল শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয়। স্বাধীনতা লাভের পূর্বযুগের শিল্পীর নিষ্ঠা এবং বর্তমান শিল্পীর প্রয়াসে যে মূলগত দৃষ্টিভংগির প্রভেদ সেই প্রভেদই শিল্পকে জনমানস থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় স্বাধীনতা লাভের পূর্ববর্তী যুগের শিল্পীদের কাছে অর্থকরী লাভালাভের প্রশ্ন ছিল গোণ যা বর্তমানে হয়ে গেছে মুখ্য। পূর্বের শিল্পীদের কেউ বলতে পারেন না যে তাঁরা বর্তমানে যে যশ ও অর্থ পেয়েছেন তাঁরা ত' পূর্বেই ভাবতেন। এঁদের নিকট এই লাভ আকাস্মিক হলেও অন্যায্য হয়ত নয়। যদিও তাঁরা অনেকে এটাকে বর্তমানে একচেটিয়া করে নিতে চেয়ে নিজেদের প্রাপ্যের অংশে কোনও ভাগীদার দেখতে পছন্দ করেন না, নূতনের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে কুণ্ঠিত তবুও বর্তমানে শিল্পী হওয়ার প্রয়াসে পাওয়াটাই মুখ্য হওয়াতে নবীন শিল্পী যেন-তেন-প্রকারে জনমানসে চমক সৃষ্টি করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাতে কেউ কেউ কৃতকার্য হলেও সেটা স্বল্পস্থায়ী হচ্ছে এবং মননশীল শিল্পসৃষ্টি আর হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরাও নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য এমন কিছু করছেন যার ভেতর থেকে পূর্বের নিষ্ঠা ও মননশীলতা কমে যাচ্ছে। তারাও শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের সোজা পথে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার সহজতর পথ বুঝে মননশীলতা ত্যাগ করছেন। অবশ্য একটা কথা এঁদের পক্ষ থেকে বলার আছে। সৃজনশীলশিল্পী মানুষের জীবনে খুব বেশি একটা হয় না, কিন্তু এই সৃজনশীলতার নিত্য নবীনতার মাপকাঠিতে যখন তাঁকে বাঁচতে হয় তখন তাদের উপর অবিচার করা হয়। তখন শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচাবার তাগিদেই শিল্পীকে মনোরঞ্জক শিল্পী হতে হয়। এইস্থানে শিল্পীকে সমাজচেতন হতে হবে এবং একই সংগে শ্রোতাকেও হতে হবে সংবেদনশীল। শিল্পের ক্ষেত্রে কাজ ফুরিয়ে গেলেই সেটাকে অকেজো বলে সরিয়ে দেওয়া ভবিষ্যতের সৃজনশীল, মননশীল শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর এ ধারণা রাখতে হবে। আর্টের গণ্ডি, কাল বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সীমায়িত রাখা অন্যায়, কিন্তু তার চেয়ে বড় অন্যায় হয় যখন কোনও বিশেষ কালের মানসিকতাকে পুরানো বলে উপেক্ষা করি। ভবিষ্যতের শিল্পকে তার অতীত থেকে পাঠ নিতে হবে, জানতে হবে বর্তমানকে, তবেই সে মননশীল হবার দাবী করতে পারে।

বেসরকারী উদ্যোগে যেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বর্তমানে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়ে উঠছে তাদের প্রচেষ্টা যদিও শ্রোতা তৈরির পক্ষে কিছু সহায়ক হচ্ছে তবু তার মধ্যেও যে সকল ত্রুটি আছে সেগুলিকেও বুঝতে হবে। একই অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র বৈচিত্র্যের প্রয়োজনে এবং বিভিন্ন রুচির মানুষকে একই সংগে আনন্দ দিতে যেয়ে তাঁরা একটা বিষয়ে ভেবে দেখছেন না যে, আনন্দলাভের উপায় প্রত্যেক মানুষের এক নয় এবং প্রত্যেক মানুষই একই বিষয়ে একরূপ ভাবেন না যদি সেটা জ্ঞানের বিষয় না হয়ে হৃদয়বৃত্তির বিষয় হয়। তাঁদের আয়োজিত অনুষ্ঠানের সকল শ্রোতাই সকল সংগীত ভালবাসতে পারেন না, একথা তাঁরা নিজেরাও মানবেন যদিও সকল সংগীতই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠ কিন্তু বিভিন্ন মানসিকতার শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করতে যেয়ে প্রত্যেক বিশিষ্ট সংগীতই নিজের বৈশিষ্ট্য কিছুটা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। রাগসংগীত যদিও অন্যান্য সংগীতের মত মানুষের মনের একই উৎস থেকে উৎসারিত তবুও তাকে বোঝার জন্য রুচি ও গভীরতা বোধের প্রয়োজন আছে। লোকসংগীত ও রাগসংগীতকে একই আসনে বসাবার অর্থ সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাঁচালীকার ও কবিকে সমমর্যাদা দেওয়ার অনুরূপ।

অবশ্য এ বক্তব্য কাউকে ছোট করার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, এর উল্লেখের কারণ শুধু এইজন্য যে শিল্পের ক্ষেত্রে এই ধরণের সাম্যবাদ সুস্থ মননশীলতার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখানে আরো উদাহরণ দেখান যায় এই অনুষ্ঠানগুলি কিভাবে আবেগাশ্রয়ী রাজনৈতিক চিন্তার বাহক হয়ে নিজের চরিত্রকে হারিয়ে ফেলছে। সংগীতকে শিল্প হিসেবে না নিয়ে যদি তা থেকে আরো কিছু করিয়ে নেবার তাগিদে এই অনুষ্ঠান হয় তা হলে ভয় হয় তাতে উভয় দিকেই ক্ষতি হতে পারে। ইতিহাসে অবশ্য সংগীতের সামাজিক বিপ্লবের হাতিয়ার হওয়ার উদাহরণ অপ্রচুর নয় তবুও তার সাথে এর পার্থক্য এই যে, সেখানে শিল্পী ছিলেন সেই যুগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আর এ যুগে শিল্পীকে দিয়ে সেই অবস্থার সৃষ্টির প্রয়াস চলছে। অবস্থা যত জরুরীই হোক না আর্টের ক্ষেত্রে আর্টের আপন ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হবে সেই সৃষ্টির জন্য। শিল্পীকে মানুষ হিসেবে বোঝান চলতে পারে কিন্তু তার জন্য তার শিল্পের উপর কোনপ্রকার বাহ্যিক চাপ দিয়ে তাকে ফরমাইসী শিল্প সৃষ্টি করতে বললে শিল্পের স্বাভাবিক প্রাণস্পর্শিতা হারিয়ে ফেলতে পারে। তখন সেই শিল্প কোনও প্রয়োজনে না এসে অনেক গুরুতর বিষয়কে হাল্কা করে দিয়ে সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে দেবে। রাগসংগীতকেও কোনোরূপ ফরমাইসী অবস্থার মাঝে নিয়ে যাওয়া তার নিজস্বতাকে ক্ষুণ্ণ করে। বর্তমান শিল্পী এই ফরমাইসী শিল্পের তাগিদে নিজের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে রাগসংগীতকে এমন এক অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন যাতে ভবিষ্যতের শিল্পীদের কাছে কোনও উদাহরণই রাখতে পারছেন না। আবার জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে নিত্যনূতন চমক সৃষ্টির তাগিদে রাগ-সংগীত বর্তমান আধুনিক সংগীতের কাছে সমানে মার খেয়ে চলেছে। এই হেরে যাওয়া স্বাভাবিক। এখানে যে অসমরুচির লড়াই, তাতে রাগসংগীতকে হারতেই হবে। রাগসংগীত শিল্পী যদি নিজেকে মননশীলতা থেকে দূরে সরিয়ে এনে মনোরঞ্জকতার মাঝে স্থান করে নিতে চান তবে তাঁর বুঝতে হবে যে তার উপাদান অনেক কম, গণ্ডী নির্দিষ্ট তাই সেক্ষেত্রে তাকে এই ফরমাইসী চালে নিজেকে সাজাবার অর্থ তার নিজের ক্ষতিকে ডেকে আনা। অথচ রুজি-রোজগার এবং পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়ে শিল্পীকে তাই করতে হচ্ছে। অনুষ্ঠান উদ্যোক্তারা অর্থকরী অবস্থার দিকে তাকিয়ে ঐসব তথাকথিত শিক্ষিতের মানসিকতার প্রশ্রয় দিতে পারেন না তখন তাঁদের সেই বিদগ্ধ সংস্কৃতিকাতর মনের আসল স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে।

শিল্পের গতিশীলতাই শিল্পের প্রাণ। আমাদের রাগসংগীত যদি তার মধ্যযুগীয় ভাবধারায় পরিবর্তন না করে, যুগসচেতন না হয়ে এখনও নানা কুসংস্কারের অন্ধকারে নিজেকে আচ্ছন্ন রাখে,

শুধুমাত্র পুরান বস্তাপচা ভাব-ভাবনাকে মূলধন করে বেঁচে থাকার আশা করে তা হলে সেটা হবে আর এক মারাত্মক ভুল। শিক্ষিত মনের কাছে এই ভাবগুলির অনেকটাই কোনও আবেদনই সৃষ্টি করতে পারে না। অথচ এই শিক্ষিত জনমানসই শিল্পের মাঝে গতিশীলতা পরিমাপের কষ্টিপাথর। শুধুমাত্র বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী না হলে রাগসংগীত বোঝা যাবে না এই ভেবে যে শিল্পী শিল্পচর্চা করবেন তাঁর জানা উচিত কোনও ভাল সাহিত্য বোঝবার জন্য সাধারণ মানুষ বিশেষ কিছু সাহিত্য চর্চা করেন না। শিক্ষিত মনের স্বাভাবিক রুচিবোধেই তার স্থান হয়। রাগসংগীতও এইভাবেই নিজের স্বাভাবিক স্থান করে নিতে পারবে যদি তার মাঝে যুগের ক্লাসিক ভাবধারার প্রভাব আসে; তার জন্য প্রয়োজন সংগীতের সাথে সাহিত্যের সমন্বয় এবং শিল্পীর যুগসচেতনতা।

বর্তমানে সংগীত বিষয়ে সামান্য কিছু সমালোচনা কিছু কিছু পত্র-পত্রিকাতে স্থান পাচ্ছে—যদিও তাতে সাধারণ মানুষের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। এই সমালোচনাগুলিতে সংগীতের দর্শন এবং মননশীলতা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই থাকে না, পরিবর্তে দেখা যায় রাগের টেকনিক্যাল ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ যাতে সাধারণ মানুষ কোনও উৎসাহ পান না, বরঞ্চ একে জানতে গেলে এইসব টেকনিক্যাল অংশগুলি না জানলে চলবে না এই ভেবে এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন হয়ে পড়েন।

কল্যাণী রায়

আমার কথা (১১১)

কল্যাণী রায়

বিশ্বের দরবারে পুণ্য ভারতভূমির শাশ্বত ঐতিহ্য ও মহান সংস্কৃতির প্রচারের পবিত্র কর্মে ভারতের বর্তমান যুগের যে সঙ্গীতশিল্পীর দল যথোচিত দক্ষতা প্রদর্শন করে অভাবনীয় সুনাম ও প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী কল্যাণী রায় নিঃসন্দেহে এক বিশেষ উল্লেখের অধিকারিণী। সুদক্ষ সেতারশিল্পী হিসাবে আজ তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা শুধু বাঙলা দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, সাত-সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে সেই খ্যাতি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে বাঙলার গর্ব ও গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৩১ সালের ২৯-এ এপ্রিল বাসুদেবপুরের শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র রায়ের কন্যা কল্যাণী রায়ের জন্ম। মা শ্রীযুক্তা মণিকা দেবী শিল্পাচার্য অসিতকুমার হালদারের খুল্লতাত পুত্রী। তাঁর সঙ্গীতানুরক্তি উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছেন কন্যা কল্যাণী রায়। সঙ্গীতে মণিকা দেবীর প্রবল অনুরাগ যে প্রভাব বিস্তার করল কল্যাণী দেবীর মধ্যে তাঁর জীবনে তা হয়ে উঠল অনতিক্রম্য। কালে সঙ্গীতই হয়ে দাঁড়াল তাঁর জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা, ব্রত, আনন্দ এবং এই সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই তিনি উপনীত হলেন খ্যাতির অন্তহীন রাজ্যে।

সেতারে তিনি পাঠ নেন নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রমোহন সেন এবং বিলায়েৎ হোসেন খাঁ প্রমুখ কৃতবিদ্য শিল্পীদের কাছে। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি ভূষিত হন 'সুরশ্রী' উপাধিতে। ঝঙ্কারের বি, মিউস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানটি এঁর অধিকারগত হয়। তের বছর বয়স থেকে ইনি নিয়মিত যন্ত্রশিল্পী হিসাবে আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত আছেন। ন্যাশানাল প্রোগ্রামে মহিলা যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে ইনিই প্রথম অংশগ্রহণ করেন। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনায় রাধিকামোহন মৈত্রের সঙ্গে ইনি লঙ প্লেয়িং রেকর্ড-এ অংশ নেন। এ বিষয়েও মহিলাশিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম। ই পি রেকর্ডেও এঁর বাজনা গৃহীত হয়েছে।

১৯৬৩ সালে ইনি সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন। এই রুশিয়া ভ্রমণ নানাদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ—যা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাংস্কৃতিক বিনিময় পরিকল্পনা অনুসারে রুশ সরকারের বিশেষ অতিথিরূপে তিনি রাশিয়া যান এবং সেখানে রসিকসমাজে বক্তৃতার দ্বারা ভারতীয় রাগপদ্ধতি প্রভৃতি বিশ্লেষণ করেন। সেখানকার গুণিজন তাঁর অনবদ্য প্রতিভায় মুগ্ধ হন। তাঁর এই রাশিয়া সফরের প্রত্যুত্তরে কয়েকজন রুশশিল্পী ভারতে আসেন এবং শ্রীমতী রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই যোগাযোগ ভারত-রুশ মৈত্রীর বন্ধনকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করল।

সেতারবাদিকা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি আজ সুপরিব্যাপ্ত। রসিকসমাজে তিনি যে আলোড়ন এনেছেন তার তুলনা বিরল। যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি যে অভিনবত্বের আস্বাদ এনে দিয়েছেন তার গুরুত্ব অল্পমূল্যের নয়, রসিকসমাজ জেনে আরও আনন্দ পাবেন যে, কল্যাণী রায় শুধু সুরেরই সাধিকা নন তুলিরও পূজারিণী। চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রেও তিনি সিদ্ধহস্তা। বর্ণের প্রয়োগে ও রেখার ব্যঞ্জনায় তাঁর অঙ্কিত ছবিগুলি যেমনই অপূর্ব তেমনই অনবদ্য।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন অবিশ্রান্ত বর্ষণের রাত্রির অন্ধকার আকাশে প্লেন উঠল যেন নিরুদ্দেশ শূন্যতায় হারিয়ে যাবার হতাশা নিয়ে।

মাটির স্পর্শ ছেড়ে প্লেনের শূন্যে প্রথম উৎক্ষেপের মুহূর্তটা কেন জানি না আমাকে প্রত্যেকবারই কেমন বিহ্বল করে দেয়।

এবারের বিহ্বলতাটা একটু বুঝি অস্বস্তিমিশ্রিত।

উঠবার সময় বাঁক নেবার দরুণ ঊর্ধ্ব ও অধোলোকের কিছুটা যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে। মেঘাবৃত আকাশে তারার চিহ্নমাত্র নেই। তার বদলে ফেলে-আসা বোম্বাই শহরের বিস্তৃত আলোক সমারোহই যেন আরেক আকাশ সৃষ্টি করছে। প্লেনের জানলার ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল অথচ বৃষ্টিধারায় ধেবড়ে যাওয়া সেই আলোর আলপনা দেখতে দেখতে স্থান-কালের চেতনাও বুঝি স্বাভাবিক থাকে না।

একনমি ক্লাশের যাত্রী। একধারে পাশাপাশি তিনটি ও অন্য ধারে দু'টি করে সীটের দীর্ঘ সারি।

ভাগ্যক্রমে পাশাপাশি দু'টি সীটের সারিতেই জানলার ধারে জায়গা পেয়েছি।

প্লেন বেশ রাত করে ছেড়েছে। আমাদের যথাস্থানে বসিয়ে দেবার সময় এয়ার-হোস্টেস যে আলো জ্বালিয়েছিল তাও এখন নেভানো। লম্বা কামরায় ক্ষীণ কয়েকটি বাল্বের অত্যন্ত মৃদু আলো। সহযাত্রীরা নিজেদের সীট হেলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে না পড়ুন, তারই আয়োজন করছেন।

আমার কিন্তু ঘুম আসবার কোন আশাই নেই। ট্রেনে কি প্লেনে উঠলে ছেলেবেলা থেকেই কিরকম একটা উদ্‌গ্রীব উত্তেজনা আমাকে অধীর করে রাখে। আজও অনিদ্রার একটা বিশেষ কারণই রয়েছে।

বাঁক নেবার পর টাল সামলে ঊর্ধ্ব-অধোর বিভাগ স্বাভাবিক করে তুলে প্লেন আরব সমুদ্র পাড়ি দেবার রাস্তায় মুখ ফিরিয়েছে। বোম্বাই শহর তার আলোর মালা নিয়ে অসীম নীরন্ধ্র অন্ধকারে ক্ষীণ অস্পষ্ট হ'তে হ'তে হারিয়ে গেল একসময়ে।

প্লেন আরব সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলেছে বলে অনুমান করে নিতে হয়, প্রধানত তার কম্পনে আর অবিরাম একঘেয়ে শব্দ নির্ঝরে। নইলে ভাবতে পারা যেত চারিদিকে গাঢ় কালো পর্দা টানা একটা কামরায় যেন বসে আছি। সে অনুভূতিকে নাড়া দেবার একটিমাত্র ব্যাপারই অবশ্য আছে। যেখানে আমার সীট তার একটু পেছন দিয়ে প্লেনের একটা ডানা সেই অন্ধকার পর্দা ভেদ করে কিছুদূর পর্যন্ত ছড়ানো। টার্বো-প্রপ প্লেন। অনুক্ষণ একটা নীলাভ বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ তাই সে ডানার প্রপেলার আর জেট মুখের যন্ত্রে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। এ সব কিছু মিলিয়ে একটা অবাস্তবতার অনুভূতিই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

কিন্তু আমার অনিদ্রার কারণ সে সব কিছু বললে ভুল বলা হবে। প্লেনে ওঠার পর থেকে একটি ভাবনাই আর সব অনুভূতি ছাপিয়ে মনটা অধিকার করে আছে। তীব্র কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা মেশানো ভাবনা। সে ভাবনা যে শ্বেতাঙ্গ মেয়েটির অযাচিত সাহায্য ছাড়া সেদিনের আকাশযাত্রা সম্ভব হত না তাকেই কেন্দ্র করে।

মাত্র কিছুক্ষণের জানা এই বিদেশী মেয়েটি সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা বোধ ছাড়া আর কিছু থাকবার কথা নয় অবশ্য। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সে যা করেছে তার তুলনা হয় না।

শুধু যে নিজের জন্যে আনিয়ে রাখা গাড়িতে আমাদের এয়ার-পোর্টে পৌঁছে দিয়েছে তা নয়, দেরিতে এসে পৌঁছোবার দরুণ, মাল ওজন চেক করা, পাশপোর্ট ইত্যাদি দেখানোর ব্যাপারে যে ঝামেলা হতে পারত তাও কাটাতে সাহায্য করেছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে।

সাহায্য করেছে অবশ্য যাঁর গাড়ি নিয়ে এয়ার-পোর্টে এসেছে তাঁর দ্বারাই। আত্মীয়বন্ধু বা প্রেমিক যাই তিনি হন, তাঁর ওপর মেয়েটির বেশ কিছু অধিকার আছে বোঝা গেছে। ভদ্রলোক ভারতীয় নন শ্বেতাঙ্গ। পদবী না জানলেও ডাক নাম যে বিল, মেয়েটির মুখ থেকেই তা জেনেছি, সেইসঙ্গে এটাও বুঝেছি যে পেশা তাঁর যা-ই হোক বোম্বের বিদেশী বাসিন্দা হিসাবে বিলের ক্ষমতা প্রতিপত্তি খুব অল্প নয়।

বিল খুব প্রসন্ন মনে আমাদের মত দু'জন বিপন্ন ভারতবাসীর সাহায্যে এগিয়ে যে আসেন নি এটা তাঁর ব্যবহারে খুব অস্পষ্ট থাকে নি। কিন্তু নীনায় সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপই ছিল না, আর আমাদেরও তখন মনোভাব বিশ্লেষণ করে সাহায্য গ্রহণ করব কি করব না স্থির করার অবস্থা নয়।

বিলের এয়ার-পোর্টে প্রচুর খাতির। মসৃণভাবে অত্যন্ত তাড়াতাড়িই তাই আমাদের সব ঝামেলা চুকে গেছে।

যে কাঠের বেড়ার ওপার থেকে সাগর পারের আকাশযাত্রীদের তখনকার মত মাটির মানুষের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে যেতে হয় সেখানে দাঁড়িয়ে নীনা 'বিল'-এর দিকে চেয়ে কেমন একটু নিষ্ঠুর কৌতুকের সঙ্গেই হেসে বলেছে,—চললাম বিল। তোমাদের মুখে চুণকালি লাগবার ভয় আর রইল না।

চেহারায়, চরিত্রে, চলনে-বলনে বিল যে পাক্কা সাহেব তা ইতিমধ্যেই বুঝেছি। মুখে কোনভাব প্রকাশ হতে দিলে—বিশেষ দু'জন ভারতীয়ের সামনে—তাঁর জাত যায়। তবু তাঁর চোখ দু'টোয় কেমন যেন একটু কাতরতার আভাস ফুটে উঠেছে।

নীনা তারপরে বলেছে,—দেবরাজ হয়ত আমার খোঁজ করতে তোমার কাছেও আসতে পারে। তাকে বোলো আমি আর ফিরব না।

তা বলবার সময় বোধ হয় পাব না!—বিলের দাঁতে দাঁতে পিষ্ট হয়েই বুঝি কথাগুলো অস্পষ্টভাবে বেরিয়েছে।

কেন?—নীনার মুখে যেন সরল কৌতুহলের প্রশ্ন।

কারণ তার আগেই তাকে গুলি করব বলে:—কথাটায় একটু পরিহাসের স্বর দেবার চেষ্টা থাকলেও চোয়ালের পেশীর কাঠিন্যটা তার সঙ্গে খাপ খায় নি।

নীনা হেসে উঠেছে এবার। বেশ উচ্চৈঃস্বরেই আশপাশের সকলকে চমকে দিয়েও বিলকে রীতিমত বিব্রত ক'রে হেসে উঠেছে অকুণ্ঠিতভাবে। তারপর বলেছে,—তাই কোরো। ভারতবর্ষে এসে একটা সত্যিকার নাটক লাগিয়ে দিয়ে গেছি বলে তা হলে গর্ব থাকবে।

এ কথা বলবার পর নীনা কিন্তু আর দাঁড়ায় নি। হঠাৎ পেছন ফিরে বিলকে আর কোন বিদায়-সম্ভাষণ না জানিয়েই এগিয়ে গেছে একলা।

আমরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি কয়েকমুহূর্ত, তারপর কর্তব্যবোধে বিলকে ধন্যবাদ জানিয়েছি আমাদের জন্যে যা করেছেন তার জন্যে।

বিল সে কথা শুনতেই বোধ হয় পান নি কিংবা নীনার খাতিরে যাদের সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছেন তেমন দু'জন অবাঞ্ছিত উপদ্রবের ধন্যবাদ গ্রাহ্যের মধ্যে আনাও প্রয়োজন বোধ করেন নি।

অবস্থা বুঝে আমরাও প্লেনের দিকে পা বাড়িয়েছি এবার।

সব উদ্বেগ দুর্ভাবনা পার হয়ে এসে আমার সহযাত্রী এখন নিশ্চিন্ত। যেতে যেতে একটু অবজ্ঞার সঙ্গেই বলেছেন,—যা-ই বলুন, মেয়েটা কেমন একটু অভব্য! আদব-কায়দা জানে না। কিভাবে হাসল দেখলেন! বড়ঘরের ত' নয়ই খাস বৃটিশ কি না তাই সন্দেহ হয়।

বলতে পারতাম, আদব-কায়দা জানা ও মানা খাস বৃটিশ বলতে তিমি যা বোঝেন, নীনা তাই হ'লে—এ প্লেনে চড়বার সৌভাগ্য ত' নয়-ই তার সঙ্গে পরিচয়টুকুও হ'ত না যে!

সে জবাব না দিয়েই নীরবে প্লেনে এসে উঠেছি।

সেখানে নীনার সঙ্গে দেখা হয় নি। সে প্রথম শ্রেণীর যাত্রিণী সামনের অন্য কামরায় তার আসন।

তার সঙ্গে আর দেখা হবার আশাও করি নি। তবু মন থেকে তার কথাটা মুছে ফেলতে পারি নি কিছুতেই। ওই সামান্য পরিচয়ের মধ্যেই তার জীবনের যে আভাসটুকু পেয়েছি তার রহস্য যেমন কৌতুহল জাগিয়েছে তেমনি তার চরিত্রও।

সে চরিত্র যে সাধারণ ছকে পড়ে না, আমাদের উপযাচক হয়ে নিজের মোটরে পৌছে দিতে চাওয়া থেকেই তা বোঝা গেছল।

গাড়িতে ওঠবার সময় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল আরো।

মালপত্রের লটবহর প্লেনে যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই ভালো। আমার সহযাত্রী সংখ্যায় না বাড়ালেও সঙ্গে এমন একটি ঢাউস পোর্টম্যান্টো নিয়েছেন, আকাশপথে যা প্রায় অচল। হোটেলের পোর্টিকোয় দাঁড় করানো বিল-এর গাড়ির পেছনে তা তুলতে গিয়ে সবাই হিমসিম। গাড়ি ছোট নয় কিন্তু পেছনের কেরিয়ারে তিন জনের অন্যান্য লাগেজের সঙ্গে সে সিন্দুকগোছের সুটকেশ ধরানো অসম্ভব।

সময় বয়ে যাচ্ছে। বিলের মুখের রং বদলানো দেখেই তাঁর মেজাজ কোন পর্দায় তার আভাস মিলছে। আমার সহযাত্রী অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করে হোটেলের পোর্টারদের কখনো ধমকে কখনো মিনতি করে অনর্গল ভুল নির্দেশ দিয়ে দিশাহারা করছেন আর আমি সমস্ত ব্যাপারটা পরম কৌতুকনাট্য হিসেবে উপভোগ করব না লজ্জায় ধরণী দ্বিধা হও বলে প্রার্থনা করব স্থির করতে পারছি না।

হঠাৎ নীনা বলে উঠল,—বিল! এটা ত' ভেতরে নিলেই হয়!

ভেতরে, বিলের গলার স্বরের চেয়ে এক চোখের ঈষৎ কপালে তোলা ভুরু-ই বেশি বাঙ্ময় হয়ে উঠল,—তা হলে মানুষের বদলে মাল-ই নিয়ে যেতে হবে!

নীনা বিলের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের তিক্ততাকে আমলই দিলে না। নিজের জেদ ধরেই, জোর দিয়ে বললে, মাল-মানুষ সবই যাবে। তুমি সুটকেশটা ভেতরে তোলাও দেখি। তোমরা তিনজনে সামনে বোসো আমি না হয় পেছনে থাকব।

কি যা তা বলছ নীনা! তা কি হয়! বিলের গলায় অধৈর্যের সঙ্গে অসহায়তা মেশানো।

খুব হয়! ... অটল, তা না হলে মাল বা মানুষ কোনটাই ফেলে যাওয়া চলবে ন

নিরুপায় ক্ষোভ ... শায় সত্যিকার বিলাতী কাঁধ নাড়া এবার দেখলাম।

আমার সহযাত্রীর সি... প্রমাণ সুটকেশ পেছনের সীটে তোলা হ'ল। শুধু শেষ পর্যন্ত ব... বস্থা হল তাতে বিল ও নীনার সঙ্গে আমি সামনে ও আমার ...যাত্রী তাঁর লাগেজ নিয়ে পেছনে বসলেন।

নীনা ও বিল নাম দু'টো এই মাল তোলার করুণ প্রহসনের সময়েই প্রথম জানতে পেরেছিলাম। নীনার জীবন যে গতানুগতিক ধারায় নয় তার কিছু ইঙ্গিতও পেয়েছিলাম হোটেল থেকে এয়ার-পোর্টে যাবার পথে।

বৃষ্টি তখনও সমানে পড়ছে। রাস্তাঘাট গাড়ির চেয়ে নৌকোয়ই বেশি উপযোগী।

বিল অতি নিপুণ চালক, গাড়িও তাঁর উঁচুদরের। তব মাঝে

মাঝে অতর্কিতভাবে গুপ্ত খোদলে-খানায় পড়ে আমাদের প্রাণান্ত ঝাঁকুনি দেওয়ার সঙ্গে গাড়ি বিকল হবার উপক্রম হচ্ছিল।

সান্টাক্রুজ-এর রেল লাইন পার হবার পর এমনি এক জলের তলায় লুকোন গর্তে গাড়িটা পড়ায় ঝাঁকানির চেয়ে নীনার কথাতেই বেশি চমকে উঠেছিলাম।

কি যেন বলে আপনাদের; হাড়গোড় ভাঙা কি যেন হয়ে গেল; বলুন না মিঃ চৌধুরী!

সম্বোধনটা আমাকেই এবং উচ্চারণটাও বিকৃত কিন্তু ভাষাটা বাংলা!

ঝাঁকানির দরুণ আর চমকিত বিমূঢ়তায় কয়েকমুহূর্ত কিছু বলতে পারি নি।

গাড়িটা জল থই-থই গর্ত থেকে কাৎরে উঠে তখন আবার বেগ নিয়েছে।

নীনা-ই আবার জিজ্ঞাসা করলে,—কই বললেন না!

এবার প্রশ্নটা ইংরাজিতেই।

বললাম, আপনি বোধ হয় হাড়গোড়ভাঙা দ বোঝাতে চাইছেন!

হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, হাড়গোড় ভাঙা দ-ই বটে। আমরা ওই দ হয়েই এয়ার-পোর্টে পৌছোব মনে হচ্ছে!—বলে নীনা হেসে উঠল।

আপনি বাংলা শিখলেন কোথায়? এবার না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না!

কোথায় আবার? শিখেছি মানে শিখছিলাম বাংলা দেশে, না বাংলা দেশেও ঠিক নয় বাঙালীর কাছে বলাই উচিত! এরপর আর কৌতূহল প্রকাশ করা অশোভন। তবু ঘুরিয়ে কথাটার জের টানলাম,—বাংলার একেবারে যাকে বলে ইডিয়মও কিছু শিখেছেন দেখছি।

ইডিয়ম না শিখলে আর শেখা কি? সে ত' প্রাণ বাদ দিয়ে খোলস। তাই প্রাণটা ধরবারই চেষ্টা করেছিলাম।

অনেক প্রশ্নই এ সম্পর্কে মনে এসেছিল কিন্তু নিজেকে সামলে সম্পূর্ণ অন্য কথা জিজ্ঞাসা করলাম,—কিছু মনে করবেন না! আমার পদবীটা সুটকেশের ওপরকার লেবেল দেখেই জেনেছেন বোধ হয়!

নীনার হাসি শোনা গেল। বললে,—না লেবেল না পড়ে তার আগে জেনেছি। জেনেছি হোটেলের রিসেপসনিস্ট মেয়েটির কাছে জিজ্ঞাসা করে।

আমি চুপ করেই রইলাম।

নীনা নিজে থেকেই আবার বললে, খুব অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়। তা হলে শুনুন, আপনাদের অস্থিরতা দেখেই মনে হয়েছিল কোন বিপদে পড়েছেন। রিসেপসনিস্টের কাছে জিজ্ঞাসা করে বিপদটা জেনে নিয়েছিলাম, সেইসঙ্গে আপনাদের নামটাও। কলকাতা থেকে আসছেন জেনে আর চেহারা দেখেই আপনাকে অবশ্য বাঙালী বলে বুঝেছিলাম।

চেহারা দেখেই বাঙালী বলে বুঝেছিলেন! আপনার দৃষ্টি ত' খুব তীক্ষ্ণ! সপ্রশংস বিস্ময়ে জানালাম,—সত্যি কথা বলছি বিদেশিনী হিসেবে এটা আপনার আশ্চর্য ক্ষমতা বলতে হবে।

আশ্চর্য এমন কিছু নয়! নীনা হাসল আবার,—এদেশে আসার পর থেকে ভারতবাসীর মধ্যে বাঙালীকেই যে সবচেয়ে হাড়ে-হাড়ে চিনেছি!

কথাটার সুরে কৌতুক না আক্ষেপ প্রধান ঠিক বোঝা গেল না।

এতক্ষণের আলাপ কখনো ইংরেজী কখনো বাংলায় মেশানো খিচুড়ি ভাষায় চলছিল। হঠাৎ একটা খোদলে পড়ে চাকা থেকে ছিটকানো জল আমাদের গায়ে এসে পড়ায় নীনা ইংরাজিতেই একটা মৃদুগোছের গাল পেড়ে হেসে উঠে বললে,—আমাদের 'গিবারিশ' আর বুঝি সহ্য হচ্ছে না বিল! ইচ্ছে করে গাড়ি খানায় ফেলছ আমাদের জব্দ করতে।

বিল কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবে গাড়ি চালিয়ে গেছে। ড্যাশবোর্ডের আলোয় তার মুখটা শুধু একটু যেন বেশি কঠিন মনে হয়েছে।

গন্তব্যস্থলে তখন প্রায় পৌছে গেছি। দূরে এয়ার-পোর্টের আলো দেখা যাচ্ছে।

এয়ার-পোর্টে আর একবার মাত্র নীনার সঙ্গে বাক্য বিনিময় হয়েছিল। আমাদের লাগেজ পাসপোর্ট ইত্যাদির ব্যাপারে বিল তখন ব্যস্ত। আমার সহযাত্রী নিজের দুর্ভাবনাতেই অকারণে তাঁর পাশে ঘুর ঘুর করছেন।

নীনা আমার কাছে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলেছিল,—বিল মনে মনে আমার যা মুণ্ডপাত করছে!

ভদ্রতার খাতিরে বলেছিলাম,—হ্যাঁ ওঁকে খুব কষ্ট দেওয়া হ'ল।

কষ্ট ওর কিছু নয়, শুধু মান খোয়াবার জ্বালা! মনে মনে বিল এখনো রাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যে পড়ে আছে। আমার মত হতচ্ছাড়া মেয়ের জন্যেই সেখান থেকে মাঝে মাঝে নাড়া খেয়ে জ্বলে ওঠে কিন্তু কিছু করতেও পারে না।

সদ্য-পরিচিত সম্পূর্ণ অজানা একজন বিদেশীকে এ ধরণের কথা শোনানো একটু অপ্রত্যাশিত নিশ্চয়, কিন্তু নীনাকে এইটুকুর মধ্যে যা জেনেছি তাতে তার পক্ষে কথাগুলো অস্বাভাবিক মনে হয় নি।

একটু চুপ করে থেকে নীনা আবার নিজের মনেই যেন বলেছিল, ভারি মজা লাগে বিল আর আমার কথা তুলনা করলে। বিল এদেশে রোজগারের খাতিরে থাকে অথচ তাকে চিনতে চায় না, আর প্রাণ দিয়ে চিনতে চেয়েও টিকতে না পেরে আমায় চলে যেতে হচ্ছে।

উত্তরের আশায় বলা কথা নয়। রাশি-রাশি প্রশ্ন মনের মধ্যে উথলে উঠলেও তাই চুপ করে থাকতে হয়েছিল।

সেই সব প্রশ্নই প্লেনের জানলার ধারে বিনিদ্র রাত কাটাতে কাটাতে মনের মধ্যে ঢেউ তুলছিল অনুমান ও কল্পনার।

অস্ত দিগন্তের দিকেই প্লেন ছুটে চলেছে। রাত তাই অস্বাভাবিক-রকম দীর্ঘ। সে দীর্ঘ রাতের অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম আর কিছুতেই এল না। নিচে বহুদূরে আরব সমুদ্র দুলছে, ওপরে মেঘাবরণ ছাড়িয়ে এসে তখন নক্ষত্রখচিত আকাশ।

নীনা সম্বন্ধে একটা কথাই বারবার মনে জাগছে। নীনা বলেছে,—বাঙালীকে হাড়ে-হাড়ে চিনেছে। 'হাড়ে-হাড়ে' কথাটা তার অল্পবিদ্যার দরুণ ইডিয়মে'র অপপ্রয়োগ না তার পেছনে সত্যিকার মর্মান্তিক কোন ইতিহাস আছে? সে ইতিহাস কি হতে পারে?

শেষরাত্রে একটু বুঝি ক্লান্তি ও জড়তায় তন্দ্রা এসেছিল।

কায়রোর ওপরে প্লেন যখন নামবার জন্যে ঘুরছে তখন জেগে উঠলাম।

সবে তখন বিলম্বিত সকাল হচ্ছে। ওপর থেকে নীলনদী প্লাবিত সুজলা সুফলা শ্রীর বদলে মিশরের সঙ্গে মরুপ্রান্তরের জ্ঞাতিত্বই যেন বেশি করে টের পেলাম। এয়ার-পোর্টের এলাকাটায় অন্তত লাগছে মলিন বালিতে বন্ধ্যাত্বেরই আভাস।

ট্র্যানসিট প্যাসেঞ্জার হিসাবে প্লেন থেকে নেমে নির্দিষ্ট বিশ্রামাগারে সকালের ব্রেকফাস্ট খেতে গেলাম।

বাইরেটা দেখা যায় এমন একটা কোণের নির্জন একটা টেবিলে গিয়ে বসেছিলাম। আমাদের চোখে অদ্ভুত ধরণের ঢিলে জোব্বা-পরা পরিচারক এসে ব্রেকফাস্টের ট্রে দিয়ে গেল।

মাথা নিচু করে কাপে কফি ঢালছি, এমন সময়ে অবাক হয়ে দেখলাম দূর থেকে নীনা-ই আমার দিকে আসছে।

কাছে এসে সুপ্রভাত জানিয়ে আমি কিছু বলবার আগেই নিজে থেকে অন্যদিকের একটা চেয়ার টেনে বসে বললে,—আপনার সহযাত্রীটিকে কোথায় ফেলে এলেন! তিনি যেরকম ভীতু অস্থির পঞ্চানন মানুষ আপনাকে না পেয়ে অন্ধকার দেখছেন বোধ হয়!

না, তাঁর জন্যে আর ভাবনার কিছু নেই। তিনি এই কায়রোতেই সরকারী কাজে এসেছেন। এতক্ষণে উপযুক্ত জিম্মায় স্বচ্ছন্দেই শহরের দিকে রওনা হয়েছেন বোধ হয়।

রেস্তোরাঁ-পরিচারক নীনার সামনেও একটি ট্রে রাখতে এসেছিল। ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ করে নীনা বললে,—আপনি ত' রোম হয়েই যাচ্ছেন। আমি যাচ্ছি জুরিখ্‌ হয়ে। আর দেখা হবে না বলে বিদায় নিতে এলাম।

সত্যকার কৃতজ্ঞতা নিয়েই বললাম,—আপনি যে উপকার করেছেন তাতে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিতে আমারই আপনার খোঁজ করা উচিত ছিল, কিন্তু আকাশপথে যাওয়া-আসার অভিজ্ঞতা আমার অত্যন্ত অল্প। কোথায় খুঁজব বুঝতে না পেরে সে চেষ্টা আর করি নি। সেজন্যে মাপ চাইছি!

থাক্‌ থাক্‌ ওতেই হবে!—নীনা হাসল,—ফরাসীদের মত আপনারা খুব মিষ্টি করে কথা বলতে পারেন জানি।

আমরা মানে বাঙালীরা বলছেন বোধ হয়। ফরাসীরা কিরকম মিষ্টি কথা বলে আমার জানা নেই, কিন্তু আমার কথাটা শুধু মৌখিক মিষ্টতা বলে মনে করবেন না, ওটা আন্তরিক। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার কাছে জীবনের একটা মনে রাখবার মত ঘটনা। যদিও অসংখ্য জিজ্ঞাসার চিহ্নেই স্মৃতিতে তা ঘেরা থাকবে।

যেমন?—জিজ্ঞাসা করে নীনা হাসল। হাসিটা কিন্তু ম্লান।

যেমন, কবে কেনই বা আপনার মত মেয়ে এদেশে এসেছিল, কি তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তাকে চলে যেতে হচ্ছে এমনি অনেক কিছু!

একপাশের বিশাল কাঁচের জানলা দিয়ে একটা বিশাল প্লেনকে আকাশে উঠতে দেখা যাচ্ছে। সেদিকে কয়েকমুহূর্ত চেয়ে থেকে নীনা একটু ভারী গলাতেই বললে,—অভিজ্ঞতাটা তিক্ত বলেই ধরে নিচ্ছেন কেন!

ধরে নেওয়াটা ভুল হলেই খুশি হব। প্রশ্নগুলো তবু রয়েই গেল। একটু থেমে নীনার মুখের দিকে চেয়ে সাহস করেই জিজ্ঞাসা করলাম,—একটা কথা শুধু জানতে পারলে কিছুটা কৌতূহল মিটত।

বলুন কি কথা?

আপনি কাল বোম্বের এয়ার-পোর্টে কোন এক দেবরাজের নাম করেছিলেন। দেবরাজ নামটা খুব সাধারণ নয়। আমি একজন দেবরাজের কথা সামান্য জানি। নাম দেবরাজ সরকার, বিজ্ঞানে ইওরোপের সেরা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্লভ উপাধি নিয়ে দেশে ফিরে মস্ত বড় চাকরি করতে করতে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কেউ বলে মধ্যপ্রদেশের কোন জঙ্গলে সে নাকি স্বেচ্ছা-নির্বাসনে আছে, কেউ বলে সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে। আপনি তারই নাম করেছিলেন কি না জানতে ইচ্ছে হয়! এ রকম আশাতীত ঘটনা-সন্নিপাত অবশ্য সাধারণত হবার নয়।

যা হবার নয় তাই হওয়াই আশাতীত ঘটনা-সন্নিপাত। নীনা একটু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—কিন্তু আপনার কৌতূহল মেটাবার আর সময় নেই। ওই শুনুন আপনার রোমের প্লেন ছাড়বার ঘোষণা। নমস্কার!

বাংলাতেই নমস্কার জানিয়ে এয়ার-ব্যাগ আর ফোলিওটা তুলে নিয়ে এবার বিদায় নিতে হল! বাইরে যার হবার দরজার কাছ থেকে ফিরে চেয়ে দেখলাম নীনা ওপরের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনে তার সঙ্গে আর দেখা হওয়া এবং আমার অসংখ্য অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব পাওয়া অসম্ভব বলেই তখন মেনে নিয়েছি।

সেই অসম্ভবই একদিন সম্ভব হবে কি করে জানব।

[ক্রমশ।

নীলকণ্ঠ

সাতচল্লিশ

একটি আশ্চর্য অপরাহ্ণ কখন সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রির অন্ধকারে উত্তীর্ণ হলো টের পেলাম না, আশ্চর্যতর একটি যুগলের রণীয় সান্নিধ্যে। নামের প্রয়োজন নেই। ভারতজোড়া নাম আইনজ্ঞ হসেবে। পাণ্ডিত্য প্রচুর, সাফল্যের প্রায় শিখরদেশে উপস্থিত একজন, মন্যজন সুপরিচিতা সমাজসেবিকা। দু'জনেরই এই পরিচয়ের চেয়ে মনেক আকর্ষণীয় একটি ব্যক্তিত্বভূষিত সান্নিধ্যের সৌরভে সেই সন্ধ্যায় আচ্ছন্ন হয়েছি অনেক বেশি। প্রসংগ করেছি সেদিন কাশীর। আমার প্রিয় নয়, শ্রেয় প্রসংগ। মরলোকে ওই একটি পরিবেশ, কাশী, আলোচনারম্ভমাত্রই অমরলোক থেকে এসে পড়ে একমুঠো আলো। কী আছে ওই দু'টি অক্ষরে, কাশী,—সকল যুগের সকল 'নেশন'-এর আব্রহ্মস্তম্ব সকল অন্বেষণের শেষ—অশেষ ওই কাশী। বিশ্বের যতেক অনাথের যতক্ষণ না মুক্তি হচ্ছে ততক্ষণ জেগে আছে যেখানে স্বয়ং বিশ্বনাথ। দেহের ক্ষুধা দূর করবে যে কেবল সে নয় জীবের মুক্তিদাতা। Not by bread alone। সন্দেহের অতীত যে ওই সংগে বসুধায় যত জীব তাকে সুধায় ভরে দেবে, অন্তরে দেবে অমৃতের আস্বাদ, মনে করিয়ে দেবে জীব যে, সেই শিব। খেলতে এসেই সে ইচ্ছে করে ভুলেছে যে সে-ই শিব। কাশী ছাড়া আর কোথায় শিব খুঁজে বেড়াচ্ছেন জীবকে। বরুণা আর অসি। বরুণা আর রশি, মুক্তি আর বন্ধনের সংগমক্ষেত্র আর কোথায়? শিব ও জীব আর কোথায় হরিহরাত্মা?

যতক্ষণ কাশী না পৌঁছচ্ছ ততক্ষণ এ জীবনের তীর্থভ্রমণ অসমাপ্ত! ততক্ষণই কেবল হাহাকার:

হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!

কাশীতে পৌঁছনমাত্র নাম আর প্রণাম:

'প্রাণে যদি পেয়ে থাকো চরমের পরম নির্দেশ,
এবারের মতো করে শেষ!'

কাশী যাবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ভারতবিখ্যাত সেই আইনজ্ঞ। একবার নয়। দু'বার। তারপর ভ্রমর এসে গুনগুনিয়ে গেল কানে। কাশীর গংগার ওপারে মাচার ওপর বাসা বেঁধে আছেন একজন ঈশ্বরকে ভালোবাসার যিনি জীবন্ত বিগ্রহ। কী করে যান কাশী? মনে আপশোষের মেঘ জমতে না জমতেই আবার আমন্ত্রণ আসে কাশী থেকে। এবারে আর ভুল হয় না। হ্যাঁ, যাব, কাশী। ২৩শে ডিসেম্বর '৬৩। মোগলসরাইয়ের কাছেই থাকেন এক বন্ধু। তাঁর কাছে গিয়েই উঠবেন। একখানা গাড়ি আছে তাঁর। একটি ড্রাইভারের ব্যবস্থা করতে জানালেন বন্ধুকে।

২৩শে ডিসেম্বর সকালে যথারীতি মোগলসরাই থেকে সটান বন্ধুর গাড়িতে দশাশ্বমেধ ঘাটে। সেখান থেকে নৌকায় গংগার ওপারে সেখানে সাধু বসে আছেন একটা উঁচু মাচার ওপর। বুকের খানিকটা পর্যন্ত দেখা যায়। ভারতবিখ্যাত আইনজ্ঞ বসলেন মাটিতে। গরমে নেয়ে উঠলেন। সাধুর দিকে তাকালেই সূর্যের আলো লাগে চোখে, তাকানো যায় না।

সাধু জিজ্ঞেস করলেন, কী বাচ্চা কষ্ট হচ্ছে? বলার একটু বাদে ছুড়ে দিলেন কাগজের মোড়ক। তার মধ্যে খুব ছোটো দু'টো পাতা। বললেন: খেয়ে ফেল। আইনজ্ঞ ব্যক্তি দ্বিধা করছেন দেখে বললেন: খেয়ে ফেল, ভয় নেই।

খেয়ে ফেললেন দু'টো পাতাই ভদ্রলোক। সংগে সংগে শীতল হয়ে গেল সর্বাংগ। মনে হলো একটা চাদর সংগে থাকলে ভালো হতো।

কী করতে এসেছিস কাশীতে?—সাধু-জিজ্ঞাসা।

মিটিং করতে,—ভদ্র-উত্তর।

মিটিং গিয়েই অবাক হয়ে যাবি। এখন যা, কাল আসবি।

মিটিং গিয়ে হতবাক হয়ে যান আমার সংগে সদ্য-পরিচিত সেই ভদ্রলোক। কেনেডি নিহত হবার খবর পান সকালে কাগজ পড়তে না পাওয়া ভদ্রলোক সেই প্রথম।

পরের দিন সাধু তাঁর এক অনুগত ব্রহ্মচারীকে বলেন ভদ্রলোককে কতগুলো ক্রিয়া দেখিয়ে দিতে। ভদ্রলোক যে যে ক্রিয়া করতেন ঠিক সেই সেই ক্রিয়াই দেখান ব্রহ্মচারী। ভদ্রলোককেও আবার সাধুর কথায় সেই উন্মুক্ত গংগাতীরে দেখাতে হয় একটি ক্রিয়া করে।

আগের দিনের গাছের পাতার অনেক বড় একটা মোড়ক ছুড়ে দেন সাধু যাবার আগে। বলেন, তাঁর বাড়ির কোন অসুখ হলে, এটা খাইয়ে দিলে সেরে যাবে।

প্রণাম করতে এগিয়ে আসেন ভদ্রলোক সাধুকে। মাচার নীচে গিয়ে দাঁড়াতেই নেমে আসে একটা পা। কিন্তু ভদ্রলোকের মাথা থেকে অনেক বাইরে। হঠাৎ দেখেন পা নেমে যাচ্ছে একটু একটু করে। ঠিক যখন বুড়ো আঙুলে হাত ছোঁয়াতে পারেন ভদ্রলোক, তখনই যেন স্প্রিং-এর মতো পা আবার ফিরে যায় স্বস্থানে।

কাশীর গংগার তীরে এই সাধু চিরজন ভায়রের আশ্রম বিগ্রহ। এঁর নাম দেউড়িয়া বাবা। যতবার নাম নিই, প্রণাম করি ততবার

এঁকে। লোকে বলে এঁর বয়স দেড়শো; বয়স আরও বেশি। কাশীতে থাকেন আবার অন্যত্রও চলে যান। এঁকে দেখলে পুণ্য হয়। এঁর নাম করলে শূন্য দূর হয়; এঁকে প্রণাম করতে পারলে পূর্ণকে প্রণাম করা হয়।

এরমধ্যে আরও এক জায়গায় ঘুরে এসেছেন আমার সদ্য-পরিচিত এই ভদ্রলোক। যাঁর কাছে গেছিলেন তাঁর কাছে না গেলে কাশী যাবার কোনও মানে হয় না। কিন্তু এ ভদ্রলোকেরও নাম করা যাবে না, কারণ এঁর কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে ছাপার অক্ষরে এঁর নাম প্রকাশ করব না। যাই হোক, কলকাতার আইনজ্ঞর সংগে কাশীতে বর্তমানে বাস যাঁর সেই যোগী না ভোগী বলতে পারব না, বর্তমান কাশীতে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ যিনি আমার, পাঁচ বছর আগে ফোনে যোগাযোগ হয়, কিন্তু সাক্ষাৎ এই প্রথম। প্রসংগত বলি আইনজ্ঞ এই ব্যক্তির সংগে আমারও সাক্ষাৎ হবার কথা পাঁচ বছর আগে। কিন্তু তা সত্যি সত্যি হলো এই সবেমাত্র।

কাশীর মহৎ মানুষটির কাছে পৌঁছবার জন্যে কলকাতার বিখ্যাত লোকটি কাছেই অবস্থিত এক পানের দোকানের বৃদ্ধকে পৌঁছে দিতে বলেন। বৃদ্ধ সেখানে পৌঁছে দিয়ে ছুটি চায়। কাশীর বাঙালী সাধু বলে যাঁর পরিচয় তিনি তাকে কিছুতেই যেতে দেন না। কেন, তা কলকাতার লোকটি তখন বোঝেন না। একথা সেকথার পর কাশীবাসী বলেন; রাস্তায় অনেক সময় দেখা যায় একটা ফুল অথবা ফুলের মালা রয়েছে, সেগুলি মাড়ানো বা ছোঁয়া উচিত নয়। ওগুলি অনেক সময় কারুর ক্ষতি করবার জন্যে থাকে, যে কারুরই ক্ষতি হতে পারে ছুঁলে।

রাত দেড়টায় সেখান থেকে বুড়ো পানওলাকে নিয়ে কলকাতাবাসী গাড়ির দিকে আসতে দেখেন, রাস্তায় ফুলের মালা অবিকল যেমন বর্ণনা তেমনইভাবে রয়েছে। সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন দু'জন। বুড়ো পানওলাকে একা ছেড়ে দিলে সে এটি ছুঁয়ে ফেলত। কাশীর মুখে সতর্কবাণী উচ্চারিত না হলে কলকাতার ভদ্রলোক এক লাথিতে একে উড়িয়ে দিতে গিয়ে নিজে গুঁড়ো হতেন এখন বুঝলেন।

আমরা উড়িয়ে দিই যা কুসংস্কার বলে সব সময়ই তা কুসংস্কার নয় যে একথা আমরা বুঝি না, কারণ, গোঁফদাড়ি পেকে গেলেও আমরা আসলে সবাই অপ্রাপ্তবয়স্ক। দু'পাতা ইংরিজি পড়া অথবা বলা দু'পুস্তিকা কি দু'ছত্র গদ্য কিংবা পদ্য লেখা, একটু জটিল অংক একটু কম সময়ে করতে পারা, মানবজীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা এ নয়। এহ বাহ্য। যদি চোখ খুলে যায় দৈবাৎ তবে দেখব আমরা, আমাদের হাতে কিছু নেই।

'হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।'

তরী পার হতে গিয়ে ভরাডুবি হই আমরা, কারণ আমরা ভাক্ত। রামকৃষ্ণের কথায় আমরা মূর্ছা যাই। কিন্তু তাঁর একটা কথাও আমরা বিশ্বাস করি না। করলে জানতাম, আমরা সবাই একদিন রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হব। সবাই খেতে পাবে, কেউ সকাল সকাল, কেউ বেলায়। পৃথিবী নামক বিশ্বনাথভূমিতে কেউ অভুক্ত রইবে না। যে কোনও জাত, যে কোনও ধর্ম, যে কোনও জন্ম হোক তার, মুক্তি তাকে পেতেই হবে কেন? কারণ জীবের মুক্তি না হলে শিবের মুক্তি কই।

শিব কে? না, যিনি জীবকে নিজের বুক থেকে ফেলে দিতে পারেন না। আর কাশী কি? না, কাশী হচ্ছে সেই জায়গা, যেখানে পৌঁছলে জীব জানতে পারে যে সেই শিব! এ কাশীতে পৌঁছয় কোটিকে গোটিক। আমরা সবাই যাই বেনারস ক্যান্টনমেন্টে, তাই কণ্টেন্‌মেন্ট মেলে না কিছুতেই।

সেই স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে বসে আরও একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা আমাকে শোনান। সে ঘটনা কাশীতে ঘটে নি; ঘটেছে কলকাতায়। তবু তা বার্ধক্যে বারাণসীরই কথা, কারণ তা অপার্থিব কথা। ভারতীয় সাহিত্যের যা চিরন্তন কীর্তি তা সবই যেমন তার উৎসে হয় রামায়ণ-মহাভারত, নয় উপনিষদের, তেমনই ভারতীয় যোগসাধনার আদিতে ও অন্তে রয়েছে অনাদি ও অনন্ত কাশী। আইনজ্ঞ, সাহিত্যপ্রিয়, প্রিয়দর্শন মানুষটি বলছিলেন গয়ায় এক সাধুর দেখা না পাবার পর কলকাতায় খবর পান যে সাধু এসেছেন। সাধুর সংগে কলকাতায় সাক্ষাৎ করেন সস্ত্রীক। সাধুকে বিরক্ত করেন যাচাই করবার উদ্দেশ্যে। বলেন: রাশ্যার বৈজ্ঞানিকরা স্পুটনিক বলে একটি বস্তু শূন্যে ছেড়েছে যার পরবর্তী পদক্ষেপে মানুষ পৌঁছে যাবে চাঁদে। সাধু কিছু বলেন না। মনে হয় বৈজ্ঞানিক এই ব্যাপার সাধুর আওতায় নয়। আইনজ্ঞ ভদ্রলোক এর আগের বছর তাঁর আমেরিকা সফরের কথাও বলেন সাধুকে।

আমেরিকা কি তোমায় মৃত্যুভয় দূর করতে সাহায্য করেছে?—আচমকা প্রশ্ন সাধুর।

না—

তা হলে আমেরিকা কি করেছে?

কলকাতার সেই সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব ব্যাখ্যা করলেন সফরের উদ্দেশ্য। বললেন: সকল মানুষের প্রসপারিটি, প্রোগ্রেস ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

সাধু ধরে রইলেন তাঁর এক জিজ্ঞাসা অসুখ সারাবার মন্ত্রটি কি পেলে সেখানে?

সব অসুখ নয়, কোন কোনও অসুখ তারা সারাচ্ছে বটে—

না। আমি জানতে চাইছি সব অসুখ সারাতে পারে কি না, মৃত্যুঞ্জয় হবার মন্ত্র জানে তোমার আমেরিকা?

না—

তা হলে গত বছর গেছিলে আমেরিকায়, হয়ত আসছে বছর ছুটিতে যাবে চাঁদে, সেখানে গিয়েই বা কি হবে, যদি প্রতিবার মৃত্যুর ফাঁদে পড়ার হাত থেকে বাঁচার রহস্য না জানো—

ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেন সাধু ভদ্রলোকের ওঠবার সময়ে: কোথায় থাকো?

বালিগঞ্জে—

কতদূরে জানতে চাইছি, এখানকার কোনও জায়গাই চিনি না—

এখান থেকে পাঁচ-ছ মাইল হবে—

সাধুর কাছ থেকে বেরিয়ে যে লোকটি আমার সদ্য-পরিচিত সেই ভদ্রলোককে সাধুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি ঈষৎ রাগ করেন: সাধু-মহাত্মাদের সংগে কি কেউ এত তর্ক করে। তাঁদের কাছে যাই শোনবার জন্যে। শোনাবার জন্যে নয়; কলকাতার খ্যাতনামা

মানুষটি ভাবছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কথা। সাধু হঠাৎ তাঁর বাড়ি কতদূর এ-কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?

এই 'কেন'-র উত্তর পেলেন কলকাতার বাড়ির নিস্তব্ধ শয়নগৃহে নিশীথ রাত্রে। পথের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। সেই আলোয় ঘুম ভেংগে যাওয়ায় ভদ্রলোক দেখলেন, সাধু দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে। তখন একটি য়্যাল্সেসিয়্যান ছিলো সেই ভদ্রলোকের। টিকটিকি নড়লে সে চেঁচাত। সে-ও নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকেও ধাক্কা দিয়ে তুললেন। সাধু শুধু বললেন: ডরো মাৎ।

তারপর হঠাৎ নির্বাপিত দীপগৃহ অন্ধকার। যেন ফিউস হয়ে গেছে। কোথাও সাধু নেই।

পরের দিন সাধুর ওখানে যেতে, কয়েকজনের সংগে কথোপকথনরত সাধু যেন ইচ্ছে করেই ভদ্রলোকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ভদ্রলোক বলেন: আজ উঠি। আমার একটা প্রশ্ন ছিলো—

কাল তোমার ঘরে রাতে আমার যাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ নেই। তোমার আমেরিকাকে বলো, যে যন্ত্রের চেয়েও দ্রুত, যন্ত্রের চেয়েও দূরে যেতে পারা যায়,—যদি কেবল এইটেকে বড়ো করতে পারো, —এই বুকের ভেতরটা—

ভারতের সত্যদ্রষ্টা কবির কথাও তাই:

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূর আমি ধাই,
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই—'

অন্ধকার থেকে আলোয়, অসৎ থেকে সতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে যাত্রাই চিরন্তন ভারতের স্বপ্ন, সাধনা ও সংগ্রাম। এরই আদি ও অন্তে রয়েছে অনাদি কাশী। কাশী কেবল তীর্থ নয়; ভারতীয়-স্বপ্ন-সাধনা ও সংগ্রামের সতীর্থ; স্বয়ং বিশ্বনাথের 'স্ব'-তীর্থ।

সাধু ওই বিখ্যাত সাকসেসফুল মানুষটিকে বলেছিলেন বুকের ভেতরটাকে বড় করতে। 'তোর মন' সব,—এই মন্তর জপতে জপতেই তো জীবের শিব হওয়া। পৌঁছে যাওয়া মনের অতীত এমন রাজ্যে যেখানে 'কে তুমি' তার উত্তর মেলে। যেখানে এসেই সে জানে 'সে'-ই আমি; আমিই 'সে'-ই!

ভোলেবাবার কথাও এই ভদ্রলোক যুগল আমাকে প্রথম বলেন। কাশীতে যাঁর পরিচয় বাঙালী সাধু বলে, অথচ যাঁর সাধুত্বের অভিমান কদাচ প্রকাশিত, তাঁর বাড়িতে এক বৃদ্ধ ডাক্তারের যাতায়াত আছে। সেই ডাক্তার আবার এই আইনজ্ঞ খ্যাতনামা লোকটির বাড়িতেও আসেন যান। তিনি একবার ভোলেবাবার সংগে সন্ন্যাসী হবেন বলে ট্রেনে উঠে পড়েন। ভোলেবাবা গর্জন করে ওঠেন: যা, যা, নেমে যা এখখুনি। তোর বউ-ছেলেমেয়ে আছে, তাদের দেখবে কে? যদি না নামিস তো আমি ঠেলে ফেলে দেব তোকে—

দরজা খুলে ধরেন মেল ট্রেনের ভোলেবাবা। হাতে দেন একটা আপেল। খেতে বলে দেন সেটা। উপায়ান্তর না দেখে দুর্ধর্ষ বেগে ধাবমান মেল ট্রেন থেকে লাফ দেন ভদ্রলোক। মাটিতে পড়েন যেন থামা-ট্রেন থেকে নামলেন। ততক্ষণে বাড়ি থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে তাঁকে মেএল্ ট্রেএন্। কী করে বাড়ি ফেরেন। ভাবতে ভাবতে হাতের আপেলের দিকে চোখ পড়ে। মনে পড়ে ভোলেবাবার কথা। খেয়ে ফেলতে বলেছিলেন। কামড় দিতেই ফলে, ভদ্রলোক দেখেন নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি।

ভোলেবাবার বেশ একটা; ছদ্মবেশ অনন্ত।

এই মুণ্ডিত মস্তক। এই,—অভিজাততম রেস্তোর্াঁয় আধুনিকতম পোষাকে বলড্যান্সরত। পরিচিত একজন ওই অবস্থায় ভোলেবাবাকে দেখে অপ্রস্তুত। পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে ভোলেবাবা বলেন: এত আশ্চর্য হবার কী আছে?

এই পোষাকে?—বিব্রত প্রশ্ন ভোলেবাবাকে বিব্রত করে না এতটুকু। বলেন পোষাকটা দেখিয়ে ভোলেবাবা: এই পোষাকটা কি আমি?

চিরন্তন ভারত বলেছে তাই, দেহের ওপর ওই বসনটুকুই নয়, দেহও আসলে বসনমাত্র। মৃত্যু মানে জীর্ণবসন ত্যাগ; জন্ম মানে, —নববস্ত্র পরিধান!

ভারতবর্ষ ছাড়া একথা কে বলেছে আর? হিন্দুর একার ছাড়া এ কার দর্শন আর। [ক্রমশ।

প্রেম

সবিতাদেবী মুখোপাধ্যায়

জীবনের অলস বেলায়
কে তুমি আসিলে হেথা
যৌবনের প্রস্ফুটিত পদ্মবন ছাড়ি।
ছিঁড়িছে বীণার তার
বেড়েছে হৃদয় ভার
রঙিন স্বপন মোরে গিয়েছে যে ছাড়ি।

দেহ তরু কাণ্ড সার
পত্র পুষ্প নাহি আর
রিক্ত মনে রইনু যে পড়ে।
আনন্দ বেদনা যতো
দেহভরি অলঙ্কার মতো
জড়ায়ে রাখিয়াছে মোরে।

নাই বাণী নাই ভাষা
হৃদয়ের আকুলতা
প্রেম রূপে কেন এলে হৃদয় গহীনে।
কী দিয়ে পূজিব আমি
ওগো মোর অন্তর্যামী
জীবনের এই সন্ধিক্ষণে।

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

বাজোরিয়ার পেছনে সবাই একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সব ভাল যার শেষ ভাল।

না আঁচালে বিশ্বাস নেই, তাই কথাবার্তা পাকা করেও স্বস্তি নেই।

ওঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে বললেন চৌধুরী।

এই হিরোর রোলটা, আমার মনে হয় দি পার্ট ফর ইউ মিঃ বাজোরিয়া।

সলজ্জ হাসি হাসলেন বাজোরিয়া।

গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোস সিগারেটটা ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলেন।

রিয়েলি,...ইটস্ এ জব টু হ্যাণ্ডেল দিজ টাইপ অফ পারসনস্।

মাথার থেকে ঘাম মুছে একটা নিশ্বাস ফেললেন বোস।

রবীন ওপরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল অন্যমনস্কভাবে।

হঠাৎ সত্যব্রতর গলা শুনতে পেল।

কোথায় রবীন? বাড়ি নেই?

আজ্ঞে আধঘণ্টা আগেও তো দেখেছি।

কোথায়?

আঁকছিলেন ঘরে বসে।

ঘরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছিলেন। ঠিক এই সময়ই রবীন সামনে এসে দাঁড়াল।

এই যে রবি? কোথায় ছিলে? ওপরে?

হ্যাঁ—

তোমার এক বন্ধু তোমার খোঁজ করছিলেন, তোমাকে তো পেলাম না।

কোথায় তিনি?

কে?

বললেন, এক বন্ধু এসেছে।

ও হ্যাঁ, এসেছিলেন কিন্তু এখন নেই। তোমাকে দেখা করতে বলে গেছেন।

চলে গেছেন?

হ্যাঁ কি নাম সান্যাল। ডিটেলস্ হরিপদর কাছে জেনে নিও।

ও তা হলে শক্তি সান্যাল এসেছিল।

কে সে?

আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড।

ক্লাস ফ্রেণ্ড? কোথাকার?

বগুড়ায় যখন পড়তাম তখনকার।

ওঃ, ওখানেই থাকে নাকি তারা?

না, এখন চলে এসেছে। ওর বাবা সেখানকার স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন।

ওঃ।

পরিচয়টা জেনে তাচ্ছিল্যভরে চলে যাচ্ছিলেন সত্যব্রত। রবীনও ফিরে দাঁড়াল।

রবি শোন।

কি মনে হ'তে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

বলুন।

রবীন ফিরে এল।

তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকারী কথা আছে। আমার শোবার ঘরে এসো।

এখনই কি দরকার?

হ্যাঁ এখনই।

আচ্ছা যাচ্ছি একটু বাদে।

সিঁড়িরতলার নিজের কুটুরিটায় ঢুকে পকেট থেকে একটা দোমড়া

কাগজ বার করে একটা ঝোলার ভেতর রেখে দিল রবীন। তারপর ঝোলাটা দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখল।

শোবার ঘরে ডেকেছেন কাকা। এই অসময়ে? কি বিশেষ দরকার? ভেবে পেল না সে। কি কথা থাকতে পারে তাও বুঝতে পারল না।

বাইরের ঘরে একবার এল রবীন। ওর বন্ধু চলে গেছে। কি জন্য এসেছিল কে জানে। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার বিশেষ দরকার ছিল রবীনের; সেই ব্যাপারটার কি ব্যবস্থা করল কে জানে।

হরিপদ।

হরিপদকে ডাকল সে আরও কিছু জানবার আশায়।

কি বলছেন।

রান্নাঘর থেকে জবাব এল।

সোজা রান্নাঘরে চলে এল রবীন। হরিপদ প্রচণ্ড শব্দে গরম কড়ার ওপর তরকারী নেড়ে চলেছে।

আমার বন্ধুকে বসালি না কেন?

বসালাম তো। তা বাবু···

কিছু বলে যায় নি?

হ্যাঁ, একটা চিঠি দিয়ে গেছে।

কৈ দেখি?

একটা ছেঁড়া পাতায় লেখা শক্তির চিঠিটা দিল হরিপদ।

পেন্সিলে তাড়াতাড়িতে লিখে রেখে গেছে শক্তি।

'তোমার জন্য অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তোমার কাকার কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ পেলাম না।···তুমি যা বলেছিলে সে বিষয়ে একটা কিনারা হয়েছে। কাল বিকেল পাঁচটায় দেখা কর আমার সঙ্গে আমাদের ইন্দ্র রায় রোডের বাড়িতে। তোমার···বান্ধবীটিকেও এনো, তাঁকে আমার নিমন্ত্রণ জানিও।

শক্তি।'

চিঠিটা কার হাতে দিয়েছিল। কাকা দেখেছেন চিঠিটা।

তিনিই তো আমাকে দিলেন। সে বাবুটি আমাকে দিতে যাচ্ছিলেন তা বাবু তখনি নিজে নিয়ে তারপর আমাকে দিলেন।

কাকা পড়েছেন নাকি?

নার্ভাস লাগল বুঝি রবীনের।

তা জানি না। মনে হ'ল পড়ছিলেন। তবে বাবুটি অপেক্ষা করতে রাজী ছিলেন তা বাবু বললেন, আপনার ফিরতে দেরি হবে। বাবু নাকি আপনাকে কোন কাজে পাঠিয়েছেন।··· তাই বাবুটি আর বসলেন না।

ও···আচ্ছা—ঠিক আছে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে একবার কি ভাবল রবীন।

বুঝতে পারে না তার কাকার এই ব্যবহার। শক্তিকে এভাবে তাড়ানোর অর্থ কি?

বেশ খারাপ হয়ে গেল মেজাজটা।

হাতের নখগুলো ভাল করে পালিশ করছিল সুচরিতা।

রবীন বাইরে থেকে দরজায় টোকা দিল।

কে?

আমি রবি।

এসো।

রবীন ঘরে ঢুকল, ওকে একবার দেখে আবার নখ পালিশ করতে লাগল সুচরিতা।

কাকা কোথায়?

স্নান করতে গেছেন।

আমায় আসতে বললেন।

হ্যাঁ তোমার দেরি দেখে স্নান করতে গেলেন।

ও···তা হলে স্নান হয়ে গেলে ডেকে পাঠাবেন। আমি বাইরের ঘরেই আছি।

ব'স না এ ঘরেই। তাড়া কিসের?

না তাড়া নেই?

তবে?

কি তবে?

বসতে ক্ষতি কি।

ক্ষতি নেই, তবে অনাবশ্যক হ'তে পারে তো।

এই অল্প হেসে কাকীমার কথা রবীনের মোটে ভাল লাগে না। কিছুই নয়, তবু যেন কেমন সহজ মনে হয় না তার।

সুচরিতা আবার হাসল।

অনাবশ্যক তো বটেই, তবে কাকীমার কাছে অনাবশ্যকও বসা যায়।

অবাক হ'য়ে গেল রবীন। ঠাট্টা করছেন না কি কাকীমা?

এত অন্তরঙ্গভাবে কখনও কথা বলেছেন বলে তো রবীন মনে করতে পারে না। আজ আড়াই বছরের ওপর হোল সুচরিতার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু নিজেকে কাকীমা বলে পরিচয় দেবার কোন আগ্রহ বা ইচ্ছে তো দেখা যায় নি। আজ হঠাৎ?

বস, বস। আবার বলল সুচরিতা।

কথা না বাড়িয়ে বসে পড়ল রবীন সামনে রাখা রকিং চেয়ারটায়। হঠাৎ দোল লাগতেই সোজা হ'য়ে বসার চেষ্টা করল। আবার দুলতে লাগল চেয়ারটা।

তুমি বরং এটাতে ব'স।

হেসে নিজের চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে সুচরিতা রকিং চেয়ারটায় বসে দোল খেতে লাগল। পালিশ-করা নখগুলো দেখতে লাগল সে।

আচ্ছা, কাকা হঠাৎ আমায় ডেকেছেন কেন?

কিছু না উত্তর দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল সুচরিতা।

আমি কি জানতে পারি? কেন?

ধৈর্য থাকছিল না রবীনের।

পার বৈ কি। তোমার আর ইলার ব্যাপারের একটা হদিস পেয়ে চান আর কি?

মানে?

রবীন ভ্রূ কুঞ্চিত করল।

গভীরতর কোন মানের খোঁজ আমি অবশ্য রাখি না। কিন্তু কথাচ্ছলে তোমার কাকাকে খবরটা একবার জানিয়েছিলাম, এইমাত্র বলতে পারি।

কি এমন খবর যে আলোচনা চলতে পারে তাই নিয়ে?

একটু উদ্ধতভাবেই প্রশ্ন করল রবীন।

ওর ঔদ্ধত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একটু হাসল সুচরিতা। তারপর হঠাৎ একটু এগিয়ে এসে একান্ত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আমায় বল তো, ইলার সঙ্গে সত্যিই তোমার খুব ভাব না কি?

এসব কথা নিতান্তই ব্যক্তিগত।

হোক না ব্যক্তিগত, তবু কাকীমাকে ব্যক্তিগত কথাও বলা যায়।

এমন অনেক কথা আছে যা মা-বাবাকে বলা যায় না। যায়, যদি তাঁরা বন্ধুভাবাপন্ন হন। এক্ষেত্রে···পরিহাস করছেন?

সোজা সুচরিতার মুখের দিকে তাকাল রবীন।

তোমার সঙ্গে আমার পরিহাসের সম্পর্ক আছে বলে তো আমার মনে হয় না।

আবার নখ পালিশের সেটটা টেনে নিল সুচরিতা।

আচ্ছা আমি যাই।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলল রবীন।

না।

দৃঢ়তার সঙ্গে বলল সুচরিতা।

কেন?

কেন না কথার উত্তর দিয়ে তবে যাবে।

বেশ, কি কথার উত্তর দিতে হবে।

সুচরিতার সামনে এসে দাঁড়াল রবীন।

বোস।

সুচরিতার গলায় আদেশের সুর।

রবীন আবার বসে পড়ল।

বলুন আপনার প্রশ্ন।

একটু থেমে রবীনের মুখের মধ্যে কি দেখে নিল সুচরিতা, তারপর নখ পালিশ করা বন্ধ করে খুব ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল, আমাদের প্রশ্ন, আমরা জানতে চাই, তুমি ইলার সঙ্গে এত বেশি মেশ কেন?

যদি বলি আমার ভাল লাগে?

অবাক হ'য়ে গেল সুচরিতা।

চিরকালের লাজুক স্বল্পবাক ছেলেটা এত তেজ পেল কোথায়? আস্তে আস্তে রকিং চেয়ারটা থেকে উঠে এসে খাটের ওপর বসল সুচরিতা, একেবারে রবীনের সামনাসামনি।

তোমার যে ভাল লাগে, সে তো জানা কথাই···ভাল না লাগলে ওপরে যাওয়ার যে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই, এটা তো সহজবোধ্য। কিন্তু একটা বিষয়ও তো ভেবে দেখা দরকার।

কি বিষয়ে?

এইসব হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে মন দিলে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে না?

ভবিষ্যৎ বলতে আপনি কি বোঝেন?

তোমার ক্ষেত্রে, নাম, সম্মান, শিল্পী হিসেবে যশ।

আপনার কি মনে হয় অনন্যমনা হ'য়ে ফিল্মের সিন আঁকলেই আমার জীবনে এই সব আসবে?

কেন নয়?

কেন নয়! এইভাবে ফিল্ম লাইনে আমার কি সাফল্য আসবে?

ফিল্মও কি একটা শিল্প নয়?

সব সময় না।

তার মানে কি বলতে চাও?

কিছুই বলতে চাই না, তবে এটুকু জানবেন, রসোত্তীর্ণ না হলে কিছুই শিল্পের পর্যায়ে যেতে পারে না।···তা ছাড়া এই যে বাস্তব ছাড়া, বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কহীন পুরোন গলিত চিত্রশিল্প এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে এই মৃত-বর্তমান আমাকে কোন ভবিষ্যত-সাফল্যের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে না। যাবে না। অন্তত শিল্পী হিসেবে তো নয়ই।

এ যেন অন্য রবীন, মুখচোখ তার কিসের আবেগে জ্বলছে, সে মুখের দিকে তাকিয়ে সুচরিতার মুখের সকৌতুক হাসি মিলিয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল সে।

জীবনের সাফল্য তো অর্থের ওপর। তাই নয় কি?

আমি যদিও তা মনে করি না, অর্থ ই সব নয়, তবু বলবো, সে অর্থও তো আমি পাই না। শ্রমের কি মূল্য আমি পাই তা বলতে পারেন?

তোমার কাকাকে ব'ল না কেন?

না।

না কেন? মনে মনে ক্ষোভ পোষার থেকে মুখে ব'লে ফেলা ভাল নয় কি?

মনের মধ্যে কিছু পুষে রাখবার মত যথেষ্ট জায়গা আমার মনে নেই।

ইলাকে?

আমি যাই···

ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রবীন।

দারুণ রাগ হ'ল সুচরিতার নিজের ওপর। শেষের পরিহাসটুকু না করলেই হোত। খামকা যেচে অপমান ঘাড় পেতে নেওয়া হল।

কিন্তু কি স্পর্ধা ছেলেটার। সত্যব্রত ঠিকই বলেন। এরা উপকার নেবে অথচ স্বীকার করবে না। আবার বড় বড় কথা, বাস্তবছাড়া চিত্র, গলিত চিত্র, মৃত চিত্র···কত কি! অর্থহীন কতগুলো বুকনি শিখেছে ছেলেটা। ফিল্মে আবার এসব কথার স্থান আছে নাকি? চিত্রশিল্পে সব থেকে বড় কথা অর্থ। এ তো শুধু শিল্প নয়, ব্যবসাও, তা না হলে অত কোটিপতি সব এ লাইনে আসবে কেন? শিল্পকে পেট্রোনাইজ করতে? দায় পড়েছে তাদের। যত সব।···

রাগে গা জ্বলতে লাগল সুচরিতার আরও বেশি এই জন্য যে, রবীনের কথাগুলো সে যেন ঠিক উপেক্ষা করতেও পারল না, কাঁটার মত খচখচ করতে লাগল।

সত্যিই রবীনের কথাগুলো তাকে নাড়া দিয়েছে বেশ। সে নিজেও তো জানে শিল্পের নাম করে কত ঘৃণিত জিনিস স্থান পেয়েছে এখানে। সে নিজেও তো একজন ভুক্তভোগী।

কিন্তু সত্যব্রতর মত একজন বুদ্ধিমান লোকও তো বলেন যে, আসলে বলবার আনন্দে নায়ক-নায়িকার মুখে কতগুলো কথা দিতে হবে ঠিকই, সমাজের ত্রুটিগুলোও লোকের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে, কিন্তু তার থেকেও বড় কথা—অর্থ।

SUNLIGHT
নতুন ফরমুলার
সানলাইটে
আরও ঝলমলে কাচা হয়!
নতুন ফরমুলার সানলাইট — কী চমৎকার নতুন মোড়ক, কী সুন্দর নতুন গড়ন! আর সেইসঙ্গে আরও ঝলমলে ক'রে কাচার কী আশ্চর্য্য নতুন শক্তি! প্রতি ধোপ কাচবার পরে দেখবেন আপনার কাপড়জামা...
...আরও ধবধবে, আরও ঝলমলে কাচা হয়!
S. 56-140 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

বুঝতে চায় না সুচরিতা। জানে সে, চিত্রশিল্পকে সত্যিই যথার্থ শিল্পে উত্তীর্ণ করবার প্রয়োজন আছে। কয়েকজন পরিচালক তো ইতিমধ্যেই চিত্রশিল্পকে একটি বিশেষ পরিণতির স্তরে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন। অতীতের কাঁচা ধারণার মূলোচ্ছেদ ক'রে আজ সত্যিই চিত্রশিল্পকে যে যথার্থ শিল্পের স্তরে নিয়ে যাওয়া দরকার, সে সত্য আজ স্বীকৃত হয়েছে। হোক, যখন হবে তখন।

তাই বলে রবীনের মত একটি ছেলে এত কথা তাকে শুনিয়ে যাবে? সহ্য হয়?

তাই রবীনের ওপর রাগ তার যেতে চায় না। হঠাৎ মনে হল, ঠিকই করেছেন সত্যব্রত। রবীনকে স্মারক করেই রেখেছেন তিনি, মঞ্চে প্রবেশ করতে দেন নি। একটা তেজী ঘোড়াকে বশ মানাতে সত্যব্রতই পারেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্নান সেরে ভিজে মাথা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে সত্যব্রত ঘরে ঢুকলেন। সুচরিতা তখনও শুয়ে, চোখে হাত চাপা দিয়ে।

কি ব্যাপার? শুয়ে যে?

এমনি।

রবীন আসে নি?

এসেছিল।

তবে?

তবে আর কি? চলে গেল?

বসতে বললে না কেন?

বলেছিলাম, বসল না।

বাঃ, আমার কথা আছে তার সঙ্গে বলেছিলে?

সবই বলেছি। আবার বেশ গরম গরম কথাও শুনলাম।

গরম গরম কথা? কে বললে?

কেন, তোমার রবি। কত কথা শুনিয়ে গেল।

রবীন কথা শুনিয়ে গেল তোমাকে?

অবশ্য আমারও প্ররোচনা কিছু ছিল।...

সুচরিতা উঠে বসল বিছানার ওপর। সত্যব্রতর কাছে এগিয়ে এল।

এই? নিজে পাউডার মাখছ কেন? আমি দেব না বুঝি?

গায়ে মাথায় পাউডারটা নিয়ে সত্যব্রতকে মাখাতে লাগল সুচরিতা।

ওর কোমর জড়িয়ে ওকে কাছে টানলেন সত্যব্রত। নিজে বুঝি কোন কাজ করব না?

না—অন্তত আমি থাকতে নয়।

বেশ।

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন সত্যব্রত। ওকে যতটা বোকা ভাব ততটা বোকা ও নয়।

সত্যব্রতর গায়ে ভাল করে পাউডার মাখাতে-মাখাতে বলল সুচরিতা।

কাকে?

হঠাৎ মনটা অন্যদিকে চলে গিয়েছিল সত্যব্রতর।

কাকে আবার? তোমার ভাইপো।

ও রবি?

হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কে?

ওকে বোকা ভাবি কে বললে তোমায়? দেখছ না কোলকাতার মত সহরে কেমন আস্তানা ক'রে নিজের কাজ গুছোচ্ছে।

সে না হয় তুমি ওর কাকা ব'লে।

এখনকার দিনে কোন্ আত্মীয় কার খোঁজ নেয়?

হঠাৎ সুচরিতার ভারি রাগ হল। রবীনের ওপর যদিও সে চটে ছিল, কিন্তু এ মন্তব্য সে অকপটে গ্রহণ করতে পারল না। তাই ঢুম করে পাউডারের কৌটো রেখে দিয়ে বলে বসল, উপকার পেলে নেয় বৈ কি।

ওর কাছে কি উপকার পাচ্ছি?

যথেষ্ট, সে তুমি ভালই জান।

কিসে?

ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করলেন সত্যব্রত।

ও এ রকম গাধার মত না খাটলে এত আরামে তুমি এ কোম্পানী চালাতে পারতে?

আর এতে ওর লাভ বুঝি কম হচ্ছে?

কোথায়?

কেন? ওর মত একজন শিল্পীর যে এতটা নাম হচ্ছে তাও তো দেখতে হবে।

ওঃ, ভারী।...

ঠোঁট ওল্টাল সুচরিতা। সিনেমার পট এঁকে নাম না করলেও হয়ত ওর চলতো। চলতো কেন বলব, হয়ত আরও ভাল হত।... ছেলেটা সত্যিই প্রতিভাবান।

রবীনের প্রশস্তি গাওয়া আজ কোনমতেই সুচরিতার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং ঠিক উল্টো মনোভাব তার ছিল। কিন্তু কথায় কথায় সত্যব্রতর এই দম্ভ আজকাল সে যেন কেমন সহ্য করতে পারে না। তা হলেও কথার পিঠে কথা দিয়ে সত্যব্রতকে সে যখন আঘাত করতে চাইল তখন শুধু সত্যব্রত নয় সে যেন নিজেও অবাক না হয়ে পারল না।

কিন্তু সত্যিই সে বলে ফেলছে, না ব'লে পারছে না। ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করছে সে সত্যব্রতর কোন কথার প্রতিবাদ করার একটা স্বতোৎসারিত স্পৃহা তার মধ্যে জেগে উঠছে। একে যেন সে মোটে আটকাতে পারে না।

সুচরিতার এই আঘাতটুকু সত্যব্রত লক্ষ্য করে গম্ভীর হয়ে বললেন, প্রতিভার দাম আমিও দি'।...কেন না হাতে গোণা কয়েকটি প্রতিভাবানদের মধ্যে আমিও একজন এবং প্রথম সারিতে।

তোয়ালেটা টেনে নিয়ে সুচরিতা স্নানের জন্য বেরিয়ে গেল।

এর জবাব সে দিতে পারত, কিন্তু আজ নয়।

ভয়ানকভাবে মার খেলেন সত্যব্রত। তাঁর প্রযোজিত ও পরিচালিত প্রথম বইটাই এমনভাবে ফ্লপ করল যে মোটা রকমের আঘাতে তাঁকে ধরাশায়ী করে দিল।

খুব বেশি রকমের যেন নার্ভাস হয়ে পড়লেন সত্যব্রত। নিজের অর্থাৎ সুচরিতার দরুণ পাওয়া টাকার প্রায় সবটাই তিনি ইনভেস্ট

করেছিলেন বড় লাভের আশায়। এমন কি জমি কিনে একটি বাড়ি করবার আশাও তাঁর মনে উঁকি দিয়েছিল আর যার সম্ভাবনাও তিনি ভেবে রেখেছিলেন এই লাভের টাকা থেকেই।

তাঁর একটা প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা ছিল, একজন বনেদী চিত্র-ব্যবসায়ী হবেন। শুধু নিজস্ব চিত্র-প্রতিষ্ঠান নয়, নিজস্ব বাড়ি, প্রচুর টাকা আর সম্ভবমত পরের পর বই প্রয়োজনা। যাতে চিত্রজগতে শুধু পরিচালক নয়, রমেন সরকারের মত তাঁরও একটা নাম থেকে যায়।

কিন্তু বাজারে যা রিপোর্ট পেলেন, তাতে এটুকু বুঝতে তাঁর বাকি রইল না যে, এই টাকা ফিরে না এলে তাঁকে পথে বসতে হবে। শুধু ডিরেক্টর হিসেবে তিনিই বাতিল হবেন না, নিজের হাতে ভবিষ্যতও তিনি নষ্ট করবেন।

অথচ এদিকে চাল বাড়িয়ে ফেলেছেন অনেকটা।

খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ সবকিছু থেকেই তিনি মধ্যবিত্তের গন্ধটুকু পর্যন্ত ছেঁটে ফেলতে চেয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল শুধু ধনী নয় অভিজাত হ'তে হবে। চলাফেরা, বেশবাস সবেতেই ফুটে উঠবে আভিজাত্য এবং সেটা একমাত্র সম্ভব তাঁর মতে প্রচুর অর্থ রোজগারে। তাই পারিশ্রমিক হিসেবে অন্য লোকের কাছে টাকা নেওয়াকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেন নি, নিজের কোম্পানী খুলে, প্রয়োজনার ঝুঁকিটুকুও তিনি সাগ্রহে নিয়েছিলেন শুধু অর্থপ্রাপ্তির আশায়।

কিন্তু অর্থের দিকটাই যেখানে বড় কথা সেখানে সেটুকুর আশা ত্যাগ করা তাঁর মত লোকের পক্ষে কঠিন।

এই বইটাতে অনেক আশা ছিল তাঁর।

বাছা বাছা কথা বসিয়েছিলেন তিনি নায়িকার মুখে, বড় বড় বুলি। কিন্তু একবারও বোধ হয় ভাবেন নি যে নীরস প্রবন্ধ পাঠ শুনতে দর্শক বা শ্রোতারা দলে দলে সিনেমায় যায় না। এর মূল্য আকর্ষণ আনন্দ পাওয়া, সুখ বা দুঃখের ইতিবৃত্তের ভেতর দিয়ে। তা ছাড়া এমন একটা শিক্ষার মাধ্যমও যে শিল্পসার্থক না হ'লে শ্রোতাদের মন পেতে পারে না এ ধারণা বোধ হয় তাঁর ছিল না। তাঁর নিজের প্রতিভার অহঙ্কারে তিনি বুঝি ভেবেছিলেন যে, তিনি যা দেবেন দর্শক তা মাথা পেতে নেবে।

কিন্তু দর্শক তা নিল না, আর ভয়ানকভাবেই হতাশ হলেন তিনি।

কিন্তু হতাশ হলেও হাল ছাড়বার পাত্র তিনি নন। তিন চার রাত ঘুমোতে পারলেন না, সুচরিতার অনেক ছেলেমানুষি উপেক্ষা করলেন তিনি, তার অনেক আবেগ প্রকাশ ব্যর্থ হোল, গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন সত্যব্রত।

একটা পথ করা দরকার। এভাবে নিজেকে ডুবতে দিলে চলবে না। আবার চেষ্টা করে টাকাটা না তোলা পর্যন্ত তাঁকে অবশ্যই ভেসে থাকতে হবে। একটা উপায় চাই।

উপায় স্থিরও করলেন সত্যব্রত। নিজেকে বঞ্চিত করে টাকার শোকে হা-হুতাশ না ক'রে একটি সুচতুর পন্থা বেছে নিলেন তিনি।

মূর্তিমান শোকের মত তাঁর বাইরের ঘরে বসে রইলেন সত্যব্রত।

সত্যব্রতর প্রতিষ্ঠানের পাবলিসিটির ভার ছিল বীরেন দাসের ওপর।

বীরেন দাস লোকটা এ লাইনে নতুন নয়, কিন্তু তার ছোট-খাট আয়োজনের মধ্যে দিয়েই কাজ চালিয়ে যেতে হয় তাকে। এ ক্ষেত্রে তার সুনাম হ'লেও অর্থ আসে নি। কারণ মানুষটা সত্যিই ভাল।

সত্যব্রত বেছে নিয়েছিলেন তাকে।

বই রিলিজ করবার দিন পনেরো বাদে বীরেন দাস এল তার বিলের দরুণ কিছু টাকা প্রাপ্তির আশায়।

আশার অতিরিক্ত আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা পেল সে। কিন্তু তার পরমুহূর্তেই বেজায় গম্ভীর হয়ে গেলেন সত্যব্রত।

কথাটা যেন ওঠাতেই পারছে না বীরেন দাস। ভাবগম্ভীর স্বরে সত্যব্রত ব'লে চলেছেন কিভাবে দেশের গোটা সমাজ উৎসন্নে যাচ্ছে, লঘুবিষয়ে এখনকার ছাত্রসমাজ কিভাবে আনন্দ পাবার চেষ্টা করছে, গুণীর কদর না করায় কিভাবে গুণীদের অকালমৃত্যু ঘটছে আর সব শেষে ঘুরে-ফিরে এক কথা ভাল জিনিস গ্রহণ করতে না পারার মত মূর্খতার কি পরিণতি হ'তে পারে। অবশ্যই আজ হয়ত সত্যব্রতর মত গুণীদের এ জন্য সাফার করতে হচ্ছে কিন্তু একদিন আসবে যখন...

অনেকক্ষণ শুনল বীরেন দাস।

ঘরে তার স্ত্রী অমলা আজ পাঁচ মাস ভুগছে আসবার সময় দেখে এসেছে বড় মেয়ে একা হাতে কিভাবে প্রতিবেশীর কাছ থেকে চাওয়া চাল এনে ভাতের ব্যবস্থা করে তার রুগ্না মা আর ছোট ভাইকে সামলাচ্ছে। আজ ডাক্তার না ডাকলে নয়। ছোট ছেলের অসুখটা ক্রমশ বেকাপথে যাচ্ছে। কিন্তু টাকা কোথায়?

তাই টাকার একটা সম্ভাবনার আশায় প্রায় আশ্বাস দিয়েই চলে এসেছে সে এখানে, তার প্রাপ্য টাকার কিছুটা আজ পেলেও চলে যাবে। টাকার ভারি প্রয়োজন আজ তার তাই অবশেষে মরিয়া হ'য়ে বলে উঠল—

মিঃ সেন, একটা দরকারে এসেছিলাম আপনার কাছে। আজ কিছু পেমেণ্ট আশা করেছিলাম।

স্থিরদৃষ্টিতে বীরেন দাসের দিকে তাকালেন সত্যব্রত। কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি, তাঁর এই দুঃসময়ে পেমেণ্ট?

স্বভাবতই লাজুক বীরেন দাস।

তার প্রাপ্য টাকা চেয়ে সে বুঝি অন্যায় করেছে, এমন একটি ভর্ৎসনা সত্যব্রতর চোখে দেখতে পেয়ে সে আস্তে আস্তে বলল, অন্তত শ'খানেক লাগবেই।

সত্যব্রত এখনও ওর দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে আছেন স্পষ্ট বুঝতে পারল সে। কিন্তু তবু না বললে নয় আবার রুগ্ন ছেলের মুখটা মনে পড়ল তার, মনে পড়ল অমলার কথা, মনে পড়ল মেয়েকে সে আসবার সময় আশ্বাস দিয়ে এসেছে।

হাতের কাগজটা অনাবশ্যক পাকাতে পাকাতে বলল সে—

বুঝলেন না? পাবলিসিটির জন্য আমার নিজেরও বেশ কিছু খরচ হয়েছে।

তা নতুন নতুন বিজিনেস করতে গেলে কিছু ইনভেষ্ট যে করতেই হবে।

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন সত্যব্রত।

অবশ্য আমি এ ক্ষেত্রে নতুন নয়, তবু মেনে নিচ্ছি যে ইনভে

করতেই হয় সে কথা ঠিক ; কিন্তু রিটার্নের আশাও তো আপনার মত আমিও রাখি।

আমার সঙ্গে আপনার তুলনা করবেন না বীরেনবাবু। আমার ইনভেস্টমেণ্ট কত জানেন?···যদি কিছু না মনে করেন তো তা হলে আমি বলবো, বোধ করি আপনার সারাজীবনের আয়।

তা জানি, কিন্তু আমার কাছে ঐ একশ' টাকাই যে লাখ টাকা মিঃ সেন।

হ'তে পারে, কিন্তু···

কিন্তু নয় মিঃ সেন, আমার মত গরীব লোকের পক্ষে···

বিজিনেস তো গরীব-বড়লোক শোনে না।

গম্ভীর হ'য়ে বললেন সত্যব্রত।

তা জানি, আমার তো সেটা বক্তব্যও নয়, কিন্তু আমি তো অন্য কিছু চাইছি না মিঃ সেন। এ তো দয়া নয়, এ টাকা তো আমার প্রাপ্য মিঃ সেন।

একটু যেন জোর পেয়েছে বীরেন দাস।

হ্যাঁ, প্রাপ্য তা জানি।

গম্ভীর হ'য়ে ওর দিকে তাকালেন সত্যব্রত। কিন্তু···সকলেই কি তার প্রাপ্য পায়? আমার প্রাপ্য বা সম্মান, অর্থ তা কি আমি পেয়েছি?

সে আমি·····

বীরেন দাসের কথাটা শেষ করতে দিলেন না সত্যব্রত। হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে নিজের বেদী থেকে একটু এগিয়ে এলেন।

শুনুন মিঃ দাস! মানুষের স্বভাবই এই, পদ্মের কুঁড়ি তুলে এনে ফোটান হ'ল। লোকে ফুলটাই দেখল হাতটাকে ভুলে গেল।···অবশ্য বলতে পারেন যে ফুল আপনিই ফুটত একদিন না একদিন। সে ক্ষেত্রে আমি বলব ফুটত কিন্তু তার সময়মত আর জলে থাকলে।

বুঝতে পারল না বীরেন দাস এ কথা এ প্রসঙ্গে আসছে কি ক'রে, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সে।

সত্যব্রত বক্তার আসনে যেন জোর পেয়েছেন, বলে চললেন—

বীরেনবাবু! এখানেই মজা। যে ফুল সময়মত ফুটত তাকে যে হাত সময় না নিয়ে হঠাৎ শৈশব থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ করে দিল তাকে·····

মাথা ঘুরছে বীরেন দাসের। জানে কথার এই মারপ্যাচ আজ আর শেষ হবে না। চলবে কথার মত কথার এমনি অর্থহীন বুনানি। কিন্তু তার পক্ষে বসে থাকা সম্ভব নয়। এখানে না হয় অন্য কোথাও চেষ্টা দেখতে হবে, টাকা আজ তার দরকারই। যে করে হোক টাকা তাকে পেতেই হবে।

আচ্ছা আজ উঠি। তবে আশা করছি, নেকস্ট উইকে টাকাটা পাব নিশ্চয়ই। নমস্কার।

ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে গেল বীরেন দাস।

কিন্তু অত সহজে ছাড়ল না অভিনেতা আর ছবির নায়ক নবেন্দু।

দু'-এক কথা বলবার পরই সত্যব্রত বুঝলেন, এ শক্ত জায়গা। অত সহজে কেবল কথার বুনানিতে ভোলান যাবে না একে। ফিল্ম লাইনে অভিজ্ঞ পোড়-খাওয়া ছেলে নবেন্দু। সত্যব্রতর মত না হ'লেও টাকা সেও চেনে। সুতরাং এক্ষেত্রে অন্য উপায় নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর কি?

সোজা সুচরিতার কাছে চলে এলেন সত্যব্রত শোবার ঘরে।

গতরাত্রে সিনেমা থেকে ফিরেও বেশ অনেকক্ষণ জেগে ছিল তারা। বিশেষ করে কথা কাটাকাটি করে সত্যব্রত ঘুমিয়ে পড়লেও সুচরিতার ঘুম আসে নি অনেক রাত পর্যন্ত। অসম্ভব মাথা ধরেছিল সুচরিতার, তাই বেলা অবধি বিছানায় পড়েই এপাশ-ওপাশ করছিল।

খুব ব্যস্ত হ'য়েই ঘরে ঢুকলেন সত্যব্রত।

রীতা! এখনও শুয়ে? ব্যাপার কি?

হুঁ—

কি আজ উঠবে না না কি?

হেসে আবহাওয়া লঘু করতে চাইলেন তিনি। এখন রাগারাগির সময় নয়। তাই নিজেই শেষে বশ্যতা স্বীকার করবার জন্য প্রস্তুত হ'লেন তিনি।

রীতা। ওঠ লক্ষ্মীটি, নবেন্দুবাবু এসেছেন।

তা আমি কি করবো?

গম্ভীর হয়ে বলল সুচরিতা।

ওর পাশে বসে ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে চুমু খেলেন সত্যব্রত, কিন্তু সুচরিতার কোন ভাবান্তর দেখা গেল না।

বাঃ! নবেন্দুবাবু এসেছেন দেখা করবে না?

নাঃ, আমার বড্ড মাথা ধরেছে।

ও কিছু নয় উঠে পড়।

কিছু নয় ব'ললে কি হবে? আমার মাথা ধরেছে তা ছাড়া শরীরটাও ভাল লাগছে না আমি এখন উঠে সাজ-পোষাক করতে পারব না।

ও কিছু নয়, একটু বোধ হয় হ্যাংওভার হয়েছে! কাল অতটা ড্রিঙ্ক না করলেও পারতে।

ব্যাপারটা লঘু করতে চাইলেন সত্যব্রত?

সেজন্য নয়, এমনিই শরীর খারাপ।

ওপাশ ফিরে শুয়ে প্রস্তাবটি উপেক্ষা করল সুচরিতা।

সত্যব্রত রীতিমত বিরক্ত হলেন। কতক্ষণ বসিয়ে রাখবেন নবেন্দুকে? সীমা আছে তো সব জিনিসের। একটা শক্ত কথা মুখে এসে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে বললেন—ও তোমার চোখ মুখ ধুয়ে চা খেলেই গ্লানিটুকু কেটে যাবে? তুমি এসো কিন্তু তাড়াতাড়ি, আমি চললাম, উনি একা বসে আছেন? এসো ঠিক।

বেরিয়ে গিয়ে আবার কি মনে করে ফিরে এলেন সত্যব্রত।

আচ্ছা রবীন কোথায়?

কি জানি! আমি তো বিছানা ছেড়ে উঠিই নি।

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে সুচরিতা বলল। রাত্রের একটু মনের কুয়াসা তার সত্যব্রতর আদরেই কেটে গেছে। ও ওঠবার উপক্রম করল।

এবার ওঠ লক্ষ্মীটি। আচ্ছা আমি দেখছি রবীন কোথায়। ওর ঘর তো দেখলাম না ওকে, এই সকালেই আবার ওপরে গেল নাকি?

মুচকি হাসল সুচরিতা।

তা হলে রবীনও সত্যি প্রেমে পড়ল ?

না না। হাসি নয়।

ডেস্ক থেকে সিগারেটের বিশেষ একটা টিন বার করে নিলেন সত্যব্রত।

সত্যি রবীন ভাবিয়ে তুললে।···ওর অন্য কোন দিকে ইনটারেস্ট গ্রো করলে মুস্কিল। আমার খুবই ক্ষতি। অমন একটা হ্যাণ্ড আমি পাব কোথায় ?

কিন্তু তোমার ক্ষতি হবে বলে ওর জীবনে কিছু হবে না না-কি ?

হওয়া উচিত নয়।···কিন্তু এখন থাক।···তুমি তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে এসো কিন্তু, আমি যাচ্ছি।

উচিত নয়। আবার ভ্রূ-কুঞ্চিত হল সুচরিতার।

সত্যব্রতর মতে সবকিছুই বিচার করতে হবে, প্রয়োজনের মানদণ্ডে।

আজ প্রায় তিন বছর তাদের বিয়ে হয়েছে এটুকু সে নিঃসংশয়ে জেনেছে যে, সত্যব্রতর কাছে প্রয়োজনের স্থান সব থেকে আগে। সেখানে কোন হৃদয়ধর্মের স্থান নেই। তখন তাঁর চুলচেরা বিচার। সেখানে তিনি বড় কঠিন, বড় নিষ্ঠুর।

প্রায় আধঘণ্টা লাগল সুচরিতার সাজগোজ করতে।

অবশ্য সুচরিতার পক্ষে এটাকে যথেষ্টই অল্পসময় বলতে হবে। কেন-না তার কাছে সাজ মানেই বিলাস, সাজ মানেই বিরাট একটা কিছু। অল্প সাজতে সুচরিতা জানে না। তার বহু সময় যায় শাড়ি বাছতে, মুখের এনামেল করতে আর অলঙ্কার নির্বাচনে। তা সে বাইরের ঘরেই যাওয়া হোক আর উৎসবেই হোক। প্রকাশ্যে বাইরের লোকের সামনে বেরোতে হলে তার চাই প্রচুর সাজ-পোষাকের আড়ম্বর।

বাল্যকাল থেকে সাজবার আকাঙ্ক্ষা তাকে দমন করতে হ'য়েছে দারিদ্র্যের জন্য।

তারপর যৌবনে যখন সে খোকা মিত্তিরের আশ্রয় পেল, তখন সে প্রাচুর্যে দিশাহারা হ'য়ে গেল। খোকা মিত্তিরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে অনায়াসলব্ধ অর্থে সে নিজেকে শুধু ভাসিয়ে দিতেই শিখেছে; মাত্রা টানবার কথা তার একবারও মনে আসে নি।

শুধু সাজ বলে নয় ; কেনাকাটার ব্যাপারেও সে কখনও হু'বার ভাবে নি।

দোকানে গিয়ে শুধু একবার বলা, শাড়ির পর শাড়ির স্তূপ বাক্সে বন্দী হয়েছে শুধু তারই ইচ্ছেমত। গয়নার পর গয়নায় তার গা ভ'রে উঠেছে, আর বেশি আরও বেশি, সীমাহীন প্রাচুর্যে খুশিতে আর আনন্দে ভ'রে উঠেছে সুচরিতা।

কতবার এমন হয়েছে শাড়িওয়ালার কাছে কোন শাড়ি পছন্দ করে নেবার জন্য বাইরে থেকে শাড়িওয়ালা পাঠিয়েছেন খোকা মিত্তির। পুরো গাঁটই রেখে দিয়েছে সে, সবই তার যে পছন্দ, কি করবে সুচরিতা। আর হু' হাতে টাকা ঢেলে গেছে তার পায়ে খোকা মিত্তির।

কিন্তু শেষে তাতেও বুঝি ক্লান্তি এসেছে সুচরিতার। না হলে সব ছেড়ে সে বিবাহিত জীবনের গণ্ডীর ভেতর এসে সুখী হতে চাইবে কেন ?

তার রুচির ওপর দৃষ্টির কোন ছাপ পড়ে নি। তবুও এই প্রাচুর্যের মধ্যেও তার প্রাণ বুঝি মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে উঠেছে, তার মনের অতি সংগোপনে সে বুঝি লালন করেছে একটি ভীরু আকাঙ্ক্ষার।

সে আকাঙ্ক্ষা স্ত্রী হবার, মা হবার। সেই ভীরুমন তাই সজোরে জাল কেটেছে নিজের চেষ্টায়, নিজের উদ্ধারের পথ ধরেছে, যে পথ সরল।

কিন্তু সেখানেও তার এতদিনের রুচি, তার দৃষ্টিভঙ্গী তাকে যেন আচ্ছন্ন করে দাঁড়ায়। সহজ, সরল হ'তে গিয়েও যেন সে পারে না। তার পৃথিবীটাই যেন এক ভিন্নরূপ নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়েছে। সেই পৃথিবীতেই সে ভাল করে বাঁচতে চায়।

তাই উৎসব, আনন্দ আর প্রচুর সাজগোজ করে খুশিই থাকে সুচরিতা।

নবেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে সুচরিতাকে আহ্বান জানাল।

নমস্কার।

হু'টি হাত জোড় করে বুক অবধি ঠেকিয়ে নিজস্ব এক বিশেষ কায়দায় নমস্কার করল নবেন্দু।

প্রতি নমস্কার করে নীচু সোফাটা'তে গেল সুচরিতা।

নীচু চেয়ারে বসাটাই সে পছন্দ করে। শাড়ির ভাঁজগুলি নাকি অনায়াসে এতে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়তে পারে আর মেয়েদের বেশ কমনীয় দেখায়।

সত্যব্রতর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে তিনটে বইয়ে সুচরিতা আর নবেন্দু নায়ক-নায়িকার পার্ট করেছে। দর্শকদের মতে নাকি ওদের ছিল রাজযোটক।

অবশ্যই শুধু স্ক্রীনেই নয়। ওদের মধ্যে অল্প একটু ঘনিষ্ঠতাও গড়ে উঠেছিল। একথাও বিশেষ অজানা থাকে নি কারও। কানাকানি হ'তে হতে খোকা মিত্তিরের কানেও উঠেছিল কথাটা। তাঁর ব্যাকুলতাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সুচরিতা। যেমন নবেন্দু হেসে উড়িয়েছিল প্রস্তাবটাকেই।

স্বভাবতই স্টুডিওতে বেশ একটা গম্ভীর চাল নিয়ে থাকে নবেন্দু। তাই তাকে এ নিয়ে কোন কথা বলতে কারও সাহস হয় নি, আর সুচরিতা নিজে জানে যে সত্যি সত্যি নবেন্দুর কাছে এ প্রস্তাবটার কোন মূল্যই ছিল না।

সহজ নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে সুচরিতার ভীরু মনও কোন অনিশ্চিত মায়ামৃগের পেছনে ছুটতে চায় নি। তাই সে পথ পরিত্যাগ করেছিল সুচরিতা সহজেই, খোকা মিত্তিরও নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

তা ছাড়া নবেন্দুর সঙ্গে ব্যাপারটা আরও কিছু এগোবার আর একটা বাধা ছিল সে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যত। চিত্রশিল্পে সে তখন নবাগত, তাকে আমল দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার মত হুর্বুদ্ধি সুচরিতার মনেও আসে নি।

তাই ঐ পর্যন্ত। কিন্তু একথা সুচরিতা আজও অস্বীকার করবে না যে তার নবেন্দুকে ভালই লেগেছিল আর নবেন্দুরও···

সুচরিতার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাল নবেন্দু। সে দৃষ্টিতে লজ্জিত

হ'ল সুচরিতা। আজ যেন নবেন্দু সুচরিতাকে আবার নতুন করে দেখল। আর সেকথা সে প্রকাশ করতেও দ্বিধাবোধ করল না।

আপনাকে এত নতুন লাগছে।

সুচরিতার চওড়া করে সিঁথি ভর্তি সিন্দুরের দিকে তাকিয়ে বলল নবেন্দু।

খুব বেশি ঘন করেই সিঁদুর পরে সুচরিতা। পাতিব্রত্যের জন্য নয়। ওকে ভাল দেখায় ব'লে। আপনার সঙ্গে বহুদিন বাদে দেখা, বিয়ের পর বোধ হয় এই প্রথম, না?

হ্যাঁ তাই মনে হয়।

তাই আপনার নতুন লাগছে, না হলে আমার পরিবর্তন তো নতুন নয়।

তা ঠিক, কিন্তু যাই হোক, আপনাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে এ বেশে···ভারি ভাল লাগছে।

কথাটা দু'বার বলল নবেন্দু সুচরিতার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে। মনের ভাব প্রকাশ করতে কোনদিনই দ্বিধা করে না নবেন্দু আর এখন তো নয়ই। বাংলার প্রথম সারির প্রথম নায়ক সে।

সত্যব্রতর দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামাল সুচরিতা। একজন মুগ্ধ যুবকের চোখেমুখে এই প্রশংসাতে বেশ খুশিই হ'ল সে। কিন্তু সত্যব্রত? নবেন্দুর এই উচ্ছ্বাসকে উনি ঠিকমত নেবেন তো? একটু নীচু গলায় যেন অনেকক্ষণ পরে বলল, ধন্যবাদ।

কিন্তু সত্যব্রত এ সব কিছুই লক্ষ্য করলেন না। তিনি কথাটা পাড়বার সুযোগ খুঁজছিলেন, তাই প্রথম কথার পরই সময় নষ্ট না ক'রেই তিনি বললেন,—শোন! রীতা! নবেন্দুবাবু তো অন্তত হাজারখানেক টাকা ইমিডিয়েটলি চাইছেন, কি করি বল তো?

রীতিমত ঘামতে লাগল সুচরিতা। রাগও তার হল প্রচুর। নবেন্দুর সামনে ঘরোয়া সম্বোধন না করলেই কি চলছিল না? তার ওপর সত্যব্রতর এ খেলা নতুন।

পাওনাদারকে সামনে বসিয়ে একেবারে সোজাসুজি তাকে দিয়ে বলিয়ে নেওয়ার এ পন্থা সত্যব্রতর নতুন চাল। অথচ ব্যবসার আয় ব্যয় প্রকৃতপক্ষে সুচরিতা কিছুই জানে না।

কি টাকা পাবেন নবেন্দুবাবু। মাত্র হাজার টাকার জন্য নিজে এসেছেন? কেন টাকা কি তাঁকে দেওয়া হয় নি পুরো? তবে?

অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় ক'রে এল সুচরিতার মনে। সে কি বলবে? কি করতে পারে সে? কিছুই তো জানে না সে। প্রয়োজন ছাড়া তাকে তো কোন কথাই জানান না সত্যব্রত। সে-ও মাথা ঘামাতে চায় না। তবে? আজ হঠাৎ নবেন্দুবাবুর সামনে তাকে এ প্রশ্ন করার অর্থ কি?

ওকে নীরব দেখে সত্যব্রত যেন ব্যাপারটা আঁচ করে নিলেন। সুচরিতার চোখের বিস্ময় তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই তিনি নিজে থেকেই তাড়াতাড়ি বললেন,—

মানে ওঁর পাওনা পনের হাজারের সাত হাজার দেওয়া আছে, বাকিটা···অবশ্য আমি লজ্জিত। কিন্তু কি যে করি নবেন্দুবাবু··· আমার যে সংকট চলেছে তাতে···আমি সত্যিই লজ্জিত।

না না লজ্জা পাবার কি আছে? লজ্জিত হবার কোন কারণই নেই।

একটা সিগারেট ধরাল নবেন্দু। তারপর বেশ গা ছড়িয়ে বসে ধোঁয়ার রিং ছাড়তে লাগল।

আশান্বিত হলেন সত্যব্রত।

সে আমি জানি নবেন্দুবাবু। আপনি সত্যিই মহৎ ব্যক্তি।

না ঠিক ততটা নয় মিঃ সেন, যতটা আপনি ভাবছেন।

কি যে বলেন।

বিনয়ে গলে গেলেন সত্যব্রত। আর ওঁর প্রায় কাছেই ধোঁয়া ছেড়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে নবেন্দু ওঁর জিজ্ঞাসুদৃষ্টির সামনে বলল: বুঝতে পারলেন না আমার কথাটা।

কি কথা?

সত্যব্রতর মত লোকও যেন বোকা হয়ে গেলেন।

একটু হেসে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল নবেন্দু। তারপর একবার সুচরিতার দিকে তাকিয়ে নিয়ে সোজা গলায় বলল টাকা আমার আজ চাইই। তাই বলছিলাম অনর্থক নিজেকে লজ্জিত করবেন কেন?

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালেন সত্যব্রত। মাটি সত্যিই শক্ত। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে কেন? হাতের টাকা বেরিয়ে গেলে কয়েকটি রেখা ছাড়া আর রইল কি?

তাই ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে সুচরিতাকেই যেন বললেন।

সত্যি রীতা, নবেন্দুবাবুর পরিহাসজ্ঞান বেশ সূক্ষ্ম। না!

সজোরে কথাটা বলে টান টান হয়ে বসলেন সত্যব্রত।

পরিহাস আমি করছি না সত্যব্রতবাবু। আমার সময় কম। চেকটা একটু তাড়াতাড়িই দেবেন। ক্যাশ দিতে বোধ হয় অসুবিধে হবে।

নবেন্দুবাবু!

এইবার সত্যব্রত প্রযোজকের গাম্ভীর্য মুখে এনে নিজের ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করলেন যেন।

আপনি জানেন এই বইটা আমার টাকা দিতে পারে নি। সুতরাং আমার এই হিউজ এস্টাব্লিশমেন্ট মিটিয়ে আপনার টাকা দিই কোথা থেকে?

দ্যাটস্ নট মাই লুক্ আউট।

সজোরে বলল নবেন্দু।

আপনার টাকা বেশি আসলে কি আমায় বেশি করে দিতেন?

মুখ শক্ত করে বসে থাকলেন সত্যব্রত। নবেন্দুই আবার বলল,—জানি দিতেন না···কথা ছিল বই রিলিজ করলে বাকি টাকাটা পাব। যদিও চুক্তি অনুযায়ী আরও বহু আগে—ফার্স্ট লাস্ট স্যুটিং ডে আমার বাকি টাকা আমি ক্লেম করতে পারতাম। কিন্তু করি নি···কেন তা আপনি জানেন।

জানি কিন্তু······

ধীরে ধীরে বললেন সত্যব্রত।

জানেন তো বটেই, আপনারই ব্যক্তিগত অনুরোধ, আর আপনার প্রথম প্রযোজনা, তাই আমি কোন জোর করি নি, বোধ হয় আমার দিক থেকে কোন অভদ্রতাও প্রকাশ পায় নি। কিন্তু আজ তিন মাসের ওপর বই রিলিজ করেছে, আপনি কি টাকা দিয়েছেন?··দেন নি।

কোন উত্তর না দিয়ে হাত দু'টো মুঠো করে হাতের দিকেই তাকিয়ে বসে রইলেন সত্যব্রত।

আমিও অবশ্য চাই নি, সেটা আমার ভদ্রতা। কিন্তু আর নয় মিঃ সেন, ইটস্ হাই টাইম।

আমি তা জানি।

এতক্ষণে কথা বললেন সত্যব্রত। কিন্তু একটা কথা কি ভেবে দেখেছেন নবেন্দুবাবু?

কি কথা বলুন!

জানেন কি? আমার খুচরো খরচই দিন পাঁচশ' টাকা।

তাতে কিছু আসে যায় না। আমার দৈনন্দিন খরচ তার দ্বিগুণ হ'তে পারে। তার জন্য অন্য লোকে তার প্রাপ্য ছেড়ে দেবে?

দারুণ অস্বস্তিতে রীতিমত ঘামতে লাগল সুচরিতা।

ওর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সত্যব্রত আবার বললেন গম্ভীর হয়ে।

শুনুন, নবেন্দুবাবু। সকলে কি তার প্রাপ্য পায়? আমি কি আমার প্রাপ্য যথার্থ সম্মান বা অর্থ কিছু পেয়েছি? আমি···

বাধা দিল নবেন্দু।

সম্মান কি পেয়েছেন জানি না, কিন্তু অর্থ পেয়েছেন আপনার প্রাপ্যেরও অনেক বেশি।···অবশ্যই নানা খাতে।

সুচরিতার দিকে একবার তাকাল নবেন্দু। আমি যাই।

সুচরিতা উঠে দাঁড়াল।

তার ফর্সা মুখটা টুকটুক্ করছে, মুখটা ফেটে যাবে মনে হচ্ছে।

উঠছেন নাকি?

নবেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সেও যে বেশ উত্তেজিত হয়েছে, তার টক্‌টকে মুখ দেখলে বেশ বোঝা যায়।

মাপ করবেন মিসেস সেন, আমি সত্যিই লজ্জিত। আপনার সামনে কোনরকম রূঢ়তা প্রকাশ করা আমার অভিপ্রেত ছিল না।

আমি জানি।

দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা শক্ত করে চেপে তার লোটান আঁচলটা টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুচরিতা।

নবেন্দুও যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বলল, শুনুন সত্যব্রতবাবু! বিকেলবেলা আমার ড্রাইভারকে পাঠাব। চেক্‌টা ওর হাতে কাইগুলি দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ ওর হাতেই রিসিট পাঠাব।···নমস্কার।

নবেন্দুর গাড়ির স্টার্টের শব্দ শোনা পর্যন্ত পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন সত্যব্রত।

তারপর হঠাৎ তাঁর মুঠি পাকান ডানহাতটা নিজের অজ্ঞাতেই কেমন আলগা হয়ে গেল।

সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলেন সত্যব্রত।

ঘরের মৃদু নীল আলোতে দেখতে পেলেন সুচরিতা চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে রয়েছে। কি হ'ল রীতা? ঘুমোও নি এখনও?

কোন উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরে শুল সুচরিতা। ওর পাশে বসে ওর হাতটা নিয়ে তাতে আলগা চুমু খেলেন সত্যব্রত।

শোন, সারাদিন বাড়িতে ছিলাম না ব'লে রাগ করেছ বুঝি?

রাগ কেন?

হাতটা টেনে নিয়ে অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিল সুচরিতা।

তা হলে রাগ কর নি তো! আমার···

তোমার কাজ থাকতে পারে তো।

হ্যাঁ, কাজই ছিল রীতা। তাই খাওয়াটাও বাইরেই সেরে নিলাম

খেয়ে এসেছ?

হ্যাঁ।

তা হলে ওদের বলে দিতে হবে। উঠে পড়ল সুচরিতা।

কাদের?

বাঃ, হরিপদরা এখনও বসে আছে তো?

কেন, তুমি খেয়ে নাও নি?

কোন্‌দিন খাই?

তা খাও না! তবে আজ যখন এত রাত হল···

হাত গুণতে তো জানি না, কি ক'রে জানব বল।

না রীতা, বলছ রাগ কর নি কিন্তু সত্যিই রাগ করেছ।

না!···

বেরিয়ে গেল সুচরিতা।

একটু পরেই সুচরিতার খাবার দিয়ে গেল হরিপদ। সুচরিতা হাত ধুয়ে এসে খেতে বসল আর এই সহজ, নিস্পৃহ ভাব দেখে অবাক না হয়ে পারলেন না সত্যব্রত।

রীতা। বিরাট একটা সুখবর।

কি?

গোপাল বাজোরিয়াকে এবার টানতে পেরেছি! আমার নেক্সট প্রডাকসানের অর্ধেকের বেশি টাকা দেবে ও। আর সমস্তটাই ইন এ্যাডভান্স।

বিস্মিত হয়ে তাকাল সুচরিতা।

উৎসাহে আর আনন্দে সত্যব্রতর চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করছে।

ভাব তো কি ক'রে এটা সম্ভব হল?

ঠিক পাবে টাকাটা?

একটু আশান্বিত হ'ল সুচরিতা।

নিশ্চয়ই!

জোরের সঙ্গে বললে সত্যব্রত। তা হলে তো ধারের টাকাগুলো সব শোধ করে দেওয়া যাবে।

ধার শোধ?

সজোরে হেসে উঠলেন সত্যব্রত। সেই আশায় আছ নাকি তুমি?

কেন?

সত্যিই অবাক হ'ল সুচরিতা। তুমি কি ভাব কস্মিনকালেও এদের ফুল পেমেন্ট করব নাকি আমি? পাগল?

তা হলে?

কি তা হলে? দিনের পর দিন এই সব অপমান সহ্য করবে?

কিসের অপমান?

বাঃ, অপমান নয়? আমি তো ভাবতেও পারি না।

খাওয়া বন্ধ করে বলল সুচরিতা।

খাও খাও! আরে তুমি বড় বেশি সেন্টিমেন্টাল।

কিসে?

ক্ষেত্রের পরিধি বিস্তারের সেদিন হইতে সূত্রপাত। কর্মের পটভূমি সেদিন হইতে জগদ্ব্যাপী। তাঁহার ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা সেদিন হইতে 'বিশ্বময় দিয়েছ তাহা ছড়ায়ে।' জওহরলালের মধ্যে নতুন ভারতের প্রতিচ্ছবি সেদিন বিশ্ববাসীর সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইল। নেহরুজীর আলোয় স্বাধীন ভারতের স্বরূপ জগতবাসীর সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিল। তাঁহার জ্ঞানের প্রগাঢ়তা ও চিন্তাধারার সজীবতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর বলিষ্ঠতা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শে নবভারত গঠনে শক্তি ও উদ্দীপনা জোগাইয়াছে। এক পরিশীলিত মন ও মার্জিত রুচি এবং মানুষের কল্যাণব্রতকে মূলধন করিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার দুর্বার জয়যাত্রার সূচনা যাহার পরিণতি যেমনই গৌরবোজ্জ্বল তেমনই সার্থকতায় ভরপুর। নেহরু উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও মৈত্রী ছাড়া আজিকার পৃথিবীর বাঁচিবার দ্বিতীয় পথ নাই। সেই নীতিই তিনি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি সেই নীতি অনুসারে পরিকল্পিত।

মৃত্যুর পর জন্ম হয় কি হয় না বিষয়টি আজো বিতর্কসাপেক্ষ। কিন্তু, জন্মের পর যে মৃত্যু হইবেই অনিত্য এই মানবজীবনে ইহা অপেক্ষা সত্য আর কিছুই নাই। মৃত্যু জীবনের হিসাবনিকাশের চরম নিষ্পত্তি, জীবনের ধ্রুব পরিণতি, ইহাকে অস্বীকার করার কোন উপায়ই নাই। তথাপি মৃত্যু আমাদের মধ্যে বেদনার মূর্তিতেই কখনো কখনো দেখা দেয় যখন তাহার আগমন আমাদের নিকট হইতে কোন অতি অপরিহার্যকে চিরতরে বহুদূরে সরাইয়া লয়। যে সময় নেহরুজীর নেতৃত্ব, রাষ্ট্র পরিচালনা, মানব জাতির কল্যাণার্থে বিশ্বে শান্তিস্থাপনার প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক, নিষ্ঠুর নিয়তি ঠিক সেই সময়েই তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে সরাইয়া লইল। তাঁহার গৌরবে সমুজ্জ্বল আদর্শ জীবনের ঘটনাবহুল বিচিত্র নাট্যে যবনিকাপাত ঘটাইয়া একটি যুগের অবসান ঘোষণা করিল। সমাপ্তি ঘটিল ভারত-ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের। নেহরুজী নাই, এ বেদনা দুঃসহ কিন্তু শোক-কবলিত হইলে আমরা মহৎ কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা প্রদর্শন করিব।

মহাকালের দরবারে তজ্জনিত বিরাট অপরাধে আমাদের অপরাধী হইতে হইবে। নেহরুজী রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার আদর্শ, ভাবধারা, পরিকল্পনার সন্ধান দিয়া গিয়াছেন নূতন পথের। শক্তি, সাহস ও প্রেরণা দেশবাসী তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছে অফুরন্ত। আর তাঁহার উত্তরাধিকার কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়। সেই বিরাট শক্তিপুঞ্জের উত্তরাধিকারী চুয়াল্লিশ কোটি নরনারী, মাথার উপর যাহাদের হিমালয় দণ্ডায়মান, পদপ্রান্তে যাহাদের কন্যাকুমারিকা বিরাজিতা। তাঁহার স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তোলা, তাঁহার আরব্ধ কার্যকে সম্পূর্ণতায় উপনীত করা, তাঁহার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদানই আমাদের আজ এক পরম পবিত্র কর্তব্য এবং তাহাই লোকান্তরিত দেশনায়কের উদ্দেশে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন। ইহা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। উচ্ছ্বাসের বশীভূত হইয়া নিছক ভাষার সাহায্যে তাঁহার সম্বন্ধে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া দিনের পর দিন অতিক্রান্ত করা যথার্থ নেহরুবন্দনা নয়। প্রকারান্তরে তাহা জাতীয় কর্তব্যে চরম অবহেলা হিসাবেই গণনীয়। আমরা লক্ষ্য করিতেছি নেহরুপ্রয়াণে বিশ্বজোড়া শোকের মিছিলে কোন কোন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করিয়া তাঁহার বা তাঁহাদের নামের সহিত নিজেদের নাম জড়িত করিয়া অতি নিন্দনীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন বা দিতেছেন। সম্মুখে এখন আমাদের বিরাট কর্তব্য, তাঁহার স্বপ্নের, সোনার, সাধনার ভারতভূমির যে মর্যাদা তিনি বহুগুণ বিবর্ধিত করিয়া গিয়াছেন তাহা অটুট রাখার দায়িত্ব সর্বাগ্রে এবং বিশেষ নিষ্ঠার সহিতই পালনীয়, তাঁহার পতাকা সগৌরবে উড্ডীয়মান রাখার কর্তব্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইলে চলিবে না। তাঁহার বিরাটত্ব আমাদের অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখাইবে, দেখাইবে পথ, সরবরাহ করিবে শক্তি, সাহস, প্রেরণা। আমরা মনে করি, আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহার মত বিরাট চরিত্রের মৃত্যু হয় না, কায়াগতভাবে না হইলেও তাঁহার কর্মের মধ্যে, আদর্শের মধ্যে তিনি জীবিত। সেই আদর্শের মধ্যেই নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে—'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ।'

'নিত্য তোমারে চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি' বলিয়া তাঁহার সাধনার উদ্দেশে শ্রদ্ধা, ব্যক্তিত্বের উদ্দেশে প্রণিপাত, জীবনের উদ্দেশে বন্দনা জানাইতেছি।

ভারত সরকার প্রকাশিত নেহরু স্মারক ডাকটিকিট

স্বাগত লালবাহাদুর !!

শ্রীঅতুল্য ঘোষ

১৯৬৪ সালের ৯ই জুন সারা ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষভাবে স্মরণীয় দিন। যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনই তাৎপর্য সমন্বিত। ভারতের ভাবীকালের ইতিহাস পরম সমাদরে চিরকালের ভিত্তিতে এই দিনটিকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিবে।

আধুনিক ভারতের রূপকার, মহিমার জন্মভূমি এশিয়ার এই তীর্থক্ষেত্র ভারতের প্রাণস্বরূপ মহানায়ক জওহরলাল নেহরুর আকস্মিক তিরোধানের পর সারা বিশ্বে কেবল একটি জিজ্ঞাসাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। বিশ্বের ঘরে-ঘরে, নগরে, প্রান্তরে, গ্রামে-গ্রামে, কোটি-কোটি মানুষের মুখে সেই একই জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি—নেহরুর পর কে? After Nehru Who? জগতের রাষ্ট্রনায়ক হইতে সাধারণ মানুষ কেহই এ চিন্তা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন নাই।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

নেহরুর আর এক নাম ব্যক্তিত্ব, নেহরুর নামটি উচ্চারিত হওয়া মাত্রই এক দুর্বার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি নির্দেশিত হয়। একক নায়কত্বও যে কতখানি শক্তিমান, তাহার প্রভাব যে অনতিক্রম্য জওহরলাল নেহরু তাহার এক জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত। ভারতের রাজনৈতিক গগনে এ যুগে জওহরলাল ছিলেন রশ্মিমান দিবাকর। তাঁহার শূন্যস্থানে অন্য কাহাকেও চিন্তা করা তাঁহার জীবদ্দশায় যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু, আমাদের পূর্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি, এ ভারতবর্ষ জওহরলালের, তাঁহার আকস্মিক প্রয়াণের তিন ঘণ্টার মধ্যেই গভীর শোকের বেদনাহত মুহূর্তে ভারতরাষ্ট্র তাহার অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিয়া লইল। অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হইলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ। এক সপ্তাহের মধ্যে নেহরুর ভারত বিশ্ববাসীকে দেখাইয়া দিল যে এই বেদনার কৃষ্ণঘন মুহূর্তের গভীর শোকের ত্রিযাম রজনীতেও ভারতরাষ্ট্র তাহার নবনায়ক নির্বাচন করিয়া এক মহৎ রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পরম গৌরব সহকারে পালন করিয়া লোকান্তরিত আচার্য, গুরু, নেতার সম্মান ও মর্যাদা সসম্মানে রক্ষা করিল।

নূতন নায়কের ভূমিকায় এবার ভারতরাষ্ট্রের রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী। নেহরুজীর মন্ত্রশিষ্য, দীর্ঘ দিনের সহচর, পরম বিশ্বস্ত অনুগামী লালবাহাদুরকে সারা দেশের সহিত আমরাও স্বাগত জানাইতেছি। নেহরুজীর পুণ্য-স্মৃতি বিজড়িত আসনে অভিষিক্ত শাস্ত্রীজীকে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন নিবেদন করি।

ভারতের এ যুগে ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণে এক বিবর্তন মুহূর্তে লালবাহাদুরের আবির্ভাব। একদিকে চীন, পাকিস্তান অন্যদিকে কাশ্মীর তাহা ছাড়া আভ্যন্তরীণ সহস্র সমস্যা, এই সমস্যার কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করার নেতৃত্বও লালবাহাদুরকেই লইতে হইবে, এই পথ অতিক্রম করিয়া সার্থকতার, সফলতার, সর্বপ্রাপ্তির জগতের সন্ধান ভারতের কোটি কোটি নরনারীকে তাঁহাকেই দিতে হইবে। বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত ভারতবাসীর প্রাণে সাহস শৌর্য বীর্য জোগাইবার ভারও তাঁহার। ত্রস্ত, চকিত ভারতের নরনারীকে সাহসে, প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবার পুণ্য ব্রত আজ তাঁহারই, শত শত ক্ষুধার্ত ভারতীয়ের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলিয়া দিতে তাঁহাকেই আগাইয়া আসিতে হইবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেহরুজী ভারতের যে গৌরব বিবর্ধিত করিয়া গিয়াছেন বিশেষত বিশ্বরাজনীতির দরবারে ভারতকে পুরোভাগের একটি মুখ্য আসনে তিনি অধিষ্ঠিত

শ্রীঅশোককুমার সেন

শ্রীহুমায়ুন কবীর

করিয়া গিয়াছেন যাহার ফলে সারা জগতে ভারতচেতনা আজ এত ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর এবং উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর। সেই বিশ্বব্যাপী ভারত চেতনা যাহাতে বিন্দুমাত্র ম্লান না হয় সেদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখার গুরুদায়িত্বও শাস্ত্রীজীর।

রাজনীতির ক্ষেত্রে শাস্ত্রীজী নবাগত নন। যাট বৎসর বয়স্ক এই নূতন প্রধানমন্ত্রী কৈশোর হইতেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত জড়িত। ভারতমাতার মুক্তিকামনায় যে গণনাতীত ভারতসন্তান আপন সুখ, স্বার্থ, নিশ্চিত ভবিষ্যত বিসর্জন দিয়া মুক্তিমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যাঁহাদের আত্মত্যাগে ভারতের সোনার অঙ্গ বিদেশীর শাসনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছিল শ্রীশাস্ত্রীও তাঁহাদের অন্যতম। দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেসকে তিনি নানাভাবে সেবা করিয়া আসিয়াছেন। উত্তর প্রদেশের মন্ত্রিসভার এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্যরূপে তিনি যে কৃতিত্ব, নিষ্ঠা, আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাও অবিদিত নয়।

নেহরুর নায়কত্বে কংগ্রেসের শেষ স্মরণীয় কীর্তি ভুবনেশ্বরে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের শপথ গ্রহণ। এই শপথকে কার্যকর করার দায়িত্বও বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই। আমরা আশা করি, জনগণের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগ মোচনে শাস্ত্রী-সরকার অধিকতর যত্নবান হইবেন, দেশের খাদ্যসমস্যা, বেকার সমস্যা দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করিবেন, ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক এবং পররাষ্ট্রনীতি আরও বলিষ্ঠ এবং সংযত করিবেন। সর্বোপরি কাশ্মীর এবং চীন, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে যথোচিত সাফল্য প্রদর্শন করিবেন। নেহরুজী ভারতের সর্ববিধ উন্নয়নের জন্য যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইগুলি শাস্ত্রীজীর দ্বারা বাস্তবে পরিণত হউক ইহাই আজিকার ভারতবাসীর সনির্বন্ধ কামনা।

শাস্ত্রীজীর মন্ত্রিসভায় যোগদান করিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতের রাজনৈতিক জগতের তিনি একটি উজ্জ্বল তারকা। উত্তরোত্তর তাঁহার কর্মকৃতিত্ব দেশের আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাক এবং পিতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া তিনি প্রভূত স্বকীয়তার পরিচয় দিন ইহা সারা দেশবাসীর কাম্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই নবগঠিত মন্ত্রিসভায়—নেহরু মন্ত্রিসভার দুইজন বাঙালী সদস্য সসম্মানে স্বপদে বহাল রহিলেন। এই দুইজন—আইন ও যোগাযোগ-মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন এবং পেট্রোলিয়াম ও রসায়নমন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দেও স্বপদে বহাল রহিলেন। মন্ত্রিসভায় কিছু রদবদল হইলেও বাঙালী মন্ত্রীদের দপ্তরে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। ইহা যুগপৎ আশার ও আনন্দের বার্তাবহ। ইহাতে তাঁহাদের অসাধারণ কর্মশক্তি, দক্ষতা এবং কর্তব্যানুগত্য যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে এবং বাঙালী মন্ত্রীরা যে কতখানি নির্ভরযোগ্য এবং অপরিহার্য তাহাও প্রমাণিত হইল। নেহরুজীর প্রয়াণের পর নবনায়কের নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব সুচারুরূপে যাঁহারা অতি অল্পদিনের মধ্যে পালন করিলেন বাঙালী জননায়ক অতুল্য ঘোষের নাম এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখনীয়। বিশ্ববরেণ্য দেশনায়কের আকস্মিক তিরোধানজনিত বিরাট শূন্যতা এবং সুগভীর বেদনার সমুদ্রে ভাসমান ভারতে রাষ্ট্রীয় কর্ণধার নির্বাচনে শ্রীঘোষ যে অভাবনীয় দৃঢ়তা, বলিষ্ঠ মনোভাব, সুচিন্তিত বুদ্ধি, অপরিসীম দক্ষতা এবং বিশেষত সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন এই অল্পদিনে এত বড় একটি বিরাট সমস্যার এত সহজভাবে সমাধান করিয়া তাহা তাঁহাকে আজ সর্বভারতীয় সমাজের যে আস্থা এবং বিশ্বাস আনিয়া দিল তাহা তুলনারহিত বলিলেই চলে। তাঁহার কর্মক্ষমতা আজ শুধু বাঙলার মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ নয়। সমগ্র ভারতজোড়া পটভূমির উপর তাঁহার কর্মক্ষেত্র সগৌরবে সুবিস্তৃত। এই সাফল্যের জন্য আমরা তাঁহাকেও আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। ২৭এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

॥ শোক-সংবাদ ॥

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ৮২বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। বিক্রমপুরের বিখ্যাত সন্তানদের ইনি অন্যতম। দুইখণ্ডে বিক্রমপুরের ইতিহাস রচনা করে ইনি সুধীসমাজে সমাদর লাভ করেন। বঙ্গের মহিলা কবি, সাধক রামপ্রসাদ, ভারত মহিলা প্রমুখ কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং তথ্যবহুল গ্রন্থ তাঁহাকে গবেষক জগতের একটি বিরাট আসনে সমাসীন করিয়াছে। দশখণ্ডে বিখ্যাত শিশুবিশ্বকোষ শিশুভারতী তাঁর কৃতিত্বের আর একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'গিরীশ লেকচারার'-এর সম্মানে সম্মানিত করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রবিবাসর প্রমুখ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

হিমাংশু রায়

খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ হিমাংশু রায় গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মাত্র ৫৩ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। কার্ডিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ও সভাপতির আসনে ইনি দীর্ঘকাল সমাসীন ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের (পশ্চিমবঙ্গ শাখার) সভাপতির আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীতুষারকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

পাঠক পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা-সমালোচনা

লেখিকার জবাব

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, ১৩৭০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মৌলীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমার লেখা 'ক্ষণস্মৃতি'তে ১৩৬৯ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'সন্ন্যাসিনী সংজ্ঞা দেবী' আখ্যাযুক্ত স্মৃতিকথায় দু'টি ভুল ধরিয়াছেন। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় ও অধিকাংশ সময় কলিকাতার বাহিরে থাকাতে এই চিঠিখানা এতদিন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত। প্রথম কথা—আমি শ্রদ্ধেয়া সংজ্ঞা দেবীর মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। (১) শ্রীযুক্তা সংজ্ঞা দেবীর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম 'স্বরূপানন্দ পর্বত' সম্বন্ধে আমি নিজেই কৌতূহলী হইয়া 'পর্বত' কথাটির অর্থ জানিতে চাওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের 'গিরি' প্রভৃতি নানা প্রকার সম্প্রদায় জ্ঞাপক পদবী থাকে,...পর্বতও সেই প্রকার একটি পদবী। (২) আমি শ্রীযুক্তা সংজ্ঞা দেবীর মুখে শুনি নানা সদ্গুণে বিভূষিত ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে মহর্ষিদেব পুত্রস্নেহে নিজের নিকটে রাখেন এবং পরে তাঁরই মনোনীত ঠাকুরবংশের একটি কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেন এবং নিজের জমিদারী সেরেস্তায় কাজ দেন। শ্রদ্ধেয় মৌলীনাথ মহাশয় লিখিয়াছেন—মহর্ষিদেব তাঁহাকে ধর্মপ্রচার করিতে ডাকেন,—তিনি কখনও জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করেন নাই। এ বিষয়ে হয়ত তাঁহার কথাই ঠিক, কারণ তিনি তাঁহার পুত্র—আর আমার শোনা কথা। আমি নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে যদি তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভের সঞ্চার করিয়া থাকি, তবে তাহার জন্য নিতান্তই দুঃখিত। ইতি—বিনীতা—অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা—২৯।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, 'চাংক্রন' শিরোনামায় 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত প্রখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী সত্যিই সুখপাঠ্য। এইসব কৃতীপুরুষ ও মহিলা সম্বন্ধে জানবার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও অন্য কোথাও সে সুযোগ মেলে না। একমাত্র আপনার পত্রিকা মারফৎ সে ইচ্ছাপূরণ হয়। আপনার এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে 'ক্ষণস্মৃতি'র লেখিকা অমিয়া দেবীও আমাদের ধন্যবাদার্হ। তাঁর লেখার মাধ্যমে অধুনাবিস্মৃত অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনের টুকিটাকি ঘটনার কথা জানতে পারি। কিন্তু কৌতূহলের বোধ হয় সীমা নেই। তাই আরো অনেক নাম মনের দরজায় এসে ভিড় করে। হয় তো আপনাদের তালিকায় তাঁদের নাম আছে; কিংবা হয় তো নেই—এই মনে করেই আপাতত কয়েকজনের নাম নীচে জানালাম—

1. S. K. Banerjee, Chief of Protocal.
2. P. C. Bhattacharya, Governor, Reserve Bank of India.
3. G. C. Chatterjee, Chairman, All-India Secondary Education.
4. Ela Reid (বাঙালী মহিলা), Director of Publicity, ISCON.
5. Air Vice-Marshal Ranjan Dutt, I. A. F.
6. B. Banerjee, I. G. of police, Delhi.
7. R. N. Banerjee, I. C. S. (Ex-Chairman U. P. S. C.)
8. B. N. Chakravarti, I. C. S.
9. B. R. Sen, I. C. S.
10. Dr. U. Bhattacharya, Chief Metallurgist, T. I. S. C. O.
11. A. Banerjee, Administrative Director (?), Ashok Leyland Ltd, Bombay.
12. Soami Nath Banerjee. Well-known Indus-trialist, Delhi.

এঁরা সকলেই কৃতবিদ্য, উচ্চপদস্থ এবং সর্বোপরি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবাসী বাঙালী। আপনাদের সুযোগ এবং সুবিধামত এঁদের জীবনী প্রকাশ করলে বিশেষ বাধিত হব। নমস্কার জানবেন।

—জনৈক পাঠক

মহাশয়, চৈত্র (১৩৭০) সংখ্যা মাসিক বসুমতীর সঙ্গে পাঠানো কার্ড পড়ে জানলুম যে, নতুন গ্রাহকেরা ১৮টি সংখ্যার জন্য ২০৲ টাকা দিবে। অথচ আমরা যারা পুরাতন গ্রাহক তাদের উক্ত ১৮টি সংখ্যার জন্য ২২।।০ টাকা (বাৎসরিক ১৫৲+ষাণ্মাসিক ৭।।০) দিতে হবে। অতএব এই ব্যবস্থানুযায়ী পুরাতন গ্রাহকেরা নতুন গ্রাহকদের তুলনায় আপনাদের বিশেষ কনসেশনের সুযোগ পাচ্ছে না। আশা করি, এমতাবস্থায় আমাদের মত পুরাতন গ্রাহকদেরও আপনারা কনসেশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না। রিপ্লাই কার্ড পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করে আপনাদের সিদ্ধান্ত পত্রপাঠ জানাবেন। আপনাদের উত্তরানুযায়ী আগামী বৎসরের মাসিক বসুমতীর জন্য ব্যবস্থা করব। ধন্যবাদান্তে—বিভা ভট্টাচার্য। গ্রাহিকা নং এম ৫৩০১২। নিউ দিল্লী।

বেচতে চাই

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

নিম্নলিখিত মাসিক বসুমতীগুলি প্রতিবৎসরেরটি একত্রে বৈনাদামে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। ক্রেতাগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করিতে পারেন।

১৩৬০ সন বৈশাখ থেকে চৈত্র (১২টি)

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

ভিক্স্ এর কাশি নিবারণী নতুন আবিষ্কার

প্রবল কাশি থামায়

কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে—যেখানে কাশির সূত্রপাত সেখানে এর কাজ
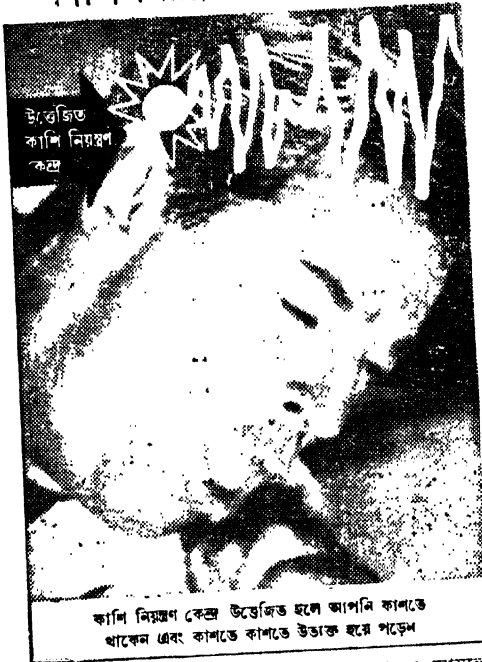
কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র উত্তেজিত হলে আপনি কাশতে থাকেন এবং কাশতে কাশতে উত্যক্ত হয়ে পড়েন

ভিক্স্ ফর্মূলা 44 আপনার কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র প্রশমিত করে: কাশি থেমে যায় ও আপনি আরামে ঘুমাতে পারেন

কাশি ঠিক আপনার গলায় নয়। ডাক্তাররা জানেন আসলে কাশির সূত্রপাত হয় আপনার কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে। গলার প্রদাহ এবং শ্বাসনালীর শ্লেষ্মা আপনার কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র উত্তেজিত করে ও আপনি কাশতে শুরু করেন ও কাশতে কাশতে উত্যক্ত হয়ে পড়েন।

ভিক্স্ ফর্মূলা 44 এর মধ্যে নতুন অনন্যসাধারণ "কাশি নিবারক" আপনার উত্তেজিত কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র প্রশমিত করে এবং কাশি থেমে যায়। প্রবল ও যন্ত্রণাকর কাশির হাত থেকে রেহাই পেয়ে আপনি সারারাত শান্তিতে কাটাতে পারেন।

আর ঐ সময়ের মধ্যেই ভিক্স্ ফর্মূলা 44 এর বিজ্ঞানসম্মত সংমিশ্রিত শক্তিশালী ঔষধগুলি দেহের প্রধান তিনটি অংশে কাজ করে যাতে আপনি প্রবল কাশির হাত থেকে সম্পূর্ণ আরাম পান।

* আপনার বুকের মধ্যে কাজ করে
ভিক্স্ ফর্মূলা 44 এর বিশেষ উপাদানগুলি শ্বাসনালীর গভীরে কাজ করে এবং বুকের জমাট শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে দেয়।

* আপনার গলার মধ্যে কাজ করে
ভিক্স ফর্মূলা 44 কাশিতে খসখসে গলার খাঁজগুলিতে দ্রুত আরাম আনে—গলার প্রদাহ অবিলম্বে থামায়।

* আপনার নাকের মধ্যে কাজ করে
ভিক্স্ ফর্মূলা 44 সর্দিতে বন্ধ নাক খুলে দেয় এবং আপনার শ্বাসপ্রশ্বাস আবার সহজ করে তোলে—সারারাত ভালোভাবে ঘুমাবার পক্ষে আপনি বেশ আরাম বোধ করেন।

ভিক্স্ ফর্মূলা 44

কাফ মিকশ্চার যেখানে কাশির সূত্রপাত সেখানে কাজ করে
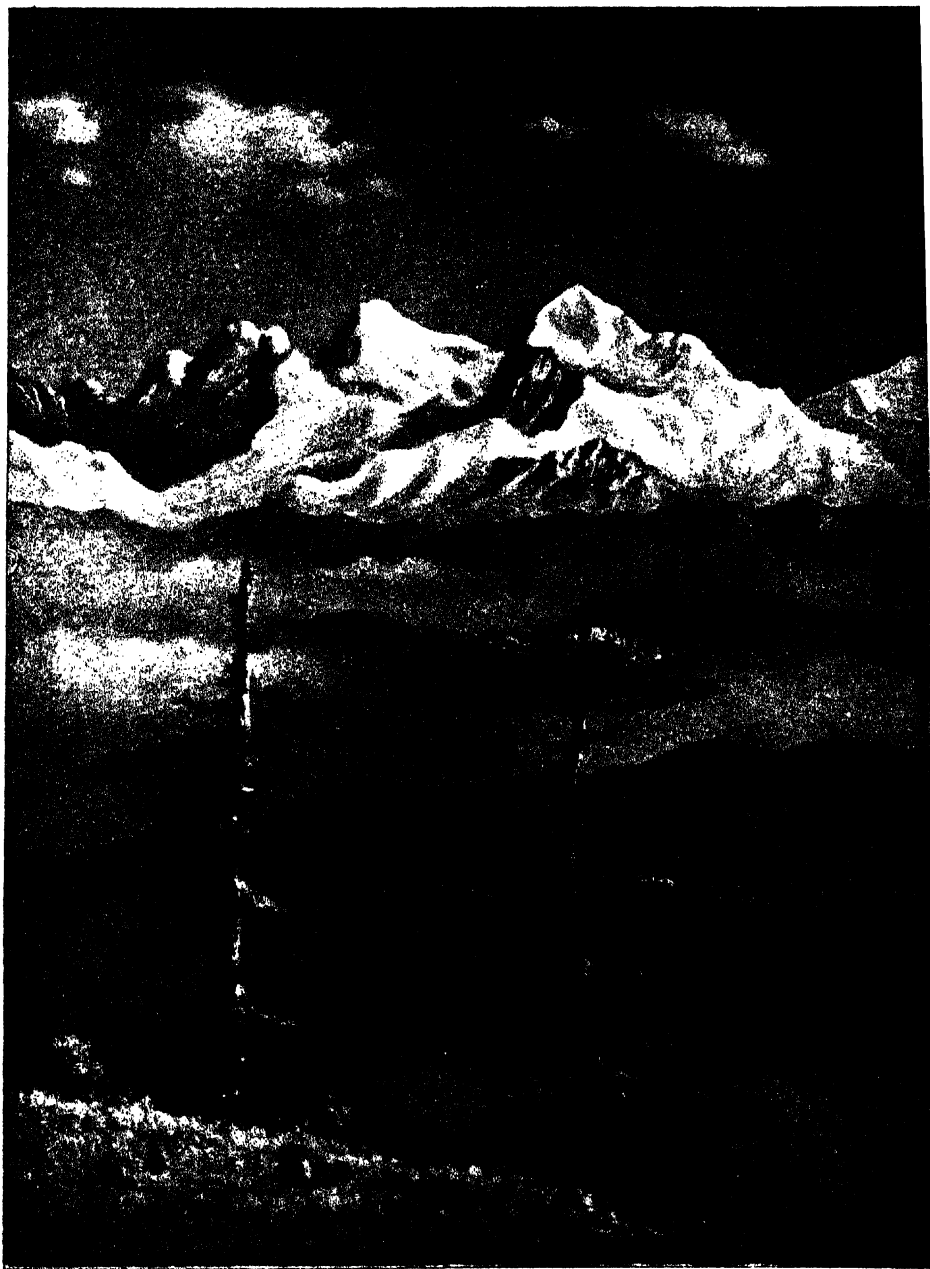
মাসিক বসুমতী
॥ আষাঢ়, ১৩৭১ ॥

(তেলরঙ)

কাঞ্চনজঙ্ঘা

—শ্রীবলাইলাল মুখোপাধ্যায়

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪৩শ বর্ষ | প্রথম খণ্ড
আষাঢ় ১৩৭১ | তৃতীয় সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

।। স্থাপিত ১৩২৯ ।।

কথামৃত

স্মৃত্যাদি তন্ত্র কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশ-কালপাত্রভেদে অধিকভাবে সামাজিক কল্যাণকর কর্মের শিক্ষা দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র, বেদান্তনিহিত তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া অবতারাদির মহান্ চরিত-বর্ণন-মুখে ঐ সকল তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যান করিতেছেন; এবং অনন্ত ভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট বৈরাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান, এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ শিক্ষার জন্য আপাত-প্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থুল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থুলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া, যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—

তখন আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত বিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম-নামক যুগ-যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনাদি-বর্তমান সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকার সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষিহৃদয়ে আবির্ভূত হন, তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে, ধর্মের পুনরুদ্ধার, পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্রচার হইবে, এইজন্য বেদমূর্তি ভগবান্ এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

বেদ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মের এবং ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ধর্মশিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান্ বারংবার শরীর ধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান্ হয়; পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়। প্রত্যেক পতনের পর আর্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্যবান হইতেছে—ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর পুনরুত্থিত সমাজ, অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন; এবং সর্বভূতান্তর্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারংবার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্তমান গভীর বিষাদ-রজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু—পূর্বস্মৃতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের মুখে, তখনকার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের—পরে যুক্তপ্রদেশ (আগ্রা ও আউধ) এবং বর্তমানে উত্তর প্রদেশ—কেন্দ্রীয় নগরী ছিল এলাহাবাদ। এখানেই ছিল ঐ প্রদেশের উচ্চতম ধর্মাধিকরণ, এলাহাবাদ হাইকোর্ট এখানেই ছিল ঐ প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং এখানেই ছিল প্রাদেশের উচ্চতম পদাধিকারীর, অর্থাৎ প্রাদেশিক 'ছোটলাটের' নিবাস এবং এখানেই ছিল প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীর ও চিকিৎসকদিগের কর্মক্ষেত্র ও আবাস।

ব্যবহারজীবীদের অন্যতম ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। এই নেহরু-পরিবারে ছিল, একাধারে, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণত্বের বৈশিষ্ট্য ও মোগল-দরবারের আভিজাত্য। উত্তর-ভারতের সামন্ত-রাজন্যবর্গের অনেকেই তাঁহাদের বৃটিশরাজের সহিত ও অন্য দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত আইন-সংক্রান্ত আদান-প্রদানের অনেক কিছুই ইঁহার হাতে দেওয়ায় ইঁহার প্রভূত আয়-আমদানী ছিল। উপরন্তু ছিল হাইকোর্টের বিরাট পসার।

আয় ও প্রতিপত্তি—হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী হিসাবে—অন্য কয়েকজনেরও ছিল। কিন্তু ঐশ্বর্য-বিলাস-ব্যসন ইত্যাদির ব্যাপক প্রকাশে ইঁহার সমকক্ষ কেউ ছিলেন না তখনকার দিনে। এবং সেই ঐশ্বর্য-বিলাস-ব্যসনের সমারোহে ছিল এমন একটা ব্যাপক আভিজাত্যের প্রকাশ এবং আত্মমর্যাদার পরিচয়, যার দরুণ তখনকার দিনের বৃটিশরাজের গর্বিত অধিকারিবর্গও তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর 'স্টেটসম্যান' সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখেছিল যে, তিনি দু'এক জন ছাড়া কোনও লাট-বড়লাটকে নিজের সমকক্ষ মনে করিতেন না। দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যেও ইঁহার খাতির ছিল গরিষ্ঠ বলিয়া, উচ্চতর আভিজাত্যের প্রতীক বলিয়া। রামপুরের নবাব ইঁহাকে অগ্রজের সম্মান দিতেন।

এলাহাবাদে লাটভবনে বিজলীর আলো-পাখা ইত্যাদি চলিবার পূর্বেই 'আনন্দভবনে' তার প্রচলন হয়। তখন শহরে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না, সে-কারণে ইজ্জৎ বাঁচাইবার জন্য লাট-ভবনেও জেনারেটার বসাইয়া বিজলীর ব্যবস্থা হয়।

১৯০০ সালে প্যারী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়। পণ্ডিত মতিলাল সেই প্রদর্শনী দেখিতে যান সপরিবারে ও সদলে। তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কুস্তিগির গোলাম রোস্তম ও তাঁর ভাই কাল্লুকে। এবং সেই সঙ্গে অবসরবিনোদনের জন্য ছিলেন ওস্তাদ কেরামতউল্লা খাঁ ও তাঁর ভ্রাতা বিখ্যাত কৌকভ খাঁ (আসাতুল্লা খাঁ) ও তাঁহাদের সঙ্গতকারেরা। ঐ প্রদর্শনী দেখিতে আরো অনেক ধনী ভারতীয় ও রাজা-রাজড়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আভিজাত্য-জ্ঞান ছিল না, ছিল শুধু টাকা ও বিলাস-ব্যসন-তৃষ্ণা।

তখনকার দিনে তুর্কি মল্ল মাদরআলি ছিলেন জগৎশ্রেষ্ঠ মল্ল বলিয়া স্বীকৃত। এই প্রচণ্ড বলশালী বিরাটকায় তুর্কের ছাতি ছিল ৬০ ইঞ্চি, গর্দান ২২ ইঞ্চি। অপেক্ষাকৃত স্বল্পকায় গোলাম রোস্তম ইঁহাকে চিৎ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও ভারতীয় মল্লদের জগতে কোনও প্রতিষ্ঠা ছিল না বলিয়া গোলাম সেরূপ স্বীকৃতিলাভ করেন নাই। তবে এই প্রথম পরিচয়ের ফলে পরে ভারতীয় মল্লরা বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় খ্যাতি অর্জনের যোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। গোলাম রোস্তমের অপরাজেয় সাহস ও অপূর্ব মল্লকৌশল পাশ্চাত্য মল্লক্রীড়াবিদদের চমৎকৃত করে। এই মল্লযুদ্ধের ফলেই পরে করিম, কাল্লু, গামা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ভারতীয় মল্লদের পাশ্চাত্য জগতে খ্যাতি অর্জনের পথ বাধামুক্ত হয়।

যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগৎ তখনও সেতার ও সরোদের মোহময় ঝংকার শুনিতে প্রস্তুত ছিল না। এদেশে তখনও যে সকল বিদেশী—বিশেষে ইংরাজ—প্রভু বিরাজ করিতেছিলেন তাঁহাদের না ছিল কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান-বিবেচনা, না ছিল মনুষ্যত্ব-বিষয়ে কোনও অনুভূতি। সুতরাং কোনও প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞ পাশ্চাত্য সুধীজন এদেশে আসিতেন না। এই সকল কারণে কেরামতউল্লা খাঁ ও কৌকভ খাঁর যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন তখনকার পাশ্চাত্য-সঙ্গীত-জগতে কোনও চিহ্ন রাখিতে পারে নাই। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে এদেশে য়াহুদি মেনুহিনের মত জগদ্বিখ্যাত পাশ্চাত্য সঙ্গীত নায়ক এদেশের সেতার ও সরোদ সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইবার পর আলি-আকবর খাঁ ও রবিশঙ্কর বিদেশে ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের ইন্দ্রজাল ছড়াইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

আজিকার দিনে, স্বাধীনতার সতেরো বৎসর অতিবাহিত হইলে পরে আমরা এসব কথা সাধারণভাবে উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু সেই দাসত্বের কালে, হীনতার যুগে, কোনও ভারতীয়ের পক্ষে বিদেশী প্রতিযোগিতার ও ঔদ্ধাসিকতার প্রবল বাধা উপেক্ষা করিয়া এজাতীয় ভারতীয়ত্বের নিদর্শন প্যারী-আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে লইয়া যাওয়ার জন্য কতবড় আভিজাত্য-জ্ঞান ও কতখানি আত্মমর্যাদার বল প্রয়োজন ছিল তাহা সহজে বুঝান যায় না।

বিত্তশালী লোক সে যুগেও অনেক ছিল এদেশে। অনেক রাজা মহারাজার প্রাসাদেও ভিনিসিয়ান ও বোহেমিয়ান কাঁচ এবং সেভ্‌র, ড্রেসডেন ও রয়াল ক্রাউন ডার্বি চীনামাটির বাসনের ছড়াছড়ি ছিল; কিন্তু পণ্ডিত মতিলালের আভিজাত্য ছিল অতি উচ্চস্তরের—যেখানে শুধু টাকার জোরে বা পদমর্যাদার ভারে আসন পাওয়া সম্ভব ছিল না।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে পণ্ডিত জবাহরলালের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। তারপর এদেশের স্কুল-শিক্ষা শেষ হওয়ার মুখে, ১৯০৫ সালে, তিনি বিলাতে পাবলিক স্কুলে ভর্তি হইলেন, তারপর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনার টেম্পল—সম্পূর্ণ হইল বিলাতী শিক্ষার পর্ব। সেই সঙ্গে হইল বিলাতী শিক্ষা-দীক্ষা, বেশ-ভূষা আদান-প্রদান ও চিন্তাধারার প্রবর্তন। আমরা হ্যারো যাত্রার পূর্বে যে জবাহরলালকে দেখিয়াছিলাম, বিলাত হইতে ফিরিবার পর তাঁহার যে রূপান্তর দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম এবার ব্রাহ্মণ্য, মুঘল ও ইংরাজী আভিজাত্যের ত্রি-ধারা মিলিত হইয়াছে। কি উজ্জ্বল মসৃণ

কান্তি, কি নিখুঁত বেশ-ভূষা ও ত্রুটিবিহীন চাল-চলন, সে যেন মণি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছে।

কিন্তু এসকল বাহিরাবরণ একদিন দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, যেদিন গান্ধীজীর পুণ্যময় স্পর্শে জবাহরলালের মন-প্রাণ সকল বাহ্যিক আড়ম্বর, সকল বিলাস-বৈভবের বন্ধন হইতে মুক্ত হইল। ১৯৪৭ সালে কনষ্টিট্যুয়েণ্ট এসেমব্লিতে, স্বাধীনতালাভ সম্পর্কিত ভাষণে পণ্ডিত জবাহরলাল বলিয়াছিলেন যে, 'দীর্ঘদিন পূর্বে আমরা ভাগ্যের সঙ্গে বাজী ধরিয়াছিলাম এই স্বাধীনতা-লাভের জন্য'। এ সেইদিনের কথা—যদিন গান্ধীজীর আহ্বানে সকল আসক্তি, সকল বন্ধন দূরে ফেলিয়া তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মনিবেদন করেন। আশ্চর্য এই পরিবর্তন, কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। কেন না যাহার শৈশব ও কৈশোরের পরিবেশে বা পিতার দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবে, হীনতাভাব বা দৈন্যের লেশমাত্র ছিল না, যাহার কৈশোরের শেষ ও যৌবনের উন্মেষ হইয়াছিল বিলাতে 'পাব্লিক স্কুল' ও 'ভার্সিটির' উচ্ছ্বসিত স্বাধীনতার স্রোতের মধ্যে, সেজন যে প্রকৃত গুরুর কাছে দীক্ষা পাইলে সকল মোহবন্ধন দূর করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবে তাহা অসম্ভব নয়। অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন বলা যায় বরং পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ক্ষেত্রে। যৌবনের আরম্ভকাল হইতে বার্ধক্যের সীমানার পার পর্যন্ত যাঁহার জীবন চলিয়াছিল অপরিসীম ঐশ্বর্যপুষ্ট বিলাস-ব্যসনের মধ্যে, সেজন যে কখনও কোনও প্রবল আকর্ষণে সবকিছু ছাড়িয়া, সর্বস্বান্ত হওয়ার ভয় উপেক্ষা করিয়া এই অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে পারেন, একথা কেহই ভাবিতে পারে নাই।

পণ্ডিতজী

আমরা তখন দেখিতাম যে, যেখানে ও যে সকল অবস্থায় পণ্ডিতজী—অর্থাৎ পণ্ডিত মতিলাল নেহরু—অস্বস্তি বা ক্লেশ অনুভব করিতেন বা ধৈর্য হারাইবার মত হইতেন, সেই পরিস্থিতিতে জবাহরলালজীর মুখে বা ভাবভঙ্গীতে কোনও দৈহিক বা মানসিক বৈষম্য বা বিরক্তির চিহ্নও পাওয়া যাইত না। অবশ্য পণ্ডিতজী তখন ষাট বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন এবং জবাহরলাল মাত্র ত্রিশ পার করিয়াছেন। কিন্তু অন্যদিকে দেখিতাম যে তর্কে অবান্তর যুক্তি প্রয়োগে বা বেচাল ব্যবহারে পণ্ডিতজী উত্যক্ত হইয়া অতি স্পষ্ট—এমন কি রূঢ় ভাষায়—প্রতিবাদ জানাইয়া বা ভর্ৎসনা করিয়া যেখানে ক্ষান্ত হইতেন, জবাহরলাল সেখানে অসহিষ্ণুতার চরমে উঠিয়া প্রায় ফাটিয়া পড়িতেন।

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে স্পেশ্যাল কংগ্রেস অধিবেশন হইয়াছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় (কাউন্সিল) কংগ্রেসীদলের প্রবেশ করার অনুমতি লাভের জন্য। কাউন্সিল প্রবেশ ইচ্ছুক দলের নেতৃত্বে ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু দাশ। দু'জনেরই দলবল বৃহৎ ছিল এবং তাঁহাদের ও সাধারণ ডেলিগেটদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল অতি জঘন্য। দাশ সাহেবের খাওয়ার ব্যবস্থার ভার পরে নিয়েছিলেন তাঁর দিদি ঊর্মিলা দেবী, যাঁর রান্নার হাত ছিল অতি সুন্দর। কিন্তু থাকার ব্যবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না। পণ্ডিতজীর সে সকল ব্যবস্থা যে রকম অপরিষ্কার পরিবেশে ও খাদ্য যেরূপ বিস্বাদ এবং জঘন্য ছিল তাহা আমাদেরই অসহ্য মনে হইত। বলা বাহুল্য পণ্ডিত মতিলাল

নেহরুর কাছে তাহা নরকযন্ত্রণার মতই ছিল। জবাহরলালজীকে কিন্তু অবিচলিত দেখা যাইত।

দুই 'বড় কর্তা'ই ছিলেন ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত—পণ্ডিত মতিলালের তো ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ বিলাস-ব্যবস্থা, খাদ্য ও পানীয় ছাড়া চলিতই না। এরূপ বিকট ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় দু'জনেরই মেজাজ সপ্তমে উঠিয়াছিল। আমায় যাইতে হইত দুই বৈঠকেই, যদিও আমি ছিলাম দাশ সাহেবের দলে। দেখিতাম অনেকেই অবস্থা বুঝিয়া দূরে দূরে রহিয়াছেন, বিরক্তি ও ক্রোধবর্ষণ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে। শুধু জবাহরলালজী ও রণজিৎ পণ্ডিত—জবাহরলালের ভগিনীপতি ও আমার প্রিয় বন্ধু—ঠিক আছেন, তবে রণজিৎ একটু বেশি চুপচাপ।

এরই মধ্যে একদিন নানা কথা প্রসঙ্গে জবাহরলালজী তর্কের ঝোঁকে পণ্ডিতজীর মতের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিলেন। পিতার ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মুখে ঐভাবে বিরূপ মন্তব্য করাটা যে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ একথা তৎক্ষণাৎ অতি তীব্র ভাষায় শোনা গেল পণ্ডিতজীর মুখে। জবাহরলালজীর মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি আর একটি কথাও উচ্চারণ করিলেন না। সকলের অজানিতে তিনি কখন বৈঠক থেকে উঠিয়া গেলেন। তারপর তিনি নিখোঁজ। পরদিন শোনা গেল যে তিনি নাভা রাজ্যে শিখ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় এবং রাজ্য ছাড়ার সরকারী আদেশ অমান্য করার জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন।

নাভার শিখ রাজা রিপুদামন সিং সেই সময় গবর্নর জেনারেলের আদেশে গদীচ্যুত হইয়াছেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে শিখেরা বিক্ষোভ জানাইতেছিল তখন, 'জঠা' বদ্ধ হইয়া জুলুস চালাইয়া প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা ও গান করিয়া জবাহরলালজী সেদিনের বৈঠকে তিরস্কৃত হইয়া সোজা ট্রেনে চড়িয়া নাভায় যাইয়া সেই 'জঠাদার'দিগের (প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দল) সঙ্গে মিলিয়া উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং গ্রেপ্তার হওয়ার পর রাজ্য ছাড়ার আদেশ অমান্য করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন।

ওদিকে পণ্ডিতজীর আবাসস্থলে দু'তিন দিন দারুণ অব্যবস্থার পর একদিন সকালের দিকে এক অত্যন্ত জমকালো পোষাকপরা ভব্য ব্যক্তি আসিয়া 'বড়ে সরকারের' (পণ্ডিতজী) সঙ্গে দেখা করিতে চাহিল। পণ্ডিতজীর সামনে হাজির হইয়া সে নিবেদন করে যে রামপুরের হুজুর নবাব সাহাব শুনিয়াছেন যে 'বড়ে সরকারের' (অগ্রজপ্রতিম বয়োজ্যেষ্ঠের) থাকা-খাওয়ার কষ্ট হইতেছে। সেইজন্য তাঁহার আদেশে লঙ্গরখানার লোক-লস্কর সাজ-সরঞ্জাম সমেত সে আসিয়াছে সেসবের ব্যবস্থা করিতে। তাহার প্রয়োজন তাঁবু ফেলার জন্য একটু জায়গা।

সেইদিন থেকে খাওয়ার ব্যবস্থা তো 'উচ্চাঙ্গের' দাঁড়ালই, উপরন্তু সব-কিছু সাফসুতরো হইল এবং পরিচর্যার কোনই ত্রুটি রহিল না। শুধু যা জবাহরলালজী রহিলেন জেলে দিন দশেকের মত। অন্যায়ের প্রতিবাদ, অবিচারের বিরুদ্ধে মুক্তকণ্ঠে বিক্ষোভ ঘোষণা ও সেইসঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এ তো তাঁহার মন-প্রাণের অঙ্গ ছিল এবং সে কাজের জন্য নিজেকে কি দুঃখদুর্দশা বরণ করিতে হইবে সে চিন্তা তাঁহার একেবারেই ছিল না। হয় তো নাভার ব্যাপারটা তাঁহার মনে প্রচ্ছন্নভাবে খেলিয়াছিল। পিতার তিরস্কারে মনের একদিক দাবিয়ে রাখার ফলে অন্যদিকের দ্বারমুক্ত হইয়া সেই সকল প্রচ্ছন্ন চিন্তা প্রবল হয় এবং তারপর যেই চিন্তা সেই কাজ। এই তো ছিল তাঁহার প্রকৃতি শেষদিন পর্যন্ত।

বহুদিন পূর্বে যুবজনকে উপদেশচ্ছলে তিনি বলেছিলেন, 'Live dangerously', অর্থাৎ বিপদ-আপদ এড়াইয়া চলার পরিবর্তে জীবনযাত্রার অভিযান চালাও বিপদসঙ্কুল পথে।' এই উপদেশ তাঁহার জীবনে নানা দুঃখ-দুর্দশা, নৈরাশ্য, বৈফল্যের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া ছিল। সেই-সবের পূর্ণবৃত্তান্ত—স্বাধীনতালাভের পূর্বে ও পরে—কোনও দিন সঠিকভাবে বিবৃত হইবে কি না জানি না।

শিক্ষিতের দায়িত্ব

'যে যে গুণ থাকিলে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতগণকে সেই সেই গুণে সুসম্পন্ন হইতে হইবে।···কেবল সামাজিক বা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গলসাধন হয় না। প্রাত্যহিক কার্যের যেমন একটা তালিকা অন্তত মনে মনে থাকিলেও কার্যের শৃঙ্খলা হয়,—সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, তদ্রূপ জাতীয় সাহিত্য যদি সুগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা-গঠনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিত্য সাহিত্য-গঠনের প্রকৃত ভার এখন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হস্তেই ন্যস্ত হইতেছে। অবকাশমত কোন ভাবুক ভাবের স্রোতে ভাসিয়া দু' একটি কবিতা রচনা করিলেন বা চিন্তাপূর্ণ দু' একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহাতে জাতীয় সাহিত্যে প্রকৃত গঠন হইবে না। তপস্যার ন্যায় একাগ্রতাপূর্ণ চেষ্টায় ঐ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে।···মাতৃভাষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে বরেণ্য করিয়া তোলা ইংরাজী শিক্ষিতগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য। কেন না তাঁহারা প্রতীচ্য ভাষায় পারদর্শী হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন; লোকসমাজের স্পৃহণীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতেছেন,—তাঁহাদের কথায়, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের, তাঁহাদের আচরিত রীতি-নীতির উপর জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই সাধারণকে স্ব স্ব মতের বশবর্তী করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্তব্য বড়ই গুরুতর। তাঁহাদের সামান্য স্খলনে, সামান্য উপেক্ষায়, একটি মহতী জাতির—উদীয়মান জাতিরও স্খলন বা অধঃপতন হইতে পারে। 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্ত ও দেবেতরো জনঃ।' তরণীর কর্ণধারের অনেক সতর্কতা আবশ্যক, অন্যথা নিমজ্জনের আশঙ্কা বলবতী। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ এবং বিপদ—এই দুই-এরই হেতু নিহিত রহিয়াছে। যাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ-বিপদ্ উভয়ই নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের কর্তব্য যে কত গুরুতর—তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।'

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৭১ বসুমতী আষাঢ়

হৃদরোগ প্রতিরোধ করুন

বিশ বছর আগের একটি ঘটনা বলছি। এক ভদ্রলোক। একজন প্রখ্যাত এঞ্জিনীয়ার: মোটা রোজগার, তা' ছাড়া পৈতৃক অবস্থাও খুবই ভালো। ইয়োরোপ-আমেরিকায় বহুবার ঘুরে এসেছেন। দেশে ফিরেও চেষ্টা করেন সাহেব-সুবোদের অনেক ভালো জিনিসকে নিজের মতো করে নিতে। বিদেশে থাকতে দেখেছেন, অনেক সুস্থ-সবল নীরোগ স্বাভাবিক লোক বছরে অন্তত একটিবার কোনও কারণ না থাকলেও 'ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের' কাছে আসেন নিজের শরীরের একটা 'চেক্-আপ'-এর জন্যে।

দেশে ফিরে এই ভদ্রলোক এই জিনিসটি চালিয়ে যেতে লাগলেন। কোনো বছর এই 'চেক্-আপ'-এর সময় কিছু লুকোনো ব্যারাম ধরা পড়ে, কোনো বছর বা তা-ও পড়ে না। ডাক্তার লিখিত রিপোর্ট দেন—চমৎকার আছেন।

এবারেও ঠিক তাই হলো। ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ফেরবার দিন তিনেক বাদে লিখিত রিপোর্ট এবং চিঠি এলো: চমৎকার আছেন মশাই, আগামী বছর আবার ঠিক সময়ে 'চেক্-আপ'-এর জন্যে অবশ্যই আসবেন—তার আগে যে আপনাকে কোনো ডাক্তারের কাছে আসতে হবে না সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

কিন্তু ঘটনাচক্রেই পরদিন সকাল নয়টার সময়েই ভদ্রলোকের ড্রাইভার তাঁকে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল— একটা সার্টিফিকেটের জন্যে, মানে একটা ডেথ সার্টিফিকেটের জন্যে। হ্যাঁ, ঘটনাটা সত্যি।

অকালে অশনিপাতের মতো আকস্মিকভাবেই ঘটেছিল ব্যাপারটা। যথাসময়ে ফ্যাক্টরীর উদ্দেশে নিজের গাড়িতে চড়ে রওনা হয়েছেন এঞ্জিনীয়ার। খানিকটা যাবার পরে পেছনের আসন থেকে একটা অস্ফুট আওয়াজ কানে এলো ড্রাইভারের—উঃ।

—কিছু বলছেন? ড্রাইভার বললো নিজের কানটা খাড়া করে।

—নাঃ, তেমন কিছু নয়, এই ঘাড়ের কাছটা যেন কেমন চিন-চিন করছে।

একটু পরে ঝুপ করে একটা আওয়াজ হতে ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো একপলক—এঞ্জিনীয়ার মুখ থুবড়ে পড়েছেন সীটের ওপর। কিছুমাত্র কালক্ষেপ না করে ড্রাইভার গাড়ির মোড় ঘুরিয়ে চলে এলো ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের চেম্বারে। ডাক্তারবাবু ছুটে এসে পরীক্ষা করে দেখলেন—ডেথ সার্টিফিকেট লেখা ব্যতীত আর করবার কিছু নেই।

কি করে মারা গেলেন ভদ্রলোক? হার্ট ফেল করে। কোনো রকম আগে থেকে হদিস না দিয়ে হার্ট 'ফেল' করে কেন? কি করে করে? এর জবাবস্বরূপ ১৯৪৮ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি যন্ত্র, এর নাম—'ব্যালিস্টোকার্ডিয়োগ্রাফ'। এ যন্ত্রের সাহায্যে হার্টের প্রতিটি স্পন্দনে হার্টের যে-কোনোও দুর্বলতার প্রকাশ থাকে তা সঠিকভাবে ধরা যায়। ইয়োরোপ-আমেরিকায় আজকের দিনে এ যন্ত্রের বহুল প্রচলন দেখা যায়। ও সব দেশে আজ আর কেউ হার্টের ব্যারাম হবার পরে চিকিৎসার জন্যে অপেক্ষা করে না—হার্টের ব্যারাম কিন্তু অদূরভবিষ্যতে আসছে কি না ব্যালিস্টোকার্ডিয়োগ্রাফের সাহায্যে তা বুঝে নিয়ে হার্টের রোগ তারা প্রতিরোধ করছে।

—নার্স মিত্র।

একটি আশ্চর্য ওষুধ

একটা অতি আশ্চর্য ওষুধের কাহিনী শোনাবো আপনাদের। আজকের পৃথিবীতে হাজার হাজার সরকারী বে-সরকারী ল্যাবরেটরীগুলিতে যে ধরনের ওষুধ নিত্য তৈরি হচ্ছে, এ ওষুধটা ঠিক সে ধরনের নয় তা ঠিক—কিন্তু তবু এটা যে ওষুধ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ আপনারও থাকবে না নিশ্চয়ই। এ ওষুধটার কথা অল্পবিস্তর হয় তো আপনিও আগে থেকেই জানেন, কিন্তু আমি এর যে আশ্চর্য কার্যকারিতার কথা বলছি তা হয় তো না-ও শুনে থাকতে পারেন এর আগে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের কথা। আমেরিকা থেকে একটি লোক মনে করুন নাম তার পিটার স্বেচ্ছায় একটা কাজ বেছে নিয়েছিলো:— তার কাজটা হলো যন্ত্রণাকাতর ক্লিষ্ট শুষ্কমুখে হাসি ফোটানো। পিটার ইয়োরোপে এসে বিভিন্ন হাসপাতালের সামনে গান-বাজনা, কখনো বা ম্যাজিক, কখনো বা হাস্যকৌতুকের আসর বসাতো। বলা বাহুল্য, তার শ্রোতারা শতকরা নব্বইজনই হতো বিভিন্ন রণক্ষেত্রের আহত সৈনিকেরা—আর তা ছাড়া এক-আধজন সামরিক বিভাগের সক্ষম লোককেও কখনো সখনো দেখা যেতো। তবে দু'চারজন নার্স এবং ডাক্তারও সব সময়ই থাকতো এই সমস্ত আসরে যাতে হঠাৎ কেউ বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে নজর দেওয়া যায় সেইজন্যে।

সব সময়েই পিটার করতো কি শ্রোতাদের (অর্থাৎ আহত সৈনিকদের) মধ্য থেকে এক-আধজনকে কাছে ডেকে নিয়ে তার 'শো' আরম্ভ করতো। এমনি একবার শো আরম্ভ করবার আগে পিটার হাঁক দিলো—আমার বাড়ি ভার্জিনিয়া, ভার্জিনিয়ার কেউ কি আপনাদের মধ্যে আছেন? যদি থাকেন তো আমার কাছে চলে আসুন, কোনো লজ্জা নেই, চলে আসুন আমরা একসঙ্গে গান গাইব।

দু'তিন মিনিট চলে যায় অথচ কোনো সাড়াশব্দ নেই। অতঃপর দেখা গেলো শ্রোতাদের একেবারে শেষ লাইন থেকে ধীরে ধীরে একখানা হাত জাগলো—দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো হাতখানা তুলতেও সে অক্ষম, কিন্তু তবু সে চেষ্টা করছিল। পিটারের অনুরোধে একজন নার্স তাকে মঞ্চের দিকে আসতে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে গেলো। কয়েকজন ডাক্তার বারণ করলেন নার্সটিকে—ঐ রোগীটিকে যেন আসন থেকে না তোলা হয়। কিন্তু নার্সটি ডাক্তারবাবুদের বারণ ঠিক লক্ষ্য করে নি। মঞ্চের কাছাকাছি যখন এসে পড়েছে রোগীটি (নার্সের কাঁধে ভর দিয়ে) তখন একজন ডাক্তার তো চেঁচিয়েই বারণ করলেন ঐ রোগীকে মঞ্চের ওপর না তুলবার জন্যে; কিন্তু ততক্ষণে পিটার নিজেই তাকে টানতে টানতে মঞ্চের ওপর এনে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে। আর চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলো রুগীটিকে—ক'টা গান জানো তুমি।

আমাদের দেশী লোকটি কথা বলতে অক্ষম, তার শুধু ঠোঁট দু'টিতে মৃদু কম্পন দেখা গেলো।

ডাক্তাররা আঁতকে উঠলো। কিন্তু পিটার কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলে উঠলো—আচ্ছা লাজুক ছোকরা তুমি, এতো লজ্জা নিয়ে স্টেনগান চালাও কি করে, হয়েছে হয়েছে আর গোঁ গোঁ করতে হবে না—আমি গাইছি, আমাদের ভার্জিনিয়ার দেশী গান, মেষপালকরা যে গান গেয়ে থাকে, পারো তো আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু গাও—দেখবে অনেক কষ্ট দূর হবে।

গান ধরলো পিটার। প্রায় মিনিট কুড়ি গলার সমস্ত পেশীগুলি ফুলিয়ে সরবে গান গেয়ে চলেছে। হঠাৎ একসময় শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজনের মুখচোখে একটা অস্বাভাবিক ভয়, আতঙ্ক এবং কৌতূহলের লক্ষণ চোখে পড়তে আকস্মিকভাবে পিটার গানটা থামিয়ে দিলো। কিন্তু তখন দেখা গেলো সেই রোগীটি সমানে গান গেয়ে চলেছে! ভাবাবেশে তার চোখ দু'টি বন্ধ হয়ে গেছে—কিন্তু গানের প্রতিটি কথা স্পষ্ট সোচ্চারিত।

কয়েকজন ডাক্তার এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো পিটারের গায়ের ওপর—ওঃ পিটার। তুমি একজন যাদু-ডাক্তার, ভগবান পাঠিয়েছেন তোমাকে আমাদের মাঝে।

এতো আনন্দের কারণ কি? পিটার জানতে পারলো একটু পরেই। ঐ রোগীটি বিগত চার মাস যাবৎ একেবারেই বাকশক্তি-রহিত হয়ে পড়েছিল। রণাঙ্গনে গোলন্দাজ-বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল ও। ক্রমাগত শেলিং এবং তারপর শত্রুর একটি গোলা কামানের গোলার স্তূপের মধ্যে এসে পড়ায় যে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে তারই আওয়াজ এবং 'শক'-এর ফলে ওর স্নায়ুমণ্ডলী যায় ওলোট-পালোট হয়ে। এই চার মাস সমস্ত রকম ডাক্তারী চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়েছে—বাকশক্তি সে ফিরে পায় নি। আর সে কি না এখন উচ্চৈঃস্বরে গান গাইছে।

—ডাঃ নাগ

বেশী বয়সের প্রেম

টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল সেই বিকেল থেকেই, আর তারপর সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসবার মুখেই সুরু হলো প্রচণ্ড বর্ষণ। প্রায় আধঘণ্টা একটানা চললো বৃষ্টিটা। বৃষ্টি পুরোপুরি থামবার আগেই দেখলাম ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে গেলো, বাসের সংখ্যাও ক্রমশ কমে আসতে লাগলো। আমার চেম্বারের দোরগোড়ায় বর্তমানে রাস্তার জল প্রায় দু' ফুট। মনে হলো এমন দুর্যোগে আর রোগীরা কেউ আসতে পারবেন না আজ। রাস্তার জলটা একটু কমলেই বাড়ি পালাবো, ততক্ষণে হাতফিলের মেডিক্যাল জার্নাল দু' একটা নাড়াচাড়া করবার জন্যে টেনে নিলাম। একটা পত্রিকার কয়েক পাতা ওল্টাতেই একটি প্রবন্ধ নজরে পড়লো: 'রোগটা কোথায়? দেহে না মনে।' এ জাতীয় রচনা অন্যান্যের মনে যে ভাবেরই সৃষ্টি করুক না কেন আমাদের মতো পেশাদার ডাক্তারদের কাছে এ জাতীয় রচনা যখন কোনো ডাক্তারের কলম থেকে পরিবেশিত হয়, তখন তার একটা বিশেষ অর্থ, কিছু কিছু বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে। অবশ্য মেডিক্যাল জার্নালের রচনামাত্রেরই যে এ মর্যাদা প্রাপ্য, তা নয়। বিশেষ অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে নিয়ে যে সমস্ত পরীক্ষা চালান, তার ফলাফল যে সমস্ত রচনায় থাকে—সেই সবেরই কেবল বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্য।

বর্তমান রচনাটির প্রথম কয়েক লাইন পড়েই জার্নালটা বন্ধ না করে পারলাম না। কারণ, যে ডাক্তারবাবু রচনাটির লেখক, ইয়োরোপে তাঁর চিকিৎসক হিসেবে প্রচুর প্রতিষ্ঠা আছে যদিও, কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়টি ঠিক আমাদের রুচিসঙ্গত নয় মনে হলো—পঁয়তাল্লিশ বছরের এক ভদ্রমহিলা চারটি সন্তানের মা—স্বামী জীবিত এবং সক্ষম, আর্থিক অবস্থা ভালো—এইরকম একজন মহিলা নিরতিশয় দরিদ্রপাড়ার এক স্কুল মাস্টারমশায়ের সঙ্গে ঘরসংসার ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন—এরই একটা কেশ হিস্ট্রি হলো আলোচ্য রচনাটি।

ডাক্তারদের সাধারণত সময় থাকে কম, কাজেই পড়াশুনোর সুযোগ যেটুকু তাঁদের আসে, তাঁর প্র্যাকটিশের পক্ষে সুবিধে হয় এই রকম রচনাই তাঁর পড়বার জন্যে আগ্রহ থাকে। আমি 'লাঙ্গস' সম্পর্কেই সাধারণত চিকিৎসা করে থাকি—কাজেই 'রোগটা কোথায়?—দেহে না মনে?' আমি পড়বার জন্যে আগ্রহবোধ করলাম না। অন্য কিছু একটা পড়বো ভাবছি এমনি সময় এলেন রথীনবাবু—বিশেষ অবস্থাপন্ন এবং মান্যগণ্য একজন ভদ্রলোক—আমি এঁদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান। বৃষ্টি তখন বেশ পড়ছে—রথীনবাবু তারই মধ্যে কিছুটা ভিজেই এসেছেন।

ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলাম: কি ব্যাপার? ছোটো খোকার জ্বরটা বুঝি আবার বেড়েছে? ক্যাপসুলটা দিয়েছিলেন তো?

—হ্যাঁ, দিয়েছি ক্যাপসুল, ওর জ্বর বাড়ে নি, ভালোই আছে; আমি এসেছি অন্য ব্যাপারে।

—বসুন, ব্যস্ত হবেন না।

রথীনবাবুর কথা বলবার বিশেষ ভঙ্গি দেখে একটু অবাক হয়ে গেলাম মনে মনে। পরিবারের কারোর একটু কিছু হলে উনি যে ভাবে আমার চেম্বারে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েন, তাতে অনেকেই আশ্চর্যবোধ করেন। আর উনি কখনো এসে পড়লে সব কাজ ফেলে আগে ওঁর কথা না শুনে উপায় থাকে না—যে জন্যে অন্যান্য লোকজন এমন কি আমার কম্পাউণ্ডারও অনেক সময় বিরক্তি প্রকাশ করে থাকেন। সেই রথীনবাবুর মুখ-চোখে ব্যস্ততার কোনই লক্ষণ দেখলাম না। উনি বেশ জেঁকে বসলেন আমার সামনের চেয়ারটায়, তারপর আস্তে আস্তে আরম্ভ করলেন—আজ এই দুর্যোগে আপনাকে নিশ্চয়ই একা পাওয়া যাবে মনে করেই চলে এলাম।

—বেশ তো বলুন কি ব্যাপার?

—দেখুন, এটা একটা ব্যারাম কি না ঠিক জানি না, হলেও হতে পারে। ব্যারাম হলে তো নিশ্চয়ই চিকিৎসা করবেন, আর তা না হলে সুপরামর্শ আশা করবো।

—নিশ্চয়ই, বাঃ!

—আগেই শপথ নিয়ে ফেললেন?

—নয় কেন?

—শুনলে আবার ঘেন্নায় নাক সেঁটকাবেন না তো?—আমার ছেলেমেয়েরা যেমন করছে? স্ত্রী যেমন করছেন?

—এ কি কথা রথীনবাবু।

—ঠিকই বলছি।

কথাটা বলেই রথীনবাবু চট করে মুখ ফেরালেন বাঁয়ে, জানালার দিকে। বন্ধ জানালার খড়খড়ি দিয়ে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছিল,—আমার মনে হতে লাগলো যেন রথীনবাবু কাঁদছেন সাধারণত বয়স্ক পুরুষমানুষেরা যেভাবে কেঁদে থাকেন।

একটু অপ্রস্তুতবোধ করলাম। গম্ভীর প্রকৃতি রোরুদ্যমান এই রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেটকে হঠাৎ যে কি বলে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

আরো একটুক্ষণ বাদে রথীনবাবু নিজেই বলতে লাগলেন জানালার দিক থেকে মুখ না ফিরিয়েই: আমি আজ সকলের ঘৃণার পাত্র ডাক্তারবাবু! স্ত্রী, ভাই, বোন, ছেলে, মেয়ে, ছেলের বৌ, মেয়ের জামাই সকলেরই ঘৃণার পাত্র। দোষটা তাদের কারো নয়, আমার নিজেরই। বলতে কি, আমি নিজেও নিজেকে এ জন্যে কারো চাইতে কম ঘৃণা করি না। সত্যি আমি ঘৃণার যোগ্য; কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি অসহায়; নিজের ওপর আজ আর আমার কিছুমাত্র জোর নেই; একটু সাহায্য করবেন?

পরে রথীনবাবু আরো যা বললেন তার সারমর্ম অনেকটা এই রকম: ওঁদের দেশের একটি বালবিধবা, খুবই সাধারণ একজন মহিলা, শিক্ষা-দীক্ষাও নেই, অবস্থাও খুবই শোচনীয়, সামান্য কিছু জমিজায়গা আছে, আর তা ছাড়া অবস্থাপন্নরা নিয়মিত কিছু কিছু সাহায্য করেন তাতেই কোনো মতে চলে যায়—বর্তমানে বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। রথীনবাবুও বিগত বিশ বছর ধরে তাকে নিয়মিত সাহায্য করে আসছেন। কখনো একজন দুঃস্থাকে সাহায্য করা হচ্ছে ভিন্ন আর কিছু মনে হয় নি—কিন্তু আজ বছরখানেক হতে চললো নিজে ষাটের কোঠা পেরোবার পরে ঐ মহিলাটি সম্পর্কে মনে একটু দুর্বলতাবোধ করতে থাকেন। ক্রমশ নিশ্চয়ই নিজের ব্যবহারে ও নিজের অজ্ঞাতসারেই ওর সম্পর্কে মনের আসল ভাবটা একটু একটু প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। তারপরে অল্প মাস-খানেক হলো স্ত্রী একদিন খোলাখুলিই বললেন যে, ঐ মহিলাটির এ বাড়িতে আসা বন্ধ হওয়া দরকার, বরং রথীনবাবুই যেন তার বাড়িতে যান, ছেলেদের বিয়ে-থা হয়ে গেছে, একেবারে বাড়ির ওপর 'ঐ সব ব্যাপার' চলতে থাকলে তাদের মর্যাদায় বাধে। রথীনবাবু হতবাক। ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ জানাজানি হয়ে গেছে সে বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ নেই। রথীনবাবু বললেন যে তাঁর স্ত্রীর মুখ-চোখ দিয়ে যে অতো ঘৃণা ঝরাতে পারে, তা উনি কখনো ভাবেন নি। আর নিজের কৃতকর্ম?—সে-বিষয়েও ওঁর কোনো সন্দেহ নেই যে, সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে দায়ী উনি নিজেই। কিন্তু উনি অসহায়। দীর্ঘ-দিনের পরিচিত ঐ মহিলাটির আকর্ষণ ইদানীং উনি আর রোধ করতে পারছেন না।

রথীনবাবুর প্রতিটি কথা খুব মন দিয়েই শুনলাম—ডাক্তার হিসেবে তো বটেই, বন্ধু হিসেবেও বটে। তারপর অভয় দিলাম ওঁকে, বললাম দিন তিনেক বাদে আসতে, এর মধ্যে ব্যাপারটা আমি একটু ভেবে নিতে চাই।

রথীনবাবু চলে যেতেই আবার ঐ মেডিকেল জার্নালখানা টেনে নিলাম, তারপর আর একখানা। এমনিভাবেই চললো তিনটে দিন। ইয়োরোপ-আমেরিকা থেকে প্রকাশিত অন্তত দশ-পনেরো খানা হালফিলের পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলাম যে বেশি বয়সে এই যে প্রেমের জন্য মানুষের নতুন করে আকাঙ্ক্ষা জাগে মনে, তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই বরং এই ইচ্ছে জাগাটাই স্বাভাবিক। যৌবনের শুরুতে এই ইচ্ছে জাগা যতোটা স্বাভাবিক—যৌবনের শেষে এই ইচ্ছেটা আবার নতুন করে জাগা তার চাইতে কোনো মতেই কম নয়। কারো এ বাসনা জাগে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ-এর মধ্যে, কারো বা পঞ্চাশ-এর পরে, কারো বা তারও পরে। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মেয়েদের বেলায় এ বয়সটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ আর পুরুষের বেলায় পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট কি বাষট্টি। এই ইচ্ছে জাগাটা একটা একান্তই জৈবিক নির্দেশ। এর মধ্যে ডাক্তারীশাস্ত্র অনুযায়ী অস্বাভাবিক বা অন্যায়ের কিছু নেই—অন্যায় যা সে সামাজিক দৃষ্টিতে। সবচাইতে আশার কথা, এ ব্যাপারে এই সামাজিক অন্যায়ের দিকটা সম্পর্কে যিনি অল্পবিস্তর সজাগ থাকেন—তাঁর পক্ষে নিজেকে আবার নতুন করে বশে আনা অনেকটা সহজ হয়।

রথীনবাবুকে তাঁর পাপ-বোধ থেকে কি করে উদ্ধার করবো মনে মনে সেইটে ঠিক করে নিয়ে অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম ওঁর আবির্ভাবের জন্যে।

—সুরসিক

ফাঁসির কয়েদী কি করে? কি তার পক্ষে করা সম্ভব? কথাটা কখনো মনে হয়েছে কি? অনেকে হয় তো বলবেন যে, ফাঁসির কয়েদীর মতো একজন হতভাগ্য লোক কি করলো বা না করলো তা জেনেই বা লাভ কি! আবার অন্য কেউ হয় তো বলতে পারেন যে, ফাঁসি ক্রমশ উঠেই যাচ্ছে পৃথিবী থেকে, এ একটা হৃদয়হীন ব্যাপার—এতোই হৃদয়হীন যে, এ সম্পর্কে কিছু জানা না থাকলেও কিছু ক্ষতি নেই।

আমাদের কিন্তু মনে হয় এর কোনোটাই সঙ্গত কথা নয়। কারণ, প্রথমত যে কোনো বিষয় সম্পর্কেই হোক না কেন, না-জানার চাইতে জানা যে সব সময়ই অধিকতর বাঞ্ছনীয় জিনিস, একটু আবেগ সংযত করতে পারলেই আমরা তা বুঝতে পারবো। আর দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে ফাঁসির সাজা বন্ধ হয়ে গেলেও গোটা পৃথিবী থেকে যে অদূরভবিষ্যতে ফাঁসি উঠে যাবে, তা মনে করবার পেছনে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। নীতিশাস্ত্রের যে গভীর তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে দেশ-বিদেশের আইনজীবী, সমাজসেবী তথা অন্যান্য মানব-দরদীরা দীর্ঘকাল ধরে ফাঁসি বন্ধ করবার জন্যে কমবেশি আন্দোলন চালিয়ে ধীরে ধীরে জনমত তৈরি করবার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ আজকের দিনে শ্রেণিসংগ্রাম, গোষ্ঠিসংগ্রাম, কিম্বা জাতীয়সংগ্রামে কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে পড়ে সমগ্রভাবে মানবজাতির জন্য চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করে নিজ নিজ শ্রেণী, গোষ্ঠী বা জাতির স্বার্থের চিন্তায় মশগুল হয়ে পড়ছেন। প্রত্যেক দেশের ভেতরকার সংগ্রাম যতো তীব্র হয়ে উঠছে নিজের গণ্ডীর বাইরের কথা ভাববার বা তার জন্যে কিছু করবার স্পৃহা মানুষের ততোই কমে আসছে। যে কোনো দেশেরই হোক না কেন, তিরিশ বছর আগের মানুষ যতোটা উদার ছিলো আজকের দিনে আর তা মোটেই নেই—রাষ্ট্রসংঘ সত্ত্বেও। বরং এক এক সময় মনে হয় যে, প্রতিটি গোষ্ঠী, দেশ বা জাতির মানুষকে রাষ্ট্রসংঘে আজকের দিনে অত্যন্ত সচেতন দেখা যাচ্ছে নিজ নিজ স্বার্থ সম্পর্কে—যতটা বোধ হয় রাষ্ট্রসংঘ সৃষ্টি হবার আগে ছিল না।

যাই হোক, পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে ফাঁসির রেওয়াজ কিন্তু অদূর-ভবিষ্যতে উঠে যাচ্ছে না। কাজেই ভালো লাগুক আর না লাগুক, আমরা কেউ চাই আর নাই চাই ফাঁসির হুকুম আরো হাজার হাজার, কে জানে, হয় তো বা লাখ লাখ মানুষকে নিজের কানে শুনতে হবে ভবিষ্যতে।

সতেজ পেশীগুলিতে যতদিন শক্তির প্রাচুর্য থাকে, ততদিন কারুরই মৃত্যুর কথা অর্থাৎ নিজের মৃত্যুর কথা মনে হয় না—কখনো মনেও হয় না তার এ কথাটা। কিন্তু এ সময়েও তাকে মনে করিয়ে দিলেই সে স্বীকার করবে যে, সে চিরজীবী হয়ে আসে নি পৃথিবীতে। একদিন যে মরতে হবেই, হ্যাঁ, সে কথা সে জানে। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে এই যে জানা আর ফাঁসির হুকুম হওয়া—এ দুইয়ের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। সবাই বুঝতে পারে যে তার মৃত্যু অবধারিত—কিন্তু কবে কখন যে আসছে সে মৃত্যু, তা নেহাৎ দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষ ব্যতীত আর কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয় বা কেউ জানেও না। কিন্তু ফাঁসির কয়েদী জানে যে তাকে অমুক দিন অমুক সময় মরতে হবে—মৃত্যুর দিনক্ষণ সম্বন্ধে এই যে একটা স্থিরনির্দিষ্ট পূর্বজ্ঞান—প্রধানত এর ফলেই তার অবস্থাটাকে দুর্বোধ্য করে দেয় যে কোনো সাধারণ মানুষের কাছে, অপরাধীমাত্রেরই আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্যে সবসময়ই প্রচুর কথা থাকে, যার সব কথাই হয় তো বা একেবারে অসার না-ও হতে পারে। কাজেই অসাধারণ দু'একটা ক্ষেত্র ব্যতীত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে ফাঁসির হুকুম হলে কয়েদী মনে করে থাকে যে তার ওপর সুবিচার করা হলো না—তা খুবই সহজবোধ্য। কাজেই আদালতে যাবার আগে বা যেতে আরম্ভ করবার পরে তার মনে যে পরিমাণ ক্ষোভ থাকে ফাঁসির হুকুম হবার পরে সেটা আরো অনেক বেড়েই যাবার কথা।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন আমাদের স্বদেশী যুগে দেখা গেছে একাধিক বিপ্লবীর ফাঁসির হুকুম হবার পরে রীতিমতো শরীর ফিরতে আরম্ভ করেছিল। এগুলি নিশ্চয়ই অসাধারণ ঘটনা। এই বীর দেশসেবকগণ কাজে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের এমন সম্পূর্ণভাবে দেশমাতৃকার পায়ে উৎসর্গ করে দিতেন যে, ফাঁসির হুকুমটা বাস্তবিকপক্ষে তাঁদের মানসিকতাকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারতো না। কাজেই এঁদের কথা আলাদা।

অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিকের রচনায় ফাঁসির কয়েদীর চরিত্র আছে—সেগুলিও সাহিত্যের কল্পনা হবারই সমধিক সম্ভাবনা, বৈজ্ঞানিক সত্য নয়।

ইদানীং দু'জন মনোবিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণের ফল জানা গিয়েছে এ সম্বন্ধে। এঁরা দীর্ঘকাল ধরে ফাঁসির আসামীদের মানসিকতাকে বুঝবার চেষ্টা করছিলেন। এই মনোবিজ্ঞানীদ্বয় ডাঃ হার্ভে ব্লুস্টোন এবং ডাঃ কার্ল ম্যাকগাহী বর্তমানে নিউইয়র্কের সিং সিং বন্দিশালার সঙ্গে যুক্ত আছেন। এঁরা দীর্ঘকাল ধরে কয়েক শত ফাঁসির কয়েদীকে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সাধারণত যা মনে করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ

বসুমতী আষাঢ়

নিদারুণ হতাশা বা নিদারুণ আতঙ্ক—এর কোনোটাই ফাঁসির কয়েদীর মধ্যে দেখা যায় না। অনুশোচনার লক্ষণও কদাচিৎ দেখা যায়। জোরালোভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্যে আবেগের যে তীব্রতার প্রয়োজন হয় (যা সাধারণত যুক্তিবোধকে সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে) তা দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে এবং আবেগের এই তীব্রতার ফলেই কয়েদী সাধারণত ফাঁসি হওয়ার তাৎপর্যটাও সবসময় উপলব্ধি করতে পারে না। ডাঃ ব্লুস্টোন এবং ডাঃ ম্যাকগাহী বলেন যে, এটা যদি না হতো তা হলে খুব সম্ভব আসন্ন-মৃত্যুর কথা ভেবে ভেবে বেশিরভাগ কয়েদীই অল্পসময়ের মধ্যেই উন্মাদ হয়ে যেতো। এই তো গেলো প্রথম অবস্থা—ফাঁসির কয়েদীদের বেশিরভাগেরই যে অবস্থার মধ্যে ফাঁসির পূর্বক্ষণ অবধি কাটে।

দ্বিতীয়ত হলো একটা ভাগ্যনির্ভরশীল অবস্থা। ভাগ্য বিশ্বাস করে এরকম ব্যক্তিরা দুরারোগ্য বা মৃত্যু অনিবার্য এরকম রোগের কবলে পড়লে যেমন হয়ে থাকে, অর্থাৎ কি আর করা যাবে, ভগবান যখন চাইছেন, মরতে হবেই। ফাঁসির কয়েদীর পক্ষে এটা দাঁড়ায় অনেকটা এই রকম—ওরা আমাকে হত্যা করবেই। বেশ। করবে, করুক।

তৃতীয় দলে পড়ে সেই সমস্ত ফাঁসির কয়েদীরা—যারা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসই করে না যে তাদের বাস্তবিকই ফাঁসি হবে। যারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, উচ্চতর আদালতে প্রাণভিক্ষার আবেদন নিশ্চয়ই মঞ্জুর হবে।

চতুর্থত দেখা যায় ফাঁসির কয়েদীদের মানসিকতার একটা আকস্মিক পরিবর্তন। কেউ হঠাৎ নতুন কোনো ধর্মে দীক্ষিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কারো মধ্যে বা দেখা দেয় সাহিত্য বা দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে একটা উদগ্র আগ্রহ—অর্থাৎ তার নিজের যে ফাঁসি হতে চলেছে এই একটা ব্যাপার ছাড়া পৃথিবীর আর সমস্ত বিষয়েই সে আগ্রহশীল হয়ে ওঠে।

পঞ্চম বা শেষ দলে যারা পড়ে তাদের মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রাথমিক লক্ষণগুলি নিঃসন্দেহভাবেই দেখা দেয়। এরা মনে করে যে, তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন যথাসময়েই মঞ্জুর হয়ে গেছে, শুধু সেই খবরটা সরকারীভাবে জেলখানায় এসে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। খবরটা এসে পৌঁছুবে যে-কোনো মুহূর্তে। প্রাণদণ্ড মকুব হয়েছে যদিও (সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই) কিন্তু তার পরিবর্তে কি হলো? যাবজ্জীবন কারাবাস না কি পাঁচ বা দশ বছরের জেল? বে-কসুর খালাসের হুকুম হবার কি কোনো আশাই করা যায় না? এই শ্রেণীর ফাঁসির কয়েদীদের কারো কারো মনোবিকৃতিটা আবার এমন একটা অবস্থায় পৌঁছয় যে, আশেপাশের লোকজনকেই এরা শত্রু মনে করতে আরম্ভ করে। এরা প্রকাশ্যেই বলে থাকে যে, প্রাণদণ্ডের আবেদন মঞ্জুর না হয়ে থাকলেও হবে নিশ্চয়ই, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে আর কি হবে—জেলখানার লোকগুলি যা শয়তান, ওরা আমাকে হত্যা না করে কিছুতেই ছাড়বে না। প্রাণদণ্ডের আদেশ মকুব করে যে অর্ডার আসবে—সে কাগজখানা নিশ্চয়ই দেখি নি দেখি নি করে অন্য কাগজপত্রের তলায় চেপে রেখে এই পাজি লোকগুলি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে আমাকে—আর তারপর যখন সব জানাজানি হয়ে যাবে তখন এই বদমায়েসগুলি বলবে, আহা ভুল হয়ে গেছে। এ রকম কত ভুলই তো ওরা করে থাকে।

একবার ভাবুন, বাঁচবার জন্যে মানুষের কি সীমাহীন আকুতি!

—তীরন্দাজ

পাগলা কুকুর, সাবধান

পাগলা কুকুর! পাগলা কুকুর! পালাও, পালাও!

এ রকম চীৎকার পাড়ায় বা পল্লীতে আমাদের দেশের গ্রামে বা সহরে তো বটেই, পৃথিবীর অনেক দেশেই কমবেশি শোনা যায়। অসতর্ক পথচারী বা ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের যাঁরা এভাবে সতর্ক করে দিয়ে থাকেন, তাঁরা পরম উপকারই করে থাকেন বলতে হবে, কারণ পাগলা কুকুর বা শেয়ালের কামড় অনেক সময় মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়—আর সে মৃত্যুর যে যন্ত্রণা তা যাঁরা দেখেছেন কখনো, শুধু তাঁরাই জানেন কি ভয়ঙ্কর।

জলাতঙ্ক রোগ যে শুধু পাগলা কুকুর বা শেয়ালে কামড়ালেই হয় তা নয়, জলাতঙ্করোগগ্রস্ত গরু, নেকড়ে, কাঠবিড়ালী এমন কি সিংহের কামড়েও মানুষের বা অন্য যে কোনো জীবজন্তুর মধ্যেও জলাতঙ্ক রোগ সংক্রামিত হতে পারে। তবে গরুর জলাতঙ্ক রোগ কদাচিৎ হতে দেখা যায়। হলেও মানুষকে কামড়াবার সুযোগ তাদের কম। কিন্তু শেয়াল বা কুকুরের মধ্যে যখন জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়, তখন অল্প সময়ের মধ্যেই তা একটা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, পাড়াগাঁয়ে রাস্তার আশেপাশের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে অসতর্ক পথচারীকে কামড়ে যাওয়া, শেয়ালের পক্ষে খুবই সহজ হয়ে পড়ে। কুকুরের পক্ষেও ঠিক তেমনি। কুকুরের জলাতঙ্ক রোগের সঙ্গে আমরা সবাই বেশি হুঁসিয়ার। কারণ, সহরে এবং পাড়াগাঁয়ে কুকুর সর্বত্রই অবাধে ঘুরে বেড়ায়। সেইজন্যেই কুকুর সম্পর্কেই সতর্কতার প্রয়োজন সর্বাধিক।

জলাতঙ্ক রোগের বীজাণু যা খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দেখা যায় না—তা থাকে জলাতঙ্করোগগ্রস্ত কুকুরের লালার সঙ্গে মিশে। সেই জন্যেই দেখা যায় কাপড় বা প্যান্টের ওপর দিয়ে যদি কখনো কোনো পাগলা কুকুর কামড়ে দেয়ও তা, হলেও রোগটা খুব বেশি সংক্রামিত হতে পারে না—কখনো বা আদৌ সংক্রামিত হয় না। এমনিতেই কুকুরের স্বভাব সবকিছু কামড়ানো—জলাতঙ্ক রোগ হলে ঐ প্রবণতাটাই আরো বেড়ে যায়। এই রোগের কবলে পড়লে দেখা যায় মানুষেরও দু'রকম প্রতিক্রিয়া হতে থাকে। এক হলো পক্ষাঘাত—যেখানে কুকুর কামড় দিয়েছে

সেইখান থেকে পক্ষাঘাতের সূচনা হয় এবং তারপর ক্রমশ সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষাঘাতের লক্ষণ—এমন কি স্নায়ুকেন্দ্র, ফুসফুস এবং হার্টেও। তখনই মৃত্যু ঘটে। আর দ্বিতীয় রকমের প্রতিক্রিয়া হলো মুখ থেকে ফেনা বেরোনো, অল্প জ্বর, সবকিছু কামড়াবার একটা তীব্র ইচ্ছা, মাঝে মাঝে শরীরে খিঁচুনী, অল্প কথাতেই একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা, অথচ তারই সঙ্গে একটা দারুণ হতাশার ভাব। ক্রমাগত গলা শুকিয়ে আসা অথচ জলস্পর্শ করবার অনিচ্ছা। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, জলাতঙ্কগ্রস্ত মানুষের যদি দ্বিতীয় ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে, তা হলে তাকে সারিয়ে তোলা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু প্রথম ধরণের অর্থাৎ পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিলে তার রোগমুক্তি প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেইজন্যেই পাগলা কুকুরে কামড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া ভালো—আর সেই কুকুরটার দিকে নজর রাখা দরকার। কারণ জলাতঙ্করোগগ্রস্ত কুকুর সাধারণত অল্পদিনের মধ্যেই মারা যায়।

জলাতঙ্করোগগ্রস্ত কুকুর কামড়ালে মানুষের মধ্যে এ রোগ দেখা দিতে দশ দিন থেকে এক বৎসর পর্যন্ত সময় নিতে পারে—কিন্তু সেজন্যে অপেক্ষা না করাই ভালো।

ইয়োরোপ-আমেরিকার অনেক দেশ এবং এশিয়ার জাপানেও আজকাল কুকুরকে জলাতঙ্কনিরোধক টীকা দেওয়া হয়—যার ফলে ঐ সমস্ত দেশ থেকে এ রোগ একেবারেই নির্মূল হয়ে গেছে। আমাদের দেশেও যতদিন অনুরূপ বন্দোবস্ত না হচ্ছে, ততদিন দেখতে হবে একটি কুকুর পাগল হয়ে যাবার জন্যে হয় তো শত শত নীরোগ এবং নিরীহ কুকুরকে মিউনিসিপ্যালিটি বা করপোরেশনের পালোয়ান কর্মচারীদের বিশাল মুদ্গরের ঘা-তে খোলা রাজপথে প্রাণ দিতে হচ্ছে।

—দরদী

স্বামী-স্ত্রী, পৃথিবীর সামাজিক সম্বন্ধের মাঝে যে সম্বন্ধটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তারই নাম. এ সম্বন্ধে আবদ্ধ যুগলের মাঝে পারস্পরিক আচার-ব্যবহার কি ধরণের হওয়া উচিত, সে সম্পর্কেও বহুজনের বহুমত, তবে একটা বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, তাদের মধ্যে কোন আড়াল থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

সাদা কথায় স্বামী-স্ত্রীর কাছে কিছু গোপন করবে না, অপরপক্ষে স্ত্রীও নিজের হৃদয়খানি সর্বদাই বিশ্বস্তভাবে মেলে ধরবে স্বামীর কাছে, কিন্তু প্রশ্ন এই যে সেটা কি সত্যই খুব সুফলপ্রদ?

নীতিবিদদের ভ্রূ-কুঞ্চন সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, দাম্পত্যকে সফল করে তুলতে হলে দম্পতির মধ্যে কিছুটা আড়াল থাকা অত্যাবশ্যক।

ধরুন কোন স্বামী একটু অধিকমাত্রায় কোপনস্বভাব সে ক্ষেত্রে সংসারে শান্তি বজায় রাখতে হলে স্ত্রীর পক্ষে 'সদা সত্য কথা বলিবে' এ নীতিবাক্যটি সর্বদা অনুসরণ করাতে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট, এজন্য বুদ্ধিমতী পত্নীমাত্রই এ ক্ষেত্রে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' রূপ পন্থাটি অবলম্বন করে থাকেন আর তাতে যথেষ্ট উপকৃতও হন।

কিছু ঘটনা বা কিছু তথ্য পরস্পরের কাছে লুকোলে যদি সংসারের শান্তি অব্যাহত রাখা যায়, তবে সেটাই কর্তব্য নয় কি?

ধরুন কোন স্ত্রী দাবা বা তাসের বাজি খেলাটিকে একেবারেই পছন্দ করেন না অথচ স্বামী বেচারার যে সেদিকে শুধু আন্তরিক আকর্ষণই আছে তা নয় সন্ধ্যার সময় একবার ওই সবের আড্ডায় যেতে না পারলে মেজাজটাই যায় খিঁচড়ে—সে ক্ষেত্রে নিজের প্রিয় নেশাটি ত্যাগ করে বাড়িতে বসে বিশ্বস্তর মূর্তিধারণ করার চেয়ে একবাজি খেলে এসে প্রসন্নমুখে গিন্নীকে আপিসের কাজের পর্বত প্রমাণ ফাইলের হিসাব দাখিল করলে সাপও মরে লাঠিও ভাঙ্গে না; গিন্নী খুশি হয়ে ভাবেন আহা 'আমার ওঁনার' মত কাজের লোক আর কে, কর্তাও নেশার খোরাক জোটাতে থাকেন প্রসন্নচিত্তে; ফলে অবকাশকালীন অবসরটুকু দম্পতির কাছে হয়ে ওঠে মধুময়। অবশ্য এই আড়ালেরও রকমফের আছে কোন গর্হিত অভ্যাস বা কর্মকে লুকোনোর পেছনে নেই কোন যুক্তিই।

আবার দাম্পত্য সম্বন্ধে কোন আড়াল না থাকার আর একটা বিপজ্জনক দিকও আছে। দু'জন মানুষ ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বাস করতে করতে কোন আড়াল না থাকায় পরস্পর পরস্পরের কাছে আর দু'টো বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তা না হয়ে একটা সত্তায় পরিণত হয়। তাদের চিন্তা, সুখ, দুঃখ সবই একখাতে বইতে থাকে, আর এরই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পরস্পরের কাছে বোরিং বা একঘেয়ে হয়ে ওঠে, দাম্পত্য সম্বন্ধে ফাটল ধরাতে এর বাড়া বিপদ আর নেই। অতএব স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে কিছুটা আড়াল অবশ্য প্রয়োজনীয় বটে, তবে আগেই তো বলা হয়েছে যে এ আড়াল যেন দূষিত না হয়, আর এ আড়ালের উদ্দেশ্য যেন শুভ হয়।

'৭১ বসুমতী আষাঢ় :

স্বামীর অমতে পুত্র-কন্যার উচ্চশিক্ষার্থে কোন স্ত্রী যদি লুকিয়ে রসদ জোগান তবে পরিণতিতে তা সুফলই এনে দেয়, আবার ঠিক তেমনি যদি তাদের উচ্ছৃঙ্খলতার কড়ি গোপনে জোগান তাতে পরিণামে সর্বনাশই ঘটে থাকে।

সন্দেহ বা অবিশ্বাস দাম্পত্যের মস্ত বড় শত্রু, যে স্বামী স্ত্রীকে অবিরত সন্দেহ করেন বা যে স্ত্রী কর্মক্লান্ত স্বামী ঘরে পা দেওয়ামাত্রই তাঁকে শত-সহস্র জেরা করে বিধ্বস্ত করে দিতে প্রয়াসী হন, তাঁরা দু'জনেই অপরিণামদর্শী। এতে দু'জনেরই মন ক্রমে পরস্পরের উপর বিষিয়ে ওঠে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন অনেক দম্পতির ইতিহাস জানি, যাদের দাম্পত্য জীবনের বনিয়াদ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে পরস্পরের আড়াল ভাঙ্গার প্রচেষ্টায়।

অনেক সময় দম্পতির মধ্যে কোন একজন অপরের সম্বন্ধে এমন কোন তথ্য জানতে পারেন যা তখনও পর্যন্ত সেই ব্যক্তির নিজেরই থাকে অজানা, অথচ যা জানতে পারলে তাঁর মানসিক সুখ ও শান্তির চিরতরে অন্তর্হিত হওয়ার সম্ভাবনা, সেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর কর্তব্য কি?

নিম্নোক্ত কাহিনী থেকে এর সদুত্তর পাওয়া অসম্ভব নয়। এক শিক্ষক স্বভাবত অত্যন্ত ভাবপ্রবণ বা ঝুঁকি স্বভাবের মানুষ ছিলেন, সেই সঙ্গে দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড ভয়, স্ত্রীকে তিনি বহুবার বলেছেন যে, ও ধরণের কোন ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করে জীবনাবসান ঘটাবেন; দুর্ভাগ্যবশত তাঁরই দেহে দেখা দিল একদিন ক্যান্সার নামক ভয়াবহ ব্যাধির সূচনা; পারিবারিক চিকিৎসক বিষাদ-গম্ভীর মুখে স্ত্রীকে সংগোপনে জানালেন সে কথা।

ভয়বিহ্বলা হয়ে পড়লেও অসাধারণ স্থৈর্যের পরিচয় দিলেন ওই মহিলা সেদিন, তিনি জানতেন সে সময় স্বামী এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত আছেন, যাতে ব্যাঘাত ঘটলে তাঁর নাম, যশ ও আর্থিক সমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে চিরতরে, আর পত্নী এও জানতেন যে, কিছুতেই ওই ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি নেই ওঁর স্বামীর, চিকিৎসক নির্ধারিত সময়েই তাঁর মৃত্যু অবধারিত, সমস্ত বিবেচনা করে স্বামীকে অন্ধকারে রাখারই সিদ্ধান্ত নিলেন স্ত্রী। জোগালেন আশা-উদ্দীপনা স্বামীর অন্তরে, সযত্ন সেবায় সাহচর্যে মধুময় করে তুললেন স্বামীর গোণা দিনগুলিকে।

যথাসময়ে গ্রন্থ সমাপ্ত হল, যশের মালা দুললো শিক্ষকের গলায়, মৃত্যুও অবশ্য এল প্রায় তার অব্যবহিত পরেই, কিন্তু পূর্ণ চিত্তের আনন্দ স্বাদ থেকে বঞ্চিত হলেন না তিনি, আর সেটুকুই রইল পতিপ্রাণা মহিলাটির সম্বল।

আড়াল যে সব সময় অনাকাঙ্ক্ষিত নয় পরন্তু অভিনন্দনযোগ্য, উপরের ঘটনাটি তাই প্রমাণ করে না কি?

বিয়ের পরে যা সব ঘটে তা ছাড়া আরও অনেক ঘটনা থাকতে পারে প্রাক্-বিবাহিত জীবনের যা গোপন থাকলেই দাম্পত্যের কালটি হয় শান্তিপূর্ণ। এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকতে পারে স্বামী বা স্ত্রীর অবিবাহিত পর্যায়ে যা বিবাহের পর পরস্পরকে না জানানোই মঙ্গলজনক। ধরুন একটু-আধটু রোমান্স বা হাল্কা ধরণের প্রেমবন্ধনের ঘটনা তরুণ-তরুণী মাত্রেরই জীবনে এসে থাকে বা আসতে পারে, কিন্তু বিবাহের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সবের কোন অস্তিত্ব থাকে না, সে ক্ষেত্রে কবে কি ঘটেছিল সেসব বিশদভাবে পরস্পরের কাছে খুলে বলার সার্থকতা কি? লাভের মধ্যে মনে সন্দেহের বীজ রোপণ করা হয়ে যায় চিরতরে এবং মনোমালিন্যের সময় উভয়পক্ষই সেইসব অস্ত্রে পরস্পরকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেন, ফলে সামান্য দাম্পত্যকলহও চিরকালীন প্রথা অনুযায়ী লঘুক্রিয়ায় পরিণত না হয়ে কখনও কখনও চিরস্থায়ী বিদ্বেষ ও ঘৃণার সঞ্চার করে।

একটু আড়াল ভাল একথা অতএব অনস্বীকার্য সত্য, তবে আগেই বলা হয়েছে যে তার রকমফের আছে, প্রবঞ্চনার সঙ্গে এই আড়ালকে কেউ যেন গুলিয়ে না ফেলেন, কারণ প্রবঞ্চনা হীনতারই নামান্তরমাত্র এবং তার আশ্রয়ে কখনও কোন মানুষ সুখী হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন স্বামী যদি স্ত্রীর কাছে বাহাদুর বনবার আশায় নিজের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা বা উপার্জনকে অতিরঞ্জিত করে স্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন—তা হলে সুফলের বদলে কুফলই দেখা দেবার প্রভূত সম্ভাবনা।

একটা ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে স্ত্রী সেসব ক্ষেত্রে যেভাবে সংসার চালনা করেন তাতে পরিণামে সংসারের আর্থিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, কারণ আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে সংসার জীবনের ভিতশুদ্ধ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

সুখী দাম্পত্য জীবন ভোগ করতে হলে তাই প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীকে বুঝে নিতে হবে কোন কোন বিষয়ে একটু আড়াল রাখা উচিত আর কোন কোন বিষয়ে সেটা একান্ত অনিষ্টকর।

বুঝে চলতে পারলে একটু আড়াল দাম্পত্য জীবনকে সফল ও পূর্ণায়ত করে তুলবে নিঃসন্দেহে।

—শ্রীমতী

একপশলা বৃষ্টির পর

সলিল মিত্র

একপশলা বৃষ্টি হল—থমথমে আকাশটা উজ্জ্বল
সমস্ত দিনের পর; সমুদ্র হাওয়ার মিঠে স্বাদ;
সমুদ্র এতোই কাছে, শুনে তার ঢেউয়ের কল্লোল
খুশি-খুশি অনুভূতি, মুছে ফেলি সব অবসাদ!

আঙিনায় এসে বসি, চোখ বুজি, বাংলার আলো
চোখের তারায় কাঁপে, বিকেলের কৃষ্ণচূড়া লাল—
তারই এতো আলো না কি আমার দু'চোখেতে ছড়ালো?
আমার বুকের কাছে তুমি স্বপ্নে এসেছিলে কাল!

আর আজ—বৃষ্টি হলে আকাশ কি মেঘাচ্ছন্ন থাকে?
কাল স্বপ্নে এসেছিলে—আজ এলে বিকেলের ডাকে!

দস্তয়েভস্কির জীবনে নারীর প্রভাব

কালীপদ মণ্ডল

বিখ্যাত রাশিয়ান সাহিত্যিক দস্তয়েভস্কির জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে আমরা নারী-চরিত্রের বিশেষ কোনদিক সম্বন্ধে আলোকপাত করবার চেষ্টা করবো। আমরা বলি বা আমাদের এমন একটা ধারণাও আছে যে, আমাদের দেশের মেয়েরা সতী-সাধ্বী ও স্বামীগত-প্রাণা, কিন্তু আমাদের দেশের বাইরে বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতের মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অন্যরূপ। জীবনে বার বার নতুন স্বামী গ্রহণ ও বর্জন তাদের মধ্যে প্রায়শই ঘটে থাকে। পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার বিচারে তা নিন্দনীয় নহে, কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ ঘটনাকে কেহ সহজে বরদাস্ত করবে না। অধুনা অবশ্যি কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে, মানুষের মন ও রুচির বদল হয়েছে, আইনের বন্ধনও শিথিল হয়েছে। দস্তয়েভস্কির জীবনেও এমনি করে পর পর তিনটি মেয়ে এসেছিল। মারিয়া, অ্যাপোলিনারিয়া ও অ্যানা। মারিয়া বিবাহিতা ও এক সন্তানের মা, তার স্বামী মদ খেয়ে অধিকাংশ সময় বদ্ধ মাতাল হয়ে থাকত। মারিয়ার জীবন হয়েছিল তাই বিষময়। স্বামীর মৃত্যুর পর দস্তয়েভস্কি মারিয়াকে বিয়ে করেন। তাঁদের এই মিলন সুখের হয় নি। দস্তয়েভস্কি দীর্ঘ আট বৎসর সাইবেরিয়ার প্রচণ্ড শীতে বন্দিজীবন কাটিয়েছিলেন, ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তিনি বাত ও মৃগী রোগে আক্রান্ত হন। সংসারে খুব অভাব। মারিয়ার দেহে ক্ষয়রোগ দেখা দিল। কারো মনে শান্তি নেই। যখন অসুখ বাড়ে তখন তিনি মাসের পর মাস মারিয়ার সেবা করে যান। তখন তিনি স্বামী নন, লেখক নন—শুধু নার্স। এই সময় দস্তয়েভস্কির 'The Insulted and the Injured' উপন্যাসখানি তরুণসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। লেখক ছাত্রদের বৈঠকে প্রায়ই নিমন্ত্রিত হতেন।

এমনি এক বৈঠকে লেখকের সংগে অ্যাপোলিনারিয়ার আলাপ হয়। অ্যাপোলিনারিয়া তখন বাইশ-তেইশ বছরের ছাত্রী। সে দস্তয়েভস্কির সাহিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিল এবং জীবনে প্রথম তাকেই আত্ম-নিবেদন করতে প্রস্তুত হলো। লেখকও মুগ্ধ হলেন অ্যাপোলিনারিয়ার রূপে। অ্যাপোলিনারিয়ার সংস্কারমুক্ত মন। সে স্বেচ্ছায় চায় লেখককে জীবনে বরণ করে নিতে। হৃদয়ের সমর্থনই তার সবচেয়ে বড় সমর্থন। সমাজের কোন সমর্থনকে সে পরোয়া করে না। ওদিকে দস্তয়েভস্কির ঘরে চিররুগ্না স্ত্রী। অর্থ ও জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। অ্যাপোলিনারিয়ার আবির্ভাব লেখকের জীবনে নতুন আশার আলোকবর্তিকা তুলে ধরলো। অ্যাপোলিনারিয়ার সংগে দস্তয়েভস্কি ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি বহু দেশ ঘুরলেন। জুয়াখেলায় তাঁর দারুণ নেশা। অ্যাপোলিনারিয়া কতবার স্বামীকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে জুয়াখেলার জন্য। ধীরে ধীরে তার মন ভেঙে পড়লো। সে চেয়েছিল লেখককে জীবনে একান্ত করে পেতে, কিন্তু সে তা পায় নি। দস্তয়েভস্কির অর্ধেক মন পড়েছিল তাঁর রুগ্না স্ত্রী মারিয়ার প্রতি।

স্বচ্ছাকাশে আবার মেঘ দেখা দিল। অ্যাপোলিনারিয়া প্যারিসে একাকী এসে এক স্প্যানিশ যুবককে ভালবেসে বসলো। তার নাম সালভাদোর। সালভাদোর প্যারিসে এসেছিল ডাক্তারী পড়তে। প্যারিসে এসে দস্তয়েভস্কি যখন অ্যাপোলিনারিয়ার কাছে এই কথা শুনলেন তখন তাঁর মনে হলো পায়ের তলা থেকে যেন পৃথিবীটাই সরে গেল। মর্মান্তিক আঘাতে দস্তয়েভস্কি অ্যাপোলিনারিয়ার কাছ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিলেন। গোপনে অনেক অশ্রু বিসর্জন করলেন।

অ্যাপোলিনারিয়া সালভাদোরকে হৃদয় দিল কিন্তু সালভাদোর তা দেয় নি। স্প্যানিশ তরুণটি তাকে নিয়ে কয়েকদিন শুধু আমোদ করতে চেয়েছিল। এই চালাকী ধরা পড়লে অ্যাপোলিনারিয়া জীবনে প্রচণ্ড আঘাত পায়। সে আবার দস্তয়েভস্কির কাছে ফিরে এলো বটে, কিন্তু লেখককে এবার সে কোন তৃপ্তি দিল না বরং তাঁর জ্বালা আরো বাড়িয়ে দিল। কাছে থেকেও দস্তয়েভস্কি তাকে পান না। যা পান তাতে তাঁর তৃপ্তি মেটে না। সালভাদোর যে অপমান করেছে পৃথিবীর সকল পুরুষের উপর অ্যাপোলিনারিয়া যেন তার শোধ নিতে চায় দস্তয়েভস্কিকে তিলে তিলে যন্ত্রনা দিয়ে।

দস্তয়েভস্কির জীবনে আবার পটপরিবর্তন দেখা দিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। একখানি উপন্যাস লিখতে হবে! সময় অল্প। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা প্রকাশককে দিতে না পারলে তাঁর তিন হাজার রুবল ফেরত দিতে হবে প্রকাশককে। তাঁর এক বন্ধুর পরামর্শে তিনি এক তরুণী স্টেনোগ্রাফার নিযুক্ত করলেন। বিশ বছরের সুন্দরী তরুণী অ্যানা। অ্যানা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। দস্তয়েভস্কির অনেক বই সে পড়েছে। তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা। এবার তাঁর কাছে যাওয়ার সুযোগলাভে অ্যানা নিজেকে ধন্য মনে করলো। ১৮৬৬ সালের ৪ঠা অক্টোবর অ্যানা খাতা-পেন্সিল নিয়ে উপস্থিত হলো দস্তয়েভস্কির বাড়ি। ২৯শে অক্টোবর 'দি গ্যামলারের' নোট নেওয়া শেষ হলো। ছাব্বিশ দিনে অ্যানা প্রায় পঞ্চাশ হাজার শব্দ টুকে নিয়েছে। অ্যানা কয়েকদিন যাতায়াত করে বুঝতে পারলো বড় অভাবের সংসার। প্রায় প্রতিদিন ঘরের বাসনপত্র বন্ধক দিতে হয়। মাঝে মাঝে দস্তয়েভস্কি অ্যানার কাছে অনেক দুঃখের গল্প করেন আর বলেন যে, জীবনটা একরকম দুঃখ-কষ্ট ও রোগ-শোকের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। শেষ জীবনেও শান্তির কোন আশা নেই।

অ্যানা বললে—আবার বিয়ে করেন না কেন?

—কে আমাকে বিয়ে করবে? তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

কথাটি বলেই তিনি মনে মনে লজ্জিত হলেন। তিনি ভাবলেন—অ্যানা হয় তো এখনই রেগে যাবে। তা ছাড়া তাঁর বয়েসও পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গেছে, দেহের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে, স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে।

কি আশ্চর্য, অ্যানার মুখে বিষণ্ণতার পরিবর্তে প্রসন্নতাই ফুটে উঠলো। সে শান্তস্বরে বললে—আমি রাজি আছি।

১৮৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অ্যানার সংগে দস্তয়েভস্কির বিয়ে

'৭১ বসুমতী আষাঢ় :

হলো। মারিয়া ও অ্যাপোলিনারিয়ার কাছে দস্তয়েভস্কি যা পান নি, অ্যানার কাছে তা পেলেন। অ্যানা দেহ-প্রাণ সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছিল স্বামীকে। অ্যানা কোন যুবকের সংগে হেসে কথা বললে স্বামী ঈর্ষাবোধ করতেন। সে তারপর থেকে আর কারো সংগে সহজে মিশতো না। অ্যাপোলিনারিয়া হলে হয় তো স্বামীর ছোট মনের অভিযোগ তুলে ঝগড়া করতো. কিন্তু অ্যানার মুখে কোন অভিযোগ নেই, কোন দুঃখ নেই, সে স্বামীর সুখে সুখী, স্বামীর দুঃখে দুঃখী। সে স্বামীর ব্যক্তিত্বকে সর্বদা বড় করে দেখতে চায়। স্বামীকে দারিদ্র্যের জন্য সে কখনো জ্বালা দেয় নি, বরং তার অংশগ্রহণ করেছে; স্বামীর জুয়ার নেশা মেটাবার জন্য সে নিজের গায়ের অলঙ্কার খুলে দিয়েছে। অন্যায় জেনেও কখনও স্বামীর সংগে কলহ করে নি, বরং স্বামীকে জীবন দিয়ে ভাল বেসেছে। স্বামীর জীবনসত্তার সংগে নিজেকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছে। এমন সতী-সাধ্বী অ্যানা নারী সমাজে বড় বিরল। দেবদাসের চন্দ্রমুখীও অ্যানার কাছে ম্লান বলে মনে হয়। দস্তয়েভস্কি তাঁর Notes from the underworld—উপন্যাসের নায়কের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন: 'Love really consists of the right—freely given by the beloved—to tyranize over her.' ভালবাসা অত্যাচার করবার অধিকার দেয়—দস্তয়েভস্কি এই তত্ত্ব কার্যে পরিণত করতে পেরেছিলেন অ্যানার উপর। মারিয়া বা অ্যাপোলিনারিয়া এমনভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। তাই ছিল তাঁর অন্তর্জ্বালা!

শেষ জীবনে অ্যানা তাঁর সঙ্গিনী। তখন তাঁর ঘরে-বাইরে শান্তি। অ্যানা তাঁকে সন্তান উপহার দিল। তখন তিনি সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করলেন। তিনি মৃগী রোগ থেকে নিরাময় হলেন। দুঃখ ও আঘাতই শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা যোগায়। দস্তয়েভস্কির জীবনে তার দৃষ্টান্ত মেলে। তাঁর লিখিত Crime and Punishment, The Gambler, The Idiot প্রভৃতি উপন্যাসে মারিয়া ও অ্যাপোলিনারিয়ার চরিত্র মেলে কিন্তু কোথাও অ্যানার চরিত্র পাওয়া যায় না। অ্যানা তাঁর জীবনসত্তার সংগে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল বলে তাঁর রচিত সাহিত্যে অ্যানার কোন স্থান নেই।

নারীর মন বিচিত্র। দস্তয়েভস্কির জীবনে নারীর প্রভাব তাঁর রচিত সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলে তিনি নিট্শের মত নারীবিদ্বেষী নন। নারীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পরিচয় মেলে।

দার্শনিক জর্জ সান্তায়ানা

অধ্যাপক কমলাপতি দে

'প্রত্যেক জিনিসের একটা প্রাকৃত ভিত্তি আছে এবং প্রত্যেক প্রাকৃত জিনিসের আদর্শ পরিবৃদ্ধি আছে'—কথাগুলো বলেছেন বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ সান্তায়ানা।

জর্জ সান্তায়ানা ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে স্পেনের মাদ্রিদ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষার্থী আর শিক্ষকের জীবন তাঁর অতিবাহিত হয় আমেরিকায়, জার্মানীতে, ফ্রান্সে আর ইংলণ্ডে। শেষজীবন কাটে আমেরিকায় এবং মারা গেছেন ইতালীর রোমে অষ্টাশি বছর বয়েসে।

দর্শনের অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা যদিও ছিল জর্জ সান্তায়ানার জীবনব্রত, তবু একথা বলা যায় যে, তিনি ছিলেন সাহিত্যিক; প্রায় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'দি লাস্ট পিউরিট্যান' (১৯৩৫) তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করেছে বললে ভুল বলা হবে না। এমন কি জীবনের একেবারে শেষদিকে তিনি রাজনীতির চর্চাও করেছিলেন; তাঁর রাজনৈতিক গ্রন্থের নাম, 'ডোমিনেশন এণ্ড পাওয়ারস্'। প্রথম জীবনের কবিতা লেখার স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত আগে প্রকাশ করেন 'দি লাইফ অব রিজন'; এই গ্রন্থ পাঁচটি খণ্ডে সমাপ্ত। এই গ্রন্থই তাঁকে এনে দেয় খ্যাতি, এনে দেয় মর্যাদা, যে খ্যাতি আর যে মর্যাদা অংশত সাহিত্যিক, অংশত দার্শনিক। পাঠকজগৎ এই গ্রন্থেই দেখতে পেলেন সান্তায়ানার দার্শনিক ও সাহিত্যিক স্বরূপ। কিন্তু সাহিত্যিক কলাকুশলতা যতই থাকুক, জর্জ সান্তায়ানা মূলত দার্শনিক।

দর্শনতত্ত্বে সান্তায়ানার বক্তব্য হিন্দু দর্শনের 'বিশ্বই ব্রহ্ম'-এর মতো কতকটা শোনালেও কিছুটা নতুনত্ব আছে। তিনি বলেন, জগৎ দু'টো নয়, জগৎ একটা এবং আমরা যদি তা না ভাবতে পারি তা হলে আমরা ভুল করবো। তিনি বলেন...to double the world would unspiritualise the spiritual sphere; to double the truth would make both truths halting and false,...একটা মাত্র জগৎ, এই মর মর্ত্য আর অদ্বিতীয় সত্য, যেখানে a spiritual life possible in it, which looks not to another world but to the beauty and perfection that this world suggests, approaches and misses.

অবশ্য একথা তিনি স্বীকার করেন যে, আমাদের সকল কর্মপ্রেরণা আসে অন্য লোক থেকে, আমাদের নিজেদের হাতে-ছুঁতে-পাওয়া সত্তার বাইরে থেকে, আর সেইটেই তো সকল বস্তুর উৎস-নির্ঝর। সান্তায়ানার এই কথায় আমরা পাই যে, তিনি জড়চেতনার সংগে অধ্যাত্মচেতনার একাঙ্গীকরণ করছেন এবং কবি আর মিস্টিক যেন মিশে গেছে তাঁর মধ্যে। তাঁর 'কবিতা ও ধর্মের ব্যাখ্যা' নামক প্রবন্ধ সংকলনের কথা এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর কাছে কবিতা ও ধর্ম প্রায় সমার্থক, প্রভেদ যেটুকু আছে সেটুকু ব্যবহারিক কার্যকলাপের সংগে তাদের যোগ-বিয়োগের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, তাঁর বক্তব্য. কবিতা তখন ধর্ম হয়ে দেখা দেয় যখন জীবনের ক্ষেত্রে কবিতা প্রবেশ করে; আর ধর্ম যখন জীবনে অস্থিরতা আনে তখন তা কবিতা ছাড়া আর কি-ই-বা। 'রিজন ইন্ রিলিজিয়ন' গ্রন্থে ধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, ধর্ম তখনই নীতিবাক্য হয়ে দাঁড়ায় যখন ধর্ম

ceases to represent or misrepresent material conditions and has learned to embody material goods.

নিজের সম্বন্ধে সান্তায়ানা একাধিক বক্তব্য রেখে গেছেন, তাঁর দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনায় সেগুলো কাজে লাগে। এক স্থানে তিনি বলেছেন, আমি যদি মানবীয় ভাবে ভাবতে না পারি, তা হলে কিছুই ত' ভাবতে পারবো না। তাঁর 'দি রিল্‌ম্‌স্‌ অব বীয়িং' পড়লে বোঝা যাবে তাঁর অধ্যাত্মচিন্তার ধারা কি রকমের ছিল। জড়বাদকে একেবারেই অবজ্ঞা করে যদি অন্ধ অধ্যাত্মবোধ প্রশ্রয় পায়, তা হলে গোড়াতেই যে ভগবদ্বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা হতে পারে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস ও ঘোষণা। বস্তুই তো ব্রহ্মের মূল এবং মূলই মাত্র, সেইটেই বা অস্বীকার করি কি করে। উপরি উক্ত গ্রন্থের অন্যতম খণ্ড 'দি রিলম্‌ অব স্পিরিট'-এ এই কথা বলেছেন। সান্তায়ানা তাঁর এই বক্তব্যকে বিজ্ঞানীদৃষ্টিসুলভ বলে দাবী করেন নি, বরং বলেছেন, এ-ও একটা লোকধর্ম, এ-ও মন ও হৃদয়ের একটা শিক্ষণ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে জার্মান কবি রিল্‌কের কথা; তিনি ধর্ম বলতে বুঝেছিলেন হার্ট-ওয়র্ক। সে যা হোক, একটা জিনিস বিশেষভাবে বলা দরকার যে, সান্তায়ানাকে অসীম আর নিত্যতা খুব একটা পেয়ে বসে নি। আত্মা তাঁর কাছে শুধু আত্মা নয়, জীবাত্মা, জীব ও আত্মা। আত্মার অবস্থান সেই সমস্ত মানবদেহে যে, bodies breeding a thousand passions and diseases by which the spirit also is formented, so that it congenitally longs at first for happiness and at last for salvation.

সান্তায়ানা বলতে চেয়েছেন যে, এই আত্মা মানবের নৈতিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জন্মলাভ করে এবং জীবদেহকে সে অস্বীকার করতে পারে না, জীব ও জীবন বাদ দিয়ে আত্মা কল্পনাতীত। এই আত্মার নিজস্ব কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই বলে তিনি মনে করেন। এ যেন 'চলিতে চালাতে নাহি জানে।' তবে এর জন্ম সম্ভব কি করে? তার উত্তরে সান্তায়ানার বক্তব্য হলো জনৈক সমালোচকের ভাষায়, Is itself created or evolved by the psyche, which he (সান্তায়ানা) defines as the organic life of the body; এবং এই সত্তা বা আত্মার স্বপ্ন হলো সচ্চিদানন্দ ও সর্বজ্ঞ হওয়ার, আর যদি সে স্বপ্ন সফল না হয় তা হলে সে-আত্মা সজীব থাকে না। এই বক্তব্যের ভিত্তিতে বলতে পারি, সান্তায়ানা নৈতিক চরিত্রের দিকে প্রচণ্ড জোর দিয়েছেন, দার্শনিক দৃষ্টিভংগীটিকে মোটামুটি অবহেলা করেছেন এবং আরও বলা যায়, নীতির কথা উঠছে বলে অ-নৈতিক আর দুর্নীতির কথাগুলো মনে না এসে পারছে না। আরও বলা চলে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি সৎ পথ-বিচ্যুত। জন ডিউই বলেছেন, আমেরিকার কাছে তাঁর সবচেয়ে বড় দান হলো, নৈতিক দর্শন। তিনি নিজেও তা বলেছেন।

সান্তায়ানা আরও বলেছেন 'রিজন ইন্‌ কমনসেন্সে'র ভূমিকায় যে, এই নৈতিকদর্শন কখনই বিজ্ঞান নয়; এবং তা নয় বলেই তাঁর মতে, দার্শনিকরা স্ব স্ব জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মুখপাত্র ছাড়া বেশি কিছু নয়। এইজন্যেই সম্ভবত দার্শনিক স্পিনোজাকে তাঁর আদর্শ মনে হয়েছে। কারণ, স্পিনোজা মানুষকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন প্রকৃতির কাছে, স্বভাবের কাছে এবং তাকে সকল নৈতিক মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু করতে চেয়েছেন। যাবতীয় নীতিবাদীদের প্রতি তাঁর সমানুভূতি পাই এই কারণে। আরও, তিনি বলেন, বাদ-বিসংবাদ কূটতর্কের যুগ গত হয়েছে, এখন হলো ব্যাখ্যানের যুগ এবং ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে, গ্রীকরা পুরাকালে যে আদর্শের যে সংস্কৃতির পোষকতা করে গেছেন তাতে আজকের চেয়েও জীবন ছিল সহজ, ব্যক্তিমানুষ ছিল মুক্ত, স্বাধীন। সান্তায়ানার যুক্তি হয়ত দৃঢ়, কিন্তু আমরা সন্দিগ্ধচিত্ত হয়ে পড়ি। এইরকম একটা নীতিবাদী-আদর্শ তাঁর মনে সব সময়ে ছিল বলে তাঁর দার্শনিক ইতিহাস 'দি লাইফ অব রিজন' হয়ে উঠেছে তাঁরই ভাষায়, Retrospective Politics.

জর্জ সান্তায়ানা শুধু হাওয়াই তর্কের দার্শনিকতা করেন নি, তাঁর যোগ ছিল বস্তুর সংগে, যে-বস্তু বস্তুর নিজের জন্য সত্য আর সত্য পারিপার্শ্বিক অবস্থানের দিক থেকে। সমাজের সংগে সান্তায়ানার যে যোগ ছিল সেটা বোঝা যায় রাজনীতি, শিল্প, যুদ্ধ, বন্ধুত্ব প্রভৃতি সাংসারিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর মত ও মন্তব্য প্রকাশে। দেশপ্রেম সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য আরও অনেক বিষয়ে তাঁর মন্তব্যের মতো বিস্ময়কর। দেশপ্রেম বলতে তিনি বুঝেছেন, দেশপ্রেম জন্মায় আকস্মিকভাবে, এবং দেশপ্রেম হলো কল্পনাপ্রবণ আবেগমাত্র।

সান্তায়ানার কলা-শিল্প সম্বন্ধীয় পুস্তক 'দি রিজন ইন আর্ট' নীতিবাদী-দর্শনের আর এক প্রকাশ। মহাকবি দান্তে, গ্যেটে, সেক্সপীয়ার প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য কবি-নাট্যকারদের সম্বন্ধে তাঁর মতামত যেমন নতুন তেমন জীবন্ত। নিজের সম্বন্ধে বিংশশতাব্দীর এই প্রকৃতিবাদী-নীতিবাদী দার্শনিকটি যে-কথা বলে গেছেন সেই কথাগুলো দিয়েই তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হবে। তিনি বলেছেন, আমার প্রকৃতিবাদ বা জড়বাদ পাঠ্যপুস্তকধৃত বিদ্যা নয়: উনিশ শতকের জড়বাদেরও অবশেষ নয়, যখন কি না সমস্ত দর্শনের অধ্যাপকরা ছিলেন ভাববাদী; এ প্রাত্যহিক বিশ্বাসে উদ্ভাবিত।···আমার অনুভূতি ও আবেগের ভিত্তিতে পাওয়া। আমার মনে হয় যারা বস্তুবাদী নয়, তারা নিজেদের ভালো করে চিনতে পারে না। ভাবুক হিসেবে নিজেদের হয় ত' তারা জানে, কিন্তু নিজেরাই যে কাজ করে যায়, যে উপলব্ধি করে যায়, তা তারা লক্ষ্য করতে পারে না, কারণ, কাজ আর অনুভব বস্তুর আকস্মিক প্রক্ষেপ। (এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব মাই ওপিনিয়ন) দার্শনিক তত্ত্ব সাধনায়—সান্তায়ানার এইটেই ছিল পুঁজি এবং এর ভিত্তিতে তাঁর যে যুক্তি, সে যুক্তি বুদ্ধি কল্পনার সংমিশ্রণজাত হলেও ভাববাদী সান্তায়ানার দার্শনিক ও সাহিত্যিক মতামত নিয়ে আলোচনা করার আছে, কারণ, তিনি বস্তুবাদী হতে চেয়েও বস্তুবাদী নন, ভাববাদ আর মিস্টিসিজমে তাঁর সমান অনীহা, নীতিবাদে গভীর আস্থা, অথচ তিনি বলবেন—To love things as they are would be a mockery of things; a true lover must love them as they would wish to be.

'৭১ বসুমতী আষাঢ়

৭০

রামচন্দ্র নীলাচল ছেড়ে চলে গেল।

এদিকে গোপীনাথ সম্বন্ধে ঘোর দুঃসংবাদ এসে পৌঁছুল। রাজা প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র তাকে 'চাঙ্গে' চড়িয়েছে।

তার মানেই গোপীনাথকে রাজাদেশে হত্যা করা হবে।

'চাঙ্গে চড়ানো' মানে মঞ্চে তোলা। মঞ্চের নিচে ধারালো খড়্গ পাতা আছে, তার উপরে গোপীনাথকে ফেলা হবে মঞ্চের থেকে। গোপীনাথ দু'-টুকরো হয়ে যাবে।

রায়-ভবানন্দের ছেলে আর রায়-রামানন্দের ভাই, গোপীনাথ কী অপরাধ করেছে?

প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠা প্রদেশের শাসনকর্তা গোপীনাথ। প্রজাদের কাছ থেকে যথারীতি খাজনা আদায় করছে, কিন্তু রাজার প্রাপ্য কর ষোল আনা জমা দিচ্ছে না। বাকি পড়ে-পড়ে দু'লক্ষ কাহনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হুকুম হলো বকেয়া বাকি শোধ করে দাও। কোত্থেকে দেবে? গোপীনাথ বললে, নগদ নেই, যদি সময় পাই জিনিসপত্র বেচে দিয়ে দেখতে পারি। দশ-বারোটা ঘোড়া আছে, আপাতত তাই নিতে পারো।

তাই সই, কিন্তু ঘোড়াগুলোর দাম কত হবে?

রাজপুত্র নিজে এল দাম কষতে। তার মুদ্রাদোষ ছিল, কথা বলতে ঘাড় বাঁকায়। থেকে-থেকে মুখ উঁচু করে।

সে একটা অকথ্য দাম বললে।

'এত কম?' দারুণ বিরক্ত হল গোপীনাথ। ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললে, 'আমার ঘোড়া তো ঘাড় বাঁকায় না, উর্ধ্বমুখেও থাকে না। তাই মাপ করুন, পারব না বেচতে।'

রাজপুত্র ভীষণ ক্রুদ্ধ হল। রাজার কাছে গিয়ে লাগাল অনেকখানি করে।

'ছল করে টাকা দিচ্ছে না। রাজকোষের প্রাপ্য অর্থ আত্মসাৎ করেছে।' বললে রাজপুত্র, 'অনুমতি করুন ব্যাটাকে চাঙ্গে চড়াই।'

রাজা বললে, 'প্রাপ্য আদায় করতে যা ভালো মনে করো তাই করো।'

আর কথা নেই, মঞ্চে তুলেছে গোপীনাথকে। মঞ্চের নীচে খড়্গ পাতা।

সবাই প্রভুকে ধরল, 'এখন আপনি যদি রক্ষা করেন তবেই গোপীনাথ বাঁচে।'

'রাজার ন্যায্য প্রাপ্য দেয় নি, রাজা যদি শাস্তি দেয় তা হলে তাকে মন্দ বলতে পারো না।' প্রণয়-রোষে বললেন প্রভু, 'রাজার জিনিস নিজে খেল, নৃত্য-গীতে অপব্যয় করল, এ তার কেমন দায়িত্ববোধ? একে তোমরা সমর্থন করো কী করে?'

এমন সময় একটা লোক ছুটতে-ছুটতে এসে বললে, 'শুধু গোপীনাথকে নয়, তার ভাই বাণীনাথকেও চাঙ্গে তুলেছে।'

প্রভু উদাসীন রইলেন। বললেন, 'রাজা সর্তমত তার নিজের প্রাপ্য আদায় করে নেবে, আমি নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী, তাতে আমার কী করবার আছে?'

স্বরূপ দামোদর ও অন্যান্য পার্ষদেরা কাকুতি করে

বললে, 'রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠীবর্গ সকলেই আপনার অনুগত। তাদের এই সঙ্কটে আপনার এ ঔদাস্য উচিত নয়।'

'তবে তোমরা কি বলতে চাও আমি রাজার কাছে গিয়ে গোপীনাথের জন্য দয়া ভিক্ষা করব।' ক্রুদ্ধ হলেন প্রভু, 'আঁচল পেতে কাহন মেগে নেব? আর রাজার কাছে সন্ন্যাসীর দাম কী? পাঁচ গণ্ডার সন্ন্যাসীর প্রার্থনায় দু'লক্ষ কাহন ছেড়ে দেবে?'

আরো একজন ছুটে এল।

'এক্ষুনি—এক্ষুনি গোপীনাথকে খড়্গের উপর ছুঁড়ে ফেলবে। প্রভু, তাকে বাঁচান।'

প্রভু বললেন, 'আমি ভিক্ষুক, আমার থেকে কিছু হবার নয়। তবে যদি তাকে বাঁচাবার ইচ্ছে তোমাদের সত্যিই হয়ে থাকে, তবে তোমরা সকলে মিলে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করো। জগন্নাথই ইচ্ছাময়, করণ-অকরণের নিয়ন্তা তিনি।'

'ঈশ্বর জগন্নাথ—যাঁর হাতে সর্ব অর্থ।
কর্তুমকর্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥'

তক্ষুনি জগন্নাথ মন্দিরের সেবক হরিচন্দন পাত্র এসে হাজির। সে নিজের থেকেই চলল রাজার কাছে। গিয়ে বললে, 'গোপীনাথ তোমার সেবক তার প্রাণদণ্ড নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। প্রাণ নিলে কি দেনা শোধ হয়ে যাবে? রাজকোষের ঘাটতি মিটবে? বরং ন্যায্য দামে ঘোড়া কিনে নাও, দেখ কতটা উঠে এল। বাকিটা না হয় আস্তে আস্তে দিয়ে দেবে। প্রাণ নিলে সুরাহাটা কোথায়?'

'সত্যি প্রাণ নিয়ে কী হবে?' রাজাও যুক্তির পথে এল: 'আমার ধনের প্রয়োজন। বেশ তো যাতে প্রাপ্যটা পাই তুমি তার ব্যবস্থা করো।'

হরিচন্দন ছুটে এল রাজপুত্রের কাছে। রাজার কথাটা বললে বুঝিয়ে। বেশ তবে তাই হোক। যথার্থ মূল্যে ঘোড়া দাও আর বাকি টাকা মেয়াদি কিস্তিতে পরিশোধ করো।

এদিকে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ বাণীনাথকে যখন বেঁধে নিয়ে গেল তখন সে কী করল, কী বলল?'

যে দেখেছে সে বললে, 'বাণীনাথ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলতে লাগল। দুই হাতের আঙুলে সংখ্যা রাখছে, সহস্র পূর্ণ হলে দাগ কাটছে গায়ে।'

প্রভু আনন্দ করে উঠলেন।

কাশী মিশ্র এলে বললেন, 'আমার আর এখানে থাকা চলবে না। ভবানন্দ রায়ের বৃহৎ গোষ্ঠী, প্রায় সবাই রাজকার্য করে। কে কখন অন্যায় করে রাজার বিত্ত আত্মসাৎ করবে, রাজা দণ্ড দেবে, আর আমাকে তখন ডাকবে সেই দণ্ড মুকুবের সুপারিশের জন্যে, সে অসহ্য। আমি তাই ভাবছি আলালনাথে যাব। এখানে বিষয়ীদের বচসা শুনতে আমার প্রবৃত্তি নেই।'

'তুমি এতে ক্ষুব্ধ হচ্ছ কেন?' বললে কাশী মিশ্র, 'যে বিষয়ের জন্যে তোমার কাছে আসে সে মহামূর্খ। তোমার জন্যে রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ করল, সনাতন বিষয় ছাড়ল, রঘুনাথ পথের ভিখিরি হল। গোপীনাথও তোমার কাছে বিষয়বাঞ্ছা করে নি, সে তোমার কাছে চায় নি প্রাণভিক্ষা। ভক্তরা নিজের প্রেরণাতেই এসেছে, তোমাকে এসে বলেছে। যে শুদ্ধ-ভক্ত সে তোমার জন্যেই তোমাকে ভজনা করে, সুখ-দুঃখ যা আসে তাই মাথা পেতে নেয়। তুমি এখানেই থাকো। কেউ আর তোমাকে বিষয়কথা বলবে না।'

প্রতাপরুদ্র এল। যতদিন সে নীলাচলে থাকে ততদিন প্রত্যহ এসে সে কাশী মিশ্রের পা টিপে দেয়। সেদিনও টিপছে, কাশী মিশ্র সমস্ত প্রকাশ করল। বললে, 'প্রভু গোপীনাথের উপর ভীষণ রুষ্ট হয়েছেন। বলছেন, রাজার থেকে মাইনে পায়, আবার কি না রাজার ধনই চুরি করে। রাজার দ্রব্য আত্মসাৎ করে আমার কাছে কি না রাজার বিচারের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। আমি আর এই বিষয়ী সঙ্গে থাকব না, আলালনাথে চলে যাব। এখন বলো, প্রভুকে কী করে ঠেকাই?'

প্রতাপরুদ্র মরমে মরে গেল। বললে, 'সমস্ত প্রাপ্য আমি ছেড়ে দেব, প্রভু শুধু নীলাচলে থাকুন।'

কাশী মিশ্র বললে, 'প্রাপ্য ছেড়ে দেওয়ায় প্রভুর সমর্থন নেই।'

'না, না, আমি প্রভুর দিকে তাকিয়ে ছাড়ব না, ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য, তার ছেলেরা আমার প্রীতিভাজন সেই জ্ঞানেই ছাড়ব। তুমি প্রভুকে আটকাও।'

গোপীনাথকে ডাকাল রাজা। তাকে সম্মানের শিরোপা পরিয়ে দিল, বললে, তোমার সমস্ত ঋণ

'৭১ বসুমতী আষাঢ় :

মকুব করে দিলাম। মালজাঠার শাসনভার তোমার উপরেই রইল। আর রাজার ভাণ্ডার যাতে না লুঠতে হয় তোমার মাইনে দ্বিগুণ করে দিলাম।

কোথায় মঞ্চে তুলে খড়্গে ফেলে প্রাণ নিচ্ছে, তা নয়, উল্টে সমস্ত প্রাপ্য ছেড়ে দিল। শুধু তাই নয়, মাইনে দ্বিগুণ করল, পরিয়ে দিল সম্মানের শিরবস্ত্র।

কাশী মিশ্র এসে নিবেদন করতেই প্রভু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি এ কী করলে? রাজার নিকট থেকে আমাকে দান গ্রহণ করালে?'

কাশী মিশ্র হকচকিয়ে গেল।

'গোপীনাথ আমার সেবক, তাকে কৃপা না দেখালে আমি অসন্তুষ্ট হব, তারই জন্যে রাজার এই অনুগ্রহ। তা হলে এ প্রকারান্তরে আমাকেই দান করা হল!'

'তোমার মুখ চেয়ে গোপীনাথকে কৃপা করে নি রাজা,' বললে কাশী মিশ্র, 'ভবানন্দের পুত্ররা তারা প্রিয়পাত্র এই জ্ঞানেই সে বদান্য হয়েছে। সুতরাং তোমাকে রাজদান গ্রহণ করতে হয় নি।'

রাজার আন্তরিকতায় প্রভু আনন্দিত হলেন।

পঞ্চ পুত্র সহ ভবানন্দ প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ হল। বললে, 'আপনার কৃপাতেই গোপীনাথের প্রাণরক্ষা হয়েছে। শুধু প্রাণরক্ষা নয়, পদোন্নতি হয়েছে। রামানন্দ আর বাণীনাথ আপনার চরণ আশ্রয় করে নির্বিষয় হয়েছে, বাকি ছেলেগুলোকেও আপনার পদপ্রান্তে রেখে যাব।'

প্রভু ঈষৎ হেসে বললেন, 'সবাই বৈরাগী হলে তোমার বহু কুটুম্বকে খাওয়াবে কে?' উপদেশ করলেন: 'রাজার প্রাপ্য ধনকে নিজের প্রাপ্য ধন বলে বিবেচনা কোরো না। আর অসদ্ব্যয় কদাচ নয়।'

বর্ষান্তরে গৌড়ীয় ভক্তের দল আবার আসে প্রভুকে দেখে যেতে। অদ্বৈত আচার্য, আচার্যরত্ন আচার্যনিধি তো বটেই, নিত্যানন্দ পর্যন্ত, যাকে কি না বলা আছে, এসো না, গৌড়ে থেকেই প্রেমভক্তি প্রচার করো। কিন্তু অনুরাগ অনুরোধ মানে না, প্রাণের টানে সমস্ত বিধি-বন্ধন ছিঁড়ে যাই। কতদিন গৌরকে দেখি নি, কতদিন পাই নি তার সঙ্গসুধা, তাকে ভালোবেসেই তার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি।

অনুরাগ কাকে বলে? যাকে সর্বদা অনুভব করা সত্ত্বেও মনে হয় আগে আর কখনো অনুভব করি নি, যাকে প্রতিমুহূর্তেই নবীন হতে নবীনতর মনে হয় তাই অনুরাগ।

'অনুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের কারণে॥'

যেমন গোপীরা করেছিল। রাস-রাত্রে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পাগলের মত বেরিয়ে এলে কৃষ্ণ তাদের আদেশ করল ঘরে ফিরে গিয়ে পতিসেবা করতে। কৃষ্ণানুরাগে সে আদেশ তারা অগ্রাহ্য করলে। বললে, যা হবার হোক, আমরা তোমার সেবা-সঙ্গ ত্যাগ করব না।

কৃষ্ণের আদেশ যে তারা অমান্য করল তাতে কৃষ্ণ কি সুখী না বিরক্ত? সুখী, যেহেতু আজ্ঞাভঙ্গের পিছনে যে অধিকতর অনুরাগ। কৃষ্ণ যে অনুরাগের বশীভূত।

'আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যতেক পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিগুণ সুখপোষ॥'

ভক্তদলের মধ্যে আছে রাঘব পণ্ডিত, সে আবার ঝালি সাজিয়ে নিয়ে আসছে। তার বোন দময়ন্তী দিয়েছে ঝালি সাজিয়ে। আমসি, আচার, কাসুন্দি, শুকনো কুল, রুখা-শুখা কত কী খাদ্যদ্রব্য, চিঁড়ে মুড়ি খৈ থেকে সুরু করে নাড়ু, গঙ্গাজল, কর্পূর-এলাচ পর্যন্ত। ঝালির উপরে মোহরের ছাপ দিয়ে দেওয়া। প্রকাণ্ড ভার, 'বোঝারি' বা মুটে তিনজন। মৌসিন বা মুনসিব বা ঝালির রক্ষক মকরধ্বজ।

ভক্তরা নরেন্দ্রসরোবরে মিলিত হয়ে প্রভুর সঙ্গে জলকেলি করল। আরেকদিন জগন্নাথের শয্যোত্থানের সময় বেড়াকীর্তন চালাল। সে কী হুঙ্কার-গর্জন-নর্তন-লম্ফন।

'কীর্তন-আটোপে ধরা করে টলমল'।

সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য হচ্ছে—অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, অচ্যুত, শ্রীবাস, সত্যরাজ আর নরহরি এই সাতজনে সাত সম্প্রদায়। প্রভু সকল সম্প্রদায়েই ভ্রমণ করছেন অথচ প্রতি সম্প্রদায়ই ভাবছে প্রভু শুধু আমার দলেই আবদ্ধ আছেন।

'হে সর্বচিত্তবিমোহন জগন্নাথ, তোমার নির্মঞ্ছন যাই, তোমার চন্দ্রবদন দেখে মন প্রমত্ত হয়েছে।' ওড়িয়া পদকর্তার এই কথা কয়টি প্রভুর মনে পড়ল, স্বরূপকে বললেন তা গেয়ে শোনাতে।

আনন্দসাগর উথলে উঠেছে। যারা দেখছে-শুনছে,

ভুলে গেছে দেহ-গেহের কথা। বেলা তৃতীয় প্রহর হল তবু নৃত্যের শেষ নেই। ভক্তদল শ্রান্ত হয়ে পড়ল। তখন ভক্তশ্রমের কথা শুনে প্রভু নিবৃত্ত হলেন।

স্নানাহার শেষ করে প্রভু গম্ভীরার দ্বার জুড়ে শুয়ে রইলেন। প্রভু শুলে গোবিন্দ প্রভুর পদসেবা করে এই নিয়মই চলে আসছে। এখন দ্বারজোড়া হয়ে পড়ে থাকলে গোবিন্দ ঢোকে কী করে? গোবিন্দ বললে, 'একপাশ হও, আমি ভিতরে যাই।'

প্রভু বললেন, 'আমার নড়বার শক্তি নেই।'

'তোমার পা টিপব যে।'

'তার আমি কী জানি!'

গোবিন্দ তখন তার বহির্বাস প্রভুর পায়ের উপর বিছিয়ে দিল, যেন তার পায়ের ধূলো না তাঁর গায়ে পড়ে। তারপর প্রভুকে লঙ্ঘন করে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে প্রভুর কটি পিঠ টিপে দিতে লাগল। মধুর মর্দনে শ্রান্তি দূর হল প্রভুর, নিদ্রাকর্ষণ হল।

দণ্ড দুই পরে জেগে উঠে প্রভু দেখলেন গোবিন্দ তখনো বসে আছে। ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'এখনো বসে আছ কী। খেতে যাও নি?'

'কী করে যাই?' গোবিন্দ বললে কাতরমুখে, 'দরজায় শুয়ে আছ, পথ কই?'

'ভেতরে এসেছিলে কী করে? সেই ভাবেই যেতে পারতে না?'

'যাব তো খাবার জন্যে।' গোবিন্দ মনে-মনে বললে, 'তোমার সেবার জন্যে শ্রীঅঙ্গ লঙ্ঘন—অপরাধ করেছি, শাস্তি যদি কিছু থাকে সহ্য করব হাসিমুখে। কিন্তু নিজের উদরপূর্তির জন্য সে অপরাধ করব এ আমার ধারণার অতীত।'

বাইরে স্তব্ধ হয়ে রইল গোবিন্দ। ভগবৎসেবী ভক্তের মনের কথা প্রভু নিজেই বুঝবেন ঠিক-ঠিক।

গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে প্রভু আবার গুণ্ডিচা-গৃহের ক্ষালন-মার্জন করলেন, বাগানে বন্যভোজন করলেন, রথের সামনে নৃত্য করলেন, দেখলেন কৃষ্ণজন্মযাত্রা।

ভক্তদের ইচ্ছে হল প্রভুকে খাওয়াই।

'গোবিন্দ, এ প্রসাদটুকু রাখো, প্রভুকে খেতে দিও।' কেউ পেঁড়া দিয়ে গেল, কেউ নাড়ু, কেউ পিঠে।

'অমুকে এটা দিয়ে গেলেন।' প্রভুকে জানায় গোবিন্দ।

প্রভু বলেন, 'ধরে রাখো।'

কত আর ধরবে! ধরতে-ধরতে ঘরের কোণ ভরে গেল। প্রায় শতজনের ভক্ষ্য স্তূপীকৃত হয়ে উঠল।

'আমার প্রসাদ প্রভুকে খাইয়েছ তো?' ভক্তের দল আবার খোঁজ করতে আসে।

'আমার মণ্ডা? সরভাজা?'

এটা-ওটা অন্য কথা বলে পাশ কাটায় গোবিন্দ।

'ভক্তদের আর কত বঞ্চনা করব?' গোবিন্দ একদিন প্রভুর কাছে গিয়ে দুঃখ জানাল: 'খাচ্ছ না অথচ খাদ্য সঞ্চিত হয়ে আছে, এ-কথা গোপন করে রেখে আর কত আমার অপরাধের বোঝা ভারী করব?'

'তোমার আবার অপরাধ কী!' প্রভু হাসলেন: 'তুমি তো আদিবশ্য, অনাদিকাল থেকে আমার বশীভূত। নিয়ে এস কে কী খাবার দিয়ে গেছে! নাম ধরে ধরে নিবেদন করো।'

একে একে সকলের দেওয়া খাবার প্রভুর সামনে জড়ো করতে লাগল গোবিন্দ। বাসি-বিস্বাদ মানলেন না, শতজনের ভক্ষ্য প্রভু একদণ্ডে খেয়ে ফেললেন। জড়বস্তুই পচে, চিন্ময়বস্তু পচে না। মহাপ্রভুর প্রসাদ চিন্ময়বস্তু।

'আর কিছু আছে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রভু।

গোবিন্দ বললে, 'রাঘবের ঝালি আছে।'

'আজ থাক। পরে একদিন দেখা যাবে।'

পরে একদিন খোলা হল রাঘবের ঝালি। সমস্ত দ্রব্যেরই কিছু-কিছু প্রভু উপভোগ করলেন এবং তা প্রায়ই, এবেলা ওবেলা। ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য উপভোগ না করে উপায় কী। তারপরে ঘরে রান্না করেও অন্নব্যঞ্জন খাওয়াতে লাগল ভক্তেরা।

শিবানন্দ সেনও নিমন্ত্রণ করল।

বড় ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে দেশ থেকে, প্রভুর কাছে আনতেই প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নাম?'

'চৈতন্যদাস।' ছেলে উত্তর করল।

'এ আবার একটা কী নাম রেখেছ!'

'যে বোঝবার সে বুঝবে।'

গুরুভোজন করাল শিবানন্দ। গুরুভোজনে প্রভু বিশেষ প্রসন্ন হল না।

যে বোঝবার সে বুঝেছে। চৈতন্যদাস বুঝেছে। সে আরেকদিন নিমন্ত্রণ করল প্রভুকে। আর প্রভুর

কী রুচিকর তা বুঝে নিয়ে তেমনিধারা ব্যবস্থা করল। শাক শুকতো ফুলবড়া দধি নেবু।

প্রভুর পরিপূর্ণ সন্তোষ হল। ভুক্তাবশেষ চৈতন্যদাসকে দান করলেন।

হরিদাসকে রোজ মহাপ্রসাদ পৌঁছিয়ে দেয় গোবিন্দ। একদিন গিয়ে দেখে হরিদাস শুয়ে-শুয়ে নাম করছে। বললে, 'ওঠো, প্রসাদ এনেছি।'

হরিদাস বললে, 'আজ আমি উপবাস করব।'

'সে কি ?'

'জানো আজ আমার সংখ্যাপূরণ হয় নি। সংখ্যাপূরণ না হলে কী করে ভোজন করি ?' হরিদাস অস্থির হয়ে উঠল : 'এদিকে মহাপ্রসাদকেও বা কী করে প্রত্যাখ্যান করি ?' মহাপ্রসাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে তার এককণা গ্রহণ করল হরিদাস।

এই ভাবে নিজের ভজননিষ্ঠা ও মহাপ্রসাদ দুয়েরই মান রাখল।

পরদিন প্রভু নিজে এসে উপস্থিত হলেন।

'কেমন আছ হরিদাস ? সুস্থ তো ?'

'শরীর সুস্থ আছে, মন-বুদ্ধিই অসুস্থ।' বললে হরিদাস।

'কেন কী ব্যাধি হল ?'

'নামসংখ্যা পূর্ণ হচ্ছে না প্রভু।'

প্রভু মমতামাখানো স্বরে বললেন, 'এখন বৃদ্ধ হয়েছ, নামসংখ্যা কমিয়ে দাও। তা ছাড়া তুমি সিদ্ধভক্ত, তোমার আর সাধনের প্রয়োজন কী! মায়াবদ্ধ জীবকে হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করবার জন্যেই তোমার আসা, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। জগতে নামের মহিমা তুমি যথেষ্ট প্রচার করেছ। এখন বার্ধক্যের দরুন নামসংখ্যা কমে গেলে কী আসে-যায় !'

হরিদাস বললে, 'প্রভু, আমি সিদ্ধদেহ ভগবৎ-পরিকর নই। আমি সাধারণ জীব, হীন জাতিতে আমার জন্ম, আমার এ দেহও নিন্দনীয়। আমার দ্বারা কিসের লোক-নিস্তার কিসের নাম-প্রচার! রৌরব নরক থেকে তুমিই আমাকে বৈকুণ্ঠে তুললে। তুমিই স্বেচ্ছাময় ঈশ্বর, তুমিই জগৎ নাচাচ্ছ। তাই তুমি আমাকেও নাচালে, ম্লেচ্ছ হয়ে ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র খেলাম। আমার শুধু এক সাধ, যেন তোমার আগে আমার শরীর পড়ে। বুকে তোমার পাদপদ্ম ধরব, নয়নে চাঁদমুখ দেখব আর জিহ্বায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম উচ্চারণ করতে-করতে চলে যাব। তোমার কৃপা হলেই আমার এ বাঞ্ছাসিদ্ধি ঘটে।'

প্রভু বললেন, 'তোমার প্রার্থনা কি কৃষ্ণ অপূর্ণ রাখতে পারেন ? কিন্তু তোমাকে নিয়েই আমার সমস্ত সুখ, আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া কি তোমার উপযুক্ত হবে ?'

'তুমি কী যে বলো! আমার মত একটা পিপীলিকা মরে গেলে এ পৃথিবীর কী ক্ষতি! তুমি ভক্তবৎসল। কিন্তু আমি কি ভক্ত ? না, আমি ভক্তাভাস। আমার বাহ্যিক আচরণ ভক্তের মত কিন্তু আমার অন্তরে কোথায় ভক্তি ? তবু তুমি কৃপা করলে অধমের অধম ইচ্ছারও পূরণ হতে পারে। আজ যাও, বেলা অনেক হয়েছে, কাল প্রাতে জগন্নাথদর্শনের পর আবার এসো।'

হরিদাসকে আলিঙ্গন করে প্রভু মধ্যাহ্নকৃত্য করতে চলে গেলেন।

পরদিন ভোর হতেই ভক্তদের নিয়ে তাড়াতাড়ি হরিদাসের কুটিরে এসে উপস্থিত হলেন। শুধোলেন, 'সংবাদ কী ?'

হরিদাস বললে, 'এখন আপনার কৃপা।'

হরিদাসকে মাঝখানে রেখে মহাসঙ্কীর্তন আরম্ভ হল। প্রভু পঞ্চমুখে হরিদাসের গুণবর্ণনা করতে লাগলেন, সকলে গুণসৌরভে মোহিত হয়ে গেল।

তুমি আমার সামনে এসে বোস। তোমার বদন-পদ্মে আমার নেত্রভৃঙ্গ দু'টি স্থাপন করি। আর তুমি তোমার পা দু'খানি আমার হৃদয়ের উপর রাখো। আর বৈষ্ণবভক্তদের পদরেণু আমার শিরোভূষণ হোক।

অঙ্গন থেকে বৈষ্ণবচরণের ধূলি হরিদাস মাথায় তুলে নিল। 'বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি।' প্রভু চরণ বুকে ধরে বারে বারে বলতে লাগল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আর এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলতে-বলতেই পড়ল শেষনিশ্বাস।

এ ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। মহাযোগেশ্বরের নির্য্যাণ। মন-প্রাণ কৃষ্ণে নিবিষ্ট করে নিষ্পলকচোখে কৃষ্ণকে দেখতে দেখতে ভীষ্ম যেমন মহাপ্রয়াণ করেছিল এ-ও সেই তিরোধান।

হরিদাসের দেহ কোলে তুলে নিলেন প্রভু।

প্রেমাবিষ্ট হয়ে নাচতে লাগলেন অঙ্গনে। আর-আর ভক্তরাও নাচতে লাগল। নামকীর্তনের তুফান ছুটল।

রথে করে হরিদাসের দেহ নিয়ে যাওয়া হল সমুদ্রে। স্নান করিয়ে তাতে প্রসাদচন্দন মাখানো হল। ভক্তরা পাদোদক খেল।

প্রভু বললেন, 'সমুদ্র মহাতীর্থ হয়ে গেল।'

প্রসাদী বস্ত্রে ঢেকে হরিদাসের দেহকে সমুদ্রতীরে বালুকা-গর্ভে সমাধি দেওয়া হল। হরি বোল, হরি বোল বলে প্রভু শ্রীহস্তে বালি তুলে দিতে লাগলেন। সমাধির উপর বেদী বাঁধিয়ে দেওয়া হল। এবার হরিধ্বনি-কোলাহলে গগন-ভুবন পরিপূর্ণ করে দাও।

সিংহদ্বারে প্রভু নিজে এসে আঁচল পেতে দাঁড়ালেন। হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসবের জন্যে প্রসাদ দাও পসারীরা।

অঢেল আসতে লাগল। যে দেখে সেই পাঠায়, যে শোনে সে-ও।

ভক্ত ভক্ত। তার জাতি-কুল নেই, পণ্ডিত-বেত্ত নেই, তার দেহ পরমপাবন, তা সমস্ত স্থানকে তীর্থান্বিত করে। আর যা আগের থেকেই তীর্থ হয়ে আছে তাকে মহাতীর্থে পরিণত করে।

সবাই আকণ্ঠ ভোজন করলে। প্রভু দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে খাওয়ালেন। আর বললেন, নাম-মহিমার প্রকাশক ও প্রচারক হরিদাসের জয় দাও সকলে।

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসি শিরোমণি॥
শেষকালে দিল তারে দর্শন-স্পর্শন।
তারে কোলে করি কৈল আপনে নর্তন॥
আপন শ্রীহস্তে তারে কৃপায় বালু দিল।
আপন প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান।
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল পয়ান॥

[ক্রমশ।

অনন্য-সংহিতা

করুণাশংকর মজুমদার

'In memory of some who are dead
Some who live and some yet unborn.'
—*Lushun.*

একটি বহতা নদী, নিরুদ্বেগ
হঠাৎ জোয়ার আনে
একটি তরণী ইতস্তত।

আমরা সূর্যমুখী নিম্নগা সমীপে
আর্তির আগুনে পুড়ে—সাহারা পেরুই
(যেহেতু সম্বদর কিছু)

যদিও রুদ্রাক্ষ গলার নির্মম তরঙ্গ আক্রোশ
কারো করতালি শ্রবণ ব্যথিত করে।

ঢেউ আনে ঢেউ ভাঙ্গে গড়ে যায়
অনন্য-সংহিতা
তার স্বাদ তরঙ্গের তার সুর তরঙ্গের
তার গান আকাশময় বেহাগ-মূর্চ্ছনায়
কখনও প্রখর হয় অথবা মন্থর।

তীক্ষ্ণ বেদনা বৃন্তে জাগুক জিজ্ঞাসা:
এই সব আয়ুধ উদবাহু কিসের প্রত্যয়ে।

মলিন সত্তা

সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

তমসাগহন নির্জনতায় ব্যথিত মনের বাস;
অন্ধবধির পরিবেশ হতে আসে মৃত নিশ্বাস
বহু বাসনার সমাধি রচনা করে চলি দিনরাত,
চরম ক্ষয়ের আলেখ্য আঁকে নিঠুর নিপুণ হাত।

শিশুর নিটোল মুখে এঁকে চলি ম্লান মৃত্যুর রেখা,
উজ্জ্বল তার স্বপ্নিল চোখে উদ্বেগ যায় দেখা।
যৌবনময় তরুণচিত্তে আতংক ফেলে ছায়া;
পূর্ণ জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টানে মন নির্মায়া।

কলুষ কঠোর বর্তমানের প্রেম পংকিল আমি—
অন্ধকারের অতলান্তেই দ্রুতপদে যাই নামি।
পুণ্য আলোকরাশির পরশে মলিন সত্তা কাঁপে,
পৃথিবীকে তাই পূর্ণ করেছি নিকষকৃষ্ণ পাপে।

শুধু পরিবেশ স্মরণসীমার বাহিরে বিলীন হলে
তীক্ষ্ণ চেতনায় ভবিষ্যতের সত্য-সাধনা চলে;—
তখন কবরে সবুজ ঘাসের স্বপ্ন চক্ষে আসে,
মনের মলিন পর্দা সরায়ে কচি শিশুমুখ হাসে।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সপ্তমোঽনুবাকঃ

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ,— তদ্‌ব্রতম্‌······মহান্‌ কীর্ত্যা ॥

(অন্ন স্থূল,—তবু) অন্নের নিন্দা কোর না,—

এই তোমার ব্রত,

প্রাণই অন্ন, দেহের ভোগ,—দেহই প্রাণের প্রতিষ্ঠা।

আবার দেহই অন্ন,—প্রাণের ভোগ,—

প্রাণেই দেহের প্রতিষ্ঠা।

এই দেহপ্রাণকে, এই অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে,—

যিনি এমন করে জানেন,—মহান তাঁর প্রতিষ্ঠা।

তিনি পুত্রপশু ধনবান, অন্নবান ও অন্নভোক্তা।

ব্রহ্মতেজোদ্দীপ্ত তিনি মহান ;—

মহান তাঁর কীর্তি ॥ ৩৭

অষ্টমোঽনুবাকঃ

অন্নং ন পরিচক্ষীত, তদ্‌ব্রতম্‌······মহান কীর্ত্যা ॥ ৩।৮

অন্নকে উপেক্ষা কোর না,—

এই তোমার ব্রত।

জলই অন্ন,—আর জ্যোতি অন্নভোক্তা।

কারণ, জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত জলে।

(জলের মধ্যে জ্যোতি,—যেমন মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ ; আবার তেজের মধ্যে জল,—সূর্যালোকে যেমন মেঘের প্রতিষ্ঠা।)

যে কেউ এই অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন,—

তিনি অন্নাদরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

তিনি অন্নবান, অন্নভোক্তা,—

সন্তান ও পশুবান,—

ব্রহ্মতেজে মহীয়ান, কীর্তিবান তিনি ॥ ৩.৮

নবমোঽনুবাকঃ

অন্নং বহু কুর্বীত·········কীর্ত্যা ॥ ৩.৯

অন্নকে তুমি অনেক অনেক বাড়াও,—

এই তোমার ব্রত।

এই পৃথিবীই অন্ন।—আকাশের ভোগ।

আকাশে ধরার প্রতিষ্ঠা।

যিনি এই আকাশ পৃথিবীকে,—

এই অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন,

মহান তাঁর প্রতিষ্ঠা ;

তিনি অন্নবান, অন্নভোক্তা,—

পুত্র পশুধনবান,—

ব্রহ্মতেজোদ্দীপ্ত তিনি মহান,—

মহান তাঁর কীর্তি। ৩.৯

দশমোঽনুবাকঃ

ন কঞ্চন বসতৌ·········অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে ॥

তোমার কুটীরে বাসের জন্যে।

যে কোন অতিথি,—যখনি আসুক দ্বারে,

কখনোই তাকে দিও না ফিরিয়ে,—

এই হোক তব ব্রত।

(নিরলসে) তাই অন্ন যোগাড় কর,—

যেমন করিয়া পার!

ভালো ও মাঝারি, কিম্বা অধম,

যে বৃত্তি নিতে পার।

তাই দিয়ে তব অন্ন যোগাড় কর।

(দানের জন্যে, অতিথির তরে, অন্ন যোগাড় কর)

(দানের জন্যে, যে বৃত্তি নেবে)

তাতেই তোমার অন্নবৃদ্ধি হবে।

(কখনোই তাই ছেড়ো না কর্ম,—

আলস বিলাস বশে।)

* * *

অন্ন ব্রহ্ম। এই মন্ত্রগুলিতে যেভাবে অন্নের বিষয়ে বলা হয়েছে তাতে বেশ বোঝা যায় যে—সে যুগেও জীবনে অন্নের প্রাধান্য আজকের চেয়ে কিছু কম ছিল না। দেহকে তাঁরা তুচ্ছ করতেন না। তাঁরা জানতেন, দেহমন্দিরেই ঘরের পরে, ঘর পেরিয়ে, একেবারে অন্তরের সেই গর্ভ-গৃহে পৌঁছানো যায়, যেখানে চিদানন্দময়ের চিরন্তন আসন পাতা আছে।

তাই দেহকে রক্ষা করতে হবে ;—দেহ রক্ষার জন্যে চাই অন্ন। অন্নকে তুচ্ছ কোর না। অন্নকে আহরণ কর, উপার্জন কর ;—অন্নকে অনেক অনেক বাড়াও।

তাই তুমি নিশ্চেষ্ট থেকো না ;—যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করে উপার্জনের পথ করে নাও। সব সময়ে যদি শ্রেষ্ঠবৃত্তি না জোটে,—উপার্জনের পক্ষে সব কাজই সমান।

যুগ যুগ আগের ভাষা এবং ভঙ্গী দিয়ে ঋষি কবি এই অতি আধুনিক ভাবটাকেই কি বোঝাতে চেয়েছেন, যার নাম dignity of labour ? মনে হয়,—তখনো এ দেশে, আরামে এবং গরমে, আলস্যের বীজ ছড়ানো ছিল। এই অন্ন ও বৃত্তির উদ্দেশে অলসতার প্রতি ধিক্কার এবং কর্মের প্রশংসা মুখর হয়ে আছে।

অন্নের প্রয়োজন শুধু নিজের জন্যে নয়। সমাজের জন্যেও, অতিথির জন্যেও। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল যেই তোমার অতিথি হয়ে আসুক, কাউকেই ফিরিয়ে দিতে পারবে না। সবাইকেই শ্রদ্ধা করে আশ্রয় এবং খাদ্য দিতে হবে। তখনকার দিনে অতিথি সেবা গৃহস্থের অবশ্য পালনীয় ছিল ; না হলে প্রবাসী পথিকের অবস্থা কি হোত? তখন তো আর এত হোটেল ছিল না। গৃহস্থের ঘরেই পথিকের জন্যে আতিথ্যের ব্যবস্থা রাখতে হোত। কাজেই গৃহীর পক্ষে অন্ন উপার্জন অবশ্য কর্তব্য ও অলসতা সর্বতোভাবে ত্যাজ্য ছিল।

য এবং বেদ ক্ষেম ইতি বাচি·········বলমিতি বিদ্যুতি ॥

এ সব তত্ত্ব যে জানে, সেজন
সেই মত ফল পায়।
বাক্যে তিনিই কল্যাণকর।
প্রাণে ও অপানে যোগক্ষেমরূপে জীবন-ধারণ তিনি।
বাহুতে তিনিই কর্ম
এবং পদতলে তিনি গতি।
দেহের ছন্দে এই নিয়মেই—
ব্রহ্মের উপাসনা।

তারপরে শোন, বেদশক্তিতে তাঁরই স্বরূপের লীলা।

বৃষ্টিতে তিনি তৃপ্তির সুখ,—
বিদ্যুতে তিনি তেজ॥

* * *

ব্রহ্ম শুধু সর্বভূতান্তরাত্মাই নন,—তিনি সর্বস্বরূপও বটে। তিনি ছাড়া কিছুই কোথাও নেই। তাই এ দেহও ব্রহ্মময়। দেহরক্ষা করতেই হবে। দেহযাত্রার যা নিয়ম তা পালনের দ্বারাই ব্রহ্মের উপাসনা হবে। শুধু হাতজোড় করে থাকলেই পূজা হবে না!—হাতের যা করণীয়, তা করার দ্বারাই ব্রহ্মোপাসনা হবে। কাজেই তুমি এমন কথা বোল—যা শোভন এবং শুভকর। তোমার শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা জীবনকে ক্ষেমঙ্কর করে তুলো। বসে বসে মন্ত্র পড়লেই হবে না। হাত দিয়ে যেমন করতে হবে কর্ম—পা দিয়ে তেমনি হবে চলতে। তবেই তোমার অঙ্গে অঙ্গে ব্রহ্মোপাসনা সার্থক হয়ে উঠবে ;—

'বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি'।

২। আমার দেহের মধ্যে যেমন দেখছি তোমার বিচিত্র প্রকাশ—তেমনি আকাশে আকাশে দেখছি তোমার অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত অনঙ্গ, অনন্ত প্রেমের সঞ্চরণ। নিদাঘতাপে তপ্তধরায় তোমার বৃষ্টি আশীর্বাদের মত ঝরে পড়ে। আমার দেহমন তৃপ্তি ও আনন্দে পূর্ণ করে দেয়। আমার মাঠে মাঠে জেগে ওঠে শস্য।

আবার যখন মেঘে মেঘে ঘনিয়ে আসে দুর্দিন—আকাশের বিদ্যুৎ-ঝলকে দেখি তোমারই তেজের দীপ্তি। তোমার সৃষ্টিতেই তোমার পূর্ণ প্রকাশ, তাই বর্ষণের তৃপ্তি ও বিদ্যুতের দীপ্তিতে তোমারি প্রতীকোপাসনা ;—

'এই যে বাতাস দেহে করে, অমৃতক্ষরণ
এই তো তোমার প্রেম, ওগো, হৃদয় হরণ'॥
যশ ইতি পশুষু জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু,
................মানবান ভবতি॥

জীবকুলে যশ তিনি,
তারকার আলো তিনি,
পুত্রের মাঝে তিনি অমৃতের ধারা
কামনার ভোগে তিনি কামসুখ।
আকাশে আকাশে সর্বস্বরূপ তিনি।
সব প্রতিষ্ঠা তাঁহার মাঝারে,
এ কথা যে জানে,—সেই প্রতিষ্ঠাবান।
(বুদ্ধির জ্যোতি) 'মহঃ'রূপে তাঁরে যে জানে,
সেই তো অসীম মননবান॥

সকলের সব ভালোর মধ্যে ব্রহ্মেরই প্রকাশ। জগতে প্রত্যেকেরই একটা শ্রেষ্ঠ স্থান আছে। সেই শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যেই ব্রহ্মের প্রকাশ সবচেয়ে সত্য। তাই তারার মধ্যে তিনি আলো,—সন্তানের মধ্যে তিনিই চিরঞ্জীব। কামে তিনি প্রেম। আর বুদ্ধিতে তাঁরই জ্যোতির প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে গীতার বিভূতিযোগ তুলনীয় ;—

'আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাংরবিরংশুমান...।'
তন্নমিত্যুপাসীত নমান্তে.....যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ।
'নম' বলে তাকে যদি কেউ করে ধ্যান,—
সকল কাম্য তার কাছে নত হবে।
প্রভুরূপে যদি কেহ তাঁরে ডাকে।
শত্রুর শেষ রবে না॥
যে রয়েছে এই মানবের দেহে,
আদিত্যে আছে যে,—দু'জনেই এক জেনো।
(দ্বৈতবোধের অন্তরে আছে এক)॥ ৩১০৪

স য এবংবিদ অস্মাল্লোকাৎ·

যিনি এরকম উপাসক আর জ্ঞানী,
মৃত্যুর পরে এ লোক ছাড়িয়া তিনি,—
অন্নময়ের স্বরূপে মিশিয়া যান!—
তারপরে ধরে প্রাণময়রূপ,—
ভাসেন বাতাসময়।
সেথা হতে ফিরে মনোময় রূপে,
মননে প্রেরণা দেন।
পরে ধীরে ধীরে (প্রজ্ঞাস্বরূপে,)
বিজ্ঞানময় আত্মার রূপ নেন।
প্রজ্ঞা হইতে আনন্দরূপে, বিশ্বে সঞ্চরণ।
কামরূপ ধরে, এই সব লোকে চিত্রবিহার করে,—
ব্রহ্মের এই সমতাস্বরূপ সামগান
গেয়ে যান।—
হাআবু হাআবু।

* * *

এই বিরাট উপলব্ধিকে গান ছাড়া আর কিভাবে প্রকাশ করা যায়?—

আনন্দ রূপান্তরিত হচ্ছে সুরে,—আর বিশ্বের মর্মকোষ হতে জ্যোতির সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে আসছে গান—হা আবু হা আবু।

অহমন্নমন্নমন্নম। অহমন্নাদো......
য এবং বেদ ইত্যুপনিষৎ॥

আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন।
আমি ভোক্তা, আমি ভোক্তা, আমি ভোক্তা
আমি অন্ন ও ভোক্তার—(বিষয় ও বিষয়ীর)
মিলনকার। আমি মিলনকার, আমি মিলনকার।১
আমিই (সেই) প্রথমজ ;—
এই রূপারূপ জগতের,
এবং দেবতাদেরও পূর্ব হতে চলেছে,—
আমারি সঞ্চরণ
আমারি মধ্যে অমৃত প্রতিষ্ঠিত।

অন্নের রূপে, যে আমাকে দান করে,
অন্নার্থীর কাছে,—
সেইরূপে সে যে আমাকে রক্ষা করে —
যে করে না দান।—অন্নের রূপে
আমি তাকে গ্রাস করি।২
আমি এ ভুবন ঈশ্বররূপে নিরত শাসন করি।
সূর্যের মত প্রকাশ আমার।—
আমারো নিত্য জ্যোতি।
এই তো উপনিষৎ!
যে জানে এ বাণী (পরম মুক্তি তার)।

* * *

১। আমি অন্ন, আমি অন্নাদ; আমি ভোগ,—আমিই ভোগী। আত্মাই বিষয় এবং বিষয়ী এবং এই উভয়ের মিলনকার। অন্ন ও অন্নাদ,—বিষয় ও বিষয়ীর মিলনের দ্বারা যে শ্লোক, যে ছন্দ রচিত হয়েছে, যে চৈতন্যময় জীবদেহ সৃষ্টি হয়েছে, আত্মাই তার কারক।—রূপ, রূপবান ও রূপকার। আবার সেই আত্মার সার্বভৌমতার কথাই বলছেন ঋষি।

২। অন্নার্থীকে অন্ন দিলে আত্মাকেই রক্ষা করা হয়, যে আত্মা সর্বভূতে বিরাজিত। আত্মার কোন প্রকাশকেই বিনষ্ট করার অধিকার কারো নেই। দানের দ্বারাই অন্নকে যথার্থভাবে রক্ষা করা যায়, সঞ্চয়ের দ্বারা নয়। ভোগকে বাড়িয়ে তুললে আত্মারই অপর্যাপ্ত ক্ষতি। যে আত্মা মুক্তিপিয়াসী স্বার্থের বন্ধনে তাকে যত বাঁধবে, ততই সে অন্ধকারে হারিয়ে যাবে, ভোগের তলায় তলিয়ে যাবে। স্বার্থ যদি উল্টো কথা বলে,—দান করতে না দেয়, তবে সেই জমিয়ে-তোলা অন্নই একদিন তাকে গ্রাস করে;—তার আর মুক্তির উপায় থাকে না।

দানের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, স্বার্থ আপনাকে তার অন্তর্নিহিত মহৎ ঐক্য, তার মর্মগত আত্মস্বরূপের দিকে নিয়ত বয়ে নিয়ে যায়।

অনুবাদিকা—চিত্রিতা দেবী

দু'টি কবিতা

ওয়াল্ট হুইটম্যান

হে আত্মা—অসমসাহসী

হে আত্মা অসমসাহসী
আমার সাথে চল, ঐ অজানা দিগন্তে
যেখানে মাটি নেই, মাটি নেই, পথ নেই কোন—অন্বেষার
নেই কোন চিত্র দিগ্বিদিকের—প্রদর্শকও
না কোন কণ্ঠস্বর, মানবিক স্পর্শও নয়
ফোটা ফুল মুখ নেই, কোন চোখ, কোন ঠোঁট—
নেই সেই দেশে।
আমি জানি হে আত্মা তা নয়
তোমার আমার মধ্যে নিঃসীম শূন্যতা
অপেক্ষা করছে—অগোচর-স্বপ্নের দিগন্ত
—সেই সব অজানা দেশে।
যখন সেই সব বন্ধন শিথিল হবে—
সেই সব চিরন্তন বন্ধন ছাড়া—দেশ ও কালের
অন্ধকার নয়, পৃথিবীর আকর্ষণ, অনুভূতি—
সেই সই বাধ্যতা যা বাঁধবে না—আমাদের;
তখন আমরা বিদীর্ণ হব, ভেসে যাব
দেশ ও কালের মধ্য দিয়ে—হে আত্মা প্রস্তুত হও
সমসাজে—সজ্জিত হও অবশেষে (হে আবেগ!
হে অনন্ত!) পূর্ণতার পথে যাত্রা করো।
হে আত্মা—আত্মা আমার।

একদা এই জনারণ্য শহরের পথ বেয়ে চলে গেছিলাম

একদা এই জনারণ্য শহরের পথ বেয়ে চলে গেছিলাম
স্মৃতিতে ছাপ রেখে ছিল—তার প্রদর্শনী, স্থাপত্য
শুল্ক এবং ঐতিহ্য।
তবুও এখনও যেটুকু স্মৃতি আজও আছে—সে এক নারী
আকস্মিক যার দেখা, পথরোধ করেছিল
—ভালবাসায়।
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পার হয়ে গেছে—
আমরা ছিলাম একত্রে, সে ছাড়া আর সব গেছি ভুলে।
আমার মনে পড়ে, শুধু তাকেই দেখেছিলাম
সপ্রেম ধৈর্যে সে আমার পাশে ছিল
তবুও আমরা কথনো বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছি—
ভালোও বেসেছি,—সরেও এসেছি ফের
আবার সে আমার হাত ধরেছে—আমি
কোনদিন যাবো না আর সেই শহরে—
আজও আমি তাকে আমার পাশে সংলগ্ন দেখি
বিষণ্ণ নিঃশব্দ ঠোঁট দু'টি তার ব্যথায় কাঁপছে।

অনুবাদক—দেবী ভট্টাচার্য

লোকাতীত

সাধন তপাদার

বেল্লারি জঙ্গলের সন্ধানটা দিয়েছিলেন বুদরি সাহেব—আমার শিকার-গুরু জিঞ্জার বুদরি।

অনেকদিন আগেকার কথা সেটা। উনিশ শো' পঞ্চান্ন সালের কথা। আমি তখন বিলাসপুরে। প্যাসেঞ্জার ড্রাইভার বুদরি সাহেব তখন রিটায়ার করে বিলাসপুর রেল-কলোনির পাশে বাঁধোয়া তালাওয়ের পাড়ে বাড়ি কিনে স্থায়িভাবে বসবাস করছেন—সে সময়ের কথা।

খাস ইংরেজ ছিলেন বুদরি সাহেব। যেমন দুর্ধর্ষ শিকারী ছিলেন তেমন ছিল তাঁর লক্ষ্যভেদ। ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে যে কৃষ্ণসার হরিণ দৌড়ায়—তিনশ' গজ দূরে ধাবমান সেই হরিণের পালের উপর রাইফেল থেকে গুলীবর্ষণ করে বেছে বেছে এক-একটি করে ধরাশায়ী করতেন তিনি। রিটায়ার করার আগের বছর পর্যন্ত আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে শিকার করে বেড়িয়েছেন, আর সেই বুদরি সাহেব রিটায়ার করেই বাতে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। শুধু তাই না, ব্লাডপ্রেসার, হার্টের রোগ কত কি! তারপর দু'টো বছরও কাটল না, জিঞ্জার বুদরি ইহজগতের মায়া কাটালেন। বেঁচে থাকার কি আগ্রহ ছিল সাহেবের! আমাকে প্রায়ই বলতেন, ব্রাদার আমার পালসটা দেখত। বলে হাতটা বাড়িয়ে দিতেন। বলতেন, আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও খুব প্রখর। তিন-শ' গজ দূরে টার্গেট হিট করতে পারি। তোমার সঙ্গে একদিন ব্ল্যাকবাক্ (কৃষ্ণসার) স্যুটিং-এ যাব। দেখবে আমার থার্টি-থার্টির অগ্নিবর্ষণ। বলা বাহুল্য তিনি আর যেতেন না। সক্ষম ছিলেন না।

সুযোগ পেলেই বুদরি সাহেবের কাছে যেতাম। বড় ভালবাসতেন সাহেব আমাকে। আমাকে দেখলে কি খুশিই না হতেন বুড়ো। নিজের হাতে চা করে নিয়ে আসতেন। কখন প্যাটিস কখনও কেক খাওয়াতেন। আমাকে প্রায়ই বলতেন, তোমাকে বড় ভালবাসি ব্রাদার। আমার থার্টি থার্টি রাইফেলটা তোমাকেই দেব। দিয়েও ছিলেন। আমি জানতাম বুদরী সাহেব অন্তর দিয়েই আমাকে ভালবাসতেন। আর বুদরি সাহেবও কি জানতেন না যে কিসের টানে আমি বারবার তাঁর কাছে ছুটে যেতাম! দৈহিক অক্ষমতার জন্তে যে শিকার ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছিল—তার প্রকাশ বুঝি দেখতেন এক তিরিশ বছরের যুবকের মধ্যে। তাই আমাকে পেলে তিনি সব কাজ ফেলে শিকারের গল্পে মেতে উঠতেন। শিকারের অনেক অন্ধিসন্ধি তিনি জানতেন। বিচিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা—বিচিত্র সে-সব গল্প। মুখে মুখে এমন চমৎকার শিকার বর্ণনা করতেন আমি উদ্‌গ্রীব-বিস্ময়ে শুনতাম। শিকারের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি উনি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতেন আমাকে। আর কি রসজ্ঞান ছিল সাহেবের। ডোরাবাঘগুলিকে বলতেন 'সাওয়ার বাথ'। বলতেন, এল জি'র 'সাওয়ার বাথ' বড় টেরিবল থিঙ্গ ওর রেঞ্জের মধ্যে। চার্জিং টাইগারের মুখে, বুনো শুয়োরের পালের পিঠে ঘাঁষ আর হরিণের পালের মধ্যে মারতে এর জুড়ি আর নেই। বলতেন, গেম ইজ ইওর্স। প্রতিটি উপদেশ মূল্যবান, অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি। আমি বহুবার যাচাই করে নিয়েছি।

সেবার গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণসার শিকার প্রসঙ্গে বললেন, গো টু বেল্লারি। বেল্লারি জঙ্গলে যাও। বেল্লারি জঙ্গলের মাঝাতালাও আর সামান্তের চিতাওয়ারের বরণায় এ সময়ে বিস্তর জানোয়ারের

কৃষ্ণসার

আনাগোনা হয়। দেখবে স্পটেড ডিয়ারস এণ্ড ব্ল্যাক বাক্‌স—এক্স হাই এক্স সাম্বার (সম্বর)। ইউ উইল সি ওয়াইল্ড বোরস হেফটি এক্স বাফেলো। সন্ধ্যা হলেই মিছিল করে এসে এরা জল খেয়ে যায়। সন্ধ্যার আগেই তুমি মাঝাতালাওয়ের পাড়ে গর্ত খুঁড়ে বসে থাকবে। স্যুট স্ট্রেট অন দি ডেমেন থিংস্। ডোণ্ট হেজিটেট—গিব এ সাওয়ার বাথ। তারপরই বললেন, বাট্ বিওয়ার! চিতাওয়ারে কখনও রাতে যাবে না।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন সাহেব?

বুদরি সাহেব বললেন, স্যাটন এ ব্লাডি হণ্টেড প্লেস্।

মানে?

মানে বনদেও আছে, স্পিরিট্ আছে।

আমি কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে বুদরি সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। শেষে বললাম, তা হলে তুমিও এসবে কান দাও সাহেব!

বুদরি সাহেব বললেন, শুধু কানই দিই না ব্রাদার, বিশ্বাস করি। ঐ বনদেও-ও বিশ্বাস করি, ভূত-প্রেতও বিশ্বাস করি। ঐ চিতাওয়ারেই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে। তা হলে বলি শোন।

বুদরি সাহেবের বাগানের এককোণে চেয়ার-টেবিল পেতে মুখোমুখি বসে আমরা। অভ্যেসমতো আজও তিনি হুইস্কির বোতল আর গেলাস নিয়ে বসেছেন। সন্ধ্যা তখন উতরে গেছে। আকাশে তারাগুলো একে একে ভিড় জমাচ্ছে, সামনে বিশাল বাঁধোয়ার জলে তার আভাস পাচ্ছি।

বুদরি সাহেব গেলাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নিয়ে বললেন, সে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কথা। বিলাসপুর রেল-কলোনিটায় তখন খানকয়েক কোয়ার্টার ছিল মাত্র। ঐযে আর টি এস্ কলোনিটা দেখছ—ঘরে ঘরে বিজলী বাতি জ্বলছে, আর পানদীর ওপারের শালের জঙ্গলটা ঐখানে গিয়ে শেষ হয়েছিল। আর তোমার কোয়ার্টারের পিছনে পলাশ জঙ্গলের যে ছোট ক্যুপটা আছে সেটার বিস্তার ছিল দু' মাইল দূরের হরদি গাঁ থেকে তোমার ঘরের সামনে লোকোশেডটা পর্যন্ত। আজ না হয় জঙ্গলটা কাটাকুটো হয়ে আবাদ হচ্ছে, নয় ত' ঐ জঙ্গলেই আমি বিস্তর ব্ল্যাকবাক আর ওয়াইল্ড বোর মেরেছি। চুচাইয়া পাড়ার দক্ষিণে নতুন যে ট্রানস্পোর্টেশন কলোনিটা হয়েছে ঠিক ঐখানেই আমি একবার পর পর দু'টো ওয়াইল্ড বোর মারি। সে এক দিনই গেছে। ওল্ডেন ডেইজ ওয়্যার গোল্ডেন, ব্রাদার। যাক সে কথা। বলে, বুদরি সাহেব গেলাসের তরল পদার্থটা গলাধঃকরণ করে নিয়ে বলতে লাগলেন—

সে সময় বেল্লারি এলাকায় একটা নরখাদক প্যান্থার উপদ্রব করে বেড়াচ্ছিল। গভর্নমেণ্ট ও স্থানীয় জমিদারের তরফ থেকে ঐ প্যান্থারটাকে মারবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। দু'মাসের মধ্যে ঐ প্যান্থারটা জনা পনেরোকে মেরে ফেলল—এণ্ড ভেরি স্ট্রেঞ্জ—সবগুলোই মেয়েছেলে! ঐ চিতাওয়ারের ঝরণায় জল আনতে গিয়ে মরল কয়েকটা। উপায় ছিল না তাদের। গ্রীষ্মের শেষদিকে চিতাওয়ারের আশেপাশের গাঁগুলোর সমস্ত জলাধার শুকিয়ে যায়। জল থাকে শুধু চিতাওয়ারে। কেসুদা, নওয়াগাঁ আর সিমুর্গাঁয়ের লোকেরা দু'-তিন মাইল পথ হেঁটে এসে চিতাওয়ার থেকে জল নিয়ে যায়। আজও তাই।

বেল্লারি, কেসুদা, সিমুর্গা আর নওগাঁয়ে একেরপর এক শিকারীরা এসে ভিড় করে। কেউ কেউ প্যান্থার মারার অজুহাতে এসে হরিণ-শুয়োর মেরে সরে পড়ে। কেউ কেউ প্রকৃতই চেষ্টা করে। আমিও বার-কয়েক চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্যান্থারটা আমাদের ফাঁকি দিয়ে তার মানুষ-মারা অব্যাহত রাখল। বেল্লারি জঙ্গলের আশেপাশের গাঁয়ে বস্তিতে বিভীষিকা বিরাজ করতে লাগল। কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে যায় না, চিতাওয়ারের জল আহরণ মধ্যাহ্নে সমাপ্ত হয়। বেল্লারি চিতাওয়ারের অরণ্যপথ পরিত্যক্ত হয়ে সেখানে নতুন ঘাস গজাতে থাকে। এ পর্যন্ত বলে বুদরি সাহেব গেলাসে একটু হুইস্কি ঢেলে আবার বলতে লাগলেন—

সে-বছর গরমটা একটু তাড়াতাড়িই পড়েছিল। ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি থেকেই কুয়ো-নালার জলে টান ধরল। মার্চের প্রথম সপ্তাহে একদিন সকালে আমার শিকারী দুখীরাম এসে বলল, মাঝাতালাওয়ে বিস্তর শুয়োর পড়ছে, গেলে হয়। ঠিক হ্যায়, চলো, বলে, দুখীরামকে নিয়ে একটা মালগাড়িতে হাতবন্দ স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। বেল্লারি গাঁয়ে এসে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা চারটে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গোছগাছ করে দুখীরামের ঘর থেকে সবে বাইরে পা দিয়েছি, গাঁয়ে একটা সোরগোল শুনলাম। সে সব ভ্রূক্ষেপ না করে আর কয়েক পা এগুতেই জায়গায় জায়গায় লোকের জটলা দেখলাম, উত্তেজিত হয়ে কি সব আলোচনা করছে। হঠাৎ দূর থেকে আমাকে দেখেই একদল লোক হল্লা করতে করতে ছুটে এল

শিঙেল চিত্রল হরিণ

হাঁপাতে হাঁপাতে একজন বলল, সাহাব, জলদি চিতাওয়ারে যাও! এই কিছুক্ষণ আগে একটি মেয়েছেলেকে কেন্দুয়ায় (চিতাবাঘ) মেরে দিয়েছে! আমি আর বাক্যব্যয় না করে দুখীরামকে নিয়ে চিতাওয়ারের দিকে রওনা হলাম। ছ' মাইল রাস্তা—চিতাওয়ারে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। গিয়ে দেখি লাঠি-সোঁটা, বাতি-মশাল নিয়ে বহুলোক সেখানে পৌঁছে গেছে। তারা মৃতদেহটা নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছে—বাঁশের খাটুলি তৈরি হচ্ছে। আমাকে দেখেই সসম্ভ্রমে সব পথ ছেড়ে দিল। মৃতদেহটা ঝরণার পাড়ে রক্তাক্ত শাড়িটায় ঢাকা ছিল। দুর্ঘটনার সাক্ষী কয়েকজন গ্রামবাসী বলল যে, তারা দুপুরবেলা ঝরণায় স্নান সেরে যার যার পাত্রে খাবার জল ধরে নিয়ে যখন দলবদ্ধ হয়ে ফিরছিল, তখনই ঘটনাটা ঘটে। মেয়েছেলেটি এমনিতেই বড় লাজুক ছিল, তাই সবার পিছনে সে জলের ঘড়া মাথায় নিয়ে আসছিল। হঠাৎ জলপূর্ণ ঘড়ার পতনশব্দে সকলে পিছন ফিরতেই দেখল—প্যান্থারটা মেয়েছেলেটির ঘাড় কামড়ে ধরে মাটিতে পড়ল। তারা আর একমুহূর্তও সেখানে দাঁড়ায় না, সবকিছু ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রাণভয়ে মাঠ পেরিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে সিমগাঁয়ের দিকে ছুটল। ব্রাদার, নরম্যালি দিজ মেন্ আর নট কাউয়ার্ডস্—কিন্তু আমি দেখেছি ভূত-প্রেত বা নরখাদক বাঘের কথা শুনলে এরা কেমন কুঁকড়ে যায়—লাইক সেন্টিপিড্স। তাই মেয়েছেলেটিকে ঐ অবস্থায় ফেলে সব পালাল শুনে আমি বিস্মিত হলাম না। যা হোক, আমি মৃতদেহের কাপড়টা একটু সরিয়ে ঘাড়ের পিছনে গভীর দু'টো দন্তক্ষত দেখলাম। দেখলাম মেরুদণ্ড থেকে ঘাড়টা স্থানচ্যুত হয়ে গেছে। নিভৃতে নিশ্চিন্তে বসে মৃতদেহটা খাওয়ার তেমন সুযোগ-সুবিধে নিশ্চয় ছিল না প্যান্থারটার, সম্ভবত সিমগাঁয়ের লোকেদের হল্লা-চিৎকার সর্বক্ষণ ওর কানে এসে থাকবে, তাই তাড়াহুড়ো করে পিঠ থেকে খানিকটা মাংস খুবলে খেয়ে সে সরে পড়ে। বছর তিরিশেক বয়েস মেয়েছেলেটির।

ভূত-প্রেতের হাত থেকে গাঁকে রক্ষা করতে সিমগাঁয়ের প্রবেশপথে বিভীষণ মূর্তি

স্বামী শিউচরণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। সে এগিয়ে এসে বলল, হুজুর, আমার একটা আরজি—এই কেন্দুয়াটাকে মারতেই হবে! আমি বললাম, ঠিক হ্যায়—আর দেরি না করে ঐ গাছের ওপরে তোমরা একটা মাচান বেঁধে দিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাও। ঝরণাটার এপার-ওপার জুড়ে সব বট, অশ্বত্থ আর ইমলি গাছ জড়াজড়ি করে আছে। আদ্যিকালের গাছ সেগুলো, যেমন উঁচু তেমনি মোটা। মৃতদেহটা থেকে আনুমানিক গজ-পঁচিশেক দূরে একটা বটগাছের উপর ওরা মাচান বাঁধল। দুখীরামকে সকলের সঙ্গে গাঁয়ে চলে যেতে বলে আমি মাচানে উঠতে যাচ্ছি, দেখি ব্যাটারা মৃতদেহটা খাটুলিতে উঠিয়ে বাঁধাছাঁদা করছে! বললাম, হেই, হোয়াট আর ইউ ডুইং? ওটা নিয়ে যাচ্ছ কেন?

শিউচরণ এসে বলল, হুজুর, মৃতদেহটা আজ রাতেই সৎকার করতে হবে, নইলে ওর আত্মার সদ্গতি হবে না—প্রেত হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমাকে সমাজচ্যুতও হতে হবে।

রাগে আমার সমস্ত শরীর রি-রি করতে লাগল। বললাম, হ্যাং ইট! সমাজচ্যুত তুমি হবে না। কে করবে তোমাকে সমাজচ্যুত! উসিকো পিছুমে হাম তিন ফায়ার করেগা না! আর প্রেত হবার কথা বলছ—কাল একটা পুজো দিয়ে দিলেই হবে, সে খরচ তোমাকে আমিই দেব। তা ছাড়া এইটে বুঝতে পার না তোমরা মৃতদেহটা নিয়ে গেলে কেন্দুয়া নাও আসতে পারে! কিসের লোভে আসবে! এই সামান্য কারণে এমন একটা সুযোগ হারাতে আছে! মৃতদেহটা রেখে যাও, আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের—কেন্দুয়াটাকে আজ আমি মারবই। কে শোনে কার কথা। লেকচার দিয়ে মৃতদেহটা আটকাতে পারলাম না। ওরা বাঁধাছাঁদা সম্পূর্ণ করে খাটুলি কাঁধে নিয়ে রওনা হল। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ব্রাদার, ও-ব্যাটাদের ওপর ব্যাগাম গুলী চালিয়ে ম্যাগাজিন খালি করে বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু তবু আমি মাচানে গিয়ে উঠলাম। এই ভেবে উঠলাম যে প্যান্থারটা কি একবার জায়গাটা দেখতেও আসবে না! দেখি একটা চান্স নিয়ে। মাচানে উঠে ও-ব্যাটাদের বললাম, গেট আউট ফ্রম হিয়ার, বাগো! হিঁরাসে—ইউ ফুলস্ অব দি ফার্স্ট ওয়াটার!

বেয়ারা এসে আমার সামনে আর এককাপ চা রেখে গেল। দুদ্রি সাহেব হুইস্কির গেলাসে একচুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন—ঘুটঘুটে অন্ধকার। চিতাওয়ার অন্ধকারে বিলীন। আমি যেন অন্ধকার সাগরে ভাসছি। চাঁদ উঠবে সেই রাত দশটার পরে। মাথাটা ধরেছিল, শরীরেও কেমন অস্বস্তি, আমি গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। তলায় শুকনো পাতার ওপর অনেকবারই জানোয়ারের চলাচল টের পেলাম। মোস্টলি ব্ল্যাকবাকস্ এণ্ড স্পটেড ডিয়ারস। কিন্তু আমি বাতি জ্বালালাম না। জ্বালালাম তখন, যখন বুঝলাম যে একটা বড় রকমের জানোয়ার এসে আমার

মাচানের কাছে দাঁড়াল। দেখলাম একটা ওয়াইল্ড বোর—এ ভেরি বিগ টাস্‌কার! ব্রাদার, অতবড় ওয়াইল্ড বোর সচরাচর চোখে পড়ে না। অন্য সময় হলে ঐ একটা ওয়াইল্ড বোরের জন্যে আমি একশ' বুলেট খরচ করতেও কুণ্ঠিত হতাম না। যা হোক, আলো পড়তেই জানোয়ারটা ঘোঁৎ করে ঘুরে সোজা পালিয়ে গেল। ভাবলাম প্যান্থারটা কাছে-পিঠে কোথাও নেই তাই অন্যসব জানোয়ারের গমনাগমন হচ্ছে। আমি ঐ একইভাবে সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সজাগ হয়ে বসে রইলাম—যদি প্যান্থারটার সাবধানী পদক্ষেপ বা কোন আভাস পাই। কিন্তু মাথাটা আমার মাঝে-মাঝে চমকে উঠেছিল, চোখ চেয়ে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই মাঝে-মাঝে চোখবুজে থাকি আবার তাকাই। এমনি করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

চোখ চাইলাম অনেক রাতে। অনেকক্ষণ চাঁদ উঠেছে। চাঁদ তখন আমার মাথার পিছনে। চিতাওয়ারের গাছের ফাঁকে-ফাঁকে বিচ্ছুরিত জ্যোৎস্নারেখা, এখানে-ওখানে মাটিতে জলের ওপরে গিয়ে পড়েছে। মনে মনে আপশোষ হল প্যান্থারটা বুঝি এসে ঘুরে গেল। কিন্তু একেবারে আশাও ছাড়লাম না। ভাবলাম নাও এসে থাকতে পারে, কিম্বা একবার এসে থাকলে আবার ও ঘুরে আসতে পারে। আমি স্থির করলাম, বাকি রাতটুকু ঠায় জেগে বসে কাটিয়ে দেব। আমি বারবার বনের অন্ধকার আর আলোকিত স্থানগুলো দেখতে লাগলাম। দেখলাম যেখানে অন্ধকার ছিল সে জায়গা আলোকিত হল, যে জায়গা আলোকিত ছিল সে জায়গা অন্ধকারে ছেয়ে গেল। জাস্ট এ প্লে অব লাইট এণ্ড সেড। তারপরই রতকোনা প্রান্তর থেকে নেকড়ের ডাক ভেসে এল। যেন অনেকগুলো নেকড়ে চাঁদের দিকে মুখ তুলে কাঁদছে—উঁউঁউঁউঁ। ভাবলাম একটা সিগারেট খেলে কেমন হয়, সন্ধ্যে থেকে খাই না।

ঠিক তখনি আমার বাঁদিকের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণ থেকে কেউ যেন বেরিয়ে এল মনে হল! ব্রাদার, আমি স্পষ্ট দেখলাম, ঐ অন্ধকার থেকে জ্যোৎস্নালোকে বেরিয়ে এল এ উওম্যান—একটি মেয়েছেলে! ঘোমটা দেওয়া মাথায়, ঘড়া নিয়ে জল নিতে আসছে! আই ওয়েণ্ট কোল্ড! কি সর্বনাশ! এ-সময় কোথায় জল নিতে এসেছে ও! ও কি জানে না আজকের দুর্ঘটনা! ভাবলাম হার ফেট ইজ ডুমড্। যতটা সম্ভব গলার স্বর চেপে ওকে ডেকে বললাম, হে বাই, বাগো হিঁয়াসে, ইধার শের হ্যায়! বলছি আর ভাবছি এখনি প্যান্থারটা কোন ঝোপ থেকে ওর ঘাড়ে ঝাঁপাবে! কিন্তু মেয়েছেলেটি আমার কথা শুনল বলে মনে হল না। এবারে আমি আর একটু জোরে বললাম, কাঁহেকো ইধার আয়া? অভি পানি লেনেকো টাইম হ্যায় কেয়া। বাগো হিঁয়াসে—শের হ্যায়! এবারে মনে হল মেয়েছেলেটি হয় কালা, নয় আমার কথা গ্রাহ্য করছে না। আমার সন্দেহ হল মেয়েছেলেটি নিশ্চয় কোন বদমতলবে এসেছে। সাম ইল্লিসিট এফেয়ার। চিতাওয়ারের সে বদনামও আছে। মেয়েছেলেটি বরাবর আমার মাচানের দিকে এগিয়ে এল। চাঁদের আলোয় যতটুকু ওর মুখটা আমি দেখলাম তাতে আমার মনে হল ওকে আমি কোথাও দেখেছি। বোধ হয় নওয়াগাঁ কি সিমর্গায়েই দেখে থাকব। মেয়েছেলেটি আমার মাচানের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। কোন কথা না বলে সে একটা হাত সোজা মাথার ওপর তুলে ধরল। ভাবলাম ডাকছে আমাকে।

আমি বেগে ঝুঁকে পড়ে একটা-কিছু বলতে গেলাম। দেখলাম আঙুলে ইসারা করে আমার মাথার ওপরে কি যেন দেখাচ্ছে। আমি একটু ঘাড় ফিরিয়ে মাথার ওপরে তাকালাম। দি প্যান্থার! ঠিক আমার পিছনে ফুট দশেক দূরে একটা বটগাছের ডালের ওপরে গুঁড়ি মেরে ঝাঁপাবার উপক্রম করছে! চাঁদের আলোর জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো! মুহূর্তে রাইফেলটা ঘুরিয়ে আমি চোখ দুটোর মাঝখানে গুলী করলাম—ঠাঁব্‌বব্! শব্দটা মিলিয়ে যাবার আগেই ধুপ করে নরখাদকটা নীচে গিয়ে পড়ল। টর্চ জ্বালাবার অবসর পাই নি। এবারে টর্চ জ্বালিয়ে প্যান্থারের প্রাণহীন দেহটা অনেকক্ষণ দেখে নিয়ে মাচান থেকে নেমে এলাম।

আমার জীবনদাত্রী সেই মেয়েছেলেটির খোঁজ করতে গিয়ে দেখি সে নেই! আশে-পাশে চারদিকে টর্চের আলো ফেলে দেখলাম, নেই! ডাকলাম, সাড়াও নেই! ভাবলাম ভয়ে নিশ্চয়ই পালিয়েছে।

বুদরি সাহেব একমুহূর্ত থেমে আবার বলতে লাগলেন—ওপর দিকে গুলী ছোঁড়ায় আমার রাইফেলের শব্দ সিমর্গায়ের লোকেরা পরিষ্কারই শুনেছিল, কেন না কিছুক্ষণ পরেই দুখীরাম বহু লোকজন নিয়ে এসে পড়ল। আরে শিউচরণ ভাইয়া, সাহাব কেন্দুয়া মার দিছে—কেউ বলে উঠল। আনন্দের আবেগে জনতা উন্মত্ত হয়ে উঠল। কেউ কেউ এসে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করেই ফেলল, কেউ কেউ গিয়ে মৃত প্যান্থারটার ওপর বেধড়ক কিল-চড়-লাথি বর্ষণ করতে লাগল। শেষে অতি কষ্টে সকলকে থামিয়ে বললাম, একটি মেয়েছেলে জল নিতে এসেছিল কিছুক্ষণ আগে—দেখ কোথায় গেল।

মেয়েছেলে! প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল সব। মেয়েছেলে! এত রাতে আসবে কেন সাহাব! ইয়ে কভি নেহি হো সাক্‌তা।

আমি বললাম, আমি নিজের চোখে দেখলাম, আমার জীবন বাঁচাল ও আর তোমরা বলছ কভি নেহি হো সাক্‌তা! বলে ঘটনাটা খুলে বললাম।

কেউ একজন বলল, আচ্ছা সাহাব মেয়েছেলেটি দেখতে কেমন বল তো?

বললাম; সে ত' ভাল করে দেখতে পারি নি, তবে আবছা-আলোয় তার মুখটা যতটুকু দেখেছি তাতে চেনা-চেনা ঠেকলো।

সে লোকটি বলল, হুজুর, ইয়ে আত্মা হ্যায়।

বললাম, কেয়া, আত্মা ম্যান?

লোকটি বলল, ওহি যো আজ মরা উনকী আত্মা। শিউচরণের ভৌকীর আত্মা।

ঝন্ করে উঠল মাথাটা আমার। থরথর করে সর্বশরীর কাঁপতে লাগল। শিউচরণের বৌয়ের মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেই কাপড় সরিয়ে একবার দেখেছিলাম।

[আগামী সংখ্যায় চলবে।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

নেপোয় মারে দৈ

কোন এক যুগে পৃথিবীটা গোল ছিল। আজ কেবলই গণ্ডগোল। আগে রাজা ছিল, প্রজা ছিল। এখন কেবল পার্টি। আকাশে সূর্যের ছিল একচেটিয়া ব্যবসা। এখন সেখানে স্পুটনিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আনাগোনা। কোন এক যুগে এ পৃথিবীতে বোধ হয় মানুষও ছিল। আজ তার চিহ্নও নেই। যা আছে তাকে বলা হয় 'মাস' (Mass)। আগে সাহিত্য ছিল, এখন শুধুই বিজ্ঞাপন। এই সেদিনও আমি পাঠক ছিলাম। আজ হ'তে চাইছি লেখক। গণ্ডগোলের এমন অকাট্য প্রমাণ আমার আর কিছু জানা নেই।

এই গণ্ডগোলের গোড়ায় শুরু করি। খেয়ে দেয়ে আর কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে মহানন্দে দিন কাটাচ্ছিলাম। সকাল থেকে সন্ধ্যে অন্নের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে, বাইরের পৃথিবীটাকে জানবার স্পৃহাও ছিল না, তেমন সুযোগও ঘটে নি। পৃথিবী বলতে যেটুকু জানতাম তার সীমানা ছিল সাত নম্বর বাস, সতেরো নম্বর বাড়ি (আমার মহাজনের) আর ছবি করার সাতশো বায়নাক্কা। বিপদ ঘটালো ভারত সরকারের আমন্ত্রণ; জোর তাগিদ এলো ভারতীয় প্রতিনিধি হয়ে বিদেশ যেতে হবে, অতএব দিল্লী এসো, আলোচনা আছে। এখন ভাবি 'বেশ ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, বিপদ হল গান শুনে।'

এতদিন সরকারি দপ্তর বলতে জানতাম ইনকাম ট্যাক্স অফিস। দিল্লী গিয়ে বোঝা গেল জানার গোড়ায় আমার প্রচণ্ড গলদ আছে। কলকাতার ইনকাম ট্যাক্স-এর যে মহারথীকে মনে হত রীতিমত বিভীষিকা, দিল্লীর দরবারি দরে তিনি নিতান্ত দীন, দরিদ্র। ওখানকার আশি টাকার কেরাণীও এক একটি বিরাশি শিক্কার বিভীষিকা। বেশি তো কম নয়।

সাক্ষাতের সময় ছিল দশটা। সেক্রেট্যারিয়েটের সিংহসদনে যখন দাঁড়ালাম তখন দশটা বাজতে পাঁচ। দেখা যখন ঘটল তখন পাঁচটা বাজতে দশ। মনের গোড়ায় ধাক্কা লেগেছিল ঠিকই কিন্তু রণে ভঙ্গ দিই নি। ভারতব্যাপী অন্যান্য বহুসংখ্যক নেপোদাদার মতন সরকারি দৈ মারবার এমন সুবর্ণ-সুযোগ ছেড়ে দেওয়ার মূর্খতা আর যারই থাক, আমার নেই। মানটাকে পকেটে পুরে মনটাকে বুঝিয়েছি এ সবই ভগবানের লীলা।

সেক্রেটারিয়েটের প্রথম হার্ডল বন্দুকধারী সেপাই। সে বিড়ি পেলেই খুশি। দ্বিতীয় পর্বত একজন কেরাণী। সরকারি ভাষায় তার নাম রিসেপশন অফিসার। তার কাজ গদিতে বসে শীতকালে হিটারে হাত-পা সেঁকা আর গ্রীষ্মকালে খসখসের তলায় বসে খুসবুদার পান খাওয়া। এখানে আর বিড়ি চলে না, চাই সিগারেট। দিতে হয় না, নিজেই চেয়ে নেন। আপন করে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা। একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে যখন মৌতাতে মন ভরে তখন টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বারকয়েক নাড়াচাড়া করে বল্লেন 'এনগেজড'। ইংরেজি এই ছোট্ট কথাটার আভিধানিক অর্থ যাই হোক, এখানকার ভাষায় এর মানে 'আর একটা সিগারেট'। দিলেন তো কৃপায় কার্পণ্য নেই, নইলে নির্ঘাত ভিড়ের মধ্যে হারালেন।

তিন সিগারেট অপেক্ষা করার পর ভেতরে যাবার ছাড়পত্র যদি বা পাওয়া গেল তো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেয়াদা নেই! আরও আধ ঘণ্টা এবং পুরো দু'টো সিগারেট।

'পিকাম্বিত' টানা অন্ধকার বারান্দা পেরিয়ে যখন সাহেবের (লুঙ্গি টাই পরিহিত) সদরে পৌছোন গেল, তখন সাড়ে বারোটা; জানা গেল সাহেব মিটিং করছেন। আমার পথ-প্রদর্শক পেয়াদাটি তার লাল পাগড়ি খুলে বিড়ি বের করে বসে গেল সাহেবের আর্দালির সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনায়। আর্দালি সাহেব মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকায় আর ফিসফিসিয়ে মেমসাহেবের মোটা মোটা খবর ছাড়ে। বোঝা গেল তার সাহেবের উন্নতি আসন্ন—আর দু'দিন যদি মেমসাহেব ঐ—বাকি কথাটা আর শোনা গেল না। কানটা খাড়া ছিল, কিন্তু গলাটা বড্ড খাটো।

সাহেব এলেন একটায়। আপাদমস্তক দেখে আমার ব্যক্তিত্বের ব্যাসটা ঠিক ঠাহর করতে পারলেন ব'লে মনে হল না। কোন কিছু না শুনেই ভদ্রলোক (?) বললেন, 'কাল আসবেন, আজ বড় ব্যস্ত।'

রাগ হল, ফিরে যাবার উপক্রম করতেই মন বললে, 'আরে মূর্খ, তুই না খেলে দৈটা অন্য নেপোয় মারবে!!'

বাধ্য হয়ে সুরটা চড়িয়ে নামটা চাহর করলাম। সাহেব মহা ব্যস্ত হ'য়ে মাটিতে প্রায় লুটিয়ে পড়েই সম্বর্ধনা জানালেন। ক্ষমা প্রার্থনার ঢেউতে আমার খাবি খাওয়ার উপক্রম। ঘরে নিয়ে বসালেন। চা এল, পান এল, দু' দশটা ফাইলও এলো।

মন্ত্রীসকাশে যখন পৌছোন গেল তখন বেলা চারটে। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের বড়বাবুর স্টেনোগ্রাফার জানালেন ক্যাবিনেটের মিটিং হচ্ছে ভেট্ হবে না। ঘরে সাদাটুপির তলায় হাত ঢুকিয়ে উকুন বাছার বহর দেখে গা ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগল। পালাবার জন্য প্রাণ কাঁদছে কিন্তু আমার মধ্যেকার নেপো যাকে বলে নাছোড়বান্দা।

দেবদর্শন ঘটল পাঁচটা বাজতে দশ মিনিটে। দয়ার সাগর মহা সম্ভ্রমে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বাণী দিলেন, 'আপনি যে যেতে রাজি হয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। আশা করি আপনার ছবি ভারতের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে!'

ব্যস। কথা শেষ। কাজও শেষ।

* * * *

জনবহুল দিল্লীর রাজপথ।

হাজার হাজার সাইকেল আমার দু'ধার দিয়ে ছুটে চলেছে। বাড়িমুখো গরুর গলায় ঘণ্টার মতন ওদের সাইকেলের ঘণ্টি বাজে। ধুলো ওড়ে।

স্যাটপরা, চটি পায়ে কেরাণী। সালওয়ার পরা পাঞ্জাবী তরুণী। বাঙালী, মাদ্রাজী, ভুটিয়া। সারা ভারতের সেরা ছেলেরা স্বেচ্ছায় তাদের স্বকীয়তা খুইয়েছে এই কেরাণীরাজ্যে। দেহে ওদের ক্লান্তি, মনে পরম ঔদাসীন্য। পেছনে অন্নবস্ত্রের নিশ্চয়তা। সারা ভবিষ্যৎ জুড়ে ভাবনা। কোথায় কাকা? কোথায় মেসো? কোথায় বোনাই? তারাই উন্নতির অপরিহার্য অঙ্গ, সুনিশ্চিত সোপান।

কনট প্লেস।

লাল নীল আলোর ঝলকানি। দাঁড়িয়ে দেখি মহিলাদের কেনার মরশুম। মরশুমী ফুলেরই জৌলুষ ওদের যৌবনে। কারো আছে, কারো গেছে। অধিকাংশেরই প্রবল প্রচেষ্টা ওটাকে রং দিয়ে আর ঢং দিয়ে ধরে রাখবার। সরকারি মহলের ঐতিহ্য ওদের পেটকাটা চোলি ব্লাউসে, ওদের নাইলন বাহারে আর হোঁচটখাওয়া চটিতে। ওদের যত দেখি তত সেই বহু পুরোণ গান মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—

'জানি না কোথায় আছি, রাশিয়া কিম্বা রাঁচি!'

হাঁটতে হাঁটতে চলেছি চক্রাকারে। সন্ধ্যাবেলার দিল্লী সহর ঐ চক্রকে কেন্দ্র ক'রে চরকিবাজি খায়। প্রতিদিন, প্রতি সন্ধ্যায়, প্রত্যেকটি মানুষ। যাদের একবার দেখি তাদের বার বার দেখি তারপর সব এক হ'য়ে মিশে যায়। একই সুতোয় বাঁধা সব সরকারি সুবেদার: কেউ কাকার কাঁধের উচ্চাসনে, কেউ খোসামোদের খাসমহলে। কেউ বোতল দিয়ে বাদশাহ। কেউ বৌ সামনে নিয়ে বড় সাহেব। বাকি সব কেরাণী। কেউ ফাউ, কেউ ফালতু।

মেদবহুল পাঞ্জাবী নারীজাতির ভিড় ঠেলে ঠেলে ন'টা বাজল। দোকানের আলো নিভল' তো পাড়াটাই অন্ধকার। তখন আর সেখানে মানুষ দেখা যায় না। কান পাতলে শোনা যায় সেই হারিয়ে যাওয়া ভারতের ক্ষুব্ধ হাহাকার। রাত্রির স্তিমিত অন্ধকারে চোখ আর মন এক করলে দেখা যাবে ইন্দ্রপ্রস্থের ঐতিহ্য আর মুঘল-এ-আজমের বাদশাহীআনা কংগ্রেসী দিল্লী আর পাঞ্জাবী অফিসারদের বেয়াদপীর তলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পার্কের বেঞ্চে ব'সে ব'সে দেখলাম নিঝুম নয়া দিল্লী। কোন এক যুগে এখানে মানুষ ছিল। আজ আর মানুষ নেই। আছে কংগ্রেস, আছে কেরাণী। আর তাদের কলঙ্ক।

সরকারি আমন্ত্রণে এসেছি, তাই আস্তানা হল অশোকায়। পুরোণ' স্থাপত্যশিল্পের সঙ্গে, এই হোটেলে জড়িয়ে আছে আধুনিক রুচি। এত বড় হোটেল শুনেছি এশিয়ায় নেই। আয়তনের কথা জানি না, অব্যবস্থায় এর তুলনা নেই সারা পৃথিবীতে এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এখানকার মানদণ্ড হল গায়ের রং। চামড়া যত সাদা ওদের সেলাম ও সেবা তত সহজ ও স্পষ্ট। বাকি সব বকেয়া। ঘরের যত বাহুল্য, ঘরোয়া আবহাওয়ার তত অভাব।

ডাইনিং-রুমে গিয়ে বসলাম সাড়ে ন'টায়। ভেবেছিলাম ভিড়টা কাটিয়ে বসব। গিয়ে দেখি মদ্যপানের মরশুম সবে জমে উঠেছে। ওদিকে নৃত্য-প্রদর্শনী। আজকের নর্তক হলেন ভারতীয় নৃত্যকলার অনন্য কলাবিদ। মনে পড়ে গেল একদিন এঁরই নাচ দেখবার জন্য সারা পৃথিবী উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। এঁকেই মধ্যমণি করে মার্কিনী টাকা এসেছিল ভারতীয় নৃত্যশিল্পের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার প্রচেষ্টায়। নয়াদিল্লীর নতুন সভ্যতা ভারতীয় কৃষ্টির সেই বৈশিষ্ট্যকে নামিয়ে এনেছে মদের আসরে, কাঁটা, প্লেট, চামচের টুং টাং-এর মধ্যে, বেয়ারা খানসামার আসা-যাওয়া আর সোডার বোতলের ফোঁসফোঁসানির সঙ্গে সমতলে।

কোন এক যুগে পয়সা দিলে মুড়ি পাওয়া যেত। এ যুগে পয়সা দিলে মানুষ ও মনুষ্যত্ব দুই-ই পাওয়া যায়। সহজেই। সে যুগে ছিল শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা, শিল্পীর প্রতি সম্মান। এ যুগে আছে শুধু লাভ আর লোকসান॥

ভোরবেলা এয়ারপোর্ট। সাহেব এলেন সি-অফ করতে—সস্ত্রীক। ভেবেছিলাম বুঝি সম্মান, সময়মত জানা গেল, স্বার্থ। মেমসাহেব আবেদন জানালেন ওঁর জন্য যদি একটা ট্রানসিস্টার আনি তা হ'লে উনি বাধিত হবেন।—প্লীজ!!

দিল্লী সহরের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে দেখলাম প্রকাণ্ড সেক্রেট্যারিয়েট থাবা পেতে বসে আছে, সারা ভারতের মানুষগুলোকে মারবে বলে। মানুষ মরবে, আবার জন্মাবে, কিন্তু মনুষ্যত্ব? আমাদের ঐতিহ্য?

প্লেনে বসে ডায়েরির পাতায় হিসেব লিখতে বসলাম। হিসেব করে দেখা গেল ভারত সরকারের সাতশো টাকা খরচ করে মন্ত্রীবর বাণী দিয়েছেন সাতটা কথায়। গড়পড়তা প্রত্যেকটি কথার দাম একশো টাকা।

হিসেব শুনে মিতা বললে, 'মস্ত পাগল!'

দুনিয়ার সব দোষ আমার মাথায় নির্বিবাদে চাপিয়ে দেওয়া প্রিয়াস্থানীয় নারীজাতির একটি প্রেম-ব্যাধি। মিতা যাই বলুক, আমি ঠিকই জানি গোলমালটা আমার মাথায় নয়, এই যুগে॥

* * * *

দিল্লী থেকে ফিরেই আমার দশম দশা। স্বাস্থ্যের ফুটো আর আত্মসম্মানের ফাটলগুলো ভরবার আগেই ভারে ভারে টেলিগ্রাম আসতে আরম্ভ করল।' কবে যাচ্ছেন? পাসপোর্ট ঠিক হয়েছে কি না? ছবিটা কাট ছাঁট হল কি না? জার্মানী ভাষায় সাব-টাইটেল্ করার কি হল? কবে হবে? কে করবে? টেলিগ্রামের বহর আর ট্রাঙ্ককলের বাহার দেখে আমার আহার নিদ্রা মাথায় উঠল। হাতে সময় মাত্র সাতদিন। সারাদিন সরকারি ফরমায়েসের ফর্দ সামি আর সারারাত ল্যাবোরেটরিতে ব'সে বারো হাজার ফুটের ছবিকে ছোট করি। তাতেও নিস্তার নেই। ওখানেও আক্রমণ শুরু হল'। ছবিটার কোন দৃশ্য বাদ যাবে, কোন কথা জোর হবে, তারও লম্বা লম্বা লিস্ট আসতে আরম্ভ হল। যত অবান্তর নির্দেশ, অসম্ভব কল্পনা, অযৌক্তিক ভাবধারা।

এদিকে ছবির কাজে রাত যায় ওদিকে সরকারি কাজের অবসরে পাসপোর্টের জন্য ছোটাছুটি। ব্রাবোর্ন রোডের দোতালার ওপর ঐ যে দপ্তর, দেখতে ওটা ছোটখাটো চিড়িয়াখানা। বড় বারান্দায় ছোট ছোট ঘুলঘুলি। ওদিকে কেরাণিকুলের হুমকি, এদিকে বিভ্রান্ত পাসপোর্ট-প্রার্থীদের হাহাকার। একটা ফ্যানের তলায় একপোটা মানুষ গরমে হাঁসফাঁস করছে। ডানধারে দরজা। উঁকি মারলে দেখা যাবে আর একটা সরু লম্বা বারান্দা। তার দু'ধারে জাল দেওয়া আছে। জালের ওপারে আরও জলন্ত বিভীষিকা—অর্থাৎ আরো

কেরাণী। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের টেবিলে ফাইল, মুখে পান, হাতে সিগারেট আর দৃষ্টিতে বিরক্তি।

সকাল ন'টায় কিউতে দাঁড়ালে দু'টো আন্দাজ দর্শন পাওয়া যায়। প্রথম দিন দরখাস্তের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে ধর্মাবতার বললেন, ছবির সঙ্গে চেহারা মিলছে না। বোঝাতে পারলাম না যে দোষটা আমার নয়। পরের খেয়ে ঘরের মোষ তাড়াবার সময় যে ছবি তোলা হয় তার সঙ্গে ঘরের খেয়ে সরকারি মোষের গুঁতো খাওয়া চেহারার প্রভূত পার্থক্য। ছবিটা তুলিয়েছিলাম মিতার মনোরঞ্জনের জন্য। আর কিছু না থাক চাকচিক্য ছিল। সরকারি ফর্ম হাতে সারাদিন কিউতে দাঁড়িয়ে সে চাকচিক্য জুন মাসের ঘামে ধুয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ধর্মাবতারের মন কিন্তু হিমালয়ের চাইতে ঠাণ্ডা, জ'মে পাথর হ'য়ে আছে। সেটাকে গলাতে পারে এমন জোর মানুষের নেই, টাকার আছে। আমার আবার ওটারই অভাব।

ছবি বদলে পরদিন আবার কিউতে। আবার দর্শন মিললো দু'টোয়। আজ যদি ছবি ঠিক হল তো ব্যাঙ্ক গ্যারাণ্টির সংখ্যা মনঃপুত হল না। হতাশ হ'য়ে মনটাকে হাতড়ে বেড়াচ্ছি, পেছন থেকে সমবেতকণ্ঠে তাগাদা এল, 'হল মশাই?' তাকিয়ে দেখি সবাই সার্টের হাতা গুটোচ্ছে, তবু একবার শেষ চেষ্টা করতেই হবে। প্রশ্ন করলাম—'কত টাকার গ্যারাণ্টি চাই?'

সহজ উত্তর এল, 'কবে যাবেন?'

'শনিবার।'

কেরাণীবাবু কৃপা ক'রে বললেন, 'আজ তো বুধবার—তারপর যে ধরণের হাসি উনি হাসলেন তার সারার্থ হল আমি একটা পাগল। আর কোন প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। তিন দিনের মধ্যে পাসপোর্ট চাওয়া ও পাওয়ার কল্পনা রাঁচি ছাড়া অন্য কোন জায়গায় যে সম্ভব নয়, এটা ওঁর হাসিতেই স্পষ্ট। আর কিছু বলার আগেই দেখি পেছনের ধাক্কায় লাইনের বাইরে বেরিয়ে গেছি।

ব্যাঙ্কের বাঁধা নিয়ম। সেখানে ফাঁক নেই কিন্তু যুক্তি আছে। আমার কাতরোক্তি শুনে ম্যানেজারসাহেব নিয়মের ওপর দয়ার দাগ টেনে নতুন গ্যারাণ্টিপত্র সই করে দিলেন। আবার ছুটলাম ব্রাবোর্ন রোড। কেরাণীবাবু দেখে-শুনে বললেন, 'রেখে যান, সময়মত জানতে পারবেন।' আর কোন প্রশ্ন করা চলবে না। পাঁচটা বেজে এক মিনিট হ'য়ে গেছে।

* * * *

পথের মোড়ে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়ে আছি, পেছন থেকে ডাক এল, 'এই যে দাদা।'

কাউণ্টারের কেরাণীবাবু।

'মানে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। কোথায় যাচ্ছেন?'

ইচ্ছে হল বলি, 'জাহান্নমে, যাবেন?'

ওঁর প্রশ্নের জবাব উনি নিজেই দিলেন আরও একটা প্রশ্ন তুলে। 'বাড়ি বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'কবে হ'লে হবে?'

'কি?'

'আপনার পাসপোর্ট।'

এইবার ওঁর নরম সুরের মধ্যে যে গরম ইঙ্গিতটুকু ছিল সেটা স্পষ্ট হল। সোজা ভাষায় সহজ কথাটা ব'লে দেওয়া আমার মজ্জাগত। ওতে আমার এতটুকু লজ্জা নেই। বললাম—

'টাকা চাই?'

ভদ্রলোক এমনভাবে হাসলেন যে নিজেকে আমার নিতান্ত নির্লজ্জ মনে হল। অবলীলাক্রমে উনি বললেন—

'সরকারের পয়সায় যাচ্ছেন, টিকিটের খরচ তো লাগবে না। দু-চারটে পয়সা আমরা পাবো না স্যার?

'কেন পাবেন?'

'চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে আপনিও তো সরকারি নজরটা পেয়েছেন। কেন পেলেন?'

যুক্তি অকাট্য। এ প্রশ্ন বহুবার আমারও মনে হয়েছে। তবু, হটবার বান্দা নই। বললাম—

'ছবিখানা করেছি ব'লে।'

'তেমনি আপনার পাসপোর্ট আমার হাতে পড়েছে ব'লে আমারও কিছু প্রাপ্য। কত তো পাবেন। দু-চার টাকা গরীবকে দিলে গুণ গাইব।

'দেব' না।'

'তা হ'লে আপনার নেক্সট ছবিতে একটা চান্স দেবেন। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবো।'

সত্যিই হাসি পেল। একই মানুষের কত রূপ। পথে দাঁড়ালে যার প্রকট দারিদ্র্য, দপ্তরের চেয়ারে বসলেই তার অন্য চেহারা! এরও বাইরে সে শিল্পী। মনে সৃষ্টির আকুল আগ্রহ।

'হাসছেন স্যার?'

'অভিনয় জানেন?'

'করিয়ে নেবেন। আপনি তো ডিরেক্টার।'

'কেন অভিনয় করতে চান?'

'এই মানে···বুঝলেন না···অনেকদিনের সখ!'

রাজি হলাম। হোক ও সরকারি মহলের জবরদস্ত সেরেস্তাদার। বাড়িতে অন্নের হাহাকার ব'লেই দপ্তরে এত হুঙ্কার এতো অত্যন্ত সহজ কথা। পেছনে হাত দিয়ে পকেট কাটাটা ওদের মজ্জাগত ব্যাধি নয়, সুযোগের সুবিধা নেওয়া। জীবিকা অর্জনের তাড়না আছে, সেইটাই ওদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ক্ষিদে আর অভাব সাধারণ জীবনে আদর্শের তোয়াক্কা রাখে না। এ সবের ওপর মানুষের যে সহজ মনটা তাকে তো আর অস্বীকার করা চলে না। তাই রাজি হলাম।

পরের ছবিতে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াবে। কত লোক তো দাঁড়ায়, তার মধ্যে একজন। সারা ছবিতে বিদ্যুৎ ঝলকানির মতন এক পলক। কেউ চিনবে না, জানবে না, লক্ষ্যও করবে না। করবে কেবল ও নিজে আর ওর কাছের মানুষ তাও দু-চারজন। দেখাটা আনন্দ নয়, আসল আকর্ষণ অভিনয় করাটা। বাড়িতে খবরটা পৌঁছোলে কেরাণী-বৌ তার হাজার দিনের পুরোন দৃষ্টির ওপর চোখ তুলে স্বামীকে একবার নতুন ক'রে দেখবে। সেই ওর আনন্দ। অফিসে আস্ফালন করে বলবে, 'কাল আসব' না, স্যুটিং

আছে।' যতদিন না ছবি মুক্তিলাভ করবে ততদিন প্রতিমুহূর্তে চলবে নিজেকে নতুন করে দেখা, স্বতন্ত্র ক'রে দেখানো। দেখতে দেখতে মুক্তির দিন আসবে। মনটা সেদিন সরকারি গোলামী ছাড়িয়ে ছুট দেবে নতুন ছন্দে। পাসপোর্ট, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি আর পাওনাদার পথের মোড়ে হারিয়ে যাবে। পাসটা হাতে আর পুরো সংসারটা পেছনে নিয়ে যখন প্রেক্ষাগৃহে দাঁড়াবে তখন ঐ কেরাণী একেবারে অন্য জগতের অনন্য জীব। ওর চারপাশের লোক শুধু দর্শক। ও দার্শনিক। পাশের লোকটাকে দেখবে নীচের মানুষের মতন, নিম্নস্তরের ছোট ছোট বিন্দু। মনে হবে ওরা অকারণ ভিড়। নিছক ঝামেলা।

ছবি আরম্ভ হবে। যে উত্তম তারকাকে দেখবার জন্য ও নিজেই দিনের পর দিন লাইন দিয়েছে আজ ওর তাকেই মনে হবে অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক; মন আকুল আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকবে সেই ভিড়টার জন্য, সেই ভিড়ের মধ্যে নিজের জন্য। সে মানুষটা অন্নের হাহাকারক্লিষ্ট কেরাণী নয়, সে সৃষ্টির অদম্য আকাঙ্ক্ষায় উদ্ভাসিত শিল্পী।

তারপর আসবে সেই মুহূর্তটি। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জাগবে নব অনুভূতি। তার সুর স্বতন্ত্র, তার ছন্দ অভূতপূর্ব। স্ত্রীর হাতখানা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরবে; একপলকের দৃষ্টিবিনিময়। ছবির ঐ সুর ও আবেশ আর মনের ঐ স্বাতন্ত্র দু'জনে ওরা ভাগ ক'রে নেবে দু'জনের নিবীড় নির্জনতায়। পরদিন ভোরবেলায় গয়লা এসে যখন পয়সার জন্য পাড়া মাথায় করবে তখন ঘুম থেকে উঠে ওরা দেখবে ঐ একপলকের অদ্ভুত মানুষ দু'টো আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে থাকবে শুধু পাসপোর্টের কেরাণী আর তার জীবন-জীর্ণ আটপৌরে বৌ।

তাই রাজি হলাম। একমুঠো চাল না দিতে পারি, আনন্দ থেকে বঞ্চিত করি কেন ?

পাসপোর্ট পেলাম পরদিন বিকেলে। প্লেন ছাড়ল, তারপর দিন রাত ন'টায়।।

বিদায়ের বিভীষিকা

কেরাণীবাবুকে 'নেকৃস্ট' ছবিতে চান্স দেবার দায় ঘাড়ে নিয়ে পাসপোর্ট পাওয়া গেল' কিন্তু ছবি পাঠাবার ছাড়পত্র পেতে যাকে বলে নাস্তানাবুদ। এই ছাড়পত্র দেবার মালিক হলেন খাকি উর্দিপরা আবগারি বিভাগ। কোকেন কারবারিদের কুপোকাৎ করায় যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের কাছে আমরা মশার চেয়েও নগণ্য। অন্যান্য সরকারি দপ্তর জনসাধারণকে যে খ্যামটা নাচ নাচান তার বেশিটাই হয় ঘোমটার তলায়। আবগারি বিভাগে আব্রুর বালাই নেই। সবটাই সহজ এবং স্পষ্ট। এখানে লাইন দিতে হয় না, সরাসরি বসতে হয় কায়েমি হ'য়ে। সকাল থেকে সারাদিন, কখন কখন সারা সপ্তাহ, নির্বাক হ'য়ে, নির্বিবাদে। কথা বলেছ' কি ব্যস্, পড়লে ১৯১৭ সনের ৩৭৩ ধারার ২৯ (ড) নিয়মের 'শ' শাখায় কবলে। সেটা কি ? ওঁরা নিজেরাই জানেন না।

তবে ওঁদের দিক থেকে সহানুভূতি এবং সাহায্যের শেষ নেই। ব্যানার্জীসাহেবের (বাবু বলা চলবে না, হাফপ্যান্ট পরার ঐটাই বিশেষত্ব।) চেহারায় যত চাকচিক্য, ব্যবহারে ততোধিক সৌজন্য। রেসের ঘোড়া যেমন দৌড়াবার জন্য ছটফট করে, উনি তেমনি সাহায্য করার জন্য সর্বদাই সচেতন। হ'লে কি হবে, ওঁদের নিজেদের আইনের বেড়াজালে ওঁরা নিজেরাই এমন বিশ্রীভাবে জড়িয়ে আছেন যে, ইচ্ছে থাকলেও সহজে নিষ্কৃতি দেবার উপায় নেই। যত নিয়মের ধারা তত বিভিন্ন ধারণা। প্রতি লাইনের প্রতিটি অক্ষর নিয়ে অফিসারে-অফিসারে মতের মারামারি—আর সেই যুদ্ধে মরে আমার মতন উলু-খাগড়া।

ব্যানার্জীসাহেব নিজের ঘরে আমাদের বসিয়ে ভাবতে আরম্ভ করলেন, ফিল্মটা কোন ধারায় ধরবে ? র' ফিল্ম ওঁদের নিয়মের মধ্যে বাঁধা, কিন্তু যে ফিল্মে ছবি তোলো হয়েছে সেটা ? একজন বললেন, 'ঐ একই জিনিস—অর্থাৎ পাঁঠাও যা মাংসের ঝোলও তাই। তৃতীয় হাফপ্যান্ট বললেন, 'আরে মশাই ওটা হল ছবি।' চতুর্থ হাফপ্যান্ট টেবিল চাপড়ে বলেন, 'কি ক'রে হয় ;—এই আইনে যে ছবির কথা বলছে সেটা হল স্থির ছবি, ফিল্মের ছবি তো নড়ে-চড়ে।'

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি হাফপ্যান্ট এসে কনফারেন্সটি বেশ জমিয়ে তুললেন। ঘণ্টা তিনেক আলোচনার পর এ সমস্যার যদি বা সমাধান হল (কেমন ক'রে তা বলতে পারব না) প্রশ্ন উঠল ফিল্মটা ফ্যাক্টরিজাত জিনিস না শিল্পবিশেষ। সরকারি নিয়মে স্টুডিও হল ফ্যাক্টরি, অথচ ফ্যাক্টরি আইন স্টুডিও সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। স্টুডিওর কর্মীরা বলেন, তাঁরা শিল্পী, সংঘ বলেন, তাঁরা 'মজদুর'। প্রযোজকমহল নিজের স্বার্থের দিকে সতর্কদৃষ্টি রেখে বলেন, 'আট ঘণ্টা কাজ কর কারণ তুমি কর্মী' আবার ওঁরা যখন কর্মীর সহজ সর্তগুলো দাবী করেন তখন সরকারি ট্রাইব্যুনাল বলেন, 'সে কি ক'রে হয় ?'

আবগারি আইনের জঞ্জাল থেকে ধার্য করের অঙ্কটা যদি বা কোনমতে উদ্ধার করা গেল, তো বিপদ বাঁধলো ফর্ম নিয়ে। কোন ফর্মে টাকাটা নেওয়া হবে। আমার সহযাত্রী প্রযোজক বন্ধু করকরে নোটগুলো পকেটে নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে শেষকালে বেয়ারাদের বেঞ্চিতেই সটাং শুয়ে পড়ল।

সারাদিন আলাপ-আলোচনার পর ফর্মের হদিস হল কিন্তু দেখা গেল সেই ফর্মের নিয়ম অনুযায়ী ক্যাসটাকা নেওয়া চলবে না, ঐ মূল্যের ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট চাই। অতএব ছোটো ডাকঘর।

জি পিওর মাথায় একখানা লাল শালুর ওপর একমণ তুলো দিয়ে চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন টাঙানো আছে 'ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন।' ভেতরে যান, দেখবেন কম করে দশটা কাউন্টার আছে ও কুড়িটি কেরাণী। তিন ঘণ্টা লাইন দিয়ে জানা গেল যে সার্টিফিকেট কিনতে গেলে চার রকম ফর্ম ফিল আপ করতে হয় এবং কম করে চারদিন কাউন্টারের ধারে ঘুরপাক খেতে হয়। নিয়মকে নাড়াবার ক্ষমতা নাকি মাস্টারবাবুরও নেই। তা হলে ? কৃপাপরবশ হয়ে কেরাণীবাবু মুখভর্তি পায়োরীয়ার গন্ধওয়ালা এক গাঁজাখোর বুড়োকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওঁকে বলুন।'

বললাম। তিনি তিন টাকা (এবং দু'টো সিগারেট ও একটা পান) নিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে সার্টিফিকেট হাতে গুঁজে দিলেন। আমাদের কার্যোদ্ধারে কেরাণীবাবুর মুখে যে অনাবিল হাসির ফোয়ারা ছুটল তাতে মুগ্ধ হয়ে প্রযোজক সুবোধ তার দাঁতের ফাঁকে কেরাণীবাবুকে

নিকটতম আত্মীয়তার শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলল। অস্পষ্ট বললে 'অমুকের ভাই।'

আবগারি-বিভাগের ঝামেলা মিটিয়ে যখন গা-বাড়া দিলাম তখন আমার ইচ্ছে হল গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে বলি 'গৃহিণীর বড় ভাই!' পারলাম না কারণ তা হ'লে সারা সরকারী মহলটার সঙ্গেই সরাসরি সম্বন্ধ পাতাতে হয়।

* * * *

এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারনাশন্যালের জেট প্লেন, গালভরা নাম বোয়িং সেভেন ও সেভেন। ছাড়বার সময় সাতটা। ভারতের বাইরে যাবার যাত্রীদের নানান ঝামেলা, অতএব এয়ারপোর্টে হাজিরা দিতে হয় দু' ঘণ্টা আগে। জুন মাসের পাঁচটা মানে টাটার ফার্নেস। দশ মিনিট বসেছি কি বসি নি, লোকে লোকারণ্য। কারো হাতে মালা, কারো হাতে ফুলের তোড়া। আমাদের বিদায়-সম্বর্দনার ব্যাপক ব্যবস্থা। ভিড় দেখে খানিকটা ভড়কে গেলাম। ছোট ছবির ছা পোষা পরিচালক, চলেছি দু' সপ্তাহের মেয়াদে, তারজন্য এত? সুবোধকে এককোণে টেনে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার?'

ও ততোধিক খাটো গলায় বললে, 'ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে ম্যানেজ করেছি, মানে পাবলিসিটি!'

লোক যখন এসেছে, কৌবি কতা ও নিবার্য। ঘর্মাক্ত মুখের ওপর কৃতজ্ঞতার লাইন টেনে মালা পরতে আরম্ভ করলাম। একগাল হেসে সবাই ফুল দেয় আর দু' গাল হেসে আমরা নি। যাচ্ছি তো দেড় মাসের মেয়াদে, তারপর ফিরেই তো আবার আমরা পরস্পরের যে কুটুম সেই কুটুমই তবু মনটা নরম হয়ে আসে। বিদায়ের সম্বর্ধনাটাও সঙ্গে সঙ্গে সেরে ফেলি।

কেউ আর বাড়ি ফেরার নাম করে না। যতই বলি 'আচ্ছা তা হ'লে···কেন আর কষ্ট করবেন···মিছিমিছি···' ততই শুনি তাও কি হয়? প্লেনটা ছাড়ুক, তারপর যাবো!'

বিদায়ের পালা শেষ ক'রে যখন কাস্টমস চেকে যাবো তখন জানা গেল যে যাত্রার সময় একঘণ্টা পিছিয়েছে। প্লেনের কোথায় গলদ দেখা দিয়েছে। প্রমাদ গুণলাম। বিদায় নেওয়া হয়েছে; ছবি তোলা হয়েছে, এমন কি করমর্দনও হ'য়েছে। এবার পুরো একটি ঘণ্টা কাটবে কেমন করে? তবু কাটল'। আবার হাসি, আবার বিদায়-সম্বর্ধনা, আবার করমর্দন এবং আবার ঘোষণা— প্লেন ছাড়তে আরও একঘণ্টা!!

দু'বার বিদায় নেওয়া হয়েছে, বাণী বিনিময়ও হ'য়ে গেছে, অতএব এখন কেবল হাসি দিয়ে ম্যানেজ করা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের এই যাওয়ার ব্যাপারে বহুপ্রকার হাসি দেখেছি; কোনটা দয়ার, কোনটা কৃপার, কোনটা ঈর্ষার, কোনটা করুণার (কৃতজ্ঞতার হাসি নিজেরাই সর্বদ হেসেছি বলে দেখার সৌভাগ্য হয় নি!) কিন্তু হাসি যে হাসপাতালে পাঠাবার উপক্রম করতে পারে এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম। ন'টায় যখন সত্যিই প্লেন ছাড়ল' তখন চোয়াল দু'টো একেবারে আড়ষ্ট।

* * * *

সারা প্লেনে যাত্রী আমরা পাঁচজন, ধাত্রী তার চেয়েও বেশি। ধাত্রী অর্থে হোসটেস্। আসলে ওরা এক একটি ডানাকাটা পরী। ফিকে নীল শাড়ি, টুকটুকে লাল ঠোঁট সিঁদুর আর ভাঙা ভাঙা হিন্দি মেশানো বাঁকা বাঁকা ইংরেজিতে ওদের শোভা বোম্বাইয়া-হিরোইনদেরও হার মানায়। নামে ভারতীয়া হ'লেও জেটের জঠরে ওরা অচিন-দেশের অপরিচিতা।

আমাদের ভৃঙ্গিসাহেবের কথা মনে পড়ছে। বৈষ্ণব বাবা মা অনেক আদর ক'রে নাম রেখেছিলেন ব্রজেন। তিনমাস বিলেতের বাতাসে নামটা পালটে তিনি হলেন বারজেন, ইংরেজি বানান Bartdzen। উনি একবার ব্রীজ খেলতে বসেছিলেন ক্যালক্যাটা ক্লাবে, মিসেস রয়কে পার্টনার নিয়ে। ভাগ্যক্রমে ভৃঙ্গিসাহেব একবার তাস পেলেন সোজাসুজি গ্রাণ্ড শ্লামের। মিসেস রয় স-উৎসাহে বললেন, 'ইউ লাকি ডগ।'

ভৃঙ্গিসাহেব তকে তকে রইলেন। তারপর ভৃঙ্গিসাহেবের ভাগ্যক্রমে (এবং মিসেস্ রয়ের দুর্ভাগ্যক্রমে!) মেমসাহেব এক হাত চমৎকার তাস পেলেন। ভৃঙ্গিসাহেব একেবারে অক্‌সোনিয়ান সুরে চিৎকার ক'রে উঠলেন—'ইউ লাকি বীচ্!'

আমাদের ধাত্রী দেবীরাও ওরই সম-গোত্রীয়। হিন্দি আমাদের জাতীয় ভাষা। ওঁদের বলার ধরণে মনে হয় ওটা বিজাতীয় বেইমানদের অকথ্য গালাগাল— যেটা বলা এবং বোঝা দুইই অপরাধ।

আর আমাদের সহযাত্রিণী ছিলেন মার্থা মেলফেয়ার। কলকাতা থেকে চলেছেন লণ্ডনে, তিনমাসের ছুটিতে। আশা আছে যদি কোন রকমে ওখানে বিয়েটা হ'য়ে যায়। দেখতে ঠিক সুন্দরী না হ'লেও লক্ষণীয় নিশ্চয়, কিন্তু আশ্চর্য, কলকাতা এয়ারপোর্টে আমরা ওঁকে কেউ লক্ষ্যই করি নি। বয়স সাতাশ কি আটাশ। রংয়ে ইংরেজি রক্তের স্পষ্ট ইসারা। জাতে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, কাজে স্টেনো। ওকে লক্ষ্য করলাম বম্বেতে, বুবলম বেরুট এয়ারপোর্টে। [ক্রমশ।

একটি সনেট

সুশান্ত ঘোষ

ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে মাঝরাতে আশ্চর্য সময়ে
সাইরেন, ব্রেনগান আজ যেন অদ্ভুত নীরব
পপলারে মুগ্ধ ছায়া; ছিন্নভিন্ন দৃশ্যাবলী সব
অন্ধকারে স্থির হয়ে দ্বিধান্বিত কৌতুকে, বিস্ময়ে
চেয়ে আছে, পাহাড়ের অন্তরালে ম্লান বৃক্ষগুলি
ফিরে চাই, বৃষ্টি নেই—আজ শুধু তোমার উজ্জ্বল
উষ্ণতায় বেঁচে-থাকা, আকাশের শাণিত বিজলী
কবে ঝলকাবে সেই দুঃস্থ স্মৃতি দু'হাতে সম্বল।

রক্তাপ্লুত মৃতদেহ, দর্পিত উল্লাসে ভয়াবহ
নিভে গেছে একে একে আজন্মের আন্তরিক স্বাদ।
অথচ অদূরে জ্বলে শান্ত রোদ, এলোমেলো হবে
সুবাতাস, চোরাবালি? ক্ষমাহীন পবিত্র বিবাহ
ঘটে গেছে বিরাট যুদ্ধের শেষে; নম্র অবসাদ
কেন যেন কেটে গেছে মত্ততার আরকে, আসবে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

ঊনত্রিশ

এ অঞ্চলে এখন প্রবল শীত পড়েছে। অরণ্যের শীত যেন বাঘের ভয়ের মতো। সারা শরীর একেবারে আড়ষ্ট করে দেয়। দময়ন্তী জানত না যে শীতে মানুষ এমন কাবু হতে পারে। তার বাবা যে অঞ্চলে থাকেন, সে এখান থেকে খানিকটা দূরে। সেখানে লোকালয় আছে, হাটবাজার আছে, রেল স্টেশনও কাছে। জায়গাটা একটু খোলামেলা। একটু ফাঁকা ফাঁকা। সন্ধ্যা হবার আগেই দময়ন্তীরা বসবার ঘরে এসে বসত। দরজা বন্ধ করে দিয়ে গল্প করত মায়ের সঙ্গে। মা কখনও উল বুনতেন, কখনও বই পড়তেন। এক-একদিন তার বাবাও এসে কাছে বসতেন।

দময়ন্তীর মনে হল, সে সব দিন আর ফিরে আসবে না। তার মা তো চলেই গেছেন, তার বাবাও তাকে গ্রহণ করবেন না। আর জগদীশ? জগদীশের লেপের উপরে দময়ন্তী একখানা কম্বল টেনে দিয়েছে। রাঁচি থেকে এই জিনিসগুলো সে নিয়ে এসেছিল। এগুলো জগদীশের জিনিস, দময়ন্তীর মনে হয় যে এই লেপ-কম্বলের ভিতর জগদীশের বেশ আরাম হয়। তার মুখ দেখেই এ কথা মনে হয়।

জগদীশের হাতে একখানা বই ছিল, কিন্তু তার মন ছিল না বই-এর পাতায়। দময়ন্তী বসে বসে একটা সোয়েটার বুনছিল। আর মাঝে মাঝে জগদীশকে দেখছিল।

এক সময় জগদীশ বলল: আজ গোলমালটা কেন হল?

জানি নে।

নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল।

হয় তো ছিল।

তোমার কোন কৌতূহল নেই?

না।

সে কি!

অন্যের সম্বন্ধে কোন কৌতূহল না থাকাই ভাল।

জগদীশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল: মিস্টার চৌধুরী চটেছিলেন লবাটের বৌ-এর ওপর, তাই না?

দময়ন্তী সংক্ষেপে বলল: হ্যাঁ।

আমার কি মনে হয় জান?

দময়ন্তী কিছু জানতে চাইল না।

মেয়েটা আমাদের সম্বন্ধেই কিছু লাগিয়েছিল।

দময়ন্তী এবারে মুখ তুলে তাকাল।

জগদীশ বলল: দেখতে পাও না, আমাদের চারিদিকে কেমন ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। নিশ্চয়ই নজর রাখে আমাদের ওপর।

দময়ন্তী মুখ নামিয়ে বুনতে লাগল।

জগদীশ আবার তার হাতের বইখানায় মন দেবার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর জিজ্ঞাসা করল: মিস্টার চৌধুরী এখন কি করছেন?

জানি নে।

সন্ধ্যাবেলায় কি করেন তিনি?

জানি নে।

তুমি তো আগে তাঁর কাছে বসতে।

দময়ন্তী আবার মুখ তুলে তাকাল। বলল: তখন আমার সঙ্গে গল্প করতেন।

কি গল্প করতেন?

তোমার কথাই হত।

হুঁ।

বলে জগদীশ চুপ করল।

আচ্ছা দময়ন্তী: একটু পরেই জগদীশ আবার কথা কইল: আজকাল তুমি মিস্টার চৌধুরীর কাছে কেন যাও না?

ভাল লাগে না।

কেন?

তোমার কাছেই থাকতে ইচ্ছা করে।

মিস্টার চৌধুরী শুনেছি খুব মদ খান।

দময়ন্তী চমকে উঠল, বলল: কে বলল তোমাকে?

জগদীশ একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল: দেখলে তো, শুয়ে শুয়েই আমি কত খবর রাখি।

এ-কথা কে তোমাকে বলেছে?

কেন, মিথ্যে কথা নাকি?

দময়ন্তী বলতে পারল না যে, এ মিথ্যা কথা। অনেকদিন আগে সে একদিন তাকে আকণ্ঠ মদ খেতে দেখেছে। কিন্তু এবারে তারা এখানে আসবার পরে একদিনও তাকে মদ ছুঁতে দেখে নি। সে যে মদ খাচ্ছে না সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ এই কথা মনে পড়তেই দময়ন্তী আশ্চর্য বোধ করল। বলল: নিজে দেখলে বিশ্বাস করব।

জগদীশ সহসা জিজ্ঞাসা করল : ঐ মেয়েটা কেমন ?

কোন্ মেয়েটা ?

ঐ তোমাদের মেমসাহেব।

ওর নাম সুজেন।

কি ?

পাদ্রীদের দেওয়া ইংরেজী নাম, ফরাসীও বলতে পার।

বেশ নাম তো।

মেয়েটাও ভাল।

জগদীশ একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল : তবে মিস্টার চৌধুরী আজ ওর ওপর অমন চটে উঠলেন কেন ?

তাঁকে জিজ্ঞাসা করি নি।

জগদীশ এবারে বলে ফেলল : মাঝে মাঝে তাঁর কাছে তোমার বসা উচিত।

এই কথা জানতে বলছ ?

না না, ও কথা কেন ? আমাদের জন্যে ভদ্রলোক এত করছেন, আমাদেরও তো কিছু করা দরকার।

বেশ।

দময়ন্তী উঠে পড়ল। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিল। তার পরেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল।

বারান্দার অপর প্রান্তের ডেক-চেয়ারে কাঠুরে চৌধুরী একাকী বসে আছে। হাতের চুরুটে ছাই জমেছে অনেকখানি। সেদিকে তার দৃষ্টি নেই। সে তাকিয়ে আছে সামনের অন্ধকারের দিকে। অরণ্যময় পৃথিবীও তারই মতো নিঃশব্দে প্রহর গণনা করছে। শীতে দময়ন্তীর সারা শরীর সহসা কেঁপে উঠল।

খানিকটা এগিয়ে যেতেই কাঠুরে চৌধুরীর ধ্যান ভাঙল। চমকে উঠে বলল : আরে, আসুন আসুন।

হাত দিয়ে একখানা চেয়ার ঠেলে দিয়ে বলল : বসুন।

কাঠুরে চৌধুরীর গায়ে একটা খদ্দরের সার্ট, তার উপর একখানা গরম চাদর। তার একটা দিক খসে পড়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে দময়ন্তী বলল : আপনার শীত করছে না ?

শীত ! জংলী মানুষের আবার শীত-গ্রীষ্ম কি !

বলেই হেসে উঠল হা হা করে। সেই উদ্দাম উন্মত্ত হাসি, অরণ্যের বন্যপশুও এই হাসি শুনে ভয় পাবে। তখুনি সংযত হয়ে বলল : জগদীশবাবু ঘুমোন নি তো ?

না।

বাঁচা গেল।

কেন বলুন তো।

আমার হাসিতে তাঁর ঘুম নিশ্চয়ই ভেঙে যেত।

দময়ন্তীর নিজের কথাই মনে পড়ল। সেই একদিন কাঠুরে চৌধুরীকে হাসতে বারণ করেছিল। তখন সে জগদীশ ঘুমিয়ে পড়লে তার কাছে আসতো। দময়ন্তীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

কাঠুরে চৌধুরী এই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনে নি। বলল : শীতে আপনাদের বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছে ! ফায়ার প্লেসটা যে কেন ব্যবহার করেন না বুঝি না। কাঠ আছে, কয়লা আছে, বললেই লবাট জেলে দিয়ে যায়।

দময়ন্তী হেসে বলল : আমরা তো আপনার মতো বাইরে বসে থাকি না, আমাদের শীত করে না।

এও আমার একটা দোষ। ঘুমোবার আগে আমি কিছুতেই ঘরের ভিতর ঢুকতে পারি না। আমার বাইরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। গরমে না হয় বাতাসের জন্যে বসি, আর বর্ষায় বৃষ্টি দেখতে, কিন্তু এই দুরন্ত শীতে কেন এমনি করে বসে থাকি যে, নিজেই জানি না। অনেকেই আমাকে পাগল ভাবে।

তার কথা শুনে দময়ন্তী হাসছিল।

আপনি হাসছেন তো ! গ্রে সাহেবও হাসত, এই শীতকালে বারান্দায় আমাকে দেখলেই পাগল বলত। মাথা গরম থাকলেই নাকি লোকে হিম লাগাতে চায়।

দময়ন্তী বলল : এও পাগলের কথা।

কাঠুরে চৌধুরী তখনি মেনে নিল, বলল : আপনি ঠিকই বলেছেন। বুড়ো সাহেব নিজেও পাগল ছিল। এক একদিন এমন এক একটা কাণ্ড করত যে, তা সামলাতে আমারই প্রাণান্ত।

এরই মধ্যে দময়ন্তী জেনে ফেলেছে যে গ্রে সাহেবের গল্প করতে কাঠুরে চৌধুরী ভালবাসে। জগদীশকে সে অনেক গল্প শুনিয়েছে। অনেক পাগলামির গল্প। আজ বলল : বুড়ো মরবার সময়ও আমার সঙ্গে রসিকতা করে গেছে।

কি রকম ?

ম্যাক্লাস্কিগঞ্জের একটা নার্সারি স্কুল, বুড়ো তাতেই তার লাভের অংশ দিতে বলে গেছে। সেই দায় ঘাড়ে নিয়ে আমি এখনও হিমসিম খাচ্ছি।

কেন ?

ও জায়গাটা জমজমাট ছিল দেশ স্বাধীন হবার আগে। এ মুলুকের যত সাহেব, রিটায়ার করে সবাই সেখানে বাড়ি করে বাকি জীবন কাটাত। এখন তার অবস্থা দেখুন। না ছাত্র, না মাস্টার। স্কুলের নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে বুড়োর টাকা আমি জমা দিয়ে দিচ্ছি।

দময়ন্তীর তখুনি একটা কথা মনে এল। কিন্তু লজ্জায় সে কথা সে বলতে পারল না। কাঠুরে চৌধুরী মাস্টারের অভাবের কথা বলেছে। সেখানে একটা কাজ কি পাওয়া যাবে না ? সে চেষ্টা করলেই হয় তো হয়। কিন্তু—

এর মধ্যেও একটি কিন্তু আছে। কাঠুরে চৌধুরীর দয়াতেই সারাজীবন বাঁচতে হবে। জগদীশ কি এটা ভাল চোখে দেখবে ? তাকে না জিজ্ঞেস করে কিছু বলা উচিত নয়। থাক আজ। আজ তাদের অন্য কথা হোক।

দময়ন্তীর হঠাৎ নজরে পড়ল, দরজার আড়াল থেকে সুজেন উঁকি দিচ্ছে। কাঠুরে চৌধুরী বারান্দায় তার ছায়া দেখেই চিনতে পারল। বলে উঠল : কে রে মেমসাহেব নাকি ?

সলজ্জ হাসিতে সারা মুখ উদ্ভাসিত করে মেয়েটা বেরিয়ে এল। রঙিন শাড়ি পরেছে ঝকঝকে ব্লাউজের উপর, মাথায় পরিপাটি সিঁথি। ফুল গুঁজেছে খোঁপায়। সামনে এসেই কাঠুরে চৌধুরীকে একটা প্রণাম করল।

কি রে, এত ভক্তি কেন আজ ?

উঠে দাঁড়িয়ে সুজেন তার গলার মালা দেখাল। রূপোর নতুন মালা।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: এইটি কিনলি বুঝি? দেখি দেখি, কেমন হয়েছে?

মেয়েটা অসঙ্কোচে এগিয়ে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল।

কাঠুরে চৌধুরী নেড়ে চেড়ে দেখল। তারপরে তার গাল টিপে দিয়ে বলল: খাসা হয়েছে।

লজ্জায় সুজেনের মুখ রাঙা হল। বলল: তিন টাকা ছ'আনা বেশি লাগল।

তা লাগুক। হতভাগা সাহেব গেল কোথায়?

ভয়ে ও লুকিয়ে আছে।

ভয় কিসের?

বলছে, সাহেবের মেজাজ আজ খারাপ। তার ওপর—

তার ওপর কি?

তিন টাকা ছ' আনা বেশি লাগল।

কাঠুরে চৌধুরী হা-হা করে হেসে উঠল। বলল: এই কথা। বল আমার ব্যাগ থেকে আরও দশ টাকা বের করে নেবে।

সুজেন দময়ন্তীকেও একটা প্রণাম করল। বলল: সাহেবের তো ছেলেমেয়ে নেই, আমরাই তাঁর ছেলেমেয়ে।

কাঠুরে চৌধরী বলে উঠল: শুনছেন এদের কাণ্ড! আমার ছেলেমেয়ে নেই বলে এদের আমার ছেলেমেয়ে সাজবার সখ। কেন-রে, আমার তো বউও নেই, আমার বউ হবার সখ হয় না?

বলে কাঠুরে চৌধুরী হেসে উঠল।

মস্ত বড় জিভ বার করে মেয়েটা পালিয়ে গেল।

কাঠুরে চৌধুরী চেঁচিয়ে উঠল: ও-রে লজ্জাবতী, ও মেমসাহেব, তোর সাহেবকে একবার পাঠিয়ে দে।

লবাট দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দার আড়ালেই। তখুনি বেরিয়ে এল। কাঠুরে চৌধুরী বলল: বেশ গরম হু'পেয়ালা কফি নিয়ে আয় তো।

কাঠুরে চৌধুরীর কাণ্ড দেখে দময়ন্তী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এই রকমের কথাবার্তা ও আচরণ তার কল্পনাতীত। এই অরণ্যে এসে তার নূতন অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

লবাট চলে যাচ্ছিল, কাঠুরে চৌধুরী বলল: হু'পেয়ালা নয়, তিন পেয়ালা।

দময়ন্তী বলল: কফি আমি ভালবাসি না।

তবে চা কর।

লবাট চলে যাবার পর দময়ন্তীর একটা পুরনো কথা মনে পড়ল। অনেক দিন আগে সে কাঠুরে চৌধুরীকে মদ খেতে দেখেছিল। বোধহয় বলেছিল যে প্রতি সন্ধ্যায় সে মদ খায়, আকণ্ঠ খায়। কিন্তু এবারে, এখানে আসবার পর সে একদিনও তাকে মদ খেতে দেখে নি। কাঠুরে চৌধুরী কি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে! একটুখানি ইতস্তত করে দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করল: আপনি আজকাল মদ খান না?

না।

ছেড়ে দিয়েছেন?

না।

তবে?

আপনারা আছেন বলে সময় বেশ কেটে যায়। হাতে কাজ থাকত না বলেই তো মদ খেতাম।

দময়ন্তীর মনে হল, এ কথা সত্য নয়। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করল না।

তিন-পেয়ালা চা আনতে লোকটি বেশিক্ষণ দেরি করল না। কাঠুরে চৌধুরী বলল: ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে খাইয়ে আয়।

জগদীশ আজকাল চা খাবার কায়দা পেয়ে গেছে। ডাক্তারের নির্দেশমতো সে চৌকিতে শোয়। শক্ত বিছানায় তার শোবার আদেশ। একটু সাহায্য পেলেই সে পাশ ফিরতে পারে। বিছানার পাশে পেয়ালাটা ধরলেই সে অনায়াসে চা খায়।

এবারে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে কাঠুরে চৌধুরী বলল: আজ বিকেল বেলায় মেয়েটাকে বকে মনটা খারাপ হয়েছিল। দশ টাকা বকশিশ দিয়েছিলাম।

কি দোষ করেছিল?

হতভাগা লবাটই ওর নামে নালিশ করেছিল, ও নাকি মেম সাহেব হয়েছে। দিনকয়েক পরে ওদের পরব, নিজেও যাবে না, লবাটকেও যেতে দেবে না। আপনিই বলুন, ওরা তো আর ইচ্ছে করে খৃষ্টান হয় নি, পাদ্রীরা ওদের বাপ-দাদাকে ভুলিয়ে খৃষ্টান করেছে। কেন তারা খৃষ্টান হয়েছিল শুনলে আশ্চর্য হবেন।

এমন সামান্য কারণে মানুষ এমন চটতে পারে, এ ধারণাও দময়ন্তীর ছিল না। আশ্চর্য হয়ে বলল: কেন?

ভূতপ্রেতে এদের গভীর বিশ্বাস, ভয়ও অগাধ। কারও অসুখ করলে মোষ থেকে মুরগি পর্যন্ত বলি দেয়। গ্রামে বেশি অসুখ শুরু হলে সে গ্রাম ছেড়েই পালিয়ে যায়। পাদ্রীরা ওদের সাহস দিয়ে বলত, খৃষ্টান হলে আর ভূতে ধরতে পারবে না। ওষুধ দিয়ে তারা রোগ সারাত। প্রায় একশো বছরের চেষ্টায় ওরা প্রায় তিন লাখ ওরাওঁকে খৃষ্টান করেছে। তা করুক। কিন্তু জীবনের চেয়ে কি ধর্ম ওদের বড় হবে। ধর্মের ওরা বোঝে কি।

কাঠুরে চৌধুরী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলল: ধর্ম যদি ওরা বুঝবেই তো যাত্রা ভগতের ডাকে ওরা বৃটিশের বিরুদ্ধে যেত না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যাত্রা ভগৎ প্রচার করেছিল— উপদেবতার পুজো চলবে না, মদ-মাংস ছাড় আর বলি বন্ধ কর। বলল, বিদেশীরাই এদেশে ভূত-প্রেত এনেছে। দেখতে দেখতে আন্দোলন শুরু হল, তার নাম টানা ভগৎ আন্দোলন:

টানা বাবা টানা ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা।

সরল জাত। যে যা বলে তাই ওরা বিশ্বাস করে। ঐ মেয়েটাও কার কাছে শুনে এসে বলছিল, পরবে যেও না। কেন যাবে না! পরবই তো ওদের জীবন! পরের কথায় জীবনটা ওরা নষ্ট করবে।

কাঠুরে চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে দময়ন্তী কোন কথা খুঁজে পেল না। বিচিত্র এই মানুষ। এমন মানুষের পরিচয় সে আগে কখনও পায় নি।

ত্রিশ

শেষ পর্যন্ত দময়ন্তীরও পরবে যাওয়া স্থির হল। জগদীশ মত দিয়েছে।

সকালবেলায় ধাঙড় মহাতো এসেছিল কাঠুরে চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করতে। কাঠুরে চৌধুরী অভিমান করে বলেছিল: আমাকে তোরা ভুলে গেলি?

হাত জোড় করে ধাঙড় মহাতো হেঁট হয়ে বলেছিল: ছি: ছি: সাহেব, এ কখনও হতে পারে! তোমাকে না হলে কি আমাদের পরব জমে!

ও-দিকের ঘর থেকে দময়ন্তী এসেছিল বেরিয়ে। তাকে দেখতে পেয়ে বুড়ো জিজ্ঞেস করল: তোমার বৌ না কি?

দূর হতভাগা, বিয়ে করলে তোরা নেমন্তন্ন খেতিস না!

তা ঠিক, তা ঠিক।

ও আমাদের ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের বৌ, ওকে বলবি না?

ধাঙড় মহাতো এবারে দময়ন্তীকে নমস্কার করল হেঁট হয়ে। তাদেরও পরবে যাবার নিমন্ত্রণ জানাল। কাঠুরে চৌধুরী একটা ভেংচি কেটে বলল: দূর হতভাগা, ইঞ্জিনীয়ার সাহেব যাবে কি করে! সে তো কোমর ভেঙে বিছানায় পড়ে আছে।

ধাঙড় মহাতো খুবই লজ্জিত হল, চিন্তিতও হল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: আর তোর নিমন্ত্রণে ইনিই বা যাবেন কেন! ধাঙড়ী মহাতো কোথায়?

তুমি একা মানুষ বলে তো আমরা জানি। তাই একাই এসেছি। তবে যা, ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে গিয়ে বল। ধাঙড়ী মহাতো এসে এঁকে নিয়ে যাবে। যাবেন তো আপনি?

বলে দময়ন্তীর দিকে তাকাল।

দময়ন্তী কিছুই বুঝতে পারে নি। কাঠুরে চৌধুরী বলল: আজ ওদের পরব আছে। হাঁড়িয়া খেয়ে ওদের মেয়ে-পুরুষ আজ নাচবে।

তারপরেই বলল: সারাদিনই তো বাড়িতে বসে থাকেন, গেলে মন্দ লাগত না।

আপনি যাবেন তো?

কাঠুরে চৌধুরী হেসে উঠল, বলল: আমি না গেলে কি ওরা আমাকে ছেড়ে দেবে? দলশুদ্ধ এখানে চড়াও হয়ে আমাকে চ্যাং-দোলা করে নিয়ে যাবে।

দময়ন্তীও হাসল তার কথা শুনে।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: যা যা, ওঁর সঙ্গে যা, ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে বল গিয়ে। বকুনি খেয়ে পালিয়ে আসিস না, মত আদায় করে আসবি।

অনেক পুরনো লোক এই ধাঙড় মহাতো। মাথার সবক'টা চুল কবে সাদা হয়েছে তার হিসাব জানে না। কাঠুরে চৌধুরী এসে অবধি তার এই চেহারাই দেখছে। দময়ন্তীকে অনুসরণ করে সে জগদীশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। বেরুল অনেকক্ষণ পরে। হাসতে হাসতেই বেরুল, বলল: ধাঙড়ী বিকেলে আসবে।

আমার জন্যে তুই আসবি না?
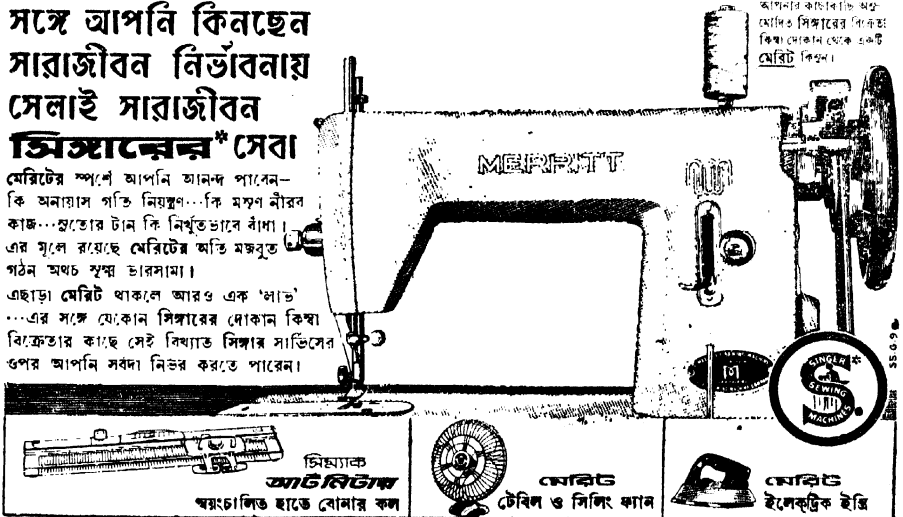
বুড়ো হেসে বলল: তা যদি বল তো এইখানেই থেকে যাই, তোমার সঙ্গেই যাব।

বেশ তো, ওরে লবাট, দু'টো মুরগি কাট আজ, ধাঙড় মহাতো এখানে খাবে।

ধাঙড় মহাতো রসিয়ে রসিয়ে হাসল খানিকক্ষণ, তারপর বলল: এই বুদ্ধি না হলে সাহেব বলেছে কেন? আমি না গেলে ধাঙড়ী আসবে কোথা থেকে!

কাঠুরে চৌধুরী কপট রাগের ভাণ করে বলল: যা যা, তোকে আর আসতে হবে না।

ধাঙড়ী মহাতো এসেছিল, এসেছিল আরও দু'জন মেয়ে। জগদীশের সঙ্গে দেখা করে তারাই দময়ন্তীকে টেনে বার করল। ওঝা রইল জগদীশের কাছে।

পথে নেমে কাঠুরে চৌধুরী বলল: আপনি বেরুতে পারবেন বলে আমার ভরসা ছিল না।

কেন বলুন তো?

আমার তাই মনে হয়েছে।

দময়ন্তী বলল: ঘরে বসে থাকলে কি আমার চিরদিন চলবে!

এ ক্ষোভের কথা। কাঠুরে চৌধুরী তাই অন্য কথা বলল: এতটা পথ কি আপনি হাঁটতে পারবেন?

আপনারা পারবেন, আর আমি পারব না?

আমরা অনেক কিছু পারি, যা আপনি পারবেন না। শহরের লোকের জন্যে তো পরিশ্রমের কাজ নয়, বসে বসে তারা বুদ্ধির কাজ করবে। নিজে না খেটে অন্যের খাটুনির পয়সায় খাবে রাজভোগ।

দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করল: লবাটরা কোথায় গেছে?

তারা গেছে অন্য গ্রামে। সে আরও দূরের পথ। আজ রাতে ওরা ফিরতে পারবে না।

আমরা পারব তো?

দময়ন্তী তাকাল কাঠুরে চৌধুরীর মুখের দিকে।

সে হেসে বলল: না ফিরলে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব আমাকে গুলী করে মেরে ফেলবেন।

দময়ন্তী শিউরে উঠল। এই মুহূর্তে তার মনে হল যে কাঠুরে চৌধুরীর সঙ্গে এমন করে বেরিয়ে আসা তার উচিত হয় নি। জগদীশ তাকে ভুল বুঝবে। সে বড় দুঃখের, বড় অসম্মানের। তার চেয়ে ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকাই ভাল ছিল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: রাগ করলেন না কি?

না না, রাগ নয়। অসুস্থ মানুষটাকে ফেলে এলাম, তাই ভাবছি—

খারাপ লাগবারই কথা।

ধাঙড়ী মহাতো এদের কথা শুনছিল তারা টের পায় নি। সে বলল: পরবের দিনে দোষ হয় না।

হিন্দী এঁরা বোঝে, বলতে পারে। নিজেদের মধ্যে যে ভাষা ব্যবহার করে তাও চেষ্টা করলে বোঝা যায়। যারা এদের দক্ষিণ দেশের লোক বলে, তারা ঠিক বলে কি না সে বিষয়ে কাঠুরে চৌধুরীর সন্দেহ আছে।

ধাঙড়ী মহাতো একটু এগিয়ে এল, বলল: গ্রামে হালচাল সব বদলে যাচ্ছে সাহেব, নিজেদের বলতে আর কিছু থাকবে না।

কি রকম?

ধুমকুড়িয়া আগলাবার জন্যে নাম হত ধাঙড় মহাতো, আমি আগলাতাম মেয়েদের ঘর। আমাদের গাঁয়ের ধুমকুড়িয়া দেখেছ তো? ভেঙে পড়ছে।

দময়ন্তী কাঠুরে চৌধুরীর দিকে তাকাল। সে বলল: বড় ছেলে-মেয়েদের এরা ধাঙড়-ধাঙড়ী বলে। দিনের বেলায় যথেচ্ছ মেলামেশা কর, কারও আপত্তি নেই। রাতে আলাদা শুতে হবে গ্রামের ধুমকুড়িয়ায়। তার জন্যে ছেলে মেয়েদের বয়স অনুসারে তিনটি করে ভাগ। আজকালকার ছেলেমেয়েরা এসব মানে না।

দময়ন্তী বলল: আমি তো এখানকারই মেয়ে, কিন্তু আমি এদের সম্বন্ধে কিছুই জানি নে।

জানতে চান নি বলেই জানেন না।

দময়ন্তী বললে: আমাদের কাছে তো কেউ আসত না।

ওরা শুধু পাড়ার লোককে ডাকে। পাড়া বোঝেন? আমাদের মতো পাড়া নয়। ওদের পাড়া হল কয়েকটা গ্রাম নিয়ে। আমি ওদের পাড়ারই লোক।

হেসে বলল: আত্মীয়ও বটে।

ধাঙড়ী মহাতো সমর্থন করে বলল: তা তুমি বলতে পার। তোমার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তাই হয়েছে।

তারপর দময়ন্তীর দিকে চেয়ে বলল: এই সাহেব আমাদের ধর্মকর্ম সবই জানে। চাই কি, পাহানের কাজও করতে পারবে।

পাহান কি?

পাহান বোঝ না বুঝি। কি বলে গো, পাহানকে তোমাদের দেশে কি বলে?

কাঠুরে চৌধুরী বলল: পুরোহিত। তারপর বল, কি রকম করে তোমরা তিন বছর পর পর পাহান বদলাও। এবারে আমি সুপধারীক শিখিয়ে দেব—ওর নোড়াবাঁধা কুলোটা যেন আমার বাড়ির দিকেই চলে। দাও না একবার আমাকে পাহান হতে।

সঙ্গী মেয়ে দু'টো খিল খিল করে হেসে উঠল।

ধাঙড়ী মহাতো বলল: কি করবে তা হলে?

ওদের সর্ণায় গিয়ে বলব, ধর্মেশ আমাকে স্বপ্ন দিয়েছে মহাদানিয়ার পুজো বন্ধ। শুধু চণ্ডীর পুজো আর মাসে মাসে সেন্দ্রা—দাও সেন্দ্রা বিশু সেন্দ্রা, লেখাপড়া শিখে তোদের ধাঙড়গুলো এখন ধাঙড়ীর মতো শুধু ঘরকন্না করছে।

মেয়ে দু'টো আরও জোরে হেসে উঠল। বলল: তুমি ঠিক বলেছ। এখনকার ছেলেগুলো বর্শা লেবড়া চালাতেও ভুলে গেছে। ধুতি-কোর্তা পরে শহরে ছুটোছুটি করছে চাকরির জন্যে। আরে, চাকরি তোদের রাজা করবে!

একটু থেমে বলল: শুনলে তুমি ক্ষেপে যাবে সাহেব, সেদিন একটা সাক্ষীর ব্যাপার নিয়ে ওরা পঞ্চে এল না, মহাতোকে কলা দেখিয়ে শহরে গেল মামলা করতে।

কে লোকটা?

নাম শুনে তোমার কাজ নেই।

কেন ?

প্রথমে তোমাকে বলবে ভেবেছিল, তারপর ঠিক করল, থাক। তোমার কানে উঠলে তার প্রাণটাই যাবে।

শহরে গিয়ে গিয়ে তোরাও দেখছি শহুরে হয়ে গেছিস। তোদের আর রইল কি ? পঞ্চ গেল, মহাতো গেল, কোনদিন শুনব পরব গেছে, সরণ বুড়িয়াও গেছে।

না সাহেব, এমন করে বলো না। যা দেখতে পাচ্ছি তাতে কোনদিন তোমার কথাই সত্যি হবে।

পথের দু'ধারে, শুষ্ক রুক্ষ মাঠ। ধানকাটা হয়ে গেছে, নূতন করে জমি চাষ হয় নি। পথ সংকীর্ণ, গরুর গাড়ি চলে চলে দু'চাকার গর্ত হয়েছে গভীর। এ পথে জীপ চলে না, মাঝখানের উঁচু জমিতে আটকে যাবে। পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্তের আর দেরি নেই।

দময়ন্তীর এ পথে চলতে ভয় করছিল। তারপর মনে পড়ছিল সেদিনের সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা। সে পথেও ছিল এমনি গরুর গাড়ির চাকার দাগ। এমন গভীর গর্ত যে মাঝে মাঝেই তার ভয় হচ্ছিল উল্টে যাবার। কিন্তু সে পথ এর চেয়ে প্রশস্ত ছিল বলেই তারা চলতে পারছিল। শেষ পর্যন্ত—

দময়ন্তী শিউরে উঠল। কাঠুরে চৌধুরী তার এই শিহরণ দেখে বলল : আপনার কি শীত করছে ?

না।

ফেরার সময় শরীর জমে যাবে।

ফিরতে কি আমাদের খুব বেশি দেরি হবে ?

কাঠুরে চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল : কি ধাঙড়ী মহাতো, আমাদের ছাড়বি কখন ?

বুড়ি হাসল। ফেরার জন্যে তো তোমার কোনদিন তাড়া দেখি নি সাহেব !

তা দেখিস নি, কিন্তু আজ যে পরের বৌ সঙ্গে আছে। তাকে তো সময়মতো পৌঁছতে হবে।

তা হবে।

কাঠুরে চৌধুরী দময়ন্তীকে বলল : আপনার ভাল না লাগলে আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

ভাল লাগলেও আসব।

সেই ভাল। শুনলি তো ধাঙড়ী মহাতো, পিছনে ঘরের টান থাকলে এইরকম হয়। আমাদের বাপু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিস।

তোমাদের যেমন মর্জি।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বুড়ির নাক দিয়ে।

ধাঙড় মহাতো খানিকটা পথ এগিয়ে এসে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। মহাতোর সঙ্গে পাছানও ছিল। তারা প্রথমেই গিয়ে সর্ণায় ঢুকল। পরিষ্কার একটি আমের কুঞ্জ, গাছে গাছে ছাওয়া এই অন্ধকার জায়গাটি গ্রামের পবিত্রতম স্থান। কাঠুরে চৌধুরী প্রণাম করল, তাকে দেখে দময়ন্তীও একটা প্রণাম করল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : বলো হে মহাতো, তোমাদের নাচ কখন শুরু হবে ?

তার তো দেরি আছে সাহেব।

কিন্তু আজ আমরা দেরি করতে পারব না, বুঝলে!

ধাঙড়ী মহাতো বলল: পরের বৌ সঙ্গে আছে, তাই তাড়াতাড়ি যেতে চাইছে।

কাঠুরে চৌধুরী ধমক দিয়ে উঠল: দূর বোকা, ওর স্বামী যে কোমর ভেঙে শুয়ে আছে, তাকে দেখবে কে, আর মনই বা এখানে টিকবে কেন!

সবাই মাথা নেড়ে বলল: ঠিক বটে।

দময়ন্তীর জন্যেই আজ ধাঙড়-ধাঙড়ীদের তাড়াতাড়ি ডাকা হল। সবাই বললে, এই সন্ধ্যাবেলাতেই একটু নাচগান হোক। হাঁড়িয়া কই?

একটা ছেলেকে ডেকে কাঠুরে চৌধুরী বলল: কি রে মগালিশের পো, তোর বিয়ে হল, না এখনও হ্যাংলামি করে বেড়াচ্ছিস।

ছেলেটা লজ্জা পেল।

কেউ বিয়ে করছে না বুঝি? ধাঙড়ী মহাতো করছে কি! এখন তো বেজোর মাস। দে না একটা বিয়ে দিয়ে।

কে একজন জবাব দিল: ওকে বিয়ে করবে কে। বেচারা সাঙার চেষ্টায় আছে।

কাঠুরে চৌধুরী হা-হা করে হেসে উঠল।

কাচের গেলাসে করে মহাতো হাঁড়িয়া এনেছিল। একটা নয়, দু'টো গেলাস। কাঠুরে চৌধুরী একটা গেলাস নিয়ে খুশি হয়ে উঠল, বলল: দে দে, ভাল করে তৈরি করেছিস তো, অনেকদিন তোদের হাঁড়িয়া খাই নি।

দময়ন্তী ভয়ে ভয়ে বলল: এ তো মদ!

কাঠুরে চৌধুরী বলল: নিন নিন, একেবারে খাঁটি জিনিস, কোন ভেজাল নেই এ'তে।

কয়েক চুমুকেই নিজের গেলাসটা শেষ করে দিল।

দময়ন্তী তার গেলাসটা হাতে নিয়েছিল, কিন্তু তাতে মুখ দেবার সাহস পেল না।

ধাঙড়-ধাঙড়ীরা তখন দু'দলে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সাঁইখো তুহিলা থেচকা নাগেরা নিয়েও দাঁড়িয়েছে ধাঙড়েরা, একজনের হাতে মুরলী। হুকুম পেলেই তারা বাজনা শুরু করবে। তারপর নাচ। এগিয়ে এসে মহাতো বলল: এরা জানতে চাইছে কি গান ধরবে।

কাঠুরে চৌধুরী হেসে উঠল হা-হা করে। বলল: তোদের পরব, তোরা গাইবি। আমি কি বলব?

মহাতো তবু নড়ল না। তাই দেখে কাঠুরে চৌধুরী বলল: তা হলে সেই গানটা ধর—

গুচ, পেলো, কালোট কোয়, টিকো ধোড়া

বলা মাত্রই নাগেরা ডুমডুম করে উঠল। তার সঙ্গে অন্য যন্ত্রের খচখচানি। ধাঙড়েরা গাইল:

গুচ, পেলো, কালোট কোয়, মমহায় পাত্রা।

অবাক হয়ে দময়ন্তী তাকাল কাঠুরে চৌধুরীর দিকে।

কাঠুরে চৌধুরী হেসে বলল: এটা যাত্রর গান। না বলে দিলে আপনি এর মানে বুঝবেন না। ছেলেরা বলছে, চল কন্যা, আমরা দু'জনে টিকো নদীতে যাই, আমাদের প্রিয় বনে, সেই বনে গিয়ে আমরা দু'জনে কন্দা, পাতা কুড়োব, আর টিকো নদীতে মাছ ধরব।

মেয়েরা এগিয়ে এল কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে।

একজন রসিক মেয়ে বলল: সাহেব যে বসে রইল।

আর একজন বলল: হাত ধরে তুলে আন না।

একবার দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে কাঠুরে চৌধুরী নিজেই উঠে পড়ল।

নাচ হল অনেকক্ষণ ধরে। দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে কাঠুরে চৌধুরীকে দেখছিল। লোকটা এই দলের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে। শুধু পোশাক আর চেহারায় ছাড়া আর কোন তফাৎ নেই। লম্বায় সে ওদের চেয়ে অনেক বড়, গলাতেও ওর জোর বেশি। দলের মধ্যে ওকেই সবচেয়ে দামাল দেখাচ্ছে।

ফিরে এসে যখন সে দময়ন্তীর পাশে বসল, তখন তার কপালে কিছু কিছু ঘাম। তার জন্য আর এক গেলাস হাঁড়িয়া এল। গেলাসটা হাতে নিয়ে সে দময়ন্তীকে বলল: আপনি এখনও শেষ করেন নি?

দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে দেখল যে, কখন এক সময় সে খানিকটা হাঁড়িয়া খেয়ে ফেলেছে। মনে মনে লজ্জা পেল অপরিসীম, কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। গেলাসটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: আপনি উঠে পড়লেন?

চলুন, ফিরে যাই।

মহাতো এগিয়ে এল, এল ধাঙড়ী মহাতোও। বলল: ভাল লাগল না?

দময়ন্তী বলল: খুব ভাল লাগল। কিন্তু আমাকে ফিরতে হবে।

কাঠুরে চৌধুরী তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করল না। পকেট থেকে খানকয়েক নোট বার করে মহাতোর হাতে দিয়ে বলল: তবে চলি রে, আমার নাম করে তোরা আর একদিন হাঁড়িয়া খাস।

সবাই দুঃখিত হল। মহাতোরা এগিয়ে দিল তাদের।

[ক্রমশ]

প্রশ্ন

তেজেন্দ্রলাল মজুমদার

হৃদয়ে ঘুমিয়ে থাকা একটি কামনা
দুরাশার বর্ম বক্ষে কোনও এক সৈনিকের মত
কেন আজ জেগে ওঠে, মানসী বলো না?
গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য এখনও তো দিগন্ত বিস্তৃত।

এখনও তো মাঠে মাঠে সবুজেরা করে নি মিছিল,
পাখিরাও ফিরে এসে বাঁধে নি যে নীড়,
হাতছানি দেয় নি তো প্রাচুর্যের প্রভাত স্বপ্নীল,
ফলভারে শীষগুলি এখনও তো নোয়াই নি শির।

তবু কেন ঘুম ভেঙে একটি কামনা
আমাকে ব্যাকুল করে মানসী বলো না?

পারাপার

—প্রভাত কান্তি ঘোষ

ভুল ভুলাইয়া

—সূর্যনারায়ণ দত্ত

—অমলেন্দু ঘোষ

খেলার ছলে

—নির্মল রায়

জাপানী বৌদ্ধমন্দির (সারনাথ)

—এস এম হায়দার

তীর, তরী, তরু

—নবগোপাল সিংহ

—মানসকুমার চৌধুরী

জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা

—চিত্রজিৎ ঘোষ

—বিশ্বনাথ ঘোষ

—অসিত মিত্র

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প

—পারুল ভট্টাচার্য

আমিও খেলবো

—শান্তিময় সান্যাল

জলহস্তীর হাঁ—

—পি জি দাস
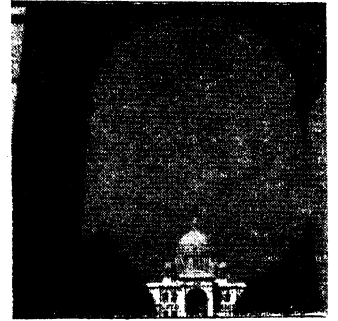
দৃষ্টিকোণ

—মলি রে

বোটানিক্স (দার্জিলিং)

—সমীর দত্ত
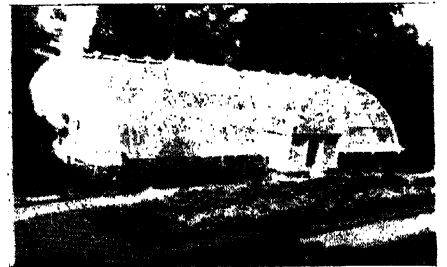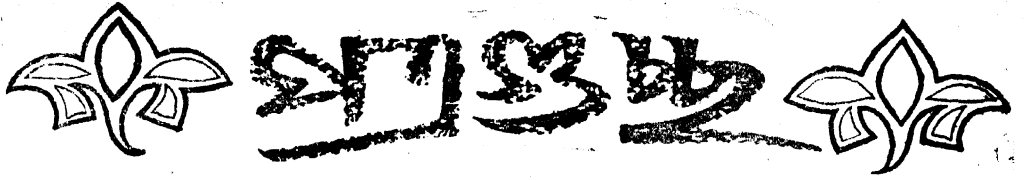
[বিগতযুগে যে-সকল স্মরণীয় ঘটনা জাতীয়জীবনে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে, আশুতোষ-লিটন মতভেদ তন্মধ্যে অন্যতম। পদাধিকারবলে তদানীন্তন বাঙলার লাট লর্ড লিটন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। এই অধিকারে তিনি আপন আজ্ঞাবহ এবং ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির চরিতার্থকাররূপে দেখতে চেয়েছিলেন বাঙলার বাঘ আশুতোষকে। কিন্তু তেজস্বিতা, বলিষ্ঠতা ও নির্ভীকতার ত্রিবেণীসঙ্গম যাঁর মধ্যে অবস্থিত, সেই আশুতোষ ছিলেন অন্য এক বিশেষ ধাতুতে গঠিত। লিটন যাঁকে নিছক একজন 'ব্যক্তি' ভেবেছিলেন আসলে তিনি নিজেই এক 'প্রখর সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব'। লিটনের দর্পিত মনোভাব, প্রভুসুলভ আচরণের সমুচিত প্রত্যুত্তর পাঠিয়েছিলেন সারা ভারতের গর্ব ও গৌরব, বাঙলা দেশের শিক্ষাচর্চার ইতিহাসে অন্যতম আলোকস্তম্ভ, পুরুষসিংহ ব্রাহ্মণতনয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। লাটসাহেবের গর্বোদ্ধত অঙ্গুলিহেলনে পোষ-মানানো গেল না বাঙলার বাঘকে। এই মূল্যবান পত্রে আত্মাভিমুক্তি এবং বলিষ্ঠব্যক্তিত্বের এক অনন্যসাধারণ সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। আশুতোষের জন্মশতবার্ষিকীর পুণ্যমুহূর্তে ঐতিহাসিক পত্রটি আমরা আমাদের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার সমীপে সমুপস্থাপিত করতে অভিলাষী। পত্রে আলোচিত শিক্ষামন্ত্রীর আসনে তখন অধিষ্ঠিত ছিলেন স্বর্গীয় স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়। —স]

স্যার আশুতোষের পত্র: লর্ড লিটনকে লিখিত

সেনেট হাউস

কলিকাতা—২৮-এ মার্চ, ১৯২৪

প্রিয় লর্ড লিটন,

আপনার ২৩-এ মার্চ তারিখে লিখিত পত্রটির—যাহা গত শনিবার সন্ধ্যায় সমাবর্তন হইতে ফিরিয়া আমি পাইয়াছি—প্রাপ্তিস্বীকার করি। আমার আচরণের প্রতি আপনি যেরূপ অন্যায় ও মূল্যহীন সিদ্ধান্ত আরোপ করিয়াছেন সে কারণে এই পত্রে আমি আমার বক্তব্য খোলা-খুলিভাবে এবং দ্বিধাহীনচিত্তেই প্রকাশ করিব।

উপাচার্য হিসাবে আমাকে পুনর্নিয়োগ করা সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাব এবং তৎসম্পর্কিত আরোপিত সর্তাদি সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করার পূর্বে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার মনোভাব সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য আলোচনার ইচ্ছা রাখি। এ সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হইয়াছে সেগুলির বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান করা যদিচ সম্ভবপর নয় তথাপি ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমার আচরণে সমালোচনা করার পূর্বে সেগুলির উপজীব্য আপনি আপনার স্মৃতিপটে উদিত করিতে পারেন নাই। সম্ভবত আপনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই যে শ্রীযুক্ত মিত্রের নিকট হইতে বিশ্ববিদ্যালয় বিলের একটি কপি পাওয়ার পর যে ৪ঠা নভেম্বর ১৯২২ তারিখে আপনার লিখিত যে পত্রে ঐ বিলের বিষয়বস্তু এবং আদর্শ সম্বন্ধে আমি বিস্মরণের অযোগ্য সর্তে আমার তীব্র আপত্তি জানাইয়াছিলাম। ঐ বিলটি আমার নিকট এক রীতিমত আশ্চর্যের খোরাক জোগায়।

আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, শ্রীযুক্ত মিত্র আমার ব্যক্তিগত অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু আপনার ৮ই নভেম্বর ১৯২২ তারিখে লিখিত পত্রে আমাকে আপনি স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত মিত্র আপনাকে জানাইয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের অভিমত সরকারীভাবে লওয়া হইয়াছে এবং আপনার ব্যক্তিগত অভিমত আমন্ত্রিত হয় নাই। ইহা আসলে প্রকৃতঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। খসড়া বিল সম্পর্কে আমার মতামত আপনার সহিত কয়েকটি সাক্ষাৎকারে এবং পত্রবিনিময় প্রসঙ্গেই আমি ব্যক্ত করিয়াছিলাম। শেষে ১১ই জানুয়ারী ১৯২৩ তারিখে বিলটি সম্বন্ধে সেনেট-সদস্যদের সহিত পরামর্শ করিবার অনুমতি আপনিই আমাকে দেন। প্রায় সেই সময়েই আপনার নিকট হইতে মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের একটি কপি আমি পাই। ইহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি বারংবার অনুরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছেন। এই ভাবেই সেনেটে দুইটি বিল আসিল এবং সেনেট এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্রদানের জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত করিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমত নির্ধারিত হওয়ার এবং আপনাকে তাহা জানানোর পূর্বেই আমার সনির্বন্ধ প্রতিবাদ এবং সিনেটের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আপনি সমর্থনের অযোগ্য এক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ব্যবস্থা পরিষদে এই বিল (অথবা বিলগুলিকে) পরিচিত করার উদ্দেশে আপনি উহা বা ঐগুলি অনুমোদনার্থে সরাসরি ভারত সরকারকে পাঠাইয়া দিলেন। আমাদের পত্রগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখিতে পাইবেন যে, আমি এবং আমার সেনেটের সহকর্মীরা আপনাকে বোঝাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি যে বিলটি (বা বিলগুলি) ঘোরতর আপত্তির সম্মুখীন হইবার সম্ভাবনাযুক্ত বলিয়াই সে সম্বন্ধে যথেষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য তদন্ত না করিয়া তাহা সরকারী সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হওয়া বিধেয় এবং যুক্তিসঙ্গত নয়। আমাদের যাবতীয় প্রতিবাদ এবং আবেদন সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

আপনি এখন অনুযোগ করিয়াছেন যে আপনার সরকারের সিদ্ধান্তগুলির কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাধাপ্রদানের সর্বপ্রকার কৌশল এবং উপায় আমি অবলম্বন করিয়াছি। আপনি অভিযোগ করিয়াছেন যে আমি ভারত এবং আসাম সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছি। তবে আপনি জানিয়া আশ্চর্য হইবেন যে আমি যাহা করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণরূপে সংবিধানসম্মত। আপনার ১১ই জানুয়ারী ১৯২৩ তারিখের পত্রে আপনি আমাকে স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, সেনেটের সদস্যদের সহিত বিলটি সম্বন্ধে আলোচনা করার সম্বন্ধে আপন অভিরুচি অনুযায়ী যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আমি সম্পূর্ণরূপে বাধামুক্ত। আমার ১৪ই জানুয়ারী ১৯২৩ তারিখের জবাবে জানাইয়াছিলাম যে—উত্থাপিত প্রশ্নের গুরুত্ব অনুসারে বিলগুলি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সেনেটের প্রতিটি সদস্যকে সে সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ দেওয়া আমি স্থির করিয়াছিলাম। আপনার হয় তো জানা নাই যে, আসামের মহামান্য গভর্নর, শিক্ষা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বড়লাটের পরিষদ সদস্য, আসামের শিক্ষামন্ত্রী এবং আসামের ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসানও—এই সেনেটের অন্তর্ভুক্ত। কাগজগুলি 'একান্ত গোপনীয়' শিরোনামায় উপরোক্ত ভদ্রমহোদয়গণের প্রত্যেকের নিকটই প্রেরিত হইয়াছিল। কাগজগুলি যদি তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে আমি দূরে সরাইয়া রাখিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা আমার বিরুদ্ধে আইন-সমর্থিত অভিযোগ আনয়ন করিতে পারিতেন। এখন ইহার ফলে তাঁহারা যদি আপনার সরকার অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করিয়া থাকেন এবং এই প্রসঙ্গে উপযুক্ত ও যুক্তিসম্মত বিবেচনা করিয়া কোন ব্যবস্থা যদি তাঁহারা অবলম্বন করিয়া থাকেন তজ্জন্য আপনি দুঃখ পাইতে পারেন, তবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের ভিত্তি হিসাবে তাহা কোনমতেই ন্যায়সঙ্গতভাবে বিবেচিত হইতে পারে না।'

আপনি আরও অভিযোগ করিয়াছেন যে আমি স্যার মাইকেল স্যাডলারের নিকটও আবেদন জানাইয়াছি। আমার এবং সিনেটের সদস্যদের পরামর্শ সত্ত্বেও স্যার মাইকেল স্যাডলারের পৌরোহিত্যে গৃহীত কমিশনের সমস্ত সমর্থন আপনি অনানুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। যে বিষয়টি আজ গত কয়েকসপ্তাহ যাবৎ জনসাধারণের দৃষ্টি ও কৌতূহল আকর্ষণ করিয়া চলিতেছে, তাহা যদি মাইকেল স্যাডলারকে আমি জানাইয়া থাকি তবে তাহা আমি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর্বসাধারণের শ্রেষ্ঠ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই করিয়াছি জানিবেন। অধিকন্তু সংবাদপত্রাদিতে আপনার সরকারকে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধাদি রচনা আমিই উদ্দীপনা জোগাইয়াছি—ইহা প্রতিপাদন করিতে আপনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই। ইহা বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসাপ্রচার এবং দাবী করি, এই কল্পিত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রামাণ্য নথিপত্রাদি আপনি উপস্থাপিত করুন।

আপনার অভিযোগ, আমার সমালোচনা গঠনমূলক হওয়ার পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক মূর্তিতে দেখা দিয়াছে। হ্যাঁ, বিলগুলির বন্দোবস্ত সম্পর্কে আমার সমালোচনা প্রতিকূল তাহার কারণ শুধু শিক্ষাগত দিক দিয়াই নয়, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়াও উহা লিপিবদ্ধ করিতে দ্বিধাবোধ করি নাই, যেহেতু আমি এবং আমার সেনেট সহকর্মীর দল ঐ বন্দোবস্তকে অত্যন্ত আপত্তিজনক বলিয়া মনে করিয়া থাকি। আমাদের সমালোচনা অনুকূল নয় বলিয়া আপনি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু আপনার সরকারেরই কল্যাণার্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে কোন পরিকল্পনা পেশ করার আমন্ত্রণ জানানোর আপনি কোন প্রয়োজনই বোধ করেন নাই। সন্দেহ নাই, আপনার মনে পড়িবে যে একাধিক উপলক্ষে আমি আমার সহকর্মিবৃন্দের এবং আপনার সরকারের প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় একটি বিল প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলাম কিন্তু আমার সে প্রস্তাব আপনার নিকট হইতে কোন সাড়াই পায় নাই। আপনার অভিযোগ যে অদ্যাবধি আপনি আমার নিকট হইতে কোন সাহায্যই পান নাই। আমার এ প্রসঙ্গে বক্তব্য যে, আপনাকে আমার সাহায্য ও পরামর্শ বারংবার দান করার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু—কারণটি অবশ্য একমাত্র আপনারই জানা—'আপনি কোনবারই তাহা গ্রহণ করেন নাই। বিলগুলির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে আপনাকে আমার খুঁটিনাটি মন্তব্যসহ পত্রের পর পত্র দিয়াছি এমন কি কয়েকটি বেদনাঘন মুহূর্তেও তাহার ছেদ পড়ে নাই—কিন্তু সেই সমস্ত মন্তব্যগুলি সম্বন্ধে আপনার কোন উত্তর আপনি কোনবারই দেওয়ার প্রয়োজনই অনুভব করেন নাই। অথচ, যদিও আপনার ১১ই জানুয়ারী ১৯২৩ সালে লিখিত পত্রে দেখা যাইতেছে যে আপনি লিখিতেছেন—সংশোধনরত বিলে প্রস্তাবিত পরিবর্তন বা সংশোধনগুলির সম্পাদন যে অসম্ভব এ বিষয়ে আপনি নিঃসংশয়। কয়েকদিন পরেই দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, সেই বিলই ভারত সরকারের নিকট অনুমোদনার্থে আপনি পাঠাইয়াছেন। আমাদের ধারণা সম্বন্ধে আপনার কোন মন্তব্যই আপনি লিপিবদ্ধ করেন নাই। রিপোর্টটি সম্বন্ধে আপনার সহিত আলোচনারও কোন সুযোগ আপনি আমাকে দেন নাই। অন্যদিকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ তারিখে আমাকে লিখিত আপনার পত্রটিও আমার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। যাহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে বিষয়টির গুরুত্ব আপনি উপলব্ধিই করিতে পারেন নাই এবং আমাদের সমালোচনার প্রতি আপনার ধৈর্যহীনতা প্রকাশ করিতেও আপনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাপ্রকাশ করেন নাই। আমি দেখিতেছি, আমার বিরুদ্ধে আপনার সঙ্কল্প এবং উদ্দেশ্যাদির বিকৃত উপস্থাপনের অভিযোগ আপনি

জানিয়াছেন। এই কল্পিত অভিযোগ, আমি এখানে প্রবলভাবে অস্বীকার করিতেছি জানিবেন। অথচ অন্যদিকে আপনি যখন ব্যবস্থা-পরিষদে বলিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ এবং যতদূর সম্ভব তাঁহাদের সমর্থন সংগ্রহ করা সম্বন্ধে আপনার উদ্বিগ্নতাই বিলম্বের কারণ—ভারত সরকার অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তখনই কি আপনি জ্ঞাত ছিলেন? এই বিষয়টি কেন্দ্র করিয়া আমাদের মধ্যে যে সমুদায় পত্রাদির বিনিময় হইয়াছে এবং ঐ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রামাণ্য দলিলাদি জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করিবার যদি আপনার সাহস থাকে—তাহা হইলে সে সম্বন্ধে একজন নিরপেক্ষ জনসাধারণের বিচার আমি হৃষ্টচিত্তেই মানিয়া লইব।

আমাকে উপাচার্যপদে পুনর্নিয়োগ করা সম্বন্ধীয় আপনার প্রস্তাবটির বিষয়ে আমি চূড়ান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিব, ইহাতে অবশ্যই কয়েকটি বিশেষ সর্ত আরোপিত থাকিবে। ঐ পদের জন্য আমি যেন প্রার্থী এবং পুনর্নিয়োগের আশা রাখি—এই মনোভাবটি আমি দেখিতেছি আপনার পত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হইতেছে। আপনাকে বিশেষভাবে অবহিত করিয়া দিই, আপনি এবং আপনার মন্ত্রীর যদি সেই ধারণা হইয়া থাকে, তবে বলিব আপনারা সম্পূর্ণ ভ্রান্তধারণার বশীভূত। দশটি বৎসর যে বিরাট আসনের ভার আমি বহন করিয়াছি তাহার ঐতিহ্যের সহিত আপনার কোন পরিচয়ই নাই। সেই ধর্মভীরু সৈনিক—মিণ্টোর পরলোকগত আর্ল আমাকে উপাচার্যের আসন গ্রহণ করিতে সর্বপ্রথম আহ্বান জানান। তিনি আমাকে কোনরূপ শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ করেন নাই। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ যাহাতে সর্বতোভাবে সিদ্ধ হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমার বিচার এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে সেনেটের সহিত একত্রে কাজ করার আদেশ স্পষ্টভাবে দিয়াছিলেন। সেদিনও সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং ধারণা সম্পর্কে আমাদের প্রকাশ্য সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। গত ১২ই মার্চ ১৯১০ তারিখে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে লর্ড মিণ্টো আমার সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা জানিবার আগ্রহ আপনার হয় তো থাকিতে পারে—তিনি বলিয়াছিলেন, আমার কার্যকাল শেষ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু ভাবিয়া আনন্দ পাইতেছি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনব্যবস্থা আপনার নির্ভীক বলিষ্ঠতা এবং অপরিসীম দক্ষতার দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হইতে থাকিবে।'

লর্ড হার্ডিঞ্জ যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের আসনে সমাসীন ছিলেন সে সময়ে সরকারের সহিত বহুবার আমাদের তীব্র পার্থক্য ঘটিয়াছে এবং সরকারের যে সমস্ত ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া আমার সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে উপাচার্য হিসাবে আমার অননুমোদন জানাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ কদাচ করি নাই। সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনের মনোভাবের সেই দৃঢ়তার প্রতি প্রতিবারই অভিনন্দন জানাইবার উদারতা ও মহত্ত্ব লর্ড হার্ডিঞ্জের মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যখন দুই বৎসর পূর্বে লর্ড চেমসফোর্ড এবং লর্ড রোনাল্ডসের সনির্বন্ধ অনুরোধে উপাচার্যের আসন গ্রহণ করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করি সেই সময় লর্ড রোনাল্ডসের সহিত আলাপ-আলোচনায় আমি বুঝিয়াছিলাম যে, সে সময়ে একজন পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন উপাচার্যের প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য তাঁহার মত আর কেহ অনুভব করেন নাই।

অবশ্য এই বিরাট ঐতিহ্য এবং মর্যাদার স্রষ্টা আমি নহি। উপাচার্যের পদে আহূত হওয়ার পূর্বে একাদিক্রমে সতের বৎসর ধরিয়া আটজন উপাচার্যের সহিত সেনেট-সদস্যরূপে কাজ করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেকে না হইলেও অনেকেই তাঁহাদের পূর্বসূরীর সময় হইতেই এই পদের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন—বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন। আমাদের প্রথম উপাচার্য সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জেমস কোলভিলের সময় হইতে অনেক উপাচার্যই রাজমুকুটের নামে ন্যায়, নীতি ও বিচারের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যদি জানানো হইত যে উপাচার্য হিসাবে সরকারের মতবাদ এবং নীতির সহিত সর্বদাই তাঁহাদের কণ্ঠ মিলাইয়া চলিতে হইবে তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁহারা অবাক এবং আশ্চর্যান্বিত হইতেন। আমার আসনের মর্যাদা আমি যথেষ্ট নিষ্ঠার সহিতই পালন করিয়া গিয়াছি এবং গত দুই বৎসরে বারেকের তরেও এ চিন্তা আমার মস্তিষ্কে উদিত হয় নাই যে, আপনার সরকারের নীতি ও মতবাদের সহিত আমি নির্বিচারে কণ্ঠ মিলাইব এইরূপ আশা করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধান সম্বন্ধে আপনার সরকার-অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে আমার ধারণার সহিত গত কয়েক মাস যাবৎ আপনি অতি ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত আছেন এবং উপাচার্য হিসাবে আমার কার্যকলাপ অযোগ্যতার পরিচায়ক এইরূপ মন্তব্য আমার কর্ণগোচর করিতে ইহার পূর্বে আপনি কখনও সাহসও পান নাই। আমি পরিষ্কার উপলব্ধি করিয়াছি যে, যদিও আপনাকে এবং আপনার মন্ত্রীকে তুষ্ট করিবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস কখনও করি নাই কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ এবং লিপিবদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করি না যে, প্রচুর বাধা এবং অসুবিধা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের অনুকূলেই যাবতীয় কার্য করিয়াছি। আপনি এবং আপনার মন্ত্রী যে আমাকে সহ্য করিতে পারেন না ইহাতেও আমি কিছুমাত্র বিস্ময়বোধ করি না। আপনার সম্মুখে এমন একজন আছে যে নিজের সিদ্ধান্ত এবং বিবেকের অনুশাসন অনুযায়ী নির্ভীকভাবে নির্দ্বিধায় কাজ করে এবং কথা বলে—বলা বাহুল্য, আপনি তাকে দেখিতে সেইজন্যই সক্ষম নন। আপনার সরকারের ইচ্ছা এবং আজ্ঞা নির্বিচারে পালন করার এবং সিনেটে গুপ্তচরবৃত্তি করার মত একজন উপাচার্য সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে হয় তো অসম্ভব হইবে না, তিনি আপনার আস্থা এবং বিশ্বাসভাজনও সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই হইবেন কিন্তু তিনি যে সিনেট এবং বাঙলার জনসাধারণের বিশ্বাস এবং আস্থা তিলমাত্র অর্জন করিতে সক্ষম হইবেন না—এ-কথা নিঃসংশয়ে বলার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে না। আমরা এই আসনের 'নূতন ঐতিহ্যের স্রষ্টা' এইধরণের এক উপাচার্যের কার্যাবলীও আগ্রহের সহিতই লক্ষ্য করিতে থাকিব।

অতএব, এ-ক্ষেত্রে একজন সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে একমাত্র যে উত্তর হইতে পারে—এবং যে উত্তর আপনি এবং আপনার উপদেষ্টারা প্রত্যাশা করেন—সেই উত্তরই আমি সর্বদ্বিধা পরিহার করিয়া আপনার উদ্দেশ্যে পাঠাইতেছি—যে অপমানজনক প্রস্তাব আপনি আমার নিকট পাঠাইয়াছেন তাহা আমি প্রত্যাখ্যান করিতেছি।

আপনাদের

স্বাঃ—আশুতোষ মুখার্জী।

বিশ্বনাথ রায়

[বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ভারতসেবক-সমাজের সভাপতি]

বর্তমান ভারতের বৃহত্তম নগরী এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর কলকাতার সেই আদিপর্বের ইতিহাসে যে ক'টি নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে, মহারাজা সুখময় রায়—তাদেরই একটি। সেদিনকার কলকাতার জনজীবনে ব্যাপকভাবে যাঁদের প্রভাব পড়েছিল, মহারাজা সুখময় ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। তারপর ইতিহাস অনেক এগিয়ে গেছে, হয়ে উঠেছে আরও বিচিত্র আরও উজ্জ্বল, আরও বলিষ্ঠ—সময়ের অগ্রগমনে মহারাজা সুখময় আজ নিজেও ইতিহাসে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু যে ঐতিহ্য তিনি রেখে গেছেন—তার গৌরব ও মর্যাদা তাঁর বংশধরদের দ্বারা উত্তরোত্তর আজও যে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, শ্রীবিশ্বনাথ রায়ের জীবনকাহিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে সে সম্বন্ধে আর কোন প্রকার সংশয়ই থাকতে পারে না।

মহারাজা সুখময়ের পুত্র রাজা বিশ্বনাথ। তাঁর পৌত্রের পৌত্র হলেন স্বর্গীয় আশুতোষ রায়। আশুতোষ রায়ের পুত্র আজকের দিনের বিশিষ্ট নাগরিক এবং জনকল্যাণব্রতী সমাজসেবী শ্রীবিশ্বনাথ রায়ের জন্ম হয় ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কলকাতার টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯২৭ সালে। ১৯৩০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হলেন আই এস সি পরীক্ষায়। পশ্চিম বাঙলার বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ ছিলেন তাঁর সহপাঠীদের অন্যতম।

বিশ্বনাথ রায়

জনজীবনে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন ছাত্রাবস্থা থেকেই। ১৯২৩ সালে আধুনিক বাঙলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নির্বাচন উপলক্ষে তাঁদের বাড়িতে এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সেই উপলক্ষে তাঁদের বাড়িতে আগমন হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে, সেই নির্বাচনে সেদিন বিধানচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বর্ষীয়ান জননায়ক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। বিশ্বনাথের বয়েস তখন বারো। সেই অধিবেশন তাঁর বালকচিত্তে গভীরভাবে দাগ রেখে যায়, জনজীবনে যোগ দেওয়ার প্রথম অনুপ্রেরণা বা অন্তর্নির্দেশ পান সেই অধিবেশন থেকেই। সুতরাং পরবর্তীকালের বিশিষ্ট জনসেবী বিশ্বনাথ রায়ের জীবনে সেই অধিবেশনটির গুরুত্ব সমধিক।

১৯৩৩ সালে তিনি পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাউন্সিলার নির্বাচিত হলেন। ১৯৩৬ সালে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নির্বাচিত হলেন অন্যতম অছি। ১৯৪৫ এবং ১৯৫২ সালে কংগ্রেস দলভুক্ত হিসাবে যথাক্রমে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। সম্প্রতি ভারত সেবক-সমাজের সভাপতির আসনে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

বর্তমান যুগে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রেও তাঁর নাম সবিশেষ স্মর্তব্য। পাঁচটি হাই স্কুল তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'জনসেবা' পত্রিকাখানি সম্পাদনে তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। জনসেবা ও বাঙলা নামক দুইখানি গ্রন্থ তাঁর দ্বারা রচিত।

শুধু লেখক, সম্পাদক হিসাবেই নয়, চিত্রশিল্পী, আলোকচিত্রকর, ডাকটিকিট অনুরাগী, ক্রীড়াবিদ হিসাবে তিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ফুটবল, টেনিস এবং বিলিয়ার্ড তিনি প্রভূত সাফল্য এবং স্বীকৃতির অধিকারী। যে সকল জনহিতকর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানাদির শীর্ষস্থান তিনি অধিকার করে আছেন, তাদের সংখ্যাও নগণ্য নয় বরং তার বিপরীতই।

যাদুগোপাল বসু

[দক্ষ প্রচারবিদ ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিটি ব্যুরোর পরিচালক]

প্রচারশিল্পের উন্নয়নে যাঁদের সমগ্র শক্তি এবং নিষ্ঠা উৎসর্গিত অথচ আত্মপ্রচার যাঁদের সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত—বিশিষ্ট প্রচারবিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত যাদুগোপাল বসু তাঁদের মধ্যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিটি ব্যুরো যাঁর অক্লান্ত কর্মশক্তির এক অভিনন্দনীয় নিদর্শন।

১৩১৪ সালের মাঘ মাসে (১৯০৮ খৃঃ) এই কর্মী মানুষটির জন্ম হয়। যশোহর জেলার অন্তর্গত পাঁজিয়া গ্রামে বসুদের আদি নিবাস। স্বর্গত দৈবচরণ বসুর দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ যাদুগোপালের স্বগ্রামেই জন্ম হয়। পাঁজিয়ার জেলা হাইস্কুলে শিক্ষা সুরু হয় তাঁর

ভারতবর্ষ তখন পরাধীন, বিদেশীশাসকগোষ্ঠীর লৌহনিগড়ে দেশজননীর সোনার অঙ্গ সেদিন শৃঙ্খলিত। দেশের মুক্তি জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করলেন ভারতের বিশেষত বাঙলা দেশের অগণিত সন্তান। সারা দেশে সেদিন স্বাধীনতার দুর্বার সঙ্কল্প। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে বন্ধনমোচনের আহ্বান। সে আহ্বানে তরুণ যাদুগোপাল সাড়া না দিয়ে পারলেন না। দেশজোড়া এই বিরাট আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়ে দিলেন যাদুগোপাল। ১৯২৮ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিলেন। সেই বছরের কংগ্রেস অধিবেশনের স্মৃতি বাঙালীর স্মৃতিতে অম্লান দীপ্তিতে বিরাজ করছে। সেই ঐতিহাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। পৌরোহিত্য করেন স্বর্গীয় মোতিলাল নেহরু ও সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেন জনগণমন অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। ছত্রিশ বছর পূর্বে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে আজও তা অবিচ্ছিন্ন। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের সঙ্গে সংস্রব রাখার জন্যে শুধু তাঁকেই নয় তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও যথেষ্ট নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। কংগ্রেসকর্মী হিসাবে তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছে।

১৯৩৩ সালে তাঁর জীবনের যাত্রাপথের মোড় ফিরল। সংবাদপত্রজগতে তাঁর প্রবেশ ঘটল। ফরওয়ার্ড 'লিবার্টি ও বঙ্গবাণী প্রমুখ তদানীন্তন বিখ্যাত পত্র-পত্রিকাগুলির বিজ্ঞাপন সংগ্রাহকের কাজ শুরু করেন। সাংবাদিকজগতের দিকপাল স্বর্গীয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে যাদুগোপাল আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদের মাধ্যমে পত্রিকাজগতের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ স্থাপিত—সময়ের অগ্রগমনে যে সম্বন্ধ আজ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে এক বন্ধনে পরিণত হয়েছে।

১৯৩৫ সালে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিটি ব্যুরোর প্রতিষ্ঠা ঘটে। ১৯৫২ সালে ঐ প্রতিষ্ঠান প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়। প্রচার-প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই সংস্থা যে অভাবনীয় সাফল্য ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করে চলেছে তার তুলনা নেই। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, তার এই ব্যাপক প্রসিদ্ধির মূলে আছে তার প্রাণস্বরূপ যাদুগোপালের অক্লান্ত উদ্যম, অশেষ কর্মনিষ্ঠা এবং অকৃত্রিম আন্তরিকতা।

১৯৬৩ সালে ভারতের অ্যাডভার্টাইসিং এজেন্সির এ্যাসোসিয়েশানের কার্যকরী সমিতির সভ্যপদ অলঙ্কৃত করেন। এ ছাড়া অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ও সেগুলির উন্নয়নকর্মে যথেষ্ট যত্নবান।

আনুমানিক ১৯৪১ সালে শ্রীমতী বীণারাণী বসুর সঙ্গে তিনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন। আট পুত্র এবং তিন কন্যার তিনি জনক।

'বসুমতী'র সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকালের যোগ এবং এই সংযোগ যেমনই অবিচ্ছিন্ন তেমনই ঘনিষ্ঠ এবং উত্তরোত্তর তা ক্রমেই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে বাঙলার তথা ভারতের বাণিজ্যজগতের পরম গৌরব ও অক্লান্ত কর্মী স্বর্গীয় ভবতোষ ঘটক মহাশয়ের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল গভীর ও ঘনিষ্ঠ।

যাদুগোপাল বসু

সুবোধ ঘোষ

[লব্ধকীর্তি সাহিত্যকার]

বাঙলা সাহিত্যের মানোন্নয়নে যাঁদের সাধনা সর্বজনস্বীকৃত এবং বাঙলা দেশের সাহিত্যের ইতিহাসের নব অধ্যায় রচনায় যাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়—সুবোধ ঘোষ তাঁদেরই অন্যতম। বর্তমান বাঙলার কথাকারদের সমাজে একটি প্রথম সারির আসন যাঁর জন্যে সসম্মানে নির্ধারিত।

দীপ্তিমান উজ্জ্বল আকৃতির অধিকারী এই স্বনামধন্য লেখকের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের অর্ধশতাব্দী আজ অতিক্রান্ত। স্বর্গত সতীশচন্দ্র ঘোষের পুত্র সুবোধচন্দ্রের জন্ম হয় ১৯০৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে হাজারিবাগে। ঘোষেদের আদি নিবাস বিক্রমপুর। সতীশ-চন্দ্রর পিতৃদেব হাজারিবাগে বসতি স্থাপন করেন, সেই থেকে হাজারিবাগেরই তাঁরা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। হাজারিবাগেই সুবোধ ঘোষের বাল্যকাল ও কৈশোর কাটে। যথাসময়ে শিক্ষা শুরু হল। প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হলেন। সেন্ট কলম্বাস কলেজে প্রবেশ করলেন বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে। তারপরই পুঁথিগত অধ্যয়নের সমাপ্তি। সুবোধ ঘোষ রূপ-রসের পিপাসু, মন তাঁর জীবনের সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু, মানসচক্ষু তাঁর সন্ধানী। জীবনের সহস্র প্রশ্নের জটিল জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে যে মনে চিন্তার পর চিন্তার তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে, পৃথিবীর রূপ, রস, মাধুরী সম্বন্ধে যাঁর শিল্পিমত্তা পরিপূর্ণ সচেতন, জীবনের অপার রহস্যের সূত্র সন্ধানে যে তরুণচিত্ত তৎপর—বিজ্ঞানের পাঠক্রম সাধারণত তাদের মনে দাগ রেখে যেতে পারে না। এখানেও তাই ঘটল, আই এস সি-তে

তাঁর পঠিতব্য পদার্থ, রসায়ন ও গণিত। কয়েকদিন আগেই এক অপরাহ্নে সুবোধ ঘোষ নিজেই কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মেধার অভাবে যে আমি আই এস সি-তে ফেল করলাম তা নয়, আসলে পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে ভাই খাপ খাওয়াতে পারলুম না। Physics, Chemistry যাও বা হল, Mathematics-এর সঙ্গে তো একেবারেই মনের মিল হল না। সেইটেই আমার fail করার একমাত্র কারণ। গণিতের সঙ্গে তাঁর মিতালি হল না—হয় তো তখনই তার চেয়ে ঢের বড় গণিত—জীবনের অঙ্ক কষা তাঁর শুরু হয়ে গেছে।

কর্মজীবন শুরু হল। চাকরিও নিয়েছেন, ব্যবসাও করেছেন। কাজের খাতিরে ভারতের বহুস্থান করেছেন পরিভ্রমণ। এশিয়ারও বহুদেশ করেছেন পর্যটন। এই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সমাজকে, তাদের বাসিন্দাকে, জীবনযাত্রাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন অতি নিকট থেকে। জীবনের বিচিত্ররূপ এক এক করে পরিপূর্ণরূপে তাঁর সন্ধানী চোখে ধরা দিয়েছে। জীবনকে ও মানুষকে বিভিন্ন কোণ থেকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ তিনি এইভাবে পান। তাঁর জীবনে এই সময়টিকে তাঁর ভাবীকালের সাহিত্যজীবনের প্রস্তুতির যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়। পরবর্তীকালে সাহিত্যের পাতায় জীবনের যে বিচিত্ররূপ তিনি এঁকে গেলেন, এই ব্যাপক ভ্রমণ এবং দর্শন তাঁর সেই অনবদ্য সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল বলা চলে।

১৯৪০ সালে তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় তাঁর রচনার প্রথম আত্মপ্রকাশ। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ফসিল। বাঙলার সাহিত্য-সমাজ অবাক-বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল সাহিত্য-গগনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের বহুবাঞ্ছিত আবির্ভাব। সেদিনকার তরুণ-সমাজে বিশেষ করে এল এক অভাবনীয় আলোড়ন। সাড়া পড়ে গেল দিকে দিকে। তরুণ কথাশিল্পীর সাহিত্য-জননীর পায়ে প্রথম অর্ঘ্যকে জনসাধারণ আবৃত করে দিল বিপুল সমাদরে। ভারত প্রেমকথা, কিম্বদন্তীর দেশে, অমৃত পথের যাত্রী, ভারতের আদিবাসী, ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস, রঙ্গবল্লী প্রমুখ তাঁর গ্রন্থগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে, শুধু গল্প-উপন্যাসেই নয়, অন্যান্য বিষয়ে তাঁর লেখনী বলিষ্ঠ এবং অসাধারণ। ইতিহাস, দর্শন, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, পুরাণ, প্রাণিতত্ত্ব, চারুশিল্প, কারুশিল্প, অরণ্যতত্ত্ব, ফ্রয়েডীয় যৌন মনোদর্শন প্রভৃতি বিষয়গুলি তাঁর প্রিয় পঠিতব্য। তাঁর অন্যান্য গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে ত্রিযামা, শতকিয়া, শ্রেয়সী, তিলাঞ্জলি, কুসুমেষু, ভোরের মালতী, চিত্তচকোর, কান্তিধারা, নাগলতা, বহুত মিনতি, শুন বরনারী, একটি নমস্কারে, সুজাতা প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম। ত্রিযামা, শ্রেয়সী, অঞ্জনগড়, শুন বরনারী, বর্ণালী, জতুগৃহ, অযান্ত্রিক, শিউলিবাড়ি, সুজাতা প্রভৃতি ছায়াচিত্রাদি তাঁরই কাহিনী অবলম্বনে রূপ নিয়েছে। তাঁর শ্রেয়সীর নাট্যরূপ দীর্ঘকাল ধরে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

কিছুকাল পূর্বে তিনি 'প্রফুল্ল স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন। বোম্বাইয়ের চিত্রজগত 'সুজাতা'র কাহিনীকার হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধাস্বরূপ অর্পণ করেন পাঁচ হাজার টাকা। বর্তমানে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকের পদে সমাসীন। ইয়োরোপের বহু দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছেন।

বই কেনা, বাগান করা, শিকার, ভ্রমণ—এই ক'টি তাঁর বিশেষ শখ। সাহিত্য-জগতে যেদিন তাঁর আবির্ভাব হয় সেদিন আমাদের মধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বর্তমান। আমি জিজ্ঞাসা করি—রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আপনি এসেছেন?

সুবোধ ঘোষ উত্তর দিলেন—একদিন মাত্র তাঁকে দেখেছি—দূর থেকে।

সুবোধ ঘোষ

রমণীমোহন রায়

[সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ]

আজকের দিনের বাঙলা দেশের শিক্ষাজগতে যে ক'টি নাম বিশেষ উল্লেখের দাবীদার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ রমণীমোহন রায় সেই তালিকায় একটি উজ্জ্বল এবং গুরুত্বপূর্ণ নাম। স্মিতহাস্য, বিনয়ে ভরপুর এই সদালাপী মানুষটির সান্নিধ্য যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হবেন যে, শিক্ষাদান এবং বিজ্ঞান-অনুশীলন ছাড়া আরও একটি বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা তাঁর করায়ত্ত—সেটি আত্মজনসুলভ আচরণে সম্পূর্ণ অপরিচিতকে অতি নিকটে আকর্ষণ করে আনার।

আদি নিবাস ঢাকার অন্তর্গত দেউশুর গ্রামে। পিতৃদেব স্বর্গীয় রাইমোহন রায় প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করতেন। মাতৃদেবী স্বর্গীয়া সুশীলাসুন্দরী রায় সে-যুগে প্রাথমিক শিক্ষায় স্কলারশিপ লাভ করেছিলেন। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ—দেখা যাচ্ছে জনক-জননী উভয়ের দিক থেকেই রমণীমোহন উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। ১৯০১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী স্বগ্রামেই রমণীমোহনের জন্ম। শৈশবে কলকাতায় চলে আসেন। ভর্তি হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে ১৯০৮ সালে। ১৯১৭ সালে উত্তীর্ণ হলেন প্রবেশিকা পরীক্ষায়। প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে ছাত্র হিসাবে তিনি যুক্ত

ছিলেন ১৯১৭ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে থেকে তিনি ১৯২৩ এবং ১৯২৪ সালে এম-এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শিক্ষাজীবনের পর সুরু হ'ল কর্মজীবন। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত এবং ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর কলেজের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। ১৯২৭ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনে। ১৯৩৫ সালে তিনি যোগ দিলেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। ১৯৪৭ সালে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান ফর কাল্টিভেশান অফ সায়েন্সের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হলেন। ১৯৪৯ সালে পুনরায় যোগ দিলেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। ১৯৫০ সালে উন্নীত হলেন উপাধ্যক্ষের আসনে। ১৯৫৫ সাল থেকে অধ্যক্ষের আসনে তিনি সমাসীন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের এবং এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের অন্যতম সদস্যের আসনে তিনি অধিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাণ্টস কমিশনের স্ট্যাণ্ডার্ড কমিটীরও সদস্যের পদ তাঁর দ্বারা অলংকৃত। পশ্চিমবঙ্গের কলেজ এ্যাণ্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স এ্যাসোসিয়েশানের সচিব কর্মপরিষদের সদস্য এবং সভাপতির আসনে তাঁকে দেখা গেছে। এ ছাড়া আরও বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত।

যে সকল অধ্যাপকের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়দারঞ্জন রায়, আশুতোষ মৈত্র, জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী প্রভৃতি নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যেও অনেকেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট যশ এবং প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। স্কুলজীবনে তাঁর সহপাঠী ছিলেন স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের পরিচালক ডাঃ রবীন্দ্র চৌধুরী, প্রবীণ চিত্রপরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষ, স্টিফেনস নির্মলেন্দু
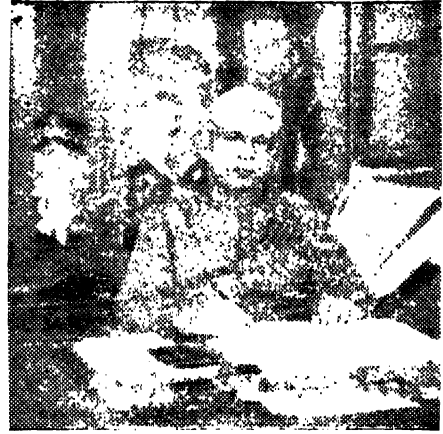
রমণীমোহন রায়

ঘোষ প্রভৃতি। কলেজজীবনে সহপাঠীরূপে পেলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম দিকপাল বীরেন্দ্রনাথ সরকার এবং বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক রচনাকার সর্বাণীসহায় গুহসরকারকে।

এই প্রসঙ্গে রমণীমোহনের আর একটি নামও মনে পড়ে যায়। বললেন, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র—তিনি কলার ছাত্র তবে গণিত ছিল আমাদের উভয়েরই পঠিতব্য। গণিতের ক্লাসে আমরা মিলিত হতাম। তাঁর নাম ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

প্রেসিডেন্সী কলেজে আশুতোষের যাঁরা সতীর্থ ছিলেন

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

হেরম্বচন্দ্র মৈত্র

ব্যোমকেশ চৌধুরী

আশুতোষ চৌধুরী

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী

আবদার রহিম

শামসুল হুদা

আশুতোষ ঃ বিদগ্ধজনের দৃষ্টিতে

বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে আশুতোষ বিদ্যার সারথি
তোমারে আপন নামে সম্মানিত করেছে ভারতী।

—রবীন্দ্রনাথ

তাঁহার স্বক্ষমতার উপর একটা প্রত্যয় ছিল যে তিনি বিজয়ী হইবেন—ইহা জানিয়াই তিনি কর্মের পরিকল্পনা করিতেন, তাঁহার সঙ্কল্পগুলি কৃতকার্যতার পথস্বরূপ ছিল।

—রবীন্দ্রনাথ

এই কর্মবীরের ধ্যানের মহত্ত্ব আমি সুস্পষ্টরূপে অনুভব করেছি। তাঁর বলিষ্ঠ প্রকৃতি শিক্ষানিকেতনে দুরূহ বাধার বিরুদ্ধে আপন সৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্র অধিকার করেছিল। এইখানে তিনি সমস্ত ভারতের চিত্তমুক্তি ও জ্ঞানসম্পদের ভিত্তিস্থাপন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। —রবীন্দ্রনাথ

আমার সৌভাগ্য যে, আশুতোষ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে দেশের ছাত্রজীবনের সঙ্গে আমাকে মেলবার অবসর করে দিলেন।···আমি বাংলায় বলব স্থির করেছি জেনে তিনি আমাকে বললেন, দেখ, লাটসাহেবের ইচ্ছে, নিদেন প্রথম বক্তৃতাটা ইংরেজিতে হোক, কি বল? আমি সোজা আপত্তি জানালাম—হবে না।···তিনি আর কোন উত্তর দিলেন না। যথাসময়ে চেয়ার খোলা হ'ল। বাংলা ভাষায় লেকচারের পর তিনি আমায় কাছে ডেকে বললেন, তুমি বাংলায় বলে ভালই করেছ, আমি চাই এখানের সব ক'টা লেকচার বাংলায় হয়। তখন আমি বুঝলেম এমনি করে তিনি আমায় বাচিয়ে নিলেন। বাংলা ভাষার উপর কতখানি টান তাঁর মনে ছিল এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমি অনুভব করলেম।

—অবনীন্দ্রনাথ

আমার মনে হয়, বাঙালী জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত পুরুষ আশুতোষ ছাড়া আর দেখা যায় নাই।··কোন বাঙালীকে আশুতোষের মত সাধু চেষ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়কে যশোমুখী করিতে দেখা যায় নাই, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

—প্রফুল্লচন্দ্র

This long familiarity with the Calcutta University, his wide grasp of educational problems and his extraordinary capacity for dealing with them made Sir Asutosh the most commanding figure in the University. During the time he was Vice-Chancellor he ruled the University with a supreme sway, and it is but right to say that he enforced the regulations with a measure of discreation, a regard for all interests that partly allayed the suspicion and anxiety they had created in the minds of the educated community in Bengal. He was a unique figure in the educational world of Bengal.

—Sir Surendra Nath Banerjee

যাঁহারা আশুতোষের চরিত্রের অন্তঃপুরে কখনো প্রবেশ করিবার অধিকার পান নাই, তাঁহারা তাঁহার জটিল প্রকৃতির এবং বিচিত্র কর্মের ভালোমন্দের সত্য বিচার করিতে পারিবেন না। এই কারণে আশুতোষের অসাধারণ প্রতিভা ও শক্তি স্বীকার করিয়াও বাহিরের লোকে অনেক সময় তাঁহার চরিত্রের মর্যাদা দিতে পারেন নাই।

—বিপিনচন্দ্র পাল

আশুতোষ সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তাঁহার যোগিজনোচিত একাগ্র সাধনা নিয়োগ করিয়াছিলেন।—দীনেশচন্দ্র সেন

আশুতোষ স্বয়ং পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন এবং সকল বিষয়েই তাঁহার জ্ঞানবিস্তর অধিকার ছিল—গণিত, সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতের জ্ঞান তাঁহার যে-কোন অধ্যাপকের যোগ্য ছিল। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি এবং বিষয়জ্ঞান এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, বিষয়টি বিবেচনাধীন হওয়ামাত্র তিনি তাহার প্রয়োজনীয়তা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও তাহা পরিপুষ্ট করিয়া তোলার উপায় সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। তিনি কোন বিষয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তথ্যগুলির আলোচনাকালে অধ্যাপকদের অপেক্ষাও তৎসম্বন্ধে দূরদৃষ্টি ও বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান করিবার শক্তি অনেক বেশি দেখাইয়াছেন। —দীনেশচন্দ্র সেন

In whatever sphere of life he moved he gave a new impetus and a fresh vigour to his cause. A strainous fighter all his life, he left behind him far resentments. *—R. N Mookerjee*

মাতৃভাষার চর্চার জন্য আশুতোষ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা যতটা করাতে সমর্থ হয়েছেন আর কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান ততটা করতে পারেন নি। তাঁর যে কেবল দূরদৃষ্টি ছিল তা নয় দেশভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত কতকগুলি বিশ্বাসও তাঁর ছিল।

—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

Like a Colossus he did bestride the world of our University with aparent ease he bore burdens under whose weight any ordinary man would have staggered, and his energy seemed tireless and inexhaustible. *—W. S. Urquarht*

The daily out-turn of Sir Asutosh's work was a moral to others, to one and all.

—Justice Rankin

He could have ruled on Empire. But he gave the best of his powers to education.

—Sir Michael Sadler.

Sir Asutosh may justly be said to be one of the brightest ornaments of the Bench of the High Court of Calcutta.

—Sir Lawrence Jenkins

Sir Asutosh Mookerjee was the most striking and representative Bengali of his time. In the eyes of his countrymen and in the eyes of the world, he represented the University so completely that for many years Sir Asutosh was in fact the University and the University Sir Asutosh.

—Lord Lytton

শচীন্দ্রনাথ বসু

দারেইওসের মৃত্যু ও জের্কস্যাসের রাজ্যলাভ

সার্ডিসের যুদ্ধের পর থেকেই পারস্য-রাজ দারেইওস অ্যাথেন্সের উপর রেগে ছিলেন, ম্যারাথনের বিপর্যয়ের খবর যখন তাঁর কাছে পৌঁছাল তখন তাঁর ক্রোধ আর বাধা মানল না। গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন রাজ্যে লোক পাঠালেন প্রস্তুতির হুকুম দিয়ে—যুদ্ধজাহাজ, গাড়ি, ঘোড়া, খাদ্য সবকিছু অবিলম্বে সংগ্রহ করতে হবে যত পারা যায়, সব অভিযানের চেয়ে বড় হবে এই অভিযান। বাছা বাছা লোক দিয়ে সেনাবাহিনী স্ফীত হল, সবরকম প্রস্তুতি চলল দিবারাত্রি, তিন বছর ধরে সমগ্র মহাদেশ রইল মেতে। পরের বছর মিশরে বিদ্রোহ দেখা দিল, ইতিপূর্বে কাম্বিসাস জয় করেছিলেন সে দেশ। এতে মিশর ও গ্রীস দুইয়েরই বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার সংকল্প দৃঢ়তর হল দারেইওসের মনে।

দুই অভিযানই যখন যাত্রা শুরু করতে প্রস্তুত তখন হঠাৎ রাজপুত্রদের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হল এর পরে কে রাজা হবে তা নিয়ে। পারসীক আইন অনুসারে যুদ্ধে যাবার আগে রাজাকে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। সিংহাসন পাবার আগে দারেইওসের প্রথমা পত্নী গোব্রিয়াস তনয়ার গর্ভে তিনটি পুত্র হয়েছিল এবং তিনি রাজা হবার পরে সাইরাস-কন্যা রাণী আতোসসা চার পুত্র প্রসব করেন। প্রথম পক্ষের প্রথম পুত্র আর্তোবাজান্যাস, দ্বিতীয় পক্ষের জ্যেষ্ঠ জের্কস্যাস। দুই মায়ের দুই ছেলের এই বিবাদে আর্তোবাজান্যাস বললে রাজার সব ছেলেদের মধ্যে সেই বড়, সুতরাং সর্বজনীন নিয়ম অনুসারে সিংহাসন তারই প্রাপ্য। জের্কস্যাস বললেন মহামান্য সাইরাস তাঁর মাতামহ, যিনি পারসীকদের স্বাধীনতা দান করেছেন।

দারেইওস তখনও নিজের মতামত জানান নি এমন সময়ে ডামারাতোস সুজাতে এসে উপস্থিত হলেন। স্পার্টার রাজা ডামারাতোসের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, সিংহাসনচ্যুত হয়ে তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাসনে গিয়েছিলেন। লোকে বলে যে, দারেইওস পুত্রদের বিবাদের কথা শুনে তিনি জের্কস্যাসের সঙ্গে দেখা করে তাঁর যুক্তির সঙ্গে আরও এক যুক্তি যোগ করতে বললেন; তা হল এই যে তাঁর জন্মের সময়ে দারেইওস রাজত্ব পেয়েছিলেন, কিন্তু আর্তোবাজান্যাসের জন্ম হয়েছে এই ঘটনার আগে, সুতরাং রাজমুকুটের ন্যায্য অধিকারী জের্কস্যাস ছাড়া আর কেউ নয়। স্পার্টাতেও এই নিয়ম যে রাজা সিংহাসনে বসার আগে তাঁর যে সব ছেলে হয় তারা রাজত্ব পায় না।

জের্কস্যাস এই বুদ্ধি গ্রহণ করলেন এবং দারেইওস তাঁর যুক্তি ন্যায়সঙ্গত মনে করে তাকেই উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন। হেরোডোটাস এখানে তাঁর নিজের অভিমত জানাচ্ছেন যে, ডামারাতোসের বুদ্ধি ছাড়াও জের্কস্যাস রাজা হতেন, তার কারণ আতোসসার প্রভাব ছিল অসামান্য।

এই ঘোষণার পর দারেইওস যুদ্ধের দিকে মন দিলেন, কিন্তু সবকিছু তৈরি হবার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। মিশরী বিদ্রোহ এবং পুত্রদের বিবাদের পরের বছর ছত্রিশ বছর রাজত্বের পর তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন; সুতরাং বিদ্রোহী প্রজাদের অথবা অ্যাথেনীয়দের শাস্তি দেওয়া আর হয়ে উঠল না।

শাসনভার হাতে নিয়েই জের্কস্যাস মিশর অভিযানের জন্য সেনাবাহিনী গড়তে আরম্ভ করলেন। গ্রীস তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু একটি সভাসদ ক্রমাগত তাঁর কানে গ্রীসের বিরুদ্ধে মন্ত্র দিত। সে তাঁরই পিসতুতো ভাই মার্দোনিয়োস জের্কস্যাসের উপরে তার মত প্রভাব দেশে আর আর কারও ছিল না। 'মহারাজ,' সে বলত, 'অ্যাথেন্স আমাদের সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে এবং এই অপরাধের শাস্তি তাকে দিতেই হবে। অবশ্য যে কাজ হাতে নিয়েছেন সেটা শেষ করা দরকার, কিন্তু মিশরের ঔদ্ধত্য দমন করে অ্যাথেন্সের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করুন। তা হলে সারা জগত আপনাকে সম্মান করবে এবং ভবিষ্যতে আপনার দেশ আক্রমণ করার আগে সকলে দ্বিতীয়বার ভাববে।' প্রতিশোধের প্ররোচনার সঙ্গে সঙ্গে সে লোভও দেখাত—ইয়োরোপ অত্যন্ত সুন্দর জায়গা, সব রকম উদ্যান-তরু মেলে সেখানে, জমির যা যা গুণ দরকার তার সবই সেখানে আছে, একমাত্র পারস্যের অধিপতি ছাড়া আর কেউ যোগ্য নয় এমন জায়গার।

মার্দোনিয়োস বদ মতলবের মানুষ এবং অনিশ্চিত উদ্যোগের দিকে তার ঝোঁক; তা ছাড়া গ্রীসের বিরুদ্ধে এত প্ররোচনার পিছনে তার আশা ছিল যে সে নিজেই সেখানকার শাসনকর্তা হবে। বারে বারে বলে শেষ পর্যন্ত সে জের্কস্যাসকে রাজী করাল—হয় তো সক্ষম হত না যদি অন্যের থেকেও সাহায্য না আসত। প্রথমত থেসালীর রাজপরিবার থেকে জের্কস্যাসের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ এল গ্রীস আক্রমণ করতে! তা ছাড়া সুজারই এক সম্প্রদায় রাজার আশ্চর্য ক্ষমতার সুখ্যাতি করে এবং বিবিধ দৈববাণী থেকে আবৃত্তি করে তাঁকে বোঝাল যে এই যুদ্ধে তাঁর জয় সুনিশ্চিত। এই কাজে তারা একটি লোকের সাহায্য নিয়েছিল, তার কাজ দৈববাণী সংগ্রহ করা; এর মধ্যে যেগুলিতে পারস্যের ক্ষতির নির্দেশ আছে সেগুলিকে সযত্নে বাদ দিয়ে শুধু জয়-নির্দেশক বাণী সে সাজিয়ে দিয়েছিল আবৃত্তির উপযুক্ত করে। জের্কস্যাস শুনলেন এক পারসীক হেলেস্পন্টে সেতু বানাবে, তার সৈন্যবাহিনী এশিয়া থেকে গ্রীসের মধ্যে ঢুকে পড়বে। এই সবকিছু মিলে জের্কস্যাসের মনস্থির করে দিল।

কিন্তু আগে তিনি মিশরে এক বাহিনী পাঠালেন পিতার মৃত্যুর পরের বছরই। বিদ্রোহীদের আগের চেয়েও হীনতর দাসত্বে পরিণত করে নিজের এক ভাইকে মিশরের শাসনভার দিলেন। কিছুদিন পরে এই রাজ্যপাল এক লিবিয়াবাসীর হাতে খুন হয়।

জের্কস্যাসের সভায় যুদ্ধালোচনা

মিশর জয়ের পর অ্যাথেন্সের বিরুদ্ধে অভিযান প্রস্তুত করে জের্কস্যাস দেশের প্রধান ব্যক্তিদের এক সভা ডাকলেন, এই যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজের ইচ্ছা জানাতে ও তাদের মতামত জানতে। সভায় তিনি অভ্যাগতদের বললেন, 'পারসীক জীবনের যে নিজস্ব ধারা আমি পিতৃপুরুষদের থেকে পেয়েছি তার ব্যাঘাত আমি করব না। জ্যেষ্ঠদের কাছে শুনেছি সেই যবে সাইরাস আস্তিয়াগ্যাসকে সিংহাসনচ্যুত করে মিডীয়দের থেকে আমাদের স্বাধীনতা আদায় করেছিল, তখন থেকে আমরা কখনও নিষ্ক্রিয় থাকি নি। আমাদের জাতীয় ইতিহাস আপনাদের নতুন করে বলার দরকার নাই—সাইরাস, কাম্বিস্যাস, এবং আমার পিতা দারেইওসের প্রসিদ্ধ কীর্তির কথা আপনারা জানেন, কেমন করে তাঁরা সাম্রাজ্য বাড়িয়েছেন তাও জানেন। আমিও যেদিন সিংহাসনে বসেছি সেদিন থেকে ভাবছি কি করে এঁদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারি। অবশেষে একটি পথ আমি দেখতে পাচ্ছি. তাতে শুধু যে পারস্যের গৌরব বাড়বে তা নয়, আমাদেরই মত বৃহৎ আমাদেরই মত সমৃদ্ধ—হয় তো আরও সমৃদ্ধ—একটি দেশ আমরা পেয়ে যাব, উপরন্তু লাভ করব প্রতিশোধের আনন্দ। এই পরিকল্পনা আপনাদের জানাবার জন্যই এই সভা ডেকেছি। হেলেস্পন্টের উপর সেতু বানিয়ে ইয়োরোপে ও গ্রীসে প্রবেশ করব, আমার পিতার ও আমাদের দেশের বিরুদ্ধে অ্যাথেনীয়রা যে অপরাধ করেছে তার জন্য তাদের সমুচিত শাস্তি দেব। দারেইওস নিজেই এ কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁকে বাধা দিল; তাঁরই হয়ে এবং আমার প্রজাদের উপকারের জন্য আমি এই কাজ সম্পন্ন না করে নিশ্চিন্ত হব না। অ্যাথেন্স দখল করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তা ধূলিসাৎ করে দেব, বিনা কারণে তারা আমাদের যে ক্ষতি করেছে এইভাবে তার প্রতিশোধ হবে। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয় আরিস্তাগোরাসের সঙ্গে সার্ডিসে এসে এরা মন্দির ও চতুর্দিকের উদ্যান পুড়িয়ে দিয়েছিল, ম্যারাথনে আমাদের সৈন্যদের কি করেছিল তা-ও জানেন।

'এই সব কারণে আমি এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছি এবং ভেবে দেখছি যে এতে কতগুলি সুবিধার আশাও আছে। অ্যাথেন্স ও তার প্রতিবেশী স্পার্টাকে যদি আমরা দমন করতে পারি তো পারসীক সাম্রাজ্যের সীমা গিয়ে ঠেকবে ঈশ্বরের আকাশে। আপনাদের সাহায্যে আমি ইয়োরোপের শেষ মাথা পর্যন্ত যাব, সবটাকে একত্র করে বানাব এক দেশ, তখন আমাদের আধিপত্যের বাইরে আর কোথাও সূর্যের আলো পড়বে না; কারণ, শুনছি অ্যাথেন্স ও স্পার্টা বাদ দিলে জগতে আর এমন শহর বা জাতি নেই যা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং দোষী ও নির্দোষ সকলকেই দাসত্বের শিকল পরতে হবে।

'অতএব আপনারা যদি আমাকে খুশি করতে চান তো নির্ধারিত দিনে স্বেচ্ছায় প্রফুল্ল মনে সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমার কাছে আসবেন—যাঁরা সর্বোৎকৃষ্ট বাহিনী দেবেন তাঁদের আমি সর্বোচ্চ সম্মান দেব। এই আমার আদেশ, কিন্তু তা বলে আমি স্বেচ্ছাচারী নই; বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হোক, যাঁর ইচ্ছা তিনি নিজের মত জানাতে পারেন।'

এর পরে প্রথমে মার্দোনিয়োস দাঁড়িয়ে বললে, 'মহারাজ। পারস্যে এ পর্যন্ত যত লোক জন্মেছে ও ভবিষ্যতে জন্মাবে তাদের মধ্যে আপনি মহত্তম। আপনি যা বললেন তার প্রত্যেকটি কথা অতি উৎকৃষ্ট ও সত্য, ইয়োরোপের ঐ দুর্বৃত্ত আইয়োনীয়রা আমাদের বোকা বানাবে তা আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। ইতিপূর্বে আমরা ভারতীয়, ইথিওপীয়, অ্যাসিরীয় ও আরও অনেক মহৎ জাতিকে বিনা দোষে দাস বানিয়েছি শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের সীমা বাড়াতে; গ্রীসীয়রা বিনা কারণে আমাদের ক্ষতি করেছে, তাদের যদি সাজা না দিই তো বড় অদ্ভুত হবে। তাদের থেকে ভয় করার কি আছে আমাদের—তাদের সৈন্য তাদের অর্থ? কিন্তু তারা কেমন যুদ্ধ করে, কত সামান্য তাদের রসদ তা আমাদের জানা আছে! ঐ জাতির বিভিন্ন শাখা এশিয়ায় ও ইয়োরোপে ইতিমধ্যেই দাস বনেছে। আপনার বাবার আদেশে আমি নিজেই একবার তাদের দেশ আক্রমণ করে ম্যাসিডোনিয়া ও প্রায় অ্যাথেন্স পর্যন্ত গিয়েছিলাম—একটি সৈনিকও আমাদের বাধা দিতে সাহস পায় নি। তবে শুনতে পাই গ্রীসীয়রা হঠাৎ বিচার বিবেচনা না করে যুদ্ধ আরম্ভ করে। নিজেদের মধ্যে যখন যুদ্ধ হয় তখন সমতল ভূমি বেছে নিয়ে তারা কাটাকাটি করে, তাতে দুই পক্ষেরই প্রভূত ক্ষতি হয়। এটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার—তাদের সকলেরই যখন এক ভাষা তখন আলোচনা বা অন্য কোনও উপায়ে নিশ্চয় ঝগড়া মেটানো যেতে পারে। আর যুদ্ধ যদি অনিবার্য হয় তা হলেও নিশ্চয় রণকৌশল ব্যবহার করা উচিত যাতে ক্ষতি কম হয়। যুদ্ধ সম্বন্ধে এই তো এদের অদ্ভুত ধারণা!

'সুতরাং মহারাজ, এশিয়ার লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা ও সমগ্র পারসীক নৌবহর নিয়ে আপনি যখন যুদ্ধে যাবেন তখন কে আপনাকে বাধা দেবে? বিশ্বাস করুন, যেখানে বিপদের সম্ভাবনা বেশি সেখানে গ্রীসীয়রা পিছিয়ে যায়; কিন্তু আমার যদি ভুলও হয়, যদি অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাজনিত এক দুঃসাহসের বশে তারা লড়াই করে, তা হলে তারা টের পাবে আমাদের মত যোদ্ধা দুনিয়ায় আর নেই। তবু বলি, এই উদ্যোগে আমাদের কোনও ত্রুটি রাখা চলবে না; সাফল্য কখনও আপনা থেকে ধরা দেয় না—চেষ্টা বিনা কিছুই হয় না।'

সম্রাটের প্রস্তাব এ ভাবে সমর্থন পাবার পর কিছুক্ষণ কেউ কিছু বিরুদ্ধ কথা বলতে সাহস পেল না। সভায় ছিল জের্কস্যাসের পিতৃব্য আর্তাবানোস, এই সম্পর্কে জোর করে সে মুখ খুলল, বললে, 'আলোচনায় দুই দিকেই মতামত প্রকাশ করা হয়, তা ব্যতীত শ্রেয়পথ বেছে নেওয়া অসম্ভব। সোনার দাম চেহারা দেখে বোঝা যায় না, অন্য সোনার সঙ্গে ঘষে জানতে হয় কোন্‌টা বেশি খাঁটি। তোমার পিতা ও আমার ভাই দারেইওসকে আমি নিষেধ করেছিলাম শহরশূন্য যাযাবরের দেশ সিদিয়া আক্রমণ করতে; ক্ষমতার গর্বে তিনি আমার কথা শুনলেন না—বহু উৎকৃষ্ট সৈন্য হারিয়ে দেশে ফিরলেন। কিন্তু তুমি যাদের আক্রমণ করার কথা ভাবছ তারা শকদের থেকে অনেক বড় জাতি, স্থল ও জলের যুদ্ধে তাদের খ্যাতি অতুল্য। এমন হতে পারে যে, জলে বা স্থলে অথবা দুই ক্ষেত্রেই আমাদের বিপর্যয় ঘটল—গ্রীসের লোকে যুদ্ধ জানে, শুধু অ্যাথেনীয়রা একলা ম্যারাথনে যে আমাদের দুর্ধর্ষ বাহিনী ধ্বংস করেছে তা থেকে তা বোঝা যায়। অথবা ধর শুধু জলেই আমাদের পরাজয় ঘটল, তখন হেলেস্পন্টে পাড়ি দিয়ে তারা আমাদের সেতুটি

নষ্ট করবে এবং তুমি সত্যিই বিপদে পড়বে। খুব জ্ঞানী বলে আমি এই সম্ভাবনার কথা বলছি না. তোমার বাবা যখন সিদিয়া আক্রমণ করেছিলেন তখন প্রায় এই রকমই ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল ; তোমার মনে আছে নিশ্চয় শকরা তখন আইয়োনীয় রক্ষীদের আপ্রাণ প্ররোচিত করেছিল দানিয়ুবের সেতু ভেঙে দিতে এবং তখন মাইলিটাস-অধিপতি তিস্তিয়াইয়োস যদি নিজের বুদ্ধিতে না চলে অন্যান্য আইয়োনীয় শাসকদের কথা শুনতেন তা হলে পারস্যের সর্বনাশ হত। কোনও এক সম্রাটের ভাগ্য যে, একদা একটিমাত্র লোকের উপর নির্ভর করেছিল একথা শুনতেও ভয় হয় !

'সুতরাং আমি বলি এই পরিকল্পনা ত্যাগ কর, অনর্থক বিপদের সম্ভাবনার মধ্যে যেয়ো না। এই সভা ভঙ্গ করে নির্জনে বসে ভেবে দেখ, তারপর মনস্থির কর। উপযুক্ত ব্যবস্থা করেও যদি ভাগ্য কারও বিরুদ্ধে যায় তবে তার সান্ত্বনা থাকে যে, যা করার সে করেছে, পক্ষান্তরে কেউ যদি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ভাগ্যক্রমে সফল হয়, তবু এই লজ্জা তার থেকে যায় যে, সে প্রস্তুত ছিল না।

'তুমি জান যে প্রাণীকুলে যারা বড় হয় তাদের গর্ব দেখে ঈর্ষাবশত ঈশ্বর তাদেরই বজ্রাঘাত করেন। যারা ক্ষুদ্র তাদের প্রতি তিনি বিরক্ত হন না। সর্বদা উঁচু বাড়ি বা গাছের উপরই বাজ পড়ে। এইভাবে ঈশ্বর উন্নতকে নত করেন, কারণ একমাত্র নিজের মধ্যে ছাড়া আর কারও অহংকার তিনি সহ্য করেন না। প্রায়ই বৃহৎ বণবাহিনী ক্ষুদ্র সেনাদলের হাতে ধ্বংস হয় যখন সাজা দেবার জন্য ঈশ্বর ভয় ঢুকিয়ে দেন তাদের মনে। বিফলতার জননী ত্বরা এবং বিফলতার ক্ষতি সর্বদা অত্যধিক ; দেরি করলেই সুবিধা হয়, যদিও সে সুবিধা সর্বদা অবিলম্বে প্রত্যক্ষ নাও হতে পারে।'

রাজাকে এই পরামর্শ দিয়ে মার্দোনিয়োসের দিকে চেয়ে আর্তাবানোস বললে, 'গ্রীসীয়দের ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করতে যা তুমি বললে তা মোটেই তাদের প্রাপ্য নয়, সুতরাং তাদের সম্বন্ধে বাজে কথা আর বোলো না ; অবশ্য বুঝতে পারছি ঐ করে তুমি রাজাকে দিয়ে যুদ্ধ করাতে চাচ্ছ, কারণ তাই তোমার মতলব। কুৎসা অতি হীন জিনিস, এতে সকলেই ক্ষতির ভাগী হয় ; কুৎসা যে করে সে নিন্দিত ব্যক্তির আড়ালে কুৎসা করার দোষে দোষী, যে তার কথা শোনে তার দোষ এই যে প্রকৃত সত্য সে জানতে চেষ্টা করে না এবং যার নিন্দা হয় সে এই দু'জনের থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

'তবু শেষ পর্যন্ত গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান যদি অনিবার্য হয় তবে আমার একটি প্রস্তাব আছে। রাজা পারস্যে থাকুন, তুমি যত সৈন্য-সামন্ত লোকজন চাও তা নিয়ে বেরিয়ে পড়। যদি সফল হও তবে আমি এবং আমার ছেলেরা প্রাণ দেব, আর যদি ব্যর্থ হও তো তুমি এবং তোমার ছেলেদের প্রাণ দিতে হবে। হয় তো তুমি এই চুক্তিতে রাজী না হয়েই যুদ্ধে যাবে—তা হলে আমি বলছি এমন একদিন আসবে যেদিন দেশের লোকেরা বলবে মার্দোনিয়োস পারস্যের সর্বনাশ এনেছে, যেদিন তারা শুনবে যে অ্যাথেন্স বা স্পার্টার কোথাও—অথবা তারই রাস্তায়—তোমার দেহ কুকুরে-পাখিতে ছিঁড়ে খাচ্ছে।'

আর্তাবানোসের কথাগুলি শুনে ক্সের্কস্যাস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বললেন, 'আপনি আমার বাবার ভাই, নয় তো এই অসার অদ্ভুত বক্তৃতার যোগ্য শাস্তি পেতেন। কিন্তু কাপুরুষতার জন্য আপনাকে অপমানিত হতে হবে। আমার সঙ্গে আপনি গ্রীসে যেতে পারবেন না, এখানে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে থাকবেন। অ্যাথেন্সকে যদি শিক্ষা দিতে না পারি তবে আমার অবিস্মরণীয় পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারী আমি নই। আমি জানি আমরা না এগোলে অ্যাথেনীয়রাই আমাদের দেশ আক্রমণ করবে—এর আগে তারাই এশিয়াতে ঢুকে সার্ডিস জ্বালিয়ে দিয়েছিল। দু' পক্ষেরই একটা বোঝাপড়ার সময় এসেছে, হয় আমাদের যা কিছু আছে তা ওরা নেবে, নয় তো ওদের সর্বস্ব আমাদের হাতে আসবে—এর মাঝামাঝি কোনও পথ নাই। সুতরাং এখনই আমাদের প্রতিশোধ নেওয়া উচিত।'

এর পরে সভা ভঙ্গ হল। সেইদিনই সন্ধ্যায় আর্তাবানোসের কথাগুলি ভেবে ভেবে ক্সের্কস্যাস চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং রাত্রে ঘুমের আগে তাঁর মনে হল যে, গ্রীস আক্রমণ করাটা আসলে ভাল হবে না। পারসীকরা বলে যে, সেদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন দীর্ঘ সৌম্য এক মূর্তি তাঁর শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁকে উদ্দেশ করে সে বললে যে গ্রীস অভিযান সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করলে তাঁকে ক্ষমা করা হবে না, তিনি যেন আবার আগের সিদ্ধান্তে ফিরে যান। এই বলে ছায়ামূর্তি উড়ে চলে গেল। পরদিন সকালে মন থেকে এই স্বপ্ন দূর করে দিয়ে ক্সের্কস্যাস আবার সভা ডেকে বললেন, 'আমি খুব শীঘ্র মত পরিবর্তন করেছি তা দেখে আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমার বুদ্ধি এখনও সম্পূর্ণ পাকে নি, তা ছাড়া যারা জোর করে আমাকে এই যুদ্ধে জড়াতে চায় তারা একমুহূর্ত আমাকে শান্তি দেয় না। আর্তাবানোসের কথাগুলি শুনে আমার যৌবনের রক্ত তেতে উঠেছিল এবং আমি তাঁকে এমন কড়া কথা বলেছি যা জ্যেষ্ঠকে কারও বলা উচিত নয়। এখন বুঝতে পারছি তিনি ঠিকই বলেছেন, গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধ করব না আমরা।'

এই সিদ্ধান্তে পারসীকরা খুব খুশি হল। কিন্তু সেই রাত্রেই সম্রাটের স্বপ্নের সেই ছায়ামূর্তি আবার এসে বললে, 'দারেইওস-পুত্র, আমার নির্দেশ সত্ত্বেও তুমি তা তুচ্ছ করে প্রকাশ্যে যুদ্ধ পরিহার করেছ। এই তোমাকে বলে যাচ্ছি, এই যুদ্ধ না করলে যেমন হঠাৎ তুমি মহত্ত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েছ তেমনি একমুহূর্তে আবার ধূলিসাৎ হবে।'

অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে ক্সের্কস্যাস বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ আর্তাবানোসকে ডেকে পাঠিয়ে সব কথা জানিয়ে বললেন, 'যদি ঈশ্বরই এই স্বপ্ন পাঠিয়ে থাকেন তবে এই মূর্তি আপনাকেও দেখা দেবে এবং একই আদেশ জানাবে। আমার মনে হয় এমন ঘটনার সম্ভাবনা আরও বাড়বে যদি আপনি আমার পোষাক পরেন, আমার সিংহাসনে বসেন এবং আমার বিছানায় ঘুমান।'

রাজ-সিংহাসনে বসতে প্রথমে আপত্তি করে পরে আর্তাবানোস ক্সের্কস্যাসের উপরোধে রাজী হল, কিন্তু তার আগে বললে, 'বৎস, যে সৎপরামর্শ শোনে সে আর বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রায় সমকক্ষ। তোমার অবশ্য দুই গুণই আছে, কিন্তু কুসঙ্গ তোমাকে বিপথে নেয়। তুমি আমাকে যে কটূক্তি করেছ তাতে আমি ততটা দুঃখ পাই নি যতটা পেয়েছি এই দেখে যে দু'টি পথের মধ্যে তুমি সেটি বেছে নিলে যা ঔদ্ধত্যের পরিপোষক, যা তোমাকে আর তোমার দেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে

যেতে পারে; ত্যাগ করলে সে পথ যা আমাদের ঔদ্ধত্য দমন করতে শেখায় কেবলই আরও বেশি চাওয়ার দোষ দেখিয়ে দিয়ে। এখন তুমি ঠিক পথটি চিনেও স্বপ্ন দেখে আবার উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছ, ভাবছ কোনও দেবতা তা পাঠিয়েছে। কিন্তু স্বপ্ন ঈশ্বরের থেকে আসে না: আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, আমি বলছি ঘুমের মধ্যে এই যে দৃশ্যগুলি আমাদের চোখের সামনে ভাসে প্রায় সর্বদাই তারা দিনের বেলায় যা আমরা ভাবি তার ছায়ামাত্র; তুমি সেদিন এই অভিযানের কথা ভেবেছিলে। অবশ্য এও সম্ভব যে তোমার স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়, হয় তো এর মধ্যে ঐশ্বরিক কিছু আছে যেমন তুমি বলছ। ছায়ামূর্তি তা হলে হয় তো আমাকেও দেখা দেবে, কিন্তু তোমার পোষাক পরলে এবং তোমার বিছানায় শুলে সে যে সহজে আসবে তা আমার মনে হয় না। কারণ, নিশ্চয় সে এমন নির্বোধ নয় যে তোমার জামা পরে থাকলেই আমাকে তুমি বলে ভাববে। তবে আমার কাছে সে আসুক আর না আসুক, তোমাকে যদি আবার দেখা দেয় তবে আমিও স্বীকার করব যে ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছেন। যাই হোক, তুমি যখন আজ্ঞা করছ তখন তোমার বিছানায় নিশ্চয় আমি শোব।'

আর্তাবানোস রাজার পোষাক পরল, রাজ-সিংহাসনে বসল, তারপর রাজশয্যায় শুয়ে স্বপ্নে দেখল সেই মূর্তি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ থেকে রাজাকে বিরত করতে চেষ্টা করার জন্য সে তাকে তিরস্কার করে বললে, ভবিতব্যের গতি পরিবর্তন করতে যাবার অপরাধে তাকে শাস্তি পেতে হবে। এই বলে ছায়ামূর্তি উত্তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে আর্তাবানোসের চোখ পুড়িয়ে দিতে উদ্যত হল, তখন চিৎকার করে জেগে উঠে সে দৌড়ে গেল রাজার কাছে।

তার পাশে বসে নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করে আর্তাবানোস বললে, 'আমি যে তোমাকে বাধা দিতে চেয়েছিলাম তার কারণ বহু ক্ষমতা-গর্বিত রাজত্বকে দুর্বলের কাছে পরাজিত হতে আমি দেখেছি। অদম্য আকাঙ্ক্ষার বিপদ আছে—মাসসাগেতাসদের বিরুদ্ধে সাইরাসের অভিযান অথবা কাম্বিস্যাসের ইথিওপিয়া আক্রমণ আমি ভুলতে পারি নি। আমি নিজেই কি দারেইওসের সঙ্গে সিদিয়ায় যাই নি? ঐ সব বিপর্যয়ের থেকে এই বুঝেছিলাম যে, একমাত্র শান্তির পথে চললেই তুমি জগতের চোখে সুখী হবে। কিন্তু এখন দেখছি ঈশ্বর স্বয়ং এই ব্যাপারে আছেন, তিনি গ্রীস ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন, সুতরাং আমার ভুল স্বীকার করছি। পারসীকদের তোমার স্বপ্নের কথা বলে তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কর।'

পরদিন প্রত্যুষে সম্রাট এই পরামর্শমত কাজ করলেন এবং আর্তাবানোস তাঁকে প্রকাশ্যে সমর্থন করল। এর পরে জেরেকসাস আর একটা স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি জলপাইয়ের মুকুট পরে আছেন, তার শাখা সমস্ত পৃথিবী ছেয়েছে; পুরোহিতরা এর অর্থ করলে যে তিনি সারা জগতের অধিপতি হবেন।

চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গেল, প্রস্তুতি শুরু হল, মিশর জয়ের পর চার বছর ধরে লোক ও রসদ সংগ্রহ হল রাজ্যের সর্বত্র। পঞ্চম বছরের শেষে এই প্রকাণ্ড বাহিনীর মুখে জেরেকসাস যাত্রা আরম্ভ করলেন।

জেরেকসাসের গ্রীস অভিযান

জেরেকসাস যে বাহিনী নিয়ে গ্রীসের দিকে যাত্রা করলেন, হেরোডোটাস বলেছেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। সিদিয়ায় দারেইওস যত সৈন্য নিয়ে গিয়েছেন, ট্রয় ও অন্যান্য রণক্ষেত্রে যত ফৌজ ব্যবহার হয়েছে, তার সব একত্র করলেও এই বাহিনীর সমান হবে না। এশিয়ার প্রতি দেশ থেকে লোক এসেছিল তাতে, কেউ দিয়েছিল জাহাজ, কেউ পদাতিক, কেউ অশ্বারোহী, কেউ বা অন্যকিছু। বড় বড় নদী ছাড়া আর সব জলাশয় নাকি শুকিয়ে গিয়েছিল এদের পিপাসা মেটাতে। হেরোডোটাস সবিস্তারে এই বাহিনীর ও তার নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

পথে এক জায়গায় পিথিয়োস নামক এক লিডিয়াবাসী জেরেকসাসের জন্য অপেক্ষা করেছিল, তাঁকে এবং সেনাবাহিনীকে নানাভাবে আপ্যায়ন করে সে যুদ্ধের খরচ বাবদ তার সব টাকা দিয়ে দিতে চাইল। জেরেকসাস খোঁজ নিয়ে জানলেন সে নাকি ইতিপূর্বে দারেইওসকে এক সোনার গাছ ও সোনার লতা উপহার দিয়েছিল এবং সম্রাটের পরেই জগতের অদ্বিতীয় ধনী বলে তার খ্যাতি। পিথিয়োস সম্রাটকে ত্রিশ লক্ষেরও বেশি স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাইল, কিন্তু তিনি তার কথায় ও ব্যবহারে এত খুশি হয়েছিলেন যে তার টাকা তো নিলেনই না, উপরন্তু নিজের তহবিল থেকে অর্থ দিয়ে চল্লিশ লক্ষ পূর্ণ করে দিলেন।

সার্ডিসে পৌঁছে প্রথমেই জেরেকসাস গ্রীসের প্রত্যেক রাজ্যে দূত পাঠালেন বশ্যতার নিদর্শন চেয়ে, এক অ্যাথেন্স ও স্পার্টা ছাড়া। ততক্ষণে অ্যাবিডস থেকে হেলেস্পন্টের উপর প্রায় এক মাইল লম্বা দু'টি দড়ির সেতু তৈরি হয়ে গিয়েছে কিন্তু পরে এক প্রচণ্ড ঝড়ে তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। খবর শুনে জেরেকসাস অত্যন্ত রেগে গেলেন, তাঁর হুকুমমত ঐ জলপ্রণালীকে তিন শো চাবুক লাগানো হল এবং একজোড়া হাতকড়া জলে ছুড়ে ফেলা হল—শোনা যায় গরম লোহার ছেঁকাও দেওয়া হয়েছিল। যারা চাবুক মেরেছিল তারা রাজার আদেশে জলকে উদ্দেশ করে নানা রকম কটূক্তি করলে, হেরোডোটাস বলেছেন হেলেস্পন্টের প্রতি এই অতি উদ্ধত ব্যবহার বর্বর জাতিরই উপযুক্ত। যারা সেতু বানিয়েছিল তাদের শিরশ্ছেদ করে নতুন ওস্তাদের হাতে কাজের ভার দেওয়া হল, তারা পাশাপাশি জাহাজ সাজিয়ে তার উপরে আবার সেতু বানালে।

সার্ডিসে শীত কাটিয়ে বসন্তকালে জেরেকসাস তাঁর বাহিনী নিয়ে অ্যাবিডসের দিকে যাত্রা শুরু করলেন, তখন হঠাৎ পরিষ্কার নির্মেঘ আকাশ রাত্রির মত কালো হয়ে গেল: রাজা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পুরোহিতদের এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন, তারা বললে চন্দ্র নির্দেশ দেয় পারস্যকে, সূর্য নির্দেশ দেয় গ্রীসকে—গ্রীসীয় শহরগুলির অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে এই হল ঈশ্বরের নির্দেশ। জেরেকস্যাস খুব খুশি হয়ে এগিয়ে চললেন।

কিন্তু বেশিদূর যেতে না যেতে পিথিয়োস চিন্তিত হয়ে পড়ল। জেরেকস্যাসের সঙ্গে তার সখ্য স্থাপিত হয়েছে সেই সাহসে সে তাঁকে গিয়ে বললে, 'মহারাজ, আমার পাঁচটি ছেলেই আপনার অভিযানে যোগ দিয়েছে, আমি বুড়ো হয়েছি, দয়া করে যদি আমার ও আমার

সম্পত্তির দেখাশোনা করতে একটিকে ফিরিয়ে দেন তবে বড় উপকৃত হব।'

অত্যন্ত রেগে জের্কস্যাস বললেন, 'আমি নিজে যখন আমার ছেলে, ভাই, আত্মীয়, বন্ধু নিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছি, তখন তুমি সামান্য এক দাস হয়ে এমন অনুরোধ করছ। ইতিপূর্বে তুমি আমাকে আতিথ্য দিয়েছ ও ঔদার্য দেখিয়েছ সেইজন্য তোমার শাস্তি কমিয়ে দিচ্ছি—তুমি নিজে ও তোমার চার ছেলে বেঁচে গেলে, কিন্তু যাকে তুমি বাঁচাতে চাচ্ছ তার প্রাণ দিতে হবে।'

তাঁর হুকুমে তৎক্ষণাৎ পিথিয়োসের বড় ছেলেকে দু'টুকরো করে কেটে সেনাবাহিনীর পথের দু'পাশে রাখা হল।

অ্যাবিডসে পৌঁছে জের্কস্যাস এক উঁচু জায়গায় শ্বেতপাথরের সিংহাসনে বসলেন, সেখান থেকে সমস্ত সেনা ও নৌবাহিনী চোখে পড়ল। পোতসমাকীর্ণ হেলেস্পনট প্রণালী ও জনাকীর্ণ উপকূল দেখে সম্রাটের হৃদয় খুশিতে ভরে উঠল—পরমুহূর্তেই তিনি কেঁদে ফেললেন।

পিতৃব্য আর্তাবানোস জিজ্ঞাসা করলে এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্তনের কি কারণ।

জের্কস্যাস বললেন, 'হঠাৎ আমার মনে হল মানুষের জীবন কত সংক্ষিপ্ত—এই হাজার হাজার লোকের একজনও এক শো বছর পরে বেঁচে থাকবে না।'

আর্তাবানোস বললে, 'ঠিক কথা, কিন্তু এর চেয়েও দুঃখের জিনিস মানুষের জীবনে আছে। জীবন সংক্ষিপ্ত বটে, তবু কোথাও এমন সুখী লোক একটিও পাবে না যে একবার নয় বহুবার মরতে না চেয়েছে। জীবনে কতরকম দুর্ভোগ আসে, রোগে কষ্ট দেয়, তখন এই ক্ষুদ্র জীবনও মনে হয় অতিদীর্ঘ, দুঃখের ভারে মৃত্যুর আশ্রয়ই আমরা সকলে কামনা করি। এর থেকেই বোঝা যায় যে, আমাদের একটুখানি সুখের স্বাদ দিয়ে ঈশ্বর কৃপণের মত বঞ্চিত করেছেন।'

জের্কস্যাস বললেন, 'এ জগতে মানুষের ভাগ্য আপনি যেমন বললেন ঠিক তেমনই। তবে এ সব দুশ্চিন্তা থাক; আচ্ছা বলুন দেখি, স্বপ্নে সেই পুরুষটিকে যদি না দেখতেন তা হলে কি এখনও আমাকে যুদ্ধ থেকে বিরত করতে চেষ্টা করতেন?'

আর্তাবানোস বললে, 'স্বপ্নের আশা পূর্ণ হোক এই প্রার্থনা করি। কিন্তু সেই রাত্রি থেকে আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আছি। ভয়ের অনেক কারণ, তার মধ্যে প্রধান হল যে, পৃথিবীর বৃহত্তম দুই শক্তি তোমার বিরুদ্ধে।'

এই কথায় আশ্চর্য হয়ে জের্কস্যাস নিজের স্থল ও জলবাহিনীর আকৃতি তাকে মনে করিয়ে দিলেন, তখন আর্তাবানোস বললে, 'যে শত্রুর কথা বলছি তোমার বাহিনী যত বাড়বে তার শক্তিও তত বাড়বে—এই শত্রু হল জল আর স্থল। আমাদের নৌবহরকে ঝড়ে আশ্রয় দিতে পারে এমন একটি বন্দরও কোথাও নেই এবং পথে এমন কয়েকটি বন্দর তোমার দরকার। আর স্থল—কেউ যদি বাধা না দেয় তো তুমি কেবল এগিয়েই যাবে, কেবলই মনে হবে আরও চাই, যতদিন না এই স্থলেরই দূরত্ব বাড়তে বাড়তে শেষে শত্রুকে অনাহারে মারবে। তার চেয়ে আমার মনে হয় সব রকম বিপদের দিকে চোখ রেখে যে সাবধানে চলে এবং সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই বুদ্ধিমান।'

জের্কস্যাস বললেন, 'আপনার কথা ঠিক, তবে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকবেন না বা বিপদের কথা ভাববেন না। যদি প্রতিটি প্রস্তাবের সব রকম সম্ভাবনা ওজন করে চলতে হয়, তা হলে কিছুই করা যায় না, বিপদের ভয়ে নিষ্ক্রিয় ও নিরাপদ হয়ে বসে থাকার চেয়ে আমি বরং বিপদের সম্ভাবনা মেনে নিয়ে কাজে লাগতে চাই, তাতে ফল যাই হোক। তর্কে কিছুই প্রমাণ করা যায় না—যারা কাজে হাত দিতে ইচ্ছুক তারাই লাভবান হয়, অতি সাবধানীরা নয়। পারস্যের যে আজ এত গৌরব, এত প্রতিপত্তি তা কি করে হল? তার রাজারা আপনার মত ভাবেন নি বা আপনার মত লোকের পরামর্শ নেন নি বলেই তা হয়েছে। আমরাও পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বসন্তকালে যুদ্ধে বেরিয়েছি, সমগ্র ইয়োরোপ জয় করে নির্বিঘ্নে দেশে ফিরব। এই বলে সম্রাট আর্তাবানোসকে সুজাতে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

পরের দিন জের্কস্যাস সূর্য উপাসনা করে হেলেস্পন্‌ট অতিক্রম আরম্ভ করলেন, সকলের পার হতে সাত দিন সাত রাত্রি কেটে গেল। কথিত আছে সম্রাট যখন ইয়োরোপে পা ফেললেন তখন স্থানীয় একটি লোক চিৎকার করে উঠল, 'হা ঈশ্বর, গ্রীসকে ধ্বংস করতে তুমি এই পারসীকের মূর্তি ধরে ও এত লোক নিয়ে এসেছ কেন? তুমিতো আরও সহজেই তা করতে পারতে।'

ইয়োরোপে পৌঁছে আবার যখন যাত্রা আরম্ভ হয়েছে তখন হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল—এক ঘোটকীর গর্ভে জন্মাল এক খরগোস। জের্কস্যাস সে দিকে নজর দিলেন না বটে, কিন্তু এর সাংকেতিক অর্থ খুবই স্পষ্ট; ইঙ্গিতটা এই যে তিনি মহাসমারোহে সৈন্যসামন্ত নিয়ে গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবেন, তারপর প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসবেন ঘরে।

থ্রেসের উপকূলে এক জায়গায় পৌঁছে জের্কস্যাস তাঁর সৈন্য গণনা করলেন, নৌ-সেনা বাদ দিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়াল সতের লক্ষ। গণনার জন্য প্রথমে দশ হাজার লোককে ঠাসাঠাসি করে দাঁড় করিয়ে তাদের ঘিরে একবৃত্ত টানা হল, তারপর সেই জায়গাটা বেড়া দিয়ে ঘিরে পর পর এক এক দল করে সৈন্য তার মধ্যে গাদাগাদি করে ভরা হল; প্রত্যেক দলের সংখ্যা ধরা হল দশ হাজার।

এর পরে হেরোডোটাস বিভিন্ন জাতির যোদ্ধাদের পোষাক, অস্ত্র ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। পারসীকদের সজ্জা ও উপকরণ ছিল সবচেয়ে চমকপ্রদ; প্রত্যেকের দেহ নাকি ঝক ঝক করছিল সোনায়—'অফুরন্ত পরিমাণ' সোনা ছিল সঙ্গে; তা ছাড়া ছিল গাড়ি ভর্তি সুসজ্জিত নারী ও দাস, বিশেষ বিশেষ খাদ্য ইত্যাদি। আরব, ইথিওপীয়, মিডীয়, লিডীয় ও অনেক সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে হেরোডোটাস ভারতীয়দেরও নাম করেছেন—তারা সুতির পোশাক পরত, অস্ত্র ছিল বেতের তীর-ধনুক, তীরের মাথায় লোহা বসানো।

সংখ্যা গণনার পরে জের্কস্যাস তাঁর স্থলসেনা ও নৌবহর পরিদর্শন করলেন। স্পার্টার সিংহাসনচ্যুত রাজা ডামারাতোস এই অভিযানে ছিলেন, পরিদর্শনের পর তাঁর সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর আলাপ হল। সম্রাট বললেন, 'আপনি গ্রীসের লোক তাও আবার এক ক্ষমতাপন্ন শহরের নাগরিক, বলুন তো গ্রীসীয়রা কি আমার বিরুদ্ধে হাত তুলতে সাহস পাবে? আমার নিজের ধারণা গ্রীস ও অন্যান্য

পাশ্চাত্য দেশ একত্র হয়েও আমার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে না—বিশেষ করে তাদের মধ্যে যখন ঐক্য নেই।'

ড্যামারাতোস বললেন, 'মহারাজ, প্রিয় বলব না অপ্রিয় বলব ?'

রাজা বললেন, 'সত্য বলুন, তাতে আপনার কোনও ক্ষতি হবে না।'

তখন ড্যামারাতোস জবাব দিলেন, 'গ্রীসের লোক শৌর্যের দ্বারা দারিদ্র্য ও অধীনতা দূরে রেখেছে। ডোরীয় বংশজাত সব গ্রীসীয়দের প্রতিই আমি শ্রদ্ধাবান, কিন্তু বিশেষ করে স্পার্টাবাসীদের কথা বলছি। গ্রীসকে দাস হতে হয় এমন সর্ত তারা কিছুতে গ্রহণ করবে না, দ্বিতীয়ত, সমস্ত গ্রীস বশ্যতা স্বীকার করলেও তারা লড়বে—সংখ্যায় মোটে এক হাজার হলেও তারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবে।'

জের্কস্যাস তাঁর কথা অবিশ্বাস করে হেসে বললেন, 'তা যদি সত্য হয় তবে যেহেতু আপনি তাদের মধ্যে রাজা ছিলেন একাই আপনার আমাদের কুড়ি জনের সঙ্গে লড়াই করতে পারা উচিত। কিন্তু আপনি ও অন্যান্য যে সব গ্রীসীয় আমার সভায় এসেছে তাদের দেখে এই দাবি কিছুটা আত্মম্ভরিতা মনে হয়। তা ছাড়া গ্রীসীয়বাহিনী এক নেতার শাসনে আবদ্ধ নয়, এই অবস্থায় সংখ্যায় সমান হলেও তারা পারসীকদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।'

ড্যামারাতোস বললেন, 'মহারাজ, আমি জানতাম সত্য কথাটা আপনার প্রিয় হবে না। আমার দেশের লোক আমার বংশগত ক্ষমতা ও সুখ-সুবিধা কেড়ে নিয়েছে, আমাকে দেশান্তরী করেছে, তাদের প্রতি আমার খুব অনুরাগ নেই ; পক্ষান্তরে আপনার বাবা আমাকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তবু আপনি জানতে চেয়েছিলেন বলে স্পার্টাবাসীদের সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য বলেছি। আমি নিজে যুদ্ধে দশজনের সমান এমন দাবি করি না—একজনের সঙ্গেও লড়বার ইচ্ছা আমার নেই ; তবে কোনও মহৎ আদর্শ যদি ডাক দেয় তো আপনার ঐ সৈন্যদের একজনকে প্রতিরোধ করে আমি অত্যন্ত আনন্দ পাব, যদিও তারা বলে তারা একজন তিনজন গ্রীসীয় সৈনিকের সমান। গ্রীসীয়রা স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ করে বটে, তবু তাদের এক নেতা আছে, আপনাকে আপনার প্রজারা যেমন ভয় করে তাকেও তারা সেই রকম ডরায়—তার নাম নীতি। এই প্রভুর আদেশে তারা যুদ্ধে কখনও পিছিয়ে যায় না, শত্রু যতই বড় হোক, হয় জেতে নয় মরে। হয় তো আপনি ভাবছেন আমি বাজে বকছি, তা'হলে আমি মুখ বন্ধ করেই থাকব, আপনি কথা বলতে বলেছেন বলেই বলেছি।'

জের্কস্যাস হেসে তাকে বিদায় দিলেন।

নানা দেশ পাহাড় বন অতিক্রম করে পারসীকবাহিনী এগিয়ে চলল। এক জায়গায় এক নদীকে খুশি করতে পুরোহিতরা কতগুলি সাদা ঘোড়া আহুতি দিল, অন্যত্র তারা নয়টি বালক ও বালিকাকে জীবন্ত সমাধি দিল। হেরোডোটাস বলছেন এটা পারসীক রীতি ; জের্কস্যাসের স্ত্রী আমেস্ট্রিস নাকি বৃদ্ধ বয়সে চৌদ্দটি উচ্চবংশীয় পারসীক বালককে জীবন্ত সমাধি দিয়েছিলেন—তাঁর আশা ছিল যে, পাতালের রাজা তাঁর নিজের বদলে এই উপহার গ্রহণ করবেন। সর্বত্র রাজা ও তার বাহিনীর খাবার ব্যবস্থা করতে স্থানীয় লোকেরা প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেল, উপরন্তু থালা-বাটি পর্যন্ত তারা হারাল। অ্যাবডেরার কাছে এক জায়গায় রাত্রে সিংহের দল এসে ভারবাহী উটগুলিকে আক্রমণ করল, অন্যান্য পশু ও মানুষকে কিছু বললে না।

যে সব দূত ইতিপূর্বে গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়েছিল, সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হতে হতে তারা একে একে ফিরে এল, কেউ খালি হাতে, কেউ বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ মাটি ও জল নিয়ে।

প্রায় দশটি জাতির থেকে অধীনতার স্বীকৃতি পাওয়া গেল, যারা আক্রমণ প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর তারা প্রতিজ্ঞা করলে যে, যুদ্ধ শেষ হলে এই সব রাজ্যগুলির সম্পত্তির এক-দশমাংশ কেড়ে নিয়ে দেলফাইর দেবতাকে উপহার দেওয়া হবে।

অ্যাথেন্স ও স্পার্টাতে যে জের্কস্যাস দূত পাঠান নি তা ইতিপূর্বে দারেইওসের দূতের প্রতি তারা কেমন ব্যবহার করেছে সে কথা মনে করে অ্যাথেনীয়রা তাদের হীন অপরাধীর গর্তে ফেলে দিয়েছিল, স্পার্টাবাসীরা ফেলেছিল কুয়াতে এবং বলেছিল যে মাটি ও জল তারা চায় তা ঐখানেই পাওয়া যাবে। এর ফলে অ্যাথেন্সের কি দুর্গতি হয়েছিল তা হেরোডোটাস জানেন না, তবে স্পার্টাবাসীরা বহুদিন ধরে মন্দিরে আহুতির পরিবর্তে কোনও শুভ লক্ষণ পেল না। এতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তারা ঘন ঘন নাগরিকদের সভা ডেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল দেশের জন্য মরতে কে রাজী আছে। অবশেষে স্পের্কিয়াস ও বুলিস নামক সম্ভ্রান্ত ও ধনীবংশীয় দু'জন লোক এগিয়ে এল দারেইওস-দূতদের হত্যার অপরাধ মোচনের জন্য জের্কস্যাসের কাছে প্রাণ দিতে।

পারস্যের পথে এদের পরিচয় হল এশিয়ার সমগ্র উপকূলাঞ্চলের শাসক হিদার্নাস নামক এক পারসীকের সঙ্গে। সে নিজের বাড়িতে এদের আতিথ্য করে খাবার সময়ে বললে, 'আপনারা আমাদের রাজার সঙ্গে সখ্য স্থাপন কর'ত রাজী নন কেন ? আমাকে দেখেই বুঝতে পারছেন তিনি গুণের আদর জানেন। জের্কস্যাস মনে করেন আপনারাও গুণীলোক, আপনারা দু'জনে যদি তাঁর অধীনতা মেনে নেন তো গ্রীসীয় দেশগুলির কর্তৃত্ব তিনি আপনাদের হাতে তুলে দেবেন।'

অতিথিরা জবাব দিলে, 'আপনি সবটা না বুঝে এমন পরামর্শ দিচ্ছেন, বিষয়টার একদিক শুধু দেখতে পাচ্ছেন। দাসত্ব কি আপনি জানেন, কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ কখনও পান নি, তা তিতো কি মিঠে তা জানেন না। যদি জানতেন তো দরকার হলে তার জন্য কুড়াল হাতে নিয়েও যুদ্ধ করতে পরামর্শ দিতেন।'

সুজাতে পৌঁছে যখন তারা রাজার সামনে উপস্থিত হল তখন প্রথমেই রাজার দেহরক্ষীরা তাদের দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করাতে চেষ্টা করল। তারা বললে, তাদের মাথা জোর করে ঠেলে মাটিতে ছুঁইয়ে দিলেও তারা কখনও তাতে রাজী হবে না—তাদেরই মত রক্ত-মাংসের কোনও মানুষকে পূজা করার রীতি স্পার্টাতে নেই। এর জন্য তারা পারস্যে আসে নি, এসেছে পারস্য-রাজদূতের হত্যার জন্য শাস্তি নিতে। শুনে জের্কস্যাস পরম ঔদার্য সহকারে বললেন যে, স্পার্টাবাসীরা বিশ্বের রীতির বিরুদ্ধে বিদেশী রাজদূতদের হত্যা করে যে অপরাধ করেছে, স্পার্টার বিরুদ্ধে সেই অপরাধই তিনি করবেন না, তা ছাড়া প্রতিশোধ নিয়ে স্পার্টাবাসীদের পাপমুক্তি দিতে তিনি চান না।

স্পের্কিয়াস ও বুলিস নির্বিঘ্নে দেশে ফিরে গেল।

গ্রীসের প্রস্তুতি

পারসীক অভিযানের নামমাত্র লক্ষ্য অ্যাথেন্স হলেও স্কের্কস্যাসের আসল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র গ্রীস জয়। অভিযান আরম্ভ হবার পরে গ্রীসে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। যে সব জাতি আগেই বশ্যতা স্বীকার করল, ক্ষতির পরিমাণ সামান্য হবে এই আশায় তারা খুশিমনে রইল; যারা অধীনতা মানল না তারা শঙ্কিত হল ভেবে যে, সমগ্র গ্রীসে যথেষ্ট জাহাজ নেই এবং দ্বিতীয়ত গ্রীসের অধিকাংশ লোক যুদ্ধে বীতস্পৃহ, পারসীক শাসন মেনে নিতে রাজি।

হেরোডোটাস এইখানে অ্যাথেন্সের উচ্চ প্রশংসা করে আবেগের পরিচয় দিয়েছেন যা তিনি সাধারণত করেন না। তিনি বলছেন, 'এই প্রসঙ্গে আমার নিজের অভিমত প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি, যদিও জানি অধিকাংশ লোকে তা মানবে না। অ্যাথেনীয়রা বিপদ দেখে যদি নিজেদের রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেত বা আত্মসমর্পণ করত তা হলে জলে পারসীকদের প্রতিরোধের কোনও চেষ্টাই হত না। আর গ্রীসীয় নৌ-বাহিনী না থাকলে স্থলযুদ্ধের কি পরিণতি হত তা সহজেই অনুমেয়। করিন্থীয় যোজকে স্পার্টা যতই প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করুক, পারসীক নৌ-শক্তির মুখে তা রক্ষা করা সম্ভব হত না; তখন স্পার্টাবাসীরা একা পড়ত—হয় খুব খানিকটা শৌর্য-বীর্য দেখিয়ে যুদ্ধে প্রাণ দিত, নয় তো গ্রীসের বাকি অংশের অবস্থা দেখে তারাও আত্মসমর্পণ করত। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অ্যাথেন্সই গ্রীসকে বাঁচিয়েছে। গ্রীসের ভাগ্য ছিল তার হাতে, সে যেদিকে যেত সেই পক্ষই জিতত। অ্যাথেনীয়রা স্থির করল গ্রীস বাঁচবে, তার স্বাধীনতা রক্ষা করবে, তখন যে সব রাজ্য বশ্যতা মানে নি তাদের তারা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করল। ঈশ্বরের সহায়ে অ্যাথেনীয়রাই পারস্য-রাজকে বিতাড়িত করেছে। দেলফাইর দৈববাণীতে যে ভয়ংকর ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল তাও তাদের সংকল্পচ্যুত করতে পারে নি। শত্রু রোধ করতে তারা বদ্ধপরিকর থেকেছে।'

দৈববাণীর নির্দেশমত কাজ করবে ভেবেই তারা দেলফাইতে দূত পাঠিয়েছিল, সেখানে পুরোহিতানীর মুখে তারা শুনল আসন্ন ধ্বংসের কথা—শুনল যুদ্ধের রথের নীচে হাত, পা, মাথা, দেহ সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবে, ছাতের উপর দিয়ে কালো রক্ত বয়ে যাবে ইত্যাদি। 'এখনও বসে আছ কেন, পৃথিবীর শেষপ্রান্তে পালাও', বললে দৈববাণী।

দূতরা তা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল, কিন্তু দলের একজনের পরামর্শ অনুসারে জলপাইর শাখা হাতে নিয়ে আবার মন্দিরে ঢুকল এবং অ্যাপোলো দেবের কাছে দেশের জন্য আরও সদয় ভাগ্য ভিক্ষা করলে।

এবার যে ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া গেল তাতেও নির্দেশ ছিল এশিয়ার পদাতিক ও অশ্বারোহীর জন্য অপেক্ষা না করে পলায়ন করতে, এও বলা ছিল যে, 'ঐশ্বরিক স্যালামিসে'* স্ত্রীলোকের গর্ভজাত পুত্ররা মারা পড়বে; তবু এ বারের বাণী আগের মত অতটা নির্দয় মনে হল না। দূতরা তা লিখে নিয়ে অ্যাথেন্সে ফিরে এল, সেখানে বিশেষজ্ঞরা নানা রকম ব্যাখ্যা করলে, কখনও তার একটা আর একটার সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্লোকের মধ্যে একটি পংক্তি ছিল যে, 'কাঠের দেয়াল নষ্ট হবে না, তাই তোমাদের বাঁচাবে'; জনকয়েক এর অর্থ করলে যে অ্যাক্রপোলিস ধ্বংস হবে না, কারণ এই গিরির চতুর্দিকে তখন কাঁটা গাছের বেড়া ছিল। অন্যরা বললে কাঠের দেয়াল অর্থ জাহাজ সুতরাং অবিলম্বে নৌ-শক্তি বাড়ানো উচিত। অথচ এ দিকে স্যালামিসে বিপর্যয়ের কথাও বলা হয়েছে—এই হেঁয়ালি নিয়ে যখন সবাই চিন্তিত তখন থেমিস্টোক্ল্যাস নামে একজন বললে যে, স্যালামিসে নিশ্চয় শত্রুর সর্বনাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নয় তো 'ঐশ্বরিক স্যালামিস' না বলে 'ঘৃণ্য স্যালামিস' বলা হত।

পেশাদার ব্যাখ্যাকাররা শুধু জলযুদ্ধের বিরুদ্ধেই পরামর্শ দেয় নি, সব রকম প্রতিরোধেরই বিপক্ষে চলেছে, কিন্তু নাগরিকরা থেমিস্টোক্ল্যাসের ব্যাখ্যাই ভাল মনে করল। স্বাধীনতাকামী গ্রীসীয় রাজ্যগুলি এক সভায় মিলিত হয়ে স্থির করলে যে, সর্বাগ্রে তাদের গৃহবিবাদ বন্ধ করা দরকার। স্কের্কস্যাস সার্ডিসে পৌঁছেছেন জেনে তারা এশিয়ায় গুপ্তচর পাঠাতে মনস্থ করল। তা ছাড়া আর্গস, সিসিলি, কর্সাইরা (বর্তমানে কর্ফু) ও ক্রীটে দূত গেল গ্রীসের জাতীয় সংকটে সাহায্য প্রার্থনা করে।

তিনটি গুপ্তচর সার্ডিসে এসে পারসীকবাহিনীর সব খবর সংগ্রহ করল, কিন্তু অবিলম্বে ধরা পড়ল। সেনাপতিরা যখন তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে উদ্যত তখন স্কের্কস্যাস খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ শাস্তি রদ করে বলে পাঠালেন, গুপ্তচরদের যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই লোকগুলিকে প্রশ্ন করে যখন তাদের আগমনের কারণ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ রইল না, তখন রক্ষীদের হুকুম করলেন তাদের সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেনাবাহিনীর সব কিছু দেখাতে; যা যা তারা দেখতে চায় তার সব দেখে নেবার পর তারা নিরাপদে যে দেশে খুশি ফিরে যেতে পারে। তারপর স্কের্কস্যাস তাঁর এই আদেশের কারণ প্রকাশ করে বললেন যে, এই তিনজনকে মেরে ফেললে গ্রীসের এমন কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু এরা যদি দেশে ফিরে পারস্যের প্রচণ্ড শক্তির কথা বলে তো তাঁর খুব উপকার হবে—গ্রীস বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবে।

স্কের্কস্যাস যখন অ্যাবিডসে ছিলেন তখন কতগুলি শস্যবাহী জাহাজ হেলেস্পন্ট অতিক্রম করে ইজিনা ও পেলপনিসাসের দিকে যাচ্ছে দেখেও তিনি তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন; তাঁর বিশ্বাস ছিল ঐ শস্য তাঁরই হাতে পড়বে, সুতরাং আগে থেকে তা কেড়ে নিয়ে নিজের ভার বাড়ানো নিরর্থক।

তিন গুপ্তচর যখন ফিরে এল তখন গ্রীসীয়রা আর্গসে দূত পাঠাল সাহায্যের অনুরোধ জানিয়ে। আর্গসবাসীরা বলে যে, পারস্য যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখনই এই অবস্থার আশঙ্কা করে তারা দেলফাইতে লোক পাঠিয়েছিল নির্দেশের জন্য। দৈববাণী স্পষ্ট বললে গ্রীসের হয়ে যুদ্ধ না করতে। স্পার্টার সঙ্গে তখন তাদের যুদ্ধ চলছিল, অল্পদিন আগে তারা ছ'হাজার সেনা হারিয়েছে। দৈববাণী উপেক্ষা করে তারা সমগ্র গ্রীসের হয়ে যুদ্ধ করতে রাজী হল, যদি স্পার্টার সঙ্গে ত্রিশ বছরের যুদ্ধবিরতি হয় এবং সম্মিলিত বাহিনীর উপর স্পার্টার সঙ্গে আর্গসের সমান কর্তৃত্ব থাকে। প্রথম সর্তের এই উদ্দেশ্য যে ত্রিশ বছরে তাদের আবার একদল যোদ্ধা তৈরি হবে; পক্ষান্তরে এই সময়টা তারা যদি হাতে না পায় এবং উপরন্তু পারস্যের কাছে পরাজিত হয় তবে এত বিপর্যয়ের পর স্পার্টার কাছে তাদের দাসত্ব কায়েমী হয়ে যাবে; এই ভেবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা দেলফাইর

* স্যালামিস অ্যাথেন্সের নিকটবর্তী দ্বীপ।

যায়। এ ছাড়া থীব্‌সের সৈন্যদেরও তিনি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ; থীব্‌স মনে মনে শত্রুর পক্ষে ছিল, তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় কি না ; কিন্তু সাড়া দিলেও তাদের সহানুভূতির পরিবর্তন হয় নি। লেওনিদাস ও তাঁর তিন শো সেনা প্রধান বাহিনীর আগে এগিয়ে গেলেন যাতে অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় রাজ্যগুলিও যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হয় ; স্পার্টাকে পিছিয়ে থাকতে দেখলে তারা অনায়াসে শত্রুর দিকে চলে যেতে পারত। তখন ওলিম্পিক উৎসব চলছে, সেই কারণে মিত্ররাজ্যগুলি বেশি লোক যুদ্ধে পাঠাতে পারে নি ; সকলেরই ধারণা ছিল থার্মপিলির যুদ্ধ শেষ হতে সময় লাগবে।

পারসীকবাহিনী যখন এই গিরিসংকটের কাছে এসে পড়েছে তখন তাদের রোধ করা যাবে কি না সে সম্বন্ধে হঠাৎ গ্রীসীয়দের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিল। পশ্চাদপসরণের কথা বিবেচনা করতে এক সভা বসল, পেলপনিসীয়রা বললে তাদের উচিত পেলপনিসিয়ায় গিয়ে করিন্থীয় যোজকটি রক্ষা করা ; অন্যেরা এই প্রস্তাবে আপত্তি করল, তখন লেওনিদাস তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন যে তারা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে এবং বিভিন্ন রাজ্যের কাছে আরও সৈন্য চেয়ে পাঠাবে।

এই সভা যখন চলছে তখন জের্কস্যাস এক অশ্বারোহীকে পাঠালেন প্রতিপক্ষের ক্ষমতার অনুমান নিয়ে আসতে, সৈন্যেরা কি করছে তাও সে দেখে আসবে। এই লোকটি গ্রীসীয় শিবিরের কাছাকাছি এসে যতটা দৃষ্টি যায় তার সবটা ভাল করে দেখল, যদিও এক দেয়ালের আড়ালে কিছু সৈন্য তার চোখে পড়ল না। যাদের দেখতে পেল তারা স্পার্টার সেনা, কেউ তখন নগ্নদেহে ব্যায়াম করছে, কেউ চুল আঁচড়াচ্ছে। পারস্যের গুপ্তচর অবাক হয়ে তাদের দেখল, তারপর সংখ্যা ও আর যা যা জানার ছিল তা লক্ষ্য করে নিঃশব্দে ফিরে গেল। কেউ তাকে নজর করল না, কেউ ধরতে চেষ্টা করল না।

তার মুখে সব শুনে জের্কস্যাস হতভম্ব হয়ে গেলেন। স্পার্টার সেনারা যে হয় মারতে নয় মরতে প্রস্তুত এটা তাঁর কল্পনার বাইরে— ব্যাপারটা কেবল অদ্ভুতই ঠেকল তাঁর কাছে। ডামারাতোসকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি সব বললেন জানতে চাইলেন তাদের এই ব্যবহারের অর্থ কি।

ডামারাতোস বললেন, 'এই অভিযান আরম্ভের সময়ও এদের সম্বন্ধে আপনাকে বলেছিলাম, এই উদ্যোগের ফল কি দাঁড়াবে তা আপনাকে বলাতে আপনি হেসেছিলেন। এরা এসেছে আমাদের থেকে এই গিরিসংকট রক্ষা করতে এবং তারই জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। জীবন যখন বিপন্ন তখন কেশ পরিচর্যা করা স্পার্টার রীতি। এই আশ্বাস আমি দিতে পারি যে, আপনি যদি এদের এবং দেশস্থ স্পার্টাবাসীদের হারাতে পারেন তবে জগতে আর এমন জাতি নেই যে আপনার বিরুদ্ধে হাত তুলতে সাহস করবে। গ্রীসের শ্রেষ্ঠ রাজ্য এবং শ্রেষ্ঠ বীরদের সঙ্গে আপনাকে এখন যুদ্ধ করতে হবে।'

জের্কস্যাস তবু বিশ্বাস করতে পারলেন না—এত অল্প সৈন্য কি করে তাঁর প্রকাণ্ড বাহিনীর সঙ্গে লড়বে তা তাঁর কল্পনার অতীত।

শত্রু অপসরণ করবে এই আশায় সম্রাট চার দিন অপেক্ষা করলেন, তারপর তাদের নির্বোধ ঔদ্ধত্য দেখে অত্যন্ত রেগে ফৌজকে হুকুম করলেন তাদের বন্দী করে তাঁর সামনে হাজির করতে। মিডীয় আক্রমণে অনেকে হতাহত হল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্যেরা তাদের জায়গা দখল করল, প্রচণ্ড ক্ষতি সত্ত্বেও হার মানল না। তারা প্রমাণ করল যে, পারস্য-রাজের বাহিনীতে অনেক লোক, কিন্তু যোদ্ধা অল্প। সারাদিন ধরে যুদ্ধ চলল, শ্রান্ত মিডীয় সৈন্যদের সরিয়ে অবশেষে হিদার্ন্যাস তার বাছা বাছা পারসীক সৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হল। তার স্থির বিশ্বাস ছিল যে এবার যুদ্ধ সহজে শেষ হবে, কিন্তু সেও কিছু সুবিধা করতে পারল না। সেই সংকীর্ণস্থানে পারসীক সংখ্যাধিক্য কোনও কাজে লাগল না।

স্পার্টার সেনারা যুদ্ধ বোঝে, তাদের শত্রু ছিল অনভিজ্ঞ। মাঝে মাঝে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়নের অভিনয় করত, জয় আসন্ন ভেবে শত্রু যেই সিংহনাদ করে এগিয়ে আসত তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের প্রভূত ক্ষতি করত। স্পার্টার হতাহত খুব বেশি হয় নি। অবশেষে পারসীকরা নিরুপায় হয়ে যুদ্ধে বিরতি দিয়ে ফিরে গেল। জের্কস্যাস এক জায়গায় বসে সব দেখলেন, শোনা যায় নিজের বাহিনীর বিপদ দেখে তিনবার তিনি লাফিয়ে উঠেছিলেন।

পরদিন পারসীকরা আবার আক্রমণ করল, তারা আশা করেছিল যে, সংখ্যাল্প আহত শত্রু সেনা আর প্রতিরোধ করতে পারবে না। কিন্তু এ বারেও তারা সুবিধা করতে পারল না, হটে যেতে বাধ্য হল। এ অবস্থায় কি কর্তব্য তা ভেবে না পেয়ে জের্কস্যাস যখন খুব ভাবিত হয়ে আছেন, তখন হঠাৎ স্থানীয় একটি লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করল। তার নাম এফিয়ালত্যাস, মোটা পুরস্কারের লোভে সে সম্রাটকে জানাল থার্মপিলিতে পৌঁছাবার আর একটি অপরিচিত পার্বত্য পথের খবর। এই বিশ্বাসঘাতকের পরে অপমৃত্যু ঘটেছিল।

এফিয়ালত্যাসের খবরে খুশি হয়ে হিদার্ন্যাস তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে এগিয়ে যাবার। যখন তারা যাত্রা শুরু করল তখন সন্ধ্যার বাতি জ্বালা হচ্ছে, সারারাত পার্বত্য পথে চলে ভোরে তারা এক শিখরে পৌঁছাল ; সেখানে এক হাজার মিত্রপক্ষীয় সেনা পাহারা দিচ্ছে, পারসীকরা এতক্ষণ বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে, কেউ তাদের দেখতে পায় নি। কিন্তু যখন তারা শিখরে পৌঁছাল তখন এতটুকু বাতাস ছিল না, ঝরা পাতার উপর তাদের পায়ের শব্দ পরিষ্কার শোনা গেল। মিত্রপক্ষীয় প্রহরীরা লাফিয়ে উঠে অস্ত্র তুলে নিতে নিতে শত্রু তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গ্রীসীয়রা যে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছে, তাই পারসীকদের আশ্চর্য মনে হল—কোনও রকম বাধা তারা আশা করে নি। হিদার্ন্যাসের সন্দেহ হ'ল হয় তো এরা স্পার্টার যোদ্ধা, কিন্তু এফিয়ালত্যাসের কাছে সঠিক পরিচয় জেনে যুদ্ধ চালিয়ে গেল সে। পারসীক বাণে আকাশ কালো হয়ে গেল। প্রতিপক্ষ তখন পর্বতের উচ্চতম অংশে হটে গেল, যদি দরকার হয় সেখানে মরবে বলে। পারসীকরা তাদের প্রতি আর নজর না দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল নিজেদের পথে।

থার্মপিলির গ্রীসীয়রা অবিলম্বে তাদের বিপদ উপলব্ধি করল। তৎক্ষণাৎ আলোচনা আরম্ভ হল। কেউ বললে এই ঘাঁটি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত, কেউ প্রকাশ করলে বিপরীত মত। ফলে সেনাবাহিনী দু'ভাগ হয়ে একদল ঘরে ফিরে গেল, আর একদল থাকল

লেওনিদাসের সঙ্গে। কেউ কেউ বলে তিনি নিজেই অনেককে বিদায় দিয়েছিলেন তাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য। স্পার্টার থেকে তাঁর অধীনে যারা এই সংকট রক্ষা করতে এসেছে, তাদের পক্ষে তা ত্যাগ করে যাওয়া অশোভন হবে ভেবে তিনি তাদের নিয়ে থেকে গেলেন। হেরোডোটাসেরও ধারণা যে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য তিনি থেকেছিলেন—ফলে মহান এক নাম অবিস্মরণীয় হয়ে রইল ইতিহাসে, স্পার্টাকেও তার সমৃদ্ধি হারাতে হল না; কারণ যুদ্ধের প্রারম্ভেই দৈববাণীতে জানা গিয়েছিল যে হয় তাদের শহর বিদেশীরা ধূলিসাৎ করবে, নয় তো এক রাজা প্রাণ দেবে। হেরোডোটাসের বিশ্বাস এই বাণী লেওনিদাসকে প্রভাবান্বিত করেছিল, তা ছাড়া তিনি স্পার্টার জন্য এমন প্রসিদ্ধি রেখে যেতে চেয়েছিলেন যার ভাগ অন্য কোনও শহর পাবে না। যারা থার্মপিলি থেকে চলে এসেছিল তিনিই তাদের যেতে বলেছেন—তারা পলায়ন করে নি বা মতবিরোধের ফলে আদেশ অমান্য করে নি।

সকালবেলা সূর্য তর্পণ করে জের্কস্যাস তাঁর বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন। এর আগে গ্রীসীয়রা থার্মপিলি সংকটের সংকীর্ণ অংশে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রেখেছে, এবার শেষযুদ্ধ করছে জেনে তারা প্রশস্ততর ক্ষেত্রে সরে এল। অনেক শত্রু হতাহত হল, অনেকে সমুদ্রে পড়ে ডুবে মরল, অনেকে বন্ধুদেরই পায়ের চাপে প্রাণ হারাল। সেনাপতিরা ক্রমাগত চাবুক মেরে তাদের এগিয়ে নিয়ে চলল, লোক মরল অসংখ্য। শত্রু ভিন্নপথে পাহাড় ঘুরে আসছে জেনে গ্রীসীয়রা বেপরোয়া যুদ্ধ করে দেহের শেষ শক্তিটুকু ক্ষয় করলে ক্রমে তাদের সব বর্শা ভেঙে গেল, তখন তরবারি হাতে নিল তারা।

এই সংঘর্ষে লেওনিদাস প্রাণ দিলেন প্রকৃত বীরের মত; আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ স্পার্টাবাসী মরল তাঁর সঙ্গে। তাদের এবং স্পার্টার তিন শো যোদ্ধার প্রতিটি নাম হেরোডোটাস জেনে নিয়েছিলেন যাতে লোকে তাদের মনে রাখে। পারসীকদেরও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রাণ হারাল, তার মধ্যে ছিল জের্কস্যাসের দুই ভাই। লেওনিদাসের দেহ নিয়ে তীব্র সংঘর্ষ চলল, চারবার শত্রুকে বিতাড়িত করে শেষ পর্যন্ত গ্রীসীয়রা দেহটি টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হল। এইভাবে অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলার পর পারসীকদের নতুন সৈন্য কাছাকাছি এসে পড়ছে দেখে গ্রীসীয়রা গিরিসংকটের সংকীর্ণ অংশে সরে গেল আরও ঘন হয়ে, তখন যুদ্ধের চেহারা বদলে গেল। সংকটের মুখে ছোট্ট এক পাহাড়ের উপর পাথরের এক সিংহমূর্তি গড়া হয়েছিল। পরে লেওনিদাসের স্মৃতিতে হেরোডোটাস তা দেখেছিলেন, এইখানে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে মরেছিল গ্রীসীয়রা—কারও হাতে তলোয়ার, কারও হাতিয়ার শুধুমাত্র হাত আর দাঁত—যতক্ষণ না শত্রু দুইদিক থেকে এসে তাদের সম্পূর্ণ গ্রাস করলে।

যোদ্ধাদের মধ্যে সেদিন সবচেয়ে বেশি বীর্য দেখিয়েছিলেন স্পার্টার দিয়েনেক্যাস। শোনা যায় যুদ্ধের আগে তাঁকে একজন বলেছিল যে, পারসীকরা যখন তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করে, তখন সূর্য ঢাকা পড়ে যায়।

তার উত্তরে দিয়েনেক্যাস শান্তভাবে শুধু মন্তব্য করলেন, 'ভাল খবর, আমাদের রোদে লড়াই করতে হবে না।' এই ধরণের আরও অনেক উক্তি নাকি তাঁর আছে। স্পার্টার যোদ্ধাদের পাশাপাশি থেস্পীয় সৈন্যরাও বীরবিক্রমে লড়েছে।

যে যেখানে মরেছিল তাকে সেখানেই কবর দেওয়া হল, গ্রীসীয় বাহিনী দু'ভাগ হয়ে যাবার আগে যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদেরও সমাধিস্থ করা হল। সমাধির উপরে লেখা হল; 'পেলপ্‌সের দেশ থেকে চার হাজার যোদ্ধা এখানে ত্রিশ লক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।' স্পার্টাবাসীদের জন্য ছিল এক বিশেষ স্মারকলিপি; 'হে পাঠক, স্পার্টায় গিয়ে বল, আমরা তাদের আদেশ মেনে এখানে মরেছি।'

স্পার্টার তিন শো যোদ্ধার মধ্যে ছিল এউরিতোস ও আরিস্তোডামোস, কঠিন চক্ষুরোগে ভুগছিল বলে লেওনিদাস যুদ্ধের আগে তাদের পাঠিয়ে দিলেন সুস্থ হতে। পথে দু'জনের মধ্যে বিবাদ শুরু হল—স্পার্টায় ফিরে যাওয়া অথবা বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা এর কোনওটাতেই তারা একমত হতে পারল না। পারসীকরা পাহাড় ঘুরে চলে এসেছে শুনেই এউরিতোস তার ভৃত্যকে বললে, তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতে; সে প্রভুর আদেশ পালন করেই পালাল, এউরিতোস যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিল। আরিস্তোডামোস আল্পিনিতে থেকে গেল, এউরিতোসকে অনুসরণ করতে তার সাহস হয় নি। তাকে ফিরে আসতে দেখে স্পার্টার লোক ভীষণ রেগে গেল; হেরোডোটাসের ধারণা আরিস্তোডামোস একাই যদি অসুস্থ হয়ে থার্মপিলি ছাড়ত, অথবা দু'জনেই যদি সেখানে ফিরে যেত তবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হত না। অসুখের দোহাই দু'জনেই দিতে পারত, কিন্তু একজন মরল আর একজন প্রাণ বাঁচাল দেখেই দেশের লোক ক্ষেপে গিয়েছিল।

আরিস্তোডামোস কি করে স্পার্টায় ফিরল সে সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে। গ্রীসীয় শিবির থেকে তাকে নাকি এক বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল এবং যদিও তার হাতে যথেষ্ট সময় ছিল ফিরে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দেবার, সে ইচ্ছা করে পথে দেরি করে প্রাণ বাঁচাল। সঙ্গের লোকটি যথাকালে ফিরে গিয়ে যুদ্ধে মরল। সে যাই হোক, দেশে ফিরে তার ভাগ্যে জুটল তিরস্কার ও অপমান। ঘরে আগুন জ্বালতে কেউ তার কাছে দেশলাই ধরল না, কেউ কথা বললে না তার সঙ্গে, সবাই তার নাম দিল 'কাঁপুনে'। কিন্তু পরে সে সব ক্ষতির পূরণ করেছিল প্লাটিয়ার যুদ্ধে। এমনও শোনা যায় যে ঐ তিন শো যোদ্ধার সবাই মরে নি, একজন বেঁচেছিল। তাকেও এক বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল থেসালীতে, কিন্তু স্পার্টায় ফিরে কুখ্যাতি সইতে না পেরে সে গলায় দড়ি দিল।

থীবসের সৈন্যরা থার্মপিলিতে বাধ্য হয়ে কিছুটা যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু যেই তারা দেখল পারসীকরা জিতে যাচ্ছে তখন স্পার্টার সৈন্যদের অপসারণের সুযোগ নিয়ে তারা দু'হাত বাড়িয়ে শত্রুর কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করল, চিৎকার করে বললে তারাই প্রথম পারসীকদের মাটি-জল পাঠিয়েছে, তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসেছে ইত্যাদি। কথাগুলি সবই সত্য এবং প্রায় সবাই তারা প্রাণে বাঁচল, কিন্তু জের্কস্যাসের আদেশে সেনাপতিশুদ্ধ সকলের দেহ চিহ্নিত করে দেওয়া হল

|| শেষাংশ ||

এবার ওর কথায় যেন অবিশ্বাস করতে পারল না ওরা। কিন্তু হরিপদ আর না ব'লে পারল না।

কিন্তু মা! আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারি না।···আমাদের কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সংসার। দু'টো টাকার জন্যই তো সব ছেড়েছুড়ে এতদূরে খাটতে আসি। মাইনে না পেলে চলে কি করে বলতে পারেন?

যেমন এসেছিল, তেমনি বেগে সেখান থেকে শোবার ঘরে চলে এল সুচরিতা।

আরশির সামনে দাঁড়িয়ে অকালে পেকে যাওয়া রগের কাছে চুলগুলোর কলপ লাগাচ্ছিলেন সত্যব্রত।

পর্দা সরিয়ে সবেগে সুচরিতাকে ঢুকতে দেখে সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন সত্যব্রত।

কি ব্যাপার? শোবে না?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল সুচরিতা।

শোন! আর তো সহ্য হয় না।

কিসে অসহ্য হ'ল?

ওর দিকে না তাকিয়েই বললেন সত্যব্রত।

তুমি হরিপদকে মাইনে দাও না?

কেন হরিপদ বলছিল নাকি?

দিয়েছ কি না তাই বল না।

গম্ভীর হয়ে সুচরিতার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন সত্যব্রত।

স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন সুচরিতার দিকে। রীতিমত অবাক হয়ে গেছেন তিনি সুচরিতার দৃপ্তভঙ্গী দেখে।

তোমাকে কি তার জন্য কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?

আমাকে নয় হরিপদকে, সে তার মাইনে চায়। আর সেটা তার ন্যায্য পাওনা।

জানি।

আর কথার অপেক্ষা না করে সোজা চলে এলেন বারান্দাবে।

হরিপদ আলো নিভিয়ে ঘর বন্ধ করছিল। অন্ধকারে সত্যব্রতকে দেখে অবাক হয়ে বারান্দার আলো জ্বালাল।

হরিপদ, মাকে কি বলেছিস?

হরিপদ চুপ করেই থাকল, বাবুকে সে সত্যিই ভয় করে।

মাইনে পাস নি ব'লে অনুযোগ করেছিস না?

হরিপদ তবুও চুপ করে পায়ের নখ দিয়ে মেঝে খুঁটতে লাগল।

হ্যাঁ রে, তিন মাসের মাইনে পাস নি ব'লে বড়মুখ করে আমার কাছে বলছিস? আর আমার কাছে এই যে এক বছর ধরে কাজ করছিস, এত ঘনিষ্ঠভাবে আমাকে জানছিস এটা কি কিছুই নয়? বল?

কি বলবে হরিপদ? এখানে কাজ করার কি বিশেষ মূল্য থাকতে পারে, ও তো ভাবতে পারে না। তাই চুপ করেই থাকল।

একবার ওর মুখটা দেখে নিলেন সত্যব্রত। ওষুধে কাজ ধরেছে, হরিপদ বোধ হয় লজ্জিত হয়েছে ওর এই অপরাধের জন্য, তাই উৎসাহ পেয়ে এবার জোরের সঙ্গে বললেন—জানিস, তুই যে সত্যব্রত সেনের বাড়িতে কাজ করিস, সেটা তোর একটা পরিচয়?

হাঁ হয়ে গেল হরিপদ।

ওর হাত থেকে চাবিটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে একটু দম নিয়ে দাঁড়াল। তারপর সোজা সত্যব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তা হলে বাবু অন্য লোক দেখবেন। আমার দ্বারা হবে না। আমার টাকা মিটিয়ে দেবেন, চলে যাব।

ভাবতে পারে না আর হরিপদ।

বাবু বলেন কি? পেটের দায়ে খাটতে এসেছে সে। পরিচয়—পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় তার?

দেশে তার চারটি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কি কষ্টে যে সংসার চালায় শত্তুর মা তা কি সে জানে না? পরন্তু শত্তুর মা'র কাছ থেকে যে চিঠি এসেছে, তারপর আর স্থির থাকা যায় কি করে? শত্তুর মা স্পষ্টই জানিয়েছে—এবার টাকা না পাঠালে সে গলায় দড়ি দেবে।

বেশি মাইনের লোভে সে এখানে কাজ করছে, তা ছাড়া তার গত অসুখে গিন্নী যা খরচ করে চিকিৎসা-পত্তর করিয়েছে সেকথা ভোলে নি সে, নেমকহারাম নয় হরিপদ। তাই এ অবস্থায়ও কিছু বলে নি সে এতদিন। জানে গিন্নী তাকে টাকা পেলেই দিয়ে দেবে।

কিন্তু একে তো শত্রুর মা'র চিঠি তার ওপর এটা কর্তারই কারসাজি দেখে মরিয়া হয়ে উঠল সে। তাই একেবারে জবাব দিয়েই বসল।

সত্যব্রত একটুও বিচলিত হলেন না তার এ উষ্মা প্রকাশে। সুচরিতা এসে দাঁড়িয়েছে, ওর দিকে একবার তাকিয়ে বললেন,—তোরা অশিক্ষিত মূর্খ! তোদের আর কি দোষ দেব বল।

তাঁর গলায় খেদ ফুটে উঠল। হরিপদর নীচু মুখকে আরও লজ্জা দিয়ে বললেন,—তোদের তো কোন বুদ্ধিই নেই, শিক্ষিত লোকেরাই বা কি? ভাবতেও দুঃখ হয়, তাদের কাছেও এই টাকাটাই বড় সব থেকে।

হাসি পেল সুচরিতার। সত্যব্রত এমনভাবে বলছেন যেন তাঁর কাছে টাকা মাটির মতই তুচ্ছ। তাঁর নিজের কাছেও কি টাকাটাই সব থেকে বড় নয়? তিনিও কি টাকাকেই সব থেকে বড় স্থান দেন না?

হরিপদর সামনে এসে দাঁড়াল সুচরিতা। হরিপদ! কাল তোমার মাইনে পাবে।

একটা তীব্রদৃষ্টি ফেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন সত্যব্রত।

রবীনের আঁকা ছবিটা শেষ হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু এটুকু এড়াতে পারে নি, একমনে এঁকে গেছে সে আর তার তুলির রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে যে মুখ, সে মুখে তার মনের সবটুকু ইচ্ছা যেন রূপ পেয়েছে, সে মুখ ইলার।

ছবি শেষ হওয়ার পর তৃপ্তিই বোধ করেছে সে।

এ ছবি তার নিজস্ব, একান্তই নিজস্ব, তার মনের গহনকোণে যে ভীরু বাসনাটুকু আশ্রয় নিয়েছে, তার প্রকাশ থাক তার এই ছবিতে, কেউ তা জানবে না কারও দেখবার দরকার নেই।

কিন্তু ছবিতে শেষটান দেবার সময়ই অসময়ে ঘরে ঢুকলেন সত্যব্রত। ছবিটা দেখে চমকে গেলেন তিনি। কিন্তু মনের ভাব গোপন রেখে গম্ভীর হয়ে ছবিটা দেখতে লাগলেন, তাঁর হাতদু'টি পেছনে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করে মাথাটা হেলিয়ে বহুক্ষণ ধরে একদৃষ্টে দেখতে লাগলেন ছবিটা।

শেষ টান দিয়ে তুলিটা রেখে একটু সরে এসে ছবিটার দিকে তাকাল রবীন, সঙ্গে সঙ্গেই পেছনে সত্যব্রতকে দেখে বেশ অবাক না হয়ে পারল না। খানিকটা অপ্রস্তুতও।

ওর ঘরে এমনিতে সত্যব্রত কখনও আসেন না, তাই নিজের এই নিভৃত ঘরটিকে সুরক্ষিত দুর্গের মত মনে করেই নিজের মনে নির্ভয়ে কাজ করে যায় সে। কিন্তু আজ সত্যব্রতকে এঘরে দেখে একটা লজ্জা আর অদ্ভুত অনুভূতি তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। পরক্ষণেই একটা আত্মপ্রসাদের তৃপ্তিতে যেন মন ভরে উঠল। সত্যব্রত তার ছবিটা মগ্ন হয়ে দেখছেন।

কাকাকে সে সত্যিই ভালবাসে আর শ্রদ্ধা করে।

কত দাম ফেলেছ ছবিটার?

রবীনের দিকে না তাকিয়েই ওকে প্রশ্ন করলেন সত্যব্রত।

এটা আমি বিক্রি করব না।

খুব নীচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে বলল রবীন।

অন্তত কস্ট প্রাইস তো ওঠাতে হবে।

সেটা অন্য ছবিতে পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব।

মনে মনে হাসল রবীন। এর কস্ট প্রাইস কত ভাবেন কাকা! হৃদয়ের সবটুকু ব্যথা-বেদনা নিংড়ে সে এঁকেছে যে ছবি, আবার সবটুকু মাধুর্য ঢেলেছে যে ছবিতে—তার কি মূল্য দিতে পারে একজন ক্রেতা! এমনিতেই সে জানে শিল্পীর সৃষ্ট ছবি, তার সন্তানের মত, সামান্য মূল্যে তাকে বেচাকেনার হাটে ছেড়ে দিতে হয়, হয়ত তা অবশ্যম্ভাবী না'হলে শিল্পী বাঁচবে না, তার জীবিকার জন্য তা করতেও হবে, কিন্তু তাই বলে এই ছবি? বিক্রি করার কথা কল্পনাও করতে পারে না রবীন।

কিন্তু এটা বেশ ভাল ছবি, বাজারে দাম পাবে, অমনি ছেড়ো না।

আবার বললেন সত্যব্রত। বেরিয়ে যাবার আগে।

এটা একজনকে দেব ব'লে প্রতিশ্রুত আছি।

আবার ফিরলেন সত্যব্রত। বুঝতে পেরেছেন তিনি। কিন্তু ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন, এ-সব দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রতিশ্রুত আছ, একটা ছবি দেবার? বেশ তো অন্য একটা দাও। এটা···

না এটাই দেব বলেছি।

জোরের সঙ্গে কথাটা ব'লে ছবিটার ওপর সাদা পাতলা কাপড়ের ঢাকাটা ফেলে দিল রবীন।

রাগে গা জ্বলে গেল সত্যব্রতর। দিন-দিন রবীন যেন আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, এত সাহস এত তেজ পাচ্ছে কোথায়? থাকত তো আগে নেহাতই আশ্রিতের মত। কোনদিন তার অস্তিত্বও জানা যেত না, শুধু কাজের ভেতর দিয়েই সে বেঁচে থাকত। এমন কি তার শিল্পিসত্তার কোন পরিচয় দিতেও সে আগ্রহী ছিল না। নিজের সিঁড়িরতলার ঘরে নিতান্ত নির্বিরোধে থাকত সে, নেহাতই নীরব।

অথচ কিছুদিন হ'ল লক্ষ্য করছেন যে রবীন যেন বদলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে সরব হ'য়ে উঠছে সে। সুচরিতার কাছেও শুনেছেন সে কথা। এত তেজ তো ভাল নয়। সত্যব্রতর কাছে থাকার তাঁর পরিচয় বহন করবার গৌরবকে অস্বীকার করে এখানে থাকবার কথা কল্পনাও করে নাকি রবীন? তা ছাড়া শুধু তাই নয়, সত্যব্রত তার অন্নদাতা। সেটাও কি রবীন ভুলে যায় নাকি?

রবীনের দিকে সোজা তাকালেন সত্যব্রত। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, তোমার আঁকার প্রতিভাকে আমরাও স্বীকার করি। তোমার কাকীমাকে দেখিয়েছ ছবিটা?

'আমরাও' কথাটার ওপর বেশ জোর দিলেন। তাঁর চোয়াল দু'টো শক্ত হয়ে উঠেছে। নিষ্ফল আক্রোশ হলে সত্যব্রতর চোয়াল শক্ত হয়ে হাত মুঠিবদ্ধ হ'য়ে যায়। তবে ব্যবহারে তিনি অসংযম প্রকাশ করেন কচিৎ কখনো।

আজও করলেন না। শুধু রবীন হাসল, শুধু ইচ্ছে নয়, কাকার আদেশে ছবিটা তাকে দেখাতেই হবে কাকীমাকে, যার কাছে এ ছবির কোনই মূল্য নেই, শিল্পীর কোন মর্যাদাই যার কাছে নেই, যাকে জীবনের স্থূল প্রয়োজন সর্বদা ঘিরে রয়েছে।

তবু দেখাতে হবে।

সত্যব্রত বেরিয়ে যাবার আধঘণ্টা পরে ছবিখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল রবীন।

বারান্দাতেই সুচরিতার সঙ্গে দেখা।

সুচরিতার সুন্দর মুখখানাও যেন আজ কি রকম খারাপ লাগল রবীনের কাছে।

সুচরিতার সৌন্দর্য তাকে কোনদিনই টানে না, সুন্দরী হ'লেও রবীনের দৃষ্টিতে সুচরিতা যেন বড় বেশি প্রকট। আজ আবার লক্ষ্য ক'রে দেখল সে, কাল রাত্রের পেণ্ট কিছু কিছু উঠে গেছে, চুলগুলো এলোমেলো, ঠোঁটের রং তখনও হাল্কা হয় নি।

হঠাৎ ওর এই যত্ন যত্নে প্রসাধিত মুখের ভগ্নাবশেষ তার মধ্যে কেমন একটা বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলল। যেন সৌন্দর্যের উৎকট বিজ্ঞাপন। আর এরই পাশে আর একজনের সরল মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ল তার। সে মুখ কত সুন্দর, সে চোখে কত গভীর অতলতা, কত সহজ শ্রী সে মুখে। সেই সরল চোখে এই প্রসাধিত মুখের জন্য কত বিস্ময়, কত প্রশংসা, তবু কত সহজ, কত নিষ্পাপ সে মুখ।

ওকে দেখে হাসল সুচরিতা।

উত্তরে হাসবার একটা প্রয়াস করল মাত্র রবীন। নারীজাতি বিশেষ ক'রে মাতৃস্থানীয়াদের প্রতি তার স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাবোধ সম্বন্ধে সে সজাগ, কিন্তু প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই সুচরিতা সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধার ভাব সে চেষ্টা করেও আনতে পারে নি। শুধু কাকীমা বলে সহ্য করেছে মাত্র। অবশ্যই তার ব্যবহারে কোনদিনও কিছু প্রকাশ পায় নি, যেটুকু পেয়েছে তা ভদ্রতা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু রবীন ভালভাবেই জানে সেখানে আন্তরিকতার লেশমাত্রও ছিল না।

আজও সুচরিতাকে হাসি দিয়ে সম্বোধন করবে ভেবেও পারল না, কেবলমাত্র হাসির ব্যর্থ প্রয়াসে তার মুখখানা কেমন অদ্ভুত হয়ে গেল।

কি ব্যাপার? হাতে কি?

একটা ছবি।

কিসের?

একটা পোর্ট্রেট, আজই শেষ করেছি···কাকা আপনাকে দেখাতে বললেন।

ও, না হলে বুঝি দেখাতে না?

পরিহাসের চেষ্টা করল সুচরিতা।

উত্তরে কোন কথা না বলে ওপরের কাপড়টা সরিয়ে ছবিটা সামনে রাখল রবীন।

ভাল ক'রে দেখবার জন্য কাছে এগিয়ে এল সুচরিতা।

অত কাছে এগোবেন না! দূর থেকেই ভাল দেখাবে অয়েলপেণ্টিং কি না।

জানি···তোমার নামসই দেখছি।

দমবার মেয়ে সুচরিতা নয়। কিন্তু আর দেখল না। ছবিটা আর না দেখেই শোবার ঘরে ঢুকে গেল সুচরিতা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকল রবীন। তারপর ছবিটা আবার তুলে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোল সে।

আরও খারাপ লাগল রবীনের, ভাঙবে তবু মচকাবে না।

আসবার সময় সুচরিতার গলার উঁচু হাসি শুনতে পেল। মনে হল বোধ হয় ইচ্ছে ক'রেই তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে হাসছে সুচরিতা। কান দু'টো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল রবীনের। অবশ্যই শিল্পীর মর্যাদা পাবার প্রত্যাশা এঁর কাছে সে করে না, কিন্তু নিজেও তো একজন শিল্পী। তাহলে? কেবলমাত্র অর্থই কি তাঁকে টেনে এনেছে এখানে? নিজেকে তিনি শিল্পী বলেই তো প্রচার করেন, তাহলে? কতটুকু দাম তাঁর কাছে শিল্পের?

শুধু কাকার অনুরোধেই না সে এসেছিল আজ। তা না হলে সে ভালভাবেই জানে তার সাধনা নির্জনের, এদের নিন্দা প্রশংসায় তার কিছু আসে যায় না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল দু'টি বড় বড় সরল চোখের সপ্রশংস দৃষ্টি। এতেই সে তৃপ্ত। মুগ্ধা কিশোরীর চোখে সে আশার আলো দেখেছে, সেখানেই সে পেয়ে গেছে তার সাধনার সার্থক পুরস্কার। আর কিছু সে চায় না।

নিজের ঘরে চলে এল রবীন।

সে শুধু এঁকে যাবে নিজের খুশিতে। একমাত্র যার কাছে তার ছবি অমূল্য, সে শুধু তার সৃষ্টিকেই ভালবাসে না, শ্রদ্ধা করে না, সঙ্গে সঙ্গে তার স্রষ্টাকেও, সে হৃদয় আর্টের সংজ্ঞা জানে না, বিশেষ মাত্রার তুলনায় সে বিচার করতে জানে না, কিন্তু সে জানে কতটা ভালবাসার সঙ্গে এই শিল্পী তার ছবি আঁকে, কতটা যত্নে লালন করে সে তার শিল্প আপন সন্তানের মত। সে তার ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়ে শুধু শিল্প যাচাই করে না। উপেক্ষিত রবীনের হৃদয়কে সে সযত্নে তুলে নিয়েছে, স্থান দিয়েছে নিজের ভীরু বুকে। রবীনের বিক্ষিপ্ত মন, অবহেলিত মন সেখানে স্থান পেয়েছে, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে কৃতজ্ঞ হয়েছে রবীন। নতুন করে যেন রবীন অনুভব করেছে, কেবল দিনগত পাপক্ষয় নয়, কেবল মুখ বুজে আদেশ পালন নয়, কেবল ভীরুতার সঙ্গে আপন সৃষ্টি নিয়ে লুকিয়ে থাকা নয়, তারও মূল্য আছে, পৃথিবীতে তারও কিছু দেবার আছে, সে শিল্পী।

রবীনের নতুন জন্ম হয়েছে, সে স্রষ্টা, তাই অনুভব করে ইলাকেও সে সৃষ্টি করবে। ইলাকেও সে তার ভালবাসার রং-এ নতুন করে গড়ে তুলবে। মাটির প্রতিমার খড়ের কাঠামোটুকু সে পেয়েছে, সে কাঠামোয় মাটির প্রলেপ লাগিয়ে রং ধরাবার ভার যদি সে পায় তো নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে। সার্থক হবে তার জীবন।

বারবার ইলার মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। স্থিরদৃষ্টিতে সে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল আর ভালবাসবার যন্ত্রণায় তার বুকটা যেন দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগল।

কতক্ষণ বসেছিল খেয়াল নেই তার। চমক ভাঙল হরিপদর ডাকে।

দাদাবাবু! দাদাবাবু!

কে? ওঃ·····কি বল।

চোখের কোণে আসা অশ্রুটা হাতের জামার উল্টো পিঠে মুছে নিল রবীন।

বাবু ডাকছেন।

আমাকে?

হ্যাঁ···

আচ্ছা যাচ্ছি।

মনের এ অবস্থায় ঠিক আবার কাকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুরটা কেটে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার। কিন্তু যেতে তো হবেই ডেকেছেন যখন।

পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা দোমড়ান কাগজ বার করে একবার দেখল রবীন। আজ তিন-চারদিন ইলার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। এ চিরকুটটুকু চারদিন আগের। রবীনের পকেটেই ঘুরছে। আবার একবার পড়ল রবীন বোধহয় সহস্রবার পড়ার পরও—

'সত্যি ভালবাস তো? আমি ভালবাসি···
সত্যি সত্যি সত্যি, তিন সত্যি।'

কতবার একথা বলবে ইলা। রবীন কি তিন সত্যি অপেক্ষায় আছে? ইলার সমস্ত চোখে কি তার অতল ভালবাসার ছায়া থর থর ক'রে কাঁপে না? আর রবীন? তার ভালবাসা বোঝাবার জন্য কত সত্যি লাগবে? ভেবে পায় না রবীন।

আর একবার দেখে নিয়ে পরম যত্নে সেই ছোট্ট দোমড়ান কাগজটা ঝোলার মধ্যে রেখে দিয়ে বেরিয়ে গেল রবীন।

কি একটা কথা নিয়ে তখনও হাসাহাসি করছিলেন ওঁরা, রবীনকে ঘরে ঢুকতে দেখে দু'জনেই গম্ভীর হয়ে গেলেন।

সুচরিতা সামনের ছোট টেবিলটা থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে পড়তে আরম্ভ করল।

বোস রবি, কথা আছে।

একটা মোড়ায় বসল রবীন।

তুমি যা করছ সে বিষয়ে কি ভেবে দেখেছ?

কোন ভূমিকা না করেই একেবারে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন সত্যব্রত।

কি করছি?

রবীন প্রশ্নটা যেন বুঝতে পারল না।

বুঝতে পারছ না? আমি তো বেশ সোজা প্রশ্নই করেছি, আর কোন কথার দীর্ঘভূমিকা আমি ভালবাসি না।

কেমন যেন একটু নার্ভাস লাগল রবীনের। ও বুঝতে পারছে কি কথা বলতে চাইছেন সত্যব্রত। কিন্তু এরকম সোজাসুজি এই ধরণের কোন প্রসঙ্গ কাকার সঙ্গে আলোচনার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তার ধারণাই ছিল না, তাই বেশ একটু নার্ভাসই মনে হোল তার।

কিন্তু মনে সাহস এনে সে বলল, ভূমিকার প্রয়োজন নেই আপনার—প্রশ্ন যদি আমি বুঝতে পেরে থাকি তা হলে তার উত্তরে বলব যে আমি ছেলেমানুষ নই, সবকিছু ভেবেই আমি···

কি ভেবে? কতটা ভেবে?

আমার সমস্ত ভবিষ্যত-পরিকল্পনা কি জানতে চান?

হঠাৎ মনে যেন জোর পেল রবীন।

না জানতে চাইতাম না, যদি না তার সঙ্গে একটি ভদ্রপরিবারের সম্ভ্রমের, একটি সরল মেয়ের জীবনের সুখশান্তির প্রশ্ন জড়ান না থাকত।

কিন্তু এতে ভাবনার কি আছে?

ভাবনার নেই তুমি বলতে চাও।

অন্তত আমি তো দেখি না।

দেখ না···

যেন গর্জে উঠলেন সত্যব্রত। দেখ না, কেন না এখন তোমার চোখ অন্ধ। প্রেম-ভালবাসা···কতটুকু মূল্য এর বাস্তবে? যখন···

আমার তো মনে হয় জীবনে তারই সব থেকে বড় মূল্য আছে।

যখন জীবন সম্বন্ধে কিছুই জান না তখন তাই মনে হয় বটে, কিন্তু ইলার সুখের কথা ভেবে দেখেছ কি? যদি অবশ্য তার সুখ তোমার···

কথা শেষ হতে দিল না রবীন। ওর চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করছে, বলল, হ্যাঁ ইলার সুখই আজ আমার কাছে সব থেকে বড় চিন্তা, আমি জানি ও সুখী হবে।

মুখ টিপে হাসল সুচরিতা, সেটুকু রবীনের দৃষ্টি এড়াল না। সে আরও জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে আরও জোরে বলল, তাকে আমি সুখী করবো, সে তা জানে।

এটুকু মেয়ে সুখের কি বোঝে এখন?

সুখ বোঝবার জন্য বয়স লাগে না কাকা।

লাগে বৈ কি, বিশেষ করে যে সুখের ওপর সমস্ত জীবন নির্ভর করে সেটুকু বোঝবার জন্য যথেষ্ট বয়স লাগে। জীবনে অভিজ্ঞতা না আসলে সুখ-দুঃখের তারতম্য বোঝা যায় না।

সেটা মাপের কথা, হিসেবের কথা।

রবীন সজোরে বলল।

কিন্তু তুমিই বা অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? রবীন হয়ত ঠিকই বুঝেছে।

সুচরিতা এতক্ষণে মুখ খুলল।

ওর দিকে একবার তাকাল রবীন। সমবেদনা না উপহাস? কাকীমার মনোভাবটা ঠিক কি?

সত্যব্রতও সুচরিতার মুখের দিকে তাকালেন। কি বলতে চায় সে? বোঝে না কি?···

ভুলই করছে রবীন!···অর্থের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা না করেই এক মহাদায়িত্ব নিতে যাচ্ছে, যা তার উচিত হচ্ছে না।

আমার মনে হয়, সুস্থ-সবল পুরুষ আমি অর্থের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারব।

দু'খানা হাত থাকলেই সব পুরুষ অর্থ রোজগার করতে পারে না রবি।

কিন্তু শুধু হাত কেন? তার সঙ্গে···

তোমার প্রতিভার কথা বলছ তো?

রবীনের মুখের কথা কেড়ে নিলেন সত্যব্রত, সবাই তোমার কাকা নয়।

উত্তরটা মুখে এসে গিয়েছিল রবীনের। কিন্তু সে উত্তর না দিয়ে অন্য কথাই বলা সমীচীন মনে করল।

আমি তো আই-এ পাশ করেছি কাকা, তা দিয়ে কি একটা স্কুলের···

হ্যাঁ ঐ পর্যন্ত, স্কুলের টিচারই হ'তে পারবে। তার বেশি নয়, তাতে লাভ?

তার বেশি হতেও চাই না।···সেই আমার যথেষ্ট লাভ, যদি পাই···আমি যাই কাকা আমার একটা কাজ আছে।

ওকে ছেড়ে দাও না! সত্যিই ওর তো কাজ থাকতে পারে।··· তা ছাড়া ও তো ছেলেমানুষ নয়, ও যদি ভাল বোঝে···

ওর ভাল বোঝার ক্ষমতা কতটুকু।

গম্ভীর হয়ে বললেন সত্যব্রত।

ওর ভালমন্দ আমি বুঝি, ও নয়।

নিজের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে বললেন সত্যব্রত। রবি যাও এখন, কিন্তু কথাটা মনে রেখ, কোনরকম অবিবেচনায় কাজ যেন না দেখি···যাও।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রবীন।

সে পারে, ইলার জন্য সব পারে। কাকীমার পরিহাস, কাকার সাবধানবাণী সবই সে সহ্য করতে পারে শুধু ইলারই জন্য।

একটু পরেই পাঞ্জাবীটা গলিয়ে নিয়ে ওপরে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল রবীন।

প্রস্তুতই হ'ল, অর্থাৎ ইলাকে দেবে বলে ছোট একটা কাগজে কি একটু লিখে সেটা হাতে করে নিয়ে নিল, ইলাকে দিতে হবে।

সামনা-সামনি কথা বলার, বিশেষ কথা বলার সুযোগ বেশি পাওয়া যায় না তাই আগে থেকে লেখা চিরকুটই তারা মন দেওয়া-নেওয়া খেলা খেলে। অ-শ্য খেলা নয় তাদের কাছে, এ বুঝি তাদের জীবনের পরম সত্য।

ক'দিন ইলার সঙ্গে দেখা হয় নি। ও নিজেও যেতে পারে নি বেশি তার ওপর গেলেও কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে মেয়েটা। অথচ অনেক কথা বলবার আছে ইলাকে। সেই কিছু না জানা মেয়েটাকে শেখাতে হবে অনেক কিছু, বোঝাতে হবে অনেক কথা। সে অবকাশ কোথায়? আবার শক্তিরই শরণাপন্ন হ'তে হবে। সেবারে যাওয়া হোল না, কাকাই আটকে দিলেন তাকে একটা কাজের অছিলায়। এবার শক্তি ছাড়া গতি নেই।

কিন্তু তার আগে একবার ইলার দেখা পাওয়া দরকার। আজই···

সোজা ওপরে উঠে এল রবীন।

এ কয় বছরে সে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে ওপরতলার সঙ্গে।

অবশ্যই অরুণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই তার বাহুত বেশি। ইলা তো প্রথম প্রথম আসত না, তারপরেও যখন এসেছে তখন সে ইলা যেন অন্য মেয়ে। বৌদির সামনে বা পিসিমার সামনেই গল্প করেছে তারা, তর্ক করেছে, বৌদির ছোট ছেলেটাকে আদর করে রাগিয়েছে ইলা আর তাদের দু'জনের ছোট ছোট ঝগড়ায় সত্যিই আনন্দবোধ করেছে অরুণা।

তাদের বাড়ির গুমোট-ধরা আবহাওয়ায় রবীনই যেন দক্ষিণের হাওয়া এনে দিয়েছে, তাই রবীনের আসাটা বরাবরই সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছে, আর উৎসাহ পেয়ে কখন চিরদিনের মুখচোরা লাজুক ছেলে রবীন এ বাড়িরই যেন একজন হ'য়ে প্রগলভতায় মুখর হ'য়ে উঠেছে, সেকথা রবীন নিজেও বুঝতে পারে নি।

অরুণা সস্নেহে প্রশ্রয় দিয়েছে রবীনকে। যে ইলা শিশুর মত উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে রেখেছে বাড়ি সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সেই ইলাই যখন ছোট ভাইপোকে কোলে নিয়ে সিঁড়িরতলার রবীনের ছোট ঘরখানায় ছবি দেখতে আসে, তখন কেমন যেন পরিবর্তন হয়ে যায় তার। তখন দু'জনের চোখে যে ভাষা ফুটে ওঠে তা শিশুর নয়, দুষ্টুমির নয়, সে দৃষ্টি যেন পরস্পরের হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি আলোড়িত করে, সে দৃষ্টি যেন হৃদয়ের অন্য ভাষা বলে।

সেই দারুণ অস্বস্তিকর অথচ মধুময় সময়টুকুতে ইলা প্রায় চুপ করেই থাকে আর সহজ হবার চেষ্টায় অনর্গল বকে যায় স্বভাব-মূক রবীন, কখনও ছবির আলোচনায়, কখনও বা সঙ্গীতের।

তারপর ধীরে ধীরে কখন দু'টি হৃদয় পরস্পরকে জেনে ফেলেছে আর থেমে গেছে তরঙ্গাঘাত।

তবু বলা হয় নি, কোন কথা বলা হয় নি, সময় হয়ে এসেছে এখন গভীরভাবে চিন্তা করবার। ইলাকে বলতে হবে বিষয়টাকে বেশ ভেবে দেখবার জন্য, শুধু হাসি নয়, অনেক আনন্দ, অনেক বেদনা নিয়ে গড়া হবে তাদের জীবন, সে জীবনের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে তাকে।

কিন্তু দেখা হচ্ছে না ইলার সঙ্গে।

কাল দু'বার গেছে বৌদির কাছে। চা খাবার ছুতো ক'রে। স্নেহ-কাঙাল এই ছেলেটাকে সত্যিই ভালবাসে অরুণা। তাই যখন তখন উপস্থিতি সস্নেহে প্রশ্রয় পায়, কিন্তু ইলার সঙ্গে একবার নিভৃতে দেখা হওয়া দরকার। আজই বলবে ইলাকে শক্তির বাড়িতে দেখা করবার জন্য।

ওপরে এসে আগেই দেখা হল অরুণার সঙ্গে।

ঘেরা বড় দালানে রাতের রান্নার জন্য কুটনো কুটছে অরুণা।

পরিবারের নিজেদের লোক অল্প হলেও আশ্রিত-আশ্রিতা আর কর্মচারী মিলিয়ে এখনও প্রতিবেলায় প্রায় পনের-ষোলজন লোক খায়। তাই খাওয়ার আয়োজনটা প্রচুরই করতে হয়।

বাব্বা! বৌদি বাড়িতে উৎসব নাকি?

কুটনোর পরিমাণ দেখে রবীন প্রশ্ন করল।

কেন?

হেসে জিজ্ঞাসা করল অরুণা।

এত তরকারি?

বা: এ তো রোজই লাগে, তবে আজ একটু বিশেষ ব্যবস্থা অবশ্য। কয়েকজন আসবেন।

ও:···আচ্ছা বৌদি! ইলা কোথায়? তাকে ক'দিন দেখছি না?

খুব সহজ সুরেই বলার চেষ্টা করল রবীন।

কোথা থেকে দেখবে?

কেন? ও কি এখানে নেই নাকি?

না থাকারই মতো। আর বল কেন? এমন পাগল মেয়ে, আজ তিনদিন তো মেয়ে অন্নজল প্রায় ত্যাগ করেছে।

কেন?

কেন আবার। খালি কাঁদছে,···

কাঁদছে ইলা?

দমটা প্রায় আটকে গেল রবীনের।

ইলা কাঁদছে? আজ তিনদিন সমানে? কিছু খাচ্ছে না? অথচ··

কষ্টে নিজের আবেগকে দমন করল রবীন, কেন বৌদি!

ভাই, কেমন পাগল মেয়ে দ্যাখ, ওর বিয়ের ঠিক হয়েছে, আজ ছেলে নিজে দেখতে আসবে সন্ধ্যের পর। তাই মেয়ের আপত্তি।

ইলার বিয়ে?

খুব আস্তে আস্তে যেন নিজের মনেই উচ্চারণ করল রবীন।

তা মেয়ে বড় হয়েছে বিয়ে হবে না? এ নিয়ে এমন কাণ্ড করে কেউ? আর কিছু তো বলতে পারবে না বাবাকে, তাই যা অস্ত্র তার, কেঁদে ভাবছে বাধা দেবে। কি পাগল মেয়ে বল তো?

রবীন নিজেই পাগল হয়ে যাবে। কিই-বা করতে পারে ইলা এ ছাড়া?

ঐ ছোট্ট সরল মেয়ে কিভাবে ঠেকাতে চেষ্টা করছে তার সর্বশক্তি দিয়ে। সত্যিই তো আর কিই-বা অস্ত্র আছে তার কাছে, চোখের জল ছাড়া। অথচ রবীন নিজে? কিই-বা সাহায্য করছে তাকে?

মনে পড়ল আর একবার কেমন করে অসুখের অছিলায় সব ঠেকিয়েছিল ইলা। বিছানা ছেড়ে ওঠেই নি এবার। তাই বুঝি এবার ওকে প্রায় না জানিয়েই এ ব্যবস্থা এতদূর এগিয়ে গেছে।

সরল মেয়ে ইলা, তার বয়স যদিও প্রায় কুড়ি হয়েছে, কিন্তু মনের বয়স তার বুঝি পনের পেরোয় নি। তবু কত চাতুরী করছে সেই সরল সংসারানভিজ্ঞা মেয়েটি।

নিজের ওপর ধিক্কার এল রবীনের। একটু আগে একেই সে প্রেমের গভীর দিকটা বোঝাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

ছটফট করতে লাগল রবীন।

অরুণা কুটনোগুলো জল থেকে তুলে বড় বড় বারকোশে সাজিয়ে রাখছে। কিছুক্ষণ সেদিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রবীন, তারপর মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করল অরুণাকে, বৌদি, কোথায় ইলা?

বাবার ঘরে শুয়ে।

কোন উপায় নেই, একটিবার দেখাও পাবে না তার। কত বড় ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে প্রাণপণে যুঝছে সে, সেই ইলা। কিন্তু বারবার কি ইলাই ভার নেবে? ইলা? যে হেঁটে গেলে বুক পেতে দিতে পারে রবীন, তার এই কষ্ট দেখবে রবীন কেবলমাত্র দর্শকের মত?···

অসম্ভব···

কুটনোর থালা নিয়ে চাকর চলে যেতেই অরুণা রান্নাঘরে চলে গেল ঠাকুরকে রান্না বুঝিয়ে দিতে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নেমে আসবার জন্য সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এল রবীন।

কর্তার ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ইলা। রবীনের গলা পেয়েছে বোধ হয়, শীর্ণ ক্লান্ত চেহারা, রবীনের বুকটা যেন ফেটে যাবে বেদনায়। জলভরা তার বড় বড় চোখ তুলে একবার রবীনের দিকে তাকাল ইলা, তারপর পাশের ঘরে ঢুকে গেল।

এটুকুই যথেষ্ট।

রবীনের বুকটা বুঝি ভেঙ্গে খানখান্ হয়ে যাবে। এ দৃষ্টিতে তিরস্কার নেই, কেবল নীরব অভিযোগ। রবীনের মনে সে দৃষ্টি যেন কেটে কেটে বসতে লাগল।

অসম্ভব···কিছু করতেই হবে, আর দেরি নয়।

দরজার দিকে এগিয়ে এল।

পর্দা সরিয়ে ডাকল, ইলা! লক্ষ্মীটি একবার নীচে এস।

জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়েছিল ইলা। ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানাল।

না বললে হবে না ইলা!···আমি নীচে যাচ্ছি···বৌদি এখুনি এসে পড়বেন,···এসো লক্ষ্মীটি···তাড়াতাড়ি···আমি যাচ্ছি···

দ্রুতপায়ে নীচে নেমে গেল রবীন।

একটু বাদেই নীচে নামল ইলা। সিঁড়িরতলার ঘর অন্ধকার, তাই দিনের বেলায়ও রবীন আলো জ্বেলে কাজ করে।

আজ ঘরটা অন্ধকার। আছে তো রবীন? তাকে আসতে বলল যে? বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে ইলার। অসম্ভব নার্ভাস লাগছে ওর। কেউ কিছু ভাবছে না, অথচ ইলার মনে হচ্ছে সব লোক বুঝি ওর গতিবিধির ওপরই নজর রেখে বসে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই দেখা হরিপদর সঙ্গে। কি দিদিমণি! কাকে খুঁজছেন? মা আর বাবু তো বাইরে গেছেন!

জানি।

SUNLIGHT
SOAP
নতুন ফরমুলার
সানলাইটে

ওপরে ওঠার জন্য পা বাড়াল ইলা। এরপর ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে?

ভেতরে এসো।

রবীনের গম্ভীর গলার গভীর স্বর।

হরিপদর কৌতূহল স্পষ্ট উপেক্ষা করে ভেতরে ঢুকে গেল ইলা।

বৌদি বলেছে দুপুরটা ঘুমিয়ে নিতে। ইলাকে চোখের জল মুছে খেতে বসতে দেখে খুশিই হয়েছে অরুণা।

জানা কথাই। ক'দিন আর কাঁদবে? প্রথমে ভয় পেয়েছিল বোধ হয়। তাই খাবার সময় ওকে মনে করিয়ে দিল দুপুরে ঘুমিয়ে নেবার কথা, তাতে মুখটা বেশ টাটকা দেখাবে, এ ক'দিন কেঁদে মুখের যা অবস্থা করেছে, সুন্দরী বলে রক্ষা, তা হলেও মনে হচ্ছে ইলা যেন কত রোগ ভোগ করে উঠল।

তবু খুশি হয়েছে অরুণা।

শেষ পর্যন্ত ইলার মন ফিরেছে, যে কাণ্ড আরম্ভ করেছিল।

একসঙ্গে খেল তারা। অন্যদিনের মত গল্পটাও বাদ গেল না। বরং ক'দিন বাদে ইলা বেশ খুশিই। তবু বেশি খেতে পারল না। কয়েকবার ধমক দিল অরুণা, তারপর এ সময়ে নিজেদের অবস্থা স্মরণ করে অব্যাহতি দিল ইলাকে।

ছেলে নিজে দেখতে আসবে, এ রকম লাগবারই কথা। সহজ হবার চেষ্টা করলেও যে সহজ হওয়া যায় না, সেকথা অরুণা জানে।

যা হোক ওকে শুতে দেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে খোকাকে নিয়ে ঘুমোতে গেল অরুণা।

বাচ্চা ছেলের মা, রাতের ঘুমের যখন কোন নিশ্চয়তা নেই, তখন দুপুরের সুনিদ্রাটুকুকে অবহেলা করা যে মূর্খতা সেকথা অরুণা স্বীকার করে।

জানলাগুলো বন্ধ করে শুয়ে পড়ল ইলা। বৌদি বলেছে বলে নয়, রোজকার অভ্যাসমতই সেও শুয়েছিল একটু ঘুমিয়ে নেবে বলে।

কিন্তু পারল না।

সাড়ে তিনটে বেজে গেলে চলবে না। ঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে দু'টো বাজতেই সে উঠে পড়ল। মুখে-চোখে জল দিয়ে এসে পাখার স্পীডটা আরও একটু বাড়িয়ে দিল ইলা।

বেজায় গরম পড়েছে, চারটের আগে আর বৌদি দরজা খুলবে না। আর অন্য কারও কথা তো ওঠেই না। গরমের দিন, রোদ না পড়লে পিসিমাও উঠবেন না জানা কথা। তা ছাড়া বাবার ঘরও বন্ধ থাকবে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত। দাদা আপিস থেকে না ফেরা পর্যন্ত।

আসলে দাদা না ফেরা পর্যন্ত বাড়িখানাকে প্রায় মৃত বলেই মনে হবে। আর ইলাকে দেখতে আসবে সন্ধ্যার পর। সুতরাং সময় অনেক, কিন্তু ইলার হাতে নয়।

সাড়ে তিনটের মধ্যেই প্রস্তুত হ'তে হবে। বাড়ি নিঝুম, যেন সবাই মরে আছে, সাময়িক মৃত্যু। দু'দিন বাদে এদের কাছে ইলারও মৃত্যু ঘটবে। ভাবতেই বুকটা টিপটিপ করে ইলার।

একা বিশেষ কখনও বাড়ি থেকে বেরোয় নি সে, কাছাকাছি অন্য বাড়ি ছাড়া। আজ কিন্তু তাকে একাই বেরিয়ে যেতে হবে।

সেখানেই অপেক্ষা করবে রবীন। তার বন্ধুর গাড়ি নিয়ে।

তারপর?

তারপর আর ভাবতে পারে না ইলা।

সেই সরল আদুরে মেয়েটা কখন রাশীকৃত ভাবনার জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে; যত খুলতে যাচ্ছে, ততই বেশ জট পাকিয়ে যাচ্ছে?

আর ভাববে না সে।

রবীন তো তাকে বলেইছে সব ভার তার ওপর ছেড়ে দিতে! আজ থেকে সব ভাবনা সব দায়িত্ব রবীনের। তাই দেবে সে! তাই দিয়েছে, তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনার ভার সে রবীনকে দিয়ে দেবে, তার নিজেরও।

হঠাৎ কেমন লজ্জা হ'ল রবীনের কথা ভেবে। আজ প্রথম রবীন তাকে···

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকেই মুখটিপে হাসল ইলা। আবার মনে পড়ল রবীনের কথা। সারা গায়ে রোমাঞ্চ অনুভব করল।

আলমারীর পাল্লাটা টান করে খুলল ইলা!

থাকে থাকে তার শাড়ি সাজান। খুব ইচ্ছে করল ইলার সোনালী বুটিদার লাল সিল্কের শাড়িখানা পরে। ওটা পরলে তাকে নাকি ভারি মানায়! তা ছাড়া আজকের দিন, হাজার হোক··প্রথম যাচ্ছে সে আজ রবীনের সঙ্গে, একটু সাজবে না?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালের ওপর একবার শাড়িটা ফেলে দেখল ইলা।

খুট করে শব্দ হতেই চমকে তাকাল পেছনের দিকে।

না, দরজা ঠিকই বন্ধ আছে। তা ছাড়া এ সময় কে আর আসবে।

কিন্তু না, আর সময় নষ্ট নয়।

গত বছরে তার উনিশ বছরের জন্মদিনে দাদা যে হাল্কা গোলাপী রং-এর চন্দেরী শাড়িটা দিয়েছিল, সেটা পরে নিল ইলা। এখানাও তার খুব প্রিয় শাড়ি।

চুলটা ভাল ক'রে আঁচড়ে মুখে অল্প একটু পাউডার দিল, তারপর কি মনে করে বড় একটা টিপ আঁকল তার সাদা কপালে। তারপর গুছিয়ে-রাখা একটা ব্যাগ নিয়ে আস্তে আস্তে পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এল।

বুকের ধড়ফড়ানি বেড়েই চলেছে। হঠাৎ চোখটা জ্বালা করে জল এসে গেল। চিরদিনের মত বিদায় নিচ্ছে সে।

বাবার ঘরের সামনে একবার মাথা ঠেকাল, তারপর দাদা, বৌদি আর ছোট পিসিমার উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে নীচে নেমে গেল।

গাড়ি-বারান্দার তলা দিয়ে বেরোতেই দেখা সামনের বাড়ির ত্রিভঙ্গবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে।

গরমকালের এই দুপুরবেলা, কিন্তু ওর চোখে ঘুম নেই। সারা দুপুর বসে থাকবে জানলার শিক ধরে।

না-দেখার ভাণ ক'রে চলে যাচ্ছিল ইলা। কিন্তু ত্রিভঙ্গগৃহিণী বোধ হয় দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম ত্যাগ ক'রে বাইরের জগতের আস্বাদন নেবার জন্য বদ্ধপরিকর। চেঁচিয়ে ডাকল, কি ইলু, এই দুপুররোদে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

বন্ধুর বাড়ি।

কথা না এগোতে দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল ইলা।

পথের মাঝে দেখা পরিমল ঘোষের ভাইপোর সঙ্গে। ওকে কথা বলবার অবকাশমাত্র না দিয়ে গম্ভীর মুখে এগিয়ে গেল ইলা। বড় কাজে বাধা আছেই।

মোড়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতেই তার ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল।

ওকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল রবীন। আজ শুধু তার সৌন্দর্য নিয়ে নয়, আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তার ইলা, সেই স্বীকৃতিটুকু যেন তাকে আরও সুন্দর করে তুলল রবীনের চোখে।

খুব কষ্ট হল তো?

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে ওর দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল রবীন।

কিসের কষ্ট বা:···

সলজ্জ হাসিতে মুখ নামাল ইলা। রবীনের মুগ্ধ চোখের দৃষ্টিতে লজ্জা পেল ও। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসল।

ওর পাশে বসে গাড়ির দরজা বন্ধ করে রবীন বলল, পরিচয় করিয়ে দি,···ইলা···আর আমার বন্ধু শক্তি সান্যাল।

নমস্কার।

গাড়িতে তাড়াতাড়ি স্টার্ট দিল শক্তি। বেশিক্ষণ দাঁড়ান নিরাপদ নয়।

হাত তুলে নীরবে প্রতিনমস্কার করে রবীনের দিকে চেয়ে একটু মিষ্টি করে হাসল ইলা।

গাড়ি চলতে লাগল। একটু কাছে সরে এল রবীন।

এই।

প্রায় কানের কাছে ফিসফিস করে বলল রবীন।

শক্তির দিকে একবার তাকিয়ে আবার হাসল ইলা।

ওর ঘামে-ভেজা ঠাণ্ডা কাঁপা হাত নিজের বলিষ্ঠ হাতে শক্ত করে ধরল রবীন।

সুচরিতার আজ স্যুটিং ছিল।

শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়েছে ফিল্মে নামতে।

রাজী কেন, এ ক'দিনের আলোচনার পর যখন সিনারিও লেখা, স্যুটিং-এর তারিখ ঠিক করা সব পুরোদমেই হতে লাগল, তখন আস্তে আস্তে কেমন যেন বেশ একটু ভালই লাগল সুচরিতার। ও যেন তার পরিচিত জগতেই ফিরে যাচ্ছে আবার।

যদিও আগে এক রাত্রে চূড়ান্ত ঝগড়ার ভেতর দিয়েই সে রাজী হয়েছে।

সেদিন তারা বেড়িয়ে ফিরল যখন, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

একটু কফি খেলে হয়?

খাও।

সুচরিতা নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিল।

খাও নয়, তুমিও খাবে।

না।

না কেন?

আমার ভাল লাগছে না।

আজকাল তোমার অনেক কিছুই ভাল লাগে না। যা আমার ভাল লাগে।

খুব স্বাভাবিক।

না স্বাভাবিক নয়, যেমন ফিল্মে নামায় তোমার আপত্তি।

হ্যাঁ তাতে কি?

কিছুই নয়, শুধু আমার অবাধ্যতা করবার জন্য। ফিল্মে নামা তোমার পক্ষে এমন বিধবার আমিষ ভোজনের মত লাগছে কেন তা জানি না।

আমি তো বলেছি আমার ইচ্ছে নেই।

কিন্তু ইচ্ছে থাকা উচিত। জান তুমি টাকা-পয়সার অবস্থা সঙ্গিন। ভালমত টাকা না আসলে পরে মুস্কিলে পড়তে হবে। তাই বাজোরিয়ার টাকাটায় একটা স্টেবিলিটির আশা করছি।

তা হলে তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটবে?

এ-কথা বলার মানে?

আর কি মানে। কারও আকাঙ্ক্ষা অল্পে মেটে, কারও সীমাহীন অর্থেও নয়।

আশা করি নিজেকেও দ্বিতীয় শ্রেণীতেই ফেলছ।

না:—

না:—আলবৎ।

তা হলে তাই।

তর্কের শেষ কথাটুকুও যেন খুঁটে ফেলে দিতে চাইল সুচরিতা।

কিন্তু অত সহজে ছাড়লেন না সত্যব্রত। অনেক কথা শুনিয়েছে আজ তাকে সুচরিতা, শুধু আজ নয়, প্রায়ই শোনাচ্ছে,—

শোন!

সময় নেই, রাত হয়েছে।

তোয়ালেটা নিয়ে বাথরুমের দিকে গেল সুচরিতা।

কোথায় যাচ্ছ? শোন তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। তুমি আজকাল বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছ রীতা। এতটা ভাল নয়।

আমারও সেই একই প্রশ্ন। একটা সীমা তো আছে?

শোন তা হলে।

ওর হাত ধরে ওকে প্রায় জোর করে বসালেন সত্যব্রত।

তুমি কি মনে করেছ যে এমনি করে আমার ওপর নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করবে? আর তোমার অপূর্ব পারসোন্যালিটি দেখে আমি ভয় পাব?

পাগল। তোমাকে আমি চিনি না? তোমার ব্যক্তিত্বের কাছে দাঁড়াব আমি?

ঠিক তাই।

রাগে হাত দু'টো মুঠিবদ্ধ করলেন দৃঢ়ভাবে সত্যব্রত। তাঁর চোয়াল দু'টো শক্ত হয়ে উঠল। শোন! তোমায় জানাচ্ছি আমি, তোমায় নামতেই হবে আমার নেকস্ট বই-এ। নায়ক ঠিক হয়ে গেছে নবেন্দুবাবু। মনে রেখ।···আর এ মাসেই স্যুটিং আরম্ভ হবে। টাকা আমার চাই-ই।

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল সুচরিতা। তার দু'টো চোখ জ্বালা করে উঠল। কিন্তু কান্না এল না।

অপমান···চূড়ান্ত অপমান করছেন সত্যব্রত তা সে জানে। এত বছরের সংসার করার পরও তার স্বামী তাকে ভাল একটা বিক্রির সম্পদ ছাড়া, কিছুই ভাবতে পারেন না।

যৌবনের উচ্ছল দিনগুলো সে ভোলে নি, কিন্তু আবার তার পুনরাবৃত্তিই কি তাকে করতে হবে জীবনভোর?

সারারাত ঘুমোল না সুচরিতা। শেষে মনস্থির করে ফেলল। দারিদ্র্যকে সে ভয় পায়, এই ভাল। সত্যব্রতর ইচ্ছামতই চলবে সে। এই তার জীবন! এ ছাড়া আর কি আছে? অর্থ প্রচুর অর্থ, আনন্দ উৎসব, সিনেমা পার্টি আর অজস্র শাড়ি-জামা গয়না। এই তার ভাল। তা ছাড়াও যে খবর শুনল, সেটাও·····

রাজী হ'য়ে গেল সে।

শুধু রাজী নয়, ক্রমশ বেশ ভাল লাগতে লাগল তার রোজকার এই উত্তেজনা আর প্রস্তুতি। আর একটা আকাঙ্ক্ষাও তার মনে উঁকি দিতে লাগল।

আজ স্যুটিং-এর দশম দিন। অনেকটা এগিয়ে গেছে বই। রবীনের যাবার কথা ছিল, কিন্তু যায় নি ও! এজন্য বেশ বিরক্তই হয়েছেন সত্যব্রত!

শুধু তাই নয়, স্টুডিওয় আজ যে কাণ্ডটা হয়ে গেল তাতেও রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন সত্যব্রত।

সমস্যাটি সুচরিতাকে শুধু একা নিয়ে নয়। নবেন্দু ঐ কাণ্ডের পর—আবার সত্যব্রতর বইতে নায়ক হচ্ছে জেনে প্রথমটা বিশ্বাস করতেই চায় নি সুচরিতা। নিজের দম্ভকে বজায় রাখবার জন্য এমনই কিছু বলা সত্যব্রতর পক্ষে অসম্ভব নয়, সুচরিতা তা জানে। সর্বদাই তাঁর এই ভাব। চলতি ভাষায় যাকে বলা যায়, 'কিল খেয়ে কিল চুরি।' হাজার অপমানের পরও তাঁর নির্বিকার ভাব, যেন তিনি কোথাও অপমানিত হন নি, হ'তে পারেন না। তাই নবেন্দুর অপমানও যে গায়ে মাখবেন না সত্যব্রত, তা সুচরিতা জানত।

কিন্তু সত্যিই কন্‌ট্রাক্ট সই করবার পর সুচরিতা যখন স্পষ্ট নবেন্দুর সই দেখল তখন শুধু অবাক নয় খুশিই হল সুচরিতা।

সেদিনের সে অপমানটুকু সত্যব্রত হয়ত ভুলেছেন কিন্তু সুচরিতা ভোলে নি।

না হোক কতকগুলো টাকার জন্য তাকেই অপমান করেছে নবেন্দু পরোক্ষে। যদিও তার পরে চিঠি লিখেছে সে টাকাটা পাবার পর এবং তার এই অনিচ্ছাকৃত দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়েছে তবুও সুচরিতা ক্ষমা করে নি।

ক্ষমা সত্যব্রতও করেন নি, তাঁর স্বভাব নয় এত সহজে ভুলে যাওয়া কিন্তু অন্য মাটি দিয়ে গড়া তাই তাঁর মনোভাব এত সহজে প্রকাশ পায় না। আবার নবেন্দুর ওপর কর্তৃত্ব দেখাবার একটা দুরন্ত স্পৃহা ওঁকে পীড়ন করেছে, যার ফলে বেশ মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে আর বেশ কয়েকবার হাঁটাহাঁটির পর তাঁর বইয়ে নবেন্দুকে পেয়েছেন তিনি। অবশ্যই শুধু অহংবোধ চরিতার্থ করা নয়, এর পেছনে ব্যবসায়িক বুদ্ধিই বেশি কাজ দিয়েছে একথা নিঃসন্দেহ। এ টাকা দ্বিগুণ হয়ে ফিরবে, সত্যব্রত তা জানেন।

সুচরিতা অত খবর রাখে না। শুধু যে নবেন্দু তাদের অপমান করেছে আবার টাকার লোভেই যে তাকে তারই স্বামীর প্রোডাক্‌সানেই আসতে হ'ল এই চিন্তাটুকু তাকে খুশি করল।

সেদিন ওদের স্যুটিং একটু আরম্ভ হবার পরই হঠাৎ সুচরিতা অজ্ঞান হয়ে গেল।

ধরাধরি করে ওকে ফ্লোর থেকে এনে বড় ঘরের কৌচে শোয়ান হল। অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে গেলেন সত্যব্রত। মনে করে দেখলেন কাল রাতে তো কিছু কথা কাটাকাটি হয় নি। মানসিক না শারীরিক কি কারণ খুঁজে পেলেন না। প্রথমদিনের পর থেকেই স্যুটিং আর এই সব উত্তেজনা যে সুচরিতার বেশ ভাল লাগছে তা লক্ষ্য করেছেন তিনি। বেশ হাসিখুশিই তো আছে সুচরিতা। তবে? মনের কোন দুরন্ত আবেগের বিচিত্র প্রকাশ নয়ত এটা? কে জানে।···

নবেন্দু ব্যস্ত হ'ল কম নয়। কিন্তু তার সামান্য ভদ্রতাসূচক উৎকণ্ঠাও কেমন যেন খারাপ লাগল সত্যব্রতর।

সুচরিতা তাঁর স্ত্রী, তার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া ব্যস্ত হওয়া সব তাঁর কর্তব্য। সেখানে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই।

কিন্তু এটা তাঁর বাড়ি নয় স্টুডিও। একজন বিশেষ করে নায়িকা অসুস্থ হয়ে পড়াতে কারও ব্যস্ততাকেই ঠেকাতে পারলেন না তিনি। রবীনকে বার বার যত মনে পড়ল, যত তার প্রয়োজন অনুভব করলেন তত রাগ হ'তে লাগল তার ওপর। আজ গিয়ে একটা বোঝাপড়া করবেন তিনি, দিন দিন বড় বাড়িয়ে তুলছে রবীন।

কিছুক্ষণ বাদেই সুস্থ হ'ল বটে সুচরিতা। কিন্তু আজ আর

তার দ্বারা স্যুটিং সম্ভব নয়। ডাক্তার ডাকবার লোক গেছে, ফোন করাও হয়েছে। তার মধ্যেই সুচরিতা সুস্থ হ'ল।

ওকে ঘরে শুইয়ে রেখে সবাইকে ডেকে নিলেন সত্যব্রত। পার্শ্ব চরিত্রের অভিনেত্রী রমাকে অনুরোধ করলেন সুচরিতার কাছে থাকতে। উনি বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করবেন এখুনি।

কিন্তু শুধু সুচরিতার জন্য আজকের দিনটা নষ্ট করা যায় না।

মনে মনে হিসেব করলেন সত্যব্রত। এই সেট, লোকজন, আজকের খরচ সব মিলিয়ে একটা দিন নষ্ট হ'লে টাকার ক্ষতি কম নয়। তা ছাড়া সুচরিতা তো সুস্থই হয়েছে। সুতরাং অন্তত নবেন্দুর সটটা শেষ করে ফেলবার জন্য ব্যগ্র হলেন তিনি। এতে অন্য সুবিধেও আছে। সুচরিতার কাছ থেকে নবেন্দু থাকবে অনেক দূরে, তাঁরই চোখের সামনে।

সাধারণত দু' একবার রিহার্সাল দিয়েই আর দু' একবার মনিটরেই নবেন্দুর অভিনয়ের ফাইনাল টেক নেওয়া সম্ভব হয়।

রিহার্সাল হয়েই গিয়েছিল, মনিটর করেই ফাইনাল নিলেন সত্যব্রত। কিন্তু কি যে হ'ল, নবেন্দু যেন অনমনস্ক। দু'বার এন জি হোল।

সত্যব্রতর ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল।

এবার রীতিমত বিরক্ত হলেন তিনি।

নবেন্দুবাবু। প্লিজ একটু যদি মন দেন।

দিচ্ছি তো!

হুঁ বুঝলেন না, না হলে বেশি রাত হয়ে যাবে, আজ আরও দু'টো সট টেক করতেই হবে। এ সিনটি আমি শেষ করতে চাই···কাল অন্য সেট।

সব তো বুঝলাম, কিন্তু কি যে হচ্ছে, মনে থাকছে না।

কয়েকজন মুখ টিপে হাসল। তারা যে সুচরিতার সঙ্গে নবেন্দুর ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করেছে তা নয় ওদের দু'জনকে নিয়ে জল্পনা করতেই তাদের ভাল লাগে। মাঝবয়সী সত্যব্রতর পাশে সুচরিতাকে মানানো যেন স্বাভাবিক নয়। তার ওপর আজকের নবেন্দুর ব্যগ্রতা তাদের এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছে বেশ।

ওদের হাসিটুকু সত্যব্রতর চোখ এড়াল না। সমস্ত গা জ্বলতে লাগল তাঁর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই সমস্ত তুচ্ছ ইঙ্গিত উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং আবার তৈরি হলেন তিনি ফাইনাল টেকিং-এর জন্য।

ক্যামেরা দিয়ে আর একবার দেখে নিলেন তারপর বললেন, স্টার্ট।

এগিয়ে এল সহকারী অনিল দাস।

সিন ফোর, টেক ফোর।

ক্ল্যাপস্টিক বন্ধ করে দ্রুত সরে গেল সে।

ক্যামেরা এগিয়ে চলল নবেন্দুর পেছন পেছন, যেখানে পথ দিয়ে নবেন্দু চলেছে উদ্‌ভ্রান্তের মত।

সত্যব্রতর প্ল্যানমত আর দু'টো সর্ট না নেওয়া হ'লেও মোটামুটি কাজটা এগোল।

প্রায় সারাদিনই তার ঘরে শুয়ে থাকল সুচরিতা। ডাক্তার এসে দেখলেন অনেক পরে, আর যে কথা বললেন সত্যব্রতকে তার থেকে বিস্ময়কর কথা ভাবতেও পারেন না সত্যব্রত।

না না হ'তে পারে না, এ অসম্ভব……

কেন অসম্ভব কেন? আপনি কি যুদ্ধে গিয়েছিলেন নাকি?

না তা নয়…তবে…আপনি ঠিক বলছেন?

মনে হয়। ডাক্তারি একটা সায়েন্স মিঃ সেন। এখানে অনুমানের স্থান নেই।

তা জানি…তা জানি…তবে…

এ-সব অবস্থায়, ভেতরের কোন দুর্বলতার জন্য অজ্ঞান হয় অনেকে।

অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে ডাক্তারকে ভিজিট দিয়ে বিদায় দেন সত্যব্রত।

ফিরে এসে সুচরিতাকে কিছু বললেন না, গভীর চিন্তায় তাঁর মুখের রেখাগুলো আরও প্রকট হ'য়ে ঝুলে পড়েছে যেন মুখখানা। একবার সেদিকে তাকিয়ে আবার চোখ বুজল সুচরিতা।

বুঝতে পেরেছে সে।

আজকের দিনের আর্থিক ক্ষতি সত্যব্রতকে ভাবিয়ে তুলেছে, ভাবুন তিনি। সে অন্য ভাবনা ভাববে। জীবনকে আবার মধুরতার ভরিয়ে তোলা। আবার সেই পুরোন খেলা। নবেন্দুর চোখেও সে তার আভাস পেয়েছে। এমনিভাবে খেলা করেই তার জীবন কাটুক। এমনি সহজ লঘুভাবে। এই ভাল তার।

কিন্তু সত্যব্রতকে শুধু আজকের ক্ষতিই ভাবিয়ে তোলে নি। বই-এর অনেকটা টেক করা হয়ে গেছে এই অবস্থায় সুচরিতা তাঁকে এত বিপদে ফেলবে তা কে জানত?

কিন্তু কি করে সম্ভব হ'ল? ভাবতেও পারছেন না তিনি।… সুচরিতাকে বলা হবে না, একটা ভালমত সমাধানের পথ না খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত।

এখন কেমন আছ?

ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করলেন সত্যব্রত।

ভাল।

চোখ বুজেই উত্তর দিল সুচরিতা। বাড়ি যাবে?

হ্যাঁ যাব। তবে তুমি তোমার স্যুটিং শেষ করে নাও না।

না আজ আর হবে না।

কেন?

না বাড়িই চল, তুমি অসুস্থ।

বেশ আমায় পাঠিয়ে দাও, তুমি টাকার ক্ষতি করে…

তা হোক…

বেশ খুশিই হ'ল সুচরিতা।

তার অসুস্থতাকে যে সত্যব্রত টাকারও ওপরে স্থান দিলেন এজন্য বেশ গর্বিতই হ'ল সে।

এখন কেমন আছেন মিসেস সেন?

ভাল।

বোধ হয় বিশেষ নয়, আপনাকে এখনও খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ক্লান্ত হ'লে আর ক্লান্ত দেখাবে না?

মিষ্টি করুণ করে হাসল সুচরিতা।

নবেন্দুর খুব একটা ইচ্ছে হ'ল ওর কোলে-রাখা ক্লান্ত হাতটা একবার ছোঁয়।

কয়েকদিন বিশ্রাম নিন…আপনার প্রচুর বিশ্রাম দরকার।

বিশ্রামেই তো থাকি।

হয়ত এটাও 'এনাফ' নয়। আরও প্রয়োজন।…ও কি…আবার বসে পড়লেন কেন? শরীরটা কি বেশি খারাপ লাগছে?

উঠতে গিয়ে সত্যিই বসে পড়েছে সুচরিতা, ওর মুখটা সাদা হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি ওর হেলান মাথাটা ধরে ফেলল নবেন্দু।

মিসেস সেন!

ওর মুখের ওপরে ঝুঁকে একেবারে কাছে এসে গভীরভাবে ডাকল নবেন্দু।

ঘরে ঢুকলেন সত্যব্রত।

সব গোটাবার অর্ডার দিয়ে সুচরিতাকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন তিনি।

কি ব্যাপার? আপনি এখানে?

সেটা প্রশ্ন নয় মিঃ সেন. মিসেস সেন বোধ হয় আবার অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

সে আমি দেখছি।

সুচরিতার পাশে বসে ওকে জড়িয়ে ওর মাথাটা বুকে টেনে নিলেন সত্যব্রত।

…আপনি দয়া ক'রে কাউকে পাঠিয়ে দিন।

আমি ডাক্তার আনছি।…

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেল নবেন্দু।

জ্ঞান হারায় নি সুচরিতা।

কিন্তু মাথাটা আবার টলে গিয়েছিল ঠিকই। ওকে ধরাধরি করে গাড়িতে তুললেন সত্যব্রত।

অনেকে চলে গেলেও, তবু বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল। সকলেই ব্যস্ত।

প্রোডাকসন ম্যানেজারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে সত্যব্র[illegible] গাড়িতে উঠে বসে ড্রাইভারকে স্টার্ট করতে বললেন।

নবেন্দু আসার আগেই তাঁকে বেরিয়ে যেতে হবে স্টুডিও থেকে।

সাধারণত কর্তার গলা কখনও শোনা যায় না।

কদাচিৎ গাড়ি বের করতে বলা বা মাঝে মাঝে জোর কাশি ছাড়া কর্তার অস্তিত্বই জানা যায় না সহজে।

কিন্তু আজ যেন সপ্তমে। শুধু চেঁচামিচি নয়, কাকে যেন গালাগাল দিচ্ছেন; বোঝা যাচ্ছে না ভালভাবে, কিন্তু গলাটি যে বেশ চড়া তারে বাঁধা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে অন্য শব্দও হচ্ছে। থালা বাটি ছুঁড়ছেন নাকি?

ইলার দাদা অফিস থেকে এসেই বেরিয়ে গেছে।

অরুণা অসহায়ভাবে প্রথম থেকেই নীচু গলায় কতগুলো কৈফিয়ৎ দিয়ে যাচ্ছে। যদিও ফল হচ্ছে না তবুও উত্তর দেবার ব্যর্থ প্রয়াস করে চলেছে সে।

সত্যব্রতদের গাড়ি এসে থামল। অসুস্থ সুচরিতাকে সাবধানে ধরে ধরেই নামালেন সত্যব্রত।

এসেই শুনতে পেয়েছেন ওপরের চেঁচামিচি, সুচরিতাকে শোবার ঘরে রেখে বেরিয়ে এলেন তিনি, নিজেও ভয়ঙ্কর ক্লান্ত।

ব্যাপার কি রে হরিপদ ?

কি জানি, বুঝতে পারছি না।

অসম্ভব বিরক্ত বোধ করলেন সত্যব্রত। না, নীচেরতলায় ভাড়া নেওয়াই ঝকমারি। ওপরের দুমদাম শব্দগুলো যেন ঠিক মাথার ওপরেই পড়ছে বলে মনে হচ্ছে।

কথাটা বলবার সময় তিনি বোধ হয় ভুলে গেলেন এই প্রথম। নীচেরতলার কোন অসুবিধে অন্তত এ বাড়িতে তাঁকে সহ্য করতে হয় নি।

কিন্তু এ রকম তো কখনও হয় নি বাবু।

হরিপদ না ব'লে পারল না যেন।

তা বটে, কিন্তু আজই বা কেন ?···আচ্ছা রবীন কোথায় ? আজ স্টুডিওতেও যায় নি সে।

কি জানি ঘর তো বন্ধ। আমি বলি বুঝি স্টুডিওতে গেছেন।·· বাড়িতে তো নেই।

যাক গে···

পরে মোকাবিলা করা যাবে ভেবে আবার নিজেদের ঘরে ঢুকে এলেন সত্যব্রত।

কি যে কাণ্ড হচ্ছে আজ সকাল থেকে। সমস্ত পৃথিবীটা ভেঙ্গে পড়লে বুঝি শান্তি পান তিনি। তার ওপর ডাক্তারের কথাটা তো তাঁকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে।

সুচরিতা উঠে বসেছিল বিছানার ওপর।

উঠলে কেন ?

ঠিক আছি। ওপরে কি ব্যাপার বল তো ?

আমিও তো তাই ভাবছি। যেন কুরুক্ষেত্র বেধেছে, কর্তা ক্ষেপেছেন মনে হচ্ছে।···

সুচরিতা উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু কেন ? কখনও তো এমন হয় না ? ভদ্রলোক তো ভারি শান্ত প্রকৃতির বলে মনে হয়।

রবীনও—

হ্যাঁ ওর কাছ থেকে তো সবই জানতে পারবে, ওর এত যাতায়াত ও বাড়িতে।

আবার মুখ টিপে হাসল সুচরিতা।

তুমি ভাল আছ তো এখন ?

উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন সত্যব্রত।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ···

হাসল সুচরিতা !

দরজায় মৃদু ধাক্কা পড়ল।

কে ?

সুচরিতা জিজ্ঞেস করল।

শোবার ঘরে রবীন ছাড়া আর কে টোকা দিয়ে ঢুকবে।

আমি।

মেয়েলি গলায় উত্তর এল।

দেখ দেখ ওপরের কেউ বোধ হয়।

সত্যব্রত পর্দা সরিয়ে রীতিমত অবাক হলেন। তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে পথ ক'রে দিলেন, আসুন।

ভেতরে ঢুকল অরুণা। ওকে দেখে চমকে গেল সুচরিতা। এর থেকে আশ্চর্য আর কি আছে ? আজ তিনবছরের ওপর ওরা এ বাড়িতে আছে কোন বিশেষ দিনে নিমন্ত্রণ করেও অরুণাকে নীচে আনতে পারে নি। ইলাই এসেছে বরাবর।

আজ হঠাৎ ?

নিশ্চয়ই বিপদে পড়েই এসেছে, যা চেঁচামিচি হচ্ছে ওপরে, না হলে অহঙ্কারের একটি আবরণে ঢেকে রাখে নিজেকে অরুণা !

বেশ খুশিই হ'ল সুচরিতা।

কি ব্যাপার বৌদি।

ভয়ানক বিপদে পড়েছি ভাই।

বসুন।

না বসব না। আপনি যদি একবার ওপরে আসেন তো ভাল হয়। একটু কথা আছে।

বেশ তো এখানেই বলুন না।

হ্যাঁ আপনার তো এখনও কাপড়-চোপড় ছাড়াও হয় নি। আপনি না হয়···

তার জন্য নয়, আমি—একটু অসুস্থ আছি।

ও মাপ করবেন। আমি আবার এসময়ে···কিন্তু এত বিপদে পড়েছি ভাই,···

বেশ ভাল লাগছিল সুচরিতার। দাম্ভিক অরুণাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে সে !

বলুন না ! আর তার জন্য নিজে এলেন কেন ? ইলাকে দিয়েও তো বলাতে পারতেন ?

সে কথাই তো বলতে এসেছি। ইলাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অরুণার গলার স্বরে স্পষ্ট ভয় আর ভাবনা।

সে কি ?

হ্যাঁ ভাই, কি যে হবে ভাবতেও পারছি না।

উত্তেজনায় কাঁপছে অরুণার গলা।

কেমন যেন মনের মধ্যে একটা তৃপ্তি অনুভব করল সুচরিতা।

সত্যব্রত অরুণা আসবার পরই বাথরুমে চলে গেছেন হাত-মুখ ধোবার জন্য।

বাথরুমের বন্ধ দরজার দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে এল সুচরিতা অরুণার সঙ্গে। উত্তেজনা তারও কম নয়। তার অসুস্থতা সে ভুলে গেল, এখন সেসব কিছু বোধই করছে না যেন।

রবীন কোথায় ?

ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল অরুণা।

কেন ওর ঘরে ?

সিঁড়িরতলার ঘরটার দিকে পা বাড়াল ওরা।

একটু ঠেলতেই বন্ধ দরজাটা খুলে গেল। রবীনের অন্ধকার ঘরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আলো জ্বালল ওরা আর সেই আলোকিত ঘরের যে অবস্থা দেখল তাতে বুঝতে আর কিছু বাকি থাকল না।

সারা ঘরটা তছনছ করা।

সামনের ইজেলটার জায়গা শূন্য। রবীনের বড় স্যুটকেশটার তালা খোলা। বোঝা যায়, রবীনের প্রিয় আঁকার সরঞ্জাম আর অতি প্রয়োজনীয় জামাকাপড় ছাড়া সবকিছুই সে বাহুল্য মনে করে ফেলে রেখে গেছে।

হরিপদ।

জোরে হাঁক দিল সুচরিতা।

দাদাবাবু কোথায় ?

বাবুকে তো বলেছি।

আমাকে বল্ না জিজ্ঞেস করছি আমি

আজ্ঞে দাদাবাবু তো দুপুরবেলা বেরিয়ে গেল একটা ব্যাগ আর ঐ বড় আঁকার জিনিসগুলো হাতে করে।

তুই দেখেছিলি ? কিছু বলেছিল ?

না। কিছু বলে নি। শুধু বললে বেরোচ্ছি, তা আমি ভাবলাম বুঝি আপনাদের স্টুডিওতেই গেছে।

তোকে আর কিছু বলে নি ?

কই না তো ?

আচ্ছা তুই যা।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল অরুণা।

সুচরিতা ওকে শক্ত করে ধরল।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল অরুণা।

বাথরুমে বার বার ধাক্কা পড়াতে রীতিমত বিরক্ত হয়েই বেরিয়ে এলেন সত্যব্রত।

আঃ ব্যাপার কি ? বাথরুমের দরজা ধাক্কাও কেন ?

কি কাণ্ড হয়েছে জান ?

উত্তেজনায় কাঁপছে যেন সুচরিতা।

কি কাণ্ড।

রবীন পালিয়েছে।

পালিয়েছে !

হাঁ শুধু একা নয়, ইলাকে নিয়ে।

ইলাকে নিয়ে ?

তাই তো অত চেঁচামিচি, দেখলে না ওপরের বৌকে নীচে, আমার কাছে ?

কোন কথা বললেন না সত্যব্রত। গুম হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ, হাত দু'টো দৃঢ়ভাবে মুঠো করলেন, চোয়াল দু'টো শক্ত হয়ে

গছে তাঁর। কি এক দৃঢ়সংকল্প করছেন তিনি। আজ কিভাবে দিন আরম্ভ হয়ে, কিভাবে দিন শেষ হচ্ছে তাঁর।

হঠাৎ খুব অস্থিরবোধ করতে লাগলেন তিনি। ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু করলেন।

কি করতে পার তুমি? এত ভেবে কি হবে?

অনেকক্ষণ পরে যেন সুচরিতা বলতে পারল।

ওর দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন সত্যব্রত।

সত্যি রবীন যে এমন শত্রুতা করবে।···

কথা শেষ হ'ল না ওর।

ওকে থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন সত্যব্রত, শত্রুতা তুমিও কম করছ না।

আমি?

এর থেকে অবাক হবার কি আছে—হ্যাঁ, তুমিই ···জান আজ তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়বার পর···

কি হয়েছিল?

ফিস ফিস করে বলল সুচরিতা।

নবেন্দুর আগ্রহ যে সত্যব্রতর ভাল লাগে নি, সেটুকু বুঝতে সুচরিতার দেরি হয় নি।

সত্যব্রত ওর দিকে এগিয়ে এলেন, দৃঢ় হাতে দু'কাঁধ ধরলেন সুচরিতার তারপর কেমন জল-জল চোখ করে বললেন, জান! তুমি মা হ'তে চলেছ!

না—

বিরাট একটা চীৎকার করে দু'হাতে মুখ ঢাকল সুচরিতা।

এ হ'তে পারে না। তার জীবনে সন্তানের স্থান নেই। ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তা সত্যব্রত। তাই সেও চায় সত্যুতারে সুর বেঁধে তার জীবন কাটাতে। সেই ভাল তার।

কিন্তু আজ এ কি কথা বললেন সত্যব্রত? বিস্ময়ে-আনন্দে দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল সুচরিতার। দু' হাতে মুখ ঢেকে সে কেঁদেই চলল।

ওর দিকে না তাকিয়ে পায়চারিই করতে লাগলেন সত্যব্রত।

তাঁর এত হিসেব, এত প্ল্যান সব যেন কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সন্তান জন্মের সম্ভাবনায় আনন্দ, বাস্তব জ্ঞানের সংঘর্ষে মিশে যেন একাকার হ'য়ে যাচ্ছে।

কি করতে পারেন তিনি?

ভেবেছিলেন হয়ত বা এই সময়ই সন্তান আসার সম্ভাবনাকে ঠেকান যায়, ডাক্তারের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করবার কথাও তিনি ভেবেছিলেন, কিন্তু সব প্ল্যান, সব হিসেব রবীন যেন কেমন ভেঙ্গে দিল।

বিশ্বাসের স্তম্ভগুলো একে একে যেন সরে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে মাটিতে গুঁড়িয়ে-গুঁড়িয়ে।

সেই রবীন!

আশ্রিত, মূক, তার সাহস হ'ল এতটা। নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে, নির্ধারিত জীবন ছেড়ে অনিশ্চিতের পেছনে ছুটতে, তাঁর মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে?

কি স্পর্ধা।

কিছুতেই ক্ষমা করবেন না তিনি।

তিনি ভালভাবেই জানেন আজ হোক কাল হোক তাকে ফিরে আসতেই হবে। অন্তত তার প্রাপ্য বহু টাকার কিছুটাও দাবী করার জন্য এ দুঃসময়ে। সেটুকু সে ছাড়তে পারবে না। তাই সে আসবেই, আজ হোক, কাল হোক।

কিন্তু ওরা এল না।

আজ কাল ক'রে একমাস চলে গেল, ওরা এল না।

সুচরিতার বিস্ময় যেন সীমা ছাড়াল। নিজের মধ্যে শুধুমাত্র সৃষ্টির সম্ভাবনায় নয়, ইলা আর রবীনের কথা ভেবে।

তার এতদিনের চিন্তাধারায় একটা বিরাট প্রশ্ন যেন মাথা তুলে দাঁড়াল।

জগতে তবে সিকিওরিটিই শেষ কথা নয়? অর্থের জোর ছাড়াও অন্য জোর আছে, যাতে পরম অনিশ্চিতকেই জীবনে আহ্বান করা যায়?

সত্যিই অবাক হল সুচরিতা।

দু'জনের ভালবাসার জোরে পৃথিবীকে উপেক্ষা করে সব-কিছুকেই জয় করবার বাসনা রাখে এরা।

একের হৃদয়ের উত্তাপ অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে কি এক গভীর মমতায় বুঝি তাকে উত্তপ্ত ক'রে তোলে। সে উত্তাপের আস্বাদন সুচরিতা পেল না কেন?

নির্বাক দৃষ্টিতে সুচরিতা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে জানলার দিকে মুখটা রাখল। ক'দিন ধরে যে শরীর তাকে একটা অস্বস্তি দিচ্ছে তারই আবেগ কাটিয়ে উঠতে চায় সে।

অন্ধকার আকাশের শরীরে হাজার হাজার তারার আলোয় জীবনের এক নির্মম সত্যবোধ যেন তার মনে মনে এক নিবিড় অনুভূতিকে আবির্ভাব করল।

অর্থের নেশা নয়—জীবনের নেশায় অর্থের প্রয়োজন। ঐ সরল মৌলিক জীবনবোধের এক দৃশ্য যেন ঐ আলোকিত আকাশে ভাস্বর বিস্ময়াবেগে সুচরিতার সামনে উপস্থিত হ'ল। বুঝি বহুদিন আগে যে রত্না ঘোষের মৃত্যু হয়েছে তার দিদির মৃত্যুপণ জীবনেশার অর্থ সে বুঝতে পারছে। হয়ত সবটা পারছেও না, কিন্তু বিবশ বিস্ময়ে সুচরিতা তার অব্যক্ত আর্তনাদে যেন শুনতে পেল, বাড়ি-গাড়ি-শাড়ি-গয়না এই সবই যেন সমস্ত নয়, এক অনাস্বাদিত উষ্ণস্রোতের প্রবহমান উদ্দাম অনুভূতিই বুঝি জীবনের অঙ্গাঙ্গি পাথেয়।

যেন এই মুহূর্তে সুচরিতা অনুভব করল, বুঝি সেই অপূর্ব অনুভূতির প্রগাঢ় স্বাদের জন্য সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধেই দাঁড়ান যায়।

না হলে কোথা থেকে জোর পেল রবীন ইলা? কোথা থেকে পরম ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হয়ে তারা এই নিশ্চিত পরম আশ্রয়কে দু'পায়ে ঠেলে সেই অনির্দিষ্ট জীবনকে বরণ করে নিল।

আজ যেন সুচরিতা ঐ সুদূর আকাশের মতই উদ্ভাসিত আবেগে জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দৃশ্যর দেয়ালে ছায়া ফেলল।

অতীতের সেই রত্না ঘোষকে সুচরিতার মনে পড়ল। আর মনে পড়ল দারিদ্র্যের প্রকট জীবনকে। সেই দারিদ্র্যের যাবতীয় অভিশাপকে উপেক্ষা করবার দুঃসাহস।

রত্না ঘোষের মার, দিদির আর [illegible]। জীবনের যাবতীয় অস্থির দুঃখ আর যন্ত্রণার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েও কেবলমাত্র মানুষের সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকবার- বাঁচবার আনন্দকে গ্রহণ করবার যে স্বপ্ন—সুচরিতা যেন তারও একটি ব্যাখ্যা মনে মনে গ্রহণ করবার জন্য তার প্রশ্নভরা মনকে মেলে ধরল।

শুধু এই তুচ্ছ বিলাসের আনন্দই নয়, জীবনে সহজভাবে বেঁচে থাকাটাই বুঝি আনন্দের। তাই বুঝি এই সমস্ত অস্বাভাবিক জীবনবোধে তৃপ্ত অর্থলোলুপ সত্যব্রত বা খোকা মিত্তিরই নয়, আছে বুঝি হাজার হাজার মনুষ্যত্বসম্পন্ন সৎ জীবনবোধে দীপ্ত প্রাণবান মানুষের মিছিল।

সে মিছিল কি সুচরিতার জন্য নয়? সে সাধারণের মিছিলে কি সুচরিতার স্থান নেই•••মাথায় যেন অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে তার।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সত্যিই সে পারে না। সে সাধারণের কাছে ফিরে যেতে পারে না, কেন না সে সাধারণ নয়। ভাল করে যেন বুঝতেও পারে না সুচরিতা। অভ্যস্ত আরামের এই জীবন ছাড়া যে জীবনের আভাস তাকে এমনি করে গভীরভাবে নাড়া দিল মনে মনে সেই জীবনটুকুতেই যেন সে নিঃশ্বাস নিতে চায়। এই পরিচিত আকাশের মাঝখানেই সে অন্য আকাশ খোঁজে। যে আকাশে সে প্রাণভরে খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারবে। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে বড় বড় করে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল।•••

সে একা, সত্যিই সে বড় একা•••।

সীমাহীন নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্য তার আজ অন্য কিছু প্রয়োজন। ইলেকট্রিক আলো নয়, ফ্লোরেসিনের উজ্জ্বলতা নয় বুঝি ঐ অন্ধকার আকাশের সহস্র প্রদীপে জ্বালা প্রাণের আলোয় উদ্ভাসিত হ'তে চায় সে?

সেই আকাশের দিকে কতক্ষণ তাকিয়েছিল সুচরিতা জানে না।

হঠাৎ দেখল, সামনের ল্যাম্পপোস্টটার কাছে ভিড় জমে গেছে।

তাকে চিনতে পেরেছে ওরা।

ওরাই তাকে ফিরিয়ে দেবে তার নিজের জগতে, শুধুই সে জগৎ তার প্রাপ্য।

ল্যাম্পপোস্টের আলোতেই বুঝি জানলার ফ্রেমে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল তার মুখ, তাই ভিড় হয়ে গেছে কৌতূহলী জনতার।

পর্দাটা টেনে সরে আসতে যাবে সুচরিতা হঠাৎ একটা মন্তব্য শুনে তার পা যেন আটকে গেল। আর পারে না সে, এটুকুই মূল্য তার, আর বেশি নয়, এর বেশি সে আশা করতেও পারবে না।

হঠাৎ যেন তার চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। সমস্ত সামনেটা যেন একবার দুলে উঠল? সামনে রাখা চেয়ারটা দু'হাত দিয়ে ধরতে গেল সুচরিতা, কিন্তু পারল না।

প্রচণ্ড শব্দ হল।•••

কিছু বলতে পারল না সুচরিতা, কিছু দেখতেও পারল না।••

অনেক, অনেকক্ষণ বাদে সুচরিতা আস্তে আস্তে দেখতে পেল ঘরের মেঝেয় বিছিয়ে রাখা নীল কার্পেটের রোঁয়াগুলো।

ক্রমশ বড় হতে হতে তারাই যেন একটা বিরাট আকাশ হয়ে গেল। সুচরিতা চোখ বুজল।

সমাপ্ত

'নবদিগন্ত' পত্রিকায় কাজ করতাম তখন। জার্নালিজমের ডিগ্রীটা সবে পেয়েছি—তার ওপর মেয়েদের মধ্যে আমাদের ব্যাচই প্রথম ডিগ্রী পেল। কাজেই অভিজ্ঞতার ঘাটতিটুকু উৎসাহের জোয়ারে পুষিয়ে নিতে চাইতাম। নিত্যনতুন পরিকল্পনা পেশ করতাম সম্পাদকের দরবারে। অবশ্য সেগুলি প্রায় সবই না-মঞ্জুর হোত। তবু ওরই মধ্যে মহিলা সাহিত্যিকদের নিয়ে একটা সিরিজ লেখার পরিকল্পনা সম্পাদকের ভালো লেগে গেল, সিরিজটা তো অনুমোদন করলেনই—উপরন্তু এর মালমশলা যোগাড় করা ও লেখার ভারও আমার ওপরই পড়ল।

এই সিরিজটার উপলক্ষেই উমাশশী দেবীর সংগে আমার পরিচয় হয়েছিল। অবশ্য উমাশশী দেবীর নাম আজকের পাঠকেরা জানবেন না হয় তো। আমিও জানতাম না। তার ওপর যে সব মহিলা সাহিত্যিকের খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত তাঁদের নিয়েই সিরিজটা লেখা হবে এটাই স্থির ছিল। কাজেই উমাশশী দেবীর কথা আমার সিরিজে লিখব এটা কখনো ভাবি নি।

অবশ্য তার আগে বলতে হয় পাঠক হিসেবে উমাশশী দেবীর সংগে আমার পরিচয়ের কথা। 'নবদিগন্ত' পত্রিকার সংগে সংশ্রব থাকলেও পাড়ায় সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত ছিলাম না আমি। এই আধা-শহর আধা-পাড়া গাঁ শহরতলীতে এসেছি আমরা বছর দুয়েক। প্রতিবেশীদের সংগে পরিচয় থাকলেও তাঁরা অনেকেই নবদিগন্ত পত্রিকার অস্তিত্বের কথা একেবারেই জানতেন না। আর যাঁরা জানতেন তাঁরাও হয় তো ধারাবাহিক গল্প উপন্যাস সিনেমার পাতা ছেড়ে প্রবন্ধের পাতাগুলিতে নজর দেওয়ার উৎসাহ বোধ করতেন না। তাই নতুন সিরিজটা সম্বন্ধে আমার যে মনোভাবই থাক না কেন, পাড়ার কারুর চোখে সেটা পড়েছে এমন আশা করি নি।

তাই যখন একদিন সকালে একটি কিশোরী মেয়ে এসে ভীরু ভীরু চোখে তাকিয়ে বললে—'আপনিই তো 'নবদিগন্ত' পত্রিকায় মহিলা সাহিত্যিকদের ওপর লিখছেন?'

তখন অবাক হয়ে গেলাম খুব। বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠে জবাব দিলাম—'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি?'

মেয়েটি এবার একটু সলজ্জ হেসে বললে—'আমার নাম অঞ্জলি রায়, ওই পুবের দিকের মাঠটার ওপারে আমাদের বাড়ি। নবদিগন্ত আমি প্রায়ই পড়ি। আপনার লেখা আমার খুব ভালো লাগে।'

এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি থেমে গেল। মনে হোল ও কিছু বলতে চায়—ভরসা পাচ্ছে না। মেয়েটির আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখলাম। লম্বা একহারা গড়ন—শ্যামলা রঙের মুখখানা ভারি মিষ্টি। পরণে সাদাসিধে ডুরে একখানা। ভালো লাগলো মেয়েটিকে। ওকে সহজ হবার সুযোগ দেবার জন্য বললাম—'দাঁড়িয়ে কেন, বোসো। চা খাবে একটু?'

'না না—আজ থাক। আরেকদিন আসবো'—তারপর একমুহূর্ত দ্বিধা করে বললে—'একটা কথা বলতে এসেছিলাম—'

'বেশ তো, বলো—'

'আপনি তো মহিলা সাহিত্যিকদের নিয়ে লিখছেন, আমার কাকীমার কথা লিখুন না কেন?'

'তোমার কাকীমা?'

'আমার কাকীমার নাম উমাশশী দেবী।' মেয়েটি ওর দ্বিধা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে দেখলাম। 'আপনি কি পড়েছেন ওঁর লেখা?'

উমাশশী দেবী? মনে করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। এই সিরিজটা শুরু করার পর বাংলা-সাহিত্যের মহিলা সাহিত্যিকদের ওপর বেশ কিছু মালমশলা ঘাঁটতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু কই, উমাশশী দেবী বলে কারুর নাম তো শুনি নি!

মেয়েটিকে সে কথা বলতে বাধলো, কিন্তু আমার দ্বিধা দেখে সে নিজেই অনুমান করে নিল উত্তরটা। বললে—'পড়েন নি তো? অবশ্য পড়বেন কি করে—কাকীমা তো বেশ কয়েক বছরের মধ্যে লেখেন নি কিছু। কিন্তু আমি এনেছি এই দু'টো পুরোনো মাসিক পত্রিকা। কাকীমার লেখা গল্প আছে এতে। পড়বেন?'

শাড়ির আঁচলের নীচে লুকিয়ে রাখা দু'টো বিবর্ণ মাসিক পত্রিকা বার করলো ও। নাম দেখলাম—'কাকলী'। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। হয় তো এর পরই 'কাকলীর' কণ্ঠ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

পত্রিকা দু'টো আমার টেবিলে রেখে ও বললে—'আপনার সময় হলে একটু পড়বেন, কেমন? আমি পরে এসে নিয়ে যাবো।'

বলতে দ্বিধা নেই গল্প দু'টো যে পড়তে শুরু করেছিলাম তার প্রথম কারণ নেহাৎ মেয়েলী কৌতূহল—দ্বিতীয় অঞ্জলির মিষ্টিমুখখানা। তা ছাড়া পাতা উল্টে পাল্টে দেখেছিলাম গল্প দুটো বেশি বড়ো নয়।

ট্রামে এসপ্লানেড পৌঁছুবার আগেই শেষ করে ফেলা যাবে। তাই সেদিনই বেরুবার সময় কাকলীর সংখ্যা দু'টো আমার শান্তিনিকেতনী ঝোলাটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

কিছুদূর পড়েই কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম। গল্প দুটোর কাহিনীগত উৎকর্ষ হয় তো খুব একটা নেই—কিন্তু যা আছে তা হোল তীক্ষ্ণ ধীশক্তির সংগে গভীর অনুভূতির এক আশ্চর্য সমন্বয়। প্রকাশভংগীর পারিপাট্য ততো নেই—কিন্তু বুঝতে পারলাম একটু ঘষলে মাজলেই পাওয়া যাবে এক নিখাদ হীরে। আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে, অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকেরও যখন জীবনবোধ নিতান্ত ভাসাভাসা তখন জীবনের মূলে পৌঁছুবার এমন সন্ধানীদৃষ্টি আর অনুভূতিশীল হৃদয় পাঠকদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল কি করে।

অঞ্জলি এলো দিন দুয়েক পরে। উৎসাহভরা গলায় জিজ্ঞেস করলো—'পড়েছেন আপনি ?'

বললাম—'পড়েছি বই কি—' কিন্তু তোমার কাকীমা এত চমৎকার লেখেন, তবে লেখা ছেড়ে দিয়েছেন কেন ?'

অঞ্জলির মুখটা এবার ম্লান দেখালো একটু। 'আমিও তো কতো বলি কাকীমাকে। কিন্তু কিছুতেই কলম ধরাতে পারি নি।'

বললাম—'চলো তোমার কাকীমার সংগে আলাপ করে আসি।'

'যাবেন ? চলুন না এক্ষুণি—' অঞ্জলিকে অসম্ভব খুশি দেখালো। 'কাকীমা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ফিরেছেন—'

'কাকীমা কি বাইরে কাজ করেন কোথাও ?'—কৌতূহল দমন করতে পারি না আমি।

'করেন বই কি—' বেশ গর্বের হাসি হাসে অঞ্জলি। 'এ পাড়ার বিনোদিনী মাইনর স্কুলের হেডমিস্ট্রেস উনি।'

এবার মনে পড়লো পাড়ার অনেকের মুখেই বিনোদিনী স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের প্রশংসা শুনেছি। অদ্ভুত নাকি ওঁর কর্মক্ষমতা। অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন স্কুলটার পেছনে। ফলে হয় তো শীগগিরই হাইস্কুল হবে এটা।

অঞ্জলিকে বললাম—'তোমার কাকীমার প্রশংসা তো সবার মুখে মুখে।'

'হবেই তো'—অঞ্জলি হেসে বলে। 'কি ভীষণ কাজের লোক কাকীমা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। আর শুধু কি বাইরে ? ঘরেও সব কাজ কাকীমা নিজে দেখাশোনা করেন। কি চমৎকার যে রান্না করেন কাকীমা'—

সারাটা পথ অঞ্জলি ওর কাকীমার প্রশস্তি গেয়ে চললো। ওদের বাড়িটা দেখলাম বেশ সুন্দর। ছোট্ট বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি—সামনে একফালি জমি। তাতে গোটা কয়েক ফুল আর পাতাবাহারের গাছ। কিন্তু বাগানের কোথাও একটি পাতা পড়ে নেই। বুঝতে পারলাম অঞ্জলির কাকীমার এদিকেও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রয়েছে।

আমাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে অঞ্জলি ভেতরে গেল। ঘরটায় আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই—খানকয়েক বেতের চেয়ার ও একটা বেতের টেবিল এম্‌ব্রয়ডারী করা টেবিলক্লথের ওপর সবুজ রঙের ফুলদানীতে গোটা কয়েক রজনীগন্ধা। দেয়ালে ঝুলছে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের ছবি। দরজায় কটকী পর্দা। সব মিলিয়ে এমন একটা বাহুল্যহীন ছিমছাম ভাব যে ভারি ভালো লাগলো।

একটু পরে ঘরে ঢুকলো অঞ্জলি—হাতে চায়ের ট্রে। পেছন পেছন এলেন উমাশশী দেবী। বলতে দ্বিধা নেই উমাশশী দেবীকে দেখে আমি একটু হতাশ হলাম। গোলগাল ভারিক্কী চেহারা, বিশেষ কোন প্রতিভার ছাপ নেই সেই মুখে। ঐ বয়েসের আরো পাঁচজন গিন্নীবান্নীর সংগে খুব একটা তফাৎ খুঁজে পেলাম না আমি। নমস্কার করে একটা চেয়ার টেনে বসলেন উনি। টি-পট থেকে চা ঢাললেন পেয়ালায়। তারপর একটু হেসে বললেন—'অঞ্জলির কাছে আপনার কথা শুনেছি। ও আপনার খুব ভক্ত। আমাকেও ঐ দলে ফেলতে পারেন। 'নবদিগন্ত' আমিও পড়ি—আপনার প্রবন্ধ সবার আগে।'

সংকুচিত হয়ে বললাম—'কিই-বা লিখি তার জন্য বাহবা দিয়ে আমায় অপ্রস্তুত করবেন না। আমি কিন্তু আজ আপনার কথা শুনতে এসেছি।'

'আমার কথা ?' বিস্মিত হলেন উনি।

আমার হাতে ছিল 'কাকলীর' সংখ্যা দু'টো। বার করে দিয়ে বললাম—'আপনার গল্প দু'টো পড়লাম। কি চমৎকার লেখার হাত আপনার। কিন্তু আজকাল লেখেন না কেন ?'

পত্রিকা দু'টো দেখে ওঁর মুখটা একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। কাঁপা গলায় বললেন—'কে আপনাকে দিলে এ পত্রিকা ? অঞ্জলি বুঝি ? অঞ্জলি—'

অঞ্জলি আগেই সরে পড়েছিল।

'আপনি অঞ্জলির ওপর রাগ করবেন না'—আমি বললাম। ও ভালোই করেছে। নয় তো কি করে জানতে পেতাম এতো ভালো লেখেন আপনি। আমার কথার জবাব দিন এবার। লেখেন না কেন আজকাল ?'

এবার একটু হেসে উনি বললেন—'কৈফিয়ৎ চাইছেন বুঝি ?'

'নিশ্চয়ই চাইছি। পাঠক হিসেবে।'

'আচ্ছা বলবো। কিন্তু চা-টা খান আগে। জুড়িয়ে যাবে।'

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে উনি আমার নিজের বিষয় দু' চারটে প্রশ্ন করলেন—বাড়িতে কে কে আছে—কবে পাশ করেছি—ইত্যাদি। তারপর আমার অজান্তেই কখন আলাপটা ব্যক্তিগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। উনি বলতে সুরু করলেন ওঁর স্কুলের কথা—কিভাবে একটু একটু করে স্কুলটা গড়ে তুলেছেন। বললেন এ পাড়ার সভা-সমিতির কথা। এ পাড়ার প্রথম বাসিন্দাদের মধ্যে ওঁরাও পড়েন। প্রথম যখন এলেন চারদিক খানা-ডোবায় ভর্তি ছিল। কত আবেদন-নিবেদন করে এদিকে বাসরুট করাতে হয়েছে ইত্যাদি।

গল্প করতে করতে কখন রাত হয়ে গেছল খেয়াল করি নি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলাম। আটটা বাজে। কালই যে আমার আগামী প্রবন্ধের প্রুফটা দেখে দেবার কথা।

বললাম,—'উঠি এবার। আমার একটু কাজ আছে। কিন্তু এতক্ষণ ধরে গল্প করলাম অথচ আপনার কথা কিছুই শোনা হোলো না।'

উমাশশী দেবী হাসলেন আবার। বললেন—'বারে আমার কথা নয় তো কার কথা হোল এতক্ষণ ? আমার স্কুল, কাজ, বাড়ি, ঘরদোর, পাড়া—এসবের মধ্যেই তো আমি রয়েছি। এগুলো বাদ দিলে আমার অস্তিত্ব কোথায় ?'

তর্ক তুলতে পারতাম। কিন্তু হাতে সময় ছিল না। বললাম—

'আজ বড়ো দেরি হয়ে গেছে—আপনার প্রশ্নের জবাব আরেক দিন দেবো।'

উনি নমস্কার জানিয়ে বললেন—'আসবেন কিন্তু আরেকদিন—'।

রাতে শুয়ে উমাশশী দেবীর কথাই ভাবছিলাম। উনি যে ইচ্ছে করেই আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু কেন? একবার মনে হোল হয় তো লেখাটা ছিল উমাশশী দেবীর সাময়িক খেয়াল। কিংবা ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখবার প্রবল বাসনা চরিতার্থ করার উপায়মাত্র। অল্পদিন পরেই সে খেয়াল সে বাসনা মিলিয়ে গেছে। কিন্তু যতোই ঐ গল্প দু'টোকে নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম, ততোই এ কথাটা পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে নেহাৎ সাময়িক খেয়ালের বশে অমন লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু তবে কেন উনি লেখা ছেড়ে দিলেন?

একে মেয়েলীমন, তায় সাংবাদিকবৃত্তি। কাজেই কৌতূহলটা দমন করা আমার পক্ষে কষ্টকর হোলো। তাই ঠিক করলাম আবার দেখা করবো ওঁর সঙ্গে। কিন্তু মনে হোলো হয় তো ওঁর বাড়িতে গেলে নানা অজুহাতে আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন না উনি। শিষ্টাচার আতিথেয়তার দুর্গে আত্মগোপন করবেন। তা ছাড়া হয় তো আত্মীয় পরিজনদের উপস্থিতিতে নিজের অন্তরকে মেলে ধরতে সংকোচবোধ করবেন উনি।

অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম স্কুলেই ওঁকে ধরতে হবে একদিন। অবশ্য একেবারে স্কুলের মধ্যেও ঠিক সুবিধা হবে না তা জানতাম। তাই একদিন বিকেলে ছুটির ঘণ্টায় বিনোদিনী স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ারও আধ ঘণ্টাটাক পরে বেরিয়ে এলেন উমাশশী দেবী। আমাকে দেখে দু' চোখ কপালে তুলে বললেন—'এ কি, আপনি এখানে? কাউকে নিতে এসেছেন বুঝি? কিন্তু বাচ্চারা তো সব চলে গিয়েছে।'

বললাম—'না, কাউকে নিতে আসি নি, আপনার সংগে দেখা করতে এসেছি।'

'আমার সংগে?' আরো বিস্মিত শোনালো ওঁর কণ্ঠস্বর। 'জরুরী কোন কথা আছে কি?'

'হ্যাঁ, একরকম জরুরীই বটে।'

'বেশ তো, চলুন আমাদের বাড়ি—'

আমি বললাম—'আপনি আসুন না আমার সংগে—'

'আপনার সংগে? কোথায়?'

আমি একমুহূর্ত দ্বিধা করলাম। একটু এগিয়ে গেলেই পাড়ার বিজয়-কেবিন—হয় তো পর্দা-ঢাকা খুপরীও মিলবে। কিন্তু বিনোদিনী স্কুলের হেডমিস্ট্রেসকে নিয়ে বিজয়-কেবিনে ঢোকা অসম্ভব। যদিও ঐ রকম একটা পরিবেশেই হয় তো উমাশশী দেবী ওঁর মনের কথা বলতে পারতেন। একটু ভেবে বললাম—'চলুন না—আজ আমাদের বাড়ি—'

খানিক ইতস্তত করে উনি বললেন,—'আচ্ছা, চলুন—'।
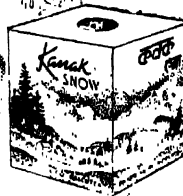
বাড়ি এসে ওঁকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। টেবিল আর বিছানার ওপর বই-খাতার স্তূপ দেখে উনি বললেন—'পড়াশোনা করেন খুব দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বইগুলিকে গুছিয়ে রাখেন না কেন ?'

লজ্জা পেয়ে বললাম—'আমি ভীষণ অগোছালো—'

'দাঁড়ান, আমি গুছিয়ে দিচ্ছি'—বলে উনি বই গোছাতে লেগে গেলেন—।

বললাম—'চা আনি আপনার জন্যে ?'

'তা আনুন। চা নইলে গল্প জমে না—'।

চা নিয়ে এসে দেখি এর মধ্যেই আমার ঘরের ভোল পাল্টে ফেলেছেন উমাশশী দেবী। বই-খাতা সব নিপুণভাবে গোছানো। জয়পুরী ফুলদানীটা দেয়ালের তাক হতে টেবিলে নেমে এসেছে। বিছানার চাদরটা টানটান করে পাতা। আমায় বললেন—'ফুলদানীটা খালি দেখছি। আমার ওখানে রজনীগন্ধা রয়েছে অনেক। অঞ্জলির হাতে পাঠিয়ে দিই যদি আপত্তি হবে না তো ?'

ওঁকে এভাবে কাজ করতে দেখে আমার ভারী অপ্রস্তুত লাগছিল। মনে মনে স্বীকার করতে হোল যে আমার একটুও দূরদৃষ্টি নেই। নয় তো ওঁকে আনতে যাবার আগে ঘরখানা একটু গুছিয়ে যেতে পারতাম। অবশ্য তখন ভাবি নি যে ওঁকে এখানে আনবো।

আমার সংকোচটা বোধ হয় ওঁর চোখে ধরা পড়েছিল। বললেন—'আপনি লজ্জা পাচ্ছেন বুঝি ? কিন্তু লজ্জা পাবার কি আছে। আপনার বয়েসে আমিও অগোছালো ছিলাম। আর এখন যেটা দেখছেন সেটা একটা বদাভ্যাস মাত্র। কাজ ছাড়া থাকতে পারি নে আমি। যাক্ এ-সব কথা। চা জুড়িয়ে গেল। শুরু করি আসুন।'

চা-য়ে চুমুক দিয়ে বললেন—'বেশ হয়েছে চা-টা। আপনি করেছেন বুঝি ?'

আমি বুঝতে পারলাম যে এই প্রসংগটুকু নেহাৎ আমাকে সহজ করার প্রচেষ্টা মাত্র। ভদ্রমহিলার বুদ্ধি আছে এবং রয়েছে সহৃদয়তা।

একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন—'কই আপনার জরুরী কথা বললেন না ?'

'বলছি। কিন্তু তার আগে কথা দিন যে আপনি উত্তরটা এড়িয়ে যাবেন না ?'

'বেশ তো জুলুম দেখছি'—হাসলেন উনি। 'সব কথার কি উত্তর আছে ?'

বললাম—'নিশ্চয়ই আছে। কখনো প্রকাশ্যে—কখনো বা অপ্রকাশ্যে। বলুন এবার, লেখা ছাড়লেন কেন ?'

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন—'কেন জানতে চান এ-কথা, বলুন তো ?'

'জানতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।'

'শুধুই কৌতূহল ? না নতুন কোন সিরিজের মালমশলা যোগাড় করছেন ? তা যদি করেন—তা'হলে কিন্তু সিরিজটার নাম দিতে হবে—যে ফুল না ফুটিতে—'

দেখলাম উমাশশী দেবীর চেহারাটা গোলগাল হলেও কথাগুলো বেশ ধারালো। বললাম—'ঠাট্টা করে কথাটা এড়িয়ে যাবেন না। বলতে আপত্তি কিসের আপনার ? এত ভালো লিখতেন—কেন বঞ্চিত করলেন পাঠকদের ?'

এবার উনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। চায়ের পেয়ালায় চামচটা নাড়তে নাড়তে বললেন—'পাঠকদের কথা জানি না—কিন্তু নিজে বঞ্চিত হয়েছি এটা অস্বীকার করবো না—'

'কিন্তু কেন ?'

হাসলেন উনি। কিন্তু মুখখানা করুণ দেখালো। বললেন—'আর লিখতে পারলাম না—তাই।'

'তার মানে ?'

'মানে তো সোজা। কলমে আর লেখা এলো না—'

'বাঃ, তাও কখনো হয় না কি ?'

'কখনো কখনো হয় বৈ কি।'

উমাশশী দেবীর উত্তরটা কিন্তু আমাকে হতাশ করলো। আমি ভেবেছিলাম হয় তো ওঁর সাহিত্যিক জীবনের সমাপ্তির পেছনে লুকিয়ে আছে কোন বেদনাবিধুর ঘটনা। আর সেই বেদনাবিধুর ঘটনা থেকে ছোটখাট একটা ফিচার লিখতে পারবো এ বিশ্বাস আমার ছিল—যদিও কথাটা ওঁর কাছে স্বীকার করি নি। সুতরাং সাংবাদিক হিসেবে আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল না বলা চলে। ভাবলাম এই প্রসংগের এখানেই দাঁড়ি টানবো। কিন্তু সেই মুহূর্তে হঠাৎ ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কি অপরিসীম বেদনার ছাপ সেই মুখে। কে বলবে এই মুখখানাকেই একটু আগে নিতান্ত সাদামাটা বলে মনে হয়েছিল। তীব্র বেদনা কি আমাদের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ওপরে তুলে ধরে—হোক তা যতো ক্ষণিকের জন্য।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। তারপর উনি নিজেই বললেন—'কই, আর তো কিছু জিজ্ঞেস করলেন না ?'

বললাম,—'কোন অধিকারে এগুবো ভাবছি।'

আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে উনি বললেন—'আপনি বয়েসে অনেক ছোট—আমি তো প্রায় গত যুগের লোক। তবু কি আশ্চর্য জানেন ? আপনিই প্রথম জিজ্ঞেস করলেন কেন লিখি নে। আত্মীয়-পরিজনেরা অনেকেই অনেকবার লিখতে উপদেশ দিয়েছেন—কিন্তু কেন লিখলাম না সে কথা এমন করে জানতে চায় নি কেউ।'

কি মনে হোল, বললাম—'জানতে কিন্তু পারি নি এখনো—'

নিশ্বাস ফেললেন উমাশশী। তারপর বললেন,—'হ্যাঁ, বলবো আপনাকে। হয় তো বুঝতে পারবেন—হয় তো না। কিন্তু আমার মনের ভার কমবে খানিকটা।'

একটুখানি চুপ করে থেকে উনি বলতে সুরু করলেন।—

'লেখার হাত আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল, কিন্তু সে লেখা থেকে বাহবা যত না পেয়েছি, মনে মনে আনন্দ পেয়েছি অনেক বেশি। আর আমার কলমে যতো না লেখা হোত তার চেয়ে ঢের বেশি লেখা হোত মনে মনে। নিজের মনে একটা কল্পনার রাজ্য গড়ে তুলেছিলাম আমি—সেখানে জন্ম নিতো কত বিচিত্র চরিত্র, কত বিচিত্র তাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না। মাটির পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগ থেকেও নেই, মনে মনে সে সব চরিত্রকে গড়তাম ভাঙতাম আমি—তাদের জীবনের সুতোগুলো মিশিয়ে নানা নক্সা তৈরি করতাম। এই জগৎ ছিল

একান্ত আমার, নিজস্ব। কেউ জানতো না এর কথা। অনেকবার মনে হয়েছে, আমার কল্পনার রাজ্যটিকে কালির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলবো, কখনো কখনো হয় তো চেষ্টাও করতাম, কিন্তু প্রতিবারই মনে হোত কালি-কলমে যা ফুটে উঠেছে তা আমার কল্পনার রাজ্যের ছায়ামাত্র, কায়া নয়।

তবু একথা স্বীকার করবো—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একদিন না একদিন কালি-কলমের মারফৎ আমার কল্পনার রাজ্যের কায়াটিকেই ফুটিয়ে তুলতে পারবো।

ম্যাগাজিনে দু'একটা লেখায় বেশ নাম হয়েছে এমন সময় আমার বিয়ে হোল। আর সেই সঙ্গে আমার পুরোণো জীবনেরও হোল ইতি। না, পড়াশোনা ছাড়লাম না অবশ্য। বরঞ্চ আমার স্বামীর আগ্রহে প্রাইভেটে বি-এ দেবার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। দেখলাম আই-এ অবধি হেলাফেলা করে পাশ করে এসেছি। এবার একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। আমার স্বামীর ইচ্ছা ছিল যেন আমি বেশ কৃতিত্বের সংগে পাশ করি—কারণ আমার পড়া নিয়ে আত্মীয়-পরিজনেরা অনেকেই বেশ বাঁকা বাঁকা কথা বলেছিলেন। হাজার হলেও সে যুগের কাল তো! শাশুড়ি ভাবতেন ঘরের কাজে ফাঁকি দেবার জন্য আমি পড়ার বাহানা তুলেছি।

আমার স্বামী বললেন—'মার ধারণা যে মিথ্যে এটা তুমি প্রমাণ করে দাও উমা—'

কাজেই পড়তে বসতাম রাত দশটার পর আর ভোর চারটেয় উঠে। বাকি সময়টা শাশুড়ির অন্যান্য পুত্রবধূদের মতোই ঘরকন্নার কাজে লেগে থাকতাম। অবশ্য এ কথা বলছি না যে এসব কাজ আমার খারাপ লাগতো। বরঞ্চ, নতুন নতুন সংসার করার আনন্দে অতিতুচ্ছ কাজেও আনন্দ পেতাম আমি। তা ছাড়া স্বামীর আদরে-সোহাগে মনটা এতোই ভরে থাকতো যে, ওদের সংসারকে খুশি করার জন্যে প্রাণ-মন ঢেলে কাজ করতে ইচ্ছে হোত। ফলে প্রশংসাও জুটতে লাগলো বেশ। আত্মপ্রসাদে আমার বুক ভরে উঠলো। আরো খাটতে লাগলাম সংসারের জন্য। কখন যেন সবার অলক্ষ্যে সংসারের দায়-দায়িত্ব প্রায় সবটুকুই আমার ওপর এসে পড়লো। মনে হতে লাগলো এক একটা দিন চব্বিশ ঘণ্টার না হয়ে আটাশ ঘণ্টায় হোক না কেন।

বলাই বাহুল্য, এত ব্যস্ততার মধ্যে কলম নিয়ে প্রায় বসতেই পারতাম না। আমার মনের কল্পনার রাজ্য কিন্তু তখনো অটুট ছিল। বরঞ্চ যতোই জীবনের কাছাকাছি আসতে লাগলাম ততোই তার অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় হাসি-কান্নার টানাপোড়েন দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি। আমার কল্পনার জালে জেগে উঠলো নতুন নতুন নক্সা। সেই নক্সাগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো মনের মধ্যে। খুশিমনে ভাবলাম এইবার আমার মনের ভাবনাগুলি কায়া নেবে। হয় তো কখনো

কখনো নিয়েও ছিল। আপনি যে গল্প দু'টো পড়েছেন সে দু'টো এ সময়কারই লেখা।

লিখতে সময় পেতাম না, এজন্য কিন্তু আমার আফশোষ ছিল না। আমি ভাবতাম একদিন সময় করে কলম নিয়ে বসলেই বন্দী হবে আমার মুক্ত-বিহংগম ভাবনাগুলো। কিন্তু ক্রমশ সেই একটুকু সময় পাওয়াই কঠিন হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে সসম্মানে বি-এ পাশ করেছিলাম আমি। পরীক্ষার ভাবনা চুকলো—ভাবলাম এবার কলম নিয়ে বসবো। কিন্তু জীবনের দাবী কি অত সহজে মেটবার? সে বছরই আমার প্রথম সন্তান কোলে এলো। প্রথম মা হওয়ার যে কি অপূর্ব অনুভূতি তা হয় তো ঠিক আপনি বুঝতে পারবেন না। আমার দেহের অস্থিমজ্জা দিয়ে গড়ে উঠেছে এক নতুন জীবন—আর একটু একটু করে আমারই স্নেহচ্ছায়ায় সে জীবন পল্লবিত হয়ে উঠেছে—এই অনুভূতি এই বোধ, হয় তো মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে বিস্ময়কর অনুভূতি।

সেই অনুভূতির জোয়ারে যে আমার সবটুকু সময়ই ভেসে গেল তা নয়—ভেসে গেল আমার মনের একান্ত কল্পনার জগতটি। অথচ জানতেও পারলাম না আমি। কচি একটা অসহায় প্রাণের একান্ত নির্ভরতা শুধু আমার কাজকে নয় চিন্তাকেও পরিব্যাপ্ত করে তুলল। খোকা একটু বড় হতে না হতেই কোলে খুকু এলো, তারপর আবার খোকা। এমনি করে ক'টা বছর আমি বিভোর হয়ে রইলাম।

আমার স্বামী কিন্তু মাঝে মাঝে অনুযোগ করতেন—'উমা তুমি আজকাল একদম লিখতে বসছো না। মাঝে মাঝে লেখ না কেন? অমন একটা ক্ষমতাকে নষ্ট করছ।'

ছোট্ট খোকাকে কোলে দোলাতে দোলাতে বলতাম—'ভাবছ কেন, এরা বড়ো হলেই লিখব।'

তখনও আমি ভাবতাম সময় পেলেই আমি লিখতে পারবো। বুঝতেও পারি নি আমার কল্পনার উৎসটা কখন শুকিয়ে গেছে। জীবনের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী হয়ে গেছি আমি।

কিন্তু জীবনের জাল তো খোলেও একদিন। আমার খোকা-খুকুরা বড়ো হতে লাগলো আর একটু একটু করে নিজের জগৎ আবিষ্কার করতে লাগল ওরা। সে জগতের কেন্দ্রবিন্দু থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেলাম আমি। এদিকে সংসারের অবস্থাও স্বচ্ছল হয়েছিল খানিকটা, ফলে ঘরের কাজের জন্য ঝি-চাকর বহাল হোলো। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম আমার হাতে অনেক—অনেক সময়। এত সময় নিয়ে কি করি?

আমার স্বামী বললেন—'এবার লেখা শুরু করো দিকি! অনেক তো খাটলে সংসারের পেছনে'—

অনেক—অনেকদিন বাদে ফের কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। ছেলেমেয়েদের হোমটাস্ক, মুদী-গয়লার হিসেব, আত্মীয়-স্বজনের চিঠির উত্তর, সবগুলি যেন পেছনে ফেলে এসেছি—। মনটা হাল্কা মনে হচ্ছিল। জানালাটা খুলে দিতে এক দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকলো। খুশিমনে কলম ধরলাম আমি।

কিন্তু কি লিখবো।

একমিনিট, দু'মিনিট, দশমিনিট কেটে গেল, মনের মধ্যে অজস্র ভাবনা তালগোল পাকিয়ে গেল কিন্তু কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না কি লিখবো।

স্বামী বললেন—'এতদিনের অনভ্যাসের ফল এটা। দিন কয়েক আপন মনে ভাবো দিকি। দেখবে লেখার মালমশলা পেয়ে গেছ। গাইয়েদেরও কিছুদিন না গাইলে অমনি হয়। শেষে দিন কয়েক রেয়াজ করলেই আবার সব ঠিকঠাক। এও তেমনি আর কি—'

কিন্তু আমার স্বামী একটু ভুল করেছিলেন। রেয়াজ করে বিকল স্বরযন্ত্রকে চালু করা যায় অবশ্য—কিন্তু দিনের পর দিন আকাশ-পাতাল ভাবলেই কি পাওয়া যায় কল্পনার সোনার কাঠি? যায় না। তাই নিজের মনের গহনে অনেক খুঁজে বেড়িয়েও পেলাম না আমার পুরোনো দিনের কল্পনার জগতটিকে। আমার অজান্তে তা কখন মিলিয়ে গেছে। নিজেকে ভীষণ রিক্ত, অসহায় মনে হতে লাগলো। মনে পড়লো কতদিন ভেবেছি ইচ্ছে করলেই সেই জগতের বিচিত্র নক্সাকে কালি-কলমে ফুটিয়ে তুলতে পারবো। ভেবেছিলাম মনের সিন্দুকে চিরকাল জমা হয়ে থাকবে তা। সেই অহংকারের ফলেই কি মায়া হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল আমার কল্পনার রাজ্যের পাত্র-পাত্রীরা?

স্বামী বললেন—'কল্পনাকে আশ্রয় করেই লিখতে হবে এমন কি কথা আছে? আজকাল তো বাস্তবকে নিয়েই লেখে সবাই। তুমিও লেখ না কেন, চারপাশে যা দেখছ?'

অগত্যা সে চেষ্টাই করতে লাগলাম। একটা গল্প লেখাও হোলো, খানিকটা স্বামী পড়ে বললেন—'এই তো বেশ হয়েছে—'

কিন্তু গল্পটা কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই থেমে গেল। কারণ? কারণ যে ঘটনাটিকে আশ্রয় করে লিখেছিলাম আমি—বাস্তবে তার সেখানেই ইতি। কিন্তু কাগজে-কলমে লিখে যতবারই পড়লাম—মনে একটা অতৃপ্তি খোঁচা দিতে লাগলো। মনে হোলো এ গল্পের এখানে শেষ হতে পারে না—এ গল্পকে আরো একটু এগুতেই হবে।

কিন্তু কোন দিকে? কতটুকু? তার হদিশ পেলাম না আমি। অনেক—অনেক চেষ্টা করেও না। যে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বাস্তবর্জিত ভব সাহিত্যের জীবন হয়ে ওঠে, সে সোনার কাঠিই আমি হারিয়ে ফেলেছি।

একটু একটু করে এই নিদারুণ সত্যটা আমার কাছে ধরা পড়লো। ফুরিয়ে গেছি আমি। একেবারেই। হয় তো একদিন আমার মধ্যে সম্ভাবনা ছিল, শক্তি ছিল। কিন্তু সে শক্তি আমার অগোচরেই কখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। একটা হাউই-এর মতো একটুখানি জ্বলে উঠেই একেবারে নিভে গেছি আমি। এরপরও কি আমার লিখতে বলবেন?'

উমাশশী দেবী থামলেন। বাইরে সন্ধ্যে নেমে এসেছে। অন্ধকারে ওঁর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। বললাম—'আলোটা জ্বালি?'

'চাইলেই কি সব সময় আলো জ্বালানো যায়? বোধ হয় না। আচ্ছা, আমি এখন। কেমন?'—অন্ধকারেই উঠে দাঁড়ালেন উমাশশী দেবী।

বিজ্ঞান বার্তা

ভিটামিন বি ১২

ভিটামিনের আবিষ্কার বেশিদিনের কথা নয়। মাত্র চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত শারীর-বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে শর্করা, স্নেহ এবং প্রোটিন জাতীয় খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে থাকলেই আদর্শ খাদ্য হয়। এর সঙ্গে অবশ্য পরিমাণ মতো ধাতব লবণ এবং জলও থাকা চাই, কিন্তু যখন পরীক্ষিত প্রাণীদের শুধু এই ধরণের রাসায়নিক ভাবে বিশুদ্ধ খাদ্য দেওয়া হয়, তখন দেখা যায় যে তারা শেষ পর্যন্ত মারা যাচ্ছে। এর থেকে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন যে, প্রাকৃতিক খাদ্যে এমন কতগুলি বস্তু আছে, যা জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। এই পদার্থগুলিকেই পরে ভিটামিন নামে অভিহিত করা হয়।

এরপর বিজ্ঞানীরা নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন যে, কোন ভিটামিনের অভাবে কি রোগ হচ্ছে। এই রকম ভাবে অনুসন্ধান করে তাঁরা দেখলেন যে, লিভারে বা যকৃতে এমন একটি ভিটামিন আছে যার ঘাটতি পড়লে প্রাণী দেহে পারনিসিয়াস এ্যানেমিয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তাঁরা আরও লক্ষ্য করে দেখলেন যে, এই বস্তুটির মধ্যে খনিজ পদার্থ কোবাল্ট আছে। এই জন্য ভিটামিন বি ১২-কে 'কোবালামিন'ও বলা হয়।

আধুনিক জৈব-রসায়ন যে কতখানি উন্নত হয়েছে, এই কোবালামিনের রাসায়নিক গঠনের কথা ভাবলেই বোঝা যায়। এর ভিতরে একটি নিউক্লিওটাইড আছে এবং এর সঙ্গে লেগে আছে এ্যামাইনো প্রোপানল। এই এ্যামাইনো প্রোপানল আবার প্রোপিয়নিক এ্যাসিডের সাথে যুক্ত আছে আর এটাও আবার যুক্ত আছে পরফাইরিন জাতীয় একটি পদার্থের সঙ্গে। এই পরফাইরিন জাতীয় গঠনের মধ্যস্থলে আছে খনিজ পদার্থ কোবাল্ট এবং এর সঙ্গে যুক্ত আছে এই পরফাইরিনের নাইট্রোজেন এবং নিউক্লিওটাইডের সায়ানাইড ও এজল (Azal) রিং। এই কোবালামিন অতি সহজেই প্রোটিনের সাথে যুক্ত হতে পারে এবং এইভাবে প্রোটিনের শোষণে (absorption) সাহায্য করে।

আমাদের দেহের অন্ত্রের মধ্যে যে সব ব্যাকটিরিয়া আছে তারা এই ভিটামিন তৈরি করতে পারে। কিন্তু এর শোষণ নির্ভর করে একটি অন্তর্নিষ্ঠ বস্তুর (intrinsic factor) উপর এবং এটি আমাদের স্যালাইভা এবং পাকস্থলীর রসে থাকে। এর রাসায়নিক গঠন সঠিকভাবে জানা যায় নি, তবে এটুকু দেখা গেছে যে এটি গ্লাইকো-প্রোটিন্ জাতীয়। পারনিসিয়াস এ্যানেমিয়া হলে এই অন্তর্নিষ্ঠ বস্তুটি স্যালাইভা এবং পাকস্থলীর রস থেকে অন্তর্হিত হয়, আর তারই ফল-স্বরূপ এই রোগ দেখা দেয়। সাধারণ অবস্থায় কোবালামিন মূত্রের সংগে থাকে না। তবে যখন এটি সরাসরি শিরার মধ্যে সূচিবিদ্ধ করে দেওয়া হয়, কেবল তখনই মূত্রে এটির উপস্থিতি দেখা যায়। মায়েদের দুধে কিন্তু সাধারণ অবস্থাতেই এটি পাওয়া যায়। যকৃতে এই ভিটামিন বেশ খানিকটা সঞ্চিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের মধ্যে পশুর যকৃতে, বৃক্কে, দুধে, হৃৎপিণ্ডে এবং ডিমে এই ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ দেহে এই ভিটামিন পাওয়া যায় না।

শরীরে এর ঘাটতি পড়লে ওজন কমে যায়, শরীরের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। সব সময় দুর্বল মনে হয়, প্রজনন ক্রিয়ায় বাধা ঘটে, রক্তে মেগাকেরিওসাইটের সংখ্যা কমে যায় এবং রক্তাল্পতা দেখা যায়। এ ছাড়াও স্নায়ুরজ্জুর কয়েকটি বিশেষ অংশে ডিজেনারেশন হয়, জিভে এবং মুখে প্রদাহও হয়।

ভিটামিন বি ১২ শরীরে অনেক রকমের কাজ করে। তবে এদের সবচেয়ে বড় কাজ লোহিত-কণিকা গঠনে সাহায্য করা। এই সায়ানোকোবালামিন এবং ফোলিক্ এ্যাসিড একযোগে লোহিত-কণিকার নিউক্লিক এ্যাসিড তৈরি করতে অংশগ্রহণ করে এবং মেগালোব্লাস্ট-এর পরের স্তর থেকেই এই সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এদের অনুপস্থিতিতে হাড়ের মধ্যে মেগালোব্লাস্ট সেলগুলি একত্রিত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে ম্যাক্রোসাইটিক্ এ্যানেমিয়া হয়।

যদিও বৃহদন্ত্রে এই ভিটামিন বেশ কিছু পরিমাণে প্রস্তুত হয়, তবুও সেখান থেকে এর শোষণ খুব কমই হয়ে থাকে এবং এইজন্যই আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যের সংগে এই ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে নেওয়া উচিত।

—শক্তিপদ সেনগুপ্ত।

মহাকাশ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

(পৃথিবীর ৬০টি রাষ্ট্রের উদ্যোগে)

আমেরিকার জাতীয় বিমানবিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা বা ন্যাশন্যাল আরোনটিক্স এ্যাণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাতে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র কতটুকু বা লাভবান হয়েছে? তা ছাড়া ১৯৫৯ সালে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র বা বিজ্ঞানীরা যদি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ ও উপগ্রহের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যসন্ধানে ব্রতী হন তবে তাতে জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা তাদের সাহায্য করতে পারেন বলে প্রস্তাব করেছিলেন সেই প্রস্তাবই বা কার্যক্ষেত্রে কতটুকু প্রয়োগ করা হয়েছে।

তবে সুখ ছেড়ে দুঃখকে মানুষ কেনই বা বরণ করে নেয়, মরণ সমুদ্রে কেন ঝাঁপ দেয়, চাঁদ ধরার প্রয়াসই বা পায় কেন—কেন এই মহাকাশযাত্রার দুঃখময় প্রচেষ্টা এ সব প্রশ্নের উত্তরে নোবেল পুরস্কার

বিজয়ী প্রখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যারল্ড উরে বলেছেন : 'মানব চরিত্রের মধ্যে মহাকাশ পরিকল্পনা গ্রহণের কারণ নিহিত রয়েছে। মানুষ চিরদিনই অজানাকে জানতে, জীবনের সকলক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করতে চেয়েছে, সমগ্র মানবেতিহাসেই রয়েছে তার পরিচয়।

আজ মহাকাশ পরিকল্পনা রূপায়ণে বিশ্বের বহু দেশ ব্রতী হয়েছে এবং এ ব্যাপারে ঐ সব রাষ্ট্রকে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা ১৯৫৯ সালের প্রস্তাবে ১৯৫৯ সালের তুলনায় সংস্থা আরও অনেকখানি এগিয়ে গেছে। প্রায় ষাটটি রাষ্ট্র ব্যক্তিগত বা আঞ্চলিকভাবে এই তথ্যসন্ধানী সামবায়িক উদ্যোগে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

সংস্থা ঊর্ধ্ব আবহমণ্ডল এবং আয়োনোস্ফিয়ার (পৃথিবী থেকে ২৫ মাইল ও তার ঊর্ধ্বস্তর) সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী পরীক্ষামূলক রকেট প্রেরণের পরিকল্পনাকে রূপদান করছে।

এই সংস্থার সাহায্যে দশটি রাষ্ট্র কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন এবং তাঁদের নিজেদের পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে রূপদান করছে। সংস্থার রকেটের সাহায্যে ঐ সব রাষ্ট্রের তথ্যসন্ধানী উপগ্রহসমূহ মহাকাশে প্রেরিত হচ্ছে। তাদের গবেষণায় সাহায্য করা হচ্ছে।

এই পৃথিবীর সব মানুষ একই আলো-হাওয়া-জলে সঞ্জীবিত। আবহাওয়ার ঐ একটি সূত্রে বিশ্বের সব মানুষই বাঁধা। ১৯৬৪ সালে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাতটি 'টাইরাস' জাতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরিত হয়েছে। জাতীয় বিমান বিজ্ঞানী ও মহাকাশ সংস্থা ঐ সব উপগ্রহের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সরবরাহ করেছেন। বিভিন্ন দেশেরও আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্বাভাষ জ্ঞাপনের ব্যবস্থা আছে। টাইরাস প্রেরিত তথ্যাদি পাওয়ার ফলে তাদের ব্যবস্থা উন্নততর হয়েছে! বিশ্বের চল্লিশটি রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার সাহায্য পাচ্ছেন এবং সংস্থার এই আন্তর্জাতিক পরিকল্পনায় সহযোগিতা করছেন।

আবহাওয়া সম্পর্কে ঐ তথ্যসন্ধানের ব্যাপারে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নেরও সহযোগিতা করছেন। এ-সম্পর্কে এই দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে এ বিষয়ে পর্যালোচনার ফলে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১। উভয় রাষ্ট্রেরই আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণে সহযোগিতা ও সংগৃহীত তথ্যের বিনিময়।

২। পৃথিবীর ভূচৌম্বক ক্ষেত্র নিরূপণের জন্য উভয় রাষ্ট্র কর্তৃক কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ ও তথ্য বিনিময়।

৩। ইকো জাতীয় নিষ্ক্রিয় কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ সম্পর্কে গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহে মিলিত উদ্যোগ।

যুক্ত উদ্যোগে মহাকাশে মনুষ্যবাহী এক আরোহী ছাড়া মহাকাশযান প্রেরণসহ অন্যান্য বহু বিষয়েও তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাগ্রহণ, গবেষণা ও ট্রেনিং ব্যাপারে সাহায্য করছে। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহের অবস্থিতির সন্ধান ও তাদের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সংস্থা করেছেন। ১৯৬৩ সালে ষাটটিরও বেশি রাষ্ট্রের বহু স্নাতক, অধ্যাপক ও ইঞ্জিনীয়ার এ নিয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা পেয়েছেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান-মহাকাশ সংস্থার সহযোগিতা সম্পর্কে সংস্থার দপ্তরের ডিরেক্টার ডাঃ হোমার ইমেওয়েল বলেছেন যে, 'এতে কোন আর্থিক লেনদেনের ব্যাপার নেই। আমরা এ ব্যাপারে কাউকে অর্থ-সাহায্য দেই না কোন অর্থও কারোর কাছ থেকে নেই না।'

প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজস্ব ব্যবস্থা অনুসারে মহাকাশ পরিকল্পনা কার্যকরী করার চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে তাদের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করার জন্য যতটুকু প্রত্যক্ষ সাহায্য করা যায় ততটুকু সাহায্য করা হচ্ছে। সংস্থার অনুরূপ কোন পরিকল্পনাকে ঐসব দেশে রূপায়িত করা হচ্ছে না। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এ ছাড়া বৈজ্ঞানিক কর্মসূচীর আর একটি মোদ্দা কথা গবেষণার ফলে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে, যে সব ফল পাওয়া যায় তার উপর অধিকার বর্তে সমগ্র মানবজাতির। ঐসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয় পুস্তকে তা দ্বারা নিখিল মানব সমাজই উপকৃত হয়ে থাকে।

মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে মানুষ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ একত্রিত হলে আরও এগিয়ে যাওয়া যাবে, মহাকাশ যাত্রা হবে ত্বরান্বিত।

অনন্ত জ্ঞানের আধার ঈশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। এখানে বিশ্ব রহস্যের সন্ধান মানুষের ধী-শক্তির বলে সম্ভব হয়েছে।

বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনই বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। এই রহস্য উদ্‌ঘাটনই করতে গিয়ে মানুষ যে জ্ঞান সঞ্চয় করবে, মানুষের কল্যাণ কামনায় কার্যক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের প্রয়োগ হবে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যারও চরম লক্ষ্য। সুতরাং মহাকাশ সংক্রান্ত কার্যসূচীর রূপায়ণে সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা এখন যেরূপ অনুভূত হচ্ছে এ রকম আর হয় নি। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে মানুষের কল্যাণ সাধিত হলেই এর সার্থকতা।

—অনুসন্ধানী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এগার

॥ খ ॥

দুর্গাদেবীর প্রশ্নের কি জবাব দেবে শিবনাথ বুঝতে পারে না।

বুঝতে পারে না কি পরিচয় সে দেবে মৃন্ময়ীর।

মৃন্ময়ীও স্তব্ধ হয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিল।

অলিন্দের আলো মৃন্ময়ীর চোখে-মুখে পড়েছে। দুর্গাদেবী দেখেন অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী মেয়েটি।

বয়েসে কৈশোর বুঝি সবে উত্তীর্ণ হয়ে যৌবন ছুঁই ছুঁই করছে।

ঘটনার আকস্মিক পরিস্থিতিটা শিবনাথ ততক্ষণে কতকটা সামলে নিয়েছে। বলে, ওর সব কথা আপনাকে আমি বলবো মা। ওকে আপনাকে একটু আশ্রয় দিতে হবে।

কিন্তু আশ্রয়ের কথা নয়, দুর্গাদেবী তখন সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবছেন। অনিন্দ্যসুন্দরী মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবছেন বুঝি।

স্বামীর নজরে পড়েছে মেয়েটি।

স্বামীকে তিনি খুব ভালভাবেই চেনেন। নারী সম্পর্কে তাঁর মনোবৃত্তিটা একটু যেন বেশি রকমই উদার এবং সে দুঃখ ও লজ্জার ব্যাপারটা আর যার কাছেই হোক পুত্রের বন্ধুর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে বা পড়বার যেখানে ক্ষীণতম সম্ভাবনাও আছে, সেখানে ঐ মেয়েটিকে তিনি আশ্রয় দেবেন কোন দুঃসাহসে, সেই কথাটা মনে হওয়াতেই বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু মুখের 'পরে ওদের সে কথাটা বলতেও যেন পারেন না।

তা ছাড়া মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে মমতায় যেন মনটা কেমন হয়ে পড়ে।

বললেন, এসো—আমার সঙ্গে এসো—মা—

অন্দরমহলে ওদের নিজের ঘরে নিয়ে এলেন দুর্গাদেবী। তারপর ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখানে বোস তোমরা—ঠাকুরঘরটা গুছিয়েই আমি আসছি—

ওদের ঘরে বসিয়ে দুর্গাদেবী ঠাকুরঘরে চলে গেলেন।

স্বামীর সংসারের মধ্যে জড়িয়ে থাকলেও ইদানীং ঐ ঠাকুরঘরটিই যেন ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা ও শান্তির জায়গা—গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নেবার পর থেকে।

দিনমানে সংসারের নানা কাজের ভিড়ে পারেন না, কিন্তু রাত্রে সংসারের সব কাজ মিটে যাবার পর গিয়ে প্রবেশ করেন ঠাকুরঘরে।

অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে কেটে যায় এবং মধ্যে মধ্যে ঠাকুরঘরেই রাত হয়ত শেষ হয়ে যায়। গৃহদেবতা কালো কষ্টিপাথরের বালগোপাল—হামাগুড়ি দিয়ে হাত পেতেছেন নাড়ুর জন্য।

গোপালের সামনে চুপটি করে বসে থাকতেও বুঝি ভাল লাগে।

সেদিনও রাত্রে চুপটি করে বসেছিলেন গোপালের সামনে, বাইরে ঐ সময় মোক্ষদা দাসীর গলা শোনা গেল।

কেন এত রাত্রে দাদাবাবুকে দিয়ে কি হবে।

ভৃত্য কৈলাস বলে, দাদাবাবুর কে এক বন্ধু আর একটি মেয়ে এসেছে, দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছে দেখা করবে বলে।

বন্ধু আর একটি মেয়ে—এই এত রাত্রে দেখা করার সময় না কি—বলে দে গে—দাদাবাবু ঘুমাচ্ছে এখন দেখা হবে না। যত সব অনাসৃষ্টির কথা—রাত দুপুরে এসেছে দেখা করতে—

কিন্তু ততক্ষণে মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলেও দুর্গাদেবী আসন ত্যাগ করে উঠে পড়েছেন।

দাদাবাবুর বন্ধু ও একটি মেয়ে কথাটা তাঁর কানে গিয়েছে। বাইরে এসে দাঁড়ান।

ভৃত্য কৈলাস ফিরে যাচ্ছিল তাকে ডাকেন, কৈলাস—

মা?

কৈলাস ঘুরে দাঁড়াল।

কে এসেছে দাদাবাবুর কাছে বলছিলি?

সঙ্গে তার বন্ধু আর একটি মেয়ে—দ্বাররক্ষী বলছিল—

চল ত' দেখি কে!

কৈলাস বহির্মহলের দিকে এগিয়ে যায়, দুর্গাদেবী তার পিছনে পিছনে অগ্রসর হল।

ভুলে যান ঐ মুহূর্তে তিনি—যে অন্তঃপুরের বাইরে অত রাত্রে গৃহস্থবধূর পা বাড়ান রীতি নয় এবং কথাটা যেন তাঁর মনে পড়ে অন্দরমহল ও বহির্মহলের মধ্যবর্তী দ্বারপথ বরাবর পৌঁছে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি থমকে দাঁড়ান আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর কানে আসে স্বামীর ঈষৎ জড়িত কণ্ঠস্বর। ভোলা, দেখ ত' বারান্দায় দাঁড়িয়ে কারা?

স্বামী তা হলে ফিরে এসেছেন, ঠিক কি করবেন বুঝতে পারেন না দুর্গাদেবী—মুহূর্তের জন্য বোধ করি ইতস্তত করেন, তারপরই শান্ত-কণ্ঠে ভোলাকে নির্দেশ করেন, ভোলা ওদের ভিতরে পাঠিয়ে দে—

ঠাকুরঘরের কাজ কোনমতে সারতে সারতেই দুর্গাদেবী ভাবছিলেন অতঃপর ঐ মেয়েটির কি ব্যবস্থা করবেন।

আশ্রয়ের জন্য মেয়েটি এসেছে তাঁর কাছে এবং নিঃসন্দেহে বিপদে পড়েছে নচেৎ এত রাত্রে এমন করে ছুটে আসত না এখানে।

মেয়েটির মুখের করুণ অসহায় দৃষ্টি যেন দুর্গাদেবীর চোখের উপর ভাসতে থাকে। কোনমতে কাজ সেরে আবার ফিরে এলেন দুর্গাদেবী, যে ঘরের মধ্যে মৃন্ময়ী আর শিবনাথকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন সেই ঘরে। দেখলেন ক্লান্ত অবসন্ন মৃন্ময়ী মেঝেতে আঁচল পেতে ঘুমিয়ে পড়েছে আর তার শিয়রের কাছে অদূরে বসে আছে শিবনাথ, স্থির পাথরের মূর্তির মত।

মৃন্ময়ীকে ঘুমাতে দেখে বললেন, আহা, ঘুমিয়ে পড়েছে—

হ্যাঁ, মা—এতখানি পথ হাঁটা তো ওর অভ্যাস নেই। তার ওপর অনেকদিন ঘরের মধ্যে বন্দিনী ছিল।

বন্দিনী ছিল। সে কি?

হ্যাঁ—সে এক বিস্ময়কর কাহিনী।

দুর্গাদেবী সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন শিবনাথের মুখের দিকে।

শিবনাথ বলে, হ্যাঁ, মা, পর্তুগীজ দস্যু ওকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে ওর মা-বাবার কাছ থেকে—

কি বলছ তুমি শিবনাথ! বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না দুর্গাদেবীর।

শিবনাথ সংক্ষেপে মৃন্ময়ীর ইতিহাস বলে যায়।

স্তব্ধ হয়ে শোনেন সে ইতিহাস দুর্গাদেবী।

শিবনাথ বলতে থাকে, আজ সেই দস্যুই নিজের আওতার মধ্যে পেয়ে ওকে গ্রাস করবার জন্য উদ্যত হয়েছে।

কিন্তু লোকটা কে? সেখানে তুমি গেলে কি করে? ওর সঙ্গে পরিচয় হলোই বা কি করে তোমার?

আমিও যে সেই দস্যুর কাছেই ছিলাম এতদিন মা—

কি বলছো?

হ্যাঁ—মানুষটা এমন উদারচেতা যে কখনো কল্পনাতে ভাবতেও পারি নি তার ভেতরে অমন একটা জঘন্য অত্যাচারী—লোভী দস্যু লুকিয়ে আছে। মৃন্ময়ীর সব কথা না শুনলে সুন্দরসাহেবের সত্যিকারের পরিচয়টা হয়ত কোনদিনই পেতাম না। তাই পরিচয়টা পাওয়ার পর আর সেখানে থাকতে সাহস হলো না। ভাবছি কোথায় যাবো, কে আশ্রয় দেবে—হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়লো মা। মনে হলো পৃথিবীতে আর কোথায়ও আশ্রয় পাই বা না পাই আপনার কাছে পাবোই। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম ওর হাত ধরে—

বেশ করেছো।

ক্ষীণকণ্ঠে বললেন দুর্গাদেবী।

আমি জানতাম মা, ভুল আমি করি নি। আমি এখন নিশ্চিন্ত—ওকে আপনার পায়ের তলায় পৌঁছে দিলাম।

দুর্গাদেবী যেন একটু অন্যমনস্ক। কি যেন ভাবছিলেন।

শিবনাথ বলে, আমি তা হলে এখন যাই মা?

যাবে?

হ্যাঁ—

রাত শেষ হয়ে এলো। তা ছাড়া এখন তুমি যাবেই বা কোথায়? যেখানে এতদিন ছিলে সেখানে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে না?

না।

তবে?

আমার এক বন্ধু—জীবনকৃষ্ণ বৌবাজার অঞ্চলে থাকে—তার বাবা—ককরেল ট্রেল এণ্ড কোম্পানীর বেনিয়ান, তার ওখানে হয়ত কিছুদিনের মত আশ্রয় পেতে পারি। তারপর সুবিধামত একটা ব্যবস্থা করে নেব।

সে কাল যা করার করো। বাকি রাতটুকু খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে ঘুমিয়ে নাও। খাজাঞ্চি বুড়ো মহেশবাবু আছেন, বলে ডাকলেন, কৈলাস—

কৈলাস আশেপাশেই ছিল কর্ত্রীর ডাকে এগিয়ে এলো, মা—ডাকছিলেন?

হ্যাঁ—শোন্, ওকে খাজাঞ্চিবাবুর ঘরে নিয়ে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে দে—

চলেন বাবু—

শিবনাথ আর দ্বিরুক্তি করে না। কৈলাসের পিছু পিছু ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সত্যিই সে তখন অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করছে। একটু ঘুমাবার প্রয়োজন।

শিবনাথ চলে গেলে আবার তাকালেন দুর্গাদেবী মেঝেতে শায়িতা ও নিদ্রিতা মৃন্ময়ীর মুখের দিকে।

কমলকলির মত মুখখানি যেন। ক্লান্তিতে, অবসন্নতায় ও দুর্ভাবনায় যেন শুকিয়ে গিয়েছে।

মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে।

স্থান দিতে হবে মেয়েটিকে। স্থান নয় রক্ষা করতে হবে। কিন্তু নিজের গৃহে তা সম্ভব নয়।

সহসা মনে পড়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনাদিনাথ বসুর কথা।

ঠিক। দাদার কাছেই কাল পাঠিয়ে দেবেন ওকে দুর্গাদেবী। দাদার আশ্রয়েই ও নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

অনাদিনাথ ধনী ব্যক্তি—নিমকমহলের দেওয়ানী করে কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রচুর সম্পদ উপার্জন করেছেন।

তা ছাড়া শোভাবাজারের রাজবংশোদ্ভূত গোপীমোহন দেবের পুত্র বর্তমান রাজা রাধাকান্ত দেবের বিশেষ স্নেহভাজন ও প্রিয়পাত্র অনাদিনাথ। সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্ব দুই আছে অনাদিনাথের।

অনাদিনাথ কলকাতার সমাজের অন্যতম প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এবং দুর্গাদেবী জ্যেষ্ঠের মুখেই শুনেছিলেন কলকাতার সমাজ প্রধান দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন চালিয়েছে বর্তমানে।

রাজা রামমোহন রায়ের দল ও রাজা রাধাকান্ত দেবের দল। মতদ্বৈধের সৃষ্টি হয়েছে দুই দলের মধ্যে তিনটি প্রধান বিষয় নিয়ে।

যেমন ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন, সহমরণ প্রথার উচ্ছেদ এবং ব্রহ্মোপাসনা স্থাপন।

রাজা রামমোহন রায়ের দলের ঐ তিনটিই লক্ষ্য এবং ঐ তিনটি ব্যাপার নিয়েই আন্দোলন চালিয়েছেন আর অন্য দল রাধাকান্ত দেবের দল—তাঁদের মতে ঐ তিনটিই বর্জনীয়। নচেৎ সনাতন হিন্দুধর্মের উচ্ছেদ নাকি অবশ্যম্ভাবী অদূরভবিষ্যতে। তাই তিনি হিন্দুধর্মের রক্ষক রূপে অগ্রণী হয়েছেন। সমাজের এই দুদিনে শক্তমুঠিতে হাল ধরেছেন।

আর সেই রাধাকান্ত দেবের দলেরই অন্যতম পাণ্ডা আজ অনাদিনাথ। অনাদিনাথ শোভাবাজারেই বসবাস করেন।

দুর্গাদেবী স্থির করেন প্রত্যূষেই জ্যেষ্ঠের কাছে সংবাদ পাঠাবেন।

কিন্তু মেয়েটা যে এখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। মৃন্ময়ীর মুখের দিকে তাকালেন—অকাতরে ঘুমাচ্ছে মৃন্ময়ী।

গায়ে ঠেলা দিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলেন, মৃন্ময়ী—মৃন্ময়ী—ওঠ মা—দু'তিনবার ডাকতেই চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে মৃন্ময়ী।

চল, ঘরে শুবি চল—

দুর্গাদেবীর কথায় আর দ্বিরুক্তি না করে মৃন্ময়ী উঠে ধীরে ধীরে তাঁকে অনুসরণ করে।

শিবনাথ ভৃত্যের সঙ্গে এসে খাজাঞ্চী ঘরে প্রবেশ করল। ঘর-জোড়া তক্তপোষ পাতা—তার উপরে ফরাস বিছান। এককোণে দু'টো সুবৃহৎ কাঠের আলমারী। তার পাশে লোহার সিন্দুক—তেল-সিন্দুরে চিত্র-বিচিত্র।

বৃদ্ধ খাজাঞ্চী মহেশবাবু একধারে ফরাসের উপর শুয়ে প্রচণ্ড নাসিকাধ্বনি করে চলেছেন। কৈলাস শিবনাথকে ঘরে পৌঁছে দিয়েই চলে যায়, শুয়ে পড়েন গো একধারে—শুধু যাবার সময় সাবধান করে যায়, বুড়োকে জাগাবেন না—একপাশে শুয়ে থাকেন চুপচাপ, ঘরের কোণে একটি প্রদীপ মিটি-মিটি জ্বলছে। তারই আলোয় ঘরের মধ্যে একটা মৃদু আলো-ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে।

শিবনাথ ফরাসের উপর শুয়ে পড়ল।

ঐ রাত্রে অতটা পথ হেঁটে এসে সে নিজেও কম ক্লান্ত হয় নি। পা দু'টো যেন ভেঙ্গে আসছিল। কিন্তু শয্যাগ্রহণ করেও চোখে নিদ্রা আসে না।

নানা ভাবনা মাথার মধ্যে একটার পর একটা এসে ভিড় করে। কাজটা কি ভাল হলো। নিজে এসেছিল—এসেছিল—কিন্তু সেই সঙ্গে মৃন্ময়ীকেও নিয়ে আসাটা কি ভাল হয়েছে সঙ্গে করে।

প্রত্যূষে উঠে সুন্দরসাহেব যখন জানতে পারবে মৃন্ময়ী আর সে দু'জনাই রাত্রে পলাতক হয়েছে—সহজে কি সে নিরস্ত হবে।

নিশ্চয়ই সে অনুসন্ধান করবে তাদের এবং তার পক্ষে তাদের খুঁজে বের করতে হয়ত তেমন কঠিন হবে না। আর একবার খুঁজে বের করতে পারলে সহজে তাকে নিষ্কৃতি দেবে না সুন্দরসাহেব।

হাজার হোক পর্তুগীজ জলদস্যু। দয়া-মায়া-মমতা বলে কোন কিছু কি ওদের হৃদয়ে আছে না কি। না—কাজটা ভাল হয় নি।

সে নিজে চলে এসেছিল—এসেছিল—মৃন্ময়ীকে সঙ্গে করে আনতে গেল কেন! তার নিজেরই এই দুনিয়ায় মাথা গোঁজবার কোন ঠাঁই

নেই—পরাশ্রিত—সঙ্গে সে নিয়ে এলো আর একজনকে। কিন্তু কি করবে শিবনাথ। মন যে তার চাইল না।

মৃন্ময়ীকে সুন্দরসাহেবের কবল থেকে উদ্ধার করার এক বীরত্ব মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু অতঃপর—অতঃপর কি!

নিয়ে ত' এলো উত্তেজনার মাথায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে মৃন্ময়ীকে সঙ্গে করে—দুর্গাদেবী যদি শেষ পর্যন্ত এখানে ঠাঁই না দেন মৃন্ময়ীকে, কোথায় যাবে সে মৃন্ময়ীকে নিয়ে।

কেউ এখানে তার আর পরিচিত নেই।

তা ছাড়া পরিচিত হলেই কি হুম্ করে কেউ কাউকে গৃহে স্থান দেয়। সুন্দরসাহেবের গৃহে স্থান পাওয়ার পূর্বে কিভাবে তার দিন কেটেছে মনে কি নেই তার।

আবার সুন্দরসাহেবের কথা মনে পড়ে শিবনাথের। সাদরে একদিন তার গৃহে সে তাকে স্থান দিয়েছিল!—শুধু স্থান নয়, তার বিদ্যালয়ে শিক্ষারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

আর সে কি না সেই লোকটার সঙ্গেই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে এলো। বিশ্বাসঘাতকতা বৈ কি—ব্যাপারটাকে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কি বলা চলে।

শুয়ে থাকতে আর পারে না শিবনাথ, অন্ধকারেই শয্যার উপর উঠে বসে। অদূরে শয্যায় শায়িত ও নিদ্রিত মহেশবাবুর মুখখানা সে অবিশ্যি দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তাঁর নাসিকাধ্বনি অন্ধকারে সমানে কানে প্রবেশ করছে।

কি করবে এখন শিবনাথ। কি তার কর্তব্য।

সামান্য বাকি রাতটুকু পোহালেই ত' যা করবার তাকে করতে হবে। সে ভাবে না তার যা হবার হোক, কিন্তু মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ীকে দুর্গাদেবী যদি আশ্রয় না দেন।

পা জড়িয়ে ধরবে শিবনাথ দু'হাতে দুর্গাদেবীর—মা মেয়েটা সত্যিই দুর্ভাগিনী ওকে আপনি পায়ে ঠেলবেন না। দয়া করুন মা—

নিজের শয়নঘরেই মৃন্ময়ীকে নিয়ে এসেছিলেন দুর্গাদেবী।

একটা ধোয়া শাড়ি এনে বললেন, শাড়িটা বদলে নে মা—ও রাস্তার শাড়িটা ছেড়ে ফেল।

ঘরের এককোণে দীপাধারে দীপ জ্বলছিল।

তারই মৃদু স্বল্পালোকে কেমন যেন ঘুম-ঘুম চোখে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে মৃন্ময়ী।

সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসে ঘুম এখনো তার চোখের পাতা থেকে একেবারে মুছে যায় নি। দু'চোখের পাতায় তখনো যেন ঘুমের অঞ্জন লেগে রয়েছে—চোখের পাতা দু'টো ভারী ভারী।

দুর্গাদেবীর নির্দেশে মৃন্ময়ী পরিধেয় শাড়িটা ছেড়ে তাঁর দেওয়া শাড়িটা পরে নিল। হাত-মুখও পাশের বারান্দায় রাখা জলপাত্রে ধুয়ে এল।

তথাপি দুর্গাদেবী খানিকটা গঙ্গাজল মৃন্ময়ীর সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলেন। এবার এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্ত হলেন, সহজ হলেন দুর্গাদেবী।

চোখে-মুখে জল দিয়ে হাত-পা ধুয়ে তাঁর দেওয়া শাড়িটা পরে যখন এসে মৃন্ময়ী দুর্গাদেবীর সামনে দাঁড়াল—প্রদীপের আলোয় মৃন্ময়ীর সদ্য জলেভেজা মুখখানির দিকে তাকিয়ে দুর্গাদেবীর যেন চোখের পলক পড়ে না। রাতের শিশিরে-ভেজা যেন একটি পদ্মকলি।

তোর নাম যেন কি বলছিল শিবনাথ?

মৃন্ময়ী—মৃদু শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় মৃন্ময়ী।

ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাবি?

না—

বাইরে ভোলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মা—

কি রে ভোলা?

কর্তাবাবু আসছেন—

কোথায়?

এই ঘরে— [ক্রমশ।

সংলাপ

বুদ্ধদেব গুহ

হ্যালো—হ্যালো
বৃষ্টি নামলো।
সন্ধ্যায় আজ আসছো কি?
মেঘের হারেমে চাঁদ মেহ্‌মান্ নর্তকী।
নতুন বোতলে পুরানো মদিরা
সখ্যের মালা দুলুক
অনেক দিনের খিল-আঁটা-বুক
এবার না হয় খুলুক।
হ্যালো, হ্যালো, মিস্ জানা!
আমার তো নেই কোনো অশ্লীল মানা।
ছুটবো না হয় ইচ্ছে-হাওয়ার মুখে
বা জন্তুর মতো রক্তের দাগ শুঁকে
দুয়ারে দিচ্ছি হানা;
নিশ্চিত জেনো আজ সন্ধ্যায় ভুলবই এই ভুলুক।

অনিকেত

ধীরেন দেবনাথ

বহুদূর প্রসারিত স্বপ্ননীল রাজপথ নয়,
নয় কোনো অনিপুণা কুমারীর অক্ষত হৃদয়।
হিসাবের ছককাটা জীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়
খুঁজেছি অনেক কাল কভু লঘু কভু দ্রুত পায়।

হেঁটেছি পথের স্রোতে উচ্ছলিত বেত্রবতী তীরে,
কখনও বা সংগীহীন কল্পনায় উজ্জয়িনী ঘিরে।
আবার নেমেছি পথে জীবিকার সত্য অন্বেষিতে,
প্রান্তিক আসাম হতে ও-পারের পশ্চিমী দিল্লীতে

তবু তো মেটে নি ক্ষুধা—সূর্যপ্রাণ আজও ঘুরে মরে,
খুঁজে ফেরে আদিগন্ত জ্যোতির্ময় ধ্রুবতারাটিরে।
সারা দেহ উন্মথিয়া প্রকম্পিত স্বর—আমি শ্রান্ত;
দূর হতে দূরতরে অনেক ঘুরেছি—আজ ক্লান্ত।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

পরিশিষ্ট

রাণু ভৌমিক (দাস)

লালমাটির পথ এঁকে-বেঁকে যেখানে শেষ হয়েছে—যেখানে পৃথিবীর সীমানা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে—চারিদিকের খোলা শূন্য মাঠ ও অসমান মাটি—সেখানেই এই নিঃসঙ্গ কালো বাড়িটা। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় পরিত্যক্ত—শুধু মানব পরিত্যক্ত নয়—পৃথিবীরও যেন পরিত্যক্ত। দূর চক্রবাল রেখায় আকাশ যেখানে মাটিতে মিশেছে—সেখানে স্পর্শ নেই নীলিমার। চারিদিকে সঙ্কীর্ণ, রুক্ষ, বিষণ্ণ মৃত্যুর ধূসরতা।

বাড়িটায় অনেকগুলি জানালা—সবক'টিই বন্ধ। কিন্তু লালমাটির পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে যদি কখনও পথিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তা' হলে হয় তো তার চোখে পড়বে শ্রীহীন কালো একটি হাত জানালার একটা পাট খুলে আবার দ্রুত বন্ধ করে দিল। কৌতূহলী পথিক যদি ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করে তা হ'লে সে হয় তো দেখবে···

কি দেখবে তা বলে না সেই ছোট্ট চা-খানার লোকরা। শুধু মাথা নাড়ে। কি যে ইঙ্গিত করে তা বোঝা যায় না, তবে এটুকু বুঝতে পারা যায় যে, ঐ বাড়ি সম্পর্কে ওদের একটা অদ্ভুত ভীতি আছে।

এই চা-খানায় পরিচিত-অপরিচিতের ভেদাভেদ নেই—যে কোন অচেনা মুখকে ডেকে অপরে বলতে পারে, দাদা কেমন আছেন ?

চমকেই উঠেছিলেন বৃদ্ধ সৌম্যদর্শন নবাগত। যিনি একটু আগে নিঃশব্দে ঢুকে নির্বাক হয়ে এককোণে বসেছিলেন। আর চমকাবারই কথা। অচেনা জায়গায় এক অপরিচিত লোক যদি এসে হাসিমুখে প্রশ্ন করে, 'কি ? কেমন আছেন ?' তা হ'লে কি রকম লাগে।

আর, ওঁর মনে তো শুধু বিস্ময় নয় একটু ভয়ও। অনেকদিন থেকেই এই ভয় হয়েছে তাঁর সঙ্গী। যৌবন ছাড়িয়ে তিনি যেদিন প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডী একলাফে পার হয়ে বার্ধক্যের এলাকায় পড়লেন—যেদিন থেকে তাঁর মনে অনুশোচনা জাগলো—সেদিনই যৌবন শেষ হলো—আর যৌবনের কৃতকর্মগুলি কালো ছায়ার মতো—দুঃস্বপ্নের মতো তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে—এখনও তিনি চমকে উঠলেন, কোথা থেকে এল ও। কিন্তু, ততক্ষণে লোকটা ওদিকে সরে গেছে।

—ওঃ। তা হ'লে বিশেষভাবে আমাকে নয়। নিশ্চিন্ত আরামের নিঃশ্বাস ফেলে ভাবেন ভদ্রলোক—আবার তখনই মনে হয়, ওকে জিজ্ঞেস করলে হোত—ও কি জানে··

এখানে আসবার আগে আমি দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলাম একটা বাড়ির সামনে—লালমাটির পথে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলাম কালো বাড়ির দিকে··বারবার এই কথাটা মনে জাগতে থাকে ভদ্রলোকের—কিন্তু, তিনি তা প্রকাশ করতে পারেন না।

অচিন্ত্যও তখন ভাবছিল ঐ কালো বাড়িটার কথা। হাফ-প্যাণ্ট পরা অচিন্ত্য একটা কেটলি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল চা নেবার জন্যে। সে ভাবছিল, ঐ কালো বাড়ির কালো মেয়েকে কেন সবাই 'মেমসাব' বলে। মেমসাহেব তো দেখেছে অচিন্ত্য—অদ্ভুত দেখতে—লাল টকটকে, পাতলা বাদামী চুল। আর, এতো কালো, রোগা বিশ্রী দেখতে। প্রথমবার যখন 'মেমসাব'কে দেখেছিল সেদিনের কথাটা আজও মনে আছে··খুব যন্ত্রণা হয়েছিল তার পেটে, মনে হয়েছিল কি যেন পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরেছে তাকে—আর হঠাৎ পৃথিবীটা কালো হয়ে গেল—

চোখ তাকিয়েই সে দেখেছিল··পরে জানতে পেরেছিল ওকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে দেখে ওর বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মা তো নাকি রীতিমতো কাঁদতে শুরু করেছিলেন। অচিন্ত্যের ভারি আপশোস হয় যে সে মায়ের কান্না দেখতে পেল না। জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তো মায়ের কাছে শুধু বকুনি আর চড়চাপড়—মা কথা বলা মানেই বকুনি দেওয়া, শুধু তাকে নয়, বাড়ির সবাইকে বকেন মা। তাই মা'র কান্নার খবরটি তার নিকট অত্যন্ত অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল—কিন্তু ছোট বোন এমনভাবে 'মা কালীর' দিব্যি দিয়ে বলে যে বিশ্বাস না করে পারা যায় না।

জ্ঞান হবার পরে তাকিয়েই সে ভয় পেয়েছিল, কালো, শ্রীহীন একটি মুখ দু' চোখে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে। ভয়ে কুঁকড়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল সে। কিন্তু সে চেষ্টা করবার আগেই কালো, দীর্ঘ হাত এসে ওকে চেপে ধরেছে। আর—

আর, অবাক হয়ে অচিন্ত্য অনুভব করে, কি নরম কি মিষ্টি সেই

হাত। ঠিক যেন দোয়েলের শিষ—ঠিক যেন একমুঠো শিউলি ফুল, ঠিক যেন···অচিন্ত্য বুঝতে পারে না, বোঝাতেও পারে না—কিন্তু, এমনি মনোভাব এসেছিল তার মনে অনেকদিন আগে—একদিন বাড়ির সবাইকে লুকিয়ে দুপুরের গরম রোদে সে অনেক অ-নে-ক দূরে চলে গিয়েছিল, তারপরে অবাক হয়ে, আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে দেখলো সামনে একটা পুকুর—টলটল করছে জল, চারিদিকে সবুজ গাছ, ঝোপঝাড়। তিনটে হাঁস খেলা করছে সেই জলে—

একটু সময় চুপ করে তাকিয়েছিল অচিন্ত্য। তারপরে প্যান্ট খুলে নেমে পড়েছিল জলে—সেই মুহূর্তের অনুভূতি সে যে সেদিনের স্পর্শে নূতনভাবে অনুভব করেছিল।

—কৃমি আছে—বের করতে হবে—শুষ্ককণ্ঠে বলেছিলেন তিনি। আর, অচিন্ত্য অবাক হয়ে ভেবেছিল, তার পেটে কোথায় কি আছে, তা কি করে উনি জানতে পারলেন?

তারপরে, সত্য সত্যই যখন ওর পেট থেকে বড় বড় কেঁচোর মতো দু'টো কৃমি পড়ে—তখন মুহূর্তের জন্য সে ওঁকে মহাভারতের ভীমের সঙ্গে তুলনা করেছিল। আর, এই আকর্ষণের প্রভাবেই বোধ হয় এক সন্ধ্যায় চুপি চুপি উপস্থিত হয়েছিল ওঁর বাড়িতে—

ঢুকতে পারে নি ও। ঢোকবার মুখে সঙ্কোচ, দ্বিধাবিচঞ্চল-ক্ষণে শুনতে পেয়েছিল বীভৎস এক চীৎকার সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে—সেই চীৎকার অমানুষিক মনে হয়েছে—ভয়ে হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে—আর সেইভাবেই ছুটে পালিয়ে আসে সে। আর কখনও ও সেখানে যায় নি—কিন্তু প্রায়ই তার মনে পড়তো সেই অদ্ভুত দু'টি চোখ—অনুপম স্পর্শ—আকুল চীৎকার···

—ওর সব অপরাধ ক্ষমা করা যায়, আবক্ষ দীর্ঘ দাড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে ভাবেন হেমন্তবাবু। ওর সব অপরাধ ক্ষমা করা যায়। ঈশ্বর যাকে ক্ষমা করেছেন, তাকে কি মানুষ ক্ষমা না করে পারে?

তারপরে পিটার তাঁর নিকটে এসে বলে, প্রভু, কতবার আমার ভ্রাতা আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করবে ও আমি ক্ষমা করবো। সাতবার?

প্রভু যীশু তাকে বললেন, আমি তোমাকে বলছি—সাতবার নয়—সত্তরগুণ সাতবার।

সাতবার নয়—সত্তর গুণ সাতবার অপরাধ ক্ষমা করো। কিন্তু, মানুষ তো তা করে না। বারবার বলে গেছেন মহামানব, মানুষকে বিচার করো না। কোন পারিপার্শ্বিকে কে কোন কাজ করতে বাধ্য হয়, তা কেউ বলতে পারে না। মানবের মনের খোঁজ কেউ রাখে না।

বিশেষত মানবী তো জন্ম-অপরাধী, প্রথমে সে সবকিছু হরণ করলো, সব মাটি এবং মানবের সব অধিকার কেড়ে নিল—সব সে আত্মসাৎ করে—প্রতিবাদীদের হত্যা করে—তারপরে সে হরণ ও হত্যার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করে। এই সব আইন তার আগে লেখা উচিত ছিল।

ঠিক এমনিভাবে নারীকে নষ্ট করেছি আমরা। প্রথমে তার সমস্ত অধিকার, সব ক্ষমতা হরণ করেছি, তাকে করে তুলেছি পুরুষ-নির্ভর। আমরা তাকে প্রলুব্ধ করেছি, বাধ্য করেছি বহু ভজনায়। তারপরে, আমরা তাকে ব্যভিচারিণী বলে বিচার করেছি, শাস্তি দিয়েছি। নারী নরকের দ্বার—আখ্যা দিয়ে পরিত্যাগ করেছি।

যে যার নিজের কাজ কর। একমাত্র ঈশ্বর-ই বিচারক। তিনি অসীম ক্ষমার আধার। নিজের নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ, ঈশ্বর তোমার কত অপরাধ ক্ষমা করছেন।

'স্বর্গাধিপতি ভৃত্যদের হিসেব পরীক্ষা করেন।

হিসাব পরীক্ষার পর তিনি দেখিলেন একটি ভৃত্য প্রভূত ঋণী। কিন্তু সে লোকটি দেয় অর্থ দিতে অসমর্থ হওয়ায় আদেশ দিলেন, সেই লোকটি, তার স্ত্রী ও সন্তানদিগকে বিক্রয় করিয়া অর্থ আদায় করিতে হইবে। সেই ভৃত্যটি তখন নতজানু হইয়া বলে, প্রভু আমাকে সময় দিন—আমি ঋণ পরিশোধ করিয়া দিব।

তখন প্রভুর মনে দয়া হইল—তিনি সেই ভৃত্যকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু, সেই ভৃত্যের নিকটে তাহার এক সহকর্মী ঋণী ছিল—সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার গলা টিপিয়া বলে, আমার প্রাপ্য মিটাইয়া দাও। সেই সহকর্মী নতজানু হইয়া বলে, আমাকে সময় দাও—আমি সব পরিশোধ করিয়া দিব। কিন্তু সে ঋণীকে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। অপরাপর সহকর্মীরা এই ঘটনার বিবরণ প্রভুর নিকটে নিবেদন করে। তখন প্রভু তাহাকে আহ্বান করিয়া বলেন, দুষ্টমতি ভৃত্য তুমি প্রার্থনা করিয়াছিলে—তাই তোমাকে ঋণমুক্ত করিয়াছি। তোমার প্রতি আমি যে অনুকম্পা দেখাইয়াছি তাহা কি তোমার সহকর্মীর প্রতি দেখানো উচিত ছিল না।'

মানুষ মানুষকে ভালোবাসে না—কথাটা মনে হতেই চমকে ওঠেন হেমন্তবাবু।

হঠাৎ যেন এক চরম ও রূঢ় সত্যের মুখোমুখি হলেন তিনি। মানুষের উত্থান, বর্ধন ও পতনের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ছবি যেন ওঁর চোখের সামনে ভাসতে থাকে। না, মানুষ মানুষকে ভালোবাসে না—কেন? কেন পারে না মানুষ ক্ষমা করতে!

—ও যে ক্ষমারও অযোগ্য। দাঁতে দাঁত চেপে শশাঙ্ক বলে, ক্ষমারও অযোগ্য। মানবের তো নয়-ই এমন কি দানবেরও নয়। পিশাচও বোধ হয় ঐ রকম পিশাচীকে ক্ষমা করতে ঘৃণাবোধ করবে। আশ্চর্য। কিভাবে ও একটা লোককে তিলে তিলে হত্যা করছে···

···চোখের সামনে আমি দেখেছি···চোখের সামনে আমি দেখেছি ···হঠাৎ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে শশাঙ্ক। সেই চীৎকার বেড়ার ফাঁক দিয়ে অনেক অ-নে-ক দূরে চলে যায়।

উপস্থিত সবাই শশাঙ্কের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওরা জানে, শশাঙ্ক মাঝে মাঝে এমন চেঁচায়—ওরা জানে—কেন?

কেন? কেন? ভ্রূ কুঁচকে বলে ওঠে শশাঙ্ক। কেন? আমি যা দেখেছি তা যদি কেউ দেখতো—সে পাগল হয়ে যেতো। কিন্তু, আমি তা হই নি। শুধু আমার ইচ্ছে হয়েছে দু'হাতে ঐ শুকনো গলাটা ধরবার। কিন্তু, পারি নি। না, শাস্তির ভয় আমি করি না। পৃথিবীর কোন্ শাস্তি আছে যা আমাকে এর চেয়ে বেশি যন্ত্রণা দেবে। তবে, ভয় পেয়েছিলাম—ভয় পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, ঐ শুকনো গলা টিপে নিশ্বাস বন্ধ করতে আমি হয় তো পারব না—তার আগেই বিষ—আগুনের হল্কায় আমার শরীর পুড়ে যাবে।

আমাকে ও ডেকেছিল ওখানে কাজ করবার জন্যে। গরীব?

হ্যাঁ, খুবই গরীব আমরা—নইলে কি আর⋯হঠাৎ চোখ দু'টি কুঁচকে ওঠে শশাঙ্কের। পাশাপাশি লোকদের চোখে-চোখে ইঙ্গিত খেলে যায়—তারা যেন একটু নড়ে প্রস্তুত হয়ে বসে।

⋯ভাবনাগুলো কি রকম জট পাকিয়ে যাচ্ছে, ভাবে শশাঙ্ক। চাকরীর জন্য ওখানে গিয়েছিলাম—প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কেন ছেড়ে এলাম না? কেন রইলাম ঐ যন্ত্রণা ও নোংরামীর কাছে। কেন?

ঠক্। ঠক্। ঠক্। কে যেন ওর মাথায় হাতুড়ী ঠুকছে। উঃ। রুদ্ধ দু'টো দু'হাতে চেপে ধরে শশাঙ্ক। নোংরামী! যন্ত্রণা! কষ্ট! পাশাপাশি ঘেঁসে-থাকা দু'টি চোখ যেন এক হয়ে তীরের মতো এসে গায়ে লাগছে—

কিছুই তো নেই—শুধু চোখ। চোখ নয় চোখের চাউনি। নিজের মনেই মাথা নাড়ে শশাঙ্ক। ঐ রকম চাউনি সে আজ পর্যন্ত কোথাও দেখে নি⋯মনকে যেন টুকরো-টুকরো করে ফেলে সেই ইস্পাতের চাউনি।

প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল শশাঙ্ক। মুগ্ধ! শশাঙ্কের শরীরটা যে বার দুয়েক হেঁচকি টানে—কোণের বলিষ্ঠ যুবক এগিয়ে এসে ওর পাশে বসে।

মুগ্ধ নয় মোহিত—সম্মোহিত। ওর সেই সাপের মতো চোখে সম্মোহন ছিল। সাপ? ঠিক কথা। সাপই বটে। সাক্ষাৎ শয়তান মানবীরূপ ধরেছে।

ঘরের সামনে বসে আছি—একটা বাচ্চা ছেলে এসে বলে, আপনাকে মেমসাব ডাকছেন। অবাক হয়ে গেলাম, এখানে আবার মেমসাব এলো কোথা থেকে। আমাদের এই অজ-পাড়াগাঁয়ে মেমসাহেব এলে নিশ্চয়ই চোখে পড়তো। ছেলেটাও অপরিচিত। তা এখানে—সাধারণ চেহারার একটি ছেলে হারিয়ে যেতে পারে—কিন্তু একটি আস্ত মেমসাব।

—কে মেমসাব? কোথায় থাকে? ভ্রূ কুঁচকে আরও অনেক প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু, তার আগেই ছেলেটা সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

যদি সেদিন না যেতাম⋯কি করে জানব? সাধারণ কৌতূহলেই এগিয়ে গিয়েছিলাম। লালমাটির পথ পার হয়ে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—কালো একটা নেমপ্লেটে সোনালী অক্ষরে লেখা—ডাঃ প্রিয়া চ্যাটার্জী—স্পেশালিস্ট।

স্পেশালিস্ট? বিশেষজ্ঞ? কিসে বিশেষজ্ঞ, তা কিছুই লেখা নেই—পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলাম—কিন্তু তা অনেক পরে—

সামনের ঘরেই বসেছিল। আমি যেন আজও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—রোগা, লম্বা, নাকটি খুব পাতলা ও তীক্ষ্ণ, চিবুকটা সরু, কালো পাড় সাদা শাড়ি পরে ইজিচেয়ারে বসেছিল।

ঘরে ঢোকামাত্র আমার দিকে শুধু একবার তাকালো। সেই মুহূর্তে সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল আমার। কিন্তু, তখন বুঝতে পারি নি।

—আমি এসেই আপনার কথা শুনলাম, গম্ভীর কাটা-কাটা কণ্ঠে ও বলে, 'শুনলাম আপনি যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছেন অথচ কোথাও কোন কাজ পান নি। আমার একটি লোক দরকার—ব্যবসায়ে সাহায্য করতে ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। কত টাকা আপনি চান?

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। এভাবে ডেকে এনে অপমান করবার মানে কি? গরীব হতে পারি, কিন্তু ওর কাছে তো সাহায্য চাই নি। অনেকগুলি কঠিন রূঢ় কথা মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কোনটাই বলতে পারি না।

—তা হ'লে ঐ কথা রইলো—কাল থেকে আসবেন।

গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, গিয়েছিলাম নিশ্চয়ই। সেজন্যই তো আজ এই অবস্থা। বন্ধুরা যতটা বলে ততটা নয়⋯তবু সেই দৃশ্যটা যখন মনে পড়ে⋯সেই দৃশ্যটা⋯

নবাগত ভদ্রলোক তাঁর অন্যমনস্ক চিন্তাধারা থেকে হঠাৎ চকিত হয়ে বলেন, ও কি? চা-খানার লোকরা কিন্তু বিশেষ বিচলিত হয় না। শুধু সেই বলিষ্ঠ যুবক এসে শশাঙ্ককে চেপে ধরে, যা জোরে হাত-পা ছুড়ছে। মুখের দু'পাশে ফেনা গড়িয়ে পড়েছে—মনে হয় যেন বুকের ওপর থেকে ভারী কিছু একটা ফেলে দিতে চাইছে।—একঘণ্টা। যুবকটি হতাশভাবে ভাবে, একঘণ্টার জন্তে আটকে গেলাম। আচ্ছা, প্রত্যেক বার-ই দেখছি এই প্রকোপ একঘণ্টা থাকে—খুব আশ্চর্য তাই না!

হিসেব মেলাতে মেলাতে বিজয় ভাবে, চা-খানায় এমন এক-একটা বিশেষ দিন আসে বটে। এমনিতে কিছুই নয়—সেই পরিচিত মুখগুলি আসছে, তাস খেলছে, আড্ডা দিচ্ছে—প্রায় একই প্রকার গল্প। কিন্তু মাঝে⋯মাঝে⋯যেমন আজের দিনটা⋯কোথা থেকে এলেন এই আধপাগলা ভদ্রলোক—আবার আজ-ই কি না শশাঙ্ক ফিট হলো—

আচ্ছা⋯কি দেখেছিস শশাঙ্ক? কেন ও এ রকম হয়ে গেল। ওকে তো ছেলেবেলা থেকেই চিনি। এ রকম তো আগে ছিল না? তবে একটু পাগলাটে ধরণের—আমরা বলতাম 'পাগলা শশে'। পড়াশুনোয় ভালো ছিল—আর বই পড়তে যে কি ভালোবাসতো⋯

এই বইয়ের জন্য-ই তো। সারাক্ষণ যে বই মুখে করে বসে থাকে তাকে পাড়াগাঁয়ে কে কাজ দেবে? কয়েকজনকে বলেছিলাম—তারা হাসতে হাসতে বলে, ও তো জেগে ঘুমোয়। ও আবার কি কাজ করবে।

সত্য সত্যই শশাঙ্কের চোখ দু'টো যেন সব সময়ই ঘুমিয়ে থাকতো। আধখানা খোলা, আধখানা বোজা। যেন সর্বদাই স্বপ্ন দেখছে চোখ দু'টো। কি সুন্দর চোখ ছিল। মাটিতে স্থির হয়ে পড়ে-থাকা শশাঙ্কের দেহটার দিকে একবার তাকায় বিজয়। কি শোচনীয় অবস্থা! যেন কোন ডাইনী রক্ত শুষে নিয়েছে। ডাইনী? ডাইনী-ই বটে। অন্তত লোকে তো তাই বলে⋯বিশেষত তিনু মাঝি⋯সে জোর গলায় বলে, অনেকদিন দেখেছে ডাইনীটাকে জানালা গলিয়ে বের হতে—আরও সরু হয়ে গেছে, আরও কালো—কিন্তু ছোট ছোট চুল অনেক লম্বা হয়েছে, দু'টো ভাগে ভাগ হয়ে পাখার মতো দু'দিকে ছড়িয়ে আছে।

—রাত্রে উড়ে ডাইনী কোথায় গেল? পরিহাসের সুরে, প্রশ্ন করতো বিজয়।

—তুমি ঠাট্টা করছ? জ্বলে উঠতো তিনু। দু'পাতা ইংরেজী পড়ে ভারী ওস্তাদ হয়ে গেছ না? এই তো সেদিনও ভূতের গল্প শুনে এসে কোলে লুকোতে—

তিনু'র রাগ দেখে বিজয় হাসতো। সত্যি কথাই বলেছে

তিনুকাকা—খুব ভয় পেতো ও ছেলেবেলায়—রাত্রি হলেই মনে হোত কি একটা কাটামুণ্ডু এগিয়ে আসছে হাঁ করে—সে সব দিনের কথা মনে হোলে হাসি পায়।

কানে বায় তিনু মাঝি বলছে, ডাইনী যদি না হবে তো লোকটাকে ঐ রকম শুষে শুষে খায় ? দেখেছিস ওর 'সোয়ামী'র অবস্থা।

কথাটা ঠিক। মেয়েটা শুধু ওর স্বামীকে নয়—শশাঙ্ককেও শুষে খেয়েছে। ভেতরে কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই—শশাঙ্কের। বড় নরম মন ছিল ওর। শশাঙ্কের দিকে করুণদৃষ্টিতে তাকায় বিজয়, সব শেষ হয়ে গেছে, কিছুই অবশিষ্ট নেই।

—কিছুই থাকবে না আমার—দেখিস, একদম শেষ হয়ে যাব। শশাঙ্কই বলেছিল একদিন।

সেদিন বিজয় হেসেছিল। তুই তো চিরদিনই জেগে জেগে স্বপ্ন দেখিস।

—স্বপ্ন নয় দুঃস্বপ্ন।

—ছেড়ে দে না। বলেছিল বিজয়, চাকরী ছাড়লেই দুঃস্বপ্ন ছাড়বে।

—তা হয় তো হবে। কিন্তু···

'কিন্তু'টা বিজয় বুঝেছিল—চাকরী তো ছাড়তে পারবে না। প্রথম দিন-ই সে কথা বুঝে নিয়েছিল বিজয়। শশাঙ্ক বলেছিল, দ্যাখ, ভদ্রমহিলা অদ্ভুত। আমার একটুও ভালো লাগে নি। ও যেন আমার নাড়ী-নক্ষত্র সব জানে···

—ভালো না লাগলে চাকরী করিস না। উপদেশ দিয়েছিল বিজয়। তোকে তো আর কিনে নেয় নি।

—না। মাথা নেড়েছিল শশাঙ্ক। শেষটায় বলেছিল, দেখি, যদি অসুবিধে হয় তো ছেড়ে দেব।

বড় দেরিতে ছাড়লো শশাঙ্ক—নিজেকে একদম শেষ করে। কিংবা হয় তো এ ভাবে শেষ না হলে কোনদিনই ছাড়তে পারতো না।

—মেয়েটা অদ্ভুত। বিজয় ভাবে, শশাঙ্ক ঠিকই বলেছে। খারাপ, ভালোর প্রশ্ন এখানে অবান্তর। মেয়েটা অদ্ভুত। ঐটুকু একটা বাড়ি—দু'খানি মাত্র ঘর—সেখানে হাসপাতাল করেছে—হাসপাতাল বলেই সবাই জানতো—যতদিন না—

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে এ রকম ঘটনা ঘটে। তার নিস্তরঙ্গ চা-খানায় উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যায়। যেমন আজ এই অপরিচিত ভদ্রলোকের আগমনে হলো··

সেদিনও দু'জন লোক এসেছিলেন। সাধারণ পোষাক পরণে—সাধারণ লোক। তবুও অপরিচিত মুখ দেখে সবাই একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল—কিন্তু, তাঁদের কোন প্রশ্ন করবার আগেই একটা ফিসফিসানো কথা সারা চা-খানায় ছড়িয়ে পড়েছিল—দারোগা সাহেব··· থানার দারোগা সাহেব··

ভয়ে বিজয়ের বুক কাঁপতে থাকে। দারোগা সাহেব কেন ? কি অপরাধ তার ? সে তো চা-বিস্কুট বিক্রি করে, কোন গোপন অন্যায় তো করে নি···তবে···

সকলের মুখে ভয় ও উদ্বেগের ছাপ। বিজয়কে তো ভালবাসতো সবাই। কি যেন কি বিপদে পড়লো ছেলেটা—

থানার দারোগা বুঝতে পারেন। হাজার হোক, দারোগা তো—লোকের মন নিয়ে তাঁদের কারবার—তিনি একটু হাসেন, অভয়ের হাসি, প্রশ্রয়ের হাসি।

—এখানে ডাঃ চ্যাটার্জী থাকেন ?

উপস্থিত সবাই বোবা চোখে তাকায়।

—ডাক্তার ? মেয়ে ডাক্তার ?

ওঃ! এতক্ষণে সবাই সহজ হয়। তাই। হ্যাঁ, ওর জন্ত দারোগা আসতে পারেন বটে। ওর জন্ত যে কেউ আসতে পারে—এমন কি ভিন্ন গ্রহ থেকে কেউ এলেও অবাক হবে না ওরা।

—কোথা থেকে এলো ? আবার প্রশ্ন করেন দারোগা।

—হুজুর। এবারে তিনু মাঝি এগিয়ে এসে বলে, হুজুর, ও ডাইনী, আমি স্পষ্ট জানি, ও ডাইনী। রাত্রিবেলা···

—কি যে বল ? ওর কথায় বাধা দিয়ে হেসে ওঠেন দারোগা। ডাইনী নয়—তবে ডাইনীর চেয়েও সাংঘাতিক। হাতেনাতে কিছুতেই ধরতে পারছি না—তাই তো এখানে এলাম—ধরবই একদিন না একদিন···
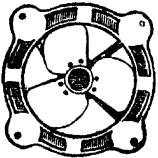
সেই সময়ই ক্যাঁটক্যাঁটে গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল গোয়ালা বুড়ি—

সে রোজ বিকেলে বিজয়কে চায়ের দুধ জোগান দেয়। এতক্ষণ এককোণে বসে সব শুনছিল—এবারে থাকতে না পেরে বলে, তোমরা কেন সবাই মিলে মেয়েটার পেছনে লেগেছ, বাছা। কি ক্ষতি করেছে সে তোমাদের। আর তিনু, তুই যে বলছিস, ও না থাকলে তোর মেয়েকে কে বাঁচাতো শুনি? তোর একটু ধর্মভয় নেই?

—সেইজন্যই তো মনে হয় ডাইনী, দীনু সোৎসাহে বলতে থাকে, শুনুন দারোগা সাহেব, আমার মেয়ের অসুখ করেছিল—সারানো শিবের বাবারও অসাধ্যি। শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছিলাম—কেউ কিছু করতে পারলো না—আর, সেই অসুখ কি না একটা সূচ ফুঁড়িয়ে সারিয়ে দিল•••

—মেয়েটা শুনেছি খুব ভালো চিকিৎসক। দারোগা গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, কলকাতায় ওর খুব নাম ছিল।

—সারিয়ে খুব অন্যায় করেছ, না। গোয়ালা বুড়ি নিজের মনেই চেঁচাতে থাকে, সারিয়েছে-ই তো। আবার এতদিনের বাতের ব্যথা—সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতাম না—সারলো তো। এতদিন দেখেছি, মেয়েরাই মেয়েদের পেছনে লাগে, তা তোরা ব্যাটাছেলে হয়ে—তোদের লজ্জা করে না।

মুহূর্তের জন্য সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। ওরা যেন ছোট হয়ে যায়।

একটু পরে দারোগা হাসেন। ওঁর সেই মার্কামারা হাসি, বলেন, তুমি যে বাছা কেন ওর পক্ষে বলছ তা জানি না কিন্তু কোন কোন মেয়ে কেন বলে তা জানি—আর সেই জানাটাই হাতেনাতে ধরতে হবে। আর কোন কথা না বলে দারোগাবাবু উঠে যান—পেছনে পেছনে একান্ত অনুগত ছায়ার মতো কনেস্টবলটি চলে যায়।

গোয়ালা-বুড়ি খানিকটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্লান্ত হয়ে চুপ করে। ধীরে ধীরে সবাই প্রায় চলে যায়। বিজয় একা বসে থাকে। ওদিকে দু'টো দল তাস খেলায় মগ্ন। এমনি সময়ে শশাঙ্ক এলো।

—কি ভাবছিস অত প্যাঁচার মতো মুখ করে। শশাঙ্ক বলে।

—তোর মনিবানীর কথা। বিজয় উত্তর দিয়েছিল, ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। এমন কি থানার দারোগা পর্যন্ত উৎসুক। অথচ•••

—অথচ কি? অন্যমনস্কভাবে জবাব দিয়েছিল শশাঙ্ক।

—অথচ আমার মনে হয় ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। এই ভদ্রমহিলা লেখাপড়া শিখেছেন—নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছেন—ওঁর চেহারা ভালো নয় আর উনি স্বল্পভাষী, এই তো ব্যাপার।

—না, শুধু এই ব্যাপার নয়। শশাঙ্ককে চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল। বুঝলি বিজয়, আরও অনেক ব্যাপার আছে, আমি ঠিক এখনই সব কথা বলতে পারছি না—কিন্তু•••

—কি বল না! এত ভাবছিস কেন?

—জানিস্ অনেক মেয়ে আসে। চিন্তান্বিত কণ্ঠে শশাঙ্ক বলেছিল।

—কেন?

—কেন? দ্বিধাভরে শশাঙ্ক বলে, যে কারণটা মনে আসছে তা ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

এই ঘটনার মাস দুয়েক পরে একদিন শশাঙ্ক এলো। ওর মুখ রক্তশূন্য!

—কি হয়েছে? বিজয় প্রশ্ন করে।

ও কোন উত্তর দেয় না। একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে ও।

—আজ একটা কাণ্ড হয়েছে। অনেকক্ষণ পরে ও বলে।

—তা তোর মুখ দেখে-ই বুঝেছি। কি?

—সকালে এই আটটা ন'টার সময়ে—প্রিয়া চ্যাটার্জী যখন বের হচ্ছে, তখন একজন ভদ্রলোক এলেন। বয়স বছর ত্রিশ, শীর্ণ, ক্লান্ত চেহারা। মুখখানায় এমন মায়া মাখানো যে প্রথমেই চোখ টানে।

প্রিয়া চ্যাটার্জী একবার ওর দিকে তাকালো। সেই ক্লান্ত, করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্বেষভরাকণ্ঠে বলে, কেন তুমি এসেছ?

জলে ভরে ওঠে ছেলেটির চোখ। বলে তোমাকে দেখতে।

•••সেই কণ্ঠ শুনে যে কোন লোকের চোখ জলে ভরে উঠবে—পাষাণেরও হৃদয় বিদারিত হবে, কিন্তু প্রিয়া রুক্ষতর কণ্ঠে বলে, দেখা হোল তো, এবারে চলে যাও।

আর কোন কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় প্রিয়া চ্যাটার্জী। সেই ছেলেটি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

—বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব-ই দেখি। শশাঙ্ক বলতে থাকে, আমার আশ্চর্য মনে হয়—অস্বস্তি লাগে, সব ঘটনাটাই অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু না, স্থিরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, রোদ এসে পড়েছে মুখে, ঠিক যেন বৌদ্ধ জাতকের করুণাঘন মূর্তির ছবি।

—আপনি আসুন, ঘরে এসে বসুন, ওঁর সামনে গিয়ে বলি।

—ও আসুক, ভদ্রলোক উত্তর দিলেন।

—কে? ডাঃ প্রিয়া চ্যাটার্জী? ওঁর ফিরতে তো অনেক দেরি, ততক্ষণ আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

ভদ্রলোক একটু হাসেন, কোন কথা বলেন না।

আর, ডাঃ প্রিয়া চ্যাটার্জী ফিরে এসে ওর দিকে দৃক্‌পাত না করে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে যায়।

বিস্ময়ে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। এও কি সম্ভব? একটা লোক ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত একটি লোক তোমার জন্য দুপুরের রৌদ্রে অপেক্ষা করছে আর তুমি কি না তার দিকে একবার তাকালেও না! তুমি কি মেয়ে? তুমি কি মানুষ?

থাকতে পারলাম না, ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। কোণের ইজিচেয়ারটায় চুপ করে বসে আছে। সেই মুখটার দিকে তাকিয়ে কোন কথা বলতে পারলাম না। বলা যায় না, ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই নীচে কৌশল্যার মা চেঁচিয়ে ওঠে, অ-দিদিমণি, শীগগির নেবে এস। লোকটা যে মরে গেল।

বিদ্যুতের মতো ডাঃ প্রিয়া চ্যাটার্জী নীচে নেমে যায়। আমিও পেছনে পেছনে নামি।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক সেখানেই পড়ে আছেন, দেখে মনে হয় প্রাণ নেই।

প্রিয়া বাঘিনীর মতো লাফিয়ে গিয়ে পড়ে। স্বয়ং মৃত্যুকে ঠেকাবার জন্যও বদ্ধপরিকর। ও নিজেই দু' হাতে তুলতে যাচ্ছিল আমি গিয়ে ধরলাম।

দু'জনে মিলে ঘরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলাম। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম প্রিয়া চ্যাটার্জী এত জোরে ঠোঁট চেপে ধরেছে যে, দাঁতের পাশে রক্তরেখা ফুটে উঠেছে।

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

এটুকু বলে শশাঙ্ক প্রশ্ন করেছিল, ওদের কি ব্যাপার বলতে পারিস।

—তু'জনে তু'জনকে ভালবাসে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে কেন এত নিষ্ঠুরতা! বোধ হয় ভদ্রলোক বিশেষ কোন অন্যায় করেছে।

—তুই ওঁকে দেখিস নি—তাই বলছিস্। অন্যায় করবার মতো উনি নন।

কয়েকদিন পরে শশাঙ্ক এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বিজয় হাসিমুখে প্রশ্ন করে, কি রে? তোদের গল্প কতটা এগুলো।

—গল্প?

—নয় তো কি? বরঞ্চ বলা উচিত গল্পের চেয়েও লোমহর্ষক, তা নায়কের কি হলো—চলে গেছে!

—না, না। অসুস্থ। শয্যাশায়ী।

কয়েকদিন পরে বিজয় জানতে পেরেছিল ভদ্রলোকের নাম জ্যোতির্ময় রায়।

—বেশ বড়ঘরের ছেলে। বলেছিল শশাঙ্ক।

—কি করে জানলি?

—কথাবার্তায় বোঝা যায়। তা ছাড়া, হাতে একটা আংটী দেখলাম—খুব দামী, আর কি চমৎকার কবিতা বলেন। অত সুন্দর কখনও শুনি নি।

—তোকে কবিতা শোনায় কি করে?

—বাঃ। ডাঃ চ্যাটার্জী কলে বেরিয়ে গেলে তো আমরা দু'জনে মিলে গল্প করি। দেশ-বিদেশের কত কথা বলেন। ওঁর বাড়ির কথা বলেন।

—তুই? তুই···, কথাটা বলতে না পেরে নীরব হয়ে যায় বিজয়।

—হ্যাঁ, প্রশ্ন করেছিলাম ওঁকে, আপনি কেন এভাবে এখানে রয়েছেন, তার উত্তরে একটু হেসে বলেন, 'আমি যে ওকে ভালোবাসি।' বললাম, 'এত অপমান, লাঞ্ছনা আপনার অসহ্য লাগে না।' না— 'এটাও যে ভালোবাসারই অঙ্গ।'

—এই রকম প্রেম-পাগলাকে আর কে কি করবে বল। এ সেই রকম, 'মেরেছ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দেব না।' বিজয় হেসে বলে।

কিন্তু এর কয়েকদিন পরে শশাঙ্ক এলো—মুখ শুকনো, গালদু'টো কে যেন টিপে বসিয়ে দিয়েছে—চোখের কোণে গভীর কালি। দেখে চমকে উঠেছিল বিজয়। শশাঙ্ক এসে স্তব্ধের মতো বসেছিল—বিজয় ডাকলেও সাড়া দেয় নি। অনেকক্ষণ পরে, নিজের মনেই বিড়বিড়িয়ে বলেছিল, মেরে ফেলবে—মেরে ফেলবে ও। পৃথিবীর সব কিছুকে ও হত্যা করবে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

বোগোন ভিলিয়া

আভা পাকড়াশী

একরাশ সবুজ পাতার মধ্যে টুকটুকে লাল ফুলগুলি ভারি সুন্দর। শীতের দুপুর। গায়ে মিষ্টি রোদ লাগছে। বড় ক্ষিধে পেয়ে গেছে। অথচ তুমি বলে গেছ খাবার সময় ঠিক ফিরে আসবে। কেন না তুমি জান, আমি একা খেতে পারি না। সেই সকাল আটটায় তুমি স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে গেছ। তখনো অন্ধকার, বাইরের কুয়াসা কাটে নি।

আমি ডাক-বাংলোর সামনের কংক্রিটের রাস্তাটা দিয়ে একবার ওদিকে যাচ্ছি আবার ধীরে ধীরে এদিকে আসছি। দেখছি আর্দালিটা ঝিমোচ্ছে। ওর গা থেকে রোদ্দুরটা সরে গেছে। সেটাও ওর খেয়াল নেই। সকালবেলাকার সেই তাজা শক্ত চেহারাটা কেমন যেন মিইয়ে গেছে। খানসামাও ঘরের ভারী মেরুন রং-এর পর্দাটা সরিয়ে আমাকে একবার দেখে গেল। ওরও সব কাজ সারা হয়ে গেছে। এতদূর থেকে আমি ঠুং-ঠাং আওয়াজ না পেয়েও বুঝতে পারছি, সেই সাদা টেবিলক্লথ-পাতা বড় টেবিলের দু'দিকের দু'টো চেয়ারের সামনে দু'টো রাইসপ্লেট উপুড় করা, কাঁটা-চামচে সাজান হয়ে গেছে। ন্যাপকিন দু'টোও দু'টো গেলাসে ফুলের মত সাজিয়ে দিয়েছে। জলের জাগের পুঁথি গাঁথা নেটের ঢাকাটা অল্প অল্প কাঁপছে। মাঝখানের ফুলদানিটা একপাশে সরান, সকালের তাজা গোলাপগুলোরও নিশ্চয়ই এখন ঐ আর্দালিটার মত ঝিমোনর অবস্থা। একটু ঢিলে হয়ে গেছে। টম্যাটো সস্ আর সল্ট পটটা অন্যদিকে রেখেছে। আমরা গিয়ে বসলেই বাওলভরে গরম চিকেন আইরিশ স্টু, আলুমটর কি শাক আর এক-একখানা করে গরম চাপাটি হাজির করবে খানসামা। আনবে ধোঁয়া-ওঠা সুগন্ধি দেরাদুনী চালের ভাত।

না: ! বড় খাবার কথা ভাবছি। এই ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় স্নানের পর বড় বেশি ক্ষিধে পেয়েছে। ঘরের ভেতর গিয়ে একটা আপেল নিয়ে এসে কামড়ে খেতে খেতে আবার পায়চারি করছি। রোদটা অনেক সরে গেছে। কি সবুজ চারদিকটা। কত নিমের গাছ। হাওয়া চলছে আর শনশন শব্দ উঠছে। দূরে ব্রীজের ওপর ট্রেন যাচ্ছে কি রকম একটা গম্ভীর শব্দ উঠছে। আর্দালিটাও চমকে উঠে বসল। ঠিক আমার মতই ওও ভুল করেছে, সাহেবের গাড়ি আসছে ভেবে। ঠিক স্টেশন ওয়াগানটা অমনি শব্দ করে আসে। জমাদারটা চলে গেল। তারও কাজ সারা হয়ে গেল। বাথরুমটা ধুয়ে-মুছে দিয়ে গেছে। ঘরের ভেতরটা কিরকম ঠাণ্ডা আর নিঃশব্দ হয়ে আছে। ঠিক আমার মনটার মত। ওর গেঞ্জি-পাজামাগুলো শুকিয়ে গেছে, তুলে নিয়ে ঘরে এলাম একবার। মনে হচ্ছে কি শান্তি। কি সুন্দর পরিবেশ। ঠিক যেমনটি আমি চেয়েছিলাম। এমনি একটা নিরালা জায়গায় এসে ওকে একান্ত করে পেতে চেয়েছিলাম। যেখানে ওরও কেউ থাকবে না, আমারও কেউ থাকবে না, শুধু ও আর আমি থাকবো। যতবার ও দিন পেছিয়েছে এখানে আসার, ততবার ওকে বকেছি। ট্রাঙ্ককলের তিনমিনিট সময়ের মধ্যেও রাগ করেছি। অভিমান করে একটার পর একটা চিঠি লিখেছি। বলেছি, তুমি যে বলেছিলে আমাকে প্রথমেই তোমার বাড়িতে নিয়ে তুলবে না। বলেছিলে, এতদিন তোমাকে প্রাণভরে পাই নি এবার এমন জায়গায় নিয়ে যাবো যেখানে তুমি তোমার মত করে আমায় পাবে। আর আমিও শুধু তোমায় নিয়ে সব ভুলে যাবো। আদর কাকে বলে তোমায় বুঝিয়ে দেবো, বুঝবে আমার ভালবাসা কি ? যত্ন কি ?

মিথ্যে বলে নি। সত্যিই এ স্বাদ আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। এমন করে কোন মানুষ যে আমায় নিয়ে মেতে উঠতে পারে সে আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমার প্রত্যেকটি কাজ, ওঠা-বসা, চলাফেরা, হাসি-কথা সবটাই যেন ওর কাছে বিস্ময়। সবকিছুর মধ্যেই ও একটা না একটা বৈশিষ্ট্য খুঁজে পায়। যেন বড়সড় একটি শিশু তার বড় বড় দু'টি অনুসন্ধিৎসু চোখ মেলে অবাক-বিস্ময়ে একটার পর একটা নতুনত্ব নিরীক্ষণ করছে। নেড়েচেড়ে দেখছে, চেখে চেখে পরখ করছে ; যদি ফুরিয়ে যায় এই যেন তার ভয়। ও যদি আমার জীবনে না আসত তা হলে আমার যে একটা মূল্য আছে বা এই বিশেষত্বগুলি আছে সে আমার ধারণার বাইরেই থেকে যেত। কোনদিন আর তা এমনি করে এত আলো নিয়ে আমার জীবনে উদ্ভাসিত হত না। কিন্তু মাত্র তো চারটি দিন। তার দু'টো দিন তো কেটেই গেল।

ইস ! পায়ে কি একটা ফুটছে, সেই গোল গোল চোরকাঁটা। ঐযে হাঁটতে হাঁটতে মাঠের মধ্যে গিয়েছিলাম তখনি কাপড়ে আটকে গেছে। 'চোরকাঁটা' বেশ নামটি। আমার অবস্থাও তো এতদিন ঐ চোরকাঁটার মতই ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে ওর সঙ্গে জড়িয়েছিলাম। সেই সব দিনগুলোতে উঃ কি উন্মাদনা, কি মাদকতা, কত লজ্জা, কত ভয়, কত সংকোচ কিন্তু ধরা যখন পড়ে গেলাম তখন সংশয় ঘুচল। যে আমায় তুলল সে কিন্তু আমার চোরকাঁটা নাম বদলে দিল, আমায় স্বীকৃতি দিল। যত্ন করে আমায় পরখ করল, নতুন করে আবিষ্কার করল আমায়। তার চেনায় আমিও নিজের নতুন পরিচয় পেলাম। যখন বলল চলে এসো আমার কাছে। পারলাম না ফিরিয়ে দিতে। এমন করে তো আমায় কেউ ডাকে নি আগে। সেবা তো অনেকেরই করেছি, সেবাই তো আমার ব্রত। সেই কবে ঘর ছেড়েছি, কোন ছোটবেলায়। তারপর কতবার কত হাসপাতালে গেলাম। নার্স, স্টাফনার্স তারপর পেট্রন। দিনে দিনে বেড়েছে বয়েস, বেড়েছে অভিজ্ঞতা।

উঃ ! প্রথম দিন, যেদিন আমি ট্রেনিং-এ যাবার পারমিশন পেলাম বাড়ি ছেড়ে, কাকা-কাকীমার পরিচিত আশ্রয় ছেড়ে খড়্গপুরে যেতে হবে। হাসপাতাল সংলগ্ন হোস্টেল। কে জানে সে কেমন ? এত উত্তেজনা হয়েছিল যে সারাটা রাত সেদিন ঘুমোতে পারি নি। কি ছেলেমানুষই না ছিলাম। প্রথম প্রথম একশো টাকা করে দেবে। তার থেকে আবার খাওয়া খরচ আর ধোপা খরচ কাটবে। কিছু জমা রাখবে যদি কিছু ভেঙ্গে ফেলি সেইজন্য, তবু তবুও আমার হাতে গোটা কুড়ি-পঁচিশ

টাকা বাঁচবে। তার থেকেই কাকুকে একটা সোয়েটার বুনে দেব, আর কাকীমাকে কিনে দেব একটা ব্লাউজ পিস। এই এতো খরচের মধ্যেও কাকু সব এনে দিচ্ছেন তার জন্য। প্রথমে কাকীমার বিয়ের ট্রাঙ্কটা রং হয়ে এলো। তারপর এলো একটা ছোট হোল্ডঅল। তার মধ্যে দু'টো সাদা চাদর আর আমার স্বল্প বিছানা। এবার চাই তেত্রিশ গজ লংক্লথ। নার্সের গাউন হবে, মাথার ক্যাপ হবে। পায়ের জন্য সাদা মোজা আর সাদা জুতো এলো, আর সুন্দর ছোট্ট একটা ঘড়ি। টান করে খোঁপা বাঁধতে হবে। বাঁধতেই জানি না খোঁপা। বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেতাম। সারাদিন ধরে চুলগুলো নিয়ে কসরত করতাম। ওঃ, প্রথমদিন খোঁপা বেধে কি আনন্দ, সব্বাইকে দেখিয়ে বেড়িয়েছি। ঐ নার্সের এপ্রন, মাথার ক্যাপ আর সাদা উঁচু হিলের জুতো পরে কেমন দেখাবে আমাকে সেই চিন্তায় মশগুল থাকতাম! অনেকে ভয় দেখাত, বলত, পারবি না তুই। কত অচেনা লোকের সেবা করতে হবে। সাংঘাতিক সব অসুখ, ঘেন্না করবে তোর। মনে মনে বলতাম পারবো, নিশ্চয়ই পারব, পারতেই হবে যে আমাকে। এ স্কুলমাস্টারী করা, দিদির মত সেই একঘেয়েমি সইতে সইতে কুঁজো হয়ে যাওয়া, ও আমি পারব না। বুঝি কষ্ট আছে এ কাজের কিন্তু তবু বৈচিত্র্যও তো আছে, কত রকম রুগী তাদের কত রকম অসুখ। তারা যাবে-আসবে, ডিউটিও বদল' হবে। কিন্তু মাস্টারী,—ও বড় একঘেয়ে।

তারপর সুরু হল অন্য জীবন। প্রথম দিকে বিশেষ আটকায় নি। তারপর যখন এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে দিল। উঃ! কি বিভীষিকা। সেই সব আত্মহত্যা করতে যাওয়া রুগী, তাদের কিছুটা পুড়েছে, কিছুটা পোড়ে নি, কি বীভৎস দেখতে হয়েছে। কেউ পুড়েছে অনেকদিন আগে, এক তো পোড়ার ঘা তার ওপর হয়েছে বেডসোর। গেজের পর গেজ ঢুকিয়েই চলেছি এতবড় গর্ত হয়েছে কোমরে। কি উৎকট গন্ধ? পোকা ধরে গেছে কারুর ঘায়। কেউ চাপা পড়ে থেঁতলে এসেছে; কারুর হাত নেই, কারুর পা নেই। কাউকে কেউ বাটারি দিয়ে চুপিয়েছে ট্রেচারটা রক্তে ভাসছে। দেখে দেখে আমার বুকের রক্ত হীম হয়ে যেত। কাজ করব কি? সেবা করব'কি ওদের? নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়তাম। ছুটে কোয়ার্টারে গিয়ে বমি করতাম না হয় বিছানায় শুয়ে পড়তাম। শাস্তি' হত। ডবল ডিউটি পড়ত। বাঁচাত বড়দি। মোটাসোটা গোলগাল হাসিখুশি মেয়ে বড়দি। সে সকলের বড়দি। অনেক কাণ্ড করে আমাকে জেনারেল ওয়ার্ডে চালান করল।

সেই ছোট্ট ঘড়িটা আজও রয়েছে হাতে। ব্যাণ্ডটা নতুন। ও দিয়েছে। বলেছে আজ একটা নতুন ঘড়ি আনবে আমার জন্য দিল্লী থেকে। সেটাতে শুধু ওর জন্যই সময় দেখব আর কারুর জন্য নয়। সময় দেখে চমকে উঠলাম প্রায় আড়াইটে বাজে। রোসনদানির মধ্যে দিয়ে রোদ্দুর আসছে ঘরে। হলদে ঘরে জানলা-দরজার মেরুন রং পর্দায় রোদের আলো পড়ে, কেমন যেন একটা লাল আভা ছড়াচ্ছে। আর হাঁটতে পারছি না বাইরে গিয়ে। পা ব্যথা করছে। খাটেই বসে আছি সেই থেকে। এবার লেপটা পায়ের ওপর টেনে নিলাম। বাইরে বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিলাম ও এসে দেখবে আমি ওর জন্য অপেক্ষা করছি। ওর গাড়িটা গেট দিয়ে ঢুকতে দেখলেই একপাশে সরে দাঁড়াব। ও হাসতে হাসতে একলাফে নামবে, আর কোনদিকে না তাকিয়ে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেবে। আর্দালিটা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বলবে 'জয়হিন্দ'। ও শুধু তাকে একবার চোখের কোণ দিয়ে দেখবে। ঘরে ঢুকেই বলবে বাঃ সুন্দর করে রেখেছ তো ঘরটি। এই না হলে তুমি? হঠাৎ আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলবে—জিতা! তুমি কিন্তু দু'দিনেই বড্ড বেশি সুন্দর হয়ে গেছ। কেমন যেন একটা নতুন আলো পড়েছে তোমার মুখে। আরও একটু সরে এসে কানে কানে বলবে,—বিয়ের জল। মুখের সেই আধখোলা হাসিটা ফুটে উঠবে, একটা ইচ্ছের ইসারা জাগতেই আর্দালিটার দিকে চোখ পড়তে থমকে যাবে। সে তখন সাহেবের পোযাক ঠিক করতে ব্যস্ত। কাঁধের কাছের অশোকচক্রটি আর স্টার দু'টো ঝকঝক করছে। সুন্দর পালিশ করেছে কিন্তু আর্দালি। খানসামা এসে দরজায় নক্ করবে, সাব খানা যোগাড়?

এককলি গান তখন তোমার মুখে গুনগুন করছে, হাতে সিগারেট। তুমি বলবে,—হ্যাঁ হ্যাঁ জল্‌দি করো।

আবার আমার দিকে তাকাবে আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখবে আমায়, চুল আঁচড়াচ্ছ তখন তুমি।

ব্যস্ত হয়ে বলবে—খাও নি এখনো তুমি? এই তোমার দোষ। আমার দিকে চেয়ে থেকে বলবে—লেমন কলারটা সুন্দর মানায় তো তোমাকে? চারদিকে একবার দেখে নেবে। আর্দালি বলে গেছে, আবার সন্ধ্যে ছ'টায় আসবে। খানসামা ঠুং-ঠাং শব্দে খাবার যোগাচ্ছে ও-ঘরে। আমাকে জড়িয়ে ধরে,—আমার রাণীটি, আমার জিতাটি বলে ব[illegible] নেবে।

[illegible] থেকে খানসামা ডাকবে—সাব!

চমকে উঠে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলবে,—ইয়েস।

সেই মিষ্টি মিষ্টি দুষ্ট হাসিটা হাসতে হাসতে বলবে,—চল রাণী খাবে চল।

চিন্তায় ছেদ পড়ল, বেলা যে তিনটে বাজে? এমন তো কথা ছিল না। বলেছিল লাঞ্চটাইমে সে নিশ্চয়ই ফিরবে। তবে? দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম কেমন জেগে জেগে? হঠাৎ এই ঝিমোন ঘরেও কেমন সুন্দর একটা চাঞ্চল্য এসেছিল। আশ্চর্য ও নেই তবু যেন ও রয়েছে। ঐ তো ড্রেসিং-টেবিলের ওপর ওর সেভিং কেস, ব্রাস, চিরুণী। ওয়ার্ড রোবের মধ্যে হ্যাঙ্গারে স্যুট আর ইউনিফর্ম ঝুলছে। বড় হলদে তোয়ালেটা ওর গায়ের গন্ধ মেখে চেয়ারের পিঠে ঝুলছে। ব্রাউন সু'টা পালিশ মেখে চকচক করছে সু-স্ট্যাণ্ডে। পাশেই আমার চটিটা রয়েছে। টেবিলের ওপর পাশাপাশি দু'টো সুটকেশ। একটা ওর একটা আমার। ওপাশের ছোট টেবিলটায় আমার সব টুকিটাকি জিনিস। এমনি সাজান ঘর ও বড় ভালবাসে। ও নিজের ঘর, নিজের বাড়ি, নিজের বাগান সব সাজিয়েছিল, কিন্তু শান্তি পায় নি। আমি তার সাক্ষী। সেবা করতে গিয়েছিলাম তাঁকে ওর মিসেসকে। উঃ কি জঘন্য মেজাজ আর নোংরা মন ছিল ভদ্রমহিলার। আশ্চর্য! তারপর তিন বছর কেটে গেছে? এলাহাবাদ থেকে বদলি হয়ে গেল ও কলকাতায়। এলাহাবাদেই আমার সঙ্গে পরিচয়। সামান্য অসুস্থ হয়ে এসেছিল কমলা নেহরু হস্‌পিটালে। আমি অবাক হয়ে

জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই অসুখে আবার কেউ হাসপাতালে আসে নাকি? বলেছিল, কি করব বাড়িতে যে বলল ইনফ্লুয়েঞ্জা ভীষণ ছোঁয়াচে। আমাকে কে দেখবে, তাইজন্য আসতে হল। ও'তো আর দেখবে না। এই সামান্য ব্যাপারে মিলিটারি হসপিটালে যায় নি ও।

ঐ ক'দিনের আলাপে কি জানি ও কি পেলো আমার মধ্যে? কিন্তু আমাকে ও পেয়ে বসল। ওর অসহায় অবস্থা, মিষ্টি স্বভাব-চঞ্চল অভ্যাস, সব মিলে যেন একটা দুরন্ত শিশু। তারপর ডাঃ খান্না ওর স্ত্রীর চিকিৎসার ভার নিতে বাধ্য হয়ে আমাকে দিনরাতের নার্স হয়ে ওর বাড়ি যেতে হল। বুঝলাম কি ব্যাপার। বাড়িশুদ্ধ চাকর, বাবুর্চি, খানসামা, আর্দালি সবাই তটস্থ মেজাজে। খুব সৌখীন ভদ্রমহিলা। অসুখের মধ্যেও মেকআপ করবেন। এদিকে কর্তার জামা-কাপড় ছেঁড়া, ময়লা। বুঝলাম ইনি বিয়ে করেছেন ওর স্যালারিকে, স্ট্যাটাসকে—ওকে নয়। আমাকে একা পেলেই বলত—কিছু মনে কোর না ও ঐরকম। বুঝতাম অসম্ভব ভয় পায়। তাই এত বেড়ে গেছেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু এলাহাবাদ তাঁকে ছাড়ল না। ওও আমাকে ছাড়ল না। তবে বদলির পরওয়ানা এলো। ওঃ! সেদিন কি কান্না কেঁদেছি। সমানে ট্রাঙ্ককল করতো। খবর রাখত, বলত একটু গুছিয়ে নি। মাঝে এসে কি মনে করে বেঁধে গেল আমায়। ওর ভয় পাছে হারিয়ে যাই। মাত্র সাতদিন ছুটি পেয়েছিল। কিন্তু আমার তখন পরীক্ষা, মোটেই কাছে পাই নি ওকে। তারপর কত কাণ্ড করে এখানে আসা দু'জনে। এবার ওর বাড়ির সবাইকে ও জানিয়েছে। আমার কথা বলেছে। এখান থেকে ফিরে এলাহাবাদের হসপিটালের কাজ ছেড়ে দেবে, তারপর দু'জনে একসঙ্গে কলকাতা যাব। ভালবাসব ওঁদের। ওঁরা তো ওরই বাবা, মা, দাদা, বৌদি? মিষ্টি একটি বৌ হয়ে যাব।

—মেমসাব?

আর্দালিটা ডাকছে। বোধ হয় ছুটি চায়। আমার জবাব দেবার আগেই স্টেশন ওয়াগনটা গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাড়াতাড়ি পায়ে চটিটা গলিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। আর্দালিটাও তটস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু এতো একজন সাহেব? আমাদের কর্নেল সাহেব কই? অজানা আশঙ্কায় বুকের মধ্যেটা যেন কেমন হিম হয়ে গেল।

—আর ইউ মিসেস সেন?

কাঁপা গলায় উত্তর দিলাম, ইয়েস।

আই অ্যাম ভেরি সরি, দিস ইস ইওর লেটার।

আমার বুকটা থরথর করে কাঁপছে, নিজেই নিজের বুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তবু পড়লাম চিঠিটা।

আমার জিতা,

আমি জানি তুমি ভীষণ শক পাবে। আমাকে নেফা যেতে হচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লী ছাড়তে হবে। তুমি জানো, আমি তোমার কাছ থেকে প্রায় সাতাশ-আটাশ মাইল দূরে দিল্লীতে বসে রয়েছি। আর দু'ঘণ্টা পরে প্লেন ছাড়বে। আমার ফেরা তাই সম্ভব হল না। এই অফিসারের সঙ্গে আমার লাগেজগুলো আর্দালির সাহায্যে প্যাক করে পাঠিয়ে দিও। আর তুমি বিলগুলো মিট আপ করে ফিরে যাও। সন্ধ্যের গাড়ি পেয়ে যাবে। এই সাহেবই তোমায় পৌঁছে দিয়ে সেই ট্রেনে কলকাতা যাবে। টাকা আমার মানিব্যাগ থেকে নিও, নিশ্চয়ই নিও। তোমার টাকা খরচ কোর না। এখন তো আর তোমার সঙ্কোচ থাকা উচিত নয়।

তুমি বলেছিলে, বোগেন ভিলিয়ার গাছ লাগাবে বাড়িতে। কয়েকটা ডাল কেটে নিয়ে যেও। টুকরো টুকরো করে কেটে লাগিয়ে দিও। পাতা ঝরে যাবে, একেবারে শুকিয়ে যাবে, তবুও নিরাশ হয়ে যেও না। জল দিয়ে যেও, একদিন না একদিন ফুল ফুটবেই।

বেঁচে থাকি তো ফিরে এসে তোমার কাছে আগে যাব। আমার রাণীটি, আমার জিতাটি, ভেঙ্গে পড় না। আমি জানি, তুমি খুব শক্ত, না হলে জীবনের এত ঝড়ঝঞ্ঝা সইতে পারতে না। আমার আদর নাও।

আর্মি হেড কোয়ার্টার
নিউদিল্লী

তোমার
—সোনা

বস্টন প্রবাসের দিন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণা বসু

হানিমুনের পর

একটা মাস দেখতে দেখতে কেটে গেল—অপরিচয়ের বেড়া ডিঙিয়ে বস্টনের সঙ্গে চেনাশুনো করতে, আমেরিকান জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে। শ'রও মাসখানেক গেল কর্মস্থলে কাজের ধারা বুঝে নিতে। তারপর একদিন বস্ বললেন ডেকে, হানিমুন ইজ ওভার, এবার কাজকর্মের ভার বুঝে নাও।

আমারও হানিমুন ওভার হয়ে গেল চটপট্। নতুন পরিচয়ের আনন্দ, কৌতূহলের ওপর প্রাত্যহিকতার ছাপ পড়ল। জড়িয়ে পড়লাম দৈনন্দিন কাজের জালে।

সকাল উঠে ব্রেকফাস্ট তৈরি করি ছুটে ছুটে। গৃহকর্তা কাজে বেরিয়ে যান আটটার মধ্যে। তারপর একটু ঢিলে দেওয়া চলে। চায়ের বাসন ধুতে-ধুতে ঘণ্টা বেজে ওঠে দরজায় দু'বার ক্রিং-ক্রিং, ক্রিং-ক্রিং। ওটা সাংকেতিক তার মানে চিঠি এনেছে পিওন। বুও বুঝে ফেলেছে এ সংকেতের মর্ম। উৎসাহিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মেলম্যান, মেলম্যান বলে। হয়ত চিঠি এল দেশের, নয়ত নিউইয়র্ক থেকে আন্টির। সিংকের ওপর অর্ধসমাপ্ত বাসনধোয়া ফেলে রেখে পড়ি-মরি করে ছুটি চিঠি নিতে।

বাজার করা আছে এরপর। কাছেই সুপার মার্কেট। ছেলের হাত ধরে চলে যাই।

চেনাশুনো হয়ে গেছে পাড়াপড়শীদের সঙ্গে। পথ চলতে দেখা হয়ে যায়, হ্যালো, হাউ আর ইউ দিস মর্নিং? বলে সবাই। কোয়াইট ওয়েল, থ্যাংক ইউ। বলতে বলতে মনে মনে ভাবি এরা সব সময় দিস্ মর্নিং জুড়ে দেয় কেন? বিশেষ করে আজ সকালে কেমন আছি জানতে চায়? না কি ওটা অমনি একটা রীতি?

ওই যে থ্যাংক ইউ বললে সবাই ফিরে বলে ইউ আর ওয়েলকাম এটা কিন্তু বরাবর সুন্দর মনে হত আমার। ছেলেবেলায় যদিও ইংরেজি কেতামতে শিখেছিলাম থ্যাংক ইউ বললে ফিরে বলতে

হয় ডোণ্ট মেনশন্ নয়ত ইটজ্ অল রাইট। কাজের বেলায় কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই ওগুলো ব্যবহার করা হয়। একটু হাসি, একটু চাহনি ধন্যবাদের উত্তরে অনেক সময় তাই যথেষ্ট। যদি কিছু বলতেই হয় তবে ডোণ্ট মেনশন বা থাক থাক ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই এর চাইতে ইউ আর ওয়েলকাম সম্ভাষণে ধন্যবাদ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করার যে ভাবটি ফুটে ওঠে তা অনেক বেশি সুন্দর নয় কি ?

পাশের বাড়ির মিঃ শ্রাহেন, বু ডাকে আংকল জো, এগিয়ে আসেন আমাদের দেখে, বুর দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বলেন, হা-ই জো, কাম্ শেক হ্যাণ্ডস্। এটা একটা বাঁধা ঠাট্টা দু'জনের মধ্যে বিনিময় হয় রোজ সকালে। জো বলে ডাকলে বু খেপে উঠে বলে, আই এ্যাম নট জো, মাই নেম্ ইজ বু। ততক্ষণে চাচা জো দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকেছেন। একটা পাতলা কাগজের ন্যাপকিনে মুড়ে নিয়ে এসেছেন গরম 'কুকি'—মানে বিস্কিট, একদম বেকিং প্যান থেকে তুলে। কুকির দিকে একনজর চেয়ে আর হ্যাণ্ড শেক-এ আপত্তি করা চলে না, জো বলে ডাকলেও না।

সুপার মার্কেটের কাচের দরজা—চৌকাঠে পা দিতে-না-দিতে আপনি খুলে যায়। ঝলমল করে ওঠে ভেতরে থরেথরে সাজানো কত বিচিত্র সামগ্রী। ক্রেতার মাথা ঘুরে যায় অমনি। দরজার পাশ থেকে একখানা পুশকার্ট বা ঠেলাগাড়ি টেনে নিয়ে ঘুরে ঘুরে হরেকরকম পছন্দমত জিনিস বাছাই করছে আর গাড়ি বোঝাই করছে সবাই। দাম দেবার পালা আসবে সবার শেষে। হাতে আছে লিস্ট কি কি চাই, পণ করেছি মনে বাড়তি জিনিস একটিও কিনব না। ওমা! কোথা থেকে যে কি হয়ে যায়। বাড়তির সংখ্যাই বেশি হয়ে যায় লিস্টির চাইতে।

ওপাশের শেল্ফে দেখছি প্ল্যাস্টিকের টেবিল ক্লথ এসেছে নতুন। একটা টেবিল ক্লথ দরকার কিচেনের গোল টেবিলটার জন্য। কি করে যে চলছিস এতদিন টেবিল ক্লথ ছাড়া, ভেবেই পাই না। চেক্-কাটা ঝাড়নের স্তূপ ওধারে টেবিলের ওপর। একটা ঝাড়নের অভাবে অসুবিধা হচ্ছিল ভারি ক'দিন থেকে। এদিকে খেলনার কর্নারের পাশে মাটিতে টাল করে রাখা আছে বেডরুম স্লিপার। বেশ সুন্দর তো, একজোড়া নিলে মন্দ হয় না। ওপরে বড় বড় হরফে লেখা 'সেল।' নিয়েই নেওয়া যাক সস্তায় দিচ্ছে যখন। এমনি করে স্তূপাকার হয়ে ওঠে পুশকার্টের ওপর জিনিসপত্তর, খাদ্য-অখাদ্য সব রকম।

তরি-তরকারীর লাইনে সাজানো আছে সুন্দর করে আলু, বেগুন, ফুলকপি, টমাটো। কুটনো কোটার হাঙ্গামাতে আর যেতে ইচ্ছে করছে না ? ঠিক আছে। প্ল্যাস্টিকের থলেতে জড়ানো আছে কাটা ফুলকপির টুকরো। নয়ত ফ্রজেন ফুডের দিকে গেলে সবই পাওয়া যাবে। কাগজের বাক্সে খোসা-ছাড়ানো কড়াইশুঁটি, টুকরো করে কাটা গাজর, নয়ত সবরকম পাঁচ মিশেলী তরকারী। মাছ-মাংসের দিকে ভিড় করেছে সবাই; কাটা ধোয়া চক্‌চকে স্বচ্ছ কাগজে মোড়া প্যাকেট সাজান রয়েছে নানান্ ওজনের, নানান সাইজের। মুরগী কি চাই ? আস্ত, আধখানা, শুধু ঠ্যাং দু'খানা—সবই আছে। তাও হয়ত মনোমত জিনিসটি খুঁজে পাচ্ছেন না কেউ। সামনেই buzzer আছে। বোতাম টিপে ধরতেই বেরিয়ে আসছে—কোন দোকান কর্মচারিণী। নিঃশব্দে দরকারের জিনিসটি এগিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হল অন্তরালে।

সুপার মার্কেটের একটি প্রধান লক্ষণই হল দোকানীর অনুপস্থিতি। কিছু দরকার হলে জিজ্ঞেস করে নিতে পার কিন্তু জিনিসপত্র কেনার জন্য কেউ মাথার দিব্যি দিচ্ছে না, দর কষাকষি করারও কোন সুযোগ নেই। তবে আধুনিক জগতে প্রোপাগাণ্ডার এমনি গুণ, দোকান-সজ্জা বা ডিসপ্লের এমনি মহিমা যে, খদ্দের যথারীতি ঘায়েল হয়ে যাচ্ছেন। দোকানী হাঁকডাক করছে না বটে কিন্তু র‍্যাক ভর্তি নয়ন-লোভন বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার কেবলি হাতছানি দিয়ে চলেছে ক্রেতাকে, যেন ডেকে ডেকে বলছে আমাকে কেনো, আমাকে কেনো।

সুপার মার্কেট প্রসঙ্গে আমার সবসময় মিরিয়মের কথা মনে পড়ে যায়। মিরিয়ম আমার বান্ধবী, আর্টের ইতিহাসের ছাত্রী। তার স্বামী ডার্গেলিস একজন প্রতিভাবান চিত্রকর। ডার্গেলিসের চিত্রকলার আলোচনা করতে করতে দু'জন মহিলার আলাপচারিতে যেমন হয়েই থাকে ফস্ করে মিরিয়ম মোড় ঘুরিয়ে মার্কেটিং প্রসঙ্গে পৌঁছে গেল।

চোখ বড় করে বললে, আচ্ছা, তুমি হে-মার্কেটে বাজার করেছ কখনো।

করি নি। যদিও হে-মার্কেট স্টেশন চোখে পড়েছে আমার আণ্ডার গ্রাউণ্ড স্ট্রীটকারে যেতে যেতে! বললাম, কেন হে-মার্কেট বিশেষ বাজার না কি!

চোখ আরো বড় করে হাত নেড়ে মহা উৎসাহে বলে উঠল মিরিয়ম্, তবে আর বলছি কেন। জানো, সেখানে সব জিনিসপত্র তরি-তরকারী নিয়ে ওপেন-এয়ারে বসে। আবার দরাদরিও করা যায় বেশ।

এতবড় একটা সাংঘাতিক খবরে আমাকে একটুও বিচলিত হতে না দেখে মিরিয়ম হয়ত আশ্চর্য হল। কিন্তু আমি যে দেখে অভ্যস্ত গড়িয়াহাট, লেক্ মার্কেটের বাজার, এমন কি সাঁওতাল পরগণার মেঠো হাট। ওপেন-এয়ারে বাজার বসে আর দরাদরিও করা যায় বেশ, এতো আমার কাছে কোন অত্যাশ্চর্য খবর নয়। আমার বরং আশ্চর্য লাগে ওদের সুপার মার্কেট। বড় বড় কাগজের কার্টন ভর্তি দুধ আর রকমারি ফলের রস তুলে নিচ্ছে গৃহিণীরা কোয়ার্টার গ্যালন, আধ গ্যালন, যেমন সাইজ চাই। এক গ্যালন দুধ অবশ্য কার্টনে নয়, প্রকাণ্ড কাচের জারে আছে। গরুর সঙ্গে দুধের সম্পর্ক কি, বলতে পারবে না কোন আমেরিকান শিশু। কাগজের কার্টন আর কাচের জার থেকে দুধ বার হতে দেখছে সে আজন্ম।

সুপার মার্কেট থেকে বাইরে যাবার মুখে এপাশে রয়েছে আইসক্রীমের র‍্যাক। দেশে ফিরে গিয়ে আমেরিকার কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মিস করবেন, প্রশ্ন করা হয়েছিল আমার এক ভারতীয় বন্ধুকে। তিনি হেসে বলেছিলেন, আইসক্রীম। সত্যি, আমেরিকার মত এত উৎকৃষ্ট এবং এত রকমারি আইসক্রীম আর কোথাও দেখি নি। আর কতরকমের ফ্লেভার—ভ্যানিলা, স্ট্র-বেরীর সাধারণ সুগন্ধ থেকে সুরু করে পীচ, পাইন-আপেলের ডেলিকেট ফ্লেভার।

এই আইসক্রীম-রসিক ভারতীয়ের গল্পটা মিরিয়মকে বলতে বলতে আমি বলেছিলাম, আমাকে এই প্রশ্ন করলে আমি কিন্তু বলতাম, দেশে ফিরে আমেরিকান জীবনযাত্রার যে জিনিসটা আমি সবচেয়ে বেশি মিস করব তা হল সুপার মার্কেট। এত আরামে বাজার করার কথা দেশে ভাবতেই পারব না। হাঁকডাক, হৈ-হট্টগোল, দরাদরি নোংরা আবর্জনার

স্তূপ সব মিলে ওখানে বাজার করাটা একটা বিভীষিকা মনে হয় আমার।

মিরিয়ম আমার সঙ্গে কিন্তু একমত হতে পারল না। বললে, এখানকার হাটবাজারে হিউম্যান সাইডটা একেবারে অবহেলিত। তোমার বর্ণনা শুনে আমার মনে হচ্ছে, কলকাতায় বাজার করাটা একটা ট্রীট নিশ্চয়ই।

বাজার সেরে ফিরবার পথে দু'হাতে থাকে দু'টো বিরাট কাগজের ঠোঙা। রাস্তা পার হতে গিয়ে বুকে বলি, আঁচল ধরো। শক্ত হাতে মুঠো করে আঁচল ধরে পার হয়ে যায় রাস্তা আমার সঙ্গে। এই কায়দাটা এখানে শিখেছি নতুন। ফেনওয়েতে বেড়াতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি মায়েরা আসে নানান বয়সী শিশুদের নিয়ে, রাস্তা পার হবার সময় তীক্ষ্ণ মেমসাহেবী গলায় কানে আসে হোল্ড অন, হোল্ড অন। ছোট ছোট বাচ্চা কেমন সুন্দর মায়ের কোট, স্কার্ট চেপে ধরে চলে যাচ্ছে।

অবশ্য এখানকার ট্রাফিক পুলিশ ও মোটরগাড়ির চালক দুই-ই শিশুদের প্রতি অত্যন্ত সদয়। পথেঘাটে শিশুদের রাইট অফ ওয়ে প্রায় অ্যাম্বুলেন্সের মত। কোপলে স্কোয়ারে চারমাথার মোড়ে একবার বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম খুব। ঠিকমত ট্রাফিক সিগন্যাল অনুসরণ করে না আসাতে দেখি ঠিক মোড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। আর প্রায় চারদিক থেকেই গাড়ি আসছে ছুটে। বুব হাত ধরে দাঁড়িয়ে ভাবছি চোখটা বুজে ফেলব কি না—এমন সময় ম্যাজিকের মত চারদিকের মোটরগাড়ির স্রোত থেমে গেল।

মোড়ের ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের ওপর দাঁড়ানো পুলিশ হাত দেখিয়ে থামিয়ে দিয়েছে চারদিকের গাড়ি। আর প্রাণপণে হাত নেড়ে আমাকে ইসারা করছে পার হয়ে যেতে। সেদিন মনে বেশ গর্ব হল। জানতাম না এটা এমন কিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়। হামেশাই এরকম হয়। হুড়মুড় করে আসতে আসতে ব্রেক কষে গাড়ি থামায় চালক। কিছু না, বেবী-ক্যারেজে শিশু নিয়ে রাস্তার পাশে অপেক্ষা করছে কোন মা পার হবার জন্য। হাত নেড়ে তাকে আগে যেতে ইঙ্গিত করবে চালক।

সেদিন ভেবেছিলাম পুলিশটা হয়ত আমাকে ভেবেছে এম্প্রেস অফ্ ইণ্ডিয়া, ভারতবর্ষের রাণী। আশ্চর্য নয়। নিউইয়র্কের হার্লেম অঞ্চলে একবার ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম একা। যদিও আন্টির নিষেধ ছিল। বারবার বলেছিলেন, ওটা শেডি ক্যারেক্টারদের জায়গা। একটা লোক এগিয়ে এসে আলাপ জমালো অযাচিতভাবে। একথা-সেকথার পর জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা, তোমার চুলের সিঁথিতে ঐ লাল লাইনটা কিসের? ওটা কি কিছুর সিম্বল? অবশ্য তোমার কপালে ঐ লাল স্পটের মানে আমি জানি কিন্তু চুলের মধ্যে লাল লাইন আগে দেখি নি।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, লাল টিপের মানে তুমি জান? কি বলো তো?

সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, কেন ওটা তো রয়েলটির চিহ্ন, তুমি নিশ্চয় কোন রয়েল ফ্যামিলির মেয়ে।

দু'এক কথা বলে আমি তখন সরে পড়তে পারলে বাঁচি। একটুও ইচ্ছে নয় যে তার ভুলটা ভাঙি। আবার মনে মনে ভয়ও ধরে গেল শেষটা সত্যি কোন রাজকন্যা ঠাউরে কিডন্যাপ করে নেবে না তো 'হোস্টেজ' করে রাখতে?

চাবি ঘুরিয়ে বাড়িতে ঢুকে হাতের জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলে রাখি। বু কেমন সাহায্য করে, এগিয়ে দেয় হাতের কাছে এটা-ওটা, রেফ্রিজেরেটরের নীচু তাকে নিজেই ঢুকিয়ে রাখে কড়াইশুঁটির প্যাকেট, চীজের টুকরো। কত অল্পদিনে এসব দেশে শিশুরা পর্যন্ত স্বাবলম্বী হয়ে যায় ভেবে আশ্চর্য হই। নয়ত ওর যা বয়স, হত যদি কলকাতা, মাটিতে কি পা পড়তে পেত ওর? এর কোলে তার কোলে দিন কাটত।

অবশ্য শুধু শিশুর কথা কেন? শিশুর মা (এবং বাবাও) অতি অল্পদিন আমেরিকান ওয়ে অফ লাইফ লীড করে যেরকম দ্রুত সর্ব-কর্মপটুত্বের পরিচয় দিতে সুরু করলাম, তাতে নিজেরাই চমৎকৃত। আমার হয়ত বেশ দম্ভই হয়ে যেত, যদি দর্পহারী মধুসূদনের মত আমার বাড়িওয়ালা থিওডোর যখন-তখন আমার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মনে না করিয়ে দিত।

যে-কোন লোককে চট্ করে একটা উপযুক্ত নামকরণ করে দেওয়ার অভ্যাস আছে বুর। থিওডোরকে সে ডাকে খিটুখিটে বুড়ো আংকল। নামটা যে নিতান্ত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভাগ্যিস বুড়ো বাংলা জানে না। দুপুরবেলা হাতে হাতুড়ি-বাটালি আর দু' একটা যন্ত্রপাতি নিয়ে খিটখিটে বুড়ো আংকলের আবির্ভাব আমার এপার্টমেন্টে। আমিই খবর দিয়েছিলাম বাথরুমের ফ্লাশিং সিস্টেমটা ঠিকমত কাজ করছে না। স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে বিভিন্ন অংশগুলো খুলতে খুলতে বুড়ো আমার সঙ্গে বকবক সুরু করে। তোমরা ইণ্ডিয়ান মেয়েরা ভারি ভাল, চমৎকার স্বভাব, খুব গুড মাদার—তবে কি জানো, তোমরা তেমন কাজের নও। গলগল্ করে ময়লা জল বেরিয়ে পড়ে সিস্টার্ন থেকে। দু' হাতে জঞ্জাল ঘেঁটে আবার সব জুড়তে জুড়তে বুড়ো বলে, এই দেখো না এই ফ্লাশিং সিস্টেমটা কোন আমেরিকান গৃহিণী হলে নিজেই মেরামত করে নিতে পারত, আমাকে ডাকাডাকি করতে হত না। কিন্তু তুমি—ইত্যাদি।

হাউসহোল্ড 'চোর'

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, আমার বস্টন জীবনের প্রথম দিকে হাউসহোল্ড চোরের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম সহজেই। (হ্যাঁ, 'চোর' chore) মনে পড়ে যেত কলকাতার বাড়ির হরিপদ বা পাঁচুর মার কথা। অথচ এ দুর্বলতার খবর আমার বান্ধবী ও প্রতিবেশিনীদের কাছে গোপন করে চলা ছাড়া উপায় কি! নানারকম কলকব্জা, গ্যাজেট উদ্ভাবন করে সংসারের কাজের ভার হাল্কা করবার চেষ্টা হয়েছে ওদেশে। তবুও কাজ যথেষ্ট আছে। আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপের মত চোখের নিমেষে কিছুই হয়ে যায় না।

জননী ও জায়ার ভূমিকা ছাড়াও আমেরিকান গৃহিণীকে একাধারে ঠাকুর-চাকর-মালী-ড্রাইভার সবরকম ভূমিকায় নেমে পড়তে দেখেছি আমেরিকান গৃহিণীর কর্মপটুতা আমাকে লজ্জা দিয়েছে। আর মুগ্ধ হয়েছি এদের হেলায় সবকিছু করে ফেলবার ক্ষমতায়। এই তো সন্ধ্যাবেলায় আমার প্রতিবেশিনী মিসেস কালিনেন্ নতুন কেনা লাল ককটেল ড্রেসটি পরে পার্টিতে গেলেন। তখন তাঁকে দেখে একবারো কি কেউ বুঝবে মাত্র একঘণ্টা আগে ইনি ফুটপাথে পার্ক করা গাড়িটি স্বহস্তে ধোয়া-মোছা করতে ব্যস্ত ছিলেন।

হ্যারিয়েট বললে, আই লাভ্ ডুয়িং মাই ওন ওয়ার্ক, তুমি কি বলো?

ঢোক গিলে বললাম, মানে আমারো বেশ লাগে, তবে কি জানো আমার একটা ধারণা হয়েছে—তোমাদের দেশে যে মেয়ে বিয়ে করেছে যার ছেলেমেয়ে আছে, সংসার আছে তার পক্ষে কোন গবেষণার কাজ করা, সিরিয়স পড়াশুনো করা, সাহিত্যে-বিজ্ঞানে কোন মহৎ কীর্তির কাজে হাত দেওয়া একটু শক্ত নয় কি? এ ধরণের কাজের জন্য যেটুকু অবকাশ বা লিজার দরকার সে বোধ হয় পায় না, তাই নয়?

হ্যারিয়েট আমার যুক্তির সার্থকতা খুঁজে পেল না। বললে, অন্তত চারদিকে তাকালে আমাদের দেশের মেয়েরা সবধরণের কর্মক্ষেত্রে যেমন সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে দেখতে পাই, তাতে তো কোন অসুবিধার কারণ ঘটেছে বলে মনে হয় না।

হাউসহোল্ড 'চোর' সংক্ষিপ্ত করতে কাপড় কাচার জন্য আছে—ওয়াশিং মেশিন, বাসন মাজারও আছে ডিশ-ওয়াশার, ঘর ঝাঁট দিতে আছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। গ্যাসের উনুন ও রেফ্রিজেরেটর প্রতি ঘরেই দেখতে পাওয়া যাবে, সাধারণের নাগালের বাইরে নয় সে সব। সুপার মার্কেট বাজার করা করেছে সহজতর। ক্যান্ড ফুড বা টিনের খাবার ও ফ্রজেন ফুড অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরি হচ্ছে ওদেশে। এর ওপর আছে 'গরম করে খাও' রেডিমেড খাবার। প্যাকেট ভর্তি মাংসের রোস্ট বা ভাজা মাছ, প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে heat n' serve-এর আবার আর একটা নামও আছে টি-ভি ডিনার। এসব না কি টি-ভি দেখতে দেখতে খাবার কথা—তাই এই অপূর্ব নামকরণ।

এর থেকে কেউ যদি ধারণা করে বসে যে, ওরা বুঝি টিন খুলছে আর খাচ্ছে, রাঁধা-বাড়ার পাট তুলেই দিয়েছে একেবারে, তবে কিন্তু খুবই ভুল হবে। প্রায় প্রত্যেক আমেরিকান গৃহে দিনের একটা বড় খাওয়া রেঁধে-বেড়েই খাওয়া হয়। তবে বাড়াবাড়ি নেই কোন কিছুতেই। নেমন্তন্ন খাওয়াতে হলেও সাধারণত মাছ বা মাংস একটা পদ যথেষ্ট। আনুষঙ্গিক একটা তরকারী, স্টার্চ হিসেবে আলু বা রুটি-মাখন। ডেজার্টের জন্য অনেকসময় আইসক্রীম। খুব বিশেষ কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়া হলে একটা মাছ ও একটা মাংস দু'রকম পদ। দেশ থেকে চিটি এল আমার এক আত্মীয়ার জামাইকে নেমন্তন্ন করে কি কি খাইয়েছেন, লিখেছেন। সেই খাওয়ার মেনু অনুবাদ করে শুনিয়েছিলাম কোন কোন বন্ধুকে। শুনে তারা শুধু বলেছিল, হোয়াট!

য়ুরোপে দেখেছি লাঞ্চটাই ওদের বড় খাওয়া, রাত্রের ডিনার হয় হাল্কা। আমেরিকাতে কিন্তু লাঞ্চটা একটা স্যাণ্ডউইচ দিয়ে সারা

হয় অথবা ক্যান খুলে সুপ ঢেলে নেওয়া হয় একপাত্র। কাজকর্মে যারা বাইরে থাকে কর্মস্থলেই খেয়ে নেয় তারা—নয়ত চলে যায় ড্রাগ স্টোর্সে—একটা হট ডগ কাগজের কার্টনে এক কার্টন দুধ হয়ে গেল লাঞ্চ। রাত্রের ডিনার এদের আসল খাওয়া। সন্ধ্যা ছ'টা হল ডিনার টাইম। শীতকালে চারটে বাজতে আঁধার ঘনিয়ে আসে—গ্রীষ্মকালে ন'টা পর্যন্ত সূর্যাস্ত হতে চায় না। কিন্তু শীত-গ্রীষ্ম যাই হোক না কেন ছ'টার সময় রাত্রের খাওয়া খেতে বসা চাই আমেরিকানদের। এ ব্যবস্থার সুবিধে আছে অবশ্যই। সাতটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া, বাসন-ধোয়া, সবরকম ঘরকন্নার 'চোর' সমাপ্ত করে যে যার মতে বেরিয়ে পড়ে। হয় কাজে, নয় অবসর বিনোদনে। নয়ত নেহাৎ বাড়ি বসে বই পড়ে টেলিভিশন দেখে। দিনের কাজের শেষে আমরাও এক একদিন বেরিয়ে পড়তাম বস্টন মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস্-এর দিকে। সারাদিনের ক্লান্তি হরণ করে নিত মিউজিয়ামের দেওয়াল-জোড়া ছবি।

হাল্কা লাঞ্চ সেরে এক একদিন কাজ সেরে রাখি এক একটা। বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ময়লা কাপড়-চোপড়গুলো ঢুকিয়ে চললাম আমার কাপড়-কাচা বুড়ির কাছে। বালিশের ওয়াড়ের এই নবতম ব্যবহার এখানে শিখেছি ন'পাউণ্ড পর্যন্ত কাপড়-চোপড় বালিশের ওয়াড়ে পুরে দিয়ে দিলে বাঁধা দর। তার বেশি হলে খরচও বেশি। ওয়ার্দিংটন স্ট্রীটের ওপর মাঝারি দোকান, সারি সারি বসানো ওয়াশিং ও ড্রাইং মেশিন। দোকানের কর্ত্রী-বুড়ির সঙ্গে আমার বেশ ভাব। গোটাচারেক বেড়াল পরিবৃত হয়ে বসে আছে দোকানে। সব বুড়ি মেমসাহেবদের বেড়ালের প্রতি দুর্বলতা থাকে কেন কে জানে? একটু হেসে আমাকে অভ্যর্থনা করে বুড়ি বললে, আজ কিরকম চাই ড্রাই না ওয়েট্? কাপড় কেচে ভেজা অবস্থাতেই দিয়ে দেবে, না শুকিয়ে তবে দেবে?

বললাম, ওয়েট্ই দাও আজ। ভেজা দিলে তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে।

বুড়ি যতক্ষণ কাপড় কাচবে মোড়ের সেলুনে বু'র চুলটা কেটে নেওয়া চলতে পারে। চুল কাটানোর খরচ ভারি বেড়ে যাচ্ছে আমেরিকাতে দিন দিন এই আলোচনা সব জায়গাতে চলছে তখন। আমাদের বন্ধু গ্রাণ্টমায়ারের স্ত্রী তো তাই বাড়ির ছেলেমেয়েদের এবং কর্তার চুলকাটার ভার নিজেই নিয়েছেন হাতে আর অল্পদিনের মধ্যে বেশ নিপুণভাবে কাজ চালাচ্ছেন। মোড়ের এই ইটালিয়ান নাপিত আমার কাছে আগেকার চার্জই নেয়, খাতির করে বেশ। চুল কাটতে কাটতে আমাকে খবর দেয় পাড়ার সব স্যাণ্ডালের।

ব্রাউনদের চেনো? বুড়োবুড়ি? আহা, ঐ যে ওদিকের লালবাড়িটায় থাকে?

চিনি বৈ-কি! প্রথম যেদিন বস্টনে এলাম মিসেস ব্রাউন বাগান থেকে ফুল দিয়েছিলেন আমাদের। মিসেস্ তো বুড়োকে ফেলে পালিয়েছেন, খবর দিল নাপিতমশাই। এ্যাঁ! আমি তো আকাশ থেকে পড়ি। তবে শোন—বলে সে জুড়ে দিল এক লম্বা কাহিনী।

চলে আসবার সময় হঠাৎ গলা নামিয়ে বললে, ম্যাডাম, বেশ সাবধানে থাকো তো বাড়িতে?

কেন কি আবার হল?

জানো না বুঝি, 'প্রাউলার' দেখা গেছে পাড়ায়। এরা চোরকে বলে প্রাউলার অর্থাৎ সেই ধরণের চোরকে যারা অন্ধকারে আনাচে-কানাচে প্রাউল করে অর্থাৎ ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায়। শুনে ভয়ে বাঁচি না।

এ-সব দিক থেকে ওদেশে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই থাকতাম। ক্রাইম বেড়ে চলেছে দিন দিন এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু ছিঁচকে চুরি বা অন্য ছোটখাট ক্রাইমের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। যা আছে সবই উঁচুদরের ভাবতাম, বিদেশী আগন্তুকের গৃহে উঁচুদরের ক্রিমিনাল হানা দেবে কিসের লোভে? স্থানীয় খবরের কাগজগুলোতে চোখ বুলোলেই নজরে পড়বে বড় বড় হেড লাইন—খুন-লুট-রাহাজানি আরো কত ঘৃণ্যতর অপরাধের খবর। আমরা ভারতীয়েরা খবরের কাগজপড়ুয়া জাত আর আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকও কাগজ পড়ে প্রধানত রাজনৈতিক খবরের জন্য—দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় প্রকার। ক্রাইম ও স্ক্যাণ্ডাল উপজীব্য কাগজে বিরক্তি ধরে যেত। বস্টনে যতদিন ছিলাম এক 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' ছাড়া অন্য কিছুতে রুচি হত না।

যে কথা বলছিলাম, একদিকে এই খুন-লুট-রাহাজানির খবর অন্য দিকে সাধারণ মানুষের সততা—দু'টোর মধ্যে সমন্বয় করা আমার পক্ষে শক্ত হত মাঝে মাঝে! দোকানে জিনিস অর্ডার দিয়ে এসেছি আমার অনুপস্থিতিতে ডেলিভারি দিয়ে চলে গেছে দোরগোড়ায়, প্রায় সাইড ওয়াকের ওপর। কোনদিন কিছু খোওয়া যায় নি। বেবীশুদ্ধ ক্যারেজ রাস্তার ওপর পার্ক করে রেখে মা ঢুকেছেন দোকানে বেবীর গায়ের সুদৃশ্য গরম কম্বলটাও কেউ তুলে নেয় নি। সেবার বস্টনের পার্ক স্ট্রীট স্টেশন থেকে হার্ভার্ড যাচ্ছি আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্ট্রীটকার অর্থাৎ ট্রামে চেপে, শখের ভাঁজকরা জাপানী ছাতাটি ফেলে নেমে পড়লাম ভুলে। সারাদিন হার্ভার্ডে কাটালাম। মনেই পড়ে নি ছাতার কথা। ফিরতি পথে হার্ভার্ড স্টেশনে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। স্টেশন কর্মচারী একজনকে বললাম, সে বললে কেমন দেখতে বর্ণনা করো।

বর্ণনা শুনে নিয়ে নিঃশব্দে উঠে গেল এবং একটু পরেই ছাতা আমার হাতে সমর্পণ করল আবার।

তাই বলছিলাম বেশ নিশ্চিন্ত মনেই ছিলাম আমার এপার্টমেন্টে। কত সময় একাই থেকেছি শিশুপুত্র নিয়ে। 'শ' কাজ করেছে নাইট ডিউটি, উইক-এণ্ড ডিউটিতে নয়ত কার্যোপলক্ষে চলে গিয়েছে মন্ট্রিওল বা সাইরাকুজ্। কিন্তু আমার নাপিতমশাই কিছুদিনের মত যা প্রাউলার ভীতি ঢুকিয়ে দিল আমার মনে, কি বলব! এমন কি 'শ'র অনুপস্থিতিতে টি-ভিতে হিচ্‌কক্ বা এলেরি কুইনের রহস্য-নাটিকা দেখার সাহসও হত না আমার।

ভেজা-কাপড়ের ঝোলা বুড়ির দোকান থেকে সংগ্রহ করে বাড়ির পথ ধরলাম আবার। সাবানের গন্ধ আসছে আমার বালিশের ওয়াড়-কাম থলের ভেতর থেকে। ভালই কেচেছে কাপড়। প্রথম প্রথম আমার শাড়িগুলো বুড়ির মনে আতংকের উদ্রেক করত। বলত এরকম ড্রেস আমি কখনো কাচি নি, পারব না।

আমি বলতাম, ড্রেস-ট্রেস ভুলে যাও—যেমন করে বিছানার চাদর, পর্দা কাচো তেমনি করে কেচে দাও।

আজকাল আর ভয় পায় না শাড়ি দিলে।

বিকেল চারটের সময় ঠিক যেন আমার সুবিধের জন্যই টেলিভিশনে সুরু হয় ডিক্ ক্লার্ক শো, মার্কিনি কায়দায় ঝ্যাং-ঝ্যাং করে নাচগান বাজনা চলতে থাকে। টেলিভিশনরূপিণী মেকানিক্যাল ন্যানির হাতে পুত্রকে সমর্পণ করে রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি নিশ্চিন্ত মনে। কানে আসে গান হচ্ছে—

দিস্ ইজ আওয়ার ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি···
বাট্ ইট্ ওনট্ বি দি ল্যা···স্ট।

মাংসের মধ্যে কারি-পাউডার ঢালতে ঢালতে নিজের মনেই বলি লাস্ট না হলেই তো বাঁচি।

একেবারে নির্বিঘ্নে যে রান্নাপর্ব শেষ হয় তা নয়, মাঝে মাঝে বু এসে ডাকাডাকি করে, এসো না এই নাচটা একটু নাচি। উনুনের আঁচ কমিয়ে দিয়ে যেতে হয় ওর হাত ধরে, দু'একবার ঘুরপাক খেয়ে আসতে হয়। সংগীত চলতে থাকে,—

টু নো, নো, নো, হিম্ ইজ টু লভ লভ লভ হিম।

কোন কোনদিন টেলিফোন বেজে ওঠে ঝন্‌ঝন্ করে। রিসিভার তুলতেই কানে আসে মহিলাকণ্ঠে পরিষ্কার বাংলায়, আজ কি রান্না চাপালেন ?

চ্যাটার্জি-গৃহিণীর টেলিফোন ব্রাইটন থেকে। আমাদের বস্টন জীবনের শুরুতেই 'শ' আর আমি বলাবলি করে নিয়েছিলাম 'যতদিন রোমে থাকব রোমানদের মতই চলব।' অর্থাৎ আমেরিকান জীবনধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করার চেষ্টা করব। প্রলোভন হলেও কোথায় স্বদেশীয়রা আছেন খুঁজে বার করে একসঙ্গে মিলে খিচুড়ি খেয়ে প্রবাসের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগের অপব্যবহার করব না। মোটামুটি এ নিয়ম মেনে চললেও এর ব্যতিক্রম ছিলেন কেউ কেউ। ব্রাইটনের চ্যাটার্জি পরিবার, সস্ত্রীক কবি অমিয় চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অখিলানন্দ, কোহাসেট আশ্রমের শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী এমনি আরো অনেকে।

প্রতিভাবান ভারতীয়েরা দেশত্যাগী হয়ে বিদেশে ঘর বাঁধছেন এ সমস্যাটা আজকাল আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। শ্রীচ্যাটার্জিকে মনে হত তারই একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। দেশে থাকতে কলকাতার কোন একটি বৃহৎ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। সে জীবনের দুঃসহতা আমাদের অনেকেরই জানা। এখানে পেয়েছেন পছন্দমত কাজের সুযোগ, পরিচ্ছন্নভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার মত আর্থিক সঙ্গতি। দেশে আর ফিরবেন না মনস্থির করে ফেলেছেন। দেশে ফিরবার কথা উঠলেই বলেন, ফিরে গিয়ে কি করতে বলেন, আবার অমুক কলেজে মাস্টারি ? ওঁর ছবির মত সাজানো বাড়িটি, দরজায় দাঁড়ানো গাড়ি আর ছেলে দু'টির উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে দেশে ফিরবার অনুরোধ করতে ভরসা পাই কই ?

কোন কোনদিন বাংলামতে ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট গল্প করে ফেলি, কোনদিন আবার টেলিফোন-আলাপ সুদীর্ঘ হয় না দু'পক্ষেই রান্না চাপিয়ে এসেছি, বাকি পড়ে আছে তখনো বিস্তর হাউসহোল্ড 'চোর'।

অবশেষে মিসেস চ্যাটার্জি বলেন, যাই আবার বামনিগিরি করি গিয়ে, এদেশে আর সবই ভাল এই এক যা ঝামেলা।

খেতে বসে সন্ধ্যার খবর শোনাটা বেশ নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। খাবার প্লেট হাতে কিচেন থেকে দৌড়ে দৌড়ে আসার ভারি অসুবিধা। ইদানীং তাই ভাঁজকরা কার্ড টেবিলটা লিভিংরুমের টেলিভিশনের সামনে পেতে নিতাম। খেতে খেতে খবর শোনা হত, দেখা যেত টুকরো-টুকরো নিউজরীল। হঠাৎ হয়ত একঝলক দেশের খবরও ভেসে উঠল টেলিভিশনের পর্দায়। কলকাতা, বা কেরালা নয়ত নিউ দিল্লী।

[আগামী সংখ্যায় আমেরিকার কলকাতা।

দক্ষিণের বারান্দা

শ্রীনন্দা কর

আমার এই দক্ষিণের বারান্দাটি
যেন একটুকরো আয়না
রূপোলী ফ্রেমে আটকানো।
সেই আয়নাটিতে মুখ দেখবো বলে
আমি বারবারই ছুটে চলে আসি।
আজ সকালে উঠে দেখলাম
ম্লান বিষণ্ণ একখানি মুখ
সময় যার চোখের কোণে
দাগ টেনে গেছে—অনেক অনেক বারই।
দুপুরে দেখলাম ক্লান্ত অপ্রসন্ন মুখটা
বিরক্তি আর রাগে কালো হয়ে উঠেছে।
সে চেহারা দেখে আমি ভয়ে
পালিয়ে গিয়েছিলাম দুই হাতে চোখ চেপে ধরে।
সন্ধ্যেবেলা দেখি তারার নীল আলোয়
উজ্জ্বল হয়ে সেই চোখ দু'টি ফুলে উঠেছে।
তোমারি প্রেমের প্রত্যাশায়
তারা গভীর সুন্দর
আর অন্তরঙ্গ মধুর।

প্রতিজ্ঞা

শ্রীমতী স্মৃতি ঠাকুর

সময়টা তখন গরমের ছুটির। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কবিতা সম্মোহিতের মতো সমুদ্রতীরে বসে চেয়েছিলো সমুদ্রের দিকে। ঢেউ-এর পরে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে ওর পায়ের কাছে—বালির বুকে। সঙ্গে নিয়ে আসছে ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের অজস্র ঝিনুক—যাবার সময় সেগুলোকে ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে ভিজে বালির বুকে, আবার পরমুহূর্তে সব ধুয়ে-মুছে নিয়ে যাচ্ছে। বিরামহীন এই খেলা খেলে চলেছে সমুদ্র।

আকাশের সন্ধ্যার রক্তরাগে সাগরও রেঙে উঠেছে—বুঝি বা কবিতার মনেও সেই রঙের ছোঁয়া লেগেছে। দূরে দিকচক্রবালে আকাশের লালে আর সাগরের লালে মেশামিশি হয়ে গেছে। নীড়ে-ফেরা হংস-বলাকারা আকাশের বুকে ক্ষণিকের জন্যে যেন একটা ছবি এঁকে

য়ে যাচ্ছে। এমন অস্তরাগের রঙে রাঙানো আকাশে কালো কালো য় পাখির জাপানী ছবি ওর একখানা আছে। সেই ছবিখানার থাই ওর বার-বার মনে পড়ে যাচ্ছে।

ওর স্বামী নীতিশ বালির ওপর পায়চারী করতে করতে দূরে গথায় ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে কবিতা আর তাকে দেখতে াচ্ছে না। সমুদ্রের কল্লোলের মধ্যেও আশপাশের লোকের থাবার্তার একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন একটু-আধটু কানে এসে বাজছে। র মনে হচ্ছে যেন অন্য কোনো জগৎ থেকে কথাগুলো ভেসে াসছে।

কে কবিতা! ওর ঠিক পেছনেই একটি পুরুষ-কণ্ঠস্বর ওর ্যানভঙ্গ করে দেয়।

কে সুমিত! চমকে উঠে যেন কবিতা পুরুষকণ্ঠের প্রতিধ্বনি চরে।

কবিতার বলার অপেক্ষা না রেখেই সুমিত ওর পাশে বসে পড়ে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেলে। চিনতে পেরেছ তা হ'লে?

তোমায় কি ভোলা সম্ভব সুমিত!

আমি ভাবছিলাম হয় তো ভুলেই গেছ আমাকে। হয় তো তোমার আমাদের সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে নেই অথবা এতদিনে মনের পরিবর্তন ঘটে গেছে।

কবিতা ওর দিকে কৃত্রিম কোপ-কটাক্ষে তাকিয়ে বলে একটুও না, কেন এমন কথা বলছো? তোমার নিজের পরিবর্তন ঘটে গেছে বোধ হয়, তাই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছো আমার ওপর।

বিশ্বাস করো কবিতা একটুও পরিবর্তন হয় নি। হবেও না কোনোদিন। তোমায় আমি চিরদিন আমার মনের মণিকোঠায় মণি-মাণিক্যের মত সযত্নে রেখে দেবো।

কবিতা বলে আর আমি বুঝি আমার মনের মণিকোঠায় জীবনের বিশেষ দিনগুলোর কথা জমা করে রাখতে অক্ষম হবো বলে তুমি মনে করো? সে দিনগুলো চিরদিন আমার মনে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

সুমিত ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। বলে, সত্যি বলছো?

কবিতা বলে, একদম সত্যি। ওই সমুদ্রের সামনে বসে আমার মিথ্যে বলতে ইচ্ছে করছে না।

সুমিত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে বসে থাকে তারপর জিজ্ঞেস করে, এখানে কার সঙ্গে এসেছ?

পতিদেবতার সঙ্গে এসেছি।

কই কারুকে সঙ্গে দেখ'ছি না তো? বলতে বলতে সুমিত এদিক ওদিক দেখে নেয় কবিতার স্বামীর উদ্দেশ্যে।

ঐদিকে গেছে বেড়াতে বেড়াতে।

কোথায় উঠেছ?

আমরা পুরী হোটেলে ঐ দোতলার সামনের দিকের ঘরে উঠেছি। তুমি?

ঐ সী-ভিউ হোটেলটায়।

একলা এসেছ?

হুঁ, বৌ ছেলেদের নিয়ে ছুটিতে বাপের বাড়ি গেছে। তোমাদের বাড়ির আর সকলের খবর কি কবিতা?

ভাল। নমিতা গত বছর বি-এতে অনার্স পেয়েছে। তোমাদের বাড়ির কি খবর?

আমাদের বাড়ির আর সকলে একরকম ভালই আছে, তবে মা শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।

কবিতা বলে, কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হোলো বল তো?

অনেকদিন পরে। আমি তোমায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি যে সত্যি তুমি কবিতা কি না, তারপর নিঃসংশয় হয়ে তবে এসেছি তোমার কাছে, না হলে অন্য কোনও ভদ্রমহিলা হলে অচেনা লোককে এভাবে কথা কইতে দেখে চটে যেতে পারেন তো?

কি এতো ভাবছিলে বসে বসে কবিতা?

কিছুই ভাবি নি বিশেষ, শুধু দেখছিলাম বসে বসে সীমাহীন এই সমুদ্রকে। ভারি আশ্চর্য আর অদ্ভুত লাগছে ঢেউগুলোকে—ওদের কি বিরাম নেই আছড়ে পড়ার! দেখো! কি বিরাট শক্তি ওই সমুদ্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে, নিজেকে ওর কাছে অতি ক্ষুদ্র অসহায় যেন একটা কুটোর মত মনে হচ্ছে। নিমেষের মধ্যে ঢেউগুলো আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর কি অদ্ভুত সুন্দর দেখ আকাশের এই রঙের খেলা! কোনও শিল্পীর তুলিতে এমন প্রাণবন্ত ছবি আঁকা যাবে না।

কবিতা দেখছি তুমি শুধু কবিতা নও কবিও! তোমার এমন আত্মসমাহিত ভাবটাকে আমি অনাহূতভাবে এসে নষ্ট করে দিলাম বলে সত্যি দুঃখিত।

মোটেও না, তুমি আমার সকল ভাবকে আরও প্রেরণা যোগাও তাই তোমাকে পাশে পেয়ে আমার ভাবগুলো ভাষা পেল। আমার কবি হওয়ার কৃতিত্বটা তোমারই। মনে পড়ে সুমিত, রোজ সকালবেলা যখন তুমি বাবার কাছে পড়তে আসতে, তখন আমি আমাদের বাগানে ফুল তুলতাম আর রোজ তুমি আমাকে দেবার জন্য একটি করে তোমাদের বাগানের গোলাপ ফুল নিয়ে আসতে?

হ্যাঁ, মনে পড়ে। আর তার বদলে তুমি আমায় দিতে সদ্য-ফোটা শিউলি ফুল প্রতিদিন সকালবেলা। কি যে ভাল লাগতো ফুলগুলো! তোমাকেও ওই শিউলি ফুলের মত নির্মল শুভ্র সুন্দর মনে হতো। সারাদিনটা আমায় তুমি ওই শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধ দিয়ে ভরে দিতে।

ততক্ষণে আকাশের লাল মুছে গিয়ে ধূসর ছায়া গাঢ় হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের কালো কালো ঢেউগুলো মাথায় ফসফরাসের আলো জ্বালিয়ে সারা সমুদ্রে ছুটোছুটি করছে। বড় বড় ঢেউগুলো যেন দৈত্যের মত দাঁত বার করে ছুটে এসে তীরের ওপর নিষ্ফল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যেখানে ঢেউগুলো এসে ভেঙে পড়ছে অন্ধকারে সেখানে ফস্‌ফরাসের চিক্‌মিকিমি দেখে মনে হচ্ছে যেন অনেক হীরের কুঁচি ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে ঢেউগুলো।

ওরা সেইদিকে চেয়ে চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর একসময়ে সুমিত বলে ওঠে কি মনে হচ্ছে জানো? আমার ব্যথিত বুভুক্ষিত হৃদয়ের সঙ্গে ওই সমুদ্রের হৃদয়ের কোথায় যেন খুব মিল! ওর হৃদয়খানিও যেন আমার হৃদয়ের মত কোনো প্রেয়কে পাবার আশায় উদ্বেল হয়ে ছুটে আসছে, আর বার বার ব্যর্থ হয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ভেঙে পড়ে হাহাকার করছে। পরমুহূর্তে আবার নতুন

উদ্যমে ছুটে আসছে নতুন করে পাবার চেষ্টায়। কিন্তু ওর আশাও আমার আশার মতই কোনোদিন পূর্ণ হবে না।

কবিতা মনে পড়ে আমাদের কত ইচ্ছা ছিল যে বিয়ের পর পুরী বেড়াতে আসবো ? পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনারকের মন্দিরের ভাস্কর্যগুলো আমরা দু'জনে ঘুরে ঘুরে দেখব, সমুদ্রস্নান করবো, দু'জনে পাশাপাশি বসে সমুদ্রের ঢেউ গুণবো আর গল্প করবো ?

হ্যাঁ খুব মনে পড়ে, আশ্চর্য দেখ, আজ আমরা ঘটনাচক্রে দু'জনেই পুরীর সমুদ্রের ধারে বসে গল্প করছি !

যদিও আজ তুমি অপরের স্ত্রী কিন্তু আমারই তো হতে পারতে, যদি না বাবা মৃত্যুশয্যায় তাঁর মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করার জন্য আমায় ওভাবে না অনুরোধ করতেন ! অসবর্ণ বিয়েতে ওঁর খুব আপত্তি ছিল। তাই তিনি তোমার সঙ্গে আমার কিছুতেই বিয়ে হতে দিলেন না। বাবা বেঁচে থাকলে আমি তাঁর অমতেই তোমায় বিয়ে করতাম, হয় তো তোমায় নিয়ে আলাদা থাকতাম, কিন্তু তাঁর শেষ সময়ের কথা আমি অমান্য করতে পারলাম না। তারজন্য জীবনে যত অসুখী হই, কর্তব্য আমাকে করে যেতেই হচ্ছে। তাই বলছি আমার যেমন এ জীবনে তোমাকে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই তেমনি ঐ সমুদ্র পারবে না এই তীরকে পেতে—শুধু বৃথাই ওর আস্ফালন।

তোমার বিয়ের আগের দিনটার কথা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে সুমিত। সেদিন সন্ধ্যাবেলা তুমি আমাদের বাড়ি এসেছিলে আমার সঙ্গে দেখা করতে। বারান্দার কোণে যেখানে ফুলগাছের টব দিয়ে ঘেরা বসবার জায়গা ছিল সেখানে আমরা বসেছিলাম দু'জনে। আমায় তুমি একটা মস্তবড় রক্তগোলাপ দিয়ে বলেছিলে আর যেই আসুক না কেন তোমার জীবনে আমাকে ছাড়া আর কাকেও তুমি ভালবাসবে না।

আর তার বিনিময়ে তুমিও সেদিন একটা মস্তবড় চন্দ্রমল্লিকা আমায় দিয়েছিলে, বলেছিলে তোমার পক্ষেও আর কাকেও জীবনে ভালবাসা সম্ভব নয়। ফিরে আসার সময় তোমার চোখের জল আমাকে বড় বিচলিত করেছিল কবিতা।

আমি প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলাম তোমাকে আমার হৃদয়ের আসনে এখনকার মতই চিরদিন প্রতিষ্ঠা করে রাখবো।

তুমিও প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলে সেই কথা কবিতা। পরদিন বিয়ের সবকিছু উৎসব-আড়ম্বর আনন্দ-কোলাহল আমার কাছে বেসুরো, অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল, এমন কি তারপরের আরও অন্য-দিনগুলোও। প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ কর্তব্যকর্মের মধ্যে ফিরে যেতে আমার বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল।

তারপর বছর দুয়েক বাদে আমারও বিয়ে হয়ে গেল, আমিও আমার বিবাহিত জীবনের কর্তব্য করে এসেছি নিখুঁতভাবে। কিন্তু তোমার জায়গায় আমি কারুকে বসাতে পারি নি সুমিত।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়।

কি চিন্তা করছিল ওরা কে জানে। সুমিত আবার বলে ওঠে, তোমার ক'টি ছেলেমেয়ে কবিতা ?

একটি মাত্র মেয়ে।

আমার শুধু তিনটি ছেলে। কত বড় হোলো তোমার মেয়ে ?

এই···বছর সাত-আট হোলো।

তোমার মেয়ে তোমার মত সুন্দরী হয়েছে কবিতা ?

সকলে তো তাই বলে।

বড় দেখতে ইচ্ছে করছে তাকে, তোমার সঙ্গে এখানে এসেছে নাকি ?

না। ব্যাঙ্গালোরে ওর পিসিমার বাড়ি বেড়াতে গেছে। আমার শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না কিছুদিন থেকে, তাই দিন পনেরোর জন্যে এখানে এসেছি চেঞ্জে।

আমি কালকেই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

কোথায় ?

আরও দু-এক জায়গায় ঘুরে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছবো, তারপর ফ্যামিলি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবো।

তোমার সঙ্গে হয় তো আর কখনও দেখা হবে না সুমিত !

হয় তো নয় তবে···সুমিত চুপ করে কি ভাবতে থাকে।

আকাশে এর মধ্যে একফালি বাঁকা চাঁদের কখন আবির্ভাব হয়েছে তা ওরা খেয়াল করে নি। এই অবসরে কবিতার সমুদ্রের দিকে চোখ পড়তে দেখে ঢেউগুলো এখন হীরের খেলা ফেলে চাঁদকে নিয়ে সোনার খেলা শুরু করেছে।

কবিতা—তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বড়ছেলের বিয়ে দেবে ? আমার জীবনে তো আর তোমাকে পেলাম না,—তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে আমার সেই সাধকে পূর্ণ করতে দাও। বল দেবে ?

এখন তো ওরা ছোট !

আহা, আমি বলছি বিয়ের কথা ঠিক করে রাখতে, বিয়ের বয়স হলেই বিয়ে দিয়ে দেবো ওদের, ততদিন দুই বাড়ির মধ্যে মেলামেশা চলবে। অবশ্য তোমার স্বামীর আপত্তি হবে কি না জানি না।

আমার কোনো মতামত নিয়ে উনি মাথা ঘামান না। এ ব্যাপারেও আমি যদি ভাল বুঝি আর জোর দিই, আমার পছন্দকরা ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য, তবে উনি আপত্তি করবেন না।

তবে কথা দিলে তো ?

দিলাম। তবে সবার উপর ভগবানের ইচ্ছা—তিনি যা করেন।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে, আজ তবে আসি কবিতা।

আচ্ছা। দেখি উনি বোধ হয় আমাকে খুঁজে না পেয়ে হোটেলে ফিরে গেছেন। আমিও চলি সুমিত।

ক্ষণিক পাওয়ার আনন্দ আর বিচ্ছেদ-বেদনায় ভারাক্রান্ত একটা অদ্ভুত অনুভূতি মনে নিয়ে ওরা পরস্পরের কাছে বিদায় নেয়।

১৪

বন্ধুর পর্বত পার হতে হতে অধিত্যকায় এসে পৌঁছে পথিক বিশ্রাম পায় যেমন, সন্ন্যাস-জীবনেও তেমন অধিত্যকা-কাল আসে মাঝে মাঝে। চলার পথটা সহজ হয় তখন, বাধা আসে না, বিপদ সংকেতের মুখে পড়তে হয় না। পরের দু'টো বছর সেই অধিত্যকা-কাল সিস্টার লুকের জীবনে। অন্তর জুড়ে প্রগাঢ় প্রশান্তি, নিজের কর্মক্ষমতা দেখে নিজেরই বিস্ময় লাগে। বিস্তীর্ণমান কংগোর মনে একটা স্বাদেশিকতার গর্ব এনেছে। এমন কোন গর্ববোধ যে মনে ছিল তার, নিজেও জানত না। কিন্তু আজ আর সে গর্বে উগ্রতা কিছু নেই, শান্ত মনে মেনে নিয়েছে শুধু। সব মানুষের মনেই কোন না কোন পূর্বগামুকৃতি প্রবিষ্ট হয়ে থাকে, নানরাও একেবারে মূলোচ্ছেদ করতে পারেন না তার—পূর্বজীবন থেকে টেনে আনতে বাধ্য হন সন্ন্যাস-জীবনেও। এই স্বাদেশিকতার গর্ববোধও তেমনই কোন পূর্বগামুকৃতির মত মিশে গেছে ওর স্বভাবে, তাকে বাদ দেওয়া যাবে না।

কংগোর সমৃদ্ধি নিয়ে নানা কথা বলাবলি করে পুরুষ রোগীরা—কোব্যাল্ট আর ইউরেনিয়াম··তুলোর ফসলের রপ্তানি—১৯৩৮ সালে প্রায় তিরিশ হাজার টনের কাছাকাছি পৌঁছোবে। রেলপথ ক্রমেই আরও অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে—কংগো নদীর প্রধান শাখানদীগুলো থেকে কাটা খরস্রোতা নালীগুলোর মতই।

—উপনিবেশিকতার অর্থ পরিবহন—উপনিবেশিকদের মুখে মুখে কথাটা প্রবাদে দাঁড়িয়েছে।

মাইলের মাপে নির্মিত পথের পরিমাপ নিয়ে জাঁক করেন তাঁরা।

আর নানরা নীরবে কনভার্টদের সংখ্যা গোণেন।

ভাষায় বহু নতুন নতুন শব্দ যোগ হচ্ছে এসে—নানা প্রতিষ্ঠান, নানা গঠনমূলক সংস্থার পোশাকী নামের বদলে ছোটখাট ঘরোয়া নাম চালু হয়েছে মুখে মুখে। ওট্রাকো, ইউটেক্সলেও, ইনেয়াক। এ এম আই তেমনই এক প্রতিষ্ঠান—চিকিৎসাক্ষেত্রে নিগ্রোদের কাজে লাগানোর পরিকল্পনা তার মূলে। ১৯৩৫ সালে সরকার গড়েছেন, যে বছর সে ড্রেসিং-বয়দের প্রথম দলটা গড়ে তার পরের বছরই ঠিক। এই সংগঠনটার সংগে তাই মনে মনে মধুর একটা যোগাযোগের অনুভূতি আছে। যদিও সেই সঙ্গে নম্রভাবে নিজের মনেই একথাও ভাবে ও ধরণের কোন ছককাটা মেডিক্যাল প্রোগ্রাম তার চোখের সামনে ছিল না। কালো ছেলেগুলোর বড় বড় কালো চোখে আর কিছু শেখবার আকূতি দেখত, সেই দেখা হতেই ড্রেসিং-বয়দের দল গঠন পরিকল্পনার উৎপত্তি। তবু সেই পরিকল্পনারই মাধ্যমে এক সুপরিকল্পনার ভিত্তির সঙ্গে তার যত্ন ও পরিশ্রম মিশে একাত্ম হয়ে গেছে। বর্তমানের ব্যাপক পরিকল্পনাটার রূপায়ণ দেখতে দেখতে তাই হঠাৎ এক এক সময় মনে পড়ে যায় প্রায় ছ'বছর আগে জাহাজের একটা প্রার্থনার কথা—এক সমুদ্র-ক্যাপ্টেনের চোখ দিয়ে যেদিন প্রথম মিশনারী সিস্টারদের দেখে সাগ্রহে আপন মনে প্রার্থনা করেছিল, হে প্রভু, আমি যেন ভাল কিছু করতে পারি।

ইয়োরোপে ইতোমধ্যে বিচিত্র সব ঘটনা ঘটছে। ওরা বিস্তারিত খবর রাখে না তার, কেবল শিরোনামগুলোই জানতে পারে, তা থেকে কোন কিছুই উপলব্ধি করা যায় না। সবই দুর্বোধ্য লাগে। বিগত চার বছরে রিক্রিয়েশনের আলোচনা প্রায়ই জাগতিক ব্যাপারের দিকে মোড় ফিরেছে, অন্য কোন কারণে নয়—অত্যাচারিত বিপন্ন আত্মার জন্য প্রার্থনার প্রয়োজনে। নাৎসী-নির্যাতিত ইহুদীদের আত্মার জন্য গৃহযুদ্ধ-হত স্প্যানীয়দের আত্মার জন্য। চারিদিকে ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে যেন সবকিছু—রাজা-রাজত্ব সব লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যুগোস্লাভিয়ার আলেকজাণ্ডার গুপ্তভাবে নিহত হয়েছেন, ইংলণ্ডের এডওয়ার্ড সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করেছেন, জার্মানী গ্রাস করেছে অস্ট্রিয়াকে। আর এখন এই আটত্রিশের সেপ্টেম্বরে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার একাংশ জার্মানীর বলে দাবী করেছেন এবং মিউনিকে স্বাক্ষরিত এক অদ্ভুত দলিল অনুসারে সত্যই তা তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দলিলটার নাম শান্তি-চুক্তি!

নানরা মাদার ম্যাথিল্ডাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনার কি মনে হয় ফিরে গিয়ে ইয়োরোপকে আর চিনতে পারবেন আপনি?

নতুন সুপিরিয়র নির্বাচন হয় ছ'বছর অন্তর। সেই উপলক্ষে

বেলজিয়ামে ফেরার তোড়জোড় করছেন মাদার ম্যাথিল্ডা। কিছুদিন ধরে একটা আন্তর্জাতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠছিল—সিস্টার ইউচেরিস্‌সিয়ার মত প্রবীণাদের মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল '১৪-'১৮র দিনগুলোর স্মৃতি। মিউনিক চুক্তির পর সে সব উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে এল। মাদার ম্যাথিল্ডাকে এখন অন্য এক যুদ্ধের জন্য উদ্বিগ্ন হতে হচ্ছে—দেশের কন্‌কনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাসটার সংগে লড়তে হবে, তাঁর নিস্তেজ রক্তটা পেরে উঠবে কি না সেটাই ভাবনা!

নানরা নানাভাবে তাঁর যাত্রার আয়োজন করে দিচ্ছেন। টিচাররা তাঁর জন্য শাল আর দস্তানা বুনছেন, তাঁর পশমের গাউন আর ন্যাপুলার হাওয়ায় দিয়ে ইস্ত্রি করে দিচ্ছেন। নার্সরা ওষুধপত্র গুছিয়ে দিলেন—প্রচুর ক্যাফাইন রইল, জাহাজ আটলাণ্টিকের ঠাণ্ডা স্রোতে গিয়ে পড়বে যখন, তখন রক্তটা গরম করে নিতে পারেন যাতে।

সিস্টার লুক কৃতজ্ঞ যে মাদার ম্যাথিল্ডার সঙ্গিনী হতে ডাক পড়ে নি তার। কংগো তার রক্তে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে যে, সে এখন দেশে গিয়ে ছোটখাট একটা ছুটি কাটিয়ে আসার কল্পনাও করতে পারে না। বেলজিয়ামকে এখন আর তার রুমালখানার চেয়ে বড় লাগবে না দেখতে!

অন্যান্য মিশনারী সিস্টারদের কথা মনে হয়—ভারতবর্ষে, সিংহলে, চীনে, আফ্রিকার অন্য অন্য মিশনে—মাদার ম্যাথিল্ডার জন্য তারা যা করছে তারাও সবাই ঠিক তাই করছে তাদের সুপিরিয়রের জন্য। প্রত্যেক কমিউনিটি চায় সর্বাধিক যত্ন ভালবাসায় সুপিরিয়রকে ঘিরে রাখতে।

মাদার হাউসের পথে প্রাক্তা-প্রবীণাদের মিছিল দেখতে পাচ্ছে কল্পনায়। দেখা সম্ভব নয় বটে, কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা চলে চুলগুলো একেবারে সাদা ওঁদের···চারপাশ ঘিরে দূরাগত স্থানের বিচিত্র সুবাস···ট্রপিকের সুপিরিয়রদের রিক্তচাকার বাদামি মুখোসের মত মুখগুলো দেখে ইংলণ্ড আর ইয়োরোপের সুপিরিয়ররা চমকে যাবেন সম্ভবত—ওঁদের ফ্যাকাশে সাদা রঙের সংগে এত বেশি তফাৎ তার। নভিসরা এই শ্রদ্ধেয় সমাবেশের মাঝে পড়ে আঙুলের ওপর ভর দিয়ে চলাফেরা করবে। আকুল আকাঙ্ক্ষায় স্বপ্ন দেখবে মিশনের জন্য উপযুক্ত নির্বাচিত হওয়ার দিনটাকে, সে যেমন দেখত। এগারো বছর আগে! নিজেরই অবাক লাগে ভাবতে।

তিন মাস থাকবেন না মাদার ম্যাথিল্ডা। এই তিন মাসের জন্য খুব সতর্কভাবে নিজের দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন তিনি। অ্যাক্‌টিং সুপিরিয়র হিসেবে কাজ করবেন তাঁর সেক্রেটারি সিস্টার মারিয়া-রোজ। সিস্টার মনিক স্কুলগুলোর পূর্ণ দায়িত্বে থাকবেন। সিস্টার ইউচ্যারিস্‌সিয়ার ওপর নার্সারির সব ভার রইল, সিস্টার লুকের ওপর হাসপাতালের।

যাবার আগে তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ডেকে নির্জনে শেষবার উপদেশ দিলেন।

সিস্টার লুককে বললেন, তোমাকে এইমাত্র আমার বলবার কথা সিস্টার, মাত্রাজ্ঞান হারিও না কখনও। মনে রেখ, টি-বি হওয়ার পরও একদিন রেহাই পাও নি তুমি। কিন্তু পাবে, ফিরে আসি আমি। মৃদু হেসে ডেস্কের ওপর-রাখা একখানা চিঠিতে চাপড় দিলেন ধীরে ধীরে, একজন কোয়ালিফায়েড নার্স সংগে নিয়ে আসক সার্জারির ভার নিতে। এর মধ্যে ভগবান করুন বিশেষ কোন সমস্যার মুখে পড়তে না হয় তোমায়। আর তা যদি পড় সিস্টার, যা করবে তার আগে ঈশ্বরের নির্দেশ প্রার্থনা করার কথা যেন কখনও ভুলো না।

পূর্ণ বিশ্বস্ত চোখে সিস্টার লুক তাকাল তাঁর দিকে। সামনে বসে ছোটখাট মানুষটি, তার অধ্যক্ষা। কংগোর তার প্রথম দিন-গুলোয় তাকে যে কত পরীক্ষার মধ্যে দেখেছেন তার ঠিক নেই।

—কোন সমস্যা দেখা দেবে না মাই মাদার, এ আমি বিশ্বাস করি। প্রতিকূল ঘটনা যা ঘটবার তা ঘটেই গেছে। ঈশ্বর সদয় আমার ওপর, মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা যা কিছু সব একসংগে প্রথম ক'টা বছরেই দিয়ে শেষ করে দিয়েছেন এখন আপন গতিতে বাঁধা পড়ে গেছে সবকিছু, চাকার তালে ঘুরে যাচ্ছে দিনগুলো। প্রশান্ত হাসল একটু! আপনি ফিরতে ফিরতে মাই মাদার, মেটারনিটি এক্সটেনসানটা আমরা শেষ করে ফেলতে চেষ্টা করব।

মাদার ম্যাথিল্ডা চলে যাবার পর সে আর সিস্টার অরেলি পালা করে মেটারনিটির নতুন ব্লকের কাজ দেখল। মাদার ম্যাথিল্ডার অনেকদিনের স্বপ্ন এটা এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে নিজেরা তদারক করে এটা শেষ করে আনার তৃপ্তি কম নয়। ইয়োরোপীয় কলোনীতে জন্মের হার ক্রমশই বাড়ছে, মেটারনিটির পুরোণো প্যাভেলিয়নে আর কুলোয় না। এই এক্সটেনসানের প্ল্যানটা মাসের পর মাস ঘুরেছে গভর্নমেণ্ট, ভিকার এ্যাপসটোলিক আর মাদার ম্যাথিল্ডার অফিস থেকে অফিসে। তার মধ্যে একমাত্র মাদার ম্যাথিল্ডাই জানেন মেটারনিটির কোথায় কি থাকা দরকার না দরকার। সুতরাং বারে বারে সযত্ন ধৈর্যে প্ল্যান সংশোধন করেছেন তিনি।

সমস্তটা বাঁশের কাঠামোর ওপর উঠল বাড়িটা। অক্টোবর আর নভেম্বর—এই দু'মাসেই বেশ চোখে পড়ার মত কাজ এগিয়েছে। ইটালীয়ান কনট্রাক্টর জংগল থেকে মজুরের কাজ করতে দেশীয় ছেলেদের আনিয়েছেন, নিজের দক্ষ রাজমিস্ত্রী আর ছুতোর মিস্ত্রীর দলকে যোগান দেবে বলে। ভদ্রলোকের চোখে মাদার ম্যাথিল্ডা একজন সেণ্ট—তিনি ফিরে আসার আগেই কাজটা শেষ করে ফেলার পরিকল্পনাটা তাঁরও মনে ধরেছে সুতরাং কাজ চলছে পুরোদমে।

জংলী-ছেলেগুলো ভারা বেয়ে বাঁদরের মত ছুটোছুটি করে, যতক্ষণ কাজ করে গান গায় অবিরাম। আর সপ্তাহে একবার তাদের বৌরা কনস্ট্রাকসন সাইটে যখন স্বামীদের রোজগারের ইয়োরোপীয় খাবার আর ইয়ার্ডের মাল গুছিয়ে নিয়ে যেতে তখন যেন জংগলটাকেই সংগে করে আনে ওরা। ঢাক-ঢোল আসে, জংলী-ছেলেগুলোর থাকবার ব্যবস্থা যেখানে সেখানে নাচ-গান চলে।

সিস্টার অরেলির মনে দুর্জয় লোভ ওদের ধর্মের পথ দেখাবে, খ্রীশ্চান করবে। সিস্টার লুককে একা পেলেই পরম বিশ্বাসভরে সোৎসাহে নিজের মনের আশার কথা শোনায় তাকে।

—একটু যদি বেশি সময় দেওয়া যেত ওদের পেছনে—খ্রীশ্চান করবার কত যে সুযোগ রয়েছে!

বিল্ডিংয়ের কাজ দেখাশোনা করতে আসে যখন সব সময়

আনন্দের
দিনে
উপভোগ্য
কোলে
বিস্কুট, লজেন্স ও টফি
KOLAY
KOLAY
Glucose
KOLAY
QUALITY SWEETS
LACTO BONBON
KOLAY
TOFFEE
কোলে বিস্কুট কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১

একটা ফার্স্ট-এডের ব্যাগ নিয়ে আসে। এটাই নাকি ওর বঁড়শির টোপ। মাঝে মাঝেই একটা জংলী-ছেলে কাছে এসে দাঁড়ায় সলজ্জে—কাটা আঙুলে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে হবে। কিংবা চোখে চুন-বালির গুঁড়ো পড়ে ফুলে উঠেছে, পরিষ্কার করে দিতে হবে। সিস্টার অরেলি শুশ্রূষা করার ফাঁকে ফাঁকে হাসতে হাসতে ঘরোয়া কিস্‌ওয়াহিলিতে আলাপ করে তার সংগে। জিজ্ঞাসা করে তার নাম কি, তার গোষ্ঠী কি, কোন গাঁয়ে তার বাড়ি, ক'টি বৌ তার, বড় মালিক কতগুলি পুত্র-কন্যার ধনে ধনবান করেছেন তাকে!

শুনতে শুনতে স্মিতমুখে বলে, এই যে তোমাদের বড় মালিক, আমার ঈশ্বরও তিনিই···হ্যাঁ, হ্যাঁ···একেবারে এক।

সংগিনীর এই কনভার্ট করার আগ্রহের ভাগ সিস্টার লুকও নেয়। তবে ওর মতে সময় থাকলে শিক্ষার মাধ্যমে কনভার্ট করতে চেষ্টা করত ওদের; জংলী-ছেলেগুলোর দিকে তাকালে প্রথমেই নজরে পড়ে ওদের গায়ের তাবিজ আর তুক্‌তাকগুলোর দিকে—হাড়ের টুকরো, পাখির নখ, বুনো জন্তুর লোমের গোছা···ঐগুলোই ওদের বন্দী করে রাখে জাদুকর আর ওঝার কাছে। ওরাই ওদের ওপর রাজত্ব করে সারাজীবন—আমৃত্যু।

সিস্টার অরেলিকে তাই বলে, ওদের একটাকে অন্তত শেখাও ফোড়াটা কাটতে আর বুঝতে পুঁজ পুঁজই—অশুভ উপদেবতা নয়। তা হলে আর কিছু করার দরকার হবে না, অন্ধকার থেকে সে আপনি আলোতে বেরিয়ে আসতে পারবে।

অন্তত একটা জংলী-ছেলের গলা থেকে ঐ সব বীভৎস তাবিজ-টাবিজের কিছুটা নিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা তার, আর সিস্টার অরেলির ইচ্ছা সময়ের অপচয় না করে শীঘ্র ওদের কনভার্ট করার—জানত যদি কি হতবুদ্ধিকর আকস্মিকতায় তাদের দু'জনের ইচ্ছাই চরিতার্থ হবে তা হলে সেই ক্ষণেই জংলী-ছেলেগুলোর দিকে তাকালেই যে ইচ্ছা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে মনে, সেই বিপত্তিকর ইচ্ছাটাকেই সিস্টার লুক ভাবনা থেকে টেনে উপড়ে ফেলে দিত।

উৎসাহটা পেয়ে বসেছে। সারা নভেম্বর মাসটা তারা দু'জনে জংলী-ছেলেগুলোকে মেজে-ঘসে একটু ভদ্রস্থ করবার চেষ্টা করল। গোপনে মতলব আঁটতে লাগল ক্রিসমাস্ ইভের অনুষ্ঠানে তাদের চ্যাপেলে যাবার লোভ দেখাবে। পরে শুনেছিল সিস্টার লুক, সেই একই সময়—সারা মাস ধরে জংগলের একটা জাদুকর এই ছেলেগুলোর একটাকে বলছে সে যদি একটি স্ত্রীলোককে খুন করতে পারে—শ্বেতকায়া হলেই ভাল হয় খুব, তা হলে যে বৌটা মরে যাবার পর তার প্রেতিনী তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাকে, তার হাত থেকে সে চিরদিনের জন্ম রেহাই পাবে।

বড়দিনের আগের পনেরো দিন সিস্টার অরেলির নাইট ডিউটি ছিল মেটারনিটিতে। জংলী-ছেলেটা সেই সময় একদিন এল। নিজেই নিজের বুড়ো আঙুলটা কেটেছে, রক্তাক্ত আঙুলটা উঁচু করে ধরে বন্ধ বারান্দার দরজার বাইরে থেকে উঁকি মারতে লাগল। সিস্টার অরেলি তখন সবে নবজাতকদের তাদের মায়েদের কাছে দুধ খাওয়াতে এনেছে।

আপনারা আমাদের এক মিনিট ক্ষমা করেন যদি আমাদের [illegible] ফার্স্ট-এড নিয়ে এসেছে।

এগিয়ে গিয়ে প্রসন্নহাস্যে দরজাটা খুলল সে।

ছ'জন মহিলা দেখেছিলেন প্রথম দৃশ্যটা। দরজা খোলামাত্র বয়টি ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়ল ওয়ার্ডের মধ্যে, হাতে তার পিছন দিকে লুকোনো একটা কাঠের মুগুরের মত···পাগলের মত এদিক-ওদিক চাইল, যেন বেছে নিতে পারছে না কোন শ্বেতাঙ্গিনীর প্রাণটা ওর চাই—যারা বেডে আছে তাদের কারো, না কি ঐ পরিচিতা দীর্ঘাঙ্গিনী মেয়েটির—যার মুখের শুভ্র-পবিত্রতা তার পোষাকে অবধি ছড়ানো।

হঠাৎ মুগুরটা তুলে ধরে সিস্টার অরেলির মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হানল সে!

প্রথম আঘাতেই দু' ফাঁক হয়ে গেল মাথাটা, তবু কেমন করে যেন তখনও নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি মা দুধ খাওয়াচ্ছিল বাচ্চাকে, এ ভয়ংকর দৃশ্যের পরও চেতনা ছিল তার—সে দেখল দৃঢ় শান্ত পায়ে জংলীটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সিস্টার অরেলি, এক পা এক পা করে বার করে নিয়ে যাচ্ছে তাকে ওয়ার্ড থেকে।

করিডর অবধি চলে গেছে যখন, জংলীটা আরও দু'বার আঘাত করল তাকে। সিস্টার অরেলি পড়ে গেল মাটিতে, আর তাকে দেখা গেল না। এবার সেই মহিলাটি তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল।

এমিল এসে যখন বহু ধস্তাধস্তি করে সেই উন্মত্ত জংলীটাকে আয়ত্তে আনল, তখনও সেই মহিলাটি চীৎকার করছে এক নাগাড়ে, সিস্টার লুক যখন করিডর দিয়ে দৌড়ে এল তখনও।

একজন রোগীর বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন—এ ছাড়া প্রথমটায় কিছুই ধারণা করতে পারে নি সিস্টার লুক—যদিও দুঃস্বপ্নের মত দেখতে পেয়েছে দু'টো কালোমূর্তি লড়াই শেষে দম ফুরিয়ে হাঁফাচ্ছে, চকিতে এও দেখেছে ওপরের মূর্তিটা এমিলের। আরও কিছু দেখেছে। সিস্টার অরেলির নিশ্চল সাদা দেহটা পেরিয়ে আসতে আসতে দেখতে পেয়েছে তার হেড-ব্যাণ্ডে রক্ত।

চীৎকার থামাতে প্রথমেই মহিলাটিকে সিডেটিভ দিল অকম্পিত হাতে।···হিস্টেরিয়ার চীৎকার ডুবে যাচ্ছে ক্রমশ···

—উনি মারা গেছেন তখন সিস্টার, লোকটার দিকে হেঁটে গেলেন যখন···সত্যি মারা গেছেন···তবু হাসছিলেন···হেঁটে যাচ্ছিলেন···

সিস্টার অরেলি মারা যায় নি মাদাম—মারা যায় নি—আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন এখন, সে মারা যায় নি—

ওয়ার্ড থেকে চলে আসবার আগে এ্যাক্টিং সুপিরিয়রকে ফোন করে ফোর্স পাবলিককে ডেকে পাঠাতে অনুরোধ জানাল। তারপর কাচের দরজাটা খুলে শান্তভাবে করিডরে এসে দাঁড়াল।

ততক্ষণে এমিলের কাছে সমস্ত নাইট-ডিউটির বয়রা এসে জড়ো হয়েছে। পাগলটাকে বেশ শক্ত করে বেঁধে তার ওপর বসে আছে তারা, ভীত বিস্ফারিত দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে গিয়ে পড়ছে সিস্টার অরেলির দেহের ওপর।

ধর্মজীবনে এই দ্বিতীয়বার হাঁটু গেড়ে বসে একটি সিস্টারের উষ্ণ কব্জিতে হাত দিল সিস্টার লুক। প্রাণের স্পন্দন তখন স্তব্ধ তাতে।

মৃদুকণ্ঠে এমিলকে ডাকল, সিস্টার অরেলিকে তুলে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

কিন্তু এমিল নড়বার আগে বা নড়তে পারার আগে, গোদার

ম্যাথিল্ডা আর তিনজন ডেপুটি এসে গেছেন। সিস্টার মারিয়া-রোজ, সিস্টার মনিক আর সিস্টার ইউচ্যারিস্সিয়া। সিস্টার অরেলিকে ট্রিটমেণ্ট-রুমে বয়ে নিয়ে গেলেন চারজনে, টেবিলে শোয়ালেন। এ্যাকৃটিং সুপিরিয়রের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল সিস্টার লুক, তিনি তখনই প্রিস্ট ডাকতে চলে গেলেন।

গ্র্যাণ্ড সাইলেন্স অক্ষুণ্ণ রেখেই তাঁরা ফিউনারালের প্রথম পর্যায়ের কাজগুলোকে করলেন—যে যেটা সবচেয়ে ভাল পারেন। আর্ট বিভাগের সিস্টার মনিক স্কার্ট ঠিক করে দিলেন, বিমর্দিত কয়ফটায় চাপ দিয়ে শামুকের খোলার আকৃতি ফিরিয়ে আনলেন। নার্সারির সিস্টার ইউচ্যারিস্সিয়া তার দু'টি হাত মুড়ে শিশুসুলভ বিশ্বাসের ভংগিমায় বক্ষস্থ ক্রুশের ওপর ন্যস্ত করলেন। একটিমাত্র সরু রক্তের রেখা নেমে এসেছে মুখে। সিস্টার লুক ভিজে তুলো দিয়ে সেটা পরিষ্কার করে দিল। নার্স-সুলভ স্থৈর্যে লক্ষ্য করেছে শুধু হেড-ব্যাণ্ডটা মাথাটাকে যথাস্থানে ধরে রেখেছে!

উত্তরকালে কথাটা মনে পড়ে বিচলিত হয়েছে বহুবার।

ফাদার স্টিফেন শেষ অনুলেপনের তেল নিয়ে এলেন, আর সিস্টার মারিয়া-রোজ প্রতিজ্ঞাপত্রের ছোট কাগজখানা তার যুক্তকরের ফাঁকে দিয়ে দিলেন, আমৃত্যু ঈশ্বরের আনুগত্য স্বীকারের শপথ তাতে।

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ সবার, ভাব-ভংগিতে চিন্তাশূন্য আবিষ্টতা, অতল গহ্বরের কিনারায় এসে স্বপ্নচারীর মত ইতস্তত করছে যেন।

সিস্টার মারিয়া-রোজের সংগে জেগে রইল সিস্টার লুক। নতজানু হয়ে বসে একাগ্র বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল প্রশান্ত মুখখানার দিকে, অপঘাতমৃত্যুও কোন বিকৃতি আনে নি সে মুখে!

বহুক্ষণ পরে সিস্টার মারিয়া-রোজ নীরবতা ভংগ করলেন, সুপিরিয়র হিসেবে এ অধিকার একমাত্র তাঁরই।

মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কেমন করে ঘটল, সিস্টার লুক?

—আমি ঠিক জানি না। তবে শুনলাম বয়রা একটা জাদুকরের কথা কি বলাবলি করছে। এমিল বলতে পারবে সব ঘটনাটা। আমায় সব আগে সেই মহিলাটিকে দেখতে হয়েছিল।

থেমে গেল, দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে।

এও কি সম্ভব যে সে রোগিণীটির পরিচর্যা করেছিল সব আগে!

খবরাখবরের ঢাকে ক্ষণমাত্র না থেমে ঘটনাটা এতক্ষণে সবিস্তারে জংগলে পৌঁছে গেছে।

—আমি শুধু এইটুকু জানি সিস্টার, ঐ প্রচণ্ড আঘাতের পরও সেই জংলী-ছেলেটাকে ও ওয়ার্ড থেকে বার করে দিয়েছিল···

এইটুকু বলেই থামল।

তারপর সিস্টার অরেলিকে নীরব ভাষায় বলল, আমি শুধু এইটুকু জানি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে স্মিত হেসেছিলে তুমি, ভেবেছিলে একটু কনভার্ট গেঁথে তুলছ বঁড়শিতে!···ওদের খ্রীশ্চান করবার লোভ আমাদের ছোট্ট বোনটি আমার! ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বঁড়শির টোপ গেঁথেছিলে তুমি সিস্টার, আমি অস্ত্রোপচারের ছুরি দিয়ে! বেওয়ারিশ ঐ আত্মাগুলোর দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম আমরা, কৃপণ যেমন করে বিশাল পরিমাণ ধন-দৌলতের দিকে তাকায়···মনে পড়ে? আর বড়দিনের সময় আমাদের খ্রীশ্চান বয়দের সংগে ওদের চ্যাপেলে নিয়ে যাবার জন্যে কি রকম মতলব করেছিলাম!···মুখে না বলি, মনে মনে আশা করেছিলাম এই ভাবেই জয় করব ওদের, চোখে সেই আশার আলো ফুটত আমাদের···

ঠোঁট দু'টো সিস্টার অরেলির রক্তাভ এখনও, জীবনের রং এখনও মিলোয় নি। লাজুক মিষ্টি হাসিটুকু এখনও লেগে আছে, তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হ'ল ঠোঁট দু'টো নড়ছে বুঝি, যে কথাগুলো বলবে সেগুলো সাজিয়ে নিচ্ছে যেন।

কি বলবে ওরা? বলবে ওর স্বপ্নের কথা, ওর আকাঙ্ক্ষার কথা···ঐ জংলী-ছেলেগুলোকে খ্রীশ্চান করবে ও।

···আর কোনদিন তাকাবে না তুমি, কোনদিন না। তোমার চোখ বন্ধ হয়ে গেছে চিরতরে—ঐ নৃশংস আঘাতে। আমরা বুঝি নি আমাদের ঐ ছোট ছোট বঁড়শির টোপ দেখে খুশি হন নি প্রভু, তিনি চাইছিলেন একেবারে বড় জাল ফেলি···

বেদনা-বিহ্বল অন্তরটা অসাড় হয়ে আছে, কোন কিছুই উপলব্ধি করতে পারছে না! না হলে দেখতে পেত একেবারে বড় জাল ফেলাই যদি সত্যই অভিপ্রেত ছিল বিধাতার তো সে জাল ফেলার কাজ ইতোমধ্যেই সমাপ্ত হয়ে গেছে···সিস্টার অরেলির চির-মুদ্রিত দু'টি নয়নের দিকে চেয়েই দেখতে পেত।

সে দৃষ্টি নেই আপাতত, এখন শুধু তিক্ত অন্তর চীৎকার করে উঠছে ঐ উন্মত্ত হত্যাকারীর বিরুদ্ধে। [ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

ইন্দ্রনাথের নতুন ম্যানেজারের বাঙালী পোষাক দেখে শিবানী বিস্ময়বোধ করেছিল তখনই। এখন সে বুঝতে পারলো কেন ইন্দ্রনাথের মিশনারী স্কুল-কলেজে পড়া, ইংরেজী নকলে গড়া স্যুট, টাই, স্যু পরা ম্যানেজারের জায়গায় এমন ধুতি-পাঞ্জাবী-চপ্পল পায়ে দেওয়া ম্যানেজার রাখতেও মন উঠেছে! লোকটা চতুর—এ কথা ইন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছে বলেই পোষাকের এমন অকৌলীন্য মেনে নিয়েছে।

কিছুক্ষণ পূর্বেও জয়ের আনন্দ বোধ করেছিল শিবানী। ইন্দ্রনাথ কোথায় আছে জানতে চাওয়ায় যে লোক বলেছিল, 'তা হয় না'—সেই লোককে শুধু ইন্দ্রনাথ কোথায় আছে বলা নয়, সে যেখানে আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে ওকে পৌঁছে দিতে বাধ্য করেছে শিবানী—মনে হয়েছিল লোকটাকে দিয়ে এটা না করাতে পারলে ওর সম্মানকে কেওড়াতলার শ্মশানযাত্রায় পাঠাতে হতো। লোকটার ঐ জবাবের পর—ও যদি ঘরে গিয়ে ঢুকত তবে মর্যাদার কি কিছু অবশিষ্ট থাকত—কি এর কাছে, কি বাড়ির লোকগুলির কাছে। এখন ইন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলে কি হবে না হবে, কি ঘটবে না ঘটবে সে এখন বোঝা যাবে। ঘরে যে তৃতীয় ব্যক্তি থাকবে হয় সে বেরিয়ে যাবে ওকে দেখে, নয়ত ইন্দ্রনাথই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবে ওকে নিয়ে। তারপর বোঝাপড়া ওদের মধ্যে। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।

কি বোঝাপড়া করত শিবানী ইন্দ্রনাথের সঙ্গে?

জানে না—শিবানী জানে না। শিবানী ইন্দ্রনাথকে নিয়ে আগে অনেক কল্পনা করেছে। প্রথম প্রথম করেছে প্রেমের। তারপর রাগের, দুঃখের, ক্ষোভের, ঝগড়ার। কিন্তু এত কল্পনার ভেতরও এ কল্পনা ওঁর মনে কোনদিনও উদয় হয় নি যে, ইন্দ্রনাথের পিছু তাড়া করে ছুটেছে সে! ভাবতেও পারত না সে কথা। স্বপ্ন দেখলেও শিউরে উঠত ঘৃণায়।

কিন্তু এমনিই হয়—

সবার না হোক, এমন জীবন আছে, যা সে কল্পনা করতে পারে না, ভাবতে পারে না, স্বপ্নে দেখতেও ঘৃণা বোধ করে, ঘটনা তাকে কেবল সে-সবের ভেতরই নিয়ে ফেলে। শিবানী জানে তার অদৃষ্টটা সেই রকম। নইলে যে রুচিগর্হিত কাজ সে কল্পনা করতে পারে না তাই করছিল—তাও একা নয়। একজন অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে জোর করে টেনে সঙ্গে নিয়ে! যেন এ লোকটার যে রুচিবোধ আছে, ওর সেটুকুও নেই। যেন এই যে লোকটা বুঝছে এ ভাবে গিয়ে উপস্থিত হওয়াটা নিতান্ত কুরুচির পরিচয়—শিবানীর সে বোধটুকুও নেই। এমনি নিম্ন মানের মেয়ে ও।

কিন্তু শিবানী এও তো মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়েছিল। লোকটা তাও হতে দিল না।

নিজে উঁচুতে উঠল না, ওকে উঁচুতে তুলল লোকটা ওকে ইন্দ্রনাথের কাছে না নিয়ে গিয়ে।

না, এসব কিছু নয়। উঁচু-নীচু সুরুচি-কুরুচি—কিছু নয়। এগুলি হলো এসব লোকের মোসাহেবি। চাটুবৃত্তি আর চাকরি বজায় রাখা। হাঁটুর উপর তোলা আট হাত কাপড় পরা, ফতুয়া গায়ের সরকার হলে, হাত কচলে ইনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে-ককিয়ে দয়া প্রার্থনা করে শিবানীর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করত। পঞ্চাশ ইঞ্চি বহরের ধুতি আর হাঁটু-ঝোলানো পাঞ্জাবী-পরা ম্যানেজার বলে সে কাজটাই চতুরতার সঙ্গে করলো।

একটু নড়েচড়ে বসল শিবানী, সোফায়।

যদিও ললিতা এইমাত্র শিবানীর সজ্জাটাকে রমণীয় বলতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাটাকেও রমণীয় বলেছে, কিন্তু আজকের সন্ধ্যাটা একেবারেই রম্য ছিল না। একটু হাওয়া নেই। গাছপালা এমন নিথর নিশ্চল যে, সেদিকে তাকালে আকাশটাকেও মনে হয় যেন জমাট বেঁধে আছে। পাখার তলায় বসেও শিবানীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল। অন্যমনস্ক হাতে ব্যাগ খুঁজল শিবানী

রুমালের জন্য। কোলের উপর সোফার পাশে হাতড়ালো। না পেয়ে মনে পড়ল, সে বেরুবার জন্য নেমে আসে নি, নেমে এসেছিল ভেতরের অস্থৈর্যে স্থির থাকতে না পেরে। কোন বিষয়েই সে প্রস্তুত ছিল না। না লোকটার সঙ্গে এ ভাবে জড়িয়ে যাওয়ার জন্য—না তার সঙ্গে বেরুবার জন্য।

কপালের ঘাম হাতে লাগায় রুমালের কথা মনে হয়েছিল, না পেয়ে ভুলে গেল শিবানী রুমালের প্রয়োজনের কথা। মনে মনে যতই গাল দিক শিবানী লোকটাকে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে পরা—সরকারের সঙ্গে এক করে, কিন্তু তাতে শান্ত হতে পারল না। মনের গালিতে মনের জ্বালা নিরসন হয় না।

আর হার হারই।

অপরকে ভুল বোঝান সহজ, কিন্তু নিজেকে ভুল বোঝান সহজ নয়।

সে পরাজিত হয়েছে লোকটার কাছে।

অহংকার দিয়ে সম্মান বাঁচাতে গিয়ে অসম্মানের অতল তলায় তলিয়ে গেছে সে।

না, মাথা তোলারই আর উপায় নেই।

ও গিয়ে এখন গাড়িতে উঠবে। লোকটা গাড়ি চালাবে। বাড়ির সিঁড়ি-বারান্দায় নিয়ে গাড়ি দাঁড় করাবে। ও নেমে উপরে চলে যাবে?

সম্ভব?

অসম্ভব! ভেতরের অসহ্য ছটফটানিতে শিবানী উঠে দাঁড়াল। তারপরই আবার বসে পড়ল।

তবে কি করবে?

ও চাকর দিয়ে বলে পাঠাতে পারে অরুণকে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে। তারপর ও যে করে হোক যাবে—হোক ট্যাক্সিতে। হোক ট্রামে-বাসে।

আরো হাস্যকর। আরো পরাজয়। আউট হাউসের উপর-তলায় ইন্দ্রনাথের পি-এ'র ঘর। সেখান থেকে সমস্ত লন বাগান গাড়িবারান্দা দেখা যায়। অরুণ সেখান থেকে দেখবে, সে ট্যাক্সি থেকে নামছে? নয়ত হেঁটে লন পার হচ্ছে? তার মানেটা কি দাঁড়াবে? রাগ করে ও গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে! হ্যাঁ রাগ। চটে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিতে হলে চাকর দিয়ে বলে পাঠানো যায়। ওকে দিয়ে তপ্ত-কণ্ঠে বলতে হয়, চলে যান আপনি গাড়ি নিয়ে এখান থেকে। তাই আদেশ করবে গিয়ে সে অরুণকে। সোফায় হাতের চাপ দিয়ে উঠতে গিয়েও উঠল না শিবানী।

না, বসে থাক।

কথায় বলে, একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর। একা ইন্দ্রনাথেই রক্ষা ছিল না তাতে এমন অনুচর মিলেছে তার। আর ইন্দ্রনাথকে পায় কে!

ইন্দ্রনাথকে পাওয়ার চেষ্টা কি ও করত? করত না। অনেক দিন ধরে তার প্রতীক্ষা করা শিবানী ছেড়ে দিয়েছিল। ওর বিবাহিত জীবনের এই পাঁচ বছরের ভেতর প্রথম দু'বছর প্রতীক্ষা করেছে শিবানী প্রেমের সঙ্গে, আকুলতার সঙ্গে। তারপর কিছুদিন করেছে ধৈর্যের সঙ্গে। তারপর এই তিন বছর ধরে আর করে না। এক সময়ের মুহূর্ত গোণা স্ত্রী আজ আর খেয়ালও করত না কতদিন চলে যাচ্ছে বিনা সাক্ষাতে। কিন্তু আবার প্রতীক্ষা করতে আরম্ভ করেছিল শিবানী। যদিও সে ইন্দ্রনাথকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, নির্ভয়ও হচ্ছিল না! তবু—তবু বড় গাঢ় এবং গভীর অনুরাগ ফেন্না এসে গিয়েছিল শিবানীর সে প্রতীক্ষায়—। ইন্দ্রনাথের ভেতর একটা আকর্ষণী-শক্তি আছে বলেই না শিবানী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাকে ভালোবেসেছিল। বিয়ে করেছিল। যখন ইন্দ্রনাথ দূরে সরে যায় তখন তার করবার কিছু থাকে না। কিন্তু যখন ইন্দ্রনাথ তাকে কাছে টানে তখন—

ঝম্...

মেঝের উপর একগোছা চাবি পড়ার শব্দে একটু চমকেই পায়ের কিউটেক্স মাখা নখের উপর থেকে চোখ তুলল শিবানী।

শিবানীকে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে দেখে মেঝে থেকে চাবির গোছা তুলে নিয়ে অপরাধী মুখে ললিতা বলল, সরি!

সরি কেন?

তোমাকে জাগিয়ে দিলাম।

আমি ঘুমোচ্ছিলাম!

ঘুম থেকে নয়। চিন্তা থেকে।

চাবির গোছা হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে এসে সোফায় বসল ললিতা। বলল, এর ভেতর আরো তিনবার ঘুরে গেছি।

সত্যি! তবে সরি তুমি বলছ কেন, সরি বলব তো আমি।

ললিতা একটা রুমাল বাড়িয়ে ধরল।

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, এটা কি?

রুমাল—

আচ্ছা! বলে হেসে, উঠে হাত বাড়িয়ে রুমাল নিল শিবানী। কপালের ঘাম রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, রুমাল যখন গিয়ে নিয়ে এসেছ, তখন তিনবার না হোক একবার যে অন্তত ঘুরে গেছ—আমি টের পাই নি তা সত্যি।

না, তিনবার। ঘড়ি দেখো। সাতটায় এসেছ। এখন প্রায় আটটা। তোমাকে বসিয়ে রেখে যাবো আর এক ঘণ্টার ভেতর বার তিনেক ঘুরে যাবো না! চা নিয়ে এসেছিল। তাও ফিরিয়ে দিয়েছি। এবার দিতে বলি। ললিতা উঠে গিয়ে চা দিতে বলে এলো।

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, তোমার মা বৌদিরা বাড়ি নেই বুঝি?

বৌদি বাড়ি নেই। মা আছেন। কিন্তু পাশের বাড়ির গিন্নী এসেছেন। খুব জমিয়ে দু'জনে গল্প করছেন দেখলাম। তাই আর ডাকলাম না। ওঁদের জমাট গল্প নষ্ট হবে—আমাদেরও মাঝে মাঝে নিয়ে গল্প জমবে না। চলে এলাম।

চা-খাবার নিয়ে এলে ললিতা চাকরকে যাবার সময় বলে দিল, ড্রাইভারকে চা খাবার নিয়ে গাড়িতে দিয়ে আসিস মাধু।

শিবানী মুখ খুলতে গিয়েও মুখ শক্ত করে ফেলল। একটবাদে বলল, চা-খাবার কেন আনলে—

খাবে না?

ইচ্ছে করছে না।

চা-টা?

তাও নয়!

তবে থাক।

আচ্ছা, কেবল চা-টা দাও। সোফা থেকে শরীর তুলে হাত বাড়াল শিবানী।

ললিতা ওর হাতে কাপ তুলে দিয়ে বলল, যে'গাযোগের কুমুর একটা ছবিকে নবীন বলেছিল, এমন ছবি দৈবাৎ হয়। যে-দুর্লভ লগ্নে ওঁর মুখটিতে লক্ষ্মীর প্রসাদ সম্পূর্ণ নেমেছিল ঠিক সেই শুভ যোগটি ওই ছবিতে ধরা পড়ে গেছে। আজ তোমাকে ঘুরে ঘুরে দেখে ধাচ্ছিলাম আর আমার মনে হচ্ছিল, লক্ষ্মীর প্রসাদ নয় কিন্তু ঠিক তার উল্টো। একটা বিদ্যুৎ-খেলানো তলোয়ারের রূপ তোমার মুখের ওপর যেভাবে স্থির হয়ে আছে, এমন দৈবাৎ দেখা যায়। তুমি নাকি বাঁশরি নাটকে বাঁশরির পার্ট করেছিলে। আজ যদি তোমার সেই অভিনয়ের দিন হতো তবে তুমি অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জয় করতে।

চায়ে চুমুক দিচ্ছে দিতে খুব মনোযোগ দিয়ে ললিতার কথা শুনছিল শিবানী। সে কথা শেষ করতেই হাতের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের প্রতি আমার এতটুকু লোভ নেই ললিতা। অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার কেউ পাচ্ছে শুনলে আমার হাসি পায়। আমার ধারণা এতবড় ফাঁকির পুরস্কার আর দ্বিতীয় নেই।

কেন! বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল ললিতা।

প্রতিটি মানুষ নিপুণ অভিনেতা। প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সুনিপুণ অভিনয় করে চলেছে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নয় কে? তুমি, আমি, ও, এ, সে সবাই—সবাই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। এর ভেতর কেউ যখন কারিল ছবিতে বা থিয়েটারে অভিনয় করে পুরস্কার পায়, তখন আমার হাসি পায়।

তুমি কিন্তু আজ ভিনয়ে উতরোতে পারো নি।

আমি অভিনয় করিই নি। তুমি না হয়ে যদি তোমার বাড়ির আর কেউ বেরিয়ে আসতেন, তবে আমি নিশ্চয়ই অভিনয় করতাম এবং সে অভিনয়ে ভুল ধরার সাধ্য তোমাদের রথী-মহারথী পরিচালকদেরও থাকত না। তারপর হঠাৎ ছাদের দিকে চোখ তুলে শিবানী হেসে বলল, নাচের রিহার্সেল এখনও হচ্ছে? অভিনেতৃবৃন্দ ক্লান্ত হচ্ছে না?

এর মধ্যে একবার বিশ্রাম আর অন্তর্বর্তী খাওয়া হয়ে গেছে।

মাধু চায়ের কাপ-ডিস নিতে এসে ফিরে যাচ্ছিল খাওয়া হয় নি দেখে। ললিতা ডেকে বলল, সব তুলে নিয়ে যা। খাবেন না। ড্রাইভারকে চা-খাবার দিয়েছিলি তো?

মাধু জানাল, দিয়েছিল সে, কিন্তু সে খায় নি কিছু।

আচ্ছা যা।

মাধু ডিস-কাপ তুলে নিয়ে চলে গেল।

ত্রয়োদশীর চাঁদটা যেন জানালার কাছাকাছি প্রায় এসে দাঁড়িয়েছিল। যদি ঘরে আলো না থাকত তবে ঘরটা জ্যোৎস্নায় ভরে যেত। বাইরে বোধ হয় হাওয়া ছেড়েছে। জানালার পর্দাটা আগের চাইতে অনেক বেশি উড়ছে। এতক্ষণ ঘরের বাতাসে এতটা উড়ছিল না। বাড়ি যেতে হলেই গাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে—তাই বোধ হয় শিবানী উঠতে পারছিল না। নইলে তার এখন সত্যি কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। ললিতার সঙ্গেও না।

ললিতা বুঝতে পারছিল তাই সে চুপ করেই রইল।

একটুক্ষণ বাদে শিবানী বললো, যা, এমন চুপ যে!

কেবল কথা বলতে হবে তার কি মানে আছে।

...তোমার খবর বল। সোফায় পিঠ রেখে একটু গা ছেড়ে বসল শিবানী।

আমার খবর—ললিতা একটু ভাবল যেন। তারপর ঠোঁট উল্টে বললো, কিস্‌সু নেই।

একেবারেই কিছু নেই?

না একেবারেই নেই। এ মাসে একদিন হোটেলে খাই নি। একটা ছবি দেখি নি। একখান নতুন গয়না গড়াই নি। একটা শাড়ি কিনি নি—

খবরের জগৎ তবে তো সত্যি শূন্য দেখছি। বলে একটু হাসল শিবানী। কিন্তু তার মুখের হাসির সঙ্গে যে তার অন্তরের যোগ ঘটল না, তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

ললিতা চাবির গোছা কোমরে গুঁজে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, অভিনয়ে কিন্তু উতরোতে পারলে না শিবানীদি'। ওবার বলেছিলে, অভিনয় কর নি। এবার আর তা বলতে পারছ না! যত সহজ বলছ, তুচ্ছ বলছ, অভিনয় তত সহজ নয়।

অভিনয় সহজ তো আমি বলি নি। আমি বলেছি, প্রতিটি মানুষ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। আমরা প্রতিটি মানুষ দিনরাত যে অপূর্ব অভিনয় করে চলেছি তার কাছে সিনেমা নাটকের অভিনয়—তার আবার পুরস্কার। বক্তা পরিহাস করছে। তার পরিহাস তো মাঠে মারা যায় নি, আমার হাসি এটুকুই বলতে চেয়েছে তার চাইতে বেশি বলতে চায় নি। যদি চাইত তবে পারত। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে?

চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কেন, তুমি আমাকে পৌঁছে দিতে যাবে কেন? তুমি ভাবছ আমি মারামারি কাটাকাটি করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি?

না। কাটাকাটি করলে জামাকাপড়ে রক্ত থাকত। তা আমি পৌঁছে না দি না দিলাম। চলো গঙ্গার পাড়টা একটু গাড়িতে চক্কর খাইয়ে তুমি আমায় পৌঁছে দিয়ে বাড়ি চলে যাবে। অসহ্য লাগছে ঘরের মধ্যে।

শিবানীকে তবু উঠতে না দেখে ললিতা ছেলেমানুষি আব্দারে গলায় বললো, কই উঠছ না শিবানীদি'। ওঠ না। তারপর এগিয়ে এসে শিবানীর হাত ধরে টেনে বললো, এমনিতেই আজকাল শরীর নিয়ে হাঁসফাঁস করি। তাতে আজকের গরম যেন দমবন্ধ করে আসছে। একটু বাইরের হাওয়ায় ঘুরিয়ে নিয়ে এসো না বাপু।

শিবানীকে উঠতে হলো।

আজ তার কপালে যেন কোন কাজ মসৃণভাবে হবে না। ড্রাইভারের বদলে অরুণ তার গাড়ি চালাচ্ছে—এটা স্বাভাবিক নয়। অরুণ যখন ললিতাদের বাড়ি চেনে তখন ললিতাও হয় তো তাকে চেনে—কিংবা হয় তো চেনে না—এ কথাটা বড় নয়। সব চাইতে বড় কথা যেটা, সেটা হলো ললিতার বিস্ময় লাগবে, ড্রাইভারকে চা খাবার গাড়িতে দিয়ে আসবার নির্দেশ তো সে ওর কাছে বসেই দিয়েছে। একে যে চা গাড়িতে এনে দেওয়া যায় না একথা কেন শিবানী ওকে বলে নি!

ললিতা তো বুঝবে না অবজ্ঞা উপেক্ষা দিয়ে মাথা উঁচু রাখা ছাড়া ওর আর মাথা উঁচু রাখার কোন উপায় নেই।

যাক্ গে—ওদিক থেকে মনটাকে ঘুরিয়ে ফেলল শিবানী। ললিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে কোন রকম অস্বস্তিজনক অবস্থায় ফেলবে না। ললিতার সঙ্গে চলতে চলতে বললো, এমনিতেই হাঁসফাঁস করো মানে?

শরীর ভালো নেই।

কি হয়েছে?

এই—কিছু নয়।

এই বললে শরীর ভালো নেই। আবার বলছ কিছু নয়—ললিতার দিকে তাকালো শিবানী, বাচ্চা হবে?

খোঁজ করো কিছু?

আচ্ছা! এত বড় খবর রয়েছে আর বলছিলে খবর নেই। তাই মার কাছে এতদিন ধরে রয়েছ।

ফের তাকালো সে ভালো করে ললিতার দিকে। বললো, বেশ তো বোঝা যায়, আমারই বোঝা উচিত ছিল।

তাকালে তো বুঝবে। তুমি কি তাকাও আমাদের দিকে।

হাসল শিবানী। তাকাই নে বুঝি! তা ক'মাস হলো।

ছ'।

এতদিন! এ পর্যন্ত তুমি বল নি। কেউ বলে নি? কি অন্যায়!

কেন বলবো? কোন আগ্রহ আছে তোমাদের আমাদের সম্বন্ধে। আমি ছুটে ছুটে যাই বলে তবু আমার সঙ্গে কিছু সম্পর্ক আছে—বলেই ঠোঁট ভারী করল ললিতা, বললো, তাও ভারি! জন্মদিনে নেমন্তন্ন করলাম এলে না পর্যন্ত। সেদিন গিয়ে অফিস থেকে ধরে নিয়ে এলাম—বসলে না পর্যন্ত।

আজ?

আজ তুমি এসেছ কি আর কেউ তোমাকে আচমকা ছেড়ে দিয়েছে আমাদের দরজায়, বুঝতে পারছি নে। তবে আমি যে তোমাকে অনেকটা সময় পেলাম, তা ঠিক।

গাড়ির গদিতে পিঠ রেখে সিগারেটের পর সিগারেট টানছিল অরুণ আর গরমে ঘামছিল। ওদের দেখে সোজা হয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসল।

গাড়ির দরজা খুলে ললিতাকে ওঠাল তারপর নিজে উঠে ঝপাং শব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ করে শিবানী কঠিন কণ্ঠে আদেশ করল, রেড রোড ধরে গঙ্গার ধারে যান।

পুরো কথাটায় বাংলায় বলার জন্য তো বটেই শিবানীর গলার অহেতুক কাঠিন্যেও আশ্চর্য হয়ে ললিতা ড্রাইভারের আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তির দিকে তাকাল। অরুণকে সে কালকেই প্রথম দেখেছে কালীনাথকে নামিয়ে দিতে এলে। যদিও অরুণ গাড়ি চালাচ্ছিল না। ড্রাইভারই গাড়ি চালাচ্ছিল। সে গাড়িতে ছিল। কালীনাথের কাছে কালই জেনেছি এই ছেলেটি ইন্দ্রনাথের নতুন পি-এ। আজকের পুরো ব্যাপারটাই ললিতার এতো বোধের বাইরে লাগছে যে, সে একেবারে চুপ করে গেল।

বালিগঞ্জ থেকে বেরিয়ে ভবানীপুর পড়ল তারপর চৌরঙ্গী পার হয়ে অরুণ শিবানীর নির্দেশ অনুসারে রেড রোডে পড়ল। রেড রোডে পড়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি ছেড়ে দিল অরুণ।

গাড়ির ভেতর চুপচাপ বসে রইল দু'জন। ললিতা মুখের উপর উড়ন্ত চুলগুলি দু'হাতে চেপে ধরে বসে রইল। শিবানী তা-ও করলো না। তার খেয়ালও নেই যে, মুখের উপর চুলগুলি অসহ্য নাচানাচি করছে।

ললিতাকে পৌঁছে দিয়ে শিবানী যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি থামতেই দরজা খুলে নেমে পড়ল শিবানী। আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন—তেমনি কঠিন স্বরে অরুণকে আদেশ করে বসবার ঘরে এসে ঢুকল সে। ঢুকে ঘরের চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে আনল। ঘরটার চারদিকে না বলে বাড়ির আবহাওয়াটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে আনল বললে ঠিক হয়। যেন নিষ্পন্দ বাড়ি। গাছের পাতাগুলির মতো স্থির হয়ে আছে। কোথাও কিছু নড়ছে না।

[ক্রমশ।

আয় তোরা আয়

(গান)

[উইলিয়ম শেক্সপীয়র-এর 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকের 'Under the greenwood tree' গানটির অনুবাদ।]

শ্যামল গাছের মধুর ছায়ায়
আরামেতে শুয়ে থাকতে কে চায়
আমার পাশে পরমাশ্বাসে
বল্ না রে ভাই বল্ না আমায়॥
হেথায় শুয়ে আজ দুপুরে
মিলিয়ে গলা পাখির সুরে
গাইবি কে গান আর আয় আয়॥
ঝড় বাদল আর শীতটি ছাড়া
অন্য অরির পাবি নে সাড়া
সবুজ ঘাসে আমার পাশে
থাকবি শুয়ে আয় তোরা আয়॥

চাও নাকো হতে হোমরা-চোমরা
তেমন মানুষ কে আছ তোমরা
বাঞ্ছা বাঁচার খোলা আলো-হাওয়ায়॥
অতি সাদাসিধে জীবনযাপন
ছোটবড় সবে ভাবিয়া আপন
বাঁচতে কে চাস চিন্তাহীনতায়॥
ঝড় বাদল আর শীতটি ছাড়া
কোন শত্রুর পাবি নে সাড়া
নরম ঘাসে পরমাশ্বাসে
থাকবি শুয়ে আয় তোরা আয়॥

অনুবাদক—মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জুলফিকার

এক

১০ই পৌষ সোমবার—শীলার জন্মদিন। দীপঙ্করের পিসতুতো বোন শীলা। বছর পাঁচেক হল ওর বাবা শিলং থেকে কলকাতায় বদলী হয়ে এসেছেন।

এই পাঁচবছর ধরে দীপঙ্কর শীলাকে তার জন্মদিনে উপহার দিয়ে আসছে। প্রতিবারই উপহার পেয়ে শীলা খুশি হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, টেস্ট আছে দীপুদার!

বিশেষ দামী হয়ত নয়, কিন্তু জিনিসগুলো বাস্তবিকই চমৎকার।

কোথা থেকে জোগাড় করে এগুলো দীপুদা,—ভেবেই পায় না শীলা। আরবছর পেয়েছিল ক্রীমরঙের একটা ফাউন্টেন পেন। তার ক্লিপটা ছাই-ছাই রঙের মিনে-করা সাপের আকারের—ঈষৎ এঁকে-বেঁকে নেমে গেছে লেজটা, ফণাটা কলমের মাথার দিকে। দু' পাশে ছোট্ট দু'টো লাল পাথরের চোখ, জ্বলজ্বল করে ওঠে আলো লাগলে।

দোকান দোকান ঘুরে জিনিস দেখে বেড়ানো দীপঙ্করের একটা নেশা। যত নতুন ও অদ্ভুত ঢংয়ের জিনিস বাজারে বেরোয়—তাদের খোঁজ ওর মত কেউ রাখে না।···

শীলার জন্মদিনের উপহার কিনবার জন্যে দীপঙ্কর গোটা রবিবারটা ঘোরাঘুরি করে ফিরল। মাসের আজ ছাব্বিশে, তা' ছাড়া ছোট ভাইয়ের পরীক্ষার ফিস্ দিতে হয়েছে এ মাসে। হাত ফাঁকা বললেই হয়। বারো, তের, মেরে-কেটে পনের,—তারই মধ্যে যা হোক করে সারতে হবে। সে রকম যদি কিছু না-ই পাওয়া যায়, অগত্যা নিউ-মার্কেট থেকে ভাল দেখে একটা ফুলের তোড়াই নিয়ে যাবে। হলদে গোলাপের গায়ে দু'-একটি চন্দ্রমল্লিকা, মাঝে মাঝে নীল এক-আধটা কর্ন ফ্লাওয়ার,—মন্দ দেখাবে না কম্বিনেশনটা। ফুলের দোকানে বললে তারাই তোড়া বেঁধে দেয়।

ভাবতে ভাবতে দীপঙ্কর নিউমার্কেটের যে দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ায়, তার মালিক ওকে ভালভাবেই চেনে। অনেকবার তার দোকান থেকে টুকিটাকি জিনিস কিনেছে। দীপঙ্করকে দেখে লোকটা হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায়।

'আসুন স্যার, একটা নতুন জিনিস রেখেছি আপনার জন্যে।'

বাঁ-হাতি র‍্যাকটার পিছন দিক থেকে একটা কাগজের বাক্স এনে খুলে বার করল একটা কাঠের কাস্কেট। ডালার উপর চমৎকার একটা ছবি, ল্যাকার ভার্নিশে আঁকা। ফিকে নীল, সবুজ, মভ, কালো আর সাদা,—জায়গায় জায়গায় ঘোর লালের স্পর্শ।

আপাতদৃষ্টিতে এর সূক্ষ্ম কলানৈপুণ্য সবার চোখে ধরা পড়বার কথা নয়। একটু নিবদ্ধভাবে দেখলে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়! দীপঙ্কর মুগ্ধবিস্ময়ে অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা দেখে। কয়েকজন শিল্পী-বন্ধুর সঙ্গে জানাশোনা থাকায়, জীবনে অনেক ভাল ছবি দেখবার সুযোগ হয়েছে তার।···নিজেও সে ছবি এঁকে থাকে।···এটা সত্যিই একটা অনবদ্য সৃষ্টি। সম্ভবত কোন দাক্ষিণী-শিল্পীর কাজ। অজ্ঞাত এই শিল্পীর উদ্দেশে মনে মনে শ্রদ্ধা জানায় দীপঙ্কর।

একটা পৌরাণিক কাহিনীর আলেখ্য। বোধ হয় কচ ও দেবযানীর ছবি। বল্কল-পরা, পুঁথি-হাতে এক সুকুমার বিদ্যার্থী—মুখে-চোখে এক অপার্থিব কমনীয়তা। সম্মুখে দাঁড়িয়ে মুক্তকুন্তলা, আয়তলোচনা, ক্ষীণ-মধ্যা এক তাপস-বালিকা।

বুকের কাছে দু' হাতে পরম স্নেহে ধরে আছে একটা মৃগশিশু। মাথার উপর আনত শাখায় দুলছে পুষ্পিত বনলতা। নীচে তৃণের শ্যামল আস্তরণ। মেয়েটির ওষ্ঠ-লগ্ন হাসিটি ভারি সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে···।

দোকানীর কথায় দীপঙ্করের চমক ভাঙে।

'নিয়ে যান স্যার, দাম খুব বেশি নয়, মাত্র সাতচল্লিশ টাকা।'

হাতে টাকা থাকলে দীপঙ্কর জিনিসটা নির্ঘাত কিনত।

ওকে চুপ থাকতে দেখে দোকানদার আশ্বাস দিয়ে বলে, 'টাকার জন্য ভাববেন না। না হয় আসছে মাসে দেবেন। পছন্দ যখন হয়েছে নিয়েই যান।'

ধারে জিনিস কেনা দীপঙ্করের স্বভাব-বিরুদ্ধ।

একটু ম্লান হেসে উত্তর দেয়, 'কৌটোটা সত্যিই খুব ভাল লেগেছে আমার। রেখে দিতে পারবেন না কয়েকটা দিন? পরে নেব।'

'আপনি যখন বলছেন, না হয় আসচে মাসটা পুরোই রেখে দেব।'—বলল দোকানদার।

দীপঙ্কর ভাবল—আসছে মাসে জিনিসটা কিনেই ফেলবে গোটা-পঞ্চাশেক টাকা ধার করে।

দুই

মার্কেট থেকে বেরিয়ে খানিকদূর এগুতেই দেখে, ফুটপাথের কোল ঘেঁষে দামী একখানা লিম্যুজিন; তারই পাশে দাঁড়িয়ে ওর ভূতপূর্বা কলেজ-সহপাঠিনী সুশোভনা—সুশী মিটার একজন অবাঙালী স্যুট-পরা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে।

বহুদিন বাদে দেখা।

কলেজ ছাড়ার পর মাত্র দু'বার ওর সাথে দেখা হয়েছে, দীর্ঘ সাত বছরের মধ্যে—একদিন সকালে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, আর একদিন লাইট-হাউস সিনেমার সামনে রাত সাড়ে আটটার সময়। শেষবার দেখা হবার পরও তিন বছর হতে চলল।

দীপঙ্করকে দেখতে পেয়ে সুশী এগিয়ে এল, 'ইজ দ্যাট ইউ দীপ, ওল্ড বয়? ওয়েল, হাউ গোজ দ ওয়ার্ল্ড উইথ ইউ? উই মীট আফটার এ্যান্ এজ।···এসো, আলাপ করিয়ে দি।'

টানতে টানতে দীপঙ্করকে সেই স্যুট-পরা ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যায়।

'হি ইজ এস্ ভি—শুকদেব বাজাজ। বাজাজ এয়ার ওয়েজের নাম শুনেছ নিশ্চয়, আর রাজস্থান মেশিন টুলসের?···সেই বাজাজ বাড়ির ছেলে। ফিল্ম লাইনে আছেন, হলিউড-ফেরতা। ডিরেক্টর হিসাবে বাজারে নামও করেছেন। ওঁর লেটেস্ট ফিল্ম 'দিমাগ' হাজ কজড্ এ সেনসেশান। আমাকে ওঁর নতুন ফিল্মে হিরোইন সাজতে বলছেন।···সিনেমায় নামলে অনেক আগেই নামতে পারতুম। আই হেট টু থিঙ্ক অব স্ট্যাণ্ডিং ইন এ স্টাফি রুম ফর আওয়ার্স টুগেদার, আণ্ডার দি ব্লাইণ্ডিং গ্লেয়ার অব ল্যাম্প্স্ টু আটার সাম সিলি এ্যাণ্ড সপি ডায়ালগ।···এ্যাণ্ড মিঃ বাজাজ দিস ইজ মাই ওল্ড ফ্রেণ্ড এ্যাণ্ড ক্লাশ মেট, দীপঙ্কর ঘোষ ডি· ফিল,—এ ম্যান অব ফাইন আর্টিস্টিক টেস্ট এ্যাণ্ড টেম্পারেমেণ্ট। চমৎকার বাঁশি বাজান। ছবিও আঁকেন।'

বাজাজ 'গ্ল্যাড টু মীট ইউ ডক্টর ঘোষ,' বলে দীপঙ্করের হাত ঝাঁকি দিলেন। তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন—মাফ করবেন ডক্টর ঘোষ, বড়ই দুঃখিত খুব জরুরী কাজ রয়েছে। আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যে দুটো কথা বলব, তার উপায় নেই।···আই মাস্ট বাজ অফ নাউ, আর নট ইউ কামিং মিস্ মিটার?'

সুশোভনা দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বলল, 'ভাল কথা, কাল আমার জন্মদিন, এসো বুঝলে। চায়ের নেমন্তন্ন রইল। আমি এখন উড্ স্ট্রীটে ফ্ল্যাট নিয়ে আছি। বাবা মারা যাবার পর বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি।'

সুশী হ্যাণ্ড-ব্যাগ থেকে একখানা কার্ড বার করে দীপঙ্করের হাতে গুঁজে দেয়।

'এতেই রয়েছে ঠিকানা।··আচ্ছা, চলি এখন। যেও কিন্তু··· বিটউইন কোয়ার্টার টু সিক্স এণ্ড সেভেন। সাড়ে পাঁচটায় গেস্টরা সব চলে যাবে, মিসেস বর্ধনের ওখানে মজলিস আছে। আমি ইচ্ছে করেই যাচ্ছি নে। আই কাণ্ট স্টাণ্ড হার।

বাজাজের হিস্পানো স্যুইজা ওদের দু'জনাকে নিয়ে গেল।

* * *

দীপঙ্করের সমস্ত প্ল্যান ওলোট-পালোট হয়ে যায়। শীলার জন্মদিনের পার্টিও কাল সন্ধ্যেয়। সহপাঠী হিসাবে একবার সুশীর বার্থ-ডে পার্টিতে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। কিন্তু ওদের বাড়ির ধনী ও উৎকট সাহেবী পরিবেশে সে নিতান্ত বিব্রত হয়ে উঠেছিল। দীপঙ্কর সুশীর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাবে কি যাবে না—ঠিক করে উঠতে পারে না। পাশের চায়ের দোকানে বসে কাপ দু'য়েক চা খেতে খেতে অনেক চিন্তার পর যাওয়াই স্থির করল।

তার তরুণ জীবনের অনেক সুখ-স্মৃতি ওর সঙ্গে বিজড়িত। সুশীর সাদর আমন্ত্রণ তাই সে শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারল না। শীলাদের ওখানে তা হলে আর যাওয়া হবে না, যদিও পিসীমা আসার জন্য বার বার করে বলেছেন, চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে,—জরুরী কাজে আটকা পড়ায় যেয়ে উঠতে পারল না। সাথে না হয় ভাল দেখে একটা ফুলের তোড়াই পাঠিয়ে দেবে।

তিন

প্রথম কলেজে, পরে ইউনিভারসিটিতে একসঙ্গে পড়েছে ওরা,—পুরো চার বছর। ভক্ত ও স্তাবকের অভাব ছিল না সুশোভনার—কলেজের ভিতরে এবং বাইরে। তবু কেন যেন দীপঙ্করের ওপর ওর একটু সদয় দৃষ্টি পড়েছিল। বোধ হয় ভাল ছেলে আর অসম্ভব লাজুক বলে। একটু কিছুতেই মেয়েদের মত মুখ রাঙা হয়ে উঠত ওর। ছেলেরা তাই ঠাট্টা করে ওর নাম দিয়েছিল, 'মিস দীপা'।

সুশী সত্যিই অসাধারণ মেয়ে। সুঠাম, লাবণ্যময়ী, শ্লেষ-নিপুণা। ছেলেবেলায় মেমদের স্কুলে দৌড়-ঝাঁপ, হার্ডেলরেসে বরাবর ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে এসেছে। মোটর চালনায় অনেক পাকা ড্রাইভারকেও হার মানায়। রাইফেলের লক্ষ্যও অব্যর্থ। টেনিসে বাহবা পাবার মত হাত। গানও গায় চমৎকার। সচরাচর বাঙালীর ঘরে এত ফর্সা রঙ চোখে পড়ে না। তা ছাড়া বেশিরভাগ মেয়েরা যেমন প্রশংসায় অভিভূত হয় ও তাদের দলে পড়ে না, নিন্দাও ওকে বিচলিত করতে পারে না। ওর নিজের চারপাশে কৌতুক ও বিদ্রূপের এমন একটা দুর্ভেদ্য প্রাকার রচনা করে তুলেছিল, যে ওর হৃদয়দ্বারে করাঘাত করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এসেছে প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর দল।

সুশোভনা ঊর্ধ্বলোকের তারা।

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে দীপঙ্করের তাকে পাবার স্বপ্ন আকাশ-কুসুমের মত। তবুও সেই অলভ্যার সান্নিধ্য মাঝে মাঝে

জুটেছে তার ভাগ্যে। বোটানিকসের ছায়া-নিবিড় গাছের নীচে কাটিয়েছে ছুটির দিনের কোন অলস মধ্যাহ্ন, পাশাপাশি বসে। শুনিয়েছে ওকে তার বাঁশির করুণ মধুর স্বর। চীনাপাড়ার হোটেলে, প্রণচাউয়ের প্লেট সামনে নিয়ে আলোচনা করেছে ডাইলান টমাসের কবিতা না হয় স্যালভেডর ড্যালীর ছবি।

ইউনিভারসিটি ছাড়বার পর সুশীর চারপাশে গড়ে উঠল গুঞ্জনরত এ্যাডমায়ারারদের একটা মধুচক্র। সেখানে দীপঙ্করের মত সামান্য লোকের স্থান নেই। কমলভোজী, বেপরোয়া, পয়সাওয়ালা পরিবারের ছেলেরাই ওর ওখানে ভিড় জমাতো। আসত ফ্রী লান্স জার্নালিস্ট উৎপলাক্ষ নন্দী,—যার বাবা বছরে ইনকাম ট্যাক্সই দেন বিয়াল্লিশ হাজার টাকা। আসতেন ক্যাপ্টেন রণবীর সিং চৌহান—অক্সফোর্ডের টেনিস ব্লু। বাপের কারবার বেচে দিলেও, শেয়ারের ডিভিডেণ্ট আর জমা টাকার সুদে তিনপুরুষের বসে বসে খাওয়া চলবে। দুর্দান্ত শিকারী চন্দ্রকুমার মেহরা। মেহরাদের ইউরোপ জুড়ে কাশ্মীরী শাল আর জয়পুরী মিনাকরা জিনিসের কারবার চলছে। প্যারি, রোম, ভিয়েনা তিন জায়গায় দোকান—হেড অফিস লণ্ডনে। চন্দ্রকুমার পাঁচবার কণ্টিনেণ্ট ঘুরে এসেছে—এই ত' সবে সাতাশ বছর বয়স, এরই মধ্যে। মন্টে কার্লোয় রুলেৎ খেলেছে, ইয়টে চেপে ভূমধ্যসাগরের নীল জলে ঘুরে বেড়িয়েছে।···সুররিয়্যালিস্ট শিল্পী টুটুল সেন,—জাস্টিস স্যার সি আর গুপ্তের ভাগ্নে ও একমাত্র ওয়ারিশ। বিলেতে তিন বছর থেকেও সিল্কের পাজামা, পাঞ্জাবী আর শাল ছাড়া কিছু গায় দেয় নি; বিড়ি ছাড়া ধূমপান করে নি। পুরো তিন বছরের খোরাক—ছ' হাজার বাণ্ডিল বিড়ি (দিনে কমপক্ষে পাঁচ বাণ্ডিল হিসাবে) স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল, চড়া কাস্টমস ডিউটি দিয়ে।

তবে সুশীর বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব বেশিদিন টেকে না, বিশেষ যাদের সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গতা নিবিড় হয়ে ওঠে। বন্ধুস্থানে ওর পরিবর্তন যোগ লেগেই আছে।···প্রথম দিকটায় মিতালীটা বেশ জোর কদমে চলে, তারপর আসে মন্থরতা। শেষে বন্ধুত্বের পালায় নামে যবনিকা। কিন্তু এই বিচ্ছেদ, বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণা কিছুই রেখে যায় না ওর মনে। অবিশ্যি যারা ওর খুব কাছাকাছি না ঘেঁসে, তাদের সঙ্গে ওর সৌহার্দ্যের বিশেষ ব্যতিক্রম হয় না।

কতবার ভাল ভাল বিয়ের প্রস্তাব এসেছে ওর, কিন্তু সুশী বারবার তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ভাবী পতির অসঙ্গতি নিয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করেছে। তার চলন, বলন, হাবভাবের নকল করে সবাইকে হাসিয়েছে।···

দাদারা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়েরা শেষ পর্যন্ত সবাই হাল ছেড়ে দিলেন। ইচ্ছে করে যে মেয়ে নিজের ভাগ্যকে অবহেলা করে, তার দুঃখ কে খণ্ডাবে?

ওদের বাড়ির বৈঠকখানায় হরেকরকম লোকের ভিড়, অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-হুল্লোড় দাদা-বৌদিদের কাছে নিতান্ত অসহনীয় হয়ে ওঠে। কোন কোন দিন সুশী বাইরে রাত কাটিয়ে বাড়ি ফেরে। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে বোনের নিন্দে শুনতে শুনতে দাদা দু'জন অস্থির।···

যা করে করুক দূরে গিয়ে করুক।···পৃথকভাবে বাস করতে সুশোভনার কিছুমাত্র অনিচ্ছা ছিল না। বাবা ওর নামে পৃথক যে টাকা রেখে গেছেন তাই আর পার্ক স্ট্রীটের বাড়িখানা নিয়ে, দাদার আশ্রয় ছেড়ে চলে এল সুশী। বাড়িভাড়া আর ব্যাঙ্কের সুদে একা মানুষের দিব্যি চলে যায়, তা ছাড়া বড়লোক বন্ধুদের কাছে দরকার মত যখন ইচ্ছে চাইলেই টাকা পাওয়া যায়।

আজ শিকার, কাল পিকনিক, পরশু প্লেজার ট্রিপ, ককটেল পার্টি, টেনিস টুর্নামেণ্ট, আর্ট শো—এই সব নিয়েই মেতে রইল সুশী মিটার। প্রজাপতির মত লঘু ডানা মেলে ভেসে বেড়ায় নির্ভাবনায়, চঞ্চল বাতাসের স্রোতে।

চার

সুশীরা চলে যেতেই দীপঙ্কর ফিরে গেল দোকানটাতে। ভাবল, কৌটোটা পেলে সুশী নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। আর ওর মত লোক এর চেয়ে আর কি এমন ভাল প্রেজেণ্টই বা দিতে পারে। সুশীকে সাত বছর আগে যেমন দেখেছে, তাই দিয়ে ওকে বিচার করে। ওর বড়মানুষ বন্ধুরা অনেক দামী সৌখীন জিনিস দেবে ওকে।· তার এই সাতচল্লিশ টাকার কাঠের কাস্কেটটা হয়ত সেগুলোর পাশে নিতান্ত বে-মানান লাগবে। তবে দীপঙ্করের বিশ্বাস, সুশীর কাছে কৌটোটার অমর্যাদা হবে না। ডালার ওপরের অমন সুন্দর ছবিটা যে ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না, সে বিষয়ে ও অনেকটা নিঃসন্দেহ।

দোকানী কাস্কেটটা প্যাক করতে যাবে, এমন সময় একটা বুদ্ধি খেলে যায় দীপঙ্করের মাথায়। ফাঁকা কৌটোটা না দিয়ে, কিছু চকোলেট ভর্তি করে দিলে হয় না! ও জানতো নারকেল শাঁসভরা এ্যামেরিকান বাউণ্টি চকোলেট এককালে সুশীর খুবই প্রিয় ছিল। বাজার ঘুরে অনেক কষ্টে জোগাড় করল তারই পাউণ্ডখানেক। চকোলেটগুলো কাস্কেটে পুরে, একটা সুদৃশ্য ম্যাজেণ্টা রঙের ফুল পাতা আঁকা সিল্কের ফিতে দিয়ে বেঁধে, দোকানী প্যাকেটটা তুলে দেয় ওর হাতে।

ছোট্ট একখানা কার্ডে দু' ছত্র কবিতা উদ্ধৃত করে কাস্কেটটা পরদিন সুশোভনার উড স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিল কলেজের এক বেয়ারার মারফৎ।

সেই একই লোকের হাতে শীলাকেও চিঠি ও ফুল পাঠিয়ে দেয়—হলদে ও বেগুনী গোলাপের স্তবক।···

দীপঙ্কর সুশী মিটারের ফ্ল্যাটে একটু দেরিতেই পৌঁছল—সন্ধ্যে পেরিয়ে সওয়া ছ'টায়।

তেতলায় ওর ফ্ল্যাট—সোজা উঠেই বাঁ-হাতি। দরজা খোলাই ছিল। দীপঙ্কর নিঃশব্দে ড্রইং-রুমে ঢুকল।

একটা নীল রঙের অনুজ্জ্বল বাল্ব জ্বলছে ঘরটায়।

মাঝখানে একটা বড় গোল টেবিল, নানা রকমের উপহারে ভর্তি ভ্যানিটি ব্যাগ, মূল্যবান ফাউণ্টেন পেন, ছোট বড় ভেলভেটের বাক্সে হীরের আংটি, দুল, রিস্ট-ওয়াচ, ব্রোচ, নক্সাকাটা দামী কাচের শিশিতে ফরাসী সেণ্ট, প্রসাধন সামগ্রী, সুদৃশ্য চীনামাটির ক্রোকারিস, রূপোর কফি-সেট, সিল্ক-নাইলন ও ডেক্রনের শাড়ি, ব্লাউস, নরম পশমিনার চাদর, স্কার্ফ, একজন দিয়েছে ছোট্ট একটা ফ্রিজ আর

খাজুরাহের যুগলমূর্তি

(মধ্যপ্রদেশ)

—বিশ্বনাথ বিশ্বাস

মাসিক

বসুমতী

আষাঢ় / '৭১

মাসিক
বসুমতী
আষাঢ় / '৭১

[ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্য
উপযুক্ত ডাক-টিকিট
দিতে হয়।]

বুদ্ধ-স্মৃতি

—পি সি ভট্টাচার্য
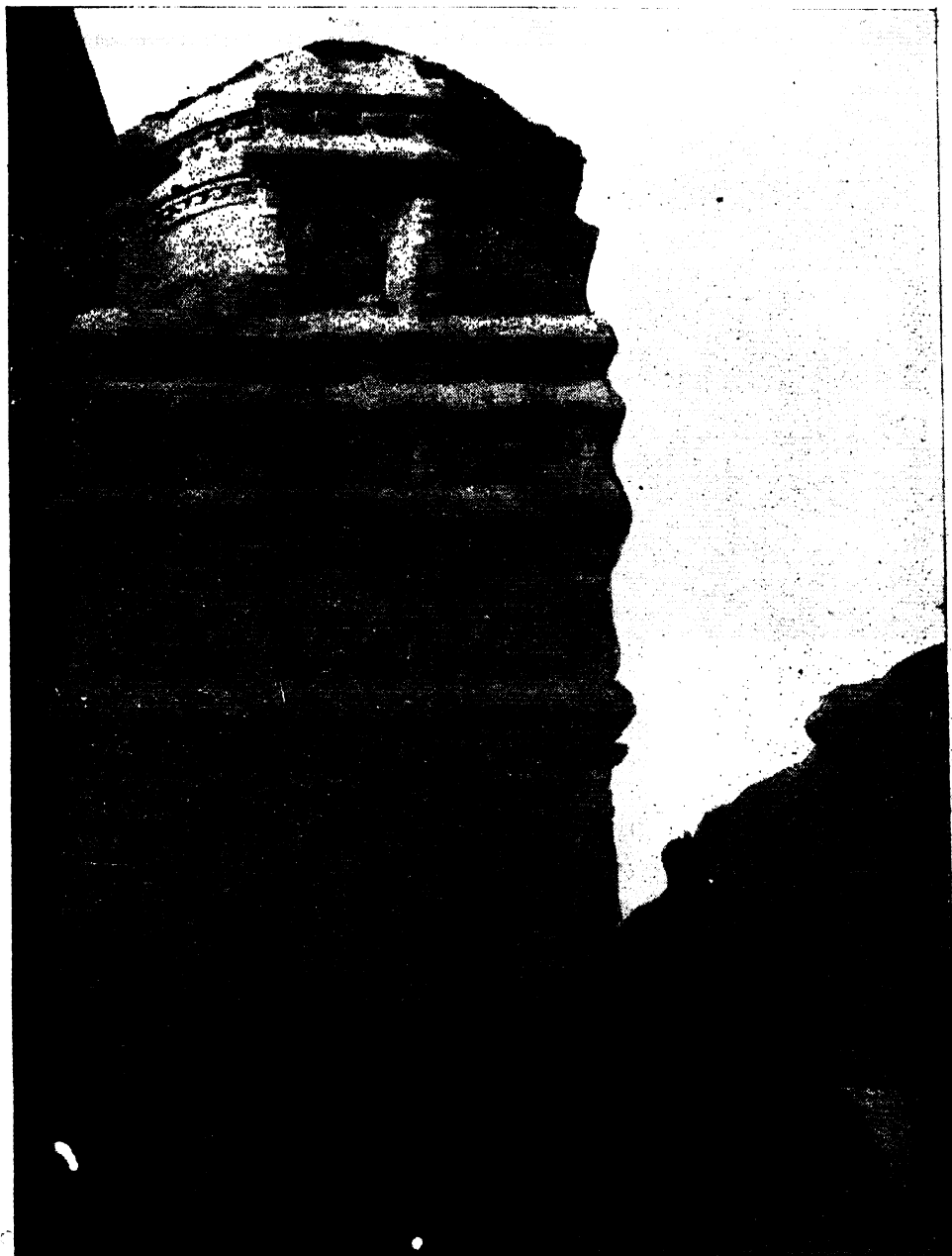
দিলবাহার

(আবু পাহাড়)

—বিশ্বনাথ বিশ্বাস

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে আপনার নাম, ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন

ছায়াছবির যন্ত্র

—দেবু দাস

[ছবির নেগেটিভ্ পাঠালে ছবি ছাপা হয় না।

একজন একটা চিন্‌চিলার ফার দেওয়া ক্লোক সম্ভবত বিদেশ থেকে আমদানী করা।

কোথাও কিন্তু তার কৌটোটার চিহ্ন নেই।

বেয়ারাটা ভুল করে অন্য কোন বাড়িতে কৌটোটা দিয়ে আসে নি ত'? না, তাই বা কি করে হয়! লোকটা ফিরে এসে বাড়ির যা বর্ণনা দিল তা'ত হুবহু মিলে যাচ্ছে। ফটকের পাশে দু'টো ইউক্যালিপটাস গাছ, সিঁড়ির দু'ধারে দু'টো টবে ক্ষুদে চীনা বাঁশের ঝাড়। কাস্কেটটা যার হাতে দিয়েছিল, সে স্বয়ং সুশোভনা না হয়ে যায় না—মেম সাহেবদের মত রঙ, ঈষৎ সোনালী চুল, চোখে পুরু চশমা, বাঁ গালে তিল।

পাশের ঘরে আলো জ্বলছে।

সুশী আর কে যেন রয়েছে ওঘরে।

পর্দার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আলো এসে পড়েছে এঘরে, চৌকাঠ পেরিয়ে...

হঠাৎ শুনতে পায় ঈষৎ সুরাজড়িতকণ্ঠে সুশী বলছে, 'ইট্‌স্ মার—মারভেল্লাস মিস্টার বাজাজ, ইউ আর এ ডিয়ার।'

একটু সরে এসে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে, একটা সোফায় এলায়িতা সুশী ডান হাতের মণিবন্ধটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। উজ্জল নিয়ন আলোয় হাতের হীরের কঙ্কণটা থেকে থেকে ঝলমল করে উঠছে। চোখ-ধাঁধানো নীল, সাদা, সোনালী বর্ণচ্ছটা দ্রুত রঙ পাল্টাচ্ছে একটা থেকে অন্যটায়।

সুশীর সামনে একখানা আর্ম-চেয়ারে বসে কালকের সেই স্যুট-পরা মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি।

'হাউ মাচ?' সুশী জিজ্ঞাসা করে।

বাজাজ সাহেব একটু হেসে জবাব দেন, 'হোয়াই ডু ইউ ওয়ারী ফর দি প্রাইস,...ইউ লাইক দ্য ট্রিঙ্কেট, দ্যাট্‌স্ অল।

সুশী বলে, 'স্টিল আই মাস্ট নো হাউ মাচ ডাজ ইট ওয়ার্থ।'

'নট মাচ, নিয়ার এ্যাবাউট টুয়েলভ্‌ থাউজেণ্ড।'

'ও দিস ইজ শিয়ার এক্স-এক্সট্রাভ্যাগান্স!...এতগুলো টাকা মিছেমিছি খরচা নাই বা করতেন।'

'মিছেমিছি!...আ, হোয়াট ডু ইউ সে মিস্ মিটার! আপনার মুখের এই হাসির ঝিলিক...এরই দাম লাখ টাকা! আর তা ছাড়া কোথায় রাখবো টাকা বলুন তো? ব্যাঙ্কে রাখলে মোটা ইনকাম ট্যাক্স কেটে নেবে। ঘরের সেফ লুকিয়ে আর কত মজুত করা যায়। চোর, ডাকাত, আগুনের ভয়ও তো আছে।'

পাঁচ

দীপঙ্করের উপস্থিতি বাজাজই প্রথম লক্ষ্য করলেন, 'ওয়েল সামবডি ইজ লয়টারিং ইন দ্য ড্রইং রুম।'

'কে, দীপু?'

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে দীপঙ্কর।

'দেখেছ কি সুন্দর ব্রেসলেটটা।' সুশী ওর হাতখানা বাড়িয়ে দেয় ওর দিকে। 'লুক! ইজ নট ইট ম্যাগ-ম্যাগনিফিসেণ্ট?'

ঈর্ষায় ও ঘৃণায় দীপঙ্করের মনটা বিষিয়ে ওঠে। একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বলে, 'খাসা!'

সুশীর দিকে চেয়ে দেখে দীপু। বাস্তবিক অপরূপ লাগছে ওকে!
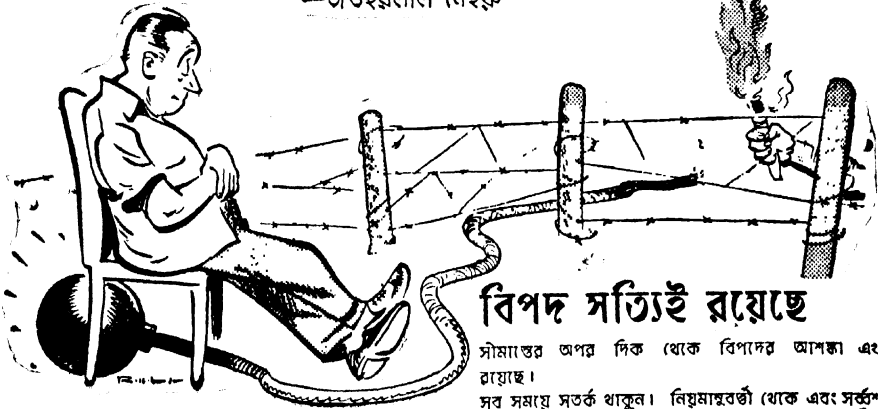
পরিপুষ্ট দেহখানি সূক্ষ্ম পশমের আঁটা জামার নীচে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ। গায়ের দামী র‍্যাপখানির বেশির ভাগই মাটিতে লুটোচ্ছে। চোখ দু'টো ঢুলু ঢুলু—স্বপ্নাতুর। একটা কোমল অলস ভঙ্গিতে সোনার অঙ্গ এলিয়ে দিয়েছে সোফায়। হাতলের ওপর রাখা একটা চাঁপা রঙের ভেলভেটের কুশানের ওপর মাথাটা ন্যস্ত। লাল টুকটুকে মুখখানা ঘিরে সোনালী চুলের উচ্ছলতা—যেন সোনালী ঢেউ-এ ভাসছে একটা প্রস্ফুটিত রক্তকমল, মনে হয় ও যেন কোন কল্পলোকের মায়াবিনী—কামনার সাথে বিস্ময়ও জাগিয়ে তোলে মনে।

'তোমার চকোলেটগুলো সত্যিই সুন্দর ছিল। সব শেষ করে ফেলেছি, আমি আর ট্রুল যেন'—সুশী বাঁ হাতে ধরা লম্বা হোল্ডারে আঁটা ঈজিপ্‌সিয়ান সিগারেট মুখে তুলে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'সবাই কত দামী দামী উপহার দিল, কিন্তু কি আশ্চর্য চকোলেটের কথাটা কেউ ভাবে নি। থ্যাঙ্কস্‌ ফর ইওর ডেলিশাস চকোলেটস্‌।'

দীপু ভাবে ও শুধু চকোলেট পেয়েই খুশি, কাস্কেটটা কি ভাল করে দেখেও নি? কই একবারও ত' তার উল্লেখ করল না।

বাজাজ দীপঙ্করের দিকে একটা ঈর্ষাতুর দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বললেন, 'নাউ ইউ হ্যাভ ইওর ওল্ড প্যাল মিস মিটার টু টক অ্যাবাউট ওল্ড টাইমস। আই থিঙ্ক আই শুড্‌ বেটার টেক মাই লীভ।'

'ও নো, নো···মিস্টার বাজাজ!—ইউ মাস্ট স্টে এ্যাণ্ড হ্যাভ ইওর ডিনার হেয়ার। হোটেলে খবর দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে আপনার জন্যে।···দীপু ত' ঘরের লোক।···ইউ ডোণ্ট টেক ইট এ্যামিস্‌, দীপু। আই অ্যাম্‌ ফ্রাইটফুলী সরি···ফিলিং রাদার সিক। মাথাটা ঘুরছে। মেহরা কণ্টিনেণ্ট থেকে কি নতুন মদ আমদানী করেছে। তার পাল্লায় পড়ে ক্যামেলের সঙ্গে হাঙ্গেরিয়ান টোকাই আর খানিক জিন মেশান পাঞ্চ দুপুরের দিকে একটু বেশি মাত্রায় খেয়ে ফেলেছি।··· ক্যারাউজড এ বিট টু মাচ···ইট ওয়াজ এ হেভি পাঞ্চ।'

সুশী কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ সিগারেট টেনে চলে।

ওয়েল দীপ, মাই গুড ওল্ড বয়! কিছু মনে কোরো না। ও ঘরে টেবিলে খাবার আছে, নিয়ে খাও। ইলেকট্রিক কেটলও আছে একটু কফি বানিয়ে নাও নিজে। ইচ্ছে করলে চাও তৈরি করতে পার। সবই মজুত আছে শেলফে—চা, চিনি, কণ্ডেনশড মিল্ক। মেডটার বোনের অসুখ, তাকে দেখবার জন্য গোটা বিকেলটা ছুটি নিয়েছে, আটটায় ফিরবে।···ডোণ্ট মাইণ্ড প্লিজ।'

দীপঙ্করের মুহূর্তের জন্যেও ওখানে থাকবার ইচ্ছে ছিল না, তবু কি ভেবে সে পাশের ঘরে গেল। একটা টেবিলের উপর কিছু কেক, পেস্ট্রি, ডালমুট, বিস্কুট রয়েছে, প্লেটে পড়ে দু' চারখানা কাটলেটও রয়েছে।···হঠাৎ পাশের শেলফে নজর পড়তে দেখে তার সেই কাস্কেটটা, ডালা খোলাই পড়ে আছে। তার মধ্যে সিল্কের ফিতেটা গোল করে জড়ানো (ঝিটাই বোধ হয় জড়িয়ে রেখেছে ওটা নেবে বলে)।

থমকে দাঁড়ায় দীপঙ্কর।

আস্তে তুলে নেয় কৌটোটা। আলোয়ানের নীচে বগলদাবা করে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

'আচ্ছা আসি তা'হলে সুশী—গুডনাইট। গুডনাইট মিঃ বাজাজ।

রাস্তায় নেমে হন হন করে এগিয়ে চলে দীপু বড় রাস্তার দিকে। কোনও একটা দোকান থেকে এক্ষুণি ফোন করতে হবে শীলাকে যে ও আসছে তার জন্মদিনের নিমন্ত্রণে যোগ দিতে।···মোটে সাতটা দশ, ট্যাক্সি নিলে সাড়ে সাতটার আগেই গিয়ে পৌঁছে যাবে পিসিদের ওখানে।

নেহরুর মহাপ্রয়াণে

চামেলীবালা মিত্র

অভ্রভেদী গিরিচূড়া হোল আজি চূর্ণ
রত্নের ভাণ্ডার আজি হোল চিরশূন্য
ভারত জননী হোল 'জহরৎ' হারা
গগনে নিভিল বুঝি চির শুকতারা
ভারতের শ্রেষ্ঠরত্ন কোথা গেলে চলি
কোটি কোটি সন্তানের হৃৎপিণ্ড দলি
স্নেহের 'নন্দিনী' তব লুণ্ঠিতা ধরায়
আদরিণী 'ইন্দু' বলি কে ডাকিবে হায়
প্রাণের দৌহিত্র দুই সঞ্জয় রাজীব
বেদনায় মুহ্যমান নির্বাক স্তম্ভিত
কোথা চলি গেলে চির ভারত 'সম্রাট'
শূন্য তব সিংহাসন শূন্য রাজ্যপাট
কারে দিয়ে গেলে ভার কে হবে সারথি?

গন্ধরাজ

শ্রীমতী মায়া ঘোষ

তোমার দেওয়া গন্ধরাজের ঝাড়ে
(শুকনো) তবু দিনে দিনে প্রেমের সুবাস বাড়ে
অনেক দিনের অনেক কথা
গাঁথা এদের সাথে
মনে তোমার পড়বে কি আর
পাও যদি গো হাতে
তোমার পথে অভিসারের
রাতের রাণী আমি
জানতে তুমি মনে মনে
এরা তাই হয়েছে দামী
এরা আমার জীবন-সাথী
চিরদিনের তরে
দেখবে এদের শুকনো ধূলি
মোর চিতাভস্মের 'পরে—

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বাবিংশ-স্তবক

রাস-বিলাস

১। এরপরে অনেক মধুরাত্রি এসেছে এ তিন ভুবনে। সে সব রাত্রে রাধারমণ-বিলাস যে এত মোহন ও এত আমোদ-মেদুর হতে পারে তা কল্পনাতেও আনতে পারেন নি দিব্যলোকের রমণীরা। সে বিলাসগুলি যেন আরাধনারও অতীত,...এত মধুর, এত দুর্লভ, এত রসদ। তাদেরি মধ্যে একটি রজনীর বিলাসের ইতিহাস বিশেষভাবে বর্ণনার যোগ্য। রসের বাসনায় হৃদয় যাঁদের ভরপুর, তাঁদের সেটি জ্ঞানের ধন।

এই দোলোৎসব-লীলাশ্রেণী, বিপুল আনন্দের শালীনতায় সম্পাদন করেছিলেন লীলাকিশোর শ্রীভগবান...তাঁর লাবণ্যময়ী মহাভাবময়ীদের সাহচর্যে।

শ্রীবৃন্দাবনে এমন একটি বনস্থলী ছিল যেখানে সমারোহে উৎসব হত ঝুলনের, হিন্দোলায় দোলনের। বনস্থলীর প্রান্তে প্রান্তে কল্পদ্রুমের এত ছিল শ্রেণী-সুন্দর অবস্থান, যে দেখলেই মনে হত কেউ যেন সেগুলিকে সাজিয়ে-গুজিয়ে পুঁতে রেখে গেছে। সরল দীর্ঘ হৃষ্টপুষ্ট...আকাশের দিকে উঠে গেছে গুঁড়িগুলি। গাছের শাখার ডগায় ডগায় দেখবার মত সে এক বাহুবন্ধনের রেখাচিত্র। চলেছে, একের পর এক গাছ, আর মাঝখান দিয়ে চলেছে শূন্যাবকাশ।

বিরাট পান্নার প্রাচীরের মত কল্পদ্রুমগুলির মাঝখানে,...আহা, গাছে গাছে ঝুলছে মুক্তার লহর, দুলছে চামর, কাঁপছে চীনাংশুকের পতাকা, ডালে ডালে ফুটছে রতন-ফুল, ফলছে রতন-ফল, ডাকছে মণিবিহঙ্গ,...বনস্থলী আলোকিত করে বিরাজ করছিল একটি চতুষ্কোণ প্রান্তে কাঞ্চনী বেদী।

বেদীর চার কোণে হরিচন্দনের চারটি গাছ। অদ্ভুত সুন্দর। চারদিক থেকে তারা তাদের শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে বেদীর উপর এমনভাবে গড়ে তুলেছিল একটি তুঙ্গ মণিমণ্ডপ, যে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল মণ্ডপের চতুর্দ্বার চতুঃস্তম্ভ। শিখরের চতুশ্ছদিটিও যেন হীরা-পান্নায় সচকিত।

সেইখানে হরিচন্দনের শাখাগ্র থেকে অনতিস্থূল স্বর্ণরজ্জু দিয়ে বাঁধা, ঝুলছিল এবং জয়দোলন-ছন্দে ধীরে ধীরে দুলছিল শ্রীহরির...প্রেঙ্খোল-খট্টা। খট্টাটিরও এমনি সংস্থান যে, উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম যেদিকেই বসুন না কেন অঙ্গনে, দিগঙ্গনাদের বলতেই হবে,—

'ঐ তো, আমার দিকেই তো মুখ করে দুলছে।'

২। রাধাকুঞ্জের এই দোলমণ্ডপের চতুষ্প্রান্ত থেকে চতুর্দিকে যে ছড়িয়ে পড়েছিল উৎসব-মূর্তি দেবতরুর অগণিত বীথি, সেগুলি কিন্তু বিভক্ত ছিল সৌন্দর্যচতুর এককেটি চতুরস্রে। চতুরস্রের প্রত্যেকটিই যেন আবার পাখি-ডাকা আনন্দের ও শ্যামলতার স্বপ্ন। তাদের প্রত্যেক দু'টির মাঝখানে একটি একটি করে দোলস্থলী। প্রত্যেকটিতেই বেদী। বেদীমধ্যা যূথেশ্বরীদের জন্যেই যেন সৃষ্টি।

এই দোলস্থলীতে, দু'টি-দু'টি করে দেবতরুর স্কন্ধ থেকে ঝুলছিল,...সমান রেখায়...উঁচু নয় নীচু নয়...সোনার শিকল দিয়ে দৃঢ় করে বাঁধা, চার চার সারি দোলনা।

৩। মধ্য-মণ্ডপটির চতুর্দিকে চিন্তামণি-রুচি-রুচির চতুশ্চত্বরের কল্পনা। সমান তাঁদের পরিসর। সেখানে খেলে বেড়াচ্ছিল যৌবন-মদমত্ত অনিন্দ্যসুন্দর স্মর-হরিণ...পালে পালে। প্রত্যেকটি চত্বরের মাথায় সোনার জাল। বড় বড় গাছের চূড়া থেকে এত উঁচুতে টান্‌টান্ করে সেগুলি বাঁধা যে ঊর্ধ্বলোচনে দেখতে হয় তার সৌন্দর্য।

আর গাছগুলিও কি সুন্দর! চোখ ঠিক্‌রে যায় তাদের প্রবাল রঙের পাতার আগুনে। চাঁদনী রাতে পাতার ফাঁক দিয়ে দিয়ে যখন ছিটছিট জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে সেই চত্বরগুলিতে, তখন এক ভারি রগড়ের ব্যাপার ঘটে যায় সেখানে;...আলো-আঁধারিতে তিল-তণ্ডুল ছিটিয়ে রয়েছে ভেবে ভুল করে ছুটে আসে হরিণবধূরা, আর ঠক্ ঠক্ ঠোক্কর লেগে যায় মুখে-মুখে। হুবহু এত একরকমের দেখতে এই চত্বরগুলি যে দিক্‌ভেদজ্ঞান না থাকলে চিনতে কষ্ট হত দেবতাদেরও।—বনদেবীরাই এখানে বিরচন করে গিয়েছিলেন মুক্তার জাল দিয়ে গাঁথা চারটি অপূর্ব বিতান। ঝুলন উৎসবের শোভাবর্ধনের উদ্দেশ্যেই, তাঁরা যেন খুব তাড়াতাড়ি এসে রচনা করে ফেলেছিলেন এগুলিকে।

বিতানগুলি এত সুন্দর যে অলঙ্কারশাস্ত্রও মুখর হয়ে উঠতে চাইছেন তাদের প্রশংসায়।

এগুলি তো বিতান নয়, এরা যেন বৃন্দাবনভূমির দিগঙ্গনাদের মুক্তাময়ী বিশ্লথ কঞ্চুলিকা,...প্রণামে নত হয়ে অকম্পিত হস্তে যাঁদের ধরে রয়েছেন পবনদেব। অথবা এরা যেন দূর-আকাশের গুচ্ছ গুচ্ছ নক্ষত্রের নীড়...আনন্দে পৌর্বাপর্য ভুলে স্বস্থান পরিত্যাগ করে, চরণবন্দনার আগ্রহে দুলতে দুলতে নেমে এসেছে ধরণীতে।

৪। এই বিতানগুলি থেকে মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যখন দোল খেতে থাকে খণ্ড খণ্ড চীনাংশুক, তখন মনে হয় বৃন্দাবনভূমির রেণু-লেহনের লালসায় বুঝি চপল হয়ে উঠেছে আকাশলক্ষ্মীদের রসজ্ঞ জিহ্বা। মন্দ-সপন্দী পবনে তখন ধীরে ধীরে দুলতে থাকে এগুলির দোলমঞ্চ, আর ঠুন্‌ঠুন করে বাজতে থাকে মুক্তা-মণির প্রলম্ব।

আর এর প্রান্তে প্রান্তে যখন দুলতে থাকে চামর, তখন কি বাহারটাই না খুলে যায় বিতানগুলির, তখন মনে হয় বনদেবীরাই বুঝি সশ্রদ্ধ সংস্কার করছেন এগুলির...জ্যোৎস্না-সায়রের উড়ন্ত হংসগুলিকে বসিয়ে, অথবা আকাশজন্মা শ্বেত শতদল দুলিয়ে, অথবা নানান ফুলের গাঁথা মালায় সাজিয়ে।

এই হেন দোলস্থলীটি সেদিন বিহ্বল হয়ে উঠেছিল সৌরভের আতিশয্যে। ভুর ভুর করে বাতাসে ভাসছিল অগুরুধূপের মধুসুরভি, দিগঙ্গনাদের লোমের মত সেই ধূম্রলেখায় উল্লাসে খেলে বেড়াচ্ছিল কর্পূরের ত্রসরেণু এবং ঝুম ঝুম করে চতুর্দিকে ঝরে পড়ছিল কল্পদ্রুমের বিন্দু বিন্দু মকরন্দ।

আকাশ ছেয়ে অসংখ্য বিমানে সেখানে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিলেন •••বিচিত্র বাদিত্রাদি সঙ্গে নিয়ে•••সিদ্ধেরা, বিদ্যাধরেরা, চারণেরা, কিন্নরেরা, দেবীরা এমন কি দেবেরাও। আগে থাকতেই তাঁরা এসে গিয়েছিলেন। উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না যদি উপস্থিত হওয়া যায় সময় হাতে রেখে।

৫। সারা বন থেকে বেরিয়ে এলেন বনদেবীরা। তাঁদের সকলেরি এক খেয়াল, নানা নেই। নানান রকমের অতি সৌখীন উৎসব সামগ্রী হাতে নিয়ে তাঁরা পৌঁছে গেলেন। আনন্দবিশাল তাঁদের হৃদয়। বৃন্দাদেবীর সঙ্গে কি তাঁদের সদ্ভাব, কি তাঁদের সহচরী ভাবের ঘটা! অমন দেবীটি কি আর বৃন্দাবনে হয়? হৃদয়ের অমন প্রশান্তি সত্যিই অতুলনীয়া। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা দোলামণি-তরুর মণ্ডপগুলি থেকে খুলে নিলেন বাছা বাছা ফুলের মালা এবং গড়তে বসে গেলেন ছোট্ট ছোট্ট জালিদার ফুলের গয়না। কি সুন্দর গয়না, কল্পনাও সয় না।

৬। এবার চতুর্দিক থেকে উড়তে উড়তে এল পাখি। ঝাঁকের পর ঝাঁক। দোসস্থলীর গাছে গাছে, ডালে ডালে, এমন কি পাতায় পাতায় সভা জমকিয়ে তারা বসে পড়ল। তাদের দেখেও আনন্দ। পাখিদের লক্ষ-হৃদয় তখন দোল খাচ্ছে আনন্দে। কৃষ্ণ দুলবেন, কৃষ্ণকে দেখব, এ নবীন আমোদের কি তুলনা হয়। আনন্দে তারা ডাক ভুলে গেল, গুণতে বসে গেল কৃষ্ণগুণ।

৭। নয়নে পরম কৌতুক, হৃদয়ে পরম সুখ•••

এ বন থেকে ও-বন থেকে টুকটুক্ করে বেরিয়ে এল হরিণেরা। লতায়-ছাওয়া প্রত্যেকটি কুঞ্জের শ্যামল অঙ্গনে অঙ্গনে তারা ছবিটির মত স্থির হয়ে বসে পড়ল।

তারপরে অকস্মাৎ•••বেণুর কলধ্বনিতে আকৃষ্টা হয়ে নয়, ঘরের কাজ ফেলে চলে আসাও নয়, গুরুজনদের নিষেধ লঙ্ঘন করে পলায়নও নয়,•••না জানি কোথা থেকে কেমন করে সেখানে এসে সম্মিলিতা হলেন ব্রজের যত মৃগনয়না সুন্দরীর দল। লীলারহস্যের এই চিন্তামণিগুলি কি তবে বেরিয়ে এলেন দিগবধূদের বুক চিরে? না শ্রীমুখ ভেদ করে কল্পতরুদের? কে জানে।

তাঁদের প্রত্যেকের শ্রোণিদেশের উপর দিয়ে অর্ধেক জানু ঘিরে কুঙ্কুম-রঙিন মৃদু-ঘন চণ্ডাতকের শোভা। তার উপরে বাহার দিয়ে কাঁপছিল বাতাসের মত ফুরফুরে আগুল্‌ফ-লম্বিত সূক্ষ্ম চীনাংশুক। স্তনের উপর কঞ্চুলিকা ভ্রমরছন্দে বাঁধা। নীবিবন্ধে কল্পনা কাবীর। সকলেরই সমান সাজ, সমান শ্রী।

তাঁদের মধ্যে কয়েকটি এলেন•••ফুলের ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে। মেখলার মালায় ফুলের শর, হাতে আবীরের গুলাল। শ্রীমদনের বীরবেশ পরে তাঁরা যেন রণরঙ্গে মাততে এলেন দোলমঞ্চে কৌতুকের।

আর কয়েকটি সুন্দরী অঞ্চলে কুঙ্কুম বেঁধে এবং কোমরের নীচে সোনার থলায় সেটিকে জড়াতে জড়াতে লীলাভরে বঙ্কিম হয়ে এসে দাঁড়ালেন; যেন তাঁরা এতদিনকার জমানো রতিপাণ্ডিত্যের বিত্তাধনটিকে কাপড়ের গিরোয় বেঁধে, কিনতে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণের মাণিকখানি হৃদয়ের।

আর একদল এলেন, মহামণিময় ছোট্ট ছোট্ট থালা হাতে নিয়ে। বাষ্প লেগে পাছে নষ্ট হয়ে যায় এই ভয়ে লাক্ষার কৌটায় ভরে তাঁরা থালায় বসিয়ে নিয়ে এলেন•••মহাসুরভি অগুরুর সিক্তসার, কস্তুরীপঙ্ক, কর্পূররেণু আর চন্দনচূর্ণ।

আর একদল এলেন, বিভিন্ন গড়নের অতুলনীয় কারুকার্য করা জলযন্ত্র বহন করে। সব ক'টিই সোনার। কোনোটির ভিতর কুঙ্কুমবারি, কোনটিতে চন্দনজল, কোনোটিতে কস্তুরীগোলা জল, কোনোটিতে পাতলা রস পুষ্পের। সোৎসাহে সুন্দরীরা যেভাবে এলেন, তাতে মনে হল, অস্ত্রধারিণী একদল ওজঃশ্রী বুঝি মন্মথযুদ্ধে নামলেন।

৮। অতনু-সেনার সম্পূর্ণ সৌভাগ্য হরণ করে স্ত্রীরত্নেরা চতুরঙ্গনে প্রবেশ করতেই এক লহমায় যেন তাঁরা অভিভূত হয়ে গেলেন অন্তকার এই মহোৎসব-রসের মাদকতায়। আরম্ভ হয়ে গেল ঝুলন। কি খেলা— সে কি খেলা। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। আমি আগে সই, আমি আগে। কোথায় ভেসে গেল পৌর্বাপর্যজ্ঞান। কলকণ্ঠের সে কি পরিহাস-শিথিল মত্ত কলরব! যথা,—

'আয় তো দেখি।
এই তো এসেছি।
দেখবে তবে?
দেখাও দিকি।
ঐ যা, খুলে গেল•••
ওমা এই নাও, পরে ফেল
চড়ো চড়ো মারো মারো।
রঙে রঙে রাঙাও আরো।'•••ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীরাধিকার কাঁধের উপর বাম বাহুর আদরখানি রেখে, বামকরে বাঁশরী, দক্ষিণ মণিবন্ধে কঙ্কণ বাজছে কিনি-কিনি-কিনি, লীলাকমল দোলাতে দোলাতে, মণিতরু-মণ্ডপে প্রবেশ করলেন শ্রীকৃষ্ণ।

শোণ-কুসুম-বর্ণের অন্তর্বাস;
কিরীটতটে বর্হি-বর্হের গুম্ফন;
বিলোল কর্ণোৎপলে উড়ন্ত ভ্রমরের মধুগুঞ্জন;
মকর-কুণ্ডলধারী প্রবেশ করলেন মণ্ডপে।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কঞ্চুকের চিক্কণ পেলবতায় চুম্বিত তাঁর অঙ্গ।
কেয়ূর-কঙ্কণের মণীন্দ্রে মণীন্দ্রে নব্যচারুতার বিচ্ছুরণ।
কণ্ঠের উপকণ্ঠে কৌস্তুভমণির কিরণনৃত্য;
মদনমোহন প্রবেশ করলেন দোলমণ্ডপে।
কত বিলাস তাঁর নূপুর-রণিত চরণে।

লাস্যছন্দে ললিতাদেবীও তাঁর ওষ্ঠাধরে তুলে ধরলেন তাম্বুল, আর যিনি মদমত্তকরী-মূর্তি তিনি চলতে চলতেই গ্রহণ করলেন সেই তাম্বুল। মণিময় মুক্তামাল্যের মত টলটলে হয়ে উঠল শ্রীঅঙ্গের আভা। আর সে আভার রসিকতায়, দূরে হঠাৎ যেন সরে গেল বিদ্রোহিণী অম্বররমণীদের মণীন্দ্র-বীথি;•••শ্রীভগবান প্রবেশ করলেন দোলমণ্ডপে।

জয় জয় জয় জয়ধ্বনি তুলে গান গেয়ে উঠল মণিবিহঙ্গেরা। মুকুলের রোমাঞ্চ ফুটিয়ে অন্তর্হর্ষের অভিনয় করে বসল দ্রুমসমাজ। ফুলের মধু ঝরিয়ে লতিকারা বর্ষামঙ্গল দেখাল আনন্দাশ্রুর। আর যেই শ্রীরাধাকে সঙ্গে নিয়ে দোলমঞ্চে আরোহণ করতে গেলেন শ্রীহরি,

অমনি দ্রুমমণ্ডপের শিখরে শিখরে কোথায় যেন বসেছিল ময়ূরেরা, অপূর্ব এক প্রেমের উন্মাদনায় উতলা হয়েই যেন নেচে উঠল তারা। তারা যেন চোখের সামনে আবির্ভবন দেখতে পেয়েছে স-তড়িৎ এক স্নিগ্ধ নীলমেঘের। কে—ও কে—ও···কেকাধ্বনি তুলে তারা যেন আকাশে বাতাসে প্রশ্ন ছড়িয়ে দিল—'ওগো তোমরা কে'।

৯। নভোমণ্ডলের চারণ-কিম্পুরুষ-পুরুষ-রমণীর দল ললিতপদ-সঞ্চারে আনন্দে দু'হাত ভরে ছুড়তে লাগলেন নক্ষত্রের মত ঝলমলে নন্দনকাননের ভ্রমর-বসা ফুল। সিদ্ধবধূদের সুকোমল হাতগুলি লজ্জার অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে মর্দন, পেষণ ও চূর্ণনের নৈপুণ্য দেখিয়ে, বাজাতে লেগে গেল মর্দল পনব ও বর-লম্পট পটহাদি বাদিত্র। মন্দাকিনীর তরঙ্গভঙ্গের মত একটি কম্পিতসৌন্দর্য বিস্তার করে অমরবধূদের হাতে হাতে দুলতে লাগল দিব্যচামরের অজস্রতা। আর উর্বশীবশীভূতা অপ্সরাদের তখন কি ভিড় কি ভিড় সারা গগনে।

নতনয়নে তাঁরা দেখতে পেলেন···দোল-পর্যঙ্কিকা। তার উপর পাতা রয়েছে জ্যোৎস্নার ফেনার মত শুভ্র একখানি আস্তরণ। কী শুভ্র! রূপগ্রাহীনয়নে যেমন নবীনেরও মহিমা পবিত্র হয়ে ওঠে, তেমনি পবিত্রসুন্দর হয়ে উঠল সেই পর্যঙ্কিকা তাঁদের নয়নে। ময়ূরকলাপের কারুকাজ-করা দোলনা। এত সুন্দর কাজ যে, সৌন্দর্যের উপরেও যেন রেখে গেছে তার শিল্পচিহ্ন।

গভীর উল্লাসে যেই দোলনায় সমারোহণ করতে এগিয়ে গেলেন ব্রজতিলকনন্দন, অমনি বনদেবীদের কণ্ঠে সমস্বরে জেগে উঠল মধুর মঙ্গলগান। তাঁরাও এগিয়ে এলেন এবং মহামণিময় মঙ্গলদীপের তাপ দিয়ে আরতি করলেন কৃষ্ণের।

শ্রীরাধিকার সঙ্গে এবার রসিকশেখর মুকুন্দও অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন অদ্ভুত দোলাশিল্প। তারপরে সকৌতুকে উঠে বসলেন মণীন্দ্রদোলন উৎসব-প্রেঙ্খোলিকায়। বামে বসলেন শ্রীরাধা··· মুকুটমণি যিনি ব্রজধাম-সুলোচনাদের। শ্রীহরির হাতখানিকে লীলাভরে ধরে রইল রাধার হাত···অনুভব করতে লাগল রহস্য-রোমাঞ্চের মহোৎসব।

চতুর্দিকে ছড়িয়ে বসলেন সহচরী-সমাজ।

১০। এমন সময় একটি সহচরী চক্ষুখানদের অতিবৃদ্ধির মত যিনি সত্যই অপরূপ সুন্দরী, তিনি ঠেলা দিয়ে দুলিয়ে দিলেন শ্রীভগবানের সেই অনিন্দ্যসুন্দর দোলোৎসব-প্রেঙ্খোলিকা। দিতেই, দোলনা থেকে এমন রূঢ়-তারল্যে ছুটে বেরিয়ে এল এক লাবণ্যামৃত-স্রোতস্বিনী, যে তার মাধুর্যতরঙ্গে ধুলোর মত কোথায় যেন ধুয়ে ভেসে গেল সকলের ধৈর্য-মর্যাদা। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখেই, দীপ্ত উৎকণ্ঠায় প্রায়-কণ্ঠাগত প্রাণ, সুরলোকের দেব-দেবীরা বাধ্য হলেন পুষ্পকরথ ফেলে রেখে নভোমণ্ডলের এমন সব প্রদেশে আশ্রয় নিতে, যেখান থেকে শ্রদ্ধায় এবং নির্ঝঞ্ঝাটে তাঁরা তৃপ্ত করতে পারবেন তাঁদের দর্শন-বাসনা।

১১। 'কি মহামাধুরী আজি ঝুলনে'···তান-লয়ে এই মঙ্গলগানের স্বরপরিমল দিকে দিকে বিকিরণ করতে করতে, উল্লাসে অধীর হয়েই যেন যূথ-প্রধানারা মূর্চ্ছা যেতে লাগলেন আনন্দে। কুঙ্কুমগুলাল কোমরে বেঁধে এবার তাঁরা অধিকার করে বসলেন নিজের নিজের দোলনা।

মুরারির পুরোভাগে বসলেন চন্দ্রাবলী প্রভৃতি; পরিজনদের নিয়ে দক্ষিণে বসলেন ভদ্রাদি; নিজগণ নিয়ে বামে বসলেন শ্যামাদি; এবং স-সহচরী পশ্চাতে বসলেন ধন্যাদি।

১২। 'দে দোল দোল,'···দোল খেলবার প্রবল প্রত্যাশায়, যে যার দোলনায় চরচর করে উঠে পড়লেন আভীরকন্যারা। কৃষ্ণের দোলনার সমান সমান তাঁদেরও দোলনাগুলি উঁচু। অত কাণ্ড অত আনন্দ অত আলো,···সে যেন এক অদ্ভুত রসের বিদ্যুৎ খেলতে লাগল সর্বত্র।

১৩। রসের সভায় সকলেই আজ গরবিনী। সবক'টি আঙিনাই উথলে উঠল ঝুলনগানে। চতুর্দিকেই যেন বীণ বাজাতে লাগল মূর্তিমতী কনকলতার বন। কানে যেন হর্ষের শ্রাবণ-বর্ষণ করতে লাগল সেই ঝঙ্কারের সীমাহীন মরতা! ডুব দেওয়াও কঠিন এই আমোদের সায়রে।

একহাতে দোলনার স্বর্ণদাম, দুলতে লাগলেন তাঁরা। লীলায়িত লাবণ্য ছড়িয়ে, ভ্রূভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে, দোল দোল দোলাতে লাগলেন নিজেদের তনুলতিকা। তারপরে অন্য হাত দিয়ে অঞ্চলের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে ছুড়তে লাগলেন···আবীর··মুঠো মুঠো আবীর। আনন্দের সহস্র ভাষায় অযুত ঝঙ্কার তুলল ব্রজবধূদের হাজার হাজার মণিবলয়।

আবীরের রাঙা ধুলোয় লাল হয়ে গেল আকাশ। বায়ুস্রোতে ভাসতে লাগল ধূলি; জবাফুলের সৌন্দর্য-চোর ঐ আবীর। অন্ধকার হয়ে গেল ব্যোম। দৃষ্টিরোধ করে বিহ্বল করে তুলল দিব্যলোকের অধিবাসীদের। ব্যস্ত হয়ে তাঁরা মুহুর্মুহুঃ বর্ষণ করতে লাগলেন ফুল। ফুলের মধুতে ধীরে ধীরে শান্ত হতে লাগল কেলিধূলির উচ্ছ্বাস।

দোলস্থলীর সীমানায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বৃন্দাদি বনদেবীরা, জয় দিয়ে দিয়ে তাঁরা দোল দোল ফুলদোল দোলাতে লাগলেন রাধাকৃষ্ণের দোলনা। লীলালোল রাধাকৃষ্ণও ছুড়তে লাগলেন ফাগুয়া। আবার মরি মরি, যুবতীদেরও হাত থেকে তাঁরা উল্টে খেতে লাগলেন ফাগুয়ার মার।

চতুর্দিকে দোল, দোল দোল দুলতে লাগলেন প্রেয়সীরা। তাঁদের একমাত্র বাসনা···হারিয়ে দিতেই হবে প্রিয়তমকে। বাতাস চিরে ছুটতে লাগল ফাগুয়াগুলাল। যন্ত্রের মুখ থেকে ফট্‌ফট্ করে বেরোতে লাগল গালার কৌটোয় ভরা চন্দনাদির পঙ্ক। সব যেন কামদেবের গুলিকা।

দোল দোল দোল!

১৪। রাধাকৃষ্ণের দোলনাটির চতুর্দিকে বিরাজ করছিলেন যে সব কলাবতীরা, এবার তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধে গেল চতুর্দিকস্থলের দোলনা-বিলাসিনীদের। দূরের বিলাসিনীরাও অতি চতুর। সন্ সন্ করে ছুটে আসতে লাগল তাঁদের কস্তুরী আর চন্দনের গন্ধগুলাল। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কুবলয়-লোচনাদের দল মার খেতে খেতে হাতে ধরে ফেলতে লাগলেন গুলাল। সেগুলিকে আবার টিপ করে করে ছুড়ে মারতে লাগলেন তাঁদের দিকে উল্টিয়ে।

১৫। এত ছোড়াছুড়ির ধুম, কিন্তু আশ্চর্য, একটি গুলালও এসে লাগল না যুগল রঙ্গেশের অঙ্গে। শত চেষ্টাতেও লাগল না। রোখ চেপে গেল সুন্দরীদের। তাঁদের মধ্যে তিন-চারজনের নিসপিস করতে

লাগল হাত। 'আমি আগে, আমি আগে'—বলতে বলতে তাঁরা প্রত্যেকেই উপর্যুপরি ছুঁড়তে লাগলেন গন্ধগুলাল···চার চারটে করে একসঙ্গে।

বিপুলবেগে সর্বদিক থেকে ছুটে আসতে লাগল লাক্ষার নরম নরম কৌটোয়ভরা গন্ধগুলাল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেগুলি মাটিতে পড়ে গিয়ে ভেঙে যেতে লাগল দ্বিখণ্ডিত হয়ে। আর ডিম ফেটে বেরিয়ে আসা পাখির বাচ্চার মত চৌদিকে গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়াতে লাগল অগুরুর গোলা, কস্তুরীর গোলা, চন্দনের গোলা আর আবীরগুলাল।

কতকগুলো গোলা আবার, সত্যিই, নিকটেই এসে ফেটে পড়ল ব্রজরাজনন্দনের। ভুরু তুলে শিউরে উঠে সেগুলোকে সামলালেন··· পাশেই যাঁরা ছিলেন, সেই সুন্দরীর দল। দু-একটা যদিই বা ছুটে লাগব-লাগব হল জলদ-শ্যামলের শ্রীঅঙ্গে, রাধা সামলে নিলেন সেগুলিকে···পদ্ম চোখে হাসি হেনে। ঘামে সিক্ত হয়ে গেল তাঁর অঞ্জলি।

১৬। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব স্বতন্ত্র হরিণনয়নাদের লোচনে লোচনে যে আহ্লাদ খেলে বেড়ায়,···যেটি নেচে ওঠে চপল নয়নের দোলনে,···যেটি তারা কাটে দু'নয়নের অভিমানে,···যা চকোরীর রূপ নেয় অনুকম্পা-ভিক্ষার অতি রসিকতায়,···যা ফুলের কুঁড়ির মত ফুটে ওঠে লজ্জায়, শ্রীকৃষ্ণ কেবল সেই আহ্লাদটিকেই ফুটিয়ে তোলা একমাত্র মাদন-ব্রত বলে জানতেন ভালবাসার। অন্যথায় অলস হয়ে রইত তাঁর ধীর লালিত্য।

তাই তিনি চতুর্দিকে ঘোরাতে লাগলেন তাঁর বিলাস চতুর মত্তনয়ন। দেখলেন, চতুরঙ্গনের সমস্ত লোচনের আহ্লাদ তাঁর পানেই চেয়ে আছে। তখনি তাঁর ইচ্ছে হল···মুখ্য পক্ষটিকে বেছে নিতে। কিন্তু কোন পক্ষটি মুখ্য?

তিনি দক্ষিণ দিকে চাইলেন। দেখলেন,···দক্ষিণীরা কেলিকলায় অসামান্যা। কী অসম্ভবই না তাঁরা দুলছেন! কী আবীরই না তাঁরা ছুঁড়ছেন! যেন ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছেন লালে লাল ধুলোমাখা হাতীগুলোকে, যেন উড়িয়ে দিচ্ছেন বিজয়-বৈজয়ন্তী বৈদগ্ধের।

উত্তর দিকে চাইলেন। দেখলেন, আহা উত্তর-বিলাসিনীরা, সত্যিই যেন তাঁরা বিলাসিনীর শ্রেণী,···কী প্রগল্‌ভ আনন্দেই না তাঁরা দুলছেন!

পশ্চিম দিকে এবার চাইলেন। দেখলেন, পশ্চিমাদের নীল-নয়নের নীলিমায় হার মেনে গেছে নীলপদ্মেরও নীলিমা। দোল দোল তাঁরাও দুলছেন। রসের বিলাসে টলটল করছে যৌবন।

আর পূর্বীয়ারা!···অপূর্ব তাঁদের দোলনা চালনার কৌশল। প্রচণ্ড আমোদের খেয়ায় যেন ভেসে চলেছেন এই বরবর্ণিনীদের দল।

দেখতে দেখতে, আর শ্রীরাধার সঙ্গে দুলতে দুলতে, করপদ্মের পদ্মরাগ-সুন্দর আবীরধূলি কখন যে তিনি ছুঁড়লেন জানি না, কিন্তু দোলস্থলীর সমস্ত আনন্দময়ীরাই হঠাৎ বুঝতে পারলেন, দেখতে পেলেন,···তাঁরা হেরে গেছেন! কি আশ্চর্য, মুরলীধর হাসছেন আর তাঁরাই রাঙা হয়ে গেছেন রঙে রঙে! হায় হায়···হেরে গেছেন।

১৭। আর রসের ও কৌতুকের বিক্রমের আবেশে, পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ দিক্‌চতুষ্টয় তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যেই যেন, সেই সেই দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুরলীধর দুলছেন! আশ্চর্য তাঁর দ্বিবিধ-ছন্দ দোলনের।

পূর্ব ও পশ্চিম···এই দু'টি দিকের সম্মুখীন হলেন যেই কৃষ্ণ, দোলনা অমনি চলতে লাগল সম্মুখ-ছন্দে। উত্তর ও দক্ষিণ···এই দু'টি দিকের সম্মুখীন হলেন যেই কৃষ্ণ, দোলনা অমনি চলতে লাগল পার্শ্বগ-ছন্দে। আর ঠিক সেই সময়ে মরি মরি, সম্মুখ ও পার্শ্বগ দোলনের কৌতুক-ছন্দে···দুলতে লাগল তাঁর শ্রীমৎ কুণ্ডল, গলার হার আর বনমালা। বলিহারি যাই এই অদ্ভুত অত্যদ্ভুত দোলোৎসবের।

১৮। ওরে হৃদয়, রসাম্বুধির এই নিত্যসিদ্ধ রহোবিলাস···তা তারা প্রকট হোক, আর অপ্রকটই হোক,···নিত্যবিকশিত হয়ে চলেছে পূর্ণপদ্মের মত, একের পর এক। এ খেলা শাশ্বতাঙ্কের।

কেউ হয় তো বলবেন,—'কৃষ্ণ-প্রভুর এই হেন প্রকট-অপ্রকট-নিত্য-লীলাস্পদী হবার শক্তি নেই।

শ্রুতিরূপা-মুনিরূপা ইত্যাদি নিত্যসিদ্ধাভেদে, কৃষ্ণপ্রেয়সী কমল-লোচনা ব্রজযুবতীদের অস্তিত্ব নেই।

লীলাময়ের লীলাস্থান বৃন্দারণ্যভূমির অপ্রকটতা···সমীচীন নয়।

সেখানে হয় না কেন শ্রীহরির নিত্যবিলাস?'

কিন্তু উত্তরে বলব,—'তাঁর সে শক্তি আছে। তাঁর প্রেয়সীরা আছেন। বৃন্দাবনের অপ্রকটতা সমীচীন নিত্যলীলা সেখানে হয়।

তা না হলে, যিনি এক তিনি কেমন করে নানা হন? ষোড়শ সহস্র স্ত্রীরত্নের পাণিগ্রহণের পর কেমন করেই বা তিনি পৌরজনদের সঙ্গে নিয়ে···যুগপৎ প্রবেশ করেন প্রত্যেক স্ত্রীরত্নের পৃথক পৃথক গৃহে এবং অব্যবহিত পরেই নিজের অবস্থানের মতই ব্যবস্থা করেন গুরুজনদের এমন কি সাধারণ মনুষ্যদেরও অবস্থান?

সর্বক্ষণ বৃন্দারণ্যেই যিনি ধেনু আর রাখালিয়া নিয়ে খেলায় মেতে থাকেন, তিনি কেমন করে মধুপুরী যান, নিত্যবিহার করেন প্রেয়সীদের সঙ্গে, বিরচন করেন তাঁদের বিরহ-ব্যাধি?

অতএব, যিনি অতর্ক্যৈশ্বর্য, যিনি পুরু-মহিমা, যিনি শ্রীভগবান, যিনি ব্রজেশ্বরীর নন্দন,···তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয় কোনো বিলাস।'

* * * *

কবি কর্ণপূর রচনা করেছেন এই চম্পূ। চৈতন্যকৃষ্ণের করুণায় উদিত হয়েছে তাঁর বাগ্‌বিভূতি।

চৈতন্যকৃষ্ণই একমাত্র যাঁর জীবনধন (শ্রীশিবানন্দ সেন) সেই হেন জনকের তিনি পুত্র। শ্রীনাথের চরণ-কমল স্মরণ করে শুদ্ধ হয়েছে তাঁর বুদ্ধি।

ইতি দোলোৎসবো নাম দ্বাবিংশঃ স্তবকঃ।

সমাপ্ত

মুখটা কালো হয়ে গেল, ঝুলে গেল। চোখ দু'টো তার ছলছল করে উঠলো। নস্তে তাড়াতাড়ি গোপলাকে বাঁচালে। ওর হাত ধরে দল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল: চলে আয় ইদিকে। শুনিস্ না ওর কথা। ফাজিল একটা।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। পন্টুর চালও বেড়েছে, নস্তের রাগও বেড়েছে, আর গোপলার বুদ্ধিও একটু বেড়েছে বোধ করি। কারণ আর সে বেশি কথা বলে না।

বন্দুক আর বন্ধুরা

কুমারেশ ঘোষ

আমাদের পাড়ার পন্টুটা বড্ড ফাজিল। কেবল বড় বড় কথা। আর বড় বেশি চাল। সাজগোজের ঘটাঘটি খুব। পায়ে শুঁড়তোলা চটি, পরনে ঢোলা পায়জামা, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী মাথায় ওল্টানো টেরি। চোখে চশমাও পরে, পাওয়ার আছে কি না কে জানে! হাতে ঘড়িও পরে, কখনো সেটা ফার্স্ট যায়, কখনো শ্লো। কিন্তু কারোর কিছু বলার উপায় নেই! বললেই বলে: জানিস আমার ঘড়ি দেখেই বেলা একটায় কেল্লায় তোপ পড়তো।

নস্তেটা ঠোঁটকাটা। দু'চক্ষে দেখতে পারে না পন্টুর চালবাজি। বলে, রেখে দে ওর গপ্পো, ওর ঘড়ির মতে যদি তোপ পড়তো, তবে কোনদিন বেলা দশটায় পড়তো, কোনদিন পড়তো বেলা তিনটেয়। একটায় আর কোনদিন পড়তো না। আসল কথা কি জানিস, তোপের পাঁচমিনিট আগে, গোলাটাকে রড থেকে সরিয়ে, ঐ পন্টুকে ওখানে বসিয়ে দেয়।

আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠি। আসল কথা, ওরা দু'জন কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। ঠিক যেন, সাপে নেউলে কিংবা আদায়-কাঁচকলায়, অথবা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল আর আমরা হচ্ছি দর্শক।

আমাদের দলে গোপলাটা একটু বুদ্ধিতে খাটো। বোধ হয় মাথায় ঘি নেই, স্রেফ গোবর পোরা। কোথায় কি বলতে হবে জানে না। সেদিন স্কুলে টিফিনের সময় আলুকাবলি কিনে খাচ্চি আর গপ্পো করছি, এমন সময় গোপলা বললে: জানিস ভাই সেদিন খেলা দেখে ফেরবার সময় ট্রামে এত ভিড় হয়েছিল যে উঠতেই পারলাম না। কোনো ট্রাম আর স্টপেজে দাঁড়ায় না। পাঁচ-ছয়খানা ট্রামের পেছন পেছন ছুটে ধরবার চেষ্টা করতে করতে প্রায় অর্ধেক রাস্তা চলে এলাম। শেষে ধ্যেত্তোরি বলে রাগ করে বাকিটা পথ হেঁটেই মেরেছিলাম। যাক্ বাবা ক'টা পয়সা বেঁচে গেল।

চালবাজ পন্টু গম্ভীর হয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে সব শুনছিলো। ফট্ করে মুখ বেঁকিয়ে বললে: ইস গোপলা তুই বড্ড ভুল করেছিস।

কেন? কেন? গোপলা জিগ্যেস করলে।

পন্টু হেসে বললে: তুই যদি ট্রামের পেছনে না ছুটে ট্যাক্সিগুলোর পেছনে ছুটতিস, তবে নির্ঘাত তিন-চার টাকা বাঁচাতে পারতিস।

আমরা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম বটে, কিন্তু গোপলার

সেদিন এক বাগানে সবাই ফিস্ট করতে গিয়ে গল্প করছিলাম। রেমো বললে: আচ্ছা, এ সময় যদি একটা হরিণ আসতো কি করতিস তোরা?

প্রায় সবাই বলে উঠলাম: কেন? ধরে, কেটে, রান্না করে খেয়ে সাবাড় করে দিতাম?

—আর যদি একটা বাঘ আসে? বললে রেমো।

এবারে প্রায় সবাই বললাম: বাঘ? বাঘ এলে চোঁ চোঁ পালাবো, নইলে বাঘটাই যে আমাদের সবাইকে সাবাড় করে দেবে।

—দূর বোকা! পন্টু বললে: বাঘ কখনো সবাইকে একসঙ্গে মেরে আরাম করে খেতে বসে? তারও প্রাণে ভয় নেই? আমাদের যে-কোন একটাকে মুখে তুলে নিয়ে পালাবে। তারপর হেসে বললে: হয়ত নস্তেটাকে নিয়েই পালাবে!

নস্তের গা জ্বলে উঠলো বোধ হয়। বললে: আমাকে কেন? আর তোকে নয় কেন?

পন্টু বললে, আমাকে নিলে বাঘটাকে মারবে কে? আমার বাবার বন্দুক আছে, তাই নিয়ে তাকে গুলী করে মারবো।

অ!—নস্তে বললে: এতক্ষণে বুঝলাম। বাঘটা আমায় মুখে করলেই, আমি জোড়হাতে বলবো, দাঁড়াও হে ব্যাঘ্রমশায়, পন্টু বাড়ি গিয়ে তার বাবার বন্দুকটা নিয়ে এসে আগে তোমাকে মেরে তার বীরত্ব প্রকাশ করবে, তারপর তুমি আমাকে খেয়ো।

সবাই হেসে উঠলাম। রেমো বললে, সে আবার কি করে সব হয়? বন্দুক ছুড়লে বাঘটা তো মরেই যাবে!

নস্তে বললে: তুই জানিস্ নে, পন্টু যখন বন্দুক ছুড়বে সামনে দিকে, হুস করে গুলী বেরুবে ঠিক পিছন দিকে। এমনি ওর টিপ! আর নয় তো বাড়ি থেকে ঘুরে এসে বলবে: ভাই বন্দুকটাকে মা'র ক্যাশব্যাক্সের মধ্যে অনেক খুঁজলাম, পেলাম না।

মানে? চটে গেল পন্টু।

বন্দুক তোদের আছে কি না তারই ঠিক নেই! চোখ উল্টে বলে নস্তে।

বটে! পন্টু বললে: জানিস ভুটানের এখনকার রাজার ঠাকুরদা বন্দুকটা আমার ঠাকুরদার বাবাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন। অবশ্য কারণ ছিল! তিনি নাকি একফোঁটা হোমিওপ্যাথি ঔষধে সেই রাজার রক্ত-আমাশা সারিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর জানিস ঐ বন্দুক ঠাকুরদার বাবা, ঠাকুরদা আর আমার বাবা বাঘ-ভাল্লুক-সিংহ মেরে বন প্রায় উজাড় করে ফেলেছিলেন। রীতিমত দামী বন্দুক। ডবল ব্যারেল। আর এমনি মজা, একবার গুলী ছুড়লে হয়,

গিয়ে জন্তুটার কপালের মাঝখান ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে পেছনধার থেকে—এত জোর!

নস্তে থামিয়ে দিল তাকে মাঝপথে, বললে: যা যা বাজে বকিস না? দেখাতে পারিস তোদের বন্দুক? তা'লে বুঝি!

কথাটা শুনেই পল্টু কেমন থমকে গেল। বললে দেখাতে আমি পারি—তবে—তবে—

তবে কি?

মানে, খুব লুকিয়ে দেখাতে হবে, বাবা যখন অফিসে যাবেন, দুপুরে সেই সময়ে।

কেন? নস্তে প্রশ্ন করলে।

মানে, পল্টু বললে, বাবা এখানে বদলি হ'য়ে আসার পর থেকে আর বন্দুক ধরেন নি। কি করে ধরবেন। এই কলকাতায় বন্দুক ছুড়তে গেলেই তো কারোর রান্নাঘরের হাঁড়ির মধ্যে ঢুকে যাবে! যা ঘিঞ্জি সব বাড়ি। আর আমাকেও বারণ করে দিয়েছেন বন্দুক ছুঁতে—যতদিন না মেজর হই।

গোপলা আবার হঠাৎ বোকার মত বলে ফেললো: সে কি? তুই মিলিটারিতে ঢুকবি বুঝি? কিন্তু মেজর হবার আগেই তো তোকে বন্দুক ছোড়া শিখতে হবে রে!

পল্টু বললে: আরে বোকা, সে মেজর নয়। একুশ বছর হ'লে সাবালক হবো, তারপরে বন্দুক ছোড়া শিখবো!

নস্তে বললে: থাক গে, সে তুই যখন শিখবি, শিখবি। এখন তোদের বন্দুক দেখাবি কি না বল্।

পল্টু একটু ভেবে বললে: আচ্ছা তোরা আসিস্ পরশু বুধবার দুপুরে, দেড়টা নাগাদ। মা-ও তখন ঘুমুবে।

বুধবার দেড়টায় গুটি-গুটি আমরা তিন চারজন গেলাম পল্টুদের বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি। বাইরের ঘরে পল্টু আমাদের বসালো। দেখলাম, দেওয়ালে হরিণের শিং, মোষের শিং, ফরাসে বাঘের ছাল পাতা।

পল্টু বললে: সব ঐ বন্দুকে মারা।

নস্তে বললে: দেরি করিস্ নে, নিয়ে আয় তোদের বন্দুক। দেখি একবার হাতিয়ারটাকে! বন্দুকটা কোথায় আছে, জানিস তো!

পল্টু বললে: জানি, মা'র আলমারির তলায় বন্দুকের বাক্সে বন্ধ করা। বোস্ তোরা, আনি।

পল্টু চলে গেল। আমরা ভাবতে লাগলাম—সেই অদ্ভুত ভুটানী বন্দুকের কথা—যা ছুঁড়লেই গুলী গিয়ে লাগে জন্তুদের ঠিক মাঝ-কপালে! শুধু তাই নয়, যার দাপটে কত না জীবজন্তুর ইহলীলা শেষ হয়েছে! ক'য়কটি প্রমাণ তো আমাদের চোখের সামনেই!

একটু পরেই পল্টু এলো, পা টিপে-টিপে। হাতে তার লম্বা একটা বাক্স। টেবিলের উপর রাখলো সেটা। আমরা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম তার উপর!

পল্টু মরচে-পড়া ছিটকিনি খুলে ডালাটা ওঠাতে ওঠাতেই আমরা তো অবাক! বন্দুক কোথায়? কাঠের গুঁড়োর মধ্যে জং-ধরা জোড়া-নলটা প'ড়ে আছে শুধু! আর বাক্সটা উইয়ে ভর্তি!

নস্তে ঠাট্টা ক'রে বললে: বন্দুক কৈ রে? এ তো দেখছি, এক জোড়া নল! লোহার বাঁশি বুঝি? ক্লারিওনেট?

পল্টুও অবাক হয়ে গেছলো। ছলছল চোখে বললে: উইগুলো বন্দুকের ব্যাটনটা—ইস্, একেবারে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। বাক্সটা এতদিন খোলাই হয় নি তাই·····

গোপলা কবিতা বানিয়ে ফেললে:

উইগুলো বড় পাজি: দেখ, ব্যবহার
ভুটানী বন্দুক খেয়ে করে ছারখার!

মনে হ'ল ঘরের হরিণ-মোষ-বাঘদের ছিন্ন অংশগুলো যেন হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। বন্দুককে যেন বললে—কি ভায়া? আমাদের মেরে শেষ পর্যন্ত নিজেই গেলে উইয়ের পেটে!

নেমো বললে: সত্যি, কার কপালে যে কি ঘটে, বলা যায় না।

পল্টু বন্দুকের বাক্স বন্ধ করলে।

বাউল শিল্পী—সীতেশ রায়

রেশম সুতার গোড়ার কথা

শ্রীবরুণচন্দ্র মল্লিক

সিল্কের জামা-কাপড় কার না প্রিয়বস্তু। উৎসবে, পূজাপার্বণে সিল্কের জামা-কাপড় পরা বা কেনা যেন একটা অপরিহার্য অঙ্গ। তোমরাই বল এ সময়ে তোমাদের জন্য সিল্কের কিছু একটা না হলে মনটা কেমন খুঁত খুঁত করে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কি ভেবে দেখেছো, এই সিল্ক হেন জিনিসটা কি? আর কি করেই বা আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আজ সেই কথাই তোমাদের জন্য লিখছি।

তোমরা জান কাপড় তৈরির কাঁচামাল সুতো। সুতার উৎপত্তির প্রকারভেদে মোটামুটি তিনটি শ্রেণী দেখা যায়। যেমন (১) উদ্ভিজ বা প্রোটিন্ ফাইবার, (২) প্রাণীজ বা এ্যানিম্যাল ফাইবার ও (৩) কৃত্রিম বা সিন্থেটিক ফাইবার। কার্পাস সুতো ও নাইলন যথাক্রমে প্রোটিন ও কৃত্রিম ফাইবার শ্রেণিভুক্ত আর এ্যানিম্যাল ফাইবার বলতে পশম ও রেশমের কথাই বোঝায়।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে যে সব কীট ব্যবহৃত হয় রেশম-কীটের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। খাদ্যের

তারতম্যানুসারে রেশমকীটের মধ্যেও শ্রেণিগত পার্থক্য দেখা যায়; তবে সকল রেশমকীটের জীবন-প্রণালী প্রায় এক।

রেশমসুতো প্রস্তুতকারী কীটকে চলতি ভাষায় পলু বলে। প্রথম অবস্থায় এগুলি দেখতে ছোট সরিষাকৃতি এবং ডিম নামেই পরিচিত। অল্পদিনের মধ্যে এসব ডিম থেকে ছোট ছোট শুঁয়াপোকার মত পলু বার হয়, এ অবস্থায় এদের বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তুঁতগাছের পাতা খাওয়ানো হয়। ধীরে ধীরে পলু তুঁতগাছের পাতা খেয়ে বাড়তে থাকে এবং বড় হলে বা পাকলে এদের গায়ের রং-এ পরিবর্তন আসে। এ অবস্থায় দেরি না করে পাতলা বাঁশের পাত দিয়ে তৈরি চন্দ্রকীর মধ্যে এদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পলু নিজের স্বভাব-ধর্মানুযায়ী একটা কোণ বেছে নেয় এবং ধীরে ধীরে এক ধরণের সুতো নির্গত করতে থাকে এবং এই সুতার মধ্যেই সমস্ত দেহটাকে গোপন করে। এ অবস্থায় এদের দেহেও ক্রমিক পরিবর্তন হতে থাকে এবং অল্পদিনের মধ্যেই এরা পুত্তলিকায় রূপান্তরিত হয় এবং এই পুত্তলিকা, পরে প্রজাপতি হয়ে গুটি কেটে বার হয়ে যায়। আবার চলে ডিম পাড়ার পালা। এভাবে চলে এদের বৈচিত্র্যময় জীবনচক্র।

পুত্তলিকা অবস্থায় গুটিগুলি রোদের তাপে বা গরম জলে সেদ্ধ করা হয় এবং এর ফলে পুত্তলিকা মরে যায় আর গুটি কেটে প্রজাপতি হয়ে বার হতে পারে না। কাটা গুটিতে নিরবচ্ছিন্ন সুতো পাওয়া সম্ভব হয় না বলেই পুত্তলিকাগুলিকে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হবার আগেই মেরে ফেলা হয়।

গুটির আকার ও শ্রেণিভেদে সুতার নির্ভর করে। গুটি থেকে হাতে ও মেসিনে দু'রকমেই সুতো কাটার প্রচলন আছে। আমাদের পশ্চিম বাংলায় মালদহ জেলায় সুতো কাটাই-এর কারখানা আছে। কাঁচা রেশমসুতোর তার কত মোটা, তার মাপের একক ডেনিয়ার। চারশ' পঞ্চাশ মিটার কাঁচা রেশমসুতোর ওজন যদি পাঁচ সেন্টিগ্রাম হয় তবে তা এক ডেনিয়ার। কাজেই এক ডেনিয়ার ওজনের সুতো খুবই মিহি। সাধারণ কাপড় বুনতে দশ বা এগারো ডেনিয়ার থেকে সুরু করে আরও মোটা সুতোই ব্যবহৃত হয়।

তা হলে জানলে তো কিভাবে রেশমসুতো তৈরি হয়। বড় হলে এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত জানতে পারবে।

ভাগাভাগি

জসিমউদ্দিন

বাপ মরিয়া গিয়াছে। দুই ভাই পৃথক হইবে। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলিল,—দেখ, আমাদের গাইটা আছে। কাটিয়া ত' আর দুই ভাগ করা যাইবে না। তুই ছোট ভাই। তোকেই গাই-এর বড় ভাগটা দেই। তুই গাই-এর মুখের দিকটা নে। আর আমি গাই-এর লেজের দিকটা লই।

ছোট ভাই ভারি খুশি। বড় ভাই তাহাকে ভাল ভাগটা দিয়াছে, সেজন্য সে বড় ভাই-এর প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। সে সারাদিন এখান হইতে ওখান হইতে ঘাস কাটিয়া আনিয়া গরুকে খাওয়ায়। বড় ভাই রোজ সকালে কাড়ি ভরিয়া দুধ দোয়ায়। সেই দুধ দিয়া ছানা বানায়, ছানা দিয়া রসগোল্লা বানায়, সন্দেশ বানায় আরও কত কি বানায়। বলত খোকা-খুকুরা, আর কি কি বানায়? যে আগে বলিবে তারই জিৎ।

বড় ভাই ভারি খুশি। বেশ আমার ছোট ভাই। এমনটিই ত' চাই। এবার বুঝিতে পারিলাম, বাপের সম্পত্তি তুমি ঠিকই রক্ষা করিতে পারিবে। তোমার ভাগে যখন গরুর মুখের দিকটা পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তোমাকে ভালমত তাকে খাওয়াইতে হইবে।

বড় ভাই-এর তারিফ শুনিয়া ছোট ভাই আরও বেশি করিয়া গরুকে ঘাস দেয়, বড় ভাই আরও বেশি করিয়া গরুর দুধ দোয়ায়, আর ছোট ভাইকে আরও বেশি করিয়া তারিফ করে।

একজন চালাক লোক একদিন ছোট ভাইকে বলিল—আরে বোকা! তুই গরুর মুখের দিকটা লইয়া দিনরাত গরুকে ঘাস খাওয়াইয়া মরিতেছিস আর ওদিকে তোর বড় ভাই মজা করিয়া দুধ দোয়াইয়া লইতেছে।

ছোট ভাই-এর তখন টনক নড়িল। তাই ত'! কিন্তু এখন ত' কিছুই করার উপায় নাই। আমি যে আগেই গরুর মাথার দিকটা লইয়া ফেলিয়াছি। ঘাস আমাকে খাওয়াইতেই হইবে।

চালাক লোকটি তখন ছোট ভাই-এর কানে কানে একটি বুদ্ধি দিয়া গেল।

পরদিন সকাল। যেই বড় ভাই গরুর দুধ দোওয়াইতে আসিয়াছে অমনি ছোট ভাই গাই-এর মাথায় একটি মুগুর লইয়া মারিতে আরম্ভ করিল। মুগুরের চোটে গাই এদিক নড়ে ওদিক নড়ে। গাই-দোয়ান অসম্ভব।

বড় ভাই তখন বলে—আরে করিস কি, করিস কি?

ছোট ভাই উত্তর দেয়—রোজ আমি গরুকে ঘাস খাওয়াই আর দুধ দোওয়াইয়া লইয়া যাও তুমি। আমাকে এককোঁটা দুধও দাও না। গরুর মাথার দিকটা যখন আমার, তার উপরে আমি মুগুরই মারি আর কুড়ালই মারি, তুমি কোন কথা বলিতে পারিবে না।

বড় ভাই বুঝিল, কোন চালাক লোক ছোট ভাইকে বুদ্ধি দিয়াছে। তখন ছোট ভাইকে বলিল—আহা, তুই গরুর মাথায় মুগুর মারিস না। এখন হইতে গরুর দুধের অর্ধেক তোকে দিব।

ছোট ভাই বলিল—শুধু অর্ধেক দুধ দিলেই চলিবে না, তোমাকে আজ হইতে গরুর খাইবার জন্য অর্ধেক ঘাসও কাটিতে হইবে। নইলে এই মারিলাম আমি গরুর মাথায় মুগুরের ঘা।

: আরে রাখ রাখ!—বড় ভাই নরম হইয়া বলে—আজ হইতে অর্ধেক ঘাসও আমি কাটিব।

বাড়িতে ছিল একটা খেজুর গাছ। শীতকালে খেজুর গাছ কাটিয়া রস বাহির করিতে হইবে। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলে,—আমাদের একটামাত্র খেজুর গাছ। কাটিয়া ত' ভাগ করা যাইবে না। সেবার গরুর মাথার দিকটা লইয়া তুই ঠকিয়াছিলি। এবার বল খেজুর গাছের কোন্ দিকটা নিবি? তুই-ই আগে ভাগ নে।

ছোট ভাই উত্তর করে—আমি খেজুর গাছের গোড়ার দিকটা লইব।

বড় ভাই খুশি হইয়া বলে—আচ্ছা, তোর কথাই থাক্। তুই

ছোট ভাই, ভাল ভাগটা চাহিলে আমি বড় ভাই হইয়া ত' না করিতে পারি না।

ছোট ভাই লইল খেজুর গাছের গোড়ার দিকটা। সে সেখানে রোজ জল ঢালে। যা'তে গাছ আরও তাজা হয়। বড় ভাই গাছের আগায় হাঁড়ি বসাইয়া মনের আনন্দে রস পাড়িয়া আনে। শীতকালে খেজুরের রস খাইতে কি মজা! রস দিয়া গুড় তৈরি হয়—গুড় দিয়া চিনি তৈরি হয়। চিনি দিয়া কি কি তৈরি হয় খোকা-খুকুরা? বল, বল, যে আগে বলিতে পারিবে তারই জিৎ।

এইভাবে কিছুদিন যা'য়। বড় ভাই খেজুরের রস খাইয়া মোটা হইয়া উঠিয়াছে। আর ছোট ভাই গাছের গোড়ায় জল ঢালিতে ঢালিতে মাজায় ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছে।

এমন সময় সেই চালাক লোকটি আবার আসিয়া দেখিল, বোকা ছোট ভাই কেমন ঠকিয়াছে। সে তখন ছোট ভাইকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিল।

ছোট ভাই বলিল—তাই ত' এবারও আমি ঠকিয়াছি। কিন্তু খেজুর গাছের গোড়ার দিকের ভাগ ত' আমি নিজেই চাহিয়া লইয়াছি। এর ত' আর কোন প্রতিকার হইবে না।

: দূর, বোকা কোথাকার। বুদ্ধি থাকিলে প্রতিকার হবে না কেন? এই বলিয়া চালাক লোকটি ছোট ভাই-এর কানে কানে আর একটি বুদ্ধি দিয়া গেল। বলত খোকা-খুকুরা কি বদ্ধি দিয়া গেল?

পরদিন সন্ধ্যাবেলা যেই বড় ভাই খেজুর গাছে উঠিয়া সেখানে হাঁড়ি পাতিতে গাছের খানিকটা কাটিতেছে, অমনি ছোট ভাই একখানা কুড়াল লইয়া খেজুর গাছের গোড়া কাটিতে লাগিল—খপ্, খপ্, খপ্।

বড় ভাই গাছের উপর হইতে শব্দ পাইয়া বলিল—আরে, করিস কি? করিস কি?

ছোট ভাই গাছের গোড়ায় কুড়াল মারিতে মারিতে উত্তর করিল—তুমি গাছের মাথা লইয়াছ। রোজ গাছের মাথা হইতে রস পাড়িয়া খাও। আমাকে একটুও দাও না। আমার যখন গাছের গোড়াটা, সেখানে আমি কুড়াল মারি আর যাই করি, তুমি কিছু বলিতে পারিবে না। এই বলিয়া ছোট ভাই আবার গাছের গোড়ায় কুড়ালের কোপ মারিতে আরম্ভ করিল, খপ্-খপ্-খপ্।

: আরে, থাম থাম। বড় ভাই বলে—আজ হইতে খেজুরের রস তোকে অর্ধেক দিব।

দুইভাই বেশ আছে ভাল। গরুর দুধ আর খেজুরের রস দুইজনে ভাগ করিয়া লয়।

তাহাদের বাড়িতে ছিল একখানা মাত্র কাঁথা। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলে—দেখ, কাঁথাখানাকে ত' ছিঁড়িয়া দুইটুকরা করা যায় না। তুই কাঁথাটা দিনের ভাগে তোর কাছে রাখ্। আমাকে রাত হইলে দিস্।

ছোট ভাই খুব খুশি। বড় ভাই তাহাকে আদর করিয়া দিনের বেলার জন্য কাঁথাখানা দিয়াছে। কিন্তু দিনের বেলা গরম। তখন ত' কাঁথা গায়ে দেওয়া যায় না। সে কাঁথাখানাকে সারাদিন এভাঁজ করিয়া ওভাঁজ করিয়া দেখে। রাত হইলে বড় ভাই কাঁথাখানা লইয়া যায়।

ছোট ভাই সারারাত শীতে ঠকঠক করিয়া কাঁপে।

বড় ভাই দিব্যি আরামে কাঁথা গায়ে দিয়া রাতে ঘুমায়।

সেই চালাক লোকটি আবার আসিয়া ছোট ভাই-এর অবস্থা দেখিল। দেখিয়া তার কানে কানে আর একটি বুদ্ধি দিয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ছোট ভাই তার কাঁথাখানা জলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিল। বড় ভাই যখন শুইবার সময় ছোট ভাই-এর কাছে কাঁথা চাহিল, সে তাহাকে ভিজা কাঁথাখানা আনিয়া দিল।

বড় ভাই খুব রাগ করিয়া বলিল—আরে, করিয়াছিস কি? কাঁথাখানা ভিজাইয়া রাখিয়াছিস!

ছোট ভাই বলিল—কাঁথাখানা যখন দিনের ভাগে আমার, তখন সেটা দিয়া আমি দিনের ভাগে যাহা ইচ্ছা করিতে পারি। তোমার ইহাতে কোন কথা বলিবার নাই।

বড় ভাই তখন বলিল—আচ্ছা, কাল হইতে আমরা দুইভাই একত্রে কাঁথার তলে শুইব।
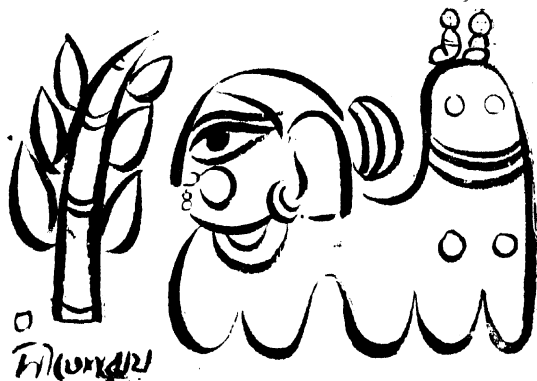
খেলাঘর • শিল্পী—সীতেশ রায়

Mukta-Dhara

আলোচ্য পুস্তকটি এক অনুবাদকর্ম। রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা নাটকের সংস্কৃত অনুবাদ করেছেন লেখক, অনুবাদকর্মের যা প্রধান সম্পদ সেই সাবলীলতা এতে পরিপূর্ণরূপেই বর্তমান এবং বিশেষ করে সেজন্যই এই রচনাকে স্বচ্ছন্দে শিল্পোত্তীর্ণরূপে অভিহিত করা যায়। বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্র-রচনায় অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাকে সুষ্ঠুভাবে ভাষান্তরিত করাটা বড় সহজসাধ্য নয়, কিন্তু বর্তমান অনুবাদক সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছেন। রবীন্দ্র-রচনাকে বর্তমানে নানা ভাষায় অনূদিত করা হচ্ছে কিন্তু সেসব ভাষার অধিকাংশই বিদেশী; স্বদেশের পুরাতন সংস্কৃতির প্রতীক সংস্কৃত ভাষায় রবীন্দ্র-প্রতিভাকে মূর্ত করার প্রচেষ্টা যে একান্তরূপেই প্রশংসনীয় সে সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র নেই. বর্তমান অনুবাদক সেজন্য প্রভূত সাধুবাদের অধিকারী। এই অনুবাদকর্মটির আঙ্গিক ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—প্রো: ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। প্রকাশক—শ্রীমতী উষাদেবী চক্রবর্তী, এম-এ, বি-টি, ১৩২।৫ শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলি-৩১ (পশ্চিমবঙ্গ)। দাম—তিন টাকা।

রান্নার বই

রান্না—কথাটা শুনতে অন্য অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু এই ছোট্ট শব্দটির তাৎপর্য বড় কম নয়, সুপাচিত খাদ্যের আকর্ষণ প্রায় সর্বজনীন, মানুষের যত ইন্দ্রিয় আছে রসনা তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। সুখাদ্য এই রসনাকেই তৃপ্ত করে এবং বলা বাহুল্য এই পথে মনকেও ছুঁয়ে যায় স্বচ্ছন্দেই। আমাদের দেশে মেয়েরা এ তথ্য খুব ভালভাবেই অবগত আছেন বলেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত রান্নার নানারকম কেরামতি দেখানোতে ক্ষান্ত থাকেন নি কখনও, আর হয়ত বা সেজন্যই ছোট্ট 'রান্না' শব্দটি আজ রন্ধনশিল্পরূপেই পরিগণিত হচ্ছে, বর্তমান গ্রন্থটিও এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করে। লেখিকা অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে বহুবিধ নতুন ধরণের রান্নার প্রকরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, অভিজ্ঞা থেকে অনভিজ্ঞা সব রন্ধনেচ্ছু মহিলাই যে এ রচনার দ্বারা উপকৃতা হবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই, অবশ্য রন্ধনশিল্পে যে পুরুষের কোন অধিকার নেই সেটা বলা উচিৎ নয়, সেজন্য বলা উচিৎ যে-কোন রন্ধন-বিলাসী ব্যক্তিই এ রচনাকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন। সে যাই হোক গৃহস্থের দৈনন্দিন সহজ সাদাসিধে শুকতা, ডাল, ডালনা থেকে ভোজের পর্যায়ভুক্ত হরেকরকমের উচ্চাঙ্গের রন্ধনপ্রণালীও স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে এবং যেটা লেখিকার পক্ষে সবচেয়ে কৃতিত্বের বিষয় সেটা হল তাঁর শিক্ষা-প্রণালীর সহজগম্যতা, মনে হয় এ গ্রন্থ হাতে থাকলে বহু আনাড়ীও রান্নার নামে কান্নার বদলে সোৎসাহে কোমর বাঁধবেন হাতা-বেড়ি-খুন্তি নিয়ে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হতে। এক কথায় রন্ধনশিল্পের উপর এ ধরণের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বোধ হয় কমই লেখা হয়েছে। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখিকা—সুলেখা সরকার, প্রকাশক—এস সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রা: লি:, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পঙ্ক পল্বল

বর্তমান উপন্যাসটি বিভূতিভূষণের সাম্প্রতিক রচনা, স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ ভারত ভাগের পরিকল্পনা মেনে নিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন যে ভ্রম করেছিলেন একদিন, তারই মূল্য দেশবাসী কিভাবে আজও দিয়ে চলেছে সেটাই দেখানো লেখকের উদ্দেশ্য। লক্ষ লক্ষ মানুষ, বাস্তুহারা যাদের একমাত্র পরিচয় কি অপরিসীম দুর্গতির মাঝে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছে, এ গ্রন্থে রয়েছে তাদেরই ইতিহাস। দু'মুঠি অন্ন ও একখানি বস্ত্র; মানুষের এই সামান্যতম অধিকারটুকুতেও যারা বঞ্চিত সেই সর্বহারাদের জন্য যে বেদনা লেখকের মনে সঞ্চিত হয়েছে কাহিনীর প্রতি ছত্রে ছড়িয়ে গেছে সেটাই। একটা গোটা জাতির জীবনে অধঃপতনের এই সীমাহীন বিকার দেখে যেন স্তম্ভিতপ্রায় তিনি, তবু কোথায় যেন লুকিয়ে আছে একটু আশা একটু বিশ্বাস, পঙ্ক পল্বলের মধ্য থেকেই কি ফুটে ওঠে না পঙ্কজ? বিনোদ আর বিধু পঙ্ক পল্বলের পঙ্কজের মতই যারা একদিন ফুটে উঠল, লেখকের প্রত্যাশা তাদের মাঝেই মূর্ত; উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে এযাবৎ তো বহু রচনাই রচিত হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এ রচনা বুঝি অনন্য, দরদ ও আন্তরিকতার যে অভূতপূর্ব পরিচয়ে উজ্জ্বল এ রচনা, তা সত্যই তুলনাহীন আর এখানেই লেখকের শিল্পিসত্তার ঘটেছে পূর্ণ বিকাশ। বর্তমান উপন্যাসকে উদ্বাস্তু জীবনবেদ বললেও বোধ করি অত্যুক্তি করা হয় না। আমরা এ গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্যকামী। প্রচ্ছদ-শিল্প শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রা:, লি:, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—আট টাকা।

অষ্টক

রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থলেখকের এক বিশেষ আসন আছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আটটি রসমধুর গল্প সংগৃহীত হয়েছে এই সংক্ষিপ্তাকার গ্রন্থটিতে। কোন স্টান্ট বা চমকবর্জিত আখ্যায়িকাগুলি যেন অনাবিল আনন্দেরই প্রতীকস্বরূপ, পড়তে পড়তে পাঠকের মনও যেন এক রসনির্ঝরে অবগাহন করে ওঠে। একান্ত ঘরোয়া ছোটখাট ঘটনা-সমষ্টির মধ্য থেকেই অধিকাংশ কাহিনীর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু লেখকের যাদুকরা লেখনী কল্যাণে সামান্য বিষয়বস্তুই এক অসামান্য মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যে পরিণত। হাসতে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের কাছে এ রচনা পরম উপভোগ্য বলেই প্রতীয়মান হবে। আঙ্গিক, ছাপা ও

বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—আড়াই টাকা।

রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ (প্রথম খণ্ড)

রবীন্দ্ররচনা সম্বন্ধে প্রামাণ্য রচনাদির অভাব নেই, তবু স্বীকার করতেই হবে যে, বর্তমান গ্রন্থটিতে ঠিক যেভাবে কবিমানসকে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা হয়েছে তা একটু নতুন ধরণের। রবীন্দ্র-সাহিত্য চিন্তাশীল পাঠকমননে ঠিক কোন ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, আলোচ্য গ্রন্থ লেখক সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। বর্তমান খণ্ডে কবির আত্মসত্তার, রুচি, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণার একটা সামগ্রিক পরিচয় দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং এই সূত্রে তাঁর যেসব রচনাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন, সেইসব রচনাকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তাঁর 'কবিকাহিনী', 'বনফুল,' 'ব্যঙ্গ কৌতুক' ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ রচনাকে অবলম্বন করে তাঁর কবিসত্তার যে ক্রমবিকশিত রূপটিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা সত্যই আকর্ষণীয়। বিষয়বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিযোগবশত মালিনী, চিত্রাঙ্গদা, পঞ্চভূত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রচনা নিয়েও পর্যাপ্ত আলোচনা করা হয়েছে, সাহিত্য পাঠের ভূমিকায় যার মূল্য বড় কম নয়। প্রাবন্ধিক ও মননশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ যথেষ্ট মূল্যবান বলেই পরিগণিত হবে। চিন্তাশীল ও বোদ্ধা পাঠকমাত্রই যে বর্তমান রচনাকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। আঙ্গিক শিল্প রুচিসম্মত, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—হরপ্রসাদ মিত্র, প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, দাম—নয় টাকা।

সপ্তবহ্নি

জরাসন্ধ ও তাঁর লৌহকপাট, বাংলা সাহিত্যের পরিসরে অতি সুপরিচিত দুই নাম, বর্তমান কাহিনীর বিষয়বস্তু শেষোক্ত নামটির উপরই নির্ভরশীল। জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' যে শুধু বিষয়বস্তুর আন্তরিকতাতেই উল্লেখ্য তা নয়, তিনখণ্ডে বিভক্ত এই বৃহৎ গ্রন্থখানির আসল আকর্ষণ এর বৈচিত্র্য, মূল কাহিনীর উপর নির্ভর করে দেখা দিয়েছে কত প্রক্ষিপ্ত কাহিনী, কত আখ্যায়িকা এবং প্রকৃতপক্ষে এরাই মূল গ্রন্থের মৌল আকর্ষণ। আলোচ্য গ্রন্থে এই ধরণের কয়েকটি আখ্যায়িকা একত্রে গ্রথিত হয়েছে মূল গ্রন্থ থেকে চয়িত হয়ে, বস্তুত তিনখণ্ডে বিভক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থ 'লৌহকপাট' পড়বার সুযোগ-সুবিধা না ঘটলেও পাঠক এই গ্রন্থে তার রসাস্বাদন করতে পারবেন সহজেই। বর্তমান আখ্যায়িকাগুলি বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে অবক্ষনীয়রূপে সমৃদ্ধ হলেও এর কোনটিই কল্পনাপ্রসূত নয়, লেখকের জীবনব্যাপী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই ফসল; দূরদর্শী সহৃদয় এক কারাকর্মী কয়েদীর পোষাকের অন্তরালে যে মানুষকে দেখেছেন, খুঁজেছেন—আলোচ্য কাহিনীগুলি তারই মূর্ত বাণীরূপ। কি গভীর সহানুভূতিই না প্রকাশ পেয়েছে এদের মাঝে; চমক বা মননশীলতার মেকিসাজে সাজানো অন্তঃসারশূন্য রচনার কচকচিতে আধুনিক পাঠক যখন বিভ্রান্তপ্রায়, তখন এই ধরণের রচনা তাঁদের পক্ষে আহার ও ঔষধ এ দু'টিরই কাজ করে; মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় যে হৃদয়, সেই হৃদয়েরই স্পর্শে ধন্য এ রচনা, মনকে অভিভূত করে প্রাণে দোলা দিয়ে যায়। মানবদরদী লেখকের উদ্দেশে পাঠকের শ্রদ্ধাও তাই এখানে স্বতঃউৎসারিত। নামে 'সপ্তবহ্নি' হলেও, মোট আটটি আখ্যায়িকা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। প্রচ্ছদ-শিল্প সুষম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—জরাসন্ধ, প্রকাশক—রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫।২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—চার টাকা।

নির্জন সৈকতে

আলোচ্য গ্রন্থ লেখকের বলিষ্ঠ সাহিত্যকারের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। কাহিনী গড়ে উঠেছে তীর্থযাত্রী কয়েকটি মানুষকে ঘিরে, মানসিক বেদনায় বিপর্যস্ত এক তরুণীকে সঙ্গে করে নীলাচলের পথে যাত্রা করেছেন চারজন নারী, পথে পরিচয় ঘটল ভবঘুরে এক যুবকের সাথে, স্নেহে কৌতুকে বেদনায় পথের সঙ্গীকে অপরিচয়ের বেড়া ডিঙ্গিয়ে আপন করে নিতে বাধল না এক লহমার তরেও, প্রবাসের দিনগুলোও যেন উড়ে গেল দ্রুত পক্ষ বিস্তার করে; মানুষে মানুষে মিলন যে কত সহজ কত সুন্দর তারই পরিচয়ে যেন ধন্য হয়ে উঠেছে এ রচনা; লেখকের অপরূপ শৈলীতে বিবৃত কাহিনী অতি সহজেই অধিকার করে পাঠকের হৃদয়; পড়তে পড়তে এক অনাবিল শান্তিতে ভরে ওঠে মন, মনে পড়ে যায় বিখ্যাত পদকর্তার দু'টি চরণ 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।' এ যেন উপন্যাসের ছদ্মবেশে এক গদ্য কবিতা, পড়া শেষ হয়ে গেলেও ব্যঞ্জক ঝঙ্কার তোলে মননে। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—কালকূট, প্রকাশনায়—ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রাইভেট লিঃ, ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—সাত টাকা।

অনল আয়তি

বর্তমানে পুরাতনী বাংলাকে নিয়ে সাহিত্য রচনার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে, এতে উপকার দ্বিবিধ, প্রথমত কথা-সাহিত্যে গতানুগতিকতার পরিবর্তে নতুন ধরণের রস আমদানী করা ও দ্বিতীয়ত সাহিত্যের মাধ্যমে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো; আলোচ্য উপন্যাসে এ দু'টিরই স্বাক্ষর বর্তমান। সতীদাহ আমাদের দেশের এক বহু আলোচিত কুপ্রথা। যদিও অধুনালুপ্ত তবু একদিন যে এ ভয়াবহ প্রথা দেশের মর্মমূলেই শিকড় গেঁথেছিল তাতে সন্দেহমাত্র নেই—বর্তমান রচনার প্রধান উপজীব্যও এটাই। সতীদাহ-প্রথা বাংলায় কিভাবে প্রচলিত ছিল এ রচনায় তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে, সেইসঙ্গে রয়েছে যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের এক পরিচ্ছন্ন পরিচয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই বাংলাকে স্মরণ করতে হলে যাঁকে বিস্মৃত হওয়ার উপায় নেই কোনক্রমেই। আশ্চর্য মুন্সিয়ানার সঙ্গে লেখক আমাদের টেনে নিয়ে গিয়েছেন অতীত বাংলার এক বর্ণাঢ্য পরিবেশে। যেখানে যত আলো তত অন্ধকার, কৌলীন্য ও সতীদাহ প্রথার যূপকাষ্ঠে নিবেদিত শত সহস্র রমণীর আকুল ক্রন্দনকে ডুবিয়ে দিয়ে যেখানে পৈশাচিক আনন্দের জয়ঢাক বেজে উঠত মহাসমারোহে—মূঢ় ধনীর প্রমোদ-সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যেত মানুষের মনুষ্যত্ব, নারীর সতীত্ব। তবু ঐ ঘন-তমিস্রা ভেদ করেও ফুটে উঠেছে বারবার আলোর দিশা, জ্ঞানের দীপশিখা জ্বালিয়ে

সমাজের পুঞ্জীভূত গ্লানি অপসারণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন কয়েকজন মানুষ সে সময়, যাঁদের নাম বাংলা তথা বাঙালী কখনই ভুলবে না। আর সেই অবিস্মরণীয়দেরই পুরোধাস্বরূপ জ্বলবে একটি নাম, সে নাম রাজা রামমোহন রায়। আলোচ্য রচনায় গ্রন্থকার এই অপ্রতিপাদ্য সত্যকে বড় আন্তরিকভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কৌশলে কাল্পনিক কাহিনী যেন সত্য-ঘটনার মতই হৃদয়বেদ্য হয়ে উঠেছে। সেকালের স্মরণীয় কয়েকটি ঘটনা ও মানুষের নাম অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছে, বাস্তব ও কল্পনার মেশামিশি কোথাও এতটুকু অতিরঞ্জিত ঠেকে না, আর সেটাই তাঁর সর্বোত্তম কৃতিত্ব। চরিত্র সৃষ্টিতেও নিপুণ তিনি, এ্যান্টনী কবিয়াল, নিরুপমা, রাধারাণী, হরশঙ্কর, কানাগিন্নী প্রভৃতি চরিত্রের, কয়েকটি ঐতিহাসিক, কয়েকটি কাল্পনিক, কিন্তু সব কয়টিই সমান জীবন্ত, সমান কৌতূহলপ্রদ। বাংলা সাহিত্যে লেখক আজ এক চিহ্নিত স্থানের অধিকারী, মনে হয় ভবিষ্যতেও তাঁর লেখনী সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করবে, কিন্তু একথা বোধ হয় সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বর্তমান রচনাই তাঁর সাহিত্য কর্মের সর্বোত্তম পরিচয়রূপে কীর্তিত হতে থাকবে। বাংলা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ এক চিরকালীন সংযোজন। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—সুনীল রায়, প্রকাশক—এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট, লিঃ, ১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২, দাম—পনেরো টাকা।

ছাত্রদের আশুতোষ

বাংলার 'বাঘ' আশুতোষের এই নতুন জীবনচিত্রটি ছাত্রদের উপযোগী করে রচনা করেছেন লেখক। বর্তমান বৎসর এই মহাপুরুষের শতবার্ষিক উৎসবের বৎসর—এই উপলক্ষে তাঁর কর্মময় বিরাট চরিত-কথা নতুন করে আলোচনার সুযোগ পেয়ে ছাত্ররা সত্যই উপকৃত হবে। লেখক বহু জীবনীমূলক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন এ যাবৎ এবং এ বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতাও অনস্বীকার্য। আলোচ্য রচনাতেও তার ছাপ রয়েছে। আশুতোষের জীবন ও কর্মের এক সুস্পষ্ট পরিচয়ে উজ্জ্বল এ রচনা তাই বিশেষভাবেই মূল্যবান বলে পরিগণিত হবে। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—মণি বাগচি। প্রকাশনায়—অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শিক্ষাগুরু আশুতোষ

বাংলার বরেণ্য-পুরুষ স্যার আশুতোষের নাম নানা কারণেই স্মরণীয় হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে বাংলা ও বাঙালী চিরদিন সকৃতজ্ঞচিত্তে মনে রাখবে; আলোচ্য জীবনী-গ্রন্থে লেখক বিশেষ করে এই দিকটিতেই আলোকপাত করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের শ্রী ও সমৃদ্ধি যে একান্তরূপেই 'আশুতোষের' জীবনব্যাপী সাধনার ফল এ রচনায় সে সত্য স্বপ্রকাশ। বাংলা ভাষার জন্য তাঁর দরদ, ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে তাঁর প্রচেষ্টা, প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের জন্য তাঁর বিপুল আয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠক্রমের প্রবর্তন করে তার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতম চূড়ে শিক্ষার্থিগণকে আরোহণ করানোর জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এ সবেরই বিশদ পরিচয় বিবৃত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। আজকের এই হতাশাগ্রস্ত, অবক্ষয়ের দিনে মহৎ লোকের মহান জীবনী রচনার প্রয়োজন সমধিক; এই কর্মযোগীর জীবনী রচনা করে লেখক সেদিক থেকে এক বৃহৎ অভাব মিটিয়েছেন। লেখকের আন্তরিকতা ও সযত্ন শ্রমের ফলে এ গ্রন্থটি সহজেই প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—মণি বাগচি, প্রকাশক—জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—পাঁচ টাকা।

ইতি তোমারই

আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু মামুলী; হিন্দুনারীর পতি পরম গুরুমার্কা কাহিনীতে না আছে কোন বৈশিষ্ট্য না আছে কোন বৈচিত্র্য, তদুপরি বাংলার এক স্বনামধন্য ঔপন্যাসিকের কোন বিখ্যাত রচনার ছাপ জায়গায় জায়গায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। লেখকের আন্তরিকতা সম্বন্ধে অবশ্য অনুযোগ করার কিছু নেই—আর একমাত্র সেজন্যই রচনাটিকে পাঠযোগ্য বলা যায়। প্রচ্ছদ সাধারণ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—অক্ষয় লাইব্রেরী, ৪০, গরাণহাটা স্ট্রীট, কলিকাতা—৬, দাম—দু'টাকা।

শেক্সপীয়ারের সনেট পঞ্চাশৎ

মহাকবি শেক্সপীয়ারের চতুর্থ-জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে এ সময় পৃথিবীর সর্বত্র, এই সন্ধিক্ষণে তাঁর অতুলনীয় লিরিক কবিতাগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করে লেখক জগৎবরেণ্য কবির প্রকৃত স্মৃতিতর্পণেই উদ্যত হলেন। শেক্সপীয়ারের সনেট বা লিরিক কবিতার সংখ্যা বড় কম নয়, আলোচ্য গ্রন্থে পঞ্চাশটি সনেট অনূদিত হয়ে একত্রে গ্রথিত হয়েছে; অনুবাদক স্বয়ং কবি আর সেজন্যই অনুবাদকর্মটিকে যথোচিতভাবে শিল্পোত্তীর্ণ করে নিতে সক্ষম হয়েছেন তিনি; মূল রচনার রস ও রূপ প্রায় অব্যাহত রয়েছে বলা যায়। অনূদিত সনেটগুলির ঠিক পাশেপাশেই মূল সনেটগুলি উদ্ধৃত করে দেওয়ায় পাঠকের পক্ষে মিলিয়ে নেওয়াটা সহজ হয়ে যায়। রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই মূল রচনার সঙ্গে কাব্যানুবাদকে মিলিয়ে পাঠ করে মহাকবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের আস্বাদ অনুভব করতে পারেন। কাব্য সাহিত্যের পরিসরে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। আঙ্গিক রুচিস্মিত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। অনুবাদক—মণীন্দ্র রায়, প্রকাশনায়—বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম—চার টাকা।

শৌলমারী আশ্রমের রহস্য

শৌলমারী আশ্রম ও তার সাধুকে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা-কল্পনা, তর্ক-বিতর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছে দেশে, বস্তুত এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, শৌলমারীর সাধু বাস্তবিকই নেতাজী কি না সে সম্পর্কে সঠিক খবর যদিও কেউই দিতে পারেন নি অদ্যাবধি তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, উক্ত সাধু যেই হোন বা যাই হোন—তিনি অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এই বিষয়টিতেই তাঁর স্বকীয় ধারণা অনুযায়ী আলোকপাত করতে চেয়েছেন। লেখকের

[ধা]রণা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও একথা সন্দেহাতীতভাবেই সত্য যে, তাঁর বিশ্বাস ও ধারণাকে পাঠকমনে সঞ্চারিত করে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর অধিকৃত। লেখকের অনুপমশৈলী সমস্ত রচনাটিকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। উত্তমচাঁদ কথিত অংশটুকু সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থের আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক- দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল, প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, দাম—সাড়ে তিন টাকা।

রাজা বাদশার পথের ধারে

বর্তমানকালে ঐতিহাসিক উপন্যাসের চাহিদা ও সমাদর বহুলাংশে বেড়ে গেছে, ইতিহাসের উপাদানকে উপজীব্য করে উপন্যাস রচনা করতে হ'লে সেই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আর সেই প্রয়োজনের দিকে লেখক সতর্কদৃষ্টিও রেখেছেন। সাম্প্রতিক গ্রন্থের লেখক নিগূঢ়ানন্দ ইতিপূর্বেও কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাতে তিনি কৃতকার্যও হয়েছেন নিঃসন্দেহে। গ্রন্থটিতে মানবজীবন প্রবাহের চিত্রকে মুন্সিয়ানার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। মধ্যযুগ থেকে যে ইতিহাস বর্তমান যুগ অবধি এগিয়ে এসেছে তার একপাশে রয়েছে চলমান সমাজ, আর একপাশে স্থবির আদিম হৃদয়। যুদ্ধ-বিগ্রহে ঘাত-প্রতিঘাতে, উত্থানে ও পতনে সেই মানব-মনের উপর যে প্রতিফলন ঘটেছে, তাকে লেখক সুন্দর ও মনোরমভাবে অঙ্কিত করেছেন গ্রন্থটিতে। গ্রন্থে লেখক ইতিহাসের মূল চরিত্রকে মুখ্য স্থান দিয়েছেন। আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পোযাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, মানবিক ক্রিয়া ও প্রক্রিয়াকে ফুটিয়ে তুলতে সাধ্যমতো চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় গ্রন্থটিতে। বিগত যুগের চিত্র পরিবেশনে লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থটি পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করবে বলে মনে করি। প্রচ্ছদ অপূর্ব, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, লেখক নিগূঢ়ানন্দ। প্রকাশনায়—চক্রবর্তী এ্যাণ্ড সন্স, ১১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—আট টাকা।

দূর দুর্গমে (ভ্রমণ-কাহিনী)

দূর দুর্গম পথ মানুষকে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণে মানুষ বেরিয়ে পড়ে পথে অজানাকে জানবার অদম্য কৌতূহল নিয়ে। একঘেয়ে সাংসারিক জীবনযাত্রা থেকে দুর্গম পথের টানে একাধিকবার বেরিয়ে পড়েছিলেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক গ্রন্থটি একটি ভ্রমণ-কাহিনী। চলার পথে লেখক কত বিচিত্র নর-নারীর সংস্পর্শে এবং বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই কাহিনীটি সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন গ্রন্থটিতে। গাড়োয়ালের দুর্গম তীর্থ, শিখতীর্থ হেমকুণ্ড, জ্বালামুখী, কাংড়ার গুহা, কোলাহাই হিমবাহ, অমরনাথের তুষারক্ষেত্র, নেপালতীর্থ, কোনারক প্রভৃতি তীর্থের কাহিনী মুন্সিয়ানার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন গ্রন্থটির প্রতি ছত্রে-ছত্রে। বর্তমান পুস্তকে রচনাগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে যেসব সাবলীল সৌন্দর্য বিদ্যমান তার ছাপ পাঠকমনে গভীরভাবে এঁকে দেয়। গ্রন্থটি পড়তে পড়তে পাঠক একাত্ম হয়ে যায় লেখকের সঙ্গে, মনে হয় যেন বর্ণিত ঘটনাবলীকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেছে তারও! চিত্রগুলি গ্রন্থটিকে সুশোভিতকরেছে। লেখক—অজিতকুমার শ্রীমানি। প্রকাশনায়—দি নিউ বুক এম্পোরিয়ম, ২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—ছয় টাকা।

প্রতীক্ষিতা শবরী

বাংলা-সাহিত্য-আসরে বর্তমানে যে সব নবাগত লেখকের পদার্পণ ঘটেছে এবং বলিষ্ঠ লেখনীর বলে নিজ আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সাম্প্রতিক গ্রন্থের লেখক অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উপন্যাস। ভাগ্য-বিড়ম্বিত সর্বহারা উদ্বাস্তদের জীবন-কাহিনীকে উপজীব্য করে এই মনোরম উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে লেখক যে সর্বহারা মানুষের জীবন্ত-চিত্রের আবরণ তুলে ধরেছেন তা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। একটুখানি মাথা গোঁজবার আস্তানা ও দু'মুঠি অন্নের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছেন আজ দেশের প্রতিটি মানুষ। সেইরকম উদ্বাস্তুরাও জীবনের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করে চলেছেন সুদিনের আশায়। তাঁদের সংগ্রাম একদিন সার্থক হবে বলে মনে করি। উপন্যাসটিতে লেখক তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতায় কাহিনীটুকু লিপিবদ্ধ করেছেন সুন্দরভাবে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। কল্যাণ সেন, মনোরমা, সুনন্দা, পটল, সুধা, অটল, তটিনী, ও রুক্মিণী প্রভৃতি চরিত্র-চিত্রণে লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় বহন করে। সুনিপুণ ব্যঞ্জনায় এবং অনুভূতির স্নিগ্ধতা কাহিনীকে যথেষ্ট রসসমৃদ্ধ করেছে। ভাষায় প্রাঞ্জলতা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীব্র জীবন-সচেতনা উপন্যাসটিকে উজ্জ্বল করেছে। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—অচ্যুত গোস্বামী। প্রকাশক—দি নিউ বুক এম্পোরিয়াম, ২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬, দাম—আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ইরাণের ইতিকথা (পূর্বকাণ্ড)

ইতিহাস-অনুরাগী বাঙালী পাঠকের কাছে আলোচ্য গ্রন্থলেখক অপরিচিত নন, প্রাচ্যের বিগত গৌরব কাহিনীকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে আলোয় আনার প্রচেষ্টায় তিনি ইতিমধ্যেই যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। বর্তমান গ্রন্থও সে বিষয়ের স্বাক্ষরবাহী। ইরাণ বহু পুরাতন এক ঐশ্বর্যময় প্রদেশ, প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পাদপীঠ, এই রচনার মাধ্যমে গ্রন্থকার এই প্রদেশের এক প্রামাণ্য ও আকর্ষণীয় পরিচয় প্রদান করেছেন। ইরাণের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সে স্থানের প্রচলিত কিংবদন্তী সমূহের সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় ঘটানো হয়েছে, ফলে প্রাবন্ধিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয়েও এ রচনা কথা-সাহিত্যের প্রসাদগুণে বঞ্চিত নয়। বাঙালী পাঠক যে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ এক উল্লেখ্য অবদান বলেই গৃহীত হওয়ার যোগ্য। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—আট টাকা।

ধর্মের আলো

ধর্ম আমাদের প্রাণ। ধর্মকেই ভিত্তি করে আমাদের জীবন তার চলার পথের সন্ধান পায়। ধর্মকে বর্জন করে কোন জাতি কখনও জীবনের পূর্ণতায় স্বাদ পেতে পারে না। সুপ্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলি তাই আমাদের ঘরে ঘরে আবহমানকাল ধরে পূজিত হয়ে আসছে। গীতা বেদের গুরুত্ব বা বিরাটত্ব সর্বসাধারণের পক্ষে সব সময়ে বোধগম্য হয়ে ওঠে না, তাদের দুরূহ তত্ত্বাদির গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না, তাই সেইগুলির সর্বসাধারণের উপযোগী সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে সাম্প্রতিক গ্রন্থটির লেখক সকলের ধন্যবাদভাজন হবেন। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মূল বক্তব্য, সারমর্ম সংক্ষেপে অথচ কৃতিত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। ভাষাশৈলী, রচনাদক্ষতা প্রশংসনীয়। গ্রন্থটির বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়। লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথমজুমদার। প্রকাশনায়—রঘুনাথ লাইব্রেরী, ১৯৫।১এ কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা।

অকস্মাৎ (নাটক)

নাট্যকার হিসাবে সুশীল মুখোপাধ্যায়ের নাম সুপরিচিত। ইতোপূর্বেও ব্যঙ্গরসাত্মক নাটক রচনায় শ্রীমুখোপাধ্যায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ব্যঙ্গরসপূর্ণ এই নাটকটিতে নাট্যকার বর্তমান সমাজ-জীবনের একটি বিশেষ দিকের আবরণ তুলে ধরেছেন। নাটকটি সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত ও নাট্যকারের বলিষ্ঠ লেখনীর পরিচয় বহন করে। সাম্প্রতিক নাটকটির মধ্যে নাট্যকার তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এবং সমাজ-সচেতন বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে। সংলাপ যোজনে ও ঘটনার স্বাভাবিকতায় নাটকটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। মুন্সিয়ানার সঙ্গেই নাট্যকার তাঁর বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী ও মনোরম করে তুলেছেন। চরিত্রচিত্রণে নাট্যকারের পারদর্শিতা লক্ষণীয়, কয়েকটি চরিত্রে বিশেষ করে কুবের মল্লিক, যদুগোপাল, ভীমার্জুন, গজানন, অলকানন্দা, জয়ন্তী ও রিণি সেন উজ্জ্বল হয়েই ফুটে উঠেছে। লেখক—সুশীল মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—এস সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ, ১-সি কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—১২। দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

হলুদ পাতার সবুজ শির

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক কথা-সাহিত্যের আসরে নবাগত হলেও তাঁর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বাক্ষরকে অবজ্ঞা করার উপায় নেই। এক পুরুষকে কেন্দ্র করে দু'-তিনটি নারীর ব্যথা, বেদনা ও আনন্দের ইতিহাসকে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সঙ্গেই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। লেখকের শৈলীও বলিষ্ঠ, তবে জায়গায় জায়গায় কিছুটা অসংযম প্রকাশ পেয়েছে, মনে হয় তাঁর রচনারীতি আরও কিছু পরিণতির মুখাপেক্ষী। চরিত্র-চিত্রণেও নিপুণ লেখক দিব্যেন্দু, অঞ্জলি, নীলিমা প্রভৃতি মুখ্য চরিত্রগুলি বেশ উজ্জ্বল হয়েই ফুটে উঠেছে, পাঠক-মনে তারা সহানুভূতির সঞ্চার করে। সহজেই আমরা বর্তমান রচনাটি, হাতে পেয়ে সুখী হয়েছি, তবে লেখকের পক্ষে যে আরও অনুশীলন প্রয়োজনীয় একথাও স্বীকার করি। প্রচ্ছদ রুচিশোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—শচীন্দ্রনাথ মিত্র, প্রকাশনায়—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাতরঙ

স্বপনবুড়ো নামটি আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকের কাছেই সুবিদিত। ছোটদের জন্য গল্প লেখায় যে তিনি সিদ্ধহস্ত তা পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থের গল্পগুলি অনেকটা হিতোপদেশের কাহিনীর মত। লেখক কাহিনীর মাধ্যমে আসল যে কথা বলতে চেয়েছেন, তা পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম করতে মোটেই অসুবিধা হয় না। গ্রন্থটিতে নাটিকা, গল্প ও কবিতা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে 'আপনি বাসা বাঁধো,' 'হারজিৎ,' 'পুকুরের পাড়ে,' 'শিক্ষাশিবির' ও 'বোধনে বিসর্জন' বিশেষ সুখপাঠ্য এবং শিশু ও কিশোরদের যথেষ্ট আনন্দদান করবে বলে আমরা মনে করি। গ্রন্থটির বহুলপ্রচার কামনা করি। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। লেখক—স্বপনবুড়ো। প্রকাশনায়—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

কালো হরিণ চোখ

বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের জগতে যাঁরা যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী প্রখ্যাত নাট্যকার ধনঞ্জয় বৈরাগী (তরুণ রায়) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থটি একটি সামাজিক উপন্যাস। লেখকের সাম্প্রতিক উপন্যাস 'কালো হরিণ চোখ' পরিপূর্ণরূপে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর অন্যতম প্রধান পরিচায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ঘাত, প্রতিঘাত, হাসি-কান্নাভরা পরিপূর্ণ একটি নারী জীবনের নিটোল গল্প রচনায় তিনি অভূতপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। চরিত্র-চিত্রণে, কাহিনী-বিন্যাসে উপন্যাসটি সর্বতোভাবে সুখপাঠ্য ও রসসমৃদ্ধ। কাহিনীর গতি কোথায়ও ব্যাহত হয় নি। তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং তীব্র জীবনবোধ উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। গ্রন্থটির প্রচার বাঞ্ছনীয়। লেখক—ধনঞ্জয় বৈরাগী। প্রকাশক—বাক্-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—দশ টাকা।

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী (রাসলীলা)

পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাময় জীবনে রাসপর্ব এক স্মরণীয় অধ্যায়। সে কারণে ভক্তহৃদয়ে রাসলীলা এক অভিনব আবেদন জাগিয়ে তোলে। তার মাধুর্য, তার বৈশিষ্ট্য, তার দর্শন ভক্তের মনে এক অপূর্ব অনুভূতি এনে দেয়। দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ বর্ণিত এবং চিত্রিত। ঐ দশম স্কন্ধের নব্বইটি অধ্যায়ের মধ্যে উনত্রিশ থেকে তেত্রিশ—এই পাঁচটি অধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থটির উপজীব্য। এই গ্রন্থের রাসলীলা সম্বন্ধে অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা সন্নিবিষ্ট করে। এই সুবিস্তৃত আলোচনায় ভক্ত পাঠক-সমাজ বহুলাংশে উপকৃত হবেন। রচনার প্রসাদগুণে, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনভঙ্গীর প্রাঞ্জলতায় এই মহামূল্য গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে। লেখক—হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। প্রকাশক—তারকনাথ সমাজদার, সমাজ ভবন ৭৭ বাগুইআটি রোড, যাটগাছি, কলিকাতা—২৮। দাম—কুড়ি টাকা।

বাতাসী মঞ্জিল

অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[৺নটবর মিত্রের ডায়েরি থেকে]

মনে হইল আমার এই অদম্য কৌতূহল বাতাসী বিবির তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। সারা দেশজোড়া বে-আইনী দলকে যে তাহার অঙ্গুলি হেলনে চালাইতেছে, এ দলের যে নাকি একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী, এ দলে যাহার হুকুমের উপর নাকি আর আপীল চলে না, সেই অসাধারণ নারীর দৃষ্টি এড়াইবে, আমার কৌতূহলের এমন সাধ্য কি ?

কিন্তু শুধু সাধ্যের প্রশ্ন নহে। আমার কৌতূহল তাহার দৃষ্টি এড়াইতে চাহে নাই, চেষ্টাও করে নাই। নারীজাতির মনস্তত্ত্বে আমার তেমন দখল না থাকিলেও এটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এই নারী আমার কৌতূহলে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং আত্মপ্রসাদই অনুভব করিবে। কোনরূপ ভাণ না করিয়া মনের সত্য এবং স্বাভাবিক ভাবের প্রকাশে এই সাংঘাতিক এবং রহস্যময়ী স্ত্রীলোকটি—আমি এখন যাহার আওতায়, অথবা 'হাতের মুঠায়'—যদি আমার প্রতি সদয় বোধ করে, তাহাই তো আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় এবং নিরাপদ।

জোছনাও যেন আমারই মতো কৌতূহলী হইয়া ধীরে অতি ধীরে বাতাসী বিবির মুখের আবরণ স্পর্শ করিল। যেন মৃদুস্বরে বলিল, 'ওগো রহস্যময়ী ভয়ঙ্করী, আবরণ তোল, একবার তোমার রুদ্রাণী রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া কৌতূহল মিটাই।'

কিন্তু কৌতূহল মিটাইল না বাতাসী বিবি। মনে হইল কৌতূহল মিটাইবার আগে সে যেন আমাকে যাচাই করিয়া নিতে চায়, আমাকে আরেকটু ভাল করিয়া বুঝিবার আগে সে আড়ালের বাহিরে আসিয়া আমার দৃষ্টিতে ধরা দিতে চাহে না, রহস্যের আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া রাখার মূল্য সে বোঝে।

বাতাসী বিবি বলিল : 'বাবুজি, আপনি আমার হাতে হাত মিলাইয়াছেন। ইহাতে আমাদের দোস্তি হইল তো ?'

আমি বলিলাম : 'সে কি কথা বিবি ? দোস্তি হয় সমানে সমানে। আমি কি তোমার সমান ?'

'না, বাবুজি। আপনি বড়, আমি ছোট। কিন্তু বড়তে ছোটতে কি দোস্তি হয় না ?'

আমি লজ্জিত (এবং কিঞ্চিৎ শঙ্কিত) হইয়া বলিলাম : 'ছি ছি, বাতাসী বিবি ! আমি বড়, এ কথা আমি বলি নাই।'

'আপনি বলিবেন কেন ? আমি জানি। আপনি শহরের বড় অ্যাটর্নী ; শুনিয়াছি অনেক টাকা আপনি ফি মাহিনায় আমদানী করেন।'

'কিন্তু তোমার চাইতে অনেক কম, বাতাসী বিবি।'

বাতাসী বিবি বলিল : 'তাহাও আমি জানি, বাবুজি। আপনি আইন মানেন, আর আমার আইন ভাঙিবার পাইকারি কারবার। আমার বে-আইনী আমদানীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া আপনার আইনসম্মত আমদানী পারিবে কেন ? কিন্তু একথা আর আমি আপনাকে কি বলিব বাবুজি ? আপনি পড়া-লিখা এলেমদার আদমি। আর আমি একটা সামান্য মূর্খ স্ত্রীলোক মাত্র।'

বাতাসী বিবি 'পড়া-লিখা' বা 'এলেমদার' কি না জানি না, কিন্তু এরূপ কথা যে বলিতে পারে, সেই স্ত্রীলোককে সামান্যা বা মূর্খ বলিয়া

ভাবিতে পারিলাম না। বরং বাতাসী বিবি সম্বন্ধে আমার উৎসাহ এবং কৌতূহল আরো যেন উগ্র হইয়া উঠিল।

আমি বলিলাম: 'বাতাসী বিবি, যদি অভয় দাও তো একটা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি।'

বাতাসী বিবি আমার কথা শুনিয়া যেন একটু কৌতুক বোধ করিয়া বলিল, 'আপনার ভয়ের বা ভাবনার কিছুমাত্র কারণ নাই, বাবুজি। আমাদের এই কথোপকথন আমরা ছাড়া অপর কোনো ব্যক্তির কানে পৌঁছিতেছে না, পৌঁছিবেও না। একটা নহে, আপনি যত খুশি সওয়াল করুন। যেমন আপনার মর্জি। আমি যথাসাধ্য জবাব দিব। আমার সওয়াল করিবার কিছু নাই, আমি শুধু আর্জি পেশ করিব। বাবুজি, আপনার পহেলা সওয়াল বলুন। কথা বলিতে যদি আপনার নিজের কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে হেকিম সাহেবের কোনো হুঁশিয়ারি বা মানা নাই।'

জানি না আমাকে কিসে পাইয়াছিল। ঐ অনভ্যস্ত পরিবেশে রহস্যময়ীর অমন নিকট সান্নিধ্যে, বোধ করি তাহার কণ্ঠস্বরের যাদুতেও, মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, নতুবা অমন অদ্ভুত একটা প্রশ্ন—আমি বরাবর খুব হিসাব করিয়া, ওজন বুঝিয়া, কথা বলি—আমার মুখ হইতে ফস করিয়া বাহির হইয়া গেল কিরূপে? অমন দুঃসাহসের ভূত কি করিয়া হঠাৎ ঘাড়ে চাপিল?

আমি প্রশ্ন করিলাম: 'বে-আইনী কারবারের রাস্তায় তুমি নামিলে কেন, বাতাসী বিবি?'

আমার নিজের অজানিতেই কি করিয়া 'তুমি' শব্দটার উপর জোর পড়িয়া গেল। সম্ভবত সেইজন্যই প্রশ্নটা একটু আচমকা এবং উদ্ধত হইলেও বাতাসী বিবি অখুশি হওয়ার বদলে যেন প্রীতিই লাভ করিল। জবাবটা যে সে একবাক্যে সংক্ষেপে গুছাইয়া বলিতে পারিল না তাহার অন্য কারণও ছিল, কিন্তু অন্তত একটি কারণ তাহার বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দখলের অভাব, অথচ সে তাহার যথাসাধ্য আমারই মাতৃভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলিতেছিল। লিখিতে লিখিতে আবার মনে হইতেছে, বাতাসী বিবির সেই বহু প্রয়াসে, বহু আয়াসে বলা ভাঙা-ভাঙা বাংলা ভাষণ যেন আমার কানে আস্ত বাংলার চাইতে অনেক বেশি মধু ঝরাইতেছিল।

আমার প্রশ্নের জবাবে বাতাসী বিবি যাহা বলিল, তাহা সে এক কথায় বলিতে পারিত: 'বে-আইনের পথ আমি বাছিয়া লই নাই বাবুজি, বে-আইনের পথই আমাকে বাছিয়া লইয়াছিল।' কিন্তু অত সংক্ষেপ সে করিতে পারে নাই।

বাতাসী বিবির জন্য মনের গভীরে উদ্বেগ বোধ করিতেছিলাম কি? সম্ভবত করিতেছিলাম, তাই বলিলাম: 'কিন্তু বে-আইনের পথ যে বিপথ, বাতাসী বিবি। আর সেই বিপথে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা, অনেক ঝামেলা, অনেক ঝকমারি, অনেক ঝুঁকি—বিপথ তো সহজ সরল নিরাপদ মোলায়েম নয় বাতাসী বিবি।'

বাতাসী বিবি বলিল, 'সেই জন্যই তো বে-আইনী কারবারের এমন টান বাবুজি। ও নিরাপদ সহজ রাস্তা আমার বিলকুল না-পছন্দ।'

ছোট্ট একটুখানি কথা। কিন্তু ঐ কথাটুকু যে আশ্চর্য সুরে, আশ্চর্যভঙ্গিতে বাতাসী বিবির মুখ হইতে বাহির হইল, তাহার আমেজ বা ভাবায় আনিতে পারিলাম না। প্রবল-প্রতাপান্বিত সরকারের বাঁধা আইন ভাঙিতে গেলে যে প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়া তাহার বিপুল ভার প্রতিমুহূর্তে বহিতে এবং সহিতে হয়, তাহাতেই রোমাঞ্চের, রোমান্টিক আনন্দের খোরাক পায় বাতাসী বিবি। সেই খোরাকে পায় অমৃতের স্বাদ।

'বাতাসী বিবি, আগুন নিয়া খেলিতে গেলে অনেক সময় হাত পোড়ে।'

শুনিয়া বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, 'আমিও একটু নিজের হাত পোড়াইয়াছিলাম। এই মুলুকে যখন বেশি পুরাতন হই নাই, তখন। তাহাও অবশ্য শখ করিয়া।'

'শখ করিবার জন্য কি কেহ হাত পুড়ায়, বাতাসী বিবি?'

'তামাসা উপভোগ করিবার জন্য পুড়ায় বৈ কি, বিশেষ করিয়া যখন নিশ্চিন্ত জানে হাতে ফোস্কা পড়িবে না।'

বিস্মিত হইয়া আবার বাতাসী বিবির মুখের দিকে আমার দুই চোখের ব্যর্থ কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। ভাবিলাম, আহা, আমার দৃষ্টি যদি আড়াল-ভেদী হইত, এক্স-রে (X-Ray) রশ্মির মতন! বিস্ময়ের কারণ: এমন জবাব এই জাতীয় স্ত্রীলোকের নিকট হইতে পাইবার আশা করি নাই। বাতাসী বিবি আমার দৃষ্টির তীব্রতা অনুভব করিল কি না জানি না, কিন্তু মনে হইল তাহার আবৃত মুখমণ্ডলে দু'টি অনাবৃত চোখের তারা যেন আকাশের দু'টি তারার মতই একবার ঝিকমিক করিয়া উঠিল। বাতাসী বিবি যেন পরম আগ্রহান্বিতা হইয়াই স্মৃতি-মন্থন করি।। বলিতে লাগিল: 'হ্যাঁ বাবুজি, শখ করিয়াই একবার হাত পুড়াইয়াছিলাম। এই মুলুকে ইংরাজ সরকারের আদালতের বিচারে কিছুকালের জন্য মেহনতী কয়েদ ভোগ করিয়াছিলাম।'

মেহনতী কয়েদ। অর্থাৎ সশ্রম কারাদণ্ড। এইবার মনে পড়িয়া গেল, কোথায় যেন এই আইন-বিরোধিনী রমণী সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম, সে চোরা-চালান সংক্রান্ত দণ্ডবিধির কি একটা ধারায় বছর-তিনেক জেল খাটিয়াছিল। এই খাটা সে না খাটিলে তাহার দলের আরেকজনকে (বোমভোলা পাঠককে কি?) খাটিতে হইত এবং সেই আরেকজন নাকি সেই দণ্ডাদেশেরই প্রত্যাশা করিতেছিল, কিন্তু তাহার খালাসের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিয়া বাতাসী বিবি দণ্ডটা নিজের মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এ-কাহিনী কয়েকবছর আগে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু মনে রাখার মত গুরুত্ব ইহাকে দিই নাই, কারণ বাতাসী বিবি নাম্নী এক 'ক্রিমিনাল' (criminal) স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার আগ্রহ আমার হয় নাই। বিশেষ করিয়া দেওয়ানী আদালত নিয়াই আমার কারবার ছিল, ফৌজদারী আইন-আদালতের জগতের সঙ্গে আমার দেহের বা মনের যোগ ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু বাতাসী বিবির ডেরার নিভৃতে নিঝুম রাতে তাহারই এ-কথা শুনিয়া সেই পুরাতন শোনা কথা মনে পড়িয়া গেল।

বলিলাম: 'শখ করিয়া কেহ সশ্রম কারাদণ্ডের ফাঁস গলায় পরে, ইহা আমি কোনোদিন ভাবিতে পারি নাই।'

বুঝিলাম বাতাসী বিবি মৃদু মৃদু হাসিতেছে। ভুল বুঝিলাম, না ঠিক বুঝিলাম, বলিতে পারি না।

কিন্তু বাতাসী বিবি বলিল, 'কোনোদিন এমন করিয়া বাতাসী

ভাবিতে পারিলাম না। বরং বাতাসী বিবি সম্বন্ধে আমার উৎসাহ এবং কৌতূহল আরো যেন উগ্র হইয়া উঠিল।

আমি বলিলাম: 'বাতাসী বিবি, যদি অভয় দাও তো একটা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি।'

বাতাসী বিবি আমার কথা শুনিয়া যেন একটু কৌতুক বোধ করিয়া বলিল, 'আপনার ভয়ের বা ভাবনার বিন্দুমাত্র কারণ নাই, বাবুজি। আমাদের এই কথোপকথন আমরা ছাড়া অপর কোনো ব্যক্তির কানে পৌঁছিতেছে না, পৌঁছিবেও না। একটা নহে, আপনি যত খুশি সওয়াল করুন। যেমন আপনার মর্জি। আমি যথাসাধ্য জবাব দিব। আমার সওয়াল করিবার কিছু নাই, আমি শুধু আর্জি পেশ করিব। বাবুজি, আপনার পছেলা সওয়াল বলুন। কথা বলিতে যদি আপনার নিজের কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে হেকিম সাহেবের কোনো হুঁশিয়ারি বা মানা নাই।'

জানি না আমাকে কিসে পাইয়াছিল। ঐ অনভ্যস্ত পরিবেশে রহস্যময়ীর অমন নিকট সান্নিধ্যে, বোধ করি তাহার কণ্ঠস্বরের যাদুতেও, মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, নতুবা অমন অদ্ভুত একটা প্রশ্ন—আমি বরাবর খুব হিসাব করিয়া, ওজন বুঝিয়া, কথা বলি—আমার মুখ হইতে ফস করিয়া বাহির হইয়া গেল কিরূপে? অমন দুঃসাহসের ভূত কি করিয়া হঠাৎ ঘাড়ে চাপিল?

আমি প্রশ্ন করিলাম: 'বে-আইনী কারবারের রাস্তায় তুমি নামিলে কেন, বাতাসী বিবি?'

আমার নিজের অজানিতেই কি করিয়া 'তুমি' শব্দটার উপর জোর পড়িয়া গেল। সম্ভবত সেইজন্যই প্রশ্নটা একটু আচমকা এবং উদ্ধত হইলেও বাতাসী বিবি অখুশি হওয়ার বদলে যেন প্রীতিই লাভ করিল। জবাবটা যে সে একবাক্যে সংক্ষেপে গুছাইয়া বলিতে পারিল না তাহার অন্য কারণও ছিল, কিন্তু অন্তত একটি কারণ তাহার বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দখলের অভাব, অথচ সে তাহার যথাসাধ্য আমারই মাতৃভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলিতেছিল। লিখিতে লিখিতে আবার মনে হইতেছে, বাতাসী বিবির সেই বহু প্রয়াসে, বহু আয়াসে বলা ভাঙা-ভাঙা বাংলা ভাষণ যেন আমার কানে আস্ত বাংলার চাইতে অনেক বেশি মধু ঝরাইতেছিল।

আমার প্রশ্নের জবাবে বাতাসী বিবি যাহা বলিল, তাহা সে এক কথায় বলিতে পারিত: 'বে-আইনের পথ আমি বাছিয়া লই নাই বাবুজি, বে-আইনের পথই আমাকে বাছিয়া লইয়াছিল।' কিন্তু অত সংক্ষেপ সে করিতে পারে নাই।

বাতাসী বিবির জন্য মনের গভীরে উদ্বেগ বোধ করিতেছিলাম কি? সম্ভবত করিতেছিলাম, তাই বলিলাম: 'কিন্তু বে-আইনের পথ যে বিপথ, বাতাসী বিবি! আর সেই বিপথে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা, অনেক ঝামেলা, অনেক ঝকমারি, অনেক ঝুঁকি—বিপথ তো সহজ সরল নিরাপদ মোলায়েম নয় বাতাসী বিবি।'

বাতাসী বিবি বলিল, 'সেই জন্যই তো বে-আইনী কারবারের এমন টান বাবুজি! নিরাপদ সহজ রাস্তা আমার বিলকুল না-পছন্দ।'

ছোট্ট একটুখানি কথা। কিন্তু ঐ কথাটুকু যে আশ্চর্য সুরে, আশ্চর্য ভঙ্গিতে বাতাসী বিবির মুখ হইতে বাহির হইল, তাহার আমেজ তো ভাষায় আনিতে পারিলাম না। প্রবল-প্রতাপান্বিত সরকারের বাঁধা আইন ভাঙিতে গেলে যে প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়া তাহার বিপুল ভার প্রতিমুহূর্তে বহিতে এবং সহিতে হয়, তাহাতেই রোমাঞ্চের, রোমান্টিক আনন্দের খোরাক পায় বাতাসী বিবি। সেই খোরাকে পায় অমৃতের স্বাদ।

'বাতাসী বিবি, আগুন নিয়া খেলিতে গেলে অনেক সময় হাত পোড়ে।'

শুনিয়া বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, 'আমিও একটু নিজের হাত পোড়াইয়াছিলাম। এই মুলুকে যখন বেশি পুরাতন হই নাই, তখন। তাহাও অবশ্য শখ করিয়া।'

'শখ করিবার জন্য কি কেহ হাত পুড়ায়, বাতাসী বিবি?'

'তামাসা উপভোগ করিবার জন্য পুড়ায় বৈ কি, বিশেষ করিয়া যখন নিশ্চিত জানে হাতে ফোস্কা পড়িবে না।'

বিস্মিত হইয়া আবার বাতাসী বিবির মুখের দিকে আমার দুই চোখের ব্যর্থ কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। ভাবিলাম, আহা, আমার দৃষ্টি যদি আড়াল-ভেদী হইত, এক্স-রে (X-Ray) রশ্মির মতন! বিস্ময়ের কারণ: এমন জবাব এই জাতীয়া স্ত্রীলোকের নিকট হইতে পাইবার আশা করি নাই। বাতাসী বিবি আমার দৃষ্টির তীব্রতা অনুভব করিল কি না জানি না, কিন্তু মনে হইল তাহার আবৃত মুখমণ্ডলে দু'টি অনাবৃত চোখের তারা যেন আকাশের দু'টি তারার মতই একবার ঝিকমিক করিয়া উঠিল। বাতাসী বিবি যেন পরম আগ্রহান্বিতা হইয়াই স্মৃতি-মন্থন করি।। বলিতে লাগিল: 'হ্যাঁ বাবুজি, শখ করিয়াই একবার হাত পুড়াইয়াছিলাম। এই মুলুকে ইংরাজ সরকারের আদালতের বিচারে কিছুকালের জন্য মেহনতী কয়েদ ভোগ করিয়াছিলাম।'

মেহনতী কয়েদ। অর্থাৎ সশ্রম কারাদণ্ড। এইবার মনে পড়িয়া গেল, কোথায় যেন এই আইন-বিরোধিনী রমণী সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম, সে চোরা-চালান সংক্রান্ত দণ্ডবিধির কি একটা ধারায় বছর-তিনেক জেল খাটিয়াছিল। এই খাটা সে না খাটিলে তাহার দলের আরেকজনকে (বোমভোলা পাঠককে কি?) খাটিতে হইত এবং সেই আরেকজন নাকি সেই দণ্ডাদেশেরই প্রত্যাশা করিতেছিল, কিন্তু তাহার খালাসের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিয়া বাতাসী বিবি দণ্ডটা নিজের মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এ-কাহিনী কয়েকবছর আগে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু মনে রাখার মত গুরুত্ব ইহাকে দিই নাই, কারণ বাতাসী বিবি নাম্নী এক 'ক্রিমিনাল' (criminal) স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার আগ্রহ আমার হয় নাই। বিশেষ করিয়া দেওয়ানী আদালত নিইয়াই আমার কারবার ছিল, ফৌজদারী আইন-আদালতের জগতের সঙ্গে আমার দেহের বা মনের যোগ ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু বাতাসী বিবির ডেরার নিভৃতে নিঃঝুম রাতে তাহারই এ-কথা শুনিয়া সেই পুরাতন শোনা কথা মনে পড়িয়া গেল।

বলিলাম: 'শখ করিয়া কেহ সশ্রম কারাদণ্ডের ফাঁস গলায় পরে, ইহা আমি কোনোদিন ভাবিতে পারি নাই।'

বুঝিলাম বাতাসী বিবি মৃদু মৃদু হাসিতেছে। ভুল বুঝিলাম, না ঠিক বুঝিলাম, বলিতে পারি না।

কিন্তু বাতাসী বিবি বলিল, 'কোনোদিন এমন করিয়া বাতাসী

বিবির সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবেন, ইহাই কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন, বাবুজি ?'

বাস্তবিকই পারি নাই। তাহা মনে মনে এবং মুখে স্বীকার করিলাম। রহস্যটা আমাকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য বিবেচনা করিয়াই বোধ করি বাতাসী বিবি বলিল : 'বাবুজি, আপনি যদি জানিতেন ইংরেজের জেলখানায় আমি কি হালে ছিলাম, তাহা হইলে আমার গলা বাড়াইয়া কারাদণ্ড বরণের শখের কথা শুনিয়া অবাক হইতেন না।'

'জেলে কি হালে ছিলে, বাতাসী বিবি ?'

'আপনারা যাহাকে রাণীর হাল বলেন, বাবুজি। সুলতানার হালও বলিতে পারেন।'

কথাটা বাতাসী বিবি যেমন সহজকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, তত সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু অবিশ্বাস প্রকাশ না করিয়া শুধাইলাম : 'জেলে ঢুকিয়া না হয় রাণীর হালেই থাকিবার সৌভাগ্য তোমার হইয়াছিল বাতাসী বিবি, কিন্তু সশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদী তুমি জেলে গিয়া রাণীর হালে থাকিতে পারিবে, একথা তোমার নিশ্চয়ই আগে হইতে জানা ছিল না।'

বাতাসী বিবি বলিল : 'ছিল, বাবুজি। শারীরিক দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন আর মেহনত সহ্য করিবার সাহস আর ক্ষমতা দুই আমার প্রচুর আছে, কিন্তু মিছামিছি শখ করিয়া এগুলি সহ্য করিতে যাইব, এ-হেন দুঃখ-বিলাসিনী বিকৃত-মস্তিষ্কা আমি নহি।'

অর্থাৎ অকারণে দুঃখ বরণ করিয়া বাহাদুরি দেখাইবার মতো খামখেয়ালী পাগলামি তাহার মগজে নাই। বাতাসী বিবি তাহার জেল-জীবনের যে বর্ণনা দিল তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম।

বাতাসী বিবির তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছিল ; হাকিম সাহেব বুঝি একটু কড়াকড়িভাবেই আইন মানিতেন তাই আসামী স্ত্রীলোক হইলেও তাহার কারাদণ্ডকে সশ্রম করিতে দ্বিধা করেন নাই। দণ্ডাদেশে 'তিন বৎসর' লেখা থাকিলেও কার্যত বাতাসী বিবিকে পুরা তিন বছর বন্দিনী থাকিতে হয় নাই ; আড়াই বছর মাত্র থাকিতে হইয়াছিল। 'বন্দিনী অবস্থায় আদর্শ সন্তোষজনক আচরণ'-এর ফলে বছরে দুই মাস হিসাবে মোট ছয় মাস অর্থাৎ আধা বছর মকুব হইয়া গিয়াছিল—আইনে এরূপ মকুবের বিধান আছে। বাতাসী বিবির আদর্শ সন্তোষজনক আচরণের সার্টিফিকেট সরকারীভাবে দিয়াছিলেন স্বয়ং কারাধ্যক্ষ মহাশয়।

জেলের ভিতরে বাতাসী বিবির আহারে-বিহারে, আমোদ-প্রমোদে এবং বিবিধ বিলাসে কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটে নাই এবং বাহিরের সহিত—বিশেষ করিয়া তাহার দলের সহিত—যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। এমন কি কারাগারের চার-দেয়ালের ভিতরে আসিয়া তাহার দলের প্রধান প্রধান কর্মীরা দলের আগম এবং আগামী কার্যসূচী সম্বন্ধে বৈঠকী পরামর্শও বিনা বাধায় করিয়া গিয়াছে, দোর্দণ্ডপ্রতাপ সরকার বাহাদুরের মাথা তাহাতে এতটুকুও ঘামিয়া উঠে নাই। কড়া হাকিমের দেওয়া তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের কৃপায় বাতাসী বিবি আড়াই বছর মনোরম সরকারী আতিথ্য উপভোগের সুযোগ পাইয়াছিল, সৌখীন-সৌখীনারা যেমন অর্থের প্রাচুর্য থাকিলে হাওয়া বদলের জন্য মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য শৈল-নিবাসে অর্থাৎ 'হিল-স্টেশনে' কাটাইয়া আসেন।

একদা এক পাগলকে পথে পথে চীৎকার করিয়া বেড়াইতে শুনিয়াছিলাম :

'সম্ভব অসম্ভব হবে।
অসম্ভব সম্ভব হবে।'

বাতাসী বিবির কথা শুনিয়া পাগলের সেই ভবিষ্যৎ ঘোষণার কথা মনে পড়িয়া গেল। প্রশ্ন করিলাম : 'বাতাসী বিবি, এ যে আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর মত শুনাইতেছে। অসম্ভবকে এভাবে সম্ভব করিয়াছিলে কি করিয়া ?'

বাতাসী বিবি ডানহাতের যথাযোগ্য ভঙ্গিসহযোগে বলিল : 'জুতা মারিয়া।'

বলিতে বলিতে অতীতের সেই জুতা মারার স্মৃতি মনে করিয়া বাতাসী বিবি পরম কৌতুকে যেন নবীনা কিশোরীর মত উচ্ছ্বসিতা হইয়া উঠিল।

আমি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম : 'জুতা মারিয়া ?'

'হাঁ বাবুজি। সে জুতা অবশ্য চামড়ার নহে, চাঁদির এবং সোনার। এই দু'য়ের কোনোটারই অভাব আপনার এই বাঁদীর নাই, বাবুজি।'

বাতাসী বিবির এই দুই রকমের বিনামা ছোট, মাঝারি ও বড় যাহাদের উপর প্রচুরভাবে বর্ষিত হইয়াছিল তাহাদের চামড়া শুধু কালোই নহে, সাদাও ছিল। সে কথাও বাতাসী বিবির মুখেই শুনিলাম।

আপনার বাঁদী ! বারবার সেই বিনয়। অথবা প্রচ্ছন্ন উপহাস ? উপহাস বলিয়া বিশ্বাস করিতে এবারও প্রবৃত্তি হইল না, বিনয় বলিয়াই মনে করিয়া নিলাম।

ইংরাজ জাতির কর্মশৃঙ্খলায়, শাসন দক্ষতায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে এবং দোর্দণ্ডপ্রতাপে আমার আস্থা ছিল বিরাট, সেই আস্থায় প্রচণ্ড আঘাত দিল বাতাসী বিবির এই বিচিত্র কারাবাসের কাহিনী। বাতাসী বিবিকে জেল খাটিতে হইয়াছিল, সেই কাহিনীই শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে খাটা যে এই ধরণের খাটা—তাহা শুনি নাই।

ইংরাজ সরকারের আইনকে এমনভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোও সম্ভব ইহা মানিয়া নেওয়াকে যেন একটা আস্ত ঢেঁকি গেলার মতই কঠিন বলিয়া মনে হইল। যে ইংরাজের রাজত্বে সূর্যের অস্ত যাইবার ক্ষমতা নাই, ইংরাজের শাসনচক্ষুকে এমন অবলীলায় ফাঁকি দেওয়া কি সম্ভব ?

ঠিক কি কথা বলিয়াছিলাম স্মরণ করিতে পারিতেছি না ; কি একটা কথায় আমার মনের খট্‌কা বাতাসী বিবির কাছে ধরা পড়িয়া গেল। বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, 'বাবুজি ভাবিতেছেন ইংরেজের মুলুকে এমন ব্যাপার সম্ভব নহে, আমি আপনাকে মগের মুলুকের কিস্‌সা শুনাইতেছি ?' বলিয়া আমাকে সে ইংরাজ-চরিত্রের যে বিশ্লেষণ শুনাইল, তাহাতে পুরাপুরি সায় দিতে না পারিলেও অপরাধ-জগতের এই কুখ্যাতা নাগরিকার অন্তর্দৃষ্টিতে মনে চমক লাগিল। সে বলিল, 'বাবুজি, ইংরাজরা জানে আমি বা আমার দল এদেশে ইংরাজ-শাসনের দুষমন নহি, এদেশ হইতে ইংরাজ সরকারকে ছলে, বলে বা কৌশলে তাড়াইয়া দিবার অথবা তাহাদের শাসনকে বিপন্ন করিবার কিছুমাত্র আগ্রহ আমাদের নাই। আমরা ইংরাজের তৈয়ারি আইন ভাঙি—যথাসাধ্য গোপনে, লোকচক্ষুর আড়ালে, প্রকাশ্যে কখনোই

তাহাদের আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করি না। আমরা আইন ভাঙি বটে, কিন্তু এমন কোনো আইন ভাঙি না যাহা ভাঙার ফলে তাহাদের শাসন কিছুমাত্র বিপন্ন হয়।'

অর্থাৎ ইংরাজ যাহাকে আসল ভয় করে তাহা 'সিডিশন' (sedition) বা রাজদ্রোহ, ক্রাইম (crime) বা অপরাধ নহে। অথবা যে ক্রাইমকে ইংরাজ এদেশে সত্যিকারের দুশমন বলিয়া গণ্য করে, তাহা পোলিটিক্যাল ক্রাইম (political crime), অর্থাৎ 'রাজনৈতিক' অপরাধ। বাতাসী বিবি বা তাহার দলের চরিত্রে বা ক্রিয়াকলাপে ক্রাইম আছে, কিন্তু রাজনীতির কণামাত্র নাই। সেই কারণেই ইংরাজ রাজশক্তি বা রাজপুরুষবৃন্দ বাতাসী বিবির দুশমন নহে; তাহার জেলযাত্রায় আইনের মর্যাদা রক্ষিত হইল, ইংরাজরাজের 'প্রেস্টিজ' (prestige) বা সম্মান বজায় থাকিল, ব্যস, আর কি চাই? জেলে গিয়া চার দেয়ালের নেপথ্যে রাজনীতি-সম্পর্কহীনা এবং ইংরাজ-অবিদ্বেষিণী বাতাসী বিবি শাস্তি ভুগিল, না স্বস্তি ভোগ করিল, সাজা পাইল না মজা লুটিল, তাহা লইয়া ইহাদের কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই। আর্থিক দাক্ষিণ্য দু'হাতে ছড়াইয়া বাতাসী বিবি আইনের সাজা এড়াইয়া বে-আইনী সুখ-সুবিধা-বিলাস ভোগ করিলে ইহাদের আপত্তি কিছুমাত্র নাই।

বাতাসী বিবি বলিল, 'বাবুজি, কোনো ইংরাজ তার জাতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না, বেইমানি করে না, নিজের বড় স্বার্থসিদ্ধির জন্যও জাতির এতটুকু ক্ষতি হইতে দেয় না। তাই রাজনৈতিক অপরাধীদের তাহারা হাজার প্রলোভনেও ক্ষমা করে না, রেহাই দেয় না। কিন্তু—'

আর শোনা বাহুল্য মনে হইল। বলিলাম, 'বুঝিলাম, বাতাসী বিবি। তুমি ইংরাজ রাজশক্তির দুশমন নও বলিয়াই চাঁদি আর সোনার দৌলতে জেলে থাকিয়াও জেলের কিছুমাত্র দুঃখের ছোঁয়াচ টের পাও নাই। কিন্তু তুমি রাজদ্রোহিনী হইলে নারী বলিয়া ইংরাজ তোমাকে রেহাই দিত না, দুশমন বলিয়া তোমার দুর্দশার চূড়ান্ত করিত।'

বাতাসী বিবি বলিল, 'হাঁ বাবুজি, ইংরাজের সঙ্গে তো আমার কোনো ঝগড়া নাই, শত্রুতা নাই। এ জাতের অনেক গুণের আমি তারিফ করিতাম, এখনও করি। শুধু একটা ব্যাপারে কিছুদিন আগে ইংরাজের উপর আমার কিছু ঘৃণা হইয়াছে বাবুজি।'

'কি ব্যাপারে, বাতাসী বিবি?' প্রশ্ন করিলাম আমি, যখন মনের ভিতরে অনুভব করিলাম বাতাসী বিবির এই ঘৃণার ভাবটা শুধু মুখের কথা নহে, বাস্তবিকই আন্তরিক।

বাতাসী বিবি বলিল, 'বাবুজি, আপনাদের আঠারো বছরের নও-জোয়ান—ক্ষুদিরাম। তাহারই ব্যাপারে।'

ঘরের ভিতরে সহসা বজ্রপাত হইলেও বোধ করি এমন চমকাইয়া উঠিতাম না, বাতাসী বিবির মুখে বাংলার কিশোর শহীদ ক্ষুদিরামের নাম শুনিয়া যেমন চমকিত হইলাম। এক বছরও হয় নি মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়াছে, তাহাকেই বেদনার সহিত স্মরণ করিয়া এবং স্মরণ করাইয়া পথে প্রান্তরে কত গায়ক ভিখারী বেদনা-করুণ কণ্ঠে গাহিয়া বেড়াইতেছে:

'একবার বিদায় দাও মা, ঘুরে আসি।'

ক্ষুদিরামের ফাঁসির ব্যথা বাঙালী ভোলে নাই, বাঙালীর ভুলিবার কথা নহে, বাঙালী কোনোদিন ভুলিবেও না। বাঙালীর এই মর্মান্তিক বেদনায় অংশগ্রহণ করিয়া ক্রিমিনাল দলের নেত্রী বাতাসী বিবি এক মুহূর্তে যেন আমার হৃদয় জয় করিয়া নিল। আমি বলিলাম, 'ক্ষুদিরামের ফাঁসির জন্য তোমার ইংরাজের প্রতি ঘৃণা হইয়াছে, বাতাসী বিবি?'

বাতাসী বিবি বলিল, 'না বাবুজি, ফাঁসির জন্য নহে। মানুষ খুন করিলে ফাঁসি যাইতে হয়, এমনই আইন আছে। ক্ষুদিরাম মানুষ খুন করিয়াছিল, ফাঁসি গিয়াছে। ইহাতে ইংরাজের কিছু কসুর নাই।'

এই হৃদয়হীনার কথা শুনিয়া মর্মাহত হইলাম। মাত্র আঠারো বছরের এক কিশোর বিদেশী অত্যাচারীর বিচারালয়ে দণ্ডিত হইয়া ফাঁসি গেল, ইহাতে এতটুকু বেদনা-বোধ নাই, এ কেমন স্ত্রীলোক? বাতাসী বিবি কি মানবী, না দানবী?

'তবে ইংরাজের উপর তোমার ঘৃণা কেন, রাগ কেন, বাতাসী বিবি?'

'ফাঁসির আগে ক্ষুদিরাম কি শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, আপনি তাহা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন, বাবুজি?'

'মরিবার আগে ক্ষুদিরাম একবার তাহার জন্মভূমি মেদিনীপুর এবং তাহার মাতৃসমা দিদিকে শেষ দেখা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল।'

'ইংরাজ তাহার সেই শেষ ইচ্ছা সহজেই পূরণ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই, বাচ্ছা দুষমনকে তাহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিয়াই তাহাকে ফাঁসি লট্কাইয়া হত্যা করিয়া নীচ আক্রোশ মিটাইয়াছিল। থুঃ।'

অন্তহীন ঘৃণা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বাতাসী বিবি থুথু ফেলিবার আওয়াজ ও ভঙ্গির নকল করিল। তারপর বলিল 'ইংরাজকে বড় তারিফ করিতাম বাবুজি, দরাজ-দিল মর্দানা জাত বলিয়াই ভাবিতাম। ইংরাজের দিল এত ছোট হইতে পারে, তাহা কখনো স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।'

বাতাসী বিবির কথা শুনিয়া মনে হইল অতি উচ্চ শিখর হইতে ইংরাজের পতন আরম্ভ হইয়াছে; বাতাসী বিবি যেন তাহা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করিতেছে। অতৃপ্ত কামনা লইয়া ক্ষুদিরামের আত্মা অনন্তশূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ যদি বালকের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া মৃত্যুর আগে তাহাকে শেষ তৃপ্তিটুকু দিত, তাহা হইলে ইংরাজের মহত্ত্বই প্রকাশ পাইত, গৌরবই বৃদ্ধি হইত, ভারতে ইংরাজের শাসন তাহা দ্বারা বিন্দুমাত্র বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহা না করিয়া ইংরাজ জাতি অন্তত একজনের শ্রদ্ধা হারাইয়াছে—সেই একজনের নাম বাতাসী বিবি।

'ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর হইতেই বাঙালীকে আমি নতুন চোখে দেখিতে লাগিলাম, বাবুজি। বুঝিলাম বাঙালী যেমন জান নিতে জানে, সাচ্চা মরদের মতো তেমনি বিলকুল বেপরোয়া ভাবে জান দিতেও জানে। ক্ষুদিরামের ফাঁসি না হইলে আপনার সঙ্গে আমার মোলাকাত, অন্তত এইভাবে মোলাকাত, হয় তো কোনদিনই হইত না, বাবুজি।'

বাতাসী বিবির এই হেঁয়ালি-মার্কা কথা শুনিয়া আরও বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এ কি অদ্ভুত কথা বলিতেছে বাতাসী বিবি? ক্ষুদিরামের ফাঁসির সঙ্গে বাতাসী বিবির সহিত আমার সাক্ষাতের কি সম্পর্ক?'

[ক্রমশ।

প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

দৈর্ঘ্যে ৬৪হাত এবং বিস্তারে ৩২ হাত এই মর্ত্য মানুষোচিত মণ্ডপে রংগপীঠ, রংগশীর্ষ, নেপথ্য, মত্তবারণী এবং প্রেক্ষা-মণ্ডপের সংস্থান নির্দেশ করা প্রয়োজন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, দর্শকাসনের দিক থেকে নেপথ্যগৃহপর্যন্ত যদি একটি রেখা টানা যায়, তা হলে সেইটি হবে দৈর্ঘ্য এবং অন্যদিকে যে ৩২ হাত রয়েছে, তাকে বোঝাবে বিস্তার ব'লে। নাট্যশালা তখন দুইভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগে রংগমঞ্চ ও অপরভাগে দর্শকসভা। ৩২ হাত পরিমিত ক্ষেত্রে দর্শকাসন স্থাপন করা হত। মনে হয়, তার সামনে ৩২ হাত রংগপীঠ, রংগপীঠের পশ্চাতে ৮হাত রংগশীর্ষ এবং তার পশ্চাতে ১৬হাত ছিল নেপথ্যগৃহ। এই অংশগুলোর পরিমাপ এবং অবস্থান সম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকায় সুষ্ঠ গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এই সম্বন্ধে বর্তমান বাংলার প্রখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ আচার্য সাধনকুমার ভট্টাচার্যের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রংগপীঠ কারো কারো মতে দ্বিভূমিক হোতো। রংগপীঠের পৃষ্ঠে এবং নেপথ্যগৃহের সম্মুখে নির্মিত হ'ত রংগশীর্ষ। এই রংগশীর্ষ বিকৃষ্ট নাট্যগৃহে রংগপীঠ থেকে উন্নত এবং চতুরস্রে রংগপীঠের সংগে সমতল ভূমিতে অবস্থিত হবে। আহুতি, অর্ঘ্যদান প্রভৃতি এখানেই বোধ হয় সম্পাদিত হ'তো। রংগশীর্ষের ষটদারুকে নেপথ্যগৃহের দুইটি প্রবেশদ্বার থাকবে। এই রংগশীর্ষে নানাবিধ দৃশ্যসজ্জা ও যন্ত্রাদির বিন্যাস করা হত। নাটকে যথাসম্ভব বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তাঁরা বর্তমানের মতো বহুবিধ সেট এবং নানাবিধ চিত্রাদি অংকন করতেন। ভরত রংগশীর্ষের দারুকর্মসম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে বলছেন—

'এবং রংগশিরঃ কৃত্বা দারুকর্মপ্রযোজয়েৎ।
ঈহ প্রত্যুহসংযুক্তং নানাশিল্প-প্রযোজিতম্॥
নানা সঞ্জবনোপেতং নানাগ্রথিতবেদিকম্।
নানাবিন্যাস-সংযুক্তং যন্ত্রজালগবাক্ষকম্॥
সুপীঠধারণীযুক্তং কপোতালীসমাকুলং।
নানাকুট্টিমবিন্যস্তৈঃ স্তম্ভৈশ্চাপ্যুপশোভিতম্॥'

এরপর মত্তবারণী সম্বন্ধে ভরত বলছেন—

'রংগপীঠস্য পার্শ্বে তু কর্তব্যা মত্তবারণী।
চতুস্তম্ভসমাযুক্তা রংগপীঠপ্রমাণতঃ॥
অধ্যর্ধহস্তোৎসেধেন কর্তব্যা মত্তবারণী।
উৎসেধেন তয়োস্তুল্যং কর্তব্যংরংগমণ্ডপম্॥'

এই মত্তবারণীর সংস্থান সম্বন্ধে বহুপ্রকার জটিলতা র'য়েছে নাট্যশাস্ত্রে এবং তার ভাষ্যে। ফলে এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। তবে আচার্য সাধনকুমার ভট্টাচার্য মহোদয় সংস্কৃত নাটকের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ সংগ্রহ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন, তাই আপাতত যুক্তিসহ বলে মনে হয়। মত্তবারণী হচ্ছে রংগপীঠের দুই পাশের স্তম্ভযুক্ত সোপানপরম্পরাবিশিষ্ট, গোলাকার উপাধামবেষ্টিত উচ্চ বেদিকা বা দ্বিতীয়ভূমি। সম্ভবত, এই স্থানটি অভিনয়কালে বিশ্রাম, প্রাসাদারোহণ, রাজোপবেশন, নাটকের ভেতরের নাটকীয় নৃত্যগীতাদি দর্শন প্রভৃতি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হ'ত।

বেশরচনাদির জন্য নেপথ্যগৃহের সংস্থান হ'ত রংগশীর্ষের পৃষ্ঠে এবং তার দুইটি দ্বার সম্মুখে এবং একটি দ্বার পার্শ্বে সন্নিবেশিত হ'ত। পাত্র-পাত্রীরা পাশের দ্বার দিয়ে বাইরে থেকে এসে নেপথ্যে প্রবেশ ক'রতেন এবং সামনের দ্বার দু'টি দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতেন মঞ্চে।

প্রেক্ষামণ্ডপ ও দর্শকাসনের পরিকল্পনায় ভরত বাস্তুবিদ্যায়ও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। Accoustic সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট চিন্তা করতেন। মহর্ষি বলছেন—

'কার্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ।
মন্দবাতায়নোপেতো নির্বাতো ধীরশব্দবান্॥
তস্মান্নিবাতঃ কর্তব্যঃ কর্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ।
গম্ভীরস্বরতা যেন কুতপস্য ভবিষ্যতি॥'

পর্বতের গুহার মতো, দিভূমি, স্বল্পবাতায়নযুক্ত, নির্বাক এবং গম্ভীর স্বরবান হবে নাট্যমণ্ডপ। নির্বাত এবং গুহাকার হবার জন্যে গীতবাদ্যধ্বনি সুগম্ভীর হ'য়ে শ্রুত হবে। রংগগৃহের চতুর্দিকে আধুনিক ব্যালকনির মতো দ্বিতীয় তল নির্মিত হবে। রংগপীঠের নিকট থেকে দ্বারদেশ পর্যন্ত ক্রমোন্নত সোপানাকৃতি অর্থাৎ গ্যালারির মতো আসনশ্রেণীর ব্যবস্থা থাকবে। ইষ্টকের দ্বারা সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণের পর ভূমিভাগকর্ম, ভিত্তিকর্ম দারুকর্ম, ভিত্তিলেপকর্ম, সুধাকর্ম, চিত্রকর্মাদির দ্বারা নাট্যগৃহকে সুগঠিত এবং সুদৃশ্য করার নির্দেশ দিয়েছেন ভরত—

'ভিত্তিকর্মবিধিংকৃত্বা ভিত্তিলেপং প্রদাপয়েৎ।
সুধাকর্মবহিস্তস্য বিধাতব্যং প্রযত্নতঃ॥
ভিত্তিষথ বিলিপ্তাসু পরিমৃষ্টাসু সর্বতঃ।
সমাসু জাতশোভাসু চিত্রকর্ম প্রযোজয়েৎ॥
চিত্রকর্মাণি চালেখ্যাঃ পুরুষাঃস্ত্রীজনস্তথা।
লতাবন্ধাশ্চ কর্তব্যাশ্চরিতং চাত্মভোগজম্॥'

ভিত্তির দ্বারা দেয়াল, ভিত্তিলেপের দ্বারা প্লাস্টারিং, সুধাকর্মের দ্বারা চূর্ণকামকরা, চিত্রকর্মের দ্বারা বিলিপ্ত ও পরিমার্জিত সমতল ভিত্তির ওপর স্ত্রী-পুরুষ এবং প্রাকৃতির দৃশ্যাদির অংকন করাই বোঝাচ্ছে।

সোপানাকৃতি দর্শকাসন নির্মিত হবে ইষ্টক এবং কাষ্ঠ দিয়ে। প্রথম শ্রেণীটি হবে ভূমিভাগ হ'তে একহাত উঁচু, যাতে রংগপীঠ সহজে অবলোকন করা চলে। এই সম্বন্ধে তিনি বলছেন—

'স্তম্ভানাং বাহ্যতশ্চাপি সোপানাকৃতিপীঠকম্।
ইষ্টক-দারুভিঃ কার্যং প্রেক্ষকাণাং নিবেশনম্॥
হস্তপ্রমাণৈরুৎসেধৈর্ভূমিভাগসমুত্থিতৈঃ।
রংগপীঠাবলোক্যং তু কুর্যাদাসনকং বিধিম্॥

নাটকীয় মূলরসানুযায়ী বর্ণবিশিষ্ট ছিদ্রবিহীন অথচ সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড রংগভূমির পশ্চাদ্ভাগে শোভা পেতো। যাকে বলা হ'ত যবনিকা। আদিরসে শ্যামবর্ণ, হাস্যে শ্বেতবর্ণ, করুণে ধূম্রবর্ণ, রৌদ্রে রক্তবর্ণ, বীরে স্বর্ণবর্ণ, ভয়ানকে কৃষ্ণবর্ণ বীভৎসে নীলবর্ণ, অদ্ভুতে পীতবর্ণ এবং শান্তরসে ইন্দুকুন্দধবলবর্ণের যবনিকা ব্যবহৃত হ'ত। আবার কেউ কেউ সর্বরসেই অরুণবর্ণের যবনিকা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্রুত প্রবেশের সময় যবনিকার সবেগ আন্দোলনকে বলা হ'ত অপটিক্ষেপ।

নেপথ্য থেকেই নাটকীয় নেপথ্যোক্তি এবং আবশ্যকস্থলে কোলাহলাদি করা হ'ত। আলংকারিকেরা অভিনেতৃবর্গের প্রবেশ ও প্রস্থানের দু'টি দ্বারপথের উল্লেখ ক'রেছেন। নেপথ্য থেকে রংগমঞ্চে প্রবেশের সময় দু'টি সুন্দরী কুমারী উক্ত দ্বারসম্মুখস্থ যবনিকা সরিয়ে পথ ক'রে দিতো। এই দ্বার দু'টির মধ্যস্থলেই সম্ভবত যন্ত্রবাদকদের বসার স্থান থাকতো।

এই সুগঠিত রংগমঞ্চে আংগিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক—এই চতুর্বিধ উপায়ে অভিনয়ের পূর্ণতা সম্পাদনে তাঁরা নিরত হতেন। অংগের দ্বারা নিষ্পন্ন অভিনয় হচ্ছে আংগিক, বাক্যের দ্বারা বাচিক, বেশ রচনাদির দ্বারা আহার্য এবং স্তম্ভ-স্বেদাদি ফুটিয়ে তোলার দ্বারা সাত্ত্বিক অভিনয় সম্পাদিত হ'ত। এর মধ্যে অভিনয়ের সর্বাধিক সাফল্য নির্ভর করে আহার্যের ওপর—এই কথা বলছেন নাট্যশাস্ত্রকার এবং তদীয় ভাষ্যকার উভয়েই। নাটক দৃশ্যত্বের ওপরই বেশি নির্ভর করে বলে মঞ্চকল্পনার গুরুত্ব সর্বাধিক মঞ্চের জগৎ—কলাকৌশলে রচিত বাস্তব জগৎ—অর্থাৎ বিধাতার সৃষ্ট বাস্তব জগতের illusion অথবা মায়ামাত্র। এই মায়াসৃষ্টির ওপরেই অভিনয়ের সার্থকতা। আর এই মায়াসৃষ্টিতে সর্বাধিক সহায়তা করে আহার্য-অভিনয়। পুস্তবর্ম অর্থাৎ নানাবিধ সেট এবং মূর্তিনির্মাণ, অলংকরণ, অংগরচনা অথবা বর্তমানের painting এবং সজীব অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে মঞ্চে জীবন্ত জীবাদির সমাবেশ প্রভৃতি আহার্য-অভিনয়ের আওতায় পড়ে। হাল্কা বস্তু দিয়ে পর্বত, রথাদি নির্মাণ ক'রে বাস্তবের মায়াসৃষ্টির জন্যে মঞ্চে সন্নিবেশ করে অভিনয়কে যতদূর সম্ভব realistic করার নির্দেশ দিয়েছেন ভরত। এই প্রসংগে বর্তমানের জনৈক বিদগ্ধ সমালোচকের কথাগুলো বিশেষ স্মরণীয়।—

'It, however, must be assumed that as models of hills and palaces have been prescribed by Bharat to be used on the stage, and as these were actually used, there were certainly some means for the shifting of such pustas. In ancient Indian theatre, neither there was any painted scene nor even the possibility of producing any light effect. In creating dramatic illusion, actors in these days had to depend mainly on their voice and skill in recitation and partly on dance, music, make-up and costumes. Conditions of stage representation prevalent in a particular age are mainly responsible for the particular pattern of dramatic literature produced in that age. This is why we come across numerous descriptions of time and place in rhythmic prose and verse in any Sanskrit drama. Shakespeare used long soliloquies and descriptive

বি, এফ, জে-এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসবে বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতী সুচিত্রা সেন

passages in his dramas mainly to overcome the handicap imposed upon by the want of painted scene and suitable light arrangement in Elizabethan stage. Indian seers and artists, however invented the use of suggestive sets with pustas to overcome this difficulty long before the Europeans could conceive of it. It is really interesting that centuries before the use of even painted hanging scenes by European theatres, not to speak of the most modern device of se's, ancient Indian theatre attained success in creating dramatic illusion with suggestive sets.'

(S. Chatterjee *Our heritage* IX, Part II. P. 81)

পুস্তব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল দর্শকের হৃদয়ে ব্যঞ্জনা উদ্রিক্ত করা। বর্তমানে যেমন কোথাও কোথাও শুধু বিদ্যুতের খেলা এবং মঞ্চকলার যাদুর দ্বারাই দর্শককে মুগ্ধ করা হয়, তখন কিন্তু তা হ'ত না। দর্শককেও ভাবতে হবে, তার হৃদয়ের সুপ্ত রসবোধকে জাগ্রত ক'রতে হবে—এই ছিল নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ। এই প্রসংগে বলা চলে—

'The object of a dramatic presentation, according to the Indian ideal, is to evoke an aesthetic pleasure in the minds of the spectators and the propounders of theories in ancient India were fully conscious about the limitation of realism in the matter. In fact, stark realism was never favoured in any form of Indian art. This shows that ancient Indian theatre was very cautious regarding the use of accessories and a harmonius blending of the realistic and suggestive practices—was the result.' (ঐ)

হিন্দী চিত্র 'বিদ্যাপতির' নায়িকা—শ্রীমতী সিদ্ধি

নাটকে একদিকে রয়েছে রসস্রষ্টা, আরেকদিকে রয়েছে রসভোক্তা—আর এদের মাঝখানে রয়েছে মঞ্চ ও অভিনেতা। রসভোক্তা তথা দর্শকের সম্বন্ধেও আমাদের এই অধিকারবাদের দেশে কিছুটা বাছ-বিচার ছিল। অপরিচিত, শস্ত্রপাণি, অনাচারী, পীড়িত, পাষণ্ড এবং যারা অভিনয়ে অনভিজ্ঞ, নাট্যসভায় তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অযোগ্য পাত্রে রস পরিবেশনে তাঁরা ছিলেন নারাজ।

মধ্যস্থ, সাবধান, অচঞ্চল, ন্যায়বাদী, নিরহংকার, রসভাবাভিজ্ঞ, সানন্দচিত্ত এবং গুণদোষ নিরূপণে অভিজ্ঞ কলারসিকেরাই নাট্যসভার সদস্যপদ লাভে যোগ্য বিবেচিত হ'তেন। আমাদের আলংকারিকদের ভাষায় দৃশ্য-শ্রব্যসকল কাব্যেরই আবেদন সহৃদয়ের নিকট। আর সেই সহৃদয়ত্ব প্রভৃত অনুশীলন সাপেক্ষ। সহৃদয়ের সংজ্ঞাবিশ্লেষণে আলংকারিক বলছেন—

'যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ বিশদীভূতে কাব্যমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তেহত্র হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।'

'কাব্যের নিয়ত অনুশীলনের অভ্যাসবশে যাঁদের মলিন চিত্তদর্পণ স্বচ্ছ হ'য়ে গেছে এবং ফলে যাঁর শুদ্ধ হৃদয়-দর্পণে কাব্যবর্ণিত বস্তুর বিম্ব সুন্দরভাবে প্রতিবিম্বিত হয় এবং সেই প্রতিবিম্ব দর্শনে যিনি আনন্দে তন্ময় হ'য়ে যেতে পারেন, তিনিই সহৃদয়। তাঁরা ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর কাব্যরস পরিবেশন ক'রতেন এই সহৃদয় সহমর্মীদেরই জন্য। আর, এই নাট্যবেদের যাঁরা প্রয়োগ ক'রবেন, তাঁদেরও হতে হবে মহর্ষি ভরতের ভাষায়—'কুশলা যে বিদগ্ধাশ্চ প্রগল্ভাশ্চ জিতশ্রমাঃ'—সুনিপুণ, বিদ্বান, সাহসী এবং পরিশ্রমী।

মানুষের ঊষর জীবন-মরুতে আনন্দের অভিষিঞ্চনই হ'ল নাটকের কাজ। যুগযুগান্ত ধ'রে মানবসমাজ এই আনন্দের সন্ধানে ক'রেছে যাত্রা। নিখিল জ্ঞান, শিল্পকলা, যোগ এবং বিদ্যার আকর: ধর্ম, যশ এবং বুদ্ধির বিবর্ধক; লোকোপদেশজনক, সকল আর্তজনের বিশ্রান্তিজনক এবং আনন্দদায়ক হ'ল এই সার্থক নাটক—

'দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাম্।
বিশ্রান্তিজননং কালে নাট্যমেতদ ভবিষ্যতি॥
ধর্ম্যং যশস্যম্ আয়ুষ্যং হিতং বুদ্ধিবিবর্ধনম্।
লোকোপদেশজননং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি॥
ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
নাসৌ যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেঽস্মিন যন্ন দৃশ্যতে॥'

(না-শা-১।১১৪-১৬)

আর, রসপিপাসুরা এই নাট্যরস আস্বাদন ক'রে 'আনন্দে করুক পান সুধা নিরবধি।'*

* ৬ষ্ঠ বংগ নাট্যসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে বিশ্বরূপা রংগমঞ্চে ৩০শে মার্চ, ইং ১৯৬৪ বিশেষ আমন্ত্রণে প্রদত্ত ভাষণ।

ব্রাগুন। এখন তাদের কেমন লাগে?

মিলার। বর্তমানে তাদের অনেক সৃষ্টি অত্যন্ত মৃদু, একটু অভিনয়-সচেতন এবং নিরীহ মনে হয়—যদিও তারা পুরাতন ভাবরীতির ধারা ও স্টেজের আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। তাদের অনেকগুলিই খুব ভালো কাজের রীতি খুব ভালো—বোধ হয় আমাদের বর্তমান জগতের তুলনায় অতিরিক্ত ভালো। ও'নীলের অনেক লেখা এখন যথার্থতর মনে হয়, বোধ হয় আমরা ওঁর স্নায়ুপীড়ার অংশীদার। তা ছাড়া ওঁর লেখা ত' আত্মগত। অপররা তাদের নিরুদ্ধ মনের ছবি রঙ্গমঞ্চে দেখাতে চায় নি। তাই তাদের অত্যন্ত শীতল মনে হয়। ও'নীল আমাদের মতো সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর। আর ওরা জনবক্তা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এভাবেই ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেছে। আমরা এখন আত্মগতভাবই চাই কিন্তু ওরা গঠনশিল্প, রসপূর্ণ কথাবার্তা, লোকের হাবভাবের সম্বন্ধে মন্তব্য, প্রতিমাভঙ্গ এসব পছন্দ করতো। ও'নীলের লেখাও মাঝে মাঝে এই রকম ভাবে লিখে নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তার অন্তর্জীবনের ছাপ দর্শনীয় ও তা মনকে নাড়া দেয়।

মনরো-মিলার সাক্ষাৎকার-৬

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

হেনরি ব্রাগুন

এই সব লেখকদের কতগুলি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ত্রিশদশকে হয়েছিল কিন্তু সে যুগ যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সুরে বিশেষত্ব লাভ করেছিল—তার মধ্যে কিলফোর্ড অডেটস্ এবং লিলিয়ান হেলম্যান প্রধান। সামাজিক নাট্যকাররা তখনও গঠনশিল্পী—তারা জনগণের কথাই বলে, কিন্তু অডেটস ও হেলম্যানের অন্তরের নিরুদ্ধ ভাষাও রূপ পেয়েছিল—তারা ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করেছিল ফ্যাসিস্টকালীন জনমনের যন্ত্রণা। ওজেট একটা নূতন কাব্যময় ভাব—আর সেই গন্ধ যেন জীবনের চেয়েও বড়। হেলম্যানের সুন্দরভাবে সাজানো নাটকে গতি ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। এই দু'জন লেখকেরই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছেন—তাদের কাজ থেকেই তা চেনা যায়—কিন্তু প্রতীকগুলি প্রায়ই এতটা ত্রিশদশকধর্মী ছিল যে, যখন সেই সামান্য রাজনৈতিক বিক্ষোভ যুদ্ধে পরিণত হলো তাদের পৃথিবী পুরোণ হয়ে গেল। আমাদের বিচার করে দেখা উচিত সত্য-ই তাই কি না? এই সব নাটকগুলি আমার হৃদয়কে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল এবং ভালোবাসার সঙ্গে আজও স্মরণ করি।

একথা মনে রাখা উচিত যে, কেবলমাত্র বামপন্থীরা সামাজিক নাটক লেখেন নি। ম্যাক্সওয়েল এণ্ডারসন, শেরউড, রাইস, সিডনি হাওয়ার্ড এমন কি বারম্যান ও ব্যারীও এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ফ্যাসিজম ও কম্যুনিজমের বিরোধ নিয়ে লিখেছেন। আমার মনে হয় অডেটস ও হেলম্যান এই বিষয়বস্তু নিজেদের একক কল্পনায় দেখেছিলেন। এজন্যই এটা তাঁদের যুগের মনে হয়েছে। আসলে এভাব 'ডিপ্রেসনের' সময়ে সাবালক হয়ে ওঠে।

চল্লিশ শতকের পরিণতির সূত্রে আমরা দেখি নাট্যকারদের আত্মপ্রচারের অন্তরঙ্গতা দিন দিনই গভীরতর হয়েছে—এবং গঠনশৈলী ও রঙ্গমঞ্চের নীতির দিকে তাঁরা কম নজর দিচ্ছেন। এই হিসেবে ও'নীল-ই নায়ক—চিরস্থায়ী ভিত্তি। তাঁর সৃষ্টিও আমাদের মতো অজীর্ণ ফ্রয়েডীয়বাদ, নিগ্রো সমস্যা, সমাজতন্ত্রবাদের ভাণ, সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ এবং সেই রকমই অপ্রচলিত অশ্লীলতা, বিশ্রী কৌশল ও অতি নাটকীয়তায় কলুষিত। কিন্তু তিনি নিজে মুহূর্তের জন্যও তলিয়ে যেতে পারেন নি—আমরা তাঁর অন্তরের কথা শুনতে পাই—তাঁর নানা সুরে সাড়া দিই। তাঁর আত্মকরুণা, তাঁর যন্ত্রণাময় জিজ্ঞাসা, তাঁর নির্মম সন্দেহ রঙ্গমঞ্চসুলভ সমাধানকে ঢেকে দেয়। আর সব লেখকরাও তাঁদের নাটকে বন্দী হয়ে আছেন।

চল্লিশ এবং পঞ্চাশ কুজ্‌ঝটিকার যুগ। এর জন্য প্রধানত দায়ী টেনেসী উইলিয়াম। আমার একটি পা'ও এই স্রোতে। এ হচ্ছে নিষ্ঠুর, রোমাণ্টিক স্নায়ুপীড়া, সমসাময়িক জীবনকে আত্মার মধ্যে যুদ্ধে লিপিবদ্ধ করা। ব্যক্তিই জয়লাভ করেছে। সমস্ত সংঘাতই যৌন-সংঘাতে রূপান্তরিত হয়েছে। পরিপ্রেক্ষি দিন দিনই বাস্তবানুযায়ী হচ্ছে। কারণ হয় এতে সমাজের খুব বেশি স্থান নয় তো সমাজকে একদম বাদ দেওয়া হয়। এর গুণ স্পর্শপ্রবণতা বিস্তার ক্ষমতায়—এখানে স্পর্শপ্রবণতা অর্থে আমি ভাবানুভূতি বোঝাচ্ছি।

এখন এটা চপলবিজ্ঞতার বিপজ্জনক আতিশয্যে চলে গেছে। এ যেন নীল-আকাশের নাটক বিশেষত কয়েকটি নূতন লেখকদের নিকট। যৌন-সংঘাত এতটাই পৌছতে পারে—আর বেশি নয়, এটা এখন ডাক্তারী শাস্ত্রের আওতায় এসে যাচ্ছে। নাটককে নিজের অন্তর্জীবন পরিত্যাগ না করেও রৌদ্রালোকিত জগতে পথ করে নিতে হবে। প্রত্যেক আবিষ্কারই শেষে নিয়মবদ্ধতায় পরিণত হয়। আমি বলতে চাইছি পূর্ণতার পথে যেতে গিয়ে পুনরাবৃত্তি ও নিজেকে সংস্কার করতে হয় যতক্ষণ না অন্তত এটা ভবিষ্যদ্বাণীর মতো শোনায়। প্রথম বারে অন্তর্ভেদী চীৎকার ধীরে ধীরে অভ্যাসগত ক্রন্দন কিংবা আত্মসচেতন কোঁপানীতে পরিণত হয়েছে। অনেক সময়ে মনে হয় এই রকম আত্মসচেতন ইচ্ছার জোরকরা কবি,

উত্তমকুমার প্রযোজিত 'ছোটিসে মুলাকাত' চিত্রের নায়ক উত্তমকুমার ও নায়িকা বৈজয়ন্তীমালা।

নিয়তির শিকার এবং কুজ্‌ঝটিকার চেয়ে সেই আগের মতো একগাদা ছাদ দেখাই ভালো। কিভাবে যে এটা ঘটবে—আরও বেশি প্রতীকতার প্রকাশের পথে অথবা বাস্তবতার পুর্ণজন্মে (চিরাচরিত ধারণানুযায়ী বলছে) তা জানি না—কিন্তু যেভাবেই হোক নাটককে ইন্দ্রিয়স্পর্শ থেকে মুক্ত হয়ে ভাগ্যের জগতে নিজেকে দাঁড় করাতে হবে এবং ভাগ্যই হচ্ছে প্রতিপক্ষ।

ব্রাগুন। আপনি যেন বলতে চাইছিলেন যে ও'নীল এক পাশে···

মিলার। ও'নীল একদিকে ছিলেন, কারণ বিশ-ত্রিশ দশকের মেজাজ ছিল অধামিক। মূলত তাদের জগৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য—তাঁর অতীন্দ্রিয়। একটি ব্যক্তি ও ভাগ্যের (এর চেয়ে ভালো শব্দ খুঁজে না পেয়ে এটাই ব্যবহার করছি) মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা তাঁর মতো আর কোন নাট্যকারের ছিল না—অন্তত আমার জানা নেই। সেটাই ছিল তাঁর চিন্তার প্রধান বিষয়—এবং তিনি সর্বদা তাই নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। তিনি একহাতে আধুনিক সাহিত্যের চিরাচরিত সমস্যাগুলির সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন—কিন্তু তিনি সর্বদা ঈশ্বরের বানের কাছে গুঞ্জরণ করেছেন। সেই পরম অজানাকে মন থেকে মুছে ফেলবার অক্ষমতার আশীর্বাদ তিনি পেয়েছিলেন।

ব্রাগুন। আপনি কি স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর দি গডট' দেখেছিলেন।

মিলার। আমি পড়েছি। কখনও দেখতে যাই নি। ঐ নাটকটার বৈপ্লবিক ভাবের জন্য আমার ওটা খুব ভালো লাগে। এটা খুব অন্তরঙ্গ বক্তব্য—রঙ্গমঞ্চে করা খুবই কঠিন এবং সেই সময়ের সারাংশ। এতে অনুভূতি আছে—বুদ্ধিও আছে। কিন্তু আমি এর সমাপ্তি কোথায় জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করছি—এই শিল্পকৌশল, এই আকার এবং অনেক অভিজ্ঞতা অনুবাদের সমাপ্তি কোথায়? অর্থাৎ ভবিষ্যতে এ কতটা টিকে থাকবে। আমি অনুভব করি যে পরিত্যক্ততা এর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। এতটা বস্তু-নিরপেক্ষতা—তা যেভাবেই লেখা হোক না কেন শূন্যতা আসতে বাধ্য এবং এটা করাই ওদের মনোগত ইচ্ছা। এবং আমার মনে হয় না এটা অন্যান্য মনোভাব গ্রহণ করবার মতো নমনীয়। আমি সমালোচনা করছি না—শুধু বিবরণ দিচ্ছি। আমার মতে সমালোচনা সম্পূর্ণভাবে নিজের সাংস্কৃতিক স্তরে সীমায়িত থাকবে। এটাই যুক্তিসঙ্গত এবং উচিত। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি যে আমি এলিজাবেথীয় যুগে থাকতে চাই। রাস্তার ওপরের ঠিকানা মাত্র। শুধু সৌন্দর্যবর্ধন—প্রয়োজন নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন—দুই-ই ঠিক।

ব্রাগুন। আমার মতে আপনি ও সাঁত্রে বর্তমান যুগের দু'টি শক্তিশালী নাট্যকার। আপনার ও ওঁর মধ্যে তফাৎ এই যে, ওঁর লেখায় আদর্শের প্রাধান্য।

মিলার। আমাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এক নম্বর,

সন্ধানী পরিচালিত 'অয়নান্ত' চিত্রে নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী ও নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আমি এমন একটা সংস্কৃতির মধ্যে লিখছি—যেখানে ভাববাদের প্রাধান্য নেই। এরা জানে না এরা কি করছে। একটি সাধারণ লোক কিংবা বিরাট প্রতিষ্ঠান দু'য়ের পক্ষেই এটা সত্য। আমার নিজের অভিজ্ঞতার থেকে আমি তা জানি।

ফরাসী দেশের লোকরা খুব ভালোভাবেই জানে যে, নিজেদের জীবন সম্বন্ধে সচেতন না হলেও তা যেভাবেই হোক বস্তুগতভাবে চিত্রণ করা সম্ভব। মানে, তারা ভেবে নেবে যে 'কেউ' জানে তারা কি করছে এবং বলতে গেলে এটা ঠিক নিয়মতান্ত্রিক কাজ। এখানে এটি বিলাস—কয়েকটি হুজুগে লোক হয় তো এতে মাততে পারে, কিন্তু কোন ফল হবে না। তুমি জানলেই বা কি আসে যায়? আমরা এখানে প্রয়োজনে বিশ্বাস করি। আমরা প্রয়োজনের প্রভুভক্ত ক্রীতদাস। প্রয়োজনকেই এখানে সত্যের সম্মান দেওয়া হয়। কিন্তু, কখনও কখনও লোককে অপরিহার্যতার সঙ্গে যুক্ত করতে হয়।

ব্রাওন। এটা কি কতকটা অ-বুদ্ধিজীবী মনোভাব নয়?

মিলার। এই দেশের বস্তুবাদ সম্বন্ধে যে অভিযোগ আছে তার সম্বন্ধে আমি স্পষ্টভাবে মত জানাতে চাই। আমি বিশ্বাস করি কয়েকজন ইংরেজ ও ইয়োরোপীয়ের ধারণা বিকৃত জ্ঞান থেকে লব্ধ।

আমি নিজে অনুভব করি যে, আপনারা ভাবতেই অবাক হয়ে যান যে এখানে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নেই। কিন্তু এ সত্যের কারণ হয় তো যে আমরা কোন ব্যাপারের নামাকরণ করতে চাই না—তাকে শ্রেণিবদ্ধ করতে চাই না।

উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি অন্যান্য দেশের লোকরা কি বুঝতে পারে যে বুদ্ধিজীবীরা কি করে? কিন্তু বাইরে অনেক লোক আছে যারা বুদ্ধিজীবীর নামেই মাথা নীচু করতে শিখেছে। আমার সেই নাপিতটার কথা মনে পড়ছে যার কাছে আমি যেতাম। সে বছরের পর বছর আমার চুল কেটেছে, কিন্তু কখনও 'কেমন আছেন', 'ধন্যবাদ' ছাড়া কোন কথা বলে নি যতদিন না আমার ছবি 'ডেইলি নিউজে' ছাপা হোল—সেবারে বোধ হয় আমি একটা পুরস্কার পেয়েছিলাম—এই রকম কিছু একটা হবে। ও ছিল ইটালিয়ান কোনরকমে ইংরাজী বলতো—তখন ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ডি এনানজিওর নাম শুনেছি কি না? আমি বললাম তার লেখা পড়েছি। তখন থেকেই ওর চোখ জ্বলে ওঠে এবং তারপর যখনই আমি দোকানে এসে ওর চেয়ারে বসতাম ও আমার দিকে তাকিয়ে অন্তরঙ্গ, মধুর হাসি হাসতো এবং মাথা নেড়ে বলতো, ডি এনানজিও। আমিও হাসতাম এবং ও আগের চেয়ে অনেক যত্নে চুল কেটে দিত। আসলে সে ডি এনানজিওর লেখা সম্বন্ধে কিছুই জানতো না—কিন্তু ঐ নামটাতেই জাতীয় গর্ব ও পূর্ণতা অনুভব করতো। ডি এনানজিও তার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

ব্রাওন। আপনি 'ডি এনানজিও'কে জানেন বলে ঐ নাপিতটার চোখে বুদ্ধিজীবী বলে প্রতিভাত হলেন।

মিলার। ইটালীর জনসাধারণের চোখে ডি এনানজিও নামটির যা অর্থ এখানকার লেখকদের তেমন কিছু নেই। কিংবা রুশীয় এবং অনেক ফরাসী লেখকদের মতো কোন লেখক নিজেকে জাতীয়তা অথবা ঐ ধরণের কোন ভাবে প্রকাশের মুখপাত্র ভাবে না। এক কথায়, আমাদের কোন সামাজিক স্থান নেই—শুধুমাত্র আমোদ-সৃষ্টিকারী কিংবা কখনও গভীর চিন্তাবিদ বা প্রচুর রোজগেরে।

অর্থের দ্যোতনার দিক দিয়ে এটা অবশ্য অ-বুদ্ধিজীবী মনোভাব—কিন্তু তাই বলে ঘৃণা বা অবজ্ঞার বিষয় নয়। সত্য কথা এই যে, একমাত্র যুদ্ধের সময়ে সৈনিকবৃত্তি ভিন্ন আর কোন বৃত্তি জাতীয় শোভার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। তা ছাড়া, ফরাসী অথবা অপরাপর ইয়োরোপীয় জাতির মতো আমাদের 'আমেরিকার সংস্কৃতি'র সম্বন্ধে সচেতনতা নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমরা নাটক, চলচ্চিত্র, ছবি, গানের কোন মূল্য দিই না। সহজ কথা এই যে, জাতীয়তাবাদের কোন ছাপ না লাগিয়েই তাদের উপভোগ করা হয়। আবার বলছি, আমরা নামাকরণ করি না—শুধু সেগুলি করি।

এর ভালো-খারাপ দু'রকম ফলই আছে। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে এতে দেশকে ফেরিওয়ালার বাসা মনে হয়। জনগণের স্বীকৃতি না পাওয়ায় কোন কোন বুদ্ধিজীবী নিজেদের চারিদিকে অস্বাভাবিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং হীনমন্যতা বোধ তাদের মনে একাকিত্ব, হতাশা ও দুর্বলতা সৃষ্টি করে। বোধ হয় এর সর্বাপেক্ষা খারাপ ফল দেখা গিয়েছিল ম্যাকার্থারের সময়ে—যখন মানবের অস্তিত্বের মূল কথাগুলিই বলবার প্রয়োজন ছিল বুদ্ধিজীবীদের এমন

'ভোজপুরী' চিত্র 'কে তুমি'র নায়িকা—শ্রীমতী সুরেখা

এক জনতার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল যারা উপদেশ শুনতে অভ্যস্ত নয়।

তবুও আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি, বুদ্ধিজীবী পূজারী জার্মানীজাত নাজিবাদের সামনে কি করতে পারলো কিংবা পাঁচ বৎসর আলজেরিয়া যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের সামনে ফরাসীরা কি করছে? রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে অনেকে অবাক হয়ে ভাববে যে হয় তো বুদ্ধিজীবীরা শাসনতন্ত্রের কোন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হলে, অপরিহার্যভাবে তাকে সরকারের জন্ম ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

এক কথায় আমাদের অবহেলাই করা হয়, ব্যতিব্যস্ত করা হয় না। কিন্তু সবাই তো অবহেলিত। আমার সন্দেহ হয় এদেশে কোন একটি বৃত্তি জনসাধারণের নিকট থেকে প্রাপ্য ধন্যবাদ অথবা স্বীকৃতি পায় কি না? এতে ব্যবসায়ীরা আছে যারা সর্বদা বৃত্তিগত হীনমন্যতাবোধে, হিংসা ও ক্রোধে ভোগে—যে শিল্পীরা সর্বদা জনগণের কাছ থেকে সমাদর পাচ্ছে।

এতে যে উপকার হয় (যদি উপকার নাম দেওয়া যায়) তাও যথেষ্ট। ঐ এক ধরণের স্বীকৃতি না পাবার ফলে আমরা দায়িত্ব থেকেও মুক্ত হতে পারি। অসহিষ্ণু সমালোচক দ্বারা আক্রমিত অথবা প্রতিরোধিত না হয়ে আমরা যেমনি খুশি লিখতে পারি। এখানে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই—অন্ততঃ অধিকাংশ মনে নেই। তাই সাহিত্য জীবনকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করে।

ব্রাগুন এতে কি শিল্পিমন নিরুৎসাহ হয়ে যায় না?

মিলার। হ্যাঁ। মুস্কিল এই যে শিল্পীর পথে নিজেকে একথা বোঝানো কষ্টকর যে তার বৃত্তি একটা তুচ্ছ চাপল্য নয়। আমার মনে হয় যে আমেরিকার মনোবৃত্তির এটাই সর্বাপেক্ষা বড় অবকাশ। এ থেকে বাঁচবার জন্য শিল্পীকে দাঁতে দাঁত চেপে আত্মসম্মান রক্ষা করতে হয়—কখনও হয় তো লাভ করবার মুহূর্তেই—কারণ খুব বাজে ব্যাপার ছাড়া সম্মান পাওয়া যায়—কিংবা হয় তো এই জয়ের পেছনে দীর্ঘস্থায়ী তিক্ততা থাকে। কিন্তু জনগণ যদি বুদ্ধিজীবীদের একটা মূর্তি তৈরি করে তাহলেই কি প্রমাণিত হবে যে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের নিবিড় সম্পর্ক আছে? যদি উদাহরণস্বরূপ ইয়োরোপকে ধরা যায় তা হলে আমি সন্দেহ প্রকাশ করবো। আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় শুনেছি বুদ্ধিবাজের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা নোংরা লোকের কাছ থেকে তীব্র প্রতিবাদ।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর একটিমাত্র প্রয়োজনীয় সুবিধা যে, শিল্পীকে এই ভাব জয় করবার মতো জোর দেয়। যা সাধারণ অভিজ্ঞতা প্রকাশ না করে সে কাজ পছন্দ না করাও যখন তারা অন্যমনস্ক তখন তাদের আঘাত করতে হবে। তোমাকে এটা তাদের কাছে সত্য করে তুলতে হবে যে ভাবে রাজপথের পার্শ্বস্থ পথগুলি সত্য—তোমার লেখা সাহিত্য বলেই তারা গ্রহণ করবে না—তোমাকে তাদের মনে এখনও

আর ডি বনশল প্রযোজিত 'মেরে মন মতুয়া' চিত্রে কুমারী নাজ, অনুভা গুপ্তা ও রবি ঘোষ।

যেটুকু জাগ্রত ও জিজ্ঞাসু আছে তার নিকট বার্তা পৌছে দিতে হবে। এই প্রকার যুদ্ধাহ্বানে কবিতার মতো সুকুমার কলা নষ্ট করে দিতে পারে—কিন্তু নাটক ও উপন্যাসকে পুরুষোচিত দৃঢ়তা দেয়। অবশ্য এ তাদের পেশী দৃঢ়, মর্মরনাদী, চীৎকারমুখর এবং স্পর্শপ্রবণ করেও তুলতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যা বলতে চাইছি তা হোল যে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ক্ষতিকর নাও হতে পারে।

ব্রাউন। ইয়োনস্কো ও বেকেটের মতে নির্ভেজাল বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে আপনার কি মত?

... : ফটো-নৃপেন দত্ত

মিলার। আমার মতে ওঁরা নাট্য-বিরোধী, ওঁরা কি বলতে চান তা আমি জানি। সেই একই কথা—ইচ্ছাশক্তির শেষ—ধারণাক্ষম মানবের গোধূলি। ওঁরা সাহিত্য থেকে উচিত শব্দটা বাদ দিয়েছেন। জীবন প্রকৃতপক্ষে অদ্ভুত এবং যখন কেউ সেই অদ্ভুতত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে তখনই সে সবচেয়ে প্রাণবন্ত হয়। মানব এবং তার অস্তিত্ব পরস্পর শত্রু এবং এর মধ্যে কোন আপোষের কথা ভাবা যায় না।

ব্রাওন। কিন্তু ইয়োনস্কো বলেন যে শিল্পের মূলে আদর্শবাদ থাকতে পারে না।

মিলার। আমিও তা বিশ্বাস করি। কিন্তু এত চরম সূত্র কাজে লাগবে না। আমি বিশ্বাস করি না যে লেখকের জানার পরিধি তাকে লেখায় অথবা তার সাহিত্যসৃষ্টি করে। কিন্তু আমি কেন মানবের অবচেতন জীবন—যা থেকে সাহিত্য খোরাক পায় এবং যা সাহিত্যসৃষ্টি করে—চিন্তাধারাকে অসম্ভব করে তুলবে? লেখকদের মধ্যে এইরকম বিশ্বাস আছে বলে মনে হয়। অনুভূত জ্ঞান বলে একটা জিনিষ আছে। আমি বুঝতে পারি না কেন কোন ধারণা বা আদর্শবাদ সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের পথে বাধা হবে। বরঞ্চ একে যদি ব্যক্তিগত দর্শনের পরিবর্তে ব্যবহার না করা হয় তবে এটা সঞ্জীবনী হতে পারে। ইয়োনস্কোর আদর্শ হীনতাবাদ আর একরকম আদর্শবাদ।

ব্রাওন। আপনার মতে আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছেচি।

মিলার। একটা কথা যে থিয়েটার আর বেশিদিন টিকবে না—অন্তত আমাদের দেশে। আকাশনীল নাটকেই ভবিষ্যতের সুর। আমরা জানি কি আশা করতে হবে—নাটকে আমাদের শোচনীয় পরাজয়—এবং স্নেহচ্যুত একাকিত্বের দলিল। হঠাৎ দেখতে পাব তারা পুরণো টুপি হয়ে গেছে। হয় তো, আমিই শুধু এভাবে ভাবছি—এবং হয়তো জীবনধারণ করা আর দু'বৎসর আগের মতো অসম্ভব নয় এবং এটা যতটা রাজনৈতিক ও সামাজিক সত্য ততটা নাটকীয় সত্য। আমি বলতে চাইছি যে, এখন আশা করা যায় যে মানবজাতি রক্ষা পেয়ে যাবে। মনে হচ্ছে দুইটি প্রবল শক্তি মানবজাতিকে ধ্বংস করবার প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। এ-কথা অবশ্য নিশ্চিত যে পৃথিবীময় সৌভ্রাত্র সম্প্রদায় করতে' হলে আরও অনেকদূরে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু শুধুমাত্র এই সত্য যে গত পাঁচ-দশ বৎসরের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকলেও যুদ্ধ না ঘটা এবং কিছু পদক্ষেপ করা যাতে মনে হয় এই দুই দেশের মধ্যে পূর্ণ মৈত্রীস্থাপন হতে পারে এবং সমগ্র পৃথিবীতে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন হয় তো যুদ্ধকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে। এই সবই দেশকে শোধন করবে যতদিন না এটা ভাবাবেগপ্রবণ লোকের জীবনের অংশ হয়ে উঠব—যারা কখনও খবরের কাগজ পড়ে না—এবং তারা জানবে না যে কেন কয়েক বৎসর আগের থেকে সব পৃথক মনে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকত্ব হতে রান্নাঘর পর্যন্ত লাইনটা বদ্ধ ও বক্র কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে। সামরিক শিক্ষার মতন একটি সহজ জিনিসের কথা ধরুন। যখন প্রতিটি আঠারো বছরের ছেলেকে সেজন্য নির্বাচন করা হচ্ছে এবং দু'তিন বৎসর তাদের শিক্ষার ক্ষতি হচ্ছে যা হোক এ একটি মানুষ তো···তার মনে নানারকম নিরুদ্ধ বিরক্তি মিশ্রিত ঘৃণা জেগে ওঠে। ছেলেটার মনে হয়—দুর ছাই, কেন এরা আমার সময় নষ্ট করছে কারণ আঠারো বছরের একটা ছেলের কাছে তিন বৎসর সমস্ত জীবন, একটা বিরক্তির ভ্রূকুটি মনে জেগে ওঠে—সব-ই বৃথা মনে হয়। সামরিক শিক্ষা অনেক কমানো হয়েছে। হয় তো শেষ পর্যন্ত প্রতি বৎসর কয়েকজন মাত্র নিয়েই হয়ে যাবে। শুধুমাত্র এই ব্যাপারটাই মনস্তত্ত্বের ওপরে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করতে পারে—শুধুমাত্র বালকটির নয় তার পিতামাতার শুধুমাত্র, পিতামাতার নয় চারিপাশের সকলের, আমি এরকম একটা বাজে উদাহরণ দিলাম। প্রতি মানসিকতায় পেছনেই প্রকৃত কারণ আছে, এই সবগুলি খুবই প্রয়োজনীয়—বাস্তব জগতের অসুন্দর অংশ—কিন্তু যারা ফলভোগ করে তাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়—এবং এরকম অনেক লোক আছে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চ এখনও যে অবস্থায় পৌঁছায় নি—দূরদৃষ্টির সেই গভীরতায়—যখন শুধুমাত্র আমাদের আটকে রাখা যন্ত্রণার মাকড়সার জাল না দেখে তার চেয়েও বেশি কিছু দেখতে পাই।

চারিদিকে বহুবিধ ইঙ্গিত থেকে বোধ হয় জোর দিয়ে বলতে পারি যে আমরা এখনও শেষ হয়ে যাই নি। এবং যে মুহূর্তে প্রকৃতই তা ঘটবে তখন অনেক নাটকের জুড়ে থাকা কালো হাওয়া অনুচিত মনে হবে। ঘটনা কি রকম তা কেউ দেখবে না—শুধু দেখবে রীতি।

সমাপ্ত

অনুবাদিকা—রাণু ভৌমিক

গৃহকোণে একা—শর্মিলা ঠাকুর

[বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময় সান্যাল, বীরেন ধর ও নৃপেন দত্ত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।]

ভারতীয় যন্ত্রের প্রকরণ

শ্রীপ্রভাকর সেন

ভারতবর্ষ সঙ্গীতের তীর্থ। প্রাচীনকাল থেকে এই আজকের বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষ সঙ্গীতে বিশেষ অধ্যায় যোজনা করেছে। বিশ্বের বৃহত্তম সঙ্গীতক্ষেত্র যে ভারতবর্ষ তা বোধ করি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণীয়। যাই হোক, ভারতের যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বহুজনের অবদান অসামান্য। এই যন্ত্রগুলির প্রকরণ সুবিশাল এবং অসংখ্য। সেই আদিকাল থেকে এই আজ পর্যন্ত বহুজনে বহু নূতন যন্ত্র সৃষ্টি করেছেন। সেই যন্ত্রগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র অনুসারে যন্ত্রগুলির বিভক্তিকরণ হয়েছে। রাজসভার জন্য, নহবৎখানার জন্য, যুদ্ধের জন্য, মঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। যন্ত্রের প্রধান শ্রেণীগুলির নাম :—ঐকতান যন্ত্র, সভ্য যন্ত্র, মাঙ্গল্য যন্ত্র, রণ যন্ত্র, ঘোষ যন্ত্র, গ্রাম্য যন্ত্র ও সওয়ারী যন্ত্র। আফগানিস্তান, কাবুল, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে কয়েকটি যন্ত্র ভারতবর্ষে এসেছিল এবং ক্রমে ক্রমে তা ভারতীয় যন্ত্র নামে অভিহিত হয়েছে।

ঐকতান যন্ত্রগুলি ঐকতান বাদনের জন্য নিযুক্ত ছিল। ঐকতান বাদন 'নওবৎ' বা 'নহবৎ' নামে সমধিক পরিচিত। ভারতে ঐকতান বাদন একটি বিশিষ্ট বস্তু ছিল। সেকালে নওবৎ বা নহবৎ যথেষ্ট উৎকর্ষ ও সমাদর লাভ করেছিল। সেকালে রাজা এবং সমস্ত ধনীদের গৃহেই নহবৎখানার ব্যবস্থা থাকত। ঊষাকালে এবং গোধূলিলগ্নে নহবৎ-খানায় নহবৎ বসত—এ ছাড়া ইচ্ছা ও ব্যবস্থানুযায়ী বা প্রয়োজনানুযায়ী অন্যান্য সময়ও বসত শোনা যায়। ভারতীয় নহবৎ-এর জন্য নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হত—১। সানাই ২। নাগড়া ৩। কাড়া ৪। টিকাড়া ৫। রণশৃঙ্গ ৬। করতাল ৭। নুই বা নৈ অর্থাৎ আফগানি বাঁশি ৮। আলগোজা ৯। রসনচৌকি ১০। কলম ১১। বাঁশি ১২। ডম্ফ ১৩। তরাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের মধ্যে কতকগুলি বহির্দেশ থেকে এসেছে।—

সভ্য যন্ত্র বলা হত তাকেই যা সদা-সর্বদা সভাতে ব্যবহৃত হত। রাজসভায়, দরবারে সভ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল। সভ্যযন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা :—১। স্বয়ংসিদ্ধ ২। অনুগতসিদ্ধ। যে সমস্ত যন্ত্র গান বা অন্য কোন বাদ্যের সঙ্গে অনুগত হয়ে বাজে না, সেগুলিকেই স্বয়ংসিদ্ধ বলা হয়। আর যেগুলি গান বা অন্য কোন যন্ত্রের অনুগত হয়ে বাজে সেগুলিকে অনুগত সিদ্ধ বলা হয়।

স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্রের তালিকায় পড়ে—১। রুদ্রবীণা ২। সরস্বতী বীণা, ৩। ত্রিতন্ত্রী বীণা, ৪। মহতী বীণা অথবা শারদীয়া বীণা, ৫। কচ্ছপী বীণা, ৬। কিন্নরী বীণা, ৭। রঞ্জনী বীণা, ৮। কাত্যায়ন বীণা, ৯। প্রসারণী বীণা, ১০। ময়ূর বীণা, ১১। পিনাকী বীণা, ১২। চিত্রা বীণা, ১৩। সপ্তস্বরা, ১৪। সুর সাং. ১৫। সুরশৃঙ্গার, ১৬। সুরবীণ, ১৭। রবাব, ১৮। কানুন, ১৯। বংশী ২০। এস্রাজ, ২১। তরব, ২২। দিলরুবা ইত্যাদি।

অনুগত সিদ্ধ-বিভাগের মধ্যে পড়ে—১। তম্বুরা বা তানপুরা ২। মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ, ৩। তবলা-বাঁয়া, ৪। ডম্ফ, ৫। মন্দিরা ও করতাল ৬। সারেঙ্গী ৭। মুচঙ্গ, ৮। খঞ্জরী ইত্যাদি।

উক্ত যন্ত্রগুলির মধ্যে রবাব, কানুন, তরব আরব দেশ ও কাবুল দেশ থেকে এদেশে এসেছে।—

মাঙ্গল্য যন্ত্র সাধারণত মঙ্গলসূচক অনুষ্ঠানে মঙ্গলাচরণের জন্য ব্যবহৃত হত। বিবাহ-উৎসব, পূজা-অর্চনা ইত্যাদির জন্য সময় সময় মঙ্গলধ্বনির সৃষ্টির প্রয়োজন হত। যে যন্ত্রের ধ্বনি মঙ্গল-সূচক তাকেই বলা হয় মাঙ্গল্য যন্ত্র। যেমন :—শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঝাঁঝ, মৃদঙ্গ, ঢোল, ভীর, শিঙারা প্রভৃতি—

যুদ্ধক্ষেত্রে উৎসাহিত করার জন্য যে সব যন্ত্রের ব্যবহার হত তাদেরকে রণ যন্ত্র বলে। জয়ঢাক (জয়ঢাক), দগড়া, দুন্দুভি, রণ-শৃঙ্গ, দামামা, গোমুখ, মহাশঙ্খ, পনব, ডম্ফ, তুরাই, কর্ণ প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে।—

রাজা-মহারাজাদের যুগে প্রায়শই বিভিন্ন বিষয় দেশময় ঘোষণা করার প্রয়োজন হত। ঘোষকরা কয়েকটি নির্দিষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করত; এই সহায়ক যন্ত্রগুলির নাম ঘোষ যন্ত্র। ভেরী, দুন্দুভি, দামামা ইত্যাদি যন্ত্রই ঘোষযন্ত্র।—

চিরকালই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার চেষ্টা করেছে দেশী বা গ্রাম্য-সঙ্গীত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য যেমন কয়েকটি নির্দিষ্ট যন্ত্র ব্যবহার হয় তেমনই গ্রাম্য বা দেশী সঙ্গীতের জন্যও কয়েকটি নির্দিষ্ট আছে। গ্রাম্য-সঙ্গীতের জন্য যে সব যন্ত্র ব্যবহার হয় তাদেরকে গ্রাম্যযন্ত্র বলে। যেমন :—মর্দল (মাদল), স্বরমঙ্গল, একতারা, দোতারা, সারিন্দা, আনন্দলহরী বা [illegible]বিগুবাগুব, বাঁশি (বংশী নয়), বেণু, বিভিন্ন প্রকারের বাঁশি, গোপীযন্ত্র, খোল (শ্রীখোল), বিণ্ডিমী (খঞ্জনী), ডম্বরু (বানর ও ভালুক নাচের

সঙ্গে ব্যবহৃত হয়), তুব্ড়ি (সাপুড়িয়ার বাঁশি), হুড়কা বা হুড়্কা, রামসিঙা, ঢোলক ঢোল ইত্যাদি।—

রাজা-বাহাদুরেরা যখন যুদ্ধভিন্ন অন্য কোন কারণে সজ্জিত হয়ে বহির্গমন করতেন তখন তাঁদের মনস্তুষ্টির জন্য রাজার হাতীর অগ্রে চলমান উট বা অশ্বের পিঠে একটি ছোটখাট মজলিস বসত। রসনচৌকি, আলগোজা, কলম, ডঙ্কা, খোরদক্ প্রভৃতি যন্ত্র সেই চলমান মজলিসে ব্যবহৃত হত। পারস্য ভাষায় রাজার বহির্গমনকে সওয়ারী বলে। কাজেই সওয়ারীর জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হত তাকে স্বাভাবিকভাবে সওয়ারীযন্ত্র বলা হত।

দেখা যাচ্ছে যে কিছু যন্ত্র একাধিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যন্ত্রের নিজস্ব নাম অপরিবর্তিত থাকছে কিন্তু যখন যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে সেই উদ্দেশ্যের নামানুসারে যন্ত্রের ব্যবহারিক নামকরণ হয়েছে। যেমন দেখি ডম্ফ যন্ত্র; যখন নহবৎ-এ ব্যবহৃত হয়েছে তখন তাকে 'নহবৎ-এর যন্ত্র' বলা হয়েছে, কিন্তু আবার যখন দেখি যে ওই ডম্ফ যন্ত্রই রণ যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তখন তা 'রণ যন্ত্র' নামধারণ করেছে—ডম্ফ, যা নিজস্ব নাম, তা কিন্তু পরিবর্তিত হয় নাই। এ পর্যন্ত যা আলোচনা হল তা সব অতীতের—আদি মধ্য যুগের! আধুনিক যুগে যন্ত্রের শ্রেণীকরণ আর অতীতের মত নেই। বলতে বাধা নেই, ভারত আজ পশ্চিমী যন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত। প্রায় সব উদ্দেশ্যেই পশ্চিমী যন্ত্রের ব্যবহার হয়, এর ফলে আজ ভারতের যন্ত্র-ঐতিহ্য বিলীয়মান।

সভাযন্ত্রগুলির মধ্যে গীটার, সেতার, সরোদ, বংশী ও বাহুলিন অর্থাৎ বেহালা বর্তমানে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অবশিষ্টগুলি বর্তমানে অপ্রচলিত।

ঐকতান বাদনে পুরাকালের যন্ত্রগুলি সব ব্যবহৃত হয় না। সানাই, বাঁশি ব্যতীত ব্যাগপাইপ; বিভিন্ন প্রকারের ড্রাম; ক্ল্যারিওনেট; বিভিন্ন ধরণের পাইপ; একর্ডিয়ন, পিয়ানো, অর্গ্যান, হর্ন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাঙ্গল্য যন্ত্রের মধ্যে শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টা, সানাই, ঢাক, ঢোল ইত্যাদি গণনীয়।

রণ যন্ত্রের মধ্যে পশ্চিমের ব্যাগপাইপ, হর্ন, ড্রাম, মার্চড্রাম ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ভারতের রণ যন্ত্রগুলিকে বর্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর করাই যায় না। এখন সেনাদের ব্যবহার্য যে সব রণ যন্ত্র তা সবই পশ্চিমী—অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রও পরিবর্তিত হয়েছে!

আধুনিক যুগে বোধ যন্ত্রের প্রয়োজন নাই। বর্তমানে রাজা-মহারাজা নামে কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না—সরকার বাহাদুরের যাবতীয় ঘোষণা নানাভাবে এবং অধিকতর সুচারুরূপে করা হয়, সঙ্গীতযন্ত্রের প্রয়োজন তাই হয় না।

গ্রাম্যসঙ্গীতে যন্ত্রগুলি প্রায় অপরিবর্তিত আছে। সওয়ারী যন্ত্র বর্তমানে অচল। প্রয়োজন হলে পশ্চিমী ড্রাম পাইপ হর্ন ইত্যাদির স্মরণ নেওয়া হয়ে থাকে।

অতীতে যে যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হত, তা এক বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাব জাগিয়ে তুলতে পারত। শুধু তাই নয়, এর এক বিশেষ আবহাওয়া সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল। বর্তমানে পশ্চিমী যন্ত্র ব্যবহারে বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাব যে পরিস্ফুট হয়, একথা বোধ করি জোর করে বলা যায় না। যাই হোক না কেন, নিবিষ্ট চিন্তায় মনে হয় এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে ভারতীয় যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করলে যে আবহাওয়া বা পরিবেশ অথবা ভাবের সৃষ্টি হবে, তা পশ্চিমীযন্ত্রের সম্পূর্ণ ব্যবহার কিংবা কিছু ভারতীয় ও কিছু পশ্চিমীযন্ত্রের ব্যবহারে সৃষ্ট আবহাওয়া থেকে পৃথক।

আমরা ভারতবাসীরা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রকাশ্যে গৌরববোধ করতে কুণ্ঠিত বোধ ক'র। অথচ পশ্চিম দেশগুলির ঐতিহ্য সম্পর্কে পশ্চিমীরা যথেষ্ট গর্ব করে থাকেন, তাঁদের থাকে না কোনও কুণ্ঠা, বরং তা পাঁচজনকে জানাবার জন্যই তাঁরা সদা উদ্‌গ্রীব! কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে আমরা আপনাদের মহত্তর ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁদেরই ঐতিহ্য নিয়ে গৌরববোধ করি। আমাদের আপন ঐতিহ্য পুনঃস্মরণ করে তা পুনঃপ্রচলিত করা উচিত।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতের প্রাচীন যন্ত্রের ঐতিহ্য অপর কোন দেশের যন্ত্রের ঐতিহ্যের তুলনায় কোন অংশেই অপকৃষ্ট নয়—বরং অনেক পরিমাণেই মহৎ এবং উৎকৃষ্ট।

রেকর্ড-পরিচয়

'এইচ্-এম্-ভি' ও কলম্বিয়ায় সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:—

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

এন্ ৮৩০৬৮—দু'খানি নজরুল গীতি 'দূর দ্বীপবাসিনী' ও 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে'—গেয়েছেন ফিরোজা বেগম।

এন্ ৮৩০৬৭—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দু'খানি নজরুল গীতি 'শাওন রাতে যদি' ও 'গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়'।

এন্ ৮৩০৬৬—'ভোট প্রার্থীর নিবেদন'—দু'খণ্ডে সমাপ্ত কৌতুক নক্সা—শিল্পী সুশীল চক্রবর্তী ও শ্যামল দাস।

এন্ ৮৩০৬৫—'আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে' ও 'তোমরা সবাই অঙ্ক কষে'—আধুনিক দু'টি গান—গেয়েছেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এন্ ৮৩০৬৪—সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (চৌধুরী) দু'খানি আধুনিক গান 'ঝরে ঝরে বরষারে' এবং 'ওপথে যাবো না যাবো না'।

এন্ ৮৩০৬৩—দু'খানি আধুনিক গান 'মধুর সে মুখখানি' ও 'আমি স্বপনে তাহার' গেয়েছেন—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলম্বিয়া

জীঈ ২৫১৮৩—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবার নজরুলের দু'খানি ধর্মমূলক গান পরিবেশন করেছেন—'জগতের নাথ করো পার হে' ও 'যত নাহি পাই দেবতা'।

জীঈ ২৫১৮২—বহুকাল পরে গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবার দু'খানি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন—'রাঙা সাঁঝের লগনে' ও 'মানসী সেজেছি আমি'।

জীঈ ২৫১৮১ মিণ্টু দাশগুপ্ত, যোগেশ দত্ত ও রবীন অধিকারীর দু'খানি কৌতুক-নক্সা 'মোহিনী' ও 'পালিয়ে পথ পাই না'।

জীঈ ২৫১৮০ 'নয়নে বরষা রিমঝিম্' ও 'সে আসবে আজকে বলেছে'—আধুনিক দু'খানি গান—পরিবেশন করেছেন ইলা বসু।

জীঈ ২৫১৭৯—পান্নালাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে মাতৃপূজার সুর-নৈবেদ্য—'বসিলেন মা হেমবরণী' ও 'যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকতে'।

আমার কথা (১১২)

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রতিভা এবং বিনয় যুগপৎ যাঁদের মধ্যে সম্যক্‌ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে সুরশিল্পী শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম তাঁদেরই সঙ্গে উল্লেখনীয়। সঙ্গীতের প্রতি উত্তরাধিকারসূত্রে অনুরাগবশত তার অনুশীলনে তাঁর আত্মনিয়োগ যেমন তাঁর উত্তরজীবনে এনে দিল অপরিসীম জনপ্রিয়তা এবং প্রভূত খ্যাতি তেমনই তাঁর আত্মজনসুলভ আচরণ, প্রীতিমধুর আচরণ এবং সদালাপিতা তাঁকে অন্যের হৃদয়ের অনেক কাছে টেনে নিয়ে যায়। বয়সের অনুপাতে অনেকের তুলনায় তিনি নবীন হলেও তাঁর জীবনের সঙ্গীতানুশীলনের বিচিত্র বিবরণ আপন গুরুত্বে এবং বৈচিত্র্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা দেবীর পুত্র রামকুমারের জন্ম হয় ১৯২১ সালের ২১শে আগস্ট তারিখে। রেণুকা দেবী ছিলেন সঙ্গীতাচার্য রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে বিদ্যালাভ করতে থাকেন রামকুমার। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভর্তি হলেন বিদ্যাসাগর কলেজে।

বিদ্যালয় জীবন থেকেই তবলা বাজানো তাঁর শুরু হয়। এ বিষয়ে প্রথম দীক্ষা পেলেন মাতামহ সঙ্গীতাচার্য রাজেন্দ্রনাথের কাছে। ছায়াচিত্রে তখনও ভাষা ফোটে নি, চলচ্চিত্রের সেই নির্বাক যুগেও তার সঙ্গে বালক রামকুমারের যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল তবলাকে কেন্দ্র করে। সে যুগের নির্বাক চিত্রে রামকুমার তবলা বাজিয়ে থাকতেন। টপ্পা ইত্যাদি গানেও রাজেন্দ্রনাথ তাঁর সুযোগ্য দৌহিত্রকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রনাথের পর তিনি বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ তবলীয়া বুন্দি মিশ্র, খলিফা ছোটেন হোসেন খাঁ, দৌলা বক্স ঘরোয়ানার ভূতেশ্বরবাবু, মিশ্র ঘরোয়ানার শ্যামবাবু প্রভৃতির কাছে তিনি তবলা শিক্ষা করেন। টপ্পা শেখার পর ধ্রুপদ শিক্ষাও তাঁর আরম্ভ হয়। জমিরুদ্দীন খাঁ ও বাদেল খাঁর কাছে শিখতে থাকেন খেয়াল-ঠুংরি। রামপুরের মেহেদি হোসেনের কাছে শিক্ষা পনের বছরব্যাপী। ধ্রুপদে তাঁর গুরু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধ্রুপদী প্রবীণ শিল্পী যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাগ-সঙ্গীতের জগতেই তাঁর প্রতিভা সীমাবদ্ধ নয়। হাল্কা সঙ্গীতের শ্রোতাদেরও তিনি যথেষ্ট পরিতৃপ্তি দিতে সক্ষম। বেতারে, ছায়াচিত্রে এবং গ্রামোফোন জগতে তাঁর সংযোগ একে একে গড়ে উঠতে থাকে। সময়ের স্রোত সেই সংযোগকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তুলছে।

প্রখ্যাত বেহালাবাদক পরিতোষ শীল তাঁকে এই জগতে (হাল্কা গানের জগতে) নিয়ে আসেন। হাল্কা গানের শিক্ষা নেন যশস্বী শিল্পী কমল দাশগুপ্তের কাছে। এ প্রসঙ্গে সুখ্যাত সুরকার দুর্গা সেনের নামও উল্লেখ্য।

কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানী দ্বারা তাঁর কয়েকটি চিত্র সঙ্গীতের ও একক সঙ্গীতের রেকর্ড গৃহীত হয়েছে। বহু বিখ্যাত সম্মেলনে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করে অফুরন্ত সাধুবাদে বিভূষিত হয়েছেন। কলকাতা ছাড়া প্রয়াগ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একাধিক সম্মেলনে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে।

স্বরগ সে সুন্দর দেশ হামারা, চন্দ্রশেখর, মেঘদূত, বিদেশিনী, আঁধারে আলো প্রভৃতি ছবিগুলির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া কয়েকটি মাদ্রাজী ও তেলেগু ছবির সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন।

পূর্বোক্ত শিল্পিবৃন্দ ছাড়া আরও বহু গুণিজনের শিষ্যত্ব নিয়ে নিজেকে যথেষ্ট লাভবান করে তুলেছেন। বর্তমানে বহু ছাত্র-ছাত্রী এঁর শিক্ষায় নিজেদের পরিপূর্ণরূপে ভরিয়ে তুলছে।

মানুষের মনে গন্ধের প্রভাব

ইটো উলরিখ

আজকের দিনে জিনিস বিকোয় বিজ্ঞাপনের জোরে এবং তার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়। বিজ্ঞাপন হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা আর্ট না শিল্প। বিজ্ঞাপনে আজকাল নিত্যনতুন কৌশল ব্যবহার হয়। এই ব্যাপারে জার্মান বিজ্ঞাপনদাতারা এখন এক নতুন 'আশ্চর্য অস্ত্র' আবিষ্কার করেছে এবং সেই অস্ত্র হচ্ছে সুগন্ধ। মানুষের অবচেতন মনে গন্ধের প্রভাব লক্ষ্য ক'রে তারা বিজ্ঞাপনে গন্ধের কৌশল অবলম্বন করেছে। কিছুদিন আগে এক দোকানে দু'জাতের মোজা বিক্রি হয়েছিল। মোজাগুলি আসলে ছিল এক জাতের কিন্তু কিছু মোজায় একরকম গন্ধ লাগানো ছিল। শতকরা আশিজন মহিলা কিনলেন সেই গন্ধ-লাগানো মোজা। বিজ্ঞাপনের দৌলতে শুধু যে গন্ধের কাটতি বেড়েছে তা নয়, অন্তর্বাস, মোজা, মনিব্যাগ, বেল্ট, জুতো, দস্তানা, স্যুটকেস, লেখার কাগজ, বই, জ্বালানি, আসবাবপত্তর সবেতেই এখন বিক্রির জন্যে গন্ধ ব্যবহার হচ্ছে। খাবার দাবারে এখন গন্ধের অঢেল ব্যবহার। গন্ধ-বিশেষজ্ঞদের সীমাহীন কল্পনার সঙ্গে এখন রাসায়নিকশিল্পকে তাল বজায় রেখে চলতে হচ্ছে। 'নিউকার' বলে একরকম গন্ধ তৈরি হচ্ছে যা পুরোনো গাড়িতে ছিটিয়ে দিলে ভালো বিক্রি হবে এই আশায়। গন্ধের যাদুতে জিনিষপত্তরের কাটতি বেড়েছে তো বটেই, মানুষের কর্মশক্তির ওপরও গন্ধের প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। মনোবিজ্ঞানীরা তাই এখন কলকারখানায়, অফিসে সুগন্ধময় আবহাওয়া সৃষ্টি করার পরামর্শ দিচ্ছেন। চিকিৎসকরাও পিছিয়ে নেই। তাঁরাও রুগীদের প্রফুল্ল রাখার জন্যে 'গন্ধ চিকিৎসার' আশ্রয় নিচ্ছেন। তবে একটা কথা আমাদের নাক বড় সৌখীন। একই গন্ধ, তা সে যত ভালোই হোক, রোজ রোজ আমাদের নাকের পছন্দ হয় না। তাই নাকের মারফৎ বিজ্ঞাপনের প্রভাব বিস্তার করতে গেলে তাকে নিত্যনতুন গন্ধের সন্ধান করতে হবে।

[ডি এ ডি]

নমিতা চক্রবর্তী

আজ তপতীর বার্থ-ডে পার্টি। কাল রাত হতে অস্বস্তিতে ভরে আছে মন। পার্টি জিনিসটা মন্দ নয়। বন্ধু সমাগম, আলো, নরম কেক, সোনালী চা এখানে-ওখানে ফুল। কিন্তু নিজের জন্মদিনের জন্য পার্টি। সবার লক্ষ্যের কেন্দ্রীভূত হওয়া, টেবিল-ভরা উপহার—কি যে বিশ্রী। আর জন্ম তো হয়েছে তার কবেই আজ তো পূর্ণ হবে তপতীর উনিশ বছর। ইস! কুড়ি বছরে পড়ল তপতী। বুড়ি হতে বাকি কি আর। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে—এই পার্টিটা কেবল উদ্দেশ্য, তাকে ধরে একটা লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে তপতীকে। গত তিন-চারদিন ধরে তপতীর মাসি—তিনি বছর দশেক হোল তার মা হয়ে গেছেন, তাকে সেই রকমই বুঝতে দিচ্ছেন।

সকাতায় ফিরেছে ভাস্কর, ভাস্কর মিত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করে সে গিয়েছিল ইয়োরোপে। পশ্চিমের বিদগ্ধমণ্ডলী তার প্রশংসাপত্রের পাতাকে নিজেদের সানন্দ স্বাক্ষরে অলঙ্কৃত করে দিয়েছেন। মস্ত বড় চাকরী জুটবে অনায়াসে। কিন্তু না, চাকরীর দরকার নেই ভাস্করের। মস্ত ব্যবসায়ী ওমোহন মিত্রের একমাত্র ছেলে সে, চাকরী করবে কেন! নিজেদের ব্যবসাতে লেগে যাবে। প্রস্তুত হবে ভবিষ্যতের মালিকানার জন্য।

আবার কেবল টাকাই নয়, রূপও আছে তার। দিন সাতেক হোল ভাস্কর ফিরেছে কলকাতায়। এর মধ্যেই আর তর সইলো না মীনাক্ষীর, একেবারে পার্টির হাঙ্গামা বাধিয়ে দিলেন। উঃ! তপতীর যদি জন্ম না হোত জুন মাসে—তা হলে? তা হলে নিশ্চয় অক্লেশে বাবার জন্মদিন বানিয়ে পার্টি দিতেন মা আর ভাস্কর তাতেও হোত প্রধান অতিথি। অবশ্য বয়স্কদের জন্মদিনে বেশি ঝকমকে তাজা ভাবটা আনা যায় না। বড় মানুষের জন্মদিন—অর্থাৎ কি না তিনি যে বুড়ো হচ্ছেন সেটা মনে করিয়ে দেওয়া। আর উনিশ বছরের জন্মদিন সে তো আনন্দের চিঠি। কিন্তু সেই খবরটি যদি চুপি চুপি তার কাছে চলে আসতো! ছোট্ট বাটিতে পায়েস, মাথায় মায়া-ভরা হাত বুলানো। যেমন চুপি চুপি সে বেড়ে উঠেছে, ছোট ছোট জোয়ারের ঢেউ পূর্ণ করে দিয়েছে তাকে, তেমনি নিজের নিরালা ঘরটিতে বসে জানতে পেতো তপতী কুড়ি বছর তার দরজায়—কি ভালোই না লাগতে পারতো। তারপর এ তো জন্মদিনের পার্টি নয়, একটা মস্ত পরীক্ষায় আবার ফেলেছে তাকে মীনাক্ষী। এত কম প্রিপারেশন নিয়ে এ পরীক্ষায় কি পাস করা যায়। রোগা-রোগা একটা শরীর, গঙ্গাজলের মত আধা-গেরুয়া রং আর সত্যি যদি এ পরীক্ষা—যার খবর বেরুতেও ঢের দেরি, এই নিয়ে কি খাপখোলা নূতন তলোয়ারের মত ভাস্করকে মুগ্ধ করা সম্ভব? অন্তত আর পাঁচটা বাঙালী মেয়ের পরিবেশে সে একটু ঘরোয়া হয়ে উঠলেও এত ভয় লাগতো না তপতীর। অবশ্য তপতী ভালোই জানে এত কথা ভাববার সময় একটুও নেই মীনাক্ষীর।

অনবদ্যভাবে বাড়ির আভিজাত্যে ভাস্করকে মুগ্ধ করবার আয়োজনে ব্যস্ত সে অর্থাৎ ধারে না কাটলেও ভারে যেন অবনত হয় ভাস্কর। ভীতু ভীতু তপতীর প্রচ্ছদপট রচনা করেছে যে শৈলেন রায়ের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স আর রমণীকুল-শিরোমণি মীনাক্ষী রায় এটা খুব স্পষ্টভাবে উহ্য থাকবে ইনটারভিউর সময়ে। তপতীর মা থাকলে কি এতটা সম্ভব হোত? হোত না। ভালোই জানে তপতী। মাকে বেশ মনে আছে তার। তিনি ভীতু আর কাঁপা মেয়েই ছিলেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে মারা যান তপতীর মা। তিনি ছিলেন অবিকল তপতীর মত। সাদাসিধে, লাবণ্যের স্পর্শে মুখটি মধুর। ছোটবোন মীনাক্ষীর মত দীপ্তি তাঁর কোনদিন ছিল না। এই নিয়ে তপতীর বাবার একটি নীরব অভিযোগ ছিল। এণাক্ষী সব বুঝতেন, স্বামীর অবহেলা সহ্য করতেন মেয়ে আর সেতার নিয়ে। তারপর একদিন হঠাৎ মারা গেলেন। যেমন চুপচাপ ছিলেন এণাক্ষী, তাতে তপতী ছাড়া কেউ সংসারের খালি জায়গাটুকু দেখে অভিভূত হোল না। অবশ্য দুঃখ পাবার বেশি লোকও ছিল না তাদের বাড়িতে, মাইনে করা লোক আর বাবা। সেই ন'বছর বয়সেই তপতী বুঝতো বাবা-মার আড়ি। বাবা খুব বড়লোক মা কিন্তু গরীব—প্রায় তাদের দামী যন্ত্রমণির মতই গরীব।

দিদি বেঁচে থাকতে বড়লোক ভগিনীপতির দেওয়া পার্টিগুলিতে প্রধান অতিথির আসনটি বাঁধা ছিল মীনাক্ষীর। এবার স্থান বদল হোল, পার্টি দেবার অধিকার বর্তালো তাঁর এবং প্রধান অতিথি হতে লাগলেন তাঁরাই, যাঁদের হাত করলে শৈলেন রায়ের ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। শ্রীবৃদ্ধি হোল আশাতীতরূপে সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন মীনাক্ষীর 'পার্টস' আছে বটে! শৈলেন রায়কে সে আগাগোড়া ঢেলে সেজেছে। বিশেষ করে কয়েকবছর আগে ইয়োরোপ ট্যুর করে এসে তাঁর যে অনির্বচনীয় পরিবর্তন হয়েছে তা উপভোগ

করবার মত। ছিলেন দেশী বড়লোকের পাড়ায়। মস্তবড় বাড়ি দামী গাড়ি তাঁকে কৌলীন্যের কোঠায় তুলেছিল সত্য, তবু নিমন্ত্রণ খেতে দেশের মাটিতে—পাত্তা পান নি নিমন্ত্রিতের মধ্যে;—কোঁচা, পাম্‌স আর পাঞ্জাবীর দলে। মীনাক্ষী তাঁকে ঠেলে তুলেছেন নক্ষত্রলোকে। ডবল প্রমোশন হয়েছে—মিঃ ডে, বর, মিটারের মধ্যে নয়, স্যার চৌধুরী, অনারেবল ভাতড়ীদের অভিজাত গোষ্ঠীতে। সবাই একবাক্যে বললেন এই উর্ধ্বলোকে একটুও বে-মানান লাগছে না মীনাক্ষীকে, বরং এতদিনই দেশীদের মধ্যে তাঁকে কেমন যেন রং করা মনে হাত। শৈলেন রায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা হালো না। পুরুষকে দেখে ধনের বিচার করা যায় না, আভিজাত্যেরও না টাই, স্যুট, জুতো, গাড়ি বেবাক একরকম। হাজার টাকা মাইনে পাওয়া চাকরের সঙ্গে হাজার টাকা মাইনে দেনেওয়ালা মনিবের তফাৎ করা শক্ত। ত্রুটি সেরে নেন মহিলারা।

যাক গে সে সব কথা, এখন তপতী পড়েছে মুস্কিলে। এতদিন সে ছিল মাসি অর্থাৎ মা আর বাপ দু'য়েরই লক্ষ্যের বাইরে। কমলা ইনস্টিটিউশন—তারপর আশুতোষ কলেজ। বাইরে চটি, বাড়িতে খালি পা। বেশভূষা যে কোনো কেরাণী-দুহিতার উপযুক্ত। হঠাৎ একটা ব্যাপারে সে একেবারে মায়ের একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে বসলো। লাজুক মেয়েটিকে মীনাক্ষী টেনে আনলো সভার মাঝখানে এবং সর্বাঙ্গীণ আয়োজন করলো তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে।

সেতার নামে একটা তারের বাজনার জন্যই তপতীর জীবনে এলো এই বিপ্লব। সেতার ভালোবাসতেন এণাক্ষী—তপতীর মা; নিজে নিজেই অনুশীলন করে মহিলা বাজনাটি আয়ত্ত করেছিলেন ভালো। স্বামীর অনাদরের দিনে সেতার তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল গভীন ব্যথা হতে। মেয়েকেও মা শেখাচ্ছিলেন বাজনা। ন' বছরে মা যখন মারা গেলেন, তপতীর তখন সেতারে হাতেখড়ি শেষ। মায়ের জায়গায় রাতের বেলায় তপতীর পাশে শুয়ে থাকতো মায়ের সেতার, হাত লাগলে বেজে উঠতো অবিকল মায়ের গলার সুরে।

সেতার ভালবাসলো তপতী। কান পাতলো রেডিয়োর চাবি ঘুরিয়ে। আস্তে আস্তে হয়ে উঠলো অনেকের চেয়ে ভালো বাজিয়ে। বন্ধুরা রাখতো তপতীর সব খবর। কেবল সেতার নয়, তার মিষ্টি গলার নরম গুনগুনও শুনতো তারা অফ পিরিয়ডে ডালমুট সহযোগে। সেবার মস্তবড় জলসা কলেজে। বন্ধুদের ঠেকাতে পারলেও তপতী অমান্য করতে পারলো না ভেরাটিগলা প্রিন্সিপালের অনুরোধ। সেতার কোলে নিয়ে বসতে হল তাকে, আর একঘণ্টা পর যখন বাজনা থামলো, অনেকেই ভাবলেন—শেষ হয়েছে তাড়াহুড়ো করে।

তপতীর সেতার বাজানোর প্রশংসা যথাকালে পিতৃপরিচয় সহ প্রকাশিত হল পত্রিকায়। লেডী বোস নিজের মেয়ের জন্য খোঁজ চাইলেন তপতীর মাস্টারের। জীবনে প্রথম থতমত খেয়ে গেল মীনাক্ষী রায়। তপতীর সম্বন্ধে কিছু জানবার বা করবার আছে, সে যে কোনো কারণেই লক্ষ্যীভূত হতে পারে একথা কখনো মনে হয় নি মীনাক্ষীর। হঠাৎ তাড়া খেয়ে একেবারে চমকে গেল সে। কিছু একটা বলে ব্যাপারটা সামলে নিয়ে, বাড়ি ফিরেই তপতীকে ডেকে পাঠালো। তার তখন বি-এ পরীক্ষার টেস্ট চলছে। বাড়ি ফিরে খাটে গড়াচ্ছে শ্রান্তিতে, ডাক শুনে অবাক। এমনটা তো কখনো হয় নি তাই অবাক হল, আর ডাকবার কারণ আন্দাজ করবার চেষ্টা করতে করতে গিয়ে পৌঁছাল মায়ের বসবার ঘরে।

মীনাক্ষীর সদ্য বাড়ি-ফেরা মুখের লালাভা তখনো মিলায় নি। কালো সাটিনের ব্লাউজের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আছে আটত্রিশ বছরের সুডৌল সোনালী বাহু, আর তার উপর মাথা রেখে চুপচাপ সোফায় হেলে আছে মীনাক্ষী। দাই পায়ে চটি পরিয়ে দিচ্ছিল, মেয়েকে দেখে সোজা হয়ে বসলো মা, পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি বুলাল মেয়ের উপর। রাতের বিনুনী ঝুলছে পিঠে, সামনেটায় চিরুণী চালিয়ে কলেজে গিয়েছিল তপতী, সেই ক্ষণিক শাসন ভেঙ্গে কুচি কুচি চুল উড়ছে কপালে, পরনের সবুজ রং-এর শাড়িটা মোলায়েম অন্তরঙ্গতায় প্রায় মলিন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ব্লাউজে বোতাম নেই, এক ঢাউস সেপ্‌টিপিন সেই স্থান দখল করেছে। লজ্জা পেল মীনাক্ষী। তার দাই যমুনার পোষাকও এর চেয়ে ভালো। রুচির অভাব আছে, কিন্তু দামে ভারী। মনে হলো কি অদ্ভুতভাবে এতদিন সে তপতীকে ভুলে ছিল। কবে তপতী বড় হোল? কলেজে পড়লো? মেয়েকে পাশে বসিয়ে দীর্ঘ দশ বছর পর মীনাক্ষী এই প্রথম জানতে চাইল তার পড়াশুনা আর সেতারের কথা।

এক সপ্তাহের মধ্যেই তপতীর সজ্জা আর ঘরের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। এল আয়না-বসানো মেহে-আলমারী, রকমারী শাড়ি, জামা, জুতো আর নতুন সেতার। তপতীর টেবিল ভরে গেল নানা প্রসাধন সম্ভারে। স্বামীর রূপান্তর ঘটাবার ব্যাপারে এতটা হাতযশ লাভ হয়েছিল যে, কন্যার বর্ণান্তর সাধনের সফলতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ এল না মীনাক্ষীর মনে। তপতীর নূতন সম্পদ কিন্তু অস্পৃশ্যই থেকে যেতে লাগলো। মীনাক্ষী হাত লাগাতে এসেও পরীক্ষার কথা ভেবে রূপ ফেরানোর কাজ স্থগিত রাখল। এদিকে পরীক্ষা এগিয়ে এল উর্ধ্বশ্বাসে, আর হুড়োহুড়ি করে শেষও হয়ে গেল। শেষের দিনটার রং বদলানও দেখতে পেল না তপতী। ইতিহাসের তৃতীয় পত্র—রাশি রাশি কাগজ, পেনের কালি ফুরাল—আর! আরাম! ঘণ্টা বাজবার দু'মিনিট আগেই শেষ হয়েছে লেখা। কি লিখেছিস? ও মা! কই আমি তো লিখি নি। উ! ঘার টেস্টের ব্যাপারটো কি জং-জং—একঘণ্টা অবিশ্রান্ত বক বক, তারপর বাড়ি ফিরে খাটভর মস্ত এক ঘুম দেবার যোগাড় করল তপতী।

সন্ধ্যা নেমেছে, কিন্তু আলো জ্বলে নি ঘরে। তপতীর মাথার ঘন চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে মীনাক্ষী ডাকলো—খুকু! ঘুমিয়েছিস?

চমকে তাকাল তপতী। খুকু! কতদিন আগে তার নাম ছিল খুকু? মা ডাকতেন—আমার খুকুমণি। তারপর তো আর কেউ ডাকে নি ও নামে! কতদিন! বহুদিন পর আজ সেই ছোটবেলার নামটির সাঁকো বেয়ে ফিরে এলেন মা তার শৈশবকে হাতে নিয়ে। সেই আধো-অন্ধকারে, মীনাক্ষীকে মাঁ

বলে ভাবতে পারলো তপতী অক্লেশে। তার হাতটি জড়িয়ে, শান্ত দু'চোখ ভরে ঝিম-ঝিমে ঘুম নেমে এল তপতীর।

মীনাক্ষী যা বলতে এসেছিল—বলতে পারল না। বসে রইলো তপতীর পাশে। মনে পড়ল কতদিনের ভুলে-যাওয়া দিদিকে—এণাক্ষী, তপতীর মা।

এণাক্ষী প্রথম মেয়ে। ম্যাট্রিক পাশ করতে পারলো না পড়ায় মন নেই, গান-বাজনার ঝোঁক—আর ঘরের কাজ।

ঠাকুমা বললেন—দরকার নেই লেখাপড়ায়, মেয়ের বিয়ে দাও এণাক্ষীর বাবাও ভাবলেন—তাই ভালো। ষোলো বছরে এণার বিয়ে হয়ে গেল। ষোলো বছর। রূপকথা আর স্বপ্নের ষোলো বছরে এণার বর এল, সেই বর দেখে চমকাল সবাই। যেমন রূপ, তেমনি স্বাস্থ্য। বি-এ পাস করেছে, চাকরীতে মন নেই, নেমেছে ব্যবসাতে। তাতেও টাকার দরকার। প্রচুর পণ দিলেন বাবা। ঢেকে গেল এণার কালো রং, পাশ না করার ত্রুটি।

এক হেমন্তের গোধূলীতে বর হয়ে বাইশ বছরের শৈলেন। শাঁখ, সানাই আর সারি সারি উৎসুক —সবার আগে মীনাক্ষী। মীনাক্ষী পড়াশুনায় ভালো ডায়সে নর ছাত্রী। ঝক-ঝকে রং, কোঁকড়া চুল, খাটো গোলাপী সার্টিনের ফ্রকে একেবারে পরীটি। হৈ হৈ করে উঠলো বরযাত্রী দল—শৈলেন! এই! এই তোমার সবচেয়ে সুমধুর ছোট শ্যালিকা। শৈলেনের চোখ ভরে গেল খুশিতে, মনও! ভাবল—একটু পর এরই উত্তর সংস্করণ মালা দেবে গলায়। ব্যবসাতে নামলেও লোহার টুকরো গিলে ফেলেনি তাকে। সদ্য কলেজ-ফেরা মনে তখনো লেগেছিল রোমান্সের রং। রাজস্ব ভালো লাগে, কিন্তু তার চেয়েও ভালো লাগে কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুল। মীনাক্ষী এগিয়ে এসে হাতে দিল যুঁইয়ের মালা। মুগ্ধচোখে তাকাল হবু-ভগ্নীপতির দিকে। দুধে-গরদের পাঞ্জাবী মিলিয়ে গেছে গায়ের রঙে, হীরের মত জলজ্বলে চোখ হাসছে।

মুখ-চন্দ্রিকার সময় চমকে গেল শৈলেন। রোগা, কালো একটি মেয়ের ভীতু মুখ। সমস্ত মন কটু হয়ে গেল। ইচ্ছে করল বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে, উঠে যায় বরাসন ছেড়ে। বাসরের সব আমোদ ঝিমিয়ে এসেছিল বরের গম্ভীর মুখ দেখে, কিন্তু মীনু এসে হাঁটু মুড়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরল—

আজি অমল ধবল পালে
লেগেছে মন্দ-মধুর হাওয়া,—

বসল এসে জামাইবাবুর গা ঘেঁষে, একটু একটু ভালো লাগা তখন শৈলেনের মুখে খুশির আলো জ্বালাল।

তারপর দিন গেল। বড় হল ছোট মীনাক্ষী, ইস্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকল। ব্যবসা বাড়াল শৈলেন। মীনাক্ষীর প্রতি তার যে স্নেহ একদিন সবাই সকৌতুকে উপভোগ করছিল, তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল ক্রমে। এণাক্ষী চিরদিন শান্ত মেয়ে,—আরো শান্ত হয়ে গেল। চুপচাপ একেবারে। মেয়েটিকে নাড়াচাড়া করে, একা একা সেতার বাজায়। প্রথমে মা বুঝলেন ব্যাপারটা, স্বামীকে বললেন উদ্বিগ্ন হয়ে—

—মিনুর বিয়ে দাও।

—বিয়ে? মিনুর? এখুনি কি! পাশ করুক বি-এ। অমন সুন্দর মেয়ে। দেখো রাজপুত্র বর আনব।

—না, না। মা ককিয়ে উঠলেন।—দেরি কোর না বিয়ে দিতে।

মহীনবাবু বিস্মিত হয়ে চাইলেন স্ত্রীর দিকে। সব কথা শুনলেন, বুঝতেও চেষ্টা করলেন। তার পরদিন হতেই লাগলেন মীনাক্ষীর পাত্রের খোঁজে। সম্বন্ধ স্থির হতে দেরি হলো না। আকাঙ্ক্ষিত পাত্র সব রকমে। হীরালাল ঠাকুরলালের জড়োয়ার ক্যাটালগ খুললেন মা, বাড়িতে রং পড়বার তোড়জোড়। বাধা দিল মীনাক্ষী। রাগী লাল চোখ বাপের, মায়ের কান্না—কিছুতে বশ মানল না মেয়ে। সে পড়বে আরো, বিলেত যাবে।

বাপ-মায়ের মুখ কালো হয়ে গেল। বুঝলেন, যে সর্বনাশ ঘটেছে এণার তাকে রুখতে পারবে না। জেদীমানুষ বাপ। বললেন—এক পয়সা পাবে না মিনু। উইল করে এণাকে সব দেবেন।

—দাও, নির্ভেজাল সাহসী উত্তর দিল মীনাক্ষী। সে তখন বি-এ পড়ছে, বরাবর ইংরেজী ইস্কুলে পড়ে, দারুণ স্মার্ট। পড়া ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করেছে, বাধা দিল এণাক্ষী। এণা মাকে বোঝালো, বাপের কাছে কাঁদল আর বোনের হাত ধরে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে।

শৈলেন জীবনে প্রথম খুশি হোলো স্ত্রীর প্রতি—বাঃ? বেশ করেছ। এ কি জুলুম বাপ-মার! বিয়ে করবে, সময় হলে, তার জন্য অত্যাচার কেন।

দক্ষিণের খোলা ঘরে সবুজ-সাদায় মিলিয়ে ডিসটেম্পার করা—মীনাক্ষীকে দিদি সাজিয়ে দিল সেই ঘর। এণাক্ষীকে নূতন জড়োয়া নেকলেস কিনে দিল শৈলেন রায়। তারপর হতেই কিন্তু কর্মব্যস্ত ব্যবসায়ীর পাঁচটার পর কাজ কমে গেল, উৎসাহ দেখা গেল ডায়মণ্ড হারবার কিম্বা বারাকপুরের রাস্তা ধরে লম্বা দৌড় দিতে।

মীনাক্ষী বুঝেছিল—অন্যায়, ভীষণ অন্যায় হচ্ছে দিদির উপর কিন্তু অবুঝ মন যে মানে না শাসন। যত নিজেকে বাঁধতে চাইত মীনু, তার চেয়ে বেশি জোর শৈলেনের। সে উড়িয়ে দিত সব বারণ। আত্মীয়-স্বজন যখন 'ছি ছি' রব তুলেছে,—হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে মারা গেল এণাক্ষী।

মীনাক্ষী কাঁদল। দিদির মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে কঠিন ধিক্কার দিল, চলে গেল অপরাধী মুখে মায়ের কাছে। মজা হোল যে বছর না ঘুরতেই বাপ-মা জবরদস্তি লাগালেন শৈলেনকে বিয়ে করবার জন্য। মীনাক্ষী মন শক্ত করেই ছিল, কিন্তু যখন শীর্ণমুখে শৈলেন এসে কাছে দাঁড়ালো,—সব প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল তার। একরত্তি বেলা হতে শৈলেনকে ভালবেসে এসেছে সে। দিদির পুতুল, শাড়ি, গয়নার মতই দিদির বরেও মীনুর একাধিপত্য। কোনো অন্যায়ের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর ছিল। তারপর দিনে দিনে কি যে হল, কি করে যৌবনের অনুরাগে রূপান্তরিত হয়ে গেল কৈশোরের অনাবিল ভালবাসা,—বুঝতেই পারে নি মীনাক্ষী। রূঢ় বাস্তবের কঠিন ধাক্কা খেয়ে যখন জাগল, তখন ফিরবার পথ আর

নেই। শৈলেন আকণ্ঠ ডুবে গেছে, আর মীনাক্ষীর বন্ধ দরজায় মিথ্যেই আঘাত হানছে অরুণকুমার, বরুণকুমার।

বিয়ে হয়ে গেল যেমন তেমন করে। বাজনা বাদ্য, আলো কিছু হোল না। উৎসব করতে বাধা দিল মীনু বাবা-মাকে। তাঁদের তেমন ইচ্ছেও ছিল না, মনে হচ্ছিল বড়মেয়ের কান্না-ভেজা মুখ।

শৈলেন কিন্তু আয়োজন করল মস্ত প্রীতিভোজের। রয়েছে বন্ধু, কর্মচারী, খাতির করবার কত শত লোক—ভোজ না দিলে ছাড়বে কেন তারা? বাড়িকে শৈলেন একেবারে নূতন ঢং-এ বদলে দিল মীনাক্ষী এসে প্রবেশ করবার আগে, আর উৎসাহে-আনন্দে নিজে এমন করে বদলে গেল নিজেরি অজান্তে যে মীনাক্ষীরও ধাঁধা লেগে গেল চোখে। দেখল এক নূতন শৈলেন রায় এসেছে দামী মোটর হাঁকিয়ে তাকে নিয়ে যেতে।

উৎসবের ক্লান্তি কাটিতে গেল ক'দিন। স্বামী গেছে অফিসে। ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করে রাতের গাড়িতে তারা যাবে নৈনিতাল। সেই হ্রদের দেশে কাটিবে একটি মাস মধুযামিনী। মীনাক্ষী জানে তাদের মধুরাত্রি শেষ হবে না কোনদিন তবু হ্রদের নীল জলে তারা নূতন করে দেখবে নিজেদের মুখ! মীনাক্ষী ব্যস্ত হোল গোছ-গাছ করতে। দুপুর বেলা। হঠাৎ চোখে পড়ল—তপতী। ন'বছরের মেয়ে বড় বড় চোখ মেলে দেখছে মাসির নবরূপ। চমকে গেল মীনাক্ষী। মনে হল তপতীর চোখ দিয়ে দেখছে দিদি। দেখছে তার সিঁথির সিঁদুর কেমন চুরি করে নিয়েছে মীনু—হাতে লোহা! দৃপ্ত বলছে—এই তোর মনে ছিল!

বড় ভয় পেলো মীনাক্ষী। একরকম পালিয়ে গেল সে তপতীর কাছ হতে। তারপর হতে ইচ্ছে করেই তপতীর কাছ হতে দূরে দূরে থাকতো সে। ক্রমে ভুলে গেল তপতীকে তার দিদির খুকুকে। তপতী আছে—যে বুড়ি ঝি, যাদুমণি তাকে মানুষ করেছে, সে-ই বুকে করে আগলে রইল আটটা বছর। নিয়ম মত মাস্টার এসেছে, ইস্কুল ছাড়িয়ে তপতী ঢুকেছে কলেজে। যে ঘরে তার মা থাকতো সেই ঘরে থেকে কৈশোর কাটিয়ে চলে এসেছে যৌবনে। আচ্ছা! অসুখ? অসুখ কি কখনো করে নি ওর? হয় তো করেছে, আর তাতেও দেখেছে যাদুমণি। সে মরে যাবার পর তপতী তো বড় মেয়ে। তখন নিজের ব্যবস্থা নিজেই করেছে বুঝি! চোখে জল এলো মীনাক্ষীর। উচ্ছাস আবেগ কেটে বহুদিন হোল জীবন চলছে স্বাভাবিক ধারায়। হঠাৎ আজ আবার নূতন করে দিদির উপর ভালবাসায় উত্তাল হয়ে উঠল মন, আর সেই ভালবাসার সন্তান হয়ে মীনুর কোলে নূতন জন্ম নিল তপতী। টুটুন আর মানুর মতই জনকে যে মমতায় লালন করেছে জঠরে, সেই মমতায় ভারী হোল মীনাক্ষীর বুক। তপতীর কপালটিতে হাত রেখে অন্ধকার ঘরে নীরবে বসে রইল মীনাক্ষী। আকাশ জুড়ে তখন তারা উঠেছে।

পার্টি। বাংলা নিমন্ত্রণ কথাটার অর্থ আরো ব্যাপক। অনেক লোক, বহু ভোজ্য, আলো, বিশৃঙ্খলা—সব আছে নিমন্ত্রণে,—বিকেলের জলখাবারের নিমন্ত্রণ হলেও। ইংরেজী পার্টি ছিমছাম। ছোট ছোট টেবিল ঘিরে চারটে, দু'টো চেয়ার এখানে-ওখানে। ফর্সা পাজামা আর শার্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে অভিজাত চাকরের দল। স্যাণ্ডউইচ, ফ্রাই, কেক—ঋতুর ফল। কাছের ঘরে ম্যাগনোলিয়া কোম্পানীর লোক—সময়মত যোগান দিচ্ছে আইসক্রীম। টুং-টাং কাচের বাসনের শব্দে মিলছে হাসির ঝঙ্কার। মেয়েদের স্বর কি নরম আর মৃদু তবু শোনা যাচ্ছে প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার। বরং ছেলেদের জড়ানো চিবানো কথা বোঝা শক্ত।

ইতিপূর্বেও বাড়িতে হয়েছে অনেক পার্টি, তপতীর নিজের ঘরে খাবার প্লেটে মিলছে তার পরিচয়। এই প্রথম নায়িকার বোলে নেমে একেবারে উদভ্রান্ত হয়ে গেল তপতী। সবটাই তপতী, আবার অনেকখানিই তার নয়, এইরূপে সাজিয়ে, বাগানে যখন তাকে পার্টির মাঝখানে ছেড়ে দেওয়া হোল, তখন তপতীর টেম্পারেচার পঁচানব্বই ডিগ্রীতে নেমে গেছে। সেই আদিকাল হতেই মীনাক্ষীর কাছে পার্টি টার্টি জলভাত তাই মেয়ের অবস্থা একটুও বুঝল না সে। দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে সোজা তপতীকে বসিয়ে দিল ভাস্করের টেবিলে। তপতীর বুক ধক্‌ধক্ করতে লাগল, চোখে অন্ধকার। ঘামে ভেসে যাচ্ছে বুক, পিঠ, গলা। কত আলো আর রং, সাটিন আর সিফন-নাইলন। সীমা মণ্ডল, লিলি বোস আর দেবকী পালিতের প্রসাধন-চাতুর্যে একেবারে মুগ্ধ তপতী। কি বুদ্ধি! হন বিষম

নেই যা নিয়ে ওরা কথা বলতে পারে না—আর বাজায় হাসির জলতরঙ্গ।

সুন্দর একটা কনসার্ট হচ্ছিল, অনেকের মত ভাস্করও শুনছিল তাই, তপতী একটু অবসর পেল নিজেকে সামলাবার। হঠাৎ শুনল ভাস্কর তাকে জিজ্ঞেস করছে সুরের কথা সর্বনাশ! তপতী কি জানে আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারীর বিশদ ব্যাখ্যা, না বোঝাতে পারবে পুরিয়া ধানেশ্রী আর মিশ্রগান্ধারের তত্ত্ব! এ কোথায় তাকে নিয়ে এল মীনাক্ষী। আবার চোখ তুলে চাইল তপতী। অচেনা রাজ্য। চোখে চোখে বিদ্যুৎ খেলছে, বাঁকানো ঠোঁটের কোণে কি ধার!—সে ভাবল তার ঘরটির কথা—ছায়া আর শান্তি!

—আপনি একটা কথাও বলছেন না কিন্তু। নবীন মেঘের গুরুগুরু ভাস্করের গলায়। চমকে ভীতুচোখে তাকাল তপতী।

—তপতী? ও তো কথা বলবে সেতারের ঝঙ্কারে। পাশের টেবিল হতে পাখির কূজনে বলল দেবকী।

—তাই ভাল সেতারের কথাই শুনব।

উঠে দাঁড়াল ভাস্কর। মীনাক্ষী ব্যস্ত থাকলেও তার সমস্ত মনোযোগের বার আনা ছিল ভাস্করের প্রতি। তাকে দাঁড়াতে দেখে, হেসে কাছে চলে এল।

—ভাল লাগছে না বুঝি?

—খুব ভাল লাগছে। আরো লাগাতে চাই মিস রায়ের বাজনা শুনে।

—বা, খুকু তো বাজাবেই। চল, চল, খুকু। ডায়াসে চল। তোমার সেতার আছে ওখানেই। ওকে নিয়ে এস তো ভাস্কর।

মীনাক্ষী চলে গেল ব্যবস্থা করতে।

ওদিক হতে কথার বাণ ছুড়লো সীমা—বানানো কথা।

বসন্তলক্ষ্মী যাও বিজয় অভিসারে।

সেতারে ঝঙ্কার তোল বসন্তরাগেরে।

ভাস্করও সায় দিল—তাই ভাল। চলুন বাজাবেন বসন্তরাগ।

সমস্ত শরীর অনিচ্ছায় ভরে গেল তপতীর, তবু তাকে যেতে হোল। বেদীতে বসে কোলে তুলে নিল সেতার—নূতন দামী সেতার। এ তার মায়ের তার-বদলানো সেতার নয়, ঝকঝকে নূতন। আজকের পার্টির মতই অচেনা। হাত কাঁপতে লাগল তপতীর। মেরজাপ জ্বলে উঠল আঙুলে। চারিদিকে সারি সারি রং করা মুখ এখুনি বুঝি হেসে উঠবে বিদ্রূপে। নিজেকে সম্বৃত করল তপতী। আরম্ভ করলো বিলম্বিত দ্রুতলয়ে দরবারী কানাড়া।

প্রায় তিরিশ মিনিট ধরে বাজলো সেতার। প্রথম ভয় পেয়েছিল তপতী। জিভে তিক্তস্বাদ উঠেছিল। তারপর আলাপ শেষ হয়ে তান ধরবার আগেই সুরের গভীরে ডুবে গেল সে, কোন অসঙ্গতি চোখে পড়ল না, মনে এল না তার। বাজনা শেষ। শোনা যাচ্ছে প্রশংসার মৃদুগুঞ্জন।

—সুন্দর। খুব সুন্দর বাজিয়েছিস!—মেয়ের কপালের ঘাম মুছে দিল মীনাক্ষী। ভাস্করের চোখ হতেও এই প্রথম মুগ্ধ অঞ্জলি বর্ষিত হল। সুরের ঘুম-জড়ানো চোখে, মনে প্রথম পুরুষকে দেখল তপতী। তারও ভাল লাগল। প্রায় ভালবাসার মতই ভাস্করকে ভাল লাগল তপতীর।

ভাস্কর তপতীর হাতে তুলে দিল আইসক্রীমের প্লেট। চেয়ে চেয়ে দেখলো ভাল করে। এতক্ষণ তপতীর পটভূমিকা রচনা করেছিল শৈলেন রায়ের টাকা, মীনাক্ষী রায়ের আভিজাত্য। এবার সেতারের সুরটিকে পিছনে রেখে দাঁড়াল তপতী। সুন্দর মানিয়েছে। চিকণ ভ্রূ উড়েছে শ্যামল ললাট ফলকে, তার তলায় দু'টি টলটলে চোখ—এ যেন কিছু মেয়ে কিছু সুর।

পার্টি শেষ। শুভকামনা শেষে বিদায় নিল অতিথির দল। টেবিলে উপহারের স্তূপ। এধারে-ওধারে ঘুরছে বয়। মীনাক্ষী ছাড়ল না ভাস্করকে। রাত! দশটা আবার রাত!

—এক্ষুনি যাবে কি চল একটু বসবে। নূতন কেনা স্প্যানিয়েলটাকে দেখেছ? নকশা তোলা কাঁথা? নূতন কালেকশন।

ভাস্করের ইচ্ছা ছিল আর একটু দেখবে তপতীকে। বিনা আপত্তিতে চলে এল তাই বসবার ঘরে। কিন্তু মিথ্যে অপেক্ষা। একটি ঘণ্টা কাটল স্প্যানিয়েলের লতানো কান, পেডিগ্রি আর নকশাতোলা কাঁথার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে। তপতী এল না। রাত এগারোটায় আর একদফা কাটলেট খেয়ে বাড়ি ফিরল ভাস্কর। তপতীর রং-করা মুখের সঙ্গে চোখের চাওয়ার কতটা অমিল, সেকথা ভাবতে ভাবতে।

পার্টি হতে পালিয়েছিল তপতী। কেবল সারাক্ষণ মাকে মনে পড়ছিল তার। মা! সেই ছলোছলো চোখ। কপালে লুটিয়ে থাকতো শাসনভাঙা চুলের গুচ্ছি। ন'বছর বয়স পর্যন্ত মা-ই তো ভরে ছিল তপতীর ছোট্ট জীবন। পুতুল খেলার সঙ্গীও মা। কাছে আসতে একটু দেরি হলে, ঠোঁট ফুলিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে থাকত সে। যাদুমণির সাধ্যও ছিল না ফিতের ডগাটি পর্যন্ত ছোঁয়।

কি যেন—কি যেন আদর করে বলতো মা? উৎকর্ণ হয়ে সেই কবেকার শোনা সুরটি মনে আনতে চাইল তপতী। একটুও মনে নেই মায়ের আদরের কথাগুলো। মাকে—তার মাকে একেবারে ভুলে গেছে তপতী। ভুলে গেছে? মায়ের সেতার ধরে রেখেছে না মাকে?

ভুলবে সাধ্য কই তপতীর। বাবা ছিলেন অন্য দেশের লোক। কি অবহেলা মাকে! তখনো মাঝে মাঝে পার্টি হোত বাড়িতে—দুপুর হতে কারা এসে সাজাত বাড়ি, টেবিল। আসতো রকমারী খাবারের বাক্স আর মাসি—তখনো মা হতে দেরি ছিল তার। মীনুমাসি আসতো রাজকন্যার মত সেজে। হেসে হেসে মায়ের সঙ্গে কথা বলতো, তপতীর জন্য নেসলস। তার কিন্তু একটুও ভাল লাগত না। আশা করে থাকত মা এক্ষুনি উঠে তিনতলার ছাদের ঘরে চলে যাবে,—সেখানে আছে তার সেতার। মিষ্টি শিশিরভেজা চোখ আর সেতারের রিনরিন শুনতে শুনতে তপতী চলে যাবে ঘুমের দেশে। সে রাজ্যের ঘুম-পরীরা সবাই মায়ের মত, কেবল বাবার গাড়ির শব্দ শুনেও তাদের হাসি মুছে যায় না এই তফাৎ।

তারপর একদিন মা চলে গেল। মরে যাওয়া কাকে বলে তখন জানতো তপতী, কিন্তু মরে যাওয়া তো ফুরিয়ে যাওয়া নয়। রাতের বেলা ছোটখাটের পাশের দক্ষিণের জানালা খুললেই চোখের সামনে

বিছিয়ে পড়ে নীল আকাশের মস্ত একটা টুকরো। সেই নীলের দেশে, হাজার তারার ঝিকমিকির মধ্যে ঝিকমিক্ করত তার মা। ঘুমিয়ে থাকলে চুমো দিয়ে যায় কপালে, বাতাসে পাঠায় হাতবুলানো—তাই তো শিউরে ওঠে তপতীর সব শরীর।

যাদুমণির শক্ত হাতের চিরুণী ঢক্-ঢক্—আপত্তি না-মানা দুধের গেলাস, কাঁটাশুদ্ধ মাছ—বড় হয়ে উঠতে লাগলো তপতী। মীনুমাসি মা হয়ে গেল। বাড়িটা হল অচেনা রাজ্য। অনাদর? আদর করবারই কেউ নেই—তার আবার অনাদর! সুন্দর একটা উদাসীনতার পরিমণ্ডলী ঘিরে রইল তপতীকে। ফ্রক, শাড়ি, স্কুল কলেজ একটার পর আরেকটা এল রুটিন করে। কোন অসুবিধা নেই। অনেক বই, মায়ের সেতার—আর যাদুমণি।

বড় হয়ে গেল তপতী। কষ্ট হয় নি কি মায়ের জন্য? হয় নি? ভীষণ কষ্ট! সেই নরম, গরম বুকে মুখ গুঁজে থেকে, হঠাৎ একদিন বড় হয়ে যাওয়া—আর নিজে নিজে দিন গুণে বড় হয়ে ওঠা, কি কষ্ট! যাদুমণি মরে গেল তপতীর সেকেণ্ড ইয়ারের শেষের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গেল জ্বরের গরম কপালে বুলোবার হাত, পড়তে পড়তে রাত হয়ে গেলে বসে-থাকা একটি কুঁচকানো বুড়ো মুখ।

প্রিয়বালা এল যাদুমণির বদলে। সে যাদুমণি নয়—ভাল ঝি মীনাক্ষীর বন্ধু এক মহিলা দিলেন প্রিয়বালাকে। সে জানে কালো মেয়েকে ফর্সা করার কৌশল। চুল আর চেহারার কারুকার্যে ওস্তাদ বলে সার্টিফিকেট আছে তার। তপতীর কাছে কিন্তু নিরাশ হল প্রিয়বালা। হাত লাগাতেই দিল না মোটে, বাহাদুরি দেখায় কি করে! নেহাৎ মেয়েটা ভাল আর মায়না বেশি, তাই টিকে গেল প্রিয়বালা। না হলে প্রসাধিকা হতে সাদামাঠা ঝিয়ের কাজে কখনো সে পদাবনতি ঘটাতো না নিজের।

আজকে কিন্তু তপতীর কোন আপত্তি চলে নি। মীনাক্ষীর একশো টাকা মাইনের যমুনা তার প্রসাধন করে দিয়েছে। লম্বা চুল গুচ্ছগুচ্ছ হয়ে দুলছে ঘাড়ের উপর। ভ্রূ আর চোখ এমনিতেই ভাল—তুলি চালাবার দরকার নেই সেখানে, কিন্তু উদার হাতে রং ঢেলেছে যমুনা তপতীর প্রায় সর্ব শরীরে। দিদুর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা তপতী একেবারে গৌরী আজ। ব্লাউজ কি মিতব্যয়িতা!—দেখা যাচ্ছে ফালি ফালি পিঠ আর কোমর। শাড়িটার আগুনের রং। ঠোঁটেও আগুন জ্বলছে। আয়নায় নিজেকে দেখে ভেবেছিল তপতী—এ তো তার জন্মদিনের সাজ নয়,—একজনকে মুগ্ধ করবার আয়োজন সব বিস্বাদ লেগেছিল। তারপর সেতার—সব খাবাপ-লাগা সুরের আলোয় ভাল হয়ে গেল। ভাস্করকে দেখল তপতী। যত শুনেছিল, তেমন ভয়ঙ্কর সুন্দর নয় সে। রং বাঙালীর মতই, লম্বা পক্ষ্মঘেরা টানা চোখ, নিমশাতা ভ্রূ অবিকল অবনঠাকুরের বর্ণনা-মাফিক নাক আর বাঁ দিকের কপালে দু'টো চুলের ঘূর্ণি।

যদি এমন বানানো পার্টি না হয়ে ভাস্করের সঙ্গে দেখা হত অন্য কোথাও? মায়ের তৈরি আলো ফুলের মেলায় নয়, ভগবানের নিজের দেওয়া দৈবের মধ্যে হঠাৎ যদি দেখা হত—পার্কে, ট্রাম লাইনে? তপতীর শুকনো চুল, উড়ছে বারো টাকা দামের সস্তা শাড়ির আঁচল। সারাদিনের ঘামে পালিয়েছে পাউডারের চিহ্নও। আর তিনদিনের পরা ঘরোয়া পোষাকে ভাস্কর! তা'হলে? যদি ঠেকে যেত হাতে হাত? তা'হলে? হয় তো তা'হলে সেতার ছাড়াই বেজে উঠতে পারতো বসন্তরাগ।

তপতীর বাজনা ভাল লেগেছে ভাস্করের। মীরা ছাড়া আর কেউ এত খুশি হয়েছে কি তার বাজনা শুনে? অবশ্য কলেজে তার নাম আছে। সেবার প্রফেসর সরকার—কেমিষ্ট্রীর বাচ্চা মাস্টার সজল সরকার বাজনা শুনে চেয়েছিলেন কি রকম মুগ্ধ-চোখে। তপতীরা ভাল চেনে না সায়েন্সের প্রফেসরদের। কমনরুমে ছেলেমানুষ মাস্টার মশাইদের নিয়ে মেয়েদের ফিস্-ফিস্ উপভোগ করে আর্টসের ছাত্রীরা।

মীরা বলেছিল—দেখছিস্ সরকারের চোখ? ওর চোখ কি বলতে চাইছে জানিস?'

—কি? হেসে জানতে চেয়েছিল তপতী।

—বলছে যদি পারতাম—

শচীর কণ্ঠে মালাখানি লয়ে

তোমার গলায় দিতাম দুলায়

—এঃ! ভুল হল।

—হোক। ভুলই ওরিজিন্যালিটি। হেসেছিল দুই বন্ধু আঠারো বছরের চপল হাসি।

ভাস্করের চোখ কি বলছিল—মীরা থাকলে বলতে পারত সে কথা, কিন্তু ওকে তো আজ নিমন্ত্রণ করা হয় নি। না না, ভুল নয়। ইচ্ছে করে, ওকে বাতিল করা হয়েছে লিস্ট থেকে। মীরা থাকলে যে আজকের পার্টির আভিজাত্যই কমে যেত।

প্রিয়বালাকে বাইরে পাঠিয়ে দিল তপতী। একঘর অন্ধকার। উঁকি দিচ্ছে তারা-ছিটানো আকাশ—সেখানে বসে আছে তারা হয়ে তপতীর মা। রং ধোয়া, পাতলা শাড়ি জড়ানো তপতী ঘুমোতে লাগল বালিশ জড়িয়ে ছোট্টটি হয়ে। স্বপন-বুড়ো বুনে দিলেন একটুকরো মিষ্টি স্বপ্ন যৌবনের 'মধুগন্ধে ভরা'। এক ছেলের চোখের আলোয় আলো হয়ে উঠেছে তপতী। হাতে তার কি?

ফুলের মালা নয়, আইসক্রীমের প্লেট।

ভাস্কর অফিসে। মস্তবড় সেক্রেটেরিয়েট টেবিল। একপাশে ফোন। দু'টি ফাইল-র‍্যাকে জমে আছে কাগজপত্র। একপাশে গোল আয়না বসান লম্বা স্ট্যাণ্ড—ঝুলছে কোট। ব্যস্ত ভাস্কর জরুরী ডিকটেশন দিতে। মস্তবড় ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম সুমোহন মিত্রের। দিনে দিনে বাড়ছে ব্যবসা। নিজে সব কাজ দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল, ইদানীং ভাস্কর এসে কিছু ভার নিয়েছে। নিবিষ্ট ছিল কাজে—আর্দালী এসে জানাল—মিস লিলি বোস। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলো ভাস্কর,—চারটা। বসন টান হয়ে ইঙ্গিত পেয়ে স্টেনো গুছিয়ে নিল আজকের মত কাগজ। ভিজিটর এল ঘরে—লিলি বোস এই নূতন নয়, অফিসে আরো এসেছে লিলি। লিলির ভাই প্রবীর ভাস্করের ছোটবেলার বন্ধু—লিলিও।

সারা ডালহৌসী স্কোয়ার রোদ জ্বলে যাচ্ছে, তার তাপে টুকটুকে লিলির মুখ। অফিসের সাবেক ঠাট এখনো বদলান নি সুমোহন মিত্র, হয় নি এয়ার কণ্ডিশনড্। ভাস্করের ঘরে খসখসের ভিজে

পর্দা মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে। সারা ঘর অন্ধকার, আলো ঠিক টেবিলের উপর। ঘর যেন ঘুম-জড়ান। একটুও মনে হয় না মোটা মোটা হিসাবপত্রের ঘর বলে। লিলির সতর্ক অবহেলায় উদ্ভাসিত তনুশ্রী আর বিশ্বকর্মাকে হার মানানো কারিকুরি দিয়ে বানানো মুখশ্রী আবেশ আনে যুবামনে। ভাস্কর হয়তো বিহ্বল হোল।

—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার আবার কি। খেয়াল—চলে এলাম।

কুন্দদন্ত দেখাল লিলি।

—তুমি নাকি তপতী রায়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ? বিয়ে করবে তাকে!

—এগুলি কি জিজ্ঞাসা না অনুমান?

জানতে চাইল ভাস্কর।

—গুজব। বাজারের সব চেয়ে জোর খবর সরবরাহ করছি। পি, টি, আই। দক্ষিণা দাও।

করপল্লব প্রসারিত করলো লিলি।

—গুজবে কান দিতে বারণ আছে প্রাজ্ঞজনের সুতরাং অন্যকিছু বল।

লিলির হাতটি নিজের হাতে তুলে নিল ভাস্কর। রক্তাভ কোমল হাত

—এত বড় নখ রেখেছ কেন? জান না চাণক্য পণ্ডিত নখীদের হতে শত হস্ত দূরে থাকতে উপদেশ দিয়ে গেছেন?

—ইস্!—খর্ব কেশে ঝাপট দিল লিলি।

—এখন তো এই লম্বা নখই শত হস্ত দূর হতে টেনে আনছে তোমাদের।

—তা হবে। কিন্তু সত্যি লিলি। তোমাদের এই লম্বা নখ একটুও ভাল লাগে না আমার।

—তোমার না লাগলেও লাগবে আর কারোর। তবে যদি নিশ্চিন্ত করে দাও,—নখ কেটে, বেণী বেঁধে একেবারে সরলা কিশোরী বনে যেতে রাজি আছি।

হাসলো দু'জনেই। একটু বা গম্ভীর হল ভাস্কর।

—এ তোমার বড় বেশি শানানো কথা লিলি। কেবল পুরুষদের সন্তুষ্ট করতে, অন্তত ভদ্রমেয়েরা প্রসাধন করে,—একটুও ধারণা হয় না।

—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও টাকার বদলে যারা বিকিয়ে দেয় নিজেকে, তারাই কেবল সাজটা করে পুরুষের মনস্তুষ্টির জন্য?

—একেবারে বুদ্ধু তুমি ভাস্কর! ভেবে দেখত,—একটা রাতের ভার নেবে বলে যারা যায়, তাদের খুশি করতে ওরা যদি অত সাজ করে, তবে সমস্ত জীবনের ভার নেবে যারা, যোগাবে হরেক রকম খেয়াল-খুশির সরঞ্জাম, দেবে সামাজিক সম্মান আর স্বাধিকারের সুখ—তাদের মন হরণ করবার জন্য আমরা,—ভদ্রমেয়েরা ধরব না কেন মোহিনী বেশ?

হাসি চমকাল ভাস্করের চোখে, ছেড়ে দিল লিলির মুঠি। ভাল করে ইংরেজী শেখার এই এক দোষ—ইংরেজী সাহিত্যের কড়া কড়া কথাগুলি এমন আয়ত্তে এসে যায় যে, শ্রোতার চমক লাগে সে সব শুনে। মনে হয় বুঝি আলোচনাকারিণীর নিজেরই আধুনিকতম চিন্তার প্রকাশ হচ্ছে।

লিলি বুঝলে কি না কে জানে ভাস্করের ভাবনা, কিন্তু প্রসঙ্গটা সে ছেড়ে দিল।

—দাদার কাণ্ড জান?

—অর্থাৎ নবতম কাণ্ড?—জিজ্ঞেস করল ভাস্কর।

লিলি হাসল।—হ্যাঁ নবতমই বটে, তবে আধুনিকতম নয়। ভালবাসা, বিয়ে, ছাড়াছাড়ি এ তো সেই আদ্দিকালের ব্যাপার। হরদম ঘটত সাবেক দিনে,—গল্প করেন ঠাকুমা। দাদাটা এমন হাবা,—ঠিক তাই করছে, আর জ্বালিয়ে মারছে মাকে।

লিলির দাদা প্রবীর শুধু একবার বাকত্রাস করে নিজেই ফিটফাট। আমাদের দেশের কার্তিক লম্বা কোঁচা আর ময়ূর নিয়ে দেশী উদাহরণ দেবার সম্ভাবনা মেরে রেখেছেন, দরকার পড়লে তাই ছুটতে হয় ভিন দেশে। প্রবীর দেখতে যেন দেবাদিদেব জুপিটার—যাঁর ললাট ফলক হতে আথেনা দেবী আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেন্ট লরেন্সে ছোট হতে পড়ে চোস্ত ইংরেজী গানগুলো সে রপ্ত করেছিল অ্যাংলো ছেলেগুলির দৌলতে শৈশবেই। যৌবনে বিলেত গিয়ে রপ্ত করেছে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যান্য জিনিস। যা পড়তে গিয়েছিল তা পড়া হোল না বটে, কিন্তু দু'বার স্ক্যাণ্ডাল, একবার বিয়ে আর ডাইভোর্স—। বহু টাকা বেরিয়ে গেল প্রবীরের বাবা বিমান বোসের মোটা পকেট হতে। ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে বিলেত গিয়ে ছেলেকে হস্তগত করে ফেললেন; প্রথমে অবশ্য তাতে বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। বলেছিলেন—চুলোয় যাক। কিন্তু প্রবীরের মায়ের মুখের দিকে চাইতে হ', আর চারদিকের গুঞ্জনেও বিব্রত হয়ে—অগত্যা—।

মাস ছয়েক যাবৎ প্রবীর ফিরেছে দেশে এবং সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে আবার নাকি প্রেমে পড়েছে সে কোন এক পথে বেড়ানো মেয়ের। চাকরী নেবে বার্মাশেল বা বার্ড কোম্পানীতে দুশো টাকা মায়নায়, আর নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেনে ষাট টাকার ফ্ল্যাট। মা আবার ভির্মি খেতে আরম্ভ করেছেন। বিলেতে যা করত, তাতে তবু একটা আভিজাত্য ছিল তো! এ যে আর্ট স্কুলের পাস বাইশ বছরের মাস্টারণী। বাবা বলছেন—গেট আউট। প্রবীর বলছে—ও কে। মাঝখানে লিলি পড়েছে মুস্কিলে। হোত ডরোথী গুপ্ত—সরোজ গুপ্তের তিনবার ডাইভোর্স করা বৌ, কিম্বা পম্পা চাকলাদার, স্বামী আমিমুলকে ত্যাগ করে সম্প্রতি যে বেকার অবস্থায় গ্রাণ্ডে আছে—তবু কিছুটা মান বাঁচত। সবাই মানত অ্যারিস্টোক্র্যাট ফ্যামিলির স্ক্যাণ্ডাল বলে। এ যে একেবারে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের পেটি কেলেঙ্কারী।

ভাস্কর দেখল লিলিকে। তাকিয়েছে সে সামনের দিকে, হাসি-খুশি নেই। থমথমে হয়েছে মুখ, বাঁ দিকের জ্রটি একটু বেঁকে গেছে আর তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ছোট তিল। ভাস্কর দেখেছে জয়ন্তীকে—প্রবীরের নব-মনোনীতা। আশ্চর্য! কি করে যে তাকে পছন্দ করেছে প্রবীর। না আছে তনু-গরিমা না আত্মিক ঐশ্বর্য। আত্মিক ঐশ্বর্য! চমকাল ভাস্কর। সে কি জয়ন্তীর আত্মার মুখোমুখি হয়েছে? নারীদেহকেই সে ভাবছে বুঝি

নারী·মহিমা! মুস্কিল! বিলেত ঘুরে এসেও সিগারেট খাচ্ছে না ভাস্কর। চিন্তা করবার সময় অসুবিধা হয়

দু'দিন প্রবীরের সঙ্গে জয়ন্তী এসেছে ভাস্করের অফিসে। চঞ্চল মেয়ে। মাস্টারী ছাপ পড়তে অনেক দেরি এখনো। জয়ন্তীর ছবি দেখেছে ভাস্কর। হুঁকো হাতে এক বুড়ো আর কোন একটা শালুক-ফোটা পুকুরের একটা টুকরো। ভাস্কর দিয়েছিল তাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কিছু কাজ। জয়ন্তীর আইসক্রীম খাওয়া লোভী লোভী মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন একটা মায়া হয়েছিল ভাস্করের—কিন্তু এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে! সত্যি, পরিবারকে মুস্কিলে ফেলেছে প্রবীর।

—এই লিলি! ভাবছ কি?

লিলি তাকাল, হাসল একটু,—এ হাসি মানায় না রং-করা ঠোঁটে। বললো—চলো, মা তোমায় ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন।

পাঁচটা বেজেছে তবু তখনো ওঠে নি কর্মচারীর দল। হলের মাঝ দিয়ে যাবার সময় নীচু নীচু মুখের চোরা দৃষ্টি পড়তে লাগল লিলি আর ভাস্করের উপর।

স্কুটার। কাঁধের উপর মাত্র হাত ঠেকিয়েই অক্লেশে বসতে পারে লিলি। লোয়ার সার্কুলার রোডটা যদি পৃথিবীকে ছাড়িয়ে আরও দূরে ছড়ান থাকত—অসীমের রাজ্যে উধাও হত লিলি। আবার হাসল সে, এ হাসিও মানাল না রঙিন ঠোঁটে।

তপতী চোখে ধাঁধা দেখল নাকি? সে এসেছিল ডালহৌসী স্কোয়ারের টেলিফোনের বাড়িতে মীরার খোঁজে। একমাস পাত্তা নেই তার। নূতন বাড়ি বদলেছে ওরা—সে ঠিকানাও অজানা—চলে এসেছে তাই মীরার অফিসে। দেখা হল, কলকণ্ঠ হল দুই সখী। কিন্তু সময় নেই, মীরার ডিউটি শেষ হবে পাঁচটায়। অগত্যা তপতী বসল একটা চেয়ারে, হাতে তুলে নিল অবসর-বিনোদনের একমাত্র সহচর সিনেমা পত্রিকা। বেলা শেষে বেরিয়েছে দু'জন। হাঁটছে পুকুরের পাড় ধরে। হঠাৎ দেখা গেল স্কুটারে চলেছে ভাস্কর, তার কাঁধে হাত রেখে লিলি বোস। ইসারায় চলে গেল ওরা। উড়ছে লিলির খাটো চুল, উড়ছে শাড়ির আঁচল—ওরাও উড়ে চলে গেল তপতীর সামনে দিয়ে। বন্ধুকে থমকাতে দেখে মীরাও তার চোখ পাঠাল দ্রষ্টব্যের সন্ধানে—

—কি দেখছিস? ও! লিলি বোসকে? জানিস না তো কি মুস্কিলে ফেলেছে আমাদের ওরা!

তপতী অবাক। লিলি বোসরা মুস্কিলে ফেলেছে! এত উঁচুতে অধিষ্ঠিত ওরা, যে সেখান হতে মীরাদের সান্নিধ্যে এসে মুস্কিলে ফেলা একটা দস্তুরমত বিপ্লবাত্মক ঘটনা। বন্ধুর চোখে প্রশ্ন দেখে মীরা আবার বলল,—চল বাড়িতে, শুনবি সব। মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা'র, বাবা রেগে আগুন। টেকা যাচ্ছে না মোটে বাড়িতে।

তপতী একটু ভাবল।—আবার তোর বাড়ি যাবো? দেরি হয়ে যাবে যে।

—তোর যেতে ইচ্ছে না হলে যাস না। আমার সাধ্য কি পচা গলিতে তোকে নিয়ে যাই।

অভিমানে অবুঝ হল মীরা। বড় কমপ্লেক্স ওর। একটু কিছু হলেই অমনি তুলবে পারিবারিক প্রভেদের প্রশ্ন। অথচ ছোট থেকে দু'জনে এক স্কুলে, একই কলেজে পড়ে বড় হয়েছে তারা। সেই অবহেলার স্বাধীনতার দিনগুলিতে তপতীর প্রধান যাবার জায়গাই ছিল মীরার বাড়ি। তেল-মাখা মুড়ি, আমের ঝাল-টক আচার,—সব কিছুতে ভাগ তপতীর। মীরার জোড়া তাঁতের শাড়ি পরে, বিজয়ার প্রথম প্রণাম করত তপতী মাসীমাকে। মীনাক্ষীর খবরদারীর আওতায় এসে কয়েক মাস যাবৎ তপতীর গতিবিধি সংযত হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে মীরার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হবার কারণ ঘটে নি। তপতীদের পরিবার যেখান হতে সুরু, সেটা মীরাদেরই সমাজ ছিল। অবশ্য এখন শৈলেন রায় উঠেছেন বহু ঊর্ধ্বে, কিন্তু তাই বলে কেরাণী বা কবিরাজ আত্মীয় দেখে ভ্রূ কুঁচকে যায় না মীনাক্ষীর। শৈলেন রায় তো তাদের পেলেই প্রাক-জীবনের আলু-কাঁচকলার গল্পে লেগে যান, চেষ্টা করেন অল্পবয়সী ছেলেদের চাকরী দেবার, ক্যারেকটর সার্টিফিকেট বিতরণ করেন অকাতরে।

ডবল-ডেকারের দ্রুতগতি পঁচিশ মিনিটে এনে দিল মীরার বাড়ি—মনোহরপুকুর রোড। ঝাঁকুনি সামলে নামলো দুই বন্ধু। এ বাড়ি আগের চেয়ে ভাল। একটি ঘরের সংখ্যা বেড়েছে। জানালায় পর্দা, দুই বোনের তক্তপোষে নূতন সুজনি।

—সুন্দর তো বাড়িটা। তপতী বললো।

উৎফুল্ল হল মীরা।—বেশ ভালো না? কিন্তু ভাড়া বড্ড বেশি। একশো টাকা; আর এ বাড়ি তো ছেড়েই দিতে হবে।

বিষণ্ণতার ছায়া নামল মীরার মুখে।

খাবার এল—চা আর গরম সিঙাড়া। বসলো দুই সখী মুখোমুখি।

—জানিস তপতী! দিদি বিয়ে করছে।

বিয়ে হওয়া আর বিয়ে করার মধ্যে যে অর্থগত বিভিন্নতা রয়েছে তা বুঝতে পারল না তপতী। খুশির খবরে হাসলো।

—ওমা, কবে? সেই হায়দ্রাবাদের ডাক্তার বুঝি?

—না রে, মেয়ে নিজেই বর ঠিক করেছে। প্রেমে পড়েছে! লিলি বোসের ভাই প্রবীর—সেই যে লাল গাড়ি আর মেয়ে নিয়ে ঘুরতো, মেমসাহেবের ঠেঙানী খেয়ে ফিরে এসেছে দেশে—দিদি তারি সঙ্গে জুটেছে।

এত বড় হাঁ করে ফেলল তপতী। দিদি! তার মানে জয়ন্তী? সেই ছাপা শাড়ি—ছিপছিপে—টিচার আর প্রবীর! ইয়োরোপ, লক্ষ টাকা, গাড়ির স্পীড নব্বুই মাইল! বলে কি মীরা!

মীরার মা এসে বসলো মেয়েদের কাছে। নরম চোখ, নরম গলা।—শুনেছ জয়ার কাণ্ড?

নিজেকে সামলাল তপতী।—কাণ্ড আবার কি? ভালই তো। বিয়ে দিয়ে দিন।

—বিয়ে দেব? ও কি ঘর করবে আমার মেয়েকে নিয়ে হয় তো দু'দিন সখ হয়েছে, চাইছে বিয়ে করতে। খেয়াল ফুরোলে ছুড়ে ফেলে দেবে মেয়েটাকে।

একটু থামলো মা।—আমাকে তো গ্রাহ্যই করে না। কি যে ভাবছে আজকাল! কেবল বলে—আমরা নাকি ওর টাকা চাই, সুখ চাই না।

চোখের জল ঝরলো শীর্ণ গাল বেয়ে। মায়ের দুঃখে ভারী হল দুই মেয়ের বুক। সখীর কাছে চোখে চোখে বিদায় নিয়ে তপতী চলল বাড়ি, ভিড় ঠেলে উঠে দাঁড়াল ট্রামে।

—তাই, তাই—লিলি চলেছে ভাস্করের সঙ্গে। হয়তো যাচ্ছে লিলির বাড়িতে। ওদের বাড়িতেও উঠেছে নিশ্চয় একটা প্রকাণ্ড ঝড়। মীরার মা ভাবছে মেয়ের আসন্ন দুঃখের কথা, আর লিলিদের দুঃস্বপ্ন—প্রবীর নেমে যাচ্ছে নীচে, কেরাণী মাস্টারদের সমাজে যেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে পরিবারের প্রতিনিধি হয়ে ড্রাইভার, অক্লেশে যাদের প্রবীণতাকে অগ্রাহ্য করে সময় বিশেষে ধমক লাগায় লিলির মা। যারা অপেক্ষা করে বারান্দায় বেতের চেয়ারে, আপ্যায়িত হয় রিজেক্টেড কানা-ভাঙা কাপে চা পেয়ে। লিলি বুঝি ভাস্করকে ধরেছে প্রবীরকে বোঝাবার জন্য। দেশপ্রিয় পার্ক, সুন্দর হাওয়া, দুলে দুলে চলছে ট্রাম। একটি সিট পেয়ে বসল তপতী। ভাগ্যিস্ তপতীর বাবার টাকা আছে,—তপতীকে বিয়ে করলে মিত্র পরিবারের নীচে নামবার কথাই উঠবে না।

বাড়িতে পৌঁছে গেল তপতী। সিঁড়ি বেয়ে উঠল উপরে—নিজের ঘরে। দেরির খবর নিল না কেউ। মীনাক্ষী গেছে চৌরঙ্গীর ছবির একজিবিশনে। ছবি না বুঝলেও যাওয়াটা ফ্যাসন,—না হলে নাম খারিজ হয়ে যাবে আধুনিকতার দলিল হতে।

আয়নার কাছে দাঁড়াল তপতী। টাকা বাদ দিলে জয়ন্তীর সঙ্গে তার তফাৎ কতটা বুঝতে চাইল। জয়ন্তী বি-এ পড়ে নি, কিন্তু মেডেল পেয়েছে আর্টস্কুল হতে। ইম্‌প্রেসনিস্ট নয় সে। ফুল, মেয়ে, আর শকুন একাকার হয়ে যায় না তার ছবিতে। দেখতে? দেখতেই বা মন্দ কি জয়ন্তী? আধুনিক অন্তর্বাস কিনবার টাকা থাকলে আর ম্যানুফাক্টরের ব্যবহার-কৌশল আয়ত্ত করতে পারলে ফিগারে, ফ্যাসানে অনায়াসে হার মানাতো প্রবীরের বোনকেই।

জয়ন্তীর বাবা দু'শো দশ টাকা মায়নার কোন অফিসের ক্যাশিয়ার। ভাইবোনে মিলে তারা দশ জন। বড় কষ্টে দিন চলে। বি-এ তো পড়তেই পারলে না মীরা। অবশ্য সম্প্রতি চাকরী করছে তারা দুইবোন। সংসারেরও তাই শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। মীরার মা ইন্‌স্টলমেন্টে কিনেছে 'উষা' সেলাই কল—তার আজীবনের স্বপ্ন। কোথায় মস্ত বড়লোক, লক্ষপতি, সাতখানা বাড়ির মালিক বিমান বোস আর কোথায় বা জয়ন্তী—কোন এক ইস্কুলের দেড়শো টাকা মায়নার আর্ট সেকশনের ইনচার্য! তবু তো প্রবীর চাইছে জয়ন্তীকে বিয়ে করতে। কেন চাইছে? প্রেম? না বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শ্রান্ত পাখি ডালে বসতে চায়? যে ঘর বাঁধতে না বাঁধতে ভেঙ্গে দিয়েছে ইয়োরোপের মেয়ে তাকে আবার স্বপ্ন দিয়ে গড়বে? লিলি উড়ছে ভাস্করের স্কুটারে, প্রবীরের সাধ কেন পায়ে-হাঁটা পথে চলতে?

—আপনার বাথসল্টের শিশিটা একটুও খরচ হয় নি বলে মেমসাহেব আজ আমাকে খুব বকেছেন দিদি।

তপতীর চুলে চিরুণী দিতে দিতে বলল প্রিয়বালা।

—বাথসল্ট! ও মাকে বলো আমার সাদাজলই ভাল লাগে স্নান করতে।

—বাথসল্ট জলে ঢেলে নাওয়া কিন্তু ফ্যাসন দিদি। দত্তসাহেবের বাড়ির মেয়েরা তো একদিনও অমনি জলে চান করবে না।

সুবিধা পেলেই পূর্বতন মনিব দত্তবাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে তপতীকে জ্ঞান দিতে পারলে খুশি হয় প্রিয়বালা। তপতী সব সময় আমল দেয় না, আবার মাঝে মাঝে মজাও লাগে শুনতে।

—ওরা একেবারে আহেলী বিলিতি মেমসাহেবের মত থাকে কি না।—মুখ চলতে লাগলো প্রিয়বালার।

—সকাল ন'টার আগে বিছানাই ছাড়ে না কেউ। চুলে কার্ল—কাগজ, মুখে ক্রীম আর একচিলতে চলকো সেমিজ পরে শুতে যায়। শোবার আগে রোজ চুমো খায় বব আর মামকে—ঐ বাপ-মা আর কি। আমার মত আরো তিনটে আয়া আছে ওদের। মুখে মাখবার রং, সিল্কের জামা-কাপড় কত দিয়ে দেয় আয়াদের।

নিশ্বাস ফেলল প্রিয়বালা। পঞ্চাশটা টাকার লোভে সাহেব বাড়ি হতে নেমে এসেছে কোথায়। তবু বা মেমসাহেব হলে কথা ছিল,—তার ধরণ-ধারণ কিছুটা সাহেবী। মেয়েটা একেবারে বাঙালী। মান আর নেই প্রিয়বালার।

জয়ন্তী ঠোঁট কামড়ে বসেছিল। রাত একটা বেজে গেছে, ওদিকের বিছানায় মিটিমিটি চাইতে চাইতে বুঝি চোখ বুজেছে মীরা। জয়ন্তীর ঘুম নেই। শুধু কি আজ! ঘুম গেছে তার ছ'মাস আগে হতে—যেদিন প্রথম দেখা হল প্রবীরের সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবারের পথে। বাস ধাক্কা খেয়েছে গাছের গুঁড়িতে। যাত্রীরা দাঁড়িয়ে পথে,—সারি সারি সব উদ্বিগ্ন মুখ। রাত ন'টায় মেয়ে-যাত্রী একা জয়ন্তী। প্রবীর আসছিল ঝড়ের মত কোন্ দূরান্তর হতে যেন। গাড়ি থামাল, শুনল সব। তুলে নিল সবার অনুরোধে জয়ন্তীকে তার টু-সিটারে। প্রবীর বোস—যার নামে কত কুৎসা-কেলেঙ্কারী—তবু যার গাড়িতে দেখা যায় বড়ঘরের মেয়েদের।

আবার দেখা হল প্রবীরের সঙ্গে লেকের পাড়ে—রবীন্দ্র-সরোবরে জলের উপর মুখ দেখছে প্রথম প্রভাত, ছবিতে সেই দুর্লভক্ষণটি ধরে রাখবার চেষ্টা করছিল জয়ন্তী। প্রবীর এসেছিল চক্কর মারতে, কাছে এল। দেখল ছবির রেখা,—তারপর? তারপর কবে যে তাকে তুলে নিল নিজের টু-সিটারে, আর এমন আপন হয়ে গেল একটুও মনে পড়ছে না জয়ন্তীর।

বিয়ে! হ্যাঁ। প্রবীর তো তাকে বিয়েই করতে চায় কিন্তু মা যে কাঁদছে! বাবার রাগ—ভাইবোনদের নীরবতা, সব দেখছে জয়া। সেটা কি নিজেও জানে না এমন অসঙ্গত বিয়ে হতে নেই। বার বার প্রবীরকে বলেছে সে কথা, কিন্তু সব যুক্তি ভেঙ্গেছে প্রবীর।

জয়া ভাল করেই জানে ভালবাসা আর বিয়ে এক নয়। হাতে-হাত, একটু ঠোঁটের ছোঁয়া, দু'টো ছোট কথা—ফুটে ওঠে প্রেমের

ফুল। বিয়েতে বাস্তবের দাবী। বাসর-শয্যা গ্রীষ্মরাতে স্বল্প-পরিসর হয়ে ওঠে। বিয়েতে হাঁড়ি-কড়া, এমন কি মাছের লাল কানকো আর মাংসের পাঁশুটে রং-এর জ্ঞানও অপরিহার্য। প্রবীরের জানা পৃথিবী, আর জয়ন্তীর জানায় যে তফাৎ অনেক। মাঝে মাঝে তারা যায় কাফেতে, প্রবীর দু'একবার চুমুক দেয় কফিতে, খায় কি না খায় ভেঙ্গে একটু কাটলেট, আর জয়ার নিজেরটা খেয়ে ইচ্ছা করে খেয়ে নিতে প্রবীরের থালায় পড়ে-থাকা খাবার, মনে হয় রুমালে জড়িয়ে তুলে নিয়ে আসবে টেবিলের সব খাবারগুলি কোল্ডড্রিঙ্কে চুমুক দিয়ে সে শেষ পর্যন্ত শুষে নেয়, প্রবীরের খালি হয় না অর্ধেক গেলাস। প্রবীরের যত নির্লিপ্ত দেখে, মনে হয় ঠাকুর্দার কথা। আশির উপর বয়স। সব ইচ্ছে চলে গেছে—কেবল আছে খাবার লোভ। খাবার দেখলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। হজমশক্তি নেই, দাঁতও নেই, আঙুল দিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে সেই খাদ্য উপভোগের দৃশ্য দেখে কতদিন বমি এসে গেছে জয়ার। দুর্ভিক্ষের দেশের ভাইবোন, বাবার কথাবার্তা ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে কবে, সেই সংসারের প্রথম মেয়ে জয়ন্তী। এখানে হাত বাড়িয়ে আছে সবাই—লোভী হাত। একটুকরো বিস্কুট, আধখানা মাছের জন্য ঠেলাঠেলি করছে ভাইবোন। গত বছরেও নূতন বাচ্চা হয়েছে মায়ের, কিন্তু বাবা মেজাজ খারাপ হলেই স্ত্রীকে বলেন—মাগীটা। জয়ন্তীর রোজগারের দেড়শো টাকা—অনেক টাকা। রোজ মাছ খাওয়া হচ্ছে, ইচ্ছে করলে কেনা যায় অ্যালোপ্যাথি ওষুধ। মীরারও চাকরী হয়েছে। স্বচ্ছলতা উঁকি দিয়েছে সংসারে। বাবা-মা খুশি। ভাইবোনদের চোখে আশার আলো,—সব বোঝে জয়ন্তী। কিন্তু প্রবীরকে এত কথা বোঝানো যায় কি? বরং বলা যায়,—তোমায় বিশ্বাস করি না। অনেকবার ভালবেসেছ, আর ভেঙেছ সে ভালবাসা তুমি। ভাণ করতে হয় উদাসিনী, গরবিনীর।

কিন্তু জয়ন্তীরও যে সব শুকিয়ে যাচ্ছে। তার ষোল বছর বয়স তো প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ নয়। তখন লাবণ্যের ঢল নেমেছিল সর্বাঙ্গে। শির-শির করে উঠতো সমস্ত মন রবীন্দ্রনাথ পড়ে। কৃষ্ণচূড়ার মত ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল সে। আর আজ বাইশ বছরে তার কণ্ঠা উঠেছে, চোখ ঢুকেছে—কেউ কথা বললে, হাসলেও রাগ হতে আরম্ভ হয়েছিল প্রায়, এমন সময় প্রবীর এল! দেখল না তার হাড়-ওঠা গাল—সেলাই করা শাড়ির আঁচল। টু-সিটারে তুলে নিল জয়ন্তীকে, দৌড় দিল অনেক দূরে—বহু দূরে সংসারের সীমা ছাড়িয়ে।

ক'দিন হল চিঠি লিখেছে কিশলয়। পিসীর দেওর—ছোটবেলার খেলার সাথী। কাজল-কালো হরিণ চোখ ছেলে। ইকনমিক্সের ছাত্র। জয়ন্তীকে ডাকত মেজদি'। বলত বড় সুন্দর ডাক—মেজদি। সেই কিশলয় সব শুনে কঠিন কথা বলে চিঠি দিয়েছে। বলেছে জয়ন্তী স্বার্থপর, নিষ্ঠুর। প্রবীর ধাপ্পাবাজ। হয় তো সত্যি কথাই বলেছে কিশলয় কিন্তু জয়ন্তীর মন যে জেগে উঠেছে—তার কি। চাঁদের পরিপূর্ণতার ছোঁয়া লেগে নদীর জল যেমন উত্তাল হয়ে উঠেছে তেমনি হয়েছে যে জয়ার বুক। সে ভালবাসতে শিখেছে, ভালবেসেছে।

—দিদি! এবার ঘুমো। ওদিকের বিছানা হতে বলল মীরা।

চমকাল জয়া—তুই ঘুমোস নি এখনো?

—ঘুমোবো কি করে? তুই যে ঘুমুচ্ছিস না।

—শোন মীরা। আয় আমার কাছে।

মীরা চলে এল দিদির বিছানায়—শুলো পায়ে-পায়ে জড়াজড়ি করে ছোটবেলার মত। বোনের গায়ে হাত রাখল জয়ন্তী। উনিশ বছরের মীরা ভরাট হয়ে উঠেছে, কিন্তু জানে জয়া, এ ঐশ্বর্য থাকবে না অনেক দিন। চাকরী করে আর সংসারের দাবী মিটিয়ে ঝরে যাবে সে-ও।

—প্রবীরকে বিয়ে করব বলে তুইও রাগ করে আছিস মীরা? বোনকে জিজ্ঞাস করল জয়া।

—প্রবীর ভীষণ খারাপ দিদি। সবাই জানে বিলেতে বিয়ে করেছিল, আর—

—আমিও তো ভীষণ খারাপ ভাই।

—তুই? তুই খারাপ? ভয়ে আঁতকে ধড়ফড় করে উঠে বসলো মীরা, কথা আটকাল তার।

—দূর পাগল! সে সব কিছু নয়। আমি বলছি অন্য অর্থে। শোন্ তুই, বুঝতে চেষ্টা কর। প্রবীরের টাকা আছে কিন্তু আমরা যাকে চরিত্র বলে জানি, তা ওর নেই। আমার টাকা তো নেই-ই, ওরা যাকে চরিত্র ভাবে তারও অভাব আমার মধ্যে।

—তোর? তোর চরিত্র নেই? বলেছে প্রবীর এ কথা? ও কি জানে তোকে? বাংলা দেশে আছে এমন মেয়ে! কি ষ্ট্রাগল! কত স্যাক্রিফাইস্! ভীষণ রাগলো মীরা।

—শোন্! বোনের হাত ধরে শুইয়ে দিল জয়া।

—প্রবীর মেয়েদের সম্বন্ধে দুর্বল। মেয়েদের কাছ হতে দূরে থাকতে চায় না, দরকারও নেই ওর। কিন্তু সব সময় সত্যি কথা বলে, নিজের দোষও স্বীকার করে অকাতরে। আমরা যাকে চরিত্রহীনতা বলি, ওর অভিধানে তার নাম—স্পোর্টিং স্পিরিট। আমার কথা ভেবে দেখ। দরকারে তো বটেই, অদরকারেও অভ্যাসবশে মিথ্যাকথা বলে ফেলি। সাহস নেই, তাই ছেলেদের সঙ্গে মিশি না, কিন্তু বন্ধুর বর দেখে চোখ টাটায়। সবকিছুতে লোভ, অন্যের ভাল দেখে কষ্ট—এর নাম কি দিবি বল তো?

মীরা শুনল, বুঝতে চেষ্টা করল জয়ন্তীর কথা।

—কিন্তু দিদি! তবু তুই প্রবীরকে বিয়ে করিস না। সবাই বলছে—ও তোকে ফেলে ঠিক পালিয়ে যাবে।

—ওকে পালাতে দেব না মীরা। তেমন দেখলে ওকে ফেলে আগেই পালাব আমি।

—পালাবি? হতবাক মীরা;—তবে বাবা-মাকে এত কষ্ট দিয়ে বিয়েটা করবার দরকার কি?

—দরকার? নিজের কানেও যেন শোনা না যায় এমনি অস্ফুটে বলল জয়ন্তী।

—আমি এই সংসার হতে পালাতে চাই মীরা।

—এই সংসার, বাবা-মা এতগুলো ভাইবোন—সব দায়িত্ব ফেলে তুই পালাতে চাস দিদি!

মীরা আর্তনাদ করে উঠল।

—পালাতে চাই। ফুরিয়ে যাওয়া গলায় বলল জয়া। সকাল হতে সন্ধ্যা বিষাক্ত হয়ে থাকে এখানে অভাবের বিষে। শ্রী নেই, শান্তি নেই—ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও নেই,—এমন করে আর থাকতে পারছি না। উমা দেখেছে বুমু-টুমু নাকি কালীঘাট পার্কে কার কাছে ভিক্ষে চাইছিল। বড়খোকা তিনমাস স্কুলের মাইনা দেয় নি। হয় তো খেয়েছে সিগারেট, সিনেমা দেখেছে। হয় তো কোনদিন শুনবি মেয়ে দেখে সিটি দিচ্ছে, পকেট কেটে জেলে গেছে। বাঁচতে হলে এ সংসার ছেড়ে পালানো ছাড়া উপায় নেই।

—কেন? উৎসাহে বিছানায় উঠে বসল মীরা। আমরা সবাইকে ভাল করব। বিয়ে না হলে কি হয়? আমরা ভাইদের মানুষ করব, নিজের বোনদেরও, কত খুশি হবে তখন মা! জানিস তো দিদি। কত অল্পে মা খুশি হয়, আর দেখেছিস একটু খুশিতে কেমন ঝলমল করে ওঠে মুখ? একটুও বুড়ো লাগে না মাকে তখন। তোর শাড়িটা পরে মাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল, দেখিস নি?

দেখেছে। সব দেখেছে সে। মীরার কথার উত্তরে মনে মনে বলল জয়ন্তী। মায়ের সতেরো বছরের প্রথম সন্তান জয়া। তার চোখের ওপর দিয়ে কেটেছে মায়ের তরুণী-বয়স। কতদিন চুপি চুপি গলির মোড়ের দোকান হতে জয়া কিনে এনেছে পাউডার, ডেকেছে 'বেল ফুল চাই'কে। রাত আটটায় স্নান করতো মা সব কাজের শেষে। জল ঢেলে ঢেলে ক্লান্ত শরীর তাজা, মুখে হাল্কা পাউডার আর কপালে গোল টিপ্। তখন কান পাতা থাকতো মায়ের পথের উপর। ন'টায় বাড়ি ফিরতেন বাবা—টিউশনি সেরে। একটা কিছু নিশ্চয় হাতে থাকত। ঠাকুমার জর্দা, দাদুর জন্য হয় তো কোনো কাগজের সান্ধ্য-সংস্করণ, মাঝে মাঝে গঙ্গার টাটকা ইলিশ। পিসীরা এলে তো উৎসব। সব সময় হাসি-গল্প। অবাক হয়ে জয়া ভাবত—মায়ের খোঁপায় শুকনো বেলফুলের মালা আবিষ্কার করে, এত আনন্দ কেন ছোট পিসীর!

তারপর এল দুঃখের দিন। শেয়ারের বাজারে দাদু অনেক টাকা লোকসান দিলেন। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে গেল সব আনন্দ। বাড়ির দরজায় লাঠি হাতে কাবলী-কিস্তিওয়ালা। কুণ্ডু লেনের সেই বড় বড় ঘর ছেড়ে, মস্ত চৌবাচ্চার টলটলে একপুকুর জল ফেলে, বাড়ি বদলান হল স্যাঁৎসেঁতে একটা একতলায়। দু'টো ছোট্টঘর, একফালি দরমা-ঘেরা রান্নার জায়গা। কান্না পেত জয়ন্তীর। ভাইবোনদের নিয়ে ঘরবন্দী থাকতে হত তাকে, পাড়ার নোংরা বাচ্চাগুলোর চেয়ে অবশ্য ঘরই ভাল কিন্তু করপোরেশনের ইস্কুলে পড়তে গিয়েই ঘাড় বাঁকাল জয়ন্তী, আর সেই প্রথম মার খেল—শবার হাতের মার—যে বাবা তাকে দশটা চুমো দিয়ে ঘুম ভাঙাতেন।

মায়ের মুখের হাসিটি কিন্তু তখনো ছিল। প্রাণপণে চেষ্টা করত মা সংসারের শ্রী বজায় রাখতে। দিনে দিনে সব অন্যরকম হয়ে গেল। ঠাকুমা আর মাকে মা-লক্ষ্মী বলে ডাকতেন না। মাছ-দুধ না পেলে দাদু করতেন বিশ্রী গালাগালি। আর বাবা? বাবার জ্র কুঁচকেই থাকত। একটু হাসতেন না কখনো বাবা। কথা বলা মানেই ধমক। কত যে বিশ্রী কাণ্ড হতে লাগল বাড়িতে। একবার তিন পিসীর আসা নিয়ে মহা হাঙ্গামা বাঁধল। খরচপত্রের কৃপণতা নিয়ে কি যেন টিপ্পনী কাটল বড়পিসী, আর বাবা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যা-তা বললেন তাকে। পিসীরাও ছাড়ল না। সে কি বিরাট ঝগড়া। মা ছুটে এসেছিল শান্ত করতে, কিন্তু তাকেই সব অনিষ্টের মূল বলে ঘোষণা করে পিসীরা চলে গেল। সেদিনের মায়ের কান্না—সেই নিরুপায় মেয়ের প্রাণপণে গড়া ঘরের সব মাধুরী যখন দারিদ্র্য কঠিন হাতে মুছে দিল, সেদিনের মর্মান্তিক কান্নাও দেখেছে জয়ন্তী।

লেকের ওদিকে একটু অন্ধকারে জলের ধার ঘেঁষে বসেছিল তপতী। ওখানে কি কোন অভিজাত তরুণী অমন করে বসে? ও তো কলেজে-পড়া, হৃদয়াবেগে টলমল সস্তা মেয়ের নিভৃত নিরালা। গাড়িতে ভাস্কর জিজ্ঞেস করেছিল—আজ কোথায়?

ঠাণ্ডা শান্ত তপতী হঠাৎ বলল, লেকে যাবেন? অনেকদিন যাই নি ওখানে।

তাই লেকে এসেছে দু'জনে, চুপচাপ বসেছে একটি কোণে। যদি চিনে-বাদাম কিনত তপতী, কোল পেতে বসত—বাদাম ভাঙার মুটমুটে শব্দে ভাঙত নীরবতা, হতে পারতো অন্তরঙ্গ কথাবার্তা। মীরার সঙ্গে এলে তাই করত তপতী, কিন্তু এ যে—ভাস্কর—বিদ্যা-বুদ্ধি আর চেহারা, কাছে এলেই যেন আড়ষ্ট লাগে একটু।

—রেজাল্ট কতদূর! নীরবতা ভেঙে ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল। অভিজ্ঞতায় বুঝেছে—পড়া আর সুরের কথাতেই খুশি হয়ে সাড়া দেয় তপতী।

—সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে বেরুবে শুনছি।

—তারপর এম-এ বুঝি?

—না। মায়ের মত নেই। একটা ঘাসের শিষ ছিঁড়ল তপতী।

—তপতী শোন! ক'দিন হতে মীনাক্ষীর অনুরোধমত তপতীকে তুমি বলছে ভাস্কর।—আমি মত করে দিতে পারি মায়ের—মৃদু মৃদু বললো ভাস্কর।

হাসল তপতী। ভালই জানে সে,—ভাস্কর যা বলবে তাতেই রাজী মীনাক্ষী। অপেক্ষায় আছে, মস্তবড় একটা অনুরোধে রাজী হবার জন্য। ভাস্কর মীনাক্ষীকে জানাবে তপতীকে বিয়ে করবার কথা—আর তক্ষুনি খুশি হয়ে মা বলবে—হ্যাঁ—হ্যাঁ। যেন তার আর ভাস্করের মাঝখানে তপতী বলে কেউ নেই—দরকার নেই তার সম্মতি।

—আমিও আর পড়ব না ঠিক করেছি। অ্যাপ্লিকেশন করছি মীরাদের অফিসে চাকরীর জন্য।

—মীরার অফিসে? মানে টেলিফোনে? চাকরী করবে তুমি? অবাক হল ভাস্কর।

—চাকরী করব কেন? শুধু তো অ্যাপ্লিকেশন। চাকরী

হবে বুঝি আমার ? আর মা করতে দেবেন চাকরী ? স্টেট্‌সম্যান দেখে দেখে দুপুরবেলা মেলা অ্যাপ্লিকেশন করছি আর ছাড়ছি। ইংরেজী অভ্যাস হচ্ছে আর কি।

প্রায় বেমানান হাসল ভাস্কর। এমন করেও কথা বলতে পারে নাকি তপতী ? ক্যালকাটা ক্লাবের কড়া আলোয়, অভিজাত হোটেলে, লম্বা ড্রাইভে এতদিন দেখেছে ভাস্কর চুপচাপ তপতীকে। কথা বলেছে সে তার কথার উত্তরে, হেসেছে—হাসির কথায়। আজ প্রথম শুনল নিজে হতে এত কথা, আর নূপুর-বাজান হাসি। এই হাসি আর কথা আরো শুনতে চাইল ভাস্কর।

—আমার অফিসে আছে চাকরী। দেখ, করবে নাকি অ্যাপ্লিকেশন।

—কত মায়না ? বোনাস কত মাসের ? বৈষয়িক জিজ্ঞাসা তপতীর আর হাসি। সত্যি আছে কাজ ? মীরা একটা অন্য কাজের খোঁজ করছে। ওর আর ভাল লাগছে না দূরভাষিণী হয়ে থাকতে ?

—মীরা ? জয়ন্তী সোম ওর দিদি—না ?

—হ্যাঁ। যাকে লিলির দাদা—

থেমে গেল তপতী। সমস্ত সময়টাই যেন এক মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়ে উৎসুক কান পাতল ওদের কথা শুনবার জন্য। ততক্ষণে চাঁদ উঠেছে একফালি আর নাচছে তার ছায়া এঁকে বেঁকে লেকের জলে। ঝিরঝিরে হাওয়া ; তবু আর এখানে বসে থাকতে ভাল লাগল না তপতীর। জয়ন্তী—প্রবীর,—তাদের ভালোবাসার কথা বলতে ইচ্ছাই করল না তার। কি হবে এখানে বসে থেকে কেবল বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে ? যা অন্তরভরে নিজে হতে জেগে ওঠে নি, সে কি জাগবে মুখের কথায় ? প্রথম দিনটিতে কত ভাল লেগেছিল তপতীর ভাস্করকে. কিন্তু তারপর হতে দামী শাড়িতে নিজেকে মুড়ে, সন্ধ্যা কাটাতে কাটাতে সে ভালবাসা কোথায় যেন উড়ে গেছে। তপতী মনে মনে বলল,—বিয়ে দিতে পার দাও, কিন্তু আমরা ভালোবাসব তারপর বিয়ে হবে, তার অপেক্ষায় থাকলে তো মনে হচ্ছে যুগান্ত ধরে বসে থাকলেও আসবে না সে দুর্লভবস্তু।

ভালোবাসা যে জাগে নি মীনাক্ষীও বুঝেছিল সে সত্য। ভাস্কর নিত্য আসে, বেড়াতেও যায় কিন্তু চোখে আলো কই? তপতী তো আরো নীরব। সুতরাং আদ্দিকালের প্রথামতই সে গিয়ে উপস্থিত হল খুড়তুতো বোনের দেওর সুমোহন মিত্রের বাড়ি। এককালে আধুনিকা শ্রেষ্ঠা ছিল মীনাক্ষী। সেদিন তার পায়ের তলায় অনায়াসে নিজেকে বিসর্জন দিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত বহু তরুণ। পূজকের দলে ছিল সুমোহনও সেদিন। মীনাক্ষী ইচ্ছা করলেই অনায়াসেই তার পদবী বদল হত মিত্রগোষ্ঠীতে। সুমোহন মিত্রের স্ত্রীও জানত সে কথা, কিন্তু তাকেও বিয়ে করেছে সুমোহন ভালোবেসেই, তাই মীনুর প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল না তার। সুকল্যাণীও বন্ধু মীনাক্ষীর।

যথারীতি মিত্র-দম্পতি রবিবারের সন্ধ্যা কাটাচ্ছিল বোনা আর মোটা বই ও চুরুটে। মান্য অতিথির আগমনে বৈচিত্র্য এল। ব্যস্ত হল স্বামী-স্ত্রী। দু'হাতে মীনাক্ষীকে ধরে আপ্যায়ন করল সুকল্যাণী।

—খবর কি ? একজনের ওষ্ঠে আর একজনের চোখে জিজ্ঞাসা।

—খবর ছাড়া আসতে নেই বুঝি ?

—আরে না না। আসবে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু তোমার কত কাজ, আর এদিকে ইদানীং আসছও না অনেক দিন, তাই—বলল সুকল্যাণী।

—আহা। আমি আসছি না। আর নিজেরা ? সেই খুকুর জন্মদিনের পার্টি—তাও কত দিন হয়ে গেল। বন্ধুদ্বয়ের প্রীতিভরা অনুযোগে সুন্দর হয়ে উঠল ধূসর সন্ধ্যা, এলো সোনালী চা, বাড়ির বানানো কেক।

—ছেলের বিয়ের কতদূর কল্যাণীদি ? কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করল মীনাক্ষী আর তক্ষুনি সব বুঝে ফেলে হাসি চমকাল কল্যাণীর চোখে। তাই বল। এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে দেবীর আগমনের উদ্দেশ্য। তা মন্দই বা কি। দেখতে পরীটি না হলেও তপতী মেয়ে বড় ভাল। একই কথা মনে হল সুমোহনেরও।

—কোথায় বিয়ে ? দু' একটা কথা হচ্ছে বটে। ঠিক হয় নি কিছুই। তোমার খুকুরও তো বিয়ের কথা হচ্ছে না ?

—বিয়ের চেষ্টা চলছে, কিন্তু ভাল ছেলে পাই কই।

—ভাল ছেলে ? তা ভাস্করকে কি তোমার ভাল ছেলে বলে মনে হয় !

হাসির ফুল ফুটল তিনটি মুখে।

—ভাল তো নিশ্চয়ই। খুকুর চেয়ে খুব বেশিরকম ভাল তোমার ছেলে। আর ভাস্কর কাউকে পছন্দ করে বসে নেই কি না ঠিক জানো তো ?

মীনাক্ষী চাইল ছেলের মায়ের দিকে।

—না না —বলল বটে সুকল্যাণী, কিন্তু গলায় ঠিক নিঃসন্দেহের সুরটি বাজল না মায়ের।

—আচ্ছা। আমি না হয় জিজ্ঞেস করব ওকে। কি বল ? স্বামীর দিকে চাইল মিত্র-জায়া।

সুমোহন এতক্ষণ নীরব শ্রোতা ছিলেন বান্ধবীদের আলাপনের, জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তর দিলেন,—পছন্দ আর করব কাকে ? অফিস নিয়েই তো আছে। তারপর সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই যাচ্ছে মীনুর ওখানে, পছন্দ করে থাকলে ও—করেছে তপতীকেই।

—কেন ! লিলির সঙ্গে খুব ঘোরে তো। আর খুকুটা—একটু থামল নাক্ষী—আপ টু হিজ চয়েস না ও হতে পারে। বড় বেশি প্লেন ও।

—প্লেন ? উত্তেজিত হলেন সুমোহন মিত্র।

—চমৎকার মেয়ে তপতী, সাবল্যইম ! হার আইজ আর সাইলেণ্ট হোম অব প্রেয়ার। একদা প্রিয় কবির লাইন কোট করলেন তিনি।

হাসলো দুই বান্ধবী আর দৃষ্টি বিনিময় করলো। সাইলেণ্ট আইজ আর এখন কাউকে আকর্ষণ করতে পারে না। ঠিক হল ভাস্করকে সুকল্যাণী বলবে তপতীর সম্বন্ধে। তাদের ? তাদের ব মত। অমন মেয়ে পাওয়া যাবে নাকি সহজে আজকাল

লিলি তো একটা উদ্ভট। আধা মেম, আধা বাঙালী। ছেলে যদি পাগল না হয়, তবেই বিয়ের জন্য অমন মেয়ে পছন্দ করবে। তবে তেমন কিছু আছে বলে মনে হয় না। মেশে? প্রবীর ছোটবেলার বন্ধু যে—ওদের পরিবারের সঙ্গে মেলামেশাও তাই। আর বোসেরা মানুষ খারাপ নয়।

—যাক! তা হলে মীনুর সঙ্গে সম্পর্কটা দাঁড়াবে কি রকম? হো হো হাসলেন সুমোহন। হাসল সুকল্যাণী, মীনাক্ষীও। যৌবনের ঝলমলে দিন, স্কটিশের করিডোর, ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট উঁকি দিল ক্ষণিকের জন্য।

তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিদায় নিল মীনাক্ষী। সেই অতীত দিনে বোঝে নি কত দোষ করেছে মৌন-মুখ দিদিটির কাছে। দিদির শাড়ি-গয়না দখল করত যে জোরে। স্বামীও নিয়েছিল সেই জোরেই। তারপর যখন পিছন ফিরে দেখবার বুদ্ধি হল, তখন দেরি হয়ে গেছে—কত রাত্রি কেঁদে কাটিয়েছে মীনাক্ষী। ভেবেছে মা কেন চুলের মুঠি ধরে প্রথমেই নিবৃত্ত করেন নি তাকে এই নিষ্ঠুর খেলা হতে। যদি তপতী সুখী হয়, হয় তো দিদি ক্ষমা করবে—সেই ছোটবেলার মত, যখন অনেক দোষের পর ছলছলে চোখে কাছে এসে দাঁড়াত সে আর এণাক্ষী হেসে কাছে টেনে নিত তাকে।

অর্থনীতিতে বিলেতী ছাপ থাকলেও ছাব্বিশ বছরের ভাস্কর কল্যাণীর একমাত্র সন্তান। এখনো বড় হতে পারে নি সে, স্বতন্ত্র হয় নি মায়ের বক্ষোনীড় হতে। জমা টাকার অঙ্ক মোটা হলেও মিত্র-পরিবার অতি আধুনিক নয় চলনে-বলনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেমন অনেককে গুঁড়িয়ে দিয়ে [illegible] তুলেছেও আবার অনেককে। সুমোহন মিত্রের টাকা যুদ্ধের দান। আর কল্যাণীর বাপের বাড়ি তো আজও মধ্যবিত্ত মাত্র। বিদ্যার খ্যাতি আছে কল্যাণীর ভাইদের, কিন্তু টাকার কথা বলে না কেউ। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখী পরিবার গড়েছে কল্যাণী। দেয়ালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ছবি, বেলুড় মঠ, কালীবাড়ি। আলতা-সিঁদুর বর্জিত নয় কল্যাণীর পরিবেশ হতে, আবার পার্টি, সাহেব-বন্ধু এসবও আছে ব্যবসা এবং ভাললাগার খাতিরে।

খাটে টান্ টান্ ভাস্কর, কল্যাণী এসে বসলো কাছে, ছেলের কপালের চুল সরিয়ে, মুখে-চোখে আদর দিল মা।

—কি মতলব? হাসল ভাস্কর।

—বুঝলি ভাস্কর! একটা ভারি ভাল খবর আছে। ভণিতা বাদ দিয়ে প্রথমেই বিষয়বস্তুতে চলে এল কল্যাণী।

—যথা? সবিস্তারে বল। মাকে একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ছেলে।

—আজ মীনাক্ষী এসেছিল। তপতীর সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চায়।

অবাক হোল ভাস্কর। অতি আধুনিকা মীনাক্ষী রায়। কি যেন একটা সম্পর্কের সূতো ধরে তাকে পিসীও বলতে পারে ভাস্কর, কিন্তু মহিলার এমন অমর্যাদা করতে সাহস হয় নি তার। মেয়ের বিয়ের চেষ্টা তো আধুনিক প্রণালীতে আরম্ভ করেছেন মিসেস রায়—হঠাৎ আবার মায়ের কাছে প্রস্তাব করবার মত সেকেলে হতে গেলেন তিনি

—চুপ কেন? কথা বল? ভাস্করকে নাড়া দিল কল্যাণী। অনেক সন্ধ্যায় জর্জেট হাইহিলে সুশোভিত মাকে দেখেছে ভাস্কর, কিন্তু ধনেখালি তাঁতের শাড়ি আর এলানো খোঁপার ঘরোয়া রূপটি ভারি ভাল লাগে তার। অবশ্য মিঃ শোভানের ডিনারে মাকে আঁচলে চাবি বাঁধা বেশে দেখলে ভীষণ চটে যাবে সে। ছোট-খাট মায়ের দিকে চেয়ে আনমনা হাসল ভাস্কর। গত ছ'মাসের মধ্যে একদিনও কি এমনি সাজে দেখেছে সে মীনাক্ষী রায়কে?

—হাসলে হবে না। উত্তর দে। উনি বলেছেন তপতীকে ভারি পছন্দ ওঁর।

আবার হাসল ভাস্কর। মনে পড়লো লিলির উক্তি—মীনাক্ষী রায়—ওল্ড ফ্লেম অব ইয়োর ফাদার।

—লক্ষ্মী মা। এখন বিয়ের জুলুম লাগিয়ো না। ফাইনান্সিয়াল ইয়ার ক্লোজ করবার আগে ইন্‌কাম্ ট্যাক্সের ঝামেলা মেটাতে হবে। ব্যবস্থা না করলে একটি লাখ টাকা সেলামী যাবে সরকারের ঘরে। আরো একটি বড় কাজের তালে আছি—পরে শুনো। সুতরাং বিয়ের আলোচনা স্থগিত থাক সম্প্রতি।

—বড়ই কাজের মানুষ হয়েছিস—না? কই উনি তো বলেন নি কোন ভাবনার কথা।

—বা, বাবা তো নিশ্চিন্ত যোগ্য ছেলের উপর ভার দিয়ে।

—তপতীকে পছন্দ নয়—তাই বল আসল কথা।

—না মা, না। ভাস্কর উঠে বসল খাটের উপর।

—ছাড়বে না যদি, অবধান কর—পছন্দ করা কি এত সোজা আজকাল? জর্জেট, সিফন, নাইলন হরেকরকমের প্যাকেট-মোড়া বস্তুগুলি কি ঝকমকের আলোয় ধাঁধা লাগাচ্ছে না চোখে? কত রং, হাসি—চিত্ত হরণের অগুন্তি আয়োজন। সাধ্য কি কাউকেই ডিস্‌কোয়ালাইজ করি। পছন্দ আর বিয়ে দু'টোই যে বড় শক্ত কাজ হয়ে উঠেছে অধুনা মা!

—আহা! কি ছেলের কথা। আমাদের সময়ে তো আর কেউ পছন্দ করে বিয়ে করে নি।

—সেই ত্রিশ বছর আগে? মান্ধাতার আমল সেটা মা। এখন যে বছরে যুগ পালটাচ্ছে। সাদাসিধে ছোট্টটি তোমাকে পছন্দ করেছিলেন বাবা আর তুমিও আপত্তি না করেই ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিহীন সুমোহন মিত্রকে বিয়ে করেছিলে। আজ আর তা চলবে না মা। এখন আমরা চাই—প্রেজেন্টেবল ওয়াইফ, তারা চায় ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, গাড়ি ও বাড়িতে সুটেবল হাজব্যাণ্ড।

কল্যাণী হাসলো।—আর ফালাস নে ভাস্কর! তা এখন মোট কথাটা কি? তপতী প্রেজেন্টেবল ওয়াইফ হবে না বলে ভাবছিস!

—এই নিয়ে অন্তত বেশ কিছুদিন চিন্তা করা দরকার। তপতীর গ্ল্যামার কই মা? এখন পর্যন্ত লিপস্টিকেই রপ্ত হতে পারে নি। মায়ের চোখের আড়াল হলেই রুমালে ঘষে তুলে ফেলে।

—তবে তাই বলব মীনুকে—এ বিয়ে হবে না।

[ক্রমশ]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বুধওয়ারার হাটে গেছলাম।

সুদূর উত্তর বিহারের গভীর মফস্বলের একটা নেহাৎ নগণ্য হাট। প্রতি বুধবারে বসে বলে নাম বুধওয়ারা।

হাটের জায়গা নির্বাচনের মধ্যে সুদূর অতীতে কি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল জানি না, এখনকার পক্ষে স্থানটা অনেকদিক দিয়েই বেপোট।

যে সরকারী পাকা রাস্তাটা বর্তমানে হাটের দু'দিকের দু'টি মাঝারি গাছের গ্রামকে যুক্ত করে উত্তর-দক্ষিণে চলে গেছে, তা থেকে অন্তত আধ মাইল পথ খানিকটা কাঁচা রাস্তা ও তারপর খানাখন্দ-ভরা বাঁজা ডাঙা জমির ওপর দিয়ে গিয়ে হাটে পৌছোতে হয়। বহুকাল বহুজনের যাতায়াতে একটা পায়ে-চলা পথের আঁকাবাঁকা রেখা সেখানে দেখা যায় মাত্র। কোথাও কোথাও অস্পষ্ট বয়েল গাড়ির চাকার দাগও আছে। তবে এ ছোট হাটে একটি দু'টির বেশি গরুর গাড়ি কদাচিৎ আসে। তাদের কোন বাঁধাধরা রাস্তাও নেই।

অসুবিধে অনেক হলেও বাপ পিতম'র আমলে যেমন হয়ে এসেছে সে ধারা বদল করবার কথা এ দেশের মানুষ সহজে ভাবে না। চিরকাল যা করে এসেছে তাই চোখ বুজে করে যায়। খানাখন্দ ডিঙিয়ে মাঠ ভেঙে বুধবার এই হাটে আসে সওদা বেচতে আর কিনতে আবার প্রতি রবিবার এতোয়ারায় হাটে যায় আরো মাইল ছয়েক দূরের দীঘাওয়ারায়।

এ-সব নেহাৎ গাঁইয়া হাটের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। শহরে সভ্যতার ছোঁয়াচ এখনো এ-সব সমাবেশকে তেমন বিকৃত করতে পারে নি। সস্তা খেলো মাথার তেলের শিশি, চিরুণী আয়না পুঁতি আর নকল পলার মালা জরির ফিতে বিক্রি হয় বটে, কিন্তু বেশির ভাগ সওদাই চিরন্তন।

প্রথমে হাটে ঢুকতেই দেখা যায়, দু'পাশে দেশী মুচিরা জুতোর সারি নিয়ে বসেছে। বেশির ভাগই শক্ত পুরু চামড়ার নাগরা। শহুরে ফ্যাশনের অনুকরণে কিছু অন্য ধরণের জুতোও আছে, কিন্তু তার খদ্দের তেমন আছে বলে মনে হয় না। চামড়ার জুতোর সঙ্গে অপবিত্রতার একটা ধারণা মেশানো আছে বলে জুতোর সওদা হাটের একেবারে বাইরে সাজানো।

জুতোর পরেই মাছ বিক্রির জায়গা। মাছ-মাংস এদেশে এখনো ঘৃণার বস্তু। জাতের গর্ব যাদের আছে তারা খায় না। মাছ নিয়ে আসেও দু'চার জন মাত্র জেলে। বেশির ভাগ হাটুরে সেখানে নাকে কাপড় চাপা দিয়ে যায়।

জেলেদের সীমানা ছাড়ালেই সত্যিকার হাট আরম্ভ। কোথাও হাঁড়ি-কুঁড়ি সরা, কোথাও স্থানীয় কামারদের তৈরি হাতা, খুন্তা, কড়াই থেকে কোদাল, কুড়ুল, লাঙলের ফাল, কোথাও রাশিকৃত চাল, গম, জনার আর তা ছাড়া বেশির ভাগই শাকসব্জী ফলমূলের পসারী। এরই মধ্যে কোথাও কেউ দেশী ধরণের পুরুষ মেয়েদের জামা নিয়ে বসেছে, কোথাও কাঠের বারকোষ, উখলি বা গরুর গাড়ির চাকা বিক্রি হচ্ছে।

নৃতত্ত্বে উৎসাহী বন্ধু সুবীর নাগের পাল্লায় পড়ে সুদূর ছাপরা থেকে এখানে এসেছি। এ অঞ্চল রেলপথ থেকে অনেক দূর। নতুন একটা সরকারী রাস্তা সম্প্রতি তৈরি হওয়াতেই যাতায়াত একটু সুগম হয়েছে। সে রাস্তাতেও প্রায় পঞ্চাশ মাইল জীপে করে আসতে হয়েছে এই নগণ্য হাটে পৌঁছোতে।

সুবীর এসেছে তার নৃতত্ত্ব সমীক্ষার কাজে। এখনও এ অঞ্চলটার জীবনযাত্রায় যন্ত্রযুগের দেশী-বিদেশী পাঁচমিশেলী ভেজাল তেমন মেশে নি। নয়া সড়ক দিয়ে কিছু-কিছু লরী মোটর যেতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনো বয়েল গাড়ি চলে সেই সাবেকী ছাঁদের চাকায় গড়িয়ে। মেয়েরা ঝুলা বানায় চিরাচরিত রীতিতে, হাতের পায়ের রূপোর গয়নায় সনাতন কারিগরী।

সুবীর সেই সব দেখতে এসেছে। এ-দেশে গরুর গাড়ির চাকায় যে অর থাকে না, কয়েক টুকরো কাঠের পাটা দিয়ে যে তা তৈরি হয়, এই ধরণের চাকা যে সেই প্রাচীনকালের মহেঞ্জদড়োর মাটির খেলনায় দেখা যায়, এই সব সে আমায় উৎসাহভরে বোঝায়।

আমার কাছে বিষয়টা যে একেবারে নীরস তা নয়, কিন্তু শুধু তার নৃতত্ত্ব সমীক্ষার সাথী হ'তে এই পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে আমি আসি নি।

আমার একটু শিকারের সখ এককালে ছিল। এ অঞ্চলে এক

বিস্তীর্ণ জলায় শীতের শেষেও অজস্র পাখী পাওয়া যায় খবর পেয়ে সুবীর নাগের সঙ্গে এ টহলে আসতে রাজী হয়েছিলাম।

বেরিয়েছি সেই পাটনা থেকে। পথে দু' জায়গায় ডাক-বাংলোতে কাটিয়ে সর্বশেষ এই বুধওয়ারার হাটে এসে পৌচেছি। সুবীরের এখানকার কাজ সারা হলেই আনাড়ি শিকারীরও স্বর্গ সেই জলার উদ্দেশে রওনা হব এই কথা ছিল।

বুধওয়ারার হাট থেকে সে জলার সন্ধানে যাওয়া আর হ'ল না।

এক বছর আগে যে কাহিনীর খেই হারিয়ে গেছল তা যে এ রকম একটা জায়গায় অপ্রত্যাশিতভাবে আবার খুঁজে পাব, তা কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছি।

কোথায় কায়রোর এয়ার-টার্মিন্যাল আর কোথায় অজ জংলা অঞ্চলের একটা নগণ্য চাষীদের হাট।

ছেঁড়া গল্পের সুতো কিন্তু এইখানেই জোড়া লাগল।

হাটের এক জায়গায় জন দুই দেশী ব্যাপারী কিছু পুরুষদের কামিজ আর মেয়েদের ঝুলা নিয়ে বসেছে। কামিজ ও ঝুলাগুলি সম্ভবত একালের কলে সেলাই করা, কিন্তু তার কাট-ছাঁট-নক্সা চিরকালের। সুবীর সেইখানেই হাটুরেদের মধ্যে বসে সেই সব জামা ঘাঁটছিল। আমার উৎসাহে তখন ভাঁটা পড়েছে। একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে হাটের এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ হাটের অপর প্রান্তে একটি মানুষকে দেখে বিস্মিত হলাম। এখানকার এই ধূলিমলিন জনতার মধ্যে মানুষটি একেবারে বেমানান।

এই হাটে আমরাও অবশ্য একদিক দিয়ে বিসদৃশ। সেটা প্রধানত পোষাকে। আমাদের দু'জনেরই পরনে চলাফেরার সুবিধার জন্য হাফ প্যাণ্ট সার্টের সঙ্গে মজবুত জুতো মোজা। সরকারী আধা-সরকারী কর্মচারীদের কল্যাণে এ পোষাক গরমিলের হলেও এ সুদূর অঞ্চলেও অপরিচিত নয়। হাটের মাঝে এ পোষাক অতিরিক্ত কৌতূহল এখন আর জাগায় না।

এ মানুষটি কিন্তু শুধু পোষাকে নয় চেহারাতেও এ হাটের মধ্যে অনন্য। দূর থেকে মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু হাটের সাধারণ মানুষের মাথা ছাড়ানো দীর্ঘ ঋজু সুগৌর সুঠাম মূর্তিটিই বিস্মিত কৌতূহল জাগাবার মত। তার সঙ্গে গেরুয়া রঙে ছোপান পাজামা পাঞ্জাবী, মাথার আঁট টুপি আরো বিশিষ্ট করে তুলেছে।

আমার চোখে অদ্ভুত লাগলেও এখানকার মানুষের মধ্যে তেমন কোন সচকিত চাঞ্চল্য না দেখে বুঝলাম মানুষটি এদের অপরিচিত নন। কৌতূহলী হয়ে পাশের একজনকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে আমার অনুমানের সমর্থনই পেলাম। কিছুকাল ধরে এই অদ্ভুত সাধুজিকে নাকি এ অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে। দীবাওয়ারার কাছে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় থাকেন। মাঝে মাঝে রাস্তায় ঘাটে বা এরকম হাটে তাঁকে দেখা যায়।

সাধুজি একটি থলে হাতে সওদা করতেই হাটে এসেছেন। দেখে একটু অবাক লাগছিল। তাঁর চেহারা পোষাকের সঙ্গে এ কাজটা মানায় না। সুবীরকে তার নৃতত্ত্ব সন্ধান থেকে বিরত করে দৃশ্যটা দেখালাম।

সুবীর খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে দেখে একটু চিন্তিতভাবে বললে,—আচ্ছা! কেমন চেনা চেনা লাগছে না?

চেনা!—অবাক হয়ে একটু মনোযোগ সহকারেই সেদিকে চাইলাম। কিন্তু স্মৃতিতে কোথাও কোন আলোড়ন অনুভব করলাম না।

সুবীরই এবার আমার হাত ধরে টেনে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে বললে,—এসো ত'।

একটু বিমূঢ় ভাবেই তার পিছু পিছু গেলাম। তার নিজের গবেষণার বিষয়ে ছাড়া সুবীরের এরকম আগ্রহ ত' আর কিছুতে দেখা যায় না।

সাধুজির কাছ পর্যন্ত পৌছোতে হ'ল না। হাটের ভিড় কাটিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত গিয়েই সুবীর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে উৎসাহভরে তাকিয়ে বললে,—চিনতে পেরেছ এবার?

তখন বেশ কাছাকাছিই এসে পড়েছি। ওদিকের সংকীর্ণ হাটের রাস্তায় কিছু তরিতরকারী কিনে সাধুজি নিচু হয়ে সেগুলো থলেতে ভরছেন।

ক্ষীণ একটু স্মৃতির কম্পন যে একেবারে অনুভব করলাম না তা নয়। কিন্তু পরিচয়টা মনে কিছুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল না।

সুবীর এবার গর্বভরে আমার দিকে তাকিয়ে সোল্লাসে বললে,—আরে ও ত' দেবরাজ!

দেবরাজ!

বিমূঢ় হয়ে সুবীরের দিকেই তাকালাম।

হ্যাঁ দেবরাজ সরকার! তোমার মনে নেই? আমাদের বছরের সেরা ছেলে ছিল! কলেজে রাজনীতি করতে গিয়ে কর্তাদের চটিয়ে দেয়। কি যেন সামান্য শাস্তি হয়েছিল মাপ চাইতে রাজী না হওয়ায়। সব গোল মিটে যেত ক'দিন বাদেই। কিন্তু সকলকে অবাক করে পড়া ছেড়ে দিয়ে দেবরাজ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছল। তারপর বছর কয়েক বাদে জার্মানী থেকে ওর খবর পাওয়া গেছল। সেখানে ও নিজের বিষয়ে দুর্লভ কৃতিত্ব দেখিয়েছে···

সুবীর আরো কি সব বলে গেল। আমার তখন সেদিকে কান নেই। আমি সবিস্ময়ে একটু বিহ্বলভাবেই দেবরাজকে তখন দেখছি।

জলায় পাখী শিকারের লোভ ত্যাগ করে দেবরাজের আস্তানাতেই তারপর এসেছি।

বুধওয়ারায় যে হাটে তার সঙ্গে দেখা সেখান থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে দীবাওয়ারার জঙ্গল সুরু হয়েছে। সেই জঙ্গলের সীমানার মধ্যে কিছুদূর গিয়েই দেবরাজের বর্তমান আবাস।

আবাসটি একটি টিনে ছাওয়া কাঠের দেওয়াল দেওয়া বারান্দাঘেরা কুটীর গোছের। আপাতত তার বেশ ভগ্নদশা। এ ধরণের ভাঙা-চোরা দু-একটি কুটীর আশেপাশে আরো আছে। তার কোনটা টিনে কোনটি খড়ে ছাওয়া।

এগুলি দেবরাজের নিজের তৈরি নয়। বছর দু-এক আগে, সরকারী এক ভূতাত্ত্বিক দল কিছুকালের জন্যে এ অঞ্চলের খনিজসম্পদের হদিস নিতে এখানে আড্ডা গেড়েছিলেন। এ সব অস্থায়ী আবাসগুলি তাঁদেরই তৈরি। তাঁরা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবার পর যে কোন কারণেই হোক কুটীরগুলি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করা হয় নি। দেবরাজ ঘুরতে ঘুরতে এসে তারই একটিকে একরকম বাসযোগ্য করে নিয়ে তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

জঙ্গলের মাঝে পোড়ো বাড়িতে দেবরাজ কিন্তু ঠিক হাঘরে কোপনি সম্বল সন্ন্যাসীর মত থাকে না। সুখ না হোক মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যের

উপকরণ সেখানে বর্তমান। কেরোসিনের স্টোভ আছে, চালিয়ে নেবার মত লোহা ও অ্যালুমিনিয়মের কটা বাসন কোসন, কলাইকরা প্লেট কাপ ডিশও গোটা কয়েক। সেইসঙ্গে এদিক-ওদিকে যাতায়াতের একটা সাইকেলই সবচেয়ে বিস্ময়কর।

বুধওয়ারার হাট ছেড়ে আসবার সময় এই সাইকেলটি দেখেই বেশ কৌতুক ও বিস্ময় অনুভব করেছিলাম।

সুবীর বলেছিল—সে কি হে! তুমি সাইকেল চড়ে ঘোরাফেরা করো নাকি?

দেবরাজ গম্ভীরমুখে বলেছিল—একটা বাহন ত' চাই।

কিন্তু সন্ন্যাসীর সাইকেল কেমন একটু দেখায় না?

এবার দেবরাজের মুখে কৌতুক ফুটে উঠেছিল। বলেছিল,—তা হয়ত দেখায়। কিন্তু যতদিন না লঘিমা সিদ্ধিলাভ করে শূন্যবিহারটা রপ্ত করতে পারছি ততদিন এ সব বাহন ছাড়া যে গতি নেই।

একটু গম্ভীর হয়ে তারপর বলেছিল,—সন্ন্যাসী ট্রেনে-মোটরে চাপতে পারে আর সাইকেল চড়লেই দোষ। তা ছাড়া গেরুয়া দেখলেই সন্ন্যাসী ভাবো কেন? ওটা সোজা ও বাঁকা দুই অর্থেই ময়লা লুকোবার একটা ফিকির।

তোমায় কি ভাবে তাই ত' ধরতে পারছি না!—ঠাট্টা করে বলেছিল সুবীর।

ভাবনাটা এখনই সেরে ফেলতে চাইছ কেন? দু'দিন সবুর করো না!—দেবরাজও বলেছিল পরিহাসের সুরে।

দেবরাজ ও সুবীর এমনিতর হাল্কা রহস্যালাপ করতে করতেই সারা রাস্তাটা গেছল। আমার ও সুবীরের সঙ্গে একই বছরের সহপাঠী হলেও দেবরাজের সঙ্গে সুবীরের পরিচয়টাই ঘনিষ্ঠ। সুবীর আর দেবরাজ একসঙ্গে একই কলেজে পড়েছে, আমি ছাত্র ছিলাম অন্য কলেজের। কৃতী ও উজ্জ্বল ছাত্র হিসেবে দেবরাজের নাম তখন শুনেছিলাম, দেখেওছিলাম দু'একটি জায়গায়। তার বেশি পরিচয় দেবরাজের সঙ্গে হয় নি।

বুধওয়ারার হাটে অপ্রত্যাশিত গেরুয়া পোষাকে তাই তাকে চিনতে না পারা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। চিনে ফেলবার পর সুবীর আমায় সঙ্গে নিয়ে দেবরাজের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কি হে সাধু মহারাজ! চিনতে পারো!

দেবরাজ প্রথমটা চমকে উঠেছিল, খুশি হয়েছিল তারপর। সুবীর আমায় পরিচয় করিয়ে দেবার পর তিনজনে আলাপ করতে করতে হাটের বাইরে যাবার সময়েই দেবরাজ তার আস্তানায় যাবার প্রস্তাব নিজে থেকে করেছিল। সুবীর আপত্তি বোধ হয় করত না। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই আমি সাগ্রহে উৎসাহ জানিয়েছিলাম।

সাইকেল নিয়ে হাস্য-পরিহাসের পর জীপের পেছনে সেটি বেঁধে তিন জনে দীঘাওয়ারার জঙ্গলের দিকে রওনা হয়েছিলাম। সুবীরই চালক। দেবরাজ তার সঙ্গে সামনে বসেছিল। আমি বসেছিলাম ভেতরে।

অনেকদিন বাদে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা পাওয়া দুই বন্ধুর হাল্কা আলাপ-আলোচনা সব আমার কানে যায় নি। যে কাহিনীর আভাস মাত্র আকস্মিকভাবে আকাশভ্রমণের পথে একবার ক্ষণিকের জন্যে পেয়েছিলাম তার রহস্য উন্মোচনের সুযোগ সত্যিই পাব কি না সেই কথাই আমি তখন ভাবছি। নীনার কথায় যার উল্লেখ ছিল আর আমরা যাকে জানি, এই দুই দেবরাজ এক ও অভিন্ন কি না সে বিষয়ে সংশয় তখনও আমার যায় নি।

এ সংশয় দূর করতে হ'লে দেবরাজের কাছে নীনার প্রসঙ্গ কোনোভাবে একবার তোলা দরকার। কি ভাবে সেটা তুলব আর তুললেও দেবরাজ কি ভাবে তা গ্রহণ করবে, কিছুই তখনো বুঝে উঠতে পারি নি।

জঙ্গলের মধ্যে দেবরাজের নির্জন আস্তানায় ক'দিন কাটিয়ে তার গত কয়েক বছরের বাইরের ইতিহাস মোটামুটি অবশ্য জানতে পারলাম। তার সম্বন্ধে যে সব গুজব ছড়িয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ আজগুবি নয়। বেশির ভাগ সুবীরের প্রশ্নের উত্তরেই দেবরাজ তার জীবনের কিছু কিছু কথা আমাদের কাছে বলতে দ্বিধা করলে না। ইওরোপ থেকে বেশ শাঁসালো গোছের একটা চাকরী নিয়েই সে যে দেশে এসেছিল এ কথা সত্য, কিছুদিন বাদে হঠাৎ চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে সে যে প্রায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এ কাহিনীও অলীক নয়।

কিন্তু এ পাগলামির মানে কি বলতে পারো?—গম্ভীর হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল সুবীর।

দেবরাজ একটু হেসে বলেছিল,—পাগলামিই যদি বলো তা হলে ত' মানের কথা আসে না।

হাসি-তামাসার কথা নয় দেবরাজ—সুবীরের গলায় এবার উদ্বিগ্ন বিমর্ষতা,—তোমার মত মানুষ নিজের জীবনকে নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলছে এ যে আমি ভাবতেই পারি না।

চাকরীর ধাপে-ধাপে একেবারে চূড়ায় উঠে অগাধ নাম-পয়সা করতে পারলে, তাকে ছিনিমিনি খেলা নিশ্চয় বলতে না!

দেবরাজের স্বরে প্রসন্ন কৌতুক ছাড়া তিক্ততার আভাস ছিল না, তবু সুবীর বেশ একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলেছিল,—তোমার সঙ্গে কথার প্যাঁচ খেলতে বসি নি দেবরাজ। উত্তর দিতে না চাও ত' আমায় স্পষ্ট সে কথা বলতে পারো। ছিনিমিনি খেলা আমি কেন বলেছি তা তুমি ভালো করেই বোঝো। চাকরী ছেড়ে দিয়েছিলে তাতে বলবার কিছু নেই কিন্তু তোমার মত মানুষের সার্থকতা কি এই জঙ্গলের অজ্ঞাতবাসে? তুমি সত্যিই আধ্যাত্মিক প্রেরণায় সন্ন্যাসী হয়েছ আমি বিশ্বাস করি না।

আমি সন্ন্যাসী হয়েছি তাই বা ধরে নিচ্ছ কেন?—দেবরাজের স্বরটা এবার যেন একটু গাঢ়,—এই গেরুয়াটা যে সুবিধের খাতিরে চোপানো তা'ত আগেও বলেছি। এই বেশবাস এই অজ্ঞাতবাস এ-ও একটা অদম্য অদ্ভুত নেশার অঙ্গ মনে করো না। তোমার নেশা যেমন নৃতত্ত্ব, তুমি যেমন এ দেশের বাস্তব জীবন-প্রণালীর খুঁটি-নাটি জানতে উৎসুক, আমি তেমনি এ-দেশের মানুষ তার গহন অন্তরের জীবনে কি খুঁজেছে কি পেয়েছে তাই বুঝতে চাই। ভুল হোক ঠিক হোক আমার ধারণা এই যে শহরের সভ্য-ভব্য একজন হয়ে কোনো ল্যাবরেটরিতে বসে এ সন্ধান গবেষণা চালানো যায় না। তাই এই ভবঘুরে জীবন তাই এই গেরুয়া পোষাক। মাঝে-মাঝে এই নির্জন বাস, এ-কথাটা বিশ্বাস করতে পারো কি?

সুবীর দেবরাজের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে কি বলতে গিয়ে যেন থেমে গেছে।

তারপর যে দু'দিন সেখানে ছিল সুবীর নাগ এ ধরণের প্রশ্ন আর তোলে নি।

চাকরীর খাতিরে সুবীর তারপর কাল নিয়ে ফিরে গেছে। আমি কিন্তু যাই নি। দেবরাজের কাছে আরো অনুমতি চেয়েছি।

এখানে আর ক'দিন যদি থাকি, আপনার অসুবিধা হবে না ত'—কথাগুলো নিজের কানেই বড় কৃত্রিম শুনিয়েছে।

দেবরাজ কিন্তু তা বোধ হয় লক্ষ্যও করে নি। সানন্দে জানিয়েছে,—অসুবিধা কি বলছেন! অসুবিধা ত' আপনার। এ রকম কৃচ্ছ্রসাধনের অভ্যেস নিশ্চয় নেই।

অভ্যেস নেই বলেই ত' স্বাদটায় মজা পাচ্ছি।

দেবরাজ হেসে বলেছে,—আপনাকে কুমন্ত্র দিয়ে বিবাগী করছি বলে আপনার আত্মীয়বন্ধুরা আমার বদনাম না দেয়!

না সে সুযোগ তারা পাবে না।—পরিহাসের সুরেই বলেছি,—বিবাগী হবার মুরোদ আমার নেই।

দেবরাজ একটু যেন গম্ভীর হয়ে বলেছে,—কার ভেতরে কি যে থাকতে পারে কেউ জানে কি!

সেদিন প্রসঙ্গটা ওইখানেই শেষ হয়েছে। যে দিকে চাই প্রসঙ্গটা সেদিকে ঘোরাবার একটা সুযোগ হয়ত দেবরাজের শেষ কথাটায় ছিল। কিন্তু সে সুযোগ আরো ভালো করে পাবার জন্যে অপেক্ষা করাই উচিত মনে করেছি।

সুবীর যাবার সময় আমায় আলাদা করে ডেকে ক'টা কথা বলে গিয়েছিল। সে কথাগুলোও ভোলবার নয়।

সুবীর বলেছিল,—তুমি ক'দিন এখানে থাকছ জেনে আমি খুশি। পারলে আমিও থাকতাম। দেবরাজের ধাঁধাটা মনের একটা বড়ো অস্বস্তি হয়ে রইল। পারো ত' বোঝবার চেষ্টা কোরো। তবে আমার মত তর্ক করতে গিয়ে ভুল কোরো না। নিজের চারিধারের দেওয়াল ও তা' হলে আরো উঁচু করে তুলবে।

সুবীরের কথাগুলো মনে লেগেছিল। সুবীর তবু আমার অন্য উদ্দেশ্য কিছু জানে না। যা এখনো অনুমান ও সংশয়ের বেশি কিছু নয়, তা তাকে বলা উচিত মনে হয় নি। আমার সংশয় সত্য হোক বা না হোক, দেবরাজকে জানবার ও বোঝবার অন্য তাগিদও কম জোরালো নয়। তার মত মানুষের এই রূপান্তরের রহস্যও মনকে অভিভূত করে।

দেবরাজের সঙ্গে একান্ত সহজভাবেই মেশবার চেষ্টা করলাম। তার প্রকৃতিতে বা ব্যবহারে সেদিক দিয়ে কোনো বাধা নেই।

এক হিসেবে সে নিজের সম্বন্ধে সত্য কথাই বলেছে। সন্ন্যাসী বলতে যা বুঝি বাইরের জীবনযাত্রায় তা সে ঠিক নয়। নির্জনে থাকা আর গেরুয়া পরা ছাড়া আর কোথাও কোন মিল নেই।

নিজের কুটীরে ধ্যান-ধারণা পূজাগোছের কিছু সে করে কি না জানতে পারি নি। বাইরে সারাদিন সে কোন না কোন একটা কাজ নিয়েই থাকে।

এখানে আসবার পর আমার ও সুবীরের জন্যে আলাদা একটা কুটিরের ব্যবস্থা সে করে দিয়েছিল। ভাঙাচোরা হলেও সেটা বাসযোগ্য। এ রকম প্রয়োজন হ'তে পারে মনে করে আগে থাকতেই না কি সে কুটিরটা দেখেশুনে রেখেছে।

এই সূত্রেই তাকে সেদিন বললাম,—তোমার এখানে আমাদের মত অতিথি-অভ্যাগত তা হলে আসে! ক'দিনের সান্নিধ্য আর এককালে সহপাঠী হওয়ার দরুণ আপনি থেকে তুমি-র অন্তরঙ্গতায় ইতিমধ্যেই পৌঁছেছি।

দেবরাজ কুড়ুল দিয়ে জ্বালানি কাঠ কাটছিল আর আমি সেগুলো বয়ে রান্নার জায়গায় গিয়ে সাজিয়ে রাখছিলাম।

কাঠ কাটা থামিয়ে দেবরাজ কেমন একটু অদ্ভুতভাবে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বললে,—আসবে আশা করতে দোষ কি?

কিন্তু তোমার ত' দু'দিনের ডেরা। আজ আছ কাল নেই। হঠাৎ আমাদের মত অঘটনের দেখা না পেলে আসতে চাইলেও কেউ ঠিকানা পাবে কি করে।

ঠিকানা যদি কেউ সত্যি চায়, তা হলে ওরকম অঘটন ঘটতে কতক্ষণ!

সে অঘটন সত্যিই অত তাড়াতাড়ি যে ঘটবে ভাবতে পারি নি।

পরের দিন সকালে দেবরাজ আমায় কিছু না বলে আমার ঘুম থেকে ওঠার আগেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেছল। ফিরে এলো দুপুরবেলায়। থলিতে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে দেখলাম। আর কয়েকটা খবরের কাগজ ও একটা বই।

জিজ্ঞাসা করলাম,—এসব আবার কোথা থেকে জোগাড় করলে?

জোগাড় করি নি। আমার নামে আসে। দূরের একটা গ্রামের পোস্ট-আফিসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা আছে। সেখানে জমা থাকে। আমি হপ্তায় একদিন গিয়ে নিয়ে আসি।

হেসে বললাম, তা'হলে একেবারে নিরুদ্দেশ তুমি নও।

না, তা আর হলাম কই।—দেবরাজ একটু যেন অস্বস্তির সঙ্গে বললে,—তোমায় কিন্তু একটু কষ্ট দেব এবার।

কি কষ্ট!—অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম।

না, এমন কিছু নয়। পরশু থেকে তোমার থাকার ব্যবস্থা আমার সঙ্গেই করব। তোমার ও ডেরাটা আর একজনকে দিতে হবে। পরশুই সম্ভবত এসে পৌঁছোবে।

কে এই অভ্যাগত জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করলাম। [ক্রমশ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এই সংখ্যার মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন
শিল্পী—শ্রীকান্ত রায়।

আশুতোষ স্মরণে

বাঙালীর জাতীয় চিত্তক্ষেত্রে বিদ্যারথের শ্রেষ্ঠসারথি হিসাবে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতে, স্বয়ং সরস্বতী যাঁহার নামের সহিত আপন নামটি সানন্দে যোগ করিয়া দিয়াছেন বাঙলার বিশ্রুতকীর্তি সন্তান, স্বদেশের শিক্ষাব্যবস্থার দেশবরেণ্য অগ্রদূত 'বাঙলার বাঘ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শুভ-জন্মশতবার্ষিকীর পুণ্যলগ্নে তাঁহার অবিস্মরণীয় কর্মাবলী নূতন করিয়া স্মরণ করিবার সময় আজ দুয়ারে সমাগত।

তাঁহার জন্মের সাত বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ঘটিলেও তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা আশুতোষ। আশুতোষের স্পর্শে তাহা যে শুধু প্রাণ পাইল তাহা নয়, সর্বাংশে কাণায় কাণায় ভরপুর হইয়া উঠিল এবং শুধু স্বদেশেই নয় জগতের শিক্ষাক্ষেত্র ও গুণিজন-সমাজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতির আসন লাভ করিল।

শিক্ষার বিস্তৃতি, প্রসার ও ব্যাপকতা ছাড়া জাতির উন্নতির আশা নাই এবং শিক্ষাই জীবন—এই বিশেষ এবং শাশ্বত সত্যটি আশুতোষের দ্বারা মর্মে মর্মে অনুভূত হইয়াছিল—বিশ্বের সুধীজনসমাজেই শুধু নয় সাধারণ মানবসমাজেও স্বদেশের ভাবধারা ও অন্তরের বাণী প্রচারের জন্য শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন সেদিনকার পরাধীন ভারতের ব্যাঘ্রের সহিত তুলনীয় নাগরিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাঙলা দেশের শিক্ষার মান যে নগণ্য নয়—ইহাই প্রতিপাদন করা ছিল তাঁহার জীবনের সারস্বপ্ন। সেই স্বপ্ন সফল করিয়া তোলার সাধনাই তাঁহার গৌরবদৃপ্ত জীবনের অপরূপ ইতিহাস। বৃটিশ শাসিত হইলেও, রাজনীতির দিক দিয়া পরশাসনের অধীন হইলেও শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়া বাঙালীর ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে সচেতন করিয়া তোলার মধ্যে আশুতোষের যে গভীর দেশপ্রেম এবং স্বাজাত্যচিন্তা পরিলক্ষিত হয় তাহার গুরুত্বও অল্পমূল্যের নয়।

বাঙলা দেশের শিক্ষানায়ক বলিতে তিনটি নাম প্রথমেই উল্লেখনীয়—পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ এবং শিক্ষাচার্য আশুতোষ। ধারা ও পথে পার্থক্য থাকিলেও লক্ষ্য যে একই, সে বিষয়েও কোনপ্রকার মতদ্বৈধতার অবকাশ নাই। শিক্ষা যে জাতির প্রাণ—এই পুণ্যমন্ত্রে সারা বাঙালী আশুতোষের নিকট যে দীক্ষালাভ করিল, তাহাই তাহার জীবনপ্রকাশের স্রোতোমুখ খুলিয়া দিল।

বস্তুত আশুতোষের নায়কত্বেই দেশের শিক্ষাজগতে যে ব্যাপকভাবে আলোড়ন আসিল, তাঁহার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বতোভাবে লাবণ্যময়ী ও শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার অভিনব কর্মশক্তির দ্বারা দেশের বাইরে দেশের যে অনুপম আলেখ্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, সে সম্বন্ধে বাঙালীর অন্তরে আজ বিন্দুমাত্র জিজ্ঞাসার স্থান নাই।

আশুতোষ ছিলেন এক জীবন্ত ব্যক্তিত্ব। এক অফুরন্ত শক্তির আকর। সত্য, ন্যায় ও নীতিতে প্রতিষ্ঠিত এক বিবেক পরিচালিত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তিনি। অন্যায়, দুর্নীতির সহিত তাঁহার বৈরিতা চিরদিনের, যেখানে তিনি সত্যের অবমাননা, বিবেকের শূন্যতা, নীতির ভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেইখানেই তন্মুহূর্তে ধ্বনিত হইয়াছে সেই সিংহকল্প-পুরুষের কম্বুকণ্ঠের প্রতিবাদ। আদর্শনিষ্ঠ আশুতোষকে বারেকের তরেও স্বীয় আদর্শ হইতে কোন প্রতিবন্ধকতা কি কোন শক্তি বিচ্যুত করিতে পারে নাই। আশুতোষের নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধিতব্য ছিল জনকল্যাণ। জনকল্যাণকর হিসাবে যাহা শ্রেয়রূপে প্রকটিত হইয়াছে তাঁহার বিবেচনায় তাহার রূপদানে তিনি কোনদিন পশ্চাৎপদ হন নাই। অমিতবীর্যের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত আশুতোষ তাঁহার বিবেক এবং ন্যায়নিষ্ঠার উপরে কাহাকেও স্থান দিতে রাজী নন। রাজশক্তি বারংবার তাঁহার শক্তি খর্ব করিবার অপচেষ্টা করিয়াছে কিন্তু প্রতিবারই এই তেজোদৃপ্ত ব্রাহ্মণ

স্যার আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী ডাকটিকিট। আশুতোষের প্রতিকৃতির পাশে তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ সিনেট হল।

সন্তানের শক্তির তেজে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, ইংরাজ সরকার মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহাদের অভিরুচি অনুযায়ী চলিবার লোক আশুতোষ নন, বুঝিয়াছিলেন কি প্রলোভন, কি ভীতি-প্রদর্শন জনকল্যাণে উদ্‌বুদ্ধ আশুতোষকে তাঁহার পথ হইতে টলাইতে পারে না, বুঝিয়াছিলেন আশুতোষ তাঁহাদের দ্বারা চিরদিনই অপরাজেয়।

শুধু শিক্ষাবিস্তার বলিলে সম্পূর্ণ হয় না—মাতৃভাষার মহৎ মর্যাদা দান, খ্যাতি ও গৌরবের উচ্চতম শিখরে তাহার প্রতিষ্ঠা এবং তাহার সুগভীর অনুশীলনের সূচনা ঘটানো তাঁহার জীবনের মুখ্যতম কীর্তি। শুধু শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের ইতিহাসেই নয়, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ইতিহাসেও তিনি এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। তাঁহার জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহার জীবনে কলা ও বিজ্ঞানের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। বাঙলার প্রবন্ধ-সাহিত্যের উন্নয়নে এবং প্রবন্ধের মাধ্যমে জ্ঞানবিস্তারে তাঁহার অবদানও সবিশেষ স্মরণীয়। দেশীয় বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করার আগ্রহ তাঁহার কম ছিল না। বিজ্ঞানের জটিল ও দুরূহ তত্ত্বগুলিকে সাধারণের উপযোগী প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করিয়া তোলার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট উৎসাহী। সর্বোপরি বিজ্ঞানকে রসাশ্রিত করিয়া তোলার দিকেও তাঁহার যত্নের অন্ত ছিল না। আবার তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে দেখা যায় প্রতি ছত্রে তাঁহার বিজ্ঞানীমন ছায়া ফেলিতেছে, আপন বক্তব্যকে নিছক উচ্ছ্বাসসর্বস্ব করিয়া তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নাই বরং তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন রীতিমত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে।

আশুতোষের জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক গুণীব্যক্তিকে তাঁহার প্রাপ্য মর্যাদাদান। পরবর্তীকালের বহু সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত করিবে। তাঁহাদের জীবনীর মাধ্যমে জানা যায় যে, তাঁহাদের জীবনের বোধনলগ্নে রত্নসন্ধানী আশুতোষ তাঁহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণ করিয়া সেই কৃতবিদ্যপুরুষদের জীবনের প্রসিদ্ধির পথ করিয়া দিয়াছিলেন। মালাকর যেমন এক একটি ফুলে একটি নিটোল মালা গাঁথে, আশুতোষও তেমনই এক একটি শক্তিমান তরুণরূপী উজ্জ্বল মণি-মাণিক্যের সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐশ্বর্যবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

আজ জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া পড়িতেছে, তাহার কারণও অজানা নয়। জাতির চরিত্রের দৃঢ়তাও ক্রমশই শিথিল হইয়া যাইতেছে। জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য আজ শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন। শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখা যাইতেছে—সেখানে অযোগ্যতা এবং অক্ষমতার মিছিল চলিতেছে। দুর্নীতির বিষবাষ্পে সেই আলোময় জগৎ আজ তমসাচ্ছন্ন। তদুপরি সংবাদপত্র খুলিলেই তাহার মানের ক্রমাবনতি বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। পাঠ্য পুস্তকে পর্বতপ্রমাণ ভ্রান্তিও আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে না। আশুতোষ যে-সকল বিষয় দেশের গর্ব ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া এক নূতন চেতনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার লোকান্তরের চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই সে সকল বিষয়ে এই ভয়াবহ দুর্নীতি এবং বিপজ্জনক অবস্থা স্বভাবতই অন্তরে নিদারুণ বেদনার কৃষ্ণমেঘ ঘনাইয়া আনে। সেই জন্যই পুরুষসিংহ আশুতোষ প্রমুখ দেশের প্রাতঃস্মরণীয় সন্তানদের ভাবধারা, আদর্শ অনুসরণ করা ছাড়া আজ এই জাতীয় দুর্যোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার দ্বিতীয় পথ নাই। আশুতোষের আদর্শ, স্বপ্ন এ যুগের পথভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট সমাজকে, গলদে পরিপূর্ণ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বপ্রকার দুর্যোগমুক্ত হইবার শক্তি দিক ও জাতিকে নূতন করিয়া পুনরায় সর্ব ক্ষেত্রে গৌরবপ্রদীপ্ত করিয়া তুলুক—তাঁহার জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া—এই কামনাই লেখনীর সাহায্যে ব্যক্ত করি।

শোচনীয় খাদ্যপরিস্থিতি

সেই সর্বনাশা ভয়ঙ্কর দিনগুলিরই ভয়াল পদধ্বনি কি আবার কর্ণগোচর হইতেছে? সর্বহারা বাঙলা দেশের বুকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের কি আবার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে চলিয়াছে কলিকাতার বর্তমান খাদ্যপরিস্থিতি বারবার এই প্রশ্নই আমাদের যুগপৎ শঙ্কিত ও জিজ্ঞাসু অন্তরকে পরিপূর্ণ অধিকার করিয়া চলিতেছে।

প্রভাতের সংবাদপত্র রাত্রির অবসানে বিশ্বের দিক দিগন্তের বার্তা যেমনই আমাদের গৃহগৃহকোণে বহন করিয়া আনে বর্তমানে তেমনই আনিতেছে নিত্য খাদ্য-দুর্যোগের দুঃসংবাদ। বাজার এবং দোকানগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত, অগণিত ক্ষুধার্ত আপ্রাণ চেষ্টা এবং অর্থের বিনিময়ে শুনিতেছে কেবল এক দুঃসহ 'নাই, নাই' ধ্বনি। চাল, মৎস্য, তৈল এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুলি যেন রূপকথার অপরূপবস্তুতে পরিণত, বিলাস খাদ্যগুলি বাজারে অনুপস্থিত হইলে জনসাধারণকে খুব একটা অসুবিধায় পড়িতে হয় না, কিন্তু যে খাদ্য ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব তাহার দুষ্প্রাপ্যতার দুর্ভোগ কল্পনাতীত, ভাগ্যের পরিহাসে কলিকাতার অধিবাসীদের আজ সেই দুর্ভোগের মধ্যেই কাল অতিক্রম করিতে হইতেছে।

কলিকাতায়, যতদূর জানা যায়, রেশন কার্ড চালু আছে তেষট্টি লক্ষ তিরিশ হাজার, অথচ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে আটাশ লক্ষ লোকের মত—অতএব অর্ধেকের বেশি লোকেদের অবস্থা অনুমেয়। তৈল ও চালের দর নির্ধারিত, সেই মূল্যে বিক্রয় করিলে যাঁহারা বিক্রয় করেন তাঁহাদের পড়তায় পোষায় না এই মর্মে তাঁহারাও অনুযোগ করিয়াছেন। উড়িষ্যা হইতে চাল আনাইবার ব্যবস্থা হইলেও তাহা সার্থকতায় উপনীত হইতে পারে না, কারণ উড়িষ্যার চাল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের উপযোগী নয়, সেইকারণে এ চালে তাহার চাহিদা কমই থাকিবে।

অনেকেরই মনে এ সন্দেহ দেখা দিয়াছে যে এই অভাব কৃত্রিম। মুনাফাখোরেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং পকেটপুষ্টির জন্য এই অভাব সৃষ্টি করিয়াছেন। একগুলি মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন লইয়া যাঁহারা ছিনিমিনি খেলিতে পারেন তাঁহাদের পিশাচ এবং পশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শত শত শিশুর ক্ষুধার আকুল ক্রন্দনে, শত শত নরনারীর একমুঠো অন্নের জন্য আকাশফাটা হাহাকারের মধ্যে ইঁহাদের স্বার্থসাধনের ক্রূর নির্মম হাসি, দানবীয় উল্লাস ধৈর্য ও ক্ষমার কোন মূর্তিমন্ত বিগ্রহকেও আদর্শচ্যুত করার ক্ষমতা রাখে।

আমাদের বর্তমানকালের জীবনধারায় জ্বালার অন্ত নাই। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় সংখ্যাতীত জ্বালা। জ্বালার সেতু দিয়া জীবননদী অতিক্রম করিতে হইতেছে, কিন্তু জঠরের জ্বালা যে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক সে সম্বন্ধে অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। শত সহস্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক

বিপর্যয় জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহার উপর প্রত্যহের দুইবেলার 'দু'মুঠো অন্ন' হইতেও যদি আমাদের বঞ্চিত হইতে হয় তাহা হইলে জীবনধারণ যে একেবারেই অসম্ভব সে কথাটি যে-কোন একটি বালকের নিকটও জলের মতই স্বচ্ছ।

অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে দেখা যায় যে, এই বাঙলা দেশ শুধু তাহার সন্তানদেরই নয়, তাহাদের প্রয়োজন কড়ায়-গণ্ডায় মিটাইয়াও উৎপন্ন শস্য—ধান্যের দ্বারা বাহিরের বহু নর-নারীর ক্ষুধার নিরসন ঘটাইয়াছে। বাঙলা দেশের ধান্যে কত অবাঙালীর যে রসনা পরিতৃপ্ত হইয়াছে তাহার তুলনা মেলে না। বাঙলা দেশের দিগন্তবিস্তৃত সোনালী ধানের শোভা কত পথিককে যে আকর্ষণ করিত তাহারই বা তুলনা কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনীতে বাঙলা দেশ 'সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা, শস্যশ্যামলা', রবীন্দ্রনাথের ধানদৃপ্ত ঘোষণায় 'চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,' দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' বাক্যস্থানের তথা ভারতের সামগ্রিক পটভূমিতে প্রয়োগ করা হইলেও মূলত তাহা বাঙলা দেশের উদ্দেশেই লিখিত ইহা বুঝিতে ক্লেশস্বীকার করিতে হয় না। আর আজ? সেই বাঙলা দেশের এ কি ভয়াবহ অবস্থা? তবু যদি এই দুর্যোগ প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক হইত তাহা হইলে বেদনা থাকিলেও অভিযোগ থাকিত না, অবস্থা যতই আশানুরূপ না হউক, তবু ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, উৎপাদনের দিকে বাঙলা দেশ খুব অনগ্রসর নয় তথাচ তাহার ঘরে ঘরে আজ উপবাসের হাহাকার। সাময়িকভাবে এই ঘৃণ্য পদ্ধতিতে পূর্বোক্ত নরপিশাচগণের স্বার্থসিদ্ধ হইলেও ইহার পরিণাম যে কি ভয়াবহ সে সম্বন্ধে ভাবিয়া কূলকিনারা পাওয়া যায় না। ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের কিছুটা পরিচয়ও আছে তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে, অন্নাভাব যখনই কোন দেশে ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়াছে তখনই সেখানে আবির্ভাব হইয়াছে সাংঘাতিক রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ের। অন্নের অভাব শেষে পরিণত হয় শান্তির অভাবে। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ তাহার সর্বপ্রকার বুদ্ধি, বিচার হারাইয়া কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়ে। কোনপ্রকার যুক্তিতর্ক তাহাদের প্রভাবিত করিতে পারে না। প্রবাদকার অন্নচিন্তায় মহাকবি কালিদাসকেও বুদ্ধিহারা করিয়া ছাড়িয়াছেন—কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় তাহার ক্রিয়াকলাপগুলিও দেশ ও জাতির পক্ষে এক বিপজ্জনক মূর্তিতে দেখা দেয়। একমুঠো অন্নের প্রলোভন অধিকাংশ মানুষকেই বহুতর অন্যায় কার্য করিতে প্ররোচিত করিয়া থাকে। অনতিক্রম্য অভাবের তাড়না মানুষের মন হইতে তাহার বিবেক, নীতি, ন্যায়সমূহ নির্বাসিত করিয়া দেয়—ফলত জাতীয়জীবন এক সর্বনাশা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। বিদেশী শত্রুরা এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় থাকে যাহার ফলে দেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত বিপন্ন হয়।

আশার কথা, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মাণিয়ম এই বিপদে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে আকাঙ্ক্ষিত এবং অভিনন্দনীয়। চোরাবাজারীদের কঠোর হস্তে দমন করার এবং তাহাদের শাস্তিবিধানের যে সঙ্কল্প তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সর্বাংশে সাফল্যলাভ করিয়া এই ভয়ঙ্কর অবস্থার অবসান ঘটাক সেই কামনাই আমরা সর্বান্তঃকরণে করিতেছি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই ঘোর দুর্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সক্রিয় কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন দেশবাসীর তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার যে আছে আশা করি রাজ্য সরকার তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন না।

জয়তু নারলিকার

যাঁহাদের প্রতিভার রশ্মি সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করিয়া দেশজননীর গর্ব ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে ভারতের সেই মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানদের তালিকায় আরও একটি নাম যুক্ত হইল। ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার সেই সমাদৃত নাম।

কিছুদিন পূর্বেও এই নামটি ছিল সাধারণ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত আজ সেই নামটি শুধু পরিচিতই নয় ভৌগোলিক যাবতীয় দূরত্বকে অস্বীকার করিয়া পৃথিবীর দিক হইতে দিগন্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত প্রসারিত হইয়া ভারত-জননীর মহিমাকীর্তন করিতেছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগত সমাজে ভারতের ঐতিহ্য ও মর্যাদা আজ যাঁহার দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল সেই তরুণ-বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ ও আপেক্ষিকতত্ত্ব বর্তমান জগতের অন্যতম বিজ্ঞানগুরু আইনস্টাইনকে তিনি চ্যালেঞ্জ করিয়া বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন আনিয়াছেন।

জগদীশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ, শিশিরকুমার, রামানুজম, রামন, ভাবা প্রভৃতি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সাধনায় বিশ্ব সংসার সমৃদ্ধ, সেই বিশ্বখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানসাধকদের তালিকা নারলিকার বৃদ্ধি করিলেন। ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-অনুশীলনের ইতিহাস যেমনই বিচিত্র, তেমনই গৌরবোজ্জ্বল। পাটীগণিত, বীজগণিত ভারতের সৃষ্টি। যে শূন্যবাদ ও দশমিক তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া বর্তমান গণিত রূপ লইয়াছে তাহারও জন্ম ভারতই দিয়াছে। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য প্রমুখ বিগত যুগের গণিতাচার্যদের সাধনা আজও অবিস্মরণীয় দীপ্তিতে ইতিহাসে উজ্জ্বল।

নানাদিক দিয়া ভারত আজ অজস্র দুর্দশা ও সমস্যার সম্মুখীন হইলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহার তপস্যা যে আজও অপ্রতিহত তাহার অসংখ্য প্রমাণের মধ্যে ইহা এক বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। শুধু তাহাই নয়, ব্যথা, বেদনা ও দুঃখে ভারাক্রান্ত ভারতের নর-নারীর হৃদয়ে নারলিকারের এই বিজয়বার্তা যে কতখানি উদ্দীপনা ও শক্তি জোগাইবে তাহাও অনুভবসাপেক্ষ। দীর্ঘকাল পরে ভারতের এই নবলব্ধ জয়ে প্রত্যেকটি ভারতবাসীরই সমান অংশ, জয়লক্ষ্মী তাঁহার বরমাল্য নারলিকারকে উপলক্ষ করিয়া সমগ্র ভারতের কণ্ঠেই পরাইয়া দিয়াছেন তাই নারলিকারের জন্য আমাদের গর্ব ও গৌরবের অন্ত নাই।

ভারতের যে সকল তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রসমূহ পৃথিবীর দেশে দেশে ভারতের নামে অজস্র কুৎসা রটাইয়া তৃপ্তিলাভ করেন, সে ক্ষেত্রে ভারতের এই বিজয়-বৈজয়ন্তী তাঁহাদের মনে অবশ্য কি প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করিবে তাহা বুদ্ধিজীবী মহলে সহজেই অনুমেয়। ●

আপেক্ষিকতা [illegible] আমাদের মধ্যে ছিল নার্লিকারের [illegible] ছিলেন। তাঁহার গবেষণায় আজ বিশ্বজগৎ চমকিত।

ভারতবর্ষ বর্তমানে [illegible] পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। স্বাধীন ভারত আজ জগতের একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত। [illegible] শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের দরবারে একটি প্রথম শ্রেণীর আসনই ভারতের অধিকারভুক্ত চিরদিনই ছিল, রাজনৈতিক অধীনতা সেই আসন হইতে তাহাকে কোন প্রকারে টলাইতে পারে নাই। [illegible] প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক শত দুর্যোগে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যে ক্রমশই উন্নত হইতে উন্নততর হইয়া চলিয়াছে নার্লিকারের সাধনায় তাহা আর একবার প্রমাণিত হইল, বর্তমানের স্বাধীন ভারতের অনেক পরিকল্পনা, দেশের সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধির জন্য বহু কাজ এখনও তাহার আরব্ধ। সেই সকল পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য চাই অসংখ্য কর্মী, অনেক গুণী, অগণিত প্রতিভাধর বিজ্ঞানী। নার্লিকার প্রমুখ কত কীর্তিমান ভারত-সন্তান যে ভারতের বাহিরে পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া আছেন, তাহার তালিকা দীর্ঘ আকার ধারণ করিবে। ভারতের জনসাধারণের কল্যাণযজ্ঞে ঋত্বিকের ভূমিকায় ইঁহাদেরই অবতীর্ণ হইতে হইবে। মাতৃমন্দিরের পুণ্য-অঙ্গনে এই শক্তিমান সন্তানদের সমাবেশ ঘটান হউক—ইঁহাদের সাধনায় ভারতের সমৃদ্ধিসাধন অনেক দ্রুতবেগে এবং অনেক সাফল্যের সঙ্গেই ঘটিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই সমাবেশ ঘটানোর দায়িত্বগ্রহণ করিতে হইবে ভারত সরকারকে। ফিরাইয়া আনিতে হইবে প্রবাসী সন্তানদের, নিয়োজিত করিতে হইবে দেশের উন্নয়নমূলক কার্যে। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, অনেক গুণী বিদেশে থাকিতে বাধ্য হন কারণ তাঁহাদের [illegible] এবং [illegible] ভারতের মাটিতে গবেষণার ক্ষেত্র ও সুযোগ অনুপস্থিত, (স্মরণ থাকিতে পারে এই কারণে একজন বিজ্ঞানী আত্মহত্যা করিয়াছিলেন) আবার ভারতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য বিদেশ হইতে আমাদের কুশলীদের আনিতে হয়, [illegible] দেখান হয় যে আমরা পরমুখাপেক্ষী, [illegible] তাঁহাদের [illegible] সকল সময়ে সাফল্যমণ্ডিত হয় না, তাঁহাদের পিছনে বিপুল অর্থরাশি [illegible] পর্যবসিত হয়। [illegible] দেশে এই বিপুল অর্থের অকারণ অপব্যয় [illegible] কোন [illegible] করে না। [illegible] বিদেশী [illegible] আনাইবার [illegible] বরণ করিয়া অর্থের [illegible] সন্তানদের [illegible] আনিয়া তাঁহাদের গবেষণার [illegible] সরকার নিশ্চয়ই [illegible] এবং [illegible] সামগ্রিকভাবে নিশ্চয়ই লাভবান হইবে।

পরিশেষে আমরা শ্রীনার্লিকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি। [illegible] ঐতিহ্য ও গৌরব আরও [illegible] করিয়া চিরকালের [illegible] বিশ্ববিজ্ঞানে [illegible] তাঁহাকে [illegible] রাখুক, আমাদের এই [illegible] এই বিশ্বাস আমরা [illegible]।

শোক-সংবাদ

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য

প্রখ্যাতনামা ভারততত্ত্ববিদ পাণ্ডিত্যপ্রবর ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য [illegible] বছর বয়সে সম্প্রতি তাঁর [illegible] ভবনে পরলোকগমন করেছেন। দেশপূজ্য মনীষী মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ইনি সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রিলাভ করেন। বরোদা রাজ্যের গায়েকোয়ার্স ওরিয়েণ্টাল সিরিজের সাধারণ সম্পাদক ও ওরিয়েণ্টাল ইন্স্টিটিউটের পরিচালকের আসনে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়, কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী গত ২৬এ আষাঢ় ৫৫ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে এবং জনগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রসারে তাঁর সাধনা যথেষ্ট উল্লেখের দাবীদার। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি কিছুকাল সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত, লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ রমা চৌধুরী তাঁর স্বনামধন্যা সহধর্মিণী।

সতীনাথ বাগচী

সুবিখ্যাত ধাত্রীবিশারদ ডাঃ সতীনাথ বাগচী গত ১৮ই আষাঢ় [illegible] বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত অধ্যাপক পরিচালকের পদ হতে অবসর নেওয়ার পর ঐ কলেজের অন্যতম এমারিটাস অধ্যাপকরূপে তিনি সম্মানিত হন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক-স্নাতক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের পরিদর্শক উপদেষ্টা ও 'ক্যালকাটা মেডিক্যাল জার্নাল'-এর সম্পাদকের দায়িত্বও তাঁর দ্বারা সগৌরবে পালিত হয়েছে।

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সুকবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের গত ১৫ই আষাঢ় [illegible] বছর বয়সে জীবনাবসান ঘটেছে। কৈশোর থেকে তাঁর কাব্যসাধনার সূচনা। তদবধি মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যসাধনায় কোথাও ছেদ পড়ে নি। কবিতা ছাড়া উপন্যাস ও গল্পরচনাতে তাঁর শক্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে। কলকাতা হাইকোর্টের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রার (অরিজিনাল সাইড) এর পদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন।

গিরিজাকুমারী দেবী

দিঘাপতিয়ার স্বর্গত রাজা প্রমোদানাথ রায়ের সহধর্মিণী রাণী গিরিজাকুমারী রায় গত ১২ই আষাঢ় ৮৬ বছর বয়সে গঙ্গালাভ করেছেন।

যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আসামের কৃষিবিভাগের প্রাক্তন পরিচালক, রায়বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গত [illegible] বৈশাখ [illegible] বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমেরিকা থেকে এম-এস-সি ডিগ্রী অর্জন করে এ দেশের কৃষিবিভাগে যোগদান করেন ও অল্পকালের মধ্যেই যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের টেকনিক্যাল এ্যাডভাইসার ও এগ্রিকালচারাল এ্যাডভাইসারি বোর্ডের সদস্যরূপেও তিনি অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। [illegible] রামকৃষ্ণ মিশন ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত।

লক্ষ্মীমণি দেবী

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী লক্ষ্মীমণি দেবীর [illegible] বছর বয়সে গত [illegible] জ্যৈষ্ঠ তিরোধান ঘটেছে। ইনি [illegible] অন্যতমা [illegible] ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীতারকনাথ মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত]

পত্রিকা-সমালোচনা

সম্পাদক মহাশয়, [illegible] আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। অনেকদিন পরে আপনার কাছে [illegible] এই চিঠি। নতুন বছরের 'মাসিক বসুমতী' কাছে তাই লিখছি। আমি এ পত্রিকা দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছি। তাই আর লেখনী ধারণ না ক'রে থাকতে পারলাম না। অনুরোধ ক'রে ত্রুটি ক্ষমা ক'রে নেবেন। এখন এক কথায় বাঙালী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ব'লতে আমার প্রিয় পত্রিকা মাসিক বসুমতীকেই বোঝায়। সত্যিকথা বলতে কি,—এই পত্রিকাটিই বাংলা ভাষায় প্রচারিত পত্রিকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈশাখ মাসের (১৩৭১) মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদপটটি হ'য়েছে অপূর্ব। বিশ্বকবির অমূল্য চিত্রখানি পরিবেশন ক'রে আপনি সত্যিই সমগ্র বাংলা দেশের ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন। আপনার পত্রিকা মনোরম সুন্দর। আমি আপনাকে কয়েকটা অনুরোধ ক'রেছিলাম, আপনি অনুরোধগুলি রক্ষা করেছেন দেখে আপনাকে জানাচ্ছি আমার প্রাণের অভিনন্দন এবং প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মাসিক বসুমতীর পাতায় নারায়ণবাবুর জীবনী জানলাম, কিন্তু কৈ আপনার জীবনী তো পেলাম না? সত্যিই প্রাণতোষবাবু, আপনার 'পদ্মাবতী' অপূর্ব হ'য়েছে। আপনি অতসীর চরিত্র এত সুন্দরভাবে অঙ্কিত ক'রেছেন, যেন মনে হয় চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এক নিপীড়িতা লাঞ্ছিতা নারীকে। এ রচনার জন্য আপনাকে জানাচ্ছি আমার অভিনন্দন। আমি আপনার পত্রিকার অতি পুরনো গ্রাহক। কবে যে গ্রাহক হ'য়েছিলাম—সেই ক্ষণটুকু যেন আমার কাছে চির প্রজ্বলিত হ'য়ে থাকবে। এখন মাসিক বসুমতীর সাথে এক হ'য়ে মিশে গেছি। মাসিক বসুমতীর উন্নতি আমার মনে জাগায় আনন্দের স্পন্দন। সত্যিই সম্পাদক মহাশয়, অপূর্ব আপনার পরিকল্পনা, বলিষ্ঠ আপনার সম্পাদনা, সার্থক আপনার শ্রম। সত্যিই সবকিছু মিলিয়ে বলতে গেলে—কবির কথায়, 'ঠিক একটি গানের মত।' যাক এবার মাসিক বসুমতীর উন্নতিকল্পে দু-একটি কথা লিখছি। গ্রহণ করা না করা আপনার মত বিচক্ষণের হাতেই তুলে দিলাম। প্রথমত মাসিক বসুমতীর গ্রাহকরা ছড়িয়ে আছে সমগ্র বিশ্বে। তারা এই পত্রিকার মাধ্যমেই চিনতে পারে, জানতে পারে বাঙালীকে ও বাঙালী সংস্কৃতিকে। মাসিক বসুমতী সেই কর্তব্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি একটি মতামত দিচ্ছি। আচ্ছা সম্পাদক মহাশয়, স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙালীর দান অসীম। আমরা অনেকের নামই জানি যাঁরা অসীম বীরত্ব প্রকাশ ক'রেছেন, এই স্বাধীনতা যুদ্ধে। কিন্তু এমনও ত' অনেক আছেন যাঁরা সবার অলক্ষ্যে এমনি-বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের জীবনী কি আমাদের জানা উচিত নয়? আর তাঁদের বিষয়ে জানতে হবে জানাতে হবে এই ধরনের বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকার মাধ্যমেই। আজকেই এ [illegible] আপনার মত সম্পাদকের দায়িত্ব বড়। আমার মা [illegible] দেবী যেমনি অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, [illegible] লিখিত হ'লে হয়। বরিশালের পুলিশ-সুপারের [illegible] লুকিয়েছিলেন বা নেতাজী [illegible] তাঁর বিয়ের [illegible] কিভাবে সমস্ত সোনার গহনা দান করেছিলেন তা শুনলে মনে হয় যেন রূপকথা শুনছি। এ রকমের ত' আর বহুজন আছেন, যাঁদের অসাধারণ বীরত্বের কাহিনী আমাদের অজ্ঞাত রয়েছে। তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আপনার [illegible], এগিয়ে [illegible]। সব শেষে মাসিক বসুমতীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করছি। '[illegible]' বিভাগটি সুন্দর। পড়তে চাই আশুতোষের [illegible], আপনার জীবনী। সবশেষে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই ছড়িয়ে পড়ুক 'মাসিক বসুমতী' সমগ্র বিশ্বে। পড়ুক বিস্তৃত হ'য়ে দূর থেকে দূরান্তরে। বহুদূর থেকে আমার সমস্ত শুভকামনা যুক্ত ক'রে দিলাম আপনাদের শুভকামনার সাথে। 'জয়তু বসুমতী'। ইতি—তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়। মজলিঘর, টি, ই, পোঃ—খড়িয়া, ডারাং, আসাম।

মহাশয়, আপনাদের গত কার্তিক মাসের (১৩৭০) মাসিক বসুমতীর [illegible] পৃষ্ঠায় 'নগ্নতাবাদের' উল্লেখ করিয়া '[illegible] রাগিণী' উপন্যাসের মাধ্যমে অজিত রায়চৌধুরী কর্তৃক 'মা কালীর নাম—নগ্নতাবাদের দেবীরূপে পরিবেশিত হওয়াই'—একটু বিশেষরূপেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে মনে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছি। 'নগ্নতাবাদ' সম্বন্ধে অনেক পুস্তক আছে এবং অনেকেই অনেক কিছু লিখিয়া থাকেন। কিন্তু যে মহাশক্তি আদি হিন্দুসমাজে আদ্যাশক্তি—দশমহাবিদ্যার প্রথমাবিদ্যা, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজনকারিণী আবার মহাকালভয়হারিণী, বরাভয়দায়িনী, স্বর্গ, মর্ত্য-পাতাল ছাড়িয়াও যিনি বিরাজমানা, কোন অসীম অম্বর [illegible] কোন নীলাম্বরী তাঁহাকে আবরিত করিতে পারে না বলিয়াই তাঁহাকে 'দিগম্বরী' নামে পরিকল্পিত করা হইয়াছে। তিনি নিরাকার হইয়াও কখনও কখনও ভক্ত-সন্তানের জন্যই সাকার ধারণ করিয়া [illegible] হইয়া থাকেন—তাহার দৃষ্টান্ত সাধক কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, বামাক্ষেপা ও বিবেকানন্দস্বামীর জীবনীতেই পাওয়া যায়।

'তুমি মহাশক্তি সদা নিরাকার
সন্তান তরে তুমি মা সাকার।'

বিদ্রোহী সাধককবি নজরুলের গানেও আছে—

'বিশ্ব মায়ের রূপ ধরে না,
মা আমার তাই দিগবসন।'

যিনি সীমা ও অসীমার বাহিরে তিনি 'দিগবসনা বা দিগম্বরী'

বলিয়াই তাঁহাকে নগ্নতাবাদের দেবী বলিয়া উপন্যাসিত করিতে হইবে ইহা কিরূপ মনোভাবের পরিচায়ক ? ইহা কোন অতি আধুনিক হিন্দুও স্বীকার করিতে পারেন না ! কিন্তু শাক্ত হিন্দুর অভীষ্ট দেবী 'মা কালীকে' লইয়া যদিচ্ছামত 'নগ্নতাবাদের দেবী' বলিয়া কোনও উপন্যাসে সন্নিবেশিত করিতে পারেন না। ইহা অতি বিগর্হিত ও কলুষিত মনের কদর্য যৌন-আবেদনসুলভ প্রকাশন ছাড়া আর কিছুই নহে। আর বেশি কি লিখিব ? আশা করি আপনি ইহার প্রতিবিধান করিবেন এবং অজিত রায়চৌধুরীকে তাঁহার লিখিত 'কিংশুক রাগিণী' (১২) বসুমতীর কার্তিক সংখ্যার ১২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত 'তুমুল ঝগড়া হবে' হইতে 'নগ্নতাই নারীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য' পংক্তিগুলি উক্ত উপন্যাস হইতে পুনর্বিন্যাস (delete) করিতে বলিয়া বাধিত করিবেন। এই ঠিকানাগুলি দয়া করিয়া জানাইলে বড়ই উপকৃত হইব। (১) কাশীর সন্ন্যাসী বিশুদ্ধানন্দ ও গোপীনাথ কবিরাজের ঠিকানা এবং (২) গত পৌষ সংখ্যার 'বার্ধক্যে বারাণসী'তে প্রকাশিত 'সাধক জ্যোতিষী সুধীরবাবুর ঠিকানা' পোস্টবার্ড রহিল। আমি ১৯২০ সাল হতেই বসুমতী পাঠ করিয়া আসিতেছি, অবশ্য মাঝে মাঝে বাদ গিয়েছে স্থানপরিবর্তন হেতুই ! বিনীত—কমলাকান্ত রায়চৌধুরী। ভট্টাবাজার, পূর্ণিয়া বিহার।

I like the magazine very much. So kindly send me the following issues which I have not received. Thanking you. S. L. Debi Rani Saheba of Kurupam, Kurupam House. 15 Gopalapuram 2nd. St. Madras—6.

বেচতে চাই

মহাশয়, আমি নিম্নলিখিত মাসিক বসুমতীগুলি একত্রে প্রতি কপি এক টাকা হিসাবে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন লোকের কিনিবার ইচ্ছা থাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন। উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি আপনার মাসিক বসুমতীর আষাঢ় সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে বিজ্ঞাপিত করিলে বাধিত থাকিব। বিজ্ঞাপিত করিতে যদি খরচ লাগে, তাহা দিব।

১৩৭০—শ্রাবণ হইতে চৈত্র

১৩৭১—বৈশাখ

স্বপনকুমার নাথ, পোঃ—চিত্তরঞ্জন, জিলা—বর্ধমান, কোয়াটার নং ২১ডি, ষ্ট্রীট নং ৩২, আমলাদহি।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী রীণা ঘোষ, অবধায়ক—শ্রীঅনিলকুমার দে, গ্রাম—আদর্শ পল্লী, ডাক—খড়দহ, জেলা—২৪ পরগণা, * * * শ্রীমতী প্রীতি দেবী, এ ১১ ৬, রাজঘা বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ * * * শ্রীমতী রমা রায়, অবধায়ক—শ্রী এ এস রায়, টাটা হাউসিং কলোনী টাইপ ৪, বিল্ডিং নং ২, ম. রোড, বোম্বাই—৭৪ (এ এস) * * * সচিব, জয়শ্রী ক্লাব, [illegible]য়ক—জয়শ্রী টেক্সটাইল এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ডাক—রিষড়া, জেলা—হুগলী * * * শ্রীমতী ইলা পাল, ৪।৩২, ওয়েস্ট প্যাটেল নগর, দিল্লী—: * * * শ্রীমতী লীলাবতী সেন, অবধায়ক—ডাঃ আর সি সেনগুপ্ত, মহীদাস বাজার, কটক—২ * * * ডাঃ পি জি চন্দ্র, সি-এ, ৬ (১) ডাক—নামসাই, লোহিত ফ্রণ্টিয়ার ডিভিশন, নেফা, * * * শ্রীমানিকচন্দ্র পাল, গ্রাম—শ্রীমন্তপুর, ডাক—ঘাসবার (ঘাটাল হয়ে) জেলা—মেদিনীপুর * * * শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মুরলী দি কোলিয়ারী, ডাক—মহুদা, ধানবাদ, * * * শ্রীমতী রত্না দাশগুপ্তা, অবধায়ক—রায়সাহেব জে এন দাশগুপ্ত, বোস পার্ক, চার্চ রোড, ভাগলপুর—১, * * * শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র কুণ্ডু মাতেলী বাজার, ডাক—মাতেলী, জেলা—জলপাইগুড়ি * * * শ্রীসুকুমার মণ্ডল, গ্রাম—রোদীপুর, ডাক—বীরগঞ্জ (নলহাটী হয়ে) জেলা—বীরভূম * * * সচিব, বিল্বগ্রাম কিশোর সঙ্ঘ পাঠাগার, ডাক—বড়বলগোনা, জেলা—বর্ধমান * * * শ্রীকল্যাণকুমার ভৌমিক, অবৈতনিক সচিব, টি আর এল রিক্রিয়েশন ক্লাব, ১২, রিজেণ্ট পার্ক, কলিকাতা * * * গ্রন্থাগারিক, গান্ধী সেবক সংগ্রহালয়, গ্রন্থালয়, ১৪, রিভার সাইড রোড, ব্যারাকপুর, জেলা—২৪ পরগণা, * * * শ্রীবরেন্দ্রকুমার সরকার, ডিপো ইনচার্জ (দিল্লী) বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ, ১ দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী—৬। * * * শ্রীঅজিতানন্দ সেনগুপ্ত ; ৩৫, আমহার্স্ট রো, কলিকাতা ৯। * * * অবৈতনিক সচিব, স্টাফ ইনস্টিটিউট, সাহরাহ সরণ, বিহার * * * শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য, অবধায়ক—ভবানীচন্দ্র ভট্টাচার্য, এ্যাডভোকেট, বি ভট্টাচার্য রোড, ডাক—সীতাপুর উত্তর-প্রদেশ * * * শ্রীমতী বীণাপাণি বন্দ্যোপাধ্যায়, পোস্ট বক্স নং ৬৭, ধানবাদ।

Sending herewith Rs. 15/- only as the yearly subscription of the Monthly Basumati. Kindly send the magazine every month. The Librarian, Dist. State Library. Dumka, (S. P.)

Herewith I am remitting the yearly subscription of Rs. 15/- for the Monthly Basumati for the current year. Please send the magazine from the beginning of the current year. The Principal, St. John's Dioceson Girl's Higher Secondary School. 17, Sarat Bose Road, Cal-20.

I am sending Rs. 15/- towards the yearly subscription of the Monthly Basumati. Please send the magazine regularly. Mrs. Pratima Chatterjee, 22, Queens Road. Allahabad.

Herewith I am remitting my subscription of the Monthly Basumati. Kindly send the magazine regularly. Sm. Jharna Banerjee. C/o Shri P. Banerjee. Mikaibari Tea Estate, Kurseong.

The subscription of the Monthly Basumati is sent herewith. Please send the magazine regularly. Mr. T. K. Mukherjee. C/o Expro International Ltd. P. O. Chanisword Dt. Poona-19 Maharastra.

An annual subscription of Rs. 15/- only is sent herewith. Kindly acknowledge receipt and send the magazine every month. The Librarian, Utkal University Vanibihar. Bhubaneswar.

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুকুমার [illegible]]

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

স্বাধীনতার ইতিহাস

বিপ্লবী বাংলার শৃঙ্খলমোচন অভিযানের প্রারম্ভে তরুণদের উদ্দীপিত করিয়াছিল।

পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থরাজি

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বর্ণোজ্জ্বল প্রথম প্রামাণ্য বিবরণী

প্রতাপাদিত্য ২৲

ভারতের স্বাধীনতার সহিত সম্পদ লুণ্ঠনের প্রথম জালিয়াৎ ও বাটপাড়ের কথা

জালিয়াৎ ক্লাইব ২৲

মহারাজ নন্দকুমারের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-আলেখ্য

মহারাজ নন্দকুমার ২৲

রাজনৈতিক-গগনের দীপ্তসূর্য্য—পাঞ্জাবকেশরী

লালা লাজপৎ রায়ের জীবনী

(ইংরাজীতে)

রাজনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় মহাজীবনী। মূল্য ।০

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ

শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেইদিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল তাহারই সুযোগ লইয়া আমাদের গৃহ সমাজ ধ্বংস করিয়াছে য়ুনানী সভ্যতা। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি করকমলে যে পবিত্র নৈবেদ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন প্রদেশপাল শ্রীমাধব শ্রীহরি এনি লিখিয়াছেন —

"...চমৎকার বই। ঋষিদের প্রচারিত হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোর ও কিশোরীদের হাতে এই রকমের একখানি করে বই শোভা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছে।"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র অভিমত—

"স্বধর্ম্মের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ার সন্তান-সন্ততিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এইরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—১২

সদ্য প্রকাশিত নূতন নূতন উপন্যাস

বই	লেখক	মূল্য
উত্তরণ	আশাপূর্ণা দেবী	৫·০০
কাছের মানুষ	ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী	৪·০০
তমস্বিনী	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৩·০০
পরজবসন্ত	অরবিন্দ পালিত	৩·০০
অপরাহ্ণের নদী	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	২·৫০
বিলাসিনী রাই (কাহিনী)	সুনীলকুমার ঘোষ	৩·০০
সন্তবাসি যুগে যুগে	রণবিজয় চট্টোপাধ্যায় (ধর্মমূলক জীবনীচিত্র)	৩·০০

সঙ্কলন

বই	লেখক	মূল্য
সিন্ধুর স্বাদ (২য় সং)	প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পা:	৭·০০
রবীন্দ্র-চর্চা	হরপ্রসাদ মিত্র সম্পা:	৫·০০
অনেক দিনের অনেক কথা	সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত	৪·০০

উপন্যাস

বই	লেখক	মূল্য
নজরানা	অমরেন্দ্র দাস	১০·০০
জেবুন্নিসা (৩য় সং)	অমরেন্দ্র দাস	৬·০০
তনছন্দ	আশাপূর্ণা দেবী	৪·০০
দূরের মালঞ্চ (২য় সং)	হরিনারায়ণ চট্টো:	৫·০০
রেণীপার্ক	সুনীলকুমার ঘোষ	৪·০০
মায়ামারিচ	"	৩·৫০
সাহসিকা	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩·৫০
সরস্বতীয়া	বিমল মিত্র	৩·০০
রায়মঙ্গল	শক্তিপদ রাজগুরু	৩·০০
রাতের ঢেউ	সত্যপ্রিয় ঘোষ	৩·০০
বাহ্নিবিহঙ্গ	চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩·০০
অচেনা	শুদ্ধসত্ত্ব বসু	২·৫০
বিজয় বসন্ত	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	২·৫০
হেডমাস্টার (৩য় সং)	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২·৫০
সোনারুপোর কাঠি	কবিতা সিংহ	২·০০

গল্পসংগ্রহ

বই	লেখক	মূল্য
মাৎস্যমোতো	প্রতিভা বসু	৩·৫০
শুভক্ষণ (২য় সং)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩·৫০
ধূলিধূসর	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩·০০
পত্রবিলাস	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৩·০০
ছায়াসূর্য	আশাপূর্ণা দেবী	৩·০০
ছায়া হরিণ	সন্তোষকুমার ঘোষ	৩·০০
পাহাড়ী ঢল	সমরেশ বসু	৩·০০
মরসুমী	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২·৫০
শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি	দিব্যেন্দু পালিত	২·০০

কবিতার বই

বই	লেখক	মূল্য
সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা	হরপ্রসাদ মিত্র	৩·০০
যৌবনবাউল	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	৩·০০
অতিদূর আলোরেখা	মণীন্দ্র রায়	২·০০
প্রথম নায়ক	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১·৫০

সুরভি প্রকাশনী ১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

(রেখাচিত্র)

বাস্তহারা

—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অঙ্কিত

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪৩শ বর্ষ
শ্রাবণ ১৩৭১

প্রথম খণ্ড
চতুর্থ সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

কথামৃত

● ঈশা অনুসরণ ●

[স্বামীজী আমেরিকা যাইবার বহুপূর্বে ১২৯৬ সালে অধুনালুপ্ত 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামক মাসিকপত্রে Imitation Of Christ নামক জগদ্বিখ্যাত পুস্তকের 'ঈশা অনুসরণ' নাম দিয়া অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত পত্রের প্রথম ভাগের প্রথম হইতে পঞ্চম সংখ্যা অবধি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা সমুদয় অনুবাদটিই সন্নিবেশিত করিলাম। সূচনাটি স্বামীজীর মৌলিক রচনা।—স]

সূচনা

খৃষ্টের অনুসরণ নামক এই পুস্তক সমগ্র খৃষ্টজগতের অতি আদরের ধন। এই মহাপুস্তক কোন 'রোমান্ ক্যাথলিক্' সন্ন্যাসীর লিখিত—লিখিত বলিলে ভুল হয়—ইহার প্রত্যেক অক্ষর উক্ত ঈশা-প্রেমে সর্বত্যাগী মহাত্মার হৃদয়ের শোণিতবিন্দুতে মুদ্রিত। যে মহাপুরুষের জ্বলন্তজীবন্ত বাণী আজি চারিশত বৎসর কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় অদ্ভুত মোহিনী শক্তিবলে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে—রাখিতেছে এবং রাখিবে, যিনি আজি প্রতিভা এবং সাধনবলে কত শত সম্রাটেরও নমস্য হইয়াছেন, যাঁহার অলৌকিক পবিত্রতার নিকটে পরস্পরে সতত যুধ্যমান অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত খৃষ্ট-সমাজ চিরপুষ্ট বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে—তিনি এ পুস্তকে আপনার নাম দেন নাই। দিবেন বা কেন?—যিনি সমস্ত পার্থিব ভোগ বা বিলাসকে, ইহজগতের সমুদয় মান-সম্ভ্রমকে বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি কি সামান্য নামের ভিখারী হইতে পারেন? পরবর্তী লোকেরা অনুমান করিয়া 'টামাস আ কেম্পিস্' নামক একজন ক্যাথলিক্ সন্ন্যাসীকে গ্রন্থকার স্থির করিয়াছেন, কতদূর সত্য ঈশ্বর জানেন। যিনিই হউন, তিনি যে জগতের পূজ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখন আমরা খৃষ্টিয়ান রাজার প্রজা। রাজঅনুগ্রহে বহুবিধ নামধারী স্বদেশী-বিদেশী খৃষ্টিয়ান দেখিলাম। দেখিতেছি, যে মিশনরী মহাপুরুষেরা, 'অদ্য যাহা আছে খাও, কল্যকার জন্য ভাবিও না' প্রচার করিয়া আসিয়াই আগামী দশ বৎসরের হিসাব এবং সঞ্চয়ে ব্যস্ত—দেখিতেছি—'যাঁহার মাথ রাখিবার স্থান নাই', তাঁহার শিষ্যের', তাঁহার প্রচারকেরা বিলাসে মণ্ডিত হইয়া বিবাহের বরটি সাজিয়া এক পয়সার মা-বাপ হইয়া—ঈশার জলন্ত ত্যাগ, অদ্ভুত নিঃস্বার্থতা প্রচার করিতে ব্যস্ত, কিন্তু প্রকৃত খৃষ্টিয়ান দেখিতেছি না। এ অদ্ভুত বিলাসী, অতি দাম্ভিক, মহা অত্যাচারী, বেরুস এবং ব্রুহম চড়া প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায় দেখিয়া খৃষ্টিয়ান সম্বন্ধে আমাদের যে অতি কুৎসিত ধারণা হইয়াছে, এই পুস্তক পাঠ করিলে তাহা সম্যকরূপে দূরীভূত হইবে।

'সব্ সেয়ান্ কি একমত' সকল যথার্থ জ্ঞানীরই একপ্রকার মত। পাঠক এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে গীতায় ভগবদুক্ত 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' প্রভৃতি উপদেশের শত শত প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইবেন। দীনতা, আর্তি এবং দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মুদ্রিত এবং পাঠ করিতে করিতে জ্বলন্ত বৈরাগ্য, অত্যদ্ভুত আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরের ভাবে হৃদয় উদ্বেলিত হইবে। যাঁহারা অন্ধ গোঁড়ামীর বশবর্তী হইয়া খৃষ্টিয়ানের লেখা বলিয়া এ পুস্তকে অশ্রদ্ধা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বৈশেষিক দর্শনের একটি সূত্র বলিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব,—

'আপ্তোপদেশবাক্যঃ শব্দঃ'

সিদ্ধপুরুষদিগের উপদেশ প্রামাণ্য এবং তাহারই নাম শব্দপ্রমাণ। এস্থলে টীকাকার ঋষি জৈমিনি বলিতেছেন যে, এই আপ্তপুরুষ আর্য এবং ম্লেচ্ছ উভয়ত্রই সম্ভব।

যদি 'যবনাচার্য' প্রভৃতি গ্রীক জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ পুরাকালে আর্যদিগের নিকট এতাদৃশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ভক্তসিংহের পুস্তক যে এদেশে আদর পাইবে না, তাহা বিশ্বাস হয় না।

যাহা হউক এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ আমরা পাঠকগণের সমক্ষে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত করিব। আশা করি, রাশি রাশি অসার নভেল নাটকে বঙ্গের সাধারণ পাঠক যে সময় নিয়োজিত করেন, তাহার শতাংশের একাংশ ইহাতে প্রয়োগ করিবেন।

অনুবাদ যতদূর সম্ভব অবিকল করিবার চেষ্টা করিয়াছি—কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। যে সকল বাক্য 'বাইবেল' সংক্রান্ত *কোন বিষয়ের উল্লেখ করে, নিম্নে তাহার টীকা প্রদত্ত হইবে।*

কিমধিকমিতি।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

'খৃষ্টের অনুসরণ' এবং সংসার ও যাবতীয় সাংসারিক অন্তঃসারশূন্য পদার্থে ঘৃণা

১। প্রভু বলিতেছেন, 'যে কেহ আমার অনুগমন করে, সে অন্ধকারে পদক্ষেপ করিবে না।'(ক)

যদ্যপি আমরা যথার্থ আলোকপ্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করি এবং সকল প্রকার হৃদয়ের অন্ধকার হইতে মুক্ত হইবার বাসনা করি, তাহা হইলে খৃষ্টের এই কয়েকটি কথা আমাদের স্মরণ করাইতেছে যে, তাঁহার জীবন ও চরিত্রের অনুকরণ আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য।

অতএব ঈশার জীবন মনন করা আমাদের প্রধান কর্তব্য।(খ)

২। তিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা অন্য সকল মহাত্মাপ্রদত্ত শিক্ষাকে অতিক্রম করে এবং যিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত, তিনি ইহারই মধ্যে লুক্কায়িত 'মান্না'(গ) প্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু এ প্রকার অনেক সময়ে হয় যে, অনেকেই খৃষ্টের সুসমাচার বারম্বার শ্রবণ করিয়াও তাহা লাভের জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে না, কারণ, তাহারা খৃষ্ট আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত নহে। অতএব যদ্যপি তুমি আনন্দহৃদয়ে এবং সম্পূর্ণভাবে খৃষ্ট-বাক্যতত্ত্বে অনুপ্রবেশ করিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের সহিত তোমার সম্পূর্ণ জীবনের সৌসাদৃশ্য স্থাপনের জন্য সর্বদা যত্নশীল হও।(ঘ)

৩। 'ত্রিত্ববাদ'(ঙ) সম্বন্ধে গভীর গবেষণায় তোমার কি লাভ হইবে, যদি সেই সমস্ত সময় তোমার নম্রতার অভাব, সেই ঐশ্বরিক ত্রিত্বকে অসন্তুষ্ট করে?

নিশ্চয়ই উচ্চ বাক্যচ্ছটা মনুষ্যকে পবিত্র এবং অকপট করিতে পারে না; কিন্তু ধার্মিক জীবন তাহাকে ঈশ্বরের প্রিয় করে।(চ)

অনুতাপে হৃদয়শল্য বরং ভোগ করিব,—তাহার সর্বলক্ষণাক্রান্ত বর্ণনা জানিতে চাহি না।

যদি সমগ্র বাইবেল এবং সমস্ত দার্শনিকদিগের মত তোমার জানা থাকে, তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে, যদি তুমি ঈশ্বরের প্রেম এবং কৃপাবিহীন হও?(ছ) [ক্রমশ।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

(ক) যোহন ৮।১২
He that followeth me &c.

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

—গীতা। ৭ অ-১৪॥

আমার সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী মায়া নিতান্ত দুরতিক্রম্য; যে সকল ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করে, তাহারাই কেবল এই দুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

(খ) To meditate &c.

ধ্যায়েদেবাত্মানমহর্নিশং মুনিঃ।
তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ॥—রামগীতা।

মুনি এই প্রকারে অহর্নিশি পরমাত্মার ধ্যান দ্বারা সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

(গ) ইস্রায়েলেরা যখন মরুভূমিতে আহারাভাবে কষ্ট পাইয়াছিল, সেই সময়ে ঈশ্বর তাহাদের নিমিত্ত একপ্রকার খাদ্য বর্ষণ করেন—তাহার নাম 'মান্না।'

(ঘ) But it happens &c.

শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।

—গীতা।

শ্রবণ করিয়াও অনেকে ইহাকে বুঝিতে পারে না।

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ।
বিনাঽপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে।

—বিবেকচূড়ামণি ৬৪।

'ঔষধ' কথাটিতেই ব্যাধি দূর হয় না, অপরোক্ষানুভব ব্যতিরেকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিলেই মুক্তি হইবে না।

শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্মমাচরেৎ।

—মহাভারত।

যদি ধর্ম আচরণ না কর, বেদ পড়িয়া কি হইবে?

(ঙ) খৃষ্টান মতে জনকেশ্বর (পিতা) পবিত্র আত্মা এবং তনয়েশ্বর (পুত্র)—ইঁহারা এক তিন তিনে এক।

(চ) Surely sublime language &c.

বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

—বিবেকচূড়ামণি ৬০।

নানাবিধ বাক্যবিন্যাস এবং শব্দচ্ছটা যে প্রকার কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশল মাত্র, সেই প্রকার পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ কেবল ভোগের নিমিত্ত, মুক্তির নিমিত্ত নহে।

(ছ) কোরিন্থিয়ান ১৩.২

জিপ্সী, জিপ্সী

ইয়োরোপে হেনরী ফিল্ডিং এবং ভিক্টর হুগো থেকে সুরু করে আমাদের তারাশঙ্কর পর্যন্ত দেশ-বিদেশের ছোটো-বড়ো সমস্ত শ্রেণীর সাহিত্যিকই তাঁদের সাহিত্যে জিপসীদের কথা কিছু কিছু বলবার চেষ্টা করেছেন। শক্তিমান সাহিত্যিকদের রচনা পড়ে জিপসীদের জীবনযাত্রার অনেক খুঁটিনাটি পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি তা ঠিক, তবে সাধারণভাবে জিপসীদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল বা ধারণা কোনো লেখকের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে না।—ওদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা, বিশেষ করে সহরাঞ্চলের অধিবাসী যারা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই গড়ে ওঠে।

মনে করে দেখুন, হঠাৎ একদিন কোনো একসময় মেয়ে-পুরুষ মিলে ছ'জন কি হয় তো পাঁচ-সাতজন লোকই আপনার গেটের কাছে এসে গান-বাজনা চাই কি হয় তো বা নাচও সুরু করে দিয়েছে। কেউই তার বাড়ির সামনে হল্লা পছন্দ করে না, আপনিও করেন না তা জানি, কিন্তু পেরেছেন কি সেই অনাহূত গায়কদলকে তখুনই তাড়িয়ে দিতে? জানি, আপনি পারেন নি। কারণ, ওদের ঐ গান, ওদের অস্বাভাবিক প্রাণচঞ্চলতা। অস্বাভাবিক বলছি এই জন্যে যে, প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে যে আনন্দোচ্ছল সরস প্রাণচঞ্চলতা মানুষ মাত্রেরই থাকবার কথা—তা আজকের পৃথিবীর সুসভ্য মানুষ আমরা সকলেই হারিয়ে ফেলেছি—বিশেষ করে নগরবাসীদের তো কথাই নেই। আমরা যেন প্রতিমুহূর্ত নিজেদের 'এডিট' করতে তৎপর। কথা বলি এডিট করে, চলি-ফিরি 'এডিট' করে, পোষাক পরি এডিট করে, চিন্তা-ভাবনা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকাশ তাও করি 'এডিট' করে। চাই কি একটু কাঁদবার সময়ও 'এডিট' করতে ভুলি না। অথচ ভালোভাবে 'এডিট' করার কাজটা যে কতো কঠিন তা এক-আধজন এডিটরের আশেপাশে যাঁরা কিছুকাল কাটিয়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন। ভালো এডিটর কিন্তু আকছার মেলে না—এডিটর হিসেবে আমরা সকলেই যৎপরোনাস্তি খারাপই বলা চলে। কাজেই যখনই আমরা নিজেদের এডিট করতে যাই, তখনই অস্বাভাবিকতা এবং হাস্যকর কৃত্রিমতায় আমরা ঢাকা পড়ে যাই। কিন্তু জিপসীরা, নিজেদের এডিট করে না। আমাদের সঙ্গে জিপসীদের এইখানটাতেই তফাৎ।

একজন প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী এক সময় বলেছিলেন যে, জিপসী বা তাদের পূর্বপুরুষ ভারতীয় 'বেদেরাই' হচ্ছে আজকের সুসভ্য মানুষের সঙ্গে ফেলে-আসা দিনের অলৌকিকতায় বিশ্বাসী মানবসমাজের একমাত্র যোগসূত্র।

জিপসীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের প্রচলন আছে। তবে বেশির ভাগ ঐতিহাসিকই মনে করেন যে ভারতের বেদেরাই আজকের সারা পৃথিবীর জিপসীদের পূর্বপুরুষ; আর এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতে জিপসীদের আদিভূমি ছিল স্পেন দেশে। আবার কেউ কেউ মিশরের দক্ষিণাঞ্চলকেও জিপসীদের উৎপত্তিস্থল বলে মনে করে থাকেন।

উৎপত্তিস্থল যেখানেই হোক-না-কেন বিভিন্ন নামে পৃথিবীর যেখানেই জিপসী দেখা যায়, অঞ্চলবিশেষে তাদের পোশাক-আশাকের

চিরমুক্তির পিয়াসী—একটি জিপসী কন্যা

বিভিন্নতা থাকলেও জীবনধারণ প্রণালী এবং স্বভাবচরিত্র প্রায় একই রকম দেখা যায়।

জিপসী সমাজের পুরুষেরা সাধারণত থাকে নাচ-গান-বাজনা নিয়েই, কখনো বা গাছ-গাছড়ার ওষধ নিয়েও নাড়াচাড়া করে তারা—এদের সমাজের প্রকৃত কর্তাব্যক্তি, অর্থাৎ সংসার চালাবার যে দায়িত্ব তা প্রায় সর্বত্রই মেয়েদের হাতে। কখনো সাপের খেলা দেখিয়ে, কখনো দুরারোগ্য কোনো ব্যারাম সারাবার কোনো অলৌকিক প্রক্রিয়ায় চেষ্টা করে, কখনো দুষ্প্রাপ্য মণি-মুক্তা ইত্যাদি পাথরের পসরা মিলিয়ে, কখনো ভেড়া-ছাগল বিক্রি করে, কখনো বা জ্যোতিষ-চর্চা করে যে উপার্জন এদের করতে হয় সংসার চলে তাই দিয়েই। এ উপার্জন সাধারণত খুব বেশি না হবারই কথা, অনিয়মিত তো বটেই—কিন্তু তারই ওপর নির্ভর করে গোটা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ জিপসী-পরিবার শতাব্দীর পর শতাব্দী চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় অনেক ধুরন্ধর রাষ্ট্রনায়ক (যেমন জার্মানীর হিটলার) চেষ্টা করেছেন জিপসীদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাতে। পাকা বাড়িতে স্থায়ী ঠিকানার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন ওদের আকৃষ্ট করবার জন্যে—কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। দীর্ঘকাল অনিশ্চিতভাবে পথে-পথে ঘুরতে ঘুরতে নিরুদ্দেশের পথে ঘোরার নেশা ওদের মজ্জায়-মজ্জায় মিশে গেছে।

জিপসীদের নিজেদের একটি ভাষা আছে—নিজেদের মধ্যে সাধারণত এই ভাষাতেই কথা বলে থাকে ওরা। কিন্তু, নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে আরো বিভিন্ন ভাষা ওরা আয়ত্ত করে ফেলে দেখা যায়। একবার দেখা গিয়েছিল একটি বৃদ্ধ জিপসী পুরুষ পৃথিবীর প্রধান বাইশটি ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করতে সক্ষম। ইয়োরোপের একাধিক গভর্নমেণ্ট তাকে নিজেদের সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। সে বলতো—এক জায়গায় স্থায়িভাবে কোনো কিছু করলে তা প্রকৃতির বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধের সামিল একটা কাজ হয়ে যায়। প্রকৃতি নিজে সদা-চঞ্চল, সদা-পরিবর্তনশীল, আমাদেরও (অর্থাৎ মানুষদেরও) ঠিক তেমনিই হওয়া দরকার। তোমাদের পাকা বাড়ির চাইতে আমাদের খোলা মাঠ, কিম্বা পথের ধারের এই তাঁবু এ অনেক ভালো।

জিপসীরা পৃথিবীর কোনো দেশের সরকারকেই নিজেদের সরকার বলে মনে করে না—বাস্তবিকপক্ষে সরকারমাত্রেই অপ্রয়োজনীয় একটা কিছু বলে এদের ধারণা। আর এই জন্যেই কোনো দেশে যখন জিপসীদের আবির্ভাব হতে থাকে, (বিশেষ করে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় যুদ্ধের রঙ লেগে গেলে) তখন সেই সমস্ত দেশের পুলিশ বিভাগ সজাগ হয়ে ওঠে ওদের সম্পর্কে—যাতে না স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করে সামরিক বা অসামরিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর ওরা সংগ্রহ করতে পারে।

যে বিশেষ গুণের জন্যে এক এক সময় জবরদস্ত রাজনীতিবিদদের কুনজরে পড়া সত্ত্বেও, আজও জিপসীরা প্রায় সর্বত্রই চলাফেরা করতে পারে, তার একটি হলো টোটকা চিকিৎস। নানা গাছ-গাছড়ার সাহায্যে অনেক সময় অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি ওরা প্রকৃতই সারিয়েছে দেখা গেছে। বলাই বাহুল্য এই ওষুধগুলি পুরুষানুক্রমে ওরা গোপন রেখেই চলে; এইটেই ওদের মূলধন হয় তো একটা গাছের শিকড়, তুরস্কে যা আকছার পাওয়া যায়, কেউ তার কোনো গুণ আছে বলেই মনে করে না, তেমনি একটা জিনিস দিয়ে হয় তো জিপসীরা ভেনেজুয়েলা কিম্বা ইকোয়াডোরের (যে অঞ্চলে ঐ গাছ আদৌ মেলে না) কোনো মৃতকল্প রুগীকে সারিয়ে দিলে। আর দ্বিতীয় যে গুণ তার আবেদন সর্বজনীন বললেই হয় অর্থাৎ গান-বাজনা এবং নাচ। বাঁশি এবং বেহালা যন্ত্রের মধ্যে এই দু'টি কঠিন জিনিস পুরুষানুক্রমে চর্চার ফলে ওরা এমনভাবে আয়ত্ত করে ফেলেছে যে, অনেক সঙ্গীত বিশারদকেই অনেক সময় দেখা গেছে যে, হয় তো চলতে চলতে হঠাৎ পথের মাঝে স্তব্ধ হয়ে পড়েছেন পথের ধারে কোনো জিপসীর বেহালা শুনে। কিন্তু যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারবে যে, আপনি ওর বেহালাটা শিখে নেবার চেষ্টা করছেন, সেই মুহূর্তেই সে বন্ধ করবে—কারণ, সকলের মতো ওরাও ওদের মূলধন হাতছাড়া করতে নারাজ।

বাইরে থেকে মনে হয় যে জিপসীদের জীবনযাত্রার নৈতিক মান বোধ হয় খুব প্রশংসনীয় নয়—কারণ কোথাও গান-বাজনা শুরু করে দিয়ে ওদের মেয়েরা হয় তো সহজেই আপনার হাত ধরে ফেলবে কিছু চাঁদার জন্যে, (চাই কি হাতখানা হয় তো বা আপনার পকেটেই ঢুকিয়ে দিলে।) কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ওদের জীবনযাত্রার নৈতিক মান আমাদের চাইতে অনেক উঁচুতে। বিয়ের বাইরে কোনো প্রকার যৌনসংস্রব ওরা কল্পনা করতে পারে না। —তীরন্দা

জিপসীদের কাছে টাকা একমাত্র স্বর্গ

প্যাভলফ

প্যাভলফ

মানুষই হোক বা মনুষ্যেতর অন্যান্য জীবজন্তুরাই হোক—এরা সবাই যে কোনও কিছু শিখতে পারে তা কি করে সম্ভব হয়? পাখি উড়তে শেখে, হরিণশিশু দৌড়তে শেখে, মাছ সাঁতার কাটতে শেখে—এ সমস্ত বুঝতে পারা বা তা অপরকে বোঝানো বিশেষ কঠিন নয়। বিজ্ঞানের প্রথম অবস্থায় এ সবের কারণস্বরূপ যা বলা হতো অর্থাৎ সহজাতবৃত্তি, তাতে এ শিক্ষার যা প্রকৃত কারণ তার বেশির ভাগটাই জানা হয়ে গি. হল এবং আজকের দিনেও তা অভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু পাখি মানুষের ভাষা (তা একটি শব্দই হোক আর দু শব্দই হোক) বলতে শেখে কি করে? হরিণশিশু বা কুকুর বা হাতী যে মানুষের পোষ মানে তা কি করে সম্ভব হয়? কিম্বা মানুষ যে জ্যামিতি শেখে বা দর্শনশাস্ত্র শেখে বা খেয়াল গান শিখতে পারে—এগুলিই বা কি করে সম্ভব হয়? অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নানা দেশের বিজ্ঞানীদের শত শত পরীক্ষা-কার্যের ফলে কতকগুলি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তা হলো সজ্ঞানভাবে মানুষ বা মনুষ্যেতর জীব যা শেখে তার কারণগুলি। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের থিয়োরীগুলি মোটামুটি তিনটি ধারণার মধ্যে সীমিত করা যায়। প্রথমত ধারণার একত্রীকরণ (association of ideas), দ্বিতীয়ত ধারণা বা বিচ্ছিন্ন চিন্তা (concepts) এবং তৃতীয়ত রূপকল্প (images)। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই নানা দেশের বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সহজাতবৃত্তির গুণে শিক্ষা এবং সজ্ঞানভাবে শিক্ষার কারণস্বরূপ যে প্রধান তিনটি সূত্র পাওয়া গেছে তার সাহায্যে সবকিছু সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ সহজাতবৃত্তির গণ্ডীতে পড়ে না এবং সজ্ঞানভাবে শেখা হচ্ছে না—এ রকম অবস্থাতে মানুষ বা মনুষ্যেতর জীবেরা অনেক কিছুই শিখে থাকে। মানুষের মতো উচ্চস্তরের মস্তিষ্ক না থাকা সত্ত্বেও একটা বুনো হাতী পোষ মানে কি করে? ওরা তো ধারণার একত্রীকরণ, বিচ্ছিন্ন চিন্তা বা রূপকল্পের সাহায্য নিতে পারে না। আর মানুষের কথাই যদি ধরা যায়, অনেক সময়ই দেখা যাবে যে, এ রকম অনেক অভ্যাস বা দোষ—কিম্বা গুণ আমাদের চরিত্রের মধ্যে ঢুকে গেছে, যেগুলি শেখবার জন্যে আমরা কেউ নিশ্চয়ই কখনো সজ্ঞানভাবে চেষ্টা করি নাই। সাধারণ মানুষের কাছে এ সমস্ত প্রশ্ন কখনই খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় নি—হবার কথাও নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েক যুগ ধরে ঠিক এই জিনিসটা সঠিকভাবে বুঝবার জন্যেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। নানা বিচিত্র গবেষণাও করে গেছেন।

শত শত বিজ্ঞানী যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন ঠিক সেই সাধনাতেই সাফল্যলাভ করেছিলেন প্যাভলফ—আইভান পেট্রোভিচ প্যাভলফ। জারশাসিত রাশিয়ার একজন দরিদ্র পাদ্রীর ছেলে প্যাভ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর। সেন্ট পিটারসবার্গ (আজকের লেনিনগ্রাড) বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-শাস্ত্রের কৃতিছাত্র প্যাভলফ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে একজন চিকিৎসক হিসেবেই জীবন সুরু করেছিলেন। কিন্তু নানা বিষয় নিয়ে গবেষণার জন্যে ছাত্র-অবস্থা থেকেই প্যাভলফ আগ্রহী ছিলেন। ডাক্তারী করে আর ল্যাবরেটরীতে এসে গবেষণা চালানো শরীর বা মনের দিক থেকে অসম্ভব না হলেও ফুরসতের অভাবে অসম্ভব হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা-তদ্বির করে প্যাভলফ একটা অধ্যাপনার চাকুরী জোগাড় করলেন। তারপর সুরু হলো গবেষণা।

মনোবিজ্ঞানের নানা দিকে প্যাভলফের গবেষণায় যে সাফল্য দেখা গিয়েছিলো, তার পেছনে রয়েছে প্রধানত দু'জন জার্মান গবেষক-অধ্যাপকের সস্নেহ শিক্ষা। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্যাভলফ জার্মানীতে এসে দু'জন জার্মান গবেষক-অধ্যাপক কার্ল লুডভিগ এবং আর পি এইচ হাইডেনহাইন-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ওঁরা দু'জনেও জীবজগতে সজ্ঞানভাবে শিক্ষার কাজটা কিভাবে সম্ভব হয় তাই নিয়েই গবেষণা করছিলেন। প্যাভলফেরও আগ্রহ ছিল ঐ বিষয়েই একেবারে ছাত্রাবস্থা থেকেই।

জার্মানী থেকে ফিরে আসবার পরে একটানা প্রায় বিশ বছর নিজের ল্যাবরেটরীতে নানা পরীক্ষা-কার্যের পরে প্যাভলফ যা আবিষ্কার করলেন—মনোবিজ্ঞানে তা 'কণ্ডিসণ্ড রিফ্লেক্স' নামে খ্যাত।

প্যাভলফের আবিষ্কার মোটামুটিভাবে এইরকম: কোনও কুকুরকে যদি তার খাবার দেখানো বা শোঁকানো যায় তা হলেই তার স্যালিভারি গ্ল্যাণ্ড থেকে রস নির্গত হতে থাকে এবং পাকস্থলীর ভেতরেও গ্যাসট্রিক রস নির্গত হতে থাকে গ্ল্যাণ্ডগুলি থেকে। এরপর যখন কুকুরটিকে খাবারটা খেতে দেওয়া হয়, তখন ঐ রসের আধিক্য বেশ বেড়ে যায়—ভুক্তবস্তু পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছবার আগেই এটা হতে আরম্ভ করে। প্যাভলফের এই আবিষ্কার কিন্তু প্রকারান্তরে সেই সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের যাবতীয় বিশ্বাসেরই সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ সে সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে, খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছবার পরে কোনও যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই গ্যাসট্রিক রস নির্গত হয়। প্যাভলফের আবিষ্কার প্রচলিত ধারণাকে আমূল পাল্টে দিলো।

চিকিৎসাশাস্ত্রে প্যাভলফ প্রধানত শারীরবিদ্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই মানসিক যে কোনো ক্রিয়াকলাপের জন্যেই প্রথমত শারীরিক কারণ খুঁজতেন। এ ক্ষেত্রে

দেখা গেলো, সে অভ্যাস প্যাভলফকে সত্যের সন্ধানই দিলো। প্যাভলফ আবিষ্কার করলেন যে ভেগাস (Vagus) স্নায়ু স্যালিভারি গ্ল্যাণ্ডস্ এবং গ্যাসট্রিক গ্ল্যাণ্ডস্ থেকে রস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। প্যাভলফ পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, ঐ স্নায়ু বিচ্ছিন্ন করে ফেলবার পরে ঐ সমস্ত গ্ল্যাণ্ড থেকে রস নির্গত হওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

প্যাভলফের আবিষ্কারের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার স্থান এ নয়। কিন্তু যে 'কণ্ডিশণ্ড রিফ্লেক্স'-এর সঙ্গে প্যাভলফের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। 'বেল এক্সপেরিমেণ্ট' বা 'ঘণ্টার সাহায্যে পরীক্ষাকার্য' নামে সুপ্রসিদ্ধ এই পরীক্ষা-কার্যের ফলে প্যাভলফ এই সত্যই প্রমাণিত করেছিলেন যে, জীবের যে প্রকৃতি বা স্বভাব তা নানা অভ্যাসের ফলে সীমিত এবং তার কারণগুলি সম্পূর্ণ দৈহিক—দেহের বাইরের কোনো কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বেল এক্সপেরিমেণ্ট হয় এইভাবে: প্রথম একটি কুকুরকে কয়েকদিন ক্রমাগত খাবার দেবার সময় একটা বিশেষ ধরণের ঘণ্টার ধ্বনি করা হতে লাগলো। বলা বাহুল্য, খাবারের কাছে এলেই কুকুরের স্যালিভারি গ্ল্যাণ্ড থেকে রস নির্গত হতে আরম্ভ করলো। এর ফলে দেখা গেলো যে কুকুরটির প্রকৃতি ঐ বিশেষ ধরণের ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যে, তারপর থেকে শুধু ঘণ্টার ধ্বনি শুনলেই, খাবার না পেলেও তার স্যালিভারি গ্ল্যাণ্ড থেকে রস নির্গত হতে আরম্ভ করেছে।

প্যাভলফ-প্রদর্শিত পথে ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজি আজকের দিনে আরো অনেক এগিয়ে গেছে এবং মানুষের মানসিকতাকে সম্পূর্ণভাবে দৈহিক কারণগুলির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা অচিরেই সম্ভব হবে বলে অনেকের ধারণা।

—তীরন্দাজ

কৃত্রিম বৃষ্টি

মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতির কাছ থেকে যখন যেটুকু পারছে নিয়ে নিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রকৃতি যেটুকু স্বেচ্ছায় দেয় নি, সেটুকুও মানুষ জবরদস্তি করে আদায় করে নিচ্ছে। এটা মানুষের বিজ্ঞানের সাফল্যের কথা; মানুষের অধ্যবসায়ের সাফল্যের কথা।

প্রসঙ্গত একটা ব্যাপার আলোচনা করবো আমরা। সে হলো কৃত্রিম বৃষ্টির কথা। প্রকৃতি আমাদের বৃষ্টি দেয় এবং পরিমাণেও নেহাৎ কম দেয় না। কিন্তু প্রকৃতি দেয় তার খুশিমতো, সব সময়ে ঠিক আমাদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে দেয় না। ফলে অনেক সময় আমরা বৃষ্টির অভাব বোধ করি। এই অভাব মোচন করবার জন্যে বেশ কিছুকাল ধরেই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে আসছেন যে, প্রকৃতি তার খেয়াল-খুশিমতো যেটুকু বৃষ্টি নামাচ্ছে নামাক; কিন্তু আমাদের প্রয়োজনমতোও যাতে আমরা প্রকৃতিকে বাধ্য করতে পারি বৃষ্টি নামাতে। এ সম্বন্ধে নানা ধারণা প্রচলিত আছে। অর্থাৎ এমন রকমারি প্রচারকার্য চালানো হয়েছে বিভিন্নমহল থেকে যে, অনেকের ধারণা বিজ্ঞানীরা ইচ্ছে করলেই যে-কোনও সময় অমনি ঝপ করে বৃষ্টি নামাতে পারেন—যেমনি অনেকটা সুইচ টিপে বিজলীর আলো জ্বালানো হয় আর কি। আবার অনেকে ব্যাপারটাকে একেবারেই বুজরুকি বলে মনে করেন। অর্থাৎ কি না বৈজ্ঞানিক ধাপ্পাবাজী।

কিন্তু এ দু'টো ধারণার কোনটাই পুরো সত্য নয়। ইচ্ছে করলেই বিজ্ঞানীরা বৃষ্টি নামাতে পারেন তা যেমন সত্য নয়, তেমনি বিজ্ঞানীরা জনসাধারণকে ধাপ্পা দিচ্ছেন তা-ও সত্য নয়। কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামাবার জন্যে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা প্রকৃতই প্রচুর গবেষণা চালিয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত সে গবেষণা যথেষ্ট সাফল্যলাভ করে নি। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশ বা অল্পবিস্তর আমাদের দেশের মতোই বিজ্ঞানচর্চা যে সমস্ত দেশে হয়ে থাকে সে সব দেশের কথা বাদ দিয়ে আসুন বিজ্ঞানের দিক থেকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অগ্রণী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করা যাক।

কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামানোর সম্বন্ধে ইউ এস ওয়েদার ব্যুরো মার্কিন বিমানবহরের সহযোগিতায় সব চাইতে ব্যাপক পরীক্ষাকার্য চালিয়েছে। এই পরীক্ষা-কার্যের জন্যে ১৬০ বর্গ মাইল জায়গার ঊর্দ্ধাকাশ-এ চষা করা হয়েছে। নয়মাসব্যাপী এই পরীক্ষা-কার্যের জন্যে পাঁচটি বিমান এবং পঞ্চান্নটি আবহাওয়া অফিসে প্রায় দু'শ জন আবহাওয়াবিদ বিজ্ঞানী কাজ করেছেন। লেড অক্সাইড, সিলভার আইওডাইড এবং ড্রাই-আইস (বিশুদ্ধ বরফকণিকা) প্রয়োগ করা হয়েছে। নয়মাসে মোট উনআশিবার বৃষ্টি নামাবার চেষ্টা করা হয় তার ফলে দেখা গেছে:

১। পনেরোটি ক্ষেত্রে সামান্য কিছু বৃষ্টি নামানো গেছে যখন ত্রিশ মাইলের মধ্যে কোথাও না কোথাও স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টিপাত ঘটছিল এবং ২। এককোঁটা বৃষ্টিও নামানো সম্ভব হয় নি যখন ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইলের মধ্যে প্রাকৃতিক বৃষ্টি না হচ্ছিল।

এই অভিজ্ঞতার ফলেই মার্কিন দেশের বিজ্ঞানীরা আজকের দিনে কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা থেকে কার্যত বিরতই হয়েছেন। তাঁরা মনে করেন যে, যে পর্যন্ত না এমন কোনও গ্যাসীয় রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করা না যাচ্ছে যার ফলে বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় (অর্থাৎ বায়ুকে অন্তত কিছু সময় স্তব্ধ করে রাখা যায়) সে পর্যন্ত ঊর্দ্ধাকাশ লক্ষ্য করে যতোই লেড অক্সাইড, সিলভার আইয়োডাইড বা ড্রাই-আইস বিচ্ছুরিত করা হোক না কেন—তার ফলে যে নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় বৃষ্টি নামানো যাবেই এমন কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

—সত্যবিজয়

কেশতত্ত্ব

চুল কাটলেই বাড়ে এবং যতো বেশি ঘন ঘন কাটা যায় ততো বেশি বাড়ে—এই রকম একটা ধারণা আমাদের সকলের মধ্যেই প্রচলিত রয়েছে এবং আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা এতই সাধারণ এবং সহজ-সরল মনে হয় যে, আমরা যেন 'কমনসেন্স' দিয়েই ব্যাপারটা বুঝতে পারি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার পরে আজকের দিনে স্পষ্টই বলছেন যে, সাধারণের মধ্যে প্রচলিত এ ধারণাটা সত্য নয়। প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক জায়গার চুলের বাড়বার একটা নির্দিষ্ট হার আছে এবং কাটা হোক আর না হোক, তাতে ঐ চুলের বৃদ্ধির হারে কোনও তারতম্য ঘটে না।

মানুষের শরীরে চুল আগার দিক থেকে বাড়ে না (সচরাচর কিন্তু আমরা সেই রকমই মনে করে থাকি)—বাড়ে গোড়ার দিক থেকে। হাত-পায়ের নখের মতোই আমাদের চুল নিষ্প্রাণ। প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের ওপর অবশ্যই চুলের বৃদ্ধি নির্ভর করে। পনেরো বছরের একটি কিশোরের চুল যে হারে বাড়তে থাকে, পঁয়ষট্টি বছরের একজন বৃদ্ধের—বা অন্যভাবে বলা যায় যে ঐ কিশোরটিই যখন বুড়ো হবে তখন তার চুলের বৃদ্ধির হার অনেক কমে যাবে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, জীবনীশক্তি বলতে আমরা যা বুঝি চুলের বৃদ্ধি বেশ কিছুটা তার ওপর নির্ভর করছে।

একটি চুলের আয়ু সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় বৎসর। ছয় বৎসর হয়ে যাবার পরে গাছের শুকনো পাতার মতোই একটি চুল তার গোড়া থেকে সমূলে আপনিই ঝরে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয় যে, একটি 'বুড়ো' চুল ঝরে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের ভেতর থেকে ঠিক সেই মূলেই আবার নতুন চুলের আবির্ভাব ঘটে—এ যেন অনেকটা অঙ্কুরোদগমের মতো আর কি।

একজন অধ্যাপক প্রথমে কয়েক মাস ধরে মাইক্রোমিটারের সাহায্যে তাঁর বক্ষোদেশের চুলের বৃদ্ধির হার জেনে নিলেন। তারপর পুরো এক বছর ধরে বুকের একটা পাশ কামিয়ে ফেলতে লাগলেন এবং অন্য পাশের চুলগুলিতে বাজারে-চলতি নানারকম তেল মাখাতে লাগলেন। সাত দিন পর পর তিনি কামাতে লাগলেন বুকের একটা দিক। তারপর এক বছর পরে মাইক্রোমিটারের সাহায্যে বুকের কামানো দিক এবং না-কামানো দিকের চুলের বৃদ্ধি হিসেব করে দেখলেন যে একেবারে সমান। যে দিকটা এক বছরে বাহান্ন বার কামানো হয়েছে সে দিকের চুলের বৃদ্ধির হার অন্য দিকের তুলনায় এক চুলও বেশি নয়।

ঘন ঘন চুল কাটলে বা দাড়ি কামালে স্বাভাবিকভাবেই চুলগুলির ডগার সরু এবং মোলায়েম ভাবটা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই জন্যে হাত বুলোলে 'খসখসে' ভাবটা একটু বাড়ে এবং তারই ফলে আমাদের মনে হয় যে চুল বা দাড়ি বুঝি এবার খুব ঘন হয়ে উঠেছে—কিন্তু বাস্তবিক তা হয় না। চুলের স্বাস্থ্য যাঁরা প্রকৃতই ফেরাতে আগ্রহশীল, ঘন ঘন চুল কাটার চাইতেও তাঁদের যে কাজটি বেশি করণীয় সে হলো ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করে খাদ্য-নির্বাচন করা। নানা জিনিসের অভাবে অনেক সময় চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি তথা সৌন্দর্য ব্যাহত হয়।

বেশি চুল কাটলে শরীরের অনিষ্ট হয় বলে সাধারণত একটা ধারণা প্রচলিত আছে—সে ধারণাটাও কিন্তু সত্যি নয়। চুল, নখ প্রভৃতি আমাদের শরীরের উপচে-পড়া অংশ বললেই হয়—কাজেই তা নষ্ট করে ফেললে শরীরের কোনো ক্ষতির প্রশ্নই উঠতে পারে না।

—সুরসিক

সারমেয় প্রীতি

যুগ যুগ ধরে সভ্য-অসভ্য নানা দেশের মানুষ কুকুরকে যে কতো রকমে সোয়াস্তি দেবার চেষ্টা করে আসছে, তা ভাবলে অবাক লাগে। কুকুরের খাবার, কুকুরের পোযাক, কুকুরের বিছানা, কুকুরের প্রসাধন চাই কি কুকুরের মনোরঞ্জনের জন্যে অনেকে যে পরিমাণ অর্থ এবং সময় ব্যয় করে থাকেন তাও নেহাৎ কম নয়। এর মধ্যে বেশিরভাগই হয় তো ব্যক্তিবিশেষের বিলাসিতার অঙ্গ, কারো ক্ষেত্রে কুকুরের প্রতি অতিমাত্রায় যত্ন-আদর তার সামাজিক মর্যাদা বাড়ায় বলে গণ্য করা হয়; কিন্তু আবার অনেকের ক্ষেত্রে এটা একটা প্রয়োজন হিসেবেই দেখা দেয়—তার নিজের এবং তার পরিবারের জীবনরক্ষার প্রয়োজন। সম্প্রতি এক পর্যটকের বিবরণী থেকে এই শেষোক্ত প্রয়োজনে কুকুর পোষার কাহিনী জানা গেছে, যা প্রকৃতই চমকপ্রদ।

ব্যাপারটা সত্যি এবং ঘটে থাকে বৃটিশ গায়নার দক্ষিণাঞ্চলে অরণ্য-অধ্যুষিত জেলাগুলিতে। এ অঞ্চলটি জনবসতিবিরল। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে প্রতি পাঁচ বর্গ মাইলে হয় তো মাত্র একজন মানুষের বাস। এখানকার অধিবাসীরা 'ইণ্ডিয়ানদের' একটি গোষ্ঠী। এদের বলে 'ওয়াই ওয়াই ইণ্ডিয়ান'। এরা পৃথিবীর আদিমতম অধিবাসীদের অন্যতম। এরা একেবারে অসভ্য না হলেও আমাদের মতো ধবধরে সভ্য নয় (অর্থাৎ খবরের কাগজ পড়ে না, পার্টি পলিটিক্স করে না, খাবার এবং ওষুধে ভেজাল দেয় না, ঘুষ নেয় না ইত্যাদি ইত্যাদি)।

এই প্রায়-অসভ্য 'ওয়াই ওয়াই ইণ্ডিয়ানরা' তাদের কুকুরের যা যত্ন নেয় তা শুনলে নিশ্চয়ই অবাক হতে হয়। এ অঞ্চলে গরম খুবই। গরমে কুকুরদের কোনও কষ্ট যাতে না হয় সেইজন্যে এরা এদের কুকুরদের দিনে অন্তত তিনবার স্নান করায়। স্নান করাতে

যাবার সময় কেন অযথা কষ্ট করবে বেচারীরা। আহা, পায়ে যদি কাঁটা-টাঁটা ফুটে যায়। সুতরাং এরা এদের কুকুরদের কোলে, কাঁধে বা পিঠে করে কাছাকাছি কোনও নদী বা জলাশয়ে নিয়ে যায়, আবার স্নান করিয়ে কোলে-পিঠে করেই বাড়ি ফিরিয়ে আনে। এরা নিজেরা বেশিরভাগই বাস করে পাতার ঘরে, আর যার অবস্থা খুবই ভালো তাদের দেখা যায় সরু সরু গাছের ডাল পাশাপাশি একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়ে পুঁতে বেড়া বানায়—কিন্তু ছাঁউনি এদেরও পাতার। যাস মাটি আর এদের ঘরের মেঝের উচ্চতায় কোনও পার্থক্য নেই। কুকুরদের এভাবে রাখা চলে না। কারণ সাপ আছে, নানা জংলী পোকামাকড় আছে, তা ছাড়া নীচু জায়গাতে হাওয়া খেলে না, কাজেই গরমটাও বেশি। তাই দেখা যায় কুকুরদের বাসের জন্যে এরা বেশ উঁচু মাচান তৈরি করে। কেউ কেউ আবার দোলনা বানিয়েও দেয়।

বাসের জন্যে যে কুকুর তার প্রভুর কাছ থেকে এতটা সুবিধে পায়, তার খাবার যে কি রকম হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতপক্ষে এই কুকুররা তাদের প্রভুদের চাইতে অনেক বেশি ভালো খাবারই পেয়ে থাকে। যদি কখনো খাদ্যবস্তুতে টানাটানি পড়ে তা হলে এদের প্রভুরা বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে নিজেকে, এমন কি নিজের সন্তানকে বঞ্চিত করেও তার কুকুরগুলিকে খাবার জোগায়। উৎসব এবং পালা-পার্বণের সময় প্রভুরা যেমন নানা রঙে নিজেদের দেহ রঞ্জিত করে, কুকুরদেরও ঠিক তেমনই করা হয়। কোনও কুকুরী যদি প্রসবের পরে মারা যায় তা' হলে নবজাতকেরা প্রভু-পত্নীর স্তন্যের সুধাপানের সুযোগ লাভ করে থাকে। যে কুকুরেরা এতটা পায় তাদের প্রভুর কাছ থেকে, প্রতিদানে তারা কি দেয় প্রভুকে এবং তার পরিবারবর্গকে? এককথায় বলতে গেলে এই কুকুরেরাই এ অঞ্চলের অধিবাসীদের একমাত্র রক্ষাকর্তা। অরণ্যসঙ্কুল এই অঞ্চলে জনবসতি এতই কম যে সেখানের অধিবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণের উপযোগী সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি করা কোনো সাম্রাজ্যবাদী শাসকের পক্ষেই লাভজনক (!) হয় না। কাজেই বৃটিশ সরকারও তেমনি কিছু করে নি এদের সম্পর্কে। এখানকার অধিবাসীরা তাই নির্ভর করে এদের কুকুরগুলির ওপর।

কুকুরের ঘ্রাণশক্তির কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এই ওয়াই ওয়াই ইণ্ডিয়ানদের কুকুরদের ঘ্রাণশক্তির সঙ্গে বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলের কুকুরদেরই তুলনা করা চলে না। অন্তত মাইলখানেকের মধ্যে নতুন কোনও জন্তু বা মানুষের পদক্ষেপ হলেই এরা ডাকতে আরম্ভ করে এদের প্রভু এবং তার পরিবারবর্গকে সতর্ক করে দেয়। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষের গন্ধে এরা যেরকমভাবে ডাকতে আরম্ভ করে জন্তু-জানোয়ারদের গন্ধে ঠিক সে ভাবে ডাকে না। তার ফলে এদের প্রভুরা এবং তাদের পরিবারবর্গ সহজেই বুঝতে পারে বিপদটা কি ধরণের। বলাই বাহুল্য, এই আগন্তুকেরা, তা মানুষ হোক বা জন্তু-জানোয়ারই হোক, যতই প্রভুর আস্তানার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, এই কুকুরদের ডাকাডাকির তীব্রতাও ঠিক সেই হারে বেড়ে যেতে থাকে এবং তারপর সেই নবাগতকে গিয়ে আক্রমণ করা, সে তো প্রভুর ইঙ্গিত পেলেই সুরু হয়ে যায়।

এই কুকুরদের সম্বন্ধে যাঁরা জানেন তাঁরা সকলেই বলে থাকেন যে, এই কুকুরগুলি তাদের প্রভু বা প্রভুর পরিবারবর্গের কাছে মেষশাবকের মতো হলেও প্রভুর শত্রুর কাছে এরা সাক্ষাৎ যমদূত।

—শিকারী

নেই তাই খাচ্ছ

মহাকবি কালিদাস বলেছিলেন একদা,—

'নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে?'

হায় রহস্যচ্ছলে এ বাক্য উচ্চারণ করার সময় ভ্রমেও হয়ত ভাবেন নি তিনি যে ভবিষ্যৎ জাতির জন্য কি মহান আপ্তবাক্যই না রেখে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি শহর কলকাতার তাবৎ জনসাধারণ উপরোক্ত বাক্যটির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করছেন প্রতি মুহূর্তে প্রতি পলে। বিশ্বাস না হয় চলে আসুন বাজারে দেখবেন সর্বত্র, সর্বগ্রাসী এক নেই নেই রব, নেই—চালের দোকানে চাল, তেলের দোকানে তেল, মাছের দোকানে মাছ। আপনার প্রশ্নের উত্তরে দোকানী এক উচ্চাঙ্গের হাসি হাসবে, যেন ঐ সব বস্তু আছে কি না জানতে চাওয়াটাই আপনার মূঢ়তা বা ধৃষ্টতা, তারপর কণ্ঠস্বর ঈষৎ নামিয়ে বলবে আপনার হতাশা দর্শনে—'আছে স্যার মাল, একেবারেই কি নেই তবে এক নম্বর মাল নিতে গেলে দামটা একটু বেশি লাগবে, দিতে পারবেন কি?' বলা বাহুল্য, শোনামাত্র উদ্বাহু হবেন আপনি, জানতে চাইবেন কত লাগবে?

এবার বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ পাবে দোকানীর মুখে, মরমিয়া সুরে যে কথা নিবেদন করবে, তা শুনে নুয়ে-পড়া লজ্জাবতী লতার মত আস্তে আস্তে স্থানত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করবেন আপনি, কারণ ডি-এ, টি-এ নিয়ে আপনার মাসিক আয় মাত্র আড়াইশো টাকা, এই টাকায় চার-পাঁচজন লোকের সমস্ত সমস্যা সমাধান করে সংসার চালাতে হয়, কাজেই সাড়ে চারটাকা কিলোর তেল বা চল্লিশ টাকা কিলোর চাল, আপনার পক্ষে চিত্রতারকা বৈজয়ন্তীমালার সান্নিধ্য পাওয়ার মতই দুর্লভ।

শূন্য মনে, শূন্য হাতে, বাড়ির দিকে চলবেন আপনি, প্রতীক্ষমানা গৃহিণী যেখানে তেলাভাবে প্রায় ফুটন্ত লাভাস্রোতের মতই টগবগ করছেন। এবার আসুন অন্যত্র অর্থাৎ কাঁচা বাজারে, সদাশয় সরকার মাছের দাম বেঁধে দিয়েছেন আর পাঁচজনের মত এ-খবরটা আপনার কানে এসেছে সুতরাং ভোরবেলা প্রাত্যহিক চায়ের পেয়ালাটা নিঃশেষ করে বেশ প্রসন্নমনেই বাজারের দিকে ধাবিত হলেন, গৃহিণী মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছেন মাছের মাথা আনতে যন ভুল না হয় মুড়িঘণ্ট হয় নি কতকাল; ছোট খোকা আবার চিংড়ি মাছ বলতে পাগল, ছেলেটার আজ জন্মতিথি—কাজেই যদি পাওয়া যায় একটু চিংড়িও যেন নেওয়া হয়, তা ছাড়া ঘর করতে কাটাপোনা তো আছেই, আহা, কতদিন

মাছ পাতে পড়ে না, মুখপোড়া সরকারের এতদিনে তবু হুঁস হল।

যাক্, ফর্দ পকেটে বীরদর্পে তো এলেন মাছের বাজারে। গুড়ের হাঁড়ি ঘিরে মাছির জটলার মতই এক একটা জায়গায় কালো কালো মাথার জটলা দেখেই আন্দাজ করে নিলেন, ওইসব জায়গাতেই আছে প্রার্থিত ধন। অবশ্য মাছওয়ালা বা মাছ চাক্ষুষ করতে একটু বেগ পেতে হল। দেড়শো জনের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে শরীরটা একটু অগ্রসর হলে পর দর্শন মিললো। গলাটা যথাসম্ভব চড়িয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রার্থনা করলেন। প্রায় মিনিট পনেরো আর্তনাদ করার পর মেছো বা মেছুনীর দৃষ্টি পড়ল আপনার দিকে।

নির্বিকার নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আপনার দিকে বারেকের তরে চেয়ে দেখল, অনুকম্পাভরা কণ্ঠে আদেশ প্রচারিত হল,—'ঝুটমুট চিল্লাচ্ছেন কেন বাবুমশায়? লাইনে দাঁড়ান।'

—'লাইন?' সভয়ে হৃদয়ঙ্গম করলেন যে ওই দেড়শো জন ভাগ্যবানের হয়ে গেলে তবেই মৎস্য-ভাগ্যবিধাতা আপনাকে কৃপা করবেন—হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন একবার, গৃহিণীর রক্তচক্ষু স্মরণ করলেন একবার, তারপর চক্রের মত ব্যূহভেদ করে ঈপ্সিত সাধনার ধনের কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করলেন একবার, কিন্তু হল না কিছুই। বাঙালী যে এতটা ডিসিপ্লিনের ভক্ত তাও তো জানা ছিল না। শতকণ্ঠে ধিক্কৃত হলেন বে-আইনী প্রচেষ্টার জন্য নিপুণ গোলরক্ষকের মতই সামনের সারি আপনাকে আবার স্বস্থানে অর্থাৎ পিছনে পাঠিয়ে দিল। দুর্গা শ্রীহরি থেকে যতজনের নাম স্মরণ হল, অভিমানভরে তাঁদেরই স্মরণ করলেন মনে মনে। নাকের বদলে নরুণের মত মাছের বদলে কয়েকটি ডিম সংগ্রহ করে, তরকারীর বাজার অভিমুখে পা চালালেন। সেখানে অবশ্য ক্ষোভের কোন কারণ ঘটল না, সবই পাওয়া যাচ্ছে এবং ভদ্রলোকের কথার মত একদামে। দেখা গেল সেখানে ব্রাত্য বলে কিছু নেই, উচ্ছে, পটল, আলু, ঝিঙে সব একদর; সাম্যবাদের এমন জ্বলন্ত নিদর্শনে বিমুগ্ধ হৃদয়ে যথাশক্তি সংগ্রহ করলেন কিছু, তারপর ফিরে চললেন হোম—সুইটহোমে।

পথ চলতে চলতে কিছু দার্শনিক-চিন্তার উদয় হল আপনার মনে। বাজারে যা মেলে না, তা মেলে কালোবাজারে অর্থাৎ বর্ধিত দামে। তা হলে কালোবাজারী বা নেপথ্য ব্যবসায়ী বেঁচে আছে বা করে খাচ্ছে শুধু একটা নেতিবাচক অস্তিত্বের মাধ্যমে। আপন মনেই বলে উঠলেন এবার—

'নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে?
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।'

—শ্রীমতী

পশুপ্রীতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে

গত কয়েক দশকে চিকিৎসার একটি বিশেষ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে বহু কাজ হয়েছে। চিকিৎসার এই শাখার নাম মানুষ ও পশুর রোগ। মানুষ ও তার গৃহপালিত পশু উভয়কে যে-সব রোগ আক্রমণ করে সে সম্বন্ধে পশ্চিম জার্মানীর একদল চিকিৎসক তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থার হিসাবে এতাবৎ এই রোগসমূহের সংখ্যা আশি। এর মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন প্লেগ। এক থেকে অন্যজনে এই রোগ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছড়ায়। পশু থেকে এই রোগের উৎপত্তি। প্লেগের জীবাণু মশার মারফৎ ইঁদুর থেকে মানুষে সংক্রমিত হয়। মহামারী আকারে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার আগে দলে দলে ইঁদুর মরে। আজও মাঝে মাঝে এশিয়ার কোন কোন দেশে প্লেগ দেখা দেয়। কিন্তু ১৯২০—২১ সালে ফ্রান্সে মার্শাই শহরে প্লেগ মহামারীর পর য়ুরোপে আর কখনও প্লেগের আবির্ভাব হয় নি।

জলাতঙ্ক আর একটি রোগ যেটি মানুষ ও পশু উভয়কেই আক্রমণ করে। এই রোগে আক্রান্ত মানুষ বা পশুরা শরীরে খিল ধরে ও ধীরে ধীরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে কঠিন যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পাস্তুর টিকা গ্রহণ করলে একশ জনের মধ্যে নিরানব্বই জন বাঁচতে পারে কিন্তু দেরি হলে বাঁচানো মুশকিল। এই রোগ যে কেবল কুকুর, শিয়াল এবং খটাস থেকেই ছড়ায় তা নয়, বাদুড় থেকেও হতে পারে। গত বছর পশ্চিম জার্মানীতে এই রোগে প্রায় তিনশত জানোয়ার মারা পড়েছে। সেকালের অপর একটি বদরোগের নাম গ্রন্থিরোগ (গ্লাণ্ডার্স)। রোগটি ছোঁয়াচে এবং জোড়া-ক্ষুর পশুদের থেকে মানুষ ও বিড়ালের মধ্যে ছড়ায়। এর বীজাণু মানুষের চোখ ও শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের যোগাযোগকারী ঝিল্লিতে আক্রমণ করে। এই রোগ যে ভীষণ ছোঁয়াচে তার প্রমাণ এক ল্যাবরেটরীতে এই রোগবীজাণুভরা একটি শিশি ভেঙে যাওয়ায় ল্যাবরেটরীর সব লোক মারা যায়। একজন ছাত্র এই রোগে অসুস্থ এক ঘোড়ার চিকিৎসা করতে গিয়ে মারা পড়ে। সেই ছাত্রের শরীর-পরীক্ষারত চিকিৎসকও এই রোগে আক্রান্ত হয় ও মারা যায়। আজকাল পশ্চিম জার্মানীর সব সীমান্তে জোড়া-ক্ষুর পশুদের পরীক্ষা করা হয় এবং রোগের সামান্য আভাস ধরা পড়লেই সেই পশুকে মেরে ফেলা হয়।

আধুনিক এক গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত গরুর দুধ থেকে মানুষের মধ্যে যক্ষ্মা ছড়ায় না ছড়ায় সেই গরুর নিঃশ্বাস থেকে। এই থেকে মেনিনজাইটিস হয়। মানুষের অপেক্ষা কুকুর ও বিড়াল এইভাবে যক্ষ্মাক্রান্ত হয়। খুব ছোট ছেলেমেয়েরা অবশ্য যক্ষ্মাক্রান্ত গরুর দুধ খেলে পেটের গোলমালে ভোগে।

এ ছাড়াও ছাগল, গরু-মহিষ এবং শূকর থেকে বহুরকমের রোগ হয় যেগুলির প্রাদুর্ভাব আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং আশ্চর্যের বিষয় সেইসব রোগ কখনও ৪৬ ডিগ্রি অক্ষরেখার সীমা লঙ্ঘায় না।

—ডি এ ডি।

বিদেশে ভারতীয় শিক্ষার্থী

অতীত ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় জ্ঞানভিক্ষু বিদ্বজ্জন মহান শিক্ষকদের নিকটে শিক্ষালাভের জন্য দেশে-বিদেশে গিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়, ভারত প্রভৃতি দেশে যে প্রজ্ঞাতীর্থসমূহ গড়ে উঠেছিল, তাঁরা তাতে সমবেত হয়েছেন। তখন ভারতের তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, নালন্দা, বিক্রমশীলা, বল্লভী, কাঞ্চী, কাশী ছিল বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষার পীঠভূমি। তক্ষশীলায় ভেষজবিজ্ঞান, উজ্জয়িনীতে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং নালন্দায় বিক্রমশীলা, বল্লভী, কাঞ্চী, কাশী ও মথুরায় ন্যায়ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র চর্চার জন্য মধ্য এশিয়া, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন, ইন্দোচায়না, ইন্দোনেশিয়া এমন কি সুদূর কোরিয়া থেকেও বিদেশী বিদ্যার্থীরা ভারতে আসতেন।

সে যুগ আর নেই। আজ যুগের প্রয়োজন অনুসারে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শনের তুলনায় ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী বিষয়ের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। নতুন ভারতের পুনর্গঠনের যে আয়োজন চলছে, তাতে নতুন নতুন ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র ভারতে গড়ে উঠছে এবং দেশ-বিদেশের সঙ্গে শিক্ষা বিনিময় চলছে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এজন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য বহু ভারতীয় বিদ্যার্থীও ঐ সব দেশে যাচ্ছেন এবং ঐ সব দেশ থেকে সাহিত্যাদি অনুশীলনের উদ্দেশ্যে বিদেশী বিদ্যার্থীরাও এদেশে আসছেন।

১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত বিদেশে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল—চৌদ্দ হাজার দু'শো তেরো জন। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন আমেরিকায় এবং তিন হাজারের কিছু বেশি যুক্তরাজ্যে।

বিদেশী বিদ্যার্থীদের উচ্চতর শিক্ষালাভে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং আমেরিকার প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহ বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকেন ও এজন্যে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয়িত হয়ে থাকে। এই কারণেই প্রতি বছর সেখানে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৯৬২-৬৩'শিক্ষা বছরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ সময়ে ১৮০৫টি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে ১৫২টি বিদেশী রাষ্ট্রের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৪৭০০ জন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র কানাডার বিদ্যার্থীদের দলটিই সব থেকে বড়। ঐ দেশের ৭০০৪ জন ছাত্র-ছাত্রী ঐ সময়ে যা আমেরিকায় পড়াশুনা করত। কানাডার পরে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। ছ' হাজার এক শত বাহান্ন জন ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী তখন আমেরিকায় ছিলেন। ১৯৫০ সালের তুলনায় এঁদের সংখ্যা দ্বিগুণ।

এ সব ভারতীয় বিদ্যার্থীদের অধিকাংশই ছিলেন ইঞ্জিনীয়ারিং ও ভেষজবিজ্ঞানের ছাত্র। মাত্র কয়েক বছর আগে শিল্পকলা ও সাহিত্যাদি (হিউম্যানেটিক্স) অনুশীলনের জন্য ভারতীয় বিদ্যার্থীরা আমেরিকায় যেতেন। কিন্তু নবভারত গঠনের জন্য প্রয়োজন অধিকতর সংখ্যায় ইঞ্জিনীয়ার ও টেকনিশিয়ান। তাই শিল্পাদি অনুশীলনের উৎসাহ দেওয়া হয় নি। ফলে ঐ সব বিষয়ে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সেখানে কমে গেছে।

তবে আট হাজার মাইল দূরের ঐ দেশটিতে কেন এত বেশি সংখ্যায় ভারতীয় বিদ্যার্থীরা যায়? বিদ্যা অর্জনের সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থা তো অন্যান্য দেশেও রয়েছে। এর উত্তরে বলা যায় শিক্ষার সব ক্ষেত্রে অতি উচ্চমান সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ সাধারণত সর্বাধুনিক শিক্ষাদানপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন এবং শ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাবান অধ্যাপকগণকে নিয়োগ করে থাকেন।

দ্বিতীয়ত যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক সংস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন শিল্প-সংস্থা যে অসংখ্য বৃত্তি, ভ্রমণ-বৃত্তি দিয়ে থাকেন, সে সকল বৃত্তি ছাড়া বিদ্যার্থীরা আমেরিকায় এসে অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্থোপার্জনের অধিকতর সুযোগ-সুবিধাও পেয়ে থাকেন, তৃতীয়ত আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশও তাদের মনোমতই হয়ে থাকে। তাদের পক্ষে খাদ্য-খাবার কোনরকম সমস্যা হয়ে দেখা দেয় না। অধিকাংশ রেস্তোরাঁ ও কাফেটেরিয়া নিরামিষ ও আমিষ দু' রকমেরই নানাপ্রকার খাদ্য পরিবেশন করে থাকে। ফলে পানভোজন সম্পর্কে সুরুচিসম্পন্ন ও খুঁত-খুঁতে লোকেরও খাদ্যাদি ব্যাপারে কোন অসুবিধায় পড়তে হয় না। আমেরিকায় আসবাবপত্র সমেত বাড়িভাড়াও সহজেই পাওয়া যায়, চতুর্থত বিদেশীদের প্রতি বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আমেরিকাবাসীদের মনোভাব, তাদের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করে আপন করে নেওয়ার জন্য সেখানে বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান নানাভাবেই বিদ্যার্থীদের সাহায্য করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফরেন স্টুডেণ্টস্ কাউন্সিল, ফেডারেটেড উইমেনস্ ক্লাব, লীগ অব উইমেন ভোটার্স, এক্সপেরিমেণ্ট ইন ইণ্টারন্যাশনাল লিভিং প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আগে থেকেই এদের খবর দিয়ে রাখলে, বিদ্যার্থীরা যেদিন যেখানে এসে পদার্পণ করবে, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ সেইদিন ঐস্থানে গিয়ে নবাগত বিদ্যার্থীদের কাস্টমস বা শুল্ক সংক্রান্ত সমস্যা ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করে থাকেন, পরে আবার এদের জন্য ঐ সকল স্বেচ্ছাসেবক পিকনিকের এবং আমেরিকার

বিভিন্নস্থান পরিদর্শনের জন্য সফরের ব্যবস্থা করে থাকেন, এঁরাই এদের মার্কিন পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, মিলন বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। মিনেসোটার মত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একই রুচি ও প্রবণতাসম্পন্ন বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কিন সাথী জুটিয়ে দেবার অভিনব পরিকল্পনা ব্যতীত আমেরিকার প্রায় প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা দপ্তর রয়েছে।

বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের আমেরিকা এই প্রকার শ্রদ্ধা ও মর্যাদার চোখে দেখে যে, দেশের সর্বপ্রধান কর্মকর্তা প্রতিবছরই হোয়াইট হাউসে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে থাকেন। পরলোকগত প্রেসিডেন্ট কেনেডি ১৯৬১ সনে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশে বলেছিলেন—

'আমরা আপনাদের জন্য চাই স্বাধীনতা, চাই উন্নততর জীবন—আমাদের দেশবাসীর সঙ্গে মিত্রতা—আপনারা আমাদের অতিথি—আপনাদের দ্বারা আমরা উপকৃত—আপনারা যতদিন এখানে থাকবেন, সেই সময়ে আপনারা যা শিখবেন তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের শেখাবেন।'

এই কয়টি কথার মধ্যেই বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে মার্কিন মনোভাবের পুরো চিত্রটি পাওয়া যায়। এ বছরেও ঐ ধরণের একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট জনগণের অভিনন্দনবাণীতে আমেরিকার মূল আদর্শ অভিব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন—

'মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, কোন একটিমাত্র আইন, একটিমাত্র পদ্ধতি বা ধারণার মাধ্যমে অভিব্যক্ত হতে পারে না। আমেরিকা থেকে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা কি নিয়ে আসেন, কি শিখে আসেন, তাঁরা বিজ্ঞান ও কারিগরী-বিজ্ঞান-কৌশল আয়ত্ত করা ছাড়া, মানবিক মর্যাদা, স্বাধীনতা ও বিদেশীদের প্রতি আতিথেয়তা এবং জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নিয়ে আসেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। দূর অতীতের মতই আজও শিক্ষার ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের সঙ্গে ভারতের আদান-প্রদান চলছে।

—সন্ধানী।

একফালি চাঁদ

শ্রীনিখিলরঞ্জন মাইতি

দিনের শেষে সাঁঝ-আকাশে—
একফালি চাঁদ উঠল হেসে,
দীঘির পাড়ে বাঁশের বনে—
লক্ষ তারার ঝিলিক হেনে।

চেয়ে ছিলাম আপন মনে
আধখোলা ঐ বাতায়নে,
ভাবতে ছিলাম মনের কথা
চাপা দিয়ে কথার গাথা।

খোলা চাঁদের পরশ লেগে
মন-কমলে উঠল জেগে,
গোপন প্রিয়ার মিষ্টি হাসি
মনের সর্ব বাঁধন নাশি।

মৃদু বায়ু দোল দিয়ে যায়—
ব্যাকুল মনে গোপন-কোঠায়,
তোমার স্মৃতি আঁকতে মনে
আধখোলা ঐ বাতায়নে।

চাইছি তোমায় বারে বারে
পাই না তোমায় ক্ষণের তরে,
জানাই তোমায় অশ্রুনীরে—
শেষ কথাটি—'ভালোবাসি প্রিয়ে।'

● ● ●

অনির্দেশ যাত্রী

সলিল চট্টোপাধ্যায়

আমার এ প্রাণে এসেছিল কত ভাষা
দিতে পারি নি কো সুর মেটে নি কো আশা।
সেদিন প্রভাতে, সারাদিনে, সাঁঝে
গেয়েছি কত যে গান।
সুখে-দুখে মিলে গিয়েছে ভরিয়া
আমার পিপাসু প্রাণ।
মধুর নিশীথে চাঁদ তারা তলে
ব'লেছি কত যে কথা।
তারা সব আজ দিয়ে চলে শুধু
অসহ অশেষ ব্যথা।
এ বেদনা হায়, না পারি ভুলিতে
না পারি বলিতে কারে।
তাই মন উড়ে গিয়ে সুদূরেতে
যেন সে কাঁদিতে পারে।

৭১

হরিদাসের তিরোধানের পর থেকেই প্রভুর চিত্ত বিষণ্ণ! কৃষ্ণবিরহস্ফূর্তিতেই এই বিষণ্ণতা। অহরহ প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের জন্যে কাতরতা।

'হাহাকৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাও কাঁহা পাও মুরলীবদন॥'

মনে স্বস্তি নেই স্বাস্থ্য নেই, স্বরূপ আর রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা বলে রাত কাটান। সমস্ত রাত্রিই এখন কৃষ্ণরাত্রি

এদিকে গৌড়ে ভক্তদের আয়োজন চলেছে আবার প্রভুদর্শনে নীলাচল যাত্রা করবে। নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ যেন নবদ্বীপ না ছাড়ে, তবু আদেশ অমান্য করে সে চলেছে। চার ভাই আর স্ত্রী মালিনীকে নিয়ে চলেছে শ্রীবাস। সস্ত্রীক শিবানন্দ, সঙ্গে তাদের তিন ছেলে। বাসুদেব মুরারি পুণ্ডরীক তো আছেই, ঝালি সাজিয়ে রঘুনাথ। আরো অনেকে। শচীমাতা সকলকে আশীর্বাদ করে দিলেন।

দলের নেতা শিবানন্দ, রাস্তাঘাট সম্বন্ধে সেই পাকা লোক। ঘাটিয়ালকে পথকর দিয়ে ছাড় নিতে সেই ভালো পারবে।

একদিন ঘাটিয়াল সকলকে আটক করল। ঠিকঠাক কর দাও।

'ওদের ছেড়ে দাও। সকলের হয়ে আমি দেব।' শিবানন্দ রুখে উঠল: 'নাও, হিসেব করো।'

আর সকলকে ছেড়ে দিল ঘাটিয়াল। তারা গ্রামের মধ্যে ঢুকে গাছতলায় অপেক্ষা করতে লাগল। শিবানন্দ হিসেব চুকিয়ে ফিরে এলে পর থাকবার জায়গা ঠিক হবে।

ঘাঁটি থেকে ফিরতে শিবানন্দের দেরি হচ্ছে।

খিদের জ্বালায় নিত্যানন্দ অস্থির হয়ে উঠেছে। শিবানন্দই খাবার বন্দোবস্ত করবে অথচ তার এখনো ফেরবার নাম নেই। কী এত হিসেব যে এতক্ষণ দেরি হবে! তার জন্যে এতগুলি লোক না খেয়ে মরবে নাকি?

অসহ্য। নিত্যানন্দ শাপ দিয়ে বসল। বললে, 'ও এখনো ফিরছে না? ওর তিন ছেলেই মারা যাবে।'

শিবানন্দের স্ত্রী কাঁদতে বসল। এ কী অকরুণ।

তখুনিই ফিরল শিবানন্দ।

স্ত্রী কেঁদে পড়ল। 'কেন ফিরতে দেরি করলে? থাকবার খাবার জায়গা এখনো ঠিক হয় নি দেখে গোঁসাই শাপ দিয়েছে, তোমার তিন পুত্রই মারা যাক।'

'তুমি তার জন্যে কাঁদছ কেন? মরুক, আমার তিন পুত্রই মরুক,' শান্তমুখে বললে শিবানন্দ, 'গোঁসাইয়ের সব বালাই নিয়ে তারা চলে যাক।'

শিবানন্দ নিত্যানন্দের কাছে এসে দাঁড়াল। আর তক্ষুনি নিত্যানন্দ তাকে লাথি মারল।

পদপ্রহার না আশীর্বাদ! আনন্দে বিহ্বল হল শিবানন্দ। গ্রামের মধ্যে গিয়ে তখুনি বাসস্থান ঠিক করে এল। চলুন সকলে। অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর নয়।

বাসায় সকলকে নিয়ে গিয়ে শিবানন্দ নিত্যানন্দকে বললে, 'আমার মত ভাগ্য কার, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য বলে স্বীকার করে নিলেন। শাস্তির ছলে করুণা করলেন আমাকে। আপনার চরণরেণুর স্পর্শে আমার অধম দেহ পবিত্র হল, মনে জাগল কৃষ্ণভক্তি। আমার জন্ম-কুল-কর্ম সার্থক হল।'

নিত্যানন্দ শিবানন্দকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করল।

সবাই ভাবলে এ কী বিচিত্র ব্যবহার। যার প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন তাকেই আবার কৃপা করলেন। লাথি দিয়ে পরে আলিঙ্গন।

শিবানন্দের ভাগনে শ্রীকান্তের সহ্য হল না। সে বলে ফেলল, 'মহাপ্রভুর পার্ষদ আমার মামা, তাকে লাথি মারা গোঁসাইয়ের উচিত হয় নি। আমি প্রভুর কাছে যাচ্ছি নালিশ করতে।'

সটান গিয়ে প্রভুর পায়ে দণ্ডবৎ করল শ্রীকান্ত।

গোবিন্দ বললে, 'গায়ের জামা খোলো, খালিগায়ে দণ্ডবৎ করো। বস্ত্রাবৃত দেহে ভগবৎপ্রণাম অপরাধ।'

'আহা-হা, থাক, ওকে বাধা দিও না।' প্রভু গোবিন্দকে বাধা দিলেন: 'এ বালক মনে দুঃখ নিয়ে এসেছে, ওর যেমন খুশি তেমনি করুক।'

প্রভু তা'হলে সমস্তই জানতে পেরেছেন! বালক অবাক হল। তা হলে সবিস্তার নালিশ করবার আর দরকার কী।'

সবাই এসে পড়ল, দর্শন করল প্রভুকে। থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত পলকে ঠিক হয়ে গেল, কারু কোনো অভিযোগ রইল না।

তিন ছেলে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল শিবানন্দ।

'তোমার এই ছোট ছেলেটির নাম কী?' জিজ্ঞেস করলেন প্রভু।

'পরমানন্দ দাস।' বললে শিবানন্দ।

'ও! এই আমার পুরীদাস?' প্রভু আনন্দ করে উঠলেন।

আগে কোনো এক বছর শিবানন্দ যখন নীলাচলে সস্ত্রীক অবস্থান করছিল তখন প্রভু বলেছিলেন, তোমার এবার যে ছেলেটি হবে তার নাম পুরীদাস রেখো।

নীলাচলেই মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হয়েছিল বলেই তার নাম পুরীদাস। পোশাকী নাম পরমানন্দ দাস।

এই পুরীদাসই কবি-কর্ণপুর।

বালকের মুখে প্রভু তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ ঢুকিয়ে দিলেন। ওর মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হোক।

গোবিন্দকে বললেন, 'যতদিন পর্যন্ত শিবানন্দের প্রকৃতি আর পুত্র এখানে থাকবেন আমার ভুক্তাবশেষ পাবেন।'

স্ত্রী-শব্দ উচ্চারণ করেন না প্রভু। বলেন, প্রকৃতি।

নবদ্বীপ থেকে পরমেশ্বর মোদক এসেছে। প্রভুর গৃহের কাছেই তার ঘর, কত মোয়া-নাড়ু খাইয়েছে প্রভুকে, বাল্যকাল থেকেই প্রভুর প্রতি অনির্বাণ স্নেহ। এবার সেও চলে এসেছে। সেই নয়নমণিকে একবার দেখে আসি।

'আমি পরমেশ্বর।' মোদক দণ্ডবৎ করল।

'তুমি—তুমি এসেছ?' প্রভু প্রীত হলেন: 'বা, এসে ভালো করেছ। সব কুশল তো?'

'মুকুন্দের মা-ও এসেছে।'

পরমেশ্বর ভেবেছিল তার স্ত্রী, মুকুন্দের মাকে দেখেও প্রভু খুশি হবেন। ছেলেবেলায় প্রভু কত আদর আপ্যায়ন পেয়েছেন এই মুকুন্দের মার কাছে। সে কি আর ভোলবার?

কিন্তু প্রভু সঙ্কুচিত হলেন। কোনোক্রমেই যে তাঁর কাছে স্ত্রীপ্রসঙ্গ তোলা ঠিক নয় তা মোদক কী করে জানবে? সে সরল, চাতুর্যের ধার ধারে না। তারই জন্যে স্ত্রীপ্রসঙ্গে তার অপরাধ হলেও প্রভু তা উপেক্ষা করলেন! মুকুন্দের মা মালিনীর মতই দূর থেকেই প্রভুকে দেখে গেল।

প্রতিবারের মত এবারও যথারীতি গুণ্ডিচামার্জন হল, হল রথাগ্রনর্তন। সেই চাতুর্মাস্য, সেই সব যাত্রা, উৎসবলীলা। প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জনে প্রভুকে ভিক্ষে দেওয়া। সর্বত্রই শুধু ভক্তি-প্রীতির ঢেউ।

'প্রতি বৎসর কত কষ্ট করে তোমরা আস।' প্রভু গৌড়-ভক্তদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আসতে-যেতে কত ক্লেশ। তবু তোমাদের বারণ করতে পারি না। তোমাদের সঙ্গলাভে যে আমার সুখ হয়। আর বারণ করলেও নিত্যানন্দ শুনছে কই? অদ্বৈতেরই বা আমার প্রতি কত কৃপা, কত দুর্গম পথ লঙ্ঘন করছেন প্রতিবার। স্ত্রী-পুত্র-গৃহসুখ সব ছেড়ে এমনি চলে আসা সহজ কথা নয়। আমার কোনো পরিশ্রম নেই, আমি তো নীলাচলেই বসে আছি। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার কোনো ধন নেই, কী দিয়ে তোমাদের ঋণ আমি শোধ করব? শুধু আছে আমার এই দেহ তাই তোমাদের সমর্পণ করে দিলাম। কে চায় বলো তাকেই আমি আমার দেহ বেচে দিতে পারি। আমার এ দেহ তোমাদেরই জিনিস, তোমাদেরই সম্পত্তি।

প্রভুর কথা শুনে অঝোরে কাঁদতে লাগল সকলে। •

কেউ আর ছেড়ে যেতে চায় না। ফেরবার দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, তবু কারু বাড়ি যাবার নাম নেই। তুমি বিকোবে কী, তোমার গুণে সমস্ত জগৎ যে তোমাতেই বিকিয়ে আছে।

প্রবোধবাক্যে সবাইকে সুস্থ করলেন প্রভু। নিত্যানন্দকে বললেন, 'তুমি বার বার এসো না, আমিই ওখানে তোমার সঙ্গ নেব। অনেক দিন হয়ে গেল, এবার সকলে ফিরে যাও।'

কেন ফিরিয়ে দিলেন কে বলবে। ঈশ্বরের আচরণ জীব কী করে বুঝবে? তাই সবাই শান্তমুখে ফিরে চলল।

'ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥'

প্রভুর কথামত জগদানন্দ নবদ্বীপে শচীমাতার সঙ্গে দেখা করল।

'তোমাকে এ সব প্রসাদী বস্ত্র মালা চন্দন আর মহাপ্রসাদ পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন প্রণাম আর বিনয়স্তুতি।' প্রভুর হয়ে জগদানন্দই দণ্ডবৎ করল।

শচীমাতার আনন্দ দেখে কে। 'বলো আমার নিমাইয়ের কথা বলো।'

প্রভু যে এখানে খেতে আসেন, আর শচীমাতা যে সেটাকে স্বপ্ন বলে ভাবে সেইসব কথা অনেক বললে জগদানন্দ। আরো আরো কত কথা। চৈতন্যের সুখকথা।'

সেই কথাই বিলোতে লাগল ঘরে-ঘরে। ঘরে-ঘরে শুধু নয়, জনে-জনে বিলোতে লাগল চৈতন্য।

শেষ পর্যন্ত শিবানন্দের বাড়িতে এসে উঠল, প্রভুর জন্যে বহু যত্নে চন্দনাদি তেল তৈরি করাল। এ তেলে মাথা ঠাণ্ডা হয়, পিত্তের দোষ কাটে। প্রভু কীর্তনে মত্ত থাকেন, কৃষ্ণবিরহক্লেশে রাত জাগেন, আহারে অসময় হয়ে যায়, জগদানন্দের ধারণা হল এ তেলে তাঁর উপকার হবে।

মনোহরণ গন্ধ মিশিয়ে সে তেল কলসীতে করে নীলাচলে নিয়ে চলল।

গোবিন্দকে বললে, 'এ তেল প্রভুর অঙ্গে মাখিয়ে দাও।'

গোবিন্দ প্রভুর সমীপস্থ হল। বললে, 'জগদানন্দ চন্দনাদি তেল তৈরি করে এনেছে। তার ইচ্ছা সে তেল আপনি একটু মাথায় দেন। তাতে পিত্ত আর বায়ু শান্ত হবে। এক কলস নিয়ে এসেছে। গন্ধ কী সুন্দর!'

প্রভু বললেন, 'তেলে সন্ন্যাসীর অধিকার নেই। তারপরে সুগন্ধ! সে অত্যন্ত লজ্জার কথা। এ তেল জগন্নাথকে দাও—সে তেলে তাঁর দীপ জ্বলবে আর তাইতে জগদানন্দেরও পরিশ্রম সার্থক হবে।'

জগদানন্দ জানতে পেল প্রভুর প্রত্যাখ্যানের কথা। অভিমানে মুখ ভার করে রইল।

জগদানন্দের দুঃখ গোবিন্দের মনে গিয়ে বাজল। দিন দশ বাদে আবার সে প্রভুর কাছে নিবেদন করল। 'একটু তেল মাখলে পণ্ডিতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তাই বলছিলাম—'

প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন। 'তা হলে মর্দন করতে একজন পালোয়ান ডেকে নিয়ে এস। এই সুখের জন্যেই তো আমি সন্ন্যাস করেছি! এ তেল মাথায় মেখে আমি রাস্তায় বের হই আর সকলে বলাবলি করুক, আমি স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জন করবার জন্যে গন্ধ মেখেছি। আমার সর্বনাশ নিয়ে তোমরা পরিহাস করতে চাও?'

গোবিন্দ চুপ করে গেল।

পরদিন এল জগদানন্দ। প্রভু তাকে বুঝিয়ে বললেন, 'আমি তো সন্ন্যাসী এ তুমি ভুলে গেলে? তবে তুমি এ গন্ধতেল গৌড় থেকে নিয়ে এলে কেন? আমাকে কি তা ব্যবহার করা সাজে? এ তেল জগন্নাথকে দাও, তাঁর প্রদীপে এ দগ্ধ হোক।'

'কে তোমাকে বললে যে এ তেল আমি গৌড় থেকে এনেছি? মিথ্যেকথা।'

জগদানন্দ অভিমানে রুষে উঠল: 'এ আমি আনি নি। কখনো না।' বলে ঘরের ভিতর থেকে তেলের কলসী নিয়ে এসে আঙিনায় প্রভুর সামনে আছাড় মারল। কলসী চৌচির, সমস্ত আঙিনা ভেসে গেল। তার উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল নিজ ঘরে। দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে রইল।

পরদিন প্রভু এসে হাজির। অনেক ডাকাডাকিতেও উঠল না জগদানন্দ। খুলল না দরজা।

'শোনো, আজ মধ্যাহ্নে আমি তোমার এখানে ভিক্ষে নেব।' প্রভু বললেন বাইরে থেকে: 'তুমি নিজে রান্না করে দেবে। আমি যাই স্নান-দর্শন করে আসি।'

তখন জগদানন্দ না উঠে করে কী। প্রিয়তমকে কি উপবাসী রাখা যায়।

মধ্যাহ্নকৃত্য সাঙ্গ করে প্রভু এসে দেখলেন বিচিত্র ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছে জগদানন্দ।

কিন্তু আহারে বসেও প্রভু হাত লাগাচ্ছেন না।

'আরেক পাত্রে তোমার জন্যে অন্নব্যঞ্জন নাও।' বললেন প্রভু, 'তুমি-আমি আজ একত্র ভোজন করব।'

তার খাবার জন্যে প্রভুর আগ্রহ দেখে জগদানন্দ প্রেমাভিভূত হ'ল। তেলের জন্যে আর তিলমাত্রও দুঃখ রইল না। গাঢ়স্বরে বললে, 'তুমি আগে খেয়ে নাও, আমি পরে খাব। তুমি যখন বলছ তখন আমি কি আর না খেয়ে থাকতে পারি?'

'বেশ, তবে তাই, পরে খেয়ো।' প্রভু খেতে সুরু করলেন, বললেন, 'রান্না কী অপূর্ব হয়েছে! ক্রোধাবেশে রান্না করেও ব্যঞ্জনে অমৃত ফলিয়েছ। এ কৃষ্ণের প্রসাদ ছাড়া আর কিছু নয়। কৃষ্ণ আজ তোমার হাতে খাবেন বলেই তোমাকে দিয়ে এত ভালো রাঁধিয়েছেন।'

জগদানন্দ বললে, 'যে খাবে সেই নিজে রেঁধেছে। আমি শুধু রান্নার জিনিস জোগাড় করে দিয়েছি।'

'পণ্ডিত কহে, যে খাইবে সেই পাক কর্তা।
আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী আহর্তা॥'

বেশি-বেশি করে পরিবেশন করছে পণ্ডিত। পাছে আবার অভিমান করে বসে তাই ভয়ে-ভয়ে সব খেলেন প্রভু, অন্যদিনের প্রায় দশগুণ। যে ভগবান প্রেমের বশীভূত সে ভক্তকে ভয় করবে না তো কী।

'কিন্তু আর নয়, অনেক হয়েছে।' প্রভু বলতে ক্ষান্ত হ'ল পণ্ডিত।

আচমন করে মুখশুদ্ধি নিয়ে বসলেন প্রভু। বললেন, 'এবার তুমি খাও, আমি দেখি।'

জগদানন্দ বললে, 'খাব'খন। আপনি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন।'

'তাই যাচ্ছি।' প্রভু উঠলেন, গোবিন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি এখানে থাকো। পণ্ডিতের ভোজন হয়ে গেলে আমাকে খবর দেবে।'

প্রভু চলে যেতেই জগদানন্দ গোবিন্দকে বললেন, 'তুমি যাও, গিয়ে প্রভুর পদসেবা করো। আর বলো, পণ্ডিত এই ভোজনে বসেছে। ভয় নেই তোমার জন্যে প্রভুর ভুক্তাবশেষ রেখে দেব। উনি ঘুমিয়ে পড়লে এস।'

গোবিন্দ প্রভুর কাছে এসে হাজির হল।

'পণ্ডিত ভোজনে বসেছে।'

'ভোজনে বসলে কী হয়? দেখে এস ভোজন শেষ হ'ল কিনা।' প্রভু গোবিন্দকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন

আর সকলেরটা বেড়ে রেখে প্রভুর স্বস্তির জন্যে থাল নিয়ে বসে পড়ল পণ্ডিত। ভোজন শেষ করল। গোবিন্দ সেই সংবাদ পৌঁছে দেবার পর প্রভু স্বস্তিতে শুলেন।

প্রভুর শয়ন কী? কলার শরলা প্রভুর শয়ন। আস্ত কলাপাতার মধ্যের ডাঁটিটার নাম শরলা। সে শয়ন সুখকর নয়। প্রভুর শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গেছে, ও বন্য শয়নে শুতে তাঁর হাড়ে ব্যথা লাগে। কৃষ্ণের বিরহ-আর্তিতেই তাঁর কৃশতা, তারপর ঐ শয্যা যদি মেঝের উপর বিছানো থাকে তা হলে দেহক্লেশের আর অবধি থাকে না। তবুও মাঝে মাঝে তাঁকে প্রফুল্ল দেখায়, হয় তো যখন রাধাভাবে তাঁর পূর্ব মিলন কথা মনে পড়ে।

আবার জগদানন্দের বুকে বাজল সেই কলার শরলা। প্রতিকারের জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। সূক্ষ্মবস্ত্র নিয়ে এসে গৈরিকে রাঙাল, শিমূল তুলো ভরে দিব্যি তা দিয়ে তোশক আর বালিশ তৈরি করল। গোবিন্দকে বললে, 'নিয়ে যাও। এতে প্রভুকে শুতে বলো।'

গোবিন্দ বুঝি একটু দ্বিধা করল নেয় কি না নেয়।

সামনে স্বরূপ দাঁড়িয়ে। 'আপনি যান।' জগদানন্দ স্বরূপকে ধরল: 'আপনি গিয়ে প্রভুকে এ শয্যায় শুইয়ে আসুন।'

তোশক-বালিশের শয্যা দেখে প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হলেন। গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন: 'এ কে করালো?'

'জগদানন্দ পণ্ডিত।'

জগদানন্দের নাম শুনে প্রভুর সঙ্কোচ হল যদি আবার রাগ করে অনাহারে পড়ে থাকে। তাই রূঢ় কথা বললেন না। তোশক-বালিশ সরিয়ে রেখে কলার শরলার উপরই যথাবিধি শয়ন করলেন।

স্বরূপ বললে, 'এ শয্যা উপেক্ষা করলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে।'

'তা হ'লে একটা খাট নিয়ে এস।' প্রভু রোষ পরিহাস করলেন: 'জগদানন্দ কি চায় আমি বিষয়-ভোগ করি? মাটিতে শোয়াই তো সন্ন্যাসীর কর্তব্য, সেই ক্ষেত্রে তোশক-বালিশের শয্যা ব্যবহার অর্থই আমার জাতিচ্যুতি।'

স্বরূপ জগদানন্দকে জানাল প্রভুর বিতৃষ্ণার কথা।
জগদানন্দ প্রশ্ন করল : 'এর তবে প্রতিকার কী?'
স্বরূপ উপায় বের করল। বিস্তর কলাপাতা সংগ্রহ করল। নখে চিরে চিরে রাশি-রাশি তন্তু বের করে প্রভুর দু'খানি বহির্বাসের মধ্যে পুরল। বেশ একটা লেপের মত জিনিস হল। এই তবে তাঁর শয্যা হোক। তাঁর কৃশ দেহ কিছুটা আরাম পাক।

প্রভু এও স্বীকার করতে চান না।

স্বরূপ অনুনয় করতে লাগল। তোমার সেই কলাপাতাই তো আছে, আর তোমারই নিজের বহির্বাসে তোমার আপত্তি কী। তোমার কষ্ট দেখাটা যে ভক্তের পক্ষে কষ্টকর এটা তো তুমি মানবে।

শেষ পর্যন্ত এ শয্যা অঙ্গীকার করলেন প্রভু।

কিন্তু জগদানন্দ শান্তি পাচ্ছে না কিছুতেই। প্রভুর এত ক্লেশ স্বচক্ষে দেখা যায় না। এর চেয়ে বৃন্দাবন চলে যাই।

'অনুমতি করুন আমি বৃন্দাবনে যাই।' প্রভুর কাছে অনুমতি চাইল পণ্ডিত।

'তার অর্থ আমার উপর রাগ করে চলে যাচ্ছ? আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তুমি ভিখারি হবে?'

'না, তা কেন? কতদিন থেকেই আমার বৃন্দাবন যাবার ইচ্ছে।'

'তা হোক। তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার কষ্ট হবে না? আমার কষ্ট তো খুব বোঝো—এ কষ্টটা বোঝো না?' প্রভু অনুমতি দিলেন না।

তখন জগদানন্দ স্বরূপকে গিয়ে ধরল। দয়া করে প্রভুর মত করিয়ে দিন। আমার বিচ্ছেদে তাঁর আবার কী কষ্ট!

স্বরূপ প্রভুকে বোঝাতে বসল। পণ্ডিত গৌড়ে তো যায় শচীমাতাকে দেখতে, তেমনি একবার বৃন্দাবন দেখে আসতে বাধা কিসের!

তবে যাক। প্রভু শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিলেন।

পথের উপদেশ দিতে বসলেন। বললেন, 'বারাণসী পর্যন্ত কোনো ভয় নেই, স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। বারাণসীর পর থেকেই ভয়। তখন কখনো একা চলবে না, স্থানীয় ক্ষত্রিয়দের কারু সঙ্গ নেবে। একলা বাঙালি দেখলে বাটপাড়েরা অত্যাচার করবে, সব লুটপাট করে বেঁধে রাখবে, খেতে দেবে না। সঙ্গে ক্ষত্রিয় কাউকে দেখলে এগুতে সাহস পাবে না। আর মথুরায় সনাতনের ওখানে উঠবে। মথুরায় যত স্থায়ী ভক্ত আছেন তাঁদের চরণবন্দনা করবে। দূর থেকেই তাঁদের ভক্তি করা ভালো। কদাচ তাঁদের সঙ্গে থাকবে না যেহেতু তাঁদের সহজ আচরণের মর্মগ্রহণ করা তোমার পক্ষে কঠিন হবে। সনাতনের সঙ্গে ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বন দেখবে, কিন্তু গোবর্ধন পর্বতের উপর যে গোপাল আছে তাকে দেখতে পাহাড়ে উঠো না, কৃষ্ণ-কলেবরে পা ঠেকালে অপরাধ হবে। দেখো, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। সেখানেই থেকে যেয়ো না। আর সনাতনকে বোলো, আমি শিগগিরই বৃন্দাবনে যাচ্ছি, আমার জন্যে যেন একটি জায়গা ঠিক করে রাখে।'

প্রকটলীলায় প্রভু তো আর যান নি বৃন্দাবন, কিন্তু বিগ্রহমূর্তিতে গিয়েছেন। দ্বাদশাদিত্য টিলার কাছে সনাতন প্রভুর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেছে।

প্রভুর আশীর্বাদ নিয়ে জগদানন্দ রওনা হল। তার জন্যে প্রভুর কত স্নেহব্যাকুলতা! প্রভু যদি আমার প্রতি মনোযোগী থাকেন তাহলেই তো আমি নির্বিঘ্ন-নির্ভয়।

'ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাঁহা যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার॥'

যে অমিতাহারী বা যে অনাহারী, যে অত্যন্ত নিদ্রাশীল বা যে অত্যন্ত জাগরণশীল তাদের কারুই যোগানুষ্ঠান হয় না। যার আহার বিহার কর্মচেষ্টা নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত তারই যোগসিদ্ধি সম্ভব।

ঐ কথা গীতায় অর্জুনকে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। আবার ভাগবতে বলছেন উদ্ধবকে: আমার প্রতি উর্জিতা ভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করে, যোগ বা সাংখ্য ধর্ম বা তপস্যা বা বেদাধ্যয়ন বা সন্ন্যাস তেমন পারে না।

ভগবান শুধু শুদ্ধ ভক্তের অধীন। বলছেন গোপিনীদের: 'আমার প্রতি ভক্তিই প্রাণিগণের সংসারমোচনের উপায়। আমার প্রতি তোমাদের যে মদাকর্ষক স্নেহ জন্মেছে এ আমারই ভাগ্য।'

ভাগ্য তো বটেই। ভক্ত না থাকলে ভগবান যায় কোথায়? বাঁচে কী করে? ভক্ত সরস বলেই তো ভগবান স্নিগ্ধ হতে পাচ্ছেন।

আবার ভক্তই তো ভগবৎ-অস্তিত্বের প্রমাণ।

[ক্রমশ।

‘আত্মোন্নতি’ বৈপ্লবিক সমিতির ইতিকথা

সতীশচন্দ্র দে

বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে শুনেছি ‘আত্মোন্নতি’ সমিতির উদ্ভব হয়েছিল মধ্য-কলিকাতার রাজা সুবোধ মল্লিক (প্রাক্তন ওয়েলিংটন) স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব কোণে খেলাৎচন্দ্র ইনস্টিটিউশন নামে যে এন্‌ট্রেন্স স্কুল ছিল সেই বিদ্যালয় বাটীতে, কতিপয় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের দ্বারা, বোধ করি ১৮৯৭ সনে। লর্ড কার্জনের দ্বারা বঙ্গভঙ্গ তখনও হয় নি বা দেশব্যাপী স্বদেশী-আন্দোলন জাগে নি। শুনেছি, উদ্যোক্তারা ভেবেছিলেন স্কুলের শুধু পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নে বা পরীক্ষায় পাশ করে জীবনযাপনের জন্য উপার্জন সম্ভব হতে পারে কিন্তু সর্বভাবে উন্নত মানুষ হওয়া যায় না, মানসিক উন্নতি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই তাঁরা মধ্যে মধ্যে দেশী ও বিদেশী সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনাসভার অনুষ্ঠান করতেন। এই সমিতির নামকরণ হয়েছিল ‘আত্মোন্নতি’ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রস্বার্থে নয়, সমষ্টিগত সামগ্রিক কল্যাণে নিজেদের সর্বরকমে উন্নত করা।

ক্রমে তাঁরা নিজেদের উন্নয়ন, শুধু মানসিক গঠনে সীমাবদ্ধ না রেখে শরীরচর্চায় মন দেন। সেকালে বৃটিশ ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ফিরিঙ্গিরা দেশীয়দের উপর পথে-ঘাটে অত্যাচার-অপমান করত। ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ধর্মতলা, ইডেন উদ্যান প্রভৃতি স্থানে নিরীহ পথচারীকে ছড়ি মারত, স-বুট পদাঘাত করত। তরুণ ছাত্রদের মনে এ সকল অপমানের জ্বালা অসহ্য বোধ হতে লাগল। সে সময়ে মঁশিয়ে লর্ড নামক স্থানীয় এক ফরাসী যুবকের সহিত সমিতির যুবকদের বন্ধুত্ব হয়। বোধ হয় ফরাসী বলে, মঁশিয়ে লর্ডের বৃটিশ ও ফিরিঙ্গিদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তিনি নিজে ছিলেন মুষ্টিযুদ্ধের ভাল ওস্তাদ এবং তাঁরই প্রদত্ত উৎসাহ ও শিক্ষায় সমিতির অনেক সভ্য বক্সিং লড়ায় ও নানারূপ ব্যায়ামক্রীড়ায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিল।

প্রথম যাঁরা সমিতির পত্তন করেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম জানতে পেরেছিলাম ও স্মরণে আসে, তাঁরা হলেন ৺সতীশ মুখোপাধ্যায় (ডন্ সোসাইটির নন) ইনি পরে চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন; ৺নিবারণ ভট্টাচার্য, ইনি পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েছিলেন; ৺ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়; লেখকের অগ্রজ ৺তিনকড়ি দে, ইনি পরে বঙ্গবাসী কলেজে রসায়নের অধ্যাপক হয়েছিলেন ও ৺হরিশ সিকদার মহাশয়গণ। পরে ক্রমশ স্বনামধন্য বিপ্লবী নেতা ৺বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ৺প্রভাসচন্দ্র দে (পরে ইনি রাজসাহী কলেজের ও তদানীন্তন রিপন কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক হয়েছিলেন), শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী (ইনি মাণিকতলা বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দের সহিত বিচারাধীন আসামী ছিলেন), শ্রীরণেন গাঙ্গুলী ইত্যাদি তদানীন্তন যুবকগণ সমিতিতে যোগদান করেন।

বিংশ শতকের প্রারম্ভে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস দেশের মনোগগনে তেমনভাবে জেগে ওঠে নি। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ-আদি মহামানবদের বাণীতে অন্তরের পরাধীনতার লজ্জা কিছু অনুভূত হোত। সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে অক্ষম হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবোধেও ভারত এক ছিল না, নানা কুসংস্কারের আবর্জনার স্তূপে দেশের যা কিছু মহৎ, ভারতের বেদান্ত-উপনিষদ্-চরিত্র-বীর্য চাপা পড়েছিল। এ দেশকে জাগতে হবে। ‘কংগ্রেস’ বলে তখনকা’র দিনে যে প্রতিষ্ঠান ছিল মধ্যে মধ্যে তার সভার অনুষ্ঠান হোত। তাতে থাকত শুধু বৃটিশের দরবারে ক্রন্দন, আবেদন-নিবেদনের পালা, রাষ্ট্রচালনায় ভারতীয়দের দু’একজন উপযুক্ত লোককে উচ্চস্থান দিতে অনুরোধ। কিন্তু একথা স্বীকার্য, তখনকার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের মতৈক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা ছিল ও অনেকটা জাতীয় বা ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। কংগ্রেসের পিছনে সংগ্রামী বা দাবীর শক্তি না থাকলেও সর্বভারতীয় সংহতি শক্তির কিছু উন্মেষ হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

‘আত্মোন্নতি’ সমিতির দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হল ১৯০৫ সালে। যখন বাংলা দেশ খণ্ডিত করার প্রতিবাদে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পিতা ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলনে দেশ ভেসে গেল। সে স্বদেশী বন্যায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল আমাদের ‘আত্মোন্নতি’ সমিতি। মানসিক ও শারীরিক অনুশীলনের উপর আরও যা সমিতির প্রাণে জেগে উঠলো তা হোল স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তাবোধ।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সারা বাংলা দেশে তথা ভারতে যে তীব্র স্বদেশী-আন্দোলন জেগেছিল তাতে কয়েকজন মুসলমান নেতা আন্তরিকভাবে যোগদান করলেও সাধারণ মুসলমানগণ প্রাণের সাড়া দেয় নি। হিন্দু বাঙালী স্বদেশী গ্রহণ করেছিল ও বিদেশী বিশেষত বৃটিশদ্রব্য বর্জন করেছিল। তদানীন্তন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন কোন স্থানে, যেমন মৈমনসিং জেলার জামালপুর এলাকায় মুসলমান গুণ্ডার দ্বারা হিন্দুদের আক্রমণ, দেবমন্দির লুণ্ঠন ও প্রতিমা ভগ্ন করতে প্ররোচনা দিচ্ছিল। ‘আত্মোন্নতি’ সমিতি থেকে কয়েকজন যুবককর্মী কলিকাতা হতে পূর্ববঙ্গের আক্রান্ত স্থানগুলিতে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়ে বীরযোদ্ধার মত সেখানের আক্রান্তদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। ‘আত্মোন্নতি’ সমিতির পক্ষে এটি একটি স্মরণীয় গৌরবময় ঘটনা। বাংলা দেশ থেকে সারা ভারতে স্বদেশী-আন্দোলন জেগে উঠলো। শুধু বিদেশী বর্জনের ঘৃণাভাব থেকে দেশের প্রস্তুত দ্রব্যের প্রতি মমতাবোধ, দেশপ্রেম ও স্বজাতি-প্রীতি জাগতে লাগল। ‘আত্মোন্নতি’র কর্মিগণ এই স্বদেশীভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে মন-প্রাণ দিয়ে দেশের কাজ করতে লাগল। যে কংগ্রেস সারা ভারতে নরমপন্থী নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে গভর্ণমেণ্টের কৃপাভিক্ষার জন্য আবেদন-নিবেদনে নিবদ্ধ ছিল, সেই কংগ্রেসে ক্রমশ দাবীকারী স্বরাজপন্থীদের আবির্ভাব হোল।

ইতিমধ্যে ‘আত্মোন্নতি’ সমিতি ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে বহুবাজার ভরদ্বাজের মাঠে, যেখানে খেলাৎচন্দ্রের শাখা-স্কুল ছিল, সেখানে স্থানান্তরিত হোল। এই নিবন্ধের লেখক সেই সময়ে ‘আত্মোন্নতি’ সমিতিতে সক্রিয় কর্মীরূপে যোগদান করেন। রডা কেসের মজার

পিস্তল সংগ্রহ ব্যাপারে যে ৺ভুজঙ্গভূষণ ধরের কারাদণ্ড হয়েছিল, সেই ভুজঙ্গদা'ও সেই সময়ে সমিতিতে যোগদান করেন। বৌবাজার মলঙ্গা লেনের পার্শ্বে অভয় হালদার গলির রামলালার ঠাকুরবাড়িতে সমিতির শাখা ছিল; সে শাখা পরিচালনা করতেন ৺অনুকূল মুখার্জী, ৺জীবন মুখার্জী, ৺কালিদাস বসু, ৺গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ইত্যাদি দাদারা শ্রীঅংশু ব্যানার্জী, ৺নরেন ব্যানার্জী প্রভৃতি কর্মীদের সাহায্যে। মজার পিস্তল সংগ্রহের জন্য রডা কোম্পানীতে যিনি জেটি সরকারের কাজ নিয়েছিলেন সেই ৺শ্রীশ মিত্র ওরফে ৺হাবু মিত্র 'আত্মোন্নতি'র এই মলঙ্গা শাখার কর্মী, অনুকূলদা'র শিষ্য। মধ্য-কলিকাতার তালতলায় ৺ডাঃ বিমান ঘোষ ও ভবানীপুরে শ্রীবঙ্কিম রায়, আলমবাজার বরানগরে ৺খগেন চ্যাটার্জী ৺পার্বতী মুখার্জী, হাওড়ায় কোন্নগরে শ্রীনিবারণ মিত্র 'আত্মোন্নতি'র শাখা-সমিতিগুলি পরিচালনা করতেন: ৺বিপিন গাঙ্গুলী এই শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন—তার বিশদ তথ্য লেখকের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

তখন সমিতির সভ্যগণকে বড় ও ছোট লাঠিখেলা ও মুষ্টিযুদ্ধ, ছোরাখেলা, জাপানী যুযুৎসু, উচ্চলম্ফন, দীর্ঘলম্ফন, বুকে হাঁটা, লক্ষ্যে গোলা নিক্ষেপ করা, ড্রিল, কুচকাওয়াজ, কুস্তি ইত্যাদি সকল রকমের চর্চা করানো হত। প্রায় প্রতি রবিবারে গঙ্গার বাবুঘাটে, সুরেন্দ্র ব্যানার্জী রোডে, তালতলায় ৺শিবকালী কুমারের পুকুরে, শিয়ালদার নিকটস্থ আপার সাকুলার রোডস্থিত ৺মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর গৃহপ্রাঙ্গণের পুষ্করিণীতে সাঁতার শিক্ষা দেওয়া হোত। সন্তরণান্তে শিক্ষার্থীদের খাদ্য ছিল মুঠো মুঠো ভিজা ছোলা। মাঝে মাঝে কর্মীরা দাঁড়ি ও মাঝি হয়ে নৌকা চালানোর শিক্ষালাভ করত ভবিষ্যতে স্বাধীনতার যুদ্ধে হবু-সৈনিকদের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষারূপে। গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'রাজসিংহ' ৺কবি হেমচন্দ্রের কবিতা 'বাজ রে শিঙা বাজ, এই রবে'—এই সকল সদগ্রন্থ সমিতির সভ্যদের পাঠ করানো হত। বিদেশীয়দের মধ্যে ইতালীয়দের দেশপ্রেমের জন্য স্বদেশী যুবকগণ নিজেদের বিশেষভাবে ঋণী বোধ করত। সে দেশের ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডি, কাভূর প্রভৃতি নব ইতালীর স্রষ্টাদের পুস্তকগুলি বিশেষ অনুপ্রেরণা দান করত। ফরাসী বিপ্লবের পুস্তক, রাশিয়ার প্রিন্স ক্রোপাটকিন লিখিত নিহিলিস্টদের কাহিনী, আইরিশ বিপ্লবের সিন্‌ফিন আন্দোলনের কথা, চীনের সান ইয়াৎ সেনের জীবনী ও পৃথিবীর যেখানে যত দেশের স্বাধীনতা ও উন্নয়নের জন্য বিপ্লব সম্বন্ধে পুস্তক পাওয়া যেত সেগুলি সংগ্রহ করে পাঠ করানো হত, বৈপ্লবিকভাবে মানসিক অনুশীলনের জন্য। ততদিনে দেশের ও সমিতির সভ্যদের মন ও আকাঙ্ক্ষা শুধু বিদেশীবর্জনে বা স্বদেশীতে সীমাবদ্ধ রইল না, অন্তরে জেগে উঠতে লাগলো বৃটিশ বিতাড়ন ও পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন। কংগ্রেসের চরমপন্থিগণ তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বরাজ পেলে সন্তুষ্ট হবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। নরমপন্থিগণ বৃটিশের অনুগ্রহলাভে আংশিক স্বরাজে খুশি থাকবেন বলেছিলেন। সমিতির সভ্যরা কিন্তু সাম্রাজ্যের ভিতর স্বাধীনতা বিশ্বাস করতো না এবং সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা বৃটিশ বিতাড়ন করে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে—এই ছিল দৃঢ়পণ। কিন্তু, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিরাট প্রস্তুতি সম্বন্ধে কোনও সম্পূর্ণ ধারণা ছিল না। মনে হোত কর্মে অগ্রসর হতে হতেই পথ খুলে যাবে।

'আত্মোন্নতি' সমিতির পরিচালকগণ নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করতেন, দ্বিতীয় স্তরের বা কনিষ্ঠদের পুরা জানবার উপায় ছিল না। কর্মের জন্য যখন যেটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত কোনও কথা কনিষ্ঠদের বলা হোত না। অনুসন্ধিৎসা ছিল অপরাধতুল্য। যখন যে কাজের ভার পড়তো কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সহিত সেই কাজ করবার জন্য আদেশ দেওয়া হোত। সন্ধ্যার আঁধারে পিস্তল, কার্তুজ বা বোমা একস্থান হতে আর একস্থানে পৌঁছে দিতে হলে কে কাকে কি দিতো তা যথাসম্ভব গোপন থাকতো। চাদরে অঙ্গ আবৃত করে কাজ করতে হোত—যার ফলে অনেকক্ষেত্রে পরিচিতের পরিচয় লাভ করা যেতো না। লেখক যখন বোমা প্রস্তুত করে সরবরাহ করতো তা গ্রহণ করতো একজনমাত্র কর্মী। দ্বিতীয় ব্যক্তি এ কাজে আসতো না, পাছে জানাজানি হয়ে যায় ও পুলিশে টের পায়। বোধ করি এই কঠোর সাবধানতার জন্য 'আত্মোন্নতি'র বহুকর্মীই পুলিশের অজ্ঞাত থেকে যেতে সমর্থ হয়েছিল এবং ১৯১৫-১৬ সালে যখন ডিফেন্স-অ্যাক্টে প্রবল ধরপাকড় হোলো, তখন 'আত্মোন্নতি'র বহুকর্মী কারাগারের বাইরে থাকতে পেরেছিল।

১৯০৯-১০ সালে 'আত্মোন্নতি' সমিতি স্থানান্তরিত হোল বহুবাজার স্ট্রীট বর্তমান বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, যেখানে বসুমতীর অফিস এবং তখন ছিল ন্যাশনাল কলেজ সেই প্রাঙ্গণসংলগ্ন বাটীতে। এইখানেই আমরা শ্রীঅরবিন্দের প্রথম সাক্ষাৎলাভ করি। বরোদা রাজ্যের উচ্চ বেতনের সম্মানীয় পদ পরিত্যাগ করে তিনি দেশের জন্য মাত্র ৭৫.০০ টাকা বেতনে জাতীয়শিক্ষার পরিচালনার্থে ন্যাশনাল কলেজের ভারগ্রহণ করেন। তিনি বক্তৃতা দিতেন অন্তরস্পর্শী ভাষায়, তাঁর ত্যাগের আদর্শে 'আত্মোন্নতি'র কর্মীদের অন্তর মুগ্ধ হোত। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় যাঁকে আমরা 'দেবী দুর্গা' বলে পূজা করি—তিনিই আমাদের দেশজননী, জন্মভূমি, স্বাধীনতা সাধনাই জীবনের ধর্ম—শ্রীঅরবিন্দের কাছে সেই শিক্ষাই পেতাম। দুর্গাপূজায় মহাষ্টমীর দিনে তীক্ষ্ণ ছোরার দ্বারা বুকের রক্ত বাহির করে বিল্বপত্রে স্পর্শ করে আত্মোন্নতির সভ্যরা মাতৃপূজায় অঞ্জলি দিতো। শপথ গ্রহণ করতো:—

'তোমার তরে মা সঁপিনু এ দেহ,
তোমার তরে মা সঁপিনু প্রাণ।'

মধ্যে মধ্যে সমিতিতে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক মহামানবদের স্মরণে উৎসব অনুষ্ঠিত হোত। প্রতাপাদিত্য উৎসবে ৺সরলা দেবীচৌধুরাণী সভানেত্রী হলেন। আমাদের মনে হোত তিনি যেন বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী স্বয়ং সম্মুখে আবির্ভূতা। রাজা সুবোধ মল্লিকের ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ বাটীর প্রাঙ্গণে শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হোত। বড় লাঠি, ছোট লাঠি, তরবারি খেলা, বক্সিং লড়া, বীরত্বব্যঞ্জক নানা ক্রীড়ার মাধ্যমে সে উৎসব সম্পাদিত হোত। কিন্তু আমাদের 'আত্মোন্নতি' সমিতি হিন্দুর পুনরুত্থান বলতে ঠিক যা বোঝায় তা চায় নি। উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়-স্বাধীনতা অর্জন। হিন্দু, মুসলমান, ক্রীশ্চান, শিখ, পারসিক, জৈন সকলকে নিয়ে এক মহা-জাতির জন্য। একমাত্র পথ ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা যা বৃটিশ বিতাড়ন ব্যতীত অসম্ভব।

'আত্মোন্নতি' বৈপ্লবিক সমিতির ইতিকথা

সমিতির বিশেষ নেতা শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী বিখ্যাত মাণিকতলা বোমা মামলায় বিচারাধীন আসামী হলেন। ইনি মিলিটারী ডাক্তার ৺কর্নেল নন্দীর পুত্র। এঁর বাড়ি ছিল মধ্য-কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীটে। বোমা বিস্ফোরণে তাঁর একখানি হাত উড়ে গিয়েছিল। তিনি পুলিশের নিকট বলেছিলেন যে, লোহার সিন্দুক সরাতে গিয়ে তাঁর হাত নষ্ট হয়ে যায়। পুলিশ ইন্দ্রনাথবাবুর জন্যে ও সমিতির উপর নানাপ্রকার উপদ্রব আরম্ভ করায় প্রকাশ্য বিভাগ লুপ্ত হোল, রইলো গুপ্ত সমিতি বৈপ্লবিক-ভাবাপন্ন কর্মীদের নিয়ে। আমরা অনেকে সে সময়ে বৈপ্লবিককর্মের সঙ্গে জনসেবার কাজ করতাম। অর্ধোদয় আদি বিভিন্ন যোগে ও গ্রহণে পুণ্যার্থী যাত্রীদের সেবার্থে গঙ্গাঘাটে, রেলে, স্টেশনে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতাম। সে সকল সেবাকর্ম এমন সুশৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদিত হোত যে, শুধু দেশের জনগণের নয় গভর্নমেণ্টেরও কিছু প্রশংসা পাওয়া যেত। কিন্তু, পুলিশ সেইসঙ্গে আমাদের কর্মশক্তির বিকাশ এবং জনপ্রিয়তা দেখে যে কিছুমাত্রায় ভীত হোত না এমন নয়। পরাধীন-জাতির আত্মশক্তির উন্মেষ, মনুষ্যত্বের জাগরণ দেখলে বিদেশী শাসকদের খুশি না হওয়াই স্বাভাবিক। কেউ মারা গেলে সমিতির সভ্যরা গামছা কাঁধে শবদাহ করতে যেতো। শ্রাদ্ধাদিকর্মে ভিখারীর ভোজনে স্বেচ্ছাসেবকের কাজও করতে হোত। কেউ অসুস্থ হলে দিবারাত্র রোগীর পরিচর্যাও সভ্যেরা করতো। ১৯১৩ সালে দামোদরের বন্যায় মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী জেলার বহুপল্লী জলপ্লাবিত হয়েছিল, কর্মীরা দলবদ্ধভাবে নৌকায় খাদ্যবস্ত্রাদি বহন করে প্লাবিত অঞ্চলের দুস্থদের সেবাকার্য করেছিল। কর্মীদের মধ্যে অনেকেই ভাল ছাত্র ছিল। কিন্তু এ সকল দেশের কাজে পড়াশোনার যে ক্ষতি হোত তার জন্য কেউ বিন্দুমাত্র দুঃখিত হোত না। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষিত, বিত্তবান ও পদস্থ হওয়া নয়; ধন নয়, মান নয়—কর্মীরা চাইতো জাতি কি করে জাগে, বিদেশী শাসক বিতাড়িত হয়ে দেশ কিভাবে স্বাধীন হয়। তাদের বিশ্বাস ছিল দেশ স্বাধীন না হলে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক—কোনও উন্নতি সম্ভব নয়। দেশের কাজ করে সম্ভবমত লেখাপড়ায় মন দিত। দেশসেবার মাধ্যমে 'স্বদেশী-ছেলেরা' সাধারণের স্নেহভালবাসা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল।

দেশের ধনী জমিদারদের মধ্যে অনেকে বিপ্লবী সমিতিগুলিকে সহায়তা করতেন, এমন কি গভর্নমেণ্টের বিষনজরে পড়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও। গুপ্তভাবে তাঁরা অর্থ-সাহায্য করতেন। আশা করা যায় ভবিষ্যতের গণতন্ত্রী সমাজবাদী ভারত সেই সকল ধনী, মহানুভব ব্যক্তিদের দান সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবেন না। কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে তখনও দেশপ্রেমের উন্মেষ হয় নি, অধিকাংশ দেশপ্রেমিক এসেছিল শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে।

কবি রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে' কবিতাটি পাঠ করে মনে পরাধীনতার ধিক্কার এনে দিত। সমিতির কর্মীরা ভাবতো দেশ পরাধীনতা থেকে মুক্ত না হলে জগতের সম্মুখে আমাদের দেশ অতি দীন ও হেয়। রুশ-জাপানের যুদ্ধে জাপানের জয়লাভে কর্মীদের মনে প্রচুর ভরসা এসেছিল—ইয়োরোপীয়দের পরাজিত করে এশিয়াবাসীর জয়লাভে, সমিতির কর্মীদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জাগলো যে, এ-দেশবাসীও প্রাণপণ চেষ্টা করলে একদিন বৃটিশ শাসককে বিতাড়িত করতে পারবে এবং দেশ স্বাধীন হবে। কবি রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধনের গান, তাঁর করুণ দেশপ্রেমের সঙ্গীত। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' ইত্যাদি, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' কর্মীদের মনে দেশের সংহতিভাব জাগিয়ে তুলতো, দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতে শেখাতো। তাঁর 'বন্দীবীরের' 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন' মনে বীর্যবোধ জাগরিত করতো—মরণে আনতো নির্ভরতা। আরও কতকগুলি গান সমিতিতে গীত হোত যেমন, 'আমায় দে মা অসি, সন্তানে অক্ষম জেনে বল মা আর সবে অধোবদনে শুধু নীরবে বসি।' 'ভয় করবোনা ভয় করবোনা' কর্মীদের মন দেশপ্রেম, সাহস, বীর্যে ভরে দিত।' ৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্', 'দেশের কথা,' 'বর্তমান রণনীতি,' 'মুক্তি কোন পথে' ইত্যাদি পুস্তক কর্মীরা পাঠ করতো এবং দেশের স্বাধীনতা আনয়নের পন্থার কথা চিন্তা করত।

'আত্মোন্নতি' সমিতির নেতা ও কর্মিগণ, মধ্যবিত্তের পক্ষে যা সম্ভব তার অপেক্ষা সরলতর জীবনযাপন করতো, আধা-সন্ন্যাসীর মতো। অনেকেই আজীবন ব্রহ্মচারী থাকবার সংকল্প করতো। ভারতের মহানেতা বীর শিবাজীর কথা কর্মীরা ভাবতো। মহারাষ্ট্র গঠন করতে তাঁর অপূর্ব ত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন, বীরত্বের কাহিনী কর্মীরা পাঠ করতো। রাজস্থানের ইতিহাসও পাঠ করানো হত। রাণা প্রতাপের অপূর্ব যুদ্ধকাহিনী এবং কৃচ্ছ্রসাধনের কথা স্মরণ করে 'আত্মোন্নতি' সমিতির সভ্যরাও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, যতদিন না দেশ স্বাধীন হয় ততদিন পর্যন্ত তারাও ভোগবিলাস ত্যাগ করে কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা নিজেদের উপযুক্ত যোদ্ধা করে গড়ে তুলবে। দেহের ও মনের সকল শক্তি, প্রাণের গভীর ভক্তি দেশের জন্য নিয়োগ করবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে ভারতে বিশেষত বাংলা দেশে বিভিন্ন বিপ্লবী সমিতি চালিত ছিল, যেমন—'অনুশীলন', 'যুগান্তর', 'আত্মোন্নতি' ইত্যাদি। সে সমিতিগুলি মোটের উপর পারস্পরিক সহযোগিতায় দেশের স্বাধীনতা আনয়নের কাজ করতো। রিভলবার পিস্তলাদি গোপনে সংগ্রহের জন্য মূল্য দিতে হোত উচিত মূল্যের অনেকগুণ বেশি। জাহাজের নাবিক, চীনা ও কোনও কোনও ফিরিঙ্গির কাছ থেকে রিভলবার, কার্তুজ পাওয়া যেত। বিপ্লবী কর্মীরা বিদেশীদ্রব্য ব্যবহার করতে ঘৃণা বোধ করতো। কিন্তু, বিদেশী পিস্তল, কার্তুজ তাদের কাছে অতি প্রিয় ছিল, কেন না দেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতীত আর কোন উপায় তাদের জানা ছিল না। দেশের শত্রু নিপাত করতে, দেশী হোক, বিদেশী হোক, পিস্তল, কার্তুজের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। সমিতির কর্মীদের নিজস্ব উপার্জন ছিল না বললেই হয়। যারা কিছু উপার্জন করতো তারা অধিকাংশই সমিতির কাজে ব্যয় করতো। দেশের কতিপয় লোকের কাছ থেকে এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যা পাওয়া যেত তাতে পিস্তল, কার্তুজের মূল্যের কিছুই সংকুলান হোত না। তাই স্বদেশী ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহের পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল। দেশের লোকের কাছ থেকে অর্থ লুণ্ঠন করা ছিল অবাঞ্ছনীয়। সরকারের বা বিদেশী ধনিক ব্যবসায়ীর অর্থ লুণ্ঠনই ছিল কাম্য, যেমন খিদিরপুরে বার্ড [illegible]ম্পানীর অর্থ লুণ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সহরে ও গ্রামে দেশের [illegible]লোকের টাকা ও গহনা কিছু কিছু লুণ্ঠিত হোত যার জন্য 'স্বদেশী'

জনসাধারণের নিকট কিছু অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বললে মিথ্যা বলা হয় না।

রসায়ন শাস্ত্রের ছাত্র ছিল বলে লেখককে 'আত্মোন্নতি' সমিতির পক্ষ থেকে চন্দননগরে বোমা-প্রস্তুতির শিক্ষালাভ করতে হয়েছিল। এ বিষয়ে ৺বিপিনদা ব্যবস্থা করেছিলেন। বোমার ক্যাপের বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে লেখককে প্রায় বার দিন যাবৎ অন্ধভাবে কাটাতে হয়। বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ রাখবার ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করবার ভার ছিল নেতাদের উপর। যাঁরা 'আত্মোন্নতি' পরিচালনা করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রধানত ৺বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ৺অনুকূল মুখার্জী ও গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। এটুকু জানা ছিল, ৺যতীন্দ্র মুখার্জী (বাঘা যতীন) ছিলেন সকল দলের মিলিত প্রচেষ্টার সর্বাধিনায়ক।

১৯১৪ সালের অগাস্ট মাসে ইয়োরোপের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হোল। দেশের স্বাধীনতালাভের সুযোগ এসে গেল। জাহাজের নাবিকদের কাছ থেকে যে অস্ত্র সংগ্রহ করা হোত, প্রয়োজনের তুলনায় তার সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। সেই সময়ে এসে গেল 'আত্মোন্নতি' সমিতির দ্বারা রডা কোম্পানীর মজার পিস্তল অপসারণের সুযোগ। পিস্তলগুলি ছিল অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয়। দশটি টোটা একসঙ্গে ক্লিপে লাগান যেত, খাপটি পিছনে সংলগ্ন করে দেড় মাইল রেঞ্জের রাইফেলের কাজ করার জন্য পুরা ব্যবস্থা ছিল, সংখ্যায় ছিল পঞ্চাশটি পিস্তল ও পঞ্চাশ সহস্র রাউণ্ড এ্যামুনিশন বুলেট। 'আত্মোন্নতি'র বৈপ্লবিক কর্মে এটি একটি গৌরবময় ঘটনা—যা শোনা ও যা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তার কিছু এখানে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না।

যাঁর নাম আগেই করা হয়েছে, শ্রীহাবু বা শ্রীশ মিত্র ছিলেন মলঙ্গাপল্লীর যুবক ৺অনুকূল মুখার্জী ও ৺কালিদাস বোসের স্বদেশী-শিষ্য। প্রধানত কালিদাসবাবুর পরামর্শক্রমে শ্রীশবাবু রডা কোম্পানীতে জেটি সরকারের কর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সে সময়ে জার্মানীর প্রস্তুত কিছু মজার পিস্তল ও কার্তুজের আমদানী হয়েছিল কাশ্মীর বা তিব্বত গভর্নমেন্টের জন্য। তার মধ্য থেকে কতকগুলি পিস্তল ও কার্তুজের বাক্স, বন্দর থেকে নিয়ে আসবার পথে শ্রীশবাবু রডা কোম্পানীর গুদামে ডেলিভারী না দিয়ে মলঙ্গা লেনের পল্লীতে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী কান্তি মুখার্জীর লৌহ রাখবার প্রাঙ্গণে নিয়ে আসেন। পথে 'আত্মোন্নতি' সমিতির কয়েকজন বিপ্লবী-কর্মী—যাঁরা সশস্ত্র হয়ে পাহারা দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের নামগুলি শোনা গিয়েছিল—তাঁরা হলেন ৺কালিদাস বোস, দুর্গা পিতুরী লেনের ৺কালিচরণ দত্ত ও শ্রীহরিদাস দত্ত। পরে সেই সব মাল মলঙ্গাপল্লী থেকে বৌবাজার হিদারাম ব্যানার্জী লেনের সংলগ্ন জেলেপাড়া লেনে আনা হয়। ৺বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর নির্দেশে লেখক সার্পেন্টাইন লেনের শ্রীবসন্ত দাস ও ডিক্সন লেনের শ্রীজগৎ গুপ্তকে নিয়ে কুলির ছদ্মবেশে সেই সব বাক্স বহন করে ৺ভুজঙ্গ ধরের বাড়িতে নিয়ে যান। রাত্রে বাক্সগুলি ভেঙ্গে মাল বাহির করে নেতাদের নির্দেশমত তাঁদেরই প্রেরিত কতকগুলি স্টীল ট্রাঙ্কে ভর্তি করে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়। প্যাকিং বাক্সগুলি, তেলা কাগজ ও প্যাকিং-এর উড্ উল ইত্যাদি পুড়িয়ে সাফ করে লেখক গভীর রাত্রে নিজ বাড়িতে ফিরে আসে। 'আত্মোন্নতির' বিশিষ্ট সভ্য ৺ভুজঙ্গ ধর, ৺কালিদাস বোস, ৺নরেন্দ্র ব্যানার্জী ও শ্রীহরিদাস দত্তের কারাদণ্ড হয়। লেখকের বাড়িও খানাতল্লাসী হয় ও কিছুকাল হাজতবাসের পর লেখক প্রমাণাভাবে মুক্তি পায়। এই ঘটনার আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা কারুর জানা আছে কি না বলা যায় না, যিনি যতটুকু করেছিলেন তাঁর ততটুকুই জানা আছে। কিন্তু এই মজার পিস্তল সংগ্রহের দ্বারা বিপ্লবীদের মধ্যে অস্ত্রশক্তি বর্ধিত হয়। বড়বাজারে শিবঠাকুর লেনে এক গুদাম থেকে পুলিশ কিছু কার্তুজ হস্তগত করতে সক্ষম হয়েছিল, নচেৎ প্রায় সমস্ত মাল সে সময় পুলিশ কর্তৃক অনাবিষ্কৃত ছিল। কারুর কাছ হতে কোনও স্বীকারোক্তি পুলিশ আদায় করতে পারে নি এবং এই কার্যলিপ্ত অন্যান্য কর্মীরা ধরা পড়েন নি। বালেশ্বরের মহাবিপ্লবী নামক ৺যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, ৺চিত্তপ্রিয় ইত্যাদি বীরগণ যে পুলিশের বিরুদ্ধে বুড়িবালাম নদীর তীরে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, তাতে এই মজার পিস্তল ব্যবহৃত হয়েছিল। অনেক কাল পরে ৺সূর্য সেনের বা মাস্টারদা'র নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনেও এই মজার পিস্তল ব্যবহৃত হয়েছিল।

ইয়োরোপের প্রথম মহাযুদ্ধ তখন পুরাদমে চলেছে এবং জার্মানী জয়লাভ করছে। শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নয় ইয়োরোপ ও আমেরিকাতেও ভারতীয় বিপ্লবীদল গঠিত হয়েছিল। এমন দিনে বিপিনদা'র কাছে গুপ্ত সংবাদ পেলাম যে, জার্মানী থেকে জাহাজ ভর্তি যুদ্ধাস্ত্র আমদানী হচ্ছে এবং সে সব অস্ত্র বিপ্লবীরা গ্রহণ করে বৃটিশ উচ্ছেদের জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ সুরু করবে। ৺বিপিন গাঙ্গুলী লেখককে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন; অস্ত্র পাওয়া গেলে ভারতব্যাপী যে অভ্যুত্থান হবে, ঠিক হয়েছিল যে বিপিনবাবু ও সহযোগী শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষের নেতৃত্বে 'আত্মোন্নতি' ও 'যুগান্তরের' কর্মীরা ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করবে। মজার পিস্তল নিয়ে কর্মীরা নির্জন প্রান্তরে স্যুটিং অভ্যাস করত। সে সময়ে ফোর্টে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা ছিল অল্প।

কিন্তু অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ ভারতে পৌঁছাল না। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে যারা দেশে বিপ্লব ও অভ্যুত্থান হলে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল, তারও কিছুই হল না। আশার স্বপন ভেঙ্গে গেল। ১৯১৫-১৬ সালে 'আত্মোন্নতি' ও অন্যান্য সমিতির বহু বিপ্লবী কর্মীর বাড়ি খানাতল্লাসী হল। ডিফেন্স অ্যাক্ট এ এবং ১৮১৮ সালে তিন নম্বর রেগুলেসনে ব্যাপকভাবে অনেকে কারাগারে ও অন্তরীণে আবদ্ধ হলেন। ৺বিপিন গাঙ্গুলী তখন কারাগারে। অন্তরীণ অবস্থায় লেখক যখন কুতুবদিয়া দ্বীপে বন্দী ছিল সেখানে 'আত্মোন্নতি'র অনেকগুলি বিপ্লবীকে রাখা হয়েছিল। কলিকাতার বৌবাজারের ৺কালি দত্ত, বরাহনগরের ৺খগেন চ্যাটার্জি, ৺পার্বতী মুখার্জি, বড়বাজারের মাড়োয়ারী যুবক শ্রীকানাহাইয়ালাল ইত্যাদি 'আত্মোন্নতি'র কর্মীরা অন্তরীণ ছিলেন। পরে যখন লেখক হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ছিল, তখন 'আত্মোন্নতি'র নেতাদের মধ্যে সহবন্দী ছিলেন প্রফেসর ৺প্রভাস দে, ৺হরিশ সিকদার প্রভৃতি। 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' সমিতির অনেকে সেখানে বন্দী ছিলেন; যেমন সর্বশ্রী সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অরুণ গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, নলিনী গুহ, যোগেন দে-সরকার, সুধীন বোস, অন্নদা মজুমদার ইত্যাদি।

'আত্মোন্নতি' বৈপ্লবিক সমিতির ইতিকথা

'আত্মোন্নতি' কর্তৃক দেশের শত্রুনিপাত যা হয়েছিল তার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পুলিশ অফিসার নন্দ ব্যানার্জীর হত্যা, বৌবাজারের সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের (তদানীন্তন সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ার) দক্ষিণ-পশ্চিমে পথের সংযোগস্থলে। নন্দ ব্যানার্জী বাংলার তথা ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের শহীদ প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করে, অত্যাশ্চর্য মনোবলে যার জন্য নিজেকে দুইবার গুলী করে ৺প্রফুল্ল চাকী মৃত্যুবরণ করেন। নন্দ ব্যানার্জীকে হত্যা করেন 'আত্মোন্নতি'র ৺শ্রীশ পাল ওরফে নরেন, লেখকের সংকর্মী। তাঁর সহযোগী ছিলেন ব্যাটরানিবাসী শ্রীরণেন গাঙ্গুলী। দ্বিতীয় হত্যা যা স্মরণে আসে তা হোল আগরপাড়াবাসী দেশদ্রোহী মুরারি মিত্রের, যার জন্য ৺বিপিন গাঙ্গুলী ধরা পড়েন। মলঙ্গা পল্লীতে ৺গিরীন্দ্র ব্যানার্জীর বাড়িতে বসে লেখকের উপস্থিতিতে পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় এবং নন্দ ব্যানার্জীর হত্যাকারী শ্রীশ পাল একাই মুরারি মিত্রের বাড়িতে গিয়ে তাকে হত্যা করে আসে।

যুদ্ধ অবসানের পর ১৯১৯ সালের শেষে আমরা যখন কারাগারের বাইরে আসি তখন দেশে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের পরিচালনায় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে বিপ্লবী-কর্মীরা অনেকেই কংগ্রেসে যোগ দেন। তখন বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে 'আত্মোন্নতি'র পৃথক সত্তা আর কিছুই রইলো না। অন্যান্য বিপ্লবী দলের ন্যায় 'আত্মোন্নতি'র অনেক কর্মী মনে-প্রাণে অহিংস অসহযোগ মেনে নিলেন, আবার অনেকে ভাবলেন যে, সশস্ত্র ও অহিংস,—সকল উপায়েই দেশের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করা যায়। কেউ কেউ সশস্ত্র বিপ্লবের পথ একমাত্র পথ রূপে বেছে নিলেন। এর পর 'আত্মোন্নতি'র পুরাতন কর্মীরা যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য কর্ম করতে লাগলেন, তা ঠিক 'আত্মোন্নতি' সমিতির সদস্যরূপে নয়। 'আত্মোন্নতি' সমিতি তখন কংগ্রেসের দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের মধ্যে বিলীন হয়েছে।

মানুষের শত্রু 'ভয়'

ভয় মানুষের চরম ও পরম শত্রু, 'ভয়েই আধমরা হয়ে রয়েছি', একথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি। আর প্রকৃতপক্ষে কারণে বা অকারণে প্রায় সর্বদাই আশঙ্কাকে আমন্ত্রণ করে আনি মনে। ভয় মনকে অধিকার করলে মানুষ বাঁচার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়, নির্ভীক বা নিঃশঙ্ক না হলে বেঁচেও মরে থাকে মানুষ। একথা অবশ্য ঠিক যে, বর্তমান যুগে মানুষের চিত্ত শঙ্কাকুল হয়ে ওঠার সম্যক কারণ বর্তমান দুনিয়ার যা হালচাল তাতে সুস্থমনে শান্তিতে বসবাস করার কথা প্রায় ভুলতেই বসেছে মানুষ; রাজনৈতিক ঠাণ্ডা লড়াই, মারাত্মক পারমাণবিক আবিষ্কারসমূহ, স্বার্থের সংঘাতরূপ ইত্যাদির চাপে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী প্রায় বিধ্বস্ত কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঁচবার জন্য অভীমন্ত্রের সাধন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমরা যদি নিজেদের চিন্তাধারাকে একটু পরিবর্তিত করে নিতে পারি তা হলেই দেখব অনেক সুখে, অনেক স্বস্তিতে বাস করতে সক্ষম হচ্ছি। মানুষমাত্রই মরণশীল, আর মৃত্যুও একবারই আসে, এই মহা সত্যকে সহজে স্বীকার করে নিতে পারলেই প্রতিমুহূর্তে মরার যন্ত্রণা থেকে মানুষ রেহাই পেতে পারে, 'ভীরু মৃত্যুর আগে শতবার মরে', এই প্রবাদ বাক্যটি বর্ণে বর্ণে সত্য, বাস্তবিকই ভয়ের তাড়নাকে জীবনভোর যারা ভোগ করে যায়, একটি মুহূর্তের জন্যও সত্যকার জীবনের স্বাদ কি তারা পেতে পারে? আমার এক পরিচিত ব্যক্তি একদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করেই জানালেন যে, তাঁর মনে হচ্ছে সেদিন তাঁর কপালে কোন অঘটন ঘটা নিশ্চিতপ্রায়, অহেতুক আশঙ্কায় সেদিন প্রতিমুহূর্ত যে যাতনা তিনি ভোগ করলেন তার তুলনা কোথায়, অবশ্য শেষ পর্যন্ত কিছুই ঘটল না শুধু তাঁর জীবনের মাপা দিনগুলি থেকে একটি সোনায়-রাঙা দিন সার্থকতার বদলে ব্যর্থতার কালি মেখে চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে গেল। আমেরিকার প্রাক্তন বিখ্যাত রাষ্ট্রপতি 'ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট' বললেন, 'আমাদের ভয়কেই শুধু ভয় করা উচিত', 'অজানা, অচেনা, অদেখা বিপদকে ভয় করে করে আমরা যেন মনুষ্যত্বের অবমাননা না করি'। মানুষে যে কতরকম আশঙ্কাকেই না লালন করে বাড়িয়ে তুলছে নিয়ত, যুদ্ধভীতি আজকের দিনে অবশ্য একটা সর্বজনীন আর একথাও অনস্বীকার্য যে এ ভয়ের পেছনে অন্তত কিছুটা যুক্তি আছে। আমাদের মধ্যে অনেকেরই যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ভীতিকে এতটা প্রশ্রয় দেওয়ারই বা কি আছে? এমনও তো হতে পারে যে মানুষের শুভবুদ্ধিই পরিণামে জয়ী হয়ে চিরতরে মানব সমাজকে রাহুমুক্ত করে আনবে। মানুষই যুদ্ধের আমদানী করেছে একদিন, আবার হয়ত একদিন এই মানুষই যুদ্ধ, কাটাকাটি, হানাহানির উপর সমাপ্তির দাঁড়ি টেনে দেবে। অতএব অহেতুক ভয়ে চিত্তকে পীড়িত না করে বরং নিজের নিজের কর্তব্য অবিচলিতভাবে পালন করে যাওয়াই সমুচিত কাজ। কয়েক বছর আগে শত্রুদ্বারা অবরুদ্ধ কোন এক শহরে একটি পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার, বোমার আঘাতে বিধ্বস্তপ্রায় সেই গৃহের স্নানের ঘরটি ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, দেখলাম সেই অপরিসর কক্ষে খাওয়ার জন্য একটি ছোট টেবিল পাতা রয়েছে, দুগ্ধশুভ্র আবরণ তার উপর, মাঝখানে সুন্দর একটি ফুলদানীতে অম্লান পুষ্পগুচ্ছ অবধি শোভা পাচ্ছে; গৃহিণী বললেন, 'জানি হয়ত আমরা এই মুহূর্তেই বোমার আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব, কিন্তু এখনও তো বেঁচে আছি, আর যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ বরাবর যেভাবে চলেছি সেইভাবেই চলব'। আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদি আরও কত রকমের আতঙ্কেই না বিচলিত হই আমরা কিন্তু এ সবের হাত থেকেই তো পরিত্রাণ আছে, সব অশুভেরই তো শেষ হয় কখনও না কখনও তবে বৃথা চিন্তা করে মনকে অবসন্ন করে লাভ কি? মনস্থির রাখতে পারলে যে কোন বিপদকেই অতিক্রম করা যায়, এজন্যই হিন্দুর শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ 'গীতায়' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে হৃদয়দৌর্বল্য পরিহার করতে বারবার উপদেশ দিয়েছেন। আতঙ্ক একবার মনে শিকড় গাড়লে মানুষ আর কোন কাজেই সফল হতে পারে না, দ্বিধাগ্রস্ত কুণ্ঠিত মন নিয়ে যে কাজেই অগ্রসর হয় তাতেই ব্যর্থতা বরণ করে, আবার মন দৃঢ় থাকলে যে অসম্ভবও সম্ভব হয় তারও দৃষ্টান্ত আছে ভূরি ভূরি। অতএব বৃথা শঙ্কায় জীবনের পথ চলা আমরা যেন কণ্টকাকীর্ণ না করে তুলি। কবিগুরুর ভাষায় যেন বলতে পারি,—

'জীবন মৃত্যু, পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।'

একটি প্রসিদ্ধ শিশু-অপহরণ কাহিনী

কুন্তলা দত্ত

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বিমানে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠে কর্নেল লিণ্ডবার্গ দেখলেন খ্যাতিরও বিড়ম্বনা আছে। দিনরাতই লোক আর লোক আর হৈ-চৈ। ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা বলে কিছুই আর তাঁর থাকছে না।

নিরিবিলিতে শান্তিতে বাস করবেন বলে লিণ্ডবার্গ অবশেষে নিউ জারসীর হোপওয়েলের কাছে একটু জনবিরল জায়গায় একটা বাড়ি করলেন। ১৯৩২ সাল সেটা। কিন্তু শান্তি তাঁর কপালে ছিল না।

১লা মার্চ রাত্রে লিণ্ডবার্গ গৃহিণী যখন শুতে যাবার জোগাড় করছেন হঠাৎ নার্স বেটি ছুটে এল—'খোকাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

খোকা হল লিণ্ডবার্গ-দম্পতীর একবছর আটমাস বয়েসের ছেলে।

নার্সের কথা শুনে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ছুটে গেলেন খোকার ঘরে।

শয্যা শূন্য! বালিশের ওপর শিশুর মাথা রাখার দরুণ অগভীর গর্ত দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, শিশু কিছুক্ষণ আগেও বালিশে মাথা দিয়ে শুয়েছিল।

ব্যাপার বুঝতে চার্লস লিণ্ডবার্গের দেরি হল না। স্ত্রীর দিকে ফিরে ভগ্নকণ্ঠে তিনি বললেন—'এ্যান, খোকাকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে।'

অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে চুরি করে নিয়ে গিয়ে মোটা মুক্তিপণ দাবী করার ঘটনা আমেরিকায় মোটেই বিরল নয়। লিণ্ডবার্গ তখন অগাধ অর্থের মালিক। তাঁর স্ত্রী-ও বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী।

কর্নেল লিণ্ডবার্গ তৎক্ষণাৎ স্থানীয় এবং রাজ্য পুলিশকে খবর দিলেন। তাঁর ব্যবহারজীবীকে খবর দিলেন। তারপর রাইফেল নিয়ে মোটরের হেডলাইটের আলোয় বাড়ির চারধারে বৃথাই খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন।

পুলিশ এলো। ভাল করে অকুস্থল পরীক্ষা করে বোঝা গেল কাঠের মই-এর সাহায্যে কেউ দোতলায় শিশুর ঘরের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে ওকে চুরি করেছে। ভাঙা মইটাও পাওয়া গেল। লিণ্ডবার্গের মনে পড়ল যে শিশুর নিখোঁজ হওয়ার কথা জানার কিছুক্ষণ আগে তিনি একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনেছিলেন যেন কাঠের কিছু একটা ভাঙার শব্দের মত। কান পেতে আর কিছু শুনতে না পেয়ে শেষে তিনি ভেবেছিলেন ও কিছু নয়। জানালা চাড় দিয়ে খোলার একটা যন্ত্রও পাওয়া গেল। একটা চিঠির খাম শিশুর ঘরে পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশ না আসা পর্যন্ত লিণ্ডবার্গ সেটি কাউকে স্পর্শ করতে দেন নি। হয় তো অপরাধীর আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে এ থেকে। আঙুলের ছাপ কিন্তু পাওয়া গেল না। তখন চিঠিটি খোলা হল। যা ভাবা গিয়েছিল তাই। চিঠিতে পঞ্চাশ হাজার ডলার দাবী করে জানানো হয়েছে যে শিশু নিরাপদেই আছে। পুলিশে বা সংবাদপত্রে যেন কিছু জানানো না হয়। দু'চার দিন পর টাকাটা কোথায় দিতে হবে, সেটা জানানো হবে।

টাকার জন্য অসুবিধা ছিল না। লিণ্ডবার্গ স্থির করলেন যে, তিনি অপহারকদের নির্দেশমতই চলবেন। পুলিশকে তিনি তখনকার মত নিষ্ক্রিয় থাকতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু খবরের কাগজগুলো তৎক্ষণে কাগজ ছেপে ফেলেছে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশময় হৈ-চৈ পড়ে গেল। দুঃসাহসী বীর বৈমানিক লিণ্ডবার্গের শিশুপুত্র অপহৃত হয়েছে। এটা কম উত্তেজনার খবর নয়। লিণ্ডবার্গ পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু উত্তাল জনসমুদ্রের ভিড় ঠেকাতে তাঁকে পুলিশের সাহায্য নিতে হল। তবে তিনি ঘোষণা করলেন যে, অপহারকদের অনুসন্ধানে তিনি পুলিশ লাগাবেন না।

৪ঠা মার্চ অপহারকদের প্রতীক চিহ্নিত আরেকটি চিঠি এল। যেহেতু লিণ্ডবার্গ সব প্রকাশ করে হৈ-চৈ লাগিয়েছেন, সেহেতু সব শান্ত না হলে এবং পুলিশ না চলে গেলে তিনি ছেলে ফিরিয়ে পাবেন না। মুক্তিপণের টাকাও পঞ্চাশ হাজারের জায়গায় সত্তর হাজার দাবী করা হল চিঠিতে। চিঠি ইংরাজীতে লেখা হলেও তাতে কয়েকটি জার্মান শব্দ এবং ভুল বানান দেখা গেল। অবশ্য এগুলো আত্ম-গোপনের জন্যও করা হতে পারে।

৮ই মার্চ সংবাদপত্রে একটি চিঠি বের হল। জন এফ কণ্ডন বলে এক বৃদ্ধ শিক্ষক জানালেন যে, একটি মা যাতে তাঁর হারানো ছেলেকে ফিরে পান, সেজন্য তিনি তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় এক হাজার ডলার অপহারকদের দিতে এবং অপহারকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে প্রস্তুত।

পরদিনই জন কণ্ডন অপহারকদের কাছ থেকে চিঠি পেলেন এবং লিণ্ডবার্গকে জানালেন। লিণ্ডবার্গের সম্মতি নিয়ে তিনিই লিণ্ডবার্গ ও অপহারকদের মধ্যস্থরূপে কাজ করতে লাগলেন। অপহারকরা প্রয়োজনমত চিঠিতে এবং ফোনে তাঁকে নির্দেশ দিতে লাগল। তাদের নির্দেশানুযায়ী ডঃ কণ্ডন রাত্রে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে একটি লোকের দেখা পেলেন। সে জানাল তার নাম জন এবং সে দলের একজন লোকমাত্র। আরো পাঁচজন লোক দলে আছে। তারাই যে শিশুর অপহারক সে বিষয়ে জন কিছু প্রমাণ দিল এবং শিশুর পরনে যে পোষাক ছিল সেটি ডাকে তাঁকে পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। জন সর্বাঙ্গ যথাসাধ্য ঢেকে রেখেছিল যাতে তাকে ভাল করে দেখা না যায়। কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ভয় পেয়ে সে ছুট দিলে ডঃ কণ্ডনও তার পেছন পেছন ছুটে গিয়ে তাকে আশ্বস্ত করার সময় তাকে ভাল করে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শিশুর পোষাকটি অপহারকরা পাঠিয়ে দিল। তখন লিণ্ডবার্গ অপহারকদের প্রার্থিত অর্থ দিতে প্রস্তুত হলেন। এর মধ্যে কার্টিস বলে একটি লোক জানাল যে অপহারকরা তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। এতে লিণ্ডবার্গ কিছুটা বিভ্রান্ত হলেন এবং সময়ও নষ্ট হল। অবশেষে অপহারকরা স্থান নির্দেশ করে ডঃ কণ্ডনকে চিঠি দিলে এবং তাড়াতাড়ি করবার দাবী জানাল।

লিণ্ডবার্গ টাকা আনতে গেলে কোষাগার কর্তৃপক্ষ নোটগুলোর নম্বর রাখতে চাইলে লিণ্ডবার্গ আপত্তি করলেন। এটা জানতে পারলে হয় তো অপহারকরা ক্রুদ্ধ হয়ে শিশুর অনিষ্ট করবে বা ভীত হয়ে শিশুকে ফিরিয়ে দেবার ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক হবে ভেবে তাঁর পিতৃহৃদয় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কোষাগার কর্তৃপক্ষ পীড়াপীড়ি করায় তিনি মত দিতে বাধ্য হলেন কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও বন্ধুবান্ধবরা টাকা দেবার সময় পুলিশ রাখার এবং অপহারকদের ধরে ফেলার যে পরামর্শ দিলেন তা তিনি সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন। তা কিছুতেই হতে পারে না।

জনের নির্দেশমত একটি কবরখানার পাশে গিয়ে লিণ্ডবার্গকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে ডঃ কণ্ডন নেমে গেলেন। জন উপস্থিত ছিল। কণ্ডন বললেন যে—সত্তর হাজার জোগাড় করা যায় নি পঞ্চাশ হাজার আনা হয়েছে। তবে ছেলেকে কোথায় পাব সেটা আগে লিখে না জানালে টাকা হবে না। জন তাতেই রাজী হল। কণ্ডন লিণ্ডবার্গকে এসে জানালেন যে জন পঞ্চাশ হাজারেই রাজী হয়ে গেছে। লিণ্ডবার্গ ধন্যবাদ দিয়ে বিশ হাজার ডলারের বাক্সটা রেখে পঞ্চাশ হাজার ডলারের বাক্সটা কণ্ডনের হাতে তুলে দিলেন। সেটা পেয়ে জন একটা খাম দিল এবং বলল ছ' ঘণ্টার আগে যেন সেটা খোলা না হয়।

কিন্তু লিণ্ডবার্গের কাছে এসে ডঃ কণ্ডন বললেন যে লিণ্ডবার্গ তো কোনো কথা দেন নি, কথা দিয়েছেন তিনি সুতরাং লিণ্ডবার্গ চিঠিটা খুলে ফেলুন। বলা যায় না, যদি জন ফাঁকি দেয়, চিঠিতে যদি শিশুর কথা কিছু না থাকে তবে ছ' ঘণ্টা সময় শুধু শুধু নষ্ট হবে। সুতরাং লিণ্ডবার্গ চিঠি খুলে ফেললেন। জন ফাঁকি দেয় নি। স্থান নির্দেশ করে লেখা ছিল একটা নৌকোয় শিশুকে পাওয়া যাবে।

ছ' ঘণ্টা পর বৈমানিক সি-প্লেনে (যে প্লেন জলে ভাসে) ঐ স্থানে গেলেন। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও নৌকো বা শিশুর কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরে লিণ্ডবার্গ দেখলেন একমাস পর সেদিন তাঁর শিশুপুত্রের ঘরে আলো জ্বলেছে। মা অপহৃত-পুত্রকে কোলে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। লিণ্ডবার্গ স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বললেন—দেরি হতে পারে তবে ছেলেকে ফিরে পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

কণ্ডন আবার অপহারকদের উদ্দেশে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন যে ছেলে পাওয়া যায় নি। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন লিণ্ডবার্গ যথাকর্তব্য করতে প্রস্তুত হলেন। প্রথমে কোষাগার থেকে লিণ্ডবার্গ কর্তৃক মুক্তিপণের টাকা হিসেবে জনকে প্রদত্ত গোল্ড-নোটগুলোর নম্বর যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রত্যেক ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেওয়া হল। লিণ্ডবার্গ তখনো ছেলে ফিরে পাবার আশা ছাড়েন নি, তাই তিনি এ প্রসঙ্গে তাঁর নামটা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন পাছে অপহারকরা সন্দেহ করে যে তিনি পুলিশ লাগিয়েছেন। কিন্তু সেটা গোপন রাখা গেল না। তখন লিণ্ডবার্গ একটি বিবৃতিতে জানালেন যে, তিনি টাকা দেওয়া সত্ত্বেও অপহারকরা শিশুটিকে ফিরিয়ে দেয় নি। সেদিন ৯ই এপ্রিল।

এর মধ্যে কার্টিস বলে লোকটি জানালো যে অপহারকরা তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। তার কথায় বিশ্বাস করে লিণ্ডবার্গ নির্দিষ্ট স্থানে গেলেন কিন্তু কারো পাত্তা নেই। আবার কার্টিস বলল অপহারকরা অন্য জায়গায় সন্ধান করতে বলেছে। সে দিন আবার আবহাওয়া খারাপ। এভাবে ১২ই মে পর্যন্ত আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে হতভাগ্য পিতা পুত্রের সন্ধানে ইতস্তত তোলপাড় করে বেড়ালেন।

অবশেষে উইলিয়াম এলেন বলে একটি লোক দৈবক্রমে পচাপাতা ও মাটিতে ঢাকা একটি শিশুর বিকৃত শবদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দিল। খবর পেয়ে লিণ্ডবার্গ এলেন। তাঁর মুখে রক্তোচ্ছাস। ধৈর্য ও সংযম সহকারে দেহটি পরীক্ষা করে তিনি বললেন—'এটি আমারই ছেলে।'

পরে প্রকাশ পেয়েছিল যে, অপহারক যখন শিশুকে চুরি করে মই বয়ে নামছিল তখন মই ভেঙে পড়ে যাওয়ায় শিশু যে আঘাত পায় তাতেই তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটে। অপহারক প্রথম থেকেই জানত সে লিণ্ডবার্গকে ধোঁকা দিচ্ছে। ছেলে সে ফিরিয়ে দেবে না।

মিসেস লিণ্ডবার্গ তখন অন্তঃসত্ত্বা।

নিউ জারসী স্টেট পুলিশ উঠে-পড়ে লাগল অপরাধীকে ধরার জন্যে। এর মধ্যে জানতে পারা গেল যে কার্টিস আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলেছে এবং এভাবে মূল্যবান ক'টি দিনের অপচয় ঘটিয়েছে হতভাগ্য পিতাকে মিথ্যা আশা দিয়ে।

অপহরণের দিন লিণ্ডবার্গ-পরিবারের মিসেস লিণ্ডবার্গের মায়ের কাছে গিয়ে থাকার কথা ছিল। শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ায় যাওয়া হয় নি। কিন্তু এ খবর অপহারকরা পেল কোথেকে? পুলিশ শিশুর মাতামহীর একটি পরিচারিকাকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করে জেরা করতে থাকে। খবরটা কারো কাছে বলেছে বলেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল এবং বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল।

সংবাদপত্রে তুমুল হৈ-চৈ শুরু হল। পুলিশকে প্রচুর গালাগাল দেওয়া হতে লাগল। তারা আসল কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, অসহায় তরুণীকে ভয় খাইয়ে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিতে ওস্তাদ—ইত্যাদি।

কিন্তু সত্যি বলতে কি পুলিশ এই মামলায় অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। আড়াই বৎসরেরও পরে অপরাধী ধরা পড়েছিল। কিন্তু ততদিন পুলিশ বসে থাকে নি। তাদের দু'টি প্রধান সূত্র ছিল মুক্তিপণরূপে প্রদত্ত গোল্ড-নোটগুলোর নম্বর এবং কাঠের ভাঙা মইটি। এরই সাহায্যে তারা আটঘাট বাঁধছিল। নম্বরী নোটের অনুসরণ করে তারা অপরাধীর বাসস্থান সম্বন্ধে কতকটা আন্দাজ করতে পেরেছিল এবং সেইসব অঞ্চলে কড়া নজরই শুধু রাখে নি সব পেট্রল পাম্পেও লিণ্ডবার্গপ্রদত্ত নোটের নম্বর জানিয়ে দিয়েছিল যাতে এই নম্বরী নোট পেলেই মালিকের গাড়ির নম্বর রাখা হয়।

কাঠের মইটি পুলিশ আর্থার কোয়েলার বলে একজন কাষ্ঠ-বিশারদকে দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করিয়ে, কি জাতের, কোথায় হয় এমন কি কোন দোকান থেকে কাঠ কেনা হয়েছিল তা পর্যন্ত বের করেছিল। অপরাধী ধরা পড়লে পর এই কাঠের শার্লক হোমস অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে, মইয়ের একটা ধাপের কাঠটি অপরাধীর ঘরের একটি কাঠের থেকে নেওয়া এবং অপরাধীর নিজের একটি যন্ত্রেই কাঠটি কাটা হয়েছে। এভাবে পুলিশ এমন সব সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করেছিল যাতে দীর্ঘদিন পরেও অভিযোগ প্রমাণ করতে অসুবিধা হয় নি।

১৯৩৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর একটি পেট্রল পাম্পে পেট্রল কেনার পর ক্রেতা একটি দশ ডলারের গোল্ড-নোট দিলে ম্যানেজারের মনে পড়ল যে, লিণ্ডবার্গপ্রদত্ত নোটের নম্বরের যে তালিকা পুলিশ বিভাগ থেকে এসেছিল তাতে দশ ডলারের নোটের কথা আছে। দুঃখের বিষয়, তালিকাটি ময়লা হয়ে ছিঁড়ে যাওয়ায় সেটি ফেলে দেওয়া হয়েছে। ম্যানেজার চালককে ভাল করে লক্ষ্য করলেন এবং সে গাড়িতে উঠলে পর গাড়ির নম্বর টুকে রাখলেন।

নোটটাসহ সমস্ত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে গেলে পর দেখা গেল নোটটা সেই লিণ্ডবার্গের মুক্তিপণের নোট। তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর গেল। ম্যানেজারের কাছে নোটের মালিকের চেহারার বর্ণনা শুনে●

পুলিশের উৎসাহীকর্তা যিন্ তার আনন্দ লুকোতে পারলেন না। কণ্ডনপ্রদত্ত বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। এতদিন ধৈর্য ধরে যে অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়েছেন অবশেষে তার ফল মিলল। স্টেট মটর ভেহিকল্ ব্যুরোতে ফোন করে গাড়ির মালিকের নাম-ঠিকানা পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। মুক্তিপণের টাকার একটি মোটা অংশ তার বাড়িতে পাওয়া গেল এবং পাওয়া গেল একটি দূরবীণ যা দিয়ে খুব সম্ভব সে লিণ্ডবার্গের বাড়ির পাশের কোনো জঙ্গল থেকে বাড়ির কে কখন কোথায় থাকে এসব লক্ষ্য করত—যাতে শিশুকে নির্বিঘ্নে চুরি করা সম্ভব হয়। জাতিতে সে জার্মান। নাম তার ব্রুনো রিচার্ড হাউপ্টম্যান। জার্মানীতে পর পর কয়েকটি চুরির অভিযোগে জেল খেটেছে সে। জেল থেকে পালিয়েই সে আমেরিকায় আসে।

হাউপ্টম্যান অবশ্য বলল সে শিশু অপহরণ করে নি। কিন্তু মুক্তিপণের অর্থ তার কাছে এল কি করে—এরও কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারল না।

১৯৩৫-এর জানুয়ারী হাউপ্টম্যানের বিচার শুরু হল। নিউ জারসীর তরুণ এটর্নী-জেনারেল ডেভিড উইলেন্সের এটিই ছিল প্রথম ফৌজদারী মামলা। এই প্রথম মামলাতেই তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

ড: কণ্ডন সাক্ষ্য দিতে উঠে দ্বিধাহীনচিত্তে জানালেন যে, জন বলে যে লোকটি তাঁর সঙ্গে মুক্তিপণ সম্বন্ধে কথা বলতে আসত, সেই যে ব্রুনো রিচার্ড হাউপ্টম্যান এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। অপহৃত শিশুর মৃতদেহ পাওয়া যাবার অব্যবহিত পরে কণ্ডন পুলিশের কাছে জনের চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছিলেন সেটি তাঁকে আবার বলবার অনুরোধ করলেন উইলেন্স। কণ্ডন যখন সেই বর্ণনাটি আবৃত্তি করলেন আদালতের সবাই তাকিয়ে দেখলেন হাউপ্টম্যানের চেহারার সঙ্গে সেটি হুবহু মিলে যাচ্ছে।

হাউপ্টম্যানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন দুর্ধর্ষ আইনব্যবসায়ী এডোয়ার্ড রিলী। রিলী বহু খুনী আসামীকে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে মুক্ত করেছিলেন। এ-হেন দুঁদে আইনজীবীর নির্মম জেরার মুখে দাঁড়িয়েও ড: কণ্ডন একটুও টললেন না।

সরকার পক্ষে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাক্ষী ছিলেন কাষ্ঠ-বিশারদ আর্থার কোয়েলার। সেই ভাঙ্গা কাঠের মইটি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে উঠে কোয়েলার বিভিন্ন তথ্য ও অকাট্য প্রমাণ দাখিল করে দেখালেন যে, মইটি হাউপ্টম্যানের বাড়িতে প্রাপ্ত যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি এবং ঐ বাড়িরই একটি তক্তা থেকে কেটে একটি কাঠও মইয়ে লাগানো হয়েছে। রিলী প্রচণ্ড আক্রমণ করেও এই 'শার্লক হোমসের' সাক্ষ্যকে উড়িয়ে দিতে অক্ষম হলেন। হাউপ্টম্যানের পক্ষে ছাড়া পাওয়া শক্ত হবে এ কথা বুঝতে কারো বাকি রইল না।

রিলী তাঁর সওয়ালে এই শিশু-অপহরণ ব্যাপারটি লিণ্ডবার্গ-পরিবারের পরিচারকবর্গের ওপর চাপাতে চাইলেন। বিশেষ করে শিশুর নার্স বেটি'কে তিনি প্রধান অপরাধী বলে নির্দেশ করলেন। কোয়েলারের সাক্ষ্য উড়িয়ে দেবার জন্য একজন কাষ্ঠবিশারদ আনা হয়েছিল। তিনি আদালতে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছিলেন।

উইলেন্সের জেরার উত্তরে হাউপ্টম্যান বললে সে নির্দোষ। কিন্তু সে যে একাধিকবার মিথ্যে বলেছে তা আদালতে উইলেন্সের জেরায় প্রমাণিত হল। সব শেষে সরকার পক্ষীয় সাক্ষ্যগুলির অকাট্যতা আবার সবার সামনে তুলে ধরার পর হাউপ্টম্যান যে কতবড় মিথ্যাবাদী তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ উপস্থিত করলেন আদালতে।

মুক্তিপণ দাবী করে লেখা চিঠিগুলিতে Signature শব্দটি Singnature বলে লেখা ছিল। হাউপ্টম্যান ধরা পড়ার পর পুলিশ ঐ সব চিঠিতে যে সব বানান ভুল লেখা ছিল সেগুলি এক এক করে তাকে দিয়ে লিখিয়েছিল। বলা বাহুল্য হাউপ্টম্যান সেগুলো ঠিক চিঠির মতই ভুল লিখেছিল। আদালতে রিলীর প্রশ্নের উত্তরে হাউপ্টম্যান বলে যে, পুলিশ তাকে বাধ্য করেছিল Signature শব্দটি Singnature বলে লিখতে। এখন উইলেন্স সেই সমস্ত কাগজের টুকরোগুলি জুরীর হাতে দিয়ে বললেন—'আপনারা দেখুন, এর মধ্যে অনেকগুলো শব্দই আছে কিন্তু Signature শব্দটি নেই, কোথাও নেই আর হাউপ্টম্যান আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছে পুলিশ জোর করে তাকে Singnature লিখতে বাধ্য করেছে!!'

পুলিশ ইচ্ছা করেই Signature শব্দটি বাদ দিয়েছিল। কারণ কাগজে এটা নিয়ে এত আলোচনা হয়েছে যে, হাউপ্টম্যান অবশ্যই ভুলটা জানতে পেরে গেছে সুতরাং ওটা লেখানোর অর্থ হয় না। হাউপ্টম্যান সজ্ঞানে ভুলে গিয়েছিল।

১৩ই ফেব্রুয়ারী রায় বের হল। বিচারক ট্রেন্‌চার্ড মামলাটি বুঝিয়ে দেবার পর সুদীর্ঘ এগারো ঘণ্টা সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করে জুরী রায় দিলেন হাউপ্টম্যানের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।

মামলার শুনানী আরম্ভ হবার আগে থেকেই বাইরে বহুলোক ফ্লেমিংটনে ভিড় করেছিল। হোটেল মাত্র একটিই ছিল। তাতে ৯০০ ঘরের জন্য অনুরোধ এসেছিল, যাতে মামলার সময় ওখানে থাকা যায়। আদালতের বাইরে অপেক্ষমাণ বিরাট জনতা অধৈর্য হয়ে চীৎকার করছিল, 'খুন করে ফেল, শেষ করে দাও হাউপ্টম্যানকে।' রায় বের হতে জনতা আনন্দে চীৎকার করে উঠল।

ট্রেনচার্ড মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেবার সময়ও হাউপ্টম্যান স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পরে সে ভেঙে পড়ল। কখনো কাঁদতে লাগল কখনো ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল 'ছোট ছোট মানুষ, ছোট ছোট কাঠের টুকরো, ছোট ছোট কাগজের টুকরো—'

সম্ভবত শিশু, ভাঙ্গা মই এবং চিঠির কথা তার মনে হচ্ছিল।

হাউপ্টম্যানের বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় কেউ কেউ মনে করলেন, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত হয় নি।

হাউপ্টম্যানের আইনজীবীরা টালবাহানা করে সময় নিলেন, আপীল করলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। ১৯৩৬-এর ১লা এপ্রিল বৈদ্যুতিক চেয়ারে হাউপ্টম্যানকে প্রাণ দিতে হল।

এরপর লিণ্ডবার্গ-দম্পতী তাঁদের দ্বিতীয় পুত্রের সম্বন্ধে শাসিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে লেখা কতকগুলো চিঠি পেলেন। যদিও চিঠিতে 'আমরা' বলে উল্লেখ ছিল, হাউপ্টম্যানের কোনো সঙ্গী এ পাপকার্যে ছিল বলে কিন্তু জানা যায় নি। সুতরাং এ চিঠি তার দলের লোকের লেখা বলেও মনে করা যায় না। সম্ভবত শিশু-অপহারক দুর্বৃত্তদের কেউ ঘটনার বিবরণ জেনে হাউপ্টম্যানের প্রতি সহানুভূতিবশত এ রকম করে থাকবে। তা ছাড়া অন্যান্য কারণেও লিণ্ডবার্গ-দম্পতী বেশ কিছুদিনের জন্য আমেরিকা ছেড়ে ইংলণ্ডে চলে আসেন শান্তিপূর্ণ ও নিরিবিলি জীবনের আশায়।

(শেষাংশ)

সাধন তপাদার

—মনে পড়ল,—হ্যাঁ, সেই মুখটাই তো! ব্রাদার, তারপর কি হয়েছিল আমার মনে নেই, কি করে সে রাতে সিমগাঁয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম তাও বলতে পারব না। এরপর বেশ কিছুদিন কাজকর্মে আমার মন বসে নি। সর্বক্ষণ চিতাওয়ারের ঘটনাটি আমার মাথায় পাক খেয়ে বেড়াত। তারপর একদিন স্টেট্‌সম্যান-এ এক জ্যোতিষীর বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। জ্যোতিষী আমাকে বলেছিলেন যে, শিউচরণের বৌয়ের সংসারের সাধ-আহ্লাদ মেটে নি। তার অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই তার অকালে অপঘাতমৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছিল তোমারই সাহায্যে।

আমি বললাম, এ ত' খুব ভাল কথা, এতে ভয়ের কি আছে।

বুদরি সাহেব বললেন, দাঁড়াও ব্রাদার, আরও আছে। সিনোধা গাঁয়ের মাধো কুর্মিকে আমি জানতাম। ভাল শিকারী ছিল। সেই মাধো কুর্মি বেল্লারিতে শিকার করতে গিয়ে আর ফিরল না। তিন দিন পর ওর গলিত মৃতদেহটা চিতাওয়ারে পাওয়া গেল। কেউ বলল সাপে কেটেছে, কেউ বলল ভয়ে মরেছে। যাতেই সে মরুক কিন্তু চিতাওয়ারে মরেছে এটা ঠিক। এসব অবশ্য পুরনো দিনের কথা। এই কিছুদিন আগে স্যামুয়েল আলফি আর আমার ভগিনীপতি ইয়ং চিতাওয়ার থেকে পালিয়ে এসেছে। ওরা গিয়েছিল ওয়াইল্ড বোর শিকারে। চিতাওয়ারের ঝরণার পাড়ে গর্তে বসে গভীর রাতে শুনল একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ। একটা মানুষের শ্বাসরোধ হতে থাকলে গলা দিয়ে যেমন শব্দ বেরোয় ঠিক ঐ রকম। কেউ যেন কাউকে টুঁটি টিপে মারছে। ইয়ং, আলফি বন্দুক বাগিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিন্তু কিছুই দেখল না। তারা বার বার শুধু শুনল ধুপধাপ করে কারা যেন এদিক-ওদিক দৌড়োয়। শেষে তারা পালিয়ে আসে।

ব্রাদার, তুমি বেল্লারি, মওয়া গাঁ, সিমগাঁয়ে গেলেই জানতে পারবে তুমিও কতলোক কতভাবে ঐ চিতাওয়ারে মরেছে। চিতাওয়ারে মৃত্যু লেগেই আছে। প্রতি বছর দু'টো-একটা লোক সেখানে মরছে। ফাঁসিতে ঝুলে মরছে নয় তো খুন হচ্ছে। কখন ভয়ে মরছে কখন সর্পদংশনে মরছে। তা ছাড়া জন্তু-জানোয়ারে তো মারছেই। একথা সত্যি—গ্রীষ্মকালে চিতাওয়ারের ঝরণায় অসংখ্য জানোয়ার জল খেতে আসে। আর গ্রীষ্মের শেষে এক সময় যখন বেল্লারির মাঝাতালাওয়ের জলও শুকিয়ে যায় তখন বেল্লারির পার্শ্ববর্তী ঘুঘুয়া ও সারোরা জঙ্গলের মধ্যে বা আশেপাশে কোথাও জল থাকে না। জল থাকে শুধু বেল্লারি সীমান্তে চিতাওয়ারের ঝরণায়। সুস্বাদু সুশীতল সে জল। চিতাওয়ারে তখন জানোয়ারের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কিন্তু শিকারী পায় না মারার সুযোগ। বন্দুক ছুড়বার অবসর আর তার হয় না। তার আগেই শিকারীকে নিজের জীবন নিয়ে [illegible]তে হয় নয় তো প্রাণ দিতে হয়। প্রাণ দিয়েছে মাধো কুর্মি, প্রাণ দিয়েছে আরও কতজনে। পালিয়ে এসেছে ইয়ং, আলফি—পালিয়ে এসেছে কত লোকে। তাই বলি ব্রাদার, বেল্লারির আর সব জায়গায় তুমি

মাঝাতালাও

যাও কিন্তু চিতাওয়ারে তুমি যেও না। মিছিমিছি হয়রান হবে, শিকার পাবে না। হয় পালাতে হবে নয় মরবে।

এ পর্যন্ত বলে বুদরি সাহেব একটু থেমে গেলাসের সমস্ত হুইস্কিটুকু নিঃশেষে পান করে শূন্য গেলাসটি হাতে নিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঁধোয়া তালাওয়ের দিকে চেয়ে আবার বলতে লাগলেন। যেন নিজেকেই নিজে শোনাতে লাগলেন—

উঃ, কি ভয়ংকর জায়গা চিতাওয়ার! দিনমানে যে চিতাওয়ার বিচিত্র ছত্রিশগড়ী কলরব হাসিগানে মুখরিত হয়ে থাকে, রাতের অন্ধকারে সেখানে নেমে আসে বিভীষিকা। সূর্যদেব যখন বনের পিছনে হেলে পড়ে চিতাওয়ারের শেষ মনুষ্য-কলরবটা তখন ক্ষীণ হয়ে যায় সিমগাঁয়ের পথে বিশাল অশ্বত্থ গাছটার পিছনে। আর ধীরে ধীরে চিতাওয়ার তার নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে জাগতে থাকে। কটকটে ব্যাঙগুলো কটকট করে চিতাওয়ারের জাগরণ ঘোষণা করে। ঝিঁঝিঁরা একে একে জাগে, ঝিল্লিরবে ঐকতান শুরু করে। ঝরণার মাছেরা মনের আনন্দে আবার খেলা শুরু করে, টুপটাপ শব্দে জলে ছোট ছোট তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এখানে-ওখানে সরসর করে কত কি চলে যায়। রাত বাড়ে আর ঘন বৃক্ষের আড়ালে চিতাওয়ার অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। শুধু নক্ষত্ররাজি বৃক্ষশীর্ষের ফাঁকে ফাঁকে চিতাওয়ারের দিকে তাকিয়ে অতন্দ্র পাহারা দেয়। রোজকারমতো হুমো প্যাঁচাটা থেকে থেকে ডাকে—হুম-হুম! তারপর একসময় রতকোনা প্রান্তর থেকে নেকড়ের ক্রন্দন ভেসে আসে—উঁউঁউঁউঁ! গাঁয়ের লোকেরা বলে অভিশপ্ত চিতাওয়ারের অশরীরীরা এ সময়ে জাগে।

রামসহায়ও ধৃত বনো-শূয়োরের বাচ্চা

সেদিন অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম। ঘুরে-ফিরে চিতাওয়ারের কথাই মনে পড়ছিল। গভীর রাতে স্বপ্নে দেখলাম চিতাওয়ারের অশরীরীরা আমাকে ঘিরে নাচছে। আতংকে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি ঘেমে নেয়ে উঠেছি।

বিংশ শতাব্দীর যুবক, বিশেষ বিজ্ঞান-চর্চা না করেও যুগপ্রভাবে কিছুটা বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন। দিনে দিনে বিজ্ঞান চরমে উঠছে। বিধ্বংসী এটম, হাইড্রোজেন বম মানুষের করায়ত্ত, দেবাদিদেব মহাদেবের বাসস্থান কাঞ্চনজংঘা বেদখল করে তারা তখন চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছে। সর্বত্র মানুষের জয়-জয়কার। এসব দেখেশুনে বুদরি সাহেবের কাহিনী বিশ্বাস করতে মন চায় না, অশরীরী বিশ্বাস করি না, কোন কালেই করি না। কিন্তু অশরীরীর ভয় যে একেবারেই নেই তাও বলি না। তবে কয়েকদিন ধরে অনুভব করছি বেল্লারি আমাকে টানছে, বিপুল বিক্রমে টানছে।

তারপর বৈশাখ শেষে একদিন দুপুরে বিলাসপুর-রায়পুর লাইনে হাতবন্দ স্টেশনে এসে নামলাম। স্টেশন পোর্টার রামসহায়কে সঙ্গে নিয়ে জনহীন রতকোনা প্রান্তর পেরিয়ে উত্তর-দক্ষিণ সমান্তরালে বেল্লারির ধূলিধূসর বনরেখা দেখলাম—রৌদ্রালোকে ঘুমিয়ে আছে। বনমধ্যে কোথাও একটা দাবানল থেকে কুণ্ডলীকৃত ধূম উদগিরণ হচ্ছে। রতকোনা প্রান্তরের প্রবহমান উত্তপ্ত উন্মত্ত বায়ুপ্রবাহ সে ধূমশিখাকে এলোমেলো করে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কি নিষ্করুণ ভয়াল সে সৌন্দর্য! সে শুধু উপলব্ধিই করা যায় প্রকাশ করা যায় না।

এ জঙ্গল রামসহায়ের নখদর্পণে। সে আমাকে নিপুণ পদবিক্ষেপে পথ দেখিয়ে সন্ধ্যার আগেই বনের গভীরে মাঝাতালাওয়ে নিয়ে এল। ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে পাড়ের ওপর উঠে দাঁড়াতেই একপাল কৃষ্ণসার হরিণের মুখোমুখি হয়ে পড়লাম। জলে মুখ দিয়েও তাদের জল খাওয়া হল না, মুহূর্তে সব চারদিকে ছিটকে পালাল।

রামসহায় আপশোসে শিরে করাঘাত করে বলল, হায় ভগওয়ান, কিতনা বড়া বড়া কারসাইল (শিঙেল কৃষ্ণসার)।

আমি ঢাল বেয়ে নেমে জলার চারপাড় ঘুরে দেখলাম। দেখলাম মাঝাতালাওয়ের জলও দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে। জলার পাড়ে পাড়ে কচি ঘাস গজাচ্ছে। বেল্লারির আর সর্বত্র জল শুকিয়ে গেছে, ঘাস পুড়ে যাচ্ছে—বুধুয়া আর সারোবার জঙ্গলে দুর্ভিক্ষের হাহাকার, শুধু মাঝাতালাও এই কচি ঘাস আর জল নিয়ে লঙ্গরখানা খুলে বসেছে। শত শত হরিণ আর বুনো-শূয়োরের ক্ষুরে মাঝাতালাওয়ের চারপাড় চিহ্নিত হয়ে আছে। কোথাও বুনো-শূয়োর ভূমিকর্ষণ করেছে কোথাও কাদায় গড়িয়েছে। পাড়ে পাড়ে ছড়িয়ে হরিণের বিষ্ঠা।

গর্ত খুঁড়তে হল না। জলার পশ্চিম পাড়ে একটা কড়ি গাছের নীচে গর্ত একটা খোঁড়াই ছিল সেটা দখল করলাম। চারিদিকে রক্তলাল শিমুল আর পলাশ ফুলের শোভা দেখে আর অশ্রান্ত ঘুঘুর ডাক শুনতে-শুনতে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলাম। হঠাৎ টিটিভ পাখির তীব্র চিৎকারে ধ্যান ভাঙতেই দেখি, বনভূমি অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। আমাদের পিছনে কোথাও কতকগুলো চিত্রল হরিণ ডাকছে—টিউউ! টিউউ!

আমি পিছন ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। ও কি! গাছের ফাঁকে ফাঁকে লাল আভা! লালে লাল পশ্চিম আকাশ! ভাবছি

অনেকক্ষণ সূর্য অস্ত হয়েছে আকাশ এত লাল কেন! রামসহায়কে দেখালাম।

সে দেখেই বলল, হায় ভগওয়ান্, সত্যনাশ হো গিয়া! সারোয়ার ঘাসবনে আগুন লেগেছে হুজুর। দুনিয়াভর্ ঘাস জ্বলে যাচ্ছে হুজুর! কি হবে!

বললাম, ঘাসবনে আগুন লেগেছে তো কি হয়েছে?

রামসহায় বলল, গাঁয়ের গরু-ভয়েষ খাবে কি হুজুর! আবাদি জঙ্গলে কোন চরাগ নেই (গরু-মোষ চরবার জায়গা) এককাচ্চা ঘাস নেই।

বললাম, কেন বেল্লারি ঘুঘুয়ায় নেই?

রামসহায় বলল, আছে। কিন্তু এসব তো সরকারী জঙ্গল, এখানে গরু-ভয়েষ চরতে দেয় না। উঃ, সারোয়ার কি ঘাস হুজুর! শুধু ঘাসই ঘাস। আর কত হরিণ-শূয়োর—ঘাসের বনে ডুবে নিশ্চিন্তে চরে বেড়ায়। শিকারী গুলী চালাবে কি হুজুর—দেখতেই পায় না। শুধু শোনে সর্সর্-সর্সর্ শব্দে সব চলে যায়। তারপর একটু থেমে বলল, আপনার তকদির বড় ভাল হুজুর। সারোয়ার সমস্ত জানোয়ার আজ বেল্লারি ঘুঘুয়ায় চলে আসবে। আপনার গুলী ফুরোবে তো জানোয়ার ফুরোবে না।

হঠাৎ জলার চারপাশে বিশ্রামরত ব্যাঙেরা একসঙ্গে জলে ঝাঁপাল—শব্দ হল চর্রাৎ!

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামিয়ে ফোকরে চোখ রাখলাম। অন্ধকারে চোখটা একটু সয়ে এলে দেখলাম একপাল হরিণ পুবদিকের ঢাল বেয়ে জল খেতে নামছে।

রামসহায় ফিস-ফিস করে বলল, ডবল ফায়ার করিয়ে হুজুর, দো-চারঠো গিরা দিজিয়ে।

ওর কথায় কান না দিয়ে আমি পাঁচসেলের টর্চটা জ্বালালাম। দেখলাম জলার অর্ধেকটা জুড়ে তৃষ্ণার্ত হরিণেরা নিঃশব্দে জলপান করছে। কৃষ্ণসার, চিত্রল দুই-ই এসেছে। বাতি নিভিয়ে দিলাম। কিছু সন্দেহ করল না ওরা। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল জল খেয়ে তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল।

রামসহায় বড় ক্ষেপে গেল। বুঝি আর সমীহ করতে চায় না। হাত-পা ছুঁড়ে বলল, কেয়া বাবুজী, আপ গোলি নেহি চালাতে হেঁ! ইত্না হরণ—বাপরে বাপ! কেইসান শিকারী আপান হুজুর!

ধমক দিয়ে বললাম, চুপ থাক জংলী কোথাকার! সারাদিনের পর পিপাসার্ত হরিণেরা জল খেতে এসেছে, ওদের মেরে বাহাদুরী না করলেও চলবে! হরিণ যখন মারবার আমি ঠিকই মারব।

রামসহায় বলল, তা হলে হুজুর আর এখানে বসে থেকে কি হবে?

বললাম, কেন, শূয়োর মারব।

সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দিল, ওরাও তো জল খেতে আসবে।

বললাম, তা হলেও মারব। ওরা হিংস্র শত্রু। ওরা আমাদের অশেষ ক্ষতি করে। ফসলের সময়ে একটা হরিণ যত ফসল খায় তার বিশগুণ খায় একটা শূয়োরে। আবার একটা হরিণ বছরে যখন একটা বাচ্চা দেয়, একটা শূয়োরে দেয় দশ থেকে ষোলোটা। নিরীহ-নির্জীব হরিণগুলোকে মেরে মেরে সাবড়ে দিল লোকে, আর ওদিকে দুর্ধর্ষ দুর্দম বুনো-শূয়োরগুলো পরম নিশ্চিন্তে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। যে হারে শূয়োর বাড়ছে, বুঝলি, এরপরে জঙ্গলের আশে পাশের গাঁয়ে ঐ শূয়োর নিয়েই মানুষকে ঘর করতে হবে। টের পাবি যখন শূয়োরের সঙ্গে এক হয়ে মাটি খাবি—ফসল তো আর পাবি না।

কথাগুলোর মর্মার্থ রামসহায় হয় ত' কিছুটা বুঝল। সে বলল, সে ত' সহিবাত হুজুর। এই শূয়োরে প্রতি বছর আমাদের ক্ষেতের ফসল—

রামসহায়ের কথা অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। অনেকগুলো হরিণ আবার একসঙ্গে ডেকে উঠতেই দু'জনে পিছন ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠলাম।

উঃ, কি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে সারোয়ায়! পশ্চিমের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত আগুন বিস্তারলাভ করছে। রক্ত আলোর বন্যায় ঘুঘুয়া-বেল্লারি উদ্ভাসিত। রক্তাভ আকাশে পাতাশূন্য শীর্ণ গাছগুলো উলঙ্গ প্রেতিনীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে শুকনো গাছের মাথায় মাথায় প্রেতিনীর ক্রন্দন। দেখলাম লাল আকাশে পাখিরা ঊর্ধ্বশ্বাসে উড়ে চলেছে দিকে দিকে, উড়ে আসছে ঘুঘুয়া-বেল্লারির দিকে সেই সর্বগ্রাসী অগ্ন্যুদগার আর ধূমশিখার উপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে। আকাশে কালো কালো বিন্দুর মতো সে পাখিদের কলধ্বনি বহুদূরে এই মাঝাতালাওয়ের পাড়ে বসে আমি শুনলাম। শুন... সাথীহারা সন্তানহারা সব অসহায় হরিণের ডাক। চিত্রল ডাকছে, ... র ডাকছে, টিউউ! টিউউ! চাঁ-আক! চাঁ-আক!

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আমরা শুনতে পেলাম ঢালের ও পিঠে ফাঁকা জায়গাটায় যেন জানোয়ারের চলাচল হচ্ছে। রামসহায়কে রেখে আমি বুকে হেঁটে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। ঢালের ওপরে মাথা রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

সারোয়ার বনের আগুনে আলোকিত হয়ে আছে ফাঁকা জায়গাটা। সে আলোয় সুস্পষ্ট অনেকগুলো বন্যজন্তু দেখলাম বুঝি সারোয়া থেকে পালিয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। ফাঁকা জায়গাটার যতটুকু দেখতে পেলাম—দেখলাম এখানে-ওখানে ছড়িয়ে দলে-দলে হরিণ আর বুনো-শূয়োর। অসংখ্য চিত্রল, কৃষ্ণসার আর বুনো-শূয়োরের

সমাবেশ দেখলাম। পালে পালে শুয়োর ঘুরে বেড়াচ্ছে নিঃশব্দে, মায় বাচ্চাগুলো পর্যন্ত টুঁ শব্দটি করছে না।

এরই মধ্যে তিনটে চিত্রল হরিণ ঘুরতে ঘুরতে ঢালের নীচে এসে দাঁড়াল। বিরাট শিঙেলটা বাতাসে বারকয়েক নাক টেনে-টেনে শুঁকল। প্রতিকূল বায়ুতে কিছু বোধগম্য না হওয়াতে নিশ্চিন্ত মনে হরিণী দু'টোকে নিয়ে ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল—আর উঠতে লাগল আমার নাক বরাবর।

মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম আমি! না পারছি পথ ছেড়ে দিতে না পারছি ঐভাবে পড়ে থাকতে। আর দু'পা এগুলেই আমাকে দেখে ফেলবে। আমার কেমন লজ্জা হতে লাগল, আমি চোখ বুজে ফেললাম।

পরমুহূর্তেই শিঙেলটার তীব্র চীৎকার কানে এল, ট্যাঁও-ও-ও! সঙ্গে সঙ্গে খটাস্-খট্—খটাপট্, খটাপট্ শব্দে শত শত বন্যজন্তুর শব্দ—চারদিকে পালাতে লাগল। যখন চোখ চাইলাম দেখি সব ফাঁকা। মুহূর্ত ক[illegible]তে শত শত জানোয়ারের উপস্থিতি যেন বিশ্বাস করতেও মন চায় না। একটা সুখস্বপ্ন বলে মনে হয়।

আমি আবার গর্তে এসে বসলাম। সারোবার আগুন ঐ একই ভাবে জ্বলতে লাগল। নিঃশেষে সব পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমি গর্তের গায়ে হেলান দিয়ে চুপচাপ চোখ বুজে বসে রইলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রামসহায়ের খোঁচা খেয়ে চোখ চাইলাম। কানের কাছে মুখ এনে সে ফিসফিস করে বলল, দু'টো শুয়োর এসেছে দেখুন হুজুর।

বুনো-শুয়োরটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

ফোকরে চোখ রেখে দেখলাম হ্যাঁ শুয়োরই বটে। জলের কিনারে কিনারে নাক ঘষে ঘষে এগুচ্ছে—তবে তেমন বড় নয়।

আমি বন্দুকটা উঠিয়ে নিলাম এই ভেবে যদি এর পর আর না আসে। কেন-না ভরসা হচ্ছিল না যে রকম চমকে পালিয়েছে সব আর না-ও আসতে পারে।

আমি বন্দুকের উপর ঝুঁকে অন্ধকারে নিশানা ঠিক করতে গেলাম এমন সময় কানে এল আমার বাঁ-দিকে উত্তরে বড় পাহাড়ীর দিক থেকে সোঁ সোঁ শব্দে যেন ঝড় আসছে। লক্ষ্য করলাম শুয়োর দু'টোও সেদিকে মুখ তুলে তাকিয়ে উদগ্রীব হয়ে আছে।

আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কোটি-কোটি নক্ষত্র অলঙ্কৃত আকাশ, কোথাও একবিন্দু মেঘ নেই। তা' হলে ঐ শব্দ কিসের! একটা অজানা আশঙ্কায় আমার মন ছেয়ে গেল। আমি বন্দুকটা একটু নামিয়ে সেদিকে কান পেতে উদগ্রীব হয়ে বসে রইলাম।

শব্দটা আরও এগিয়ে এলে বুঝলাম গতিটা ঝড়ের কিন্তু শব্দটা নয়। সর্‌সর্-স্বর্‌সর্ শব্দে বহুপদবিক্ষেপে কারা যেন ঝরাপাতা মাড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে। ক্রমশ শব্দটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। অবশেষে দেখলাম ছটাপট, ছটাপট্ করে বন থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল কালো কালো স্তূপের মতো অসংখ্য বুনো-শুয়োর। খুর্‌খুর্-খুর্‌খুর্ করে সেই বিশাল বরাহবাহিনী জলার চারপাড় ঘিরে ফেলল। প্রথমোক্ত সেই শুয়োর দু'টো ভিড়ের মধ্যে যে কোথায় হারিয়ে গেল আর পাত্তাই পেলাম না। কিন্তু এই সব নয়। ক্রমাগত বাহিনীর পর বাহিনী দুর্বারগতিতে বেরিয়ে আসতে লাগল। মাঝাতালাওয়ের জল আর দেখা যায় না।

শুয়োরগুলো সরবে নানা কাজে মেতে গেল। কেউ কাদায় গড়াচ্ছে, কেউ মাটি খুঁড়ছে, কেউ জল খাচ্ছে, আবার কেউ কেউ প্রেমাস্পদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি বারকয়েকই গুণতে গিয়ে অকৃতকার্য হলাম, এদিক-ওদিক সরে গিয়ে গোল বাধায়। তবে অনুমান করলাম প্রায় দু'শো বুনো-শুয়োর। এই দু'শো শুয়োরে মাঝাতালাওয়ে একটা বিপ্লব বাধিয়ে দিল। বরাহ-নিনাদ আর ঘোঁৎঘোঁতানিতে কানে তালা লাগাবার যোগাড়। ওদিকে জলার ব্যাঙগুলো বুঝি চিঁড়েচপ্টা হয়ে গেল।

নিশানা না করলেও চলত, চোখ বুজে ট্রিগার টানলেই হত, তবু বেছে নিলাম কতকগুলোকে। গ্রা-আম্! গ্রা-আম্!

পর পর দু' ব্যারেল খালি করে দিয়ে মাঝাতালাওয়ের বিপ্লব চরমে পৌঁছে দিলাম। কে মরল কে বাঁচল, কিছু দেখলাম না। ক্ষণিক দেখলাম শুয়োরগুলো নারকীয় চিৎকারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চারদিকে ছিটকে পড়ল আর তারই একটা দল ভীমবিক্রমে আমাদের গর্তের দিকে ছুটে আসছে—আমার মন হায় হায় করে উঠল। আমি রামসহায়কে ইসারা করেই গর্তের মুখে পিঠ পেতে চোখ বুজে মাথা গুঁজে পড়ে রইলাম।

ভয়-ভাবনার আর শারীরিক যন্ত্রণার সেই সেকেণ্ডগুলো যেন ঘণ্টা বলে অনুমিত হচ্ছিল। মনুষ্য সেতুর উপর দিয়ে ডজনখানেক শুয়োর আমাদের গর্তটা নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেল। যে পারল না সে একটা বাচ্চা। টের পেলাম বাচ্চাটা আমার আর রামসহায়ের দেহের ফাঁকের

মধ্যে পড়ে গিয়ে বারবার আমার গা বেয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। ওকে ধরে ফেললাম।

রামসহায়কে ডাকলাম, সাড়া দিল না। ঠেলে দিয়ে ডাকলাম রামসহায়!

চুপ। ঐ একইভাবে উপুড় হয়ে সে মাথা গুঁজে পড়ে রইল। ভয়ে-ভাবনায় আমার সর্ব শরীর শির-শির করে উঠল।

শূয়োরের বাচ্চাটাকে কিটব্যাগের মধ্যে পুরে দিয়ে ফাস্‌নারটা এঁটে দিলাম। টর্চ জ্বালাতেই দেখি রামসহায়ের পিঠ বেয়ে অঝোরে রক্ত ঝরছে আর সে অচৈতন্ত। ওকে পাঁজাকোলে করে উঠিয়ে গর্তের বাইরে এনে শুইয়ে দিলাম।

জল আনতে গিয়ে দেখি গুলীর আঘাতে তু'টো শূয়োর পড়েছে। একটা মরে পড়ে আছে, আর একটা তখনও পা ছুড়ছে।

আমি জল এনে রামসহায়ের চোখে-মুখে বারকয়েক ঝাপটা দিতেই সে একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করে চাইল, পরক্ষণেই আবার চোখ বুজল। ওর জ্ঞান ফিরে আসছে বুঝতে পেরে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওর পাশে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরেই উত্তরের বন থেকে একটা জান্তব গোঙানি ভেসে এল অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ!

প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপরে আবার শুনলাম। শুনে মনে হল একটা শূয়োরের যন্ত্রণা-কাতর শব্দ সেটা। সম্ভবত এলজি'র ছররায় আহত হয়ে শূয়োরটা বনের মধ্যে পড়ে আছে।

রামসহায় উঠে বসতে গেল। ওকে বাধা দিয়ে বললাম, উঠিস না, শুয়ে থাক।

রামসহায় বলল, আমার কি হয়েছে? আমি এখানে শুয়ে আছি কেন?

খানিকটা বলতেই ওর সব মনে পড়ল। বলল, হ্যাঁ হুজুর এবারে মনে পড়েছে।

আপনি গুলী ছুড়তেই শূয়োরগুলো তেড়ে এসেছিল।

আমি বললাম, তেড়ে আসে নি, চমকে পালাচ্ছিল। ওরা আমাদের দেখতেই পায় নি। বলে, ওকে বাচ্চাটা দেখালাম, মৃত শূয়োর তু'টোর কথাও বললাম।

শুনে ভারী খুশি সে। হেসে বলল, হুজুর, আপনে আজ কামাল কর্ দিয়া। বলে শূয়োর তু'টো দেখবার জন্যে জোর করেই উঠে বসল। বসেই বলল, উঃ, পিঠে বড় ব্যথা!

রামসহায়ের পিঠটা জায়গায়-জায়গায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। কেন না গর্তের মুখ থেকে অনেকটা নীচে সে পিঠ পেতেছিল। ফলে, শূয়োরগুলো পূর্ণ ওজনে ওর পিঠে পড়ে আবার উঠে যায়। তা ছাড়া বেশির ভাগ শূয়োরই ওর পিঠ মাড়িয়ে যায়। আমার পিঠেও কয়েক জায়গায় ছড়ে গিয়েছিল, কিন্তু গুরুতর নয়। আদুল গায়ে না থাকলে হয়ত আমার পিঠে আঁচড়ও লাগত না। আমি রামসহায়ের পিঠের ক্ষতগুলোতে ভালো করে টিঞ্চার-আয়োডিন ঘষে দিলাম। সে দিল আমার পিঠে।

অ্যাঁ-অ্যাঁ অ্যাঁ! সে গোঙানিটা আবার ভেসে এল।

রামসহায় বলল, ও কিসের ডাক হুজুর!

বললাম, মনে হচ্ছে একটা শূয়োর গুলীতে আহত হয়ে ঐ বনে কোথাও গিয়ে পড়েছে। তুই গর্তে গিয়ে বস আমি আর এক গুলীতে শূয়োরটাকে শেষ করে দিয়ে আসি। ভয় নেই, এখুনি আসব।

আমি তু'সেলের টর্চটা বন্দুকে ক্ল্যাম্প করে ধীরে ধীরে বনের মধ্যে ঢুকলাম। কি অন্ধকার! সেই একটুকরো চাঁদ উঠেছিল, কোথায় যেন আছে, দেখলাম না। জন্তুটার অবস্থান আন্দাজ করতে সেই গোঙানিটা শুনবার অপেক্ষায় আমি সেই অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

শব্দটা আবার হল। আমার ডানদিকে আনুমানিক পঞ্চাশ গজ দূর থেকে শব্দটা ভেসে এল। এবারে নিঃসন্দেহ হলাম যে, শব্দটা একটা আহত শূয়োরেরই যন্ত্রণা-কাতর ক্রন্দন। আমি টর্চ জ্বেলে শূয়োরটাকে খুঁজতে সাহস পেলাম না। অন্ধকারে তীব্র আলোর ধাঁধায় বুনো-শূয়োর বড় ক্ষেপে যায়। হয় চমকে পালায় নয় আলো লক্ষ্য করে তেড়ে আসে। তা ছাড়া হিংস্রতায় দলছাড়া বুনো-শূয়োর আর আহত বাঘ তুই ভয়ংকর। এক্ষেত্রে শূয়োরটা দলছাড়া ত' বটেই—আহতও।

অগত্যা আমি ঝরাপাতার উপর খুব সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এগুতে লাগলাম। আমার চলার পথে ঝিঁঝিগুলো একে একে স্তব্ধ হয়, এগিয়ে গেলে আবার ঝিল্লিরব সুরু করে। পায়ের কাছে সরীসৃপ খরগোসের চকিত পলায়নে এক একবার চমকে দাঁড়াই আবার চলি। প্রায় অর্ধেকটা পথ যেতেই শূয়োরটা ককিয়ে উঠল। আমি এবারে সাবধান হলাম যেন অসতর্ক মুহূর্তে শূয়োরটার

বেল্লারি জঙ্গলে লেখক

সামনে না পড়ে যাই। আমি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি কেন্দ্রীভূত করে পায়ে পায়ে এগুতে লাগলাম।

কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও শূয়োরটা টের পেল। শুনলাম আমার সামনে থেকে ঘোঁৎ করে উঠে পড়ে একটা অস্ফুট শব্দে অসহায় যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সে ছুটে চলল। আমাদের পরস্পরের ব্যবধানটা কমাতে এ-সুযোগে আমিও তার পিছু পিছু দ্রুত ছুটে চললাম। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলাম না। অন্ধকারে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমি মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। আর সেই শব্দে শূয়োরটা চমকে গিয়ে আরও দ্রুত ছুটতে লাগল। তবে আশার কথা শূয়োরটা এক নাগাড়ে বেশিদূর ছুটতে পারল না। আমি হাত-পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতেই শুনলাম সেই কর্কশ অনুনাসিক যন্ত্রণাকাতর ধ্বনিটা আরও তীব্র হয়ে ভেসে এল প্রায় এক শ' গজ দূর থেকে। আমি অনুমান করলাম শূয়োরটার ফুসফুসে গুলী লেগেছে তাই ঐ অসহ্য যন্ত্রণা, বেশি ছুটতে পারে না—পালাতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে।

আমি আবার ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম। কিন্তু পায়ের তলায় শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি এড়াতে পারলাম না, ফলে খানিকটা যেতেই শুনলাম শূয়োরটা আবার পালাচ্ছে। আমি এবারে মরিয়া হয়ে সামনে টর্চের আলো ফেলে শূয়োরটার উদ্দেশে ছুটতে লাগলাম। কিছুদূর দৌড়েই হঠাৎ বন থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

দেখলাম সেখান থেকে একটা বড় ঢাল নেমে গেছে। ঢালটায় ছড়িয়ে ছোট বড় অনেক পাথর। ঢালের শেষে সুরু হয়েছে এক বিস্তীর্ণ ঘাসবন। যেদিকে তাকান যায় শুধু ঘাস আর ঘাস। মানুষের মাথা ছাড়িয়ে সে ঘাস। সেই ঘাসবন আবার ঢেউ খেলে উঠে গেছে বহুদূরে একটা টিলার উপরে। নক্ষত্র-আলোয় দেখলাম মুহুর্মুহু হাওয়ায় ঘাসের ডগাগুলো হেলছে-দুলছে-কাঁপছে। যতদূর শুনেছিলাম মনে হল এটাই বড় পাহাড়ীর ঘাসবন।

হঠাৎ শূয়োরটা আমার বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়েই গজ-তিরিশেক দূরে যন্ত্রণায় কেঁদে উঠল। আমি চমকে বন্দুকটা তুলেই ঘুরে দাঁড়ালাম। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। ঐ শূয়োরেরই মতো অসংখ্য কালো-কালো পাথর ঢালটায় ছড়িয়ে আছে, কোনটা শূয়োর কোনটা পাথর আমি বুঝলাম না। আমি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তারপরেই শুনলাম খট্‌খট্‌ শব্দে শূয়োরটা সেই প্রস্তরাকীর্ণ ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। আমি একটা উঁচু পাথরের উপর উঠে দেখতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। পাথরের শব্দে একাকার হয়ে মিশে গিয়ে সে নেমে যাচ্ছে। আমি পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে শব্দটা অনুসরণ করতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে শূয়োরটাও দ্রুত নেমে চলল, আর চলার তালে-তালে একটা ক্ষীণ কাতরধ্বনি করতে লাগল, উঁ-উঁ-উঁ-উঁ!

আমি আর একটু দ্রুত এগুতেই শূয়োরটাকে দেখে ফেললাম, ঢাল থেকে নেমেই একফালি ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে সে ঘাসবনের দিকে ছুটছে। সর্বনাশ! আমি বন্দুকটা তুলে গুলী ছুড়তে গেলাম আর অমনি টাল সামলাতে না পেরে পাথর থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। ঘোঁৎ করে শূয়োরটা তীরবেগে ঘাসবনে ঢুকে গেল। নিমেষে উঠেই আমি শূয়োরটার অনুসরণে উন্মত্তের মতো সেই ঘাস-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

আমার মাথায় যেন খুন চেপে গেল। সর্‌সর্‌ শব্দে শূয়োরটা ঘাসবন দিয়ে ছুটছে আর দিশেহারার মতো আমি তাকে অনুসরণ করছি। ঘাসের ডাঁটায়, পাতায় আমার আদুল গা ঘষে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল, অজস্র ঘাসের বীজ মাথায়-চোখে-মুখে ঝরে পড়ছে, বারবার ঘাসে পা আটকে পড়ে যাচ্ছি আবার উঠছি যেন শূয়োরটাকে না হারাই। কিন্তু এত করেও শূয়োরটাকে যেন শেষ পর্যন্ত হারালাম। এক সময় সেই সর্‌সর্‌ শব্দটা আর শুনলাম না। কোনদিকে যে গেল শূয়োরটা তার হদিসই করতে পারলাম না।

শূয়োরটাকে যে কখন হারালাম, কোথায় হারালাম কিছুই বুঝলাম না। আর আমি যে কোথায় এসেছি, কতদূরে এসেছি তা-ও জানি না। ভেবে দেখলাম শূয়োরটাকে এখন খুঁজতে গেলে এই ঘাসবনের গোলকধাঁধায় নির্বোধের মতো ঘুরে মরতে হবে। তা ছাড়া বিপদের সম্ভাবনাও বেশি। এই ঘন ঘাসবনে শূয়োরের অতর্কিত আক্রমণ এড়ানো যাবে না। কোন অবস্থাতেই তখন আর এগিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হল না—আমি দুঃখে-হতাশায় সেখানেই বসে পড়লাম। রাত তখন কতটা জানি না।

একটা সিগারেট মুখে দিয়ে দেশলাইয়ে কাঠি জ্বালিয়েই সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে ফেললাম। সর্বনাশ, কি করছি। একটা ফুলকিতে খাণ্ডবদাহন হয়ে যাবে যে! হয়ত নিজেও পুড়ে মরব। সিগারেট দেশলাই পকেটে পুরে ঘাসের গদিতে হাত-পা টান করে শুয়ে পড়লাম। ভাবলাম ভোর হলেই রক্তের দাগ দেখে দেখে শূয়োরটাকে খোঁজ করব। ঘাসের ডগার ফাঁকে তারাময় আকাশের দিকে চেয়ে নানান কথা ভাবতে লাগলাম। রামসহায়টা না জানি কি করছে—না জানি ও কেমন আছে! ভোর হতে কত বাকি!

ডুইট্‌-ডিডু ডুইট্‌। টি-টি-টি!

একটা টিট্টিভ পাখির ডাকে বনভূমির নির্জনতা খান খান হয়ে ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল ঘাসবনটা কাছাকাছি কোথাও শেষ হয়েছে। ঐ টিট্টিভটাই তার প্রমাণ। এই ঘন ঘাসবনে টিট্টিভ থাকে না, থাকতে পারে না। বনের ফাঁকে ফাঁকে, মাঠে জলাভূমিতে গাছতলায় ডিম পেড়ে বা বাচ্চা রেখে আশেপাশে থেকে সে পাহারা দেয়। জীবজন্তু দেখলেই সন্দিহান হয়ে ডাকতে থাকে, কখন ঠুকরে দেয়। ওরা শিকারীর 'ইনফরমার'। শিকারীকে জীবজন্তু চলাচলের খবর দেয়। কিন্তু টিট্টিভটা কি দেখল! শূয়োরটাকে নয়ত!

আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ক্রুদ্ধ টিট্টিভটার একটানা টি-টি ডাক শুনতে শুনতে আমি ঘাসের বন ভেদ করে সেদিকে ছুটতে লাগলাম। যা ভেবেছিলাম তাই, কিছুটা গিয়েই একচিল ময়দানে এসে পড়লাম। ওপারে এক নিবিড় মসীময় বন। গগনচুম্বী সব বট-অশ্বত্থ আর তেঁতুল গাছ শাখায়-প্রশাখায় জড়াজড়ি করে ছড়িয়ে আছে। টিট্টিভটা তখনও ময়দানের উপরে ডেকে ডেকে চক্কর মেরে ঘুরছে। আমাকে দেখেই তীব্রতর চিৎকারে উড়ে এসে আমার মাথার উপর ডেকে ডেকে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। আমার মনে হল শূয়োরটা এদিক দিয়েই কোথাও বনের

মধ্যে ঢুকেছে। টিটিভটাকে এড়াতে আমি দ্রুত সেই খোলা জায়গাটা পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকেই একটা গাছের নীচে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়ালাম।

ভেতরটা যেমন অন্ধকার তেমনি ঠাণ্ডা। দু'হাত দূরে আমার দৃষ্টি যায় না। ভাবলাম ভাল করি নি এসে—একটা অনুমানের উপর নির্ভর করে। টিটিভটা হয়ত অন্য কোন জানোয়ার দেখে ডেকে থাকবে। একবার ভাবলাম ফিরে গিয়ে ঐ ঘাসের বনেই শুয়ে থাকি, আবার ভাবলাম থাক আর একটু দেখি। আর সেই মুহূর্তে শূয়োরটা কেঁদে উঠল, অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ! দূরে নয়, কাছেই।

আমি সেই অন্ধকারে আঙলে ভর করে গাছের পিছন থেকে পিছনে এগুতে লাগলাম। খানিকটা গিয়েই অন্ধকারে জলের চকমক দেখলাম। আর শুনলাম শূয়োরটা ঐখানেই কোথাও খুব ক্ষীণস্বরে কাতরাচ্ছে, উঁ-উঁ-উঁ!

আর একটা গাছের পিছনে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা প্রশস্ত নালা, আর তারই পাড়ে জলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আহত শূয়োরটা কাতরাচ্ছে। পাড় থেকে জলের অবস্থান খানিকটা নীচে—অন্ধকারে চোখটা একটু সয়ে এলে দেখলাম শূয়োরটা বার বার চেষ্টা করেও জলে মুখ দিতে পারছে না। আমি ধীরে ধীরে বন্দুকটা তুলে অন্ধকারেই নিশানা ঠিক করে ওর পাঁজর ঘেঁষে গুলী করলাম। একটা ভয়ংকর চিৎকার করে শূয়োরটা একপাক ঘুরেই পড়ে গেল।

টর্চ জেলে ট্রিগারে হাত রেখে আমি শূয়োরটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মৃত্যুযন্ত্রণায় শূয়োরটা হাঁ করে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছটফট করছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম ওর প্রাণ আর বেরোয় না।

সুদূর শৈশবে ছোট্ট একটা ঘটনা মনে দাগ কেটেছিল, আজ আবার মনে পড়ল। তখনও স্কুল-পাঠশালায় পড়ি না। আমাদের বাড়ির দরজায় কাদের একটা কুকুর মরছিল। আমি দেখে দৌড়ে গিয়ে মাকে ডেকে আনলাম। কুকুরটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মা বললেন, যা তো এক গেলাস জল নিয়ে আয়। আমি দৌড়ে গিয়ে জল নিয়ে আসতেই মা বললেন, দে, ওর মুখে একটু একটু করে জল দে। তা দিলাম। দিয়েই জিজ্ঞেস করলাম, কেন মা জল দিলে কি হয়? মা বললেন, এ সময়ে জল দিলে পুণ্য হয়। তোরও পুণ্য হবে।

সেদিন মৃত্যুপথযাত্রী কুকুরটার কষ্ট দেখে আমার মন কেঁদে উঠেছিল, আজও শূয়োরটার কষ্ট দেখে আমার মন কেঁদে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমালটা বের করে জলে ভিজিয়ে আনলাম। তারপর রুমালটা নিংড়ে শূয়োরটার মুখে জল দিলাম। সেদিনও পুণ্য অর্জন করেছিলাম কি না জানি না, আর শূয়োরটা মারার দরুণ যদি পাপ হয়ে থাকে সেটা লাঘব হয়েছিল কি না তাও জানি না, কিন্তু জল দিতেই শূয়োরটা বারকয়েক মুখটাকে দ্রুত নাড়ল, তারপরই শেষবারের মতো চোখ বুজে নিথর হয়ে গেল।

এরপরই শেয়ালেরা কোথাও প্রহর ঘোষণা করল। কোন প্রহর ঘোষিত হল বুঝলাম। আমি অবসাদ আর ক্লান্তিতে ভোরের অপেক্ষায় সেখানেই হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে রইলাম ও খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ব্রা-দা-র!

অকস্মাৎ বুদরি সাহেবের ডাকে আমি চমকে জেগে মাথা তুললাম। মনে হল বহুদূর থেকে বুদরি সাহেব যেন আমাকে ডাকলেন। ও ডাক আমার পরিচিত। তাঁর সঙ্গে শিকারে গিয়ে বনের মধ্যে যখনই ছাড়াছাড়ি হয়েছে ও-ডাকেই তিনি আমার খোঁজ করতেন।

আমি ভাবলাম তা হলে কি শেষ পর্যন্ত বুদরি সাহেবও শিকারে এলেন! কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব, সাহেব তো এত হাঁটতে পারবেন না! একেই বাতের রোগী, তার উপর হার্টের রোগ—না সম্ভব নয়। ভাবলাম এ আমার অবচেতন মনের ক্রিয়া।

আবার মাথা গোঁজবার আগে আমি চারদিকটা একবার দেখে নিতে গেলাম। ডানদিকে শূয়োরটার উপর দিয়ে আমার দৃষ্টিটা ঘুরতে ঘুরতে বাঁদিকে এসে বাধা পেল। একটা শুকনো লম্বা ডাল পড়ে আছে। এমন একটা গাছের ডাল আমার পাশে ছিল বলে মনে হল না। আমি তো জায়গাটা বসবার সময় পরিষ্কার করেই বসেছি। আমি ডাল সরাতে হাত দিতে গিয়েই চমকে হাত টেনে নিলাম!

একটা সাপ! বিরাট একটা সাপ আমার পিছন থেকে জলের কিনারা পর্যন্ত পড়ে আছে! সম্ভবত একটা ময়াল সাপ জল খাচ্ছে! হোক নির্বিষ, আমি আলগোছে বন্দুকটি তুলে নিয়ে একলাফে ডানপাশে সরে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে পিছনে তীব্র একটা হিস্-স্ শব্দে টর্চটা জেলেই বন্দুক তুলে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখি ময়াল নয়—ভয়ংকর বিষধর একটা শঙ্খচূড়! আমার বুক-সমান উঁচু ফণা তুলে বাতির আলোয় দুলছে! ব্যবধান কিছুই না, ছোবল মারলেই হয়।

ব্রা-অ্-ম্!

গুলী খেয়েই লুটিয়ে পড়ল সাপটা। উল্টে-পাল্টে আছড়ে-পাছড়ে গিয়ে পড়ল জলে। তারপর খানিকক্ষণ জলটাকে তোলপাড় করে স্থির হয়ে গেল।

আমি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলাম। গলগল করে ঘামতে লাগলাম। আমার পা দু'টো শরীরের ভার আর সইতে পারছিল না। আমি আবার মাথা গুঁজে বসে পড়লাম। ভাবলাম আর ঘুমুব না, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙল মাথা গুঁজে থেকেই শুনলাম বহু পাখির কাকলিতে বনভূমি মুখর। মাথা উঠিয়ে দেখি তপোবনের মতো এক অপূর্ব সুন্দর জায়গায় আমি বসে আছি। সামনে অর্ধচন্দ্রাকার একটা জলাশয়, স্ফটিকের মতো সে জল। চারদিক ঘিরে আলিঙ্গনাবদ্ধ সব দ্রুম-মহাদ্রুম, ফাঁকে ফাঁকে সূর্যরশ্মির বিকিরণ। আমার মনে হল এরকম একটা দৃশ্য আমি যেন আর কোথাও দেখেছি।

কিন্তু, এ আমি কোথায় এলাম! কোনপথে মাঝাভাঙায় ফিরব তাও জানি না। রামসহায়ের জন্যেও উৎকণ্ঠিত হলাম। এদিকে শূয়োরগুলোরও একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

আমি বন্দুকটা তুলে নিয়ে জলার পাড়ে পাড়ে হেঁটে গিয়ে একটা টিলার উপরে উঠতেই বুঝলাম এটা বনপ্রান্ত। টিলার ওপারে ধু-ধু করছে শূন্য ধানক্ষেত। ধানক্ষেত শেষে একটা গাঁ। গাঁয়ের পাশ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে।

ঢিবি থেকে নেমে মাঠ দিয়ে অনেকটা দৌড়ে গিয়ে আমি হাত তুলে চিৎকার করে গাড়িওয়ালাকে ডাকলাম।

লোকটা সেখানেই গাড়ি রেখে দৌড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এল। বলল, কেয়া সাহাব?

বললাম, দেখ আমার কয়েকজন লোকের দরকার। তিনটে শূয়োর মেরেছি আমি, বেল্লারি বা গাঁয়ে নিয়ে যেতে চাই, মাংস, মজুরি যা চায় দেব।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, কোথা মেরেছেন সাহাব?

বললাম, দু'টো মাঝাতালাওয়ে, আর একটা—

মাঝাতালাওয়ে! সে ত' অনেকদূরে!

জিজ্ঞেস করলাম, কতদূর?

তা প্রায় তিন কোশ হবে। আর একটা কোথায় মেরেছেন সাহাব?

বললাম, ঐ জঙ্গলে নালার পারে।

এই জঙ্গলে, কখন মেরেছেন?

বললাম, কাল রাতে।

লোকটা অনেকক্ষণ অপলক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বারকয়েক আমার আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে বলল, সাহাব ঐ জঙ্গলে কখনও রাতে যাবেন না।

কেন?

বলল, ওটা চিতাওয়ার। ওখানে বনদেবী আছে, প্রেতাত্মা আছে।

চিতাওয়ার! ধক্ করে উঠল বুকটা আমার! তা হলে এই সে চিতাওয়ার! বুদ্রি সাহেবের বর্ণনা গভীর দাগ কেটেছিল আমার অবচেতন মনে—তাই জায়গাটা চেনা-চেনা ঠেকছিল। মনে পড়ল সাহেবের সাবধানবাণী বিওয়্যার, চিতাওয়ারে কখনও রাতে যাবে না! দ্যাট্স এ ব্লাডি হন্টেড প্লেস। বনদেও আছে, স্পিরিট আছে। তা' স্পিরিট-ফিরিটের কথা সত্যি না হলেও চিতাওয়ার যে খারাপ জায়গা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাপ-খোপের ভয় আছে। উঃ! কি ভয়ংকর সাপ! কিন্তু বুদ্রি সাহেবের সেই ডাকটা,—

সেটা কি!

যা হোক গাড়িওয়ালার সাহায্যে লোকজন সংগ্রহ করে ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই শুয়োরটাকে নিয়ে মাঝাতালাওয়ে এলাম। গর্তে অপেক্ষারত রামসহায়কে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। সৌভাগ্যের কথা শুয়োরগুলো বেল্লারি গাঁয়ে নিয়ে ফেলতেই বিক্রি হয়ে গেল। বুদ্রি সাহেবের জন্যে একটা ঠ্যাং কেটে রেখে বাকি সব যে দাম পেলাম তাতেই রাজী হয়ে গেলাম। তারপরেই রামসহায়কে নিয়ে সোজা চলে এলাম হাতবন্দ স্টেশনে। তাকে কিছু টাকা বকশিস দিয়ে একটা মালগাড়ির ব্রেকে উঠে দুপুরের আগেই বিলাসপুরে এসে পৌঁছলাম।

স্টেশনে পা দিয়েই শুনি বুদ্রি সাহেব নেই! গতরাতে হার্ট স্ট্রোকে মারা গেছেন। সংবাদদাতার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার কানে শুধু বাজতে লাগল বহুদূর থেকে ভেসে-আসা বুদ্রি সাহেবের সেই ডাকটা, বা-দা-র!

শেষ

সিঁড়ির গান

সন্তোষকুমার দে

সিঁড়ি • সিঁড়ি • সিঁড়ি

সিঁড়ি উঠে গেছে ধাপে ধাপে, গেছে নেমে
সিঁড়ি চলে গেছে ডাইনে ও বামে,
কোথাও থাকে নি থেমে।
চলার পথের সঙ্গী, তবু তা
মাড়িয়েছি দুই পায়ে
দাঁড়িয়ে থাকি নি, উঠি নামি ঘুরি ফিরি
সঙ্গে চলেছে চিরসঙ্গী সে সিঁড়ি।

সিঁড়ি, ঐ সিঁড়ি ধাপে ধাপে আছে
সদরে অন্তঃপুরে
সিঁড়ি আছে বুঝি সবার জীবনে
পাকে পাকে ঘুরে ঘুরে।
কঠিন কাটানো কঠোর বাঁধন
ইটে আর কংক্রিটে
কাষ্ঠ লোহায় ধাপে ধাপে ঝরে
জীবনের ঘাম পিঠে।
ছোট বড় ধাপ আছে আছে আছে আছে
যত দূরে যাই, উপরে নীচে কি কাছে।

কোথা এর শেষ? লিফ্‌ট্‌ম্যান কবে এসে
দাঁড়াবে দুয়ার ঘেঁসে?
হয় উঠে যাবে স্বর্গের পানে
নয় নামে রসাতলে—
বাজে বেল কিরি কিরি,
জীবন বাহিয়া ওঠে নামে বুঝি
চলমান্ কোন্ সিঁড়ি।

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

একত্রিশ

বন্দুকের নল পরিষ্কার করতে করতে কাঠুরে চৌধুরী ঐ সভ্যজগতের কথা ভাবছিল। তার মনে হয়েছে যে সভ্যতা একটা মুখোস। এই মুখোস পরে বনের পশুও মানুষ নামে সমাজে চলাফেরা করতে পারে। তার কোন ভয় নেই। ঐ মুখোস যতক্ষণ খসে না পড়ছে ততক্ষণ সে নির্বিঘ্ন মানুষের সমাজে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেতে পারে। বনে বাস করে কাঠুরে চৌধুরী এই মুখোসের খবরটা পায় নি, আজ তাই সে সভ্য-সমাজের কাছে মানুষের সম্মান পেল না।

আর দিনকয়েক পরে দময়ন্তীরা রাঁচী ফিরে যাচ্ছে। ডাক্তার সেন অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছেন। অ্যাম্বুলেন্স রাঁচী থেকে আসবে? এই ব্যবস্থায় কাঠুরে চৌধুরীর দুঃখ পাবার কিছু নেই, বরং তার কাঁধ থেকে এত বড় একটা দায়িত্ব নেমে যাচ্ছে বলে তার খুশি হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কাঠুরে চৌধুরী খুশি হতে পারে নি মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের অভাব দেখে। পৃথিবীতে যে মনুষ্যত্বের এত অভাব, এ-কথা তার জানা ছিল না।

দময়ন্তী কখন এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে খেয়াল করে নি। কথা শুনে চমক ভাঙল।—কি করছেন?

কাঠুরে চৌধুরী ক্লান্তভাবে বলল: বন্দুকটায় মরচে পড়ে গেছে।

পড়বেই তো। কতদিন ফেলে রেখেছেন বলুন! আমরা চলে গেলে আপনার কাজে লাগবে।

কাঠুরে চৌধুরী এবারে মুখ তুলে তাকাল। গভীরভাবে দেখল দময়ন্তীকে। তারপর নিঃশব্দে আবার কাজে মন দিল।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে দময়ন্তী তার মুখোমুখি বসল।

এবারে সে কি মামুলি কৃতজ্ঞতার কথা বলবে! কিছু বিচিত্র নয়। তার স্বামী তাকে সন্দেহ করেছে, কত কদর্য কুৎসিত ঘটনা ঘটেছে গত কয়েক দিনে। কাঠুরে চৌধুরী বোঝে যে এ ছাড়া দময়ন্তীর আর কোন উপায় ছিল না। বাঁচতে হলে এ স্থান তাকে ত্যাগ করতেই হবে, কিন্তু অন্যত্র গিয়েও সে কি বাঁচতে পারবে! যতদূর সে জানতে পেরেছে তাতে তাদের দুর্দশার আর সীমা থাকবে না। জগদীশের কোন সঞ্চয় নেই। সরকারী টাকায় মোটর কিনেছিল, মাসে মাসে তার জন্যে মোটা টাকা কেটে নিচ্ছে। পাওনা ছুটি ফুরিয়ে গেলে মাইনেও সে পাবে না। তারপর যখন তাকে পরীক্ষা করে জানবে যে সে কোনদিনই আর কার্যক্ষম হবে না, তখন নিশ্চয়ই তাকে জবাব দিয়ে দেবে, বলবে সরকারী কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে। তখন তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে! জগদীশ না ভাবুক, দময়ন্তী এ-কথা কেন ভাবছে না! তার কি এমন অবুঝ হলে চলে।

দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করল: আজ আপনি কাজে বেরুলেন না?

এই তো কাজ করছি।

বন্দুকের কাজ নয়, আপনার কাঠের কাজ।

আজ ছুটি নিয়েছি।

বলেন কি, আপনি ছুটি নিয়েছেন! আপনাকে তো ছুটি নিতে কোনদিন দেখি নি!

সব মানুষেরই ছুটি নেওয়া উচিত। গ্রে সাহেব ঠিকই বলতেন, হপ্তায় একদিন ছুটি না নিলে দেহের ক্লান্তি কখনও দূর হয় না। তারপর একদিন কঠিন অসুখ করে।

দময়ন্তী উদ্বিগ্ন হল, বলল: আপনার কি আজ শরীর ভাল নেই?

আজ ভাল আছি।

তবে কি কাল রাতে কোন কষ্ট হয়েছিল?

হয়েছিল। কিন্তু কাঠুরে চৌধুরী সে কথা স্বীকার করল না। দময়ন্তীকে সে কথা বলা যায় না, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে ডাক্তার সেন সে কথা বলতে এসেছিলেন। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এ কথা যখন বলছিলেন, কাঠুরে চৌধুরী চটে উঠেছিল: কে বলেছে আপনাকে এ সব ব্যবস্থা করতে?

ডাক্তার সেন একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন: কিছুদিন থেকেই তো মিসেস মেহতা আমাকে বলছেন। রাঁচী ফেরবার জন্যে মিস্টার মেহতা খুবই অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

তবে আমাকে কেন, তাঁদেরই এ সংবাদ দিন।

ডাক্তার সেন খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপরে বললেন: আপনি অকারণে আমার ওপর রাগ করছেন। ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।

কাঠুরে চৌধুরী কোন কথা কইল না।

ডাক্তার বললেন: প্লাস্টার খুলে ছবি নিয়ে যা দেখলাম তাতে কোনই ভরসা পাচ্ছি নে। তিন মাস পরেও হাড়ের ভাঙা টুকরোগুলো আলাদা আলাদা রয়ে গেছে। ক্যালাস ফর্ম করছে বটে, কিন্তু ও জোড়া শক্ত হবে না। ভদ্রলোক সারাজীবন খোঁড়াবেন।

একটু থেমে বললেন: ওদের ভার আপনি আর কতদিন বইবেন!

কাঠুরে চৌধুরী জিজ্ঞাসা করতে পারল না যে তবে কে ভার বইবে ওদের! এ কথা জিজ্ঞাসা করা হয় তো অশোভন হত, এর কদর্থ

করতেও এরা দ্বিধা করত না। তাই বলেছিল: খবরটা ওদের দিয়ে আসুন।

কাঠুরে চৌধুরী যে খুশি হয় নি, ডাক্তার সেন তা বুঝতে পেরেছিলেন: বললেন: আর মাস তিনেক থেকে গেলেই ভাল হত। প্লাস্টার খুললেই যেতে পারতেন। অ্যাম্বুলেন্সেরও দরকার হত না। কিন্তু মিস্টার মেহতার জন্যেই মিসেস মেহতা তাড়াহুড়ো করছেন। মিস্টার মেহতা বলছেন, রাঁচীতে পৌঁছতে পারলে তাঁর আর কোন দুঃখ থাকবে না। তাঁর বাড়ি আছে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডেও টাকা জমেছে অনেক। তার ওপর তাঁর দেশের বিরাট ব্যবসা। বড়ভাইকে বলে রাঁচীতেই একটা ব্রাঞ্চ খুলবেন। লোকজনে ব্যবসা করবে, সিন্দুকের চাবিটি দেবেন মিসেস মেহতার কাছে।

কাঠুরে চৌধুরী তার মুখ বেঁকিয়ে বলল: খুব ভাল ব্যবস্থা।

ডাক্তার সেন কি বুঝলেন তিনিই জানেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: যাই, খবরটা ওঁদের দিয়ে আসি।

কাঠুরে চৌধুরী আর বলেন নি, ডাক্তারও আর ফিরে আসেন নি। দময়ন্তীকে সুখবরটা দিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন।

তারপরে দময়ন্তী এসেছিল প্রসন্নমুখে। বলেছিল: শুনেছেন?

হ্যাঁ শুনেছি।

এই ভাল হল, কি বলেন?

আপনাদের ভালমন্দের আমি কি বুঝি বলুন।

উত্তর শুনেই দময়ন্তী বুঝেছিল যে, কাঠুরে চৌধুরী মোটেই খুশি হয় নি। তবু বলেছিল: আশা করি নিজেদের একটা চলনসই ব্যবস্থা করে নিতে পারব। কয়েকমাসের মাইনে তো উনি পাবেন, তা ফুরোবার আগেই একটা মাস্টারি জোগাড় করে নেব।

কাঠুরে চৌধুরী শুধু বলেছিল: হুঁ।

তারপর দময়ন্তী বলেছিল তার বেদনার কথা: আপনি তো সবই জানেন।

এই কণ্ঠস্বর শুনে কাঠুরে চৌধুরী চমকে উঠেছিল। তার মনে হয়েছিল, দময়ন্তীর অন্তর আজ কাঁদছে। মুখ তুলে তাকিয়েছিল তার চোখের দিকে।

সন্ধ্যার বাতাসে তখন বেশি শীত ছিল না, অন্ধকারে কুয়াশা মিশে নিশাই শুধু ঘন হয়েছিল। দময়ন্তীর মন হয়েছিল ভারী। বলেছিল: আমার জীবন তো আর আমার ইচ্ছায় চলবে না। যার ইচ্ছায় চলবে সে বড় অবুঝ। সে কিছু বোঝে না। বুঝবেও না কোনদিন। আপনার আশ্রয়ে থেকে সে বড় নীচ ইতর হয়ে যাচ্ছে। তাকে আমি টেনে তুলতে চাই। আপনি বাধা দেবেন না।

কাঠুরে চৌধুরী কোন উত্তর দেয় নি।

দময়ন্তী বলেছিল: অনেক অসম্মানের কথা আমাকে শুনতে হয়। সহ্য করতে হয় মুখ বুজে। নিজের অসম্মান আমি গায়ে মাখি না, কিন্তু আপনার অসম্মান যে কিছুতেই সইতে পারি নে। প্রতিবাদ করলে ফল উল্টো হবে, তাই চুপ করে থাকি। আমরা চলে গেলে লবাটের বৌকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন। সে আপনাকে অনেক খবর দেবে। সব শুনলে আপনি অনায়াসেই আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন।

কাঠুরে চৌধুরীর বিশ্বাস হচ্ছে না দময়ন্তীর এই সব কথা। লবাটের বৌ সব জানে, আর তাকে কিছুই বলে নি! তার ইচ্ছা হল, মেয়েটাকে এক্ষুণি ডেকে সব কথা জেনে নেয়। কিন্তু দময়ন্তীর জন্যেই পারল না।

দময়ন্তী বলল: দোহাই আপনার, আমরা না যাওয়া পর্যন্ত এসব কথা কাউকে জিজ্ঞেস করবেন না।

তারপর নিজেই কিছু কিছু বলল: আপনার বোধ হয় মনে আছে, সেদিন ওরাঁওদের গ্রামে আমি খানিকটা মদ খেয়ে ফেলেছিলাম। এর আগে আমি কোনদিন মদ খাবার কথা কল্পনাও করতে পারতাম না। কেন খেয়েছিলাম তা জানি না। বোধ হয় নাচ দেখতে দেখতেই অন্যমনস্ক হয়ে খেয়ে ফেলেছিলাম। তারপর আমারও ইচ্ছা হয়েছিল ওদের মতো এগিয়ে পিছিয়ে খানিকক্ষণ নাচতে। সে ঐ বাজনা শুনে আর আপনাদের দেখে। আমার খুব ভাল লেগেছিল।

তবে আপনি তখুনি ফিরলেন কেন?

সে ভয়ে। আমার মনে হচ্ছিল যে ঐ পরিবেশে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলছি। তা না হলে কেউ অন্যমনস্ক হয়ে মদ খায়!

ধাঙড়-ধাঙড়ীরা তো সবাই খেয়েছিল।

ওরা খাক, তাই বলে—ছিঃ ছিঃ—

আমিও তো খেয়েছিলাম!

আপনি পুরুষমানুষ, আপনার আলাদা কথা।

তারপরেই দময়ন্তী স্বীকার করল: ওদের সঙ্গে নাচতে আমার একটুও লজ্জা হত না।

এ যে কত বড় সত্য কাঠুরে চৌধুরী তা জানে। তার এই বাংলোর কেউ তাকে নাচতে বললে লজ্জায় সে মরে যাবে। অথচ সেখানে সে প্রাণের আবেগে নাচে। তাদের নাগেরার বাজনা শুনলেই তার মন নেচে ওঠে, আর দেহে পুলক জাগে হাঁড়িয়া খেয়ে। দময়ন্তীরও যে নাচতে ইচ্ছে করেছিল, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তারপরেই দময়ন্তী বলল: আমার নির্যাতনের কথা আপনি জানেন না।

না তো।

ফেরার পরে আমার মুখে ও মদের গন্ধ পেয়েছিল। কি বলেছিল জানেন? না, সে কথা আপনাকে বলব না। আত্মহত্যা করে আমার মরতে ইচ্ছা হয়েছিল। কি নীচ, কি ইতর কথা। সেদিন ওকে আমার ভদ্রলোক বলে মনে হয় নি। এখনও ও আমাকে সন্দেহ করে। লবাটের বৌকে যা জিজ্ঞেস করে, পরে আপনি সব জেনে নেবেন। সেদিন তো আমরা কাছে থাকব না, কাউকে আপনার খুন করার দরকার হবে না।

খুন!

কাঠুরে চৌধুরী যেন আর্তনাদ করে উঠেছিল।

শান্তভাবে দময়ন্তী বলেছিল: আমাদের জীবন নিয়ে কেউ যদি গল্প লেখে, তা হলে একটা খুনের দরকার। তা না হলে এ গল্প শেষ হবে না। ও যদি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত, বলতে পারত, তা' হলে সে আমাকে খুন করত, নয় তো আপনাকে। আর তার সন্দেহের কথা জানলে আপনিও চুপ করে বসে থাকতেন না।

কাঠুরে চৌধুরী সবই বুঝেছিল। কিন্তু রাগ করে নি, অভিমান করে নি। শুধু স্তব্ধ হয়ে বসেছিল।

এম.এল.বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস • কলিকাতা—৯

নিজের ঘরে ফিরে যাবার আগে দময়ন্তী বলেছিল : আমার বুকের ভিতরটা জ্বলছে মিস্টার চৌধুরী, এই জ্বালার হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই আমি পালিয়ে যাচ্ছি। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

দময়ন্তী বলল : আজকে আপনার শরীর ভাল নেই।

না-না, বেশ ভাল আছি।

আমি মানব কেন! আপনার হাতও চলছে না, আমার কথার উত্তরও দিচ্ছেন না।

কাঠুরে চৌধুরী জেগে উঠে আবার বন্দুক পরিষ্কারে মন দিল।

দময়ন্তী হেসে বলল : আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ কাল রাতের কথা ভাবছিলেন।

শুধু কাল রাতের কথা নয়, আরও অনেক দিনের কথা। ভাবছি, এই পৃথিবীটাকে আজও চিনতে পারলাম না।

পৃথিবীটা চিনেছি, কারও এ গর্ব থাকা উচিত নয়। আমাকেই কি আপনি চিনতে পেরেছিলেন, না আমি চিনেছিলাম আপনাকে!

আপনাকে বোধ হয় আজও আমি চিনতে পারি নি। তবু একটা নিবেদন জানিয়ে রাখি। সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে আমাকে স্মরণ করবেন।

দময়ন্তীর দু'চোখ হঠাৎ ছল ছল করে উঠল। বলল : আমার জীবনে তো সুখের দিন আর আসবে না!

বলেই পালিয়ে গেল তার সামনে থেকে। কাঠুরে চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

লবাট এসে খবর দিল : একটা লোক অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে।

কাঠুরে চৌধুরী চটে উঠল : দেখা হবে না বলে দে।

বলেছি।

তবে আমাকে কেন বলতে এসেছিস?

দেখা না করে সে যাবে না বলছে।

তবে পাঠিয়ে দে আমার কাছে।

লোকটা যখন সামনে এল, কাঠুরে চৌধুরীর মনে হল তাকে সে কোথায় দেখেছে। বলল : কে হে তুমি?

লোকটা হাতজোড় করে বলল : আমি একজন মালী। কাজের জন্যে এসেছি।

কোথায় তোমাকে দেখেছি বল তো?

খেমলানিবাবুর বাড়িতে।

কাঠুরে চৌধুরী একমুহূর্ত কি ভাবল, তারপর বলল : তা সেখান থেকে চলে আসতে চাইছ কেন?

সে বাড়ি তো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

কি বললে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কে কি[illegible]ছে?

বোধ হয় নীলাম হবে।

তা এত লোক থাকতে তুমি আমার কাছে এলে কেন?

ভাল ফুল দেখে আপনার বড়া ভেজে খাবার কথা মনে হয়েছিল, তাই ভাবলাম আপনি নিশ্চয়ই সৌখীন লোক।

বটে। দু'দিন পরে এস।

কাঠুরে চৌধুরী আর অপেক্ষা করল না। জীপ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বত্রিশ

কাঠুরে চৌধুরী দিন কয়েক এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়াল। স্নান করে নি, খেতেও আসে নি এক একদিন। দময়ন্তী খবর নিয়েছে, জেনেছে যে সে তার কারখানাতেও যায় নি। কোথায় গেছে, কি করেছে, তা শুধু সেই জানে।

এই মানুষটার জন্য দময়ন্তীর আজ দুঃখ হল। রাতারাতি সে যেন বদলে গেছে। দুর্ঘটনার পর তারা যখন এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, তখন লোকটা অন্যরকম ছিল। এমন দুঃসময়েও তার মাথা ঠাণ্ডা ছিল। নিজেই শুধু নিয়ম পালন করে নি, দময়ন্তীকে নিয়ম মানতে বাধ্য করেছিল। বলত, নিয়ম মানা না-মানা একটা অভ্যাস। এই অভ্যাসের সঙ্গে বিপদ-আপদের সম্বন্ধ নেই।

সেই কাঠুরে চৌধুরী এখন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়িতে তাকে পাওয়াই যাচ্ছে না। কেন এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাও জেনে নেবার উপায় নেই।

দু'দিন থেকেই সেই মালীটা ঘোরাঘুরি করছে। কাঠুরে চৌধুরীর দেখা পায় নি, দেখা পেয়েছে দময়ন্তীর। তাকে দেখে লোকটার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। বলেছিল : তুমি এখানে দিদিমণি?

দময়ন্তীও জিজ্ঞাসা করেছিল। তুমি এখানে?

মালী বলেছিল : চাকরির চেষ্টায় ঘুরছি।

দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে বলেছিল : কেন, আমাদের বাড়ির চাকরি বুঝি নেই?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালী বলেছিল : বাবুই নেই তো আমার চাকরি!

বাবা নেই!

ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল দময়ন্তী।

তাড়াতাড়ি মালী বলেছিল : বাড়িতে নেই, কোথায় আছেন তা কেউ জানে না।

তারপর দময়ন্তীকে তাদের বাড়ি বিক্রি হবার খবর দিয়েছিল। বলল : শুনতে পাচ্ছি, তোমাদের বাড়িতে একটা ইস্কুল বসবে।

বাবার কি হয়েছিল?

কিছু একটা অসুখ ছিল, কিন্তু ডাক্তারের চিকিৎসা করান নি। রাতে ঘুম হত না বলে বারান্দায় পায়চারি করতেন, এক একদিন—

এক একদিন কি?

ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠতেন।

কিসের ভয়?

তা তো জানি না দিদিমণি। আমরা কোনদিন ভয়ের কিছু দেখি নি।

তবে?

তবে লোকে নানান কথা বলত।

আদি

মিল্ক অফ্‌

ম্যাগনেসিয়া

পরিবারের সকলের
পক্ষেই আদর্শ

বিরেচক-অম্লনাশক

GENUINE
PHILLIPS'
MILK OF MAGNESIA
CONCENTRATED LIQUID MAGNESIA
SHAKE WELL BEFORE USING

এই নিশ্চিত উপায়ে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হচ্ছে!

কেবলমাত্র একটিই খাঁটি ফিলিপ্‌স মিল্ক অফ্‌ ম্যাগনেসিয়া আছে—সারা পৃথিবীর কোটি কোটি লোক যে অম্ল-নিরোধক কোষ্ঠ পরিষ্কারক ওষুধটি জানেন ও ব্যবহার করেন। কোষ্ঠকাঠিন্য ও তার উপসর্গ থেকে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের জন্যে মিল্ক অফ্‌ ম্যাগনেসিয়ার চেয়ে ভাল ওষুধ আর নেই।
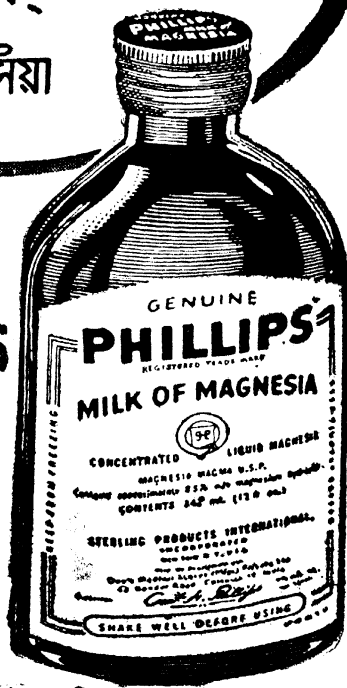
প্রস্তুতকারক রেজিষ্টার্ড ব্যবহারকারী: দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স (ম্যানুঃ) প্রাঃ লিঃ

দময়ন্তী উৎসুকভাবে তাকাল মালীর মুখের দিকে। কিন্তু মালী আর কোন কথা বলল না।

দময়ন্তী জিজ্ঞাস করল: কারা ইস্কুল খুলছে?

শুনছি, এক বুড়ো মহাজন। বাবুর দেনার দায়ে বাড়িটি নীলাম হয়ে যাচ্ছিল। সেই বুড়ো কিনে নিয়েছে।

ইস্কুল খুলছে কেন?

বোধ হয় নামের জন্যে। বুড়ো-বয়সে সবারই ইচ্ছা নাম কিনবার।

দময়ন্তী বলল: তুমি একটু বসো মালী, আমি এখুনি আস

দময়ন্তী জগদীশের কাছে এসে ঘটনাটা বলল। তার হাত দু'টো চেপে ধরে বলল: তুমি যদি অনুমতি কর, তা' হলে এই স্কুলেই একটা চাকরির চেষ্টা দেখি।

মাথা নেড়ে জগদীশ বলল: না-না এখানে নয়, চল আমরা রাঁচীতে ফিরে যাই।

কি করব সেখানে?

দরকার হলে ভিক্ষে করব, কিন্তু এই জঙ্গলে আর নয়।

দময়ন্তী স্তব্ধ হয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বলল: সেই ভাল।

তার চোখের দিকে জগদীশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়েছিল। দেখল, তার মুখের প্রসন্নতা অন্তর্হিত হল, দৃষ্টি হল বেদনার্ত।

জগদীশ বুঝি এই রকমই কিছু আশা করেছিল, বলল: মিস্টার চৌধুরীকে কয়েক দিন দেখতে পাচ্ছি না।

দময়ন্তী সংক্ষেপে বলল: হাঁ।

তিনি কি কোথাও বাইরে গেছেন?

জানি নে।

রাতে বাড়ি ফেরেন না?

বোধ হয় ফেরেন।

দেখা হয় না তোমার সঙ্গে?

না।

তবে এই ইস্কুলের খবর কে দিল?

এতক্ষণে দময়ন্তী তার বিরাগের কারণ বুঝল। বলল: আমাদের পুরনো মালি। বাবার কথা তো তার কাছেই শুনলাম। অপমানের ভয়ে বোধ হয় পালিয়ে গেছেন।

জগদীশ এবারে চুপ করে রইল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দময়ন্তী বলল: লিই না একটা দরখাস্ত করে। মালীকে বসিয়ে রেখে এসেছি, তা ই হাতে দিয়ে দেব।

জগদীশ কোন উত্তর দিল না।

দময়ন্তী বলল: লিই না গো!

এবার জগদীশ উত্তর দিল, বলল: দরখাস্ত পাঠালেই কি চাকরি হয়।

হবে। ডাক্তার সেনকে ধরব, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন।

জগদীশ সম্মতি দিল না, আপত্তিও করল না। দময়ন্তী আর দেরি না করে দরখাস্ত লিখে ফেলল। তারপর বাইরে গিয়ে মালীর হাতে দিয়ে বলল: সেই বুড়ো মহাজনের হাতে এটা পৌঁছে দাও। কোন উত্তর দিলে আমাকে জানিও।

বিকেল বেলায় ডাক্তার সেন এসেছিলেন জগদীশকে দেখতে। বললেন: টেলিফোনে কথা হয়েছে। সামনের বুধবারে অ্যাম্বুলেন্স আসবে।

জগদীশ বলল: দময়ন্তী এদিকে কি করেছে জিজ্ঞেস করুন।

দময়ন্তী সবই খুলে বলল, সেই সঙ্গেই অনুরোধ জানাল তাকে সাহায্যের জন্যে।

আশ্চর্য হয়ে ডাক্তার সেন জিজ্ঞাসা করলেন: কারা ইস্কুল?

দময়ন্তী লজ্জিতভাবে বলল: তা তো জানি নে। মালী বলছিল এ বুড়ো মহাজন।

ডাক্তার সেন বললেন: মুস্কিলের কথা।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন: মিস্টার চৌধুরী কোথায়?

জানি নে।

ডাক্তার সেনের জন্য চা নিয়ে লবাট ঘরে এসেছিল। ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কি রে, তোর প্রভু কোথায়?

সাহেব? সাহেব হাজারীবাগে গেছেন।

জগদীশও আশ্চর্য হল। বলল: কবে?

লবাট বলল: কিছুক্ষণ আগে ওঁরা এসে জিনিসপত্র নিয়ে গেল। ফিরতে নাকি দেরি হবে।

বিস্ময়ে দময়ন্তী অভিভূত হল।

ডাক্তার সেন বললেন: মানুষটা এই রকমই।

জগদীশ প্রশ্ন করল: কি রকম?

সাধারণ সৌজন্যবোধের অভাব আছে। জংলী লোকেদের সঙ্গে কাজকর্ম করে এই অবস্থা হয়েছে।

জগদীশ বোধ হয় খুশি হল। তাই দেখে ডাক্তার সেন বললেন: আপনারা যে চলে যাচ্ছেন উনি জানেন। দিনকয়েক পরে গেলে কি চলত না?

হঠাৎ দময়ন্তীর দিকে চোখ পড়তেই ডাক্তার সেন থেমে গেলেন।

জগদীশ বলল: উনি ফিরে না এলেও ওঁর জন্যে আমরা অপেক্ষা করতে পারব না। অ্যাম্বুলেন্স এলে আমাদের যেতেই হবে।

দময়ন্তী বলল: কিন্তু এর মধ্যে আমার চাকরিটা যদি হয়ে যায়—

জগদীশ বলল: তা হলেও আমরা এ বাড়িতে আর থাকব না। ভদ্রলোকের উপর আমরা অনেক অত্যাচার করেছি।

ডাক্তার বললেন: তা সত্যি।

দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করল: এ অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না?

বাড়ি ভাড়া!

চাকরিটা যদি আমাদের হয়, তা হলে তো একটা আস্তানা আমাদের চাই!

তা ঠিক।

যাবার সময় ডাক্তার সেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন যে, এ বিষয়ে তিনি তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। বুড়ো মহাজন যদি এ অঞ্চলের লোক হন, তা হলে তাঁর কথা কিছুতেই ফেলতে পারবেন না। দময়ন্তী নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

[আগামীবারে সমাপ্য।

বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্র-সাহিত্য

নন্দিতা দত্ত

মানুষের চাওয়ার অন্ত নেই। প্রয়োজনের তাগিদায় মানুষের যে জিনিসের চাহিদা থাকে তার যোগান দেওয়া ব্যবসায়ীদের কাজ। যুগ যুগ ধরে ব্যবসায়ীরা মানুষের চাহিদা বুঝে—জিনিস উৎপাদন করেছেন এবং স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের উৎপন্নজাত দ্রব্য ক্রেতারা যাতে বেশি পরিমাণে কেনে—তার জন্য ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপন দেন। নানা উপায়ে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। রাস্তায়-ঘাটে সর্বত্র এই বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্র-পত্রিকায়, রূপালী পর্দায়, চৌমাথার মোড়ে সর্বত্র বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপন আরও আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে যখন শিল্পীর তুলিতে, বৈদ্যুতিক আলোর চমৎকারিত্বে, লেখকের লেখনীতে এবং কবির কবিতার ছন্দের যাদুস্পর্শে—বিজ্ঞাপন—সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ ধারণ করে।

তাই আজকাল দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্র শতবর্ষোত্তর যুগে কবিগুরুর কবিতার মধ্য দিয়ে, কাব্যের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতি শুরু হয়েছে। এমনও দেখা যায় কোন কোন জায়গায় কবির ফটো টাঙিয়ে এক বিশেষ দ্রব্যের সম্বন্ধে তার মুখের প্রশংসাবাদ লিখে দেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে এমনভাবে সাজিয়ে দিয়ে গেছেন যাতে সাহিত্য-পিপাসুর দল ঈপ্সিত বস্তু চাইতে এসে ফিরে না যান। তাঁর সাহিত্যের রসপান করা ছাড়াও রয়েছে তাঁর ডাক্তারী বিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, নৃতত্ত্ব বিদ্যা, রাসায়নিক বিদ্যা এবং আরও কত কি তাও বা আমরা যখন অবাক বিস্ময়ে তাঁর আকাশছোঁয়া প্রতিভার কথা চিন্তা করি তখন দেখি রবীন্দ্রসাহিত্যকে বিজ্ঞাপনের মধ্যেও টেনে আনা হয়েছে। খবরের কাগজের এক কোণায় যখন দেখি একটি সুন্দরী তরুণীর কেশরাশির পাশে ছোট একটি সুগন্ধি তেলের ছবি আর বাঁকা হাতের লেখায় ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে—

'ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটেই,
মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।'

তখন বিজ্ঞাপনদাতার কাছে হার মানতেই হয়। আবার যখন দেখি—

'মুক্তকেশে পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি'

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় দেবতার বরে চিত্রাঙ্গদা যে রূপ অঙ্গে ধারণ করেছিলেন রূপলাবণ্য-বিলাসিনীরা সেইরূপ ইচ্ছা করলেই ধারণ করতে পারেন কোন এক বিশেষ তৈল ব্যবহার করে।

রবীন্দ্রশতবর্ষোত্তর যুগে বিজ্ঞাপনদাতারা রবীন্দ্রকাব্যের অংশবিশেষ এমনভাবে তাঁদের বিজ্ঞাপনে বসিয়ে দিলেন যেন মনে হয় কবিগুরু তাদের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই তাঁর জীবিতকালে লিখে রেখে দিয়েছিলেন। আর যেসব ভাগ্যবান বিজ্ঞাপনদাতারা তাঁদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে কবিগুরুর কাছ থেকে মতামত লিখিয়ে নিয়েছিলেন তাঁদের তো এ যুগে আনন্দ আর ধরে না।

উদাহরণস্বরূপ এক রেকর্ড কোং তাঁদের বিজ্ঞাপনে কবির উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন—'সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যলোকে আমাদের নিয়ে যায়। সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না। সেখানে যাবার পথ কেউ চোখে দেখে নি।'

শেয়ালদা স্টেশনের সম্মুখভাগ ছবি এঁকে ওপরে রেলপথ বিভাগ ক্যাপসন দিলেন 'শেয়ালদা হয়ে শিলাইদহ।' তার পাশে লেখা রয়েছে 'শান্তিনিকেতনের বন্ধুর খোয়াই থেকে শিলাইদহের প্রশস্তা পদ্মা অনেক দূর। উর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড় থেকে শ্রান্ত রূপসীর মত প্রসারিত তন্বু পদ্মার উচ্চ তটতল।' কবিমনের এই ক্রমপরিবর্তনের বিচিত্র পথ হয় তো শান্তিনিকেতন থেকে শিলাইদহ পর্যন্ত প্রসারিত। বারংবার কবির এই পথ-পরিক্রমার সহস্র স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে শতাব্দী-প্রাচীন শিলাইদহ। এইরকম বিজ্ঞাপন পড়ে কার না মন পাড়ি জমাতে চায় শিলাইদহের প্রশস্তা পদ্মার শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে! আর একরকম রেলপথের বিজ্ঞাপনে দেখেছি রেলগাড়ির সম্মুখভাগের ছবি দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে—রেল লাইনের ধারে বিরাট বটবৃক্ষরাজি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে রয়েছে—নীচে লেখা রয়েছে—

'দিনরাত গড় গড় ঘড় ঘড়
গাড়ি ভরা মানুষের ছোটে ঝড়
ঘন ঘন গাড়ি তার ঘুরবে
কভু পশ্চিমে কভু পূর্বে'

রবীন্দ্রনাথ অনেক বিষয় নিয়ে লিখেছেন। মানুষের দুঃখকে তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তাঁদের সুখ-দুঃখ নিয়ে লিখেছেনও প্রচুর। বিশেষ করে পল্লীঅঞ্চলের রোগজীর্ণ শীর্ণকায় লোকেদের দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি কোন এক জায়গায় তাদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

'দেখেছি সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের আধমরা মানুষ নিয়ে দেশে কোন বড় কাজের পত্তন সম্ভব নয়। তারা কাজে ফাঁকি দেয় প্রাণের দায়ে, আর সেই কারণেই প্রাণের দায়ে দুরূহ হ'য়ে ওঠে। আমরা অনেক সময় দোষ দেই বাহ্য কারণকে। কিন্তু রোগজীর্ণতা পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জার মধ্যে বাস করে গুরুতর কর্তব্যের ভারকে ভগ্ন উদ্যমে ফাটল দিয়ে পথে-পথে যে ছড়িয়ে দিতে থাকে, লক্ষ্যস্থানে অল্পই পৌছয়।' এক নামকরা ওষুধ বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান, কবিগুরুর এই অংশটিকে তাঁদের ওষুধের বিজ্ঞাপনের কাজে লাগালেন।

আর এক বেকারিজ প্রাইভেট কোম্পানী কবিগুরুর জনপ্রিয় কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে' থেকে অংশবিশেষ তুলে ধরলেন 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই স্বাস্থ্য উজ্জ্বল আনন্দ, উজ্জ্বল পরমায়ু'। কবিগুরুর এই কবিতার গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য কতখানি—তা রবীন্দ্র পাঠক-পাঠিকার জানা আছে—কিন্তু শুধু ঐ বিশেষ অংশটুকু প'ড়ে মনে হয় যেন ঐ বিশেষ পাঁউরুটী বিক্রেতার জন্যই বোধ হয় তিনি লিখেছিলেন।

এক বর্ষাতি বিক্রেতার বিজ্ঞাপনের নমুনা কিরকম ভাবে দিলেন তাই দেখা যাক। মাঠে রাখাল বালক গরুর পাল নিয়ে দাঁড়িয়ে

রেলগাড়ীতে উচ্ছৃঙ্খলতা

ডিসেম্বর ১৯৬৩ থেকে মে ১৯৬৪ পর্যন্ত এই ছ' মাস সময়সীমার মধ্যেই পূর্ব-রেলপথের হাওড়া এবং শিয়ালদহ এই দু'টি বিভাগকে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে তার অঙ্ক যথাক্রমে ২৯১,৯৮৬ এবং ৪৩৭,৩১৩ টাকা। ট্রেনগুলির কামরা, ওয়াগন এমন কি বৈদ্যুতিক ট্রেন থেকেও ট্রেনের আসবাবপত্রগুলির উন্মত্তের মত ধ্বংসসাধন ও তার যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলি ও বস্তুগুলির অপহরণই এই বিপুল ক্ষতির প্রধান কারণ। শুধু মে মাসেই এই বাবদ ক্ষতির অঙ্ক ৬১,৮১২ টাকা (হাওড়া) এবং ৬৬,৯১৬ টাকা (শিয়ালদহ)।

২৫ KV. AC. বৈদ্যুতিক ট্রেনগুলি—২রা ডিসেম্বর ১৯৬৩ থেকে যেগুলি প্রচলিত হয়েছে—দেখা যাচ্ছে এই উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপক লীলাক্ষেত্রে আজ পরিণত। এপ্রিল মাসে দেখা গেছে বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক বস্তুগুলির অপহরণ বাবদ শিয়ালদহ স্টেশনকে ৬০,০০০ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

রেল-কামরার ছিন্নভিন্ন আসন
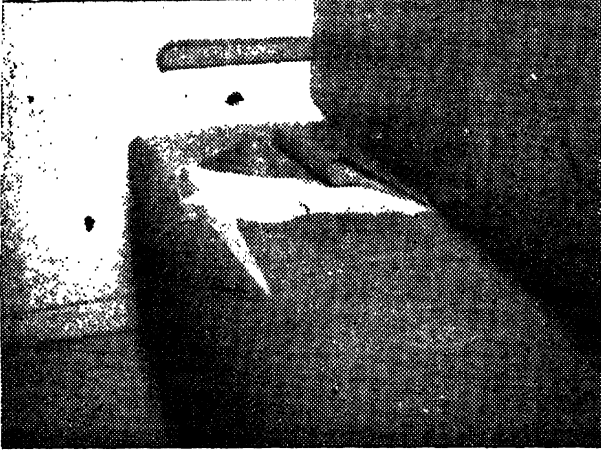
পৃথিবীর যে কোন দেশের রেলপথের মূল্যবান সম্পদ হিসাবে গণনীয় এই সকল সুন্দর ও সুদৃশ্য কোচগুলি যেভাবে এই সমাজবিরোধী উচ্ছৃঙ্খলদের শিকারে পরিণত হয়েছে তা ভাবলে আর বেদনার অন্ত থাকে না। এই ধ্বংসকর্মে তারা সম্পূর্ণরূপে জড়তাবিহীন। রবারের আসন, রেক্সিন কাপড় এবং পাটের ক্যানভাস ও ব্যয়বহুল বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও বস্তুগুলি পরিপূর্ণরূপে আজ ছিন্নভিন্ন ও বিনষ্ট।

এই উচ্ছৃঙ্খলদের অপকীর্তির ফলে সাধারণ যাত্রীদের অনেকেই তাঁদের প্রাপ্য এবং তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট সুযোগ ও বন্দোবস্ত থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছেন। তাই, এদের দমনে রেল কর্তৃপক্ষ সাধারণ যাত্রীদেরও সানুকুল সহযোগিতা এই অবস্থায় বিশেষভাবে কামনা করেন—এই মর্মে সাধারণ্যে কর্তৃপক্ষ আবেদন জানিয়েছেন।

দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে; মেঘের ঘনঘটায় সমস্ত আকাশ কালো হয়ে রয়েছে। এ আর একটি সুশ্রী তরুণীর ঘনকালো কেশরাজি বাতাসে উড়ছে। এই রকম ছবি ছেপে পাশে লিখে দিলেন—

'ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে
আঁচলখানি দোলে॥

এই রকম আরও কত বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্র-কাব্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এটা সত্যি যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে সহজ হয়ে আসে। আর বিজ্ঞাপনদাতারা সব সময় দাবী করেন—তাঁদের আপন আপন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনজাত দ্রব্য উৎকৃষ্ট—সেই বিশ্বাস হয় তো ক্রেতার মনে জন্মাতে সফল হন। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করতে হয় কবিগুরুর উপযুক্ত অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দ্বারা আপন আপন জিনিসের গুণাগুণ ব্যক্ত করার প্রয়াস আনন্দ ও উৎসাহজনক।

কোন কোন সময় মনে প্রশ্ন জাগে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বকে বোঝার মত বা নিবিড়ভাবে আপন করে নেওয়ার মত আমাদের সাধারণস্তরের লোকেদের সুযোগ আসবে কি না। হয় তো বা—উচ্চস্তরের পণ্ডিতদের গবেষণার মধ্যেই তাঁর প্রতিভা সীমিত থাকবে। আমাদের কাছে তিনি হয়ে থাকবেন অনেক দূরের মানুষ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না, নানাভাবে তাঁকে আমরা কাছের মানুষ করে নিতে পেরেছি। তাঁর সান্নিধ্য গানে, কবিতায়, বিজ্ঞাপনে, সর্বদিক দিয়ে আমরা তাঁকে আমাদের কাছে একান্তভাবে আপন করে পাচ্ছি।

মনের অন্তস্তলে যে আশঙ্কা মাঝে-মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে এমন একদিন আসবে যেদিন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গবেষণার উপাদান ফুরিয়ে যাবে—কিন্তু এখন দেখছি তেমন দুর্দিন আর আসবে না। নতুন অনেক সম্ভাবনার পথ খুলে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট কর্মময় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কথা ও কাজ আমাদের কাছে সাহিত্যের মূল্য আছে এবং তা নিয়ে বহুরকম ভাবে আলোচিত হচ্ছে। চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ, হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্রনাথ এ-রকম ধরণের অনেক প্রবন্ধই আজকাল খবরের কাগজে বা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পাচ্ছে। সুতরাং মাভৈঃ—রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে দূরের মানুষ নন, তিনি চিরদিন আমাদের মাঝেই চির-অমর হয়ে থাকবেন। তিনি হলেন কালজয়ী মহাপুরুষ।

বার বার তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে এ কথাই মনে ধ্বনিত হয়,—

তুমি আমাদের ভাষা,
তুমি আমাদের গান,
তুমি আমাদের চিন্তা,
তুমি আমাদের ধ্যান
তোমাকে নমস্কার।

আলোকচিত্র

মৌন প্রহরী

—পি, সাহানা

বাতিঘর (বিশাখাপত্তনম্)

—প্রতিমা মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় বিমানবন্দরে চেস্টার বোলস

—ইউ এস আই এস
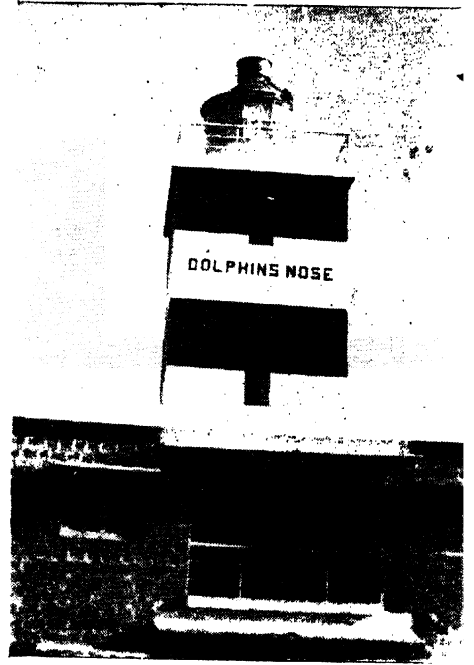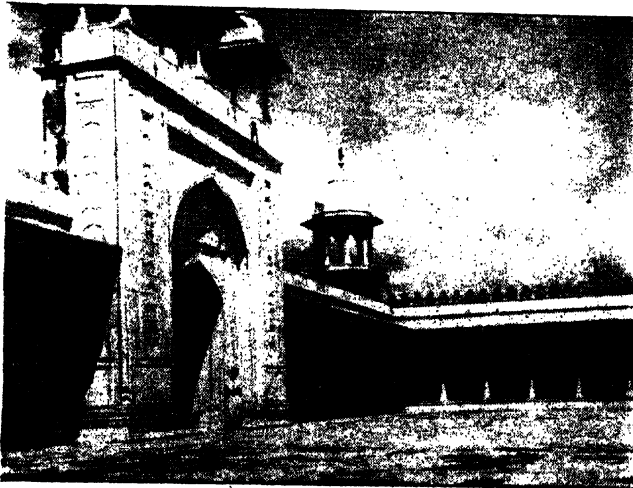
আগ্রা দুর্গ

—অসিত সরকার

অপেক্ষা

—জানকী বন্দ্যোপাধ্যায়

এ্যাক্‌সিডেন্ট্

—শান্তিময় সান্যাল

খাদ্য চাই !

—এস, ধর

সোহাগী

—প্রভাত বাগচী

প্রভাতের প্রভায়

—বিনয় মুখোপাধ্যায়
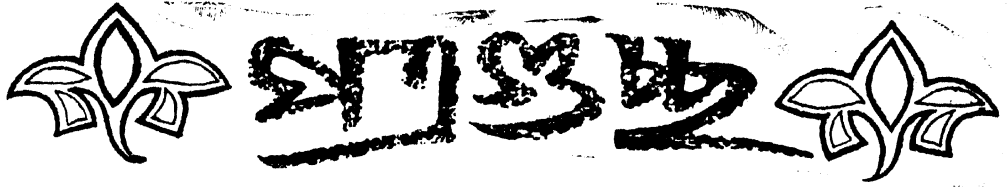
কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক পত্র

ডঃ বাস্টিডকে লিখিত লর্ড কার্জনের পত্র

হ্যাকউড, ব্যাসিংস্টোক

প্রিয় ডক্টর বাস্টিড, এপ্রিল ১৬, ১৯০৮

আপনার সুবিখ্যাত 'ইকোস ফ্রম ওল্ড ক্যালকাটা'র একটি বৃহত্তর সংস্করণ প্রকাশের প্রহর গুণিতেছে জানিয়া আমি আন্তরিকভাবে আনন্দলাভ করিলাম। যে সংস্করণটি আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল তা'হাতে আমি আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি যে, উহার প্রতিটি ছত্রে আপনার অফুরন্ত জ্ঞান এবং অক্লান্ত উদ্যমের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। ভারত হইতে আসিবার পথে যখন আমি প্রথম আপনার গ্রন্থ পড়িতে শুরু করি তখন হইতেই লক্ষ্য করিতেছি যে, সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে এমন কোন পৃষ্ঠা নাই যাহার মধ্যে অনুরাগ এবং অনুপ্রেরণার চিহ্ন অনুপস্থিত। অনুরাগ বলি এই কারণে যে, বঙ্গদেশে বৃটিশ-শাসনের সূত্রপাত হইতেই প্রখ্যাতনামা নরনারীদের ভাগ্য একটি সূত্রে সংযুক্ত হইয়া যায় যাহা তাহাদের জীবনের এবং প্রতিভার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুপ্রেরণা বলিব এই কারণে যে, আপনার সজীব বর্ণনভঙ্গী নিশ্চয়ই অগণিত পাঠক-পাঠিকার অন্তর অভিভূত করিয়াছে। অবলুপ্ত অথচ অতীতের ঔজ্জ্বল্যযুক্ত বিবরণসমূহ উদ্ধার করিয়া তাহাদের যে অভিনব রূপদান আপনি করিয়াছেন তাহা আবিষ্কার করিয়া আমারও চিত্ত বিশেষরূপে অভিভূত হইয়াছে।

কলিকাতা—ব্যবহারিকজীবনের সচরাচর দৃষ্টিতে একটি সাধারণ স্থান বলিয়া প্রতিভাত হইলেও সত্যের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশেষ আকর্ষণীয় স্থান। অনেকানেক ইউরোপীয়ের মধ্যে যাঁহারা সেখানে সমাবিষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সেখানে অল্পকালের জন্য বাসা বাঁধিয়াছিলেন তাঁহাদের পদচিহ্ন আজ যে আবৃত সে সম্বন্ধে অবশ্যই কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু, আপন যৌবন ও আকাঙ্ক্ষার স্বর্ণলগ্নে যাঁহারা এশীয়মঞ্চে পদক্ষেপ করিয়া বহু পরবর্তীকালে অবসর লইয়াছিলেন হয় তো বিশেষ খ্যাতিলাভের জন্য কিম্বা অন্যত্র আরও বিরাট পরিসরের মধ্যে নিজেকে সংযোজিত করার জন্য—কলিকাতার এই আকর্ষণের মূলে তাঁহাদের অবদান অবিস্মরণীয় নয়। যে সময়টি আপনার লেখনীর মধ্য দিয়া চিত্রিত হইয়াছে সে দিকে নয়নপাত করিলে দেখিতে পাই যে, কুড়ি বছরের সময় সীমার মধ্যে কত আলোকোজ্জ্বল চরিত্রের অভাবনীয় সম্মেলন কলিকাতাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল—বহু বিচিত্র পথগামী এই এক-একটি চরিত্রগুলির মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস, স্যার ইলাইজা ইম্পে, ক্লোস এমলার, শিল্পী জোফানি, ভবিষ্যৎ যুবরাজ্ঞী ট্যালেরান্দ প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হওয়ার দাবী রাখে। এই সব কারণেই যুগ এবং স্থান উভয়ই বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

যুগের প্রথার এবং আচার-আচরণের পরিবর্তন যত ঘটিতেছে, অতীতের পরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অপেক্ষাও ব্যক্তিচরিত্র এবং ব্যক্তিগত ঘটনাদি ততই অধিকতর আকর্ষণীয় মনে হয়। অতীতের বহু এই জাতীয় চরিত্র এবং ঘটনা বিস্মৃতির সমুদ্র হইতে পুনরুত্থিত হইয়া নবরূপে নবকলেবরে আপনার গ্রন্থে যে চিত্রিত হইয়া উঠিয়া বর্তমানের পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছে—ইহাও আপনার গ্রন্থের কম আকর্ষণ নয়। আপনার সান্নিধ্যে আমরা আজ আবার ব্ল্যাক হোলের মরণ যন্ত্রণা, ওয়ারেন হেস্টিংসের নম্র, শান্ত, গাঢ় অনুরাগ এবং সহিষ্ণুতা, জুনিয়াসের হিংসা ও ষড়যন্ত্র, ইয়োরোপের কূটনৈতিকের সঙ্গে যাঁর বিবাহ হইল—কোরোমণ্ডল উপকূলে জাতা সেই পরমাসুন্দরী দুঃসাহসিকার জীবনালেখ্য যেন আমরা স্পষ্টভাবে আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ব্যবসায় এবং শাসনকার্য সময় যতই অধিকার করুক তথাপি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাকার্যে অবকাশ মুহূর্তটুকুও নিয়োজিত করিতে ভারতের এ যুগের মানুষকে আপনার গ্রন্থটি উদ্দীপিত করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তদুপরি যে অতীত অবচেতনভাবে আমাদের বর্তমান সাম্রাজ্যশস্যের বীজ বপনের কাল বলিয়া গণ্য তাহার প্রতি একটা পবিত্র কর্তব্যও আমার মতে এই মানুষদের আছে।

আপনার গ্রন্থের নবসংস্করণ উৎকর্ষের বিচারে পূর্ববর্তীগুলিকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া যাক এই কামনা সর্বান্তঃকরণে করিতেছি জানিবেন।

আপনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত

স্বাঃ কার্জন অফ কেডলস্টন

কোম্পানীর পরিচালকদের উদ্দেশে লর্ড ক্লাইভ এবং তাঁহার কর্মপরিষদের সদস্যদের পত্র

ফোর্ট উইলিয়াম

২৯এ ডিসেম্বর, ১৭৫৯

আপনাদের পত্রের ভাষা ও রচনারীতি আপনাদের এবং আমাদের উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ইহা বলিবার অনুমতি দান করুন। কি প্রভু-ভৃত্যে, কি ভদ্রলোকে-ভদ্রলোকে—যে কোন দিক দিয়া বিচার করিলেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। সামান্য খুঁটিনাটি ভুলত্রুটি এবং কোন কোন অনায়াসে উপেক্ষণীয় অনিচ্ছাকৃত অনবধানতার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত করা হইয়াছে এবং উহা যথেষ্ট কঠোরতার সঙ্গে গৃহীত হইয়াছে। দুর্নামের ও কলঙ্কের প্রসার যদি বহু বৎসরের কর্মজীবনের

সকল গৌরব এক ঘণ্টায় ফুৎকারে কবিয়া দিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সামান্য ও অপ্রধান উদ্দেশ্যগুলিতে আস্থা রাখাই সমীচীন।

স্বা: ক্লাইভ
ম্যানিংহাম
ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড,
ম্যাকেট
কুক
বেচার
প্লেডেল

উপরোক্ত পত্রের উত্তর

কোম্পানীর কর্মে এখনও যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা গত ২৯এ ডিসেম্বরের পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেছি যে এই পত্র পাঠ মাত্র তাঁহাদের যেন অবিলম্বে কর্ম হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁহারা যেন কোন প্রকারে ভারতবর্ষে আর অবস্থান করিতে না পারেন সে দিকেও আপনাকে প্রখর দৃষ্টি দান করিতে এতদ্দ্বারা নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে এবং এই পত্র আপনার হাতে পৌছানোর পর যে প্রথম জাহাজ স্থানীয় বন্দর ত্যাগ করিবে—তাহাতে যেন অবশ্যই তাঁহাদের তুলিয়া দেওয়া হয়। এই নির্দেশগুলি যেন কোনপ্রকারে অ করা না হয়।

গভর্নর ভ্যান্সিটার্টকে লিখিত হলওয়েলের পত্র

বর্তমান পরিচালকমণ্ডলীর নিকট হইতে হাল আমলে আমি যে সকল অন্যায়, বিচারবিহীন ও ক্রোধোদ্দীপক মন্তব্যসমূহ লাভ করিতেছি তাহা আর অধিকদিন এই কর্মভার বহন করিবার ক্লেশ হইতে আমাকে মুক্তি দিতেছে। কোম্পানীর অনুকূলে এবং স্বার্থে আমার নিঃস্বার্থ সেবা ও উদ্যম এই সময়ের মধ্যে কিছু সম্মানজনক এবং পক্ষপাতবিহীন প্রতিদান আশা করিতে পারিত।

ক্লাইভকে লিখিত ফিলিপ ফ্রান্সিসের পত্র

নিজের জায়গীরের ভাগ্যের প্রতি অবিলম্বে দৃষ্টি দিন। অন্য কাহাকেও কখনও যাহা বলি নাই, আপনাকে তাহা বলিতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেছি না যদি এমন কোন ব্যবস্থা হয় যাহার সহিত আমি নিজেকে মিলাইতে পারিব না বা যাহার সহিত আমার সংযোগ কোনপ্রকার ফলপ্রসূ হইবে না তাহা হইলে আপনি সেক্ষেত্রে বরাবরের জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগ করিতে পারেন।

শেরিফকে লিখিত বিচারপতিদ্বয়ের পত্র

কলিকাতার শ্রীযুক্ত শেরিফ মহোদয় এবং কলিকাতাস্থ
মহামহিম রাজনের কারারক্ষক মহোদয়

বিষয়: মহারাজা নন্দকুমার

মোহনপ্রসাদ, কামালউদ্দীন খাঁ এবং অন্যান্যের শপথানুসারে-অভিযুক্ত মহারাজা নন্দকুমারকে আপনার হেফাজতে রাখিয়া লউন। পরলোকগত বুলাকী দাসের এক্সিকিউটারবর্গকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে জাল জানিয়াও ইচ্ছাপূর্বক এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে আসল বলিয়া একটি জাল উইলকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত। আইনের স্বাভাবিক বিধান অনুযায়ী ইনি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ইঁহাকে নিরাপদে আপনার হেফাজতে রাখিবেন।

স্বা: এস সি লিমেন্ডে

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ জন হাইড

পত্রটি ঐতিহাসিক হ'লেও তার বিষয়বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে সংশয়ের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। ভারতবর্ষে একটি সময় এসেছিল, যে সময় শাসকগোষ্ঠীর খুশিমাফিক ইতিহাস লিখিত হয়েছিল। একাধিক কারণবশত সত্যকে চাপা দিয়ে কাল্পনিক কাহিনীকে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দেওয়া হয়েছিল। সুখের বিষয়, এ যুগের শক্তিমান গবেষকদের সাধনায় বহু অবলুপ্ত সত্যের পুনরুদ্ধার হয়ে ইতিহাসের নতুন ভাষ্যের সৃষ্টি হচ্ছে। দেশপূ মহারাজা নন্দকুমারের মাথা নত করতে পারেন নি বৃটিশ সরকার। ইংরেজের প্রীতির পাত্রদের তালিকায় সেই জন্যে এই স্মরণীয় নেতার নাম অনুপস্থিত। স্বাধীনচেতা, দৃঢ়চিত্ত, তেজস্বী এই ব্রাহ্মণকে মিথ্যা অভিযোগে যে অভিযুক্ত করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আজকের দিনের নর-নারীর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

ফ্যারারকে লিখিত ব্রিক্সের পত্র

প্রিয় মহাশয়,

গুরুতর উদ্বেগের সহিত এই পত্রে আমি আপনাকে যাহা জানাইতেছি আমার অনুমান যে, মেসার্স জ্যারেট এ্যাণ্ড ফক্সক্রফট তাহা আপনাকে পূর্বেই অবহিত করিয়াছেন যে রাজাই শুধু দোষী সাব্যস্ত হন নাই, আদালতের সময়ে মিথ্যা শপথগ্রহণ করার অভিযোগে মীর আশাদ আলী, শেখ ইয়ার মহম্মদ এবং কৃষ্ণজীবন দাসকেও অভিযুক্ত করার দায়িত্ব পাবলিক প্রসিকিউটার গ্রহণ করিয়াছেন। কি দুর্ভাগ্য রাজার! কেন যে তিনি জীবন দাসের শেষ সাক্ষ্য কামনা করিলেন—যে সাক্ষ্য পূর্ববর্তী সমস্ত বিবৃতিগুলিকে একেবারে উল্টাইয়া দিল এবং তাহাদের গুরুত্বসমূহ একেবারে নষ্ট করিয়া দিল। রাজা নিজেই নিজের দুর্ভাগ্যকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। পূর্ববর্তী সাক্ষ্যদাতাদের সাক্ষ্যগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া ও সুচিন্তিতভাবে বিচার-বিবেচনা করিয়া স্যার ইলাইজা হয় তো জুরিবর্গকে রাজাকে "নির্দোষ" বলিয়া ঘোষণা করার নির্দেশ দিলেও দিতে পারিতেন। আপনি এবং আমি স্যার ইলাইজাকে যে নোট দিয়াছিলাম—তাহার সদ্ব্যবহার তিনি যথেষ্টই করিয়াছেন—সেগুলি আমি এতৎসহ পাঠাইতেছি। যেহেতু গতকল্য রাত্রি তিনটার পর আর নিদ্রা না আসায় আমি বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিতেছি সে কারণে কিছু বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া আপনার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষিত থাকিব। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে এ বিষয় কার্যকর কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তাহা যথেষ্ট সতর্কতা এবং বিচার বিবেচনা বিশ্লেষণ সহকারে আলোচনা করিতে হইবে। আমার সাধ্যের মধ্যে যতদূর সম্ভব এ

ক্ষেত্রে তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া আপনার সহিত সানন্দে সহযোগিতা করিব জানিবেন। বাস্তবিক, হতভাগ্য বৃদ্ধের জন্য বড়ই বেদনা হয়।

প্রিয় মহাশয়, আপনার
অত্যন্ত বিশ্বস্ত
স্ব: সি এফ ব্রিস্ক
শুক্রবার, প্রাতঃকাল

উইলারকে লিখিত ফ্র্যান্সিসের পত্র

প্রিঃ মিঃ উইলার,

মিঃ হেস্টিংস ও আমার মধ্যে যে কাগজপত্রের বিনিময় হইয়াছে, তাহার একটি নকল মিঃ টিলঘম্যান আপনাকে দিবেন। এইগুলি অনুধাবন করিলে দেখিবেন যে, কি পরিমাণে অপমানিত ও আহত হইয়া (যাহার ক্ষতিপূরণ অসম্ভব এবং কোন ভদ্রলোকের মধ্যে যাহা সমর্থনের ও কল্পনার অতীত) আমি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়াছি।

আমার পশ্চাতে যে ঘোষণা রাখিয়া যাইতেছি তাহা সত্য বলিয়া গণ্য করিবেন। মিঃ হেস্টিংস আমাকে সম্ভবত ভুল বুঝিতেন না এমত অবস্থায় তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না, কারণ তাঁহার প্রতি কোন অবিচার করা ইচ্ছাবিরুদ্ধ বলিয়া আমি মনে করি। তিনি যাহা জানেন তাহা ভালই জানেন। আমি কোন নীতিকে ভিত্তি করিয়া কাজ করিয়া যাইতেছি অন্য যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা আপনি সে বিষয়ে অধিক জানেন। এই দেশকে তাহার ভাগ্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া যত শীঘ্র পারেন—ত্যাগ করুন। প্রিয় বন্ধু বিদায়, চিরকালের জন্য বিদায়।

এখনও জীবিত থাকাকালীন
আপনারই
স্বাঃ পি ফ্র্যান্সিস

বন্ধুকে লেখা স্যার ইলাইজা ইম্পের পত্র

অদ্য প্রভাতে মিঃ হেস্টিংস এবং মিঃ ফ্র্যান্সিস পিস্তলের দ্বারা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন একই সময়ে উভয়ে উভয়কে লক্ষ্য করিয়া গুলী করেন। মিঃ ফ্র্যান্সিসের গোলা লক্ষ্যচ্যুত হয় কিন্তু মিঃ হেষ্টিংসের গোলা মিঃ ফ্র্যান্সিসের দক্ষিণ দিকে বিদ্ধ হয় তবে পঞ্জরাস্থি দ্বারা উহা প্রতিহত হওয়ায় বক্ষঃস্থলে পৌঁছাইতে পারে না। উহা মেরুদণ্ডকে আহত না করিয়াই তাহা অতিক্রম করিয়া উপর দিকে উঠিয়া যায় উহার এক ইঞ্চি পরিমাণ বাম দিক হইতে নির্গত হয়। ক্ষত সম্বন্ধে গুরুতর কোন আশঙ্কা নাই এবং তিনি নিজেও বিপন্মুক্ত।

স্ত্রীকে লেখা হেস্টিংসের চারখানি পত্র

সোমবার
১৪ই অগাস্ট

আমি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করি নাই এবং কিছুই আমার শ্রবণগোচরও হয় নাই তবে মাদ্রাজ হইতে আমি একখানি পত্র পাইয়াছি, যাহাতে কোম্পানীর জাহাজগুলির আগমনবার্তাগুলি জানানো হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের মধ্যে একমাত্র যাহা উল্লেখযোগ্য তাহা হইল যে, নিশ্চিতরূপে ধার্য হইয়াছে যে যতদিন আমার অভিপ্রায় ততদিন আমি এখানে থাকিতে পারিব, তবে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে সেই একই সহচরদের সঙ্গে।

কলিকাতা
বৃহস্পতিবার
প্রাতঃকাল

আমার পরম প্রিয়তমা ম্যারিয়ান,

আজই সকালে মিঃ ফ্র্যান্সিসের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং আঘাত তিনি পাইয়াছেন তবে সে আঘাতটিও ভীতিকর নয় তোমাকে এই সংবাদটি স্যার জন ডে দিন এইরূপ ইচ্ছা আমার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। আমি ব্যক্তিগতভাবেও অবস্থাটি সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ লইব এবং অবশ্যই তোমাকে জানাইব। তিনি আছেন এখন বেলভেডিয়ারে। ডাঃ ক্যাম্পবেল ও ডাঃ ফ্র্যান্সিস এক্ষণে তাঁহাকে দেখিতেছেন। আমি বিন্দুমাত্র আহত হই নাই তা ছাড়া আছিও বেশ ভালই। আমার নিকট হইতে কুশলবার্তা শুনিয়া তোমাকে আশ্বস্ত হইতে হইবে। তবে, আমাকে দেখিতে কিন্তু এখন কোন প্রকারেই পাইবে না। মিঃ ফ্র্যান্সিস যতক্ষণ না পরিপূর্ণরূপে বিপন্মুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইতেছেন ততক্ষণ আমার পক্ষে কলিকাতা ত্যাগ কিছুতেই হইতে পারে না। তবে, আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি এখন চুঁচুড়াতেই থাকিয়া যাও। তোমার সহিত সেখানে মিলিত হইবার সেই পরমানন্দময় ক্ষণটি এখনও কিছুদূরে আছে তবে বেশি দূরে নাই। আশা করি, কয়েকদিনের মধ্যেই সেই মুহূর্ত সমাগত হইবে। মিঃ রসকে আমার প্রীতি ও শুভকামনা জানাইও কিন্তু, এই সকল ঘটনা কদাচ তাঁহার কর্ণগোচর করিও না। আমার ম্যারিয়ান, গত দুইদিন ধরিয়া আমার সকল চিন্তা, সকল কর্ম এমন কি স্বপ্নে তুমি যে ওতঃপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া আছ আমার মন-প্রাণ তুমি ভরপুর করিয়া আছ, তুমি যে আমার সারাটি হৃদয় জুড়িয়া আছ।

আমার প্রাণেশ্বরী, আমি তোমারই
স্বাঃ ডব্লিউ এইচ

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা

আমার প্রেয়সী ম্যারিয়ান,

আজ সকাল সাতটার সময়ে তোমাকে একটি পত্র আমি লিখিয়াছি, সেই খামেই স্যার জন ডে'কেও লিখিয়াছি, তাঁহাকে আমি নির্দেশ দিয়াছি যে, পত্রটি তোমার হস্তে সমর্পণ করিবার পূর্বেই বিষয়বস্তুটি যেন তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন, কারণ, ফ্র্যান্সিসে এবং আমাতে আজ যাহা ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত সংবাদ পাছে তোমাকে ভীতা, চকিতা ও শঙ্কিতা করিয়া তোলে সেইহেতুই আমি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম, আশা করি আহারের পূর্বেই পত্র পাইয়াছ এবং চিঠি মারা যাইবার কোন সম্ভাবনা এ ক্ষেত্রে আমি দেখি না। তদুপরি, ডাকবাহকদের যথাক্রমে হইতেও বিশেষ নির্দেশ দেওয়া আছে। তবে, এক চিন্তা যে স্যার জন যদি চুঁচুড়ার সেই সময়ে না থাকেন তাহা হইলে···! এখন অতীব আনন্দের সহিত তোমাকে জানাইতেছি যে, মিঃ ফ্র্যান্সিস সম্বন্ধে চিন্তার কোন

কারণ নাই, আঘাতও তাঁহার সেরকম গুরুতর নয়, গোলা তাঁহার দেহকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেপ ারে নাই। তুমি বলিয়াছ না যে 'কি যে হয় তাহা কে বলিতে পারে, কালের দিকে কেই বা তাকাইতে পারে…ইত্যাদি।

হতভাগ্য নেলারকে আমি চাল ইত্যাদি দিয়াছি কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যের এখন যা অবস্থা তাহাতে খাদ্যগ্রহণ তাহার পক্ষে সম্ভব কি না বুঝিতে পারিতেছি না এবং বর্তমানে খাদ্যদ্রব্য তাহার কোন উপকারেও আসিবে কি না বলিতে পারি না। মিঃ মোট তোমাকে তোমার চাবির গোছা ফিরাইয়া দিবেন। তোমার যে একশত সোনার মোহর আমার কাছে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলে তাহার ভারও তাঁহার হস্তেই দিয়াছি। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার এ আশ্বাস তোমাকে দিতেছি। মিঃ ফ্র্যান্সিস সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়া ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত কলিকাতায় আমাকে থাকিতেই হইবে, কারণ এ অবস্থায় আমি কলিকাতা ত্যাগ করিলে পলাতক দুর্নাম আমার প্রতি আরোপিত হইবে, অতএব এক সপ্তাহের পূর্বে আমি তোমার নিকট যাইতে পারিব না, কিন্তু তোমার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তুমি কলিকাতা আসিও না।

আমি ভাল আছি। কিন্তু তুমি তো পত্রে লেখ নাই যে তুমি কেমন আছ—তোমার কুশলবার্তাটুকু তোমার পত্রে অনুপস্থিত! স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বপ্রকার যত্ন অবশ্যই গ্রহণ করিও। বিদায় প্রেয়সী—

তোমার একান্ত অনুরক্ত—স্বাঃ ওয়ারেন হেস্টিংস

কলিকাতা
শুক্রবার
প্রাতঃকাল

আমার আদরের ম্যারিয়ান,

তোমার পত্রটি আমি পাইয়াছি তুমি কিন্তু রাগ করিতে পারিবে না। হয় তো যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে—ধরিয়া নেওয়া উচিত কারণ ইহার মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বীজ নিহিত থাকতে পারে, ইহার ফলে যাহা আসিতেছে তাহা হয় তো সুন্দর ও সার্থকতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াই উদিত হইবে।

এখন তুমি আমাকে অসুস্থতা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা প্রত্যেকটির হস্ত হইতে মুক্ত জানিবে। যেখানে তুমি আছ সেইখানেই আরও অধিককাল থাকিলে যদি তুমি আনন্দ পাও, তাহা হইলে আমার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য জানিবে। মিঃ ফ্র্যান্সিস ভালোর দিকে যাইতেছেন এবং তাঁহার পরিপূর্ণ আরোগ্য সম্বন্ধে এখন আমি সুনিশ্চিত বলিতে পারি। বেচারা নেলার আর জীবিত নাই। স্যার জে ডে'কে তুমি কি কষ্ট করিয়া একটু জানাইয়া দিবে যে এখন এখানে আসার তাঁহার আশু কোন প্রয়োজন নাই।

আমি নিজেও তাঁহাকে লিখিতেছি। লেডী ডে অসুস্থ জানিয়া উৎকণ্ঠিত হইলাম। তাঁহাকে, বিবি মোটকে এবং মিঃ রসকে আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাইও। তোমারই—স্বাঃ ডব্লিউ এইচ
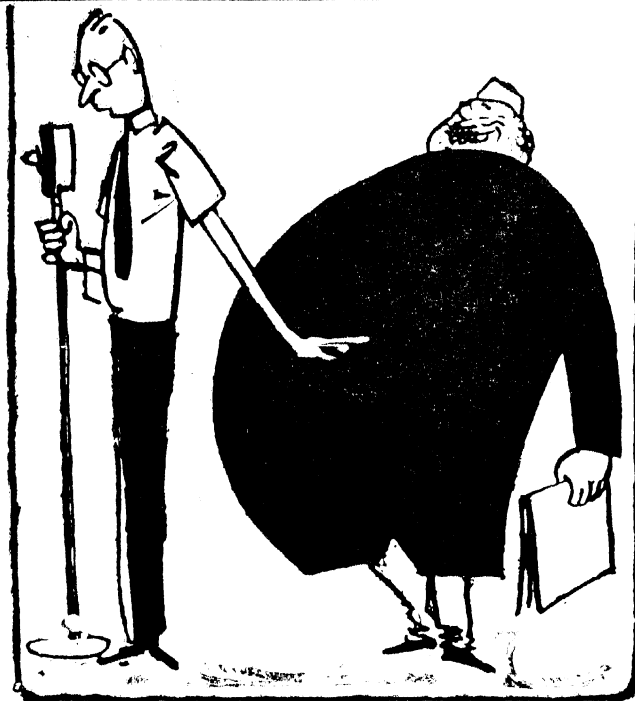
'এবারে দেশের খাদ্যাভাব ও তার কারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবেন খাদ্যবিভাগের উপমন্ত্রী ….'

শিল্পী—রতন

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

[বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ও ঐতিহাসিক গবেষক]

সাহিত্যজগতে যে গবেষকের দল শুধু ইতিহাসচেতনা ও ঐতিহাসিক জ্ঞানেরই পরিচয় দেন নি—সেইসঙ্গে সমান দক্ষতার সঙ্গে যাঁরা অপূর্ব ভাষালালিত্য ও সরস বর্ণনভঙ্গীরও পরিচয় দিয়েছেন, যার ফলে ইতিহাস শুধু তথ্য ও বিবরণে পরিপূর্ণ না হয়ে এক রসস্নিগ্ধ আকারে যাঁদের লেখনীর মাধ্যমে সাহিত্যের পাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পাঠক সাধারণের অন্তরস্পর্শে সক্ষম হয়েছে—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় সেই তালিকার এক বিশিষ্ট নাম। যে সুধিবৃন্দ ইতিহাস এবং সাহিত্যের সমন্বয় সাধন করেছেন তপনমোহনের নাম সেই তালিকায় যথোচিত স্বীকৃতিসহ সবিশেষ উল্লেখনীয়। ইতিহাসের বহু তথ্যের, বহু ঘটনার সঙ্গে নব-আলোকে এ যুগের পাঠক-পাঠিকার পরিচয় ঘটানোয় তাঁর কৃতিত্ব এবং গুরুত্ব বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

বাঙলার এক বিদগ্ধ-পরিবারের সন্তান তপনমোহন। বলা বাহুল্য, তাঁর দ্বারা বংশের সুনাম ও ঐতিহ্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। রাজর্ষি রামমোহনের পৌত্রী-পৌত্র স্বনামধন্য সুধীবর স্বর্গীয় মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের তিনি কনিষ্ঠ পুত্র। মা স্বর্গীয়া সরোজা দেবী ছিলেন পুণ্যশ্লোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্যতমা পৌত্রী এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা—রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

১৮৯৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী উত্তর-কলকাতার রায়বাগান অঞ্চলে তপনমোহনের জন্ম। ১৯ নং ডাফ স্ট্রীটে অবস্থিত মিস ওয়াইটের বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষারম্ভ। দশ বছর বয়েসে তিনি শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন। শান্তিনিকেতনের তখন আদিপর্ব। কলেজ-জীবন তাঁর অতিবাহিত হয় প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯১৮ সালে এম-এ পরীক্ষায় হন সসম্মানে উত্তীর্ণ। পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করে তপনমোহন বিলাত যাত্রা করেন। কেম্ব্রিজে পিটার হাউসে তিনি অর্থনীতি অধ্যয়ন করেন। লিঙ্কনস ইন থেকে ১৯২২ সালে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় সিদ্ধমনোরথ হন।

ব্যারিস্টার হয়ে তপনমোহন ফিরে এলেন কলকাতায়—তাঁর স্বদেশে, জননী-জন্মভূমির মহিমাময় অঙ্কে। সুরু করলেন আইনব্যবসায়। যোগ দিলেন কলকাতার হাইকোর্টে। প্রথমে কিছুকাল ইনি স্যার টৌরিক আমীর আলীর অধীনে শিক্ষানবিশী করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি আইনব্যবসায় পরিত্যাগ করেন।

১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের নবরূপকার স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ইচ্ছানুসারে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ্যাডমিনিস্ট্রেটার-জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। এই পদে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশ্বভারতীর সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সংযোগ। ১৯৪১ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত বিশ্বভারতী সোসাইটি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম-পরিষদের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন।

তপনমোহনের সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয় ইংল্যাণ্ডে। রবীন্দ্রনাথের দেশবাসী তদুপরি তাঁর আত্মজ-দৌহিত্র তপনমোহনের লেখনী ফসল ফলাতে শুরু করে শেক্সপীয়ারের দেশের মাটিতে। রচনার ভাষাও তখন শেক্সপীয়ারের দেশের অর্থাৎ প্রথম জীবনে ইংরাজী ভাষায় তিনি লিখতেন, ফরাসী ভাষাতে তাঁর দখল অসাধারণ। কিছু

বাঙলা রূপকথার তিনি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন, ইংরাজী ভাষাতেও সেগুলির পরে রূপান্তর ঘটে।

'পলাশীর যুদ্ধ' গ্রন্থটি তাঁর সাধারণ্যে এক বিপুল আলোড়ন আনল। আমাদের জাতীয়-জীবনে পলাশীর গুরুত্ব যে কতখানি সে সম্বন্ধে আজ নতুন করে কিছু বলা অর্থহীন। ভারতের ইতিহাসের সেই যুগসন্ধির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অভিনব দক্ষতা সহকারে লিপিবদ্ধ করে পাঠক-সমাজের বিপুল সাধুবাদ তপনমোহন লাভ করলেন। ঐতিহাসিক রচনার ইতিহাসে 'পলাশীর যুদ্ধ' একটি নতুন ধারার ও একটি নব অধ্যায়ের স্রষ্টা বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্মৃতিরঙ্গ, বাঙলা লিরিকের গোড়ার কথা, হিন্দু আইনে বিবাহ, পলাশীর পর বক্সার প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর রচনাশক্তির এক-একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

আজকের দিনে সুধীসমাজের একটি প্রথম সারির আসন তপনমোহনের অধিকারগত। বাঙলা সংস্কৃতির ঐশ্বর্যবর্ধনের সাধনায় তাঁর জীবন অতিবাহিত। বাঙলা দেশের রসিকসমাজেরও তাঁর কাছে তাই প্রত্যাশার অন্ত নেই।

ডাঃ মনোমোহন দাস

[ভারতের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী]

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। বাঙলা দেশের অসংখ্য গ্রামের অন্যতম গ্রাম। সে গ্রামের এক সাধারণ কৃষিজীবী-পরিবারে ১৯১১ সালের মার্চ মাসের একটি দিনে যে নবজাতক ভূমিষ্ঠ হল, কেউ জানল না সকলের অলক্ষ্যে বিধাতাপুরুষ তার ললাটে কি লিখে রেখে গেলেন—সেদিন হয় তো পরিবারের কেউই ভাবতে পারে নি যে এই শিশুর জীবন অন্য ধারায় প্রবাহিত হবে—স্বল্পপরিসর গণ্ডী অতিক্রম করে এই শিশুর কর্মক্ষেত্র স্থাপিত হবে বিরাট পরিসর পটভূমির উপর—এক সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সে লাভ করবে বিপুল জনপ্রিয়তা ও অপরিসীম খ্যাতি—আপন দক্ষতায় ও আন্তরিকতায় সে আসবে অনেকেরই পুরোভাগে। আজকের দিনে সেই শিশুই—ভারতের অন্যতম উপমন্ত্রীরূপে সাধারণ্যে সুপরিচিত। ডাঃ মনোমোহন দাস তাঁর নাম।

পিতৃদেবের নাম স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র দাস। মনোমোহনের বাল্য

বাল্যকাল সেই সময় পূর্ণচন্দ্রের ভাগিনেয় স্বর্গীয় মদনমোহন দাস তাঁকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। সেদিন সেই বালকের মধ্যে হয় তো ভবিষ্যতের কোন বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছিল মদনমোহনের সন্ধানী চোখ—কৃষক পরিবারের সন্তান মনোমোহনের জীবনের বোধনলগ্নের সে এক স্মরণীয় অধ্যায়। মদনমোহন তাঁকে নিয়ে না এলে হয় তো তাঁর জীবনের ধারা গতানুগতিক স্রোতেই বইত, বৃহত্তর জগতের সিংহদ্বার হয় তো উন্মুক্ত হোত না তাঁর সামনে। মদনমোহনও পরিবারের মধ্যে প্রথমজন, যিনি গ্রামের বাইরে আসেন। আনন্দের কথা মাতুলপুত্র সম্বন্ধে মদনমোহনের আশা পরিপূর্ণ-সফলতার রূপ নিয়ে পরবর্তীকালে প্রতিভাত হল।

মদনমোহনের বাড়িতে বাস করতে থাকলেন মনোমোহন। দশ টাকার স্কলারশিপ নিয়ে সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯২৮ সালে। সিটি কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি উত্তীর্ণ হলেন আই-এস-সি পরীক্ষায়। যোগ দিলেন মেডিকেল কলেজে। ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩৬ সালে।

সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়ে আপন রাজনৈতিক-জীবন আরম্ভ করলেন মনোমোহন। সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে পৌরকর্তৃপক্ষ তাঁকে কর্মে নিয়োগ করলেন, পরে স্যানিটারী অফিসারের পদে তিনি উন্নীত হলেন, ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সেই আসনে তিনি সমাসীন ছিলেন। মদনমোহনের অনুজ বিধানসভার সদস্য রাধানাথ দাস ছিলেন গান্ধীবাদী আর মনোমোহন সুভাষবাদী একই বাড়িতে বসবাস করতেন কিন্তু রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দুই ভায়ের মধ্যে মুহূর্তের জন্যেও মনের মিল নষ্ট করতে পারে নি। এই সময়েই শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মনোমোহনের যোগাযোগ গড়ে উঠল।

ডাঃ মনোমোহন দাস

১৯৪৮ সালে ভারতের কনস্টিট্যুয়েন্ট এ্যাসেম্ব্লির অন্যতম সদস্য পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় যোগ দিলে তাঁর শূন্য আসনে সমাসীন হলেন মনোমোহন। ১৯৫১ সালে গঠিত অস্থায়ী লোকসভার সভ্যও তিনি নির্বাচিত হলেন। ১৯৫২ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন মনোমোহন দাস, কিছুদিন পরে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী দেশবরেণ্য মনীষী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের তিনি পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন। আরও কিছুদিন পরে উপমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন শিক্ষাবিভাগে। শিক্ষা-মন্ত্রণালয় দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল—(১) শিক্ষা ও (২) বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তর। দ্বিতীয় ভাগের উপমন্ত্রী হিসাবে গৃহীত হলেন মনোমোহন। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডঃ চাগলা আবার বিভাগ দু'টিকে এক করলেন, তখনও মনোমোহনকে সেই বিভাগেরই উপমন্ত্রী হিসাবে দেখা গেছে। আচার্য নেহরুর লোকান্তরের পর ভারতের শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভায় তাঁর বহুকালের দপ্তর পরিবর্তন হল—বর্তমানে তিনি পুনর্বাসন বিভাগের উপমন্ত্রী।

সেদিন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মৌলানা আজাদের উদ্দেশে। মৌলানা আজাদের বিশেষ স্নেহ তিনি লাভ করেছিলেন। বর্তমানে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের কল্যাণ-সাধনই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত বলে তিনি মনে করেন—তাঁর সমগ্র শক্তি এ ক্ষেত্রে তিনি উৎসর্গ করেছেন। তাঁর প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ না করলে এই জীবনালেখ্য অপূর্ণ থেকে যাবে। রাজনৈতিক জগতের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যের সঙ্গে তিনি মোটেই সম্পর্কশূন্য নন। এই প্রসঙ্গে আমাদের পাঠক-পাঠিকাকে জানিয়ে রাখার সুযোগটুকু গ্রহণ করি যে, বিজ্ঞানধর্মী রচনায় এবং ছোটদের উপযোগী কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

বিষ্ণু দে

[দিকপাল কবি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ]

এ যুগের কাব্যকলার উৎকর্ষসাধন এবং বিকাশের ইতিহাসে যে ক'টি নাম চিরকালের দাবীতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে—বিষ্ণু দে তাদেরই অন্যতম। আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের গরিমা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে রসিকসমাজে আজকের দিনে নতুন কিছু বলার নেই। মননশীল প্রবন্ধ-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের প্রগাঢ় পরিচয় বিদ্যমান, প্রাবন্ধিক বিষ্ণু দে তাঁদের হৃদয়েও এক বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদরের আসনের অধিকারী।

বিষ্ণু দে'র প্রপিতামহ যখন কলকাতায় এসে স্থায়িভাবে বাসা বাঁধলেন, ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, এ দেশে ইংরেজ শাসনের তখন সবে সূত্রপাত হয়েছে। স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র দে'র মধ্যম পুত্র বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও শক্তিমান প্রাবন্ধিক বিষ্ণু দে'র জন্ম হয়, এই মহানগরীতেই ১৯০৯ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে। বিদ্যালয়-জীবন অতিবাহিত হয় মিত্র ইনস্টিটিউশান (মেন) এবং সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯২৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পাশ করলেন আই-এ। সেন্ট পল্‌স কলেজের ছাত্র হিসাবে

ইংরাজীতে অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। ইংরাজীতে এম-এ পরীক্ষায়ও সসম্মানে সফলকাম হলেন ১৯৩৪ সালে।

কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্র-জীবন সমাপ্ত হল। সুরু হল গৌরবময় অধ্যাপক-জীবন। অধ্যাপক-জীবনের অর্থাৎ শিক্ষাদানের মহৎ কর্মের সূচনা হয় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ১৯৩৫ সালে। ন'বছর পর ১৯৪৪ সালে তিনি যোগ দিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। সেখানে তিনি যুক্ত ছিলেন তিন বছর। ১৯৪৭ সালে তিনি যুক্ত হলেন মৌলানা আজাদ কলেজে। আজও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হিসাবে সেখানে স্বমহিমায় বিরাজমান। বিষ্ণু দে যখন কলেজে পাঠ নিচ্ছেন সেই সময় যে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের শিক্ষাগুরু হিসাবে লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রফুল্ল ঘোষ, রবি ঘোষ, কিরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অন্যতম।

সাহিত্যের গগনে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সাহিত্যের আলোতেই সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র। লেখা আরম্ভ হয় বিদ্যালয়-জীবন থেকে। লেখা প্রকাশিত হয় আনুমানিক ১৯২৬-২৭ সালে। বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়—দিকপাল সাহিত্যিক স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়—'বিচিত্রা' এবং বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি', 'কল্লোল' প্রমুখ পত্রিকাগুলিতে বিষ্ণু দে'র রচনাদি প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়, পরবর্তীকালের ইতিহাস কারোর অজানা নয়। ১৯৩৩ সালে (আনুমানিক) তাঁর কাব্যগ্রন্থ উর্বশী ও আর্টেমিশ প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির নাম—চোরাবালি, পূর্বলেখ, সাত ভাই চম্পা, সন্দীপের চর, অন্বিষ্ট, তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ, আলেখ্য, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ প্রভৃতি। সম্প্রতি, কিছুকাল আগে তাঁর সম্পাদনায় একটি এ-যুগের কাব্য-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। হে বিদেশী ফুল এবং এলিয়টের কবিতা তাঁর দু'খানি অনুবাদগ্রন্থ। রুচি ও প্রগতি, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ হিসাবে বিশেষ উল্লেখনীয়।

তাঁর পঞ্চাশৎ জন্মদিনে তাঁর অনুরাগী বন্ধুমহল এক মহতী সম্বর্ধনার দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণ করলেন।

তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী প্রণতি দে শিক্ষাক্ষেত্রে এক যশস্বিনী মহিলা। বর্তমানে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা হিসাবে নিযুক্তা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিকট-সান্নিধ্যে এসেছেন কবি বিষ্ণু দে। সাহিত্যরথী স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বিষ্ণু দে পরিচিত হন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে। সে-যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক-আড্ডা ভারতী বৈঠকেও তিনি যাতায়াত করেছেন—অবশ্য, বয়েসে তখন তিনি বালকমাত্র। এই প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখি, একদিন তাঁর গৃহে তাঁর সঙ্গে কথোপকথনরত অবস্থায় তাঁর কাছে তাঁর একটি আলোকচিত্র চেয়েছিলাম।

উত্তরে তিনি বলেছিলেন—'কোথাও ছবি ছাপাতে আমার আপত্তি, তোলাতেও'—

এই কথাগুলির মধ্যে তাঁর আত্মপ্রচারবিরোধী মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে ওঠে।

বটকৃষ্ণ দত্ত

[ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডাইরেক্টার]

এ দেশের ব্যাঙ্কিং-ব্যবসায়ের ইতিহাসে ১৯৫০ একটি স্মরণীয় বছর। সুপ্রসিদ্ধ চারটি ব্যাঙ্ক এই সময়ে একত্রে সংযুক্ত হয়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া নাম গ্রহণ করে ভারতের ব্যাঙ্কিং ইতিহাসের এক বলিষ্ঠ নবযুগের সূচনা করে। এই বিরাট বিশাল প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ণধারের আসনে সেদিন যিনি অধিষ্ঠিত হলেন সেদিন বয়সে তিনি ছিলেন তুলনামূলক বিচারে নিতান্তই কনিষ্ঠ। চল্লিশ তখনও তাঁর অতিক্রান্ত হয় নি, বলা বাহুল্য, আজও সেই আসনে সমাসীন থেকে ব্যাঙ্কের প্রভূত উন্নতিসাধন করে আপন দক্ষতা ও কর্মশক্তির পরিচয় দিয়ে চলেছেন। আজ শুধু বাঙলা নয়—সারা ভারতের ব্যাঙ্কিং-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এক প্রসিদ্ধ নাম। তাঁর নাম বটকৃষ্ণ দত্ত।

এই দক্ষতা ও প্রতিভা তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রেই লব্ধ। এ দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের ইতিকথায় অবিস্মরণীয় পুরুষ স্বর্গত নরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের ইনি সুযোগ্য এবং স্বনামধন্য পুত্র। কুমিল্লায় ১৯১০ সালের মার্চ মাসে তাঁর জন্ম। বিদ্যালয়জীবন কুমিল্লাতেই অতিবাহিত হয়। কুমিল্লা থেকে আই-এস-সি পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-কম পরীক্ষায় তিনি সফলকাম হলেন ১৯৩০ সালে।

বি-কম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্বল্পকালের জন্য তিনি পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশানে যোগ দেন। তখন থেকেই বটকৃষ্ণ আশা, উদ্দীপনা ও স্বপ্নের এক মূর্তিমন্ত প্রতীক। নব নব সম্ভাবনা সে সময় থেকেই তাঁর মন-প্রাণ-চিন্তা আচ্ছন্ন করে আছে। নিজে ব্যাঙ্ক গঠন করে সেটি পরিচালনার বাসনা তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠল। পিতৃদেবের অনুমতি এবং সমর্থনে তিনি সৃষ্টি করলেন নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড। অধিষ্ঠিত হলেন তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের আসনে। ১৯৩৮ সালে এই ব্যাঙ্কটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় সিডিউলে

বটকৃষ্ণ দত্ত

অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই ক্যালকাটা ক্লিয়ারিং হাউসের পুরোপুরি সদস্য হতে সমর্থ হয়। ১৯৪৬ সালে এই ব্যাঙ্ক কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। বটকৃষ্ণ ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টার নিযুক্ত হন। পরে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার পদে তিনি যখন উন্নীত হন নরেন্দ্রচন্দ্র তখন চেয়ারম্যানের আসনে সমাসীন। ১৯৫০ সালের ১৮ই ডিসেম্বর কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশান, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং হুগলী ব্যাঙ্ক একত্রে সংযুক্ত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়স্ক বটকৃষ্ণই যে তার প্রধান কর্ণধারের আসন লাভ করলেন এই রচনার প্রারম্ভেই তা বিবৃত হয়েছে। গ্রাম্য এবং মফস্বল অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং-ব্যবসায়ের সুযোগ-সুবিধা, বৃদ্ধি ও প্রসার সম্বন্ধে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে তিনি একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। ১৯৫০ সালের রুরাল ব্যাঙ্কিং এঙ্কোয়্যারি কমিটীর নিকট এই পরিকল্পনাটি উক্ত চেম্বার প্রেরণ করেন।

শ্রফ কমিটী, বোর্ড অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট করপোরেশান অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স করপোরেশান অফ ইণ্ডিয়া, এগ্রিকালচারাল রিফাইন্যান্স করপোরেশান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রূপায়িত ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাডভাইসারি কাউন্সিল ফর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কার্সের কর্মপরিষদের, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের কর্মপরিষদের, ফেডারেশান অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির কার্যকরী সমিতি, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাণ্ড বিজনেস ম্যানেজমেণ্টের পরিচালক সমিতির তিনি অন্যতম সদস্য।

এল আই সির পূর্বাঞ্চলের অঞ্চল উপদেষ্টা পরিষদের ও টি বোর্ডের সভাপদ তিনি অলংকৃত করেছেন।

ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কস এ্যাসোসিয়েশানের তিনি ডেপুটি চেয়ারম্যান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বোর্ড অফ ইণ্ডাস্ট্রিজের তিনি চেয়ারম্যান। আসাম ও উড়িষ্যার স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশানের তিনি পরিচালক।

ইনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করেছেন। সেই সব স্থানের ব্যাঙ্কিং পরিচালন ব্যবস্থাসমূহ বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

১৯৬০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে বিনয়কুমার সরকার মেমোরিয়াল লেকচারারের সম্মান প্রদান করেন।

প্রথম জীবনে ইনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। শিকারেও ছিল তাঁর যথেষ্ট শখ। বর্তমানে ফাইন্যান্সিয়াল প্রেসেরও তিনি একজন নিয়মিত লেখক।

এক ভারতসেবীর দেহাবসানে

সৈয়দ আলী আসাদ

দিল্লীর রাজপথ শোকাতুর। নীরব নিথর
রূপ নিয়ে সমাসীন। সবায়ের মাঝে
বিরাট জিজ্ঞাসা, অসংখ্য কৌতূহলী
জোড়া জোড়া চোখ ফটকের কাছে।

এ মন প্রসারিত সুদূরের প্রান্তে
বেদনাবিধুর জ্বালা অন্তরের কোণে,
যে ছিল রৌশনি আঁধারের মাঝে
আজ তার নিঃশেষ আলো, স্বর্গের পানে।

অশান্ত পৃথিবী, উতলা বাতাস বহে
মন্দাকিনীর কিনারে কিনারে।
বেদনাবিহ্বল শত হৃদয়ের হাহাকার
কেবলি ধ্বনিত আজ দেবতার দ্বারে।

হে মহাপুরুষ! তোমার জীবনই বাণী
পথহারা মানবের আলোর দিশারী তুমি
মর্ত্যলোকে শেষ যাত্রাপথে প্রণামি তোমায়
অমৃত আশীষ তব চিরদিন আসে যেন নামি।

নিঃসম্পর্ক যাত্রা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তখন আবিল দিন, বর্ষায় শহর গেছে ভিজে,
কেউ কেউ ঘর হতে বের হয়ে গিয়েছে কোথায়,
আমি হেমন্তের কোলে মুখ পেতে শুধিয়েছি নিজে,
জেনেছো স্বর্গীয় সেবা, গাঁথো বসে অভিপ্রায়মালা

নীরবে ঘরের কোণে, দিন যায়, মধ্যাহ্ন লুকায়;
অপমানে পোড়া রূপ ঘুরে ঘুরে একা ঘুরে ঘুরে
নদী বৃথা ধরে কোথা? সাগরের রহস্যে যে জ্বালা
হে দীপ, নয়ানে মৃত্যু, কোথা তুমি নিশ্চিত আমার?

চাই চাই তোমাকেই ঘরে শুয়ে হেমন্তের কোলে।
শৈশবে ঝরাও মুখে সব দুঃখ, পাতার সন্ন্যাস···
অচেনা নৈমিষে, ভারে, মরে যাবো বুকের ভিতর,
সূত্রহীন, বিষণ্ণতা, ঢেকে দাও প্রিয়ের মতন
গভীর আড়ালে, ঘরে, এসো বর্ষা দূরে পরবাসে
যা আমার নয় তারে নিরানন্দ রেখে চলে যাবো?

শচীন্দ্রনাথ বসু

ডামারাতোসের রহস্য

যুদ্ধের অবসানে আবার ডামারাতোসকে ডেকে জের্কসাস বললেন, 'আপনি যা যা বলেছিলেন সবই ফলেছে, আপনি ভাল লোক, এখন বলুন দেখি আর কত ল্যাসেডিমোনীয় বাকি আছে? তাদের মধ্যে এদের মত উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ক'জন?'

ডামারাতোস বললেন, 'মহারাজ, ল্যাসেডিমানে (১) অনেক লোক, অনেক শহর। সে দেশে স্পার্টা বলে যে শহরটি আছে তার লোকসংখ্যা প্রায় আট হাজার। এখানে যারা যুদ্ধ করেছে তারা প্রত্যেকেই তাদের সমকক্ষ, স্পার্টার বাইরে যারা আছে তারা তাদের সমান না হলেও ভাল যোদ্ধা।'

জের্কসাস বললেন, 'এবার বলুন সবচেয়ে সহজে কি উপায়ে এদের জয় করা যায়। আপনি একদা এদের রাজা ছিলেন, ভিতরের খবর জানেন।'

ডামারাতোস পরামর্শ দিলেন, 'আপনার নৌ-বহর থেকে তিন শো জাহাজ ল্যাসেডিমোন উপকূলে কিথিরা দ্বীপে পাঠান। আমাদের সবচেয়ে জ্ঞানীব্যক্তি খিলোন একদা বলেছিলেন যে, এই দ্বীপ যদি সমুদ্রগর্ভে যায় তবেই স্পার্টার মঙ্গল কারণ আমি যে বুদ্ধি আপনাকে দিচ্ছি সেই অভিসন্ধি একদা দেশের কোনও শত্রুর মাথায় আসবে তা তিনি অনুমান করেছিলেন। আমি প্রস্তাব করি আপনার জাহাজগুলি কিথিরায় ঘাঁটি বানিয়ে সমগ্র ল্যাসেডিমোনে আতঙ্ক ছড়াক। নিজের দরজায় যুদ্ধ ফেলে তারা অন্যত্র গ্রীসীয়দের সাহায্যে যাবে না। আপনি অনায়াসে তখন গ্রীসের বাকি অংশ জয় করবেন, ল্যাসেডিমোন নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে। কিন্তু এই প্রস্তাব যদি গ্রহণ না করেন তবে আরও বিপদ আশঙ্কা করতে পারেন। পেলপনিসাসের প্রান্তে সমুদ্রের উপর এক সংকীর্ণ যোজক আছে, সেখানে মিত্রপক্ষীয় গ্রীসের সব সেনা আপনার বিরুদ্ধে মোতায়েন দেখতে পাবেন, এযাবৎ যা যুদ্ধ করেছেন তার চেয়ে অনেক ভীষণ যুদ্ধ করতে হবে আপনাকে। আমার বুদ্ধি নিলে ঐ যোজক ও পেলপনিসীয় শহরগুলি বিনা যুদ্ধে আপনার হাতে আসবে।'

এই সময়ে সম্রাটের ভাই নৌ-বহরের অধিনায়ক আখাইমেনেস বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'মহারাজ, এই বিশ্বাসঘাতক গ্রীসীয়ের কথায় কান দেবেন না, আপনার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে সে দুর্বুদ্ধি দিচ্ছে। আমাদের চার শো জাহাজ এরই মধ্যে নষ্ট হয়েছে, তিন শো যদি পেলপনিসাসে পাঠাই তো শত্রু আমাদের সমকক্ষ হয়ে পড়বে। নৌশক্তি ভাগ না করলে তারা যুদ্ধ করতে সাহস করবে না। তা ছাড়া স্থল ও জলবাহিনীর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখে একত্র অগ্রসর হওয়া উচিত, তাদের পৃথক করলে নৌ-বাহিনী আপনার কোনও কাজে লাগবে না।'

জের্কসাস বললেন, 'আখাইমেনেস, তুমি ঠিকই বলেছ, আমি তোমার বুদ্ধিই নেব। কিন্তু ডামারাতোস যা আমার ভাল মনে করেছেন তাই বলেছেন, তিনি মনে মনে আমার বিরুদ্ধবাদী এমন কথা আমি মানব না, তাঁর বিশ্বস্ততার প্রমাণ ইতিপূর্বে আমি পেয়েছি। তা ছাড়া সবাই জানে যে লোকে প্রায়ই প্রতিবেশীকে ঈর্ষা করে, ঘৃণা করে, তাকে এমন বুদ্ধি দেয় না যাতে তার ভাল হবে—অবশ্য অতি মহৎ লোকদের কথা আলাদা কিন্তু তেমন আর ক'জন! পক্ষান্তরে ভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে সম্পর্ক একই শহরের নাগরিকদের সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক; বিদেশী বন্ধুর সৌভাগ্যে লোকে সহানুভূতি বোধ করে, তাকে সর্বদা ভাল বুদ্ধি দেয়। ডামারাতোস বিদেশী এবং আমার অতিথি; ভবিষ্যতে কেউ যদি তাঁর কুখ্যাতি না করে তো আমি সুখী হব।'

১। পেলপনিসাসের দক্ষিণ-পূর্বাংশ।

এই আলোচনার পর জের্কসাস যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন মৃতদেহ দেখতে। লেওনিদাস স্পার্টার রাজা ও সেনাপতি ছিলেন শুনে তাঁর মাথাটি কেটে শূলে চড়াতে হুকুম দিলেন। এতে বোঝা যায়, হেরোডোটাস বলছেন, লেওনিদাসের প্রতি সম্রাটের অতি তীব্র ক্রোধ ছিল, নতুবা তাঁর দেহ নিয়ে তিনি এমন বীভৎস কাণ্ড করতেন না, কারণ সাধারণত অন্য সব জাতির তুলনায় পারসীকরা বীর শত্রুকে বেশি সম্মান দেখাত।

স্পার্টা ও পারস্যের প্রতি ডামারাতোসের প্রকৃত মনোভাব কি ছিল তা স্পষ্ট না হলেও এই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি কাহিনী আছে। স্পার্টাই সবচেয়ে আগে জানতে পারে যে জের্কসাস গ্রীস অভিযানে উদ্যত হয়েছেন, তখন দেলফাইর থেকে তারা কি দৈববাণী পেয়েছিল তা ও আগে বলা হয়েছে। আসন্ন আক্রমণের খবর তারা পেয়েছিল অতি আশ্চর্যভাবে। ডামারাতোস তখন পারস্যে নির্বাসন নিয়েছেন এবং স্পার্টাবাসীদের প্রতি তাঁর যে খুব প্রীতি ছিল না এমন সম্ভাবনাই স্বাভাবিক। যাই হোক, সুজায় বসে তিনি স্থির করলেন জের্কসাসের মতলবটা গোপনে স্পার্টাকে জানাতে হবে। দু'টি ভাঁজ-করা কাষ্ঠফলকের উপর তিনি জের্কসাসের অভিযানের কথা লিখলেন, তারপর মোম দিয়ে ঢেকে ফলকগুলি স্পার্টাতে পাঠালেন। সেখানে প্রথমে কেউ ফলকগুলির রহস্য ধরতে পারল না, কিন্তু লেওনিদাসের স্ত্রী গোর্গো (ক্লেওমেনেসের মেয়ে) ভেদ করলে রহস্য। তার কথায় মোম চেঁচে ফেলে বার্তা উদ্ধার হল এবং তা গ্রীসের অন্যত্র পাঠানো হল। প্রশ্ন এই যে ডামারাতোস এই কাজটি করেছিলেন কি স্পার্টার প্রতি সদ্ভাবের থেকে, না কি তিনি এক ক্রুর আনন্দ পেয়েছিলেন আসন্ন বিপদের খবর জানিয়ে।

পারস্যের অগ্রগতি ও গ্রীসের সন্ত্রাস

স্থলে গ্রীসের পরাজয়ের পর হেরোডোটাস এই দুই শক্তির মধ্যে জলযুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রীসীয় নৌ-বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক

ছিল স্পার্টার এউরিবিয়াডাস—মিত্রপক্ষীয় রাজ্যরা কেউ অ্যাথেনীয় সেনাপতির অধীনে কাজ করতে রাজী হয় নি, ল্যাসেডিমোনের লোক চেয়েছে। এ নিয়ে ঝগড়া করলে সমগ্র গ্রীসের সর্বনাশ হবে জেনে অ্যাথেন্স তা মেনে নিয়েছে; কারণ শান্তির চেয়ে যুদ্ধ যতটা হান বলছেন হেরোডোটাস, যুদ্ধের তুলনায় ততটা মন্দ অন্তর্দ্বন্দ্বে খণ্ডিত দেশ।

আর্টিমিসিয়ামে এসে গ্রীসীয়রা দেখল অদূরে সেনা-সজ্জিত প্রকাণ্ড পারসীক নৌ-বহর। এতটা তারা আশঙ্কা করে নি, ভয়ে গ্রীসের ভিতরের দিকে পলায়নের কথা চিন্তা করতে লাগল। তা হলে ইউবিয়া অন্তরীপকে তৎক্ষণাৎ শত্রু গ্রাস করবে, সেখানকার যোদ্ধারা এউরিবিয়াডাসের মত পরিবর্তন করতে অসমর্থ হয়ে ঘুষ দিয়ে কাজ সমাধা করলে; তারা সেনাপতি থেমিস্টোক্লাসকে প্রায় তিরানব্বই হাজার টাকা দিল, সে এই টাকার অংশ এউবিবিয়াডাস ও আর এক জনকে দিয়ে ব্যবস্থা করলে যে আর্টিমিসিয়াম ত্যাগ করা হবে না। এরা দু'জন জানতে পারল না টাকা কোথা থেকে এসেছে, ভাবলে অ্যাথেন্স পাঠিয়েছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা শত্রুর শক্তি ও রণকৌশল পরীক্ষা করতে গ্রীসীয়রা পারসীক-বাহিনী আক্রমণ করলে। এই অল্প কয়েকটি জাহাজকে এগিয়ে আসতে দেখে পারসীকরা ভেবেছিল অতি সহজেই জয়লাভ করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রীসীয়রা তাদের ত্রিশটি জাহাজ বন্দী করল। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে যুদ্ধ বন্ধ করে যে-যার ঘাঁটিতে ফিরে গেল। তখন ভরা গ্রীষ্ম, সেদিন সারারাত প্রচুর বজ্রপাত সহ ঝড় বৃষ্টি চলল। মৃতদেহ ও ভাঙা জাহাজের খণ্ডগুলি ভাসতে-ভাসতে এল পারসীক নৌ-বাহিনীর চতুর্দিকে, তার মধ্যে ক্রমাগত ঝড় ও বজ্রের শব্দ—সৈন্যরা ভাবতে লাগল তাদের শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে। এর আগেও তাদের উপর দিয়ে কম দুর্ভোগ যায় নি—আর একবার ঝড়ে অনেকগুলি জাহাজ নষ্ট হয়েছে, তা সামলাতে সামলাতে আবার এল ভীষণ জলযুদ্ধ। পারসীক নৌ-বাহিনীর এক অংশ ইউবিয়া প্রদক্ষিণ করতে এগিয়ে গিয়েছিল, এই ঝড়ে এর সব জাহাজগুলি পাথরে ঠেকে মরল। গ্রীসের তুলনায় পারসীক বাহিনীর সংখ্যাধিক্য কমিয়ে দেবার জন্য ঈশ্বর যেন যথাসাধ্য করছিলেন। তা ছাড়া অ্যাথেন্স থেকে আরও তিপ্পান্নটি জাহাজ আসাতে গ্রীসীয়দের উৎসাহ অনেক বেড়ে গেল। আগের দিনের মত আবার বেরিয়ে গিয়ে শত্রুর কিছু ক্ষতি করে ফিরে এল তারা।

ক্ষুদ্রের কাছে এত অপমান সহ্য করে পারসীক সেনাপতিরা পরের দিন দুপুরে নিজেরাই আক্রমণ করলে। জলে এই সংঘর্ষগুলি যখন চলছিল তখনই স্থলে থার্মপিলির যুদ্ধ চলছে, গ্রীসের পক্ষে দুইয়েরই উদ্দেশ্য এক—দেশের অন্তর্দেশে পৌঁছাবার পথ বন্ধ করা। এই তৃতীয় দিনের যুদ্ধে পারসীকদের জাহাজগুলি অর্ধচন্দ্রাকার রেখায় গোল হয়ে এগিয়ে এল, তখন গ্রীসীয় নৌ-বাহিনী গিয়ে তাদের আক্রমণ করলে। দুই পক্ষেরই শক্তি প্রায় সমান—পারসীকদের সংখ্যা বেশি হলেও সেটাই তাদের বাধা হয়ে দাঁড়াল কারণ জাহাজগুলি কেবলই একে অন্যের পথে পড়ছিল। এ যুদ্ধেও চরম নিষ্পত্তি কিছু হল না, আবার যে-যার ঘরে ফিরে গেল।

এর পরে আর্টিমিসিয়ামে থার্মপিলির বিপর্যয়ের খবর পৌঁছাল এবং গ্রীসীয় নৌ-বাহিনী তৎক্ষণাৎ পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করলে। তা জানতে পেরে পারসীকরা আর্টিমিসিয়াম দখল করল এবং আরও অগ্রসর হতে থাকল। এই সময়ে জের্কসাস নিজের নৌ-সেনাদের মনোবল বাড়াবার জন্য তাদের থার্মপিলি রণক্ষেত্র দেখতে পাঠালেন, কিন্তু তার আগে ব্যবস্থা করলেন সেখানে তাঁর যে বিশ হাজার সৈন্য মরেছে তাদের হাজারখানেক বাদ দিয়ে আর সকলের মৃতদেহ খাদে ফেলে তার উপর যেন মাটি পাতা দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়। হেরোডোটাস বলছেন, কিন্তু নিজের ক্ষতি গোপন করার তাঁর এই অদ্ভুত চেষ্টায় কেউ ভোলে নি।

একটা দিন বেড়িয়ে সৈন্যরা আবার জাহাজে ফিরে এল, স্থল-বাহিনীর সঙ্গে জের্কসাসও এগিয়ে চললেন। এই সময়ে আর্কেডিয়ার থেকে কয়েকজন লোক চাকরীর খোঁজে তাদের কাছে এসেছিল; জের্কসাস তাদের প্রশ্ন করলেন, গ্রীসীয়রা কি করছে, উত্তরে তারা বললে, তারা ওলিম্পিক উৎসব পালন করছে, নানারকম ক্রীড়া ও রথের দৌড় দেখছে। পুরস্কার কি জিজ্ঞাসা করে জানা গেল জলপাইপাতার মালা।

আর্তাবানোসের ছেলে তা শুনে বলে উঠল, 'এ কি শত্রুর সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করতে এসেছি যারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে টাকার লোভে নয়, শুধু গৌরবের খাতিরে!'

এই সুন্দর উক্তি শুনে জের্কসাস তাকে বললেন কাপুরুষ।

অগ্রসরের পথে পারসীক স্থল-সেনা কোথাও কোথাও জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সবকিছু ধ্বংস করল। এক জায়গায় এসে বাহিনীকে দ্বিভক্ত করে বড় দলটি নিয়ে বিওশিয়া প্রবেশ করে জের্কসাস অগ্রসর হলেন অ্যাথেন্স লক্ষ্য করে। বিওশিয়াবাসীরা তখন শত্রুর পক্ষে চলে গিয়েছে, ম্যাসিডোনিয়ার থেকে আলেকজাণ্ডার শহরে শহরে সৈন্য মোতায়েন রেখেছেন জের্কসাসকে বোঝাতে যে, বিওশিয়া তাঁর বন্ধু। পারসীকদের অন্য দলটি চলল দেলফাইর মন্দিরের দিকে, তাদের উপর হুকুম, মন্দির লুঠ করে তার সম্পদ সম্রাটের সামনে উপস্থিত করতে হবে; এ সম্বন্ধে তিনি এত কথা শুনেছিলেন যে, শোনা যায় যে দেশে নিজের ধনরত্নের চেয়েও এখানকার কোনও কোনও সামগ্রী তাঁর কাছে বেশি পরিচিত ছিল। আক্রমণ আসন্ন দেখে দেলফাইবাসীরা প্রথমে তাদের স্ত্রীলোক ও শিশুদের অন্যত্র পাঠিয়ে দিল, তারপর নিজেরা পার্নাসাস গিরিতে গিয়ে আশ্রয় নিল, শহরে থাকল শুধু ষাটজন ও মন্দিরের পুরোহিত। পারসীক সৈন্য যখন অ্যাথিনীর মন্দিরে পৌঁছেছে তখন নাকি হঠাৎ দারুণ বজ্রপাত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্নাসাসের দুই শিখর ভেঙে প্রচণ্ড গর্জনে তেড়ে এসে পড়ল তাদের উপর, বহু লোক মরল সেখানে। তা ছাড়া মন্দিরের ভিতর থেকে এক ভীষণ চীৎকার শোনা গেল। নিদারুণ ভয়ে পারসীকরা পালাতে আরম্ভ করলে, তখন স্থানীয় অধিবাসীরা পাহাড় থেকে বেরিয়ে তাদের আক্রমণ করে আরও ক্ষতি করল।

অ্যাথেনীয়রা ভেবেছিল যে, পেলপনিসীয়রা বিওশিয়াতে শত্রুকে আটকাতে চেষ্টা করবে, দেখা গেল তা না করে শুধু নিজ দেশের নিরাপত্তার কথা ভেবে তারা করিন্থীয় যোজকটুকু প্রতিরক্ষা করতে ব্যস্ত। অ্যাথেনীয়দের অনুরোধে গ্রীসীয় নৌ-বাহিনী আর্টিমিসিয়াম থেকে সরে স্যালামিসে আশ্রয় নিল, সেখান থেকে অ্যাথেনীয়রা দেশে

ফিরে তাদের স্ত্রীলোক ও শিশুদের অ্যাটিকার বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে। দৈববাণী স্মরণ করে তারা বুঝল যে, অ্যাথেন্স বিপন্ন, কিন্তু তার চেয়েও বড় একটা কারণ ছিল; অ্যাথেনীয়দের বিশ্বাস যে প্রকাণ্ড এক সাপ অ্যাক্রপোলিসের মন্দিরে বাস করে এবং পাহাড়টি পাহারা দেয়; সাপের জন্য প্রতি মাসে তারা মধুমাখা পিঠে রেখে আসত, প্রতিবারই তা শেষ হয়ে যেত, কিন্তু তখন দেখা গেল পিঠে যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে। সুতরাং তাদের মনে হল দেবী নিজেই অ্যাক্রপোলিস ত্যাগ করেছেন।

স্যালামিসে নৌ-বাহিনীর বিভিন্ন অধিনায়কদের এক আলোচনা-সভা বসল, এউরিবিয়াডাস প্রত্যেককে অভিমত জিজ্ঞাসা করলে কোথায় শত্রুকে বাধা দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে। অধিকাংশ বললে, স্যালামিসে হেরে গেলে তারা সেখানেই আবদ্ধ হয়ে পড়বে, কিন্তু করিন্থীয় যোজকে হারলে অন্তত নিজেদের লোকের মধ্যে আশ্রয় পাওয়া যাবে, সুতরাং সেখানেই যুদ্ধ করা উচিত; পেলপনিসীয়রা অবশ্য সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করল এ প্রস্তাব। আলোচনা তখনও চলছে এমন সময়ে অ্যাথেন্স থেকে এক দূত এসে জানাল যে পারসীক স্থল-সৈন্য অ্যাটিকায় পৌঁছে সারা দেশ জ্বালিয়ে দিয়েছে।

হেলেস্পণ্ট অতিক্রম করার পর অ্যাটিকা পর্যন্ত আসতে তাদের তিন মাস লেগেছিল। তারা যখন অ্যাথেন্সে এল তখন শহর পরিত্যক্ত, শুধু অ্যাথিনীর মন্দিরে জনকয়েক ছাড়া—কিছু মন্দিরের কর্মচারী, কিছু গরীব লোক; পয়সার অভাবে তারা দের সঙ্গে পালাতে পারে নি, তা ছাড়া তাদের ধারণা ছিল যে, দৈববাণীতে যে বলেছে 'কাঠের দেয়াল' অ্যাথেন্সকে রক্ষা করবে, তার প্রকৃত অর্থ তারা ধরতে পেরেছে; দেয়ালের ইঙ্গিত জাহাজের প্রতি নয় ভেবে তারা তক্তা দিয়ে অ্যাক্রপোলিস ঘিরে সেখানে বসে রইল। পারসীকরা কাছেই আর একটি পাহাড় দখল করে তাদের প্রতি অগ্নিবাহী বাণ বর্ষণ করতে থাকল, কাঠের দেয়াল তাদের বাঁচাতে পারল না দেখেও তারা নানা কৌশল প্রয়োগ করে চলল। শত্রু যখন এগুতে চেষ্টা করল তখন প্রকাণ্ড পাথর গড়িয়ে ফেলল তাদের উপর, তা দেখে জের্কসাসও থতমত খেয়ে গেলেন। শেষকালে পারসীকরা বাঁধা পথটি ছেড়ে অন্যদিক দিয়ে শিখরে উঠল, সেদিকটা এতই খাড়া যে সেখানে কোনও প্রহরী ছিল না। তাদের দেখে অ্যাথেনীয়রা কেউ কেউ নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরল, অন্যরা মন্দিরের অন্তঃপুরে আশ্রয় নিল। মন্দির খুলে পারসীকরা প্রত্যেককে মারল, তারপর মন্দিরের সব সম্পদ নিয়ে সমস্ত অ্যাক্রপোলিস আগুন জ্বেলে ধ্বংস করল। অ্যাথেন্স-বিজয়ী জের্কসাস সুজাতে পিতৃব্য আর্তাবানেসের কাছে চিঠি পাঠালেন সুখবর জানিয়ে। পরদিন তাঁর দলে অ্যাথেন্সের লোক যারা ছিল তাদের আদেশ করলেন অ্যাক্রপোলিসে গিয়ে অ্যাথেনীয় রীতি অনুসারে আহুতি দিতে; হয় তো স্বপ্নে এই রকম নির্দেশ পেয়েছিলেন, অথবা মন্দির পুড়িয়ে বিবেকের দংশনে জ্বলছিলেন।

এদিকে স্যালামিসে এই সব খবর অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। কয়েকজন নৌ-সেনাপতি কোনও আদেশের অপেক্ষা না করেই নিজের নিজের জাহাজ নিয়ে পলায়ন করল। যারা থাকল তাদের আলোচনায় ঠিক হল যোজকে গিয়ে যুদ্ধ করা হবে। সভার পর রাত্রে যখন সবাই যে-যার জাহাজে ফিরে এসেছে তখন ন্যাসিফিলোস নামক এক এ্যাথেনীয় থেমিস্তোক্ল্যাসের জাহাজে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জেনে সে বললে, 'না না, একবার যদি আমরা স্যালামিস ত্যাগ করি তা হলে একতা বলে কিছু থাকবে না, যে-যার বাড়ি চলে যাবে, আমাদের সব শক্তি ক্ষয় হবে। আমার কথা শুনুন, যথাসাধ্য চেষ্টা করুন ঐ সিদ্ধান্ত রদ করতে, হয় তো আপনি পারবেন এউরিবিয়াডাসের মন বদলাতে।'

কথাটা থেমিস্তোক্ল্যাসের ভাল লাগল, কিছু না বলে সে তখনই প্রধান সেনাপতির জাহাজে গিয়ে জানালে যে একটা জরুরী কথা আছে। এউরিবিয়াডাস তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাল। তখন থেমিস্তোক্ল্যাস একটু আগে যে সব যুক্তি শুনেছে তার সঙ্গে নিজের যুক্তি মিশিয়ে এমন গুরুতর আবেদন জানাল যে, ফলে ঠিক হল সেনাপতিদের আবার এক সভায় ডাকা হবে। সভার আলোচ্যবিষয় সম্বন্ধে এউরিবিয়াডাস কিছু বলার আগেই থেমিস্তোক্ল্যাস দীর্ঘ আবেগপূর্ণ এক বক্তৃতা আরম্ভ করল।

অবশেষে করিন্থের সেনাপতি তাকে বাধা দিয়ে বললে, 'থেমিস্তোক্ল্যাস, দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যে লোক সংকেত না পেয়েই ছোটে তাকে চাবুক মারা হয়।'

থেমিস্তোক্ল্যাস সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'হ্যাঁ কিন্তু ছোটা আরম্ভ করতে যারা দেরি করে তারা কোনও পুরস্কার পায় না।'

তারপর এউরিবিয়াডাসকে বললে, 'এদের কথা না শুনে গ্রীসকে বাঁচাতে আপনিই পারেন। আমাদের সামনে দু'টি পথ আছে, বিবেচনা করে দেখুন কোন্‌টা ভাল। যোজকে গেলে খোলা সাগরে যুদ্ধ করতে হবে, তা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে না, কারণ আমাদের জাহাজ শত্রুর চেয়ে সংখ্যায় অল্প ও মৃদুগতি। তা ছাড়া যুদ্ধ আমাদের পক্ষে গেলেও স্যালামিস, ইজিনা ইত্যাদি তো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তৃতীয়ত শত্রুর নৌ-বহর দক্ষিণে এলে স্থল-সেনাও পেলপনিসিয়ার দিকে অগ্রসর হবে, সমগ্র গ্রীসকে বিপদে ফেলা হবে। কিন্তু আমাদের পরামর্শমত এইখানে যুদ্ধ করলে খোলা জলে আমরা পড়ব না, দ্বিতীয়ত স্যালামিসে আমাদের পরিবার আশ্রয় নিয়েছে তারা বাঁচবে এবং তৃতীয়ত এখানে লড়েও আমরা পেলপনিসিয়াকে রক্ষা করতে পারি সেখানে শত্রুর স্থল-সেনাকে না ডেকে।'

বক্তৃতার শেষে থেমিস্তোক্ল্যাস ভয় দেখাল যে, তার কথা না শুনলে অ্যাথেনীয়রা জাহাজে তাদের পরিবার তুলে নিয়ে ইটালিতে চলে যাবে।

এই কথায় কাজ হল, স্যালামিসে থাকাই স্থির করল এউরিবিয়াডাস। তর্কযুদ্ধ শেষ করে কর্মযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হল জাহাজে জাহাজে।

স্যালামিস

এ দিকে পারস্যের নৌ-বহর ফ্যালেরুমে এসে পৌঁছাল, তখন জের্কসাস গেলেন তা পরিদর্শন করতে। সেখানে বিভিন্ন সেনাপতিদের মতামত জিজ্ঞাসা করলেন আসন্ন অভিযান সম্বন্ধে, সবাই একবাক্যে বললে গ্রীসীয় নৌ-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত, শুধু নারী-যোদ্ধা আর্তেমিসিয়া বললে, 'মহারাজ গ্রীসীয়দের সঙ্গে জলযুদ্ধ করবেন

নৌ-কৌশলে তারা আমাদের চেয়ে বহুগুণ শ্রেয়, যেমন পুরুষ শক্তিশালী নারীর তুলায়। তা ছাড়া তার প্রয়োজনই বা কি? আপনার প্রধান লক্ষ্য অ্যাথেন্স আপনি দখল করেছেন, গ্রীসের বাকিটা অনায়াসে আপনার হাতে আসবে। বরং জলে হেরে গেলে আপনার স্থল-সেনাও বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার: উৎকৃষ্ট প্রভুর কপালে সাধারণত নিকৃষ্ট সেবক জোটে, আর নিকৃষ্ট প্রভু পায় উৎকৃষ্ট সেবক। আপনার মত প্রভু আর জগতে ছু'টি নেই, তাই আপনার এই তথাকথিত সহযোগীরা এত অপদার্থ— এই যারা মিশর, সাইপ্রাস, সিলিশিয়া ইত্যাদি জায়গা থেকে এসেছে।

এই সব কথা শুনে সভাস্থ সকলে ভাবল নৌ-যুদ্ধে বিরত হতে বলেছে বলে ক্সের্কস্যাস তাকে ভীষণ শাস্তি দেবেন; তার বন্ধুরা দুঃখিত হল, যারা রাজদরবারে তার প্রতিষ্ঠার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ তারা আনন্দ পেল। আসলে রাজা খুব খুশি হলেন, তার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আরও বাড়ল। তবু অধিকাংশের মতানুসারে তিনি যুদ্ধের আদেশ দিলেন। জাহাজগুলি স্যালামিসের দিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল, তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছে, আলো নেই; পরের দিন আক্রমণের জন্য তারা তৈরি হতে লাগল।

গ্রীসীয়রা তখন ভয়ে জর্জরিত, বিশেষত পেলপনিসীয়রা। তারা স্যালামিসে রয়েছে অ্যাথেন্সের সাহায্যে যুদ্ধ করবে বলে, হারলে এই দ্বীপেই আবদ্ধ হয়ে পড়বে, দেশরক্ষার সাহায্য করতে পারবে না। সেই রাত্রেই পারস্যের স্থল-সেনা পেলপনিসিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করেছে। অবশ্য করিন্থীয়-যোজকে শত্রুকে আটকাবার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছিল, থার্মপিলির পতনের পর পেলপনিসিয়ার সব শহর থেকে সৈন্য গিয়ে সেখানে জড়ো হয়েছে। কিন্তু এই সব প্রস্তুতির খবর স্যালামিসে সবাইকে আরও সচেতন করে তুলেছে পেলপনিসিয়ার বিপদ সম্বন্ধে, এউরিবিয়াডাসের সিদ্ধান্তের প্রতি বিরুদ্ধতা আবার জেগে উঠেছে। নতুন করে সভা ডেকে আবার অনেকে বললে স্যালামিস ত্যাগ করে পেলপনিসিয়ায় গিয়ে যুদ্ধ করতে, যদিও অ্যাথেন্স, ইজিনা ও মেগারা আপত্তি করলে।

এই সময়ে আলোচনায় নিজের পরাজয় আসন্ন দেখে থেমিস্তোক্ল্যাস নিঃশব্দে সভা থেকে উঠে এল। তারপর তার কথামত এক ভৃত্য রাত্রির অন্ধকারে নৌকা করে পারসীক নৌ-শিবিরে গেল, সেখানে পৌঁছে বললে, 'অ্যাথেনীয় সেনাপতির থেকে আমি এক গোপনবার্তা এনেছি, তিনি আপনাদের রাজার মঙ্গল কামনা করেন, তাঁর জয় হোক এই চান। গ্রীসীয়রা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে, দ্রুত পলায়ন করে গা বাঁচাবার মতলব করছে। আপনাদের হাতের মুঠোর থেকে তারা যেন বেরিয়ে না যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করলে অসামান্য সাফল্যলাভ করবেন। তারা এখন পরস্পরের গলা কাটতে উদ্যত, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না, উপরন্তু যারা মনে মনে পারস্যের পক্ষে তারা আপনাদের হয়ে যুদ্ধ করবে।'

খবর পৌঁছে দিয়ে দূত তাড়াতাড়ি ফিরে গেল। পারসীকরা তার কথা বিশ্বাস করে স্যালামিস ও উপকূলের মধ্যে এক ছোট দ্বীপে বহু সৈন্য নামাবার ব্যবস্থা করলে। তারপর মধ্যরাত্রে সেই সংকীর্ণ জলপ্রণালীর আশেপাশে তাদের জাহাজগুলি এমনভাবে সাজাল যাতে গ্রীসীয়রা সেখান থেকে আর বার হতে না পারে। সারারাত তারা কেউ ঘুমাল না, নিঃশব্দে চলল এই কাজ, প্রতিপক্ষ জানতেও পারল না।

গ্রীসীয় সেনাপতিদের মধ্যে তখনও বাকযুদ্ধ চলছে, তারা জানল না যে শত্রু তাদের দু'দিকে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই যখন খুব গরম হয়ে উঠেছে তখন ইজিনা দ্বীপ থেকে নৌকা করে আরিস্তিডাস নামক এক অ্যাথেনীয় স্যালামিসে এল এবং সভার বাইরে দাঁড়িয়ে থেমিস্তোক্ল্যাসকে ডেকে পাঠাল। এই দু'জনের মধ্যে তখন গভীর শত্রুতা ছিল, কিন্তু আরিস্তিডাস তা ভুলে গিয়েছিল গ্রীসের এই সংকটে। থেমিস্তোক্ল্যাস বাইরে আসা মাত্র সে তাকে বললে, 'এই সময়ে কে দেশের বেশি উপকার করতে পারে তাই নিয়ে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া উচিত। পেলপনিসীয়রা যতই স্যালামিস ছেড়ে যাবার কথা বলুক এখন আর তাতে কিছু এসে যায় না। নিজের চোখে দেখে এলাম, এখন আর কারও বেরিয়ে যাবার উপায় নেই, আমাদের নৌ-বহর সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। সভায় ফিরে গিয়ে খবরটা দাও।'

'সুখবর এবং সুপরামর্শ,' বললে থেমিস্তোক্ল্যাস, 'যা আমি সবচেয়ে বেশি চেয়েছিলাম তাই ঘটেছে, শত্রুর এই উদ্যোগের জন্য আমিই দায়ী। আমাদের লোকরা যখন স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে চাইল না তখন তাদের বাধ্য করতে হল। কিন্তু খবরটা তুমিই গিয়ে বল, আমি বললে ভাববে বানানো কথা। তোমায় বিশ্বাস করে ভাল, না করলেই বা কি— পালাবার পথ তো বন্ধ।'

আরিস্তিডাসের কথাও সেনানায়করা বিশ্বাস করল না, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তখন শত্রুর পক্ষ ত্যাগ করে একটি জাহাজ এসে হাজির হল, তারাও একই খবর দিল। এই জাহাজটি নিয়ে গ্রীসীয় নৌ-বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়াল তিনশো আশি।

বাধ্য হয়ে গ্রীসীয়রা এবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল, ভোরবেলা যোদ্ধাদের একত্র করে থেমিস্তোক্ল্যাস এক বক্তৃতা দিল, মনুষ্য চরিত্রের মহৎ ও হীন অংশের তুলনা করে আসন্ন সংকটে মহত্ত্বের পথ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করলে। তারপর সব জাহাজ শত্রুর দিকে এগিয়ে গেল, পারসীকরাও দেখতে দেখতে তাদের উপর এসে পড়ল, আরম্ভ হল ভীষণ যুদ্ধ। পারসীক নৌ-বাহিনীর বিশেষ ক্ষতি হল যুদ্ধে, তার কারণ তারা নৌ-যুদ্ধে পারদর্শী নয়, জাহাজগুলি ঠিকভাবে না সাজিয়ে এলোমেলো আক্রমণ করছিল তারা, আর গ্রীসীয়রা কাজ করছিল দলবদ্ধভাবে। তবু ক্সের্কস্যাসের চোখ তাদের উপর আছে জেনে তারা সেদিন ভালই যুদ্ধ করেছিল।

আর্তেমিসিয়ার আচরণ বিশেষ কর সম্রাটের প্রশংসা অর্জন করেছিল। যখন পারসীক নৌ-বাহিনী সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ তখন তার জাহাজকে তাড়া করল এক গ্রীসীয় রণপোত। সামনে তখন কতগুলি পারসীক জাহাজ, পলায়নের পথ বন্ধ, পিছনে শত্রু, এই অবস্থায় দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আর্তেমিসিয়া নিজেদেরই এক জাহাজ ধাক্কা মেরে ডুবিয়ে দিল। তা দেখে যে অ্যাথেনীয় জাহাজটি তাকে তাড়া করেছিল তার কর্তারা আর্তেমিসিয়ার জাহাজটিকে স্বপক্ষীয় বলে ভুল করল এবং পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করে অন্য দিকে চলে গেল। তারা যদি জানত যে এই জাহাজ আর্তেমিসিয়ার তা হলে প্রাণপণ চেষ্টা করত তাকে ধরতে; এক স্ত্রীলোক তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে এটা

অ্যাথেনীয়দের অসহ্য মনে হয়েছিল এবং জাহাজের কর্তাদের বিশেষ আদেশ ছিল তাকে বন্দী করার জন্য—পুরস্কার প্রায় তিপ্পান্ন হাজার টাকা।

যাই হোক, আর্তেমিসিয়া যখন নিজেদের এক জাহাজ ডুবিয়ে দিল তখন তা জের্কস্যাসের চোখে পড়ল, তিনি এক জায়গা থেকে যুদ্ধ দেখছিলেন। পার্শ্ববর্তী একটি লোক তাঁকে বললে, 'মহারাজ, দেখেছেন আর্তেমিসিয়া কি অদ্ভুত যুদ্ধ করছে? একটি শত্রু জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে সে।'

সম্রাট নাকি তখন বলেছিলেন, 'আমার পুরুষরা স্ত্রীলোক বনে গিয়েছে, আর স্ত্রীলোকরা হয়েছে পুরুষ।'

জাহাজটি যে শত্রুর নয় তা জানবার উপায় ছিল না, কারণ সবাই ডুবে মরেছিল। পারসীকরা সাঁতার জানত না, তাদের বহু জাহাজের সঙ্গে তারাও জলের নীচে গেল। ক্রমে তাদের বাহিনী সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। যুদ্ধ করে তো সুবিধা করতে পারলই না, সংকীর্ণ জলপথে পালাবারও পথ পেল না, কেউ অ্যাথেনীয়দের হাতে কেউ ইজিনীয়দের হাতে ডুবল।

পারস্যের সন্ধি প্রস্তাব

স্যালামিসের বিপর্যয়ের কয়েকদিন পর পারসীক স্থল-বাহিনী পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করল, থেসালিতে মার্দোনিয়োসের অধীনে বাছা বাছা কিছু সৈন্য রেখে জের্কস্যাস দেশে ফিরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে যারা গেল তারা কেউ মারা পড়ল, কেউ থেকে গেল পথে, ঘাস-পাতা-বাকল খেয়ে চলতে হল অনেক দিন। নৌ-বহরের যা বেঁচেছিল তা-ও এশিয়ায় ফিরে গেল।

থেসালির থেকে মার্দোনিয়োস ম্যাসিডোনিয়ার রাজা অ্যালেকজাণ্ডারকে দিয়ে অ্যাথেন্সকে এক বার্তা পাঠালেন। সেখানে গিয়ে তিনি অ্যাথেন্সকে বললেন, 'পারস্যরাজ মার্দোনিয়োসকে জানিয়েছেন যে অ্যাথেন্স তাঁর যা ক্ষতি করেছে তা তিনি ভুলে যেতে রাজী আছেন। জের্কস্যাস তাকে আদেশ করেছেন অ্যাথেন্সের ভূমি তাকে ফিরিয়ে দিতে, তা ছাড়া আরও যা ভূমি সে চায়, তা সে পেতে পারে, উপরন্তু স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে তার। অ্যাথেন্স তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলে দগ্ধ-মন্দির আবার গড়ে দেওয়া হবে।

মার্দোনিয়োস জিজ্ঞাসা করছে, 'তোমরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও কেন পাগলের মত? তোমরা কোনও দিন তাঁকে হারাতে পারবে না, একদিন তাঁর কাছেই হারবে। গ্রীস আমার হাতে কত বড় বাহিনী আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ, দরকার হলে এর চেয়ে বহু গুণ বেশি সৈন্য আসবে। সন্ধি কর, করে স্বাধীনতা বাঁচাও।'

মার্দোনিয়োসের উক্তি শেষ করে অ্যালেকজাণ্ডার নিজের হয়েও একই সুর গাইলেন—জের্কস্যাস অপরাজেয়, তিনি যে বিশেষ করে তাদেরই এমন উদার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন এবং বন্ধু হতে চাচ্ছেন তা অ্যাথেন্সের পক্ষে পরম ভাগ্য। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তাদের দেশে চিরদিন যুদ্ধ লেগে থাকবে, ইত্যাদি।

সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে অ্যালেকজাণ্ডার অ্যাথেন্সে গিয়েছেন শুনে স্পার্টা ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে দূত পাঠাল। অ্যালেকজাণ্ডারের ভাষণ শেষ হলে তারা বললে, 'আপনারা পারস্যের এই অপমানকর প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না, আপনাদের পক্ষে তা অত্যন্ত অন্যায় হবে, কারণ আপনারাই এই যুদ্ধ শুরু করেছেন, তখন আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিবেচনা করেন নি। এখন সেই যুদ্ধে সমস্ত গ্রীস জড়িয়ে পড়েছে।'

মার্দোনিয়োসের প্রস্তাব অ্যালেকজাণ্ডার খুব মিষ্টি করে বলেছেন, 'তাঁরা দু'জন একই দলের লোক। আপনারা নিশ্চয় জানেন যে বিদেশীর মধ্যে সত্য বা আত্মসম্মান পাওয়া যায় না।'

অ্যাথেনীয়রা অ্যালেকজাণ্ডারকে বললে, 'পারস্যের বল যে আমাদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি তা আমরা জানি, সেটা আপনার অত করে বলার দরকার ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা আমাদের এতই প্রিয় যে, যে করে হোক তা আমরা রক্ষা করব। পারস্যের সঙ্গে আমাদের চুক্তি করতে বলা বৃথা, তাতে আমরা কোনওদিন রাজী হব না। মার্দোনিয়োসকে গিয়ে বলুন যে যতদিন আকাশে সূর্য আছে আমরা জের্কস্যাসের সঙ্গে সন্ধি তো করবই না, অবিরত যুদ্ধ করে যাব—যে সব দেবতা এবং বীরের মন্দির ও মূর্তি তিনি আগুনে পুড়িয়েছেন তারাই আমাদের সহায়। আর কখনও আমাদের উপকার করছেন ভেবে এমন প্রস্তাব নিয়ে আসবেন না।'

তারপর স্পার্টার দূতদেরও তারা বললে, 'আমরা সন্ধি করব এমন আশঙ্কা করা ল্যাসেডিমোনীয়দের পক্ষে হয় তো স্বাভাবিক, কিন্তু এতে আমাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। পৃথিবীর সব সোনা, সবচেয়ে মনোরম ও সমৃদ্ধ দেশও যদি আমাদের দেওয়া হয় তবু আমরা সকলের শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়ে গ্রীসকে শৃঙ্খলিত করব না। এমন ইচ্ছা থাকলেও তা আমরা করতে পারি না, তার প্রধান কারণ তারা আমাদের মন্দির, মূর্তি পুড়িয়েছে। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে। তা ছাড়া আমরা ভাবতে শিখেছি সমগ্র গ্রীসীয় জাতির কথা —এক রক্ত, এক ভাষা, মন্দির, ধর্মানুষ্ঠান, জীবনধারার সূত্রে বাঁধা যে জাতি। সুতরাং যতদিন একজন অ্যাথেনীয়ও বেঁচে আছে ততদিন আমরা জের্কস্যাসের সঙ্গে সন্ধি করব না।'

অ্যাথেন্সের হয়ে আবেগপূর্ণ কথা হেরোডোটাস এর আগেও বলেছেন, এই ইতিহাসে তা দেখা গিয়েছে।

অ্যাথেনীয়দের জবাব পেয়ে মার্দোনিয়োস অ্যাথেন্স আক্রমণ করল এবং দ্বিতীয়বার ধ্বংস হল এই শহর। কিন্তু পরে প্ল্যাটিয়ার যুদ্ধে পারসীক বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটল এবং মার্দোনিয়োস নিজে মারা পড়ল। সেই দিনই এশিয়ার পশ্চিম উপকূলে মিকালে নামক জায়গায় আর এক যুদ্ধে গ্রীসীয়রা শত্রু-বাহিনীকে হারাল এবং যে ক'টি জাহাজ তাদের ছিল তাও পুড়িয়ে দিল।

জের্কস্যাসের প্রণয়

স্যালামিসে পরাজয়ের পর সুজায় ফেরার পথে জের্কস্যাস কিছুদিন সার্ডিসে ছিলেন, তখন তিনি নিজের ভাই মাসিস্ত্যাসের স্ত্রীর প্রেমে পড়লেন! তাকে নানারকম বার্তা পাঠিয়ে কোনও ফল হল না, ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবশত জের্কস্যাস জোরও করলেন না। বলপ্রয়োগে তিনি সাহস পাবেন না জেনেই মহিলাটিও তাঁকে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করার মত জোর পেয়েছিল। জের্কস্যাস তখন এ সব পথ ত্যাগ করে মাসিস্ত্যাসের মেয়ে আর্তাইন্ত্যার সঙ্গে নিজের ছেলে দারেইয়োসের বিয়ে

ঠিক করলেন, তাঁর ধারণা ছিল যে এর ফলে আকাঙ্ক্ষিতাকে সহজে পাওয়া যাবে। এর পরে তিনি সুস্তাতে ফিরে গেলেন।

সেখানে পুত্রবধূ যখন তাঁর প্রাসাদে এল তখন মাকে ভুলে তিনি মেয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। এইবার তাঁর প্রেম সফল হল, কিন্তু কালক্রমে এই গোপন প্রণয় প্রকাশ হয়ে পড়ল এইভাবে। রাণী আমেস্ত্রিস নিজের হাতে বুনে স্বামীকে নানা রঙের সুন্দর এক লম্বা জামা উপহার দিয়েছিলেন। খুব খুশি হয়ে সেটি পরে ক্সের্কস্যাস আর্তাইন্ত্যার কাছে গেলেন, কিন্তু যেহেতু সেও তাঁর খুশির আর একটি কারণ সেহেতু তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন যে সে যা চাইবে তাই পাবে। আর্তাইন্ত্যা ও তার পরিবারের কপালে নিশ্চয় সর্বনাশ লেখা ছিল, তাই সে জামাটি চেয়ে বসল। রাণীর ভয়ে ক্সের্কস্যাস প্রাণপণ চেষ্টা করলেন জামা না দিয়ে কোনও গতিকে দায়মুক্ত হতে; আমিস্ত্রিস ইতিমধ্যেই সন্দেহ করেছেন, জামা দিলে আর সন্দেহ থাকবে না। তিনি আর্তাইন্ত্যাকে অফুরন্ত সোনা, নানা সুন্দর শহর দিতে চাইলেন, বললেন, ইচ্ছা করলে সমগ্র এক সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হতে পারে সে। আর্তাইন্ত্যা কোনও কথা শুনলে না, জামাটি আদায় করে মহানন্দে তা পরতে লাগল।

রাণী অবশ্য অবিলম্বে সব জানলেন, কিন্তু তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ল আর্তাইন্ত্যার মায়ের উপর। সেই তাঁর সব যন্ত্রণার কারণ মনে করে তিনি তার সর্বনাশের কথা ভাবতে লাগলেন।

রাজার জন্মদিন-উৎসবে প্রতি বছর তিনি এক রাজভোজে নিমন্ত্রণ করেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে রাজা নিজের মাথা ধুয়ে পারসীকদের উপহার বিতরণ করেন, যে যা চায় তাকে তাই দেওয়া তাঁর অবশ্য কর্তব্য। খাবার সময় যখন এল তখন রাণী উপহার চাইলেন মাসিস্ত্যাস-পত্নীকে। এই দাবীর অর্থ বুঝতে পেরে ক্সের্কস্যাস সম্পূর্ণ বিহ্বল হয়ে পড়লেন, ভাইয়ের স্ত্রীকে এভাবে দান করার চিন্তা তাঁর কাছে খুব খারাপ লাগল, বিশেষ করে তিনি যখন জানতেন সে নির্দোষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হতেই হল।

তখন তিনি মাসিস্ত্যাসকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'তুমি আমার সহোদর তা ছাড়া লোক ভাল। আমি বলি তুমি স্ত্রীকে ত্যাগ কর, আমি চাই না তুমি তার সঙ্গে বাস কর। পরিবর্তে আমার মেয়েকে দিচ্ছি, তাকে বিয়ে কর।'

মাসিস্ত্যাস অবাক হয়ে বললে, 'এ অতি আশ্চর্য প্রস্তাব। যাকে ত্যাগ করতে বলছেন তার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তাদের একজনের সঙ্গে আপনি রাজপুত্রের বিয়ে দিয়েছেন—তা ছাড়া এমন স্ত্রী কারও হয় না। এখন হঠাৎ একে ত্যাগ করে আপনার মেয়েকে বিয়ে করব! না মহারাজ, আমাকে রাজকন্যার যোগ্য মনে করেছেন বলে আমি অতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু এমন কাজ আমি করতে পারব না। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আমাকে শান্তিতে ঘর করতে দিন। রাজকন্যার জন্য আমার তুল্য লোক আপনি আরও পাবেন।'

ক্সের্কস্যাস রেগে বললেন, 'বেশ, আমি তোমার হাতে রাজকন্যাকে দেব না—তবে স্ত্রীর সঙ্গে তুমি আর একদিনও থাকবে না। উপহার প্রত্যাখ্যানের উচিত শিক্ষা তুমি পাবে।'

'মহারাজ, আমার প্রাণটা এখনও আছে, তা আপনি এ পর্যন্ত নেন নি', এই বলে মাসিস্ত্যাস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই দু'জনের মধ্যে যখন কথা হচ্ছে তখন এদিকে আমেস্ত্রিস প্রহরী পাঠিয়ে মাসিস্ত্যাসের স্ত্রীকে ধরে আনলেন। তাঁর আদেশে প্রথমে তার স্তন, নাক, কান ও ঠোঁট কেটে কুকুরদের দেওয়া হল, তারপর জিভ ছিঁড়ে সেই ভয়ংকর অবস্থায় তাকে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ক্সের্কস্যাসের সঙ্গে কথার পর বিশ্রী আশঙ্কা নিয়ে মাসিস্ত্যাস তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরল; স্ত্রীর সাংঘাতিক চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ তার ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করল যে তারা এবং আরও কয়েকজন বন্ধু মিলে বাক্‌ট্রিয়ায় যাবে। সেখানে বিদ্রোহ-জ্বালিয়ে তুলে রাজার বিশেষ ক্ষতি করবে। মাসিস্ত্যাস ছিল সেই প্রদেশের রাজ্যপাল, সেখানে সবাই তাকে খুব ভালবাসত; এই উদ্দেশ্যে নিশ্চয় সে সফল হত, কিন্তু ক্সের্কস্যাস তার মতলব জানতে পেরে পিছনে ফৌজ পাঠালেন, তারা রাস্তায় তাদের ধরে ফেলে প্রত্যেককে হত্যা করল।

সমাপ্ত

বিশেষ বর্ষাদিনকে

চিন্তা চিন্ত্যা

গোটা দিনটাই সেদিন
মাঠে মারা গেলো,
সে শুধু তোমার জন্যে—তোমার জন্যে।

সকালের সংগে সংগে সেই যে
ঝরঝর ঝরঝর ঝরতে থাকলো
তোমার পাগলা-ঝোরা,
দিনভোর আর তার বিন্দুর বিরতি
বেরোতে পারলো না।

কি জানি কি সাধ সেদিন জেগেছিলো,
তার মনে—তার প্রাণে।

এদিকে এ্যাক্‌সা যে গো-বেচারা গোছের
প্রায় প্রত্যেকের রকমফের
হয়রানির অন্ত থাকলো না,
সে যেন জেনেও জানে না!
এ' কিন্তু তার উচিত হয় নি,
সে তুমি যাই বলো না।

(পরিশিষ্টের শেষাংশ)

রাণু ভৌমিক (দাস)

—আজ আমি ওকে হত্যা করেছি, ঠিক সেই সময়ে অন্ধকার বাড়ির কোণের একটি ঘরে অনুজ্জ্বল আলো জ্বেলে প্রিয়া চ্যাটার্জী লিখছিল—আজ আমি ওকে হত্যা করতে পেরেছি। এতদিন চেষ্টার ফলে ও আজ শান্ত হয়েছে—আমার পাশেই ও পড়ে আছে—আমার প্রেম।

কেন ও এলো আমার জীবনে। আহ্বান তো কখনও জানাই নি—বারবার প্রতিরোধ করেছি—তবু ও এলো। তাড়িয়ে দিলাম—চলে গেল না—পালিয়ে এলাম—ও এলো পেছনে পেছনে। কেন ও বুঝতে পারে না ভালোবাসা আমার জন্য নয়। সুর ও অসুর দু'দল মিলে সমুদ্র মন্থন করেছিল—কিন্তু ঐশ্বর্যের, সৌন্দর্যের, কল্যাণের অমৃতের ভাগ অসুর পায় নি। আমি সেই অসুরের দলের। আমার জন্য এ পৃথিবীর কিছুই নেই।

বারবার বলেছি, প্রেম আমার জন্য নয়। ও শুনলো না। ভগীরথের তপস্যা ওর। আমাকে প্রেম-মন্দাকিনীতে সিক্ত করবেই করবে।

বললাম, প্রেম ঘৃণা করি। ও বিশ্বাস করে না। ও ভাবতেই পারে না কেউ প্রেম ঘৃণা করতে পারে। পারিজাত কি চেনে পাঁক?

আলোর দেশের লোক ও। সেখানে অন্ধকারের ছায়া নেই। বাবা, মা, ভাই, বোন সুখী পরিবার। বাড়ির আদরের বড় ছেলে। অনেকগুলি ছোট ছোট ভাইবোনের ভালোবাসার দাদা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল, সামান্য আঘাত—কিন্তু সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—হাসপাতালে নিয়ে এলেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল বাইরে থেকে যতটা সহজ মনে হয়েছিল ততটা সহজ নয়। পায়ের হাড় সরে গেছে।

—বেশ কিছুদিন চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে। এই হলো হাসপাতালের নির্দেশ।

ওর বাবা বললেন, তা' হলে এখানেই থাক।

তাঁর চেহারাটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। দীর্ঘকায়, প্রশস্ত বুক, রং তামাটে—হাসিখুশি—সদানন্দময়। সেদিন সকালে অনেকক্ষণ ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হাসতে হাসতে উনি বললেন, জ্যোতি এখানেই থাক। যা চমৎকার ব্যবস্থা। আমার নিজেরই মনে হচ্ছে পা ভেঙ্গে শুয়ে পড়ি।

ওর মা সঙ্গে এসেছিলেন। মাতৃত্বের স্নিগ্ধতায় ভরা দেহ—যেখানে সৌন্দর্যের প্রশ্ন অবান্তর। আশঙ্কায় মুখখানি একটু ম্লান। ওঁকে দেখে আমার মনে হয়েছিল···আর একটা দূষিত দুর্গন্ধ এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে।

—কি যে বল। স্বামীকে মৃদু ধমক দেন উনি।

বিনুনীতে লাল ফুল-বাঁধা কিশোরী ছোট বোনটি দাদার গা ঘেঁসে বসে কি যেন বলে ফিসফিসিয়ে আর মিটিমিটি হাসতে থাকে।

সব মিলিয়ে একটা ছবি। স্বর্গের ছবি। সে ছবি দেখার অধিকারও আমার নেই। আমি পালিয়ে যাই।

ধবধবে সাদা বিছানায় সাদা, পাতলা পাঞ্জাবী পরে শুয়ে থাকতো জ্যোতির্ময় রায়। হাসপাতালের অসুস্থ পরিবেশের মধ্যে আত্মীয়-স্বজন পরিজন প্রীতিতে ঘেরা এই ঘরটির চেহারাই যেন বদলে গেল। জমাদার থেকে সুরু করে সিভিল-সার্জন সবাই হাসিমুখে ঘরে ঢোকে, প্রীতমুখে ঘর ছাড়ে। আর নার্সদের তো কথাই নেই। রীতিমতো রেষারেষি।

শুধু একমাত্র আমি পরিত্যক্ত। আমি জানি অমৃতের অধিকার আমার নেই—তাই সেদিকে তাকাই না আমি। এটুকু আত্মসম্মান বোধ ছিল আমার।

ওখানে আমি চাকরি করি। আমার ডিউটি আছে। রোজ একবার ঢুকি।

সেদিন টেবিলে রাখা চার্টটা দেখছিলাম। হঠাৎ ও ডাকলো, ডাঃ চ্যাটার্জী।

ভাষা ইংরাজী—সুর বাংলা। আমি সেই সুর সম্পূ উপেক্ষা করলাম। গম্ভীর পেশাগতকণ্ঠে বললাম, ইয়েস্!

ও বোধ হয় একটু থমকে গেল—চমকে গেল। জানি না।

তাকাই নি ওর দিকে। এমন কি, কেন ডেকেছিল—সে প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করি নি।

ও চলে গেল ভালো হয়ে। শুনেছিলাম হাসপাতালের সবাই নাকি ওকে বিদায়-স্মৃতির ফুল দিয়েছিল। শুধু আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। সেদিন ডিউটি ছিল না আমার।

কয়েকদিন পরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দেখতে পেলাম উল্টোদিকের রাস্তায় ও দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে এগিয়ে এলো। কিন্তু ঠিক তখনই একটা বাস পেয়ে উঠে পড়লাম। বাস থেকে দেখতে পেলাম রাস্তার যানবাহনের ভিড়ের মধ্যে অবাক হয়ে আপনভোলার মতো ও তাকিয়ে আছে। দু' চোখে অপার বেদনা ও বিস্ময়।

পরদিন বেরিয়ে বাসস্টপে যেতেই ও এগিয়ে এলো। আজ এদিকের রাস্তাতেই ছিল। হাসিমুখে বলে, নমস্কার।

—নমস্কার! অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিই।

—আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল। একটু সময় হবে।

—না।

—কেন? হাসিমুখে ও প্রশ্ন করে।

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, সে কৈফিয়ৎ কি আপনাকে দিতে হবে। তাকালাম—ট্রাম, বাস, গাড়ির শব্দ, ভিড়, নোংরামির পরিপ্রেক্ষিতে ওর সেই অনুপম মুখের দিকে একবার তাকালাম—ব্যস। সব শেষ।

হাসপাতাল থেকে ইডেন গার্ডেনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ। কিন্তু কত শতবার গিয়েছি আমরা। অনেক ··অ-নে-ক-দূ-র পৃথিবীর শেষ প্রান্ত।

সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। এ কি? কোথায় যাচ্ছি আমি। চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছি বলেই বোধ হয় ও বলে, ঐ চাঁদ তো কিছুই নয় পৃথিবীর একটা টুকরো অংশ—ওখানে মরা নদী আর মরা পাহাড়। তবু আমরা ওকে কত সুন্দর ভেবে নিয়েছি।

—তাতে কোন লাভ হয় নি—তার নয়—আমাদেরও নয়।

—সেই কল্পনায় পৃথিবী সুন্দরতর হয়েছে।

হঠাৎ রাগ হয়ে যায়। বোধ হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি বলেই রাগ হয়। দাঁতে দাঁত চেপে বলি, চাঁদের দিকে তাকিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ কারো অপরাধ ক্ষমা করেছে!

উঠে এলাম। প্রচণ্ড রাগ হলো ওর ওপরে। এ কি ন্যাকা পৃথিবীর সঙ্গে ও আমার পরিচয় করাতে চাইছে। থাকুক ও ওর অবাস্তব স্বপ্ন নিয়ে। যখন রূঢ় আঘাতে স্বপ্ন ভাঙবে তখন ও জাগবে। কিন্তু আমি জেগেছি। জেগে ঘুমোবার কোন মানে হয় না।

শুধু নেকামীভরা নয়—মিথ্যা একটা পৃথিবী। ও কি কখনও আমাকে ভালোবাসতে পারে? পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মিথ্যা।

—কেন তুমি আমাকে ভালোবাস! বলেছিলাম একদিন, মানুষ মানুষকে যজন্য ভালোবাসে তার কিছুই নেই আমার। রূপ নেই, গুণ নেই, অর্থ নেই।

—আমি তোমাকে ভালোবাসি।

—আমাকে? হাঃ, হাঃ শব্দে হেসে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল। বলতে ইচ্ছে হয়েছিল—আমি জারজা: আমি পৃথিবীর একটা অবাঞ্ছিত সৃষ্টি যে মৃত্যুর ডালি থেকে ছিটকে পড়ে গেছে।

—একটা জানা গল্প ওকে বললাম, বামন এসেছিল রাজসভায়। যেমনি কুৎসিত রূপ ততোধিক কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী। ফুলের মতো সুন্দরী রাজকুমারী হেসে গড়িয়ে পড়ে—আর বামন ভাবে রাজকুমারী ওর প্রেমে পড়েছে। সে আরও নানারকম ভঙ্গী করতে থাকে। সভা ভেঙ্গে যায়। কিন্তু বামনের মনে শান্তি নেই—সে রাজকুমারীকে খুঁজছে। হঠাৎ সামনের আয়নায় একটা ছায়া—ক ঐ কুৎসিত বামন? কেন ও এলো এই সৌন্দর্যের প্রাসাদে। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বামন ওকে হত্যা করতে যায়—অমনই সে নিজেকে চিনতে পারে—আর বুঝতে পারে রাজকুমারী তাকে—

—গল্পটা আমি পড়েছি, ও হাসিমুখে বলে, এণ্ডারসনের লেখা। অপূর্ব গল্পটি।

—বামন অনেক দেরিতে নিজের মুখ দেখেছিল, কিন্তু আমি আমার মুখ অনেক আগেই দেখেছি, আমি বলি।

সেদিন-ই আমি কলকাতা ছাড়লাম। ওর সঙ্গে দেখা হোক তা আমি চাই না। কি উদ্দেশ্যে ও আমাকে একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার বিশ্বাস করাতে চাইছে তা জানি না—কিন্তু কথাটা যে অবিশ্বাস্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মায়ের বীভৎস মৃত্যুদৃশ্যটা কি আমি কখনও ভুলতে পারি? সেই সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ পরনে—আমার শুচিস্মিতা মা। কে তাকে টেনে নামালো রাত্রির পঙ্কিলতায়! তারপর ধীরে ধীরে রাত্রি ঢেকে ফেলে দিনকে—গোপন জীবনের পাপ প্রকাশ্যে সামনে এসে দাঁড়ায়, তাঁকে শেষ করে দেয়।

ছোট গ্রামের ছোট্ট সেই মেয়েটি। ছোট ছোট চুল দুলিয়ে সে ঘুরে বেড়াতো—হাঁসের খেলা দেখতো জলে পা ডুবিয়ে বসে। আরও পাঁচটি গরীব মেয়ের মতো পরিশ্রম করে কালো-কালো রং আর দুর্দান্ত স্বাস্থ্য নিয়ে সে একদিন যৌবনে পা দিল।

বিয়ের বয়স হলো—বিয়েও হয়ে গেল। রোগজীর্ণ, প্রায় বৃদ্ধ একটি লোকের সঙ্গে বিয়ে হলো তার। ভাগ্য থাকলে পাকা চুলে সিঁদুর পড়বে' আশীর্বাদ করলেন বর্ষীয়সীরা, কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুপথ-যাত্রীকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনবার মতো ভাগ্য তার ছিল না—কাজেই কুড়ি বৎসর বয়সে সে বিধবা হোল।

তারপরে সে একজনের ভালোবাসা পেল—একজনকে ভালোবাসলো।

আমি সেই মেয়েটিকে দোষ দিই না। পাশের শান্ত, স্থির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রিয়া ফিসফিসিয়ে বলে, আমি সেই মেয়েটিকে দোষ দিই না। আগুনে-পোড়া মন না হলে কেউ প্রেমকে প্রতিরোধ করতে পারে না।

সেই ছোট্ট মেয়েটি—গ্রাম্য মেয়েটি—অশিক্ষিতা মেয়েটির মন তো কাঁচা মাটি। সে সত্য সত্যই ভালোবেসেছিল সেই লোকটিকে যার নাম আমি জানি না।

মেয়েটি সত্য সত্যই ভালোবেসেছিল ছেলেটিকে—দেহের প্রতি শিরায়-উপশিরায়—ফুলের মতো নিবেদিত করেছিল নিজেকে—নইলে···

কাগজে অনেকক্ষণ মুখ চেপে পড়ে থাকে প্রিয়া। তারপরে লেখে, নইলে সে সেই পরিণতিকে ভালোবাসতে পারতো না।

জানতে ইচ্ছে হয় যখন সেই মেয়েটি উপলব্ধি করলো, প্রেমের ফুল ফল হয়ে উঠেছে তখন সে কি ভেবেছিল? সে কি আশা, আশঙ্কা-ভরা দুরু-দুরু-বক্ষে ছুটে গিয়েছিল প্রেমিকের কাছে। সে কি ফিরে এসেছিল অপমানিতা হয়ে?

সভ্যতার প্রথম স্তরে নারী সন্তান বহন করেছে, সে পেয়েছে স্বর্গাদপি গরীয়সীর সম্মান—সে হয়েছে জননী আর আজ সেই সন্তান বহনের অপরাধে তাকে পতিত বৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করতে হয়। একবার ভেবে দেখ, একটি গ্রাম্য, নির্বোধ, বিধবা মেয়ের দেহপোজীবিনী হওয়ার পেছনে কত যন্ত্রণা, কত লাঞ্ছনা, কত অপমানের ইতিহাস গুপ্ত আছে।

তবুও সেই মেয়েটি দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশার সন্তানকে ভালোবাসতো। সংসারের সমস্ত বিষ নিজে নিয়ে সন্তানের জন্য সঞ্চিত রেখেছিল অমৃত। ভালোবেসেছিল বলেই ভালোবাসার এই সন্তানকে প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা, সমাজের অত্যাচার সত্ত্বেও ভালোবাসার বৃত্তদ্বারা তাকে ঘিরে রেখেছিল। রাত্রির যন্ত্রণা যখন এসে তার দিনকে ঢেকে দিয়েছিল তখনও সে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে—

না, মাকে আমি দোষ দিই না। তাঁর মতো স্নেহপ্রাণ, তরুণ মনের পক্ষে ভালোবাসা অপরাধ নয়। না, তাঁকে আমি দোষ দিই না। আর তাঁকে দোষ দিই বলেই যাদের জন্যে তাঁকে সেই কুৎসিত মৃত্যুবরণ করতে হলো—তাদের ক্ষমা করতে পারি না।

আমাকে মা 'মানুষ' করতে চেয়েছিলেন, মানুষই আমি হয়েছিলাম—মেয়েমানুষ হই নি। মা'র মৃত্যুসময়ে আমি কলেজের ছাত্রী। ওঁর মৃত্যুর পরে কলকাতা অসহ্য হয়ে উঠলো। এক বিশ্রী দুর্গন্ধ, যন্ত্রণা আর চীৎকার শুনতে পেতাম।

—বিন্দুদি', চল এখানে থেকে চলে যাই।

—তাই চল্। বিন্দুদি' চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে। কিন্তু পরক্ষণেই চমকে উঠে বলে, তোর লেক পড়া ?

—ছেড়ে দেব।

—না, না। আঁতকে ওঠে বিন্দু। তোর মা···

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকি। যে নারী আমাকে রক্তেরসে গড়ে তুলেছে—বুকের স্নেহ পালন করেছে—তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না। অসম্ভব ইচ্ছা হচ্ছিল জানবার—তবু চুপ করে থাকি।

কিন্তু, বিন্দুঝি নিজের মনেই বলতে থাকে, ওকে তো আমি এইটুকু বয়স থেকে জানি—পিসীমির নোক বলতো। হাঁদা—আসলে কথা এই যে, এখানকার নোকগুলোই খারাপ—কেউ যদি ভালোমানুষ হলো, অমনি তাকে বলবে—হাঁদা।

বিন্দুদি'র মতো এরকম খাঁটি কথা কেউ বলতে পারে নি। বিন্দুদি' আরও বলেছিল, বিধবা হয়ে এলো, কত নিয়ম করত, পুজো—এটুকু মেয়ে—আমরা তাজ্জব বনে যাই। ও মা, কিসের মধ্যে কি—এক রাত্তিরে আমার কাছে এলো—আমাকে তুই লুকিয়ে কলকাতা নিয়ে যেতে পারিস।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম, কোথাকার কি ঠিক নেই শুধু শুধু কলকাতায় যেতে চায় কেন?

—দরকার আছে।

মনে 'সন্দো' হোল। দোর বন্ধ করে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, কলকাতায় কে থাকে?

ও উত্তর দেয় না। এতক্ষণে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। হুঁ, ঠিকই।

—সব্বোনাশটি বাধিয়ে বসেছিস—যাক, সেজন্য তোকে কলকাতায় যেতে হবে না। আমিই পারব।

—না। না।

ওকে তো বড্ড ভালবাসতুম তাই আবার বললাম, ছাখ, তোর কাছে তো লুকোন নেই—আমি এই করি। তোদের ডাক্তার-মাক্তারের' চেয়ে অনেক ভালো ওষুধ আছে আমার।

তা ও বলে, আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি তোমাকে কে বললে?

—তবে কোথায় যাচ্ছিস? তাজ্জব বনে গিয়ে বলি, এই কাঁটাটা বয়ে নিয়ে কি তুই বেড়াতে যাচ্ছিস।

—না। আমি কলকাতায় যাচ্ছি। কালোমুখ আর দেখাবো না—তাই যাচ্ছি। বিন্দুদি', তুমি যা ভাবছ তা আমি করব না। সেটা মহাপাপ। বিধবা হয়ে ভালোবেসে এক পাপ করেছি আবার নতুন করে পাপ টানব না।

প্রিয়া কাগজে ঝুঁকে পড়ে দ্রুত লিখতে থাকে, বিন্দুদি'র কথা থেকে এক নূতন আলোকপাত হলো আমার জীবনে। তা'হলে, আমার অস্তিত্বের মূলে স্নেহ নয়—ধর্মভয়।

এই ভালো। এই ভালো। মোহের অন্ধকার ভাঙতে হবে। কোন মোহ'আমার প্রয়োজন নেই—রূপের মোহ, গুণের মোহ, স্নেহের মোহ, ভালোবাসার মোহ।

সেই মোহমুক্ত মন নিয়ে গিয়েছিলাম রামরাজপুর। জীবনের সোনালী ক'টা দিন—পুতুল, প্রতিমা, পাপড়ি। পাপড়িকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। এই পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে কি করে কোন মেয়ে অমনভাবে হাসতে পারে? ভাবতে গেলে অবিশ্বাস্য কিন্তু সেই প্রাণবন্ত হাসির দিকে তাকিয়ে কেউ অবিশ্বাস করতে পারবে না। ঘটবে কিছু একটা ঘটবে—যাতে ওর হাসি মুছে যাবে।

ক'দিন পরেই ঘটনাটা ঘটলো। বিচিত্র এই পৃথিবী—বিচিত্র তার ব্যবস্থা। সহশিক্ষা কলেজ—অথচ মেয়েদের সামনে কাঁটার মতো একটা বেড়া। পাপড়ির হাসি নষ্ট করবার জন্য ওকে টেনে নিয়ে ওদিকে বসলাম—যার ফলে আমাকে কলেজ ছাড়তে হোল।

মৃদু হাসলাম। এই তো ঠিক। কলকাতায় ফিরে এসে কলেজে ভর্তি হলাম। আমাকে 'মানুষ' হতে হবে 'মেয়েমানুষ' নয়—অনেক মানুষকে শাস্তি দিতে হবে। বিন্দুদি'র মৃত্যুর পরে হোস্টেলে চলে গেলাম।

বেশ ছিলাম। ডাক্তারীতে নাম ছিল। হয় তো ঐভাবে জীবন কেটে যেতো। কিন্তু···

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় প্রিয়া। ঠাণ্ডা দেহটি দু'হাতে স্পর্শ করে বলে, আজ আমি স্বীকার করছি—তোমাকে ভালোবেসেছিলাম—সত্যই ভালোবেসেছিলাম। তাই তুমি অত অসহ্য হয়ে উঠেছিলে। তোমার জন্যই আমি কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এলাম। এখানে এসে পেলাম শশাঙ্ককে। এই একটি অদ্ভুত ছেলে। আরও একটু কল্পনা বা

সৃজনীপ্রতিভা থাকলে ও বোধ হয় লেখক হতে পারতো—কিন্তু তা না থাকায় হয়েছে একটি সেন্টিমেণ্টাল ফুল।

প্রথম দিন-ই কি রকম হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়েছিল। অবশ্য ওরা পাড়াগাঁর লোক। শহুরে মেয়ে—বিশেষত শহুরে ডাক্তার মেয়ে—এবং আমার মতো এই রকম দ্বিধাহীন অপূর্ব স্পষ্ট চেহারা দেখবার অভ্যাস নেই।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, দিন দিন ওর 'হাঁ' বড় হতে থাকবে কিন্তু ও কখনও কোন কথা প্রকাশ করবে না। এরা হচ্ছে 'সেন্টিমেণ্টাল ফুল।'

তাই নিশ্চিন্ত মনে সেদিন বললাম, আজ একটা মেয়ে আসবে বলেছে, এলে ওপরে পাঠিয়ে দিও।

প্রথমবারে ও কিছু বলে না—কিন্তু দ্বিতীয় কেসটায় মেয়েটাকে না পাঠিয়ে নিজেই উঠে আসে।

—কি, প্রশ্ন করি।

—মেয়েটা এসেছে।

—বেশ তো, ওপরে পাঠিয়ে দাও।

—কেন?

এবারে আমি ওর দিকে তাকাই। আমার চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নেয়। সেন্টিমেণ্টাল ফুল। খুব আস্তে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলি, ওপরে পাঠিয়ে দাও।

তৃতীয়বারে শশাঙ্ক আবার ওপরে এলো। ওর মুখটা রক্তশূন্য। দাঁতে দাঁত চেপে আছে—এসব কি হচ্ছে? দমবন্ধ গলায় ও বলে।

আমি ওর চোখের দিকে তাকাই। ও চোখ নামিয়ে নেয়—সরে যায় না। ওর সমস্ত শরীরটাই যেন সাদা হয়ে গেছে। কতটা মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত হলে তবে মানুষ এতটা মরিয়া হতে পারে—

মনে মনে বলি, শশাঙ্ক, অজানার যন্ত্রণায় তুমি উৎপীড়িত হচ্ছ কিন্তু জানতে পারলেই কি তুমি সুখী হবে?

প্রকাশ্যে বলি, কি বিষয়ে তুমি জানতে চাইছ?

চুপ করে থাকে।

—জানতে চাইছ সেই বিষয়ে যে বিষয়ে তুমি জান।

—যা জানি তা কি সত্য! ও এমনভাবে কথা বলে যেন ও মরে গেছে। ওর প্রেতাত্মা কথা বলছে।

—হ্যাঁ, সত্য।

তবুও ও দাঁড়িয়ে থাকে। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যা জানবার তা তো জানা হয়ে গেছে। তখনো বুঝতে পারি নি যে ওর সরে যাবার শক্তি নেই। তাকিয়ে বুঝতে পেরে ওকে একটা ইঞ্জেকশন দিই। কিছুক্ষণের জন্য ওর মন অসাড় হয়ে গেল—যে মন দেহের বিরুদ্ধে কাজ করেছিল।

ও চলে যাচ্ছিল। আমিই ওকে ফেরালাম—সঙ্কোচের আবরণ মুক্ত করতে হবে।

—একবার যখন উঁকি দিয়েছ তখন সবটাই দেখ, আমি বলি।

ও অবাক চোখে তাকায়। সেন্টিমেণ্টাল ফুল। নগ্নজগতকে জানতে ওদের এত ভয়, অথচ কৌতুহলেরও সীমা নেই।

—এখানে বস। কোণের একটি চেয়ারে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলি।

—চুপ করে বসে দেখ, লক্ষ লক্ষ বৎসরের ইতিহাস—তোমাদের স্বর্গ, মর্ত্য, নরকের ছবি।

মেয়েটি ওপরে এল।

—তোমার কি নাম?

—সন্ধ্যা।

—কি করো?

—বাড়িতে থাকি চুপচাপ। স্কুল ফাইন্যাল দিয়েছিলাম তিনবার, পাশ করতে পারি নি।

—বাড়িতে কে আছে।

—সবাই।

—তা হলে কি করে এমন হলো!

মেয়েটি মুখ নীচু করে। ওর ফর্সা মুখটা লাল টকটকে। লজ্জায় ওর সব রক্তকণিকা যেন চামড়া ভেদ করে বের হতে চায়। কিন্তু, আমি নির্মম। আমি পাষাণ। আমি নির্বিকার।

—বল।

—এই আর কি···

—কি ?

—গানের মাস্টারমশাই···

—বুঝেছি :

'হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আনো দাও গো আমার হাতে।
ধরব তাকে, ভরব তাকে রাখব তাকে সাথে।
একলা পথের যাত্রা আমার করবো রমণীয়।'

তা কি হলো? স্পর্শসুখের চাপে একলা পথের যাত্রা যে ভারী বোঝা হয়ে উঠলো।

মেয়েটি নীরব। কিই-বা বলবে। আমার কাছে ও অনুগ্রহ-প্রার্থী। এমন একটা অনুগ্রহ যা আইনের চোখে অপরাধ—যে আইন তাকে বাঁচাবার বা ভবিষ্যৎ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না।

—তুমি কি বিপদে পড়েছ? কোর্টে সওয়ালের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করি।

ও অবাক চোখে তাকায়। জানি, ব্যাপারটা হাস্যকর। কিন্তু, 'কনফেশন' আমার চাই। তাই আবার বলি, তুমি কি বিপদে পড়েছ ?

—হ্যাঁ।

—তোমাকে আমি মুক্ত করবো—কিন্তু বিনিময়ে তোমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

—কি ?

—তুমি লিখে দেবে যে জীবনে আর কখনও প্রেমে পড়বে না।

মেয়েটি একটুখানি তাকিয়ে থেকে মুচকি হেসে বলে, আচ্ছা।

সেই সেন্টিমেন্টাল ফুল এতক্ষণ সব দেখছিল, শুনছিল আর মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল। তা কাঁপুক। ওকে অনেকবার কাঁপতে হবে।

সেদিন বিকেলে দৃঢ়, স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুখ নিয়ে আমার কাছে এসে বলে, এটা মহাপাপ।

—কি? প্রশ্ন করি। জানি ও কখনও 'ভ্রূণহত্যা' শব্দটি উচ্চারণ করতে পারবে না।

—মহাপাপ করলে কি হয়? হাসিমুখে প্রশ্ন করি। নরকে যাব এই তো। ওর রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে বলি, তোমাদের এই ঈশ্বর ভদ্রলোক কোথায় থাকেন বলতে পারো ?

শশাঙ্ক যেন শিউরে ওঠে। পাড়াগাঁয় ছেলে। ওর রক্তের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের সংস্কার। এতটুকু বয়স থেকে মা-বোনদের ব্রত, নিয়ম, পুজো, উপোস, মানসিক করতে দেখেছে। কোন মেয়ে যে ঈশ্বরকে নিয়ে এভাবে বিদ্রূপ করতে পারে তা ও ভাবতেই পারে না। বিহ্বলকণ্ঠে বলে, আ···আপনি ঈশ্বর মানেন না।

—না। পরিচয় হয় নি। তুমি পারো পরিচয় করিয়ে দিতে ?

শশাঙ্ক মুহূর্তের জন্য আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলে, ঈশ্বরকে মনে মনে উপলব্ধি করতে হয়।

—খুব ভালো কথা। কিন্তু, আমার মন যে 'ঈশ্বরকে' দেখতে পাচ্ছে তার বাসস্থান নরক।

—তু···তুমি একটা পিশাচী। ও কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যায়।

তা পড়ুক। কিন্তু তবু ওকেই জানতে হবে। সেন্টিমেন্টাল ফুল। এই 'শক থেরাপি' চিকিৎসায় ভেঙ্গে যাবে ওর চারিদিকের নির্বুদ্ধিতার জগৎ। আঘাত—আঘাত হানো। প্রচণ্ড আঘাত হানো; নিরাবরণ করে দেখাও নগ্নতাকে।

প্রতিটি কেসে আমি ওকে ডাকতাম। সব কথা জানুক। এখানে কোথায় ওর ঈশ্বর। কি উল্লাসে নিজের সন্তানকে হত্যা করছে জননী।

একদিন বলেছিলাম—আমি ঈশ্বরের চেয়ে বড়। এভাবে যদি ঈশ্বরের সব সৃষ্টি ধ্বংস করতে পারতাম।

ও মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতো—আর আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, ও আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে না কেন।

তারপরে, জানতে পারলাম। আশ্চর্য। আমার-ই জীবনে ?

ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই যে, কি করে লোক আমাকে ভালোবাসতে পারে? কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও বার বার এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে—যা আমার মনকে তিক্ততর করে তুলেছে।

ইদানীং ও রোগা হয়ে গিয়েছিল। আমারই দেখে মায়া হোত। সেদিন একটা বিশ্রী ছন্নছাড়া মুখ নিয়ে এসে দাঁড়ালো। আর, আমি তাকাতেই ভীত, চকিত মুখে বলে, থানার দারোগা সন্দেহ করছে।

—কি।

—এই সব ব্যাপার।

ওর ভয় দেখে বুঝলাম ও আমাকে ভালোবাসে—আমি যা চাইব না তাই কি আমাকে পেতে হবে সারাজীবন। রাগে শরীর জ্বলে যায়। রুক্ষকণ্ঠে বলি, দারোগাকে কি কেনা যায় না ?

—এ লোকটা সে রকম নয়। ও যেন আমাকে চ্যালেঞ্জ করে।

—সব লোককে কেনা যায়, কাউকে দু'টাকা, কাউকে দু'হাজার, কাউকে দু'লাখ, কাউকে দু'কোটি। কাউকে রূপোয়—কাউকে রূপে।

জ্যোতির্ময় আসবার কয়েক দিন পরে আবার এলো ও। কেন আমি জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহার করছি।

বলতে যাচ্ছিলাম, তাতে তোমার কি? কিন্তু বললাম না, ওর শান্ত, সহজ, সরল মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। অনেকগুলি যন্ত্রণার ছাপ পড়েছে সেখানে।

—ওকে চলে যেতে বল। মুখ ফিরিয়ে বললাম।

—উনি আপনাকে ভালোবাসেন—তাই এভাবে পড়ে আছেন।

—ভালোবাসা একটা ব্যাধি। তা থেকে ওকে মুক্ত করতে হবে। আমি ডাক্তার, এটা আমার কর্তব্য।

যখন জ্যোতির্ময়কে ইঞ্জেকশন দিতাম আর ও যন্ত্রণায় ছটফট করতো—তখন প্রথম দিন, হ্যাঁ প্রথম দিন শশাঙ্ক অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারপরে ও শুধু বিড়বিড় করতো আর তখনই ওর মাথাটা খারাপ হতে আরম্ভ হয়। সেন্টিমেন্টাল ফুল—এদের এই রকম অবস্থাই হয়।

জ্যোতির্ময়কে—আমার প্রেমকে আমি হত্যা করেছি। কিন্তু শশাঙ্কের জন্য আমি দায়ী নই। এরা সেন্টিমেন্টাল ফুল—এরা মানসিক অসুস্থ—এরা পৃথিবীকে পেলব করতে চায়—যা অসম্ভব।

জ্যোতির্ময়, তোমার মৃতদেহের পাশে বসে, তোমার ঠাণ্ডা দেহ স্পর্শ করে আজ আমি শপথ করে বলছি, তোমাকে প্রথম দিন-ই ভালোবেসেছিলাম—তুমি যে ভালোবাসারই জিনিস। কে তোমাকে না ভালোবেসে থাকতে পারে? কিন্তু তুমি কেন কিছুতেই বুঝলে না

যে এই পৃথিবীতে ভালোবাসা টিকতে পারে না। পৃথিবী পচা পাঁকে পূর্ণ। এখানে প্রেম পদ্ম হয়ে ফোটে না—নোংরা বেড হয়ে দুর্গন্ধ ছড়ায়। এখানে প্রেমকে নির্মম মূল্য দিতে হয়। সরলা, সতাকে হতে হয় পতিতা—কি করে ভুলব আমি আমার জন্মের চারিদিকের এই তীব্রযন্ত্রণা! কি করে ভুলব দেহপোজীবিনী মায়ের মৃত্যু আর্তনাদ? কি করে ভুলব প্রেম কোন নরক সৃষ্টি করেছিল?

তুমি তো জান না কি যন্ত্রণা আমি ভোগ করেছি! যতবার আমাকে ভালোবাসার কথা বলেছ ততবার আমার চোখের সামনে ছায়াছবির মতো আবর্তিত হয়েছে আমার জারজ-জীবনের পূর্ণ ইতিহাস। সেই যন্ত্রণার জ্বালায়, (ক্ষমা করো) তোমাকে যন্ত্রণা দিয়েছি।

জ্যোতির্ময়, তোমাদের বাইবেলে বলে, নরের শ্রেষ্ঠ অংশ নিয়ে নারী সৃষ্ট হয়েছে—She is bone of my bone & flesh of my flesh—অস্থি, আমার মজ্জা, তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি পুরুষ-ই যদি স্রষ্টা তা হলে কি সে হত্যাকারী নয়? কিন্তু শাস্তি পাবে সেই নারী—যে কষ্টে ধারণ করবে—পালন করবে—তার জন্ম রয়েছে দারিদ্র্য, কলঙ্ক, অত্যাচার, ব্যাধি, এই পৃথিবীতে এসে কেন তুমি আমাকে প্রেমের কথা শোনাতে চেয়েছিলে জ্যোতির্ময়।

আমার যদি শক্তি থাকতো তা হলে পৃথিবীটা ভেঙ্গেচুরে নূতন করে সৃষ্টি করতাম। কিন্তু সে ক্ষমতা আমার নেই। তাই শুধু কতগুলি ভাবী প্রিয়া চ্যাটার্জীকে নিঃশেষ করে দিয়েছি। কিন্তু তুমি কি বলতে পার, কতগুলি প্রিয়া চ্যাটার্জীর ধ্বংসস্তূপের ওপরে পৃথিবী নূতনভাবে গড়ে উঠবে।

দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ শোনা যায়। 'ওরা এসেছে'—প্রিয়া ভাবে। ঘরের কোণ থেকে সিরিঞ্জ ভরে ওষুধ নিয়ে আসে। বলে, জ্যোতির্ময়, তুমি আমার সব উল্টে দিয়েছ। জানতাম, একদিন না একদিন ওরা আসবে। সে দিনটিকে ভয় পাই নি—সেই দিনটির আশায় তাকিয়ে ছিলাম—যেদিন কোর্টে উন্মুক্ত পৃথিবীর সামনে বিচারককে বলতে পারব, আপনি ক'টি জারজ-সন্তানের পিতা। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, তোমার মৃতমুখের দিকে তাকিয়ে সবই মিথ্যে মনে হচ্ছে। আজ পাপড়ির হাসির অর্থ বুঝতে পারছি—তোমাকে যে বিষ দিয়েছি জ্যোতির্ময় তা আমি একসঙ্গে নিলাম, মৃত্যুর পরে যেন তোমাকে পাই।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে হতাশ হয়ে ওরা যখন শেষপর্যন্ত ঘরে ঢুকলো তখন দু'জনের দেহ-ই সমান ঠাণ্ডা। দারোগা একটু হতাশা, একটু বেঁচে-যাওয়া কণ্ঠে বলেন, বড় দেরি করে ফেলেছি। আর, সেই কথাই ভাঙ্গাকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে, বড় দেরি করে ফেলেছি। ও জেনে গেল না যে মানুষ অন্যায় করে, অনুতাপ করে, প্রায়শ্চিত্ত করে—তাই পৃথিবী আজও সবুজ।

সমাপ্ত

বিজ্ঞান বার্তা
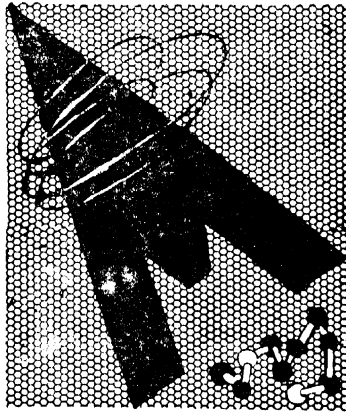
শরীর সুস্থ রাখতে হলে খাদ্য, জল ও বাতাসের মত বিশ্রামও যে আবশ্যক, তা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা খুব বেশি হয় নি। রোগ চিকিৎসায় নানা ঔষধের আবিষ্কার ও ব্যবহার দ্রুতগতিতে চলেছে, একই রোগে বিভিন্ন ঔষধ ও উদ্ভাবিত হয়েছে, কিন্তু বিশ্রামের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় এমন কিছুই এ পর্যন্ত জানা যায় নি।

জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রত্যেক প্রাণীর যে পরিমাণ অঙ্গ-সঞ্চালন অপরিহার্য, তা বজায় রাখার জন্য শক্তি খাদ্যবস্তুর জটিল উপাদানগুলিকে সরলবস্তুতে বিশ্লিষ্ট করেই পাওয়া যায়। এইভাবে

ব্যবহৃত শক্তিকে ফিরে পাওয়ার জন্য আবার কতকগুলি সংশ্লেষমূলক কার্যও সঙ্গে সঙ্গে চলা দরকার। শ্রমের সময় যেমন প্রথম প্রক্রিয়া চলে (বিশ্লেষণ), বিশ্রামের সময় তেমনি দ্বিতীয়টি (সংশ্লেষ) চলে। এইজন্য রোগীকে উপযুক্ত বিশ্রাম দেওয়া চিকিৎসার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

বিশ্রামের মাত্রা ঠিকভাবে মাপজোক করা কঠিন ব্যাপার। কোন রোগী বিছানায় শুয়ে থাকলেও তার শরীরের অংশবিশেষে বা সর্বাংশেই কিছু কিছু নড়াচড়ার কাজ চলতে পারে। ডাক্তার বা নার্স হয়ত দেখেন যে, রোগী বার বার পাশ ফিরছে, হাত-পায়ের কোন অংশ বার-বার নাড়ছে, অথবা তার শ্বাস-প্রশ্বাস শান্তভাবে হচ্ছে না। কিংবা তার মুখের ভাবভঙ্গী ক্রমাগত বদল হচ্ছে, কপালের চামড়া কোঁচকাচ্ছে, দৃষ্টিতে রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে, বা চোখের পাতার গতি নিয়মিত মৃদুভাবে ঘটছে না। এই সব দেখেই বোঝা যায় যে, রোগীর বিশ্রাম উপযুক্তভাবে হচ্ছে না। অন্যপক্ষে রোগীর মানসিক চাঞ্চল্য থাকলে তা চোখে দেখা না গেলেও উপযুক্ত যন্ত্রে ধরা যায়।

মাংসপেশীর সংকোচের সময় তাদের দৈর্ঘ্য কমে ও প্রসারণের সময় তা বাড়ে। মাংসপেশীর এই সঙ্কোচপ্রসারের উপরেই শরীরের যাবতীয় নড়াচড়া নির্ভর করে। এই ঘটনা প্রকাশ্যভাবেই দেখা যায়। আবার কোন কোনটি গোপনে বা চোখের আড়ালে ঘটে; যেমন হৃৎপিণ্ডের, ফুসফুসের, পাকস্থলীর অন্ত্রনালীর ও মূত্রাশয়ের নিয়মিত বা অনিয়মিত গতি। আবার মনের ভাবের তারতম্যের সময় মুখের বা হাত-পায়ের ভঙ্গীর পরিবর্তন অনেক সময় এমন সূক্ষ্মভাবে ঘটে যে, ভাল করে নজর না করলে তা বোঝা যায় না। উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে এই গোপন সঙ্কোচপ্রসার লক্ষ্য করা ও মাপা যায়। সঙ্কোচন মৃদু অথচ দীর্ঘস্থায়ী হলে তাকে স্থায়ী-সঙ্কোচ hypertonia বলে। কোন কোন রোগে এই স্থায়ী সঙ্কোচ অবস্থা একই ভাবে বহুকাল চলতে পারে। অন্য কোন কোন রোগে মাঝে মাঝে আসতে পারে। রক্তের চাপবৃদ্ধি (essential hypertension) রোগে বা থাইরয়েড গ্রন্থিবৃদ্ধি রোগে এই রকম দেখা যায়। কোন কোন অজীর্ণ রোগে এবং স্নায়ুর অস্থিরতা রোগেও (nervousness) এই রকম লক্ষণ দেখা যায়।

বৃহদন্ত্রের আক্ষেপ-প্রবণতা, বৃহদন্ত্রের আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কোন কোন ধরণের উদরাময়ে এই অতি সঙ্কোচপ্রবণতা অন্ত্রনালীর পেশীতন্ত্রে সারাদিনই থাকে। আবার খাদ্যনালী, পাকস্থলী এবং বৃহদন্ত্রের অবসাদেও এই রকম দেখা যায়।

Essential hypertension নামক রক্তের চাপবৃদ্ধি রোগে ধমনীর ক্ষুদ্রতর শাখাগুলির পেশীতে এই অতি সঙ্কোচ অবস্থা ধীরে ধীরে জন্মে ও বাড়ে। রোগের প্রথম অবস্থায় দৈহিক মাংসপেশীর skeletal muscle tonicity সঙ্কোচের ফলেই অস্থায়ী চাপবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়। মানসিক শান্ত অবস্থায় রোগীর রক্তচাপ স্বাভাবিকই থাকে।

মাংসপেশীর পূর্ণ প্রসারণ বা বিশ্রাম অবস্থা তখনই হয় যখন পেশীর কোন সঙ্কোচই থাকে না। এই অবস্থা কারুর কারুর পক্ষে বিশ্রামের সময় স্বাভাবিকভাবেই আসে। কারুর আবার অভ্যাসের ফলে বা চেষ্টার ফলে এই অবস্থা আনতে হয়। আবার শরীরের বিশ্রামকে মনের বিশ্রাম থেকে তফাৎ করা যায় না, কারণ সজ্ঞান অবস্থার সকল কাজই মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের জ্ঞাতসারে হয় এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যাকে আমরা মানসিক শ্রম বলি, তাতেও শরীরের কাজ একেবারে বন্ধ হয় না। আমাদের দৃশ্যমান প্রতিটি আচরণের সময় মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের ও বহুসংখ্যক মাংসপেশীর কাজ পরস্পর-সাপেক্ষভাবে ও সহযোগে ঘটে।

এই জন্য মাংসপেশীকে পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হলে মনের বা মস্তিষ্কের বিশ্রামও আবশ্যক। কল্পনা বা গভীর চিন্তা, আবেগ বা অন্যসকল মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে সূক্ষ্ম শারীরিক ক্রিয়া সর্বদাই জড়িত থাকে। শরীরের কোন অংশে মাংসপেশীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম সম্ভব হ'লে সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশের নিয়ামক মস্তিষ্কের অংশগুলিও বিশ্রাম পায়। অর্থাৎ

পেশীর বিশ্রামে মনেরও বিশ্রাম ঘটে। শারীরিক এবং মানসিক রোগের চিকিৎসায় এই জ্ঞানটি কাজে লাগালে অনেক সুফল পাওয়া যায়।

Weir Mitchell বিশ্রাম চিকিৎসা নাম দিয়ে যে ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন তাতে খাদ্যের উপরেই বেশি ঝোঁক দেওয়া হ'ত। রোগীকে, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি প্রচুর খেতে দিয়ে তাকে অধিকাংশ সময় শুয়ে থাকতে বলা হ'ত। বলা বাহুল্য, যাদের শরীরের ওজন কোন কারণে কম, এই ব্যবস্থায় তাদের সহজেই ওজনবৃদ্ধি হ'ত। কোন কোন ক্ষেত্রে আরামবোধও কিছু বাড়ত। মিচেল কিন্তু ঠিক উপলব্ধি করেন নি যে, যে রোগীর মানসিক অশান্তি বা অস্থিরতাই প্রধান লক্ষণ, মাংসপেশীর হাইপারটোনিয়াই তার শীর্ণতার কারণ, কিছুদিন ভাল খেলে ও শুয়ে থাকলে এদের ওজন কিছু বাড়লেও, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তি ওজন কমে যায়। অপরপক্ষে এসব রোগীকে প্রকৃত বিশ্রামের কৌশল শিখিয়ে দিলে শুধু মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে না, খাদ্যের পরিমাণ না বাড়ালেও ওজন বেড়ে যায়। এর জন্য কিন্তু সারাদিন শুয়ে থাকার দরকার হয় না, রোগী সাধারণ কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে।

ওজন বাড়াতে হ'লে শয়ন বা নিদ্রার সময় মাংসপেশী ও মনের পূর্ণ বিশ্রামের দিকে নজর দেওয়া দরকার। এই অবস্থা তখনই পূর্ণভাবে ঘটে, যখন (১) metabolic rate বা খাদ্যবস্তুর রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার কম থাকে; (২) যখন knee jerk বা অন্যান্য শারীরিক reflex গুলির তীব্রতা কমে যায়; (৩) যখন রোগী বিভিন্ন অঙ্গের দিক থেকে এবং সর্বাঙ্গের দিক থেকে শান্ততর অবস্থায় থাকে; যখন (৪) মনের বিভিন্ন কাজগুলির (চিন্তা, কল্পনা, বিচার ইত্যাদি) তীব্রতা বা উগ্রতা অনেকটা কমে যায়।

সর্বশরীরের এই পূর্ণ বিশ্রামের সময় খাদ্যের চাহিদা কিছু পরিমাণে কম হয়। কিন্তু শুধু সে জন্যই যে উপকার বেশি হয়, তা নয়। সকলেই জানেন যে, বিছানায় শুয়ে থাকলেও যদি অনিদ্রায় রাত কাটে, তা হ'লে সকালে স্বাভাবিক ঘুমের পর যে স্বাচ্ছন্দ্য, ক্লান্তি ও গ্লানিহীনতা বোধ হওয়া উচিত, তা মোটেই হয় না। বরং রোগী সকালে নিজেকে ক্লান্ত ও দুর্বল বোধ করে। অপরপক্ষে একঘণ্টা মাত্র উপযুক্তভাবে মাংসপেশীকে বিশ্রাম দিতে পারলে রোগী মনে করে যে, তার যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। যদিও সে একটুও ঘুমায় নি। সুতরাং ঘুমের যে কোনও নিজস্ব অদ্ভুত গুণ আছে, তা মনে হয় না। মনের অশান্তি বা অস্থিরতার ভাব রোগী চিকিৎসকের সহযোগিতায় যে পরিমাণে সংযত করতে পারে, তার শরীর-মনের বিশ্রাম এবং স্বচ্ছন্দতা সেই পরিমাণে বাড়ে। কিছুকালের জন্যও সম্পূর্ণভাবে সংযত করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে সিস্টোল ডায়াস্টোলের রক্তচাপ কমে যায় এবং পাকস্থলী, অন্ত্রনালী ও অন্য আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলির নড়াচড়া ততই স্বাভাবিক ও নিয়মিতভাবে চলতে থাকে। চোখের এবং স্বরযন্ত্রের বিভিন্ন পেশীগুলির গতি মনের বিভিন্ন কার্যকলাপের দ্বারা (যেমন চিন্তা, আবেগ, উদ্বেগ ইত্যাদি) বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। মনের পূর্ণ বিশ্রামে এদের বিশ্রামও পূর্ণমাত্রায় ঘটে এবং এই কারণে এই বিশ্রামের উপকারিতাও বেশি।

মাংসপেশীর উপযুক্ত বিশ্রামের জন্য নানা কৌশলের উদ্ভাবন হয়েছে। আবার উপযুক্ত পথ্য, শান্তকর ভেষজ এবং মানসিক চিকিৎসার দ্বারা মনকে শান্ত করার উপায়ও এখন জানা গেছে। তবে ঔষধ ইত্যাদির উপর নির্ভর না করে রোগী যদি নিজের শরীর ও মনকে সংযত করার কৌশলগুলি শিখে নেন, তা হলেই সবচেয়ে ভাল ফল হয়।

স্থানীয় বিশ্রাম :—শরীরের কোন অংশে আঘাত ঘটলে সেই অংশকে বিশ্রাম দেওয়ার বিশেষ দরকার হয়। শিশু-পক্ষাঘাত এবং কোন কোন বাতরোগে এর আবশ্যকতা সবচেয়ে বেশি হয়। আবার পড়ে গিয়ে হাতের কব্জির উপরের অংশ ভেঙে গিয়ে যে colles' fracture প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, তাতে কাঠের 'বাড়' ও প্লাস্টার দিয়ে অংশটির নড়াচড়া একেবারে বন্ধ করাই চিকিৎসার গোড়ার কথা। যক্ষ্মারোগে ফুসফুসে ছিদ্র হয়ে গেলেও বুকে প্লাস্টার করা অত্যাবশ্যক হয়। চোখের কোন কোন রোগে চোখের নড়াচড়া বন্ধ করার জন্য ব্যাণ্ডেজ দেওয়া হয়। আবার কোকেন প্রয়োগ করেও চোখকে বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব। কাঠের নানারকম ফ্রেম 'বাড়' নানারকম স্ক্রু, বা পেরেক এবং কপিকলে ঝোলান ওজনের সাহায্যেও শরীরের আহত অংশকে অচল করে রাখা যায়।

এই স্থানীয় বিশ্রামের ব্যবস্থার আর একটি কারণ হচ্ছে বেদনা কমান। পশু-পক্ষীরাও কোনভাবে জখম হ'লে বিশ্রামের দ্বারাই শরীরকে সুস্থ করে। কোন কোন পাখির ডানায় চোট পেলে ঠোঁটের সাহায্যে পালকগুলি সমেত ডানাটাকে মেলে দিয়ে জলের কাছে গিয়ে বিশ্রাম করে। পিপাসা দূর করার জন্য গলা বাড়িয়ে জল খাওয়া ছাড়া অন্য কোন নড়াচড়া করে না।

সাধারণ ব্যবস্থায় আহতস্থানের নড়াচড়া একেবারে বন্ধ করা যায় না। অন্য অঙ্গের নড়াচড়ার সময় আহত অঙ্গের পেশীগুলিরও সঙ্কোচ চলতে পারে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বেদনাবোধই সেই কাজ থেকে বিরত হতে বাধ্য করে। পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হ'লে আহত অঙ্গের প্রভাবক স্নায়ুগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা দরকার। এই কাজ উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বা অবসাদক ঔষধের সাহায্যে ঘটান যায়।

শরীরের প্রায় প্রত্যেক অঙ্গের নড়াচড়া দুই দল বিপরীতধর্মী মাংসপেশীর ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। সাধারণত একদলের ক্রিয়া কিছু বেশি জোরাল হয়। আঘাতের পর এই জোরাল পেশীদলের স্থায়ী সঙ্কোচে অঙ্গটি একদিকে অচল হয়ে পড়ে। তাতে বেদনা কম বোধ হয়। তবে এই স্থায়ী সঙ্কোচ অবস্থা অস্বাভাবিক। সুতরাং 'বাড়' বা প্লাস্টারের বা প্লাস্টিকের সাহায্য নেওয়া খুবই দরকার। এই ব্যবস্থা করলে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর ভয়, উদ্বেগ ও বেদনা অনেকটা কম পড়ে। তবে এই কাজটি এমন সুচারুভাবে হওয়া চাই, যেন আহত অঙ্গের পেশীদলকে কোন অস্বাভাবিক অবস্থানে থাকতে না হয়। তুলা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করেই অনেক ছোটখাট আঘাতে অঙ্গটিকে বিশ্রাম দেওয়া যায়। এতে যথেষ্ট না হলে মোটা কাপড় দিয়ে বারবার জড়িয়ে দেওয়ার পর শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ করা হয়। গ্রন্থির আঘাতে এই উপায়েই কাজ হয়। হাড় ভাঙলে বা বাতরোগে বালিশের

মত নরম পুরু জিনিসের উপরে অঙ্গটি রাখলে আরাম হতে পারে। পাতলা ভাবে প্লাস্টার করেও এই কাজ করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার স্নায়ুগুচ্ছকে ঔষধের সাহায্যে অবশ করলে ফল বেশি পাওয়া যায়। হাড় ভাঙলে ভাঙার উপর থেকে নীচে পর্যন্ত প্লাস্টার করা দরকার। হাঁটু ভাঙলে প্রায় সমস্ত পা-টা এই রকম করতে হয়। প্লাস্টারের আগে ভাঙা হাড়ের দুই অংশ যাতে ঠিকভাবে এক লাইনে 'বসে' তা দেখা বিশেষ দরকার। তা হলে একটি আর একটির উপরে বা নীচে পড়ে না এবং দুই অংশ সহজে জোড়া লাগে। আর্থাইটিস বাতের তরুণ অবস্থায় বেদনাযুক্ত ও ফুলা অংশকে বিশ্রাম দেওয়া খুবই দরকার। না হলে অনেক সময় পেশীগুলির অনিয়মিত স্থায়ী সংকোচে অঙ্গটি বেঁকে যায় ও কিছুদিন পরে এই বাঁকা ভাব যোজক তন্তুর অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে স্থায়ী হয়ে ওঠে। পরে আর সংশোধন করা যায় না। এজন্যে প্লাস্টারের সাহায্যে অঙ্গটির নড়াচড়া কিছুদিনের জন্যে একেবারে বন্ধ করতে হয়। হাঁটুর রোগেই এই সাবধানের আবশ্যক সবচেয়ে বেশি এবং পায়ের গুল্‌ফ থেকে কুচকির কাছ পর্যন্ত অংশের নড়াচড়া বন্ধ করা দরকার হতে পারে। প্লাস্টারের ফলে স্থায়ী ক্ষতি হ'তে দেখা যায় না। তবে দুই দিনের পরে প্লাস্টার খুলে অঙ্গটি নড়াচড়া করতে দেওয়া হয়। হাতের আঙুলের বাতের জন্য দীর্ঘকাল প্লাস্টারের সাহায্যে বিশ্রাম দেওয়া দরকার।

আহত বা আক্রান্ত অঙ্গের উপযুক্ত বিশ্রাম হ'লে মাংসপেশী, অস্থি বা গ্রন্থির তন্তুগুলি আপনা-আপনি ও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। তবে এই সব ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিশ্রামের আবশ্যকতাও কম নয়। ক্রোধ, উত্তেজনা, বিরক্তি ইত্যাদি থাকলে এই সব ব্যবস্থার পূর্ণ বিশ্রাম ঘটে না এবং রোগ নিরাময়ে বিলম্ব ঘটে। চিকিৎসকের সহযোগিতায় রোগীর মানসিক ক্লেশ, উদ্বেগ এবং গ্লানি অনেকাংশে দূর হতে পারে।

অকালে জাত-শিশুদের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা

এঞ্জেলিকা ডিক

যে সব শিশু অকালে জন্মায়, আগেকার কালে যাদের বেশির ভাগ মারা যেত, আজকাল তাদের অনেকে বেঁচে যায় স্রেফ উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার কৃপায়। মিউনিখে এই রকম অকালে জাত-শিশুদের জন্য শোয়াবিঙ হাসপাতালে একটি কেন্দ্র আছে। এখানে শিশুদের কাচের বাক্সের মত ইনকিউবেটরে সমান তাপে রেখে দেওয়া হয়। ঐ ইনকিউবেটরের কাচের বাক্সে দু'টি প্রায় বায়ুরুদ্ধ পথ থাকে যার মধ্যে দিয়ে অকালে জাত-শিশুদের অনবরত ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হয় যতদিন না সে নিজে খেতে শেখে। এইরকম ইনকিউবেটর সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত। চিকিৎসকরা যখন মনে করেন যে শিশু যথেষ্ট শক্তিসঞ্চার করেছে, একমাত্র তখনই তাকে ইনকিউবেটর থেকে বার করে আনা হয়।

কেন্দ্রের প্রধান চিকিৎসকের মতে অকালে জাত-শিশুদের যত শীঘ্র কেন্দ্রে পাঠানো হবে, ততই তাদের বাঁচার আশা বেশি। এর জন্য কেন্দ্রের নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স আছে যাতে পোর্টেবল ইনকিউবেটর ও সুশিক্ষিত চিকিৎসক থাকে। খবর দিলেই অ্যাম্বুলেন্স গিয়ে শিশুদের কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

মিউনিখের হাসপাতালে অকালে জাত-শিশুদের জন্যে কুড়িটি ঘরে চল্লিশটি শিশু রাখার ব্যবস্থা আছে। শিশুদের তদারক করার জন্য বহু নার্স আছে। এইসব নার্সরা যখন ডিউটিতে যায় তখন তাদের প্রত্যেককে নিরাবরণ হয়ে গা-হাত-পা ধুতে হয় এবং অতি বেগুনী রশ্মির সাহায্যে তাদের জীবাণুমুক্ত করা হয়। তারপর তারা জীবাণুমুক্ত পোষাক গায়ে দিয়ে মুখে মুখোস পরে ওয়ার্ডে প্রবেশ করে। ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি ঘর সম্পূর্ণ শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেকটি ঘরের টেবিলে অক্সিজেন ও অতিরিক্ত তাপ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। ঐ টেবিলের ওপর শিশুদের পোষাক বদলান হয়। প্রত্যেকটি ঘরে এমন যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে যার ফলে কোন রোগ-জীবাণু ঘরগুলিতে প্রবেশ করতে পারে না। মলমূত্র ত্যাগ করলে শিশুর কাপড় ইত্যাদি ইনকিউবেটরের একটি বিশেষ পথ দিয়ে এসে কাচার জন্যে একটি থলিতে জমা হয়।

প্রত্যেক দিন মা-বাবারা তাঁদের অকালে জাত-শিশুদের দেখবার জন্যে হাসপাতালে ভিড় করেন। একটি জানালার সামনে এনে দু'ফুট দূর থেকে শিশুদের তাঁদেরকে দেখানো হয়।

—ডি এ ডি।

রাত্রি অনেক

কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী

এখন রাত্রি অনেক, মালবিকা, বাইরে যেও না তুমি;
বাইরের অন্ধকার—ঘনকালো অন্ধকার স্তর,
তার চেয়ে কাছে বসে দুই চোখে চোখ দু'টি রেখে
হাতে হাত ছুঁয়ে থাকো;—রাত্রি শোনাবে কাহিনী।

মনে পড়ে সেইদিন ক্লান্ত পায়ে পথে যেতে যেতে
প্রথম আলাপ হ'ল তোমাতে-আমাতে
তারপর কতদিন চলে গেছে ভেবে,

আজকে যখন এলে সলাজ চরণে
তখনো বুঝি নি আমি,—বুঝি নি তখনো
ঘাসের ফুলের ঘ্রাণে,—শাড়ির আঁচলে,
নিরুক্ত আমার পাশে কখন দাঁড়ালে।

ফড়িং

আন্তন শেখভ্

অলগা আইভানোভ্‌নার আজ বিয়ে। পরিচিত বন্ধু ও বান্ধবীরা সকলেই এসেছে ওর বিয়েতে।

স্বামীকে দেখিয়ে বান্ধবীদের লক্ষ্য করে অলগা বলে, 'দেখ্, দেখ্, চেয়ে দেখ্, কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওনাকে!'

চমক লাগার মতো এমন কিছু নেই ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে। তবুও অলগা কথাগুলো বলে, বোঝাতে চায় কেন ও একজন সাধারণ লোককে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।

অলগার স্বামীর নাম স্টেপানোভিচ্ ডিমভ্। ডিমভ্ নামেই কাউন্সিলার, আসলে সে একজন ডাক্তার। দু'টো হাসপাতালে ওকে যেতে হয়, একটাতে অস্থায়িভাবে কাজ করে।

সকালে ন'টা থেকে দুপুর পর্যন্ত তার ওয়ার্ডের এবং বাইরের যে-সব রুগী আসে তাদের দেখাশোনা করতে হয়। বিকেলে ট্রামে করে অন্য হাসপাতালে যেতে হয়।

সারা বছরের আয় খুবই অল্প। এইটুকু বললেই ভদ্রলোকের সম্বন্ধে সবই বলা হয়—বেশি কিছু বলার বাকি থাকে না।

এদিকে অলগা এবং তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা ডিমভের মতো অতো সাধারণ নয়, প্রত্যেকেরই একটা না-একটা বিষয়ে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। একেবারেই অখ্যাত কেউ নয়। পুরোপুরি নাম করতে না পারলেও কিছুটা নাম কিনতে আরম্ভ করেছে, ভবিষ্যতে হয় তো আরো নাম করতে পারবে।

ওদের মধ্যে একজন অভিনেতা। এরই মধ্যে অভিনয়ে বেশ কিছুটা নাম করেছে। সুন্দর, সুপুরুষ, চালাক-চতুর, লোকটা আবৃত্তি করতেও জানে। কি ভাবে বক্তৃতা দিতে হয় অলগাকে তাই শেখায়।

একজন গায়ক। মোটা আমুদে লোকটা প্রায়ই দুঃখ করে বলে,—অলগা নিজেকে নষ্ট করছে। অলগা যদি কুড়ে না হ'তো, অলগা যদি একটু মন দিয়ে খাটতো, একদিন না একদিন সে নামকরা গায়িকা হ'তে পারতো। এ ছাড়া কয়েকজন শিল্পীও ছিল ওদের দলে। তাদের মধ্যে রিয়াবভ্‌স্কী নাম করা।

পঁচিশ বছরের অপরূপ সুন্দর যুবক রিয়াবভ্‌স্কীর ছবি প্রদর্শনীতে হৈ-চৈ পড়ে গেছে—শেষ ছবিটায় সে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পেয়েছে। অলগার আঁকা ছবিগুলোতে তুলির টান দিতে দিতে ও বলে, 'চিত্রশিল্পে অলগা নতুন কিছু দিতে পারবে।'

অপরজন বেহালা বাজায়। বেহালার সুরে কান্না ঝরে পড়ে! সে স্পষ্টই বলে—'যে সব মহিলাদের আমি জানি, তাদের মধ্যে একমাত্র অলগাই তার সমকক্ষ।'

একজন লেখকও আছে দলের মধ্যে। ছোট ছোট উপন্যাস, গল্প ও নাটক লিখে ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা নাম করেছে। আর বাকি রইলো কে? ওহো, ভ্যাসিলি ভ্যাসিলিভিচের কথা বলাই হয় নি। ভদ্রলোক জমিদার, বিনা পয়সায় বই-এর মলাটে ছবি এঁকে দেন। দেশীয় কৃষ্টি ও পৌরাণিক মহাকাব্যের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক টান। অসুখে না পড়লে এই সব শিল্পী, উদারনৈতিক ভাগ্যবান ধনী ভদ্রলোকদের ডাক্তারদের কথা মনেই পড়ে না।

ডিমভ্‌কে এরা সাধারণ লোক মনে করে—যেমন মনে করে আর পাঁচজনকে—বেনিয়ানের মতো একগাল দাড়ি, গায়ে একটা বেমানান কোট, ডিমভ্‌কে ওদের প্রয়োজনই হয় না। অবশ্য ডিমভ্ যদি লেখক হ'তো কিংবা হ'তে পারতো একজন শিল্পী, তা হ'লে সকলে বলতো, 'ডিমভ্‌কে ঠিক জোলার মতো দেখতে।'

অভিনেতা অলগাকে বলে, 'এই বিয়ের সাজে তোমাকে ঠিক সাদা ফুলে ঢাকা একটা লাল গাছ মনে হচ্ছে।'

অভিনেতার হাতটা ধরে অলগা বলে, 'না, না, শোন। ঘটনাটা কি ভাবে ঘটলো তাই বলি,—বাবা আর ডিমভ্ একই হাসপাতালের

ডাক্তার। বাবা অসুখে পড়লে ডিমভ্ নিঃস্বার্থভাবে দিন-রাত তাঁর সেবা করতো। রিয়াবভ্স্কা শোন, ওহে তোমরাও সকলে শোন। ও কি হচ্ছে, আরো কাছে এগিয়ে এসো। রাতে আমার ঘুম হ'তো না, বাবার পাশে চুপ করে বসে থাকতাম। একদিন বুঝতে পারলাম যে ডিমভ আমাকে ভালোবাসে, আমি ডিমভের মন জয় করতে পেরেছি। কি অদ্ভুত ভাগ্যের খেলা! তাই না?

বাবা মারা গেলেন। ডিমভ্ কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আসতো। কখনো কখনো বাইরেও আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ চলতো। একদিন সে আমাকে সব কথা বলে। সারারাত কেঁদে কাটালাম, বুঝতে পারলাম আমিও ডিমভ্‌কে ভালোবাসি। আজ আমার বিয়ে হ'লো।

পাশ ফিরে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে ডিমভ। মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। এদিকে মুখ ফেরালে অলগা বলে, 'তোমারই কথা হচ্ছে। কাছে সরে এসো। রিয়াবভ্স্কীকে দেখিয়ে বলে এর হাতে হাত মেলাও...। থাক্, থাক্, হ'য়েছে। আজ থেকে তোমরা দু'জনে বন্ধু হলে, কেমন?'

মুচকি হেসে ডিমভ্ বলে, 'খুব খুশি হলাম। রিয়াবভ্স্কী নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে পড়তেন। বোধ করি তিনি আপনার কোন আত্মীয় নন।'

২

অলগার বয়স বাইশ, ডিমভের একত্রিশ।

বিয়ের পর ওদের দিনগুলো সুখেই কাটে। বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে অলগা বাঁধানো ছবি ও ফটোগুলো বসবার ঘরে সাজায়। বড়ো পিয়ানো ও ঘরের আসবাবপত্রগুলোর চারপাশে ছোট ছোট চীনা ছাতা ও রঙিন টুকরো কাপড় দিয়ে সাজায়। রান্নাঘরের দেয়ালে টাঙায় সস্তাদরের আঁকা ছবি। ঘরের কোণে জড়ো করে রাখে বিদ্ ও কাস্তেগুলো। সিলিং এবং দেয়ালে কালো কাপড় দিয়ে ঢাকে, ঘরটাকে করে তোলে একটা গুহাবিশেষ। বিছানার ওপর ঝোলানো 'ভেনিটিয়ান' আলো, দরজার সামনে দাঁড়-করানো মূর্তির হাতে টাঙি। যে-ই দেখে সে-ই বলে—খাসা বাসা তৈরি করেছে ওরা।

রোজ এগারোটার সময় অলগা ঘুম থেকে ওঠে। কিছু পরেই পিয়ানো বাজাতে বসে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ছবি আঁকে। বারোটার কিছু পরে মেয়েদর্জির কাছে যায়।

স্বামী ও স্ত্রীর আয় খুবই কম। কেবলমাত্র দরকারী জিনিসটুকু কেনা চলে। অলগার নতুন পোষাক দরকার হ'লে দর্জি ও অলগাকে নানাপ্রকার ফন্দী-ফিকির করতে হয়। আর তার জন্যে বারবার অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। পুরনো রঙিন ফ্রকটাই নানা রঙ-এর টুকরো টুকরো জরি ও ফিতে দিয়ে সেলাই করে দেয়, ফলে সেটা জামা না হ'য়ে কিম্ভূতকিমাকার একটা বস্তুবিশেষ হ'য়ে দাঁড়ায়।

দর্জির কাছ থেকে যায় এক বান্ধবী অভিনেত্রীর কাছে। প্রথম রজনীর কিংবা কোন 'চ্যারিটি' শোয়ের টিকিট জোগাড়ের চেষ্টা করে। ওখানকার কাজ সেরে হ'য় স্টুডিওতে যায়, নয় তো কোন সিনেমা হলে ঢোকে। পরে কোন এক নামজাদা বন্ধুকে নিজের বাড়িতে আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করে আসে।

সকলেই অলগাকে পছন্দ করে, ওর সুখ্যাতি করে। সকলেই বলে অলগা ভালো, অলগা সুন্দরী, অলগা অসাধারণ,...। নামকরা যারা তারা সকলেই অলগাকে নিজেদের সমকক্ষ বলে মনে করে এবং সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে যে, যদি অলগা নিজেকে এ-ভাবে নষ্ট না করে, তা হ'লে একসময় সে-ও নাম করতে পারবে।

অলগা গান করে, পিয়ানো বাজায়, ছবি আঁকে, মাটির মূর্তি গড়ে, সখের দলে অভিনয় করে। যা-কিছু সে করুক না কেন সবকিছুই সে নিখুঁৎভাবে করে। নামকরা বন্ধুদের এবং পরিচিত লোকদের সঙ্গে সহজ মেলামেশার মধ্যে তার যে-রকম দক্ষতা ফুটে বেরোয় অন্য কোন কিছুতেই তেমন ফোটে না। কোন লোকের মধ্যে নতুন কিছু দেখলেই অলগা তার সঙ্গে পরিচয় ক'রে বন্ধুত্ব পাতায় এবং নিজের বাড়িতে আসবার জন্যে অনুরোধ করে।

যেদিন কোন নতুন লোকের সঙ্গে অলগার পরিচয় হয়, সেদিনটা ওর কাছে সত্যিই মধুর বলে মনে হয়। নামকরা লোকদের ও শ্রদ্ধা করে, তাদের নিয়ে ও গর্ব করে, রাতে তাদের স্বপ্ন দেখে। নামকরা লোকদের সঙ্গে পরিচিত হতে ব্যগ্র, সে ব্যগ্রতা অলগা মন থেকে দূর করতে পারে না।

পুরনো বন্ধুদের ভুলে যায়, নতুন বন্ধুদের নিয়ে উঠে-পড়ে লাগে। কিছুদিন পর তাদেরও ভালো লাগে না। তাদের সঙ্গ বিরক্তিকর বলে মনে হয়। নতুন বন্ধুদের জন্যে সে ঘুরে বেড়ায়, তাদের দেখা মিললে অন্যদের খোঁজ করে। কেন, অলগা এ-রকম করে কেন?

চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে সে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসে। ডিমভের সহজ-সরল রসিকতায় আনন্দে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে অলগা।

অলগা স্বামীকে বলে, 'দেখ, তুমি সবই জান, সবই বোঝ। কিন্তু তোমার মস্তবড়ো দোষ যে 'আর্টের' দিকে তোমার কোন উৎসাহ দেখি না! ছবি আঁকা বা গান-বাজনা নিয়ে তো মাথাই ঘামাও না, কেন বল তো?'

ডিমভ্ বলে, 'ও-সব আমার মাথায় ঢোকে না। জীবনভোর শুধু বই আর ওষুধপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। ও-সব ব্যাপারে মন দেবার ফুরসোৎ হ'লো কই?'

'আমাদের আলোচনায় যোগ না দেওয়াটা খুব খারাপ দেখায়।'

'কেন? তোমার বন্ধুরা তো বই বা ওষুধপত্র নিয়ে কোন আলোচনা করে না। কই, তুমি তো তাদের দোষ ধরো না? যে যার নিজেরটা নিয়েই আছে। তা ছাড়া ছবি ও সিনেমার বিষয় আমি কিছু জানি না বা বুঝি না। একদল লোক জীবনভোর এই নিয়ে মেতে থাকে আর অন্য একদল লোক এ সবের পেছনে অজস্র টাকা খরচ করে—দু'দলেরই প্রয়োজন। সত্যি কথা, আমি ও-সব বুঝতে পারি না। তাই বলে আমি ও-গুলোকে হেয়জ্ঞান করি না।'

খাওয়া সেরে অলগা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরোয়। পরে থিয়েটার বা অর্কেষ্ট্রা পার্টিতে যায়। কোনদিনই রাত দুপুরের আগে ফেরে না।

বুধবার অলগা কোথাও বেরোয় না। কেন না বুধবার সন্ধ্যার সময় সকলে ওর বাড়িতে আসে। নিজেদের মধ্যে 'আর্টের' আলোচনা চলে।

নামকরা অভিনেতা আবৃত্তি করে, গাইয়ে গান গায়, কেউ বা অলগার 'আলবামে' ছবি এঁকে দেয়। বীণাবাদক বীণা বাজায়। অলগা গান করে, নাচ দেখিয়ে ওদের আনন্দদান করে। আবৃত্তি, অভিনয় ও গানের মধ্যে বিরামের সময়টুকু চলে সাহিত্য, অভিনয় বা শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা।

বান্ধবী কাউকে দেখা যায় না। কারণ, অভিনেত্রী আর ঐ মেয়েদর্জি ছাড়া সমস্ত মেয়ে-জাতটাকেই অলগা তুচ্ছ ও হেয়জ্ঞান করে। প্রত্যেক বুধবারে একজন না একজন নতুন অতিথি আসে।

ওদের এই আসরে ডিমভকে দেখা যায় না। কেউ ওর জন্যে ভাবেও না। ঠিক সাড়ে এগারোটার পর রান্নাঘরের দরজা খুলে যায়, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডিমভ অভ্যর্থনা করে—খাবার দিয়েছে, আপনারা আসুন। ডিমভের মুখে হাসি লেগে আছে।

সকলে খাবারঘরে চলে আসে। ডিসে করে খাবার দেওয়া হ'য়েছে—সেই একই রকমের খাবার চিরকাল চলে আসছে।

খেতে খেতে ওরা ডিমভের দিকে তাকিয়ে দেখে। ঐ পর্যন্ত, পরক্ষণেই আর তার কথা মনে থাকে না। আলোচনার মধ্যে সকলে ডুবে যায়।

বিয়ের পর প্রথম ছ'টো সপ্তাহ ওদের বেশ ভালোভাবে কাটে। তৃতীয় সপ্তাহ কিন্তু ভালোভাবে কাটে না। চর্মরোগে আক্রান্ত হ'য়ে ডিমভকে ছ'দিন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়।

সুন্দর কালো চুল কেটে ছোট করে দেওয়া হ'য়েছে। অলগা স্বামীর পাশে বসে কাঁদে। একটু ভালো হ'লে ডিমভের মাথায় একটা সাদা রুমাল বেঁধে দেয়, যাযাবরের মতো স্বামীকে সাজায়। স্বামী-স্ত্রী ছ'জনেই আনন্দবোধ করে। তিনদিন পর ডিমভ সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু নতুন করে আবার বিপদ দেখা দেয়।

একদিন খাবার সময় ডিমভ বলে, 'আমার সময়টা এখন ভালো যাচ্ছে না। আজ চারটে মড়া চেরাই করেছি! বাড়ি এসে দেখি ছ'টো আঙুল কেটে গেছে।'

অলগা ভয়ে শিউরে ওঠে। ডিমভ হেসে বলে, 'ও কিছু না, মড়া কাটতে গিয়ে ওরকম কতবার কেটেছে।'

কখন স্বামীর রক্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে এই চিন্তায় অলগা ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। ভালোয়-ভালোয় যাতে বিপদ কেটে যায় তার জন্যে রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে।

দিনকয়েক কেটে গেল, ডাক্তারের কোন ক্ষতি হলো না। ফিরে এলো সুখ ও স্বস্তিতে ভরা দিনগুলো। বর্তমান দিনগুলো হ'য়ে উঠলো আনন্দে ভরপুর। শীঘ্রই আসবে বসন্ত আনন্দের ডালি সাজিয়ে, তাদের জীবন বয়ে যাবে চিরসুখের মধ্যে দিয়ে। এপ্রিল, মে এবং জুন মাসের জন্যে রয়েছে গাঁয়ের ছোট্ট বাড়ি —সেখানে চলবে পায়ে হেঁটে বেড়ানো, চলবে ছবি আঁকা, চলবে মাছ ধরা আর চলবে পাখির মিষ্টি গান শোনা। জুলাই থেকে শরৎকাল পর্যন্ত চলবে শিল্পীদের ভল্‌গা অভিযান।

অলগা শিল্পিগোষ্ঠীর একজন স্থায়ী সদস্যা। তাই ঐ অভিযানে সে-ও অংশগ্রহণ করবে। এরই মধ্যে অলগা একজোড়া ভ্রমণের পোষাক তৈরি করিয়েছে—ভ্রমণের জন্যে সে কিনেছে রঙ, তুলি, ব্রাশ, ক্যানভাস্ ও নতুন একটা রঙদানি।

রিয়াবভ্স্কী প্রায়ই অলগার কাছে আসে দেখে যায় অলগার কি রকম ছবি আঁকা চলছে। অলগা নিজের আঁকা ছবিগুলো দেখায়। রিয়াবভ্স্কী ছবিগুলো দেখে বলে 'বাঃ!…মেঘগুলো যেন গর্জন করছে, সন্ধ্যেবেলার আলোটা ভালো ফুটে ওঠে নি…সামনের জমিটা জগাখিচুড়ি হ'য়েছে, ছবিটার মধ্যে কিসের যেন…আমি যা বলতে চাইছি বুঝতে পারছো?…ছবিটা সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে নি। কুঁড়েঘরটা মণ্ডপের মতো হ'য়ে উঠেছে…ঐ কোণটা আরো কালো হওয়া দরকার সব মিলিয়ে মন্দ হয় নি ছবিটা…সত্যিই খুশি হ'য়েছি।

৩

একদিন বিকেলে কিছু ফল ও মিষ্টি কিনে ডিমভ্ শহরের দিকে বেরিয়ে পড়ে। পনেরো দিন হ'লো স্ত্রী বেড়াতে গেছে, তাই স্ত্রীকে দেখতে যাচ্ছে। স্টেশন থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যে স্ত্রীর বাড়িটা খুঁজে বেড়ায়।

সূর্য তখন ডুবু ডুবু। এমন সময় ডিমভ্ ছোট্ট বাড়িটা দেখতে পায়। চাকর জানায় অলগা বাড়ি নেই, এখুনি ফিরবে।

সাদাসিধে ছোট্ট বাড়ি, খুব বেশি উঁচু নয়। দেয়ালের ওপর টুকরো টুকরো চিঠির কাগজ আঁটা, গর্তভর্তি এবড়ো-খেবড়ো মেঝে। বাড়ির মধ্যে মাত্র তিনটে ঘর। একটার মধ্যে বিছানা পাতা। পরেরটায় ক্যানভাস্, আঁকবার তুলি, ময়লা কাগজ, চেয়ারে ও জানলার ওপর পুরুষদের কোট ও টুপী। তৃতীয়টার মধ্যে তিনজন অচেনা লোক বসে আছে। ওদের মধ্যে দু'জনের গায়ের রঙ কালো, মুখে একগাল দাড়ি। অপরজনের দাড়ি কামানো, দোহারা শরীর, খুব সম্ভব একজন অভিনেতা। টেবিলের ওপর কেটলিতে জল ফুটছে।

ডিমভের দিকে চেয়ে লোকটা জিজ্ঞেস করে, 'কাকে চান? অলগাকে? ওরই সঙ্গে দেখা করতে চান? একটু বসুন, এখুনি সে এসে পড়বে।'

ডিমভ্ অলগার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় বসে থাকে। একজন দাড়িওয়ালা লোক ঘুম-ঘুম চোখে ডিমভের দিকে তাকিয়ে থাকে। কাপে চা ঢেলে লোকটা জিজ্ঞেস করে, 'এককাপ হবে নাকি?'

খিদে ও তেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ডিমভ্ বলে, 'না, আমি চা খাই না'।

একটু পরেই হাসির ও পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়ে অলগা ঘরে ঢোকে, হাতে একটা স্যুটকেশ। পেছনে ঢোকে রিয়াবভ্স্কী—হাতে বড় ছাতা ও মোড়া টুল একটা।

আনন্দে আটখানা হ'য়ে অলগা চীৎকার করে ওঠে, 'ডিমভ্! ডিমভ্ তুমি!' ডিমভের বুকের ওপর মাথা ও হাত দু'টো রেখে অলগা থেমে থেমে বলে, 'ডিমভ্…আমার ডিমভ, এতোদিন কেন আস নি? কেন?'

'কি করে আসি বলো? আমি সব সময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে যখন আমার অবসর মেলে, ওদিকে তখন আসবার গাড়ি জোটে না।'

'তোমাকে দেখে কি যে আনন্দ হ'চ্ছে, কেমন করে বলি সে-কথা। রাতের পর রাত তোমার স্বপ্ন দেখেছি, মনে মনে ভেবেছি হয় তো তোমার অসুখ করেছে। আমি যে তোমাকে কত ভালোবাসি! ভাগ্যিস্ তুমি এসে পড়েছো তা না হ'লে যে কি হ'তো, ভাবতেই পারছি না। এ বিপদের হাত থেকে তুমিই পারবে আমাকে বাঁচাতে।'

'কাল এখানে একটা বিয়ে আছে। স্টেশনের টেলিগ্রাফ্ অপারেটারের বিয়ে। ছেলেটা দেখতে শুনতে ভালো, চালাক-চতুরও বটে। আমরা কথা দিয়েছি যে সকলেই আমরা ওর বিয়েতে যাব। সে গরীব, তার বিয়েতে না-যাওয়াটা খুব খারাপ দেখাবে।'

'আমরা সোজা কনের বাড়িতে যাব। সেখানে আছে লতাবীথিকা, পাখির কাকলি, ঘাসের ওপর রোদের ঝিলিমিলি আর থাকব আমরা রঙ-বেরঙয়ের পোষাক পরে প্রকৃতির শ্যামল কোল জুড়ে।'

মুখ শুকনো করে অলগা বলে, 'কিন্তু ডিমভ্ কি পরে আমি বিয়েতে যাব, আমার যে একটাও জামাকাপড় নেই। তুমি আমাকে বাঁচাও, এ বিপদ থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর। কপাল ভালো যে তুমি এসে পড়েছো, এ যাত্রা তুমি আমাকে বাঁচাও। এই নাও চাবিটা নাও, শীগগির বাড়ি চলে যাও। আমার বেগুনি রঙয়ের জামাটা নিও, ওটা সামনেই ঝুলছে দেখতে পাবে। যে ঘরে আমরা গান বাজনা করি, সেই ঘরের মেঝেতে দু'টো পিচ্বোর্ডের বাক্স দেখতে পাবে। ওপরের বাক্সটা খুললে টুকরো টুকরো জরি ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না, তারই তলায় ফুলের তোড়া আছে। সবগুলোই নিয়ে এসো। দেখো, নষ্ট করো না যেন! ওরই ভেতর থেকে কয়েকটা বেছে নেব।'

'ঠিক আছে, কাল গিয়েই ওগুলো পাঠিয়ে দেব।'

ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে অলগা বলে, 'কাল! কাল হয় তো তুমি ঠিকসময় গাড়ি ধরতে পারবে না। সকাল ন'টায় প্রথম গাড়ি ছাড়ে, এখানে এগারোটায় বিয়ে। লক্ষীটি, আজই যাও। কাল যদি নিজে আসতে না পার, লোক দিয়ে ওগুলো পাঠিয়ে দিও। নাও ওঠো, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। গাড়ি ছাড়ার সময় হ'য়ে এলো।'

'আচ্ছা যাই।'

অলগার চোখ জলে ভরে ওঠে। অলগা বলে, 'তোমাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয় না। কি করি বলো, এখন বুঝতে পারছি ভদ্রলোককে কথা দিয়ে কি বোকামিটা'ই না করেছি।'

এক্গ্লাস চা গোগ্রাসে গিলে, বিস্কুটটা হাতে করে তুলে নিয়ে ডিমভ্ হাসতে হাসতে চলে যায়। কালো লোক দু'টো ও অভিনেতা বাকি খাবারগুলো শেষ করে।

৪

জুলাই-এর নিঝুম চাঁদনী রাত। ভল্গার ওপর জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে অলগা—একবার জলের দিকে আর একবার তীরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। পাশে দাঁড়িয়ে রিয়াবভ্স্কী বলে চলে, 'জলের ওপর ঐ যে কালো কালো ছায়া, ওটা সত্যি ছায়া নয়—ওটা একটা স্বপ্ন। সব

কিছুই ভুলে যাওয়া ভালো, মরে গিয়ে মানুষের স্মৃতিতে জেগে থাকা ভালো। চারপাশে এই কুহেলিকাভরা চকচকে জল, ঐ অসীম আকাশ, শোকাকুল বিষণ্ণ এই নদীতীর সবকিছুই আমাদের অন্তঃসার-শূন্য জীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, স্মরণ করিয়ে দেয় এমন কিছু যা মহৎ, যা অনন্ত, যা বরণীয়। অতীত নগণ্য, অনুরাগবিহীন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার—এমন কি এই সুন্দর চাঁদনীরাত—যা আর কখনও ফিরে আসবে না, এখুনি শেষ হবে, অনন্তে মাঝে হবে লীন। কেন? তবে কেন এই জীবন?'

নিজের চিন্তায় বিভোর অলগা মনে মনে ভাবে—আমি অমর, আমি কখনো মরবো না। জলের ওপর আলোর ঝিলিমিলি, ঐ আকাশ, এই নদীতীর, ঐ কালো কালো ছায়া অপার আনন্দে ওর মন ভরিয়ে তোলে। প্রাণে জাগায় আশা। সুদূর জ্যোৎস্নালোকের পরপারে, অনন্ত-অসীম শূন্য ছাড়িয়ে যে জগৎ, সেখানে আছে যশ, আছে খ্যাতি আর আছে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা। দূরের পানে তাকিয়ে অলগার মনে হয় যেন ভিড় লেগেছে ওখানে, আলো হয়ে উঠেছে জায়গাটা, গান-বাজনায় আর আনন্দে মেতে উঠেছে সকলে।

গায়ে ওর সাদা পোষাক। চারিদিক থেকে যেন পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে ওর ওপর। গরাদের ওপর হেলান দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে যে লোকটা, অলগার মনে হয় সত্যিই ও মহৎ ও প্রতিভাবান। ভবিষ্যতে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওর ঐ অসাধারণ প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠবে। দিনের অবসানে প্রকৃতির বুকে ফুটে ওঠে যে আরক্তিম বর্ণচ্ছটা ওর তুলিতে তা মূর্ত হয়ে উঠবে অনবদ্য ব্যঞ্জনায়, চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না আর রাতের ছায়া-কুহেলিকা সজীব হয়ে উঠবে ওর তুলির রেখায়।

রিয়াবভস্কী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অলগার দিকে—ভয়াল সে চাউনি; ওর চোখে চোখ রাখতে পারে না অলগা।

কানের কাছে মুখ রেখে রিয়াবভস্কী অলগাকে বলে, 'আমি তোমার প্রেমে পাগল হ'য়ে উঠেছি। একটিবার মাত্র বল—তুমি আমায় ভালোবাস। তোমার জন্যে আমি সবকিছু ত্যাগ করতে পারি।'

চোখ বন্ধ করে অলগা বলে, 'ওভাবে বলো না, বিশ্রী শোনায়। ডিমভের কি হবে?'

'ডিমভের এতে কি আসে যায়? ডিমভের কথাই বা উঠছে কেন? ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? ওর কথা আজ নয়—আজ শুধু প্রেম, আনন্দ, শুধু তুমি আর আমি। আমি কিছু জানি না, তাকাব না আমি পিছনপানে, আমি চাই ক্ষণিক একটি মুহূর্ত।'

অলগার বুকটা ধক্‌ধক্ করতে থাকে। অতীতের সব ঘটনা—বিয়ের কথা, ডিমভের কথা আজ অস্পষ্ট বলে মনে হয়—মনে হয় যেন অনেক দূরে সরে গেছে তারা। সত্যিই তো ডিমভের কথা আজ কেন? ওর জন্য কি করতে পারে সে?
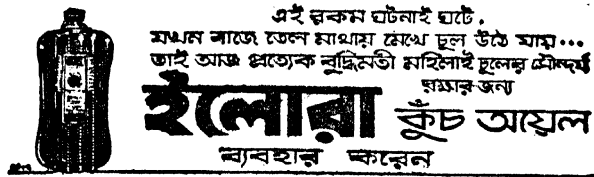
হাত দু'টো দিয়ে মুখটা ঢেকে অলগা আপন মনে বলে চলে, 'যতটুকু আনন্দ দিয়েছি ডিমভকে একজন সাধারণ পুরুষের পক্ষে তাই যথেষ্ট। যা মন চায় তাই করুক তারা। দিক তারা আমায় অভিশাপ। নিজের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে দেখাব যে আমি ওদের কত ঘৃণা করি··· একবার অন্তত চেষ্টা করতে দোষ কি? হায় ভগবান, কি ভয়ঙ্কর অথচ কি সুন্দর।'

রিয়াবভস্কী ওকে জড়িয়ে ধরতে এলে অলগা দু'হাত দিয়ে ওকে সরিয়ে দেয়। রিয়াবভস্কীর দিকে তাকিয়ে দেখে। জলের ধারা বইছে রিয়াবভস্কীর চোখ দিয়ে। অলগা ওকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে।

ডেকের অপর দিক থেকে কে যেন বলে ওঠে, 'এক মিনিটের মধ্যে আমরা 'কিসেনমায়' পৌঁছবো।' খাবারঘর থেকে বেরিয়ে এসে লোকটা জোরে জোরে পা ফেলে ওদের পাশ দিয়ে চলে যায়।

হাসতে গিয়ে অলগা কেঁদে ফেলে।

উত্তেজনায় রিয়াবভস্কী ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে ও। মাথাটা গরাদের ওপর রেখে অলগার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি শ্রান্ত, আমি ক্লান্ত আমি অবসন্ন।'

৫

সেপ্টেম্বর মাস। কুয়াসায় ঘেরা দিন। ভোরের দিকে পাতলা কুয়াসা ভল্‌গাকে ঘিরে বাতাসে উড়ে বেড়ায়। ন'টার পর গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়। পরিষ্কার দিনের কোনই আশা থাকে না। সকালে খাবার সময় রিয়াবভস্কী বলে, 'শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বিরক্তিকর হ'চ্ছে ছবি আঁকা। আমি শিল্পী নই, বোকারা ছাড়া অন্য কেউ আমার প্রতিভার কথা বিশ্বাস করবে না।'

হঠাৎ কাউকে বুঝতে না দিয়ে সে ছুরিটা নিয়ে সবচেয়ে ভালো ছবিটা ফাঁসিয়ে দেয়। খাওয়া শেষ হ'লে জানলার কাছে ব'সে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

ভল্‌গা অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। সে চাকচিক্য আর নেই। প্রকৃতির সবখানেই বিষণ্ণ ছায়া, শরতের নিরানন্দের আগমনী। তীরে-বিছানো কার্পেটের মতো ঘন সবুজ ঘাস, হীরের মতো চকচকে সূর্যরশ্মির বিকিরণ, স্বচ্ছ নীল আকাশ, প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য সবকিছুই যেন ভল্‌গার ওপর থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। বসন্তের আগে ও-সব আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে কাকগুলো বিকট চীৎকার জুড়ে দিয়েছে, রিয়াবভ্‌স্কী বসে বসে ওদের ডাক শোনে। কাকগুলো যেন চীৎকার করে উঠলো, 'সব কুছ্ ঝুটা হ্যায়, সব কুছ্ ঝুটা হ্যায়।'

রিয়াবভস্কী মনে মনে ভাবে, 'আমি নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি, আমার সমস্ত প্রতিভা আজ নিঃশেষিত। দেখছি এই পৃথিবীতে সবকিছু গতানুগতিক, সবকিছুই আপেক্ষিক, সবকিছুই অর্থহীন। ঐ মহিলাটির সঙ্গে মেলামেশা করা আদৌ সঙ্গত হয় নি।'

এক কথায় বলতে গেলে রিয়াবভ্‌স্কীর জীবনে এসেছে নৈরাশ্য আর অবসাদ।

'পার্টিসানের' অন্যদিকে বিছানার ওপর বসে অলগা ঘন চুলের মধ্যে আঙুলগুলো চালায়। মনে হয় যেন নিজের ঘরে বসে আছে। থিয়েটারের কথা, দর্জির কথা, বন্ধুদের কথা, মনে পড়ে। এখন কি করছে তারা? তারা কি আমার কথা মনে রেখেছে? ডিমভ্! আমার ডিমভ্! বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে চিঠির মধ্যে কি কাকুতি-মিনতি বেচারী ডিমভের!

ডিমভ্ মাসে মাসে অলগাকে টাকা পাঠায়। রিয়াবভ্‌স্কীর কাছ থেকে টাকা ধার করেছে জানালে আরো একশো টাকা পাঠিয়ে দেয়। কত ভালো, কত দয়ালু ডিমভ্!

ভ্রমণে এসেছে ক্লান্তি। এই চাষাভুষোদের সংস্পর্শে থেকে অলগা পালিয়ে বাঁচতে চায়, ঝেড়ে ফেলতে চায় দেহ-মনের সমস্ত গ্লানি। চাষাদের সঙ্গে বাস করলে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালে মনের এই গ্লানি কোনদিনই দূর হবে না। রিয়াবভ্‌স্কী ওদের সঙ্গে আরো দিনকতক থাকার কথা না দিলে, ওরা সকলে আজই চলে যেতে পারতো।

রিয়াবভ্‌স্কী বিরক্তির সুরে বলে, 'হা ভগবান, কখন আবার সূর্য উঠবে? সূর্য না থাকলে আমি যে সূর্যালোকিত ভূভাগ দৃশ্য আঁকতে পারি না।'

'পার্টিসানের' ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে অলগা বলে, 'মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ছবিটা তো পড়ে রয়েছে, মনে নেই?—ডান দিকে ঘন বন, বাঁ দিকে গরুর পাল ও রাজহাঁসের ঝাঁক। ঐ ছবিটা তো শেষ করতে পার।'

রিয়াবভস্কী মুখভঙ্গী করে বলে, 'শেষ কর! তুমি কি সত্যিই আমাকে এতো বোকা মনে কর যে, আমার কখন কি করা উচিৎ তা আমি জানি না। তোমার কাছ থেকে কি আমায় জানতে হবে?'

'তুমি একেবারেই বদলে গেছ।'

'ভালোই হ'য়েছে!'

অলগা উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে।

'আবার কান্না হ'চ্ছে! কান্নাটাই যদি না শেষ হ'তো। চুপ কর বলছি। কাঁদবার হাজার রকম কারণ আমারও আছে, কিন্তু আমি কাঁদি না।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে অলগা বলে, 'কারণ আছে! সবচেয়ে বড়ো কারণ বোধ হয় আমাকে তোমার আর ভালো লাগে না। সত্যি বলতে কি আমাদের এই মেলামেশার জন্যে তুমি লজ্জিত, তুমি ভয় পাও পাছে সকলে জেনে ফেলে। তুমি হয় তো জানো না যে, অনেকদিন আগে থেকেই সকলে আমাদের লক্ষ্য করছে, গোপন কিছুই নেই।'

রিয়াবভস্কী জোড়হাত করে বলে, 'অলগা', তোমার কাছ থেকে একটিমাত্র জিনিস চাই, মাত্র একটি—তুমি আমাকে একা থাকতে দাও, তোমার কাছ থেকে এই আমার সব চাওয়া।'

'কিন্তু শপথ করে বল, আজো তুমি আমায় ভালোবাস।'

রিয়াবভস্কী দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'কি যন্ত্রণা! তুমি কি চাও যে, আমি ঐ জলে ঝাঁপ দিয়ে এ-জীবনটা শেষ করে দিই? আমাকে একা থাকতে দাও। তা না হ'লে আমি যে পাগল হয়ে যাব। দোহাই তোমার, একটু একা থাকতে দাও।'

'মারো, আরো মারো, মেরে ফেল আমাকে।'

কাঁদতে কাঁদতে অলগা পার্টিসনের পেছনে চলে যায়।

মাথাটা দু' হাতে চেপে ধরে রিয়াবভস্কী ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে আরম্ভ করে। খড়ের গাদার ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা

যাচ্ছে। হঠাৎ মাথায় টুপিটা চাপিয়ে, বন্দুকটা কাঁধে ফেলে ও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ও বেরিয়ে গেলে অলগা বিছানায় পড়ে কাঁদে। বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে করে। মনে পড়ে বাড়ির কথা, ডিমভের কথা। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের জন্যে মন কেমন করে।

একজন মেয়েছেলে ঘরে ঢোকে। খাবার তৈরি করবার জন্যে উনুনে আস্তে আস্তে বাতাস করে। ধিকি ধিকি পোড়া কাঠের গন্ধ ভেসে আসে, ঘরের বাতাস ধোঁয়ায় নীল হয়ে ওঠে।

একে একে ওরা ফিরতে আরম্ভ করে। কাদামাখা পায়ের জুতো, বৃষ্টির জলে ভেজা মুখ।

দেয়ালে-টাঙ্গানো ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ এবং মূর্তিটার পাশের কোণ থেকে মাছির ভন্ ভন্ আওয়াজ ভেসে আসছে। বেঞ্চির তলায় মাছির গাদার মধ্যে তেলাপোকাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সূর্য অস্ত গেল। রিয়াবভস্কী ফিরে এলো। টুপিটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ময়লা জুতো পরেই বেঞ্চিটার ওপর চোখ বুজে শুয়ে থাকে।

'আমি ক্লান্ত, আমি শ্রান্ত, আমি অবসন্ন।'

উৎকণ্ঠিতা অলগা ওর কাছে এগিয়ে যায়। ওকে দেখাতে চায় যে, ওর ওপর অলগা রাগ করে নি। ওকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে। চিরুণী দিয়ে ওর চুলের গোছা ঠিক করে দেয়।

রিয়াবভস্কীর মনে হয় চটচটে কি যেন ওর গায়ে লাগছে। চোখ খুলে চেয়ে দেখে। বলে, 'এ আবার কি হচ্ছে? আমাকে কি একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও।'

অলগাকে ঠেলা দিয়ে ও সেখান থেকে চলে আসে। অলগা লক্ষ্য করে, ওর মুখে ফুটে উঠেছে ঘৃণার ছাপ।

ঠিক ঐ সময় মেয়েলোকটা থালায় করে খাবার নিয়ে এসে রিয়াবভস্কীর সামনে দাঁড়ায়। ঐ কুৎসিত মেয়েটা, এই ঘর, এই জীবনযাত্রা আর এই পরিবেশ ওর কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হয়।

অলগা নিজেকে অপমানিত বোধ করে। সে আস্তে আস্তে বলে, 'এখন আমার দূরে থাকা ভালো। তা না হলে হয়তো রাগের মাথায় ঝগড়া করে বসবো। এসব আর আমার ভালো লাগছে না। আমি নিজেই চলে যাব।'

'কেমন করে, উড়ে?'

'আজ সাড়ে ন'টার সময় জাহাজ ভিড়বে।'

'তাই না কি? বেশ তাই যাও।'

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে রিয়াবভস্কী নরম সুরে বলে—'এখানে তোমার ভালো না লাগবারই কথা। আমি এতটা স্বার্থপর নই যে, তোমাকে আটকে রাখবার চেষ্টা করবো। আচ্ছা এসো, বিশ তারিখের পর আবার আমাদের দেখা হবে।'

অলগা জামা-কাপড় গোছায়। মনে মনে বলে, 'সত্যই তা হলে চললাম। আবার কি নিজের ঘরে গিয়ে বসতে পারবো? ছবি আঁকতে পারবো? বিছানায় শুয়ে ঘুমতে পারবো? বিরাট একটা বোঝা ওর মন থেকে নেমে যায়। রিয়াবভস্কীর ওপর অলগার আর কোন রাগ নেই।

অলগা বলে; 'রেবুসা, আমার রং ও তুলিগুলো রেখে যাচ্ছি। কিছু যদি পড়ে থাকে যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো···। শোন, আমি না থাকাতে তুমি যেন কুড়েমি করে বসে থেক না, মন দিয়ে কাজ করো।'

রিয়াবভস্কী জানতো যে, অ গা এখানে আসবেই। পাছে ডেকের ওপর সকলের সামনে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে হয়, তাই ঠিক ন'টার সময় সেখানে এসে অলগার কাছে বিদায় নেয়। অলগা সিঁড়ি দিয়ে নেমে জাহাজে উঠলো। জাহাজটা ধীরে ধীরে চোখের বাইরে চলে গেল।

আড়াই দিন পরে অলগা বাড়িতে ফিরে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে বৈঠকখানায় ঢোকে, সেখান থেকে চলে আসে খাবারঘরে। টেবিলের সামনে বসে ডিমভ ছুরিতে শাণ দিচ্ছে। গায়ে একটা সার্ট, ওয়েস্ট কোর্টের বোতামগুলো খোলা, সামনে ডিসের ওপর খাবার রয়েছে।

প্রথমে অলগা স্থির করে যে, ডিমভের কাছে সব কথা চেপে যাবে। কিন্তু ডিমভের ঐ প্রাণখোলা হাসি দেখে অলগার মনে হয় এই সরল আপন-ভোলা মানুষটাকে ঠকানো তার পক্ষে অসম্ভব। হাত দু'টোর মধ্যে মুখটা লুকিয়ে ডিমভের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে।

'এ কি করছো ?'

অলগা ঘাড় তোলে, চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে। লজ্জা ও ভয়ে কোন কথা বলতে পারে না।

'না, না, কিছু হয় নি···আমি ঠিকই আছি···।'

ডিমভ অলগাকে তুলে ধরে টেবিলের কাছে এসে বলে, 'নাও—খেতে বসো।'

অলগা নিজেকে হালকা মনে করে। ডিমভ্ ওর দিকে চেয়ে মুচ্ কি মুচ্ কি হাসে।

৬

শীতের মাঝামাঝি সময় থেকে ডিমভের সন্দেহ হয়—সন্দেহ হয় যে, বোধ হয় অলগা তাকে প্রতারণা করেছে। সে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে পারে না, যেন সে নিজেই দোষী, স্ত্রীকে দেখে সে আর আনন্দে হাসে না। যতটা পারে স্ত্রীকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। তাই বন্ধু কোরোস্টেলেভকে প্রায়ই খেতে আসতে বলে। কুৎসিত, বেঁটে, মাথাভর্তি খাড়া খাড়া চুল কোরোস্টেলেভের। অলগার সঙ্গে কথা কইবার সময় অকারণে জামার বোতামগুলো একবার খোলে, আবার একটু পরেই লাগিয়ে দেয়। ডান হাত দিয়ে বাঁ দিকে গোঁফ পাকাতে থাকে।

খাবার সময় দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হয়—'ডায়াফ্রাম্ যখন খুব ওপর দিকে উঠে যায়, প্রায়ই দেখা যায় বুক ধড়ফড় করে, পরে নানাপ্রকার উপসর্গ দেখা যায়।' ডিমভ বলে, 'কাল সন্ধ্যের সময় মরা চেরাই করবার সময় সে দেখতে পায় যে, রুগীটা প্যানক্রিয়াস্' ক্যানসারে মারা গেছে, যদিও মৃত্যুর কারণ ধরে নেওয়া হয়েছিলো রক্তহীনতা।'

মনে হয়, তারা এই চিকিৎসা-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যায়—যাতে না অলগা কোন কথা বলার সুযোগ পায়। কেন না, অলগা তো কেবল একরাশ মিথ্যে কথাই বলে যাবে। খাওয়ার শেষে কোরোস্টেলেভ পিয়ানো নিয়ে বসে। ডিমভ ঠাট্টা করে বলে, 'আর দেরি করছো কেন ? আরম্ভ কর।'

কোরোস্টেলেভ্ সোজা হয়ে বসে চড়া সুরে গান ধরে। ডিমভ্ হাত দু'টোর ওপর মাথা রেখে গভীর চিন্তায় তলিয়ে যায়।

আজকাল অলগা প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বসে বসে আনমনা মাথামুণ্ডু ভেবে মরে। অলগা ভাবে···আমি রিয়াবভ্স্কীকে ভালোবাসি না। আমাদের মধ্যে সকল সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। পরক্ষণেই ভাবে—না, না, রিয়াবভ্স্কী আমাকে স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আজ ডিমভ্ বা রিয়াবভ্স্কী দু'জনের একজনও ওর পাশে নেই।

যারাই রিয়াবভ্স্কীর স্টুডিওতে এসেছে তারাই একবাক্যে ওর ছবির প্রশংসা করেছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে এ ছবির সৃষ্টির মূলে রয়েছে অলগারই প্রেরণা। যদি অলগার কাছ থেকে ও প্রেরণা না পেতো, তা হ'লে আজ কোথায় তলিয়ে যেতো রিয়াবভ্স্কী। আরো মনে পড়ে, শেষবার যখন ও অলগার সঙ্গে দেখা করতে আসে, ওর গায়ে ছিলো সাদা ডোরা কাটা ছাই রঙের একটা কোট, গলায় ছিলো একটা নতুন টাই। কোঁকড়ানো কালো চুল, নীল চোখ আর বেশভূষায় অলগার ওকে সুন্দর বলেই মনে হ'য়েছিলো।

রিয়াবভ্স্কীর কথা চিন্তা করতে করতে অলগা বেশভূষা পাল্টে স্টুডিওর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। রিয়াবভ্স্কী বেশ সহজভাবেই নিজের ছবির সম্বন্ধে আলোচনা করে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ রিয়াবভ্স্কী ঠাট্টার ছলে বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসে। ছবিগুলো দেখে অলগার হিংসে হয়—সত্যিই ছবিগুলো ভালো। তবুও মুখ বুজে এ-সব সহ্য করতে হয়।

এরপর চলে অলগার অনুরোধ, উপরোধ, চলে কাতর প্রার্থনা।

স্টুডিও থেকে সে যায় মেয়েদর্জির কাছে কিংবা থিয়াটারের টিকিটের জন্যে কোন বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করে।

যেদিন রিয়াবভ্স্কীকে স্টুডিওর মধ্যে দেখতে না পায়, সেদিন অলগার বাড়িতে আসবার জন্যে চিঠি লিখে আসে। চিঠিতে লেখে যদি রিয়াবভ্স্কী অলগার বাড়িতে না যায় তা' হলে অলগা বিষ খেয়ে মরবে।

আশ্চর্য ! রিয়াবভ্স্কী অলগার বাড়িতে আসে, অলগার সঙ্গে দেখাও করে, এমন কি অলগাকে নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসে। ডিমভের সামনে কোনপ্রকার লজ্জা না করেই ও অলগার সম্বন্ধে যা-তা বলে। দু'জনেই বেশ বুঝতে পারে যে ওরা যে-যার নিজের পথেই চলেছে। ওদের খেয়াল থাকে না যে, ওদের চালচলন কতখানি দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে আর পাঁচজনের চোখে। এমন কি কোরোস্টেলেভ্ও সব বুঝতে পারে।

'কোথায় যাচ্ছো ?' অলগা জিজ্ঞেস করে।

ভ্রূকুটি করে রিয়াবভ্স্কী এমন একজনের নাম করে, যাকে ওরা দু'জনেই চেনে। ওর বলার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—একটু তামাসা করা, অলগাকে কিছুটা চটিয়ে তোলা।

অলগা শোবার ঘরে চলে আসে। বিছানায় শুয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। লজ্জায়, অপমানে, রাগে অলগা বালিশটা কামড়ায়। ডিমভ্ কোরোস্টেলেভকে ড্রইংরুমে বসিয়ে রেখে শোবার ঘরে চলে আসে। হতবুদ্ধি, লাজুক ডিমভ্ অলগাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'কেঁদো না, চুপ করো। কেঁদে লাভটা কি ? এ-সব ব্যাপার চেপে যাওয়াই ভালো, অন্য কেউ যেন জানতে না পারে···। তুমি তো বোঝ, যা ঘটলো তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না।'

রাগে অলগা কাঁপতে থাকে। মনে মনে ভাবে—সাংঘাতিক এমন কিছু হয় নি, সবই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

অলগা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। চোখে-মুখে জল দেয়। মুখে পাউডার মাখে। রিয়াবভ্স্কী এইমাত্র যার নাম করলো, সেই বান্ধবীর কাছে ছোটে। সেখানে ওকে দেখতে না পেয়ে আর একজনের কাছে যায়। সেখানেও না পেয়ে ছোটে আর একজনের কাছে।

প্রথম প্রথম এতে অলগার লজ্জা হ'তো। ক্রমে ক্রমে সবই সয়ে যায়। এখন এ-সব অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কোন কোন দিন চেনাশোনা যত বান্ধবী আছে, ওর খোঁজে প্রত্যেকেরই বাড়ি টহল দিয়ে বেড়ায়। বান্ধবীরা অলগার এই বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

একদিন স্বামীকে দেখিয়ে রিয়াবভ্স্কীকে বলে, 'ঐ লোকটার

চুলের সৌন্দর্য
তেলের অপচয়ে নয়
— যত্নে
চুলের যৌবনে ভাটা পড়লে অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে লাভ নেই
কারণ চুল সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকেরই একটা প্রচ্ছন্ন ঔদাসীন্য আছে।
কোন রকমে একটু তেল মাথায় দিয়ে চট্ করে স্নানের পাট চোকাবার
দিকেই আগ্রহটা বেশী। এতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চুলের
যত্নের চেয়ে তেলের অপচয়টাই বেশী হয়।
তেল চুলের প্রধান
খাদ্য তাই অন্ততঃ দশ মিনিট
চুলের গোড়াগুলিতে তেল বেশ ভাল
করে মালিশ করা উচিত। সামান্য
একটু যত্নে চুলের সৌন্দর্য যে
কত বর্দ্ধিত হতে পারে তা কিছুদিন
যত্ন নিয়ে জবাকুসুম তেল ব্যবহার
করলেই বুঝতে পারবেন।
জবাকুসুম
কেশ তৈল
সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১
১, টাকার্স লেন, ব্রডওয়ে মাদ্রাজ - ১
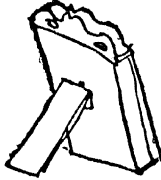
ভালোমানুষী আর আমি সহ্য করতে পারি না। রিয়াবভস্কী ও অলগার মেলামেশার খবর যারা জানে তাদের সঙ্গে দেখা হলেই অলগা স্বামীর সম্বন্ধে ঐ কথাগুলো বলে নিজেকে সুখী মনে করে।

গত বছরের মতো এ বছরের দিনগুলোও বাঁধাধরা নিয়মে কাটে।

বুধবার সন্ধ্যার সময় বাড়িতে আসর বসে। অভিনেতা আবৃত্তি করে, শিল্পী ছবি আঁকে, পিয়ানোবাদক পিয়ানো বাজায়, গাইয়ে গান করে। ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় খাবার ঘরের দরজা খুলে যায়, ডিমভ্ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, 'খাবার তৈরি, আপনারা আসুন।'

অলগা নামকরা লোকদের ডেকে ডেকে তোলে, তাদের তদারক করে। পরে অন্য লোকজনদের কাছে যায়।

অলগা রোজ রাত করে বাড়ি ফেরে। দেখে ডিমভ্ তখনও নিজের ঘরে বসে কাজ করছে। তিনটে বাজলে তবে ডিমভ্ শুতে যায়, পরের দিন আটটার সময় ঘুম থেকে ওঠে।

একদিন সন্ধ্যেয় থিয়েটার যাবার আগে অলগা যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেহারাটা শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে, সেই সময় ডিমভ্ শোবার ঘরে ঢোকে—গায়ে পোষাকী কোট, গলায় সাদা রংয়ের টাই। অলগার দিকে চেয়ে ডিমভ্ হাসে—ঠিক আগে যে রকম হাসতো।

বিছানার ওপর বসে ঢিলে পা-জামাটা সোজা করতে করতে ডিমভ্ বলে, 'আমার প্রবন্ধটা পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'উৎরোবে তো।'

'দেখা যাক না।'

স্বামীর দিকে পেছন ফিরে অলগা মাথার চুলগুলো ঠিক করে নিচ্ছিলো। ডিমভ্ গলাটা বাড়িয়ে আয়নার মধ্যে স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, 'দেখাই যাক না। খুব সম্ভব 'প্যাথোলজিতে' আমাকে 'ডক্টরেট' উপাধি দেবে।'

অলগা যদি ডিমভের এই সাফল্যের কিছুটা অংশীদার হ'তে পারতো, হয় তো ডিমভ্ তাকে ক্ষমা করতো পারতো। পারতো অতীত ও বর্তমানের সব ঘটনা মন থেকে মুছে ফেলতে। কিন্তু অলগা না উপাধি, না প্যাথোলজি, কোনটাই বোঝে না। কিছুই বলে না অলগা, থিয়েটার যাবার জন্যে ব্যস্ত সে।

কিছুক্ষণ বসে ডিমভ্ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

৭

মাথার যন্ত্রণায় ভুগছে ডিমভ্। সকালে সে কিছুই খায় নি; হাসপাতালেও যায় নি। পড়ার ঘরে সারাদিন শুয়ে আছে। রোজ যেমন বেরোয় সেদিনও বেরিয়ে যায় অলগা।

ওর আঁকা ছবিটা রিয়াবভস্কীকে দেখাবে, জিজ্ঞেস করবে পরশুদিন রিয়াবভস্কী ওর বাড়ি যান নি কেন? অলগা মনে মনে জানে ছবিটা মোটেই ভালো হয় নি, রিয়াবভস্কীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছল করে এঁকেছে ছবিটা।

বেল না বাজিয়েই অলগা ভেতরে ঢোকে। হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে পা থেকে জুতো খোলবার সময়ে, স্টুডিওর মধ্যে মৃদু পায়ের শব্দ ও জামার খসখস আওয়াজ শুনতে পায়। ভেতর দিকে তাকাতেই খয়েরি রংয়ের স্কার্ট চোখে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে চমক লাগিয়ে কালো কাপড়ে-মোড়া ক্যানভাসের পেছনে কে যেন চলে গেল। একটা মেয়ে যে ক্যানভাসের পেছনে লুকিয়ে পড়লো, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। অলগাকেও যে কতবার ওরই পেছু লুকোতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। অলগাকে দেখে রিয়াবভস্কী আশ্চর্য হয়ে বলে, 'খবর কি?'

অলগার চোখ জলে ভরে ওঠে। বেচারী অলগা নিজেকে অপমানিত মনে করে। মেয়েটা লুকিয়ে আছে, সব শুনতে পাবে। ও থাকতে মরে গেলেও অলগা একটা কথাও বলতে পারবে না। ক্যানভাসের পেছনে দাঁড়িয়ে মেয়েটা নিশ্চয় হাসছে।

'আমার আঁকা ছবিটা দেখাতে এনেছি'—ভয়ে ভয়ে অলগা বলে।

'ছবি···?'

ছবিটা দেখতে দেখতে রিয়াবভস্কী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, পরে পাশের ঘরে চলে যায়।

অলগাও ওর পেছনে পেছনে চলে আসে।

স্টুডিওর ভেতর থেকে পায়ের শব্দ হলো। স্পষ্ট বোঝা গেল যে মেয়েটা চলে গেল। অলগা কেঁদে ফেলে, তাড়াতাড়ি ছুটে চলে আসে ওখান থেকে। ছবির কথা ভুলে যায়। নিজেকে বড়ো খেলো বলে মনে হয়।

রিয়াবভস্কী বিরক্তির সুরে বলে, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আজ একটা, কাল একটা, পরশু একটা···। আচ্ছা, ছবি আঁকতে তোমার এখনো ভালো লাগে? বিতৃষ্ণা হয় না তোমার? তোমার মতো অবস্থায় পড়লে আমি ছবি আঁকা ছেড়ে গান-বাজনা কিংবা অন্যকিছু একটা নিয়ে উঠে-পড়ে লাগতাম। অবশ্য ছবিটা মন্দ হয় নি। কিন্তু মনে রেখো তুমি একজন গায়িকা, শিল্পী নও।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রিয়াবভস্কী। অলগা শুনতে পায় চাকরকে কি যেন বলছে সে। বিদায় নেওয়ার হাত থেকে এড়িয়ে যাবার জন্যে, তার চেয়েও কান্নার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে অলগা রিয়াবভস্কী আসার আগেই ওখান থেকে হলঘরে পালিয়ে আসে। কোনরকমে জুতো দু'টো পায়ে গলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

প্রথমে সে মেয়েদর্জির কাছে যায়। সেখান থেকে যায় 'বারনাই'-এর কাছে, কিছুদিন আগে সে ফিরে আসছে। 'বারনাই'-এর কাছ থেকে যায় বাজনার দোকানে। রিয়াবভস্কীকে চিঠি লিখে জানাতে ইচ্ছে হয় যে অলগা আজো তার ইজ্জৎ হারায় নি। চিঠিতে লিখবে যে আসছে বসন্তকালে কিংবা আগামী গ্রীষ্মকালে সে ডিমভকে নিয়ে 'ক্রিমিয়ায়' বেড়াতে যাবে। অতীতের সবকিছু ভুলে গিয়ে নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করবে।

অনেক রাত করে অলগা বাড়ি ফেরে। নিজের ঘরে ঢুকে বেশভূষা না-খুলেই চিঠি লেখবার জন্যে বৈঠকখানায় চলে আসে। রিয়াবভস্কী বলেছে যে অলগা আসলে শিল্পী নয়। অলগাও জানাবে যে সে-ও খুব বড়ো নামকরা শিল্পী নয়। বছরের পর বছর সে একই ধরণের ছবি এঁকে এসেছে—দিনের পর দিন একই কথা বলে এসেছে। যতটুকু সে সুখ্যাতি পেয়েছে ততটুকুই সব—এর বেশি সে কিছু আশা করতে পারে না। অলগার লিখে জানাতে ইচ্ছে করে যে, অলগার সাহচর্য রিয়াবভস্কীকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে, অলগার কাছে সে ঋণী।

আজ সে অলগার প্রতি বিমুখ, কেন না পাঁচজন তাকে বোকা বানিয়েছে—পাঁচজনের মধ্যে ঐ মেয়েটা একজন, যে-মেয়েটা আজ ছবির পেছনে লুকিয়ে ছিলো।

'এদিকে এসো একবার'—দরজা না খুলেই পড়ার ঘর থেকে ডিমভ ডাকে।

'কেন, কি দরকার?'

'দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাক। আমার কাছে এসো না। দু'দিন হ'লো আমি ডিপথিরিয়া রোগে ভুগছি···। এখন খুব খারাপ লাগছে। কোরোস্‌টেলেভের কাছে লোক পাঠাও। ওকে ডেকে আনুক। আমি ভালো বোধ করছি না।' অলগা বেশ বুঝতে পারে যে ডিমভ্‌ পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে সোফার ওপর শুয়ে পড়লো।

'ওর কাছে লোক পাঠাও' ধরা গলা ডিমভের।

অলগা মনে মনে বলে, 'সত্যিই ডিপথিরিয়া নাকি? মহা বিপদ তো!'

অলগা ভেবে ঠিক করতে পারে না কেনই বা সে শোবার ঘরে এলো, কেনই বা সে বাতি জ্বালালে। কিছুই বুঝতে পারে না সে। এখন কি করা উচিত।

আয়নার ভেতর নিজের চেহারাটার ওপর নজর পড়ে। ফ্যাকাশে হ' উঠেছে মুখ, চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ। হাতওয়ালা জামা, সা ন হলদে রংয়ের ঝালর, ডোরাকাটা স্কার্ট, সবকিছু মিলে এ টা কিম্ভূতকিমাকার রূপবিশেষ করে তুলেছে। ডিমভের জন্য মায়া হয় অলগার। অলগার প্রতি ওর কি গভীর ভালোবাসা। ওর নিঃসঙ্গ জীবন, বিশেষ করে ওর ঐ মিষ্টি হাসি—সব মনে পড়ে। দুঃখে কেঁদে ফেলে অলগা। শেষে কোরোস্‌টেলেভকে আসবার জন্যে অনুরোধ করে চিঠি লেখে। তখন রাত বারোটা।

৮

অনিদ্রায় ক্লান্ত দেহ, অবিন্যস্ত চুলের গোছা, মুখে অপরাধের ছাপ। সাতটার কিছু পরেই অলগা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। গায়ে সাদাসিধে বেশভূষা।

একটা লোক অলগার পাশ দিয়ে হলঘরে চলে যায়। মুখে একগাল দাড়ি, বোধ হয় কোন ডাক্তার হবে। ওষুধের গন্ধ ভেসে আসছে। পড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কোরোস্‌টেলেভ. ডান হাত দিয়ে বাঁ-দিকের গোঁফে চাড়া দিচ্ছে।

অলগাকে দেখে বলে, 'মাপ করবেন, আপনাকে ডিমভের কাছে যেতে দিতে পারি না। আপনারও ছোঁয়াচ লাগতে পারে, এখান থেকেই দেখুন। তা' ছাড়া ওর কাছে গিয়ে কোন লাভ নেই। ডিমভ এখন ভুল বকছে।'

অলগা চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, 'সত্যি ওর ডিপ্‌থিরিয়া হয়েছে?'

কোরোস্‌টেলেভ্‌ বলে, 'আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, তা' হলে এইভাবে যারা নিজেদের মরণকে ডেকে আনে, তাদের প্রত্যেককেই আমি জেলে পুরতাম। জানেন কি, কেমন করে ও ঐ রোগ ডেকে এনেছে? একটা ছোট ছেলের গলা থেকে মুখ দিয়ে পুঁজ টেনে বার করতে গিয়ে—ছেলেটা ডিপ্‌থিরিয়া রোগে ভুগছিলো। কি জন্যে ও এ কাজ করলো? তাহা বোকামী, ক্ষণিক মানসিক দুর্বলতামাত্র!'

'খুব কি ভয়ের কারণ আছে?'

'হ্যাঁ, ডাক্তাররা তো তাই বলেন।'

একজন বেঁটে লোক ঘরে ঢোকে। মাথায় কটা চুল, লম্বা নাক, কথায় ইহুদী ভাষার টান। ওর পেছনে ঢোকে একজন লম্বা লোক। সারা গা লোমে ভর্তি, মাথা ও কাঁধ সামনের দিকে নোয়ানো। কদাকার চেহারা লোকটার। সব শেষে ঢোকে একজন যুবক—লাল মুখ, দোহারা চেহারা, চোখে চশমা। ওদের সকলেই ডাক্তার, বন্ধুর অসুখে এসেছে নার্সিং করবার জন্যে।

পাহারা দেওয়া শেষ হলেও কোরোস্‌টেলেভ্‌ বাড়ি না গিয়ে ভূতের মতো ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। ঝি ডাক্তারদের জন্যে চা তৈরি করে আর অনবরত ওষুধের দোকানে ছোটাছুটি করে। তাই অন্য ঘরগুলো ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়।

শোবার ঘরে বিছানার ওপর বসে অলগা আপন মনে ভেবে চলে—স্বামীকে প্রতারণা করার শাস্তি ভগবান আজ দিলেন। শান্তশিষ্ট স্বামী আমার কোচের ওপর শুয়ে নীরবে কষ্ট সয়ে যাচ্ছে আর আমি নিশ্চিন্তমনে এ ঘরে বসে আছি। যদি ডিমভ অভিযোগ করতো, এমন কি বেঘোরেও যদি প্রলাপ বকতো তা হ'লে ডাক্তাররাও বুঝতে পারতেন যে, ডিপথিরিয়া একমাত্র কারণ নয় রোগের অন্য কারণও আছে। কোরোস্‌টেলেভ সব জানে। ডাক্তাররা ওকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারতেন। কোরোস্‌টেলেভ জানে যে, বন্ধু-পত্নীই ওর বন্ধুর মৃত্যুর কারণ, ডিপথিরিয়া উপলক্ষমাত্র।

ভলগার ওপর চাঁদনী রাতের কথা ভুলে যায় অলগা। ভুলে যায় প্রেমের স্বীকৃতির কথা, ভুলে যায় চাষার কুঁড়েঘরে ছন্নছাড়া জীবন। যে পাপের পাঁকে সে আপাদমস্তক ডুবেছে, সে পাঁক থেকে অলগা কোনদিনই নিজেকে মলিনমুক্ত করতে পারবে না—তুচ্ছ মোহের বশে এ-সবই তার খামখেয়ালী।

রিয়াবভস্কী ও অলগার মধ্যে যে গভীর প্রেম, সে প্রেমের কথা মনে পড়তেই অলগা আপন মনে বকে—কি মিথ্যুক আমি! এ-প্রেম যেন একটা মস্ত অভিশাপ।

চারটের সময় অলগা কোরোস্‌টেলেভকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসে। কোরোস্‌টেলেভ কিছুই খায় না। অলগাও কিছু খেতে পারে না। নীরবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, শপথ করে—ডিমভ ভালো হয়ে উঠলে সে স্বামীকে ভালোবাসবে, স্বামীর অবাধ্য আর হবে না।

কোরোস্‌টেলেভের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে ভাবে—এই প্রকার মুখোশ-পরা বদমেজাজী লোকের বেঁচে থাকাটাই এক বিড়ম্বনা!

অলগার মনে হয় ভগবানের নিষ্ঠুর আঘাতের হাত থেকে তার আর কোন পরিত্রাণ নেই। সত্যই কি স্বামীর ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলবার জন্যেই সে একটিবারও পড়ার ঘরে ঢোকে নি? অলগার মনে হয়—জীবনটা শুধুই দুঃখময়, জীবনের সবকিছু আজ নষ্ট হ'য়ে গেছে। কিছুতেই আর তা ফিরে পাওয়া যাবে না।

খাওয়া শেষ হয়। সন্ধ্যাও হ'য়ে আসে। ড্রইংরুমে এসে অলগা দেখে—চকচকে সুতোর কাজ-করা সিল্কের বালিশের ওপর মাথা রেখে কোরোস্‌টেলেভ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

ডাক্তাররা ডিমভের বিছানার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছেন

এ-সব ব্যাপার তার। কিছুই জানে না।' ড্রইংরুমে অপরিচিত লোকটার নাক ডাকা, দেয়ালে টাঙ্গানো ছবি, অদ্ভুত অদ্ভুত আসবাবপত্র, গৃহকর্ত্রীর অবিন্যস্ত চুলের গোছা, এলোমেলো বেশভূষা—এ-সবে ওদের মন আকৃষ্ট হয় না।

ড্রইংরুমে ফিরে এসে অলগা দেখে কোরোস্‌টেলেভ ঘুম থেকে উঠে বসে চুরুট টানছে।

চাপা গলায় কোরোস্‌টেলেভ বলে, 'ডিপথিরিয়া রোগের বীজাণু তার নাকে সংক্রামিত হ'য়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, রুগীর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। রুগীর অবস্থা খুব খারাপ।'

'শ্রেককে ডেকে পাঠান নি কেন?'

'তাঁকে ডেকে পাঠানো হ'য়েছে। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন যে, ডিপথিরিয়া নাকে সংক্রামিত হ'য়েছে। তা ছাড়া শ্রেক কে? সত্যি কথা বলতে কি শ্রেক্ ডাক্তারই নন, আমিও যেমন শ্রেকও তেমন।'

উদ্বেগ ও আশঙ্কার মধ্য দিয়ে সময় কাটে।

তন্দ্রার ঘোরে বিছানার ওপর পড়ে থাকে অলগা। অলগার মনে হয়—সমস্ত ফ্ল্যাটটা, মেঝে থেকে ওপরের সিলিং পর্যন্ত, যেন একটা লোহার চাই। যদি এই লোহার চাইটা কোনরকমে সরিয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে সবকিছুই আবার আনন্দে নেচে উঠবে। হঠাৎ অলগার চমক লাগে, মনে হয় ওটা লোহা নয়। ডিমভের রোগ ছাড়া ওটা আর কিছুই নয়।

তন্দ্রার ঘোরে অলগা বলে, 'বন্ধুরা, আজ তোমরা কোথায়? তোমরা কি জানো না যে, আমরা বিপদে পড়েছি? হে ভগবান, আমাদের বাঁচাও, দয়া করো আমাদের।'

নীচের তলার ঘড়িটা ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বেজে চলেছে, বাজার যেন শেষ নেই। যখন-তখন বাইরের বেলটা ঘন-ঘন বেজে ওঠে। ডাক্তাররা ডিমভকে দেখতে আসছে। ঝি ঘরে আসে, হাতে ট্রে, ট্রের ওপর একটা খালি গেলাস।

ঝি জিজ্ঞেস করে, 'মা, আপনার বিছানা পেতে দেব কি?'

উত্তর না পেয়ে ঝি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নীচের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার শব্দ হয়। অলগা স্বপ্ন দেখে যেন অলগার ওপর বৃষ্টি হচ্ছে।

ঘরের মধ্যে কে যেন ঢুকলো। কোরোস্‌টেলেভকে দেখে অলগা বিছানার ওপর উঠে বসে।

অলগা জিজ্ঞেস করে, 'ক'টা বাজে?'

'প্রায় তিনটে।'

'উনি কেমন আছেন?'

'কেমন আছেন! উনি মরতে বসেছেন, সেই কথাটাই বলতে এসেছি।' কান্না চেপে যায় কোরোস্‌টেলেভ। বিছানার ওপর অলগার পাশে বসে জামার আস্তিন দিয়ে চোখের জল মোছে। প্রথমটায় অলগা কথাটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। কিন্তু পরমুহূর্তেই হতাশায় মুষড়ে পড়ে।

কোরোস্‌টেলেভ্ কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'ডিমভ মরছে, নিজেকে উৎসর্গ করে ডিমভ্ মরতে চলেছে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের কি ক্ষতিটাই না হলো! আমাদের তুলনায় সে কত বড়ো, সে কত মহৎ! কত বড়ো গুণী সে, কতখানি আশাই না সে জাগিয়ে তুলেছিলো আমাদের সকলের মধ্যে।'

হাতের মধ্যে হাত রেখে ও বলে চলে, 'হায়, হায়, কত বড়ো বৈজ্ঞানিক সে হতে পারতো। ডিমভ্, এ কি করলে তুমি? হা ভগবান!' দু'হাতে মুখ ঢেকে হতাশায় ভেঙে পড়ে কোরোস্‌টেলেভ্।

কথা বলার ধরণ দেখে মনে হয় যেন কোরোস্‌টেলেভ্ কারোর ওপর চটে কথাগুলো বলছে, 'কি অদ্ভুত। এতটুকু মালিন্য নেই ডিমভের জীবনে। বিজ্ঞানের সাধক বিজ্ঞান সাধনায় আত্মাহুতি দিতে চলেছে। ব্যক্তিগত উপার্জনের জন্যে তাকে দিনরাত গাধার মতো খাটতে হতো—সারারাত ধরে করতে হতো অনুবাদ। কিন্তু কাদের জন্যে? কেউ তাকে রেহাই দেয় নি। আজকের এই শিক্ষিত তরুণ হতে পারতো আগামীকালের একজন খ্যাতিমান অধ্যাপক।'

কোরোস্‌টেলেভ্ অলগার দিকে ফিরে তাকায়। চোখে-মুখে ঘৃণার ছাপ। বিছানার চাদরটা দু'হাতে ধরে রাগে ছিঁড়ে ফেলে, যেন সব দোষ ঐ চাদরটার। কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'নিজের দিকে ডিমভ্ চেয়ে দেখে নি, অপরেও তাকে রেহাই দেয় নি। কিন্তু এ-সব বলে লাভটা কি?'

নিজের জীবনের অতীত ঘটনাগুলো এক এক করে মনে পড়ে অলগার—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এখন অলগা বুঝতে পারছে, বুঝতে পারছে যে যাদের ও চেনে, যাদের ও জানে তাদের তুলনায় ওর স্বামী ছিলো অসাধারণ, সত্যই মহৎ। মৃতপিতার প্রতি ও সহকর্মীদের প্রতি ডিমভের ব্যবহারের কথা মনে পড়ে—সকলেই আশা করতো যে ভবিষ্যতে ডিমভ্ নাম করতে পারবে। দেয়াল, সিলিং, আলো এবং মেঝের কার্পেট—সবই যেন ওর দিকে চেয়ে আছে।

কাঁদতে কাঁদতে অলগা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। প্রায় ছুটে চলে আসে বৈঠকখানায় সেই অদ্ভুত লোকটার কাছে।

স্বামীকে দেখে ডুকরে কেঁদে ওঠে। কোচের ওপর নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে ডিমভ্। কোমর পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। মুখটা শুকিয়ে উঠেছে। মুখের ঐ মেটে হলদে রঙ এর আগে দেখে নি অলগা। কপাল, ভ্রূ, মুখের ঐ স্মিতহাসি দেখে ডিমভ্‌কে চিনতে পারা যাচ্ছে।

অলগা স্বামীর বুক ও কপাল হাত দিয়ে দেখে। বুকটা তখনও গরম আছে। কিন্তু কপাল ও হাত দু'টো বরফের মতো ঠাণ্ডা। আধ-ভাবে চোখ খুলে তখনও চেয়ে আছে ডিমভ।

অলগা বলে, 'ভুল, সব ভুল। এখনো সবকিছু শেষ হ'য়ে যায় নি, জীবন এখনও সুন্দর ও মধুময় হতে পারে। মনে মনে শপথ করে—জীবনভোর তোমায় পূজা করবো, ভক্তি করবো, শ্রদ্ধা করবো!

স্বামীর কাঁধ দু'টো ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অলগা বলে, 'ডিমভ্ কথা কও, চেয়ে দেখ। আমি এসেছি, আমি,...আমি তোমার অলগা।'

অলগা বিশ্বাস করতে চায় না যে ডিমভ্ আর জাগবে না।

ঠিক তখনই বৈঠকখানার মধ্যে কোরোস্‌টেলেভ ঝিকে বলছে—'জিজ্ঞেস করার কি বা আছে? ঘুরতে ঘুরতে গির্জার দিকে যাও, খোঁজ করো ভিখারীরা কোথায় থাকে। তারাই শবদেহ ধুয়ে-মুছে সবকিছু ঠিক করে দেবে।

অনুবাদক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

বাড়িটা যেন নৈঃশব্দের রাজ্য।

শিবানীর মনে হলো ও অরুণকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে এ বাড়ির লোকগুলি তারপর আর নড়ে নি চড়ে নি: হাঁটে নি চলে নি। যে যেখানে ছিল সেখানেই প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে।

শিবানীকেও যেন বাড়িটা প্রভাবান্বিত করে ফেলল।

সে-ও বাড়ির লোকগুলির সঙ্গে যেন একীভূত হয়ে গেল। সামনের সোফাটার মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল হয়ে। অবশ্যি শিবানী এখন আর মোটেই এখানে দাঁড়াত'না। সোজা তার নিজের ঘরে চলে যেত, যদি না—অরুণকে আদেশ করে আসত দেখা করে যেতে। অরুণের চাটুকারিতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে সে তার অপমানের উত্তর দিয়ে যাবে।

ওদিকে শিবানীর দেখা করে যাবার আদেশ শুনে স্টিয়ারিং-এর উপর হাত রেখে কিছুটা স্তব্ধ হয়ে বসেছিল অরুণও।

ক্ষিধেয় সে দস্তুরমতো দুর্বলবোধ করছিল। সকালবেলার চায়ের পর তার অদৃষ্টে আজ এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় খাওয়া জোটে নি। ইন্দ্রনাথ তার ইংরেজ সহযোগীদের সঙ্গে লাঞ্চ বেরিয়ে গিয়েছিল লাঞ্চ টাইমের অনেক আগে। ওর হাতে চাপিয়ে দিয়েছিল অনেক কাজ। ইন্দ্রনাথ ফিরে এলে—তারপর অফিসের ক্যান্টিনে গিয়ে খেয়ে নেবে—এই ছিল অরুণের ইচ্ছে। কিন্তু লাঞ্চ থেকে ইন্দ্রনাথ ফিরে আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আগরওয়ালা এল মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে। যদিও সে আগরওয়ালার কথার মাঝখানেই উঠে এসেছিল তবু খেতে যেতে পা'র নি। আগরওয়ালার উপস্থিতিতেই যদি ইন্দ্রনাথের ওকে প্রয়োজন হয়, যদি ডাক পড়ে তাই অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাকে। ডাক পড়েছিলও। আগরওয়ালা চলে যেতেই ওর ডাক পড়েছিল। কিন্তু ইন্দ্রনাথের ডাকের জন্য প্রস্তুত থাকলেও, ডেকে যে কথা তাকে ইন্দ্রনাথ বললে সে কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না অরুণ। রিভলবিং চেয়ারটায় ঈষৎ এদিক-ওদিক করতে করতে ইন্দ্রনাথ বললে, মিঃ চক্রবর্তী আমি আপনার নামে একটা ফ্ল্যাট নিচ্ছি। আশা করি আপনার আপত্তি হবে না।

কথাগুলির কোন উত্তরের প্রত্যাশা ছিল না ইন্দ্রনাথের দিকে। সে তার কথা বলেই রিভলবিং চেয়ারের এদিক-ওদিক করা থামিয়ে সোজা হয়ে বসে চেক বই-এর উপর কলম নিয়ে উপুড় হয়েছিল।

কিন্তু অরুণ বিস্মিতকণ্ঠে বললে, আমার নামে ফ্ল্যাট! সে বুঝতেই পারলে না কিছু।

ইন্দ্রনাথ মুখটা কিছুটা বিস্তৃত করে বললে, হ্যাঁ। আমার নামে নেবার একটু অসুবিধে আছে তাই আপনার নামেই নিচ্ছি—কি বলেন।

বাস্। এর চাইতে আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলে না ইন্দ্রনাথ। বা এক কথা তাকে যে দু'বার বলতে হলো সেটাই বেশি ঠেকল কি না তার কাছে কে জানে, খসখস করে একটা বড় অঙ্কের চেক লিখে পাতাটা বই থেকে খসিয়ে অরুণের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, এই চেকটা নিয়ে আপনি চৌরঙ্গী ম্যানসনে চলে যান—এক্ষুণি। আমার গাড়ি নিয়ে যাবেন।

ইন্দ্রনাথ চেক বাড়িয়ে ধরেছে—চেকটা নিতে হলো অরুণকে।

ইন্দ্রনাথ বললে, মিঃ স্মিথের হাতে চেকটা দেবেন। তার সঙ্গে যা কথাবার্তা হবার—তা আমার হয়ে গেছে। আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপনি শুধু চেক দিয়ে বাড়ি ভাড়ার রসিদটা আপনার নামে ঠিকমত কাটিয়ে নিয়ে আসবেন। দেরি করবেন না। এক্ষুণি চলে যান।

কিন্তু এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে অরুণ চলে যেতে পারে নি। আর তাকে যেতে না দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল ইন্দ্রনাথ দারুণ বিস্মিত হয়েছে। ওর নামে ফ্ল্যাট নেবার আগে এই যে ওর মত চাওয়া এ তো আর কিছু নয়—ব্যাপারটা ঠিক আমাদের কারু ঘরে ঢোকবার আগে 'আসছি কিন্তু' বলে ও-পক্ষের সাগ্রহ আহ্বান সম্বন্ধে নিশ্চয়

থাকার এবং নিশ্চয় থেকে অনুমতির অপেক্ষা না করে ঢুকে পড়ার মতো। অর্থাৎ শুধু একটু জানান দিয়ে নেওয়া। তার নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে অরুণ আদেশ পালন করতে চলে গেছে এ ছাড়া আর কিছু সম্ভবত ইন্দ্রনাথের মনেও আসে নি। তার কাজে লাগার মূল্য যে কি তা বুঝবে না, বুঝে বিগলিত হবে না অরুণ—এত বড় অর্বাচীন ভাবে নি ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথের মাথায় তখনও মদের নেশা এবং সে বিষয়ে সে সচেতনও আছে। নিজেকে সংযত রেখে অরুণের দিকে তাকিয়ে ধীরকণ্ঠে বললে, আপনার কিছু বলবার আছে ?

অরুণও ইন্দ্রনাথের মতই ধীরকণ্ঠে বললে, ফ্ল্যাটে কে থাকবে ?

যেন 'থ' হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ অরুণের কথা শুনে। এমন একটা প্রশ্ন যে অরুণ তাকে করে বসতে পারে, তার ধারণার অতীত। অরুণের ধৃষ্টতার রাগে, অপমানে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে না ইন্দ্রনাথ। কিন্তু ইন্দ্রনাথের চরিত্রে একটা মস্ত প্রশংসনীয় জিনিস আছে, সে সহজে ব্যবহারের ভারসাম্য হারায় না। নেশার মাথায় ও যতক্ষণ বুদ্ধি উপস্থিত থাকে ততক্ষণ সে নিজেকে ঠিক রাখে। নেশার মাথাটা যখন মাতাল কণ্ঠে 'ইউ গেট আউট, ইউ গেট আউট' বলে অরুণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল স্বভাবের শুভ দিকটা তখন তাকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে রাখল। একটু সময় পরে হাত দিয়ে টেবিল দেখিয়ে শুধু বললে চেকটা রাখুন।

অরুণ চেকটা নামিয়ে রাখল। এ ছাড়া সে করতেই বা পারে কি! প্রথম ধাক্কায় যদিও সে ধরে উঠতে পারে নি, তার নামে ফ্ল্যাট নেবার মানেটা কি। কিন্তু তারপর বুঝতে সময় লাগে নি। আজকাল যত নোংরামির আঁস্তাকুড় তো এই নানা নামে-বেনামে ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটবাড়িগুলিই। ইন্দ্রনাথকে অরুণ মদ খেতে দেখেছে। মাতাল হতে দেখেছে। দেশী-বিলিতি যে মেয়ে যখন চোখে ধরছে সুযোগ-সুবিধা এবং সম্মতি মিললে কোমর বেষ্টন করে তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তে দেখেছে। কিন্তু ফ্ল্যাট ভাড়া করে তাতে মেয়ে নিয়ে তোলা! ইন্দ্রনাথ কি আরো নীচে নামছে। যে লোক দু'দিন আগেও আগরওয়ালার ফ্ল্যাটে যাওয়া প্রত্যাখ্যান করেছে, সে আজ নিজে ফ্ল্যাট নিচ্ছে! আগরওয়ালা এই যে আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল, তার এটা তবে এই জয়ের হাসি। ইন্দ্রনাথ যখন ওর হাতে চেক দিয়ে মিঃ স্মিথের কাছে গিয়ে কি করতে হবে, না হবে বলছিল তখন অরুণ এ কথাগুলিই ভাবছিল। শিবানীকে সে খুবই কম দেখেছে। তবু তার চোখের উপর হঠাৎ কিছুদিন যাবৎ শিবানীর শাড়ির উড়ন্ত আঁচল আসতে-যেতে যে খুশি ছড়িয়ে যাচ্ছিল তা ভেসে উঠল। ইন্দ্রনাথের আজ বাড়ি ফিরতে দেরি হবার সংবাদটা যে ও নিজে গিয়ে দেয় নি তার কারণও কিছুটা এই। শিবানীকে সংবাদটা দিতে খারাপ লাগছিল তার। বেদনাবোধ করছিল সে।

চেক ফিরিয়ে দেওয়ার ফলাফল কি হবে অরুণ জানত না। তবে ভাল কিছু যে হবে না, সে তো নিশ্চয়ই। অরুণ দেখল ইন্দ্রনাথ কলম তুলে নিল। আর একটা চেক লিখল তেমনি একটানে। তারপর চেকটা ফস্ করে একটানে ছিঁড়ে নিয়ে অরুণের হাতে দিয়ে বললে, আজ মাসের দশদিন। কিন্তু পুরোমাসের মাইনেই আমি আপনাকে দিলাম। মিঃ রায়কে আপাতত আপনার হাতের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন—আচ্ছা।

নিজের কামরায় এসে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল সে। চাকরীটা যাওয়ায় খারাপ ভালো কিছুই লাগছিল না তার। চাকরী এটা গেছে আর একটা হবে। আমাদের দেশের চাকরীর বাজারটাকে কি এতই সুলভ ভাবছিল অরুণ ? না, তা ভাবছিল না। বরং দুর্লভ যে কত, সে কথা সে জানে। কিন্তু ওর সবুর সইবে। বিয়ে করে নি। মা, ভাইবোনের বৃহৎ পরিবারের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে বাবা চোখ বোজেন নি। বরং বোন ক'টার ভালো বিয়ে দিয়ে, মার ষোড়শ শ্রাদ্ধ নিজ হাতে করে এবং নিজের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থার সঙ্গে উপরন্তু ওর জন্য গোটা দুই বাড়ি রেখে চোখ বুজেছেন। বড় রকমের কিছু নয় কিন্তু এখন পর্যন্ত একার পক্ষে যথেষ্টেরও বেশি সংস্থান রয়েছে ওর। তাই চাকরী যাওয়া নিয়ে সে কিছু ভাবছিল না। তবু সে কিছু ভাবছিল। মিঃ রায়কে ডেকে কাজ বুঝিয়ে দেবার আগে সে যে কেন এতক্ষণ চুপ করে বসে রইল তা অরুণের কাছেও স্পষ্ট নয় কিন্তু সে যে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল তা সত্য। দীর্ঘদিন বাদে অবশ্যি ওর এখনকার এই ভাবনাটা হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠে ওকে ভীষণ অবাক করে দিয়েছিল কিন্তু সে অনেকদিন পরের কথা—অনেকদিন পরে হবে। এখন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে তারপর মিঃ রায়কে ডেকে সে তার হাতের কাজ বুঝিয়ে দিল। মিঃ রায় অনেক দিনের লোক। পাকা লোক। কেবল বললেন, আপনার একাজ যে বেশিদিন টিকবে না আমি জানতাম। একটা ভালো এম-এ ডিগ্রী রয়েছে—কোথাও প্রফেসরি নিয়ে, বইপত্তর নিয়ে থাকুন গিয়ে। মনের সুখে থাকতে পারবেন মশাই। যার যে কাজ।

মিঃ রায়কে কাজ আর কাগজপত্র বুঝিয়ে দিতেই পাঁচটা বেজে গেল। এর ভেতর আর তার খাওয়ার কথা, খিদের কথা মনেও পড়ে নি। এখন যখন পড়ল তখন অফিস ছুটি হয়ে গেছে। সবাই চলে গেছে। ক্যান্টিন প্রায় বন্ধ হবার মুখে। আর ক্যান্টিনে গিয়ে বসে খাবার ইচ্ছেও তার ছিল না। অরুণ যখন অফিসের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে—ইন্দ্রনাথ তখন নিজের গাড়ি বাড়িতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে আগরওয়ালার গাড়িতে উঠছে। অরুণকে দেখে ইন্দ্রনাথ যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। যাকে অঙ্গুলী হেলনে এইমাত্র তাড়িয়ে দিয়েছে, তাকে দেখে অপ্রস্তুত—ইন্দ্রনাথ গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বাড়ি যাচ্ছেন ? বেশ, তবে—মিসেস সেনকে গিয়ে বলবেন, আমার ফিরতে আজ একটু দেরি হতে পারে।

এই সংবাদটা শিবানীকে দেবার ইন্দ্রনাথের কোন প্রয়োজন ছিল না ; ইচ্ছেও ছিল না। কিংবা তার চাইতে বলা ভালো—সাহসই ছিল না। কিন্তু ওই যে সাহস ছিল না তাই সাহস দেখাল সে অরুণের কাছে। অরুণের কাছে কেন দেখাল ? কারণ ওরই কাছে যে অপ্রস্তুত বোধ করছিল সে।

অরুণ মনে মনে হেসেছিল। মানুষের অহমিকাটা কি অদ্ভুত চিজ্!

বাড়ি এসে স্যুটকেশে জিনিসপত্র গুছিয়ে একটা কাঠে-ঝোলানো ব্যাগে টুকিটাকি ভরে রেখে সে গিয়েছিল শিবানীকে খবরটা দিতে এবং কিছু খেয়ে নিতে। খেয়ে নিয়েই সে বেরিয়ে পড়বে পুরীর গাড়ির উদ্দেশ্যে। ঠিক ক'টায় গাড়ি ও জানে না। তবে সন্ধ্যার পর আটটা-টাটটায় গাড়িটা ছাড়ে এটা সে জানে। তার ঢের সময় আছে। এখন তার সব আগে দরকার কিছু খেয়ে নেওয়া।

কিন্তু ওকে খেতে দিল না শিবানী। মুখের গ্রাস নামিয়ে, সামনের খাবার ফেলে ওকে উঠে যেতে হলো শিবানীর সঙ্গে। তারপর চা-খাবার আর একবারও এসেছিল তার ভাগ্যে। ললিতা পাঠিয়ে দিয়েছিল গাড়িতে। সে তখন অসহ্য গরমে গাড়িতে টিকতে না পেরে রাস্তায় নেমে পায়চারি করছিল আর ক্ষুধার তাড়নায় বিশ্বের খাদ্যবস্তু চোখের উপর প্রত্যক্ষ করছিল। এমন অবস্থায় হাতের কাছে খাবার—কে ড্রাইভার ভেবে গাড়িতে খাবার পাঠাল, আর গাড়িতে বসে খেতে দেখে কারা ওকে ড্রাইভার ভাবল এ নিয়ে মাথা ঘামাত না অরুণ। সে ঠিক খেয়ে নিত। কিন্তু মুশকিল হলো, এই যে আরো ক'টা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তার ড্রাইভাররা নেমে এখানে-ওখানে বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে—তারা কেউ ওকে ড্রাইভার ভাবছে না। এইমাত্র একজন এসে ওকে সা'ব সম্বোধন করে একটা ইংরেজী ঠিকানা পড়িয়ে নিয়ে গেছে। এ অবস্থায় সা'ব তো বাইরে গাড়িতে বসে খাবার খেতে পারে না।

সমস্ত দিন অনাহারে দুর্বলবোধ করছিল অরুণ। এ-বাড়ির ব্রেকফাস্টটা অত্যন্ত ভালো তাই বিকেল পর্যন্ত একরকম চলছিল কিন্তু এখন আর চলছে না। শিবানী ওকে তার সঙ্গেই দেখা করবার আদেশ করে গেলে অরুণের মনে হলো যাবে না। গাড়ি থেকে নেমে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকবে। স্যুটকেশ আর ব্যাগ তুলে নিয়ে চলে যাবে সোজা হাওড়া। তারপর এ-পরিবারের সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাত ঘটবার কোন কারণ নেই। অত্যাচারের একটা সীমা আছে। হ্যাঁ, ও পালাবে। পুরী এক্সপ্রেস চলে গেছে—তা চলে যাক। পুরী প্যাসেঞ্জার তো রয়েছে। ওটাতেই উঠে পড়বে সে।

গাড়ি থেকে নেমে সে তার আউট-হাউসের দোতলায় নিজের ঘরটার দিকেই তাকাল। কিন্তু স্যুটকেশ হাতে নিয়ে সে পালিয়ে যাচ্ছে—দৃশ্যটা কল্পনা করতেই তার ভারি হাসি পেয়ে গেল। যদি শিবানী দেখতে পেয়ে, এই দারোয়ান উস্‌কো পাকড়ো পাকড়ো বলে চেঁচিয়ে ওঠে!

হেসে ফেলল অরুণ।

দৃষ্টিটা ঘরের ভেতর ছড়িয়ে দিয়ে অরুণ গিয়ে দাঁড়ালো শিবানীর সামনে।

শিবানী নিজেও দাঁড়িয়েছিল। অরুণকেও বসতে বললে না। চোখ-মুখ বিদ্রূপে শাণিয়ে তুলে বললে, আপনার মতো বিশ্বস্ত অনুচর মি: সেনের আর ক'জন আছেন বলতে পারেন?

শিবানীর কথা শুনে অরুণের চোখের দৃষ্টিটা যে-রকম হয়ে উঠতে চাইছিল এবং যেভাবে গিয়ে সে দৃষ্টি শিবানীর মুখের উপর পড়তে চাইছিল তা সংবরণ করল অরুণ। যেমন ছড়ানো ছিল দৃষ্টিটা তেমনি ছড়ানো রেখেই বললে, আমি নতুন এসেছি তাই বলতে পারছি নে।

তবে পুরোনো হোন। জানুন। জেনে আমাকে বলবেন। আমি সবাইকে পুরস্কৃত করব। আর তার প্রথম পুরস্কারটা হবে আপনার প্রাপ্য।

বিশ্বস্ততার প্রথম পুরস্কার আমি থাকতে আর কারুর পাবার উপায়ও নেই। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে পুরস্কার নেবার সৌভাগ্য আমার হলো না।

এমন অভিব্যক্তিহীন মুখে এবং কণ্ঠে অরুণ কথাগুলি বললে যে, সে পরিহাস করলে, না সত্য সত্য বললে বোঝাই গেল না। অরুণের অবশ্যি আরো একটু ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছে ছিল বলে, আমার দুর্ভাগ্য, আপনার হাত থেকে সে পুরস্কার নেবার সৌভাগ্য আমার হলো না। কিন্তু 'আপনার হাত থেকে' কথাটা সামলে নিল। শিবানীর শাণান বিদ্রূপের উত্তরে যে বিদ্রূপ করবার তীব্র বাসনা তার জেগেছিল, সে বাসনাকে কিছুক্ষণ পূর্বে চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে ওঠা সংবরণ করার মতোই, সংবরণ করলে।

অরুণের কথা শুনে তখন কিন্তু শিবানীর বিদ্রূপভরা চোখের কোণে বিস্ময় দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে বিস্ময়টাকে সে স্পষ্ট হতে দিলে না। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে, কেন হবে না?

মি: সেন আমাকে জবাব দিয়েছেন। আমি চলে যাচ্ছি।

এবার শিবানীর দু'চোখের এ-কূল-ও-কূল দুকূল ছাপিয়ে যতটা বিস্ময় দুলে উঠতে চাইল ততটা বিস্ময় ফুটতে দিলে না সে। বিস্ময়ের পাশে বিদ্বেষও বজায় রেখে গম্ভীরকণ্ঠে বললে, আপনাকে, জবাব দিয়েছেন মি: সেন?

হ্যাঁ।

কেন?

আমি যদি আপনার কাজ করতাম শুধু ডেকে কথা না বলে এক্ষুণি আমাকে তাড়াতেন।

তাঁর নির্দেশ শোনেন নি আপনি?

আমার পক্ষে শোনা সম্ভব ছিল না।

শিবানীকে নীরব দেখে অরুণ বললে, কাজ দিয়ে আপনাকেও সন্তুষ্ট করতে পারলাম না, মি: সেনকেও না; সেজন্য আমি সত্যি দুঃখিত।

মি: সেনকে কাজ দিয়ে সন্তুষ্ট কেন যে আপনি করতে পারলেন

না সেটাই তো আমার আশ্চর্য ঠেকছে। এতক্ষণ তো তাঁর খুশি হওয়ার মতো অনেক কাজ করলেন আপনি আমি দেখতে পেলাম। কি নিয়ে মিঃ সেনের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন আপনি?

অরুণ চুপ।

শিবানী বুঝলে এ জিজ্ঞাসার জবাব মিলবে না। যেমন মেলেনি ইন্দ্রনাথ কোথায়, সে জিজ্ঞাসার জবাব। অপমানটা আবার আঘাত করলো। আবার দু'চোখে বিদ্বেষ ঘনিয়ে এলো। কঠিনকণ্ঠে বললে শিবানী, আপনি প্রথমেই বলেন নি কেন আপনার চাকরী চলে যাবার কথা?

আজ মাসের দশ তারিখ। মিঃ সেন মাইনে দিয়েছেন পুরো মাসের। আমি এখনও আপনাদের কর্মচারী। যতক্ষণ আছি যা আদেশ করবেন অবশ্যই আমাকে তা পালন করতে হবে।

না, এ লোকটার সঙ্গে সে পারলো না। ভেতরটা হতাশায় যেন হাত পা ভেঙে পড়ল শিবানীর। এর সঙ্গে আজ তার পুরো হার রয়ে গেল। কিন্তু মুখে সে রূঢ়কণ্ঠেই বললে, আচ্ছা, যেতে পারেন আপনি।

অরুণ চলে গেল।

শিবানী দখল বারান্দায় বেরিয়েই অরুণ হাতের কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে নিল।

নিজের ঘরে এসে বসে ভাবলে শিবানী অরুণ এমন কি কাজে আদিষ্ট হয়েছিল যে সে আদেশ পালন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না?

ইন্দ্রনাথ কি হুকুম করেছিল তাকে?

কি কাজ করাতে চেয়েছিল সে তাকে দিয়ে?

ও জানে না। অরুণ ওকে বলে নি।

কিন্তু তবু সে কথা জানে শিবানী। ঘটনার ইতিবৃত্তি না জানলেও বোঝা যা যায় তা জানার চাইতে এতটুকু কম হয় না। একটি ভদ্র ডিসেণ্ট ছেলের পক্ষে কিছুতেই করা সম্ভব নয় এমনি কিছু করতে বলেছিল নিশ্চয়ই ইন্দ্রনাথ অরুণকে।

স্বামীর লজ্জায়, নিজের লজ্জায় কেমন যেন ছোট লাগতে লাগল শিবানীর নিজেকে অরুণের কাছে। ওরা দু'জনই যেন ভীষণ নীচ প্রমাণিত হয়ে গেছে তার কাছে। অনুচরবৃত্তি আর নির্বিচার আজ্ঞাপালন অরুণের দ্বারা সম্ভব হয় নি বলেই যে তার পক্ষে সম্ভব লো না ইন্দ্রনাথের চাকরী বজায় রাখা, এ বুঝতে আর শক্তটা কি।

হায় ভগবান! বিশ্বস্ত অনুচর সহচর বলে গালাগাল করে, বিদ্রূপ করে এই লোকটাকে অপমানিত করতে গিয়েছিল সে!

এতক্ষণ শিবানী ভাবছিল তাকে নাজেহাল করেছে অরুণ। এখন ভাবলে অরুণকে নাজেহাল করেছে সে। লোকটার চাকরী গিয়েছে। কে জানে বেচারার বাড়ির অবস্থা কেমন। হয়ত মনে উদ্বেগের অন্ত নেই। কাচ্চি বলেছিল, ম্যানেজারবাবুর সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি। নিশ্চয়ই মনের অবস্থা এমন যে লোকটা খেতে পারে নি। তারপর সমস্ত দিন শেষে এসে খেতে চেয়েছিল—খাবার প্লেট সামনে টেনে মুখে খাবার তুলেছিল মাত্র। ও তাকে প্লেট থেকে টেনে তুলে গেছ। ললিতাদের বাড়িতে গাড়িতে খাবার পাঠিয়ে দিতে খোলে নি। সে খাবার ফেরৎ আসতে দেখেও নীরব থেকেছে। জেনেশুনে ক্ষুধার্ত লোকটাকে নিষ্ঠুরের মতো উপোস রেখেছে—আজ সে নীচতার শেষ সীমায় চলে গিয়েছিল যেন! লোকটা আজ সমস্ত দিন উপোসী—ভেতরটা ব্যস্ত হয়ে উঠল শিবানীর। কাচ্চিকে ডাকল সে। কাচ্চি এলে বিরক্তভরা কণ্ঠে বললে, তোরা সব কোথায় রয়েছিস? দেখাই নেই? রাত দশটা বাজে—খাওয়া-দাওয়া হবে না?

তোমাকে খেতে দিতে বলব?

হ্যাঁ বলবি—ম্যানেজারবাবু কোথায় খায়?

তাঁর ঘরে।

তাঁর খাবার দেওয়া হয়েছে?

দেখে আসছি।

একটু বাদে ফিরে এসে কাচ্চি জানাল, ম্যানেজারবাবু চলে গেছেন।

চলে গেছেন!

হ্যাঁ। স্যুটকেশ ব্যাগ কিছু নেই।

খেয়ে গেছেন?

না। বাবুর্চি বলল সে খাবার নিয়ে গিয়ে দেখে ম্যানেজারবাবু নেই।

শিবানীর মনে হলো, বিশ্বের জনারণ্যে যেন একটি খাঁটি লোক কাছে পেয়েও আবার হারিয়ে ফেলল। আর একে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

[ক্রমশ।

মল্লিকার ব্যথা

সবিতা দত্ত

নিজের অদৃষ্টকে বারে বার ধিক্কার জানায় তনিমা। সংসারে সকাল থেকে রাত্রি অবধি একটানা পরিশ্রমে মন তার পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা যদিও বা থাকতো, তবুও মনে শান্তি থাকতো। তা-ও নয়। সংসারে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। তা থেকে একটু ব্যতিক্রম ঘটলেই মুস্কিলে পড়তে হয় তনিমাকেই। নিত্যদিন এ আর ভালো লাগে না। সুরঞ্জন তো এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। মাসের প্রথমে নিয়মধরা মাইনেটি এনে তনিমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত, আবার বলে কি না, 'এ বোঝা আমার নহে, তোমার'। এবার যত দায়-দায়িত্ব তনিমা বুঝবে। কোনটাই তো বাদ দেওয়া চলে না, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারেই তো চলে যায় সুরঞ্জনের আয়ের এক-চতুর্থাংশ তারপর সবই বাকি, দশ তারিখ অবধি শুধু টাকা দেবার পালা চলে। নিজস্ব সখ-সাধ সব কিছু বিসর্জন দিতে বসেছে তনিমা। আজ আর কিছুই ভালো লাগছে না। মনটা তিক্ত অবসাদে ভরে গিয়েছে। সুরঞ্জনের ওপর রাগ তত বেশি হচ্ছে। আজ একটা বোঝাপড়া সে করবেই।

নিস্তব্ধ দুপুরে ক্লান্ত মন নিয়ে একটা শেলাই হাতে বসেছিল তনিমা। হঠাৎ সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে সামনে মল্লিকাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় তনিমা। দশ বছর পর দেখা, কিন্তু বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি মল্লিকার। পরনে ঘি রঙ-এর মুর্শিদাবাদী শাড়ি, কালো ব্লাউস, চোখে চশমা, হাতে বালা আর ঘড়ি। ছিপছিপে দেহ, সুন্দর মুখশ্রী। হঠাৎ দেখলে তরুণী বলে ভ্রম হয়। মল্লিকা যে তনিমারই সমবয়সী, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না হয়তো।

—কি রে চিনতে পারছিস না নাকি? তনিমার চমক ভাঙায় মল্লিকা।

মল্লিকাকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে আসে তনিমা।

—আমি কখনও কল্পনা করি নি মলি, তুই আসবি গরীবের কুঁড়েঘরে। খুশির আতিশয্যে তনিমা বলে।

—থাক থাক্ আর ভদ্রতা করতে হবে না। বাধা দেয় মল্লিকা।

কত প্রশ্ন একসাথে মনে জাগে তনিমার। একই কলেজে পড়তো দুজনে একই চিন্তাধারা ছিল দুই তরুণী-মনের, আর আজ? কত প্রভেদ দু'টি নারীর জীবনধারায়। দু' বছর কলেজে পড়বার পরই তনিমার বিয়ে হয়ে যায় তারপর মাঝে দু' একবার দেখা হয়েছিল মল্লিকার সংগে, কিন্তু এবারের দেখা দীর্ঘদিন পরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি পরীক্ষাতেই সসম্মানে উত্তীর্ণা হয়ে মল্লিকা একটি মেয়ে-কলেজের অধ্যাপিকা হয়েছিল। স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করবার বাসনা পোষণ করতো মল্লিকা, এতদূর খবরই জানা ছিল তনিমার। তারপর এতদিনের বিচ্ছেদে সে সবই ভুলতে বসেছিল। তনিমার ছোট ছেলে রাণা ঘুম থেকে উঠে এসে অপরিচিতাকে দেখে মাকে জড়িয়ে ধরে।

মল্লিকা রাণাকে আদর করে বলে—কটি ছেলেমেয়ে?

তনিমা মৃদু হেসে জবাব দেয়—তিনটি, দুটি ছেলে একটি মেয়ে, বড় দু'টি স্কুলে গেছে।

মল্লিকা তনিমার ঘরের চারপাশে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। সমস্ত বাড়িটিতে যেন লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করছে। তনিমার কল্যাণকর স্পর্শ চারিদিকে সুস্পষ্ট। সোফা-কৌচ, রেডিয়োগ্রাম আলমারীতে ঘর ভরা নেই, চোখ ঝলসানো বস্তুও কিছু ঘরে নেই, কিন্তু চোখ জুড়োয় মন ভরে যায়। যেখানে যা আবশ্যক তাই দিয়ে যেন সাজানো সংসারটি। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটি ফুল বাগান, নানাবর্ণে গৌরভে সুরভিত হ'য়ে আছে। সবুজ কচি ডালপালাগুলো সজীব জীবন্ত হয়ে হাওয়ায় দুলছে। এই স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশের স্পর্শে মল্লিকার রিক্ত-হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে, হাহাকার করে ওঠে মন। নিজের অধ্যাপনার দৃঢ়তা যেন শিথিল মনে হয়। তনিমা আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছে কিন্তু মাতৃত্বের কমনীয় লাবণ্য ওর সারা অঙ্গে জড়ানো, অতি সাধারণ আটপৌরে পোষাকেও তনিমাকে অপূর্ব লাগে মল্লিকার চোখে। নিজের ক্ষত স্থানে যেন জ্বালা ধরে।

হাঁ, তারও জীবনে বসন্তের আবির্ভাব হয়েছিল বৈ কি, তবে সে বড় স্বল্পক্ষণের জন্যে। অরুণাভকে সে বিশ্বাস করেছিল, বিদেশ যাত্রার দিনে বিদায়ের ক্ষণে মল্লিকার হাতটি গভীরভাবে ধ'রে ধরা গলায় বলেছিল নবীন ব্যারিস্টার অরুণাভ মিত্র—আমার পাশে তুমি না দাঁড়ালে ব্যর্থ হয়ে যাবে আমার জীবন, কথা দাও মলি।...কণ্ঠে কি গভীর ব্যাকুলতা ছিল, দৃষ্টিতে ছিল আশ্বাস।

সেদিন মল্লিকার চোখের পাতা ভারী হয়ে গিয়েছিল, ছলছল চোখে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল। কিন্তু তার সবই ভুল। সবই ব্যর্থ। উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশ গেল অরুণাভ, সে শিক্ষা নিয়ে সেখানেই ঘর বাঁধলো বিদেশিনীকে জীবনসঙ্গিনী করে। মুছে গেল তারই মুখাপেক্ষিনী প্রেয়সী মল্লিকাকে। ভুলে গেল আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত সমাজকে, অন্ধ মোহে সেখানেই সে রয়ে গেল। এ খবর পাবার পর মল্লিকা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল, সমস্ত পুরুষ জাতটার ওপরই ঘৃণায় বিদ্বেষে মন ভরে গিয়েছিল। না না, আর সে ওপথে যাবে না, নিজে স্বাধীন স্বাবলম্বীভাবে জীবন কাটাবে, কারোও সংস্পর্শে নিজেকে সে জড়াবে না। তার মনের এই গোপন ক্ষতটি কিছুতেই শুকাতে পারে না, কত জ্বালা, কত ব্যথা কাকে বোঝাবে সে। গলাটা শুকিয়ে আসে মল্লিকার, তনিমার কথায় তন্ময়তা ভাঙে।

—কি রে, কি অত ভাবছিস? কত সহজ প্রশ্ন তনিমার।

—কই, কিছু না তো। তোকে দেখে বড্ড ভালো লাগছে রে তনু। ছেলেটাও ভারি সুন্দর।

তনিমা অনুযোগ করে—তোর খবর কি বল? বিয়ে যে করিস নি বুঝতেই পারছি, সারা জীবন কি এইভাবে কাটাবি?

মল্লিকা রসিকতা করে বলে—কি আর করি বল্, মনের মানুষ পেলাম কই? অন্তরের বেদনা গোপন করে।

—এখনও সময় আছে, তোর মত কি?

—বুড়ো বয়েসে আর ও-প্রশ্ন কেন? নিজে স্বাধীনভাবে জীবন কাটাব ব'লে বিয়েতে অমত ছিল, এখন সে সময় পেরিয়ে গেছে—বাকি জীবন এমনি করেই কাটিয়ে দেব। এখন ছুটিতে আছি, এখানে চেঞ্জে এসেছি। কোলকাতায় তোর দাদার সংগে দেখা হয়েছিল সেখানেই তোর ঠিকানা পেলাম, একটু থেমে আবার বলে মল্লিকা—মা বাবা মারা যাবার পর নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ লাগে, দাদারা বিদেশে, দিদি শ্বশুর বাড়িতে, এত সম্পত্তি নিয়েই বা আমি কি করব, এই দেখ না, টাইফয়েড হয়েছিল, বাড়িতে কেউ নেই, নার্সিং হোমে যেতে হয়েছিল।

নার্সিং হোমে? চমকে ওঠে তনিমা। সামান্য অসুখে নার্সিং হোমে যেতে হয় মল্লিকাকে, ওখানের ডাক্তার নার্সদের কোনও মায়া-মমতা থাকে নাকি? শুধু কর্তব্য ছাড়া ওরা কিছু জানে না। গতবছর তনিমার অসুখে কি অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষাই না করেছিল সুরঞ্জন। মায়ের পরে একমাত্র এই মানুষটিই এত পরিচর্যা করেছিল তনিমার। এমন দরদ দিয়ে আর কেউ সেবা করতে পারে বলে তো মনে হয় না।

স্বল্পক্ষণের মধ্যেই মল্লিকার মনোবেদনার অনেক কথা জেনে ফেলে তনিমা। রূপ, যশ, অর্থ প্রতিপত্তি কোনও কিছুরই অভাব নেই মল্লিকার জীবনে, অভাব শুধু মনের। সেখানে শান্তি নেই, সান্ত্বনা নেই সহানুভূতি জানাবার কোনও মানুষ নেই। অরুণাভ মিত্রের নাম উল্লেখ করে না মল্লিকা। বলে—বাইরের বিচারে আমি সর্বজয়ী, কিন্তু অন্তর আমার রিক্ত, শূন্য। তুই ভাই মনের মত সংগী পেয়েছিস, তোর 'মনের খবরের জন্যে একজন সর্বদা প্রস্তুত হয়ে আছে, সকলের ভাগ্যে তো সব সুখ সয় না কি বলিস?

শেষের কথাগুলো তনিমার কানে যায় না, মনে পড়ে সুরঞ্জন কতবার বলেছে—তোমার চোখের মধ্যে আমি তোমার মন দেখতে পাই। ছিঃ! ছিঃ! এত সৌভাগ্যকে সে উপেক্ষা করতে চাইছিল সামান্য একটু আর্থিক টানাটানিতে, চেতনা জাগে তনিমার।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর মল্লিকা উঠে পড়ে। তনিমা রাগ করে।

—বারে এতদিনপর দেখা, একটু মিষ্টি মুখ না করেই যাবি? কণ্ঠে অভিমান।

—না রে এখন একটু নিয়মে আছি কি না সেজন্য। অন্যদিন এসে তোর রান্না খেয়ে যাব।

তনিমা সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়, নিজের হাতে তৈরি করা মিষ্টি-খাবার এনে দেয়—বলে এ ঘরের তৈরি এতে অসুখ হবে না।

পরম তৃপ্তিতে মল্লিকা সবই গ্রহণ করে।—চমৎকার হয়েছে ভাই, আমার একক জীবনে এ-সব সুস্বাদু খাদ্যের স্বাদ থেকে আমি বঞ্চিত। চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে মল্লিকার কণ্ঠ থেকে।

আবার একদিন আসার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে বিদায় নেয় মল্লিকা। অপরাহ্ণের বেলা পড়ে আসে। তনিমা নতুন উৎসাহ নিয়ে সংসারের কাজকর্ম সুরু করে দেয়। ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে ফিরবে, সুরঞ্জন অফিস থেকে। ঝি উনানে আগুন ধরিয়েছে, সারা ঘর ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে তব এখন একটুও বিরক্ত হয় না তনিমা। মল্লিকার ব্যথা তনিমা অনুভব করে। ধনী কন্যা রূপসী বিদুষী মল্লিকার মন কি না রিক্ত! তার তুলনায় নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে হয়। রাত্রে শোবার ঘরে গিয়ে তনিমা নিদ্রামগ্ন সন্তানদের মুখগুলি প্রাণ ভরে অতৃপ্ত নয়নে বারে বারে দেখে।

সুরঞ্জন বই পড়ছিল, তনিমার সাড়া পেয়ে রসিকতা করে বলে—কি গো রাণী কাজকর্ম সারা হল?

অন্য দিন হলে তনিমা রাগ করতো, দু'-একটি কথা বলতে ছাড়তো না কিন্তু আজ নতুন করে তার মনে পরিপূর্ণতা এসেছে দারিদ্র্যের জন্যে যেটুকু ক্ষোভ ছিল, তা-ও মুছে গেছে মল্লিকা আসার পর। সারা মন আজ ভরে গেছে পরম শান্তিতে সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মাথা নীচু করলো তনিমা।

চাইবো না মা

শ্রীমতী বসুমতী চট্টোপাধ্যায়

সেদিন যখন তোর কাছে 'মা'
চাইলাম গো চিনি
তুই বললি; ভাত খেয়ে নাও,
ভাত খেয়ে নাও মিষ্টি বিনি
কতদিন যে খাই নিকো মাছ।
আজ কেন গো দিস্ নিকো আঁচ?
আজকে আমার বড্ড খিদে
খেতে দেগো ভাত।
ও কি! চোখে কেন দিলি চাপা—
তোর ঐ নিরাভরণ হাত?
কাঁদলি এমন অঝোর ঝরে।
ছেলে বুঝি তোর গেছেই মরে।
চুপ কর মা আর কখন—
চাইবো নাকো ভাত
চোখের ওপর দিস নে চাপা
তোর ঐ নিরাভরণ হাত।

বিগত নায়িকা

শ্রীমতী রমা মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ দুপুরে বৃষ্টি অঝোর অধীর,
দ্বারবন্ধ ঘরে বসে আছি মনস্থির;
আজ আর কোথাও না শুধু রব ঘরে,
অবিরাম বৃষ্টি ঝরে শেওলার পরে;

হারায় অবুঝ মন চিন্তার রথ,
মনে পড়ে বহুদূরে ফেলে-আসা পথ;
কোথায় ঋষির গুহা জ্যোৎস্নার ঘট,
বিস্মৃতির লুপ্ত পটে আঁকা দৃশ্যপট;

ক্রমে ক্রমে লুপ্তপ্রায় অজন্তা ইলোরা,
আধুনিক সভ্যতায় পাশ্চাত্য ইসারা
অর্বাচীন বলে সবে বুদ্ধিজীবে ক্ষমা,
গ্রামীণ দু' চোখে ভাসে পল্লীর প্রতিমা।

বস্টন প্রবাসের দিন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণা বসু

আমেরিকার কলকাতা

বস্টন অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমাদের বেশ আপনার হয়ে পড়ল। এর কারণ কি ভাবতে গিয়ে অনেক সময় মনে হয়েছে বস্টন আর কলকাতা এই দুই শহরের জীবনধারায় কোথায় যেন রয়েছে এক সূক্ষ্ম সাদৃশ্য। তাই কোন বস্টনিয়ান কলকাতায় এলে সহজেই 'অ্যাট্ হোম' বোধ করেন। একই অনুভূতি হয় কলকাতাবাসীর বস্টনে।

বেশ কিছুকাল আগে আমাদের একজন বস্টনিয়ান বন্ধু কলকাতায় এসেছিলেন। হার্ভার্ডের অধ্যাপক। বস্টনের সঙ্গে তখন আমার পরিচয় হবার সম্ভাবনাও ঘটে নি। এই অধ্যাপক বন্ধু কলকাতা ঘুরে-ফিরে দেখলেন। কিন্তু শুধু বাইরের চেহারা দেখে সন্তুষ্ট না থেকে ইনি কলকাতার জীবনের সঙ্গে যতদূর সম্ভব অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেছিলেন। কলকাতার প্রকৃত বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করতে ইনি উৎসুক হলেন, সাধারণত ট্যুরিস্টরা তাদের চারপাশে সমাজের যে জীবদের দেখেন তারা নয়। বাংলা সিনেমা দেখলেন, দেখলেন বাংলা থিয়েটার। মুগ্ধ হলেন। কলকাতা তথা বাংলা দেশের প্রাণে প্রাণে যে একটা শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতির ফল্গুধারা বয়ে চলেছে সেটা তাঁর নজর এড়ায় নি।

ফিরে যাবার সময় তিনি বললেন, তোমাদের কলকাতা ঠিক যেন আমাদের বস্টন। সেদিন এ কথাটার মানে আমি ঠিক ধরতে পারি নি। কিন্তু বস্টনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর ওঁর বক্তব্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাস্তবিক আমারও ঘুরিয়ে বলতে ইচ্ছে হত—বস্টন যেন আমেরিকার কলকাতা।

এই মিল যে ঠিক কোনখানে তা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এ তো বাইরেকার সাদৃশ্য নয়, এ হল ভাবের মিল, স্পিরিটের মিল। কলকাতার মতই বস্টনের একটা নিজস্ব স্পিরিট আছে। ওপর থেকে চট করে সেটা ধরতে পারা যায় না। রাজধানী ওয়াশিংটনে একটা সাইট-সিয়িং ট্যুর করে এলে শহরটা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা হয়ে যায়। তেমনি নিউইয়র্কের ধন-জন-সমৃদ্ধি যে কোন নবাগন্তুকেরও চোখে পড়বে। কিন্তু বস্টনে কিছুদিন বসবাস না করলে তার স্পিরিটটা ঠিক ধরা যায় না। তাই বোধ হয় ওরা বলে Boston grows on you. একটা হেক্‌টিক্ ট্যুরের মাঝখানে কোনমতে চব্বিশ ঘণ্টা কলকাতায় কাটিয়ে যে সব বিদেশী ট্যুরিস্ট কলকাতার বিচার করতে বসেন—তাঁরাও করেন মারাত্মক ভুল। কারণ বস্টনের মতই কলকাতাও grows on you.

বাইরেকার চেহারায় বস্টন নিতান্ত সাধারণ পুরোন শহর। আর পাঁচটা আমেরিকান শহরের মত ঘোর আধুনিক নয়। অধুনা বস্টন-প্রবাসী কোন কোন নিউইয়র্কার আমাদের কাছে দুঃখ করতেন বস্টন যথেষ্ট ফ্যাস্ট (fast) নয় বলে। এই তো আমি কিছুদিন
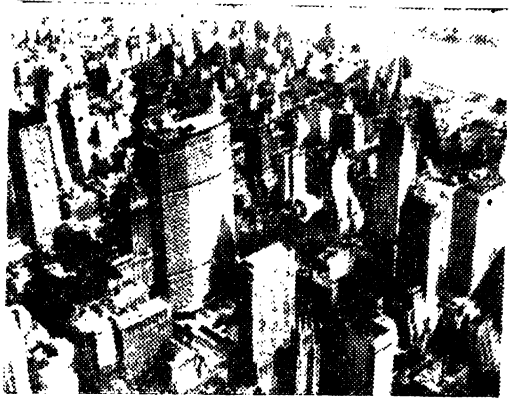
নিউইয়র্ক শহর প্রথম সাক্ষাতে

চারতলার এপার্টমেন্টে রইলাম সেখানে এলিভেটর ছিল না। সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামা করতে প্রাণান্ত। যে দেশে এলিভেটর, এস্কেলেটরের ছড়াছড়ি সে দেশে এ কি দুর্ভোগ! ময়লা ঝুড়ি হাতে নিয়ে পাঁচতলা ভেঙে রোজ নামি বেসমেন্টে ময়লা ফেলতে। আর নিউইয়র্কের বাড়িতে সিঁড়ির পাশে ছিল দরজা, খুলে একটা পাইপের ডালা তুলে ময়লা ফেলে দিতাম টুক করে—আর ধাঁ করে চলে যেত জানি না ঠিক কোথায়—মোটের ওপর যথাস্থানে।

বরফ পড়ত যেদিন খুব বেশি বস্টনের পথঘাট, গাছপালা, গাড়ি, বাড়ি সবই যেত সাদা হয়ে—সেদিন দেখতে বড় সুন্দর হত। কিন্তু এ রূপ ক্ষণস্থায়ী, একদিন বড় জোর দুদিন। তৃতীয় দিনে শুরু হল বরফ-গলা রাস্তায় এখানে-ওখানে বরফ-গলা জল, অর্ধেক গলে-যাওয়া বরফ, পিছল কঠিন বরফের চাঁই। সাবধানে পথ চলতে চলতে হঠাৎ ভুল হয়ে যেত বর্ষণসিক্ত কলকাতার পথে হাঁটছি বুঝি-বা। যে শহরের লোক যত বেশি বুদ্ধিমান সে শহরের মিউনিসিপ্যালিটি তত বেশি অপদার্থ—সেবার কলকাতায় তদানীন্তন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত

চার্লস নদীর তীর: এপারে বস্টন ওপারে হার্ভার্ড

গ্যালব্রেথ যখন এই গ্যালব্রেথস ল' ঘোষণা করলেন তখন আমার নতুন করে মনে পড়ে গেল বস্টনের সেই থস্থসে খোটাটা।

বস্টনিয়ানদের হাবভাব চাল-চলনের সঙ্গে কোথাও কোথাও আমাদের মিল আছে যথেষ্ট। অন্তত তাদের নামে যে নিন্দা চলিত আছে তার অনেকগুলো আমাদের ওপরও প্রযোগ করা হয় কখনো কখনো। বস্টনের লোকেরা নাকি বেজায় অহংকারী—যুক্তরাষ্ট্রের অন্য অঞ্চলের লোকেদের এই এক অভিযোগ। সবই তাদের ভাল, সবই তাদের অত্যাশ্চর্য। এ নিয়ে অনেক ক্লাসিকাল গাট্টা আছে। তারই একটা হল ওখানকার খামখেয়ালী ওয়েদার সম্পর্কে।

বস্টনের আবহাওয়া লোকেদের সর্বক্ষণ একটা অনিশ্চয়ের মধ্যে ফেলে রাখে। এই গরম তো এই ঠাণ্ডা। কখন কি জামা-কাপড় পরে বাইরে যাব এই এক চিন্তা। ওভারকোটটা কি নেব না উলের জ্যাকেটটাই চলবে? মাথায় বাঁধার রুমালটা নেবার আজ আর বোধ হয় দরকার নেই, তেমন তো কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে না। তারপর হয়ত একরাশ জামা-কাপড়ের বোঝা অকারণে বয়ে বেড়াতে হল। নয় তো শীতে ফিরে আসতে হল মাঝরাস্তা থেকেই। খবরের কাগজ হাতে আসতে লোকে তাই প্রথমেই চোখ বলিয়ে নেয় ওয়েদার-রিপোর্টের ওপর।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশে স্কুল-কলেজের মেয়েরা বেবী-সিটারের কাজ করে অর্থোপার্জন করে

বস্টন গ্লোব না বস্টন হেরাল্ড—কোন্ কাগজ যেন দিন দুই ওয়েদার রিপোর্ট দিচ্ছিল 'সানি টু-ডে এ্যাণ্ড টু-মরো' অর্থাৎ আজ রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন গেল এবং কালও তাই থাকছে। এর মধ্যে তৃতীয় দিন খবরের কাগজ খুলে সবাইর চক্ষুস্থির—ছাপা হয়ে গেছে, 'সানি টু ডে এ্যাণ্ড টু-নাইট'—অর্থাৎ আজ রৌদ্রকরোজ্জ্বল রাত্রি। নিন্দুকেরা বললে, জানি বস্টনে সবই সম্ভব তাই বলে রাত্তিরে রোদ্দুর?

বস্টনবাসীরা সাধারণত চাপাস্বভাব। তারা সহজে লোকের সঙ্গে মিশতে চায় না। মিশবার যোগ্য লোক তাদের চোখে পড়ে না। বস্টনের উদ্দেশ্যে টোস্ট প্রপোজ করতে গিয়ে একদা ডিনার টেবিলে জন কলিন্‌স্ বসিডি যে চার লাইন কবিতা রচনা করেছিলেন, তা আজও অমর হয়ে আছে—

And here is so good old Boston
The home of the bean and the cod
Where the Lowells speak only to Cabots
And the Cabots speak only to God.

উন্নাসিকতার এই অপবাদ সত্য কি না জিজ্ঞাসা করেছিলাম একজন খাঁটি বস্টনিয়ানকে। সে বললে, লোকে আমাদের ভুল বোঝে, কারণ ইমোশনের বহিঃপ্রকাশ আমাদের কম। আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে ওয়েস্ট কোস্টে লোকেরা নিতান্ত অল্প পরিচয়ে হা—ই বলে পিঠ চাপড়ে দেবে, টেলিফোনে এ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে হুট করে এসে উপস্থিত হবে বাড়িতে, এসে বেল্ বাজাবে না গড়গড় করে ঢুকে পড়বে কিচেনে। একজন খাঁটি বস্টনিয়ান এগুলোর কোনটাই করবে না। কিন্তু চাপাস্বভাব বস্টনিয়ান যখন একবার একজনের বন্ধুত্ব মেনে নেবে তখন তা নেবে অকপট আন্তরিকতার সঙ্গে। কিন্তু পিঠ-চাপড়ানো, লোক-দেখানো বন্ধুত্বের গভীরতায় আছে সংশয়ের অবকাশ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট যখন ট্যাফট্ একবার এক আগন্তুক হার্ভার্ডে গেলেন লাওয়েলের সঙ্গে দেখা করতে। লাওয়েল তখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট। বিশেষ কাজে লাওয়েল সে সময় গেছেন ওয়াশিংটনে ট্যাফটের সঙ্গে ছিল জরুরী এ্যাপয়েন্টমেণ্ট। আগন্তুক অতশত জানেন না—ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে খোঁজ করতে জবাব পেলেন—The President is in Washington seeing Mr. Taft!

এই সব নিছক গল্পের অন্তরালে রয়েছে বড় একটা সত্য। তা হল এই নগরের ঐতিহ্যে নাগরিকদের একান্ত বিশ্বাস। সকলেরই মনের ভাব I am a citizen of no mean city. আর সত্যিই তো তারা যে-সে শহরের অধিবাসী নয়। সেকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র, পরবর্তীকালে সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পকলায় আপন বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ অভিজাত রুচি শহর এই বস্টন। বস্টনিয়ানদের হাবভাব নিয়ে যতই কেন না হাসাহাসি করুক আবার তাদের আভিজাত্যের ভাগটুকুও ছাড়ে না কোন আমেরিকান। আমি বস্টনে জন্মেছি, বর্ন ইন্ বস্টন বলতে পারা এখনো মস্ত বনেদীয়ানার পরিচয়।

যদি বলি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় জীবনের শুরু এই বস্টনে তবে বোধ হয় ভুল হয় না। কারণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃত্বে বস্টনের

ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। 'বস্টন ম্যাসাকার' আর 'বস্টন টি পার্টি' দু'টি কথা আমেরিকান স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সুপরিচিত। তাদের গায়ে ইটপাটকেল ছোড়া হয়েছিল এই অজুহাতে একদল বৃটিশ সৈন্য বস্টনের পথে গুলী করে মেরে ফেলল পাঁচজনকে, আহত হল আরো অনেকে। এই বস্টন ম্যাসাকারের খবর চকিতে ছড়িয়ে পড়ল অন্য সব কলোনীতে আর সেইসঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল ক্রোধের আগুন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে বস্টনের বন্দরে বাঁধা বৃটিশ জাহাজে রেড ইণ্ডিয়ানদের বেশ পরে প্রায় একশ' লোক হানা দিল একরাত্রে। নতুন আইনমতে চা বেচবে বলে বাক্স বোঝাই চা ছিল জাহাজে। সব চায়ের বাক্স ঝুপঝাপ জলে ফেলে দিল বিক্ষোভকারীরা তাদের শ্লোগান ছিল 'বস্টন হার্বার, এ টি-পট টু-নাইট।' বস্টন টি-পার্টির ষড়যন্ত্র যে বাড়িতে বসে করা হয়েছিল—সেই ওল্ড সাউথ মিটিং হাউস আজও সবাই দেখতে যায় বস্টনে।

বস্টনের কাছেই লেক্সিংটনে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম গুলী ছোড়া হয়েছিল। এ গুলী ছুড়েছিল কে তা অজানাই রয়ে গেছে। বৃটিশরা বলে আমেরিকানদের কেউ আর ওরা বলে না বৃটিশ সেনাদের কেউ। সে যাই হোক, এ রহস্যময় গুলীর আওয়াজ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল চারদিকে। আর সেখান থেকেই সুরু হয়ে গেল দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। বস্টনের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে বাংকার হিল স্মৃতিস্তম্ভ তারই স্মরণে।

পল রিভিয়ের বস্টনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগের রোমান্টিক হিরো। নর্থ স্কোয়ারে তাঁর বাড়িটি ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে রক্ষিত আছে। লেক্সিংটনের যুদ্ধের আগের রাত্রে এই বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে গোপনে বেড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যান তিনি। বৃটিশ সৈন্য সমাবেশ সম্পর্কে আমেরিকান সেনাদের সতর্ক করে দেওয়ার ভার ছিল তাঁর। এই নৈশযাত্রা এখন প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে।

Listen my children and you shall hear
Of the midnight ride of Paul Revere.

পল রিভিয়ের বাড়ির মত ওল্ড নর্থ চার্চটিও রক্ষিত হয়েছে। এই চার্চের চূড়া থেকে আলোর সংকেত পাঠানো হয়েছিল বৃটিশ সেনাদের গতিবিধি সম্পর্কে—কোনপথে আসছে তারা জলপথে না স্থলপথে?

One it by land, two it by sea এই নাকি ছিল সংকেত।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিক্ষোভ শান্ত হয়ে যাবার পর অনেকদিন ধরে বস্টন ছিল নিউ ইংলণ্ডের তথা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক রাজধানী। শিক্ষা দীক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা সবকিছুর নেতৃত্ব বস্টনে।

ম্যাসাচুসেটস্, নিউ হ্যাম্পশায়ার, মেইন, ভেরমণ্ট, রোড আইল্যাণ্ড এই নিয়ে হল নিউ ইংলণ্ড। প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক সবদিক থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীতে সারা নিউ ইংলণ্ডে লেগেছিল নবজাগরণের ঢেউ—নিউ ইংলণ্ড রেনেশাঁস নামে তা

ইতিহাসে লিপিবদ্ধ। আর বস্টন হল এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু দি হাব্ অফ নিউ ইংলণ্ড। কেম্‌ব্রিজ আর কনবর্ডকে যদি বৃহত্তর বস্টনের মধ্যে ধরে নেওয়া যায় তবে তো কথাই নেই। ইতিহাস, রাজনীতি থেকে স্বরু করে সাহিত্য-শিল্পকলা সবকিছুতে দেখা দিল এক বলিষ্ঠ, উদার চিন্তাধারা।

নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল চারদিকে—লাইব্রেরি, আর্ট মিউজিয়াম, সিম্ফনি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম খবরের কাগজ প্রকাশিত হল বস্টনে—নিউজ উইক ১৭২০ খৃষ্টাব্দে। প্রথম ম্যাগাজিন তা-ও বার হল বস্টন থেকে—প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল প্রতিবেশী হার্ভার্ডে। বিশ্বের মনীষা-রাজ্যে বস্টন তার স্থান করে নিল। আর জাতীয় জীবনে? বস্টন আজ যা ভাবে সারা আমেরিকা কাল তা ভাবে অবস্থা দাঁড়ালো সেইরকম।

[আগামীবারে শীতের হাওয়ায়।

তুমি বিচিত্র

পূরবী চক্রবর্তী

রাস্তার ধার ঘেঁষিয়ে গাড়িটাকে পার্ক করলাম। নামতে যাব —আর তখনই চমকে উঠলাম আমি। সামনের ওই অতিকায় হলদে-সবুজ বাই-কালারের 'লেফট্ হ্যাণ্ড ড্রাইভ'-মার্কা এতক্ষণ অনড় ডজটির এঞ্জিন মুহূর্তে সচল হয়ে উঠল, আর লাফিয়ে কিছুটা পিছনে সরে এসে যেন অতর্কিত আঘাতে বিধ্বস্ত করে দিতে চাইল এত সাধের এই ক্ষুদ্রকায় ফিয়্যাট-টিকে। আমার সব সাধ আর সাধ্যকে যেন গ্রাস করতে চাইল বৃহত্তের দম্ভে! স্বাভাবিক প্রেরণাতে আবার হাতের চাবি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হল। কিন্তু স্টার্ট দিয়ে পিছিয়ে গিয়ে সামলে নেবার আগেই সবাহন আমাকে অক্ষত রেখে তীব্রবেগে সে উধাও হয়ে গেল দৃষ্টির অন্তরালে। হ্যাঁ, অন্য গাড়ির বাধাই ছিল সম্মুখে। আর বড় রাস্তায় পড়ে টার্ন নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংকেতের রক্তিম দপদপানিও যখন শেষ হয়ে গেল—তখনই বুঝি আত্মস্থ হলাম আমি। কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। এতকিছু ঘটে গেল এই কয়েক মুহূর্তের অবকাশে। ঘটনার আকস্মিকতার যত বিস্মিত বিচলতা—সব যেন এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল আমার দুই অবাক্-চোখের তারায় তারায়। ছাড়া পেয়ে এবার বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত উছলে উঠল আর ভাসিয়ে দিল আমাকে ভাবনার অথৈ স্রোতে।

ওই নিউ মডেলের কার-টি আমার অচেনা সন্দেহ নেই। কিন্তু বিনা ক্ষয়ক্ষতিতে অমন ঝাঁপিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে আমার জানায় শুধু একজনই পারে। আর অর্পণ সেনের চেনাতেও তো সেই একজনই আছে—মোটর ড্রাইভিং যার কাছে ছেলেখেলা মাত্র। জীবন নিয়ে—সে নিজেরই হোক আর পরেরই হোক—খেলা করতেই যে ভালবাসে।

ঠোঁটের কোণের হাসিটুকু চেপে নিলাম। হয় তো বা ক্ষোভের হাসি আপনিই মিলিয়ে যায়। গাড়িতে লক্ করে, স্টেথোসকোপ আর ব্যাগটি হাতে ঝুলিয়ে দরজার পথে অগ্রসর হলাম। ফ্ল্যাট সিস্টেমের বাড়ি। তাই সর্বদাই মুক্তদ্বার। সিঁড়ি বেয়ে যেখানে হাজির হলাম, তাকে কোনমতেই ফ্ল্যাট বলে ভুল করা চলে না। নীচু-ছাদের মেজানিন। প্ল্যান স্যাংশনের সময় বাড়ির মালিক নিশ্চয় কর্পোরেশনের কাছে ঘরটির শয়নকক্ষ ভিন্ন অন্য কোন সংজ্ঞাই নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু কিছু বেশি উপায়ের মোহ তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। অল্পবিত্তের লোকের কাছে স্বল্প ভাড়ার এই ঘরটিই যথেষ্ট। এখন তাই তার যে রূপ—তাকে ড্রইংরুম কাম ডাইনিংরুম বা বেডরুম কাম কিচেন—যে কোনও নামেই অভিহিত করা যায়। স্যানিটেরির ব্যবস্থা নীচে দরওয়ান-চাকরদের সঙ্গে একত্রে। অত্যল্প আয়ের ভদ্র-শিক্ষিত পরিবারে বিলাস-প্রাচুর্য—দুরাশা। ঘরে সকল কিছুই সাজান আছে হয় তো সুন্দরভাবে। একজন বেডরিডনের পক্ষে অপরিহার্য সবই আছে সেখানে। তবু এই বিচিত্র সম্ভারের সমাবেশ নিঃসন্দেহে অনভ্যস্ত চোখকে পীড়া দেয়। কিন্তু আমি ডাক্তার। কতরকম পরিবেশেই না আমাকে যেতে হয়। আর এ তো নিতান্ত চেনামহল। তাই অভ্যাসের চোখেই আমি দেখে নিলাম—ঘনায়মান সন্ধ্যায় প্রায়ান্ধকার একলা ঘরে বিছানার একান্তে শুয়ে আছে আমার রোগী।

বালিশে মুখ গুঁজে রয়েছে সে। থেকে থেকে কি যেন এক অবরুদ্ধবেদনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে তার বিশীর্ণ দুর্বল দেহ। ক্রেপসোলের জুতো পায়ে না থাকলেও বুঝি আমার উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারত না ওই আহত, আপনমগ্ন মন। না, মা নেই ঘরে। এতক্ষণেও তিনি ফিরে এলেন না। জানি, রুগ্ন ছেলেকে এমন অন্ধকারে একা ঘরে রেখে যেতে তিনি পারেন না। সন্দেহ এবার দৃঢ়তর হল শুধু। সে-ই এসেছিল। এতক্ষণ ছিল এই ঘরে। তারই হাতে সাময়িকভাবে ছেলের দায়িত্ব সমর্পণ করে নিশ্চিন্তচিত্তে মা বেরিয়েছেন। এখনও যে তার দেহের সুবাসে মদির হয়ে আছে এই ঘরের বাতাস। আর তারই আভাস পাচ্ছি ওই ভারাক্রান্ত হৃদয়, তরুণ জীবনের কাতরতায়। আঘাত হেনে সে চলে গেছে নিষ্ঠুরের মত—সব বিশ্বাসের ভারকে অবলীলায় ঠেলে ফেলে দিয়ে। আর আমি শুধু রয়েছি এই বিয়োগান্ত দুঃখের নীরব সাক্ষী হয়ে। এমন হবে আমি জানতাম। এই করুণ দুঃখের অবতারণার অপেক্ষাতেই যে ছিলাম এতদিন। কিন্তু এই কি আমি চেয়েছিলাম!

তের বছর আগে। সদ্য ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়েছি—কৃতিত্বের সঙ্গে। হাউস-সার্জন হিসাবে কাজ করছি আমারই কলেজের এক শুভার্থী শিক্ষকের অধীনে। অভিভাবকদের মনে কত আনন্দময় উজ্জ্বল কল্পনা আমাকে ঘিরে। অল্পদিন পরেই দেশান্তরে যাব উচ্চতর শিক্ষার কারণে—ডবল এফ-আর-সি-এস'-এর দুর্বার আকর্ষণে। ইচ্ছা সকলের,—ফরেনে যাবার আগেই আমি বিবাহিত হই আর সম্ভব হলে বধূকে সঙ্গে নিয়েই চলে যাই সেই প্রলোভনের অচেনা ভূমিতে। ঘটকের আনাগোনা চলছে, আত্মীয়-বন্ধুরা বহু সুপাত্রীর খবর আনছেন, আর দিনেরাতে কলিং-বেল বাজাচ্ছেন কত কন্যাদায়গ্রস্তের দল। অত্যন্ত বিশ্রী লাগত আমার। যেন নীলামে চড়ান হয়েছে আমাকে। মেয়েদের তরফ থেকে তাঁদের রূপ-কোয়ালিফিকেশন ও যৌতুকের ধার-ভার দেখিয়ে বাবার মনটি জয় করে নিয়ে, তাঁর এই লোভনীয় সন্তানটিকে কে টোপর পরিয়ে

বর সাজাতে পারেন তারই এক অদ্ভুত কাড়াকাড়ি চলেছে। স্পষ্টতই অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম আমি। এত তাড়াতাড়ি বাঁধা পড়বার ইচ্ছা ছিল না। তা' ছাড়া উপার্জনশীল না হয়ে সংসারী হতে এ যুগে কোন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই পারে না। যা হোক, বিয়ে একটা লেগেই গেল বাড়িতে। আমার সূত্রে যাঁরা আসা-যাওয়া করতেন, তাঁদেরই একজনের মনে ধরে গেল অনুজা সুরীতিকে। সাদরে বিদেশী ডিগ্রীধারী প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনীয়ার একমাত্র পুত্রের বধূ করে নিলেন তাকে। একঘরে দুই কুটুম্ব করতে অনাগ্রহ থাকায় রেহাই পেলাম আপাতত। সৌভাগ্যবশত ওঁর মেয়েটি আগেই সুপাত্রস্থ হয়ে গেল।

রীতির বিয়ের বাসরেই ওর সম্পর্কিতা ননদিনী ধরিত্রীর সঙ্গে প্রথম দেখা। অষ্টাদশী তরুণীর দেহে বসন্তের সমারোহ। আমার যৌবনের মন সেদিন সমস্ত সংযমের দম্ভ ভুলে আকুল হয়ে উঠেছিল। কুসুমিত কবরী, নীরক্ত সীমন্তে মুক্তার সারে গাঁথা সিঁথিমৌর, দূর্বা-রঙ বেনারসী আর সর্বাঙ্গে হীরক-মরকতের দ্যুতি। হাসিতে, গানে, সুসমঞ্জস কথায়-আচারে তার সৌন্দর্য ও সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব যেন ফুটে উঠেছিল। ফাল্গুনী সন্ধ্যায় মূর্তিমতী বাসন্তিকা হয়ে, সম্রাজ্ঞীর মহিমায় সকলকে সে একাই আকর্ষণ করেছিল, মাতিয়ে রেখেছিল। বর-কন্যা নিষ্প্রভ হয়েছিল ওর পাশে। হয় তো সাক্ষাতের বিশেষ লগ্ন, নয় তো বিবাহের পারিপার্শ্বিকতা, জানি না কি আমার চিত্তের বিচলতার জন্য দায়ী। কিন্তু এটা ঠিক যে, তখন থেকেই তাকে আমি অন্তরতমার আসনটি দিয়ে ফেলেছি, আমার ব্যাকুল বাসনা তার অভিধ্যানেই অহরহ মগ্ন হয়ে গেছে।

সে রাত্রেই জানা হয়ে গিয়েছিল, বিস্তর অর্থবান এক ব্যবসায়ীর একমাত্র সন্তান সে। মাতৃহীনা আদরের দুলালী। লেখাপড়া ও অন্যান্য বিদ্যায় কুশলী। বি-এ পড়ছে। গুণ আছে বহুতর। অতএব জেনে আমার কি কাজ। নাগালের বাইরে হাত না দিতে যাওয়াই তো ভাল। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে এইবেলা মানে মানে সরে আসাই সুবুদ্ধির পরিচয়। তবু হৃদয়ের কাছে যে সব বিচার-বিবেচনা হার মানে। ধরিত্রীর সঙ্গে আমার নাম যুক্ত করে স্বজনবন্ধুদের সরস আলোচনা ও মন্তব্য এরপরও কতবার শুনেছি আর কিছুটা আশান্বিতও হয়ে উঠেছি। এতই কোন ক্ষুদ্র আমি? উপযুক্ত হয়ে তো পেতেও পারি ওকে পাশে। আমার ভালবাসার সাধনা হয় তো সার্থকই হবে একদিন।

পরিচয় ক্রমে সুনিবিড় হল। রীতি এখানে থাকলে মাঝে মাঝেই ও চলে আসত। দু'জনে সম্প্রীতি ছিল গভীর। আমাদের সবার সঙ্গেই সে সহজ অন্তরঙ্গতায় মেলামেশা করত। মার স্নেহে স্বর্গতা জননীকে খুঁজে পেত, এটাও ছিল বড় কারণ। আপনজনই হয়ে উঠল অবাধে। আমরা প্রত্যেকে তাকে ঘিরে মধুর কল্পনা করতাম। দৃঢ়তর বাঁধনে এই সংসারে আটকাতে চেয়েছিলাম। মনের ভাব শেষ পর্যন্ত মুখের কথায় নিজেদের মধ্যে বলাবলিও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরিহাসে, আলাপনে, কোনও অবস্থাতেই তার অতলান্ত হৃদয়রহস্য কারও বিশেষত আমার ব্যগ্র অনুসন্ধিৎসায় ধরা পড়ে নি।

শেষ পর্যন্ত সুরীতি দেখা করে তাকে সরাসরি এ সম্পর্কে প্রশ্ন ও প্রস্তাব করেছিল। ঐকান্তিক বিশ্বাসের যত আনন্দিত অভিলাষ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে দেরি হয় নি। সামান্য স্তব্ধ থেকে হেসে বলেছিল ধরিত্রী, বড় ভুল করে ফেলেছ তোমরা। আমার জীবনের সঙ্গী হতে পারে এমন পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ আজও হয় নি। চায় তো অনেকেই, কিন্তু আমাকে পায় না তো কেউ। অতিপ্রিয় অগ্রজের প্রতি এই অনায়াস অবহেলাকে সহজে সহ্য করতে পারে নি আমার ভগ্নী। সক্ষোভ অপমানে পূর্বপ্রীতি ভুলে রূঢ়ভাবে বিবাদ করতে গিয়েছিল তার সঙ্গে। পরিবর্তে নির্বাক হাসির বঙ্কিমা ছাড়া আর কিছুই মেলে নি। শ্বশুরবাড়ি থেকে এ সংবাদ ফোনে মাকে জানিয়েছিল সে। গুরুজনের সঙ্গে আমারও অজানা থাকে নি। বিষাদ আর নিরুপায় বিদ্বেষ ঘনিয়ে এসেছিল সকলের মধ্যে। অসুস্থচিত্তে আমি পালিয়ে ফিরছিলাম ওদের চোখের আড়ালে।

সেই সন্ধ্যায় অবসন্নভাবে অন্ধকার ঘরের শূন্যতায় আমি বসেছিলাম। সুরীতি ও তার স্বামী এসেছে—বুঝতে পেরেছিলাম। পিঠোপিঠি ভাই-বোন আমরা। সব থেকে আমাকেই ও ভালবাসে। পাশে মা'র ঘর থেকে তার ক্ষুব্ধ আলোচনার সাড়া পাচ্ছিলাম। খানিক পরে খুঁজতে খুঁজতে আমার ঘরে এল। আলো জ্বালতে দু'জনেই চমকে উঠলাম। তারপরই দু'হাতে মুখ ঢাকলাম, নিভিয়ে দে সুরীতি, চোখে লাগছে। আঁধারের মধ্যেই পাশে এসে দাঁড়াল। স্বাভাবিকভাবে বলতে চাইলেও বিপুল হতাশার গ্লানি দেহ ও কণ্ঠস্বরে বুঝি প্রকাশ পেয়েই গিয়েছিল। ওর মমতার স্পর্শে বিচলিত হয়েছিলাম। নির্বাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। চঞ্চল হয়ে তীক্ষ্ণ ঘৃণাভরা গলায় বলছিল, ওকে তুই মন থেকে মুছে ফেল দাদাভাই,—ওর নিজেরই যোগ্যতা নেই, তাই মিথ্যে অহঙ্কারে এমন করে বিমুখ করল তোকে। ভগবান যাকে তোর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, তাকেই পেয়ে সুখী হবি। এ হয় তো একরকমে ভালই হল। কিন্তু ওই সৃষ্টিছাড়া গরবিনীর কপালে অশেষ দুঃখ আছে, নিশ্চয় বলছি আমি, দেখে নিস। এমন করে অপরকে ব্যথা দিয়ে অনেককে তুচ্ছ করে সর্বনাশী কখনও জীবনে শান্তি, স্থিতি পাবে না, পেতে পারে না।

শেষের দিকের কথাগুলি জড়িয়ে গিয়েছিল আবেগে। তীব্র আর্ততায় তাকে স্তব্ধ করেছিলাম, 'রীতি।' উঠে খোলা জানালার গ্রীল ধরে সামলে নিলাম। ধীর মৃদু বিষণ্ণতায় বললাম, অকারণে তার অসাক্ষাতে মন্দ কথা নাই বা বললি বোনটি। নিজের বিয়ের বিচারের স্বাধীনতা তো প্রত্যেকেরই আছে। ও যেমন বুঝেছে—বিবেচনাশক্তি তার কম নয় জানিস। সত্যিই হয় তো বিধাতার অভিপ্রেত নয় এ মিলন। সেজন্য তাকে দোষী করিস না। একই রীতিতে বিশ্বের সব মানুষ চলে না। কিছু বিশেষ, কিছু অন্যরকম হবেই বা সে।

একান্ত প্রিয়জনের লাঞ্ছনা সইতে পারি নি আর। সুরীতি তা অনুভব করেছিল। নীরব সহানুভূতিতে কতক্ষণ বসে থেকে থেকে একসময়ে চলে গিয়েছিল।

তারপর দেশের বাইরে গেলাম। আরব্ধ কাজ শেষ করে ফিরেও এলাম। আর তখনই একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল। চেম্বার সাজিয়ে-গুছিয়ে বসতে হবে। কিন্তু অনেক টাকার দরকার যে। বাবা স্পষ্ট ভাষায় তাঁর অসামর্থ্য জানালেন। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের মোটা টাকার সবটাই প্রায় বাড়ি করতে ব্যয় হয়েছিল।

তাও জমি কত আগে ফেলাদামে কেনা ছিল। ভাইবোনেদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে, জীবনযাত্রার উচ্চমান বজায় রাখতে সঞ্চয় তেমন করতে পারেন নি। মানী বৈবাহিকের সঙ্গে তাল মেলাতে, দাবী-দাওয়া না থাকলেও রীতির বিয়েতে যথেষ্ট খরচ হয়েছে। এখনও ছোটবোন বাকি। ছোটভাই-এর ভবিষ্যৎ গড়তে হবে। দাদারাও সংসারী হয়েছেন, বাড়তি সাহায্য করা তাঁদের পক্ষে বাস্তবিক অসুবিধাজনক। একটি উপায়ই শুধু আছে—যা তিনি নির্দেশ করলেন। আর তাই-ই হল। উচ্চ কন্যা-পণের বিনিময়ে অনুপায় আমি আত্মবিক্রয় করতে বাধ্য হলাম।

সহাস্যে সুসজ্জিতা ধরিত্রী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এল। আগুন রঙের টিস্যুর আবরণে আর রত্নোপলখচিত স্বর্ণাভরণে তাকে অগ্নিশিখার মত লাগছিল। আগের মতই, সাময়িক সব অসম্প্রীতি যেন ভুলে গিয়ে হর্ষে গোচ্চার হয়েছিল সে, বুঝি ভুলিয়েও দিতে পেরেছিল। নববধূকে ছাড়িয়ে সে-ই এ উৎসবের উজ্জ্বলতমা নায়িকা হয়ে উঠেছিল। অন্যদের সঙ্গে আমার স্ত্রীও সপ্রশংস বিস্ময়ে তার প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়েছিল। শুধু আমি অসহ্য প্রদাহে অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম ভিতরে।

ধীরে ধীরে বিভিন্ন সূত্রে ধরিত্রী ও আমার সম্পর্কে সব তথ্যই অর্ধাঙ্গিনীর জানা হয়ে গেল। বিচিত্র নারীমন! সহজাত ঈর্ষার প্রবণতা তাকে হতভাগ্য স্বামীর প্রতি বিদ্বিষ্ট তো করেছিলই, ধরিত্রীর উপর তার ক্রমবর্ধিত রাগের আরও একটা আশ্চর্য হেতু ছিল। ওর অসামান্যা দর্পিত অবজ্ঞার স্পর্ধাকে কোনমতেই ক্ষমা করতে পারে নি সে। বহুবার আচরণে কথায় তা প্রকাশমান হয়েছে।

স্বভাবগত কর্তৃত্বের প্রখরতায় রঞ্জনা আমাকে পরাভূত বশংবদ করতে চেয়েছিল। স্বস্তির আশায় অবশেষে তাকে আমি মেনে নিয়েছিলাম, মানিয়ে নিতেও চেয়েছিলাম। মনে পড়ছে কনিষ্ঠা সুমিতির বিয়েতে ধরিত্রী এসেছিল সুনীল সজ্জার প্রশান্তি আর মুক্তার সম্ভারে অপরূপা হয়ে। আমার ছোট্ট বুবলা হট্টগোলে ভয় পেয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে উত্ত্যক্ত করছিল। কোলে তুলে তাকে নিপুণভাবে ভুলিয়ে দিয়েছিল তখন। আমি কাছেই কোন কাজে ব্যস্ত ছিলাম। স্পষ্টত আমায় শুনিয়ে রঞ্জনা আকস্মিক এক অমার্জিত কুটিল বক্রোক্তি করল, এখনও স্বয়ংবরা হতে পারল না ধরিত্রী, তোমার সমযোগ্য পুরুষ বোধ হয় এ পৃথিবীতেই নেই।

পার্শ্ববর্তিনী সুরীতিও উপস্থিত অনেকের কুঞ্চিত ভ্রূতে বিরক্তি গোপন থাকে নি। আমি শঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কি সুন্দরভাবে ধরিত্রী তার বিদ্রূপ ফিরিয়ে দিল। ছেলেকে আদর করে নামিয়ে দিয়ে মধুর হাসির উদ্ভাসনায় বলল, তাই-ই রঞ্জনা। অন্য সব মেয়েরা যাদের গলায় সাগ্রহে বরমাল্য দিয়ে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করে, আমার কাছে তারা নিতান্ত সাধারণ বোধ হয়। বরণীয় তো দেখলাম না এদের মধ্যে একজনও।

রঞ্জনার সুগৌর মুখ মুহূর্তে কালো ভার হয়ে উঠেছিল। আর অপেক্ষা না করে, নিরুদ্ধ ক্রোধ ও সঙ্কোচের অধীরতায় সে স্থান ত্যাগ করেছিলাম। বাড়িতে ডেকে এনে আমারই স্ত্রী ওকে যে অসম্মান করল, বহুগুণ হয়ে আমাকে তা আঘাত করেছিল। ধরিত্রীর উপর রাগ করতে আমি কিছুতেই পারি না কোনদিন।

দিনে দিনে রঞ্জনার আধিপত্য বিস্তারের প্রবলতা আমাকে অতিক্রম করে গৃহের সব কিছুকেই অধিগত করতে চেয়েছিল। আমার পশার ইতিমধ্যে বেশ বেড়েছে,—পরিবারের মধ্যে সর্বাধিক উপার্জন করে ও মুখ্যত প্রতিপালক হয়ে—বয়োজ্যেষ্ঠ না হলেও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছি। পতি-গর্বের অংশভাগিনীরূপে তার ব্যবহারে তাই ক্ষমতার দাম্ভিকতা ক্রমশই মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যাচ্ছিল। নিত্য অশান্তিতে চরমপথ বেছে নিলাম। এমন কি মা-বাবার সম্পর্কেও ওর প্রত্যক্ষ অবহেলা ও তুচ্ছতা প্রদর্শনে ধৈর্যচ্যুত হলাম। অথচ বিবাহিতা পত্নীর প্রতি শুষ্ক কর্তব্যের নির্মম বন্ধন আছে। যখন কোনমতেই একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখা গেল না, এতটুকুও নম্র হল না ও,—তখন অন্যত্র ফ্ল্যাট নিয়ে নিজস্ব সংসার রচনা করলাম। বাড়ির সঙ্গে শুধু অর্থ নয়, অন্তর আর সাক্ষাতের যোগও রইল, অবশ্য যথাসম্ভব রঞ্জনার অজ্ঞাতে। না হলে, ওর বটুভাষণের ঝড়ে বিধ্বস্ত হতে সারাদিনের শ্রমক্লান্ত আমি পারতাম না, আপনার জনের উদ্দেশ্যে বারবার রূঢ় বাক্যবাণ বর্ষণ আমাকে অকথ্য যন্ত্রণা দিত। আমার চেয়ে অর্থ-ই ওর কাছে প্রিয়তর। সমমর্মিতা নেই এতটুকু। সন্তান, দাস-দাসী—ড্রাইভার, অজস্র বিলাস-উপকরণ ইত্যাদি নিয়ে ঘরে অপ্রতিহত প্রভাবে সে গৃহিণীত্ব করে চলল—তার বাইরে আমি চেম্বার, হসপিট্যাল ও সেবাধর্মে নিজেকে সর্বথা বিনিয়োগ করে গৃহসুখের বঞ্চনাকে বিস্মৃত হবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ব্যাপৃত হলাম। জীবনের সরল প্রবাহ ধরিত্রীর ঔদ্ধত্যে যেদিন প্রথম ধাক্কাটা পেয়েছিল, সেদিন থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম শান্তিসুখের সান্ত্বনা আমার জন্য নয়।

এরপরও ধরিত্রীর সঙ্গে বহুবার এখানে-সেখানে দেখা হয়েছে। সহজভাবে সে আমার সঙ্গে মিশেছে, আমিও তাই করতে চেয়েছি। অসঙ্গ মনের তমসায় ও যেন আলোক-দিশারী। সে যদি বাঞ্ছিত জনের সঙ্গে মিলিত হত, তবে সব থেকে তৃপ্ত হতাম আমি। কিন্তু তা হল না। ওদিকে কোন আগ্রহই ছিল না তার। স্নেহময় পিতা যেমনই ভেবে থাকুক, এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করেন নি তাকে। কোন আশ্চর্য ক্ষমতায় যে উত্তর-তিরিশেও লাবণ্য ও প্রাণোচ্ছলতাকে সে ধরে রেখেছিল—এ নিয়ে গবেষণার অন্ত ছিল না আর। প্রসাধনে বা কৃত্রিমতায় নয়,—এই ছিল তার যথার্থ রূপ।

আনন্দের মধুচক্রে মক্ষিরাণী ছিল ধরিত্রী। মৌ-পিয়াসীরা তাকে ঘিরে থাকতে চাইত অবিরাম। বন্ধুত্বের দাক্ষিণ্যে অকাতর ছিল সে। মুক্তহস্ত ছিল জ্ঞাত-অজ্ঞাত নানাবিধ দানের ক্ষেত্রেও। শুধু ক্লাব পার্টি পিকনিকের উঁচু-মহলেই আনাগোনার ক্লান্তি ছিল না,—চ্যারিটি শো'র মধ্যমণি। বন্যায়, দুর্ভিক্ষে, আর্তত্রাণের জন্যও তার কল্যাণহস্ত সদা প্রসারিত থাকত। দুস্থ কতজনের কাছে প্রভাবিত হত মাতৃমূর্তিতে। কিন্তু সবকিছুই নিরঙ্কুশ নয়, এর একটা বিপরীত দিকও ছিল। যেখানে অপযশ আর ঈর্ষা ঘৃণাময় আক্রোশের অসংখ্য আক্রমণ। একটি বিষয়ে প্রখর ব্যক্তিত্বে সদাসতর্ক থাকত ধরিত্রী। নিত্য-সহচর পুরুষরা সখ্যতার সীমা লঙ্ঘন করতে গেলে, তাকে জয় করবার স্পর্ধিত অভিলাষ পোষণ করলেই, নির্বিকার নির্মমতায় তাদের দূরে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করত না। এই অনারী-জনোচিত আচরণে একদার বিমুগ্ধ অনুরাগীরা এক-একে প্রবলতম শত্রু হয়ে দাঁড়াত। আর মেয়েদের বিরাগের কারণ ছিল ব্যক্তিমনে

তার অনমনীয় স্বভাবের প্রভাব। এই হীন প্রচারকার্যকে সতাচ্ছিল্যে অগ্রাহ্য করত ও স্বকীয় মহিমায়। আমি অসংশয়ে জানতাম—কলঙ্ক তার চরিত্রকে স্পর্শও করতে পারে না। তাই মিথ্যা রটনায় দীর্ণ হয়ে যেতাম অক্ষম যন্ত্রণাতে। এ আমাদের সমাজের এক কুৎসিত অভিশাপ।

নির্দিষ্ট সময়ের অন্তে অন্তবিধ কাজে আমি রাত্রের দিকে বহুক্ষণ চেম্বারে অতিবাহিত করতাম। যতক্ষণ ঘরের বাইরে থাকা যায়। এমনই এক নিরালা অবকাশে ধরিত্রী এসেছিল আমার কাছে। বিস্ময় বোধ করলেও অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় নি। ওর নবতম আবিষ্কার অনতিখ্যাত নবীন কণ্ঠশিল্পী অর্পণ সেনের নাম সেই প্রথম শুনেছিলাম। অভিজাতরা, যে কোন কারণে ও ভাবেই হোক—আজও গুণের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন একথা অনস্বীকার্য। এক আত্মীয়ার বাড়িতে ঘরোয়া আসরে বাঙলা রাগসঙ্গীতে অর্পণের অসামান্য নৈপুণ্য ও কণ্ঠমাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিল ধরিত্রী। কৌতূহলী হয়েছিল অসুস্থ দীনদেহ গায়কের প্রতি। মৌখিক আলাপ পর্যবসিত হয়েছিল অন্তরঙ্গতায়। তার দরিদ্র আবাসে ছুটে গিয়েছিল প্রাসাদচারিণী। মাতৃহীনা নূতন মায়ের স্নেহে ধন্য হতে পেরেছিল। চেয়েছিল ওঁদের স্বাচ্ছন্দ্যে উপনীত করতে, অর্পণকে স্বনামে বিখ্যাত করতে। কিন্তু তার আগে ওর নিত্যরোগের উপশম প্রয়োজন! তাই আমার কাছে আসা। ধরিত্রীর অনুরোধ আমার পক্ষে অনতিক্রম্য। তখনই সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলাম এ ঘরে। সদ্য মাকে হারিয়েছিলাম। অর্পণের মা'র সুকোমল বাৎসল্যের মাধুরী দুয়ারপ্রান্তে তাঁর পায়ের তলায় আমার মাথা লুটিয়ে দিয়ে সব দুঃখ দূর করে দিয়েছিল। অনুজোপম বোধ হয়েছিল ওঁর সন্তানকে? সযত্নে পরীক্ষা করলাম তাকে—তখন সে শয্যা নিতে বাধ্য হয়েছে। প্রচুর পরিশ্রম অথচ ম্যালনিউট্রিশন-এর যা প্রত্যক্ষ ফল,—উপযুক্ত জীবনীশক্তির অভাব ও গুরুতর ধরণের অ্যানিমিয়া। এরপর তিলে-তিলে ক্ষয়িত হয়ে যেতে আর বাধা কি! হয় তো এটা ঠিক আমার কাজ নয়, তবু যথাশক্তি তার নিরাময়ে আমি একান্তভাবে নিযুক্ত হলাম। পারিশ্রমিক দেবার প্রয়াস থেকে ধরিত্রীকে অশাসনে বিরত করেছিলাম। এই সর্বপ্রথম কঠিন হয়েছিলাম ওর প্রতি। আমার আন্তরিকতা হৃদয়ঙ্গম করে এবং ফিরে যাব এই ভয়েও অপ্রতিবাদ কুণ্ঠায় নিবৃত্ত হয়েছিল।

ওদের মা-ছেলেকে ঘিরে আমার জীবন এক অপূর্বছন্দে আন্দোলিত হল। একজন্য ধরিত্রীর কাছে অপরিসীম কৃতজ্ঞ। এখানে যে ওর ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পাই মাঝে মাঝে, তার মূল্যেরও কি পরিমাপ আছে! বেশ বুঝতে পারি, এই অকূল অবস্থায় এদের প্রাত্যহিক দাবীগুলি কার সাহায্যের হাত মিটিয়ে যাচ্ছে,—দামী ঔষধ-পথ্য থেকে সবকিছুই কেমন করে আসছে। শুধু এরা নয়, আমিও এই অযাচিত করুণায় শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলাম। যথোচিত সেবা-চিকিৎসায় রোগ এখন মুক্তিরই পথে। কিন্তু সম্প্রতি অর্পণের অনুচ্চার ভাব-বৈলক্ষণ্য আমার অভিজ্ঞ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে গিয়েছিল, অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়েছিলাম—কারণ ধরিত্রীকে আমার চেনা আছে। যদিচ ওর অধিকারের নির্মোক থেকে, কিছু বুঝেছে কি না আভাসমাত্র পাবার উপায় নেই। আর মা'র অগাধ সরলতায় এত সূক্ষ্মদৃষ্টি আশা করাই অসঙ্গত। ছাব্বিশের অপরিণামদর্শী যৌবন, প্রাচুর্যবতী নারীর খেয়ালী আনুকূল্যের সংস্পর্শে এসে—অবস্থার সামর্থ্য বয়সের সমস্ত পার্থক্য ভুলে নিবিড় প্রণয়ে আত্মহারা হয়েছে। ওকে কি করে ফেরাব ভেবে পেলাম না। যতদিন না মুখরতায় ব্যক্ত হয় দয়িতার কাছে—ততদিনই রক্ষা। ক্ষমাহীন কাঠিন্যে বিদায় নেবার কালে একটিবারও আর পিছনে তাকাবে না ধরিত্রী,—বিভ্রান্তির প্রতি কোনও অনুগ্রহের দায়িত্বই তার অবশিষ্ট থাকে না।

সন্দেহ নেই, আজ বিচ্ছেদের পর্ব চুকে গেছে। নিরালা ঘরে অর্পণের রুদ্ধ আবেগ নিশ্চিত অবাধ হয়ে ছিল প্রিয়ার উদ্দেশে। এই তার পরিণাম। বেদনার অবগাহনের শ্রান্তিতে এখন স্তব্ধ হয়েছে ও,—জানে নি আমার আগমন।

আমি ভাবছিলাম, কত অভিনবরূপেই যে ধরিত্রীর বিকাশ। স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা, করুণা, সহানুভূতি প্রভৃতি সুকুমার চিত্তবৃত্তি পর্যাপ্ত আছে তার মধ্যে,—ঔদাসীন্য, ঔদ্ধত্য, নির্দয়তারও তেমন পরিমিতি নেই! একই বসুন্ধরা কোথাও বা শস্যশ্যামলা, কোথাও উষর মরুভূমি, নয় তো তুষারের রাজত্ব! যে ধরণীর বুকের খনিতে সমুদ্রের অতলে সম্পদের দাক্ষিণ্য—তারই মধ্যে জীবনহরণের দারুণতা। ভূমিকম্প, প্লাবন, ইত্যাকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কোনও নিয়ম নিরাপত্তা নেই। পৃথিবীকে আমরা কুমারী জননীরূপেই মেনেছি—প্রণয়িনীর রূপে দেখি নি। নিখিল বিশ্বের মাঝখানে থেকেও সে একক। ধরিত্রীতে এই বিচিত্র প্রকৃতি বুঝি সঞ্চারিত হয়ে গেছে।

মা ফিরে এসে সন্ত্রস্ত হয়ে আলো জ্বাললেন। পুত্রের সম্পূর্ণ আরোগ্য কামনায়, কোন দেবতার পূজা দিয়ে আশীর্বাদ এনেছেন। সচকিত অর্পণ ফুলে-ওঠা আরক্তচোখ থেকে উপাধানে মুখ মুছে ফেলবার ভাণ করল। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে বললাম, ধরিত্রী চলে গেল মা, আমি এসেছি। ওঁরা কেউই এর নিগূঢ় অর্থ বোঝেন নি। এরপর কতক্ষণ অর্পণের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা করে দু'জনের মুখেই হাসি ফুটিয়ে আমি ফিরলাম।

চৌরঙ্গী থেকে ময়দান, সেখান থেকে স্ট্রাণ্ড, এলোমেলো ড্রাইভ করে উদার হাওয়ায় মনের সবটুকু দুর্বলতা গ্লানি উড়িয়ে দিলাম। 'ধরিত্রী, তোমার বিরুদ্ধে কোনও নালিশ আমার নেই, রাখতেও দেব না অর্পণকে। আর কিছু তো পাই নি, যে কর্তব্যের দুরূহতা দিয়েছ আমায়—সব প্রতিবন্ধক পেরিয়ে সে ভার আমি সানন্দে বহন করে চলব। তুমি সূচনা করেছ, আমি শেষ করব। অর্পণকে সারিয়ে তুলব, বাঁচিয়ে রাখব সাচ্ছল্য সম্মানের জীবনে। ওর প্রতিষ্ঠা আর খ্যাতির ব্যাপ্তিতে চরিতার্থ হব নিজে। এই আমার শপথ।'

দু'টি হৃদয়

প্রতিমা দেবী রায়

বিষণ্ণ ক্লান্ত দিনটা কেটে গেল,
দিনান্তের পারে নামলো রিক্ত সন্ধ্যা
মলিন-ধূসর বসন টেনে;
বাজলো না আবির্ভাবের আনন্দ।

আবার, তার মৃত্যুতে আসবে নতুন দিন,
তার আত্মকার হিসাব থাকবে না কোথাও।

দিন আসছে, যাচ্ছে—
কে তার হিসাব রাখছে ?

কত অগণিতের স্রোত,—
কত ভাল লাগা, কত বেদনা,
কত সৃষ্টি, কত ছন্দ
সব বিলীন।

সভ্যতার উদয়-বিলয়
রাজ-রাজাদের কথা
অমর সে ব্যথা
আজ ইতিহাসের পাতা মাত্র
সন তারিখ চিহ্নিত।

কিন্তু আমরা ?
গড্ডলিকার স্রোত ?
আমাদের চিন্তা, ভাবনা, উপলব্ধি
পাবে না কোন ঠাঁই কালের পাতায়
রিক্ত দিনের মত ক্ষয়ে যাওয়া জীবনটা
হবে ক্ষয়, মরণ সন্ধ্যায়।

আতঙ্কিত প্রাণ কেঁদে মরে
শান্তি, সত্য, শিব, পরমসুন্দর,—তুমি কোথায় ?
হৃদয়-বিদারি নামে অশ্রু।
জীবন-জন-মান, সব ঝাপসা হয়ে যায়।
বিবর্ণ ক্লান্ত দিনের রুদ্রালোকে
দিগন্তের পারে চোখে পড়ে 'ও কে ?'

ও কি সেই পরম সুন্দর
পার্বতী পরমেশ্বর ?...
ও মরণবিজয়ী প্রেম !
মৃত্যু-তরঙ্গোপরি দাঁড়ায়ে দু'টি নরনারী
চিরকালীন আশ্বাসে
পরম বিশ্বাসে।
ধ্বংস আবর্ত ওঠে জেগে সৃষ্টি মাঝারে
সমস্ত বিলয় ;
চারিদিকে ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের অপচয়—
তার মাঝে সত্য জেগে রয়।

আবার পূর্বদিগন্তে দেখা দেয় অরুণিমা
জীবনের সুর সাহানা ওঠে বেজে
দেখা দেয় নতুন আলোকে
যুগান্তরের পারে দু'টি মানুষ
দু'টি হৃদয়।

আনো আশীর্বাদ

শ্রীমতী অরুণা ঘোষ

অস্তাচলগামী বর্ষ নিয়ে গেল
ব্যথাভরা রক্তমাখা দিন,
কি নিয়ে আসিছ তুমি অভিশাপ ?
না আশীর্বাদ বলো হে নবীন।
আকাশ যে আজো লাল
জ্বলিছে যে চারিদিকে হিংসার আগুন,
মানুষের মন হোতে চলে গেছে চিরতরে
সুখময়, স্বপ্নভরা মধুর ফাগুন।
দাবদগ্ধ বঙ্গবালা কি দিয়ে করিবে বলো
তোমারে বরণ আজ প্রাণের ঘাটে,
শুধু যে বিলাপধ্বনি মলয় বহিয়া আনে
রক্ত লেগে আছে তার শ্যাম পত্রপুটে।
আকাশের আলো আজি গোধূলির রক্তিম লগনে
রক্তে রক্তে রাঙা হয়ে আছে,
বুভুক্ষার বহ্নি জ্বলে বাঙালীর মর্মতলে
সর্বহারা আশাপথ তবু চেয়ে আছে।
তোমার বরণডালায় ছিলো যে প্রদীপ জ্বালা
নিভে গেছে বেদনার ঘায়ে,
ফুটেছিলো যত ফুল শুকায়ে সে ঝরে গেল
অকালে গো মরণের পায়ে।
তাই তো বাঙালী আজ রিক্ত হৃদয়ে বসে
'স্বাগত' জানাবে বলো কি বা দিয়ে আর,
আনো, আনো আশীর্বাদ পুড়ে যাক্ অভিশাপ
শ্মশান বঙ্গ হোক্ নন্দন আবার।

তা-ই হোক আশীর্বাদ

রূপশ্রী ঘোষ

ছন্দোবদ্ধ বেদনার গান আমি গাই—
সে গান সুন্দর কোথা কখনও হয়েছে অসুন্দর
তবুও থামি নি কভু, বিলাপের নাহি অবসর।

সে গানের শ্রোতা তুমি হে দেবতা—জীবনদেবতা
দুঃখ পেয়েছি যবে কেঁদেছি অজস্র বেদনায়,
তব চক্ষে দেখিয়াছি বরাভয় আশিস ঘনায়।

তাই ত' বুঝেছি দুঃখ রুদ্রের প্রসাদ—
অবশ্য তা' গ্রহণীয় জীবনের পথে,
আনন্দের অভ্যুদয় তাহারই শপথে।

হে রুদ্র, জয় হোক্, হোক তব জয়
তোমার দক্ষিণ মুখ স্নিগ্ধ হাস্যময়,
তাই হোক্ আশীর্বাদ—স্নিগ্ধ বরাভয়

মাদার হাউসের জন্য রিপোর্ট সে-ই লিখেছে। লেখাটার মধ্যে আলংকারিক শব্দ ঢুকে গেল ক'টা। ঘটনাটা আনুপূর্বিক নিজে চোখে দেখতে পেত যদি, তাহলে ঐ শব্দগুলো দিয়ে জায়গা ভরাট করার বদলে লেখার মত বাস্তব সত্য কিছু পেত। রিপোর্টটা কনভেন্ট ম্যাগাজিনে বেরোবে। এই ধরণের রিপোর্ট সে একবারই মাত্র পড়েছিল মনে পড়ে। আরম্ভটা তার এই রকম: 'আমার কলমটা আজ ডুবিয়েছি ছোট একটি শহীদের রক্তে···।' প্রত্যেক ধাপটা লক্ষ্য কর, তথ্য সংকলন কর। তথ্য লিপিবদ্ধ করলে আর নিজেকে মোচড়াতে হবে না···

পরদিন ভোরে এ্যাক্টিং সুপিরিয়র ডরমিটোরির বাইরে দেখা করলেন নানদের সংগে, জানালেন আজকের ম্যাস সিস্টার অরেলির রেকুয়েম—তার আত্মার জন্য প্রার্থনা করতে হবে, গতকাল রাত্রে আকস্মিকভাবে নিহত হয়েছে সে। ম্যাসের পর খাবার ঘরে যাবার আগে তিনি বিস্তারিত জানাবেন ঘটনাটা, বাইরে কেউ প্রশ্ন করলে যাতে উত্তর দিতে পারে তারা। মধ্যাহ্নের আগেই সমাধি হবে।

···ট্রপিকে সবকিছুই তাড়াতাড়ি করতে হয়।

···কিন্তু এ কথাও তো আর লেখা যায় না।

···এ কথাও লিখতে পারি না যে সিস্টার অরেলির জায়গায় আমিও হ'তে পারতাম—যদি আমি কেবল নাইট রাউণ্ডে কয়েক মিনিট আগে যেতাম, সার্জারি ওয়ার্ডে দেরি না করতাম যদি।

···নিজেকেই নিজে বলছে, না এ কথাও লিখতে পার না তুমি! এ রিপোর্ট যারা পড়বে তারা সবাই জানে তা হতে পারত না কখনও, ঈশ্বর যাকে মনোনীত করেছেন সে ছাড়া আর কেউ হতে পারত না। তাঁর পরিকল্পনায় অনিশ্চিত বলে কিছু নেই।

নানরা পরে বলবে, স্বর্গের দিন শুরু হবার সময় হয়ে গিয়েছিল তার।···পরিচিত বাক্যবিন্যাসে এই অকারণ মৃত্যুর পাশবিকতার দিকটা ঢাকা পড়ে যাবে।

খাবার ঘরের বাইরে এ্যাক্টিং সুপিরিয়র নানদের ছোট দলটিকে থামালেন। যে মৃত্যুকে এখনও বোঝে নি, তারই রেকুয়েম্রে এইমাত্র গান গেয়ে এসেছে তারা।

শান্তভাবে বললেন, সিস্টার অরেলি পরার্থে মৃত্যুবরণ করেছে। একটি উন্মাদ দেশীয় লোক কাল রাত্রে মেটারনিটিতে ঢুকে এমন আঘাত করেছে তার মাথায় যে সে মারা গেছে। লোকটিকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি মৃত্যুর আগে সে ক্ষমা করেছে তাকে, ভগবানের কাছে তার শেষ প্রার্থনা ছিল, এ অপরাধকে পাপ বলে গণ্য কোর না তুমি, ক্ষমা কোর ওকে।

প্রচণ্ড ধাক্কায় নানরা নিশ্চল হয়ে গেল একেবারে।

প্রথম অস্বচ্ছন্দ দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা গেল এদিকে-ওদিকে, আগের রাতে ট্রিটমেণ্ট-রুমে যে হতচেতন নীরবতা নেমেছিল সেই নীরবতা নামল তারপর চারদিক ব্যাপ্ত করে।

সিস্টার মারিয়া-রোজ থামলেন না শুধু।

—আমরা জানি আমাদের প্রিয় সিস্টার প্রতিহিংসার ভার দিয়ে যায় নি আমাদের ওপর—চিন্তাতেও না। সে আর নেই বটে, তার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব রয়ে গেছে আমাদের ওপর—প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে হবে আমাদের, সেই কাজই সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার। ডিউটিতে গিয়ে এখনই তোমাদের বয়দের সংগে দেখা হবে। এত বড় একটা দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া কি হয় আমাদের মধ্যে, সেজন্য সশংকিত হয়ে আছে তারা, ভাবছে আমরা নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেব। তোমরা তাদের দেখাও খ্রীশ্চানরা প্রতিশোধ নেয় না, যীশু আমাদের শিখিয়েছেন শত্রুকেও ভালবাসতে। এই আদর্শবাদই শহীদ সিস্টার রেখে গেছে আমাদের জন্য, আমরা তাকে বাস্তব রূপ দেব।

···পরার্থে মৃত্যুবরণ···এটা আমি লিখতে পারি।

···কিন্তু নিজে বিশ্বাস করতে পারব কি? সিস্টার লুক হতাশ মনে জিজ্ঞাসা করছে নিজেকে।

সামনে মস্ত কাজ—দেশীয় মানুষগুলোর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে আবার। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার এই নীতির ওপর ভিত্তি করে
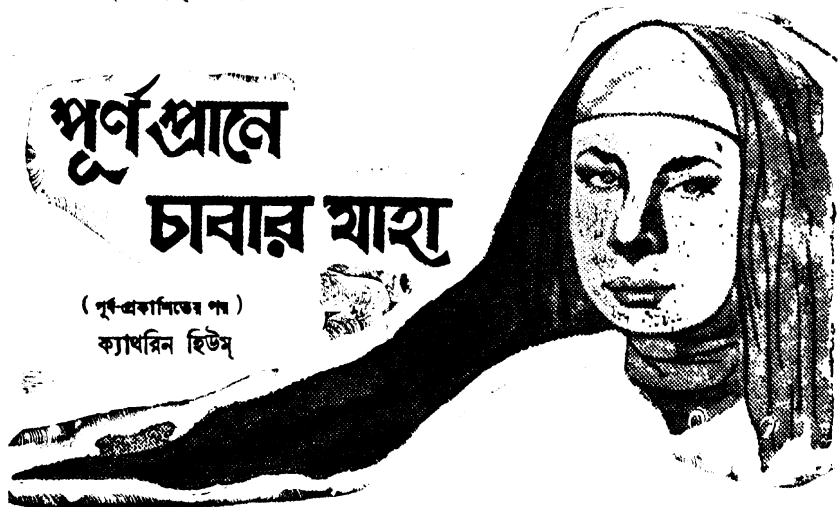
অনিরুদ্ধ মিশনের যে কাহিনী সৃষ্টি হল কল্পনায়, সিস্টার লুকের রিপোর্টটাতেও ছোঁয়া লাগল তার—হতাশ মনে যে ভাবছিল রিপোর্টটা লিখে উঠতে পারবে না, বিশ্বাসের আলোক ফুটল তাতে।

লক্ষ্য করেছে কয়েকজন সিস্টার ফিউনারাল-শেষে নিজের নিজের দায়িত্বে ফিরে যাবার সময় ভয় পেয়েছে—বয়দের সংগে মুখোমুখি দেখা হবে এবার। এই পরিস্থিতির মধ্যে থেকে গিয়েই সহজসুরে তাদের সংগে কথা বলতে হবে, খৃষ্টধর্মের আদর্শের কথা রাখতে হবে মাথায়। বাস্তব অন্তরে কিন্তু বিপরীত সুর বেজে উঠতে চাইছে। ক'জনের মধ্যে বিদ্রোহী ভাবটা এমনই মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে যে, দমনের ঐকান্তিক প্রয়াসে বাহ্যতই অসুস্থ দেখাচ্ছে তাদের! যে কোন বিভাগেই বয়রা সিস্টারদের তুলনায় জনপ্রতি কুড়িজন অনুপাতে বেশি।

কালো মুখগুলো হঠাৎ দারুণ লজ্জায় কুৎসিত দেখাচ্ছে, কি এক অপরিচয়ের ছাপ পড়েছে এইটুকু সময়ের মধ্যে, যেন সেই চেনা মানুষগুলোই নয়। ওদের দিকে তাকিয়ে সব সিস্টারদেরই মনে পড়ছে কংগোয় তাদের প্রথম দিনগুলোর কথা—সেই সেদিনের মতই আবারও আজ নতুন করে বৃহৎকায় মুখের অগাধ, অভেদ্য, অজ্ঞেয় সমুদ্রে এসে পড়েছে যেন।···বায়ু-তাড়িত একদল মানুষ—গায়ের রংটা অতিরিক্ত সাদা, বড় বেশি চোখে পড়ার মত।

তার নিজের বোঝাপড়া এমিলের সংগে। তা দিয়েই বোঝা হয়ে গেল প্রথম এক ঘণ্টায় কি অভিজ্ঞতা লাভ করেছে অন্যরা। তবু তো এমিল একজন কনভার্ট, আর শ্বেতকায় মানুষগুলোর সংগে তার পরিচয়ও আজকের নয়।

কিন্তু হাসপাতালে ঢুকল যখন, এমিল চোখ তুলে তাকাল না। তারপর সে ডেস্কের কাছে এগিয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে করিডর দিয়ে চলতে শুরু করল। সামনের দিকে ঝুঁকে কুঁজো হয়ে চলছে কেমন, পিঠের ওপর সপাং করে এক ঘা চাবুক পড়েছে যেন।

পিছন থেকে এবার তাকে ডাক দিল সিস্টার লুক।

—এখন কি তুমি কনটেজিয়াসে যাচ্ছ নাকি এমিল? এই কাগজগুলো সিস্টার মার্গারিটার কাছে পৌঁছে দেবে?

ফ্যাকাশে কুঞ্চিত মুখে এমিল ফিরে তাকাল, মিত্রতার সুরটা হৃদয়ংগম হচ্ছে না। ওর স্মিতমুখের দিকে তাকিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল তবু।

কি যে কাজের কথা বলছিল মামা লুক, কানে ঢুকেছে কি না সন্দেহ। অন্তর জুড়ে যে কথাটা বেদনা হয়ে বাজছে, সেই কথাটাই সব আগে এল জিহ্বাগ্রে।

—সিস্টাররা রাগ করেন নি আমাদের ওপর? ফরাসীতে নয়, কিসুওয়াহিলিতে জিজ্ঞাসা করল। নিহতের ভাষায় কথা বলার অধিকারই হারিয়ে ফেলেছে যেন।

—তুমি তো আমাদেরই মত খ্রীশ্চান এমিল, তুমি তো জান আমাদের মনে হিংসার স্থান নেই। না এমিল, না, রাগ আমরা করি নি।

মামা লুকের শান্তস্বর দ্বিধায় ফেলেছে, মনের সহজ হিসাবটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কেমন।

—কিন্তু ঐ লোকটার ওপর তাহলে, মামা লুক···ঐ যে লোকটার জন্যে লজ্জা রাখবার জায়গা নেই আমাদের? কাল রাত্তিরে যাকে মঁসিয়ে মারসেলের হাতে তুলে দেওয়া হল?

—তার ওপরও নয়, এমিল।

—আমি যে বুঝতে পারছি না। যে দুর্বোধ্য সমস্যার মুখে পড়ে সবটা দ্বিধাগ্রস্ত, তারই আভাস ফুটল এমিলের মুখে-চোখে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল একটু, চিন্তার ভারে ভ্রূ দু'টি কুঞ্চিত। মাথাটা সঞ্চালিত হ'ল দু'বার ওপর-নীচে। ধীরে ধীরে চোখের ভীতদৃষ্টিটা মিলিয়ে গিয়ে বিস্ময় ফুটেছে, সেই সংগে কাঠিন্যের আভাসও একটু। এই কঠোরতাটুকু পরিচিত।

—আমাদের কেউ যদি এভাবে খুন হ'ত মামা লুক, খুনেটাকে একেবারে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে খুঁটিতে বাঁধতাম আমরা, আর জেলেরা সবাই তার গায়ের এক এক টুকরো মাংস খুবলে নিয়ে মাছ ধরার টোপ তৈরি করত—কংকালটা না বেরিয়ে পড়া অবধি।

সিস্টার লুক তৎক্ষণে ওর গলায় ফিতে দিয়ে ঝোলানো ছোট সোনার ক্রুশটা স্পর্শ করেছে।

—হয় তো করতে এমিল, যদি···আমি বলব যদি না তাঁর এই চিহ্নটা থাকত তোমার গলায়—তিনি আমাদের ক্ষমা করতে শিখিয়েছেন।

এমিলের কালো মুখে অদ্ভুত একটুকরো হাসি ফুটল এবার। ল্যাবোরেটোরির কোন জানা কাজে ভুল করে ফেললে মামা লুক ধরে ফেলেন যখন, তখন যেমন ফোটে।

—এটাই তোমাকে বয়দের বুঝিয়ে দিতে হবে এমিল। মনে রেখ, তুমি ওদের ক্যাপিটা, আমার ডেপুটি।

কাগজপত্রগুলো হাত বাড়িয়ে নিল এমিল, নিয়ে অভিবাদন করল। বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা বাৰ্ট চেহারা, মাথা উঁচু করেই এবার হেঁটে যাচ্ছিল, কি ভেবে হলের মাঝখান থেকে ফিরে এল আবার। শর্টসের পকেট থেকে সুতোয় একসংগে আটকানো একগোছা পালক আর নখ বার করে ডেস্কের ওপর রাখল।

—কাল রাত্তিরে সেই বজ্জাতটার গলা থেকে একজন বয় এটা ছিনিয়ে নিয়েছে, জেলখানায় যাতে ভূতপ্রেতের হাত থেকে তার বাঁচবার কোন উপায় না থাকে।

সিস্টার লুক পূর্ণ চোখে তাকিয়ে দেখল। লগ্ বুকের ওপর পড়ে আছে 'ফেটিশটা। সিস্টার অরেলির ঝরঝরে ছাপা অক্ষরের মত হাতের লেখার খানিকটা ঢেকে।

হৃৎপিণ্ডটা এত দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে যে একমুহূর্ত কথা বলতেই পারল না।

—কে, এমিল?

—ইলুংগা, মামা লুক।

ইলুংগা! বয়দের মধ্যে একমাত্র এই-ই খ্রীশ্চান নয়!

এত জোরে তাবিজটা চেপে ধরেছে যে সুতোয় গাঁথা নখগুলো ফুটছে হাতে। একদৃষ্টে ওটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হাতের নীচে সুন্দর ছোট ছোট নির্ভুল লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে এল।

···ইলুংগা সিস্টার, তোমার দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে দেখে যে বেদনা সে পেয়েছে তাই তাকে এই মন্ত্রপড়া জিনিসটা স্পর্শ করবার

সাহস জুগিয়েছে। একজনকে অন্তত তুমি গেঁথেছ তোমার বঁড়শিতে, ছোট্ট বোনটি আমার, একজনকে তুমি গেঁথেছ···

মুঠো শিথিল করে ফেটিশটা বাড়িয়ে দিল এমিলের দিকে।

—এটা তোমার সেই ছেলেটির কাছে জেলে ফেরৎ পাঠাতে হবে এমিল—এটার ওপর তার মস্ত নির্ভরতা, আমরা তাকে অসহায় করে দেব কেন! বিচারের সময় নিজেকে বাঁচাতে এটা তার কাছে থাকা চাই।

চমকে ফেটিশটা থেকে চোখ তুলে তার দিকে চাইল এমিল, কিন্তু এটা তাকে বাঁচাতে পারবে না মামা লুক!

—সেটা ওকে নিজেই বুঝতে দেওয়া দরকার এমিল।

কোমলকণ্ঠে কথাটা বলে এমিলের দিকে চেয়ে একটু হাসল। ষড়যন্ত্রটার মধ্যে তাকেও টেনে এনেছে!

সেই হাসিটুকু এমিলের মেরুদণ্ডটাকে সোজা করে দিল। ডাকহরকরার মত ছুটে চলে গেল সে, ঝুলিভর্তি খবর তার, বন্দের দেবে।

এরপর অনেকদিন রিক্রিয়েশনে নানরা প্রায়ই সিস্টার অরেলির কথা বলাবলি করল। তাদের মৃদু গভীর কণ্ঠস্বরে কখনও বেদনার আভাস পাওয়া যায় না কিন্তু। বরং একটু ঈর্ষার আভাস থাকে।··· যদি আমি মনোনীতা হতাম···

সে ঈর্ষার কুণ্ডলী সিস্টার লুক নিজের অন্তরেও অনুভব করতে পারে। সেদিন রাত্রে সিস্টার মনিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে পরমেশ্বরের অপার করুণার কথা শোনালেন—সেই করুণা ঝরে পড়েছে সিস্টার অরেলির ওপর···সেই করুণার বলে তাঁর নামে প্রাণ দেবার গৌরবে গৌরবান্বিতা হয়েছে সে···শুনতে শুনতে সেদিন ঐ ঈর্ষার দাহ নিজের অন্তরেও অনুভব করেছিল।

অথচ ভাবতে গেলে একসময় ছিল যখন যীশুর নামে মৃত্যুবরণ করার এইরকম আকাঙ্ক্ষা বাড়াবাড়ি মনে হ'ত, কিংবা বলা চলে একেবারে পাগলামি মনে হ'ত। এখন আর তা মনে হয় না। ···ট্রি হাউসে থাকতে উপলব্ধি করেছিল প্রকৃত নান হওয়ার অর্থ কি···সেই থেকে এই দু'বছরে কি পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যে মাঝে মাঝে বিশ্লেষণ করে দেখে। দেখে যত, মনে হয় তার নিজের ধারাটাও প্রকৃত নান হওয়ার দিকেই এগোচ্ছে সেই অবধি। প্রকৃত নান শেষ শক্তিবিন্দুটি পর্যন্ত উজাড় করে দেয় কাজে আর প্রার্থনায়, চিরকাল আশা পোষণ করে কোন না কোন আত্মাহুতির মূল্যে প্রভু স্বর্গে স্থান দেবেন তাকে। সেই আত্মাহুতি তার অসমাপ্ত কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে পৃথিবীতে, সিস্টার অরেলির আত্মাহুতি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেমন।···

আরও তিনজন সিস্টারের কাছে বন্দীরা নিজেদের ফেটিশ খুলে দিয়ে গেছে। নিজে হ'তে, চাইতে হয় নি। ঠিক তারই মত তাঁরা সবাই ফেরৎ দিয়ে দিয়েছেন সেগুলো তাদের, যাতে ওরা নিজেরাই

পরীক্ষা করে বোঝে কোন ক্ষমতা ওগুলোর নেই—যদিও সে কিন্তু কোনদিন বলে নি এমিলকে দলে টেনে কি ষড়যন্ত্র সে করেছে।

রিক্রিয়েশন-বৃত্তের চারদিকে চেয়ে চেয়ে সবার মুখগুলো দেখে সিস্টার লুক। দেখে সিস্টার অরেলির কথা বলতে বলতে বেদনার চিহ্ন মুছে ওদের মুখে গৌরবের আভাস ফুটেছে। যে কৃষ্ণবর্ণ মানুষটা হত্যা করেছে তাকে তারই সমগ্র জাতটার ওপর সিস্টার অরেলির রক্তঝরা সার্থক আজ।···আলোচনাটা মধুর শোনায় না, ছেলেমানুষিও নয়। সব কিছুর মধ্যে যে কথাটা মনে লাগে তা হ'ল তাবিজগুলো হাতে এসে পড়তে সবাই তারা একইভাবে উত্তর দিয়েছে। মনে হবে যেন একটা একক বুদ্ধিবৃত্তি তাদের ভিন্ন ভিন্ন মস্তিষ্কগুলোকে অনুপ্রাণিত করেছে।

একটা ব্যতিক্রমের কথা মনে পড়ল হঠাৎ।

—প্রথম ধাক্কায় আমার খালি মনে হয়েছিল ওটা একটা উন্মাদ খুনে···সমস্ত অন্তর চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করেছিল বিধাতাকে, কেন এই অবিচার!

এ্যাকটিং সুপিরিয়র বললেন, আমার ধারণা আমরা সবাই তাই করেছি সিস্টার লুক। এর জন্যে অনুশোচনার কোন কারণ নেই। পরমেশ্বরের প্রতি রহস্যময় পদক্ষেপটি আমরা তখনই দেখতে পেতাম যদি আর বুঝতে পারতাম, এই লৌকিক জগতে আর থাকতে হ'ত না আমাদের। হ'ত কি!

কথাটা সবারই উদ্দেশ্যে, সবাই-ই তাই তার মর্ম উপলব্ধি করে মাথা নাড়ল।

সিস্টার লুক ভাবছে। সিস্টার অরেলির দেহের অবাঞ্ছিত সমাধি-মিছিলের সংগে যেতে যেতে প্রার্থনাটা বড় বেশি যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল নিজেদের কানেই···অন্তরাত্মা বারে-বারে কেঁদে উঠছিল কেন? কেন?···পরে সেই বেদনাদায়ক সময়টা অনুতাপের কারণ হয়েছে। আজ সিস্টার মারিয়া-রোজ সেই অনুতাপের শেষ ছায়াটুকুও সরিয়ে দিলেন—তার ওপর থেকেও যেমন, ওদের সকলের ওপর থেকেও তেমনি।

শামিয়ানার তলায় ক্ষুদ্র আলোক-বৃত্তের চারপাশে রাতের একঘেয়ে সুর আঘাত হানে। ডিসেম্বরের মধ্য-গ্রীষ্মের উত্তাপে শ্বাসরোধ হয়ে আসে। রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবী সারাদিনে যে পরিমাণ প্রজ্বলিত উত্তাপ টেনে নিয়েছে, সূর্যাস্তের পর তা উদ্গিরণ করে দেয়। এই দুঃসহ গরমে বোধ হয় ঝিঁঝিঁ পোকা আর বাদুড়গুলোরই কেবল ইচ্ছে থাকে ঘুরে বেড়ানোর।

···আর নানদের!

তাদের হাতের বোনার কাঁটায় কাঁটায় ঠোকাঠুকির শব্দ কানে আসে, ওরা সেলাই করছে বসে।

বাদুড় উড়ছে। নানা পোকা-মাকড়।

কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ। তীক্ষ্ণ স্বর।

সে শব্দতরংগে বোনার কাঁটার ঠোকাঠুকির শব্দ কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

···কনভেন্টে কোন বীরত্ব নেই।···

মঠের চলিত উক্তিটা মনে করে নিজের মনেই একটু হাসল সিস্টার লুক।

১৫

কংগোর ক্রিস্‌মাস ইভের মধ্যরাত্রির ম্যাস সব সময়ই মর্মস্পর্শী হয় খুব। পাঁচবার সিস্টার লুক গান গেয়েছে এই ম্যাসে, এ বছর হাসপাতালে ডিউটিতে আটকে ছিল, গানের দলে যোগ দিতে পারে নি। ম্যাসের সময় এসে অন্যান্য দর্শকদের মত পিউতে বসেছে তাদের সংগে। তাদেরই মত একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিল নানদের তৈরি বাঁশ আর ফার্নগাছের পাতার ছোট্ট আস্তাবলটার দিকে। বসে দেখতে দেখতে চারপাশের আসনগুলোর অনুভূতির আভাস পাচ্ছে। সংগীহীন জোয়ান ব্যবসায়ীদের মনে পড়ছে জীবনের সব বড়দিনগুলো—সেই কোন্ ছেলেবেলায় অসীম কৌতূহলে জাবনার পাত্রে শিশু যীশুর মূর্তিটিকে শোয়াতে দেখেছিল। আকণ্ঠ রাম পান করে যে সব ঔপনিবেশিকরা সংগী-সাথী ছেড়ে কনভেন্ট চ্যাপেলে এসেছেন, স্বদেশের কথা ভেবে চোখ ছলছল্ করছে তাঁদের। কনভেন্টের কৃষ্ণাঙ্গ বয়দের মধ্যে যে বৈদ্যুতিক উত্তেজনার প্রবাহ বইছে, সেই প্রবাহটাই সবচেয়ে বেশি আসছে অনুভবে। একধারে সবাই বসে স্থির চোখে তাদের নতুন ধর্মের এই মর্মগ্রাহী দিকটা দেখছে। তাদের মধ্যে জঙ্গলের বুনো ছেলেগুলোও বসে···ওদেরই সটস্ আর সার্ট ধার করে পরেছে। বয়রা ওদের নিয়ে এসেছে অনুষ্ঠান দেখতে।

কি ভাবছে ঐ বুনো ছেলেগুলো কল্পনা করা সম্ভব নয়, তবু টের পাচ্ছে মধ্যরাত্রির সুরেলা ঘণ্টাধ্বনিতে যে আকুলতা ও প্রত্যাশা ফুটেছে ওদের তীক্ষ্ণ চেতনায় তখনই ধরা পড়ল তা। পরমুহূর্তে সে ঘণ্টাধ্বনি থামামাত্র যে নীরবতা নামল, তার মধ্যে ওদের ব্রেসলেটের টুং-টাং শব্দ শোনা গেল···হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা অভিভাবক-ভাইদের হাত ধরতে।

ধব্‌ধবে সাদা ক্যয়ার ক্যাপ মাথায়···সিস্টারদের সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বেরিয়ে এল মঠের তোরণ দিয়ে। অরগ্যানে প্রথম সুর ঝংকৃত হ'ল, তারই সংগে অবিমিশ্র মাধুর্যে সুর মিলিয়ে গলা তুলল তারা। এক একজন করে আসছে সুধীর পদক্ষেপে···সারিবদ্ধ···মিছিলটা দীর্ঘায়িত হচ্ছে ক্রমেই···অবশেষে এ্যাক্‌টিং সুপিরিয়রকে দেখা গেল, দু'হাতের পাতায় শোয়ানো শিশু যীশুর মূর্তি।

নানরা অলটার ঘিরে দাঁড়িয়েছে। মোমবাতির আলো এসে পড়েছে মুখে···পোশাকের লম্বা আস্তিন ডানার মত ঝুলে আছে দু'পাশে···যুক্তকর তারই মধ্যে লীন, বাইরে থেকে দেখা যায় না।···একদল দেবদূত যেন, এগিয়ে চলেছে ম্যানজারটার দিকে—জাব দেবার সেই পাত্রটা। চ্যাপেলের ঘণ্টাটা বাজছে···গানের মধ্যে বাজছে, গানের বিরতিতে বাজছে। সুপিরিয়র যখন খড়ের বিছানার ওপর পোর্সিলিনের মূর্তিটা শুইয়ে দিলেন, অরগ্যানের সংগে ক্যয়ার দলের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে চড়ল···

···ক্রাইস্ট আবার জন্ম নিলেন···ক্রাইস্ট আবার জন্ম নিলেন···

···সিস্টাররা গাইছেন···

···খড়ের ওপর শোয়ানো মূর্তিটার হাঁটুতে টোল, বাঁকানো কব্জি, —পুতুলের মত দেখাচ্ছে···

ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে অনেক উঁচু থেকে।

···ওরা ঠিক ছোট ছোট আবলুশ কাঠের মূর্তির মত বসে আছে এখানে, সিস্টার অরেলি! পালক আর নখের গোছা এখনও গলায়

ঝোলানো ওদের :··· তা'হলেও—ওরা এখানে এসেছে। ছোট বোনটি আমার, এসেছে ওরা। আমাদের মোহন-বিষ্কা দেখছে বসে। কারো একটি নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না···নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত না।

তিনটি ম্যাসের পর প্রায় সব নানরাই বাৎসরিক ভোজে যোগ দিতে গেল খাবার ঘরে—ইচ্ছামত খাওয়া-দাওয়া করতে পারে তারা আজ, কোন বাধা-বন্ধ নেই। ফল আর এক গেলাস মদ, আর অল্প ক'জন যারা এ দিনও মদ খেতে চায় না, তাদের জন্য ঠাণ্ডা করা কোকো। গ্র্যাণ্ড সাইলেন্স অক্ষুণ্ণই রাখতে হবে, তবে তারা চোখে-চোখে কথা বলতে পারে, হাসতে পারে।···আর ঐ মদ—বছরে কেবল চারবার দেখা দেয় বড় বড় ভোজগুলোয়—ইস্টার, এ্যাসাম্পসান, অল্ সেন্টস্ আর ক্রিসমাসে—তাও দু'গব্লিটের বেশি কেউ নয়···ঐ মদ তাদের মুখর চোখে দীপ্তি এনে দিয়েছে।

—সিস্টার অরেলি নিশ্চয় চ্যাপেলে ঐ জংলী-ছেলেগুলোকে দেখছিল।···যদিও যে সম্ভাবনাটা মনে আসছে তার উল্লেখ করাটা হঠকারিতা হবে, কিন্তু আমরা তো অনুরোধও করি নি তাদের, তা সত্ত্বেও তারা যে এল এতে আশ্চর্য হবেই সবাই।

—শোভাযাত্রায় তাকে আমার বড্ড মনে পড়ছিল···খারাপ লাগছিল ভারি···সে সবসময় সামনে থাকত আমার। মাঝে মাঝে চড়ায় আমার গলা উঠত না যখন, তার কণ্ঠের সুরে আমার ত্রুটি ঢাকা পড়ে যেত।

—মাদার ম্যাথিল্ডা আজ রাত্রে আমাদের কথা ভাবছেন নিশ্চয়···মাদার হাউসে বড়দিনের উৎসব—কি সুন্দর হয়, মনে আছে ?

যারা ঠাণ্ডা কোকো বেছে নিয়েছে, মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে তাদের দিকে তাকাতে গিয়ে গোপনে গোপনে কেমন একটা করুণা অনুভব করছে সিস্টার লুক। পানীয়টা ঠাণ্ডা করে দিয়েছে মনটাকে···আজ রাত্রে সারা বিশ্বে যে আনন্দ পরিব্যাপ্ত তারই আভাস লেগেছে ওদের ছোট বঞ্চিত দলটাতেও।···মাদার হাউসের উৎসব অবশ্যই আরও জমকাল হবে। সে কিন্তু একমুহূর্তের জন্যও তার নিজের এই ছোট্ট কমিউনিটির উৎসবের বিনিময়ে সেখানকারটা পেতে চায় না। পশ্চাৎ পটভূমিতে ঢাকের শব্দ, ঝিঁঝিঁর ডাক, উত্তাপের আধিক্যে লাল মুখগুলো—তবুও না।

স্মিতমুখে চুমুক দিচ্ছে পানপাত্রে। মনে হচ্ছে মাদার হাউস আট হাজার কিলোমিটারের চেয়েও অনেক বেশি দূর। কংগোর এই খাবার ঘরে···যেখানে হাসিখুশি সিস্টারদের একটা ছোট কমিউনিটি তাদের মাড় দেওয়া বিবের ওপর তোয়ালে আটকে মধ্যরাত্রির পর আম খাচ্ছে, যারা নিজের দু'হাতের রেখাগুলোর মতই অন্তরংগভাবে জানে পরস্পরকে···এখান থেকে মাদার হাউসের মধ্যে যেন বহু বৎসরের ব্যবধান।

সিস্টার অরেলি তাদের জ্বালাতন করতে যে ভাবে জোর করে আম খাওয়াত—ছুরী-কাঁটা ছাড়াই—বলত, ওগুলো ব্যবহার করা মানে ভগবানের এই অপূর্ব দানকে অপবিত্র করা···দেখল তারা অধিকাংশই সেই পদ্ধতিতে আম খাচ্ছে। টেনে টেনে খোসা ছাড়িয়ে

ফেলে সোজা সোনালি শাঁসের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিচ্ছে চ্যাপ্টা আঁঠিটা ধরতে।

সিস্টার মনিককে আগে কখনও হাতে করে ফল খেতে দেখা যায় নি, আজ দেখা যাচ্ছে তিনিও হাত লাগিয়েছেন আম খেতে। দাঁতে করে তুলে নিয়েছেন অনেকখানি শাঁস, আর সেই খালি জায়গাটার আঁশ ধরে ডিম্বাকৃতি আঁঠিটাকে তুলে ধরেছেন। কলারসিকের চোখ তাঁর, ওটার আকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখছেন হয় তো তাই উদ্ভিজ্জ উৎপত্তি নির্ধারণ করছেন। 'ম্যানগিফেরা ইন্ডিকা'—মনে হয় প্রায় ছ'হাজার বছর ধরে চাষ হচ্ছে···বল্লমাকৃতি চিকণ পাতা, ছোট ছোট লালচে ফুল·· আঁঠিওয়ালা শাঁসালো ফলে রূপান্তর ঘটে তার···

সত্যি তা বলে এমন কথা ভাবছেন না সিস্টার মনিক। সিস্টার লুক জানে যে একটি অদৃশ্য উপস্থিতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে তাদের সবার মনের সংগে, তারই উদ্দেশ্যে কথা বলছেন তিনি।

বোধ হয় বলছেন, তুমিই নির্ভুল সিস্টার, ছোট বোনটি আমার আম খাওয়ার এটাই একমাত্র উপায় বটে।

সিস্টার লুকের সংগে চোখোচোখি হয়ে গেল, আঁশ-ভরা আঁঠিটা নামিয়ে রাখতে রাখতে স্মিত হাসলেন।

১৯৩১ সাল। কে জানত বছরটা কি অমংগলের ছায়া নিয়ে এল। নববর্ষের পনেরো দিন পরে মাদার ম্যাথিল্ডা ফিরে এলেন। প্লেনে এসে পৌছোতে প্রায় সন্ধ্যা হল। এ্যাক্টিং সুপিরিয়রের সংগে কোন্ কোন্ নান বিমানঘাঁটিতে যাবে তা নিয়ে কিছু গবেষণা হ'ল যেমন হয়ে থাকে এবং চিরাচরিত নিয়মে সবচেয়ে নিরহংকার দু'টি নান মনোনীতা হ'ল—রান্নাঘর আর লন্ড্রির তত্ত্বাবধানের ভার যাদের ওপর।

রাউণ্ড দিতে দিতে সিস্টার লুক শুনতে পেল প্লেনটা হাসপাতালের ওপর দিয়ে চলে গেল। শুনে নিজের মনেই প্রার্থনা করল একটু, মাটিতে নামবার মুহূর্তটির জন্য।

এই ভাবে দেশ থেকে কেউ ফিরলে সেদিন সান্ধ্যভোজনের সময় খাবারের সংগে মদ দেবার বিশেষ বিধান আছে। সেদিন চ্যাপেলে স্যালভের ঠিক আগেটাতে মনে মনে মাটিন আর লড বলে নিলেই চলে। তাতে মাদার ম্যাথিল্ডার সংগে প্রথম রিক্রিয়েশনটার সময় খানিকটা বাড়িয়ে নেওয়া গেল। নানদের অনেক কথা বলবার থাকবে তাঁর—মাদার হাউসের বড় বড় ক্রিয়াকলাপের কথা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী মৌখিক- ভোটে রেভারেণ্ড মাদার ইমাক্যুয়েলের পুনর্নির্বাচনের কথা—এটা তিনি ইতোমধ্যে লিখেছিলেনও সংক্ষেপে, সুপিরিয়র জেনারেল কি খবর পাঠিয়েছেন তার কথা, ওদের আত্মীয়-বন্ধু যাঁরা দেখা করেছেন তাঁরা কি বলে দিয়েছেন সে কথা।

পরদিন সকালে একক সাক্ষাৎকার হবে মাদার ম্যাথিল্ডার সংগে, চিন্তায় সেখানে গিয়ে পড়েছে একেবারে। নিজের ধর্মীয় জীবনের কথা বলবার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছে। সুপিরিয়র সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করবেন সর্বপ্রথম। আর যা কিছু সব পরে আসবে—মেটারনিটির এক্সটেনশান-ব্লকটা শেষ হয়ে যাওয়ার খবর, রোগীদের সেখানে রাখা শুরু হয়ে গেছে, তার নার্সিং নানদের স্বাস্থ্যের খবর—সিস্টার অরেলি মারা যাবার পর তারাই সব কিছুর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে এই বিশ্রী আবহাওয়ায় দ্বিগুণ অতিরিক্ত কাজ করে তার কাজগুলো করে যাচ্ছে···

বলবে, আমার আধ্যাত্মিকতায়, মাই মাদার, এতদিনে যেন একটা ঐক্য এসেছে। ঐ দুঃখময় ঘটনাটা অনেক কিছু শেখালো আমায়—আমি অজ্ঞ ছিলাম অনেক বিষয়। অনিশ্চয়তা আর নেই, ছোটখাট ভুল-ত্রুটিতে দুঃখ পেয়ে আত্ম-নিপীড়নের অসারতা এখন বুঝেছি। এ আত্ম-নিপীড়ন এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটে ঠিকই —হ্যাঁ, অনেক সময়ই ঘটে। তাহলেও আমার দক্ষতার চেয়ে ঈশ্বর বেশি করুণা করেন আমায়। নিজেকে আজকাল শক্তিময়ী মনে হয়—আভ্যন্তরীণ শক্তি···

—আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে জানেন? ক্যানারী পাখি গিলে ফেললে বেড়ালকে যেমন দেখায় তেমনি।

ডাক্তার কখন এসে তার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছেন সে নিজের সংগে কথা বলছে।

বিকৃত হাস্যে হাত বাড়ালেন, এংগেবার্টের চার্টটা পেতে পারি কি? মাদার ম্যাথিল্ডাকে শুভেচ্ছা জানাতে যাচ্ছি—সেই সংগে কাজের কথাও যোগ করে দিতে হবে—সাইকিয়াট্রিক কেসটার কথা বলতে হবে তাঁকে।

সিস্টার লুক ফাইলটা দিতে সেটা হাতে নিয়ে তা দিয়ে হাওয়া খেলেন একটু, কাল রাত্তিরেও তার সংগে জেগেছিলেন দেখছি। এবার কি? আত্মহত্যার হুমকি?

—কিছু না ডক্টর, সত্যি ভারি একলা লাগছিল, তাই। না হলে দেখাশোনা যেটুকু করবার, সেজন্যে নাইট-বয়ই তো যথেষ্ট। এক মুহূর্ত থেমে হাসল একটু। আমি শুধু একটু কথা বলেছিলাম তাঁর সংগে আর কিছুই করি নি। তখনই তো একেবারে শান্ত নিরীহ হয়ে গেলেন।

—বিনয়ের আড়ালে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করবেন না। একমাত্র আপনিই ওকে চালাতে পারেন এবং পারেন যে তা নিজেও জানেন বেশ। আমার অবশ্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কিন্তু আপনার দিকে চাইলে আর তা হওয়া হয় না আমার।···মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি সিস্টার, কখন আপনি একটু ঘুমোন—আমার তো মনে হয় আদপেই ঘুমোন না আপনি।

মুহূর্তকয়েক বিশ্লেষণ করে দেখলেন তাকে, গুনগুন্ করে গান গাইতে লাগলেন তারপর। টোসকার সুর ভাঁজতে ভাঁজতেই মনে মনে মতলব একটা ঠিক করে ফেলেছেন, ছোট ছোট চোখ দু'টো জলে উঠল।···উত্তরকালে কতবার তার মনে পড়েছে এ দৃশ্য—কি সরল বিশ্বাসই ছিল অপরের মন-বিশ্লেষণের ক্ষমতার ওপর। ভেবেছিল ডাক্তারের চোখের উজ্জ্বল্যকেও তা দিয়ে বুঝে ফেলেছে।

···এখন থেকে মঁসিয়ে এংগেবার্টকে অল্প-স্বল্প ঘুমের ওষুধ দেবার হুকুম আসবে, আমি যাতে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারি।

গুনগুনিয়ে গান গেয়ে চলে যাচ্ছেন ডাক্তার হাতের ফাইলটা হাত-পাখার মত নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে।

পিছন হতে সিস্টার লুক দেখছে তাকিয়ে। [ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

বাতাসী মঞ্জিল

অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[৺নটবর মিত্রের ডায়েরি থেকে]

ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর হইতে বাতাসী বিবি বাঙালীকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিতেছে, এ কথা বাতাসী বিবির নিজের মুখে শুনিয়া ভাবিলাম, তবে কি সে ইহার পূর্বে বাঙালী-জাতিকে ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ ভাবিয়া ঘৃণা করিত এবং বাঙলার নির্ভীক কিশোর ক্ষুদিরাম শহীদ হওয়ার পর বাঙালী-চরিত্র সম্বন্ধে সে তাহার আগেকার ধারণা পরিবর্তন করিয়াছে ? ইহাতে 'ক্রিমিনাল' (criminal) বাতাসী বিবি সম্বন্ধে আমারও ধারণার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিল। সে যতই হীনচরিত্রা, অপরাধপ্রবণা সমাজ ও আইন-বিরোধিনী পাপিষ্ঠা হোক না কেন, আমাদের শহীদকে সে শহীদ বলিয়া চিনিয়াছে, মনে মনে মর্যাদার আসনে বসাইয়াছে এবং ক্ষুদিরামের স্বজাতি বলিয়া বাঙালীকে সে সম্মানের চোখে দেখিতেছে, ইহা ভাবিয়া আমি মনে মনে তাহার সাতখুন মাফ করিয়া দিলাম।

শুধু তাহাই নহে, মনে হইল আমি যেন বাতাসী বিবির কাছে ছোট হইয়া গিয়াছি। বাতাসী বিবি বাঙালী নহে, বাঙলার কিশোর ক্ষুদিরাম তাহার কেহ নহে ; কিন্তু আমি বাঙালী এবং কিশোর ক্ষুদিরাম বাঙালী, আমার স্বজাতি। তবু এই বাতাসী বিবি ক্ষুদিরামকে যে মর্যাদা দিল, আমি তাহা দিতে পারি নাই। বাঙলায় যে 'রাজনৈতিক' বা 'স্বদেশী' আলোড়ন চলিতেছে আমি সে বিষয়ে কখনো বড় একটা মাথা ঘামাই নাই, আপন মনে অ্যাটর্নীগিরি করিয়া পয়সা কামাইয়াছি আর আপন খেয়ালে ছামুদা'র কুস্তির আখড়ায় কুস্তি লড়িয়াছি। মজঃফরপুর জেলে বাঙলার কিশোর ক্ষুদিরামের ফাঁসির সংবাদে দুঃখবোধ করি নাই তাহা নহে। কিন্তু ঐ একটু সাময়িক 'আহা !' একটু অনুকম্পা। একটু সহানুভূতি। বেচারা, খামখেয়ালী ডানপিটেপনা করিতে গিয়া অকালে বেঘোরে প্রাণ হারাইল। ইংরাজ যদি ক্ষুদিরামকে ফাঁসি না দিত তাহা হইলে খুশি হইতাম—হয় তো ধন্য ধন্যও করিতাম। ইংরাজ তাহাকে ফাঁসি দেওয়ায় দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু বাতাসী বিবির মত ইংরাজকে অমন করিয়া ঘৃণা করিতে তো পারি নাই !

বাতাসী বিবি আমাকে মর্যাদা দিতেছে শহীদ ক্ষুদিরামের স্বজাতি বলিয়া, ইহাই যেন আমাকে ক্ষুদিরামের শহীদত্ব প্রথম অনুভব করাইল ! বাঙলার ক্ষুদিরামকে যেন প্রথম শহীদ বলিয়া মনে করিলাম বাতাসী বিবির ডেরায়। বিধাতার এ কি অদ্ভুত খামখেয়ালী !

ভাবিলাম যে ক্ষুদিরাম অবাঙালী বাতাসী বিবির চোখে বাঙালীকে শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে—আমি বাঙালী—আমার কিছু মন্তব্য করা আবশ্যক। বলিলাম, 'আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ক্ষুদিরামই সর্বপ্রথম ফাঁসির শহীদ।'

বাতাসী বিবি বলিল, 'আজ হইতে পঞ্চাশ সাল আগের কথা ভুলিবেন না, বাবুজি, যখন ব্যারাকপুরে সেপাই ছাউনির ময়দানে সেপাই মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হইয়াছিল। আমি পাঠকজির মুখে তাহার কথা শুনিয়াছি। পাঠকজি তাহার কথা আজিও ভুলিতে পারেন নাই। মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি পাঠকজি নিজের চোখে দেখিয়াছিলেন।'

বলিলাম, সে কথা আমি পাঠকজির মুখে শুনিয়াছি বাতাসী বিবি।'

ইহা শুনিয়া বাতাসী বিবি যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত বোধ করিয়া বলিল, 'ওঃ, তিনি আপনাকে শুনাইয়াছেন? তিনি কি ক্ষুদিরাম সম্বন্ধেও আপনাকে কিছু বলিয়াছেন?'

'না, বাতাসী বিবি।'

'আমাকে বলিয়াছেন।' বলিয়া বাতাসী বিবি যেন আমার উপর তাহার এই কথার ক্রিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল। আমার কৌতূহল হইল। প্রশ্ন করিলাম, 'কি বলিয়াছেন?'

'মজঃফরপুর জেলে যখন ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইতেছিল, তখন সেই ফাঁসি—'

আবার নীরবতা! বাতাসী বিবি যেন বিশেষ কোনো কারণে কথাটা বলিতে ইতস্তত করিতেছে। আমি প্রশ্ন করিলাম: 'তখন সেই ফাঁসি··?'

আমার কৌতূহল আর অতৃপ্ত রাখা উচিত হইবে না মনে করিয়াই বোধ করি বাতাসী বিবি বলিল, 'সামনে দাঁড়াইয়া নিজের চোখে দেখিয়াছিলেন পাঠকজি।'

শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমি চমকাইয়া উঠিলাম। মুখ হইতে আপনা হইতেই বাহির হইয়া গেল, 'অসম্ভব।'

কথাটা উচ্চারিত হইয়া নিজের কানেই বড় কটু শুনাইল। আমার কথা যেন ইঙ্গিত করিতেছে বাতাসী বিবি মিথ্যা বলিতেছে, অথবা বোমভোলা পাঠক তাহাকে মিথ্যাকথা শুনাইয়াছেন। ভয় হইল এইরূপ ইঙ্গিতে বাতাসী বিবি অপমানিত বোধ করিবে, ক্রুদ্ধ হইবে এবং ক্রুদ্ধা ফণিনীর দংশনের অত্যাচার আমাকে সহিতে হইবে। এই রহস্যময়ী রমণী কি ভয়ঙ্করী রুদ্রাণী রূপ ধারণ করিবে কে জানে?

কিন্তু না। বাতাসী বিবি চটিল না। চটিয়াও না-চটিবার ভাণ করিতেছে এরূপ সন্দেহ যাহা হইতে পারিত, তাহা তাহার কণ্ঠের স্বরে এবং বাচনভঙ্গিতে দূর হইয়া গেল। বাতাসী বিবি যেন একটু কৌতুকবোধ করিয়াই বলিল, 'অসম্ভব ভাবিতেছেন কেন, বাবুজি?'

ভরসা এবং সুযোগ পাইয়া বলিলাম, ভারতে এখন প্রবল প্রতাপ ইংরাজ রাজত্ব করিতেছে, ভারত মগের মুলুক নহে, সুতরাং ইংরাজ যখন জেলের ভিতর কড়া পাহারায় এক ঘৃণিত ইংরাজ-হন্তাকে ফাঁসি দিতেছে, তখন সেখানে একটি বে-আইনী দলের পাণ্ডা বোমভোলা পাঠক সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া সেই ফাঁসি দেখিবেন, এ কথাটা সহজে বিশ্বাসের যোগ্য নহে এবং এই কারণেই 'অসম্ভব' শব্দটি আমার মুখ হইতে একরকম অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া গিয়াছিল।

বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, মগের মুলুকেই হউক বা ইংরাজের মুলুকেই হউক, বাতাসী বিবি, পাঠকজি অথবা হেকিম সাহেবের পক্ষে অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করা অনায়াসসাধ্য। বাতাসী বিবির মুখেই সবিস্ময়ে শুনিলাম, বোমভোলা পাঠক ক্ষুদিরামের ফাঁসি-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদিরামকে যে ফাঁসি দিয়াছিল, সেই সরকারী-জল্লাদের সহকারীরূপে!

শুনিয়া আবার চমকাইয়া উঠিলাম। মনে হইল এ যেন কোনও রোমাঞ্চক উপন্যাসের একটি অংশকাহিনী শুনিতেছি অবশ্য কথাটা এবার আর তেমন অবিশ্বাস্য ঠেকিল না।

বাতাসী বিবির মুখে শুনিলাম, হত্যার দায়ে ক্ষুদিরামের যখন ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল তখন হইতেই বোমভোলা পাঠক ক্ষুদিরামের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

'তারপর?'

'ক্ষুদিরামের ফাঁসির তারিখের কাছাকাছি তিনি মজঃফরপুরে চলিয়া গেলেন। আমাদের দলের সেখানেও একটা মস্ত ঘাঁটি আছে, বাবুজি, যেমন আছে তামাম হিন্দুস্তানে নানান শহরে, নানান গাঁয়ে, নানান বন্দরে। জেলখানার সরকারী-জল্লাদের সঙ্গে আমাদের দলের লোকজের জান-পহচান ছিল। লোকটা শুধু মদ নয়, আরো কয়েক রকমের নেশা ছিল এবং সেই নেশার খোরাক সংগ্রহের জন্য সে হামেশাই আমাদের আড্ডায় আসিত। ফাঁসি দিবার সময় তাহার সঙ্গে সর্বদাই একজন সহকারী থাকিত, সে অবসর নিলে বা মারা গেলে ঐ সহকারীই জল্লাদ-পদে তাহার উত্তরাধিকারী হইবে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির বেলায় ঐ সহকারীকে তাহার পুরা পাওনাটা আগাম দিয়া তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া বোমভোলা পাঠক গেলেন মজঃফরপুর জেলে ঐ জল্লাদের সহকারী হইয়া।'

'তারপর?'

বাতাসী বিবি বলিল, 'পাঠকজি লুকাইয়া একরকম বিষ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল ক্ষুদিরামকে মওকা মতো গোপনে সবার অলক্ষ্যে সেই বিষ খাওয়াইয়া দিবেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শরীর শিথিল হইয়া আসিবে এবং জ্ঞান লোপ পাইবে। পাঠকজি ভাবিয়াছিলেন যে শহীদকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না, বিষের সহায়ে তাহার মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার অন্তত কিছুটা লাঘব করিবেন।'

'লাঘব করিতে পারিয়াছিলেন কি?'

'না, বাবুজি, পারেন নাই। ক্ষুদিরামই পাঠকজিকে সেই সুযোগ দেয় নাই।'

বোমভোলা পাঠকের মুখে বাতাসী বিবি যাহা শুনিয়াছিল, বাতাসী বিবির মুখে তাহাই শুনিয়া আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত চমকিত হইলাম। তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপ।

ফাঁসির মঞ্চে যখন ক্ষুদিরামকে আনা হইল তখন সে অনায়াস পদক্ষেপে অম্লান হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিল, যেন কোনো একটি মজাদার খেলা খেলিতে অথবা দেখিতে আসিতেছে। ভয়, উদ্বেগ, বিরক্তির লেশমাত্র চিহ্ন তাহার মুখে, চোখে বা চলনভঙ্গিতে নাই। সে যে এতগুলি লোকের একাগ্র মনোযোগের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে, এই মজাতেই সে মশগুল। যে সাহেব-লোকেরা ভাবিয়া রাখিয়াছিল—এই নেটিভ ছোকরা ভয় পাইয়া, কান্নাকাটি করিয়া একটা কাণ্ড বাধাইবে, তখন তাহাকে জোর করিয়া ফাঁসিতে ঝুলাইয়া দিয়া বেশ মজা উপভোগ করা যাইবে, তাহাদের সে গুড়ে বালি পড়িল।

সরকারী জল্লাদ বিষম বিস্মিত। ফাঁসির এমন আসামী সে আর কখনো দেখে নাই। এ যেন ফাঁসির দড়ি গলায় পরিবার জন্য আকুল! সাহেব-লোক যাহারা ছিল, ক্ষুদিরাম তাহাদের দিকে হাসিমুখে এমন দৃষ্টিতে তাকাইল যে, তাহারা সেই দৃষ্টির তীব্র তাচ্ছিল্য—হয় তো বা কিঞ্চিৎ বিদ্রূপও—সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষণেকের জন্য চোখ নামাইয়া নিল।

বোমভোলা পাঠক আসন্নমৃত্যু ক্ষুদিরামের মুখের দিকে তাকাইয়া চমকাইয়া উঠিলেন। মনে হইল যেন মঙ্গল পাণ্ডের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন তিনি। এ কি আশ্চর্য সাদৃশ্য দুই মুখে! তাঁহার মনে হইল যেন তাঁহার 'ভাইয়া' মঙ্গল পাণ্ডে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া আবার ফাঁসিমঞ্চে আত্মবিসর্জন করিতেছে। না, আর সন্দেহ নাই, এ যে সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি; কেবল বাঙলার সরস মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মুখের কাঠিন্য কিঞ্চিৎ কমিয়াছে, এই যা। বোমভোলা পাঠকের মুখ হইতে অস্ফুট উচ্চারণ করিয়া গেল: 'ভাইয়া!'

এই বেপরোয়া মৃত্যুঞ্জয়ীকে বিষের সাহায্য দিবার কথা বিস্ময়ের ধাক্কায় পাঠকজির মনেই রহিল না। পঞ্চাশ বছর আগে মঙ্গল ভাইয়ার ফাঁসি দেখিয়াছিলেন কিছুটা দূর হইতে, তাহার পঞ্চাশ বছর পরে আজ আবার তাহার ফাঁসি দেখিতেছেন একেবারে সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

সব কিছু ব্যাপার যেন মন্ত্রবলে বড় তাড়াতাড়ি হইয়া গেল, বোমভোলা পাঠক দিশাহারা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ায় ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করিতে পারিলেন না, যাহা করিবেন ঠিক করিয়া আসিয়াছিলেন তাহার কিছুই করা হইল না।

যাহারা ফাঁসি দেখিতেছিল, হাসিমুখে তাহাদের দিকে তাকাইয়া ক্ষুদিরাম বলিল ফাঁসিতে মৃত্যুর পর প্রথম সুযোগে সে এই দেশেই আবার জন্মগ্রহণ করিবে, গলায় এই ফাঁসির দড়ির চিহ্ন দেখিয়াই তাহাকে চেনা যাইবে।

পঞ্চাশ বছর আগে বাঙলার ব্যারাকপুরে সেনা ছাউনির মাঠে অবাঙালী মঙ্গল পাণ্ডে ফাঁসিতে ঝুলিয়া পড়িবার আগে অন্তিম-মুহূর্তে তাহার মুখে ছিল শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি। তাহার পঞ্চাশ বছর পরে বাঙলার বাহিরে মজঃফরপুর জেলে সে আবার ফাঁসি গেল বাঙালী কিশোর ক্ষুদিরাম রূপে, এবার ফাঁসিতে ঝুলিয়া পড়িবার আগে তাহার মুখে অন্তিমধ্বনি:

'বন্দে মাতরম!'

বাতাসী বিবির মুখে বোমভোলা পাঠক কথিত এই কাহিনী শুনিয়া আমার বুকের ভিতর হইতে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বাহির হইয়া আসিল। সেই আর্তনাদে আন্তরিক অনুতাপ আর লজ্জা মেশানো। বাঙলার শহীদ ক্ষুদিরামের কথা যেমন করিয়া ভাবা আমার উচিত ছিল তেমন করিয়া ভাবি নাই, ভাবিতে পারি নাই, লজ্জা আর অনুতাপ সেই জন্য।

মনের উত্তেজনা একটু সামলাইয়া লইতেই মনে হইল বোমভোলা পাঠকের মস্তিষ্কে কিছুটা বাতিকের প্রভাব রহিয়াছে। অথবা বাতিক না বলিয়া বলিতে পারা যায়, ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যু-প্রতীক্ষমাণ মঙ্গল পাণ্ডের স্মৃতি তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাই ক্ষুদিরামকেও তিনি পুনর্জাত মঙ্গল পাণ্ডে বলিয়া ভাবিয়াছেন। ক্ষুদিরামের চেহারায় মঙ্গল পাণ্ডের মুখচ্ছবির আভাস দেখিয়াছেন। তা তিনি দেখুন, কিন্তু আমার চেহারার সঙ্গে তিনি মঙ্গল পাণ্ডের চেহারার সাদৃশ্য কল্পনা করিলেন কেন? ইহার তাৎপর্য কি? ইহা বোমভোলা পাঠকের প্রায় উন্মত্ততার লক্ষণ নহে কি?

আ ়র মনোভাবটা বাতাসী বিবিকে আভাসে জানাইলাম। বলিলাম: 'বাতাসী বিবি, পাঠকজি আমার মুখের চেহারাতেও মঙ্গল পাণ্ডের মুখের চেহারার ছাপ দেখিতে পাইয়াছেন।'

আমাকে বিস্মিত করিয়া বাতাসী বিবি বলিল, 'জানি।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত নহে কি?'

বাতাসী বিবি বলিল, 'না, বাবুজি। পাঠকজির কিছুই আমার কাছে আর অদ্ভুত নহে।'

বাতাসী বিবির কণ্ঠে বোমভোলা পাঠকের উপর অসীম বিশ্বাসের সুর। সেই সুরের জের টানিয়া বাতাসী বিবি আরো বলিল, 'সেইজন্যই পাঠকজি আপনার অসাধারণ ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং পাঠকজি সহজে কাহারও ভক্ত হইয়া উঠিবার মানুষ নহেন।'

মনে প্রশ্ন জাগিল, বাতাসী বিবি আমাকে যে এতখানি গুরুত্ব দিতেছে, আমার জন্য এতটা মাথা ও সময় খাটাইতেছে, আমার প্রায় ভক্ত হইয়া উঠিবার লক্ষণ দেখাইতেছে, তাহা কি আমার প্রতি পাঠকজির এই অদ্ভুত, রহস্যময় ভক্তিরই প্রতিক্রিয়া? কিন্তু মনের এই প্রশ্ন মনের ভিতরেই গোপন রাখিলাম। মুখে উচ্চারণ করিলাম না।

কিছুক্ষণ নীরবতা। আমি নির্ভয়ে মৃত্যুবরণকারী ক্ষুদিরামের কথা ভাবিতে লাগিলাম। বাতাসী বিবি কি ভাবিল বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, 'বাবুজি আমাকে যেন ভুল বুঝিবেন না।'

'তাহার অর্থ?'

'ক্ষুদিরাম জুলুমের বদলা নিবার জন্য নিজের জান কবুল করিয়া জালিমের জান নিতে গিয়াছিল এবং সাচ্চা মরদের মত, বাহাদুরের মত, বুক ফুলাইয়া ফাঁসিকাঠে জান দিয়াছিল, তাহার সেই মর্দানা হিম্মতের জন্য আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি। বাঙালী কাপুরুষের জাত নহে, বাঙালী দরকার হইলে অনায়াসে জান নিতে আর জান দিতে পারে, ক্ষুদিরামই তাহা আমাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু বাবুজি—'

'কিন্তু কি, বাতাসী বিবি?'

'ক্ষুদিরাম যদি আমার দলের লোক হইত, আর বিচারে কোনো ফাঁকে ছাড়া পাইয়া, বা কোনো সুযোগে পলাইয়া দলে ফিরিয়া আসিত, তাহাকে আমি, বাতাসী বিবি, কি করিতাম বলিতে পারেন?'

বলিলাম, 'সমাদরে অভ্যর্থনা করিতে, সম্মান করিতে।'

বাতাসী বিবি বলিল, 'কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করিতাম না। দলের লোকদের সামনে বিচার করিয়া তাহার মৃত্যুদণ্ড দিতাম এবং নিজের হাতে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলী করিয়া মারিয়া কবর দেওয়াইতাম।'

শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। বাতাসী বিবিকে ঠিক যে শ্রদ্ধা করিতে শুরু করিয়াছিলাম এমন কথা বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার প্রতি আগেকার বিতৃষ্ণা ও অশ্রদ্ধার ভাব যে অনেকখানি কমিয়া আসিতেছিল ইহা সত্য। কিন্তু হঠাৎ এ কি কথা বলিয়া বসিল বাতাসী বিবি?

বলিলাম, 'কেন?'

'অমার্জনীয় অপরাধে। কিংসফোর্ড সাহেবকে মারিতে গিয়া সে ভুল করিয়া মারিয়া বসিল দু'জন কেনেডি মেম-সাহেবকে, যাহাদের কোন অপরাধ নাই। গাড়িতে তাহার লক্ষ্য শিকার আছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত না হইয়া গাড়িতে বোমা ছোড়া তাহার উচিত হয় নাই—অমন কাঁচা কাজ করার অর্থ লক্ষ্য কাজটিকে সম্ভাবনা হইতে

আরো দূরে পিছাইয়া দেওয়া, উদ্দেশ্য সাধনের পথে বাধার সৃষ্টি করা। তারপর—'

'তারপর—?'

'তারপর যেভাবে সে ধরা পড়িয়াছিল, সেই ধরা পড়াটাও এক অমার্জনীয় অপরাধ।'

আমি বলিলাম, 'কি আশ্চর্য। ধরা পড়িলে ফাঁসি যাইতে হইবে জানিয়াও সে কি শখ করিয়া ধরা দিতে গিয়াছিল? দুর্ভাগ্যবশত ধরা পড়িয়া গিয়াছিল, সেজন্য তাহাকে নিশ্চয়ই দোষ দেওয়া যায় না।'

'কিন্তু ধরা সে দুর্ভাগ্যের দোষে পড়ে নাই, বাবুজি। ধরা পড়িয়াছিল নিজের বুদ্ধিহীন অসাবধানতার দোষে। খবর পাইয়াছি, বোমা ফাটিবার পরদিনই রেল-স্টেশনে সে খাবার খাইতেছিল, তখন তাহার পাতলা জামার দুই পকেটে দুইটি রিভলভার ঝুলিতেছে। এই অবস্থায় সে ধরা পড়িল। দুই মেম-সাহেবকে বোমা মারিয়া আততায়ী পলাইয়াছে, সে খবর চারিদিকে লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে, এমন গরম আবহাওয়ার মধ্যে রেল-স্টেশনের মত প্রকাশ্য জায়গায় পাতলা জামার দুই পকেটে দুই রিভলভার ঝুলাইয়া সন্দেহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একরকম আত্মহত্যার সামিল নহে কি, বাবুজি?'

বলিলাম, 'পলাইয়া ফিরিতেছে, নাওয়া-খাওয়া হয় নাই, এ অবস্থায় মাথার ঠিক ছিল না; তাই অতটা খেয়াল রাখিতে পারে নাই।'

বাতাসী বিবি বলিল, 'কিন্তু বাবুজি, এমন কাজে যে নামিবে তাহাকে অমন খেয়ালহীন হইলে চলিবে কেন? না বাবুজি, ইহার কোন ক্ষমা নাই।'

বুঝিলাম, ক্ষুদিরামের মৃত্যুভয়হীন অসাধারণ সাহসকে বাতাসী বিবি অসাধারণ শ্রদ্ধা করিয়াছে, কিন্তু তাহার দু'টি ভুল সে ক্ষমা করিতে পারে নাই এবং ক্ষুদিরাম তাহার দলের কর্মী হইলে বাতাসী বিবি তাহাকে শাস্তি দিবার সুযোগ পাইলে নিজের হাতে গুলী করিয়া হত্যা করিত। 'ক্রিমিন্যাল' দলের হয় তো এইরূপই 'ডিসিপ্লিন' (discipline) বা নিয়ম-শৃঙ্খলা, বে-আইনী দলের হয় তো ইহাই আইন, কিন্তু তবু বাতাসী বিবির এই কথায় তাহার প্রতি আমার মন একটু বিরূপ হইয়া উঠিল। মনে হইল এই অদ্ভুত রমণীর মনের ভিতরে যেন পরস্পর-বিরোধী ভাব কাজ করিতেছে, যাহাদের একের সহিত অপরের তেমন সামঞ্জস্য নাই। যাহার জন্য বাঙালীকে সে নূতন চোখে, শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে শিখিয়াছে, তাহাকেই সে নিজের আওতায় পাইলে নিজের হাতে গুলী করিয়া মারিত। অদ্ভুত, অদ্ভুত এই বাতাসী বিবি!

বাতাসী বিবিকে আমার বিতৃষ্ণার ভাবটা বুঝিতে দিলাম না। বাঘিনীর গুহায় বাধ্যতামূলক অবস্থানকালে বাঘিনীর প্রতি বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করা নিরাপদ নহে।

কিছুক্ষণবাদে বাতাসী বিবি হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করিল, 'বাবুজি, আপনি কি জন্মান্তর বিশ্বাস করেন?'

'এ প্রশ্ন কেন বাতাসী বিবি?'

'পাঠকজি বিশ্বাস করেন, সেইজন্য। পাঠকজি আমাকে বলিয়াছেন মঙ্গল পাণ্ডেই আবার ক্ষুদিরাম হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মঙ্গল পাণ্ডে বাঙলামুলুকে শেষ নিশ্বাস নিয়াছিল, তাই নবজন্মে এই বাঙলা-মুলুকেই আবার প্রথম নিশ্বাস নিয়াছিল। ইহা কি সত্য, বাবুজি?'

এই শেষ প্রশ্নে যেন বালিকাসুলভ কৌতূহল এবং আমার উপর তাহার বালিকাসুলভ আস্থা। যেন ইহা সত্য কি অসত্য, তাহা আমি দিব্য উপলব্ধি দ্বারা জানিয়া বসিয়া আছি।

বলিলাম, 'বাতাসী বিবি ইহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার। পাঠকজি যদি এরূপ বিশ্বাস করেন, তবে ইহা তাঁহার কাছে সত্য।'

'কিন্তু আপনার কাছে? আপনি কি বিশ্বাস করেন বাবুজি?'

এ প্রশ্নের উত্তর কি দিব ভাবিতেছিলাম; বাতাসী বিবি আমার উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা না করিয়া বলিল, 'বাবুজি, এই জীবনটাই একমাত্র জীবন; এ জীবন গেলে আর জীবন কখনো মিলিবে না, আমার তো ইহাই মনে হয়।'

বিস্মিত হইলাম। বাতাসী বিবি এইরূপ মনে করে বলিয়া নহে, জীবন সম্বন্ধে চিন্তা এই বে-আইনী দলের কুখ্যাতা সর্দারণীর মগজে কিরূপে স্থান পাইল, ইহাই ভাবিয়া। [ক্রমশ।

SUNLIGHT
Soap
নতুন ফরমুলার
সানলাইটে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

॥ বেরুট রঙ্গমঞ্চ ॥

নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি লোভ আদম ও ঈভের সময় থেকে চ'লে আসছে। ওঁরা দু'জন নিষিদ্ধ ফলের প্রতি লোভ করেছিলেন বলেই প্রসিদ্ধ মনুষ্যজাতির জন্ম। মানুষের সেই আদিম ও অকৃত্রিম দুর্বলতা বম্বের ছায়াচিত্র জগতে তার কায়েমি আসন বসিয়েছে। তাই, যাঁরা রাত একটার সময় বম্বে এয়ারপোর্টে আমাদের সম্বর্ধনা জানাতে এলেন তাঁরা অল্প-বিস্তর প্রায় সকলেই মদোম্মত্ত। এইখানে সরকারীভাবে আমাদের ডেলিগেসনে যোগ দিলেন শ্রীমতী পাকওয়াসা (ইনি ফিল্ম দেখেন, এ-ধরণের একটা কিংবদন্তী শোনা যায়।) এবং বে-সরকারীভাবে যোগ দিলেন বহু ব্যবসাদার। তাঁরা কেউই ছবি করেন না, প্রযোজকদের জবাই করেন। লোক হিসেবে কেউ যে খুব লোভনীয়, তা আমার মনে হল না—এবং আমাদের দেখে ওঁদেরও বোধ হয় মনে হয় নি। হবার কথাও নয়। ছবি যাচ্ছে মাত্র একটা, তাও আবার বাংলা দেশে আসামী ভাষায় তোলা। নাচ, গান এবং পর্দার আকাশে একশো পাওয়ারের চাঁদ নেই ব'লে যাঁরা বাংলা ছবিকে ছবির পর্যায়ে ফেলেন না, তাঁরা যে সেই ছবির নির্মাতাদের নির্মমভাবে বর্জনীয় মনে করবেন তাতে আশ্চর্য কি? আমাদেরও আবার ঘরে নেই ভাত, লম্বা কোঁচা। ছবি করি আধ-পয়সার, নাকটা কিন্তু উঁচু। শিল্পী হিসেবে ওদের আমরা মনে করি নীচু দরের, চিন্তাধারার পটভূমিকায় একেবারে ম্লেচ্ছ। ছবি তোলবার জন্য যখন সকলকে দাঁড় করান হল, তখনই দেখি ভাগাভাগিটা হ'য়ে বসে আছে। একধারে বিয়ারের দল, অন্যধারে কোকাকোলা আর মাঝখানে জর্মান প্রতিনিধি কেল সাহেব।

ছবির জন্য দাঁড়িয়েছি এক লাইন। কেউই কাউকে বিশেষ চিনি না, তবুও আন্দাজে, আভাসে ও ইঙ্গিতে ওদের প্রায় সকলকেই বুঝছি কেবল একজন বাদে। মহিলাটি গলায় মালা পরে চমৎকার আসর জমিয়েছেন। চেহারাটা সুন্দর না হ'লেও বয়সের গুণ যাবে কোথায়? বিয়ারের ঢুলি-পরা পুরুষ-চোখগুলো ঘুরে-ফিরেই সেই বয়সের পায়ে গিয়ে হোঁচট খায়। সুবোধকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কে হে মেয়েটি? অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মনে হচ্ছে।'

সুবোধ বললে, 'দেখি'

দেখতে গিয়ে একেবারে দেখিয়ে দিলে।

প্লেন ছাড়ল রাত দু'টোয়। ঠাসা ভর্তি। আমরা টুরিস্ট শ্রেণী। সামনে লাক্সারি ক্লাস অর্থাৎ মাড়োয়ারী শ্রেণী। জানা গেল বত্রিশ কেদারার কেবিনে পুরো একটা পরিবার। বাপ, দাদা, পরদাদা মায় ঝি-চাকর পর্যন্ত। ফরেন এক্সচেঞ্জ নামে একটা মস্ত ফাঁস আছে। ভারতের বাইরে যেতে হ'লে ওটা একটা মস্ত দায়। বিদেশে পড়াশুনা বন্ধ, এমন কি প্রয়োজনীয় ওষুধও আসছে না—কিন্তু ব্যবসাদাররা বেড়াতে কি ক'রে যাচ্ছে বোঝবার উপায় নেই।

আমার এক মাড়োয়ারী বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলাম, সে বললে—

'দাদা সে কি বলে রে কাহেকো রোবে না? হামাদের রুপেয়া দিয়ে কোংগ্রেস্ বিলাইতকো তাড়ালো। হামাদের দোরকার রুপীয়া না দিলে হামলোগ কোংগ্রেসকে তাড়াব।'

ঠিক কথা এবং দেশনেতারা সেটা মর্মে মর্মে জানেন সেইজন্যই দান বাবদ যে টাকাটা দেওয়া হয় সেটা ইনকাম ট্যাক্স আওতার বাইরে। এ নিয়ে এই সেদিনও লোকসভায় তর্কের ঝড় ব'য়ে গেছে। কিন্তু কর্তারা টলবার পাত্র নয়। কানুনটা কায়েম থেকে গেছে।

আদার ব্যাপারী আমরা, আইনসভার তর্কের ঝড় সাধারণত কাগজের হেডিংয়েই দেখে থাকি, কিন্তু তার উপসর্গগুলো তো পথে-ঘাটে। আপাতত প্লেনে, আমাদের চোখের সামনে। অগত্যা চোখ বুজি।

• • •

বেরুট হল বারোয়ারী এয়ারপোর্ট এখানে প্লেনে তেল নেওয়া হবে অতএব আমাদের ভাগ্যে আর একপ্রস্থ কোকাকোলা। রাত তিনটে, ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে কোকাকোলাবাহী মহিলাকে আড়চোখে দেখে নিয়ে পাশের চেয়ারের দিকে আঙুলের ইসারা করে বলি, 'ওঁকে দিন!'

উনি হলেন গ্রুপফটোর সেই মধ্যবর্তিনী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণী অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় একবার আমার দিকে চেয়ে নির্বিবাদে গেলাসটি নিয়ে নিলেন। আর সবাই আমারই মতন তন্দ্রাচ্ছন্ন কোকাকোলার স্পৃহা কারুরই নেই। মিনিট দুয়েক পর প্লেটভর্তি স্যাণ্ডউইচ এলো আমি আবার ঘামের ঘোরেই পাশের দিকে ইসারা করি। এবার বোধ হয় মহিলাটি আপত্তি জানালেন।

ইজিপ্সিয়ান হোস্টেস্ ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বললেন—ইয়ু মাস্ট নো? ইওর হাসব্যান্ড অ্যাগ্রি'

আড়চোখে চাইলাম। কে কার স্বামী? দেখি ইজিপ্সিয়ান মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। আমায় চোখ চাইতে দেখে সে তেমনি মিষ্টি ভাষায় প্রশ্ন করলে—ইয়াস? ইয়ু বি অ্যাংগ্রি?

ও হরি আমার ইঙ্গিতকে ও ভুল করে ভেবে বসে আছে স্বামিত্বের সঙ্কেত। সুবোধ (ডাক নাম পাজি!) ঘুমোয় নি চোখ বুজে শুয়েছিল। পেজেমো ক'রে বললে, 'নিউ ব্রাইড ইট কেক!'

মেয়েটি চোখ কপালে তুলে বললে, ও লা লা!—নিউ ব্রাইড!

দেন ইয়ু মাস্ত !—নো ?' প্লেটটা তখন আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'দেন ইয়ু ইত।'

সুন্দরী যুবতী, কোন কারণেই 'না' বলা আমার নিয়ম বিরুদ্ধ, 'খেলাম।' প্লেট সরিয়ে রেখে টেবিলের ওপর পা ঝুলিয়ে মেয়েটি জমিয়ে বসল।

'কবে বিয়ে হয়েছে আপনাদের ?'

ও কোণ থেকে পাজি বলে, 'কাল। বিলেত যাচ্ছে হানিমুন করতে।'

মেয়েটি আরও চোখ পাকায়, হানিমুনটা যেন ওরই। বলে, 'ও মা সত্যি'

আমাদের সহযাত্রিণীর রসবোধ আছে। অস্পষ্ট বললে, 'হাঁ।'

সকৌতুকে আমার দিকে তাকায়। দলের প্রায় সকলেই মুচকি মুচকি হাসছেন। তাইতেই বোধ হয় হোস্টেসটির সন্দেহ হল, বললে, 'সত্যি বিয়ে হয়েছে ?'

এবার উঠে বসতে হল। পর্দা যখন উঠেছে নাটকটা জমাতেই হবে। বলি, কেন পাত্র হিসেবে আমি কি নিতান্তই অবিশ্বাস্য।'

ও বোধ হয় আবার বিশ্বাস মানল। আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সহযাত্রিণীকে বললে, 'আপনার ভাগ্য আছে !'

'আমি চট্ করে উত্তর দি', 'তোমারও হতে পারে।'

'কেমন করে ?'

'আমায় বিয়ে ক'রে।'

হেসে হোস্টেস্ গড়িয়ে প'ড়ে যায় আর কি ! হাত দু'টোর ওপর শরীরের ওজন চাপিয়ে মাথাটা হেলিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'ধ্যাৎ তোমার তো বিয়ে হ'য়ে গেছে !'

'আবার হ'তে পারে। জাতে আমি মুসলমান, চারবার হ'তেও আপত্তি নেই !'

'তোমার বৌ তোমায় মারবে !'

'তাহ'লে তালাক দিয়ে দব' !'

মেয়েটি আবার খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে; সহযাত্রিণীকে বলে, 'সাবধান তোমার স্বামী লোক ভালো নয় ভয়ানক রিস্কি !

'জানি।' সহযাত্রিণী আমায় একপলক দেখে, বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলে—'জীবনটাই তো রিস্ক !' আমায় বলে, 'না ডার্লিং ?'

'সেইজন্যেই তো তোমায় ভালোবাসি। আমাদের তো বিয়ে নয়, একেবারে কমরেডশিপ।'

হাসির ঝড় বয় চারিধার থেকে। এমন সময় খাওয়ার ডাক পড়ে

সহযাত্রিণী আমার হাতের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বলে, 'চলো ডার্লিং !'

হোস্টেস্ চলল সঙ্গে সঙ্গে। প্লেনের সিঁড়ির তলায় বলে, 'বাই ! বাই !' সহযাত্রিণীকে বলল, 'তোমায় হিংসে হচ্ছে !'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম হাত ধরাধরি করেই। পেছন ফিরে দেখি মেয়েটি তখনও হাত নাড়ছে। নাটকটার এইটাই শেষ দৃশ্য।

শেষ ডায়লগ, বললে সহযাত্রিণী—'হ'লে আমি খুশিই হতাম !'

জানলার ধারেই আমার সীট্। পর্দাটা সামান্য সরিয়ে বসলাম — ভোরের আকাশে তারা চিক্‌চিক্ করছে। ওপরে উঠলাম। নীচে ঘুমন্ত শহর, পাশে জাগ্রত আকাশ। নীচে শহরের আলোগুলোও আস্তে আস্তে নিঃশেষিত হ'য়ে অসেছে।

ছেড়ে এলাম বেরুট। ফেলে এলাম একটি মাত্র দর্শকের জন্য অভিনীত দু'টি চরিত্রের ছোট্ট একাঙ্ক নাটিকা।

* * *

সকালবেলাকার প্রথম সূর্য ঘুম থেকে তুলে দিল আল্পস্-এর ধারে, সুইজারল্যাণ্ডের ওপরে। বেরুট ছেড়েছি ব্যস্ত জীবনের একটা ছোট্ট অথচ সুন্দর বৈচিত্র্য নিয়ে। জুরীকে নামলাম একেবারে জীর্ণ। শরীরে ক্লান্তি; শীতে কাঁপুনী। মনে গভীর অবসাদ। দেশ থেকে বহুদূরে; কাজের মধ্যে কম করে দু'মাসের ফাঁক পড়বে, তার ওপর মেয়ের জন্যে মনের কোথায় যেন একটা করুণ মায়া মুহুর্মুহু আমার মনটাকে নাড়া দিয়ে যায়। প্লেন এখানে আবার তেল নেবে। আমাদের ভাগ্যে বোধ হয় কোকাকোলা।

বিরাটাকার দৈত্যের মতন দানবীয় মেসিন নিয়ে চলেছে এয়ারপোর্টটাকে নতুন করে গড়ার কাজ। তারই মধ্যে দিয়ে চলেছি খেলাঘরের ট্রেনের মতন ডিজেলটানা গাড়িতে। পাশে এসে বসেছে সহযাত্রিণী। ও যে আসবে, পাশে বসবে এমন আশঙ্কা আমার অবশ্যই ছিল।

'ইয়ু আর এ ব্যাড হাসবেণ্ড।'

পাশে বসে ছেলেমানুষের মতন হাসতে থাকে। ওর চাউনিতে বেশ বুঝতে পারি রাতের মাধুর্য এখনও ওর মনে এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। গাড়ি চলতে থাকে, খানিকটা প্রায় লাফিয়ে লাফিয়েই। হাতখানা ও আমার মুঠোয় মধ্যে মেলে ধরে। হাতের ভাষা ওর চোখের দৃষ্টিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—দূরে বহুদূরে—আল্পস্ পাহাড়ের ওপর ভাসা-ভাসা মেঘেরও ওপারে। দূরে দেখি পাইনগাছগুলো আকাশের দিকে ইসারা করে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাসের আসা যাওয়ার একটানা সুর ঐ দানবীয় মেসিনগুলোর হুঙ্কার ছাপিয়ে উঠেছে। ঠিক সহযাত্রিণীটির মতন। আমার এই বিস্তৃত পৃথিবীতে এত ব্যস্ততা, বাঁচবার সংগ্রাম, পাঁচজনের মধ্যে নিজেকে প্রচার করার প্রবল প্রচেষ্টা, স্বার্থের হানাহানি; পেছনে ফেলে-আসা দিনের দারুণ দৈন্য, অনাগত ভবিষ্যতের কাছে প্রচণ্ড দাবী। কিন্তু তারই মধ্যে ওর হাতের ছোঁয়াটুকু আপন স্বাতন্ত্র্য ও স্নিগ্ধতায় বিস্তীর্ণ আমাদের সাথিত্বের মেয়াদ আর বড় জোর দু'ঘণ্টা তারপর যে যার পথে চলে যাব আপন আপন স্বার্থ সন্ধানে, জীবনে আর কোনদিন হয়ত দেখাও হবে না তাহ'লে ? ভাবলাম হাতটা সরিয়ে নি, কিন্তু পারলাম না। নেক্সট ছবিতে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানোর যে আকুল মিনতি ছিল কেরানীবাবুর, আজ তার মানেটা আরও একটু স্পষ্ট হল। সহযাত্রিণীর হাত ধরাটাও ঠিক তাই। পুরো ছবির একটি কোণে সামান্য কেরানীবাবুর ছায়া। তার বেশি নয়।

মেয়েটি বললে, 'আমার নাম, মার্থা।'

আমার নামটা বোললাম না। কারো স্মৃতির বোঝা না হওয়াই ভালো।

জুরীক টার্মিনালটা সত্যিই সুন্দর। এখানে বেরুটের

বিরাটত্ব নেই, কলকাতার বিশৃঙ্খলতা নেই, বম্বের বুরিশনেশ নেই। শিশুদের ঘরবাড়ির মতন সহজ-সরল পরিবেশ। এলোমেলো সাজানো আরামকেদারা, মাঝখানে কাউণ্টার। কোণে কফির প্রকাণ্ড পারকুলেটার। বাঁচা গেল। কোকাকোলার দৌরাত্ম্য আর সইতে হবে না।

হাঁফ ছেড়ে ঘুরতেই দেখি মাড়োয়ারীদের ঠাকুর্দা। ওঁরা সদলবলে জুরীকেই নামবেন। বুড়ো বললে—'বাবুজি, কিধার যাচ্ছেন?'

'বার্লিন।'

'আরে ও শালা তো হিটলারকা রাজ। রহিয়ে ইধার। শরীল ভি আছে পৈসা ভি আছে।'

'পয়সা?'

ঠাকুর্দা হেসে বলেন—'বাঙালীর বিজনেস্ হোবে না! আরে বাবুজি, ইধারকা ঘড়ি সারা দুনিয়া মে মশুর আছে। আমরা তিশজন তিন ডবল ঘড়ি লেবে। একঠো ঘড়িমে শ' রূপীয়া লাভ, তো নব্বেমে কিতনা?'

'কাস্টমস্ ধরবে না?'

'কাহেকো? চীৎকার ক'রে ওঠেন ঠাকুর্দা—'একঠো ঘড়ি তো দেশ সে আনবার পরমিশন আছে—আর দোঠো লিয়ে যাবার। আমরা কোই ঘড়ি আনে নি। সে হল তাহ'লে তিনঠো। ব্যস্ ঘড়ি লেকর হামারা আনা যানা অসুল।'

বুড়োর কবল থেকে উদ্ধার করল' মার্থা। কফি এনেছে ক্রীম দেওয়া। গরম ধোঁওয়া উঠছে।

কোণের ছোট্ট টেবিলে বসি আমি আর মার্থা, মুখোমুখি।

'হ্যালো নিউলি ওয়েডস্, কি হচ্ছে?'

ঘুরে দেখি শকুন্তলা সায়গল, সঙ্গে পাজি। আমাদের ট্রাভেলিং এজেণ্টের ও একজন স্থির আকর্ষণ। দেশে টিকিটের ব্যাপারে প্রায়ই ওর শরণাপন্ন হ'তে হয়। ওর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়ে মাঝে মাঝে যে ওর দৈনন্দিন কর্ম-জীবনে বিনা টিকিটের যাত্রীও হই না তা বলব' না। শুধু আমি নয় অন্য অনেকেই।

'কে বলুন?'

বোঝা গেল পাজি ওকে গল্পটা বেশ গুছিয়ে বলেছে। আমার পাশের চেয়ারে ব'সে বলে মার্থাকে—'খুব সাবধান! এঁরা ফিল্মের লোক, মিথ্যেটাকেও সত্যি বানিয়ে চোখের জল ফেলায়!'

মার্থা একপলক চুপ ক'রে থেকে ছোট্ট উত্তর দেয়—'জানি।'

ওদের দৃষ্টিবিনিময়ের মধ্যে একটা বিচিত্র সুর। সেটাকে কাটিয়ে দেব বলে শকুন্তলাকে প্রশ্ন করি—'তুমি কোত্থেকে?'

ও ওর ম্যান-কিলার হাসি ছড়িয়ে বলে—'ছুটি নিয়ে ছোটাছুটি। পরশু এসেছি এখানে, কাল কোথায় থাকব ভাবি নি।'

'আপাতত?'

'বার্লিন।' বলেই তাকাল মার্থার দিকে। অবার ওদের দৃষ্টিবিনিময়। সুরটা যে সহজ নয় সেটা বুঝলেও, কারণটা আমার ঠিক বোধগম্য হল না।

* * *

সাড়ে দশটায় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট। জর্মানীর মাটিতে পা দিয়েই আমরা ওদের অতিথি। যাকে বলে একেবারে জামাই অভ্যর্থনা। ফুল, ফল, চকলেট, ফটোগ্রাফ, অটোগ্রাফ, প্রেস, ওদের কোনরকমে পাশ কাটিয়ে যখন মার্থার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম তখন ট্রানজিট যাত্রীরা চ'লে গেছে। দূরে প্লেনটা দাঁড়িয়ে পাখা ঝাড়া দিচ্ছে।

মার্থা না বলে যখন গেছে তখন রাগ করেই গেছে, কিন্তু অপরাধটা বুঝলাম না। বেরুটের সুন্দর ছোট্ট নাটকের যবনিকা পড়ল, গ্রামের বারোয়ারি থিয়েটারে ড্রপসিন পড়বার মতন একেবারে বিনা নোটিশে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতন মার্থার মুখখানা কল্পনা করতে গিয়ে দেখি, সেটাও ঝাপসা হয়ে গেছে। কেমন দেখতে ছিল মার্থা? আর জানবার উপায় নেই। ও জীবনের ভিড়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে হারিয়ে গেছে। মনে আছে বেরুটে প্লেন ছাড়বার ঠিক আগে সিঁড়ির ওপর ওর শেষ ডায়লগ, 'হলে খুশি হতাম'—আর মনের মধ্যে মিশে আছে ওর হাতের ছোঁওয়াটুকু।

কেলসাহেব টেনে নিয়ে গেলেন দোতালায়। কিছু খেয়ে আবার এক ঘণ্টা প্লেন। শকুন্তলাকেও টেনে নিয়ে গেলাম। কফি খেয়েই ও উঠে দাঁড়াল।

'এ কি? খাবে না?'

'উঁহু! আমার প্লেনের সময় হ'য়ে গেছে।'

'তুমি যে বললে বার্লিন যাবে।'

'বলেছিলাম।'

'তাহ'লে?'

'ওটা বলেছিলাম তোমার বেরুটের কনেকে হিংসেতে কানা করব' বলে—করেওছি।'

শকুন্তলা চলে গেল। চেয়ার সরিয়ে যেতে আমার যতটুকু দেরি হ'য়েছে তারই মধ্যে ও একেবারে নিরুদ্দেশ। প্রকাণ্ড এয়ারপোর্ট ভর্তি লোক। ঐ বিরাট জনতার মধ্যেও আমার মনে হল—আমি একেবারে একলা। পৃথিবীর কাউকে চিনি না। বিশেষ ক'রে মেয়েদের তো নয়ই।

॥ বার্লিন ॥

বার্লিনের মাটিতে পা দিয়েই যে মানুষটার কথা প্রথম মনে হয়—তাঁর নাম হিটলার। কম করে এক মাইল বৃত্তের ওপর আধভাঙা চাঁদের মতন চমৎকার এয়ারপোর্টটা—তাঁরই কীর্তি। এখানে দিনে-রাত্রে যে কোন সময় একসঙ্গে ছ'খানা প্লেন উঠতে নামতে পারে। প্লেন এসে থামে একেবারে বারান্দার তলায়, প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়ানোর মতন। দলে দলে ডেলিগেট আসছে দেশ দেশান্তর থেকে, তাই দিকে দিকে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা। সারবন্দী রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার আর উৎসুক প্রতিনিধিদের ভিড় ঠেলে যতই এগিয়ে চলি, ততই কানে বাজে এয়ার রেড সাইরেন আর চোখে ভাসে নাকের তলায় একগোছা বাটারফ্লাই গোঁফ। মনে পড়ে, ওপর দিকে তোলা ডান হাত আর তার ওপর স্বস্তিকা। অতটুকু মানুষটা একদিন ছিল এত বড় পৃথিবীর আতঙ্ক। 'হেল হিটলার।'

পৃথিবীর ইতিহাসে হিটলার একমেব অদ্বিতীয়ম্। হিটলার আসলে যাই হোক, জর্মান শুধু কাগজ, যাকে বলে 'ডোমিসাইল্ড'।

একটা মানুষ যখন অন্য দেশকে নিজের ব'লে স্বীকার ক'রে নেয়, তখন সে দেশের সাধারণ নিয়মকানুনকে সে মেনে নেয়। হিটলারের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। উনি দেশের আইন মানেন নি, দেশ ওঁর আইন মেনেছিল। উনি চেয়েছিলেন জর্মানীকে বড় করতে। করেছেন ছোট। উনি চেয়েছিলেন সারা পৃথিবীর জর্মানকে এক করতে। করেছেন জর্মানীটাকেই দ্বিখণ্ডিত। চেয়েছিলেন জর্মানীর বাইরে রাইখ রাজত্ব; রাইখটা-কেই ক'রে বসেছেন বারোয়ারি জমিদারী। পরিকল্পনা ছিল নতুন দেশ, নতুন জাত—হয়েছে টুকরো দেশ, নিশ্চিহ্ন জাত। আশা ছিল মস্কোতে বসবেন রুশকে পদদলিত ক'রে। মস্কো এসে ব'সে আছে জর্মানীর মাথায়। জাতটাকে করতে চেয়েছিলেন পবিত্র; ক'রে বসেছেন পতিতা। জ্যু-দের করতে চেয়েছিলেন নির্বংশ। তারা সৃষ্টি করেছে নতুন দেশ। উনি বাঁচতে চেয়েছিলেন আকাশ ছুঁয়ে; মরতে হল মাটির তলায়। আপনি বলবেন এসবই হল যুদ্ধে পরাজয়ের অবধারিত উপসংহার। আসলে ওঁর কার্যাবলীর অনিবার্য পরিণামই হল যুদ্ধ-পরাজয়।

শুধু হিটলার নয়, জর্মানীর সব ব্যাপারেই সবই উল্টো-পাল্টা। সাধারণত একটা যুদ্ধ-জয় করলে একটা রাজত্ব লাভ হয়—জর্মানী একটা যুদ্ধ হেরে প্রভু পেয়েছে চারটে—ইংরেজ, আমেরিকা, ফ্রান্স ও রাশিয়া। পূর্ব-জর্মানীতে পুরোপুরি রাশিয়ার রাজত্ব; বাকি অংশের অংশীদার ইংরেজ, আমেরিকান ও ফরাসী। এ বিষয়ে পশ্চিম-জর্মানীর যে কোন বাসিন্দার সঙ্গে আলোচনা করলে বুদ্ধির দংশন অবশ্যম্ভাবী। সকালবেলায় ওঁরা চান যে ইংরেজ, আমেরিকান ও ফরাসীরা জর্মানী ছেড়ে চ'লে যান, কারণ ওঁদের উপস্থিতি হল দাসত্বের স্মারক। বিকেলবেলা মত পাল্টে বলেন—এঁরা থাকলেই মঙ্গল, নইলে রাশিয়া কখন যে কি ক'রে বসে তার ঠিক কি?

ওদেরই বা দোষ কি? থেকে থেকে জর্মানীতে এই তিন দেশের বড়কর্তাদের কনফারেন্স বসে আর নিত্য শাসনতন্ত্রের নীতি পাল্টায়। আজ কনফারেন্সে ঠিক হয় জর্মানীকে অস্ত্র দাও, প্রস্তুত কর; ও বেলা হুকুম হয়, অস্ত্র দিও না, বিপদ ঘটবে। এ মাসে স্থির সিদ্ধান্ত হয় জর্মানীর শিল্প-কেন্দ্রে অস্ত্র ছাড়া আর কিছু বানাবার হুকুম নেই; ও মাসেই আবার সতর্কবাণী প্রচারিত হয়, কড়া নজর রাখ জর্মানী যেন কোন মতেই অস্ত্র না বানায়। যখন রুশ হুঙ্কার দেয়, তখন তিন কর্তা উঠে-প'ড়ে লেগে যান পূর্ব ও পশ্চিম-জর্মানী এক করার প্রচেষ্টায়। আবার যেই এক হওয়ার কথা ভাবতে আরম্ভ করে অমনি হাঁই-হাঁই ক'রে ব'লে ওঠেন, 'খবরদার, পূর্ব-জর্মানীর সঙ্গে মিশেছ কি মরেছ।'

জর্মানীকে নিয়ে সবচেয়ে বিপদে পড়েছে ইংরেজ। দু-দু'টো যুদ্ধের মারাত্মক অভিজ্ঞতা ওদের, তাই ইংরেজ বলে, জর্মানী হ'ল জাতসাপ। তাই ওদের হাতে অস্ত্র দিতে ইংরেজ নারাজ। য়ুরোপ বলে, অবশ্যই দাও, ওরা একেবারে রাশিয়ার ধার ঘেঁষে, রাশিয়াকে সামলাতে হ'লে ওদের রণসাজে সাজাতেই হবে। ইংরেজ মাথা নেড়ে বলতে বাধ্য হয়, 'তা ত' ঠিক কথা—তাহ'লে অস্ত্র দাও।' য়ুরোপ কনফারেন্স ডাকে এই 'দাও'—আর 'দিও না'র দ্বন্দ্ব শেষ হবার নয়।

জর্মানীকে নিয়ে যেমন সকলের বিপদ, সকলকে মাথার ওপর নিয়ে জর্মানীর তেমনি বিপদের অন্ত নেই। জর্মানী যদি বলে, 'আমরা অস্ত্র চাই না'—তো য়ুরোপ বলে, 'তা চাইবে কেন? তাহ'লে যে যুদ্ধ করতে হবে! তোমরা চাও আমাদের রক্তপাত ক'রে তোমাদের আমরা বাঁচাই!' জর্মানী যদি বলে, 'দাও আমাদের অস্ত্র'—তো সারা য়ুরোপ আতঙ্কিত হ'য়ে বলে, 'তা আর নয়? নইলে আর একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধবে কেমন ক'রে?' অস্ত্রপ্রসঙ্গ ছেড়ে যদি শাসনতন্ত্র প্রণালীর প্রশ্ন ওঠে তো সেখানেও সেই একই পরিস্থিতি। য়ুরোপীয় সমবেত শক্তি সমস্বরে চীৎকার ক'রে বলে, 'দাও ওদের ডেমোক্রেসি।' জর্মানী যেই সাধারণ নির্বাচন ক'রে দেশ শাসন করার কথা ভাবতে আরম্ভ করে অমনি য়ুরোপ মত পাল্টে ব'লে ওঠে—'খবরদার ওদের ডেমোক্রেসি দিয়েছ কি মরেছ! ওরা রাতারাতি চলে যাবে রুশীয় রোশন-চৌকিতে।' যাক আর নাই যাক, আপাতত জর্মানী যে কি করবে আর কি করবে না—বলা একেবারে অসম্ভব। ওরা নিজেরা তো জানেই না, যাঁদের জানবার কথা তাঁরা নিজেরাও ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না। য়ুরোপ চাইছে জর্মানী ডানদিক দিয়ে হাঁটুক বাঁ দিক চেপে; ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিক হামাগুড়ি দিয়ে নয়ত' শুয়ে থাক দাঁড়িয়ে, হেঁট ও বেড়িয়ে।

হিটলারের কথা বলছিলাম। মানুষ বাঁচে তার কীর্তির মহিমায়। হিটলার বেঁচে আছে তার ধ্বংসের কলঙ্কে। একটা জীবনে মানুষ এত ধ্বংসের কারণ হতে পারে, এ যেন চোখে দেখলেও অবিশ্বাস্য মনে হয়। বার্লিনের পথে পথে তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। প্রকাণ্ড চওড়া পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখি দু-ধারে ভাঙা বাড়ি, কান পাতলে নিশ্চয়ই শুনতে পেতাম লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের মরণার্তনাদ। কোথাও দেখি দু'টো আধভাঙা বাড়ির পর দশ-বারোখানা একেবারে নিশ্চিহ্ন; কোথাও দেখি শুধু মাঠ আর মাঝখানে মার্কিনী স্কাইস্ক্রাপার। পথের ধারে-ধারে ভাঙা বাড়িগুলোর যতটুকু অবশিষ্ট আছে সেইটুকুই সাজিয়ে-গুছিয়ে দোকান, ওপরে ভাঙা দেওয়াল আর ভর্তি আগাছা। শহরের ঠিক মাঝখানে মাঠের পর মাঠ পড়ে আছে। মাঝখান দিয়ে রাস্তা আর মাঠে মাঠে পুরোণ নামের নতুন সাইনবোর্ড। কবরস্থানে যেমন ক্রশ থাকে। থেকে সে প্রমাণ করে কোন একদিন ছিল আজ নেই। বার্লিন হল আধুনিক সভ্যতার আধুনিকতম কবরস্থান।

সব দেশেরই চারটে দিক থাকে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম। বার্লিনের দুটো দিক; পূর্ব ও পশ্চিম। আসলে বার্লিন একটা প্রহসন; পশ্চিম দিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ঝকমকে রূপ; পূবে আয়রন কার্টেনের গভীর অন্ধকার। এর একটা পথ পশ্চিম-য়ুরোপে, অন্যটা মধ্য-এশিয়ায়। এখানে একই নামে দু'রকম টাকাকড়ির প্রচলন, দু'জন মেয়র কিন্তু একটা যানবাহনের ব্যবস্থা। ধরুন কলকাতা। দক্ষিণ কলকাতা থেকে শ্রীরামপুর যেতে যদি লাগে এক ঘণ্টা তো বার্লিনে ঐ দূরত্ব যাবেন চার ঘণ্টায়।

ফেরার কোন নিশ্চয়তা নেই, কারণ রুশীয় মেজাজ-মর্জির ওপর বেশ খানিকটা নির্ভর করতে হয়। তাঁরা যখন ইচ্ছে পথ বন্ধ করে দেন, যখন ইচ্ছে পাশপোর্ট চেক্ করেন। পাশপোর্ট সঙ্গে থাকলে বিপদ কারণ সব কিছু খোঁজ খবর নিয়ে তবে ছাড়বেন; না থাকলে আরও বিপদ, ছাড়বেনই না।

কোথায় যে ত্রি-শক্তি এলাকার শেষ আর রুশীয় প্রভুত্বের আরম্ভ বলা বড় কঠিন। পশ্চিম-বার্লিনের বাসে উঠে যেখানে ইচ্ছে যাওয়ার উপায় নেই, আবার পূর্ব-বার্লিনের ট্রামে উঠে পশ্চিম-বার্লিন বেড়ানোয় বাধা নেই। রাশিয়ার যুদ্ধ-স্মৃতিসৌধ আমেরিকান এলাকায়। সেখানে রুশীয় প্রহরী অথচ মার্কিনী ভ্রমণকারী। রাশিয়া পরিচালিত পূর্ব-বার্লিনের বেতারকেন্দ্র পশ্চিম-বার্লিনে, কিন্তু পশ্চিম-বার্লিন পরিচালিত বেতার অনুষ্ঠান পূবে শোনা নিষিদ্ধ। সারা বার্লিনের আণ্ডারগ্রাউণ্ড ট্রেন (যাকে ওঁরা বলেন যু-বান) পূর্ব-বার্লিনের সম্পত্তি কিন্তু তাতে বৈদ্যুতিক শক্তি যোগান দেন পশ্চিমাংশ। একটা রাস্তার একধারে রাশিয়া, অপর ধারে রুশ-ভীতি; পাশের রাস্তাটা আমেরিকার, কিন্তু তার ধারের বাড়িগুলো রুশ এলাকায়। একটা বাড়ি আছে, যার সদর দরজা রুশ এলাকায়, ঘরগুলো ফরাসি এলাকায় এবং পেছনের উঠোন আমেরিকান এলাকায়। সেখানে থাকেন একজন ভারতীয় ডাক্তার। তিনি খাবার কেনেন রুশ এলাকায়, কারণ সস্তা; বিয়ে করেছেন ফরাসি মহিলা, কারণ তিনি সুন্দরী; বেড়াতে যান আমেরিকান এলাকায়, কারণ পথঘাট সুন্দর, শোভনীয়। কথায় কথায় তিনি বললেন—'আছি তো মহানন্দে, কিন্তু মরলে না বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে ওঠে।'

'কেন?'

'মরলে ডেথ-ডিউটি দাবি করবে তিন রাজ্য আর তাই নিয়ে বেঁধে যাবে খণ্ডযুদ্ধ!'

কথাটা ভদ্রলোক ঠাট্টা ক'রে বললেও, অবস্থাটা কিন্তু অনেকটা তাই। রুশীয় পূর্ব-বার্লিনে আমাদের একটাকার মূল্য এক মার্ক, পশ্চিম-বার্লিনেও প্রায় তাই, কিন্তু রুশীয় পূর্ব বার্লিনের মার্ক পশ্চিম-বার্লিনে চার আনায় পাওয়া যায়। আবার পশ্চিম-বার্লিনের মার্ক পূর্ব-বার্লিনে সরকারীভাবে অচল হ'লেও বে-সরকারীভাবে সোনার দামে বিকোয়।

বহুলোক আছে যারা থাকে রুশ এলাকায় কিন্তু কাজ করে পশ্চিম-বার্লিনে। তারা যা মাইনে পায় সেটার মূল্য রুশ এলাকায় চারগুণ বেড়ে যায়। আবার এমনও বহুলোক আছে যারা থাকে পশ্চিম-বার্লিনে আর কাজ ক'রে রুশ এলাকায়; তাদের মাইনের টাকা আবার পশ্চিম মূল্যবোধে হয়ে দাঁড়ায় চার ভাগের একভাগ! এই রকম নানান গোঁজামিল, গরমিল আর গণ্ডগোল বার্লিনকে বানিয়েছে এক মস্ত প্রহসন।

হলেও, বার্লিনের আকর্ষণ য়ুরোপীয় যে কোন শহরের চাইতে অনেক বেশি কুফারস্ট্যাণ্ডামের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত চোখ ঝলসানো চাকচিক্য। প্রকাণ্ড মার্কিনীমার্কা বাড়ির মাঝে-মাঝে ধ্বংসস্তূপের নীচের তলায় দোকান, ওপরে ইট-কাঠের স্তূপ। এখানকার দোকানে জিনিসের প্রাচুর্য সাজানোর সৌন্দর্য আর দামের ঔদার্য য়ুরোপের যে কোন শহরকে সহজেই হার মানায়। এখানকার তুলনায় লণ্ডনের পিকাডেলি মনে হয় কিম্ভূ গয়লার গলি। এই অর্ধ-ধ্বংস, পূর্ণপ্রাণ শহরটার অদ্ভুত একটা মোহ আছে যেটা সহজেই মানুষকে কাছে টানে।

এখানকার মানুষগুলো রাশিয়ার কাছাকাছি আছে বলে আশা-আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে উঠেছে। ওরা আজ আছে বলেই কালও যে থাকবে তার কোন স্থিরতা নেই, তাই ওদের আজকের বাঁচাটাই আনন্দ, কালকের আশাটা অলীক। ওরা বেপরোয়া আনন্দে ব্যাপ্ত। যাদের বয়স হয়েছে—অর্থাৎ যারা হিটলার-যুগের নিশ্চিত মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে এসেছে তারা সেই আনন্দে ভরপুর; যারা অল্পবয়স্ক তারা হিটলার-যুগের পরে জন্মেছে ব'লে আনন্দিত। ওরা সবাই আনন্দ দিয়ে জীবনকে জয় করেছে।

এই মনোভাবের পেছনে আরও একটা বড় কারণ আছে। জু-দের ওপর জর্মানরা যেমন বর্বর অত্যাচার করেছিল, রাশিয়াও তেমনি করেছিল জর্মানীর ওপর। জু-রা জর্মানদের ভয় পায়; জর্মান রাশিয়াকে ভয়ও পায় ঘৃণাও করে। ঠিক পেছনে সেই রাশিয়া ওৎ পেতে বসে আছে এটা ওরা জানে এবং এও জানে যে, রাশিয়া যে কোন মুহূর্তে ওদের গ্রাস করতে পারে। এই ভয়কে ওরা জয় করেছে বেপরোয়া জীবনের মরিয়া দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। ওদের অনিশ্চিত স্বাধীনতার মেয়াদ ওরা আনন্দের মধ্যে বেঁধে নিয়েছে।

এটা রুথের বক্তব্য। রুথ আমাদের দো-ভাষী। আমাদের কথাটা অতিরঞ্জন; আমাদের নয় প্রদর্শনীর দো-ভাষী। প্রয়োজন মত চাইলেই সাহায্য পাওয়া যায়। প্রথম সন্ধ্যায় পথে বেরিয়ে পাছে হারিয়ে যাই সেই ভয়ে পাজি ওকে একরকম জোর করেই সঙ্গে নিয়েছিল। তারপর থেকে ও আমাদের নিত্য সহচরী।

আসার আগে সরকারি টানা-হেঁচড়ায় ঘুম হয় নি টানা সাতদিন। সাত শো সাত বোয়িং উড়ো জাহাজের সরু সরু কেদারায় পিঠের শিরদাঁড়া একেবারে শুকনো কাঠের মতন সোজা। অতএব হোটেলে পৌঁছেই এক ঘুমে সাতটা।

রাত আটটায় পথে বেরিয়ে সোজা প্রদর্শনী-দপ্তর। আটটার সঙ্গে 'রাত' কথাটা অভ্যেসদোষেই বললাম, ওখানে আটটা 'রাত' তো নয়ই সন্ধ্যাও নয় ভরা বিকেল। দপ্তরে আমি ছবির খোঁজ-খবর নিলাম। টিকিটের ব্যবস্থা করলাম, স্টল সাজাবার আয়োজন করলাম। সহযাত্রিণী কাকোতি মেমসাহেব (ছবির নায়িকা এবং আমাদের ডেলিগেশনের অন্যতম মহিলা-সদস্যা) আরাম-কেদারায় বসে মুখে পাউডারের প্রলেপ দিলেন আর সুবোধ আবিষ্কার করল রুথকে। কাজ সেরে পথে নামতেই জ্ঞানদা বললে, 'ট্যাক্সি'।

খানিকটা অবাক হলাম। আসার সময় সারাপথ জ্ঞানদা পায়ে হাঁটার উপকারিতা ছাড়া আর কিছুই আলোচনা করে নি। হঠাৎ হল কি? আড়চোখে সুবোধের দিকে চাইলাম। ওর ভ্রূক্ষেপও নেই, মহানন্দে ও তখন রুথকে ভারত সরকারের মেডেল দেখাচ্ছে। জ্ঞানদা নাছোড়বন্দা, অতএব বাধ্য হ'য়ে ট্যাক্সি নিতেই হল। ট্যাক্সিতে উঠেই জ্ঞানদা বললে,—'দাদা খিদে পেয়েছে!'

রুথ নিয়ে গেল সুন্দর ছিমছাম রেস্তোরাঁয়। আমার ইচ্ছে ছিল খাঁটি জর্মান খাবার খাব। পাজ্জির ইচ্ছে ছিল রুথের সঙ্গে জর্মানীর রাজনীতি আলোচনা করবে।

জ্ঞানদা বললে, 'ভাত খাব'।

'অভদ্র আচরণ ' অজুহাত, 'কাল ভাত খাওয়া যাবে' প্রতিশ্রুতি, এমন কি ...র 'স্পেশ্যাল জর্মান খাবার' অন্তত একবার খেয়ে দেখার সবিনয় ...রোধ কোনকিছুই কাকোতি মেমসাহেবের ভেতোমিকে টলাতে পারল না। ভাত সে খাবেই এবং আজই খাবে। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। ওকে নিয়ে বিপদ আছে।

গেলাম চীনা রেস্তোরাঁ। জর্মানীতে চীনা খাবার আর চীনে জর্মান খাবারের মধ্যে তারতম্য খুব একটা যে নেই এটা আমার অনুমান তবে ভাতটা একেবারে বিশুদ্ধ পেশোয়ারী চালের চেয়ে ভালো। জ্ঞানদা কাঁটা-চামচ সরিয়ে রেখে বাঁ হাতে ভাত খাওয়ার যা স্পীড দিল তাতে জর্মানীর দানবীয় ডিজেল ইঞ্জিনের গতিও কিছু নয়। পরিমাণের কথা বলব না সেটা নিতান্তই অভদ্রতা, তবে রুথ যে অমন খাওয়া জীবনে দেখে নি তা ওর কথাতেই বোঝা গেল। দু'-চামচ ভাত মুখে দিয়ে রুথ বললে—'ভাত বুঝি আপনার খুব ভালো লাগে?'

জ্ঞানদা আরও এক প্লেট ভাত আনবার অর্ডার দিয়ে বলল—'লাগলে হবে কি! ফিল্ম করতে আরম্ভ করার পর থেকে খাওয়া তো প্রায় ছাড়তেই হয়েছে!'

রুথ থাকতে পারল না। বললে, 'আরও বেশি খেতেন?'

কথা ব'লেই বুঝল বলা উচিৎ হয় নি। লজ্জায় রাঙা হ'য়ে বললে, 'মানে, রাগ করবেন না...'

জ্ঞানদা সুন্দর একটা ঢেকুর তুলে বললে, 'নো, নেভার!'

ইতিমধ্যে বিল এলো। খুবই কম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ভাতের দামটা ধরে নি। ওয়েটার হেসে বললে—'ওটা ফ্রি!'

জ্ঞানদা দাঁত খুঁটছিল, কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসে বললে—'তাহ'লে আর এক প্লেট খাই?'

রুথ বাঁচালো উঠে দাঁড়িয়ে। জ্ঞানদা আর ওঠে না। নতুন জুতো খুলে সরিয়ে রেখে খাচ্ছিল, খাওয়ার পর জুতো আর পায়ে ঢোকে না। পাজ্জির পেজোমো আছে, বললে—'যা ভাত খেয়েছে, পেটে কুলোয় নি সোজা গিয়ে পায়ে নেমেছে!'

দেখা গেল জ্ঞানদার পায়ে নতুন জুতোর জাঁদরেল ফোস্কা টকটকে লাল হ'য়ে ফুলে উঠেছে। দোতালার ওপর রেস্তোরাঁ সেখানে ট্যাক্সি আনার উপায় নেই, অগত্যা জুতোটা হাতে করেই জ্ঞানদাকে নামতে হল। সারা প্রদর্শনীর সত্তরখানা ছবিতে এমন নির্জলা হাসির দৃশ্য একটাও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।

পাজ্জি ছবির প্রযোজক আর জ্ঞানদা হিরোইন। অতএব পাজ্জি আবার ট্যাক্সি নিল।

কুফারস্ট্যাণ্ডাম। সংক্ষেপে ওরা বলে কু-ড্যাম।

মানুষের মরশুম। আলোয় ভরা প্রথম রাত্রে অলসপায়ে পথ চলা। কারো কোথাও যাওয়ার ব্যস্ততা নেই, দাঁড়াবার ইচ্ছে নেই, বসবার বিরাম নেই। পথের ধারে রেস্তোরাঁগুলো সব ভর্তি। ভেতর থেকে উপচে পড়েছে পথের ওপর। একটা করে বিয়ার নিয়ে বসে আছে, কেউ একলা, কেউ একদল।

রুথ আর আমি পথ চলেছি। অচেনা-অজানা দুই মানুষ পৃথিবীর দু'প্রান্ত থেকে এসে এক পক্ষকালের জন্য পাশাপাশি দাঁড়িয়েছি। দুই পক্ষরই প্রবল বাসনা পরস্পরকে জানায়; অথচ কথা নেই। শুধুই এলোমেলো হাঁটা। কোথাও একপলক দাঁড়িয়ে আলোকিত জানলার মধ্যে দামের টিকিটআঁটা জিনিস দেখা, সাজানোর অপরিসীম সৌন্দর্যের প্রশংসা করা। ছোট ছোট ছাড়াছাড়া কথা।

'আপনার ছবি কবে?'

'পয়লা।'

'কোথায়?'

'প্লাউজ্-এ।'

'ও।'

আবার পথ হাঁটা। ভাবছিলাম মিতার কথা। কোথায় কে জানে? কেমন আছে তাও জানি না। দেশে এখন ক'টা? ঘুমোচ্ছে? ভালো আছে তো?

'পূর্বারুণ মানে কি?'

বার্লিনে ফিরে এলাম।

'পূর্বারুণ—অর্থাৎ সূর্য ওঠার আগের মুহূর্ত।'

রুথ সোনালী চুলগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'জর্মান নামটা অত সুন্দর নয় 'মর্গেন রুট'—মানে প্রভাত-সূর্য।'

আমি বলি, 'আমার নামের কাছাকাছি।'

রুথ হাসে। মিতা জানলে খুশি হত। রুথের কথা নয়, ছবির জার্মান নামটার কথা। হয়ত কখনও দেখা হবে। তখন জানাব।

'বিয়ার খাবে?'

'না।'

'সসেজ? জর্মানীর স্পেশাল?'

হেসে বলি, 'খাব।'

ঢুকলাম ছোট্ট উসলেরিতে। এখানে কেবল বিয়ার পাওয়া যায়, সঙ্গে তাজা গরম সসেজ। দু'জন দু' প্লেট নিয়ে খেতে আরম্ভ করি। লক্ষ্য করেছি সারা সন্ধ্যা রুথ ছিল কর্তব্যের কড়া আইনে বাঁধা কর্মী অর্থাৎ মাপ করা কথা, ওজন করা কায়দা। সরল, কিন্তু সহজ নয়। এখনকার রুথ অন্য মানুষ। কথা হারিয়ে নির্বাক। কায়দা শিথিল করে সাধারণ। তবু ছাড়াছাড়া কথায় জানা যায় ও কলেজে পড়ে—এখানকার ফ্রি য়ুনিভারসিটিতে অর্থ বিজ্ঞান। আপাতত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ তাই কাজ করছে অর্থোপার্জনের জন্য। ওর বাবা পূর্ব-বার্লিনে থাকেন। সেখানে অধ্যাপক। ও তাঁর একমাত্র সন্তান।

বাড়ির কথায় ও হারানো কথার সুর খুঁজে পেল। বললে, 'আমিও ছিলাম সেইখানে, সেই যুদ্ধের পর থেকে। তখন ছোট ছিলাম বাবা মা'র আদর ছাড়া অন্য কিছু জানতাম না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম রাশিয়া-প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে মানুষ নিজের মর্যাদা হারায়। ওখানকার কড়া আইনে কারুণ্য নেই,

নিয়মের মধ্যে ন্যায় নেই। পূর্ব বার্লিনে জার্মান শান্ত হারিয়েছে, কূল হারিয়েছে। বাঁচার আনন্দ ত হারিয়েইছে। ওখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিধি-ব্যবস্থায় মানুষ হয়ে ওঠে মেশিন; মন হয় বিকল। তবু দিন কাটছিল, এমন সময় ছাত্র বিদ্রোহ হল হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখনই ঠিক করলাম চলে আসব এখানে।'

'ওখানে থেকে এখানে পড়ার অসুবিধা কি ছিল?'

'অসম্ভব। নিয়ম নেই। লুকিয়ে পড়া যায় কিন্তু জানাজানি হলে বুড়ো বয়সে বাবার চাকরি যেত। জেলও অবধারিত।'

'তারপর?'

'বেড়াবার ভাণ করে মাঝে মাঝে এখানে আসতাম, সঙ্গে আনতাম কোনদিন জুতো, কোনদিন জামা—একটি একটি ক'রে ছ'মাস গেল, এমনি করে এখানে জিনিস আনতে, এখানে থাকা আর পড়ার ব্যবস্থা করতে। তারপর একদিন সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে ঝগড়ার ভাণ ক'রে তুমুল চীৎকারে পাড়া মাথায় করলাম। রাস্তায় যখন বেশ লোক জড় হ'য়ে গেছে তখন দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছুট দিলাম কাঁদতে কাঁদতে। ফ্ল্যাটের সবাই বুঝল আমি বাড়ি থেকে পালিয়েছি। রাত কাটালাম বন্ধুর বাড়িতে—পরদিন এখানে।

'আমি চ'লে আসার পর বাবা পুলিশে এজাহার দিলেন যে আমার সঙ্গে ওঁদের আর কোন সম্পর্ক নেই, কারণ আমি স্টেটের নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ ক'রে বিদ্রোহী মনোভাব ব্যক্ত করেছি।'

এক মিনিট থেমে যায় রুথ। দৃষ্টি প্রসারিত করে পূর্ব-দিগন্তে, 'ফ্রিডম রুট' লেখা নিওন আলোর পেছনে, যেখানে গভীর অন্ধকার। মুখটা সরিয়ে চোখটাকে ও আড়াল করল, নইলে নিশ্চয় দেখতাম চোখের পাতা ওর ভিজে উঠেছে। ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাসটাও গোপন ক'রে রুথ বলে—'এ ছাড়া বাবার বাঁচার পথ ছিল না। তিন বছর হ'য়ে গেল।'

'বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে তারপর?'

'মা'র সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। মা আসেন। বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাই বছরে একবার, ক্রিস্টমাসের দিন। রাত্রে যাই পূর্ব-বার্লিনে, গভীর রাত্রে বাড়িতে। কখনও দু'টো কখনও তিনটের সময়, যখন ফ্ল্যাটের সবাই সমারোহ শেষ ক'রে ঘুমিয়ে পড়ে। অন্ধকারে বাবার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকি। কথা হয় না পাছে কেউ শুনে ফেলে। ভোর হবার আগেই আবার বেরিয়ে পড়ি।'

'ধরা পড়লে?'

'সাইবেরিয়া!' হাসে রুথ।

আবার পথ। রাত প্রায় দু'টো। ইতস্তত লোক ছড়িয়ে আছে। নির্বাক পথ চলছি পায়ে হেঁটে।

নাইট ক্লাব। ব্যাণ্ড বাজছে। নাইট ক্লাবের শতকরা নব্বইজন কর্মী য়ুনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রী। তারা সারারাত কাজ করে আর সারাদিন জ্ঞানের আরাধনা করে।

চারিদিকে চোখ মেলে চাই। বিজ্ঞাপনের আলোয় রাস্তাটা ঝলমল করছে। ওপরে তার কালো আকাশ। নীচে পূর্ব-বার্লিন থেকে একদল রিফ্যুজি এসেছে, তারা চলেছে। কেউ ঘর ছেড়েছে, কেউ সংসার। এমনিধারা রিফ্যুজি আসে সাত-আটশো প্রতিদিন। নিশ্চুপে পথ চলেছি।

হঠাৎ চীৎকার। মর্মভেদী আর্তনাদ তারপরই একটা কালো গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল, পেছনের আলোটা নিভিয়ে। রুথ থমকে দাঁড়াল।

'কি হল?'

'পূর্ব-বার্লিনে কেউ একজন চালান গেল। প্রায়ই যায়।' থেমে আবার বলে হয় ত' কোন বিশেষ লোক; হয় ত' ওখানকারই কোন কর্মী। স্বাধীনতার আশায় এসেছিল, এক মুহূর্তের অসতর্কতায় বাকি জীবনের মেয়াদ হারালো। যাবে সাইবেরিয়া না হয় রাইফেলের মুখে।'

প্রকাণ্ড হোটেল বার্লিন।

এয়ার কণ্ডিশান করা ঘরের দরজা খুলে সামনের চিলতি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। পাঁচতলার ওপর থেকে দেখি সামনে ছড়ানো আছে পশ্চিম-বার্লিন। বিজ্ঞাপনের আলোয় আকাশে অরুণ-আভা। হয় ত' এখুনি ভোর হবে, নতুন দিনে পুরোন সূর্য আবার নতুন করে উঠবে। ছাত্ররা সব নাইট ক্লাব থেকে ক্লাসে গিয়ে ঢুকবে। সেখানে চলবে জ্ঞানের সাধনা, বিজ্ঞানের আরাধনা, সভ্যতার অগ্রগতি। রুথ তার কাজের আবরণ দিয়ে বাবার ব্যথা ভুলবে।

দেশে এখন ক'টা? সকাল হয়েছে। বাড়িতে মৃদুগুঞ্জন। মেয়ে কাগজ উল্টে দেখছে, কে হারল, ইস্টবেঙ্গল না মোহনবাগান। কে জিতলো? কৃষণ না ফ্রেজার? আমি হাজার হাজার মাইল দূরে দাঁড়িয়ে ওর কথা ভাবছি। ওকে যে আমি আবার দেখতে পাবো এমন কথা কে জোর ক'রে বলতে পারে? ওর আর আমার মাঝখানে অনন্ত দূরত্ব। এই ব্যবধানে কখন কি ঘটবে, এখন কি ঘটছে আমি তার কতটুকু জানি? মনের কোথায় যেন একটা আশঙ্কার ফাটল দেখা দেয়—ভাঙনের বিভীষিকা তার পাখা মেলে। ভয় পেয়ে সরে এসে আমি আশ্রয় খুঁজি মিতার স্মৃতির মধ্যে। তাও যেন কেমন ছাড়া-ছাড়া। এলোমেলো।

মিতা আমার মনের মানুষ। কোন একদিন ছিল; কোন একদিন থাকবে। আজ সে নেই। আছে। জানি না। মনের হাত বাড়ালে তার মাধুর্যের নাগাল পাই। ভয় পেলে সে ভাবনা ঘোচায়, দুঃখ পেলে সে ব্যথা দূর করে। আমার সব চিন্তাকে সে তার আপন ভালোবাসার অসীম ঔদার্য দিয়ে ঢেকেছে, আমার সব কাজের মধ্যে সে তা'র অপরিসীম সৌন্দর্য-সাধনার আসন পেতেছে। আমি তার মধ্যে নিলিপ্তভাবে বিলুপ্ত; বিলীন। দৈনন্দিন-জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে যখন বিব্রত হই তখন মিতার ভালোবাসার ভিত্তিতে আমি ভগবানের দিকে হাত বাড়াই। ও তখন পেছনে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট শুধু বলতে থাকে—'সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্।'

[ক্রমশঃ

অন্ধ

মানবেন্দ্র পাল

হাওড়া থেকে কাটোয়া পর্যন্ত এই প্রায় আশী মাইল রেল-পথের মধ্যে বৈচিত্র্য বড় কম নেই।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কথা নয়—এ বৈচিত্র্য ট্রেনের কামরার মধ্যে হকার আর ভিখিরীদের। দাদের লোশন থেকে আরম্ভ করে চিরুণী সেফ্‌টিপিন সব-কিছুই এ লাইনে মেলে। মুচির ছেলেটা পর্যন্ত—জাতে মুচি কি না তাই বা কে জানে, পেটের দায়ে যে জাতেরই হোক না কেন—একটা বুরুশ আর এককৌটো কালি, খানিকটা ন্যাকড়া একটা কাঠের বাক্সয় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। 'পলিশ—' বেশ এক রকম দ্রুতসুরে উচ্চারণ করে একবার সকলের জুতোর ওপর নজর বুলিয়ে চলে যায়।

—এই পলিশ, এদিকে আয়।

জুতো-পলিশ কাছে এসে ধপ্‌ করে ধুলোর ওপর বসে প'ড়ে জুতোটা পা থেকে খুলে নেয়।

—দশ পয়সা লাগে গা বাবু।

—দশ পয়সা! যাত্রী আঁতকে ওঠে।

—হ্যাঁ, বাবু, দশ নয়া পয়সা।

—কাহে?

—'সু' হ্যায়!

'সু' হ্যায়। অর্থাৎ কিনা একমাত্র শ্লিপার ছাড়া এদের কাছে আর সবই 'সু'। 'সু'য়ের জন্য লাগে দশ নয়া, আর শ্লিপার হলে অবশ্যই কনশেসন আছে—ছ'নয়া।

এমনি নানা আয়োজন। যাত্রীদের যাতে কোনো দিক দিয়ে কোনো-কিছুর অভাব না ঘটে—এরা যেন সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। কিন্তু এ লাইনের মতো টিনের বড় ডেকচিতে করে মিষ্টি আর তার সঙ্গে জলের ব্যবস্থা বোধ করি এখনো পর্যন্ত অন্য কোনো লাইনে নেই। হাওড়া-কাটোয়া লাইন এ দিক দিয়ে পাইওনিয়র।

এ-ছাড়া আনায় ছ'টা লজেন্স থেকে আনায় পঁচিশখানি বিস্কুটও এখানে মেলে। এইসব বিস্কুট যে-সব স্নেহান্ধ বাপ-মা শিশুদের জন্যে কিনে দেন, পরের দিন ভোরে সে-সব শিশুদের কি অবস্থা হয়, সুখের বিষয়—তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না।

তারপর আছে ভিখিরীর দল। সেও বড় কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। খোঁড়া, পা কাটা—নুলো, অন্ধ থেকে আরম্ভ করে একতারাধারী বৃদ্ধ বৈষ্ণব পর্যন্ত। এদের কেউ সোজাসুজি ভিক্ষে চায়—ছ'টো নয়া পয়সা দ্যান বাবু—ছ'টো নয়া পয়সা। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করবেন। আবার কেউ গান গেয়ে। অধিকাংশ গানই নদের নিমাইকে নিয়ে—ক্বচিৎ দেহতত্ত্বের। একবার এক ফুলপ্যান্ট সার্ট-পরা অন্ধ ভদ্রলোক ভিক্ষুক এলেন। তিনি নাকি ম্যাট্রিক পাশ। মোটা গলায় হাতে তালি বাজিয়ে বেশ দু' পয়সা রোজগার করে চলে গেলেন। এরা যে সব হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে কোথায় অকস্মাৎ বিলীন হয়ে যায় তার ঠিকানা কেউ জানে না। এমন কত জন এল—কত জন গেল। তেমন রসিক কোনো ডেলিপ্যাসেঞ্জার থাকলে এদের একটা তালিকা রাখতে পারতেন।

শনিবার। বেলা আড়াইটের সময় একখানা ট্রেন আছে শনিবারের ঘরমুখো বাবুদের জন্যে।

ব্যাণ্ডেল থেকে ইঞ্জিন বদল করে গাড়ি ছেড়েছে। ভাদ্র মাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মেন-লাইন ছেড়ে লুপ-লাইনের দিকে বাঁক ফিরল গাড়িখানা। দূরে বাঁশবেড়িয়ার ডিসট্যান্ট সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে।

একজন বললেন—এবার বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার তো হে, ব্যাণ্ডেলের এই মাঠটাতেও চাষ হয়েছে! প্রতিবারই তো এটা খাঁ খাঁ করে।

দ্বিতীয়জন বললেন—হ্যাঁ। দেখেছি। এমনি আর একটা মাঠ আছে—সোমড়ার লাইনের ধারে। কোনোবার একগাছা ঘাস জন্মাতে দেখি নি, এবার দেখো দিকি।

তৃতীয়জন বললেন—তাতে আর আমাদের কি! ওদিকে কালনা, বাগনাপাড়, ধাত্রীগ্রামের মাঠগুলো যে পুড়ে গেল! এতটুকু বৃষ্টি নেই।

দ্বিতীয়জন বললেন—নাঃ, আজকের মেঘটা ঢালবে বেশ। তার আগে বাড়ি পৌঁছতে পারলে হয়।

তৃতীয়জন বিরক্ত হয়ে বললেন—আপনার মশাই কেবল ভিজে যাবার ভয়! হোক বৃষ্টি—না হয় ভিজেই যাব তবু ধানগুলো তো হবে। নইলে দেশের অবস্থাখানা কি হবে কল্পনা করেছেন?

ওপাশে আর একজন ঢুলছিলেন, দেশের দুরবস্থার কথা শুনে নড়েচড়ে বসে বলে উঠলেন—কল্পনা আবার করতে পাচ্ছি না! খুব পারছি। ওদিকে চীন—এদিকে পাকিস্তান—তার ওপর অনাবৃষ্টি! আচ্ছা মশাই, এই যে একঝাঁক ঝানু মন্ত্রীরা দেশের এই দুর্দিনে পদত্যাগ করলেন তার কারণটা কিছু ভেবেছেন?

ট্রেন এসে দাঁড়ালো বাঁশবেড়েতে। আধমিনিটও নয়, গাড়ি ছেড়ে দিল।

—ভালো দানাদার আছে নেবেন। রাজভোগ—মাত্র দু' আনা—

—এই রাজভোগ! মন্ত্রীদের পদত্যাগ সমস্যা ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক রাজভোগ আস্বাদনে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

—কই দেখি কিরকম তোমার রাজভোগ।

মিষ্টিওলা রস থেকে সন্তর্পণে একটি রাজভোগ তুলে দেখালে।

—এর নাম রাজভোগ! এ তো রসগোল্লা হে! ছ'আনা জোড়া হয় তো গোটা চারেক দাও।

মিষ্টিওলা গম্ভীরভাবে বললে—যান, হাত ধুয়ে আসুন। বলেই আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে তখনই ডেকচি মাথায় তুলে নিয়ে অন্যদিকে এগিয়ে গেল।

ভদ্রলোক নির্বিকারচিত্তে আবার ঠেসান দিয়ে চোখ বুজলেন। ছু' চোখ নিমীলিত করবার আগে শুধু সংক্ষিপ্ত একটি মন্তব্য করলেন—যত সব জোচ্চোরের দল। ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এ্যাক্টে এগুলোকে ধরে না।

ট্রেন চলেছে। কোথায় বৃষ্টি হয়েছে। বেশ শিরশিরে বাতাস এসে গায়ে লাগছে। হঠাৎ এই কম্পার্টমেন্টে একটি মিষ্টি বেহালার শব্দ শোনা গেল। সেই শব্দে সকলেই যেন একটু উচ্চকিত হয়ে উঠল।

প্রথমজন বললেন—ঐ এসেছেন!

দ্বিতীয়জন বললেন—হুঁ। বলে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে দেখবার চেষ্টা করলেন।

প্রথমজন হেসে বললেন—অত ব্যস্ত কেন, এদিকেও আসবে।

ওপাশে ছ'জন তরুণ ছিলেন। তাঁরাও একবার চঞ্চল হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে কি ইশারা করলেন।

হ্যাঁ, বেহালার সুর ক্রমশই এগিয়ে আসছে। ঐ যে—সকলের দৃষ্টি ওই দিকে।

একটি দীর্ঘাঙ্গ গৌরবর্ণ অন্ধ। দেখলেই ভদ্রবংশের বলে মনে হয়। গলায় কণ্ঠী। গায়ে গেরিমাটিতে ছোপানো হাতা-কাটা পাঞ্জাবি, পরনে আধময়লা ধুতি। অদ্ভুত মিষ্টিসুরে বেহালা বাজিয়ে এগিয়ে আসছে। কিন্তু প্যাসেঞ্জারদের দৃষ্টি সেদিকে নেই। তাদের দৃষ্টি রয়েছে আর একজনের প্রতি। ঐ যে কি যত্নে কি সোহাগে অন্ধ মানুষটিকে আগলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। ফর্সা রঙ, বড় বড় কাজলটানা চোখ, সিঁথের ওপর দপ্ দপ্ করে জ্বলছে সিঁদুর। তার ওপর ঈষৎ ঘোমটা। ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে গলার কণ্ঠী। নিরাভরণ হাত ছ'খানিতে শুধু একজোড়া শাঁখা। ছ'জনের কেউ কোনো কথা বলছে না। একজন বাজিয়ে চলেছে। আর একজন ছুই করুণ চোখ মেলে প্রত্যেকের কাছে হাত পেতে যাচ্ছে। বিমুখ করছে না কেউই।

এদের অতিক্রম করে ওরা চলে গেল।

এক নম্বর ছ' নম্বরকে নীচু গলায় বললেন—জিনিসখানি ভালো।

দ্বিতীয়জন বললেন—হুঁ, টিকলে হয়।

প্রথমজন বললেন—তা এতদিন যখন টিকেছে—ছেলেপুলেও হয়েছে বোধ হয়।

দ্বিতীয়জন বললেন—কি করে জানলেন?

প্রথমজন একটু দুলে-দুলে হাসলেন। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। তবে একটি কি ত্রুটি। তা হোক, তবু শরীরের যত্ন জানে।

দ্বিতীয়জন বললেন—কিন্তু অমন চেহারা আর তারই ভাগ্যে ঐ অন্ধ ভিক্ষুক।

প্রথমজন বললেন—হয়তো বিয়ের পর অন্ধ হয়েছে। কে জানে হয় তো আগে আমাদের মতোই স্বাভাবিক মানুষ ছিল, চাকরি করত, নিশ্চিন্ত হয়ে সংসার করত। তারপর চক্ষুও গেল, কপালও ভাঙল। এখন ঐ ভিক্ষাপাত্র সার।

—তবে বৌটি ভালো পেয়েছে। বয়েস অল্প, সুন্দরী তো বটেই কিন্তু সতীর তেজ আছে মুখে। দেখেছেন?

প্রথমজন মাথা নেড়ে বললেন—হুঁ!

দ্বিতীয়জন বললেন—আজ আমরা অন্ধ হয়ে গেলে আমাদের স্ত্রী অমন হাত ধরে নিয়ে ঘুরবে—পথে পথে নয়, এ-ঘর থেকে ও-ঘর?

—ছাই। যেই ডান হাত বন্ধ হবার উপক্রম বুঝবে, অমনি—

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রথমজন চুপ করে গেলেন।

—বেহালা শুনতে পাচ্ছি না তো? নেমে গেল না কি?

—হ্যাঁ, অন্ধ গাড়িতে গেছে।

—বেশ আছে দু'টিতে। অমন সঙ্গিনী পেলে আমরাও ভিক্ষে করে বেড়াতে পারতাম, কি বলেন?

—হ্যাঁ।

—কিভাবে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল একপা-একপা করে, দেখেছিলেন?

—দেখি নি আবার।

আবার দীর্ঘশ্বাস। গাড়ি চলছে।

নবদ্বীপের একটা অখ্যাত গলি। কোলকুঁজো চাপা ছোট্ট একটা ঘর।

—আমি এখন যাচ্ছি।

অন্ধ দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গিনীর দু'হাত চেপে ধরে বললে—এখুনি যাবে!

—হ্যাঁ, মাথাটা বড্ড ধরেছে। ছাড়ো।

—কাল আসছ তো?

—তোমার গায়ে তো জ্বর লেগেই রয়েছে, একটা দিন না-ই বেরুলে।

অন্ধ কম্পিত-স্বরে বললে—না না, ও ঠিক আছে। তুমি নিশ্চয় কাল আসবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা আসব। আঃ বেহালাটা অমন টেনে রেখেছ কেন? এখুনি যে পা লেগে ভাঙবে। বেহালা তো ভাঙবে না—কপালও ভাঙবে!

এমনি সময় বাইরে থেকে অধৈর্য গলায় কে ডাকল—সুখী!

সুখী চমকে উঠল। ব্যস্ত হয়ে বললে—আমি যাই। ডাকতে এসেছে।

এই বলে আর মুহূর্তকালমাত্র বিলম্ব না করে সুখী বেরিয়ে গেল।

অন্ধকার গলিতে একজন পুরুষ অপেক্ষা করছিল। রূঢ়স্বরে বললে—এত দেরি আজ?

সুখী বললে—ট্রেন লেট ছিল।

—'ট্রেন লেট ছিল' পুরুষটি ভ্যাঙালে। এদিকে—দে, কি পেয়েছিস।

সুখী আঁচলের গিঁট খুলে একরাশ রেজকি লোকটার হাতে ঢেলে দিলে। লোকটার দুই চোখ অন্ধকারেও জ্বলতে লাগল।

—ওর কাছে কিছু নেই তো?

—না।

—লুকিয়ে রেখে দেয় নি তো? অন্ধগুলো কিন্তু ভারি সেয়ানা হয়।

সুখী এবার ঝেঁজে উঠল—চুপ করো। যা জান না তা বোলো না। ও একটা পয়সাও নিজের কাছে রাখে না। আমি নিজে যা ওর হাতে তুলে দিই, তাই ও নেয়।

পুরুষ সে কথায় বিশেষ কান না দিয়ে ধমক দিয়ে বললে—নে নে চ, এদিকে ছোট গোঁসাই অনেকক্ষণ এসে বসে আছেন।

সুখীর পা চলছিল না। সারাদিনের শ্রান্তি। তার ওপর হঠাৎ এই নতুন আমন্ত্রণ। বিরক্ত হয়ে বললে—না না, আজ আর আমি পারব না। আমার শরীরটা কি শরীর নয়? মেরে ফেলবে?

পুরুষটি কুৎসিত একটা হাসি হেসে সুখীর থুতনি ধরে নেড়ে বললে—এ কি আজ নতুন? তবে যে আজ বড় নতুন লাগছে সই।

অন্ধকার গলিপথের নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে অকস্মাৎ আবার বেহালার শব্দ শোনা গেল। হ্যাঁ, অন্ধই বাজাচ্ছে। কিন্তু এই সুরে ট্রেনে বাজাতে কেউ কোনো দিন শোনে নি। এ তার একলা রাতের গান।

কাজের শেষে

—ডাঃ সৌম্যেন গুপ্ত

কাঠবিড়ালীর প্রাতরাশ

—রামকিঙ্কর সিংহ

খাসিয়া যুবতী

—চঞ্চল মিত্র

ফুলের হাসি

—কুমারী রেবা সেনগুপ্ত

কটাক্ষ

—ক্ষুদিরাম মাইতি

কর্কের ইতিকথা

অমরনাথ রায়

ডাক্তারখানা থেকে যে ওষুধ-ভরা শিশিটা নিয়ে এলে—ওর মুখের ছিপিটা কি জিনিস বলতে পার ? হ্যাঁ, ওরই নাম কর্ক—একরকম গাছের ছাল। গাছের নাম 'কর্ক-ওক'—দেখা যায় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পর্তুগাল, স্পেন ও আরও কয়েকটি দেশে।

আমাদের দেশের বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের মত কর্ক-ওক গাছও বেশ বড় হয়। গাছ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের ভেতরকার কোষগুলিও সংখ্যায় বাড়তে থাকে। শেষে এই কোষবৃদ্ধির ফলেই পূর্ণবয়স্ক কর্ক-ওক গাছের ছাল যায় ফেটে। এই ফাটা ছালের নীচেকার অংশে কোষের যে পুরু স্তর থাকে—প্রকৃতপক্ষে তাই হচ্ছে কর্ক।

কর্ক-ওক গাছের বয়স বিশ বছর পূর্ণ হলে প্রথম ছাল কাটা আরম্ভ হয়। তাতে যে কর্ক পাওয়া যায় তা মসৃণ নয় এবং সেইজন্যে নিকৃষ্ট ধরণের। আর নিকৃষ্ট বলে বাজারে তার দামও কম।

প্রথমবার ছাল কাটার পর আট-দশ বছর গাছের গায়ে আর আঁচড়টিও কাটা হয় না। ইতিমধ্যে গাছে আবার নতুন ছাল গজায়, আর সেই ছালের নীচে আধ থেকে আড়াই ইঞ্চি পুরু কর্কের আস্তরণ সৃষ্টি হয়। তখন ছাল কেটে আবার কর্ক সংগ্রহ করা হয়। প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বারের এই কর্ক অনেক ভাল। তবে খুব ভাল কর্ক পাওয়া যায়—গাছের বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে।

সাধারণত প্রতি দশ বছর অন্তর কর্ক সংগ্রহ করাটাই প্রচলিত রীতি। জুলাই অথবা আগস্ট মাসে এ কাজ করা হয়। আর এ কাজে ব্যবহার করা হয় একটি ধারালো ছুরি। ছুরির ফলা দিয়ে প্রথমে কাণ্ডের নীচে বেড় বরাবর ছাল একটু গভীরভাবে চিরে দেওয়া হয়। অমনি আর একটি চিরে দেওয়া হয় কাণ্ডের সেই অংশে—যার ওপর থেকে শাখা-প্রশাখা শুরু হয়েছে। এর পর এই দুই কাটা অংশের মাঝখানের ছাল লম্বালম্বিভাবে কেটে নেওয়া হয়। কাণ্ডের চেয়ে শাখা-প্রশাখা থেকেই ভালজাতের কর্ক পাওয়া যায়। আর প্রতিবারে একটি গাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ড কর্ক সংগ্রহ করা হয়।

কাটার পর ছাল কয়েকদিন বাতাসে ফেলে রাখা হয়। তারপর তা জল দিয়ে সেদ্ধ করে নেওয়া হয়। ছালের বাইরের আবরণটা খুবই শক্ত আর এবড়ো-খেবড়ো। সেদ্ধ করার ফলে সেটি নরম হয় এবং তখন তা চেঁচে বাদ দেওয়া হয়। ছাল চেঁচে ফেলার পর ভেতরের অংশটুকু চাপ দিয়ে সমান করে—পরে শুকিয়ে নেওয়া হয়। ঐ শুকনো কর্ককে তারপর যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন আকারে কেটে ফেলা হয়। তারপর ব্যবহারের পালা।

কর্ক জিনিসটা খুব হাল্কা এবং তাপ-প্রতিরোধক। এ দিয়ে শিশি-বোতল ও থার্মোফ্লাস্কের ছিপি তৈরি হয়—তৈরি হয় টেবিল ও ঘরের মেঝে ঢাকবার ম্যাট ও আরও অনেক শিল্পদ্রব্য।

মোটামুটিভাবে এই হলো কর্কের ইতিকথা।

টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক—স্যামুয়েল মোর্স

গোপাল সাঁতরা

'ভগবানের কি বিচিত্র সৃষ্টি।'

যুক্তরাষ্ট্রের টেলিগ্রাফ তারে পরীক্ষামূলকভাবে সংবাদ প্রেরণের সময় বাইবেলের এই বাক্যটি সর্বপ্রথম সরকারী বাণী হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা স্যামুয়েল মোর্স ১৮৪৪ সালের ২৪শে মে তারিখে বাল্টিমোর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ক্যাপিটল ভবনে অবস্থিত সুপ্রীম কোর্টের গ্রন্থাগারে উপরি উক্ত বাণীটি পাঠিয়েছিলেন। ১৮৪৩ সালের ৩রা মার্চ তারিখে পরীক্ষামূলকভাবে টেলিগ্রাফ তার স্থাপনের জন্য কংগ্রেস ৩০ হাজার ডলার ব্যয়ের প্রস্তাব মঞ্জুর ক'রে একটি বিল পাশ করেন। ঐ তারিখটি ছিল কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষ দিন এবং অধিবেশন মুলতুবী হবার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে বিলটি পাশ হয়। মোর্সের টেলিগ্রাফ তার স্থাপনের ব্যয় মঞ্জুরের জন্য বিল পাশ করার কাহিনীটি উপন্যাসের ন্যায় চাঞ্চল্যকর। ব্যয় মঞ্জুরের জন্য আইনসভায় যখন ভোট নেওয়া হচ্ছিল, তখন পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা প্রায় সমান সমান থাকায় উভয়পক্ষই অস্বস্তিবোধ করছিলেন। কংগ্রেসের অনেক সদস্য এরূপ একটি কাজের জন্য ৩০ হাজার ডলার ব্যয় করাকে করদাতাদের অর্থের অপচয় বলে মনে করছিলেন। আর আবিষ্কারক মোর্স দিনের পর দিন রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছিলেন। সেনেটের অধিবেশনের শেষ দিনে মোর্স গ্যালারিতে বসে অপেক্ষা করছিলেন। যে সব সেনেটরদের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল, তাঁরা এসে জানিয়ে গেলেন যে, বিলটি পাশ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তিনি নিরাশ হয়ে আপন গৃহে ফিরে এলেন। মোর্স এক জায়গায় লিখেছেন,—'বিপদের সময় সাহায্য অবশ্যই আসবে, এই অভিজ্ঞতা আমার ছিল, তাই আমি সমস্ত ভাবনা-চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে অনতিবিলম্বেই শিশুর ন্যায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরে প্রাতরাশের জন্য নীচে নেমে আসতেই তাঁর বন্ধুর এক কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

মোর্স তাকে প্রশ্ন করলেন, 'এত সকালে যে? ব্যাপার কি?'

'আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি,' মেয়েটি উত্তর করলো।

'ও তাই নাকি, কিন্তু কেন?'

'আপনার বিলটি পাশ হয়েছে।'

'না বাছা, তুমি ভুল বলছো।'

'আপনিই ভুল বলছেন, গতকাল গভীর রাত্রিতে অধিবেশন শেষ হবার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে বিলটি পাশ হয়েছে।'

সংবাদটি এতই অভাবনীয় যে, কিছুক্ষণের জন্য মোর্স একেবারে নির্বাক হয়ে রইলেন। শেষে বললেন,—'এই সংবাদটি তুমিই প্রথম দিলে, বাল্টিমোর ও ওয়াশিংটনের মধ্যে টেলিগ্রাফ তার স্থাপন সম্পূর্ণ হলে সকলের আগে তোমার বাণীই প্রেরণ করবো।

ঐ মেয়েটি বাইবেলের উপরোক্ত বাক্যটি নির্বাচিত করে।

মোর্সের মনে অতীতের স্মৃতিগুলো ভেসে উঠল। তখন তিনি ছিলেন এক তরুণ শিল্পী। শিল্পকলা বিষয়ে তিন বছর গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনার পর তিনি লা-হার্ভার থেকে নিউইয়র্কে তাঁর আপন গৃহে ফিরে আসছিলেন জাহাজে। জাহাজখানির নাম 'মুলি'। ঐ জাহাজে চার্লস টি জ্যাকসন নামে বস্টনের একজন চিকিৎসকও ছিলেন। জ্যাকসন যাত্রীদের চিত্তবিনোদনের জন্য একটি খেলনা দেখান।

ঐ খেলনার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিলে পর উহা জাহাজের মেঝে থেকে লোহার পেরেক তুলে নিল। মোর্স নিজেও ঐ পরীক্ষা দেখছিলেন। তিনি সেখানেই বিশেষ জোর দিয়ে বললেন,—'বিদ্যুৎ চলাচলের পথের কোন অংশে যদি বিদ্যুতের অস্তিত্ব দেখানো যায়, তা হলে মুহূর্তমধ্যে বিদ্যুতের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করা কেন সম্ভব হবে না, আমি তার কারণ দেখি না।'

জাহাজের অন্যান্য যাত্রীরা তাঁর কথায় হেসে উঠলেন।

কিন্তু আহারে ও নিদ্রায় সর্বদার জন্যই মোর্স এই চিন্তা করতে লাগলেন যে, কি ভাবে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। একখানি নোটবই কোলের উপর রেখে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাতে নানা রকমের নক্সা আঁকতে লাগলেন। দিনের পর দিন জাহাজ যতই নিউইয়র্কের নিকটবর্তী হতে লাগল, মোর্সের ততই মনে হতে লাগল যে, তাঁর অস্পষ্ট ধারণাগুলি সুস্পষ্টরূপে নিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে চলেছে।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তাঁর ঐ নক্সাগুলি বর্তমানে ওয়াশিংটনস্থ জাতীয় যাদুঘরে সুরক্ষিত আছে।

অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তিনি যেসব চিত্র অঙ্কিত করেছেন এবং যেগুলিকে পরম বাঞ্ছিত বলে মনে করতেন সে-সবের তুলনায় তাঁর এই নক্সাগুলি যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। বস্টন শহরের অনতিদূরে বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিনের জন্মস্থানে ১৭৯১ সালের ২৭শে এপ্রিল স্যামুয়েল মোর্সের জন্ম হয়। ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে মোর্সের নাম সচরাচর উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে মোর্সের জন্ম হয় ফ্রাঙ্কলিনের মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে। সে সময়কার ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা পেয়েছিলেন।

১৮১০ সালে তিনি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। গ্রাজুয়েট হবার পর তিনি শিল্পকলা বিষয়ে অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত করেন এবং ইউরোপে যাত্রা করেন। শিল্পী হিসাবেও তিনি কম খ্যাতি অর্জন করেন নি। দুই বছর কাল অধ্যয়ন ও হাতে-কলমে শিক্ষালাভের পর তিনি সর্বপ্রথম যে বৃহৎ চিত্রখানি অঙ্কিত করেন তা আজও ইয়েলের আর্ট স্কুলে সুরক্ষিত আছে। চিত্রখানির নাম 'হারকিউলিসের মৃত্যু' লণ্ডনের রয়াল একাডেমিতে প্রদর্শিত দুই হাজার চিত্রের মধ্যে এই চিত্রটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় মোর্স স্বর্ণপদক লাভ করেন। ২২ বছর বয়স্ক এক তরুণ শিল্পীর পক্ষে এরূপ অসাধারণ সম্মানলাভ অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়। জাহাজে মোর্স যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তার ফলে দেশে ফিরে এসে তিনি অন্য মানুষ হয়ে যান। তিনি ভাবতে লাগলেন, মানুষের সেবার জন্য বাষ্পীয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এবং যন্ত্রের সাহায্যে সকল প্রকার পণ্যের উৎপাদন যদি বৃদ্ধি করতে হয়, তা' হলে উন্নত ধরণের দ্রুত সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থাও করতে হবে। এসব চিন্তা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে, তিনি তাঁর শিল্পচর্চার পেশা ছেড়ে দিলেন।

শিল্পচর্চা ছেড়ে দেওয়ার ফলে তাঁর অর্থাভাব দেখা দিল। বস্তুত তিনি যখন নিঃস্ব অবস্থায় এসে পৌছুলেন—ঐ সময় সৌভাগ্যবশত তাঁর বন্ধুরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় মোর্স নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রয়িং-এর অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মিতরূপে অর্থ উপার্জনের ফলে তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার সুযোগ পেলেন। দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করে তিনি নিজের হাতে একটি-একটি করে প্রত্যেকটি যন্ত্র নির্মাণ করেন।

পোষাক-পরিচ্ছদে ও খাদ্যের জন্য অর্থব্যয় করা বন্ধ করে দিয়ে তিনি সেই অর্থের দ্বারা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। অবশেষে তিনি টেলিগ্রাফের একটি নিখুঁত মডেল তৈরি করলেন। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তার খাটানো হলো এবং সেই তারে সংবাদ প্রেরিত হলো। সংবাদটি ছিল এইরূপ—'টেলিগ্রাফ পাঠাবার পরিকল্পনাটি সফল হয়েছে, ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ সাল।'

এইভাবে সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবার সময় দূরবর্তী দুইটি স্থানের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের পরীক্ষার জন্য তিনি কংগ্রেসের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। ঐ সময় কংগ্রেস সদস্যরা সিমাফোর পদ্ধতিতে সংকেত প্রেরণ সম্পর্কে আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং এই আবিষ্কারের গুরুত্ব মোটেই উপলব্ধি করেন নি। মোর্স তাঁর আবিষ্কারকে পেটেন্ট করিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। হতাশায় ভেঙে না পড়ে তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। লণ্ডন তাঁকে তাঁর আবিষ্কারের পেটেন্ট অধিকার দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু ফ্রান্স এমন কতগুলি সর্তে পেটেন্ট অধিকার দিল যে, তিনি তা চালাতে পারলেন না। সে যাই হোক, এই সফরের দরুণ তিনি ইউরোপে বিদ্যুৎশক্তির আধুনিকতম বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ পান এবং তারই ফলে তিনি হাল্কা ধরণের একটি যন্ত্র তৈরি করেন—যার মধ্যে জটিলতা অপেক্ষাকৃত কম। আর একবার তিনি অর্থের জন্য কংগ্রেসের নিকট আবেদন করেন এবং শেষ পর্যন্ত তা লাভও করলেন।

এখন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে টেলিগ্রাফকে বাঁচিয়ে রাখার সম্ভাবনা দেখা দিল। মোর্স এবং তাঁর অংশীদার ডেইল তখনিই কাজে লেগে গেলেন। মোর্সের বাধাবিঘ্ন তখনও দূর হয় নি। মাটির তলায় নল বসিয়ে তার মধ্যে দিয়ে টেলিগ্রাফের তার নেবার পরীক্ষা সুরু করলেন।

এক বছর কাল বৃথাই তিনি পরিশ্রম করলেন এবং তার সঙ্গে তেইশ হাজার ডলার ব্যয় করলেন। তিনি প্রায় হতাশায় ভেঙে পড়লেন। এ-সময় এজরা কর্নেল একজন ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। কর্নেল, মোর্সকে ডাণ্ডার উপর ইনস্যুলেটর বসিয়ে তার সঙ্গে তার টেনে নেবার পরামর্শ দিলেন। মোর্সও রাজী হলেন। বাল্টিমোর ও হাড়ো রেলপথ ধরে টেলিগ্রাফ তার খাটানো হলো এবং বিরাট পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হলো বাল্টিমোর শহরেই। অনতিবিলম্বেই ব্যবসাগত হিসাবে টেলিগ্রাফ সাফল্যলাভ করে এবং দ্রুত পৃথিবীর সর্বত্র চালু হয়। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক অগ্রদূতের মধ্যে মোর্স অন্যতম। তিনি একাধারে শিল্পী, আবিষ্কারক, ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। এই চারিটি ক্ষেত্রেই তাঁকে কঠোর পরিশ্রম, দুর্ভাগ্য এবং মতামতের সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হলেও তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি সফল হন। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি পৃথিবীর সকল জাতির শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

১৮৭২ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে মোর্স নিউইয়র্কে লোকান্তরিত হন।

মিঠে সানাইয়ের সুর শোনায়

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

সুন্দর সব পরীরা
নতুন ফুলের বেশে,
মিঠে সানাইয়ের সুর শোনাতে
এলো মোদের দেশে।

দিকে দিকে আজ উঠেছে
ওই সুরেরই ঝড়,
এমন দিনে কেউ থাকে না
দূরে আপন পর।

নীল আকাশে উড়েছে তাই
পাখিরা সকালবেলা,
মাঠে-ঘাটে বসেছে সব
রঙিন ফুলের মেলা।

শিশুর ঠোঁটে ওরাই আজ
তুলছে হাসির ঢেউ,
জ্যোৎস্নারাতে এই কথাটি
জানলো না ভাই কেউ।

এমনি করে বছর বছর
ওই পরীরা এসে,
মিঠে সানাইয়ের সুর শোনায়
আমাদের এই দেশে।

বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প

শ্রীদীপঙ্কর নন্দী

গভীর অরণ্য। সেই অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে সরু মেঠো পথ। পায়ে-চলার পথ।

পথের দু'পাশে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সেই মেঠো পথ বেয়ে চলেছে দু'টি পাল্কী। একটি আগে আগে—অপরটি তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

গভীর রাত্রি। চাঁদের আলোয় সারা জঙ্গল ঝলমল করছে। বোধ হয় পূর্ণিমা তিথি। চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু শোনা যাচ্ছে গাছপালার খসখস্ শব্দ। আর পাল্কী-বাহকদের সুমধুর রব একটানা হুঁাইও। হুঁাইও!!

ষোলজন বাহক দু'টি পাল্কী কাঁধে নিয়ে চলেছে। পাল্কীর আগে আগে চলেছে একজন লোক। তার এক হাতে লণ্ঠন—অন্য হাতে লাঠি। সেই পথপ্রদর্শক—পথের নিশানা দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

পাল্কীতে চলেছেন হাকিম সাহেব। এ জেলার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। চলেছেন সরকারী কাজে। ভোর হওয়ার আগেই সাহেবকে শহরে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। যথাসময়ে পৌঁছিয়ে দিলে ভালরকম বকশিস্ মিলবে। সেই আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওরা ছুটে চলেছে।

এই মাঘ মাসের কন্‌কনে শীতে ওরা গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে। ওদের কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে।

হঠাৎ পাল্কী-বাহকেরা থমকে দাঁড়াল। অদূরে দেখতে পেলে কতকগুলি লোক। লোকগুলি ইতস্ততভাবে লুকিয়ে রয়েছে, ঝোপঝাপের আড়ালে-আড়ালে। উঁকি-ঝুঁকি মারছে। ইসারা করছে পরস্পরের মধ্যে নানা রকম সাঙ্কেতিক আওয়াজ করে।

এই নিশীথরাত্রে নির্জন-নিরালা জঙ্গলে এতগুলি লোককে দেখে পাল্কী-বাহকদের ভয় হোলো। তারা নিরাপদ বোধ করলে না। তাদের গা ছমছম্ করতে লাগল।

লোকগুলি ক্রমশ এগিয়ে আসছে। এগিয়ে এসে লুকোচ্ছে ঝোপের আড়ালে। একঝোপ থেকে আর একঝোপের আড়ালে।

ওরা প্রায় পাল্কীর কাছে এগিয়ে এসেছে। বাহকদের বুঝতে বাকি রইল না এরা কারা। কিসের লোভে এই গভীর নিশীথে, এসেছে এই জঙ্গলে।

ওরা খবর পেয়েছে রাত্রিতে সাহেব যাচ্ছেন। সঙ্গে যাচ্ছেন তাঁর জামাই, নতুন জামাইয়ের কাছে নিশ্চয় কিছু টাকাকড়ি আছে। নিদেনপক্ষে গায়ে সোনাদানা তো কিছু আছেই। সেই গন্ধে ওরা এসেছে। এসেছে দল বেঁধে। ভয় দেখিয়ে না হয় তো খুন-জখম করে কেড়ে-কুড়ে নিয়ে চম্পট দেবে। এই নিরালা-নির্জন নিশীথে কেউ টেরটি পাবে না। কেউ জানতে পারবে না কাদের এ কাজ। এমন সুযোগ কি কেউ কখনও ছাড়ে!

ভয়-ভাবনায় বাহকদের গতি মন্থর হয়ে এলো। হঠাৎ এক সময় বিশ-ত্রিশ জন লোক হৈ-হৈ করে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। নিমেষের মধ্যে পাল্কী দু'টিকে ঘিরে ফেললে। মার মার বলে চিৎকার করতে লাগল।

বাহকেরা ভয়ে পাল্কী নামিয়ে রেখে পালাল, যে যে দিকে পারলে দৌড়াল। প্রাণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াল। ভয়ে পিছন ফিরে কেউ একবার তাকিয়ে দেখতে সাহস করলে না।

পাল্কীর মধ্যে যিনি ছিলেন, সবে তখন তাঁর একটু তন্দ্রা এসেছিল। পাল্কী মাটি স্পর্শ করায় তাঁর তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। ব্যাপার কি? কিসের এত চিৎকার—এত কলরব।

পাল্কীর ভিতর থেকে তিনি একবার মুখ বাড়িয়ে দেখলেন। দেখে তো তাঁর চক্ষুস্থির! তাঁর পাল্কী ঘিরে রয়েছে বিশ-ত্রিশ জন সণ্ডামার্কা লোক। যেমন বলিষ্ঠ তেমনি দীর্ঘকায়। ওদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি আর সড়কি। কিসের নেশায় চোখ দু'টি রক্তরাঙা। যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। আর কি ভয়ঙ্কর—বিকট হুঙ্কার।

আশ্চর্য! পাল্কীর ভিতরে যিনি ছিলেন তিনি কিন্তু একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন পাল্কীর ভিতর থেকে। পায়ের কাছে দেখলেন একটা লাঠি। বোধ হয়, লণ্ঠনধারী বেয়ারা ফেলে পালিয়েছে। তিনি ক্ষিপ্রগতিতে লাঠিটি কুড়িয়ে নিলেন। বজ্রমুষ্টিতে লাঠিটি উঁচিয়ে ধরে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—কে তোরা? কি চাস?

সেই বজ্রগর্জনে সারা অরণ্য কেঁপে উঠলো। ডাকাত-দস্যুরা চমকে উঠল। ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

হাকিম সাহেবের সে কি ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপ। রাগে তাঁর শরীরের প্রতিটি মাংশপেশী ফুলে ফুলে উঠছে। বিস্ফারিত নয়নযুগল রক্ত-রাঙা। ঠিকরে বেরুচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে আবার হুঙ্কার দিলেন হাকিম সাহেব।—আর এক-পা যদি কেউ এগিয়ে আসিস তো তোদের কারুকে আস্ত রাখব না। প্রাণে যদি বাঁচতে চাস তো এখুনি এখান থেকে পালিয়ে যা—

হাকিম সাহেবের সেই রুদ্রমূর্তিতে কি ছিল জানি না। মন্ত্রবলের মত ডাকাত-দস্যুরা একে একে সব পালিয়ে গেল। যে অরণ্য এতক্ষণ ভীষণ কলরবে আর বীভৎস চিৎকারে আতঙ্কিত হয়ে ছিল এখন তা নিস্তব্ধ। বাতাসের সন্সন্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। বাতাসে গাছের পাতাগুলি খস্খস্ শব্দে নড়ছে আর নীচে মাটিতে শব্দ করে নড়ে উঠছে ফেলে-যাওয়া ডাকাত-দস্যুদের হাতের লাঠি আর সড়কি।

হাকিম সাহেব সেই গভীর নিশীথে নিস্তব্ধ-নির্জন অরণ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন। দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল হয়ে আর ভাবতে লাগলেন, কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি।

...কিন্তু কে এই অসমসাহসী হাকিম? হাকিম সাহেব আর কেউ নন—সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যিনি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে নতুন রূপ দিয়েছেন, তাকে ঐশ্বর্যশালিনী করেছেন। তাঁর অনুপম রচনাবলী যুগে যুগে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করেছে—নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছে। তিনি শুধু সাহিত্যসম্রাট নন—মাতৃমন্ত্রের উদ্গাতা—জাতির জনক।

কিন্তু কে জানতো বঙ্কিমচন্দ্র এত বড় বীর—যোদ্ধা। যেমন নির্ভীক তেমনি তেজস্বী। যেমন মানসিক দৃঢ়তা তেমনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। যে অরণ্যে দিনের আলোয় কেউ প্রবেশ করতে সাহস করে না সেই বিপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করলেন অবলীলাক্রমে। যাত্রা করলেন গভীর নিশীথে সেই অরণ্যপথে। জনমানব নিস্তব্ধ অরণ্যে একা এগিয়ে গেলেন মৃত্যুদূতের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা আর ব্যক্তিত্বের কাছে শারীরিক-শক্তি—পশুশক্তি চিরকালই পরাভূত হয়েছে। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। পরাজিত হয়ে ডাকাত-দস্যুরা পালিয়ে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র জয়যুক্ত হলেন।

আর একবার বঙ্কিমচন্দ্র অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তখন তিনি নবীন যুবক—হুগলী কলেজের ছাত্র।

সিপাই-বিদ্রোহের আগুন তখন দেশের চারদিকে জ্বলছে। চুঁচুড়ায় সামরিক আইন জারি হয়েছে—রাত্রি ন'টার পর যে কেউ রাস্তায় বেরুবে তাকেই তৎক্ষণাৎ গুলীবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হবে। এই হলো সেই সামরিক আইন। তাই সন্ধ্যার পর থেকে চুঁচুড়ার পথঘাট জনমানবশূন্য—নিস্তব্ধ। শুধু রাইফেল উঁচিয়ে আনাগোনা করছে অতন্দ্রপ্রহরী গোরা-সৈনিকের দল।

সেই সময়ের কথা বলছি। একদিন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে চুঁচুড়ায় গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে। থিয়েটার দেখার নিমন্ত্রণ। প্রথম যৌবনে থিয়েটার বঙ্কিমচন্দ্রের বড় প্রিয়বস্তু ছিল। এমনি পরিবেশেও তাই তিনি থিয়েটার দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি।

সেদিন থিয়েটার ভাঙতে অনেক দেরি হয়ে গেল। থিয়েটার দেখতে দেখতে এমনিই তন্ময় উন্মনা হয়ে গিয়েছিলেন যে, সামরিক আইনের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। যখন থিয়েটার ভাঙলো তখন তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কি করে আজ কাঁঠালপাড়া যাবেন। গঙ্গার ওপারে কাঁঠালপাড়া। এখান থেকে গঙ্গার ঘাটও বেশ কিছুদূর। কি আর করবেন। ভগবানের নাম করে বেরিয়ে পড়লেন। হাঁটতে সুরু করলেন গঙ্গার ঘাটের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে আরো কয়েকজন সঙ্গী পাওয়া গেল। তাঁদেরই মতন কয়েকজন থিয়েটারদর্শক—ওপারের যাত্রী।

সকলে চলেছেন দল বেঁধে। থিয়েটারের গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। এমন সময় অঘটন ঘটল। কোথা থেকে একজন গোরা-সৈনিক এসে একজন যাত্রীর বুকে বন্দুক উঁচিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল। সেই লোকটির অবস্থা তো সঙ্গীন; থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে মূর্চ্ছা যায় আর কি!

বঙ্কিমচন্দ্র এতক্ষণ এই ভয়ই করছিলেন। তিনি দেখলেন, আইনানুসারে সৈনিক এখুনি শুধু ঐ লোকটিকেই নয়, প্রত্যেকটি পথচারীকেই গুলীবিদ্ধ করে মেরে ফেলতে পারে। কেউ তাকে বাধা দিতে পারে, এমন লোক নেই। এই অবস্থায় কি যে করবেন তিনি তা ঠিক করতে পারছিলেন না। অথচ কিছু একটা না করলে এখুনি এতগুলি লোককে প্রাণে মারা পড়তে হয়। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। তিনি দু' হাত তুলে সাহস করে গোরা-সৈনিকের সামনে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে দাঁড়ালেন। নির্ভয়ে সংযত ভাষায় শান্তকণ্ঠে তাকে বুঝিয়ে বললেন। বললেন যে, তাঁরা সবাই গঙ্গার ওপার থেকে এসেছেন থিয়েটার দেখতে। থিয়েটার ভাঙতে দেরি হওয়ায় তাঁদের ফিরতে দেরি হয়ে গেল। তাঁদের অন্য কোন দুরভিসন্ধি নেই।

গোরা-সৈনিকটি তখন পাল্টা প্রশ্ন করলো—কি করে জানব তোমরা থিয়েটার দেখতে এসেছ, না আইন ভাঙতে এসেছ!

—তুমি ইচ্ছা করলে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এই থিয়েটারে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। সেইজন্ত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নাম করলেন। সৈনিকটি কিন্তু উল্টো বুঝলো; সে ভাবলো, যার সঙ্গে সে কথা বলছে সেই বুঝি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। সে তৎক্ষণাৎ 'স্যালুট' করে সসম্মানে পথ ছেড়ে দাঁড়াল।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁর দলের লোককে নির্ভয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন। কিন্তু গোরা-সৈনিকের ভয় কি এত সহজে যায়। তারা প্রাণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটলো।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সহযাত্রী থিয়েটারদর্শকের দল সে যাত্রায় অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। রক্ষা পেলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অসমসাহসিকতা আর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য।

নেহেরু বিয়োগে

শ্রীসুহাসিনী দাস

নেহেরু তোমার তিরোধানে আজ
বজ্র পড়েছে শিরে
বজ্রাহত আজ স্তব্ধ ভারত
ভাসিছে নয়ন নীরে!
জনগণমন অধিনায়ক তুমি,
তুমি হে প্রধানমন্ত্রী,
সমগ্র ভারতে যে সুর বাজিছে
তুমি হে তাহার যন্ত্রী!
সুগঠন তুমি পুরুষসিংহ
শৌর্যবন্ত ধীর,
উদার হৃদয় প্রতিভা দীপ্ত
সাহসী কর্মবীর!
সুবক্তা কৌশলী রাজনীতিবিদ্
তোমার সমান নাই,
ভ্রাতৃসম তুমি ভারতবাসীকে
হৃদয়েতে দিলে ঠাঁই।
বারে বারে তুমি বরেছিলে কারা
স্বাধীনতালাভ তরে,
বিশ্বশান্তি চেয়েছিলে তুমি
প্রাণপণ চেষ্টা কোরে!
মৈত্রীবন্ধনে বাঁধিয়া বিশ্ব
করিলে সবারে জয়,
বিপর্যস্ত বিশাল ভারত
করিলে গৌরবময়!
নদী-বন্ধনে জমির সেচনে
ফসল ফলিবে কত,
প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্নে সবে
আরাম লভিবে শত!

তব, সপ্তদশের পরিকল্পনা
পরিপূর্ণ রূপ পাবে,
বিজ্ঞানের দানে সমগ্র ভারত
সমৃদ্ধিতে ছেয়ে যাবে!
নারী, শিশু আর সব সাধারণ
অশেষ কল্যাণ তরে,
সমিতি, সঙ্ঘ, নানা প্রতিষ্ঠান
তুলিয়াছ তুমি গড়ে'!
তুমি নাই, তব ভাবের বন্যায়
জগৎ প্লাবিত হবে,
তোমারি আদর্শে সমগ্র ভারত
সবারি ঊর্ধ্বে রবে!
আনন্দলোকেতে অক্ষয় হও,
জওহরলাল তুমি,
শোকাহত মোরা মাগি' শুভাশীষ—
তোমার চরণে নমি!

পল্লীর কবি কুমুদরঞ্জন

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশু-সাহিত্য পরিষদ ১৩৭০ সালের 'ভুবনেশ্বরী পদক' দিয়ে সম্মানিত করেছেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে। বস্তুত গ্রাম বাঙলার জীবন্ত-প্রতীক কুমুদরঞ্জনকে সম্মানিত করায় পরিষদেরই সম্মান বেড়েছে। কারণ এতে বাঙলা দেশের একটি সাহিত্য-সংস্থা একজন খাঁটি বাঙালিকে সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ পেলেন।

রবীন্দ্রানুসারী কবিকুলের মধ্যে এই বয়োজ্যেষ্ঠ কবির যে অকৃত্রিম প্রাণের সুর ধ্বনিত হয়েছে এমনটি আর সচরাচর দেখা যায় না।

কুমুদরঞ্জন পল্লীর কবি। বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল, বাঙলার ঘর, বাঙলার হাট, বাঙলার বন, বাঙলার মাঠ, বাঙলার পশুপাখি, গাছপালা সবই তাঁর আন্তরিকতার স্পর্শে জীবন্ত রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে।

প্রকৃতির দুলাল কুমুদরঞ্জন। বনফুল যেমন বনে সুন্দর, ঠিক তেমনি বাঙলার প্রকৃতির অকৃত্রিম পরিবেশের মধ্যেই কুমুদরঞ্জনের কবি-প্রতিভার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটেছে।

বাঙলার শ্যামল প্রকৃতি কবিকে মুগ্ধ করেছে, তিনি তাকে ভালবেসেছেন। কবি বলছেন:

আমি থাকি সুদূর গ্রামে বনরাজির মাঝ
শোভন লোভন শ্যামল কোমল নিয়েই
আমার কাজ।

কুমুদরঞ্জনের প্রকৃতিপ্রেমের মধ্যে কোথাও কোন কৃত্রিমতা নেই। একটা সহজ সারল্যের অকপট প্রাণখোলা প্রকাশ তাঁর কবিতার ছত্রে-ছত্রে। কবি নিজেই বলেছেন, তাঁর এই প্রকৃতিপ্রীতি, প্রকৃতির প্রতি এই অনুরক্তি তাঁর বুকের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে।

গ্রাম-বাঙলার প্রকৃতি কবি কুমুদরঞ্জনকে সর্বদাই আকৃষ্ট করে। বাঙলার প্রকৃতির মধ্যে কবির প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে। হৃদয়ের সমস্ত রসধ্বনি কবি খুঁজে পেয়েছেন বাঙলার প্রকৃতির মধ্যে। তাঁর কাছে বাঙলা দেশের 'লেবুর কুঞ্জ' ও 'কাশ্মীরের কমল কাননে'র চেয়ে অধিক মনোহর।

বাঙলার ধূলিকণাটি পর্যন্ত কবির আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছে। তাই কবি গেয়েছেন :

মোর কাছে তব পথের এ ধূলি
ব্রজের গরিমা পায়।

শহর জীবন কবির মনকে পীড়িত করে। তিনি পল্লীর কবি। পল্লীবাঙলার প্রাণচাঞ্চল্য শহরে স্তব্ধ। শহরের ইট-কাঠ-পাথরের মধ্যে কবি-প্রাণের সহজ প্রকাশের অজস্র অবাধ অবকাশ দেখতে পান না। সেখানে মানুষের জীবন ক্ষুদ্রগণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেন নিশ্বাস ফেলারও জায়গা নেই। তাই শহরের কৃত্রিম আবহাওয়ায় কবি ব্যথিত হন, কবি-প্রাণ সংকুচিত হয়।

এখানে তো নাই বনমর্মর বনবিহগের সাড়াটি
অগাধ জলের বদলে পেয়েছি ক্ষীণবল জলধারাটি।
কোথা আমগাছ, ঝোপঝাপ্পর, কোথা বটগাছে ঝুলব?
কোথা অজয়ের সেই শ্যামকূট যেথা বুনো ফুল তুলব?

অজয়ের কোলে জন্ম, অজয়ের কোলেই মানুষ। তাই অজয়ের কুল কবির কাছে প্রাণাধিক প্রিয়। অজয়ের দুরন্ত বিধ্বংসী রূপও কবির মনকে বিরূপ করে তোলে না।

কুমুদরঞ্জনের কাব্য-প্রাণের সহজ, স্বচ্ছ আবেগের প্রকাশ। তাঁর কাব্যে কোথাও সচেতন চেষ্টার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। অকৃত্রিম প্রাণের স্পর্শটি কুমুদরঞ্জনের কাব্যের প্রধান গুণ। তাই ঝিঙে, কচু, পুঁই পর্যন্ত সবকিছুই তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। মোহিতলালের ভাষায়, কুমুদরঞ্জন বাঙলার খাঁটি কবি।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যসাধনার একটা বড় অংশ পল্লীবাঙলার প্রকৃতিকে ঘিরে রূপলাভ করলেও ভারতীয় ঐতিহ্য, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিও অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ তিনি খুঁজে নিয়েছেন তাঁর কবিতার মধ্যে। এখানে পল্লীর কবি তাঁর ছোট্ট গণ্ডিটি ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ভারতীয় জাতিয়ত্বের প্রসারিত অঙ্গনে।

বস্তুত জন্মভূমির প্রতি তাঁর অকপট ভালবাসাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ভালবাসা জাগিয়েছে।

কবি কালিদাস রায় বলেছেন: 'কুমুদরঞ্জনের কাব্যসৃষ্টির মূলে আছে জন্মভূমির প্রতি, বাঙলার প্রতি, সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি গভীর প্রেম।'

ভারতীয় ঐতিহ্য, তার অতীত গৌরব কবির মনকে নাড়া দিয়েছে। ভারতের গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্যে তিনি গৌরবান্বিত। সৌরাষ্ট্রের দেবদেউল 'সোমনাথ' সম্পর্কে কবি অনেকগুলি কবিতা রচনা করেছেন। এই সব কবিতায় তাঁর সেই গৌরববোধের স্বাক্ষর রয়েছে। কবির মধ্যে যে একটি ভারতীয় বাস করছে তার প্রকাশ সোমনাথ সম্পর্কিত কবিতাবলীর মধ্যে। কবির জাতীয়তাবোধের সার্থক প্রকাশ এই সব কবিতা।

এই সেই সোমনাথ—জ্যোতির্লিঙ্গ যারে কয় লোকে,
উদ্গীত মহিমা যাঁর পুরাণের শত পুণ্যশ্লোকে।
এ তীর্থ যোজনব্যাপী সুপ্রাচীন অশ্বত্থের মতো,
ভারতের সব রস শান্তরসে করে পরিণত।
এর দরশনই পুণ্য; এ শুধু মন্দির মঠ নয়,
হেথায় প্রস্তরীভূত জাতির আকাঙ্ক্ষা জেগে রয়।

কুমুদরঞ্জনের দেশপ্রেমও লক্ষ্য করবার মত। 'পর্তুগীজ' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

ক' বিঘত জমি আছে? মরিতেছ
তাহারি লাগিয়া দম ফেটে?
কত শতাব্দী চলে গেল তবু
র'য়ে গেলে সেই বোম্বেটে?
গোয়া? সে দ্বিতীয় গয়া কি?
সাঙ্গ করিতে শেষ লীলা?
উহাই হবে কি পর্তুগালের
পিণ্ডদানের প্রেত শিলা?

কিন্তু এ সমস্তের মধ্যে যেন কুমুদরঞ্জনের কবি-প্রাণের সেই সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখি না। তার খোঁজ পেতে হলে চলে যেতে হবে বাঙলা মায়ের প্রকৃতির কোলে, যেখানে কুমুদরঞ্জন স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যে বৈচিত্র্য নেই সত্য, কিন্তু আপন ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তিনি স্নেহ সুনিবিড় শান্তির নীড় এই পল্লী-মায়ের শান্ত কোমল, শুচিস্নিগ্ধ রূপটিকে অন্তরের সমস্ত দরদ ও ভালবাসা নিঙড়ে প্রকাশ করেছেন।

শ্রদ্ধেয় কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের কথা দিয়েই প্রবন্ধ শেষ করছি :

'মাটির মধ্যেই কুমুদরঞ্জন মাতৃদেবতার সন্ধান পেয়েছেন, এই-ই তাঁর জীবনসাধনা।'

বিশ্বকবির প্রতি

শ্রীতুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিলে যবে গো রবি,
শতদিশি উদ্ভাসিয়া, দিগন্তের লক্ষ চন্দ্রছবি,
মাতালে সবার প্রাণ,
তাই তুমি জ্যোতিষ্মান।
ভালবেসেছিলে তুমি,—পেয়েছিলেও প্রাণভরা,
উঠেছিল নিত্য তব কবিতার ঝঙ্কার হৃদয়তায়ে।
ফুটালে যে কাব্যদল,
হে চির প্রাণচঞ্চল।
তব দৃপ্তবাণী সঞ্চারিল নবছন্দ স্থাবরের প্রাণে,
বিহঙ্গের কলকণ্ঠে, মহাসাগরের জয়গানে,
মানব প্রাণের গীতিকা তুমি
রচনা করেছ আপন মনে
মানবের শতব্যথা, জীবনের অনন্ত আভাস
তাই তুমি প্রণম্য মানব জাতির, হে রবীন্দ্র
লহ নমস্কার।

সাহিত্য পরিচয়

স্মরণীয় শতবর্ষ (আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স)

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকীকে উপলক্ষ করে রচিত হয়েছে এ গ্রন্থ। কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধের মাধ্যমে স্বামীজীর সামগ্রিক সত্তাকে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান সময়ে স্বাধীনতার পটভূমিতে এ জাতীয় রচনার মূল্য সমধিক। জীবনযজ্ঞের একনিষ্ঠ সাধক, চিরসংগ্রামী বিশ্বপথিক স্বামীজীর কর্ম ও চিন্তাধারার এক সুষ্ঠু পরিচয়ে এ রচনা প্রোজ্জ্বল। বোদ্ধা পাঠকের কাছে এ রচনা মূল্যবান বলেই গণ্য হবে। ছাপা, বাঁধাই ও আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। লেখক—নিখিলরঞ্জন রায়, প্রকাশক—আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, জবাকুসুম হাউস, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ১২, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

যুগ ভগিনী নিবেদিতা (প্রতিমা পুস্তক)

ভগিনী নিবেদিতার নাম বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়, স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যা এই মহীয়সী মহিলার জীবন ও কর্মধারার কাহিনীমাত্রেরই এক স্বতন্ত্র মূল্য আছে, আলোচ্য গ্রন্থে সংক্ষেপে সেই মহৎ প্রয়োজনই সাধিত হয়েছে। আইরিশ তরুণী মিস মার্গারেট নোবল কিভাবে ভগিনী নিবেদিতায় রূপান্তরিত হলেন, তার তাঁর পূর্ব-জীবনের পটভূমিই বা কিরূপ ছিল এ সমস্তই মনোজ্ঞভঙ্গীতে বিবৃত করেছেন লেখক এ গ্রন্থে। লোকমাতা নিবেদিতার ভারতের কল্যাণকর্মে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন সম্ভব হয়েছিল যে প্রস্তুতির মাধ্যমে তা ঘটেছিল বহুপূর্বে; স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন বলেই যে এই মহীয়সী ভারতের পরাধীনতার বেদনাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই, আর সে জন্যই শুধু ভারতের অধ্যাত্মজীবনেই নয় ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রেও অকুণ্ঠ পদসঞ্চার ঘটেছিল তাঁর। আলোচ্য রচনায় ভগিনী নিবেদিতার এই যুগ্ম কর্মধারারই পরিচয় প্রদানে সচেষ্ট হয়েছেন লেখক এবং সেজন্যই তাঁর রচনাও প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। বস্তুত স্বল্পপরিসরের মধ্যে এই মনস্বিনীর যে পরিচয় আঁকতে তিনি সক্ষম হয়েছেন, তা অকুণ্ঠ অভিনন্দনেরই উপযুক্ত। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রলয় সেন, প্রকাশক—প্রতিমা পুস্তক, ১৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—দু' টাকা।

মনীষী আশুতোষ (বিদ্যাভারতী)

বাঙলার অন্যতম যুগপুরুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম বাঙালী মাত্রেরই সুপরিচিত। আজ জন্মশতবার্ষিকীর পুণ্যলগ্নে তাঁকে বিশেষ করেই স্মরণ করা প্রয়োজন, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সেই কর্তব্যেই অগ্রসর হয়েছেন। বাঙলার কিশোর-কিশোরীর বোধগম্য ভাষায় আশুতোষের জীবন ও কর্মের এক পরিচ্ছন্ন পরিচয় দিয়েছেন লেখক, লেখকের সাবলীল শৈলী এ গ্রন্থের এক বিশেষ সম্পদ। গল্প বলার মতই আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে এই মহাপুরুষের জীবনকথা বিধৃত হওয়ায় স্বভাবতই পাঠকের মন আকর্ষিত হয়। আশুতোষের জীবনের অনেক ছোটখাট ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, যা একাধারে আকর্ষণীয় ও কৌতূহলপ্রদ। বাঙালী ছেলেমেয়েরা এ গ্রন্থকে সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবে। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—অমরনাথ রায়, প্রকাশনায়—বিদ্যাভারতী, ৮-সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৯, দাম—দুই টাকা।

বাঙলার বৈষ্ণব-দর্শন (শ্রীগুরু লাইব্রেরী)

বাঙলায় বৈষ্ণব ধর্মমত একদিন গভীর শিকড় গেড়েছিল। বহু পণ্ডিত ও দার্শনিক এ-সম্বন্ধে আজীবন সাধনা করে গেছেন, বস্তুত শক্তিমন্ত্রের উপাসক বাঙালীর চিত্ত যে বহুদিনাবধিই বৈষ্ণব ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এ-কথা শুনতে একটু পরস্পর-বিরোধী মনে হলেও সত্য। আলোচ্য-গ্রন্থের লেখক প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর রসানুভূতিও ছিল প্রবল। বাঙলার বৈষ্ণব-দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে গবেষণা তিনি করে গেছেন বর্তমান রচনা তারই ফসল। এই গ্রন্থে যে-সব প্রবন্ধাদি সংকলিত তার প্রায় সব কটিই 'মাসিক বসুমতী'তে পর্যায়ক্রমে আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রন্থাকারে এই মূল্যবান রত্নগুলিকে একত্র গ্রথিত করে প্রকাশক চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। বৈষ্ণবধর্মের অন্তর্নিহিত ভাববৈশিষ্ট্য বড় উজ্জ্বল হয়েই ফুটে উঠেছে প্রবন্ধগুলির মাঝে, গ্রন্থকারের গভীর চিন্তাধারায় পরিচয়ে এরা ধন্য। প্রবন্ধগুলিতে যে-সব প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, সেগুলিকে গভীরভাবে প্রণিধান করেছেন লেখক; বহু দিক থেকে তাদের বিচার করা হয়েছে এবং এক-একটি বিষয়ে বিভিন্নভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এ জন্যই গ্রন্থটিকে সামগ্রিকভাবে তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রামাণ্য বলে অভিহিত করা যায় নির্দ্বিধায়। গ্রন্থকারের শৈলী অত্যন্ত সাবলীল, আর সেজন্যই গ্রন্থোক্ত কঠিন দার্শনিকতত্ত্বও বুঝতে অসুবিধা হয় না পাঠকের। প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। আঙ্গিক বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রমথনাথ তর্কভূষণ, প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬। দাম—সাত টাকা।

জঙ্গলগড় (গ্রন্থপ্রকাশ)

সাহিত্যের মধ্যে কোন বিশেষ অঞ্চলকে ফুটিয়ে তোলার দক্ষতার জন্য যাঁদের খ্যাতি সমধিক, তারাশঙ্কর তাঁদের শীর্ষস্থানীয়। বর্তমান উপন্যাসটিও সে বিষয়ে সাক্ষ্যবাহী। উড়িষ্যা ও

বাঙলার সীমান্তবর্তী এক ভূখণ্ডের বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকটি মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনধারাই এ কাহিনীর বিষয়বস্তু। অনার্য ও আর্য রক্তের সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক বিচিত্র সম্প্রদায়, ছত্রিশ জাতিয়া তাদের নাম, জঙ্গলগড় তাদের রাজত্ব। অর্জুন সিং এই জঙ্গলগড়ের কুমার বা সর্দার, মূলত এই চরিত্রটিকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে কাহিনী। প্রেম, হিংসা, মিলন-বিরহের যে ছবি এঁকেছেন লেখক, তা যেমন স্পষ্ট তেমনই হৃদয়গ্রাহী; বর্ণনা-কৌশলে পরিবেশ জমে উঠেছে, কৌতূহল ঘনীভূত হয়েছে। বস্তুত এক আরণ্যজীবন যেন মন্ত্রবলে মুখর হয়ে অতীতকে টেনে নিয়ে এসেছে বর্তমানে। নায়িকা ঝুমঝুম, রুক্মিনী, দলু সর্দার, অর্জুন সিং প্রভৃতি চরিত্র যেন স্পষ্ট আকৃতি নিয়ে দাঁড়ায় চোখের সামনে। প্রেম যে সবার উপরে সেই অনাদি সত্যেরই প্রকাশে মধুর সমাপ্তি ঘটেছে কাহিনীর; পাঠ শেষে এক অখণ্ড পূর্ণতার আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে পাঠকের মন। লেখকের অনবদ্য শৈলী এ রচনার অন্যতম সম্পদ। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—গ্রন্থপ্রকাশ। ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯, দাম—চার টাকা।

বন্যা (গ্রন্থলোক)

সাম্প্রতিক সাহিত্যের আসরে যে নামটি পাঠকমাত্রেরই চিত্তে প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে, যাঁর নতুন রচনামাত্রই সাদরে গৃহীত হয়, আলোচ্য গ্রন্থেরও লেখক সেই স্বনামধন্য কথাশিল্পী জরাসন্ধ। অন্যান্য রচনার মত এ গ্রন্থে লেখক তাঁর কর্মজীবনের ছাপ ফেলেন নি, বস্তুত কারাজীবনের প্রভাবমুক্ত এ রচনায় লেখক যেন এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ। আদর্শনিষ্ঠ এক শিক্ষাবিদের জীবন ও জীবন-যন্ত্রণা, বড় নিপুণ তুলিতেই এঁকেছেন লেখক, সেই সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে বয়ে গিয়েছে মন দেওয়া-নেওয়ার এক করুণ আখ্যান। সমাজের স্বাক্ষর দেওয়ার সুযোগ হল না যে প্রেমে তারই সকরুণ পরিণতি, সংবেদনশীল লেখকের কলমে এক অপরূপ রূপ ধরেছে, নিষ্ঠা ও সততার প্রতিমূর্তি জগদীশের মাধ্যমে লেখক যেন এক দুরূহ প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন। সত্যকার প্রেম যে অকুণ্ঠ স্বীকৃতিরই উপযুক্ত, আত্মজের ঔরসজাত বে-আইনী সন্তানকে গ্রহণ করে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ জগদীশ তা প্রমাণ করেছেন। চরিত্রগুলি গভীর দরদ ও মানবিকতাবোধের উজ্জ্বল নিদর্শন। বিশেষ করে জগদীশ, নীলা, পণ্ডিতমশাই ইত্যাদি চরিত্র যেন এক অনন্য মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঙলার এক স্মরণীয় পুরুষকে সুকৌশলে কাহিনীর মধ্যে টেনে আনাতে কাহিনীর আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছে। মানবদরদী সাহিত্যকারের এ রচনা পাঠক সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। আঙ্গিক মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—জরাসন্ধ। প্রকাশক—গ্রন্থলোক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বহে নদী (গ্রন্থপ্রকাশ)

আলোচ্য গ্রন্থটি এক গল্প-সংকলন। লেখক সাম্প্রতিক বাঙলা কথাসাহিত্যের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যকার, বিশেষ করে ছোট গল্পের ক্ষেত্রেই তিনি অনন্য, আলোচ্য সংকলনের গল্পগুলিতেও তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ যথেষ্ট পরিমাণেই পড়েছে। নিখুঁত আঙ্গিকে রচিত গল্পগুলি যেন এক একটি মূল্যবান রত্নবিশেষ—আলো ঠিকরোচ্ছে যার গা দিয়ে। মননশীলতা ও মানবিক আবেদনই এদের প্রধান সম্পদ, বর্তমান সমাজের ঘুণধরা আভ্যন্তরীণ অবস্থা অতি উজ্জ্বলভাবেই ফুটে উঠেছে এদের মাঝে। মোট দশটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে এ গ্রন্থে, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি বিস্ময়কররূপেই সার্থক। এ প্রসঙ্গে, 'সে আমার প্রেম', 'সাধ যে কোন', 'ভেবেছিলাম' প্রভৃতি বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। বর্তমান যুগের ক্ষয়িষ্ণু মানস যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে, 'সে আমার প্রেম' ও 'ভেবেছিলাম' গল্প দু'টির মাঝে; অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় তরুণ হৃদয়ের প্রথম প্রেম, সদ্য-যৌবনের অক্ষুণ্ণ পবিত্রতা এ সবই যে মরে যায়, মরে যাচ্ছে, নিপুণভাবে সেই সত্যকেই পাঠকের মননে উপস্থাপিত করেছেন লেখক। লেখকের বলিষ্ঠ ও মার্জিত শৈলী, তাঁর বক্তব্যকে মুখর ও প্রাণবন্ত করে তুলতে সহায়ক। প্রচ্ছদরুচি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা।

সুখের লাগিয়া (শ্রীগুরু লাইব্রেরী)

স্বনামধন্য সাহিত্যকারের সাম্প্রতিক এই উপন্যাস এক বিচিত্র স্বাদ বহন করে এনেছে। অপরিণত বয়সী ছেলেমেয়ের পরিণাম-জ্ঞানহীন প্রেম যে তাদের জীবনে কি ধরণের বিপর্যয় টেনে আনতে পারে, সেটা দেখানোই যেন লেখকের মৌল উদ্দেশ্য। নারীকল্যাণ আশ্রমের পটভূমিতে বিবৃত কাহিনী, মূলত দু'টি তরুণ-তরুণীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে; পার্থপ্রতিম ও সুলতা ভালবেসেছিল একে অন্যকে, কিন্তু সার্থক হতে পেল না সে প্রেম, যৌবনের উন্মত্ত জ্বালায় অধীর হয়ে যে ভুল তারা করল, তারই মাশুল জোগাতে ধ্বংস হয়ে গেল তাদের মুকুলিত জীবন, দু'টি স্ফুটনোন্মুখ কমলকলি ফোটার আগেই ঝরে পড়ল। কাহিনী বয়নে অবিশ্বাস্য মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন লেখক, সাম্প্রতিক সমাজের একটা দিক যেন নিপুণ তুলিতে আঁকা উজ্জ্বল ছবির মত ভেসে ওঠে পাঠকের চোখের সামনে; পার্থপ্রতিম ও সুলতা যেন পৃথক পৃথক কোন ব্যক্তিসত্তা নয়, পরিণামজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের মূর্তপ্রতীক। মূল কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত কাহিনীও আছে দু-একটি, নারী-কল্যাণ আশ্রমের অপর দু-একজন বাসিন্দার জীবন-ইতিহাস, মানুষের আদিমতম রিপুর বীভৎস অথচ অকপট প্রকাশ ঘটেছে তাদের মাধ্যমে, সেইসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে আরও একটি মহৎ সত্য, পুরুষের পশুত্বের বেদীতে চিরন্তনী নারীর আত্মবলিদান লেখক যে সম্পূর্ণরূপেই সমাজ-সচেতন এ কথার স্বাক্ষর মেলে তাঁর রচনার প্রতি ছত্রে-ছত্রে। বর্ণাঢ্য শৈলী এ রচনার প্রধানতম সম্পদ—পরিবেশকে রেখার আঁচড়ে যেভাবে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন লেখক, তাতে তাঁকে ভাষার যাদুকর বলাই সঙ্গত। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রাণতোষ ঘটক, প্রকাশনায়—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

এই হৃদয় নিয়ে (গ্রন্থপ্রকাশ)

মানবহৃদয় এক আশ্চর্য রহস্যের আধার, ব্যথ-বেদনায় সেই হৃদয় বিকশিত হয় কখনও, আর কখনও বা বিদ্রোহ করে সমস্ত জীবনটারই ভিত্তি টলিয়ে দিতে চায়, হৃদয়ের এই অপার রহস্যই আলোচ্য রচনার মূল উপজীব্য। কাহিনীর নায়ক বীরেন বাস করে আত্ম-অহমিকার এক দুর্ভেদ্য দুর্গে, স্ত্রী উৎপলা ভাঙতে পারে না সে দুর্গ, আত্মরক্ষার্থেই অবশেষে ঘর ছাড়ে সে বীরেনেরই ঘনিষ্ঠতম সতীর্থ শুভাশীষের সঙ্গে ; অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের ভুল ধরা পড়ে ওদের কাছে, উৎপলাকে বীরেনের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করে শুভাশীষ। এততেও ঔদাসীন্যের দুর্গে ফাটল ধরল না বীরেনের, নির্বাক উপেক্ষাকে মহত্ত্বের মুখোশ পরিয়ে আবার ও ঠকে ঠকাতে চাইল উৎপলাকে এবং নিজেকেও। পরিণামে দেখা যায় বীরেন সহজ মানুষের মতই আর্ত মানুষের সঙ্গ, সাহচর্য ও মমতার ভিখারী। এই বীরেনকে দেখে স্বভাবতই মমতায় বিধুর হয়ে ওঠে উৎপলার মন, আর এইবারই প্রকৃত মিলন সম্পাদিত হয় ওদের। লেখকের আন্তরিকতায় কাহিনী হয়ে উঠেছে এক অপরূপ স্নিগ্ধতায় মণ্ডিত, মানবমনের সূক্ষ্মতম ভাবাবেগও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় পাঠক মননে। অঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫ ১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯, দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ভালোবাসার হাতেখড়ি (আর্ট এণ্ড লেটার্স)

বাংলা দেশের সাহিত্যজগতে শিবরাম চক্রবর্তী একটি বিশেষ নাম। যুগপৎ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের আলোয় এই নামটি যথেষ্ট পরিমাণে উজ্জ্বল। শিবরাম চক্রবর্তীর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'ভালবাসার হাতেখড়ি' তাঁর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কয়েকটি ছোট গল্পের সমন্বয়ে গ্রন্থটি রূপলাভ করেছে। গল্পগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সুখপাঠ্য এবং রসসমৃদ্ধ। প্রতিটি গল্প পাঠকের মনকে বিশেষভাবে ধরে রাখে এবং পরিণতিতে মনকে এক বিশেষ পরিতৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। তাঁর শব্দচয়ন, বচনবিন্যাস, বর্ণনপদ্ধতি স্বভাবতই অফুরন্ত সাধুবাদের দাবীদার। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অজিত গুপ্ত। প্রকাশক আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, জবাকুসুম হাউস, ৩৪ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১২। দাম—দুই টাকা।

অজিত দত্তের কবিতা সংগ্রহ (গুপ্ত ফ্রেণ্ডস)

যাঁদের সাধনা এবং শক্তিমত্তা এ যুগের বাঙলা কাব্যজগতকে নানাদিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছে—প্রথিতযশা কবি অজিত দত্ত তাঁদেরই অন্যতম। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে অবিরামগতিতে তাঁর লেখনী কাব্যক্ষেত্রে অনেক উল্লেখযোগ্য ফসল ফলিয়ে আসছে। সম্প্রতি তাঁর একটি কবিতা সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। সংকলন গ্রন্থটির মধ্যে শক্তিমান কবির বিভিন্ন কালের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার এক স্পষ্ট আলেখ্য প্রকটিত হয়ে ওঠে। তাঁর ভাবাদর্শ অনুভূতির প্রগাঢ়তা, রসপিপাসু কবিমনের ছায়াপাত ঘটেছে, কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে। কবিতাগুলির বিন্যাসরীতি, প্রকাশভঙ্গিমা, কল্পনাবৈচিত্র্য পাঠকসাধারণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। রসিকসমাজে এই বিশেষ সুপাঠ্য কাব্যসংকলনটির ব্যাপক ও বহুল প্রসার আমরা বিশেষভাবে কামনা করি। প্রকাশক—গুপ্ত ফ্রেণ্ডস এ্যাণ্ড কোং, ৩।১ অক্রূর দত্ত লেন, কলকাতা-১২ দাম—সাত টাকা।

সপ্তসিন্ধু (চক্রবর্তী য্যাণ্ড কোং)

হিন্দী-সাহিত্যজগতের প্রথম সারির যে কয়জন স্বনামধন্য কথাশিল্পী আছেন, তাঁদের মধ্যে মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন অন্যতম। সাম্প্রতিক গ্রন্থটি একটি উপন্যাস। ঋগ্বেদিক কালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে উপন্যাসটি। ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য মহাপণ্ডিত রাহুলজীর কল্পনায় রূপ নিয়ে পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত হয়েছে। উপন্যাসটি কেবলমাত্র হিন্দী-সাহিত্যে নয় ভারতীয় সাহিত্যের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটি নিজস্ব রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে অতুলনীয় বলা চলে। বৈদিকযুগ সম্বন্ধে এই ধরণের গ্রন্থ বিরল। গ্রন্থটি হিন্দী দিবোদাস কাহিনীর বঙ্গানুবাদ কর্ম। গ্রন্থটির প্রতি ছত্রে ছত্রে লেখকের সৃজনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদক উপন্যাসটির মর্ম সুনিপুণভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। ভাষার সাবলীলতায় এবং গতির সহজতায় অনুবাদটি নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে বলে মনে করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। অনুবাদক শ্রীভগীরথ। প্রকাশনায়—চক্রবর্তী য্যাণ্ড কোম্পানী, ১২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অচেনা শহর কলকাতা (গ্রন্থপ্রকাশ)

কলকাতার বাসিন্দারা কলকাতাকে চেনা বলেই জানে বাইরের মানুষ কলকাতায় এসে সব কিছুতে উৎসাহ আর কৌতূহল প্রকাশ করে যখন কলকাতাবাসীরা একটু করুণার চক্ষেই দেখে তখন তাদের। 'অচেনা শহর কলকাতা'র লেখক অমিতাভ চৌধুরী এই চেনা শহরের অচেনা কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের। এই চেনা শহরটার বুকে এদিকে-ওদিকে, কাছে-দূরে কত যে অচেনা, আধ-চেনা, রোজ দেখা তবু অচেনা স্থান-বস্তু-অধিবাসী আছে তার ইয়ত্তা নেই। আমরা শুধু তাদের জানি না এবং চিনি না। নয়, জানি না এবং চিনি না যে তা নিজেরাও খেয়াল করি না। অমিতাভ চৌধুরী আমাদের জানিয়েছেন এবং চিনিয়েছেন তাদের। শুধু অচেনা কেন, চেনা জিনিসগুলোকেই কি খেয়াল করি আমরা কিংবা মনের পাতায় ধরে রাখি চিরন্তন করে। সাংবাদিক-সাহিত্যিক অমিতাভ চৌধুরীর কলম তেমন বহু-উপেক্ষিতকে সাহিত্যিক অমরতা দিয়েছেন 'অচেনা শহর কলকাতা'য়। তাঁর কলকাতার টেস্ট-ক্রিকেট থেকে বৃষ্টি প্লাবনে লোক-ভরা অনড় ট্রাম পর্যন্ত প্রত্যেকটির উপস্থাপনা অনবদ্য। ঘাট-পাণ্ডা, প্রবাসী, অন্ধ, কৃপাশংকর, রামনিবাস মাহাতো তিনচাকী আড্ডায়, আফগান ব্যাঙ্ক, লালদীঘির সোফার পাড়া, টাকার গাছ, দুই আসর প্রভৃতি অজস্র রসোত্তীর্ণ লেখায় অচেনা শহর কলকাতা বিশেষ সমৃদ্ধ। বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাকে উঁচুতে স্থান দেবে। এই খণ্ড রচনাগুলি সবই 'চাণক্য' ছদ্মনামে ও স্বনামে সংবাদপত্র-পৃষ্ঠায় পূর্বে প্রকাশিত। আজকাল সাহিত্যের নামে

নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র থেকেও সাহিত্য-রস-গুণহীন বাক্যস্তূপ সৃষ্টি হচ্ছে যেমন, সাংবাদিকতা তেমন ক্রমশ বহু সুদক্ষ কলম পেয়ে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করছে। 'অচেনা শহর কলকাতা'র রচনা সমষ্টি তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বইখানির প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—অমিতাভ চৌধুরী। প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ ৫-১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—তিন টাকা।

জনম-অবধি (রবীন্দ্র লাইব্রেরী)

এক সুবৃহৎ উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক একটা আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। কাহিনীর নায়ক রামকুমার প্রাচীন ভাবধারায় লালিত-পালিত, স্বেচ্ছায় পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষাকে বরণ করে নিয়েও সে ভোগবাদী আধুনিক সভ্যতাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে না বুঝি কিছুতেই, আর তখনই দেখা দেয় সমস্যা, ব্যক্তিগত জীবন ধ্বংস হয়ে যায় আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাতে, তবু হার মানে না সে। রামকুমার চরিত্র সত্যিই মহাভারতের আত্মার প্রতীক স্বরূপ, যুগ-যন্ত্রণায় নিপীড়িত এক বিশ্বাসী মনুষ্যত্বকেই যেন মূর্ত করে তুলেছেন লেখক এই চরিত্রটির মাধ্যমে। পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে নায়িকা গৌরী, শেলী, পণ্ডিত, নচিকেতা সবই বেশ উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত, প্রেমের বেদনা ও ক্ষমাকে বহন করে গৌরীর জীবন পরিক্রমা সহজেই পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণে সক্ষম। নীলুপণ্ডিত আর এক উল্লেখ্য চরিত্র। নির্লোভ, সত্যনিষ্ঠ যে ব্রাহ্মণ একদিন হিন্দু-সমাজের শীর্ষদেশে মুকুটমণির মত বিরাজ করত—নীলুপণ্ডিত যেন তাদেরই ছায়া, সত্যকার ব্রাহ্মণ বলতে যা বোঝায় এই চরিত্রের মাঝে পাওয়া যায় তারই আভাস। লেখকের আন্তরিকতায় সমগ্র কাহিনীটি স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের, এই আবিল যুগে লেখক যে এখনও তাঁর মনে আশার প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন, আলোচ্য রচনা তারই স্বাক্ষরবাহী। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শক্তিপদ রাজগুরু। প্রকাশক—রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫।২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—দশ টাকা।

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী (গ্রন্থপ্রকাশ)

বাঙালী মঞ্চপাগল জাত, ছায়াছবির মায়ায় যতই আত্মবিস্মৃত হোক না কেন, রঙ্গমঞ্চের আকর্ষণকে উপেক্ষা করার সাধ বা সাধ্য তার নেই ; আলোচ্য গ্রন্থে সেই রঙ্গজগতেরই কয়েকটি অন্তরঙ্গ খবর পরিবেশন করেছেন লেখক। বহুদিনাবধি রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বাস করে তিনি যা যা দেখেছেন ও শুনেছেন বর্তমান রচনা তারই আংশিক স্মৃতিচারণ। রচনাটি কয়েকটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত, সরসতা ও কৌতুকের যেন এক একটি অপরূপ নির্ঝর, লেখকের কৌশলে অল্পসময়ের মধ্যেই পাঠকের মন আবিষ্ট হয়ে ওঠে, লেখার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে বাধে না একটুও। অতিশয় রমণীয় রচনা পাঠের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক যেন এক অজানা জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন। আলোচ্য গ্রন্থকে তাই একাধারে উপভোগ্য ও প্রামাণ্য বলতে পারা যায় স্বচ্ছন্দে। আমরা বইটি পড়ে সত্যই আনন্দ পেয়েছি। প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—দেবনারায়ণ গুপ্ত, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা।

বৈমানিকের ডায়েরী (গ্রন্থপ্রকাশ)

নামটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর। 'ডায়েরী' বলতে আমরা যে জাতীয় রচনা আশা করি, 'বৈমানিকের ডায়েরী' একেবারেই সে জাতের লেখা নয়। এটি একখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস। যদিও পটভূমিকার মূল ভিত্তি লেখক-নায়কের বৈমানিক জীবনের গোটা কয়েক পাতা, তাহলেও বইখানিতে ঔপন্যাসিক উপাদান সবই আছে। কতকগুলি বাছাই করা চরিত্র আছে, প্রত্যেকটি চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, লেখকের নিপুণ কলমের টানে তারা প্রত্যেকে আপনাপন রূপ পেয়েছে, আর পেয়েছে প্রাণ। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে, রসবিদ লেখক মনের স্পর্শে আর সুষ্ঠু, স্বাভাবিক পরিণতিতে উপন্যাসখানি সমৃদ্ধ। অনাড়ম্বর ও সাবলীল এই পরিণতিটুকু উপন্যাসটিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। অথচ এই পরিণতি নিয়ে সামান্য আড়ম্বর বা উচ্ছ্বাস সমগ্র রচনাটির সার্থকতার ওপর চরম আঘাত হানতে পারত। লেখকের মাত্রাজ্ঞান ও রুচিবোধ সে-কারণে সবিশেষ প্রশংসনীয়। চরিত্রসৃষ্টি কিংবা পরিণতির প্রতি লেখকের সযত্ন মনোযোগ, তবু বইখানির নামকরণকে ব্যর্থ করে দেয় নি—বাঙালী বৈমানিকের দৈনন্দিন জীবন উপন্যাসখানির আকর্ষণীয় সূত্র হয়ে অন্যান্য বিবিধ উপকরণের ফুলগুলিকে মনোহর মালায় গেঁথেছে। প্রচ্ছদ-শিল্পী অজিত গুপ্ত উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখেন। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—দীপঙ্কর। প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

নীল ক্রৌঞ্চের ডানা (জ্ঞানতীর্থ)

বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের দরবারে ছদ্মনামের অন্তরালে যে কয়জন নবাগত লেখক বলিষ্ঠ লেখনীর বলে নিজ আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের মধ্যে 'অগ্নিমিত্র' অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থটি একটি সামাজিক উপন্যাস। লেখকের নবতম উপন্যাস 'নীল ক্রৌঞ্চের ডানা' পূর্ণরূপে লেখকের সৃজনক্ষমতার পরিচায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নাভরা একটি পরিপূর্ণ রমণী-জীবনের কাহিনী রচনায় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীবিন্যাসে, চরিত্রসৃষ্টিতে উপন্যাসটি রসসমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং সমাজ-সচেতনতা গ্রন্থটিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। প্রচ্ছদ, ছাপা, বাঁধাই সুন্দর। লেখক—অগ্নিমিত্র। প্রকাশনায়—জ্ঞানতীর্থ, ১, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—ছয় টাকা।

কলা-বিভাগ, ভারতীয় সংগ্রহ শালা, কলিকাতা, সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা (গাইড বুক)

ভারতীয় সংগ্রহ-শালার কলা-বিভাগের এই নির্দেশিকা বা গাইডবুকটি রসজ্ঞ-ব্যক্তিমাত্রেরই কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বলে পরিগণিত হবে। চিত্রকলা ও অপরাপর হস্তশিল্প এ-দু'টি বিভাগেরই বিশদ পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক স্বয়ং কীর্তিমান শিল্পী, কাজেই তাঁর বর্ণনায় অনভিজ্ঞজনের পক্ষেও কলা-বিভাগের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠেছে, বস্তুত এত

সংক্ষেপে এত বিভিন্ন ধরণের শিল্পকৃতি সম্পর্কে পাঠককে ওয়াকিবহাল করে তুলতে পারাটা সত্যই বিস্ময়কর। এ নির্দেশিকা হাতে থাকলে অতি সাধারণ মানুষও কলা-বিভাগের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন। কয়েকটি মূল্যবান চিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত হওয়ায় এ গ্রন্থের মর্যাদা বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে। সাধারণ মানুষকে শিল্প-জগতে আমন্ত্রণ করারই মুখপত্রস্বরূপ এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করে প্রণেতা 'চিন্তামণিকর' শিল্পজগতের পরম কল্যাণ সাধন করেছেন। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। প্রণেতা—চিন্তামণি কর ও তিনকড়ি মুখার্জী। অনুবাদক—অমল সরকার। ভারতীয় সংগ্রহশালার ট্রাস্টি দ্বারা প্রকাশিত।

আমেরিকাকে জানুন (ইউ, এস, আই, এস)

আলোচ্য ক্ষুদ্রায়তন পুস্তিকাটিতে, ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য মোটামুটি সকল তথ্যই পরিবেশিত হয়েছে। আমেরিকা আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি, সুতরাং সে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের মত আমাদের কৌতূহলও কম নয়, এ পুস্তিকা পাঠে সে কৌতূহল কতকাংশে মিটবে এবং সেজন্যই মূলত প্রচারধর্মী হলেও পুস্তিকাটি মূল্যবান। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। প্রকাশক—ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা।

মধ্যদিন (গ্রন্থপ্রকাশ)

আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু দু'টি নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ইন্দু ও প্রমীলা, দুই বান্ধবী, দু'জনেই বিবাহিতা ও দু'জনেরই দাম্পত্যজীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত। প্রমীলা মাতাল স্বামীর রুচিবিকার ও নীচতা সহ্য করতে না পেরে সরে এসেছে; ইন্দু সইতে পারে নি স্বামীর পরনারীর প্রতি আসক্তি। এই দু'টি মেয়ের বহিরঙ্গ এক ধরণের হলেও, মানসিকতায় রয়েছে প্রচুর বৈষম্য। প্রমীলা শক্তিময়ী, ইন্দু দুর্বল, বিবাহবন্ধনকে ঘৃণা করে প্রমীলা। সে চায় স্বাবলম্বন, চায় স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা; ওদিকে বহু ঘা খাওয়ার পরেও নীড় রচনার মোহে তন্ময় থাকে ইন্দু। ভাগ্যের চক্রান্তে দু'জনের জীবনে দেখা দেয় একই পুরুষ; হৃদয়বৃত্তিকে সবলে নিরোধ করে প্রমীলা ফিরিয়ে দেয় পুরুষের আহ্বান, আর আত্মদান করে ইন্দু সে আহ্বানের কাছে নির্দ্বিধায়। ইন্দু-মণীন্দ্রের মিলন সম্পাদিত হয় আর সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ হয় প্রমীলার আত্মসমীক্ষণ, সভয়ে উপলব্ধি করে সে, প্রেমই নারীজীবনের চরম সত্য—সাফল্য, অর্থ, যশ এ সবকেই অতিক্রম করে চিরন্তনী নারীসত্তা তাই সর্বদাই আকুল হয়ে ওঠে মনোমত নীড় রচনায়। লেখকের ব্যক্তিত্বপূর্ণ শৈলী এ উপন্যাসের প্রাণসত্তাকে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে, ছোট ছোট পরিচ্ছন্ন সংলাপ সমগ্র পরিবেশকে ফুটিয়েছে বিস্ময়করভাবে। আত্মবিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ শক্তির মাধ্যমে, চরিত্র হিসাবে প্রমীলা এক অখণ্ড বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—বিমল কর, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ। ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা।

অনুরাগে রাঙা (সাহিত্য কেন্দ্র)

বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী কয়েকটি গ্রাম্য নর-নারীর প্রেম, আশা, আনন্দ বেদনাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হলেও কিছুটা প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন, তবে তাঁর রচনা এখনও অপরিণত, অনুশীলনের মুখাপেক্ষী। এ রচনায় একটা সাবলীল সৌন্দর্যের আভাস মেলে এবং এটুকুই এর সপক্ষে বলার মত যা কিছু। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—জগদীশপ্রসাদ দাশ, প্রকাশক—সাহিত্য কেন্দ্র, এ-১৩১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীশ্রীহংসভগবান ও তাঁহার উপদেশাবলী
(জে এন বসু)

স্বামী ধনঞ্জয় দাসজী কাঠিয়াবাবা সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীহংসভগবান ও তাঁহার উপদেশাবলী' গ্রন্থখানি ধর্মশাস্ত্রের এক মহামূল্য তথ্য ও উপদেশসমৃদ্ধ। ষড়্‌দর্শনের অন্যতম বেদান্তদর্শন, উপনিষদেরই সার সঙ্কলন। ভগবান বেদব্যাস এই গ্রন্থের রচয়িতা। এই বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনা করেছেন ধর্মাচার্যগণ, নিজ নিজ মতানুসারে। সেইরূপ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীনিম্বার্ক ভগবান, বেদান্তদর্শনের এক ভাষ্য রচনা করেছিলেন—তার নাম 'বেদান্ত পারিজাত সৌরভ'। শ্রীশ্রীহংসভগবান, চতুঃসন্ ও দেবর্ষি নারদ কর্তৃক উপদিষ্ট মূল সিদ্ধান্তই তিনি তাঁহার ভাষ্যে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি প্রমাণ সাহায্যে স্থাপন করেছেন। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, অ্যাড্‌ভোকেট। ১৩১এ, যোগীপাড়া মেইন রোড, কলিকাতা-৬। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রাগিতিহাসের মানুষ (ফার্মা কে, এল, এম)

অতি আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে লেখা মানুষের এ ইতিহাস, বাংলা প্রামাণ্য গ্রন্থ ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদরূপেই গৃহীত হওয়ার যোগ্য। কি করে মানুষ সৃষ্ট হল এ জগতে, তার আদি থেকে আলোচনা করেছেন লেখক, প্রসঙ্গত বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছুটা বলেছেন; কিন্তু প্রধানত তাঁর আলোচ্যবিষয় বিশ্বের উৎপত্তি ও তার বিকাশ। এই গ্রন্থে মানুষের যে ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে তা তার মর্ত্যে আবির্ভাবের সময় থেকে ঐতিহাসিককাল অবধিতে নিবদ্ধ। প্রাণীজগতের যে বিবর্তনের ফলে মানুষের উদ্ভব, তারও এক প্রামাণ্য পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এ গ্রন্থ প্রাগিতিহাসের এক প্রামাণ্য দলিল। জগদ্বিখ্যাত মনীষী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, পণ্ডিতের দল যেসব ভিত্তিতে মানুষের পুরাতাত্ত্বিক অধ্যায় সম্পর্কে গবেষণা করে এসেছেন; এ রচনার কাঠামো তারই উপর নির্ভরশীল, সুতরাং একে প্রামাণ্য বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বহু পরিশ্রম করে লেখক ঐসব তথ্যাদি থেকে বিষয়বস্তুকে প্রাণবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। লেখকের শৈলীও অত্যন্ত সাবলীল। মানুষের পৃথিবীর বুকে আগমন, তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় তথ্যাদি এত কৌতূহলোদ্দীপকভাবে বর্ণিত হয়েছে যে অত্যন্ত সাধারণ পাঠকও এ রচনা পাঠে উপকৃত

হবেন। মানুষের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে সর্বসাধারণের মনে যে ঔৎসুক্য স্বভাবতই বর্তমান, এ গ্রন্থ পাঠে তারই সম্যক নিবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—শচীন্দ্রনাথ বসু, প্রকাশক—ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ৬-১ এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা—১২, দাম—আট টাকা।

শাশ্বত ভারত—ঋষির কথা (এ, মুখার্জী)

প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, যে সব পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে আলোচ্য গ্রন্থে তারই কিছু কিছু স্থান পেয়েছে। দেবতার দেশ ভারতে দেবতার পরই যাঁরা উল্লেখ্য ছিলেন, তাঁরা মহাতেজা তপস্বী বা ঋষি; কাজেই পৌরাণিক ভারতে এঁদেরই ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পৌরাণিক কাহিনী বা গাথা ইত্যাদিও এঁদেরই জয়গানে মুখর। বর্তমান রচনায় এঁদেরই বিশদ পরিচয় দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। লেখকের শৈলী আন্তরিক ও সাবলীল, গল্প বলার ভঙ্গীতে কাহিনী বলেছেন তিনি, যে জন্য পাঠকের কৌতূহল আগাগোড়াই অব্যাহত থাকে। পৌরাণিক ভারত যেন এক রূপময় আকৃতিতে ফুটে ওঠে পাঠকের চোখের সামনে। আঙ্গিক সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী। প্রকাশক—এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ। ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

জননায়ক জওহরলাল (সুতপা)

জওহরলাল নেহরু উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা একটি নাম, ভারতের ইতিহাসে তো বটেই সারা পৃথিবীর ইতিহাসেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এই নাম। বর্তমান গ্রন্থে এই মহান নায়কেরই সুষ্ঠু রূপায়ণ করেছেন লেখক। লেখক প্রখ্যাত জীবনীকার, শ্রীনেহরুর কর্মময় আদর্শপূত জীবন ও কর্মধারার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। বিলাস ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের পটভূমিতে যে জীবন একদিন বিকশিত হয়েছিল পরবর্তীকালে তাই সুপরিণতি লাভ করল ত্যাগ ও দুঃখবরণে। ধনীর দুলাল জওহরলাল রূপান্তরিত হলেন জনগণের পণ্ডিত নেহরুতে, প্রেয় থেকে শ্রেয়র পথে উত্তরণ ঘটল এক মানবাত্মার। মনুষ্যত্বের নিষ্কম্প দীপবর্তিকা হাতে যে পথিক একদিন যাত্রা সুরু করেছিলেন, আজ তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু সেই প্রদীপ শিখার আলো আজও অনির্বাণ; পণ্ডিত নেহরুর জীবন ও বাণীই সেই অনল শিখা, বর্তমান রচনা তারই স্বাক্ষরবাহী। শ্রীনেহরুকে বুঝতে হলে, জানতে হলে এ ধরণের গ্রন্থ রচিত হওয়ার প্রয়োজনও তাই সমধিক। আমরা এ রচনার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেকক—মণি বাগচি, প্রকাশক—সুতপা প্রকাশনী, ৮ সি, রজব আলি লেন, কলিকাতা ২৩, দাম—চার টাকা।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে (প্রতিমা পুস্তক)

অধ্যাত্মজীবন প্রসঙ্গে যাঁরা আগ্রহী, তাঁদের কাছে এ রচনা সমাদৃত হবে বলেই আশা করা যায়। শ্রীশ্রীরামঠাকুর বাংলার সাধন ক্ষেত্রে এক অনন্য নাম। এই মহাপুরুষের জীবন ও কর্মধারা তথা ধর্মসাধনার এক প্রামাণ্য পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। লেখক শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন ভক্তশিষ্য এই সাধক সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কিছু ছিল, কারণ অল্পদিনের জন্য হলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসার সুযোগলাভ করেছিলেন তিনি এবং সে জন্যই এ গ্রন্থে শ্রীশ্রীরামঠাকুরের সম্পর্কে বহু ব্যক্তিগত তথ্য ও প্রমাণাদি সন্নিবেশিত হতে পেরেছে। লেখকের আন্তরিকতায় এ রচনা উপভোগ্য ও আকর্ষণীয়। ভক্তজনেরা এ রচনার মাধ্যমে অনায়াসেই এই সাধকের দিব্য-জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ আভাস লাভ করে তৃপ্ত হবেন। গ্রন্থটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—রবীন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশক—প্রতিমা পুস্তক, ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম—পাঁচ টাকা।

ঋতু সংহার (সুপ্রকাশ)

সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও আলোচ্য উপন্যাসে লেখক যে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছেন, তাতে সাহিত্য রসিকমাত্রেই আগ্রহী হয়ে উঠবেন। নারী-জীবনের এক প্রয়োজনীয় ও প্রধান দেহ-সংস্কারকে কেন্দ্র করে কাহিনীর জাল বুনেছেন লেখক। কিশোরী সুনীলা যেদিন প্রথম নারীত্ব লাভ করল, সেইদিনটি থেকে যেদিন অবলুপ্তি ঘটল সেই নারীত্বের, সেদিন পর্যন্ত তার জীবনায়ন করেছেন লেখক। কত ঘাত-প্রতিঘাত কত ব্যথা-বেদনাকে অতিক্রম করে যখন জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছল সুনীলা, ঠিক তখনই সুধাপাত্র হস্তচ্যুত হল তার, কালের অমোঘ নিয়মে মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিতা হল সে। মনে হয় সুনীলার জীবনের অসম্পূর্ণ উপসংহারের মাধ্যমে লেখক এ যুগের খণ্ডিত ও অসমাপ্ত সত্তারই রূপায়ণ করতে চেয়েছেন। পরিপূর্ণ সার্থকতা বা শান্তি যে এ যুগের মানুষের কাছে আকাশ-কুসুমের মতই দুর্লভ বস্তু—এই মহা সত্যকেই যেন রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তিনি। লেখকের শৈলী সাবলীল ও বলিষ্ঠ। বইটির আঙ্গিক সম্বন্ধেও অনুযোগ করার কিছু নেই। লেখক—নারায়ণ দাসশর্মা। প্রকাশনায়—সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—পাঁচ টাকা।

আকাশ গঙ্গা (মডার্ণ পাবলিশিং)

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবাগতকে সচরাচর একটু ঔৎসুক্যের সঙ্গেই লক্ষ্য করা হয় এবং যতটা সম্ভব উৎসাহও তিনি পেয়ে থাকেন, কিন্তু হয়ত বা সে জন্যই অবাঞ্ছনীয় আগন্তুকের পদক্ষেপ ঘটার সম্ভাবনাও এখানে সমধিক। আলোচ্য উপন্যাসটি পাঠ করলে এ কথার যাথার্থ্য কোন দ্বিধারই অবকাশ থাকে না। অত্যন্ত ক্লান্তিকর একটি কাহিনীকে কাঁচা হাতে বয়ন করা হয়েছে, শুধু তাই নয় বিখ্যাত কোন সাহিত্যকারের সুপ্রসিদ্ধ একটি রচনার অক্ষম অনুকরণ করার প্রচেষ্টা, স্থানে স্থানে বেশ চক্ষুপীড়াদায়ক। লেখকের শৈলীতে যদি অপরের স্বাক্ষর এত বেশি মাত্রায় না পড়ত, তাহলে কালে অন্তত এ-সম্বন্ধে কিছুটা প্রত্যাশার ইঙ্গিত ছিল। লেখক ভবিষ্যতে আরও সাবধান হলে সুবিবেচনার কাজ করবেন। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—বিশ্বেশ্বর নন্দী প্রাপ্তিস্থান—দি মডার্ণ পাবলিশিং কোম্পানী, ৩০, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, দাম—পাঁচ টাকা।

মৌসুমী মন (সাহিত্য প্রকাশনী)

আলোচ্য ছোটগল্পের বইটি পড়ে আনন্দ পাওয়া গেল। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হলেও তাঁর মধ্যে কিছুটা প্রতিশ্রুতির ইসারা আছে। মোট এগারোটি গল্প আছে বইটিতে, বিশেষ কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়বস্তু অবলম্বন না করে, মানুষের মনের সহজ-সরল কয়েকটি বৃত্তিকে কেন্দ্র করেই লেখক বুনে গেছেন তাঁর গল্পের জাল। লেখকের কলম এখনও সম্যক পরিণতিলাভ করে নি বটে, কিন্তু ছোটগল্প লেখার মেজাজ যে তাঁর আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বইটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—মাখনলাল সরকার, প্রকাশঃ—সাহিত্য প্রকাশনী কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মনের মধ্যে কেন যে অতি ক্ষীণ হলেও অলীক যুক্তিহীন একটা আশা হয়েছিল তা বলতে পারি না।

ভাগ্য অমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেবরাজের সঙ্গ যখন পাইয়ে দিয়েছে তখন হারানো গল্পের খেইও সে-ই নিজে থেকে জুড়ে দেবে এমনি একটা বিশ্বাস অস্পষ্টভাবে মনের মধ্যে বোধ হয় কাজ করেছে।

সে আশা অবশ্য সফল হয় নি।

দেবরাজের নতুন অতিথি যে এসেছিল এক হিসেবে সে অবশ্য কৌতূহল জাগাবার মত বিশেষ একজন।

বছর ত্রিশ বয়সের একজন ইওরোপীয়। নামটা শুনে পোল বলে মনে হয় তবে জার্মানীতেই বাড়ি। দেবরাজের সঙ্গে সেখানেই আলাপ হয়েছিল পড়াশুনা করবার সময়। তারপর বহুদিন বাদে দেবরাজের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

দেবরাজের সঙ্গে তার চিঠিপত্র লেখা বরাবরই ছিল। থাকবার কারণ টেডের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভীর তীব্র আগ্রহ।

এ আগ্রহ তার ছাত্রাবস্থাতেই ছিল। দেবরাজকে ভারতীয় জেনে সে নিজে থেকে এসে তার সঙ্গে তখন আলাপ করেছে আর দেবরাজের কাছে পরে যা শুনেছি তাতে অসংখ্য ব্যাকুল প্রশ্নে বিব্রত করে তুলেছে।

আসল নাম তার অবশ্য বাংলায় প্রায় অনুচ্চারণীয় ট্যাডুসৃজ্‌ কারবোইয়াক গোছের কি! সুবিধার খাতিরে তাই টেড করে নেওয়া হয়েছে।

প্রথম যেদিন দেবরাজ বহুদূরের স্টেশন শহর থেকে টেডকে নিয়ে এল সেদিন তাকে দেখে একটু কৌতুক মেশানো তাচ্ছিল্যই অনুভব করেছিলাম।

এক ধরণের ভারত-প্রেমিকদের সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা কি কৌতূহল নেই। এদের আমি যেন চিনি।

গায়ের চামড়া শাদা হওয়ার দরুণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উৎসাহ দেখিয়ে এরা যেন আমাদের কৃতার্থ করতে চায়।

এই গদ গদ ভারত-ভক্তদের চেয়ে নাক সেঁটকানো দাম্ভিকরাও এক হিসেবে বোধ হয় ভালো। তারা অন্তত তাদের অবজ্ঞা ঘৃণায় ধারা আমাদের নিজেদের ত্রুটি গ্লানির দিকটা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। আর এরা আমাদের মিথ্যা অহমিকাকে দেয় স্তাবকতার সুড়সুড়ি।

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দুঃখ অনগ্রসরতা সব এদের কাছে আধ্যাত্মিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল। এরা আসে দীক্ষা নেবার যোগী সাধু সন্ন্যাসী খুঁজতে, মঠ মন্দির দেখে আত্মহারা হ'তে আর দেশে ফিরে গিয়ে ধোঁয়াটে আধ্যাত্মিকতার মোটামোটা বই লিখতে।

টেডকে আমি এই দলেই ফেলেছিলাম।

ফেলেছিলাম প্রথমেই তার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে বিরূপ হয়ে।

গেরুয়া পরে সে আসে নি। কিন্তু বেঢপ ঢোলা পাঞ্জাবী আর তার সঙ্গে কাবলী ধরণের পায়জামায় তাকে যেন অত্যন্ত বেমানান লেগেছে। ভারতীয় সাজার এই চেষ্টাই আমার কাছে আপত্তিকর।

স্টেশন-শহর প্রায় মাইল কুড়ি দূরে। এতখানি পথের অর্ধেকটা মাত্র সরকারী বাসে এসে বাকিটা একটা দেহাতী একা ভাড়া করেই তারা এসেছে।

দেবরাজ একা থেকে নেমেই টেডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। দূর থেকে তাদের একার শব্দ পেয়ে আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

ভাড়া নিয়ে একা চলে যাবার পর তিনজনে মিলে আমাদের কুটীরের দিকে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম।

টেড যেরকম মুগ্ধ চোখে চারিদিকে তাকাচ্ছিল তাতেই খানিকটা অকারণে তাকে আঘাত দেবার ঝোঁক হয়েছিল।

ওয়াটারপ্রুফ খাকি ক্যাম্বিসের একটিমাত্র বড় থলে টেড সঙ্গে এনেছে। সেটা পিঠে ঝুলিয়ে সে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলাম,—ও থলের মধ্যে ক্যামেরা-ট্যামেরা কিছু আছে নিশ্চয়। এ সব মনোরম দৃশ্য নইলে তুলে নিয়ে যাবেন কিসে?

আমার গলার স্বরে বিদ্রূপটা একটু বুঝি স্পষ্টই হয়ে উঠেছিল।

দেবরাজ সবিস্ময়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে।

কিন্তু টেড লক্ষ্যই করে নি মনে হয়। একটু সলজ্জভাবে হেসে

ধীরে ধীরে বলেছিল—না, ক্যামেরা আমার নেই। আমি ছবি-টবি তুলি না।

একটু উচ্চারণের জড়তা থাকলেও টেড ইংরাজি ভালোই বলে।

উত্তরে তাকে বলার আর কিছু না থাকলেও মনে মনে কেমন একটু ক্ষুব্ধ কেন যে বোধ করেছিলাম জানি না।

তার ভারত-ভক্তিতে খোঁচা দেবার জন্যে জিভটা অহেতুকভাবে উসখুস করছিল।

সুযোগ পেলাম খেতে বসবার সময়।

ইতিমধ্যে আমাদের ওপর ওপর পরিচয় ভালোভাবেই সারা হয়েছে। টেড যে দেবরাজের মতই বিজ্ঞানের ছাত্র, হামবুর্গের একটি শিক্ষায়তনে সে যে অধ্যাপক ও এখনো অকৃতদার, দীর্ঘ ছুটি নিয়ে সে যে এই প্রথম ভারতবর্ষে এসেছে এসব কথাই জেনেছিলাম।

টেবিলে টেডের জন্যে কাঁটা-চামচের ব্যবস্থা করা যায় নি। তার বদলে একটা চামচ আর ছুরির সাহায্যেই তাকে কাজ চালাতে হয়েছে। তাতে তার একটু অসুবিধেই হচ্ছিল।

সে যে আমাদের মত হাত দিয়ে খাবার চেষ্টা করে নি, তাতেও খুশি না হয়ে খোঁচা দেবার প্রবৃত্তিটা দমন করতে পারলাম না।

বললাম,—হাত দিয়ে খাবার চেষ্টা করলে পারতেন! অন্ন হচ্ছে প্রাণ। সেই প্রাণ শরীরে গ্রহণ করবার সময় বাইরের কোন কৃত্রিম বস্তুর সাহায্য নিলে অন্নকে অপবিত্র করা হয়।

টেড খাওয়া থামিয়ে সোজা হয়ে বসে কেমন একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসল। তারপর বললে,—আপনি পরিহাসই করছেন নিশ্চয়। কিন্তু এ ধরণের পরিহাসেও বিশ্বাস করবার লোকের ভারতবর্ষে অভাব নেই বলেই আমার সন্দেহ ক্রমশ বাড়ছে।

কথাগুলো মধুরভাবে বলা হলেও কোথায় যেন একটু চাবুক খেয়ে চুপ করলাম।

টেড সম্বন্ধে ধারণা তখন থেকেই পাল্টান উচিত ছিল। কিন্তু তা ঠিক পারি নি। মনের মধ্যে কোথায় একটা বিরূপতার জড় তখনও ছিল।

হয়ত মনে মনে অস্পষ্টভাবে যা আশা করেছিলাম তা ভঙ্গ হওয়াই এ বিরূপতার কারণ।

টেডের সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ হয়েছিল শিকারে বার হবার পর।

জলায় পাখি শিকারের লোভেই এ অঞ্চলে গোড়ায় এসেছিলাম। দেবরাজের দেখা পাবার পর সে ইচ্ছে ত্যাগ করলেও বন্দুকটা সঙ্গেই ছিল।

টেড আসবার দু'দিন বাদে একদিন সকালে উঠে সেটা পরিষ্কার করতে বসলাম।

দেবরাজের সেটা ডাকের জন্যে দূরের গ্রামের পোস্টাফিসে যাবার দিন। সকালে বেরিয়ে যাবার আগে আমার বন্দুক পরিষ্কার করা লক্ষ্য করলেও কোন মন্তব্য সে করল না। সাইকেলে চড়ে চলে যাবার সময় শুধু বলে গেল যে, তার এ বেলা ফেরা নাও হতে পারে সুতরাং আমি ও টেড যেন তার জন্যে অপেক্ষা না করে দুপুরের খাওয়া সেরে নিই।

দেবরাজ বন্দুক বার করতে দেখেও কোন মন্তব্য না করায় নিশ্চিন্ত হওয়ার বদলে একটু যেন হতাশই হয়েছিলাম।

মনে মনে একটা অস্পষ্ট বিক্ষোভই যেন ক'দিন ধরে জমা হচ্ছিল। নিজের অজান্তে একটা তর্কের ছুতোই বুঝি খুঁজছিলাম।

সত্যি সত্যি শিকারে যাবার কোন বাসনা আমার সেদিন ছিল না। কিন্তু দেবরাজ বন্দুক সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলে সেইরকম ইচ্ছার কথাই না জানিয়ে বোধ হয় পারতাম না। এ জঙ্গলে পাখি শিকারের বিরুদ্ধে কিছু বললে কি জবাব দেব, তাও বুঝি মনে মনে সাজিয়ে ফেলেছিলাম।

সে সব যুক্তিতর্ক মাঠে-মারা যাওয়াতেই একটা অবুঝ রোখ চেপে গিয়েছিল কি না কে জানে।

বন্দুকটা পরিষ্কার করে তুলে রাখতে গিয়ে আর রাখলাম না।

সেটা হাতে করে টেডের কুঁড়েতে গিয়েই হাজির হলাম।

টেড তখন একটা ঝাঁটা নিয়ে অনভ্যস্ত হাতে মেঝেটা ঝাঁট দেবার চেষ্টা করছে।

আমায় দেখে ঝাঁট থামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হেসে বললে,—এ দেশ আর আমাদের দেশের জীবন-দর্শনের তফাৎটার মূল কোথায় আমি বার করে ফেলেছি।

ঝাঁট দিতে গিয়ে পেলে নাকি!—ঠাট্টা করলাম।

সত্যিই তাই! বলে টেড হাসল,—ঝাঁট দিতে গিয়েই বুঝলাম এখানকার মানুষ তোমরা জীবনটাকে বসে বসে দেখ আর চালাতে চাও, আর আমরা দাঁড়িয়ে।

সেটা বাধ্য হয়ে। আপনাদের এই বরফের দেশের ঠাণ্ডা মেঝেতে বসার উপায় নেই তাই!

ঠিকই বলেছেন। আমিও তা অস্বীকার করছি না। টেড সরলভাবে হেসে বললে,—কিন্তু কারণ যাই হোক ওই বসা আর দাঁড়ানর মধ্যে অনেক কিছুর মানে লুকিয়ে আছে।

ভারত-দর্শনের চাবি কাঠি ত' তাহলে পেয়ে গেছেন। এবার একটা মোটা থিসিস্ লিখে ফেলুন।

আমার গলায় ঝাঁজ যেটুকু ছিল টেড তা লক্ষ্য করে নি বোধ হয়। কিংবা লক্ষ্য করেও গায়ে না মেখে সে হেসে উঠে বললে,—জার্মানদের যেখানে কড়া সেইখানেই কিন্তু মাড়িয়ে দিয়েছেন? এককালে ত' সারা ইউরোপে আমাদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতির সঙ্গে এই বদনামও ছিল যে, তিল পেলেই আমরা তাল করে ফেলি। খাঁটিদের কথা ছেড়ে দিন কিন্তু পণ্ডিতম্মন্যেরা কেতাব কত মোটা করে কত ফুটনোট দিতে পারে তারই নাকি পাল্লা দেয়।

হাসিমুখে কথা বলতে বলতে হঠাৎ টেড গম্ভীর হয়ে গেল। গম্ভীর হল আমার হাতের বন্দুকটার কথাই খেয়াল করে বোধ হয়।

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে,—বন্দুক আপনার? আপনি শিকার করেন?

শিকার ঠিক নয়। হত্যা বলাই উচিত। নিরীহ পাখিদের হত্যা করি। নিজেকে নিন্দা করার ছলেই গলাটা বেশ ঝাঁঝালো করে বললাম—আজ এখন বার হচ্ছি। আসবেন নাকি সঙ্গে?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে টেড বললে, চলুন।

শিকারে গিয়ে সেদিন কিন্তু কোন পাখি মারি নি। মারবার চেষ্টাও পর্যন্ত করি নি। বন্দুক তোলবার মত পাখি দু'চারটে দেখি নি এমন

য়। ভূধরাজ দেখেছিলাম দু'টো, হলদে ময়না জাতের পীলক-এর ছোট একটা ঝাঁক, একজোড়া ভিরদিও।

টেডকে সেগুলো দেখিয়ে সামান্য যা জানি পরিচয় দিয়েছিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ ঘোরার পর এক জায়গায় বিশ্রাম করবার জন্যে বসার পর টেড জিজ্ঞাসা করেছিল, কই বন্দুক ত' আপনি ছুড়লেন না?

কি করে আর ছুড়ব! এবার হেসে বলেছিলাম, গুলী আনতেই ভুলে গেছি।

শিকারীর এমন ভুল কি হয়?—টেড গম্ভীর হয়ে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল।

খানিক চুপ করে থেকে সত্য কথাটা স্বীকার করেছিলাম। বলেছিলাম,—আমি শিকার করব বলে সত্যি বেরোই নি! আপনি শিকারের কথায় কি বলেন শোনবার কৌতূহলে আপনাকে সঙ্গে আসতে ডেকেছিলাম।

কি ভেবেছিলেন? শিকারের কথায় আমি শিউরে উঠব।

তাই ভাবাই স্বাভাবিক নয় কি! আপনি অহিংসের ভারতবর্ষে দীক্ষা নিতে এসেছেন, সর্বজীবে যেখানে সমজ্ঞান সেই অহিংসার ভারতবর্ষ।

টেড উত্তর না দিয়ে এবার খানিক চুপ করেছিল, তারপর নিজেই প্রশ্ন করেছিল,—আপনার বন্ধু দেবরাজ কি শিকারের বিরুদ্ধে?

জানি না। আজ বন্দুকটা বার করে আমায় পরিষ্কার করতে দেখে গেছে। কিছুই তবু বলে নি।

বলবে আপনি আশা করেছিলেন? টেড বেশ একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

আমি উত্তর দেবার আগেই আবার নিজে থেকে বলেছিল,—আমাকে আপনি ভুল বুঝেছেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, আপনার বন্ধুকেও আপনি চেনেন না।

নিজেকে এবার কেমন একটু অপরাধী মনে হয়েছিল। আত্মস্থালনের চেষ্টায় বলেছিলাম, আপনার কথা হয়ত সত্য। তবে একটা ধারণার আপনার সংশোধন করছি। দেবরাজ ঠিক আমার বন্ধু নয়। ভিন্ন কলেজে পড়লেও আমরা একই বছরের ছাত্র ও পরীক্ষার্থী ছিলাম। তখন আলাপ ছিল না বললেই হয়। সত্যকথা বলতে গেলে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই ক'দিন হল মাত্র হয়েছে। আমার চেয়ে আপনি সে হিসেবে ওর অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। আমার চেয়ে নিশ্চয়ই ওকে বেশি চেনেন।

এত কথা বলার মধ্যে যত অস্ফুটই হোক কৈফিয়ৎ দেবার তাগিদ ছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায় একেবারে ছিল না এমন নয়।

যেদিক দিয়ে আশা করেছিলাম আলাপের মোড় কিন্তু ঠিক সেদিকে ফেরে নি।

টেড একটু যেন অন্যমনস্ক হয়েই বলেছিল—হ্যাঁ দেবরাজকে আমি অনেকদিন আগে থাকতেই চিনি। চিনি ভালোভাবেই। ঠিক শত্রুতা না হোক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভেতর দিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব সুরু। সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি নিয়ে তা বোধ হয় বুঝতেই পারছেন। আমাদের একটি সহপাঠিনীকে নিয়ে।

টেড চুপ করেছিল যেন স্মৃতির পাতাগুলো ভালো করে মেলে ধরতে।

আমি নীরবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলাম টেডের স্মৃতিমন্থনের মেজাজটা বজায় থাকার প্রার্থনা নিয়ে।

শীত শেষের দমকা হাওয়ায় জঙ্গলের মধ্যে তখন থেকে থেকে মর্মর উঠছে। একটা কাঠঠোকরা আমাদের কাছের একটি গাছের গায়ে বসে ক'বার ঠোকর দিয়ে বোধ হয় কিছু না পেয়ে আমাদেরই যেন ভৎর্সনা করে উড়ে গেছল।

আশ্চর্যের কথা তার মুখটা পর্যন্ত এখন ভালো করে মনে করতে পারি না।—টেড আবার বলতে সুরু করেছিল। আমেরিকার মত না হোক আমাদের মধ্যেও তখন ডেটিং ছিল। আমি তাকে ডাকতাম নাচের আসরে, থিয়েটারে গান-বাজনার কনসার্টে। কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় উৎসাহ ভরে রাজী হলেও ক্রমশ সে কেমন যেন আমার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে উঠছিল। নানা ছুতো-নাতায় আমার নিমন্ত্রণ সে তখন প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছে। সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম। ভালোবাসায় সন্দেহের জ্বালা অসহ্য। গোপনে একদিন তাকে অনুসরণ করে দেখলাম আমারই এক সহপাঠীর সঙ্গে একটি রাস্তার মোড়ে সে দেখা করলে। সে সহপাঠী ভারতীয়. দু'জনে তারপর গিয়ে বসল দূরের একটি নির্জন পার্কের একটি বেঞ্চে। দূর থেকে তীব্রদৃষ্টিতে তাদের লক্ষ্য করলাম। চোখে পড়বার মত এমন কিছু ঘনিষ্ঠতা তাদের না দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে সন্দেহ আরো বাড়ল। প্রেমিকের মত ঘেঁসাঘেঁসি করে তারা বসে নি। বেঞ্চের প্রায় দু'ধারেই দু'জনে বসেছে। পরস্পরের হাত ধরবার কোন চেষ্টা পর্যন্ত তাদের নেই। শুধু মুখের আলাপই তাদের সঙ্গে চলে মনে হ'ল। সে আলাপের কি এমন আকর্ষণ যাতে নাচের আসরের উত্তেজনা সঙ্গীতের মাদকতা পর্যন্ত ভুলিয়ে দিতে পারে। বিদেশী বলেই দেবরাজের উপর বিদ্বেষটা সেদিন থেকে আরো তীব্র হয়ে উঠল। তখন আমাদের দেশকে ধ্বংস করে নাৎসীবাদ নিজের জ্বালানো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দু'একটা আগুনের টুকরো তবু এখানে-ওখানে ছাই চাপা হয়ে নেই এমন নয়। জাতের বড়াই রোগের বীজের মত সহজে মরে না, রক্তে চাপা থাকে। দেবরাজকে ত' দেখছই। ঠিক বর্ণবিদ্বেষ ওর বিরুদ্ধে তেমন সহজে জাগবার নয়। তখন ঠাণ্ডায় দেশের জলহাওয়ায় ওর রং আরো অনেক উজ্জ্বল। জার্মান না হোক স্প্যানিশ পোর্টুগীজ বলে সকলেরই ভুল হতে পারে। ওর বিরুদ্ধে এসিয়াটিক হিসেবে সহপাঠীদের মধ্যে বিদ্বেষ জাগাবার চেষ্টা করলাম। সফলও একেবারে হলাম না তা নয়। সেই মেয়েটিকেই একদিন ক্লাসের ছুটির পর অনেকের মাঝখানে ব্যঙ্গ করলাম,—তুমি নাকি বোরখা পরে পর্দানাসীন হতে যাচ্ছ? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান তখনও নিতান্ত ঝাপসা। মেয়েদের এদেশে স্বাধীনতা নেই, তারা ক্রীতদাসীর সামিল এইসব উড়ো খবরের সঙ্গে তারা সবাই বোরখা পরে এইরকম ধারণাই মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে।

মেয়েটির মুখ রাঙা হয়ে উঠল, তবু জ্বলে উঠে এ আঘাতের পাল্টা জবাব সে দিলে না। যেন সহজ রসিকতাই হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে এইভাবে হেসে কৌতুকের স্বরে বললে—বোরখা পরার সখ সত্যিই এক এক সময় হয়। মানুষের চোখের বিষে তাহলে নজর লাগে না।

আরো একটা কড়া আঘাতের কথা ভাবছি এমন সময় সে নিজে থেকেই হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে,—আজ সন্ধ্যেতে কি করছ?

তাতে তোমার কিছু দরকার আছে!

অনেকের সামনে বলে ঠাট্টার সুরটা দেবার চেষ্টা করলেও গলার তিক্ততাটা চাপা পড়ে নি।

মেয়েটি হেসে বললে,—দরকার না থাকলে জিজ্ঞাসা করছি! তেমন কিছু না থাকে আজ আমার নিমন্ত্রণ নাও না?

কিসের নিমন্ত্রণ!—আমার স্বরে সন্দেহ ও বিস্ময় মেশানো।

নিমন্ত্রণ নিতে হ'লে কি আগে থাকতে মেনু কার্ড জানতে হয়! বলে মেয়েটি হাসল তারপর আবার বললে, আজ সন্ধ্যায় কলেজের গেটেই আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো।

তাই করেছিলাম, মনের মধ্যে সন্দেহ আক্রোশ কৌতূহল সব কিছুই মেশানো আলোড়ন নিয়ে।

মেয়েটি যথা সময়েই এসে আমায় একটি রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেছল।

সেখানে গিয়ে দেবরাজ আগে থাকতেই বসে আছে দেখেছিলাম।

টেড কয়েক মুহূর্তের জন্যে একটু থামতেই তার কাহিনীতে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এ মেয়েটির মুখ ত' প্রায় ভুলে গেছেন বলেছেন। নামটা আশা করি ভোলেন নি। কি ছিল নাম?

নাম!—টেড একটু হেসেছিল।

আমি তখন উদ্‌গ্রীব উৎকর্ণ হয়ে আছি।

কিন্তু এবারও আমার নিরাশ হবার পালা।

নাম অবশ্য এ গল্পে অবান্তর।—টেড বলেছিল,—তবে নামটা খুব সাধারণ নয় বলেই ভুলি নি। নাম ছিল ব্রিট।

[ক্রমশ।

দৈনিক বসুমতীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে

মাসিক বসুমতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রগতির এই দুর্বার অগ্রগতির দিনে জাতীয়জীবনে সংবাদপত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রভাব সম্বন্ধে আজকের দিনে নতুন করে বলার কিছুই নেই। বিপুলা এই ধরিত্রীর উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে, নগরে, জনপদে, গ্রামে, অরণ্যে, সাগরে, উন্মুক্ত ক্ষেত্রে সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে যে অসংখ্য ঘটনার স্রোত নিত্য বয়ে চলেছে—পৃথিবীর নর-নারী তাদের ছায়া দেখতে পায় সংবাদপত্রের দর্পণে। তাই সংবাদপত্র ছাড়া আজকের দুনিয়ায় আমাদের জীবনযাত্রা অচল। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব তাই অনতিক্রম্য।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাঙলা দেশের সুনাম ও প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত। সাংবাদিকতার জগতে বাঙলা দেশের বিরাট ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে কেউই অনবহিত নন। এই অপ্রতিহত জয়যাত্রার সূচনা আজ থেকে প্রায় দেড় শ' বছর আগে—কিন্তু আজও তা দুর্দমনীয়।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অসংখ্য বাণী ও উক্তির মধ্যে একটি বিশেষ উক্তি—'উপেন ছাপাখানার কাজ করবে।' গৃহীশিষ্য বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথের চোখের সামনে মুহূর্তের মধ্যে খুলে গেল জীবনপ্রকাশের পথ। রামকৃষ্ণ-চরণে আত্মসমর্পিত উপেন্দ্রনাথ মাথায় তুলে নিলেন গুরুর আশীষবাণী। প্রতিষ্ঠা করলেন বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের। উত্তরকালে ঠাকুরের ও স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদে উপেন্দ্রনাথের, তাঁর একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্রের এবং আরও অনেকের সাধনায় রূপ পায় এক বিরাট-বিশাল সাহিত্য-সংবাদশালা। বাঙলা দেশের সাংবাদিকতার গর্ব ও গৌরববর্ধনের মূলে যাঁদের অবদান অতুলনীয়—বসুমতীর নাম সেই তালিকায় শ্রদ্ধার সঙ্গেই আজ উল্লিখিত।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেশ ও জাতির সেবায় বসুমতী নানাভাবে অংশ নিয়েছে। গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ইংরাজী পত্রিকাগুলির দ্বারা সে যে পরিমাণে জনগণের সেবা করে এসেছে বা আসছে, তার মূল্য নিরূপণের সময় আজ এসেছে।

বাঙলা সাহিত্যের প্রচারের ও প্রসারের ইতিহাসে বসুমতীর দান বিশেষভাবে স্মর্তব্য। সুলভে স্বল্পমূল্যে বাঙলার গ্রামে-গ্রামে বসুমতীর গ্রন্থাবলীগুলি পৌঁছে যাওয়ার ফলে জনসাধারণ্যে সাহিত্য সম্বন্ধে যে ব্যাপক সচেতনতা দেখা গেল তাও বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। এ দিক দিয়ে বসুমতীর এই ভূমিকা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার্য। এ কথা কাল্পনিক নয় যে, দূর শহরে ও গ্রামে দৈনন্দিন কর্মক্লান্ত জীবনের অবসানে অবকাশঘন মুহূর্তে বিত্তহীন দরিদ্র ব্যক্তিও সক্ষম হয়েছে বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থগুলির রসাস্বাদনে। এই দুষ্প্রাপ্যতার দিনেও চতুর্দিকে প্রতিটি জিনিস যখন দুর্মূল্য বসুমতী তার আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ তাকে—'নমো নারায়ণায়' মন্ত্রে করেছিলেন দীক্ষিত, তাই জননারায়ণের সেবায় বসুমতী কখনও কোনদিন কোন ছলনা, কপটতা বা কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয় নি।

দৈনিক বসুমতীর জনপ্রিয়তা যে কতখানি সে সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। সারা বাঙলার ঘরে ঘরে তার সমাদর ও সম্মান নিঃসন্দেহে ঈর্ষাযোগ্য। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে তার সমান আদর। সব কিছুর ঊর্ধ্বে সে স্থান দিয়েছে জনস্বার্থ, মানুষের কল্যাণের চেয়ে তার কাছে বড় আর কিছুই নেই। জনস্বার্থ-বিরোধী কোথাও কিছু ঘটলেই তার বলিষ্ঠ কণ্ঠ থেকে তৎক্ষণাৎ ধ্বনিত হয়েছে বজ্রকঠোর প্রতিবাদ। জন্মলগ্ন থেকেই সে যেমনই নির্ভীক, তেমনই সত্যাশ্রয়ী। তার বলিষ্ঠ বক্তব্যকে প্রতিহত করতে পারেন নি সরকারপক্ষ। রাজরোষে পতিত হয়েছে দৈনিক বসুমতী, লাভ করেছে দুর্ভোগ, তথাপি রাজানুশাসন সে মেনে নেয় নি। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় রচনা তাই লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করতে সমর্থ হয়।

সাপ্তাহিক বসুমতী এবং গ্রন্থাবলীগুলির মাধ্যমে উপেন্দ্রনাথ যখন সাফল্যের সপ্তস্বর্গে সেই সময়ে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে দৈনিক

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বসুমতীর শুভ প্রতিষ্ঠা। তারপর এই পঞ্চাশ বছর তার কাটল অবিরাম সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। এই সংগ্রাম অন্যায়ের সঙ্গে, দুর্নীতির সঙ্গে, বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে। তবু, ঠাকুরের অসীম কৃপায় শক্তি তার এখনও অফুরন্ত, সাহস তার এখনও সীমাহীন, উদ্যম তার অভঙ্গুর। গতানুগতিকতার সঙ্গে তার চিরবিরোধ। জনকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অভিনবত্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে সে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। সংবাদ সংগ্রহ, প্রকাশভঙ্গী, সংবাদবিন্যাস, পরিচর্যা, সংস্থাপন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তার কৃতিত্ব তুলনাহীন। শুধু দেশের নয়, বিদেশেরও বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনীর সঙ্গে দেশবাসীকে পরিচিত করে তোলার ক্ষেত্রে বসুমতীর কৃতিত্বের অন্ত মেলে না।

বসুমতীর জন্মলগ্ন থেকে একাধিক দিকপাল সাংবাদিক তাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন তাঁদের অসামান্য প্রতিভায়। দৈনিক বসুমতীর বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার নিয়মিত বিভাগগুলির অবদানও কম নয়। শিশুদের জন্য ছোটদের পাতা, পেশাদারী মঞ্চ ও চিত্রজগৎ সম্বন্ধীয় নাট্যলোক ও চিত্রকথা, মহিলাদের জন্য বৌঠাকুরাণীর হাট, অপেশাদারী নাট্যসম্প্রদায়গুলির জন্যে রূপরশ্মি, আন্তর্জাতিক জগৎ, অর্থনৈতিক দুনিয়া, খেলাধূলা প্রভৃতি তার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করেছে। সর্বশ্রী বিশু মুখোপাধ্যায়, রমেন চৌধুরী, পারুল সেনগুপ্ত কৃষ্ণ কুণ্ডু, জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামেন্দু মুৎসুদ্দি, ধীরেন ভৌমিক, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিভাগগুলির যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত। এ ছাড়া দৈনিক বসুমতীর আর একটি প্রধান আকর্ষণ রবিবাসরীয় সাহিত্যসভা। এই বিভাগটিতে মূল্যবান তথ্যবহুল সচিত্র প্রবন্ধ, সুপাঠ্য মনোরম ছোট গল্প, শক্তিমান শিল্পীদের অঙ্কিত রেখাচিত্র, জ্যোতিষ ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় অসংখ্য প্রশ্নোত্তর, বাঙলা গ্রন্থাদির
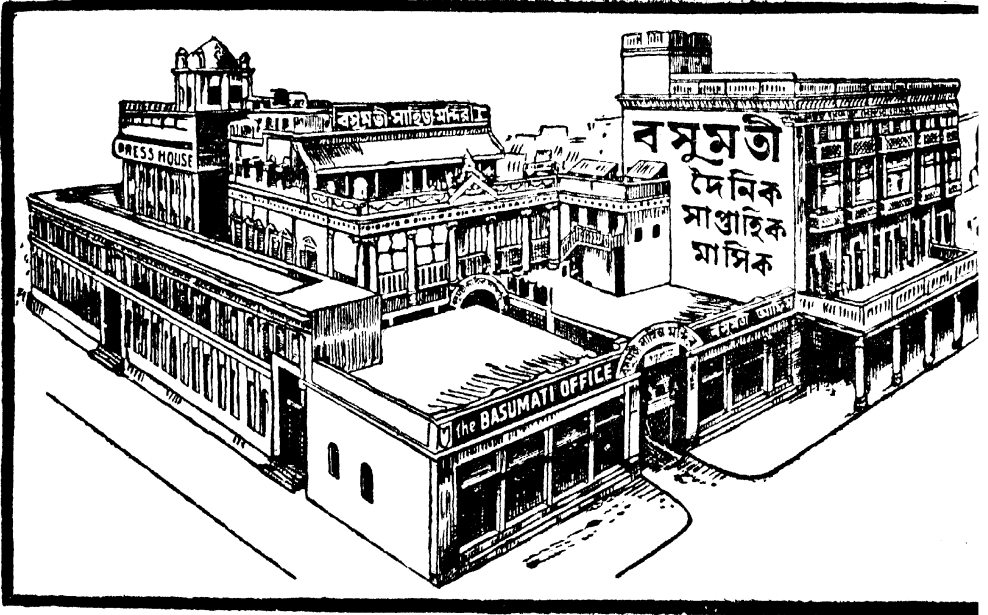
বসুমতী ভবন

ইতিহাসে যে সব অবিস্মরণীয় নামগুলি জড়িয়ে আছে, সেগুলির গুরুত্বও অসাধারণ। স্বর্গত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ মুস্তফী, জলধর সেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, দীনেন্দ্রকুমার রায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি দেশবরেণ্য সন্তানরা যেভাবে বসুমতীর সমৃদ্ধি ও বিকাশের পথ প্রশস্ত করে গেছেন তা বিরল দৃষ্টান্ত বললেই চলে। এই যুগন্ধর সাংবাদিকদের অপূর্ব এবং অভাবনীয় সমন্বয় ঘটার ফলে বসুমতীর ইতিহাস এত উজ্জ্বল, এত বর্ণাঢ্য।

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক সুকবি শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় দৈনিক বসুমতীর বর্তমান সম্পাদক। এই পত্রিকার সমালোচনা এবং সমকালীন ঘটনাদিকে কেন্দ্র করে হাস্যরসপূর্ণ চুটকি মন্তব্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে অগণিত পাঠক-পাঠিকার দরবারে বিতরণ করে চলেছে বর্ণনাতীত আনন্দ। এই বিভাগটির সম্পাদনার গৌরব লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী এবং বিদগ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটকের। কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকরূপে বিভাগটির সঙ্গে জড়িত। দক্ষ সাংবাদিকদ্বয় বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী আজ দৈনিক বসুমতীর যথাক্রমে বার্তা সম্পাদক ও প্রধান সংবাদদাতা। সর্বশ্রী সুনীল ঘোষ, মণি বসু, শেলী দত্ত,

ঘোষ, সুশীল মৌলিক, অনিল দেব, সত্যানন্দ ভট্টাচার্য

দৈনিক বসুমতীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে মাসিক বসুমতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুধাংশু দে, ধীরেন দত্ত, নীলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপ্রসন্ন চক্রবর্তী, অধীর বসু, ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সাংবাদিকগণ বসুমতীর বার্তা বিভাগের সঙ্গে এবং দিগীন সেন, অসিত গঙ্গোপাধ্যায়, কুমুদ দাশগুপ্ত, বঙ্কি রায়, অনন্ত জানা, সুনীল দাস শ্যাম মল্লিক প্রভৃতি সংবাদদাতারূপে দৈনিক বসুমতীর সঙ্গে জড়িত। দৈনিক বসুমতীর সহকারী সম্পাদকরূপে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁদের নাম গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কুর মুখোপাধ্যায়, জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দু মুৎসুদ্দি। মুদ্রণ সংশোধন-বিভাগে নিযুক্ত আছেন হৃষীকেশ হালদার, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, বসন্তকুমার রায়, দুর্গাপদ ভারতী, হিমেন্দু গুপ্ত, সুকুমার ভট্টাচার্য, মধুসূদন চক্রবর্তী, কমল দাশগুপ্ত, সিদ্ধেশ্বর রায়, মণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র সরকার।

পাঠক-পাঠিকাদের আজ আমরা সানন্দে ঘোষণা করছি যে বর্তমানে দৈনিক বসুমতীর গৌরবময় জীবনের অর্ধশতাব্দী পূর্ণ হল। এ উপলক্ষে একটি সুন্দর স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। স্মারক-গ্রন্থটিতে দৈনিক বসুমতীর বিস্তারিত ইতিহাস, অবিস্মরণীয় ঘটনাসমূহ, অসংখ্য আলোকচিত্রাদি এবং বসুমতীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধীয় অনেকগুলি সুলিখিত এবং সারগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়ে গ্রন্থটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা, মুদ্রণ পারিপাট্য এবং রচনাসম্ভার বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এ ছাড়াও ঐ গ্রন্থে দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক বসুমতীর এবং বসুমতী প্রকাশনবিভাগের প্রত্যেকটি কর্মীর এবং বিভাগীয় কর্মকর্তাদের আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে প্রকাশিত দৈনিক বসুমতী সংক্রান্ত রচনাগুলির মধ্যে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতা, কালিদাস রায়ের কবিতা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—বসুমতীর ইতিহাস, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির—বসুমতীর প্রবর্তক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিধুভূষণ সেনগুপ্তের—ভারতে সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, দিলীপ সেনগুপ্তের—Seven gates of wisdom, শঙ্করীপ্রসাদ বসুর—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ও বসুমতীর উপেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের—সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে, প্রাণতোষ ঘটকের—জয়তু দৈনিক বসুমতী, দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর—সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা, সনৎকুমার গুপ্তের—বসুমতীর প্রাক্তন সম্পাদকদের জীবনী, বিশু মুখোপাধ্যায়ের—সুলভ সাহিত্য প্রচারে বসুমতীর বিস্ময়কর অবদান, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের—বসুমতী ভবনের ইতিবৃত্ত, মহীতোষ রায়চৌধুরীর—অভিনন্দন, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের—বসুমতী সংবাদ ও সাহিত্য সংস্থা, যতীন চক্রবর্তীর মেহনতী মানুষের বন্ধু বসুমতী, বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের—বসুমতীতে সাতাশ বছর, রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামীর—বসুমতীকে যেমন দেখেছি, সুনীল ঘোষের—গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ও বসুমতী, মণি বসুর—নব ভারতে সংবাদপত্রের ভূমিকা, শক্তিপদ সিংহরায়ের—ঐতিহাসিক তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ও বসুমতীর নাম উল্লেখযোগ্য। সাপ্তাহিক বসুমতী সম্বন্ধে জয়ন্তী সেনের তথ্যবহুল রচনাটিও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

দৈনিক বসুমতীর জীবনের এই শুভমুহূর্তে তার উদ্দেশে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনবাণী প্রেরণ করেছেন দেশের বহু বরেণ্য এবং বিশিষ্ট সন্তান। এই তালিকায়—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ, ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ, উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেন, অর্থমন্ত্রী শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারী, খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সি, সুব্রহ্মণ্যম, আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন, তৈলমন্ত্রী ডঃ হুমায়ুন কবির, রেলমন্ত্রী শ্রী এস, কে, পাতিল, শ্রমমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীবায়া, শ্রীঅতুল্য ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবলবন্তরায় মেটা, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার, প্রবাসী সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, জনসেবক সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার শ্রীনৃপেন ঘোষ, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুধীরঞ্জন দাস, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিহর শেঠ, কলিকাতার মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, সাহিত্যিক বনফুল, শ্রীমনোজ বসু, ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, লেডী প্রতিমা মিত্র, শ্রীসত্যজিৎ রায়, মুর্শিদাবাদের নবাব-বাহাদুর ওয়ারিস আলী মীর্জা, বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার উদয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর, মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, চাইবাসার রুঙ্গল জেনারেল শ্রীফণীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এল সালভেদোরের কন্সাল শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডোমিনিকান গণতন্ত্রের কন্সাল শ্রীরমেন্দ্রনাথ রায় এবং অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নাম বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

দৈনিক বসুমতীর এই আনন্দোজ্জ্বল সুবর্ণ জয়ন্তী মুহূর্তে মাসিক বসুমতী তার উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীণ শুভেচ্ছা জানাচ্ছে এবং তার উত্তরোত্তর দীর্ঘজীবন এবং অপ্রতিহত জয়যাত্রা কামনা করছে। এই উপলক্ষে যাঁদের অক্লান্ত সহযোগিতা ও আন্তরিকতা বিশেষ স্বীকৃতির অধিকারী—তন্মধ্যে সর্বশ্রী সুনীল কুণ্ডু সুকুমার গুহমজুমদার, পঙ্কজ চোদ্দার, অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনমালী ভট্টাচার্য শম্ভু মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায়, করুণেন্দু ভট্টাচার্য সুধীর বেরা, জ্যোতির্ময় দে, সুধাংশু রায় নলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্ত জানা, ভোলা রায়চৌধুরী, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, অশোক রায়চৌধুরী, বিভূতিচরণ ঘোষ, সুধাংশু ভট্টাচার্য, অসিত মিত্র, মণীন্দ্র দত্ত, শ্রীমতী দেবী রুদ্র এবং দৈনিক বসুমতীর রিপোর্টারগণের নাম উল্লেখনীয়। এই রচনায় দৈনিক বসুমতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি কর্মীভাইদের নাম উল্লেখ করলে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দ পেতাম কিন্তু স্থানাভাববশত সে সঙ্কল্প আমাদের পরিত্যাগ করতে হল—এ জন্য আমরা বেদনাবোধ করছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি দৈনিক বসুমতীর সহোদরা মাসিক বসুমতীর সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তির দিন বেশি দূরে নয়। বর্তমানে মাসিক বসুমতীর বয়স বিয়াল্লিশ। আর আট বছর অতিক্রান্ত হলেই মাসিক বসুমতী তার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপনের আশা পোষণ করে।

—সাংবাদিক

নীলকণ্ঠ

কাশীতে একটি অপরূপ সূর্যাস্ত হয়ে গেলো নীরবে ক'দিন আগে. এ জগতে ক'জন তার খবর পেল জানি না। প্রায় আড়াই-তিনশো বছরের এই মরদেহ নন্দনের সৌরভ এনেছিল বহন করে। দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে নিজেকে দহন করে করে নিঃশেষ হলো একটি জীবন্ত ধূপ। নিভে গেলো একটি দীপের কাঠি। তার আলো কোনও কোনও ভাগ্যবানের অন্ধকার করে গেল দূর। কোনও উৎসবযাত্রা হলো না শবকে ঘিরে। খবরকাগজে ছাপা হলো না ছবি। শোকপক্ষ হলো না পালন করা। ছাই নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করার সুযোগ গেলো না পাওয়া। বক্তৃতা দেওয়া সম্পাদকীয় লেখা কিংবা ছুটি ঘোষণা কোনটাই দরকার পড়লো না। কারণ মরদেহে অমরাবতী রচনা করেছিলেন যিনি বহু শতাব্দী ধরে তিনি কোনও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। রাজনৈতিক নেতাদের বাণীই হচ্ছে জীবন। এখানে যাঁর কথা বলা হচ্ছে তাঁর জীবনই ছিলো তাঁর বাণী। সন্ন্যাস-নাম তাঁর—বীতরাগানন্দ। কাশীর অসংখ্য সাধারণ নর-নারীর কাছে তিনি ছিলেন কুত্তাবাবা। বহু প্রভুভক্ত জীবের মধ্যে জগতের যিনি প্রভু তাঁর এক ভক্ত জীবনের শেষ অংশের ক'টা বছর কাটিয়ে গেলেন কাশীর বানপুরিয়ায়। কেউ কেউ জায়গাটার সঠিক উচ্চারণ করেন,—বনপুরাওয়া বলে। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে কিছুদূর এই অঞ্চল,—ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড। নিরুপম নিস্তব্ধতায় মহাসন পাতা। সমস্ত শব্দর উৎস যেখানে, সেখানেও বুঝি এমনই পরমাশ্চর্য নিঃশব্দতা; নিস্তব্ধতা।

জয়পুরে ১৮৬৭তে বীতরাগানন্দের জন্ম। এ কথা বীতরাগানন্দের মুখেই শুনে একজন লিখেছেন, কথাটা তবুও ঠিক নয়। তাঁর বয়স এর চেয়ে অনেক বেশি। বীতরাগানন্দ এ কথাও বলেছেন আত্মপ্রশংসা এবং বয়স গোপন করায় কোনও অন্যায় হয় না। তা ছাড়াও মহৎ মানুষের চেয়ে যাঁরা কিছু অতিরিক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে কালের বিচার হাস্যকর। তৈলংগ স্বামী একালের আর শংকরাচার্য সেকালের,—এ যারা বলে তারা জানেই না যে ওঁরা সবাই সেই একই উৎস থেকে উৎসারিত, সেখান থেকে উৎসারিত, যেখান থেকে অনাদিকাল ধরে—

'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।'

আমরা জানিই না যে যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, চার্বাক, শুকদেব, ব্যাস, এঁরা আজও মানবদেহ পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে আসেন 'সম্ভবামি যুগে যুগে' বিচ্ছেদহীন সূত্রে। তাঁদের তৃতীয় দৃষ্টিতে দেখে চিনতে ভুল হয় না। নরেনকে দেখে ঠাকুর বিস্মৃত হয় নি বলতে: এত দেরি করতে হয়? আমি যে তোরই জন্যে বসে আছি।

বীতরাগানন্দ তো তাঁরই দূত, কিংবা স্বয়ং তিনি, দুঃখে যিনি নিরুদ্বিগ্ন, সুখে যিনি বিগতস্পৃহ, বীতরাগভয়ক্রোধ। না হলে কেন কাশীতে গেলেই যাঁর কাছে যাই, তিনি বলবেন, যাও বানপুরাওয়ায় যাও, দেখে এসো, বীতরাগবাবাকে। ঈশ্বরের সবচেয়ে প্রিয় সতীর্থ মানুষের চেয়ে মহত্তর তীর্থ নেই। তাই কাশী মানেই কেবল দশাশ্বমেধ-মণিকর্ণিকা-হরিশ্চন্দ্রর ঘাট নয়, বিশ্বনাথের গলি কিংবা গংগাস্নান নয়, নয় শুধু তিলভাণ্ডেশ্বর কিংবা সংকটমোচন দর্শন। কাশীর পরিচয় কাশীতে বসে আছেন যাঁরা তাঁদের কালাতীত অবস্থান দিয়ে বলবার জন্যে যে,—

'ওরে ভীরু তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার,
হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।'

বিশুদ্ধানন্দ, ভাস্বরানন্দ, বীতরাগানন্দ এঁরা সবাই সেই এক 'আনন্দ'। একজনের নাম করলেই প্রণাম করা হয়ে যায় আরেকজনকে। গতকালকার, আজকের, আগামীকালের সূর্য বলবার, সূর্যকে 'সান' কিংবা Soleil কথাটি বলবার মানে হয় অথবা হয় না কারণ একই সূর্যস্নাত আমরা সবাই। সাধকের ক্ষেত্রেও এই এক সত্য। সব সাধকের সব সাধনার ধারা, শবসাধনার অশ্রুধারাও, যেখানে যাঁর মিলিত হয়েছে তিনি এবং আর সব এক ও অভিন্ন। কারণ এক ও অভিন্নর সাধনাই এঁদের সকলের সাধনা। এঁদের আর কোনও সাধ নাই।

কেবল কাশীতে আছেন এঁরা? না। কোথায় নেই? কলকাতাতে এমন লোক আছেন, এমন 'আলোক' যুগান্তের অন্ধকারে যাঁরা জ্বালিয়ে রেখেছেন বিশ্বাসের আলোকবর্তিকা। এঁরা নীরবে নিভৃতে, 'মানুষের ভালো হোক,' এই মন্ত্র অবিরত উচ্চারণে নিরত। বহু শতাব্দীর ওপর প্রাচীন এঁদের দেহ। লোকালয়ের মধ্যে দিয়েও যান। লোকে এঁদের জানে না কারণ এঁরা ভারতরত্ন। তবু এঁরাই ভারতের সেই রত্ন যা হাতে পেলে বিদ্যা-বুদ্ধি-অর্থ অর্থহীন মনে হয়।

যে বিখ্যাত আইনজ্ঞ ব্যক্তির কথা এর আগে বলেছি, তিনি আমাকে তাঁর অভিজ্ঞতার অনিঃশেষ ঝাঁপি উন্মুক্ত করবার কালে শান্তিনিকেতনের অদূরে ছিন্নকন্থায় শায়িত এক রমণীর মুখে এমন কথা
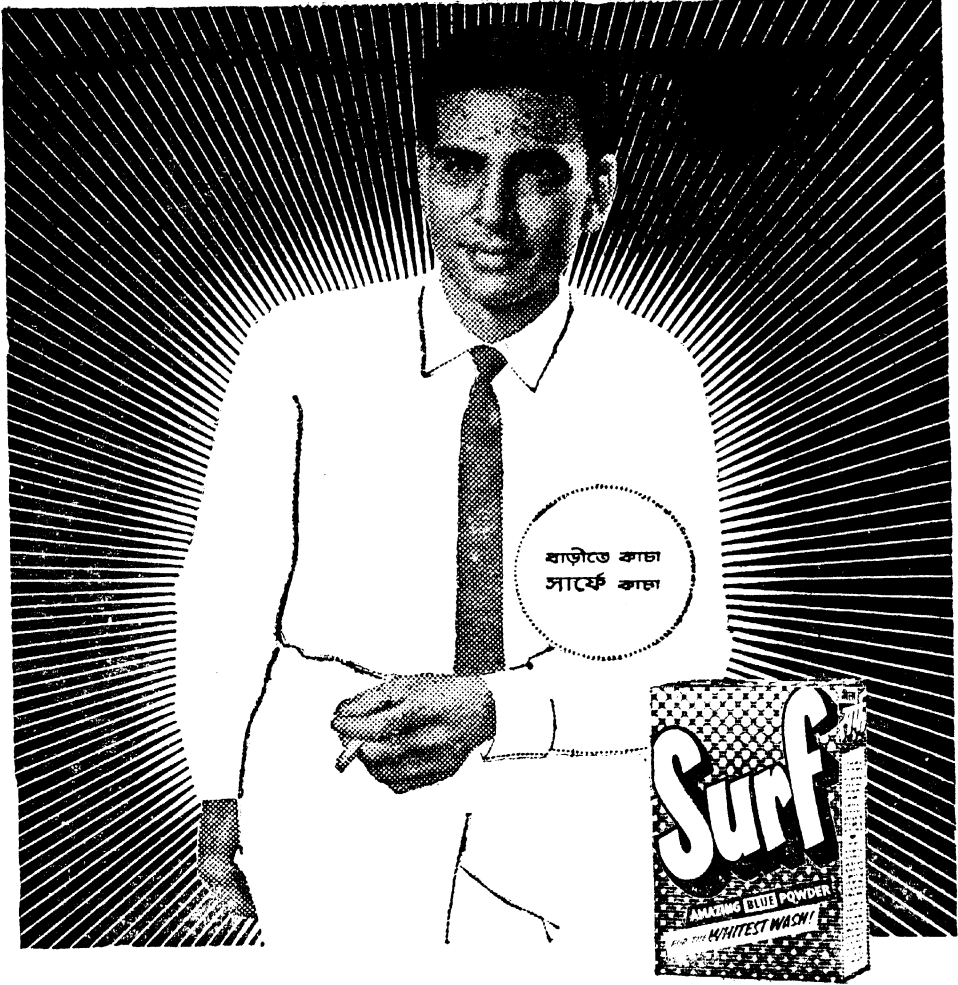
বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE WHITEST WASH!

শুনেছেন যা আজকের জগৎ-অশান্তিনিকেতনকে মুহূর্তে পুণ্য করে, পূর্ণ করে, পবিত্র করে যথার্থ 'শান্তি'-নিকেতন করে চোখের পলক পড়বার মুহূর্তে পরিণত পরিপূর্ণ করে সে; সম্পূর্ণ করে। মাটির সংগে মিশে যাওয়া সেই একফালি শরীর সাধিকার। আইনজ্ঞ বিনয় করে নয়, সত্য করেই বলেছেন যে, তাঁর মতো সামান্য মানুষকে সেই অসামান্য সাধিকা যেন কিছু উপদেশ দেন দয়া করে। দপ করে জ্বলে উঠেছে দু'টো চোখ অন্ধকার কোটরে। সাধিকা, আইনজ্ঞের পকেটের দিকে অংগুলি সংকেতে জিজ্ঞেস করেছেন: ওটা কি? দেশলাই?

ভয় পেয়েছেন আইনজ্ঞ ব্যক্তি। এই বুঝি ধূমপানের কুফল সম্পর্কে আরম্ভ হয় অনর্গল বক্তৃতা। না। চিনতে পারেন নি তখন মাটির সংগে মিশে-যাওয়া শরীর সেই 'মা'-টিকে।

সাধিকা বলেছেন সংগে সংগে: ওই বস্তুটি কি যে জানে না সে ওকে বলবে সামান্য। যে জানে সে বলবে একটু অসতর্ক হলে আমার এই কুঁড়ে থেকে সুরু করে এই অঞ্চল, এমন কি বহুদূর পর্যন্ত ভস্মীভূত করবার অদ্ভুত শক্তি ওই সামান্য দেশলায়ের আছে।

কে বলবে, কে সামান্য আর কে অসামান্য। সাধিকা তারপর আবৃত্তি করতে থাকেন মাণ্ডুক্যোপনিষদ থেকে। মাটির বুক বিদীর্ণ করে 'মা'টির মুখে উচ্ছ্বসিত হয় করুণার ধারা।

আইনজ্ঞ ব্যক্তির শুধু মনে হয় অনাদিকালের এই ভারতবর্ষ যেন তাঁর কণ্ঠে কথা বলছে সেই মুহূর্তে। অথচ কে খবর রাখে, খবরকাগজে নাম না-ছাপা এই সাধিকার। শান্তিনিকেতনে আসে না এমন বিশ্বনাগরিক আজ কে আছে! তবু তারা কে জানে শান্তিনিকেতনের অদূরে আছে এক এমন বিস্ময় নাগরিক!

কলকাতায় এখনও লোকহিতে নিরত এক ফকিরের কথা আমি শুনেছি অসম্ভবকে সম্ভব করা, সম্ভবকে অসম্ভব করার খেলায় যিনি শিশুর মতো আনন্দ পান কখনও কখনও। পংগুকে দিয়ে গিরিলংঘন করানো, বাচালকে মূক করা—এ দুয়েতেই তাঁর ইচ্ছা সমান কার্যকরী। এঁর একজন অনুগত এক সময়ে ফকিরিকে ফিকিরি মনে করতেন। ফকির একে দিয়েই এর একজন লোকের দুরারোগ্য যন্ত্রণার উপশম করান। কাতর ব্যক্তির বাড়ির লোক ছুটে আসে অবিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে, বলে, বাবাকে আপনি একবার ছুঁয়ে দিলেই তিনি ভালো হয়ে যাবেন। এ অনুনয় প্রথমে উপেক্ষা করলেও শেষ পর্যন্ত যেতে হয় একদা অবিশ্বাসীকে। অঘটন ঘটবার পর তিনি বোঝেন সবাই ফিকিরি করে না; কেউ কেউ ফকিরিই করে। বিশ্বের সকল আবরণের অধীশ্বর যেমন স্বেচ্ছায় দিগম্বর, তেমনই সকল রত্নের মালিক নিজের খেয়ালেই যে ফকির,—এ খেয়াল ততদিনে একদা অবিশ্বাসী ব্যক্তির আয়ত্ত হয়েছে।

সাধু এবং ফকিরের বেলায় হিন্দু না মুসলমান,—এ প্রশ্ন নিরর্থক। বয়সের বেলাতেও যেমন, জন্মের ক্ষেত্রেও তেমনই। যতক্ষণ জন্ম-মৃত্যুর অতীত অজানা ততক্ষণই নিজেকে হিন্দু বা মুসলমান বলে জানা কিংবা জানানো। সেই সাধনার আনন্দময়ীকে জানা সেই ভুল ভাঙা। আমরা সবাই সেই এক-এরই যে অনন্ত চেহারা মনে পড়া সেই। মান আর হুঁস, মানুষের ধর্ম হচ্ছে এই, কারণ মান আর হুঁস,—এই দুইকে দিয়ে ধারণ করেই মানুষ,—মানুষ। কিন্তু মান আর হুঁসের চেয়েও মানুষ বড়। কোনও কোন মানুষ। তাঁরা কাউকে ধারণ করেন না, ধর্ম স্বয়ং তাঁদের ধরে আছেন। দেশ-কাল-ধর্মের চেয়েও তাঁরা বড় এবং পরমাশ্চর্য খেলা সেই একমাত্র 'খেলোয়াড়'-এর হচ্ছে এই যে এই সব মহাত্মাদেরও পতন হয়।

পতন-অভ্যুদয়ে তাই বন্ধুর বড় পথ, যে পথে দুঃখের বরষায় চক্ষের জল নামলে বক্ষের দরজায় এসে দাঁড়ায় 'বন্ধু'র রথ।

তবু এখনও গেল না আঁধার। এখনও রহিল বাধা। এখনও সংশয়। এখনও সন্দেহ। এখনও জিজ্ঞাসা। একবার মনে হয় আছে, আরেকবার মনে হয় নেই। একবার মনে হয়, মৃত্যুতে সব শেষ। আরেকবার মনে হয় জীবন অশেষ। একবার মনে হয় ভস্মীভূত দেহ যে আর 'পুনরাগমন' করে না, একথা নিঃসন্দেহ। আরেকবার মনে হয় বর্ষশেষ মানে নববর্ষারম্ভ; মৃত্যু মানে নবজন্মের সূচনা। একবার চার্বাককে মানি, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। আরেকবার মনে পড়ে চির-বাক: দুঃখেষু নিরুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু চ বিগতস্পৃহ, বীতরাগভয়ক্রোধ।

অবিশ্বাসী দেওয়ালে লেখে: God is nowhere! বিশ্বাসী বালক পড়ে সেই একই লেখা আরেক চোখে: God is now here!

সন্দেহ থেকে নিঃসন্দেহে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে পৌঁছনই ভারতবর্ষের স্বপ্ন, সাধনা ও সংগ্রাম। জন্ম থেকে জন্মান্তরে, মৃত্যু রাখাল আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নব নব সৃষ্টির প্রাংগণে। বলছে, চরৈবেতি, চরৈবেতি! চলো, চলো, বলছে না শুধু; বলছে, জ্বলো, জ্বলো। সেই পুণ্যপাবক স্পর্শ করুক যার ছোঁয়ায় আঁধারের গায়ে ফুটে ওঠে নব নব তারা। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে জানা ফুরোচ্ছে না ততক্ষণ মুক্তি নেই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে। কর্মচক্রান্তে এ চক্র আমাদেরই তৈরি। এর থেকে মুকতি সেও আমাদেরই অনায়াস।

ধ্রুবকে নিয়ে শ্রীহরি বেরিয়েছেন জলবিহারে। পাহাড়ের গায়ে এসে ঠেকেছে নৌকো। ওটা কি পাহাড়? প্রশ্ন করেছে শ্রীহরিপ্রাণ বালক। ধ্রুবভক্ত শ্রীহরি বলেছেন: পাহাড় নয়, ও তোমারই অসংখ্য বিগতজন্মের দেহের হাড়। জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় সামান্য একটু বাকি ছিলো অংক মিলতে, হরির সংগে তাঁর অংকে মিলতে, সেটুকুর জন্যেই এবার আসা। তাই ধ্রুব শেষ জন্ম, জন্মেই নাম করে শ্রীহরির, প্রণাম করে শ্রীহরিকে। লোকে

অবাক হয়। ধন্য ধন্য করে ভক্ত ধ্রুবকে। সে জানে না তাই এমন করে। ধ্রুব যে শ্রীহরির নাম নেয় জন্মেই, সে নাম না নিয়ে পারে না বলেই নেয়। যেমন পারে না প্রজাপতি পাখা না সঞ্চালন করে। সংখ্যাতীত জন্ম যাকে খুঁজে পায় নি ধ্রুব, শেষ জন্মে সেই নিখোঁজ নিজে এসে দেখা দিয়েছে ভক্তকে।

এবং আমরা সবাই, তুমি-আমি যে যেখানে আছি সে সেখানে থাকব না, সবাই পৌঁছব তাঁর পায়। কারণ আমরা না পৌঁছন পর্যন্ত, কেবল ভক্ত নয়, স্বয়ং ভগবানও নিরুপায়। এই কথাই ঠাকুরের মুখেও শুনি, ঈশ্বরের দূত দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের মুখেও শুনি, যখন তিনি বলেন : সবাই খেতে পাবে, কেউ সকাল-সকাল কেউ বেলায়।

বিশ্বনাথের বিশ্বে সবাই খেতে পাবে, বিশ্বের যত অনাথ। সকলের অন্ন না জোটা পর্যন্ত অন্নপূর্ণা নাম সম্পূর্ণ হবে কেমন করে? সকলের বস্ত্র অংগে না ওঠা পর্যন্ত তিনি দিগম্বর হন কি করে? মৃত্যুঞ্জয় না হওয়া পর্যন্ত ভক্ত, শ্মশানে শবের ওপর দিগম্বরীর নিত্য কালের উৎসবলোকে বিশ্বের দীপালিকায় আমি মাটির প্রদীপ তাহলে কি করে বলি, 'জ্বালাও আমার শিখা?'

এই আমি কে?—মাটি। ওই আমি কে—মা-টি! এই মাটি আর ওই 'মা'-টি এক না হওয়া পর্যন্ত, একাকার না হলে এ মাটির মুক্তি নেই; ও 'মা'-টিরও বন্ধন অব্যাহত।

এই কেবল ধ্রুব সত্য। আর সবই অধ্রুব। হয় অলৌকিক, নয় অলীক।

তবে? যদি সবই শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকে, শেষ পর্যন্ত উৎসব হব আমরা যারা আজ শব আছি সবাই হব উৎসব-এর আলো তবে কেন সাধনা করা, তবে কেন পাপ-পুণ্য ভেদাভেদ। তবে কেন বলা : এই কর, ওই কর। আর কিছুরই জন্যে নয়, কিছুক্ষণের খেলা জমাবার জন্যে শুধু। নিজেরই সংগে নিজের খেলা। খেলা করবার জন্যেই, ইচ্ছে করেই ভোলা যে আমিই জগৎস্বামী; আমিই স্বয়ং ভোলানাথ। খেলতে নেমে ভোলা না গেলে যে আমিই রাজা। তাহলে ভিক্ষে-ভিক্ষে খেলা জমে কি করে। ভুলতে ভুলতে কর্মকে কুড়িয়ে পাওয়া পথে, তারপর জড়াতে জড়াতে, খুলতে খুলতে কর্মচক্রে ভিখিরির আবার রাজা হওয়া। রাজার ভিখিরি তখন আবার ভিখিরির রাজা।

[আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে]

হাসিকান্নার হীরা পান্না আমারই চেতনার রং। এখন অচেতন হয়ে আছি, না চিনবার খুশিটুকু পাব বলে। আবার খুশি হলেই চিনব, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, তমো-রজো-সত্ত্ব, এ সবই 'আমি'।

তবু বিশ্বাস হয় না কারণ এখন আমার চেতনার চেহারা অবিশ্বাস। এখন সেই আমি ধরায় এসেই বলছি, শ্রাদ্ধ করার কোনও অর্থ হয় না, কারণ মৃত্যুর সংগে সংগেই যে দেহ ভস্মীভূত তাকে জল দেবার অর্থ হয় না। যুক্তি দিচ্ছি, বেঁচে থাকতে তাহলে একতলার ঘরে খেতে দিলে তিনতলায় বসে কেউ স্বচ্ছন্দে তা খেতে পারত, যদি মর্ত্যলোকে খেতে দিলে অমর্ত্যলোকে তা কেউ গ্রহণ করতে পারে।

তখন আমার যুক্তি খণ্ডন করাবার জন্যে আমিই অঘটন ঘটাই। যেমন ঘটিয়েছি অসংখ্যবার। এই সেদিনও তো কোলকাতা থেকে কয়েক মাইলের মধ্যেই সেই অঘটন ঘটালাম আবার। [ক্রমশ।

যাহাদের সংস্পর্শে এসেছি

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ। বাংলার পুনরুত্থান যুগের ইতিহাস বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইতিহাসের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৬০ পর্যন্ত একশো বৎসরের মধ্যে সাহিত্যে রাজনীতিতে, শিক্ষায়, ধর্মে সমাজ-সংস্কারে সর্ববিষয়ে এত মনীষীর আবির্ভাব দেখা যায় না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বিগত ৬০ বৎসরে আমি যে সকল মনীষিগণের সংস্পর্শে আসিয়াছি তাঁহাদের কথা এখনও মনে ভাসিতেছে। হয়ত সে সব কথা বিস্মৃতির অতল জলে ভাসিয়া যাইবে। সেই সব বিচিত্র ঘটনা, তথ্য দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে না পারিলে আমার অপরাধ হইবে।

বাল্য অবস্থায় রাজনৈতিক চেতনা আমার কোমল মনে অঙ্কুরিত হয় রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁয়ের সংস্পর্শে আসিয়া। রাজা নরেন্দ্রলাল, এক বীর আদিবাসী ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদ ছিল মেদিনীপুরের নিকটে নাড়াজোল পল্লীর সুরক্ষিত গড়ের মধ্যে। তাঁহার শিক্ষা-সংস্কৃতি অতি উচ্চ আদর্শমণ্ডিত এবং উদারভাবাপন্ন ছিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় মেদিনীপুর ঐতিহ্যপূর্ণ এবং সদা-উৎসবময়। মেদিনীপুরের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দেউল, রথযাত্রা উৎসব, জন্মেজয় মল্লিক বংশের রাস ও দোল-উৎসব, গঙ্গানারায়ণ দত্তের দুর্গোৎসব, হিন্দু-মুসলমানের মহরমের বীর-উৎসব ও তাজিয়া ভাসান জাঁকজমক মেদিনীপুর শহরকে বারমাস মুখরিত করিয়া রাখিত।

সে সময় রাজা নরেন্দ্রলালের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা মেদিনীপুর-বাসীর উপর সম্যক-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ও নেতৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। দুর্গাপূজার সময় অষ্টমী-অন্তে নবমীর প্রারম্ভের সন্ধিক্ষণ দশভুজার বলিক্ষণ নির্ধারিত হইত নাড়াজোলের গড় হইতে কামানের ধ্বনি করিয়া। মনে পড়ে, এক শারদনিশির স্বচ্ছ নীলাকাশের অগণ্য তারা জ্বলিতেছে—যুক্তকরে সকলে জগন্মাতার স্মরণে নিমগ্ন হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া নাড়াজোলের গড় হইতে কামান গর্জিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র কণ্ঠে 'মা মা, মা!' রব আকাশ-বাতাসকে আকুলিত করিল।

জগন্নাথের রথের প্রথম টান ভীমকায় সৌম্যসুন্দর রাজা নরেন্দ্রলাল টানিতেন। মুসলমান ও ঘোসেরিয়াদের আগুন লইয়া খেলিতে খেলিতে অগ্রসর হইবার ও বিবাদ ও মারামারির মধ্যে রাজা নরেন্দ্রলালের ইঙ্গিতে সুপরিচালিত হইত।

রাজা নরেন্দ্রলাল দক্ষ অশ্বারোহী, ওয়েলার অশ্ব (Australian breed) চালক, হস্তী আরূঢ় রাজা নরেন্দ্রলালকে দেখিলে পুরাকালের কুরুরাজার বীরত্ব স্মরণ করাইয়া দিত। মেদিনীপুর—মহাভারতে লিখিত বিরাট রাজার গোপগৃহের অধিকারী ছিল।

আমার পিতা স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কসাই নদীর Annicut বা Dam-এর রক্ষণাবেক্ষণের এঞ্জিনীয়ার এবং মেদিনীপুর ক্যানাল বিভাগের কারখানার কর্তা ছিলেন। এই কারখানা হইতে ড্যামের মুখ পর্যন্ত নদীর তীর প্রস্তরে বাঁধান ছিল এবং এই বাঁধের উপর দিয়া ভ্রমণ করিবার সুন্দর Promenade ছিল। রাজা নরেন্দ্রলাল প্রায়ই শ্বেত-অশ্বের জুড়িগাড়ি হাঁকাইয়া এখানে পদচারণা করিতে আসিতেন এবং আমার পিতার সহিত সদালাপ করিতেন। ক্রমে রাজার সহিত এই পূর্তবীদের গাঢ় সৌহার্দ্য জন্মায়। আমিও রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। আমার বয়স তখন নয়-দশ বৎসর মাত্র, কিন্তু রাজার দেশপ্রীতি স্বাধীনাকাঙ্ক্ষা, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার উগ্র ছবি আমার কিশোর মনের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, ৭১ বৎসর বয়সেও মনে-প্রাণে জাগরিত হইয়া আছে। নরেন্দ্রলালের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব ও স্বাধীনতালাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র ছিল, তাহার দু'-একটি উদাহরণ এখনো মনে আছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় যখন বুয়র যুদ্ধ চলিতেছিল লর্ড কিচেনার প্রভৃতি বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষদের অপদস্থতা ও হারের কথা এবং বীর জেনারেল জুবেয়াট প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষদের সফলতা দিনের পর দিন ঘোষিত হইত, তখন রাজা নরেন্দ্রলালের কি আনন্দ। হাঁড়ি হাঁড়ি পান্তুয়া বিতরণের ধুম। আমাকে লইয়া লোফালুফির পালা চলিত। স্বাধীনতার রস আস্বাদ করিবার মত জ্ঞান ও বুদ্ধি ছিল না, তবে ইংরাজ-বিরোধিতার মর্ম প্রাণে জাগিয়াছিল।

রাজা নরেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতি পরে ইংরাজ রাজপুরুষদের রোষের কারণ হইয়া ওঠে। তিনি টেররিস্ট মুভমেণ্টের পিছনে উৎসাহ এবং অর্থ জোগাইতেন। ইহার জন্য তাঁহাকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হইতেও হইয়াছিল। তবে ইহাও সত্য, তাঁহারই প্রেরণায় ও উৎসাহে মেদিনীপুরবাসীরা প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সরকারকে অগ্রাহ্য করিতে শিখিয়াছিল এবং স্বরাষ্ট্র গঠন করিতে পারিয়াছিল।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল। আলোকচিত্রটি শ্রীসৌম্যেন গুপ্ত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

কবিয়াল লম্বোদর চক্রবর্তী ও কবিগান

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়

বাংলা দেশে অধুনাতন শিক্ষিত সমাজে প্রায় অবলুপ্ত লোক-সংগীত পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে একটি বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়েছে। সক্রিয় মন নিয়ে আজ তারা লোক-সংগীতের বিচার-বিশ্লেষণ করে। অভিজাত-সম্প্রদায়ের বহুধা-বৈচিত্র্যের মধ্যে লোক-সংগীত একটি উপধারা হয়ে মিশেছে। তাই আজ প্রাচীন উৎসব ছাড়াও শহরের বা নগরের কোন সামাজিক বা ধর্মীয় বারোয়ারী অনুষ্ঠানে যে অনুষ্ঠানসূচী থাকে—তার মাঝে কখনও কখনও কবিগান, বাউল ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও নাগরিক জীবনের আভিজাত্যের সাথে এই জাতীয়-সংগীতানুষ্ঠানের কতখানি অন্তরের যোগ আছে বা আদৌ কোন যোগ ঘটছে কি না, তা' বিচারসাপেক্ষ। তবুও অনুষ্ঠান-সূচীতে এদের প্রবেশ আনন্দের লক্ষণ—এতে সন্দেহ নেই।

বাংলা দেশের বিভিন্ন উৎসবের অঙ্গ হিসেবে কবিগানের প্রথা আজও প্রচলিত। শ্রোতাদের পক্ষ হতে যে কয়েকজন কবিয়ালের ডাক আসে তাদের মধ্যে কবিয়াল লম্বোদর চক্রবর্তী ও শেখ গোমানী দেওয়ান অন্যতম।

সাহেবগঞ্জ লুপ রেল লাইনে তারাপীঠ রেল স্টেশন থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে লম্বোদর চক্রবর্তীর বাস। গ্রামের নাম খরুণ। কথায় বলে—

'খরুণ নরুণ চাকপাড়া
মধ্যেখানে মা তারা।

বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বাড়ির বৈঠকখানায় দেওয়ালে দেওয়ালে একজন দক্ষশিল্পীর হাতের ছাপ। পরে জেনেছি লম্বোদরবাবু শুধু কবিয়াল নন—চিত্রশিল্পীও। গৃহকোণে পুঁথি, পুরাণ আর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের স্তূপ। তাঁর পুরুষোচিত চেহারা, চোখ বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। গোঁফ, চুল এমন কি চোখের ভুরু পর্যন্ত পেকে সাদা হয়ে গেছে। গলার স্বরে বার্ধক্যের আর গাম্ভীর্যের রেশ। প্রতিপক্ষ গোমানী বলেন—

'লম্বা উদর যার
লম্বোদর নাম তার।'

কথাটি ব্যঙ্গোক্তি হলেও মিথ্যে নয়।

বীরভূমের গোয়ালা গ্রামে মাতামহ শ্রীলালমোহন চক্রবর্তীর কাছে তাঁর শৈশবজীবনের সুরু। মাতামহ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। কবিগানের আসরে যাওয়া তাই নিষিদ্ধ ছিল। তবু মাতামহের অজ্ঞাতে চুপিসারে কবিগান শুনতে যেতেন শৈশবকালেই। চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। আঠারো বছরে তিনি পাঠশালার পণ্ডিতমশায়। গ্রামের জগন্নাথ মণ্ডল, সুরেন্দ্র ডোম ইত্যাদি কবিয়ালগণ চার-পাঁচটি কবিদলের সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকলকেই কবিগান লিখে দেন। এইভাবেই তাঁর কবিয়াল-জীবনের সুরু।

সম্বন্ধী শ্রীসত্যকিঙ্কর চক্রবর্তীর কবিগান গাওয়ার সখ হয়েছে। পিতা ৺উপেন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে গান শিখে নেন। সম্বন্ধীর সাথে লম্বোদর চক্রবর্তীও গান শুনতে যান। কিন্তু শুধু নির্বাক শ্রোতা হয়ে তিনি সেদিন বসে থাকতে পারেন নি। মাঝে মাঝে পরামর্শ দিয়ে ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। তখন বয়স একুশ বৎসর। তারপর কবিদলের সংস্পর্শে এলেন প্রত্যক্ষভাবে। সম্বন্ধী গান করেন—তিনি পালার বিষয়বস্তু কথায় ব্যাখ্যা করে দেন। শ্রোতাদের দাবী—গান শুনবো না—কথাই শুনবো। সম্বন্ধী তখন কিছু কিছু করে প্রণামী দান সুরু করলেন। আর্থিক অসংগতির জন্য মাতামহের নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল।

জীবনের গতিপথ পরিবর্তিত হল। বন্ধু গোবর্ধন কুলিগিরি করে পাকুড় রেল স্টেশনে। সেখানেই কান্ধি সাহেবের কাছে চাকরী নিলেন চক্রবর্তীমশায়। বাংলা আর ইংরাজী নানা হরফে লিখতে পারতেন—সেই সুবাদেই চাকরী। কিন্তু এখানেও বেশিদিন স্থিতি হল না। কারণ মাতামহ আর মাতামহী মারা গেলেন। যাজক ব্রাহ্মণের পরিবার। তাই যজমানদের জন্য ফিরে আসতে হল গ্রামে।

সম্বন্ধী বললেন: গান করো—আমি দোহারী থাকব। তাই সুরু করলেন। উপার্জন আধা-আধি ভাগ হত।

কিন্তু মামা সংসারজ্ঞানী। তিনি বললেন—একা দলের সৃষ্টি করো।

ফলে সম্বন্ধীর দল ভেঙ্গে গেল। সম্বন্ধী হলেন ভগ্নীপতির দলের পালা দোহারী। স্বতন্ত্রসত্তা আর ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রথম কবিগান গাইলেন। দ্রৌপদী ও সুভদ্রা। গোপালচন্দ্র সেট নিলেন সুভদ্রা আর চক্রবর্তী মশায় নিলেন দ্রৌপদীর ভূমিকা। কবিগান হল গোয়ালাতেই।

তারপর ভূদেব মজুমদার 'রাম' ও তিনি 'তারা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। এইভাবেই সুরু হল কবিগানকে অশ্লীলতাবর্জিত করে সমাজস্থ করার চেষ্টা। ভদ্র ও শিক্ষিত পরিবেশে রুচিসম্মত

গান। এই চেষ্টায় যোগ দিলেন নবীন মণ্ডল, জানকী ভাট, পুলিন চক্রবর্তী।

আবার জীবনের পথ বাঁক নেয়। কবিয়াল চক্রবর্তীমশায় হন চালের আড়ৎদার। কিন্তু ধানচালের আড়তেই প্রতিভা চাপা থাকে না। ডাক এল বীরভূমগৌরব জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 'রতনে রতন চেনে'। রামপুরহাটে প্রদর্শনী মেলা। কবিগান হল—তপশীলের ভূমিকা নিলেন তিনি। গোমানী হলেন 'বর্ণহিন্দু।' পালাগানের উদ্দেশ্য অস্পৃশ্যতা বর্জন। রঙ্গরসের মাঝে স্বাদেশিকতার প্রসার সুরু হয়ে গেল। জিতেনবাবুর নির্দেশ এবং প্রেরণায় চক্রবর্তী মশায় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন। সুযোগ ঘটে গেল মুকুন্দরামবাবুর স্বদেশীযাত্রা শোনার। আরও প্রেরণা পেলেন তিনি। যাত্রাদল খুললেন তিনি গ্রামাঞ্চলে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে—গ্রামবাসীদের স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। কবিগান আর যাত্রাগানের মাধ্যমে জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হল। মোহান্ত ভগবানদাস চক্রবর্তীমশায়কে স্তব্ধ করার জন্য মাঝখণ্ডের মাহালের কিছু জমি দান করলেন। অভাবে তিনি দমিত হলেও দেশ দমিত হল না।

এরপর দেশে এল দুর্ভিক্ষ। কবিগান বন্ধ। মানুষ দু'মুঠো খেতে পায় না—উৎসবের দ্বার তাই বন্ধ। দারিদ্র্য অঙ্গভূষণ হয় তাঁর। তখন গোমানীর খুব চাহিদা। গোমানী সাহেবের সাথেই চুক্তি হল। মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে গোমানীর সাথে গান করতে করতে উনি পেশাদার হয়ে গেলেন। তারপর বাংলা দেশের বহু সুধী-সম্মেলন, উৎসব হতে তাঁর ডাক এসেছে—আজও আসছে। পরিচিত হয়েছেন তারাশঙ্কর, গোপাল হালদার, প্রভাবতী দেবী প্রমুখ সাহিত্যিকদের সাথে।

যৌবনের সুরু হতে তাঁকে বিদ্ধ করেছে তিনটি যন্ত্রণা—এক, মানুষের প্রতি অবজ্ঞা; দুই, জমিদারের অন্যায় জুলুম; তিন, ব্যক্তির অহমিকাবোধ। শ্রেষ্ঠকবি হতে নিম্নস্তর পর্যন্ত প্রতিবাদের যে ঐকতান—তিনি তাঁর সামান্য এক বাঁশি। কারণ তাঁর বাণী অশিক্ষিত সমাজেই মুখ্যত প্রচারিত হয়েছে।

কবিগানের ঐতিহাসিক উৎস অনেকের মতে রাজপুতানার চারণকবি। কিন্তু চক্রবর্তীমশায়ের মত—চারণকবি একদেশদর্শী—আর কবিয়াল উভদেশদর্শী। তাঁর মতে তর্ক ক'রে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করা বাঙালী জীবনের আদিম প্রবৃত্তি। পরস্পর পরস্পরকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে—প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে বিকৃতরসের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই মানুষের শুভবুদ্ধি আর সুরুচি হতে কবিগানের জন্ম হয় নি। সমাজের পঙ্কিলগর্ভে এর জন্ম। বিকৃতমনের খোরাক জোগাতে গিয়ে তাই আদিরসের প্রাদুর্ভাব। কবিগানের প্রচলন হল—পরের কুৎসা শোনার আগ্রহ হতে। পালা গৌণ—বিধেয় অংশ নিয়ে একপক্ষ অপরপক্ষকে অশ্লীল আক্রমণ করে। শ্রোতার সুপ্ত আদিম প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়।

সিদ্ধার্থের জন্মের হাজার বছর আগে ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের মানতে চাইতো না। বিশ্বামিত্র, জনক ইত্যাদি ক্ষত্রিয়গণ যাগযজ্ঞ করে জ্ঞানমার্গের চর্চা করতেন। তারপর বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আরও হেয় প্রতিপন্ন হল। চারুবাব নিজে ঈশ্বরবাদী হতে চার্বাকদর্শনে নিরীশ্বরবাদের প্রচার করলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মণরা বিতাড়িত হলেন। যাঁরা থাকলেন—তাঁরা বৌদ্ধভিক্ষুদের আনুগত্য স্বীকার করলেন, সৃষ্টি হল সমাজপতির। সুরু হল গ্রাম্য আলোচনা আর মতদ্বৈধতার; মনে হয়—তখন হতেই কবিদলের সৃষ্টি। রাজা শশাঙ্কের কালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার প্রতিষ্ঠা পেল—সুরু হল বৌদ্ধ বিতাড়ন। দেশে ধর্মীয় যুদ্ধবিগ্রহে প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়ল সমাজে। তারপর ইসলাম ধর্মের প্রভাবে আবার হিন্দুধর্মের প্রভাব হল ক্ষুণ্ণ। রামায়ণ-মহাভারত মূলকাব্যের সঙ্গে যোগাযোগবিহীন হয়ে বিকৃতরসে পুষ্ট হয়ে উঠলো। সমাজের প্রতিটি স্তরের মত কবিগানও তখন এর প্রভাবমুক্ত হতে পারে নি।

বর্তমানে কবিগানের পালার বিষয়বস্তু প্রধানত—ধর্ম ও অধর্ম (সামাজিক), অদৃষ্ট ও পুরুষকার (ঐশ্বরিক), শিক্ষিত ও কৃষক (অর্থনৈতিক), শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্যোধন, রাম ও রাবণ (ঐতিহাসিক), কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট (রাজনৈতিক)।

সরকার পক্ষের নিকট তাঁর আবেদন—সরকারের সমাজ সংগঠনের নতুন ভূমিকায় লোকসংগীত একটি অন্যতম মাধ্যম হোক। দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে দেশের মানুষের মনকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিক লোকসঙ্গ।

কবিয়ালের কথা দিয়েই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাক। আমার মতে দেশের শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্য হতে যতদিন কবিয়ালের জন্ম না হয় ততদিন কবিগানের উন্নতি অসম্ভব। শিক্ষিত ও দরদী যুবক এলেই সঠিক তত্ত্ব আর তথ্য প্রচার হবে—লোকধর্মের প্রসার হবে।

তরুণ সঙ্গীত-সম্মেলনের সঙ্গীতানুষ্ঠান

দক্ষিণ কলকাতার সঙ্গীত-জগতে আজ 'তরুণ সঙ্গীত-সম্মেলন' একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বৈজয়ন্তীমালা ও লতা মুঙ্গেশকর সহ বম্বের প্রায় প্রত্যেকটি কণ্ঠশিল্পীর সমাবেশে সর্বভারতীয় মিশ্র আধুনিক ও মার্গ-সঙ্গীতের একটি সফল সম্মেলন পরিচালনার পর এই সম্প্রদায় আগামী ৯ই থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর সিংহীপার্কে কেবলমাত্র আধুনিক সঙ্গীত ও নৃত্যের একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ আশা ভোঁসলে ও হেলেন। এঁরা মঞ্চে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন। এঁদের সঙ্গে এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করছেন মুকেশ, হেমন্তকুমার, মহেন্দ্র কাপুর, গীতা দত্ত, সুবীর সেন, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, উৎপলা, সতীনাথ, মানবেন্দ্র, নির্মলেন্দু, ইলা, নির্মলা, সনৎ, আরতী, দ্রোণী, ঝরণা, চন্দ্রা এবং উষা খান্না (প্রথম মহিলা সঙ্গীত-পরিচালক)। নৃত্যে অংশগ্রহণ করছেন গোপীকৃষ্ণ, পদ্মা, সঙ্গীতা, বন্দনা, মালঞ্চ, বুলবুল ও মীনা। হাস্যকৌতুক পরিবেশন করবেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়। গীটার বাজাবেন কাজী অনিরুদ্ধ ও মুকুল দাস। সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ নেবেন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। পরিচালনা করবেন শ্রীগোপাল রায়। আমরা আশা করি এই সম্মেলনের সম্পাদকসহ প্রতিটি সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতা নিয়ে প্রধান প্রচারসচিব শ্রীসনাতন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমীরেন অধিকারী এই প্রচেষ্টাকে সফল করে

আমার কথা (১১৩)

হীরালাল সারখেল

সাধনায় আন্তরিকতা থাকলে পারিপার্শ্বিক সহস্র প্রতিবন্ধকতা ও চলার পথের শতেক বাধাবিপত্তি জীবনের সফলতার পথরোধ করতে পারে না—তরুণ ও শক্তিমান সঙ্গীতশিল্পী শ্রীহীরালাল সারখেলের জীবনালেখ্য সেই শাশ্বত সত্যেরই জয়গান গাইছে।

আজকের দিনের রসিকসমাজে হীরালাল সারখেল নামটি অপরিচিত নয় বরং শ্রোতৃমহলে গুণী শিল্পীর জন্য ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ আসন সমাদরের সঙ্গে নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাঁর গান সাধারণ্যে পরিবেশন করেছে যথেষ্ট পরিতৃপ্তি, তাঁকে ক্রমশই উপনীত করছে জনপ্রিয়তার স্বর্ণরাজ্যে। কিন্তু এই তরুণ-শিল্পীর জীবনের পথ প্রথম থেকেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কণ্টকাকীর্ণ। অনেক প্রতিবন্ধকতার কাঁটা পেরিয়ে তবে সাফল্যের গোলাপের সুঘ্রাণে ভরপুর হতে পেরেছেন তিনি।

১৯৩৪ সালে হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালী গ্রামে তাঁর জন্ম। স্বর্গত কিশোরীলাল সারখেলের সাত পুত্রের মধ্যে তিনি পঞ্চম।

সঙ্গীতের প্রতি বাল্যকাল থেকে তাঁর আসক্তি। সঙ্গীত সর্বতোভাবে বাল্যকাল থেকেই তাঁর মন-প্রাণ অধিকার করে আছে। যে কোন সঙ্গীতের অধিবেশন তাঁকে হাতছানি দিত, অন্তরে অন্তরে অনুভব করতেন সঙ্গীতের এক অমোঘ আকর্ষণ।

প্রখ্যাত শিল্পীদ্বয় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং সলিল চৌধুরীকে তিনি লাভ করলেন তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষাগুরুরূপে—এঁরা ছাড়া জহর মুখোপাধ্যায় ও প্রবীর মজুমদারের অনুপ্রেরণা তাঁকে প্রথম জীবনে যথেষ্ট লাভবান করে তুলেছে। ১৯৫৪ সালে অর্থাৎ মাত্র কুড়ি বছর বয়সে হীরালাল রেকর্ড জগতে আসেন। কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানী থেকে সলিল চৌধুরী ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে গাওয়া দু'খানা গানের রেকর্ড তাঁর প্রকাশিত হয় ('বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' এবং 'শাওন গগনে')। ১৯৫৭ সালে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে তিনি অন্তর্ভুক্ত হন। এখানে তিনি প্রথম রেকর্ড করলেন 'ভগবান, তুমি এখন' এবং 'সেলাম দুনিয়া সেলাম'—গান দু'টির যুগপৎ কথাকার এবং সুরকার জহর মুখোপাধ্যায়। ১৯৫৮ সালে তিনি প্রথম শ্যামা-সঙ্গীতের রেকর্ড করলেন। গান দু'টির প্রথম ক'টি কথা—'ঘুরিয়ে দে মা মনের গতি' এবং 'নিবিড় আঁধারে মা তোর'—গান দু'টিতে সুরযোজনা করেন প্রবীর মজুমদার।

হীরালাল সারখেল

এ ছাড়াও রবীন্দ্র-সঙ্গীত, রাগপ্রধান, ভজন, কীর্তন, আধুনিক, পল্লীগীতির গায়ক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার অধীশ্বর।

বেতার এবং চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। বাঁশের কেল্লা, রিক্সাওয়ালা, মহিলামহল, রাতভোর, শ্রীবৎস-চিন্তা, হরিশ্চন্দ্র, নতুন প্রভাত, প্রশ্ন, পশারিণী এবং সতী বেহুলা (অসমীয়া) চিত্রসমূহে ইনি কণ্ঠদান করেছেন। বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর পুণ্যমুহূর্তে দুইখানি বিবেকানন্দ সঙ্গীত রেকর্ড করেন।

সঙ্গীতজগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হোক এ প্রসঙ্গে এই কামনাই করি।

অ্যাণ্ড্রোমিডাকে

মায়া বসু

ডেক না আমারে ডেক না অ্যাণ্ড্রোমিডা
আমি ইকারাস উড়ে চলে যাই সুদূরের সন্ধানী,
রক্তে রক্তে কি যে আকুলতা মুক্তি উম্মাদনা
আরোও ঊর্ধ্বে প্রলুব্ধ করে অ্যাপোলোর হাতছানি।

শৃঙ্খলে বাঁধা পাষাণ পাহাড়ে রূপসী অ্যাণ্ড্রোমিডা
তব কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ে সোনালী আগুন জ্বলে;
উন্মন আমি হে অতুলনীয়া হেরি তব যৌবন
তবু কাছে যেতে ভয় পাই পাছে এ মোমের ডানা গলে।
নির্জন দ্বীপ। নারিকেল শাখে সবুজ ইসারা কাঁপে,
একটু পরেই আঁধার নামবে ইথিয়োপিয়ার 'পর
লালসামত্ত সাগর দানব দু' বাহু বাড়ায়ও যদি
হে রাজকন্যা। জেনো সে তো নয় মৃত্যুর ঈশ্বর।
অশ্রুবাষ্পে আবিল দৃষ্টি সিফিউস ক্যাসিয়োপি
ঐ বুঝি আসে সেই অভিশাপ, করে বুঝি সংহার
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রী। নশ্বরের ভয় কর না অ্যাণ্ড্রোমিডা
দেখ ঝলসায় পার্সিউসের সার্কারি তরোবার।

আমি যে বন্দি! উড়ে যেতে চাই পলাতক ডানা মেলে
জ্যোতিরিঙ্গিত মহাশূন্যের সীমান্ত প্রাঙ্গণে
গতিরোধ করে ক্রুদ্ধ অ্যাপোলো নির্দয় কৌতুকে
তবু প্রাণপণে পাখা ঝাপটাই নীলিমার নির্জনে।
অতল জলের উত্তাল ঢেউয়ে মৃত্যুর আহ্বান;
মাথার উপরে শাণিত তাম্র সূর্যের শিখা জ্বলে—
মোমের পালক থর উত্তাপে গলে গলে ঝরে যায়
দিগন্ত রেখা মুছে যায় দু'টি অন্ধ চোখের জলে।
তবুও আমারে ডেক' না—আমারে ডেক না অ্যাণ্ড্রোমিডা
ক্লান্ত রিক্ত মৃত্যু তুহিনে আমি চির নির্বাক—
এ আচ্ছন্ন চেতনায় আর স্তিমিত এ আত্মায়,
উড়ন্ত গতি সিন্ধুপাখির স্মৃতিটুকু জেগে থাক।

শিল্পীর জীবনসঙ্গিনী

চারুলতা রায়চৌধুরী

সে এক মেঘমেদুর দিনের কাহিনী। আকাশভরা মেঘপুঞ্জকে মনে হচ্ছে যেন আমাদের মাথার উপর এক ঘন আচ্ছাদন। কাজের শেষে আত্মজনদের সঙ্গে দিন কাটাতে সপ্তাহান্তে বাড়ি ফিরে দেখি, মা কাজে ভয়ানক ব্যস্ত। বাড়িতে কয়েকজন অতিথি আসার কথা। তাঁদের আপ্যায়নের জন্যে মা নিজেকে নিয়োগ করেছেন মিষ্টান্ন তৈরির কাজে। মায়ের সাহায্যার্থে নিজেকে মিলিয়ে দিলুম। বিকেলের দিকে বৃষ্টি নামল। মুষলধারে। অল্পসময়ের মধ্যেই বাড়িটির সামনে একটু-একটু করে বেশ জল দাঁড়িয়ে গেল। বাড়ির সম্মুখভাগ পরিপ্লাবিত হয়ে গেল বর্ষার ধারায়—সেই দুর্যোগে কেউ ছাতা মাথায় বেরিয়েছেন, কেউ জল এড়াবার জন্যে পরিধেয়কে হাঁটুর উপর তুলেছেন, কেউ নগ্নপদে পথ চলছেন—সে এক বর্ণনযোগ্য দৃশ্য। একান্ত বাধ্য না হলে ঘরের এক পা বাইরে কেউই আসছেন না, আসবেনই বা কেন—ঐ ঘন দুর্যোগে, বঞ্চার সাগরে শখ করে কেউ পাড়ি জমায়?

এ অবস্থায় স্বাভাবিক বুদ্ধির নির্দেশেই অতিথি আগমনের প্রত্যাশা জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া উপায় কি? কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে নির্ধারিত সময়টুকু অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত থালা সাজিয়ে অপেক্ষা আমাদের করতেই হয়।

কাঁটায়-কাঁটায় যখন পাঁচটা বাজল, দুর্দান্ত জলস্রোতকে যেন চ্যালেঞ্জ করে এক লৌহযানের ভেরী ভেসে এল আমাদের কর্ণকুহরে—যা আমাদের মন ভরিয়ে তুলল রাশি রাশি বিস্ময়ে। একটি ট্যাক্সি তার গতি থামাল আমাদের দ্বারপ্রান্তে। তখন বিস্ময়ের সত্যিই সীমা খুঁজে পাচ্ছি না আমাদের অন্তরে। কি আশ্চর্য ঘটনা! বৃষ্টি যদিও তখন বন্ধ হয়েছে, কিন্তু পথ-ঘাট সমস্ত জলে-জলময়। সেই জল ঠেঙিয়ে পাদুকা হাতে নিয়ে তিনটি ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন আমাদের বাড়িতে। প্রাকৃতিক আবহাওয়া তাঁদের যেন সব দিক দিয়ে উৎফুল্ল এবং আরও প্রাণবান করে তুলেছে।

উদার হাসি হেসে একজন বললেন—জানি আমাদেরই আপনারা প্রত্যাশা করছিলেন। তারপর বললেন—সেইজন্যেই আপনাদের নিরাশ করা আমাদের ইচ্ছার বাইরে।

তাঁদের আমার সেই প্রথম দর্শন। ইতঃপূর্বে তাঁদের কখনো দেখিই নি। শুনলাম তিনজনের মধ্যে দু'জন শিল্পী। খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। তাঁদের একজনকে সাধারণ দর্শনে শিল্পী ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় একমাত্র বেশবাস ছাড়া (যা তিনি পরেছিলেন খুব শিল্পসম্মতভাবে) তাঁর মধ্যে এমন কোন উপকরণ পাওয়া যায় না যাতে অপরিচিতের মধ্যে তিনি প্রতিভাত হতে পারেন একজন শিল্পী বলে—অন্তত শিল্পের পরিমণ্ডল থেকে যেন অনেক যোজন দূরে তাঁর গতিবিধি এই কথাই প্রথম দর্শনে মনে আসে। তাঁর দীর্ঘ, সুগঠিত পেশীবহুল দেহ দেখে শিল্পীর পরিবর্তে তাঁকে ব্যায়ামবীর বলে ভাবাটাই স্বাভাবিক। আমি পরে জানতে পেরেছিলাম যে, একজন পেশাদার কুস্তিগীরের কাছে তিনি যথারীতি কুস্তিশিক্ষা করেছিলেন। মাথায় তাঁর নরম চিক্কণ কেশগুচ্ছ। ক্ষুদ্রাকার চোখে এক গভীর দৃষ্টি—আপনাদের দিকে নেত্রপাত করলে মনে হবে যেন আপনার অন্তরের অলিখিত ভাষার পাঠোদ্ধার করছে সেই চোখ দু'টি। এক কুণ্ঠাবিহীন জয়ের হাসি তাঁর মুখে লেগে আছে। সেই মানুষটির নাম শুনলাম। শুধু তাঁকে চোখেই দেখলাম না, জানলাম তাঁর পরিচয়ও। তিনি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রথিতযশা তরুণ শিল্পী, শক্তিমান প্রখ্যাত ভাস্কর।

শিল্পের প্রতি আমার অনুরক্তি চিরদিনের, কিন্তু শিল্পী কোনদিনই আমার মনে দাগ রেখে যেতে পারেন নি। এর আগে শিল্পী বলতে আমার যা ধারণা ছিল তা হল শিল্পী মানেই এক আবছা প্রকাশভঙ্গীসম্পন্ন এলোমেলো ছন্দহীন মানুষ। কিন্তু এই শিল্পী আমার এতাবৎ সঞ্চিত ধারণা নিমেষের মধ্যে নস্যাৎ করে দিলেন। শিল্পী সম্বন্ধে আমার সমস্ত ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, কল্পনা মুহূর্তের মধ্যে যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল এবং এর মূলে যে এই এক বিশেষ শিল্পী—তা তো বলাই বাহুল্য। তাই, আমার সমস্ত ধারণা যাঁর দ্বারা তাসের ঘরের মত ধূলিসাৎ হয়ে গেল তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ করে আরও কিছু জানার এক দুর্বার কৌতূহল আমাকে অধিকার করে বসল। আমি তাঁকে তখন আরও ঘনিষ্ঠ কোণ থেকে জানার দুর্দাম ইচ্ছার কবলে। ইচ্ছাপূরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন বাধার সম্মুখীনও হতে হল না। যে মানুষটিকে কেন্দ্র করে এই ইচ্ছা তিনিও আমাদের পরিবারের সঙ্গে জড়িত হতে থাকলেন। আকাঙ্ক্ষার অতীতেই আমাদের বাড়িতে তাঁর আগমনও ঘটতে থাকে। পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কি না ভেবে দেখি নি, নিজেকে কোন কিছু গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে খোলাখুলিভাবেই মিশতে শুরু করলাম সেই অদ্ভুত মানুষটির সঙ্গে। এই ঘনিষ্ঠ মেলামেশা একদিন পৌঁছোল যথা-নির্ধারিত এক নির্দিষ্ট পরিণতিতে। একটি সন্ধ্যায় তিনি প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করলেন তাঁর অভিপ্রায়। তাতে কোন জড়তা নেই, দ্বিধা নেই, অস্পষ্টতা নেই। ক্ষণকালের সহচরীকে রূপান্তরিতা করতে চাইলেন নিত্যকালের সহচরীতে, আলাপ-সঙ্গিনীকে দিতে চাইলেন জীবন-সঙ্গিনীর মর্যাদা। সোজাসুজি প্রস্তাব এল তাঁর দিক থেকে—সোজাসুজি তো নিশ্চয়ই বরং একটু আদিমভাবেই। এ-সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে নিভৃতে তাঁর সঙ্গে আমিও খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে ভবিষ্যতকে আরও প্রাঞ্জল করে নিলাম।

এই বাগদান যখন আর গোপন থাকল না, শিল্পীর উদ্দেশে তখন বর্ষিত হতে থাকল অফুরন্ত অভিনন্দন। কিন্তু, আমার প্রতি যেন সকলের একটা করুণাই লক্ষিত হল যেন আমি একটা ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিকতার বেদীমূলে উৎসর্গিতা হয়েছি। কিন্তু সকলের এই মনোভাব আমাকে বিন্দুমাত্র বিভ্রান্ত করতে পারে নি। শিল্পী-মনোভাব বলতে যা বোঝায় সেই জাতের কোন মানুষের সঙ্গে এর পূর্বে আমার মেশার সুযোগ হয় নি। শিল্পীরা যে অন্য মানুষদের তুলনায় দৈনন্দিন জীবনে কোন অংশে পৃথক তা সেদিন আমার কল্পনাতেও স্থান পায় নি। তবে সত্যের যেদিন উদ্ঘাটন হ'ল তখন সময় অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

বিয়ের পর কিছুদিন দেবীপ্রসাদ স্বাভাবিকতার মুখোস পরেছিলেন কিন্তু যেদিন অনুভব করলেন যে, আইনের বিধানে নব

হৃদয়ের বিধানে এই সম্বন্ধ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে, এই বন্ধন লাভ করেছে অবিনাশত্ব—সেইদিনই তাঁর কৃত্রিমতার অবসান ঘটল, আসল দেবীপ্রসাদ অর্থাৎ শিল্পী দেবীপ্রসাদ—সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে সব জায়গায় তাঁদের তফাৎ—সেইগুলির মধ্যে করলেন আত্মপ্রকাশ। অল্পদিনের মধ্যেই সেই শিল্পসম্মত বেশবাস উধাও হ'ল—তাদের স্থানপূরণ করল ঢিলে ইজের আর ঢিলে জামা—কাজের পক্ষে তারা না কি খুব উপযোগী। একজন বন্ধু তাঁর ইজেরকে অভিহিত করেছিলেন 'সেফটি লুঙ্গি' বলে। সারাদিন ঐ পোষাকে আবৃত থেকে প্লাস্টারে, কাদায় মিশে থাকতেন তিনি। এর ফলও হত একদিকে যেমন হাস্যকর, অন্যদিকে তেমনই বেদনাদায়কও। দর্শনার্থীর দল যখন 'দেখতেন একটি ঢিলে বেশবাস পরিহিত, ধর্মাচ্ছন্ন লোক নিজেকে—'ডি পি রায়চৌধুরী' বলে ঘোষণা করছে—তাঁরা তো রেগেই আগুন—দেবীপ্রসাদকে তাঁরা ভয় দেখাতেন যে, মাদ্রাজের সরকারী চারু ও কারু-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডি পি রায়চৌধুরীকে তাঁরা জানাবেন যে, এক ব্যক্তি নিজেকে তিনি বলে এইভাবে প্রচারিত করছে। আমি অস্বীকার করছি না যে কাজের চাপে তাঁকে ঐভাবে সজ্জিত থাকতে হয় কিন্তু কাজের অবকাশেও তাঁর বেশবাস বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত দেখা যেত না। কদিচ কখনো হয় তো নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যেত।

আমরা যখন পরিণয়বন্ধনে মিলিত হই তখন তিনি ছিলেন রীতিমত সংযমী কিন্তু এখন তাঁর নিজের ভাষায় তিনি drinks to be sober পান তাঁর কাছে বিলাসিতা নয়, কর্মক্ষেত্রে তাঁকে প্রাণবন্ত রাখার জন্যে, সৃষ্টির জগতে, চিন্তার জগতে নিজেকে সজীব রাখার জন্য আসলে এটা তাঁর প্রয়োজন। মদ্য তিনি নিছক আনন্দের জন্যে পান করেন না, করেন প্রয়োজনের খাতিরে। শুধু তাই নয়, তাঁর চিকিৎসকরাও বিধান দিয়েছেন যে, পান ত্যাগ করলেই তাঁর স্বাস্থ্যহানি অবশ্যই ঘটবে।

জীবনের প্রতি তাঁর মনোভাব ঠিক এক দুর্দান্ত দুর্দম চপল বালকের মত। তাঁর যেটা চাই—সেটা তাঁর চাই-ই—সে যেমন করেই হোক, যেভাবেই হোক আর যে মূল্য দিয়েই হোক। কখনো তিনি সুখের সপ্তস্বর্গে, কখনও তিনি দুঃখের তিমিরান্ধকারে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটলে তখনই তিনি রুদ্রভৈরব আবার পরমুহূর্তেই একাকী অবস্থায় তিনি শান্তশিব।

তাঁর একাধিক অদ্ভুতত্বের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—লোককে বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধবার ক্ষমতা। সাধারণত এই বন্ধুত্ব শুরু হয়ে থাকে ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে দিয়েই, তাঁর প্রতিপক্ষ যদি তাঁর বিশেষত্বগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাঁর অন্তরের সূক্ষ্মস্তরে পৌঁছতে পারেন তা হ'লে হৃদ্যতার বীজ বপন হতে কোন বাধাই থাকে না।

ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন রীতিমত দুরন্ত। তাঁকে নিয়ে তাঁর বাবা-মার উদ্বেগের তো অন্ত ছিল না। এ আমি শুনেছি স্বয়ং তাঁর পিতৃদেব—আমার শ্বশুরমশায়ের কাছে। যে কোন শিহরণপূর্ণ রোমাঞ্চকর কাজ চিরকালই হাতছানি দিয়েছে তাঁকে—এক অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করেছেন। সার্কাস দলে ঢুকে সাইকেলের খেলা দেখিয়েছেন, দুরন্ত মানুষকে বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবন করেছেন বিপন্ন, অবাধ্য সংযমহীন ঘোড়ায় চড়ে অন্যেরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—আবার গাছের তলায় বসে বাঁশি বাজিয়ে সিগারেটের পয়সা সংগ্রহ করেছেন। এ সব ঘটেছে অবশ্যই তাঁর বাবা-মার অগোচরে। তাই ছেলে যতক্ষণ বাড়ি না ফিরতেন, তাঁর পিতা ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। এরকম আরও কত ঘটনা যে ঘটে গেছে তার সীমাসংখ্যা নেই।

শিল্পের পর—আমার স্বামীর আসক্তি—সঙ্গীতে ও শিকারে। সময় পেলেন তো জঙ্গলে ছুটলেন। শুধু শিকারই নয়, সামগ্রিকভাবে অরণ্যও তাঁর মনে এক অভিনব ভাবের সৃষ্টি করত। কথার রাজ্যে তিনি তো রীতিমত যোদ্ধা। শিল্প এবং যৌন-মনস্তত্ত্বই তাঁর প্রধান আলোচ্য। নিজের কথার প্রতি তিনি অত্যন্ত নির্ভরশীল এবং আলোচনায় তিনি যথেষ্ট যুক্তিবাদী, তাঁর যুক্তির বাইরে কোন মতামত গ্রহণ করতে তিনি সম্মত নন সে মতামত তাঁর স্ত্রীরই হোক, ছেলেরই হোক বা সম্পূর্ণ অপরিচিতরই হোক। পানরত অবস্থায় তাঁর যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণধর্মী মনের প্রকাশ যেন আরও প্রকট হয়।

হিন্দু-দর্শনের তিনি অনুরাগী হলেও তাঁকে তথাকথিত অধ্যাত্মবাদী বলা চলে না। যে কোন গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চিরকালের।

স্বামী হিসাবে 'জেলাস' তাঁকে আমি বলতে পারি তবে সেই 'জেলাসি' সীমা অতিক্রম করে না। এক কোমল ও স্নেহশীল মন তাঁর অধিকারগত, তা ছাড়া তাঁকে স্পর্শকাতর বললেও অত্যুক্তি হয় না। আপনি তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে দিন তিনি আপনার কোন ব্যাপারেই মাথা গলাবেন না কিন্তু তা না হলেই বন্ধনবিহীন সিংহের মতই তিনি আপনার মধ্যে এসে পড়বেন। এক কথায় এক প্রখর ব্যক্তিত্বের তিনি অধীশ্বর।

প্রায় দু'যুগ এক শিল্পীর সঙ্গে ঘর করার অভিজ্ঞতা আমি বর্ণনা করলাম। এই পরিবারে আর একজন শিল্পীরও আবির্ভাব ঘটেছে—আমার ছেলে—নৃত্যের মধ্যে সে জীবনের প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। আমার সৌভাগ্যের জন্যে আপনি ঈর্ষান্বিতও হতে পারেন, আবার দুর্ভাগ্যের জন্যে দুঃখপ্রকাশও করতে পারেন। মোটের উপর মানুষ দেবীপ্রসাদকে আমি যা দেখেছি, তাই চিত্রিত করার চেষ্টা করেছি।

বহুদিন ধরে যাঁরা কোন শিল্পীর সঙ্গে বসবাস করেন নি তাঁরা বুঝবেন না যে, একজন সাধারণ মানুষের স্ত্রীর জীবনের সঙ্গে এক শিল্পীর স্ত্রীর জীবনের পার্থক্য কোথায় বা কতখানি। সে একা, আর কোন সময়ই তার নিজস্ব বলতে থাকে না। শুধু গৃহিণীর ধর্মপালন করেই তার কাজ শেষ হয় না। কর্তার কর্তব্য তাকেই পালন করতে হয়। শিল্পী তাঁর ভাব ও সৃষ্টির জগতেই বিচরণ করে থাকেন, তার বাইরের জগতের খুঁটিনাটি কি ঘটছে না ঘটছে সেদিকে দৃকপাত করার সময় তাঁর নেই। তাঁর সন্তানের পিতা তিনি—তাদের স্নেহও তিনি করেন, তাদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার ব্যবস্থাও তিনিই করেন—কিন্তু বাস, ঐখানেই তাঁর কর্তব্যের ইতি। তাদের চোখে চোখে রাখা, বৃহত্তর পৃথিবীর প্রকৃত নরনারীরূপে তাদের গড়ে তোলা—এ কর্তব্য এখানে শিল্পী-পত্নীর।

স্বভাবতই একজন শিল্পী বিস্মরণশীল—এর জন্যে দোষারোপ তাঁকে কোনক্রমেই করা চলে না। নিত্য নব-নব মহৎ সৃষ্টির সাধনায় তাঁর সমস্ত চিন্তা নিমগ্ন। তিনি যেদিন থাকবেন না—সে সৃষ্টি সেদিনও এই নশ্বর পৃথিবীর বুকে চিরন্তন পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকবে। জগতকে তাঁর বৃহত্তর দানে সমৃদ্ধ করে তোলার সাধনাতেই তিনি মগ্নচিত্ত। তাই খুঁটিনাটি জাগতিক ঘটনা তাঁর মনে বেশিক্ষণ স্থায়িত্ব নিতে পারে না। তিনি অতিথিবৃন্দকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে বসলেন—ভুলেও গেলেন পরমুহূর্তে, অতিথিদের আগমনে তখন শিল্পী-জায়ার মনের অবস্থা বুঝুন—তিনি সেই প্রথম জানলেন যে এঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁর কোথায় যেন একটা দেখা করার কথা আছে—কিন্তু সেটা কবে, কোথায় এবং কার সঙ্গে সেটা কিছুতেই মনে আনতে পারছেন না। অতএব, সেটা তখন তাঁর স্ত্রীরই কর্তব্য—সে সব বিষয়ে খোঁজ রাখা।

তাঁর পোষাক তো রঙে-রঙে এক বিচিত্র, হঠাৎ দেখে মনে হয় সার্কাস ক্লাউন। এখন এ দোষ কার? কেউ কেন তাঁকে মনে করিয়ে দেয় নি যে কাপড়টি বদলানো উচিত।

তিনি ক্ষুধার্ত। সেজন্যে অস্বস্তি অনুভব করছেন, কিন্তু ঐ অবধিই—কারণ তাঁর অজানা, খাবার যখন দেওয়া হ'ল তখন একমুখ পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন—'ও, আমার ক্ষিধে পেয়েছিল?'

কাজের জন্যে তাঁর কিছু সিল্কের টুকরো প্রয়োজন—গৃহিণী তাঁর পুরানো বা নতুন কোন শাড়ি থেকে শিল্পীর এই অভাবটুকু মিটিয়ে দিতে পারেন না? কোন নিমন্ত্রণে যাবার জন্যে সুসজ্জিতা হয়ে শিল্পী-পত্নী শিল্পীর সামনে দাঁড়িয়ে। শাড়ির রংটি হয় তো তাঁকে মানাচ্ছে না, ব্যস তারপর—তারপর সেই মূল্যবান শাড়ি রূপ নিল পর্দায়।

শিল্পীর ঘর তাকে তো একটি 'ওয়ার্কশপ' বললেই চলে। কাগজ, রঙ, তুলি, ত্রাসে ছত্রাকার। ইতস্তত, বিক্ষিপ্তভাবে এদিক-সেদিক ছড়ানো। একজনকে তো ঢুকতে হবে খুব সতর্কতার সঙ্গে পাছে কোন-কিছু নষ্ট হয়ে যায়। ঘর যদিও বা পরিষ্কার হল, দেখা গেল অনেক জিনিসই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, সঙ্গে-সঙ্গেই এও দেখা গেল প্রতিটি জিনিস তাঁর চোখের সামনেই রয়েছে।

দর্শনার্থী এসেছেন। শিল্পী তাঁর সাধনায় মগ্ন, দেখা করার সময় কোথা তাঁর—এদিকে স্ত্রী-ও তো সাংসারিক কাজে ব্যস্ত—কিন্তু সে ব্যস্ততার কোন মূল্য নেই।

এই সব সমস্যাগুলির মধ্যই শিল্পী-পত্নীদের দিন কাটাতে হয়। শুধু দিন কাটানো নয়, সমস্যাগুলির সমাধানও করতে হয়। সমস্যাগুলির সমাধান মোটেই সহজসাধ্য যে নয় তা পাঠক-পাঠিকার কাছে অজ্ঞাত নয়। জটিল গণিতের সঙ্গে এই সমস্যা তুলনীয়—তবে তার সমাধানও পাওয়া যায় কিন্তু এর? কোন দুরূহ বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের সমাধান করে বৈজ্ঞানিক অর্জন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি। কিন্তু সাংসারিক জীবনের এই দুরূহ সমস্যাগুলির সমাধানে সাফল্য দেখিয়ে শিল্পী-পত্নীরা কি পান—স্বীকৃতিবিহীন অবস্থাতেই তো উপেক্ষিতভাবে তাঁদের নিতে হয় পৃথিবী থেকে বিদায়।

[ক্রমশ।

অনুবাদক: কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

তনু ও মন

প্রতিমা রায়

তনু। নিশীথের সুপ্তি মাঝে থাকি
তনুহীন নিঃশঙ্ক একাকী,
হে মোর স্বেচ্ছাচারী মন,
কোথা তুমি কর বিচরণ?
আছে কোথা এমন নগরী
যেথা কভু নামে না শর্বরী
চিরন্তন সূক্ষ্মরূপ ধরি'
সেথা শুধু চলে যাওয়া-আসা
মুখরিত অন্তহীন ভাষা।
সুপ্তি শেষে তাই প্রশ্ন জাগে
ছাড় দেহ কার অনুরাগে?
নিত্য কোন্ অলক্ষ্যের সাথে
প্রেমের দেয়ালা কর রাতে?
হেথা স্তব্ধ রহি অচেতন,
অনিত্যের অবাঞ্ছিত ক্ষণ
কেটে যায় বৃথা অকারণ।
শূন্যচারী, বায়ুভরে চলি
জড়তায় যাও মোরে ছলি।
দিবসের ব্যর্থতার ভারে
যাও চিত্ত কার অভিসারে?

মন। অচঞ্চল ক্লান্তি রহে জাগি
রচি অর্ঘ্য নিশীথের লাগি,
অরূপের নিভৃত দেউলে,
অনাঘ্রাত পারিজাত ফুলে
জেগে রহে সর্বব্যাপ্তি ভুলে
আরতির অনবদ্য রেশ
সেথা লভি শান্তির আবেশ।
চিত্ত আমি তুমি মোর কায়া
আমি নিত্য সেথা তুমি মায়া,
তোমারি আধারে এসে আমি
ধরার ধূলির 'পরে নামি।
অরূপেরে রূপদান করি
তুমি মোরে রেখেছ যে ধরি
তাই প্রিয়া তোমারে বিস্মরি
পারি না রহিতে দূরে দূরে
ফিরে আসি চেতনার সুরে।

এক অবিস্মরণীয় শিল্পী

হার্বার্ট বীরবম ট্রী, পরবর্তীকালে স্যার হার্বার্ট ট্রী ইংলণ্ডের মঞ্চজগতে (১৮৫৩ ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯১৭, ২রা জুলাই) এক মস্ত বড় নাম।

বিরাট ব্যক্তিত্ব, অসামান্য অভিনয়নৈপুণ্য, নিত্য নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয়, অথচ যেমন অন্যমনস্ক তেমনি অল্পস্মৃতি ছিলেন তিনি। খেয়ালেরও অন্ত ছিল না তাঁর। তাই মাঝে মাঝে তাঁকে নিয়ে বিভ্রাট ঘটত কম নয়।

বার্নার্ড শ'র পিগমেলিয়ন নাটকের ড্রেস-রিহার্সাল হচ্ছে। ড্রেস-রিহার্সাল মানে পুরোপুরি অভিনয়। দর্শকের আসনে বহু বন্ধুবান্ধব, গুণগ্রাহী আর সমালোচক উপস্থিত। স্বয়ং নাট্যকার সামনের সারিতে।

মহলা চলছে। ট্রী সেজেছেন অধ্যাপক হিগিনস্। নায়িকার ভূমিকায় প্যাট্রিক ক্যাম্পবেল্। একটি দৃশ্যে আছে, অধ্যাপক হিগিনস্-এর দুর্নীতিমূলক কথা আর কুপ্রস্তাব শুনে রেগে গিয়ে নায়িকা তাঁর পায়ের স্লিপার খুলে অধ্যাপককে ছুড়ে মারবেন—এমনভাবে চটিটি ছুড়বেন যাতে সেটি সোজা অধ্যাপকের মুখের উপর গিয়ে পড়ে। চটি আগাগোড়া মখমলের তৈরি, কাজেই লাগবার ভয় নেই।

যথাকালে সেই দৃশ্যটি এলো এবং যথারীতি ও যথাসময়ে নায়িকার চটি ট্রীর মুখের উপর গিয়ে পড়ল।

কথাগুলো ঠিকঠাক মনে আছে, কিন্তু চটির দ্বারা তাড়নার ব্যাপারটি ট্রী বেবাক ভুলে গেছেন। তাই যখন তাঁর কথার উত্তরে রেগে কাঁপতে কাঁপতে শ্রীমতী ক্যাম্পবেল পা থেকে স্লিপার খুলে ট্রীর মুখের উপর ছুড়ে দিলেন তখন ভীষণ চমকে উঠলেন ট্রী, হতবুদ্ধি হলেন, যেন অপ্রত্যাশিত দারুণ আঘাত পেয়েছেন এইভাবে একটা অর্ধস্ফুট বিস্ময়োক্তি সহকারে ধপাস্ করে স্টেজের উপর বসে পড়লেন, তাঁর মুখে বিষম ক্রোধ, অপমান, বিস্ময় ও বিমূঢ়তার ছায়া ফুটে উঠল। কোন্ সাহসে অভিনেত্রী তাঁকে জুতো মারে? এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! হাঁ করে বসে রইলেন। না ওঠেন, না কোন কথা বলেন।

স্মারক ভিতর থেকে তাঁর পার্ট হাঁকছে, কিন্তু কে শোনে তার কথা, গর্জে উঠলেন ট্রী—'কোন্ সাহসে তুমি আমায় এ ভাবে অপমান কর! আস্পর্ধা!'

ট্রীর রকম-সকম দেখে আর কথা শুনে অভিনেত্রী রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন, ট্রী এ কি সব বলছেন, এ সব কথা তো বলার কথা নয়, আর অমনধারা বিচলিতই বা হয়েছেন কেন? নাটকে তো রয়েছে যে তিনি জুতো খেয়ে মাপ চাইবেন!

শেষ পর্যন্ত ট্রীকে বোঝাতে হল যে অভিনেত্রীর কোন দোষ নেই, নাটকের মধ্যেই এই ব্যাপার আছে, আর তা তো তিনি জানেনই।

ঘাড় নাড়লেন ট্রী। বললেন, ব্যাপারটা তাঁকে আগে ভাল করে বোঝানো হয় নি, মহলার সময় শ্রীমতী ক্যাম্পবেল তো কোনদিন তাঁকে জুতো ছুড়ে মারেন নি।

তাঁর এই যুক্তি শুনে সবাই হাসতে লাগল। বার্নার্ড শ' বললেন, 'অভিনয়ের সময় যদি ঠিক এমনি ভুলে গিয়ে ওইভাবে বোকার মত স্টেজের উপর বসে হাঁ করে চেয়ে থাকতে পারেন, তা হলে আমার নাটকের চেয়ে ধন্য হবে আপনার অভিনয়।'

শুধুই এমনি বিস্মরণ নয়, তার সঙ্গে অদ্ভুত সব খেয়ালেরও সংযোগ ঘটত মাঝে মাঝে। একটি নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনী। সেজেগুজে উইংস-এর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর প্রবেশ। পাশে স্ত্রী দাঁড়িয়ে। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন স্ত্রীকে বললেন, 'জলদি! আমার এই কোটের বোতামঘরে একটা নীল ফিতে চাই। শীগ্গির নিয়ে এসো।'

স্ত্রী গেলেন মঞ্চাধ্যক্ষের কাছে। ছুটে এলো মঞ্চাধ্যক্ষ। নীল ফিতে? কিন্তু সে রকম কোন ইঙ্গিত তো নাটকে নেই! না থাক, না থাক! ব্যাকুল হলেন স্ত্রী কিন্তু এখন এই মুহূর্তে একটি নীল ফিতা তাঁর চাই-ই চাই।

এদিকে আর দেরি করবার উপায় নেই, তাঁর স্টেজে ঢোকবার সময় এসে পড়েছে। কাতর হয়ে পড়লেন ট্রী। নীল ফিতা না হ'লে অভিনয় কিছুতেই ভাল করে করতে পারবেন না। সব বুঝি পণ্ড হয়!

শর্মিলা ঠাকুর—ছায়াছবির বাইরে

এমন সময় সেই সংকটমুহূর্তে তাঁর স্ত্রী বিস্ময়কর উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয় দিলেন। তাঁর পরনে ছিল সাদা গাউন। তারই একাংশ ছিঁড়ে নিয়ে সরু একফালি ফিতা তৈরি করে সাজঘরে গিয়ে সেটিকে নীল রঙে ডুবিয়ে এনে পরিয়ে দিলেন স্বামীর কোটের বোতামঘরে। আনন্দে উদ্দীপনায় উদ্বেল হয়ে ট্রী মঞ্চে প্রবেশ করলেন, প্রেরণাদীপ্ত অভিনয় নিমেষে অভিভূত করে দিলেন দর্শকদের।

হার্বার্ট ট্রীর কাছে অভিনয় ছিল নিত্য নতুন পরীক্ষা। চরিত্রের মূল কাঠামোকে বজায় রেখে নিত্য নতুন করে তাকে সৃষ্টি করতেন। একজন প্রাজ্ঞ সমালোচক তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে, তিনি একই নাটকে ট্রী'কে বহু রাত্রি দেখেছেন এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন, প্রতি রাত্রেই ট্রী কিছু না কিছু নতুন অভিব্যক্তি ও নতুনতর আঙ্গিক সংযোজনা করে চরিত্রটিকে নিত্য নতুন করে রূপদান করেছেন।

এই ক্ষণজন্মা অভিনেতার চরিত্র ছিল বড় বিচিত্র। অভিনয়ে এমন বিরাট দাপট, অথচ যেমন অন্যমনস্ক-প্রকৃতি তেমনি আপনভোলা ছিলেন তিনি। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা সমালোচক হয়ত সাজঘরে গিয়েছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, ব্যস, তাঁর সঙ্গে আলাপে মত্ত হলেন, একটু পরেই যে তাঁকে স্টেজে যেতে হবে তা বেমালুম ভুলে বসে রইলেন। শেষ পর্যন্ত হয়ত এক রকম টানতে টানতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে স্টেজে ঠেলে দিতে হল।

স্মৃতিশক্তিও প্রখর ছিল না তাঁর। প্রায়ই সহ-অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সঙ্গে নিজের অভিনয়ের পারম্পর্য ভুলে যেতেন, সহ-অভিনেতা যা বলছে তা যেন সেই প্রথম শুনছেন, হাঁ করে তার মুখের পানে তাকিয়ে আছেন, তারপর তার প্রত্যেকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে নিজের পার্ট ভুলে গিয়ে হয়ত একটা মনগড়া উত্তর দিলেন। পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল নিজের ভূমিকার সংলাপ। তখন এমন কথার বাঁধুনি আর অভিব্যক্তির গাঁথুনি দিয়ে নিজের স্খলনটুকু মানিয়ে নিলেন যে, সেই স্খলনাংশটুকুই হয়ত সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে অপূর্বতম হয়ে উঠল।

মাইনেকরা অভিনেতা থেকে যখন নিজে থিয়েটারের মালিক হলেন তখন দায়িত্ব বাড়ল অনেক কিন্তু খেয়াল কমল না। একটা নাটকের অভিনয় বেশিদিন চালাতেন না। কিছুদিন পরেই মঞ্চাধ্যক্ষকে ডেকে হাই তুলে বলতেন, 'বড্ড একঘেয়ে লাগছে ম্যানেজার, অন্য কোন নাটক খোলবার তোড়জোড় কর।'

মঞ্চাধ্যক্ষ হয়ত বললেন যে, যে-নাটক চলছে তাতে পয়সা আসছে প্রচুর, প্রতি রাতেই হাউস ফুল, এখন এ নাটক বন্ধ করার কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু কে শোনে তার কথা। খোল শেক্সপীয়র। লাগাও প্রাচীর পত্র।

তিনশো রাত্রি চলবার পরেও যে-নাটকে প্রতি অভিনয়ে প্রেক্ষাগার

সুমিতা সান্যাল, বিকাশ রায় ও রুণু বসু—সুটিং-এর অবসরে

পূর্ণ হচ্ছে সে-নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। মঞ্চস্থ করলেন জুলিয়স সীজর, নতুনভাবে নতুন ঢং-এ।

কিন্তু শেক্সপীয়রের নাটকাবলীর প্রযোজনায় তাঁকে তীক্ষ্ণ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, দৃশ্যপটের বাহুল্যের দ্বারা তিনি অভিনয়ের স্বচ্ছন্দগতিকে ব্যাহত করেছেন, নাট্যকারের চিন্তাধারাকে উপেক্ষা করে দৃশ্যের মধ্যে ও অভিনয়ের ভিতরে বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলবার অতি-ব্যগ্রতায় সময় সময় তিনি অত্যন্ত স্থূলতার পরিচয় দিয়েছেন।

কঠোর সমালোচনা নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু ট্রী কখনো শেক্সপীয়রের অসম্মান ঘটান নি। তাঁর জুলিয়স সীজরের অভিনয় দেখে লর্ড রোজবেরি বলেছিলেন, 'অতীতের রোমীয় ঐতিহ্যকে যদি প্রত্যক্ষ করতে চাও, একজন সত্যিকারের রোমানকে যদি দেখতে

জনপ্রিয় নায়ক—অনিল চট্টোপাধ্যায়

ইচ্ছা কর তা হলে হার্বার্ট ট্রীর জুলিয়স সীজরের অভিনয় দেখে এসো।'

তখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মন্তব্য করেছিলেন যে, হার্বার্ট ট্রী কর্তৃক শেক্সপীয়রের নাটকের প্রযোজনায় সেই সেই অংশই সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠত, যে সব অংশ নাট্যকারের রচনা নয়, হার্বার্ট ট্রীর কল্পনাপ্রসূত। এ-কথা আংশিক সত্যি। অভিনয়ের মধ্যে ট্রী অনেক সময় নাটক-বহির্ভূত এমন সব ছোট ছোট 'ঘটনার' সৃষ্টি করতেন যেগুলি অসামান্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত।

'দ্বিতীয় রিচার্ড' নাটকের অভিনয়কালে তিনি একটি কুকুরকে স্টেজে নামালেন। নাটকে অবশ্য কুকুরের কোন উল্লেখ নেই। দেখানো হল, কুকুরটি রাজার বড় প্রিয় এবং রাজার বিশেষ অনুগামী। তারপর দেখানো হল, রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর বিরোধ যখন চরম সীমায় উঠেছে এবং মন্ত্রীই জয়ের সম্মুখীন হয়েছে, তখন কুকুরটি রাজাকে পরিত্যাগ করে মন্ত্রীর কাছে গিয়ে তার পা চাটতে লাগল, মন্ত্রীর মুখে ফুটে উঠল সাফল্যের কুটিল হাসি, আর রাজা সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বারেক কুকুরটির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস রোধ করতে করতে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করলেন। নাটক-বহির্ভূত এই দৃশ্যের অবতারণা দর্শক ও সমালোচকদের বিস্ময়াভিভূত করেছিল।

সময়ে সময়ে একটিমাত্র চাহনির দ্বারা হার্বার্ট ট্রী একটি চরিত্রের সমগ্র বেদনাকে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। ঐ নাটকেই শেক্সপীয়রের বর্ণনায় আছে, জনগণের বিদ্রূপ আর কটূক্তির ভিতর দিয়ে রাজা ঘোড়ায় চড়ে ওয়েস্ট মিনিস্টার হল অভিমুখে চলেছেন। দৃশ্যটি একজনের জবানিতে বলা হয়েছে। ট্রী স্থির করলেন বর্ণনাটি অভিনয় করে দেখাতে হবে। ঘোড়া বার করলেন স্টেজে। মঞ্চের উপর ঘোড়ায় চড়ে বেরুনো নেহাৎ সহজ ব্যাপার না। তার উপর চারিদিকে বহু লোকের চীৎকার, হৈ-হৈ।

কিন্তু ঘোড়াটিকে শিখিয়েছিলেন ট্রী আশ্চর্য দক্ষতায়। চারিদিকে লোকজন গলা ফাটিয়ে রাজাকে গালাগাল দিচ্ছে আর তারই ভিতর দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চলেছেন রাজা হেঁটমুখে! বিষাদে ঘোড়াটার মাথাও ঝুলে পড়েছে, অতি ধীরে ধীরে পা ফেলে প্রভুকে নিয়ে চলেছে সে, জনতার চীৎকারে এতটুকুও ঘাবড়াচ্ছে না। একটু দূরে গিয়ে প্রস্থানের পূর্বে রাজা একবার মুখ তুলে দর্শকদের দিকে চাইলেন, মাত্র একটিবার, আর তাঁর সেই একবারের মর্মস্পর্শী দৃষ্টিপাতের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠল সমগ্র জীবনের গভীর হতাশা আর করুণ-বেদনা। বাক্যহীন সেই নীরব অভিব্যক্তি যেন সহস্র কাতর কথার গুঞ্জন তুলে সারা প্রেক্ষাগারকে অভিভূত করল। —অমরেন্দনাথ মুখোপাধ্যায়

উত্তমকুমার—একটি বিশেষ ভঙ্গিমায়

স্মৃতির সঞ্চয়ে মরিস শিভ্যেলিয়র

মনে আছে যেদিন প্রথম তাঁর মুখোমুখি হই, সোজাসুজি তাকিয়েছিলেন তিনি আমার দিকে, উজ্জ্বল নীল একজোড়া চোখ, অধরোষ্ঠের সেই সর্বজনপরিচিত বিশেষ ভঙ্গিমা, ফরাসী ধরণের বাচনভঙ্গী—সবই পূর্বপরিচিত, কিন্তু যে কথাগুলি তিনি শোনালেন আমাকে তা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। 'আমার জীবনে' বললেন তিনি, 'দেহকামনার মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে প্রেম ও স্নেহবোধ এবং আমি মনে করি প্রণয় ব্যাপারে সেটাই সঙ্গত।

'অবশ্য এখনও যে আমি কোন সুন্দরী নারীকে দেখে মুগ্ধ হই না তা নয়, তবে সেটা নিছক সৌন্দর্যানুভূতির জন্যই, ঠিক যেমনভাবে আমরা কোন শিল্পকর্ম দেখে তারিফ করি, রমণীর রূপও আজ আমার চোখে সেই পর্যায়েরই।

'আমার বয়সে পৌঁছলে জানতে পারবেন যে, সৌন্দর্য দেখে শান্ত মনে উপভোগ করতে পারাতেও কত বড় আনন্দ নিহিত থাকতে পারে।'

তবু এই বর্ষীয়ান পুরুষ, যাঁর সব চুল সাদা হয়ে গেছে, বয়সের ভারে চামড়া যাঁর লোল, সৌন্দর্যের ও পৌরুষের শেষ রশ্মিতে যাঁর দেহ এক বিষন্ন মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে আছে, আজও সহস্র সহস্র নারীর চোখে ফরাসী পৌরুষের প্রতীক বলেই প্রতিভাত হয়ে থাকেন, তাঁর কথা শুনতে শুনতেই ভেবেছিলাম আমি।

তিনিই সেই শাশ্বত প্রেমিক যাঁর স্বপ্ন আজও দেখে মেয়েরা, কালে তাঁর মোহ হরণ করতে পারে নি। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে 'শিভ্যেলিয়র' এই নামটিকেই উদ্দাম প্রেমের প্রতীক স্বরূপ তারা পুজো করে আসছে

তিনি বলে যাচ্ছিলেন, 'এখন লোকে আমাকে নারীসংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করলে সত্যই বিব্রত বোধ করি, এ বয়সে ও সব সত্যই অর্থহীন বলে মনে হয় আমার।'

কিন্তু সত্যই কি তাই? আমার তো বিশ্বাস হল না।

এখনও এ বয়সে যে কোনও মেয়েকে তিনি নৈশ-আনন্দের জন্য আমন্ত্রণ করলে, সে হয়ত আনন্দের সঙ্গেই সম্মতা হবে, তা তার বয়স সতেরোই হোক্ বা সত্তরই হোক, আর সেটা সম্ভব এজন্যই যে, তিনি শুধু বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতাই ছিলেন না, আজও তিনি এক আকর্ষণীয় পুরুষ।

১৯৩০ সালের এক স্মরণীয় দিনের কথা মনে পড়ে গেল আমার; যেদিন লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে মরিস শিভ্যালিয়র বন্দী হয়ে পড়েছিলেন দশহাজার উৎসাহী নারীর এক বিরাট বেষ্টনীর মধ্যে, পুলিসের কর্ডন ভেঙে তারা ধেয়ে এসেছিল তাঁর দিকে, স্মারকচিহ্ন হিসাবে শত শত টুকরোয় পরিণত হয়েছিল তাঁর পরিধেয়।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সারা বছরের আয়ের চেয়েও অধিক ছিল শিভ্যালিয়রের সাপ্তাহিক উপার্জন, ক্লার্ক গেবল বা ক্যারী গ্রাণ্টের চেয়েও জনপ্রিয় ছিলেন তিনি।

'সমস্তটাই যেন অবাস্তব, যেন মেকী, সত্যি বলছি এ ধরণের জীবনকে সত্যকার জীবন বলেই মনে হয় নি কোনদিন', তিনি বলে উঠলেন আমার উদ্দেশে।

সে সময়ে নাকি তাঁর ধারণা ছিল যে, ছায়াচিত্রের মাধ্যমে যে জনপ্রিয়তা তিনি অর্জন করেছেন তার আয়ু দু'বছর বা বড়জোর তিন বছর; আর নিজের ফরাসী উচ্চারণকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য নিয়মিত ফরাসী শেখানোর ক্লাসে যোগ দিতেন। কিন্তু সে ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর কেটে গেল তারপর,

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে

সুপ্রিয়া চৌধুরী—ছায়াছবির বাইরে

জনপ্রিয়তার মুকুট তাঁর মাথায় সগর্বে শোভা পেল এই দীর্ঘকাল ধরে। আর সেই সঙ্গে তিনি খ্যাত হলেন পৃথিবীর পয়লা নম্বরের প্রেমিকদের একজন বলে।

তাঁর নামমাত্র উচ্চারণ করার জন্য বহু রমণী তাদের পতিদের দ্বারা পরিত্যক্ত হল। কার্ডিফ শহরে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হল না পর্যন্ত।

এক নির্বাচনে তাঁর নাম ব্যবহার করে জয়যুক্তা হলেন এক নারী এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তিনি তা স্বীকার করলেন।

শিভ্যালিয়র জীবনে বিবাহ একবার মাত্রই করেন কিন্তু অসংখ্য রমণীর সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মার্লিন ডিয়েট্রিচ্ থেকে মেরিলিন মনরোও উপস্থিত।

এই সব কারণে তিনি অত্যধিক মাত্রায় সতর্ক হয়ে ওঠেন। একসময় তিনি বলেছিলেন যে, 'আমার প্রকৃতিতে অসংযম ও সতর্কতা এ দু'টোই সমানভাবে বর্তমান; তবে আমি মনে করি যে, সতর্কতাই বেশি প্রয়োজনীয়, আর সেজন্যই অসংযম বা ইন্দ্রিয়পরতার সঙ্গে সঙ্গে শুভবুদ্ধিকে সর্বদাই সযত্নে রক্ষা করে চলি; কখন দড়ি টানতে হবে, এ হিসেবে আজও ভুল করি নি কোনদিন।

'বহু নারীর আবির্ভাব ঘটেছে আমার জীবনে, কিন্তু কখনই সম্যক্

ভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলি নি, আর হয়ত বা সেজন্যই আজও আমার আকর্ষণ রয়েছে অটুট।' অসঙ্কোচেই জানালেন শিভ্যেলিয়র।

তাঁর বিবাহিত জীবনেও এই সতর্কতার পরিচয় বহন করে। এ সম্বন্ধে তিনি বললেন, 'আমার দাম্পত্যজীবন সফল হয়নি, অন্ততঃ আমি যা আশা করেছিলাম তদনুরূপ হয় নি এবং সেজন্যই আমি নতুন করে আর জড়াতে চাই নি, হয় তো তাতে অবস্থাটার পুনরাবৃত্তি ঘটত মাত্র।'

তাঁর দাম্পত্যজীবনে অসুখী হওয়ার একটা জোরদার কারণ অবশ্য ছিল। নৃত্যসঙ্গিনী যে নারীকে একদা তিনি জীবনসঙ্গিনী হিসাবে বরণ করে নিয়েছিলেন সে নারী ছিলেন অত্যধিক মাত্রায় সন্দেহপরায়ণা।

এক সময় বলেছিলেন শিভ্যালিয়র, 'পরিমিত পানাহার ও পরিমিত প্রেম-জীবনই মানুষের সাফল্যের মূল মন্ত্র, একজন খাঁটি ফরাসী হিসাবে আজীবন আমি এই রীতিতে চলতে চেষ্টা করেছি।'

কিছুক্ষণ মৌন রইলেন তিনি, সাফল্যময় দীর্ঘজীবনের শেষ প্রান্তে আসা এক পথিক-আত্মা যেন জীবনব্যাপী পদচারণার শেষে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিল।

আবার মুখর হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠ, 'এখন আর নারীর পেছনে ছুটতে ভাল লাগে না, আমার যে বার্ধক্য এসেছে এতে আমি আনন্দিত; প্রেমে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু জ্বালাও বড় কম নেই—সে জ্বালা থেকে বোধ হয় এতদিনে নিষ্কৃতি পেলাম।'

কিন্তু এতদিনের নিপুণ শিকারী কি সত্যই মৃগয়া ভুলে গেছেন? কোন এক রেস্তোরাঁয় পূর্ব-প্রেমিকা মার্লিন ডিয়েট্রিচকে দেখতে পেয়ে সানন্দে চুম্বন করে স্বাগত জানিয়েছিলেন কেন তবে? সে আদর, সে উচ্ছ্বাস কি জীবন সম্বন্ধে বীতস্পৃহ এক বয়স্ক পুরুষের?

মেয়েদের কাছে আজও কেন তিনি রোমাণ্টিক প্রেমের রাজা বলে পরিগণিত হন? কি রহস্য আছে তাঁর? কোন যাদুমন্ত্রে আজও তিনি আকর্ষণীয়?

বিশ বছর আগে একবার মন্তব্য করেছিলেন শিভ্যেলিয়র, 'আমি যে মেয়েদের খুব বেশি বুঝি তা নয়, তবে যেটুকু বুঝি তাতে মনে হয় তারা নিছক পশুত্ব পছন্দ করে না।'

এ বিষয়ে আরও প্রশ্ন করলাম আমি, প্রথমটা কিছু ইতস্তত করে শেষে খোলামনেই জবাব দিলেন তিনি, 'বোধ হয় মেয়েদের সম্বন্ধে এই দীর্ঘকালব্যাপী অভিজ্ঞতায় এটুকু আমি জেনেছি যে, তারা প্রেমকেই সবচেয়ে বড় আসন দেয়, প্রেমহীন দেহভোগে তাদের রুচিই যে শুধু নেই তা নয়, অনুচ্চারিত প্রেমকেও উপলব্ধি করতে তাদের ভুল হয় না কখনও।' —রেবা দেবী

চলচ্চিত্রে সুভাষ-জীবনী

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের ত্যাগভাস্বর, মহিমা-প্রদীপ্ত ও গৌরবালোকিত জীবনকাহিনী চলচ্চিত্রের রূপ নিতে চলেছে বোম্বাই থেকে এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। ছবিটি হিন্দী ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই গৃহীত হবে। তেলেগু ভাষাতেও গৃহীত হবার কথা আছে। পরিচালনভার নিয়েছেন হিরণ্ময় সেন। ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন প্রমুখ ভারতের মুক্তিকামী

সন্ধ্যা রায়—ছায়াছবির বাইরে

মহান সন্তানদের জীবনীচিত্র পরিচালনায় ইতঃপূর্বে ইনি যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের বাল্য ও যৌবনকালের ঘটনাবলী, রাজনৈতিক জীবন, কংগ্রেসের সহিত মতভেদ, ঐতিহাসিক অন্তর্ধান, আহত সৈনিকদের মিষ্টান্ন বিতরণ, ভারতীয় যোদ্ধাদের মনোরঞ্জনের জন্য নাট্যোপহার, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা, সাবমেরিনে জার্মানী থেকে মাদাগাস্কার যাত্রা, দেশের বাইরে থেকে বিদেশীর সঙ্গে দুর্বার সংগ্রাম প্রভৃতি এই চিত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে। রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, মোতিলাল নেহরু, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, রাসবিহারী বসু, তোজো, অকিনলেক প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির এই চিত্রে এক আকর্ষণীয় সমাবেশ ঘটবে। এই চরিত্রগুলি রূপায়ণের ভার পড়বে বিভিন্ন শিল্পীর প্রতি। আফগানিস্থান, জার্মানী, জাপান, ইটালি, দূরপ্রাচ্য প্রভৃতি দেশগুলি চিত্রগ্রহণের স্থান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। প্রখ্যাত অভিনেতা প্রেমনাথ নামভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করবেন। ছবিটিতে জাতীয়তা উদ্দীপক এবং সুভাষচন্দ্রের প্রিয় গানগুলি গীত হবে। সঙ্গীতাংশের ভার গ্রহণ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আমরা এই প্রচেষ্টাটির সাফল্য সর্বতোভাবে কামনা করি এবং এ বিষয়ে দ্বিমত হওয়ার কোন অবকাশ নেই যে, এই সংবাদটি ঘোষিত হওয়ার পরমুহূর্ত থেকে সারা বাঙলা অনন্ত আগ্রহ নিয়ে ছবিটির প্রহর গুনবে।

মিশরের হলিউড

আজকের জাগ্রত আফ্রিকার প্রাণকেন্দ্র মিশর। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমি হিসাবেও মিশর সারা বিশ্বের বিপুল শ্রদ্ধার অধিকারী। সংবাদ এসেছে যে, অদূরভবিষ্যতে হলিউডের মত মিশরে একটি চিত্রনগরী গড়ে উঠবে। নীলনদের তীরে এই দ্বিতীয় হলিউড সৃষ্ট হবে। এ জন্য ব্যয় হবে নয় লক্ষ পাউণ্ড। চিত্রনগরীটিকে যথাসাধ্য জমকালো করে তুলে বিলাস-নগরীতে পরিণত করা হবে। বাগান, ঝর্ণা, ভোজনাগার, সুইমিং পুল ছাড়া বিদেশী তারকাদের জন্যে বিশেষ করে একটি প্রথম শ্রেণীর হোটেল নির্মিত হবে। নীলের তীরে বর্তমানে আঠারটি আধুনিক স্টুডিও নির্মিত হচ্ছে। এর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হতে পাঁচ বছর সময় লাগবে। তবে ১৯৬৬ সাল থেকেই এই চিত্রনগরী কার্যোপযোগী হয়ে উঠবে। বছরে দেড়শ'খানি ছবি নির্মাণের ক্ষমতাসম্পন্ন এই চিত্রপুরীতে চারটি পরিস্ফুটনাগারও গড়ে উঠছে। বর্তমানে মিশরে অবস্থিত স্টুডিওর সংখ্যা—নয়। গঠনকার্য সমাপ্ত হ'লে এই চিত্রপুরী মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম চিত্রনির্মাণ কেন্দ্র বলে পরিগণিত হবে।

সংবাদ বিচিত্রা

আজকের ভারতবর্ষের প্রণম্য রূপকার পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি রামমোহনের বিস্ময়কর জীবনী অবলম্বনে একটি চিত্রনির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সুবিখ্যাত অরোরা চিত্র প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী নিবেদন 'ভগিনী নিবেদিতা'। ছবিটি দর্শকসমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জনে এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিলাভে সমর্থ হয়েছে। রামমোহনের জীবনীচিত্রটিরও পরিচালনভার অর্পিত হয়েছে বিজয় বসুর প্রতি। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন শক্তিমান নট বসন্ত চৌধুরী।

অপর্ণা দাশগুপ্তা—ছায়াছবির বাইরে

রবীন্দ্রনাথের মতে কাশী ভারতের প্রদেশ নয়, কাশী ভারতের আত্মা। ভারতের বিশ্ববন্দিত সভ্যতা ও ঐতিহ্যের মূলে এই সুপ্রাচীন নগরীর অবদান যেমনই বিরাট তেমনই ব্যাপক। কাশীর বৈশিষ্ট্য ও পবিত্রতা স্বল্পপরিসরে আলোচনা করা যায় না। যুগ যুগ ধরে কাশী ভারতের ধর্মীয় ইতিহাস গঠনে এবং তার বৈশিষ্ট্য আরোপে যে কতখানি সহায়তা করে আসছে তার তুলনা নেই। এই পুণ্যভূমি সম্বন্ধীয় একটি প্রামাণ্য চিত্রনির্মাণের কাজ শেষ করেছেন অনুপম রায় প্রোডাকসান্স। এই অভিনন্দনীয় চিত্রটি পরিচালনাও করেছেন অনুপম রায়। এই চিত্রটিই কাশী সম্বন্ধে প্রথম প্রামাণ্য চিত্র দলিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যাঁদের বীরত্বে ইতিহাসে অমর হয়ে আছে বি কুনওয়ার সিং তাঁদের অন্যতম। এই বিপ্লবনায়কের মাতৃভাষা ভোজপুরীতে তাঁর একটি জীবনীচিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন পরিচালক এস এন ত্রিপাঠী। তাঁর জন্মগ্রামে মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরে ছবিটি মুক্তি পাবে বলে অনুমান করা যায়।

পুণায় অবস্থিত বৃটিশ পার্লামেণ্ট সদস্য ও ভারতের বিশিষ্ট সন্তান স্বর্গত ডঃ মুকুন্দরাম জয়াকরের বাঙলোটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া অধিকার করেছেন। ছাত্রীদের হোস্টেল হিসাবে ঐ বাঙলোটি অতঃপর ব্যবহৃত হবে বলে জানা গেছে।

ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে

ভেঙ্কট রামণ নামে বাইশ বছরের একটি যুবক সম্প্রতি গ্রেপ্তার হয়েছেন। গ্রেপ্তারের কারণস্বরূপ জানা গেছে যে, নিজেকে একটি পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত করে তিনি দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রাভিনেত্রীদের আলোকচিত্র গ্রহণ করতেন। পরে, এই মিথ্যা প্রকাশ হয়ে পড়ে ও তিনি গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনায় দেখা যাচ্ছে যে, মিথ্যাচার ও প্রতারণা কখনও ফলপ্রসূ হতে পারে না বা গোপন থাকে না। এই যুবকটি দেখা যাচ্ছে নির্গুণ নন—একটি বিশেষ গুণের অধিকারী। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করলে আলোকচিত্রী হিসাবে ইনি হয়তো কালে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন, কিন্তু জীবনের প্রথম পর্বেই তাঁর কালিমামণ্ডিত হয়ে গেল—এই ধরণের যুবক দেশে-বিদেশে অসংখ্য আছেন, এই ঘটনা থেকে তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

ভারতীয় চিত্রজগতে যথেষ্ট জনপ্রিয়তার অধিকারিণী ত্রিবাঙ্কুরের নর্তকী ভগিনীত্রয়ের সর্বকনিষ্ঠা রাগিণী সম্প্রতি শ্রী ভি মাধবন থাম্পির সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

সম্প্রতি জাকার্তায় দশ দিন যাবৎ অনুষ্ঠিত তৃতীয় এ্যাফ্রো-এশীয় চলচ্চিত্র-সম্মেলনে দক্ষিণ-ভারতীয় অভিনেতা রঙ্গ রাও শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে বিভূষিত হয়েছেন। তেলেগু চিত্র 'নারথানশালা' তাঁকে এই সম্মান এঁকে দিয়েছে। পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন রাষ্ট্রনায়ক সুকর্ণ।

সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের একটি জীবনীচিত্র নির্মাণের সংবাদ ইতঃপূর্বে পাঠকসমাজে প্রচারিত হয়েছে। বর্তমানে জানা গেল যে, তাঁর প্রপৌত্রী ইংল্যাণ্ডের বর্তমান অধীশ্বরী রাণী এলিজাবেথ এই প্রচেষ্টা কার্যকর হলে দুঃখিত হবেন জানিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে এই পরিকল্পনার তিনি বিরোধী। এই পরিকল্পনাটি বর্জিত হলেই তিনি আনন্দিত হবেন যথেষ্ট পরিমাণে

লণ্ডন থেকে প্রচারিত হচ্ছে যে, ইতালীর সরকার তাঁদের দেশের ছায়াছবি সেন্সর ব্যবস্থার আওতা থেকে মুক্তি দেবেন। তাঁরা মনে করেন সেন্সর ব্যবস্থা বলবৎ থাকলে তা চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়, তার প্রকাশভঙ্গী ব্যাহত হয়, তদুপরি সেন্সর ব্যবস্থা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি ক্ষেত্রে ইতালীর ছবিকে আইনের শিকার হতে হয়েছে, এই সব কারণে সেন্সর ব্যবস্থা তুলে দেওয়াই এঁরা সমীচীন বলে মনে করেছেন।

দক্ষ চিত্রাভিনেত্রী শার্লে ম্যাকলেন (৩৪) তাঁর বর্তমান ছবির কাজ শেষ হলেই একা ভারতভ্রমণে আসবেন বলে জানা গেল। হলিউডের অভিনেত্রীদের মধ্যে বিশ্বভ্রমণকারিণী হিসাবে এঁর স্থান সর্বোচ্চে।

শৌখীন সমাচার

খাসদখল

রসরাজ অমৃতলালের খাসদখল নাটকটি একদা দর্শকসমাজে জনপ্রিয়তার শিখরদেশ আরোহণে সমর্থ হয়েছিল। এই নাটকে হাস্যরস এবং বিদ্রূপের মাধ্যমে রসরাজ সে যুগের সমাজের এক বিশেষ দিকের যে সুস্পষ্ট আলেখ্য অঙ্কিত করে গেছেন—ইতিহাসের দাবীতে তা এক বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। সুদীর্ঘকাল পর বিখ্যাত অভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'বৈঠকী গোষ্ঠী' এই নাটকটি মঞ্চস্থ করে অভিনবত্বের পরিচয় দিলেন। বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন জয়ন্তকুমার ঠাকুর, তরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিলীপ সেন, দীপেন মুখোপাধ্যায়, কেদার রায়, আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বসু, উপেন মল্লিক, সুরজিতকুমার ঠাকুর, শ্যামদাস সাহা, সুনীত মল্লিক, অসীম ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়, সাগর সেন, চিত্রা ঠাকুর, রেখা গুপ্ত, প্রণতি গঙ্গোপাধ্যায়, ডলি গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কারাগার

প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকটি একদা যে বিরাট আলোড়ন এনেছিল—যা দর্শকমহলে তা শেষ অবধি বৃটিশ সরকারকে পর্যন্ত শঙ্কিত করে তুলেছিল। এ কথা অজানা নয় যে, পৌরাণিক পটভূমিকে অবলম্বন করে নাট্যকার এই নাটকের মাধ্যমে জনচিত্তে এক বিরাট ও ব্যাপক জাতীয়-মুক্তির চেতনা সঞ্চার করেছিলেন। সেদিক দিয়ে এর মূল্য অনস্বীকার্য। ইউনিট থিয়েটারের উদ্যোগে এই নাটকটি সম্প্রতি দর্শকসমক্ষে নিবেদিত হল। কংসের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন স্বনামধন্য শিল্পী মোহন ঘোষাল। অন্যান্য চরিত্রগুলির রূপ দেন গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য, অলোক চট্টোপাধ্যায় (পরিচালক), মলয় মিত্র, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণাপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, অমর পাল, তপন বসু, রবি পাল, রঞ্জিত দে, রথীন দত্ত, সুরেশ দত্ত, গীতা নাগ, শুভা দত্ত, রাণু রায়, জয়শ্রী কর।

আদর্শ সংসার

স্বর্গত সাহিত্যিক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'রূপ ও ছন্দ' গোষ্ঠীর প্রযোজনায় অভিনীত হল 'আদর্শ সংসার'। পাঁচ ভাই ও পাঁচ বৌ এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি ও পরিজনদের কেন্দ্র করে সুখ, দুঃখ, আঘাত, প্রতিঘাত, হাসি, কান্না সমন্বিত সাধারণ বাঙালী গৃহস্থ-পরিবারের জীবনযাত্রার একটি পরম উপভোগ্য ও মধুর চিত্র এই নাটকের উপজীব্য। চরিত্রগুলির রূপদান করেন শ্রীমান বসু, দেবী চক্রবর্তী, মোহনলাল ভাটিয়া, দিলীপ সিংহ, অজিত দত্ত, অসিত মিত্র, অরুণ বসু, সুনীল কুণ্ডু, অজিত বসু, রাসবিহারী দাস (পরিচালক), গীতা নাগ, দীপিকা দাস, শিখা ভট্টাচার্য, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, গীতা সেন, স্বপ্না বিশ্বাস প্রভৃতি।

'রাধাকৃষ্ণ' চিত্রের একটি দৃশ্যে সঙ্গিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেতকী দত্ত ও রেণুকা রায়

বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময় সান্যাল ও সত্যরঞ্জন ঘোষ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নমিতা চক্রবর্তী

—আহা হা! ব্যস্ত হয়ে বিয়েটা ভেঙ্গে দিয়ো না। লক্ষ কথার আগে ছেলের বিয়ে দিতে চাও, কেমন তুমি? এখন সোনামণি হয়ে ঘুমোও গে যাও। তারপর বিধামত বাবার সঙ্গে বসে, একটা সম্মিলিত অধিবেশনে কর্তব্য নির্ণয় হবে। কেমন?

আর কথা এগুলো না। কল্যাণী শুতে চলে গেল, আলো নিভল ঘরে ঘরে। ঘুমোবার আগে একটু ভাবল ভাস্কর। তপতী মন্দ কি! কিন্তু সে যেন কেবল সন্ধ্যার ছায়া, বিশ্রামের নীড়। কাজের পর দিনের শেষে, সে আর তার সেতার একত্র হয়ে যে মাধুর্য রচনা করে, তারও প্রয়োজন আছে পুরুষের জীবনে। কিন্তু যে গতিতে আজ চলছে মানুষ—তার বেগ কই তপতীতে? বোঝাই যাচ্ছে না ওকে। মনে পড়ল ভাস্করের লিলি বোসের কথা। কি উদ্দাম! স্কুটারের স্পীডে ভয় নেই, শঙ্কা নেই রাত জেগে নাচতে। বাহুবন্ধে ধরা পড়েও আরক্ত হয় না, মৌনতা ঘনায় না অধরপুটে। ভালোবাসার কথাতে ওড়ায় হাসির ফুলঝুরি।

ভালোবাসা! প্রেম! কথাগুলো এখন অভিধান হতে বাদ দিলেই হয়। ভাবল ভাস্কর। কেউ কি ভালোবাসছে আজকাল? কোন মেয়ে, কোন ছেলে? লিলি? তপতী? জয়ন্তী? প্রবীর? সে নিজে? কেউ না। স্ট্যাটাস্ আর আসঙ্গলিপ্সা ভাগ আনে ভালোবাসার। তাই তো ধৈর্য নেই, ক্ষমা নেই। একটু ত্রুটিতেই সব চুরমার হয়ে যায়। ও দেশেও দেখে এল ভাস্কর—কোন মূল্য নেই ভালোবাসার। সামান্য আঁচে জ্বলে যাচ্ছে সব মায়া। তখন তার নগ্নতা দেখে বিস্মিত হয়েছে সে। ফিরে এসে দেখল এ দেশেও উঠেছে সেই হাওয়া—প্রেমের চেয়ে বড় আত্মসম্মান, ঘরের চেয়ে বড় স্বাধীনতা।

মাঝে মাঝে ভাবে ভাস্কর—সেদিন ছিল ভাল, যখন আদিম নর-নারী কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে মনের প্রথম তৃষ্ণার রূপ না ঢেকে, মিলিত হত অবহেলায়। বিচ্ছিন্ন হত অক্লেশে। আজ মানুষের রক্তে ভরে একটা ঝড় জেগেছে তাই শান্তি নেই, তৃপ্তিও নেই। চলার বেগ থামলেই মুহূর্তের অবকাশে নিজের রূপ দেখে বুঝি চমকে যাবে সবাই, তাই জাজ, আর রক অ্যাণ্ড রোলে নেচে নেচেই নিঃশেষ হতে চাওয়া এই বর্তমান।

॥ ॥ ॥

সাহেব-পাড়ার নির্জন ঘরে রাত্রির প্রসাধন করতে করতে লিলিও ভাবছিল একটি ভাবনা। এগারোটা বাজিয়ে বাড়ি ফিরেছে সে। বিশ্রী কেটেছে সময়। তেতো হয়ে গেছে জিভ সিগারেটের স্বাদে। লিলি জানে ভাস্কর গেছে তপতীর কাছে,—প্রায়ই যায়। তপতীর সিঙ্গুলারিটিকে প্রশংসার চোখে দেখে সে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে নি বলেই অসামান্যা হয়ে উঠেছে তপতী। ভাস্কর কি জানে লিলিও এক নিমিষে সব, সব বদলে দিতে পারে। চলতে পারে, মনীষা, অমিতা—সাধারণীদের মত খোঁপায় বেল ফুলের মালা জড়িয়ে ট্রামে, বাসে—শুধু একবার যদি ভাস্কর বলে!

কতদিন তারা উধাও হয়ে গেছে কত দিকে। একবার গিয়েছিল কাকদ্বীপ বেড়াতে, ভাস্করের সখ। কালবৈশাখী এল পথে! গাছপালার তাণ্ডব, বিদ্যুৎ চিরে চিরে দিচ্ছে আকাশের গা। বাজ পড়ল কাছে কোথায়। ভাস্করকে জড়িয়ে থরথর করে কেঁপেছিল লিলি—কিছু ভয়ে, কিছু সম্ভাবনার প্রত্যাশায়, বুঝি এবার ভাঙবে বাধা। কোথায়! ফ্লাস্ক হতে গরম কফি তার মুখে তুলে দিয়েছিল ভাস্কর। চোখে জল এল লিলির। রিণিদি বলেছিল—কখনো ভালোবাসিস নে লিলি। রিণিদি—জাস্টিস সেনের মেয়ে। রূপের আর গুণের সীমা নেই তার। ভালোবেসেছিল অল্পবয়সী প্রফেসরকে—ব্রাউনিং পড়াতে তার জুড়ি নেই, রবীন্দ্রনাথে অসীম অনুরক্তি। ভালোবাসার স্বর্গ রচনা করে দিয়েছিল রিণি। চুপিচুপি বিয়ে করল তারা। সবার অমত? কি এসে যায় তাতে! একটি ঘর, দু'টি হৃদয়—কত সুখ! তারপর স্বামীকে বিলেত পাঠাল রিণি—স্বামীর, তার প্রিয়ের প্রতিষ্ঠা করবে পরিবারের মর্যাদা দিয়ে। কাটল কতদিন। কত পাস! নাম, খ্যাতি। আর ফিরল না প্রফেসর। ওদেশে রিণির বন্ধুরা দেখেছে, ঘর বেঁধেছে প্রফেসর অন্য নারীর সঙ্গে। সব সহ্য করেছে রিণি। মাস্টারী করে, বেঁচে আছে সে মাস্টারণী হয়ে। একটুও আর চেনা যায় না সেই অদ্বিতীয়া রিণি সেনকে—যাকে একদা ভেনাস বলে স্তুতি জানাতো তরুণ-সমাজ।

রিণির কথা শুনল না লিলি। কিন্তু সাবধান হয় তো ছিলই সে। নিজেকে তীক্ষ্ণ আর তীব্র করে হয়েছিল রহস্যময়ী—অপ্রাপণীয়া। এল ভাস্কর। তার গভীর চোখের তারায় সব ভুল হল, হারিয়ে ফেলল লিলি নিজেকে। শ্যামবনান্তে যে মেঘের গুরু-গুরু ডমরু বাজে, তারই মত কণ্ঠ ভাস্করের; কখন অজান্তে মেলেছে ডানা লিলির মন-ময়ূর টের পায় নি সে। যদি প্রতিদ্বন্দ্বী হত

বকী হালদার, সীমা পালিত—হায় মানবায় কথাই ছিল না। ড়ি মেরে সবার উপর দিয়ে লিলি নিজের জয়মাল্য কেড়ে নিত। য়ে তপতী। কালো, ক্ষীণতনু, ভীতু, সেতার-বাজানো মেয়ে। য়ংবর সভায় লিলি অসামান্যা, কিন্তু প্রদীপ-জ্বালানো ঘরের কোণে া বসবে কোথায়? তপতীকে ঘষে-মেজে, রং-এ ঢং-এ নকল লিলি নানো যায় হয় তো বা, কিন্তু লিলি যদি তপতী হতে চায়—সবাই এনকোর দেবে। ভাববে নূতন পার্টেও অনবদ্য লিলি বোস, বেশ অভিনয় করেছে। টোস্ট অফার হবে তার সম্মানে।

লাগবে নাকি তপতীর সাজ বদলাতে? ভাবল লিলি। বানাবে তাকে একটা দো-আঁশলা মেয়ে, ঘুচিয়ে দেবে ভাস্করের সব মোহ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চমকাল নিজের ভাবনার রূপ দেখে। ছি! ছি! এত নীচে নামতে পারবে না সে। তার চেয়ে বরং এই নিরালা রাতে একটু চোখের জল মুছে দিক গালের রং। নির্জন ঘরে দেখাক তাকে তপতীর মত—নকল তপতী নয়।

সুকল্যাণী জানিয়ে দিল—ভাস্করের মন বোঝা যাচ্ছে না। একটু অবহিত হোক মীনাক্ষী। মেলামেশার সুযোগ দিক। নিজেই এগিয়ে এসে, হয় তো কথা বলবে পাত্র।

মীনাক্ষী ভেবে পেল না আর কি করবে। প্রায় আসছে ভাস্কর, বাজনাও শুনছে কিন্তু ভাবান্তর কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো। দু'পক্ষকেই চুপচাপ দেখে এগিয়ে এল নিজে। লাইট হাউসে ভাল বই, আইস রিভিউ, পিকনিক বোটানিক্স-এ। সব প্রস্তাবেই আগ্রহ ভাস্করের, যাচ্ছেও। কিন্তু আলো জ্বলছে কই! ভালোবাসার সেই অপূর্ব আলো! তবে কি ভাস্কর তপতীকে চায় না? কাকে? কাকে চায় সে? সন্ধানীদৃষ্টি ছাড়ল মীনাক্ষী চারদিকে। সীমা? বেণু? লিলি? ঠিক। লিলি বোস। বোসেদের সঙ্গে ভাস্করের খুব বন্ধুত্ব। শোনা গেছে লিলি নাকি ধাওয়া করে ভাস্করের অফিস পর্যন্ত। দারুণ স্মার্ট। নাচতে জানে ইংরেজী নাচ। আর কথা? কি তীক্ষ্ণ তীব্র কথার প্রক্ষেপণ! মুগ্ধ না হয়ে ভাস্করের উপায় আছে নাকি! খুকুটা বোকা। দিদির মত, ভাল কিন্তু জ্যোতি নেই।

ঠিক এই কথাই ব্যক্ত হল লিলির মন্তব্যে—'তপতী ভাল হতে পারে, কিন্তু গ্ল্যামার কই তার?'

ভাস্কর হাসলো। তার হাসিতে আর দিঠিতে যা উচ্চারিত, তাতে উত্তপ্ত হল লিলি।

—'আমার দিকে তাকিও না অমন করে। তপতীকে খাট করে নিজের কেস প্লীড করছি যদি ভাব, ভুল করবে।'

এবার আর হাসল না ভাস্কর, কিন্তু নিঃশব্দও রইলো না। —'তোমারও কিন্তু ভুল হচ্ছে লিলি। এত সহজ আর হাল্কা কথা মানাচ্ছে না তোমার মুখে। প্রায় ঈর্ষার মত শোনাচ্ছে যে।'

লিলি আরক্ত হতে পারত। প্রসাধন আগেই লাল ছড়িয়ে রেখেছে মুখে, সুযোগ নেই কিছু প্রকাশ পাবার। ভাস্করের বাবার টাকা আছে। সে নিজে এসেছে বিলেত ঘুরে—মস্ত ব্যবসার মালিক, কিন্তু লিলিদের মত জাত-অ্যারিস্টোক্রাট নয় তারা। ওর পক্ষে তপতীর মত ঘরোয়া মেয়েই ভাল—মনে মনে ভাবল লিলি। অনায়াসে সহ্য হোল না কিন্তু চিন্তাটা। অবশ্য ভালোবাসা আর বিয়ে এক নয়। ভালোবাসার জন্য বিয়ে চলত সেকালে—যখন মেয়েরা কপালে কুঙ্কুম লাগিয়ে আশুতোষ কলেজে পড়ত আর ছেলেরা রবিঠাকুরের হুবহু নকল করে সাহিত্য করত। আজ বিয়ে হচ্ছে সামাজিক আর অর্থনৈতিক গোত্র বজায় রেখে—ভালোবাসার একটা ভাব-ভাণও থাকে অবশ্য।

চুপচাপ লিলিকে আবার বললো ভাস্কর—'তপতীর খবর তো তোমরাই ভাল জান লিলি! বন্ধু সে তোমাদের।'

—'কখনো নয়।' সবেগে অস্বীকার করল লিলি। 'ওকে দেখেছি মাঝে-মধ্যে। চেনা তো সেদিনের মাত্র। মীনাক্ষী রায় স্বীকারই করত না ওকে। সমাজে বেরুবে কি করে? তুমি কি জান ওদের খবর! তপতী তো মীনাক্ষী রায়ের স্বামীর মেয়ে; নিজের নয়।'

—'মিসেস রায় বলেন, আমার মেয়ে তপতী।'

—'আমার মেয়ে!' ওকথা বললে তিনবার মূর্ছা যাবে মীনাক্ষী রায়। অতবড় মেয়ে হলে ওর আর রইল কি! ও তো তপতীকে দাঁড় করিয়েছে নিজের প্রচ্ছদপটে। তুমি মুগ্ধ হয়ে গেছ মীনাক্ষী রায়ের ঝলমল দেখে।'

—'আ রে! মীনাক্ষী রায় যে সম্পর্কে আমার পিসী হন।'

—'পিসী? ফুঃ! মা বলেছেন—সি ইজ ইয়োর ফাদার্স ওল্ড ফ্লেম।'

উত্তেজিত লিলিকে শান্ত করতে চাইল ভাস্কর।

—'লিলি! চল ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা—অপূর্ব।'

শান্ত হল লিলি। ক্ষুব্ধ হল পরিমিতিবোধ হারিয়েছে বলে।

—'প্রবীরের খবর কি?' প্রসঙ্গ বদলে দিল ভাস্কর।

—'কি জানি! আমার সঙ্গে তো দেখা নেই কতদিন। সানডেতে আমরা একসঙ্গে খাই, তাও তো দাদা আজকাল প্রতি সপ্তাহেই অ্যাবসেন্ট। মা ভয়ানক নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। বাবা বলেছেন একদিন ওপেন ডিস্‌কাশন করে, সোজা দরজা দেখিয়ে দেবেন। নট এ ফার্দিং। তবে মুস্কিল কি জান—ঠাকুমা ওকে হাজার কুড়ি টাকা দিয়ে গেছেন। ইনট্যাক্ট রয়ে গেছে ব্যাঙ্কে, সুদেও জমেছে কিছু। টাকার জন্ত ভয় পাবে না বেশি। মুস্কিল।' ভ্রূ বাঁকাল লিলি।

—'আমাদের বিয়েটা কবে হচ্ছে?' সোজাসুজি জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করল প্রবীর।

—'তোমার চাকরী, আর বাড়ি ঠিক হলে।' সরল উত্তর জয়ন্তীর।—'চাকরী? বাড়ি? পরে হবে—পরে হবে। এখন চল বিয়েটা সেরে ফেলি। সুইটে নিয়ে থাকব হোটেল কন্টিনেন্টালে। নেপা মিত্তির আছে। বন্দোবস্ত ভাল।'

—'না, না।' বাধা দিল জয়ন্তী।—'ফ্ল্যাট দেখ। আর তার আগে দেখ বিয়েটা করা ঠিক হবে কি না।'

—'ভাবব ত' কেবল তোমাকে। ওসব বাজে ভাবনা ভেবে কি লাভ।'

সুন্দর কথা বলে প্রবীর, কিন্তু বাক-চাতুর্যে ভুলবার মেয়ে নয় জয়ন্তী। বললে—'বাবা-মা, বোন সবার অমত। গোত্রচ্যুত হতে চাইছ তুমি আমাকে বিয়ে করে। পরে আবার অনুতাপে দগ্ধ হয়ে, ফ্লোরার মত ডাইভোর্স করবে না তো? সে আবার এক হাঙ্গামা। মাস্টারীও চলে যাবে তা হলে।'

উঃ! মেয়েটা কি বাচাল! প্রায় আর্তনাদ করে উঠল প্রবীর।—'প্লীজ জয়ন্তী! এসব কথা এখন ভেবো না। বরং হানিমুনে কোথায় যাবে, তাই ঠিক করে ফেল।'

—'হানিমুন? মধুচন্দ্রিমা? ও তো বিয়ের তৃতীয় রাত্রেই খতম। ভুলে গেছ বুঝি আগের কথা?'

—'তুমিও জান বুঝি ও সব? ক'বারের অভিজ্ঞতা?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল প্রবীর। স্লিপার ছুড়ে না মারে। যে বন্য প্রকৃতির মেয়ে জয়ন্তী। আর তাই ত' মুগ্ধ করেছে প্রবীরকে। বানিয়ে কথা বলতে জানে না। রাগ, ভালোবাসা, লোভ—সব কিছুর অনাবৃত প্রকাশ। রেস্তোরাঁয় গিয়ে সব খাবে, মার্কেটে কিনবে সস্তা জিনিস। আশ্লেষে লতিয়ে যায়, আর রাগলে পরম রুক্ষ।

না। এবার কিন্তু রাগে নি জয়ন্তী; বরং হাসল।—'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাক—পরোক্ষ আছে তো কিছু, জানি ফুলশয্যার রাতেই সব মধু শেষ। তারপর আকাশ কালো। ধুলো চাঁদের মুখ ঢেকে দেয়। জীবনভরা তখন কেবল ঝড়—বেঁচে থাকার যুদ্ধ, কোথাও বা ভালোবাসার প্রহসন।'

মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল প্রবীর। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে জয়ন্তী। কপালের চুল ঘামে-ভেজা মুখে কেবল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের প্রসাধন আর তাতেই চোখ দু'টি হীরের মত জ্বল জ্বল করছে। ছলনা নেই, চাতুরী নেই।

—'চল নীরায়।' প্রবীর প্রস্তাব করল।

—'না, না।' বেশি বড় হোটেল পছন্দ করে না জয়া। প্রবীরের মানিব্যাগে কড়া নজর রাখে।

—'মানসী কেবিন। আজ খেয়ে যাই নি। রুটি-মাংস খাবো। তুমিও খেয়ে দেখ, কি চমৎকার বানায় ওরা—সুন্দর! ঝাল ঝাল।'

চৌরঙ্গীর বিকেলের জনারণ্য ঠেলে ঢুকে পড়ল জয়ন্তী হোটেলে, প্রবীরকেও টেনে নিল। দ্বিধা নেই, কৃত্রিমতাও নেই।

'তোমার ফ্লোরার সঙ্গে ত' কত খেয়েছ এমনি।' রুটির ঝোল মাখা টুকরো মুখে ফেলল জয়ন্তী।

ফ্লোরা! সি ওয়াজ এ উইচ! জ্বলে উঠল প্রবীরের চোখ। তরুণ বয়সের উচ্ছৃঙ্খলতা তাকে পেয়ে বসেছিল, কিন্তু ফ্লোরাকে প্রবীর ভালোবেসেছিল সত্যি সত্যি। কন্টিনেন্টের মেয়ে—হাউস মেড। বলত পড়াশুনা করতে চায়, তাই এসেছে লণ্ডনে। ইউনিভারসিটিতে পড়বার জন্য টাকা জমাচ্ছে। কত কথা, কত প্রেম, কত মধু বিদেশিনীর তনুতে। প্রথম বিয়ে করতে রাজী হয় নি প্রবীর। বলেছিল—অন্তত পরীক্ষাটা শেষ হোক। ফ্লোরা জানাল, বিপদ হবে তা হলে। তার মধ্যে সঞ্চার হয়েছে দ্বিতীয় প্রাণের। বাধ্য হ'ল প্রবীর বিয়ে করতে। বিয়ের পর ফ্লোরা জানাল বুঝতে ভুল হয়েছে তার। ক্রমে স্বরূপ প্রকাশ পেল। প্রচুর মদ। কত জালে জড়াল প্রবীরকে। প্রায় জেলের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। ভাগ্যিস ভাস্কর তখন বিলেতে ছিল। সব শুনে ছুটে এসে পড়ল সে, দেশে খবর পাঠাল। মোটা টাকা খেসারৎ দিয়ে মুক্তি পেল প্রবীর, কিন্তু কলঙ্কের কাহিনী পৌঁছে গেল সর্বত্র। গ্রাহ্য করে নি সে। মুক্তি পেয়েছে তাই যথেষ্ট। ভেবেছিল কখনো, কোনদিনও আর মেয়েদের ছায়া ও স্পর্শ করবে না। কিন্তু জয়ন্তী কি মেয়ে? সে তো আফ্রিকার একটুকরো বন্য প্রকৃতি। তেমনি দুর্দমনীয়, তেমনি আকর্ষণীয়!

রাত ন'টায় ভাল লাগল প্রবীরের চুল-ওড়া, ব্যাগ হাতে, পথে দাঁড়ান মেয়েটিকে। ভালোবাসল প্রবীর সকালবেলার শিল্পী শ্যামলীকে। আর জয়ন্তী? জয়ন্তী গলে গেল না, বরং তার সব সন্দেহ অনাবৃত করে প্রবীরের ভালোবাসায় অবিশ্বাস জানাল। তারপর একদিন উদ্ঘাটন করল নিজ পরিবারের পরিচয়। কোন ঐতিহ্য নেই, নেই ছিটে-ফোঁটা আভিজাত্য, মর্যাদাও নেই। আছে কেবল এক রাক্ষুসীর মত অভাব—দারিদ্র্য। বলল—তারা ঝগড়া করে কটুকণ্ঠে। তারা লোভী, তারা ক্রোধী তারা মিথ্যেবাদী। সব বলল জয়ন্তী আর তারই মাঝে মাঝে প্রবীর দেখল জয়ন্তীর আগুন-জ্বলা চোখে জল এসেছে, দেখাচ্ছে ওকে ঝড়-খাওয়া স্কাইলার্কের মত। বাহুপাশে জয়ন্তীকে টেনে নিয়েছিল প্রবীর। তেজী মেয়ে বাধা দেয় নি। কেঁদেছিল প্রবীরের বুকে মুখ রেখে। এক অদ্ভুত অনুভূতিতে ভরে গিয়েছিল প্রবীরের সমস্ত হৃদয়। মমতা—এক কোমল মমতায় সে প্রথম অনুভব করেছিল, সে পুরুষ—যে পুরুষ ঘর বাঁধে, ছায়া আনে নারীর জন্য।

—'জান! মীরার বন্ধু সেই তপতী রায়, তার সঙ্গে ভাস্কর মিত্রের বিয়ে ঠিক ঠাক; অথচ তারই সঙ্গে ঘুরছে তোমার বোন লিলি।'

মাংসের হাড় হতে রস টেনে নিল জয়া। ভাবনা ছেড়ে জেগে উঠল প্রবীর। ছোট চুমুক দিল কোল্ড ড্রিঙ্কে।

—'তাই বুঝি? ভাবনায় পড়েছে তপতী? বোনের বন্ধুকে ভয় পেতে বারণ করে দিয়ো। লিলির আত্মসম্মান বোধ আছে। ভাস্কর আমাদের বন্ধু। বেড়ানো তার নিদর্শন—আর কিছু নয়।'

—'তা হবে'। উদাসীন উত্তর জয়ন্তীর।—'তা বলে তুমি কিন্তু ওরকম বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখাতে কাউকে তোমার টু-সীটারে তুলো না। আমার আবার আত্মসম্মানটা কিছু কম তো। চেঁচিয়ে মেচিয়ে একশা করব হয়ত।'

বিল চুকিয়ে দু'জনে দাঁড়াল বাইরে এসে। দিনের আলো প্রায় শেষ। মাঠে গাছের তলায় হাল্কা অন্ধকার।

—'চল ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট। চিত্রাঙ্গদা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের।'

—'চিত্রাঙ্গদা'? ইতস্তত করল প্রবীর।—'তার চেয়ে চল বরং লাইট হাউসে, সঙ অব সঙ্‌স।'

—'যাঃ! স্কুলে সবাই দেখে ফেলেছে চিত্রাঙ্গদা। কেবল আমিই বাকি। খুব সুন্দর—চল চল।'

বাসের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল জয়ন্তী আর ট্যাক্সি নিতেই হল প্রবীরকে—ভিড় এড়াবার জন্য।

ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট। জানা ছিল গান-ফান কি সব লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। চিত্রাঙ্গদা দেখে মুগ্ধ প্রবীর। উন্মোচিত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে ধীরে ধীরে নারী মহিমায় একটি কুমারী-মন। অপূর্ব! অভিজাত মহলের ফ্যাসন রবীন্দ্রনাথ. দেখা গেল প্রবীরের বহু চেনামুখ। জয়ন্তীকে দেখে বয়ে গেল একটু তরঙ্গ, কিন্তু অতি ভদ্রসমাজ তাই উঠল না কোন ফিস-ফাস। মাথা হেলিয়ে, একটু হেসে অনেকেই চিনল প্রবীরকে, জয়ন্তী রইল উদাসীনতার অস্বীকৃতিতে অলক্ষ্য।

বেরিয়েই মুখোমুখি দেখা—ভাস্কর, সঙ্গে লিলি।

—'আরে। সাহেব যে! এ কি সৌভাগ্য কবিগুরুর। ও! আপনি? বুঝেছি। আপনিই ধরে এনেছেন প্রবীরকে।'

জয়ন্তীর দিকে চেয়ে হাসল ভাস্কর।—'সুন্দর হয়েছে, না?' উত্তর কিন্তু দেবার অবকাশ পেল না জয়ন্তী। দ্রুতপায়ে এগিয়ে যাচ্ছে লিলি, তাকে অনুসরণ করতে হল ভাস্করকে।

—'তোমার বোন পালাল আমায় দেখে।' বলল জয়ন্তী।

ঠিক এই প্রশ্নটাই করল ভাস্কর লিলিকে—'পালালে কেন লিলি? জয়ন্তীর সঙ্গে আলাপ করবার ভয়ে?'

—'সেটা কি খুব অভয়ের কথা না কি?' পাল্টা প্রশ্ন লিলির।

—'এ তোমার অন্যায় কথা। আলাপ হলে দেখতে ভাল মেয়ে জয়ন্তী।'

—'এক্সকিউজ মি ভাস্কর। আমি অত উদার নই। ভাল হলেও থি-ক্লাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারব না।'

উত্তপ্ত হল লিলি।

আজ অনেকটা সময় ভাস্করের কেটেছে লিলির সঙ্গে। ভালই লেগেছে। এখন হঠাৎ যেন সুর কেটে গেল। মনে পড়ল তপতীকে। সে ডাকে জয়ন্তীকে—জয়াদি।' বলে—চমৎকার মেয়ে জয়াদি'। বলে—কি সুন্দর ছবি আঁকে, আর এত মজার কথা বলতে পারে! তপতী হলে এখন ছুটে গিয়ে জয়ন্তীর হাতটি ধরতো, মুছে দিত সম্পদের ব্যবধান দিদি ডেকে। চিত্রাঙ্গদা দেখার পরের রমণীয় লগ্নটি আরো মধুর হয়ে উঠতে পারত।

চাইল ভাস্কর লিলির দিকে। লাল শাড়ি ঠোঁটের লাল রং-এ তাকে দেখাচ্ছে লাল আগুন—শান্তি নেই, বিশ্রামও নেই। মনে মনে চোখ বুজল ভাস্কর।

জয়ন্তী শক্ত করে মনকে বোঝাচ্ছিল—আমি ভালবাসব না, কখনো বাসব না। কেবল বাঁচবার জন্য বানিয়ে বানিয়ে ভাবব—আমি প্রবীরকে ভালোবাসছি। যদি সত্যি সত্যি ভালোবাসি, তবেই মরব। একদিন যখন ছেড়ে যাবে—দুঃখের শেষ থাকবে না, পড়ব ভাজনা-খোলা হোতে তপ্ত খোলায়। বাপের ঘরের দুঃসহ দারিদ্র্য সয়ে যাচ্ছি, কিন্তু স্বামীর তাচ্ছিল্যে ভেঙে যাবে বুক। এতসব কথা বার বার বুদ্ধি নিয়ে ভাবল জয়ন্তী আর নিজেকে বোঝাল। কিন্তু সাধ্য কি তার ভালো না বেসে পারে! সুন্দর, রোমান্টিক প্রবীর কাছে এলেই সে রূপকথার রাজকন্যা বনে যায়। তখন আর জয়ন্তী অনাদি সোমের চব্বিশ বছরের কেঠ-ওঠা—দশজন সন্তানের প্রথমা থাকে না, একেবারে হোয়ে যায় পরমরমণীয়া রমণী। কি লম্বা পলকঘেরা চোখ প্রবীরের! সকালবেলা চা-মুড়ির প্রাতরাশে বসে, মনের অতলে ডুবে গিয়েছিল জয়ন্তী।

—'দেখ টুনু! বড়দির মুখটা কি সুন্দর লাল লাল!'

চমক ভাঙলো রুনুর কথায়। বাবা যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে, ভেঙচি কেটে বললেন—'লাল-লাল আর হবে না! বাপ-মা-ভাইবোনদের অনন্ত দুর্গতি দিয়ে, চপ-কাটলেট সাঁটা হচ্ছে যে নিত্যি। বুঝলে'—হাঁক ছাড়লো অনাদি সোম স্ত্রীর উদ্দেশ্যে—'আমাদের অফিসের সেনবাবু কাল বলল—পরশুদিন দেখে হোটেল হতে খেয়ে, সেই হতচ্ছাড়াটার সঙ্গে ট্যাক্সি চড়ছ তোমার মেয়ে। চড়বে না! মায়না পেয়েছে যে—।'

—'মায়না? না না। সব টাকাই তো আমাকে দিয়ে দিয়েছে জয়া কালকে।' জয়ন্তীর মা বলল রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে।

—'দিয়ে দিয়েছে? কই? আমায় বল নি ত'!' অগ্নিমূর্তি হোল অনাদি সোম—'আমি শালা চোখে অন্ধকার দেখছি আর তুই মেয়ের টাকায় পুঁটলী বেঁধে বসে আছিস!'

ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল স্ত্রী—'পঞ্চাশ টাকা যে রেণুর মায়ের কাছ হতে আনা হয়েছিল সেটা শোধ দিয়েছি—আর সব তো অমনি আছে। তুমি কাল রাত করে বাড়ি এলে, তাই—'

—'তাই! তাই কি শুনি? রাত করে আমোদ-আহ্লাদ করছিলাম, না? কেন এ মাসে টাকা শোধ দিতে গেলে আমায় জিজ্ঞেস না করে?'

—'সে কি! টাকা তো পরদিনই দেবার কথা ছিল। কুড়ি দিন হয়ে গেল—'

—'তাই আমার শ্রাদ্ধ করতে গেলে ফোঁপর-দালালী করে'? বীভৎস মুখে স্ত্রীর দিকে এগুলো অনাদি সোম। ছেলেমেয়েগুলির মুখ বিবর্ণ। একটা তুমুল কাণ্ডের ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত বাড়ি। বাইরে হোতে কে ডাকল অনাদিকে, থেমে গেল ব্যাপারটা।

ক্লিষ্ট মুখে, ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে গেল জয়ন্তী। পড়ে-থাকা চা-মুড়ির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনটি ভাইবোন। মেয়ের দিকে চেয়ে ব্যথা বাজল মায়ের বুকে। সত্যি! দিনে দিনে কি যে হয়ে যাচ্ছেন উনি! এমন কি ছিলেন সেই পঁচিশ বছর আগের ফাল্গুন সন্ধ্যায়! টগবগে ভাতের হাঁড়ির সামনে বসে দিবা-স্বপ্ন দেখল সুরমা—অনাদি সোমের দশটি সন্তানের মা।

আঠাশ বছরের জোয়ান তেজী জামাই। সাতশো টাকা পণ দিতে হয়েছিল,—কিন্তু সবাই বলেছিল সার্থক জামাই করেছ সুরোর মা। সমবয়সীদের চোখে প্রশংসা। কি ভাল ছিলেন স্বামী, আর কত রহস্য! অগুরু ঢেলে দিতেন শাড়ির আঁচলে, তাই নিয়ে ননদ-জায়ের কি ঠাট্টা। তখন বাসা ছিল ভবানীপুরের কুণ্ডু লেনে। শনিবার অফিস হোতে এসেই স্বামী বলতেন—মাথা ধরেছে। শাশুড়ি ভার দিতেন মাথা টিপে দেবার। ঘরে ঢুকলেই সুরমার মুখে অনাদি পুরে দিতেন ভীম নাগের তালশাঁস সন্দেশ। কি লজ্জা! একদিন বড় ননদ দেখে ফেলেছিলেন আর কি!

মনে পড়ল একবার বন্ধুর বৌয়ের অসুখ দেখতে যাবার নাম করে থিয়েটার দেখা।—সীতা। কেঁদে ফুললো চোখ। বাড়ির সবাই ভাবল—নরম মন, অসুখ দেখে কেঁদেছে। সেই জয়া হবার সময় চুপি চুপি আপেল এনে দিতেন। গুঁড়ো মশলা আনতেন বাজার হতে। শাশুড়ি রাগলে বলতেন—বন্ধুর দোকান, সস্তা।'

—'চা দেবে নাকি?' চৌকাঠে এসে বসল অনাদি। চমকাল সুরমা। ধমকাতে গিয়েও থেমে গেল স্বামী। জল! টুলুর মায়ের চোখে জল। কেমন যেন দেখাচ্ছে মুখটা উনুনের আঁচে। কেমন বাপসা হয়ে এল যেন চোখ! না। একেবারে জঘন্য হয়ে যাচ্ছে মেজাজ দিনকে দিন। দোষ নেই স্ত্রীর। ওপরের ভাড়াটে বেণুর মা ক'দিন হতেই কথা শোনাচ্ছে—আগেই উচিত ছিল টাকাটা দিয়ে দেওয়া।

চায়ের কেৎলীতে আঁচল জড়িয়ে গরম জল ঢালছিল সুরমা—শিরতোলা কাঁপা কাঁপা হাতে হাত রাখল অনাদি—'তুমিও নাও চা।'

সুরমা মুখ তুলে চাইলো। চোখের জল নেমে এসেছে হাড়-ওঠা ভাঙ্গা গালে। অনাদির ইচ্ছা হোল হাত বুলিয়ে দেয় একচল্লিশ বছরের লাঞ্ছিত কপালটিতে। বাপ রে! সাতটা বাজছে দোতলার ঘড়িতে ঢং-ঢং। এক্ষুণি বাজার না গেলে নির্ঘাৎ লেট অফিসে। চায়ের শেষ ঢোক, থলি হাতে—বারান্দা পার নিমেষে। সুরমা চেয়ে রইল স্বামীর পথের দিকে। বারান্দার কোণের ছেলেটা মুড়ি মুখে পুরছে। ঘরে ছেলেমেয়েদের হল্লা। নাইট ডিউটির পর মীরা ফেরে নি এখনো। এককাপ চা হাতে মা এসে ঢুকল সামনের খোপটিতে। পার্টিশন করে জয়া তাদের জন্য একটি ঘর বের করেছে।

জয়ন্তী চুপচাপ বসে আছে নিজের বিছানায়। পাশে মীরার চৌকী। দলা হয়ে পড়ে আছে ছেড়ে-যাওয়া আধময়লা শাড়ি-ব্লাউজ। চায়ের কাপ মেয়ের হাতে দিল সুরমা। ছাড়া শাড়ি গুছিয়ে রাখলো, টান করলো কুঁচকান সুজনিটা, তারপর বেণীর ডগার ফাঁসটা টেনে জয়ন্তীর চুল খুলতে লাগল মা।

—'রাগ করিস না জয়া! দুঃখে-কষ্টে তোর বাবা অমন হয়ে গেছেন।—নয় ত' মনে নেই কত ভালোবাসতেন তোকে?'

মনে নেই? সব মনে আছে। কত টফি, লজেন্স, রিবন, নাগরদোলা। বুক ব্যথা করে উঠল জয়ন্তীর। রুক্ষ শুষ্ক চোখ বেয়ে ধারা নামল। বাবা অফিস হতে এসে ডাকতেন—মা, মা মণি! সেই যে বুকের মধ্যে ঢুকে পড়ত সে, আর ঘুমে নেতিয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত ছাড়ত না বাবাকে।

সুরমা রান্নাঘরের দিকে তাকাল। কয়লা পুড়ছে। পুড়ুক! একটু অপব্যয়ে প্রশ্রয় দিল সুরমা। মেয়ের পাশে বসল মা, চুলে একটু বিলি কাটল।

—'তোর একটা ছবির খুব প্রশংসা হয়েছে? তপতী বলছিল! সেই ছবিটা? সেই পুকুর আর শাপলা ফুল? ভারি সুন্দর!—খোকা
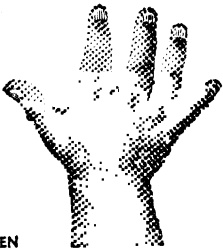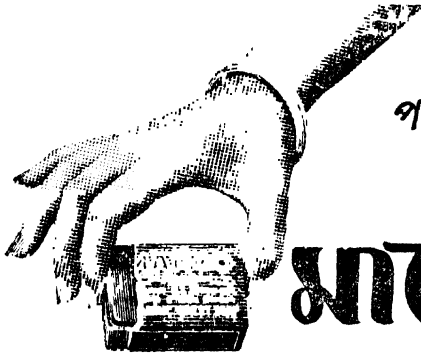
থোকা লাল ফুলে ছেয়ে গেছে পুকুর। ঠিক মনে হচ্ছিল ছোটবেলার বেলতলিতে চলে গেছি। বুঝলি জয়া! অমনি ফুল ফুটেই সেখানে পুজোর মাসের সকালবেলাগুলো আলো হয়ে থাকত।'

মুগ্ধচোখে মায়ের দিকে চাইল জয়ন্তী। চেয়েই রইল। কোথা হতে একটা আলো এসে পড়েছে মায়ের ক্লান্ত-করুণ মুখের উপর—সেই সকালবেলার আলোটিই বুঝি! মনে পড়ে গেল দু'দিন আগের ঘটনা—জল নিয়ে গোলমাল। কলকাতার ভাড়াটে বাড়িতে জল ঘটায় বন্ধু-বিচ্ছেদ। পাশাপাশি বাস। সজনে ডাঁটা চচ্চড়ি, দিলীপ জর্দার আদান-প্রদান চলে হামেশা, কিন্তু জলের প্রশ্ন এলেই কোথায় চলে যায় সব উদারতা। প্রায় পাগলের মত ক্ষেপে উঠে, কে কত রকমে জল-বঞ্চিত হচ্ছে তার হিসাব দিতে বসে। কার ক'টা বালতি, তার আয়তন কি, সে সম্বন্ধেও তীব্র বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হয়ে যায়।

দোতলার বেণুদের অবস্থা ভাল। বেশে-বাসে, চাল-চলনে পাওয়া যায় তার প্রমাণ অহরহ। বেণুর মা এমনিতে মানুষ মন্দ নয়। সুরমাকে ডাকে—দিদি। দুপুরের ঘুমের পর আলসেমি তাড়াবার জন্য রোজ চলে আসে একতলায়। সুরমাদি'র সাজা পানের স্বাদ আলাদা। কি সুন্দর খোঁপা বাঁধতে জানে সুরমাদি'। কেবল প্রশংসা নয়, মাঝে মাঝে হাতে করে আনে মাংসের বাটি। অলক সুবীরকে শুনতে দেয় ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের রিলে। মাসের শেষে হাত পাতলে ধারও দেয় মাঝে মাঝে। গত রবিবার সেই বেণুর মায়ের সঙ্গে জল নিয়ে ঘটল মনান্তর। দুপুরবেলা। সুরমা বসেছিল একরাশ কাপড় নিয়ে কাচতে। রাগে গর গর করতে করতে দোতলাবাসিনী এসে দাঁড়াল সিঁড়ির মুখে। বলতে লাগল, শাণিত বচন। ঘরে অনাদি সোম হিসাব করছিল, আর কোন্ কোন বিষয়ে খরচ কমান চলে। বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এল ঘর হতে।

—'কি? কি হয়েছে?'

বাবাকে দেখেই অন্যরূপ হোল বেণুর মায়ের। মিষ্টি মুখে হেসে বললো—'আপনি উঠে এলেন কেন? ব্যস্ত হবার মত কিছু নয়। আজকে আমি সিনেমায় যাচ্ছি তো। দুপুরের জলটা দরকার। গা-টা ধুতে হবে তাড়াতাড়ি। সুরমাদি' এমন অবুঝ! এই বেলা তিনটেয় বসেছে কাপড় কাচতে। জল নিচ্ছে কল খুলে। আর এমন সময় কি কাপড় কাচে গৃহস্থঘরে! এটা লক্ষ্মী-বেলা তো।'

—'সত্যি তো!'

স্ত্রীর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁত কড়মড় করল অনাদি।

—'যত অলক্ষ্মীর কারবার! দুপুরবেলা কাপড়কাচা। শীগ্‌গির বন্ধ কর কল।'

হেসে হেসে উপরে উঠে গেল বেণুর মা। প্রায় ফর্সা স্বাস্থ্যবতী নারী। শান্তিপুরী শাড়ি এখানে-ওখানে সোনার চিক্‌চিক্ শরীরে—ভালোই লাগছে দেখতে।

—'যেমন রূপ, তেমনি গুণ! ছঃ!'

অনাদি সোম ঢুকল ঘরে। মায়ের দিকে চেয়ে চোখে জল এসেছিল জয়ন্তীর। বেলা তিনটায় অভুক্ত শীর্ণ ক্লান্ত মুখ। এক কড়া সোডায় ভিজানো বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর। ডান হাতের শাঁখাটা ভেঙ্গে গেছে মাস দুই, একটা লাল কড়। মা, তার মা অলক্ষ্মী!

সুরমা কিন্তু ঝগড়া থাকতে দেয় নি। সুন্দর করে খোঁপা বেঁধে দিয়ে, সিনেমায় যাবার আগেই ভাব করে ফেলেছিল বেণুর মার সঙ্গে। অবাক হয়ে দেখেছিল মায়ের গলা জড়িয়ে বেণুর মায়ের মন খারাপ করা,—জল নিয়ে অসহিষ্ণু হয়েছিল বলে মন খারাপ।

জয়ন্তীদের দীনতা দেখে সবাই। তাদের করুণা করে, কটাক্ষ করে আত্মীয়-স্বজন। বাবার মেজাজ, দাদুর রাগ, ভাইবোনদের বয়ে যাওয়া দেখে তারা। দেখে নাকি জয়ার মাকে? ছেঁড়া কাপড়ে, মলিন কোণে পড়ে থাকা হীরাটির দ্যুতি চোখে পড়ে না কারোর? মাকে শুষে নিচ্ছে সংসার আর তারা দশটা ভাই বোন মিলে। জয়ন্তীর কিন্তু মনে হয় তবু আছে আরো অনেক জায়গা আর শান্তি আছে মায়ের ছেঁড়া আঁচলটির তলায়। এই তো সকালের ব্যাপারের কথা। সেই কুৎসিত বীভৎসতার উপর মা একটু যেন কি ছড়িয়ে দিয়েছেন—জয়ন্তীর নিজের চোখ ভিজেছে, বাবার মুখের সেই নিদারুণ নিষ্ঠুর ভাব আর নেই। এমনি, এমনি হয় বারে বারে। বাড়িতে ঝড় উঠে। স্বার্থপরতার হিসাব-নিকাশের দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। মনে হয় বুঝি আর কেউ কারোর দিকে জীবনেও তাকাতে পারবে না। চরম মুহূর্তটিতে বেরিয়ে আসেন মা। হলুদমাখা রোগা হাতখানি বুলিয়ে বুলিয়ে কি যেন করেন,—আবার সব সহজের মধ্যে চলে আসে। ঠাকুমা ছোট ভাইটাকে গোপাল বলে চুমো খান, ঠাকুর্দা খোঁজ নেন বাবার জ্বর ছাড়ল কি না। অনাদি সোমও এসে মেয়েদের ঘরে দাঁড়ায়।

—'কি রে! মুখ ভার কেন? বকেছি বুঝি? যা, যা, রাগ করে না। আর আমারো হয়েছে এমন মেজাজ!'

—'তোর বিয়ের কথা হচ্ছে নাকি তপতী'? মীরার জিজ্ঞাসা। মা সন্ততিসহ গেছেন মামাত ভাইপোর অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে, অফ ডিউটির দুপুর গুলতানি জমাবার জন্য তপতীকে ধরে এনেছে মীরা।

—'বিয়ে, কই? মোটে ভালোবাসার কথা হচ্ছে।' জানালা দিয়ে ফটপাথে ঘূর্ণীফুলের হলদে বুটি তোলা দেখতে দেখতে বলল তপতী।

—'তার মানে?' হতভম্ব হল মীরা।

—'মানে আবার কি? বিদ্যা, ধন আর চরিত্রের কুষ্ঠী মিলিয়ে মা ধরে এনেছেন ভাস্কর মিত্রকে। সপ্তাহে তিন দিন তিন রকম পোষাক পরে তিন রকম মেকআপে অ্যাপিয়ার হচ্ছি তার সামনে। এখন গৌরচন্দ্রিকা চলছে। ভাস্কর মুগ্ধ হলেই শুরু হবে কীর্তন।'

ভীষণ হাসলো মীরা, তপতীও।—'উঃ! তপতী! তুই কি যে সিনিক হয়ে উঠছিস দিন দিন। আগে তো এমন ছিলি না।'

—'তার মানে—আগে নাবালিকা ছিলাম।'

—'কিন্তু ভেবে দেখ তো—তোর মা যা করছেন, সে তো তোরই ভালর জন্য।'

—'স্বীকার করছি। তবে কি জানিস—ভাল বলা আর ভালোবাসানো এক নয়।'

—'ভাস্কর তো খুব যোগ্য পাত্র তপতী!'

—'আরে বোকা! আসল গণ্ডগোল তো ওখানেই। পাত্রের যোগ্যতা সম্বন্ধে দ্বিমত কই! পাত্রীও মুখিয়ে রয়েছে। দু'পক্ষের বাবা-মা গোধূলীলগ্নে লাগিয়ে দিলেই পারতেন। মিটে যেত গণ্ডগোল। মা ভাবলেন সেই আদ্যি যুগে বিয়ের পর ভালোবাসা হোত। এই যুগের দাবী, প্রণয় পরিণয়ে পরিণীত পাবে। সুতরাং ডাকো চায়ের নিমন্ত্রণে, বেড়াতে পাঠাও সব রোমাঞ্চকর জায়গায়। তোড়জোড় হোক প্রেমে পড়াবার—তাই চলছে।'

—'তা বেশ তো! ভালোবেসেই ফেল না ভাস্করকে।'

—'আঃ! অত সোজা কি না? প্রথমেই ভুল হোয়েছে মায়ের। সম্বন্ধ করে বিয়ে দিতে গেলে, যৌতুকের ভারে হলেও হতে পারতাম অদ্বিতীয়া। স্বয়ংবরে মেলা প্রতিদ্বন্দ্বী। সর্বপ্রধান লিলি বোস। স্কুটারের পিছনে বসে উধাও ছুটছে, নাচছে রাতভরে আর ইংরেজী-ফরাসী মিশিয়ে এমন সব বুলি দিচ্ছে, যে ভাস্করের চোখ বিস্ফারিত। ভালোবেসে কি শেষে হতাশ প্রেমিকা হব বলতে চাস?'

খাটের ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে হাসলো দুই বন্ধু।

—'ইঃ। কি যে হাসতে পারে মেয়ে দু'টো।' ঘরে এসে ঢুকল জয়ন্তী। রোদে ঝলা মুখ।

—'কি হলো এত হাসির?'

—'হাসি নয়, রীতিমত করুণ ব্যাপার। তপতীকে ওর মা ভালোবাসতে অর্ডার করেছেন, কিন্তু লিলির জন্য ও হালে পানি পাচ্ছে না। তোর প্রবীরের বোন—লিলি, দিদি।'

—'যাঃ অসভ্য! বিয়ের আগে তোর-টোর বলতে নেই। আমার লজ্জা করে না?' জিভ কাটল জয়ন্তী। তিনটি মেয়ের হাসির জলতরঙ্গে মুখর হল অলস দুপুর।

—'প্রবীর তোমাকে খুব ভালোবাসে—না জয়াদি?' তপতী জানতে চাইল ভালোবাসার রং-এর খবর যা একটু—লেগেছে তার মনেও, আর তাকে রেখেছে অতি সঙ্গোপনে সবার চোখের আড়ালে।

—'বাসবে না? ও যে মদ খায়।' বলল জয়ন্তী।

—'ও মা!'

চেঁচিয়ে উঠল দুই উৎসুক অল্পবয়সী মেয়ে।

—'দেখিস! ভির্মি যাস নে। মদ না খেলে ও আমার ভালোবাসবে কি করে? হাড়বেরকরা চব্বিশ বছরের মাষ্টারণী! ওর সেই মদ-খাওয়া চোখের রঙেই তো রঙিন হয়েছি আমি।'

মৃদু হয়ে এল জয়ন্তীর গলা। ধড়ফড় করে উঠে বসল তপতী:—'রঙ তো চিরকাল থাকে না জয়াদি! তখন?'

—'থাকে। থাকে। এ যে নেশার রঙ, বড় পাকা রঙ। একবার ধরলে আর ছাড়ানো যায় না। মদে যেমন ওর চোখ জ্বলে, জ্বলে যায় গলা—তবুও ভাল লাগে, তেমনি আমিও যে জ্বালাচ্ছি প্রবীরকে আমার লোভ দিয়ে, দৈন্য দিয়ে, নীচতা দিয়ে। জ্বলুনির

জানেই ও কখনো ছাড়তে পারবে না আমাকে।' বুজে গেল জয়ন্তীর স্বর।'—

—'দিদি দিদি।' জড়িয়ে ধরল বোনকে মীরা। 'এমন করে বলিস না ভাই আমরা কি এতই খারাপ নাকি রে তপতী?'

বন্ধুকে সাক্ষী মানল মীরা।

তপতী চমকে গিয়েছিল। ভাস্করকে জড়িয়ে সেও ঠাট্টা করে নিজেকে, কিন্তু মনে মনে জানে বীণা বাজতে শুরু করেছে মূলতানে। এখনো দেখা দেয় নি তরুণ তপন কিন্তু আলোর সোনার রেখা ধরা পড়েছে পূব-দিগন্তে। বুকের মধ্যে দুরু দুরু—ভালোলাগার ভয়। সে ভয় যেদিন কাটবে সেদিন তারই হবে জয়। লিলি পারবে না, পারবে না তাকে হারাতে। লিলি তো রঙিন ডিকান্টারে দামী মদ। ভাস্কর মদ খায় না।—যতই ছুটুক আর নাচুক লিলি, আশাবরীর যে সুর আছে তপতীর বীণায় তাই বাজছে ভাস্করের বুকেও। কিন্তু ভালোবাসার এ কোন্ জ্বালা, বেদনা প্রকাশ পাচ্ছে জয়ন্তীর কথায়?

—'থেকে থেকে আনমনা হয়ে যাওয়া তোর রোগ দাঁড়িয়েছে বাপু!' বন্ধুকে ঠেলে দিল মীরা।—'কথা বলছিস না কেন? আমরা খুব খারাপ?'

সচেতন হল তপতী।—'নানা রকমে জয়াদি'র মন খারাপ হয়েছে, ওর কথা ধরছিস্ কেন।' বন্ধুকে উত্তর দিল তপতী। তাকাল জয়ন্তীর দিকে।

—'তুমি প্রবীরের উপর কিন্তু অন্যায় করছ জয়াদি'। ওর এমনিতেই স্নেহশীল স্বভাব—আর তোমার মত মেয়েকে কে না ভালোবাসবে? যে চেনে, জানে—সে-ই তো ভালোবাসে তোমায়।'

হাসল জয়ন্তী।—'সবাই বাসে? তোর ভাস্করও তাহলে ভালোবাসে বল! সে তো চেনে আমাকে।'

—'খুব ভাল বলে।' একটু বুঝি লাল হ'ল তপতী।

—'চল না দিদি একদিন আমাকে নিয়ে বেড়াতে। তোরা তো কত জায়গায় যাস। আর প্রবীরের সঙ্গে আমার আলাপ করতে ভারি ইচ্ছে হয়। মা ও বলছেন।'

—'মা বলেছেন?' আশ্চর্য হোল জয়ন্তী।

—'হ্যাঁ। মা বলেছেন—তোর বিয়েতে বাধা দেবেন না, চেষ্টা করবেন বাবার মত করাতে। কেমন ওর ধরণ-ধারণ। মা তো তোকেও বলেছেন, না তপতী?'

—'হ্যাঁ।' মাথা হেলাল তপতী। 'ভাস্করকে বলব মীরার সঙ্গে প্রবীরের আলাপ করাবার ব্যবস্থা করতে।'

—'কোথায়? কোথায় ব্যবস্থা করবি? তোরা যেসব জায়গায় যাস, সেখানে ঢুকতে তিনবার হোঁচট খাবে মীরা। আলো আর বাজনায় এমন চমকে যাবে ও, যে প্রবীরের সঙ্গে কথা বলতেই ভুলে যাবে। তার চেয়ে বরং চল ডায়মণ্ড হারবার—চা আর বিস্কুট—যা গলায় বাধবে না মীরার।'

হাল্কা হাসল জয়ন্তী।

—'আচ্ছা দিদি! প্রবীর নয় তো বড়লোক আছেই। অনেক টাকা, গাড়ি, বাড়ি। কিন্তু তুই কি তার কাছে ভিক্ষে চাইছিস, যে নিজেকে সর্বদা এমন ছোট করে তুলিস? তারপর তোর যখন মনেই হচ্ছে—তোদের মধ্যে এত তফাৎ, তখন বিয়ে করবারই দরকারটা কি?'

ক্ষুব্ধকণ্ঠ মীরার। সমর্থনের জন্য চাইলো সে বন্ধুর দিকে। সায় দিল তপতীও।

—'সত্যি জয়াদি'! আমিও ভেবে পাই না—যেখানে তোমার মন জ্বলে যাচ্ছে সেখানে ভালোবাসা গড়ে উঠছে কি করে? তুমি কি এমন মন নিয়ে বিয়ে করে সুখী হবে?'

—'সুখ? সুখের জন্য প্রবীরকে বিয়ে করতে যাচ্ছি এ ধারণা জন্মাল কি করে তোদের? সুখ তো ছিল সেই ছোটবেলায়—যখন মায়ের আঁচল কেড়ে গায়ে জড়িয়েছি, ভাইবোনদের সঙ্গে একবাটি হোতে মুড়ি খেয়েছি ভাগ করে। তারপর হোতে আর সুখ কই? সেই বৃষ্টির দিনে অল্প-জায়গা বিছানায় নিটোল গভীর ঘুম? এখন তো কেবল বড় হব, অনেক বড়। গাড়ি-বাড়ির গোত্রে অভিজাত হয়ে উঠবো—তার ভাবনা।'

—'তুই বড়লোক হবি কি করে? প্রবীরকে তো শুনছি ওর বাবা কিছু দেবে না। ও নাকি চাকরী করবে বার্মা শেল-এ আড়াইশো টাকা মায়নায়?'

মীরা প্রশ্ন ছুড়ল।

—'পাগল হয়েছিস?' চাকরী করতে দিচ্ছে কে ওকে? ও চাকরী করলে বিমান বোসের জাত যাবে না?'

—'জাত যাবে?'

চোখ বিস্ফারিত দুই সখার।

—'চাকরী করলে, জাত যায় না-কি? এ মা! বিমান বোস ত' চাকরীই করে।'

—'সে চাকরা সেক্রেটারিয়েটের উপর তলায়, সাতাশ শো পঞ্চাশ। বার্মা শেল-এ ছেলে চাকরী করলে, কেরাণীর মেয়ে বিয়ে করলে, ওদের জাত যায়। বিমান বোস কক্ষণো জাত দেবে না। ছেলেকে মোটা টাকা, গাড়ি-বাড়ি সব দিয়ে ঠিকই স্বস্থানে রেখে দেবে। আমাকে বাদ দেবে পরিবারের তালিকা হতে, কিন্তু দেখবি দু'বছরের মধ্যেই আমি এমন ভোল বদলে ফেলবো যে, লিলি বোসের সঙ্গে আমাকে একটুও তফাৎ করা যাবে না—কেবল পিতৃপরিচয় ছাড়া।' জয়ন্তী থামল।

—'দরকার নেই বাবা এমন বড়লোক হয়ে। বাবা-মা সবার মনে কষ্ট দিয়ে, ভাইবোনদের বঞ্চিত করে গাড়ি, টাকা না হলেই ভাল। আমি বলি, বুঝি তুই প্রবীর বোসকে ভালোবেসে বিয়ে করছিস—তা না টাকা! দূর দিদি! দরকার নেই অমন বিয়েতে।'

না দরকার নেই বই কি! আজন্ম মাষ্টারী করে করে বুড়িয়ে যাবে তবু সেই জীবন নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কোনমতে বেঁচে থাকতে হবে। পারবে না, পারবে না জয়ন্তী। তারও বুঝি কষ্ট হয় না মা-বাবা, রণু, টুমুর জন্য? ভিজে যায় না চোখের পাতা? কিন্তু তবু অসহ্য এই দারিদ্র্য। আর ভালোবাসা? তাকে ফেরাবে কি করে! রাশি রাশি কথার ঝলক—তার তলায় চুপ্ চাপ্ বসে আছে যে সে!

যাদের জন্য মীরার ভাবনা, জয়ন্তীর ভাবনা তারাও, অন্তত

তাদের মধ্যে একজন, ভাবছিল নিজেদের কথা। সেই ভাবনার প্রমাণ পাওয়া গেল মাসের ঠিক শেষ দিনটিতে।

রাত দশটা। সব কাজ শেষ। শোবার আগে এ সময়টা বাইরের একফালি বারান্দাটুকুতে একটু বসে থাকে সুরমা। বন্ধ গলি, পাশে সাকারদের বাড়ির দেয়াল বেয়ে উঠেছে যুঁই লতা—তার একটা গুচ্ছ এদিকে ঝুঁকে পড়েছে অকারণ দাক্ষিণ্যে। বড় খোকা, সুরমার আঠারো বছরের ছেলে অলক এসে বসল মায়ের পাশে—একটু বেশি করে পাশ ঘেঁষে। অলক বখে-যাওয়া ছেলে। ইস্কুলের মায়না দেয় নি যেন কত মাসের, খবর দিয়েছেন মাস্টার মশাই। তার নাম কাটা গেছে। মায়নার টাকা খরচ করেছে অলক অন্যভাবে। নিশ্চয় বিড়ি, সিগারেট, সিনেমায় উড়িয়েছে টাকা। বাবা বার বার কড়া হুকুম দিয়েছে বাড়ি হতে বেরিয়ে যেতে। জয়ন্তীরও সেই মত, কেবল মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বলে না কিছু স্পষ্ট করে।

পুড়ে পুড়ে সুরমারও মনের মাধুর্য ক্ষয়ে গেছে। মনে হয় দেয় শাশুড়ির কথা মত ভাতের বদলে ছাই বেড়ে। তক্ষুণি বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তার অলক! সেই একডালা গন্ধরাজের মত গোল গোল নধর ধবধবে খোকন সোনা! অবুঝ মায়ের বুক ব্যথায় তোলপাড় করে ওঠে। ছেলের চোখের দিকে চেয়ে মনে হয় এ তো চুরি করবার, দোষ করবার চোখ নয়। ভুল, মস্ত ভুল বুঝেছে সবাই। তার অলকের মুখে যে এখনো দুধের গন্ধ লেগে আছে, ও সিগারেট খাবে কি!

—'মা'। আস্তে আস্তে মায়ের পিঠে মুখ গুঁজল অলক।

—'কি রে? ঘুম পায় নি? বড় গরম না? এখানে শুবি একটু? দেখ হাওয়া আসছে, মাদুর পেতে দেব?'

—'না, মা! মা।' অলক মায়ের পিঠের মধ্যে যেন মিলিয়ে যেতে চাইল।—'কাল তুমি পাঁচটার মধ্যে আমায় খাবার দিতে পারবে?'

—'পারব না কেন? কিন্তু অত সকালে যাবি কোথায়? এখন তো শীতকাল নয়।'

ক্রিকেট খেলার সময় দু'একবার এ রকম ভোরবেলা খাবার চেয়েছে অলক কিন্তু এখন কি খেলা—!

অলক বুঝল মা কি ভাবছেন।—'খেলা নয় মা। আমি একটা কাজ পেয়েছি। ভোর সাতটায় নিশ্চয় পৌঁছতে হবে সেখানে—বেলেঘাটা।'

—'কাজ? তুই—!'

অবাক হয়ে গেল সুরমা।

অবাক হল বাড়ির সবাই। স্কুলের মায়নার টাকা দিয়ে সিগারেট খায় নি, কিছু করে নি অলক। বেলেঘাটার কারখানায় টাকা-ছাড়া কাজ শিখেছে এতদিন। মায়না না দিয়ে সেই টাকা খরচ করেছে যাতায়াতে। আটমাস পর এই মাস হতে 'পেইড হ্যাণ্ড' হয়েছে সে। নব্বই টাকা, ওভারটাইম খাটলে আরো, আর কাজ শিখলে অনেক উন্নতি। অনাদি সোম উদ্‌ভ্রান্তের মত চেয়ে রইল ছেলের দিকে। অলক গোল্লায় যায় নি? চেষ্টা করেছে তার পাশে দাঁড়াতে—হাত লাগিয়েছে কিস্তিওয়ালার ধার শোধে?

দৃষ্টি পড়ল রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ান স্ত্রীর প্রতি। কতদিন, কত যুগের দুর্ভিক্ষ পার হয়ে, আবার বুঝি সুরমার কাছে পৌঁছতে পারবে সে। বাবার ধার করা গর্ত বোজাতে হয়েছে নূতন নূতন গভীর গর্ত, নিজের সংসারের জন্যও গর্ত, তার গ্রাসে গেছে জীবনের সুখ আশা সব। আর কিন্তু ভয় নেই। এবার আর অনাদির বুড়ো থরথরে হাত নয়, এবার সবল যৌবনের হাত—জয়া, মীরা, অলকের হাত লেগেছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। ফিরে আসবে সেই সুন্দর হারিয়ে যাওয়া জীবন।

বিশ্বাস, ভালোবাসা—তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে অনাদি। ও কে এসে পায়ের ধুলো নিচ্ছে? অলক? কোথায় চলেছে সে? ও চুরি করেছে? জেল হবে? পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে? পালিয়ে যাচ্ছে? না, না। অলক যে চাকরী করতে যাচ্ছে। ভাল কাজ। ভবিষ্যতের আশা আছে হাতের কাজে, কাজ শিখলে ওঠা যায় অনেক উপরে, সেই আশার আলো ছেলের চোখে, সবার চোখে, জয়া, মীরা—বাচ্চাগুলোর চোখেও। তবে আর কি? তবে?

এবার রাতের ঘন অন্ধকার নেমে এল উত্তেজিত খিটখিটে অনাদি সোমকে বিশ্রাম দিতে। বারান্দাটা কি নরম! চীৎকার—কান্নার শব্দ। আরে না, কিছু না। কিছু হয় নি তার—একটু ঘুম। একটু আরাম—সব শরীর ছেয়ে গিয়েছে আরামে।

—'মীরা আলাপ করতে চায় প্রবীরের সঙ্গে।'

—'কি মতলব? ভাওচি দেবে না আত্মসাৎ করবে?'

ভাস্করের কথায় হাসল তপতী।—'দু'য়ের একটাও নয়। ওর মা চাইছেন, মীরা প্রবীরের সঙ্গে আলাপ করুক।'

—'অর্থাৎ পাত্রের রূপ, গুণ, দোষ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে চান মহিলা। কিন্তু ভদ্রে! তোমার মীরা কি এমন গুরুভার বহনে কৃতকার্য হতে পারবে? অবশ্য পাত্রের রূপ একেবারে প্রকাশ্য ব্যাপার। নেপথ্যের কিছুমাত্র কারিকুরি নেই তাতে, আর গুণ তো দেখছই—দর্শন এবং স্পর্শন মাত্রেই মেয়েরা অভিভূত। বাকি রইল দোষ। এ জিনিস মানুষ এমন সযত্নে আবৃত করে রাখে যে ধরা শক্ত। তবে যদি সাক্ষীকে বিশ্বাস কর—বলবো, বোসেরা খারাপ মানুষ নন, আর তাদের মধ্যে প্রবীর সর্বোত্তম। টাকা আছে কিন্তু সে টাকায় ওর চিরদিন বিরাট তাচ্ছিল্য। কোল্ড আভিজাত্যের প্রতিও।'

—'লিলি বোসও তো খুব ভাল মেয়ে।'

হাসিতে চিক চিক করে উঠল ভাস্করের চোখ।—'হ্যাঁ। খুব ভাল। তবে বর্তমানের আলোচ্য প্রবীর। লিলি নয়। লিলির প্রসঙ্গ চালাতে চাও—আপত্তি নেই, কিন্তু সিফটিং গ্রাউণ্ড দোষ এসে যাবে।'

তপতী অপ্রস্তুত হল।—'মীরার বাবা-মা কিছুতেই বুঝছেন না প্রবীর কেন জয়াদি'কে বিয়ে করতে চায়। প্রথমত জয়াদি' তেমন সুন্দরী নয়, মাস্টারী করে—আর ওদের বাড়ির অবস্থা তো প্রবীরদের তুলনায়—'

—'ও সব মাইণ্ড করে না প্রবীর। বিলেতে আমি ওকে ট্যাক্সী চালাতে দেখেছি। জয়ন্তীকে ভাল লেগেছে ওর, সুতরাং আর সব প্রশ্ন অবান্তর।'

—'প্রবীর বোসের তো ভালোবাসার অভ্যাস আছে। মেয়ে দেখলেই ভাল লাগতে দেরি করে না, তারপর পালায়।' বলল তপতী।

এতক্ষণ হাসিমুখে কথা বলছিল ভাস্কর, এবার গম্ভীর হল। —'তপতী! মেয়ে সম্বন্ধে প্রবীরের সুনাম নেই তার কারণ ওর সরল সোজা ভাবপ্রবণ হৃদয়। যাকে নিয়ে খেলা করা উচিত, তাকেও একটুও ফাঁকি দেয় না প্রবীর, ফল ফাঁকি পড়ে নিজে। মেয়ে খেলা ভেঙ্গে চলে যায়, ওর কাঁধে চাপে কলঙ্ক, আর পুরুষ বলে সেটা বহন করে বিনা প্রতিবাদে।'

—'মেয়েরা বুঝি কেবল খেলা করে? কখনো নয়।' উত্তেজিত হল তপতী।

সস্নেহে তপতীর দিকে চাইলো ভাস্কর। কথা হচ্ছিল তপতীদের বাড়িতে বসে। বাইরে বৃষ্টি, বেরুবার প্রস্তাব তাই বাতিল করে বাজনা শুনতে চাইলো ভাস্কর। মীনাক্ষী ভারি খুশি।

—'তাই ভাল। আর বেরিয়ে কাজ নেই। আমাকে অবশ্য যেতেই হবে। মিটিং আছে জরুরী আমাদের মহিলা-সমিতির। একটা ক্যান্টিন খুলবার কথা হচ্ছে। তোমরা গল্প কর। বাজনা হোক, মানদা পকৌড়ী ভেজে দেবে।'

আরক্ত হয়েছিল তপতীর মুখ। বাজনা বাজাতে যে আর একটুও ভালো লাগবে না সে কথা বুঝেই ভাস্কর বাজাবার কথা তোলে নি এবং তাতেই এত খুশি হয়েছিল তপতী যে, হাসিমুখে নিজে হতে নানা কথাতে বলছিলই, মীরাদের প্রসঙ্গও এনে ফেলল।

তপতী বড় আড়ষ্ট আর নিজেকে এত বেশি ঢেকে রাখতে চায় সে, যে মাঝে মাঝে বোরিং লাগত ভাস্করের, কিন্তু প্রথম হোতেই কেমন যেন একটু নরম ভাব জন্মেছিল তার প্রতি। তারপর পরিচয় ঘন হবার সঙ্গে একটা আবিষ্কার ভাস্করকে আনন্দ দিচ্ছিল—এই তপতী-মীরার মত মেয়ে, এরা বোকা নয়। প্রচুর পড়াশুনো করে পাস করেছে, এখনো পড়ছে। আলোচনায় নামালে দেখা যায়, কথা বলে আরাম আছে এদের সঙ্গে। যে কোন প্রসঙ্গে 'হাউ স্ট্রেঞ্জ!' বলে এক নকল বিস্ময়ে ঘাড় বাঁকায় না। মূর্ছা যায় না নীতিবিরুদ্ধ কোন ব্যাপারের কাহিনী শুনে—যার নায়িকা হয় তো তাদেরি মত কোন মেয়ে। এরা জেদ করে, তর্ক করে, আবার কিশোরী কৌতূহল নিয়ে যা তাদের জানা নেই সে সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যাটা ভাল কাটবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই জন্যই প্রায় তপতীর সঙ্গ নিত ভাস্কর। ক্রমেই সে দেখছিল নিজস্ব একটা মতামত আছে তপতীর এবং সে মত যুক্তিবাদী, যুক্তিগ্রাহ্য। এজরা পাউণ্ডের কবিতা সম্বন্ধে নিজের কথা শুনবার আশা করে নি ভাস্কর একটি সদ্য বি-এ পাস করা মেয়ের মুখে। আবার এই ধীমতী মেয়ের মধ্যে বসে আছে একটি লাজুক, অনভিজ্ঞ তরুণমন—যার ঘুম এখনো ভাঙ্গে নি, কাটে নি শৈশব-স্বপ্ন।

ভাস্কর মনে মনে বুঝেছিল এদেরি দলের মেয়ে জয়ন্তী। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, যুক্তিতে কঠিন, আবার ভালোবাসায় গলে যায়, ঠোঁট ফোলায় আদর না পেলে। মধুর, মনোহর! প্রবীরের কাছে তাই বাস্তব অন্য সব দিক তুচ্ছ হয়ে গেছে। ভাস্কর তপতীর রাগ দেখল। মাথা নীচু। ঝিনুক কানে দু'ফোটা লাল চুনী। লাল হবার প্রতীক্ষারত সরু সিঁথি আর কালো চুলে আলো পড়েছে। শাড়ির পাড়টা আঙুলে খুলছে আর জড়াচ্ছে। একটু দেখল ভাস্কর ছবিটি। বলল—'সবাই কি খেলা করে? অন্তত তোমার জয়াদি' যে করছে না একথা প্রবীর ভালই বুঝেছে। কিন্তু খেলা করবার মত মেয়েও আছে তপতী। খেলতে খেলতে তাদের নেশা ধরে যায়। বোঝে না খেলতে বসে এরা ভাঙছে মানুষকেও। কি রাগ গেল? বুঝলে আমার কথা?'

—'কিন্তু ছেলেরাও তো ও রকম খেলায় কত মেয়েকে কষ্ট দিচ্ছে'। বাধো বাধো গলা শোনা গেল তপতীর।

—'দিচ্ছে।' উত্তর দিল ভাস্কর। 'প্রবীর তাদের মত নয়, আর'—তপতীর চোখের মধ্যে তাকাল ভাস্কর—'আমাকেও বাদ দিতে পার সেই খেলোয়াড়দের দল হতে।'

তপতীর চোখের সাদা পর্যন্ত লাল হয়ে গেল। আবার পর্যবেক্ষণে মন দিল শাড়ির পাড়।

ভাস্কর বুঝল আবার নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেল তপতী। মনে পড়ল তার লিলিকে। এমন কথায় লিলি কৌতুকে, রহস্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্পষ্ট হয়, প্রগলভ হয়। আর হয় তো কোন কথাই বলবে না তপতী। বিশ্রী হয়ে যাবে সন্ধ্যাটা।

কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ, শোনা গেল বৃষ্টি পড়বার, মেঘ ডাকবার শব্দ। সমস্ত পরিবেশের প্রতি বিরুদ্ধ হয়ে উঠল তপতীর মন। ভাবতে লাগলো সে,—ভাস্কর জানে—ভাল করেই জানে, তপতীর সঙ্গে মিশবার অর্থ তপতীকে বিয়ে করবার পথে অগ্রসর হওয়া। কি কুৎসিত! সে মনে মনে মীনাক্ষীর নিরাবয়ব উপস্থিতি উপলব্ধি করল। দু'জনকে একা রেখে সে যেন ইচ্ছে মত বানিয়েছে একটা বাদলার সন্ধ্যা, আর পিছনে দাঁড়িয়ে অনবরত দু'জনকে ঠেলছে প্রেমে পড়বার জন্য। কি বিশ্রী! ভাস্কর নিশ্চয় ভাবে তপতীর সব কিছুর পিছনে রয়েছে বিয়ে করবার মোটিভ। কড়া বাঙলায় জয়াদি' যাকে বলে—ফাঁদে ফেলবার মতলব। সব দিক দিয়ে যেন ভাস্করকে আটকাবার একটা আয়োজন চলছে সেতারের বাজনা হোতে শুরু করে বর্ষা, পকৌড়ী সব সেই জন্য। ভাস্কর বুঝে ফেলেছে সে কথা। আর এখন যা বলল তার মানে কি এই দাঁড়ায় না—চালিয়ে যাও তোমার সব কলা-কৌশল। যদি জিততে পার, কখনো কষ্ট দেব না।

তা দেবে না। কাউকেই কি কষ্ট দিতে পারে ভাস্কর? তা হলো আর সন্ধ্যাবেলার রাণী লিলির সঙ্গ ছেড়ে তপতীকে খুশি করতে আসে!

ভাস্করও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করল সচকিত হয়ে তপতীর নতমুখ মলিন—যেন বিপর্যস্ত। মনে পড়ল তার পকেটে রয়েছে তপতীকে খুশি করবার খবর।

—'তপতী শোন! মা তো রাজী। এখন ঠিক করে ফেল কি করবে, এম-এ পড়া না চাকরী।'

খুশি হয়ে মুখ তুলল তপতী।

—'ওঃ ভারী খুশি। এই নাও ফরম। কালকেই কিন্তু লাস্ট ডেট। রেডি হয়ে থেকো। আমি ঠিক দশটায় আসব।'

—'ও মা। একেবারে ফরম নিয়ে এসেছেন। কি নেবো বলুন তো?'

—'হিস্ট্রি তো নিশ্চয়ই।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ। হিস্ট্রী, কিন্তু মডার্ন না এনসিয়েণ্ট?'

—'তোমার তো ভাল লাগে এনসিয়েণ্ট হিস্ট্রী।'

—'আরে।' খুব খুশি তপতী।—'কি আশ্চর্য। কি করে জানলেন আপনি?'

—'থট রিডিং।'

—'যান। ঠিক। এনসিয়েণ্ট হিস্ট্রীই পড়বো সঙ্গে রিলিজিয়াস হিস্ট্রী, কেমন হবে।'

—'কেন শিখ, মারাঠা? সেও তো ভালোবাস। শিবাজী?'

—'এ-মা। কে বলেছে ভালোবাসি? শিবাজী বুঝি চলে এনসিয়েণ্ট হিস্ট্রির সঙ্গে?'

—'চলে না বুঝি? তবে মডার্নই পড়ো।'

—'না, না। এনসিয়েণ্টই ভালো—মৌর্য্য গুপ্ত ত্রিভুজ দারো, অশোক।'

প্রাচীন যুগের ছায়া পড়লো তপতীর মুখে।

—'তাই ভাল! এনসিয়েণ্ট হিস্ট্রি। তবে এখন একটা ইমন হোক, কেমন?'

—'বেশ তো, বেশ তো!'

আসন-পিঁড়ি হয়ে বসল তপতী কার্পেটের উপর।

—'শুনুন। ইমন নয়, মালকোষ। যদিও এটা মালকোষের সময় নয়, কিন্তু সুরের রাজা মালকোষ।'

ঝিন্-ঝিন্-ঝিন্। সুরের আলাপে ছেয়ে গেল ঘর, ভরে গেল মন, ঋদ্ধ কাঁটা ছুঁলো দশটার ঘর।

—'তুমি নাকি তপতী রায়কে নিয়ে গিয়েছিলে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করাতে?'

—'সঙ্গে গিয়েছিলাম। ভর্তি ও নিজেই হয়েছে।'

—'বেশ! বেশ! রবীন্দ্রনাথের অমিত রায় লেগেছিল কেটির বর্ণান্তর ঘোচাতে। তুমি বুঝি তপতীর বর্ণসংস্কার করবে? প্রমোশন দেওয়াবে মধ্যযুগ হতে আধুনিকীর আভিজাত্যে?'

—'তপতী পড়ছে এনসিয়েণ্ট হিস্ট্রি। সুতরাং বলতে পার আমার চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে।' হাসল ভাস্কর।

—'এনসিয়েণ্ট হিস্ট্রি। ইংরেজী নয়, পলিটিক্যাল সায়েন্স নয়। —যেমন রুচি আর সামর্থ্য।'

লিলির সুন্দর নাকটির পাশে কুঞ্চন জাগল।

—'সত্যি।' স্বীকার করল ভাস্কর।—'তপতীর রুচিটা ঠিক প্রি-একবিংশ শতকীয় নয়। সামর্থ্য খুব আর কই? ইংরেজীর নম্বর শুনলাম কেবল নাকি পাশের কোঠায়। তুমি তো সিনিয়র কেম্বিজে ইংরেজীতে সেকেণ্ড হয়েছিলে, না? আরো পড়লে পারতে কিন্তু।'

—'দরকার? মক্ষীরাণী হবো।'

টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি ক্লাবে বসে কথা হচ্ছিল। লিলি চাকরী করবে? কি অবিশ্বাস্যরকম হাস্যকর ইঙ্গিত! ওর মণিবন্ধের একরত্তি ঘড়িটার দামই তো আটশো পঁচাশী। গলার কানের পাথরগুলোর দামও আভিজাত্যের দিক হতে একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হলেও, দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচে নয় নিশ্চয়। কিন্তু একটু ভাবল ভাস্কর। পড়া কি কেবল চাকরীর জন্য? তপতীর কি দরকার আছে চাকরীর? করবে কোনদিন? কিন্তু পড়া হবে না ভেবে কি দুঃখ, আর এখন কত খুশি হয়েছে।

—'কি ভাবছ? তপতীর কথা?' ভাস্করের হাতে টোকা দিল লিলি।

—'তোমায় কি তপতীতে পেয়েছে? আর কোন কথা নয়, কেবল তপতী আর তপতী।'

—'আমায় পাবে কেন? পেয়েছে তোমাকে। আমি বন্ধু হিসাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চাইছি।'

—'ব্যবস্থাটা কি শুনি?'

—'কেবল দৃষ্টি দিয়ে থাকবে বলবো চলো নিজাম-প্যালেস—কার্নিভাল। পেত্নী ভাগিয়ে দিয়ে এনো আলো আর হাসির বন্যায়। নিঃশেষে অধিকার করে থাকলে অবশ্য অর্ডার দেব সানাই,—না, না। সেটা তো পাত্রী নিজেই বাজাবে। অর্ডার দেব—টোপর, ফুলের মালা আর রাশি রাশি চপ-কাটলেটের।'

—'ভাগ্যিস মালা-টোপর বাদ দাও নি।'

দু'জনেই হাসল যুব-মনের খুশির হাসি।

—'না:। অবস্থা চিকিৎসার বাইরে যায় নি। দরকার হলে জানাব তোমায়।' বলল ভাস্কর।

—'জানিয়ো, যদি অবস্থা থাকে তখন জানাবার মতন।'

—'শোন লিলি। প্রবীরের সঙ্গে জয়ন্তীর বিয়েতে এত আপত্তি করছো কেন?' প্রসঙ্গ বদলাল ভাস্কর।

—'কেন করছি তা বলি নি না কি?'

—'ইঙ্গিত করেছো, স্পষ্ট বল নি কিছু।'

—'বলেছি, বলেছি। তুমি বুঝতে চাও নি তাই বোঝ নি।'

—'জয়ন্তী কিন্তু মেয়ে ভালই।'

—'হতে পারে। কিন্তু ভাল মেয়ে আর যোগ্য পাত্রীতে, অনেক তফাৎ ভাস্কর। জয়ন্তীর মধ্যে অভাব সেই যোগ্যতার।'

—'অযোগ্যতাটা কি? গরীব?'

—'এক্জ্যাক্টলি।'

—'তা হলে শিক্ষা, সৌন্দর্য আর নানাগুণ,—তার কোন মূল্যই নেই বল?'

—'ধরে নিলাম আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জয়ন্তীর গুণগুলো কিছুমাত্র নেই।'

—'নেই?'

—'না। প্রথম ধর শিক্ষা। কোনমতে স্কুল-ফাইন্যাল পাস। তারপর করছে মাষ্টারী। রূপ? সেটা অবশ্য কনডিশন্যাল। ওর শকুনের মত দৃষ্টিতে দাদা নাকি দেখেছে একটা বক্ষ-শোভা। আর হাড় বের করা স্কীনে—কি যেন সব ভাল ভাল বাংলা উপমা শিখেছে দাদা আজকাল, তাই আছে। গুণের মধ্যে একগুণ—একলাফে ওদের বস্তি ছাড়িয়ে উঠে এসেছে প্রায় স্বর্গে। উইচ! একশো বছর আগে হলে পুড়িয়ে মারা হত ওকে উইচ ক্র্যাফ্‌ট অ্যাপ্লাই করবার জন্য।'

উঃ! কি কথায় জোর লিলির। প্রায় সবই মেনে নিল ভাস্কর।

অন্তত তাই মনে হল লিলির। আবার বলল সে—'যাক। ছাড় ওসব আনক্যানি ডিসকাশন। বাজনা বাজছে শুনছ?'

—'শুনছি। কিন্তু আজ আমি নয়। রোজ আমাকে পার্টনার করলে, ক্লাবে বয়কট করবে সবাই।'

—'কে বলল? দেবকী না রমলা?'

ভাস্করের ইঙ্গিত চাপিয়ে দিল তারই উপর লিলি।

—'ঐ দেখ—চাওলা আসছে। কালকেই আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছে আজো তোমায় অধিকার করলে দেখা করবে বক্সিং গ্রাউণ্ডে।

হাসলো লিলি পরিহাসে, কিন্তু গর্বিত হয়ে উঠলো না। আর যে কোন মেয়ে হতে পারতো ভ্যানিটিব্যাগ, লিলির মত আকর্ষণীয় হলে। চাওলার বাহুবেষ্টিতা হয়ে লিলি চলে গেল ফ্লোরে।

ভাস্কর মনোযোগী হোল ক্ষ[illegible] দেবকীর প্রতি।

—'তুমি নাকি রোজ রোজ রজতকে হারাচ্ছ দেবকী? সত্যি। তোমার মত মেয়ে ইয়োরোপেও দুর্লভ।'

গলে গেল দেবকী। 'হাউ নাইস অব ইউ। থ্যাঙ্কস্! না আর ঠাণ্ডা খাব না। মন্দাম জুলির পর আমার গান। কে বলল রোজ হারাচ্ছি রজতকে? মোটে দু'দিন।' চম্পকাঙ্গুলিতে দু'দিন দেখাল দেবকী।

—'তোমার আঙুলে চুনী তো ভারি মানিয়েছে। দেখি, দেখি কোন আঙুল! ওঃ। না। এনগেজমেন্ট রিং নয়। যা ভয় ধরিয়েছিলে। এখনো প্যালপিটিশন হচ্ছে।'

—'নটি!' ভাস্করকে তাড়না করল দেবকী। মনে মনে কৃতজ্ঞ হল মেরুন কালারের উপরে। এটাই হয় তো প্রিয় রং ভাস্করের। আর কালচে লালের উপর আলোর শেড—তাকে দেখাচ্ছেও অপূর্ব। মনে মনে আয়নায় দেখা আজকের নিজের চেহারা ভাবল দেবকী। রাগ বাড়ল লিলির উপর। একেবারে শেমলেস ক্রীচার একটুও ছাড়বে না ভাস্করের সঙ্গ।

নাচের পর চলে এল লিলি। দেবকীর গান আরম্ভ হল—

'Oh me! what eyes.
Hath love put in my head.'

—'চল, চল বাইরে যাই। ভীষণ গরম লাগছে। আর দেবকী হালদারের চিঁ-চিঁ শুনতে হবে না।'

—'আমাকে যে বসে থাকতে বলে গিয়েছে।' করুণ মুখে বলল ভাস্কর। হেসে ফেলল লিলি। বাইরে বাগানে এসে বসল দু'জন। আরো আছে জোড়া জোড়া।

অন্যায়! ভারি অন্যায় হচ্ছে। মনে মনে ভাবল ভাস্কর। লিলির উপর অন্যায়—আর নিজের উপর? হ্যাঁ নিজের উপরও বৈ কি! এই মানসিক দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব তাকে কাজ করতে দিচ্ছে না। শান্তি পাচ্ছে না সে মনে, আর বাবা-মা-ও বিরক্ত। মুস্কিল! মনে মনে উচ্চারণ করল ভাস্কর। লিলি যদি হোত দেবকীদের মত, কিম্বা তপতী হত ভোঁতা বাংলা মেয়ে—এক মুহূর্ত লাগত না মন ঠিক করতে ভাস্করের। এ যে দুই-ই অনবদ্য। তপতী শতমুখ ঝাড়ের মোমবাতি, মাধুর্যে ভরে দেয় মন। লিলি উৎসবের প্রাণোজ্জ্বল নিয়নস্টিক। তবে লিলি তাকে চায়, তপতী ব্যস্ত ঠেলে দিতে, কিন্তু ঠেলেই যে আবার আকর্ষণ করে নেয় সুরের দূত পাঠিয়ে, নিমন্ত্রণ চিঠি লেখে দু'টি চোখের আলো দিয়ে। মনে পড়ল তপতীর শান্ত কপালটি আজো ভ্রূ-বিলাস শেখে নি। বেশ ছিল সেকালে। বড় বৌ, মেজ বৌ। হেসে ফেলল ভাস্কর।

—হাস্নাহেনার গন্ধ নিচ্ছিল লিলি—'হাসছ যে?'

—'দু'টো বৌ কি রকম?' ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল।

—'রাজত্ব থাকলে মন্দ কি? হীরে মহল, মতি মহল। দুই রাণী হাসলে একজনের মাণিক ঝরে, অন্যের কান্নায় মুক্তো। রাজকোষে টাকার অভাব হবে না কখনো, আর হিংসে করে করে দুই রাণীরই পুরানো রাজাকে রোজ রোজ নূতন নূতন লাগবে। কে দুই বৌ হবে? তপতী, দেবকী? সুয়োরাণী, দুয়োরাণী?

—'দুই স্বামী কেমন? চাওলা আর অরুণাংশু?'

—'ভাল, খুব ভাল। একজন সোনার খাট গড়িয়ে দেবে, আরেকজন চাঁদে নিয়ে যাবে। চল তিব্বত যাই। সেখানে সাত ভাইয়ের বড় দাদা হবে তুমি। তোমার বৌ—সবার বৌ, তুমি কিন্তু একপত্নী ব্রতধারী।'

খুব হাসল ভাস্কর। এক্ষুণি, এই মুহূর্তে প্রগলভাকে বেঁধে ফেললে কেমন হয়?

হয়ত আজই শেষ হত ভাস্করের সব দ্বিধা, ব্যস্ত পায়ে দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়াল দেবকী—'কেমন হল গান?'

—'উঃ! সাবলাইম, ইউনিক!'

সমস্বরে বললো ভাস্কর আর লিলি।

তপতীর ঘরে আড্ডা জমাচ্ছিল তপতী আর মীরা। চার আনার চিনেবাদাম, যে কোন তারিখের একটা বাঙলা কাগজ—একটা দিন কাটাতে পারে তারা মহানন্দে।

—'জানিস মীরা! লিলি বলেছে আশুতোষ কলেজ নাকি ভাল নয়।' বন্ধুকে খবর দিল তপতী।

—'ভালো নয়?' পৃথিবীর আশ্চর্যতম কথায় চোখ কপালে তুলল মীরা।—'অমন কলেজ আর আছে নাকি কলকাতায়?' শব্দ হল চিনাবাদাম ভাঙবার।

—'বাংলা দেশেই নেই বল।' মীরাকে সংশোধন করল তপতী।

—'অমন সুন্দর কলেজ! ক্লাশে বসে শোনা যায় ট্রাম-বাসের শব্দ। একটু ভাবলেই মনে হয় ট্রামে দাঁড়িয়ে দুলে দুলে আমরাও চলে যাচ্ছি কতদূরে,—না রে?'

—'আর হাজরা পার্ক? নরম ঘাসে পা ডুবিয়ে হাঁটা?' মীরা কলেজের আরো গুণপনা যোগ করল সানন্দে।

—'তাই ত' বলেছি আমি ভাস্করকে। এঃ! বাদামটা তেঁতো। আশুতোষ কলেজে পড়ে গেছে কত মেয়ে—বাংলা দেশের সেরা সেরা মেয়ে সব—বাণী রায়, অমলাশঙ্কর, নন্দিতা কৃপালনী। পড়েছে অমন কেউ লিলির লরেটোতে? বছর বছর কি রেজাল্ট আশুতোষের।'

অল্পক্ষণের মধ্যে স্থির হয়ে গেল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কলেজ আশুতোষ। তৃপ্তমুখে গত সপ্তাহের বাসি কাগজ মুখের সামনে মেলে শুয়ে পড়ল দুই সখী।

—'ইউনিভারসিটি খুব আশ্চর্য, না রে?'

মীরার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে থমকাল তপতী। বেচারী! পড়া হল না ওর। জানল না বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার রোমাঞ্চ, ডবল-ডেকারের উর্ধ্বশ্বাসে ছুট, লাইব্রেরীতে পুরান বইয়ের গন্ধ। মুখে কিন্তু প্রকাশ পেল অন্য কথা—

—'এমন কিছু বিশেষ নয়। আমাদের কলেজেরই মত অনেকটা। ছেলেরা পড়ছে একসঙ্গে এই যা তফাৎ।'

—'ছেলেগুলো কেমন রে? হ্যাংলামি করে?' অন্তরঙ্গ প্রশ্ন মীরার।

একটু বিমনা হয়ে গেল তপতী।

হ্যাংলামি? ছেলেরা? কই না তো। বেশ ভাল তো সবাই, তবে দেওয়ালের গায়ে বিশ্রী কথা লেখা থাকে—ভারি বিশ্রী!

—'চুপ করে আছিস কেন?' তপতীকে ঠেলে দিল মীরা। পত্রিকা দেখাল তপতী।

—'দেখ, দেখ মীরা, একটা আলু কেমন মানুষের বাচ্চার মত দেখতে। কি মজা না?' সোৎসাহে দুই সখী ঝুঁকে পড়ল ছবির উপর।

—'অলকের বেশ ভাল কাজ হয়েছে, না মীরা?'

—'অ্যাপ্রেন্টিস। সবাই বলছে ফিউচার আছে।'

—'বুঝলি মীরা! অতীত আর বর্তমানের কথা কেউ ভাবে না সবাই খোঁজে ভবিষ্যৎ। বুঝতেই পারি না আমরা, ভবিষ্যতটাকে বানিয়ে দিচ্ছে বর্তমান।'

—'উঃ, তপতী! তিস্থি কেন? ফিলজফি পড়লে পারতিস তুই। এমন জ্ঞানবানদের মত কথা বলিস মাঝে-মাঝে! এত যদি জানিস তবে আবার পড়তে বসে, তোর ফিউচার জবাই করলি কেন?'

—'আমি? আমার ফিউচার? কি বলছিস তুই?' বন্ধুর কথার অর্থ জানতে চাইল তপতী।

—'আহা! তোমার ফিউচার তো ভাস্কর মিত্র। তাকে লিলির পাল্লায় ফেলে, এম-এ নিয়ে বসলে কেন?'

—'ওঃ এই কথা?' হাসল তপতী। দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল প্রিয়বালা। কি অপরিষ্কার ঘরটা করেছে মেয়েটা। শাড়ি ঝুলছে, দলামোচা ব্লাউজ ঠিক ঘরের মাঝখানে। চিনাবাদামের খোসা। কোনো সাহেববাড়ির মেয়ে কখনো খাবে কাগজের ঠোঙায় কেনা খোসাসুদ্ধ বাদাম ভাজা? তারা প্রায় খায় না কিছু। না খেয়েই তো পাতলা ছিপছিপে পুতুল পুতুল শরীরখানি বানিয়ে রাখে, হয় তো দাঁতে কাটবে বড়জোর একটা দুটো কাজুবাদাম। চামচে দিয়ে তুলে নেবে ছোট্ট ছোট্ট গ্রাসের খাবার।

মীরার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল প্রিয়বালা। এই মেয়েটাই সব নষ্টের মূল। ছিরি-ছাঁদ দিয়েই ধরা যায় কেমন ঘরের মেয়ে। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেই তপতী ভুলেছে নিজের মান-মর্যাদার কথা। মেমসাহেবও যেন কি! একটু বাধা দেবে না মেয়েকে মীরার সঙ্গে মিশতে। অবশ্য দেয় না যে কেন তাও শুনেছে প্রিয়বালা সেকালের চাকর বুড়ো হরিশের কাছে। মেমসাহেব তো মেম হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে। তার আগে বাঙালীই ছিল। মাটিতে ভাত খেত ঠাকুর রাঁধতো শুক্তো, মোচাঘণ্ট। সাহেবের তো এখনো লাগে খাবার পর একটি পান।

মেমসাহেবের বাপ-মা একেবারেই বাঙালী। টাকা আছে। এখানে এলেই প্রিয়বালাকে দিদিমা দেন দশ-বিশ টাকা বকশিস্। মা-মরা মেয়েকে দেখাশোনা করে তো সে। ঘর গুছাতে-গুছাতে প্রশ্ন করল প্রিয়বালা—'দিদিমা শীগ্‌গির আসবেন, না দিদি?'

—'দিদিমা? এখন? এখন তো আসতে পারবেন না। ওঁদের গুরুদেব এসেছেন যে, ব্যস্ত আছেন তাঁকে নিয়ে। আমরা তো যাব রবিবার।'

—'তোর দিদিমার গুরুদেবকে দেখেছিস?' জিজ্ঞাসা করল মীরা।

—'বাঃ, দেখব না কেন? সব সময় তো ও-বাড়ি যাই তিনি এলে।'

—'কেমন রে? গাঁজা-টাজা খায়?'

—'যাঃ! কি সুন্দর! সুন্দর স্তব পড়েন সকালবেলা। আমার কপালে চন্দন বুলিয়ে দেন। প্রসাদী চন্দন! ঠাণ্ডা!'

তপতী ভুল করে শৈলেন রায়ের মেয়ে হয়ে জন্মেছে। মনে মনে ভাবল মীরা। ওর কথা, ভাবনা—সব মীরার মায়ের মত। তেমনি ঠাণ্ডা আর নরম। জয়ন্তী মীনাক্ষী রায়ের মেয়ে হলেই মানাত ভাল। মেমসাহেবী কড়া মেজাজ। সবচেয়ে শান্তির কথা ছিল—প্রবীরের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে গোলমাল উঠত না তা হলে মোটেও। বদলে তপতী হয়ে যেত মীরার মায়ের বড় মেয়ে—এম-এ পড়া শান্ত-স্নিগ্ধ মেয়েটি।

—'এই কি ভাবছিস?' চিমটি কাটল তপতী।

—'ভাবছি?' আনমনা হাসল মীরা—'ভাবছি তুই আমার বোন হলে বেশ হত।'

—'বাঃ! বোন তো আছিই। হবো আবার কি? কি টুটুন?'

—'দিদি! আমাকে দিলে না বাদাম?' নাকিসুর বের করল টুটুন।

—'দূর বোকা? তোকে না দিয়ে বুঝি খেতে পারি? এই দেখ না বালিশের নীচে।'

চোখ বিস্ফারিত প্রিয়বালার। লেশের ঝালর লাগানো বালিশ, তার তলায় শুয়ে আছে এতগুলো চিনেবাদাম। একেবারে বাজে মেয়েটা। মেমসাহেবের মেয়েকেও নষ্ট করছে।

—'বাবা! সানডের কাগজে টেণ্ডার নোটিশটা দেখেছ?'

ইজিচেয়ারের হাতল হতে পা নামালেন সুমোহন মিত্র, চুরুট সরালেন মুখ হতে। ছেলের একটি কথাতেই বুঝেছেন মিত্রসাহেব কি বলতে চাইছে সে। গত সপ্তাহে ভারত সরকারের একটা টেণ্ডার নোটিশ বেরিয়েছে কাগজে কাগজে—আউটডোর ট্রান্সফর্মার সাব স্টেশন নির্মাণ এবং ইলেকট্রিক লাইটিং—যার আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে নব্বই লক্ষ টাকা। বায়নার টাকা টেণ্ডারে উল্লিখিত মূল্যের টু'পার্সেন্ট এবং কাজ সম্পূর্ণ করবার সময় পাঁচ মাস। টেণ্ডার দেবার বহু আগে হতেই ব্যবসায়ীমহল চেষ্টা-চরিত্র আরম্ভ করে দিয়েছে, ভাস্করও এ নিয়ে কথাবার্তা বলেছে, কিন্তু আজ একেবারে উত্তেজিত।

—'বোস'। ছেলেকে চেয়ার দেখালেন সুমোহন।

ভাস্কর বসলো। হাতে গোল করে পাকানো কাগজটা হয়তো রবিবারের স্টেটসম্যানেরই প্রথম পাতা।

ছেলের দিকে একটু চেয়ে দেখলেন বাবা—ছাব্বিশ বছরের একটি সম্বৃত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।

—'করপোরেশনের কাজটা তো পেয়েছি আমরা।' ছেলের কথার উত্তর না দিয়ে প্রসঙ্গান্তর আনলেন সুমোহন. বোধ হয় কিছু সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছায়।

—'ও তো যে কেউ পেতে পারতো।'

—'পারতো'? পুত্রগর্বে হাসলেন পিতা। পাম্পের কাজটা পাওয়া প্রায় অমৃত-হরণের মত দুরূহ হয়ে উঠেছিল, ভাস্করের চেষ্টাতেই পাওয়া গেছে।

—'চল্লিশ টাকা পাঠিয়েছি জোনাল ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে, টেণ্ডার-ফর্ম আনবার জন্য।'

নড়ে-চড়ে চেয়ারে বসলেন মিত্রসাহেব। পায়ের উপর হতে পা নামিয়ে সোজা হলেন। ব্যাপারটা বিরাট। প্রথমত কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা সুদূর। যদিও বা পাওয়া যায়, মাত্র পাঁচ মাসে শেষ করা যাবে না। ওদিকে মিত্র কোম্পানীর সিনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার রস গেছে তিন মাসের ছুটিতে নাইনিতাল—মাত্র তিনদিন হল। প্রচুর অসুবিধা আছে অন্যান্যদিকে।

—'শোন ভাস্কর। এ কাজ আমরা পাব না। মাধেরাম আছে। এ ভি জি কোম্পানী, আর সবার উপর কাঞ্চিদাস। জানিস তো কাঞ্চিদাসের ব্যাপার—ও এমন রেট দেবে যে কেউ পারবে না ওর সঙ্গে।'

—'আমরা কাঞ্চিদাসের চেয়ে কম রেট দেব।'

—'পারবি না। যত কম রেটই আমরা দিই না কেন, ও অনায়াসে সে খবর বের করে নিয়ে, তার চেয়ে অন্তত টু'পার্সেন্ট কম ধরে টেণ্ডার সাবমিট করবে।'

—'আমরাও ওর খবর বের করে নেব।'

—'কি করে?'

—'যে ভাবে ও বের করে।'

—'মাধেরাম, এ ভি জি কিছু নয়, কিন্তু কাঞ্চিদাস। তা ছাড়া রসও রয়েছে ছুটিতে।'

—'রসের ছুটি ক্যান্সেল করে দাও।'

—'সে কি?'

—'কেন তুমি তো আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং দিয়েছ ওকে পার্টনার করে নেবে। কাজের দায়িত্ব নেবার সময় ছুটি কি? এ সময় ও যদি না আসে, মিত্র অ্যাণ্ড কোং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম তার পুরানো নামেই থেকে যাবে। মিত্র অ্যাণ্ড রস আর হবে না।'

চুপ করে রইলেন সুমোহন। আর কে রস অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, মিত্রের স্কুলের বন্ধু। ব্যবসার প্রায় গোড়াপত্তন হাতেই আছে। সম্প্রতি তাকে পার্টনার করে নেবার কথা হচ্ছে।

—'কি ব্যাপার? পিতা-পুত্র নীরব কেন?' ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন পক্ককেশ একজন—বিশ্ববন্ধু সরকার। সুকল্যাণীর ভগ্নীপতি। কাজ করেন তের-তলার মাথায়।

সুমোহন হাসলেন:—'ভাস্করের পাগলামি।'

—'রসকে নিতে চাইছে না?'

—'রস তো ওরই সাজেশন। এখন আবার মাথায় ঘুরছে—প্রাইভেট লিমিটেড। তোমার সঙ্গে নাকি কথাবার্তা বলেছে? এখন ব্যাপার কি জান। ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের হেভী ইঞ্জিনীয়ারিং করপোরেশনের টেণ্ডার নোটিশ বেরিয়েছে—আউটডোর ট্রান্সফর্মার সাব স্টেশন আর টেরিটরী লাইটিং। মাথা খারাপ হয়ে গেছে শ্রীমানের। কাজটা করবে।'

—'বেশ! বেশ! তা মাথা খারাপ বলছ কেন? এত বড় কাজ ত' কর নি আর। লাভ, খ্যাতি দুই-ই বাড়বে কোম্পানীর।' বললেন বিশ্ববন্ধু।

—'দুর্গাপুরে হয়েছে একটা পঞ্চাশ লাখ টাকার কাজ। তবে এটা আরো বড়। অনেক টাকার দরকার, সময়ও কম। তারপর ও কাজ কি পাওয়া যাবে? কাঞ্চিদাস রয়েছে না?—আর করপোরেশনের কাজটার কি ব্যবস্থা হবে? অন্যদিকে তো মন দেওয়া যাবে না।

শেষের প্রশ্নটা ছেলেকে করলেন সুমোহন।

—'ওঃ, ভারি একলক্ষ টাকার কাজ! সাব-কনট্রাক্ট দিয়ে দেব এ ভি জিকে।' উত্তর দিল ভাস্কর।

একটু বিরক্ত হোলেন বৃদ্ধ মিত্র। এ ভি জি নেবে কেন সাব-কনট্রাক্ট? ওকি আমাদের চেয়ে ছোট ফার্ম?'

—'নেবে। আমার কথা হয়েছে গাঙ্গুলীর সঙ্গে। হেভী করপোরেশনে ওরা টেণ্ডার দিচ্ছে কিন্তু পাবার আশা ত্যাগ করেছে তোমার মতই। কল্যাণীর কাজ ছাড়া ওদের হাতে তেমন কোন কাজও নেই, সুতরাং নেবে সাব-কনট্রাক্ট। কথাটা বাজারে চালু না হলেই হল।'

আশ্চর্য সুমোহন ছেলের তড়িদ্গতিকে। বিশ্ববন্ধু খুশি।

—'বাঃ! বাহাদুর ছেলে! তা কাজটা পাবি তো?' মেসোমশাইয়ের জিজ্ঞাসা।

—'পাব কি না জানি না কিন্তু পেতে হবে।' এতক্ষণে হাসলো ভাস্কর—'চৌধুরী তো তোমার বন্ধু?'

ইঙ্গিতটা ধরলেন বিশ্ববন্ধু। হাসি চমকাল চোখে।

—'বন্ধু। কত পারবি খরচ করতে?'

—'দশ।' দুই হাতের আঙুল দেখাল ভাস্কর।

—'দেখ ভাস্কর!' রাগী গলা বাবার। 'এসব কি বলছিস তুই? কখনো টাকা দিয়ে কিছু করবার চেষ্টা করিস না। এসব আমি পছন্দ করি না।'

—'আচ্ছা বাবা! কাঞ্চিদাস তোমার খবর যখন বের করে নেয়, কি কর? তোমার অফিসেরই কেউ নিশ্চয় টাকা পেয়ে খবর দেয়। তুমি সন্দেহ কর, কিন্তু চাকরী তো আজ পর্যন্ত কারো যায় নি। টাকা দেওয়া পছন্দ কর না, আর নেওয়াটা সহ্য করছ—এটা কি রকম ব্যাপার? তবে আমি অন্যায়ভাবে কিছু করব না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার তুমি।' ভাস্কর উঠে বাইরে চলে গেল।

—'শুনলে ভাস্করের কথা?' বললেন সুমোহন।

—'কথাটা কিন্তু বলেছে ঠিক।' সিগারেটের ধোঁয়া ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করলেন বিশ্ববন্ধু।

—'তুমিও একথা বলছ ? ঘুষ দিয়ে ও কাঞ্চিদাসের খবর বের করবে।'

—'অন্য ব্যাপারের জন্য ভাস্কর টাকা খরচ করতে চাইছে, কিন্তু ঘুষেই বা তুমি অত শকড হচ্ছ কেন ? চাণক্য পণ্ডিতই তো ঐ যে শঠে শাঠ্য-টাঠাং নাকি বলে গেছেন অনেক দিন আগে। দেখ সুমোহন ! বাঙালীরা ব্যবসায়ে হেরে যায় কেন জান ? বিজনেস ট্যাক্‌টিস নেই বলে।'

—'একে তুমি ট্যাক্‌টিস বল ? এ তো চোরাগলি। সবাই এ পথ ধরলে—অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি কথাটাই ঘুচে যাবে। ব্যবসায় সাক্‌সেসফুল হবার এটাই তো জানি মূলমন্ত্র।'

হাসলেন বিশ্ববন্ধু।

—'পঞ্চাশোত্তর কি সত্যযুগে পৌঁছে গেছ নাকি ? তোমার এফিসিয়েন্সি না থাকলে অনেস্ট এফার্ট কোন কাজেই লাগবে না।'

—'এফিসিয়েন্সির অর্থ ঘুষ দেওয়া ?'

—'না। যে ভাবে হোক নিজের কাজ সফল করা। টাকা ভাস্কর না দিক, মাধেরাম দেবে, কাঞ্চিদাস দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকার উপরে উঠবার সিঁড়ি বানাবে।'

—'বানাক।' দৃঢ় উত্তর দিলেন সুমোহন মিত্র। যুদ্ধ করে অনেক নীচে হতে আজ এখানে পৌঁছেচেন তিনি। কখনো কোন অন্যায় পথে চলেন নি, ভাস্করও চলবে না।

এই কথাই ছেলে শুনলো মায়ের মুখে।—'ভাস্কর ! তোর বাবাকে তো জানিস ? অন্যায় কিছু কোরতে চেষ্টাও করিস না কখনো।'

এবার বিরক্ত হল ভাস্কর।—'ভাবছ কি তোমরা বল ত' মা ? ইচ্ছা করলেই ঘুষ দিতে পারবো আর কাজটা পেয়ে যাব সঙ্গে সঙ্গে ? অত সোজা এসব ব্যাপার ? এ কাজটা দেবার কর্তা বাঙালী। তাঁরও ইচ্ছা বাঙালী কনসার্ন কাজটা পাক। খরচপত্র হবে অন্যভাবে। জোনাল অফিসের টেণ্ডার অ্যাক্সেপট্যান্স ডিপার্টমেণ্টের হেড হচ্ছেন চৌধুরী, মেসোমশাইয়ের বন্ধু। আমি টেণ্ডার দেবার শেষ তারিখে, রাত আটটার সময় আমার টেণ্ড সাবমিট করব। বাবাকে বলো এটা কোন অসাধুতা নয়।'

—'ঠিক আছে।' ছেলেকে কাছে ডাকলেন মিত্র। বিরক্তির ধোঁয়া উড়ে গেছে। আরম্ভ হল আলাপ-আলোচনা। রসও টেলিগ্রাম পেয়ে এসে পৌঁছাল।—'ওয়েল। কাজটা ওয়াণ্ডারফুল। তবে পাওয়া যাবে কি ?'

—'আমি কাজ যোগাড় করব। বাবা টাকা দেবেন আর কাজ তুলবার ভার আপনার।'

—'ভেরি গুড।'

অফিসে ব্যস্ত হলেন মিত্রসাহেব, রস আর জেনারেল ম্যানেজার শশাঙ্ক ভকত। শশাঙ্ক বাঙালী নয়। তিনপুরুষের বাস কলকাতায়। চলনে-বলনে একেবারে এদেশের মানুষ। টেণ্ডার তৈরি হচ্ছে। চলছে তিনটে টাইপ রাইটার।

ভাস্করও খাটছে। নিজের ঘর বন্ধ। সমানে শোনা যাচ্ছে রেমিংটনের খটাখট। ক্লাব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নানা জায়গায় নিমন্ত্রণ—সময় নেই, সময় নেই। অফিসেও অনুপস্থিত ভাস্কর। জেনারেল ম্যানেজার বিশেষ পছন্দ করে না জুনিয়ার মিত্রকে। বড় বড় ভাবালস চোখ, কিন্তু যখন তীক্ষ্ণ করে তাকায়—পড়ে ফেলে যেন মনের কথার শেষ পৃষ্ঠাটি পর্যন্ত। সুতরাং ভাস্কর না আসাতে একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল সে। রাগ হচ্ছিল হেড-ক্লার্ক অন্নদা সরকারের। বুঝছিল সে নিশ্চয় এবারও কাঞ্চিদাসের কাছে হারবে মিত্র কোম্পানী। মিথ্যে সব খাটা-খাটুনি। তবু ভাস্কর থাকলে কিছুটা ভরসার কথা ছিল। তার আবার অসুখ হোল এ সময়ে। ভাস্করের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে অন্নদা চলে এল সাহেবের বাড়ি।

—'দেখা হবে না ? দরকারী কথা ছিল যে একটা।'

—'হবে না দেখা।' শশী জানায়। 'চন্দ্র-সূর্যের মুখ দেখছে না দাদাবাবু, হেড-ক্লার্কবাবু তো দূরস্থান।'

ক্ষুণ্ণ মনে বাইরে বেরুতেই দেখা ভকত সাহেবের সঙ্গে। ভ্রু কুঁচকে হেড-ক্লার্কের মুখের দিকে চাইলো জেনারেল ম্যানেজার—কি ব্যাপার ! এ বাড়িতে কেন ! পরদিন অন্নদাকে ডেকে পাঠাল ভকত। জানতে চাইল, অফিস-ডিউটি ফেলে কি দরকার ছিল কর্তার বাড়িতে।

দরকার আবার কি ! ভকতকে ভয় পায় না অন্নদা। দশ টাকা মায়নায় উনিশ শো ছত্রিশ সালে ঢুকেছে সে মিত্র কোম্পানীতে, বয়স তখন কুড়ি। সেদিন কোথায় ছিল এত বড় অফিস আর তার জেনারেল ম্যানেজার ! মিত্র সাহেব নিজে করেছেন বাড়ি, বাড়ির ওয়েরিং। সে কি দুঃসময় দেশের ! এম-এ পাশ ছেলেরও ভাত নেই। কত ডুবেছে লেকের জলে। টিউশনি, পাঁচ টাকায় তিনটে ছেলে ! অনেক দুঃখে আচার্য প্রফুল্ল রায় বলেছিলেন ল' কলেজ ভেঙে ফেলতে। ঘরে ঘরে বি-এ পাশ ছেলে—সব বেকার। মনে আছে মিত্রসাহেব নিজের হাতে ঝাল মুড়ির ঠোঙা নিয়ে আসতেন, খেতেন সবার সঙ্গে ভাগ করে। পাশের দোকানের গ্লাসে করে আনা চা—তেমন খাওয়া আর কি হবে ! সেদিনের লোক আর কে আছে ? অন্নদা সরকার আর দারোয়ান তিলক সিং। রস ? রস তো এসেছে চল্লিশ সালে। তখন দু'টো ওয়েলডিং মেশিন কেনা হয়ে গেছে। চালাঘরের টিনের তাপে গলতে গলতে কাজ করত রস।

মিত্র সাহেবের ছোটবেলার বন্ধু রবার্ট ক্যামেরন রস। ইঞ্জিনীয়ার ভাল কাজ করত। মস্ত মাইনে, বিরাট প্রতিপত্তি। সব গেল মেয়ের পাল্লায় পড়ে। লুইসা ড্যুবেরীর হেজেলনাট আঁখিতারা আর অপর্যাপ্ত চুলের সোনালী ঢেউ বিপর্যস্ত করে দিল রসকে। স্ট্যানলি ড্যুবেরী বন্ধু রসের। বন্ধু-পত্নীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি। দামী প্রেজেণ্ট, অনুরাগ, অদর্শনে চারদিক অন্ধকার।

প্রেমিকযুগল ভাবত স্বামী বুঝছে না কিছু। ড্যুবেরী বুঝছিল ভাল করেই। ওৎ পেতে ছিল হাতে-নাতে ধরবার জন্য। ধরা পড়লো রস আর লুইসা শিমলার হোটেলে। মেয়ে অব্যাহতি পেল। পুরুষ মোটা টাকা খেসারৎ দিতে বাধ্য হোল স্বামীকে। প্রায় সর্বস্বান্ত হল রস। চাকরী নিয়েও টানাটানি। মান রাখতে চাকরীতে রিজাইন দিল রস, আর সেই দুর্দিনে দেখা হল মিত্রর সঙ্গে। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুনে ড্রাগন মাত্র তার নিঃশ্বাস ছাড়তে আরম্ভ করেছে। তারপর ছড়িয়ে পড়ল আগুন সর্বত্র। টাকা ! টাকা ! ছাপানো কাগজে টাকার ছড়াছড়ি। উপচে পড়ছে

টাকা; আবার তারি মধ্যে না খেতে পেয়ে পথে মুখ গুঁজে মরছে মানুষ। একটু ফ্যানের জন্য কান্না, একটুকরো ছেঁড়া শাড়ির আঁচলের জন্য কান্না। একঠোঙা খাবারের বদলে মেয়েগুলোকে টেনে নিল শকুনেরা পথের ব্যাফেল ওয়ালের অন্ধকারে। নীচে থাকা, পড়ে যাওয়া মানুষগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রথ। মানুষের র'মিট জুস খেয়ে শরীরের হিমগ্লোবিন বাড়ালো মানুষ। মিত্র কোম্পানীও চড় চড় করে বড় হয়ে গেল। নূতন বাড়ি, সুইজারল্যাণ্ডের মেশিন। সুমোহনবাবু বড়সাহেব হয়ে গেলেন। কত জায়গা হতে ডাক এল রসের। ভাল কাজ, প্রচুর বেতন আর সম্মান—ভেলুয়া প্রজেক্ট, দরাকর করপোরেশন। সব প্রত্যাখ্যান করল রস। তার অধীনে এখন চার জন ইঞ্জিনীয়ার খাটছে।

কয়েক বছর পর এল জেনারেল ম্যানেজার নূতন পোস্টে—টাই স্যুটে নিখুঁত ফিটফাট শশাঙ্ক ভকত। বড় বেশি চকচকে চোখে তাকায়, প্রকাশ করে নিজের পাওয়ার। রসকে ভাবে এম্প্লয়ী। একটু বুঝি মন টলল রসের। স্টেটসম্যানের ওয়ান্টেড কলমে বুঝি চোখ বোলাল সে। এমনি সময়ে ইংলণ্ড হতে ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনিং নিয়ে ফিরল ভাস্কর। তুখোড় ছেলে। ইসারায় বুঝে নিল চিড় ধরেছে রসের মনে,—আর তার মানেই ব্যবসাতে চিড় ধরা। নূতন প্ল্যান দিল ভাস্কর বাপকে। কথা হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড হয়ে যাবে মিত্র কোম্পানী। রস? রস পার্টনার হবে।

ব্যবস্থার তোড়জোড় চলছে—রস গেছে নাইনিতাল—শরীরটা ভাল করে ঝেড়ে নিতে হবে নূতন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করবার আগে। এমনি সময়ে এই টেণ্ডার। এর আগেও টেণ্ডার দিয়েছে মিত্র কোম্পানী দু-দু বার, কিন্তু হেলায় তাদের হারিয়েছে কাঙ্কীদাস। এবার? এবারও হারাবে। ও-তো জেনে বসে আছে মিত্র কোম্পানীর, সব কোম্পানীর টেণ্ডার। দু-পার্সেণ্ট, তিন-পার্সেণ্ট কম ধরে নিজের টেণ্ডার সাবমিট করবে—কাজ ওর। তা'ছাড়া এবার যেন ইচ্ছে করেই মিত্র কোম্পানী তার রেট বেশি বেশি ধরছে।

মন খারাপ অন্নদার। না, না। তার কিছু তো নয়ই। তবে এতদিনের অন্ন-জলের যোগানদার মিত্র, তার ভাল তো চাওয়া ধর্ম; আর কোম্পানীর ভালতে যে সরকারের ভাল নয়—কে বলবে? কোন কোম্পানীর হেড-ক্লার্ক মাইনে পায় পাঁচশো টাকা। এখন যদিও দূরত্ব কিছুটা বেড়েছে অফিসে,—বাড়িতে ঠিক আগের ব্যবহার। ভাস্কর তো অফিসেও ডাকে 'সরকারকাকু'। সুতরাং ভকতের কৈফিয়ৎ নেবার মত জিজ্ঞাসায় ভ্রূ কোঁচকাল অন্নদা সরকার, জানাল—ছোট সাহেব অফিসে অনুপস্থিত দু'সপ্তাহ ধরে। তাঁর শারীরিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাড়ি গিয়েছিল সে।

ছোটসাহেবের স্বাস্থ্যের সংবাদে অন্নদা সরকারের কোন দরকার আছে কি না জানতে চাইল জেনারেল ম্যানেজার ঠাণ্ডাগলায়।

এবার শক্ত হল সরকার। ম্যানেজারের চোখে চোখ রেখে জানাল—টেণ্ডারের অতিরিক্ত কপিটা পাওয়া যাচ্ছে না। এসব সিক্রেট বিষয় বাইরে যাওয়া ঠিক নয়। বড়সাহেবকে না পেলে ছোটসাহেবকেই খবরটা জানাবার ইচ্ছা ছিল সরকারের।

দাঁতে দাঁতে চাপল ভকত। ইম্পার্টিনেন্স।—বেয়াদবী! দরজার দিকে আঙুল দেখাল। একটু চেয়ে দেখলে ভকতের স্টেনো-টাইপিস্ট—মাথা উঁচু করে বেরিয়ে যাচ্ছে হেড-ক্লার্কবাবু। ভয় নেই ম্যানেজারকে? নূতন চাকরী পাওয়া ছেলেটির বুক ধক করে উঠল অন্নদার জন্য। এ-বয়সে এমন চাকরী গেলে যে মুস্কিল হবে বেচারীর।

যার জন্য এত ভাবনা সেই অন্নদার গ্রাহ্য নেই একতিল। টেবিলে বসে দিব্যি মুখে পুরল বাড়ির বানানো একখিলি পান।

ঠিক চোদ্দ দিন পর বিকেল তিনটার সময় খুশি ভাস্কর জড়িয়ে ধরলো মাকে।—'মা। ভীষণ ক্ষিধে। ডিমের কচুরীর ফরমাস দাও, আর গরম রসগোল্লা।'

ছেলের ঝড়োকাকের মূর্তি দেখে স্তম্ভিত মা।—'কি করছিস দিন রাত ঘরে বসে? আয়নায় দেখগে মুখ।'

ছেলের বাপের উপরও সুকল্যাণী নিল এক হাত।—'খরচ কমাচ্ছ নাকি অফিসের, যে ছেলেকে টাইপ করতে হচ্ছে?'

সুমোহন হাসলেন স্ত্রীর কথায়।

যথাসময়ে প্রস্তুত সীল্ড টেণ্ডার। প্রত্যেকবার সাবমিট করতে যায় জেনারেল ম্যানেজার, এবার যাচ্ছে ছোট মিত্র নিজে। কাপড়-টাপড় বেশি নিচ্ছে ব্যাগে—দিল্লীটা একদৌড়ে ঘুরে আসবে। একটু আশ্চর্য হল, একটু অস্বস্তি ভোগ করল ভকতসাহেব। তার প্রতি অবিশ্বাস নাকি? না, না। এই ত' কাগজপত্র রেডি করবার সময় অত্যাবশ্যক ছিল সে। ছোক্‌রা ছেলে ভাস্কর মিত্র! সখ নিজে কর্তা বনবার, আর ভবিষ্যৎ কর্তা তো সে-ই।

—'আপনি যখন যাচ্ছেন, এ কাজটা আমরা নিশ্চয়ই পাব।' ভাস্করকে সূক্ষ্ম খোসামোদ করল শশাঙ্ক ভকত।

নিরিবিলি ঘরে এল অন্নদা সরকার।—'মিথ্যে সব পরিশ্রম। তবু ক'দিন আগে অফিসে এলে কিছুটা সম্ভাবনা ছিল।'

চোখ তুলে চাইল ভাস্কর সরকারের মুখের দিকে। হাসি চমকাল চোখে, একটু বেঁকলো সেকেণ্ড ব্রাকেট ঠোঁট।

—'বোসো কাকু! অফিসে না এলেও ফাঁকি দিই নি। কাজ করেছি বাড়িতে বসে। দেখ না কি হয়। কাজটা পেলে কিন্তু খাওয়াবে পিসিমার তৈরি সরভাজা।'

চোখে জল এসে গেল ভীষণ রাগী মানুষ অন্নদা সরকারের। ভাস্করের শিশুকালের বহু দৌরাত্ম্য গেছে তার পিঠের উপর দিয়ে। ছোট্ট এতটুকুন ভাস্কর! বউঠাকরুণকে সে-ই তো নিয়ে এল শিশুমঙ্গল হাসপাতাল হোতে ট্যাক্সি করে। ইস্কুলে কে ভর্তি করেছে ভাস্করকে, কে এনেছে পাসের খবর? সব, সব এই অন্নদা সরকার। বিলেত ঘুরে এলে কি হবে—সেই ছোট ভাস্কর, সরভাজা-লোভী ভাস্করই আছে সে এখনো। যত দেখে ছেলেটাকে, অবাক হয় অন্নদা। হৈ হৈ। ক্লাব। মেয়ে নিয়ে নাচছে, খাচ্ছে সাহেবী হোটেলে, আবার কাজে বসল তো ধ্যানমগ্ন মহাতপস্বী। তখন ভাস্করের নিকটতম বন্ধুও চিনবে না ওকে।

কোট পরতে ভাস্করকে সাহায্য করল অন্নদা।—'কবে ফিরবে দিল্লী হতে? জান তো কাঙ্কাদাসের ছেলেও যাচ্ছে!'

—'যাচ্ছে ? তা যাক। ওর জন্য ভেব না তুমি।'

—'ওরা অনেক টাকা খরচ করবে।'

—'আমিও করব কিছু, তবে অনেক নয়। তোমার বড়সাহেবের হুকুম ঘুষ-টুষ চলবে না। আর কি জান, এবার দিল্লীতে টাকার খেলা সুবিধে করতে পারবে না। আমি চাইছি—ওরা টাকা দেখাক, সেটাই যাবে ওদের বিপক্ষে তা হলে।'

—'ওরা আমাদের চেয়ে কম রেট দেবে।'

—'কি করে জানবে আমাদের রেট ?'

—'জেনেছে। প্রত্যেকবার জানে।'

একটা স্তব্ধমুহূর্ত।

—'বাবাকে বল নি কেন ?'

—'প্রমাণ কই ? ওর অতিরিক্ত বিশ্বাস ম্যানেজারের উপর। সেই সাহসেই তো রসের কাজের উপরও কলম চালাতে যায় সে। অবশ্য যোগ্যতাও আছে। এক কাঙ্কীদাস ছাড়া সব জায়গাতেই কোম্পানীর স্বার্থ দেখে প্রাণ দিয়ে।'

—'ভকত! আমি ভেবেছিলাম বিপিন গুপ্ত।'

—'ঠিকই ভেবেছ। বিপিন গুপ্তই ওর হাতিয়ার।'

—'কতদিন কাজ করছে বিপিন গুপ্ত ?'

—'দু'বছর। ভকতই এনেছে ওকে। তার আগে তো রেকর্ড থাকত অনিমেষের কাছে।'

—'হুঁ। জান কাকু, সামনের বছর কোম্পানীর অনেক অদল-বদল হবে।' প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিল ভাস্কর।

—'পাটমার হবে রস ?' অন্নদা জিজ্ঞেস করল।

—'কেবল রস নয়। মামা, মেসোমশাই, তোমার বৌঠাকরুণ।' বাবা বলেছেন তুমিও একজন ডিরেক্টর হয়ে যাবে।'

—'পাগল! বলে কি ভাস্কর। ক্লার্ক হবে ডিরেক্টর।'

পালিয়ে এল ঘর ছেড়ে অন্নদা। সিঁড়িতে শোনা গেল জুতোর শব্দ।

—'কি ব্যাপার ? মাড়োয়ারী বনবার মতলব না কি ? কেবল ব্যবসা।'

—'দেখছ তো, নিন্দে করতে চেয়েও মাড়োয়ারীদের প্রশংসাই করে ফেললে তুমি। সত্যি, কাজে ওদের নিষ্ঠা প্রশংসার যোগ্য।'

কথা হচ্ছিল অরুণাংশু আর ভাস্করের মধ্যে। পাশে জানালার উপর পা তুলে দাঁড়িয়েছিল প্রবীর। চারমাস ক্লাবে আসে নি ভাস্কর। হিল্লি-দিল্লী করেছে ব্যবসার কাজে। এই বয়সের চারটা মাস! কত আনন্দ যে মিস্ করল ভাস্কর। দিল্লীলালও প্রায় তিন মাস অনুপস্থিত ? ও তো দিল্লীতেই ছিল, দেখা হয় নি ভাস্করের সঙ্গে ? জানতে চাইল প্রবীর।

—'কতবার! এক ধাক্কায় ঘুরে, একই 'কুলচে' 'ছোলে' খেয়ে বেড়িয়েছি তো আমরা। উঃ! যা গরম দিল্লীতে।'

—'কি দরকার ছিল তোমার নিজের যাবার ? ঝানু লোক রয়েছে ভকত। এই গরমে দিল্লী! হরিবল!'—বলল জাস্টিস ঘোষের ছেলে অরুণাংশু ঘোষ—বন অ্যাণ্ড বন্সের চোদ্দ শো টাকা মাইনে পাওয়া সেক্রেটারী।

—'সত্যি! এত ব্যবসা ব্যবসা করলে ক'দিন পরই একদম মর্বিড হয়ে যাবে তুমি।' প্রবীরের উক্তি।

ভাস্কর হাসল :—'বাঙালী ব্যবসায় হেরে যাচ্ছে, হটে যাচ্ছে ঠিক এই কারণেই। কাজ আর আনন্দের সামঞ্জস্য রাখতে পারছি না আমরা। একটু উঠতে না-উঠতেই কাজ ছেড়ে দিই কর্মচারীর হাতে, আনন্দের ভার আমাদের। ক'দিন পরই ব্যবসা কাঁপতে থাকে, তখন ছুটি মাড়োয়ারী সিন্ধির দরজায়—যাদের হরদম গাল দিচ্ছি কালচার নেই বলে। কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যবসা হাত বদলে ওদের কাছে চলে যায়, আর আমরা মাথা কুটে মরি, বলি বাংলা দেশটা কিনে নিল অবাঙালী। ভকতকে পাঠাবার কথা বলছিলে অরুণ ? ওর চেয়ে অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট কর্মচারী আছে কাঙ্কীদাসের, তব টেণ্ডারের তদ্বিরে যায় কেন দিল্লীলাল ?'

একটু সময় কাটল চুপচাপ।

—'তোমাকে অত্যন্ত মিস করেছি আমরা সিজন গার্ডেন পার্টিতে। অদ্ভুত হয়েছিল। সিসি, লিসির ডান্স। বাজনায় মালাবারী। লাঞ্চ ফিরপো। লিলিরা আবার ফ্যান্সী ড্রস-বল আর ফেয়ার অ্যারেঞ্জ করেছিল। এককাপ চা দশ টাকা। টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি ক্লাব ছাড়া পারবে না কেউ এমন ব্যাপার করতে। ফিপটিন থাউজেণ্ড নীট খরচা।' অরুণ ক্লাবের মরশুমী আনন্দের খবর দিল উৎসাহের সঙ্গে।

—'আরে এই অভিজাততম ক্লাবের মেম্বার থাকবার মত চাঁদা যোগাড়ের সামর্থ্য সঞ্চয়েই তো দৌড়েছিলাম দিল্লী।'

—'উঃ! বোগাস! কেন এত পরিশ্রম ? মিত্রসাহেব কি ডিস্ইনহেরিট করছেন তোমাকে ?' বলল প্রবীর।

—'বাবার টাকা আছে, অ্যাণ্ড হি হ্যাজ আরণ্ড ছাট মানি অ্যাট দি সোয়েট অব হিজ ব্রাউ। বহু পরিশ্রমে তিনি দাঁড় করিয়েছেন ব্যবসা, কিন্তু তাতে আমার কি ? আমি নিজেকে এস্টাব্লিশ করব আমার কর্মক্ষমতা দিয়ে। বাবার অফিসে ঢুকেছি, যদি কাজ না দেখাতে পারি, বুঝব ব্যবসা আমার জন্য নয়। চাকরী নেব যে কোন জায়গায় যে কোন কোম্পানীতে।'

ভাস্করের কথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল প্রবীরের চিন্তায়। সত্যি। সত্যি কথা বলেছে ভাস্কর। নিজেকে ধিক্কার দিল মনে মনে। বাবার অজস্র টাকা নষ্ট করেছে সে, ইয়োরোপে অনেক বন্ধু তার, এখানেও সবাই গণ্যমান্য। আর সে নিজে ? তার পরিচয় বিমান বোসের ছেলে। নিজে ? নিজে কিছু না। পায়ের জুতোটি হতে যে দামী গাড়ীর স্টিয়ারিং হুইল ধরে আশি মাইল স্পিড দেয়—সব বাবার। প্রবীরের সমবয়সী ভাস্কর—এরি মধ্যে ব্যবসায়ী-মহলে নাম হয়েছে জুনিয়ার মিত্রের ফিউচার বিজনেস ম্যাগনেট বলে।

—'ডোণ্ট মাইণ্ড ভাস্কর। ছোটবেলায় বন্ধু আমরা। পার্সোনাল কথাবার্তাও সব সময় বলি খোলাখুলি। এতই যদি ম্যাটার অব ফ্যাক্ট তুমি—অনেক সন্ধ্যা কাটাও কেন তবে তপতী রায়ের বাজনা শুনে ? তাকে নিয়ে যাও লাইব্রেরীতে, ইউনিভারসিটিতে এ তো ওপেন ফ্যাক্ট, যে তাকে ভাল লাগছে তোমার। তপতী রায় ভাল মেয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু নিশ্চয়ই আনপ্র্যাকটিকাল, অ্যাক্সকিউজ মি, একটু ব্যাক ডেটেডও বটে। অথচ এদের এক প্রকার তুচ্ছ করেই তুমি ছুটছ তার কাছে। তোমার কথার সঙ্গে কি তোমার ইচ্ছার মিল দেখছি না।'

[ক্রমশ।

অন্নাভাবে হাহাকার

'বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার,
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু—
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।'

একদা ধনধান্যে পরিপূর্ণা অশেষ সোভাগ্যশালিনী বর্তমানে সহস্র দুর্ভাগ্য প্রপীড়িতা, লাঞ্ছনায় জর্জরিতা বাঙলা দেশের সাম্প্রতিক খাদ্য-পরিস্থিতির সমস্যাসংকুল পরিবেশে—'এবার ফিরাও মোরে' নামক রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় কবিতাটির উপরিউদ্ধৃত বিখ্যাত কয়েকটি পংক্তি হৃদয়ে আবার যেন নূতন করিয়া রেখাপাত করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' সম্বন্ধীয় রচনাংশগুলি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে।

মাসিক বসুমতীর গত সংখ্যায় এই বিভাগে বিষয়টি লইয়া আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু দৈনিক যে ভাবে খাদ্যাবস্থার অবনতি ঘটিতেছে এবং ইহার প্রতিক্রিয়া যে কি শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করিতেছে তাহা চিন্তা করিলে বেদনা ও উদ্বেগের আর অন্ত থাকে না।

অভাব, অনটনের সঙ্গে সঙ্গেই বোঝার উপর শাকের আঁটির ন্যায় ভেজালের ক্রমবিস্তার আজ যথেষ্ট চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একে চতুর্দিকে 'নাই নাই' রবের মধ্যে যেটুকু কচিৎ কখনো 'আছে' শোনা যায় তাহাও আবার নিরাপদ নয়। ভেজাল বস্তুটি যে সাম্প্রতিক অভাব-অনটনের সুযোগ লইয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা নয়, ভেজাল পূর্বেও ছিল, ভেজাল লইয়া আলাপ-আলোচনাও ইতোমধ্যে অসংখ্যবার হইয়াছে, ভেজাল বন্ধের আন্দোলনও বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু ভেজালের প্রাদুর্ভাব যে ভাবে ঘটিয়াছে তাহা কল্পনারও অতীত। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, একটি শিশুকে সদ্যক্রীত হরলিক্স খাওয়াইবার পর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তাহার জীবনান্ত হয়, পরীক্ষায় দেখা গেল যে হরলিক্সে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত ছিল। ইহা ছাড়া তৈলের মধ্যে সায়নাইড এবং তামাকবীচি হইতে নির্ধাসিত তৈল, রন্ধনের গুঁড়া মশলায় অশ্বিষ্ঠা প্রভৃতি প্রয়োগের ভয়ঙ্কর সংবাদসমূহ আমাদের স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে।

দেশের অধিবাসীদের তিনটি স্তরে ভাগ করা যায় (১) বিত্তবান ধনিক সম্প্রদায়, (২) মধ্যবৃত্ত গৃহস্থ, (৩) গৃহহীন শ্রমজীবী শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীর কথা বাদই দিতেছি শেষোক্ত শ্রেণীর বিষয়ও খুব গুরুতর চিন্তার কিছু নাই, ব্যয়ের অনুপাতে তাহাদের আয় বাড়িয়াছে উপরন্তু তাহাদের জীবনযাত্রা ব্যয়সাপেক্ষ নয়। কিন্তু বিপজ্জনক সর্বপ্রকার সামাজিক রীতি, নীতি, অনুশাসন মানিয়া চলিতে হয়। সাধারণত একটি পরিবারে দেখা যায় হয় তো একটি প্রাণীর উপার্জনে আটটি-দশটি প্রাণীর অন্নসংস্থান হয়, তাহার উপর রোগ, শোক, সামাজিকতা তো নিত্যসহচর, আয়ের একটি বিরাট অংশ যায় বাড়িভাড়ায়। তারপর পুত্র-কন্যাদের শিক্ষা। অবশ্য সঞ্চয়ের উদ্ভট স্বপ্ন অনেক উন্মাদের মাথায় আসিতে পারে, কিন্তু ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করিবেন যে, অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যয় যেখানে আয়ের অনুপাতে নির্বাহ হয় না—সেখানে অবশ্য সঞ্চয়?

এখন কথা হইতেছে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের এই নিত্য মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যে, ঔষধে ভেজালের ভয়ঙ্কর প্রয়োগ, খাদ্যবস্তুর ক্রমদুষ্প্রাপ্যতা মানুষের সমগ্র চিন্তা বিশেষভাবে অধিকার করিয়া আছে। ইহা লইয়া যথেষ্ট উদ্বেগ, যথেষ্ট চিন্তা, যথেষ্ট বাদপ্রতিবাদ কিন্তু তথাচ এই সর্বনাশগুলির মূলোচ্ছেদ এখনও হইতেছে না কেন? কোন শক্তির সাহায্যে ইহারা এখনও বর্তমান? সহস্র বাদানুবাদ সত্ত্বেও কোন বলে ইহারা এখনও কার্যক্ষম? আসল কথা বাদানুবাদ কেবল শক্তি ও সময়েরই অপচয় করে, প্রকৃত কার্য তাহাতে কিছুই হয় না। উদ্বেগ, চিন্তা, ভাবনার মধ্যে সমাজ সচেতন জনকল্যাণকামী মনের পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যায় কিন্তু তাহার দ্বারা কখনও কোন প্রকার সমস্যার সমাধান হয় না—হইতে পারে না—হওয়া অসম্ভব।

এই দুর্যোগগুলির কবল হইতে দেশকে মুক্ত করার বহুতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। শুধু যেগুলি অবলম্বন করিলে দুর্যোগগুলির অবসান ঘটিত সেই ব্যবস্থাগুলিই অবলম্বিত হয় নাই। সরকারপক্ষ যদি ভেজাল বা দুর্নীতি বন্ধ করার চেষ্টা তো দূরের কথা, সামান্য ইচ্ছাটুকুও অন্তরের একটি নিভৃত কোণে পোষণ করিতেন তাহা হইলে তাসের ঘরের মত সর্বপ্রকার দুর্নীতি মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হইত। এই ঘোরতর অপরাধগুলি করিবার মত সাহস কোথা হইতে পায় খাদ্য ও ঔষধে বিষাক্ত ভেজাল মিশ্রণকারী জঘন্য নরপিশাচের দল? এত সাহস কেমন করিয়া তাহাদের অধিকারগত হয়? সহস্র আন্দোলন, বাদ-প্রতিবাদ, মিছিল, জনসভা, রচনাদি ক্রমান্বয়ে তাহারা যে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে কি দুর্ভেদ্য রহস্য তাহার পিছনে নিহিত?

আসলে সরকারপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা এবং জাতীয় স্বার্থের প্রতি ক্ষমার অযোগ্য উপেক্ষাই দুর্নীতি প্রসারের একমাত্র কারণ। অগণিত জনগণের সুখ-দুঃখের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত তাঁহারা কয়েকটি মুষ্টিমেয় পুঁজিপাতিদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিয়া সর্বসাধারণকে এই সর্বনাশা অবলুপ্তির মহাসাগরে তলাইয়া যাইতে দেন তাহা হইলে সেই ভয়ঙ্কর ধ্বংসের বন্যার উন্মত্ত ঊর্মি কি তাঁহাদেরও নিস্তার দিবে? এই কথাটিই আজিকার মোহাচ্ছন্ন, কাণ্ডজ্ঞানহীন সরকারকে বারম্বার [illegible] দিতেছি।

এশীয় আকাশে ঘোর দুর্যোগ

এশিয়ার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। যুগপৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্যোগ তাহার আকাশ-বাতাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কোটি কোটি এশীয়বাসীর মনে আজ শান্তির লেশমাত্র নাই, বিন্দুমাত্র আনন্দও আজ স্মৃতিতে পর্যবসিত, হাসি, গান, কাব্য তাহাদের জীবন হইতে আজ অন্তর্হিত। কয়েকটি মানুষের রাজনৈতিক খেলায় এবং ক্ষমতার লোলুপতায় কোটি কোটি নিরীহ মানুষের জীবনযাত্রা আজ বিঘ্নিত, প্রাণ বিপন্ন, ভাগ্য বঞ্চনার প্রলেপযুক্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ভিয়েৎনাম আক্রমণকে আমাদের এই ধারণার একটি উজ্জ্বল সাম্প্রতিক উপমাস্বরূপ অনায়াসে গণ্য করা যাইতে পারে। কাহার দোষ, কাহার গুণ সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র—পরে আমরা সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। যে কোন আক্রমণ সর্বাগ্রেই যে কথাটি মনে করাইয়া দেয়, তাহা হইল রাজনৈতিক দ্যূতক্রীড়ার হতভাগ্য শিকার কোটি কোটি নিরীহ প্রাণ আবার এক সর্বনাশা অবস্থার সম্মুখীন হইল। এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশ আক্রমণের মধ্যে দোষ একপক্ষের হইলেও বা পরাজয় একপক্ষ বরণ করিলেও লোকক্ষয়, শক্তিক্ষয় ও অর্থক্ষয়ের দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায়—ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে দুই পক্ষই। সেই কারণেই সাধারণ বিচারের মানদণ্ডে সমাজের পক্ষে যুদ্ধ এত ক্ষতিকর এবং মানবকল্যাণের ও রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের জন্য যুদ্ধ বর্জনীয়।

এশিয়া যে আজ বিপন্ন সে বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা নাই, আর ইহাও মিথ্যা নয় যে, এশিয়ারই অন্তর্গত কয়েকটি রাষ্ট্র এই বিপদের জন্য অনেকখানি দায়ী। তাহাদের পররাজ্যলোলুপতা, কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ, নীতিবিসর্জিত কার্যকলাপ সমগ্র এশিয়াকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিতেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেভাবে ধীরে ধীরে কমিউনিজমের প্রসার ঘটিতেছে, তাহা অতীব ভয়াবহ। তাহার পরিণতি যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। তথাকথিত কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা কায়েম হইলে যে অবস্থায় আমরা উপনীত হইব, তাহাও বর্তমানকালে সংশয়ের তালিকাভুক্ত নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই কমিউনিজমের প্রসারে যথেষ্ট সতর্ক হইয়াছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেরও এ সম্বন্ধে চিন্তার অন্ত ছিল না।

কমিউনিজমের অধিকতম প্রসার ঘটিতে না দেওয়াই আমেরিকার উদ্দেশ্য। আমেরিকা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল এই অনভিপ্রেত প্রসারকে অবদমিত করিয়া রাখিতে। কিন্তু অবস্থা ভিন্নতর রূপ লইল।

ভিয়েৎনাম আজ উত্তর-দক্ষিণে বিভক্ত। উত্তর ভিয়েৎনাম উত্তর-দক্ষিণ সীমান্তের ভিয়েৎ কং বাহিনীকে আধুনিক আগ্নেয় অস্ত্রাদি সরবরাহ করিতে লাগিল। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—চীনের সহিত ইহার পথসংযোগ বিদ্যমান।

উত্তর অস্ত্র সরবরাহ করিতেছে উত্তর-দক্ষিণের সীমান্তের বাহিনীকে আবার উত্তরে ভিয়েৎনামের সহিত পথসংযোগ (হয় তো অন্তর সংযোগও) আছে চীনের—ইহার পরবর্তী অধ্যায় কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। ঐ অস্ত্রাদির সাহায্যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামই যে আক্রান্ত হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? তদুপরি মাও-সে-তুংয়ের সম্প্রসারণবাদ এইভাবে উত্তর ভিয়েৎনামের সহায়তায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামেও ছড়াইয়া পড়িবে এ সিদ্ধান্তে আমরা অনায়াসে উপনীত হইতে পারি।

মাত্র এক বৎসর পূর্বে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অনুষ্ঠিত কার্যকলাপ পৃথিবীর সংবাদপত্রের বিরাট অংশ দিনের পর দিন ধরিয়া অধিকার করিয়াছিল। ড্রাগন লেডী মাদাম নু দেশকে যেভাবে সর্বনাশের দ্বারদেশে উপনীত করিয়াছিলেন তাহার বিষময় প্রভাব হইতে দেশ আজ মুক্ত। সেখানে আজ শান্তি, শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। ধ্বংসস্তূপের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে আবার নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। শ্মশানের মধ্যে আবার প্রতিষ্ঠা ঘটিতেছে বৃহৎ শক্তির প্রতিশ্রুতিপূর্ণ নূতন প্রাণের। বলা বাহুল্য, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও মস্তিষ্ক পুরোপুরি বিদ্যমান। এমতাবস্থায় দক্ষিণ ভিয়েৎনাম আক্রান্ত ও ভিন্নভাবে পুনরায় বিপদগ্রস্ত হইলে আমেরিকার ক্ষতিই সর্বাধিক। সে ক্ষেত্রে তাহার আক্রমণাশঙ্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্বাভাবিকতার পর্যায়েই পড়ে তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে তাহার গত্যন্তরই বা কি ছিল?

প্রেসিডেন্ট জনসন

আরও একটি দিক আছে। প্রেসিডেন্ট জনসনের ভাগ্যচক্র। রুজভেল্টের মৃত্যুর পর ট্রুম্যান যখন রাষ্ট্রপতিত্বে উন্নীত হন তাহার তিন বৎসর পর নবনির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—অতএব নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে এবং নিজের ভবিষ্যতকে সুদৃঢ় করিতে ট্রুম্যান সময় পাইয়াছিলেন তিনটি বৎসর। এখানে জনসনের মেয়াদ মাত্র এক বৎসর। এই এক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি মাসও উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর কয়েকটি মাস মাত্র অবশিষ্ট। তাহার পরই তাঁহাকে দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হইবে—কি মূলধন লইয়া তিনি সেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন, কি তাঁহার শক্তি, কি তাঁহার রসদ? কেনেডির মর্মান্তিক মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপতি হিসাবে সক্রিয়ভাবে জনসনের এই প্রথম চরম ব্যবস্থা অবলম্বন। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম কমিউনিস্ট কবলিত হইলে আমেরিকার যে ক্ষতি, তাহা সহজেই

অনুমেয়। বিরোধিবৃন্দের এবং দেশবাসীর নিকট জনসনের চরম অযোগ্যতা সেক্ষেত্রে প্রমাণিত হইবে—জনসন যে দুর্বল নন, এই আক্রমণের দ্বারাই তিনি তাহা দেখাইলেন এবং নিজের প্রতিষ্ঠার পথ এই স্বল্পপরিসর সময়সীমায় অনেকখানি প্রশস্ত করিলেন।

তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া এই আক্রমণ যে অসমীচীন ও অযৌক্তিক এই সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই অবলম্বন করা চলে না এবং ইহার দ্বারা যে কমিউনিজমের প্রসার বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইল তাহাও অনস্বীকার্য। বিশেষত কমিউনিজম রোধকল্পে আমেরিকার এই আক্রমণ আমরা সমর্থন করি তবে সেই সঙ্গে ঈশ্বরের চরণে এই ঐকান্তিক প্রার্থনাও জানাই যে—এশিয়ার ভাগ্যাকাশকে মঙ্গলময় পরিপূর্ণরূপে মেঘমুক্ত করিয়া প্রসন্ন সূর্যের অম্লান রশ্মিতে উজ্জ্বল করিয়া দিন।

আয়ুব খাঁর ব্যাকুলতা

পাকিস্তানের আয়ুব খাঁর আজ আর ব্যাকুলতার অন্ত নাই। বোধ করি আহারনিদ্রাও তাঁহার ঘুচিয়াছে। মনে তাঁহার আজ আর তিলমাত্র সোয়াস্তি নাই। ভারতের নূতন প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীর সহিত একবার তাঁহার সাক্ষাৎ না হইলে যে কি ঘটিবে তাহা বোধ করি একমাত্র তাঁহার 'খোদা' ছাড়া আর কাহারও জ্ঞাত নয়।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

চীনের পরম মিত্র আয়ুব খাঁ কাজের লোক। তাঁহার অতি বড় শত্রুও বোধ করি তাঁহাকে নিষ্কর্মা বলিতে পারিবে না। সারা পৃথিবীর ঘরে-ঘরে, দেশে-দেশে, বন্দরে-বন্দরে ভারতের কুৎসা প্রচার এবং ভারতের বিরুদ্ধে উসকানো তাঁহার বিশেষ এবং মুখ্য কার্য। তাহার পর হিন্দুনির্যাতন সম্বন্ধেও তাঁহার মূল্যবান সময়ের অনেকখানি ব্যয় করিতে হয়, গতানুগতিকতার সহিত এই মানুষটির কিন্তু কোনদিনই মিল হইল না, এক ধরণের অত্যাচার চালানোর সেই কারণেই তিনি পক্ষপাতী নন। তাঁহার নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা নূতন নূতন ধরণের অত্যাচারের, নৃশংসতার, ও বীভৎসতার জন্ম দিয়া চলিতেছে, হিন্দুদের উপর তাহাদের প্রয়োগও ঘটিতেছে অতীব দক্ষতা (!) সহকারেই। হিন্দুনিগ্রহের নব নব কৌশল তাঁহার অভাবনীয় উদ্ভাবনীশক্তির বিশেষ পরিচায়ক। এ হেন শক্তিমান ও কর্মীপুরুষ একবার যদি শাস্ত্রীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পান তাহা হইলে হয় তো বা 'সব ঝুটা হ্যায়' মনোভাব লইয়া মনের দুঃখে বনেও চলিয়া যাইতে পারেন (এমন দিন কি······?)।

কাজের কথায় আসা যাক, খাঁ সাহেব এত ব্যগ্র কেন? এই চার চক্ষের মিলন না ঘটিলে কি দেশ রসাতলে যাইবে? তাঁহার অতি আগ্রহই আমাদের মনে সন্দেহের বীজ স্বাভাবিকভাবেই বপন করে, এই অতি আগ্রহই তাঁহার কপটতার মুখোস খুলিয়া দিল—যে কপটতা তিনি আবৃত করিতে গিয়াছিলেন এই অতি আগ্রহ দেখাইয়া।

অল্পদিন আগেও যিনি বলিয়াছেন নেহরুর মৃত্যুর সুযোগে ভারত আক্রমণ করিতে পারিতাম—এই কথার মধ্যেই তাঁহার মনোবাসনা ছায়া ফেলিয়াছে। যাহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনে মনে পরিপূর্ণভাবে ভারত আক্রমণের তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন, শুধু সুযোগ এবং অছিলার অপেক্ষা।

শোনা যাইতেছে, কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি এখানে আসিতে চান কিন্তু আমাদের বিচারবুদ্ধি ঐ কথাটি মানিয়া লইতে আমাদের নিষেধ করিতেছে। আসলে তিনি আসিতেছেন পাকিস্তানী উচ্ছেদ বন্ধ করিতে—ইহাই আসল কথা। তা ছাড়া, এখন যে পরিস্থিতি তাহাতে কাশ্মীর সম্বন্ধে আর আলোচনার কি আছে, গত জানুয়ারী মাসে পূর্ব-পাকিস্তানে যে অমানুষিক বর্বরোচিত হিন্দুনির্যাতন ঘটিয়া গেল তাহার নায়ক সবুর খাঁ তো ইতোমধ্যে ঢাকায় কাশ্মীর আক্রমণের দাবী তুলিয়া খুব লাফালাফি, দাপাদাপি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে আয়ুব দিল্লী আসিয়া কাশ্মীর সম্বন্ধে আর নূতন কি আলোচনা করিবেন? পাকিস্তান হইতে সর্বহারা বাস্তুচ্যুতদের আগমন একবিন্দু এখনও কমে নাই, পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলিতেই কদাচ কোন হিন্দুর সংবাদ প্রকাশিত

হইয়া থাকে—ইহার দ্বারাই সেখানকার অবশিষ্ট হিন্দুদের অবস্থা এবং হিন্দু সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব আঁচ করিতে তিলমাত্র ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। কাশ্মীর সীমান্তেও তো পাকিস্তানী উপদ্রবের অন্ত নাই।

ভারত সরকারের স্পষ্টভাবায় এই সকল বিষয়ে পাকিস্তানের সহিত খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা উচিৎ। এখনও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যাপারেও পাকিস্তানকে ভারতের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের এই ঔদ্ধত্য ও প্রগল্‌ভতায় প্রশ্রয় দেওয়া কোনমতেই ভারতীয় সরকারের উচিৎ নয়—তাঁহারা সর্বাগ্রে দাবী তুলুন যে, আগে হিন্দু নির্যাতন বন্ধ হউক; তাহার পর আমাদের স্বরাষ্ট্র অথবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানকার হিন্দুদের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন তাহার পর আয়ুব খাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করা চলে কি চলে না ভারত সরকার ভাবিয়া দেখিবেন কিন্তু তাহার পূর্বে কদাচ নয়।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে আজ যে সকল সমস্যা বিরাজমান সেগুলি ঠিক রাজনৈতিক সমস্যাও নয়, আসলে সেগুলি সাম্প্রদায়িক সমস্যা। সেই অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে সমস্যার সমাধানও চিরকালের মত অদৃশ্যই থাকিয়া যাইবে।

পাকিস্তান এখনও অভিযোগ করিয়া চলিতেছে যে, ভারত পাগলামি করিতেছে, এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য যে পাগলামি করা হইতেছে, ঠিকই, তবে পাগলামি ভারত করিতেছে না, করিতেছে পাকিস্তান, শুধু তাহাই নয় অর্থাৎ পাগলামিই নয় সমগ্র সভ্যতার ইতিহাসে পাকিস্তান কলঙ্কলেপন করিতেছে যাহার সহিত সে আজ একীভূত হইয়া গিয়াছে।

বর্তমান শিক্ষাসমস্যা প্রসঙ্গে

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণের মধ্যে যাঁহাদের সততা, আন্তরিকতা এবং বলিষ্ঠতা সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা তাঁহাদের অন্যতম। শ্রীচাগলার মন্ত্রী-পূর্ব জীবনও গৌরবের ও কৃতিত্বের আলোয় উজ্জ্বল। কর্মক্ষেত্রে তিনি যে অকৃত্রিমতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা জনগণের অভিনন্দনে ভরপুর। অল্পকাল পূর্বে রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর অন্তঃসারশূন্য এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভারত-বিদ্বেষমূলক ভাষণ যে সুতীক্ষ্ণ যুক্তি ও অকাট্য বক্তব্যের দ্বারা শ্রীচাগলা ম্লান করিয়া দিয়াছিলেন ভারতীয় জনগণের স্মৃতিতে তাহা উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে শিক্ষা একটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। জনজীবনের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান দিকের সমৃদ্ধিসাধনের দায়িত্ব এই দপ্তরের। সুখের বিষয়, শ্রীচাগলার ন্যায় বিচক্ষণ এবং সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির এই দপ্তরের সহিত সংযোগ নিশ্চয়ই আনন্দের বিষয়।

শ্রীচাগলার শিক্ষামন্ত্রীর কর্মভার গ্রহণের পূর্বে এই দপ্তরটি বহুবিধ অযোগ্যতার প্রমাণ দিতেছিল। জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্র নানাপ্রকার আবিলতায় ভরিয়া উঠিতেছিল, শিক্ষাজীবন এক অভাবনীয় সমস্যার সম্মুখীন হইতেছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার এবং বহুবিধ গলদের সংবাদ কাহারও অজানা নয়। স্কুল-কলেজে স্থান সঙ্কুলান যে কি ক্লেশকর তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না, যদি বা কোনক্রমে স্কুল-কলেজের দুয়ারগুলি অর্গলমুক্ত হয় পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করা তখন আর এক গভীর সমস্যার বস্তুতে পরিণত হয়; দেখা গিয়াছে পরীক্ষা যখন প্রায় নিকটবর্তী তখনই পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হইল। অথচ, তাহার আশানুরূপ প্রতিকার এতাবৎ বলিবার মত কিছুই হয় নাই।

দেশের যাহারা আশা-ভরসা-ভবিষ্যৎ, জীবনের বোধনলগ্নে যদি তাহাদের এই দুর্ভোগ ও যন্ত্রণার জ্বালায় জ্বলিতে হয় তাহা হইলে তাহার প্রভাব তাহার পরবর্তীজীবনে যে কি বিষময় হইবে সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার সংশয়ের অবকাশ থাকে না। বাল্যকালে যে দুর্ভোগ তাহাকে অতিক্রম করিতে হইতেছে তাহার স্মৃতি তাহার মন হইতে মুছিয়া যাওয়ার নয়। ছাত্রজীবনেই এই ঘটনার ফলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাই এক ভীতিকর মূর্তিতে তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইবে। এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হইলে দেশের যে সমূহ সর্বনাশ ঘনাইয়া আনে তাহার তুলনা মেলা ভার।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস কমিশনের চেয়ারম্যানরূপে দেশমুখ মহাশয়

এম সি চাগলা

শিক্ষা-সংস্কারের নামে যে শিক্ষাসংহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহার সংশোধনের দিকে বর্তমানে শ্রীচাগলা মনোনিবেশ করিয়াছেন। হতাশায় জর্জর দেশবাসীর প্রাণে এই সংবাদটি যে আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ—বলা বাহুল্য, থাকিতে পারে না। প্রয়োজনের অনুপাতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় না বাড়াইয়া ছাত্রসংখ্যা কমাইলে সমস্যা কমা তো দূরের কথা আরও ব্যাপকভাবে স্ফীতিলাভ করিবে। শিক্ষা জাতির প্রাণ, শিক্ষা ছাড়া বাঁচিবার কোন উপায় নাই, শিক্ষা হইতে ভবিষ্যতের মানুষ যদি বঞ্চিত হয় তাহা হইলে কায়িকভাবে সে বাঁচিয়া

থাকিলেও সমাজে মান যে কোথায় নামিবে তাহা ভাবিলে কলকিনারা পাওয়া যায় না। তখন চারিত্রিক অধঃপতনের যে ভয়ঙ্করী বন্যা আসিবে তাহাকে কোন শক্তি দ্বারা প্রতিরোধ করা যাইবে তাহা চিন্তা করিলে দিশাহারা হইতে হয়—তদুপরি পূর্বোক্ত ব্যবস্থার প্রচলন থাকিলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে ব্ল্যাকমার্কেট দেখা দিবে এবং উক্ত ব্যবস্থা যে কতখানি ক্ষতিকর শ্রীচাগলা তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন। দিল্লীর প্রতিটি শিক্ষার্থী যাহাতে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তজ্জন্য তাঁবু খাটাইয়া শিক্ষাদানের সুযোগ দেওয়া হইতেছে। বোম্বাইয়ে সকাল-সন্ধ্যা ক্লাশ খুলিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে, এই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষামন্ত্রীর দেশের শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য যে আন্তরিকতা ও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেল তাহা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়।

এখন বাঙলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থাও তো নৈরাশ্যজনক। দিল্লী ও বোম্বাইতে যেভাবে সমস্যার সমাধান হইতেছে, কলিকাতার দিকেও সেইরূপ কোন মঙ্গলজনক পথ অবলম্বন করিলে বাঙলার অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী লাভবান ও উপকৃত হইবে। শ্রীচাগলার সক্রিয় চেষ্টা সর্বতোভাবে আশা ও আনন্দের বার্তাবহ, আমাদের মনে তাঁহার অবলম্বিত ব্যবস্থায় যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে। তজ্জন্য, বাঙলা দেশের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির দোষ-ত্রুটি, অসুবিধাগুলির দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

॥ শোক-সংবাদ ॥

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

বাঙলা দেশের শিক্ষাজগতের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান ও রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত গত ৫ই শ্রাবণ মাত্র ৫৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। বি-এ'তে দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে ইনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন। ১৯৩৮ সালে পি আর স্কলারশিপ পান ও ১৯৪০ সালে ডক্টরেট লাভ করেন। শিক্ষাবিদ ছাড়া সাহিত্যকার ও সমালোচক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ রচনাদি দেশের সাংস্কৃতিক জগতের পরম গর্বের বস্তু। আন্তর্জাতিক সুধীসমাজে ইনি যথেষ্ট সমাদর পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এযুগে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ইতিহাসে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, বাঙলা সাহিত্যের একদিক, বাঙলা সাহিত্যে নবযুগ, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও আধুনিক কবিতার প্রথম পর্যায়, উপমা কালিদাসস্য এবং আরও অসংখ্য মূল্যবান বিদগ্ধজন-সমাদৃত গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য গ্রন্থটি তাঁকে এ্যাকাডেমী পুরস্কার এনে দেয়। শিশুসাহিত্যেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। তাঁর মৃত্যু বাঙলা দেশের পণ্ডিতসমাজে এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করল।

নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী

রোটারি ইণ্টারন্যাশানালের প্রথম এশীয় সভাপতি ও কলম্বিয়া পিকচার্স ও এম জি এমের কলিকাতাস্থ পরিচালক ডঃ নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী গত ৫ই শ্রাবণ ৭৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি এম এ পরীক্ষায় এবং আইন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ সালে রোটারি আন্দোলনে তিনি যোগ দেন। ১৯৪৪-৪৫ এবং ১৯৬২-৬৩ সালে তিনি যথাক্রমে কলিকাতার এবং আন্তর্জাতিক রোটারি ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন। বাঙলা দেশের তিনি প্রামাণিক চিত্রের অন্যতম পথপ্রদর্শক। বেদান্ত এবং উপনিষদ সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর আলোড়ন এনেছিল। ফ্রান্স, চিলি ও আরবরাষ্ট্র তাঁকে 'অর্ডার অফ মেরিট'-এ এবং ক্যালিফোর্নিয়া কলেজ অফ মেডিসিন ও টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' প্রদানে সম্মানিত করেন। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে সম্মানিত করেন।

মহারাণী সুরজা দেবী

দেশপূজ্য মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্রবধূ ও মহারাজা স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের সহধর্মিণী মহারাণী লেডী সুরজা ঠাকুর গত ১২ই শ্রাবণ ৮৪ বছর বয়েসে গতায়ু হয়েছেন। দানশীলতা, পরোপকারিতা এবং বদান্যতা প্রমুখ মহৎ বৃত্তিগুলির তাঁর মধ্যে এক পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে সমগ্র পরিবারের মধ্যে তাঁকে একটি বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিতা করেছিল। তাঁর একমাত্র পুত্র মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, পুত্রবধূ মহারাণী সুরীতি ঠাকুর বর্তমান। তাঁর মৃত্যু বিগত যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের একটি স্মরণীয় যোগসূত্র ছিন্ন করে দিল।

সরসীবালা দেবী

স্যার আশুতোষ চৌধুরী, বীরবল প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ স্বনামধন্য দিকপাল চৌধুরী ভ্রাতৃবৃন্দের অন্যতম বিখ্যাত ক্যালকাটা উইকলি নোটসের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সহধর্মিণী এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কন্যা সরসীবালা দেবী গত ৩রা শ্রাবণ তাঁর ৭৯তম জন্মদিনে লোকান্তরিতা হয়েছেন। প্রখ্যাত ব্যারিস্টার রণদেব চৌধুরী এবং প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে তাঁর পুত্র ও জামাতা। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ জয়ন্তনাথ চৌধুরী ও চিত্রতারকা দেবিকারাণী তাঁর দেবরপুত্র ও দেবরপুত্রী।

ছবি দত্ত

বেদান্তরত্ন মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্রবধূ ও কবিমনস্বী সুধীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী ছবি দত্ত গত ৯ই শ্রাবণ মাত্র ৫৩ বছর বয়সে পরলোকযাত্রা করেছেন। ইনি উত্তর কলিকাতার সুবিখ্যাত ভোস (বসু) পরিবারের স্বর্গীয় সরোজেন্দ্রনাথ ভোসের কন্যা ও শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভোসের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত]

পাঠক পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা-সমালোচনা

শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমি মাসিক বসুমতীর একজন অনুরাগী পাঠক। আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত নূতন প্রবন্ধ বা ধারাবাহিক উপন্যাস সম্পর্কে আমার কৌতূহলের সীমা নেই। গত জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আপনার সম্পাদনায় মাসিক বসুমতী এক নবরূপ নিয়েছে—এ জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় কয়েকটি ধারাবাহিক রচনার সমাপ্তি ঘটেছে। আষাঢ় সংখ্যা হাতে নিয়ে দেখলাম যে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের বদলে দু'একজন নূতন লেখক-লেখিকার রচনা প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে একজন নবাগতা মহিলা ঔপন্যাসিকের একটি ধারাবাহিক উপন্যাস এ-সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। অন্যান্য সমস্ত লেখা পড়ার শেষে নমিতা চক্রবর্তীর 'শাশ্বতী' ধারাবাহিক উপন্যাসটি পড়তে শুরু করি। খানিকটা পড়ার পর কিন্তু চমকে উঠলাম। এত সুন্দর স্টাইলের লেখা ইদানীংকালে পড়েছি বলে মনে হয় না। সম্পূর্ণ অংশ পড়ে আরও ভাল লাগল। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত লেখা, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর গুণে এত হৃদয়গ্রাহী যে মুগ্ধ না হ'য়ে উপায় নেই। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানলাম যে, উক্ত লেখিকার 'ইন্দ্রনীলা' নামে আর একটি ছোট উপন্যাস আছে। বইটি নিশ্চয়ই পড়তে হবে। এক কথার পুনরাবৃত্তি করা, মনের সামান্য reflection কে তুলে ধরবার জন্য দশ পৃষ্ঠা ধরে ক্লান্তিকর বর্ণনা দেওয়া বর্তমানে যখন অধিকাংশ লেখক-লেখিকার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, সেই ১০০০।১২০০ পৃষ্ঠার বস্তাপচা উপন্যাস রচনার যুগে এ জাতীয় শিল্পজনোচিত লেখা সত্যিই দুর্লভ। 'শাশ্বতী' উপন্যাসের পরবর্তী অংশগুলি কেমন হবে জানি না, তবে যেটুকু পড়লাম তাতে মনে হ'ল যে, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত শক্তিশালী লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছে। প্রকৃত জহুরীই জহর চেনে। প্রাণতোষবাবু, সত্যিই আপনি পাকা জহুরী—তাই এমন একজন লেখিকাকে বসুমতীর মাধ্যমে আপনি অগণিত পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরেছেন। আপনার সম্পাদনায় মাসিক বসুমতী তার জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলুক। ইতি—সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল। ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১।

মহাশয়, আপনার পত্রিকার আলোকচিত্র বিভাগটি বসুমতীর শোভাবর্ধন করে নিঃসন্দেহে কিন্তু ছবির নামকরণে ভুল দেখা যাইলে বড়ই দৃষ্টিকটু লাগে। বর্তমান সংখ্যা অর্থাৎ চৈত্র—১৩৭০'-এ এইরূপ একটি ভুল আছে। ১০১৬ পৃষ্ঠার সংলগ্ন পাতায় জনৈক এস ধর কর্তৃক গৃহীত 'গির্জা' (কলিকাতা) নামক একখানি ছবি ছাপা হইয়াছে। কিন্তু ওই ছবিটি তো আসলে কলিকাতা হাইকোর্টের ছবি—সম্ভবত ইডেন উদ্যানের দক্ষিণ দিক হইতে তোলা। হাইকোর্টকে গির্জা বানিয়ে ফেলা—এটা কি আপনাদের ছাপার ভুল না এস ধরের ভুল, নাকি ধর মহাশয় হাইকোর্টকেই একটি গির্জা বলে ধরে নিয়েছেন? ধন্যবাদান্তে—সুনন্দা বসু, প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা-২৬।

মহাশয়, নিবেদন এই আপনাদের বসুমতীর দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকের নিয়মিত (fixed) গ্রাহক আমি। কার্তিক ১৩৭০, মাসিক সংখ্যাতে সম্পূর্ণ উপন্যাস সতীকান্তবাবুর লেখা পাঠ করিয়া এত আনন্দ পাইলাম যে, তাহা বর্ণনাতীত। কৃপাপূর্বক যদি শ্রীযুক্ত সতীকান্ত গুহ মহাশয়ের ঠিকানাটি আমাকে Bearing Post-এও লিখিয়া জানাইতেন আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতাম। বাকেশ লেখা বাহুল্য মনে করি। নমস্কার, ইতি—শরচ্চন্দ্র চাকী, সম্পাদক, 'খাটিকথা' মাসিক পত্রিকা। চকমজলিশপুর, কালিয়াগঞ্জ, প. দিনাজপুর।

মহাশয়, মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠালাম। বসুমতীর উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বসুমতীর বহুলপ্রচার কামনা করি। বাড়ির সকলেই এমন কি, আমাদের ছোট ছেলে-মেয়েরাও বসুমতী পড়িয়া আনন্দ পায়। নমস্কার! ইতি—মায়া দাশগুপ্ত। অবধারক—এস দাশগুপ্ত, এ্যাডভোকেট, মঙ্গলদাই, আসাম।

মহাশয়, আপনাদের কার্তিক ১৩৭০ সংখ্যার পিছনে যে ষান্মাসিক সূচীটি সংযোজিত করেছেন, সেটি বিশেষ উপযোগী হয়েছে, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে এ প্রসঙ্গে অনুরোধ জানাচ্ছি, এই সূচীটি যখন বৈশাখ থেকে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত পত্রিকাগুলির জন্য, তখন উক্ত সূচীটি আশ্বিন সংখ্যার শেষে সংযোজিত হলে বাঁধাই-এর সুবিধা হয়। পরবর্তী বৎসরগুলিতে যদি অনুগ্রহ করিয়া আশ্বিন সংখ্যায় ঐ সূচীটি দেন, তবে ভাল হয়। আশা করি, ইহাতে আপনাদের খুব অসুবিধা হবে না। নমস্কার—আশুতোষ ব্যানার্জী। ৮৭, ফিডার রোড, পোঃ—বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

মহাশয়, আমি দীর্ঘকাল আপনাদের পত্রিকার এজেন্ট মারফৎ গ্রাহক। বাস্তবিকই এমন সর্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা আর আছে কি না জানি না। যে কোন বয়সের লোকদের হাতে দেওয়া যায় স্বচ্ছন্দচিত্তে। 'বার্ধক্যে বারাণসী'র লেখক নীলকণ্ঠের প্রকৃত নাম ও ঠিকানা জানিতে ইচ্ছুক। আমার বিশেষ দরকার আছে তাঁর সঙ্গে দেখা করার। আশা করি আপনাদের সহযোগিতা পাব। অধিক আর কি? উত্তরের জন্য জোড়া পোস্টকার্ড দিলাম। শীঘ্র উত্তর দেবেন। ইতি—বিনীত শ্রীভোলানাথ সাহা। পাইকপাড়া, পোঃ—রাণাঘাট, জিলা—নদীয়া।

মহাশয়, আমি মাসিক বসুমতীর বহুদিনের পাঠক এবং অনুরাগী, সর্বপ্রথম আমি আপনার মাসিক বসুমতীর সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, আপনার পরিচালনায় প্রত্যেকটি বিভাগকে প্রশংসা না করিয়া পারি না, ভক্তি দেবীর 'রক্তের স্বাক্ষর' এবং নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'তালপাতার পুঁথি' উপন্যাসগুলি সত্যাই ভাল লাগছে। 'চারজুন'

বিভাগে আপনি বহু খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালীর জীবনী প্রকাশ করেছেন, আশা করি আপনি নিম্নোক্ত দুইজনের জীবনীও এই 'চারজন' বিভাগে প্রকাশ করবেন। এঁরা দু'জনেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আদর্শস্থানীয়, আমার মনে হয় এঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এই 'চারজন' বিভাগে প্রকাশযোগ্য, আমি এই দুইজন ব্যক্তির নাম ঠিকানা জানালাম,—(1) H. B. Ghosh. Dy. Chief Inspector of Mines Government of India. P. O. Sitarampur. Dt—Burdwan. (2) S. N. Adhikary. P. O. Sitarampur. Dt.—Burdwan. ইতি—সুব্রতকুমার মুখোপাধ্যায়, আপার চেলিডাঙ্গা, আসানসোল।

বেচিতে চাই

মহাশয়, আমি নিম্নলিখিত মাসিক বসুমতীগুলি কোনও সরকার অনুমোদিত হাসপাতাল লাইব্রেরীকে দান করিতে চাই। গ্রহণকারীকে এই ঠিকানা হইতে নিজ দায়িত্বে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৩৬০ সাল হইতে ১৩৬৯ সাল বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত বই আছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনার পত্রিকায় এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করিলে বাধিত হইব।—শ্রীডালি বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮, থার্ড এভিনিউ, কুন্টি, ইস্টার্ন রেলওয়ে।

মহাশয়, আমি নিম্নলিখিত মাসিক বসুমতীগুলি একত্রে প্রতিকপি একটাকা হিসাবে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন লোকের কিনিবার ইচ্ছা থাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন। উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি আপনার মাসিক বসুমতীর শ্রাবণ সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে বিজ্ঞাপিত করিলে বাধিত থাকিব। ১৩৬১, শ্রাবণ হইতে চৈত্র, ১৩৭১ সালের আষাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত। শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ—সোনামুখী, জেলা—বাঁকুড়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী শোভা দত্ত, এম এ, অবধারক—ডাঃ এস পি দত্ত, এম-বি, ডি-টি-এম, চাঁদনালা কোলিয়ারী, ডাক—পাথরদি, জেলা—ধানবাদ * * * শ্রী এস কে ঘোষ, তরাই টি এস্টেট, ডাক—বেলগাছি, (দার্জিলিং) * * * শ্রীসুধেন্দু মুখোপাধ্যায়, সহকারী কর্মাধ্যক্ষ, ডি জে রাজ মুন্ডখারকি কোলিয়ারী, ডাক—মুন্ডখারকি, জেলা—ধানবাদ * * * শ্রী বি কে মিশ্র, গার্ড, অবধারক—স্টেশন মাস্টার দিত্তলেসার জংসন, পশ্চিম রেলওয়ে, গুজরাট * * * শ্রীবসন্তকুমার দে, ৫৩, সিকদার পাড়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা * * * শ্রীবিশ্বনাথ মণ্ডল, হোসেনাবাদ টি এস্টেট, ডাক—বীরপাড়া, জেলা—জলপাইগুড়ি * * * শ্রীমতী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, বাংলো নং ২৭, (টাইপ—VI) ডাক—পিপলানি, ভূপাল (মধ্যপ্রদেশ) * * * শ্রী এন হালদার, 'এলবিরস হাউস' এন ফাটক রোড, মধুপুর (সাঁওতাল পরগণা) * * * শ্রীনীতীশ রায়চৌধুরী, সচিব গান্ধী ঘর, গ্রাম—অকাই সেণ্টার, ডাক—সুলতানপুর, জেলা—বর্ধমান * * * শ্রী এস পি রায়, ব্লক নং ৩১ ও ৩২, বেল-ভিউ ৮৫, ওয়ার্ডেন রোড, বোম্বাই—২৬ * * * শ্রীমতী রেবা মিত্র, অবধারক—শ্রী ডি কে মিত্র, রাজৌরী গার্ডেন, নিউ দিল্লী—৬ * * * শ্রীমতী রুমা লাহেড়ী, বি এস সি, Under Graduate Wing Womens Hostel. আর্মি মেডিক্যাল কলেজ। পুণা—১ * * * কুমারী বিজয়া নাগ, অবধারক—শ্রী পি সি নাগ, এ্যাডভোকেট, সানি লজ, জেল রোড, শিলং, আসাম * * * শ্রী এন সি গুপ্ত, ১৯৩, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোড, ডাক—রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা—৪০ * * * শ্রীসিতিকণ্ঠ পাহাড়ী, গ্রাম—খুসকারী, ডাক—বাসস্তিয়াড়, জেলা—মেদিনীপুর * * * সচিব, টিচার্স কাউন্সিল কাসতামারী এইচ এস স্কুল, ডাক—কাসতামারী, জেলা—মুর্শিদাবাদ * * * ডাঃ এস গঙ্গোপাধ্যায়, মেডিক্যাল অফিসার, জি এন এল এফ, ডাক—চিলকালা পল্লী, (বেরিলি হয়ে) জেলা—শ্রীকাকুলাম (এ পি) * * * শ্রীমতী প্রীতি দেবী, ১১।৬, রাজঘাট বারাণসী * * * শ্রীমতী অপর্ণা ঝা, অবধারক—Lc. Col, এম এস ঝা, ডি সি এস ও এইচ কিউ পি য়্যাণ্ড এইচ পি এরিয়ান, আম্বালা ক্যান্ট, পূর্ব পাঞ্জাব, * * * সচিব, রবীন্দ্র পাঠচক্র, চন্দনপুর, ডাক—চিরুদি, চন্দনপুর, জেলা—পুরুলিয়া * * * সচিব, তাতাউর লক্ষ্মীরাম গ্রন্থাগার, ডাক—ভূতন, জেলা—পুরুলিয়া * * * সচিব, গোবিন্দপুর সাধারণ গ্রন্থাগার, গ্রাম ও ডাক—গোবিন্দপুর। জেলা—পুরুলিয়া, * * * শ্রীমতী উমারাণী চক্রবর্তী, অবধারক—শ্রী বি চক্রবর্তী, পোস্ট বক্স নং ১৬, জগদলপুর (মধ্যপ্রদেশ), গ্রন্থাগারিক, লালগোলা এম এন একাডেমী (পাবলিক) গ্রন্থাগার, ডাক—লালগোলা, জেলা—মুর্শিদাবাদ, পঃ বঙ্গ।

মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম ১৮টি সংখ্যার জন্য। বৈশাখ সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত করিয়া প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য। অবধারক—ভবানীচরণ ভট্টাচার্য, সীতাপুর, ইউ-পি।

চলতি বৎসরের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইবেন।—সুজাতা মুখার্জী, পরাশিয়া, মধ্যপ্রদেশ।

১৩৭১ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত ও ১৩৭০ সালের আশ্বিন সংখ্যাটির জন্য ১৬.২৫ পয়সা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—ডি পি বসু। পোঃ—কালিকাপুর, জেলা—বর্ধমান।

The sum of Rs. 15/- in payment of our renewal subscription is sent. Please acknowledge receipt.—S. Chatterjee, Asst. Bursar, St. Paul's School, Darjeeling.

আপনার পত্রানুযায়ী মনিঅর্ডারযোগে বার্ষিকমূল্য পাঠাইলাম। বৈশাখ সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইবেন।—ডি সি সেনগুপ্ত। সেকেন্দ্রাবাদ, এ পি।

এক বৎসরের চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। আশা করি প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইবেন।—শ্রীমতী মমতা বক্সী। অবধারক—ডাঃ বি কে বক্সী, পোঃ—নিউ ফরেস্ট, দেরাদুন।

১৩৭১ সালের মাসিক বসুমতীর চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম। অনুগ্রহপূর্বক নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী রমারাণী মিত্র, অবধারক—জে এন মিত্র। দিল্লী—৬।

সূচীপত্র

সুচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪৩শ বর্ষ | প্রথম খণ্ড
ভাদ্র ১৩৭১ | পঞ্চম সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

।। স্থাপিত ১৩২৯ ।।

কথামৃত

● ঈশা অনুসরণ ●

'অসার হইতেও অসার, সকলই অসার, সার একমাত্র তাঁহাকে ভালবাসা, সার একমাত্র তাঁহার সেবা।'(ক)

তখনই সর্বোচ্চ জ্ঞান তোমার হইবে, যখন তুমি স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইবার জন্য সংসারকে ঘৃণা করিবে।

৪। অসারতা—অতএব ধন অন্বেষণ করা এবং সেই নশ্বর পদার্থে বিশ্বাস স্থাপন করা।

অসারতা—অতএব মান অন্বেষণ করা ও উচ্চপদ লাভের চেষ্টা করা।

অসারতা—অতএব শারীরিক বাসনার অনুবর্তী হওয়া এবং যাহা অন্তে অতি কঠিন দণ্ড ভোগ করাইবে, তাহার জন্য ব্যাকুল হওয়া।

অসারতা—অতএব জীবনের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা না করিয়া দীর্ঘ-জীবন লাভের ইচ্ছা করা।

অসারতা—অতএব পরকালের সম্বন্ধে চেষ্টা না করিয়া কেবল ইহজীবনের বিষয় চিন্তা করা।

অসারতা—অতএব, যথায় অবিনাশী আনন্দ বিরাজমান, দ্রুতবেগে সে স্থানে উপস্থিত হইবার চেষ্টা না করিয়া অতি শীঘ্র বিনাশশীল বস্তুকে ভালবাসা।

৫। উপদেশকের এ বাক্য সর্বদা স্মরণ কর—'চক্ষু দেখিয়া তৃপ্ত হয় না, কর্ণ শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হয় না।'(খ)

পরিদৃশ্যমান পার্থিব পদার্থ হইতে মনের অনুরাগকে উপরত করিয়া অদৃশ্য রাজ্যে হৃদয়ের সমুদয় ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ চেষ্টা কর, যেহেতুক ইন্দ্রিয় সকলের অনুগমন করিলে তোমার বুদ্ধিবৃত্তি কলঙ্কিত হইবে এবং তুমি ঈশ্বরের কৃপা হারাইবে। (গ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আপনার জ্ঞানসম্বন্ধে হীনভাব

১। সকলেই স্বভাবত জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করে; কিন্তু ঈশ্বরের ভয় না থাকিলে, সে জ্ঞানে লাভ কি?

আপনার আত্মার কল্যাণচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, যিনি নক্ষত্র-মণ্ডলীর গতিবিধি পর্যালোচনা করিতে ব্যস্ত, সেই গর্বিত পণ্ডিত

(ক) ইক্লিজিয়াস্টিক ১।২—Vanity of vanities all is vanity &c.

কে সন্তি সন্তোঽখিলবীতরাগাঃ
অপাস্তমোহাঃ শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ।

—শঙ্করাচার্য (মণিরত্নমালা)।

যাঁহারা তাবৎ সাংসারিক বিষয়ে আশাশূন্য হইয়া একমাত্র শিবতত্ত্বে নিষ্ঠাবান্, তাঁহারাই সাধু।

(খ) ইক্লিজিয়াস্টিক ১৮

(গ) Strive therefore &c.

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।

—মনু।

কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু অগ্নিতে ঘৃত প্রদানের ন্যায় অত্যন্ত বর্ধিত হয়।

অপেক্ষা কি যে দীন কৃষক বিনীতভাবে ঈশ্বরের সেবা করে, সে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ নহে ?

যিনি আপনাকে উত্তমরূপে জানিয়াছেন, তিনিই আপনার চক্ষে আপনি অতি হীন এবং তিনি মনুষ্যের প্রশংসাতে অণুমাত্রও আনন্দিত হইতে পারেন না। যদি আমি জগতের সমস্ত বিষয়ই জানি, কিন্তু আমার নিঃস্বার্থ সহানুভূতি না থাকে, তাহা হইলে যে ঈশ্বর আমার কর্মানুসারে আমার বিচার করিবেন, তাঁহার সমক্ষে আমার জ্ঞান কোন উপকারে আসিবে ?

২। অত্যন্ত জ্ঞান-লালসাকে পরিত্যাগ কর ; কারণ, তাহা হইলে অত্যন্ত চিত্তবিক্ষেপ এবং ভ্রম আগমন করে।

পণ্ডিত হইলেই বিদ্যা প্রকাশ করিতে এবং প্রতিভাশালী বলিয়া কথিত হইতে বাসনা হয়।

এ প্রকার অনেক বিষয় আছে, যদ্বিষয়ক জ্ঞান আধ্যাত্মিক কোন উপকারে আইসে না এবং তিনি অতি মূর্খ, যিনি—যে সকল বিষয় তাঁহার পরিত্রাণের সহায়তা করিবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া—এই সকল বিষয়ে মন নিবিষ্ট করেন।

বহু বাক্যে আত্মা তৃপ্ত হয় না, পরন্তু, সাধুজীবন অন্তঃকরণে শান্তি প্রদান করে এবং পবিত্র বুদ্ধি ঈশ্বরে সম্যক নির্ভর স্থাপিত করে।

৩। তোমার জ্ঞান এবং ধারণাশক্তি যে পরিমাণে অধিক, তোমার তত কঠিন বিচার হইবে ; যদি সমধিক জ্ঞানের ফলস্বরূপ জীবনও সমধিক পবিত্র না হয়।

অতএব তোমার দক্ষতা এবং বিদ্যার জন্য বহু প্রশংসিত হইতে ইচ্ছা করিও না ; বরং যে জ্ঞান তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে ভয়ের কারণ বলিয়া জান।

যদি এ প্রকার চিন্তা আইসে যে, তুমি বহু বিষয় জান এবং বিলক্ষণ বুঝ, স্মরণ রাখিও যে, যে সকলবিষয় তুমি জান না, তাহারা সংখ্যায় অনেক অধিক।

জ্ঞানগর্বে স্ফীত হইও না ; বরং আপনার অজ্ঞতা স্বীকার কর। তোমা অপেক্ষা কত পণ্ডিত রহিয়াছে, ঈশ্বরাদিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞানে তোমা অপেক্ষা কত অভিজ্ঞ লোক রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াও কেন তুমি অপরের পূর্বস্থান অধিকার করিতে চাও ?

যদি নিজ কল্যাণপ্রদ কোন বিষয় জানিতে এবং শিখিতে চাও, জগতের নিকট অপরিচিত এবং অকিঞ্চিৎকর থাকিতে ভালবাস।

৪। আপনাকে আপনি যথার্থরূপে জানা, অর্থাৎ আপনাকে অতি হীন মনে করা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষা। আপনাকে নীচ মনে করা এবং অপরকে সর্বদা শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং তাহার মঙ্গল কামনা করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং সম্পূর্ণতার চিহ্ন।

যদি দেখ, কেহ প্রকাশ্যরূপে পাপ করিতেছে, অথবা কেহ কোন অপরাধ করিতেছে, তথাপি, আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিও না।

আমাদের সকলেরই পতন হইতে পারে ; তথাপি, তোমার দৃঢ় ধারণা থাকা উচিত যে, তোমা অপেক্ষা অধিক দুর্বল কেহই নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যের শিক্ষা

১। সুখী সেই মনুষ্য, সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং নশ্বর শব্দ পরিত্যাগ [illegible] যাহাকে শিক্ষা দেয়।

আমাদিগের মত এবং ইন্দ্রিয় সকল ভূয়শ আমাদিগকে প্রতারিত করে ; কারণ বস্তুর প্রকৃত তত্ত্বে আমাদের দৃষ্টির গতি অতি অল্প।

গুপ্ত এবং গূঢ় বিষয় সকল ক্রমাগত অনুসন্ধান করিয়া লাভ কি ? তাহা না জানার জন্য শেষ বিচার দিনে (ঘ) আমরা নিন্দিত হইব না।

উপকারক এবং আবশ্যক বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, স্ব-ইচ্ছায়—যাহা কেবল কৌতূহল উদ্দীপিত করে এবং অপকারক—এ প্রকার বিষয়ে অনুসন্ধান করা অতি নির্বোধের কার্য ; চক্ষু থাকিতেও আমরা দেখিতেছি না !

২। ন্যায়শাস্ত্রীয় পদার্থ-বিচারে আমরা কেন ব্যাপৃত থাকি ? তিনিই বহু সন্দেহপূর্ণ তর্ক হইতে মুক্ত হয়েন, সনাতন (ঙ) বাণী যাহাকে উপদেশ করেন।

সেই অদ্বিতীয় বাণী হইতে সকল পদার্থ বিনিঃসৃত হইয়াছে, সকল পদার্থ তাঁহাকেই নির্দেশ করিতেছে, তিনিই আদি, তিনি আমাদিগকে উপদেশ করেন।

তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহ কিছু বুঝিতে পারে না ; অথবা, কোন বিষয়ে যথার্থ বিচার করিতে পারে না।

তিনিই অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত,—তিনি ঈশ্বরে সংস্থিত যাঁহার উদ্দেশ্য একমাত্র, যিনি সকল পদার্থ এক অদ্বিতীয় কারণে নির্দেশ করেন এবং যিনি এক জ্যোতিতে সমস্ত পদার্থ দর্শন করেন।

হে ঈশ্বর, হে সত্য, অনন্ত প্রেমে আমাকে তোমার সহিত একীভূত করিয়া লও।

বহু বিষয় পাঠ এবং শ্রবণ করিয়া আমি অতি ক্লান্ত হইয়া পড়ি ; আমার সকল অভাব, সকল বাসনা, তোমাতেই নিহিত।

আচার্য সকল নির্বাক হউক, জগৎ তোমার সমক্ষে স্তব্ধ হউক ; প্রভো, কেবল তুমি বল।

৩। মানুষের মন যতই সংযত এবং অন্তঃপ্রদেশ হইতে সরল হয়, ততই সে গভীর বিষয়সকলে অতি সহজে প্রবেশ করিতে পারে ; কারণ তাহার মন আলোক পায়।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের মাহাত্ম্য-প্রকাশের জন্য সকল কার্য করে, আপনার সম্বন্ধে কার্যহীন থাকে এবং সকল প্রকার স্বার্থশূন্য হয়, সেই প্রকার পবিত্র, সরল এবং অটল ব্যক্তি বহু কার্য করিতে হইলেও আকুল হইয়া পড়ে না ! হৃদয়ের অনুন্মূলিত আসক্তি অপেক্ষা কোন্ পদার্থ তোমার অধিকতর বিরক্ত করে বা বাধা দেয় ?

ঈশ্বরানুরাগী সাধুব্যক্তি অগ্রে আপনার মনে যে সকল বাহিরের কর্তব্য করিতে হইবে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া লন, সেই সকল কার্য করিতে তিনি কখনও বিকৃত আসক্তিজনিত ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হন না ; পরন্তু, সম্যক্ বিচার দ্বারা আপনার কার্য সকলকে নিয়মিত করেন।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

(ঘ) খৃস্টীয় মতে মহাপ্রলয়ের দিন ঈশ্বর সকলের বিচার করিবেন এবং পাপ অথবা পুণ্যানুসারে নরক অথবা স্বর্গ প্রদান করিবেন।

(ঙ) এই বাণী অনেকটা বৈদান্তিকদিগের 'মায়া'র ন্যায় ইনিই ঈশারূপে অবতার হন।

প্রাচীন ভারতের বাস্তুশাস্ত্র

শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননকার্যের ফলে বর্তমানকালে বাংলার তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মাটির তলা হইতে প্রাচীন অট্টালিকাদির নিদর্শন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইতেছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনদেশের পরিব্রাজক ওয়ান-চোয়াং বাংলা দেশে বহুসংখ্যক অট্টালিকা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার পর, পাল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে একটি দীর্ঘকালব্যাপী স্থাপত্য-যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং 'কুল ভূধর কক্ষতুল্য' অনেক অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল। তাম্রশাসনে শিলালিপিতে সমসাময়িক গ্রন্থ ইহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী মুসলমান শাসনকালে ইহার অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছিল। এখন কোন কোন অট্টালিকার ধ্বংসাবশিষ্টে ইষ্টক-প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র।

যে শাস্ত্রে এই সকল পূর্বতন অট্টালিকায় স্থাপত্যরীতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়—তাহার নাম বাস্তুশাস্ত্র। নানা কারণে অনুশীলনের অভাবে তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা লোপ পাইয়া গিয়াছে। বাস্তুশাস্ত্রে সম্যক জ্ঞান না থাকিলে এই সকল ধ্বংসাবশিষ্ট ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না। এই সকল কারণে আমাদের সাহিত্যে প্রাচীন বাস্তুতত্ত্ব এখনও যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। পুরাতত্ত্ব বাস্তুসংগ্রাহকগণ এখনও অনেকের নিকট 'উন্মাদ' (!) বলিয়া উপহাস লাভ করিয়া থাকেন! এই অজ্ঞতাজনিত উপহাস-স্পৃহা বিজ্ঞতার আবরণে আবৃত থাকিয়া এখনও আমাদের সাহিত্যে শুধুমাত্র রস-সাহিত্যেরই প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে যে উন্মাদনাপূর্ণ মানবপ্রাণের অনির্বচনীয় আনন্দের স্পন্দন অনুভূত হইতে পারে, তাহা অনেকের কাছেই অবিজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত।

আমাদের সংস্কৃত-সাহিত্যে ধর্মশাস্ত্র লেখক ও প্রয়োজকগণের নাম বিলুপ্ত হয় নাই; কিন্তু বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকগণের নাম অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক সময়ে তাঁহাদের নামও সর্বত্র সুপরিচিত ছিল। 'মৎস্যপুরাণের' ২৫৩ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়—

> 'ভৃগুরত্রির্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বকর্মা ময়স্তথা।
> নারদো নগ্নজিচ্চৈব বিশালাক্ষঃ পুরন্দরঃ॥
> ব্রহ্মা কুমারো নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এব চ।
> বাসুদেবোঽনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্র বৃহস্পতি।
> অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকঃ॥'

কোন কোন শাস্ত্রে এই সকল বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকগণের মধ্যে ব্রহ্মাই মূল উপদেশক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাঁহার কোনও গ্রন্থের সন্ধান লাভ করা যায় না। ব্রহ্মা হইতে মুনিপরম্পরাক্রমে বাস্তুজ্ঞান আগত হইয়াছিল বলিয়া, একটি জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। 'বৃহৎসংহিতা'র ৫২ অধ্যায়ে বরাহ-মিহির তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

> 'বাস্তুজ্ঞান মথাতঃ কমলভবা মুনিপরম্পরায়াতাম্।'

বরাহ-মিহিরের গ্রন্থে 'মৎস্যপুরাণোক্ত' অষ্টাদশ বাস্তুশাস্ত্রোপক-দিগের মধ্যে গর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। গর্গ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন বরাহ-মিহিরের গ্রন্থে তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে ('সমাসাৎ') সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই সংক্ষিপ্তসারের টীকাকার ভট্টোৎপল বশিষ্ঠ-ময়-নগ্নজিতের নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা পূর্বতম আচার্য। ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তুশাস্ত্রের আলোচনা অবলুপ্ত হয় নাই। রামরাজকৃত হিন্দু স্থাপত্যবিদ্যার সুলিখিত নিবন্ধে আরও অনেক বাস্তু-বিদ্যাগ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মানসার, কশ্যপ, বৈখানস, সকলাধিকার, সনৎকুমার, সারস্বত্য ও পঞ্চরাত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার কোনও কোন গ্রন্থের লুপ্তাবশিষ্ট পাণ্ডুলিপি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়; পুরাণ-তন্ত্রাদিতেও বাস্তুবিদ্যার অনেক বিবরণ উল্লিখিত আছে।

বাস্তুশাস্ত্রোপক বিশ্বকর্মার নাম জনশ্রুতিতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। পূজা এখনও সমারোহসহকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা যে কোনরূপ শিল্পকর্মে জীবিকার্জন করিয়া থাকে তাহারা সকলেই প্রত্যহ তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া থাকে—বৎসরান্তে তাঁহার পূজা করে। গৃহাদি প্রতিষ্ঠাকার্যে শিল্পীকে এখনও সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা বলিয়া সম্বর্ধনা করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। রামরাজ 'বিশ্বকর্মীয়' নামক একখানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উহা মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু 'বিশ্বকর্ম-প্রকাশ' নামক আর একখানি গ্রন্থ একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে। বিশ্বকর্মা কিরূপে বাস্তুজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় এই গ্রন্থের আরম্ভে লিখিত আছে—

> 'প্রবক্ষ্যামি মুনিশ্রেষ্ঠ শৃণুধ্বেকাগ্রমানসঃ।
> যদুক্তং শম্ভুনা পূর্বং বাস্তুশাস্ত্রং পুরাতনম্॥
> পরাশরঃ প্রাহ বৃহদ্রথায় বৃহদ্রথঃ প্রাহ চ বিশ্বকর্মণে।
> স বিশ্বকর্মা জগতাং হিতায় প্রোবাচ শাস্ত্রং বহুভেদযুক্তম্॥'

এই বর্ণনায় জানিতে পারা যায়, বিশ্বকর্মাও বাস্তুশাস্ত্রের উদ্ভাবয়িতা ছিলেন না। বাস্তুজ্ঞান প্রথমে শম্ভু কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমে পরাশর বৃহদ্রথকে এবং বৃহদ্রথ বিশ্বকর্মাকে বাস্তুজ্ঞান দান করেন; বিশ্বকর্মা জগতের মঙ্গল কামনায় বহুভেদযুক্ত বাস্তুশাস্ত্রের রচনা করিয়াছিলেন। পুরাতন স্থাপত্যকীতির প্রকৃত পরিচয়লাভ করিতে হইলে, বাস্তুশাস্ত্রের সাহায্যে ইষ্টক-প্রস্তরের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে বহুসংখ্যক পাষাণস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল স্তম্ভ প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে;—যেগুলি অট্টালিকার সহিত সম্পর্কশূন্য এবং যেগুলি অট্টালিকার অঙ্গীভূত। যেগুলি অট্টালিকার অঙ্গীভূত, তাহাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে,—কতকগুলি ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, কতকগুলি ভিত্তির অঙ্গীভূত।

অট্টালিকার সহিত সম্পর্কশূন্য পাষাণস্তম্ভ একটিমাত্রই একস্থানে স্বতন্ত্রভাবে সংস্থাপনার জন্য নির্মিত হইত। তাহার উপর অট্টালিকার কোনও অংশের ভার ন্যস্ত হইত না। অশোকস্তম্ভ, গরুড়স্তম্ভ, অরুণস্তম্ভ

প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের পারিভাষিক নাম স্তম্ভ নহে—'ধ্বজ!' হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে 'একস্তম্ভো ধ্বজো জ্ঞেয়:' বলিয়া তাহা উল্লিখিত আছে। এই সকল স্তম্ভ যতই বৃহৎ হউক, একখণ্ড প্রস্তরখণ্ডে নির্মিত হইত। গঠন-ব্যবস্থার মান সামঞ্জস্যে এই শ্রেণীর স্তম্ভ শিল্প-সুষমার আধার বলিয়াই সুপরিচিত। ইহাতে সাজ-সজ্জায় আড়ম্বর অধিক না থাকিলেও, ইহার গাম্ভীর্যই ইহাকে সৌন্দর্যদান করিত। সুনীল দিগ্‌বলয়বিন্যস্ত প্রশান্ত প্রচ্ছদপটের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া, এই শ্রেণীর সমুন্নত স্তম্ভগুলি সেখানের গৌরবস্তম্ভরূপেই প্রতিভাত হইত।

সেকালের দেবালয়ের যে প্রকোষ্ঠে শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইত, তাহার পারিভাষিক নাম 'গর্ভ।' তাহার গঠন-ব্যবস্থা ভিত্তিমূলক ছিল; স্তম্ভমূলক ছিল না। তাহার সম্মুখে একটি 'মুখমণ্ডপ' থাকিত। তাহার পরে একটি 'মণ্ডপ' বা 'মহামণ্ডপ' বা 'নাটমন্দিরও' গঠিত হইত। ইহাই পূর্ণাঙ্গ দেবালয়ের গঠন-ব্যবস্থা বলিয়া সুপরিচিত ছিল। এই কার্যে যতগুলি স্তম্ভ ব্যবহৃত হইত, তাহার সংখ্যানুসারেই 'মণ্ডপগুলি' নানা নামে কথিত হইত। 'মৎস্যপুরাণে' ইহার বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে।

মূলমন্দিরের উচ্চতা অপেক্ষা 'মণ্ডপের' উচ্চতা অল্প থাকিত বলিয়া এবং 'মুখ-মণ্ডপের' উচ্চতা আরও অল্প থাকিত বলিয়া, স্তম্ভগুলির উচ্চতা অধিক হইত না। উড়িষ্যার প্রচলিত ভাষায় 'মুখমণ্ডপে'র নাম 'জগমোহন,' 'মণ্ডপের' নাম 'নাটমন্দির।' কেহ কেহ উড়িষ্যার প্রাদেশিক স্থাপত্যরীতির নিদর্শন বলিয়াই ইহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা বিচারসহ সিদ্ধান্ত নহে। উড়িষ্যার ন্যায় বাংলার পুরাতন মন্দিরেও 'জগমোহন' ছিল,—'নাটমন্দিরও' ছিল। উড়িষ্যার সকল মন্দিরে এই দুইটি অতিরিক্ত অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না;—হয়ত বাংলার সকল মন্দিরেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। এরূপ পূর্ণাঙ্গ মন্দির অধিক ব্যয়সাধ্য,—অধিক সমৃদ্ধিসূচক—অধিক শিল্প-সুষমামণ্ডিত।

যে সকল স্তম্ভ ভিত্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত, তাহা বাস্তুশাস্ত্রে 'মহাস্তম্ভ' নামে উল্লিখিত। 'মহাস্তম্ভ' পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। মৎস্য পুরাণের' ২৫৫ অধ্যায়ে 'পঞ্চ মহাস্তম্ভের' পরিচয়সূচক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়—

> 'রুচকশ্চতুর: স্যাত্তু অষ্টাস্রো বজ্র উচ্যতে।
> দ্বিবজ্র: ষোড়শাস্রস্তু দ্বাত্রিংশস্র: প্রলীনক:।
> মধ্যপ্রদেশে য: স্তম্ভো বৃত্তো বৃত্ত ইতি স্মৃত:॥'

যে স্তম্ভ চতুষ্কোণ, তাহার নাম রুচক,—যে স্তম্ভ অষ্টকোণ সমন্বিত, তাহার নাম 'বজ্র',—যে স্তম্ভ ষোড়শ কোণ সমন্বিত, তাহার নাম 'দ্বিবজ্র,'—যে স্তম্ভ দ্বাত্রিংশৎ কোণ বিশিষ্ট তাহার নাম 'প্রলীনক' এবং যে স্তম্ভ বর্তুল, তাহার নাম 'বৃত্ত।' ইহাই আর্যাবর্তে প্রচলিত 'বাস্তুশাস্ত্রোক্ত' পঞ্চ-মহাস্তম্ভের শ্রেণী-বিভাগ-সূচক পুরাতন কারিকা। অন্যবিধ সংজ্ঞারও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তদনুসারে 'রুচকের' নাম 'ব্রহ্মকাণ্ড',—'বজ্রের' নাম 'বিষ্ণুকাণ্ড'—'দ্বিবজ্রের' নাম 'রুদ্রকাণ্ড।'

স্তম্ভের অবস্থান ক্ষেত্রে 'পীঠিকা' নামে ও স্তম্ভোপরি সংস্থাপিত ... দুইটি পৃথক অংশের

মধ্যবর্তী অঙ্গটির নামই স্তম্ভ। 'বোধিকা' স্তম্ভশীর্ষের সহিত লৌহকীলক যোগে সম্বদ্ধ থাকিত 'পীঠিকার' মধ্যস্থলে একটি চতুষ্কোণ ছিদ্রের মধ্যে স্তম্ভমূল প্রোথিত থাকিত।

মন্দির দ্বার যদৃচ্ছাক্রমে নির্মিত হইত না। তাহা বাস্তুশাস্ত্র পরিমাণ অনুসারেই নির্মিত হইত। দ্বারের বিস্তারের সহিত উচ্চতার অনুপাত সুনির্দিষ্ট ছিল। তাহার সহিত মন্দিরের উচ্চতার অনুপাতও সুনির্দিষ্ট ছিল। মৎস্যপুরাণের ২৫৪ অধ্যায়ে দ্বারের সাধারণ 'মান' সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। যথা—

> 'গর্ভমানেন মানং তু সর্ববাস্তুষু শস্যতে।'

সকল বাস্তুতেই 'গর্ভের' পরিমাণ অনুসারে দ্বারের পরিমাণ স্থির করা হইত। 'বিস্তারার্ধং ভবেদ্‌গর্ভ:' এই সূত্রে জানিতে পারা যায়,—বাস্তুক্ষেত্রের যাহা বিস্তার, তাহার অর্ধই 'গর্ভের' পরিমাণ ছিল।

> 'গর্ভপাদেন বিস্তীর্ণং দ্বারং দ্বিগুণমায়তম্।'

এই সূত্রে জানিতে পারা যায়—'গর্ভের' চতুর্থাংশের সমান করিয়াই দ্বার বিস্তার স্থির করিয়া লওয়া হইত। এই বিস্তারের দ্বিগুণ দ্বারের উচ্চতা বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল। এইরূপ অনুপাত-সম্পন্ন দ্বারগুলি মন্দিরের আয়তনের সঙ্গে রচনা-সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিত।

চারিখানি কাষ্ঠসংযোগে কাষ্ঠময় দ্বার নির্মিত হয় বলিয়া তাহা 'চৌকাঠ' নামে কথিত হইয়া থাকে। প্রস্তরময় দ্বারও এইরূপ চারিখানি প্রস্তরেই নির্মিত হইত। যে দুইখানি প্রস্তর প্রবেশপথের উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিত, তাহার সাধারণ নাম 'দ্বারশাখা' বা 'শাখা';—যে দুইখানি প্রস্তর ঊর্ধ্বে ও নিম্নে বিন্যস্ত হইত, তাহার সাধারণ নাম 'উদুম্বর' বা 'উড়ুম্বর'। এই চারিখণ্ড প্রস্তরের মধ্যে উদুম্বরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা শাখাদ্বয়ের দৈর্ঘ্য অধিক হইলেও, সকল খণ্ডের বিস্তার ও বাহুল্য ('বেধ') সমান ছিল। শাখার চতুর্থাংশ বিস্তারের ও উদুম্বরের চতুর্থাংশ 'বাহুল্যে'র পরিমাণ নির্দেশ করিত। সুতরাং পাষাণচতুষ্টয়ের অংশমাত্র পাওয়া গেলেও, তাহার বিস্তারের ও বাহুল্যের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ দ্বারের আয়তনেরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তাহার সাহায্যে মন্দিরের আয়তনেরও পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কেবল তাহাই নহে,—দ্বারের উচ্চতার সহিত মন্দিরমধ্যস্থ শ্রীমূর্তির উচ্চতাও একটি সুনির্দিষ্ট অনুপাত প্রচলিত ছিল। সেজন্য শ্রীমূর্তির আয়তন হইতে মন্দিরের এবং দ্বারের আয়তন হইতে শ্রীমূর্তির শাস্ত্রনির্দিষ্ট আয়তন আবিষ্কৃত হইতে পারে।

দ্বারশাখা কখনও কখনও একটি মাত্র শাখারূপে নির্মিত হইত। কিন্তু তাহা সচরাচর তিন শাখা হইতে নবশাখা পর্যন্ত ভিন্নভিন্ন শাখার সমষ্টিরূপেই নির্মিত হইত। এই সকল শাখার কারুকার্য ও বিস্তার মন্দির-দ্বারকে সৌন্দর্যের সঙ্গে গাম্ভীর্যদান করিত। ঊর্ধ্বে সংস্থাপিত উদুম্বরের মধ্যস্থলে শ্রীমূর্তি ক্ষোদিত করাইবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে বিষ্ণুমন্দির দ্বারের ঊর্ধ্বাবস্থিত উদুম্বরের মধ্যস্থলে দিগ্‌গজসমূহ স্নাপ্যমানা লক্ষ্মীর শ্রীমূর্তি ক্ষোদিত করাইবার নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

> 'তস্য মধ্যে স্থিতা দেবী সাক্ষাল্লক্ষ্মী সুরেশ্বরী।
> কর্তব্যা দিগ্‌গজৈ: সা তু স্নাপ্যমানা ঘটেন তু।'

বিষ্ণুমন্দিরের ন্যায় বৌদ্ধমন্দিরেও উদুম্বর মধ্যে শ্রীমূর্তি ক্ষোদিত করাইবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল।

ইষ্টকনির্মিত দেবমন্দিরেও পাষাণনির্মিত দ্বার বা স্তম্ভ ব্যবহৃত হইতে পারিত। প্রস্তরনির্মিত ভিত্তি ও শিখর কেবল প্রস্তর-নির্মিত দেবালয়েই দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবমন্দিরের ভিত্তির উপরিভাগে অবস্থিত অঙ্গের নাম—শিখর, বা বিমান। শিখরের উচ্চতা ভিত্তির উচ্চতার দ্বিগুণ বলিয়া বাস্তুশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। সুতরাং মন্দিরের শিখর বা বিমান বহুসংখ্যক প্রস্তরখণ্ডে গঠিত হইত। তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিত হইত। শিখর রচনারীতির পার্থক্যে মন্দিরগুলি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইত। যথা,—

'মেরু-মন্দর-কৈলাস-বিমানচ্ছন্দ-নন্দনাঃ।
সমুথাঃ-পদ্ম-গরুড়-নন্দি-বর্ধন কুঞ্জরাঃ।
গুহরাজো বৃষোহংসঃ সর্বতো ভদ্রকো ঘটঃ।
সিংহো বৃত্তশ্চতুষ্কোণঃ ষোড়শাষ্টাশ্রয়ঃ স্তথা।
ইত্যেতে বিংশতিপ্রোক্তাঃ প্রসাদাঃ সংজ্ঞয়ামতা।
যথোক্তানুক্রমেণৈব লক্ষণানি বদাম্যতঃ।'

বরাহ-মিহির এইরূপে মেরুমন্দর কৈলাসাদি বিংশতি শ্রেণীর নাম লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাদের লক্ষণাদিরও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—মেরুশ্রেণীর মন্দির ষটকোণবিশিষ্ট, চতুর্দ্বারসমন্বিত, বিচিত্র-কুহরযুক্ত দ্বাদশভূমি-সম্পন্ন হইত। যথা—

'তত্র ষড়শ্রি-র্মেরু র্দ্বাদশভৌমো বিচিত্র কুহরশ্চ।
দ্বারৈ র্যুতশ্চতুর্ভি র্দ্বাত্রিংশদ্ধস্তবিস্তীর্ণঃ।'

টীকাকার 'বিচিত্র' শব্দের অর্থ 'নানা প্রকার' ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'কুহর' শব্দের অর্থ 'বাতায়ন। মন্দির-শিখর ভিন্ন ভিন্ন 'রথকে' বিভক্ত হইত; প্রত্যেক 'রথক' অনেকগুলি 'ভূমিতে' বিভক্ত হইত। এই সকল পারিভাষিক শব্দ এখন অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরিচয় প্রকাশের জন্য বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থাপত্য-ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া কাশ্যপ একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেই কবিতাটি ভট্টোৎপল তাঁহার রচনায় উদ্বৃত করিয়া গিয়াছেন। যথা—

'ভূমিকা স্তত্র কর্তব্যা বিচিত্র-কুহরান্বিতাঃ।
দ্বাদশোপর্যুপরিগা বর্তুলাভৈঃ সমাযুতাঃ।'

ইহাতে বুঝিতে পারা যায়,—'কুহরগুলির সহিত ভূমিকার সম্পর্ক ছিল এবং 'দ্বাদশভূমির উপর্যুপরি বিন্যস্ত, দ্বাদশস্তরে বিভক্ত, বর্তুলাভাসযুক্ত অণ্ডাকার প্রস্তরে নির্মিত হইত। মন্দর-শ্রেণীর মন্দিরে দশটি ভূমি, কৈলাস ও বিমান শ্রেণীর মন্দিরে আটটি ভূমি, নন্দন শ্রেণীর মন্দিরে ছয়টি ভূমি থাকিত। ভূমি-বিভাগসূচক বর্তুলাভাসযুক্ত পাষাণখণ্ডসমূহ শিখরের নানা অংশে সন্নিবিষ্ট হইত। শিখরের নানা স্থানের অলঙ্করণকার্যে 'কীর্তিমুখ' ব্যবহৃত হইত। শিখরশীর্ষে 'আমলক-শিলা' সুবিন্যস্ত হইয়া মন্দিরের শোভাবর্ধন করিত।

সেকালের দেবমন্দিরের গর্ভমধ্যস্থ ভিত্তিগাত্রে কারুকার্যের আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যাইত না; অধিকাংশ গর্ভমধ্যে মসৃণ ভিত্তিমাত্রই নির্মিত হইত; কেবলমাত্র দুই-চারিটি অতিব্যয়সাধ্য দেবমন্দিরের ভিত্তিগাত্রে কিছু কারুকার্য সংযুক্ত হইত। কিন্তু অধিকাংশ দেবালয়ের বহির্ভাগ আমূল কারুকার্যময় করিয়া নির্মিত হইত।

মন্দিরমধ্যস্থ শ্রীমূর্তির সম্মুখীন হইবার পূর্বে, মন্দির-প্রদক্ষিণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সে ব্যবস্থা এখনও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। প্রদক্ষিণকালে বহির্ভাগের বিচিত্র কারুকার্য উপাসকের আগ্রহপূর্ণ সরলচিত্ত অলৌকিক ভক্তিমাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ করিয়া, তাহাকে দেবদর্শনের অধিকারী করিয়া তুলিত; ভক্ত-উপাসকের দৃষ্টিতে দেবমন্দির দেবতারূপেই প্রতিভাত হইত। যে কারণেই হউক, দেবমন্দিরকে 'দেবমূর্তিভূত' বলিয়া দর্শন করিবার উপদেশ এখনও দেওয়া হইয়া থাকে। এ বিষয়ে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের উপদেশটি উল্লেখযোগ্য। যথা—

'শুকনাসা স্মৃতানাসা বাহুভদ্রকর্ণৌ স্মৃতৌ।
শিরস্তম্ভং নিগদিতং কলসং মূর্ধজং স্মৃতম্।।
কণ্ঠং কণ্ঠমিতি জ্ঞেয়ং স্কন্ধং বেদী নিগদ্যতে।
পায়ুপস্থে প্রণালে তু ত্বক্ সুধা পরিকীর্তিতা।।
মুখং দ্বারং ভবেদস্য প্রতিমা জীব উচ্যতে।
তচ্ছক্তিং পিণ্ডিকাং বিদ্ধি প্রকৃতিঞ্চ তদাকৃতিম্।।
নিশ্চলত্বং তু গর্ভোঽস্য অধিষ্ঠাতাস্য কেশবঃ।
এবমেষ হরিঃ সাক্ষাৎ প্রাসাদত্বেন সংস্থিতঃ।।

শ্রীহরিই প্রাসাদ-রূপে বর্তমান। প্রাসাদ শিখরের 'শুকনাসা' নামক প্রত্যঙ্গ তাঁহার নাসা,—'ভদ্রক' নামক প্রত্যঙ্গ তাঁহার বাহুযুগল—'স্তম্ভ' নামক প্রত্যঙ্গ তাঁহার মস্তক,—প্রাসাদশীর্ষাবস্থিত 'কলস' তাঁহার কেশপাশ—'কণ্ঠ' নামক প্রত্যঙ্গ তাঁহার কণ্ঠ,—'বেদী' তাঁহার স্কন্ধদেশ—'প্রণাল'দ্বয় তাঁহার পায়ুপস্থ—'সুধা' (চূণ) তাঁহার ত্বক,—'দ্বার' তাঁহার মুখ,—গর্ভমধ্যস্থ 'প্রতিমা' তাঁহার জীব,—প্রতিমার 'পিণ্ডিকা' জীব-শক্তি; পিণ্ডিকার 'আকৃতি' তাঁহার প্রকৃতি,—'গর্ভ' এই দেবায়তনরূপী দেবমূর্তির নিশ্চলত্ব বিজ্ঞাপক,—ইহার 'অধিষ্ঠাতা' স্বয়ং কেশব। এইরূপে বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে স্বয়ং শ্রীহরিই মন্দিররূপে বিরাজ করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত এই বর্ণনা কবিজনসুলভ কল্পনামাত্র বলিয়া উপেক্ষা করা সঙ্গত হইতে পারে না। শাক্ততন্ত্রেও দেবমন্দির 'দেবমূর্তিভূত' বলিয়া সমাদৃত, দ্বারপূজাপদ্ধতিতে তাহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে দেবমন্দির দ্বারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও তন্নিহিত বিবিধ দ্বারদেবতার পূজা করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে। ইহার মধ্যে কোনরূপ ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে কি না জানা যায় নাই। বৌদ্ধ চৈত্যপূজার সঙ্গে মূর্তিপূজা মিলিত হইয়া এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া থাকিতে পারে।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল পাষাণখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই উপরে বর্ণিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমতুল্য। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা তাহাদের অংশমাত্র দেখিয়া সম্পূর্ণ-মন্দিরের রচনাসৌন্দর্যের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সকল পাষাণখণ্ড দেখিয়াও সেকালের বাস্তুশাস্ত্রের সম্পূর্ণ পরিচয়লাভ করা অসম্ভব। তথাপি খননকার্য ইতিহাসের 'জীর্ণোদ্ধার' নামে কথিত হইবার যোগ্য। শাস্ত্রে 'জীর্ণোদ্ধারে'র দ্বিগুণ ফল বলিয়া উল্লিখিত আছে—

'পতিতং পতমানং তু তথার্ধ স্ফুটিতং নরঃ।
সমুদ্ধৃত্য হরের্ধাম দ্বিগুণং ফলমাপ্নুয়াৎ।'

বাংলার অনেক ধ্বংসাবশেষ 'রাজবাড়ি' নামে পরিচিত হইয়া

আসিতেছে—অনেক 'রাজবাড়ি'র প্রাকার পরিখাবেষ্টিত রাজদুর্গের সীমাচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়—অনেক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ নানাস্থানে আজিও দৃশ্যমান হইয়া আছে। খনন করাইতে পারিলে ইহাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে এখনও পুরাকীর্তির অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবার আশা করা যাইতে পারে। খননকার্যে অগ্রসর না হইলে অতীতের বাস্তুশাস্ত্রের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধারসাধন সম্ভব নহে। এই 'জীর্ণোদ্ধার' কার্যে একমাত্র গভর্নমেন্টকেই অগ্রসর হইলে চলিবে না। অবশ্য গভর্নমেন্টের সহায়তা ভিন্ন দেশের সাধারণ লোকের চেষ্টায় খননকার্যে সম্পূর্ণ সফলকাম হইবার পক্ষে অন্তরায়ের অভাব নাই। তবুও দীঘাপতিয়ার শরৎকুমারের রচনার উদ্‌ধৃতি দিয়াই বলিতে হয় :—

'এই সমস্ত প্রাচীন নগরের যথাযোগ্য প্রত্নসম্পদ উদ্ধার করিতে হইলে, খননকার্যের আরম্ভ করিতে হইবে। প্রত্নসম্পদের উদ্ধার হইলেই ইতিহাসের উদ্ধার হইবে। নচেৎ যে উপাদান এ পর্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না। তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে প্রকৃত ইতিহাসের উদ্ধার কোনকালেই সম্পন্ন হইবে না। বাঙালীকেই বাঙালার ইতিহাস উদ্ধার সাধন করিতে হইবে এবং তাহাকেই কুদ্দালিহস্তে ভূগর্ভে অবতরণ করিতে হইবে।'

শরৎকুমার আজ আর নাই ; কিন্তু তাঁহার প্রেরণা কি বাঙালার যুবক-সম্প্রদায়কে উজ্জীবিত করিবে না ? *

* স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের রচনা অবলম্বনে।

সাইনাস একটি নাকের রোগ

সাইনাস হলো সংক্ষেপিত নাম—পুরো কথাটা হলো সাইনুসাইটিস। নাকের এ রোগ আমাদের অনেকেরই অনেক সময় হয়ে থাকে। রোগের আক্রমণটা যদি পরিমাণে কম হয় বা রোগীর যদি শরীর-স্বাস্থ্য খুবই ভালো থাকে, তা হলে ডাক্তারবাবুদের সাহায্য না নিয়েও এ রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু, তা যদি না হয়—অর্থাৎ আক্রমণটা যদি খুব বেশি পরিমাণে হয় বা রোগীর শরীর-স্বাস্থ্য তেমন ভালো না হয়— তা' হলে রীতিমতো চিকিৎসা ব্যতীত সাইনাস সারে না।

অনেকেই সাইনাসকে এক ধরণের সর্দি মনে করে থাকেন এবং সেই জন্যেই সাইনাসের উপসর্গগুলিকে, যথা মাথাধরা: নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল পড়া, কপাল বা মুখের ওপরের অংশে (বিশেষ করে নাকের আশেপাশে) ব্যথা—সাধারণ সর্দির উপসর্গ মনে করে কেউ বলেন ফুটবাথ নিতে, কেউ বলেন কাঁচা পেঁয়াজ খান মশাই, ঠিক হয়ে যাবে, কতো দেখেছি ও রকম। কেউ বা মাথাধরার একটা সাধারণ ওষুধের নাম আপনাকে বলে দেবেন—যে ওষুধ বিজ্ঞাপন মারফৎ তার চাইতে আপনারও কম জানা নেই। কিন্তু ডাক্তারমাত্রেই জানেন সাইনাস ঠিক সর্দি নয়—তবে সর্দিজাতীয়। আমাদের নাকের ছিদ্রপথ দু'টি যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানকার কয়েকটি ছিদ্র-প্রান্তকে সাইনাস বলে। সংক্রমণের ফলে সেই ছিদ্র-প্রান্তে যে প্রদাহ সৃষ্টি হয়—যার ফলে প্রচুর 'সর্দি' বেরুতে থাকে, তাকে বলে সাইনুসাইটিস।

সাইনুসাইটিস বা সাইনাস ব্যারামে সাধারণত মানুষকে মরতে দেখা যায় না এবং এ ব্যারামটা মারক নয় বলেই অনেকে একে বেশ কিছুটা অবজ্ঞার সঙ্গে দেখে থাকেন। এবং আমাদের শরীর নিজের 'জীবনীশক্তির জোরে যতটুকু সারাতে পারে—সেইটুকু কমলেই এ থেকে ধরে নেন যে, দারুণ সর্দিটা (প্রকৃতই কিন্তু তা নয়) কমেছে, বাকিটুকু ঠিকমতো স্নান-টান করলেই সেরে যাবে। কিন্তু, বাস্তবিকই তা নয়।

প্রবল সর্দি ওষুধ ছাড়াও একেবারে নির্মূলভাবে সাধারণত সেরে যায় সত্যি—কিন্তু প্রকৃত সাইনাস যদি হয় তা হলে ওষুধ ছাড়া তা কদাচিৎ সারে—হয় তো খানিকটা কমে যেতে পারে এবং মাথাধরা ইত্যাদি উপসর্গগুলিও খানিকটা কমে যায় মাথাধরার ওষুধ খেয়ে, কাজেই আমাদের কাজকর্মের বিশেষ ব্যাঘাত হয় না দেখেই আমরা ধরে নেই যে রোগটা সেরে গেছে। কিন্তু—বাস্তবিক তা নয়। সাইনাস ঠিকই ভেতরে রয়ে গেছে জানবেন—দু'এক মাস বাদে যখন আবার একটু বাড়বে, আপনি তখন মনে করবেন হয় তো আবার নতুন করে একবার সর্দি হলো—কিন্তু, তা নয়।

আজকাল শিল্পাঞ্চলে সৃষ্টি হয় ধুলোর রাজত্ব। এই ধুলো এবং ধোঁয়া শুষ্ক অবস্থায় সাধারণত সর্দির সৃষ্টি করে—কিন্তু যেখানে বা যে সময়ে বাতাসে প্রচুর জলকণা থাকে, তখন ঐ একই ধুলো সাইনাস বা অন্যান্য শ্বাসনালীর ব্যারাম সৃষ্টি করে থাকে।

একটু অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাবেন যেখানে বা যে ঋতুতে আকাশটা যতো বেশি ধূলি-মলিন থাকে, সেখানে বা সেই ঋতুতে সাইনাস বা শ্বাসনালীর অন্যান্য ব্যারামও ঠিক ঐ পরিমাণেই বেড়ে থাকে। সাইনাস বার বার ঘুরে-ফিরে হওয়া ভালো নয়। তাই প্রথমেই যখন কারো হয় তিনি যদি চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করেন, তা হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাইনাস নির্মূলভাবে সেরে যায় দেখা গেছে।

অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসক মনে করেন যে, মাঝে মাঝে শিল্প-এলাকার বাইরে অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে ঘুরে এলেও প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ুর সংস্পর্শে আমাদের নাকের ছিদ্রপথের 'সেল'-গুলি সতেজ হয়ে ওঠে—যার ফলে সাইনাসকে প্রতিরোধ করা সহজতর হয়ে ওঠে।

—ডাঃ নাগ

মানুষ বড়ো অসহায়

একটি সত্যি ঘটনা বলছি।

কিছুদিন আগে একটা রেলওয়ে প্লাটফর্মের বেঞ্চে বসে ট্রেন-এর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমার পাশে আর এক ভদ্রলোকও বসেছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলো—বুঝতেই পারছেন আমাদের দেশের কথা বলছি; কাজেই নির্দিষ্ট সময়ের পরে 'বেশ কিছুক্ষণ' তারপরে আরো খানিকক্ষণ কেটে গেলো, ট্রেনের তবু টিকিটিরও পাত্তা নেই। বসে আছি তো বসেই আছি। কখনো ভালো করে পড়া খবরের কাগজটা আবার পড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভেজাল খেয়ে খেয়ে পেটের বারোটা বেজে গেছে এবং ভেজাল ভেবে ভেবে স্নায়ুমণ্ডলীর তেরোটা বেজে গেছে—এ-হেন অসহায় এবং তন্দ্রাক্লিষ্ট সাব-এডিটরদের লেখায় আর 'বিটুইন দি লাইনস' পড়বার মতো কিছুই থাকে না আজকাল। যা থাকে, তা বেশি পড়লে মনের অবস্থা ভালোর চাইতে খারাপই হয় বেশি, আলো উবে গিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

যা বলছিলাম। খবরের কাগজটা কুঁচকে দুমড়ে গেলো। বসে বসে আড়মোড়া ভাঙলাম বেশ কয়েকবার; জোর করে চোখ বুজে বসে রইলাম একটুক্ষণ; আবার চোখ মেললাম; এদিক-ওদিক দেখে একটু অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হবার নয়। না আমার মনটা স্থির হলো—না ট্রেনের ধুঁয়ো দেখা গেলো। ভাবতে পারেন, ট্রেনের দেরির জন্যে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলো—যে দেশে বিগত দেড় যুগে শতকরা নিরানব্বইখানা ট্রেনই দেরিতে আসে, সে দেশে আবার একটা ট্রেনের দেরির জন্যে এতো বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে কেন? কিন্তু বাস্তবিকই আমার ব্যস্ততার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিলো। আমি হলাম গিয়ে যাকে বলে একজন প্রায় সাহিত্যিক—পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় এবং কোথায় না—বিস্তর নিজের ঢাক পেটাবার পরে এই সবেমাত্র সাহিত্যসভায় বক্তৃতা করবার জন্যে আমন্ত্রণ পেতে আরম্ভ করেছি! কয়েকদিন আগেও অবশ্য এ রকম ছিলো যে, সভার নির্দিষ্ট জায়গায় শ্রোতা তো দূরের কথা, উদ্যোক্তারাও কেউ এসে পৌছবার আগেই বক্তা আমি গিয়ে হাজির হতাম—কিন্তু বারকয়েক এমনিধারা হয়ে যাবার পরে একটু সতর্ক হয়ে গেছি—আজকাল ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে থাকি। আজ নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে পৌছবার জন্যেই এই নির্দিষ্ট ট্রেনের জন্যে স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। পকেটে সাতপৃষ্ঠা আমার সভাপতির অভিভাষণটা মাঝে মাঝেই খচমচ করে উঠছিলো। সত্যি একটা জোরালো বক্তৃতা লিখে ফেলেছি। কাগজের যদি পা থাকতো তা হলে ও বক্তৃতাটা আমার পকেট ছিঁড়ে-কুঁড়ে প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে পড়লে কি না হতে পারতো।

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ট্রেনের দেরির জন্যে আমার অস্থিরতাটা কি পরিমাণ ন্যায্য। নিজেকেই নিজে সামলে উঠতে পারছি না, তার ওপর একটু নড়েচড়ে বসলেই বক্তৃতাটা যে রকম খচমচ করে উঠে দাঁত খিঁচোতে লাগলো তাতে আমি যাকে বলে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে পড়লাম আর কি। এমনিধারা সময়েই একটা অসতর্ক মুহূর্তে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো—ওঃ! কি অসহায় অবস্থা!

—হা-হা-হা-হা!

হকচকিয়ে পাশের ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখি ভুঁড়ি নাচিয়ে বিদ্রূপভরে আমার দিকে তাকিয়ে একটা বিকট হাঁ করে হাসছেন। ওঁর হাসির আকস্মিকতা এবং তার বেগের মুখে নিজেকে যেন ঠিক রাখতে পারছিলাম না। ঢাক-ঢাক করে কিছু লুকোতে গিয়ে একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলে মানুষের যে অবস্থা হয়, আমারও কিছুক্ষণের জন্যে অনেকটা তেমনিই হলো। তবে কি আমার উৎকট অস্থিরতার কারণটা ভদ্রলোক বুঝতে পেরে গেছেন? একেবারে অসম্ভব নয়—কারণ, মনে পড়লো খানিকক্ষণ আগে একবার আমার অভিভাষণটি পকেট থেকে বের করে গোটা দুই শব্দ এ্যাড করে দিয়েছিলাম। তার নীট ফল হয়েছিলো দু'টি। প্রথমত বক্তৃতাটা আরো জোরালো হয়ে উঠেছে আর দ্বিতীয়ত পকেটের বাইরে প্ল্যাটফর্মের খোলা হাওয়ায় ওর গরম ভাবটাও খানিকটা ঠাণ্ডা হয়েছিল।

কিন্তু আর একটা লোকসানও হয়ে গেছে বলে আমার মনে হতে লাগলো এখন। আমার রিভিশনের ফাঁকে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আমার অভিভাষণটি পড়ে ফেলেছেন। তার মানে দাঁড়ায় এই যে, আমার বক্তৃতাটির এখন যা কিছু মূল্য তা ফাঁস হয়ে-যাওয়া বাজেটের বৃত্তান্তের মতো খানিকটা, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিরক্তিকর মনে হওয়া স্বাভাবিক। এবার কিন্তু পকেটে হাত দিয়েও মনে হচ্ছিলো যেন আমার অভিভাষণটি অযোগ্য রক্ষকের হাতে পড়ে কোনো সুন্দরী তরুণীর শ্লীলতাহানি ঘটে গেলে তার যেমন অবস্থা হয়—যেন অনেকটা তেমনি হয়ে গেছে; মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়েছে পকেটের ভেতর। আমার অভিভাষণটির নামকরণ করেছিলাম 'সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব'—সাহিত্য, যে সাহিত্যের আসরে একখানা পাত পাবার আশায় কতদিন আহার ভুলে যাই, ঘুমকে অস্বীকার করি, যার প্রতি কিঞ্চিৎ ঝোঁকের জন্যে অফিসে প্রায়ই লেট এবং হাস্যকর রকমের সমস্ত ভুল যা করে ফেলি, তা মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়—সেই সাহিত্য যে মনুষ্যত্বের চাইতে কতো তুচ্ছ, মনুষ্যত্ব যে কি বিরাট, দুর্লভ এই মানবজীবন আমরা যারা একেবারেই বিনা আয়াসে পেয়ে গেছি তারা যে সবাই এক একজন জ্যান্ত অবতার—এ সমস্তই আমার বক্তৃতায় আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণ করেছি। এতো বড়ো একটা থিয়োরী যদি পথে-ঘাটে ফাঁস হয়ে যায় তা হলে কার না ক্ষোভ হয়।

শুধু ক্ষোভ তবু সামলানো যায়, কিন্তু ভদ্রলোক যখন মুখ খুললেন তখন আমার যা হলো ক্ষোভ তার কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু, শোকও বোধ হয় বালক-টালক কিছু হবে—গোটা উত্তর গ্রীনল্যাণ্ডের হিমপ্রবাহ যেন আমি আমার ছত্রিশ ইঞ্চি খাঁচার মধ্যে অনুভব করলাম।

—মাপ করবেন, ভদ্রলোক হাসির রাশ টেনে বললেন, একটা বড়ো অন্যায় করে ফেলেছি, একটা দারুণ অভদ্রতা। বুঝতেই পারছেন এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আপনি যেমন গত ঘণ্টাতিনেক ধরে কি করবেন ঠিক করতে না পেরে অনেক কিছুই করে ফেলছেন, আমার অবস্থাও অনেকটা সেইরকম। তাই চোখের কাছাকাছি যখন আপনার

'সাহিত্য ও মনুষ্যত্ব' এসে পড়লো আপনার অনুমতি ব্যতিরেকেই দেখলাম চোখ দু'টো নিজেদের বুলিয়ে নিলে আপনার কাগজগুলির ওপর থেকে। অনেকটা বিদেশী কোম্পানীর দেশী বড়বাবুদের মতো আর কি, কর্তাকে খুশি করবার জন্যে অযাচিতভাবেই সর্বদা সমস্ত রকম নীচু কাজ করতে তৎপর—যে নীচুতা অনেক সময় এমন কি খোদ কর্তাকেও অবাক করে দেয়। যাই হোক মশাই আপনার লেখাটা আমার পড়া হয়ে গেছে। ভদ্রতার খাতিরে আপনার অভিমতকে সমর্থন জানানোটাই হয় তো ভালো কাজ হতো।

কিন্তু মশাই, মাপ করবেন, মিথ্যে আমার ধাতে সয় না। সাহিত্য, মানে সম্পাদকমশাই আর প্রকাশক মহাজনদের অর্ডার সাপ্লাই করতে গিয়ে যে পণ্যসামগ্রী মাথায় হটব্যাগ চাপিয়ে আপনাদের উৎপাদন করতে হয়, তার বিষয়ে যতো নিঃশব্দ থাকা যায় ততোই যে ভালো সে কথাটা সাহিত্যিক হিসেবে না হোক অন্তত ভদ্রলোক হিসেবে আপনিও স্বীকার করবেন আশা করি। তবে মানুষ বা মনুষ্যত্বের কথা সব-সময়েই অল্পবিস্তর বলা চলে। আমি কিন্তু মশাই আপনার ঠিক বিপরীত মতে বিশ্বাসী। আপনি মনে করেন মনুষ্যজীবন দুর্লভ, মানুষ একটা বিরাট কিছু, মানুষেরা বড়ো ভাগ্যবান ইত্যাদি ইত্যাদি; আর আমি মনে করি মনুষ্যজীবন সুলভতর বস্তু, একবার ভেবে দেখুন তো কিছুমাত্র চেষ্টা ব্যতিরেকেই আমরা সবাই কেমন এক-একটি আস্ত জীবন পেয়ে গেছি। আর ভাগ্যের কথা বলেন তো বলবো, মানুষের চাইতে অসহায় জীব পৃথিবীতে আর কেউই নেই—হতে পারে না।

ভদ্রলোক একবারটি দম ফিরিয়ে নিয়ে তারপর আবার আরম্ভ করলেন: মানুষের এই অসহায়তার প্রমাণ চাই? শুনুন তা হলে কয়েকটা কথা বলি, এতেই বোধ হয় আপনি নিঃসন্দেহ হতে পারবেন।

প্রথমত দেখুন, মানুষকে পৃথিবীতে আনা হয় তার মতামতের অপেক্ষা না করে।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময়ও যেতে হয় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

তৃতীয়ত দেখুন, যে খুব গরীব সবাই তাকে বলবে উচ্ছৃঙ্খল, বাজে খরচ করে তাই অভাব হয়।

চতুর্থত, যে মানুষ বড়লোক সবাই তাকে বলবে—নিশ্চয়ই কিছু একটা অসদুপায়ে টাকা-পয়সা করেছে।

পঞ্চমত, আপনার যখন টাকা ধারের দরকার হয়, দেখবেন সবাই কেমন আপনাকে এড়িয়ে চলতে চাইবে; আর যদি আপনি সচ্ছল হন তো দেখবেন সবাই আপনার উপকার করবার জন্যে কতটা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে এবং সে অবস্থাটা আপনার পক্ষে নিশ্চয়ই বিরক্তিকর হবে।

ষষ্ঠত, যদি কেউ রাজনীতি করে তো সবাই বলবে, লোকটা কিছু একটা দাও মারবার তালে আছে, আর যদি রাজনীতি না করে তবে তাকে অসামাজিক এবং স্বার্থপর আখ্যা পেতে হবে।

সপ্তমত যদি কেউ খুব দানখয়রাত করে সবাই বলে লোকটা নিশ্চয়ই এককালে খুব পাপ-টাপ করেছে এখন তাই খণ্ডাবার চেষ্টা করছে; আর যদি দান না করে তো সে যে কঞ্জুষ এ-বিষয়ে সকলেই একমত হবে। যদি আপনি প্রকৃতই ধার্মিক প্রকৃতির হন তা হলেও সবাই বলবে ভণ্ড—আর অধার্মিক হলে তো পাষণ্ড বলবেই।

অষ্টমত শুনুন, যদি আপনি কোমল প্রকৃতির হন তো সবাই বলবে লোকটা মেয়েলি স্বভাবের—আর কোমল প্রকৃতির না হলে বলবে নিষ্ঠুর।

যে অল্পবয়সে মারা গেছে তার সম্বন্ধে সকলেই একমত যে, সে বেঁচে থাকলে কি না হতে পারতো—আর যে বুড়ো বয়স অবধি বেঁচে আছে তার সম্বন্ধে সকলেই একমত—আপদটা যমেরও অরুচি····

ও আমার ট্রেন এসে গেছে, আমি আপ-এ যাবো, আপনি তো ডাউন-এ যাবেন, তাই না? বসুন তা হলে আরো কিছুক্ষণ। আচ্ছা চলি, কিছু মনে করবেন না, নমস্কার!

মনে হলো এরপর ডাউন-এ গিয়ে, মানে আরো ডাউন-এ গিয়ে সাহিত্যসভায় না গিয়ে বরং আপ-এ বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার অভিভাষণটি চোস্ত করে রিভাইজ করতে আরম্ভ করি অন্য কোনো সাহিত্যের আসরের জন্যে। তাই এবার বাড়ি ফেরবার ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। —তীরন্দাজ

যন্ত্রের সাহায্যে চিঠি বাছাই

আমাদের প্রধান পোস্টাফিস বা জেনারেল পোস্টাফিসকে যেমন বড় ডাকঘর বলে, তেমনি পশ্চিম জার্মানীর কেন্দ্রীয় পোস্টাফিসকে বলে বুণ্ডেসপোস্ট। এই বুণ্ডেসপোস্ট থেকে প্রতিদিন পশ্চিম জার্মানীর সর্বত্র ৩০ মিলিয়ন চিঠি যায়। পশ্চিম জার্মানীর অন্যান্য অনেক ডাকঘর থেকেই দিনে তিনলাখ চিঠি যায়। পোস্টাফিসে যথেষ্ট কর্মচারী রাখলেও এই পাহাড়-পর্বত চিঠি যথাস্থানে পাঠানো সহজ কর্ম নয়! তাই অনেকদিন ধরেই পোস্টাফিসের কর্তারা মাথা ঘামাচ্ছিলেন এমন একটা যন্ত্র তৈরি করতে যেটা ঠিকমত চিঠি বাছাই করতে পারবে। গত বছরে এইরকম একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে এবং দক্ষিণ জার্মানীর ডার্মস্টাট পোস্টাফিসে সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে এটা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নয়। পশ্চিম জার্মানীর সব পোস্টাল শহরগুলির প্রত্যেকের একটা সাংকেতিক চিহ্ন আছে। চিঠির গায়ে বিশেষ টাইপরাইটার দিয়ে চিঠির গন্তব্য-শহরের সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া হয়। তারপর। যন্ত্রের মধ্যে চিঠিগুলি দলে প্রত্যেক শহরের আলাদা আলাদা খোপে চিঠিগুলি জমা হয়; তারপর চিঠিগুলি সেই সব শহরে যায়। সেখানে আবার কর্মচারীরা সাংকেতিক চিহ্নগুলি দেখে চিঠিগুলি বরাবর যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয়। এবার কিন্তু সুপরিচিত জার্মান প্রতিষ্ঠান সিমেন্স এমন একটা স্বয়ংক্রিয় চিঠি বাছাই যন্ত্র তৈরি করেছে, যাতে বাস্তবিক কোনই তদারকের দরকার হয় না। এই যন্ত্রে ঘণ্টায় তিরিশ থেকে ছত্রিশ হাজার চিঠি ঠিকমত বাছাই হয়। এতে হাতে কিম্বা টাইপরাইটার দিয়ে চিঠির গায়ে কোন সাংকেতিক চিহ্নও দিতে হয় না। কারণ যন্ত্রটি বিনা বাধায় পোস্টাফিসের সংখ্যা পড়তে পারে। এতে সেকেণ্ডে দশটা চিঠি বাছাই হয়ে ঠিকমত খোপে গিয়ে জমা হয়। সেখান থেকে চিঠিগুলো আবার আর একটা চিঠিবিলি যন্ত্রে গিয়ে জমা হয় যার নাম 'রোটুণ্ড'—কারণ সেটা অনবরত ঘোরে। এই যন্ত্রের প্রাণ হচ্ছে একটা টেলিভিশন চোখ ও তার সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই পশ্চিম জার্মানীর সব বড় বড় পোস্টাফিসে এই যন্ত্র বসানো হবে। —ডি এ ডি।

❋ মরুপ্রান্তরের কথা ❋

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সৃষ্টির আদিমকাল হইতেই মরুপ্রান্তর মানুষের পরম বিস্ময়ের বস্তু। সম্মুখে দিগন্ত-বিস্তৃত ধূ-ধূ বালুকারাশি, বিচিত্র ৃতির গাছপালা, বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির বালুকাস্তূপ র সূর্যস্নাত বালুকার উপরে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ মানুষের ম ও কৌতূহলের উদ্রেক করে। মরুপ্রান্তরে দাঁড়াইয়া ন হয় আমরা সত্যই প্রকৃতির বড় কাছাকাছি আসিয়া ৌছিয়াছি। বিপরীতধর্মী এই প্রান্তরে দিনের বেলায় যেমন চণ্ড উত্তাপ, নিশীথ রাত্রিতে আবার তেমন ঠাণ্ডা। আবহাওয়া ধারণত শুষ্ক ও রুক্ষ; কিন্তু সময় সময় প্রচণ্ড বর্ষণও অস্বাভাবিক য়।

নৈসর্গিক কতকগুলি কারণে মরুভূমির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই ব কারণ কিছু কিছু যে আমাদের আশেপাশেও নাই এমন নয়। াড়ির একটু দূরেই যে ক্যাকটাস-শ্রেণীর গাছটি দেখি, সেটি হয় তো রুপ্রান্তরের একেবারে আদি গাছ। কি করিয়া এই জাতীয় ক্যাকটাস াসিয়া পড়িল তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে মরুসৃষ্টির কারণগুলি ালোচনা প্রয়োজন।

মরুভূমি বা মরুপ্রান্তর কাহাকে বলে এবং কেনই বা মরুপ্রান্তরের ৃষ্টি হয়? এ প্রশ্ন একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে যদিও ুপ্রান্তরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য অপরিসীম তাপ, তবু উহাই একমাত্র ারণ নয় মরুসৃষ্টির। কারণ তুষারাবৃত উত্তরমেরু অঞ্চলেও মরুপ্রান্তর আছে—সেখানে কিন্তু তাপ নাই। আবার দক্ষিণ আমেরিকার মরুপ্রান্তরগুলিও অপেক্ষাকৃত শীতল। ভূমি মরুময় করিয়া তোলার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সহায়ক শুষ্ক আবহাওয়া ও শুষ্ক মাটি—যার কারণ আবার বৃষ্টির অভাব। মরুপ্রান্তরে সমগ্র বৎসরে বৃষ্টি-পাতের গড়পরিমাণ শূন্য ইঞ্চি হইতে আট ইঞ্চির বেশি নয়। কিন্তু যেটুকু বৃষ্টি হয় তাহাও আবার সমগ্র বৎসরের প্রয়োজনমত নয়। যে কোন প্রান্তরেই ৮—১০ ইঞ্চি বৃষ্টি যদি বৎসরের নানা সময়ে প্রয়োজনমত হয় তবে মরুসৃষ্টি হয় না। অনেক গাছপালা ও প্রাণী সেখানে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

কিন্তু মরুপ্রান্তরে হয় তো বৎসরে ২ মাসেই ৮ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত দেখা গেল, আর বাকী সময়ে একবিন্দু বৃষ্টিও নাই। কাজেই ইহাই প্রতীয়মান হয় যে সময়মত ম্লান পরিমাণ বৃষ্টি পাইলে মাটির এই ভয়াবহ পরিণতি হয় না। আমাদের পরিচিত গাছপালা শুধু জলের অভাবেই সেখানে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আর যেখানে গাছপালা বাঁচে না, সেখানে সাধারণ প্রাণীর বাস অসম্ভব।

পৃথিবীর সমগ্র ভূখণ্ডের প্রায় এক-পঞ্চমাংশই জনবিরল—কারণ ঐ সকল স্থানে মরুভূমীর অবস্থা বিদ্যমান। মহাদেশগুলির মধ্যে একমাত্র ইউরোপই ব্যতিক্রম। এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া উভয় মহাদেশের বিরাট অংশই মরুপ্রান্তর; এশিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত মালখণ্ডে গোবী মরুভূমি পৃথিবীখ্যাত। উত্তর আমেরিকার বড় মরুপ্রান্তরগুলির অবস্থান প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল বরাবর। ব্রেজিল, আরজেনটিনা, বলিভিয়া ও চিলিতে অনেক মরুপ্রান্তরের অবস্থান দেখা যায়। আফ্রিকার বিখ্যাত সাহারা মরুভূমি ছাড়াও ইথিওপিয়া, মালি, কেনিয়া ও ট্যাঙ্গানিকা ও বেচুয়ানাল্যাণ্ডে বিস্তৃত মরুভূমি আছে। এই বিভিন্ন মহাদেশগুলিতে মরুসৃষ্টির কারণ অনুধাবন করিলে দেখা যায় বার্ষিক গড় বৃষ্টি এবং তুষারপাতের অসামঞ্জস্য ছাড়াও কতকগুলি স্থানীয় পারিপার্শ্বিকও বিদ্যমান। বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার জন্য অনেক স্থান একেবারে মরুময় না হইয়াও হয় তো প্রায় মরুময়; এরূপ স্থানে ২০ বা ৫০ বৎসর পরে পর পর ২।৩ বৎসর যদি একবিন্দুও বৃষ্টিপাত না হয় তবে সম্পূর্ণরূপে মরুময় হইয়া দাঁড়ায়। পূর্বে গাছপালা বা জীবজন্তু যদিবা কোনওরকমে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত, পরে তাহা একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। পৃথিবীর অধিকাংশ মরুপ্রান্তরের সৃষ্টির ইহাই ইতিহাস।

মরু কথাটি মনে হইলেই আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে বালুকারাশির চিত্র—দিগন্ত-বিস্তৃত ধূ-ধূ বালুকারাশি—মাঝে মাঝে বালিয়াড়ি—হাওয়ার প্রভাবে উঁচুনীচু ঢেউয়ের মত চলিয়া গিয়াছে। এই বালিয়াড়ি সৃষ্টির পূর্ব ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে প্রথমে ঐ স্থানে ছিল আলগা বালুকারাশির স্তূপ—কোন গাছপালা ঐ আলগা ভূমিতে শিকড় গাড়িতে সক্ষম হয় নাই। তারপর কালের স্রোতে কোনও একসময়ে প্রকৃতির কোন বিপর্যয়ে বাত্যাবিক্ষুব্ধ হইয়া ঢেউয়ের মত উঁচুনীচু বালিয়াড়ির সৃষ্টি হইয়াছে। গাছপালা কোন কিছু যদিবা শিকড় গাড়িয়া কোনক্রমে প্রাণধারণ করিয়াছিল, তাহা বালুকারাশির চাপে পড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

ভূপৃষ্ঠে সর্বসময়ই বায়ুর দ্বারা ক্ষয় সাধন হয়। বায়ুর প্রবাহকালে নরম বা আলগা ভূপৃষ্ঠ হইতে মাটির কণাগুলি একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবাহিত হয়। এভাবেই মরুপ্রান্তরে বালিয়াড়ি বা বালুকা-ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। আশেপাশে ঘন বৃক্ষাদি থাকিলে এভাবে বালুকা বা মাটির কণা একস্থান হইতে অপরস্থানে পরিবাহিত হইতে পারে না—বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মরুপ্রান্তরে কোন বাধা নাই—কাজেই বালুকারাশি সর্বদাই বায়ুলাঞ্ছিত হয়। ধূলির ঝড় বা বালুকার ঝড়ও এই কারণে মরুপ্রান্তরে লাগিয়াই আছে। এই ঝড় যে কত ভয়ংকর, কি ভীষণ প্রকৃতি তাহা মরু-পর্যটনকারীদের বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়।

মরুপ্রান্তরে আবার সময় সময় প্রবলবেগে জলস্রোতও নামিয়া আসে। খুবই আশ্চর্যের কথা নয় কি? কিন্তু তবু অতিবর্ষণের ফলে বন্যা হয়। কারণ মোটামুটি এই—মরু অঞ্চলে যখন বৃষ্টি একান্তই হয় তখন সে বৃষ্টির পরিমাণ হয় অস্বাভাবিকরকম প্রবল। যে কোন একটি স্থানে অতি অল্প সময়ে অনেক বেশি বর্ষণ হইলে সেই স্থানের বালুকারাশি অতটা জল শুষিয়া লইতে সমর্থ হয় না; তখন এই অতিরিক্ত জল বন্যার আকারে এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়ে। মরুভূমিতে বন্যার রূপ ভয়ংকর; অত্যন্ত দ্রুত তার গতি—পর্যটকগণ বলেন যে মরুর বন্যার গতি দ্রুত ধাবমান মানুষের

গতির চেয়েও দ্রুততর। আর বন্যার সে জল হাজার হাজার টন বালুকা, বৃহদাকার পাথর ইত্যাদি সব ঠেলিয়া লইয়া সম্মুখের দিকে প্রবলবেগে অগ্রসর হয়।

মরুপ্রান্তরে সাধারণত বালুকা-ঝড় ক্ষান্ত হওয়ার সাথে সাথেই প্রবল বর্ষণ সুরু হয়। এজন্য অভিজ্ঞ মরু-পর্যটকগণ কখনও নীচুস্থানে তাঁবু ফেলেন না, কারণ পঁচিশ-তিরিশ মাইল দূরে বালুকা-ঝড় হইলেও সেখানকার বন্যার জল অতি অল্পসময়ে ছুটিয়া আসিয়া সবকিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে।

মরুপ্রান্তরে যে সকল গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার বা কীটপতংগের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহারা কিন্তু আমাদের অতি পরিচিত গাছপালা বা জীবজন্তুর মতো নয়। ইহাদের আকৃতি ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন এবং পরিবেশও ভিন্ন। প্রশ্ন উঠিতে পারে মরুর এই শুষ্ক আবহাওয়া ও জলশূন্য অবস্থার মধ্যে ইহারা বাঁচিয়া থাকে কিরূপে? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই সে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মরুপ্রান্তরের গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার ও কীটপতংগদের অবয়বে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

অধিকাংশ গাছপালাই ঘন কাঁটায় আবৃত—কাঁটাগুলির উপর আবার পুরু লোমের আবরণ দেখা যায়। বেশির ভাগ গাছই ক্যাকটাস শ্রেণীর। ইহার মধ্যে Organ Pipe Cactus, Saguaro, Jumping Cholla Cactus, Teddy Bear Cactus, Prickly Pear Cactus, Beaver Tail Cactus, Disappearing Leaves Cactus সমধিক প্রসিদ্ধ। উপরোক্ত কতকগুলি শ্রেণীর ক্যাকটাস আমাদের অনেকের বাড়িতেই টবে শোভাবর্ধন করে। মরুপ্রান্তরের উদ্ভিজ্জ বলিয়া এই সব ক্যাকটাসের জলের প্রয়োজন খুবই কম।

মরুপ্রান্তরের অপর বৈশিষ্ট্য খেজুর বা পাম জাতীয় গাছ দেখা গেলে সেখানে অথবা তাহার কাছাকাছি মরূদ্যান বা ওয়েসিস্ আছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। খেজুর গাছ মরুপর্যটকদের শুধু জলেরই সন্ধান দেয় না, পরন্তু তাহাদের খাদ্য ও আশ্রয়েরও ভরসা।

মরুপ্রান্তরের আর একটি বিচিত্র গাছ জশুয়া গাছ (Joshua Tree)। ইহা যেন মরুর নিশানা—লোকালয়ে ইহার সন্ধান মিলে না। গাছের গোড়া হইতে উপর পর্যন্ত বর্শাফলকের মত ছুঁচালো পাতা অজস্র ছড়াইয়া পড়ে। এই গাছের গুঁড়িও বেশ বৃহৎ। অসংখ্য পাখির নীড় ও পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল। মরুপ্রান্তরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উদ্ভিজ্জ Yucca অথবা Spanish Bayonet, Century Plant, Magueys, Ocotillo, Palo Verde ইত্যাদি।

ফুলের বৈচিত্র্যও দেখা যায়। বসন্তকালে যদি উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় তবে চারিদিক বিচিত্রবর্ণের ফুলে ভরিয়া উঠে। এই সব ফুলের মধ্যে Sand Verbena, Yellow Encelias ইত্যাদি অধিক প্রসিদ্ধ।

মরুপ্রান্তরে এখানে-ওখানে ও গাছপালার আশেপাশে সহস্রশ্রেণীর জীবজন্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রকৃতি বিভিন্ন—কতকগুলি প্রচণ্ড তাপ ও শুষ্ক আবহাওয়ার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বালুকায় গর্ত খুঁড়িয়া বাস করে—কেহ কেহ ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায় আবার কিছুসংখ্যক ঝোপের ভিতরে অথবা বড় বড় বৃক্ষের গুঁড়িতে কোটরে বাস করে। এইসব জীবজন্তুর খাদ্য উদ্ভিজ্জ অথবা ছোট ছোট প্রাণী।

এই জীবজন্তুগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার দরুণ স্বভাবতই আমাদের পরিচিত জীবজন্তুর চেয়ে আলাদা প্রকারের। ইহাদের শারীরিক গঠন মরুর রুক্ষ আবহাওয়ার উপযোগী এবং খাদ্যসংগ্রহ প্রণালীও অভিনব। বিখ্যাত চিত্র নির্মাতা Walt Disney-র Living Desert চিত্রখানি যাহাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাহারাই মরুপ্রান্তরের জীব-জগতের বিচিত্রতার পরিচয় পাইয়াছে।

স্তন্যপায়ী জন্তুগুলির মধ্যে Desert Mule Deer, Peccaris, Jack Rabbit, Trade Rat, Kangaroo Rat, Prairie Dog, Antelope Squirrel, Ground Squirrel, American Badger, Spotted Skunk, Ring tailed Cat, Bob Cat, Mountain Lion ও Coyote অধিক প্রসিদ্ধ। Mountain Lion জাগুয়ার শ্রেণীর জন্তু আর Coyote নেকড়ে জাতীয়। সম্মুখে যাহা পড়ে তাহাই Coyote-দের খাদ্য। Skunkগুলি কাঠবিড়াল শ্রেণীর—ইহাদের লোমশ চর্মে বিচিত্র বর্ণের সমারোহ।

মরুপ্রান্তরের নানাপ্রকার পাখির মধ্যে বাজপাখি অধিক প্রসিদ্ধ। নানা বিচিত্র আকৃতির পেঁচা, Chapperal Cock নামক একপ্রকার মোরগ (ইহারা ঘণ্টায় ১৫-১৭ মাইল পর্যন্ত দৌড়ায়), নানা প্রকারের কাঠঠোকরা, তিতির জাতীয় পাখি, Wren নামক গায়ক পাখি ও Desert Phainopepla নামক পাখিও দেখা যায়। কয়েক প্রকারের কচ্ছপের সন্ধানও মিলে—ইহারা গর্ত খুঁড়িয়া উত্তপ্ত বালুকার তাপ হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া বাস করে—খাদ্য—উদ্ভিজ্জ।

মরুভূমির সাপ অনেক প্রকারের এবং ভয়ংকর তাহাদের আকৃতি। অত্যন্ত বিষাক্ত এই সাপগুলির খাদ্য সাধারণত ছোট ছোট পোকামাকড়। Rattle Snake-এর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহাদের সমস্ত শরীর বিচিত্রবর্ণের বোতাম-আকৃতি চর্মে আবৃত। বোতামগুলিতে আবার ছোট ছোট শিং-এর মত বৈচিত্র্য দেখা যায়। আর একটি অদ্ভুত সাপ Sidewinder। ইহারা যখন বালুকার উপর দিয়া চলে তখন পাশে দাগ রাখিয়া যায়। Sidewinder গুলি নিশাচর জীব—রাত্রিতে যে সব ছোট ছোট প্রাণী ঘুরিয়া বেড়ায় উহারাই এই সাপের খাদ্য। অন্যান্য অনেক সাপের মধ্যে Racers ও Burrowing Snake উল্লেখযোগ্য।

সরীসৃপ নানাপ্রকার ও বিচিত্র বর্ণের। Gila Monster, Horned Toad (শিংওয়ালা ব্যাং), Skinks, Nocturnal Gecko, Chuckwalla, Collared Lizard (গলবন্ধনীওয়ালা গিরগিটি), Spade Foot Toad, Giant Desert Toad ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধ।

পতঙ্গ ও পোকামাকড়ের সংখ্যাও অনেক। আকৃতিতে ছোট হইলেও ভয়াল ইহাদের প্রকৃতি। পরস্পরের সংগে ইহাদের হিংস্র ও রক্তাক্ত লড়াই দেখিবার জিনিস। ইহারা এত বিষাক্ত যে বড় বড়

...এমন কি সাপ পর্যন্ত ইহাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। মরুপ্রান্তরের পিঁপড়েও উল্লেখযোগ্য।

একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, মানব সভ্যতার উৎস হিসাবে মরুপ্রান্তরের অবদান অনেক। মিশর তথা সাহারা মরুভূমি—এশিয়ার গোবী মরুভূমি, মানবসভ্যতার বিকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

বর্তমানে পৃথিবীতে যে-হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে সেজন্য মানুষের বাস করিবার স্থান ও শস্য উৎপাদনের চাহিদাও ক্রমশই প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। স্বভাবতই আজ মানুষের দৃষ্টি মরুপ্রান্তরগুলির উপর যাইয়া পড়িতেছে। আজ ইহা পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, সুসম বৃষ্টিপাতের অভাব অর্থাৎ পর্যাপ্ত জলের অভাবেই মরুসৃষ্টি হয়। সুতরাং সেচ-ব্যবস্থা করিয়া মানুষ মরুভূমির বিস্তৃত বালুকারাশির যতটা সম্ভব উর্বর করা যায় তাহারই চেষ্টা করিতেছে। মরু সেচ-ব্যবস্থার কাজ আজকাল সাহারায় পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে—আর চলিতেছে আমেরিকার মরুভূমিগুলিতে। ইতিমধ্যেই এইসব স্থানের অনেকটা শস্যশ্যামল করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। মরুতে ভূমি সাধারণত জৈব লবণে সমৃদ্ধ—কাজেই শুধু পর্যাপ্ত পরিমাণ জল সরবরাহ করিতে পারিলেই ঐ ভূমি অনায়াসে উর্বর হইতে পারে।

❋ আপনার ওজন পরীক্ষা করুন ❋

হয় তো মনে করতে পারেন আমি একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করতে যাচ্ছি ওজন পরীক্ষা করবার কথা বলে। কিন্তু না, তা নয়, যে ভয় আপনি পাচ্ছেন অর্থাৎ মারাত্মক রকমের 'আণ্ডারওয়েট' হয়ে যাবেন—তা নাও হতে পারে। বিশেষ করে যদি আপনার বয়স চল্লিশের ওপর হয় তা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে না হোক অন্তত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে আপনি 'আণ্ডারওয়েট' তো ননই বরং হয় তো মারাত্মক রকম ওভারওয়েট।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই যখন উপযুক্ত খাদ্য পান না—যা তাঁর জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য এবং যা তাঁরা খেতে ভালোবাসেন—সে দেশে আবার মানুষ ওভারওয়েট হয় কি করে—এ প্রশ্ন মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, এক ছটাক চর্বিজাতীয় জিনিস, তা ঘি কিম্বা মাখন হোক কিম্বা তেল বা বনস্পতি বা ইলিশ কিম্বা ট্যাংরা জাতীয় মাছই হোক—কার পক্ষে যে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বা করতে পারে, তার কোন সাধারণ নিয়ম নেই। মেদবহুল কোনো লোকের পক্ষে এ খাদ্য একেবারেই অপ্রয়োজনীয়, কারণ তার সবটুকুই তার শরীরে জমা হয়ে তার শরীরের ক্ষতিকর অবস্থাটাকে আরো বিপন্ন করে তুলবে নিশ্চয়ই; আবার যার শরীরে মেদ খুবই কম, যেটুকু অবশ্যই থাকা উচিত ছিল সেটুকুও নেই। তার পক্ষে ঐ এক ছটাক চর্বি জাতীয় জিনিস যে মোটেই ক্ষতি করবে না (অবশ্য যদি সে হজম করতে পারে) তা তো খুবই সহজবোধ্য কথা।

এ বিষয়ে সব দেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণই একমত যে খুব বেশি পরিমাণ ওভারওয়েট হওয়া তো দূরের কথা, এমন কি অল্প একটু ওভারওয়েট হওয়ার চাইতেও অল্প একটু আণ্ডারওয়েট হওয়া ভালো—বিশেষত ব্যক্তির বয়েস যদি চল্লিশের বেশি হয়।

আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার জোরেই বলছি একবার ওজন পরীক্ষা করে দেখুন, দেখবেন হয় তো আপনিও 'ওভারওয়েট।'

পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই দেখা যায় ৩৫ কি ৪০-এর পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষদের চাইতে মেয়েরা সংখ্যায় বেশি 'ওভারওয়েট' হয়ে পড়েন। বলাই বাহুল্য এর একমাত্র কারণই হলো 'বেঠিক' রকমের খাদ্যগ্রহণ। অর্থাৎ কি না ২০০০ থেকে ২৫০০ 'ক্যালরী' এনার্জি সৃষ্টির জন্যে যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন হয় তার চাইতে বেশি পরিমাণ খেয়ে ফেলা। তার ফল দাঁড়ায় এই যে ঐ ২০০০—২৫০০ ক্যালরীর অতিরিক্ত এনার্জি আমাদের শারীরিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মজুত হয়ে যায়—এইভাবে একটু একটু করে কয়েক মাস বা কয়েক বছর মজুত হতে থাকলে যে কোন মানুষই ওভারওয়েট হয়ে পড়তে পারেন।

ওজন কমাতে হলে বা ওজন যাতে বাড়তে না পারে সেদিকে যদি লক্ষ্য রাখতে চান তা হলে সবার আগে আপনার রসনা সংযত করতে হবে—যেটা আমাদের অনেকের পক্ষেই খুব সহজ কাজ নয়।

অনেকে মনে করতে পারেন যে ওভারওয়েট হলে এমন ক্ষতি কি হয়। তার উত্তর হলো যে, ওভারওয়েট ব্যক্তি নিজেই নিজের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকেন প্রতিমুহূর্তে। এ ক্ষতিটা হয় অনেক রকমে। তবে সবচাইতে বেশি ক্ষতি হয় আমাদের হার্টের। একবার ভেবে দেখুন না ৫ কিলোর একটা থলি যদি আপনাকে ১০০ গজ বয়ে নিয়ে যেতে হয় তা হলে যেটুকু পরিশ্রম আপনার হবে, থলিটা যদি ৭ কিলোর হয় তা হলে পরিশ্রমটা আর একটু বেশি হবে—নয় কি? এও অনেকটা সেই রকমই বলা চলে। আপনার ওজন ১২৫ পাউণ্ড হলে আপনার হার্টের যেটুকু পরিশ্রম প্রত্যহ করতে হবে—১৪০ পাউণ্ড হলে তার চাইতে ঢের বেশি অবশ্যই করতে হবে। ফলে ক্রমশ আপনার হার্টের পরিশ্রমের ক্ষমতা কমে আসতে থাকবে।

কাজেই, আবার বলছি—আপনার ওজন পরীক্ষা করুন, ওভারওয়েট হলে রসনা সংযত করে, খাওয়া কমিয়ে ওজন কমান, আর ওজন ঠিক থাকলে ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করে এমন খাদ্য নির্বাচন করে নিন, যাতে ওজন বাড়তে না পারে।

কিন্তু যাঁদের ওজন কম? তাঁরা কি করবেন? যাঁদের ওজন খুবই কম তাঁরা তো অবশ্যই ওজন বাড়াবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু বয়স এবং উচ্চতা বিচারে ওজনটা যদি খুব সামান্য কিছু কম থাকে (বিশেষ করে চল্লিশের পরে) তা হলে কিছুই করবার দরকার নেই—অর্থাৎ কি না ওজন বাড়াবার দরকার নেই।

—নার্স মিত্র।

নিজের মতো চলুন

যাদের বয়স খুব কম তাদের কথা আলাদা। খাওয়া, পরা, চলা, কথা বলা, কথার মধ্যে আবার বিশেষ বিশেষ ভাষা প্রয়োগ করা এবং ভাবের আতিশয্য ঘটানো—ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কেই ছোটরা বড়দের কাছ থেকে শিখে থাকে। এই যে শেখা এটাকে শিক্ষা-মনোবিদ্‌গণ বলে থাকেন অনুকরণ করা। তাঁদের কাছে শিক্ষা মানেই অনুকরণ করা, কিন্তু দেখবেন ছোটরা যখন বড়দের অনুকরণের চেষ্টা করে কোনো বিষয়ে তখন খুব খারাপ লাগে না। তার কারণ প্রথমত অনুকরণ তারা খুব সুষ্ঠুভাবে করতে পারে না, তার মধ্যে থেকে যায় কিছু কিছু ত্রুটি যার ফলে একদিকে যেমন আমরা হাসির খোরাক পাই অন্যদিকে কিন্তু বাস্তবিকই একটা নতুন ধরণের সৃষ্টির কাজ চলতে থাকে—অর্থাৎ কি না অপটু অনুকরণের ফলে নতুন একটা সৃষ্টি হয়।

কিন্তু আমরা বড়রা যখন কিছু অনুকরণ করবার চেষ্টা করি তখন কি হয়? হাসির বদলে এবার প্রথমত আমাদের মনে দেখা দেয় বিরক্তি আর দ্বিতীয়ত সে ব্যক্তি নিজের ক্ষতি করলো সব চাইতে বেশি—একটা সৃষ্টির টুঁটি টিপে মারলো। সোজা কথায় বলতে গেলে এই দাঁড়ায়—

রামবাবু যদি রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করে কবিতা লিখতে চেষ্টা করেন, তা হলে কিছু প্রতিভা থাকলেও আমরা বড়জোর একজন তৃতীয় শ্রেণীর রবীন্দ্রনাথ পেতে পারি—কিন্তু রামবাবু যদি তাঁর নিজস্ব ধারায় কাব্যচর্চা করে চলেন তা হলে তাঁর প্রতিভার ছিটেফোঁটা না থাকলেও আমরা যা পাবো তা রামবাবুর নিজস্ব সৃষ্টি তার প্রতিছত্রে রামবাবুর প্রকৃতিই উঁকি-ঝুঁকি মারবে—কাব্য হিসেবে ব্যর্থ হলেও তার মধ্যে এমন কিছু অবশ্যই থাকবে যার ফলে রামবাবুকে আমরা স্মরণ করবো।

কাব্যচর্চার বেলায় যে রকম জীবনের অন্য যে কোনো প্রসঙ্গেও ঠিক সেই রকমই। প্রত্যেকে যদি আমরা নিজের মতো চলি নিজের স্বাভাবিকতা বজায় রাখবার চেষ্টা করি (অর্থাৎ সজ্ঞানে অপরকে অনুকরণ করবার চেষ্টা না করি) তা হলে আমরা প্রত্যেকেই জীবনের সমস্ত দিকেই নিজস্ব কিছু সৃষ্টি করতে পারি।

প্রসঙ্গত একটা গল্প মনে পড়ে গেলো—

একবার এক জলসায় এক থিয়েটারের মালিক উপস্থিত ছিলেন। একটি সুন্দরী তরুণী গান সুরু করলো। অপূর্ব তার চেহারা, চমৎকার গলা। কিন্তু তবু একটা জিনিস প্রতিমুহূর্তেই বাদ সাধতে লাগলো। তার ওপরের পাটির কয়েকটি দাঁত ছিল একটু উঁচু। ফলে গান গাইবার সময় মাঝে মাঝে তার ঐ দাঁত লোকে যদি দেখে ফেলে এই আশঙ্কায় কখনো বেসুরোভাবে তার গলা কাঁপছিল, কখনো বা সে ঘামতে সুরু করছিল, কখনো বা তার স্বর একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তার ফলটা কি হয়েছিল সহজেই অনুমান করতে পারবেন। টিটকারী থেকে ঢিল, ঢিল থেকে পাটকেল, পাটকেল থেকে জু······ যাক গে সে সব অবাঞ্ছিত কথা।

তারপর কি হলো বলি শুনুন। থিয়েটারের মালিক ভদ্রলোক দেখা করলেন মেয়েটির সঙ্গে, সে তখন নাকের জলে চোখের জলে। নিজের অভিজ্ঞতা এবং যুক্তি দিয়ে বোঝালেন তোমার যে দাঁত আছে সে কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়ে গান গাইতে চেষ্টা করো।

শুনলে আশ্চর্য হবেন। সেই একই জায়গায় ঠিক এক বছর পরে অনুষ্ঠিত এক জলসায় সেই একই মেয়ে হাজার হাজার শ্রোতার সপ্রশংস হাততালি পেয়েছে। বুঝতেই পারছেন—প্রথমবার যখন সে দাঁত লুকিয়ে গান গাইবার চেষ্টা করেছিলো তখন শ্রোতারা গান কেউই শোনে নি সবাই দাঁত দেখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এবার যখন সে নিঃসঙ্কোচে দাঁত দেখাতে আরম্ভ করলো তখন আর দাঁত কেউ দেখে নি—শুধু গানই শুনেছিলো।

—শ্রীরসিক

বর্তমানে ভেষজের মধ্যে যেগুলি অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়, অ্যান্টিকোগালনাট নামীয় ওষুধটি তারই অন্যতম।

এই ওষুধ রক্তসঞ্চালনের কাজে সহায়তা করে থাকে, সকলেই জানেন যে শরীরে রক্তসঞ্চালনের কাজ ব্যাহত হলেই 'থ্রম্বসিস্' নামক ব্যাধির আক্রমণ ঘটে থাকে এবং তার পরিণামও সময় সময় অতি ভয়াবহ।

আলোচ্য ভেষজটি প্রয়োগ করে চিকিৎসকগণ অনেক সময়ই এ-সব কেস-এ সুফল লাভ করেছেন

'এই ওষুধের প্রভাবে রক্তবাহী শিরাগুলি কার্যকরী অবস্থায় থাকে, চলাচল করার সময় রক্তকণিকাগুলি দানা বাঁধতে পারে না যার ফলে দেহমধ্যস্থিত এক গুরুতর প্রয়োজনীয় অংশ হার্ট বা হৃৎপিণ্ডে রক্তসঞ্চালন হয় স্বাভাবিক রীতিতে—যার ব্যত্যয়ে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু ঘটার আশঙ্কা থাকে।

হৃৎপিণ্ডের মতই ব্রেন ও শরীরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় যে-কোন অংশেই থ্রম্বসিসের আক্রমণ ঘটতে দেখা যাচ্ছে ক্রমেই বর্ধিত মাত্রায় এবং সেজন্যই এই ধরণের ভেষজের গুরুত্ব ও চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

কিন্তু এই সব ওষুধ ব্যবহারেও যথোচিত সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ তা না হলে নানা জটিল উপসর্গের আবির্ভাব হয় রোগীর দেহে।

অ্যান্টিকোগালনাট জাতীয় কোন ভেষজ ব্যবহার করার সময়

রোগীর রক্ত পরীক্ষা করা দরকার বার-বার, যাতে ওই ওষুধের প্রতিক্রিয়া দেহে ঠিকমত হচ্ছে কি না তা বোঝা যায়।

এ ধরণের ওষুধের অতিপ্রয়োগে রোগীর দেহে রক্তসঞ্চালনের বেগ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেতে পারে এবং তা থেকে হিমোফিলিয়া জাতীয় ব্যাধিতেও আক্রান্ত হতে পারে রোগী।

হিমোফিলিয়া-আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের কোন জায়গায় সামান্য আঘাত লাগলেও রক্তপাত ঘটে থাকে প্রবল মাত্রায়, আর তা বন্ধ করাও নিরতিশয় কঠিন।

অবশ্য বর্তমানে চিকিৎসকগণ এক বিশেষ ধরণের ওষুধ ইনজেক্ট করে হিমোফিলিয়ার রোগীর রক্তপাতও নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, কিন্তু অ্যান্টিকোগালনাট জাতীয় ভেষজের ব্যবহারকারী রোগীর ক্ষেত্রে হিমোফিলিয়ার আবির্ভাব ঘটলে সে ব্যবস্থাও অচল।

অবশ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে একমত নন, কারুর কারুর মতে হিমোফিলিয়া রোগে কোন অবস্থাতেই অ্যান্টিকোগালনাট জাতীয় কোন ওষুধের প্রয়োগ অসম্ভব, আবার কেউ কেউ বলেন, ক্ষেত্র বিশেষে তা একেবারে অসম্ভব নয়।

শেষোক্ত মতের পরিপোষকে বলা যায় যে, কিছু কিছু অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেও রোগীকে এই জাতীয় ভেষজ ব্যবহার করানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘটেছে সম্প্রতি এবং তাতে কোন কুফলও দেখা দেয় নি।

বর্তমানে অত্যধিক রক্তপাত বন্ধ করার নানা উপায় আয়ত্তাধীন থাকার জন্যই অবশ্য আধুনিক শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে এ ধরণের পরীক্ষা করে দেখতে সাহসী হয়েছেন চিকিৎসকবৃন্দ, নইলে এতে আশঙ্কা তো কম ছিল না।

সে যাই হোক হিমোফিলিয়ার রোগীকে অ্যান্টিকোগালনাট জাতীয় ভেষজ দেওয়ায় বিপদের ঝুঁকি থাকে সব সময়ই, তবে তার মাত্রা কখনও বেশি কখনও কম এবং সেজন্যই থ্রম্বসিসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করার সময় চিকিৎসকরা রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকেন।

অ্যান্টিকোগালনাট ব্যবহারকারী রোগীর পক্ষে বহু ওষুধই কুফল প্রদায়ক; অ্যাস্পিরিন যা নাকি শিরঃপীড়ার পক্ষে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য এক অতি সাধারণ ওষুধ, তাও ব্যবহার করা নিরাপদ নয়, অ্যান্টিকোগালনাট জাতীয় ভেষজ ব্যবহারকারী কোন ব্যক্তির পক্ষে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ওই দু'টি ভেষজ নাকি পরস্পর বিরোধী।

থ্রম্বসিস্ রোগের ক্রমবর্ধমান আক্রমণ ক্রমশই গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করছে, চিকিৎসকদের মতে গ্রামের চেয়ে শহর অঞ্চলেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি, অ্যান্টিকোগালনাট জাতীয় ওষুধ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে, পরিমিত পানাহার ও নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যায়ামও নাকি এ রোগ নিরাময়ের পক্ষে কম সুফলদায়ক নয়, বস্তুত চিকিৎসকরা তো শেষের দু'টি অভ্যাসের ওপরই বিশেষভাবেই জোর দিচ্ছেন আজকাল, তাঁরা বলেন, পরিমিত পানাহার ও নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে স্বভাবতই মানুষের শরীরে রক্ত চলাচল থাকে অব্যাহত, যার ফলে রক্তকণিকাগুলি ক্লট বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না বললেই হয় এবং থ্রম্বসিসের আক্রমণ-আশঙ্কাও দূর হয়ে যায় বহুলাংশে।

থ্রম্বসিস রোগীর পক্ষে তাই অ্যান্টিকোগালনাট জাতীয় ভেষজ যতটা প্রয়োজনীয়, নিয়মিত ব্যায়াম, পরিমিত পানাহার, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অর্থাৎ এককথায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করার পদ্ধতিও ততটাই আবশ্যকীয়। —শ্রীমতী

এখন স্মৃতি

শক্তি মুখোপাধ্যায়

অনেক বিশ্বাস নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই
মনের বিমুগ্ধতা জ্বলে-পুড়ে ছাই হবে জেনে
স্মৃতি এখন কপট অভিনয়ের গুণে
শান্ত হয়েছে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে
অদ্বিতীয় সভ্যতার উপকরণগুলি
যেন সে সংগ্রহ করেছে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে।
এবং সে বাঘ-নখ দিয়ে
রক্তাক্ত করেছে তার বিপক্ষের শক্তিশালী ঘাঁটি।

স্মৃতি এখন কপট অভিনয়ের গুণে
শান্ত হয়েছে। তাই সাদা চোখ নিয়ে
কোন-কিছু দেখবে না; দেখলেও মুখোশে ঢেকে
হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সুস্থ রেখেছে
যেন মনের পিছনে একটা বেহিসেবী কাজ
অজ্ঞতার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ওপরে•••।

স্মৃতি এখন কপট অভিনয়ের গুণে
শান্ত হয়েছে।

কোনো অকালমৃতাকে

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস

আজকে আবার মনে পড়ে সেই হারানো ক্ষণ
আকাশে-বাতাসে খুঁজে ফেরে তাই আমার মন।
হে কিশোর রক্তিম তুমি কি চঞ্চল
ছেড়ে গেলে তবু পৃথিবীর এই স্নেহাঞ্চল।

তুমি নেই তবু রয়েছে তোমার স্বপ্ন-সাধ
শান্তি-কপোত বয়ে আনে কত সুসংবাদ।
ডানায় ডানায় ফেটে পড়ে তার কি উচ্ছ্বাস
আজকে আমার নেই কো মনের হতাশ্বাস।

বোবাকান্নার এই দেশে কত সজাগ-চোখ
কেঁপে ওঠে দেখো শত্রুর ঐ দন্ত-নখ।
যদিও এখনও উড়ছে আকাশে শকুন-চিল
তবু উদ্ধত প্রতিরোধে কত জঙ্গী দিল।

এখনও মিছিলে খুঁজে ফিরি আমি তোমার মুখ
তোমাকে না পাই তোমার মতই দীপ্ত বুক।
যৌবন রাগে উচ্ছল আজ কি উদ্দাম
ভরে ওঠে মন পূর্ণ হবেই মনস্কাম।

ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি

স্নুরেশচন্দ্র নন্দী

রাজসূয় যজ্ঞসভায় চেদীরাজ শিশুপাল সমবেত রাজন্যবৃন্দের সম্মুখে পাণ্ডবগণ, ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তীব্র কটূক্তি করেন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শিশুপালের ঘৃণ্য কটূক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া মহামতি ভীষ্মদেব যে প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার পরম প্রীতি—পূজ্য বুদ্ধির—ঈশ্বর জ্ঞানের পরিচায়ক।

যজ্ঞসভায় সমবেত রাজন্যবৃন্দের সম্মুখে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বংশ-মর্যাদা, অতুলনীয় ব্যবহার, বিদ্যাবুদ্ধি, শৌর্যের প্রভৃত প্রশংসা করিয়া সর্বশেষে বলেন, শ্রীকৃষ্ণই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা। তিনি অব্যয়, সনাতন কর্তা এবং সর্বভূতের ঈশ্বর। শিশুপাল বালক, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা, গুণ, স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান বলিয়া বালকোচিত উক্তিই করিয়াছেন।—

কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চ অব্যয়।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম॥
অযস্তা পুরুষো বালঃ শিশুপাল ন বুধ্যতে।
সর্বত্র সর্বদা কৃষ্ণং তস্মাদেব প্রভবতি॥

—মহাভারত—সভাপর্ব।

মহাপ্রাজ্ঞ প্রীতিমান ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণে পূজ্যবুদ্ধি—ভগবদাকারা মনোবৃত্তি ছিল বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান ও অব্যয় বলিয়া হৃদয়ের প্রীতি-ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার রতি ছিল বলিয়াই নিজ উপলব্ধিগত জ্ঞানদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আরও বুঝিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণই অখিল দেহীর আত্মার প্রিয় আত্মা। জগতের হিতের নিমিত্ত মায়াদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে দেহীর ন্যায় অবতীর্ণ।

গোস্বামীপ্রবর সুত বলিয়াছেন, যে পূজ্যবুদ্ধি হইতে অধোক্ষজের শ্রীচরণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা প্রীতি জন্মে তাহাই মানবের পরম ধর্ম। এই প্রীতি-ভক্তির দ্বারাই মানবচিত্ত প্রশান্ত ও সুখী হয়।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে
অহৈতুক্য প্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

—ভাগবত ১।২ ৬

ধর্মরাজ যম বলিয়াছেন, পবিত্র অন্তঃকরণে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদনই শ্রদ্ধাবিহিত পরম ধর্ম।

মানবের শ্রেষ্ঠধর্ম ভক্তিধর্মের কথা সুত গোস্বামী এবং ধর্মরাজ শাস্ত্রবিহিত যে ধর্মের কথা বলিয়াছেন, উভয়ই তুল্যগুণাত্মক। উভয় ভক্তির সার কথা—শ্রীভগবানের শ্রীচরণোদ্দেশে প্রীতি-ভক্তি অর্পণই মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম। মতিমান ভীষ্মদেবের শাস্ত্রবিহিত ভক্তি ধর্মে যে তাঁহার মতি ছিল—তিনি এই ধর্ম পালন করিতেন, তাহা তাঁহার ভক্তিনম্র ও প্রীতি রসসিক্ত হৃদয় সমুত্থিত স্তবেই সুপ্রকাশ। এই জন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অব্যয়, সনাতন কর্তা সকল ভূতের ঈশ্বর বলিয়া প্রীতি-ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

যস্মিন্ বিশ্বানি ভূতানি তিষ্ঠন্তি চ বিশন্তি।
গুণভূতানি ভূদেশে সূত্রে মণিগণা ইব॥
যস্মিন্নিত্যেততে তন্তৌ দৃঢ়স্রগিব তিষ্ঠতি।
সদ্ সদ্ গ্রথিতং বিশ্বং বিশ্বাঙ্গে বিশ্বকর্মণি॥
হরিং সহস্রশিরসং সহস্রচরণেক্ষণম্।
সহস্র বাহু মুকুটং সহস্র বদনোজ্জ্বলম্॥
অতিবাযিন্দ্র কর্মানমতি সূর্যতিতেজসম।
অতি বুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মানং তং প্রপদ্যে প্রজাপতিম্॥
পুরাণে পুরুষং প্রোক্তং ব্রহ্ম প্রোক্তং যুগাদিষু।
ক্ষয়ে সঙ্কর্ষণং প্রোক্তং তমুপাস্যমুপাস্মহে॥
যস্মিন্ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বঃ সর্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

—মহাভারত

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান বলিয়াই শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে কটূক্তি করিয়াছেন। ইহা লীলাময়ের লীলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কারণেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের অব্যয়ত্ব, ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

লীলাময়ের বিচিত্র লীলা উপলব্ধি করিয়া ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, হে ভগবান! তোমার কর্ম, তোমার লীলা কি বিচিত্র! যদিও তুমি আত্মারূপে সর্বজীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ। সকলেরই প্রতি তোমার সমদৃষ্টি—স্নেহ, মমতা আছে। তথাপি তুমি একদেশদর্শী কেন না তুমি এমনই চতুর যে, তোমার যোগমায়ার দ্বারা সমস্ত জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ। তুমি একমাত্র তোমার ভক্তের প্রতি এমনই স্নেহশীল যে, তুমি বাঞ্ছাকল্পতরুরূপে তাহাদের কামনা, বাসনা ও প্রার্থনা পূর্ণ কর। —ভাগবত ৭।২৭।৮

প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হে ভূমন! হে ভগবান! হে পরাত্মন! হে যোগেশ্বর! আপনি ত্রিলোক মধ্যে কোন স্থানে কি ভাবে, কত লীলা প্রকাশ করেন, তাহাকে তাহা কে বলিতে পারে? আপনি যোগমায়ার দ্বারা নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন।

কো বেত্তিভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কথং বাকতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥

—ভাগবত ১০।১৪।২০

প্রহ্লাদের উক্তি ইহাই বুঝাইতেছে, যে সকল ভক্ত ভগবানের উদ্দেশে প্রীতি-ভক্তি অর্পণ করে, শ্রীভগবান তাহাদের অনন্য ভক্তিতে প্রীত হইয়া কল্পতরুরূপে সেই সকল ভক্তের কামনা পূর্ণ করেন।

সুতরাং প্রীতি-ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানের অনুগ্রহলাভের একমাত্র উপায়। হতভাগ্য শিশুপাল শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত ছিলেন, সেই কারণেই মোহান্ধ হইয়া শ্রীভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে কটূক্তি করিয়াছেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সর্বদা শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত শ্রীভগবানের পবিত্র লীলামহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করেন, শ্রীহরি স্বয়ং অনতিবিলম্বে সেই মানবের—ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হন।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতং।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

—ভাগবত ২।৮।৩

শিশুপাল অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন বলিয়া শ্রীভগবানে তাঁহার প্রীতি-ভক্তি ছিল না। এই কারণেই তিনি শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কটূক্তি করিয়াছেন।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যখন মানব কাষ্ঠের মধ্যে সদা-অবস্থিত অগ্নির ন্যায় জীবজন্তে সর্বভূতে আমি—ভগবৎসত্তা বিদ্যমান উপলব্ধি করে তখনই সেই মানব পাপহীন ও মোহমুক্ত হয়।

সদা তু সর্বভূতেষু দারুষ্বগ্নিমিব স্থিতম্।
প্রতিচক্ষীত মাং লোক জহ্যাত্তর্হ্যেব কশ্মলম্।

—ভাগবত ৩।১।৩১

প্রীতি-ভক্তি দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ না হইলে ভগবদাকারা মনোবৃত্তি সর্বভূতে ঈশ্বরবুদ্ধির উদয় হয় না, এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না শিশুপাল মোহপ্রভাবেই সর্বভূতেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারেন নাই। সেই কারণেই তিনি শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ব্যতীত আর কিছুই নহে, বলিয়াই মনে করি। শ্রীভগবানের এই মোহাত্মিকা লীলার কথা স্মরণ করিয়াই মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মদেব মন ও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত মোহপ্রদানকারী শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—

যো মোহয়তি ভূতানি স্নেহপাশানুবন্ধনৈঃ।
সর্গস্য রক্ষণার্থায় তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ॥

—মহাভারত

মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মদেবের শ্রীভগবানে প্রীতি, ভক্তি ও রতি ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহাকে শ্রীভগবান জ্ঞানে তাঁহার স্তব করিয়াছেন।

ভক্তবর প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, যে সমস্ত মানবের অন্তঃকরণ জাগতিক অনিত্য সুখে পূর্ণ, তাহাদের অন্তঃকরণ কখনও শ্রীবিষ্ণুর চরণে অবনমিত হয় না। অন্যের ইচ্ছা, উপদেশ তাহাদিগকে শ্রীবিষ্ণুর চরণমুখী করিতে পারে না। এই সমস্ত দুর্ভাগাই নরকাগ্নিতে প্রজ্বলিত হয়। কারণ অনিত্য সুখভোগে মজিয়া তাহারা ঈশ্বরবিমুখ, গোবৃন্দের মত তাহারা গতানুগতিকভাবে রোমন্থন করিয়া দিনযাপন করে। তাহারা জানে না শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র গতি—পরম কল্যাণবস্তু। তাহাদের অন্তঃকরণ কুচিন্তা, কুকর্মে পূর্ণ থাকে। জাগতিক কর্মকেই তাহারা শ্রেষ্ঠকর্ম বলিয়াই জ্ঞান করে। অন্ধের মত তাহারা বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুসরণ—অনুষ্ঠান করে। —ভাগবত ৭।৫।৩০—৩১

প্রহ্লাদ বর্ণিত ঈশ্বরবিমুখ মানবের অবস্থা শিশুপালের ছিল, এই জন্যই তিনি নিত্যবস্তু বিস্মৃত হইয়া অনিত্যে মজিয়া ছিলেন। শ্রীভগবানের করুণা হইতে বঞ্চিত ও মোহাচ্ছন্ন ছিলেন বলিয়া শ্রীভগবানকে কটূক্তি সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—ত্রিকালেই আমি আছি; সকল জীবের অবস্থার কথাও পরিজ্ঞাত আছি। আমি মায়ার আশ্রয়। আমি মায়াতীত বলিয়া মায়া আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু আমার মায়ার দ্বারা জীবসকল এরূপ আচ্ছন্ন যে, তাহারা আমার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। এইজন্যই আমার শ্রবণ করে না, আমার ভজনা করে না। আমাকে ঈশ্বর বলিয়া জান বা উপলব্ধি করিতে পারে না।

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যানি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥

—গীতা ৭।২৬

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, আমি অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিলাস যুক্তি স্বরূপ অঘটন ঘটনা পটীয়সী মায়াসমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ নাই। মোহমুগ্ধ মানব আমাকে অজও অব্যয় বলিয়া অবগত হইতে পারে না। আর হে অর্জুন! আমি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালস্থিত স্থাবর জঙ্গম ভূতসকল জানি, কিন্তু আমাকে কেহই জানে না। —গীতা ৭।২৫—২৬

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, ত্রিগুণময়ী অলৌকিকী আমার মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা তথাপি যাহারা অব্যভিচারী ভক্তিতে আমাকেই ভজনা করে তাহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করে।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

—গীতা ৭।১৪

ভক্ত ও সখা অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া নিখিল জীবের হিতার্থে শ্রীভগবান এই কথাই বুঝাইয়াছেন যে, তিনি লীলাময়, কৃপাময়। নিখিল বিশ্বের জীবকে কৃপা করিবার জন্যই দেহধারণ করিয়া সাধারণ দেহীর মত মর্ত্যধামে অবতীর্ণ। তিনি এই বলিয়াই বলিয়াছেন, আমি সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ। আমি অজ ও নিত্য হইয়াও লোকানুগ্রহার্থ মায়াকল্পিত দেহ ধারণ করিয়া বেদবিহিত ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করি। আমার জন্ম, কর্ম ও মরণ সমস্তই অলৌকিক।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। —গীতা ৪।৬
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। —গীতা ৪।৯

ইচ্ছাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছা সকল মনুষ্যই শাস্ত্রালোচনা দ্বারা সর্বসংসার মুক্ত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার প্রীতিকামনায় অনন্যচিত্ত তাঁহাতে যেন প্রীতি-ভক্তি অর্পণ করে, তাহা হইলেই তিনি প্রীত হইবেন। সংসারতাপদগ্ধ মানব তাঁহার অনুগ্রহ অহৈতুকী প্রীতিলাভ করিয়া প্রীতিধন্য হউক।

ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান আত্মোপলব্ধিজাত জ্ঞান দ্বারা লীলাময়ের লীলারহস্য অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, তুমি দেব কিম্বা দৈত্যই হও অথবা মানব বা মানবেতর হও অনন্যচিত্তে শ্রীভগবানে রামচন্দ্রে ভজনা কর। তিনিই শ্রীহরি—দেহীরূপে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ। তিনি সেই শ্রীহরি—যিনি অযোধ্যাবাসীকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। —ভাগবত ৫।১৯।৮

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, দান, যজ্ঞ, ব্রত, ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রীবিষ্ণু প্রীত হন না। তিনি একমাত্র অনন্যা প্রীতি-ভক্তি দ্বারাই প্রীত হন। পরম প্রীতিময়ী ভক্তি ব্যতীত সমস্তই বৃথা।

—ভাগবত ৭.৭।৫২।

পুনশ্চ তিনিই বলিয়াছেন, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, জ্ঞান, বিদ্যা, শক্তি, মান, যশ, যোগানন্দ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শক্তি দ্বারা শ্রীহরি প্রীত হন না। গজেন্দ্রের মত একমাত্র অনন্যাভক্তি দ্বারাই প্রীত হন।

আচার্য শ্রীমৎ শঙ্কর বলিয়াছেন, যিনি জ্ঞানী তিনিই গুণ ও দোষ, নিত্য-অনিত্য অর্থাৎ পরা-অপরা তাবদ্বিষয়ে জ্ঞানী, তিনিই সকল প্রকার ভোগ্যবস্তুতে নিস্পৃহ, তিনিই মুক্তিকাম ও অধ্যবসায় সহকারে কর্তব্যকর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত ধর্মপালন করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রবিদ্‌গুণ দোষজ্ঞো ভোগ্যমাত্রে বিনিস্পৃহঃ।
নিত্যানিত্য পদার্থ জ্ঞা মুক্তিকামো দৃঢ়ব্রতঃ।

—সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সার সংগ্রহ

দুর্ভাগা শিশুপাল শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি-ভক্তিশূন্য ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে ঘৃণ্য কটুক্তি সম্ভব হইয়াছে।

নৈয়ায়িকাচার্য গৌতম বলিয়াছেন—

আরাধ্যত্বেন জ্ঞানং ভক্তিঃ।

আরাধ্যত্মক জ্ঞানের নাম ভক্তি। অর্থাৎ কাহারও প্রতি গৌরব প্রীতিসূচক ক্রিয়া বিশেষের নামই আরাধনা অর্থাৎ ঈশ্বরকে পূজ্য বলিয়া জ্ঞান করার নামই ভক্তি।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যাহারা সর্বদা আমাকে পুরুষোত্তম জ্ঞান করিয়া আমাতে নিত্যযুক্ত, একমাত্র আমার প্রতিই ভক্তিমান, সেই সকল জ্ঞানী-ভক্তই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর যেমন প্রিয়—জ্ঞানীও তেমনি আমার প্রিয়। শ্রদ্ধাসম্পন্ন মৎপরায়ণ ভক্তগণ আমার প্রিয়—

তেষাং জ্ঞানি নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।

—গীতা ৭ ১৭

শ্রদ্ধাবামা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ

—গীতা ১২।২০

প্রীতিরসপূর্ণা ভক্তিপ্রিয় শ্রীমাধব ভক্তের নিকট প্রীতি-ভক্তিই কামনা করেন। যে সকল ভক্ত প্রীতির সহিত তাঁহাকে প্রীতি অর্পণ করেন, তাঁহারাই তাঁহার প্রিয়। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা উদ্ধবকে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! যোগশাস্ত্রোক্ত ধ্যান ধারণা সমাধি চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগক্রিয়া অর্থাৎ জ্ঞানযোগ, সাংখ্যযোগ যজ্ঞাদি শাস্ত্র-বিহিত নানা সৎকর্মানুষ্ঠান দ্বারা কর্মযোগ। মহর্ষি কপিল নিজ জননী দেবাহুতিকে বলিয়াছেন, অয়ি জননী। সাধুভক্তগণ আমার প্রসন্ন বদন ও প্রেমপূর্ণ নয়নসমন্বিত নয়নাভিরাম বরপ্রদ দিব্য কলেবর দর্শন করিয়া আমার সহিত তাহাদের অন্তরের কথা বলিয়া পরমাপ্রীতি লাভ করিয়া থাকে—

পশ্যন্তিতে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তি।

— ভাগবত ৩.২৫ ৩৫

পূজনীয় জ্ঞান করিয়া অবাধ্যের প্রীতি কামনার যে প্রীতি অর্পিত হয় উহাই ভক্তি। এই প্রীতিই পরম প্রীতি—ভগবদ-প্রীতি উহারই নামান্তর ভক্তি। এই প্রীতি ভক্তির অনুসারিণী। পদ্মপুরাণ বলেন, পূজ্যবুদ্ধি বা আরাধ্যাত্মিকা বুদ্ধিই ভক্তি। উহা প্রীতিরসপূর্ণা।

পরমাপ্রীতি—ভগবদ-প্রীতির উদয় হইলে ভক্ত-হৃদয় দুই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভক্তিশাস্ত্রে যথাক্রমে উহাদের নাম—

১। সংস্ক্রিয়া বিবেশ।

২। অভিমান বিবেশ।

প্রথমটি ভক্তহৃদয় সর্ব সংস্কারমুক্ত করিয়া ভক্তকে উন্নততর ভক্তিসাধনে সিদ্ধ করে। ভক্তিসাধন সিদ্ধ হইলেই ভক্ত নির্মল, সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বভূতে প্রীতিমান হয়।

কবি বলিয়াছেন, যাহারা অচ্যুতের পদ ধ্যান করে, নিত্য তাঁহাকে স্মরণ করে, তাহারাই ভক্তি-বৈরাগ্য এবং দিব্যজ্ঞান লাভ করে এই ভাবেই তাহারা পরমা শান্তি লাভ করিয়া প্রসন্নচিত্ত হয়।

—ভাগবত ১১।২।৪৩

গোস্বামীপ্রবর সূতও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন, শ্রীভগবান বাসুদেব প্রয়োজিত ভক্তিযোগে—

বিষয়-বৈরাগ্য, অহৈতুক দিব্যজ্ঞান উৎপন্ন করে।

—ভাগবত ১।২ ৭

মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মদেব সর্ববিষয় সংস্কারমুক্ত হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত ছিলেন। সেই কারণেই তাঁহার শ্রীভগবানে প্রীতি ছিল। সেই কারণেই তিনি শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে শিশুপাল পরাজ্ঞানভক্তি-প্রীতিশূন্য ছিলেন বলিয়া অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভীষ্মদেবের অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই।—এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই ভক্ত যেমন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তেমনি উহার দ্বারাই ভক্তিলাভ করেন।

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, ভক্তিলাভ করিয়া মানব ঈশ্বরসিদ্ধিলাভ করে। অমৃত ও তৃপ্তিলাভ করে। শুধু ইহাই নহে, ভক্তিলাভ করিলে মানুষ অনিত্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষারহিত, শোকতাপশূন্য, অহিংস, অনিত্যবস্তুতে যেমন অনুরক্ত, তেমনি তদ্বিষয়ে অনুৎসাহী হয়। ভক্তি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলে মানব উন্মত্ত, স্তব্ধ, আপনাকে আপনি মাতিয়া পরমানন্দে বিভোর হয়।

ওঁ যল্লব্ধা পুমান, সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি।

—ভক্তিসূত্রম্ ১ম অনু, ৪ শ্লোক।

ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ বঞ্ছতি, ন শোচতি ন দ্বেষ্টি, ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।

—ঐ ১ম অনু, ৫ শ্লোক।

ওঁ যজ্জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবত্যাত্মা রামো ভবতি।

—ঐ ১ম অনু ৬ শ্লোক।

পরমভাগবত ভাষ্যকার আচার্য স্বামী শ্রীধর বলেন, পরমা প্রীতি-ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মলাভ হয়।

কৃষ্ণভক্তৈব যত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানম্ প্রপ্যতে।

—গীতাভাষ্য

কারণ প্রীতি-ভক্তি স্পর্শমণি, উহা যাহা স্পর্শ করে তাহাকেই রূপান্তরিত করে—সুবর্ণ করে।

ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি

শ্রীভগবান স্বয়ং প্রিয়সখা উদ্ধবকে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন স্পর্শমাত্র কাষ্ঠসমূহ দগ্ধ করিয়া ভস্ম করে, সেইরূপ আমাতে অনন্যা একাগ্রা ভক্তি সঞ্চারিত হইলেই মানবের পাপরাশি নিঃশেষ করে।

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথামদ্বিষয়া ভক্তি রুদ্ধ বৈনাংসি কৃৎস্নশঃ।

—ভাগবত ১১।১৪।১৮

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে ভক্তের এই অবস্থার কথা প্রিয়সখা অর্জুনকে যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহার মর্মকথা এইরূপ, যিনি সর্বাতীত হইয়াও সমস্ত ভূতজগতকে আপন অন্তরে সত্তার মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছেন সেই পরমপুরুষ একমাত্র ভক্তি দ্বারাই লভ্য— অন্য কিছুতেই নহে।২২

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মানব যখন ব্রহ্মময় হয়, তখন দেহাভিমানশূন্য হইয়া প্রসন্নচিত্ত হয়। বিনষ্ট বস্তুর জন্য আর শোকগ্রস্ত হয় না। তাহার পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষাও অন্তরে স্থান দেয় না। তখন জীব নির্মলচিত্ত এবং সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই মনুষ্য আমার প্রীতি-কামনায় আমাকে প্রীতি-ভক্তি নিবেদন করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৫৪

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্।।

—গীতা ৮।২২

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।

—গীতা ১৮।৫৪

পুরাণ শাস্ত্রেও ভক্তের এই অবস্থার কথা বর্ণিত আছে। সুতগোস্বামী বলিয়াছেন, শ্রীহরির এমনি দয়াগুণ যে, সমস্ত মুনি আত্মারাম, যাঁহাদিগের অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে—মোহমুক্ত হইয়াছে তাহারাই শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করে।—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।

—ভাগবত ১।৭।১০

ভক্ত নানক শিখভক্তিগ্রন্থে ভক্তের এই মানসিক অবস্থার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

স্থির—স্থির—চিত্ত স্থির হইল।
বন এবং গৃহ সমান হইয়া গিয়াছে।
আমার অন্তরে সেই প্রিয় বিরাজমান।
বাহিরেও আমি তাঁহাকেই অনেক আকারেই দেখিতেছি।
আমি রাজযোগ অবলম্বন করিয়াছি।
নানক বলিতেছেন, হে সখী, আমি সংসারে
আছি, কিন্তু সংসারের নহি।
থির থির, চিত থির হী।
বন গৃহ সমসরি হী।
অন্তর এক পিব হী।
বাহর অনেক ধরি হী।
কহু নানক লোগ অলোগিরি সখী।

'সুখমনি'—জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত। পৃষ্ঠ ।৶০

স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পরম ভাগবত গোস্বামীপ্রবর সুত এবং ভক্ত নানক ভক্তিলাভের পর ভক্তের যে অবস্থার কথা বলিয়াছেন, মহাজ্ঞানী ভীষ্মদেব সর্বসংস্কারমুক্ত হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই, শ্রীভগবানের উদ্দেশে নতি জানাইয়া প্রণাম করিয়াছেন।—

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।

শিশুপাল সংস্কার, অবিদ্যা গ্রন্থিমুক্ত ছিলেন না, সেই কারণেই শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-ভক্তিলাভে বঞ্চিত ছিলেন। এই কারণেই তিনি শ্রীভগবানের উদ্দেশে কটুভাষণ তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে।

ভক্তিলাভে ধন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা আদিপুরুষ গোবিন্দের স্তবে বলিয়াছেন—আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। যে সমস্ত ভক্ত আদিপুরুষ গোবিন্দকে ক্রোধাদি যে কোন ভাব অবলম্বনপূর্বক চিন্তা করিয়াছেন, তাহারা তাঁহার তাদৃশ তনুই প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ভক্তগণ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোধভাব, কামভাব, সখ্যভাব, ভীতিভাব, বাৎসল্যভাব, মোহভাব, গুরুজনের প্রতি গৌরবভাব এবং সেব্যভাব,—যে কোন ভাবে চিন্তা করেন, ভক্তাধীন ভগবান সেই সমস্ত ভক্তকে তাহাদিগের ভাবানুসারে স্বীয় ভাবময় সেই প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

যং ক্রোধকাম সহ প্রণয়াদি ভীতি
বাৎসল্য মোহ গুরু গৌরব সেব্য-ভাবৈঃ।
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

—ব্রহ্ম সংহিতা

শিশুপাল প্রীতি-ভক্তি শূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোধভাবে কটূক্তি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীভগবান শিশুপালকে দুর্লভ পদদান করিতে কৃপণতা করেন নাই। তিনি শত্রু শিশুপালেরও মোহান্ধ ঘুচাইয়া মুক্তিদান করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন, আমি সকল প্রাণীতেই একরূপ কেহ আমার শত্রু বা মিত্র নাই। অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন শিশুপাল বিরূপে জীবমুক্ত হইয়া শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণাশ্রিত হয়? শিশুপাল প্রভৃতি নৃপতিগণ বৈরিবশত ভোজন এবং উপবেশনকালে গতিবিলাস ও বিলোকনাদি যোগে তাঁহার আকৃতি ধ্যান করিয়া তদীয় গতি প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ তাহাতে নিরন্তর অনুরক্ত হয়—এই ভাব দ্বারাই শিশুপালাদি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সমদৃষ্টি—সম্পন্ন শ্রীভগবান কৃপাপূর্বক নিজচরণে আশ্রয় দেন।

যাহা কিছু নীচ, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, যাহা কিছু অসৎ তাহা উপেক্ষিত অঙ্গুলির ন্যায় পরিহার করিয়া, যাহা সুন্দর, নির্মল, নিষ্পাপ, মনোহর, যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সদ্ভাব পুষ্পচয়ন করিতে হইবে; এবং সেই সদ্ভাব কুসুমে আমাদের জননী বঙ্গবাণী ক অলঙ্কৃতা করিতে হইবে। —আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৭২

বনপথ দিয়ে হেঁটে-হেঁটে জগদানন্দ বারাণসী এল। মিলল তপন মিশ্র আর চন্দ্রশেখরের সঙ্গে। তাদের কাছে বললে সব নীলাচলের কথা।

সেখান থেকে চলে এল মথুরায়। মিলল সনাতনের সঙ্গে। এ বলে, আমার কী সুখ, তোমাকে পেলাম। ও বলে, আমার কী সুখ, তুমি এলে।

সনাতনের গোফাতেই জগদানন্দ আশ্রয় পেল। সনাতন মাধুকরী করে তাই গোফায় রান্নার ব্যবস্থা নেই। জগদানন্দ রান্নার ব্যবস্থা করল। একদিন সনাতনকেই নিমন্ত্রণ করল ভিক্ষে নিতে।

রান্না করছে জগদানন্দ, দোরগোড়ায় সনাতন এসে বসল। মাথায় গেরুয়াবস্ত্র বাঁধা।

ঐ গেরুয়া বুঝি মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র! জগদানন্দের প্রেমাবেশ হল। তবু জিজ্ঞেস করল, 'এ বসন তুমি কোথায় পেলে।'

'মুকুন্দ সরস্বতী নামে এখানে যে সন্ন্যাসী আছে সে দিয়েছে।'

সহসা স্থান-কাল-পাত্রের ভুল হয়ে গেল, জগদানন্দ ভাতের হাঁড়ি নিয়ে তেড়ে এল সনাতনকেঃ 'তুমি আরেক সন্ন্যাসীর কাপড় মাথায় বেঁধেছ?'

লজ্জায় ম্লান হয়ে গেল সনাতন—বৃথাই সে জগদানন্দের প্রভুপ্রীতি পরীক্ষা করতে এসেছে। অতিথি-আতিথ্য সে পলকে বিস্মৃত হল, যাকে নিমন্ত্রণ করেছে তারই প্রতি মারমুখো!

'মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ হয়ে অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি শিরোধার্য করেছ?' জগদানন্দ উদ্যত হাঁড়ি আবার উনুনের উপরই নামিয়ে রাখলঃ 'এ দেখে কে সহ্য করবে?'

সনাতন বললে, 'ধন্য তুমি। তোমার চৈতন্যনিষ্ঠাই প্রবলতমা। পণ্ডিত, তুমিই মহাপ্রভুকে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছ। এই ভালবাসা প্রত্যক্ষ করবার জন্যেই পর-বস্ত্র মাথায় বেঁধেছিলাম। যে বৈষ্ণব আশ্রমাতীত নিষ্কিঞ্চন বেশ ধারণ করবে তার গৈরিকে কী প্রয়োজন। এ বস্ত্র আমি কোনো পরদেশীকে দিয়ে দেব।'

রন্ধনশেষে অন্ন চৈতন্যকে সমর্পণ করল। দুই ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করে চৈতন্যকথায় নিমগ্ন হল। শেষে চৈতন্যবিরহদুঃখে কাঁদতে বসল দু'জনে।

দুই মাস বৃন্দাবনে থেকে জগদানন্দ ফিরে চলল। বললে, 'প্রভু বলেছেন শিগগির আসছেন তিনি, তুমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা কোরো।'

প্রভুর জন্যে কিছু জিনিস দিয়ে দিল সনাতন। রাসস্থলীর বালি, গোবর্ধনের পাথর, পাকা শুকনো পিলুফল আর গুঞ্জামালা। দ্বাদশাদিত্য টিলায় পুরোনো একটা মঠ পেল তাই প্রভুর জন্যে সংস্কার করে রাখল। মঠের সামনে লতাপাতা দিয়ে ছোট একটা ছাউনি বেঁধে তাতেই বাস করতে লাগল।

জগদানন্দ প্রভুর চরণবন্দনা করে দাঁড়াল। সনাতনের কুশল জানাল, বললে, 'আপনাকে এই সব দিয়েছেন।'

প্রভু সব রাখলেন, শুধু পিলুফল সকলকে বিতরণ করে দিলেন। এ ফল আঁটিশুদ্ধ গিলে খেতে হয়। যারা তা না জেনে চিবিয়ে খেতে গেল তাদেরই মুখের ছাল গেল। বাঙালিরা এ বিষয়ে আনাড়ি, তাই পিলু খেতে তাদেরই বেশি দুর্ভোগ।

একদিন যমেশ্বরটোটা যাচ্ছেন, প্রভু দূর হতে গীতগোবিন্দের গান শুনতে পেলেন। গুর্জরীরাগে মধুরকণ্ঠে এ কে গায়? গায়ক পুরুষ না স্ত্রী কিছু অনুসন্ধান করবারও অবকাশ মিলল না তন্ময় হয়ে ছুটলেন গানের উদ্দেশে। সিজের কাঁটার ঘায়ে অঙ্গ রুধিরাক্ত হল তবু প্রভুর খেয়াল নেই। যে কৃষ্ণের গান করে সে না জানি আমার কত বড় বন্ধু।

গোবিন্দ প্রভুকে ধরে ফেলল। বললে, 'প্রভু এ স্ত্রীলোকের গান। কোনো এক দেবদাসী গাইছে।'

দেবদাসী! প্রভু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল।

'গোবিন্দ, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচালে। স্ত্রীলোকের স্পর্শ হলে আমি আর বাঁচতাম না।'

'আমি বাঁচাবার কে? তোমাকে জগন্নাথ বাঁচিয়েছেন।' বললে গোবিন্দ।

'শোনো সব সময়ে আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে।' প্রভু বললেন, 'আমাকে বিপথে যেতে দেবে না।'

'সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ।' পরমায়ুর আর সাত দিন মাত্র বাকি আছে, অন্তত এই সামান্য সাত দিন হরিকথার শ্রবণে-মননে কথনে-কীর্তনে অতিবাহিত করো। সত্যস্বরূপ আনন্দনিধি বিরাট পুরুষের উপাসনা করো, অন্যতর আসক্তিতেই আত্মপাত, অধঃপাত।

যদি এক মুহূর্তও বাকি থেকে থাকে তা'হলে তাও অনেক।

তপন মিশ্রের ছেলে রঘুনাথ ভট্টাচার্য প্রভুদর্শনে যাত্রা করল কাশী থেকে। সঙ্গে সেবক রামদাস বিশ্বাস। রামদাস শাস্ত্রপ্রবীণ, রঘুনাথ রামচন্দ্রের উপাসক। অষ্টপ্রহর রামনাম জপ করছে। তার উপর আবার কাব্যপ্রকাশের অধ্যাপক।

অথচ রঘুনাথের ঝালি মাথায় বহন করে চলেছে। শুধু তাই নয় বিশ্রামের সময় রঘুনাথের পা টিপে দিচ্ছে।

'দেখ তুমি ধনী, পণ্ডিত, মহাভাগবত, তুমি কেন আমার সেবা করছ?' রঘুনাথ আপত্তি করলঃ 'তুমি আমার সাথি, সুখে আমার সঙ্গে চলো।'

রামদাস বললে, 'কী যে বলো তার ঠিক নেই। সেবা করাই আমার স্বধর্ম। তুমি সঙ্কোচ কোরো না, আমাকে যদি আনন্দিত দেখতে চাও তো আমাকে সেবা করতে দাও।'

রঘুনাথকে চিনতে পারলেন প্রভু। কাশীতে তপন মিশ্রের ঘরে যখন আহার করতেন তখন তাঁকে কত সেবা করেছে রঘুনাথ।

গোবিন্দকে দিয়ে আলাদা বাসা পাইয়ে দিলেন। মিলিয়ে দিলেন ভক্তদের সঙ্গে। সুনিপুণ রান্না করতে পারে রঘুনাথ, প্রভুকে প্রায়ই খাওয়াতে লাগল। আর তার রান্না অমৃতময়। রঘুনাথ জানে সে অমৃতময়তা শুধু প্রভু খাবেন বলে।

কিন্তু রামদাসের প্রতি প্রভু বদান্য নন কেন?

যেহেতু রামদাস ভক্তিকামী নয়, মুক্তিকামী। তা'ছাড়া তার মনে বিদ্যাবত্তার অহঙ্কার। সর্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভুর আর জানতে কিছু বাকি নেই।

কী আর করবে সে? সে গোপীনাথ পট্টনায়কের ছেলেদের কাব্যপ্রকাশ পড়াতে লাগল।

রঘুনাথ আট মাস থাকল নীলাচলে। বিদায় নেবার সময় প্রভু বললেন, 'শোনো, বিয়ে কোরো না। বৃদ্ধ মা-বাপের সেবা করো আর কোন বৈষ্ণবের কাছে ভাগবতের পাঠ নাও। বৈষ্ণব ছাড়া আর কে বোঝাবে ভাগবতের মর্ম? আর—আর একবার নীলাচলে এসো।'

নিজের কণ্ঠমালা প্রভু রঘুনাথকে পরিয়ে দিলেন। প্রেমগদ্গদ্নেত্রে কাঁদতে লাগল রঘুনাথ।

গৃহে চার বছর থেকে পিতা-মাতার সেবা করল রঘুনাথ। বৈষ্ণব-পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়ল। তারপর পিতা-মাতার দেহান্ত হলে উদাসীন হয়ে আবার নীলাচলে ফিরে এল প্রভুর কাছে।

'আমি মায়ের একমাত্র পুত্র ছিলাম।' নারদ বলছে ব্যাসকে, 'আমার মা অন্যগৃহে দাসীবৃত্তি করতেন। তিনি ছাড়া আমার আর গতি নেই দেখে আমাকে তিনি প্রাণপণে স্নেহ করতেন, কিন্তু অশক্ত ও পরাধীন বলে আমার মঙ্গলহেতু কিছুই করতে পারতেন না। আমার বয়েস তখন পাঁচ, দিক-দেশ-কাল কোনো কিছুতেই আমার জ্ঞান বুদ্ধি ছিল না। কেবল ভাবতাম কবে এই নিষ্ফল মাতৃস্নেহ থেকে পরিত্রাণ পাব?

গো-দোহন করতে মা বাড়ির বাইরে গিয়েছেন, দৈবক্রমে পথিমধ্যে এক সাপের গায়ে পদক্ষেপ করে বসলেন। কালপ্রেরিত সর্প তখুনি মাকে দংশন করল। মা প্রাণত্যাগ করলেন। কিন্তু, বলব কী, তাতে আমার

অণুমাত্র দুঃখ হল না। বরং মনে হল ভক্তের শুভাকাঙ্ক্ষী ভগবান এই ছলে আমার প্রতি বোধ হয় কৃপা প্রকাশ করলেন।

আমি ঘর ছেড়ে উত্তরে যাত্রা করলাম। অনেক জনপদ নগর গ্রাম গোষ্ঠ পার হলাম। অনেক গিরি নদী উপত্যকা। শেষে এক বিস্তীর্ণ অটবীতে প্রবেশ করলাম। শ্রান্ত ও অবসন্ন, ক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর, বসলাম বৃক্ষমূলে। ঋষিদের মুখে শুনেছিলাম পরমাত্মা হৃদয়ে বাস করেন, এখন এই নিস্তব্ধ অবসরে তাঁকে চিন্তা করতে লাগলাম। ভক্তিবিহ্বলচিত্তে চিন্তা করতে-করতে উৎকণ্ঠা জাগল আর উৎকণ্ঠায় জল এল চোখে। কল্পতরু নারায়ণ আমার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হলেন। দুর্বিষহ প্রেমে আমার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হল, কিন্তু কই, সেই একান্তবাঞ্ছিত ভগবৎরূপ আর দেখতে পাচ্ছি না কেন?

আবার মনঃসংযোগ করলাম। প্রাণপণ যত্নে সন্ধান করতে লাগলাম সেই অনির্বচনীয়কে। আর তার দেখা পেলাম না। তখন বাক্সনের অগোচর গম্ভীর স্নিগ্ধবাক্যে আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন, ইহজন্মে তোমাকে আর দেখা দেব না। যাদের কাম দগ্ধ হয় নি তারা আমার দর্শন পায় না। তবে তুমি আমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত বলে তোমাকে একবার দেখা দিয়েছি। দীর্ঘকাল সাধুদের সেবা করে তোমার বুদ্ধি আমাতেই দৃঢ়ভাবে বদ্ধ কর, তা'হলেই এই নিরানন্দ লোক পরিত্যাগ করে আমার পার্শ্বচর হতে পারবে। বুদ্ধি একবার আমাতে বদ্ধ হলে তার আর বিচ্ছেদ হবে না। যে আমাকে স্মরণ করে আমার অনুগ্রহে প্রলয়ের পরেও তার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। এই বলে বেদপ্রসিদ্ধ অশরীরী হরি স্তব্ধ হলেন।

সেই থেকে সমস্ত লজ্জা পরিহার করে অনন্ত-পুরুষের দুর্বোধ নাম গান ও চরিত্র স্মরণ করে দেশে দেশে ভ্রমণ করতে লাগলাম। নির্লিপ্ত ও বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে কৃষ্ণচিন্তায় কালাতিপাত করছি, আমার মৃত্যুকাল তড়িন্মালার মত সহসা আবির্ভূত হল। ভৌতিক দেহের অবসানে ভগবানের পার্শ্বচরযোগ্য দেহ পেলাম। পরে কল্পাবসানে শ্রীহরি বিশ্বসংহার করে সমুদ্রজলে শয়ন করলে আমি নিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হলাম। তারপর সহস্র যুগ অতীত হল। ভগবান সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে নিদ্রোত্থিত হলেন, মরীচি অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষির সঙ্গে আমিও উৎপন্ন হলাম।

তদবধি অখণ্ড ব্রহ্মচর্যব্রত ধারণ করে আমি মহা-বিষ্ণুর প্রসাদে ত্রিলোকের অন্তর ও বাহ্য সর্বস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দূর-নিকট কোথাও যেতে আমার বাধা নেই, স্বররূপ ব্রহ্মে বিভূষিত এই দেবদত্ত বীণায় মূর্ছনা তুলে হরিগুণগান করে আমি সর্বত্র বিচরণ করি। সেই গান শুনে হরি আহূতের মত চলে এসে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। বিষয়ভোগেচ্ছায় নিপীড়িত অশক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে হরিকথাকীর্তনই ভবসিন্ধুপারের তরণীস্বরূপ। যে ব্যক্তি কামে-লোভে আসক্ত যোগপথ অবলম্বন করে সে কিছুতেই শান্তি পায় না, কিন্তু হরিসেবা করলেই আত্মা প্রসন্ন হয়। আমার আর কী কাজ! বীণাস্বরে হরিগুণগান করে নিজে আনন্দিত হয়ে মোহপীড়িত ত্রিলোককে আনন্দিত করছি।'

গৃহহারা রঘুনাথ প্রভুর সঙ্গে আবার আট মাস কাটাল। প্রভু বললেন, 'আদেশ করছি, বৃন্দাবনে যাও, রূপ-সনাতনের সঙ্গে থাকো, ভাগবত পড়ো আর অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম নাও।' রঘুনাথকে আলিঙ্গন করলেন, জগন্নাথের প্রসাদী চোদ্দহাত লম্বা যে তুলসীর মালা পেয়েছিলেন আর যে পানের খিলি, তা তাকে উপহার দিলেন। ইষ্ট-ভক্তিতে নিবিষ্ট হয়ে রইল রঘুনাথ।

বৃন্দাবনে এসে রঘুনাথ রূপ-সনাতনকে আশ্রয় করল। পড়তে লাগল ভাগবত। প্রেমে অষ্ট সাত্ত্বিকের উদয় হচ্ছে, অশ্রুতে চোখ আচ্ছন্ন ও কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, পড়ে উঠতে পাচ্ছে না। তারপর যখন কৃষ্ণের সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের শ্লোক আসছে, তখন কী যে দেখছে কী যে বলছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। বোঝবার দরকারই বা কী! গোবিন্দচরণে আত্ম-সমর্পণই একমাত্র বস্তু।

এক ধনী-শিষ্যকে বলে রঘুনাথ ভট্ট গোবিন্দের মন্দির করে দিল, সাজিয়ে দিল বিচিত্র অলঙ্কারে, মকরে কুণ্ডলে বংশীতে। গ্রাম্যবার্তা বা বৈষয়িক কথা মুখেও আনে না, কানেও নেয় না, কৃষ্ণকথা পূজাতেই দিনমান কাটিয়ে দেয়। সকলেই কৃষ্ণভজন করছে এই বিশ্বাসে কোনো বৈষ্ণবের নিন্দাও তার কানে আসে না। প্রভুর দেওয়া তুলসীর মালাটি কণ্ঠে ধরে থাকে।

হে কেশব! হে নাথ! শ্রীকৃষ্ণকে বলছে উদ্ধব, আমি ক্ষণার্ধের জন্যেও তোমার পাদপদ্ম ত্যাগ করতে সাহস করি না, আমাকেও তোমার স্বধামে নিয়ে চলো। তোমার লীলাচরিত্রের রস-আস্বাদন মানুষের পক্ষে পরমমঙ্গল, তার কর্ণপীযূষ, আর এ রস পেলে মানুষের আর অন্য কামনা থাকে না। আর আমরা যারা তোমার ভক্ত, শয়নে আসনে অটনে অশনে স্নানে গানে তোমার সেবা করেছি প্রিয়তা করেছি, আমরা তোমাকে কি করে ত্যাগ করে থাকব?

এদিকে প্রভুর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিভ্রান্তি উপস্থিত হয়েছে। অর্থাৎ কৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীদের যে দশা হয়েছিল সেই দশা। উদ্ধবকে দেখে রাধা যেমন বিলাপ করেছিল তেমনি দিব্যোন্মাদ প্রলাপ করছেন।

হে ধূর্তের বন্ধু মধুকর, আমাদের চরণস্পর্শ কোরো না। তোমার মুখে সপত্নীর কুচমণ্ডলে বিলুণ্ঠিত মালার কুঙ্কুম রয়েছে, মধুপতি সেই সব মানিনীরই প্রসাদ বহন করুন। আমাদের প্রসন্ন করে কী হবে? ছি-ছি, এ কি বলবার কথা? তোমার মত দুর্মেধা যেমন ভুক্ত পুষ্প ত্যাগ করে তেমনি। তিনি একবার মাত্র তাঁর মোহিনী অধরসুধা পান করিয়ে আমাদের ত্যাগ করেছেন। পদ্মা কেন তাঁর পাদপদ্ম সেবা করছে? নিশ্চয়ই সেই উত্তমশ্লোকের মিথ্যা কথায় তাঁর চিত্ত অপহৃত হয়েছে। তাঁর গান আমাদের আর শুনিয়ে লাভ কী? আমরা তাঁর দারা নই। যারা সম্প্রতি তাঁর সখী তাদের কাছে গিয়ে তাঁর প্রসঙ্গ গান করো, তারাই তাঁর প্রিয়া, তাঁকে আলিঙ্গন করেই তাদের কুচতাপ শান্ত হয়েছে, তারাই তোমাকে অভীষ্ট পাইয়ে দেবে। যিনি দুঃখীর প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন, উত্তমশ্লোক আখ্যা তাকেই দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর মত কপটাচারী আর কে আছে? তুমি তো তাঁরই দূত, তাঁরই মতো চাটুকার। তোমার গুণগুঞ্জনে আমরা আর আকৃষ্ট নই।

এমনিতরো বিলাপ প্রেমবিবশ ব্যাকুলতা।

একদিন প্রভু স্বপ্ন দেখলেন, কৃষ্ণ রাসলীলা করছেন। মণ্ডলাকারে গোপীরা নৃত্য করছে আর মণ্ডলীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত।

এখানে এই স্বপ্নে প্রভু না-কৃষ্ণ না-রাধা, তিনি এখানে দর্শক। তিনি এখানে রাধার স্বয়ংরূপে নেই তিনি এখানে রাধার সখীরূপে আবিষ্ট। তাই তিনি দর্শক, রাসলীলার নায়ক-নায়িকা নন।

প্রভুর ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছে দেখে গোবিন্দ জাগিয়ে দিল।

নিদ্রায় মনে হয়েছিল রাসস্থলীতে উপস্থিত হয়ে বাস্তব রাসলীলা দেখছেন আর এখন জেগে উঠে জ্ঞান হল স্বপ্ন দেখছিলাম এতক্ষণ। স্বপ্ন কেন সত্য হল না। তার জন্যে বিষণ্ণ হয়ে রইলেন।

অভ্যাসের বশে নিত্যকৃত্য সমাপন করলেন, গেলেন জগন্নাথদর্শনে।

আজ কেন কে জানে মন্দিরে প্রচণ্ড ভিড়।

প্রভু যথারীতি গরুড়স্তম্ভের পিছে এসে দাঁড়ালেন। এখানে দাঁড়িয়েই তিনি বরাবর দর্শন করেন জগন্নাথ। আজ সামনে-পিছে আশে-পাশে দারুণ ঠেলাঠেলি। একটি ওড়িয়া স্ত্রীলোক কিছুতেই ভিড় সরিয়ে দেখতে পাচ্ছে না জগন্নাথকে। ব্যাকুল হয়ে এদিক ওদিক উঁকি মারছে কিন্তু চারদিকে মানুষের প্রাচীর। একটু উঁচু হয়ে না দাঁড়ালে তার চোখ জগন্নাথের নাগাল পাচ্ছে না। অনন্যোপায় স্ত্রীলোক ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় ধ্যাননিশ্চল প্রভুর কাঁধে পায়ের ভর রেখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল।

প্রভুর বাহ্যচেতনা নেই তাঁর কাঁধে এ কি গুরুভার!

গোবিন্দের নজর পড়ল। সে তখুনি সেই স্ত্রীলোককে নেমে দাঁড়াতে বললে।

প্রভু বললেন, 'না, ওকে নিষেধ কোরো না। ও যত খুশি দেখুক জগন্নাথকে। ওর তনু মন প্রাণ জগন্নাথে আবিষ্ট। এত আবিষ্ট যে কারু কাঁধে পা দিয়েছে তারও খেয়াল নেই।'

সেই স্ত্রীলোকটি তখুনি নেমে পড়ল। প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করল।

'আহা ওর কী আর্তি কী আনন্দতন্ময়তা! আমার যদি এমন থাকত! ও মহাভাগ্যবতী, ওকে প্রণাম করো। ওর প্রসাদে আমাদের যদি এমন আর্তি জন্মে, যদি এমন তন্ময়তার অধিকারী হই!'

আগের রাত্রের স্বপ্নের আবেশে প্রভু সর্বত্র সেই মুরলীবদনকেই দেখছিলেন, এখন বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসার পর দেখলেন জগন্নাথের সঙ্গে সুভদ্রা বলরামও বিরাজ করছেন।

হঠাৎ আবার মনে হল আমি তো বৃন্দাবনে ছিলাম,

কুরুক্ষেত্রে এলাম কি করে! আমার সেই বৃন্দাবন গেল কোথায়? আমার প্রাপ্ত রত্ন আবার হারিয়ে গেল? বৃন্দাবন ছেড়ে আমি এই কুরুক্ষেত্রে এলাম কি করে? এ কুরুক্ষেত্রই বা কোথা থেকে উদয় হল?

বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরে এলেন প্রভু। মাটির উপর বসে নখ দিয়ে রেখা টানতে লাগলেন। দু'-চোখ দিয়ে অজস্রধারে অশ্রু ঝরতে লাগল।

বৃন্দাবননাথ কৃষ্ণকে পেয়েছিলাম, আবার হারালাম কী করে? কে তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল? কোথায় নিয়ে গেল? কৃষ্ণ ছাড়া আমি এ কোথায় এসে পড়লাম? এ তো কুরুক্ষেত্রও নয়, এ জায়গার নাম কী? এ জায়গাটাই বা কোথায়, এখানে আমাকে কে নিয়ে এল?

দেহের স্বভাবে স্নান-ভোজন করছেন বটে, কিন্তু মন উন্মত্ত হয়ে রয়েছে।

স্বরূপ আর রামানন্দ এলে প্রভু তাদের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।

আমার অচ্যুতবিত্ত প্রাপ্ত হয়েও প্রনষ্ট হল। আমার বিষণ্ণ মন দেহ-গেহ ছেড়ে ভিখিরির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার ধৈর্য চলে গিয়েছে, আমি কি করব, যার লোভে বেদধর্ম লোকধর্ম আর্যপথ সমস্ত ছেড়েছি, ছেড়ে বৈরাগী হয়েছি, সেই কৃষ্ণমাধুরী কোথায় লুকোল? সেই বৈরাগী কৃষ্ণলীলাকথার শঙ্খকুণ্ডল কানে পরেছে, কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের তৃষ্ণাই তার একমাত্র জলপাত্র, আর কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশাই তার কাঁধে ঝুলি হয়ে শোভা পাচ্ছে। চিন্তা-কাঁথাই তার গায়ের চাদর, ধূলিমলিনতাই তার বিভূতি। আর মুখে কৃষ্ণপ্রলাপ। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাই তার দণ্ড। আর লোভই তার শিরোবস্ত্র। দশ ইন্দ্রিয়কে শিষ্য করে মহাবাউল নাম ধরে চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে বৃন্দাবনে। স্থাবর প্রজার গৃহে ভিক্ষে করছে, বৃক্ষলতা-কুঞ্জ কুটিরের কাছে। নিচ্ছে ফলমূল। আর জঙ্গমপ্রজা গোপসুন্দরীরা, তাদের কাছ থেকে ভিক্ষে করছে কৃষ্ণের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ। তমালশ্যামল রূপ, অধর রস, গাত্র গন্ধ, অঙ্গ স্পর্শ আর বাক্যলহর ও বংশীধ্বনি। গোপীদের ভুক্তাবশেষ পেলেও সে পরিতৃপ্ত।

তারপর সে কৃষ্ণধ্যানরূপ যোগাভ্যাস করছে। রাত জাগছে। দেহে অভিনিবেশ নেই, সে তখন ব্যাধি, মোহ আর মূর্চ্ছার কবলে।

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর দশ দশা উপস্থিত হল। চিন্তা জাগরণ উদ্বেগ কৃশতা অঙ্গমালিন্য প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদ মোহ আর মৃতি। [ক্রমশ

দাহ

সমরেন্দ্র ঘোষাল

আচ্ছন্ন শব্দরোল স্তিমিত অপরাহ্ণ বেলা
চতুর্দিক নৈঃশব্দ সমাহিত ছায়াচ্ছন্নতায়
নদীগুলি নিদ্রা গেছে। নিঃসঙ্গ বালুভূমি একেলা
বিধবার সিঁথি সম শব্দশূন্য গ্রাম নিঃস্বতায়।
সমুখের মেঠোপথে প্রসারিত শ্মশানের পথ
কারা যেন শবযাত্রায় চলেছে। এখানে আমি
স্মৃতির শবেরে লয়ে ধাবমান। গতি মন্দ শ্লথ
সময়ের শ্মশানের দিকে। কার ডাকে থামি
সহসা ফিরাই মুখ। চোখে বেঁধে আগুনের কণা।
তার রূপ শ্মশানের চিতা। তার প্রেম পিছু ডাকে।
স্মৃতির শবেরে লয়ে ধাবমান আমি অন্যমনা
গতিভ্রষ্ট হয়ে তার শরীরে মিলাই। আকাঙ্ক্ষারা থাকে।
তার রূপ শ্মশানেতে আমার আকাঙ্ক্ষারা পুড়ে।
ধীরে ধীরে ছাই হয়, উড়ে চলে দূর হতে দূরে॥

পুরশ্চরণ

অনিরুদ্ধ কর

স্পর্শের আগুনে যদি জ্বলে ওঠে শান্ত বিভাবরী
শোণিত স্রোতের মধ্যে সাড়া দেবে বিপুল বিদ্যুৎ
শূন্য দুই করতল ভরে দিয়ে দুঃখের কিংকরী
নীরব বিদায় নেবে, গোধূলির শেষ অপ্রস্তুত
রশ্মির লাবণ্যরেখা ছুঁয়ে থাকবে নিদাঘ-রজনী।

বিলাসী জ্যোৎস্নার শিখা নেবে আসে চক্ষুর কজ্জলে
সপত্র নিস্পন্দ বৃক্ষ পান করে নয়নের ধ্বনি
স্পর্শের আগুন এসে ছুঁয়ে থাকে সব কৌতূহলে
আগুনের পাশে এসে শুয়ে থাকে আহত শরীর

শুশ্রূষার মেঘখানি শুষে নেবে রহস্য-লহরী
প্রথম পাপের মত রোমকূপ মুখর অধীর
যদি আরেকবার··যদি জ্বলে ওঠে শান্ত বিভাবরী।

রোম নগরীর সৃষ্টি

শ্রীসোমেন্দ্রলাল রায়

প্রবাদে বলে যে, 'Rome was not built in a day'— অর্থাৎ রোম নগরী একদিনে সৃষ্টি হয় নাই। প্রকৃতই তাই—রোম নগরী এবং রোমান সাম্রাজ্য অতি ধীরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরীসমূহের অন্যতম এই রোম। ইহা দীর্ঘদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ইহা ছিল এক মহান সভ্যতার ধারক ও বাহক।

রোম পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরীসমূহের অন্যতমও বটে। বস্তুতপক্ষে এথেন্সকে বাদ দিলে রোমই পাশ্চাত্য দুনিয়ার প্রাচীনতম নগরী। পাশ্চাত্য জগতের অধিকাংশ স্থানই যখন অজ্ঞতার তিমির-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল—তখনি রোমের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই অজ্ঞান তমিস্রার হাত হইতে পাশ্চাত্য দুনিয়াকে উদ্ধার করিতে রোমের যথেষ্ট অবদান আছে।

রোম পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন নগরী হইলেও, ইহার প্রতিষ্ঠার সময় এবং ইহার সৃষ্টি সম্বন্ধে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। এই সব বিবরণী হইতে জানা যায় যে, খৃস্টপূর্ব ৭৫৩ সালে রোম নগরীর পত্তন হয়।

ঐ বৎসরই রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাস—তাঁহার নামানুসারে এই শহরের নাম হয় রোম—তাঁহার পিতামহ রাজা নুমিটারের নিকট হইতে টাইবার নদীর তীরে একটি নগর গঠনের অনুমতি গ্রহণ করেন। পিতামহের অনুমতি লাভের পর প্রথমেই তিনি ভাবী শহরের চারিধারের প্রাচীরের সীমা চিহ্নিত করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লাঙল টানিয়া জমিতে দাগ দিতে থাকেন। প্রাচীরের যেখানে যেখানে দরজা হইবে, সেখানে তিনি জমি হইতে লাঙল তুলিয়া মাটিতে দাগ দেওয়া হইতে বিরত থাকেন। এইভাবে রোমুলাস প্যালাটাইন পর্বত এবং তাহার পাদদেশে সামান্য জমি লইয়া এক বর্গাকৃতি চতুর্ভুজ সীমা অঙ্কিত করেন। এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডেই রোম নগরীর গোড়াপত্তন হয়। মেষপালকদের দেবী পেলসের উৎসবের দিন অর্থাৎ ২১শে এপ্রিল এইভাবে মহানগরী রোমের সৃষ্টির সূচনা হয়।

শহর পত্তনের পর রোমুলাস দেখিলেন নবগঠিত নগরের জনসংখ্যা অতি নগণ্য। এই অল্পসংখ্যক অধিবাসীর সাহায্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রোম নগরীকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। তাই রোমুলাস রোমের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি নতুন শহরের একাংশ আশ্রয়স্থল হিসাবে ঘোষণা করিলেন। এখানে যে-কেহ পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় লইতে পারিবে এবং পলাতককে রক্ষা করা হইবে বলিয়া তিনি আশ্বাস দিলেন।

এই ঘোষণার ফলে রোমে বহু আশ্রয়প্রার্থীর সমাগম ঘটিল এবং শহরের জনসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু এইবার নূতন এক সমস্যা দেখা দিল। যে-সমস্ত পলাতক আশ্রয়প্রার্থী শহরে আশ্রয় নিয়াছিল—তাহারা প্রায় সবাই ছিল পুরুষ। রোমে তখন যথেষ্টসংখ্যক বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল না। আশে-পাশে যে-সমস্ত গোষ্ঠীর লোকেরা বাস করিত, তাহারা রোমুলাসের অনুচরদের দস্যু বা দুষ্কৃতকারী বলিয়া মনে করিত এবং তাহারা রোমবাসীদের সহিত তাহাদের কন্যাদের বিবাহ দিতে সম্মত হইল না।

এই নতুন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া রোমুলাস মোটেই দমিলেন না। তিনি ইহার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনে তৎপর হইলেন এবং অবশেষে তিনি এক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রোমুলাস ঘোষণা করিলেন যে, দেবতা কনসাসের উৎসব পালনার্থে রোমে বিবিধ ক্রীড়া অনুষ্ঠান হইবে এবং ইহা দেখিবার জন্য তিনি আশে-পাশের সমস্ত রাজ্যের অধিবাসীদের আমন্ত্রণ জানাইলেন। নির্দিষ্ট দিনে খেলা দেখিবার জন্য অন্যান্য রাজ্যসমূহের বহু অধিবাসী তাহাদের পরিবার-পরিজনবর্গ সহ রোমে সমবেত হইল।

ক্রীড়া অনুষ্ঠান শুরু হইল। সবাই একমনে খেলা দেখিতেছে। এমন সময় রোমুলাসের পূর্ব-নির্দিষ্ট সঙ্কেত পাইয়া রোমের যুবকবৃন্দ দর্শকদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং অবিবাহিতা কুমারীদের তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল। দর্শকবৃন্দ এই আকস্মিক বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তাহারা ভালোমত বাধাও দিতে পারিল না এবং রোমুলাস রোমীয় যুবকদের জন্যে এইরূপে একদিনে ছয় শতাধিক কন্যা সংগ্রহ করিলেন।

এই ঘটনায় প্রতিবেশী সমস্ত রাজ্য বিক্ষুব্ধ হইল এবং তাহারা রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। তবে রোমের সৌভাগ্যবশত তাহারা একসাথে মিলিত হইয়া রোম আক্রমণ করে নাই। তাহারা একে একে রোম আক্রমণ করে এবং রোমের নিকট তাহাদের প্রত্যেককেই পরাজয় বরণ করিতে হয়। এইভাবে একে একে ক্যানিনা, এণ্টেমনিয়া, ক্রাস্টুমেরিয়াম নগরকে রোমের শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। রোমুলাস বিজিত নগরসমূহের এক-তৃতীয়াংশ করিয়া দখল করিয়া লইলেন এবং ঐ সমস্ত নগরের যে সমস্ত অধিবাসী রোমে বসবাস করিতে স্বীকৃত হইল, রোমের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন নাগরিক হিসাবে তাহাদের সাদরে রোমে আশ্রয় দিলেন।

ইতিমধ্যে সেবাইনরা তাহাদের কন্যা হরণের অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত রাজা টিটাস টেটিয়াসের নেতৃত্বে বিশাল এক সৈন্যদল গঠন করিল। রোমানরা এই শক্তিশালী সৈন্যদলের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া প্রাচীরের ভিতর আশ্রয় লইল। ইহার পূর্বে তাহারা নিরাপত্তার জন্য তাহাদের সমস্ত গবাদি পশু ক্যাপিটোলিন পর্বতে প্রেরণ করে। কারণ প্রাকৃতিক রক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও ক্যাপিটোলিন পর্বত দুর্গপ্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সেবাইন-সৈন্য বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ দুর্গ দখল করিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্গাধ্যক্ষের কন্যা টারপীয়া সেবাইন সৈন্যবাহিনীর বাহুস্থিত সুবর্ণ ব্রেসলেট দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। সে রাজা টেটিয়াসের নিকট প্রস্তাব পাঠাইল যে, তাহাকে যদি ঐ সুবর্ণ ব্রেসলেটসমূহ দেওয়া হয়, তবে সে গোপনে দুর্গের দরজা খুলিয়া দিতে পারে। টেটিয়াস তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন। রাত্রে টারপীয়া গোপনে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া

দিল। সেবাইন-সৈন্যদল মুক্ত দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ক্যাপিটোলিন পর্বতের দুর্গ দখল করিয়া লইল।

দুর্গ দখলের পর টারপীয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাহার পুরস্কার দাবি করিল, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে রাজা টেটিয়াস এবং সৈন্যরা তাহাদের স্বর্ণ ব্রেসলেট এবং ঢালগুলি টারপীয়ার দিকে ছুড়িয়া মারিতে থাকে। নিক্ষিপ্ত ব্রেসলেট এবং ঢালের আঘাতে বিশ্বাসঘাতিনী টারপীয়ার মৃত্যু হইল।

এই পরাজয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া রোমুলাস রোমান-বাহিনীসহ সেবাইনদের আক্রমণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধ শুরু হইল। কয়েকদিন অবিরাম যুদ্ধের পরও যখন জয়-পরাজয় অনিশ্চিত, তখন একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

রোমানরা যে সব সেবাইন-দুহিতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল তাহারা একদিন চীৎকার করিতে করিতে যুধ্যমান দুই বাহিনীর মধ্যে আসিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তাহাদের বিলাপ ও কাতরক্রন্দন শ্রবণ করিয়া দুই বাহিনীর মনেই করুণার উদ্রেক হইল এবং তাহারা যুদ্ধ বন্ধ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

সেবাইন-রমণীরা সেবাইন-বাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমরা তোমাদের নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে তোমরা এখন আমাদের এরূপ শাস্তি দিতে আসিয়াছ, আমাদের অন্যায়ভাবে বলপূর্বক হরণ করা হইয়াছিল। হরণের পর আমাদের পিতা-ভ্রাতা ও আত্মীয়পরিজন এতদিন আমাদের উদ্ধারের কোন চেষ্টা করে নাই। আমরা এখন রোমানদের সহিত নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি, যখন যুদ্ধে তাহাদের পতন হইলে আমরা বিলাপ করিতেছি তখন তোমরা আসিয়াছ। আমরা যখন কুমারী ছিলাম, তখন তোমরা আমাদের উদ্ধার কর নাই। আর এখন তোমরা স্ত্রীকে স্বামীর নিকট হইতে, জননীকে পুত্রের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে আসিয়াছ। তোমরা এখন রোমানদের শ্বশুর এবং মাতামহ হইয়াছ। এখন আর তোমাদের তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নয়—তোমরা যদি আমাদের ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাও, তবে তোমাদের জামাতা ও দৌহিত্রদেরও সাথে করিয়া লইয়া চল।'

সেবাইন-সৈন্যরা তাহাদের কন্যা এবং ভগিনীদের এইরূপ বিলাপ শুনিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষের ভিতর সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধির সর্ত অনুযায়ী স্থির হইল যে, যে সমস্ত সেবাইন-রমণী পত্নীরূপে রোমানদের গৃহে থাকিতে সম্মত হইবে—রোমানরা একমাত্র পশম বোনা ব্যতীত তাহাদের দিয়া আর কোন কাজ করাইতে পারিবে না এবং আরও ঠিক হইল, এখন হইতে সেবাইনরা এবং রোমানরা একই নগরে বাস করিবে এবং এই নগরীর নাম পূর্ব-নামানুসারে রোমই থাকিবে, এই চুক্তি অনুসারে সেবাইনরা প্যালাটাইন পর্বতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ কুইরীনাল এবং ক্যাপিটোলিন পর্বতে তাহাদের বাসের নিমিত্ত নূতন নগরী গড়িতে শুরু করিল।

এইভাবে এই দুইটি গোষ্ঠী পরস্পরের সহিত মিলিত হইলেও প্রথম দিকে ইহাদের প্রত্যেকের নিজেদের আলাদা রাজা এবং সেনেট ছিল। অবশ্য অল্প কিছুদিন বাদে সেবাইনদের রাজা টেটিয়াস নিহত হইবার পর রোমুলাসই রোমের একমাত্র শাসকরূপে রাজত্ব করিতে থাকেন।

রোমুলাস কর্তৃক রোম নগরী পত্তনের সময় রোমের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ল্যাটিন বংশোদ্ভব; তারপর সেবাইনরা ল্যাটিনদের সহিত মিলিত হয় সেবাইনদের সহিত এই মিলনের ফলে রোমের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়।

ইহার পর এট্রুসকানরাও রোমে সেবাইন ও ল্যাটিনদের সহিত মিলিত হয়, তাহারা স্থাপত্যবিদ্যায় বিশেষ পটু ছিল। এটসকান রাজারা দীর্ঘদিন রোমে রাজত্ব করেন এবং তাহাদের রাজত্বকালে রোম নগরী সুন্দররূপে গঠিত হয়।

রোমের সপ্তম নরপতি টারকুইনিয়াস সুপার্বাসের সময় রোমে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ-মন্দির ইত্যাদি নির্মিত হয়। প্রবাদ আছে যে, জুপিটার, জুনো এবং মিনার্ভার জন্য তিনি যখন এক বিশাল মন্দির নির্মাণের আদেশ দেন, তখন মন্দিরের ভিত খুঁড়িবার সময় একটি মানুষের মাথার তাজা খুলি পাওয়া যায়। ভবিষ্যদ্বক্তারা জানান, ইহা দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে রোম একদিন সারা পৃথিবীর রাজধানী বা প্রধান শহর রূপে বিখ্যাত হইবে। ইঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী অন্তত আংশিকরূপেও সফল হইয়াছিল বলা চলে বৈ কি, কারণ রোম সারা বিশ্বের না হইলেও সারা পাশ্চাত্য জগতের, যাহাকে তৎকালীন পাশ্চাত্যের লোকেরা গোটা পৃথিবী বলিয়া মনে করিত, রাজধানী এবং প্রধান নগরী হিসাবে দীর্ঘদিন সম্মান লাভ করিয়াছে।

টারকুইনিয়াস সুপার্বাসের পরেই রোমে রাজতন্ত্রের পতন হয় এবং প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়, আবার প্রজাতন্ত্রের পতন এবং রাজতন্ত্রের গঠন এবং রাজতন্ত্রের পতন ও প্রজাতন্ত্রের উত্থানরূপ নানা পরিবর্তন এবং গল প্রভৃতি বহিঃশত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া রোমকে যাইতে হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রোম দীর্ঘকাল যাবৎ তাহার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখে।

পরবর্তীকালেও পোপদের আবাসস্থল হিসাবে রোম সমস্ত খৃস্টান দুনিয়ার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। প্রায় আটাশ শত বৎসর পূর্বে রোমের প্রথম সৃষ্টি হইলেও নগরী হিসাবে রোমের আকর্ষণ আজও বজায় আছে, রোম অতি প্রাচীন নগরী সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও রোম নগরী চির-নবীন।

কবে এমন দিন আসিবে, যখন আমার শিক্ষিত দেশবাসিগণ আচারে-ব্যবহারে, কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে প্রকৃত বাঙালীর মতন হইবে। কবে দেখিব, দেশের যাঁহারা মুখপাত্রস্বরূপ, সমাজের যাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাঁহাদের আরাধ্য-দেবতা। কবে শুনিব, শিক্ষিত বাঙালী আর এখন বাঙলা ভাষায় সর্বসমক্ষে কথা বলিতে বা প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচবোধ করেন না বা বঙ্গবাসী নিজেকে বঙ্গভাষার সেবকরূপে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না।

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

পূর্ব-বার্লিনের অন্ধকার দেশে বসে ঐ লোকটা হয়ত ভাবছে—
কি হারালাম ? দেশের স্বাধীনতা, না নিজের জীবন ।

মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্ব চলেছে দিনে-রাত্রে, সকাল-সন্ধ্যায় । শাসনতন্ত্রের চুলচেরা বিচার হচ্ছে কনফারেন্সে আর সামিটে । নীচে নিগ্রো ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে, সাউথ-আফ্রিকায় সে আর্তনাদ করছে, আমেরিকায় সে লিঞ্চিত হচ্ছে । বিশ্বব্যাপী এই মহামারীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে এনেছি আমার ছোট্ট অসমীয়া ছবি যার একমাত্র বলার কথা হ'ল, পৃথিবীতে একটি শিশু তার নাম সব-শিশু । পৃথিবীতে একটি মানুষ, তার নাম সব-মানুষ । মানুষ এক ও অনন্য । ভারতবর্ষের একটি ছোট্ট কোণের একটি ছোট্ট কথার রেশ কোন পর্যন্ত যাবে ?

যাবে কি আজকের স্বার্থান্ধ মানুষের মনে ?

জানি না ।

কালকের নতুন মানুষের মনে ?

তাও জানি না ।

কখনও ? সুদূর ভবিষ্যতে ?

তাও জানি না ।

কেউ জানে না ।

প্রদর্শনী

দেখতে দেখতেই দু'দিন কেটে গেল । প্রদর্শনী আজ আরম্ভ । সন্ধ্যা সাতটা কংগ্রেস হল এ । আমাদের চারজনের ছোট্ট ডেলিগেশন, মাথার ওপর লিডার হলেন বার্লিনে ভারতীয় রাজদূত । তিনি হাসপাতালে, অসুস্থ ; তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে এলেন বন (Bonn) থেকে উপ-রাজদূত । সস্ত্রীক । অন্যতম ডেলিগেট পাকোয়াসা মেমসাহেব সঙ্গে এসেছিলেন ফ্র্যাঙ্কফুর্ট পর্যন্ত, তারপর থেকে আর তাঁর দর্শন মেলে নি । সারা ভারতে এত লোক থাকতে তাঁর প্রতি সরকারের সুনজর যে কি ক'রে পড়ল বোঝা দুষ্কর । ছবি তো করেনই না, দেখেনও কম । সমালোচক হ'লে বুঝতাম, সমঝদার হ'লেও না হয় চলত ; অল্পবয়স্ক সুন্দরী হলেও না হয় সরকারকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমাও করা যেত । কিন্তু মহিলা সুন্দরী নন, সমালোচক হবার সাধ্য নেই । সমঝদার কোনদিন হবেন এমন আশা করাও অন্যায় । পরে কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল উনি মাস্টারণী ছিলেন এবং আপাতত মেয়েদের ব্যায়াম করানোর ব্যায়রামে বিশেষ ক'রে ভুগছেন । উনি সারা বার্লিন মেয়েদের স্কুল দেখে বেড়িয়েছেন আর তারই ফাঁকে ফাঁকে যখনই সময় পেয়েছেন মদের আসরের শোভা বাড়িয়েছেন । নিজেকে 'নেপো' বলে জানতাম । উনি নেপো-লায়ান !

আমাদের ডেলিগেশনের সরকারি অগ্রজ বন (Bonn) আগত উপ-রাজদূত এবং তাঁর স্ত্রীকে প্রদর্শনীর পনেরো দিনে খুব বেশি হ'লে পাঁচদিন দেখেছি কি না সন্দেহ । মদের আসরে পাজি ওঁদের দেখেছে প্রায় প্রত্যেকদিন এবং বাজারে জ্ঞানদা শ্রীমতী উপ-রাজদূতকে দেখেছে দিনে তিনবার । ভারত সরকারের তে-রঙা ওড়ানো প্রকাণ্ড মারসিডিজখানা তিনি নিজের ব্যক্তিগত এবং একচেটিয়া সম্পত্তি ক'রে ফেললেন । হিসেব করলে অবশ্যই দেখা যাবে বনীয়-দম্পতিকে আনা, থাকা আর গাড়ির পেট্রোল খরচায় ভারত সরকার বেশ মোটা টাকা ব্যয় করেছেন—যার মোটা অংশ ওঁরা উসুল করেছেন মদের আসরে । করুন, ভালো কথা কিন্তু ফরেন এক্সচেঞ্জ ? থাক গে ও প্রসঙ্গ । লিখতে বসেছি বার্লিনের কথা ভারত সরকারের ভণ্ডুল কাহিনী বলতে গেলে ইতিহাস হ'য়ে যাবে ।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন হ'ল কংগ্রেস হল-এ । বহু মাইল বিস্তৃত কাননের এককোণে রাশিয়ান যুদ্ধ-স্মৃতিসৌধের প্রায় উলটো দিকে এই হলটা আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ারদের অক্ষয়কীর্তি এবং মার্শাল এডের অমর দান । আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের এবং অপূর্ব পরিপূর্ণতা পৃথিবীর আর কোথাও দেখি নি । শোনা যায় এটা তৈরি করতে লেগেছে তিন বছর আর তিন কোটি টাকা । বলা বাহুল্য, দু'টোই সার্থক ।

হল-প্রাঙ্গণে পৌঁছোনো গেল ঠিক সাতটায় । সঙ্গে অসমীয়া মুগার লুঙ্গি, চাদর-পরা কাকাতি মেমসাহেব, মধ্য-দেশ অগ্রবর্তী পাজি আর ক্ষীণাঙ্গী রুথ । আজ ওর পোষাকের বাহারে এবং মনের প্রসন্নতার সৌন্দর্যের বন্যা নেবেছে । আজ ও ঠিক দো-ভাষী নয়, একাগ্রভাবে অনন্যাসুন্দরী নারী ।

প্রাঙ্গণের চারিদিকে ফোয়ারা । আকাশ-ছোঁওয়া জলধারার ওপর রামধনুর রং, তারই পাশ দিয়ে ক্যান্টিলিভার সিঁড়ি । ওপরে আবার প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ । তারই মাঝখানে পুরো ঘসা কাচের মাজা হল, গোল হ'য়ে ওপরে উঠছিল, কে যেন বাঁকা থাবড়া মেরে ওপরে ওঠা থামিয়ে দিয়েছে মাঝপথে । ফলে, ছাদটা অদ্ভুত এক এলোমেলো ছন্দে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে । ভেতরটা তিনভাগে বিভক্ত । একধারে অল্প নীচু খাবারের জায়গা, মাঝখানে সিঁড়ি উঠে স্লোপ নেবে হল, আর ওধারে, দোতালার মাঝামাঝি মদ্যপানের আসর আর ব্যাণ্ডের রোশন-চৌকি । হল-এ অতি আধুনিক বসবার কেদারা, প্রত্যেকটির সঙ্গে কানে-আঁটা ইয়ার প্লাগ । ছবি যে দেশেরই হোক আর বক্তৃতা যে-কোন ভাষায়, ঐ ইয়ার প্লাগের সাহায্যে জার্মান, ইংরেজি আর ফরাসী ভাষায় তার অনর্গল অনুবাদ শোনা যায় । হল-এ লোক ধরে হাজার-দুয়েক, ওধারে খানা খেতে পারে হাজারখানেক আর মদ্যপান আসরে লোক ধরে তা-ও হাজার । ছাদটা ঠিক কাচের নয়, কিন্তু তা হ'লেও আকাশ দেখা যায়, হাত বাড়ালে হয়ত' বা তারাগুলো ছোঁওয়াও যায় । আলোর ব্যবস্থা অল্পও নয়, অতিরিক্তও নয় ।

প্রথমে শিল্পী-পরিচিতি । কাকাতি মেমসাহেব নাচতে নাচতে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে মঞ্চে উঠলেন । ওঁর আগে আছেন ক্যারি গ্রাণ্ট, আনা সাইয়ানি । পেছনে হ্যারল্ড লয়েড, মেল ফেরার । মাঝখানে মেমসাহেব একেবারে চিঁড়ে চ্যাপ্‌টা । পায়ে প্রকাণ্ড

ফোস্কা, চেহারায় পর্যাপ্ত নার্ভাসনেশ। কথায় ভাষা জোগালো না, ইংরেজি তো নয়ই, অসমীয়াও আটকে গেল। কোন গতিকে হাতটা কপালে ছুঁইয়ে দে দৌড়। মঞ্চ থেকে নাবতে গেলে যে তিনটে সিঁড়ি পড়ে সে খেয়ালও নেই। ফলে, উল্টে একেবারে ক্যারি গ্রাণ্টের কোলে। পাজির ধারণা পড়াটা ইচ্ছাকৃত। আমার মনে হয় না।

পরিশেষে বার্গো মাস্টারের বক্তৃতা। বার্গো মাস্টার মানে লর্ড মেয়র। জর্মানির শাসন-ব্যবস্থায় উনিই হলেন বার্লিনের অধিপতি—অর্থাৎ পদমর্যাদা-বিধান একীভূত। আজকের ছবি ফ্রান্সের সৃষ্টি, নাম 'লে জুঁ দাঁ লামোর' বাংলায় মোদ্দা মানে দাঁড়ায় 'ভালোবাসা'। প্রদর্শনী-সমিতির মতে (জুরীর নয়) এইটাই বছরের সেরা ছবি। ছবির শিল্পিচাতুর্য যেমনই হোক নৈতিক অর্থ দাঁড়ায় বাংলা প্রকাশকের, নতুন লেখকের লেখা প্রথম উপন্যাসের মতন। মানে, আগে বই বাজারে বের হোক, লোকে পড়ুক তারপর পয়সা! ছবির নায়িকার হঠাৎ একদিন মনে হল বিয়ে না করলে নারীজন্মই বৃথা। অথচ মনের মতন উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছেন না। অগত্যা তিনি ঠিক করলেন, আগে বিয়ে করবেন না, পরীক্ষামূলকভাবে ঘর করবেন, মা হবেন, তারপর যে ছেলেটিকে মনে হবে তাঁর স্বামী এবং তাঁর সন্তানের পিতা হবার উপযুক্ত তাকে বিয়ে করবেন। তাঁর সন্তানের পিতা কে সেটা বড় কথা নয়।

ছবির শেষে প্রচণ্ড হাততালি। শ্রীমতী পাকোয়াসার মতে এমন ছবি জীবনে দেখেন নি!

খাবার প্রাঙ্গণে বুফের ব্যবস্থা! দেড় হাজার লোক লাইন দিয়েছে দশহাত টেবিলের ধারে। প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম প্রায় পঞ্চাশ মিনিট। আমার পেছনে রুথ। এগুলাম এক পা। আরও তিন কোয়ার্টার আরও এক পা। আধঘণ্টা আবার স্থির। রুথের সহকর্মিণী এসে সংবাদ দিল ওধারে কাড়াকাড়ি পড়েছে।

রুথ হেসে বললে, 'খাবার চাও তো লাইন ছাড়।'

সাদা চামড়া কায়দায় অগোছাল হ'লে লোকে বলে 'বোহেমিয়ান আর্টিস্ট'। কালো চামড়া অনুরূপ করলে লোকে বলে 'আন্‌কালচার্ড নেটিভ!' ইতস্তত করছি ইতিমধ্যেই দেখি দূরে খাবারের টেবিলে বেয়াল্লিশ দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। আমাদের হাতের প্লেট হাতেই রইল।

পাজি আর কাকোতির খোঁজ নেই। রুথকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে গিয়ে দেখি জাপানী দলের সঙ্গে ওরা জমিয়ে বসেছে। প্রশ্ন করি—
'খাবি না?'

'খেয়েছি।'

'কি?'

পাজি হাসে আর জ্ঞানদা মিট্-মিট্ ক'রে আলতোভাবে নির্বাক চেয়ে থাকে। বোঝা গেল ব্যাপারটা। আমরা নীচে দুর্ভিক্ষের দলে পড়েছি আর ওরা ওপরে বন্যায় ভেসেছে। জাপানী-নায়িকার ধার ঘেঁষে বসলাম। লাল রঙের কিমোনোতে হলদে রঙের বড় বড় ফুল। হাত দু'টো চওড়া আস্তিনের মধ্যে লুকোনো। আমি মাথা নীচু ক'রে অভিবাদন জানাতেই মহিলা অধোবদন হলেন।

...সুন্দরী। নাকটা অতখানি বোঁচা না হ'লে বলতাম পরমাসুন্দরী। চোখ দু'টো ওপরে উঠে ইনফিনিটিতে মিলিয়ে গেছে। খানিকটা ভগবানের হাত, বাকিটা ওঁর নিজের। আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল চেহারায়; চালে ও চলনে চাকচিক্যের অভাব। রং ধবধবে ফর্সা, ফ্যাকাশে নয়। পাশাপাশি বসলেও মনে হয় মানুষ নয়। মোমের পুতুল।

নারী-পুরুষের কথোপকথনের বহুবিধ ভাষা। প্রথম কথা বলে চোখ। চেয়ে দেখি মেয়েটি হাসছে। আমিও হাসলাম। রুথ ইতিমধ্যে কোথা থেকে একপ্লেট কেক আর আইসক্রিম এনে হাজির করল। প্লেটটা নিতে গিয়ে আঙুলে-আঙুলে অল্প ছোঁওয়া লাগে। ওটা দ্বিতীয় ভাষা। সুস্পষ্ট অথচ নির্বাক। চোখ তুলে দেখি রুথ নিষ্পলক তাকিয়ে আছে।

জ্ঞানদা বললে, 'চলুন হোটেলে ফিরি।'

পরদিন সকালে স্টল উদ্‌ঘাটন। সে-ও এক পর্ব। দেশে যখন আসার জন্য তোড়জোড় করছি ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে খবর এল ওখানে আমাদের একটা স্টল দেওয়া হয়েছে। আরও জানা গেল দৈর্ঘ্যে সেটা বারো ফুট, প্রস্থে আট। জানি মার্কিনী আর ফরাসী চাকচিক্যে আমরা পাত্তা পাবো না তাই স্টল সাজানোর জন্যে এনেছিলাম আমাদের গ্রামীণ শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সঙ্গে ছিল ধানের শীষ, কুলো, শাঁখ। আসামের মাতলা, সাঁওতালদের কুনকো, বাঁকুড়ার ঘোড়া, জয়পুরের হাতী, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল। সাজাতে গিয়ে দেখি ভারত সরকার যেটাকে স্টল বলেছেন, আসলে সেটা চটের দেওয়াল। মনে পড়ে গেল যুদ্ধকালীন ছোট্ট কাহিনী।

সেনাধ্যক্ষ লর্ড ওয়াভেল মধ্যপ্রাচ্যে গেছেন সেখানে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনে। ঘণ্টাখানেক দেখাশোনার পর সাহেব মহাখুশি। এক শিখ সর্দারকে প্রশ্ন করলেন—'সব ঠিক?'

প্রকাণ্ড স্যালুট মেরে সে উত্তর দিল—'জি!'

সাহেব সদয় হ'য়ে প্রশ্ন করলেন—'কুছ মাংতা?'

'জি হ্যাঁ। দাঁতন।'

সাহেব বললেন—'ঠিক হ্যায়। মিলেগা।'

দেশে ফিরে ওয়াভেল সাহেব হুকুম দিলেন মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় সৈনিকদের জন্য ড্যান্‌টন্ পাঠাও কম করে একলক্ষ। পাঠাও তিন দিনের মধ্যে। সারা সরকারিমহলে সাড়া প'ড়ে গেল। ড্যান্‌টন্ কি? পুরো আর্মিদপ্তর জুড়ে বৈঠক বসল। ঘাঁটো ফাইল, আনো যুদ্ধবিদ জিজ্ঞেস কর স্পেশ্যালিস্টদের, তার পাঠাও মধ্যপ্রাচ্যে। ড্যান্‌টন্ কি জিনিস? তিনদিনের জায়গায় তিন সপ্তাহ কাটল তবু 'ড্যানটন' রহস্য আর উদ্‌ঘাটিত হয় না। কলকাতায় এক বাঙালী ব্যবসাদার তাক বুঝে দর হাঁকল! বললে—'আমি দেব ড্যানটন। দাম, প্রত্যেকটা চোদ্দ আনা।'

সাপ্লাই দপ্তর মহাখুশি।

একলক্ষ ড্যান্‌টনের জন্য লাগল দু'টো নিম গাছ।

ভারত সরকার হাত বদলেছে ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধির বহর বদলায় নি। ধোপার কাছেই থাকুক আর সার্কাসেই থাকুক—গাধা গাধাই

থাকবে! কোথায় স্টল আর কোথায় চটের দেওয়াল! তবু সাজানো হল, একেবারে খাঁটি গ্রামীণ পন্থায়। ঝাঁটা থেকে আরম্ভ ক'রে ঘট, কলাপাতা, ডাব পর্যন্ত। ঐ ঘর সাজানোর সামগ্রী আর পদ্ধতির ওপর টেলিভিসন অনুষ্ঠান হল তিনটে। বার্লিন থেকে, ইতালী থেকে আর লণ্ডন থেকে।

আমাদের ছবি দেখানো হল ১লা জুলাই রাত দু'টায়, প্রদর্শনীর প্রধান প্রেক্ষাগৃহে।

হলে তিলধারণের জায়গা নেই। তিন ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি। ভাঙা ক্যামেরায়, অল্প অর্থে, ছোট্ট ছবি। আমাদের পুরো ছবির যা খরচ, যে-কোন য়ুরোপীয় দেশে ঐ টাকায় একজন শিল্পীও মেলে না। আমাদের অভিনেতা অভিনেত্রী সবই আনকোরা নতুন! লেখকের পেশা ডাক্তারি, নায়কের পেশা গো-পালন!

দাম পেলাম আদর্শের। প্রেক্ষাগৃহ কেঁপে উঠল হাততালিতে। আমাদের হাত কাঁপল অটোগ্রাফের তাগিদে। লিখলাম তিনটি কথা—'সত্যম শিবম্ সুন্দরম্'।

আমাদের ছবির বক্তব্যও যে তাই।

সত্যম, শিবম্ সুন্দরম।

যেদিন প্রথম ওঁঙ্কারধ্বনি উঠেছিল মানুষের কণ্ঠ থেকে সেই সত্যযুগের প্রথমারম্ভ থেকে আজও পর্যন্ত মানুষ সর্ব দেশে, সর্ব কালে, সর্ব ভাষায় ঐ একই কথা বলতে চেয়েছে তার সাহিত্যে, কবিতায়, তার বাঁচার আনন্দে।

সত্যম শিবম সুন্দরম।

শুধু এইটুকুই ছিল আমাদের বলার কথা। ছোট্ট ছবির ছোট্ট গল্প আরও ছোট্ট পরিধির মধ্যে—পৃথিবীর সব মানুষ এক। সব মানুষ সমান। পৃথিবীতে একটিই শিশু। তার নাম সর্ব-শিশু। পৃথিবীতে একটিই মানুষ তার নাম মানুষ। পৃথিবীর একটিমাত্র আদর্শ।

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

আনন্দের আতিশয্যে পাজি সকলকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল চীনা রেস্তোরাঁয়। খাওয়াবে। সবাই খেল। শ্রীমতী কাকোতি গিলিলেন গোগ্রাসে। রুথ আমাদের সঙ্গ নিল। আজ ওকে বলতে হল না, ডাকতে হল না, নিজেই বললে আসবে। সে দু'-একদিন আমাদের সঙ্গেও চীনা রেস্তোরাঁয় গেছে, ভাতের প্লেট সামনে নিয়ে নাড়াচাড়াই করেছে, খুব একটা খায় নি কখন। আজ ও একবারে অন্য মানুষ। সরকারি কায়দা নেই, দৃষ্টির ওপর পরম ঔদাসীন্যর মোটা পর্দাও নেই। আজ ও আমাদেরই একজন। আন্তরিকতায় ও অন্তরঙ্গতায় একেবারে ভরপুর। শ্রীমতীর কাছে হাতে খাওয়ার দীক্ষা নিয়ে, পরিমাণে পাল্লা দিল। এতক্ষণ হলের সম্বর্ধনার সুস্পষ্ট রেশ ছিল আমার কানে। রুথের আমূল পরিবর্তন সেটা ছাপিয়ে উঠল। হঠাৎ এক সময় দেখি রুথ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

হাসলাম।

রুথ আবার মন দিল খাবারে।

চারজনে পথ চলেছি। আজ আর শ্রীমতী নায়িকা ট্যাক্সির জন্য আব্দার ধরল না। মনটা ওরও বেশ খানিকটা মাতাল হ'য়ে আছে ছবির অভ্যর্থনায়। নির্জন রাত্রি। সামান্য কুয়াসার একটা আস্তরণ পড়েছে মাথার ওপর। তারই মধ্যে দিয়ে চাঁদটা দেখাচ্ছে যেন মধ্যপ্রাচ্যের যুবতী নারীর বোরখা-ঢাকা চোখ।

সারা সন্ধ্যাটা মনের মধ্যে গুনগুন করছে। সকলের পেছনে আছি সবকিছুর ঊর্ধ্বে। খাবার টেবিলের মুখরতা পথে নেবেই হারিয়ে বসেছি। সকলেই। যত ছবির কথা ভাবছি রুথের চোখ দু'টো ততই তারমধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে। হঠাৎ দেখি রুথ আমার পাশে। একমাথা সোনালী চুল একঝাঁকে ডানদিক থেকে বাঁদিকে নিয়ে ও আমার দিকে চাইল। বললে, কেমন লাগল তোমার ছবি জানতে চাইলে না?

বল। শুনি।

কিছু বলে না রুথ। হাঁটতে থাকে।

কৈ বললে না?

রাগ করবে। হাসল।

না। বল।

উদগ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা করি। ওর হয়ত খারাপ লেগেছে। আরও অনেকেরই খারাপ লেগেছে, ও এমন কিছু অনন্য নয়। তবু মনে আমার অধৈর্য প্রতীক্ষা। ও নীরব; হয়ত ভাবছে কি বলবে। আবার বলি—লেট্স হিয়ার ইট!

রুথ আমার দিকে চাইল। বললে আদর্শের আড়ালে সত্যকে গোপন করা যায় না।

কি সত্য? মানে কোন সত্য?

মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব করার যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা। সেই সত্য।

অর্থাৎ?

মানুষ সমান নয়। প্রভুত্বটাই সহজ সত্য। যুগে যুগে সভ্যতার ইতিহাস মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বেরই ইতিহাস। শিক্ষিত চায় অশিক্ষিতের ওপর প্রভুত্ব। পুরুষ চায় নারীর ওপর প্রভুত্ব, ধনী চায় দরিদ্রের ওপর প্রভুত্ব। প্রভুত্বের অনন্ত সংগ্রাম চলেছে বিশ্ব জুড়ে। সেইটাই আসল সত্য। তুমি যেটা বলতে চেয়েছ, সেটা সত্য নয়, আদর্শ। মানো?

তর্কের খাতিরে না হয় মানলাম।

আদর্শের দোহাই দিয়ে সত্যকে এড়িয়ে যেতে চাও কেন?

জানি না।

আমি বলি?

বল।

জীবনকে তুমি ভয় পাও; তাই।

ওটা ছবির সমালোচনা নয়, আমার চরিত্র-বিশ্লেষণ।

রুথ হাসে। বলে, ঠিক তাই। ছবি তো বছরে বছরে আসে। দেখি। বাহবা পায় তারপর বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে হারিয়ে যায়। মানুষের বেলায় তা তো হয় না। কোন কোন মানুষের বেলায় একেবারেই নয়।

আমি কোন দলে ?

শেষের দলে।

কেন ?

রুথ হাসে। এমন জোরে যে পাজিও পেছন ফিরে তাকায় আর ছোট্ট করে বাংলায় বলে, জমেছে'!

আবার প্রশ্ন করি রুথকে, বললে না ?

কারণ তুমি শিল্প-সাধনার আড়ালে নিজেকে গোপন ক'রে রাখতে চাও, ভাই। তোমার সৃষ্টি তোমার চেয়ে বড় হ'য়ে উঠে তোমার হাত ধরেছে। হওয়া উচিৎ ঠিক তার উল্টো। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

ওটা সৃষ্টির মহিমা নয়, আদর্শের উচ্ছাশা।

রুথ একপলক কি ভাবল, তারপর বললে, আদর্শ তখনই সার্থক হয়, সত্যের ওপর যখন তার ভিত্তি।

আমি যা বলতে চেয়েছি, সেটার ভিত্তি কি মিথ্যের ওপর ?

মিথ্যে নয়, ভুলের ওপর।

থেমে আবার বলে, সার্থক শিল্পসৃষ্টি হচ্ছে সত্যের সাধনা, আদর্শের নয়।

চুপ ক'রে ভাবতে থাকি। হলের আনন্দধ্বনি কেমন যেন মিইয়ে যাচ্ছে।

রুথ আবার বলে, তোমার আদর্শ এমন সহজভাবে সাজিয়েছ এবং সরলভাবে বলেছ যে, সবাই মুগ্ধ হ'য়ে দেখেছে। যখন পরে ভাবতে বসবে তখন দেখবে যে মোহিত হয়েছে ঠিক, মুগ্ধ হয় নি।

প্রশ্ন করি, প্রভেদ কোথায় ?

একটা অনুভূতিকে নাড়া দেয়। অন্যটা মনকে জয় করে।

হোটেলের মুক্ত-প্রাঙ্গণ। রাত বোধ হয় দুটো। কয়েকটা ট্যাক্সি অন্ধকারে মিটমিট করছে। বেল-বয় সজাগ আগ্রহে অপেক্ষা করছে আমার ঘরের চাবিটা নিয়ে। ওদের সকলকে কুঁচের মধ্যে হাতীর দাঁতের এতটুকু হাতী মুক্তহস্তে দান করেছি বলে, আমার 'দেখাশোনার দায়িত্বের জন্যে ওদের মধ্যে হাতাহাতি লেগেই আছে।

কাচের দরজায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালো রুথ। ওর নীলাভ চোখের ভাষা নীরব কিন্তু অস্পষ্ট নয়। বললে—ধর আমরা।

হেসে বলি, ধরলাম।

তুমি কি ভাব তুমি আর আমি সমান।

হ্যাঁ।

নো। নেভার।

থেমে আবার বলে, এখন যদি আমি উঠে যাই ওপরে, তোমার ঘরে, তুমি ঠিক চাইবে আমার ওপর তোমার প্রভুত্ব।

হেসে বললাম—এসো।

পাজি শুনছিল। বললে—মার কৈলাশ!

বিনা দ্বিধায় রুথ উঠে এল ওপরে। পাঁচতলায়। চাবিটা ওর হাতে দিয়ে বললাম—চাবিটা এনেছি আমি। খোলাটা তোমার ভার। ও আমার দিকে চাইল। চাবিটা নিল। আমি দরজার পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ওকে দেখলাম। সুন্দরী, তাতে সন্দেহ নেই। ভেতরে বিছানাটা পরিপাটি ক'রে সাজানো। সাদা ধবধবে চাদরটা আরামের আমন্ত্রণ। সটাং শুয়ে পড়ল রুথ একদম ছেলেমানুষের মতন লাফিয়ে। জুতোটা না খুলেই।

প্রশ্ন করলাম—খাবে কিছু ?

একটা সিগারেট।

ধরিয়েও দিলাম। আলোটা ওর চোখে লাগছিল। নিবিয়ে দিলাম। বারান্দার মোটা পর্দাটা টেনে সরাতেই চাঁদের একফালি আলোয় অন্ধকারটা ঝাপসা হ'য়ে উঠল। বেড-সাইড টেবিলের ওপর ছোট্ট চকোলেট ছিল। ওকে দিলাম। বললাম—আরাম ক'রে শোও।

জুতোটা ও পায়ে পা দিয়ে খুলে ফেলল। সোফায় ব'সে আমি মাঝে মাঝে শুনি চকোলেটে কামড় দেওয়ার শব্দ আর সিগারেটের বিন্দু আলোয় দেখি ওর সাদা ধবধবে মুখখানা বালিশের সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে গেছে। চুলের লাইন টেনে চেহারা খুঁজতে হয়। হাতঘড়ির টিক্-টিক্ শব্দও কানে আসে।

রুথ বলে, দূরে থেকে দায় এড়াচ্ছ ?

আমি বলি, কাছে গেলে ঘেঁষাঘেঁষি হবে।

রুথ দুষ্টুমির সুর টেনে বলে—আগুনের ওপর পা ফেলে হাঁটে অথচ পা পোড়ে না এমন মানুষ নাকি তোমার দেশে আছে ? সত্যি ?

ওর পাশে শুতে শুতে বলি—আছে। সত্যি।

তিনটে বাজল।

চারটে বাজল।

ঘুম থেকে উঠে দেখি আটটা বেজেছে। রুথ নেই পাশে। চ'লে গেছে। বালিশের ওপর ওরই মাথার কাঁটা দিয়ে গোঁজা একটা চিঠি। ছোট্ট।

'আটটায় ডিউটি। চললাম। আদর্শ ভালো কিন্তু তার দম্ভ ভালো নয়। এরজন্য হয়ত একদিন জীবনের সবকিছুই তুমি হারিয়ে বসবে।'

—রুথ

আজ লিখতে ব'সে মনে হচ্ছে সেদিন যদি রুথের কথা শুনতাম তা হ'লে জীবনের অনেক কিছুই হয়ত হারাতে হোত না। সন্তানদের তো নয়ই। রুথের সঙ্গে আর কখন আমার দেখা হবে না, হলে ওকে জানাতে পারতাম যে ওর কথা না শুনে জীবনের অনেক কিছু হারিয়েছি ঠিকই, কিন্তু সে হারানোর জন্যে আমার কোনই বেদনাবোধ নেই। যা হারিয়েছি সেটা আদর্শের মুগ্ধতায় নয় বিশ্বাসের মূর্খতায়।

সোনার পাথর বাটি

ইংরেজ যখন কিছু চায় তখন কনফারেন্স ডাকে আর বৈঠক বসায়। ফরাসীরা যখন কিছু চায় তখন তর্ক করে, আমেরিকা যখন কিছু চায় তখন ডলার ছড়ায় আর জার্মান যখন কিছু চায় তখন করে যুদ্ধ। গত পঞ্চাশ বছরে এইটাই ইতিহাসের মূল কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের কথা জানি না, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, ইংল্যাণ্ড চাইল শান্তি অতএব ডাকল কনফারেন্স এবং র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে ছাতা বগলে পাঠালো বৈঠকে আলোচনা

করতে। ফ্রান্স চাইল যুদ্ধ থেকে মানে মানে সরে পড়বে এবং তর্কে জিতে ওরা প্যারিসকে করল মুক্ত শহর। জার্মানী চাইল বিশ্বব্যাপী রাজত্ব—অতএব ঝাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধে। শেষ পর্যায়ে এসে দেখা যাবে আমেরিকা যুদ্ধজয় করেছে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে আর শান্তি এনেছে মার্শাল এডের ডলার ছড়িয়ে।

প্রথমে ধরা যাক জার্মানীর কথা।

সবাই জানেন যুদ্ধটা হচ্ছে শক্তির পরীক্ষা। তারা উচিত দুর্বলের। কিন্তু পর পর দু'টো যুদ্ধে দেখা গেল জয়লাভ করেছে বানিয়া আর ডলার। এই ব্যাপারটা জার্মানী ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তাই বাধ্য হয়েই ওরা যুদ্ধের কথা বাদ দিয়ে এখন বুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছে। ওরা ঠিক করেছে বুদ্ধি দিয়ে বড় হবে এবং দরকার হ'লে রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে লড়বে।

এই বুদ্ধি দিয়ে বড় হবার প্রথম ও প্রধান সোপান হচ্ছে আমেরিকার মার্শাল এডের পূর্ণ সুযোগ নেওয়া এবং বলা নিতান্তই বাহুল্য যে ওরা সেটা নিচ্ছে শুধু নিচ্ছে না, দু' হাতে নিচ্ছে। লুঠে নিচ্ছে। কিভাবে যে নিচ্ছে সেটা সঠিক বুঝতে গেলে যুদ্ধের ঠিক পরে বার্লিনের অবস্থাটা যে কি হয়েছিল সেটা আগে বোঝা দরকার। সেটা বোঝা সহজ হবে একটা ছোট্টগল্প থেকে। এটা ওখানকার অনেকের মুখেই শুনেছি।

গত মহাযুদ্ধে এক অন্ধকার রাত্রে বৃটিশ প্লেন বোমা ফেলতে এলো বার্লিনে। তার আগে এত বোমা ওরা ফেলে গেছে যে, আর বোমা ফেলে ভাঙবার বার্লিনে কিছু বাকি নেই। এক বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বলল,—'বেচারা ইংরেজ !···এবার বোমা ফেলে যদি বাড়ি ভাঙতে হয় তো বোমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িও ওদের আনতে হবে!'

সে-হেন বার্লিনকে আজ দেখলে আর চেনা যায় না। শহরের বাইরে মাঠের পর মাঠ প'ড়ে আছে, কিন্তু ধ্বংসস্তূপ নেই। যেখানে বাড়ি ছিল সেখানে আজ ইমারত উঠেছে। যেখানে ইমারত এখনও ওঠে নি সেখানে ঐ ভাঙা-বাড়িই এমন চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে যে, দেখলে মনে হয় ঐ ভাবেই বুঝি বাড়িটা তৈরি।

বার্লিনের কুডামে (কুরফারস্ট্যাণ্ডামে) এই সবেরই অদ্ভুত সমন্বয়। প্রকাণ্ড চওড়া পথের দু'ধারে প্রাসাদ-প্রমাণ নতুন নতুন বাড়ি। যেখানে বাড়ি হয় নি সেখানে হয় সাজানো বাগান আর না হয় সাজানো ভগ্নস্তূপ। ওপর তলায় খুঁজলে পাথরের তলায় এখনও দু' একটা মৃতদেহ হয়ত বা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নীচের তলায়, পথের ধারে দোকান সাজানোর উৎকর্ষতা আর আলোর ঝকমকানি দেখলে মরা মানুষও উঠে দাঁড়াবে। দোকানে এমন জিনিস বহু আছে যা য়ুরোপের বহু শহরে দেখি নি। রেস্তোরাঁয় অপর্যাপ্ত খাবার, মানুষের অবাধ যাওয়া-আসা। র‍্যাশনের কোন বালাই নেই (ইংল্যাণ্ডে এখনও গাড়ি র‍্যাশন, ডিম র‍্যাশন, চিনি র‍্যাশন!) কিউ'র কোন প্রয়োজন নেই, কাজের কোন অভাব নেই।

রাস্তা দিয়ে অহরহ প্রকাণ্ড মার্কিনী গাড়ি ছুটছে জার্মান নম্বর বুকে এঁটে। দু'হাত অন্তর মার্কিনী ট্যুরিস্ট ঘুরছে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে দু'হাতে ডলার ছড়াতে ছড়াতে। এককথায় বলা যেতে পারে সুখ-সুবিধায় আর ভ্রমণ আকর্ষণে বার্লিন' এবং পণ্যের শ্রেষ্ঠতায় কুডাম সারা য়ুরোপে একক ও অনন্য। বলা নিষ্প্রয়োজন এ সবই এত সহজে, সুষ্ঠুভাবে এবং তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়েছে মার্শাল এডের মাহাত্ম্যে আর জার্মান জাতির কর্মতৎপরতায়।

সব দেখেশুনে পাজি বললে, দাদা, আমাদের দেশে এসব হয় না?

শ্রীমতী নায়িকার বুদ্ধি ব্লেডের চেয়ে ধারালো; বললে, খুব হয়। সহজ রাস্তাও আছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করি। হারবো তো জানা কথা। ব্যস্ তা হলে ওরাও আমাদের এইভাবে পুনর্গঠনে সাহায্য করবে!

পাজি প্রাণখোলা হাসে, বলে, ঠিক।

রুথ কম কথা বলে। আস্তে বলল—আর যদি আমেরিকাকে আপনারা হারিয়ে দেন? আসলে শ্রীমতী নায়িকার (অন্যান্য সব ব্যাপারের মতন) এটা ভুল ধারণা। শুধু মার্শাল এডের জন্য এটা সম্ভব হয় নি। হয়েছে জার্মানদের জন্য। এইটাই ঐ জাতটার বৈশিষ্ট্য। যা করে তার শেষ রাখে না। যুদ্ধ করল তো দেশের শেষ রাখল না। জু মারল তো ষাট লাখ, এখন মার্কিনী ডলার নিচ্ছে তো বার্লিনকে বানাচ্ছে নিউইয়র্কেরও বাড়া। আর শেষ রাখে নি হিটলারের এবং নাজীদের।

বার্লিন যাবার আগে আমার অত্যন্ত জানবার কৌতূহল ছিল হিটলার সম্বন্ধে আধুনিক জার্মানীর মতামত কি। কথাপ্রসঙ্গে রুথকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্রশ্ন শুনে আমার দিকে ও এমনভাবে তাকালো, মনে হল যেন হিটলারনামীয় কোন ব্যক্তি, কোনকালে কোথাও যে ছিল তার খবরই ও রাখে না। প্রশ্নটা ক'রেই মনে হয়েছিল হয়ত ও খানিকটা অপ্রস্তুত হবে। ওর ভাবগতিক দেখে অবাক হলাম আমি। তখনই মনে মনে ঠিক করলাম আর নয়। আর কাউকে এ প্রশ্ন করা হবে না। যদি সম্ভব হয় হিটলারের অস্তিত্ব নিজেই খুঁজে বের করব।

পারি নি। জার্মানীর বড় বড় শহর ঘুরেছি, হামবুর্গ, স্টুটগার্ট, মুনিস্, ডসেলডর্ফ, ড্রেসডেন। ছোট শহরে গেছি, ফ্রাইবুর্গ, ব্যাডেন-ব্যাডেন, বন, রেস্; গ্রামাঞ্চলে ঘুরেছি, টিটিজি, ড্রাসডেনফেল্স কিন্তু কোথাও হিটলারের ছবি তো দূরের কথা নামোল্লেখও শুনি নি। কথাপ্রসঙ্গে আমি যদিও বা নামটা বলেছি, অপরপক্ষ গা-ঝাড়া দিয়ে সেটা এড়িয়ে গেছেন।

শুধু হিটলারকেই জার্মানী ভোলে নি। তাঁর কুকীর্তির প্রতিবিধানে অন্য যে সব দেশ ওদের বিরুদ্ধে হাজারো কুকীর্তি করেছে সেগুলোও ওরা ভুলেছে। সারা পৃথিবী একজোট হ'য়ে ওদের দেশ ধ্বংস করেছে; যুদ্ধ অপরাধের জন্য শাস্তি দেবার অজুহাতে ছোটবড় বহু দেশকর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে; রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা ওদের বুকের ওপর ব'সে আজও অবাধে প্রভুত্ব করছে এবং আজ কেনেডি এবং ক্রুশ্চেভ ওদের নিয়ে ক্ষমতার জুয়াখেলা খেলছেন,—এসবই ওরা বেমালুম ভুলে গেছে। শুধু ভুলেছে বললে ভুল বলা হবে। এমনভাবে ভুলেছে এবং অন্য সবাইকে ভুলিয়েছে যে, আমেরিকা থেকে হাওয়াস পর্যন্ত প্রায় সব দেশই ধ'রে নিয়েছে গত মহাযুদ্ধের মূল কারণ জার্মানী ছাড়া অন্য সবাই। অর্থাৎ ওদের ঔদার্যের অসীমতায় অপরাধের বোঝা উঠেছে অন্য সকলের কাঁধে।

হিটলার তত্ত্ব আবিষ্কার করতে গিয়ে আরও একটা মস্তবড় ঐতিহাসিক সত্য ঐ সাতদিনেই আমি আবিষ্কার ক'রে ফেললাম। নাজী নামে কোন রাজনীতিক-সম্প্রদায় কোনদিনই জার্মানীতে ছিল না!

কোন জার্মানের কাছে এ বিষয় কোন আলোচনা যদি ভুলেও উত্থাপন করা যায়, ওরা হাসে, কাঁধঝাড়া দেয় আর সমস্ত ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এমন ভাব দেখায় যেন সমস্ত ব্যাপারটা নিতান্তই বিরক্তিজনক এবং পুরোপুরি অবান্তর। আমি ভাবতাম বুঝি এ বিষয়ে ওদের একটা অপরাধী মনোভাব আছে। ও হরি! একেবারে উল্টো। নাজী-প্রসঙ্গ তুললেই ওরা এমন-ভাবে তাকায় যে নিজেকেই লজ্জা পেতে হয়। ওদের মধ্যে যাঁরা নিতান্তই বুদ্ধিমান তাঁরা লজ্জা দেন না—ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে বুঝিয়ে দেন যে হয়ত কোন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে ও ধরণের কেউ বা কিছু একটা ছিল এ রকম কিম্বদন্তি কখন কখন শোনা যায়!

ওঁরা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ঘটিয়েছিলেন, লাখ লাখ লোক সেই যুদ্ধে মরেছে (তার মধ্যে বেশিরভাগই জার্মান!); সেই যুদ্ধে আদ্দেক পৃথিবী ধ্বংস হয়েছে (জার্মানী প্রায় পুরোটাই!), জু মেরে নির্বংশ করতে গিয়ে নতুন জাতের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু প্রশ্ন হল 'ওঁরা' কারা? ওঁরা বলতে জার্মানীর যদু-মধু শ্যাম নিশ্চয় নয়! যদুরা বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করেছে, প্রয়োজনমত আদেশ পালন করেছে আর বিপদে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছে। মধুরা কুচকাওয়াজ করেছে, হাত তুলে হেইল হিটলার বলেছে, বড়জোর দু-চারটে জু-র বাড়ি লুঠতরাজ করেছে। আর শ্যাম? ওরা হয়ত আইকম্যানের আওতায় প'ড়ে বেলসেনের গ্যাস-চেম্বারের সুইচ্ টিপেছে। তা হ'লে 'ওঁরা' কারা?—এ প্রশ্নের উত্তর ওঁরাই জানেন না, আমি তো কোন্ ছার!

হিটলার এবং নাজীতত্ত্ব আবিষ্কার করতে না পেরে খানিকটা হতাশমনেই দেশ দেখায় মন দিলাম।

রুথ বললে, চল, কাল সকালে পূর্ব-বার্লিন পরিভ্রমণ করা যাক।

দেখার কিছু আছে?

হুম্! দুর্দশা!

দেশে রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক বহু ব্যাপারে রুশী-বাঁশির সুরে সুরে নানান রকম সাপের নাচ অবশ্যই দেখেছি এবং একবার ছোবল যে খাই নি তাও নয়, কিন্তু স্বচক্ষে রুশ শাসনের নমুনা দেখার এমন সুবর্ণসুযোগ যে এত সহজে পাওয়া যাবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি। ঠিক হল—পরদিন সকাল দশটায় আমরা যাবো।

রুথ বললে, 'পাসপোর্ট সঙ্গে রেখ'। মাঝে মাঝেই ও এলাকায় পাসপোর্ট চেক হয় এবং সঙ্গে না থাকলে সরাসরি চালান দেওয়া হয়।

শ্রীমতী নায়িকা দেখেশুনে বললেন, দরকার নেই আমার গিয়ে।

আমরা গেলাম। সব মিলে জনা-কুড়ি। নানান দেশের ডেলিগেট। রুথ আমাদের রথী। ভারতীয় ডেলিগেশনের সভ্যদের মধ্যে আমি আর পাজি। আর সঙ্গে ছিলেন 'হিন্দু'র প্রতিনিধি কৃষ্ণমূর্তি। রংয়ে কৃষ্ণ হলেও ঐ মূর্তিটি একেবারে চাণক্য। ভাগ্যদোষে [illegible] এ যে সহজেই [illegible] বসে রাজ্যশাসন করতে পারত, সে বিষয় আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ওকে দেখলেই আমার ব্যাকরণ মনে পড়ে। চাণক্য আর চার্চিলের দ্বন্দ্ব সমাস হল কৃষ্ণমূর্তি। অথচ ঐ চালে ভুল ক'রে বসল বুকে ব্র্যাণ্ডেনবার্গ গেটের ছোট্ট প্রতীকটা পেন দিয়ে এঁটে। আমরা কেউই লক্ষ্য করি নি। ধরা পড়ল 'পটসড্যামের প্ল্যাটজ' পেরিয়ে রুশীয় এলাকায় প্রবেশ ক'রেই।

রুশীয় আদব-কায়দায় প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে জার্মান ভাষায় বন্দুকধারী সেপাই বললে, ফেরৎ যাও!

রুথ অবাক মানলো। নাটুকে দল নিয়ে এ অভিজ্ঞতা ওর একেবারে আনকোরা নতুন। ও অনেক বোঝালো, আমরা অনেক আবেদন জানালাম, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কেউ কথাই বলে না। আমরা হতাশমনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি—এমন সুবর্ণসুযোগ বুঝি বা বরাতের দোষেই বরবাদ হয়ে গেল।

রুথ বললে, বুঝেছি।

সোজা গিয়ে রুথ কৃষ্ণমূর্তির কোটের কলার থেকে গেটের প্রতীকটা খুলে বললে, এবার যেতে পারি?

দেখি!

প্রতীকটা রুথের হাত থেকে নিয়ে মাটিতে ফেলে তার ওপর পা দিতে যাবে, এমন সময় মূর্তিভায়া হাঁ হাঁ করে উঠল। সৈনিকটি কৃষ্ণভায়ার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে অস্পষ্ট ভাষায় যা বলল, তার মর্মার্থ হল—আর একটি কথা বললে তোমাকেও এই-ই করব।

মাদ্রাজীর বাচ্চা দমবার পাত্র নয়। বাস থেকে নেমে পড়ল। আমরা দম বন্ধ ক'রে বসে আছি। কি একটা অঘটন বুঝি ঘটে যায়। ও গিয়ে দাঁড়ালো সৈনিকের মুখোমুখি। রুথ আমার দিকে চাইল। কৃষ্ণভায়া কি বললে শুনি নি, হঠাৎ দেখি নিজেই পা দিয়ে মাড়িয়ে ওটাকে ভেঙে দিল। সৈনিকবর স-উৎসাহে ওর করমর্দন ক'রে বললে, গুট!

লজ্জায় সারাটা পথ আমি আর রুথের দিকে চাইতেই পারি নি। ওটা হল রুশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুক্ত জার্মানীর প্রতিবাদের প্রতীক।

পটসড্যামের প্ল্যাটজ-এ তিনটি এলাকা এসে মিশেছে। বৃটিশ, আমেরিকান ও রাশীয়ান। স্কোয়ারটা কিন্তু পশ্চিম-বার্লিনে। খামখেয়ালি জায়গা, ভয়ও লাগে, হাসিও পায়। এখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোর্ড লাগানো আছে। বৃটিশ এলাকায় ইংরেজিতে লেখা আছে—'আপনি এবার বৃটিশ এলাকা ছাড়ছেন।' রুশীয় এলাকায় জার্মান ভাষায় লেখা আছে—'আপনি এবার ডেমোক্রেটিক এলাকায় ঢুকছেন।' ডেমোক্রেটিক এলাকা মানে রুশীয় এলাকা, বোধ হয় রুশীয়রা ডেমোক্রেটিক বলে! স্পষ্টই বোঝা যায় ইংরেজ জনসাধারণকে সাবধান ক'রে দিচ্ছে আর রাশিয়া নিজেদের প্রচার করছে জার্মানদের কাছে। এখানে যে কোন সময় এলেই দেখা যায় বৃটিশ এবং বিশেষ করে মার্কিনী ট্যুরিস্টরা আসেন, বাস থেকে নাবেন, বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে সদলে ছবি তোলেন এবং কেউ কেউ দূরবীণ এঁটে পূর্ব-বার্লিনকে ভালো ক'রে দেখে নেন। এরপর তাঁরা দেশে ফিরে 'রাশিয়ার কবলে বার্লিন' নামে বই যে লিখবেনই, তা বলাই বাহুল্য।

বাস চলল' রাশীয়ান এলাকার মধ্যে দিয়ে।

এখানকার প্রধান রাজপথের নাম স্ট্যালিন অ্যালি। শোনা যায়—হিটলারের আমলে এইটাই ছিল বার্লিনের চৌরঙ্গি—এবং সারা য়ুরোপের ঈর্ষা! এখন এর দু'ধারে ব্যারাক বাড়ি আর নীচে দোকান। দোকানে কোন নাম নেই। ব্যবসাটা স্টেটের দায়িত্ব, অতএব প্রতিযোগিতার বালাই নেই। আলোর দরকার নেই কারণ দৃষ্টিআকর্ষণের প্রয়োজন নেই। নেবে দেখা গেল গ্লাস-কেসে কিছু কিছু জিনিস অবশ্যই আছে, কিন্তু সাজানোর শোভা নেই আর দামের মা-বাপ নেই। সবচেয়ে অবাক লাগল এই প্রধান রাজপথের দু'মাইল পথে গোণাগুণতি ন'জনের বেশি লোক দেখি নি! ছেলেবেলায় ঠাকুরমার ঝুলিতে পড়েছিলাম পাতালপুরীর দৈত্য এসে রাজকুমারীর চোখে ছুঁচ ফুটিয়ে রাজত্বের সব্বাইকে ঘুমে অচেতন ক'রে দিয়েছিল। ছেলেবেলার সেই কাহিনী রাশিয়ার হাতে কায়া পেয়েছে!

পুরো দু' ঘণ্টা ঘুরেছি ওখানকার পথে-পথে। দেখেছি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পোড়োবাড়ি (পড়ানো হয়); স্টেট অপেরা হাউসের পুড়ে-যাওয়া সামনের বারান্দা আর পড়ে-যাওয়া খিলান (অপেরা কিন্তু নিয়মিত হয়)। জার্মান রাজাদের প্রাসাদ সেখানে ছিল সেখানে রাজপ্রাসাদ নিশ্চিহ্ন করে বক্তৃতার মঞ্চ; হিটলারের প্রাসাদ যেখানে ছিল সেখানে সবুজ ঘাসের ঢিবি, গোয়েবলস, গোয়েরিং-এর ভাঙা বাড়ির দেওয়ালে বুলেটের বসন্ত দাগ; সারা এলাকায় অসংখ্য ভগ্নস্তূপ আর তাদের ওপর আগাছার জঙ্গল; দেখেছি বন্ধ দোকান, নিতান্ত মামুলি ধরণের ও প্যাটার্নের নতুন খাঁচাবাড়ি, জানলায় ছেঁড়া পর্দা, অর্ধনগ্ন শিশু, গোণাগুণতি তেইশজন মানুষ; অসংখ্য রাজনীতিক পোস্টার বেশিরভাগই রাশীয়ার বদান্যতার জয়গান—কর্মশক্তি বাড়াও, কম্যুনে যোগ দাও, দিনে তিন ঘণ্টা স্বেচ্ছায় ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার কর (না করলে জেলে যাবে আর করলে সরকারি নতুন ফ্ল্যাটের জন্য লটারীর টিকিট পাবে একশো ঘণ্টা কাজের পর।) আর দেখেছি পথের মোড়ে-মোড়ে সঙ্গীন তোলা সৈনিক।

একটাও গাড়ি দেখি নি; বাস দেখি নি, বেশিরভাগ পথেই একটাও লোক দেখি নি; একটাও রেস্তোরাঁ খোলা দেখি নি। যে কয়েকজন লোক দেখেছি তাদের প্রায় কাউকেই কথা বলতে শুনি নি। যাদের কথা বলতেও শুনেছি তাদের হাসতে দেখি নি। মরা মানুষ আগে দেখেছি কিন্তু বেঁচে থেকেও যে মানুষ মরে তা এই প্রথম দেখলাম।

দু'ঘণ্টায় দম বন্ধ হ'য়ে আসার উপক্রম। রুথকে বলি, এবার ফেরা যাক। সকলেই অস্থির, শুধু রুথ ছাড়া। রাতের অন্ধকারে যে মানুষটা বছরে একবার আসে এবং দিনের আলোয় যে মানুষটা চার বছর দেখে নি, তার পক্ষে চট্ করে ফিরে যাওয়া চারটিখানি কথা নয়। বাস এসে থামল একমুহূর্তের জন্যে এক জনহীন পথে—প্রকাণ্ড ভাঙা ফ্ল্যাট-বাড়ির তলায়। দোতালায় ওর বাবা-মা থাকেন। পথের ধারেই যে ঘর সেইটাই ওর বাবার। জানলাটাও খোলা; তবু রুথের সাহস হল না বাস থেকে নাবে, বাবা বলে ডাক দেয়। বাসের জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে বাড়িটা একবার দেখে নিয়ে রুথ বললে—চল।

ওর ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাসের টানা শব্দটাও মনে হল যেন অন্তহীন আর্তনাদ।

আমার মেয়ে কি করছে? আজ রবিবার, দেশে এখন বেলা পাঁচটা। বোধ হয় গানের ক্লাস আরম্ভ হল। সংসারে আমার ফাটল ধরেছে এ খবর তো আমার জানা। যে আবর্তে ওর ভবিষ্যৎ হারাবে এইটাই আমার ভয়। ভবিষ্যতের ভাবনায় নিজেকে খানিকটা হারিয়ে ফেলি।

রুথ তখন রুমালে চোখ মুছছে। [ক্রমশ।

সনেট

(মাইকেল ড্রেটন)

শ্রীমতী জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়

আর কোনো পথ নেই, তবে নিই চুম্বনে বিদায়।
আহা, রিক্ত আমি আজ, আর কিছু পারবো না দিতে:
অথচ খুশিই তবু—খুশির উজান এ হিয়ায়
এতদিনে অবসর! আহা, পূর্ণ খুশি আমি মিতে।
শেষবার হাতে হাত রাখো, ওগো সব প্রতিজ্ঞাই
ভুলে যাও। ফিরে যদি হয় পুনঃ আমাদের দেখা
জেনো কারো কপালের লিখন সে বিধি অভিজ্ঞতাই—
অথবা উত্তর-প্রেম-প্রণয়ের ফলশ্রুতি রেখা।
এখন প্রেমের এই গঙ্গাজলী বালির শয্যায়
দেখেই ইচ্ছারা বোগ; নাভিশ্বাস উপস্থিত হলো
মরণের মুখোমুখি—তীব্র ইচ্ছা—বিকল—লজ্জায়
প্রার্থনার নিষ্ঠা ব্যর্থ; কি সারল্যে পারো যদি বলো
এখনো অভীপ্সা যদি। জাখো, কোনো আশা নেই, জানি।
তুমি পারো না কি মিতে শোনাতে সে জীবনের বাণী?

কেউ কি দেখে নি তাকে

সুকুমার ভট্টাচার্য

কেউ কি দেখে নি তাকে যখন একান্তে রক্ত ঝরে,
মাঠ বন সমুদ্রের অন্তিম হৃদয়ে নীল পাখি
ডেকে যায়। হিঙ্গুল পলাশ তার অস্তিত্বের বিজনে একাকী—
যখন ঝরায় ফুল রোদে নোওয়া ধূসর প্রান্তরে।
কেউ কি দেখে নি তাকে···ওলো সখি সন্ধ্যা হয়ে এলো—
এই বলে মিলিয়ে যায় নক্ষত্রের মতো নিরুপমা
সন্ধ্যার শরীরে। যেন অবগাহনের দৃশ্যে ছড়ায় নির্জন রক্তজবা—
পশ্চিম পাড়ায়। প্রত্যহ ভোরের স্মৃতি সন্ধ্যার শরীর
ছুঁয়ে আসে, ওলো সখি কান্দিতে পারি না আমি আর···
ফিরে চল···এই বলে কার্তিকের ভোরের মতন শান্ত ধীর
দু' হাতে কঙ্কণ নেড়ে চলে যায় প্রসন্ন সংসার।

আমি তো দেখেছি তাকে চোখ তার কান্নার শিশিরে
ভেজা। আমাদের রৌদ্র শীত ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনন্ত শরতে
চলো ফিরে,—এই বলে বিহ্বল রাত্রে কখনো অস্থিরে
নূপুর বাজিয়ে গেল···গেল রৌদ্রে, মিছিলে পর্বতে।

আত্মহত্যা ও প্রেম

সুধাংশু চৌধুরী

আজকাল সংবাদপত্রে তরুণীদের আত্মহত্যার খবর প্রায়ই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর এই আত্মহত্যার মূলে যে কারণটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে—সেটা হলো প্রণয়। প্রণয় আজ নর-নারীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রেম-জীবনে নানা অভিঘাতের দরুন আত্মহত্যার হিড়িক পড়েছে এবং সেই আত্মহত্যার দিকে পুরুষের চাইতে মেয়েরাই অগ্রণী। পুরুষের চাইতে মেয়েরা কেন অগ্রণী ? মধুমিলনের বার্তা যেখানে যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষকে 'প্রেম ও প্রীতির মধুনির্ঝরে আনন্দময় করেছে, আজ সেখানে জীবন বিসর্জনের পালা কেন ?

সাধারণ দৃষ্টিতে এই আত্মহত্যার কতগুলো কারণ পাওয়া যায়। সে কারণগুলোর পশ্চাতে রয়েছে আত্মহত্যার পটভূমি। নিম্নে সে ধরণের কতগুলো কারণ উল্লেখ করলাম :

এক : প্রেম-জীবনে ভুল বোঝাবুঝির জন্য সংসার-জীবনে বা সংসার গড়ার পূর্বেই একটা বিতৃষ্ণা আসতে পারে। তার ফলে নায়িকার মনের সমস্ত আশা বা স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তখন সে প্রেমতিক্ত পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাকে অর্থহীন মনে করে। পৃথিবীর মুহূর্তগুলো তার কাছে তিক্ত আর বিষবাষ্পে ভরা বলে মনে হয়। সে ব্যর্থতার জ্বালা নিয়ে বেঁচে থাকাটা যখন তার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠে, তখন পৃথিবীর বুক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়। সরিয়ে নেয়।

দুই : অনেক সময় প্রেমটা হয় এক পক্ষের। প্রেমিকা প্রেমিককে অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছে, নায়ক ভালোবাসে নি বা ভালোবাসতে পারে নি, একটা দৈহিক আকর্ষণে শুধু ফালতু প্রেমের অভিনয় করেছে দিনের পর দিন, আর যখনই সেটা প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে প্রেমিকার চোখে, আশা প্রবঞ্চিত হয়েছে, তখন প্রেমিকা দিন-রাত্রির অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে বেঁচে না থেকে মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে জেনেছে—জানে।

তিন : উভয়ের নিবিড় অন্তরংগতার ফলে প্রেমিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। প্রেমিককে বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে শুরু করে। তা ছাড়া উপায় কি ? নায়ক সামাজিক মর্যাদার ভয়ে বা আর্থিক সংকটের দরুন বা প্রেমিকার কাছে এতদিন ধরে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রাসাদচুম্বী যে লেকচার দিয়েছে, তার আসল রূপ প্রকাশ হবার ভয়ে অলক্ষ্যে সরে পড়ে। প্রেমিকার কথা ভুলে যায়। সে অবস্থায় নায়িকা কি করতে পারে ? তার যদি পারিবারিক মর্যাদা থাকে, পারিবারিক সংস্কার থাকে তবে পরিবারের মর্যাদা ও সংস্কারকে রক্ষার জন্য, নিজের ব্যর্থপ্রেমের জ্বালাকে জুড়োবার জন্য মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। যারা রুচিশীলা তারা কোনদিন অপারেশন বা অসামাজিক জীবনযাত্রাকে বেছে নিতে পারে না। তাই মৃত্যুকে তারা সবচেয়ে বড়ো আপনজন বলে মনে করে।

চার : আর্থিক সংকট প্রেম-জীবনে আত্মহত্যার আরো একটি মুখ্য কারণ।

পাঁচ : একদিকে অসবর্ণে প্রণয় অন্যদিকে পারিবারিক গোঁড়ামি প্রেম জীবনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

ছয় : বিবাহিতজীবনে আত্মহত্যার কারণ ঘটে পরস্পরকে জানাজানিতে ভুল করার দরুন। ভালোবাসার গোড়াপত্তনের পর থেকে নারী-পুরুষে উভয়ে উভয়ের গুণগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ব্যক্তিগতজীবনে কারো কোন দোষ বা অপরাধমূলক কিছু থাকলে তা চাপা পড়ে থাকে ভালোবাসার পেপার-ওয়েটের নীচে। বিয়ের পর নানা পরিস্থিতির মধ্যে বা সাংসারিক-জীবনের নানা বিপর্যয়ের মধ্যে সে দোষগুলো প্রকটিত হয়ে উঠে। ভালোবাসার জীবনে উভয়ে উভয়ের রূপ-রস-গন্ধ-গানে যতটুকু আকৃষ্ট হয়েছিল, বিয়ের পর প্রকটিত হওয়া দোষগুলোর প্রতি নিকৃষ্ট ধারণা নিয়ে ততখানি আকৃষ্ট হয় এবং সেটা সংক্রামক ব্যাধির মতো মনকে ঘিরে থাকে। তারপর তর্ক-বিতর্ক ঝগড়া-ঝাঁটি সংসার-জীবনকে বিষিয়ে তোলে। নারী বলে—এমন জানলে, এমন ছোট মনের পরিচয় পেলে কখনো তোমায় বিয়ে করতাম না। তুমি একটা জঘন্য। পুরুষ বলে—তুমি এমন নীচ মনোবৃত্তির মধ্যে থাক জানলে কখনো তোমার ছায়া মাড়াতাম না ইত্যাদি। তার ফলে ঘটে ডাইভোর্স, আত্মহত্যা। আত্মহত্যাটা অনেকক্ষেত্রে না ঘটলেও মনের দিক থেকে অবশ্যই ঘটে।

সাত : অনেক নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রেমে পড়ে, অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজনের শত বাধা-বিপত্তিকে অমান্য করে বিবাহ-বন্ধনে বন্দী হয়। নতুন সংসার গড়ে তোলে। কালক্রমে একঘেয়ে জীবন, আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদের অনুশোচনা, স্বামীর আসক্তিহীন ব্যবহার মনটাকে ধীরে ধীরে আনন্দহীন করে তোলে। তখন সংসারে আর সার থাকে না, সঙ্‌টাই থাকে। অসারতা এসে সংসারকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আত্মগ্লানির দহনজ্বালায় জ্বলতে-জ্বলতে জীবনে বেঁচে থাকাটা যখন দুঃসহ হয়ে উঠে, তখন চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

আট : কলেজ-জীবনে প্রণয়ের ফলে অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নায়কের স্বপ্ন থাকে, আজ বাবার বা অভিভাবকের অধীনে থাকলেও ডিগ্রী নিয়ে ভালো চাকরী পাবে। দু'টি জীবন এক হয়ে সোনার সংসার রচনা করবে। কিন্তু পাশ করার পর বাস্তবক্ষেত্রে যখন ফিরে আসে, চাকরীর উমেদারী করতে করতে জীবনটা তিক্ততায়, নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, আর্থিক সংকট জীবনযাত্রাকে দিশাহারা করে তোলে, ঘরের বাইরের নানা কটু মন্তব্য জীবনকে জর্জরিত করে তোলে, তখন এতো আত্মগ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকাটা দুর্বিষহ হয়ে উঠে—দাম্পত্যজীবনের সমস্ত স্বপ্নটা 'মেশাকার' হয়ে যায়—মৃত্যুর হাতছানি তখন পরম পাওয়া বলে মনে হয়। ফুল ঝরে যায় পৃথিবীর ধুলো-কাদায়।

নয় : টিউটর আর ছাত্রীর মধ্যে প্রণয় জন্মে আরো একটি অঘটন ঘটতে পারে। টিউটর আর ছাত্রী পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকতে-থাকতে বা আসা-যাওয়া করতে করতে স্বাভাবিক নিয়মে উভয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মে। টিউটর বেকার। চাকরীর ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে দিন কাটায়। টিউশনির পয়সাটা দিয়ে কোনরকমে পেটের ভাতটি জোগায়। কিন্তু প্রেম যখন আসে, সে বেকারত্বের কথা মনে থাকে না। প্রেমের দুর্বার আকর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তার ফলে, দৈহিক সংযোগও ঘটে। ছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়। মাস্টার চিত্তভরা প্রেম নিয়ে বিত্তহীন

জীবনের গ্লানিকে সংগে নিয়ে গা-ঢাকা দেয়। ছাত্রী নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যাকে শ্রেয় মনে করে, নয় তো গার্জেনের চাপে গর্ভপাত করতে বাধ্য হয়।

দশ: অতিমাত্রায় সেন্টিমেন্টালের দরুন মেয়েরা ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করে বসে।

এগারো: মেয়েকে জোর-জবরদস্তি করে বিয়ে দেওয়ার ফলে বা এক বর দেখিয়ে অন্য বরকে বিয়ে দেবার ফলেও আত্মহত্যা ঘটতে পারে। এমন নজীর বিরল নয়।

বারো: অনেক ক্ষেত্রে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা আত্মীয়ার সঙ্গে নিবিড় প্রেম, আত্মহত্যার কারণ হতে পারে। একান্ত নৈকট্যের মধ্যে থেকে প্রেম জমেছে বা দৈহিক ক্ষুধার কাছে নিজেদের সংবরণ করতে পারে নি, সে ক্ষেত্রে ধরা পড়ার ভয়ে বা ধরা পড়ে, বিয়ে হবার কোন উপায় না দেখে মৃত্যুর গলেই বরমাল্য দেয়।

তের: আবার অনেক ক্ষেত্রে কামনালিপ্স, কতগুলো মানুষ (?) নারীকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। সে ক্ষেত্রটা বিবাহিত বা অবিবাহিত দুই প্রকার নারীর ক্ষেত্রেই আসতে পারে বা ঘটতে পারে। পুরুষ নিজের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য অথবা লোভনীয় ব্যবসা ফাঁদবার জন্য নানা প্রলোভনে বা জোরপূর্বক বিবাহিত-অবিবাহিত নারীকে সমাজ থেকে অসামাজিক জগতে টেনে আনে। তার উপর নির্বিবাদে অত্যাচার চালায়। সে ক্ষেত্রে ছাড়া পেলেও নারীর আর সংসারে ফিরে যাবার পথ থাকে না, আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজের কলংকিত-ধর্ষিতজীবন ও যৌবনকে শেষ করে দেয়। আর যদি বাঁচার তাগিদ থাকে তবে অন্ধগলির গুমোট বাতাসের সংগে হাস্যে-লাস্যে রূপোপজীবিনীর ভূমিকা নেয়।

চৌদ্দ: অধিক বয়েস পর্যন্ত অবিবাহিত থাকাটাও আত্মহত্যার একটি মূখ্য কারণ। সৃষ্টির অনন্ত-যৌন-সম্ভারে একটি নারী পরিপূর্ণা হওয়া সত্ত্বেও তার যৌবন অনাঘ্রাত রয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, চিরন্তন কামনার হোমানল থেকে অনেক মেয়েই নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। কামনা তাকে পশ্চাৎ-পর ভুলিয়ে দেয়, প্রেমে-অপ্রেমে তার যৌবনকে পুরুষ-নিপীড়নের হাতে নিঃশেষে সঁপে দিয়ে তৃপ্তি পেতে চায়। কামনার হোমাগ্নিতে নিজেকে আহুতি দেয়।

এ সব ছাড়া আরো নানা কারণে আত্মহত্যা ঘটতে পারে। এখানে কয়েকটি প্রধান প্রধান আত্মহত্যার কারণ উল্লেখ করলাম শুধু, যা নিয়তই দেখছি—শুনছি। উল্লেখিত কারণগুলো কতদূর সত্য বা তাৎপর্যপূর্ণ তার বিচার করবেন পাঠক-পাঠিকা। ভুক্তভোগীরা। আমি মনস্তাত্ত্বিক নই, যৌনবিদ নই, দেখাটাকেই লেখার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছি। তার ভেতর অনেক ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে, সেজন্য সহানুভূতিশীল পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই ক্ষমার চক্ষে দেখবেন—এটা আশা করি।

প্রেম-জীবনে ব্যর্থতার হিড়িক পড়েছে আজকাল। আমাদের দেশে দিনের পর দিন শিক্ষা-প্রসারের সংগে সংগে আত্মহত্যার ক্ষেত্রটাও প্রসারিত হচ্ছে। ষোল থেকে পঁচিশের মধ্যে যাদের বয়েস তাদের মধ্যে এই হিড়িকটা বেশি। পাশ্চাত্যে আত্মহত্যার এত হিড়িক নেই—বিশেষ করে প্রেম-জীবনে। তারও অবশ্য কতগুলো কারণ আছে।

প্রথমত তারা সে নায়ক হোক বা নায়িকা হোক, নিজের উপর দায়িত্বশীল, আস্থাশীল। একটি প্রেমের ব্যর্থতায় দমে যাবার পাত্র-পাত্রী ওরা নয়। মানসিক দিক দিয়ে তারা খুব সবল। তা ছাড়া আমাদের দেশের মতো সংস্কারের পরিপন্থীও তারা নয়। সুতরাং ব্যর্থতায় তারা সহজে কাবু হয় না এক ব্যর্থতাকে ঢেকে নতুন ভাবে সংসার গড়বার স্বপ্ন দেখে তারা—সংসার গড়ে। এই ভাঙাগড়া তাদের জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। বিয়েটা ওদের কাছে সচরাচর চিরস্থায়ী বন্ধন হয়ে উঠে না। মন মজলো—ঘর বাঁধলো, মনের চাকা বিকল হলো—আবার ভেঙে দিল, আবার নতুন চাকা জুড়লো। কিন্তু আমাদের দেশের রুচি, কৃষ্টি, সমাজ আলাদা। আমাদের দেশের নর-নারীদের প্রেম-ভালোবাসার মধ্যে 'রুট' বা মূল বলে একটা বস্তু আছে, যা অন্তরের প্রত্যন্তে গিয়ে পৌঁছয়। সে মূলে যদি ঘুণ ধরে তবে নতুনভাবে বাঁচতে বা সংসার গড়তে তাদের রুচিতে, সমাজে ও সংস্কারে বাধে। মনের দিক দিয়ে তা সাড়া দেয় না। তারা এককের প্রতি রুচিশীলা—শুভ্রাশুভ্রা, বহুলের প্রতি নয়। তাই আমাদের জীবনে এতো বিপর্যয়।

দ্বিতীয়ত পশ্চিমী দেশের ছেলেমেয়েরা যে অবাধ মেলামেশার মধ্যে মানুষ হয়, সে মেলামেশার মধ্যে বড় হতে হতে স্বাভাবিক জীবনের রোমাঞ্চটুকু অনেক কমে যায়। আমাদের দেশে কমে না। কারণ, এতদূর মেলামেশার সুযোগ আমাদের দেশে নেই—গার্জেনরা দেন না। তার ফলে নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি একটা অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ নিয়ে বড়ো হয়। আর যখনি কোন পুরুষ বা নারী ছল-ছুতো অথবা নানা ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে পরিচিত হয়, তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশি। সে আকর্ষণ কালক্রমে জানাজানিতে—তারপর মন নিয়ে টানাটানিতে আর বেশি সময় লাগে না। সকল যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে সামান্য একটু মুক্ত আনন্দের জন্য উভয়ে লালায়িত হয়ে উঠে—যা পশ্চিমী দেশে সহজে হয় না।

তৃতীয়ত ও দেশের নর-নারীর মধ্যে প্রেম-জীবনে বিরাট নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা এলেও কর্ম-জীবনে ওরা অটুট থাকে। আমাদের দেশের মতো এতো ভেঙে পড়ে না। কিন্তু আমরা ভেঙে পড়ি। প্রেমের আঘাতকে আমরা চরম আঘাত বলে মনে করি। আঘাতটা আমাদের কাছে চরমই। কারণ, একটি পুরুষের জীবনে অনেকগুলো মেয়েকে পাওয়া যেমন আমাদের সংসার-ধর্মের কাম্য বস্তু নয়, তেমনি একটি নারীর জীবনে অনেক পুরুষকে চাওয়াও কামনার বস্তু নয়। আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের রুচি ও আদর্শ একটা পবিত্র ভাবধারা নিয়ে থাকে।

সে যাক, ওদেশের কথা আমার আলোচ্য বিষয় নয়। খানিকটা মনোবলের দৃষ্টান্ত হিসেবেই উল্লেখ করলাম। তা ছাড়া ও দেশের মতো আমাদের দেশে যোগ্যতা থাকলেই চাকরী সহজলভ্য নয়। আলোচনা হচ্ছে প্রেম ও আত্মহত্যাকে নিয়ে।

সাধারণ তরুণ-তরুণীর মধ্যে যে আত্মহত্যার ঘটনাগুলো ঘটছে তার কারণগুলোর মধ্যে 'প্রণয়টাই' অন্যতম কারণ। প্রেম-জীবনে মিলনের চেয়ে ব্যর্থতাই আসছে বেশি। অনেক ব্যর্থতার সংবাদ আমরা পাই—অনেক অনেক ব্যর্থতার সংবাদ আমরা পাই না। তরুণ-তরুণীর জীবনের এ জাতীয় নানা সমস্যা নিয়ে 'মাসিক বসুমতী

আর 'নরনারীতে' কয়েকটা প্রবন্ধে আলোচনা করেছি পূর্বে। রচনাগুলো পাঠক-পাঠিকার ভালো লেগেছে জেনে, এই প্রবন্ধটিও তাঁদের সামনে তুলে ধরছি।

একটা কথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে, প্রেমের মধ্যে কোন অপরাধ নেই। এটা বয়েসের ধর্ম। যুক্তিতর্কে এর মীমাংসা নেই। একজন আর একজনকে অন্তর দিয়ে চাওয়াটাই হলো প্রেম। যে প্রেম হৃদয়ের গভীরে গিয়ে মূল বিস্তার করে। অন্তর-জগতে ফুল ফোটায়। জীবনকে সুরভিত করে তোলে। প্রেমের 'ডেফিনেশন' দিতে গিয়ে ডোনাল্ড পোর্টার গডভেজ বলেছেন,—Love is an emphemison. It means practically anything and all that one wants it to mean. It is a polite word for sexual intercourse. It is a word for the feeling a mother has toward a child. It is the word that is used for the feeling God has toward his children. It is the way we feel toward chocolate ice-cream, if we particularly like chocolate ice-cream. It expresses our willingness or eagerness to go to the mollies with some one. It is the word that is used to express patriotism. It is the word that is used in connection with the affection human beings have for other human beings—the love of mankind অর্থাৎ অন্তরের সঙ্গে অন্তরের যে সংযোগ, সে সংযোগটাই হলো প্রেম। ভক্তি-প্রীতি শ্রদ্ধা সবই এ প্রেমেরই অন্তর্ভুক্ত। যে প্রেমটা আজ বিকৃত হতে চলেছে, ব্যর্থ হতে চলেছে, সেটা হলো নরনারীর প্রেম।

প্রেম-জীবনে ব্যর্থতা আসার সাধারণ কতগুলো কারণ আছে। সে কারণগুলোর দিকে আমরা যদি নজর দিই খানিকটা তবে প্রেম-জীবনের ব্যর্থতার সংখ্যা কিছুটা কমবে বলে মনে হয়। সে কারণগুলো উল্লেখ করে সাধ্যমতো তার বিশ্লেষণ করলাম নীচে—

এক: আর্থিক সংকট—আর্থিক সংকট প্রেম-জীবনের সব চেয়ে বড়ো শত্রু। আর্থিক সংকট মানুষকে অমানুষ করে তোলে। বিবেকবুদ্ধিকে বেপথু পরিচালিত করে। মানুষের অন্তরের রসকে নিঙড়ে নেয়। হাসি-আনন্দকে কেড়ে নেয়। প্রেম-জীবনকে ব্যর্থ করে দেয়। আর্থিক কাছে প্রেমের ফুল অকালে শুকিয়ে যায়। সুতরাং সর্বপ্রথম আর্থিক সংকট দূর করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। ক্ষুধা যেখানে—সুধা সেখানে নেই। প্রেম সেখানে পাশব-প্রবৃত্তিকে জাগায়। প্রবঞ্চনাকে জাগায়। অর্থহীনের কাছে প্রেম স্বর্গীয় কিছু হয়ে আসে না, হাস্যাস্পদ বস্তু হয়ে আসে। স্বর্গ সেখানে নরক। অতএব আর্থিক সংকটকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে আগেই।

দুই: সামাজিক বা পারিবারিক গোঁড়ামি—সামাজিক বা পারিবারিক গোঁড়ামি প্রেম-জীবনকে ব্যর্থ করে দেয়। স্ববর্ণে বা অসবর্ণে যেখানেই একটা প্রণয় গড়ে উঠেছে পিতা-মাতা-অভিভাবক সেখানে বাধার প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়েছেন। আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, কোন পিতা-মাতাই তাঁর ছেলে বা মেয়ের খারাপ কিছু চান না, কিন্তু যুগটাকে কিছুতেই তাঁরা স্বীকার করবেন না। তার ফলে প্রেম ব্যর্থতার স্মৃতিকে বুকে নিয়ে ধুকে ধুকে মরছে। হাজারো বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে যে মিলন হয়, সে মিলন সুখের হয় না। কারণ, শত বাধা-বিপত্তির ঠেলায় মন বস্তুটা একেবারে গুঁড়িয়ে যায়। মন এমন একটা জিনিস, যে অতি সহজে ভেঙে পড়ে না, আবার সামান্য কারণেই ভেঙে পড়তে পারে। দুর্বিষহ যন্ত্রণাকে টেনে আনতে পারে। মা-বাপ হয় তো আর পাঁচ কি দশ বছর বাঁচবেন, কিন্তু যারা আরও অনেক বছর বেঁচে থাকবে, সংসারে যারা সুখ-দুঃখের ভেতর একটা অনাবিল আনন্দের প্রস্রবণ আনতে চাইছে, বাধা বা গোঁড়ামির ফলে তাদের আগামী জীবনটাকে তছনছ করে দেন। সুতরাং মা-বাপ-অভিভাবকে একটু যুগধর্মের দিকে তাকাতে অনুরোধ করছি, আর অনুরোধ করছি, যেখানে একটা পবিত্র প্রেম গড়ে উঠেছে বা উঠছে সেখানে একটা কেচ্ছা কেলেংকারীর সৃষ্টি না করে, দু'টি জীবনকে নষ্ট করে না দিয়ে, নবজীবনের পদযাত্রীদের আশীর্বাদ করতে।

গোঁড়ামি কোনদিন মানুষের হিত করতে পারে না—যতদূর করে অহিত। ফালতু গোঁড়ামির আশ্রয় না দিয়ে, একটা অন্ধসংস্কার বা গোঁয়ারতুমি মনোভাব নিয়ে না থেকে যেখানে মিলনের বাঁশী বেজে উঠেছে সেখানে সুরটা সুরেলা হোক। পূরবী বিদায় নিক। তবে প্রেম-জীবনের আর একটি সমস্যার সমাধান হবে।

তিন: ভালোবাসায় প্রবঞ্চনা—ভালোবাসার মধ্যে প্রবঞ্চনা প্রেম-জীবনে ব্যর্থতার আরো কটি কারণ। সে প্রবঞ্চনা নারী বা পুরুষ কোন দিক থেকে হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ দৈহিক ক্ষুধার তাড়নায় বা মেয়েপক্ষের আর্থিক প্রাচুর্য দেখে একটি মেয়েকে সহজে ভালোবেসে ফেলে। সে প্রবঞ্চনা অজ্ঞান সত্তা নিয়েও হতে পারে। কিন্তু জীবনের নানা পর্বে সে প্রবঞ্চিত প্রেমের মুখোস খুলে যায়, যার ফলে ভালোবাসার মধ্যে ভালো কিছু আর বাসা বেঁধে থাকে না, থাকে বিষ। আগুন।

প্রবঞ্চিত ভালোবাসার মধ্যে নারীরাই বিপন্ন হয় বেশি। ভালোবাসা তাদের কোমল প্রাণে এমন এক অনাস্বাদিত উপলব্ধি এনে দেয়, যে উপলব্ধি প্রেমিককে অন্তর দিয়ে যাচাই করতে ভুলে যায়। আপন গন্ধে আপনিই উতলা হয়ে উঠে। যার ফলে ঠকতে হল তাদের, সুতরাং এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যখন প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, তখন প্রেম-জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য নায়ক বা নায়িকার অলক্ষ্যে নায়ক বা নায়িকা ভালোবাসার গভীরতা কতটুকু, অন্তর দিয়ে তা উপলব্ধি করতে হবে।

চার: প্রেম-জীবনে আন্তরিকতা—ভালোবাসা যেখানে মহৎ মর্যাদার অধিকারী, আন্তরিকতা সেখানে একেবারে একাত্মক। অন্তর দিয়ে আর একটি অন্তরকে উপলব্ধি করার নাম ভালোবাসা। দু'টি অন্তরের গভীর উপলব্ধি যেখানে, প্রেম সেখানে মহৎ। প্রেমের নামে ফাঁকা বুলির তুবড়ি ফাটালে খোলও সেখানে ফেটে যায়। অর্থাৎ আমি তোমাকে কতখানি ভালোবাসি, তুমি আমাকে কতখানি ভালোবাসো—প্রকৃত প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে এ প্রশ্ন অবান্তর। অন্তর যেখানে প্রকাশমান সেখানে প্রেম ও পরিণয়

শাশ্বত। দু'টি ফুলের গুণের বিকাশ তাদের পাপড়ির মধ্যে নয়, সৌরভের মধ্যে। গভীর প্রেমের দিকে নর-নারী যখন এগিয়ে যায় সেখানে মুখ হয় মূক—অন্তর হয় মুখর। অন্তরের মুখরতা সেখানে নেই। প্রেম সেখানে পদ্মপত্রে জলবৎ। সুতরাং কথা ও নীরবতার মধ্যে আসল-নকলের কিছু হদিস অবশ্যই পাওয়া যায়।

পাঁচ : সেন্টিমেন্টাল বা ভাবপ্রবণতা—অনেক মেয়ে অতিমাত্রায় সেন্টিমেন্টাল। প্রেম-জীবনে সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঢেউ আনতে পারে তারা। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে অনেক সময় নিজেদের মনোমালিন্যটুকুকে মুছে ফেলতে পারে না, ফলে প্রেম-জীবনে অশান্তির প্রবাহ এসে ঢোকে। নিজের নিজের দোষগুলোকে ঢেকে অন্যের দোষগুলোকে বড়ো করে দেখতে চায়, বা দেখতে অভ্যস্ত। এটা অবশ্য সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দোষ-গুণ নিয়েই মানুষ। সে নারী হোক বা পুরুষই হোক, কেউ পৃথিবীতে দোষমুক্ত নয়। নানা পরিবেশের মধ্যে মানুষের দোষগুলো প্রকাশ পায়। মানুষের মধ্যেই পাপ আছে, দোষ আছে, মানুষই সেগুলো প্রকাশের সহায়তা করে। সেণ্ট মার্ক বলেছেন, All these evil things come from within and defile the man. সুতরাং মানুষ যদি মানুষের গুণগুলো দেখে তবে তার গুণেরই প্রকাশ পায়। দোষগুলোকে সহানুভূতির সংগে বিচার করে গুণের প্রতি আকৃষ্ট হলে, মানুষ মন্দ থেকে ভালো হয়। এটা জীবন ও জীবিকার সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ছয় : পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা রাখা—পরস্পরের উপর বিশ্বাস বা আস্থা রাখা প্রেম-জীবনে কি দাম্পত্য-জীবনে সুখী হওয়ার আরো একটি মৌলিক সত্য। বিশ্বাসের অভাব হলেই আসে অভিযোগ। সে অভিযোগ থেকেই আসে অভিঘাত। তারপর অবাঞ্ছিত যুক্তি-তর্কের ফাঁসে আটকা পড়ে প্রেম-জীবন তিক্ততায় ভরে ওঠে। সংসার-জীবনে নামে ট্রাজেডি। ভালোবাসা যেখানে মধুরেণ—সেখানে সামান্য কারণে অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠলে ভালোবাসাটা হয়ে উঠে অর্থহীন। একটি পুরুষ বা নারী বিবাহিত-জীবনে কোন বন্ধু, আলাপী বা সহকর্মীর সংগে হাসি-ঠাট্টার দু'টি কথা বললে, তাকে যদি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তবে ধরে নিতে হবে—প্রেম-জীবনে ব্যর্থতার ওটা প্রথম পদক্ষেপ। নানা কারণে মানুষকে মানুষের সংগে মিশতে হয়। সমাজে একক স্বামী-স্ত্রী রূপে কাল কাটানো কোনদিন সম্ভব নয়। তাই বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এদেরকে বাদ দেয়া যায় না।

আপনি পুরুষ। আপনি যদি একটি মেয়ের সংগে সহজভাবে একটু কথা বলেন, তা যদি আপনার স্ত্রীর সন্দেহের কারণ হয়ে উঠে, অথবা আপনি নারী, একজন পুরুষের সংগে হাসি-মসকরা করে যদি দু'টি কথা বলেন, তা যদি আপনার স্বামীর সন্দেহের কারণ হয়ে উঠে, তবে বুঝবেন, আপনাদের ভাঙনের দিন আর বেশি দূরে নেই। এটাই ভাঙনের সিধে রাস্তা। কিন্তু এমন ঠুনকো মনোবৃত্তি নিয়ে সংসার করা চলে না। আপনি স্ত্রী হয়ে যদি স্বামীকে চোখে চোখে রাখতে চান বা আপনি পুরুষ হয়ে যদি স্ত্রীকে চোখে চোখে রাখতে চান, তবে আপনাদের ভালোবাসার সার্থকতা কোথায়? আর সত্যিকারের যে যাবার তাকে কোনদিন কোনভাবেই ঠেকানো যাবে না। যায় না। আপনি পুরুষ হয়ে যদি মনে করে থাকেন যে, একজনের সংগে কথা বলার সংগে সংগে মন দেওয়া-নেওয়া ইংগিত থাকতে পারে, তবে ভুল করবেন। সে ভুলের জন্য নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন এবং আর একজনার সর্বনাশ করবেন। কারণ, জীবনটা অতো সস্তা জিনিস নয় যে, ভিজে মাটি দেখলেই পা পিছলোবে। মেয়েরা যাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে, আর পুরুষের কাছ থেকে যদি সে ভালোবাসার উপযুক্ত মর্যাদা পায়, তা হলে কোনদিন পা পিছলায় না। পিছলাতে পারে না। পুরুষ যতটা বহির্মুখী মেয়েরা ততটা নয়। বিয়ের পর যদি পিছলায়, সেটা পুরুষের পৌরুষহীনতার জন্য, ঘৃণ্য মনোবৃত্তির জন্য। সুতরাং প্রেম-জীবনে সুখী হতে হলে পরস্পরের উপর বিশ্বাস রাখাটা সব সত্যের একটি বড়ো সত্য। বিশ্বাসে বিশ্বাস জন্মায়।

সাত : অত্যধিক মেলামেশা—অত্যধিক মেলামেশা প্রেম-জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। ভালোবাসা গাড়ে ওঠার সংগে সংগে অত্যধিক মেলামেশার দরুন বিয়ের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই মনে হয়, জীবনের যা কিছু আনন্দ সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। কথাবার্তায় একটা নিষ্প্রাণ ভাব স্বভাবতই পরিলক্ষিত হয়। জীবনটা একঘেয়েমীতে ভরে উঠে। তার ফলে সংসার-জীবনে অশান্তি আসতে পারে বা আসা অস্বাভাবিক নয়। অনুরূপ ধ্বনি ডাঃ কিন্সের মধ্যেও শুনতে পাই। ডাঃ কিন্স বলেছেন, Many males are disappointed after marriage to find that their wives are not responding regularly and are not as interested in having as frequent sexual contact as they, the males, would like to have; and a great many of the married females may be disappointed and seriously disturbed when they find that they are not responding in their coitus, and not enjoying sexual relations as they had anticipated they would not a few of the divorces which occur within the first year or two of marriage are the product of these discrepancies between the sexual background of the average females and average males.

দেহটা পার্থিব, প্রেম অপার্থিব। উগ্র দৈহিক লালসায় প্রেমের পবিত্রতা নষ্ট করে দেওয়া উচিত নয়, যেখানে নর-নারী সবাই সুবুদ্ধি-সম্পন্ন। আমি অবশ্য এটা বলছি না, একজন কোলকাতা একজন সিমলা থেকে প্রেমটাকে ওয়ারলেসের মতো কিছু করুন। প্রেমের সঙ্গে দৈনিক কামনাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওটা প্রকৃতির চিরন্তন রীতি। দেয়া-নেয়া জীবনের ধর্ম। মানবিকতার স্বাভাবিক নীতি। তবে কথাটা বলছি এইজন্যই যে, একটি সন্দেশ যদি খাওয়া হয়, তবে তার সুস্বাদু টেস্ট, আর একবার খাওয়ার আগ্রহ জাগায়। আগ্রহকে জিইয়ে রাখে। কিন্তু একসংগে একসের কি আধসের খেলে, টেস্ট বস্তুটা নষ্ট হয়ে যায়, গা বমি-বমি করে। পুনরায় খাওয়ার আগ্রহকে কমিয়ে দেয়, যতটুকু বাড়ায় তা, বিতৃষ্ণা। তা নয় কি?

আট : মানসিক দুর্বলতা বা ভীরুতা—মানসিক দুর্বলতা ঘটে

পুরুষের ক্ষেত্রেই। একটি মেয়েকে ভালোবেসে ঘর বাঁধার স্বপ্ন অনেক পুরুষই দেখে, কিন্তু সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে তারা পেছিয়ে আসে। কারণ ভলোবাসার সময় যে সমস্যার কথাগুলোর চিন্তা করে নি, এখন সেগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ফলে মনের জোর হারিয়ে ফেলে। বিয়ে হয় না। এটা ভালোবাসার অজুহাতে একটি মেয়েকে গলা টিপে মারারই সামিল।

প্রেম-জীবনে মানসিক দুর্বলতা পুরুষকে পৌরুষহীন করে তোলে। সেটা অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য। ভালোবাসার সংগে নায়িকাকে গ্রহণ করার একটা বলিষ্ঠ ভাবধারা অনেক নায়কের থাকে না। ফলে ব্যর্থতা আসে। সুতরাং ভালোবাসার সংগে-সংগেই মনের জোরও বাড়াতে হবে, ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। প্রয়োজন হলে, সমস্যা সমাধানের জন্য দু'জনকেই অগ্রসর হতে হবে। সে অগ্রগতির মধ্যে প্রেম-জীবনের স্বাদ বাড়বে বৈ কমবে না।

নয়: ধনবৈষম্যতা—ধনবৈষম্য প্রেম-জীবনে ব্যর্থতার আরও একটি মুখ্য কারণ। একটি দরিদ্র পরিবারের ছেলের প্রেমে যদি পড়ে কোন ধনীকন্যা, তবে সে প্রেমকে নস্যাতে উড়িয়ে দেন কন্যার 'গার্জেনরা'। গরীবের ছেলের ভালোবাসাটা তাঁদের কাছে হাস্যাস্পদ ব্যাপার। সে ভালোবাসাকে মেয়ের যৌন-উন্মাদনা ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না। সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি না হলে সে প্রেম স্বীকৃতি পায় না। ফলে-মেয়ের কথা একটু চিন্তা না করে মেয়েকে আয়ত্বে আনার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ মেয়ের বাপ হয়ে পরোক্ষভাবে মেয়েকে হত্যা করেন। প্রেম-জীবনে এতো আত্মহত্যা দেখেও তাঁদের দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না। তাঁরা ব্যোমশংকরের দল। তাঁরা যদি তাঁদের মেয়ের সুখই কামনা করতেন, তবে প্রেমটাকে অংশই স্বীকার করতেন। মেয়েকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতেন না। সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি দিতে গিয়ে তাঁরা যে প্রচুর অর্থব্যয় করেন, সে অর্থ যদি গরীব ছেলেটির জন্য ব্যয় করতেন, তবে ছেলেটি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো এবং তাঁদের মেয়েও সুখী হতো। কিন্তু তাঁদের আভিজাত্য তাঁদের অমন সুবুদ্ধি দেয় না, যা দেয় তা সিনেমা-থিয়েটারে।

ধনবৈষম্য সংসার-জীবনেও ব্যর্থতা আনতে পারে। কোন বড়োলোকের মেয়ে যদি কোন গরীব ছেলেকে ভালোবেসে, প্রেমিকের সমস্ত দরিদ্রতাকে মাথা পেতে নিয়ে সুখে-দুঃখে ঘর বাঁধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই অত্যধিক দরিদ্রতার চাপে ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা ভাবতে থাকে। মনে মনে দু'টি সংসারের তুলনা করে। কোন বান্ধবীর ঐশ্বর্য দেখে মনে মনে ঈর্ষা জন্মে। সে ঈর্ষা থেকেই জাগে অনুশোচনা। একদিন যে বিত্তকে পরিহার করে' চিত্তের টানে এ সংসার গড়ে তুলেছিল, আবার বিত্তের অভীপ্সায় মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। প্রতিশ্রুতির কথা মনে থাকে না। যার ফলে স্বামীর দুঃখের সংসারটা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। সংসার অসার হয়ে উঠে। স্বামীর সমস্ত দুঃখ আর দৈন্যকে নিজের অংশভাগ হিসেবে গ্রহণ করে সুখী দাম্পত্যজীবন উপভোগ করতে খুব কম মেয়েই পারে। কিন্তু প্রেম যেখানে শাশ্বত সেখানে দুঃখ আর দৈন্যকে বুক পেতে নিয়ে সংসার গড়তে হবে, না হলে দু'টো জীবনই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যায়।

যা হোক, মোটামুটি যে আলোচনাটা এতক্ষণ করলাম, তার ভেতর দিয়ে আমাদের চিরন্তন সমস্যাটার কতদূর আলোকপাত করতে পেরেছি জানি নে এবং এই রচনার ভেতর থেকে প্রেমিক-প্রেমিকার কতটুকু উপকার হবে, কতটুকু গ্রহণীয় আছে, বা আদৌ আছে কি না জানি নে, তার বিচার করবেন পাঠক-পাঠিকা। দিনের পর দিন প্রস্ফুটিত জীবন যেভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সুন্দর পৃথিবীতে এসে তিক্ত মর্মযাতনা নিয়ে যারা চিরবিদায় নিচ্ছে তাদের নিয়েই এই আলোচনা। তাদের নিয়েই এ আলোচনা, যারা প্রেমে পড়ছে, পড়েছে, পড়বে। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভেতর প্রথিত-ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় হোক, এটাই আমার প্রধান বক্তব্য। সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনে মধুর সে প্রেম মধুরেণ হোক—এটাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত। পৃথিবীতে সবই প্রফুমো-কিলার নয়। তারা যৌবনকে ভালোবাসে, আমাদের ভালোবাসতে হবে জীবনকে। জীবনের ভেতর দিয়েই যৌবনের মধুর ও নিবিড় সান্নিধ্য। প্রেমের পরিণতি আত্মহত্যায় নয়—মিলনে। নিজেরা যদি পরস্পরকে ভালো করে জেনে নিই তবে দাম্পত্যজীবন সুখেরই হবে আশা করি। কারণ বিবাহ জিনিসটি সামান্য কিছু নয়, Ludovic Halevy'-র কথা দিয়েই বলছি, Marriage is not a trifling thing. If a mistake is made it is for life. So it's well to know what one is doing when one takes the plunge.

১৩ই জুন নিউ সেক্রেটারিয়েটের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে প্রেমের মর্মযাতনা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে একুশটি বসন্তের স্বপ্ন-সান্নিধ্য পাওয়া সুনন্দা মজুমদার। সংসার তাদের প্রেমকে স্বীকৃতি দেয় নি। কিন্তু সুনন্দা জানে না, তার সাতাশ বৎসরের প্রেমিক অরূপ সেনও ঠিক চারদিন পরে বিষপানে সুনন্দার অনুগমন করেছে।

দু'টি ফুল অকালে ঝরে গেল পৃথিবীর স্বপ্নোদ্যান থেকে। তাদের নির্মম মৃত্যুই আমাকে এ প্রবন্ধ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। অনেক মর্মযাতনা নিয়ে এ প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। তবু লিখেছি, আর যাতে নষ্ট না হয়। সুনন্দা-অরূপকে দেবার মতো আমাদের কিছু নেই। যে নির্মম পৃথিবী তাদের প্রেমকে স্বীকৃতি দেয় নি, মৃত্যুর মহামিলনে তাদের প্রেম অমরত্ব লাভ করুক—তাদের পবিত্র আত্মার প্রতি আমাদের এই সহানুভূতিশীল কামনা।

আর, আমরা যারা নবীন প্রেমিক-প্রেমিকা, আমাদের যাত্রাপথ হোক মধুময়—

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥

স্পেন্সার সুব্রত দত্ত

আর বছরের এই দিন—আর এই বছরের এই দিন—কত তফাৎ হেলেনের জীবনে! গত বছরের জুলাই মাস ছিল আউসধানের মতো তাজা—অমাবস্যার নির্মেঘ রাত্রির মত গাঢ়—এখন এসেছে গংগাস্নানের পর শ্মশানবন্ধুদের নীরবতার ভার। পৃথিবী একবার মাত্র সূর্যের চারিদিকে ঘুরে এসেছে—আর সেই ঘূর্ণনে আলাদা হয়ে গেল ওরা দু'জন। গত বছরের জুলাই—ওর একার ছিল না। ছিল ওদের দু'জনের। এ বছরের জুলাই—ওর একারই। তবু পরিপূর্ণভাবে নয়—আরেকজনেরও বুঝি ভাগ আছে সেখানে। সে সুশোভন নয়—তবু সুশোভন। ওরা দু'জন কি একই পৃথিবীতে থাকতে পারতো না? পৃথিবী তো কত ছোট? এই ছোট্ট পৃথিবীর স্বপ্ন তো ওরা দু'জনেই দেখেছিল—আরো ছোট—আরো ছোট করতে চেয়েছিল। কেন সে পৃথিবীর দূরত্ব আরো বড় হল?

বার্মিংহামে সুশোভনের তখন তিন বছর থাকা হয়ে গেছে—যখন ওর হেলেনের সংগে প্রথম আলাপ। বার্মিংহামে তিন বছর—আর এই দেশে সাড়ে-তিন। আমিই বরং ওর তুলনায় ছিলাম নতুন। আদব-কায়দা আমাকে ওর কাছে শিখতে হলেও—একটা ব্যাপারে ও আমার চেয়ে অনেক পেছিয়ে ছিল—সেটা হল বান্ধবী যোগাড় করা। আমার কলা-কুশলতার ধার-কাছ অবধি ও ঘেঁসতে পারতো না—আমার আর্টের সাকরেদী করার সামান্য একটু ইচ্ছে অবধি ওর ছিল না। তাই ওর অবস্থা হয়ে থাকলো—ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবের মত।

সুশোভনের বয়স কিন্তু নেহাৎ অল্প ছিল না—সাতাশ চলছিল তখন। আমারই সমান। আমরা একই বাড়িতে থাকতাম তখন—বেশ কিছুদিন ধরে। ওর স্বভাব ছিল—চিরকালই চাপা; তাই বেশি কিছু জানতামও না ওর সম্পর্কে। আর আমার সময়ও ছিল না বিশেষ। থাকতাম নিজের ধান্দায়, পরের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার না ছিল সময়—না ছিল প্রবৃত্তি। তবু মাথা ঘামাতে হল—ওর ব্যাপারে।

সেটা উইক-এণ্ড নয়। কি যেন একটা বার। সন্ধ্যেবেলায় দরজায় কার টোকা শুনে—দরজা খুলে দেখি সুশোভন দাঁড়িয়ে। অভাবনীয়।

'আয় ঘরের মধ্যে,' ওকে বললাম, 'কি ব্যাপার তোর—এই সময়ে হঠাৎ?'

'দীপংকর, একটু ইয়েতে পড়েছি' সুশোভন বললে, 'তোর কাছে পরামর্শ চাই।'

'সুশোভনের মুখের দিকে তাকালাম। ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম না ব্যাপারটা কি হ'তে পারে। গ্যাসরিং-এ দু'জনের কফির জল চড়িয়ে দিয়ে—ওকে বললাম, তোর আবার 'ইয়ে' কি হ'তে পারে? হয় Drawing-এর Designটা ঠিক হ'চ্ছে না—নয় Office-এর Canteen-এ আর খাওয়া পোষাচ্ছে না। এ ছাড়া তোর আর কি হতে পারে?'

'দেশের একটা চিঠি এসেছে—বড় ভাবনায় পড়েছি তাই নিয়ে। আমি নিজে কিছুতেই এর মাথা-মুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছি না। তাই তোর পরামর্শ নিতে এলাম।'—গম্ভীর হয়ে ও বললে।

সুশোভনের গল্পের প্রথম অধ্যায় শুনলাম তখন। ওর মত ছেলের পক্ষে সেটা খুব মামুলী নয়। চুপচাপ সুশোভন—কিন্তু একেবারে নিরামিষ নয়। সুশোভনের অনেকদিন ধরে দেশের একটি মেয়ের সংগে ভালবাসা আছে। তার নাম চিত্রা। চিত্রাদের বাড়ির সংগে ওদের কুটুম্বিতা আছে—কারণ, চিত্রা হল ওর মামীমার ভাইঝি। বিলেত আসবার আগে সুশোভনের বালখিল্য-প্রেম নিশ্চয় সাবালকী একটা কিছু করার সাহস পায়—(ব্যাপারটা ও খুলে বললে না—যদিও ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, বোধ হয় চুমু-টুমু খাবার সময় কেউ দেখে ফেলেছিল)—যার ফলে ঘটনাটা আর পাঁচজনের নজরে আসে। আপত্তি তুলেছিল সবচেয়ে বেশি সুশোভনের মামীমা। তাঁর যে কি এতে মাথাব্যথা সুশোভন কিছুতেই ভেবে উঠতে পারে নি। আপত্তির কোনও যুক্তি ছিল না—তাই মেয়ের মা-বাবা খুব ইচ্ছেও দেখান নি, অনিচ্ছেও দেখান নি। মামীমা কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাকে দিলেন ঘুলিয়ে, যার জন্যে সুশোভন আর চিত্রাকে বন্ধুদের মারফত চিঠি লেখালেখি আরম্ভ করতে হল। সম্প্রতি দেশ থেকে চিঠি এসেছে যে চিত্রার বিয়ের চেষ্টা চলছে—হয় তো কোথাও ঠিকও হয়ে যেতে পারে। আর সেটাই হল সুশোভনের সমস্যা।

'তোর ভালবাসা এখন কোন stage-এ এসেছে?' ওর গল্প শুনে ওকে জিগ্যেস করলাম।

'ভালবাসার stage সেটা কি জিনিস?—আমি তো তা জানি না'—সুশোভন বললে।

'মানে—তোর ভালবাসা matured তো? চিত্রা কি তোকে ভালবাসে? তোকে বিয়ে করতে চায়?'

'হ্যাঁ ভালবাসে নিশ্চয়ই। তবে বিয়ে করতে চায় কি না জানি নে। কি করে জানবো বল্, আমি তো জিগ্যেসও করি নি এখনও।'

'ওর বিয়ের চেষ্টা চলছে খবর পেলি কোথা থেকে—চিত্রার কাছ থেকে?'—

'হ্যাঁ' বলে সুশোভন একটা খাতায় হিজিবিজি কাটতে সুরু করে দিল। আমার চিঠি লেখার নতুন প্যাড সেটা!

'হিজিবিজি কাটিস নে সুশোভন—ওগুলো তোর এলোমেলো চিন্তার প্রতিচ্ছবি—তা বুঝিস তো? এখন বল্ কি করবি?'

'কি করবি? তুই তো আমাকে বলবি আমি কি করবো যার জন্যে তোর কাছে এলাম পরামর্শ চাইতে, আর তুই উল্টে আমাকে জিগ্যেস করছিস—আমি কি করবো। তুই বল না—কি করবো?'—

'হুঁ'—তা তো বটে, বললাম—তারপর একটু চুপ করে থাকার পর বললাম—তোর মামীমার ভাই, মানে চিত্রার বাবাকে একটা চিঠিতে খোলাখুলি লিখে দে যে আমি চিত্রাকে ভালবাসি আর চিত্রাও আমাকে ভালবাসে, আমি ওকে বিয়ে ক'রতে চাই।'

'চিঠিতে ঐ বয়স্ক ভদ্রলোককে এ-সব ভালবাসাবাসির কথা লিখবো?' সুশোভন ভুরু কুঁচকাল।

'ভদ্রলোকটি তো বয়স্ক হয়েছেন—তুমি কি হামা দিচ্ছ এখনও যে এ-সব কথা লিখতেও সংকোচ? তোর লজ্জা করে না বুড়ো ধাড়ী।'

সুশোভনের আত্মমর্যাদায় বোধ হয় একটু লাগলো। তাই আমার কটু কথাগুলো পকেটস্থ করলে।

'আচ্ছা দীপংকর, ওরা যদি বলে আমার দেশে যেতে আর কত দিন লাগবে—পরীক্ষা কবে শেষ হবে—তো কি বলব?'

'ও-সব ঝোপ বুঝে কোপ মারার ব্যাপার। হয় সত্যি বলবি—নয় ধাপ্পা দিবি, তোর পরীক্ষা শেষের তো দেরি নেই—ওরা কি মেয়েকে ঝুলিয়ে রাখতে পারে না? আর কেমন লোক বা ওরা যে, এমন বিলেত-ফেরত সু-পাত্তর একটা—তার জন্যে মেয়ে বসিয়ে রাখতে পারে না?' তারপর মিটমিট করে তাকিয়ে বললাম, 'তোর চিত্রাকে দেখতে কেমন রে? ডানা-কাটা? প্রেম করছিস—অথচ, তোর ম্যাণ্টলপীসে একটা ছবিও রাখিস নি? বলিহারি!'

'চিত্রার ছবি দেখবি—আয় আমার সংগে আমার ঘরে,' সুশোভন বললে।

'আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে এলাম সুশোভনের ঘরে। স্যুটকেশ খুলে ও একগোছা চিঠির মধ্যে থেকে দু'টো-তিনটে ছবি দেখে তার মধ্যে থেকে একটা বেছে নিল—তারপরে আমার হাতে দিল এগিয়ে, ভাল ক'রে আমি ছবিটা দেখলাম। স্টুডিওতে তোলা ছবি, একটা মানুষ-প্রমাণ উঁচু ছোট টেবলের মাথায়—পেতলের টবে ছোট পাম গাছ বসান—তার পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। দেখতে সাধারণই। আমি মন দিয়ে ছবিটা দেখছি, হঠাৎ সুশোভন আমাকে আবার প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা দীপংকর, ওরা যদি না বলে তো কি হবে?'

'ওরা না বললে ভাববার কি আছে। তুই চিত্রাকে লিখে দিবি তখন ও যেন অন্য কোথায় বিয়েতে রাজী না হয়। তারপর দু-এক বছর পরে তুই দেশে গিয়ে ওকে বিয়ে করবি। ভাল কথা—ওর বয়স কত?'

'কুড়ি চলছে'—সুশোভন বললে।

'বাঙালী মেয়ের বয়স জানতে চাইলে—হাতে চার বছর রেখে দেয়। তুই সেই বয়স বললি না আসল বললি।'

'সঠিক বয়স বললাম।' সুশোভন আহতস্বরে বললো। 'তুই চিত্রাকে জানিস না তাই এমন কথা বললি। জানলে কিছুতেই বলতিস না।'

'চটে যাচ্ছিস কেন শুধু-শুধু, সব দেশের মেয়েরা বয়স কমিয়ে বলে, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কিন্তু আমি ভাবছি—তোর চিঠি আসে কোথায়? চিঠি মানে চিত্রার চিঠি।'

'কেন এ বাড়িতেই। আবার কোথায় আসবে?'

'এ বাড়িতে আসে অথচ কেউই জানে না। এটা কেমন করে হয়?' ওকে বললাম, তারপর একটু ভাবার পর বললাম—'C. Ghoshal বলে যে চিঠি আসে—সেটা নাকি?'

সুশোভন হাসলো এবার, বললে—'হ্যাঁ সেই হল চিত্রার চিঠি—আর তোরা সব মস্ত হাঁদা।'

'তুই খুব একটা বুদ্ধিহীন নোস।' ওকে বললাম।

সুশোভন কিছু না বলে আবার হঠাৎ গোমড়া হয়ে গিয়ে বললো, —'দীপংকর—কি হবে বল তো?'

'ঘাবড়াস নে তুই।' আমি বললাম। 'চিঠি লিখে তো দে—তারপর দেখা যাবে।'

দু-সপ্তাহ কেটে গেল, দু-সপ্তাহের আগে চিঠি আসার সম্ভাবনা খুবই কম। আসে অবশ্য—তবে হয় সেগুলো মায়ের চিঠি নয়ত প্রেমিকার, প্রথমে আসে নিয়ম করে, তারপরে আসে শিথিলতা—কখনও এ পারে, কখনও বা ঐ পারে। সুশোভনের ঘর থেকে আসার পর ব্যাপারটা অনুশীলন করছিলাম। চিত্রার বাবা নিশ্চয়ই একটা কেউকেটা হবেন। পাত্র হিসেবে সুশোভন এমন কিছু খারাপ নয়—ঘরও জানা, সেখানে মেয়ের বিয়ে দিতে চান না। মেয়েকে দেখতেও সাধারণ। তা হ'লে? 'সাধারণ' দেখতে মেয়েদের বাপের টাকার জোর না থাকলে বিয়ের বাজারে কাটতি কম এই ধরণের একটা কথা—একদিন আমার এককালীন বান্ধবী ইটালীয়ান মেয়ে কার্লাকে বোঝাতে গিয়েছিলাম। সে তো পুরো ব্যাপার শুনে গালে হাত দিয়ে বসে পড়লো। সাজগোজ করে এসে মেয়েদের পাঁচজনের সামনে বসতে হবে—দর্শনযাচাই-এর জন্যে। কি ইতর বর্বর-টর্বর গোছের উক্তি হয়েছিল কার্লার। ওর গালে গাল দিয়ে আমরা যে সুসভ্য তাই প্রমাণ করতে হয়েছিল সেদিন। তবে কার্লার গাল থেকে হাত এলো আমার মুঠোয়। চিত্রার কথা যখন ভাবছিলাম তখন মনে হল—চিত্রার বাবার জোর কোথায়? নিশ্চয়ই কোন জোর আছে। নয় তো সুশোভনের ভাবনার সিঁড়ি ভাঙার শেষ নেই কেন?

ভাবনা সুশোভনের নয়—এবার ভাবনা হল আমার, সুশোভনকে শুক্রবার রাতে Shakespeare-এ দেখে। Shakespeare আমাদের রাস্তার ওপরেই একটা পাবের নাম। অতি সাধারণ পাব। আমার যখন সময় কাটতে চায় না বা বান্ধবী থাকে না তখন এখানে এসে হয় 'ডার্ট' খেলি, নয় তো বীয়ার খাই দু-এক পাঁইট, সুশোভনকে এখানে দেখে ভাবনাও হল—অবাকও হলাম।

'তুই এখানে কি করছিস এই মন্দ ছেলেদের এলাকায়?' ওকে বললাম।

'বীয়ার খাচ্ছি—দেখতে পারছিস না, তোর চোখ নেই?' সুশোভন বললে।

'তা তো দেখছি—কিন্তু একেবারেই ড্রাফট ধরেছিস। ভাল লাগছে তোর? লাইট বা পেল দিয়ে আরম্ভ করতে পারতিস।'

'বেশ লাগছে ড্রাফট—মন্দ কি?' বলে সুশোভন টাম্বলার ধরে বড় একচুমুক দিল। তারপরে বিষম খেয়ে বলল—'দে সিগারেট দে একটা। জমবে ভাল।'

অনুমানে বুঝলাম—একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। কোনরকম

ঢোলকবাদিনী

—আশীষ মিত্র

স্নানার্থী
—শ্রীমতী ডলি ঘোষ

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে আপনার নাম, ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন

মাসিক
বসুমতী
ভাদ্র / '৭১
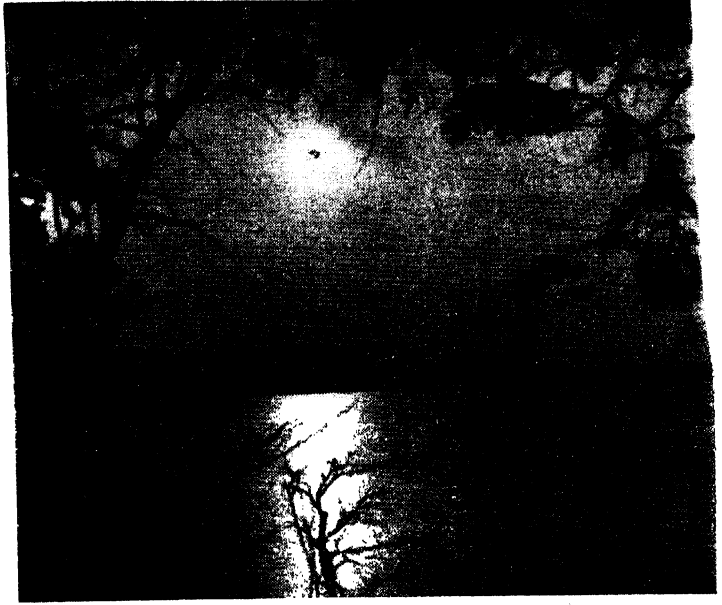
তোপচাঁচী লেক
—বিমলকান্তি সাহা

রফের নদী (বদ্রীনাথ)
—নীহাররঞ্জন শেঠ

ফুলকুমারী
—ইন্দ্রতোষ ঘটক

চাঁদে যেতে চাই

—শুভেন্দু রায়

মায়ের আদর

—অজানা

সাথী

—গদাধর শীল

উচ্চবাচ্য না করে—ওকে একটা সিগারেট দিলাম। তারপরে বললাম—'তুই তো ডার্ট খেলা জানিস না। আয় তোকে শিখিয়ে দি।'

ডার্ট খেলে যখন বাড়িতে ফিরলাম আমরা তখন রাত বেশ ভারী। আমি অবাক হয়েছিলাম সব দিক দিয়েই। প্রথমত সুশোভন আমাদের আর পাঁচজনের মত নয়। ও 'নাচে' যায় না—বীয়ার সাধারণত খায় না. ওর মেয়েবন্ধুও নেই। পড়াশুনোয় যে ও একটা কিছু তাও নয়—কিন্তু design-এর কাজ ও ভালরকম জানে, আর এজন্যে অফিসেও ওর খাতির আছে। ঘর-মুখো ওর মন। দেশে যাবার ইচ্ছে প্রচুর। 'পাবে' একলা বসে বীয়ার খাওয়া ওর পক্ষে বিচিত্রই। সেদিন রাতে আমি আর চিত্রার কথা ওকে জিজ্ঞেস করি নি। দু-একদিন পরে ওকে বললাম—'তোর কি ও তরফ থেকে চিঠি এসেছে?'

ও বললে, 'হ্যাঁ।'

'আমাকে বলিস নে কেন?' আমি বললাম। 'তোকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

'কি বলার আছে আর। ওরা তো ঘুরিয়ে 'না' বলে দিয়েছে। তোকে সেই খবর দেওয়াও যা—না দেওয়াও তা।'

'ও! তাই বুঝি তুই Shakespeare-এ গিয়ে দেবদাস হচ্ছিলি' আমি বুঝেছিলাম যে এমন একটা কিছু ঘটেছে। 'নয় তো সুশোভন-চন্দর একলা পাবে যায় বীয়ার খেতে? আর দেখি তোর চিঠি।' আমি বললাম।

সুশোভনের চিঠি পড়লাম। চিত্রার বাবার লেখা খুব যুক্তিপূর্ণ চিঠি। সুশোভন যদি এক বছরের মধ্যে পরীক্ষায় পাস করে দেশে যায় তো চিত্রার সঙ্গে বিয়েতে তাঁর আপত্তি নেই। তিনি চিত্রাকে আর এক বছর বসিয়ে রাখতে পারেন। তবে এর মধ্যে, সুশোভনকে তার লেখাপড়া সম্বন্ধে বিশদ-বিবরণ দিয়ে চিঠি দিতে হবে।'

'আস্পর্ধা দেখেছিস?' সুশোভন বললে। 'আমাকে আমার progress report পাঠাতে বলেছেন।' আর পরীক্ষায় পাস না করলে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব না লিখেছেন। কেন মেয়ের কি মন বলে কোন বস্তু নেই?'

'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে মনে হয়' বললাম। 'একটা জিনিস অন্তত জলের মত সোজা। তোদের হৃদয়ের কোনও দামই দেওয়া হয় নি। বিয়েটা আমরা যেমন বেচা-কেনার পর্যায়ে ফেলে দর করি—এ তার চেয়ে খুব বেশি দূরে নেই। তুই এক কাজ করতে পারিস। চিত্রাকে খোলাখুলি লিখে দে যে, যদি তুই ছুটি নিয়ে দেশে যাস ও তোকে তিন-আইনে বিয়ে করবে কি না। তোর রোজগারে তুই ওকে খুবই সহজে বিয়ে করে নিয়ে আসতে পারিস। ও যদি রাজী হয় তো কাজ ফতে। আর যদি বলে না তো বলবো—She is not the only pebble on the beach; তারপর বাকি অংশটা ছেড়ে দে আমার হাতে।

নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল সুশোভনের জীবনে এইবার। চিত্রা ছকে-বাঁধা মেয়ে। সনাতনী। মা-বাপের অজান্তে তিন-আইনে বিয়ে করার সাহস তার নেই—সে দিল জানিয়ে। অপমানে-লজ্জায় সুশোভনের পৃথিবী কালো হয়ে গেল। আমি বললাম, 'তুই অপমানিত মনে হচ্ছিস কেন? এতে আর নতুন কি আছে? এই হল আমাদের দেশের মেয়ের প্রেম—মেরুদণ্ড নেই। বাবা যদি বলেন তো রাজী হই,' মরে যাই। কেন এর আগে যে ভালবাসার কথা বলে দিস্তে-দিস্তে চিঠি লেখা হয়েছিল সেটা কি বাবা বলেছিলেন?,—তারপরে আবার বললাম, 'তাথ ওকে খুব বেশি একটা দোষ দিতে পারি না। মেয়ের স্বাধীনতা নেই, মেয়ে স্বাবলম্বী নয়। ওর পক্ষে ও যা বলেছে—সেটা বলাই স্বাভাবিক, এই পরিবেশে ওকে খুব দোষারোপ করা অন্যায়।'

সুশোভন তার ম্যাণ্টলপীসের মাঝখানে চিত্রার ছবি রেখেছিল গত কয়েক সপ্তাহ। আবার বোধ হয় তা ফেরৎ গেল স্বস্থানে। স্যুটকেশের অন্তরালে। সুশোভনবাবু প্রায় প্রতিদিন আবার যাতায়াত সুরু করলেন Shakespeare-এ। এসব না-বালকী কারবারের নীরব দর্শক হয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না। হাজার হোক ছেলেটা দেশের ছেলে। তাই একদিন ওকে বললাম—'তুই নাচের class-এ চল না আমার সংগে—নাচ শিখবি, একটা নতুন জিনিস শেখা হবে, দু-পাঁচজনের সংগে আলাপও হবে, তখন আর জীবনকে এত একঘেয়ে লাগবে না, আসবি?' সুশোভন রাজী হয়ে গেল, তখন ও এল আমার সংগে হেলেনের স্কুলে।

হেলেন কিপস, তুমি এই কাব্যের নায়িকা, বিদগ্ধা—না। তুমি বিদগ্ধা নয়। খণ্ডিতা—হয় তো খণ্ডিতা। বহুবল্লভ—না বহুবল্লভ নয় সে, হেনরী কিপসের ঘরণী হেলেন। হেলেনের বয়স তখন তিরিশকে বুড়ি-ছোঁওয়ার মত সবে ছুঁয়েছে—ছুঁয়েই লুকিয়ে গেছে বিশ শতকের ঘেরাটোপে। হেলেনের নিজস্ব কোন স্কুল ছিল না—হাই স্ট্রীটের একটা স্কুলে সে নাচ শিখেছে। সপ্তাহে দু'দিন, আর একদিন তার নিজের বাড়িতে। আমি তখন কিন্তু জানতাম না যে, হেলেন একদিন নিজের বাড়িতে প্রাইভেট লেসন দেয়। সুশোভনকে নিয়ে এলাম—হাই স্ট্রীটের স্কুলে, শিখে নে মোটামুটি নাচটা—বেশি কিছু নয়, ওয়ালটজটা শিখলেই হবে। তারপর তুই বলবি—

> 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেছে খুলি
> জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'—
>
> সুশোভন-চন্দর,কিসের কি ওষুধ আমি জানি।
> ঘাবড়াও ম্যৎ ইয়ার, দিয়ে দিলাম বাণী।

সুশোভনকে তো 'ঘাবড়াও ম্যৎ' বলে ছেড়ে এলাম। যীশু-কালী-আল্লা! ঘাবড়ালেম এবারে আমি। ওর সব চাল দেখছি আমাকে বানচাল করছে। কয়েক সপ্তাহ পরে দেখি সুশোভন আমাদের ক্লাবের ফ্লোরে নেমেছে। আমি নিয়ম করে ক্লাবে কখনই যেতাম না। যেতাম—মধ্যে-মিশেলে। ক্লাবটা বিশেষ কিছুই নয়—যারা ইংরেজ নয় তারাই এদের সদস্য সাধারণত—এতে ভিড় বেশি কণ্টিনেণ্টালদের আর কালোদের, অর্থাৎ—জ্যামাইকান, নাইজেরীয়ান, ভারতীয়, পাকিস্তানী আর সিংহলী, বিভিন্ন দেশের ছাত্র-ছাত্রী—যুবক-যুবতীর মতের বিনিময়। মনেরও বিনিময়। সপ্তাহ শেষে সাধারণত রেকর্ড বাজিয়ে নাচ হত ক্লাবে। সুশোভন একলা নয় সংগে একটি

মেয়ে। দেখতে মন্দ নয়। পায়ের দিকে নজর গেল আমার, গোদা পা দেখে মনে হল বোধ হয় জার্মান।

একটা নাচের পর সুশোভন এসে বসলো আমার কাছে। ওর পার্টনার তখন আর একজনের সংগে নাচছে। 'কেমন নাচতে শিখেছি?' ও আমাকে প্রশ্ন করলো।

'দারুণ,' আমি বললাম—'কিন্তু তোর ব্যাপার কি? আমার সংগে দেখাসাক্ষাৎ করিস না। এখানকার হালচাল, দেশের হালচাল—কিছুই বলিস না। তার ওপরে দেখলাম নাচের নতুন পার্টনার, কে রে মেয়েটা—নতুন দেখছি। not too bad-ch?'

'ও অলগার কথা বলছিস। এখানেই আলাপ হয়েছে—ব্যাভেরিয়ার মাল, সবে এসেছে।'

'আর নাচবি না ওর সংগে? আমার সংগে অন্তত আলাপ করিয়ে দে,—'

'না আর নাচবো না' ও বললে, 'তোর সংগে আলাপ পরে করিয়ে দেব'খন, চল একটু বেরোই।'

'কোথায় যাবি এখন? এখানেই বল না কি বলবি? মেয়েটার সংগে ভাব করব না?'

'হবে রে ভাব হবে, তোর কি মেয়েদের সংগে ভাব করার শেষ নেই? তোকে আমার কতগুলো কথা বলার আছে দীপংকর—তার জন্যে আমি তোর দু-একবার খোঁজও করেছি। কিন্তু বুঝিস তো—সব কথা বাড়িতে বলা চলে না। হয় তোর ঘরে কেউ এসে পড়বে—নয় তো আমার রুম-মেট কান খাড়া করে সবকিছু শুনবে, আয় একটা নিরিবিলি পাবে যাই।'—

পাবে আবার যেতে হবে? তুই কি আজকাল খুব বেশি বীয়ার খাচ্ছিস?'

'বীয়ার? খুব বেশি খাচ্ছি?' হা-হা করে সুশোভন হেসে উঠলো। 'আমাকে কি তুই নাবালক ঠাউরেছিস?'

সুশোভনের মুখের দিকে ভাল করে তাকালাম, তারপর বললাম—'চল যাই পাবে।'

দু'টো পাইন্ট হাতে নিয়ে পাবের একটা কোণে সুশোভন বসলে। তারপর কোন কিছুর ভণিতা না করে মোটামুটি বললে—'জানিস দীপংকর আমি চিত্রাকে ভালবাসি না, আর চিত্রাও আমাকে ভালবাসে ব'লে মনে হয় না, এটা আমার নতুন উপলব্ধি।'

'কি করে তোর মনের কথা জানবো বল, এই সেদিন অবধি তুই তোর ভালবাসার কথা চেপে রেখেছিলি, হঠাৎ জানালি—তুই চিত্রাকে ভালবাসিস—এমন কি আমি তাই ভেবে তোকে বিয়ে করার পরামর্শ অবধি দিলাম। আজ বলছিস তুই চিত্রাকে ভালবাসিস না। তা হ'লে তোদের এই এতদিনের ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল কার ওপর?'

মাথার চুলের মধ্যে সুশোভন তার আঙুল চালিয়ে দিল। তারপর আস্তে আস্তে টাম্বলারে চুমুক দিল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—'আমিও তাই ভাবি দীপংকর।'

'কি ভাবিস তুই?' সীরিয়াস হয়ে বললাম।

'আমি ভাবি যে, একটা দিক আমি এতদিন দেখি নি। যেটাকে তোরা আর পাঁচজন মিলে বলবি bese—অর্থাৎ দেহ। দেহকে অস্বীকার করে ভালবাসা হয় না। আমাদের তরফে তার সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি ছিল—তাই বোধ হয়—'

'দেহ—bese তোর রাতারাতি এত জ্ঞান হয়েছে ভাবলে অবাক হয়ে যাই—' বাধা দিয়ে বললাম, 'এদেশে এসেছিস তিন বছরের ওপর, এতদিন তো এসব তোর কাছে শুনি নি—এই তিন হপ্তায় এত জ্ঞান হল তোর কোথা থেকে?'—

সুশোভন সহসা উত্তর দিলে না। সিগারেটকে খুব জোরে টেনে রিং করার বৃথা চেষ্টা ক'রে বললো—'হেলেন বলেছে,'—

'হেলেন বলেছে?'—আমি আকাশ থেকে পড়লাম, 'তোর হেলেনের সংগে এত আলোচনা হল কখন?'

'দীপংকর, তোকে আরও অবাক করবো।' সুশোভন বললে। 'জানিস, আমার মনে হয়, আমি হেলেনকে ভালবাসি, আর হেলেনও আমাকে'—

'না মাইরি, এ যে অবাকের চেয়ে বেশি।' আমি বললাম—'তুই আর ঝামেলা বাড়াস নে সুশোভন, হেলেনের স্বামী আছে, সন্তান আছে, ক্লাবে অলগা—উটা, যে কোনও স্প্যানিস জার্মান মেয়ের সংগে দু-এক বছর নেচে-কুঁদে ঘরের ছেলে ঘরে ফের, এ সব করতে গেলে ঝামেলায় পড়বি—পয়সার শ্রাদ্ধ হবে,—'

'দীপংকর তোর জাতের ছেলে প্রেম বোঝে না। তুই তো কখনও প্রেমে পড়িস নি—এসব বুঝবি কি করে? আমার মনে হয় আমার আর চিত্রার ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাওয়ায় আমাদের দু'জনেরই ভাল, আমার ভাললাগা ওর ভাললাগায় কোনও মিল নেই, আমি গান ভালবাসি সুর ভালবাসি—চিত্রা তো একেবারেই—অ-সুর। ও আমার থেকে অনেক দূরে।'

'বেশ কথা, সে না হয় হল। কিন্তু হেলেন? হেলেনকে ভালবাসার যুক্তি কি? দেহ? না তার চেয়ে বেশি। আর মনে রাখিস যে তুই একটা সংসার ভাঙছিস। সবচেয়ে বড় কথা হল—তোর এখন মোহ চলছে। ভালবাসা নয়। আর কিছুদিন যাক্—তখন তুই নিজেই বিচার করবি—এটা ভালবাসা—না মোহ, সেদিন তুই রায় দিস।'

পাব থেকে ফিরলাম দু'জনে। প্রচুর অবাক হয়েছিলাম আমি, প্রথম সুশোভনের আচরণে—দ্বিতীয় হেলেনের, সুশোভনকে হেলেনের ওখানে আমিই নিয়ে যাই। স্বামী-পুত্রপরিবৃতা হেলেনকে দেখে আমার এই দিককার কথা একেবারেই মনে আসে নি। ওর স্বামীকে অবশ্য দেখি নি কখনও—যদিও ওদের বাড়িতে দু-একবার গেছি—নাচের ব্যাপারে, হেলেন প্রাইভেট লেসন দিতো সপ্তাহে একদিন যা আমি পরে জেনেছিলাম। ওদের পাড়াটাও—মধ্যবিত্ত পাড়া, সুন্দর।

এ পর্যন্ত সুশোভনের সমস্যা ছিল চিত্রা। এবারে ও অনেক সমস্যা সৃষ্টি করছে দেখলাম। আমাদের জীবনে বৈচিত্র্যহীনতা আমরা পছন্দ করি না—তাই বোধ হয় ইচ্ছে করে জীবনগ্রন্থি জটিল করি। জট বাঁধতে ভালবাসি—নিজেদের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মনের গোচরে-অগোচরে জট বাঁধি, দুঃখ পাই, বেদনা পাই—দুঃখ দিই। তবু বাঁধি—বাঁধাই। আনন্দও পাই। সুশোভনের পৃথিবী জটিল হ'চ্ছে—

দেখলাম। কিন্তু আমার কি তাতে? ওর পৃথিবী ওর—ওর আনন্দ ওর—ওর দুঃখও ওর।

হেলেনের সংগে সুশোভনের ভালবাসা হল কি করে? স্বাধীনতা কই ওদের? তাই ভাবছিলাম, হেলেনের নিজস্ব—সপ্তাহের দু'টো দিন নাচের স্কুলে, আর একটা দিন প্রাইভেট লেসন দেবার সময়! সেটা কি যথেষ্ট? অন্য সময়ে ওর স্বামী আছে—পাঁচ বছরের ছেলে জন আছে। হেলেন মোটামুটি সুন্দরীও। সে সুশোভনের প্রেমে পড়বে কেন? একেবারে পাঁচপাঁচি মামুলি সুশোভন। অন্য ভারতীয় ছেলের সংগে ওর তফাৎ কোথাও নেই। তফাৎ শুধু পেপ্যাকেটে। Air-craft design-এ ওর হাত খুব ভাল। হেলেন কি তবে ওর পেপ্যাকেটের প্রেমে পড়েছে? তাই বা হবে কেন? ওদের বাড়ি-ঘর-দোর দেখে তো মনে হয়—হেলেনের স্বামীর অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। মাত্র তিন-চার সপ্তাহের আলাপ—এর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা-প্রেম, মন দেওয়া-নেওয়া সব! সুশোভন করিৎকর্মা কি জানি না—তবে ত্বরিৎকর্মা নিশ্চয়ই।

হেলেনের সংগে আমার একদিন দেখা হল ওডিয়ন সিনেমায়, কন্টিনেণ্টাল ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে ওকে দেখলাম সুশোভনের সংগে। আমিও একলা ছিলাম না। সুশোভন মারফত এর মধ্যে সেই জার্মান-মেয়েটির সংগে ভাব হয়েছিল। অল্গা ছিল আমার সংগে। ছবির শেষে বাইরে বেরোবার সময় দেখা।

'হ্যালো দীপংকর' বলে হাসিমুখে হেলেন এগিয়ে এলো। আমি এর সংগে অল্গার আলাপ করিয়ে দিলাম। সুশোভনের হাতে বোধ হয় কিছু সময় ছিল। আমাকে বললে, 'আয় নূরমহল রেস্তোরাঁয় হেলেনকে ভারতীয় খাবার খাওয়াব।'

খাবার টেবলে দেখলাম হেলেন সমানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে। কোলকাতা শহর কেমন? বার্মিংহামের চেয়ে বড় না ছোট—সেখানে ওপরতলার লোকেদের আদব-কায়দা কেমন, তাদের মধ্যে কারা কাঁটা-চামচ দিয়ে খায় আর কারা হাত দিয়ে—এইসব। সুশোভন তার কিছু জবাব দিচ্ছে, কিছু ছেড়ে দিচ্ছে আমার ওপর, অল্গা একটু একটু বুঝছে—আবার কিছু বুঝছে নাও। ওর ইংরেজী তখন বিশেষ রপ্ত হয় নি। তা ছাড়া খাবার নিয়েও সে ব্যস্ত; কন্টিনেণ্টাল মেয়েগুলো আর যাই হোক, ভারতীয় খাবারের মর্যাদা দেয় বেশ। খাওয়া শেষ করে আমরা বেরোলাম। বিদায় নিয়ে দু'দিকের পথ দু'জনে ধরলাম। অল্গা তখন আমাকে বললো, 'হেলেন মেয়েটা বেশ ভালই, কিন্তু বড় বোকা'।

আমি বললাম—'বোকা কেন বলছো?'

'তুমি বুঝতে পার নি যে ও সুশোভনের প্রেমে পড়েছে?' অল্গা বললে, 'মেয়েদের চোখ এড়ান বড় কঠিন।'

'আর সুশোভন?' আমি ওকে জিগ্যেস করলাম।

'সুশোভন একটু চেখে দেখতে চায়' হি-হি করে অল্গা হেসে উঠলো। 'ওসব ছেলে আমরা খুব বুঝি'—

'ছাই বোঝ পোড়ারমুখী'—আমি বাংলায় বললাম।

'পোড়ামুখী' কি বললে তুমি তোমাদের ভাষায়? অল্গা ভুরু

'তোমার সত্যি বুদ্ধি আছে—আমার ভাষায় বললাম 'খু-উ-ব বুদ্ধি'—জবাব দিলাম।

অল্গা খুশিতে উপছে পড়লো। একটু দূরে এসে ওকে তুলে দিলাম বাসে।

কয়েকমাস কেটে গেছে। সুশোভন আমাদের বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে উঠে গেল। এ বাড়িতেও অনেকদিনই ছিল। হঠাৎ বাড়ি বদলের কারণ আমি জানতাম। সুশোভনের এ বাড়িতে নিজস্ব কোন ঘর ছিল না ও একটা ডাবল ঘর সেয়ার করছিল, তা ছাড়া সুশোভন আর হেলেনের ব্যাপার নিয়ে এ বাড়ির অন্য ভারতীয় যে সরস-আলোচনা করত তা ওর ভাল লাগার কথা নয়। বাড়ি বদল ক'রে সুশোভন এলো—পার্ক ক্রেসেণ্ট। সিংগল ঘর—ভাড়া বেশি—স্বাধীনতাও। মাঝে মাঝে এই বাড়িতে আমি আসতাম। পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে আমি নিরপেক্ষ ছিলাম বলে সুশোভনের সংগে আমার যাতায়াত বজায় ছিল। হেলেনকেও দেখেছি দু-একদিন সুশোভনের নতুন বাড়িতে। দেখলাম হেলেনও বদলেছে!

আমি আজও বুঝি না হেলেনের কেন এই পরিবর্তন এসেছিল সেদিন। হেলেনের প্রথম প্রেম নয় অথচ প্রথম প্রেমের তরুণিমা মাখান ওর মুখে। ওর যৌবন ফুরোবার আগে—শেষ উন্মেষও নয়—প্রদীপ নিভে যাবার আগে শেষবার প্রাণপণে জ্বলে ওঠার মত, কারণ হেলেনের তখন প্রায় তিরিশ বছর বয়স—তার ইংরেজমেয়ে যৌবনকে বেঁধে রাখতে জানে। কিসের ছোঁওয়া পেয়েছিল সে? ওর জীবনে মন দেওয়া নেওয়া খেলা—অনেক খেলা হয়েছে। এত উদ্বেগ বা কিসের? একদিন ওকে দেখলাম সীনিওর পেড্রোর দোকান থেকে বেরোচ্ছে, সীনিওর পেড্রোকে আমার পাকিস্তানী ব'লে সন্দেহ হয়। কেন যে নাম ভাঁড়িয়ে স্প্যানিশ নাম নিয়েছে বুঝি না। ইনি হস্তরেখাবিদ আবার এঁর নতুন অভিনব পদ্ধতি হল—শব্দ-তরংগ দিয়ে মেসেজ পাঠান। এই শব্দ-তরংগের সংগে মনের তরংগের যোগ হ'লে অলৌকিক কিছু বলা যায়। সীনিওরের দোকানে হেলেন কত পয়সার চোট খেল জানি না। আমি সীনিওরের দোকানের সামনের কাফেতে চা খাচ্ছিলাম। হেলেনকে বেরোতে দেখে বেরিয়ে এলাম।

'তুমি পেড্রোর ওখানে গিয়েছিলে দেখলাম।' কোনরকম ভণিতা না করেই বললাম, হেলেন আমাকে দেখবে আশা করে নি। একটু চমকে গেল।

'হ্যাঁ পেড্রোকে হাত দেখালাম। আচ্ছা দীপংকর তুমি হাত দেখতে পারো? সব ভারতীয়রাই তো পারে।'

'হ্যাঁ তা পারে বটে! শুধু হাত দেখতে না—শূন্যমার্গে দড়ি ফেলে ভোজবাজীর খেলা দেখাতেও পারে।'

'উল্টা-পাল্টা কথা বোল না দীপংকর। বল না—তুমি আমার হাত দেখবে কি না?'

'নিশ্চয়ই দেখব—নিশ্চয়ই দেখব। নরম হাত—চাঁদের আলোয় আমি খুব ভাল দেখি'—

'Please দীপংকর। Please আমি পেড্রো যা বলেছে তার সংগে মিলিয়ে দেখবো—আমার ভারতবর্ষে যাওয়া হবে কি না—আমার

হেলেনের হাত আমি দেখি নি। দেখতে জানি না—আমি, হাত দেখে কি বলব? একবার ইচ্ছে হল বলি, 'তুমি কিসের নেশায় স্বামী পুত্র আর স্বদেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে আসার স্বপ্ন দেখছো? তোমার ভারতবর্ষ কি সুশোভন অনেক রঙে রাঙিয়েছে? সে রঙ মিথ্যা ছলনার—না সুশোভনের হৃদয়ের রক্তরাগে রাঙান? হেলেন কিপস যে ভারতবর্ষকে তুমি ভালবাসতে চাইছো, মাতৃত্বের মূল্য যে তার কাছে অনেক বড়? তোমার রক্ত-মাংসে তৈরি ছোট্ট জনকে তুমি ভুলতে বসেছ—আজ এ ভোলাকে আর যে কেউ ক্ষমা করলেও ভারতবর্ষ কখনও ক'রবে না।' কিন্তু আমার মনের কথা মনেই রয়ে গেল। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে যে-যার বাড়ির পথে রওনা হলাম।

অলগার নতুন ছেলেবন্ধু হয়েছে—ইংরেজ। আমারও আবার নতুন বান্ধবী হল—এরিকা। বিড়ালাক্ষী: আইরিশ মেয়ে। আমার আলাপ খুব বেশি হয় নি এরিকার সংগে তখনও, মানে আমি খুব হিসেব ক'রে ব'ড়ের চাল দিচ্ছিলাম। গজ-নৌকো আর ঘোড়া সব হাতে রেখেছি। একটু বেশি হিসেব করেই চলছিলাম, কারণ এরিকা সুশোভনের সংগে এক বাড়িতেই থাকতো। আর সুশোভন আমাকে টিপ দিয়েছিল আগে থেকে খুব সাবধানে ব'ড়ের চাল দিতে। The Goat'-এ আমাদের নাচতে যাবার কথা ছিল। এরিকা এসে বললো—আজ নাচ বন্ধ থাক। তুমি সুশোভনকে দেখে এসো। ও অসুস্থ। উইক-এণ্ডটা এমন করে মাটি করার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। কিন্তু এরিকার অনিচ্ছে দেখে তা মাটি করতেই হল।

'কি হয়েছে সুশোভনের?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'জ্বর-টর হবে বোধ হয়, দেখতে বড় খারাপ লাগলো। তোমার কথাও জিগ্যেস করছিল।'

'কথা জিগ্যেস ক'রছিল তো কি হয়েছে? যেতে বলেছে কি?'

'দীপংকর আমার মনে হল ও বলতে গিয়ে বলল না। বোধ হয় আমাদের কথা ভেবেই বলে নি। আমার সেটা খুব ভাল লাগলো না। থাক না আজকের মত নাচ। আমি আমার বোনের বাড়িও যেতে পারি।'

'ভাল। যা তোমার ইচ্ছে'। বলে সুশোভনকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে পার্ক ক্রেসেণ্টে এলাম।

সুশোভন নিজেই দরজা খুলে দিলো। একমুখ দাড়ি—দৃষ্টিও উদাস।

'কি হয়েছে তোর এমন নোংরা হয়ে বসে আছিস? জ্বর-টর হয়েছে?'

'না জ্বর হয় নি। মনটা বড় খারাপ হয়েছে। কত কি যে ভাবছি।'

'কি ভাবছিস তুই? আমাকে বলা চলে?' চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম।

'আচ্ছা দীপংকর? (ওর আচ্ছা দিয়ে যে কথাগুলো আরম্ভ হয়, সেগুলো একটু গোলমেলে) এ্যাফ্রিকায় উইচক্রাফট আছে—আমাদের দেশে মারণ-উচাটন আছে—এই দেশে ফেথ-কিওর আছে—তা হলে নিশ্চয়ই ফেথ-কিলিংও আছে তাই না? আমেরিকাতে তো ভুডু আছে।'

'তাই বিলেতে বসে মারণ-উচাটন করছিস? মতিচ্ছন্ন না হ'লে লোকে এমন কথা বলে না। কিন্তু মারবি তুই কাকে—কে তোর কাঁচা আলে পা দিয়েছে?'

'হেনরীকে মারবো। হেনরী কিপসকে। ভগবানকে রোজ বলছি—'হে ভগবান রোজ দুর্ঘটনায় তো কত লোক মরে। হেনরী কেন মরে না। হেনরী কেন মরে না?'

'হেনরী মরলে তোর লাভ কি? বেঁচে থেকেও তো তোর খুব লোকসান হচ্ছে না।'

'আমার লাভ কি তা তুই কি করে বুঝবি? এত লুকোচুরির হাত থেকে তা হলে মুক্তি পাই রে দীপংকর। সাতাশ বছর বয়স হয়েছে আমার। আর লুকোচুরি ক'রে ভালবাসতে পারি না। প্রতিনিয়ত আমার ভয়, প্রতিক্ষণ হেলেনের ভয় এই বুঝি জানাজানি হল। এই বুঝি কোন প্রতিবেশি হেনরীর কানে কথা তুলে দিল। তুই তো জানিস আমাদের কত সাবধানে বাইরে বেরোতে হয়। অথচ আমি হেলেনকে ভালবাসি—আর হেলেনও আমাকে ভালবাসে। ওকে বেশি করে পাব বলে তোদের বাড়ি ছেড়ে এলাম এই বাড়িতে। কিন্তু কোথায় ওর স্বাধীনতা? কোথায় আমার সুযোগ?'

'ছেড়ে দে তা হ'লে হেলেনকে। এত ঝামেলা করে, মন খারাপ করে, শরীর খারাপ করে, নাই বা প্রেম করলি? আর তোকে তো কেউ প্রেম করার জন্যে মাথার দিব্যি দেয় নি। দেখ না আমাকে—হাঁসের মত জলে সাঁতার দিচ্ছি—অথচ পালকে জল লাগছে না। আমার মত হতে পারিস নে?'

'পাবি না দীপংকর তোর মতো হ'তে, ওর মুখের দিকে চাইলে সব ভুলে যাই। জানিস আমার সংগে ও কত আলোচনা ক'রেছে আমাদের দেশের সংসার সম্বন্ধে? মা-বাবা কেমন লোক? জনীর কথা ও যদি চেপে যায় তা হ'লে তো তাঁরা কিছুই ভাববে না—কারণ জনকে ও এ দেশেই রাখতে চায় শিক্ষার জন্যে।'

'তোরা এতদূর এগিয়েছিস? ভারতবর্ষে যাবার কথা ভাবছিস? কিন্তু তোর তো আসল সমস্যাই রয়ে গেছে। হেনরী কিপস যদি ওকে ডিভোর্স না করে তো তুই কি করবি? আর যদি ডিভোর্স আনে তো তুই কি কো-রেসপণ্ডেণ্ট হবি? জানিস তো বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর co-respondent হ'লে আটতিরিশ তোকে খেসারত দিতে হবে। তোর ঘটি-বাটি চাটি হবে। বাঙালীর ছেলে যা দু'পয়সা জমিয়েছিস—তা আর থাকবে না। তা এত ঝামেলা করে, যদি তোর বিয়ে করা পোষায় তো কর বিয়ে। নয়ত সময় থাকতে চুকিয়ে দে, এসব মারণ-উচাটনের কোনও কাজ হবে না।'

'co-respondent হবার দিকটাও আমি ভেবেছি,' সুশোভন বললে। 'হেলেনকে বলে দিয়েছি যে আমার পক্ষে তা হওয়া সম্ভব নয়। ওর সংগে হেনরীর সংগে এখন বনাবনিও নেই। সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে হরদম ঝগড়া হচ্ছে, ওকে mental cruelty-র অজুহাত দিয়ে ডিভোর্স আনাতে বলব ভাবছি। যদি হেলেন কোনরকমে ডিভোর্স পায় তো ও আমার হবে। পরিপূর্ণভাবে আমার। তখন আর কোন লুকোচুরি থাকবে না। আমাদের ভালবাসা—আর আমরা দু'জনেই স্বাধীন হবো।'

'কিন্তু যদি mental cruelty-র অজুহাত যথেষ্ট না হয় যদি হেনরী ওকে ডিভোর্স না দেয় তখন?'

'তখন? জানি না তো তখন কি হবে। তুই দেখবি দীপংকর ভগবান আমার সহায় হবে। এতবড় ভালবাসার কি কোনও দামই নেই? তুই কি করে জানবি যে, হেলেন আমার কাছে কতখানি। ওকে ছাড়া আমার জীবন হবে প্রেমহীন জীবন। যে জীবনে সব থাকবে আহার, নিদ্রা, সন্তানের জন্ম দেওয়া—তবু কিছু থাকবে না। যে জীবন হবে দৈনন্দিন রথচক্রের দৈনন্দিন চলা। এ জীবন টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আমার ভালবাসা দেহকে আশ্রয় করেই উঠেছে কিন্তু আজ তা দেহতে আবদ্ধ নেই। এর পরিধি অনেক বড়—তবু এর বিকাশ নেই, আমাদের স্বাধীনতা নেই বলে। তাই অহরহ ঈশ্বরকে বলছি—হে ঈশ্বর, হেনরী কিপসের একটা কিছু হোক —একটা কিছু হোক, কেন হেনরী থাকবে আমাদের দু'জনের মধ্যে? হেলেন আমার—হেনরীর নয়, হেলেন আমার।'—

সুশোভন এতগুলো কথা বলে হাঁফিয়ে উঠলো। আমি দেখলাম ওর চোখে জ্বালা, মন অশান্ত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত। কথাবার্তা ওর সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। ও যদি হেলেনকে ভালবেসেই থাকে তো সোজাসুজি ডিভোর্স আনার চেষ্টা করলেই তো হয়? সেটা ওর পছন্দ নয়—অথচ হেলেনকে ওর চাই। কি আর বলব আমি, চোরা না শোনে ধর্মের কথা। তারও পরে আবার মারণ উচাটন শুরু হয়েছে, ইচ্ছে হোল নামাবলী শোনাই। মুখে বললাম, 'তোর একটু পরিবর্তন দরকার। যা না দিন ছুটি নিয়ে বার্মিংহাম ছেড়ে অন্য কোথাও। London-এ যা না? আর এখন ছেলেমানুষী রেখে দাড়ি কামা। আমার সংগে রেস্তোরাঁয় চ' প্রন-কারী খাওয়াব।'

সুশোভন যে ভেতর ভেতর লণ্ডনে চাকরীর চেষ্টা করছিল তা জানতাম না, লণ্ডনে আমার কথামত ও দু' সপ্তাহ হলিডে করে এসেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন আমাদের লণ্ডন রোডের বাড়িতে ও এসে হাজির।

'লণ্ডনে চললাম দীপংকর, চাকরী পেয়েছি, মাইনেও ভাল।'

'লণ্ডনে হঠাৎ চাকরী নিলি কেন? লুকোচুরি আর সইছে না বলে?'

'না ওসব লুকোচুরি দেখা-চুরির স্টেজ আমার কেটে গেছে। Ambition, বুঝলি Ambition, মানুষের Ambition থাকা চাই। ছোটর চেয়ে একটু বড়, তারপর আরো একটু। এটা আমার প্রথম ধাপ।'

'হেলেনের সংগে তা হ'লে চুকিয়েই দিলি। ভালই করেছিস।' আমি বললাম।

'চুকিয়ে দিয়েছি কে বললে? ভালবাসা কি খোলামকুচি যে চুকিয়ে দিলুম, ফেলে দিলুম? তুই তো ভালবাসার ভ-ও বুঝিস না। এরকম বুদ্ধি আর কে দেবে।'

'তা হ'লে? তা হ'লে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াচ্ছে?'

'ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, আমি আগে লণ্ডনে গিয়ে গুছিয়ে বসব। তারপর হেলেন আসবে—চাকরী-বাকরী নিয়ে। তারপর

'দু তিন বছর? তুই থাকবি বসে এই দু-তিন বছর। তোর পাঁঠা তোর যা ইচ্ছে করবি। ল্যাজা-মুড়ো সবই তোর।'

'হ্যাঁ আমার পাঁঠা আমি ল্যাজের দিকে কাটবো না—এটা জোর গলায় বলছি। দু-তিন বছর! দু-তিন বছর আর কি এমন সময়? ও তো দেখতে দেখতে কেটে যায়। এদেশে কত লোক তো কতো বছর এনগেজ্‌ড হয়ে বসে থাকে।'

সুশোভন এই অবধি বলে থামল। তারপর দু'টো আঙুল দিয়ে নিজের দাড়িটা চেপে ধরে আস্তে আস্তে বললো—'দীপংকর, মাঝে মাঝে তোর এখানে এসে যদি হেলেনের সংগে দেখা করি তো—মানে ইয়ে'—

'তা তুই যদি লণ্ডন উজিয়ে আসিস তো আমি তোর চাঁদে রাজ হবো না'—

'সাবাস। তুই আমার ভাই-এর চেয়ে বেশি, গদগদ হয়ে সুশোভন বললে। যাবার আগে একটা পার্টি দেবার ব্যবস্থা করছি। তোর পুরো Co-operation-এ আমার জয়লাভ হবেই।'

সুশোভনের পার্টিতে হেলেনকে দেখলাম। নীরব-নতমুখী-শান্ত, ইংরেজ মেয়েকে এমন চুপচাপ পার্টিতে সচরাচর দেখা যায় না। যেন ভূমিকম্প হবার আগে থমথমে পৃথিবী। সুশোভন এর কয়েকদিন পরেই লণ্ডনে চলে গেল। কিন্তু প্রতিটি শুক্রবার হাজিরা দিতো— বার্মিংহামে। ওর ভালবাসার আগুনের তাপ যে কমে আসছিল তা আমি বুঝেছিলাম। আর একটা ঘটনায়—সেটা আরো স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ালো। হেলেন অনেকদিন থেকে একটা ভাল শাড়ি চেয়েছিল ওর কাছে। সুশোভনের তা খেয়ালে থাকতো না। শেষ উইক-এণ্ডে হেলেন সেটা আবার মনে করিয়ে দিয়েছিল আমার সামনে। এবারে যখন সুশোভন এলো হাতে ওর একটা প্যাকেট দেখে আশ্বস্ত হলাম। ছেলেটা তা হ'লে ভুলে যায় নি! যদিও ওর সংগে হেলেনের এতটা মাখামাখি আমি কোনদিনও চাই নি—তবু মেয়েটা ভাল দেখে আমার মন ভিজেছিল।

'আমার শাড়ি আছে বুঝি প্যাকেটে?' হেলেন খুব উৎসাহের সংগে ওকে জিগ্যেস করেছিল।

'ঐ যা ডারলিং আবার ভুল হয়ে গেছে—প্যাকেটে আমার একটা পুরোনো সোয়েটার আছে—এর হাতাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে বলে তোমাকে দিয়ে সেলাই করাতে এনেছি—পরের বার ঠিক শাড়ি আনবো—' সুশোভন বললে।

হেলেনের মুখ দেখলাম—কালো হয়ে গেল লজ্জায় অপমানে দুঃখে। কি-ই বা একটা শাড়ির দাম। সে তো দাম যাচাই করতে যায় নি। যাকে ভালবাসে তার কাছে কাঙালের মতো হাত পেতেছিল। আজ শূন্য হাত তার সমস্ত কিছু যেন শূন্য করে দিল। আমি নজর করলাম সুশোভনের দিকে।

হঠাৎ আমার মনে হল সুশোভনের জাত আর আমার জাত একই। ক্রৌঞ্চ ও নয়—ও আমারই মতন পাতিহাঁস। ডুব-সাঁতারের খেলা খেলছে জলে নেমে কিন্তু পাখায় ওর জল লাগছে না, পিছলিয়ে যাচ্ছে। সুশোভন বোধ হয় আমার চেয়েও ভাল সাঁতারু।

কারণ আমার আর ভাল লাগছিল না। প্রত্যেকটা উইক-এণ্ডে সময় করে ঘর ছেড়ে যাওয়া কার আর ভাল লাগে? তার ওপর সময়ের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কারণ হেলেন যে কোন সময় ছাড়া পাবে—জানা নেই, আমার রুম-মেটও ঘটনাকে খুব ভাল করে নেয় নি। শুধু সুবিধে ছিল যে, সে শনিবার দিন সাধারণত থাকতো না, তার দাদার ওখানে যেত। তবু সব ব্যাপারটা যেন কেমন ঘোলাটে—আমার মনে হোত। সুশোভন মুখে বলছে 'ভালবাসি-ভালবাসি'। আর একদিন আমাকে হৃদয়, আত্মা-টাত্মা বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, অথচ ডিভোর্সে কো-রেসপণ্ডেন্ট হবে না। একটা আস্ত মাকড়া। তবু এই আস-যাওয়া কমে আসাতে আমি খুশিই হয়েছিলাম। কারণ হেলেনের সংসার আছে—স্বামী-পুত্র আছে, আমি কোনদিনই চাই নি সে-সংসার ভেঙে যাক, ওদের ভালবাসার তাপ যদি নিভে যায় তো ওরা আবার সহজ জীবনে যাবে—এই ছিল আমার বিশ্বাস। হেলেন কিন্তু তখনও লণ্ডনে চাকরী নেবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভাগ্যে জোটে নি।

তিন মাস কেটে গেছে। একটা রবিবারের সন্ধ্যেবেলায় সুশোভন হঠাৎ এসে হাজির বার্মিংহামে। রবিবার সন্ধ্যেবেলায় আমরা সচরাচর বাড়িতে থাকতাম না, সুশোভনের তা জানা ছিল। সুশোভন এর আগের তিনটে উইক-এণ্ড আসে নি। কোনরকম চিঠিও দেয় নি যে কেন এলাম না। হেলেনের সংগেও আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় নি—বেশ কিছুদিন। ওদের ঘটনা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

'আরে সুশোভন, তুই?' অবাক হয়ে বললাম, 'রবিবার সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ—এসেছিলি বুঝি বার্মিংহামে? আছিস কোথায়—হোটেল-টোটেলে? তিন সপ্তাহ তো ডুব দিয়েছিস।'

'দীপংকর ঝামেলায় পড়েছি। (হরি! হরি! আবার ঝামেলা। তোর এক ঝামেলায় তো আমি নাজেহাল!) এখুনি আসছি লণ্ডন থেকে। তোর সঙ্গে পরামর্শ করব। নিরিবিলি করা চলবে এখন? তোর রুম মেট চন্দর তো তার দাদার বাড়ি থেকে রাত এগারোটার আগে আসবে না, এখন সন্ধ্যে ছ'টা।'

'না চন্দর এগারোটার আগে আসবে না। তবে ঝামেলা আবার কি, না মাইরি।'

সুশোভনের ঝামেলার কথা শুনলাম। একটু ঘাবড়ে যাবার কথা। পরকীয়া প্রেমের পথ, সোজা প্রেমের পথের চেয়ে অনেক কুটিল। প্রেম সহজ পথে চলে না, পরকীয়া প্রেমের পথে অনেক চোরকাঁটা—অনেক চোরাবালি, সুশোভন সেই কাঁটা দেওয়া পথে হাঁটছিল কাঁটা বাঁচিয়ে। এখন তার কাঁটা ওর পায়ে বিঁধেছে। হেনরীর সন্দেহের জালে ও পড়েছে—আর সে জাল ভীমজাল। আজই সকালে লণ্ডনে ওর বাড়ির দরজায় রিং শুনে ও এসে দরজা খুলে দেখে এক ইংরেজ-দম্পতী দাঁড়িয়ে, তারা সোজাসুজি বলে যে, তারা সুশোভন রায়ের সংগে দেখা করতে চায়। সম্ভব হবে কি না। সুশোভন এর আগে কখনও এদের দেখে নি তাই আশ্চর্য হয়ে যায়—তারপর তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে, মেয়েটি বলে

যে, সে হেলেনের বান্ধবী—হেলেনের কথা অনুযায়ী দেখা করতে এসেছে সুশোভনের সংগে। এই ঘটনার আগের তিন সপ্তাহ সুশোভন বার্মিংহামে আসে নি। হেলেনেরও কোনও খবর পায় নি। তাই খুশি হয়ে তাদের নিজের বসার ঘরে নিয়ে আসে। ওর তখনও মনে কোন সন্দেহের রেশও ছিল না। কফি-সিগারেট দিয়ে যখন সুশোভন তাদের আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত তখন ভদ্রলোকটি সহসা ওকে এই প্রশ্ন করেন।

'আচ্ছা, আপনি কি হেলেনকে বিয়ে করতে চান ?'

'এ অত্যন্ত ব্যক্তিগত কথা, আমি অল্প পরিচয়ের লোকের সংগে একথা আলোচনা করতে চাই না'—

'আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি—যদি আপনি আপনার স্বীকৃতি দেন।'

'স্বীকৃতি ? কিসের স্বীকৃতি ?' সুশোভন তখন ঘামতে থাকে।

'আমরা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার। হেনরী কিপসের। হেনরী কিপস হেলেনকে ডিভোর্স করতে রাজি আছে—আপনি যদি এই জবানবন্দীতে সই করেন।' ভদ্রলোকটি সুশোভনের সামনে এক লিখিত জবানবন্দী ফেলে দেন। জবানবন্দীর সারাংশ এই যে, হেলেন অন্তঃসত্ত্বা। আর সন্তান সুশোভনের।

সুশোভন জবানবন্দী সই না ক'রে পত্রপাঠ তাদের বিদায় দেয়।

'হেলেনের বাচ্চা হবে, তুই এ ঘটনা জানিস ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ' সুশোভন জবাব দিলো।

'বাচ্চা কার—তা জানিস ঠিক করে ? তোর না হেনরীর ?'

'আমার'—সুশোভন বললে। গত চার মাস হেনরীর সংগে হেলেনের কোন সম্বন্ধ নেই। এখন আমাকে London-এর বাড়ি পাল্টাতে হবে। আমার নতুন Office-এর ঠিকানা ওরা কেউ জানে না। তোদের থেকে যেন কেউ না জানে। এই জন্যে আমি আজই লণ্ডন থেকে দৌড়ে এলাম।

'কিন্তু হেলেন ? হেলেন তো তোর Office-এর ঠিকানা জানে। তাকে তো তোর contact করে চলতে হবে ? সেদিক দিয়ে যদি খবর বেরোয় ?'

'না আমি এখন হেলেনের সংগে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারবো না। আমার শেষ চিঠির উত্তর আজ তিন সপ্তাহ দেয় নি। কি আমার এমন গরজ ? আর হেলেন আমার নতুন Office-এর নামও জানে না—তো ঠিকানা।'

'হয় তো হেলেনের অসুখ-বিসুখ হয়েছে, আমিও তো তিন হপ্তা তাকে দেখি নি। তুই এ নিয়ে এত উতলা হচ্ছিস কেন ? এ তো ভালই হল। তোর তো সমস্যা সমাধান হ'য়ে গেল। হেনরী নিশ্চয়ই হেলেন আর তার কালো-ছেলেকে নিয়ে ঘর করবে না। তুই তো এখন ওকে বিয়ে করতে পারিস।'

'বিয়ে ? এমন করে বিয়ে ? এমন ক'রে কে বিয়ে করবে ? এমন করে বিয়ে করতে কি আমি কোনদিন চেয়েছিলাম ! দূর দূর ওসবে জমি নেই। কো-রেসপণ্ডেণ্ট হবার অনেক খরচ।'

হেলেনকে এত করে চেয়েছিস, তোর ভালবাসার মধুচক্র ওকে ঘিরে উঠেছে, তুই হেনরীর মৃত্যুর জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা অবধি করেছিস—যাতে তুই হেলেনকে সম্পূর্ণভাবে পাস। আর আজ যখন তার কাছে আসার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে—তুই দু'হাতে তাকে ঠেলে দিচ্ছিস—এই কি তোর ভালবাসা ? এই কি তোর এতদিনের মন জানাজানি।'

'দীপংকর তুই বুঝছিস না, কি কেলেঙ্কারী হবে এতে। আর আমার যথাসর্বস্ব যদি খেসারত দিতে যায়, তো বিয়ের পরে আমার থাকবে কি ? বিয়েটা তো ছেলেখেলা নয় !'

'থাকবে তোদের প্রেম, তোদের দু'জনের সন্তান, তোর রক্ত আর হেলেনের দেহ-কোষের প্রতিটি বিন্দুর যৌথসৃষ্টি, তোদের দু'জনের স্বাক্ষর, তুই কি তাকে ফেলে দিতে চাস ?'—

'আমার মনে হয় হেলেন আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসে না। যদি বাসতো—তা হ'লে আমাকে না জানিয়ে ও হেনরীর সংগে এই ধরনের কখনও আলোচনা ক'রতো না। হেলেনের সংগে আমার হাজারবার কথা হয়ে গেছে যে আমি কখনও কো-রেসপণ্ডেণ্ট হবো না, হবো না। আর সেই আমাকে কো-রেসপণ্ডেণ্ট করাতে চায় ?'

'কিন্তু হেনরীরও তো সমাজ আছে। হেলেনকে ও যদি আজও ভালবাসে—তবু ওর পক্ষে হেলেনের কালো রং-এর ছেলেকে—সুশোভন রায়ের ছেলেকে ও কি করে গ্রহণ করবে ? তুই ওদের দিকটাও দেখ। এমন স্বার্থপরের মত কাজ করিস নে। তুই একবার হেলেনের সংগে দেখা করে কথা বল। কিভাবে হেনরী খবর জেনেছে তা তো তুই জানিস না, কেন মিথ্যে দোষারোপ করছিস হেলেনকে ?'

'না হেলেনের সংগে আমি এখন কোনমতেই দেখা করতে পারবো না। কে জানে আশেপাশে কোথায় হেনরীর চর-চামুণ্ডারা ঘোরাঘুরি করছে। আর তা ছাড়া—ওর তো এখন উত্তর দেবার পালা। আমার শেষ চিঠির উত্তর তিন সপ্তাহ হয়ে গেল দিচ্ছে না। ও আগে জানাক সব খোলাখুলি, তারপর দেখা যাবে। তুই আশা করি আমার বন্ধুত্বের খাতিরে এই অনুরোধটা রাখবি—যে Office-এর ঠিকানা কাউকে দিবি না। আমি কালই বাসা বদল করবো।'— একটু থামার পর দীপংকর উঠে দাঁড়াল, টাইটা বাঁধতে বাঁধতে বলল, দীপংকর আমি তোকে ভেবেছিলাম, 'তুই অন্য জাতের, তুইও যে এমন সেণ্টিমেণ্টাল হবি জানতাম না। আজ চলি— আমার ট্রেনের সময় নেই।'

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম—'সুশোভন, তুই একটা স্কাউণ্ড্রেল।'

রেলওয়ে সাইডিং-এর ধারে যে রাস্তাটা অনেকদূরে কবরখানার দিকে চলে গেছে সেই পথে একদিন আমার সংগে হেলেনের দেখা হল। পথটা নির্জন—বার্মিংহামের উপযুক্ত নয়—কোলাহল নেই এখানে। সুশোভনের ব্যাপারের 'পরে আমারও যেন ক্লান্তি এসেছিল। নিজের দিকে তাকাই নি কখনও, প্রতিটি দিনের দিকে তাকাতাম। সোমবার—black monday, মংগল, বুধ, বেস্পতি থোড় বড়ি খাড়া, শুককুর pay day—শনি লাগাম ছাড়ার দিন, এই ছিল আমার ভাবনা। বিভিন্ন দিনের গতি ছিল বিভিন্ন, কিন্তু এ ক্লান্তিকে এক

দেখ না সময় হাতের মুঠো দিয়ে গলে যায়? আমার ছোটার গতি কমে গেল। তাই এরিকা গেল ইংরেজ ছেলের সংগে। মাঝে মাঝে একলা তখন হাঁটতাম এই পথে। দেখতাম ঘাসের ওপরে শিশির চকচক করছে—কাঠবেড়ালী ছুটে বেড়াচ্ছে, ভাবতাম এর দাম নেই—কিন্তু এর দাম অনেক। এই পথেই আমার দেখা হল হেলেনের সংগে।

সুশোভনের গত চার মাস কোনও খবর জানতাম না। জানার প্রবৃত্তিও ছিল না। বার্মিংহামে ও সেই আসার পর আর আসে নি। কারণ এলে কোথা না কোথা থেকে নিশ্চয়ই খবর আসতো। হেলেনকে হঠাৎ দেখলে চিনতে পারা যায় না। ওর বাচ্চা হবার সময় এগিয়ে আসছে। ঢিলে পোষাক পরা, পাণ্ডুর মুখ, চুলগুলোও অবিন্যস্ত। 'গুড-ইভনিং' বলে ওকে আমি সম্ভাষণ করলাম।

'গুড-ইভনিং', বলে হেলেন হাসলো। ভোরের আকাশের তারার মত ম্লান।

'তোমাকে অনেকদিন দেখি নি হেলেন—কেমন আছ?' প্রশ্ন করলাম।

'ভাল আছি—দীপংকর, হেলেন বললে, আবার প্রশ্ন করলো, 'তুমি কেমন আছ? এদিকে?'

'এই পথটা আমার বেশ ভাল লাগে। এত নিরালা—নিজের মনের সংগে যেন মুখোমুখি দাঁড়াই এখানে।'

'আমারও ভাল লাগে। তবে মনে হয় এ পথটা যেন ঝরাপাতার পথ। জান তো এ সড়ক কোথায় গেছে?'

'আমি এই পথে হাঁটি, দেখি প্রত্যেক বছর গাছ তার পাতা খসিয়ে দেয়, তার সময় হয়েছে—যেন কেউ মনে করিয়ে দেয়। যৌবনের সাজ খসাবার সময়! কখনও কখনও দেখি ঝড়ে গাছের সব পাতাকে খসিয়ে দিয়েছে, শুধু আগায় একটা পাতাকে পারে নি। সে হেলে-দুলে নাচছে—বেশ লাগে তাও দেখতে।'

'তোমরা ভারতীয়রা সাধারণ জিনিসের মাঝে, এমন অসাধারণ দেখতে জান—আর সেই দেখাটা আমাদের কাছে পরম বিস্ময় হয়ে ওঠে দীপংকর। সুশোভনও আমার কাছে প্রথমে এই বিস্ময় ছিল। মনে হত সে কত ছেলেমানুষ?' হেলেন বললে।

'আজ কি ভাব তাকে হেলেন?' প্রশ্ন করলাম।

'থাক সে কথা।' ও বললে, 'কিন্তু তুমি তো নিশ্চয় তার খবর পাও, জান সে কেমন আছে?'

'ভালই আছে,' মিথ্যেকথা বললাম।

'জান দীপংকর আমি আর কয়েকদিন পরে ইল্‌ফ্রাক্রম্বে চ'লে যাচ্ছি। ফিরবো চার মাস পরে। যাবার আগে তোমার সংগে আমার এত দেখা করার ইচ্ছে ছিল যে বলার নয়। কপাল গুণে দেখাও হল। কেন দেখার ইচ্ছে ছিল জান? কারণ আমার জীবনের এই কালো অধ্যায়ের প্রথম শব্দ তুমিই লিখিয়েছ।'

'আমি এর জন্যে দুঃখিত হেলেন। কে জানতো যে তার এই পরিণাম হবে। এসো আমরা ঐ বেঞ্চিটায় একটু বসি। তোমার সংগেও দু-চারটে কথা বলা যাবে।' একটু এগিয়ে একটা পার্কের বেঞ্চে দু'জনে বসলাম।

'তুমি হঠাৎ বার্মিংহাম ছেড়ে চলে যাচ্ছ কেন—যদি কিছু মনে না কর তো জিগ্যেস করি'—বললাম।

'দীপংকর আমার বাচ্চা হবে ইলফাক্রম্বের এক ক্যাথলিক হোমে', হেলেন একটু চুপ করে থাকার পর বললে—'সেখানে আমি ততদিন থাকবো যতদিন না আমার ছেলেকে কেউ দত্তক নেয়। তারপর আবার ফিরবো এখানে। তুমি তো জান—বাড়িটা আমাদের নিজস্ব। হঠাৎ বিক্রি করে যাওয়া চলে—কিন্তু তাতে অনেক লোকসান। তবু হয় তো একদিন বাড়ি বিক্রি করে চলে যেতে হবে! তাই বলছিলাম তোমার সংগে দেখা করার ইচ্ছে ছিল'—

'আচ্ছা হেলেন, লণ্ডনে সুশোভনের বাড়িতে যে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর গিয়েছিল তা কি তুমি জানতে? আর সে যে জবানবন্দী নিয়ে গিয়েছিল—সে তো সুশোভন কোন দিনও চাই তো না। এমন জবানবন্দী—

'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর? তুমি কি বলছ দীপংকর, আমি এর তো কিছুই জানি না। তবে হেনরী আমার অসাবধানে সুশোভনের একটা টাইপ করা চিঠি পায়। তাই নিয়ে আমাদের ঝগড়া-মনোমালিন্য শুরু হয়। আমি শেষে সব স্বীকার করি। কারণ সুশোভনের মোহ আমাকে এত আচ্ছন্ন করেছিল যে বলার নয়।'

'ভাল কথা, যদি সুশোভনের মোহই তোমাকে এত আচ্ছন্ন করেছিল তো তাকে চিঠি দেওয়া বন্ধ করলে কেন? সুশোভন তো আমাকে বলেছে যে তুমি তার চিঠির জবাব দাও নি'—

'হয় তো আমার কিছুটা দোষ। হয় তো আমার অভিমান। দীপংকর তোমাকে ছোটখাট ঘটনা বলতে চাই না। তবু আমাদের যা সম্বন্ধ ছিল সেটা যেন ক্রমশ একপেশে হয়ে আসছিল। সুশোভন আমার ছোটখাট কত অনুরোধ যে ভুলে যেত তার শেষ নেই। আমার চিঠি দেবার পালা ছিল সেটা সত্যি। কিন্তু তার চেয়ে তো বড় সত্যি যে সুশোভনের সন্তান আমার গর্ভে, আর তা সুশোভনের জানা। আমি যদি একবার চিঠি না দি, তো সে কি পর পর আমাকে দু'টো চিঠি দিতে পারতো না? সে সপ্তাহে আমার এত শরীর খারাপ ছিল যে, আমার পক্ষে চিঠি বাইরে ফেলে আসা সম্ভব ছিল না। আমি তো হেনরীকে দিয়ে চিঠি ফেলাতে পারি না। তার পরের বুধবার যখন অলগা এলো তাকে প্রশ্ন করলাম—আমার কোন চিঠি আছে কি না। কারণ ইদানীং আমার চিঠি আসতো ওর ঠিকানায়। অলগা যখন না বললো তখন লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে আমার চোখ ফেটে জল এলো। এই আমার ভারতীয় প্রেমিক? এই তার ভালবাসা? আমার গর্ভে তার সন্তান, আমার দেহের পুষ্টিতে তার পুষ্টি—আমার ভারতীয় প্রেমিক এত অকরুণ? এক সপ্তাহ চিঠি না দিলে সে আমাকে পর পর দু'টো চিঠি দিতে পারে না? হে ঈশ্বর, আমার স্বামী হেনরী তো এত অকরুণ নয়? কেন তাকে বঞ্চনা করেছি?'

'কেন তাকে বঞ্চনা করেছ হেলেন?' প্রশ্ন করলাম।

'জানি না দীপংকর, আজও জানি না। আমার মনকে আজও জানি না। জান হেনরী আজও আমাকে ভালবাসে—সুশোভন যে আমাকে ভালবাসে না হেনরী বার বার আমাকে বলেছে।

পাঠিয়েছিল শুধু সুশোভনকে জানতে—আজ আমার মনে হ'চ্ছে। ও নিজে জেনেছে যে সুশোভন আমাকে ভালবাসে না। আর সেই জানাও ওর একার, আমাকে আজও বলে নি।'

'হেনরী তোমাকে এত ভালবাসে জেনেও—তুমি ঘর ভাঙার স্বপ্ন দেখতে।'

'দেখতাম দীপংকর। আজ তা মনে করে হাসি। তবে জান আমি প্রথমেই সুশোভনের প্রেমে পড়ি নি। সে যখন আমার কাছে এসেছিল—তখন মস্ত ঘা খেয়ে এসেছিল। আমি ওকে একটু সহানুভূতি দেখাতে চেয়েছিলাম! ইদানীং হেনরীর ভালবাসা অন্তঃস্রোতা হয়ে এসেছিল—তাই সুশোভনের ভালবাসার আগুনে আবার জ্বললাম। আবার জ্বললাম সে আগুনের শিখায়—কিন্তু গৌরবে নয়, অগৌরবে। পুড়ে মরলাম দীপংকর—আমার ভালবাসার দাহনে জ্বলে গেলাম আমি।' হেলেন চুপ করে রইলো এর পরে।

আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম—'হেলেন, তুমি একদিন ভারতবর্ষকে ভালবাসতে চেয়েছিলে। সুশোভনের মধ্যে দিয়ে। এখন তোমার ভারতবর্ষের ওপর ঘৃণা যেন সুশোভনের মধ্যে দিয়ে না আসে। আমার দেশ অনেক বড়—আবার ছোটও। অনেক বিচিত্র রঙে রাঙান। তুমি আমার দেশের ওপর অবিচার ক'রো না অন্তত।'

'না দীপংকর, তা কখনো করবো না। এ তো আমারই ভুল' হেলেন বললো। তারপর চলে গেল ম্লান হেসে। যাবার আগে দু'টো হাত দিয়ে আমার হাত ধরে বললো—'হয় তো আবার কখনও দেখা হবে আমাদের।'

আবার ফিরে আসছিলাম একলা নির্জন পথে। দূরে কোন বাগানে বোধ হয় কারা শুকনো পাতা জ্বালাচ্ছে। গন্ধ আসছিল নাকে। একটু এগিয়ে রেলওয়ে সাইডিং। তারপর আরো এগিয়ে আমাদের ক্লাব। শুনলাম রেকর্ড প্লেয়ারে রামবা বাজছে। কত সাদা, কত কালো আসছে পরস্পরের কাছে এই সন্ধ্যায়! কত মতের বিনিময়—কত মনের বিনিময়। হ্যাঁ মনের বিনিময়ও। তবু আবার মনে এলো, আজ সকালের ডাকে—নতুন দিল্লী থেকে আসা চিঠি। রঙিন খাম আইভরি পেপারের ওপর আঁকা সিঁথি-মৌর, টোপর আর গোড়ের মালা। ভেতরে লেখা—সবিনয় পুরঃসর নিবেদন। চিত্রার সংগে সুশোভনের বিয়ের চিঠি। সুশোভন পরীক্ষায় পাস করেছে বলে চিত্রার বাবা কন্যা-সম্প্রদানে রাজী হয়েছেন। আমার হঠাৎ মনে হল—ওর প্যাসেজখানি নিশ্চয়ই বরপণ হিসেবে ভদ্রলোক দিচ্ছেন। সুশোভন কি তেমন কাঁচা ছেলে যে ঘরের পয়সা খরচ ক'রে বিয়ে ক'রতে যাবে? আর চিত্রার? সে হয় তো বলবে—তোমার জন্যেই ভগবান আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তুমি আমারই। তুমি যতদূরেই থাক, আমার প্রেমের টানে তোমাকে আসতেই হবে আমার কাছে।'

থাক ওসব চিন্তা। পায়ে পায়ে অনেক পথ হাঁটা হয়েছে—বড় তেষ্টা পেয়েছে, সামনের পাবটায় ঢুকলাম। কাউণ্টারের ধারে এসে

ক্ষণ স্মৃতি

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্নিযুগের কল্যাণী

প্রেসিডেন্সি কারাগার। বৃটিশ-সূর্য ভারতের মধ্যগগনে। কারাগারে কুসুম-কলির ন্যায় অর্ধস্ফুট কয়েকটি ভদ্র-তরুণী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে। কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী লাইন অতিক্রম করে দ্রুতপায়ে চলেছেন এগিয়ে,—কয়েদীরা তাঁকে দেখামাত্র নিয়মমাফিক কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে উঠছে,—সেলাম সরকার!

একটি তরুণীর পাশ দিয়ে যাবার সময় মেয়েটির হাত অনড়, বদন বাক্যহারা! থমকে দাঁড়ান কর্মচারী; কে এই উদ্ধত বালিকা? স্পর্ধা ত' কম নয়। ইংরেজ সরকারের জেলে বন্দিনী হয়েও তার তেজ কমে নি! কোন সাহসে সে অমান্য করে জেলের অনুশাসন?

ও! ঐ বুঝি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মন প্রাণ-সমর্পিতা তরুণী কন্যাদের একজন! কৈশোরের লালিত্য এখনও মুখ থেকে অপসারিত হয় নি। তা হোক,—কঠিন হৃদয় সরকারী কর্মচারীর ওতে মর্মাহত হয়ে চলে গেলে ইংরেজ-দপ্তরে পদোন্নতির আশায় জলাঞ্জলি! তৎক্ষণাৎ হুকুম হয় তাকে 'সেলে' বন্ধ করার। তার পূর্বে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়,—কেন সে জেলের নিয়ম লঙ্ঘন করে,—কেন 'সরকার সেলাম' বলে অভিবাদন জানায় না?

গর্বোন্নত শিরে তরুণী জবাব দেয়,—যে সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম,—যার জন্য আজ জঘন্য জেল-জীবন, তাকেই আবার সেলাম? এও কি সম্ভব? আমরা কি মানুষ নই? সেলে বন্দিনী হবার ভয়েও তার মুখে একবিন্দু ভীতির রেখা ফুটে ওঠে নি।

সেলের ভয়াবহতা শুনে আঁতকে উঠি। ছোট ও নীচু এমন একখানা কুঠুরী, যাতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না, অথবা পা মেলে শোওয়া চলে না। জানালা-দরজার বালাই নেই, সামনের দিকে দরজার বিকল্পে কয়েকখান মোটা লোহার শিক, যা সব সময়ই মোটা একটি তালা দিয়ে বন্ধ থাকে। তার দেয়ালে কালো রং,—ভেতরে রাত-দিনের তফাৎ বোঝা দায়! এর মধ্যে অসীম মানসিক-শক্তিসম্পন্ন পুরুষমানুষও বেশিদিন থাকলে পাগল হয়ে যায়!

সেদিনের রাজনৈতিক সংগ্রামে দেশকে দু'শো বৎসরের পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার সংকল্প নিয়ে যে সব শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের তরুণ-তরুণী মৃত্যুপণ করে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাদের অনেককেই এই সব সেলে বন্দী থাকতে হয় মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা পেয়ে। ভগবান যেন এক অদ্ভুত ধাতুতে তৈরি করেছিলেন এই নির্ভীক, আত্মত্যাগী, কষ্টসহিষ্ণু বাংলার ছেলেমেয়েগুলিকে। আমাদের আজকের স্বাধীনতার ভিত্তি তাদেরই নির্যাতন ও আত্ম-বলিদানের উপর গঠিত,—আজ কি আমাদের সে কথা ভুললে চলে?

এই কঠিন ইস্পাতে গড়া মেয়েদের মধ্যে একজনকে দেখে হই বিস্মিত-রোমাঞ্চিত! নাম তাঁর কল্যাণী দাস,—অধুনা কল্যাণী ভট্টাচার্য। বয়স ৫৫, বর্তমানে ভগ্নস্বাস্থ্য। বলেন,—শরীরের উপর দিয়ে এত ঝড় বয়ে যাবার পরেও এখনও পর্যন্ত যে বেঁচে আছি তাই আশ্চর্য! বৎসরের পর বৎসর জেলের কাঁকর-ভরা ভাত খেয়ে স্বাস্থ্য আর থাকে কি করে?

অতি মৃদুভাষিণী, সুশীলা মহিলাটির জীবন সম্বন্ধে আরও কিছু জানার আগ্রহ প্রকাশ করায়,—মৃদুহেসে তিনি বলেন,—সেদিনের সেই গুটিকত আত্মত্যাগী মেয়ের কথা আজ কেইবা শুনতে চায়? এখন যেন তাঁদের সকলেই ভুলে গিয়েছেন! কিন্তু যে সময়ে তাঁরা দেশের মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন,—সে সময়ের সে কাজের দুরূহতা, আজকের মানুষের কল্পনা করাও কঠিন। বেশির ভাগ অভিভাবক, পরিবার-পরিজন, জনসাধারণ, সকলেই ছিলেন সরকারের বিরুদ্ধাচরণের ভয়ে কম্পমান,—সবাই তাঁদের বিরুদ্ধে। কোন সহযোগিতা কি উৎসাহের বদলে নিছক নিরুৎসাহ ও তিরস্কার পেয়েও তাঁরা তাঁদের কর্মপন্থায় এগিয়ে চলেন যেন ভেতরেরই একটা আবেগের তাড়নায়।

কল্যাণীদেবীর পিতৃদেব ৺বেণীমাধব দাস ছিলেন কটক কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সেকালের আদর্শ-চরিত্র দেশ-হিতব্রতী কর্তব্যপরায়ণ মুষ্টিমেয় শিক্ষকদের অন্যতম। তাঁরই হাতে-গড়া, তাঁরই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত, সেদিনের স্বদেশী যজ্ঞের হোতা—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর লেখায়, নিজের জীবনে এই আদর্শ শিক্ষকের প্রভাব নানাভাবে প্রকাশ করেছেন।

মাতা ৺সরলাদেবী আজীবন সমাজ-সেবার কাজে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদয়-হৃদয়া; আশেপাশের দুঃখী মেয়েদের দেখে তাঁর প্রাণ এতই কাতর হত যে, যখন যেখানে থেকেছেন, সর্বদাই নিজের বাড়িতে এরূপ দুস্থা মেয়েদের নানা প্রকার শিক্ষা ও হাতের কাজ শিখিয়ে তাদের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি আজ 'সরলা পুণ্যাশ্রম' নামে শতাধিক দুস্থা মেয়ে নিয়ে কলকাতার সহরতলী কসবায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

কল্যাণীদেবীর সংগঠন শক্তিতে এবং তাঁর ভগ্নী ও ভ্রাতৃজায়ার সহযোগিতায় 'সরলা পুণ্যাশ্রম' এখন বিস্তৃতিলাভ ও নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করে নিজস্ব বাড়ি নির্মাণে সক্ষম।

এমন পিতামাতার গৃহেই এমন অসাধারণ কন্যার আবির্ভাব ঘটে। তাঁর ছোটবোন বীণা দাসের নাম কে না জানে? ১৯৩১ খৃস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় তদানীন্তন চ্যান্সেলার ও গভর্ণর, স্যার স্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সনকে উপাধি বিতরণ সময়ে যে উপাধি-গ্রহিত্রী মেয়েটি অত বড় জনসভায় প্রকাশ্য দিবালোকে অকুতোভয়ে পিস্তলের গুলী ছুড়ে মেরেছিল,—স্বদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার প্রেরণায়,—সেই অসীম সাহসী বীরাঙ্গনা বীণা দাস (অধুনা ভৌমিক) কল্যাণীদেবীর সহোদরা।

দু'টি বোনই স্বদেশপ্রেমে আত্মহারা,—জীবনদানে ও মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনে বদ্ধপরিকর! তাঁরা বেথুন কলেজে পাঠ্যাবস্থায়ই ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে। তখনও মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতি তেমন প্রবলভাবে প্রচারিত হয় নি,—বাংলার কিছুসংখ্যক দৃঢ়চিত্ত তরুণ-তরুণী মৃত্যুপণ করে বৃটিশ শাসকের উচ্ছেদ সংকল্প নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের প্রদর্শিত পথে পা বাড়িয়েছেন। এ পথে নেই বিপদের সীমা-পরিসীমা—সমস্ত কাজ করা চাই অতি সংগোপনে। ইংরেজের চর সর্বদা পিছনে ঘুরছে, ঘুণাক্ষরে সন্দেহ হওয়ামাত্র দলে দলে বিনা বিচারে জেলে পুরছে। আবার দলের অন্যদের খবরাখবর জানার জন্য, ধৃতদের উপর চালাচ্ছে বর্বর অত্যাচার! কিন্তু চাবুকের আঘাতে শয্যাশায়ী অথবা অজ্ঞান করে ফেললেও ওদের মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে না পেরে হার মানছে! এঁদেরই একজন কল্যাণীদেবী।

আদি নিবাস চট্টগ্রাম হলেও জন্ম কটকে এবং শিক্ষা কলকাতায় বেথুন স্কুল ও কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাশের ছাত্রী অবস্থায় কল্যাণীদেবী ছাত্রী-সংঘের সম্পাদিকারূপে রাজনৈতিক কর্মজীবন আরম্ভ করেন ১৯২৮ খৃস্টাব্দে। সে বৎসর কলকাতা-কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন ৺মতিলাল নেহেরু এবং জি ও সি—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। কল্যাণীদেবীর নেতৃত্বে ১০০টি ছাত্রী সেখানে স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ সম্পন্ন করেন সুষ্ঠুভাবে। তারপর থেকে তিনি দেশের কাজেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করেন।

১৯৩২ খৃস্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনে কলেজী-শিক্ষায় দাঁড়ি টেনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশমুক্তির কাজে। কতবার জেলে যান, কিন্তু দারুণ দুঃসহ জেল-জীবনের অবসানেই আবার লিপ্ত হন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। জেলের ভিতরে থেকেই তিনি ফিলজফিতে এম-এ পাশ করেন। মেয়ে-জেলের ভিতরেও কল্যাণীদেবী করেন কত জীর্ণসংস্কার। তাঁর নিকট শুনি,—জেলের ভিতরে তখন মেয়েদের যে একটি ঝোলার মত পোষাক দিত, তাতে সম্পূর্ণরূপে লজ্জা নিবারণ হওয়া ছিল দুষ্কর। কল্যাণীদেবী এবং তাঁর কয়েকটি সহকর্মিণী ও জেল-সঙ্গিনীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদ ও বিরুদ্ধতার পর, জেলে মেয়ে-কয়েদীদের মোটা শাড়ি দেবার প্রথা প্রচলিত হয়।

আজকের স্বাধীন ভারতে ইংরেজ-প্রবর্তিত জেলের ভিতরের কুপ্রথাগুলির সংস্কারসাধনে আমাদের নেতারা আগ্রহশীল, কল্যাণী-দেবীর মত ভুক্তভোগিনীরাই পারবেন মেয়ে-জেলের অমানুষিক বর্বর প্রথাগুলি দূর করতে। আজ এঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে দেশ হবে অনেক লাভবান ও শক্তিশালী।

কল্যাণী দাস বেশ কিছুকাল কারাগার বাসের পরও অন্তরীণে আবদ্ধ থাকেন অনেকদিন। তারপর এলো বহু-প্রতীক্ষিত, বহু-আকাঙ্ক্ষিত, যুগান্তকারী স্বাধীনতা! এবার মুক্ত হয়ে কল্যাণীদেবী নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেন সমাজসেবা ও সংগঠনমূলক কাজে। তাঁর সময় ও মেধা, এখন বহুলাংশে নিয়োজিত হয়েছে তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতৃদেবীর নামে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'সরলা পুণ্যাশ্রম' নামক প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকল্পে। কল্যাণীদেবীর সুযোগ্য পরিচালনায় আজ এটি এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক অগ্রস্থান অধিকার করে এবং সরকারী সাহায্যপুষ্ট হয়ে, দুস্থা মেয়েদের প্রভূত কল্যাণসাধনে রত। বালীগঞ্জের মুরলীধর গার্লস্ কলেজ স্থাপনেও তাঁর প্রচেষ্টা অবিস্মরণীয়! আদিতে, তাঁর কল্যাণহস্তের স্পর্শ বিনা এই কলেজ আজ এত বৃহৎ রূপ ধারণ করতে সমর্থ হত কি না সন্দেহ!

কল্যাণীদেবীর সাহিত্য প্রতিভারও স্ফুরণ দেখতে পাই তাঁর রচিত জেলের তথ্যবহুল 'জীবন-অধ্যয়ন' গ্রন্থে। কল্যাণীদেবীর সাম্প্রতিক কাজ—দিল্লীর 'রামমোহন রায় মেমোরিয়াল হল' নির্মাণ। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—'স্বামীর কর্ম-উপলক্ষে সম্প্রতি দিল্লী বাসের সুযোগ ঘটে। সেখানে মনে হয়, এই রাজধানীতে যদি রামমোহন রায়ের একটি স্থায়ী স্মৃতিমন্দির গড়া যায়, তবে একটা কাজের মত কাজ হয়। স্বর্গীয় মনীষীর নিকট আমরা কতভাবে ঋণী, বিশেষ মেয়েদের অবস্থার উন্নতিকল্পে তাঁর অন্তহীন অবদান! আজ যে আমরা লেখাপড়া শিখে স্বাধীনভাবে বিচরণ ও কর্মক্ষমতা পেয়েছি সেও ত' তাঁরই কৃপায়। এ কল্পনা মনের মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করার পর কোমর বেঁধে কাজে অগ্রসর হই।'

আজ তাঁর সে স্বপ্ন সফল, সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত! দিল্লীর সরকারীমহলের নানা শাখা-প্রশাখায় ঘোরাঘুরি ও নিজ পরিকল্পনা জানানোর পর, কেন্দ্রীয় সরকার কল্যাণীদেবীকে এই কাজের জন্য দান করেন,—নূতন দিল্লীর রাউস্ অ্যাভিনিউতে তিন বিঘা জমি ও পঞ্চাশ হাজার টাকা। আরও লক্ষাধিক টাকা চাঁদা তুলে, বৎসর দুইয়ের ভিতরে বিরাট একটি হলঘর, পুস্তকাগার, মাতৃমঙ্গল বিভাগ,—সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় একটি মেয়ের পক্ষে গড়ে তোলা কি কম কৃতিত্ব? অবশ্য তাঁর সৌভাগ্যক্রমে পারিবারিক-জীবনে তিনি তাঁর দেশহিতৈষণা ও সমাজসেবী কাজে সর্বক্ষণই পেয়েছেন আত্মজনের সস্নেহ সহযোগিতা। বংশের তথা বাংলার মুখোজ্জ্বলকারিণী এই অসাধারণ শক্তিশালিনী মহিলাকে জানাই শ্রদ্ধানতি!

বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান-চিন্তা

মৃণাল ঘোষ

শুধু বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক নহে, সর্বকালে সর্বদেশে চিন্তাশীল মনস্বিগণের মধ্যেও বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব উপলব্ধি করবার, সৃষ্টি রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করবার একটা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বন্দেমাতরম-এর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ইঁহাদের অন্যতম।

বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা উপন্যাস-সম্রাট'র অতুলনীয় মর্যাদা দিয়েছি, কিন্তু এ কথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না যে, এই রসস্রষ্টার জীবনব্যাপী বিজ্ঞান-চেতনা কিংবা সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর মর্মপরিচয়ের বিষয়টি নিয়ে আজ পর্যন্ত আমরা আশানুরূপ আলোচনা করি নি।

বিজ্ঞান-চর্চার ভিত্তিভূমি গণিত। সমস্ত বিজ্ঞান-জগতে এক বিস্ময়কর যুগান্তর সৃষ্টি করল আইনস্টাইনের থিওরী অফ রিলেটিভিটি। কিন্তু এই আপেক্ষিকতত্ত্ব কি? মাত্র কয়েকটি ফুলস্কেপ কাগজের উপর একটি গণিতের সিদ্ধান্ত! ছাত্রাবস্থা হইতেই অঙ্কশাস্ত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল অসামান্য ব্যুৎপত্তি। কনিষ্ঠভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের অধ্যয়নকালে কলেজের কোন গণিতাধ্যাপক ক্লাসে জ্যামিতির কোন এক 'প্রতিজ্ঞা' পূরণে ব্যর্থ হয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, 'হায় বঙ্কিম থাকিলে 'প্রতিজ্ঞা'র নিশ্চয়ই সমাধান হইত।'

বৈজ্ঞানিক মতবাদ কিংবা সিদ্ধান্ত চিরপরিবর্তনশীল। নিউটনের যুগের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির রূপান্তর ঘটল আইনস্টাইনের কালে, আবার হয়েল-নারলিকার আজ বিজ্ঞান রাজ্যের কোন নব দিগন্তের দিশারী? আজ মহাশূন্য-বিজয়ী মানুষের বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রার যুগের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের তুলনা করা বাতুলতা। বাঙালী তথা ভারতবাসী তখন সবেমাত্র প্রতীচীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসতে আরম্ভ করেছে। আশ্চর্যের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র তখনই সমসাময়িককালের প্রচলিত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করেছিলেন। তার পরিচয় রয়েছে ১২৭৯।৮০ সালে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে। ১৮৭৫ সালে ঐ প্রবন্ধগুলি 'বিজ্ঞান রহস্য' নামে পুস্তকে প্রকাশিত হয়। অনেক পরে ১৯৩৮ সালে বঙ্কিম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক যে বারোখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে, তার অন্যতম 'বিজ্ঞান রহস্য'। এখানে স্মরণ করা কর্তব্য যে, কোন বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে প্রকাশভঙ্গী সহজ হয় না। কি সুন্দর সহজ অথচ সুললিত ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণ করলেন সৃষ্টি-রহস্য।

'তবে এককালে জগতের যে এ রূপ ছিল না, বিজ্ঞান ইহা বলিতে সক্ষম। ইহা বলিতে পারে যে এই পৃথিবী এইরূপ তৃণ, শস্য, বৃক্ষময়ী সাগর পর্বতাদি পরিপূর্ণ, জীবসংকুলা, জীববাসোপযোগিনী ছিল না; গগন এককালে এরূপ সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি বিশিষ্ট ছিল না। একদিন তখন দিন হয় নাই, এককালে জল ছিল না, ভূমি ছিল না··· বায়ু ছিল না। কিন্তু যাহাতে এই চন্দ্র, সূর্য, তারা হইয়াছে, যাহাতে জল, বায়ু, ভূমি হইয়াছে···যাহাতে নদ, নদী, সিন্ধু···বনবিটপী, বৃক্ষ··· তৃণ, লতা, পুষ্প···পশু, পক্ষী, মানব হইয়াছে, তাহা ছিল। জগতের রূপান্তর ঘটিয়াছে—ইহা বিজ্ঞান বলিতে পারে।'
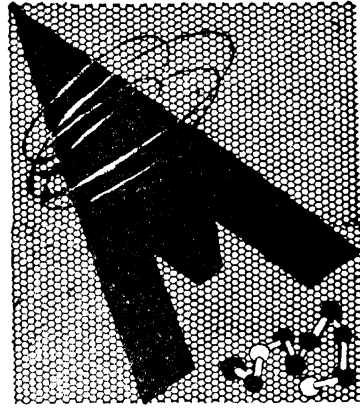
বৈজ্ঞানিক Sir James Jeans সুন্দর প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় Mysterious Universe-এর ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর বহুপূর্বে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব এক সাহিত্যধর্মী প্রকাশভঙ্গীর সাহায্যে নিজ মাতৃভাষা বাঙলার মাধ্যমে সৃষ্টি-রহস্যের কথা তাঁর স্বজাতিকে শুনিয়ে গেছেন যখন বাঙলায় বৈজ্ঞানিক শব্দের কোন পরিভাষা সৃষ্ট হয় নি।

কি অপরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিস্তরঙ্গের নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ!

'আলোক ঈথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী জাগতিক তরল পদার্থের আন্দোলনের ফলমাত্র। সূর্যালোক সপ্তবর্ণের সমবায়, সেই সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু অথবা স্ফটিক প্রেরিত আলোকে লক্ষিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গ সকল পৃথক পৃথক; তাহাদের প্রাকৃতিক সমবায়ের ফলে শ্বেতরৌদ্র। এই সকল জ্যোতিস্তরঙ্গ বৈচিত্র্যই জগতের বর্ণ বৈচিত্র্যের কারণ।'

স্বনামধন্য প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) বলেছিলেন, ওমর খৈয়ামের হাতে জ্যামিতির রেখা বসোরার গোলাপের মত ফুটে উঠেছিল। নীরস বিজ্ঞানতত্ত্ব বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বও ঠিক সেই রকম। গতিতত্ত্ব প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :—

'গতিই জাগতিক নিয়ম—স্থিতি নিয়মরোধের ফলমাত্র। জগৎ সর্বদা সচঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুঝিতে গেলে, অতি বিস্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন। হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও দৈহিক পরমাণু মধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়া, দেহ ধ্বংস হয়।'

Heat অর্থাৎ তাপ কি, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা :—

'যাহাকে তাপ বলি, তাহা পরমাণুগণের আন্দোলন মাত্র। কোন বস্তুর পরমাণু সকল পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাড়িত হইলে, তাহা তরঙ্গবৎ আন্দোলিত হইতে থাকে। সেই ক্রিয়াই তাপ।'

Light অর্থাৎ আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কি সুন্দর প্রাঞ্জল বর্ণনা :—

'পৃথিবীতলে আলোক সর্বত্র দেখিতে পাই। অতি অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রে, পৃথিবীতল একেবারে আলোকশূন্য নহে। অতএব সর্বত্রই সর্বদা আলোকীয় আন্দোলনের গতি বর্তমান।'

ছাত্রাবস্থা থেকেই Astronomy-র প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগ ছিল সুগভীর। নক্ষত্রলোকের রহস্যের কথা প্রসঙ্গে—'আকাশে কত তারা আছে' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে তিনি প্রথমেই উত্থাপন করেছেন জ্যোতির্বেত্তাদের সেই চিরন্তন প্রশ্ন :—

'ঐ যে নীল নৈশ নভোমণ্ডলে অসংখ্য বিন্দু জ্বলিতেছে——ওগুলি কি ?'

সুগভীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে তিনি আমাদের সেই শাশ্বত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন :—

'তারা সব সূর্য, সব সূর্য !···এই আলোকবিন্দুগুলি সকলেই সৌর-প্রকৃতি। কেবল আত্যন্তিক দূরতাবশত আলোকবিন্দুবৎ দেখায়।'

তারালোকের, নক্ষত্রপুঞ্জের রহস্য বর্ণনায় ঋষি বঙ্কিমের কি হৃদয়গ্রাহী ভাষা :—

'অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অন্যান্য নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দূরদৃষ্ট তারাপুঞ্জময়ী নীহারিকা স্বতন্ত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। সমুদ্রতীরে যেমন বালি, বনে যেমন পাতা, মালার রাশিতে যেমন ফুল, এক একটি নীহারিকাতে নক্ষত্ররাশি তেমন অসংখ্য এবং ঘনবিন্যস্ত।'

যখন ইংল্যাণ্ডে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানচর্চা হয় নি, তখন সেখানে নিউটনের পরমাশ্চর্যকর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের কথা স্মরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র নক্ষত্রের আবর্তনশীলতা প্রসঙ্গে লিখেছেন :—

'বিচিত্র এই যে নিউটন, পৃথিবীতে বসিয়া পার্থিব পদার্থের গতি দেখিয়া পার্থিব উপগ্রহ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, দূরবর্তী এবং সৌরজগতের বহিঃস্থ এই সকল নক্ষত্রের গতিও সেই সকল নিয়মাধীন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি বিস্ময়কর। তাঁর দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়েছিল সর্বসৃষ্টিব্যাপী অফুরন্ত প্রাণের লীলা। তাঁর 'জৈবনিক' নামক প্রবন্ধে রয়েছে তার মর্মপরিচয় :—

'জলজান, অম্লজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজান এই চারিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযোগের ফল জৈবনিক···এখন দেখ এক জৈবনিকে সর্বজীব নির্মিত। যে ধান ছড়াইয়া তুমি পাখীকে খাওয়াইতেছ, সে ধান সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী। যে কুসুম ঘ্রাণ মাত্র লইয়া লোকমোহিনী সুন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, সুন্দরীও যাহা, কুসুমও তাই। কীটও যাহা, সম্রাটও তাই······ সকলই জৈবনিক।'

এ যেন বিজ্ঞান-জগতে বঙ্কিমচন্দ্রের এক নূতন pantheism প্রচার !

শুধু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নয়, সত্যদ্রষ্টা ঋষির ন্যায় তিনি অবলোকন করেছিলেন, সৃষ্টির মধ্যে এক সর্বব্যাপী জৈবনিক চাঞ্চল্য। জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত ঐক্য আপন অন্তরের গভীর অনুভূতি দিয়া উপলব্ধি করে বললেন :—

'জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন সেইখানেই জৈবনিক তাহার পূর্বগামী। 'অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ববর্তিতা কারণত্ব'— এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জৈবনিকই জীবনের কারণ। জৈবনিক ভিন্ন জীবন কুত্রাপি সিদ্ধ নহে এবং জৈবনিক জীবনের নিয়ত পূর্ববর্তী বটে। অতএব আমাদের এই চঞ্চল, সুখদুঃখবহুল, বহু স্নেহাস্পদ জীবন কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া, রাসায়নিক সংযোগসমবেত জড়-পদার্থের ফল। নিউটনের বিজ্ঞান, কালিদাসের কবিত্ব, হ্যাম্বল্ট বা শংকরাচার্যের পাণ্ডিত্য—সকলই জড়পদার্থের ক্রিয়া, শাক্য সিংহের ধর্মজ্ঞান, আকবরের শৌর্য, কোমতের দর্শনবিদ্যা—সকলই অণুর গতি···সকলই জড়পদার্থের আকুঞ্চন সম্প্রসারণ মাত্র···এই সকলই জৈবনিক অম্লজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজানের রাসায়নিক সমষ্টি।'

রঙের অনুভূতি কি করে জাগে

অনুসন্ধানী

মানুষের মধ্যে রঙের অনুভূতি কি করে জাগে, এই প্রশ্নের উত্তর বহুকাল আগে ১৮০২ সালে টমাস ইয়ং নামে জনৈক পদার্থবিজ্ঞানী দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, চোখের অক্ষিপট বা রেটিনার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য মোচাকৃতি শঙ্কু। এইসব শঙ্কু অক্ষি-গোলকের স্বচ্ছ-আবরণ বা অক্ষিপটের উপর যে বিভিন্ন রঙ প্রতিফলিত হয় তা আত্মসাৎ করে এবং তাদের পাঠিয়ে দেয় স্নায়ুমণ্ডলীতে। তাতেই রঙের চেতনারও অনুভূতি জাগে। পরে আবার বিজ্ঞানী বললেন, প্রতিটি কোষের বা শঙ্কুর মধ্যে রয়েছে তিনটি রঞ্জকের বা পিগমেণ্টের একটি। দেড় শতাব্দী ধরে এ নিয়ে গবেষণার পর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত না হলেও অনেকে এই ধারণাই আজ পোষণ করেন।

এই ঘটনার ১৬২ বছর পরে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবপদার্থ বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজেদেরই পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত অতি সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানুষের অক্ষিপটের বা রেটিনার মধ্যে রঙ সম্পর্কে অতি সচেতন তিন প্রকার কোষ বা শঙ্কুর সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের এই উদ্ভাবনে টমাস ইয়ং-এর সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়েছে।

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবপদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ এডোয়ার্ড এফ ম্যাকানকলের (জুনিয়ার) সঙ্গে ডাঃ উইলিয়াম মার্ক্স এবং উইলিয়াম ডোবেল নামে জনৈক বিদ্যার্থী এই বিষয়ে গবেষণা করছেন। নীল রঙ গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা নীল রঙ-এর গ্রাহক বা রিসেপটার যে মানুষের চোখে রয়েছে এই গবেষণার ফলে তা প্রথম আবিষ্কৃত হল। পূর্বে রেটিনা বা অক্ষিপটের কোষ বা শঙ্কু সম্পর্কে পর্যালোচনার ফলে বিজ্ঞানীরা দু'টিমাত্র আলোক-সচেতন রঞ্জকের বা পিগমেণ্টের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য কোষের বা শঙ্কুর মধ্যে তা কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে তার কোন হদিশ তাঁরা দেন নি। অক্ষিপটের বা রেটিনার কোষের ও রঙের স্তরটিই হচ্ছে চোখের আলোক-সচেতন অংশ। মানুষের একটি চোখের প্রায় দশ লক্ষ মোচার মত শঙ্কুর বা কোষের এবং এক কোটি রড বা দণ্ড রয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা যে আলোকে রঙ চোখে পড়ে কেবলমাত্র সেই আলোকেই কোষসমূহ চালু থাকে। অক্ষিপটের

রেটিনার ঐ সব কোষ বা শঙ্কুর প্রত্যেকটির ব্যাস এক ইঞ্চির তিন হাজার ভাগের দুই ভাগ। হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা একটি অভিনব মাইক্রোস্পেক্‌ট্রো ফটোমিটারের সাহায্যে এই সব কোষের মধ্যে আলোকরশ্মি প্রবেশ করিয়ে এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের কাজে ব্রতী হন। এই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত বিভিন্ন কোষের বর্ণালীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়ে তাঁরা পর্যালোচনা করে দেখলেন যে এদের শ্রেণী তিনটি। দু'টি লাল ও সবুজ রং সম্পর্কে সচেতন। এই দু'টি রঞ্জকের কথা পূর্বেই জানা ছিল। তবে তৃতীয় রঞ্জকটির সন্ধান বহুকাল থেকেই পাওয়া যায় নি। এই প্রক্রিয়ায় সেটির সন্ধান তাঁরা পেলেন, এটি নীল রঙ সম্পর্কে সচেতন। এই পর্যালোচনায়ও ইয়ং-এর মতবাদই সমর্থিত হয়েছে। এই অতি সূক্ষ্ম মাইক্রোস্পেক্‌ট্রো ফটোমিটারটি তৈরি করেছেন ডাঃ ম্যাকনিকল এবং ডাঃ মার্ক্স। এই যন্ত্রের পরিকল্পনা এবং নক্সাও তাঁরাই তৈরি করেছেন।

এ ছাড়া হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ ওয়াল্ডের অধীনে মিঃ পল কে ব্রাউনও একই সময়ে এ বিষয়ে পৃথকভাবে গবেষণা করে একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন।

ডাঃ ম্যাকনিকল তাঁর ঐ যন্ত্রটি সম্পর্কে বলেন যে, স্পেকট্রো ফটোমিটার আলোর তীব্রতা বা মাত্রা নিরূপণের একটি যন্ত্র। এটি যে কোন গবেষণাগারেই ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ইলেকট্রনিক্স এর ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হওয়ার ফলে তাঁর এই অভিনব মাইক্রোস্পেকট্রো ফটোমিটার নামে যন্ত্রটির উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে এবং রেটিনার বা অক্ষিপটের কোষের মত অতি ক্ষুদ্র বস্তু সম্পর্কেও এটি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। 'সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির অভাবেই নীল রং সম্পর্কে এই রং-এর গ্রাহক বা রিসেপ্টার সম্পর্কে সন্ধান পাওয়া এতদিন সম্ভব হয় নি।'

ডাঃ ম্যাকনিকল এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে মনে হয় লাল রং-এর গ্রাহক কোন একটি কোষের বা শঙ্কুর মধ্যেই লাল ও সবুজ উভয়প্রকার রঞ্জন পদার্থই একই সঙ্গে থাকতে পারে। এ বিষয়ে আরও তথ্য অনুসন্ধানের সঠিক বর্ণালী গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

ডাঃ ম্যাকনিকল স্নায়ুমণ্ডলী বা নার্ভস সিস্টেম নিয়েই গবেষণা করছেন। নেত্রস্নায়ু বা অপটিক নার্ভের মাধ্যমে সংবাদ কিভাবে পরিবাহিত হয়ে থাকে তা নির্ধারণের চেষ্টা তিনি করেছেন। অক্ষিপট বা রেটিনা উদ্দীপিত হওয়ার পর বিশেষ বিশেষ স্নায়ু বা নার্ভ তাতে কিভাবে সাড়া দেয় তা জানবার চেষ্টাও তিনি করছেন। রং সম্পর্কে সচেতনতা সম্পর্কে যেসব তথ্য বিজ্ঞানিগণ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে তা এ ব্যাপারে সহায়ক হবে।

বর্ণ সম্পর্কে অনেকে অন্ধ অথবা বর্ণ সম্পর্কে দৃষ্টিও অনেকেরই ত্রুটিপূর্ণ। বিজ্ঞানীদের ধারণা কোন একটি কোষের বা শঙ্কুর মধ্যে রঞ্জকের পরিমাণ জানবার প্রক্রিয়ার প্রক্রিয়া এ বিষয়ে আলোকপাত করবে।

মৃত্যু-নীল সাগরের নেশায়

সুধাংশু দে

আকাশ সমাবিষ্ট
মৃত্যু-নীল সাগরের নেশায়
আমাদের এখানে এখন
মহুয়ার নেশায়
কানামাছি খেলা ;

রকেটেও পাড়ি জমাই
আকাশের কেনারা সন্ধান ;

আমাদের সূর্য-প্রদক্ষিণ
যবনিকাপাতের
প্রয়াসে উন্মুখ ;

সমুদ্রের হাওয়ায় তখন
নীল-নীল নেশা
মহাকালের জলদগম্ভীর আমন্ত্রণ ;

মৃত্যু-নীল সাগরের নেশায়
আকাশ নীল।
গভীর সাধনায় মগ্ন
জীবন-অনন্ত-বিবর্তন।

দীপালী দিন

মানময়ী বিশ্বাস

ভুলি নিক সেই হাসির ঝলক দীপালী দিন !
সুনীল আকাশে স্নিগ্ধ সহাসে কিসের স্বপ্ন
অসীম আবেগে চলার লগ্ন
বিরামহীন !

উন্নত তার উজ্জ্বল দেহে
পূর্ণিমা স্মৃতি চন্দন স্নেহে
জ্বালাল পূর্ণ জীবনপ্রদীপ মৃত্যুহীন
নন্দন বনে সোনালী সূর্য কালিমাহীন।
রবিকর হতে পেয়েছে শক্তি অপরিসীম ;
দিগন্ত থেকে দিগন্ত-ভরা মরণহিম
গলেছে,—গলেছে চরণে তার,
স্পর্শ পেয়েছে অন্ধকার,
মুহূর্ত মাঝে অপরূপ সাজে চমক লাগাল ঘন বিপিন।
আঁধার জীবনে উড়ন্ত তারা দীপালী দিন।
ভুলি নিক সেই হাসির ঝলক দীপালী দিন,
দুর্বার বেগে জোয়ার এনেছে বিভাসহীন
জীবননদীতে—কুসুম ফুটেছে, সুষমাহার
ধরণীবক্ষে চরণচিহ্ন মনোলোভার।
এ কি কল্পনা মুগ্ধ জীবনে মৃত্যুলীন
হারানো প্রাণের স্বপ্নসুষমা—দীপালী দিন !

ভারতের বস্ত্রশিল্পের সংকট

শ্রীবিভূতিভূষণ রায়

আপৎকালীন অবস্থায়ও দেশের দীর্ঘদিনের সমস্যা-কণ্টকিত বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতি সম্বন্ধে আমাদের সম্মুখে বিশেষ কোন সুপরিকল্পনা নেই বরং এ বিষয়ে শৈথিল্য বা অবহেলা আমাদের এ শিল্পের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে রেখেছে। এজন্য মালিকদের যুগোপযোগী নীতির প্রতি অসহযোগিতা এবং সরকারের শৈথিল্য বহুলাংশে দায়ী। এ বিষয়ে বিশেষ সমালোচনা এবং সুনির্দিষ্ট পথে শিল্পকে পরিচালিত করার বিশেষ প্রয়োজন।...

ভারতের বস্ত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য বা ঐতিহ্য আজকের নয়। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব থেকে ভারতের এ শিল্প পৃথিবীর বিস্ময়। খৃঃ পূঃ ২০০০ সালেও দেখা যায় মিশরীয় মমীকে আবৃত করা হত ভারতীয় সূক্ষ্ম মসলিনে। একটি শিল্পকর্মের বিরাট-বিস্ময় ছাড়াও আজ বস্ত্রশিল্পকে ভারতের বৃহত্তম শিল্প বলা যায়। কারণ ভারতের শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগই উৎপাদন হয় কাপড় মিলদ্বারা। বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত বর্তমানে শ্রমিকসংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। তাদের উপার্জন একশত কোটি টাকার অধিক। ভারতবাসীর দাবি মোটা ভাত, মোটা কাপড়। কোনোটাই আশানুরূপভাবে মেটে নি এ তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যেও।

আজও 'করিম শেখ' কৌপীন পরে হল চাষ করে, অর্ধ-উলঙ্গিনী 'পরাণের স্ত্রী' ভিক্ষান্নের সাথে নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য, জীর্ণবস্ত্রের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘোরে—এ আমাদের জাতীয় চিত্র।

অপর দিকে নাইলন, টেরিলিন, ডেক্রন-এর প্রাচুর্য। 'আছে'র (Haves) দলবৃদ্ধি হচ্ছে। 'না আছে'র (Have not দলের নিঃস্বতা কমছে না। (আমাদের দেশে প্রায় ৬ কোটি লোক প্রায় অনাহারে দিন যাপন করে, তদুপরি আছে লক্ষ লক্ষ ভিখিরী)। এই অসমতা (Disparity) সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গঠিত রাষ্ট্রের অগ্রগতির একদিককার নগ্নরূপ। আমাদের মাথাপিছু কাপড়ের প্রয়োজন ১৮·৫ গজ। সরকারী মতে পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু কাপড়ের প্রয়োজন ২৪গজ। কিন্তু বর্তমানে আমরা পাচ্ছি মাথা-পিছু ১৬গজ। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত হয় মাথাপিছু প্রায় ৩শত গজ)। ভারত সরকার কানুনগোর রিপোর্টের পর ১৯৫৪ সালে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তাতে হস্তচালিত তাঁতকে বিদ্যুৎশক্তি চালিত তাঁতে রূপান্তরের নির্দেশ দেন। এর ফলে বস্ত্র উৎপাদনে কতদূর অগ্রগতি হয়েছে, দেশবাসীই বা কতদূর লাভবান হয়েছেন তার সূক্ষ্ম আলোচনার মধ্যে না গিয়ে একটি সংখ্যাতত্ত্ব উল্লেখ করলেই বোধহয় বিষয়টি সহজে বোধগম্য হবে। ভারতের তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন পরিমাণ নিম্নোক্তরূপ।

১৯৫৭ সনে ১৬৭·৮ কোটি গজ। ১৯৫৮ সনে ১৮২·২ কোটি গজ, ১৯৫৯ সনে ১৯১·০ কোটি গজ ও ১৯৬০ সনে ১৮৬·০ কোটি গজ। এর অর্থ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে সমস্ত বৃহৎ পরিকল্পনাসত্ত্বেও তাঁতবস্ত্রের অগ্রগতি অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। তাছাড়া আমাদের বস্ত্রের অতিরিক্ত প্রয়োজন ১৭০ কোটি গজ তো রয়েই গেল। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তাঁতশিল্পের জন্য বাংলার বাইরে থেকে আমদানী করতে হয় (বিশেষত দক্ষিণ-ভারতীয় অঞ্চল থেকে) ২১ মিলিয়ন পাউণ্ড। নানা হাত ঘুরে খুচরো মুনাফায় যে সুতোর যে দাম পড়ে, তাতে বস্ত্রমূল্য জনসাধারণের সাধ্যাতীতই থেকে যায়। পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন তাঁতবস্ত্রের চিত্র ও উপরি-উক্তরূপ নৈরাশ্যজনক। কোটি গজ হিসেবে ১৯৫৭ সনে ১৬·০৮, ১৯৫৮ সনে ১৮·৩৭, ১৯৫৯ সনে ১৮·৫০, ১৯৬০ সনে ১৮·৬৯। ১৯৬১ সনে অবশ্য অনুমান করা হয়েছে ১৯ কোটি গজের কাছাকাছি। পরিকল্পিত প্রচুর অর্থব্যয় হচ্ছে, কিন্তু আশানুরূপ উৎপাদন বা ফল কোথায়? এ বিষয়ে অপর একটি দিকের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। হস্তচালিত তন্তুশিল্পকে উৎসাহদানের উদ্দেশ্য নূতন কোন মিলেও তাঁত বসাতে দেওয়া হয় নি। যন্ত্রযুগে এ ব্যবস্থায় কোন শুভ ফল হয় নি। বস্ত্রশিল্পে সংকট রয়েই গেছে। এতে মিল-মালিকদের কৃত্রিম বাজার সৃষ্টি এবং বস্ত্র দুষ্প্রাপ্যতার সুযোগ এনে দিয়েছে। এ ব্যাপারে মিল-মালিকদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।

আবার অপর দিকে মান্ধাতার আমলের রীতি অনুযায়ী একজন তন্তুবায় সমস্ত দিনে ৮ গজের বেশি বস্ত্র উৎপাদন করতে পারে না। এর দরুণ তৃতীয় পরিকল্পনার শুরুতেও মাথাপিছু বস্ত্র ব্যবহারের হার ১৬ গজের উপর ওঠে নি। যুদ্ধ-পূর্ব-কালেও অর্থাৎ ২০ বৎসর পূর্বেও আমাদের এ অবস্থাই ছিল, অর্থাৎ বলা যায় চরম 'স্থিতাবস্থা।' এ-যন্ত্রযুগে—মিলের বস্ত্র শিল্পকে অবশ্যই উৎসাহ দিতে হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, অবশ্য তা সরকারী নিয়ন্ত্রাধীনে! কারণ—চটকলের ন্যায় বস্ত্রশিল্পেও বহু মিল-মালিকের নীতি দেশের আদর্শের পরিপন্থী সন্দেহ নেই। আমরা সমস্ত বস্ত্রশিল্পকে সরকারী নিয়ন্ত্রাধীনে আনার পক্ষপাতী, তা যদি সম্ভব না হয়, কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সেই মিলের তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন বাড়াতে হবে।

এ যুগে যন্ত্রশিল্পকে অস্বীকার করা যায় না। এ-যেন মিলমালিকদের সঙ্গে পেরে না উঠে সরকার হস্ত-চালিত তাঁতকে আসরে এনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। এখানে অম্বর চরকার ব্যর্থতা এবং কোটি কোটি টাকা ব্যয় উল্লেখযোগ্য। হস্ত-চালিত তাঁতশিল্পকেও অবশ্যই-যন্ত্র-চালিত বা স্বয়ংক্রিয় তাঁতে রূপান্তরিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। যুগধর্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

জাপানে একটি মহিলা তাঁতী স্বয়ংক্রিয় তাঁত চালায় গড়ে প্রায় ৭০ খানা। অবশ্য এতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও শ্রম সাশ্রয়ের প্রশ্ন জড়িত। আমাদের সংকটমোচনে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে নচেৎ বস্ত্রশিল্পের অবস্থা গুরুতরই হবে। প্রসঙ্গত বলা অসমীচীন হবে না যে, দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানে ছিল ১১টি কটন মিল, বর্তমানে মিল সংখ্যা বোধ হয় ১৪০টি এ শুধু পাকিস্তানের প্রয়োজনই মিটছে না, ঐ দেশ বস্ত্র রপ্তানীতে অগ্রসর হচ্ছে; বিদেশী

দ্রা অর্জন করছে। অথচ পাকিস্তানের কোন বৃহৎ পরিকল্পনা নেই—এরা শুধু চায় অভাব মেটাতে, দেশকে বাঁচাতে।

আমাদের দেশেও বিদেশী মুদ্রা অর্জনের পরিকল্পনা আছে। বিদেশী মুদ্রার কাঙাল আমরা। ঐ মুদ্রা অর্জনকল্পে আমাদের বস্ত্র রপ্তানীর তথ্যও নৈরাশ্যজনক। মিলিয়ন গজ হিসেবে ১৯৫০ সনে বস্ত্র রপ্তানী হয়েছে ১০০০, ১৯৬০ সনে ৬৯৫, ১৯৬১ সনে রপ্তানী হয়েছে ৫৭৫, ১৯৬২ সনে কিছু বৃদ্ধি হয়েছে বলে খুবই গর্ব করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা বেদনার সঙ্গে ভাবছি—সে আর কতটুকু? তার জন্যে বিন্দুমাত্র গর্ব করার নেই। বস্ত্রের দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্যতা ...চিনি রপ্তানীর ন্যায় আমরা বস্ত্র রপ্তানীর বিরোধী নই। কিন্তু ...সত্ত্বেও রপ্তানী-বাণিজ্যে এ দৈন্যের কারণ কি? বস্ত্রের অত্যচ্চ মূল্য ও নিম্নমানের বস্ত্রই এ দুঃখকর পরিস্থিতির অন্যতম কারণ। ...আমাদের বাঁচোয়া কিসে—অগ্রগতিই বা কোন পথে? যুগ এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে জাপানী কুটিরশিল্পের অগ্রগতি সম্বন্ধে আমরা সকলেই কম-বেশি ওয়াকিবহাল, যুগের অগ্রক্ষেপে আমাদের তন্তুবায়দের ভূমিকা কি? সেই ঠুকঠুক-ঠুকঠুক ...তাঁত আমলের গতি যাতে দৈনিক ৮ গজ কাপড়ের বেশি ...একজন তাঁতী উৎপাদন করতে পারে না। কৃষকের মত তাঁতীও ...থাকছে—শিল্পোন্নত হচ্ছে না—অন্তর্যামী হাসছেন। আমাদের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আমরা বাইসাইকেলের যুগে ...—এদিক দৃষ্টি দিলে মনে হয় আমাদের ঘোড়ার গাড়ির যুগ ...উত্তরণ হয় নি।...সমবায়ভিত্তিতে কারখানা চালানো, তাঁত-...কে উৎসাহ দান, সূতো বণ্টন এবং কিছু কিছু ঋণ দানের ...পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে এবং সে সম্বন্ধে কাজও শুরু হয়েছে। ...পরিকল্পিত সমবায়ভিত্তিতে কর্মচালনায় আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে।

কিন্তু বণ্টন রীতি-নীতি বা বিলিব্যবস্থার অবশ্যই সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। অসাধু-ব্যবসায়ীমহল তো সবই বানচাল করে দিচ্ছে। ...ক্ষেত্রে তো তাই হচ্ছে অথচ প্রতিকার কিছুই হচ্ছে না। এ বিষয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে কিছু লিখছি। তন্তুবায়গণ যাতে ন্যায্যমূল্যে ...তো পায় তারই ব্যবস্থাকল্পে সরকার সমবায়ভিত্তিতে সূতো বিলিব্যবস্থা করছেন, উদ্দেশ্য সাধু কিন্তু কাজ সফল হচ্ছে কি? আমাদের ...লিপি অনুরূপ। তন্তুবায়দের অর্থ কোথায় যে তারা সূতো ক্রয় করবে? সুতরাং তাদের সেই মুনাফাখোরদের হাতেই পড়তে হয়। ...দার, ব্যবসায়ী, মহাজন, মাস্টার, উইভার বহুজনের হাত ঘুরে যে সূতো আসে তন্তুবায়দের হাতে, তার যে মূল্য পড়ে তাতে তাঁতীদের ...প্য আর কিছু থাকে না। ঋণগ্রস্ত তাঁতীদের মহাজনদের সুদ ...তে হয়। তারপর আরেকদল ব্যবসায়ী তাঁতীদের মধ্যে সূতো ...লি করেন। তাদের সামান্য মজুরীর বিনিময়ে বস্ত্রাদি নিয়ে নেন ...ভের অংশ দেওয়া তো দূরের কথা। এ বিষয়ে আমাদের দেশে অবাঙালী ব্যবসায়ীদের অসাধু প্রচেষ্টা সুপরিকল্পিত; তাই আমাদের তাঁতী-জোলাদের কৌপীন জোটে না—অভাব চিরস্থায়ী, প্রতিকারহীন। ...দীপের তলাটাই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁতীদের ঋণ দিতে হবে সরকার থেকে। এদের ম্যুজদেহে প্রাণ দিতে হইবে। ঘরে ঘরে তাঁতীদের পৌঁছে দিতে হবে মিলের দরের সূতো। মধ্যবর্তী কোন ব্যবস্থা চলবে না। অর্থের অভাব নেই। শুধু চাই একটু দয়া, দেশের প্রতি একটু মমত্ববোধ, একটু আশা-আশ্বাস। পরিকল্পনার কাগজপত্র থেকে একদলকে নেমে এসে জনসমাজের মধ্যে পরিকল্পনা রূপময় করে তুলতে হবে। কুটিরশিল্পকে বাঁচাতে হবে, ভারতের তন্তুবায়দের ঐতিহ্য রক্ষা করতে হবে, কিন্তু তা আধুনিকতার মাধ্যমে। সাইকেলের যুগকে অন্তত মোটরের যুগে উন্নীত করতে হবে।...বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে তুলাশিল্প অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ বিষয়ে আলোচনা না করলে নিবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকবে।

রপ্তানী-বাণিজ্যে আমাদের তুলাশিল্পের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। আমাদের দেশজাত তুলা উৎকৃষ্ট ধরণের নয়। লম্বা আঁশযুক্ত তুলা আমাদের আমদানী করতে হয়। তব আমাদের রপ্তানী-যোগ্য তুলাতে বিদেশী মুদ্রার একটি বিশেষ সাশ্রয় হয়। কিন্তু তুলা উৎপাদনও আশ্চর্যজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদন হয় ৫৪ লক্ষ গাঁট কিন্তু ১৯৬১-৬২ সালে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৮ লক্ষ গাঁট। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ৭০ লক্ষ গাঁট উৎপাদনের উচ্চাশা কি করে কার্যকরী হবে—বলা কষ্টকর। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত গলব্রেথ-এর কথা, বর্তমান মরশুমে ভারতের রপ্তানীযোগ্য তুলা নেই বা অতি সামান্যই আছে। সংবাদটি ব্যবসায়ীমহলে চিন্তার উদ্রেক করেছে, আমাদের করেছে বিমূঢ়। উৎপাদনকারিগণ উপযুক্ত মূল্য পায় না, তুলার চেয়ে অন্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন লাভজনক—এটাই হল উৎপাদনকারীদের বক্তব্য। এর প্রতিকারার্থে সরকার কি করেছেন বা করছেন, আমাদের জানা নেই।

আমাদের প্রধানত তুলা আমদানী করতে হয় মিশর বা আমেরিকা থেকে. মিশর থেকে উৎকৃষ্ট ধরণের তুলা আসে কিন্তু আমেরিকা থেকে যে তুলা আসে তার মান সর্বত্র ঠিক থাকে না, ফলে বস্ত্র-উৎপাদনের মানও ঠিক থাকে না। এটাও একটি বিবেচ্য বিষয়। আপৎকালীন অবস্থায় মিশরীয় তুলা আমদানী প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। অনিয়মিতভাবে তুলা আসার দরুণ বস্ত্র-মিলগুলো মাঝে মাঝে সংকটে পড়ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এ সংকট-মোচনের উপায় নির্ধারণে বিশেষ তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কি?

নানা কারণেই ভারতের বস্ত্রসংকট-এর একটা সুরাহা হবার আপাতত কোন বলিষ্ঠ নীতি নেই বলেই আমাদের ধারণা। এ-প্রসঙ্গে অপর একটি বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে! বস্ত্রজগতের একটি বিস্ময় 'র‍্যামী' (পাট জাতীয় গাছ এবং এ বিষয়ে প্রথম বাংলায় লেখা আমার একটি প্রবন্ধ পত্রান্তরে প্রকাশিত হয়েছে) একটি বিশেষ সম্ভাবনার যুগ সৃষ্টি করছে।

এর থেকে কাপড়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি টেকসই বা শক্ত সূতো তৈরি হয়। তুলো বা উলের সঙ্গে এ মেশানো যায়। র‍্যামী বিদেশেও রপ্তানী চলে। আমাদের দেশে এ প্রচুর জন্মে। পশ্চিমবঙ্গে একটি র‍্যামীর মিল প্রতিষ্ঠার কথাও আমরা শুনেছি কিন্তু সরকারী গবেষণাগার থেকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা আর শুনা যাচ্ছে না। আমাদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। অথচ র‍্যামী (Ramie) আমাদের বস্ত্রসংকট

বহুলাংশে লাঘব করতে পারে। এ বিষয়ে বিলম্বের সময় নেই; কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বস্ত্রসংকট বেড়েই যাবে। সর্বশেষ সংবাদ—ভারত সরকার বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত-শিল্পের উপর কর আদায়ের আইন করেছেন। ৫০টি বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত থাকলেই তাকে মিল বলে ধরা হবে। এর ভয়াবহ পরিণতি পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিয়েছে। তাঁত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শত শত অর্ধাহারী তাঁতী বেকার হচ্ছে। এ সমস্ত শিল্প-পরিচালকগণ বাইরে থেকে সুতো ক্রয় করেন—এর দাম অনেক বেশি পড়ে এর কারণ পূর্বে বলা হয়েছে; সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আদায়ের এই অভিনব পরিকল্পনা বস্ত্রসংকট দূর করা দূর হস্ত, বরং দেশে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। সরকার কি চান বোধগম্য নয়, তবে তৃতীয় পরিকল্পনায়ও বর্তমান নীতি অনুযায়ী বস্ত্রসংকট মোচনের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। তদুপরি আমরা যেন নানা মুনির নানা মত সম্বলিত জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার আবর্তন ঘুরে মরছি, ভারতের বস্ত্রসংকটের এও অন্যতম কারণ। তৃতীয় পরিকল্পনায় এ দুর্দৈব সত্যই নৈরাশ্যকর ও বেদনাদায়ক। এ বিষয়ে সুষ্ঠু পরিচালনার সময় আসে নি কি? কারণ আমরা চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

রথ

শ্রীমতী সাবিত্রী দত্ত

জগন্নাথের রথ ছুটে চলে রজ্জু আকর্ষণে,
সম্মুখে যা পড়ে দলিত মথিত চক্র বিঘূর্ণনে।
হস্ত বিহীন যেই শালগ্রাম,
হউক দেবতা কতটুকু দাম,
সন্ত্রাসে কাঁপে বলীর প্রতাপে আতুরে করিবে কিবা!
নিশ্চেতনায় বিগ্রহ শুধু বাড়ায় রথের শোভা।

বিশ শতকের আকাঙ্ক্ষা যবে কাঁদে রে আঘাত হানে,
পুষ্পক আর পাশুপত আসি নর-শ্রেষ্ঠতা মানে,
যখন মানব বীরবিক্রমে করিতেছে চিৎকার,
জ্ঞান-গরিমার শ্রেষ্ঠ সোপান করিয়াছি অধিকার।
তারই পাদদেশে তখনও মানব প্রেতের আকৃতি লয়ে
জঠর জ্বালায় খুঁজিছে জীবিকা রক্তের বিনিময়ে,
যে শোণিতে জাগে প্রাণস্পন্দন জীবজন্ম আনে সাড়া,
এই দুনিয়ায় বিলাইয়ে তায় বাঁচিবারে চায় তারা।

স্বদেশের টানে সমরাঙ্গনে নহে এ রক্তদান,
দিবে না কেহই যোদ্ধার সেই সুমহান সম্মান,
রবে না স্মরণে কেবা ছিল এরা,
কিবা ইহাদের জীবনের ধারা,
শহীদস্তম্ভ রচিয়া এদের লিখিবে না কেহ নাম,
শুধু দুইমুঠা অন্নের লাগি যাহাদের সংগ্রাম।

চুক্তি সেথায় রুটি ও রুধিরে ক্রেতা ও বিক্রেতায়,
সেথায়ও লোলুপ কর প্রসারিত আকণ্ঠ পিপাসায়।
অপ্রত্যক্ষ বর্বরতায় সেই আদিকাল উঁকি দিয়ে যায়—
যখন আছিল মানব দানব, রুধির পিয়াসী নর,
আজিও বিরাজে বিমূর্তরূপে তাদেরই বংশধর।
সেই আদিমের নর-খাদকের নবীন সংস্করণ—

আদিগন্ত প্রসারিত কর করিতেছে বিকিরণ,
ধর্ম, বিবেক, দলি পদতলে,
জগন্নাথের রথ ছুটে চলে,
বিশ শতকের শীর্ষ শিখরে মোরা সুসভ্য জাতি,
জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ছুটিয়া চলেছি চাঁদে যে করিতে সাক্ষী।

সুদৃশ্যের ভিড়ে : একটি অনিচ্ছা

বাসুদেব দেব

কোথায় যে ঠিকানা লেখা ছিল,
দেখা হয়েছিল এক দুপুরের লোকাল ট্রেনে।
হাওয়ায় পাতা উড়ছে। ফিঙে পাখি টেলিগ্রাফের তারে,
দুপুরটা থমকেছে ঠিক মাঠের 'পরে হঠাৎ চেন টেনে।
(জলে ঢিলটা ডুবলো, মুখের ছবি ভাঙলো : একটি স্মৃতি)
নীলে চিলটা ডুবলো—নীলচে ধোঁয়া, চশমার কাচে
চোখের পাতা আছড়ায়, ঠিকানা ভুলে গেছি নামটা
হাওয়ায় ভাসছে ধরতে পারছি না, কি যেন নাম? সময়ের আঁচে
পুতুলটা গলে গেছে, গালের কাছের তিনটা মাত্র চিহ্ন, আঃ
বিস্মৃতির বরে সুন্দর বাগান ঘেরা বাংলোর ভিতর ঘরে নরম ছায়ায়
এখনো একটা সূর্যমুখী সতেজ উজ্জ্বল। পৃথিবীর কোথাও।
রেণু রেণু বয়সের গন্ধ শুধু ঝরে পড়ছে মেদুর মায়ায়।
কিন্তু তাকে না, তাকে না, তাকে না, শুধু তার সৌরভ এখন
মধুকর বাতাসের অনন্ত ঐশ্বর্য; এক মায়াবী দর্পণ নিয়ে সে
টিপ আঁকছে, চুল বাঁধছে, জাফরি-কাটা জানালার ফ্রেমে।
সে এক উজ্জ্বল ছবি; তিলোত্তমা যদিও দিয়েছে
যুধ্যমান বর্তমান-ভবিষ্যৎ সুন্দ-উপসুন্দকে ত্বকের শরীর।
হলুদ এ-মাঠ ভেঙ্গে ট্রেন তাকে নিয়ে যাবে নিরাপদ দুর্গের গভীরে।
ঠিকানা সঠিক নয় কখনও, তাকে আমি দৃষ্টির কুহকে
রাখবো না বেঁধে আর, চাইবো না তাকে আর সুদৃশ্যের ভিড়ে!

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

তেত্রিশ

হাজারিবাগ থেকে ফিরে এসে কাঠুরে চৌধুরী সব শুনল। বুধবার দুপুরবেলায় দময়ন্তীরা চলে গেছে। রাঁচী থেকে অ্যাম্বুলেন্সগাড়ি এসেছিল। কিন্তু তারা রাঁচী যায় নি। এইখানেই একটা নতুন স্কুলে চাকরি পেয়েছে।

লবাট বলল: যাবার সময় মেমসাহেব কেঁদেছিল।

কিছু বলেছিল?

না।

কিছুই বলে নি!

সাহেব ফিরে এলে কিছু বলতে হবে কি না আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

কি উত্তর দিলে?

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে লবাট বলল: বলল, বলার কিছু নেই, সাহেব সবই জানেন।

আর কিছু?

বলেছিলাম, বেশিদূরে তো যাচ্ছেন না। মাঝে-মাঝে আসবেন তো!

এ কথায় উত্তর নিশ্চয়ই দেয় নি!

বলেছে, ভগবান জানেন।

কাঠুরে চৌধুরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: ঠিকই বলেছে, বোতল বার কর।

শীত ফুরিয়ে এসেছে বলেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাতে দেরি হচ্ছে। বেলা শেষ হবার আগেই কাঠুরে চৌধুরী ফিরে এসেছিল। স্নান সেরে বাইরের বারান্দায় এসে বসেছে। ফাঁকা লাগছে সব-কিছু। শুধু ঘর আর বারান্দা নয়, পৃথিবীটাই তার কাছে ফাঁকা মনে হচ্ছে।

অনেক দিন পরে লবাট আবার মদের বোতল আর গেলাস বার করল। খানিকটা গেলাসে ঢেলে কাঠুরে চৌধুরী কিছু আশ্বাস পেল। এই মদ তার পরম বন্ধু ছিল, তার নিঃসঙ্গ জীবনটাকে ভরে রাখত। অত্যন্ত হতাশার দিনেও পৃথিবীটাকে তার ফাঁকা মনে হয় নি। এই নির্জন বন আর গভীর অন্ধকারেও সে রঙিন স্বপ্নের কোন অভাব দেখে নি।

কাঠুরে চৌধুরী একচুমুক মদ খেয়েই মুখটা বিকৃত করল। বড় তেতো লাগছে। চীৎকার করে লবাটকে ডাকল। বলল: এ কি দিয়েছিস?

প্রশ্নটা লবাট বুঝল না।

কাঠুরে চৌধুরী বলল: এ তো খারাপ হয়ে গেছে। অন্য কিছু বার কর।

বোতলটা লবাট বদলে দিল, গেলাসটাও। কিন্তু কাঠুরে চৌধুরীর পছন্দ হল না। বলল: এও তেতো।

তবে বিলিতি বোতল দিই?

যা তেতো নয় তাই দে।

কোন মদ তেতো নয়, লবাট জানে না। যা বার করে আনল, তা-ও মনিবের পছন্দ হল না। বিরক্ত হয়ে বলল: কি যা-তা সব বার করছিস?

লবাটের হঠাৎ হাড়িয়ার কথা মনে পড়ল। তার বৌ ভাল হাড়িয়া তৈরি করে। বলল: হাড়িয়া দেব হুজুর?

কাঠুরে চৌধুরী চীৎকার করে উঠল: খবরদার ওসব ছোটলোকের জিনিস আমাকে আর কখনও দিবি না।

ভয়ে লবাট পালিয়ে গেল।

কাঠুরে চৌধুরী একটা চুরুট ধরাল। সেই চুরুটও আজ তার তেতো লাগছে। কিন্তু কেন তেতো লাগছে, কেন বিস্বাদ লাগছে সবকিছু! দময়ন্তীরা চলে গেল বলে? ছি ছি, তা কেন হবে! দময়ন্তীরা তো তার কাছে থাকবার জন্যে আসে নি। তাদের বিপদের সময় সে তাদের তুলে এনেছিল। চিকিৎসার জন্যেই নিজের কাছে রেখেছিল। তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তাই তারা চলে গেছে। তার জন্যে দুঃখ কিসের, অভিমানই বা কিসের!

যাবার সময় বলে গেল না! তার জন্যে সে-ই তো দায়ী! সে নিজেই তো পালিয়ে গিয়েছিল। এখানে থাকলে কি আর না বলে তারা চলে যেত। দময়ন্তীই তো এর জন্যে অভিমান করতে পারে। সে তো তা করে নি।

তবে কেন এই ঘটনাকে সে ভুলতে পারছে না?

কাঠুরে চৌধুরীর আঙুলের ফাঁকে চুরুটটা পুড়ছে, আর সে ভাবছে গত কয়েক মাসের ঘটনা। দময়ন্তীরা এসে কিছুদিন থেকে গেল। এই তো স্বাভাবিক ঘটনা। সে তো কোন গোপন প্রত্যাশায় তাদের উপকার করে নি। তার মনে কি কোন লোভ ছিল, কোন পাপ। না কিছুতেই না। কাঠুরে চৌধুরী বুনো লোক হতে পারে, প্রকৃতিতেও সে বন্য। লোভ সে লুকিয়ে রাখে না। পাপ সে গোপনে করে না। তার মনে কোন ক্লেদ নেই, সেখানে কিলবিল করে না পাপের পোকা।

কাঠুরে চৌধুরী চারিদিক থেকে তার মনটাকে দেখতে লাগল।

নিজের মনই তো মনের অণুবীক্ষণ যন্ত্র। নির্বিকার মন দিয়েই নিজের বিচার করা যায়। খুব সত্যি কথা যে, দময়ন্তীকে তার ভাল লেগেছিল, ভালবেসেছিল তাকে। কিন্তু তার বেশি তো কিছু নয়। তাকে পাবার ইচ্ছা হলে তো সে অনেক কিছু করতে পারত। কিন্তু তা তো সে চায় নি। সে যা চেয়েছিল সে একেবারে অন্য জিনিস। দময়ন্তীকে সে সুখী দেখতে চেয়েছিল। এ কি অন্যায়, না পাপ!

সহসা তার দময়ন্তীর কথা মনে পড়ল। সে বলেছিল: আমরা চলে গেলে লবাটের বৌকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন। সে আপনাকে অনেক খবর দেবে।

বলেছিল: সব শুনলে আপনি অনায়াসেই আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন।

কথাটা মনে পড়তেই কাঠুরে চৌধুরী চেঁচিয়ে ডাকল: মেম-সাহেব।

তারপরেই ধিক্কার দিল নিজেকে—ছি ছি, এদের সঙ্গে সে এমন করে কেন কথা বলে! দময়ন্তীরা তাকে কি ভাবত!

ভয়ে ভয়ে লবাটের বৌ দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে কি না কাঠুরে চৌধুরী খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর দময়ন্তীর কথাই আবার মনে পড়ল। সে-ই তাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে। নিঃশব্দে মেয়েটা অপেক্ষা করছিল। তার দিকে চোখ পড়তেই জিজ্ঞেস করল: ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তোর কাছে কি জানতে চাইত?

মেয়েটা এবারে ভয়ে মলিন হল।

কাঠুরে চৌধুরী তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল: তোর ভয় নেই আমি তোকে কিছু বলব না।

ভয়ে ভয়েই সে বলল: মেমসাহেব স্নানে গেলেই আমাকে ডাকত, অনেক কথা জিজ্ঞেস করত।

কি কথা, তাই তো জানতে চাইছি।

জিজ্ঞেস করত, মেমসাহেব আগে কতবার এ বাড়িতে এসেছে।

তুই কি বললি?

বললাম, আমরা একবার তাকে এই বাড়িতে দেখেছি। কতক্ষণ ছিল, কি করত সব জানতে চাইল। বললাম, বেশিক্ষণ ছিল না। মদ খেতে খেতে সাহেব তার হাত ধরে টেনেছিল বলে রাগ করে চলে গেল।

আর কি বললি?

বললাম, সাহেব আমাদের সকলেরই হাত ধরে টানে। তাতে রাগ করবার কি আছে!

তারপর?

এক-একদিন এক-এক কথা জিজ্ঞেস করত। বলত, কাল রাতে মেমসাহেব কতক্ষণ বাইরে বসেছিল, তোমার ঘরে গিয়েছিল কি না, কি কথা হচ্ছিল। বলতাম, আমরা সে সব জানি নে।

জানি নে কেন বলতিস?

মেমসাহেব বারণ করেছিল।

ই।

লবাটের বৌ কথা না বলে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর সরে গেল। কাঠুরে চৌধুরীর হাতের চুরুট তখন নিভে গেছে।

পরের দিন খবর দিয়ে কাঠুরে চৌধুরী নরোত্তম খেমলানির মালিকে ডেকে আনল। জিজ্ঞাসা করল: কি হে তুমি আর এলে না?

এসেছিলাম হুজুর, কিন্তু আমার আর কাজের দরকার নেই।

কেন?

ইস্কুলেই চাকরি পেয়ে গেলাম। পুরনো বাড়িতেই কাজ করব।

কিন্তু ফুল ফোটাতে পারবে তো আগের মতো?

কেন পারব না?

ভাল বীজ আছে?

আগের বছরের বীজ তুলে রেখেছি।

সেকি আর ভাল আছে?

কাঠুরে চৌধুরী লবাটকে ডেকে তার নতুন বীজের বাক্স আনতে বলল। সেইটে মালির হাতে দিয়ে বলল: নিজের বাড়িতে লাগাব বলে হাজারিবাগ থেকে এনেছিলাম, তা তুমি যখন কাজ করবে না তখন আমি রেখে আর কি করব, এটা তুমিই নিয়ে যাও।

মালি ইতস্তত করছিল।

কাঠুরে চৌধুরী ধমক দিল: নিয়ে যাও না হে, কাউকে না হয় নাই বললে।

বলে বাক্সটা তার সামনে রেখে দিল।

সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মালি চলে যাচ্ছিল। কাঠুরে চৌধুরী বলল: ফুল ফুটলে একদিন দেখতে যাব। যদি তেমন ফুল দেখাতে পার তো বকশিশ পাবে।

তা পারব হুজুর।

বলে মালি চলে গেল।

সন্ধ্যার দিকে এলেন ডাক্তার সেন। বললেন: আপনি এসেছেন খবর পেয়েই এলাম।

কাঠুরে চৌধুরী তাঁকে খাতির করে বলল: বসুন।

ডাক্তার সেন বললেন: মিস্টার মেহতাদের খবর পেয়েছেন তো!

শুনলাম, এইখানেই কোন স্কুলে কাজ পেয়েছেন।

ঠিকই শুনেছেন। রঘুরাজ সিংকে তো চেনেন। স্টেশনের পাশে যার কাঠের গুদাম?

চিনি বৈ কি।

মিস্টার খেমলানির বাড়িখানা কিনে নিয়ে তিনিই স্কুলটা খুলেছেন। বাইরে থেকে একজন মেমসাহেব এসেছে। আর মিসেস মেহতা। এই দু'জনেই এখন স্কুলটা চালাবেন। বুড়োকে ধরে বাড়ির একটা অংশে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

গম্ভীরভাবে কাঠুরে চৌধুরী বলল: ভাল ব্যবস্থাই হয়েছে।

ডাক্তার সেন এ কথায় আত্মপ্রসাদ পেলেন। বললেন: এ অঞ্চলে আজ অনেকদিন ডাক্তারী করছি তো, কোন অনুরোধ করলে লোকে রাখে।

তা রাখবে বৈ কি।

উঠবার আগে ডাক্তার সেন একটা কথা বললেন, অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গেই বললেন: মিসেস মেহতা আপনাকে একটা কথা বলতে বলেছেন। প্রথমটায় লিখবেন বলেছিলেন, পরে বললেন,

আপনিই বলবেন কথাটা। আপনারা তো অনেক দিনের বন্ধু কিছু যেন মনে না করেন এমনিভাবেই বলবেন।

বলুন না আপনি।

বলেছেন, তাঁর অসুস্থ স্বামী পছন্দ করেন না, তা না হলে—

কাঠুরে চৌধুরী কঠিন হয়ে বলেছিল: বুঝেছি, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

মিসেস মেহতাকে আপনি ভুল বুঝবেন না। আমি তাঁর অবস্থাটা বুঝতে পারি। আপনার মতো উপকারী বন্ধুকে এ কথা বলে পাঠাতে তিনি নিশ্চয়ই ব্যথা পেয়েছেন, কিন্তু এ অবস্থায় তিনি আর কিই-বা করতে পারেন। আপনিই বলুন।

আমি বুনো হতে পারি, কিন্তু ছেলেমানুষ তো নই ডাক্তার সেন যে, সকলের কাছ থেকেই আমাকে উপদেশ নিতে হবে।

না না, আমি আপনাকে ঠিক বলতে পারলাম না। এ ঠিক উপদেশ নয়—

যা বোঝবার তা আমি ঠিকই বুঝেছি ডাক্তারসাহেব? মিসেস মেহতাকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে বলবেন, আমি তাঁর শান্তি ভঙ্গ করতে যাব না।

ডাক্তার সেন তাড়াতাড়ি বললেন: আজ আমি উঠি মিস্টার চৌধুরী, আবার দেখা হবে।

আপনার বিলটা আমার কাছেই পাঠাবেন।

না না, বিল আবার কিসের! আপনি তো আমাকে অনেক টাকা দিয়েছেন।

বলতে বলতেই ডাক্তার সেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

কাঠুরে চৌধুরী হা-হা করে হেসে উঠল। আদিম মানুষের মতো বন্য হাসি, চারিদিকের অরণ্যের ভিতর সেই হাসি কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেল।

চৌত্রিশ

কাঠুরে চৌধুরী ভেবেছিল, তার জীবনের গল্প এইখানেই শেষ হয়ে গেছে। স্রোতের মাঝখানে একটা ঢিল পড়েছিল, খানিকটা জল উঠেছিল ছিটকে, তারপর সব মিলিয়ে গেল। জীবনের স্রোত আবার ঠিক আগেরই মতো বইছে।

শুধু একটি বেদনা আছে বুকের মধ্যে বিঁধে, তারই থেকে মাঝে-মাঝে রক্তক্ষরণ হয়। মানুষের উপর বিশ্বাস তার হারিয়ে গেছে। নিজেকেও আর বিশ্বাস হয় না। এই বিশ্বাস যে কত গভীর ছিল, তা সে নিজেই জানত না। আকাশের সূর্যের মতো সে ত' সত্য ভেবেছিল। আজ ফানুসের মতো সেই বিশ্বাস তার চুপসে গেছে। মানুষকে মানুষ ভুল বুঝতে পারে, এ কথা সে কোনদিন ভাবতে পারে নি। আজ নিজেকে তার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করছে।

আজকের কাগজে সে একটা খবর দেখেছিল। কোডারমায় নরোত্তম খেমলানি গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ছিল। সংক্ষিপ্ত খবর পড়ে সব কিছু জানা সম্ভব হয় নি।

কাঠুরে চৌধুরীর মনে পড়ল যে অল্পদিন আগে এই ভদ্রলোক একদিন তাঁর কাছে এসেছিলেন, নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাকে, পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিলেন। দময়ন্তীর কলেজে তখন ছুটি ছিল বলে তার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল।

সেই দময়ন্তী একদিন তার কাছে এসেছিল। কি জন্যে এসেছিল তা বলে নি, বলবার সুযোগ হয় তো পায় নি। কাঠুরে চৌধুরীর ভাল লেগেছিল তাকে, ইচ্ছা হয়েছিল তাকে কিছুক্ষণ ধরে রাখে, গল্প করে। কাঠুরে চৌধুরী শপথ করে বলতে পারে, আর কোন ইচ্ছা তার হয় নি। কিন্তু দময়ন্তী নিশ্চয়ই তাকে ভুল বুঝেছিল। লবাটের বৌয়ের কথায় তার মনে পড়েছে যে সেদিন সে দময়ন্তীর হাত ধরে টেনেছিল। লবাটের বৌয়ের যখন চোখে লেগেছে, তখন কাজটা নিশ্চয়ই তার ভাল হয় নি। কিন্তু হাত ধরায় যে দোষ হতে পারে এ তো তার জানা ছিল না। জানা থাকলে কেন সে এ কাজ করবে!

লবাটের বৌয়ের সঙ্গে তো সে এই রকম হামেশাই করে, করে গ্রামের ধাওড়িদের সঙ্গেও। নাচতে নাচতে তাদের জড়িয়েও ধরেছে কতদিন। কিন্তু কেউ আপত্তি করে নি, বাধাও দেয় নি কেউ। কেউ অসম্মান বোধ করলে কি মহাতো তাকে বলত না? লবাটও তো কোনদিন কিছু বলে নি? কথাটা মনে হতেই সে ডাকল: লবাট।

লবাটের বদলে তার বৌ এল।

লবাট কোথায়?

মেয়েটা মাথা দুলিয়ে হাসল, বলল: আমাকে বল না।

কাঠুরে চৌধুরীর মনে হল, এ মেয়েটাও তাকে হয় তো ভয় পায়। বলল: আমার সামনে তুই আর আসবি নে।

মেয়েটার সাহস বেশি, বলল: আমি কি দোষ করেছি?

কাঠুরে চৌধুরী কটমট করে তার দিকে তাকাল। এমন করে সে কোনদিন তাকায় না। ভয় পেয়ে মেয়েটা পালিয়ে গেল।

দময়ন্তীদের খবর কাঠুরে চৌধুরী মাঝে-মাঝেই পায়। তারা ভাল আছে, সুখে আছে। স্কুলও কোনরকমে চলছে। এ বছর ছাত্র-ছাত্রী কম। আশা করা যায় সামনের বছর থেকে উন্নতি হবে।

একটা কথা ভেবে কাঠুরে চৌধুরী সান্ত্বনা পায়। দময়ন্তী আর তাকে তার স্বামীর প্রাণহানির চেষ্টার জন্য দায়ী করবে না। আন্তরিকভাবে সে তার সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেছে। বোধ হয় সে সফলও হয়েছে, দময়ন্তী চিনতে পেরেছে তাকে।

ডাক্তার সেন আসেন মাঝে-মাঝে। একদিন এসে দুঃখ প্রকাশ করলেন: হল না।

কি হল না?

মিস্টার মেহতা উঠে দাঁড়াতে পারলেন না।

কাঠুরে চৌধুরী সোজা হয়ে বসল: আপনি কি তার ব্যাণ্ডেজ খুলে দিলেন?

কাল খুলেছি।

তবে?

কোনরকমে জোড়া লেগেছে, কিন্তু টুকরো হাড়গুলো মজবুত হয় নি।

উদ্বিগ্নভাবে কাঠুরে চৌধুরী বলল: কি হবে তা হলে?

ডাক্তার সেন বললেন: দাঁড়াবার চেষ্টা করে কাল বেদনা খুব বেড়ে গিয়েছিল। ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়েছে। আজও দাঁড়াবার চেষ্টা করে কষ্ট পেয়েছেন।

কাঠুরে চৌধুরী আরও কিছু শোনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইল।

ডাক্তার সেন বললেন : দেখি কি করতে পারি।

ডাক্তার কি করতে পারেন, কাঠুরে চৌধুরী জানে না। কিন্তু তিনি চলে যাবার পরেও সে এই কথাই ভাবতে লাগল।

এর কয়েক দিন পরে কাঠুরে চৌধুরী সেই দুঃসংবাদ পেল। জগদীশ মেহতার আত্মহত্যার সংবাদ। ঘুমের ওষুধ খেয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। সকাল বেলাতেই তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ডাক্তার সেন এসে ডেথসার্টিফিকেট দিয়েছেন, পুলিশ এসে তদন্ত করেছে। শ্মশানে তাকে দাহ করে সবাই ফিরে এসেছে।

দময়ন্তী কি করছে ?

নরোত্তম খেমলানির মালি এসেছিল খবর দিতে। সে বলল : বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে কেউ নেই ?

এতক্ষণ স্কুলের বড় মেমসাহেব ছিলেন, এইমাত্র চলে গেলেন।

কাঠুরে চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। লবাট আর তার বৌ দাঁড়িয়েছিল দরজার পাশে। চারিদিকের অরণ্যও স্থির হয়ে আছে।

আস্তে আস্তে মালি বলল : দিদিমণি একা কি করে রাত কাটাবেন, সেই ভাবনা হচ্ছে। রাতে ঐ বাড়িতে আমাদেরই ভয় করে।

তোমার বৌকে শুতে ব'লো।

উত্তরে মালি একটু হাসল। কান্নার মতো করুণ হাসি।

কাঠুরে চৌধুরী কি বুঝল সে-ই জানে, ডাকল : লবাট।

লবাট এগিয়ে এল।

তোর বৌকে নিয়ে চলে যা। রাতে তোরা ঐ বাড়িতে থাকবি। ওঝাকে গাড়ি বের করতে বল।

মালি এই ব্যবস্থায় বোধ হয় খুশি হল। একটা নমস্কার করে নেমে গেল।

কিন্তু লবাটের বৌ একটুও খুশি হল না। দরজার পাশে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার দিকে চোখ পড়তেই কাঠুরে চৌধুরী আশ্চর্য

হল, মেয়েটা কাঁদছে। কাঠুরে চৌধুরী চেঁচিয়ে উঠল : যা যা, সরে যা আমার সামনে থেকে।

অল্পক্ষণ পরেই বাড়ির সব মানুষক'টা জীপে করে বেরিয়ে গেল। কাঠুরে চৌধুরী একা বসে রইল তার পুরনো বারান্দায়। এ কি হল! জগদীশ কি তার উপরে এমনি করে প্রতিশোধ নিল। হারিয়ে দিল তাকে জীবনের খেলায়।

সামনের অন্ধকার অরণ্যের দিকে তাকিয়ে কাঠুরে চৌধুরী কোন আশ্বাস পেল না। আকাশে চাঁদ নেই, তারার আলো আকাশেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর লোকের জন্যে আজ বুঝি কোন আলো নেই।

কোন শব্দ নেই, চারিদিকের গভীর অরণ্য স্তব্ধ হয়ে আছে। বুঝি তারা কাঠুরে চৌধুরীকেই দেখছে, আর আশ্চর্য হচ্ছে। গ্রামের একটা চেনা লোক মরে গেলে যে মানুষটা ছুটে দেখতে যায়, এত বড় দুঃসংবাদ পেয়েও সে কি না এমন করে বসে রইল! কি হয়েছে তার! কেন এমন পাথর হয়ে গেছে। কে তাকে পাথর করেছে।

সামনের সেগুন গাছটার পাতা খস-খস করে উঠল। এই গাছটা গ্রে সাহেব নিজে হাতে লাগিয়েছিলেন, বলেছিলেন, একশো বছর পরে এটা তৈরি হবে। গ্রে সাহেবের ডায়েরিতে এর বয়স আছে, বয়স আছে আরও অনেক গাছের। এরা সকলেই কাঠুরে চৌধুরীর চেয়ে বড়। এরা অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে। আজ এরা কাঠুরে চৌধুরীকে দেখছে চোখ মেলে।

এরা কথা বলতে পারে না কেন। এই যে খস-খস করে শব্দ হচ্ছে, এ কি ওদের দীর্ঘশ্বাস। এতদিন তো ওরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নি। তবে আজ কেন ফেলছে!

ও কিসের শব্দ! ওর জীপটা কি ফিরে আসছে। ওদের কে ফিরে আসতে সে বলে নি। তাই তো তার জীপটাই তো ফিরে এল। গাড়িতে এত মানুষ কেন। তবে কি লবাটরাও ফিরে এল। তাড়িয়ে দিল দময়ন্তী।

উত্তেজনায় কাঠুরে চৌধুরী উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল সিঁড়ির নীচে।

এ কি! কাঠুরে চৌধুরী কি স্বপ্ন দেখছে। ওদের পাশ থেকে যে দময়ন্তী নামছে। কাঠুরে চৌধুরী যেন আর্তনাদ করে উঠল : আপনি!

দময়ন্তীর শুকনো চোখ বেদনায় থম-থম করছে। কোন উত্তর দিল না।

পিছন থেকে লবাটের বৌ বলল : আমরাই নিয়ে এলাম।

তার কাজের তারিফ করতে গিয়ে কাঠুরে চৌধুরী থেমে গেল। বলল : আসুন।

দু'জনের কেউই দেখতে পেল না যে অন্য মানুষগুলো কত খুশি হল।

বারান্দায় উঠে দময়ন্তী উদ্গত কান্নায় ভেঙে পড়ল। আর তার পাশে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল কাঠুরে চৌধুরী। মাস ছয়েক আগের কথা তার মনে পড়ল। দময়ন্তী ঠিক এমনি করে এইখানে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদেছিল। বলেছিল, আপনি আমার স্বামীকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। আজও কি দময়ন্তী সেই অভিযোগ করবে।

নিজেকে শান্ত করতে দময়ন্তীর সময় লাগল। অনেকক্ষণ পরে সে মুখ তুলে তাকাল।

কেন এমন হল?

কেন!

বলে বুকের ভিতর থেকে একখণ্ড কাগজ দময়ন্তী বার করল। এগিয়ে দিল কাঠুরে চৌধুরীর হাতে। সে ভেবেছিল, এ চিঠি জগদীশের লেখা। কিন্তু নরোত্তম খেমলানির নাম দেখে আশ্চর্য হল। জগদীশকে সে লিখেছে—

ছি ছি, বাপ হয়ে মেয়ের সম্বন্ধে এ কথা লিখতে পারল! শয়তান পাষণ্ড জানোয়ার! এই মুহূর্তে তাকে সামনে পেলে কাঠুরে চৌধুরী তাকে কুকুরের মতো গুলী করে মারত। ভগবান তাকে মারবেন, নরকের কীট হবে নরোত্তম খেমলানি।

জগদীশকে লিখেছে : বিশ্বাস না হয় রঘুরাজ সিংকে জিজ্ঞেস কর—কার টাকায় সে আমার বাড়ি কিনেছে, আর কার কথায় সে ঐ স্কুল খুলেছে। সে যখন এ অঞ্চলে আসে ঐ ঠাকুরসাহেব তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, এবারেও তাকে এই কাজে সাহায্য করেছে। বিশ্বাস না হয়—

কাঠুরে চৌধুরী স্তম্ভিত হয়ে গেছে। অত বড় মানুষটার দু'টো শক্ত হাত আজ থরথর করে কাঁপছে। দু'চোখের দৃষ্টি গেছে ঝাপসা হয়ে। সমস্ত চিঠিখানা কাঠুরে চৌধুরী পড়তে পারল না। ফিরিয়ে দিল দময়ন্তীর হাতে। তারপর কেঁদে উঠল ছেলেমানুষের মতো।

একটা পুরুষমানুষ যে এমন করে কাঁদতে পারে, দময়ন্তী জানত না। কি করবে, কি বলবে, কিছুই ভেবে পেল না।

অনেকক্ষণ পরে কাঠুরে চৌধুরী বলল : আমি সত্যিই আপনার স্বামীকে হত্যা করলাম। সেদিন আপনি ঠিকই বলেছিলেন।

বাধা দিয়ে দময়ন্তী বলল : ঠিক বলি নি। ভুল করে আমি আপনার দোষ দিয়েছিলাম, আর কখনও ভুল করব না।

কাঠুরে চৌধুরী দময়ন্তীর মুখের দিকে তাকাল। বেদনার্ত, বিষণ্ণ মুখ, গালের উপর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। একফালি আলোয় সেই জল চিক-চিক করছে।

এই আলো কোথা থেকে এল। এতক্ষণ তো আকাশে আলো ছিল না।

॥ সমাপ্ত ॥

প্রেম ও বিবাহ

শ্রীমণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবাহ বহুদিন থেকে প্রচলিত একটি প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠান। নর-নারীর জীবনে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। যে সব নর-নারী আজীবন অবিবাহিতভাবে কাটান, তাঁদেরই বরং বলা চলে অস্বাভাবিক। খোঁজ করলে জানা যায় নেপথ্যে কোন কারণ থাকার জন্য তাঁরা এই জীবনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু এমনও দিন ছিল যখন বিবাহ বলে কোন সামাজিক প্রথার সৃষ্টি হয় নি। সেদিনের গুহাবাসী মানব পশুর মতই যৌন আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটাতো। কোন লজ্জা, বাধা বা আইন ছিল না যা তাদের এই পাশবিক মনোবৃত্তিকে দমন করতে পারতো। কালক্রমে যখন সেই ছন্নছাড়া মানব সন্তান একত্রে দলবদ্ধভাবে বাস করতে শিখলো—তখন তাদের মধ্যে জাগ্রত হ'লো বুদ্ধি, বিবেচনা এবং সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা। মানুষে মানুষে এতদিন যে বিবাদ চলছিল তার নিবৃত্তি ঘটায় মানুষ প্রথম উপলব্ধি করলে ভালবাসার স্বাদ। স্ত্রী ও পুরুষের উভয়ের ভালবাসা এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হ'ল বিবাহ প্রথার। এতদিন মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধভাবে বাস করতো। একদল অপর দলের নিকট পরাজিত হলে বিজিত দলের মেয়েরা বিজেতাদের ভোগ্যা হিসাবে গণ্য হতেন। কিন্তু ক্রমশ সমাজে শান্তি ও আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মানুষ একে অন্যকে ভালবাসতে শিখলো। এই ভালবাসা থেকেই হ'লো বিবাহ প্রথার উৎপত্তি। নর-নারী একে অন্যকে ভালবেসে একান্ত আপনার করে কাছে পাওয়ার আশায় বিবাহ করতো। অর্থাৎ সেইযুগে প্রেমকে ভিত্তি করেই বিবাহ সংগঠিত হ'তো।

কিন্তু যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ প্রথায়ও পরিবর্তন দেখা দিল। ধর্ম বিবাহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে শত বাধা-নিষেধের গণ্ডীতে তাকে সংকীর্ণ করে তুললো। বৈদিক যুগে নর-নারীর মেলামেশা ও স্বেচ্ছায় বিবাহ করার যে স্বাধীনতা ছিল, পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য যুগে তা থাকলো না। এইভাবে বিবাহ প্রথায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। সামাজিক বিবাহ ব্যতীত রাক্ষস, পৈশাচ, গান্ধর্ব ইত্যাদি প্রথায় বিবাহ প্রচলিত ছিল। রাক্ষস বিবাহে আইন বা নিয়মের কোন বালাই ছিল না। কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করে বিবাহ করা হতো। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের প্রেমের ভিত্তিতে লুকিয়ে যে বিবাহ হ'তো তার নাম ছিল গান্ধর্ব। অর্থাৎ অনেকটা আমাদের রেজেস্ট্রী ম্যারেজের মত আর কি।

অতএব দেখা যাচ্ছে বিবাহ প্রথা সৃষ্টি হওয়ার সময় থেকেই এ নিয়ে সমস্যা চলে আসছে। বর্তমান বিংশ শতাব্দীও সে সমস্যার হাত থেকে রেহাই পায় নি। উপস্থিত সমাজে দু'টি নিয়ম প্রচলিত আছে। একটি নেগোসিয়েটেড—সামাজিক বিবাহ এবং অপরটি লাভ ম্যারেজ বা প্রেমঘটিত বিবাহ। একাধিক নিয়ম প্রচলিত থাকলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কোন পদ্ধতিটি শ্রেয়।

প্রাচীনপন্থিগণ বলবেন, পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকগণ যে বিবাহ দেন সেটাই আদর্শ।

আর নব্যপন্থিগণ বলবেন, বিবাহের প্রধান নায়ক-নায়িকা নিজেরা দেখেশুনে যে বিবাহ করেন সেটাই শ্রেয়।

প্রাচীনপন্থিগণ বলেন: আমাদের কালে এমন ঢলাঢলির বিয়ে ছিল না। গুরুজনে যা দেখে দিয়েছেন তাই হয়েছে। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয় না। কারণ প্রেমঘটিত বিবাহ যে প্রাচীনকালেও ছিল তার প্রমাণ গান্ধর্ব বিবাহ প্রথা। প্রেম মানুষের হৃদয়ের একটি চিরন্তন সুকুমার বৃত্তি। প্রেম-ভালবাসা যদি প্রাচীনকালে থাকিত তবে শকুন্তলা-দুষ্মন্ত; কচ-দেবযানী; প্রতাপ-শৈবলিনী; কৃষ্ণ-নরেন্দ্র; অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা ইত্যাদি বিভিন্ন যুগের প্রেমিক-যুগলের সাক্ষাৎ আমরা পেলাম কিভাবে? একথা তো অনস্বীকার্য যে সাহিত্যিকগণ সেই যুগের বাস্তব ঘটনায় প্রতিচ্ছবি নিয়েই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে রচনা করে থাকেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রেম সব যুগেই ছিল।

অবশ্য প্রেমঘটিত বিবাহের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কারণ এখনকার মত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা; সহশিক্ষা প্রভৃতির এত প্রচলন ছিল না। তাই ক্ষেত্র বিশেষে প্রেম ও বিবাহ দেখা গেলেও সামাজিক বিবাহই প্রধান স্থান দখল করেছিল। এ বিবাহে পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব মতামতের বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না। তখন বাল্য-বিবাহের প্রচলন থাকায় তাদের মতামতের প্রশ্নও দেখা দিত না। কিন্তু বর্তমান যুগে যখন আমরা বিবাহের জন্য প্রস্তুত হই তখন পাত্র-পাত্রী উভয়েই নাবালকত্বের সীমা পার হয়ে যায়। তাদের নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা পাকা হয়। ছেলেরা উপার্জনক্ষম এবং মেয়েরা উচ্চ-শিক্ষিতা না হয়ে বিবাহে আবদ্ধ হতে রাজী হয় না। এই পরিবেশে কোন ছেলে বা মেয়ে যদি কাউকে ভালবেসে বিয়ে করতে চায় সেখানে যুক্তির দিক দিয়ে দেখলে আপত্তির বিশেষ কারণ থাকে না। এমতাবস্থায় অভিভাবক তাঁর অভিভাবকত্ব বজায় রাখতে জোর করে অন্যত্র বিবাহ দিলে সে বিবাহে দম্পতি সুখী না হলে তার বিষময় ফল যে কতদূর গড়াতে পারে সে বিষয়ে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

'Love is the happiness of the world..Love is a comming together...In love, all things unite in a oneness of joy and praise.'

এটাই হ'ল ইংরাজী সাহিত্যে প্রেমের প্রকৃত সংজ্ঞা।

বয়ঃসন্ধিকালে পুরুষ স্বতই অদম্যবেগে নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। নারীও এই সময় থেকে তার মন, প্রাণ, চেতনা সব কিছু দিয়ে কামনা করে পুরুষকে। যুগ যুগ ধরে নারী কামনা করে স্বামীর মধ্যেই পাবে সে তার প্রেমিককে। দু'টি নর-নারী যখন সর্বনাশা ভালবাসার মধ্যে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে একে অন্যকে জীবনের সাথী হিসাবে পেতে চায়, তখন মিথ্যে ধর্মের গোঁড়ামী অথবা অর্থ-কৌলীন্যের অসামঞ্জস্যের সূত্র ধরে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের গণ্ডী না টানাই মনে হয় ভালো। তবে একথা সত্য যে অভিভাবককে দেখতে হবে তাঁর পুত্র বা কন্যার স্বনির্বাচিত সে সঙ্গী যোগ্য কি না।

তবে যোগ্যতার বিচারে রূপ, অর্থ অথবা ধর্মকে মাপকাঠি করলে চলবে না।

একথা বলা অসমীচীন হবে না যে, বর্তমান যুগের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে চলতে গেলে পুরানো যুগের কিছু গোঁড়ামী আর সংস্কার ত্যাগ করতেই হবে। নচেৎ পদে পদে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য।

সামাজিক অথবা প্রেমঘটিত কোন বিবাহ পদ্ধতিই নিন্দার নয়। পাত্র-পাত্রী যদি অভিভাবকের নির্বাচন স্বেচ্ছায় মেনে নেন সেক্ষেত্রে সামাজিক বিবাহ শুধু আনন্দদায়কই নয়—কাম্যও। কিন্তু তাদের অমতে কেবলমাত্র লোকনিন্দা অথবা বংশমর্যাদার জন্য শাসনের বেত্র উত্তোলন করা আর যাই হোক মানবিকতার পরিচায়ক নয়। সে চেষ্টায় সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠতে বাধ্য। তাই মনে হয় যুগোপযুগী আবহাওয়াকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বস্টন প্রবাসের দিন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণা বসু

শীতের হাওয়ায়

আমরা যখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে প্রথম পা দিলাম তখন ছিল শরৎকাল। উইক-এণ্ড হলেই সবাই দেখি গাড়ি নিয়ে ছুটছে শহরের বাইরে। কোথায়? না যাচ্ছে টার্নিং অফ্ দি লিভস্ দেখতে। গাছের পাতায় রঙ ধরেছে আর সেই রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে মানুষের মনে। শীতকালে দীর্ঘদিন রিক্ত হয়ে থাকে গাছপালা। তাই যেন ঝরে যাবার আগে একবার অপূর্ব শ্রী নিয়ে দেখা দেয় বনানী। মানুষ নয়ন ভরে দেখে নেয় সেই রূপ। কৃপণের মত সঞ্চয় করে রাখে মনের মধ্যে সারা শীতকালের

হাউসহোল্ড 'চোর' সংক্ষিপ্ত করেছে আধুনিক রান্নাঘর

খোরাক। নভেম্বর মাসের মধ্যে ঝরে যায় সব পাতা। বসন্ত আসবে আবার সেই এপ্রিলে, তার আগে প্রকৃতির এই দৈন্য ঘুচবে না।

শরৎকালের এই পাতার বাহার সর্বত্রই চোখে পড়বে। কিন্তু নিউ-ইংলণ্ডের 'ফল্'-এর খ্যাতি এখানকার আর সব-কিছুর মধ্যে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। ধীরে ধীরে সোনালী হয়ে ওঠে গাছের পাতা, তারপর হলদে আর ব্রাউনের, সে যে কত রকমের হাল্কা, গাঢ় মাঝারি শেডের তফাৎ। সঙ্গীতে যেমন এক স্বর থেকে আর এক স্বরে যেতে মাঝে আছে শ্রুতি—সঙ্গীতরসিকেরা তার মর্ম বোঝেন তেমনি প্রথম হলুদ ছোপ ধরা থেকে সুরু করে বিবর্ণ, ধূসর হয়ে ঝরে যাওয়া পর্যন্ত রঙের কত সূক্ষ্ম কারুকার্য—তার মর্ম বোঝেন প্রকৃতি প্রেমিকেরা। শহর থেকে দূরে বেরিয়ে পড়তে পারলে ভালই, নয় বস্টনে বসেও উপভোগ করা যায় নিউ-ইংলণ্ড 'ফল্'-এর সৌন্দর্য বেশি দূর নয় ফেনওয়ে অঞ্চলে, নয়ত বস্টন কমন-এ কিম্বা চেস্টনাট হিলের পথে চোখে পড়বে সোনালী পাতায় ছাওয়া ঝলমল তরুশ্রেণী।

শীতকালটা যখন পুরোপুরি এসে পড়ে তখন মনে হয় ভালই, কিন্তু শীতের আগমনী মনকে নিতান্ত বিষণ্ণ করে তোলে। সারা নভেম্বর মাস আকাশ মুখ কালো করে রইল আর বৃষ্টি পড়ল যখন তখন প্যাচ প্যাচ করে। হঠাৎ একদিন চমকে গিয়ে খেয়াল করি একটিও পাতা অবশিষ্ট নেই কোন গাছে। শূন্যে শুকনো ডালপালা মেলে দিয়ে কেমন যেন হাহাকার করছে গাছগুলো। বিকেল হবার আগেই অন্ধকার নেমে আসে।

আমাদের লিভিং-রুমের কাচের শার্সি দিয়ে চেয়ে বাইরে দেখা যায় ট্রেমণ্ট স্ট্রীটের ওপরে মস্তবড় ক্যাথলিক গির্জার সুউচ্চ চূড়া। গির্জার ঘণ্টাগুলো করুণসুরে বাজে। কালো আকাশের গায়ে কালো থমথমে গির্জার চূড়ার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল জানলার কাছে।

শ' বলল, ডবল প্রমোশন পেয়ে আমার মাথাটা ঘুরে গেছে, স্পয়েল্ড হয়ে গিয়েছি একদম্। কিছুকাল আগেও বিদেশযাত্রার সুযোগ যখন আসত, লোকে প্রথম যেত ইংলণ্ড, তারপর হয়ত কণ্টিনেণ্টে একটু ঘোরাঘুরি, তারপর ভাগ্য প্রসন্ন হলে পাড়ি জমাত সুদূর আমেরিকায়। আজকাল হচ্ছে অন্যরকম। ডবল প্রমোশন পাওয়া ছাত্রের মত প্রথমেই এসে পড়েছি আমেরিকায়। হত যদি ইংলণ্ড, অতিথিবৎসল আমেরিকানদের মত এত আদর-আপ্যায়নের ঘটা হত না, সেণ্ট্রাল হিটিং-এর এমন সুবন্দোবস্তও নেই সেখানে আর আবহাওয়ার কথা বলাই বাহুল্য। বস্টনের নভেম্বরের আকাশ দেখে মন খারাপ হয়ে গেল? লণ্ডন হলে কি হত? সেখানে তো নভেম্বর, তা এপ্রিল, তা জুন-জুলাই আকাশের সেই একই ছিঁচকাঁদুনে চেহারা।

বস্টনের আকাশের এই করুণ, বিষণ্ণ চেহারা সত্যিই ক্ষণিকের। শীত তীব্রতর হল আর অন্যদিকে আকাশ আবার ঝকঝকে নীল হয়ে গেল, সোনালী রোদ ঝলমল করে উঠল, যদিও সে রোদে তাপ ছিল না একফোঁটাও। যেদিন যত সুন্দর, পরিষ্কার আকাশ, সেদিন শীতের কাঁপুনি তত বেশি।

টেম্পারেচার নেমে গেল হু-হু করে।—১৮°—১৬°—১… ফারেনহাইট। টেম্পারেচারের তারুণ্য নিয়ে সকলে আলোচনা কর…

যেখানে যাচ্ছি সেখানেই। Temperature is in the seens —এই একটা কথা শিখলাম ঐ সময়ে। আর এই টিন-এজার আবহাওয়ার মেজাজ-মর্জি অনেকটা ওদের চঞ্চলমতি টিন-এজেড্ ছেলেমেয়েদেরই মত।

মেমসাহেবরা শীত-গ্রীষ্ম দুইয়েতেই বেজায় কাতর হয়ে পড়ে। আমরা যে গরম দেশের লোক তাও নীরবে মেনে নিয়েছি অসহ্য শীত, ছটফট্ করে লাভ কি আছে? অথচ শার্লি, ক্লেয়ার, ক্যারল যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে সব হি-হি করছে শীতে আর কেবলি বলছে, "ও, আই এ্যাম ফ্রিজিং।"

প্রথমে ভেবেছিলাম এরা দেখছি শীতে কাবু হয় সহজেই। কিন্তু গ্রীষ্মকাল আসতেই দেখলাম তখনো একই অবস্থা। গ্রীষ্মকাল যে এসেছে তা প্রধানত দু'টো জিনিসে বোঝা গেল। এক থার্মোমিটারের দিকে চেয়ে সেখানে পারার অংক উঁচুতে চড়তে লাগল। আর এক মেমসাহেবদের বসনের দিকে চেয়ে, বসন-ভূষণ ক্রমশই সংক্ষিপ্ততর হতে লাগল। ছেলেরা দেখলাম পুরো প্যান্ট ও পুরো হাতা জামা চালিয়ে যাচ্ছে এমন কি ছোট ছোট ছেলেরাও। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা কিন্তু তাদের মায়েদের মতই সর্ট পরতে সুরু করে দিল সামারের গোড়াতেই। যত দিন যায়, হ্রস্ব আয়তনের সর্ট ও হাতকাটা ব্লাউজ পরে শার্লি, ক্লেয়ার, ক্যারল ঘামতে লাগল—সুর বলতে লাগল, 'ও আই এ্যাম মেল্টিং।'

গরমকালের কথা এখন থাক। নভেম্বরের শেষে থ্যাংক্স-গিভিং-এর ঠিক আগের দিন ঝুপঝুপ করে অল্প একটু বরফ পড়ে গেল। অবশ্য এ কিছুই নয় আসল পারফরমেন্স সুরু হবার আগে রিহার্সেল। কোথা থেকে যে এত তীব্র কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া উপস্থিত হল, কিছুই জানি না। সেদিন পথে দেখি এক মেমসাহেব উল্টো দিকে হেঁটে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সত্যিই পিছন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হেঁটে। খানিকক্ষণ বোকার মত চেয়ে থাকার পর বুঝতে পারলাম মুখোমুখি হাওয়ার সঙ্গে যুঝে ওঠা অসম্ভব। পিছন ফিরে হাওয়ার সংগে তাল রেখে হাঁটলে তবে এগোন যায়।

ডিসেম্বরের ন' তারিখে ঘুম থেকে উঠে জানলার বাইরে চোখ পড়তে চোখ আর ফেরাতে পারলাম না। কি এক অপার্থিব সৌন্দর্য নিয়ে বস্টন দেখা দিল সেদিন। এ যেন আমার নিত্যকার দেখা বস্টন নয়। সামনেই হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের বাড়ি বরফে ঢেকে গিয়ে রূপকথার রাজপ্রাসাদের মত চেহারা নিয়েছে। হান্টিংটন এভেনিউর চওড়া পথ বরফে ঢেকে গেছে আগাগোড়া, স্ট্রীটকারের লাইন চাপা পড়েছে বরফের তলায়। রাস্তার দু'পাশে সারবন্দী পার্ক করে রাখা মোটর গাড়িগুলো বৌদ্ধস্তূপের মত চেহারা নিয়ে বেশ একটা প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছে। গাছগুলোর পাতা না-থাকার লজ্জা ঘুচেছে এতদিনে, বরফে সর্বাঙ্গ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে পড়ে গেল, কলেজ-জীবনে পড়া রবার্ট ব্রিজেসের 'লণ্ডন স্নো।' পরীক্ষার ভীতি, সাবস্টেন্স লেখার আতংক সব ছাপিয়েও কেমন করে যেন কবিতাটি মোহ বিস্তার করতে পেরেছিল মনে। আগের দিন সারারাত ধরে নিঃশব্দে বরফ পড়েছে।

When men were all asleep
the snow came flying

শহরের চেহারা পালটে গেছে কবির অজান্তে। সকালে উঠে সেই অসীম সাদার দিকে চেয়ে চোখে যেন ধাঁধা লেগে গেল—

The eye marvelled,
marvelled at the dazzling whiteness.

শীতকে অবশ্য আমেরিকানরা কাবু করে ফেলেছে সেন্ট্রাল হিটিং-এর গুণে। বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, ট্রাম-বাস, মোটরগাড়ি সবই গরম করা আছে—নাইস এণ্ড ওয়ার্ম। যদি কেউ শখ করে রাস্তায় ঘুরে না বেড়ায়, তবে শীতে কাঁপবার সুযোগ বিশেষ পাবে না। তাই কঠোর শীতের মধ্যেও আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কোন ব্যাঘাত তো হলই না হৈ-চৈ করে ঘুরে বেড়ানো সবই পুরোমাত্রায় চলতে লাগল। সামান্য একটু রকমফের হয়ত হল। ফল-এর সময় নেমন্তন্ন থাকত পিকনিক সাপারের শীতকালে বেশির ভাগ রাত্রে ডিনারের পর 'গেট-টুগেদার'।

অনেক সময় এই ইনফর্মাল গেট-টুগেদার বা বন্ধু-সম্মেলন বেশ উপভোগ্য মনে হত আমার। অনেকে একসঙ্গে হয়ে শীতের রাত্রে জমিয়ে বসে গল্প করার পক্ষে আদর্শ। ডিনারের পর আটটা নাগাদ সকলে একজনের বাড়ি জড়ো হওয়া গেল। গৃহস্বামিনী নানারকম টুকিটাকি খাবার যোগাড় রাখবেন আর কিছু ড্রিংকস্. নানারকম ফলের রস একসঙ্গে মিশিয়ে একটা পাঞ্চ হতে পারে। টুকিটাকির মধ্যে 'ডিপস্' অর্থাৎ—ডিপ্ করে—ডুবিয়ে খাবার জিনিসের প্রাধান্য। চীজ দিয়ে তৈরি পাতলা ক্রীমের মত রয়েছে পাত্রে, তাতে টুক্ করে ক্র্যাকার বা আলু ভাজা ডুবিয়ে কুটুস করে কামড় দিচ্ছে সবাই। খোশগল্প চলছে সঙ্গে। বেশ অনাড়ম্বর, অন্তরঙ্গ পরিবেশ। ঠিক বারোটা বাজতেই এক রাউণ্ড কফি খেয়ে আসর ভঙ্গ করে উঠে পড়বে সবাই।

এরই মধ্যে দু'টো বড় বড় উৎসব এসে গেল আমেরিকানদের, থ্যাংক্স-গিভিং ও বড়দিন। নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবার থ্যাংক্স গিভিং বা ধন্যবাদ দিবস আজকাল জাতীয় উৎসব হিসেবে প্রতিপালিত হয় দেশ জুড়ে। তবু আগে কিন্তু এর বিশেষভাবে নিউ ইংলণ্ড
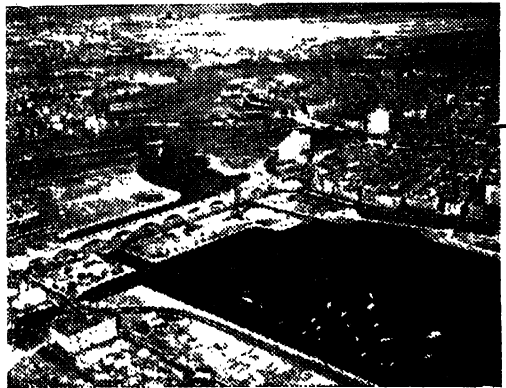
বস্টন শহরের একটি দিক

ফেস্টিভ্যাল হিসেবে খ্যাতি ছিল। তাই নিউ ইংল্যাণ্ডের আধা-গ্রাম আধা-শহর ফ্রেমিংহ্যামে হ্যারিয়েটদের সঙ্গে থ্যাঙ্কস-গিভিং কাটাবার নিমন্ত্রণ পেয়ে মনটা খুশিতে নেচে উঠল। ফ্রেমিংহ্যামে সেই আমাদের প্রথম যাওয়া। কিন্তু তারপর থেকে ফিরে ফিরে বহুবার গিয়েছি। এই অঞ্চলটি আমাদের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। টার্কি রোস্ট, ভুট্টা সেদ্ধ, ক্র্যানবারি সস্ দিয়ে ডিনার হল। ডিনারের পর বসবার ঘরে লগফায়ার জেলে আরাম করে বসে গল্পগুজব হল। সবচাইতে ভাল জায়গাটা অধিকার করে ফায়ারপ্লেসের ধার ঘেঁষে শুয়ে রইল ওদের প্রকাণ্ড কালো কুকুর বেজ্ঞ। থ্যাংক্স গিভিং থেকেই নাকি প্রকৃতপক্ষে শীতের সুরু। এ কথাটা শুনছিলাম সকলের মুখে। এবার বুঝতেও পারলাম বেশ। রাত্রে ফিরবার সময় হ্যারিয়েটের ওভারকোট ধার করতে হল।

বড়দিন কাটাতে গেলাম আমরা ওয়েস্টন বলে বস্টনের উপকণ্ঠে আর এক ছোট শহরে। সেখানে থাকেন ডাক্তার ও মিসেস এলিস্টোন। বড়দিনের উৎসব সাধারণত পারিবারিক উৎসব। ওদের পারিবারিক মিলনোৎসবে যোগ দিতে এলিস্টোন-দম্পতি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সুসজ্জিত ক্রিসমাস ট্রির নীচে রয়েছে বহু জন্য সুদৃশ্য কাগজে মোড়া ক্রিসমাসের উপহার। এলিস্টোন কন্যা পেনী বুর হাতে তুলে দিল উপহার। মোড়ক খুলে দেখা গেল তার সবচাইতে প্রিয় খেলনা মোটরগাড়ি।

ইতিমধ্যে আরো নানান ধরণের কাজকর্মে জড়িয়ে পড়লাম আমি আর তারই সূত্র ধরে বস্টনের সঙ্গে পরিচয় হতে লাগল গভীরতর। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক টেলরের স্ত্রী মেরী টেলর একদিন ধরে-নিয়ে গেল Y. W. C. A-তে এবং সভ্যও করে নিল। কোপলে স্কোয়ারের ওপর Y. W. C. A-র বাড়ি। কোপলে স্কোয়ারে আমার সবচাইতে বড় আকর্ষণ ছিল বস্টনের পাবলিক লাইব্রেরী। এবার আরো একটা যাবার জায়গা হল।

প্রতি মঙ্গলবার Y. W. C. A-তে ছিল 'ওয়াইভস ডে' অর্থাৎ মহিলামহল। সারা সপ্তাহের সাংসারিক ঝঞ্ঝাট থেকে একটা দিন আলাদা করে রাখে গৃহিণীরা। সেদিন এখানে এসে গল্পগুজব, আলোচনা সভা থেকে শুরু করে সাঁতার কাটা, টেনিস খেলা নানা কাজে দিন কাটায় তারা। প্রতি মঙ্গলবারের এই আসরে অনেক বস্টনিয়ান মহিলার সঙ্গে আলাপ হল। সকাল দশটায় 'কফি আওয়ার' দিয়ে দিনের সুরু। আমেরিকানদের কফি প্রীতি বিশেষ করে সকালবেলা কাজের মধ্যে এই কফির ছুটি একটা দেখবার জিনিস। সকাল আটটায় অফিস-পাড়ায় এবং অন্যত্র কাজের সুরু, বেলা দশটায় অন্তত পনেরো মিনিটের জন্য হলেও দেশজুড়ে কাজকর্ম থেমে গেল, থমকে দাঁড়ালো সবকিছু, কি না কফি-ব্রেক। আমাদের চা-প্রীতিকে ওরা ইংলিশ অভ্যাস বলে ঠাট্টা করত।

যা হোক, 'Y-wives day' সুরু হত কফি দিয়ে। নটার মধ্যে বস্টনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মায়েরা এসে জড়ো হতেন। ওপরতলায় প্রশস্ত নার্সারি। মায়েদের সঙ্গে যে-সব বাচ্চারা এসেছে তারা নার্সারিতে ঢুকে পড়ল সারাদিনের মত। মায়েরা কফির আড্ডা শেষ করে বিভিন্ন ক্লাসে চলে যেতেন। কেউ বিদেশী ভাষা শিখছেন, কেউ শিখছেন জাপানী কায়দায় ফুল সাজানো, কারু বা আছে হোস্টেসিং-এর ক্লাস অর্থাৎ কি করে আদর্শ হোস্টেস্ হতে হয় তার শিক্ষানবিশী।

আমার ছিল কিছুদিন আর্ট অফ্ কন্ভারসেশন ক্লাস। কণ্ঠস্বরের ওঠানো-নামানো শেখানো হচ্ছিল একদিন। স্বর টেপ-রেকর্ড করে আবার ফিরে বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন আমাদের শিক্ষয়িত্রী। কে যেন বললে, তোমাদের দেশের গান একটা শোনাও না। কি মনে করে 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' প্রথম দু'টি ছত্র গাইলাম। ঠিক ও গানটাই কেন মনে পড়ল জানি না, বিদেশেই বোধ হয় নিজের দেশ সম্বন্ধে যথার্থভাবে সচেতন হয় মানুষ। রেকর্ডিং শুনতে-শুনতে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলাম ভাবছিলাম মন্দ হয় নি খুব।

এমন সময় আমার পাশের মহিলাটি বললেন, কি চমৎকার সুর, এটা বুঝি একটা ভারতীয় লালাবাই—ঘুমপাড়ানো গান?

শুনে আমি থতমত খেয়ে গেলাম একটু।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের বিরতির পর আবার সুরু হল বিভিন্ন আলোচনা সভা আর ক্লাস নয়ত খেলাধুলার আসর। তিনটের সময় ছুটি। কর্তারা বাড়ি ফিরলেন, ইস্কুল থেকে ফিরবে ছেলেমেয়েরা তার আগে বাড়ি পৌঁছে ঠিকঠাক করতে হবে সব। তাই ষাট মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে ঘরের পথে চললেন Y-wivesরা।

আমেরিকান মেয়েরা ক্লাব লাইফ পছন্দ করে খুব। মেয়েদের নিজস্ব ক্লাব ছাড়াও যে কোন অফিসে, যে কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের স্ত্রীরা মিলে চট্ করে একটা ওয়াইফস্ ক্লাব গড়ে ফেলবে। শ'র কর্মস্থলে ওয়াইফস্ ক্লাবের মেম্বার হয়ে যেতে হল শীগগিরই। সেখানে আমাদের দু'টো গ্রুপ ছিল। আমাদের জুনিয়র দলের চাইতে সিনিয়র দলের বর্ষীয়সীরা অবশ্য আমাদের চেয়ে অনেক বেশি কর্মঠ ছিলেন। নানান ধরণের চ্যারিটির আয়োজন, উৎসব অনুষ্ঠান, ডিনার বল্নাচের ভার নেওয়া সব কিছুতে ওঁরা অগ্রণী।

আমার বন্ধু গ্ল্যাডিং চিজোম ছিল ডি এ আর (D. A. R.) নামে আমেরিকার একটি বিখ্যাত মহিলা-সংস্থার সভ্যা। ডি এ আর বা ডটারজ্ অফ্ আমেরিকান রেভোলিউশন-এর সভ্যা তারাই যাদের পিতৃ-পিতামহ কেউ কোন না-কোন মতে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত। গ্ল্যাডিং ছিল আবার ওদের স্থানীয় ডেডহ্যাম ক্লাবের একজন পাণ্ডা।

সে আমাকে একদিন ডেডহ্যাম-এ ধরে নিয়ে গেল। বস্টন থেকে মাত্র মাইল-পনেরোর মধ্যে কি সুন্দর শহর। সেদিন বরফ পড়ছিল সারাদিন। বস্টন থেকে ডেডহ্যাম পথটি এমনিতে সুন্দর, বরফে-ঢাকা গাছ-পালায় সেদিন আরো সুন্দর মনে হচ্ছিল। পথে হ্যানকক্ ভিলেজে লাঞ্চ সেরে ডেডহ্যাম পৌঁছলাম। রাস্তার দু' ধারে ছোট ছোট কটেজ, মাঝারি দোতলা বাড়ি—সবই বরফে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই চোখে পড়ল আগাগোড়া তুষারাবৃত তীক্ষ্ণ, সু উচ্চ চূড়াওয়ালা এক গির্জা। আমাদের গাড়ি গির্জার সামনে দাঁড়ালো।

এই গির্জার প্রশস্ত হলে বসে ডেডহ্যাম উইমেনস্ ক্লাবের মাসিক অধিবেশন। ডেডহ্যামের এই মহিলা সমিতি বয়সে সুপ্রাচীন, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। আমাকে ওরা সেদিন ওদের অনারারি সভ্যা নির্বাচন করল। এরপর থেকে ডেডহ্যাম যাওয়া দাঁড়ালো বাঁধাধরা নিয়ম। সকালে বস্টন থেকে বেরিয়ে পথে কোন হোটেলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে লাঞ্চ

সেরে নিয়ে ডেডহ্যাম ক্লাবে। গির্জার নীচের তলায়, একেবারে মাটির নীচে আণ্ডার গ্রাউণ্ড হল-এ সুন্দর নার্সারির ব্যবস্থা। ক্লাবসভ্যাদের ছেলেমেয়েরা সারাদিন কাটায় সেখানে। এ ব্যবস্থা ছাড়া ও-দেশে মহিলারা অচল।

রবিবার সকালে গির্জায় উপাসনায় যোগ দিতে যায় সবাই সপরিবারে, সেখানেও গির্জার সঙ্গে লাগাও নার্সারির ব্যবস্থা। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গির্জায় গিয়েছি টেলর-পরিবারের সঙ্গে বু থেকেছে নার্সারিতে। একবার একটা বড় ধর্মমহাসভার আয়োজন হয়েছিল হার্ভার্ডের কোন একটি গির্জায়। সব ধর্মের লোকেরা যোগ দিয়েছিলেন তাতে। বু'কে নার্সারিতে খেলনা দিয়ে বসিয়ে রেখে নীচে আসতে একটু দেরি হল। হলে ঢুকছি, অবাক হয়ে শুনি গান হচ্ছে মীরার ভজন। পরে আলাপ হল গায়িকা বাঙালী মহিলা।

জানুয়ারীতে একবার কোহাসেট ঘুরে এলাম। সেখানে বেদান্ত আশ্রমে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব পালিত হচ্ছিল। জন্মোৎসবের উৎসবানুষ্ঠান সব ছাপিয়ে শীতের কথাই মনে পড়ছে। সেদিন ছিল বছরের তীব্রতম শীত। ডিসেম্বর ও জানুয়ারীর প্রচণ্ড শুকনো কনকনে শীতের পর ফেব্রুয়ারীতে মাস জুড়ে শুধু তুষারপাত হয়ে চলল একটা বড়রকমের তুষারঝড়ও হয়ে গেল একদিন। সারা সকাল সাঁ-সাঁ করে হাওয়া এলোমেলো বইছে। আমাদের উন্মত্ত কালবৈশাখীরই অনুরূপ। ধূলো আর বৃষ্টির বদলে পেঁজা তুলোর মত বরফ। বরফগুলো এলোমেলো ঘুরপাক খেতে খেতে ছিটিয়ে ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে। টেলিভিশনে ওয়ার্নিং সিগন্যাল দিচ্ছিল সারাদিন। পথচারী ও বিশেষ করে মোটরগাড়ির চালকদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছিল—একটা ফার্স্ট ম্যাগনিটিউডের তুষারঝড় বয়ে যাচ্ছে নিউ-ইংল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কেউ বাড়ির বাইরে বার হবে না।

কয়েকজন আমেরিকান বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সেদিন 'পথের পাঁচালী' দেখাবার কথা আমাদের। অগত্যা ক্যানসেল করতে হল। মিসেস্ ওয়েলজ-এর ড্রাইভ করে নিয়ে যাবার কথা। টেলিফোন করলেন, 'পথের পাঁচালী' দেখবার নিতান্ত শখ আমার, কিন্তু তাই বলে তো আর মোটর-দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানোর রিস্ক নেওয়া চলে না।

[আগামীবারে ওয়াশিংটনে ছুটি]

অচেনা মেয়ে

অনীতা সেন

স্টেশনে ঢোকবার আগেই ট্রেনটা হঠাৎ একটু ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। অনেকেই নেমে পড়লো ট্রেন থেকে কি হয়েছে দেখবার জন্যে। কেউ কেউ জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়লো।

সুতপাও মুখ বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলো। ইঞ্জিনের কাছে বেশ একটা ভিড় জমে গেছে। হৈ-চৈ শব্দ ভেসে আসছে। আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

বিরক্তিতে সুতপার মন ভরে গেল। অফিসের কাজ সেই সকালবেলা বেরিয়েছিল। সমাজ-সেবার কাজ। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে বড় ক্লান্ত লাগছে। আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না।

ভাবছিল কতক্ষণে গিয়ে স্নান সেরে শুয়ে পড়বে, কিন্তু বাড়ির কাছে এসে আবার কি ঝামেলা বাঁধলো। নিশ্চয় ধর্মঘট! কলকাতা শহরে তো নিত্য লেগেই আছে। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ওর বাড়িটা বেশি দূরে নয়। ভাবতে লাগল এখানে নেমে হেঁটেই রওনা দেবে কি না।

কিছু কিছু লোক আলোচনা করতে করতে এইদিকেই ফিরে আসছিল। টুকরো-টুকরো কথা এবং অনেকের মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল। কেউ বললে, 'ওদের মরাই ভাল'।

কেউ বললে, 'আহা বেচারা! একেবারে দু'আধখানা!'

একজন সুতপাদের কামরায় উঠতেই অন্যেরা জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়েছে মশাই?'

লোকটা অবজ্ঞাভরে বললে, 'ও একটা বোবা পাগলী ভিখারী মেয়ে চাপা পড়েছে।'

কথাটা শুনেই সুতপা চম্‌কে উঠলো একটি পুরোনো স্মৃতি ওকে চাবুক মেরে উঠিয়ে দিলে। তাড়াতাড়ি সঙ্গের ঝোলাটা কাঁধে ফেলে নেমে পড়লো। একরকম প্রায়-দৌড়েই ভিড়ের কাছে এগিয়ে গেল। ভিড় ঠেলে ঢুকতেই একজন মন্তব্য করলে—'মেয়েছেলে আবার এখানে কেন?'

সুতপা কান দিল না। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেলল। ঠিক যা ভেবেছিল তাই রক্তের প্লাবনের মধ্যে পড়ে আছে ওদেরই পাড়ার সেই বোবা ভিখারিণীর দেহ—পরনে ওরই দেওয়া শাড়ি। মুণ্ডুটা কিছুদূরে ছিটকে গেছে।

সুতপা আর দাঁড়াতে পারলো না। সমস্ত দেহমন যেন অবশ হয়ে গেল। মাথাটা ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগলো। টলতে টলতে ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। রেল-লাইনের ধার দিয়ে দিয়ে যন্ত্রচালিতের মত উঠে এল প্লাটফর্মে। মনকে যতই বোঝায় একটা ভিখারিণী মেয়ের জন্য এত দুঃখ কেন, ততই যেন গলা বুজে যায়—চোখে জল ভরে আসে। সামান্য কয়েকদিনের জন্য হলেও ওর জীবনের সঙ্গে যে কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিল সুতপা। সে কথা ভুলবে কেমন করে? সে-সব দৃশ্য যে এখনও মনের মধ্যে জ্বল্-জ্বল্ করছে।

সেই কথাই ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কের মত সুতপা বাড়ির পথ ধরলো।

সেই প্রথম যখন বালিগঞ্জের নূতন বাড়িটাতে উঠে এসেছিল সুতপা, সেদিন নতুন পরিবেশে অনেক রাত্ত পর্যন্ত ওর ঘুম হয় নি। অনেকক্ষণ ধরে এ-পাশ ও-পাশ ..র শেষ রাত্রের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল ও।

হঠাৎ একটা গোঙানি আর করুণ কান্নার স্বরে ওর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খোলার আগেই একটা অজানা ভয়ে বুকটা ঢিব্-ঢিব্ করতে লাগলো। চাইতেই জানলা দিয়ে নজর পড়লো ও-পাশের ফুটপাথে।

ঐ যে বাগান-ঘেরা বড় বাড়িটা তারই পাঁচিলের ধারে একটা আমগাছতলায় বসে কাঁদছে এক আধবয়সী ভিখারিণী। সবে তখন কাঁচা হলুদ রোদটা এসে পড়েছে ওর গায়ে। মাথার ওপরে তোলা রুক্ষ জট-বাঁধা চুল। পরনে শতছিন্ন গিঁট বাঁধা ময়লা শাড়ি কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করছে। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করতেই সুতপা বুঝতে পারলে ও কাঁদছে না। হাত-মুখ নেড়ে পথচারীদের কাছে কি সব বলছে। কিন্তু মুখ দিয়ে গোঙানির মত অব্যক্ত শব্দটা ছাড়া আর কিছুই বেরোচ্ছে না। যারা আশেপাশে রয়েছে তারা কেউই ওকে গ্রাহ্য করছে না। পথচারীরাও অবজ্ঞাভরে চলে যাচ্ছে।

ভাল করে লক্ষ্য করবার জন্যে সুতপা বারান্দায় বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কতগুলি ছোট ছোট ছেলের ভিড় হয়ে গেল মেয়েটির সামনে। ওদের দেখে মেয়েটি যেন আরও ক্ষেপে গেল। ওরা হাততালি দিয়ে কি বলছে আর মেয়েটি তাড়া করছে। ওরা কিছুদূরে পালিয়ে গিয়ে হাসছে। আবার ফিরে আসছে। কেউ আবার ঢিল কুড়িয়ে ছুড়ছে। মেয়েটি রেগে পথচারীদের কাছে নালিশ করতে লাগলো গোঁ-গোঁ করে। কেউ তাদের ধমক দিল, কেউ চেয়েও দেখল না। পাশের বটগাছটার ছায়ায় ছাতুর পশরা খুলে বসেছিল এক ছাতুওয়ালা। সে হেসে কি মন্তব্য করলো। ইটের ওপর বসে যে লোকটি দাড়ি কামাচ্ছিল সেও সেই হাসিতে যোগ দিল।

পাশের বাড়ির দরওয়ানটাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুতপা জিজ্ঞেস করলো, 'মেয়েটি কে?'

সে বলল,—'ও একজন পাগলী, বোবা; ওকে নিয়ে সবাই মজা করে।

সত্যি সত্যি দেখা গেল সবাই ওকে নানাভাবে রাগাবার চেষ্টা করছে। ও কখনো চেঁচাচ্ছে, কখনও কাঁদছে, কখনও হাতমুখ নেড়ে দৌড়ে যাচ্ছে।

সুতপার দাঁড়িয়ে থাকবার সময় ছিল না। একে নতুন বাড়ি তার ওপর অফিসের তাড়া। তাই কাজ সারবার জন্য বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। কিন্তু সব কাজের ফাঁকেও সেই একটানা একঘেয়ে সুর শুনতে লাগলো।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে আর মেয়েটিকে দেখতে পেল না।

এরপর মেয়েটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, কিন্তু দিন পনেরো পরে আবার সেই গোঙানি সুরু হোল। সেদিন কিন্তু খুব বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল সুতপা। বাড়িটা ওর বেশ ভালই লেগেছিল। বেশ ছোট দু'তলা বাড়ি। সামনে একটুখানি বাগান। ভেবেছিল বেশ নিরিবিলিতে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ আবার কি বিপত্তি অথচ আশ্চর্য, এ পাড়ার সবাই এরকম বিশ্রী একটানা শব্দ সহ্য করে কি করে? মেয়েটাকে কোন আশ্রয়-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দিতে পারে তো? আচ্ছা একটু সময় পেলে নিজেই চেষ্টা করে দেখবে।

সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে সুতপার একেই দেরি হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে দেখে ও তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। ভারি ভাল লাগছিল ওর বৃষ্টি আসার রূপ দেখতে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো দূরের তাল-নারকেল গাছগুলো দুলতে আরম্ভ করেছে। দু-একটা শুকনো পাতা, সাদা কাগজ উড়তে-উড়তে কিছুদূর গিয়ে পড়লো। রাস্তার বাতিগুলো এক এক করে জ্বলে উঠলো।

ও পাশের ফুটপাথে দৃষ্টি পড়তেই দেখলো সেই পাগলী মেয়েটা আশ পাশ থেকে পয়সা কুড়িয়ে আঁচলে বাঁধছে। যাক তা' হলে ও

রাজ কিছু পায়। মেয়েটা এবার পাশের হোটেল থেকে কিছু খাবার চয়ে নিয়ে আঁচলে বাঁধলো। তারপর এগিয়ে গেল রাস্তার বাতিটার নীচে। ওখানে একটা কুকুর অনেকক্ষণ থেকে পড়েছিল, বোধ হয় কিছুতে ওর একটা পা চাপা দিয়ে গেছে। তখনও যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে কেঁউ-কেঁউ করছিল। মেয়েটা তাকে তুলতে গেল। কুকুরটা পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারলো না। তখন ও কুকুরটাকে কোলে তুলে নিল। রাস্তার চাপা কল থেকে একটু জল নিয়ে ওর মায়ে দিল। তারপর আঁচল থেকে ভাত নিয়ে খাওয়াল। ইতিমধ্যে বড় বড় ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করেছে। সেইদিকে চেয়ে ও কুকুরটাকে কোলে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে চলে গেল।

অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিল সুতপা; কুকুরটা এতক্ষণ রাস্তার জঞ্জালের মত পড়েছিল, কেউ ফিরেও তাকায় নি কিন্তু এই আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে মেয়েটির যে দরদী মনের পরিচয় পেল, সেটাও কি ওর পাগলামী?

এর পর কয়েকমাস আর মেয়েটি আসে নি।

শীতকালের এক ছুটির দিনে সুতপা বসে বসে সামনের বাগানটার সংস্কার করছিল। এমন সময় একটা হৈ-চৈ শুনে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলো। সেই বোবা মেয়েটাকে ঘিরে বেশ একটা ভিড় জমে গেছে, আর মেয়েটা হাউ-হাউ করে কাঁদছে।

প্রায় সকলেই মেয়েটাকে গালাগাল দিচ্ছে। মেয়েটা কখনো কখনো সকলের পা ধরবার চেষ্টা করছে আবার কখনো কি বলবার চেষ্টা করছে। সব মিলিয়ে একটা কিম্ভূতকিমাকার শব্দ বেরোচ্ছে ওর গলা দিয়ে। টানাটানিতে ওর জীর্ণ কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। রুক্ষ চুলগুলো মুখের সামনে ঝুলে পড়েছে। একটা ছেলে হঠাৎ মজা পেয়ে ছাতুওয়ালার জলের কলসীটা দিল মেয়েটার মাথার ওপর উপুড় করে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথা, কাপড়, গা ভিজে একাকার।

একজন মন্তব্য করলো, 'এবার পাগলামী সারবে।'

আর একজন বলল, 'পাগলামী—না বদমায়সী।'

মেয়েটা আরও জোরে কাঁদতে কাঁদতে কোন রকমে ভিড় ঠেলে এ পাশের ফুটপাথে দৌড়ে এল। ভিড়টাও ওকে তাড়া করলো। বাড়ির সামনে আসতেই সুতপা হাত ধরে মেয়েটাকে টেনে নিল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলো—'ওকে প্রশ্রয় দেবেন না। এখনই পকেট মারবার জন্যে এক ভদ্রলোকের হাত ধরে টানাটানি করছিল।'

'সে আমি বুঝবো,' বলে গেট বন্ধ করে দিল সুতপা।

মেয়েটা ততক্ষণে একপাশে বসে পড়ে কাঁপছে। সুতপা তক্ষুণি ওর একটা পুরনো কাপড় এনে দিয়ে ভিজে কাপড়টা বদলে ফেলতে বলল। কাপড়টা হাতে নিয়ে কেমন একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল মেয়েটা, সে দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা, আনন্দ, বেদনা সব মিশে একাকার হয়ে গেছে। চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো ওর।

সুতপা ভাত এনে ওকে খেতে দিলে। ভাত দেখে ওর চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি করে ভাতগুলো কাপড়ে বাঁধতে লাগলো। সুতপা মনে করলো নিশ্চয় সে কুকুরটাকে খাওয়াবে। তাই বলল—'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? এখানে বসে খা।'

মেয়েটা কেমন ঘাবড়ে গেল। তারপর হঠাৎ কি হোল, আঁচলটা চেপে ধরে ছুট দিল। পাগলী আর সাধে বলে?

কিন্তু এ পাগলামীর কি শেষ নেই? কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার একটা গণ্ডগোল বাঁধাল মেয়েটা। সুতপা বাস থেকে নামতেই দেখলো ও পাশের ডিসপেন্সারীর সামনে ওকে ঘিরে বেশ ভিড় জমেছে। ও ঠিক সেইভাবেই কাঁদছে, আর সকলের পা জড়িয়ে ধরছে। মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এবার ওর জন্যে কিছু না করলেই নয়। সুতপা ভাবতে ভাবতে যেই গেট খুলে বাড়িতে ঢুকতে যাবে—তীরের মত ছুটতে ছুটতে মেয়েটা এসে ওর পায়ের ওপর আছড়ে পড়লো। হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথমটা সুতপা। মেয়েটা হয় তো মনে করেছে এটাই ওর একমাত্র আশ্রয়। পিছু পিছু কয়েকজনকে ছুটে আসতে দেখে সম্বিৎ ফিরে এল ওর। একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

বাইরে চেঁচামেচি শুনতে পেল, 'ওকে ছেড়ে দিন—আমরা পুলিশে দেব।'—'ওঃ! ভারি দয়া দেখাচ্ছে!' ইত্যাদি।

মেয়েটা তখনও হাঁপাচ্ছে। মার খেয়েই হোক আর দরজায় লেগেই হোক কপালটা কেটে দর দর করে রক্ত পড়ছে।

সুতপার চাকর পঞ্চু ছুটতে ছুটতে সেই সময় এসে বলল—'দিদিমণি ওকে এক্ষুণি তাড়িয়ে দিন। ও পাগলামীর ভাণ করে চুরি করে। ডিসপেন্সারীর কম্পাউণ্ডারের হাত ধরে টানছিল; ধমক খেয়ে একটা দামী ওষুধ তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল।'

মেয়েটা কি বুঝলো কে জানে? চোখ দু'টো ওর জ্বলে উঠলো, তারপরেই নিস্তেজ হয়ে মুখ নীচু করে বসে পড়লো।

সুতপা জিজ্ঞেস করলো, 'বারে বারে কেন এমন দুষ্টুমী করিস?'

মেয়েটা এবার চোখ তুলে তাকাল। চোখ দু'টো জলে ভরে গেছে। ভারি ক্লান্ত, বিষণ্ণ মুখখানা। দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে গোঁ-গোঁ করে কি বললে। সুতপা কিছুই বুঝতে পারলো না। এবার ওর হাত ধরে টেনে টেনে দূরের দিকে দেখাতে লাগল। ইসারা করে বোঝাতে লাগলো ওর সঙ্গে কোথাও যাবার জন্যে। সুতপার কেমন জিদ চেপে গেল এ ব্যাপারের একটা হেস্ত-নেস্ত করবে ও। অন্তত বাইরের লোকদের ব্যবহারের এটাই হবে নিঃশব্দ প্রতিবাদ। তাই একটা গরম কাপড় জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'চল্ কোথায় যেতে হবে।'

পঞ্চু খুব ছেলেবেলা থেকে সুতপাদের সংসারে কাজ করছে। দিদিমণির কাণ্ড দেখে অবাক!

বললে—'পাগল হলেন নাকি!'

সুতপা হাসতে হাসতে বললে, 'তুমিও চল না।'

বুড়ো বয়স পর্যন্ত সুতপাকে দেখে আসছে পঞ্চু; জানে যেটা জিদ ধরেছে করে ছাড়বে। তাই আর কিছু বললে না।

তখন অন্ধকার নেমে এসেছিল। বাড়ির সামনে ভিড়টাও আর ছিল না, হু-হু করে উত্তরে হাওয়া দিচ্ছিল। শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, রুক্ষচুল গুছিয়ে নিল মেয়েটা। তারপর টলতে টলতে এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে ফিরে দেখতে লাগলো, সুতপা ঠিক আসছে কি না।

কিছুদূরেই একটা পরিত্যক্ত মাঠ পড়েছিল। মাঠটা পেরিয়ে ও একটা বস্তির পিছন দিকে সুতপাকে নিয়ে গেল। সেখানে একটা ভেঙ্গে-পড়া পোড়ো ঘর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পেছন দিকটা

জঙ্গলে ভরে গেছে। কিন্তু সামনেটা বেশ পরিষ্কার করে নিকোনো। সেদিনকার সেই কুকুরটা একপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। গ্যাসের মিটমিটে আলো-অন্ধকারে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল জায়গাটা।

মেয়েটি ইসারায় ওদের দাঁড়াতে বলে ভেতরে ঢুকে গেল। কুকুরটা মুখ তুলে দু'বার ভেক্ ভেক্ করে মেয়েটিকে দেখে আবার মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল 'কে, বিনো এলি ?'

তারপর হাঁপানীর সঙ্গে কাশির শব্দ হতে লাগলো। সুতপার গা'টা কেমন ছম্-ছম্ করতে লাগলো। পঙ্কু গজ্, গজ্, করতে লাগলো।

মেয়েটা সেই সময় একটা মোমবাতি জ্বেলে ওদের ভেতরে ডাকলো। ভেতরে যাবে কি, যাবে না ভাবতে ভাবতে ভেতরে উঁকি দিল সুতপা। দেখলে মেঝেতে শুয়ে শুয়ে ধুঁকছে এক মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন লোক। অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় শেষ ডাক এসে গেছে। মেয়েটি খুব যত্ন করে লোকটির মাথাটি ওর কোলের ওপর তুলে নিল। লোকটি চোখ বুজতেই চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। মেয়েটি সেইরকম যত্ন করেই আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে ওকে ঠেলে সুতপার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে।

লোকটির ওর দিকে দৃষ্টি পড়তেই চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মুখে একটা করুণ হাসি ফুটলো। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে অতি ক্ষীণস্বরে জড়িয়ে জড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, 'মঙ্গলময় ভগবান আপনাকে ঠিক সময় পাঠিয়েছেন।' তারপরেই কাশতে লাগলো। বললে, 'বড্ড কষ্ট হচ্ছে।'

কিছুক্ষণ থেমে থেমে, কাশতে কাশতে, হাঁফাতে হাঁফাতে যা বললে তা থেকে সুতপা 'জানতে পারলো' যে, বিনোর স্বামী এই লোকটি। আগে অবস্থা ভাল ছিল—কারখানায় কাজ করতো। কিন্তু ট্রাম চাপা পরে ওর একটা হাত কাটা যায়। চাকরিটা চলে যাওয়ার পরেই স্ত্রীর কঠিন রোগ হয়ে গলার স্বর বিকৃত হয়ে গেছে। সে সময় যেটুকু পুঁজি ছিল, সব খরচ হয়ে গেছে। তারপর কোনরকমে ভিক্ষে করে দিন চলছিল। কিন্তু অভাব-অনটনের জ্বালায় ও একবছর হলো এই দারুণ রোগে ভুগছে।

বিনো কোথা থেকে দু'মুঠো ভাত জোগাড় করে আনে, কোন ভাল জায়গায় ওর কাজ পাবার উপায় নেই—ওকে সবাই পাগলী মনে করে। আজ আশা দিয়ে গিয়েছিল ওষুধ দিয়ে ভাল করবে, কিন্তু ও তো জানে না আজই হয় তো সব ওষুধের বাইরে চলে যাবে তার স্বামী। বিনোর ভার কেউ নিলে তবু নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারে সে।

এবার সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল সুতপার। ও যেন কেমন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। পাথরের মত এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। লোকটি ছটফট্ করে উঠতেই ওর সম্বিৎ ফিরে এল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে লোকটির মাথা একপাশে ঢলে পড়লো।

একটা কিছু হয়েছে বুঝতে পেরেছে মেয়েটি। দৌড়ে এসে সুতপার পা জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না! একটা ডাক্তার ডাকবার জন্যে একটু ওষুধ দেবার জন্যে ইসারা করে বোঝাতে লাগলো। সে কি আকুলি-বিকুলি। সুতপার চোখ ফেটে জল এল। বুঝতে পারলো সব শেষ হয়ে গেছে। তবু মেয়েটিকে আশ্বাস দিয়ে বেরিয়ে এল। পঙ্কুকে বললে, মৃতদেহ না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত যেন ওখানে বসে থাকে। তারপর মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি আসে।

সুতপা এরপর সোজা চলে এল ওর সহকর্মী বন্ধু রঞ্জনের কাছে। তার ওপর ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করা এবং সৎকারের ব্যবস্থা করার ভার দিয়ে বাড়ি ফিরে এল। কিছু খেতে ইচ্ছে করলো না। উৎকর্ণ হয়ে রইল কখন মেয়েটাকে নিয়ে পঙ্কু ফিরে আসে।

গভীর রাত্রে পঙ্কু একাই ফিরে এল। বললে—'গোলমালের মধ্যে মেয়েটা কোথায় চলে গেছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

এই ঘটনার সাতদিনের মধ্যে ওকে এভাবে দেখবে, সুতপা আশাই করে নি। বেশ বোঝা যাচ্ছে ও আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু কেন? যে স্বামীর মুখ চেয়ে সে এতদিন এত অপমান, এত গ্লানি সহ্য করেছিল, তার অবর্তমানে সবই কি শূন্য হয়ে গেল?

পিতৃগৃহের স্মৃতি

জয়শ্রী গুপ্ত (চৌধুরী)

শীতের রোদ্দুর বেঁকে জানালার শাসিতে দেয়ালে
আল্পনা গিয়েছে এঁকে। ফেরিওলা দূরে হেঁকে যায়
মেঝেতে সেলাই কল, সুতো টানা অর্ধেক সেলাই,
মা গেছেন ব্যস্ত পায়ে, ছবি ভাসে চোখের উপরে।

শঙ্কর, দু'হাতে কাদা খেলাঘরে দোকান সাজায়
এতদূরে আমি তবু স্পষ্ট দেখি দুই চোখ ভরে
ছায়া রোদ্দুরের ছবি। ওঠে নামে ছবির ঢেউয়েরা।
ছবির মিছিল যায়। আসে আর কেবলি হারায়।

ট্রেনের গম্ভীর ধ্বনি। স্মৃতি আনে গানের মতন
স্কুল থেকে ছুটে ফেরে দীপঙ্কর, দ্রুতপায়ে ঢোকে
জানালার অলিন্দে ডাকে, কালো সাদা পায়রার জোড়া
ফুলের বাগানে ছাদে, ঝরে পড়ে ক্রিসানথিমাম।

ছবির ফুলেরা ঝরে, ঝরে, ঝরে ছবির ফুলেরা।

হাউই

চিত্রা সেনগুপ্ত

একটা জ্বলন্ত হাউই অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে আকাশের এককোণ থেকে পাড়ি দিতে দিতে আরেক কোণে মিলিয়ে গেল একনিমেষে। সেটা মিলতে না মিলতেই আরেকটা হাউই নিঃসীম অন্ধকার আকাশের দিকে ছুটে চললো। তারপর আরেকটা। আরো কয়েকটা জ্বলন্ত হাউই মাথা ঠেলে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। কখনো বা ঝাঁকে-ঝাঁকে আকাশের বুক আলো করে ছুটে চলেছে প্রজ্বলিত হাউই-এর বিসর্পিল বহ্নিশিখা।

কলকাতার শুষ্কশ্রান্ত আকাশের গায়ে কারা যেন দেওয়ালির আলোর মালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে একে-একে। সঁ··সাঁ··হাস্কা একটা

আওয়াজ তুলে হাওয়া ঠেলে উঠে যাচ্ছে হাউইগুলো। তীব্র অথচ স্নিগ্ধ আলোর রোশনাই সমস্ত অন্ধকারকে ভেঙ্গে চুরে সোনাগলা স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিচ্ছে আকাশময়।

ছাদের এককোণে শুয়ে মুগ্ধবিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়েছিল মাধবী। বেশ লাগে অবসন্ন চোখ দু'টো দিয়ে এ দৃশ্য উপভোগ করতে। পাশ ফিরে অশোকের দিকে একবার তাকিয়ে নিল মাধবী। ঠিক···যা ভেবেছে। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে অশোক। অশোকের এই ঘুমকাতুরে স্বভাবের কথা ভাবলে হাসি পায় মাধবীর। এত ঘুমুতেও পারে অশোক। অথচ একবার জিজ্ঞাসা কর সাত রাজ্যের কৈফিয়ৎ দিতে বসে যাবে এখুনি।

···উঁহু কি বাজে বক। তুমি তো আমাকে কেবল ঘুমুতেই দেখ। যাও বিরক্ত কর না। একটু কেবল গড়িয়ে নিচ্ছি, তাও তোমার সহ্য হচ্ছে না—এই তো?

কৈফিয়ৎ দেবার সময় অশোকের অসহায় মুখটার যা অবস্থা দাঁড়ায়···দেখে না হেসে পারে না মাধবী।

আজকের কথাটা অবশ্য আলাদা। পুজোর দিন বলে একটু নতুনত্বের নেশা পেয়ে বসেছিল মাধবীকে। অনেক সাধ্য-সাধনা করে অশোকের মত করিয়ে দু'জনে সিনেমা দেখে রাত করেই বাড়ি ফিরেছে। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিতে ছাদে এসেছিল ওরা। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও কথাটা ভোলে নি অশোক। ঐ আর এক মস্ত ছেলেমানুষি। খেয়ালটা একবার উঠলেই হল। তখন ওকে সামলান দায় হয়ে দাঁড়ায় মাধবীর। যেন কিছুতেই নিবৃত্ত করা যায় না অশোককে। নানান কথা দিয়ে অন্যমনস্ক করে তোলবার চেষ্টা করে মাধবী। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। ভালও লাগে মাধবীর। অপলক বিস্ময়ে অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে মাধবী। যে মানুষটাকে পড়ার ঘর থেকে এক মিনিটের জন্যেও হুঁস করিয়ে ঠেলে তুলতে পারে না মাধবী···সেই মানুষ যেন কত বদলে যায় এই সময়টা। চেনাই যায় না অশোককে। নতুন একটা উপন্যাসে হাত দিচ্ছে অশোক। সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক হিসেবে নামও করেছে প্রচুর। তবু নিজের সাধনায় ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর অধ্যবসায় ওর প্রথম প্রচেষ্টার মত আজও তন্ময় করে রাখে অশোককে। রাশি-রাশি বইয়ের মধ্যে যেন ঘুমিয়ে থাকে অশোক। পরখ করে দেখেছে মাধবী···অশোককে তখন নিজের কাছেই কেমন আশ্চর্য অচেনা বলে মনে হয়।

সেই অশোকই ছোট্ট লোভাতুর ছেলের মত ঐ সময়টা নিজের চাহিদায় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে মাধবীকে। অশোককে নিজের আয়ত্তে এমন করে ধরা দিতে দেখলে ভাল না লেগে পারে না মাধবীর। হয় তো ওর চোখেও মাদকতার প্রলম্বিত ছায়া ঘনিয়ে আসে ধীরে ধীরে। প্রজ্বলিত কামনায় তীব্র মৃদু দহন আগুন ধরিয়ে দেয় দেহ-মনের প্রতি তন্ত্রীতে। নিজেকে সামলে নেবের চেষ্টা করে মাধবী। অন্তত সে চেষ্টার ত্রুটি রাখে না ও। তবু সহজে নিষ্কৃতি দিতে চায় না অশোক।

ঠিক সেই সময় অশোকের ঐ অবাধ্য ঘুমটা যেন মহৌষধের মত কাজ করে। কখন যেন একটু একটু করে নিজেকে হারাতে শুরু ক'রে একসময় হঠাৎ কতদূরে তলিয়ে যায় অশোক। অবাক লাগে মাধবীর। কত সহজে পার পাওয়ার একটা অভাবিত স্বস্তি পায় মনে মনে। তবু কেন কে জানে, অতৃপ্তির আলতো একটা ছোঁয়াচ শুষ্ক বিষণ্ণতার ঘন ছায়া চুপিসারে ছড়িয়ে পড়ে মাধবীর মনের কোণে-কোণে।

হাউইয়ের খেলা তখনো ছুটে চলেছে আকাশে-বাতাসে। দেওয়ালির রাত্রি আজ যেন আগুনের অলঙ্কারে নিজের সর্বাঙ্গ সাজিয়ে-গুছিয়ে সচকিত পায়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আকাশময়। দিকচক্রবালের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত মুহুর্মুহু সর্পিল রেখাগুলো ছড়িয়ে পড়ছে দিগভ্রান্তের মত।

আনন্দে দিশাহারার মত হাততালি দিয়ে ওঠে মাধবী—দ্যাখ-দ্যাখ ···কত ফুল···উঃ···কি সুন্দর!

অশোক তবু চেয়ে থাকে মাধবীর দিকে।

কিন্তু তখনো ভ্রূক্ষেপহীনভাবে নিজের উচ্ছ্বাসের জের টেনে চলে মাধবী। ঐ···ঐ পড়ল, পড়ল একটা।···উঃ ফুলগুলো কি সুন্দর সাদা হয়ে যাচ্ছে দ্যাখ···দ্যাখই না।

অশোকের নির্বিকার চোখ দু'টো তখনো কেবল আশ্চর্য স্থির হয়ে রয়েছে মাধবীর চোখের ওপর। মাধবীর ঐ কৌশল যে কখনো কখনো বিরক্তিতে ভরিয়ে তুলতে পারে অশোকের মন-প্রাণকে···এ কথাটাই বা ভাবতে বাকি রাখে কি করে মাধবী ভেবে বিস্ময় ফুটে ওঠে অশোকের চোখে।

শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হল মাধবীকে।—আমার মুখের দিকে কি এত হাঁ করে দেখছ বল ত'?'

প্রত্যুত্তরে পাশ ফিরে শোয় অশোক।

আবার অন্য পথ ধরে মাধবী। অশোকের মত কাছে আসার অদম্য নেশাটা যেন মাধবীকেও পেয়ে বসে ধীরে ধীরে। তাই আতঙ্ক আর ভয়ের মধ্যেই খুঁজে পেতে চায় অশোককে। বলে—এখানেই শুচ্ছ যে বড়। যদি একটা জ্বলন্ত হাউই এসে পড়ে গায়ে। বলা তো যায় না···তখন কি হবে-ভেবে দেখছ?

থাক···তোমায় আর আমার জন্যে ভাবতেই হবে না। মুখ না ঘুরিয়েই উত্তর দেয় অশোক।

অশোকের মনের অভিমানটা যেন মাধবীর মনের আয়নায় স্পষ্ট প্রতিবিম্ব ফেলে এবার।

চুপ করে যায় মাধবী। কেবল একটা শুকনো ঢোক গিলে সামলে নেয় নিজেকে। দায়টা যেন একা মাধবীরই। একটা কিছু অজুহাত পেলেই হল অশোকের।···সব দোষ মাধবীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলেই···নিষ্কৃতি।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করে মাধবী। কথাটা কানে নিচ্ছ না যে বড়। চল···নীচে চল। একটা জ্বলন্ত হাউই এসে পড়তেও তো পারে।

পড়ে পড়ুক···পুড়েই মরব। অশোকের কণ্ঠস্বরে অভিমানের সেই সুর আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।—তবু সে অনেক ভাল···

এবার হো-হো করে হেসে ওঠে মাধবী। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সামলেও নিল নিজেকে। বড্ড অবুঝ। বড্ড অভিমান অশোকের। যদি একটু বোঝবার ক্ষমতা থাকে···অভিমান কি মাধবীর থাকতে নেই। অবুঝ তো ও নিজেও হতে পারত। হলেই বোধ হয় ভাল হত। তবু আবদার করার অজুহাত থাকতো। ●

নিজেকে যেন একটু-একটু করে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করে মাধবী। অনেকক্ষণ চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। ঘন অন্ধকার আকাশের পটভূমিকায় যেন আগুনের মেলা বসে গেছে ততক্ষণে। একটার পর একটা হাউই উঠছে আকাশে। আবার নামছে কোনটা। ভাইনে...বাঁয়ে ওঠা আর নামার নিরন্তর খেলায় যেন মাতাল হয়ে উঠেছে আকাশটা।

এবার অশোকই কথা বলল।—চল নীচে যাই।

প্রথমটা উত্তর দেয় নি মাধবী। তাই আবার বলে উঠল অশোক —কৈ শুনছ না নিজেই ঘুমিয়ে পড়লে!

না। আমি তুমি নই। কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য আনার চেষ্টা করে মাধবী।—কি এমন অন্যায় কথা বলেছিলাম? একটা আগুনের টুকরো এসে যদি পড়ে! বলা তো যায় না।

যত পাগলের প্রলাপ। অবিচলিত প্রজ্ঞার-হাসি হেসে মাধবীর আতঙ্ককে উড়িয়ে দিতে চাইল অশোক। সব যদির উত্তর দেওয়া যায় না।

এবার মুখ খুলল মাধবী—হাসছ যে বড়? কি এমন হাসির কথা হল এটা!

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে—পড়তেও তো পারে। না... ঐ রকম হেসেই উড়িয়ে দিতে পারবে বিপদকে?

এবার মাধবীর দিকে ফিরল অশোক। কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল—ইস...এত ভয়! সংক্ষিপ্ত পরিহাসের মধ্যেই মাধবীর যুক্তিকে উড়িয়ে দিতে চাইল অশোক। তারপর কি ভেবে দু'হাত ওকে নিবিড় করে কাছে টেনে নিতে হাত বাড়াল।...অত যদি ভয়...সরে এস আমার কাছে।

—থাক। কপট অভিমানে অশোকের ব্যগ্র হাতটা সরিয়ে দিল মাধবী।—আমার জন্যেও ভাবতে হবে না।

আরও হয় তো কিছু বলত মাধবী। কিন্তু হঠাৎ বড্ড চমকে উঠেছিল মাধবী। ছাদের একেবারে ধার ঘেঁসে একটা জলন্ত হাউই সাঁ-সাঁ শব্দে বেরিয়ে গেল আকাশের দিকে। সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও। সভয়ে অশোকের আরো একটু কাছে সরে এসেছিল মাধবী। সাঁই-সাঁই শব্দটা হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গিয়ে আলোর ঝরনা ফুটে উঠল আকাশময়। কি তীব্র অথচ মিষ্টি আলো! দুলছে আলোর ফুলকিগুলো। একরাশ ঈষৎ হলুদ কাশের গুচ্ছ যেন হাওয়ায় দুলছে ধীরে ধীরে। কি বিপুল সম্ভাবনায় ভরে রয়েছে আকাশটা। আর ধীর ছন্দে শুভ্রমুক্তার মত আলোর টুকরোগুলো যেন একে একে নিজেকে গেঁথে নিচ্ছে মালার আকারে। নৈকষ্যঘন অন্ধকার আকাশের পটভূমিকায় আলোর মেলা যেন ঘুমের নেশা ধরিয়ে দিল মাধবীর চোখে। চোখ বুজল মাধবী।

যে ভয়টা করেছিল মাধবী সেই আতঙ্কই সত্যি হয়ে দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত। সমস্ত আকাশ-বাতাসকে হঠাৎ সচকিত সন্ত্রস্ত করে একটা জলন্ত হাউই কোথা থেকে উড়ে এসে ঠিক ওদের মাথার ওপর স্থির অচঞ্চল ডানা মেলে থমকে দাঁড়াল। মাধবী অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে। ভীষণ একটা উজ্জ্বল আলোর পিণ্ড অচঞ্চল হাউইয়ের ঠিক মুখটায় যেন জলছে অনির্বাণ শিখার মত। হঠাৎ স্খলিত নক্ষত্রের মত এটা সোজা নেবে আসবে না তো ওদের ওপর! বিহ্বলের মত অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মাধবী। যদি ঠিক ওদের মধ্যেই এসে পড়ে হাউইটা! নিদারুণ একটা অগ্ন্যুৎপাতে জ্বলিয়ে-পুড়িয়ে সব শেষ করে দেবে তা হলে। সভয়ে কেঁপে উঠল মাধবীর দেহটা।

হঠাৎ একটা স্নিগ্ধ ক্ষীণ আলোর রেখা জলন্ত পিণ্ডটা থেকে সোজা বেরিয়ে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল মাধবীর চোখের সামনে। ঘুমের মধ্যেই অনুভব করার চেষ্টা করে মাধবী, স্বপ্ন নয় তো! না; আলোর উত্তাপটা বেশ বুঝতে পারছে মাধবী। স্বপ্ন কি করে হবে। আলোটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও।

কিন্তু কি আশ্চর্য! বিভীষিকার এতটুকু ছায়া পড়ে নি আলোটার কোন অঙ্গে। শুভ্র স্নিগ্ধ মোহময় একটা আস্তরণে মোড়া আলোর রশ্মিটাকে ভাল লাগল মাধবীর। শিশুর অবোধ অসহায় দু'টো সুন্দর ডাগর চোখের মত মিটি মিটি জলছে আলোটা। মুখটা বড্ড চেনা ঠেকে মাধবীর চোখে। কোথায় যেন দেখেছে মুখটা। কোথায়...কোথায়...। আলোর গতির মত দ্রুত ভেবে চলে মাধবী। কেমন যেন সব গুলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে ওর। হাঁা, ঠিক। খুঁজে বার করেছে এতক্ষণে। সেই শিশুটাই। সদ্য দেখা সিনেমার একটা দৃশ্যে ঐ শিশুটার আসন্ন একটা দুর্যোগের সম্ভাবনায় বুক কেঁপে উঠেছিল মাধবীর।

এবার ধীরে ধীরে মনে পড়ে যাচ্ছে সবকিছু। একদল ভীষণ দুর্বৃত্তের ভয়ে জনপদ ফাঁকা করে পালাচ্ছে ভয়ার্ত নরনারী। ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ, পঙ্গু, অথর্ব...কেউ বাদ নেই পালাতে। পাহাড়ের সংকীর্ণ একটা রাস্তা ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে সকলে। ঐ কচি শিশুটা ছিল ওর অসহায় মা'র বুকে। আর কারো দিকে নজর পড়ে না মাধবীর। কেবল অপলকদৃষ্টিতে চেয়েছিল ওই দিকে। আহা...বেচারা! ও জানে না যে-কোন মুহূর্তে কত বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে ওর জীবনে। প্রাণভয়ে ছুটছে ওর মা। আর মা'র বুকের মতই কেঁপে কেঁপে উঠছে শিশুর নিষ্পাপ কুসুম-কোমল দেহটা।

হঠাৎ সেই সংকীর্ণ পথটুকুও দুর্বৃত্তেরা বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিল। প্রচণ্ড কর্ণবিদারক আর্তনাদের মত সে প্রাণঘাতী শব্দটা পাহাড়ের প্রতিটি গিরিকন্দরে প্রতিধ্বনিত হতে হতে আবার মিলিয়েও গেল একসময়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একাকার হয়ে গেল ভীতত্রস্ত মানুষগুলো। শিশুটা যে মা'র কোল থেকে ছিটকে কোথায় মিলিয়ে গেল খুঁজে পায় নি মাধবী। হয় তো বা অনেকের মতই ওর দেহটা রক্তাক্ত বিকৃত হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল শুষ্ক প্রান্তরের বুকে।

আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠছিল মাধবী। ওর খেয়ালই ছিল না নিজের বাহ্যিক অবস্থাটার কথা। হুঁস ফিরে এল অশোকের আতঙ্ক-জড়ান কণ্ঠস্বরে।—মাধবী? মাধবী...। কথার মধ্যেই মাধবীর হিমশীতল হাতটা অন্ধকারের মধ্যে চেপে ধরল অশোক।—কি হল তোমার? শরীর খারাপ করছে না তো?

নিজের অপ্রস্তুত অবস্থাটা বোধ হয় নিজের কাছেই এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। ভুলেই গিয়েছিল মাধবী ও সিনেমা দেখছে বসে বসে। কিন্তু অশোকের কথার উত্তরে একটাও কথা বলতে পারে নি মাধবী। গলাটা তখনো শুকনো হয়েই ছিল। একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় টনটন করছিল ওর হৃদয়টা। তাতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে চেয়েছিল অশোক। তবু মন সাড়া দিতে চায় নি কিছুতেই।

সেই আতঙ্কটা যেন কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না মাধবী।

একে একে সব মনে পড়ে যাচ্ছে মাধবীর। কি গভীর আতঙ্কেই না নিজের চোখ দু'টো বন্ধ করে ফেলেছিল ও। এতক্ষণে খোলা আকাশের গায়ে আবার ভয়ে ভয়ে চোখ ফেরাল মাধবী। কিন্তু সেই স্নিগ্ধ আলোটা? আর যেটা রক্তচক্ষু ঈগলের আতঙ্ক নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে ভয় দেখাতে চেয়েছিল ওকে? চোখের ভুল হল না তো মাধবীর? গভীর অস্বস্তিতে পাশ ফিরতেই শিউরে উঠল মাধবী। সেই আলোটা কত নীচে নেমে এসেছে? ঠিক অশোকের গায়ের ওপর মনে হচ্ছে। হ্যাঁ···ঠিকই। আলোটার উত্তাপে একটু একটু করে জ্বলছে অশোক। একগুচ্ছ শুকনো কাশের দামে আগুন লাগার মত পুট পুট শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে চলেছে অশোকের দেহটা। একটা অজানিত ভয়ের আতঙ্কে ঘুমের মধ্যেই ঠেলা দিল অশোকের গায়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য হয়ে শুয়ে রয়েছে অশোক। কোন ব্যস্ততা নেই···কোন আতঙ্ক নেই, শান্ত বিকারের এতটুকু চিহ্ন নেই ওর দেহে। কিন্তু মাধবীর চোখ এড়াতে পারে নি অশোকের বিকৃত মুখটা। আগুনে অশোকের সুন্দর মুখটা পুড়ে পুড়ে কদাকার হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই অশোকের সর্বদেহ আগুনের জ্বালায় জ্বলছে। তবু কেন মাধবীর কাছে নিজেকে গোপন করতে চেষ্টা করছে অশোক!

গভীর বিরক্তি নিয়েই মাধবীর ডাকে সাড়া দিল অশোক। সেই পুরানো কথাটা এখনো যে যন্ত্রের মত বলে যেতে পারে অশোক, নেই, ভাবতে পারে নি মাধবী। অশোক বলল—থাক। আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। বলেছি তো···এর চেয়ে পুড়ে মরা অনেক ভাল। কথা শেষ করে আবার ও-পাশ ফিরে শুলো অশোক।

এবার প্রাণখোলা কৌতুকের হাসিতে ফেটে পড়তে চাইল মাধবী। বাবা···এত অভিমান অশোকের। হাসির দমকে ফুলে ফুলে উঠল মাধবীর দেহটা। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজেকে সামলে নিল মাধবী। অশোকের কথাটা যেন প্রতিধ্বনিত হতে হতে এতক্ষণে সজোরে এসে ধাক্কা খেল মাধবীর বুকে। কানে আঙুল দিল মাধবী। ছিঃ, এত নিষ্ঠুর, এত নির্মম অভিমান অশোকের! বেশ। আমার জন্যেও তোমায় ভাবতে হবে না। গভীর অভিমানে মাধবী সরিয়ে নিল চোখটা।

তবু আতঙ্কটা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারল না মাধবী। প্রতিটি দণ্ড-পল-মুহূর্ত এক একটি গভীর দুঃস্বপ্নের মত অস্থির করে তুলল ওকে। আবার তাকাল মাধবী। ক্ষীণ আলোটা হঠাৎ বড় হতে হতে সৌরজগতের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত ফেটে চৌচির হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। কর্ণবিদারী ও একটা প্রাণান্তকর শব্দ দিকচক্রবাল মুখরিত করে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল মাধবীর প্রতিটি তন্ত্রীতে।

কিন্তু এবার চোখ বন্ধ করার মত সাহসটুকুও বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছিল মাধবী। নিনিমেষ দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়েই রইল অশোকের দিকে। অশোকের হাত-পা-মুখ জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে আগুনের জঠরে। কেবল একটা মাংসের পিণ্ড তখনো জ্বলছে মাধবীর চোখের সামনে। আগুনের উত্তাপটা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে নিজের গায়েও অনুভব করল মাধবী। সরে যাবে কি না তাও ভাবল কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু সে শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে ও। শত চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে একবিন্দু নড়াতে পারল না মাধবী। একটা আসুরিক শক্তি যেন আষ্টেপিষ্ঠে ধরে রেখেছে ওকে।

ঠিক তাই। যা ভেবেছে? ভাল করে একবার তাকাল মাধবী। অশোকের প্রজ্জ্বলিত দেহটা থেকে দু'টো সুন্দর ডাগর চোখের সেই শিশুটা এখনো তাকিয়ে রয়েছে মাধবীর দিকে। কি মিষ্টি মধুর হাসি হাসছে শিশুটা! মুহূর্তে দেহের সব যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে শিশুটাকে কোলে তুলে নিতে হাত দু'টো বাড়িয়ে দিল মাধবী। কিন্তু কোথায় যেন হঠাৎ ঠোক্কর খেল মাধবীর হাতদু'টো। চমকে উঠে সপ্রশ্ন-দৃষ্টি মেলে দিল মাধবী। বদলে যাচ্ছে শিশুটা ধীরে ধীরে, চোখের সামনে বদলে যাচ্ছে অনিন্দ্যসুন্দর শিশুর আকৃতিটা। তার জায়গায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটা বিভৎদর্শন মুখ। আগুনে পোড়া মুখটা চেনা যাচ্ছে না একটুও। প্রকাণ্ড একটা মাথার নীচে জ্বলন্ত হিংস্র দু'টো চোখ বড় হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। ওর দিকে এগিয়ে আসছে শিশুটা। হাত-পা বিহীন শিশুটা একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ওরই দিকে। সভয়ে নিজের হাত দু'টো একটু গুটিয়ে নিল মাধবী! এবার পালাতেই হবে ওকে। যেমন করেই হোক শেষ প্রচেষ্টার জন্যে ওকে যে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র। নিজের জিভটা বোলাচ্ছে ঠোঁটের ওপর। কেঁচোর মত দেহের পেছনের অংশটা চালনা করে এগিয়ে আসার কৌশলটা ওর মধ্যেই আয়ত্ত করেছে বিভৎদর্শন শিশুটা! গা ঘিন-ঘিন করে ওঠে মাধবীর। ওর অশুচিস্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাতেই হবে।

একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে মাধবীর তন্দ্রাচ্ছন্ন দেহটা এতক্ষণে নিদ্রার অতল অন্ত থেকে ভেসে উঠল ধীরে ধীরে। অশোকের উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল।—মাধবী!···মাধবী···!

চোখ খুলল মাধবী। অশোকের উদ্বিগ্ন চোখ দু'টো সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে স্থির হয়ে রয়েছে ওর আতঙ্কজড়িত চোখ দু'টোর ওপর। আকাশ-বাতাস এতক্ষণে আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেছে। জ্বলন্ত হাউইয়ের আকাশময় সচকিত দাপাদাপি কখন শেষ হয়ে গেছে তাই বা কে জানে! শ্রান্ত ক্লান্ত আকাশটা কেবল বিষণ্ণতার কালিমা মেখে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে অজগরের মত। কেবল একটা উজ্জ্বল তারা এখনো স্পষ্ট জ্বলজ্বল করছে মাথার ওপর। অশোকের মুখের পাশ দিয়েই মাধবী দেখতে পাচ্ছে তারাটাকে। যেন নিজের স্নিগ্ধ আলোর ছায়া বুলিয়ে মাধবীর দেহমন জুড়িয়ে দিতে চাইছে।

কিন্তু তারাটা যদি হঠাৎ স্খলিত স্ফুলিঙ্গের মত নক্ষত্রগতিতে আবার ভেঙে পড়ে ওদের মধ্যে। কে জানে স্বপ্নের আতঙ্কটাকে যেন কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। তাই অশোকের বুকে মুখ লুকিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভর হতে চাইল মাধবী। গভীর আবেগে মাধবীকে নিজের আরো কাছে টেনে নিল অশোক। আর কেউ ওকে ছুঁতে পারবে না, কিছুতেই নয়। সেই বিকৃত শিশুটার অশুচি স্পর্শ ওকে আর কোনদিন ভয় দেখাতে পারবে না।

এতক্ষণে হাসি পায় মাধবীর। প্রথম সাহসের জোয়ার একটু একটু করে ছেয়ে ফেলছে ওর দেহ-মনে। উজ্জ্বল তারাটা নিশ্চয়ই

এখনো তার স্নিগ্ধ আলোর মধ্যেই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অদম্য কৌতূহলে অশোকের বুক থেকে মাথা তুলে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে দেখল মাধবী। ঠিক···তাই। যেন ওরই দিক তাকিয়ে এখনো অদম্য কৌতুকের-হাসিতে ভেঙ্গে পড়ছে তারাটা। মিটি-মিটি চোখ দু'টোর আলোর ইশারার ভাষা বুঝতে আর ভুল হবে না মাধবীর। নিজের মনেই হেসে ফেলে আবার। লজ্জায় আরক্তিম মুখটা অশোকের বুকের মধ্যেই লুকিয়ে ফেলে মাধবী।

বিজয়িনী

শ্রীমতী হাসি গঙ্গোপাধ্যায়

শ্যামল বনানী খুঁজে মরি যবে
পাই শুধু মরীচিকা,
সরসতা যবে খুঁজি মাটি মাঝে
মিলে আগুনেরি শিখা।

পরাণ খুলিয়া যারে ভালবাসি
দেয় সে ঠেলিয়া দূরে,
কৃতজ্ঞতা জানায়েছি যারে
ব্যঙ্গ করেছে সুরে।

লক্ষ্মীর আসনে বসায়েছি যারে
করেছে লক্ষ্মীছাড়া,
গৃহনির্মাণ করিনু যাহার
সে করিল গৃহহারা।

পঙ্ক হইতে তুলিনু যাহারে
দিল সে পঙ্কে ফেলে,
দুঃখীর দুঃখে ব্যথা জানাইলে
গিয়াছে সে অবহেলে।

যারে সাজাইতে সুন্দর ফুল
এনেছি আঁচল ভরে,
বক্র হাসিয়া বলেছে, ছুঁয়ো না,
যাও গো হোথায় সরে।

দেবতারে যবে বলেছি তুলিতে
সে ফেলিয়া দিল নীচে,
বলেছে আমারে, এ ছিল না তব,
এ ভকতি তব মিছে।

লাঞ্ছিতা মোরে, দিল লাঞ্ছনা
সুরলোক ইহলোক,
তাই তো প্রমোদে নাহি অনুভূতি,
দুঃখেও নাহি শোক।

কঠোর আজিকে যদি কেহ থাক
এস গো আমার কাছে,
দেখ আজ মাপি, কঠোরতা বেশি
তোমা হ'তে মোর আছে।

আরণ্যক

ডলি চট্টোপাধ্যায়

ঘাটের সিঁড়িটা দিয়ে তর তর ক'রে নেমে এলো পাতা, পুকুরের শেষ ধাপটায়। যেটা জলে ডুবে সবুজ শ্যাওলায় পেছল হ'য়ে র'য়েছে। পা টিপে টিপে নামতে হয়। পা টিপে টিপেই নামল পাতা। কাঁখের ঝকঝকে মাজা পেতলের কলসীটা আর গামছাখানা ওপরের সিঁড়ির ওপর রাখল।

একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে নিলে কেউ কোথাও আছে কি না। না কেউ কোথাও নেই।

সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে। শুধু পুকুরের সিঁড়ির ওপরের চাতালের পাশে বড় টগরগাছটার সাদা ফুলের চারপাশে দু'টো প্রজাপতি ঘুর ঘুর ক'রছে। এবার পাতা সামনের দিকে চেয়ে একটু হাসল।

দূরে পুকুরের ওদিকের ঘাটটা পুরুষদের। সেখানে সাতাশ-আটাশ বছরের একটি দোহারা বলিষ্ঠ চেহারার ছেলে একমাথা কালো কোঁকড়া চুলের নীচে মিষ্টি একখানা মুখ নিয়ে বসে মাছ ধ'রছিল।

সে এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে ফাৎনাটার দিকেই চেয়েছিল। এখন ফাৎনাটা ডুবে গিয়েছে, হুইলের সুতোয় টান পড়ছে, সেদিকে ওর খেয়াল নেই। পাতা আসতে কি ক'রে বুঝতে পেরেছে জানি না।—ও পাতাকেই দেখছে।

পাতার বয়স বছর বাইশ। শ্যামল চিক্কণ দেহটি থেকে যৌবন উপছে পড়ছে। ঢেউখেলান কালো চুলের মস্ত একটা খোঁপা। ডাগর চোখে দুষ্টু মিমাখা চঞ্চল চাউনি।

পাতা জলে নেমেছে। পাতাকে ঘিরে ছোট ছোট ঢেউগুলো বৃত্তাকারে বড় হ'য়ে হ'য়ে আবার জলের বুকেই মিলিয়ে যাচ্ছে। সবুজ কাচের চুড়িপরা নিটোল দু'খানি হাতে পাতা জল সরিয়ে সরিয়ে খেলা করলো। জলের ওপর একটা জল-ফড়িং লাফাচ্ছিলো, সেটাকে জল ছিটিয়ে তাড়িয়ে দিলে।

পুকুরের ঠাণ্ডা কালো জলে মুখখানাকে একবার ডোবালো। গা ডুবিয়ে মাথার কাপড়টা খুলে জলে ভিজিয়ে নিলে। তারপর কলসীটা টেনে নিয়ে বুকে চেপে আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে ছেলেটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

তখন গোধূলির লাল আভা নারকেল-বীথির ঝিলমিলে সবুজ পাতা থেকে ছায়া ছায়া সন্ধ্যের বুকে মিশে যাচ্ছে।

সাঁতারকাটা পাতার নরম শরীরের চাপে পুকুরের বুকে ছোট ছোট ঢেউ উঠে তীরের ওপর ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। তারই ওপর নারকেল গাছের কালো কালো ছায়াগুলো থর-থর ক'রে কাঁপছে।

সব শান্ত। সব স্তব্ধ।

কেবল পাখিরা একটি দু'টি ক'রে নীড়ে ফিরে আসছে—তাদের কূজন শোনা যাচ্ছে।

ছেলেটির কাছাকাছি এগিয়ে এলো পাতা। দু'জনের চোখের ভাষায় ক'টি নীরব মুহূর্ত কি যেন কথা কইলো।

একটু পরে ছেলেটি বললে—বাড়ি যাও পাতা, সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে।

পাতা ছেলেটির শূন্য বেতের খারুইটার দিকে চেয়ে তার সুন্দর দাঁতের হাসিটাকে চেপে রাখতে পারল না। খিল খিল করে হেসে বললে—তোমার চারে আজ একটা মাছও পড়ে নি?

ছেলেটি হেসে বললে—খুব বড় একটা পড়েছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না।

ভেতরের অর্থটা বুঝতে পেরে পাতার মুখটা লালচে হ'য়ে উঠল। মুখখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ওর দিকে আড়চোখে একটা ঝিলিক দিয়ে বললে—ছাই পড়েছে। তারপর বললে—আমি যাই। তুমি এসো, কেমন?

ছেলেটি বললে আসব।

আধাশহর—গ্রামটার নাম রাজীবনগর।

ওখানেই থাকে বুড়ো মহিম দাস, শীর্ণ হাঁপানি রুগী। গলায় কণ্ঠি। তারই বাইশ বছরের বৌ পাতা।

এ অঘটনটা যে কি ক'রে ঘটল তা কেউ জানে না।

লোকে কানাকানি করে: বৌ-ফৌ নয় হে সেবাদাসী।

আবার কেউ কেউ বলে—মহিম দাস ওকে নাকি অনেক গণ্ডা টাকায় কিনেছে।

পাতাকে জিজ্ঞাসা করলে হাসে, উত্তর দেয় না।

ওরা অন্য গ্রাম থেকে এ গ্রামে এসে বাসা বেঁধেছিল।

কথাগুলো পাতারও কানে যায়। এক একদিন ও স্নান করে উঠে ছোট্ট করে নাকে রসকলি কাটে। সরু ভ্রূ দু'টোর মাঝখানে ছোট্ট করে একটা চন্দনের টিপ দেয়। ঘর থেকে হাত-আয়নাখানা বার ক'রে এনে মুখখানাকে ঘুরিয়ে দেখে আর টিপে টিপে হাসে। তারপর আয়না রেখে কাজে যায়।

পাতারা ছোট জাত। তাই কারো ঘরে-দোরে ঢুকতে পায় না···

পাতা পাঁচবাড়ির কাজ বাইরে বাইরেই করে—বাসন মাজে, উঠোন নিকোয়···তাতে মাইনে বেশি নেই। একবাড়ি দু'বেলা দু'টি খেতে দেয়। পাতা খায় না, সেই ভাত ক'টি সে বাড়ি আনে। আর তারই অর্ধেক বুড়ো মহিম দাসকে খাইয়ে নিজে বাকিটুকু খায়।

স্টেশনের দিকে আমবাগানের মধ্যে ছোট্ট নিকোন কুঁড়েটুকু পাতার। নিকোন ছোট্ট উঠোন। তারই একপাশে একটা লাউমাচা। মাচার তলায় লঙ্কাগাছ, পাতার নিজের হাতে পোঁতা। আর একপাশে একটা শিউলিফুলের গাছ। কে জানে কে কবে পুঁতেছিল। অজস্র শিউলিফুলে তলাটা সাদা হয়ে থাকে। মিষ্টিগন্ধ হাওয়ায়·····

হাঁপানি রুগী মহিম দাস পাতার সাজা তামাক হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে টানে। তারপর পাতার হাত ধরে গিয়ে ছোট্ট একটা তক্তপোষে পাতার তৈরি কাঁথাটার ওপর চুপ করে শুয়ে ঝিমোয়।

পাঁচবাড়ির কাজ সেরে একদিন সন্ধ্যের একটু আগেই বোসেদের পুকুরে গা ধুতে এসেছিল পাতা। বর্ষার আকাশে তখন পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের অভিসার—এলোমেলো বাতাসে বৃষ্টির কণা।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেই রজনী আপন মনে মাছ ধরছিল। আপন মনেই ফাৎনাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর কখন আপনা হ'তেই ওর চোখ দু'টো গিয়ে মেয়েদের ঘাটের দিকে পড়েছিল। সেদিন আর তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিতে পারে নি রজনী। ইল্‌শে গুঁড়ি বৃষ্টির আবছা ছায়ায়, আসন্ন সন্ধ্যার নিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে উচ্ছল-যৌবনা পাতা তখন ভিজে-কাপড়ে জল থেকে উঠে ভরা-কলসীটা কাঁখে নিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

কি মনে করে পাতাও আর একবার পেছন ফিরে চাইল। দু'টি মুগ্ধদৃষ্টি দেখল আর দু'টি কালো চোখের মুগ্ধদৃষ্টি।

ও অমূল্য দাসের ভাই রজনী। রজনী কাপড়ের দোকানে কাজ করে। মাছধরা রজনীর নেশা। আগে ও হালদার পুকুরেই মাছ ধ'রতো, পুকুরটা ছোট। ভাল মাছ পড়ে না। তাই এখন রজনী বোসেদের বড় পুকুরেই মাছ ধরে।

প্রতিদিন রজনীর মাছ ধরা—আর সেই সময়ে পাতার গা ধোয়ার ছল। সন্ধ্যে হয়ে আসে ঘাটে তখন লোক থাকে না। যদি কেউ কদাচিৎ থাকে তো এপারে পাতা ঘোমটা টেনে, ধীর মন্থর পায়ে জল-ভরা কলসী নিয়ে ঘরে ফিরে যায়।

ওপারে রজনী তার সমস্ত মনটা ফাৎনাটার ওপর ঢেলে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। যেন কেউ কাউকে চেনে না।

দোকানের কাজ সেরে রজনী সেদিন বাড়ি এসে দেখলো অমূল্য খেয়ে-দেয়ে তখনও ঘুমোয় নি। দাওয়ায় পিঠ রেখে বসে বসে বিড়ি টানছে। অমূল্যর কালো ষণ্ডামার্কা চেহারা। নেশাভাঙ না ক'রলেও চোখ দু'টো সব সময় লালচে। গলার আওয়াজটা রূঢ়। অমূল্য আড়তে কাজ করে, খাটা-খাটুনী বেশি। তাই ও অন্যদিন একটু তাড়াতাড়িই খেয়ে শুয়ে পড়ে।

পাশের চালাটায় রান্না হয়। রজনী হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসলো। অমূল্যর বৌ দেওরের ভাত ঢেকে রেখে ঘুমোয়।

বৌটার রোগাটে কালো চেহারা। ছেলেমেয়ে হয় নি, সেইজন্যেই বোধ হয় মনটা রুক্ষ, মেজাজী। রাগ হলে অমূল্যকে গাল দিয়ে সাত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়ে। পাড়ায় দুধ জোগান দেয়।

অমূল্য আর রজনী মারামারি করলো কি গলা ধরাধরি করলো কিছু আসে যায় না ওর।

রজনী খেয়ে এলে অমূল্য ডাকলো, রেজো।

রজনী বললে—কি?

কড়া গলায় অমূল্য বললো,—রোজ রাতে তুই কোথায় যাস? চুরি করতে না ডাকাতি করতে?

রজনী বললো,—কে দেখেছে?

চাপা গর্জনে অমূল্য বললো,—আমি দেখেছি। বল কোথায় যাস?

রজনী রেগে উঠে বললে,—যেখানেই যাই না সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

ধক্ করে অমূল্যর চোখ দু'টো জ্বলে উঠল। বললে, আলবৎ দরকার আছে। তুই মহিম দাসের ঘরে যাস।

ক্রুদ্ধ রজনী বললে, বেশ করি, যাই তো যাই তাতে তোমার কি?

একটা গোপন ঈর্ষায় অমূল্যর চোখ দু'টো হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্বলতে লাগলো। বললে, আমার কি? আচ্ছা দেখিয়ে দেব আমার কি?

রজনী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বললে,—যাও যাও ঢের দেখেছি।

রজনীর অপসৃয়মান দেহের দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘসে অমূল্য একটা অস্ফুট শব্দ করলে।

অমূল্যদের আড়তের সামনে দিয়েই পাতাকে রোজ বাজে যেতে হয়। অমূল্য ওৎ পেতে থাকে। পাতা অমূল্যর সামনে পড়ে যায়।

পাতার সমস্ত দেহটা অমূল্য একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি দিয়ে যেন লেহন করে মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে নেকড়ের মতো হাসে। আর সঙ্গে সঙ্গে পাতার কালো চঞ্চল চোখের তারায় যে ঘৃণা ও অবজ্ঞা ফুটে ওঠে, অমূল্যর মনে হয় তার আঘাত বুঝি চাবুকের চেয়েও বেশি।

পাতা যেন একটা ক্ষুধার্ত পশুর সামনে থেকে দ্রুতপদে ছায়াঘন পল্লীপথে পালিয়ে যায়।

আর লালচে চোখ দু'টো অমূল্যর আরও লাল হয়ে ওঠে। নিষ্ফল আক্রোশে অমূল্য ফুলে ফুলে ওঠে।

পাতা জানে রাতের কোন ট্রেনটার শব্দ মিলিয়ে যাবার কতক্ষণ পরে রজনী আসবে।

ঘরে ঘরে প্রদীপ নিভে যায়। সারা পাড়া নিশুতি। পাতা পথ চেয়ে দাওয়ায় বসে থাকে তারা-ছিটোন রাতের নরম অন্ধকারে।

রজনী এলে ওরা পড়শীদের কান বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে হাসে গল্প করে। বুড়ো মহিম দাস ঘুমোয়।

পাতার হাতটা সজোরে চেপে ধরে রজনী বলে, চলো পাতা আমরা এখান থেকে অনেক—অনেক দূরে চলে যাই। যেখানে আমাদের কেউ খুঁজে পাবে না।

হাতটা ছাড়িয়ে নেয় না পাতা। সরু জ্র দু'টো একটু বেঁকিয়ে বলে, যাঃ পালাবো কেন? তারপর ওর চোখের চঞ্চল তারা দু'টো কেমন মমতায় মন্থর হয়ে আসে, একটু হেসে বলে, আমার বুড়োকে খাওয়াবে কে?

পাতাকে কাছে টেনে নিয়ে রজনী বলে, কিন্তু দাদা জানে আমি এখানে চুপি চুপি আসি। রাত করে বাড়ি ফিরি। দাদা রোজ গালাগালি করে। বলে মেরে খুন করে ফেলবো তোদের। ফাঁসি যেতে হয় সেও ভি আচ্ছা।

পাতা আরও কাছে সরে এসে হেসে বলে, দিক না গালাগালি। আমার জন্যে একটু গালাগালি সইতে পারবে না তুমি?

রজনী বলে, কিন্তু আমার ভয় করে পাতা। দাদা যা গোঁয়ার, একদিন না কিছু কাণ্ড করে বসে।

পাতা বলে, ধেৎ ও তোমার মিথ্যে ভয়। কি করবে কি?

ঘন গাছের পাতায় পাতায় হাওয়া লেগে শির-শির শব্দ ওঠে।

বুড়ো মহিম দাসের নাক ডাকার শব্দ আসে।

পাতা হেসে রজনীর কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলে—বা বাঃ!

পাতার নিবিড় স্পর্শে রজনীরও বুঝি মুছে যায় রাতের ভয়। মুছে যায় দিনের গোপনতা। পাতার পিঠে হাত বুলিয়ে রজনী বলে, তুমি বড্ড দুষ্ট পাতা।

কিন্তু মিথ্যে ভয় করে নি রজনী।

রজনীর দাদা অমূল্য দাস সত্যিই একদিন একটা কাণ্ড করে বসলো।

ঘরে-ঘরে প্রদীপ নিভে গিয়ে পাড়াটা যখন নিশুতি হয়ে গিয়েছিল। পাতা আর রজনী যখন ভুলে গিয়েছিল দুনিয়ার একটুকরো জায়গা ওদের জন্যে কোথাও নেই। ওদের গল্প যখন আবেশ-ছড়ানো চাপা গলায় মুখর হয়ে উঠেছিল। দু'টি হাসি-মাখা অধরের কোমল স্পর্শে রজনী যখন ভুলে গিয়েছিল রাত হ'য়ে যাচ্ছে। আর পাতা ওর হাত দু'খানা ধরে মিষ্টি সুরের কথায় কথায় রাতের নিভৃতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে হেসে উঠছিল।

ঠিক সেই সময়টিতেই আমগাছের আড়ালে-আড়ালে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে একটা হিংস্রমূর্তি আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল।

দু'টি হারিয়ে-যাওয়া মন বুঝি সেটা লক্ষ্য করে নি।

আচমকা হঠাৎ একটা পেতলের ভারি ঘটি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পাতার মাথার সজোরে এসে আছড়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে পাতা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

মাথা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো।

আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় রজনী চিৎকার ক'রে উঠলো,—মেরে ফেললে, মেরে ফেললে।

মুহূর্তে রাতের অন্ধকার খান্ খান্ হ'য়ে গেল।

নিশুতি পাড়ার ঘুম ছুটে গেল।

দলে দলে লোক ছুটে আসতে লাগল।

কি সর্বনাশ, কি ক'রে হ'ল?

কে মারলো?

পালালো কোথায় লোকটা?

মারলো কেন? মেয়েটা মরে গেছে নাকি?

একটা গোলমাল, একটা হৈ-চৈ।

ছি-ছি রাত দুপুরে পাড়ার মধ্যে এ কি ভয়ানক কাণ্ড?

ভিড়টা যেন ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠতে লাগলো।

স্পষ্ট কিছু না বুঝলেও এর মধ্যে গণ্ডগোল একটা আছে লোকে আন্দাজ করে। বক্রোক্তি, সমালোচনা, হৈ-চৈ আর চেঁচামেচির মধ্যে কখন বুড়ো মহিম দাস কাঁপতে-কাঁপতে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ দেখলো না।

ছোকরার দল এগিয়ে এসে পাতার অচৈতন্য দেহটা ওখানকারই একজন বড় নামকরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে এলো।

অমূল্য দাস তখন ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়েছে।

অনেক চেষ্টা করলেন ডাক্তার মুখার্জি।

ওপাড়া থেকে এপাড়ায় আনতে আনতে পাতার শাড়িটা রক্তে ভিজে লাল হ'য়ে গিয়েছে।

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, অত্যন্ত রক্তক্ষরণ হয়েছে, তা ছাড়া মাথায় দারুণ চোট লেগেছে, যদি বেঁচেও যায় তো স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলবে হয় তো।

কিন্তু বাঁচলো না পাতা। হয় তো স্মৃতিশক্তি হারিয়ে বেঁচে থাকার কোন মূল্য নেই বলেই।

সমস্ত ঘরটায় একটা বেদনাহত নীরবতা নিথর-নিষ্প্রভ।

কতক্ষণ পরে পাতার মৃতদেহের দিকে চেয়ে ডাক্তারের মৃদুগম্ভীর বিষণ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল—পুওর গার্ল—।

পাতার বেডের পাশেই রজনী স্তব্ধ পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ডাক্তারের গলার শব্দেই যেন সম্বিৎ পেয়ে একবার আস্তে আস্তে পাতার মৃত পাণ্ডুর মুখখানাতে হাত বোলাল। ছোট কপালটার পাশে রক্তের সঙ্গে একথোকা চূর্ণ-কুন্তল জড়িয়ে আছে।

রজনীর মনে হ'ল, কানের কাছে কে যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে বলছে, ও তোমার মিথ্যে ভয়।

তারপর কখন এক সময় রজনীর বলিষ্ঠ দেহটা ধীরে ধীরে তন্দ্রাহত রাত্রির নিকষ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মাদার ম্যাথিল্ডার ডেস্কের একপাশে ফাইলটা রয়েছে। হাসপাতালের রিপোর্ট, রোগী ভর্তি আর ছাড়ার রিসংখ্যান—সে সব কাগজ-পত্রের স্তূপের ওপরে—অর্থাৎ অদরকারী ব কথাই পরে হবে।

আশীষ জানিয়ে আলিংগন করলেন তাকে।

তারপর কাঁধ দু'টো ধরে বললেন, তোমার কথা যে কি রকম নে হত মাই চাইল্ড, বিশেষত সেই কেব্‌লটা পাবার পর। কত অন্তরংগ ছিলে তুমি সিস্টার অরেলির, আমি তো জানি! তাই অনুভব রতে পেরেছিলাম কত কষ্ট তোমার হয়েছে ভগবানের এমন বিধান মেনে নিতে।

কাঁধ ছেড়ে দিয়ে নিজের চেয়ারে ফির গিয়ে বসলেন।

—তারপর ফিরে এসে তোমাকে দেখেও বুঝলাম তা। অনেক রোগা হয়ে গেছ—খাবার ঘরে প্রথম দেখে সত্যি বলতে কি চিনতেই পারি নি আমি, এমন কষ্টের ছাপ পড়েছে তোমার চেহারায়।

সুপিরিয়র থামলেন, উদ্বেগ-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাইলেন তার দিকে।

—আমি চলে যাবার পর আর তোমার স্পুটাম টেস্ট করেছ কি না ল তো আমায় সিস্টার।

—না মাই মাদার। এত কাজ ছিল, সময় পাই নি। আর আসল কথা কিছু দরকারও মনে করি নি। স্মিত হেসে আশ্বাস দিল। ··নিজেকে আমার এত শক্তিশালী মনে হয় মাই মাদার—আপনি আমাদের জানালেন একজন সহকারী আসছে জাহাজে এখন যেন আমার কাছে সে প্রয়োজনটাও তুচ্ছ হয়ে গেছে।

কণ্ঠে দৃঢ়তার সুর বাজল। তার আত্মার উদ্বিগ্ন প্রহরীকে তাঁরই নীতিটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যেন—সিস্টারদের সহজ পথে চলার প্রেরণা যোগাতে যে নীতিবাক্যটা প্রায় ব্যবহার করেন তিনি। 'স্বাস্থ্যবান আত্মার আবাসস্থলরূপে স্বাস্থ্যবান দেহ প্রয়োজন।'

মাদার ম্যাথিল্ডা মাথাটা নাড়লেন একটু, অর্থাৎ সে বলে যেতে পারে।

মহড়া দেওয়াই ছিল, কথা খুঁজতে হ'ল না। বরং কথাগুলো যেন সাগ্রহে বেরিয়ে এল ভিতর থেকে, একরকম কোন বাধা না মেনেই। অর্ধেক বক্তব্য পেশ করার আগেই জানতে পেরেছে সুপিরিয়রের মুখে যে উদ্বেগ সহ্য করতে পারে না সে, সেই উদ্বেগের ছায়াটা এবার সরে যাচ্ছে। মাদার ম্যাথিল্ডার ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি খেলা করছে, সানন্দ বিস্ময়ের স্বাভাবিক প্রকাশ ভ্রূ দু'টো টান-টান। নিজের গলার চড়া সুরটা কানে যাচ্ছে, তবু তাকে খাদে নামিয়ে আনার চেষ্টা করে নি। যা বলছে তার মধ্যে আত্ম-প্রবঞ্চনা নেই, অতিভাষণ নেই, নিজের সম্বন্ধে বিকৃত কোন উচ্চধারণাও নেই। অন্তরে যে শক্তি দ্বিতীয় একটা অস্থিমজ্জার কাঠামোর মত বাস্তব হয়ে আছে, তার মধ্যে এ শুধু তাকেই বাইরে তুলে ধরামাত্র।

—একবার পিছু হটে এলে আবার এগোবার সময় যে শক্তি পাওয়া যায় সেইরকম একটা কিছু মাই মাদার···আপনাকে বলবার জন্যে এত ব্যগ্র হয়েছিলাম আমি!

কথা শেষ হয়ে গেছে, মাদার ম্যাথিল্ডার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসিটুকু লেগে আছে তবু। বেলজিয়ামের ঠাণ্ডা তাঁর মুখের মত হাতের শুভ্রতাও ফিরিয়ে দিয়েছে—ক্রুশিফিক্সের ওপর শুভ্রতর দেখাচ্ছে ডান হাতখানা। ক্রুশিফিক্সের কালো কাঠে হাতটা বোলাচ্ছেন ধীরে ধীরে, দৃঢ়তা ও অভীষ্টসাধনের অভিব্যক্তি তাতে।

—যা বললে আমায় সিস্টার, বিস্ময়ে অভিভূত আমি! অনুচ্চ কণ্ঠস্বর ঈষৎ উত্তেজনায় কাঁপছে মাদার ম্যাথিল্ডার।—এর থেকে বোঝা যাচ্ছে তোমায় যে কথা বলতে যাচ্ছি প্রভু নিজেই সেজন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন তোমায়। তাঁর চরণে ফিরে দিতে অদ্ভুতভাবে সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যায়।

এ্যাংগলবার্টের ফাইলটা তুলে নিলেন।

—ফেরার পথে প্লেনে সারাক্ষণ এই কেসটার কথা ভেবেছি আমি। মঁসিয়ে এ্যাংগলবার্টের আত্মীয়রা কয়েকবারই মাদার হাউসে এসেছিলেন—ওঁকে দেশে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছিলেন সবাই। তারপর গতকাল ডক্টরও সেই একই অনুরোধ করলেন, আত্মীয়দের চেয়েও জরুরী তাগিদ তাঁর। স্মিত হেসে ঝুঁকে বসলেন সামনে।—কাল সারা সন্ধ্যা আমি ভেবেছি সিস্টার কি করে তোমায় বলব এই কেসটার সঙ্গে তোমাকে বেলজিয়ামে ফেরৎ

পাঠাতেই হবে আমায়। মিশনে তোমার আসক্তি যে কতখানি আমি জানি, কিন্তু সাইকিয়াট্রিতে ব্যুৎপন্ন একা তুমিই আছ—
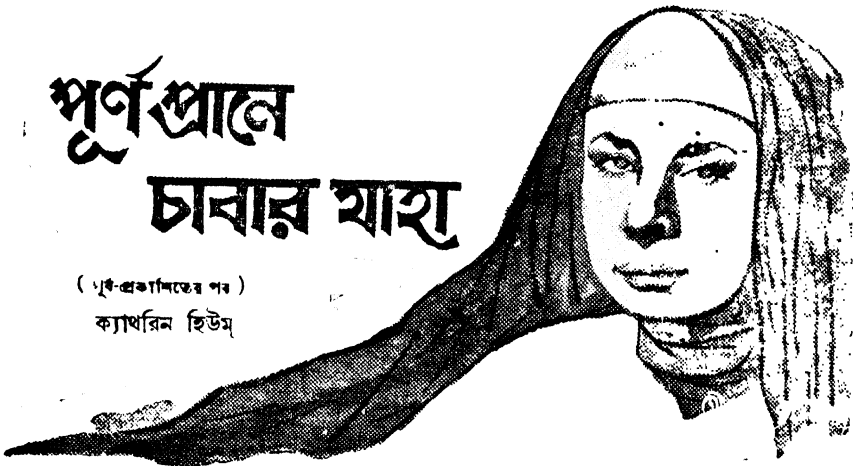
বেলজিয়ামে ফেরং পাঠাতেই হবে তাকে···সিস্টার লুক দৃষ্টিটা আর সরায় নি মাদার ম্যাথিল্ডার মুখের ওপর থেকে। শক্তিমান এক একাগ্রদৃষ্টি তার হৃদয়-গভীরে প্রবেশ করে দেখছে আর এদিকে স্বাভাবিক নার্সসুলভ অনুচ্চকণ্ঠে কথা বলে চলেছে। সমস্যাটাও সেবাসংক্রান্ত।

—আর এক তোমার ওপরই এ দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি আমি। কলোনিতে এই একটি মানুষের গুরুত্ব তোমার অজানা নয়, তাঁর মানসিক অসুস্থতা আর না বাড়ে তার ব্যবস্থা করা কতটা জরুরী তুমি তা ভালই জান। লক্ষণ যা দেখা যাচ্ছে যত তাড়াতাড়ি কোন স্যানাটোরিয়ামে নিতে পারা যায় ততই মঙ্গল, চিকিৎসার সময় পেরিয়ে গেলে কিছুরই কোন মূল্য থাকবে না।

সুপিরিয়র থামলেন।

এবার তার কথা বলার পালা। দেখাতে হবে যে মনটাকে তিনি অপলকনেত্রে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন, সেটাও তার দেহের মতই অচঞ্চল আছে।

জিজ্ঞাসা করল, আর ডক্টর? প্রশ্নের বাকি অংশটুকু উহ্যই রইল,—তিনি কি করবেন?

—তোমার নাম প্রস্তাব করে ডাঃ ফরচুনাটি কাজটা আমার পক্ষে সহজ করে দিয়েছেন সিস্টার। তুমি চলে যাবার পর ওঁর অনেক দিনের পাওনা ছুটিটা নিয়ে নেবেন বলছেন। ওঁর অ্যাসিস্টেণ্ট ডাঃ পিটারস্কে দেবেন তাঁর বদলিতে জরুরী সার্জারি কেসগুলোয় কাজ করতে। আর বড় বড় সার্জারি কেসগুলো সব খনির ডাক্তারদের দিয়ে করাবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

মাদার ম্যাথিল্ডা একটু থেমে হাল্কা সুরে আবার বললেন, আমি তো ভাবছি ভালই হল। প্রথম থেকে ঐ কাজ-পাগল প্রতিভাবানটির সামনে সবসময় তটস্থ হয়ে থাকতে না হলে তোমার পর যে আসবে আরও সহজে সব কাজ নিয়ে নিতে পারবে সে।

···তোমার পর···তোমার উত্তরাধিকারিণী।

···উত্তরাধিকারিণী···একজনের পর তার জায়গায় আর একজন নেয় যখন তাকে বলে—

—মাই মাদার···সিস্টার লুক কি বলতে গিয়ে ইতস্তত করে থামল।

—বল সিস্টার? সুপিরিয়রের স্মিতহাসিতে বরাভয়।

—আমি কি···ওঁরা কি···এখানে ফিরিয়ে দেবেন আমায়! আপনার কি মনে হয়?

মাদার ম্যাথিল্ডার কালো চোখে সমবেদনার দ্যুতি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

কণ্ঠস্বরে আভাস নেই তার, গম্ভীর দৃঢ়তায় বললেন, আমি নিশ্চিত জানি যতশীঘ্র সম্ভব মাদার হাউস ফিরিয়ে দেবে তোমায়। আমি উদগ্রীব হয়ে থাকব তোমার ফেরার জন্যে। অবশ্য তোমার ফেরা নির্ভর করবে রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েল তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য কেমন দেখেন, আর ডাক্তার তোমার দৈহিক স্বাস্থ্য কেমন দেখেন তার ওপর। তবে কোনটার রায় নিয়েই আমার চিন্তা নেই—সোজাসুজি হাসলেন কোন আবরণ না রেখে। সত্যিই তুমি যা বললে আমায় তারপর আর কোনটার জন্যেই উদ্বেগ নেই আমার।

কংগো-প্রত্যাবর্তনের আশ্বাসে যে স্বস্তিটুকু আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে সিস্টার লুক বুঝতে পারছে সেটুকু একেবারে স্পষ্টত ধরা পড়ে গেছে। মাদার ম্যাথিল্ডা থামলেন, বুঝি ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বচ্ছন্দ গতিটা শুনতেই, তারপর বলতে লাগলেন আবার।

—জলহাওয়া পরিবর্তনের ছুটির অজুহাতেও দেশে আটকে থাকবে না তুমি। সে সময় এখনও হয় নি। চোখ নামিয়ে এ্যাংগ্লেবার্টের ফাইলটার দিকে তাকালেন। যাই হোক সিস্টার, এ দায়িত্ব যেটুকু পরিবর্তন আনবে তোমার মধ্যে উপকারই হবে তাতে। সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিটা কেটে গিয়ে চোখ দু'টো জ্বলজ্বল্ করছে এখন। যত অল্প সময়ই হোক তুমি একটা সুযোগ পাবে মাদার হাউসের প্রশান্ত পরিবেশে তোমার আত্মিক জীবনটাকে পুনর্বিন্যস্ত করে নেবার। আঃ নীরবতার সেই মরূদ্যান, সন্ন্যাস-জীবনের পবিত্র আবহাওয়ার স্পর্শ পাবে তুমি। নিজের সুখস্মৃতি রোমন্থন করে মাথাটা নাড়লেন।

উজ্জ্বল চোখে চেয়ে বললেন, আমায় বেল্ট যেমন দিয়েছিলে নিজের জন্যেও তেমনি তোমার মেডিক্যাল ব্যাগে ক্যাফাইন নিও নিশ্চয়ই। ক্যাফাইন খেয়েও বেলজিয়ামে সারাক্ষণ আমি থরথর করে কাঁপতাম।

আলোচনার বাকিটুকু নেহাৎ সংক্ষিপ্ত। সিস্টার লুক জানল নতুন সিস্টারকে নিয়ে যে জাহাজ আসছে সেই জাহাজেই তাকে যেতে হবে, প্লেনে যাওয়া তার রোগীর পক্ষে অযথা উত্তেজক হতে পারে। সরকারী খরচে তাকে যাতে পাঠানো যায় সেজন্য ডাক্তার কাগজপত্র তৈরি করছেন। ভেসট্যাকে জানাতে হবে তার পশমের পোশাক দরকার।

হাসপাতালে ফিরে যাবার পথে বাগানটা পেরোবার সময় তার প্রিয় জগতটাকে চারপাশে চেয়ে চেয়ে দেখল সিস্টার লুক। মনের মধ্যে ছাপ তুলে নিচ্ছে যেন, পথিক যেমন যাত্রার প্রাক্কালে রসদ সংগ্রহ করে নেয়। গ্রীষ্মাকাশের নির্মেঘ চাঁদোয়াখানা বহু দূরে রক্তাভ পৃথীর সংগে মিশেছে—আগুন-রঙা দীপ্ত দিগন্তে। রোদের তাপে পাতা ঝলে গেছে গাছগুলোর। শুকনো ঝোপ-ঝাড় কাঁটা-সার হাত ঊর্ধ্বে তুলে বৃষ্টির আশায় উন্মুখ হয়ে আছে।

হাসপাতালের চারদিকে ছিমছাম্ বাগান, পরিচ্ছন্ন পথগুলোর দু'পাশে চুনকাম করা পাথরের নিশানা। অন্ধকার হয়ে গেলে চাঁদের আলোয় দেখা যায় ঐ সাদা পাথরগুলা। নাইট-ডিউটির নার্সরা ওগুলোর নির্দেশ মেনে ঠিক পথে চলে, না হলে বৃষ্টির পর আশেপাশে অনেক সময় গোখরো সাপ লুকিয়ে থাকে।

তেমনি একটা পাথরের ওপর একটা গিরগিটি বসে আছে স্থির হয়ে। ভংগীটা এমন যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনছে কি। বিধাতার জীবন্ত সৃষ্টির মত যত না মনে হচ্ছে ওটাকে তার চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে শ্রবণ-মুদ্রায় ধরা তামার ছাঁচ যেন একটা।

অস্ফুটকণ্ঠে তাকে বলল, সুন্দর জীব। আমি ফিরে আসছি আবার। ফিরে আসছি, শুনলে?

একঝলক রক্তাভার মধ্যে মিলিয়ে গেল গিরগিটিটা। সিস্টার লুক দেখল তাকিয়ে তাকিয়ে।

মাদার ম্যাথিল্ডা যেমন বলে দিয়েছেন হাসপাতালে ফিরে তখনই ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার নিজের ডেস্কে বসে ফর্ম পূরণ করছিলেন, চোখ তুলে দেখে কাজের গুরু-গাম্ভীর্যে মাথা নাড়লেন।

চটপটে ভাব দ্রুতকণ্ঠে বললেন, এই যে সিস্টার, আমাদের তো অনেক কাজ করবার রয়েছে। এ্যাংগ্রেবার্টের সমস্ত পুরোনো ফাইলটা দরকার—সব ক'টা স্কাল এক্স-রে, ল্যাব টেস্ট, কন্সালটেশন রিপোর্ট···

নোট বই বার করল সিস্টার লুক। এই একবারও অন্তত ডাক্তার যে মাথা ঘামাচ্ছেন না সে কি ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে। কৃতজ্ঞ বোধ করছে সেজন্য। নির্দেশগুলো সংক্ষেপে লিখে নিল। তিনদিনের রেলের পথে স্বল্প-স্বল্প ঘুমের ওষুধের বিধান, প্রয়োজন হলে কিছু বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থা:—ডাক্তার অবশ্য স্থিরনিশ্চয় এসব কিছু লাগবে না তার, লোবিটো অবধি সংগে যাবার জন্য ফোর্স পাবলিক থেকে দু'জন এদেশীয় গার্ডের ব্যবস্থা। তারপর জাহাজের ডাক্তার দায়িত্বের ভাগ নেবেন। জাহাজের ডাক্তারের নামটা নোট করার সময় সুবিধার্থে বানান করে দিলেন।

একই রকম গুরুগম্ভীর কাজের সুরে যোগ করলেন তারপর, তাকে একটা চিঠিও লিখে দেব আমি। রোগী যে কোন জন বুঝিয়ে দিতে হবে তো।

চমকে মুখ তুলে চেয়ে দেখল ডাক্তারের মুখে ব্যংগের হাসি। তা হলে শেষ পর্যন্ত মাথা ঘামাচ্ছেন উনি! স্থির হয়ে অপেক্ষা করে রইল পরবর্তী আক্রমণের জন্য।

—আমি ঠাট্টা করছিলাম সিস্টার। আপনার কর্তব্যানুরাগের রিফ্লেক্স টেস্ট করছিলাম।

—অবশ্য-করণীয় বিষয়গুলো বিবেচনা করে ডক্টর, আমি বলি শুধু কাজের কথাই আলোচনা করেন যদি তো ভাল হয়।

সামান্য একটু ভাবান্তরও হ'ল না ডাক্তারের, সে যেন কোন কথাই বলে নি। একভাবেই বলে চললেন। কথাটা আমার মিথ্যে নয়। এরপর আপনাকে যে পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াতে হবে তাতে সত্যিই আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষার দরকার ছিল।

সিস্টার লুক একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

ডাক্তারের ছোট ছোট লাল চোখের দৃষ্টিতে শাণিত ছুরির তীক্ষ্ণতা। মুখভাবে কিংবা কণ্ঠস্বরে ব্যংগের আভাসও আর নেই।

—যে আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে এত নিশ্চিন্ত আপনি, উপলব্ধি করতে পারছেন না সিস্টার যে সেই শক্তিই আপনার পরীক্ষায় মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে! বেলজিয়ামে আপনার মাদার হাউসে ঢুকবেন যে মুহূর্তে কড়া নিয়মানুবর্তিতা, পাঁচিলের বেড়া আর নীরবতার মধ্যে পড়ে এই শক্তি আপনার পরীক্ষার মুখে পড়বে। ধরুন, অনির্দিষ্টকালের জন্যে আটকে রাখল আপনায়। কনভেন্টে যে কোন ঘটনাই ঘটতে পারে তা আপনিও ভালই জানেন। তখনও কি এ শক্তি যথেষ্ট হবে সিস্টার?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

উত্তর শুনে মনে হবে যেন উভয়ের মধ্যে টেবিলের ওপর

একটা দেহ শায়িত আছে আর ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেছেন সব ঠিক আছে তো।

—ঠিক জানেন সিস্টার হবে যথেষ্ট? জানেন এটা হওয়ানোর একগুঁয়ে ইচ্ছে নয় কেবল? সোজা এর শেষ পরিণতি পর্যন্ত ভেবে দেখেছেন?

তিনটে প্রশ্নের উত্তরেই মাথা নাড়ল শুধু, কথা বাড়াতে ইচ্ছে নেই।

হঠাৎ রেগে গেলেন ডাক্তার, তাই বুঝি! আমি কিন্তু নিঃসংশয় নই!

বিস্ময়াবিষ্ট সিস্টার লুক তাঁর আবেগের মুখে সংযমের বাঁধন ভুলে ধরা পড়ে গেল।—তা হলে সবাইকে ছেড়ে আমার নামটাই বা করলেন কেন মাদার ম্যাথিল্ডার কাছে?

ধীরে ধীরে কঠোরকণ্ঠে ডাক্তার বললেন, আপনার ভুলটা আপনাকে ধরিয়ে দিতে। এই ক'বছরে যে কথাটা বহুবার বলেছি আপনার সেই কথাটাই প্রমাণ করতে—তার জন্যে আপনাকে হারাতে হলেও! প্রমাণ করতে—

আর বলবার সুযোগ দিল না সিস্টার লুক।

ত্বরিতপায়ে অফিস ছেড়ে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে বলে গেল, কেসটার জন্য কি নিতে হবে না হবে আলোচনা করবার সময় হবে যখন আপনার আমায় একটা ফোন করে দেবেন ডক্টর।

অযৌক্তিক অস্বাভাবিক সমস্ত ব্যাপারটাই নিজের মনেই বুঝছে। তবু মনের মধ্যে সংশয়ের বীজ একটা উপ্ত হয়ে গেছেই। কাঁটার মত বিঁধছে সেটা খচ্‌খচ্‌ করে…যে শক্তির ওপর এত আস্থা রাখে সে কি সত্যই কেবল কংগোর পক্ষেই যথেষ্ট? কাঁটাটা বিঁধছে যত সিস্টার লুক ততই চেষ্টা করছে ভাবনাটার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে। প্রিয় বস্তুর কথা ভাবতে চেষ্টা করছে, প্রিয় মানুষগুলোর কথাও।

এমিল। কংগোর দেওয়া প্রথম বন্ধু তার, সারামুখে বিশ্বস্ততার ছাপ মাখানো।…এখন তার দিকেই আসছে দেখতে পাচ্ছে দূর থেকে। ওর সংগে দেখাশোনা শেষ হবে এবার, আর কতদিনই বা বাকি।

হাসপাতালের ছাদে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির এই রোমাঞ্চকর শব্দ, হঠাৎ নাকে এসে লাগা রৌদ্রদগ্ধ মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ—বুনো, তীব্র, অদ্ভুত মিষ্টি…সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনছে নিজেকে।

মাদার ম্যাথিল্ডা টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন তাকে। বৃষ্টির শব্দের চেয়ে নিম্নগ্রামে বাঁধা স্বর, তবু বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে উঠেছে।…সুপিরিয়রের গলার স্বর শুনতে শুনতে তাঁর কাছ থেকেও নিজেকে পৃথক করে আনল—চেনা-পরিচিত সব মানুষের মধ্যে তাঁকে সে বেশি ভালবেসেছে।

যা কিছুই ছেড়ে দিচ্ছে আঘাত দিচ্ছে খুবই, তবু শান্তমনে স্থির বিশ্বাসে ভাবছে বিচ্ছেদ যদি আসেই বিচ্ছেদের বেদনাও সইবে তার। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের জন্য সইতেই হবে, তাই যদি তাঁর ইচ্ছা হয়। অবশেষে নিজের মনে ব্যাখ্যাত্মক বিশ্লেষণটা চালিয়ে যেতে যেতে এক অদ্ভুত সত্য আবিষ্কার করল। মাদার ম্যাথিল্ডার পর ডাক্তারকে ছাড়াই সবচেয়ে বেশি বেদনাদায়ক মনে হচ্ছে!

তাঁর মুখের রাগত ভাবটা ভালবাসার মত দেখায়। এই এতগুলো বছর একসংগে কাজ করার সময় সদা-সতর্ক পাহারায় নিজেকে তো বটেই তাঁকেও ঘিরে না রাখত যদি—তাই হয়ে দাঁড়াত সম্ভবত। আকাশের গায়ে হলদেটে চাঁদটা স্পষ্ট যেমন, ওর চিন্তায় ঐ রুক্ষ মুখখানাও তেমনই। তার মতামতের ওপর তাঁর আস্থা, পূর্ণ বিশ্বাসে তার একার ওপর সব দায়িত্ব দিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়া, অপরেশন টেবিলের ওপর শায়িত কম্পমান দীপশিখার মত কোন জীবনের সংগে যে রুদ্ধশ্বাস দুঃসাহসিকতার বন্ধন তাদের বেঁধে রাখে…স্কালপেল, হেমোস্টাট, ক্যাটগাট, সিস্টার…নিঃশ্বাস মৃদু হলেও নিয়মিত, ডক্টর, নাড়ী এখনও পাওয়া যাচ্ছে বেশ… বছরের পর বছর অন্ধকার উষায় এই তাদের একমাত্র কথপোকথন…কঠোরভাবে এক এক করে সেগুলো ছেঁটে ফেলছে সিস্টার লুক মন থেকে।

ডাক্তারের টেলিফোন। ভাবনায় ছেদ পড়ল। তাড়াতাড়ি হল পেরিয়ে চলে এল।

ডাক্তার নিজের ডেস্কে বসে, কেস ফাইলের বিরাট এক স্তূপের ওপর হাত দু'খানা স্থিরভাবে মুড়ে রাখা।

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে, আপনার ব্যাপার দেখে আমি তাজ্জব সিস্টার, কাজের মধ্যে হঠাৎ পালিয়ে গেলেন যে! যেন এই প্রথম ডায়গনোসিসে মতের তফাৎ হল আমাদের! যে হাসিটুকু ক্ষমাপ্রার্থনা করল তাকে মধুর বলা চলে না।—যেন জানেন না কেউ প্রতিবাদ করলেই চটে যাই আমি। সব সময়ই আমার ভয় কখন একশ' বারের মধ্যে একবার আপনার কথাটাই ঠিক হয়ে যায়!

—একশ' বারে একবার! কি সাংঘাতিক দাম্ভিক আপনি! বলল বটে অভ্যাসবশে, এটাকেও সরিয়ে দিল মনে মনে…তাদের যুদ্ধ আর সন্ধির পদ্ধতি!…চোখ নীচু করে নিজের স্কার্ট-পকেটে নোট-বুকটা হাতড়ে ফিরছে, চোখের জলটা ধরা না পড়ে।

তিন সপ্তাহ পরে মাদার হাউসের পথে পাড়ি দিল সে।

বয়রা তার কামরাখানাকে বিবাহোৎসব কুঞ্জের মত সাজিয়ে দিয়েছে। দেওয়াল, ছাদ, বসবার আসনগুলো রাশি রাশি সাদা ফুলে ভরা। কোণে কোণে বড় বড় উইস্টারিয়ার স্তবক ঝোলানো, প্রস্ফুটিত ফুলের আড়ালে উপহার লুকোনো আছে। অতিকায় এদেশী ঝুড়িতে মেঝে পর্যন্ত ঢাকা—ঝুড়িভরা বাছাই-করা আম, পেঁপে, পিয়ারা, আরও অনেক রকম দেশীয় ফল। সব ওপরে অঙ্গুলী-পরিমাপ ছোট্ট ছোট্ট বিটিকা কলার কাঁদি। বয়রা জানে এগুলো তার প্রিয়।

পাশের কামরাটা মঁসিয়ে এ্যাংগ্লেবার্টের। তাঁর দরজার বাইরে ফোর্স পাবলিকের দু'জন দেশীয়-পুলিশ পাহারায় দাঁড়িয়ে। ট্রেনটা ছাড়বার আগে রোগীকে সামান্য একটু ঘুমের ওষুধ দিয়ে নিজের অভিভূতকর মিষ্টতা-ভরা কুঞ্জে ফিরে এল। জানলায় দাঁড়িয়ে

দেখবে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে তার ধর্মজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক'টা বছর।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিদায় নেবার সময় সব আবেগ অশেষ নৈপুণ্যে দমন করে রেখেছিল, বিশ্বাসটা জিইয়ে রেখেছিল সে ফিরে আসছে। রিক্রিয়েশনে সিস্টারদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে, সার্জারির অতি-পরিচিত পুরোনো যুদ্ধক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছ থেকেও। এমনই শান্তভাবে যেন দিন তিনেকের জংগল-সফরে যাচ্ছে। কিন্তু হুইসিল্ বেজে উঠল যখন···মাদার ম্যাথিল্ডা আর তার ড্রেসিং-বয়রা তার কাছ থেকে সরে যেতে লাগল, হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে এক ঝলক বেদনা উঠে এল গলা পর্যন্ত···সাদা ফুলের ফ্রেমের মধ্য থেকে হাসিমুখেই তবু চেয়ে আছে তখনও।

শেষ দৃশ্যে স্টেশনের পিছনে মিমোসা গাছের তলায় দণ্ডায়মান আবভাঙা কনভেণ্ট-ফোর্ডটা দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল, তারপর জানলার পাশে বসে পড়ল। তার বয়রা এই একটিমাত্রই বসবার মত জায়গা খালি রেখেছে। অপস্রিয়মান কংগোকে দেখবার জন্য বাইরের দিকে তাকাবার প্রয়োজন নেই; কংগো তার সংগে সংগে রয়েছে এই কামরার মধ্যেই। মনে হ'ল কাছেই ফুলের একটা মোড়কের মধ্যে কি রয়েছে; আবলুশ কাঠের মূর্তি বেরোল একটা।

প্রায় ইঞ্চি-পনেরো দীর্ঘ মূর্তি একটা, নতজানু মেয়ে একটি। কণ্ঠমূলে নেকলেসের তলায় উৎক্ষিপ্ত চকচকে কালো দু'টি পীনোদ্ধত বক্ষের আভাস, মোড়া হাঁটু দু'টির ওপর ছোট ছোট কঠিন দু'টি হাত। পূর্ণ সৌন্দর্যে উন্নমিত মুখখানি, অর্ধনিমীলিত দু'টি চোখ, কৃষ্ণবর্ণ পুরু অধরোষ্ঠে নীরব মিনতির অভিব্যক্তি—সামনে এমন এক প্রচণ্ড দেবতা যেন, যার সংগে কথা বলা বা যার দিকে চোখ তুলে চাওয়া সহজ নয়। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে মূর্তিটা···চৌকোণা পায়ের গোড়ালির ওপর বক্র মূর্তিটির নিতম্বভার ন্যস্ত আর সেই পায়ের পাতায় দু'টো নাম খোদাই করা আছে—'এমিল ও বাকোংগো'।

আবলুশ কাঠের মূর্তিটি কোলের ওপর বসাল সিস্টার লুক।

দু'চোখে অশ্রুর প্লাবন।

কয়ফটা তার বেদনা-বিকৃত মুখখানা অন্য যাত্রীদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করেছে। কাচের দরজার বাইরে ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে তারা, ভিতরের দৃশ্যটা কৌতূহল উদ্রেক করেছে। একটি শ্বেতকায়া সিস্টার বিবাহোৎসবকুঞ্জে বসে কোলের ওপর জীবন্ত কিছুর মত ধরে আছেন এই অসভ্য দেশে তৈরি মূর্তি একটা—যাদুঘরের তরফ থেকে এগুলো সংগ্রহ করে 'নিগ্রো-আফ্রিকান আর্ট' লেবেল আঁটা শুরু হয়েছে তাই, না হলে তার আগে পর্যন্ত হাটে বাজারে ক'গজ কাপড়ের বিনিময়ে যে কেউ কিনতে পারত এগুলো।

কিছুক্ষণ পরে মূর্তিটাকে তার পুষ্পশয্যায় বসিয়ে দিল আবার। মেঝের দিকে তাকাল। কংগো-গ্রাম্যসুলভ উজ্জ্বল রংচঙে জমকালো ঝুড়িগুলোর মধ্যে তার পেপিয়েমাশের স্যুটকেশটা গরীব আত্মীয়ের মত বসে। ভেদটো সবচেয়ে ছেঁড়া যেটা পেয়েছেন সেটাই দিয়েছেন, তাই নিয়ম। যে নান মাদার হাউসে ফিরছে যে সব মালপত্র বা

পোশাক বদলানো দরকার সেইগুলোই তাকে দেওয়া হয়। নীচু হয়ে নিজের স্যুটকেশ থেকে ইঞ্জেকশানের ব্যাগটা নিল আর একটা ঝুড়ি থেকে একমুঠো অঙ্গুলী-পরিমাপ কলা।

পাশের কামরায় গেল ছোটখাট শান্ত মানুষটির সংগে বন্ধুত্ব করতে। উপনিবেশের কাজের জন্য রাজা লিওপোল্ড স্বয়ং তাঁকে একদিন সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।

প্রহরী দু'জন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল, মামা লুক।

—তোমরা তোমাদের কামরায় চলে যাও, লোবিটোর আগে তোমাদের দরকার হবে না।

শুনে ওরা মাথা হেঁট করছে দেখে তখনই কিসওয়াহিলিতে বলল, আমাকে এখন একা থাকতেই হবে, সর্দিগর্মির প্রেতগুলোকে তাড়াব কি না। তাড়িয়ে দিলে সেগুলো এখন করিডরে ঘুরে বেড়াবে, কাজেই আমি চাই তোমরা নিরাপদে সরে যাও।

তার মুখের স্মিতহাসিতে মর্যাদা ফিরে পেল ওরা। স্যালুট করে নিজেদের স্লিপিং কারে চলে গেল পিঠ টান করে।

দরজা খুলে কামরায় ঢুকল, ইচ্ছে করেই রোগীর দিকে পিছন ফিরে সেটা আবার বন্ধ করল টেনে। ছিটকিনি দিতে দিতে নিজের মনের বিশ্বাসটাকেই আওড়াল নিজের মনোবল দৃঢ়তর করতে। অপ্রকৃতিস্থতার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাবে না ওঁর মধ্যে।

ভগবানকে স্মরণ করল একমুহূর্ত। হে প্রভু, তুমি সহায় থেক।

জানলার কাছে গিয়ে ঢাকা নামিয়ে দিল আফ্রিকার সূর্যকে আড়াল করতে। আলোটা বেদনা দিচ্ছে তাকে। তার রোগীর চোখকেও। পাশে বসে তাঁর সংগে কলা ভাগ করে নিল তারপর।

ঈষৎ অন্যমনস্কতায় আলাপ শুরু করল, মঁসিয়ে এ্যাংগ্রেবার্ট, কাল হয় তো আমার কামরায় আপনাকে নেমন্তন্ন করতে পারি আমি—এই পাশেই ঠিক। কামরাটা সাদা ফুল আর ফলের ঝুড়িতে ভর্তি একেবারে। তির্যক নেত্রে একবার দেখল তাকিয়ে।—চকোলেটের বাক্সও আছে। লোবিটো পৌঁছোনোর আগেই এগুলো আপনাতে-আমাতে খেয়ে শেষ করতে হবে। এসব তো থাকবার জিনিস নয়, নষ্ট হয়ে যাবে।

পূর্ণ সম্মতিতে হেসে চাইলেন মঁসিয়ে এ্যাংগ্রেবার্ট।—আরও এই দুর্দান্ত গরমের জন্যে সিস্টার। তার বাড়িয়ে-ধরা হাত থেকে আর একটা ছোট্ট কলা নিলেন তুলে।

১৬

কংগোর বিরাটত্ব সমগ্র বেলজিয়ামকে খর্ব করেছে, কিন্তু মাদার হাউসকে পারে নি। বিশালাকার ধূসরবর্ণ অট্টালিকা, দুর্লভদর্শন, নৈর্ব্যক্তিক। ঢুকতে গিয়ে গাটা শিরশির করে উঠল। প্রথম পসচ্যুল্যান্ট হয়ে ঢুকেছিল যখন তখন যেমন করেছিল।

চৌকাঠ পেরোবার সংগে সংগে ধর্মজীবনটা গোড়া থেকে শুরু হল যেন। পোর্টারের জায়গায় যে নানটি বসে, উঠে এসে কেমন ভাবে আলিংগন করল সে। এ আলিংগন কেবল প্রত্যাগতা মিশনারীদেরই প্রাপ্য। একবার সেও এমনি পোর্টারের জায়গায় ছিল। তাকে অভ্যর্থনা করছে যে ছেলেমানুষ সিস্টারটি তারই মত সেও গৃহাগতা সিস্টারটির রোদেপোড়া তামাটে মুখ আর বিশুষ্ক প্রত্যাশীদৃষ্টির দিকে একবার মাত্র চেয়েই বাধ্য চোখ দু'টো নামিয়ে ফেলেছিল···যে ছেঁড়া স্যুটকেশটা দরজা থেকে হাতে এসে পৌছেচে সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করে নি···তার স্যুটকেশে আবার রুল-অনুমোদিত ওজনের বেশি ওজন আছে···বাকোংগো মূর্তিটা···সিস্টার ইউডোক্সি স্বভাবতই বাজেয়াপ্ত করবেন ওটা।

কেউ যে তার দিকে তাকাচ্ছে না এ অনুভূতিটা অচেনা হয়ে গেছে। সয়ে নিতে ফয়েতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটু। মনে পড়ল ফিরে আসবার পর নানের প্রথম কর্তব্য চ্যাপেলে যাওয়া।

ভেসপারের ঘণ্টা বাজছে···

চ্যাপেল-অভিমুখী সিস্টারদের সারিতে ঢুকে গেল সিস্টার লুক। নিজেকে নিজের প্রেতাত্মার মত লাগছে! কালো প্রেতাত্মা একটা।

পাশে পাশে যে নানটি যাচ্ছে, তার সঙ্গে একটি আইরিশ মেয়ে নভিস ছিল সেই মেয়েটির সংগে তার খুব আদল আসে। এখন এমনই নিখুঁত ছাঁচে ঢালা নান হয়ে গেছে যে নীলাভ চোখের হাসি দেখে তবে বোঝা যাবে এ সেই কি না। কিন্তু সংগিনীর দু'চোখ নত, পূর্ণ বিশ্বাসে চিন্তা তার ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত। সিস্টার লুক যেদিকে তাকাল একই দৃশ্য···মনে মনে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা একজোড়া চোখ অন্তত তার দিকে চেয়ে পরিচিতির আলোয় জ্বলে উঠুক!·· বহুক্ষণ পরে সেই শিরশিরে অনুভূতিটা কেটে গিয়ে সৌন্দর্যোপলব্ধি ফিরে এল।

তারপর ক্যায়ার-দল গ্রেগোরিয়ান স্তব গাইতে শুরু করল যখন বাড়ি ফেরার অভ্যর্থনা শুনতে পেল তার সুরে-ছন্দে। কংগো-কমিউনিটির পনেরোটি গলার ক্যায়ারের পরে মাদার হাউসের এই শ'খানেক মোপ্রানোর গান···শুনতে শুনতে পায়ের ভর হারিয়ে ভেসে যাচ্ছে যেন! চোখ বুজে শুনছে ওদের কুমারী-গলায় ভার্জিনের গান। চোখ মেলে চাইল যখন দৃষ্টি অনেকখানি প্রসারিত হয়ে গেছে। নীচে সামনের দিকে ছোট টুপি-পরা পসচ্যুল্যান্টদের সারি। সিস্টারদের সংগে গান গাইবার অনুমতি এখনও পায় নি তারা, চোখের দৃষ্টিও পূর্ণায়ত্তে আসে নি—অবাধ্য দৃষ্টি এদিক-ওদিক গিয়ে পড়ে। লিভিং রুলদের প্রস্তরমূর্তিবৎ সারিটায় পড়ে ওদের গোপন দৃষ্টি যা আবিষ্কার করতে চাইছে চাপাগলায় গীত এ্যানটিফোন সেই গোপন তথ্যটারই উদঘাতা···বিশাল এক উত্তরাধিকার রহস্য···

সিস্টার লুক চোখ নামিয়ে নিজের কালো স্ক্যাপুলারের দিকে তাকাল। লিভিং রুলের পোষাক!···সত্যই কি সে লিভিং রুল একজন? প্রভু জানেন সে কথা, এ প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারবে না।

উপাসনা শেষে সুপিরিয়র জেনারেলের অফিসে তাঁর সংগে দেখা করতে গেল। অফিসের লাগোয়া ছোট ঘরে নিস্তব্ধ নানরা যেন বসে আছেন সমাধিমগ্নার মত। রেভারেণ্ড মাদারের সংগে দেখা করবেন বলে অপেক্ষা করছেন। সিস্টার লুক তাঁদের মধ্যে গিয়ে বসল। কেউ লিট্ল অফিস পড়ছেন, কেউ মালা জপ করছেন, আর একজন—ওরই মত রোগা, বাদামি···নিশ্চয় সম্প্রতি বনগ্রেগেশানের কোন উষ্ণোজ্জ্বল উপনিবেশ থেকে ফিরেছেন—একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছেন ঘরের অনাড়ম্বর সাজ সজ্জাগুলো। নগ্ন দেওয়াল, কার্পেটহীন মেঝে, দু'টো গথিক ধাঁচের ওককাঠের চেয়ার, একটা সেকেলে ডেস্কের ওপর দাঁড় করানো ক্রশ আর একটা ছোট দিনপঞ্জী—তাতে প্রাত্যহিক শহীদদিবস, তারিখ আর সাল দেওয়া আছে।

আজকের তারিখটার দিকে তাকাল সিস্টার লুক। ১৫ই মার্চ, ১৯৩৯। সকালে এ্যান্টোয়েপের জেটিতে মঁসিয়ে এ্যাংব্রবার্টকে তাঁর আত্মীয়দের হাতে দিয়ে দিল যখন—জেটিতে ওঁরা যে সাইকিয়াট্রিস্টকে এনেছিলেন সংগে এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন তিনি যে, তাঁর তুলনায় মঁসিয়ে এ্যাংব্রবার্টকেই অনেক স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল, হকার ছেলেগুলো কাগজের হেডলাইন হাঁকছে শুনেছিল :···জার্মান সৈন্যের চেক বোহেমিয়া দখল—

কনভেন্টের কালো লিমুজীন গাড়িতে ব্রাসেলসের পথে পপলার গাছের সারি দেওয়া পাহাড়ে-রাস্তায় জাহাজ-যাত্রীদের যুদ্ধালোচনা মনে পড়ছিল :···যুদ্ধ শুরু হয় যদি কনভেন্টে থাকাটা কি রকম হবে? ভাবতে অবাক লাগে কেমন। একবার সিস্টার ইউচেরিসদিয়া এ সম্বন্ধে বলেছিলেন কিছু, কিন্তু কি যে বলেছিলেন এখন আর খেয়াল নেই তার।

একজন নান বেরিয়ে এলেন সুপিরিয়র জেনারেলের অফিস থেকে, আর একজন ঢুকলেন। বেঞ্চে একটা জায়গা এগিয়ে বসল সিস্টার লুক।

···যুদ্ধ যদি বাধে কনভেন্টে থাকার অর্থ এইভাবে থাকা। একেবারে ঠিক এইভাবে, কোথাও কোন রদ-বদল হবে না। আমরা প্রত্যেকে গোপনে গোপনে সংগ্রাম করব কোন প্রাকৃতিক সমস্যা নিয়ে, অথবা অন্তরের কোন সমস্যা। রেভারেণ্ড মাদার ইমাস্থ্যুয়েলের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির তলায় গিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে অপেক্ষা করব; সে দৃষ্টি সোজা অন্তরের সংগ্রাম-স্থলে গিয়ে ঢুকবে। অন্তরের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতি কখনও ঘটে না, কখনও না। ক্রাইস্টের কা। আরম্ভ হওয়ার পর থেকে কখনও ঘটে নি···

···যুদ্ধ বিরতি হয় না কখনও।

ইতোমধ্যে আর এক ধাপ এগিয়ে বসেছে।

কি কথা বলবে সুপিরিয়র জেনারেলের সংগে মনে মনে কিছুই ঠিক করে নি। মনটা বরং বন্ধ দরজার বাইরে টানা করিডরে চলে গেছে আপাতত···পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে সাদা পোষাক-পরা নভিসরা যাচ্ছে যেখান দিয়ে, কাজের ঘানিতে বাঁধা ওরা। যেতে যেতে আড়চোখে এক-একবার চেয়ে দেখছে লিভিং রুমদের দিকে, রেভারেণ্ড মাদার ইমাস্থ্যুয়েলের সংগে সাক্ষাতের পর বেরিয়ে আসছেন যাঁরা। কারো মুখে হাসি, কারো চোখে জল···এখনই হয় তো পদোন্নতি হয়েছে, অথবা অবনতি···প্রশংসা পেয়েছেন, কিংবা ভর্ৎসনা।

কিছুক্ষণের জন্য নভিসদের নিঃশব্দ যাতায়াতে সেও ঢুকে গেল।

তারপর দেখা করবার পালা এল তার।

অফিসে ঢুকতেই রেভারেণ্ড মাদার ইমাস্থ্যুয়েল উঠে দাঁড়ালেন। মিশনারী সিস্টারদের প্রতি বিশেষ সম্মানের অভিবাদন এটা। সিস্টার লুকের ধারণা মিশনারী সিস্টারদের সবার চেয়ে বেশি মূল্য দেন তিনি। সুপিরিয়র জেনারেল নিজেও মিশনারী নান ছিলেন, যে সংগ্রামে দিন কাটে তাদের স্মৃতির স্তরে স্তরে বুঝি তার উপলব্ধি এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সিস্টার লুক নতজানু হতে হতে সোজা তাকাল তাঁর জ্বলজ্বলে চোখের দিকে।

সুপিরিয়র জেনারেল সামনে এগিয়ে এসে নত হয়ে আলিংগন করলেন। অন্তরংগ উষ্ণতার প্রকাশটুকু অনুভব করল সিস্টার লুক। অনুভব করল এক সংবেদনশীল হৃদয় স্থান দিয়েছে তাকে তার অন্তস্তলে।

উঁচু-পিঠ চেয়ারে ফিরে গিয়ে বসেছেন সুপিরিয়র জেনারেল। কৃষ্ণ-চক্ষুর চুম্বকশক্তি এমনই আবিষ্ট করে রেখেছে প্রথমটায় ডেস্কের পিছনে বুক-শেলফের ওপর এমিলের দেওয়া আবলুশ কাঠের নতজানু বাকোংগো-স্ত্রী-মূর্তিটা দেখতেই পায় নি। পাশ করে রাখা হয়েছে মূর্তিটা, প্রার্থনার ভংগীটা প্রকাশ পায় যাতে।

অপেক্ষা করে আছে ঐ কণ্ঠস্বর শুনবে বলে।

···যে কণ্ঠস্বর বার বছর আগে বলেছিল, এ জীবন প্রকৃতি-বিমুখ···

···আর সাত বছর আগে বলেছিল, মনে রেখ, তুমি একটা যন্ত্রমাত্র···

রেভারেণ্ড মাদার ইমান্যুয়েল স্মিতহেসে চাইলেন, ফেরার পথে কেমন এলে মাই চাইল্ড? ভাল তো?

—খুব ভাল রেভারেণ্ড মাদার। পথে আমরা রাণীর মত ব্যবহার পাই। সিস্টার লুক শাসন করল নিজেকে, মূর্তিটার দিকে তাকাবে না আর।

—শরীর কেমন আছে তোমার!

—চমৎকার, রেভারেণ্ড মাদার। আমার আত্মিক স্বাস্থ্যও—খুব ভাল।

—এ তো খুব ভাল কথা সিস্টার লুক। তা হলেও শরীর তোমার এখন সারাতে হবে। ভুললে চলবে না অনেকগুলো-বছর কিভাবে একটানা অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছ তুমি।

অন্তর্ভেদী কালো চোখের দিকে চেয়ে সিস্টার লুক দেখছে যে দৃষ্টিতে এক সুপিরিয়র তাঁর নানদের বিষয় যা লিখেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ যেন অনেকগুলো স্ফটিকের টুকরোর মত জ্বলছে। সুপিরিয়র জেনারেল কিছু ভোলেন নি, তুচ্ছ কথাও না।···একবার আমাশয় হয়েছিল, মারা যেতেই বসেছিলে প্রায়···তারপর যক্ষ্মা—ঈশ্বরের করুণায় নিজেকে টেনে তুলতে পেরেছ আবার।···একমাত্র কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করতে পারে কোন নান, তুমি কিন্তু বোধ হয় প্রায়শই সে ক্ষেত্রের বাইরেও প্রয়োগ করতে তোমার বিচার-বিবেচনাগুলো, আর কিছু মানব-সত্যতার ক্ষেত্র ছিল একটু চেষ্টা করলেই যেগুলোকে অতি প্রাকৃত পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে দেখতে পারতে তুমি, কিন্তু অপর দিকে···

—তারপর, কি ভাবছ বল! নিয়ম হল মিশনারীরা অন্তত একমাস এখানে থাকবেন, এই শান্তিময় পরিবেশে বিশ্রাম নেবেন শুধু। মনটাকে পুনর্বিন্যস্ত করে নেওয়াই একমাত্র কাজ থাকে তখন। কমিউনিটির উপাসনায় নির্দিষ্ট সময়গুলি ছাড়া যে কোন সময় আত্মীয়-বন্ধুদের সংগে দেখাসাক্ষাৎ করতে পার তুমি। আমার ইচ্ছে সকালে রোজ ছ'টা বাজলে তবে উঠবে, উপাসনায় যোগ দেবে পিউ থেকে নয়, চেয়ার থেকে। থেমে একটু হাসলেন।—এ নয় যে তোমার বয়স হয়ে গেছে বা এত অসুস্থ তুমি যে উপাসনার সময়টুকুও দাঁড়াতে পারবে না, আমি চাই কিছুদিন তুমি প্রভুর চরণতলের মেষশাবকটির মত ভাব নিজেকে। মার্থা তো অনেকদিন ছিলে সিস্টার, এখন চেষ্টা কর মেরী হতে।

—আমি চেষ্টা করব মাই মাদার।

চোখ তুলে তাকাতেই শেলফের ওপর আবলুশ কাঠের মূর্তিটার চোখ পড়ে গেল···আর একটি মূর্তি—হাতীর দাঁতে কোঁদা যেন—তার দিকে একটু ঝুঁকে সামনে বসে···মুহূর্তখানেক দু'টি মূর্তি পাশাপাশি জেগে রইল মনে। উভয়েরই প্রেরণার মূলে যে ঈশ্বর দু' ক্ষেত্রে তাঁকে ভিন্ন বলে মনে হচ্ছে না, তিনি এক, তিনি অদ্বৈত।

—প্রথম প্রথম তোমার উত্তেজিত লাগবে, কোন কাজ নেই, কোন বিক্ষিপ্ত আত্মা নেই, যাকে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। রেভারেণ্ড মাদারের চোখ দু'টো জ্বলে উঠল।—এতজনকে কনভার্ট করেছ সিস্টার তুমি কলোনিতে—সবার কাছেই এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। ঈশ্বরের প্রিয়পাত্রী তুমি, যেসব আত্মার সংগে লড়াই করেছ তাদের সংগে তাঁর সংযোগের সেতু। উপনিবেশবাসীদের পরিবারগুলো থেকে, মিশনারী ফাদারদের কাছ থেকে বহু চিঠি পেয়েছি আমি, সবাই তোমার ভাল কাজের প্রশংসা করেছেন। সেই দূর বিদেশে প্রত্যেকে পছন্দ করেছে তোমায়, শ্রদ্ধা করেছে। মাথাটা একটু ঘুরিয়ে শেলফে যেখানে আবলুশ কাঠের মূর্তিটা রাখা আছে সেদিকে তাকালেন।···তোমার কালো বন্ধুরাও, দেখতেই পাচ্ছি।

এ ইংগিতের পর সে সোজাসুজি তাকাতে পারল এমিলের দেওয়া মূর্তিটার দিকে। ঐ মসৃণ কালো কাঠের প্রতি বাঁকটি ওর আঙুলগুলো চেনে। স্নেহভরা চোখ দু'টো একপলক আটকে রইল ওটার দিকে। তখনই আবার গথিক ছাঁচে গড়া মাতৃমূর্তিটির দিকে তাকাল। একমাত্র তিনি পারেন কংগোয় তাকে ফিরিয়ে দিতে।

আকর্ষণীয় স্বরে রেভারেণ্ড মাদার বললেন, উপহারটি ভারি সুন্দর সিস্টার। ঐ অন্ধকার মহাদেশটার বড় সুন্দর প্রতীক। তুমি কি চাও তোমার বাবাকে দিই এটা?

সুপিরিয়র জেনারেলের প্রশ্নের অন্তরালবর্তী ইচ্ছাটিকে বেশ দেখতে পাচ্ছে সিস্টার লুক।···তোমার মনের দিকে চেয়ে আমি সর্বান্তঃকরণে চাই এটার ওপর কোন দাবী না রাখ তুমি···একেবারে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পার যেন। তোমার মন যেন এটুকু তৃপ্তিও সঞ্চয় করে না রাখে যে ওটা তোমার পরিবারে আছে।···

প্রায় প্রলুব্ধ করার মত করে বললেন, তোমার বাবা খুশি হবেন এটা পেয়ে, ডেস্ক সাজিয়ে রাখার পক্ষে সুন্দর মনে করবেন! কি বল?

অগ্নিপরীক্ষার আহ্বানটা হাসিমুখে গ্রহণ করল সিস্টার লুক।

—আমার ইচ্ছে রেভারেণ্ড মাদার কনগ্রেগেশানে রাখা হোক ওটা, কনগ্রেগেশানেরই তো আসল দাবী ওর ওপর। যখন আমি চলে যাব এখান থেকে এ কথা ভাবতে ভাল লাগবে আমার যে আমার দেওয়া কোন কিছু মাদার হাউসের মিউজিয়ামে রাখা আছে।

রেভারেণ্ড মাদার ইমান্যুয়েল বললেন, তুমি মহানুভব সিস্টার।

সিস্টার লুক জানে বিশেষ কারণ না থাকলে তিনি কখনও মূর্তিটার কথা উল্লেখ করতেন না, ঐ শেলফের ওপর রাখাই থাকত। মাঝে মাঝেই ওখানে বিশ্রাম করে কোন স্যুটকেশের মধ্যে থেকে বার করে আনা সিংহলের সেগুন কাঠের হাতী, ভারতের বহু বাহুবিশিষ্ট

দেবতা, চীনের হাতীর-দাঁতের বুদ্ধমূর্তি। বসে থাকে মন্তব্যহীন, নামহীন। কার স্যুটকেশে স্মৃতিচিহ্নটা পাওয়া গেল সে উল্লেখ কখনও থাকে না। শুধু যা'র স্মৃতিতে ঐ চিহ্নটুকু চির-অম্লান সেই মিশনারী সিস্টারটি নতজানু হয় যখন এ অফিসে, চেষ্টা করে তার প্রিয় জিনিসটির দিকে না তাকাতে। আশাভরা সাহসে পূর্ণ ত্যাগের দ্বারে নামিয়ে দিয়েছে তাকে, সে ত্যাগ ক্ষুণ্ণ না হয়।

হঠাৎ মনে হ'ল কংগোর ওপর তার আকর্ষণ যতটা দৃশ্যমান বলে তার ধারণা সম্ভবত তার চেয়েও বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ে!

—আমাদের বার্ট্ জিনিসের সঞ্চয় বাড়াবে এটা। তুমি ভাল করে বিশ্রাম নাও সিস্টার। তারপর কোনদিন হয় তো তোমাকে রিক্রিয়েশনে বসে তোমার সিস্টারদের তাদের কংগোর সতীর্থদের খবরাখবর বলতে বলব। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের জন্যে সর্বদাই উন্মুখ হয়ে থাকে তারা।

সিস্টার লুক মাথা নাড়ল বাধ্য মেয়ের মত। কিন্তু মনে মনে ভাবছে শান্তভাবে কংগোর কথা বলতে পারবে কি না। বিশেষত এখন। বেশ পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছে মাদার ম্যাথিল্ডা যা ইংগিত দিয়েছিলেন বেলজিয়ামে তার চেয়ে বেশিদিন থাকতে হবে তাকে।

চলে আসতে আসতে অনুভব করছে চুম্বকী চোখ দু'টো দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করছে তাকে। রেভারেণ্ড মাদার ইমান্যুয়েল আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন যে-কোন সময় অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনার ইচ্ছে হলেই যেন অফিসে আসে সে। বেরিয়ে এসে দরজাটা পিছনে নিঃশব্দে বন্ধ করে দিতে দিতে ভাবল, ফিরেই আসবে। আসবে, কারণ এ ভরসা তার আছে যে কংগো-প্রত্যাবর্তনের কথা জিজ্ঞাসা করে দুর্বলতা প্রকাশ করবে না কখনও। প্রথম দিনের কথাবার্তাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে প্রশ্নটা হৃদয়ের কেন্দ্রে ধাক্কা দিয়ে ফেরে হঠাৎ সে প্রশ্নটা করে না বসার মত মনোবল তার আছে। খুব সম্ভবত চোখ থেকে প্রশ্নটা ঝরে পড়ছিল তার, তবু জিভটাকে সংযত করে রাখতে পেরেছিল।

দেখা করতে প্রথম এলেন বাবা।

প্রথম তাকে হ্যাবিট পরে দেখে যেমন ভাবে বলেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে বললেন, বেটি তুমি রোগা হয়ে গেছ!

বহুদিন পরে দেখা পিতা-পুত্রীতে। জড়িয়ে ধরে আদর করলেন! একটু দূরে দাঁড় করিয়ে দেখতে লাগলেন তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নীলাভ চোখে সমালোচনার দৃষ্টি।

—অবশ্য আমি কোনদিনই বিশ্বাস করি নি কংগোয় তোমার টি-বি হয়েছিল—বাজে কথা যত সব! ট্রপিকে অসুখ করলে কেউ বাঁচে নাকি? অবিশ্বাস্য!

অবাধ ডাক্তারি আলোচনায় পুনর্মিলন সহজ হ'ল এরপর। না হলে কথা খুঁজে বেড়াতে হ'ত।

বাবার প্রত্যেকটি বিরোধিতার যথাযথ উত্তর দিচ্ছে বসে, কিন্তু, একবারও বলে নি এক্স-রেগুলো দেখতে। এসব কৃত্রিম সাহায্যগুলোকে কিরকম দম্ভভরে উপেক্ষা করেন তিনি ভালই জানে। তার চেয়ে স্টেথোসকোপ দিয়ে স্বকর্ণে যা শুনবেন তার দাম অনেক বেশি তাঁর কাছে, তার ওপর তাঁর অনেক বেশি আস্থা। ডাঃ ফরচুন্যাটির নিজস্ব চিকিৎসার বর্ণনা দিতে গিয়ে বেলজিয়ানের পাণ্ডুর মুখখানা ভাসছে চোখের সামনে। তার বদলি সিস্টারটির সংগে কিভাবে মানিয়ে নেবেন তিনি অবাক লাগছে ভাবতে…গাছের ওপর সেই ঘরখানা…সে পায়চারি করত যখন ফেলিক্স তার দু'হাতের মধ্যে থেকে উঁকি মারত সোনালি চোখ বার করে!…প্রফুল্ল মনে অফিস আবৃত্তি করত বাঁদর ছানাটাকে ছেড়ে দিয়ে…খড়ের চালে ঝিঁঝি পোকা খুঁজে বেড়াত সে।…

বাবার কাছে বিস্তৃত বিবরণ দাখিল করতে গিয়ে স্মৃতির টানা-পোড়েনে নতুন সত্য আবিষ্কার করেছে: কি সময়ের ব্যবধানে ঠিক কতগুলো গোল্ড ডাস্ট ইনজেকশন নিয়েছে, ঘুম আর অতিরিক্ত আহারের শাসন কতটা মানতে হয়েছে কংগোর জীবনের সেই অবধিই সে বিবৃত করতে পারে, তার বেশি আর কোন কথা নয়। তবে মনে হ'ল বাবাও যেন ধরেই নিয়েছেন যক্ষ্মা রোগটার ওপর যে কংগোয় তার শরীরটা জয়লাভ করল, এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে আর কিছু ঘটে নি।

—কিছুদিন ছুটিতে হাওয়া বদলানো হলে ওরা তোমাকে নিশ্চয় ফেরৎ পাঠাবে কংগোয়।

—হয় তো। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয় যদি…

সিস্টার ইউচ্যারিস্টিয়া যুদ্ধকালীন মিশনের কথা বলতেন মনে পড়ে গেল। প্রতিটি শব্দ জ্বলজ্বল করে ভাসছে তার স্মৃতিতে।

—'চৌদ্দ সাল থেকে আঠারো সাল অবধি মাদার হাউস বা স্বদেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। উপনিবেশের সৈন্যদল জার্মানদের সংগে যুদ্ধ করেছিল এখানে…এইভাবে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর রোয়াণ্ডা উরাণ্ডির শাসনাধীন হলাম আমরা। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল দীর্ঘ চার বছর পরে পাওয়া আমাদের প্রিয় মাদার জেনারেলের চিঠিখানা। তারপর সিস্টাররা আবার কলোনিতে আসতে শুরু করল…

চোখের তারা দু'টো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে কখন অজানিতে। বাবার ডাকে চমক ভাঙল।

—তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে গ্যাবি?

—না, না তো। জোর করে হাসি টেনে আনল মুখে।—হঠাৎ নিজের মনে যুদ্ধ নিয়ে কথা কইতে শুরু করেছিলাম। তারপর ভাবছিলাম যুদ্ধের অর্থ কি দাঁড়াবে।

—যুদ্ধ হবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস হয় না যে জার্মানির ঐ উন্মাদটা আর একদফা গোলমাল শুরু করবে। দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে হিটলার সংক্রান্ত কিছু ডাক্তারি তথ্য শোনালেন আধুনিক জার্মানির দাম্ভিক প্রচারগুলো ব্যাখ্যা করতে তদগতভাবে বললেন তারপর, অবশ্য এ সবকিছুই আমার খেয়ালি ভাবনা হতে পারে। এন্টোনি রিজার্ভে রয়েছে, তবে ডাক পড়ার অপেক্ষাও তার সইবে না। ছোট দু'টোরও অবশ্য ফৌজে যাবার বয়স হয়েছে।

—বাচ্চা দু'টোরও! সব শেষ দেখেছে যখন তাদের নিকারবোকার পরা ছোট ছোট ছেলে তারা। কনভেন্টের গতিহীন বছরগুলোর তারা আর বড় হয় নি তার চিন্তায়।

বাবার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে কেঁপে উঠল সে।

দেখে বাবা কোমল গলায় বললেন, মার্চের হাওয়াটা সয়ে না যায় যতদিন, একটু ক্যাফাইন খেও।

বাবা চলে যাবার পরও ইচ্ছে করছিল এই বসবার ঘরেই একা বসে বসে খানিকক্ষণ ভাবে। কিন্তু তা হবার নয়। কমিউনিটির অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে চারপাশে—সদা-সতর্ক, বিশাল! সিস্টার লুকের প্রত্যাবর্তনের জন্য যেন অপেক্ষা করে আছে সে। দু'শো জোড়া চোখ তার সদা-আনত, তবু কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না।

ভিতরে ঢোকবার দরজাটা খুলতে খুলতে সে আরও একবার কেঁপে উঠল।

নিজেকে বলছে এতে অভ্যস্ত হয়ে যাব আমি। নিজেই জানে না কিসে অভ্যস্ত হয়ে যাবার কথা ভাবছে। এই আবহাওয়ায়! না কি এই এক ছাদের নীচে এতজন নানকে দেখতে?

পকেট থেকে একটা ক্যাফাইন-ক্যাপসুল নিয়ে মুখে পুরে দিল। মাদার হাউসের জনাকীর্ণ যাতায়াতের পথ দিয়ে নানদের ড মিটোরির দিকে যাচ্ছে। রেভারেণ্ড মাদার ইমানুয়েলকে কথা দিয়েছে প্রথম সপ্তাহটায় এই সময় আধঘণ্টা বিশ্রাম করবে।

এই ক্যাফাইন ক্যাপসুলে জাহাজের ক্যাপসুলগুলোর মত তাড়াতাড়ি কাজ হয় না।···খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়েছে, খসখস আওয়াজ হচ্ছে নড়তে-চড়তে। মাদার ম্যাথিল্ডার কথাগুলো মনে পড়ে গেল।

—আমার বেলা যেমন দিয়েছিলে নিজের বেলাও তেমনি তোমার মেডিক্যাল ব্যাগে ক্যাফাইন নিও···বেলজিয়ামে সারাক্ষণ থরথর করে কেঁপেছি আমি।···

তখনই অনুভব করল হৃৎপিণ্ডের ওপর ক্যাফাইনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। স্পন্দন দ্রুত হয়েছে, জোরালোও। প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছোল। প্রতিটি কোষ সক্রিয় হয়ে উঠছে···জেগে শুয়ে আছে, সম্পূর্ণ সচেতন।···মেটেরিয়া মেডিকা ফারমাকোলজি থেকে লাইনের পর লাইন মুখস্থ বলে যাচ্ছে আপন মনে।···আশ্চর্য, বহু বছর তো ভাবেও নি, কথাগুলো, তবু একটা কথাও ছেড়ে যাচ্ছে না বলতে গিয়ে।

···ক্যাফাইন সেবনে রোগীর মানসিক শক্তি, বিশেষত বিচার-ক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। ক্লান্তি দূর হয়। কল্পনাশক্তি অধিকমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলাফল অল্পক্ষণের জন্য স্থায়ী হয়।

সেই অল্পক্ষণের জন্য সে চোখ বন্ধ করল।

···অমনি মনে হ'ল কনভেন্ট ফোর্ডে চড়ে বসেছে। এক হাতে নিজের ভেলটা ধরা, অন্য হাতে যন্ত্রপাতির ব্যাগটা। এমিল বাইরে ড্রাইভারের পাশে বসে। একটু পাশ ফিরে বসেছে, মামা'লুকের সংগে চিকিৎসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলার বাসনা, কালুলুক তাক লাগিয়ে দিতে পারে যাতে। শহর ছাড়িয়ে এল তারা, একটা দেশীয় হাসপাতালে অপারেশনের জন্য সব তৈরি করল। কাজ শেষ হয়েছে সবে, ডাঃ ফরচুন্যাটি সেই ছোট্ট নিরাভরণ অপারেশনের ঘরখানায় এসে ঢুকলেন।···টেবিলে শোয়ানো দেহটার দিকে তাকিয়েও দেখলেন না, যন্ত্রপাতির ট্রের দিকেও না,—তার দিকে চাইলেন।

বললেন, আপনার বদলি নানটিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে ইনস্ট্রুমেন্ট নার্স করে নিয়েছি। কিন্তু ওর দৌড় ঐ পর্যন্তই, আপনার জায়গা ওকে তা' বলে নিতে হচ্ছে না! একেবারে রোখ নেই, আমার ভুল হলেও তা নিয়ে তর্কাতর্কি করতে পারবে না।···

···অপর্যাপ্ত সূর্যালোক আর মোড়ো বাতাস···তারই মাঝে অসীম শূন্যে চকচকে সোনালি একটা আলো দুলছে যেন। ও না, ওটা ডাঃ ফরচুন্যাটির মুখ!

—ও মেয়েটি নান হতেই জন্মেছে···দেহটাই বেড়েছে ওর, মনটা আছে সেই শৈশবের স্তরে। হাজার বছরেও ও রকম আপনি হতে পারবেন না রেভারেণ্ড সিস্টার।

কঠিনের মত অনায়াসে হঠাৎ মুখখানায় মাস্কটা পরিয়ে দিয়েছে এমিল। ক্রুদ্ধ ভাবটা ঢাকা পড়ে গেছে। মাস্কের ভিতর থেকে চোখ দু'টো মানবিক দেখাচ্ছে এবার।···রেডি? সেই মানবিক চোখ দু'টো জিজ্ঞাসা করছে। কালো জ্র দু'টো উঁচু হয়ে জোড়া লেগে গেছে তবু পরিহাসে। দস্তানা পরা হাতে প্রথম যন্ত্রটা তুলে দিলে সে।···

—তুমি ওঁর প্রেমে পড় নি তো? মাদার ম্যাথিল্ডা জিজ্ঞাসা করেছিলেন

কংগোয় তার দ্বিতীয় বছর সেটা, ম্যাডাম গুল্ভেন্স সবে তাঁর পঞ্চম কন্যাটির জন্ম দিয়েছেন। বেনজিবাবের ইচ্ছা ছিল টিউব বেঁধে দেন তাঁর—অবশ্য গোপনে। সামনে যেন ভাণ করবেন সন্তান ধারণের ক্ষমতা আর নেই, ভদ্রমহিলার বয়স হয়ে গেছে। সেবার যেরকম তর্কাতর্কি হয়েছিল দু'জনে তেমন আর কখনও হয় নি। প্রচণ্ড বাগবিতণ্ডার পর সে ঠেকাতে পেরেছিল ডাক্তারকে। তাঁকে কাপুরুষ বলেছিল—এই পাঁচবারের বার এক পুত্র বুভুক্ষু পিতার সামনা-সামনি হতে পারছেন না বলে, তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারছেন না বলে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরকম। ঝগড়া করে সার্জারি থেকে বেরিয়ে আসছিল যখন, কথাটা বলে ফেলার লজ্জায় মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। মাদার ম্যাথিল্ডা সেই সময় দেখেছিলেন তাকে। [ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

পরীক্ষার্থিনী

শ্রীগুণময় মান্না

'মণিদা,

তোমার ১৪ই মার্চের চিঠি আজ সকালে পেয়েছি। খুব ভালো লেগেছে। এটা মামুলি কথা নয়, তোমার প্রত্যেকটা চিঠি আমার এত ভালো লাগে! আমি নিজেই মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যাই, প্রতিবারেই এত নতুন করে ভালো লাগে কেন। অথচ কি লেখো তুমি! তোমার রিসার্চের বিষয় ছাড়া আর কিছু না। সবাই বলে, গবেষণার বিষয় মাত্রেই নীরস, শুকনো পাণ্ডিত্য, কিন্তু তুমি যে ভারতের পূর্ব-উপকূলের মন্দিরগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আমি যেন সেখানে মনে মনে তোমাকে অনুবর্তন করতে পারি। তুমি কি কেবল তথ্য সংগ্রহ করেই বেড়াচ্ছ? আচ্ছা, তুমি অনুভব কর না কিছু? আমার কিন্তু ঠিক উল্টো, তোমার চিঠিগুলো পড়তে পড়তে বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা বোধ হতে থাকে, আমি ঠিক বোঝাতে পারি নে·····'

অতসীর চিঠি লেখায় বাধা পড়ল। ওদেরই চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর এক ছাত্রী রুবি নিঃশব্দে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, চেয়ারের পিছনে হাত রেখে। ওর সকৌতুক ভঙ্গি দেখে মনে হয় ওরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মুচকে হেসে বললে, 'নিশ্চয়ই মধুপত্র লেখা হচ্ছে···' স্পষ্টত, বহু-ব্যবহৃত শব্দটা ওরা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করে না।

'তুই! বেশ···' চমকে উঠল অতসী, ঘাড়খানা কাৎ করে বললে, 'কতক্ষণ থেকে দুষ্টুমি করে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েছে শুনি···' সঙ্গে সঙ্গে রুবির হাত ধরে পাশে বিছানায় এসে বসবার জন্য ওকে আহ্বান করল।

'কতক্ষণ? যতক্ষণ তুই তন্ময় হয়ে মধুপত্র রচনা করছিলি···কিন্তু লিখছিলি কাকে? মিঃ মুখার্জীকে নিশ্চয়ই···রণজিৎ মুখার্জী···সত্যি, ওর নামের সঙ্গে তোর অতসী নামটা মানায় না, হওয়া উচিত বিজয়লক্ষ্মী···' বলতে বলতে চেয়ারের পিছন থেকে ঘুরে রুবি ওর সামনে এল এবং বিছানায় না বসে টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। 'এত গভীর মনোযোগ দিয়ে কি লিখছিলি রে·····'

তরুণীর স্বভাবসুলভ লজ্জা মুহূর্তের জন্য অতসীর মুখের ওপর ছোপ ফেলে গেল যেন, কিন্তু পরক্ষণেই ওর গভীর কালো চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'মিঃ মুখার্জীকে! কখখনো না···'

অতসীর আকস্মিক উত্তেজনা খট করে লাগল রুবির মনে, কিন্তু একটু আগেকার পরিহাসপ্রবণ ভাবটাই কাজ করতে লাগল ওর মধ্যে, 'লুকোচ্ছিস তো, কিন্তু লুকোলে আর কি হবে, তোর হবু-বরটিকে কেউ তো কেড়ে নিচ্ছে না।·····'

'তবু মনে হচ্ছে যেন একটু জেলাস হয়েছিস···'

'তা সত্যিই তোকে হিংসে হয়! বিত্তের সরস্বতী, রূপে অপ্সরী, গানে কিন্নরী···তার ওপর কে-বি ইণ্ডাস্ট্রিজের চীফ এগজিকুটিব এঞ্জিনীয়ার যার জন্যে পাগল···আচ্ছা, রণজিৎবাবু কবে থেকে তোর কাকার এ্যাসিস্ট্যান্ট হলেন রে···'

'আচ্ছা, ঠিক করে বলতো, আগ্রহটা কার জন্যে, সেই এঞ্জিনীয়ার না আমার জন্যে···'

এক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে রুবি বললে, 'সত্যি কথা বলব, তোর জন্যে। কলেজ-শুদ্ধ মেয়েরা তোর গান শুনে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু দেখ, তোর মসৃণ কপালের নীচে এই ভুরু, আর তোর চোখের দৃষ্টি··কতবার হিংসে হয় আমি যদি অমনটি পেতাম, নাঃ, আমি যদি ছেলে হতাম···' বলতে বলতে দুই হাতের তেলোর মধ্যে অতসীর মুখখানা নিয়ে তুলে ধরল রুবি, আর কুণ্ঠিত অথচ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অতসীর তুলে-ধরা মুখের মধ্যে একটা মৃদুহাসি ফুটে উঠল, আগেকার উত্তেজনাটা কেটে আসছিল আস্তে আস্তে, কিন্তু বুকের মধ্যেকার নিঃশব্দ বেদনা ওর হাসিটাকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারল না। বললে, 'কাকে চিঠি লিখছি পিছন থেকে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে দেখেছিস। না দেখে থাকিস তো চিঠিখানা এখনো খোলাই রয়েছে দেখ না··'

'দেখার দরকার নেই, বুঝতে পারছি মিঃ মুখার্জীকে নয়···কিন্তু অতসী তোর যেন কি হয়েছে, লুকোচ্ছিস নিজেকে।' বলতে বলতে নিজের হাতের তেলো দু'টো টেনে নিলে।

অতসীর মুখখানা ঝুঁকে পড়ল, নিটোল গ্রীবায় দেখা দিল ভাঁজ, কণ্ঠার গাছে গলায় রক্তস্রোত কাঁপছে লক্ষ্য করা যায়। সেই অবস্থায় অতসী বললে, 'তোকে লুকোচ্ছি না, কিন্তু একটু আগে তুই যে বলছিলি তুই যদি পুরুষ হতিস···সত্যিই যদি তাই হত!'

এক মুহূর্ত অনিশ্চিতভাবে থেকে রুবি বললে, 'এটাতে আরো আড়াল তোল হল···'

স্বীকৃতিতে ঘাড় কাৎ করল অতসী, কিন্তু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললে, 'খেয়েছিস তুই? সেকেণ্ড বেল পড়েছে বোধ হয়···'

'ও মা, তুই খাস নি! সেকেণ্ড বেলের অনেকটা পরেই তো আমি গেলাম, ফিরবার পথে তোকে এই অবস্থায় দেখে···ভাবলাম তুই খেয়ে এসেছিস।'

'লক্ষীটি, আমার সঙ্গে কিচেনে আর একবার চল, অণিমাদি'র বকুনি খানিকটা ভাগ করেই নিবি না হয়...'

আনন্দপুর ছাত্রী-নিবাসের রাত্রির খাবার শেষ ঘণ্টা সত্যিই অনেকক্ষণ আগে পড়ে গিয়েছিল। প্রথম দফায় নীচের ক্লাসের ছাত্রীরা ছুটোপুটি করে খাওয়ার ঘরে গিয়ে হাজির হয়, ঘণ্টা পড়ার আগের থেকেই কেউ কেউ গিয়ে জায়গা দখল করে। সমস্ত হোস্টেল তখন জোয়ারের মতো কলরবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই পর্ব শেষ হয়ে নতুন দলের জন্য জায়গা হতে আধঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিট সময় লাগে দ্বিতীয় দলের খাওয়া যখন চলতে থাকে, তখন ক্রমে-ক্রমে আর এক প্রস্থ ঢেউ ওঠে কলরবের: খবরের কাগজ আর মাসিকের পাতার সামনে, ক্যারামবোর্ড আর পিংপং-এর টেবিল ঘিরে। আজ সত্যিই দেরি হয়ে গিয়েছিল, ক্রমে-ক্রমে উচ্ছ্বাসের রেশ তখন মিলিয়ে এসেছে, আর খাওয়ার ঘরে তখন কেউ ছিল না।

দরজার মুখে রুবির হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ওকে থামাল অতসী, 'আমার ওপর তুই রাগ করেছিস! দোতলা থেকে নেমে এতটা পথ এলাম, একটা কথাও বলছিস না। আমি তোর কথার উত্তর দিতে পারি নি তখন, সত্যিই লুকোবার জন্যে নয়, নিজের কথাটা কেমন করে গুছিয়ে বলব সেইটেই ঠিক করতে পারছি না...'

রুবির অভিমান হয় নি—তা নয়, কিন্তু কৌতূহলটাই বড় হল ওর কাছে। তা ছাড়া, অতসীর ফিরিয়ে-নেওয়া মুখে যে বেদনার ছাপ দেখেছিল সেইটেই ভুলিয়ে দিলে ওকে। বললে, দেখ, প্রত্যেকেরই এমন কতকগুলো কথা আছে, কিছুতেই যা অন্যের কাছে বলা যায় না! সেই জন্যেই আমি পীড়াপীড়ি করতে চাই নে, তোকে ভুলও বুঝব না'...

অতসী আবার কথার মোড় ফেরাল, 'কিন্তু তোর সেই কথাগুলোই আমাকে না বললে আমি রাগ করব...পরীক্ষার পরই তো তোর বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। যাঁর সঙ্গে ঠিক হয়েছে তাঁর কথা আমাকে বল কিছু, তিনি যেন কোন স্কুলের টিচার, না?

হেসে ফেলল রুবি, 'বরিশালের গইলা গ্রামের রায়-বংশের মেয়ের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা, আমরা যেমন, তেমনি আমাদের ঘর হবে তো?'

'তুই আমাকে খোঁচাচ্ছিস, কিন্তু আমি তোকে খোঁচা দিতেও চাই নি, তোর কথা গায়ে মাখছিও না। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে তোর মতো ভাগ্য যদি আমারও হত, তা হলে কি না খুশি হতাম'...বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে উঠল অতসী।

'আচ্ছা, তুই কি মিঃ মুখার্জীকে বিয়ে করতে চাস না? কিন্তু কেন'...সত্যিই বিস্মিত হল রুবি।

পায়ে পায়ে ওরা ঘরের মধ্যে চলে এসেছিল, সামনের যে কোনো একটা বেঞ্চেই বসে পড়ল ওরা। ঘরের ও-প্রান্তে বলরাম একহাতে বালতি অন্যহাতে ঝাঁতা নিয়ে শেষদফায় বেঞ্চ পরিষ্কার করে চলে যাচ্ছিল, এদিকে দৃষ্টিপাত করে রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে বললে, 'অতসী দিদিমণিকে খেতে দাও ঠাকুর...' পরে এদিকে আবার লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'রুবি দিদিমণি আবার খাবেন না কি...'

ঠাকুর দুই-তিন দফায় ডাল-ভাত-তরকারি দিয়ে চলে গেল। স্পষ্টত এইরকম দেরি করে আসাটা ওরা পছন্দ করল না। অতসী ভাত সামনে রেখে বসে রইল কতক্ষণ, রুবি খেতে বসার পর নাড়াচাড়া করতে লাগল। হঠাৎ বললে, 'তোর কাছেই শুনেছি, তোর ভাবী শ্বশুরের চালের আড়ৎ আছে রামপুরহাটে। তোর শাশুড়িও দেখতে এসেছিলেন তোকে, আগেকার আমলের লোক তো, নিশ্চয়ই তোর মধ্যে মেয়েদের লক্ষীশ্রী দেখে পছন্দ করে গেছেন...আমি বেশ বুঝতে পারি তোকে বরণ করে নেবেন তিনি। বৌ হিসেবে তোর স্বাধীন চলা-ফেরায় অনেকটা বাধা পড়বে, রান্নাবান্না, গেরস্থালীর কাজেই কাটবে অনেকটা সময়...'

নিজের অজান্তেই একটা খুশির আভাস ফুটে উঠল রুবির মুখে, কিন্তু ও বললে, 'এই বর্ণটা তো সব মেয়ের পক্ষেই সত্যি, আমারটাই বিশেষ হল কি করে...'

'না, সব মেয়ের পক্ষে সত্যি নয়। অন্তত আর সবার পক্ষে যেটা অত্যন্ত সহজেই আসে, আমার পক্ষে সেটা মরীচিকা ছাড়া আর কিছু নয়, অথচ তোরাই আমাকে হিংসে করিস! ওখানে গিয়ে আমি কি পাবো? ঘরকন্নার দায়িত্ব থাকবে না, প্রাসাদের মতো বাড়ি, কিন্তু তার সবটাই ঠাকুর-চাকর-আয়া-বেয়ারার কর্তৃত্বে চলবে। আমাকে দায় নিতে হবে সোসাইটির, ওদের সামাজিকতার। আমাকে ক্লাবে যেতে হবে আর কিছুটা টেনে আনতেও হবে বাড়িতেও। আমার গানের সম্বন্ধে মিঃ মুখার্জী উৎসাহিত, কিন্তু গান ভালো বা উনি গান বোঝেন সে জন্যে নয়...সত্যি কথাটা বুঝতে অসুবিধে হয় নি আমার...আর্টিস্ট মেয়েকে তিনি বিয়ে করতে চান, তার কারণ অন্যের চোখে তিনি বিশেষ হয়ে উঠবেন বলে...'

'তুই রাগ করিস না, একটা কথা বলছি, নিজেকে বাড়িয়ে তুলছিস না তুই? তোর কথাটা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু মিঃ মুখার্জীদের ডিস্টিংশানের অভাব আছে কিছু?'

'সত্যি! আমারও অবাক লাগে। মেয়েদের ঠিক পত্নী হিসেবে দেখে না ওরা, যে কেবল ঘরের গৃহিণী। পত্নী-নির্বাচনে অন্যদের উপর একটা টেক্কা দিতে পারলে খুশি হয় ওরা, একটা অলক্ষ্য কম্পিটিশন যেন আমি বুঝতে পারি। ব্যাপারটা যেন একটা আকস্মিক প্রক্সিটের মতো জমকালো, অন্যদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো...'

'আমি তোর কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, আর তোকে অবিশ্বাসও করি নে আমি। কিন্তু তোর যদি এতই খারাপ লাগে, তা হলে বিয়ে না করলেই হয়...'

হাসল অতসী, এবার রুবি অনুরোধ না করলেও খেতে আরম্ভ করল। বললে, 'জানিস, নিজেই অনেকখানি জড়িয়েছি, থার্ড ইয়ারের পর গেল সামারে মাসখানেক, কাকুর ওখানে ছিলাম জানিস তো...শেষ পর্যন্ত কি হবে জানি নে। আজ হোক কাল হোক এর একটা সমাধান আমাকে করতেই হবে। আমারও মেয়াদ তোরই মতো, এপ্রিলের শেষে পরীক্ষা হওয়া পর্যন্ত...যে কথা বুকের মধ্যে গুমরে মরছে, তুই না জিজ্ঞেস করলে তা বেরোত না। কিন্তু এ ব্যাপারে তুই পারিস নে আমাকে সাহায্য করতে?'

॥ ২ ॥

খাওয়ার সময় এবং তার পরেও অতসীর ঘরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলল ওরা, অতসী নিজের বুকখানা উজাড় করে মেলে ধরল। কিন্তু তাতে কি বন্ধুর থেকে সত্যিই কোনো সাহায্য পেয়েছিল ও, নিজের সমস্যার সমাধান হয়েছিল কিছু? না, তা হবার নয়, জীবনের পরম

সন্ধিক্ষণে যে সমস্যা আসে, জীবন দিয়েই তার সমাধান করতে হয়। অতসী আশ্চর্য হয়ে দেখলে, এতক্ষণ কথা বলার পর বুকের ভারটা হয় তো কিছু কমেছে, কিন্তু ভিতরে আগুনটা তখনও ধিকিধিকি জ্বলছে। তখনই ওর ইচ্ছে হল, সুরেলডাঙায় মার কাছে একবার যেতে, তাঁর হয় তো সে কিছু নির্দেশ পাবে। মার কথা মনে হতেই বুকের ভেতর একটা মোচড় অনুভব করল অতসী। মালিনী দেবী তার মা, সুরেলডাঙা গার্ল'স স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বাবা নেই, কোনো ভাইও নেই তার। বাবার নিজের হাতে-গড়া ঐ স্কুল আর একমাত্র মেয়ে নিয়ে তার সংসারটিকে এতদিন বুকে করে রেখেছেন তিনি। এখন বয়েস হয়েছে, স্বাস্থ্যহীন, সৌভাগ্যহীন জীবনে একমাত্র স্বামীর এবং নিজের আদর্শকে মেনে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

ঠাকুর্দা ছিলেন কলকাতার এক ছোট খাটো মেশিন-শপের মালিক। গত মহাযুদ্ধের সময়ই তিনি নিজের কারখানা এবং বিত্ত সম্পদ উল্লম্ফিত গতিতে বাড়িয়ে তোলেন। বিনয়শঙ্কর আর সুজয়শঙ্কর তাঁর দুই ছেলে। বড় ছেলে বাবার আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন নি। অনেকদিন পর্যন্ত তিনি বরিশালের গ্রামেই কাটিয়েছেন, তারপর পশ্চিম বাংলায় চলে আসেন নিজের স্ত্রীকে নিয়ে। সুরেলডাঙায় গড়ে তোলেন স্ত্রীর নামে মালিনী দেবী গার্ল'স্ স্কুল। প্রথম থেকে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ছিলেন গ্রামের শিক্ষক। অতসীর শৈশবে বিনয়শঙ্করের মৃত্যু হলে মালিনী দেবীই সব ভার হাতে তুলে নিয়েছেন।

আর তাঁর ছোট ছেলে হলেন সম্পূর্ণভাবে বাবার অনুগামী। যুদ্ধের ঠিক পরেই আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড ঘুরে এসেছেন তিনি। বাবার মৃত্যুর পর সমগ্র শিল্প-সংস্থাটি তাঁর হাতে পড়েছে। অনেকবারই বৌদি আর ভাইঝিকে নিজের কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন তিনি, কিন্তু সফল হন নি। বাবা-মার কথা মনে হলে অদ্ভুত একটা গর্ব অনুভব করে অতসী, ঠিক এখনও একটা কঠিন আবেগ বুকের ভেতরটায় ঠেলে উঠল, 'ওঁরা যদি লড়াই করতে পেরে থাকেন, তা হলে আমিও পারব'···মনে মনে কথাগুলো উচ্চারণ করল ও। আর মনে হল এ ব্যাপারে মা-ই তার সহায় হতে পারেন।

হাই তুলে একবার টেবিলের ওপর মাথাটা রাখল অতসী। খুড়তুতো ভাই মণিশঙ্করকে যে চিঠিটা লিখতে বসেছিল সে, ভেবেছিল যে সেটা শেষ করবে। কিন্তু হাতে কলম নিয়ে লিখতে গিয়ে দেখলে, তখনকার আবেগ অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে, মাঝখানকার ফাঁক পড়াতে চিন্তাটাও কেমন এলোমেলো হয়ে উঠেছে। এতক্ষণ রুবিকে যে কথাগুলো বলছিল তা মনে করবার চেষ্টা করল। হঠাৎ ওর মনে হল, সব কথা অমনি করে রুবিকে না বললেই হত। মণিদা'কে যা বলবার কথা ভাবছিল ও, একটা অসতর্ক মুহূর্তে সেগুলোই রুবিকে বলেছে। তার নিজের দিক থেকে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, রুবি এটা কিভাবে নিয়েছে কে জানে। সে কি তার কথাগুলো ঠিকভাবে বুঝবে?

দেরাজ টেনে মণিশঙ্করের শেষ চিঠিখানা বের করতে চাইল অতসী, তখন যার উত্তর লিখতে বসেছিল। খানকয়েক চিঠিই বেরিয়ে এল একসঙ্গে। কেমন একটা ঝোঁকের মতো লাগল ওর, সবগুলোর ওপরই চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল। কোথাও কোথাও চমকে যেতে হল ওকে, কিন্তু আস্তে আস্তে ওর পরিচিত প্রিয়-জগতের মধ্যে এসে পড়ল। ওর মনে হল, মণিদা' তার চিঠিতে যে সব কথা লেখে, কোথায় তার সঙ্গে নিজের জীবনের যোগ আছে। এক জায়গায় সে লিখেছে, 'এই পুরানো মন্দির-গুলোতে প্রাচীনকালে দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল, নৃত্যগীতনিপুণা তরুণী কন্যাদের মন্দিরে উৎসর্গিত করা হত। এতে ধর্মের সমর্থন ছিল। অথচ সত্যি কথা বলতে কি, রাজসভার নটী আর এই সব মেয়ের মধ্যে সত্যিকারের কোন পার্থক্য ছিল না। আমার কি মনে হয় জানিস, আমাদের সামাজিক গঠন ছিল এমনিই, তাতে নারীদের সম্মানের আসন দিতে পারি নি আমরা, নিজেদের পাপ আর ত্রুটি সঞ্চারিত করেছি তাদের মধ্যে, তাদের কাছে সেটা তুলে ধরেছি সম্মানের জিনিস বলে, নিজেদেরও ঠকিয়েছি। এখনও যে অবস্থার খুব পরিবর্তন হয়েছে তা মনে হয় না, কেবল তার রূপের বদল হয়েছে। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগে, কোথাও নারীজাতির প্রতিবাদ নেই। এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে নারী নীরব, পুরুষ তাকে যে দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে সেই দিকেই চলেছে। উভয়ের মধ্যে কারুর পক্ষে তাতে ভালো হয়েছে কি?'

আর এক চিঠিতে মণিশঙ্কর লিখেছে, 'দেখ অতসী, দিনে দিনে আমাদের পারিবারিক-জীবনে একটা সঙ্কট অনুভব করছি, দেখছি বাবার পথ আমার নয়। বাবা আমার সম্বন্ধে ক্ষুব্ধ, হতাশাও বোধ করেন, এ জন্যে তাঁকে দোষ দিতে পারি নে। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, আমার সম্বন্ধে আশা করা ছাড়া তাঁর উপায় নেই, অথচ আমার ওপর তিনি নির্ভর করতে পারেন না। কিন্তু রুবি (অতসীর খুড়তুতো বোনের নামও রুবি) আমাদের পারিবারিক আবহাওয়ার সঙ্গে ঠিক মিশে গেছে। শুধু তাই নয়, সেই পরিবেশের মধ্যে সে নতুন প্রাণসঞ্চারও করেছে। রুবি যদি আমার ভাই হত। প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্ব-বোধের মধ্যে সফল উত্তরাধিকারের ধারণাও জড়িত, আমি সেখানে বাবার মুখ রক্ষা করতে পারি নি। বি বাড়ির মেয়ে হলেও হয় তো সেটা পারবে। ভালো কথা, তুই কি জানিস, রুবি কিছুদিন হল অক্সফোর্ডে গেছে, ও কি তোকে লেখে?'

এই চিঠিরই শেষ দিকে হঠাৎ সে লিখেছে, '[illegible] আমি যদি
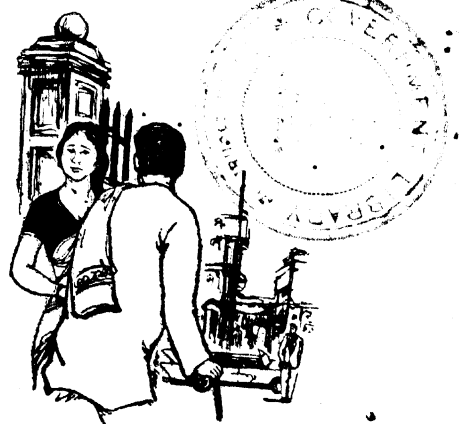
জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে হতাম। এটাকে হয় তো অলস মস্তিষ্কের উর্বরতা বলে ঠাট্টা করবি, কিন্তু সেটা ভাবতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমার ইচ্ছে করে তুই আর আমি দুই ভাইবোনে একই জায়গায় একই সঙ্গে থাকবো, আমাদের পছন্দমতো জীবনসঙ্গী বেছে নিয়ে আসব আমরা। জ্যাঠামশাই যে ব্যক্তিত্বের আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন, তাকেই আমরা একই সঙ্গে রূপ দিতাম, নিজেদের জীবন-প্রেরণা পেতাম তার থেকে।···'

শুতে যাবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অতসী। যে চিঠিগুলো খুলেছিল, সেগুলো পুনরায় ভাঁজ করে রাখার মতো উৎসাহ ছিল না ওর, সেই অবস্থাতেই দেরাজের মধ্যে ঠেলে রাখল। ফুলের মতো যে হৃদয় ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে, সৌরভ ছড়াবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে, সেটাই বেদনার্ত হয়ে উঠল। কান্নার বেগে থরথর করে কাঁপতে লাগল তার দেহ। মণিশঙ্করের চিঠির মধ্য দিয়েও অতসী আশঙ্কা করে, তার জীবনকে ঘিরে একটা কালোছায়া ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। কিন্তু মণিদা'র কি হল? সেও কি নিজেকে এমনি অসহায় বোধ করছে? কি তার যন্ত্রণা? সে ছেলে, নিজের ওপর জোর আছে তার, সে যদি নিজেকে না শেষ করতে চায়, কে তাকে ধরবে? কিন্তু তবু সে একটা উৎসাহবোধও করে। তারা দুই ভাইবোনে চিন্তায়-বেদনায় একটা জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে পথ কেটে বেরোতে পারবে না তারা?

আলো নিবিয়ে বিছানায় যেতে গিয়েই থমকে গেল অতসী, একটু এগিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস কপালে-মুখে এসে লাগল, ঠিক এখনই অতসী বুঝতে পারল তার মাথা ধরেছে, দুই রগ টিপটিপ করছে। সামনেটা ভালো করে দেখা যায় না, বাগানের গাছপালায় দুর্ভেদ্য জালের মতো তৈরি হয়েছে। দিনের বেলা তো এমনি মনে হয় না। কতক্ষণ সেই অন্ধকারের দিকেই তাকিয়ে রইল অতসী, একসময় যন্ত্রবৎ এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে।

আজ চুল বাঁধা হয় নি, সন্ধ্যার দিকে এলো খোঁপায় জড়িয়ে রেখেছিল, এখন সেটা খুলে দিতে গিয়ে একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ অনুভব করল অতসী। ডান হাতখানা মুড়ে কপালের ওপর রেখে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল ও। 'মা গো, কেন আমার এমনি হয়···সবারই কি তাই?'—আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রশ্নটা বুকের মধ্যে কুরে-কুরে খেতে লাগল। আস্তে আস্তে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল একখানা মুখ। প্রথম পরিচয়ের সময় যে অসীম আগ্রহ নিয়ে এই মুখখানা দেখেছিল অতসী, তা কবে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তবু তার অনেক আশা এবং নৈরাশ্যের হেতু এই মুখখানা হয় তো তার জীবনে চিরকালের জন্য কাঁটার মতো রইল বিঁধে।

॥ ৩ ॥

সুজয়শঙ্করের ফার্মের চীফ একজিকুটিভ্ অফিসার রণজিৎ মুখার্জী কার্যত সুজয়শঙ্করের ডান হাত হয়ে উঠেছিল। নিজের ছেলের সম্বন্ধে নৈরাশ্য এবং অস্বস্তি সুজয়শঙ্করকে বেশি করে আকর্ষণ করেছিল

যুবকটির দিকে। ওপরওয়ালার নৈর্ব্যক্তিক আগ্রহ অপেক্ষা তাঁদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আবেগটাই ক্রমে বড় হয়ে উঠছিল। তাঁদের ক্লাবে এবং নিকট-মহলে সুজয়শঙ্করের অকথিত ইচ্ছা সরব হয়ে উঠছিল যে, মেয়ে রুবির সঙ্গে তিনি রণজিতের বিবাহ দেবেন। এই নিয়ে একটা উত্তেজক কানাঘুষারও সৃষ্টি হল। রুবির বহু-প্রার্থীর মধ্যে দু-একজনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা যে প্রত্যাশার সঞ্চার করেছিল, এটা এল তার বিপরীত তরঙ্গ হিসেবে। কাছাকাছি বন্ধুদের পক্ষে সত্যাসত্য যাচাই করা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠল। রণজিৎ মুখার্জীকে বললে কথাটা সে এড়িয়ে যেত। আর রুবির বন্ধুরা তাকে চেপে ধরলে বলত, 'বিয়ে তো করতেই হবে, কিন্তু তার দেরি আছে। একবার বিলেতটা ঘুরে আসতে চাই। বাবা গিয়েছেন, যাঁর সঙ্গে আমার নাম জড়াচ্ছিস তিনিও ঘুরে এসেছেন একবার···আমাকে অন্তত তাঁর যোগ্য হতে হবে।'

ঠিক এমনি সময় দৃশ্যপটে অতসীর আবির্ভাব। ও তখন গরমের ছুটিটা কাটাবার জন্যে কলকাতায় কাকার বাড়িতে এসেছিল। রণজিৎ আর রুবিকে নিয়ে যে আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা এখন অতসীকে নিয়ে নতুন পথে মোড় ফিরল। মফস্বলের মেয়ে অতসীর পক্ষে এদের মনোযোগ আকর্ষণ করার কথা নয়, কিন্তু অতসীর দেহে ছিল সত্যকার নারী-সৌন্দর্য এবং কোনো কৃত্রিমতার জন্য তার সজীবতার ওপর মোটেই প্রলেপ পড়ে নি। হঠাৎ রণজিৎ মুখার্জী অতসীর প্রতি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ল এবং সেটাকে সে গোপন করার চেষ্টা করল না। সুজয়শঙ্করের বাড়িতে নিয়মিত আসা ছাড়াও কখনও রুবি আর অতসী দুই বোনকে একসঙ্গে, কখনো অতসীকে একলাই গাড়িতে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে লাগল। এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে রুবি উৎসাহ দেখায় আর আড়ালে হাসাহাসি করতে থাকে বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু অতসীর অবস্থা হয়ে দাঁড়াল আবিষ্ট কিশোরীর মতো। রণজিৎ মুখার্জী গোপন করার আর্ট জেনেও যা গোপন করতে চায় নি (কাদের ও টেক্কা দিতে চাইছিল তা খুবই স্পষ্ট)—অতসী সেই আর্ট জানত না বলেই সেটা গোপন করতে পারল না। অন্যদের চোখের সামনেই নিজেকে রণজিতের একেবারে কাছাকাছি এনে ফেলল ও।

রুবির বন্ধুরা বললে, 'গ্রামের মেয়ে, পুরুষ কখনো দেখে নি তো! কিন্তু মুখার্জীটা কি রকম, পুরুষরা এমন বেহায়া হতে পারে তা জন্মেও ভাবি নি···'

রুবি বললে, 'এটা অন্যায় হচ্ছে, তোদের পেছনে ঘুরলে বোধ হয় সেটা বেহায়াপনা বলতিস না···'

'তোর কি ভাই, পাঁচটার মধ্যে চারটে বাদ দিলেও একটা বাকি থাকবে···'

'ইস্, শেষ পর্যন্ত আমার ওপরই কটাক্ষ! শোন্, নিরাশ হস নে, যাদের কখনো একজনের পিছনে ঘোরার অভ্যেস হয়েছে তারা অন্যদের পিছনেও ঘুরবে···দু'একটাকে তোদের কাছে পাঠিয়ে দেব!'

এরই মধ্যে ওদের ক্লাবের মাসিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে সমস্ত বিদ্রূপ আর বিরূপতা সত্ত্বেও ওরা চমৎকৃত না হয়ে পারল না। রণজিৎ কথায় কথায় অতসীকে একবার বলেছিল তাদের ক্লাবে একদিন গান গাইতে, যদিও সে ভাবে নি যে অতসী সত্যিই রাজী হয়ে যাবে। এর মধ্যে অতসীর গান সে শোনে নি, গান সম্বন্ধে তার কোনো উৎসাহও ছিল না। অতসী বললে, 'আপনি কি সত্যিই চান যে আমি গান গাই, আপনি খুশি হবেন তাতে?'

'সার্টেনলি, ত্যাট্‌ল্ বী এ পার্সন্যাল ফেভার টু মী···'

সত্যি কথা বলতে কি, রণজিৎ যখন অতসীর নাম শিল্পীদের তালিকাভুক্ত করার জন্ত ওদের সেক্রেটারিকে জানাল, তখন ওর কেমন ভয়ই করছিল, ঝক্কিটা না নিলেই ভালো হত। ওদের নাম জড়িয়ে যে হাসাহাসিটা চাপা ছিল, সেটা কেমন শাণিত বিদ্রূপে ছিটকে পড়বে তা অনুমান করতে ওর অসুবিধে হল না। ভেবেছিল অনুষ্ঠানের দিন ওর সঙ্গে আসবে না, রুবির সঙ্গে অতসী চলে যাবে। কিন্তু অতসী যেন ঠিক তার বিপরীতটাই ভেবে নিয়েছিল এবং অদ্ভুত আগ্রহ দেখিয়ে ওর সঙ্গেই আসতে চাইলে। বললে, 'আপনাদের ক্লাবে আমি প্রথম যাচ্ছি, এর আগে কখনো কোনো ক্লাবেই যাই নি আমি, একলা গেলে আনাড়ির মতো কিছু করে বসব···'

'ক্লাব-এটিকেটের কথা বলছেন? এ ব্যাপারে আপনার বোন আমাকে তিনবার পালিশ করতে পারেন···'

'রুবি? ওরা তো আগেই বেরিয়ে গেছে, বললে যে ক্লাবে যাবার আগে আর কোথায় যেতে হবে। কিম্বা কে জানে, হয় তো আনাড়ি ভেবে এড়িয়ে গেছে···'

রণজিৎ মুখার্জীর বুকের ভেতর ধক করে উঠল, মেয়েটা এত সরল যে অতিশয় সত্য কথাটাও বুঝতে পারে না, নয় তো এমন রোখালো যে বুঝেও স্বীকার করতে চায় না। দু'টো সম্ভাবনাই ওর বুকের ভেতর ঘুলিয়ে তোলে। কিন্তু পরিহাসের ধারাটা বজায় রেখে বললে, 'আমি কিন্তু আপনাকে একটু আনাড়ি বলেই মনে করছি। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে এই সব অনুষ্ঠানে পোশাকপত্র ফিটিং হওয়া দরকার···'

'আমার পোশাকের কথা বলছেন? জানেন, আমি এই শাড়িটা পরেই কলেজের লাস্ট সোস্যালে গান গেয়েছিলাম, খুব ভালো হয়েছিল। আমি ইচ্ছে করেই এই শাড়িটা পরে এসেছি।'

'কেন, আপনার বোনকে দেখেন নি?· সত্যি কথা বলতে কি তাঁর সবকিছুই আমার পছন্দ হয় না, কিন্তু সো ফার অ্যাজ ড্রেস ইজ কন্‌সার্নড্···'

মুহূর্তের জন্ত চুপ করল অতসী, রুবির কথা ভেবে লজ্জার একটা ছোপ পড়ল ওর মুখের ওপর। বললে, রুবি আর আমি বোন, আমরা দু'জনে দু'জনকে খুবই ভালোবাসি, কিন্তু আপনি হয় তো জানেন, আমাদের জীবন ঠিক একভাবে গড়ে ওঠে নি। ও আমাকে বোন বলে সব জায়গায় পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে, ওরও কোনো কোনো জিনিস···যেমন এই যে পোশাকপত্রের কথা বললেন, সত্যিই ভালো লাগে না আমার। তার মানে, বুঝতেই পারছেন কেউ কাউকে দোষ দিতে পারি নে আমরা···'

'মনে হয় আপনি একটু একরোখা। আচ্ছা, এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা হবে···'

অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। অতসীর পালা আসবার আগে পর্যন্ত কেমন মনমরা হয়ে রইল ও। এই প্রথমবারের জন্ত ওর মনে একটা সংশয় উপস্থিত হল যে, এখানে এসে সে ভালো করেছে কি না। রণজিৎ মুখার্জী হয় তো সেটা বুঝল, মুহূর্তের জন্ত একটা সমবেদনাও বোধ করলে। কিন্তু সবারই আত্মরক্ষার প্রয়োজন আছে, রুবিদের দলে গিয়ে ও নিজের আসন নিলে এবং সরবে গল্প করতে লাগল। ঠিক এইখানেই এল সেই পরিবর্তন। যে নিশ্চিত এবং পূর্বলালিত বিদ্রূপ ফেটে পড়ার অপেক্ষায় ছিল, সেটা বিস্ময় এবং প্রশংসায় রূপান্তরিত হল। অতসীর প্রথম গানের শেষে রণজিৎ মুখার্জীকে নিয়ে পড়ল ওরা, নতুন শিল্পীর সন্ধানের জন্ত ওদের অভিনন্দন জানালে এবং দ্বিতীয় গানের শেষে অতসীকে নিজেদের মধ্যে আহ্বান করে নিয়ে এল। যারা ওকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করত, তাদের মাঝখান থেকে সেদিন সহজে ও ছাড়া পেল না। অতসী জানত না যে জিনিস ও জয় করে নিয়েছে তাকে নিজের জন্ত গ্রহণ করা ওর পক্ষে কতখানি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

এরপরে মাঝখানে একটা দিন বাদ দিয়ে রণজিৎ মুখার্জীর সঙ্গে সেই বোঝাপড়ার সময় উপস্থিত হল। রণজিৎ আশান্বিত, উচ্ছ্বসিত এবং নতুন জয়ের আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে। রুবি কার্যত তাকে প্রত্যাখ্যান করে যে আঘাত দিয়েছিল, তার প্রত্যুত্তর দিতে পারবে সেই সম্ভাবনায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ও। কথা উঠেছিল ওদের ক্লাবের আগামী অনুষ্ঠানে যে নাট্যাভিনয় হচ্ছে, তাতে অতসীর অংশগ্রহণ করার ব্যাপার নিয়ে। অতসী অস্বীকার করেছে এবং রণজিতের অনুনয় সত্ত্বেও তাতে মত দিতে পারছে না। সুজয়শঙ্করের বৈঠকখানায় অতসীর পাশে বসে তার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে রণজিৎ বলছিল, 'দেখুন, (ইচ্ছে সত্ত্বেও এতদিনেও রণজিৎ অতসীকে 'তুমি' বলতে পারত না) বারবার কেন না বলছেন? সকলের কাছে আপনি কতখানি সম্মান পাবেন, আপনার নাম ছড়িয়ে পড়বে কতখানি। আমার ভাবতে ভালো লাগে, আপনার নাম কাগজে বেরোচ্ছে, সকলেই জানাচ্ছে অভিনন্দন, আপনাকে দেখবার জন্ত সকলের চোখেই আগ্রহ, আর তার মাঝখান থেকে আপনাকে আমি নিয়ে আসছি···আপনি আমাকে সেই গৌরবের অধিকারী করতে চান না?'

'আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নে, আমি যা ঠিক তাকেই আপনি স্বীকার করতে পারেন না, না?' পরিপূর্ণদৃষ্টিতে রণজিতের দিকে তাকাল অতসী, সেই দৃষ্টিতে একই সঙ্গে বেদনা আর অনুনয় ফুটে উঠল।

'তা নয়, আপনার সঙ্গে আমার যে দেখা হয়েছে সেটাকে আমি পুরস্কার বলেই মনে করি। কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধে ট্র্যাডিশন্যাল ধারণাটা আমি পছন্দ করি নে। বিয়ে সবাই করে, বিয়ের পরদিন তাদের আর কেউ মনেও রাখে না। কিন্তু আমাদের একটা সমাজ আছে, সেখানে দু'টি মানুষ বিয়ের দিনের পরেও বিশেষ হয়ে রইল এইটে কি চাইবার মতো জিনিস নয়?'

বুদ্ধিমতী অতসীর পক্ষে একথার অর্থ বোঝা কঠিন নয়। ও

মৃদুস্বরে বললে, 'আমার ধারণা কিন্তু ঠিক তার উল্টো। বিয়ে হবে একান্ত ব্যক্তিগত, একমাত্র ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা অন্তের কৌতূহলী চোখের সামনে আসবেই না। যা কিছু লোক-লৌকিকতা তা সেই ঘরটিকে কেন্দ্র করেই থাকবে···'

'সেখানে অফিস থেকে ফেরার পর স্বামীকে স্ত্রী চা করে খাওয়াবে, ভাত খাবার সময় পাখা হাতে করে বসবে, শোবার সময় পদসেবা করবে···'

হেসে ফেলল অতসী, কিন্তু গম্ভীর হতে গিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, সেটাই তো হওয়া উচিত।'

অতসীর হাতখানা ছেড়ে দিলে রণজিৎ মুখার্জী, সিগারেট ধরাবার অছিলায় একটু দূরে সরে গিয়ে বসল এবং সিগারেট বের করে বাক্সের উপর ঠুকতে লাগল। এইরকম স্ত্রীর সম্ভাবনাতেও ওর বুকের ভেতরে কেমন করে ওঠে। স্তিমিতকণ্ঠে বললে, 'সে কথা যাক, কিন্তু এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে আপনার আপত্তি কোথায়, জানতে পারি?'

সুর কেটে গেল, এতক্ষণ কথা বলার যে আগ্রহ বোধ করছিল অতসী সেটা অর্থহীন হয়ে উঠল। তবু কথাটা শেষ করা দরকার সেইজন্য বললে, 'পুরুষদের সঙ্গে আমি কখনও অভিনয় করি নি, মা সেটা পছন্দ করবেন না। তা ছাড়া, আমার কলেজ তখন খুলে যাবে···'

'সত্যিই, আমার অবাক লাগছে, আমি আপনার সম্বন্ধে কি ভেবেছি! পুরুষদের সঙ্গে আপনি এর আগে অভিনয় করেন নি। এই পৃথিবীতে আপনি আগে ছিলেন না, কিন্তু এখন তো বেশ চলাফেরা করে বেড়াচ্ছেন···'

উঠে দাঁড়াল রণজিৎ, অসমস্ত সিগারেটশুদ্ধ পিষে দুইহাত মুড়ে পায়চারি করতে লাগল। তার কথার কোনো উত্তর প্রত্যাশা করে নি সে, কিন্তু অতসী বললে, 'আমার বিশ্বাস, আমার ইচ্ছার ওপর কোনো শ্রদ্ধাই আপনি রাখতে চান না?'

স্পষ্টত ব্যাপারটা কলহে এসে দাঁড়াল। রণজিৎ এটা আশঙ্কা করে নি, মুহূর্তে ওর মধ্যে সেই কর্মিষ্ঠ, আত্মবিশ্বাসী, বুনো যুবকটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এক পা এগিয়ে এসে অতসীর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল, বললে, 'ঠিক তার বিপরীত, আপনিই আমার সম্বন্ধে কোনো শ্রদ্ধা রাখতে পারছেন না। কথার খেলা আমি পছন্দ করি নে, কিন্তু আমার ইচ্ছেটাও আপনি জানতেন। আমি আপনাকে নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম, যেখানে আমি আছি, আমি চেয়েছিলাম সেখানকার আপনি কেন্দ্রমণি হয়ে উঠবেন···'

'শুনুন, আপনি যা বলছেন তার থেকে গর্বের বিষয় কোনো মেয়ের পক্ষে হতেই পারে না। কিন্তু তার ব্যাখ্যাটা আমি অন্যরকম বুঝি। আমাকে আপনি সাজাতে চান ঠিক রুবি আর তার বন্ধুদের মতো···'

'দেখছি যে আপনি আমাদের সমাজকে ভীষণ ঘৃণা করেন। তা না হলে এসব কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু আপনার মতো বুদ্ধিমতী মেয়েও এটা কেন বুঝতে পারেন না যে আপনাকেই আমাদের সমাজে আসতে হবে, আমাকে নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে নিয়ে যাবেন না···'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল অতসী, একটা দুরন্ত কান্নার বেগ থেকে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করল। মৃদুস্বরে বললে, 'আপনি একটু আগেই বলছিলেন ট্র্যাডিশন্যাল ধারণা। আপনি পছন্দ করেন না, কিন্তু এটা হচ্ছে মেয়েদের প্রতি পুরুষের চিরকালের নির্দে···'

রণজিতের দৃষ্টিতে আহত বিস্ময় ফুটে উঠল, কিন্তু কি বলতে গিয়ে সংযত করল নিজেকে। অতসীর বিপরীত দিকে সামনের একটা কৌচে বসে ধীরে-সুস্থে বললে, 'লেট আস চেঞ্জ দি টপিক, আপনি আর কতদিন কলকাতায় আছেন?'

'বোধ হয় দিন-পাঁচেক, মাকে অনেকদিন দেখি নি, চিঠিও পাই নি···'

'আচ্ছা, আপনাদের বাড়িতে কে কে আছেন?'

কথাবার্তার মধ্যে একসময় ও অনুরোধ করলে, 'আচ্ছা, এর মধ্যে একদিন আমাদের বাড়িতে আপনার যাওয়া সম্ভব হবে, ধরুন পরশু দিন সন্ধ্যা সাতটায়?'

অতসী সম্মতি দিতে তখনকার মতো কথাবার্তা শেষ হল।

কলকাতা থেকে আসার আগের দিন সুজয়শঙ্কর অতসীকে বললেন, 'আমি একটা কথা ভাবছি। তুই যদি ট্রান্সফার নিয়ে এসে আমাদের এখানে থেকে পড়িস তা হলে কেমন হয়!'

'কেন···না, মানে, আপনি কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না···'

'বুঝতে ঠিকই পারছিস, কবুল করতে চাস নে···' যেন ওকে অনুমান করতে দেবার জন্যই একটুখানি থামলেন সুজয়শঙ্কর, তারপর বললেন, 'এই এতবড় বাড়িতে একলা থাকতে ভালো লাগে? মণি বাইরে বাইরেই কাটায়, রুবি ফয়েনে যাবার চেষ্টা করছে···আচ্ছা, তোকে এখনই উত্তর দিতে হবে না, বৌদিকে আমি লিখব'খন···'

ঠিক তখনই নয়, কিন্তু অতসীর পরে বুঝতে অসুবিধে হয় নি সুজয় কেন তাকে কলকাতায় গিয়ে থাকতে বলেছিলেন। তাঁর জীবনের সব আশাই তাঁর শিল্প-প্রতিষ্ঠানটির ওপর নির্ভর করছে, আর সেই সূত্রে রণজিৎ তাঁর কাছে অপরিহার্য। রুবিকে দিয়ে যখন তাকে বাঁধতে পারেন নি, তখন তাঁর কাছে অতসীর প্রয়োজন হল। ক্রমে ক্রমে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল।

॥ ৪ ॥

ছাত্রী-নিবাসের সকালবেলাকার চা-পর্ব শেষ হয়ে গেছে এমন সময় অতসীর ঘুম ভাঙল। বেলা পর্যন্ত ঘুম না ভাঙলে যা হয়, ওর সমস্ত শরীর ভার-ভার, মাথা টিপ-টিপ করছে, অতসী অনুভব করল ওর গলায়-কপালে ঘাম দিয়েছে; শাড়ির আঁচলে মুছতে-মুছতে ক্লান্ত ভঙ্গিতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল ও, কিছু না ভেবেই। হঠাৎ চমকে উঠল ও, দুই চোখের কোণা থেকে গাল আর নাকের ওপর দু'টি কালো দাগ নেমে এসেছে! ইস্, ও কি রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে কেঁদেছে না কি?

সহসা একটা তীব্র গ্লানি অনুভব করল অতসী, কি হয়েছে তার? কাল রাত্রিতে মণিদা'কে চিঠি লিখতে বসে যা আরম্ভ হয়েছিল, সেটাই সমস্ত রাত্রি ধরে তার বুকের ভেতর কুরে-কুরে খেয়েছে? যে জিনিসটা এতদিন চাপা পড়েছিল সেটাই হঠাৎ এমনিভাবে বিহ্বল করে ফেলল তাকে। বন্ধুর সহানুভূতিই কি তার কারণ? তা নয়

সেই আঘাতের বেদনাটা সে ভুলতে পারে নি বলেই তাকে এমনি অভিভূত হয়ে পড়তে হয়েছিল।

নিজেকে শক্ত করে তুলল ও। সামনেই পরীক্ষা, কাল রাত্রে খাওয়ার পর পড়া হয় নি, সেইটে খারাপ লাগল ওর। আস্তে আস্তে পড়াশুনোর মধ্যে ডুবে গেল ও; কিন্তু ওর পক্ষে এই স্বস্তি পাবার কথা নয়। দশটা নাগাদ একটা চিঠি পেলে ও, সুরেলডাঙা থেকে বীণা সেনগুপ্ত লিখেছেন তার মায়ের অসুস্থতার খবর দিয়ে। বীণা ওখানকার স্কুলেরই শিক্ষয়িত্রী, তাদের প্রতিবেশিনী, অতসী তাঁকে মাসিমা বলে ডাকে। চিঠি পেয়ে অস্থির হল না অতসী, এই রকম একটা খবরই যেন সে প্রত্যাশা করেছিল। একটা অশুভ ছায়া যেন আস্তে আস্তে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। এর আগে কোনদিন নিজেকে সে এতটা বিষণ্ণ নিস্তেজ মনে করে নি।

আনন্দপুর থেকে সুরেলডাঙা মাত্র পনের মাইলের পথ, মেট্রন অণিমা বিশ্বাসকে বলে দুপুরের গাড়িতে রওনা হয়ে গেল অতসী। রুবি তাকে বিদায় দেবার সময় চোখের জল ফেললে। অন্য মেয়েরা সামনেই তার পরীক্ষার কথা ভেবে ভয় করতে লাগল। কিন্তু অতসীর বুকের মধ্যে যে ভয় ছিল, তাতে এই আশঙ্কা তাকে স্পর্শই করতে পারল না। ওর মনে হতে লাগল, সুরেলডাঙায় গিয়ে মাকে আর দেখতেই পাবে না। যতই জায়গাটার কাছাকাছি হল ও, ততই ওর বুকের ভেতর খামচে ধরতে লাগল।

সুরেলডাঙা স্টেশন থেকে মিনিট-পাঁচেকের পথ ওদের স্কুলের দেওয়া কোয়ার্টার, এক রকম ছোটার মতো করেই রাস্তাটা পার হল ও। দূর থেকে দেখলে ওদের বারান্দাটা খালি, কিন্তু দরজা-জানালা খোলা, পরিচিত পর্দাগুলো বাতাসে দুলছে। আশ্চর্য স্বস্তির মতো লাগল ওর। বারান্দায় পা দিয়েই ও ডাকল, 'মা···'

দুর্বল, পরিষ্কার উচ্চারণে কিন্তু বিস্ময়মাখানো স্বরে মালিনী দেবী ভেতর থেকে বললেন, 'তুই···কি ব্যাপার? আয়···'

মনে হল আসন ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু তার আগে অতসী ঘরে ঢুকে বললে, 'কেমন আছ?'

উত্তরটা যেন মায়ের মুখ থেকে না শুনে নিজেই পড়ে নিতে চাইলে ও। না, বোধ হয় তার আশঙ্কা অমূলক, বিছানার পাশে আরাম-কেদারায় মা চেনা-ভঙ্গিতে শুয়ে রয়েছেন, হাতে কয়েকখানা চিঠি। অতসীর জন্য একটুখানি সোজা হয়ে বসেছেন। অতসী পায়ে হাত দিতেই বললেন, 'বীণা বুঝি তোকে আসতেই লিখেছিল?' ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর।

'না, কিন্তু এই খবর শুনে না এসে থাকা যায়?'

'কিন্তু ক'দিন পরেই তোর পরীক্ষা···এই সময় কোনোরকম ডিস্টার্ব্যান্স না হলেই ভালো, আমারও এমনি কুগ্রহ, হঠাৎ···যাক গে, তুই কেমন আছিস বল? মুখ এত শুকনো কেন···?'

বুকের ভেতর ধক করে উঠল অতসীর, মৃদুহেসে বললে, 'আমি ঠিকই আছি মা। কিন্তু তোমার ঠিক কি হয়েছে বলো তো···' বলতে বলতে মায়ের পায়ের কাছে মেঝেতেই বসে পড়ল অতসী। মালিনী দেবী ওকে বিছানার ওপর উঠে বসতে বললেন। একটু আগে যে চিঠিগুলো পড়ছিলেন তিনি, সেগুলো রাখলেন ঠিক ওর পাশেই। অতসী লক্ষ্য না করে পারল না খামের ওপর সুজয়শঙ্করের হাতের অক্ষর। 'ওমা, কাকা কি এর মধ্যে এতগুলো চিঠি লিখেছেন মাকে···' অতসীর মনে পড়ল, গেল বারে কলকাতা থেকে আসার পরই তার কলকাতা যাওয়ার প্রস্তাব করে কাকা লিখেছিলেন। অতসীর তীব্র আপত্তির জন্যে সেই প্রস্তাবটা স্বীকৃত হয় নি—ওর ভালোই লেগেছিল যে মাও তাতে রাজী হন নি। কিন্তু তারপর এই চিঠিগুলো কবে লিখলেন তিনি, মা তো সে নিয়ে কিছু বলেন নি তাকে। মা নিশ্চয়ই উত্তর দিয়ে লিখেছেন, তা না হলে একতরফা এতগুলো চিঠি হবে কি করে। একটা কৌতূহল বোধ করল ও, কিন্তু অস্বস্তিই বেশি করে লাগল, কে জানে তাকে নিয়ে কি হচ্ছে।

মালিনী দেবী ওর কথার সূত্র ধরে বলছিলেন, 'ট্রাব্‌ল্ সেই একই রকম, বুকে-পাঁজরায় ব্যথা, এবারে বেশি হয়েছিল এই যা··· প্রেসার কত আমাকে বলে না। কিন্তু সে আর কি,···আজ এটা কাল ওটা আছেই···' হঠাৎ অতসীর চোখের দিকে চোখ পড়ল ওঁর, বললেন, 'তোর কাকার চিঠি, পড়ে দেখতে পারিস···'

মুখখানা টান হয়ে উঠল অতসীর, বললে, 'আমাকে পড়তে বলছ কেন? পড়তে ইচ্ছে করছে আমারও। কিন্তু···মা?'

মালিনী দেবী বলতে গেলেন, 'না', ভয় করবার কিছু নেই তো···', কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নিলেন, ঠোঁট দু'টো কেঁপে কেঁপে স্থির হল। যে উদ্বেগটা চেপে রেখেছিলেন তিনি, ঠিক এতক্ষণ পরেই সেটা ফুটে উঠল ওঁর রোগশীর্ণ মুখে।

বাইরে হাল্কা চটির শব্দ শোনা গেল, আর পরক্ষণেই ঘরে ঢুকলেন বীণা, অতসীর মাসিমা। 'এই যে, তুই এসেছিস। বাব্‌বা, আমি এখন নিশ্চিন্ত। কিন্তু এত চুপচাপ কেন সব, আমি বুঝতেই পারি নি···'

মালিনী দেবী বললেন, 'তুমি ওকে কি লিখেছিলে বীণা? ও চলে এল, সামনেই পরীক্ষা ওর···'

'হোক পরীক্ষা, ওর ভয় কিসের, তোমারই মেয়ে তো···'

'ঠিক তাই, ও যদি আমার মেয়ে না হত।···'দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন মালিনী দেবী। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'বীণা, তুমী অনেকক্ষণ এসেছে, ওর কিছু খাওয়া হয় নি এখনো। তোমার ওখানে নিয়ে যাও না ওকে···'

'না-না, মাসিমা, আমার এখন খাবার দরকার নেই কিছু, তুমি বসো···'

'বিরক্ত করিস নে তুসী, চলে যা। পাঁচুর মা'র আসতে দেরি আছে···' বলে মালিনী দেবী ওদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

সন্ধ্যার কতক্ষণ পরে পাঁচুর মা কাজকর্ম, রান্নাবান্না সেরে চলে গেল। বীণা এতক্ষণ গল্প করছিলেন, তিনিও চলে গেলেন। আজ আর রাত্রিতে থাকার প্রয়োজন নেই, অতসীই থাকবে। মালিনী দেবী বিছানায় অনেক আগের থেকেই শুয়েছিলেন, অতসী মেঝের থেকে উঠে গিয়ে পায়ের কাছে বসল। হাত বুলিয়ে দিতে লাগল আস্তে আস্তে।

কিছুক্ষণ কেটে গেলে মালিনী দেবী মৃদুস্বরে বললেন, 'তোর কাকার চিঠিগুলো পড়লি?'

'পড়লাম···' অতসীর হাতখানা থেমে গেল, 'এর মধ্যে ব্যাপারটা

অনেকদূর এগিয়েছে দেখছি। সব কথা জানতে আমারই খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু তোমার এই অবস্থায় কোনো কথা না বলাই ভালো। তুমি একটু সুস্থ হয়ে ওঠো, আমারও পরীক্ষাটা হয়ে যাক।'

'দেখ, তোকে বীণা চিঠি লিখে আনাক এটা আমি চাই নি, কিন্তু তুই যখন এসে পড়েছিস তখন ভালোই হয়েছে। কতকগুলো কথা তোকে না বললেই নয়···' থামলেন মালিনী দেবী, হয় নিজের আবেগটা সংযত করতে চেষ্টা করছিলেন, নয় তো কি বলবেন ভাবতে পারছিলেন না। 'তুই কি জানিস, আমরা কত একলা, মানে···তুই কোনোদিন আমাকে ছেড়ে নিজেকে ভেবে দেখেছিস? কি মনে হয় তোর···'

অতসী বুঝল তাকে কথা বলতে হবে। 'কোনোদিন কিছুই মনে হয় নি আমার, কিন্তু চিঠিগুলো পড়ে মনে হচ্ছে আমাকে নিয়ে তুমি খুব বেশি ভাবছ। মা, বাবা আমার ছেলেবেলায় কবে মারা গেছেন, কোনোদিন তো কিছু মনে হয় নি তোমার? আমাকে একলা ভাবতে দিয়েছ তুমি?'

'একটা কথা অস্বীকার করতে পারিস···আমার দেহের এই অবস্থা, আজ হোক কাল হোক···'

'মা, তুমি এমন নিষ্ঠুর হতে পারো? এসব কথা বলছ কি করে তুমি।···'

'বলছি, তার একমাত্র কারণ তুই-ই, সেটা বুঝতে পারছিস না··· তোর জন্যে মরেও আমার শান্তি নেই।'

মাঝে মাঝে কথাবার্তা এমন একটা জায়গায় পৌঁছায় যার জন্য কারুরই প্রস্তুতি থাকে না। কোনোদিন মায়ের কাছে কড়া কথা শুনেছে বলে অতসীর মনে পড়ে না, এইরকম তিরস্কার তো নয়ই। এতক্ষণ নিজের দিক থেকে ব্যাপারটাকে দেখছিল ও, এখন সহসা মায়ের দিকটা তার চোখের সামনে অনাবৃত হয়ে উঠল। মালিনী দেবী কথাটা বলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তাঁর চোখে অশ্রু নেই, বরঞ্চ পরাজিতের একটা গ্লানি তাঁর মুখখানাকে কালো করে তুলেছে। একটু আগেই যে সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল ও, দেখলে মা তারই বিরুদ্ধে এতকাল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থেকে আজ ভেঙে পড়েছেন। নারী কি চিরকাল এমনি করেই ভেঙে পড়বে। 'না, তা হতে পারে না, অসম্ভব···' তীব্রকণ্ঠে উচ্চারণ করতে গেল ও, মায়ের এতদিনকার শিক্ষা আর জীবন মায়ের বিরুদ্ধেই উত্তেজিত করতে গেল ওকে, কিন্তু ঐ নিস্তেজ নিঃশেষিত মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর সকরুণ হয়ে উঠল ওর। নিজেকে সংযত করে আস্তে আস্তে ও বললে, 'মা, কাকাবাবুর চিঠিগুলো সব আমি পড়লাম। আমাকে কি করতে হবে তুমি বলো···'

চোখ ফেরালেন মালিনী দেবী। যেন কথাগুলো তাঁর নিজের নয়, আগের থেকে কেউ তালিম দিয়ে রেখেছে এমনি করে বললেন, 'দেখ, ওদের সঙ্গে মাঝখানে দীর্ঘকাল আমাদের যোগ ছিল না, কিন্তু তার

আগে বরিশালের গ্রামে আমাদের পরিবার একই ছিল, এখন যোগসূত্রটা আবার গড়ে তোলাই ভালো…'

'মা, এখন সেটা ওদের কাছে আশ্রয় চাওয়া হবে না?'

'তুসী, উনি তোর বাবার নিজের ভাই, কাকু…'

এর উত্তর অতসীর অজানা নয়, অনেক দিনই সে কথা ভেবেছে ও। রক্তের সম্বন্ধ যে বন্ধনে বাঁধে, মানুষের নিজের কীর্তি তাকে অস্বীকার করে চলে। গেলবার অন্তত এটা বুঝে এসেছে যে, সুজয়শঙ্কর যেখানে নিজেকে নিয়ে গেছেন, সেখানে অতসীর সঙ্গে তাঁর রক্ত-সম্পর্কের দোহাই বৃথা। বললে, 'আচ্ছা মা, বাবা মারা যাবার পর এসব কথা তো তোমার মনে হয় নি। বাবা যে স্কুল রেখে গিয়েছিলেন…'

'স্কুল! মালিনী দেবী গার্লস্ স্কুল হয় তো থাকবে, কিন্তু মালিনী দেবী থাকবে না। অনেকদিন থেকেই নেই। তুই কি জানিস, তোর বাবার স্কুল অনেকদিন মরে গেছে, আদর্শ নেই, সে রীতিনীতিও নেই…কিন্তু আজ থাক, তুই শুয়ে পড়। আমার ইচ্ছের কথা তুই জেনে রাখলি, তোকেই এখন নিজের জন্য সমাধান খুঁজে বের করতে হবে…' বলে পাশ ফিরে শুলেন মালিনী দেবী।

॥ ৫ ॥

সুরেলডাঙা থেকে ফিরে এসে পড়াশুনোয় মনঃসংযোগ করল অতসী। বুকের ভেতর যে আগুনই জ্বলুক না কেন, স্পষ্টতই ও বুঝতে পারল যে ওকে শান্ত থাকতে হবে। মা বলার 'সময় যা ওর মনে হয় নি, এখানে ফিরে নিজেকে সত্যিই একলা মনে হতে লাগল ওর। সেটা কাটাবার জন্যও বেশি করে পড়াশুনো নিয়ে পড়তে হল ওকে।

আশ্চর্য এই, মানুষের মন ঘটনা-নির্ভর হলেও ঘটনা মানুষের মনের সঙ্গে তাল রেখে চলে না। অতসী জানত না, পরীক্ষা দেবার পর মায়ের সঙ্গে আর তার দেখা হবে না। ইতিমধ্যে মায়ের অসুখ বাড়াতে তাঁর ইচ্ছানুসারেই কলকাতার খবর দেওয়া হয়েছিল, সুজয়শঙ্কর নিজে এসে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পরীক্ষার পর খবরটা সে পেল অদ্ভুতভাবে। পরীক্ষা সে ভালোই দিয়েছিল। সহপাঠিনী বন্ধুদের সঙ্গে এরপর হয় তো আর দেখাই হবে না, সকলেই আনন্দ-কলরব করে দু'দিন কাটিয়ে দিলে। অণিমাদি'র কাছে বাড়ি যাবার অনুমতি চাইতে তিনি বললেন, 'তোমার বাড়ি যাওয়া নিয়ে কথা আছে, আমার ঘরে দেখা কোর…'

সকালবেলা সমস্ত হোস্টেল পরিক্রমা করে নিজের ঘরে যখন তিনি এলেন তখন অতসীর মনে হল তিনি একটু পরিশ্রান্ত, হয় তো ঈষৎ উত্তেজিত। অন্য উপলক্ষের মতো সোজাসুজি কাজের কথায় এলেন না তিনি, কেবলই দেরি করতে লাগলেন। ঝিকে দিয়ে চা আনিয়ে নিজে চুমুক দিতে লাগলেন, অতসীকেও বললেন খাওয়ার জন্য।

একটি মাত্র আশঙ্কাই অতসীর বুকের ভেতর থামচে ধরল, স্থিরদৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে বললে, 'দিদি, মায়ের সম্বন্ধে কোনো খারাপ খবর আছে?'

মেট্রন ওর কথার উত্তর না দিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুজয়শঙ্কর রায় তোমার কে হন?'

'আমার কাকা…'

'ও, এতবড় একজন লোক তোমার কাকা! এর আগে কোনো দিন তো বলো নি। তিনি আজ দুপুরে তোমাকে নিতে আসবেন। তোমার মায়ের কথা তিনিই তোমাকে শোনাবেন বলেছেন…'

'দিদি, আমার মা কি আর নেই?'

'তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে। তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। কিন্তু যে ঘটনার ওপর আমাদের কারুরই হাত নেই…শোনো…' বাঁ-হাতের রুমাল মুখের ওপর তুলে ধরে অতসীর কাছে উঠে এলেন তিনি, তার মাথার ওপর হাত রাখলেন।

অতসী নিজের ঘরে গিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ছাত্রী-আবাসিকাদের কাছে অতসী সর্বদাই বিস্ময় আর শ্রদ্ধার পাত্রী, এই সংবাদে সত্যকার একটা বেদনাবোধ করল ওরা। সান্ত্বনা দেবার জন্য ওরা ছুটে এল, কিন্তু কেবল ভিড় করে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারল না। অতসী রুবিকে বললে, 'আমি একটু একলা থাকতে চাই…,' বলে দরজা বন্ধ করতে যেতেই রুবি বললে, 'ওরা যাক, কেবল আমি থাকি…'। অতসী বোধ হয় কথাটার অর্থ বুঝল, বললে, আচ্ছা…'। রুবির উদ্বিগ্ন, স্নেহাতুর, সান্ত্বনায় উৎসুক চিত্তেও অতসীর কঠিন নীরবতা দুর্ভেদ্য বলেই মনে হতে লাগল, একসময় উঠে গেল সেও।

বেলা একটার পর ওর বন্ধ দরজায় টোকা পড়ল। মেট্রন বললেন, 'সুজয়শঙ্করবাবু এসেছেন, তুমি এসো…'

একেবারে তৈরি হয়েই বেরিয়ে এল অতসী। মেট্রন বললেন, 'তুমি এখনও খাও নি, যাবার দিন কিছু খেয়ে যাবে না সেটা ভালো দেখায় না…'

উত্তরে অতসী কেবল প্রণাম করল ওঁকে। বন্ধুদের মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও, রুবির হাতে নিজের হাতখানা একবার রেখে বললে, 'আমি যাচ্ছি…।'

ওদের চোখের জল বাধা মানল না।

ভিজিটর্স-রুমে সুজয়শঙ্কর বসেছিলেন। তাঁর পরিচিত শার্ট-ট্রাউজার নেই, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছেন। এই পোশাকে তাঁকে ঘরোয়া এবং কতকটা বিষণ্ণ, দুর্বল বলে মনে হল। কিন্তু সহসা একটা সাদৃশ্যের কথা মনে হল অতসীর। বাবা এই পোশাকই পরতেন, তাঁর ছবির মূর্তির সঙ্গে এই চেহারা অনেকটা কাছাকাছি; কিন্তু তিনি ছিলেন অনেক বেশি প্রসন্ন আর উজ্জ্বল।

অতসী আসতেই উঠে এলেন সুজয়শঙ্কর, 'থাক, থাক, প্রণাম করতে হবে না…' ওর মাথায় হাত রাখলেন তিনি। অমন জাঁদরেল মানুষটিও কথার জন্য হাতড়াতে লাগলেন, 'তোর পরীক্ষা কেমন হল…'

ঘাড় নাড়ল অতসী। মৃদুস্বরে বললে, 'কাকু, চলুন…'

মনে হল আরো কিছু বলবেন সুজয়শঙ্কর। অতসীকে বিহ্বল অবস্থায় দেখবেন আর তাকে শান্ত করতে হবে এই ছিল তাঁর ধারণা, কিন্তু অতসীকে অসাধারণ শান্ত, আত্মস্থ দেখে নিজেই কেমন বিহ্বল হয়ে উঠলেন। 'আমি গাড়ি এনেছি, চল। বাই দি বাই, তুই তো জানতিস রুবি অক্সফোর্ডে গেছে। চিঠি পেয়েছি ওর, লিখেছে যে ভালোই করেছে…'

'কাকু, মণিদা' এখন কোথায়?'

প্রশ্নটা সুজয়শঙ্করের ভালো লাগার কথা নয়, কিন্তু নিজেকে

অতিক্রম করে বললেন, 'ওর লাস্ট চিঠি পেয়েছি ভুবনেশ্বর থেকে···কি হল ?'

ছাত্রী-নিবাসের সামনের ছোট্ট বাগানটি পেরিয়ে মেন-গেটের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল অতসী। রাস্তার উপর সুজয়শঙ্করের পরিচিত মূল্যবান কার দাঁড়িয়ে, আর গাড়ি থেকে নেমে প্যাণ্টের পকেটে হাত ভরে পায়চারি করছে রণজিৎ মুখার্জী। স্পষ্টত, সে-ই গাড়ি চালিয়ে এসেছে এবং তাদেরকে নিয়ে যাবে। বুকের ভেতর ধক করে উঠল ওর, সুজয়শঙ্করকে বললে, 'কিছু না···', কিন্তু গেটের বাইরে বেরিয়েই ও জিজ্ঞেস করলে, 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন ?'

'কেন, কলকাতায়, আমাদের বাড়িতে···', তৎক্ষণাৎ ওঁর চোখে একটা জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল, 'আশা করি এতে তোর আপত্তি নেই ?' কিন্তু অতসীকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই আবার বললেন, 'তোর বোধ হয় মনে আছে গেল ছুটিতে তোকে কি বলেছিলুম··· মণি-রুবি দু'জনেই কলকাতার বাইরে···বাড়িতে আমি একলা, আমার ভার তুই নিতে পারিস না ?'

'কাকু, আমি কলকাতাতেই যাব···'

সুজয়শঙ্কর আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু রণজিৎ এগিয়ে এসে দু'হাত তুলে নমস্কার করল অতসীকে। বললে, 'আসুন, আপনি যে শোক পেয়েছেন তাতে সান্ত্বনা দেওয়া অসম্ভব, কিন্তু আমার সমবেদনা জানাচ্ছি।'

অতসী ঈষৎ মাথা নত করে এটা স্বীকার করে নিলে এবং তারপর গাড়িতে উঠে বসল। সুজয়শঙ্কর ওঠার পর রণজিৎ স্টার্ট দিলে। অতসী পেছনে ছাত্রীদের দিকে একবার তাকাল। বুকের ভেতর কেঁদে উঠল ওর। ওরা ভাবছে অতসীর নিজের কাকা এসে ওকে নিয়ে যাচ্ছেন, নিজের ঘরেই ফিরে যাচ্ছে ও, কিন্তু ওরা জানল না সত্যিই ও কোথায় ভেসে চলেছে।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গাড়ি দ্রুতবেগে হাওড়ার দিকে ছুটে চলেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই সুরেলডাঙা এসে পড়বে, তারই পাশ দিয়ে যেতে হবে ওদের। বাইরের দিকে মুখ করে বসে রয়েছে অতসী, আর সুজয়শঙ্কর খানিকটা উদ্বেগ খানিকটা সতর্কতার সঙ্গে ওর দিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ অতসী ওঁর দিকে ফিরে বললে, 'কাকু, মায়ের মৃত্যু কবে হয়েছে ?'

'দিন-পনেরো আগে, ষোলই এপ্রিল···'

'মায়ের অসুখ কবে বাড়ল আর কবেই বা নিয়ে গেলেন আপনারা ?' সুজয়শঙ্কর উত্তর দিতে যেতেই হঠাৎ আবার ও বলে উঠল, 'কাকু, আমি জানতে পারি কেন আমাকে মায়ের মৃত্যুর খবর দেওয়া হয় নি, কিছুই জানানো হয় নি কেন আমাকে ?'

এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন সুজয়শঙ্কর, কিন্তু তরুণী ভাইঝিটির চোখে যে কান্না দেখবেন বলে আশঙ্কা করেছিলেন, সেখানে একটা কঠিন আক্রোশ দেখে শঙ্কিত হলেন। ওর কাছে সরে এলেন তিনি, মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তুসী, শোন, একটা জিনিস তোর কাছে প্রত্যাশা করব ? বল, সব না শুনেই আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবি নে ? বারোই, তোদের কে বীণা সেনগুপ্ত, তাঁর কাছ থেকে চিঠি পেলাম বৌদির কঠিন অসুখ। নিজেই এসেছিলাম আমি, জিজ্ঞেস করলাম তোকে খবর দেওয়া হয়েছে কি না। বৌদিই জেদ করলেন তোকে খবর না দেবার জন্য। তোর তা হলে পরীক্ষা দেওয়া হবে না, এই ছিল তাঁর আশঙ্কা। আর সে আশঙ্কাটা অমূলক নয়। কলকাতায় গিয়েও খবর দেওয়ার কথা ভেবেছি। কিন্তু সেই একই নিষেধ, পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে যেন কোনো খবরই না দেওয়া হয়। খারাপ কিছু ঘটলেও না। আর তুই তো জানিস, দাদা বা বৌদির কোনো ইচ্ছাকে অমান্য করার সাধ্য আমাদের নেই। তোদের বীণা সেনগুপ্তও তো তোকে খবর দিতে পারতেন, দিতে পারলেন না কেন ? শোন···ভেবে দেখ, বছরখানেক আগেও তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাবার কথা ভাবতেও পারতাম না, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় গেছেন, তা না হলে···'

'কাকু, এই যে আমাকে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন, এটাও কি মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য···'

অদ্ভুত অবিনয় ওর কণ্ঠস্বরে, রণজিৎও পেছনে ফিরে তাকাল একবার। সুজয় সেটা গায়ে মাখলেন না, 'কেন, তাতে কি তোর অবিশ্বাস হয় ? তবে বলতে পারিস, সে ইচ্ছার সঙ্গে আমারও ইচ্ছে যুক্ত হয়েছে, অনেক আগে থেকেই সেটা ছিল তুই জানিস।'

'আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন এটা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নয় ? আমি ভাবতেই পারি নে মা-ও তাতে যোগ দেবেন···'

আবার রণজিৎ ফিরে তাকাল, ধৈর্যচ্যুতি ঘটল সুজয়েরও, বললেন, 'কি বলছিস, তুসী ? তুই বৌদির সম্বন্ধেও সম্মান রেখে কথা বলতে পারছিস না ? তোর প্রতি কি অগাধ স্নেহ ছিল তাঁর, তোর কল্যাণই চেয়েছিলেন তিনি, আর···'

অতসী মাথা নীচু করে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমিই। আমার ভালোর জন্যই সব কিছু হচ্ছে। কিন্তু কাকু, আমার ভালোর জন্য

আমি যখন পরীক্ষা দিয়ে চলেছি, তখন মা তিলে-তিলে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করছেন, তারপর মৃত্যুবরণ করেছেন। যে পরীক্ষার কথা ভাবছিলেন তিনি···কেন, সেই পরীক্ষার ক'টা দিনও বেঁচে থাকতে পারতেন না ?···কেন···' আর পারল না অতসী, সেই সকালবেলা থেকে যে নীরবতা ওর মধ্যে কঠিন হয়ে উঠছিল, একটা আকস্মিক ধাক্কা খেয়ে তা ভেঙে পড়ল। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগল ও।

রণজিৎ মুখ ফেরাতে সাহস পেল না, সুজয় ওর পিঠের ওপর হাত রেখে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কেবল গাড়িটারই এটা বুঝতে পারার কথা নয়, তার যান্ত্রিক শব্দ আর দোলার সঙ্গে ক্রন্দনরত—এই তরুণীর দেহের আক্ষেপ মিশে গেল।

কতক্ষণ পরে মুখ তুলল অতসী, আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে, 'কাকু, কতদূর এলাম আমরা, সুরেলডাঙা পেরিয়ে গেছি ?'

'না, এখুনি এসে পড়ব···'

'যদি আমি একবার আমাদের ঘরটা দেখে যাই, তা হলে আপনি রাগ করবেন ?'

শঙ্কিত হলেন সুজয়, যদি অতসী বিদ্রোহ করে। কিন্তু ওর সকরুণ মুখখানা ছুরির মতো ওঁর বুকে বিঁধল যেন। বললেন, 'আজকেই যাবি ? তোর মনের এই অবস্থা···আর একদিন আসতাম না হয় আমরা···'

'না-না, আমি একবার দেখে যাই। মনে হয় আমার আর আসা হবে না···'

'আসা হবে না কেন ? কিন্তু তুই বলছিস যখন আমরা একবার ঘুরেই যাই···'

সুরেলডাঙায় ওদের বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি যায় না, খানিকটা দূরে নেমে পড়ল ও। সুজয় গাড়িতেই বসে রইলেন, রণজিৎ তার সঙ্গী হল। একটা সংশয়ের ধাক্কা লাগল অতসীর মনে কিন্তু সেটাকে স্বীকার করতে লজ্জা পেলে ও। কিছু না বলে এগিয়ে গেল। তবু একটা কথা না ভেবে পারল না সে। গেলবারে কলকাতা থেকে ফেরার পর একদিন সন্ধ্যায় স্টেশনে মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল সে। বহুক্ষণ পায়চারি করার পর এই পথেই বাসায় ফিরে আসছিল ওরা। মালিনী দেবী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কলকাতার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। একসময় হঠাৎ শুধিয়েছিলেন, 'আচ্ছা, রণজিৎ ছেলেটিকে সব মিলিয়ে তোর কেমন মনে হল—'

একটু থেমে উত্তর দিয়েছিল অতসী, 'খুব ইনটেলিজেন্ট আর শক্ত লোক···'

ঠিক সেই পথে সেই রণজিতের সঙ্গেই তাদের বাসায় যাচ্ছে সে, এখন আর মা নেই। এর মধ্যে অনেকখানি বদলে গেছে সব। মনে হল রণজিতের স্বাস্থ্য অনেকখানি ভালো হয়েছে। কিন্তু যাকে মনে হয়েছিল ইনটেলিজেন্ট, তাকেই এখন মনে হয় কুটিল, শক্ত নয় নির্মম।

রণজিৎ একটু পা চালিয়ে ওর পাশাপাশি হল। বললে, 'আপনার মা'র কথা বারবার আমার মনে পড়ছে। শেষ দু-তিনটে দিন তাঁর কাছে থাকবার সুযোগ হয়েছিল আমার। সত্য অর্থেই সজ্ঞানে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর ; আমি তখনই ভেবেছিলাম সুরেলডাঙায় একবার

'আপনি মা'র কাছে ছিলেন।···' নিদারুণ বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল অতসী। যে দুঃসহ বেদনাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল ও, তা আরো একবার অর্গলমুক্ত হল। ওর এই মুহূর্তে জানতে ইচ্ছে করল, সেই ক'দিন মা ওকে কি বলেছেন, তার সম্বন্ধে কি কথা হয়েছে। কিন্তু ও কেবল বললে, 'কেন, কাকুদের কি নার্সিং করার লোকের অভাব ছিল! আমি বুঝতে পারছি না···'

আরো কয়েক পা চুপচাপ হাঁটার পর রণজিৎ বললে, 'আপনার এই প্রশ্নের উত্তর নেই তা নয় কিন্তু এর উত্তর না দিলেই ভালো হয়। শুধু আমার ওপর নয়, আমাদের সবার ওপরই অন্যায় করছেন আপনি···'

সত্যিই তো, এ কি করছে সে। মায়ের স্মৃতি সম্বন্ধেও সে আর শ্রদ্ধা রাখতে পারছে না! কাকু যা বলছিলেন ? কিন্তু রণজিতের কথাটাও কি রকম, 'আমাদের···'। ওর বুকের ভেতর অসহ্য বেদনায় জ্বলে ওঠে, ওরা কি মাকেও ওদের দলে টেনে কথা বলবে! আর—সত্যি তো তাই-ই, মা-ই ওই রকম ভাববার অবকাশ দিয়েছেন।

অতসী বলতে গেল, 'আমিই অন্যায় করেছি। কিন্তু আমার ওপর অন্যায়টা কারুর চোখে পড়ে না কেন সেটাই আশ্চর্য!' কিন্তু তার আগেই বীণা ওদের দূর থেকে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, হাত ধরলেন অতসীর, আর কিছু বলতে না পেরে চোখে কাপড় চাপা দিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

'মাসিমা আমাদের ঘরটা বন্ধ দেখছি, চাবি রয়েছে আপনার কাছে ?'

'না, সেক্রেটারি নিয়ে গেছেন—তুই আয়।'

রণজিতের কিছু বলার ছিল না, কিন্তু এরকম একটা অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে সেটা হয় তো খানিকটা বুঝেছিল ও। অতসীদের বন্ধ বাড়িটার সামনে পায়চারি করতে করতে ঘনঘন ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগল ও।

প্রায় মিনিট-দশেক পরে বেরিয়ে এল অতসী। ওর মুখের দিকে তাকিয়েই রণজিৎ বুঝতে পারল সব। অতসী বললে, 'আপনি যান, কিছুতেই আমি যেতে পারব না মায়ের এই জায়গা ছেড়ে। আপনাদের স্নেহ আমি বুঝি, কিন্তু আমার পক্ষে তা অসম্ভব। কাকুকে বলবেন আমাকে ক্ষমা করতে···'

'আচ্ছা, আপনার কথা আমি জানাব তাঁকে···আমাদের ভুল বুঝবেন না কিন্তু। নমস্কার'···বলে রণজিৎ চলে গেল।

॥ ৬ ॥

সুরেলডাঙার পরিচিত পরিবেশে যদি অতসী হঠাৎ একবার না এসে পড়ত, তা হলে ঠিক এরকমটি হয় তো হত না। সে যে সুজয়শঙ্করের গাড়িতে চড়ে কলকাতার জন্য রওনা হয়েছিল, তার কারণ ভেবেছিল, যে বাড়িতে মা মারা গেছেন সেখানে গিয়ে সে পৌঁছোতে পারবে। কিন্তু মায়ের কর্মক্ষেত্রে এসে সম্পূর্ণ বিপরীতটাই সে ভাবল : মা ভুল করেছেন অসুস্থতার জন্য সন্তানের প্রতি ভালোবাসা তাঁর সন্তানকে পাশে সরিয়ে দিয়েছে। অতসী বুঝল, বাবার যে আদর্শ ছিল—মা যে আদর্শ এতদিন এগিয়ে নিয়ে এসে শেষকালে আর পারেন নি, সেটাই একমাত্র তার লক্ষ্য হতে পারে। এইখানে দাঁড়িয়েই সে

সন্ধ্যার কাছাকাছি বীণা মাসিমার সঙ্গে সেক্রেটারি রামকমলবাবুর বাসায় উপস্থিত হল অতসী। হৃতস্বাস্থ্য পাতলা-পানা বৃদ্ধলোকটি নিজের শোক প্রকাশে এবং মালিনী দেবীর গুণকীর্তনে মুখর হয়ে উঠলেন। অতসীর গুণপনা ঘোষণাতেও পিছিয়ে রইলেন না তিনি। পড়াশোনায় এত ভালো মেয়ে তিনি এর আগে আর দেখেন নি। শেষকালে কাজের কথা আসতেই বললেন, 'আহা-হা, তুমি এসেছ একটা খবর দিলেই আমি চাবি পাঠিয়ে দিতাম। তুমি তিনদিন, ষড়জোর দিন-সাতেক ঘরটায় থাকতে পারো। মালিনীদি'র মেয়ে তুমি, তোমাকে ওখানে রাখতে পারলে আমি সবচেয়ে খুশি হতাম···'

'আমি সেই কথাই আপনাকে বলার জন্য এসেছিলাম। মায়ের জায়গায় আমাকে যদি নেন···আমি ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছি, দিদিরা আমার সম্বন্ধে ভালোই বলেন···'

'ওরে বাব্‌বাঃ, আমাকে তুমি আইনের দায়ে ফেলতে চাও! তুমি ছেলেমানুষ, জান না, মালিনী দেবী বি-এ ছিলেন, অর্ডিনারি পাশ···এ নিয়ে বোর্ড থেকে কতবার নোট এসেছে তার ঠিক আছে! আগাগোড়া ফাইট করেছি আমি···অন্যেরা কত বলেছে, কিন্তু···আচ্ছা মালিনী দেবীর জন্যে ফাইট করব না আমি? তাঁরাই এই স্কুল গড়েছেন হাতে করে···যাক গে, ওসব পার্সন্যাল কথা, বোর্ড চায় একজন এম-এ, বি টি, এর মধ্যে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিও আমরা একজনকে···'

'আমি এই স্কুলে একটা চাকরী পেতে পারি না? কোনো একজন শিক্ষয়িত্রীর··'

'নিশ্চয়ই, তা পাবে না কেন। কিন্তু এখন কোনো ভেক্যান্সি নেই, শীগগির হবে আশা করা যায়···তা ছাড়া, তোমার রেজাল্টটা এর মধ্যে বেরোন দরকার।···'

ওরা যখন চলে আসছে, তখন ওদের সঙ্গে সঙ্গে উনি খানিকটা এগিয়ে এলেন। সাতদিনের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে তোমাদের জিনিসপত্রগুলো বের করে নিতে হবে, মা লক্ষ্মী। নতুন হেডমিস্ট্রেস আবার শীগগির এসে যাচ্ছেন তো···মালিনীদি'র কথা ভেবেই তোমার হাতে চাবিটা দিলাম আমাকে আবার বিপদে ফেলো না যেন··'

রাত্রিতে মায়ের পরিত্যক্ত বিছানায় তাঁরই একটা সাদা থান পেতে শুয়েছিল অতসী। বীণাও ওর পাশে বসেছিলেন, আলিস্যির জন্য এক সময় শুয়ে পড়লেন ওরই পাশে। বললেন, 'তুসী, তুই কিছু বলছিস না এটা আমার খুব খারাপ লাগছে···'

'বলার কি আছে, আপনি তো সবই দেখতে পাচ্ছেন···'

'তা ঠিক, কিন্তু তুই কিভাবে সব ব্যাপারটাকে দেখছিস সেইটে জানতে ইচ্ছে করে।'

'মাসিমা, আমি কলকাতায় গেলাম না ওদের গলগ্রহ হতে হবে বলে, কিন্তু এখন দেখছি আমি গলগ্রহ হয়েই আছি। আচ্ছা, মেয়েরা কি কোনো সময়েই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না···'

'তুই এসব কথা ভাবতে যাচ্ছিস কেন বল তো, একটা কিছু···'

'সেক্রেটারি কি বললেন? অনুগ্রহ করে থাকতে দিয়েছেন তিনি এ

ঘরে···মাসিমা, আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আজ আপনাদের ঘরে খেয়েছি, এই ক'দিন খাব···এসব জিনিস যে এমনি, এত বিচ্ছিরি···মা কি সেটা বুঝেই গেলবার এত জেদ করেছিলেন ?···কাল কি ছিলাম আমি আর আজ কি হয়েছি···তবু কি জানেন, বাবা নিঃস্ব হাতে এখানে এসেছিলেন, নিজেদের জন্য কিছুই রেখে যান নি···সেইটে জানি নে কেমন করে আমাকে জোর দেয়। একটা কথা ঠিক, যদি আমি মরেও যাই, মরবার আগে শেষ চেষ্টা করে তবেই সেটা স্বীকার করে নেব···'

বীণা ওর হাতখানা টেনে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ওর হাতের কাঁপা কাঁপা ভাবটা বোঝাল কতখানি অভিভূত হয়েছেন তিনি···একটা মামুলি সান্ত্বনার কথাও শোনাতে পারলেন না। শেষকালে বললেন, 'দেখ, তোর এসব কথা শুনলে আমার ভয় হয়। কিন্তু তোর মায়ের কথাটা একবার ভেবে দেখ··· কিসের জন্য তুই এত দুঃখ স্বীকার করে নিবি ? কাকার বাড়িতে তোর কিছুরই অভাব থাকবে না, তোকে পর বলেও ভাববে না···'

'ঠিক সেই জন্যেই আমি যেতে চাই নে। সব জায়গাতেই ওরা সোনার খাঁচা তৈরি করে রেখেছে আর মেয়েরা সোনার শিকলি পরবার জন্যে পা বাড়িয়েই রয়েছে। কত রকম করে সাজাতে চায় ওরা আমাদের···বিদুষী মেয়ে, রূপসী মেয়ে, আধুনিকা মেয়ে, আর্টিস্ট মেয়ে ···ছি-ছি, ভাবতেও ঘেন্না লাগে···'

'মেয়েদের ভাগ্যই যে তাই···এই দেখ, আমি চাকরী করছি, আমি না স্বাধীন ? কিন্তু সেক্রেটারিকে তুই নিজেই পরখ করে এসেছিস আজ ···তোর মেসোমশায়কেও জানিস তুই, আমাদের সংসারও তুই চিনিস···'

'মাসিমা, সেই ভাগ্যটাকেই আমি মানতে চাই নে।'

'কি জানি বাছা, সেটা হয় কি না আমি জানি না, কখনো ভাবি নি সেরকমভাবে···সত্যি কথা বলতে কি, এই যে বিয়ে করেছি, সংসার হয়েছে, চাকরী-বাকরীও করছি···গায়ে এসে পড়েছে আর স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু মনে হয় তুই হয় তো পারবি, যা তুই বুঝেছিস। তোর জোর আছে···'

'মাসিমা, আশীর্বাদ করুন যেন তাই হয়'···অতসীর মুখখানা বীণার বুকের কাছে আরো সরে এল।

প্রত্যেক চিন্তারই একটা নৈয়ায়িক উপসংহৃতি আছে। অতসী যে পথে চলছিল, তার সজীব তরুণী হৃদয় যে-পথে নির্দেশ দিচ্ছিল তাকে, তার মধ্যে কোন ভুল ছিল না, কেবল তার শেষটাই দেখা হয় নি তখনো। পরদিন সেটার একটা উপলক্ষও এল, কিন্তু কে জানে, তা দেখে ওর বুক কেঁপে উঠেছিল কি না।

সকাল ন'টা-দশটা নাগাদ ওদের পুরানো ঝি পাঁচুর মা হঠাৎ ওদের ঘর খোলা দেখে ভেতরে ঢুকে গেল এবং অতসীকে দেখেই কাঁদতে আরম্ভ করলে। তারই ফাঁকে ফাঁকে অতসীর মার সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করল ও এবং বারবার একটা কথা অনুযোগের সুরে বলতে লাগল যে, গতকাল অতসী এসেছে—এর মধ্যে তাকে একটা খবর দেওয়া হয় নি কেন। ওরই মধ্যে মনে মনে হাসল অতসী, কার কথা কে কাকে জানায়। একটু পরেই পাঁচুর মা আবার দু'টো ঘর আর বারান্দাটা ঝাঁট দিতে আরম্ভ করল।

ঘরের জিনিসপত্রগুলো সব কেমন এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে দেখেছ, আমাকে একটু সাহায্য কর দেখি···'

পাঁচুর মার মুখখানা প্রথমে বিরস তারপর কঠিন হয়ে উঠল, 'তুসীদি, ই বেলা ত' পারব নাই ইসব করতে, বিকালবেলা লয় আসব। পাঁচুর বাবা রুগী মানুষ, আমি এখন না গেলে উয়ার চারটি মুখে পড়বে নাই গো। আমার হইচে সবদিকে জ্বালা···'

'আর এইমাত্র আমার ওপর তুমি সহানুভূতি দেখাচ্ছিলে!' বলতে গেল অতসী, কিন্তু একদিকের টাল সামলাতে গিয়ে যেমন হঠাৎ বিপরীত দিকেই টলে পড়তে হয়, তাই হল। সত্যিই তো, অসুস্থ মার কাছে থাকতে না পারার দুঃখ সে জানে, তা হলে অসুস্থ স্বামীর জন্য ওর উদ্বেগকে সে সন্দেহের চোখে দেখে কেন! অতসী বললে, 'পাঁচুর বাবার কি অসুখ, কতদিন হয়েছে ?'

'সে আর বলবেন নাই তুসীদি, আজ দেড়মাস-দু'মাস হল, কি করে যে চালাচ্ছি···'

'কি বললে, তা হলে তুমিই চালাচ্ছ সংসার, মানে কি করে চলে···'

'পাঁচুর মা অতসীর ভাবান্তরটা বুঝল, কারণটা বুঝল না। বললে, 'সে আর বলবেন নি দিদি, এই দেখেন না'···একটা লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করল পাঁচুর মা। কথাগুলো যেন গিলে খাচ্ছিল অতসী, যদিও নিজের এই ভাবান্তরের কারণটা তখনই সে বুঝতে পারছিল না। দেখলে যে পাঁচুর মার অভিযোগ-অনুযোগ আর কান্নার মধ্যে তবু অদ্ভুত একটা আত্মবিশ্বাস আর গর্ব ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ অতসী প্রস্তাব করে বসল, 'পাঁচুর মা, আমাকে তোমাদের ঘরে নিয়ে যাবে ?'

'সে কি বলেন গো, আপনি কি আমাদের ঘর যাবেন···কতদূরের পথ আর এই রোদ···'

সত্যিই মে মাসের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছিল রুক্ষ মাটি আর শুকনো গাছপালার ওপর। মুহূর্তের জন্য ভয় পেল অতসী, কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে পড়ল পাঁচুর মাকেও এই পথ দিয়ে যেতে হবে। তখনই নিজের ছাতাটা টেনে নিয়ে তৈরি হল ও। কেবল একবার দেখে নিলে মাসিমা স্কুলে বেরিয়ে গেছেন কি না। জানতে পারলে আপত্তি করবেন হয় তো।

॥ ৭ ॥

সুরেলডাঙার মতো ছোট্ট মফস্বল শহরের মাঝখান থেকে কয়েক পা গেলেই গ্রামের মধ্যে এসে পড়তে হয়। প্রথমেই ছোটখাটো বস্তি, তারপর একটা বড় মাঠ, সেই মাঠ পেরিয়ে পাঁচুদের বাড়ি পৌঁছোতে হবে। মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা মোটা আলের রাস্তা গ্রাম পর্যন্ত গিয়েছে বটে, কিন্তু গ্রীষ্মের শুকনো মাঠে পায়ে পায়ে সব দিকেই রাস্তা হয়ে গেছে। পাঁচুর মা ঠিকই বলেছিল, সমস্ত মাঠ রোদ্দুরে ঝিমঝিম করে উঠেছে। তাপের হল্কা চোখমুখ ঝলসে দেয়, জ্বালা করতে থাকে। মাঠের মধ্যে কাছে-দূরে এখনও বহুলোক যাতায়াত করছে, কোনো সময়ই বোধ হয় বন্ধ হয় না, কেবল বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে আসবে।

অতসী দেখলে মাঠের লোকজনদের মধ্যে মেয়েরাই বেশি, ছোট

মতো শহরে ঝি-চাকরের কাজ করে এখন ফিরছে ছোটখাট সওদা করে, নয় তো হাটে গিয়েছিল সব্জি বিক্রি করার জন্য। অতসী খবর নিয়ে জানতে পারল, কতক মেয়ে আছে যারা নিয়মিত এই ব্যবসা করে, পাইকারদের কাছ থেকে মাল কিনে হাটে বিক্রি করে। গ্রামে ঢোকার মুখে দেখলে ছোটখাট থলেতে ভরে ধান নিয়ে যাচ্ছে কলে ভানাতে, স্পষ্টত এসব নিজেদের ব্যবহার করার জন্য, ভানিয়ে নিয়ে এলে তারপর রান্না হবে। গ্রামের পথে দেখলে কতকগুলি প্রৌঢ়া এবং যুবতী মেয়ে মাথায় সারের ঝোড়া নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছে, ঘামে সারের গুঁড়োয় সমস্ত শরীর কালো হয়ে উঠেছে।

পাঁচুর মা'র পায়ের শব্দ পেয়েই ভিতর থেকে রোগজীর্ণ, খনখনে গলায় পাঁচুর বাবা কাতরে উঠল, 'বেলা দু'ফর কাটি' এলি মাগি, তোর আঁতের বাবুরা তোকে ছাড়ল এতক্ষণ···'

সমানে উত্তর দিল পাঁচুর মা, 'হ্যাঁ ছাড়ল, না হলে উদরে ঢুকবে কি করে তোমার···চোখের মাথা খেইছ, ঘরে ভদ্দনোকের মেয়েছেলে এসছে···'

অতসী তখনো বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে ছাতার নীচে ঘামছে। অন্যসময় হলে, তাদের স্ব-সমাজ হলে এটা তার কাছে অশ্লীল, কুৎসিত মনে হত, কিন্তু এখন সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে হতে লাগল। অতসী খাওয়া-দাওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়েছিল, পাঁচুর মাকে বললে সে খেয়ে এসেছে। সারাদুপুর একটা অদ্ভুত আবেশ নিয়ে ওখানেই থেকে গেল ও। দেখলে যে, পাঁচুর মা যতই খেঁকিয়ে উঠুক, যত্নের সঙ্গে স্বামীকে রান্না করে খাওয়াল। স্পষ্টত সামান্যই চাল ছিল, নিজে ছাতু ভিজিয়ে খেলে। অতসীর জন্য চারটি মুড়ি ছাড়া আর কিছু সংগ্রহ করতে পারল না ও। অতসী খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে গ্রামের মেয়েদের কথা, তারা কি ভাবে থাকে, অভাবের সময় কি করে সংসার চালায়, এই সব জিজ্ঞেস করতে লাগল। প্রথমটা উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিচ্ছিল পাঁচুর মা, তারপর ভাঁটা পড়তে লাগল, তার খাওয়ার পর স্বামীর কাছেই রয়ে গেল সে।

বিকেলে পাঁচুর মা'র সঙ্গেই ফিরে এল অতসী। সারাদিনের উপোস, দু'বার মাঠ পেরিয়ে যাতায়াত—তার ওপর একটা ভুল করে বসল অতসী, ফেরার কিছুক্ষণ পরেই স্নান করে বসল। সন্ধ্যার পর থেকেই শরীরটা কেমন বোধ করছিল, খাওয়ার পর শুতে গিয়ে বুঝল তার জ্বর হয়েছে। সমস্ত রাত্রি তার ঘুমটা কেমন আচ্ছন্ন, ঘোলাটে হয়ে রইল। স্বপ্নের মধ্যে কত কি অসংলগ্ন ঘটনা তার চেতনার ওপর দিয়ে ভেসে গেল। মাঝে মাঝে ডাক ছেড়ে ছেড়ে কাঁদতে লাগল ও। শেষদিকে দেখলে গ্রামের সেই মাঠের মধ্যে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় যেন যাচ্ছিল ওরা, কিন্তু সেই জায়গায় আর পৌঁছোতে পারছিল না। ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছিল ওরা। সকলের মাথায় বোঝা, সকলেই ক্লান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। অতসীর সম্বন্ধে প্রথমটা ওরা ছিল সন্দিগ্ধ, তারপর তর্জন গর্জন আরম্ভ করে দিলে। পাঁচুর মা কর্কশকণ্ঠে বার বার বলতে লাগল, 'আমাদের সঙ্গে এস নি তুমি, তুমীদি, ফিরে যাও।···' আর একজন বিরাট একটা বোঝা নিয়ে এসে বললে, 'ঘাড়টা গেল, লাও না একবার নিজের মাথায়, লাও না···' বলে নিজের বোঝাটা দিলে তার মাথায় চাপিয়ে। উঃ, গেল, মাথা গেল, তবু অতসী কাতর অনুনয়ের সঙ্গে বলতে লাগল, 'দাও, আমাকে দাও, আমি তো নেবার জন্যই এসেছি।···' মাথার ওপর বোঝাটা আর একবার তুলে ভালো করে বসাবার জন্য ঠুকে দিলে। উঃ।

পরের দিন সকালে সমস্ত দেখেশুনে বীণার চক্ষুস্থির। সত্যিই উদ্বিগ্ন হলেন তিনি। কাল তাঁকে না বলে যাওয়ার জন্য বকলেন। ইস্কুলে যাওয়ার আগে ওর পথ্যের ব্যবস্থা করলেন, অতসীর জেদের জন্য ওষুধের বন্দোবস্ত করতে পারলেন না। কিন্তু উনি যতটা আশঙ্কা করেছিলেন, ততটা হল না। আস্তে আস্তে অতসীর জ্বরটা ছেড়ে গেল, এমন কি বিকেলে বিছানা ছেড়ে ঘর-দোর পরিষ্কার করতে লাগল ও। শেষকালে হাঁফিয়ে উঠে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বারান্দায় বসে পড়ল।

চোখের সামনে অনেকটা খোলা, দূরে রাস্তাটা স্টেশনের দিকে বেঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে দূরে একটি যুবককে যেন লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখছিল ও, খেয়াল করেও করে নি। একটু কাছাকাছি এসে কাউকে যেন কি জিজ্ঞেস করলে। আরো কাছে আসতেই তাকে চিনতে পারল অতসী। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। যুবকটিও তখন ওকে দেখতে পেয়েছে আর সোজা এগিয়ে আসছে। 'মণিদা', তুমি'···বারান্দা থেকে নামল অতসী, কিন্তু মণিশঙ্কর ওর হাত ধরে আবার বারান্দায় ফিরিয়ে নিয়ে এল।

'কি রে, তোর চোখ-মুখ ভীষণ খারাপ মনে হচ্ছে, অসুখ-বিসুখ নয় তো···'

'মণিদা', তুমি এসেছ ! আঃ, আমি যেন বিশ্বাস করতেই পারছি না। তোমাকে কত দরকার ছিল আমার ··'

'আমাকে নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবছিলি, কিন্তু শোন, আই এ্যাম জাস্ট এ মেসেঞ্জার··তোর জন্যে একটা পত্র বহন করে এনেছি ··'

বুকপকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে দিয়ে ঘরে ঢুকল মণিশঙ্কর, নিজের জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখবার জন্য।

অতসীর চিঠিখানা লিখেছে রণজিৎ। অযাচিতভাবে চিঠি লেখার জন্য প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করেছে সে, জানিয়েছে যে মৃত্যুঞ্জয়শঙ্করের নির্দেশে তাঁরই কথাগুলি তাকে জানিয়েছে। খানিকটা ব্যাখ্যা করে সে মন্তব্য করেছে, 'সেদিন আপনি হঠাৎ মত-পরিবর্তন করাতে উনি খুব আপসেট হয়ে পড়েছিলেন। আপনাদের ওখান থেকে কলকাতা পর্যন্ত যে রকম ডিপ্রেস্‌ড্ অবস্থায় প'ড়েছিলেন, তাতে আমার ভয়ই করছিল। এখন কিন্তু তাঁর চিন্তা অন্যরকম, ভাবছেন যে, আপনি নিশ্চয়ই ওখানে খুব অসুবিধেয় পড়েছেন। ওঁর ইচ্ছে আপনি ওঁর ওখানে থেকে পড়াশুনো করেন। আপনার সম্মতি পেলে, আমাকেই গাড়ি নিয়ে তিনি পাঠাতে চান। আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপারে আমাকে কথা বলতে হচ্ছে বলে আশা করি সেদিনের মতো ভুল বুঝবেন না···আমার মনে হয় যদি মণিবাবুর সঙ্গে চ'লে এসে আপনি ওঁর সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলে যান খুব ভালো হয় ··'

অতসী কয়েকবারই বীণার খোঁজ করল, কিন্তু ইস্কুলের পর তিনি বাড়ি ফিরতে পারেন নি। খবর দিয়েছেন যে কোন মিটিং-এর জন্য সেখানে আটকে পড়েছেন। অতসী চা করে খাওয়াল মণিশঙ্করকে। সন্ধ্যার মুখে মণিশঙ্কর বললে, 'মনে হচ্ছে তোদের এখানে বেড়াবার চমৎকার জায়গা···নিয়ে যাবি ?'

অতসী বলল না যে সে অসুস্থ দুর্বল। বললে, 'কোথায় যেতে চাও ?'

'সেটা তো তোরই বলার কথা'···'

স্টেশনের কথা ভেবে বেরোল অতসী, কিন্তু কি মনে করে যে পথে কাল পাঁচুর মা'র সঙ্গে গ্রামে গিয়েছিল, সেই পথেই নিয়ে গেল মণিশঙ্করকে। শহরের সীমায় বস্তি পেরিয়ে মাঠের মধ্যে এসে পড়ল ওরা এবং একটা উঁচু আলের ওপর বসল। তখন সূর্য অস্ত গেছে, পূর্বদিক অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

অতসী প্রশ্ন করল, 'তুমি আমার চিঠিটা পড়েছ ?'

'হাউ কুড আই ? রণজিৎ মুখার্জী লিখেছেন তোকে।···'

পুরোপুরি দৃষ্টিতে অতসীর চোখের দিকে তাকাল মণিশঙ্কর, একই সঙ্গে জিজ্ঞাসা আর একটা ব্যঙ্গাত্মক ভাব ফুটে উঠল সেই চোখে।

'তা হলে চিঠিখানা পড়ে দেখ···' বলে জামার ভাঁজ থেকে খামটা বের করল অতসী। 'আচ্ছা, মণিদা', শেষ পর্যন্ত তুমিও ওদের সঙ্গে যোগ দিলে ! এই অলক্ষ্য, অদ্ভুত ষড়যন্ত্রে···'

চিঠির ওপর দ্রুত চোখ বুলোতে বুলোতে মণিশঙ্কর বললে, 'ঠিক বুঝতে পারছি না আমিও ওদের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছি কি না, তবে এটুকু বলতে পারি, তার ইচ্ছে ছিল না এখনও নেই··'

'তুমি ঠিক করে বলো তো, কেন এখানে এসেছ ?'

'বলছি। জ্যেঠীমার মৃত্যুর খবর আমাকে জানানো হয় নি, পরে জানলাম তোকেও না। কলকাতায় এসে দেখলাম, ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে। মনে হয় তোর ওপর ওদের একটা আশা ছিল, সেটা তুই ভেঙে চুরমার করেছিস। তখনই তোকে অভিনন্দন জানাবার জন্য আসব বলে ঠিক করলাম, মিঃ মুখার্জী চিঠি দিলেন তখন···'

'আচ্ছা, এই চিঠি মিঃ মুখার্জীকে দিয়েই লেখানো কেন, তোমার মারফৎ কাকু বলতে পারতেন না ?'

'নিশ্চয়ই পারতেন, চান না আর কি। তবে একটা জিনিস সত্যি, বাবা খুব শক পেয়েছেন···'

'আশ্চর্য, সবাই আমার জন্য শক পাচ্ছে, কিন্তু কেউ কি ভাবতে পারে না তারা আমাকেও শক দিতে পারে আর দিচ্ছেও···'

'নাঃ, এটা কেউ ভাবতেই পারে না, তোর পক্ষেও সেটা অসম্ভব।'

'তুমি এই কথা বলছ ! আচ্ছা, আমার সম্বন্ধে তুমি কি বল···'

'নাঃ, তোর সম্বন্ধে তোকেই বলতে হবে···'

পূর্বদিকের আকাশে একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে, সমস্ত মাঠটা আলো-আঁধারি হয়ে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল অতসী। কালকের সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল ওর, সেই স্বপ্নের কথা। কতক্ষণ আচ্ছন্নের মতো বসে রইল ও, তারপর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'মণিদা,' আমি কি কিছুই করতে পারি না ?'

'নিশ্চয়ই পারিস, করছিসও তো অনেক কিছু···'

'দেখ, আমি নিঃস্ব, একলা। ভেবে দেখলাম নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হলে আমায় এম-এ পড়তে হবে, সেটা কি করে সম্ভব বলতে পারো ?'

'তোর বিত্ত কত ?'

'আমি যখন কলেজে প্রথম পড়তে যাই, তখন মায়ের পাশ বইতে সাড়ে তিন হাজার টাকা ছিল, এখন দেখছি চারশো সাঁইত্রিশ টাকা আছে। সবটা আমার জন্যই খরচ করেছেন তিনি···'

'তা হলে কলকাতায় বাবার কাছে যেতে হয়, নয় তো এম-এ পড়ার আশা ছাড়তে হবে···'.

আবার সেই মাঠের দিকে তাকাল অতসী, চমকে উঠে বললে, 'মণিদা',' মা শেষ জীবনে কলকাতায় গিয়ে মরেছেন, আমাকেও মরবার জন্য ইঙ্গিত করে···'

মণিশঙ্করের সব মুখরতা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। হাসি-ঠাট্টার অন্তরালে রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছিল ও, অতসীর কথার মধ্যে একটা পরিণতি দেখার জন্যে। বুঝল সে।

আস্তে আস্তে বললে, 'তুসী, তুই আমার সঙ্গেই কলকাতায় চল। তোকে পৌঁছে দিয়ে আমি চলে যাব···'

'কলকাতায় থাকবে না তুমি ? তাহলে আমি কেমন করে থাকব···' উৎকণ্ঠায় মণিশঙ্করের হাতখানা জড়িয়ে ধরল ও।

মণিশঙ্করের গলা ভার হয়ে এল, বললে, 'কলকাতায় আর ফেরার ইচ্ছে নেই।'

'কেন ? তোমার থিসিস সাবমিট করবে না তুমি !···'

'না, যে জিনিস জীবনের সত্য, তা নিয়ে কেউ গবেষণা করে না।'

'মণিদা', মণিদা', আমার ওপর রাগ কোর না তুমি, আমাকে ঘৃণা কোর না। আমাকে ছেড়ে যেয়ো না···' মণিশঙ্করের হাত ছেড়ে ওর পায়ে জড়িয়ে ধরল অতসী। সেই আবছা আলোতে, তার গতকালকার সেই কঠিন পরিচয়ের মাঠের ওপর পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।
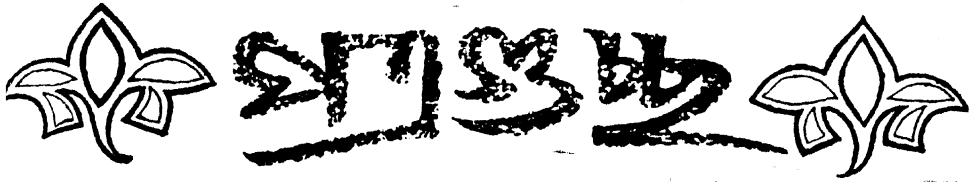
ভগিনী নিবেদিতার চিঠি

[A letter of Sister Nivedita, addressed to Hindu Women on 23rd Dec, 1902 at Triplicane (Madras)]

প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় মহিলাবৃন্দ,

আমার পক্ষে, সে দুঃখ প্রকাশের ভাষা নেই, যে দৈবদুর্বিপাকে, এই অপরাহ্নে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি—এবং অন্যপক্ষে নানা দূরদূরান্তর থেকে আপনারা এসে সমবেত হয়েছেন।

আমি অনুভব করছি, আমার মহান গুরুর (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধাই এত বিপুল সংখ্যায় আপনাদের একত্রিত করেছে এই টনডামনডলম্ (Tonda-mandalam) উক্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

ইহা আমার পক্ষে এক অবর্ণনীয় আনন্দের কারণ হতো, যদি আপনাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সে স্মৃতি বর্ণনা করতে পারতুম—কিভাবে গুরুদেব আমাদের পাশ্চাত্য দেশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, আর তাঁর স্বদেশের জনসাধারণের সম্বন্ধে কি অনন্ত আশা তিনি হৃদয়ে পোষণ করতেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, ভারতের ভবিষ্যৎ—পুরুষদের চেয়ে, নারীদের উপরেই বেশি নির্ভরশীল এবং তাঁর বিশ্বাস আমাদের সকলের প্রতি কত গভীরই না ছিল। ভারতীয় নারীই, পুরাকালে—স্বামীর মৃতদেহের পাশে সহমরণে জ্বলন্ত চিতায় আনন্দের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তেন—তাঁদের বিরত করবার মতো বলিষ্ঠ হস্ত তখন ছিল না। সীতা ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ। অনুরূপ সাবিত্রীও। মহাদেবকে পার্শ্বে পাবার জন্যে, গৌরীর তপস্যারত চিত্র,—ভারতীয় নারীর আদর্শ। গুরুদেব যুক্তি প্রয়োগ করতেন, এমন অন্য কি কর্তব্য আছে, যার দ্বারা নারীর গৌরব এঁদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে?

প্রত্যেকটি দেশে, পবিত্রতা এবং শক্তিই হ'চ্ছে জাতির সেই সম্পদ যা' নারীরাই রক্ষণ

ভগিনী নিবেদিতা

করে পুরুষদের চেয়ে বেশিভাবে। এখানে-সেখানে মাত্র কয়েকজন পুরুষ শিক্ষকরূপে চিহ্নিত হ'তে পারেন—কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেরই রুটির জন্যে পরিশ্রম করতে হয়। গৃহেই তাঁদের অনুপ্রেরণা নিত্য নতুনতা লাভ করে—তাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের আন্তরিকতা ও মহত্ত্ব নারীর তপস্যার মধ্য থেকেই আসে। আপনারা, ভারতীয় বধূরা ও মাতৃগণ, আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন—রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শঙ্করাচার্য—তাঁদের জননীর কাছে কত ঋণী। নারীর শান্ত, নীরব জীবন—গৃহে গৃহে তপস্বিনীর মতো তাঁরা বাস করেন, তাঁদের গর্ব অনুভব করা উচিত, কি বিশ্বস্ততায়, কি অধ্যবসায়ে, সর্বোপরি পরিপূর্ণতার আদর্শে, ধর্মরক্ষায় ও পরিপোষণে তাঁরা যা' করেন তা' বস্তুতই বাইরে যে কোন যুদ্ধ যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়—তার চেয়ে অনেক বেশি।

আজ আমাদের দেশ (ভারতবর্ষ) এবং তার ধর্ম—

'হৃতগৌরব নতশির অপমানে লাজে'—

আজ বিশেষভাবে তার মেয়েদের এই মুহূর্তে আহ্বান জানাচ্ছে এগিয়ে আসতে, যেভাবে আগের যুগে তারা এসেছিল, পরম শ্রদ্ধায় দেশকে সাহায্য করতে। আমাদের প্রশ্ন—'কিভাবে দেশের আহ্বানে কাজ করতে পারবো?' প্রথমেই বলবো, আসুন—ভারতীয় মায়েরা তাঁর সন্তানদের ব্রহ্মচর্য পালনে আগ্রহান্বিত করুন। ইহার অভাবে আমাদের জাতি তার প্রাচীন শক্তি-সামর্থ্য নষ্ট করবে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই, যে দেশে ছাত্রদের আদর্শ এর চেয়ে উন্নতমানের, আর যদি ভারতবর্ষ থেকে ইহাকে নির্বাসিত করা হয়, তবে জগৎ কার

কাছ থেকে এই আদর্শকে উজ্জীবিত করবার প্রেরণা পাবে? সমস্ত শক্তির এবং মহত্ত্বের মূল নিহিত আছে ব্রহ্মচর্যে। আসুন, প্রত্যেক মায়েরা সংকল্প নিন, ভারতের সন্তান বড় হউক।

আর দ্বিতীয়ত আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে পরোপকারবৃত্তি বেশি করে অনুশীলন করি। এই সহানুভূতি থেকেই সমস্ত মানুষের দুঃখ ও বেদনার সংবাদ নিতে আমরা ব্যগ্র হ'বো, আমাদের জন্মভূমির ক্রন্দন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করবে। আজকের আধুনিকজগতে আমাদের ধর্মের বিপদের ভয় রয়েছে কোথায়—এবং এভাবে জ্ঞান সংগ্রহ করেই আমরা কঠোর কর্মিরূপে রূপান্তরিত হ'বো। সেই কাজ আমরা কর্মের আনন্দেই সম্পাদন করবো (work's sake)—মরবো ভয় পাবো না, যদি আমাদের কাজে দেশের ও জনগণের সেবা করতে পারি।

আসুন, আমরা স্মরণ করি আমাদের দেশ আমাদের জন্যে কি করেছে, কিভাবে দেশ আমাদের সৃষ্টি করেছে, খাদ্য দিচ্ছে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব দিয়েছে—সর্বোপরি দিয়েছে গভীর বিশ্বাস। এই দেশ কি আমাদের জননী নয়? আমরা কি আবার তাকে দেখতে চাই নে 'মহাভারতের' মধ্যে? প্রিয় বোন এবং মায়েরা, আমার বিশ্বাস, আমার গুরুজী (স্বামী বিবেকানন্দ), আরো অনেক সুন্দর করে এসব কথা আপনাদের বলেছেন, সে সামর্থ্য আমার নেই।

আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিই, আমার মতো অযোগ্যাকে সম্মান দেখিয়ে—আপনারা আমার গুরুদেবের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। আপনাদের আমি বিনয় সম্ভাষণ জানাচ্ছি তাঁর পক্ষ থেকে, যিনি তাঁর মেয়েরূপে আমাকে গ্রহণ করেছেন; সুতরাং আপনারা, দেশের মহিলাগণ, আমাকে ছোটবোনের মতো ভাববেন এবং আমার জন্যে প্রার্থনা করবেন। আমি এই সুন্দর ও পুণ্যভূমিকে ভালবাসি—আর চাই আরো বেশিভাবে আপনাদের সেবা করতে। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাঁর কথা যিনি আমার গুরুকেও পথ দেখিয়েছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা এবং বিশ্বজননী কালীর কথা—যাঁর কৃপায় আমরা কাজ করছি। মা আমাদের যে কারও মধ্যে নিঃসন্দেহে কাজ করাবেন—যেই তাঁকে ডাকবে।

সেই জগৎজননী মায়ের নামে এবং তাঁর করুণায় আপনাদের সামনে আমি বলছি—

আপনাদের একান্ত প্রিয় বোন,

নিবেদিতা

(শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চরণে)

অনুবাদক—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দে।

কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক পত্র

পরিচালকমণ্ডলীকে লেখা হেস্টিংসের পত্র

৩রা ডিসেম্বর, ১৭৭৪
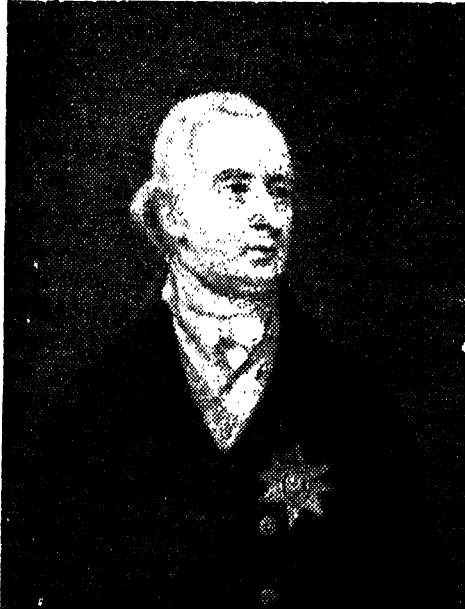
আমার ক্ষমতাবলে যে বিষয়টি সম্বন্ধে আমাকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে তাহা এত নগণ্য এবং লঘু যে, তাহাদের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইতেছে ভাবিয়া আমার লজ্জার সীমা নাই। তাহারা আমাকে অভিযুক্ত করিয়াছে এই মর্মে যে, তাহাদের প্রাপ্য মর্যাদা আমি তাহাদের দিই নাই। অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, তাহাদের আগমন ঘটিলে মাত্র সতেরবার তোপধ্বনি দ্বারা তাহাদের আপ্যায়িত করা হয়; তাহাদের সমাদর জানাইবার জন্য বাহিনীকে সেখানে হাজির করানো হয় নাই; তাহাদের সহিত কাউন্সিল হাউসের পরিবর্তে আমি আমার বাসগৃহে সাক্ষাৎ করিয়াছি; সাধারণ ঘোষণার নূতন পরোয়ানা জারির হইতে তিন দিবস বিলম্ব হইয়াছে অর্থাৎ শুক্রবারের পরিবর্তে উহা জারির করা হইয়াছে সোমবার; যথাযোগ্যভাবে নূতন সরকারের ঘোষণাও জারির হয় নাই।

আমি এক্ষণে এই পাঁচটি অভিযোগ সম্বন্ধে এক-এক করিয়া আমার বক্তব্য পেশ করিতেছি—

১নং—আদেশই ছিল যে প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতিদের উদ্দেশে সতেরবার তোপধ্বনি দ্বারা স্বাগত জানান হইবে। জেনারেল ক্লেভারিং সম্বন্ধে অনুরূপ সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কোম্পানীর খোদ পরিচালকবর্গই আদেশ পাঠাইয়াছিলেন স্যার এডোয়ার্ড হিউসকে [পনেরবার] তোপধ্বনি' মারফৎ বরণ করিতে—বোর্ডের প্রতি সদস্যদের

আর যদি একত্রে আসেন তাহা হইলে সর্বোচ্চ সংখ্যক ধ্বনি তাঁহাদের উদ্দেশে নির্গত করা হইবে। এই ব্যবস্থাই প্রচলিত এবং অদ্যাবধি অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। এই নিয়মকে অস্বীকার করার আমার পক্ষে কোন যুক্তিতেই সম্ভবপর ছিল না। তাঁহারা একত্রেই আসিয়াছিলেন এবং স্বভাবতই তাঁহাদের স্বাগত জানান হইয়াছে সতেরবার ধ্বনি দ্বারা।

২নং—তাঁহারা যদি দুর্গে পদার্পণ করিতেন তাহা হইলে সমগ্র বাহিনী নিশ্চয়ই তাঁহাদের অভিবাদন করিতে অংশগ্রহণ করিত—কিন্তু দুর্গ হইতে দূরবর্তী কোন স্থানে তাঁহাদের সামরিক সম্মান প্রদানের জন্য সমগ্র বাহিনী হইতে কিছু সৈন্য বিচ্ছিন্ন করা আমি সামরিক নিয়মবহির্ভূত বলিয়া মনে করি।

৩নং—আমার গৃহের পরিবর্তে কাউন্সিল ভবনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহাদের অভিপ্রেত তাহা যদি বিন্দুমাত্রও পূর্বাহ্নে অনুমান করিতে পারিতাম বা সাক্ষাতের স্থানের এরূপ আলোচনার বস্তুতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বুঝিলে আমি নিশ্চয়ই তাঁহাদের বাসনার অনুকূলে কাজ করিতাম। কিন্তু তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য ঘাটে প্রবীণ সদস্যদের উপস্থিত রাখা এবং তাঁহাদের সহায়তায় অভ্যাগতদের নগর পরিদর্শন করানোয় ও আমার বাসভবনে তাঁহাদের সাদর আপ্যায়ন জানানো তাঁহাদের প্রতি সম্মানের যথেষ্ট পরিচায়ক বলিয়াই আমি মনে করিয়াছিলাম এবং বলিতে বিন্দুমাত্র বাধা নাই—এখনও করি।

৪নং—পরোয়ানা জারির তিন দিনের বিলম্ব আমার নির্দেশেই হইয়াছে তাহাদের মর্ম সম্বন্ধে আমি পূর্বেই গোপন বারতা সংগ্রহ করিয়াছিলাম কিন্তু আমার সংগৃহীত সংবাদ সম্পূর্ণ ছিল না। তদুপরি আমার অধিকার ও ক্ষমতা হ্রাসকরণে ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিয়োগ ও প্রথমজন অপেক্ষা তাঁহাকে প্রকাশ্য ক্ষমতাদানের এই অসঙ্গতি আমাকে অন্তরের দিক দিয়া বিশেষভাবে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সময়ে, যখন আমি এইরূপ অভাবিত আচরণে ক্ষুব্ধ তখন আমি অনুরোধ করি হয় আমাকে আমার নির্দিষ্ট ক্ষমতার মধ্যে অধিষ্ঠিত রাখা হউক নতুবা পূর্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমারও কোম্পানীর সেবা সমাপ্ত হউক—নূতন ব্যবস্থার বিবরণ প্রকাশ সম্বন্ধে নিজের মনে আমাকে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার অবসর দেওয়া হউক।

৫নং—নূতন সরকারের ঘোষণা সংক্রান্ত ত্রুটির জন্য বোর্ডের সদস্যরা নিজেরাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। তাঁহারা সংখ্যায় অধিক, যাহা খুশি বলিতে বা করিতে পারেন কিন্তু একবার বিষয়বস্তুটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া তবে আমার প্রতি অভিযোগের তীক্ষ্ণ শরগুলি প্রয়োগ করিলে ন্যায়সঙ্গত হইবে। এখানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী লিখিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ঘোষণার প্রস্তাব আমি করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা সামরিক নিয়মকেই অধিক প্রাধান্য দিলেন। তবে কার্যপালনের দিক দিয়া আমার আচরণে যদি কোন স্খলন বা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তবে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে উহা ইচ্ছাপূর্বক নহে বিশেষত ইহা যখন নূতন সরকারকে কেন্দ্র করা—যে সরকারের মর্যাদা ও সম্ভ্রম সম্পর্কে তাহার শীর্ষস্থানে আসনগ্রহণকারী হিসাবে আমি অধিকমাত্রায় সচেতন।

সামগ্রিকভাবে, নির্দ্বিধায় এ কথা আমি সোচ্চারে বলিতে পারি যে, এই বিশেষ অভ্যাগতদের সমস্থানীয় আর যাঁহারা এতাবৎ এই দেশের মৃত্তিকায় অবতরণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের তুলনায় অনেক বেশি সম্মান, সম্ভ্রম ও সমাদর ইঁহারা লাভ করিলেন। এমন কি ইঁহাদের তুলনায় যাঁহারা যথেষ্ট কর্মশক্তির এবং অভাবনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়া এ দেশের নর-নারীর মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন—যাঁহাদের কর্মকুশলতা, ক্ষুরধার প্রতিভা এবং অনমনীয় উদ্যম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে—সেই ক্লাইভ বা ভ্যান্সিটার্ট যখন গভর্নররূপে প্রথম আসেন তখন সেই কর্মবীরেরাও এ জাতীয় সম্মান পান নাই। তাঁহাদের আপ্যায়নের জন্য সমগ্র কাউন্সিল আমার ভবনে জমায়েত হইয়াছিল—প্রকৃতপক্ষে তাহার ফলে আমার আবাসটি কাউন্সিল ভবনে পরিণত হইয়াছিল—তথাপি তাঁহারা তুষ্ট হইলেন না—ইহাও খোলাখুলি বলিয়া রাখি তাঁহারা বোধ হয় নিজেদেরই খোদ সরকার ভাবিয়া সেই প্রাপ্য সম্মানের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং স্বপ্নের ঘোরে তাঁহারা এইটুকুইমাত্র ভুলিয়াছিলেন যে তাঁহারা আদপেই সরকার নন—আসলে তাহার একটি অংশমাত্র।

স্ত্রীকে লেখা ডাঃ হ্যানককের চারখানি পত্র

বিষয় ঃ হেস্টিংস ও মিসেস ইমহফ

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৭২

আজ মিঃ হেস্টিংস আসিয়া পৌঁছাইলেন। তাঁহাকে খুব কৃশ এবং দুর্বল দেখাইতেছে। তবে স্বাস্থ্যের দিক দিয়া সামগ্রিকভাবে তিনি কুশলেই আছেন।

এপ্রিল ১৭৭২

মিঃ হেস্টিংস সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দিতে তোমার নিকট আমি প্রতিশ্রুত আছি। বাঙলা দেশের বহু প্রচলিত প্রথার বিলোপসাধন করিতে তিনি বদ্ধপরিকর, বলা বাহুল্য এই মনোভাব এখানকার অধিবাসীদের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মিসেস ইমহফ নামে এখানে একজন মহিলা আছেন—মহিলাদের মধ্যে তিনিই হেস্টিংস-এর বিশেষ প্রীতি ও পক্ষপাতের পাত্রী। হেস্টিংসের সহিত একই জাহাজে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাঁহার স্বামী জার্মান সার্ভিসের একজন অফিসার এবং মাদ্রাজ ক্যাডেট হিসাবে তিনি আসিয়াছেন। যুদ্ধবৃত্তির দ্বারা সংসারনির্বাহ তাঁহার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছিল না। যুদ্ধবৃত্তির দ্বারা অর্জিত অর্থ তাঁহার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। চিত্রাঙ্কন বিদ্যাতেও তিনি দক্ষতাসম্পন্ন ছিলেন। কিছু কিছু ছবিও ফাঁকে ফাঁকে তিনি আঁকিতেন শেষে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তুলিকেই পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করিলেন। মাদ্রাজে প্রায় সকল প্রসিদ্ধ নরনারী ও ধনাঢ্য পরিবারের সদস্যদের চিত্র অঙ্কিত করিবার পর যখন দেখা গেল সে ক্ষেত্রে আর কেহই অবশিষ্ট নাই—সকলেই তাঁহার তুলিকায় ধরা পড়িয়াছেন—তখন তিনি বঙ্গদেশে আসিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের তখন একেবারে শেষাশেষি। তাঁহার সহধর্মিণী কিন্তু বুঝ্যাক্ত মাদ্রাজেই রহিয়া গেলেন এবং তিনি বাস করিতে লাগিলেন হেস্টিংসেরই ভবনে। এই মহিলার বয়ঃক্রম ছাব্বিশ বৎসর। মহিলাটি কি আচরণে, কি আলাপনে, কি রূপসম্পদে সকল দিক দিয়াই অতুলনীয়া। ঈশ্বর এই মহিলাটিকে অফুরন্ত সৌন্দর্যে

বিকশিতা করিয়া তুলিয়াছেন। তৎসহ তাঁহাকে অধিকারিণী করিয়াছেন নানাবিধ গুণের ও দক্ষতার। ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি বিদ্যমান তাহা ছাড়া ইনি একজন রীতিমত রসিকাও। সকল দিক দিয়া বিচার করিলে মহিলাটি নিজেই একটি নিখুঁত ও চিত্তাকর্ষক সৃষ্টি। গত অক্টোবরে তাঁহারও কলিকাতায় আগমন ঘটিয়াছে। তাঁহাদের হেস্টিংসের সংসারে একীভূত না দেখিলেও হেস্টিংসের ঘরোয়া মিলনচক্রগুলিতে ঘনিষ্ঠভাবেই দেখা যায়। মিঃ ইমহফ নিজে আসলে একটি খাঁটি জার্মান। মিসেস ইমহফ সম্বন্ধে আমি এই দীর্ঘ বর্ণনা হইতে বিরত থাকিতাম, কিন্তু হেস্টিংস প্রসঙ্গে তাঁহার অবতারণা করিতেই হয় আর ইহা আমি ভালভাবেই জানি হেস্টিংস সংক্রান্ত একটি অতি তুচ্ছ, উপেক্ষণীয় সামান্যতম তথ্যও তোমাকে বিশেষভাবে আগ্রহী এবং আকৃষ্টা করে।

ফেব্রুয়ারি ১৭৭৩

মিঃ ইমহফ ইংল্যাণ্ড যাত্রা করিতেছেন। তোমার উদ্দেশে তাঁহার নামে একটি পরিচয়পত্র লিখিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব। তাঁহার সহিত আলাপ করিও। তবে তাঁহার সহধর্মিণী এইখানেই থাকিয়া যাইতেছেন।

ডিসেম্বর ১৭৭৩

যে তরুণটি এই পত্র তোমার হাতে সমর্পণ করিবে সে মিঃ ও মিসেস ইমহফের পুত্র। আমার পূর্বপত্রে ইহার সম্বন্ধে তোমাকে আমি আলোকিত করিয়াছি। তুমি ইহার প্রতি স্নেহপূর্ণ লক্ষ্য রাখিলে এবং ইহার মঙ্গল সম্বন্ধে চিন্তাদি করিলে তোমার প্রতি হেস্টিংস যথেষ্ট পরিমাণে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। হেস্টিংস ইহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট যত্নশীল এবং এই তরুণের আজ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক, সেই কারণে আমি ইহাকে শুধু তোমারই নিকট পাঠাইতেছি জানিবে।

স্ত্রীকে লেখা স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের পত্র

হীরকের কর্ণাভরণ বা তোমার অভিরুচি অনুযায়ী যে কোন অলঙ্কার ক্রয় করার জন্য উপহারস্বরূপ কলিকাতা হইতে তোমাকে পাঁচশত পাউণ্ড পাঠাইতেছি। ভাগ্যলক্ষ্মী আমার প্রতি তাঁহার করুণা উজাড় করিয়া দিয়াছেন তাঁহার অবিরাম কৃপায় আমাকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছেন—আমি তো তাঁহারই সেবকস্য সেবক। তাঁহার নিকট আমার ঋণের সীমা-পরিসীমা নাই। তোমার তো অজানা নয় যে একদা অভাব-অনটন জনিত কি নিদারুণ দুর্যোগের ঝড় আমাদের উভয়ের জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। ভাবিয়া দেখ, কি ভয়ঙ্কর দিনগুলিই না আমাদের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

পত্রের উত্তর

নভেম্বর ১৭৭৭

আমরা উভয়েই ভাগ্যলক্ষ্মীর নিকট নিশ্চয়ই গভীর ঋণে ঋণী। সে কারণে আমি নিশ্চিতরূপে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধা। অতীতের সেই অভাবসঙ্কুল দিনগুলি মনে পড়ে বৈ কি, জীবনের উপর তাহারা যে সকল ছাপ রাখিয়া গিয়াছে তাহা তো আর জলের

দিনগুলির স্মৃতি, সত্য কথা বলিতে কি—আমাকে আনন্দই দেয় আমার অন্তরে বেদনার সৃষ্টি করে না। তখন একটি নিটোল শান্তি আমাদের পরিবারে বিরাজ করিত। পরমা শান্তির প্রতিষ্ঠা আমাদের সর্বতোভাবে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিল, পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে সমস্ত দুঃখ, দৈন্য জয় করিতে পারিয়াছি, একে অপরকে শক্তি জোগাইয়াছি, জোগাইয়াছি প্রেরণা, দু'জনে দু'জনকে অতি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিবিড়ভাবে পাইয়াছি—সে যে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি, কি সুখ—তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আজ বিরাট সাফল্য ব্যাপক প্রতিপত্তি তোমাকে খ্যাতির উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে কিন্তু আমার নিকট হইতে তোমাকে দূরে সরাইয়া লইয়াছে—একত্রে থাকার আনন্দ সবটুকু নিষ্ঠুরের মত কাড়িয়া লইয়াছে। এই বিচ্ছেদ যে আমার পক্ষে কতখানি মর্মান্তিক তাহা আমিই জানি, তথাপি ইহা আমাকে মানিয়াই লইতে হইবে এবং তাহা আমাকে সহ্যও করিয়া চলিতে হইবে। তোমার পত্রগুলি পাইয়া, ওগো প্রিয়তম ফিলিপ কি অভূতপূর্ব আনন্দ যে লাভ করি তাহার বিবরণ দান দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য।

স্ত্রীকে লেখা ফ্রান্সিসের আর একটি পত্র

আমার পরম প্রিয় পবিত্রতা,

তোমাকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করার জন্য যে আমি কতখানি অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছি তাহা কিভাবে যে ভাষায় প্রকাশ করি ভাবিয়া পাইতেছি না। আমি নিজেকেও যখন ভুলিয়া যাই—তোমাকে সকল সময়েই শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে মনে পড়ে। আনন্দের চরমে তখনই আত্মহারা হই যখন ভাবি যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা নারী আমার অধিকারে যাহাকে বাদ দিলে আমিই অস্তিত্ববিহীন চলি, বিদায়।

ফ্রান্সিসকে লিখিত তদীয় পত্নীর আরও তিনটি পত্র

আরও একটি বৎসর তোমাকে ভারতে অতিবাহিত করিতে হইবে ইহা শুনিয়া রীতিমত হতাশ হইলাম। আমার প্রিয় ফিলিপ, কি কারণে তুমি আরও একটি বৎসর ভারতে থাকিতেছ, অবশ্য আমি ভালভাবেই জানি যে তুমি স্বদেশেই থাক কি বিদেশেই থাক—তোমার নিকট উভয়েই সমতুল্য—কিন্তু তোমার তো ইহা অজানা নয় যে আমার নিকট তাহা সমতুল্য নহে। আমি অন্তর হইতে লিপিবদ্ধ করিতেছি যে আমার যা কিছু আনন্দ, শান্তি, স্বস্তি সবকিছুই নির্ভর করিতেছে তোমার সান্নিধ্য সুখের উপর কিন্তু আশ্চর্য, তোমার দিক হইতে লক্ষ্য করিতেছি তাহার ব্যতিক্রম।

১ই ডিসেম্বর ১৭৭৮

অদ্য প্রাতঃকালে আমার উদ্দেশে প্রেরিত প্যাকেটটি গ্রহণ করিবার জন্য আমি ইণ্ডিয়া হাউসে গমন করিয়াছিলাম। আমি তোমার ছবিটির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে তাহারা তোমার ছবিটি আমাকে দেখাইলেন। ছবিটি সুন্দর সন্দেহ নাই—তবে আসলটি ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণ সুন্দর।...

ডিসেম্বরের শেষভাগ ১৭৭৮

তোমার ছবিটিকে আমি প্রায় সর্বদাই চুম্বিত করি,—তাহার সহিত আমার কথা হয়—সে যেন ছবি নয়, সে যেন সর্বাংশে জীবন্ত হইয়া আমার নিকট ধরা দেয়।

হেমলতা দেবী

বর্তমান বাঙলার প্রবীণতমা লেখিকা, প্রসিদ্ধা সমাজসেবিকা]

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে চর্মনেত্রে প্রত্যক্ষ করার দুর্লভ সৌভাগ্য যাঁদের অধিকারগত তাঁদের কেউ কেউ আমাদের অসীম সৌভাগ্য এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান থেকে আমাদের ধন্য করে চলেছেন। পূর্ণব্রহ্মের নররূপকে নয়নভরে অবলোকন করে তাঁরা কৃতার্থ—তাঁদের আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা ভাগ্যবান। পরম শ্রদ্ধেয়া হেমলতা ঠাকুর সেই তালিকায় একটি উজ্জ্বল নাম।

জীবনের নব্বুইটি বছর তাঁর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই সুদীর্ঘ জীবন তাঁর কর্মের ও সাধনার এক নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। সে সাধনায় এখনও তাঁর ছেদ পড়ে নি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে যিনি দর্শন করেছেন, রামমোহনের সঙ্গে যাঁর রক্তের সম্পর্ক, দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের বাড়ির যিনি বধূ সেই হেমলতা দেবী আজ চৈতন্য-চরণস্পৃষ্ট পুরীধাম প্রবাসিনী। নারীকল্যাণ এবং সাহিত্য সাধনার পুণ্যকর্মে নিমগ্না। এখনও তাঁর উদ্যম, উৎসাহ অনুকরণযোগ্য—স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।

১৮৭৪ সালের জানুয়ারী মাসের এক ভোরবেলায় হেমলতা দেবীর জন্ম। গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর তাঁর জন্মস্থান। পুণ্যশ্লোক রামমোহনের তিনি পৌত্রীর পৌত্রী। তাঁর পিতৃদেব ছিলেন যোগীবর স্বর্গীয় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রখ্যাত এ্যাটর্নি ও সুধীবর স্বর্গত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর অগ্রজ। ১৮৯০ সালে জোড়াসাঁকোর বিশ্ববন্দিত অমৃততীর্থে তাঁর আগমন ঘটল মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র বিপত্নীক দীপেন্দ্রনাথের সহধর্মিণীরূপে, রামমোহন ও তাঁর মানসপুত্র দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক যোগসূত্র অবশ্য তার আগেই স্থাপিত হয়ে গেছে। মোহিনীমোহন ও তাঁর মধ্যম অনুজ স্বনামধন্য রমণীমোহন দ্বিজেন্দ্রনাথের কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেছেন। হেমলতা দেবীর চতুর্থ অগ্রজ রজনীমোহনের বিবাহও তখন সম্পন্ন হয়েছে মহর্ষির ভ্রাতুষ্পৌত্রী শিল্পীশ্রেষ্ঠ সুনয়নী দেবীর সঙ্গে।

বিবাহের পর হেমলতা দেবীর সাহিত্যচর্চা অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে। পড়া আর লেখা সমান তালে এগোতে থাকে। তা ছাড়া তখন জোড়াসাঁকোর পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া হেমলতা দেবীর সৃষ্টিধর্মী রসপিপাসু মনকে যে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলছে এবং নব নব ভাবে উদ্দীপিত করছে তা সহজেই অনুমেয়। পুণ্যকল্প দেবেন্দ্রনাথ তখনও বর্তমান। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী, স্বর্ণকুমারী, তা ছাড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা, সুনয়নী, হিরণ্ময়ী, সরলা প্রমুখ তরুণ-তরুণীর সৃষ্টির অভিসার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হল না হেমলতা দেবীর পক্ষে, সেই মিছিলে নিজেকেও তিনি দিলেন যুক্ত করে।

শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দ্বিজেন্দ্রনাথও স্থায়িভাবে বাসা বাঁধলেন শান্তিনিকেতনে। দীপেন্দ্রনাথ এবং হেমলতা দেবীও। কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর অকালমৃত্যুর পর আশ্রমের তদানীন্তন বালক-বালিকাদের পরিচর্যা ও লালন-পালনের ভার নিলেন হেমলতা দেবী। এদের লালন-পালনে সেদিন তিনি যে যত্ন ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার তুলনা মেলে না। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ তাঁর দেবরপুত্রেরা তাঁকে 'বড়মা' বলে ডেকে থাকেন বা থাকতেন—সেই থেকে দেখতে দেখতে সকলের দ্বারাই তিনি সম্বোধিতা হতে থাকলেন 'বড়মা' বলে। মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি হেমলতা দেবীর এ সার্থক সম্মান।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁর অভূতপূর্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। আজকের মহিলা লেখিকাদের মধ্যে তিনি প্রবীণতমা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। গদ্য এবং কাব্য উভয় রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্তা। দুনিয়ার দেনা

হেমলতা দেবী

মেয়েদের কথা, দু' পাতা, পৃথিবীর ডাক (নাটিকা), দেহলি (গল্প), জ্যোতি (কাব্য), আলোর পাখী (কাব্য) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর সাহিত্য-কীর্তি পরিচায়ক। তাঁর লেখা 'পথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি বর্তমানে প্রকাশের পথে।

১৯২২ সালে দীপেন্দ্রনাথের স্বর্গলাভ। ১৯২৬ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে কলকাতায় বাসা বাঁধেন হেমলতা দেবী। যোগ দেন সরোজ নলিনী মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামে যে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় দীর্ঘকাল তার সম্পাদনা করেছেন তিনি, এখনও তার পরিচালিকামণ্ডলীর শিরোদেশে তাঁর নাম শোভা পাচ্ছে। ১৯৩০ সালে পুরীতে এলেন হেমলতা দেবী। এলেন স্বর্গীয় স্যার প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী ও সুভাষচন্দ্রের মুক্তি বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি মেজর জেনারেল এ সি (অনিলচন্দ্র) চট্টোপাধ্যায়ের জননী লেডী বসন্তকুমারীর আহ্বানে। গড়ে তুললেন 'বসন্তকুমারী বিধবাশ্রম'। আজও ঐ আশ্রমের শীর্ষস্থানে তিনি সসম্মানে সমাসীনা। নারী-জাগরণের ইতিহাসেও তিনি স্মরণীয়া হয়ে থাকবেন, নারীদের প্রাপ্য মর্যাদা এবং অধিকার আদায়ে তাঁর সাধনা অবিস্মরণীয়। মূর্খ অশিক্ষিত নারীদের, অসহায়া বিধবাদের শিক্ষাদানে ও স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর গৌরবময় ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁর কল্যাণে কত নারী যে বেদনা, বঞ্চনা ও অজ্ঞতার করালগ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে নবজীবনের আলোকধারায় স্নাত হয়েছেন তার সীমাসংখ্যা নেই।

ইয়োরোপ পরিভ্রমণের সময় তিনি ব্রিস্টলে পূর্বপুরুষ রামমোহনের সমাধি মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। সম্প্রতি পুরীতে তাঁর একানব্বইতম জন্মদিন পরম সমারোহে উদযাপিত হয়, এ উপলক্ষে তাঁকে উপাধি দেওয়া হয়—স্বর্ণসেতু। দু'টি বিশেষ যুগের মধ্যে আজ সত্যিই তিনি এক স্বর্ণসেতু।

ষোড়শী বধূ হয়ে যেদিন তিনি জোড়াসাঁকোয় আসেন, সেদিন মাতৃহারা দু'টি শিশুকে তিনি বুকে তুলে নিয়েছিলেন অপত্যস্নেহে—তাঁরা দীপেন্দ্রনাথের প্রথমা সহধর্মিণী সুশীলা দেবীর পুত্র-কন্যা-সঙ্গীতাচার্য দিনেন্দ্রনাথ ও নলিনী দেবী। উভয়েই আজ পরপারের বাসিন্দা। দিনেন্দ্রনাথের দুই স্ত্রী সুনয়নী দেবীর কন্যা বীণাপাণি দেবী (হেমলতা দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্রী) এবং কমলা দেবী ও নলিনী দেবীর স্বামী প্রমথ চৌধুরীর অনুজ ডাঃ সুহৃদনাথ চৌধুরীও আজ ইহলোকে বর্তমান নেই। কিন্তু হেমলতা দেবীর 'সন্তান' আজ সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। শত শত সন্তানের তিনি পরম শ্রদ্ধার 'বড়মা'।

সুবোধচন্দ্র সরকার

[প্রখ্যাত প্রকাশক, বর্ষীয়ান আইনবিদ]

প্রকাশন ব্যবসায়ে প্রভূত সাফল্য অর্জন করে যাঁরা দেশ-জননীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সরকার মহাশয় সেই তালিকায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। শুধু প্রকাশক হিসাবেই নয় আইনজীবী হিসাবেও বিপুল প্রসিদ্ধি তাঁর অধিকারগত।

স্বনামধন্য পরিবারের স্বনামধন্য সন্তান তিনি। পিতৃদেব স্বর্গীয় রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকার ছিলেন কৃতবিদ্য পুরুষ। সাবজজ এবং গ্রন্থকার ও গ্রন্থ প্রকাশক হিসাবেও তিনি স্মরণীয়। সাহিত্য-সাধিকা স্বর্গীয়া সরলাবালা সরকার ও বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশক ও সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার যথাক্রমে তাঁর অগ্রজ পত্নী ও অনুজ বহরমপুরে ১২৯২ সালের ২২-এ শ্রাবণ (অগাস্ট ১৮৮৫) তাঁর জন্ম। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজ-জীবনে তিনি পাঠ নিয়েছেন জেনারেল এ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশান (বর্তমানের স্কটিশ চার্চ) ও সিটি কলেজে। ১৯১০ সালে আইন পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ।
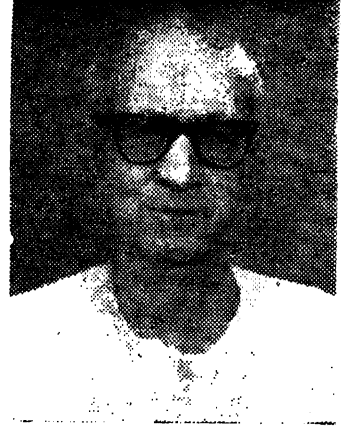
সুবোধচন্দ্র সরকার

গত শতাব্দীর শেষপাদে মহিমচন্দ্র প্রকাশনা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। আইন সম্পর্কিত গ্রন্থ তিনি লিখতেন এবং প্রকাশ করতেন। বাঙালীদের মধ্যে আইনগ্রন্থ রচনায় তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তা ছাড়া প্রকাশক জগতের চেহারা সেদিন আজকের মত ছিল না। প্রকাশন ব্যবসায় এগিয়ে আসতে কোন বাঙালীকে তখন বড় একটা দেখা যেত না। সেদিন সেই দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন মহিমচন্দ্র, ঈশ্বরের কৃপায় ভাগ্যলক্ষ্মীর অফুরন্ত আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল তাঁর শিরোদেশে। সুবোধচন্দ্র মিলিত হলেন পিতার সঙ্গে এই মহৎ প্রচেষ্টায়। আইনগ্রন্থগুলির সম্পাদন করতে থাকেন। প্রতিষ্ঠা হ'ল সুবিখ্যাত এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্সের, পুস্তক জগতে একটি বিশেষ উল্লেখের আজ যে অধিকারী।

১৯১৯ সালে মুন্সেফ নিযুক্ত হওয়ায় সুবোধচন্দ্র প্রতিষ্ঠানের ভার তুলে দিলেন সুযোগ্য অনুজ সুধীরচন্দ্রের প্রতি। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত অংশীদার হিসাবে তিনি লিপ্ত ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, তারপর তার সমস্ত স্বত্ব সুধীরচন্দ্রকে দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন এস সি সরকার এ্যাণ্ড সন্সের। ১৯৩৪ সালে কলকাতার ছোট আদালতে তিনি অন্যতম বিচারক নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালে তিনি অবসর নিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি লাভ করলেন 'রায়বাহাদুর' উপাধি। ১৯৪৯ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিচার সংস্কার কমিটির

সভ্য নির্বাচিত হন। ল অফ এভিডেন্স, ল অফ সিভিল প্রসিডিওর, ল অফ ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর, মডার্ন এ্যাডভোকেসি এ্যাণ্ড ক্রস-এক্সামিনেশান ও অন্যান্য আইনগ্রন্থের তিনি সার্থকনামা রচয়িতা। আইন-জগতে তাঁর গ্রন্থগুলি আলোড়ন এনেছে, বিচারকমণ্ডল ও ব্যবহারজীবী সম্প্রদায় তাঁর সুচিন্তিত ও সারগর্ভ মতামতগুলির যথেষ্ট মূল্য দিয়ে থাকেন। দেশের বিভিন্ন বিচারালয়ের বিচারকগণ তাঁর মত ও ভাবধারা অবলম্বন করে বিচারকার্য পরিচালনা করে থাকন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এস সি সরকার এ্যাণ্ড সন্সও প্রকাশক হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

১৯০৩ সালে ইনি ইতিহাসচর্চায় আধুনিক ভারতের গুরুসদৃশ আচার্য স্যার যদুনাথের অগ্রজ কুমুদনাথ সরকার মহাশয়ের কন্যা নিরুপমা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁর দুই পুত্রই যথেষ্ট কৃতী। জ্যেষ্ঠ প্রভাসচন্দ্র সরকার এস সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার এবং সাহিত্যরসিক ও কনিষ্ঠ পুত্র বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রেস ইনস্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়ার ডাইরেক্টার চঞ্চল সরকার। কন্যাদ্বয় পরলোকগতা। সুপ্রসিদ্ধ শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর জামাতা।

বহু ইংরাজী আইনগ্রন্থের রচয়িতা হলেও বাঙলা সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর অপরিসীম। বাঙলা সাহিত্যের তিনি একজন বিদগ্ধ পাঠকও। বাঙলা সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন তাও বিশেষভাবে স্মর্তব্য! আজ তিনি অশীতিতে উপনীত—কিন্তু কর্মশক্তি এখনও জরার বাহুবন্ধনে আত্মসমর্পণ করে নি! তাঁর উদ্যম, উৎসাহ এবং উদ্দীপনা এখনও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্তমানে চক্ষুপরীক্ষার্থে তিনি ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করছেন। সিদ্ধকাম হয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করুন সর্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনাই করি।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[বাঙলা চলচ্চিত্রের জনক]

বাঙলা ছায়াছবির আজকের দিনে গৌরবের আর প্রসিদ্ধির অন্ত নেই। দিগ্বিদিকে তার জয়যাত্রা আজ অপ্রতিহত। সারা বিশ্বে তার আজ অকুণ্ঠ সমাদর। ছায়াছবি কলা ও বিজ্ঞানের সমন্বয় এক বিরাট শিল্পে পরিণতি লাভ করে অসংখ্য নর-নারীর মুখে আজ তুলে ধরছে অন্ন, ভরিয়ে তুলছে তাদের যশ, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তায়। বহু বছর পূর্বে বাঙলা ছবি নির্মাণের বাসনা যে তরুণের সৃজনধর্মী মনে প্রথম দানা বেঁধে উঠেছিল, বাঙলা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বপ্ন সর্বপ্রথম যিনি দেখেছিলেন, আজকের দিনের বিশ্ববন্দিত বাঙলা ছবির নির্মাণের দুঃসাহসের পরিচয় যিনি সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন তিনি নিঃসংশয়ে সমগ্র চিত্রজগতের নমস্য। বাঙলা চলচ্চিত্রের স্রষ্টা সেই পথিকৃতের স্মরণীয় নাম—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সময়ের অগ্রগমন সেই তরুণকে আজ পরিণত করেছে বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধে। সুখের বিষয় বয়স তাঁর কর্মশক্তিকে ম্লান করতে পারে নি, অসাধারণ উদ্যম এখনও তাঁর আয়ত্তে।

বরিশালের বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও আলতার স্বনামধন্য জমিদার কালীকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা বিরাজমোহিনী দেবীর ছয় পুত্রের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ পঞ্চম। দ্বিতীয় উপেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যারিস্টার, বিবাহ করেন সুপ্রসিদ্ধ সমাজনেতা ও সাহিত্যসেবী চিরঞ্জীব শর্মার (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) কন্যাকে, অরুণা আসফ আলি ও স্বর্গতা পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদেরই দুই কন্যা। তৃতীয় দিকপাল পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জামাতা। চতুর্থ হায়দ্রাবাদের চীফ ইঞ্জিনীয়ার জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা শরৎকুমারী দেবীর দৌহিত্রীপতি। খ্যাতনাম্নী শিল্পী সুধা মুখোপাধ্যায় এঁদের কন্যা।

১৮৯৩ সালের ২৬এ মার্চ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ১৩ নং বাড়িতে ধীরেন্দ্রনাথের জন্ম। সেই বাড়িতে তখন এই পরিবার ছাড়া বাস করতেন বিপিনচন্দ্র পাল ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, উভয়েই ছিলেন বামনচন্দ্রের সুহৃদ। বারো বছর বয়সে ধীরেন্দ্রনাথ ভর্তি হলেন শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনের তখন আদিপর্ব রবীন্দ্রনাথ নিজে পড়াতেন ইতিহাস, জগদানন্দ রায় পড়াতেন বাঙলা, ভূপেন্দ্র সান্যাল পড়াতেন সংস্কৃত। গান শেখাতেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অজিতকুমার চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের ছাত্রদের দিয়ে অভিনয় করাতেন, এই অভিনয়ের মাধ্যমেই ছাত্রদের ইতিহাস পড়া হয়ে যেত, এমনই বিশেষত্বসমৃদ্ধ ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাধারা। এই সময় থেকেই অভিনয় ধীরেন্দ্রনাথের মনে প্রথম স্বাক্ষর রেখে যায়। কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে। এখানে ছাত্র থাকাকালীন 'বেজায় রগড়' অভিনয়ে তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখান, এই অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন—লাটসাহেব লর্ড কারমাইকেল ও লেডী কারমাইকেল। এখানকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আড়াই শ' টাকা বেতনে বামরা রাজ্যে একটি কর্ম গ্রহণ করেন। তারপর তের শ' টাকা বেতনে হায়দ্রাবাদের শিল্প মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করেন।

ছাত্রজীবন থেকে চলচ্চিত্র তাঁর মন জুড়ে থাকে, চলচ্চিত্রেই সাধনার বস্তুতে রূপ নিল, অবসর সময়ে চলচ্চিত্রের উপযোগী প্লট আঁকতেন, স্থির চিত্রের সাহায্যে সেগুলি প্রকাশ করেন। কাহিনীগুলিকে পরম্পরা অনুযায়ী স্থিরচিত্রের মাধ্যমে রূপ দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই ধরণের সাতখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেগুলির নাম ভাবের অভিব্যক্তি (একশ' খানি চিত্র-সমন্বিত, ইংরাজি, বাঙলা ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হয়) বিয়ে, ফুলশয্যা, কেবল হাসি, রঙ-বেরঙ, আমার দেশ (জাতীয়তা উদ্দীপক)।

এই পরিকল্পনা তিনি পাঠালেন ম্যাডানকে। ম্যাডান আমন্ত্রণ জানালেন ধীরেন্দ্রনাথকে। তের শ' টাকার মাইনের পাকা চাকরী একবাক্যে ছেড়ে দিয়ে সুনিশ্চিত ভবিষ্যতকে উপেক্ষা করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ধীরেন্দ্রনাথ, ম্যাডান চাইলেন 'বিসর্জন' করতে। ধীরেন্দ্রনাথ ভার নিলেন, অনুমতি সংগ্রহ করলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। ম্যাডানের প্রতিষ্ঠানে তখন ভিতরে ভিতরে এক আগুন জ্বলছে। বাঙালীদের 'শ্যালক' বিশেষণ প্রয়োগে তাঁরা তখন দরাজ দিল। সেই প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার তখন সদ্য পরলোকগত নীতিশচন্দ্র লাহিড়ী। নীতিশচন্দ্র ধীরেন্দ্রনাথকে জানালেন

সে কথা। বললেন—আমরা ছেড়ে যাচ্ছি, আপনি পারবেন এই পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে, আসুন নিজেরা কিছু গড়ে তুলি।

১৯১৮ সালে গড়ে তোলা হ'ল ইণ্ডো বৃটিশ ফিল্ম কোম্পানী। বাঙালীর অর্থে ও শ্রমে নির্মিত প্রথম চিত্র প্রতিষ্ঠান। প্রথম ছবি এঁদের বিলাত ফেরৎ। (মুক্তিলাভ ১৯২১) পরবর্তী ছবি যশোদানন্দন সাধু-কি-শয়তান। ধীরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় এই সব ছবিতে নীতীশচন্দ্রও অভিনয় করতেন। আবার ফিরে গেলেন হায়দ্রাবাদে, সৃষ্টি করলেন লোটাস কোম্পানী, উপহার দিলেন ন'খানি, ছায়াচিত্র। ১৯২৬ সালে বাঙলা দেশে প্রত্যাবর্তন করে মিত্র থিয়েটারে যোগ দিলেন ধীরেন্দ্রনাথ, সেখানে প্রায় শতাধিক রজনী তিনি অলীকবাবু নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করেন।

১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠা হ'ল অবিস্মরণীয় বৃটিশ ডোমিনিয়ান ফিল্মসের। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধীরেন্দ্রনাথ আটখানি ছবি উপহার দেন—ফ্লেমস অফ ফ্লেস, টাকায় কি না হয়, নটি বয়, অলীকবাবু, পঞ্চশর, মরণের পরে, সীমান্ত চোর, চরিত্রহীন। বাঙলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানের অমরত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষানবীশ বা সহকারী হিসাবে বহু বিখ্যাত নট-নটী, কুশলী এইখানে সর্বপ্রথম যোগ দিয়েছিলেন, এইখানেই তাঁদের হাতেখড়ি—সেই তালিকায়—চিত্রাচার্য দেবকীকুমার। চিত্রজগতের গৌরব প্রমথেশচন্দ্র, সাহিত্যিক দীনেশরঞ্জন দাস, চিত্রশিল্পী দিব্যেন্দু ঘোষের বাবা সতীশ ঘোষ, শ্যামাপদ বসু, রাধা ফিল্মস স্টুডিওর অন্যতম কর্ণধার কানাই ঘোষাল, নবদ্বীপ হালদার, —র রায়ের বাবা সতু রায়, বাণীবাবু, কৃষ্ণগোপাল, চিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্তের বাবা হেম গুপ্ত, প্রেমিকা দেবী, সবিতা দেবী, রাধারাণী, ডিলিসিয়া ক্লার্ক, প্রেমকুমারী নেহরু, অমিয়া দেবী প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট নাম। দেবকীকুমার, প্রমথেশচন্দ্র, কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ দিকপাল পরিচালকবৃন্দ ধীরেন্দ্রনাথের সহকারী ছিলেন। তা ছাড়াও দেবকীকুমার প্রমুখ আজকের দিনে খ্যাতির উত্তুঙ্গ শীর্ষে অধিষ্ঠিত অসংখ্য শিল্পী ও কুশলীর সামনে এই জগতের দ্বার ধীরেন্দ্রনাথই প্রথম উন্মুক্ত করে দেন। সেই নামগুলির পূর্ণতালিকা প্রকাশ করা রীতিমত কষ্টসাধ্য। অভিজাত ও ভদ্র-পরিবারের মহিলাদের চিত্রজগত সর্বপ্রথম লাভ করেছে ধীরেন্দ্রনাথেরই কল্যাণে। তাঁর সহধর্মিণী প্রেমিকা দেবী (কানাইলাল ঠাকুরের কন্যাবংশীয়া) রমলা দেবী নামে ছায়াচিত্রে অবতীর্ণা হন, তিনিই প্রথম সম্ভ্রান্ত পরিবারোদ্ভূতা যিনি ছায়াচিত্রে অভিনেত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

আজ ভদ্র ও অভিজাত অগণিত মহিলা চলচ্চিত্রে যোগ দিয়ে তাঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতির দ্বারা চিত্রজগতকে সুসমৃদ্ধ করে তুলেছেন, কিন্তু অতীতে ধীরেন্দ্রনাথ যেদিন এই সঙ্কল্পে আত্মনিয়োগ করেন, তখন তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল যথেষ্ট উপহাস, লাঞ্ছনা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। বাঙলা দেশের ছায়াচিত্রের জনক ধীরেন্দ্রনাথ তাঁর যাত্রারম্ভে পাথেয়রূপে লাভ করলেন যথেষ্ট অসহযোগিতা এবং নিন্দা ও বিদ্রূপ তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে, বাধা-বিপত্তি বারংবার তাঁর সমানে এসেছে। সহস্র দুর্যোগ তিনি অতিক্রম করে গেছেন, অপার মনোবল অসীম ধৈর্যে এবং অসাধারণ দৃঢ়তায়। অবশেষে এই ধৈর্য, মনোবল ও দৃঢ়তাই তাঁর সাধনায় এনে দিল সিদ্ধি, বিজয়লক্ষ্মীর জয়টিকায় উজ্জ্বল হল তাঁর ললাট, ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন আশীর্বাদ বর্ষিত হল তাঁর উদ্দেশে অমৃতধারায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঁচ বছরের জন্য তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন গোয়েন্দাবিভাগের অফিসারদের ছদ্মবেশ সম্পর্কে শিক্ষাদানের। রূপসজ্জার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষজ্ঞ।

বর্তমানে 'মনের মতন' নামে একটি ছায়াচিত্র নির্মাণে তিনি ব্যস্ত। সাধারণ্যে একটি বিশেষ অভিহিতিতে তিনি সম্বোধিত—ডি জি ধীরেন গাঙ্গুলী ছাড়া এরকম আরও একটি অর্থ হতে পারে সেটি—ডাইরেক্টর দ্য গ্রেট।

শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ

[নির্যাতিত দেশকর্মী, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কমিশনার ও গ্রন্থকার]

দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, কঠোর পরিশ্রম ও কর্মে সততা যে সব মানুষের জীবনে সাফল্য এনেছে আর যাঁদের মধ্যে আত্মপ্রচারের ঢক্কা নিনাদ নেই, সেই সব ব্যক্তির তালিকায় শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ এমন একটি উল্লেখযোগ্য নাম—যিনি একাধারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র, অধ্যাপক, নির্যাতিত দেশকর্মী, বিপ্লবী, সৎ সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রশাসক, সমাজসেবী ও লেখক।

জন্ম ১৯০৭ সালের ৮ই মে (২৫-এ বৈশাখ) মাতুলালয়ে হুগলী জেলার ধামাসিন গ্রামে হলেও শ্রীবিনয়জীবন ঘোষের পরিবার পুরুষানুক্রমে মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী: স্বাধীনতা-যুদ্ধে মেদিনীপুরের নাম সর্বাগ্রে করা যায়, স্বাধীনতা-যুদ্ধে এই পরিবারের
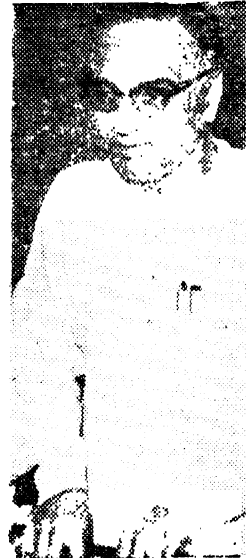
শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ

তিমির বিদারি

—বৈদ্যনাথ ভড়

॥ আলোকচিত্র ॥

ওড়নার আড়ালে

—দেবু
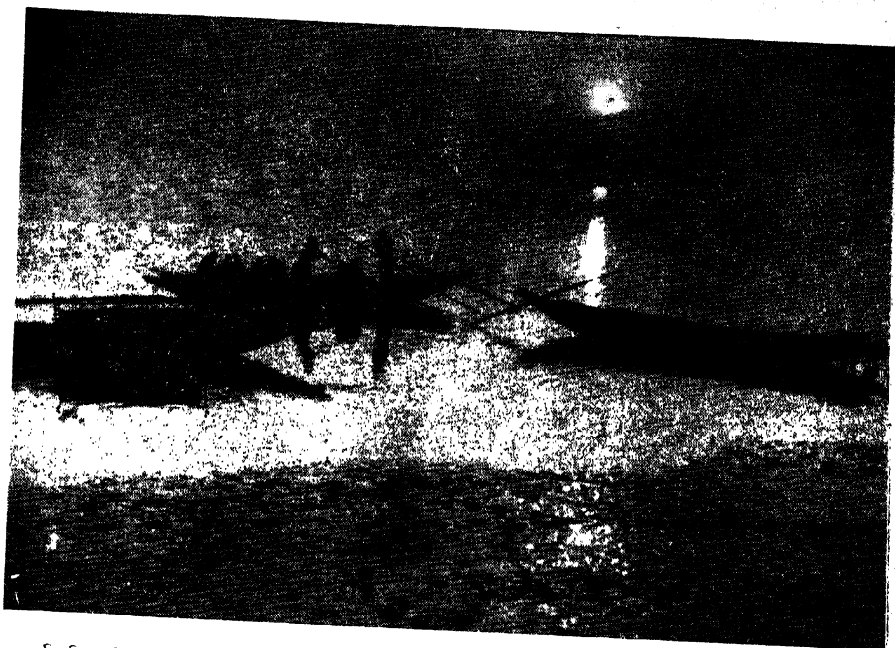
—গোপালকৃষ্ণ পাল

—অসিত মিত্র

॥ ভোরের ভৈরবী ॥

—মেঘনাদ সাহা

—প্রভাতকুমার বসু

—এস এম হায়দার

…র হ'তে
দূরান্তরে

—বিনয় মুখোপাধ্যায়

—শ্রীভনি ঘোষ
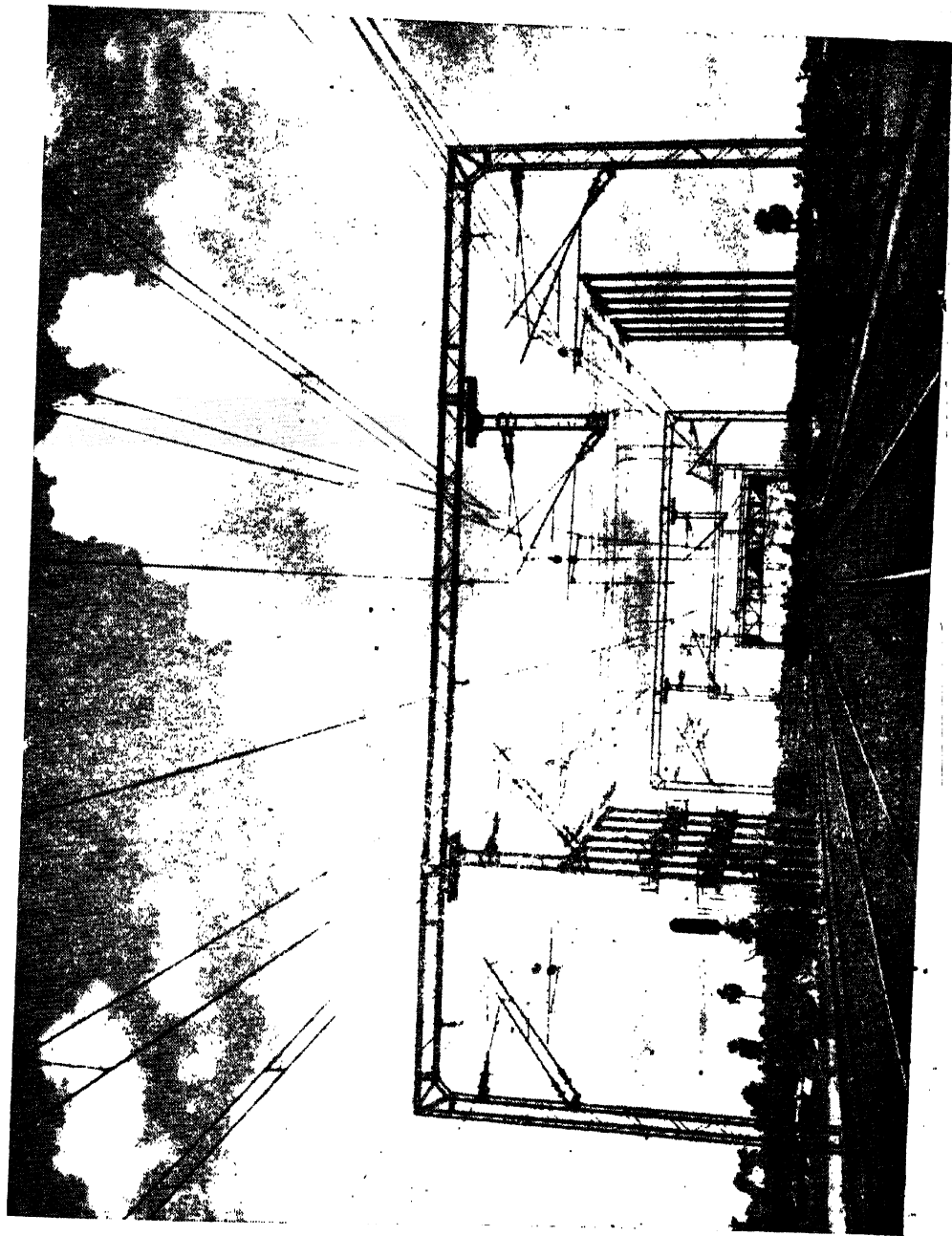
দানও অপরিশোধ্য। আর এই বিখ্যাত বিপ্লবী পরিবারের একজন বিনয়জীবন। তাঁর কাকা স্বনামখ্যাত যোগজীবন ঘোষ বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম যুগে মেদিনীপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় দশ বছর দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন। বিনয়বাবুর তৃতীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতিজীবন পেডী-হত্যার লিপ্ত থাকার কারণে দু'দফায় মোট বারো বছর রাজবন্দী ছিলেন। চতুর্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবজীবন রাজবন্দী থাকাকালীন সন্দেহজনক পরিবেশে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পঞ্চম কনিষ্ঠ ভ্রাতা নির্মলজীবনের বার্জহত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি হয়। এইসব কারণে সমগ্র পরিবারের ওপর ইংরেজ শাসকদের অবর্ণনীয় অত্যাচার চলে। বিনয়জীবনও তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। বিনয়বাবুর পিতা মেদিনীপুরের উকিল শ্রীযামিনীজীবন ঘোষ ৭৯ বছর বয়সে এখন জীবিত। তাঁর মহীয়সী মাতা শ্রীমতী প্রভাসরঞ্জিনী ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে পরলোকগমন করেন।

শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল, মেদিনীপুর কলেজ ও কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে শিক্ষাগ্রহণের পর ১৯৩০ সালে ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৩১ সালে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের পথ গ্রহণ করেছিলেন মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে। কিন্তু পারিবারিক ঐতিহ্যে স্বাধীনতাকামী যুবক বিনয়জীবন বিপ্লবী আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। তাই ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট থাকায় তিনি অধ্যাপক পদ হতে বরখাস্ত ও মেদিনীপুর হতে বহিষ্কৃত হন, ছাড়তে হল তাঁকে শিক্ষাব্রত, ছাড়তে হল দেশ। চলে এলেন কলকাতায়।

শরৎচন্দ্র বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় বিনয়জীবন ১৯৩৭ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী বিভাগে প্রবেশ করেন। সৎ ও দক্ষ কর্মচারী হিসেবে তাঁর দ্রুত পদোন্নতি হতে থাকে। তা সত্ত্বেও তিনি সরকারী কোপ হতে নিষ্কৃতি পান নি। কর্পোরেশনে চাকুরীতে বহাল থাকাকালীন রাজনৈতিক অপরাধে ১৯৪১ সালের মে মাসে শ্রীবিনয়জীবন ঘোষকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ৫ বছর বাংলা দেশের নানা জেলে তিনি আটক থাকেন। তারপর ১৯৫১ সালের প্রারম্ভেই তিনি কর্পোরেশনের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ১৩ বছর সেই পদ সগৌরবে অলঙ্কৃত করার পর ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসের সুরুতে কর্পোরেশনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁকে চার মাসের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার পদের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে আহ্বান করা হয়। এই গুরুদায়িত্ব তিনি সাফল্যের সঙ্গে বহন করেন ও চার মাস শেষ হলে তিনি কর্পোরেশনের চাকুরী হতে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

চাকুরী ছাড়লেও তিনি তাঁর স্বভাবজ জনহিতকর কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন নি, তাই অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি ভারত-সেবক সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ শাখার অবৈতনিক সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন। বহু বছর পূর্বে তিনি কলকাতায় মেদিনীপুর সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নিরলস কর্মব্যস্ত জীবনে তিনি সাহিত্যকে ভোলেন নি, তাঁর সাহিত্য-প্রীতির স্বাক্ষর পাওয়া যায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্ন প্রবন্ধাদির মাধ্যমে। এ ছাড়াও তিনি 'অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র,' 'Murder of British Magistrates' ও হাস্যরসাত্মক 'চকিত-চমকে' নামে দু'খানা বাংলা ও একখানা ইংরেজি বই লেখেন। প্রথম দু'টি বইয়ে রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক অলিখিত দলিলের উদ্ঘাটন হয় আর শেষোক্ত গ্রন্থে তাঁর সুরসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগতজীবনে স্মিতহাস্য, বিনয়-ভদ্রপুর, এই সদালাপী সুরসিক মানুষটির সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন, তাঁর আত্মীয়জনসুলভ আচরণকে।

কর্পোরেশন হতে তাঁর বিদায়ক্ষণে কাউন্সিলারগণ ও সকল স্তরের কর্মচারীরা তাঁকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা জানান। পৌর-প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্ররূপে মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন—

'May your integrity, your devotion to duty, your forth rightness be a beacon in a blackout for all.'

আপনার সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সরল স্পষ্টাচার অন্ধকারে আলোকবর্তিকারূপে হোক সকলের পথ-নির্দেশক।

এস মা জননী

শ্রীমতী শান্তি বসু

এস মা জননী কলুষনাশিনী
এস বরাভয় প্রদায়িনী
রাখিতে মোদের মান

আজি অন্ন-বস্ত্র, হাহাকারে
দৈন্য-দুঃখ, ব্যথা ভারে
জর্জরিত তব সন্তান

স্নেহের পরশে তব,
দূরে যাক্‌, অমঙ্গল সব
দেহে জাগুক, নব প্রাণ

আমাদের পূজালয়ে
ফিরে যেও, শিবালয়ে
অন্ন-বস্ত্রের, করে সংস্থান

নিয়ে যদি যাস মা ধরে
মুনাফা বাজিদের, সঙ্গে ক'রে
আমরা পাই পরিত্রাণ

সিংহ লেলিয়ে, দে মা পিছে
নইলে মোরা, বাঁচি না যে
কে করে, চোরার সন্ধান।

বাতাসী মঞ্জিল

অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[৺নটবর মিত্রের ডায়েরি থেকে]

কিন্তু আমার এই বিস্ময়টিকে ছাপাইয়া উঠিল আরেকটি বিস্ময়। ঠিক এমনি সময় কিছুদূরে কে যেন বাঁশের বাঁশি বাজাইতে শুরু করিল। অমন আশ্চর্য বাঁশি বাজানো জীবনে কখনো শুনি নাই। বাঁশির সুর যে কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া মন-প্রাণ এমন আকুল করিতে পারে, তাহা জানিতাম না। আইন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে আড়া-আড়িই যাহাদের জীবনের বৃত্তি ও ব্রত, তাহাদের একটি প্রধান ডেরায় এমন সংগীত শুনিব আশা করি নাই। বাঁশিতে দরবারী কানাড়া রাগের অতি অপরূপ আলাপ বাজিতেছিল, যাহা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম বাদক শুধু বংশীবাদনেই অসামান্য দক্ষ নহে, রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানও অসাধারণ। স্বয়ং তানসেনও তাঁহার সৃষ্ট এই রাগের এমন রূপায়ণ শুনিলে আনন্দে আত্মহারা হইতেন। আমিও আত্মহারা হইলাম। সমস্ত পরিবেশটাই যেন ঐ সুরের মন্ত্রে বদলাইয়া গেল।

কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল। প্রশ্ন করিলাম, 'কে এমন আশ্চর্য বাঁশি বাজাইতেছে, বাতাসী বিবি?'

বাতাসী বিবি বলিল, 'পাঠকজি। চাঁদনীরাতে ঘুমাইবার আগে তিনি এইরূপ বাঁশি বাজান।'

'পাঠকজি এমন আশ্চর্য বাঁশি বাজান? ইহা আমার কল্পনারও অতীত ছিল।'

বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, 'পাঠকজির আপনি আর কতটুকু জানেন, বাবুজি? বাঁশের লাঠি চালাইতে তাঁহার জুড়ি ছিল না; বাঁশের বাঁশি বাজাইতেও তাঁহার জুড়ি নাই। ফুল-বাগানের শেষ দিকে একটি দেওদার গাছের তলায় একা বসিয়া তিনি বাঁশি বাজাইতেছেন। এ সময়ে ওখানে কাহারো যাইবার হুকুম নাই, এমন কি আমারও নহে।'

বোমভোলা পাঠকের নিজের মুখেই শুনিয়াছি তিনি একাধিক মানুষ খুন করিয়াছেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে অথবা বাতাসী বিবির নির্দেশে এখনও অম্লানবদনে আরো মানুষ খুন করিতে পারেন। ইহা তাঁহার মিথ্যা বড়াই নহে, সে বিষয়েও আমার কোনো সন্দেহ নাই। এ হেন সাংঘাতিক মানুষের হাত হইতে বাঁশি এমন মন-মাতানো-করা সুরলহরী আদায় করে কি করিয়া?

বাঁশির অতুলনীয় সংগীতে আমি যেন কিছুক্ষণের জন্য বাতাসী বিবিকেও ভুলিয়া গেলাম। মনে হইল যেন বহুদূরে কোনো স্বপ্নের জগতে চলিয়া গিয়াছি। সে জগতে দুঃখ নাই, শোক নাই, হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব কিছুই নাই, আছে শুধু সংগীত আর আনন্দ। চাঁদের স্থান পরিবর্তনের ফলে চাঁদের আলো কখন ঘরের আরো ভিতরদিকে ঢুকিয়া আসিয়াছিল খেয়াল করিতে পারি নাই। বাঁশির সুর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে নীরব হইয়া গেল, তখন নাইটিঙ্গেল পাখির গান থামিয়া গেলে কবি কীটস্ (Keats) যেমন ভাবিয়াছিলেন, আমিও তেমনি ভাবিলাম:

'ফ্লেড ইজ দ্যাট মিউজিক:
ডু আই ওয়েক অর শ্লীপ?'
(Fled is that music :
Do I wake or sleep ?)

সংগীত থামিয়া গিয়াছে: আমি কি জাগিয়া আছি না ঘুমাইতেছি?

সহসা মনে হইল আমি বুঝি স্বপ্নই দেখিতেছি। আমার সামনে বসিয়া এক অপরূপা নারীমূর্তি। কোথায় গেল সেই মুখ-ঢাকা বাতাসী বিবি? এ নারীর সম্পূর্ণ অনাবৃত মুখ চাঁদের আলোয় হাসিতেছে, চাঁদের আলোও যেন ঐ আশ্চর্য মুখের স্পর্শসৌভাগ্য লাভ করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হইতেছে।

আমি চমকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, 'কে তুমি?'

নারী মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, 'আপনার বাঁদী, বাবুজি। বাতাসী বিবি।'

অবিকল সেই কণ্ঠস্বর, বাঁশি থামিবার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত যে কণ্ঠস্বর শুনিতেছিলাম। বাঁশির সুর যে অপ্রত্যাশিত চমক লাগাইয়াছিল, তার চেয়ে বড় চমক লাগাইল মুখাবরণহীনা বাতাসী বিবির আবির্ভাব। মেঘের ঘন আড়াল হইতে সহসা চাঁদের আবির্ভাব হইল যেন। কিন্তু না, ঐ মুখে চাঁদের শীতলতা ছিল না, চাঁদের মাধুর্যের উপর বিদ্যুৎ-চমকের উগ্র উজ্জ্বলতার প্রলেপ লাগানো সম্ভব হইলে যাহা দাঁড়ায়, তাহাই ছিল। নারী-মুখের রূপ যে মনকে এমন চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে, তাহাও যেন আজই প্রথম বুঝিলাম।

আমি বাধ্য হইয়া কিছুক্ষণ অপলকনেত্রে বাতাসী বিবির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, আপ্রাণ চেষ্টাতেও অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। ঐ রহস্যময়ীর দু'টি চোখে কিসের যাদু ছিল জানি না, যাহা চুম্বকের মতো আমার দু'টি চোখের তারাকে আকর্ষণ করিতেছিল। অদ্ভুত ভাললাগা, অদ্ভুত ভয়। আর অদ্ভুত অস্বস্তির বিচিত্র মিশ্রণের এক অনির্বচনীয় অনুভূতিতে যেন দেহে-মনে আচ্ছন্ন বোধ করিতেছিলাম।

ভাবিলাম বাতাসী বিবি কি মায়াবিনী? নহিলে আমার মনের গোপন বাসনা জানিল কি করিয়া? বাঁশিতে দরবারী কানাড়ার আলাপ যখন থামিয়া গেল তখন, অথবা তাহার আগেই, মুখাবরণের আড়ালে লুকানো মুখটি দেখিবার কৌতূহল আমার মনে অদম্য হইয়া উঠিয়াছিল। হয় তো কিছুক্ষণ বাদে মরিয়া হইয়া নিজের হাতেই আবরণ উন্মোচন করিবার জন্য হাত বাড়াইতাম। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না, বাতাসী বিবি যেন আমার ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে আপন হাতেই সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া দিল।

কি জানি কেন একটি ইংরাজি ছড়ার দু'টি লাইন মনে পড়িয়া গেল:

'কাম ইন্‌টু মাই পার্লার,
সেইড দ্য স্পাইডার টু দ্য ফ্লাই'
(Come into my parlour,
Said the spider to the fly)

অর্থাৎ মাকড়সা মাছিকে আমন্ত্রণ জানাইল: এসো আমার ঘরে।

মাকড়সার জালের ঘরে গিয়া মাছির যে অবস্থা হইয়াছিল, আমারও কি সেই অবস্থা আসন্ন?

বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম আমার এই স্বপ্ন আর জাগরণের মিশ্রিত অবস্থা কি বাঁশির যাদুকর পাঠকজির বাঁশির সুরের মাদকতা এবং বাতাসী বিবির ঐ আশ্চর্য মুখের রূপের মাদকতার ফল? অথবা আমার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমাকে যে হেকিম তরল দাওয়াই পান করানো হইয়াছে, তাহারই ফল এতক্ষণে গাঢ় হইয়া ফলিতে শুরু করিয়াছে?

বাতাসী বিবি বলিল, 'বাবুজি, আপনার সামনে মুখ খুলিলাম, অপরাধ ক্ষমা করিবেন।' তাহার কণ্ঠে যে আবেদনের সুর ছিল, তাহা বাস্তবিকই আন্তরিক, না ছলনাময়ীর অভিনয়, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমার বুদ্ধি বলিল ইহা কূটবুদ্ধি মতলবী মায়াবিনীর আন্তরিকতার ছলমাত্র, ইহার পিছনে কোনও গভীর অভিসন্ধি কাজ করিতেছে। কিন্তু আমার হৃদয় এই রহস্যময়ী রূপসীর আবেদনকে ছলনা ভাবিতে কিছুতেই রাজী হইল না। হৃদয়ের কাছে বুদ্ধি হারিয়া গেল। এই কথাটা এখন যেভাবে বুঝিতেছি, তখন ঠিক সেভাবে বুঝিতে পারি নাই। তখন যেরূপ মোহের ঘোরে আচ্ছন্ন ছিলাম, তাহাতে মস্তিষ্ক ঠিক স্বাধীন ও স্বাভাবিকভাবে কাজ করিতে পারিতেছিল না।

বাতাসী বিবি বলিল, 'বাবুজি, আপনি জেনানা হইতে দূরে দূরেই থাকেন। এমন কি জেনানা আপনার কুস্তি দেখিবে তাহাতেও আপনার আপত্তি ছিল। আপনার আপত্তির কথা বিবেচনা করিয়াই ভাবিয়াছিলাম আপনাকে মুখ দেখাইব না। কিন্তু না দেখাইয়া পারিলাম না। না দেখাইলে আমার চলিত না। কারণ গরজটা আমার।'

শুনিয়া আরো বিস্মিত হইলাম। আমাকে নিজের মুখ দেখাইতে বাতাসী বিবির অত গরজ কেন? এ কি অদ্ভুত ব্যাপার? মনের প্রশ্ন মুখে উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। তাহার প্রয়োজনও হইল না।

বাতাসী বিবি বলিল, 'আপনাকে আমার বড় প্রয়োজন বাবুজি। যাঁহাকে এতবড় প্রয়োজন, তাঁহাকে মুখ না দেখাইলে চলিবে কেন?'

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। দুনিয়ায় এত লোক থাকিতে এই দুর্দমনীয়া রহস্যময়ীর বড় প্রয়োজন হইয়াছে আমাকেই এবং এই কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে মনের ভিতর সাহস সঞ্চয় করিবার জন্য সে এতক্ষণ সময় নিয়েছে!

বাতাসী বিবিকে ভয়, সন্দেহ, ঘৃণা এবং অবিশ্বাস করিবার প্রচুর কারণ ছিল, তবু মনে হইল, 'আপনাকে আমার বড় প্রয়োজন, বাবুজি!'—বাতাসী বিবির এই আবেদনে যে ব্যাকুল মিনতির সুর, তাহা মিথ্যা নহে। মনে হইল এত ঐশ্বর্যবল, এত প্রতিপত্তি, এত প্রভাব, বিরাট শক্তিশালী দলের উপর এতবড় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও বাতাসী বিবি কোথায় যেন বড় অসহায়, আর সেইখানেই সে যেন বড় ব্যাকুলভাবে আমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে।

ইহাতে মনে মনে যে কিছুটা পুলকিত অহঙ্কার বোধ হইল না, এমন কথা বলিতে পারি না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিতও হইয়া উঠিলাম। বাতাসী বিবি কি কোনও বিশেষ মতলবে আমাকে তাহার এই বে-আইনী, অপরাধ-ব্যবসায়ী দলের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিতে চায়? ভাবিলাম একবার যখন ইহার খপ্পরে পড়িয়াছি, তখন আমি ইহার আওতা ছাড়াইতে চাহিলেই কি ছাড়ান পাইব? মগের মুলুক বাস করিতেছি না, বাস করিতেছি প্রবল প্রতাপান্বিত

ইংরেজের রাজত্বে, তাহা জানি। কিন্তু বাতাসী বিবির কুখ্যাত দলের বে-আইনী প্রতাপকে যদি কোনও প্রকারে চটাইয়া বসি, তাহা হইলে ইংরেজের প্রতাপ তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য মাথা ঘামাইবে কি? এবং মাথা ঘামাইলেই কি আমি নিশ্চিন্ত বা নিরাপদ হইতে পারিব? বাতাসী বিবির নজরে—যেভাবেই হউক—যখন একবার পড়িয়াছি, তখন তাহার মর্জির বিরুদ্ধতা করা নিরাপদ হইবে না বলিয়াই মনে হইল।

মনের শঙ্কিতভাব গোপন করিয়া বলিলাম, 'আমি তোমার দলের কোন কাজে লাগিব, বাতাসী বিবি?' বলিয়া অনেক কষ্টে সহজ হাসি হাসিবার চেষ্টা করিলাম।

বাতাসী বিবি বলিল, 'আপনাকে প্রয়োজন আমার দলের জন্য তত নহে বাবুজি, যত আমার জন্য।'

তারপর মাথা নাড়িয়া আরো জোর দিয়া বলিল, 'না বাবুজি। দলের জন্য নহে, আমারই জন্য আপনাকে আমার প্রয়োজন।'

একথা শুনিয়া আবার ভীষণ চমকাইয়া উঠিলাম। দলের প্রয়োজনে নহে, তাহার নিজেরই প্রয়োজনে বাতাসী বিবি আমাকে দাবি করিতেছে! ভাষাটা ভিক্ষার এবং ভঙ্গিটা মিনতির বটে, কিন্তু পিছনের সুরটা দাবির এবং হুকুমের, যে দাবি প্রত্যাখ্যান করিলে এবং যে হুকুম তামিল না করিলে আমার নিরাপত্তা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

জানি না চাঁদের আলোয় বাতাসী বিবির মুখে হঠাৎ কি দেখিয়া আমি ভরসা করিয়া বলিতে পারিলাম, 'বাতাসী বিবি, যদি অভয় দাও তো একটি প্রশ্ন করিব।'

বাতাসী বিবির মুখখানি এক আশ্চর্য হাসিতে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, 'বাতাসী বিবি জীবিত থাকিতে আপনার কোনো ভয় নাই, বাবুজি। আপনার চুলের ডগাও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।'

অভয় পাইয়া প্রশ্ন করিলাম এই প্রয়োজন-বোধটা তাহার এমন হঠাৎ মনে জাগিল কেন।

বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, 'হঠাৎ নহে বাবুজি। আপনি আমাকে আজই প্রথম দেখিলেন। কিন্তু আপনি আমার কাছে নূতন নহেন।'

বাতাসী বিবি বলিতে লাগিল, 'বাবুজি, হুকুম চালাইতে চালাইতে আমি হয়রান হইয়া গিয়াছি, আমার উপর হুকুম চালাইবার কেহ নাই। আমি হুকুম শুনিবার জন্য, হুকুম তামিল করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি।'

লক্ষ্য করিলাম এই কথা বলিতে বলিতে বাতাসী বিবির আশ্চর্য মুখের তীব্র রূপটি যেন হঠাৎ কোমল স্নিগ্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছে এবং দুই চোখে আত্মপ্রতিষ্ঠার চাইতে বরং যেন আত্মসমর্পণের বাসনাটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে কি বাতাসী বিবি চাহিতেছে এমন একজন মানুষ যে তাহার উপর হুকুম চালাইতে এবং যাহার হুকুম তামিল করিয়া সে তাহার বহুদিনের অতৃপ্ত তৃষ্ণা মিটাইবে? এবং সেই হুকুমকারীর পদ অধিকারের জন্য আমাকেই যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া আমন্ত্রণ জানাইতেছে?

আমি বলিলাম, 'কেন, পাঠকজি আর হেকিম সাহেব?'

অর্থাৎ এই দুই প্রবীণ নিশ্চয়ই তাহার উপর হুকুম চালাইবার লায়েক, তাহার তাঁবেদার নহেন।

কিন্তু না। বাতাসী বিবি যেন সখেদেই জানাইল তাহার উপর 'হুকুম' চালাইবার ক্ষমতা ইঁহাদেরও নাই, হুকুম-তৃষ্ণার্ত বাতাসী বিবির জীবন যেন এই কারণেই বিষম একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জীবনে যেন ইহাই ট্র্যাজেডি।

বাতাসী বিবি বলিল, 'বাবুজি পাঠকজি, হেকিম সাহেব—ইহারা আমাদের দুনিয়ার মানুষ। এই দুনিয়ার মানুষ। কি ছোট, কি বড়, সবারই শির আমার সামনে ঝুঁকিয়া পড়ে। আমাদের দুনিয়ার কেহ আমার উপরে হুকুম চালাইবার কথা কল্পনাই করিতে পারে না।'

বুঝিলাম অপরাধ-জগতের, অর্থাৎ 'ক্রিমিন্যাল'দের জগতের, কেহ এই পদের যোগ্য নহে, সেই কারণেই 'ক্রিমিন্যাল' জগতের বাহিরের 'ভদ্রসমাজ' হইতে সে—কি রহস্যময় কারণে জানি না—আমাকে চাহিতেছে তাহার ব্যক্তিগত হুকুমদাতা, পরামর্শদাতারূপে।

বাতাসী বিবি যে জগতের জীব, সে জগৎ সমাজ-বিরোধী, সে জগৎ বে-আইনের, পাপের, অন্ধকারের, সে জগৎ নানা রহস্যে, নানা বীভৎসতায় ভরা। চাঁদের আলোয় বাতাসী বিবির আশ্চর্য মুখের

দিকে তাকাইয়া আমার মনে হইতে লাগিল এ জগতে তাহার জন্ম নহে, এই পঙ্কে এ হেন পঙ্কজের জন্ম হইতে পারে না, বাতাসী বিবি ভাগ্যবিপর্যয়ে—হয় তো নিজের অজ্ঞানিতেই—এ জগতে আসিয়া পড়িয়াছে, 'ক্রিমিন্যাল' বা অপরাধী-রক্ত বাতাসী বিবির জীবনের উৎস নহে।

এমন কি হইতে পারে না যে জালে সে জটিলভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে সেই জাল হইতে, সেই পাপচক্র হইতে সে মুক্তি চাহিতেছে এবং সেইজন্যই সে আমার সহায়তার ভিখারিণী ?

মুগ্ধমনে মুগ্ধচোখে বাতাসী বিবির মুখের দিকে তাকাইয়া সংশয়ের দোলায় দুলিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম বাতাসী বিবি সম্বন্ধে এইমাত্র যাহা ভাবিলাম তাহার মূলে কি সত্য আছে ? না আমি রহস্যময়ীর মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া অলীক কল্পনা বিলাসে মাতিয়াছি মাত্র ?

মনে হইতে লাগিল কিসের নেশায় যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছি ; দুই চোখের পাতা ঘুমে ভারী হইয়া আসিতেছে কি ?

বাতাসী বিবি আমার আরেকটু কাছে আসিয়া বসিল, চাঁদের আলোকে আরো ভালভাবে তাহার সম্পূর্ণ দেহের উপর পড়িতে দিল, তাহার ব্যাকুল মুখখানিকে আরো কাছে, আরো স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম, মনে হইল তাহার দু'টি চোখের তারায় যেন অসীম অবসাদ আর অসীম মিনতি, দু'টি চোখের কোণে যেন মৃদু অশ্রুর আভাস। কিংবদন্তী-কুখ্যাতা ক্রিমিন্যাল-সম্প্রদায়নেত্রী বাতাসী বিবির রূপ হইতে এ রূপ একেবারে আলাদা। এ যেন অসহায়া, অভিভাবিকাহীনা নারী একান্ত নির্ভরযোগ্য অভিভাবকের আশ্রয় পাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিতেছে।

নেশা যেন দ্রুতবেগে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। মনে পড়িতেছে আমি যেন সেই নেশার ঝোঁকেই উদার হইয়া বাতাসী বিবির প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলাম, বাতাসী বিবি আমার অভিভাবকীয় আশ্রয়ের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিল।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম খেয়াল নাই, চোখ মেলিয়া দেখিলাম ভোরের আলো ঘরের ভিতর উঁকি দিয়াছে, বাতাসী বিবি নাই, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বোমভোলা পাঠক। তিনি জানাইলেন জুড়ি-গাড়ি প্রস্তুত এবং পাঠকজির উপর বাতাসী বিবির নির্দেশ আছে আমাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবার। পাঠকজি সেই নির্দেশ অনুযায়ী জুড়ি-গাড়িতে আমার সঙ্গে আসিয়া আমাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মত মনে হইতেছে। বিধাতা আমাকে বাতাসী বিবির সঙ্গে এমনভাবে জড়াইয়া ফেলিবেন তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। জানি না ইহাদ্বারা আমার জীবনে কিসের সূচনা হইল—মহাবিপদের, না মহাসম্পদের।

[ক্রমশ।

পিঁপড়ের লড়াই

রাণী মজুমদার

ষাঁড়ের লড়াই, মুরগীর লড়াই, ঝিঁঝি পোকার লড়াই, মাছের লড়াই প্রভৃতির কাহিনী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। হাজার হাজার লোক এদের লড়াই দেখবার জন্য ভিড় করতো। এদের লড়াইয়ের কথা বাদ দিয়ে এখানে কেবল পিঁপড়ের লড়াইয়ের কথা বলবো। রুশ-জার্মান, চীন-জাপান যুদ্ধের তুলনায় পিঁপড়ের লড়াই কোন অংশে কম নয়। লড়াইয়ে এরা যেভাবে আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ করে তা নিজের চোখে দেখলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। পিঁপড়ের লড়াই পৃথিবীর নানা দেশেই দেখা যায়। এই লড়াই সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা তাঁদের চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। হয় তো তা অনেকেই পড়ে থাকবেন।

নানা কারণেই পিঁপড়েদের মধ্যে লড়াই বাঁধে। সাধারণত দেখা যায়—সন্তান ও ডিম লুঠ, বাসা দখল, খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই লড়াই সুরু হয়। রণক্ষেত্রে একদল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত পিঁপড়ের লড়াই সাধারণত থামে না। এদের লড়াইয়ের দৃশ্য রীতিমত রোমহর্ষক। লড়াই লাগবার পর এদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা দেখা যায়—সর্বত্রই সাজ সাজ ভাব, হাজার হাজার পিঁপড়ের রণ-উত্তেজনা দেখবার মতো, তা ঠিক ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মারমুখো পিঁপড়েরা একক ভাবে, কখনও বা দলবদ্ধভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করবার জন্য তেড়ে যায়। কামড়াকামড়ি আর ধস্তাধস্তি হচ্ছে এদের লড়াইয়ের প্রধান অঙ্গ। কোন কোন জাতের পিঁপড়ে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের দেহনিঃসৃত বিষবাষ্প প্রয়োগ করে থাকে। পরস্পর পরস্পরকে এমন কামড়ে দিয়ে ধরে যে প্রাণ গেলেও সেই 'মরণ কামড়' আর ছাড়ে না। শত্রুকে এরা কামড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। লড়াই শেষ হলে বিজয়ী দল বিজিত দলের খাদ্য, মৃতদেহ, ডিম ও বাচ্চা লুট করে নিয়ে যায়। সময় সময় বিজয়ী পিঁপড়েরা পরাজিত পিঁপড়ের মৃতদেহ উদরসাৎ করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—রণক্ষেত্রে এরা নিজেদের দলের পিঁপড়েকে ঠিক চিনতে পারে, শুঁড়ে শুঁড়ে ঠেকিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে যে যার দলভুক্ত সঙ্গীদের চিনতে পারে। লড়াই অবসানে রণক্ষেত্রে এক অদ্ভুত স্তব্ধতা বিরাজ করে।

অনেকদিন আগের কথা। কোলকাতার কাছাকাছি সোনারপুর অঞ্চলে একটা বাগানের আমগাছের একটা ভাঙ্গা ডাল লাল পিঁপড়ের বাসা সমেত (লাল পিঁপড়ে কালসো নামেও পরিচিত) বেড়ার একটা খুঁটির খুব কাছেই বাখারির সঙ্গে ঝুলছিল। হয় তো ঝড়ের বেগে ডালটা ভেঙ্গে গিয়ে বাগানের বেড়ার গায়ে আটকে গিয়েছিল। কারণ, আগের দিন সেখানে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল। বাসাটার মধ্যে ছিল হাজার হাজার পিঁপড়ে, কতকগুলি পিঁপড়ে বাসার উপর এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। আবার কতকগুলি পিঁপড়ে ডালটার গা বেয়ে উপরের দিকে যাচ্ছে। গতিবিধি থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল—তারা ঐ ঝুলন্ত ভাঙ্গা বাসা থেকে অন্য কোথাও যাবার রাস্তা খুঁজছে। কিন্তু তাদের বাইরে যাবার সব রাস্তাই বন্ধ। কারণ, যে বাখারিটার সঙ্গে বাসাটা ঝুলছিল—সেই বাখারিটার উপর দিয়ে একসার লাল পিঁপড়ে যাতায়াত করছে। বাগানের এককোণে একটা ঝোপের ভিতর আগে থেকেই আর একদল লাল পিঁপড়ে বাসা তৈরি করে বাস করেছিল। তারাই বাখারিটায় প্রায় ৩০।৩৫ ফুট লম্বা লাইন করে একটা সদ্যকাটা কচ্ছপের খোলা থেকে মাংসের টুকরো সংগ্রহ করে বাসায় তুলছে। ঝুলন্ত বাসার পিঁপড়েরা ডাল বেয়ে বাখারির কাছে এসে উক্ত পিঁপড়ের দল দেখে আর এগিয়ে যেতে ভরসা পায় না। অথচ বাখারির উপরের পিঁপড়েদের না ডিঙ্গিয়ে তাদের অন্যত্র যাবার উপায় নেই। ভাঙ্গা বাসাতেও বেশিদিন থাকা যায় না। একে তো শত্রু কাছে, তার উপর পাতা শুকাবার সঙ্গে সঙ্গে বাসা কুঁচকে যাবে, নয় তো শুকনো পাতা কুঁচকে গিয়ে বাসার জোড়া মুখ খুলে গিয়ে জায়গায় জায়গায় ফাটল দেখা দেবে। কাজেই এই বাসা ছেড়ে অন্য নূতন আশ্রয়ের সন্ধান করা খুবই দরকার। বিশেষত বাসার মধ্যে অসংখ্য ডিম ও বাচ্চা রয়েছে—তাদেরকেও নিরাপদ স্থানে রাখা একান্ত দরকার। এইসব নানা কারণে বিব্রত হয়ে ঝুলন্ত বাসার বাসিন্দারা বিষম উত্তেজিত হয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করছিল। বাখারির উপর দিয়ে যারা যাতায়াত করছিল—সম্ভবত তারাও এই আগন্তুক দলের সন্ধান পেয়েছিল, কারণ তারা তখন ভীষণ উত্তেজিত। তারা ক্রমে ক্রমে ঝুলন্ত ডালটার কাছে এসে জমায়েত হতে থাকে। এই অবস্থা প্রায় ৩০ মিনিটের বেশি সময় স্থায়ী ছিল। একমাত্র উত্তেজনা বা একস্থানে দলবদ্ধভাবে ভিড় করা ছাড়া লড়াইয়ের আর কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

অবশেষে ঝুলন্ত বাসার প্রায় ৫ ৭টা পিঁপড়ে ডাল বেয়ে বাখারিটার কাছে এসে ইতস্তত করতে থাকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর সেই দলের গোটা তিনেক পিঁপড়ে বাসায় ফিরে যায়। বাকি যারা রইলো—তারা শুঁড় উঁচু করে যেন বাখারির উপরের দলকে মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকে। ইতিমধ্যে একটা পিঁপড়ে অসীম সাহসে ভর করেই হঠাৎ অতি দ্রুতবেগে ছুটে বাখারির পিঁপড়েদের লাইনের মধ্য দিয়ে পার হতেই একটা তুমুল কাণ্ড বেঁধে গেল। বাখারির দলও যেন তৈরি হয়েই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ১০।১২টা পিঁপড়ে তাকে একসঙ্গে কামড়ে বন্দী করে রাখে। বন্দী করবার কায়দাটি বড় অদ্ভুত। বন্দী পিঁপড়ের ছয়টা ঠ্যাং ছয়টি পিঁপড়ে কামড়ে যথাসম্ভব টেনে ফাঁক করে রাখে। আর দু'জন বন্দীর দু'টি শুঁড় টেনে ধরে রাখে। ফলে বেচারীর আর কোন নড়াচড়া করবার উপায় থাকে না। এই ঘটনার ফলে—দুই দলের মধ্যে ভীষণ লড়াই সুরু হয়ে যায়। দুই দলের সৈন্য-সামন্তরা শুঁড় উঁচিয়ে পুচ্ছদেশ শূন্যে তুলে প্রবল উত্তেজনায় যেন তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিল। মাঝে মাঝে এক একটা পিঁপড়ে অন্য

একটা পিঁপড়ের শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে কি যেন বলছিল। সে তৎক্ষণাৎ বাসায় চলে যায় আর পরক্ষণেই একদল নূতন সৈন্য বাসার ভিতর থেকে চলে আসে। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষের ভিড় বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে বাথারির উপরের দল শত্রুপক্ষের একটাকে বন্দী করে উৎসাহের বশে আস্ফালন করতে করতে ভাঙ্গা ডালটার খুব কাছে এগিয়ে যায়। তাদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয়—তারা প্রতিপক্ষের বাসার দখল নিতে যাচ্ছে।

কিন্তু হুমকীর ফল হলো বিপরীত। মুহূর্তের মধ্যেই ভাঙ্গা বাসার পিঁপড়েরা তাদের শত্রুপক্ষের ৫।৭টি অগ্রবর্তী সৈন্যকে শুঁড়ে কামড়ে ধরে একেবারে তাদের আস্তানার মধ্যে টেনে নিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য সৈন্য সামন্ত এসে তাদেরকে ঘিরে ফেললো। কয়েকটার দেহ তারা কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে আর বাকিগুলিকে টানা দিয়ে বন্দী করে রাখে। ২।৩ মিনিটের মধ্যে এই সব ঘটনা ঘটে যায়। এদিকে বাথারি ও ঝুলন্ত ডালের সংযোগস্থলে দ্বৈরথ লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। দুই দলের সৈন্য-সামন্তরা একজন আর একজনকে আক্রমণ করেছে—অর্থাৎ দু'জন করে লড়াই চলতে থাকে। টানাটানি, ধস্তাধস্তি, কামড়া-কামড়ি চলছে পুরাবেগে। বাথারির দলের কয়েকটা সৈন্য ঝুলন্ত ভাঙ্গা বাসার কয়েকটা সৈন্যকে শুঁড়ে কামড়ে তাদের দিকে নেবার চেষ্টা করছে। আবার ঝুলন্ত বাসার সৈন্যরাও এক-একজনে এক একটি করে শত্রুসৈন্যকে শুঁড় কামড়ে তাদের দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করছে। যাকে টানছে—সে প্রাণপণে পিছু হটবার চেষ্টা করছে, আবার কেউ কেউ ছ'টি পা দিয়ে অবলম্বন স্থান আঁকড়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ টানাটানির পর কেউ কেউ শত্রুর মুখে শুঁড়ের অর্ধেক রেখেই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবার চেষ্টা করছে। ক্রমশ লড়াই এমন ভীষণাকার ধারণ করে যে, ২।৩ হাত চওড়া জায়গার মধ্যে প্রায় সর্বত্র এইরূপ টানাটানি, কামড়া-কামড়ি চলতে থাকে। শুধু কামড়া-কামড়ি নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিষবাষ্পের অবাধ প্রয়োগ হতে থাকে, এতগুলি পিঁপড়ের দেহনিঃসৃত বিষাক্ত রসের উগ্রগন্ধে চারদিক ভর্তি হয়ে যায়। কামড়া কামড়ি আর জড়াজড়ি করতে করতে শত শত পিঁপড়ে ঝুপ, ঝুপ, করে নীচে পড়তে থাকে। লড়াই লাগবার ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই দুই দলের এত পিঁপড়ে মরে মাটিতে পড়েছিল যে, তাদের মৃতদেহের নীচে ঘাস-পাতা প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের গতি দেখে বোঝা গেল—দুই দলের সৈন্যের সংখ্যা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। যারা তখনও ছুটাছুটি করছিল—তাদের প্রত্যেকের শুঁড়ের বা পায়ের সঙ্গে 'মরণ-কামড়' দিয়ে ঝুলে রয়েছে—শত্রুর ছিন্ন মাথা বা শরীরের সামনের অংশ।

বাথারির উপরের পিঁপড়েরা ভাঙা বাসাটা দখল করবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করতে থাকে। দেখা গেল—এত লড়াইয়ের পরও তাদের উৎসাহ বিন্দুমাত্র কমে নি। তাদের বাসা থেকে নতুন নতুন সৈন্য এসে আবার নবোদ্যমে আক্রমণ শুরু করে। এবার মনে হলো বাথারির পিঁপড়েরাই লড়াইতে জিতেছে। ঝুলন্ত ভাঙা বাসার পিঁপড়ের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। এরা শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে কে শত্রু আর কে মিত্র তা চিনে নিচ্ছিলো। এদিকে বাথারি পিঁপড়ের দলের ২৪টি সৈনিক ক্রমে ক্রমে ঝুলন্ত ভাঙা বাসার উপরে যেতে সুরু করে। কিন্তু তারা ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে যাচ্ছিলো—তা তাদের চাল-চলন দেখেই বোঝা গেল। কিছুক্ষণ বেশ চুপচাপ, ঝুলন্ত ভাঙা বাসার পিঁপড়েরা যে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল—তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ তাদের তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিলো না। কিন্তু ভাঙা বাসার ভিতরে অতন্দ্র পিঁপড়ে পাল্টা আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

প্রায় ৫।৭ মিনিট এভাবে কেটে গেল। তারপর হঠাৎ দেখা গেল—গোটাকয়েক পিঁপড়ে ভাঙা বাসার মধ্য থেকে অপরিণতবয়স্ক বাচ্চাগুলিকে মুখে করে নিয়ে বেরিয়ে এলো—পিছনে আছে একদল সৈন্য। এরা পাহারা দিতে দিতে চলেছে। বাচ্চাবহনকারীরা কোন দিকে না চেয়ে অতি দ্রুতগতিতে ডাল বেয়ে বাথারির উপর দিয়ে বেড়ার খুঁটির উপর উঠতে থাকে। সৈন্যরাও তাদের পিছু পিছু চলছিল। এই ব্যবধানটুকুর মধ্যে শত্রুরা তাদের বিশেষ বাধা দেবার চেষ্টা করলো না। কেবল দু-একটাকে ধরে টানা দিয়ে বন্দী করে রাখছিল। তখন অবশ্য সেস্থানে বাথারির দলের পিঁপড়ের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, আর যারা ছিল—তারা লড়াই করবার চেয়ে ঝুলন্ত ভাঙা বাসাটাকে লুট করবার তালে ছিল। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল—আরও অনেকে ডিম ও বাচ্চাগুলিকে মুখে নিয়ে দলে দলে ভাঙা বাসা থেকে বের হয়ে প্রাণপণে নিজেদের ঘাঁটির দিকে ছুটতে থাকে।

এবার দুইদলে পুনরায় তুমুল লড়াই শুরু হয়। ঝুলন্ত ভাঙা বাসার ভিতর এতক্ষণ অসংখ্য সৈন্য যেন দম নেবার জন্য চুপ করেছিল। এবার তারা দলে দলে ঝুলন্ত ভাঙা বাসা থেকে বেরিয়ে বাথারির পিঁপড়েদের প্রচণ্ডবেগে হঠাৎ আক্রমণ শুরু করে। বাথারির পিঁপড়েদের তারা কামড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। এরই ফাঁকে ফাঁকে তারা তাদের ডিম ও বাচ্চাদের নিরাপদ স্থানে অর্থাৎ নূতন বাসায় সরাতে থাকে। আর একদল কর্মী বিদ্যুদ্বেগে গাছের পাতা জুড়ে নতুন বাসা তৈরি করা শুরু করে দেয়। বাসা তৈরি শেষ হতে না হতেই—তারা ডিম ও বাচ্চাদের তার মধ্যে স্তূপাকারে জমা করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে লড়াইও চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল—যাদের আগে জয়ী বলে মনে হয়েছিল অর্থাৎ বাথারির দল—তারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছে।

পিঁপড়ের এই একটি লড়াইয়ের ঘটনা থেকেই বোঝা যায়—এদের লড়াই কি সাংঘাতিক! এই বিচিত্র লড়াইয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বাংলার প্রসিদ্ধ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রাণিবিভাগের গবেষক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

ম্যাজিক দেশলাই

(গল্পে ম্যাজিক শিক্ষা)

কার্তিক ঘোষ

পাড়ার ছেলে পল্টু।

ও যখন-তখন আমাকে এসে জ্বালাতন করে। পড়া নেই শোনা নেই শুধু একটা খামখেয়ালী স্বভাব। খুটখাট একটা না একটা কাজ নিয়েই আছে। শুধু দুষ্টুমি করার চিন্তা।

কি করলে বাড়ির লোক, পাড়ার লোক এমনি কি গোটা

কোলকাতার লোককে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায় এই ওর একমাত্র লক্ষ্য।

শুধু তাই নয়, এক এক সময় এমন মজার মজার ধাঁধা তৈরি করে, যা ধরতে অনেককেই অনেক সময় গোলকধাঁধার মধ্যে যেমে নেয়ে যেতে হবে। তবে একথা স্বীকার করতে দোষ নেই—পল্টুটা বেশ চালাক-চটপটে বুদ্ধিমান ছেলে।

এই তো সেদিন রবিবার দুপুর বেলায় হঠাৎ এসে ঢুকলো আমার ঘরে। ওকে দেখেই চেয়ারে বসে বসেই আমি ঘুমের ভাণ ক'রে চোখ বুজে ঢুলতে লাগলুম। কিন্তু তা হ'লে কি হয়, পল্টু তার স্বভাবসুলভভাবেই বলে উঠলো—আরে ঘুমোচ্ছেন কি,—আজ যে রবিবার। বলতে বলতে একেবারে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো।

ওর ঝাঁজালো গলা শুনে আমি আর চোখ বুজে থাকতে সাহস পেলাম না। তাই দু'চোখ মেলে বেশ ভালো ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, কি বলছো?

—কি আর বলবো, একটা ম্যাজিক দেখাতে এলাম আপনাকে। বলতে বলতে পল্টু ওর প্যান্টের পকেট থেকে ফস ক'রে একটা টেক্কা-মার্কা দেশলাই বার ক'রে ফেললে।

আমি হাঁ হ'য়ে রইলুম।

—এই দেখুন। আমার কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে পল্টু দেশলাইটা খুলে তুলে ধরলে বেশ সাবধানে। দেখছেন তো ভর্তি দেশলাই।

—হ্যাঁ। যা দেখছি আমি তাই বললুম।

পল্টু দেশলাইটা আবার বন্ধ ক'রে ফেললে। তারপর কাঠিভর্তি দেশলাইটা মুঠোয় নিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগলো,—

> দেশলাই ফেস্লাই
> সব কাঠি ফুঃ—
> ঠকঠক্ ঠকাঠক্
> হুক্কা হুঃ!

বলেই গোটা দেশলাইটা খুলে তুলে ধরলো বেশ সতর্কতার সংগে। গোটা দেশলাইটার কাঠিগুলো সত্যি সাত্য উধাও হ'য়ে গেছে দেখে আমি তো আনন্দে লাফিয়ে উঠে পল্টুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলুম।

—সাবাস পল্টু, সত্যিই তুমি একজন বিখ্যাত জাদুকর হ'তে পারবে। আমার কাছে এই রকম শুভেচ্ছা আর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়ে পল্টুও যেন একটু হতভম্ব হ'য়ে গেলো সেদিন। তারপর সেই আড়ষ্টতা কাটিয়ে ও সত্যি সত্যিই আবার একদিন এসে পড়লো আমার কাছে। তখন ও নিজেই শিখিয়ে দিলে ম্যাজিকটা।

বললে, প্রথমে একটা খালি দেশলাইয়ের ওপরের মার্কা দেওয়া কাগজ সাবধানে খুলে আর একটা দেশলাইয়ের পিছন দিকে (যেদিকে কোন মার্কা দেওয়া কাগজ থাকে না) ভালো ক'রে এঁটে নেবেন। তার পরে সেই দেশলাইটার খোলের উল্টো দিকে আঠা মাখিয়ে কিছু দেশলাই কাঠি (এক সরল রেখায়) এঁটে নেবেন। তখন দূরে থেকে দেশলাইটার আধে'কটা খুলে দেখলেই মনে হবে বুঝি একবাক্স দেশলাই-কাঠি। আবার তার পিছনের দিকটাও থাকবে উল্টো দিকের মতো মার্কা, কিন্তু খোলটা আসলে ফাঁকা। ম্যাজিক দেখাবার সময় দেশলাইটা শুধু একটু উল্টে নিতে হবে সতর্কতার সংগে। তা হ'লেই দর্শকরা একবার দেখবে ভর্তি দেশলাই আর একবার দেখবে খালি।

পল্টুর কথামতো আমিও একটা ম্যাজিক দেশলাই ক'রেছি—সত্যি মজার! তোমরাও ক'রে দেখো। কেমন!

শালকি পাখি

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার

> শালকি পাখি, হাল্কি বড়,
> বলছি পাখি, পাল্কি চড়।
> নইলে পরে ঠ্যাঙটি ভেঙে
> খাইতে হবে ভিক্ষা মেঙে।
> শালকি পাখির গানটি মিঠা,
> খাইতে দিমু আসকে পিঠা।
> শালকি রে, তুই ঝোপে-ঝাড়ে
> পোকা খুঁজে মরিস না রে,
> খাঁচায় পাবি ছাতু-ছোলা,
> কামরাঙা-ফল পাকা কলা।
> রোদে পুড়ে জলে ভিজে
> বল দেখি তুই ফলটা কি যে।
> হলদে ঠোঁট আর হলদে ঠ্যাঙে
> জলের ধারে খুঁজিস ব্যাঙে।
> খাঁচায় বসে খাবার খাবি,
> মনের সুখে গানটি গাবি,
> গ্রামের সুরে, মাঠের সুরে,
> গাইবি জলের ঘাটের সুরে,
> হাল্কা সুরে হাল্কি পাখি
> গাইবি সবাই শুনবে নাকি?

কুরুক্ষেত্রের কথা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীসাধনা কর

॥ ৪ ॥

কর্ণ এবার উৎসাহভরে চললেন দুর্যোধনের কাছে। বললেন —এবার আমি অস্ত্র গ্রহণ করব, যুদ্ধে যোগ দেব।

নূতন উদ্দীপনায় দুর্যোধন উল্লসিত হয়ে উঠলেন। কর্ণ দিচ্ছেন রণে যোগ, এবার জয় অনিবার্য। সকলে মিলে পরামর্শ করে দ্রোণকে সেনাপতি করলেন।

দ্রোণ বললেন—বৎস, আমি তোমাকে বলেই দিচ্ছি—পাণ্ডবদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব, কিন্তু পাঁচ ভাইয়ের একজনকেও হত্যা করা সম্ভব হবে না। তারা কৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত—মৃত্যু তাদের কাছে ঘেঁসতে পারবে না—এ তুমি স্বীকার করো আর নাই করো, এ অতি সত্য।

দুর্যোধন অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। মরণকালে ওষুধ রোগীর রোচে না, দুর্যোধনেরও তেমনি হিতবাক্যে অভিরুচি নেই। দ্রোণ তথাপি বললেন—এ কথাও জেনে রেখো,—আমাকে হত্যার নিমিত্তই ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম। এ ভিন্ন তোমার আর যা অভিলাষ আছে বলো, আমি তাই পূর্ণ করব।

দুর্যোধন বললেন—তাই যদি হয়, আমি তবে আর কিছুই চাই নে—আপনি শুধু যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় বন্দী ক'রে আনবেন—এই আমার প্রার্থনা।

বিস্মিত হলেন দ্রোণ—এ কি কথা বলে দুর্যোধন! যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু কামনা না ক'রে কেবল বন্দী ক'রে আনা! শুভবুদ্ধি জেগেছে তবে! বংশ ও কুলনাশে দুর্যোধন হবেন বিরত! দ্রোণ জানিতে চাইলেন এই অভিপ্রায়ের উদ্দেশ্য।

দুর্যোধন অভিসন্ধি গোপন রাখতে পারলেন না। দ্রোণ যদি যুধিষ্ঠিরকে মারতে সক্ষমও হন তবু কৌরবদের জয় হবে না। ভীম অর্জুন নকুল সহদেব বর্তমান থাকবে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে যদি বন্দী ক'রে আনা যায়, আবার দ্যূত-ক্রীড়াচ্ছলে পরাজিত ক'রে দীর্ঘদিনের জন্য তাঁদের বনে পাঠিয়ে দিয়ে কৌরবগণ নিশ্চিন্তে রাজ্যভোগ করতে পারেন।

শুনে দ্রোণ হাসলেন। পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর নিগূঢ় প্রেম, সে স্নেহকে রোধ করা তো সহজ নয়। কূটচালে তিনিও কম যান না। হেসে বললেন—দেখো, অর্জুন তো কেবল আমার কাছেই অস্ত্র শেখে নি, দেবতাদের কাছেও তার শিক্ষালাভ হয়েছে। সে আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরের কাছে থাকে, তবে কখনোই যুধিষ্ঠিরকে আমি বন্দী করতে পারব না।

দেয়ালেরও কান আছে, যুদ্ধের সময় গুপ্তচর সর্বত্র। দ্রোণের কথা গিয়ে পৌঁছল পাণ্ডবশিবিরে। যুধিষ্ঠির বললেন—অর্জুন, একমাত্র তুমিই আমার রক্ষাকর্তা। আচার্য দ্রোণ কৌশলে সে কথাই প্রকাশ করেছেন।

অর্জুন হেসে বললেন—ভয় নেই তাত, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আচার্য আপনাকে বন্দী করা দূরে থাক্ একটু নিগ্রহও করতে পারবেন না।

একাদশ দিবসের যুদ্ধ আরম্ভ হল। দ্রোণ অধিনায়ক, শকট-ব্যূহ তৈরি করে সংগ্রাম শুরু করলেন। সে সংগ্রামের ভয়াবহতা কল্পনা করা যায় না। দ্রোণের প্রধান চেষ্টা হলো—যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা। বিরাট দ্রুপদ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন কারুর সাধ্য হল না দ্রোণকে বাধা দেবার। যুধিষ্ঠির ধরা পড়েন আর কি! পাণ্ডব সৈন্যের মধ্যে তুমুল আর্তনাদ উত্থিত হল—বন্দী হলেন, মহারাজ বন্দী হলেন!

অর্জুন ছিলেন দূরে, বিদ্যুদ্বেগে ধেয়ে এলেন। অগণিত বাণধারা ছেয়ে ফেললেন জল-স্থল-অন্তরীক্ষ। দ্রোণাচার্য দেখলেন সূর্য অস্তগত। তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে শিবিরে প্রত্যাগত হলেন। রক্ষা পেয়ে গেলেন যুধিষ্ঠির।

দুর্যোধন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—আচার্য, আপনি পারলেন না যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে, এই কথাই সত্য হল।

দ্রোণাচার্য আশ্বাস দিয়ে বললেন—দেখ, অর্জুন কাছাকাছি থাকলে দেবতাদের পর্যন্ত এ ক্ষমতা হবে না। একমাত্র উপায়—অর্জুনকে যদি কেউ দূরে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখতে পারে, নিশ্চয়ই তবে বন্দী হবেন যুধিষ্ঠির।

ত্রিগর্তরাজ সে মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন—কাল আমি হত করব অর্জুনকে, নয় দেব প্রাণ।

সঙ্গে সঙ্গে সুশর্মা, সুধর্মা, সুরথ, সত্যবর্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু এবং সত্যকর্মা অযুত রথী নিয়ে অগ্নিসাক্ষী রেখে শপথ করলেন—অর্জুনকে বধ করব, নিশ্চয় বধ করব।

এঁরাই পরিচিত হলেন সংশপ্তক নামে।

দ্বাদশ দিনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। সংশপ্তকগণ অর্ধচন্দ্রব্যূহ তৈরি করে অর্জুনকে আহ্বান করলেন যুদ্ধে। অর্জুন বিপদে পড়লেন। যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করতেই হবে; এদিকে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবে কে?

অর্জুন বললেন—তাত, দ্রোণাচার্যের অভিপ্রায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তিনি আপনাকে বন্দী করতে ইচ্ছুক। আজ আপনাকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পাঞ্চালবীর সত্যজিৎ। যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হন, আপনি নিমেষকাল রণক্ষেত্রে থাকবেন না।

অর্জুন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলে গেলেন। রণ শুরু হল। সংশপ্তকগণ এমন সংগ্রাম করতে লাগলেন যে, অর্জুন একবারও এদিকে আসতে পারলেন না।

দ্রোণাচার্য ভীম-বিক্রমে পিঁপড়ার মতো সহস্র সহস্র সৈন্য ধ্বংস করে চললেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে পারলেন না। সেদিন যুদ্ধ শেষে অভিমানে ফেটে পড়লেন দুর্যোধন—আচার্য আপনি—আজও আপনি যুধিষ্ঠিরকে হাতের কাছে পেয়ে বন্দী করে আনলেন না। আপনিই আমাকে বর দিয়েছিলেন, আপনিই তার অন্যথা করছেন।

দ্রোণ লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হলেন, বললেন—মহারাজ, আপনার প্রিয়কাজ করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, তবু কেন আমার উপর এমন দোষারোপ করছেন। আমি শপথ করছি, কাল এমন ব্যূহ রচনা করব যা দেবগণেরও অভেদ্য। অর্জুন ব্যতীত কারুর সাধ্য হবে না সে ব্যূহে প্রবেশ করে। এমন কৌশল করতে হবে যাতে পার্থ সে ব্যূহের কাছেই না থাকতে পারে। এই ব্যূহের দ্বারাই পাণ্ডবগণ পরাজিত হবেন।

পরম তুষ্ট হলেন দুর্যোধন। পরদিন দ্রোণ সপ্তরথী নিয়ে রচনা করলেন চক্রব্যূহ। সে চক্রে রইলেন স্বয়ং দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি আর জয়দ্রথ। অর্জুনকে সেদিন সংশপ্তকগণ কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে বহুদূরে যুদ্ধে রত রাখলেন। তিনি জানতেও পারলেন না এ ব্যূহের কথা।

পাণ্ডবদের বিষম সংকট। কিভাবে ভেদ করা যায় ব্যূহ। এর কৌশল যে জানেন মাত্র কৃষ্ণ অর্জুন আর কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন। উৎসাহে জ্বলে উঠল তরুণ বালক অভিমন্যু। বললে—আমি জানি চক্রব্যূহ ভেদ করে ভিতরে যাবার পন্থা, কিন্তু বের হতে জানি নে।

যুধিষ্ঠির বললেন—বৎস, মান রক্ষা করো আমাদের। তোমার সঙ্গে আমরা সবাই আছি। তুমি প্রবেশ করো, পিছনে পিছনে আমরাও তবে প্রবেশ করতে পারব।

অভিমন্যু সকলের আশীর্বাদ নিয়ে তেজোদ্দীপ্ত হয়ে যুদ্ধারম্ভ করলে। কৌরবগণ ষোড়শবর্ষের বালককে চক্রব্যূহ ভেদ করতে অভিলাষী দেখে পরিহাসে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। বলতে লাগলেন—অর্জুনপুত্রকে হত্যা করলে অর্জুনের অর্ধেক শক্তি নাশ করা হবে।

উৎসাহে এগিয়ে এসে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কার সাধ্য ক্ষণের পথ রোধ করে। শরাঘাতে সে জর্জরিত করে তুললে বিপক্ষদলকে। দ্রোণাচার্য বিস্ময়ে-আনন্দে-প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। তাই দেখে ক্রোধে-ক্ষোভে তীব্রতর হলেন কর্ণ—অর্জুন আচার্যের পরম স্নেহের পাত্র। তারই পুত্র বলে আচার্য এমন মুগ্ধ হয়েছেন। সপ্তরথী মিলে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘিরে ধরলেন বালককে—জয়দ্রথ রইলেন ব্যূহের মুখ বন্ধ করে।

সিংহশাবক যেন আবদ্ধ হলো শার্দূলদলগুলোতে। অভিমন্যুর শক্তি প্রকাশ হলো দ্বিগুণ—ভয় পেলে না, শংকা জাগল না, মরণামোদে মেতে উঠল মেতে। বিদ্যুতের মতো গতি, শ্রাবণের বারিধারার মতো শরপাত, মার্তণ্ডের মতো তেজ। সহ্য করতে পারা দুঃসাধ্য। একা বালক সপ্তরথীর মার সহ্য ক'রে আকুল ক'রে তুললে সকলকে। দেবলোক থেকে রব উঠলো—সাধু! সাধু! নরলোকে ধ্বনিত হল—সাধু! সাধু! এমন যুদ্ধ কেউ কখনো দেখে নি, ভয়ে পালিয়ে যেতে লাগল কৌরবসৈন্য। দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ হত হল। দুঃখে-ক্ষোভে আগুন হয়ে দুর্যোধন বলতে লাগলেন—এ বালককে আজ বধ করা চাই-ই।

শকুনি পরামর্শ দিলেন একা একা যুদ্ধ করে পারা যাবে না বধ করতে। সকলে মিলে একসঙ্গে আক্রমণ ক'রে তবে একে নিঃশেষ করতে হবে।

দ্রোণ বললেন—এর দেহে রয়েছে অভেদ্য কবচ। এ কবচ ধারণের কৌশল আমিই শিখিয়েছিলাম অর্জুনকে। তারই কাছ থেকে অভিমন্যু শিখে নিয়েছে। এই কবচ এবং ধনুর্বাণ যতক্ষণ ওর হাতে থাকবে ততক্ষণ এই বালক দেবতাদেরও অজেয়। যদি বধ করতে চাও আগে ওকে রথ ধনুর্বাণ ও কবচ-বিহীন করো, তারপরে তা করতে পারবে।

কৌশল জানা গেল। কর্ণ ত্বরিতে শর দিয়ে ছেদন করলেন অভিমন্যুর কবচ ধনুক, রথের অশ্ব; কৃপাচার্য বধ করলেন সারথিকে, তারপর দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন মিলে ঘিরে ফেললেন বালককে।

পাণ্ডবগণ ব্যূহ-মুখ ভেদ করার নিয়ম জানেন না, ব্যূহের দ্বারে যমসম জয়দ্রথ। শিবের কাছে তাঁর পিতা বর পেয়েছেন—যে, অর্জুন ছাড়া আর চার পাণ্ডবকে জয়দ্রথ পরাস্ত করতে পারবেন। আজ সেইদিন সমাগত। তাই জয়দ্রথকে হটিয়ে বহু চেষ্টা করেও যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব কেউ পারলেন না ভিতরে ঢুকতে। হায় হায় করতে লাগলেন, যুঝতে লাগলেন প্রাণপণে—একবারও যদি হটান যেতে জয়দ্রথকে, রক্ষা করতে পারতেন অমিতবীর্য অভিমন্যুকে। কতক্ষণ যুঝতে পারে ঐটুকু তরুণ বালক সপ্তরথীর সমবেত আক্রমণের বিপক্ষে। অন্তরীক্ষ থেকে আর্তনাদ উঠল, দেবলোক থেকে ধিক্কার শোনা গেল। এই কি রীতি, এই কি নীতি, এই কি ধর্ম!

তখন কোথায় ধর্ম, কোথায় বা রীতিনীতি, কোথায় স্নেহ, কিসের বা বিচার-বিবেচনা। ক্রোধ প্রবল, পরাজয় লজ্জাজনক, প্রতিশোধস্পৃহা দুর্বার। চিরকলঙ্ক মাথায় নিয়ে সপ্তরথী মিলে নিরস্ত্র করলেন একটিমাত্র কিশোরকে। অমনি দুঃশাসনের ছেলে এগিয়ে এসে গদাঘাতে অভিমন্যুকে নিধন করল। মহা উল্লাসে যুদ্ধ শেষ করে কৌরবেরা ফিরে গেলেন শিবিরে।

যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন অভিমন্যু।

সেদিন সংশপ্তকদের বিনাশ ক'রে চঞ্চলচিত্তে শিবিরে ফিরলেন অর্জুন। তাঁর বাঁ চোখ নাচছে, প্রাণ হাহাকার করছে, যুদ্ধ করতে লাগছে না মন। কেন এমন হল। কৃষ্ণকে তিনি দ্রুত রথ চালনা করতে বললেন। সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ। নির্বিকারভাবে নানা কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে রথ নিয়ে এলেন শিবিরে। অর্জুন চমকিত হলেন—কৌরবশিবিরে আনন্দ-কোলাহল, পাণ্ডবশিবির কেন স্তব্ধ। কে নিহত হলেন এ পক্ষে। যুধিষ্ঠির কি হয়েছেন বন্দী। শংকিতমুখে অর্জুন এসে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠিরের শিবিরে—জ্যেষ্ঠকে দেখে আশ্বস্ত হল মন। কিন্তু নিদারুণ কান্নায় পাণ্ডবশিবির উচ্চকিত হয়ে উঠল—কোথায় রইলে আজ অর্জুন, কোথায় সারাদিন বৃথা যুদ্ধে কাটালে। অমূল্যরতন অভিমন্যুকে যে সপ্তরথী মিলে নিধন করলো, সে তো জানলে না!

রহস্যময় যাদুকর মহম্মদ চেল্

যাদুকর বি দাস

[ম্যাজিকের কথা উঠলেই অনেকেই যাদুকর হুডিনীর উদাহরণ দিয়ে থাকেন। এর জন্যে কি হুডিনীর অতিপ্রাকৃত খেলাগুলোই দায়ী? তাঁর জনপ্রিয়তার পেছনে প্রচার-কৌশলের কৃতিত্বও অনেকখানি। আমাদের দেশে যাদুবিদ্যাকে জনপ্রিয় করার জন্যে প্রচারের উপযোগিতা যাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন অনেকদিন আগেই—যাদুকর মহম্মদ চেল তাঁদের অন্যতম। পৃথিবীব্যাপী খ্যাতিলাভ না করলেও ভারতের কোন কোন অংশে তাঁর কথা এখনও শোনা যায় লোকের মুখে।]

আজকের দিনে যাদুকরেরা প্রদর্শনীর আগে কত বিচিত্র প্রচার-কৌশলের যে সাহায্য নিয়ে থাকেন, তার ঠিক নেই। হ্যাণ্ডবিল, পোস্টার, প্রোগ্রাম তো আছেই, তা ছাড়া চোখ বেঁধে সাইকেল, মোটর-সাইকেল বা গাড়ি চালাতেও দেখা যায় অনেককে। নিয়ন-দীপের ব্যবহারও ধীরে ধীরে চালু হচ্ছে যাদুকরদের প্রচারকার্যে।

প্রায় ৭০ বছর আগে ভারতের এক যাদুকর মহম্মদ চেল প্রচারের মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু লেখাপড়া না জানায় Printed Publicity-তে বেশ সুবিধে করতে পারেন নি। পথে-ঘাটে-মাঠে-ময়দানে অলৌকিক (!) সব খেলা দেখিয়ে লোকের মনে নিজেকে এমন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, সবাই তাঁকে সত্যিকার যাদুকর বলেই ভাবতেন। মহম্মদ চেল ছিলেন পশ্চিম ভারতের লোক। প্রায় ৬৫ বছর আগে মৃত্যু হয়েছে তাঁর, কিন্তু লোকে আজও তাঁর কথা বলে থাকেন—যেন সেদিন মাত্র দেখেছেন সেই যাদুকরের খেলা। অনেকের বিশ্বাস যে, তিনি সত্যি সত্যি অপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী ছিলেন।

'চলন্ত ট্রেনের গতিরোধ করা' তাঁর বিস্ময়কর খেলাগুলির মধ্যে একটি। যতক্ষণ না আদেশ দিতেন ততক্ষণ যন্ত্রযানের সাধ্য ছিলো না একচুল নড়বার। আর একটি বিশিষ্ট খেলা ছিলো খালি একটি থালা চাদর-ঢাকা দিয়ে তার মধ্যে দর্শকদের পছন্দমত খাবার জিনিস নিয়ে আসা। এই খেলাটির কথা সেদিনও শুনেছি একজন বৃদ্ধ মুসলমানের কাছে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে তিনি খেলাগুলো দেখাতেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

স্কুল ছুটির পর ছোট ছোট ছেলেদের তিনি হাওয়া থেকে খাবার ধরে ধরে খেতে দিতেন আর গরীবদের হাওয়া থেকে ধরে দিতেন মুঠো মুঠো টাকা। এত সুন্দর আর সহজ ছিলো তাঁর প্রদর্শনভঙ্গী, যে কেউ ধারণাই করতে পারতো না—ঐ খেলার জন্যে তাঁকে আগে থেকেই প্রস্তুত হতে হয়েছে। জীবিতাবস্থায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তীর নায়ক। টাকা রোজগার করার জন্যে যে তিনি খেলা দেখাতেন সে রকম কোন লক্ষণই দেখা যেতো না। সাধারণ লোকে না জানলেও রাজা-মহারাজাদের সামনে অলৌকিক সব যাদুর খেলা দেখিয়ে প্রচুর অর্থ তিনি উপার্জন করতেন একথা সত্যি। তা ছাড়া তাঁর কয়েকজন ধনী বন্ধুর অযাচিত অর্থসাহায্যে জীবনটা বেশ আরামেই কাটিয়ে গেছেন। লোক-দেখানো যে সামান্য টাকা তিনি গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলি করতেন, উপার্জনের তুলনায় তা অতি নগণ্য।

স্কুল ছুটির পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফেরবার সময় যাদুকর চেল হাওয়া থেকে চকোলেট, লজেন্স ধরে ধরে দিতেন তাদের হাতে। মহানন্দে বাড়ি ফিরে গিয়ে সবার কাছে যাদুকরের ভৌতিক-কাণ্ডের গল্প করতো পঞ্চমুখে। কাগজে কাগজে প্রচারের চেয়ে এ উপায়টাও মন্দ নয়।

একবার কয়েকজন রাজা-মহারাজার সামনে খেলা দেখাবার জন্যে আমন্ত্রিত হন তিনি। খেলা আরম্ভ করার আগে বললেন যে, তাঁর ঝুলিতে বহু খেলাই আছে কিন্তু মাত্র একটি খেলা তিনি দেখাবেন সেদিন। একটা ছোট টেবিলের ওপর বসানো ছিলো সুন্দর একটি মার্বেল পাথরের মূর্তি। যাদুকর তাঁর কাঁধের চাদর দিয়ে সেটি ঢেকে দিলেন। তারপর—চাদরটা ধরে টান মারতেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো নিরেট মূর্তিটা! চাদরটা কাঁধে ফেলে জানালার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাতেই সবাই তাকালেন সেদিকে। মূর্তিটা বাগানের সবুজ ঘাসের ওপর সোজা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

যাদুকর চেল তাঁর খেলাগুলো কৌশলের সাহায্যেই দেখাতেন, একথা জানা গেছে তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মুখ থেকে। লোকে অবশ্য জানতো যে, তিনি সত্যিকার যাদুবিদ্যার দ্বারাই খেলাগুলো করে থাকেন। আমাদের দেশে বহু লোককেই গলায় চাদর ঝুলিয়ে বেড়াতে দেখা যায় আজও। সুতরাং এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছুই নয়। যাদুকর চেলের কাঁধে চাদর থাকাটা তাই কারো মনে কোন সন্দেহ জাগাতো না। আসলে কিন্তু চাদরটিতে যথেষ্ট কৌশল করা থাকতো। ঐ চাদর দিয়ে তিনি বিভিন্ন জিনিস অদৃশ্য করা বা দর্শকদের পছন্দমত খাবার খালি থালায় এনে দেখানোর কাজ হাসিল করতেন। বলা বাহুল্য যে সব জিনিস বার করতে হবে সেগুলো আগে থাকতেই তাঁর কাছে লুকো[নো] থাকতো।

মানুষের মন সম্বন্ধে জন্মগত একটা জ্ঞান তাঁর ছিলো। দর্শ[ক] কি পছন্দ করবে না করবে তা তিনি আগে থেকেই মোটামুটি আন্দা[জ] করতে পারতেন এবং তাঁর ধারণাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্যি প্রমাণি[ত] হতো। রাস্তার ধারে বা চলন্ত ট্রেনে, যেখানেই অনেক লোক একত্রি[ত] হতো—সেখানেই তিনি আরম্ভ করতেন তাঁর অদ্ভুত যাদুর খেলা[।] ফলে লোকমুখে অল্পসময়ের মধ্যেই প্রচার হয়ে পড়তো তাঁর নাম।

সামান্য সুযোগের কেমন সদ্ব্যবহার তিনি করতেন তার ছো[ট্ট] একটি উদাহরণ দিচ্ছি এখানে। একবার তিনি এক দর্শকের সোন[ার] আংটি কুয়োতে ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। পেছনে পেছনে চলে[ছে] একটি ছোটখাট জনতা মজা দেখার জন্যে। আংটির মালিকের অব[স্থা] তো বুঝতেই পারছেন? এক জেলে এক ঝুড়ি মাছ নিয়ে সেই [পথ] দিয়েই যাচ্ছিলো বাজারে। যাদুকর তাকে থামালেন। তার[পর] ঝুড়ি থেকে সবচেয়ে বড় আকারের মাছটি বেছে ছুরি দিয়ে পেট চি[রে] ফেলতেই সেই মাছের পেট থেকে বেরিয়ে পড়লো দর্শকের নিশা[না] দেওয়া আংটি! অবাক-বিস্ময়ে সবাই তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। মালি[ক] আংটিটা নিতে পর্যন্ত ভুলে গেছেন। এ কি করে সম্ভব!

ভাবুন তো, কালিদাসের যুগে যাদুকর চেল থাকলে শকুন্তল[া] আংটি খেয়ে মাছটা হজম করতে পারতো—না শকুন্তলা কা[ব্য] লেখাই হতো।

বিদ্ঘুটে জানোয়ার

সুলেখা হাণ্ডে

কিম্ভূত কিমাকার
অদ্ভুত মজাদার
নাই তার
একফোঁটা পুচ্ছ।
বিদ্ঘুটে জানোয়ার
মগজটা ফাঁকা তার
সব কিছু
করে দেয় তুচ্ছ।
দিন-রাত গজ্ গজ্
বজ্ বজ্ বজ্ বজ্
এই ছাড়া
কাজ নাই কিচ্ছু।
চোখ দু'টো পিট্‌পিটে
শয়তান মিট্‌মিটে
ঠিক যেন
বসে আছে বিচ্ছু।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

টেডের কাছে সমস্ত গল্পটাই তারপর শুনেছিলাম।

গল্প হিসেবে জমাট কিছু নয়। শুধু তার পরিণতিটা যা ভাবা যায় তার থেকে একটু ভিন্ন ধরণের।

টেড শেষ পর্যন্ত দেবরাজের ভক্ত হয়ে উঠেছিল এটা অবশ্য আগে থেকেই অনুমেয়। কিন্তু ঘৃণা বিদ্বেষ থেকে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসাতে পৌঁছোবার পথটাই আলাদা।

না, দেবরাজের কোন আধ্যাত্মিক জ্যোতির ছটা দেখে টেড মুগ্ধ অভিভূত হয় নি। দেবরাজ ধর্ম কি আধ্যাত্মিক কোন আলোচনার ধার দিয়েও যায় নি সেদিন। শুধু টেডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ খেয়েছিল।

ব্রাট টেডকে নিয়ে টেবিলে গিয়ে উপস্থিত হবার পরই কেমন একটু বাঁকা কৌতুকের দৃষ্টিতে টেডের দিকে চেয়ে দেবরাজ বলেছিল,—বোসো ট্যাডুসজ কারবোইয়াক।

টেডের পুরো জিভ আড়ষ্ট করা নামটাই দেবরাজ উচ্চারণ করেছিল, ব্যঙ্গভরে নয় প্রসন্ন পরিহাসের সুরে।

তারপর বলেছিল,—তোমায় কেন আজ নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছি জানো?

কঠিন মুখে অবজ্ঞার স্বরে টেড বলেছিল,—নিমন্ত্রণটা তোমার তা জানতাম না। জানলে আসতাম না বোধ হয়।

আচ্ছা নিমন্ত্রণ তা হলে বলব না, ধরো চ্যালেঞ্জ! দেবরাজের মুখে সেই কৌতুকের হাসি।

টেড ভেতরে ভেতরে আগুন হয়ে উঠেছিল। মুখটা মুখোশের মত ভাবলেশহীন করে রেখে দাঁতে চিবোন চাপা গলায় বলেছিল,—চ্যালেঞ্জ যদি হয় ত' গ্রহণ করলাম। অস্ত্রটা কি হবে?

অস্ত্র!—দেবরাজ টেডের দিকে চেয়ে হেসেছিল এবার।

তারপর রেস্তোরাঁর একজন ওয়েটারকে ডেকে দু'পাত্র বীয়ার দেবার আদেশ দিয়ে টেডের দিকে ফিরে গাম্ভীর্যের ভাণ করে বলেছিল,—অস্ত্র এই!

টেড ভ্রূকুটি করে তাকাতে দেবরাজ আবার বলেছিল,—বীয়ার খাওয়ায় কলেজের ছোকরাদের মধ্যে তুমি নাকি চ্যাম্পিয়ন, তাই তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে চাই। যে হারবে, আজকের সব খরচ তার।

ব্রাট কেমন একটু বিমূঢ় শঙ্কিতকণ্ঠে বলে উঠেছিল,—সরকার!

আর ঘৃণায় ঠোঁট বেঁকিয়ে টেড বলেছিল,—এদেশে আসার আগে বীয়ার কাকে বলে জানতে?

না তা আর কি করে জানব!—দেবরাজ হেসে ঠাট্টা করেই বলেছিল,—তবে এদেশে জংলীরা যখন কাঠ লতা পাতার কুঁড়ে বাঁধতেও শেখে নি তখন আমরা নাকি সোমরস খেয়ে বুঁদ হতাম শুনেছি।

ঠাট্টার সুরটা সত্ত্বেও টেড গরম হয়ে উঠে টিট্‌কিরি দিয়ে বলেছিল,—শুনেছ! কবরখানার কি ছিল তারই দেমাক ত' তোমাদের সম্বল!

দেবরাজ তখনও কিন্তু কৌতুকের দৃষ্টিতে টেডের দিকে তাকিয়ে আছে।

টেড তাতে আরো যেন জ্বলে উঠে তীব্র অবজ্ঞাভরে বলেছিল,—না, তোমার এ চ্যালেঞ্জ নিলাম না। পোকা-মাকড় বধ করার বাহাদুরিতে আমার রুচি নেই।

ভয় পাচ্ছ তা হলে! দেবরাজ সেই এক সকৌতুকস্বরেই বলেছিল।

ভয় পাচ্ছি!—লাল হয়ে উঠেছিল টেড, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল,—আচ্ছা তোমার সখ তা হলে মিটিয়ে দিচ্ছি। এদিক দিয়েই তোমার শিক্ষা একটু হোক্।

বীয়ার এসেছিল তারপর পাত্রের পর পাত্র। আশপাশের টেবিলেও তখন অনেকে অল্পবিস্তর কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

দেবরাজ সমানে টেডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ট্যাংকার্ডের পর ট্যাংকার্ড শেষ করে গেছে শান্ত একটু সকৌতুক হাসি মুখে নিয়ে।

ব্রাট শুধু ক্রমশ শঙ্কিত পাণ্ডুর হয়ে উঠেছিল। তারপর এক সময়ে আর থাকতে না পেরে ব্যাকুলভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, না। না এ পাগলামি তোমরা করতে পাবে না।

ওয়েটার তখন নতুন যে দু'টো পাত্র দু'জনের সামনে ধরে দিয়ে গেছে তার মধ্যে দেবরাজেরটা টেনে নিয়ে বলেছিল—এ তুমি কি করছ সরকার? এ তোমার সাজে না।

স্নিগ্ধভাবে হেসে অথচ দৃঢ়হাতে পাত্রটা ব্রীটের কাছ থেকে আবার টেনে নিয়ে দেবরাজ বলেছিল—ভয় পাচ্ছ কেন? পিস্তল কি তলোয়ার নিয়ে ত' লড়ছি না। কি আর হবে এতে! বড়জোর বেসামাল কি বেহুঁস হব খানিকক্ষণের জন্যে! দেখাই যাক না টেড শেষ পর্যন্ত তার নিজের নামটাই উচ্চারণ করতে পারে কি না।

টেড একটু অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি করে নিজের পাত্রটা একচুমুকে শেষ করে দিল। দেবরাজও পিছিয়ে থাকে নি।

তারপর রাত বেড়েছিল। কৌতূহলী দর্শকের ভিড়ও পাতলা হয়ে গেছল ক্রমে ক্রমে। রেস্তোরাঁর—স্বয়ং একটু যেন অপ্রসন্নমুখেই দু-একবার এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের টেবিলের ধারে। মুখে কিছু না বললেও ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়ানো হয়ে যাচ্ছে বলেই তার মুখের ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

ব্রীট শেষপর্যন্ত অধৈর্যের সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল,—না তোমরা যদি এখনো না থামো ত' আমি চললাম।

বেশ থামব! হেসে বলেছিল দেবরাজ—টেড তা হলে নিজের নামটা বলুক।

নাম বলবার কড়ার নিয়ে বসি নি!—টেড তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে বলেছিল,—উঠতে চাও ত' হার স্বীকার করে যেতে পারো।

উত্তরে দেবরাজ ওয়েটারকে আরো দু'পাত্র আনবার ইঙ্গিত করেছিল।

ওয়েটার তা টেবিলে রেখে যাবার পরে নিজেরটা টানতে গিয়ে টেডের পাত্র থেকে খানিকটা চলকে পড়ে গিয়েছিল তার হাত কাঁপার দরুণ।

দেবরাজ নিজের ট্যাংকার্ড থেকে তাতে খানিকটা ঢালতে ঢালতে হেসে বলেছিল,—সমান সমান করে দিচ্ছি।

জ্বলন্তদৃষ্টিতে দেবরাজের দিকে তাকিয়ে টেড সে-পাত্র মুখে তুলতে গিয়ে কিন্তু পারে নি। ধরার দোষে বা হাত শিথিল হবার দরুণ পাত্রটা হাত থেকে খসে সশব্দে মেঝের পড়ে গিয়েছিল তার পোষাক ভিজিয়ে। মোটা কাটা-কাচের হওয়ার দরুণই বোধ হয় পাত্রটা তবু ভাঙে নি। ঝুঁকে পড়ে সেটা মেঝে থেকে তুলতে গিয়ে কেমন টাল সামলাতে না পেরে টেডের নিজেরই চেয়ার থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল।

ওয়েটার ছুটে এসেছিল দূর থেকে। তার আগেই টেডকে সাহায্য করবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল দেবরাজ। তারপর সমস্ত অন্ধকার হয়ে গেছে।

জ্ঞান যখন হয়েছে তখন দাঁড়িয়ে ওঠার পরই কাটা গাছের মত সোজা মেঝের ওপর পড়ে যাওয়ার কথা সে মনে করতে পারে নি। মনে পড়েছে কোন একটা গাড়িতে করে কোথাও যাওয়ার অস্পষ্ট স্মৃতি। তারপর ধরাধরি করে কোন একটা ঘরে তাকে এনে শোওয়ানো। কপালে-ঘাড়ে ঠাণ্ডা জল বা কিছুর স্পর্শ। চাপা গলায় কয়েকজনের আলাপ। তারপর ঘরের আলো নিভে যাওয়া।

খুব বেশিক্ষণ এ অবস্থা বোধ হয় থাকে নি। একসময়ে দেবরাজ নিজে থেকেই বিছানায় উঠে বসেছিল। তারপর হাতড়ে হাতড়ে

আলো জ্বলার পর নিজের ঘরেই যে তাকে আনা হয়েছে তা বুঝতে পেরেছিল। সুইচটা যথাস্থানে পাওয়াতেই অবশ্য তা বোঝা উচিত ছিল আগেই।

নিজের ঘরেই আছে জেনে যেটুকু বিস্মিত হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছিল টেডকেও সেই ঘরেই তার পড়বার টেবিলের ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে।

আলো জ্বালার পর টেডও তখন চোখ খুলে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

পরস্পরের দিকে খানিক তাকিয়ে দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে হেসে ফেলেছিল তারপর।

টেড এবার উঠে বসেছিল টেবিলের ওপর। বলেছিল একটু জল খাওয়াতে পারো সরকার!

আর বীয়ার নয় ত'?—ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছিল দেবরাজ।

তা হলে মন্দ হত না। কিংবা আরো কড়া কিছু, খোয়াড়ি ভাঙার তাই নাকি ওষুধ। বিষে বিষক্ষয়।

অত্যন্ত দুঃখিত!—ট্যাপ থেকে গেলাসে করে জল আনতে আনতে বলেছিল দেবরাজ।

জলটা খেয়ে গেলাসটা টেবিলের ধারেই রেখে বিকৃত মুখভঙ্গী করে টেড বলেছিল—জল না কি খেলাম বুঝতে পারলাম না। জিবটা যেন অসাড় ব্লটিং-পেপার।

আমারটা পাপোষ!—হেসে বলেছিল দেবরাজ।

চোখ দু'টো ছোট করে দেবরাজের দিকে খনিক অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে টেড এবার জিজ্ঞেস করেছিল,—সত্যি কথা বলো ত' সরকার। আগে কখনো এসব কিছু খেয়েছ!

না!—বলে দেবরাজ কাছের একটা চেয়ারে বসেছিল। মাথাটায় তখনও যেন সীসেতে ঠাসা, থেকে থেকে ঘরটা সবকিছু নিয়ে একটু পাক খাবার চেষ্টাও করছে।

আমি তা গোড়াতে বুঝতে পারি নি।—টেড বলেছিল—তোমার ধরণ দেখে সন্দেহ হয়েছিল তুমি পাকা লোক। নইলে আনকোরা আনাড়ি হলে কি ওরকম সমানে চালিয়ে যেতে পারে!

আনকোরা আনাড়ি বলেই হয়ত পেরেছিলাম!—দেবরাজ হেসে বলেছিল!—

বুঝেছিলাম ঠেলা দেওয়া ভাঙা দেওয়ালের মত সটান ওরকম মেঝের ওপর পড়ে যাওয়ায়।—টেড সরলভাবে স্বীকার করেছিল—আমি ত' ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার নিজের অবস্থাও যদিও তখন কাহিল।

তুমিই কি আমায় নিয়ে এসেছ —জিজ্ঞাসা করেছে দেবরাজ।

সঙ্গে আসাকে যদি নিয়ে আসা বলো।—হেসেছিল টেড—নিয়ে এসেছিল রেস্তোরাঁরই 'জন লোক,—হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াটা রেস্তোরাঁর মালিকও এড়াতে চায় বলেই হয়ত। তোমায় এখানে পৌঁছে আমারও আর নড়বার ক্ষমতা বা সাহস হয় নি।

আর ব্রীট?

ব্রীট এখানকার গেট পর্যন্ত এসেছিল এইটুকু মনে আছে। তারপরের কথা সব ঝাপসা।

যে হাসি দেখা গিয়েছিল, তাতে লজ্জা বা কুণ্ঠার তেমন চিহ্ন কিন্তু ছিল না।

কিন্তু কেন?—এবার এক জোর দিয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল টেড—এ-রকম কেলেঙ্কারী হবে হয়ত ভাবতে পারো নি, তবু এ-রকম সখ বা খেয়াল হ'ল কেন তোমার?

বিশ্বাসের ছাড়পত্র পাবার জন্যে!—হেসে বলেছিল দেবরাজ।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে টেড এ-ঘরের আলাপের মধ্যে প্রথম একটু রুক্ষ হয়ে উঠেছিল,—ভারতীয় হেঁয়ালী ছাড়ছ

না, টেড, সত্যি কথাই বলছি!—দেবরাজের আন্তরিকতাটা ভাল বলে মনে করতে পারে নি টেড—তোমাকে গোটাকতক কথা বলবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সাধারণভাবে তোমায় ডেকে বললে তুমি তা বিশ্বাস করবে না আর উল্টো ফলও তাতে হতে পারে বলে সন্দেহ ছিল। তাই ব্রৌটকে দিয়ে তোমায় ডেকে আনিয়ে ও-রকম অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ করেছিলা। ব্রাট পর্যন্ত তাতে স্তম্ভিত হয়েছিল তুমি জানো। আশা ছিল যে নেশায় চুর হয়ে আমাকেও তা হ'তে দেখলে আমার সম্বন্ধে তোমার মনের কয়েকটা বেড়া হয়ত আলগা হতে পারে।

একটু থেমে ঈষৎ কৌতুকের সুরেই দেবরাজ আবার বলেছিল, ভেবেছিলাম, আমাকে অবিশ্বাস করলেও আমার নেশাকে তুমি করতে পারবে না। আমার কথাগুলো বলে তখন তোমায় বিশ্বাস করাতে পারব। কিন্তু নিজের মাত্রা না বুঝে সব ভণ্ডুল করে ফেললাম।

আমায় বিশ্বাস করানোর এত কি দায় তোমার, যাতে নিজের স্বভাব-চরিত্রের বিরুদ্ধেও তোমার এমন উৎকট ঝুঁকি নিতে হয়!—টেড একটু কঠিনস্বরে বলেছিল,—তোমার কথা আমি শুনি না শুনি আর বিশ্বাস করি না করি তাতে কি আসে-যায় তোমার?

আসে যায় টেড!—গাঢ়স্বরে বলেছিল দেবরাজ,—অকারণেও কারুর দুঃখ কি আঘাত পাবার উপলক্ষ হয়ে আমি নির্বিকার হয়ে থাকতে পারি না। তোমাকে আমার কথাটা শুনিয়ে বিশ্বাস করাবার জন্যে তাই এত ব্যাকুলতা!

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থেকেছে টেড। তারপর শান্ত কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করেছে,—কি সে কথা? ব্রৌটকে নিয়ে কিছু কি!

হ্যাঁ,—টেডের মুখে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছে দেবরাজ,—ব্রৌট ও আমার সম্পর্ক নিয়ে মনে মনে তুমি যন্ত্রণা পাচ্ছ আমি জানি। বিশ্বাস করো আর না করো, শুনে রাখো যে এ-সম্পর্কের মধ্যে তোমার সন্দেহ বা ঈর্ষা করবার মত এককণা বস্তুও নেই।

তুমি কি নপুংসক না সমকামী?—হঠাৎ তীব্র হয়ে উঠেছিল টেডের কণ্ঠ,—সুন্দরী যুবতী মেয়ের সঙ্গে দিনের-পর-দিন কাটিয়েও নিষ্কাম হয়ে থাকো!

দুই-এর কোনটাই নই টেড! অক্ষুণ্ণ প্রসন্নতার সঙ্গে বলেছিল দেবরাজ,—কিন্তু যে-কোন রূপসী তরুণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হলেই ভালবাসার খেলা খেলবার উৎসাহ বা সম্ভোগের লোলুপতা যে আমার জাগে না সেটা আমার চরিত্র ও শরীরের একটা বোধ হয় ত্রুটি। তা' ছাড়া তুমি বুঝবে কি না জানি না ব্রৌট আমার কাছে শিষ্যার মন নিয়ে আসে। প্রাচ্য দেশ ও বিশেষ করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওর মনে একটা গভীর মোহ আছে। তুমি জানো কি না

জানি না, ওর পিতামহ মিশনারী হয়ে ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন অনেক কাল আগে। সেখানে কিছুকাল থাকার পর বেশ একটু অগৌরবের মধ্যেই নিজের মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর ছিন্ন হয়। তিনি সেখানে ভারতীয় ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখান এই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। মিশন থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি দেশে ফেরেন নি। ভারতবর্ষেই কোন সন্ন্যাসী না সাধুর দলে যোগ দিয়েছিলেন বলে ব্রীটদের পরিবারে কিংবদন্তী আছে। তিনি শেষ পর্যন্ত কোথায় কেমনভাবে মারা যান পরিবারের কেউ জানে না, তবে তাঁর মিশন ত্যাগ করবার পর লেখা কয়েকটা চিঠি ওদের কাছে আছে। পরিবারের কারুর কাছে সেগুলি লজ্জার ও অবজ্ঞার, কারুর কাছে আবার সবিস্ময় কৌতূহলের বস্তু। ব্রীট ছেলেবেলা থেকেই সেই পিতামহের কাহিনী সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত সশ্রদ্ধ আকর্ষণ অনুভব করেছে। বড় হবার পর সেই আকর্ষণ থেকেই বেড়ে উঠেছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই একটা মোহাচ্ছন্ন অনুরাগ। আমি ভারতবাসী জেনেই আমার সঙ্গে ও নিজে থেকে আলাপ করেছিল নানা কৌতূহল মেটাবার আশায়। ওর সে সব প্রশ্ন শুনে নিজের দেশ সম্বন্ধেই আমার বিরাট অজ্ঞতা টের পেয়ে আমি লজ্জিত হয়ে উঠেছি। ওর প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যেই নিজেকে তৈরি করার চেষ্টায় ভারতবর্ষকে যেন আমি নতুন করে আবিষ্কার করছি। আমার দিক থেকে ত' নয়ই ব্রীটের দিক থেকেও তার এ মোহাচ্ছন্নতা ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে নি বলেই আমার বিশ্বাস। হয়েছে সন্দেহ করলে আমি নিজেই সরে আসতাম।

এতক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে দেবরাজ নিজেই উঠে গিয়ে ট্যাপ থেকে একগেলাস জল এনে খেয়েছিল।

টেড তখন স্তব্ধ গম্ভীর হয়ে বসে আছে। কথাগুলো কিভাবে সে নিয়েছে তার মুখ দেখে বোঝা যায় নি। জিজ্ঞাসা করে তা জানবার চেষ্টাও করে নি।

পর্দাটানা কাচের জানলায় এবার ভোরের আলোর আভাস দেখা গেছে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে একটু টলে টেবিল ধরে সামলে টেড বলেছিল, তোমার ঘরে আশ্রয় দেবার জন্যে ধন্যবাদ সরকার। আমি এখন যাচ্ছি।

ধন্যবাদটা একটু বেশি ব্যঙ্গ হয়ে গেল কিন্তু। হাল্কাস্বরে সমস্ত ব্যাপারটা শেষ করবার চেষ্টায় হেসে বলেছিল দেবরাজ,—আশ্রয় দেবার মালিক কি আমি তখন ছিলাম!

না তা ছিলে না বটে। তবে তোমারও যেমন আশ্রয় দেবার অবস্থা ছিল না আমারও তেমনি আতিথ্য চাইবার। থাকলে বোধ হয় চাইতামও না, তোমার এ দীর্ঘ কৈফিয়ৎ শোনবার সৌভাগ্যও অবশ্য হ'ত না তা হলে।

কথাগুলোয় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর ছিল কি না টেডের মুখ দেখে বা গলার স্বরে ঠিক বোঝা যায় নি।

এতক্ষণও যখন রইলে একটু কফি খেয়ে যাবে না! দেবরাজ সহজ হবার চেষ্টা করেছিল এবারও।

না, আর কেউ জানবার আগেই যেতে চাই। দৃঢ়স্বরে বলেছিল টেড,—তোমাদের জ্যানিটর অবশ্য সবই জানে। তবে ব্রীটকে দেখে সে একটু নরম হয়েছিল। সুতরাং গোলমাল তেমন কিছু হবে না বলেই আশা করি।

ব্রীট খুব আঘাত পেয়েছে নিশ্চয় আমাদের দু'জনেরই কাণ্ড দেখে। ঈষৎ বিষণ্ণ সুরে বলেছিল দেবরাজ।

না পেলেই অবাক হবার কথা। বলে টেড চলে গিয়েছিল।

ব্রীট তারপর সত্যিই দেবরাজকে এড়িয়ে চলেছিল।

অনেকদিন বাদে নিজে থেকে একদিন তার কাছে যে এসেছিল, সে টেড।

টেড ঠিক এইভাবে সেদিন বনের মাঝে এ কাহিনী বলে নি। তার কাছে যা শুনেছিলাম তাই সামান্য অনুমান মিশিয়ে আমি এইভাবে কল্পনা করেছি। সে কল্পনায় পরবর্তীকালে অন্য সূত্রে পাওয়া উপাদান মিশে যাওয়া আশ্চর্য নয়।

টেড তারপর আরও হপ্তাখানেক দীঘাওয়ারায় ছিল।

তার নিজের রূপান্তরের যে বিবরণ টুকরো-টুকরো ভাবে তখন শুনেছিলাম, এ কাহিনীতে তাও অবান্তর নয়। [ক্রমশ।
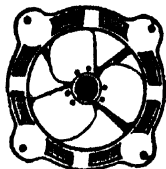
সাহিত্য পরিচয়

Legacy of a President / U. S. I. S.

জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি, এ শতাব্দীর এক অবিস্মরণীয় এবং মহৎ সম্ভাবনার প্রতীক; আজ অবশ্য তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর আদর্শ রয়ে গেছে অম্লান, স্মৃতি অটুট। মানবতার কঠিনতম পূজারী কেনেডি চেয়েছিলেন বিশ্বকে এক অচ্ছেদ্য শান্তির সূত্রে বাঁধতে। মানুষের বিকাশের পথের বাধা দূর করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন তিনি। এক কথায় মনুষ্যত্বের পথে মানুষকে উত্তীর্ণ করে দেওয়াটাকেই ব্রতস্বরূপ নিয়েছিলেন তিনি, আর তাঁর স্বল্পস্থায়ী কিন্তু গৌরবদীপ্ত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই ব্রত পালন করে গেছেন; বর্তমান গ্রন্থে এ কথার সমর্থন মিলবে। স্বর্গত কেনেডি যেখানে যা বলেছেন, আমেরিকান গণতন্ত্রের সাধারণ সদস্য হিসাবে, সেনেটর হিসাবে ও সর্বোপরি প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তিনি যে সব নির্ভীক ও মূল্যবান উক্তি করেছেন তার প্রায় সবই সযত্নে সংগৃহীত হয়েছে এ রচনার পাতায় পাতায়। পাঠক এ গ্রন্থপাঠে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পটভূমিকেই প্রত্যক্ষ করবেন না, পরন্তু তাঁর মহান স্বর্গত নেতা কেনেডির জীবনদর্শন সম্বন্ধেও সম্যক ওয়াকিবহাল হবেন। কেনেডির অদম্য সাহস, তাঁর সুগভীর দূরদর্শিতা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি এ সবই উজ্জ্বল রেখায় আঁকা ছবির মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে পাঠকের মননে; মানুষ হিসাবে এই বীরযোদ্ধা যে কত বড় ছিলেন আলোচ্য গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে সে পরিচয় ছড়ানো রয়েছে। এ রচনার আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতা 'ডীন রাস্ক' ও বর্তমান প্রেসিডেণ্ট 'লিণ্ডন বি জনসন' লিখিত দু'টি সুচিন্তিত প্রবন্ধ এ গ্রন্থের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনের কয়েকটি দুর্লভ আলোকচিত্র যা এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, সেগুলিও কম উপভোগ্য নয়। আমরা বইটি হাতে পেয়ে সত্যই গভীর আনন্দ লাভ করেছি ও প্রকাশককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রকাশক—ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা।

দু'টি গোলাপ একটি কুঁড়ি / অ্যাল্‌ফা-বিটা

আলোচ্য উপন্যাসে লেখক নারীর মাতৃত্ব নিয়ে এক উদ্ভট তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। দু'টি নারী ও একজন পুরুষকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী বয়ন করা হয়েছে তাতে কাঁচা হাতের ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সাধারণভাবে দেখতে গেলে রমেশ ও অনুপমার দাম্পত্যজীবনে শুধুমাত্র সন্তানহীনতার জন্য যে সমস্যা লেখক সৃষ্টি করেছেন, তা আজকের দিনে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হতে বাধ্য এবং শুধু সন্তান কামনায় একটি কুমারীর দেহের দুয়ারে কোন পুরুষের পক্ষে আবেদন জানানোটার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও সবিশেষ সন্দেহ করা যেতে পারে। এখনও বহুদিন অনুশীলন করে তারপর সাহিত্যের ক্ষেত্রে পদার্পণ করলে সুবিবেচনার পরিচয় দিতেন লেখক, বর্তমানে বাঙলা সাহিত্যের মান এতই উন্নত যে এত দুর্বল রচনার সম্বন্ধে আশা করার মত কিছুই নেই। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক—সুখেন্দু সরকার, প্রকাশক—অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্স, কলিকাতা, দাম—পাঁচ টাকা পঁচিশ পয়সা।

কিরো—হস্তরেখা অভিধান/আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স

জ্যোতিষ বা সামুদ্রিক শাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাও যেমন অগাধ, কৌতূহলও তেমনি অসীম, আলোচ্য গ্রন্থপাঠে এ দু'টোরই নিরসন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীবিখ্যাত গণৎকার কিরোর নাম অনেকেই অবগত আছেন, লেখক এঁরই অবলম্বিত হস্তরেখা বিচার পদ্ধতির এক সুষ্ঠু পরিচয় বিধৃত করেছেন এই গ্রন্থে।

● যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী ভবনে সম্প্রতি এশিয়া পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত প্রায় তিনশত পুস্তক প্রদর্শিত হইয়াছে। ইঁহারা স্বর্গত নেহরুর পুস্তকাবলী এবং নানা বিষয়ে প্রায় নয়শত পুস্তক প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বড় পুস্তক প্রকাশক হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন●

হস্তরেখা বিচার সম্বন্ধে কিরো যে সব গ্রন্থ প্রণয়ন করে গেছেন Language of the hands তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে পরিগণিত হয়ে থাকে, আলোচ্য গ্রন্থটি এরই সরল বঙ্গানুবাদ। লেখকের শৈলী সাবলীল হওয়ায় দুরূহ বিষয়বস্তুও সুদয়ঙ্গম করা যায় সহজেই; জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকের কাছে এ রচনা মূল্যবান বলেই গণ্য হবে। জ্যোতিষ-সম্রাট কিরোর একটি সুন্দর প্রতিকৃতি যুক্ত হওয়ায় গ্রন্থের আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছে। প্রচ্ছদ ও অপরাপর আঙ্গিক ত্রুটিহীন। লেখক—কিরো, অনুবাদক—পরীক্ষিৎ, প্রকাশক—আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২, দাম—দশ টাকা।

তুচ্ছ মম / বাক্ সাহিত্য

বহু ইজম ও কমপ্লেক্স কণ্টকাকীর্ণ কথাসাহিত্যের আসরে সহজ সরল সুরে বলা মিষ্টি প্রেমের গল্প ক্রমেই বিরল হয়ে উঠছে, বর্তমান উপন্যাসটিকে তাই গুমোট গরমের পর হাল্কা একপশলা বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা চলে স্বচ্ছন্দেই। শৈশবে মাতৃহীনা একটি মেয়ের জীবনায়ন করেছেন লেখিকা এই গ্রন্থে। বিরাট একান্নবর্তী সংসারে মাতৃহীনা শর্মিষ্ঠার শৈশব কেটেছিল পরম উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের পরিবেশে, শিশুমন স্বভাবতই হয় স্নেহবুভুক্ষু, হয়ত বা সেজন্যই পরবর্তীজীবনে শিক্ষিতা, সুন্দরী প্রাণচঞ্চলা। তরুণী শর্মিষ্ঠা অতীতকে প্রায় বিস্মৃত হতে গিয়েও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পারে নি কোনদিনই, আর তারই ফলে আর একটা শিশুর মধ্যে নিজের বেদনাময় অতীতকে প্রত্যক্ষ করে সহজেই তাকে বুকে তুলে নিয়েছিল সমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে। শিশু টুকুনের প্রতি শর্মিষ্ঠার আকর্ষণ তার চরিত্রকে যেন এক মহিমময় মর্যাদা দিয়েছে; বস্তুত এই চরিত্রটিকে লেখিকা সত্যই বড় উজ্জ্বলভাবে এঁকেছেন, প্রকৃতপক্ষে এই একটি চরিত্রের জন্যই যেন অপরাপর চরিত্রগুলির সৃষ্টি হয়েছে—শুভজিৎ, দেবাশীষ, নন্দিতা, দীপঙ্কর সবাই যেন শর্মিষ্ঠারূপ গ্রহের কয়েকটি উপগ্রহ মাত্র। শুভজিৎ ও শর্মিষ্ঠার প্রেমেও শর্মিষ্ঠাই বেশি উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। অবশ্য শুভজিৎ-এর মানসিক দ্বন্দ্বের যে চিত্রটি লেখিকা এঁকেছেন তাও বড় কম কৌতূহলপ্রদ নয়। একটি সরল মধুর প্রেমের কাহিনী হিসেবে বর্তমান রচনাটি সত্যই উপভোগ্য; সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখিকা প্রায় নবাগতা হলেও রচনায় তিনি যে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর দিয়েছেন তাতে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া চলে। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—পাঁচ টাকা।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু/শ্রীভূমি পাব্লিশিং

যে তরুণ বাঙালী বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় একদিন স্বয়ং আইনস্টাইনও আকৃষ্ট হতে বাধ্য হয়েছিলেন, বর্তমান রচনা তাঁরই জীবন ও কর্মের পরিচায়ক। সত্যেন্দ্রনাথ বসু উদ্ভাবিত আলোককণার সংখ্যায়নিক সূত্র আধুনিক তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার এবং স্বয়ং আইনস্টাইন এই সূত্রকে প্রামাণ্য বলে অভিনন্দিত করে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। বোস-সংখ্যায়ন বলে সেই অবধি এই সূত্রটি পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়ে আসছে এবং এটি বর্তমানে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সুদৃঢ় দু'টি ভিত্তিস্তম্ভের অন্যতম বলেই স্বীকৃত, আলোচ্য গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথের এই মূল্যবান গবেষণা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা বিশদভাবেই আলোচিত হয়েছে। বাংলার এক সার্থক সন্তানের গৌরবোজ্জ্বল এই জীবনকথা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই মূল্যবান বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। লেখকের ভাষারীতিও প্রশংসনীয়রূপেই সাবলীল। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—রণীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রফুল্ল / ওরিয়েণ্ট বুক

প্রফুল্ল—বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক। সাধারণ বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের পটভূমিতে রচিত এ নাটক এককালে নাট্য-রসপিপাসু বাঙালীকে কম আলোড়িত করে তোলে নি। নাটকটি প্রথম শ্রেণীর কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও এর দুর্বার গতিশীলতা ও আবেদন সম্বন্ধে দ্বিমত নেই, আর প্রধানত সেটাই এর প্রাণসত্তা। এই পুরাতন ও বহুসমাদৃত নাটকটিকে শিক্ষার্থীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনী সমেত নবকলেবরে প্রকাশ করে প্রকাশক বিদ্যার্থী ও সাহিত্যরসিক মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হলেন। নাটকটি ভাল করে বুঝতে হলে এইসব মূল্যবান টীকা-টিপ্পনীর প্রয়োজন বড় কম নয়, সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীরা যে আলোচ্য গ্রন্থটিকে সমাদর করবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। নতুন কায়ায় পুরোনো নাটকটি যেন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, নাট্য সাহিত্যের একটা বিশেষ দিগন্তই যেন নতুন করে উন্মোচিত হয় পাঠকের মননে। সম্পাদনার উৎকর্ষ বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। প্রচ্ছদ ও অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। লেখক—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক—ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী, প্রকাশনায়—ওরিয়েণ্ট বুক কোং ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

মেবার পতন / ওরিয়েণ্ট বুক

চারণকবি দ্বিজেন্দ্রলালের অনন্য ঐতিহাসিক নাটকগুলির মূল্য অসীম, আলোচ্য নাটকটি তাদেরই অন্যতম। বিশেষ করে, সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী নাটকটিকে মূল্যবান ভূমিকা ও টীকা টিপ্পনীসহ নব-কলেবরে প্রকাশ করা হয়েছে। 'মেবার পতন' রাজপুত জাতির শৌর্য, বীর্য, গর্ব ও পতনের ইতিহাস, প্রসিদ্ধ রাজপুত বীর রাণা প্রতাপের বংশধর রাণা অমরসিংহের রাজত্বকালই বর্ণিত হয়েছে। এ নাটকে প্রধানত চরিত্রগুলির মধ্যে প্রায় সবই ঐতিহাসিক, দেশপ্রেমই নাটকোক্ত কাহিনীর মূল উপজীব্য, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই নাটক যখন রচিত হয় তখনও ভারত বিদেশীর শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীনতালাভ করতে সক্ষম হয় নি, পরাধীনতার যে বেদনা এ রচনার প্রাণসত্তা শুধু ইতিহাসের পটভূমিতেই তা জন্মলাভ করে নি, রচনাকারের নিজস্ব উপলব্ধির আভাসেও তা প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের অনন্ত দেশপ্রেমও মূর্ত

হয়ে রয়েছে এ রচনার মাঝে। কাহিনী এক মহৎ আদর্শকে যেন সর্বাঙ্গীণ সমগ্রতায় ফুটিয়ে তোলে পাঠকের মননে, স্বভাবতই আবেগ-প্রধান হওয়ায় এর আবেদনও অত্যন্ত তীব্র। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সম্পাদক—ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—চার টাকা।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত / নয়া প্রকাশ

আলোচ্য গ্রন্থ আদিযুগ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য যে ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পদক্ষেপ করেছে তারই প্রামাণ্য দলিল। দেশের রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় সে-কালীন সাহিত্য যেভাবে বিস্তারলাভ করেছিল, বর্তমান রচনার মাধ্যমে সেই ইতিহাসকেই বিবৃত করতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখিকাদ্বয়। শিক্ষার্থী ও সাহিত্য-জিজ্ঞাসু মাত্রেরই কাছে সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের এ ইতিহাসের মূল্য অসীম, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এ গ্রন্থ বিশেষ একটি মূল্যমানের অধিকারী। বাঙলার অমরকবি কৃত্তিবাস সম্বন্ধে যে সব নতুন তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে তাও বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। বাঙলা প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান সংযোজন। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখিকাদ্বয়—ডক্টর সতী ঘোষ ও ডক্টর প্রণতি রায়, প্রকাশনায়—নয়া প্রকাশ, ২০৬, বিধান সরণী, কলি-৬, দাম—সাড়ে ছয় টাকা।

সাহিত্যালোচনার মূলসূত্র / নব ভারতী

আলোচ্য বইটিতে লেখক সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই দেশীয় সাহিত্য বোদ্ধাদের মতামতই তিনি বিচার করে দেখিয়েছেন, ফলে সীমিত পরিধির মধ্যে তাঁর রচনা সহজেই প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। সাহিত্যের ভাব, ভাবনা, আদর্শ, বৈচিত্র্য, অভিমুখিতা, বিচার ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ নিয়েই তিনি অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন, আকারে ক্ষুদ্র হলেও সে সবের মূল্য কম নয়, সাহিত্য রসিক ও সাহিত্য শিক্ষার্থী এই দ্বিবিধ পাঠকই যে বর্তমান সমালোচনা গ্রন্থটি পড়ে আনন্দ লাভ করবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—অধ্যাপক দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ। পরিবেশক—নব ভারতী, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯, দাম—তিন টাকা।

পুনশ্চের কবি রবীন্দ্রনাথ / ওরিয়েন্ট বুক

পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের এক অনন্য সৃষ্টি, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এই কাব্যটিকেই বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন। বস্তুত এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী কাব্য রচনার ধারা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে এক নতুন পথ অবলম্বন করেছেন, আর লেখকের মূল বক্তব্যও সেটাই। অনেক সময়ই লেখকের নতুন দিগ্‌দর্শন সম্বন্ধে একটু-আধটু ইঙ্গিত আগে থেকে পেলে পাঠকের পক্ষে লেখার রস সম্যক উপলব্ধি করা সহজ হয়। পুনশ্চ কাব্য গ্রন্থটির রসোপভোগ করতে ও বর্তমান রচনাকে তাই একটি সহায়িকারূপে বর্ণনা করা যেতে পারে। পুনশ্চে কবি কি বলতে চেয়েছেন, কোথায়ই বা নিহিত এর গভীরতর জীবনসত্তা। আলোচ্য গ্রন্থ লেখক বহু পরিশ্রমে সেই সত্যকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন পাঠকের মননে ; আন্তরিকতা ও সততায় তিনি তাতে সফলও হয়েছেন। এ গ্রন্থ পাঠ করলে পুনশ্চের ভাবরূপটি সহজেই ধরতে পারা যায় ; মননশীল ও কাব্যোৎসাহী পাঠকের কাছে এ রচনা তাই মূল্যবান বলে পরিগণিত হতে বাধ্য। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—সমীরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—ছয় টাকা।

বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র / বাক্ সাহিত্য

আলোচ্য গ্রন্থে বিশ্বসাহিত্য এবং সাহিত্যিকের এক সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য পরিচয় দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, কেবলমাত্র বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়-ধন্য সাহিত্যই বিশ্বসাহিত্য বলে পরিগণিত হয় না। সাহিত্যরসই এ ধরণের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ; রূপ ও রসের গহীন সায়রে ডুব দিতে পারলেই শুধু কোন রচনা শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে আর তখনই তার আবেদন দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। হৃদয়বত্তার সঙ্গে সাহিত্য মিশ্রিত হলে পরে শুধু তা সম্ভব হয়ে থাকে এবং যে সাহিত্যিকের রচনায় তার আস্বাদ মেলে শুধু তিনিই বিশ্বসাহিত্যিক-এর আখ্যায় ভূষিত

হয়ে থাকেন। বর্তমান রচনার লেখক এই পর্যায়েরই আটজন সাহিত্যিক ও তাঁদের বিখ্যাত কয়েকটি রচনার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্য সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণার অধিকারী লেখক, তাঁর আবেগের সঙ্গে যুক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকায় তাঁর রচনা সহজেই বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে পেরেছে, যে কোন সাহিত্যানুরাগী পাঠকই এই মননশীল অথচ হৃদ্য রচনাবলী পাঠে পরিতৃপ্ত হবেন। সাহিত্য শিক্ষার্থীর পক্ষেও এ রচনার অবদান বড় কম নয়, আমরা এ গ্রন্থ পাঠে সত্যই আনন্দলাভ করেছি। বর্তমান গ্রন্থটি এই পর্যায়ের গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড, পরবর্তী খণ্ডগুলির জন্যও আমাদের সাগ্রহ প্রত্যাশা রইল। আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—নীলকণ্ঠ, প্রকাশনায়—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—আট টাকা।

দূরের আকাশ / রবীন্দ্র লাইব্রেরী

বিদেশের পটভূমিতে সাহিত্যরচনা করে যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছেন আলোচ্য উপন্যাসের লেখক তাঁদের অন্যতম। বৃটেনের এক পল্লী-শহর কাডিফের পটভূমিতে কাহিনীর পরিবেশ গঠিত হয়েছে; কর্মোপলক্ষে সেখানে বাসা বেঁধেছিল একদা অতনু মিত্র ও তারই মত আরও কত ভারতের সন্তান। হাসি-কান্না, ব্যথা-আনন্দে, সুখে-দুঃখে ওয়েলসের এই ছোট্ট শহরটিতে বহুদিন কাটল প্রবাসী অতনু মিত্রের, যাওয়ার বাঁশী যেদিন বাজল হঠাৎ সেদিনই যেন সে নতুন করে আবার আবিষ্কার করল, প্রীতির বাঁধনে বিদেশ তাকে কি গভীরভাবেই না বেঁধেছে। অত্যন্ত সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে লেখক বিদেশ ও বিদেশী পটভূমিতে একটি বাঙালী যুবকের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ছবি এঁকেছেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিও অত্যন্ত জীবন্ত, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী যে সম্পূর্ণরূপেই মানবিক, তাঁর রচনায় ভিড় করে আসা চরিত্রগুলিই তার সাক্ষীস্বরূপ, চিরন্তন মানবপ্রকৃতি যে সাদা-কালো চামড়ার প্রভেদ রাখে না সেই মহা সত্যই সোচ্চার হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫।২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২, দাম—তিন টাকা।

চার দেওয়ালের গল্প / আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স

জীবনের দৈনন্দিন চলার পথে সাধারণ মানুষ নিয়তই যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়, বর্তমান রচনা তারই দর্পণস্বরূপ। লেখক সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবাগত হলেও, জীবনের বিস্তৃততর পরিসরে ইতিমধ্যেই আপন পরিচয়ে ধন্য। এক্ষেত্রেও যে তিনি সফল হতে পারবেন আলোচ্য রচনায় তার সমর্থন রয়েছে। সংসারকে শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় করে গড়ে তোলার পেছনে যে প্রয়োজন সামান্য স্বার্থত্যাগের, যৎকিঞ্চিৎ সহিষ্ণুতার এ কথাটাই তাঁর রচনার মূল বক্তব্য। নাটকের মাধ্যমে এই বক্তব্যটুকুকেই সার্থকভাবে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা, স্পর্শকাতরতা ও মমতার ছোঁয়ায় তাঁর রচনা এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। সংলাপ রচনাতেও তাঁর শক্তির স্বাক্ষর পাওয়া যায়। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—পার্থপ্রতিম চৌধুরী। প্রকাশক—আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, জবাকুসুম হাউস, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা-১২, দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ফুটবে আবার ফুল / অ্যাল্‌ফা-বিটা

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গীতে রচিত, সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশে লিখিত কবিতাগুলির কাব্যরস খুব উচ্চ শ্রেণীর না হলেও কবির মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। অত্যন্ত সহজ ভাষায় রচিত হওয়ায় এ কাব্য সর্বজনবোধ্য এবং সেটাই এ কাব্যগ্রন্থটির স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় বলার মত কথা। গ্রন্থটির আয়তন ও আঙ্গিক বিবেচনা করলে এর মূল্য কিছু বেশি বলে মনে হতে বাধ্য। লেখক—অনিলকুমার বিশ্বাস, প্রকাশনায়—অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন, দাম—পাঁচ টাকা।

ওরা কাজ করে / বাক্ সাহিত্য

শহরের গণ্ডির মধ্যে ধরা না দিলেও দেশের প্রাণসত্তা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে যে জীবন্ত মানুষের মিছিল, বর্তমান গ্রন্থে তাদেরই জীবনায়ন করেছেন লেখক। কাজ করতে যারা ইচ্ছুক, কাজ করার সামর্থ্যও যাদের কম নয় তেমন মানুষেরা যে কেন বেকার জীবনের গ্লানি ও দৈন্য বহন করতে বাধ্য হচ্ছে, এই রচনার মাধ্যমে যেন দেশের সেই অগণ্য মানুষেরই অনুচ্চারিত প্রশ্ন সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থের পটভূমিস্বরূপ যে গ্রাম ও গ্রাম্য মানুষের ছবি এঁকেছেন লেখক, তা কোন বিশেষ স্থান কাল বা পাত্রের ছবি নয় বর্তমান বাংলারই তা যেন এক সামগ্রিক পরিচয়ে ধন্য। এ রচনার পাত্র-পাত্রী, চাষী-মজুর, চন্দন, মুকুন্দ, ফকির, অধর, শিবু প্রভৃতিও যেন পৃথক পৃথক ব্যক্তিসত্তা নয় বাংলার অগণ্য গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে থাকা মেহনতি মানবসত্তারই এক ও অখণ্ডরূপ। যে মানুষেরা কাজ করে তবু নিরন্ন তাদেরই জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা নিরাশা, আনন্দ-বেদনা, ন্যায়-নীতি, ধর্ম-কর্ম বিজড়িত বিচিত্র জীবনের সুষ্ঠু রূপায়ণে এ রচনা উজ্জ্বল। লেখক যে সম্পূর্ণরূপেই সমাজ সচেতন এ কাহিনীর ছত্রে-ছত্রে তার পরিচয় আঁকা রয়েছে। মানবিকতা ও সমাজবোধে বলিষ্ঠ এ উপন্যাসকে প্রামাণ্য বলে অভিহিত করাতেও বোধ হয় অসঙ্গতি নেই কোন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—প্রভাত দেবসরকার, প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, দাম—সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

নিলোখেরি / বুকল্যাণ্ড

নিলোখেরি—হতাশ্বাস মানবতা যেখানে খুঁজে পেয়েছে একটু আশা একটু আশ্বাস; দিল্লী থেকে পঁচাশী মাইল দূরে গড়ে উঠেছে এই ছোট উপনগরী, স্বাধীনতার অন্যতম বলি একদল উদ্বাস্তুর আশ্রয় শিবির। লেখক প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এই উপনগরী গঠনের কাজে, কয়েক সহস্র ছিন্নমূল মানুষ আজ যেখানে নতুন করে শুরু করেছে জীবন, সেই জীবনকে সামনে থেকে দেখেছেন তিনি দিনের পর দিন, উপলব্ধি করেছেন সেই মহাসত্যকে। সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই; তাই তাঁর রচনায় শুধু আন্তরিকতার স্বাদই

মেনে না প্রামাণ্যতায়ও তা অনন্য। নতুন দিনের নতুন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনীমাধ্যমে, সহস্র সহস্র ছিন্নমূল মানুষকে স্থায়ী নিরাপত্তা দিতে দেশের জাতীয় সরকার সামূহিক বিকাশ আন্দোলনের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, নিলোখেরি তারই প্রত্যক্ষ ফসল, লেখকের আন্তরিক উদ্যমে নিলোখেরির এ ইতিহাসও তারই প্রত্যক্ষ দলিল হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—এস কে দে, প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলি-৬, দাম—পাঁচ টাকা।

জন্ম-জয়ন্তিকা / সর্বোদয় প্রকাশনী

ইংরাজিতে 'বার্থ-ডে-বুক' বলে যা প্রকাশ হয়, আলোচ্য ডায়েরি তারই বঙ্গ সংস্করণ ; বার্থ-ডে-বুক বা জন্মদিনের বই বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, দেশী-বিদেশী মহাপুরুষদের জন্মদিন স্মরণ রাখার বই। বিদেশে এ ধরণের বইয়ের প্রচলন সমধিক, কিন্তু বাংলায় এর রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা বোধ হয় এই প্রথম হল, সেদিক থেকে দেখলে বর্তমান স্মারক গ্রন্থটির এক বিশেষ মূল্য আছে। ডায়েরির আকারে গ্রন্থিত এ বইয়ে বিশেষ করে বাংলার বরেণ্য সন্তানদের নাম ও জন্মতারিখ উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছে ; প্রতিপৃষ্ঠার একদিকে মাসের তারিখ ও অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্য ও গীতিগ্রন্থ থেকে সুন্দর সুন্দর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, এক হিসাবে বইটি যেন রবীন্দ্রনাথেরই স্মারক গ্রন্থ, এযুগে বাস করে রবীন্দ্র-ভাবধারাকে অতিক্রম করে সত্য, শিব ও সুন্দরের সন্ধানী হওয়ার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র, এ গ্রন্থের সম্পাদক যে এ সত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত তাতে সন্দেহমাত্র নেই।—বাংলা ভাষায় এই নতুন ও সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য এই বইয়ের প্রকাশকও প্রভূত সাধুবাদের অধিকারী। বিখ্যাত শিল্পী রদেনস্টাইন অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের ছবিটি সংযোজিত হওয়ায়, গ্রন্থের মর্যাদা বেড়ে গিয়েছে! প্রচ্ছদ শোভন, অপরাপর আঙ্গিক যথাযথ। গ্রন্থনা—নিরুপমা দেবী, সম্পাদনা—পরমেশ বসু। প্রকাশনায়—সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল। সাহেবনগর, নদীয়া। দাম—সিল্ক বাঁধাই—তিন টাকা, কাপড় বাঁধাই—দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পাহাড় অরণ্য উপত্যকা / ন্যাশনাল পাবলিশিং

বাঙলা-বিহারের সীমান্তে সাঁওতালদের ছোট গ্রাম রাঙামাটি, শাল পলাশ মহুয়ার দিগন্তবিস্তৃত বন, মাটির লাল রং নেশা ধরিয়ে দিল শ্বেতদ্বীপবাসী এক বিদেশীর মনে। রাঙা মাটিতে মিশনারীদের ছোট গির্জার ধর্মযাজক কলিন্স ভালবাসল এই মায়াভরা ছোট গ্রামটিকে, আপন করে নিল সহজ সরল বন্য মানুষগুলোকে। সাঁওতালদের বিচিত্র জীবনযাত্রার এক পরিচ্ছন্ন আভাস পাওয়া যায় কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে, লেখকের আন্তরিকতায় কাহিনী উপভোগ্যতায় রম্য। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক—নির্মল সান্যাল, প্রকাশক—ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, এ-৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২, দাম—তিন টাকা।

শ্যামল বনানী / জ্ঞান ভারত প্রকাশন

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্যসংকলন, অনেকগুলি কবিতা একত্র গ্রথিত হয়েছে। ভাব বা আঙ্গিকে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকলেও, সহজ একটা মাধুর্যের আভাস পাওয়া যায় কবিতাগুলির মাঝে, সাধারণ পাঠক হয়ত এদের একেবারে অবজ্ঞার চোখে দেখবেন না। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—ননীগোপাল আইচ, প্রকাশক—জ্ঞান ভারত প্রকাশন, ৩২, অভয় বিদ্যালংকার রোড, কলিকাতা-৩৪, দাম—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আধুনিক কোরিয়ার কবিতা / কপোতাক্ষী

আধুনিক কোরিয়ার কয়েকটি স্বনামধন্য কবির রচনা, অনূদিত হয়ে সংকলিত হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। দেশের সমাজ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারায় যখন যে রকম পরিবর্তন দেখা দেয়, সমসাময়িক সাহিত্যে সর্বদাই তার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই কাব্যগুলির মূল্য শুধু সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার্য নয়, কোরিয়ার সাম্প্রতিক জীবন-চেতনার এরা এক মূল্যবান দলিল। তাই বলে আলোচ্য কবিতাগুলির মাধুর্য সম্বন্ধে অবশ্য অনুযোগ করার মত কিছু নেই, স্বতঃ-উৎসারিত এক সরল গভীর সৌন্দর্যে এরা এমনভাবেই মণ্ডিত যে পড়তে পড়তে মন আবিষ্ট হয়ে ওঠে ; গভীর বেদনা ও স্বাভাবিক আনন্দকে কয়েকটি কবিতার মধ্যে এত সহজে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায় যা সত্যই বিস্ময়কর। মনে হয় আধুনিক কোরিয়ার কবিরা আর কিছু জানুন বা না জানুন, সহজ সুরে মানুষের চিরকালীন গান গাইতে জানেন, আঙ্গিক বা ফর্মের বেড়াজালে তাঁরা যে ধরা দেন নি সেজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। সংকলনকর্তা ও অনুবাদক—জাহাঙ্গীর চৌধুরী। প্রকাশনায়—কপোতাক্ষী। ৩৪, জিন্নাহ এভেন্যু, ঢাকা-২। দাম—তিন টাকা।

এই সংখ্যার মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন শিল্পী—শ্রীহীরেন সেন।

বার্ধক্যে বারাণসী

নীলকণ্ঠ

সাতচল্লিশ

কলকাতা থেকে কয়েক মাইলের মধ্যে বেশ কয়েক বছর আগে এই অঘটন ঘটে। এক ভদ্রলোকের বাড়িতে একটি কুকুর সতৃষ্ণনয়নে বাড়ির মালিকের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলবার চেষ্টা করে। প্রথমে ব্যাপারটা এমন ব্যতিক্রম কিছু মনে হয় নি। যেমন আর পাঁচটা কুকুর কখনও কখনও খাবার বা আদরের লোভে কিংবা অকারণ পুলকে করে থাকে, তেমনই মনে হয়েছিলো। তারপর দেখা গেলো তা নয়। কুকুরটি একটু বেশি রকমের কাঙাল। খাওয়া কিংবা আদর বা অকারণ পুলক নয়। সে যা বলতে চায়, সে যা বলতে পারছে না তা কোনও গভীর গুরুতর ব্যাপার। মনে হলেও একথা বাড়ির কারুর, বাড়ির কর্তা তার তেমন কোনও গুরুত্ব দিলেন না। বরং বিরক্ত হলেন বেশ। দূর দূর করে তাড়াতে চাইলেন কুকুরটিকে। কুকুরটি অবশ্য গেল না। ভদ্রলোকের মন থেকেও না; সেই স্থান থেকেও না।

স্বপ্ন দেখলেন রাতে তাঁর কাছে এসে বলছেন একজন: আমি তোর গতজন্মের পিতা। গর্হিত কোনও অপকর্মের জন্যে কুকুর হয়ে জন্মেছি। তুই আমার মুক্তির জন্যে গয়ায় যাবি। সেখানে কি করতে হবে তাঁকে সে কথা স্বপ্নে বলে দেন তাঁর পূর্বজন্মের পিতৃত্বের দাবীকার। স্বপ্নভংগ হলে ভদ্রলোক অস্বীকার করেন স্বপ্নাদেশকে। সারাদিন ওই কুকুরটির চিন্তা তাঁর পক্ষে গুরুপাক হয়েছে বলেই এই আজগুবি স্বপ্ন,—এই তাঁর ধারণা হয়। ধারণার বশবর্তী হয়ে কুকুরটির ধার-কাছ মাড়ান না তিনি।

পরের দিন রাতে দ্বিতীয়বার স্বপ্নদর্শন হয়, এবারেও সেই একই মূর্তি আবির্ভূত হয়ে বলেন আমার কথা তোর বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ প্রমাণ দিচ্ছি, মিলিয়ে নে।

এই কথার পর তিনি একটি জায়গার কথা বলে দেন যেখানে মাটির নীচে বেশ কিছু টাকা পোঁতা আছে বলে তিনি জানান।

অর্থবহ বাস্তবের গন্ধ পাওয়া মাত্র এবারে স্বপ্নকে অস্বীকার করা গেল না আর। মাটি খুঁড়বার জন্যে কুলি-কামীন যোগে নির্দিষ্ট জায়গায় গেলেন বাড়ির মালিক এবং বেশ কিছু টাকা পেলেন মাটির নীচ থেকে। সে টাকা এবং গতজন্মের পিতাকে তাঁর পাপ থেকে যথারীতি উদ্ধার করলেন এবার। তারপর বাড়ি করলেন একখানা সেই টাকায়। ঘটনার নিষ্পত্তি হলো না এখানে।

ভদ্রলোকের এ জন্মের ভাই দাবী করলেন বাড়ির অংশ। তাই নিয়ে মামলা হলো। মামলায় প্রমাণিত হলো এ জন্মের পিতার অর্থে সে বাড়ি হয় নি, অতএব ভাইয়ের কোনও দাবী থাকতে পারে না এই বাড়িতে।

এ ঘটনা যিনি আমাকে বলেছেন তিনি এসব অঘটনে বিশ্বাস করেন না এবং মিথ্যাকথা বলেন না।

আমি জানি। এ অঘটনকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেবার লোক আছে। কিন্তু তাতে এসে যাবে না কিছু। কারণ বিশ্বাসের আলোক আমার কাছে যুক্তির রঞ্জনরশ্মির চেয়ে ছোটো নয়। লজিক্যাল এবং এসট্রালজিক্যাল,—দুয়েরই মূল্য আছে আমার কাছে। গণনায় কোনও কথা মিলে গেলে, যদি একটা কথাও হয়, যেহেতু তা লজিকে পাচ্ছি না সেইহেতু তা গণনায় ধরব না, বা কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেব, এ আমার ধর্ম নয়। যুক্তি মানি বলে, যুক্তির চেয়ে বড় কিছু মানি না,—এ আমি মানি না। এই অমান্য করাকে আমি ধর্ম বলি না, আমি অধর্ম বলি। যা শুনব, যা দেখব, তাই বিশ্বাস করব, কিংবা অবিশ্বাস করব—এ মানুষের ধর্ম নয়।

আমার 'বার্ধক্যে বারাণসী'-র দ্বিতীয় পর্বের জীবন-নদীর কথা এবার সিন্ধুতে প্রবেশ করবার মুহূর্তে যাঁকে স্মরণ করছে তাঁর নাম,—শক্তিপদ বসুরায়। কাশীর এবং আমার জীবনে অবিস্মরণীয় এই মানুষটিকে প্রণাম। এই একটি লোকের জন্যেই,—এই একটি পরমাশ্চর্য আলোকের জন্যেই মানুষের মহত্তম তীর্থ, মহাকালের সতীর্থ কাশী-দর্শন সার্থক। একজন লোক,—স্ত্রীলোকের চেয়েও কত আকর্ষণের চুম্বক হতে পারে, রমণীর চেয়ে কত রমণীয় হতে পারে একজন মানুষের সংগ, নশ্বর পৃথিবীতে কি অবিনশ্বর বাণীর প্রতিমূর্তি হতে পারে একজন, এই 'একজন' সেই আর 'একজন'-এর প্রতিচ্ছায়ায় জ্বালাতে পারে মরলোকে অমরলোকের আলো,—শক্তিপদ বসুরায়কে যে চোখে দেখে নি তার ধারণা করা শক্ত। চোখে দেখলেও সকলের পক্ষে তা সহজ নয়। কারণ আমরা সবাই প্রায় অন্ধ। কেউ অর্থে, কেউ কামে, কেউ খ্যাতিতে, কেউ রূপে। পরমার্থে কিংবা অপরূপে কদাচ। তবু কেউ কেউ, কোনও কোনও ধ্যানী, নিঃসংগ কোনও কোনও বিহংগ কেঁদে বেড়ায়, অর্থ নয়, খ্যাতি নয়, সচ্ছলতা নয়… আরো এক বিপন্ন বিস্ময়।

না। বিপন্ন বিস্ময় নয়, সম্পন্ন আশ্বাসের জন্যে যদি কেউ আকুল হয় দৈবকৃপায় তা হলে তার কূল মিলবে কাশীতে, ঘাটের ওপর সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে অসাধারণ গৃহস্থ শক্তিপদ

বসুরায়কে যদি সে দেখতে পায়। চর্মচক্ষে নয়। মর্মচক্ষে সে দেখবে,—মানবজীবন 'নিরুদ্দেশযাত্রা' নয়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য,—নিজেকে জানা। কোটি জন্মের সুকৃতির ফলে একটি মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। তখন থেকে আর কোনও জন্ম তার বিফলে যায় না।

শক্তিপদ বসুরায়,—শক্তিদা বা শক্তিবাবু, বাঙালী সাধু, যে নামেই ডাকো তাঁকে একই আলো বিচ্ছুরিত দু' চোখে সারাক্ষণ। ভালোবাসার আলো, আলো আর আশার করুণাধারায় বিগলিত দু'টি চোখ। মর্ত্যের কিংবা অমর্ত্যলোকের কোনও স্ত্রীলোকের চোখে এ জাদু নেই। এ চোখ আসক্ত করে না; নিরাসক্ত করে। রূপের উজান বয় না এ চোখে; অপরূপের উৎস খুলে দেয় দু' চোখে। ক্ষণকালের দৃষ্টিতে চিরকালের আভাস।

শক্তিপদ বসুরায়ের কাছে কাশীর দিগ্বিজয়ী সাধক-পণ্ডিত আসেন, রাজনীতির ধুরন্ধর ব্যক্তি আসেন, সুরসাধক, লেখক, ডাক্তার, অধ্যাপক, খ্যাত-অখ্যাত নর-নারী আসেন। কথা শুনতে আসেন, কথা বলতে আসেন। লৌকিক ও অলৌকিক প্রার্থনা নিয়ে আসেন। কিন্তু শক্তিপদ বসুরায় আমার চোখে লৌকিক সাচ্ছল্য ও অলৌকিক দীনতার চেয়ে অনেক বড়ো। তাঁর ওপর বিদেহী আত্মার ভর হয়েছে, এমন কথা শুনে আমার বিস্ময় উদ্রিক্ত হয় না। হিমালয়ের মানব পদক্ষেপ-মুক্ত ক্ষেত্রে মুক্তপুরুষের পদক্ষেপ পড়ে, এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। শক্তিপদ সাধু,—একদা রাজনীতিকরা, কাজী নজরুল ও সুভাষের অনুরাগী, শক্তিপদ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী,—এহ বাহ্য। শক্তিপদ বসুরায়ের ঘরে কলকাতার নামকরা ডাক্তারকে দেখেছি, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীকেও; কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতির যাওয়া-আসা আছে শুনেছি। অতি সাধারণ [আমাদের পরিভাষায়] নর-নারীকে প্রণাম করতে দেখেছি। চিঠি পড়ে থাকতে দেখেছি, দূরের ও কাছের। কিন্তু এও তুচ্ছ।

শক্তিপদ বসুরায় থাকেন মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যে। গংগার ওপর দুরন্ত হাওয়ার মধ্যে তাঁর থাকা-খাওয়া। সিগারেট প্রায় অনর্গল চলে। চা-ও চলে ঘন ঘন। খাওয়াতে ভালোবাসেন খুব। খেয়ে খুশি হন। কেউ, শক্তিপদ সাধু মনে করে গেলে, বলে দেন স্পষ্ট, 'আমি সাধু নই, সাধারণ গৃহস্থ।' আমাকেও আরম্ভে তাই বলেছিলেন যে, 'আমি কিন্তু সাধু-টাধু কিছু নই।'

অবিনয়ে বলেছিলাম তৎক্ষণাৎ: আমি অত্যন্ত অসাধু পুরুষ, কাজেই সাধুর সন্ধানে আমি আসি নি; আমি এসেছি আপনাকে দেখতে কেবল।

সত্যিই তাই। লোকে পূর্ণিমার রাতে তাজমহল দেখতে যায়; সূর্যোদয়ে যায় টাইগার হিলে উঠতে; তীর্থে যায় পুণ্যসঞ্চয় করতে; জীবন দেখতে যায় বারে এবং বারবনিতার গৃহে। আমি কাশী যাই, তীর্থ করতেও নয়, পুণ্য করতেও নয়। কাশীর দিদিমার কাছে যাই আর দেখতে যাই শক্তিপদ বসুরায়কে।

মানুষের মধ্যে আর একজন কতবড় মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে,

শক্তিপদ বসুরায় তার দ্বিতীয়-রহিত দৃষ্টান্ত। 'মানুষের ভালো হোক', শক্তিপদ বসুরায় যেন তার জীবন্ত মন্ত্র। জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষকে দেখলেই মনে মনে বলো: ভালো হোক। শুধু এই মন্ত্রের-জপ জপতে জপতে মন তোর উধাও হোক সীমার গণ্ডী পেরিয়ে অসীমে।

অন্ধকার আলো হোক মুহূর্তে; মৃত্যু থেকে অমৃতে যাত্রা হোক আরম্ভ। মানুষের ভালো হোক,—এর চেয়ে বড় কথা, মানুষের মুখে আমি শুনি নি। মানবজীবনে সবই মন্ত্রণা; মন্ত্র কেবল ওই,—মানুষের ভালো হোক। এ মন্ত্র নিরন্তর বলতে বলতে মানুষের রোমকূপ অমৃতনিস্যন্দী হয়; চলার ছন্দ হয় পরিবর্তিত। মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বইতে থাকে অন্য বাতাস। মানুষের চোখে উদ্ভাসিত হয় অন্য এক আকাশ। চোখে দেখা যায় যে আকাশ তার চেয়ে অনেক নিরুপম। নিবিড়তর নীল; তার চেয়ে অসীমতর। এ আকাশে ওড়বার পাখা ওই মন্ত্রে পায় মানুষ;

ক্ষমা কর সবে, ভালোবাসো।
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো!

এ মন্ত্র উচ্চারণমাত্র রণ শেষ। মরণ পরাস্ত! মল,—পরিমল। শক্তিপদ বসুরায়ের চোখের তারায় আর এই মন্ত্রময়ী তারায় কোনও তফাৎ নেই। চেয়ে দেখো ওই চিরন্তন ভারতের চোখের দিকে। সে বলছে, মৃত্যুদীপদীপ্ত জীবনের জ্যোতির্ময়ী তপস্যায় যাঁরা জেনেছেন মানুষ অমৃতের সন্তান, তাঁরা জেনেছেন অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে, বন্ধন থেকে মুক্তিতে যাত্রাই জীবনের উদ্দেশ্য। চেয়ে দেখো তাঁদের চোখে, শ্যামলাবিপুলা এ ধরার দিকে চেয়ে আছে অনন্তকাল ধরে এক অধরা। নক্ষত্রখচিত নীলাম্বরা সে বিরহবিধুরা। পূর্ণিমার পাত্রে আনন্দের অমৃত বহন করবে সে আর কতকাল! অন্তহীন অমার অবিশ্বাস ছিন্নভিন্ন করে করে দেখা দেবে, মানুষের কণ্ঠে তার নিরুপম নীরব বীণাখানি: ভালো হোক!

ভালো হোক সকল মানুষের। বিশ্বাসের আলো হোক যত অবিশ্বাসের কালো। টেলিভিসান থেকে ভিসানে, কামফর্ট থেকে কনটেনমেন্টে, কম্পিটিশান থেকে আত্মসমাহিতে, সংগ্রাম থেকে শান্তিতে, মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরো চলো। জয়ধ্বনি করে 'নির্বোধ' নবজাতকের। বলো, মানুষের জয় হোক। সে জয়, দেশের স্বাধীনতা হরণের নয়। দেশ ও কালের কাছে মানুষের অধীনতা-মুক্তির বিস্ময়। দেশ জয় নয়, হৃদয় জয় কর মানুষের। বলো,—এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।

সেই মধু,—মধু ও কৈটভের মুক্তিকে করুক মধুর!

শক্তিপদ বসুরায়-এর জীবন উপন্যাসের মতো অলীক নয়; কিন্তু উপন্যাসের চেয়ে অলৌকিক। যে কোনও উপন্যাসের চেয়ে যে মানুষের জীবন অনেক বৃহৎ, একথা কে জানতো শক্তিপদকে না দেখলে।

শক্তিপদ বসুরায়ও একদিন অবিশ্বাসী ছিলেন। একদিন তিনি জীবনের দেওয়াল জুড়ে লিখেছিলেন, লিখে চলেছিলেন—God is nowhere। আরেকদিন তাঁর নিজের হাতে সেকথা মুছে দেবার জন্যেই লিখেছিলেন—এখন সে কথা মুছে নিজের জীবন দিয়ে যে কথা লিখছেন, God is now here।

যতবার মানুষ যুদ্ধ করেছে মানুষের সংগে, ততবার লেখা হয়েছে এই অসত্য উক্তি: God is nowhere। যতবার মানুষ মানুষকে দেখে বলেছে, ভালো হোক। ততবার লেখা হয়েছে এই সত্য ভাষণ · God is now here।

'শক্তিপদ বসুরায়ের কাছে যাবার সময় সংকল্প করে যাই, God is nowhere। কাছে গিয়ে মনে হয়, God is now here।

God মানে আকাশে কোনও চতুর্ভুজ অবস্থানকারী নয় [Beware of the man whose God exists in the heaven] ।God হচ্ছে Good-এর সামটোটাল। মানুষের Good যে চেয়েছে সেই God-এর দেখা পেয়েছে। যখনই বলেছে তখনই 'God is now here,'—সম্ভব হয়েছে।

মানুষের Good-ই হচ্ছে মানুষের God। শক্তিপদ বসুরায়ের কাছে গেলে এই Good-এর, সেই God-এর স্পর্শ পাই! এই স্পর্শ সেই স্পর্শাতীতের ছাড়া আর কার!

[ক্রমশঃ

রুদ্রবীণা

শ্রীপ্রভাকর সেন

অনেক যুগ আগে, সে প্রায় হিন্দু যুগে বীণার সৃষ্টি হয়। এই বীণার আলোচনার পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বিখ্যাত ভাষাবিদ এবং সঙ্গীতজ্ঞগণ বলেছেন যে, ভাষার জন্মের বহু পূর্বেই সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে। মানুষ যেদিন প্রথম শুনল বিশ্বের বিভিন্ন ধ্বনি, সেইদিনই জন্ম নিল সঙ্গীত। ধ্বনিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে সঙ্গীতের।

ভারতবর্ষে যখন শুরু হল বিশেষ সভ্যতা, সেই সময়ে জন্ম নেন, বহু ঋষি; এই সময়কে বৈদিক যুগ বলে মনে হয়। এঁরা সঙ্গীতকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই উন্নত করে মানুষ কর্তৃক যাতে বিভিন্ন উপায়ে সেই সব ধ্বনির পুনঃসৃষ্টি হয় তার সকল পন্থার উদ্ভাবন করলেন। ক্রমে ক্রমে সেই সব ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে নবরূপ ধারণ করল এবং নতুন নামে পরিচিত হল—সুর।

সুরের সৃষ্টি হওয়ামাত্র তাকে কিভাবে যন্ত্রের মাধ্যমে পুনঃসৃষ্টি বা প্রকাশ করা যায় তার উপায় স্থির করতে লাগলেন ঋষিরা। এইভাবে গবেষণা করতে করতে আবিষ্কার করেন 'বীণা'। কাজেই, প্রাচীনত্বের দিক থেকে বীণা যে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

কোনও কোনও মতে বলা হয়েছে যে প্রথম বীণাই রুদ্রবীণা; আবার অন্যান্যরা বলেন সরস্বতী বীণা। এই দু'টির মধ্যে কোনটি অধিকতর প্রাচীন তা সঠিক নির্ণয় করা সুকঠিন। রুদ্রবীণা উত্তর ভারতে এবং সরস্বতী বীণা দাক্ষিণ ভারতে প্রচলিত। সঙ্গীত গ্রন্থকারেরা বলেছেন যে রুদ্রবীণার সৃষ্টিকর্তা দেবাদিদেব এবং সরস্বতী বীণা সৃষ্টি করেন দেবী সরস্বতী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কিছু মতে দেবাদিদেব ও দেবী সরস্বতী ঋষিদের তাঁদের সৃষ্ট যন্ত্র প্রদান করেন মর্ত্যলোকে তা প্রচার করার জন্য। তা হলে ব্যাপার এই রকম দাঁড়ায় যে, মহাদেব এবং সরস্বতী দেবী তাঁদের বীণা যন্ত্রদ্বয় ঋষিদের প্রদান করেন মর্ত্যলোকে প্রচার করবার জন্য: এই যদি হয় তবে বলতে হবে উক্ত বীণা দু'টি ঋষিদের সৃষ্টি নয়, তাঁরা এই যন্ত্রের শিক্ষাদাতা ও প্রচারক মাত্র। সে যুগে অবশ্য এই রকম ঘটনা ঘটত, তার নজিরও কম পাওয়া যায় না। এখন তা হলে দেখা গেল যে বীণার সৃষ্টির সম্বন্ধে দু'রকম মত পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম মতে, বীণা ঋষিদেরই সৃষ্টি; তাঁরা মহাদেব ও সরস্বতী দেবীর নামে যন্ত্রের নামকরণ করে তা প্রচার করেন। দ্বিতীয় মতে, দেবাদিদেব এবং দেবী সারদা যথাক্রমে রুদ্রবীণা ও সরস্বতী বীণাযন্ত্র আবিষ্কার বা সৃষ্টি করেন এবং তা ঋষি কর্তৃক মর্ত্যলোকে প্রচলিত হয়।

রুদ্রবীণার সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি মনোরম কাহিনী চলিত আছে। কোনও এক সূর্যাস্তের পরকালীন আলোকে পুষ্প শয্যায় দেবী পার্বতী শায়িত আছেন। তাঁর এই অপূর্ব শয়নভঙ্গীতে মহাদেবের এক কল্পনা আসে। এই কল্পনা শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনায় পর্যবসিত হয়। দেবীর পুষ্প অলঙ্কার সজ্জিত বাহুদ্বয় বক্ষের উপর ন্যস্ত; তাঁর মুখমণ্ডল কেশরাশি দ্বারা জড়িত এবং শোভিত; তাঁর সমস্ত দেহ এক অপূর্ব লাবণ্যপ্রভা বিস্তারে সচেষ্ট। দেবীর শ্বাস-প্রশ্বাসে এবং প্রকৃতির মনোহর বায়ু-হিল্লোলে জন্ম নিল মনোমোহকর 'সঙ্গীত'। মহাদেব অভিভূতের ন্যায় এই দৃশ্য দর্শন এবং এই সঙ্গীত শ্রবণ করলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি দেবীর শায়িত অবস্থার মধ্যে রুদ্রবীণার রূপ আবিষ্কার করলেন। দেবীর দেহ থেকে জন্ম নিল বীণার দণ্ড, বক্ষঃস্থল থেকে জন্ম নিল বীণাদণ্ডের দুই লাউ, বাহুদ্বয়ের অলঙ্কার থেকে বীণার পর্দা, কুন্তলদাম থেকে বীণার তার, কেশের অলঙ্কার থেকে তারের খুঁটি বা কান, অঙ্গুলির অঙ্গুরীয় থেকে মিজ্রাব এবং শিরের মুকুট থেকে ময়ূরের উর্ধ্বাংশ (রুদ্রবীণার নিম্নভাগে ময়ূরের অবয়বের উর্ধ্ব অংশের প্রতিমূর্তি থাকে) এইভাবে মহাদেব রুদ্রবীণার উদ্ভাবন করেন। অবশ্য এই কাহিনী যে পৌরাণিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ-ছাড়া, এই কাহিনী কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য।

রুদ্রবীণার অপর নাম 'বীণ্'। উত্তর-ভারতে রুদ্রবীণার স্থান রাজ-সিংহাসনে। রুদ্রবীণা যন্ত্র-শ্রেষ্ঠ। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বে যত যন্ত্র আছে তাদের মধ্যেও রুদ্রবীণার স্থান সর্বোচ্চে। পাশ্চাত্য-জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিজ্ঞানসম্মত শ্রেষ্ঠযন্ত্র হল 'পিয়ানো'। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রুদ্রবীণা বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে যত উন্নত, পিয়ানো কিন্তু এই যন্ত্রটির তুলনায় বৈজ্ঞানিক দিক থেকে তত উন্নত নয়। একবাক্যে এ-কথা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-সম্মত যন্ত্র এই রুদ্রবীণা। বীণ যন্ত্রে যেভাবে বিভিন্ন শ্রুতি, স্বরের আন্দোলন, কম্পন, বিভিন্ন গ্রাম দর্শান সম্ভব তা কিন্তু অন্য কোনও যন্ত্রে সম্ভব নয়। কাজেই পিয়ানোর ঐতিহ্য বীণ্-এর ঐতিহ্যের কাছে ম্লান হয়ে যায় এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। তবে পিয়ানো তার

জোরাল আওয়াজে বীণ্-এর ক্ষীণ আওয়াজকে অনেক গুণেছাড়িয়ে যায়। অবশ্য এ এমন কিছু গর্বের বস্তু নয়।

বীণ্-এর ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করলে মনশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে কয়েকটি মুগ্ধকর চিত্র—বৃন্দাবনের নিকটবর্তী বনে নাদসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য বৈজুবাওরা বীণ্ বাজিয়ে চলেছেন একাগ্রচিত্তে। তাঁর অত্যাশ্চর্য যৌগিক ক্ষমতায় সারা বন যেন আলোকিত হয়েছে, বন্যপশুরা তাঁর নিকটবর্তী হয়ে আত্মহারা হয়ে সেই মহাসঙ্গীত শ্রবণ করছে। কিংবা কোন সিদ্ধা রাজপুত নারী উপর আলোকে বীণ্ বাজিয়ে সমস্ত প্রাণীকে শিহরিত করে দিচ্ছেন। অথবা কোন সঙ্গীতসিদ্ধ মহাযোগী পুরুষ বীণাবাদনে নভে মেঘ সঞ্চার করছেন।

আমরা বিংশ শতাব্দীর মানুষেরা হয়ত এইসব কাহিনীকে বা কিংবদন্তীকে উপেক্ষা করে নিছক কল্পনা বলব বা হয়ত অবজ্ঞা-সূচক কোন মতামত দেব। কিন্তু আমরা জানব না যে কতবড় মিথ্যাবাদী আমরা। যে প্রক্রিয়ায় যে বিদ্যাবলে এইসব সম্ভব হত সেগুলি আমাদের বহু পিছনে ফেলে চলে গেছে কোন এক অজানা লোকে। যাক সে কথা। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

সঙ্গীতে উদীয়মান শিশুশিল্পী

● দশ বৎসর বয়স্ক পিয়ানোবাদক মাইকেল গিজ। বিশেষজ্ঞদের মতে গিজ একটি অসাধারণ প্রতিভার আধার

পিয়ানোবাদক হিসেবে পশ্চিম জার্মানীর শিল্পনগরী বিয়েলেফেল্টের যে দশ বছরের শিশুশিল্পীর এতো খ্যাতি, তার নাম মাইকেল গিজ। কড়া সঙ্গীত সমঝদাররা 'ছেলেটিকে ওয়েস্টফালিয়ার মোৎজার্ট' বলতেও দ্বিধা করছেন না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করলে অবান্তর হবে না যে, মোৎজার্ট যখন সুরের তরঙ্গে য়ুরোপের সবক'টি রাজধানী ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল সবে দশ। মাইকেল এখনো সব রাজধানীতে যায়নি, তবে যেখানে যেখানে সে ইতিমধ্যে বাজিয়েছে, সেখানকার সঙ্গীতরসিক মানুষদের কাছে সে অজস্র প্রশংসালাভ করেছে। সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে যখন তাকে সালৎস্‌বুর্গের মোৎজার্ট কলাভবনের আচার্যদের সামনে তার শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিতে হয়েছিল। এই কলাভবনের বাছাইকরা ছাত্রদের মধ্যে মাইকেল আজ বয়সে সবচেয়ে তরুণ।

অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মাইকেল। বিয়েলেফেল্টে গান শিখিয়ে কোনমতে তার বাবা সংসার চালাতেন। পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত ভাড়া-করা পিয়ানো বাজিয়ে মাইকেলের হাত রপ্ত করতে হয়েছে। মাইকেল যখন সালৎস্‌বুর্গ কলাভবনে ভর্তি হ'ল, পৌর কর্তৃপক্ষ তাকে ১,৮০০ মার্কের বৃত্তি দিলেন। মাইকেলের মা ও বাবা বিয়েলেফেল্ট ছেড়ে ছেলের সঙ্গে সালৎস্‌বুর্গ গেলেন। কলাভবনে শিক্ষার প্রথম ধাপে মাইকেল যখন সবচেয়ে গুণী ছাত্র হিসাবে নাম কিনলে তখন বৃত্তির টাকা ফুরিয়ে গেছে। এদিকে সালৎসবুর্গে এসে মাইকেলের বাবা গান-বাজনা শেখাবার কোন কাজ যোগাড় করতে না পেয়ে উপার্জনহীন হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে ছেলেকে কলাভবন থেকে ছাড়িয়ে বিয়েলেফেল্ট ফিরে এলেন। একটি ক্ষণজন্মা ছেলের অর্থাভাবে শিক্ষা বন্ধ করতে হ'ল শুনে অনেক সদাশয় লোক সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। [illegible] মাইকেলের শিক্ষার জন্য মাসে ২৬০ মার্ক ভাতা বন্দোবস্ত করায় মাইকেল-পরিবার আবার সালৎসবুর্গে ফিরে এলেন এবং মাইকেল আবার মোৎজার্ট কলাভবনে ভর্তি হ'ল।

সঙ্গীত-বিশারদরা মনে করেন মাইকেল একদিন সুরের ঝঙ্কারে বিশ্বজয় করবে। —ডি এ ডি

বনে 'রবার্ট শুমান স্মৃতিসৌধ'

সঙ্গীত-রচয়িতা রবার্ট শুমান যে গৃহে থাকতেন এবং যেখানে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন, গত মহাযুদ্ধে সেটি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গৃহটিকে বর্তমানে সুসংস্কৃত করে 'শুমান স্মৃতিভবন' হিসাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই গৃহের দু'টি কক্ষে শুমানের নিত্যব্যবহার্য কয়েকটি জিনিস, তাঁর ও তাঁর পত্নীর আলোকচিত্র ও তৈলচিত্র, চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। আর আছে শেষ জীবনে শুমান যে পিয়ানোটি বাজাতেন সেটি, তাঁর পত্নীর তৈরি পিয়ানোর ফুলতোলা ঢাকা, সঙ্গীত-রচয়িতার একগুচ্ছ কেশ, মৃত্যুর সার্টিফিকেট ও তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর শেষকৃত্যের এক বিশদ বিবরণী। এতদ্ব্যতীত শুমান গৃহটিকে সঙ্গীতের কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। এখানকার সঙ্গীতের লাইব্রেরীতে ৪০০০

পুস্তক ও ২০০ রেকর্ড আছে। এই গৃহে ম্যাক্স রেগের ইন্‌স্টিটিউটের কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে যেখান থেকে রেগের সমগ্র রচনাবলী ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত হবে। —ডি এ ডি

একটি উপভোগ্য সঙ্গীতানুষ্ঠান

সম্প্রতি শ্রীঅদ্রিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেলের উদ্যোগে একটি মনোরম সঙ্গীতানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। কল্যাণী রায়, বাণী ঠাকুর, মুন্নাওয়ার খাঁ (ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলীর পুত্র) ও নবকুমার পাণ্ডা প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পিবর্গ সম্প্রতি একটি সাংস্কৃতিক সফর সমাপ্ত করে নেপাল থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হওয়াই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যরূপে বর্ণিত হয়। কল্যাণী রায়ের অনবদ্য সেতার বাজনা, বাণী ঠাকুর ও মুন্নাওয়ার খাঁর গান, নবকুমার পাণ্ডার সঙ্গত এবং প্রারম্ভে গৃহস্বামীর কন্যা রুচিরা মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত সমাগত অভ্যাগতবৃন্দকে অফুরন্ত আনন্দে ভরিয়ে তোলে। এই আয়োজন সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। অতিথিবৃন্দের আপ্যায়নের দিকে গৃহস্বামীও যথেষ্ট যত্ন নেন।

আমার কথা (১১৪)

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

আজকের দিনে সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী হিসাবে বাঙলা দেশের যে তরুণবৃন্দ যথেষ্ট সাফল্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন শ্রীসন্তোষ চট্টোপাধ্যায়ের নাম সেই তালিকায় অবশ্য করণীয়।

বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে তাঁদের নিবাস। পিতৃনাম—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৩৩৬ সালের ১১ই মাঘ (জানুয়ারী ১৯৩০) কলকাতায় সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। শৈশব থেকেই মাতুলালয়ে মাতামহ স্বর্গীয় জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হতে থাকেন। সঙ্গীতের প্রতি এই অনুরাগের মূলে মাতামহের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতশিক্ষাও শুরু হয়। প্রথমে সঙ্গীতশিক্ষা শুরু করেন শ্রীঅনাথনাথ বসুর কাছে। তারপর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে শিক্ষালাভ করলেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীচিন্ময় লাহিড়ীর। এ ছাড়াও স্বর্গত সুবল দাশগুপ্ত, লক্ষ্মণ হাজরা ও কাদের বক্স প্রভৃতি শিল্পীদের কাছে লঘুসঙ্গীত সম্বন্ধে শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করেন। বিদ্যাসাগর কলেজে যখন ইনি পাঠরত, সেই সময়ে বহু সাংস্কৃতিক এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দেন এবং তার বিনিময়ে লাভ

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

করেন প্রভূত সুনাম এবং যথেষ্ট সুখ্যাতি। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁকে ভরিয়ে দেন বিপুল উৎসাহে।

১৩৫৯ সালে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে তাঁর গান প্রথম রেকর্ডেড হয়। গান দু'টির প্রথম কথাগুলি হল' যথাক্রমে—'ঝিরি ঝিরি ঝরণা বহে' ও 'মোহনীয়া বাঁশি'। পরের বছর তাঁর আরও দু'টি গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। সেই গান দু'টির প্রথম কথাগুলি হল যথাক্রমে—'মৌরীফুলের যৌবনে' ও 'জীবনের এই দরিয়ায়'। তারপর সুরকার হিসাবেও তাঁর প্রতিভার প্রকাশ ঘটতে থাকে। রেকর্ডে গৃহীত বহু জনপ্রিয় গানের সুরসংযোজনার কৃতিত্ব তাঁর। মহম্মদ সাকী এই ছদ্মনামের অন্তরালে দু'খানি ইসলামী গানও তিনি রেকর্ড করেন। বিখ্যাত বাউল পূর্ণ দাসের কণ্ঠে চারখানি গান তাঁর পরিচালনায় গৃহীত হয়। বর্তমানে 'লগ্ন' নাটকে ইনি সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী হিসাবে যুক্ত আছেন।

আকাশবাণীর মাধ্যমেও তিনি নিয়মিত শিল্পী হিসাবে সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন।

লঘুসঙ্গীত শিল্পী হিসাবে ইনি সমধিক পরিচিত হলেও মার্গসঙ্গীতের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ কম নয়। এ বিষয়ে যাঁদের সস্নেহ উৎসাহ তাঁকে লাভবান করে তুলেছে, তাঁদের নাম ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ, ডি ভি পালুশকার এবং ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যেহেতু

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

যেহেতু তোমার অঙ্গে এখন যৌবন বন্যার
কল-কল্লোল, মদির নয়নে বিজলী ঝিলিক হানে,
বুকের গভীরে দিবানিশি তুমি সরোদের ঝঙ্কার—
নিদ্রাবিহীন রাত্রি আমার ভরো পদাবলী গানে।

যেহেতু তোমার অঙ্গে এখন বসন্ত গান গায়,
খশিচঞ্চল প্রজাপতিগুলি পুষ্পবিতানে নাচে!
তোমার গোপন কামনা কবে যে চৈতালী সন্ধ্যায়
ইরাণী মেয়ের চোখের মতন আমাকে টানবে কাছে।

শিল্পীর জীবনসঙ্গিনী

(পূর্বানুবৃত্তি)

চারুলতা রায়চৌধুরী

[মাসিক বসুমতীর গত সংখ্যা থেকে এই রচনাটি প্রকাশিত হচ্ছে। লেখিকা শ্রীমতী চারুলতা রায়চৌধুরী বিখ্যাত শিল্পী ও ভাস্কর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সহধর্মিণী। অত্মস্মৃতিমূলক রচনাটির মধ্যে লেখিকা তাঁদের দ্বৈতজীবনের এক অপরূপ আলেখ্য চিত্রিত করেছেন। অন্তরালের দেবীপ্রসাদ সম্বন্ধে রচনাটি এক অমূল্য উপাদান। দেবীপ্রসাদের অনুরাগীরা তথা সমগ্র পাঠকসমাজকে লেখাটির বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী যথেষ্ট আনন্দদান করবে এ বিশ্বাস আমরা রাখি।—স]

একজন শিল্পীর সঙ্গে শেষ অবধি ঘর করার দীক্ষাগ্রহণ কিভাবে করলাম, সে বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনার আগে এ সম্বন্ধে যিনি আমাকে পাঠ দিয়েছেন, তাঁর জীবনের গঠন ও বিকাশের সম্বন্ধে কিছু বলা অপরিহার্য বলে মনে করি।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এ সম্বন্ধে আমার অফুরন্ত কৃতজ্ঞতার যিনি পাত্র, শৈশব অতিবাহিত করেছেন যথেষ্ট ভোগ-বিলাসের মধ্যে। তাঁর বাবা ও মা—উভয়েই বাঙলার এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁর মা আমার শাশুড়ী ছিলেন রংপুরের অন্তর্গত তাজহাটের স্বর্গীয় মহারাজের মেয়ে। দীর্ঘকাল তিনিই ছিলেন মহারাজার একমাত্র সন্তান। সেই কারণেই তাঁর বাবা-মার আদর তিনি একটু অধিকমাত্রাতেই পেয়েছিলেন, এমন কি তাঁর বিয়ের পরেও বছরের একটা বিরাট অংশ তিনি কাটাতেন তাজহাটেই। গল্প শুনেছি যে, তাঁর সাঁতার কাটার জন্যে একটি বিশেষ সেতুই তৈরি হয়েছিল। সোনার মোহর নিয়ে খেলাও করেছেন তিনি।

চারুলতা রায়চৌধুরী

এই পরিবেশের মধ্যেই দেবীপ্রসাদের চরিত্র রূপ নিতে থাকে। সেই জন্যেই এত আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকে না, যখন জানা যায় যে, যে বয়সে অন্য শিশুরা আদেশ পালন করে সেই বয়সে দেবীপ্রসাদ আদেশ জারি করতে থাকেন। এই স্বভাবই বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে আরও দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল এবং চিহ্নিত হতে থাকল তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্বরূপে।

শিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছেলেবেলা থেকেই, কিন্তু এই অনুরাগ সেদিন ভরে ওঠে নি পরিজনদেরও স্বীকৃতিতে। তাজহাটে দুর্গাপূজা হ'ত খুব জাঁকজমকের মধ্যে, বিরাট ধুম হত। আমোদ-আহ্লাদের আয়োজনে তিলমাত্র ত্রুটি থাকত না। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোকেরা অফুরন্ত আনন্দে তাজহাটে পূজো দেখতে এসে এক বিরাট মিলনচক্র গড়ে তুলত। মহারাজার বিরাট সুপ্রশস্ত আঙিনা ভরে যেত বাজীকরে, সার্কাসের তাঁবুতে, মেলায়, থিয়েটারে, নাচের আসরে, গানের জলসায়—সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। শিশু দেবীপ্রসাদ তাঁর শিশুমনের অদম্য কৌতূহল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন প্রায় প্রতিটি তাঁবুতে তাঁর সন্ধানী চোখ নিয়ে। এত বৈভব, এত আড়ম্বর—সব বিলাসের এই বহুমূল্য উপকরণ—সবকিছুর মধ্যে তাঁর মন পরিতৃপ্তিতে ভরে যেত মূর্তিকরটির সান্নিধ্যে। শিল্পী তন্ময় হয়ে গড়ে চলেছেন দেবী দুর্গার প্রতিমা, ততোধিক তন্ময় হয়ে একদৃষ্টে সেই মহান সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে চলেছেন দেবীপ্রসাদ ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেইখানে বসে থেকে। শিল্পীর চোখ পড়ে বালকের প্রতি, বালকের এই সহজাত শিল্পাসক্তি তাঁর সূক্ষ্ম মনে এনে দেয় এক অপূর্ব অনুভূতি। খানিকটা মৃত্তিকা তিনি খুশি হয়ে তুলে দেন বালকের হাতে। মনে মনে এই সুযোগই তো খুঁজছিলেন দেবীপ্রসাদ। মনপ্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে—সে এক অভাবিত হর্ষ। শিল্পীর কাজে ক্ষণকালীন ছেদ পড়ে। শিল্পীকে উঠে যেতে হয় আহারের জন্যে। সেই সুযোগটুকুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার গ্রহণ করলেন দেবীপ্রসাদ। একটি সাপ গড়ে ফেললেন—অতি কৌশলে মূর্তির পিছনে তাকে লাগিয়ে দিলেন। নিশ্চিন্ত মনে আহার সমাধা করে শিল্পী এলেন তারপরেই এক গগনভেদী চিৎকার, লোকজন ছুটে আসে—সাপ-সাপ, বিষধর ফণাধারী ভুজঙ্গ—শিল্পী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, চোখে ভয়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন। তারপর যখন আবিষ্কৃত হল যে এই ফণা নিষ্ক্রিয়, এই সাপ নিষ্প্রাণ তখন শিল্পীর মন ভরে গেল যুগপৎ লজ্জায় এবং আনন্দে। শিশুর এই অপূর্ব সৃষ্টি তাঁর শিল্পিমনে দোলা লাগিয়ে দয়।

দেবীপ্রসাদের পিতামহ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর তাঁর অনুরাগ ছিল যথেষ্ট। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পৌত্রও এই ছাপ বহন করুক। সেই মানসে নাতিকে পাঠালেন স্কুলে। স্কুলের নির্দিষ্ট পাঠক্রম ও প্রাণহীন পরিবেশ তাঁর মন ভরিয়ে তুলতে পারে না। এই বাঁধাধরা গণ্ডিবদ্ধ জীবনের কবল থেকে মুক্তির জন্য প্রাণ তাঁর হাঁফিয়ে উঠতে থাকে—মুক্তি পেলেন

দুষ্টুমির মধ্যে দিয়ে। শিক্ষকের চেয়ারে মার্বেল দিয়ে রাখা আবার দুশিয়ারীর সঙ্গে তাঁকে নিশ্চিত পতন থেকে রক্ষা করা, নিদ্রিত পণ্ডিতের শিখায় দড়ি বেঁধে দেওয়ার মধ্যেই এই সুশীল সুবোধ শান্ত বালকটি বাঁধাধরা পরিবেশের ব্যতিক্রম দেখতে পেলেন। পিছনের বেঞ্চে একতাল মাটি লুকিয়ে রাখতেন, কি শিক্ষকের কি কোন ছাত্রের মূর্তি গড়ে চলেছেন—মাথার, অবয়বের গঠন, বিশেষত্ব জ্যামিতি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি রেখে।

নিয়মের গণ্ডীতে পড়াশুনার পরিবর্তে এইভাবে সময় কাটে তাঁর।

একদিন এইভাবে মূর্তি গড়ার সময় পারিপার্শ্বিক সবকিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাঁর কাছে, খেয়ালই নেই—শিক্ষক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। শিক্ষক দেখছেন যে, মূর্তিটি তাঁরই—রাগে ফেটে পড়েন—কি স্পর্ধা দুর্বিনীত ছাত্রের।

দেবীপ্রসাদ দেখলেন এই পরিবেশ তো কিছুতেই তাঁর সৃষ্টির পিপাসা মেটাতে পারবে না—চার দেওয়ালের আবেষ্টনীর মধ্যে কল্পনার রূপদান অসম্ভব হয়ে উঠল তাঁর পক্ষে—আস্তানা গাড়লেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে—স্কুলের খুব কাছে। মাথার উপর বিরাট বিশাল অনন্ত আকাশ, সে আকাশে পাখা মেলে উড়ে চলেছে কত অসংখ্য জানা-অজানা পাখি, চারপাশে সবুজ ঘাসে সমাবেত কত গাছ কত ফুল। আনন্দে কাজ করেন দেবীপ্রসাদ। আশেপাশে অসংখ্য লোক জমতে থাকে—দেবীপ্রসাদ যেন এক অপূর্ব সাফল্যের স্পর্শ পান। হায়, অদৃষ্টে এ সুখ সইল না। কথাটা কানে উঠল প্রধান শিক্ষকের। আসামীকে ডেকে আনা হ'ল, বসল বিচার, রায় হ'ল ঘোষিত। আসামীকে টিফিনের সময় এক সপ্তাহ ক্রমান্বয় প্রকাশ্যে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কিন্তু সেই শাস্তি দেবীপ্রসাদ কি মেনে নেবার পাত্র—কিছুতেই না। তাঁর অভিজাত মন এই চরম অসম্মানে বিদ্রোহী হয়ে উঠল—তা ছাড়া মুক্তির পথও তিনি খুঁজছিলেন—সহসা প্রহরীকে একটি আঘাতে ভূপাতিত করে দেবীপ্রসাদ একেবারে সেই সুযোগে প্রস্থান করলেন—সেই স্থানে জীবনে আর কোনদিন পদার্পণ না করার সঙ্কল্প নিয়ে।

অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বাবা তাঁকে একখানি চিঠি দেখালেন—চিঠিতে প্রধান শিক্ষক তাঁর বাবাকে জানাচ্ছেন, এই অবাধ্য দুর্বিনীত বালকটির নাম তাঁদের ছাত্রতালিকার এরপরেও অন্তর্ভুক্ত করে রাখার অক্ষমতা। বাবা ছেলের সঙ্গে করলেন আড়ি। অদৃষ্টে ফল ফলল, কিন্তু শিক্ষকের রক্তচক্ষু, বেত্রদণ্ড, কঠোর শাস্তি যা করতে পারে নি—বাবার এই অসহযোগ সেখানে সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রসূ হ'ল—বাবুজীর (বাবাকে এইভাবে দেবীপ্রসাদ ডাকতেন) মনে দুঃখ হয়েছে এই নিদারুণ বেদনা সঞ্চারিত করল তাঁর মনে। দুষ্টু ছেলে লক্ষ্মী হয়ে গেল—শান্ত হয়ে গেল স্কুলে—তবে অন্য স্কুলে ভবানীপুরের সাউথ সাবার্বাণে বেশ মন দিয়ে পড়াশুনা এগোতে থাকে। দেখতে দেখতে প্রবেশিকার শ্রেণীতে পৌঁছে গেলেন—হঠাৎ নজরে পড়ল এক সার্কাসদল—দড়ির খেলা দেখিয়ে ম্যানেজারকে খুশি করে মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে ক্লাউনের চাকরি নিয়ে ঢুকে পড়লেন সার্কাসদলে। বৈচিত্র্যের অন্বেষণে। তবে এ জীবন বেশিদিনের নয় আবার তিনি মন দিলেন অধ্যয়নে—যোগ দিলেন বিদ্যালয়ে। হঠাৎ একদিন আবার তাঁকে

● দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

দাঁড়াতে হল দুর্দান্ত সহ-প্রধান শিক্ষকের ভয়ঙ্কর শাসনের সামনে। হাত পেতে নিতে হল বেত্রাঘাত, নীরবে সেই নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করে গেলেন কিন্তু হাত একবারও সরিয়ে নিলেন না। রক্ত নির্গত হতে থাকে হাত দিয়ে, প্রাথমিক ঔষধের আদেশ হয়—সঙ্গে সঙ্গে এ উত্তর দেন আহত ছাত্র—'ধন্যবাদ, প্রয়োজন হবে না'। দ্বারবানকে আদেশ দিলেন পাঠ্য বইগুলি আনতে, সকলের সামনে বইগুলি পুড়িয়ে দিয়ে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গেলেন দেবীপ্রসাদ। স্কুল-জীবনের সেইখানেই তাঁর যবনিকা।

বাড়ি এসে প্রকাশ্য স্বীকারোক্তির দ্বারা বাবাকে জানালেন যে পুরোপুরিভাবেই তিনি শিল্পী হতে চান এবং শিল্পকেই জীবনের সাধনা হিসাবে গ্রহণ করতে চান—বাবার খুব একটা সমর্থন না থাকলেও পুত্রের জীবনের উন্নতির পথে অন্তরায়স্বরূপ কোন বাধারই সৃষ্টি করলেন না। কিন্তু প্রবল বাধা এল পিতামহের কাছ থেকে, এল মাতৃকুল থেকে। বংশের ছেলে শেষে পেশাদারী শিল্পী হবে—এই নিদারুণ কলঙ্ক যে অনপনেয়—তা ভেবে রাগে দিশাহারা হয়ে যান পিতামহ। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, দেবীপ্রসাদরা পিতাপুত্রে পরিবারের অন্যান্যদের কাছে অচ্ছুত হয়ে গেলেন।

নির্ভীক দেবীপ্রসাদ একমনে পৃথিবীর সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে থাকেন আপন অভীষ্টের সন্ধানে। একলব্যের মতই দেবীপ্রসাদ মনে মনে তাঁর আপন গুরুকে বরণ করে নিয়েছিলেন

তাঁকে দর্শনের বহু পূর্বেই। একদিন সকালে দুরু দুরু বক্ষে হাজির হলেন অবনীন্দ্রনাথের সামনে। জানালেন তাঁর বাসনা। তাঁর কাজের নিদর্শন তৃপ্ত করল গুরু অবনীন্দ্রনাথকে। সেইদিন থেকেই অবনীন্দ্র-শিষ্য তালিকায় আরও একটি নাম যুক্ত হয়ে গেল—দেবীপ্রসাদ। দিকপাল গুরুর নির্দেশনায়, শিক্ষায় লাভবান হতে থাকলেন দেবীপ্রসাদ। তাঁর ছবি প্রদর্শিত হতে থাকল বিভিন্ন প্রদর্শনীতে। দেবীপ্রসাদের কাছে ধরা পড়ে গেল প্রাচ্য-শিল্প এবং পাশ্চাত্য-শিল্পের মধ্যবর্তী দুস্তর ব্যবধান। প্রাচ্য শিল্পশৈলীর সঙ্গে ততদিনে তাঁর যথেষ্ট মিতালি গড়ে উঠেছে, পাশ্চাত্য শিল্পধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বাসনা নিয়ে সুবিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর মিঃ বোয়ীর কাছে গ্রহণ করলেন পাশ্চাত্য-শিল্পশিক্ষা, গুরুকে সন্তুষ্ট করতে, তাঁর বিদ্যা নিজের দখলে আনতে কোন কাজই তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয় নি শিক্ষার্থী শিল্পীর কাছে, একদিন আকস্মিক সকালে দেখা গেল গুরুর গৃহে তালা ঝুলছে, গোপনে তিনি ভারত ত্যাগ করেছেন। অদম্য বাসনা নিয়ে সেইদিন দেবীপ্রসাদ গিয়েছিলেন তাঁর ছবি গুরুকে দেখাতে।

বাসনা অতৃপ্ত থেকে যায় দেবীপ্রসাদের। সাধ মেটে না, স্বপ্ন হয় না সফল। হঠাৎ মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার সেই মূর্তিকরকে, যার কাজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখে যেতেন দেবীপ্রসাদ, যে এক অপূর্ব শিল্পমায়ার বিস্তার ঘটেছিল তাঁর শিশুমনে, চোখের সামনে যেন নতুন দিগন্তের সন্ধান পেলেন দেবীপ্রসাদ, এক নবতর ধারার ইঙ্গিত, ভাস্কর্য বিদ্যায় পাঠ নিতে মনস্থির করলেন। লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর কাছে শিক্ষা নিতে থাকেন। ভাস্কর হিসাবে হিরণ্ময় যেমনই অসাধারণ ছিলেন তেমনই আরও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল (এমন কি তিনি যদি নিজের ছাত্রও হন) শিষ্যকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হয়। শুধু যে এইটুকুই তিনি ভালভাবে জানতেন তা নয়, অন্য শিল্পীকে যতদূর সম্ভব প্রশংসা করার ও স্বীকৃতি দেওয়ার মহৎ গুণটুকুও তাঁর মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল। বাবার মূর্তি গড়লেন দেবীপ্রসাদ। মা বললেন—'এ যেন বিশ্বের বোঝা তাঁর ঘাড়ে চড়ে আছে। আর একটু উজ্জ্বল করে করতে পার না।'

বাতিল করে দিলেন সেই মূর্তি—হিরণ্ময় এলেন একদিন, মাটিতে রাখা সেই শিরোদেশ দেখে বললেন—'এ যদি তোমার কাজ হয়, তা হলে বলব, তোমাকে শেখাবার আমার কিছু নেই, আমার কাছে তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে।'

ভাস্কর্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক অবস্থাও প্রতিকূল হতে থাকে। ঠাকুর্দা বন্ধ করলেন পুত্রের ও পৌত্রের মাসিক হাতখরচা। নিজের জন্যে নয় কিন্তু দেখলেন তাঁরই জন্যে তাঁর বাবাকেও কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে—এ বেদনা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না, ফেরিওয়ালার মত ছবি বিক্রি শুরু করলেন তিনি। তখন এইসব শিল্পকর্মের কিই বা মূল্য ছিল যা পিতা-পুত্রের আর্থিক সমস্যা ঘোচাতে পারে। চাকরীর খোঁজ করতে লাগলেন দেবীপ্রসাদ মাসের শেষে একটা নির্দিষ্ট টাকা যাতে হাতে আসে। পঁচাত্তর টাকা বেতনে এক শিল্পীর রঙ গোলার কাজে সহকারী নিযুক্ত হলেন—তাও হারাতে হল কারণ উক্ত শিল্পী দেখলেন সহকারী তাঁর তুলনায় অনেক কুশলী, অনেক শক্তিমান—এ হেন লোককে কি আর সহকারী রাখা চলে?

আশুতোষের কাছে গেলেন দেবীপ্রসাদ। সোজা বললেন যে একটি ড্রইং-মাস্টারের কাজ চাই। আশুতোষ বললেন তুমি চৌধুরী বাড়ির ছেলে না, তুমি স্কুল মাস্টার হতে চাইছ, বাড়িতে ঝগড়া করেছ বুঝি?' —মিত্র ইনস্টিটিউশানে অঙ্কন শিক্ষকের পদ তৈরি করে দেবীপ্রসাদকে দেওয়া হল। বেতন নির্ধারিত হল চল্লিশ টাকা।

তাঁর দুই বন্ধুর উল্লেখ তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যায়। সাংবাদিক জগতের নমস্য দিকপাল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায়। এঁরা উভয়েই দেবীপ্রসাদের দুর্দিনের বন্ধু। এঁরা নিজেরা তাঁর ছবি কিনেছেন। নানাস্থানে ছবি বেচিয়েও দিয়েছেন। এঁদের সেই সহায়তা কোনমতে ভোলবার নয়। আস্তে আস্তে শিল্পীর ত্রিযাম রজনী অতিক্রান্ত হতে থাকল, তাঁর ভাগ্যের আকাশের পূর্বকোণ তখন একটু একটু করে আলোকিত হচ্ছে। মাসিক পাঁচ শ' টাকা আন্দাজ তখন তাঁর আয়। শিল্পী হিসাবে যথেষ্ট সুখ্যাতি তখনই তাঁর অধিকারে এসে গেছে। এই সময়েই আমাদের বাড়িতে তাঁর পদার্পণ। তাঁকে দেখে মনে হ'ল যেন সৈনিক। তাঁর পুরুষকার অমিত শক্তির সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, বলিষ্ঠতার প্রাচুর্য আমার সারা মনে দোলা দিয়ে যায়, ১৯২৯ সালের ২৭-এ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হ'ল তাঁর সঙ্গে আমার পরিণয়। [ক্রমশ।

অনুবাদক : কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরণ

রূপশ্রী ঘোষ

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা থাক্ নির্জলা আকাশ,
রাত্রির তমিস্রা যদি মন্বন্তর আনে—
মনের মশাল জ্বেলে খুঁজি' অবকাশ
নীলাভ্রের রেখা আঁকি শূন্যতার পানে।
এ-ও জেনো স্বপ্ন এক কল্পনা বিলাস
মনের মেদুরক্ষণে বৈশাখী পূর্ণিমা—

গোলাপের রং নেই শুধু যে নির্যাস
সাহিত্যের ভোজে তার এইটুকু সীমা।
সীমার বন্ধন এই অতিক্রম ক'রে
বিহঙ্গ-হৃদয় আজ কোন্ স্বপ্ন দেখে?
নীলিমার তটিনীতে আপন স্বাক্ষরে
চেতনায় মুক্তি চায় অমৃত-নিষেকে।

বৈঠকখানা থিয়েটার

অমল মিত্র

১৮২৪ সাল।

বিখ্যাত চৌরঙ্গী থিয়েটার তখন চলছে। ১১১, বৈঠকখানায় নতুন এক নাট্যশালার দ্বারোদ্‌ঘাটন হল (২৪শে মে, ১৮২৪)। নাম বৈঠকখানা থিয়েটার (Boitaconnah Theatre)।

বৈঠকখানা অঞ্চলের ইতিকথা আজ গল্পের মত শোনাবে। বৌবাজার এবং সার্কুলার রোডের মোড়ে বিশাল এক বটগাছ ছিল। বহুকালের প্রাচীন বট। অগণিত ডালপালায় সুবিস্তীর্ণ ছায়া মেলে বহুদিন সে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ঐ কোণে। আপজন তাঁর ১৭১৪ সালে আঁকা মানচিত্রে গাছটিকে দেখিয়েছেন। তার পাশে থাকত সত্তর ফুট উঁচু এক জগন্নাথের রথ। সে যুগের কোন ধার্মিকের কীর্তিত স্মৃতি। সে রথ আজ কোথায় জানি নে। তবে আজো ওখানকার রথের মেলা প্রসিদ্ধ। কলকাতার আশপাশ থেকে ব্যবসায়ীরা এসে জড়ো হতেন ওই বটতলায়। চোর-ডাকাতের ভয়ে দলবেঁধে আসা-যাওয়া করতেন। সেই বৃক্ষরাজের ছায়ায় বসে বেচা-কেনা, লেন-দেন চলত। বৈঠক বসত। ওই পরিবেশের নাম তাই বৈঠকখানা। শোনা যায়, জব চার্নকও একদিন ওর ছায়ায় বসে তামাক টানতে-টানতে কলকাতা পত্তনের স্বপ্ন দেখেন। অনেকের মতে, অবশ্য সেটি নিমতলার দিকের একটি বটগাছ। হতেও পারে। সুতানুটি অঞ্চলেই প্রথম তিনি পদার্পণ করেন। আজ সে বটগাছ বিলুপ্ত, কিন্তু তার সুবর্ণ ঐতিহ্য বাঙালী ভোলে নি। বৈঠকখানার গাছটিও ১৭৯৯ সালে নির্মূলিত হল, বৌবাজারের রাস্তা বাড়াবার জন্যে। কিন্তু গাছ নির্মূল করল যে কুঠার, সেটা কালের কুঠার নয়। তাই বোধ হয় নাম এবং স্মৃতি এখনও অটুট আছে। কলকাতার এই অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই বৈঠকখানা রঙ্গালয়।

রঙ্গালয়গৃহের বাইরের রূপসজ্জা তেমন নয়নাভিরাম ছিল না। কিন্তু ভেতরটি ছিল সর্বাঙ্গসুন্দর। ব্যবস্থাপনা, অভিনয় সকল দিক দিয়েই। হাওড়ার একজন দর্শক 'বেঙ্গল হরকরা'র সম্পাদককে লিখেও ছিলেন সে কথা। বলেন—

'On arriving, I felt rather disappointed at the outward appearance of the Theatre, which was bot very inviting...I went in, and was highly pleased at the neat and elegant manner in which everything was fitted out...The drop-scene was beautiful and un·ivalled by anything I saw nefore.'

দমদম রঙ্গালয়ের শেষদিনে বহু যশস্বী শিল্পীই ছড়িয়ে পড়লেন বৈঠকখানা এবং চৌরঙ্গী রঙ্গালয়ে। মাধুর্য-স্বরূপিণী মিসেস ফ্র্যান্সিস বৈঠকখানা থিয়েটারে যোগ দিলেন। মিসেস কোহেনও। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অভিনেত্রী মিসেস ফ্র্যান্সিস সম্বন্ধে একজন দর্শক মন্তব্য করেছিলেন—

'I may safely say she is one of the finest ornaments to the theatre.'

এতগুলি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী সমাবেশে অল্পদিনের মধ্যেই জমে উঠল রঙ্গালয়টি। 'রেজিং 'দি উইও', 'বোম্বাসটস ফিউরিয়োসো', 'ইচ ফর হিমসেল্ফ', 'রম্প', 'দি লাইং ভ্যালেট', 'এ ট্রিপ টু ক্যালে', 'স্লিপিং ড্রাফট', 'থি উইক্স আফটার ম্যারেজ', 'দি মেয়র অফ গ্যারট', 'ব্লু ডেভিল্স', 'দি ইয়ং উইডো', 'মাই ল্যাণ্ডলেডিস গাউন' প্রভৃতি অনেক নাটকেরই সার্থক অভিনয় সেখানে হল। সংবাদপত্রের পাতাও নতুন রঙ্গালয়ের প্রশংসায় ভরে যেত। প্রায় প্রতি রাত্রের অভিনয়েরই পূর্ণ বিবরণী তাঁরা প্রকাশ করত। অভিনয়ের সমালোচনাও থাকত কাগজে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এইসব সমালোচনা বা প্রশংসা পত্রিকা-সম্পাদককে লেখা দর্শকদের চিঠিপত্রে পাই। কাগজওয়ালারা সেখানকার সুচারু অভিনয় সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করে নি। মনে হয়,

● বোম্বাইয়ের স্বনামধন্যা অভিনেত্রী শ্রীমতী সুরেখা

অনেক বিশিষ্টজনের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত অভিজাত চৌরঙ্গী থিয়েটারটির প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব ছিল। শুধু অভিনয় নয়, চৌরঙ্গী থিয়েটারের খুঁটিনাটি সকল খবরই তারা প্রকাশ করত। কিন্তু বৈঠকখানা রঙ্গালয়টি সম্বন্ধে তারা ছিল নির্লিপ্ত। যাই হোক, দর্শকদের চিঠিপত্র থেকেও বৈঠকখানা থিয়েটার সম্পর্কে কম খবর মেলে না। যেমন, একরাত্রে 'থি উইক্স আফটার ম্যারেজ' ও 'স্লিপিং ড্রাফট'-এর অভিনয় দেখে বেঙ্গল হরকরায় একজন লিখলেন,—

'অভিনয় অপূর্ব করেছেন মিসেস ফ্র্যান্সিস এবং ডিমিটির অংশে মিসেস কোহেনের অভিনয় আমাদের আশ্চর্য করেছে।···

'প্রকৃতই রঙ্গালয়ের তিনি গৌরব।' আর একরাত্রে 'রেজিং দি উইণ্ড' ও একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখে সেদিনের জনবুল পত্রিকার সম্পাদককে একজন লিখলেন—

সকলেই উঁচুদরের অভিনয় করেছেন। পেগির চরিত্রে মিসেস ফ্র্যান্সিসের অভিনয় নিখুঁত সুন্দর। আর, ডিস্টাফিনার ভূমিকায় তো তাঁর অভিনয়ে সমুজ্জ্বল হাসির জোয়ার লেগে ছিল সারা প্রেক্ষাগৃহে। অভিনয়ের কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করেন। যেমন—

'...Greater neatness in shifting the scenery is also requisite, and...a better band.'

অভিনয়রাত্রে বহু বিশিষ্ট দর্শক প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত থাকতেন। মাঝে মাঝে শিল্পীদের জন্যে বেনিফিট নাইটেরও ব্যবস্থা করতেন কর্তৃপক্ষেরা। কিন্তু, কেন জানি না, সেদিনের পুরুষ অভিনেতাদের বৈঠকখানা রঙ্গালয় তেমন আকর্ষণ করতে পারে নি। সকলেই তাঁরা চাইতেন চৌরঙ্গী রঙ্গালয়ে যোগ দিতে। সেদিনের কাগজেও এর উল্লেখ দেখি। জনবুল পত্রিকার সম্পাদককে উদ্দেশ করে দুঃখ করেই একজন লেখেন—

'I lament the very limited number of Amateurs at present apparently attached to this theatre, and among so many amateur gentlemen in Calcutta, who have borne away laurels at another theatre in the second walks of the Drama, I am surprised that some of them do not step forward to support this Thespic Band. Are they tenecious of their talent? The audience were most

জ্যোৎস্না বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ ও পরিচালক অসিত সেন—'তৃষ্ণা' চিত্রের শুটিং-এর অবসরে

respectable, and some of the first gentlemen of the settlement, who are willing to pay the tribute to merit, were in the house. Though small, the House is beautifully fitted up, and the scenery very well painted, and in my humble opinion, altogether worthy the patronage it scenes beginning to acquire....But all I hope, sir, is, that gentlemen who possess theatrical talents, will step forward to support this little House with their aid, and we may then have amusement which may in some measure suffice for the loss of that our Chowringhee Drury once afforded.'

('John Bull,' 13th July, 1824)

এ আকর্ষণের কারণ সহজেই অনুমেয়। চৌরঙ্গী থিয়েটারের জমজমাট নাম সেদিন। বড়লাট থেকে সুরু করে শহরের গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট সকলেরই যাতায়াত ছিল সেখানে। তা হলেও সমঝদার দর্শক ও সংসিদ্ধিরূপিণী অভিনেত্রীদের সমাবেশেই বৈঠকখানা থিয়েটার সেদিন খ্যাতির স্বর্ণচূড়া ছুঁয়েছিল। কিন্তু চৌরঙ্গী থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা তার পক্ষে শক্ত। তাই মাত্র ক'বছর রসিকজনদের চিত্তবিনোদন করে একদিন নিঃশব্দে তার পাদপ্রদীপের আলো নিবিয়ে দিলেন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা। কিন্তু অস্তবিলীন সূর্যের মতো তার আভা ছড়িয়ে রেখে গেল রঙ্গালয়টি ইতিহাসের পাতায়।

ভয়াল মুহূর্তের জনক অ্যালফ্রেড হিচকক্

ক্লারিজের রম্য পরিবেশে উপবিষ্ট হিচককের শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকালাম আমি, চারিধারে সজ্জিত পুষ্পাধারগুলি পর্যন্ত যেন এক গোপন রোমাঞ্চের ছোঁয়ায় মুহূর্ত বাঙ্ময় হয়ে উঠল, মনে হল যেন মুহূর্তমধ্যে প্রাণ পেয়ে আক্রমণোদ্যত হয়ে উঠতে পারে তারা; রুদ্ধপ্রায় স্বরে সম্মুখস্থ মূর্তিটিকে প্রশ্ন করে বললাম; স্মরণ করতে অনুরোধ করলাম সেই স্মরণীয় ক্ষণটিকে, যখন তিনি সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেছিলেন ভয়াল রোমাঞ্চের ভয়াবহ বিন্যাসে।

১১২৬ সালে প্রথম রোমাঞ্চকর ছবি তুলতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম আমি, ছবিটির নাম 'দি লজার।'

সাধারণত বীভৎসতা প্রদর্শনের উদ্দেশে রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে আগ্রহী নই আমি, আমার উদ্দেশ্য দর্শকের সামনে একটা পরিবেশ উপস্থাপিত করে ছেড়ে দেওয়া, যাতে বাকিটা তাঁরা নিজেরাই কল্পনা করে নিতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, সাইকোর সেই স্নানাগারে হত্যার দৃশ্যটির কথা স্মরণ করুন, প্রায় পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডব্যাপী সেই দৃশ্য বাহাত্তরটি বিভিন্ন চিত্রাংশ একত্র গ্রথিত হয়েছিল, অথচ চিত্রায়িত করার সময় একবারের জন্যও কোন নারী-দেহের কাছে কোন ছুরিকাকে নিয়ে যাওয়া হয় নি।

নায়িকাকে প্রথম সম্পূর্ণ চিত্রটি প্রদর্শন করার সময় দেখেছি ভীতি-বিহ্বলা হয়ে উঠতে কারণ চিত্রগ্রহণের সময় তার সামগ্রিক রূপায়ণ সম্বন্ধে কোন ধারণা ঘটবারই অবকাশ ছিল না।

বিভিন্ন ভঙ্গিমায়—অঞ্জনা ভৌমিক্

'রিয়ার উইণ্ডো' নামক ছবিটিতে জেমস স্টুয়ার্টকে জানালার মধ্য দিয়ে ঠেলে ফেলে দেওয়ার দৃশ্যটি আমি গ্রহণ করেছিলাম কয়েকটি ক্লোজ-আপের মাধ্যমে। একটি পা, একটি হাত ও একটি মাথার ক্লোজ-আপ নিয়ে সেগুলো যুক্ত করেছিলাম, আর তাতেই ফল হয়েছিল বৈদ্যুতিক।

ভয়াল ও রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের স্রষ্টা হিসাবেই যে শুধু হিচকক্ প্রসিদ্ধ তা নয়, রোমান্টিক চিত্র নির্মাণেও রয়েছে তাঁর অবিসংবাদী নৈপুণ্য।

'যৌন আবেদনকে সস্তা প্রদর্শনী করে তুলি নি আমি কখনও' —মন্তব্য করলেন তিনি।

—যৌনতাকে আচ্ছাদিত অবস্থায় রাখাটাই আমার মতে প্রকৃষ্ট পন্থা, কারণ, সবকিছুর মত ওটাও আবিষ্কারসাপেক্ষ।

আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে গল্পকে টেনে নিয়ে যেতে না পারলেই, যৌন-আবেদনের স্থূল প্রকাশ প্রয়োজনীয়। আমি সে ধরণের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে উৎসুক নই। আজকের দিনের বেশির ভাগ ছায়াচিত্রই বাক্যরত কয়েকটি নর-নারীর চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

হিচকক্ লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন ও সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষা সমাপ্ত করেন। স্থপতি বিদ্যা ও শিল্পকলা-বিদ্যা অধ্যয়ন করেছেন তিনি সেখানে, তাঁর মতে ছায়াচিত্র নির্মাণে এই উভয়বিধ বিদ্যাই প্রয়োজনীয়।

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে

প্রাকৃতিক পরিবেশে—শর্মিলা ঠাকুর

চিত্রনাট্য রচয়িতা, শিল্পনির্দেশক ও আলোকসম্পাত-শিল্পীর পদে যথাবিহিত নিপুণতায় কাজ করার পর পরিচালকরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। বৃটিশ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিতেই শুরু হয় তাঁর চিত্রজগতের কর্মজীবন।

বর্তমানে ডাফ্‌নি-দ্যু মরিয়রের বিশিষ্ট গ্রন্থ, 'দি বার্ডস'-এর চিত্ররূপ নির্মাণে ব্যস্ত আছেন তিনি। হিচকক্‌এর মতে তাঁর এই নির্মীয়মাণ চিত্র বিশেষভাবেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন করে আনবে।

বর্তমান জগতের বহু চিত্র-নির্মাতা হিচকক্‌এর দ্বারা অনুপ্রাণিত, প্রকৃতপক্ষে চিত্রজগতের সামনে অ্যালফ্রেড হিচকক্ আজ আর শুধু একটি নামমাত্র নয়, এক নতুন জগতের উদ্‌গাতা, এক বিচিত্র অনুভূতির জনক।

সামনের পাত্র থেকে বক্তাভ একটি আপেল তুলে নিয়ে কামড় দিলেন তিনি, চোখের দৃষ্টি সটান হয়ে রইল, চিবোনোর সশব্দ কিন্তু আওয়াজে খণ্ডিত হল কক্ষমধ্যস্থ নৈঃশব্দ।

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল তীক্ষ্ণসুরে, দৃঢ় সবল পদক্ষেপে প্রায় ভয়ালভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন তিনি সেদিকে।*

---

* বিদেশী সাময়িক পত্র থেকে সঙ্কলিত।

আরোহী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী বনফুল রচিত দু'টি গল্প অবলম্বনে 'আরোহী' চিত্রটি রূপ নিয়েছে। একটি মহৎ মানুষের জীবনের অবিরাম সাধনাই ছবিটির উপজীব্য। জমিদারী আমলের পটভূমিতে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। নায়ক অর্জুন মণ্ডল সততার এবং অধ্যবসায়ের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। ক্ষুদ্র বাতায়নের মধ্যে দিয়ে এক বিরাট বিশাল আকাশকে তার প্রাণভরে প্রত্যক্ষ করার স্বপ্ন ও সাধনার বিচিত্র কাহিনীই এখানে পরিবেশিত হয়েছে অতীব দক্ষতা সহকারে। শক্তিমান পরিচালক তপন সিংহের প্রতিভার সজীবতায় এবং চিন্তাধারার সারবত্তায় ছবিটি বৈশিষ্ট্যের ছোঁয়ায় ভরপুর হয়ে উঠেছে। কাহিনী গ্রন্থনে, বিন্যাসে, পরিবেশ গঠনে তপন সিংহ যে অনন্য নৈপুণ্যের ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবিটি দর্শকের হৃদয়ে দাগ রেখে যায় এবং সুষ্ঠু পরিচর্যায় ও রসের যথাযথ সঞ্চারে সর্বতোভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয়-প্রতিভার আর একবার পরিচয় পাওয়া গেল। বিকাশ রায়, শিপ্রা মিত্র, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, চোলনচাঁপা দাশগুপ্তের অভিনয়ও চিত্তস্পর্শী এবং তাঁদের শক্তির পরিচায়ক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরযোজনাও বিশেষ উল্লেখের দাবীদার।

বলাকা মহিলা সঙ্ঘ কর্তৃক অভিনীত 'পথের দাবী'র মহিলা শিল্পিবৃন্দ

মহিলাদের নাট্যপ্রয়াস : পথের দাবী

কলকাতার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 'বলাকা মহিলা সঙ্ঘ' অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানটি দক্ষিণ কলকাতার সম্মানিত পরিবারের মহিলাদের নিয়ে রূপ নিয়েছে। সম্প্রতি এই সঙ্ঘের উদ্যোগে অভিনীত হল শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র নাট্যরূপ। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দেন সর্বশ্রীমতী উষসী বসু, মীনাক্ষী গোস্বামী, ভারতী দাশগুপ্ত, পুষ্প ঘোষ, প্রতিমা দাশগুপ্ত, অর্চনা চৌধুরী, স্মৃতি বসু, সাধনা বসু, সাধনা কীর্তি, অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমেলি কীর্তি, শর্বাণী রায়, গীতা সেনগুপ্ত, অর্চনা রায়, বেলা সরকার, নূপুর গুপ্ত, মনিমঞ্জরী ঘোষ, প্রণতি ভট্টাচার্য, নন্দিতা বসু, গীতা সেন, আরতি ঘোষ, উমা মুখোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে সব্যসাচী, অপূর্ব, সুমিত্রা ও ভারতীর ভূমিকায় যথাক্রমে মীনাক্ষী গোস্বামী, ভারতী দাশগুপ্তা, প্রণতি ভট্টাচার্য ও নন্দিতা বসুর অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর ও শক্তির পরিচায়ক। অন্যান্য শিল্পীরাও যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন ও তাঁদের চরিত্রায়ণ সার্থকতার স্পর্শে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। মহিলাদের প্রচেষ্টায় এই দুরূহ ও সাড়া জাগানো নাটকটির সুষ্ঠু ও চিত্তাকর্ষক অভিনয় দর্শকচিত্তে দাগ রেখে যায়। এই প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন এঁদের অবশ্য প্রাপ্য।

সাধক কবি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার উদ্যোগে সম্প্রতি 'মহাজাতি সদন' মঞ্চে নিবেদিত হল 'সাধক-কবি'। শঙ্করাচার্য থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতের সাধক-কবিদের জীবনী এই নৃত্যনাট্যটির উপজীব্য। ভারত মহাপুরুষদের লীলাভূমি। যুগে-যুগে কত মনীষীর, সাধকের, স্রষ্টার পবিত্র পদরজে ভারতের মাটি ধন্য হয়েছে, তার তুলনা পাওয়া যায় না। এই পটভূমিতে রচিত নৃত্যনাট্য তার উৎকর্ষে এবং বৈশিষ্ট্যে যথেষ্ট উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সাধক কবিদের পুণ্যজীবন অপূর্ব কুশলতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। একটি অনুষ্ঠানে চণ্ডীদাসের, জয়দেব, মীরাবাঈ, কবীর, রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, রবীন্দ্রনাথের পদাবলী, দোঁহা, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত এবং গানগুলি শ্রোতৃবর্গ শোনার সুযোগ পেয়েছেন। নৃত্যাংশ সুপরিচালিত, গানগুলি সুগীত এবং অভিনয় অনবদ্যতার পরিচায়ক। নৃত্য-নাট্যটির রচয়িতা নরেশ চক্রবর্তী। প্রতিটি শিল্পীর কাজ যথেষ্ট প্রশংসার দাবীদার। সামগ্রিকভাবে এই প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সার্থক এবং বিপুল অভিনন্দনের দাবী রাখে।

সংবাদ বিচিত্রা

কলকাতার স্টুডিও-ল্যাবরেটোরির কর্মী ও কুশলীদের নিম্নতম পারিশ্রমিককে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যে জটিলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি তার অবসান হয়েছে। মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্টে নির্ধারিত অঙ্কটি কর্তৃপক্ষ মেনে নেওয়ায় বিভিন্ন স্টুডিও ল্যাবরেটারিগুলি থেকে বিক্ষোভের মেঘ সরে গেছে, এই কারণে যে ধর্মঘটটি আশঙ্কিত হয়েছিল তারও মূলোচ্ছেদ ঘটেছে। পারস্পরিক সহযোগিতার পরিচায়কস্বরূপ মালিকপক্ষের এই ব্যবস্থা গ্রহণ শুধু কর্মী ও কুশলীমহলেই নয়, সাধারণ চিত্রামোদীসমাজেও যথেষ্ট আনন্দের সঞ্চার করেছে।

বোম্বাইয়ে সংঘটিত যে সাম্প্রতিক ঘটনাটি সারা ভারতের জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে—বোম্বাইয়ের চিত্রতারকাদের গৃহে অতর্কিত সরকারী হানা। এই হানায় বে-আইনীভাবে সংরক্ষিত সর্বসমেত প্রায় চল্লিশ লক্ষ নগদ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা, সোনা এবং মাদকদ্রব্যাদি উদ্ধার হয়েছে। সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক টাকা পাওয়া গেছে মালা সিনহার বাড়িতে। তাঁর বান্দ্রাস্থ ভবনে নগদ কুড়ি লক্ষ টাকা, বত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের চার শ' স্বর্ণমুদ্রা, কিছু বর্মী মুদ্রা, কয়েক বোতল সুরা ও দু'টি ট্রান্সিস্টার পুলিশের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সমগ্র অভিযানটির নেতৃত্ব করেন বোম্বাইয়ের ডেপুটি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টার শ্রী এস জি সহস্রভোজন। যে সব শিল্পীদের গৃহে এই অভিযান চালানো হয়, তাঁদের নাম—রাজকাপুর, বৈজয়ন্তীমালা, রাজেন্দ্রনাথ, মালা সিনহা, প্রেমনাথ, বীণা রায়, সুরকার শঙ্কর এবং রবি।

সাধারণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে যে, ফিল্ম ফাইনান্স করপোরেশন সংক্রান্ত যে প্রশাসনিক দায়িত্ব এ যাবৎ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের উপর ন্যস্ত ছিল, বর্তমানে সেই ভার অর্পিত হয়েছে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার-মন্ত্রকের প্রতি।

পাকিস্তান ফিল্ম ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে পাকিস্তানে যে চিত্রমেলার আয়োজন চলছে, তাতে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান ভারতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ মডার্ন ক্লাসিক্স—এই শিরোনামায় ১১ই নভেম্বর থেকে লাহোরে, করাচীতে এবং ঢাকায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। ঐ মেলায় একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্র এবং একটি শিল্পী এবং/অথবা পরিচালকদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতেও ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জনপ্রিয় চিত্রতারকা দিলীপকুমার বর্তমানে ফিল্ম প্রোডিউসার্স গিল্ড অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতির আসনে সমাসীন। মেহবুব খাঁর মৃত্যুর পর ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার এক্সপোর্ট করপোরেশানের পরিচালকমণ্ডলীতে তাঁর শূন্য আসনে দিলীপকুমারই মনোনীত হয়েছেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ছায়াছবির চাহিদা সম্পর্কে সবিশেষ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে যে ভারতীয় প্রতিনিধিদলটি এ্যামেরিকা যাত্রা করছেন, সেই তালিকায় দিলীপকুমারের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শিল্পী এবং প্রযোজক হিসাবে সুনীল দত্ত আজ যথেষ্ট জনপ্রিয়তার অধিকারী। পরিচালক হিসাবেও এবার তাঁর পদক্ষেপ শুরু হচ্ছে।

● মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত 'দিনান্তের আলো'র সেটে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও ধ্যানমগ্ন

সুনীলের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান অজন্তা আর্টসের তৃতীয় অর্ঘ তাঁরই পরিচালনায় রূপ নেবে। ছবিটির গঠনকল্পনায় তাঁর স্রষ্টা এক অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বৈশিষ্ট্যে এবং বৈচিত্র্যে ছবিটি অতুলনীয় হয়েই দেখা দেবে। সমগ্র ছবিটি মাত্র একটি সেটে গড়ে উঠবে—চিত্রজগতে এ ঘটনা অবশ্য প্রথম নয়, তবে সমগ্র ছবিতে একজন মাত্র শিল্পী—এ অবশ্যই অভূতপূর্ব ঘটনা এবং তা এই ছবিতে ঘটল। প্রযোজক-পরিচালক সুনীল দত্তই ছবিটির একমাত্র শিল্পী। ছবিটির কাজ শুরু হয়েছে—এর কাহিনী রচনা করেছেন শিল্পীজায়া—এককালের দর্শকসমাজে জনপ্রিয়তার শীর্ষে সমাসীনা শ্রীমতী নার্গিস।

ওয়াজিদ আলী শাহ—ভারতীয় ইতিহাসের এক যুগসন্ধির স্মরণীয় চরিত্র। অযোধ্যার এই শেষ নবাবের কাহিনী অবলম্বনে উদ্যোগী হয়েছেন বোম্বাইয়ের পুষ্প পিকচার্স। পরিকল্পিত ছবিটির নামকরণ হয়েছে—সাম-এ-ঔধ। বিশিষ্ট তারকা শ্রীমতী মীনাকুমারী প্রধান স্ত্রী-চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

সুপ্রসিদ্ধা মিশরীয় তারকা জোহরা গামাল সম্প্রতি কায়রো থেকে বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছেছেন। অল ইণ্ডিয়া পিকচার্সের প্রযোজনায় নির্মীয়মাণ 'সিন্দবাদ, আলিবাবা এবং আলাদিন' ছবিটির অন্তর্ভুক্ত দু'টি নাচে অংশগ্রহণ করার জন্য জোহরার ভারতে আগমন। তাঁর নেতৃত্বে বাইশটি স্থানীয় নর্তক-নর্তকীর সমন্বয়ে সমগ্র নৃত্যটি রূপ নেবে।

● অমল দত্ত পরিচালিত 'অশ্রু দিয়ে লেখা' চিত্রে
—অসিতবরণ ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস

● বোম্বাইয়ের লাস্যময়ী অভিনেত্রী—শ্রীমতী নাজ

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি রামমোহনের মহিমান্বিত জীবনী অবলম্বনে বিজয় বসুর পরিচালনায় ও অরোরার প্রযোজনায় যে ছায়াচিত্রটি রূপ নিচ্ছে, তার বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন জহর গাঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, অজিতবরণ, বসন্ত চৌধুরী (নাম ভূমিকায়), কালী সরকার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, বাসবী নন্দী, ছন্দা দেবী প্রমুখ শিল্পিবর্গ।

কথাশিল্পী সমরেশ বসুর গল্প অবলম্বনে আলোর ফেরা ছবিটি রূপ নিচ্ছে। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন বিকাশ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, রবি ঘোষ, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, অরুন্ধতী দেবী, সুমিতা সান্যাল প্রমুখ তারকাবৃন্দ।

প্রথিতযশা সুরকার শ্যামল মিত্রের প্রযোজনায় নির্মীয়মাণ 'রাজকন্যা' ছবিটির কাহিনীকার ঋত্বিক ঘটক। রূপায়ণের ভার অর্পিত হয়েছে উত্তমকুমার, শেখর চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রা দেবী, রীণা ঘোষ প্রমুখ অভিনেত্রীবৃন্দের প্রতি।

নেপালীচিত্র 'মাইতি ঘর' সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে সংবাদ, সেটি এই প্রচেষ্টার সঙ্গে স্বয়ং নেপালাধীশ মহেন্দ্রের সংযোগ। প্রযোজক বা পৃষ্ঠপোষক হিসাবে নয়, গীতিকার হিসাবে রাজা মহেন্দ্র এই প্রচেষ্টায় নিজেকে যুক্ত করেছেন। ছবিটিতে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হচ্ছেন মালা সিনহা—এ তথ্য অনেকেরই সুবিদিত যে, মালা ব্যক্তিজীবনে নেপালেরই মেয়ে।

বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার আর্থার মিলারের 'আফটার দ্য ফল'-এর চিত্ররূপে নায়িকা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তেত্রিশ বছর বয়স্কা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেন। অনেকের দৃঢ়ধারণা যে, মিলার তাঁর প্রাক্তন সহধর্মিণী হলিউডের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না আর একটি তারকা স্বর্গতা মেরিলিন মনরোকে কল্পনা করে ঐ চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রটিতে মেরিলিনই আগাগোড়া লক্ষিতা হচ্ছেন। সেই অনুসারে বলা যায়, অতুলনীয়া মেরিলিনের চরিত্রে দেখা যাবে অতুলনীয়া সোফিয়াকে।

● অগ্রদূত পরিচালিত 'জতুরালে'র সেটে বিকাশ রায়, সন্ধ্যা রায় ও পরিচালক বিভূতি লাহা

এই সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী বীরেন ধর, মোনা চৌধুরী।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নমিতা চক্রবর্তী

প্রথমে গলা শোনা গেল অরুণের। তিন বন্ধুই তাকাল সামনের পরী-মহলের দিকে। জীবন—উত্তপ্ত জীবন ফুটছে ওখানে। ব্যাক-ডেটেড, অনাধুনিক হবার প্রশ্নই নেই ওখানে।

—'না। ওদের মত একটুও নয় তপতী।' স্বীকার করল ভাস্কর।

—'তবে?'

—'তবে আবার কি? ওর সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে যাবার প্রশ্ন তুলছ কেন? হতেও তো পারে তোমাদের কুইনকে লোকজনের ঘোমটা দিয়ে বৌ বানিয়ে দেব আমিই।'

হাসল তিনটি যুবক, তার মধ্যেও আনমনা দেখা গেল প্রবীরকে।

—'যাচ্ছ কোথা?' প্রস্থানোদ্যত অরুণাংশুকে জিজ্ঞেস করল ভাস্কর।

—'কুইনের সম্বন্ধে তোমার ভবিষ্যৎ দুরাকাঙ্ক্ষাকে শাসন করবার জন্য ফেনসিং শিখতে।' হাসতে হাসতে চলে গেল অরুণ, যেখানে লিলির পিয়ানোর উপর ঝুঁকে রয়েছে দিল্লীলাল। ভাস্কর মন দিল প্রবীরের প্রতি—'কি ভাবছ?'

—'ভাবছি?' আবছা হাসল প্রবীর। 'ভাবছি আমার নিজের কথা।'

—'ইন্টারেস্টিং! বলবে নাকি ভাবনাটা?'

—'শোন ভাস্কর! জয়ন্তীর কথা শুনবার পর হতেই নিজের কথা ভাবছি আমি। ও সর্বদা বলে—তুমি কে? বিমান বোসের ছেলে ছাড়া আর যে পরিচয় আছে তোমার তাই বল আমাকে। একজন মানুষকে, স্বাধীন মানুষকে বিয়ে করতে চাই আমি—কোন বড়লোকের ছেলেকে নয়। অবশ্য এতদিন ওর কথায় তেমন মন দিই নি। ভেবেছি—ওর অতিরিক্ত সাবধানী মনের ভবিষ্যৎ ভাবনা—এসব। কিন্তু আজ তোমার কথায় নিজেকে প্রথম ভাল করে দেখতে পাচ্ছি আমি। আমার নিজের বলে কোন পরিচয় নেই।'

—'ডোন্ট, বি সেন্টিমেন্টাল। ও-সব ভাবনা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে, কাজে লেগে যাও।'

—'কাজ! জান তো আট বছর ও-দেশে কাটানোর ইতিহাস? ম্যাওলা জোগাড় করেছি দু' হাত ভ'রে। কোয়ালিফিকেশন—নীল্।'

—'সাব-কনট্রাক্ট নেবে? ক্যাপের? বিশেষ টাকার দরকার নেই কেবল খাটতে হবে খুব, আর উন্নাসিক মনটাকে কাজের করে তুলতে হবে।'

—'কে দেবে আমায় সাব-কনট্রাক্ট?'

—'লোক আছে দেবার। শৈলেন রায়। তারপর চুনোরিয়া তো তোমার বাবার বন্ধুই।'

—'না:, আর বাবাকে নয়।'

—'দূর পাগল! ও তো আমাদের জন্মসূত্রে পাওয়া অধিকার। ছাড়বে কেন দাবী? বাই দি বাই। সত্যি বিয়ে করছ জয়ন্তীকে?'

—'সত্যি। অবশ্য যদি জয়ন্তী রাজী হয়।'

—'সে কি! রাজী হবে না কেন? সবাই তো বলছে ওই অ্যাডভান্সড্।'

—'সবার মত তুমিও ভুল কর না।' ভাস্করের হাত ধরল প্রবীর।—'জয়ন্তী যদি কিছুর লোভে আমার কাছে এগিয়ে আসতো, কয়েক গ্যালন পেট্রল পুড়িয়ে—কিছু দামী প্রেজেন্ট, হোটেলে খাওয়া—শেষ করে দিতাম স্পোর্ট। ও অপূর্ব। ওর মত কেবল আর একটিমাত্র মেয়ে দেখেছি আমি—সে আমার বোন লিলি।'

—'হ্যালো ভাস্কর! উইশ ইওর গুড লাক।' সামনে দিল্লীলাল।

—'সেইম টু ইউ! কবে ফিরলে?'

—'ফিরেছি গত সানডেতে। ক্লাবে আসি নি? আর বোল না ভাই। দিল্লী সিটে একদম রোস্ট হয়ে গেছি। হেঃ! রংটং একটু তাজা না করে আসতে পারিনি। নাউ, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? সবাই বলছে মিত্র কোম্পানী কাজ পাচ্ছে?'

—'তুমি কি বল?' জিজ্ঞেস করল ভাস্কর।

—'আমি? দেখ ভাই, তুমি কাজটা পেলে বাবুজি আমার উপর নারাজ হবেন কিছুটা। ইন্এফিসিয়েন্ট বলে গালাগালিও করবেন ওপেনলি। কিন্তু আমার কিছু মনে হবে না। এতদিন কাস্বীদাস পেয়েছে, এবার নয় ত' সুমোহন মিত্র পেল।'

হাসতে হাসতে চলে গেল দিল্লীলাল।

—'দিল্লীটা ওর বাবার মত নয়। ছোটবেলা হতেই ও অন্যরকম। মনে নেই তোমার ভাস্কর?'

—'হ্যাঁ। আর ওদের গ্রোইং জেনারেসনের আউটলুকও ব্রড।' প্রবীরের কথায় উত্তর দিল ভাস্কর।

—'প্রবীর নামটা অলক্ষুণে'। জয়ন্তীর চুলের গোড়ায় শক্ত হাতে

ফিতে বাঁধতে বাঁধতে য় দিলেন ঠাকুমা। ক'দিন একটানা বৃষ্টির পর আলোর ঝলক। ঠাকুমার মনটাও খুশি আছে, চুল বাঁধছেন বড় নাতনীর। মেয়ের ঘন একরাশ চুল, যত্ন কই তেমন। না সময়ে তেলটুকু, না টুকু! বড় আদরের প্রথম পৌত্রী। চোখে চোখে, বুকে বুকে রেখেও আশ মিটত না, আর এখন দিনরাত গালমন্দ। দোষ? দোষ কিছু করে নি জয়া। মেয়ে-সন্তান, বয়স হয়েছে। বিয়ে দিতে পারছো না তোমরা, নিজেই বর যোগাড় করে নিয়েছে। দোষটা কোথায়? হামেশা হচ্ছে এসব আজকাল। হতো আগের দিনেও। শাস্ত্রে আছে কত কুমারী কন্যে বেছে নিয়েছে নিজের বর। আর বর তো ভালই বেছেচে জয়া। রাজপুত্রের মত বর। একটু খুঁত-খুঁতানি ঐ নামটা—অলক্ষুণে, অল্পায়ু নাম।

—'ওমা! ঠাকুমা বলছ কি? কি সুন্দর নাম 'প্রবীর'। হাতের আকারে জিভ ঠেকালে মীরা।

—'সুন্দর হলে কি হয়। রাখতে নেই ওসব নাম। দেখিস না সীতা—অমন সুন্দর নাম, কিন্তু রাখে না কেউ। জনম-দুখিনী মেয়ে যে।'

—'প্রবীরও জনম-দুখী ছিল বুঝি?'

—'জনম-দুখী নয় রে, অল্পায়ু। প্রবীরের গল্প জানিস না তো। কপাল! জানবি কোথা হতে! না পড়লি রামায়ণ-মহাভারত, না শুনলি কথক ঠাকুরের কথকতা। জানবি কি করে এমন সব গল্প!'

—'প্রবীরের গল্পটা দিদিকে শুনিয়ে দাও না দিদু! দেখছ তো কেমন তাকাচ্ছে!'

ঝুঁকে মীরার হাঁটুতে চড় লাগালো জয়া। টান পড়ল চুলে—'উঃ ঠাকুমা! ব্যথা।'

—'আহা! ব্যথা! নিজেই তো মাথা নাড়ছিস্ বারবার, আর কি জটই পড়েছে চুলে। কেবল সামনাটুকু আঁচড়ে স্কুলে যাস। সামনা পরিপাটি!'

সম্মুখ চিক্কণ দন্তের ঝি
সাজছ গুজছ নাইছ নি?

তোদের হচ্ছে সেই বিত্তান্ত।

—কত যে ছড়া আছে দিদু তোমার ভাঁড়ারে। হাসল দুই মেয়ে।

—'থাকবে না? আমার জেঠামশাই যে প্রসন্ন কাব্যতীর্থের শিষ্য ছিলেন,—কথকতাবিশারদ প্রসন্ন কাব্যতীর্থ। কত শুনেছি ছড়া, পাঁচালী। আজকালের মেয়ে তোরা—কলেজে পড়ে বিদুষী। আমাদের সময় কি ছিল এত ইস্কুল কলেজের ছড়াছড়ি? ঐ রামায়ণ মহাভারত আর কথকতা।'

—'আমরা কত মজার গল্প পড়ি।' ঠাকুমার কাছে এসে পা ছড়িয়ে বসল এগার বছরের রুণু। জানে এক্ষুণি গল্প বলবেন দিদু, আর কি সুন্দর সে গল্প! শুনতে শুনতে ইচ্ছে করে রুণুর—কেয়ূর অঙ্গদ পড়ে সেও গল্পের মানুষ, ছবির মানুষ হয়ে যাবে।

—'পড়িস ত' বিলেতের মেমসাহেবের গল্প। বাঙালীর মেয়ে আর রইলি কই তোরা! মাঘমণ্ডলের ব্রত করে ফুল-দূর্বার গুছিতে সূর্যের ঘুম ভাঙালি না, ক্ষীরের নাড়ুর ঘুষে যমকে খুশি করে করলি না যমপুকুর। স্রোতের জলে নাইলি কি একদিন? আম-কাঁঠালের বাগানে আর 'উড়কি ধানের মুড়কি' ছড়ার মধ্যেই রয়ে গেল, স্বোয়াদ পেলি না তার।'

—'তা হোক এখন তুমি প্রবীরের গল্পটা বল। দিদি শুনতে চাইছে।' বলল মীরা।

—'বললাম না অলক্ষুণে গল্প!'

—'হোক। দুগ্‌গা, দুগ্‌গা বিপদনাশিনী বলে, দোষ কাটিয়ে নেব। বল তুমি গল্প।' সাগ্রহে ঠাকুমার গা ঘেঁষে বসল রুণু।

শাড়ির আঁচলে তেষট্টি বছরের কুঁচকান মুখ মুছে মীরার ঠাকুমা,—সেই বিখ্যাত কথকতাবিশারদের শিষ্যের ভাইঝি, নাতনীদের প্রবীরের গল্প শোনাতে বসলেন—

মাহেশ্বতী পুরীতে অশান্তি আরম্ভ হয়েছে। রাজপুত্র প্রবীর এক ঘোড়া ধরে এনেছে। যে সে ঘোড়া নয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির,—সেই যজ্ঞের ঘোড়া। পাণ্ডুপুত্র? একাদশ অক্ষৌহিণীপতি দুর্যোধনকে নির্মূল করে তিনি সিংহাসনে বসেছেন, নিত্য তাঁর সহায় নররূপে নারায়ণ, লক্ষ্মী সেবা করেন রমণীমূর্তিতে।

—সেই যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব। সমস্ত পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘোড়া। কেউ ছুঁতেও সাহস করে নি, তার রক্ষক যে কৃষ্ণার্জুন।

প্রবীর কিন্তু ভয় পায় নি। কেন ভয় পাবে সে? সাক্ষাৎ অনলরূপিনী রাণী জনার গর্ভে, জননী জাহ্নবীর আশীর্বাদে জন্ম তার। শিরায় শিরায় অমিতবীর্যস্রোত তরুণ কুমারের। নরনারায়ণকে ভয় নেই তার। ঘোড়ার কপালের জয়পত্র তুচ্ছ করে ঘোড়াকে বেঁধেছে প্রবীর। বাপ কাঁপছেন, কৃষ্ণভক্ত বাপ। মায়েরও ইচ্ছা ঘোড়া ফিরিয়ে প্রবীর বন্ধু হোক পাণ্ডবের।

অভিমান হল প্রবীরের। বীরের অভিমান। ক্ষোভে গলা রুদ্ধ, কপালে ঘনাল রক্তিম রোষাবেশ। জানতে চাইল মায়ের কাছে—গঙ্গা কি তাঁকে কাপুরুষ পুত্র 'বর' দিয়েছিলেন। বলল কুমার, যদি ঘোড়া ফেরাতে হয়, সেও রাজ্যপাট ছেড়ে হবে নিরুদ্দেশ। হীনবীর্য ক্ষত্রিয়কুলের গ্লানি হয়ে রাজার মুকুট মাথায় পরতে পারবে না প্রবীর।

জনা বুঝলেন সব। স্বামীকে সম্মত করলেন, একত্র করলেন সৈন্যদল। যুদ্ধ বাঁধলো। ভয়ানক সে যুদ্ধ। মাকে প্রমাণ করে যুদ্ধযাত্রা করলে দেব-নরের অসাধ্য প্রবীর। কৃষ্ণভক্তকে রক্ষা করবার জন্য ছল করলেন। অস্ত্র হরণ করা হল। মাকে প্রণাম করতে পেল না ছেলে যুদ্ধে যাবার আগে। যেমন করে কর্ণকে হতবল করেছিলেন, তেমনি হতবল করে একরকম অন্যায় যুদ্ধেই প্রবীরকে মেরে ফেলা হল।

—'বুঝলি তো কেন প্রবীর নাম অলক্ষুণে?'

—'প্রবীরের গল্পটা কিসে আছে দিদু? রামায়ণ না মহাভারতে?' রুণু জানতে চাইলে।

—'বলেছি যুধিষ্ঠির পাণ্ডবদের কথা। রামায়ণ হয় কি করে?' বিরক্ত হলেন ঠাকুমা।

—'সত্যি, রুণুটা একেবারে হাঁদা।' রুণুকে চোখ টিপল জয়া।

—'তোরাও কম হাঁদা নোস। প্রবীরের গল্প জানিস না। মহাভারত নয়ত পড়িস নি, পড়িস নি গিরিশ ঘোষের নাটক—'জনা'? কি যে লেখাপড়া করিস, তোরাই জানিস। কত সুন্দর সব বই ছিল আমাদের কালে,—পলাশীর যুদ্ধ, বৃত্রসংহার।'

—'দাদু বুঝি তোমাকে সব বই কিনে দিতেন ?' মীরা জিজ্ঞেস করল।

—'দিতেন তো। আমি তখন দিঘলী, দেশের বাড়িতে থাকতাম। উনি ছুটিতে বাড়ি যাবার সময় কত বই কিনে নিয়ে যেতেন। দুপুর বেলা কাঁঠালবীচি পোড়া আর নুন নিয়ে বসতাম যত ঝি-বৌ। হরুদিদির পড়া বড় সুন্দর ছিল, সেই পড়ত, আমরা সব শুনতাম।'

সেই পুরানো দিনগুলির স্মৃতি বিমনা করে দিল ঠাকুমাকে। ঘোলাটে চোখ মেলে তিনি সামনের একচিলতে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন একটু সময়, তারপর উঠে পড়লেন—সলতে নেই একটাও।

ভাবতেই অবাক লাগে, মনে মনে বলল মীরা—অল্পবয়সের দিদু, কবিতার, গল্পের বই, কাঁঠালবীচি পোড়া! অবিকল তাদের মত। কেবল তারা কাঁঠালবীচির বদলে ডালমুট খাচ্ছে আর পড়ছে—উঁহু, কবিতার বই পড়ে না তারা। উল্টোরথ হতে সুরু করে বাংলা নভেল সব, আর ইংরেজী নভেলও কিছু কিছু পড়ছে তারা। কিন্তু মনে করে রাখবার মত চোখে জল আসবার মত বই কি পড়ে? দিদুর মত গলা বন্ধ হবে আবেগে বই পড়ে? না। হতেই পারে না। পৃথিবী এখন পলকে পলকে রং বদলাচ্ছে। মানুষের মিছিল চলছে দ্রুতগতিতে, বইয়েরও। একটি বই, কয়েকটি বই মনে রাখবার সময় নেই কারো। একজন যা বলল তা ধীরে-সুস্থে মনে বসাবার অবকাশ আছে কি? বইয়ের মিছিলে হারিয়ে যায় যে সব ভাবনাগুলো একাকার হয়ে।

—'বুঝলি দিদি! ঠাকুমার জন্য সামনের মাসে দু'টো বই কিনে আনব, তাঁর সেকালের বই।'

হাঁটুর উপর থুতনি ঠেকিয়ে কি ভাবছিল জয়ন্তী, একটু চমকাল। দূর! ও সব বই কি পাওয়া যায় আজকাল?'

—'যায়, নূতন করে প্রকাশ করা হচ্ছে।'

—'কি মজা!' হাততালি দিল রুণু—'আমরাও পড়ব। রামায়ণ কিনো মেজদি'।'

হঠাৎ মীরার মনে পড়ল জয়ন্তীর সেদিনের কথা। বোনকে কাছে টেনে আনল—'হ্যারে রুণু! তুই নাকি ভিক্ষে করছিলি কালীঘাট পার্কে?'

—'আমি? ভিক্ষে?' থতমত খেল রুণু।

—'হ্যাঁ, তোর সঙ্গে টুনুও ছিল। দিদি বলল। ছি ছি! এমন সুন্দর মেয়ে, কি সুন্দর চুল, কি সুন্দর চোখ—সে ভিক্ষুক হতে চায়? ভগবান তো তা হলে তোকে ভীষণ কুচ্ছিত করে দিলেই পারতেন। আর মা এ কথা শুনলে তাঁর কি কষ্ট হবে বল?'—টস্ টস্ করে চোখের জল পড়ল রুণুর গাল বেয়ে।

জয়ন্তী শুনতে লাগল মীরার কথা। যেন মা হয়ে কথা বলছে মীরা—তেমনি শান্ত গলা, বুঝানোর ভঙ্গি। আর কত সহজ ওর—মনে মনে ভাবল জয়ন্তী।

—'কে বলেছে ভিক্ষে করছিলাম? ভিক্ষে ভিক্ষে খেলছিলাম তো আমরা।'

ফিতে ছাড়া জাঙ্গিয়া কোমরে গুঁজে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে টুনু। ঝকচকে চোখে আর সমস্ত শরীরে চঞ্চলতা।

—খেলা? ভিক্ষে ভিক্ষে খেলা? অবাক দুই দিদি।

—'খেলাই তো।' আবার জোর দিয়ে বলল টুনু আর ভিজে চোখ মুছতে মুছতে রুণুও সমর্থন করল টুনুকে।

—'কি হয়েছে জান মেজদি'? ইস্কুলের বইতে আছে না দুর্ভিক্ষের কবিতা? সেই—

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে,
জাগিয়া উঠিল হাহারবে

তখন বুদ্ধের এক শিষ্যা মেয়ে সুপ্রিয়া তার নাম,—সে তো ভিক্ষে করে সবাইকে বাঁচিয়েছিল। জান তো সে কথা? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন না সেই?

—'তা তো লিখেছেন, কিন্তু তাতে তোদের ভিক্ষে ভিক্ষে খেলতে হল কেন?'

'আহা!' ছোট্ট মুখে ঝঙ্কার দিল টুনু।—'ঐ যে পার্কের পাশের রাস্তাটায় একটা ছোট বাচ্চা নিয়ে একজন ভিখিরী মা না খেয়ে মরে যাচ্ছে না? আমরা ঠিক করেছিলাম ভিক্ষে করে, পয়সা যোগাড় করে ওদের বাঁচাব। ভিক্ষেটা তো আর ঠিক ঠিক ভিক্ষে নয়, ওটা তো খেলা—যেমন সুপ্রিয়া করেছিল।'

মীরার চোখে জল এল, মুখ নামাল জয়ন্তী।

সুরমা এসে ঘরে ঢুকল। চার কন্যাকে এমন চুপচাপ দেখতে অভ্যস্ত নয় সে। আর টুনু যেখানে, গোলমাল তো সেখানে থাকবেই। মায়ের কোলে সবচেয়ে ছোট ভাই—আটমাসের বাচ্চা। সদ্য ঘুম-ভাঙ্গা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। আর ঠোঁট ভেঙ্গে কান্নার উপক্রম করছে।

—'এমা! উঠে গেছে দুষ্টুটা! দাও, দাও ওকে আমার কাছে। তুমি একটু শোওগে—বাবা তো ভাল আছেন। এই পাজী! আয়।' ভাইকে নিতে হাত বাড়াল মীরা। ঠাকুমা বেরিয়ে এলেন ঘর হতে।

—'স্বর্ণ-সিঁদুরটুকু দিয়েছ ত'?'

—'ছ'টার সময় দিতে বলেছেন বাবা।' বৌ উত্তর দিল।

—'তাই দিও।' আবার ঘরে ঢুকলেন শাশুড়ী। সেই বড় নাতির চাকরি পাওয়ার খবর শুনে ভিমি। এখনো শয্যাগত, তবে ডাক্তার বলেছে ভয় নেই, সময় লাগবে সারতে। তা লাগুক। বিশ্রাম বলে তো কিছু আর নেই কত বছর ধরে। অসুখের ফাঁকে বিশ্রামটা হয়ে যাবে এবার। টাকা? অভাবেরই সংসার তো, বেড়েছে আরো অভাব। আফিস হতে মিলেছে বটে মাইনে—পাওনা ছুটি, কিন্তু রোগের খরচ আছে না? ডাক্তার, তারপর ভাল ভাল পথ্যি। তা একেবারে নিঃসম্বল নন তিনি। আছে বাক্সের নীচের তলায় সাত-কানির মধ্যে লুকানো মোটাসোটা কয়েকখানা সোনার গয়না। রেখেছিলেন—নাতি-নাতনীদের বিয়েতে দেবেন, নিজেদেরও সময় অসময় আছে তো! ছেলে না পারলে তখন বের করে দেবেন তাকে অসময়ে। তা এর চেয়ে অসময় আর কই! দরকার পড়লে দেবেন তিনি জিহ্বার তল করে রাখা সেই জীবনতুল্য গয়না ক'টি। বলে সবার সেরা মাণিক, মেয়ে-জীবনের সার রত্ন—ছেলের অসুখ। তার আবার গয়না। অবশ্য ভাল সময়ও উঁকি দিয়েছে যেন। বড় খোকা, জয়া, মীরার চাকরি, আবার বিয়ে বড় নাতনীর। ঠাকুরের ইচ্ছা।

—'দাও মা খোকনকে।'

—'ওকে নিয়েই শোব আমি।' মীরার কথার উত্তরে বলল সুরমা। 'তুই বরং ওদের বিকেলের খাবারটা দিস—জয়ার চুল বাঁধা হল এরি মধ্যে! বেরুচ্ছিস?' মা তাকালো বড় মেয়ের দিকে।

—'কোথায়!' তাড়াতাড়ি দিদির হয়ে জবাব দিল মীরা।—'ডাক্তারবাবু আসবেন তো সাড়ে পাঁচটার সময়। দিদি বেরুবে কি! দিদুর মেজাজ-পত্তর আজ যে ভাল আছে তারই সাক্ষী দেখছ দিদির চুলে।'

—'আর মেজাজ! বুড়ো হয়েছেন। নানা কষ্ট। মেজাজ না হয়ে পারে। কত আর সইবেন!'

—'মা আমি কিন্তু মুড়ি খাব না কিছুতে।' ঘোষণা করল টুনু।

—'বা, মুড়ি তো ভাল। তেল-নুন, না মেজদি'?' শান্ত রুণু শান্তি চাইল।

—'আঃ টুনু! মা তুমি যাও না শুতে, আমি সব ঠিক করে দেব। শোন টুনটুনি, টুনটুন। আমি একটা মজার জিনিস খেতে দেব আজ।'

—'কি, কি?' মেজদির গলা ধরে জিজ্ঞেস করল টুনু।

—'আমার কাছে একটা টাকা আছে, আনিয়ে দিবি কিছু?' জয়ন্তী চাইল মীরার দিকে।

—'দূর। ওসব আনানো-টানানো হলে আর মজাটা কি? আমি আলুকাবলি-ওয়ালার খেলা করব। ঠোঙায় করে আলুকাবলি বেচবো।'

—'পয়সা দিতে হবে?' জানতে চাইল টুনু।

—'সে তো দিতেই হবে, খেলার মিছিমিছি পয়সা। আমি আঙুলে বাজিয়ে বাজিয়ে নেব।' হাওয়া দিয়ে আঙুল বাজাল মীরা।

—'সত্যি সত্যি ঠোঙা আর কাঠি? লেবুর রস?'

উত্তেজিত হল রুণু টুনু—'চল কমলকে ডেকে আনি।'

—'উঃ। কি যে মজা হবে আজ!'

হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে চলে গেল তিন বোন।

বিকেলের খাবার, আর খাবার নেই। রূপকথা হয়ে গেছে, খেলা হয়ে গেছে, মজা হয়ে গেছে।

বোনদের যাবার পথের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে নিশ্বাস ছাড়লো জয়ন্তী। বেশ আছে মীরাটা। ক'দিন—মাত্র ক'দিন আগে সেও তো বেশ ছিল। মীরার ধৈর্য আর শান্তি কখনোই তার নেই সত্য; তবু এমন করে সব ভাল লাগাগুলোকে সেও সন্দেহের চোখে দেখত না। খেলা, ঝগড়া আর প্রত্যাশায়ভরা দিন, রাতে গা-ভরা নিটোল ঘুম। এখন যে কি হয়েছে,—কেবল একটা জ্বালা। ছবি আঁকতে বসলেও সেই জ্বালা বেরিয়ে আসে তুলির ডগায়। হুঁকো হাতে চোখ ঢোকা, কাশি-পাওয়া বুড়ো, বাচ্চার হাত ধরে ধুঁকছে ভিখারিণী, মরা দেহের উপর উড়ন্ত শকুনের লোলুপদৃষ্টি—সব জয়ন্তীর অন্তরের জ্বালার প্রকাশ। কেন? কেন এমন হোল? অভাব? সে তো কোন্ ছোটবেলা হতে সঙ্গ নিয়েছে, তবু তো কত ভাল লাগত জীবন। মাত্র একবছর আগেই সে এঁকেছিল রাঙা শালুক-ফোটা একপুকুর টলটলে জল। মীরার আর তার চাকরীর হাত ধরে আনন্দ এসেছিল বাড়িতে। বড় বড় সন্দেশের দিকে চেয়ে ঠাকুর্দার চোখের জল চকচক, বাবার খুশি। অলক আবার বুদ্ধি করে একটা বাট পাওয়ারের বা[...] লাগিয়ে দিয়েছিল। উজ্জ্বল আলোর কাপড় পরে হেসে উঠেছিল নূতন হয়ে, রোজকার মলিন ঘর। তার পরদিন সকালে উঠেই জয়ন্তী আঁকতে পেরেছিল ভরা পুকুরের ছবি।

তারপর? তারপর প্রবীর এল, এল ভালবাসা। সে কি আলো[র] মত? মস্ত বড় আকাশের মত, না পদ্মফুলে-ভরা এক দীঘির মত? সে ব্যথার মত। দুঃসহ ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে গেল জয়ন্তী। কি অসহ অনুভূতি! সমস্ত জীবন যে প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়েছিল, তাকে নিষ্ফ[ল] করে দিচ্ছে পরিবারের দীনতা এই দুরন্ত ক্ষোভ জয়ন্তীকে বুঝি পাগ[ল] করে ছাড়বে। এখন পদে পদে কেবল সন্দেহ বাবার চোখে, মায়ে[র] হাত বুলানোয় সন্দেহ, বিচার আর বিতর্ক। কেবল নিজেকে ঢেকে রাখবার, দুষ্প্রাপ্য দেখাবার প্রাণান্ত চেষ্টা। প্রবীরের চোখের আলো[য়] ডুব দিয়ে উঠে যখন কত কথায় মুখরা হতে চায় জয়ন্তী, তখনো তা[র] সামনে দিয়ে উড়ে উড়ে যায় নিষেধের পায়রা। তাদের ডা[না] ঝাপ্টানোয় জয়ন্তী শোনে বাবার 'রাগ, মায়ের কান্না। সেই সহ[জ] সুন্দর দিন আর ফিরে পাবে না সে। আঁচল উড়িয়ে আলুকাব[লি] চাখতে না পারার দুঃখে চোখে জল এল জয়ন্তীর।

প্রবীর! আচ্ছা প্রবীর যদি বিমান বোসের ছেলে না হয়ে, হ[তো] একশ' আশি টাকা মাইনার কেরানী? তবে তো একদিন সস্তা বেনার[সী] আর দু' এক চিলতে সোনাপরা জয়ন্তী অনায়াসে তার বৌ হতে পারত। তখন জয়ন্তীর দেড়শ' টাকার ভরসায় প্রবীর বাসা বদলাবার চে[ষ্টা] করত, কিনতে যেত হয়তো কাঠের সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড টেবিল, চেয়া[র] আলনা। উঃ! ভাগ্যিস তা হয় নি। একটা বদ্ধগলি ছেড়ে আ[র] একটায় ঢুকতে যাচ্ছে না জয়ন্তী। আর্থিক অনটনের এমন হীন[তা] প্রবীরকে না দেখলে বুঝতই না সে। মীরা এখনো স্বপ্ন দেখ[ে] ছোটবেলার,—দেখুক। জয়ন্তী পারবে না আর বানিয়ে বানিয়ে স্ব[প্ন] দেখতে। স্বপ্ন দেখতে চাইল না জয়ন্তী তবু তো চোখের সাম[নে] হতে ছবি মুছতে চায় না—দুঃখের ছবি, একটা জেনারেশনে[র] দুর্গতির ছবি। তারা হেরে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, সর্বত্র তার পরিচয়। চল্লিশ বছরের মায়ের কোলে আটমাসের বাচ্চা। মায়ের বুকে দু[ধ] নেই, দুধ কিনবার পয়সা নেই বাপের পকেটে, তবু বাচ্চা, আ[বার] বাচ্চা। ফুটপাথে হাঁটা যায় না, করপোরেশনের স্কুলে জায়[গা] নেই। একটা পয়সা, আধখানা বিস্কুট, ছেঁড়া প্যাণ্ট, রো[গা] কঙ্কালসার, লোভী বাচ্চা! বই ভরে লেখা হচ্ছে এই পরাজয়ে[র] কথা, একটা শ্রেণীর মৃত্যুর কাহিনী। বিদেশীর ক্যামেরায় উঠছে—হাড় বের-করা শীর্ণ ভিখারিণীর কোলে ধুঁকছে শিশু। কে পে[ল] পুরস্কার? ক্যামেরার কারুকার্য? না, না। অনাহারে দুর্গা[র] মৃত্যু, সর্বজয়ার বাসন বিক্রি করে অন্নসংগ্রহের মর্মান্তিক চেষ্টা ক[ত] সফল করে দেখানো হয়েছে তাই জিতে এনেছে জয়মালা।

অনেক রাতে যখন ভাবতে ভাবতে মাথা গরম, ঘুম পালি[য়ে] যায় অনেক দূরে, তখন দেখেছে জয়ন্তী তারা—তার মা, তাদে[র] পরিবারও আনতে পারে অনেক পুরস্কার তাদের ছবি দেখিয়ে হাততালি দিয়ে বলবে দর্শক—কি সুন্দর ছবি! কি বাস্তব একেবারে নিখুঁত! সত্যই দেখছে হার আর মৃত্যু? সর্বনাশ—বিলুপ্তি।·

নিশ্চিন্ত বিশ্রাম
আজকের দিনে মানুষের চিন্তার আর শেষ নেই। চিন্তা যখন নিত্য সঙ্গী তখন নিশ্চিন্ত বিশ্রামের সুযোগ যে ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে সে আর বেশী কথা কি? নিত্য নূতন সমস্যা মানুষের স্নায়ু আর মস্তিষ্ককে যখন বিকল করে আনে তখন দেহে আর মনে আসে অপরিসীম ক্লান্তি—বেশীর ভাগ রাত্রিই তাই কাটে বিনিদ্রায় বা বিক্ষিপ্ত নিদ্রায়।
জবাকুসুম তেল মাথা ঠাণ্ডা রাখে তাই নিয়মিত জবাকুসুম তেল ব্যবহার করলে খানিকটাও নিশ্চিন্ত বিশ্রাম যে সম্ভব তা এ বাজারেও জোর করে বলা চলে।
জবাকুসুম
কেশ তৈল
সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস
কলিকাতা-১২
১, টাকার্স লেন, ব্রডওয়ে, মাদ্রাজ-১

মনে পড়ল জয়ন্তীর সরগুনার পথে দেখা একটা গরু,—পড়েছে একগলা কাদাজলের মধ্যে। যত উঠবার চেষ্টা, তত ঢুকছে পাঁকে। রাস্তার ছেলেগুলো হাততালি দিচ্ছে, ঢিল ছুড়ছে। বড় মজা। দৃশ্যটা আঁকলে চিত্রকরের ভাগ্যে মিলতে পারতো অনেক প্রশংসা, কালজয়ী হত তার চিত্র। কিন্তু ভেবেছিল জয়া—কাদায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত গরু—বড় সিম্বলিক চিত্র তবু আরো, আরো একটা জিনিস সেখানে যেন ছিল দেখবার। গরুটার উঠবার প্রাণান্তকর চেষ্টা, যা দেখে আমোদ পাচ্ছে ছেলেগুলো, তা যদি একবার আঁকা যেত? পরাজয়ের ছবি, অসহায়ের ছবি দেখল সবাই, দেখত যদি জয়ী হবার চেষ্টার ছবি? সমস্ত প্রাণ এসে জমা হয়েছে চোখের মধ্যে, আপ্রাণ চেষ্টায় একটু-একটু করে এগিয়ে আসতে চাইছে পাড়ের দিকে। হয় তো পারবে না। একেবারে তলিয়ে যাবে থকথকে পচা গলিত মৃত্যুর মধ্যে তবু এই যে উঠতে চাইছে, এটাও কি আঁকবার মত ছবি নয়? ঐ যে দৌড়ে এসেছে আট বছরে কালো রোগা নেংটিপরা ছেলেটা, শীর্ণ হাত দু'টি দিয়ে প্রাণপণে ঠেলছে তার গরুকে জীবনের দিকে, অতল যেখানে শেষ হয়েছে সেই শুকনো মাটি'র দিকে,—তার কথা? তার কথা যদি লিখতো কেউ, এঁকে রাখতো একটি ছবি—যুদ্ধ করবে আর জিতবে সেই কথা।

জয়ন্তী জানে সে পারবে না। প্রবীরকে ভালোবেসে তার যুদ্ধ করবার ইচ্ছাই চলে গিয়েছে। এখন সে কেবল পালাতে চায়। ধুলোর গ্লানির উপরে উঠে নিজেকে দেখাতে চায় জ্যোতির্ময়ী। কিন্তু মীরা পারবে, অলক পারবে। হয় তো পারবে রুনু টুনুও, যদি নষ্ট না হয়ে যায়। ওরা যুদ্ধ করতে পারবে, আর কে জানে—হয় তো বা জয় হবে ওদের। জয়ন্তী দেখছে মীরার চোখে মায়ের সেই স্বপ্ন, আজো যা কদাচিৎ উদ্ভাসিত হয়, কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিতে। মীরার চোখের আশার আলো মাঝে মাঝে নিভিয়ে দিতে চায় আশঙ্কা এসে, কিন্তু আবার ভাইবোনদের দিকে চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সে। জয়ন্তী জানে—মীরা ভাবছে, ভাবছে—তারাও এই নিমজ্জিত পরিবারকে টেনে আনবে অথৈ জল হতে কূলের দিকে। স্বপ্ন তো দেখছে সবাই। স্বপ্ন না দেখে অব্যাহতি আছে নাকি কারো? স্বপ্নগুলোই যে মানুষকে প্রত্যহের মৃত্যু হতে বাঁচিয়ে রাখছে। ঐ যে ঘরের মধ্যে সত্তর বছরের বুড়ো দাদু, উনিও স্বপ্ন দেখছেন। পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করে বেঁচে আছেন কোনমতে। জয়ন্তী উঠে পড়ল। অনেকদিন পর আজ একটা ছবি আঁকবে সে—সত্তর বছরের বুড়ো মানুষের হারানো দিনের সোনার স্বপ্ন।

সোনার স্বপ্নই দেখছিলেন শ্রীনিবাস সোম। তিরিশ বছর বয়সের স্বপ্ন। কলকাতার ম্যাকিন্টস কোম্পানীতে চাকরী, কিন্তু দেশ সেই পদ্মাপাড়ে দিঘলী গ্রামে। নদীর ভাঙ্গন কূলে বাড়ি, কয়েক বছর হল রুদ্রাণীমূর্তি সম্বরণ করেছে পদ্মা—পাতলা চর পড়েছে গ্রামের তলা ঘেঁষে। কি সুন্দর কাশফুলের সাদা চর, চামর, কাল কাশুন্দের হলদে ফুলে পুজোর সাজ।

পুজোর সময় বাড়িতে যেতেই হবে। কতদিন আগে হতে তোড়জোড়। নাইনিতাল আলু, পাঁপড়, পোস্ত আর ফুলকফি। ছবি আঁকা জাপানী মাদুরেরও ফরমাস আছে একখানা।

আবছা ভোরে চৌবাচ্চার বাসি জলের শিরশিরানি। ভবানীপুরে চক্রবেড়িয়ায় ছ্যাকড়া-গাড়ির আড্ডা। পাঁচসিকা। যাত্রী জুটলো আরো কয়জন, শেয়ার করে ভাড়া। শেয়ালদা। টিকেট করবার লাইনেও কি কম রোমাঞ্চ! প্রচণ্ড ভিড়, রাগ, ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি। দেখো দেখো কেমন বুদ্ধি করে জায়গা নিয়ে নিল এক অতি চালাক যাত্রী। কি গরম? বিশ্রী ঘাম। ঐ, ঐ! দুলছে সবুজ ফ্ল্যাগ, হুইশিলের চিল-চিৎকার—ঘটাংঘট—আঃ, কামরায় ঢুকল একঝলক হাওয়া। বাড়তে লাগল গতির বেগ, ঠাণ্ডা হয়ে এল শরীর।

গোয়ালন্দের ঝাল-ঝাল তরকারী আর পুরী-গরম মুখে লেগে আছে এখনো। স্টিমারে উঠলেই বাতাস ছিটিয়ে দিত কুচি-কুচি পদ্মার জল চোখে মুখে। ডেকে শতরঞ্চি বিছিয়ে টান-টান। গেঞ্জিও খুলে ফেলতেন গা হতে। আঃ। শরীর-জুড়ানো হাওয়া! সে হাওয়া মুছে নিত কলকাতার সব দুর্গন্ধ গা হতে, মন হতে। ইলিশ মাছ ধরছে জেলে-ডিঙি নিয়ে মাঝ-গাঙে, শুশুক লাফিয়ে লাফিয়ে দেখাচ্ছে তার কালো কোলা শরীর। খানিকপরেই রাজাবাড়ি স্টেশন। ছোট ছোট নৌকো আছড়ে আছড়ে পড়ছে নদীর ঢেউয়ে। নৌকোতে ফেরিওয়ালা। গরম রসগোল্লা, সোনারঙের মর্তমান কলা; ভোজেশ্বরের পাত-ক্ষীর! ক্ষিধেই বেড়ে গেছে পদ্মার হাওয়ায়। পাইস হোটেলের একআনার ভাত আর দু'পয়সার ডাল-তরকারী নয়, আস্ত একটা ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে একথালা ভাত। কোমরে গামছা বেঁধে উঁচু পুকুরের পাড় হতে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়া, হাতে জড়িয়ে ঝাকি-জাল, পুকুর ছেঁকে তোলা মস্ত মস্ত খয়রা, পুঁটি আর মলুন্দি। মুড়লীর বাঁট ফেটে পড়ছে, দু' টানে ভর্তি বড় ঘটিটা।

সাত দিনে ফিরে যেত চেহারা। বৈঠকখানার আটচালা ঘরে দাবা-পাশার আড্ডা, মহলা চলছে—সাজাহান। শিউলীর গন্ধ, কোজাগরী পূর্ণিমার আলপনা। শীত আসবার বাতাস। দেশের বাড়িতে পনের দিন কাটালে আয়ু বাড়ত পনেরো বছরের।

তারপর বাবা-মা গেলেন এক বছরের মধ্যে। সংসার নিয়ে আসতে হল কলকাতায়। মাইনে বেড়েছে, বাবাও দিয়ে গেছেন হাজার কয়েক টাকা। কুণ্ডু লেনের বাড়িতে ঠিক দেশের মত জাঁকজমক করে বিয়ে হল ছোটবোন নয়নতারার। তখনো বছর বছর যাওয়া হতো বাড়িতে। কি যে হল শেষে! মেয়েদের বিয়ে দিয়ে হাতের টাকা শেষ। পেনসন কমুট করে করে তাকেও একেবারে মিনমিনে করে ফেলেছেন। ছেলের চাকরীর ভরসায় থাকতে চাইল না মন। বন্ধু ব্রজেন দত্ত নামাল শেয়ার-মার্কেটে। দেশের বাড়ি, জমি বেচে টাকা আনলেন, কিছু লাভের মুখও দেখা গেল; লোভ গ্রাস করল শক্ত হাতে। ধার, ধারের পর ধার। আশায় আশায় বাড়ল ধার। দরজায় কাবলিওয়ালারা, আদালতের শমন—একেবারে সর্বস্বান্ত।

বাইরে শোনা গেল ঝিয়ের কর্কশ গলা, বাসনের ঝন্‌ঝন্‌। একটা কাক ডাকল সঙ্গীকে এঁটোর ভাগ নিতে। স্বপ্ন ভেঙ্গে তাকালেন শ্রীনিবাস সোম, ঝাপ্‌সা চোখে দেখলেন সেজ নাতনী মীরা শান্তপায়ে ঘরে ঢুকছে তাঁর বিকেলবেলার চা নিয়ে।

—আরো পার্টনার চাইছিস কেন? তোর ইচ্ছে যদি একটুও বুঝতে পেরে থাকি! কত খেটে তোর বাবা একাই তো ব্যবসা গড়ে

তুলেছেন। অন্যের হাতে দিবি সেই ব্যবসা? রসকে নিতে চাইছিস, বেশ! কিন্তু আবার মেশো, মামাকে টানছিস কেন?'

সকালের খাবার টেবিলে কথা তুলল সুকল্যাণী। ক'দিন ধরে ক্রমাগত চলছে আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ। বৈষয়িক কথাবার্তায় না থাকতেই অভ্যস্ত সে। অবশ্য স্বামীর ব্যবসার প্রথম দিকে সে ই ছিল প্রাইভেট সেক্রেটারী। কত পাতা-পাতা টাইপ পর্যন্ত করে দিয়েছে, সব শলা-পরামর্শ তার সঙ্গে। এখন আর অফিসের কথায় থাকত না কল্যাণী। ব্যবসা বড় হয়েছে। অনেক কর্মচারী, যোগ্য ছেলে! দরকার কি তার সব ব্যাপারে কান পেতে! এবার—ভয় হয়েছে সুকল্যাণীর, বুঝিবা ছেলের সঙ্গে একটা মতান্তর ঘটতে বসেছে বাপের। ভাস্করের ইচ্ছা অফিসের চেহারা বদলে দেবে, স্বামীর কি অসম্মতি তাতে? কিছু বুঝছে না কল্যাণী। সুযোগ পেয়ে বাপের সামনেই ছেলেকে প্রশ্ন করলো আজ মা।

ডিমের হলুদের মধ্যে মরিচগুঁড়ো মেশাচ্ছিল ভাস্কর। মুখ তুলে চাইলো। দেখল বাবাকেও। বুঝল, প্রশ্নটা মায়ের নিজস্ব, বাবার জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হয় নি মায়ের মুখ দিয়ে। হলে বিশ্রী লাগত নিঃসন্দেহে। ভাস্কর বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। তার বুদ্ধিশাণিত মনের অবচেতনায় বসে আছে এখনো অতিরিক্ত স্নেহ-লালিত অভিমানী ছেলে। বাবা তাকে বকবেন, শাসন করবেন—এখনো তা চায় সে, কিন্তু অন্যের মুখ দিয়ে, সে মুখ মায়ের হলেও—তার সঙ্গে কথা বলবেন —অসহ্য এ ভাবনা।

—'কথা বলছিস না যে?' কল্যাণী জিজ্ঞাসা করল।

—'পায়েস দিচ্ছ না কেন মা আজকাল লাঞ্চে? কাস্টার্ড ভাল লাগে না; পায়েস পাঠিও। কি বলছ? আরো পার্টনার কেন চাইছি। পার্টনার না হলে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হবে কি করে?'

—'দরকার কি প্রাইভেট লিমিটেড করে? যা আছে তাও তো ভালই।'

—'ভাল নয় মা।'

—'ভাল নয় কেন?'

—'কেন? কর্তাকে জিজ্ঞেস কর না। বাবাই ভাল বোঝাতে পারবেন সে কথা।'

—'শুনছ ভাস্কর কি বলছে?' স্বামীকে জিজ্ঞেস করল কল্যাণী।

—'শুনছি'। হাতের পত্রিকাটা রেখে দিলেন সুমোহন। ভাস্কর ব্যবসা বাড়াতে চায়। মূলধন না বাড়ালে ব্যবসা বড় হবে কি করে? তাই প্রাইভেট লিমিটেড করে পার্টনার নেবার কথা হচ্ছে।'

—'বেশ তো! রস আসছে, আবার দাদা, জামাইবাবু কেন?'

—'শোন মা!' চায়ে শেষ চুমুক দিল ভাস্কর। 'রসের আর কত টাকা আছে বল? তুমি, আমি, মানেই তো বাবার টাকা! এই শাই ক্যাপিটেল নিয়ে কখনো কমপিটিশনে দাঁড়াতে পারবে না তুর কোম্পানী। দেখছ তো নূতন কাজটা পেলে টাকা ধার করতে হবে!'

—'গভর্নমেণ্টের লোন নে না।'

—'এই ত' মুস্কিল! সরকারী লোন মানেই সিক্স পারসেণ্ট ইণ্টারেস্ট। ও তো ক্যাপিটেলের মধ্যে পড়ে না। তারপর দেখ, সব কোম্পানী বোনাস দিচ্ছে অন্তত তিন মাসের আর মিত্র কোম্পানী কোনমতে পুজোর সময় এক মাসের বোনাস দেয়। অবশ্য মাইনে এখানে ভাল, কিন্তু উপরি টাকাটা না পেয়ে ইঞ্জিনীয়ার হতে সুরু করে ক্লার্কেরও পর্যন্ত মুখ ভার। কাজের অনুপাতে রেমুনারেসন পাচ্ছে না তারা। মেসোমশাইয়ের অত টাকা আর মামার বুদ্ধি-বিদ্যা কাজে না লাগালে ঠকব আমরাই। কি বল বাবা?'

কল্যাণী চুপ করে রইল। বুঝতে চাইল ছেলের কথা।

—'তুমি কি বল?' স্বামীকে জিজ্ঞেস করল সুকল্যাণী।

—'বলেছে ভাস্কর ঠিক কথাই। প্রোপ্রাইটারি বিজনেস করে মার্কেটে দাঁড়ানোর দিন চলে গেছে। বিশ্বদার মেলা টাকা আইডল্ পড়ে রয়েছে, আর ব্যবসায় নামবার প্রস্তাব উনিই দিয়েছেন ভাস্করকে। তোমার ছেলে যে নন-বেঙ্গলী চায় না, নয় তো শোভান জয়েন করত।'

—'আবার তো টাকা ধার করতে হবে শোভানের কাছ হতে? অবশ্য কাজটা যদি পাও।'

—'উঃ মা! পাবো কি? পেয়ে গেছি জেনো। খবরটা সরকারিভাবে আসতে যা দেরি।'

—'সত্যি? কাঙ্কীদাস পাচ্ছে না এবার?—কি বলছিস?'

শশীকে উঁকি দিতে দেখে জিজ্ঞাসা করল কল্যাণী শেষের কথাটা।

—'সরকারবাবু? ওমা! তা বাইরে কেন। যা, যা এখানে নিয়ে আয়।'

ঘরে এসে ঢুকল অন্নদা সরকার। দরকারি চিঠিতে সই করাতে চলে এসেছে বাড়ি।

—'এসো ঠাকুরপো! দেখ গরম কচুরি। ভাল ঘি, খাও, খাও। অম্বল হবে না। শশী, কচুরি আন গরম।'

—'আর বৌঠাকরুণ! খেতে আর পারি না। দাঁতগুলো যেতে বসেছে। অম্বলেও ধরেছে শক্ত হাতে। না হলে আপনার সেই সরষে দিয়ে কই মাছ ভাতে—'

অন্নদা খুব অল্প করে খেতে গিয়ে, আট, ন'খানা কচুরি খেয়ে ফেলল।

—'ভেজেছে তো শশে ব্যাটা চমৎকার। আপনার ট্রেনিং তো! কাজের কথা বলছেন? তুখোড় ছেলে আমাদের ভাস্কর। তাজ্জব করে ছেড়েছে, কাঙ্কীদাস ব্যাপার জেনে চোখ কপালে।'

—'কি করেছে ভাস্কর?' উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল কল্যাণী।

—'করেছে? সে এক মহাকাণ্ড। অফিসে যখন কাঙ্কীদাস আমাদের রেট বের করে নিয়েছে, আর নিজের টেণ্ডার সাবমিট করেছে তার চেয়ে দু' পার্সেণ্ট কম ধরে, ভাস্কর তখন বাড়ি বসে আলাদা টেণ্ডার টাইপ করছিল নিজের হাতে। কাকপক্ষীও জানতে পারে নি রেট। আমিও কি জানতাম না কি? দু'দিন হল সব শুনে হেসে আর বাঁচি না। কাঙ্কীদাসের চেয়েও কম রেট আমাদের। তবে হ্যাঁ, রেট কম হলেই তো আর কনট্রাক্ট পাওয়া যায় না, যাতে পাওয়া যায় তার জন্য তদ্বির-তালাস করেছে ভাস্কর খুব। রসেরও প্রাণান্ত চেষ্টা। সেক্রেটারীর মুখ শুকিয়ে আমসি।

—'সেক্রেটারী? ভকত? আর ওর উপরেই এত বিশ্বাস তোমার?' আশ্চর্য হয়ে স্বামীর দিকে চাইল কল্যাণী।

মৃদু মৃদু হাসছিলেন মিত্রসাহেব। শুনছিলেন সবার কথাবার্তা, এবার জবাব দিলেন— কাঙ্কীদাস ছাড়া আর সব বিষয়ে বিশ্বাসী ভকত। জিজ্ঞেস কর অনুপকে।'

—'হ্যাঁ, বিশ্বাসী ভকত। যোগ্যতাও আছে, অফিসের চেহারাই বদলে দিয়েছে এই ক'বছরে, তবে সব মানুষের মতই ভকতও অ্যাম্বিসাস্। কাঙ্কীদাস বড় কাজ ছাড়া হাত দেয় না, অঢেল টাকা। কাজ তুলবার ভাবনা নেই। আর মিত্র কোম্পানীর বড় কাজ মানেই ধার। সুতরাং মোটা টাকা নিয়ে মিত্র কোম্পানীর টেণ্ডার রেট কাঙ্কীদাসকে জানিয়ে দিয়েছে সে কয়েকবারই, ধারণা—তাতে ক্ষতি হয় নি কোম্পানীর। এবার পারল না! ভাস্করের চাতুর্যে হেরে গেল সে। টাকা নেওয়া হয়ে গেছে, কাঙ্কীদাসের কাছে মুখ দেখবার উপায় নেই। ক'দিন হতে তাই টাই আর স্যুটের তেমন চমক নেই, জুতোর মস্‌মস্ কম।

শুকনো মুখের পরিচয় পাওয়া গেল না দিল্লীলালের চেহারায়। না, অনেক লক্ষ্য করেও ভাস্কর কোন ব্যতিক্রম দেখছে না তার কথাবার্তা, ভাবভঙ্গীতে। ক্লাবে দেখা হচ্ছে সপ্তাহে প্রায় দু'দিন— সেই ফুর্তিবাজ আমুদে দিল্লী।

—'দেখছ দিল্লীর অবস্থা?' অরুণের কথায় চমকালো ভাস্কর। দিল্লী আসছে ওদিক দিয়ে ঘুরে। কি হয়েছে তার—হাসি, ফিটফাট স্যুট, সব তো ঠিক, তবে? ও! দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলো ভাস্কর—দিল্লীর গালের নীলচে আভা গাঢ়।

—'ব্যাপার কি?' দিল্লীর নিটোল গালের দিকে ইঙ্গিত করল ভাস্কর।

—'ব্যাপার?' গালে হাত বোলাল দিল্লী করুণমুখে।

—'অনেক কৈফিয়ৎ করে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করেছি লিলির সঙ্গে, সেটা নষ্ট করতে চাই না, তাই উল্লুকটি সেজে বেরুতে হয়েছে।'

—লিলির কাছে কথা দিয়েছ নাকি আদিম যুগে ফিরে যাবে?'

—'আরে না ভাই! তুমি বুঝবে কি আমার যন্ত্রণা। একে তো লিলি আমাকে হাফউইট ভেবে রেখেছে। তারপর দাড়ি কামাতে গিয়ে গত দু' দিন লেট। সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট ওর বিলকুল বরবাদ হয়ে গেছে। আজ তাই আর—'

—'উঃ? আজ তাই কামানো বাদ দিয়েই এলে? নাইস! দু'দিন পর পর এই চেহারা বজায় রাখতে পার,—সি উইল লিভ ইউ ফর এভার। ভাস্কর তো ঐতিহাসিক হয়ে গেছে, দেন, ফিল্ড ইজ ওপন ফর মি।'

সিগারেট ধরাল অরুণাংশু।

—'ভাস্কর! ইজ ইট এ ফ্যাক্ট? হ্যাভ ইউ সেটল্‌ড ইয়োর মাইণ্ড?'

ভাস্করের বুকে টোকা দিল দিল্লীলাল।

—'ধরে নাও আমি রিট্রিট করেছি! বাট অরুণাংশু ইজ এ চ্যালেঞ্জ ফর ইউ। দাড়িটা কামালেই ভাল করতে।'

—'লিলি দাড়ি পছন্দ করে। এক পীরজির দাড়ি দেখে একবার উচ্ছ্বসিত হয়েছিল।' গম্ভীর মুখে জানাল গৌতম।

সাঁঝ দিয়ে সমস্ত যৌবন-বন্যা সেই লিলিকে দেখা গেল আসছে চাওলার সঙ্গে। একটা আর্ট-এক্জিবিশন খুলবে লিলি। অবশ্য উদ্যোক্তা ক্লাবই, কিন্তু ক্লাবের মধ্যমণি তো লিলি বোস! অনেক টাকার দরকার এক্জিবিশন করতে। সবাই চাঁদা দিচ্ছে মুক্তহাতে কিন্তু চাওলা আর দিল্লীর চাঁদা চারঅঙ্ক ছাড়িয়ে গেছে। সবাই বুঝছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে দু'জনের মধ্যে।

টাকা ও ডিগ্রী থাকলেও একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে এদের মনে। সংস্কৃতিবান নয় বলে কুখ্যাত হবার ভয় রাখে। আর আণ্ডারস্ট্ড আছে একটি আকাঙ্ক্ষা—লিলি, লিলি বোস, মানস সরোবরের রাজহংসী। কালো হীরে দু'টি চোখ, চাঁদের আলোর মত রং আর রাজকন্যার গরিমা চলনে। আশ্চর্য ভাস্কর! সবাই বোঝে লিলির পক্ষপাত আছে তার প্রতি। সামান্য চেষ্টায় ভাস্কর জিনে নিতে পারে লিলির হাতের বরমাল্য; কিন্তু সে চোখ ফিরিয়েছে, নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে স্বয়ংবর-সভার রাজপুত্রদের তালিকা হতে।

ছোটবেলার বন্ধু অরুণ। লিলিকে নিয়ে ঠাট্টা করলেও ভারী হত বুক, যখনি ভাস্করের বাহুবেষ্টিতা লিলিকে দেখেছে নাচের ফ্লোরে। এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে অরুণাংশু। ফিরে এসেছে শৈশবের নির্মেঘ বন্ধুত্ব। চাওলা আর দিল্লীকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না সে। টাকা? টাকা? টাকা দেখে চমকাবে না লিলি বোস। প্রবাল তার ওষ্ঠে, শঙ্খকণ্ঠ আর চোখে তো ঝরছে হাজার তারার আলো। লিলির হৃদয়? কোথায় আছে সেই হৃদয়? হাসিভরা লিলির চোখের মধ্যে ডুবে কতবার অরুণ খুঁজতে চেয়েছে তার হৃদয়কে, পায় নি। নেই, নেই। লিলির হৃদয় নেই। সে অনায়াসে পারে যুবরক্তে রাঙানো পাপোষে মুছতে তার হাই হিল। গুণে গুণে পরাজিত পাণিপ্রার্থীর মাথার মালায় সাজাতে পারে লিলি ড্রইংরুম।

তাই! তাই তো পালিয়েছে ভাস্কর। পরম শ্যামলা ঘাসের রাজ্যে, চাঁদের আলোয় যেখানে হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার হাট বসেছে, সেই রূপকথার রাজ্যে গিয়ে ভাস্কর বেসাতি করেছে একটি নরম কোমল বুক, মধুঝরা আঁখি-তারা। সেই বুকে মুখ ডুবিয়ে রেখে চেয়ে চোখে চোখে, সেতারের তানে তানে বিশ্রামের অতলে নেমে যাবে সে। নাচের ঘূর্ণি, ঝমঝমে অর্কেস্ট্রা, ক্ষণে নেভানো ক্ষণে জ্বালানো আলোর চাতুর্য, বাঁকানো গ্লাসে পানীয়ের বুদ্‌বুদ্ আর ভাস্করের বিশ্রামকে উত্তাল করে দিতে পারবে না। সকাল হবার খবর দেবে ওর কানে কানে সেতারের গুন্‌গুন্। সতেজ, সবৃত, শান্ত ভাস্কর।

অরুণ জানে ছোটবেলা হতেই অমনি ও। নম্বর পেত সবার চেয়ে বেশি। ছবি, রেসিটেশন—সব প্রাইজ তার। আবার হাইজাম্পে অক্লেশে হার মানাত ও জোয়ান ছেলে অনিন্দ্যকে। হাসি, সিনেমা, রেস্টুরেণ্ট। মনে হত ভাস্করও মেতে উঠেছে তাদেরই মত, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরার সময় কখনো ভুলত না মায়ের জন্য রজনীগন্ধা কিনতে।

মনে আছে ভাস্করের সায়েন্স পড়বার কথায় হেডমাস্টার বলেছিলেন, বিজ্ঞান? তা ইচ্ছে করলে বৈজ্ঞানিকও হতে পারবে ভাস্কর, আবার কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী হলেও অবাক হবেন না তিনি। এমনও হতে পারে গানটান শিখে হয় তো একটা নূতন ঘরানার সৃষ্টিও করে বসল ও। অন্য সবাই হেসেছিল সেদিন, কিন্তু অরুণরা বুঝেছিল হেডমাস্টার

বাজে কথা বলেন নি, সব হতে পারে ভাস্কর। যোগ্য স্থানেই পক্ষপাতী হয়েছে লিলি তবু দামী ইভনিং স্যুটের নীচে টনটন করে উঠতো সাতাশ বছরের চোদ্দশো টাকা মাইনে পাওয়া অরুণাংশু ঘোষের বুক।

অন্নদা সরকারের পঁয়ষট্টি বছরের দিদি পুনরায় কাশী যাবার সঙ্কল্প দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করছে। ভাইয়ের সংসারের গিন্নীপনায় আর তার রুচি নেই। ছেলে নেই, পিলে নেই—একপাল কুপোষ্য। অনেক সওয়া হয়েছে, আর না। ভাঙ্গা ভাদ্রের ক'টা দিন, তারপর কাশী। টাকা? বিশ্বনাথের পায়ে গিয়ে তো পড়বে, ব্যবস্থা করবার ভার তাঁরই ওপর। অত আর ভাববে না দিদি। অন্নদার কি হবে? হোক যা ইচ্ছা। ভাইয়ের কথা ভেবেই তো পরকাল খুঁইয়ে তরঙ্গ এতদিন যক্ষের ধনের মত সংসার আগলে বসেছিল।

রোয়াকে বসে মোচা কুটতে কুটতে দিদি উচ্চকণ্ঠে নিজের বক্তব্য শোনাচ্ছিল, মাথা মুছতে মুছতে স্নানঘর হতে বেরিয়ে এল অন্নদা—ব্যাপার কি? সাত সকালে উঠেই বিশ্বনাথের স্মরণ কেন?'

—'না, বিশ্বনাথকে স্মরণ করবে না, জ্বালাতন হবে একপাল কুপুষ্যি নিয়ে।'

অন্নদা সরকারের কুপুষ্যিগুলি বারান্দাতেই ছিল। ফক্সটেরিয়ার মরীর বাচ্চা ছ'টো কোস্তাকুস্তি লাগিয়েছে, খাবার মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে মেরী, কান তার খাড়া। মিনি-পুষি ধ্যানমগ্ন বাজারের থলির উদ্দেশ্যে। খাঁচায় একপাল মুনিয়ার কিচ্ কিচ্।

অন্নদা বিপত্নীক। সেই কোন জম্মে, পঁচিশ বছর বয়সে তার বৌ মরেছে। জোয়ান ছেলে, বলতে গেলে বিয়ের বয়সই হয় নি তখনো। ঠাকুমা আদর করে নাতির বিয়ে দিয়েছিলেন। সন্তান হতে গিয়ে অন্নদার বৌ আশারাণী মারা গেল। মরা মেয়ে। তা অমন হয়। আবার ঘর-সংসার করে মানুষ। অন্নদা অচল-অনড়। সেই থেকে বিবাগী হয়ে রইল। কিছুতে কান পাতল না বিয়ের কথায়। বেশি বললে খিঁচিয়ে উঠত। মনে মনে ভাবত—লজ্জা নেই আমার। মরা মেয়ে বুকে ঠেকে পনেরো বছরের মেয়েটা মরলো, বিয়ের শাড়িগুলো পর্যন্ত তখনো সব পরা হয় নি। কত সাধ-আহ্লাদের কথা বলত ফিসফিস করে। খেতে চেয়েছিল বেমেদের বাড়ির কামরাঙা। সবুজ রং-এর ধনেখালি শাড়ির সখ ছিল একখানা—সেই বৌ গেল! যার মরণের অর্ধেক দায় অন্নদার, তাকে আমকাঠের তলে গুঁজে দিয়ে আবার বিয়ে, সংসার, যে সন্তান হতে আশা গেল সেই সন্তান!

অন্নদার মনের কথা বুঝত না কেউ। দুঃখ বুকে নিয়ে চোখ বুজলেন বাপ-মা, যত দায় পড়ল তরঙ্গর মাথায়। শ্বশুরবাড়ি শেষ করে নেয়ে-ধুয়ে বসেছে কি না—বাপের ঘর ছাড়া জায়গা কৈ কড়ে-রাঁড়ী-মেয়ের। এখন ভাইয়ের স্বচ্ছল সংসার, টাকা-কড়ির অভাব নেই। একপাল পশু-পাখি, আত্মীয়-স্বজনও এসে ঘাড়ে চাপে না। এই হতচ্ছাড়া সংসারে আর মনটা টেকে না তরঙ্গর। সম্প্রতি বেশি অস্থির হয়েছে চিত্ত, আর তার কারণও আছে।

পাশের বাড়িতে একতলার কাঠ-কয়লা রাখবার ঘরটাতে সম্প্রতি এসেছে নূতন ভাড়াটে—পাকিস্থানী, নিজের দেশের মানুষ। টিকতে না পেরে পালিয়ে এসেছে শেষমেষ। মস্ত মস্ত তিন মেয়ে। বড়টির বয়স তিরিশ পেরিয়েছে—আহা জগদ্ধাত্রীর মত রূপ! আর কি হাতের কাজ! সেলাই, গান সব জানে। কেমন ছেয়ালো গড়ন-পিটন। খোঁপা খুলল তো চুল নামবে কোমর ছাড়িয়ে হাঁটু ছুঁই ছুঁই। কি যে মিষ্টি স্বভাব! সেই মেয়ে দেখে. আর না-না কথা ভাবে তরঙ্গ। বাহান্ন বছর আবার বয়স পুরুষের! চুলে পাক ধরে নি। মট মট ভাঙছে আস্ত সুপুরি। দিব্বি কাঁচা মানুষটা। অম্বল? শোন কথা! অমন কাঁকড়া চচ্চড়ি, বাটি বাটি আম-কাসুন্দি—কার না অম্বল হবে! অম্বল আবার একটা রোগ! সেই কথাই তো বলছে মমতার মা রুজি-রোজগেরে মানুষটা—তার আবার বয়স! ছঃ যত সব! সুতরাং কাশী যাবেই তরঙ্গবালা। যে ঘরে শিশুর কান্না নেই, সে ঘর তো শ্মশানতুল্য। কিসের লোভে পরকাল খুইয়ে পড়ে থাকা ভাইয়ের সংসারে,—যেখানে একটা দাসী-বাঁদীর কথারও দাম নেই।

অন্নদা দিদির প্রস্তাব শুনে হেসে উড়িয়েছে প্রথম প্রথম, তারপর রাগ। করুক রাগ আঁতুড়ঘরের ছেলে মানুষ করেছে তরঙ্গ। বুড়ো বয়সের পেটকাঁচানো ছেলেকে মা তুলে দিয়েছিলেন তার হাতে, সেই ছেলের গোঁসাকে ভয়—তারপর একটা জীবন যে যেতে বসেছে চোখের সামনে? জীবন যাওয়া নয় ত' কি! কথাটা শুনলে বুঝবে সবাই।

মমতার বাপ চাকরী পেয়েছিল একটা তেওয়ারী-মেওয়ারী কার গদীতে। সাতপুরুষ বংলা দেশে থাকলেই বাঙালী হল আর কি! যাক গে, মরুক গে; বাঙালী হলেও বারণ করতে যাচ্ছে কে আর হৃদয়রামকে! কিন্তু জাতে হাত দিতে আসে কেন? বিয়ে করতে চায় মমতাকে—আস্পর্ধাটা দেখ একবার। হৃদয়রামের মরুণ্ডে পোয়াতি বৌ মরেছে মাসকয় হল, নজর দিয়েছে ব্যাটা মমতার দিকে! কোনদিন দেখে গেছে, বাপের খোঁজে এসে। পাঁচশো টাকা দেবে বিয়ের খরচা বাবদ। আর শ্বশুরের চাকরী—মাইনা তো বাড়বেই। রাজী হয়েছে পরাশর বিশ্বাস। রাজী না হয়ে উপায় কি! তিনটে মেয়ে, নিজেরা স্ত্রী-পুরুষ। ঐ চাকরীটকুই ভরসা, আর পেটকাপড়ে বেঁধে আনা দু-চার কুচি সোনা।

মমতার মা কেঁদে কেঁদে বলেছে তরঙ্গদিদিকে সব। গাঁয়ের লোকজন দেশ ছাড়লেও ভিটে কামড়ে পড়ে ছিল তারা। আসতে কি প্রাণ চায়? চকমিলান বাড়ি। ফেলে-ছড়িয়ে বছরের ধান, পুকুরভরা মাছ, গরুর দুধ—কতবা খেয়েছে, বিলিয়েছে কতবা। মেয়েদের বিয়ে কি হত না? তাও হত। দেশ ছেড়ে যে পালালো সব ভাল ভাল ছেলে, ছুতোয়-নাতায়—ধরে নিয়ে জেলে পুরছে কি না! প্রাণের প্রাণ মমতা, চিরকুমারী থাক—তবু, বাপ বলল—অপদার্থের হাতে দেবে না। বড় হোল মেয়ে, বড় হোল সবিতা অমিতাও। সর্বদা গা ছমছম। কি সর্বনেশে দিন এসেছে। গাঁয়ের মুসলমানরা কিন্তু আছে আগেরি মত। বৌঠান, কাকী ডেকে উঠানে বসে পিঁড়ি পেতে, লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদ খায় খুশিমনে। মুস্কিল করল অবাঙালীগুলো এসে। তাদের নজর কেবল হিঁদুর বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামারে নয়, হিন্দুমেয়েদের উপরও।

চৈত্র-সংক্রান্তির কাজ সেরে ক্লান্ত মমতার মা শুয়েছে ঢেঁকিঘরের

দোরটির কাছে আঁচল বিছিয়ে, চোখটাও লেগে এসেছে পুকুরের ঝিরঝিরে হাওয়ায়। কাছে এসে দাঁড়াল নজর আলির বৌ। শুকনো মুখ, ফিস ফিস কথা। খবর দিল এক সর্বনাশের। ঐ বিটকেল মরদগুলো মতলব এঁটেছে কাল রাতেরবেলা লুঠ করে নিয়ে যাবে বিশ্বাসবাড়ির তিন মেয়েকে। সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক, কলমা পরিয়ে সাদী করবে তাদের। রকম-সকম ভাল লাগে নি জরুন্নেসার। ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনেছে তাই কথাবার্তা। গা কাঁপতে লেগেছে তার। খসম ঘরে এলে বলেছে—বেইমানী কর না।

নজু কি বেইমানী করতে চায়? কিন্তু প্রাণের ভয় যে তারও। এখন খবর পাঠিয়েছে—নিশুতি রাতে আজ খালের মুখে নাও রাখবে সে। বিশ্বাস চাচা যেন একবস্ত্রে বেরিয়ে আসে মেয়েদের নিয়ে। জান-কবুল, নজুমিঞা পৌঁছে দেবে তাদের সিরাজগঞ্জের ঘাটে; কিন্তু সাবধানে একটুও সোর যেন তোলে না তারা। তা হলে নিজেরা তো যাবেই, নজুরও কেল্লা ফাঁক।

কাঁপতে কাঁপতে গিন্নি আর মেয়েদের নিয়ে রাতের অপেক্ষায় রইল বিশ্বাস কর্তা। দরজায় তিন টোকা, বারোটার মেল যাবার পর। খানিক আগে চৌকিদার সাড়া চেয়েছে গৃহস্থের, কে জানে সব আছে নাকি তার সঙ্গে, সাবধানের মার নেই ভেবে নাক ডাকিয়ে বিশ্বাসমশাই জানিয়েছে গভীর ঘুমের নিশানা।

ঘর হতে বেরিয়ে এল সবাই-ই টোকার শব্দে। পায়ের তলে পাতা পড়লে কাঁপে বুক। মেয়েদের আঁচলে বাঁধা করবী ফুলের গোটা। বেগতিক হলে খেয়ে নেবে, তখন তাদের মান বাঁচাবার জন্ম স্বয়ং ধর্মরাজ পেয়াদা পাঠিয়ে দেবেন। নাও ছেড়ে দিল নজর আলি। প্রাণ দিয়ে বাইতে লাগল বাপ-বেটা, পক্ষীর ডানা হল দুই বৈঠা। তিন পুরুষের চাকর নজুরা, বিশ্বাসবাড়ির নিমকের ধার শুধল এবার। ভোরের তারা ডুববার আগেই পৌঁছে দিল সিরাজগঞ্জ।

ট্রেনে উঠেও কি বুকের থরথরি যায়। বাপ বলল, 'এবার ফেলে দে আঁচলের বিষফল।' মেয়েরা উত্তর দিল, 'না, থাক!' শহর-বন্দর কলকাতা। কি জানি তার আবার কি রূপ! মেয়েদের মান বাঁচে কি না সেখানে। দরকারে তো লাগতে পারে! আজো আছে করবীর গোটা মেয়েদের বাক্সের তলায়।

এখন মা-বাপের দুঃখ লাঘব করবার জন্ম প্রাণ দিতে পারে মমতা, কাটতে পারে নিজের হাত-পা একটা একটা করে—খারাপ বিয়ে তো কোন ছার কথা। উপায় নেই। লালচোখো সেই ষাঁড়টার পায়ে জড়াবে তার স্বর্ণলতা। চোখের জলের আর বিরাম নেই মমতার মায়ের। তরঙ্গের চোখেও জল। কার না কষ্ট হবে এমন দুঃখের কাহিনী শুনে। অন্নদার মত পাষাণ প্রাণ তো নয় কারো।

তা একেবারে পাষাণও নয় অন্নদা।

অনেক উপকারের প্রস্তাব করেছে সে বৃত্তান্ত শুনে, কিন্তু দিদির এককথা।—বিয়ে কর মেয়েটাকে। আর সইতে না পেরে কাল রাতে বলে দিয়েছে অন্নদা এক মোক্ষম কথা—বেশ! করবো বিয়ে। অপেক্ষা করতে বল ওদের। তোমার জন্মও খুঁজে বের করি এক পঁচাত্তুরে বর, একসঙ্গে ভাই বোনের হবে ছ্যাডাং ছ্যাডাং!

রাগে জ্বলে গেছে তরঙ্গর সর্ব শরীর। কপাল না পুড়লে তরঙ্গের ছেলে হতে পারত ভাইয়ের চেয়ে বয়সে বড়, তার মুখে এমন কথা।

ঠাট্টা? না, এমন ঠাট্টা-ঠিসারা ভাল লাগে না বাপু। দরকারটা কি এখানে আর পড়ে থেকে অপমানী হবার? কাশী যাবার জন্ম পুঁটলী বেঁধেছে কাল রাতেই তরঙ্গবালা।

মাথা মুছে দিদির পাশে মোড়াটি নিয়ে বসল অন্নদা।

—'কি, মোচা নাকি আজ? কচুর শাক রাঁধবে না? বুঝলে দিদি। সেদিন যে রেঁধেছিলে একখানা শাক—একেবারে বাঁধিয়ে রাখবার মত। মোচার ঘণ্ট, লাউ-চিংড়িও তুমি যাই বল না কেন, তোমার হাতের মত ওৎরোয় না কারো হাতে।'

আড়চোখে ভাইয়ের দিকে চাইল তরঙ্গ। খোসামোদ। কত না অন্য হাতের রান্না খেয়েছে, যে তারতম্য বুঝবে। তা খোসামোদে ভিজবে না মন। মুখের মিষ্টিতে আর ভুলবে না দিদি।

—'আচ্ছা দিদি!' গায়ে হাত বুলানোর গলা অন্নদার—'কি করে বিয়ে করতে বল তুমি এ বয়সে? একটা সাধ-আহ্লাদ আছে না মেয়েটার, বুড়ো বরে মন উঠবে কেন তার বল?'

কথাটি কইল না দিদি। জাগন্ত মানুষকে জাগাবে কে? হৃদয়রাম তো আর একটা বুড়ো মোষ নয়। এক গা চুল, মিশমিশে রং, ষাট বছরের যুবো! পাষণ্ড! কি কলে ফেলেছে বাপটাকে! বিয়ে না দিলে চুরির দায়ে দড়ি দেবে হাতে। অন্নদা বিয়েটা করলে সর্বরক্ষা। দেখবার-শুনবার একটা ভরসা, মস্ত বল। অন্যথানে চাবর ও দিতে পারবে অনায়াসে।

অন্নদা ভাবল কিছুক্ষণ।—শোন দিদি! বিশ্বাসমশাইকে আমি একটা ভালো চাকরী যোগাড় করে দেব, আর মেয়ের বিয়ের জন্ম কিছু টাকা, অন্য পাত্রে বিয়ে দিক।

—'তোর করতে বাধাটা কি?' এতক্ষণে কথা বলল তরঙ্গ:—'এখনো মনে করে আছিস সেই বৌকে? এত ভালবাসতিস তাকে যে একটা গোটা পরিবার বাঁচাবার জন্মও গোঁ ছাড়তে পারিস না?'

—'ভালবাসার কথা বলছে কে। মুখই মনে নেই আশালতার, কিন্তু মনে আছে তার মৃত্যুর কারণ। মনে আছে শ্মশানের সব বীভৎস দৃশ্য—শেষ কাজগুলো অন্নদাকেই করতে হয়েছিল তো। তারপর কতদিন চোখ বুজতে পারে নি সে সারারাত ধরে। যে সৃষ্টি করেছিল দু'জনে মিলে, তার শাস্তি মেয়ে বলেই বইতে হল আশালতাকে—যে তার চেয়ে বয়সে ছোট, শরীরে দুর্বল আর একান্ত নির্ভর স্বামীর ওপর।

একটু একটু করে মনের কথা এত বছর পর খুলে বলতে লাগল অন্নদা। বলল—'যদি রোগে ভুগে বৌ যেত, বাবা-মা আর তোমাকে কষ্ট দিতাম না। যা বলতে তাই শুনতাম। বিয়ে, ছেলেমেয়ে সব হত, কিন্তু এ যে অন্যরকম ব্যাপার। বুঝছ না বিষয়টা? যেন খুন করলাম আমি, ফাঁসী গেল থৌলৎদার। বিধির বিধান এই রকম তা বুঝি, কিন্তু তবু আর বিয়েতে প্রবৃত্তি হয় নি। এখন তো বুড়োই হয়েছি। ক্ষ্যামা দাও দিদি।'

প্রায় চোখের জল ফেলে দিদির হাত ধরলো ভাই। তরঙ্গ আর বলবে কি! তারো তো গলা বন্ধ, চোখে জল! না:, বিয়ের কথা ওকে বলা—! তবে একটা চাকরী করে দিতেই হবে পরাশর বিশ্বাস—মমতার বাপকে। লেখাপড়া ভাল জানে সে, আই-এ পাশ!

মিত্রসাহেবকে ধরে একটা ব্যবস্থা হল বিশ্বাসের। তারপর

মমতার বিয়ের জন্য সাহায্যের প্রস্তাব। কিন্তু, কিন্তু করল বটে, আবার মহা খুশিতে গলেও গেল বাপ-মা।

বড় ভাল লোক, মহা সদাশয় ব্যক্তি অন্নদা সরকার। কে দিতে চায় পরের জন্য এত টাকা জলাঞ্জলি! হ্যাঁ, দিত বটে সেকালে। তাদের গ্রাম ভাতশালা নামে বিখ্যাত তো, জমিদার রায়বাবুদের অন্নসত্রের জন্যই। কত বিয়ে, পৈতে দিয়ে গেছেন তাঁরা। এখন? এই কলির শেষকালে কেউ খসাবে পরের দায়ে নিজের একটি কড়ি? ত্রিভুবনে কেউ শুনছে এমন কথা?

পত্রিকার 'পাত্র-পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনে খোঁজ চলল সম্প্রদায়ের বরের। দু'মুঠো খেতে দিতে পারে, পেটে থাকে একটু কালির আঁচড়, —দোজপক্ষেরই ভাল। মেয়ের তো বয়েস হয়েছে। দেখা গেল, দু-একটা ঠিক একেবারে মনের মত না হলেও সাধ্যের মত। তবে আর কি? দাও লাগিয়ে উদ্যোগ-আয়োজন করে এই সামনের এই অঘ্রাণে।

সন্ধ্যাবেলায় খালি গায়ে ছাদে মাদুর পেতে গড়াগড়ি দেওয়া চিরকেলে অভ্যাস অন্নদার। ফুরফুরে হাওয়া, ঘুম নয় আবার ঘুম ঘুম। চোখ চাইলে মস্ত আকাশ, বড় আরাম। আরামে বাধা পড়ল সেদিন। হাল্কা হাল্কা পায়ের শব্দে চোখ মেলে তাকিয়েই একেবারে তাজ্জব অন্নদা। ছাদে, প্রায় সামনে দাঁড়িয়ে এক কন্যে। আবছা-আঁধারেও ঠাওর হচ্ছে চাঁপাফুলি রং। ধড়মড় করে উঠে বসল অন্নদা। আদুড় গা, কষির বাঁধন ঢিল—একটা বেয়াক্কেলে অবস্থা। উঃ! দিদির যে কি বুদ্ধি! দু-একটা ঢোক গিলে নিজেকে সামলে ফেলল অন্নদা। এসেছে তো, এসেছে। ভারি! বাহান্ন বছরের বুড়ো তার আবার লজ্জা পরাশর বিশ্বাসের অ-বিয়েতো মেয়েকে। মেয়েটার তো দেখি লজ্জা-সরমের নামগন্ধও নেই। গুটিমেরে বসে পড়ল ছাদের উপর, উপুড় হয়ে পেন্নাম ঠুকল ধুলোর মধ্যেই তারপর নিজেই আরম্ভ করল কথা—'দেখুন, আমার বিয়ের জন্য আপনার টাকা দেবার দরকার নেই।'

এ কি কথা! রাগ হল অন্নদার। আচ্ছা বেহায়া মেয়ে ত'! একটু সময় চুপচাপ। শোনা গেল মেয়ে-গলা—'বাবার চাকরী দিয়েই আপনি আমাদের মহা উপকার করেছেন, কিন্তু আমার বিয়ের জন্য চিন্তা করবেন না।'

এবার কথা বলল অন্নদা—'তোমার বাবার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হবে আমার।'

—'না, বাবার সঙ্গে কোন কথাই নেই। আমি আপনাকে শেষ কথা জানিয়ে গেলাম।'

উঠতে যাচ্ছিল মমতা।—

—'বসো, বসো!' অন্নদা বলল। এতক্ষণে সন্দেহ হয়েছে তার—বুঝি পছন্দের লোক আছে মেয়েটার। আরে সে কথা বললেই তো হয়, সেখানেই বিয়ে দেওয়া হবে। মজা লাগল অন্নদার। অন্তরঙ্গসুরে খবর নিল মমতার পছন্দের বরের।

—'না!' হাসি শোনা গেল, দেখা গেল দাঁতের চিকমিক।—'আমি কি পছন্দের মেয়ে যে, আমাকে কেউ পছন্দ করবে? এক করেছিল হৃদয়রাম, সে তো আপনিই ভেঙে দিলেন। সে কথা নয়। আমি বিয়েই করব না। লাভ কি মানুষকে বিপদে ফেলে।'

—'বিপদ? বিয়ে বিপদ হবে কেন?' তাজ্জব অন্নদা।

—'হয়, তেমন মেয়ে হলে বিয়েও বিপদ হয়ে ওঠে। আপনিও তো বিপদে পড়েছিলেন।'

—'নাও ঠ্যালা! আরে আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি।'

—'আমিও। মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি হয়। আমার পঁয়ত্রিশ। বিয়ে যে বুড়ো বয়সে বিপদ—সে তো আপনিই বলছেন।'

থমকে গেল অন্নদা সরকার, বাহান্ন বছরের মিত্র কোম্পানীর হেড-ক্লার্ক—যাকে ওয়ার্কিং ডিরেক্টর হতে হবে নাকি ক'দিন পর। কি বলতে চাইছে মেয়েটা? অন্নদা বিয়ে করতে চায় নি বলে রাগ করেছে? অভিমান? বাহান্ন বছরের বুড়ো বুক কি মেয়ের রাগে এখনো ধক করে ওঠে? আরে। এ যে প্রায় ভালই লেগে যাচ্ছে মমতার রাগটা। ফুঁপিয়ে কাঁদছে মমতা। কেন? অন্নদা বিয়ে করতে চায় নি বলে অপমান হয়েছে? কি যে সব গোলমেলে ব্যাপার! একেই বলে সাধু বাংলায়—'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' অবস্থা। নীচে শোনা যাচ্ছে দিদির গলা। নির্ঘাত সে-ই পাঠিয়েছে শলা দিয়ে মমতাকে এখানে,' আর মজা দেখছে বিপাকে ফেলে।

—'শোন মমতা, শোন!' আর শোন! কেঁদে কেঁদেই কথা বলতে লেগেছে মেয়েটা—

'আপনি নিজে যাকে বিয়ে করবার একেবারে অযোগ্য মনে করেন, কেন তাকে পরের ঘাড়ে ফেলতে চাইছেন? কক্ষণো—কক্ষণো, বিয়ে হবে না।'

চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল মমতা। অন্নদা চুপ। কি করে বোঝাবে—অযোগ্য ভেবে নয়, অসম্ভব বলেই সে বিয়ে করতে চায় না। কোন মেয়েরই কি উচিত সব শুনে তাকে বিয়ে করা? ভাল লাগা উড়ে, রাগ এলো অন্নদার মনে।

—'দিদি!' রাগীগলা অন্নদার। ভাইয়ের রাগ বুঝে ফোকলা মুখে হাসলো তরঙ্গবালা।—'আমি কি করবো? অমনি তেজী মেয়ে মমতা। বলে—ঘেন্নায় আমায় বিয়ে করল না, টাকা দেবে বিয়ের জন্য! ভিখারী নাকি আমি যে ভিক্ষে দেবে? ভিক্ষে করব তো, হাত পাতব সব দুয়োরে। একা ওঁর ঠাঁই নেব কেন সব ভিক্ষে? আসল ব্যাপারটা কি জানিস?'

ফিস ফিস করে বলল দিদি—'দেখছে সাজান-গুছান সংসার। মহাদেবের মত মানুষটা তারপর আশাও দিয়েছিলাম আমি। দুঃখু হয়েছে আর কি! তুই আর রাগ করিস নি ভাই! দু'কথা শুনিয়েছে তো হয়েছে কি? গেরস্থ তো হলি না, স্বোয়াদ জানলি না মেয়েমানুষের রাগ-ঝালের। মরুক গে! টাকা দিয়ে দরকার নেই। আর সত্যি তো, বয়সও হয়েছে মেয়েটার।'

গুম্ মেরে অন্নদা ঘরে গিয়ে ঢুকল। ফ্যান খুলে খাটে [illegible] চিৎ হয়ে। চেনা নেই, শুনো নেই, বলে গেল কতগুলি কথা! অপরাধ? অন্নদা উপকার করতে চেয়েছে! বড় রাগ হল অন্নদা সরকারের। কিন্তু মনের কোন গোপন তলা হতে একটু যেন সুখ উঁকি-ঝুঁকি মারছে। কাজের মধ্যে বারবার শোনা যাচ্ছে যেন অভিমানের কান্না। নাঃ, বিপদ হলো।

•

বিপদ সত্যি হল। অন্নদার নয়, পরাশর বিশ্বাসের, শমিতা অমিতা দুই মেয়ে, তারাও খেঁদী-পেঁচী নয়। টুকটুকে না হলেও কচি আমপাতার রং, গায়ে পূববাংলার স্বাস্থ্য আর কোমর ছাড়িয়ে একরাশ চুল। তারাও পড়েছে অনেক বই-পত্তর, বিদ্যা আছে পেটে। চালাক-চতুর দুই মেয়ে। শ্রীকৃষ্ণ ফ্যাক্টরিতে কাজ যোগাড় করে নিয়েছিল তারা—লেবেল লাগানোর কাজ। তিরিশ তিরিশ ষাট টাকা ঘরে আসতো। সংসার সচ্ছল হয়েছিল। মমতার মা কালীঘাটে গিয়ে কিনে এনেছিল একজোড় পিতলের কলসী আর বগীথালা একখানা। কর্তাকে টিনের পাত্রে ভাত দিতে চোখ ফেটে জল আসত তার। বাড়িতে সিন্দুকভরা কত বাসন। খাগড়াই কাঁসার বাসন সব। একটু ছাই ঘষলে সোনার জেল্লা দেয়। একবস্ত্রে গাঁ ছাড়তে হোল—তা আবার বাসন। যাক গে। এখন মানুষকে ভাত দেবার থালা তো হোক। শাক ভাতও ভাল পাত্রে খেয়ে সুখ।

তা—সুখের মুখ দেখার দিন গেছে মমতার মায়ের। পোড়া-কপালীরা ছিল বড় ভাল। গাঁয়ের মধ্যে নাম ছিল বিশ্বাসবাড়ির মেয়েদের। বিয়ে না হওয়া আরো মস্ত মস্ত মেয়ে ছিল তো গাঁয়ে, কিন্তু এদের মত সুখ্যাতি কি কারো? সেই সোনার মেয়েরা বড়টা বাদে, আর দু'টোই বদলে গেছে একেবারে। মা-ই চিনতে পারে না যেন তাদের। শহর কলকাতায় হাওয়ায় উড়ে উড়ে বেড়ায় বিষ, সেই বিষে ধরেছে শামু-অমিকে। পেট দেখানো জামা, ফাঁপানো চুল। গা কাঁপতো মায়ের, মনে পড়ত মুস্কিল-আসানের ছড়া—

'ঘর থাকিতে বাইরে রান্ধে
অল্প চুল ফুলাইয়া বান্ধে
সাঁজ-দুপুরে বেড়ায় পাড়া
সেই নারী হয় লক্ষ্মীছাড়া!'

মমতা মাকে বোঝাতো—কেন ভয় পাচ্ছ! খাটছে, খুটছে, সখ করুক একটু। বয়স তো হয়েছে ওদের, ভালমন্দ বুঝবে নিজেরাই।

কত বুঝল ভালমন্দ! দু'টো মেয়েই বিয়ে করেছে কারখানার দু'টো মানুষকে। অজাত, বাঙালীই নয়। বাপ-মা বাধা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সাফ জবাব দিয়েছে—তাদের যা ইচ্ছা করবে, আইন নাকি তাদের দিকে।

বাপের বাধা দেবার অধিকারই নেই। হা ভগবান! ভাঙশালা গ্রামের মুরুব্বী, পাঁচখানা গাঁ মানত যাকে—তার মেয়ে অজাতের ঘরে গেল! পিতৃ-পুরুষের মুখে চুনকালি পরাশর হতে! সড়সড় করে রক্ত উঠল গিয়ে মাথায়, ভির্মি খেল বিশ্বাস রাস্তার মধ্যে। ভাগ্যিস গাড়ি চাপা পড়ে নি, সতীলক্ষ্মীর এয়োতি বজায় আছে।

তরঙ্গ বুক দিয়ে পড়ল এসে বিপদে আর দিদি এলে ভাই কোন্ না এসে পারে। সময়-অসময় নিয়ে কথা! বারবারই আসতে হল অন্নদাকে। ডাক্তার-বদ্যি, পরামর্শ। অন্নদা মমতাকে দেখল দিন-দুপুরে, সকালে-রাত্রে। মা-দুর্গার মত আগলে রেখেছে ঘা-খাওয়া বাপ-মাকে। ধীর, স্থির না! বড়ই প্রশংসার মেয়ে। স্বীকার করতেই হল অন্নদাকে।

একটু সুস্থ হতে অন্নদার হাত জড়িয়ে ধরল পরাশর—একটা আশ্রম-টাশ্রম ব্যবস্থা করে দিতে হবে মমতার জন্য। তারা স্বামী-স্ত্রী আর মুখ দেখাতে পারবে না। কত গাঁ-দেশের লোকের বাস এখানে, নিত্যি দেখা হবে। বড় উঁচু মাথা হেঁট হয়েছে। মমতা টুকটুক ঘাড় নাড়ল। আপত্তি নেই তার আশ্রমে থাকতে। কাণ্ড দেখ! কেমন সব বিপদ! আশ্রম? আশ্রম আর কোথায় পাবে অন্নদা! আশ্রয় মিলতে পারে একটা, মাথা গুঁজবার মত আশ্রয়।

আশ্রয় পেল মমতা। পাড়ার লোকের টিটকারী, অফিসে হাসি-তামাসা। ভোজও হল একটা মাঝামাঝি রকম। দিদির চোখে জল, মুখে হাসি।

—'এঃ। শিবপুজোর এই ফল? একটা তিনকেলে বুড়ো বর পেলে!' বৌকে বলল অন্নদা একদিন।

—'শিব তো বুড়োই।' বড় বড় চোখ স্বামীর দিকে মেলে উত্তর দিল মমতা।

—'ভাস্কর। তিন দিন অ্যাবসেন্ট যে? ব্যাপার কি?

—'এই! একটা বিয়ের ব্যাপারে আটকে পড়েছিলাম।'

—'বিয়ে'? ভ্রূ বাঁকাল লিলি।

—'ঐ আর কি! তুমি তো জান আমাদের অন্নদাবাবুকে।'

—'শেম! দ্যাট ওল্ড ফেলো!'

—'ইজ ইট এ কমপ্লিমেণ্ট ভাস্কর?' জানতে চাইলো অরুণ।

—'থ্যাঙ্কস গড, আমি নই, ওটা বলা হয়েছে আমাদের অফিসের অন্নদা সরকারের উদ্দেশ্যে, বিয়ে করেছেন যিনি উত্তর-পঞ্চাশে।'

নাক ও ঠোঁটের সৌন্দর্য অবসন্ন না করে অন্নদার প্রতি ঘৃণা দেখাল শ্রোতৃনগুলী। বিতৃষ্ণা প্রকাশের অপূর্ব কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হল উপস্থিত দর্শকজন।

—'চার্মিং' প্রশংসাও বর্ষিত হল দিল্লীর কণ্ঠ হতে।

—বুড়োর অনেক টাকা আছে বুঝি?' জিজ্ঞেস করল দেবকী।

—'তা আছে মন্দ না। বাড়িও আছে ছোট একটা।' উত্তর দিল ভাস্কর।

—'বাঃ! মেয়েটা খুব চালাক তো। দেখো, এবার মোটা ইন্সিওর করাবে বুড়োকে।'

—'প্রোপয়জন করবে তারপর।' বললো আগাথা ক্রিস্টির অনুরাগিণী রমলা।

—'বুড়োর কাছ হতে ক্লাবের জন্য মোটা ডোনেশন আদায় কর।' মিহিগলা রেণুর।

সেদিন ক্লাবের কথাবার্তা চলল অন্নদা সরকারের বিয়ের সংবাদ কেন্দ্র করে। ছেলেরা পাত্রীর চেহারা এবং আশয় সম্বন্ধে মাঝে মাঝেই ভাস্করের কাছে খোঁজ নিল। মেয়েরা মৃদুকণ্ঠে তাদের মতামত প্রকাশ করতে লাগল। লিলি বিরক্ত। ট্রাইফিলিং ম্যাটার! নষ্ট হল কত সময়, দরকারী আলোচনা ছিল আসন্ন একজিবিশন সম্বন্ধে।

অন্নদার বিয়ের কথাই সর্বত্র।

পরদিন সন্ধ্যায় শৈলেন রায়ের বাড়ি উপস্থিত হতেই তপতী উচ্ছসিত। 'কি মজা! আপনার সেই সরকারকাকুর বিয়ে হোল না?'

চট্‌চটে তেল না দিয়েও সারাদিন চুল পরিপাটি রাখা যায়
···কখনো রুক্ষ দেখায় না
আপনার বেয়াড়া চুলগুলোকে বশে আনতে কি চট্‌চটে তেল ব্যবহার করেন ? —কেয়ো-কার্পিন এমন একটি তেল যা মোটেই চট্‌চটে না, —আর ভেষজ গুণ সম্পন্ন এই আশ্চর্য্য তেলের গন্ধও মনোরম। কেয়ো-কার্পিন বেয়াড়া চুল বশে আনে, সারাদিন পরিপাটি রাখে। আজই এক শিশি কিনুন।
কেয়ো-কার্পিন
দ্বিবিধ ফলদায়ক কেশ তৈল
Dey's
দে'জ মেডিক্যাল ষ্টোরস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা ○ বোম্বাই ○ দিল্লী
মাদ্রাজ ○ পাটনা ○ গৌহাটি
কটক ○ জয়পুর
PXDMKB-5

—'এ মা। মজা নয়? জানেন! আমি সব দেখেছি। ওরা থাকে আমার দাদুর বাড়ির পাশে তো। সেই মিষ্টি একতলা বাড়িটাই তো অম্লদাব বর, আর তার ঠিক সামনের লালবাড়িটা দাদুর।'

—'সব দেখেছো? বর-কনে?'

—'সব। আমিই তো গিয়েছি বৌভাতের শাড়ি নিয়ে। দিদুর শরীর ভাল নয় কি না! কি সুন্দর বৌ! কোঁকড়া-কোঁকড়া কত চুল,—আর কি ফর্সা।'

—'বর? তার বয়স-টয়স জানো ত'?'

—'জানি তো। বয়েস হয়েছে তাতে কি? আমা'র কিন্তু বয়স হওয়া মানুষই ভাল লাগে। দাদু, বাবা।'

—'স্বামীর বয়েস হলে?'

—'যদি আমার ভালই লাগে, বয়সের বাধা কি করবে সেখানে?' গম্ভীর হল তপতী।

—'কিন্তু পঞ্চাশের পর বিয়ে করবার মধ্যে একটা কুৎসিত জিনিস লুকিয়ে আছে তা মান তো?'

—'মোটেই নেই। বিয়ে করাটাই তা হলে একটা কুৎসিত বিষয় হয়ে উঠবে। জোর করে বিয়ে করা বিশ্রী, সে যে কোন বয়সেই হোক। কিন্তু যেখানে ইচ্ছা করে দু'জনে একত্র হচ্ছে, সেখানে বয়সের প্রশ্ন তো অবান্তর।'

স্পষ্ট বোঝা গেল রেগেছে তপতী। চোখ চকচকে, স্বর উচ্চগ্রাম।

—'বলব একথা তোমার মাকে?'

—'কি কথা?'

—'মনে হচ্ছে কোন বুড়ো প্রফেসরকে পছন্দ হয়েছে। দত্ত নন তো?'

—'যাঃ! সত্যি কি যে সুন্দর পড়ান প্রফেসর দত্ত, পছন্দ না হয়ে উপায় আছে নাকি?'

—'সর্বনাশ। মিসেস দত্তকে তো হুঁশিয়ার করা দরকার। কোনদিন হয় তো বা বুড়ো ডাইভোর্স আনতে ছুটবে।'

—'এ মা! ভারি অসভ্য'!

একবার তাকাল ভাস্করের দিকে তপতী। চোখ নীচু করল, লাল হল। পরিবেশ রোমাঞ্চিত। হেমন্তের রাত আটটার শিরশিরে হাওয়া। মনের মধ্যে ঢেউ উঠল ভাস্করের পুরুষের প্রথম নারীর জন্য আকাঙ্ক্ষা। ইচ্ছা হল হাত বাড়িয়ে তুলে ধরে নত মুখটি; গ্রহণ করে সুধার পাত্র হতে প্রথম চুমুক। কিন্তু ভাস্কর জানে সব মাধুরী ঝরে যাবে তা হলে। বড় বড় চোখ দু'টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে চেয়ে থাকবে।

—'চুপচাপ কেন?'

ঘরে ঢুকলেন শৈলেন রায়, মীনাক্ষী। সোফায় এলালেন বাপ। মা সমালোচনার চোখে চাইলো মেয়ের অপ্রসারিত চেহারার দিকে। কেন, কেন ভাস্করের ভাল লাগবে এ মেয়েকে? রং তো প্রায় কালোই! না দীপ্তি আছে দেহে, না কথায়। এম-এ পড়ে? সেতার বাজায়? হুঁঃ! সেতার বাজানো! ব্যাক-ডেটেড ব্যাপার, আর এম-এ পড়া তো দস্তুর মত ডিসকোয়ালিফিকেশন। সোসাইটির কোন মেয়েটা এম-এ পড়ছে? নাম মনে করতে চাইলো মীনাক্ষী। না, কেউ না। লোরেটো—সিনিয়র কেমব্রিজ—বাস। ছবি আঁকা, গান, কালচারাল পরিমণ্ডলী। বিয়ের পর অবশ্য কোন বাধা নেই। যা খুশি করা যায় তখন। আজকাল সোশ্যাল সার্ভিস দেওয়া ফ্যাশন বড় ঘরের মেয়েদের। ক্যান্টিন। শিল্প-বিদ্যালয়—কত ফিল্ড আছে ওপন। কুমারী মেয়ের তো এ সব করলে চলবে না। অপ্রাপণীয়া হতে হবে তাকে, প্রায় অসূর্যম্পশ্যা। দেখাতে হবে এই পৃথিবীর সকালের আলোর প্রথম চোখ খুলেছে সে। মধুর, কোমল। পৃথিবীর সব সবল হাতের আশ্রয় প্রসারিত হবে তার জন্য।

মীনাক্ষী অবশ্য মেয়েকে প্রথম তৈরি করে নি, কিন্তু তারপর? বি-এ পরীক্ষার পর? সে কি চেষ্টা করে নি তপতীকে অমনি করার জন্য? কিছু হল না। ভিতরে ভিতরে ভীষণ জেদী মেয়ে। সেই ভর্তি হল এম-এ তে। ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠছে, ঘেমে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি। বই পড়ে পড়ে ক্লান্ত চোখ,—এখন চশমা নিলেই ষোলকলা পূর্ণ হবে। এই যে বসে আছে! একটুও আকর্ষণীয় লাগছে কি ওকে? ক্রাস্ট সবুজ রং-এর শাড়ি, পায়ে চটি নেই, মুখে নেই একতিল প্রসাধন। যেন প্রায় রান্নাঘর হতে উঠে এসেছে মেয়ে।

রাগ হল মীনাক্ষীর। কিন্তু মুস্কিল, তা প্রকাশ করবারও জো নেই। ততক্ষণে ভাস্কর আর শৈলেন রায় আরম্ভ করে দিয়েছে তাদের ব্যবসার প্রসঙ্গ—পুরুষালি কথা।

—'প্রবীর এসেছিল সেদিন, বুঝলে ভাস্কর!'

—'প্রবীর? ও! প্রবীর নিজে ব্যবসা করতে চায়। আপনার অ্যাডভাইস দরকার আছে ওর।'

—'কিন্তু স্ক্র্যাপের কাজ ও পারবে না হে! বিস্তর ঘুরতে হয় আর মিশতে হয় বহু বাজে লোকের সঙ্গে।'

—'তা প্রবীর পারবে। ওর একটা প্রমিস আছে। ইচ্ছা করলে অবাক করে দেবে সকলকে কাজ দেখিয়ে।'

—'তুমিও তো অবাক করে দিয়েছ। ব্যবসায়ীমহলে তো ছোট মিত্তিরের কথাই শোনা যাচ্ছে আজকাল। কাঙ্কীদাস নাকি পাত্তা পায় নি এবার?'

—'এখনো সরকারিভাবে খবর বেরোয় নি, তবে জেনেছি কাজটা আমাদের কোম্পানীই পাবে।'

—'প্রাইভেট লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে মিত্র কোম্পানী?'

—'হ্যাঁ। মেসোমশাইকে ঢোকান হচ্ছে। মেলা টাকা অকেজো পড়ে রয়েছে ওঁর ব্যাঙ্কে।'

হাসল ভাস্কর।

'সুমোহনদা'র কাছে শুনলাম সব। তোমার আইডিয়াটা ভাল।' সিগারেট ধরালেন শৈলেন রায়। 'ভাস্কর?—খাও না? গুড্। দেখছ মীনু! বিলেত-ঘোরা ছেলে সিগারেট খাচ্ছে না।'

—'তাতে আমার কোন বিশেষ ক্রেডিট নেই।' তাড়াতাড়ি বলল ভাস্কর—'নিকোটিন এলার্জি আমার, লিকারেও সুতরাং—'

—'এলার্জি? বেশ ব্যাপার এই এলার্জিটা। নূতন নাম, আভিজাত্যও আছে। আমাদের সময় কোথায় যে ছিল এই সব মহা মহা অসুখেরা। অন্নদা সরকারকে ওয়ার্কিং ডিরেক্টর করা হচ্ছে। বেশ, বেশ। হি ডিজার্ভস। প্রথম হতে আছে তোমাদের কোম্পানীতে।'

—'কিন্তু লোক বিশেষ ভাল নয় সরকার।'

স্বামী ও ভাস্করের সঙ্গে এবার যোগ দিল মীনাক্ষী।

—'ভাল নয়? ওকে তো খুব বিশ্বাসী আর কাজের বলেই—কি বল ভাস্কর?'

—'না না। মিসেস রায় অন্য মীন করছেন। সরকারকাকু সম্প্রতি বিয়ে করেছেন, তাই বোধ হয় ওঁর রাগ হয়েছে।'

—'রাগ? ঘৃণা হয়েছে এবং শুনলে প্রত্যেক মেয়েরই হবে।'

কন্যার মত যে ঠিক বিপরীত তা আর বলল না ভাস্কর। হাসল একটু। নড়ে-চড়ে বসল তপতী।

—'সামনের রোববার টুটুর জন্মদিন। নিশ্চয় আসবে কিন্তু।'

—'রোববার?' সামনে চাইলো ভাস্কর। দিদির কানে কানে একটা দরকারী কথা সারছিল টুটু। এসব অসভ্যতা চেষ্টা করেও দূর করতে পারছে না মীনাক্ষী। অবশ্য তপতীই দায়ী এর জন্য; দশ বছরের টুটু ফুলের মত মেয়ে—সেন্ট মেরী স্কুলে পড়ে।

ইংরেজী পোষাক আর কথার সুরে অবিকল বিলেতী বাচ্চা। এখন তপতীর পাল্লায় পড়ে অনবরত চানাচুর খাচ্ছে। হাত টানাটানি, কানে কানে কথাও দিব্যি রপ্ত হয়ে গেছে।

—'টুটু নিজে না বললে কিন্তু আসব না।'

টুটু এগিয়ে এল ভাস্করের কাছে। ছোটদের সঙ্গে ভাব জমাতে ওস্তাদ সে। বাচ্চাদের গাল টিপে, চুল টেনে ক্ষেপিয়ে তোলে, আবার লোভনীয় ঘুষও বেরিয়ে আসে তার পকেট হতেই।

—'বা রে! তোমাকে তো নিমন্ত্রণই করব। আমি নিজে কার্ড ছাপছি যে, না দিদিভাই?'

—'কার্ড ছাপাচ্ছিস?' হো হো হেসে উঠলেন শৈলেন রায়। 'ব্যাপার কি? তোমার মেয়ে সাবালিকা হয়ে উঠল এরি মধ্যে!' স্ত্রীর দিকে চাইলেন।

আশ্চর্য হল মীনাক্ষী—'সে কি রে? আমি তো জানি না কিছু।'

—'আমাদের একটি বন্ধুর বাবার প্রেস আছে'—এতক্ষণে গলা শোনা গেল তপতীর—'ও টুটুর কার্ড করে দেবে।'

টুটু গম্ভীর। চোখ ফোলাল, ভাবখানা—বোঝ একবার ব্যাপারটা।

—'তা কার্ড পাচ্ছি কবে? আমিও পাবো তো?'

—'সক্কলে—সক্কলকে কার্ড দেবো।' বদান্যতার বান ছুটিয়ে বলল টুটু। 'মুনিয়াকেও একটা দেবো, না দিদিভাই?'

জমাদারের মাতৃহীনা মেয়ে মুনিয়া রোজ বাপের সঙ্গে আসে। টুটুর বয়সী সে।

মীনাক্ষী বিরক্ত হল—'ছি ছি টুটু, ওর সঙ্গে আবার খেলছিস্ বুঝি? সামনের বছর তোকে বোর্ডিং-এ না পাঠালে চলবেই না।'

—'মুনিয়ার সঙ্গে খেললে কি হয়? ভাল তো ও।'

—'ভালো?' মীনাক্ষীর রাগ মাত্রা ছাড়াল। ভাস্করের উপস্থিতি ভুলতে পারছে না তাই, না হলে কান টানতো মেয়ের।—'তোমার টেডিটা চুরি করেছিল কে?'

—'মোটেও চুরি করেনি মুনিয়া। কতবার বলেছি না, আমি নিজে দিয়েছি ওকে। তুমি কেবলি ভুলে ভুলে যাও মা।'

ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠল, মায়ের মুখ টকটকে। শৈলেন রায় হাল্কা করতে চাইলেন পরিস্থিতি।

—'তা চোর না হলেও, নোংরা যে মুনিয়া এ তো মানতেই হবে তোকে?' মেয়েকে কোলের কাছে টানলেন বাবা।

—'কক্ষণো না।' সতেজ প্রতিবাদ টুটুর। 'মুনিয়া কি পরিষ্কার! সানলাইট দিয়ে রোজ স্নান করে, জামাও ফর্সা।'

তপতী উঠে দাঁড়াল। বোনকে নিয়ে এল কাছে।—'তুই বড় বোকা টুটু! বুঝছিস না তোকে রাগাতে চাইছেন সবাই। সবার প্রথম তো মুনিয়াকেই কার্ড দেওয়া হবে। চল লিস্ট করি গে।'

টুটুর হাত ধরে তপতী চলে গেল ঘর ছেড়ে, শোনা যেতে লাগল তার গলা—'কি যে সুন্দর হবে কার্ডটা! সক্কলের লোভ হবে অমন চিঠি পাবার জন্য। গোলাপী রং, সোনালী পাড়—থোকা থোকা ফুল—।'

টুটুর জন্মদিনের পার্টি। তপতীর বার্থ-ডে-পার্টির মত অত জম-জমাট নয়। দরকার কি তার। টুটু সবে দশ বছরের হল—তার জন্যই পার্টি ডাকতে এখনো এক যুগ দেরি। ডাকা হয়েছে কেবল অন্তরঙ্গদের। লিলির মা কর্তার সঙ্গে দিল্লীতে, সুতরাং আসতে হল লিলিকে। ইচ্ছে ছিল না একটুও আসবার, পিন পিন শুনবার তপতীর সেতারের। জানে এমন সুযোগ কক্ষণো মিস করবে না সে। আগে এখানে সেখানে দেখা হয়েছে তাদের মাঝে মাঝে। লিলি কিছুটা অনুকম্পাই করতো আশুতোষ কলেজে পড়া নি গোবেচারী মেয়েটাকে। নিজের পরিমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থিতা লিলির দুঃস্বপ্নেও ছিল না তপতীর কোন ইন্টারফিয়েরেন্সের কল্পনা। কি যে দেখেছে ভাস্কর মিত্র ওর মধ্যে, একেবারে ক্ষেপে গেছে। কমনসেন্সও বিসর্জন দিয়েছে। পায়ে পায়ে জড়ানো বোকা মেয়েটাকে নিয়ে না-ঘুরছে হেন জায়গা নেই। সবাই হেসে অস্থির ভাস্করের চয়েস দেখে। আনসফিস্টিকেটেড? ইনোসেন্ট? আহা রে! অবশ্য এসব ভাবনা লিলির মুখ দেখে বোঝা যায় না কিছু, ভাষাতে তো নয়ই।

দেবকী-রমলার হাসাহাসি তপতীর সাজ দেখে। কি ম্যাচ হলুদে-সবুজে কালো মেয়ের! শিখবে কোথায়। তপতীর উপদেষ্টা তো মীনাক্ষী রায়। বুড়ি! জানে না কি টয়লেটের কিছু!

অবশ্য বিদ্রূপ ছাড়া আর কোন ভাবের উদয় হল না ওদের মনে। ভাস্কর মিত্রের টেস্ট যে অত লো নয়—জানে ওরা।—তপতীকে নিয়ে ঘোরে? আত্মীয় যে। তা ছাড়া বিলেতে বোধ হয় খেয়ে এসেছে বহু কড়া লিকার, দেশী সরবতে মুখ বদলে নিচ্ছে একটু। দেবকীদের ভয় লিলিকে নিয়ে। সাজ, টাকা বা রূপ নয়—কথা। কি যে কথা বলতে পারে লিলি! ওকে সমকক্ষ শত্রু করাই যায় না। মনে হয় অনেক উপরে বসে অবজ্ঞায় দেখছে সবাইকে।

বন্ধুত্ব? অসম্ভব। লিলি বোসের বন্ধু কে আছে? ঝর্ণা সোম? হতে পারে—হতে পারে। সেও অমনি উন্নাসিক। চলে গেছে জার্মানী এক খাড়া নাক, চোখ ডোবানো জার্মান প্রফেসর বিয়ে করে।

চাওলা, অরুণাংশু, গৌতম বন্দ্যো—সব সেরা সেরা ছেলে বিকিয়ে আছে লিলির পায়ে। ভাস্কর? ভাস্কর-ও তো ঘুরছে। ভাস্করের প্রতি যেন দেখা যাচ্ছে দেবীর কিছু করুণা। তবে বলা

যায় না, ভাস্কর তো বন্ধু প্রবীর বোসের। সেজন্য ঘনিষ্ঠতা না কি কে বলবে! ওর কি পছন্দ হয় ইণ্ডিয়ান, বাঙালী ছেলে? নিজে কিছু করবে না, পথও ছাড়বে না। বিষভরা চোখে তাকালো সব মেয়ে লিলির দিকে।

সুন্দর প্লেট। আইসক্রীম, স্যাণ্ডউইচ, পেস্তাছড়ানো নরম সন্দেশ। একটু ঘরোয়া দেশী ধরণের পার্টি।—'মীনাক্ষী রায় তো বর্ন অ্যারিস্টোক্র্যাট নয়'—ফিস ফিস করল মেয়েরা। ক'বছর আগেও শৈলেন রায় ধুতি পরে বাসে ঝুলতে ঝুলতে উল্টাডাঙা গেছে ফ্যাক্টরী পরিদর্শনে। বিলেত গেল তো—সেদিনের কথা।

সুন্দর বাজনা হচ্ছিল।—'তুমি বাজাবে না তপতী?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

—'পারব না বাজাতে। আঙুল পুড়ে গেছে।' আঙুল দেখাল তপতী।

—'সে কি! আঙুল পুড়ল কি করে?

—'আলু ভাজছিলাম।'

—'আলু ভাজছিলে?' হাসি চাপল অনেক কষ্টে দেবকী-রমলারা।

—'কেন তোমাদের প্যানট্রি-হ্যাণ্ডের কি হল? জিজ্ঞেস করলেন তপতীর পার্শ্ববর্তিনী মিসেস তরফদার রমলার মা।

'প্যানট্রি-হ্যাণ্ড!' সেটা আবার কি বস্তু! একটু ভাবতে হ'ল তপতীকে—ও ঠাকুর বুঝি!

—'কিচ্ছু হয় নি তার মিসেস তরফদার। আমারই ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল আলু ভাজতে।'

চোখে চোখে বিজলী খেলে গেল মেয়েদের।

—'তুমি তো এম-এতে ভর্তি হয়েছ, না?'

—'হ্যাঁ। এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি।

—'শুনেছি। আচ্ছা এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি কেন তপতী?' লিলি বলতে লাগল—'পৃথিবী চলছে, বদলাচ্ছে, আর তোমরা এখনো পড়ে থাকবে প্রাচীন যুগে? তার চেয়ে ইংরেজীতে পড়তে কিম্বা পলিটিক্যাল সায়েন্স?'

—'আমার হিস্ট্রি ভাল লাগে। ইংরেজীতে তো আমাকে পারমিশন দিত না। বি-এ তে মোটে পাস-মার্ক ছিল। তা ছাড়া আমার সাবজেক্টই হিস্ট্রি যে।'

লিলি বিস্মিত হল তপতীর সারল্যে। ইংরেজীতে তার অসুবিধার কথা শুনেছিল লিলি ভাস্করের কাছে, কিন্তু এই পার্টিতে, ফ্যাসন চমকাচ্ছে যেখানে আধুনিকতম প্রকাশে—এ কথা স্বীকার করলো তপতী! ও কি জানে না—ইংরেজী জানে না স্বীকার করার এক্ষুণি কি বিদ্রূপের আলো খেলবে চোখে-চোখে?

একটু দূর ছাড়িয়ে ভাস্কর টুটুর সঙ্গে তার সদ্য পাওয়া উপহারগুলি দেখছিল, লিলির বিস্ময় লক্ষ্য করল সে।

—'তা হলে মডার্ন হিস্ট্রি পড়তে!'

—'হিস্ট্রি যদি ব্যাকওয়ার্ড সাবজেক্টই হয়, ত' হলে মডার্ন হলেও সে দোষ কাটবে না তার লিলি।' হেসে হেসে বলল তপতী।

—'মডার্ন হিস্ট্রি, তো অন্তত তোমাকে আজকের খবর দেবে!'

—'ঠিক আজকের নয়, তবে পৃথিবী কি করে আজকের দিনে এসে পৌঁছাল তার খবর দেবে। সেও তো পুরানো কথাই ভাই। হিস্ট্রি মানেই পুরানো দ[illegible]ল। তফাৎ কেবল কম আর বেশি পুরানো নিয়ে। যদি [illegible]না নটেলমেণ্ট, নেপোলিয়ানের কলোনিয়াল সিস্টেম পড়তে [illegible]রি, তবে অশোকের ধর্মবিজয়, কণিষ্কের মহাসংহতি দোষ করলো কি?'

থমকে গেল লিলি। তপতী এভাবে কথা বলতে পারে না কি। কিন্তু আলোচনা আর চালালো না, পারলও না। হতো এলিয়েটের ওয়েস্টল্যাণ্ড, পাউণ্ডের ক্যাণ্টোস, সমঝাতে পারত লিলি, বিশ শতকের মানুষ চলছে কোন দিকে। কিন্তু অপর পক্ষ আগেই মেনে নিয়েছে ইংরেজীতে ন্যূনতা। কথা উঠেছে এমন বিষয় নিয়ে, যার কিছু কিছু নাম ঝাপসা মনে হয়, আর সব ব্ল্যাঙ্ক। কথা হয়ত বাড়ত অন্যদিকে, কিন্তু তক্ষুণি ঘরে ঢুকল টুটুর একদল বন্ধু, বেলুন আর জাপানী-পাখা হাতে—একঝাঁক রঙিন প্রজাপতি। ওরা নাচ দেখাবে।

—'তপতীর সঙ্গে এসব কথায় কাজ কি?' ফিস ফিস করল দেবকী।—'বোঝে তো কেবল প্রাচীন ইতিহাস আর আলুভাজা। হয় তো প্রেমে পড়েছে কোন প্রফেসারের সঙ্গে, ইতিহাসের মাস্টার—চায়ের সঙ্গে আলুভাজা যার মনোরম ব্রেকফাস্ট।'

দেবকীর হিউমারে হাসির ঢেউ উঠল ছোট ছোট। লিলি কিন্তু যোগ দিল না হাসিতে। একটু সরে বসে সে তাকালো ভাস্করের দিকে। ও কি সব শুনেছে? হাসছে মনে মনে তপতী লিলিকে চুপ করিয়ে দিতে পেরেছে বলে? লিলি বুঝল যতটা ব্লাণ্ট সে ভেবেছিল, ঠিক ততটা নয় তপতী, আর ভাস্করও সে খবর রাখে। মুগ্ধ হয়েছে কি সে? বোনের চুলে ক্লিপ আটকাতে ব্যস্ত তপতীর দিকে তীক্ষ্ণ সমালোচকের চোখে তাকাল লিলি। সুঠাম তনু। ভ্রূ-বিলাস নেই। কোন বিলাসই নেই মুখে, চোখে, কথায়, ইঙ্গিতে। ভাস্করকে মোহিত করবার একবিন্দু চেষ্টাও নেই তপতীর। নেই কাউকেই মুগ্ধ করবার প্রয়াস। মনে মনে ভাবল লিলি—তপতী ভাগ্যক্রমে এমন পরিবারে, পরিবেশে জন্মেছে, যেখানে এখনো বিয়ে দিচ্ছেন অভিভাবকেরাই ঠিকুজি মিলিয়ে মোটা মোটা যৌতুক দিয়ে। ভালই হচ্ছে। বেঁচে গেছে মেয়েগুলো কাউকে ভালোবাসবার দায় হতে মুক্তি পেয়ে। পাত্রের যৌতুক লিলিদের সমাজেও কম নয়, কিন্তু তাদের রাজী করাবার ভার পড়েছে পাত্রীদের উপর। স্বয়ংবর-সভায় তাই ঈর্ষা-বিদ্বেষের, ঠেলাঠেলি-হুড়োহুড়ির আর শেষ নেই।

পার্টির ব্যাপারটা ভাল করেই লক্ষ্য করল মীনাক্ষী। বুঝল—তপতী হেরে গেল। লিলির সঙ্গে কি তুলনা ওর? তেজী, ঘাড়-বাঁকানো আরবী অশ্বীর পাশে দাঁড়ে-বসা চন্দনা,—ভালো করে শিস দিতেও শেখে নি।

—'তোমার মেয়ের সম্বন্ধ দেখ। ভাস্কর বিয়ে করবে না ওকে।'

—'কি বলে ভাস্কর?'—কাগজ হতে চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞেস করলেন শৈলেন রায়।

—'বলবে আবার কি? কেউ পছন্দ করবে অমন মিনমিনে, প্যানপেনে পানসা মেয়ে?' ক্ষোভে-দুঃখে ঘর ছেড়ে, বেরিয়ে গেল মীনাক্ষী।

পানসা মেয়ে কেউ পছন্দ করে না। তিনি বিরক্ত হলেন কি—

মনে মনে ভাবলেন শৈলেন রায়। অতীতের কয়েকটা বছর এসে দাঁড়াল চোখের সামনে। কতদিন আগে—বাইশ? তেইশ—থাক গে! অনেকদিন আগে তপতীর মা এণাক্ষীকে বিয়ে করে এনেছিলেন তিনি, কিন্তু একটুও সুখ পান নি। আজকের মত এতটা অ্যাডভান্সড্ না হলেও, তখনো মেয়েরা যথেষ্ট স্কুল কলেজে পড়েছে, বিলেত গেছে, বিয়ে করেছে ভালবেসে। তাঁরও স্বপ্নে ছিল একটি জীবন-চঞ্চল মেয়ে। সব কল্পনা গুঁড়িয়ে, এল ঠাণ্ডা, ভীতু এণাক্ষী। তপতীও হয়েছে তার মত। কিন্তু—বাইফোকাল চশমার ওপর দিক দিয়ে অন্যমনস্ক দৃষ্টি জানালার বাইরে পাঠালেন শৈলেন রায়। তিনিও ভাল ব্যবহার করেন নি তার সঙ্গে। নির্মম অবহেলা পেয়েছে এণাক্ষী। অসহ্য লাগত ওকে। আর সব বুঝেই নিজে হতে এণাক্ষীও সরে গিয়েছিল দূরে। কখনো, কোন ছলে কাছে আসতো না। না, না। মনে পড়ল শৈলেনের—একবার খুব কাছে এসেছিল এণা। বাবা মারা গেছেন। পাটনায় জৈৎরাম আলাদা হয়ে গেল তার টাকা নিয়ে। কথা হ'ল পাঁচ হাজার টাকা বেশি দিলে, ব্যবসার গুড-উইল থাকবে শৈলেনের। প্রাণান্ত চেষ্টা। টাকা যোগাড় হোল না। বিছানায় মুখ গুঁজে পড়েছিলেন শৈলেন। এণা এসে দাঁড়িয়েছিল কাছে। জানতে চেয়েছিল বিপর্যস্ত হবার কারণ। বিহ্বল শৈলেন এই দ্বিতীয়বার তাকে দিলেন স্ত্রীর অধিকার,—বললেন সব কথা। সমস্ত দিন স্বামীর পাশে বসে রইলো এণা। তারপর জোর করে স্নান-খাওয়া করিয়ে সুস্থ করেছিল তাঁকে। হাতে দিয়েছিল ভেলভেটের মেয়ে-থলি। থলি উপুড় করতে বেরিয়ে ছিল—এণার গয়না। বাপের বাড়ির, শ্বশুরবাড়ির পাওয়া সব অলঙ্কার। হাতের দু'টি চুড়ি ছাড়া স্বামীর ব্যবসাতে সব গয়না দিল এণাক্ষী।

শৈলেন সহজে গয়না নিতে রাজী হয় নি, কিন্তু কি সুন্দর হেসে তাকে রাজী করেছিল এণা। তারপর ব্যবসা দাঁড়াল,—বড় হল। এণাক্ষী কিন্তু আর কাছে এল না। এখন সন্দেহ হয়, শৈলেন রায়ের,—বুঝি অবহেলার অভিমানেই দূরে রইল সে।

তপতীর দিকে চাইলেই মনে কেমন যেন সঙ্কোচ আসে শৈলেন রায়ের। ঠিক সেই বয়সের এণাক্ষী হয়ে উঠেছে তপতী। ওর চোখের মধ্য দিয়ে চেয়ে থাকে ওর মা। ব্যস্ত হয়ে জানতে চান তিনি—কি, কি দরকার তপতীর।—কিছু না। পেনের কালি ফুরিয়েছে, নেবে বাবার টেবিল হতে। ঠিক অমনি ছিল এণাক্ষী।

শৈলেনের ভ্রূ-কোঁচকানো জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতো—দরকার? দরকার আবার কি। ঘরের কোণে ঝুল জমেছে, পরিষ্কার করতে এসেছে।

তপতী যা চায়, সব দিতে রাজী বাবা। কিন্তু তার চাওয়াটা বোঝা যায় না একটুও। মীনাক্ষী অবশ্য ইদানীং তপতীর পুরোপুরি মা হয়ে উঠেছে, আর সব কর্তব্যই করছে। ভাস্কর ছেলে ভাল। কল্যাণী আর সুমোহন তো চমৎকার। যেতে হবে ওদের কাছে ব্যাপারটার ফয়সালা করতে। এ বিয়ে হয় তো হয়ে যেত কবেই। মীনাক্ষীই হাঙ্গামা বাধাল, বলল—'বোঝ না কেন, বিদেশ-ঘোরা ছেলে। কখনো নিজের পছন্দ না হলে বিয়ে করবে বাপ-মায়ের কথায়?' তা পছন্দ করাবার ভার বোধ হয় নিজেই নিয়েছিল, এখন হালে পানি না পেয়ে, স্বামীর শরণ নিয়েছে। আরে! তপতী হল এণাক্ষীর মেয়ে। সেজেগুজে কোন ছেলেকে আকৃষ্ট করবার ইচ্ছাই নেই ওর রক্তে। হয় তো ঠাণ্ডা, মাছের মত ঠাণ্ডা রক্ত ওদের। আর তা যদি না হয় এবং সেটাই সম্ভব বেশি—তবে এমন মানসিক আভিজাত্য এই মেয়ের, যার ধারে-কাছেও পৌঁছাতে পারবে না মীনাক্ষীর চেষ্টা।

উঠে পড়লেন শৈলেন রায়। সমস্ত দিন আজ বাড়িতে। ক'টা বেজেছে? সাতটা? সবে সন্ধ্যা। 'মধু ড্রাইভারকে বল গাড়ি বের করতে।'

গাড়ি রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে পড়তেই দেখা গেল তপতী। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে ট্রামের লাইন ধরে। গাড়ি থামালেন শৈলেন রায়।

—'কোথায় যাচ্ছ? চল নামিয়ে দেব।'

একটু ইতস্তত করে গাড়িতে উঠে বসল তপতী।

—'আমি মনোহরপুকুর—মীরার ওখানে যাবো।'

—'মীরা? ও, তোমার সেই বন্ধু? সেও কি এম-এ পড়ছে না কি?'

—'না না। ও কাজ করছে টেলিফোনে।'

—'বেশ! বেশ! আজকাল আসে-টাসে তোমার কাছে? কাল দেখলাম না তো। বল নি আসতে?'

—'বলেছি।' একটু হাসল তপতী।—'কিন্তু এলো না কেন। —অনেক দিনই কেন আসছে না, সেই খোঁজ নিতেই যাচ্ছি।'

মনোহরপুকুর। মীরার বাড়ির সামনে দাঁড়াল গাড়ি। মীরা বাইরেই ছিল, কেঁদে ফেলল তপতীকে দেখে।

—'কি? কি হয়েছে মীরা?' তপতী দু'হাতে ধরল মীরাকে। শৈলেন রায় ব্যস্ত হয়ে নেমে এলেন গাড়ি হতে।

—'মীরার বাবার খুব অসুখ। লো প্রেসার। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। ভয়ানক খারাপ অবস্থা। হয় তো বাঁচবেনই না।'

—'পাগল!' বললেন শৈলেন রায়—'কত বেরিয়ে গেছে প্রেসারের ওষুধ। কে দেখছে? মোড়ের ডাক্তার গুহ? রায়-চৌধুরীকে দেখাও নি কেন! এসব ব্যাপারে রায়চৌধুরী অব্যর্থ। যাও, যাও, তাঁকে খবর দেবার ব্যবস্থা কর। ও! আচ্ছা, আচ্ছা! এই বীরেন, চল ক্লীক রো, ডক্টর রায়চৌধুরী।

তিন মাস যমে-মানুষে টানাটানি। অবশেষে জয়ী হল জীবন। কৃতজ্ঞতায় থরো-থরো হাত দু'খানির দিকে চেয়ে, পায়ের কাছে আনত মেয়ে দুটির মাথায় হাত রেখে, বুড়ো বয়সে চোখে জল আসতে চায় আর কি। শক্ত হলেন শৈলেন রায়। '—ব্যস, ব্যস। বলেছিলাম—সেরে যাবেন। সব পাগল, এখন মাকে খুব করে ঘুম পাড়াও তো।

আস্তে আস্তে সুস্থ হতে লাগল অনাদি সোম। জয়া, মীরা, অলকের অল্পবয়সী হাত তাকে টেনে তুলতে লাগল মৃত্যুর অতল গহ্বর হতে। রকমারী ওষুধ, পুষ্টিকর খাবার। উঠে বসলো অনাদি সোম। বাইরে বেরুল, অফিসে।

—'মা'। সন্ধ্যাবেলা মাকে নিজেদের ঘরে ডেকে নিল জয়ন্তী।— 'মা! শোন যা বলছি, বেশ ভাল করে ভেবে দেখো। মেসোমশাই —তপতীর বাবা, বলছিলেন ওঁর অফিসের ম্যানেজার চলে যাচ্ছে 'হব অ্যাণ্ড হবস্'-এ চাকরি পেয়ে। বাবা সেখানে কাজ

করলে খুব ভাল হয়. উপকার হয় ওঁর—উপকারটা অবশ্য আমাদেরই।'

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে হাসল জয়ন্তী। সুরমা চুপ করে রইলো। দেখা মীরার উস্‌খুস্‌। মনে মনে বুঝল তার কারণ। তপতী মীরার বন্ধু। খুব বন্ধুত্ব ছোটবেলা হতে। আর্থিক বৈষম্যের প্রশ্ন কখনো ওঠে নি। তপতী তো অতশত বোঝেই না, মীরা বুঝলেও বন্ধুর চেয়ে নিজেকে ছোট ভাববার সময় পায় নি। তাদের ঘরই তপতীর ক্লাব। মীরা বালীগঞ্জে গেলে তারও সমাদরের অভাব ঘটে নি কখনো। বাবার অসুখের সময় অর্থ আর উৎসাহ দুই দিয়েই সাহায্য করেছেন শৈলেন রায়, কিন্তু তিনি মেয়েদের মেসোমশাই হয়ে এসেছিলেন। তাঁর অফিসে অনাদি ঢুকলে, মীরা তপতীর বাবার কর্মচারীর মেয়ে হয়ে যাবে।

মা আর বোন দু'জনের দিকে চেয়ে হাসলে জয়ন্তী।—'তুমিও বুঝি মীরার ভাবনায় পড়ে গেলে ?'

মীরার কপালের ঝুলে-পড়া চুলের গুছিটা সরিয়ে দিতে দিতে জয়ন্তীর দিকে চাইলে সুরমা।

—'তা, একটু ভাবতে হচ্ছে তো। তুই ভাবছিস না ?'

—'বা! ভাবনারই কথা যে, তাই তো মেসোমশাই বাবাকে না বলে আমাকে—'

—'দিদি শোন।' আবেগভরা ডাক মীরার।

—'দরকার কি বাবার পুরনো অফিস ছেড়ে ? মায়না কম, কিন্তু ওরা তো খাটুনি কমিয়ে দেবে বলছে। ধার-টার গুলো শোধ হয়ে গেলে, আমাদের সবার মিলে তো অনেক টাকা।

—'অনেক টাকা!' মনে মনে ভাবল জয়ন্তী। দাদুর অবিমৃষ্যকারিতার দরুণ ধার হয়েছিল। তা শোধ করতে প্রত্যেকবার হত নূতন ধার। তাদের চাকরী পাবার পর নূতন ধার হচ্ছে না সত্য, কিন্তু পুরানোটা শোধ হতেও অনেক দেরি। শৈলেন রায় বাবাকে দিতেন সাতশো টাকা। বেঁচে যেত পরিবারটা। মিথ্যে আত্মসম্মানের অভিমান কিছুতে ছাড়া যাবে না জেনেও জয়ন্তী কথাটা মাকে বোঝাতে চেয়েছিল।

মেয়ের ক্ষুব্ধ মুখে তার মনের কথা পড়ে নিল সুরমা। এই দারিদ্র্যের মরুভূমি আর সইতে পারছে না জয়ন্তী। সে নিজেও তো অসহ্য অভাব হতে মুক্তি চায়, কিন্তু মীরার মেসোমশাই ওর বাবার সাহেব হলে ত' বড়ই খারাপ লাগবে। সুরমাও যে তা হলে শৈলেন রায়কে আর হাসিমুখে নারকোলের সন্দেশ, জলখাবার ধরে দিতে পারবে না, বসতে দিতে পারবে না রান্নাঘরের দরজায় মোড়া পেতে।

—'কেমন লাগলো প্রবীরকে ?' বেড়াতে যাবার দু'দিন পর, লাইব্রেরীর মাঠে, ক্যানার কেয়ারীর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তপতীকে জিজ্ঞেস করল ভাস্কর।

—'ভালো, খুব ভাল। মীরারও ভাল লেগেছে।'

উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিল তপতী।

—'একটি দিনের আলাপ আর এত বড় সার্টিফিকেট তুই বন্ধুর। প্রবীরের জোর ভাগ্য। কি বল ?'

—'কি বললাম আমি ?'

মুখ নীচু করল তপতী। ভাস্কর বুঝল—সে ভাল বলেছে, তার বিশ্বাসের আলোয় উজ্জ্বল হয়েছে প্রবীর। আলাদা করে বিচার বিবেচনার ধার-কাছেও ঘেঁষে নি দুই বন্ধু। মীরার বাবার অসুখের গোলমালের দরুণ মীরার সঙ্গে প্রবীরের পরিচয় ঘটাতে দেরি হয়ে গেল। এখন সব বাধা কেটে গেছে। বিয়েতে এখন রাজি অনাদি সোম। পাত্র তো প্রস্তুতই ছিল, বিঘ্ন ঘটাল পাত্রী নিজে। বলল—অপেক্ষা করে দেখা যাক। একদিকের বাধা যখন কেটেছে, দেখা যাক আর একদিকের বাধা কাটে কি না। কিন্তু সে বাধা কাটতে যে বড় মুস্কিল তা ভালই জানে ভাস্কর। তপতীও আন্দাজ করেছে কিছু কিছু। অগত্যা যা করবার মত হাতে ছিল, তাই করল ভাস্কর। মীরার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল প্রবীরের। একটি দিন তারা কাটাল সোনারপুরের ঝোপঝাড়ে ঘুরে, স্যাণ্ডউইচ, ডাব আর সন্দেশ খেয়ে। কিন্তু অন্য মনে ভাবছিল ভাস্কর, আর এক কথা, তার প্রতি তপতীর এত বিশ্বাস জন্মাবার কথা!

—'কি ভাবছেন ?'

—'ভাবছি কি জানো ? সার্টিফিকেট দেবার দায় অনেক। তোমরা প্রবীরকে ভাল বলেই থেমে গেলে, গোলমালে পড়লে দেখিয়ে দেবে আমাকে, আর তখন কৈফিয়ৎ দেবার দায় আমার।'

—'কৈফিয়ৎ কিসের ?' চোখ তুলে জানতে চাইল তপতী।

—'প্রবীরের ভালত্বের। অসুবিধায় পড়লেই জয়ন্তী সগোষ্ঠী চেপে ধরবে আমাকে। তখন ?'

—'আপনার সার্টিফিকেট নিয়ে তবে কি জয়াদি প্রবীরকে ভাল বেসেছে ? কেউ কি তা বাসে ?'

—'না, না। আমি ঠিক ও ভাবে'—

—'কিছু ভাববেন না আপনি। আপনি জানেন প্রবীর ভদ্র, মিশবার মত, আর তাই তো বলেছেন আমাদের কাছে। জয়াদি'র কি আসে যায় কেউ প্রবীরকে ভাল বা মন্দ বললে ? ও প্রবীরকে ভালবেসেছে কারো সাহায্য ছাড়া, তার সব ভাল মন্দের দায় ওর। জয়াদি কক্ষণো অন্যকে সে ভাগ নিতে ডাকবে না।'

অনেক কথা আজকাল বলে তপতী। বুদ্ধির কথা, যুক্তির কথা। লজ্জা পাবার, আড়ষ্ট হবার দিন কেটে গেছে। প্রায় তিন বছরের চেনা। মাত্র বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে তপতী, ভাস্কর গিয়েছিল তার বার্থডে পার্টিতে। আর এখন এম-এ পরীক্ষা এসে গিয়েছে,—সামনের নভেম্বরে।

—'এই, ম্যাগনোলিয়া!'

গেটের কাছে গিয়ে দু'টো ম্যাগনোলিয়া কিনল তপতী। ঘাসের উপর বসল পা ছড়িয়ে। অগত্যা বসতে হল ভাস্করকেও।

—'ইস্! ঠাণ্ডায় শিরশির করছে দাঁত।'

—'কি দরকার ছিল রাস্তা হতে ম্যাগনোলিয়া কিনবার ? রেস্তোরাঁয় খাওয়া যেত স্টাফড পাইন-আপেল।'

—'বিশ্রী রেস্টুরেন্ট।' অক্লেশে জানাল তপতী।

—'বিশ্রী ?' হতবাক হল ভাস্কর।

—'বিশ্রী নয় ? একপাল লোক, তাও আবার সবাই চেনা

অবিকল লিলি আর দেবকীর স্বর নকল করল তপতী। ভাস্কর এমন জোরে হাসল যে, গাছে জল দিতে ব্যস্ত মালীরা ফিরে ফিরে দেখল।

—'হাসছেন কেন?' কাঠিটা ছুড়ে ফেলল তপতী দূরে।—'যা মুস্কিলে পড়েছি আমি, বিপদ যাকে বলে।'

—'ব্যাপারটা জানতে পারি?'

—'কি করবেন তা হলে?'

—'চেষ্টা করব মুস্কিল আসানের।'

—'তা আর হয় না। এ আপনার ক্লাবের ঝমঝমে বাজনার সঙ্গে উচ্চিংড়ি-লাফানো নয়।'

—'তা তো নয়ই। এ হোল প্রাচীন ইতিহাস। যাকে বলে শিলা-তত্ত্ব, মাটি খুঁড়তে হবে। কোদাল আর গায়ের জোর চাই!'

—'দেখুন রাগাবেন না। পরীক্ষা দোরে, আর সব বইগুলোই নাকি অকুপাইড। কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।' ঘাসের শিষ ছিঁড়ে দাঁতে কাটলো তপতী।

—'আঃ! ওগুলো মুখে দিচ্ছ কেন! লাইব্রেরিয়ানের কাছে যাও। একটা ব্যবস্থা হবে।'

—'ছাই হবে। কি করবে লাইব্রেরিয়ান? ছেলেগুলো ভীষণ চালাক আর স্বার্থপর।'

—'তা হলে যাও ডক্টর দাশগুপ্তের লাইব্রেরীতে। ওঁর কালেকসন তো সাফিসিয়েন্ট শুনেছি।'

—'মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট, কিন্তু আলাপ নেই যে ভাল। আর ওঁর সেই বই চুরি যাবার পর হতে একটি মাছিও অ্যালাউ করছেন না লাইব্রেরীতে।'

—'সেজন্য ভাবনা নেই। দাশগুপ্ত বাবার বন্ধু। আমি জামিন থাকব বইয়ের জন্য।'

—'কত জনের জামিন হবেন আপনি? প্রবীর, আবার আমার জন্যও। লিলি ক্ষেপে যাবে যে শুনলে।'

উঠে পড়ল তপতী। শাড়ি কুঁচকে গেছে, ঘাস লেগেছে। একটু ঝেড়ে নিল।

—'লিলি হঠাৎ ক্ষেপতে যাবে কেন?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল ভাস্কর।

—'আহা! জানি না যেন।'

—'কি জানো?'

তপতীর লম্বা বেণী টেনে দিল ভাস্কর।

—'এই নিয়ে তিন দিন চুল টানলেন, চারদিনের দিন রাগ করবো।' জানাল তপতী।

—'এই নিয়ে দশবার বললে—রাগ করবে। এগারো বারের বার অপমানিত বোধ করব কিন্তু।'

দু'জনের মিলিত হাসি।

গাড়িতে বসে যেতে যেতে বলল তপতী—আচ্ছা, রোজ নিতে আসছেন কেন বলুন তো? আমি কিন্তু একাই যেতে পারি। লিলি নিশ্চয় রাগ করছে সন্ধ্যাবেলায় আপনাকে আটকাবার জন্য। বিয়ে কবে আপনাদের?'

—'বিয়ে? ও! হ্যাঁ। দেখি কবে হয়।' বললো ভাস্কর।

রাস্তায় চুপচাপ চোখ পেতে তপতী ভাবল লিলির কথা। কি সুন্দর লিলি! লাল জর্জেট দেখায় যেন হেলসিঙ্কির অ্যাথলেটের হাতের লাল মশাল।

—'তপতী!' চমকাল তপতী। একহাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাতে নিজের দিকে তার মুখ ফেরাল ভাস্কর।

—'লক্ষ্মীটি! আজেবাজে কিছু ভেবো না এখন। পরীক্ষা সামনে। ভাল করা চাই।'

তপতীকে বাড়ি নামিয়ে দিয়ে ভাস্কর একটু গাড়ি চালাল রসা রোড ধরে। তপতীর নীরবতার কারণ ঠিকই বুঝেছিল সে। তার নিজের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব কেটে গিয়েছে, কিন্তু ভাস্কর জানে, তবু অপেক্ষা করতে হবে। সে ঘর বানিয়ে আসর সাজিয়েছে কিন্তু তার বধূর বরণমালা এখনো গাঁথা হয় নি। সাড়া জেগেছে, ফুল তোলার আয়োজন হচ্ছে, কিন্তু ঠিক লগ্নটি আসে নি এখনো। আজো তপতীর কুমারী মনের বেশির ভাগ জুড়ে রয়েছে ছাত্রীটি। আগের সে নিষ্ঠা নেই সত্য, মাঝে মাঝেই বিক্ষিপ্ত চিত্তের মাঝখানে এসে দাঁড়াচ্ছে কেউ, তবু ধনুকে জাগে নি টঙ্কার। যেদিন জাগবে—ইতিহাসের পাতা, পরীক্ষা, সব ছেলেমানুষি পড়ে থাকবে। এক বেণীধারিণী কুমারী বাহুবন্ধে ধরা দিতে ছুটে আসবে। তার দেরিও খুব বেশি নেই।

লিলির কথা মনে পড়লো ভাস্করের। শতদলে বিকশিত কনক-পদ্ম। লিলিকেও ভাল লাগে। ভাল লাগবার মতই যে সে। উৎসবের রাণী লিলি। কিন্তু যখন বহুবিস্তৃত কর্মভারে ক্লান্তি জাগে, ক্লাব, লম্বা ড্রাইভ—কিছুতেই মন ভরে না, তখন যে মেয়ে এসে পাশে দাঁড়ায়—সে তো লিলি নয়, তপতী।

দাঁড়ালো তপতী ভাস্করের পাশে নিজের স্থানটি নিয়ে, আর সেকথা জেনে চমকাল।

ইতিহাসের পাতায় মগ্ন মনকে নাড়া দিল মীরা।

—'দিন দিন তুই দেখতে বেশ হচ্ছিস তপতী।'

—'বেশ হচ্ছি? মানে? পরীক্ষার বাকি ক'দিন জানিস? বেশ হবারই সময় এখন! কতদিন সাবান পর্যন্ত মাখছি না ভাল করে।' করুণ মুখে গালে হাত বোলাল তপতী।

—'ভাস্কর নাকি তোকে ভীষণ হেল্প করছে। অফিস ছাড়া সব বন্ধ তার?'

—'ভাস্কর? আমাকে? হ্যাঁ।' হেসে ফেললো তপতী, আর তক্ষুণি বুঝল কি হয়েছে তার; আবে। কবে? কখন? একটুও তো টের পায় নি তপতী কবে হতে তার সব সংশয় কেটে গেছে। নাঃ। মার্ডার হল সব। কবিতা নয়, ফুল নয়, ফাল্গুন মাস পর্যন্ত নয়, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর বইয়ের স্তূপে বসে, ডক্টর দাশগুপ্তর নোট নিতে নিতে একেবারে ভালবেসে ফেলেছে সে ভাস্করকে!

—'দিদি বলছিল—ভাস্করের সঙ্গে নিশ্চয় তোর ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সব সময় দেখা যাচ্ছে তোরা একত্র।'

—'তুয়াদি' দেখেছে? ও। প্রবীর বোস বলেছে বুঝি?'

প্রবীর। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—লিলি।

[ক্রমশ।

ব্রজেন্দ্রনাথ

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভারতভূমি দীর্ঘকাল পরপদানত থাকিলেও তাহার জ্ঞানচর্চা ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের স্বাধীনতা ও বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি কোন শক্তিপুঞ্জ কোনকালেই রোধ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর দু'একটি দেশ ছাড়া ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক উর্দ্ধে। ইতিহাসের আলোকশিখায় দেখা যাইতেছে সুদূর অতীতে ভারতের সন্তানেরা দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরম পবিত্র বাণী বহন করিয়া পাড়ি জমাইতেছেন দেশ-দেশান্তরে, ভিন্ন দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতেছেন ভারতবাণী, দীক্ষিত করিতেছেন ভারতের মহামিলনমন্ত্রে পৃথিবীর অগণিত নরনারীকে। এ দেশের শাশ্বত সভ্যতার অমৃতধারার উদ্দেশে সপ্রণাম অর্ঘ্য অর্পণ করিয়াছেন পৃথিবীর অসংখ্য সুধী, মনীষী, চিন্তানায়ক।

ভারতের বুকে এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঘটনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে কত সাম্রাজ্যের পতন-উত্থান কত নগর-জনপদের পতন-উত্থান, কত সমাজের আবর্তন-বিবর্তন, তাহার উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক বিপর্যয়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব কিন্তু জ্ঞানচর্চার সেই ধারাটি কোনপ্রকারে ছিন্ন হয় নাই বরং সময়ের অগ্রগমনে তাহা উজ্জ্বল বলিষ্ঠ হইতে বলিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন সমাজের প্রভাবপুষ্ট চিন্তানায়কদের চিন্তাধারার এই সমন্বয় ভারতের মনীষালোককে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে থাকে।

মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

আমাদের জাতীয়জীবনে উনবিংশ শতাব্দী আসিয়াছিল এক নবতর জীবনাদর্শের বাণী বহন করিয়া। শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজবিপ্লব, রাষ্ট্রচেতনা সকল দিক দিয়াই উনবিংশ শতাব্দী এক নূতন যুগের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিল। অতীতের পটভূমিতে যেন এক বলিষ্ঠ ইমারত গড়িয়া উঠিল বর্তমানের মালমশলায়। এই সময়ে জ্ঞানগগনে দেখা দিলেন অনেকানেক উজ্জ্বল তারা—যাঁহাদের আলোকধারায় অজ্ঞতার, কুসংস্কারের এবং শূন্যতার অবসান ঘটিয়া পরমপ্রাপ্তির এক পরিপূর্ণতায় জাতীয় জীবনের ভাগ্যাকাশ যেন এক [illegible] উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই সময় দেখিলাম মনীষা

সারিতে উপনীত করিল বিদেশের বুকে ভারতীয় মহিমার প্রচার ও জয়ধ্বনি ঘোষিত হইল যাঁহাদের কল্যাণে, ভারতের গর্ব ও গৌরব বিবর্ধনে যাঁহারা গ্রহণ করিলেন এক বিরাট ভূমিকা—দর্শনাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সেই তালিকায় নক্ষত্রের অক্ষরে লেখা একটি অবিস্মরণীয় নাম।

আমাদের দেশের বেদে ও উপনিষদে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত যে ঋষিকুলের বিবরণ পাই—ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যে যেন তাঁহাদেরই ছায়া দেখা যায়। সনাতন ভারতের সেই তপোবন সভ্যতার, সেই শান্ত, সরল, অনাড়ম্বর জীবনধারা, সেই জ্ঞানের দুশ্চর তপস্যা সব কিছুরই যেন পুনরাবৃত্তি এ যুগে ঘটে ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যে, সুতরাং সে দিক দিয়া আমরা অনায়াসে বলিতে পারি যে, ব্রজেন্দ্রনাথ সর্বতোভাবে ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার নবযুগের বার্তাবহ, সেই গরিমামণ্ডিত ঐতিহ্যের যোগ্যতম ধারক ও বাহক।

তাঁহার জ্ঞানের প্রগাঢ়তা, মনীষার অনন্যতা এবং পাণ্ডিত্যের সীমাহীনতাই কি একমাত্র তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, শুধু এই জন্যই কি বুধবৃন্দের ঘরে ঘরে আজও তিনি পূজা পাইতেছেন শুধু কি এই কারণেই—তাঁহার এই শতবর্ষ পূর্তিতে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজাইতেছি?—ইহা সম্পূর্ণ নয়। ব্রজেন্দ্রনাথের একটি খণ্ড পরিচয়মাত্র। ভারতীয় দর্শন এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাঁহার মধ্যে, তাহারই ফলে তাঁহার নিকট হইতে দর্শনের এক অভিনব ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ এ যুগের ফসল, বিশ্বের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সাংস্কৃতিক সংযোগ কপিল, কণাদ, জৈমিনি, ব্যাস, ক্যাণ্ট, হেগেলের যুগের মত কষ্টসাধ্য নয়। পাশ্চাত্য দর্শনের ভরন্ত সরোবরে অনন্ত আগ্রহ লইয়া দুরন্ত নাবিকের মত লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্র, ডুব দিয়াছিলেন গভীর হইতে গভীরে, তাহার অতল অঙ্ক হইতে আহরণ করিয়াছেন মুঠো মুঠো রত্ন, লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় পরিচয় সত্ত্বেও বাবেকের তরে কোথাও কখনো তাহার দ্বারা

করিয়াছেন সানন্দে, কিন্তু তাহাকে স্বীকৃতি দিতে যাইয়া কখনও প্রাচ্য দর্শনকে কোথাও তিনি লঘুস্থান দেন নাই। মনে-প্রাণে তিনি প্রাচ্যই ছিলেন, এই স্বাতন্ত্র্য তিনি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মধ্যে দুই দেশের ভাবধারার সমন্বয় এত সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিয়াছিল। প্রতিভার সপ্তস্বর্গে উপনীত হইয়াও শুধু আপন সাধনাতেই নিরত ছিলেন, দেশবাসীর প্রতি তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি কখনও উদাসীন হন নাই শিক্ষাদানের মহান ব্রতে তিনি ব্রতী, তাহারই ফলে আমরা পরবর্তীকালে অগণিত দার্শনিক পণ্ডিতকে আমাদের মধ্যে লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছি যাঁহাদের বিরাট আমাদের পিপাসুমনকে নানাভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছে।

আচার্য শীলের পাণ্ডিত্যের মূল্যায়ন বা তাহার মান নিরূপণ কিছু ভাষার সাহায্যে বা কয়েকটি বিশেষণের প্রয়োগে করা সম্ভবপর নয়। ব্রজেন্দ্রনাথের সমশ্রেণীর কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের মূল্যায়ন অন্যের পক্ষে অসম্ভব। এ যুগের সাংবাদিককুলের শিরোমণি স্বর্গত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ একদা কথাপ্রসঙ্গে আমাদের বলিয়াছিলেন—'ব্রজেন শীল কারো সঙ্গে যদি এমনি দু'টো সাংসারিক সুখ-দুঃখেরও কথা কইতেন, তারও মধ্যে থিসিস লেখার অনেক উপকরণ থাকত'—এত স্বল্পপরিসরে ব্রজেন্দ্রনাথের অগাধ পাণ্ডিত্যের এত সুন্দর ব্যাখ্যা সচরাচর শোনা যায় না।

ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বিদেশের পণ্ডিতসমাজে ভারতীয় মননশীলতা ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে সচেতনতা আনিয়া দেওয়া। এ কাজে যদিও ব্রজেন্দ্রনাথ একমাত্র নাম নন তথাপি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নাম—যে নাম বারংবার এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত উল্লেখিত হওয়ার দাবীদার। একটি সময় আসিয়াছিল যে সময়ে ইয়োরোপে নতুন করিয়া ভারতীয় গৌরবের প্রচার অনুভূত হইয়াছিল, ইয়োরোপের জনসমাজে সাময়িকভাবে সেই সময়ে ভারত সম্বন্ধে ধারণা অনুরাগপুষ্ট বা শ্রদ্ধার স্পর্শযুক্ত ছিল না। ভারত ইংল্যাণ্ডের পদানত— এই পরিচয়েই এদেশ সেদিন ঐ মহাদেশের নিকট অধিকতর পরিচিত ছিল—ভারতের মহান সন্তানরা সেদিন আবার নূতন করিয়া ভারতের ভাবধারা ও শাশ্বত বাণীর প্রচার শুরু করিলেন। তাঁহাদের কর্মে, রচনায়, বাগ্মিতায়, গবেষণায় এবং অবদানের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা আবার নূতন রূপে, নূতন দীপ্তিতে, নূতন মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিল। ইয়োরোপ অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করিল যে প্রশাসনের দিক দিয়া ভারত পরাধীন হইলেও তাহার সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য রীতিমত ঈর্ষার উদ্রেককারী। বিদেশের সমাজে জননী জন্মভূমির অবলুপ্ত মর্যাদার পুনরুদ্ধার সাধনে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশের পূজ্য সন্তানগণ যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং অমরত্বের বীজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল জীবনের শতবর্ষ পূর্তি ঘটিল। মহানগরীতে ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁহার শততম জয়ন্তী উদযাপিত হইল। তাঁহার ধারা অনুসরণ করিয়া এবং তাঁহার প্রজ্ঞার রশ্মিতে স্নাত হইয়া এ কালের জ্ঞানতাপসবৃন্দ প্রতিভার এক নবদিগন্তের উন্মোচন করুন ও ভারতীয় দর্শনের এক নবতর ভাষ্য রচনা করুন এই কামনা জানাইয়া এই জ্ঞানতপস্বী আচার্যের উদ্দেশে আমরা আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করি।

রামেন্দ্রসুন্দর

বিশ্ববন্দিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ ও শ্রীবৃদ্ধির ইতিহাসে যে কয়টি নাম ধ্রুবতারার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, বাঙলা ভাষার পুষ্টি ও সমৃদ্ধির সাধনায় যাঁহাদের জীবন উৎসর্গিত, সাহিত্যের নতুন ধারা অনুসরণে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—পুণ্যশ্লোক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম সেই তালিকায় একটি অবিস্মরণীয় নাম।

১৮৬৪ সাল একাধিক শক্তিমান সন্তানকে উপহার দিয়াছে। সেদিক দিয়া ১৮৬১র পরেই তাহার স্থান। ১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া আপন আপন ক্ষেত্রে যে বরণীয় বাঙালী সন্তানরা অভাবনীয় কীর্তির স্বাক্ষর রাখিয়া আপন আপন অমরত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য নয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, কবি কামিনী রায়, লেডী অবলা বসু প্রভৃতি সেই তালিকায় এক-একটি উজ্জ্বল নাম। এ কারণে ১৮৬৪ সালের নিকট আমাদের ঋণের সীমা নেই।

রামেন্দ্রসুন্দর

রামেন্দ্রসুন্দর বাঙলা সাহিত্যে একটি নূতন ও স্বতন্ত্র ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন গতানুগতিকতার আশ্রয় তিনি অবলম্বন করেন নাই। তিনি সেই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন যে পথে তাঁহার পূর্বসূরী ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বাঙলা সাহিত্য বিজ্ঞানভিত্তিক রচনায় রামেন্দ্রসুন্দরের অবদান অনস্বীকার্য। সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাবতীয় জিজ্ঞাসা, সংশয় নিরসনে, প্রাঞ্জলভাবে বিজ্ঞানের জটিল দুরূহ তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যানে তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা তুলনারহিত। ইহার ফলে সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল, আগ্রহ বাড়িয়াছে এবং এই বিজ্ঞানসচেতনতা তাহাদের মনের উপরও যে ছাপ ফেলিয়াছে তাহা সুফলই ফলাইয়াছে। জটিল দুরূহ তত্ত্বের জালে আবদ্ধ বিজ্ঞান-গঙ্গাকে সাহিত্যভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত করাইয়াছেন রামেন্দ্রসুন্দর—এ বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব ভগীরথ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নয়। পরবর্তীকালে দেখা গেল ঐকান্তিক

গুণীব্যক্তি বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সমন্বয়ে ও সাহিত্যের মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দিকে যত্নবান হইলেন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর খ অল্প কয়েকজন ছিলেন অগ্রদূত।

বাঙলা ভাষার ইতিহাস যেমনই বিচিত্র তেমনই চিত্তাকর্ষক। যুগে যুগে বিভিন্ন গুণীর কুশলী হাতের স্পর্শে যেভাবে তাহার সংস্কার ও নবরূপায়ণ ঘটিয়াছে তাহার কাহিনী যেমনই বিস্ময়কর, তেমনই অনন্যসাধারণ। এই কুশলীদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরও অন্যতম। বাঙলা ভাষার পঙ্গুতা মোচন করিয়া তাহাকে দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তোলার ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান অসামান্য।

সাহিত্য ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাণস্বরূপ। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন সাহিত্যই জাতির প্রাণ। সাহিত্য ব্যতীত একটি জাতি কখনও প্রাণধারণ করিতে পারে না। সাহিত্যের একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগঠনে ও পরিচর্যায় তাই তিনি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরের মাধ্যমে একটি পরম প্রীতি ও ঐক্যের বাণী প্রচার করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের আর একটি দিক সম্বন্ধে উল্লেখ না করিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে ইংরেজ শোষণে জর্জরিত বাঙালীজাতির মুক্তির এক নব দিগন্তের দিক নির্দেশ দিয়াছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। পাঁচ সালের জাতীয় আন্দোলনে তিনি নিজেকে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত করিয়া জাতির মুক্তিযজ্ঞকে সফল করিয়া তুলিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যে, শুধু বক্তৃতা ও সভা-সমিতির দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তিনি অবলম্বন করিলেন ভিন্নতর পথ, মাতৃপূজায় তিনি প্রথম মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'—সেই মন্ত্রে উদ্বোধিত হল সারা বঙ্গদেশ। বাঙালী উদ্দীপিত হইল এক অভিনব জাতীয় চেতনায়, রামেন্দ্রসুন্দরের নেতৃত্বে বাঙালী মুক্তিমন্ত্রে নূতন করিয়া দীক্ষিত হইল। বড়লাট কার্জনের অসঙ্গত ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে বাঙালী জনগণের মনে বিদ্রোহের চেতনা জাগাইয়া যাঁহারা দেশের মুক্তিযজ্ঞের রূপ দিয়া গিয়াছেন রামেন্দ্রসুন্দরের নাম তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখনীয়। প্রকৃত বিদ্রোহ বলিতে যাহা বোঝায় ইহারা সেই বিদ্রোহেরই পরিচর্যাকার। বিদ্রোহের নামে অনর্থক উপদ্রব তাঁহারা প্রশ্রয় দেন নাই, তাঁহাদের নির্দেশিত বিদ্রোহ জাতীয় জীবনে এক বিরাট ও মহৎ পরিণতি লইয়া দেখা দিয়াছে। পরবর্তীকালের মুক্তি যোদ্ধাগণকে দিয়াছে শক্তি, জোগাইয়াছে প্রেরণা। ইংরাজের অবিচার, দুর্নীতির দিয়াছিল সে মেরুদণ্ডহীন, দুর্বল নয়, পাঁচ সালে সারা বাঙলাব্যাপী যে জাগরণ সূচিত হইয়াছিল, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির যে বিকাশ দেখা গিয়াছিল, যে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জনের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হইল তাহা সময়ের অগ্রগমনে বিরাট পরিণতিলাভ করিল এবং সারা ভারত তাহার সফলে ভাগ বসাইল। ইঁহাদের নেতৃত্বে সেদিন বাঙলার গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে যে স্বাধীনতার উপাসনা চলিতেছিল ভারতের অন্যান্য অঞ্চল তাহা হইতেই স্বাধীনতার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল; ভারতবাসীকে মুক্তিচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল বাঙলা দেশের এক দুর্বার আন্দোলন। রামেন্দ্রসুন্দর বাঙলার মাতৃরূপটি বাঙালীর মনের মধ্যে গাঁথিয়া দিলেন। করুণাময়ী, গরীয়সী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী বঙ্গজননী, মহিমময়ী মাতৃমূর্তি আমাদের হৃদয়ে তিনি অঙ্কিত করিয়া দিলেন। দেশীয় সম্পদের দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি ফিরাইলেন, দেশীয় বস্ত্র, ধান্য প্রভৃতির পূর্ণ সম্মানের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। দেশীয় বস্ত্র, ধান্য প্রভৃতি অন্যান্য সম্পদের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ায় স্বাধীনতার প্রস্তুতি যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার সংশয়ের অবকাশ নাই। বস্ত্র, ধান্য প্রভৃতির মধ্যে বঙ্গজননীর যে শাশ্বতরূপটি রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের জাতীয় মানসে ফুটাইয়া তুলিলেন আমাদের অন্তরে তাহা এক ব্যাপকতর মুক্তিচেতনার উন্মেষ করিল।

দীর্ঘকালের মেয়াদে রামেন্দ্রসুন্দর পৃথিবীতে বর্তমান ছিলেন না। স্বল্পপরিসর জীবনের সমগ্র অংশই তাঁহার কর্মের আলোয় উজ্জ্বল, সার্থকতার আলোকে ভরপুর।

গত ২১শে আগস্ট তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত একাধিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পালিত হইল। তাঁহার ন্যায় কর্মবীরের, দেশপ্রেমিকের ও সাহিত্য সাধকের জীবন, বর্ম ও ভাবধারা এ যুগের দেশবাসীর মনে এক নব আদর্শের সঞ্চার করুক, তাঁহাদের জীবনের পথে পদক্ষেপ করিবার শক্তি জোগাক, তাঁহাদের সম্মুখে সার্থকতার অমৃতলোকের সিংহদ্বার অর্গলমুক্তি করিয়া দিক, এই কামনা এই শুভক্ষণে সর্বান্তঃকরণে করি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবলীর প্রসার আরও ব্যাপক হওয়া উচিত এবং তাঁহার সাহিত্যের সহিত দেশবাসীর পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় হওয়ার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করা যাইতেছে। বিজ্ঞানভিত্তিক তাঁহার প্রবন্ধাবলীর সহিত এ যুগের বাঙালী যদি বিশেষভাবে পরিচিত হন তাহা হইলে বিজ্ঞানের বহু জটিল দুরূহ তত্ত্বগুলি অতি প্রাঞ্জলভাবে তাঁহাদের নিকট বোধগম্য হইয়া উঠিবে এবং বলা বাহুল্য তাঁহারা নানাভাবেই লাভবান হইবেন। এই প্রসঙ্গে এই কর্মসাধকের ও দেশীয় কল্যাণকামী সাহিত্য নায়কের পদাঙ্কতির উদ্দেশে আমাদের

আজাদ কাশ্মীর

মাত্র তিনটি মাস পূর্ণ হইয়াছে নেহরুজীর লোকান্তরযাত্রার। ভারতের সর্বজনবন্দিত প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক তিরোধানে শুধু ভারতেরই বিভিন্ন অঞ্চল নয়, পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই মর্মান্তিক সংবাদে অভিভূত হইয়া লোকনায়কের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছে আপন আপন প্রতিনিধি। সেই সারা বিশ্বের প্রতিনিধিদের বিরাট সমাবেশে লক্ষ লক্ষ শোকাকুল জনতার সম্মুখে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিলেন শেখ আবদুল্লা। নেহরুজীর তিরোধানে এত গভীর আঘাত নাকি তিনি পাইয়াছিলেন যাহা সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত। সেইজন্যই চোখের জলে একটি ছোটখাটো যমুনা তৈরি করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু তিনটি মাসের মধ্যেই সব শোকের উপশম! চোখের জল তিন মাস থাকার নজীর সচরাচর মেলে না, কিন্তু আবদুল্লার দেখা যাইতেছে চোখের জলের সঙ্গে তাঁহার চোখের চামড়াও অদৃশ্য হইয়াছে—অবশ্য ইহা তাঁহার জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে তাহা আমাদের জানা নাই! তিন মাসের মধ্যেই সেই চিরাচরিত স্বরূপেই রাজনীতির আসরে আবার তিনি হাজির।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর লইয়া যে বিরাট সমস্যা আজ দীর্ঘকাল ধরিয়া রীতিমত তিক্ততার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, যে তিক্ততার অবসানের জন্য কত দৌত্যের আয়োজন হইল পরিণামে সকল দৌত্য নিষ্ফল হইয়া পরিবেশকে তিক্ত হইতে তিক্ততর করিয়া তুলিল—সেই সমস্যার এক অপূর্ব দাওয়াই তাঁহার উর্বর মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়াছে। সোজাসুজি তিনি বিধান দিয়া বসিলেন—আজাদ কাশ্মীর হইলেই সব গোলমাল মিটিয়া যায়।

দাবাইটি দিতেছেন কে? আবদুল্লা। আবদুল্লা যদি ভারতের জন্য আজ হৃৎপিণ্ডও উপড়াইতে আসেন তথাপি তাঁহার আন্তরিকতা ভারতবাসীর মনে কখনই বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে না। স্মরণ থাকিতে পারে যে, ইঁহার শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল আয়ুবের প্রতিকৃতিকে পুরোভাগে রাখিয়া। মনে-প্রাণে ইনি পাকপ্রেমী। আয়ুব তাঁহার ইষ্ট। এ হেন তিনি ভারত-পাক বিরোধ অবসানের পথ দেখাইতেছেন ইহা অপেক্ষা ক্রোধোদ্দীপক আর কি থাকিতে পারে তাহাই চিন্তনীয়। ইনি জননেতা হিসাবে আদৌ অভিহিত হইতে পারেন কি না তাহা আলোচনার বিষয়, তবে অভিনেতা হিসাবে তিনি যে কুশলী এ বিষয়ে আমাদের তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

আজাদ কাশ্মীর অর্থাৎ স্বাধীন কাশ্মীর। পাকিস্তানের এই বিরাট চাল না বুঝিবার মত বুদ্ধিহীন ভারতবর্ষ নয়। আবদুল্লা যে পাকিস্তানের দাবার ঘুঁটি তাহা কি কাহারও অজানা? তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ যেখানে পাক-সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁর শ্রীমুখের প্রতিটি বাণী যেখানে পাকিস্তানের নির্দেশে নিঃসৃত হয় সেখানে কোন যুক্তিতে মানিয়া লওয়া যায় যে এই উক্তিটি তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবিত।

পাকিস্তান সারা পৃথিবীর দুয়ারে-দুয়ারে কাঁদুনি গাহিল ভারতের সম্বন্ধে ভারতের কুৎসায় তাহার উৎসাহ ও উদ্যমের সে কি সমারোহ—কিন্তু ফল কি হইল? কেহই তাহাকে পাত্তা দিল না। যে দু'একটি রাষ্ট্র তাহার দিকে মিত্রতার হস্ত প্রসারিত করিল সংখ্যায় তাহারা এত নগণ্য যে সে ক্ষেত্রে কিছুই আসে-যায় না। এখন পাকিস্তান কি করিবে—ভূস্বর্গ অধিকার করার স্বপ্ন তো তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে অথচ ভূস্বর্গ লাভ তাহার ভাগ্যে কিছুতেই ঘটিতেছে না, মাতুলালয়ের আবদার সে যতবার করিল ততবারই প্রত্যাখ্যাত হইল, শেষে অনুগৃহীত ভক্ত আবদুল্লাকে দিয়া 'আজাদ কাশ্মীর'-এর ধুয়া তোলা, বাস, তাহার পর দিব্যি কাশ্মীরকে নিশ্চিন্তে ভোগদখল।

কাশ্মীরকে লইয়া এত সমস্যা, এত বাগ্বিতণ্ডা, এত আলাপ-আলোচনা ইহার জন্য দায়ী কে—ভারত কাশ্মীর সমস্যার স্রষ্টা নয়, কাশ্মীর সমস্যার স্রষ্টা পাকিস্তান। সকল দিক দিয়া কাশ্মীরের উপর ভারতের ন্যায্য অধিকার। ভারত কখনও পররাজ্যের প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই বরং ভারত নানাভাবে তাহার উদারতা এবং বিশ্বাসেরই খেসারৎ দিয়াছে—কাশ্মীর কখনও পাকিস্তানের নয়, কাশ্মীর চিরদিনই ভারতের।

শেখসাহেব 'আজাদ কাশ্মীর'-এর ধুয়া তুলিলেই কি অমনি কাশ্মীর তাঁহার কুক্ষিগত হইবে? কাশ্মীর কি জনমানবশূন্য কোন বসতি—যেখানে তিনি বলিলেই অমনি আজাদ কাশ্মীর গড়িয়া উঠিবে? কাশ্মীর রাজ্যটি তো আর দাবাখেলার ছক নয়—তদুপরি আর একটি দিকও বিবেচ্য যে কাশ্মীর প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী ইহা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদের মুখে দিনের অন্ন তুলিয়া দেওয়ার পরিধানের বস্ত্র জোগাইবার ক্ষমতা কি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আছে—তাহা যদি না হয় তাহা হইলে শেখসাহেব নিশ্চয়ই জানেন যে, তাঁহাকে বিদেশের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে—এবং কোন কোন বিষয়ে ও কোন কোন দেশের নিকট সেই চিন্তা কি সুদৃঢ় ফেজ ভেদ করিয়া শেখসাহেবের চিন্তাশীল মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে? কাশ্মীরকে তিনি পরমুখাপেক্ষীও করিতে তাহলে পশ্চাৎপদ নন—কাশ্মীর রাজ্য 'আজাদ' হইয়া শেষে নানা বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া রহিল এবং ধীরে ধীরে পাকিস্তান তাহাকে আত্মসাৎ করিল—সারা বিশ্ব কি তাহা হইলে এইবার এই দৃশ্য দেখিতে পাইবে—এ অবস্থাতেও যিনি কাশ্মীরকে স্বতন্ত্র করিবার স্বপ্ন দেখেন তাঁহাকে আর যাহাই বলা চলুক অন্তত দেশপ্রেমিক বলা চলে না। এ বিষয়ে কোনপ্রকার মতভেদের অবকাশ থাকিতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এ হেন ব্যক্তিকে 'ভাস্কর', 'স্বার্থান্বেষী', 'দেশদ্রোহী' প্রমুখ বিশেষণগুলিতে বিভূষিত করিতে বাধা কোথায় তাহা আমাদের জানা নাই।

আবদুল্লা চাহিলেই যে ভারত-রাষ্ট্র সরিয়া দাঁড়াইবে ইহাও যদি তিনি ভাবিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হয় তিনি স্বপ্নাচ্ছন্ন। কাশ্মীরকে ভারত-অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করার কুৎসিত চক্রান্ত ভারতবাসীর পক্ষে বরদাস্ত করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখার সময় আজ আসিয়াছে যে ভারতের এক-একটি অঞ্চল যদি পৃথক হইতে চায় স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থায়, স্বতন্ত্র পরিচয়ে, স্বতন্ত্র সংবিধানে তাহা হইলে ভারতের অস্তিত্ব থাকে কোথায়—'ভারত' নামটির ইতিহাসে পরিণত হইতে তা হ'লে তো আর বিলম্ব থাকে না।

আমরা অখণ্ড ভারতের উপাসক, এমনিতেই আমাদের দুর্ভাগ্যবশত ইতোমধ্যেই ভারত খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্ম পূর্বেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তান মানিয়া লইয়া স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইয়াছে, আবার যদি ভারতের অঙ্গ কর্তন করা হয় তাহা হইলে দুঃখের অন্ত থাকিবে না। ভারত মানে শুধু দিল্লী নয়—ভারত মানে ভারতই। মাথার উপর হিমালয়, পায়ের তলায় কন্যাকুমারিকা—তাহার মধ্যবর্তী বিরাট বিশাল ভূখণ্ড—ভারতবর্ষ। শত শত মনীষীর লীলাক্ষেত্র। বিশ্বসভ্যতার অন্যতম জন্মভূমি, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশতীর্থ এই ভারতভূমির প্রকৃত স্বরূপ সেই অখণ্ডতার মধ্যেই নিহিত ভাগ্যের দুর্বিপাকে ঐক্য, সংহতি ও মিলনের প্রতীক এই অখণ্ডতা যতটুকু বিনষ্ট হইয়াছে তাহা ভাবিয়া হা-হুতাশ করিলে আজ আর অবশ্যই কোন ফল হইবে না। তবে, যেটুকু অখণ্ডতা আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সেটুকু যাহাতে তিলমাত্র বিনষ্ট না হয় সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া সেদিকে লক্ষ্য রাখাই আজ আমাদের প্রতিটি ভারতবাসীর এক জাতীয় কর্তব্য । উচিত।

অবশ্য 'আজাদ কাশ্মীর'-এর প্রস্তাব যিনি উত্থাপন করিয়াছেন তাঁহার এই জাতীয় উক্তি কাঁকে বা লুম্বিনীর বাসিন্দাদের উক্তি সমূহের সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিলে কি যুক্তিনীতার পরিচয় দেওয়া হইবে এবং ঐ বাসিন্দাদের উক্তি দুই শ্রেণীর হয়—প্রথম শ্রেণীর উক্তিগুলি অনায়াসে উপেক্ষা করা চলে আর দ্বিতীয় শ্রেণীর উক্তিগুলি শুনিলে তাহাদের যথেষ্ট শাসনের প্রয়োজন হয়। শেখসাহেবের উক্তিগুলি এই দ্বিতীয় শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত অতএব যাহাতে এই প্রকার অভিসন্ধিমূলক-বাক্য আর কখনও তাঁর দ্বারা উচ্চারিত না হয়—সে সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা ভারত সরকারের উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

॥ শোক-সংবাদ ॥

ভারতের সলিসিটার জেনারেল ও আইনজগতের অন্যতম মহারথী ডঃ হেমনাথ সান্যাল গত ২৩শে ভাদ্র ৬২ বছর বয়েসে তাঁর দিল্লীস্থ সরকারী-ভবনে আততায়ীর হাতে গভীর রাত্রে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় নিহত হয়েছেন। রঙপুরের এক বিশিষ্ট জমিদার-পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অর্থশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদেশযাত্রা করেন। বিদেশে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপস লাভ করেন, পি এইচ ডি উপাধি অর্জন করেন ও ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ সালে ইনি আইনব্যবসায় শুরু করেন ও অল্পকালের মধ্যে আইনজগতে একটি সম্মানজনক আসন লাভ করেন ও সারা দেশে আইনজ্ঞ হিসাবে প্রভূত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'টেগোর ল লেকচারার' নিযুক্ত করেন (১৯৫৬-৫৭)। ১৯৫৭ সালে তিনি ভারতের অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল এবং গত মার্চ মাসে সলিসিটার জেনারেল পদে উন্নীত হন। তিনি রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির অন্যতম অছি ও কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। স্থাপত্য এবং চিত্রাঙ্কনেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা এবং অনুরাগ ছিল। কর্মবীর হেমনাথ ছিলেন প্রচারবিমুখ। বহু পত্র-পত্রিকা তাঁর জীবনী প্রকাশ করতে সচেষ্ট হন কিন্তু তাঁর প্রিয় পত্রিকা মাসিক বসুমতীর 'চারজন' বিভাগেই তিনি প্রথম তাঁর জীবনী প্রকাশ করার অনুমতি দেন (আশ্বিন ১৩৬৪ দ্রষ্টব্য)। তাঁর মৃত্যুতে সারা ভারত যে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হল এবং একটি মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানকে হারাল সেই বেদনা বিশেষ উপলব্ধিসাপেক্ষ।

নাটোরের মহারাজা সাহিত্যসেবী যোগীন্দ্রনাথ রায়ের সহধর্মিণী মহারাণী ইন্দুমতী দেবী গত ২০-এ ভাদ্র ৬৪ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর শাশুড়ী, স্বামী, দুইটি পুত্র ও দুই কন্যা ও অন্যান্য আত্মপরিজন বর্তমান।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক, বিশিষ্ট বিপ্লবী এবং অধুনা পৌরসভার ডেপুটি কমিশনার (এক) লোকনাথ বল ১১-এ ভাদ্র ৫৭ বছর বয়সে আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। সুপ্রসিদ্ধ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানে বীর বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে ইনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ও দীর্ঘ দিনের মেয়াদে দণ্ডভোগ করেন। ১৯৪৬ সালে ইনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৪৯ সালে দুর্নীতিদমন বিভাগের অফিসাররূপে ইনি পৌরপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। বিশিষ্ট সমাজসেবিকা শ্রীমতী প্রতিমা বল তাঁর সহধর্মিণী।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক যামিনীকান্ত সোম গত ৭ই ভাদ্র ৮২ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। বাঙলা দেশের শিশুসাহিত্যের সেবায় এঁর জীবনব্যাপী নিরলস সাধনা অনস্বীকার্য। প্রথম জীবন থেকেই তাঁর সাহিত্য সাধনার সূচনা এবং শেষ জীবনেও তাঁর লেখনী অক্লান্তভাবে শিশু পাঠক-পাঠিকার খোরাক জুগিয়ে গেছে। বহু জনপ্রিয় গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভুবনেশ্বরী পদকে সম্মানিত করেন।

অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রথম সেক্রেটারী সতীশচন্দ্র গুপ্ত গত ২২-এ ভাদ্র ৮৮ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। সে যুগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সিভিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্তের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় ইনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব শ্রীরঞ্জিৎ গুপ্ত এবং লোকসভার সদস্য শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত—তাঁর দুই পুত্র। তাঁর সহধর্মিণী প্রিয়বালা গুপ্ত (কবি কামিনী রায়ের সপত্নীকন্যা) গত বৎসর পরলোকগমন করেছেন।

প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক বীরেন নাগ গত ২২-এ ভাদ্র মাত্র ৪৪ বছর বয়সে পরলোকযাত্রা করেছেন। চিত্রজগতে ইনি শিল্প-নির্দেশক হিসাবে যোগ দেন ও কলকাতা এবং বোম্বাইয়ের চিত্রজগতে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। তাঁর পরিচালিত 'বিশ সাল বাদ' এবং 'কোহরা' ছবি দু'খানি জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণে সমর্থ হয়।

পাঠক পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়, সত্যি বলতে কি এমন সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা কোথাও আমি দেখি নাই। সবচেয়ে তার আকর্ষিত জিনিস হচ্ছে প্রচ্ছদপট। বৈশাখ থেকে পত্রিকা উত্তরোত্তর আরও সুন্দর হচ্ছে। সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল (শ্রাবণ সংখ্যায় যাঁর চিঠি ছাপা হয়েছিল) এবং আমি একমত। কারণ সত্যিই আপনি একটি পাকা জহুরী। প্রেমেনবাবুর 'নভোনীল' অপূর্ব লাগছে। রাণু ভৌমিককে আর একটা উপন্যাস লিখতে বলুন, ওঁর লেখা ভাল। আমরা এই পত্রিকাটিতে যেন আপনার উপন্যাস দেখতে পাই। নীহার গুপ্ত, তারাশঙ্কর, যাযাবর এঁদের লেখা আর দেখতে পাই না কেন? আপনাদের একটা বিশেষ সংখ্যা করা উচিত। রঙ্গপট বিভাগটা আর একটু বাড়ালে আনন্দিত হবো। আমরা চাই আপনি ও আপনার পত্রিকা সমেত লেখক-লেখিকাদের যেন ভগবান মঙ্গল করেন। বাজে লিখে হয়ত আপনার মূল্যবান সময়টা নষ্ট করলাম; মাপ করবেন। ইতি—জহর, গীতা ও শীলু পাল। পাকুলীয়া হাই স্কুল। পোঃ—ছোটপাকুলীয়া, সিংভূম, বিহার।

মহাশয়, আমি আপনাদের মাসিক বসুমতীর একজন নিয়মিত গ্রাহক। মাসিক বসুমতীতে 'চারজন' পর্যায়ে বাংলা দেশের সর্বক্ষেত্রের কৃতী সন্তানদের পরিচিতি তাঁদের রচনা গুণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়—সঙ্গে সঙ্গে গর্বে বুক ফুলে ওঠে, শুধু তাই নয় তাঁরা কিভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে একাগ্রতার গুণে আজ যশস্বী হয়েছেন তার কাহিনী আমাদের ছেলেদের মনে উৎসাহ জাগায়। মাসিক বসুমতীর 'চারজন' পর্যায়ে যদি বাংলা দেশের কোন কৃতী পর্বতারোহীর জীবনী প্রকাশ করেন তা হলে আমাদের ছেলেরা সে কাহিনী পড়ে দুঃসাহসিকতার উৎসাহ পাবে। ১৯৬১ সালে আশ্বিন সংখ্যায় বিশ্বদেব বিশ্বাসের 'নন্দা ঘুণ্টি অভিযান ও পর্বতারোহণ শিক্ষা' প্রবন্ধটি রীতিমত আগ্রহসহকারে সকলে পড়েছে এবং ভাল লেগেছে। নমস্কারান্তে—শচীন্দ্রকুমার নাগ, ৪ বেলগেছিয়া রোড, কলিকাতা-৪,

মহাশয়, আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। আমি একজন মাসিক বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহক। আজ আপনাকে এই পত্রে একটি অনুরোধ জানাইতেছি। আশা করি, আপনি আমার ও অন্যান্য অনেক আগ্রহশীল পাঠকদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। বহু বিষয়ের সমালোচনাপূর্ণ আপনার পত্রিকা আমাকে বিশেষ আনন্দ দেয়। কতকগুলি সংখ্যাতে বিপ্লবী ক্ষুদিরামের বিষয় আলোচনা পাইয়াছি। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবনীর বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। গত বৈশাখ সংখ্যাতে নবাব সিরাজদ্দৌলা ও জগৎশেঠের বিষয় অঙ্গন-প্রাঙ্গণের আলোচনার মাধ্যমে পাঠ করে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি ও অনেক অজানা জিনিস আপনাদের মাধ্যমে জানিতে পারিলাম। তাই আজ আমার অনুরোধ যে মহাপুরুষদের জীবনী ঐভাবে প্রকাশ করুন। মাইকেল মধুসূদনের জীবনী সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবেন। ক্রমশ প্রতি সংখ্যাতেই প্রকাশ করিয়া সম্পূর্ণ জীবনী লিখিলে আমরা আনন্দিত হইব। ঐভাবে একের পর এক একটি মহাপুরুষদের জীবনী প্রকাশ করিবেন। মাইকেল, স্যার আশুতোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজীর জীবনী একের পর এক যদি প্রকাশ করেন, তা হলে আপনি আমাদের অনেক উপকার করিবেন। বহু আশা নিয়ে আপনার কাছে অনুরোধ জানাইলাম। ইতি—রণেন্দ্রনাথ মিত্র। ৪১, মনসাতলা লেন কলিকাতা-২৩।

এভারেস্টের উচ্চতা প্রসঙ্গে

[মাসিক বসুমতীর বিগত পৌষ সংখ্যায় এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা সম্বন্ধীয় তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এই তথ্যে কিছু ভুল থাকায় এক পত্রে ডেরাডুন থেকে সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার জিওডেটিক এ্যাণ্ড রিসার্চ ব্রাঞ্চের সহযোগী পরিচালক কর্নেল কে এল খোসলা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং ভুল সংশোধিত ক'রে দিয়েছেন। আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য পত্রটি আমরা হুবহু প্রকাশ করলাম—স]

Sir,

Please refer to the news appearing in your issue for December 1963-Jan. 1964 on the subject of height of Mount Everest.

2. We may add for your information that the Survey of India department had carried out fresh observations to refix height of Mount Everest during the years 1952-54 and the height of Mount Everest now stands corrected to 29028 feet.

3. We do not now propose to carry out further work on this subject in the immediate future.

You are therefore, requested to correct the news item accordingly and inform us, preferably by sending us a copy of the journal containing the correction.

Dated—July 14, 1964.
Survey of India
P. B. No.—77
Dehra Dun (U.P.)
India

Yours faithfully,
K. L. Khosla
Colonel
Dy. Surveyor General II &
Dy. Director (G. & R. B.)

বেচতে চাই

মহাশয়, আপনার সুবিখ্যাত মাসিক বসুমতীর পাঠক আমি বহুদিন হইতে। অনুগ্রহপূর্বক আপনার মাসিক বসুমতীর মারফৎ জানাইয়া দিলে বাধিত হইব—আমি প্রায় ১০।১২ বৎসরের 'মাসিক বসুমতী' (কতক বাঁধান কতক অবাঁধন) বিক্রয় করিতে চাই। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ—আমার নিকট খোঁজ করতে পারেন। ইতি—শ্রীদেবীদাস সেন, ২০।১ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা—২০।

মহাশয়, আমি মাসিক বসুমতীর গ্রাহক ছিলাম অধুনা পাঠক। আমার কাছে ১৩৬৮ সনের মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এবং ১৩৬৯ সনের বৈশাখ হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত ১৪টি মাসিক বসুমতী আছে। কোন গ্রাহক বা পাঠক কিনতে চাইলে অনুগ্রহপূর্বক জানালে বা যোগাযোগ করলে বাধিত হব। নমস্কারান্তে—দীপক দেব। মেটাল বক্স. ৫৯সি, চৌরাঙ্গী, কলিকাতা-২০।

মহাশয়, আমার নিম্নলিখিত বৎসরের মাসিক বসুমতী বিক্রয় করিতে চাই। কেহ কিনিতে ইচ্ছুক থাকিলে এই ঠিকানায় যোগাযোগ স্থাপন করিতে অনুরোধ করি। এই বিজ্ঞাপনটি আপনার মাসিক বসুমতীর আগামী সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে বিজ্ঞাপিত হইলে বাধিত থাকিব। নমস্কার জানিবেন। ১৩৬৫ কার্তিক ও চৈত্র, ১৩৬৬ বৈশাখ ও আশ্বিন, ইতি—শ্রীমতী কনকরেণু ঘোষ। ২৮।৪ কনভেণ্ট রোড, ফ্ল্যাট নং ডি, এণ্টালি, কলিকাতা-১৪।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী লতিকা সেন, 'লতিকা কুটীর' সি।৮২, নিউ দিল্লী সাউথ এক্সটেনশন, পার্ট—২, নিউ দিল্লী—১৬, * * * শ্রীযতীন্দ্রনাথ পট্টনায়ক, শিক্ষক, ইসমালিচক, এইচ এস বিদ্যালয়, ডাক—বাইচক, জেলা—মেদিনীপুর * * * শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম ও ডাক—মণিহারা, জেলা—পুরুলিয়া * * * প্রধান শিক্ষক, সেঙ্গাবাদ মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠ, ডাক—খাগড়া। (বহরমপুর) জেলা—মুর্শিদাবাদ * * * সচিব, মহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার, ডাক—রিষড়া, জেলা—হুগলী * * * সচিব, তালচর ক্লাব, এন, সি, ডি, সি লিঃ তালচর কোলিয়ারী, জেলা—ধেনকানল, উড়িষ্যা * * * শ্রী এস কে বসু, অধ্যক্ষ, জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ইটাচুনা, জেলা—হুগলী * * * শ্রী এইচ এন কুণ্ডু, সহকারী স্টোরকিপার, ডি বি কে রেলওয়ে প্রোজেক্টস, ডাক—দাস্তিওয়াদা, জেলা—বস্তার, (এম-পি) * * * শ্রী ডি এন মুখোপাধ্যায়, বি, এস-ও অফিস অফ দি জি ই ফ্যাক্টরী, কানপুর—১ * * * শ্রীমতী লক্ষ্মীরাণী ত্রিপাঠী, অবধারক—শ্রী এন এন ত্রিপাঠী গ্রাম ও ডাক—নন্দীগ্রাম, জেলা—মেদিনীপুর * * * শ্রীসত্যবান দেবাংশী, গ্রাম ও ডাক—মহুরাপুর (সাঁইথিয়া হয়ে) বীরভূম * * * শ্রীমতী শোভারাণী আইচ, অবধারক—শ্রী বি সি আইচ, ১৬৩, কসবা রোড, কলিকাতা-৪২ * * * শ্রী বি পি গুপ্ত, ৩, সিসেলা বিল্ডিং, কাঁকে, পুণা—৩ * * * শ্রীমদনলাল জেন, ৬৮, নলিনী শেঠ রোড, কলিকাতা—৭ * * * The Office Commanding No. 0507/66. XXX III Corps Signal. Regiment C/o 56 A P O শ্রী আর সি কালী, ডিপার্টমেণ্ট অফ সাইকোলজি, বি জে মেডিক্যাল কলেজ, আমেদাবাদ * * * শ্রীউমাপতি চক্রবর্তী, ধনিয়াগাছি উচ্চ বিদ্যালয়, ডাক—ধনিয়াগাছি, জেলা—মেদিনীপুর * * * সচিব, সিরকা রিক্রিয়েশন ক্লাব, সিরকা কোলিয়ারী, ডাক—ঘ্যারগাদা, হাজারিবাগ * * * শ্রীশুকুমার ঘটক, ডুমনি টি এস্টেট, ডাক—ডুমনি, কামরূপ * * * শ্রী কে চৌধরী ১১৩।২৪৬, স্বরূপনগর, কানপুর—২ * * * শ্রীমতী কমলা ত্রিপাঠী, অবধারক—শ্রী বি ত্রিপাঠী, আই এ এস, কালেকটার, গঞ্জাম, উড়িষ্যা।

আপনার পত্রানুযায়ী—১৩৭১ সালের বার্ষিকমূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতি মাসে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ।

Remitting Rs. 20/- to cover one and half years subscrption of the Monthly Basumati. Please send the magazine regularly. Hony. Genarel Secretary, Bharati Bhabon. Burdwan.

Please receive the annual subscription of Rs. 15/- for the Monthly Basumati. K. N. Banerjee. Retd. Supdt. Jail, 182 Moti ali Nehru Nagar, Allahabad.—2.

বার্ষিকমূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত প্রতি মাসে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। শ্রীমতী স্বর্ণরাণী সিংহ, অবধারক—ডাক্তার আর এন সিংহ, পাটনা—৪।

We are interested to be the subscribers of 1½ years in payment of Rs. 20/- as published. Please send the magazine every month. Secretary Jayashree Club, Po. Rishra, Dt, Hooghly.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। বৈশাখ সংখ্যা হইতে প্রতিমাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, শ্রীমতী সেবাদেবী চক্রবর্তী, গোরক্ষপুর, ইউ পি।

I am sending herewith the sum of Rs. 15/- only being the annual subscription of the Monthly Basumati. Please send the magazine every month. Head Master, Jhargram K K Institution. P. O. Jhargram, Midnapur.

মাসিক বসুমতীর জন্য ১৫৲ পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী রায়চৌধুরী, অবধারক—এস রায়চৌধুরী, গুলজারবাগ, পাটনা—৭।

বর্তমান বৎসরের বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এন এন চট্টোপাধ্যায়, অবধারক—ডাক্তার সি আর চট্টোপাধ্যায়, ডাকঘর—ফরবেশগঞ্জ জিলা—পূর্ণিয়া।

I am sending the subscription of Rs. 15/- for the Monthly Basumati for one year. Please send the magazine regularly. Secretary, Suhrid Prosad and Hem Chandra Library. Langertoli,

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

উৎসব মুখরতে
ভালো বই
বাংলা ইংরেজী গল্প
কবিতার সুনির্বাচিত
সংগ্রহ আর বাছাই করা
শারদীয় সংখ্যার জন্য
মনীষা
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

অকাল বোধন

—শ্রীঅন্নদা মুন্সী অঙ্কিত

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪৩শ বর্ষ
আশ্বিন ১৩৭১

প্রথম খণ্ড
ষষ্ঠ সংখ্যা

মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

কথামৃত

● ঈশা অনুসরণ ●

আত্মজয়ের জন্য যিনি চেষ্টা করিতেছেন, তদপেক্ষা কঠিনতর সংগ্রাম কে করে?

আপনাকে আপনি জয় করা, দিন দিন আপনার উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং ধর্মে বর্দ্ধিত হওয়া, ইহাই আমাদিগের একমাত্র কর্তব্য।

৪। এ জগতে সকল পূর্ণতার মধ্যেই অপূর্ণতা আছে এবং আমাদিগের কোন তত্ত্বানুসন্ধানই একেবারে সন্দেহ রহিত হয় না।

গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান অপেক্ষা আপনাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করা ঈশ্বরপ্রাপ্তির নিশ্চিত পথ।

কিন্তু বিদ্যা গুণমাত্র বলিয়া অথবা কোন বিষয়ের জ্ঞানদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইলে, নিন্দিত নহে; কারণ, উহা কল্যাণপ্রদ এবং ঈশ্বরাদিষ্ট।

কিন্তু ইহাই বলা হইতেছে যে, সদ্বুদ্ধি এবং সাধু জীবন বিদ্যা অপেক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেকেই সাধু হওয়া অপেক্ষা বিদ্বান্ হইতে অধিক যত্ন করে; তাহার ফল এই হয় যে, অনেক সময় তাহারা

৫। অহো! সন্দেহ উত্থাপিত করিতে মানুষ যে প্রকার যত্নশীল, পাপ উন্মূলিত করিতে এবং পুণ্য রোপণ করিতে যদি সেই প্রকার হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে এবম্প্রকার অমঙ্গল এবং পাপ কার্যের বিবরণ থাকিত না এবং ধার্মিকদিগের মধ্যে এতাদৃশী উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিত না।

নিশ্চিত শেষ বিচার দিনে কি পড়িয়াছি তাহা জিজ্ঞাসিত হইবে না; কি করিয়াছি, তাহাই জিজ্ঞাসিত হইবে। কি পটুতা সহকারে বাক্য-বিন্যাস করিয়াছি, তাহা জিজ্ঞাসিত হইবে না; ধর্মে কতদূর জীবন কাটাইয়াছি, ইহাই জিজ্ঞাসিত হইবে।

যাঁহাদের সহিত জীবদ্দশায় তুমি উত্তমরূপে পরিচিত ছিলে এবং যাঁহারা আপন আপন ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল পণ্ডিত এবং অধ্যাপকেরা কোথায় বলিতে পার?

অপরে তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিতেছে এবং নিশ্চিত বলিতে পারি, তাহারা তাঁহাদের বিষয় একবার চিন্তাও করে না।

জীবদ্দশায় তাঁহারা সারবান্ বলিয়া বিবেচিত হইতেন,

৬। অহো! সাংসারিক গরিমা কি শীঘ্রই চলিয়া যায়! আহা! তাঁহাদের জীবন যদি তাঁহাদের জ্ঞানের সদৃশ হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, তাঁহাদের পাঠ এবং চিন্তা কার্যের হইয়াছে।

ঈশ্বরের সেবাতে কোনও যত্ন না করিয়া, বিদ্যামদে এ সংসারে কত লোকই বিনষ্ট হয়!

জগতে তাহারা দীনহীন হইতে চাহে না, তাহারা মহৎ বলিয়া পরিচিত হইতে চায়; সেই জন্যই, আপনার কল্পনা-চক্ষে আপনি অতি গর্বিত হয়।

তিনি বাস্তবিক মহান্, যাঁহার নিঃস্বার্থ সহানুভূতি আছে।

তিনিই বাস্তবিক মহান্, যিনি আপনার চক্ষে আপনি অতি ক্ষুদ্র এবং উচ্চপদ লাভরূপ সম্মানকে অতি তুচ্ছ বোধ করেন।

তিনিই যথার্থ জ্ঞানী যিনি খৃস্টকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সকল পার্থিব পদার্থকে বিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন।

তিনিই যথার্থ পণ্ডিত, যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হন এবং আপনার ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কার্যে বুদ্ধিমত্তা

১। প্রত্যেক প্রবাদ অথবা মনোবেগজনিত ইচ্ছাকে বিশ্বাস করা আমাদের কখনও উচিত নহে, পরন্তু, সতর্কতা এবং ধৈর্যসহকারে উক্ত বিষয়ের ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ বিচার করিবে।

আহা! আমরা এমনি দুর্বল যে, আমরা প্রায়ই অতিসহজে অপরের সুখ্যাতি অপেক্ষা নিন্দা বিশ্বাস করি এবং রটনা করি।

যাঁহারা পবিত্রতায় উন্নত, তাঁহারা সহসা সকল মন্দ প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন না; কারণ, তাঁহারা জানেন যে, মনুষ্যের দুর্বলতা মনুষ্যকে অপরের মন্দ রটাইতে এবং মিথ্যা বলিতে অত্যন্ত প্রবল করে।

২। যিনি কার্যে হঠকারী নহেন এবং সবিশেষ বিপরীত প্রমাণ সত্ত্বেও আপন মতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করা যাঁহার নাই, যিনি যাহাই শুনেন, তাহাই বিশ্বাস করেন না এবং শুনিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ রটনা করেন না, তিনি অতি বুদ্ধিমান।

৩। বুদ্ধিমান্ এবং সদ্বিবেচক লোকদিগের নিকট হইতে উপদেশ অন্বেষণ করিবে এবং নিজ বুদ্ধির অনুসরণ না করিয়া, তোমা অপেক্ষা যাঁহারা অধিক জানেন, তাঁহাদের দ্বারা উপদিষ্ট হওয়া উত্তম বিবেচনা করিবে।

সাধুজীবন মনুষ্যকে ঈশ্বরের গণনায় বুদ্ধিমান্ করে এবং এই প্রকার ব্যক্তি যথার্থ বহুদর্শন লাভ করে। যিনি আপনাকে আপনি যত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানেন এবং যিনি যত পরিমাণে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন, তিনি সর্বদা তত পরিমাণে বুদ্ধিমান্ এবং শান্তিপূর্ণ হইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শাস্ত্র পাঠ

১। সত্যের অনুসন্ধান শাস্ত্রে করিতে হইবে, বাক্চাতুর্যে নহে। যে পরমাত্মার প্রেরণায় বাইবেল লিখিত হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে বাইবেল সর্বদা পড়া উচিত।(ক)

শাস্ত্র পাঠকালে কূটতর্ক পরিত্যাগ করিয়া আমাদের কল্যাণমাত্র অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

যে সকল পুস্তকে পাণ্ডিত্য সহকারে এবং গভীরভাবে প্রস্তাবিত বিষয় লিখিত আছে, তাহা পড়িতে আমাদের যে প্রকার আগ্রহ, অতি সরলভাবে লিখিত যে কোন ভক্তির গ্রন্থে সেই প্রকার আগ্রহ থাকা উচিত।

গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধি অথবা অপ্রসিদ্ধি যেন তোমার মনকে বিচলিত না করে। কেবল সত্যের প্রতি তোমার ভালবাসা দ্বারা পরিচালিত হইয়া, তুমি পাঠ কর।(খ)

কে লিখিয়াছে, সে তত্ত্ব না লইয়া, কি লিখিয়াছে, তাহাই যত্নপূর্বক বিচার করা উচিত।

২। মানুষ চলিয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরের সত্য চিরকাল থাকে।

নানারূপে ঈশ্বর আমাদিগকে বলিতেছেন, তাঁহার কাছে ব্যক্তিবিশেষের আদর নাই।

অনেক সময় শাস্ত্র পড়িতে পড়িতে যে সকল কথা আমাদের কেবল দেখিয়া যাওয়া উচিত, সেই সকল কথার মর্মভেদ ও আলোচনা করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়া পড়ি। এইপ্রকারে আমাদের কৌতূহল আমাদের অনেক সময় বাধা দেয়।

যদি উপকার বাঞ্ছা কর, নম্রতা এবং সরলতা এবং বিশ্বাসের সহিত পাঠ কর এবং কখনও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা রাখিও না!

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে

ক। 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' তর্কের দ্বারা ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করা যায় না,—শ্রুতিঃ।

খ। আদদীত শুভাং বিদ্যাং প্রযত্নাদবরাদপি। নীচের নিকট হইতেও যত্নপূর্বক উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে।

মানসিকরোগের কারণ—দুটি গ্ল্যাণ্ড

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে বিজ্ঞানীরা একদিকে যেমন মানুষ মারবার নিত্য-নূতন কৌশল ...বিষ্কারের জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছেন—অন্যদিকে কিন্তু ...নুষকে বাঁচাবার জন্যেও তাঁদের উদ্যম কিছু কম দেখা ...চ্ছে না। প্রসঙ্গত বলতে হয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা। ...ত পাঁচিশ বছরে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যা উন্নতি হয়েছে, ...র আগের আড়াইশ' বছরেও বোধ হয় ততখানি ...য় নি। আজকের দিনে অনেক পুরনো অনিবার্যভাবে ...রব্যাধির হাত থেকে আমরা প্রায় নিঃশঙ্কভাবেই রেহাই ...চ্ছি। এটা কি কম কথা!

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মধ্যে আবার মানসিক রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে যে উন্নতি হয়েছে তা এককথায় ...স্ময়কর। নরদেহে ঈশ্বরের পরশ আমরা পাই একমাত্র ...মাদের মনে। সেই মন রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে আগেকার ...নে সে ব্যক্তি সবার কৃপার পাত্র হয়ে থাকতো তো বটেই, ...নো বা অহেতুক শাস্তির পাত্রও হয়ে উঠতো। বিগত ...ক শতাব্দী ধরেই অবশ্য এ-দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন ঘটেছে ...বং একজন 'পাগল' যে হাসবার পাত্র নয়, সে-ও যে কলেরা ... টি-বি-গ্রস্তদের মতই একজন রোগী, এ-সত্য বৈজ্ঞানিকভাবে ...কার করা হয়। আজকের দিনে কিন্তু দর্শনের সাথে ...নোবিজ্ঞানের একটা জটপাকানো অবস্থা কয়েক শতাব্দী ...রেই চলে আসছিল। কাজেই বিগত শতাব্দীতে পাগলের ...গ্যে কখনো-সখনো ডাক্তারী প্রক্রিয়া জুটলেও, বেশির-...গ সময়েই তাকে ডাক্তারের দর্শনশাস্ত্রের চাপে পড়ে যেতে ...তো। ফল সহজেই অনুমেয়।

ক্রমশ অবশ্য অবস্থার রূপান্তর ঘটতে থাকে। মনোবিজ্ঞান ...র্শনিকের কব্জার বাইরে চলে আসতে সক্ষম হয়েছে এবং ...জকের দিনের পাগলকে আর দার্শনিকের খেয়াল পূর্ণ ...রতে হয় না। ডাক্তারবাবুদের সর্বজনজ্ঞেয় পদ্ধতির বাইরে ...কে যেতেই হয় না। এখনো অবশ্য একটা ব্যাপারের ...রাহা হয় নি। সে হলো 'মন' প্রথম মানসিক চিকিৎসার ...দ্ধতি আর শরীর প্রথম পদ্ধতি। যাঁরা 'সাইকোথেরাপী' ...রেন, তাঁদের একরকম পদ্ধতি অর্থাৎ যাঁরা মনে করেন ...য রোগীর নিজের মনের সাহায্যেই তাকে স্বাভাবিক ...বস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়—শুধু কথাবার্তা এবং চিন্তা-...বনার সাহায্যে। কিন্তু যাঁরা ভিন্ন পদ্ধতিতে বিশ্বাসী-...রা সর্বদাই মানসিক বিকৃতির জন্যে শারীরিক কারণ ...জে থাকেন। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে

ঠিক বর্তমানে পৃথিবীর অন্তত একশ'টি হাসপাতালে দু'টি গ্ল্যাণ্ডকে একটা প্রধান মানসিক ব্যাধির একমাত্র কারণ মনে করে পরীক্ষাকার্য চালানো হচ্ছে। বেশিরভাগ গবেষকই বর্তমানে এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে একমত। রোগটি হলো সিজোফ্রেনিয়া। এই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সত্য এবং অসত্য, বাস্তব এবং অবাস্তবের সীমানা হারিয়ে ফেলে। এরকম রোগী হয় তো কখনো বলে বসবে যে, কাল রাতে ভগবান যুধিষ্ঠির, মহাকবি কালিদাস এবং পরমহংসদেব একই সময়ে তাঁর বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তিনি নিজে তাঁদের পদধূলি নিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী দেখতে পান নি ওদের, কারণ তিনি তখন ঘুমুচ্ছিলেন। এর মানেটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, স্ত্রী যে ঘুমুচ্ছিলেন সে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে যুধিষ্ঠির, কালিদাস এবং পরমহংসদেবকে নিয়ে একটা অবাস্তব অবস্থা তিনি মিশিয়ে ফেলেছেন। এই ব্যাপারটা যখন ব্যাপকভাবে চলতে থাকে—ঘন ঘন ঘটতে থাকে, তখন তাঁর পক্ষে স্বাভাবিকজীবন বলে আর কিছু থাকে না।

শতাধিক হাসপাতালে প্রায় এক সহস্র মনোবিজ্ঞানী গত দুই যুগ ধরে নানা পরীক্ষাকার্য চালাবার পরে আজকের দিনে মনে করছেন যে, সিজোফ্রেনিয়ার একমাত্র কারণ হলো দু'টি গ্ল্যাণ্ডের ত্রুটি—এ্যাড্রিনাল গ্ল্যাণ্ড দু'টির উপযুক্ত কর্মক্ষমতার অভাব। এ্যাড্রিনাল গ্ল্যাণ্ড দু'টি থেকে যে রস নির্গত হয়, তাকে বলে এ্যাড্রিনাল করটিক্যাল হরমোন। হাত বা পা নাড়ির মতো একটা সামান্য প্রয়াস থেকে, ফুটবল বা হকি খেলা বা পাঁচ শ' মাইল বেগে প্লেন চালানো —প্রত্যেকটি উদ্যমের জন্যেই এ্যাড্রিনাল করটিক্যাল হরমোনের প্রয়োজন হয়—এই জিনিসটির দ্বারাই শরীর এবং মন সক্রিয় হয়ে ওঠে। কয়েক হাজার ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শতকরা আশীটি সিজোফ্রেনিক রোগীরই এ্যাড্রিনাল গ্ল্যাণ্ডস যথেষ্ট সক্রিয় এবং সতেজ হয় না। ফলে যে কোনো নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সে তার মন বা শরীরের সঙ্গতি বজায় রেখে চলতে পারে না—অর্থাৎ তার যে শারীরিক বা মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটে, তা এক কথায় অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়—কাজেই সেও অপ্রকৃতিস্থ হিসেবে গণ্য হয়।

অনেকেই মনে করেন যে, এই গবেষণা মানসিক রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারে যেমন উন্নতি ঘটাবে তেমনি বিপ্লব ঘটাবে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে। মন যে সর্বতোভাবেই শারীরিক কারণবশত বিকৃত হয়ে যায়—এটা ব্যাপক

আমরা সবাই চোর

ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, আমরা চাই বা না চাই ; সত্যের খাতিরে এ কথাটা সব সময়েই স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, প্রকৃত সৎ এবং নিখুঁত মানুষ প্রায় নেই বললেই চলে। অনেকে হয় তো ভাবছেন যে 'পারফেকশন' আমাদের আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও 'পারফেকশন'-এ পৌঁছানো প্রায় অসাধ্য বলেই এই মওকাতে কয়েকটা নীতি কথা শোনাচ্ছি আপনাদের। কিন্তু বাস্তবিক সে রকম কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আমার নেই। মানুষের অক্ষমতাকে নিয়ে বিদ্রূপ করা আমার নেশাও নয়, পেশাও নয়। বরং কয়েকটি বিষয়ে আমরা মানুষেরা যে কতো অসহায় সেই বিষয়ে আপনার নজর আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। সকলেই জানেন, যে কোনো ত্রুটিকে দূর করবার জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হলো সজ্ঞানভাবে তার অস্তিত্ব স্বীকার করা। যদি সজ্ঞানভাবে কোনো ত্রুটিকে আমরা দূর করবার জন্যে চেষ্টা করি, তা হলে হয় তো বা কালক্রমে তা আমরা দূর করে উঠলেও উঠতে পারবো—নচেৎ সেই সমস্ত ত্রুটিসহই আমাদের চোখ বুজতে হবে।

যাই হোক, যা বলছিলাম। সৎ মানুষের কথা—সততার অনেক দিক আছে বা থাকতে পারে। বিস্তারিতভাবে সে আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আসুন আমরা একটু সীমিতভাবে জিনিসটা আলোচনা করি। সততা—যেমন, বিষয়-সম্পত্তি, ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি ইত্যাদি সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক না কেন—এইটেই তো আজকের দিনে একটা প্রধান সমস্যা এবং বোধ হয় অন্য সমস্ত সমস্যারও বেশ খানিকটা এই একটি সমস্যার মধ্যেই যে-ভাবেই হোক না কেন নির্ভর করে আছে।

প্রসঙ্গত একটা পুরনো গল্প মনে পড়ে গেলো।

প্রাচীন গ্রীসে পণ্ডিতপ্রবর ডায়োজেনিসের একদিন মনে হলো যে, রাজধানী এথেন্সে সৎ-ব্যক্তিরা সংখ্যায় কি পরিমাণ এটা একটু দেখা দরকার। বেশ কিছুদিন খোঁজাখুঁজি (অর্থাৎ অনুসন্ধান) চালাবার পরে নিরাশ হয়ে এ কাজে ইস্তফা দিতে হয়েছিল তাঁকে—মানে সৎ লোক তিনি একটিও পান নি। একবার ভাবুন অবস্থাটা। একটা গোটা নগরে দ্বিতীয় আর একজনও সৎ লোক পাওয়া গেলো না। ডায়োজেনিস দেখেছিলেন যে যে ব্যক্তির অন্য কোনো খুঁত নেই—তারও একটি খুঁত আছে—অর্থাৎ কি না চোর। হ্যাঁ চোর। সকলেই চোর। তফাৎ শুধু ডিগ্রির। কেউ বড়ো চোর—কেউ ছোটো চোর—আদৌ চোর নয়—এ রকম লোক

আজকের এথেন্স বা রোম, কিম্বা লণ্ডন, বার্লিন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, মস্কো, কোলকাতা, পিকিং বা টোকিও যদি কেউ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায় তা হলেও ঠিক ডায়োজেনিসের অভিজ্ঞতাই হবে। চোর নয়, কিছুমাত্র চুরির অপরাধ কখনো করে নি বা করে না এ রকম ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া একটা নিদারুণ সমস্যা হয়ে উঠবে বৈ কি।

বলাই বাহুল্য, এখানে চুরি কথাটা একটু ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হলো। 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়'—অবশ্যই, কিন্তু তার পরেও কথা থাকে। দ্রব্য কিছু না লইলেও চুরি করা হয়। যেমন ধরুন, কারো অফিসে হাজিরা দেবার কথা ঠিক দশটায়, সে যদি কোনোদিন সোয়া দশটায় হাজিরা দেয়, কিন্তু পুরো দিনের বেতন নেয় তা হলেও একদিক থেকে সেটা চুরি করা হলো বৈ কি। চুরি অবশ্য সে প্রত্যক্ষভাবে কোনো 'দ্রব্য' করলো না। করলো কিছু সময়, কিন্তু সেই সময় তাকে পয়সা এনে দিলো তো ?

চুরির কথা বলতেই সাধারণত মনে পড়ে কবে কোথায় সিন্দুক ভেঙ্গে দু'শো ভরি সোনা চুরি গিয়েছিল বা ব্যাঙ্ক থেকে লাখ টাকা চুরি গিয়েছিলো বা মস্ত একটা জলহস্তীর হাঁ-এর মতো সিঁদ কেটে গৃহস্থকে সর্বস্বান্ত করা হয়েছিল অর্থাৎ কি না দু' বছর, চার বছর বা পাঁচ বছরের শ্রীঘর ঘুরে আসবার মতো জমকালো চুরি। কিন্তু এ সবের প্রতি নজর আকর্ষণ করা যে আমার উদ্দেশ্য নয়। তা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। 'চোর' আখ্যাপ্রাপ্ত হতভাগাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জায়গা এ নয়। ভদ্র, সাধু এবং 'চোর-নয়' আখ্যাপ্রাপ্তদের মধ্যে যে চুরির কাজটা কি রকম নিয়মিতভাবে চলে থাকে, সেই কথাই আমি বলতে চাই।

নিউইয়র্কে একটি প্রতিষ্ঠান আছে—সওদাগরী প্রতিষ্ঠান সমূহকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হলো যার কাজ, এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা নরম্যান জেসপার কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে, বিভিন্ন সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের (দোকান-পসার সহ) কর্মচারীরা (যারা চোর আখ্যাপ্রাপ্ত নয়) সমবেতভাবে যে চুরি (দ্রব্য) সারা বছর ধরে করে থাকে—চোর আখ্যাপ্রাপ্তদের সমবেত চুরির পরিমাণ সে তুলনায় কিছুই নয়।

আসুন এবার ব্যাপারটা একটু সতর্কভাবে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ভেবে দেখা যাক। ধরুন অমুকবাবু একটা অফিসে চাকুরী করেন। দিনের শেষে কাজের টেবিলের ওপর থেকে তিনি অর্ধেক খয়ে-যাওয়া পেন্সিলটা তুলে

আমাদের, পেন্সিল একটা চাইলেই পাওয়া যায়—আর তা ছাড়া এ-তো অর্ধেকটা নাই-ই এটা বাড়ি নিয়ে যাওয়া আর এমন কি দোষের? কি-ই বা এর মূল্য। সবাই তো নিয়ে থাকে এ-রকম। (অমুকবাবুর মনে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয় যে, ছেলেবেলায় তিনি দেখতেন বাবা-কাকারাও অমন অনেক আনতেন। কখনো রাফ খাতার কাগজ আসতো, কখনো ভালো ভালো 'নিব' আসতো কখনো বা ব্লটিং-পেপার কখনো বা কালি ইত্যাদি ইত্যাদি।)

এই সমস্ত কথা মনে এসে যেতেই অমুকবাবু নিষ্পাপ মনে পেন্সিলের টুকরোটা বাড়ি নিয়ে চলে এলেন। একদিক থেকে ব্যাপারটা এই রকমই একান্ত বৈশিষ্ট্যহীন এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে এ কাজটাকে 'চুরি' করা হলো বললে যেন 'চুরি'র অমর্যাদা হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাপারটার অন্য একটা দিকও আছে। আসুন এবার সেই দিকটা ভাবা যাক। ধরুন আস্ত পেন্সিলটার দাম ছিলো আট আনা। কাজেই আধখানা পেন্সিলের দাম হবে চার আনা। এবার ভাবুন, অমুকবাবু একটা ব্যাঙ্কের কর্মচারী, চাই কি ক্যাশিয়ার। চার গণ্ডা পয়সা আর কি! এই মনে করে যদি তিনি মাঝে-মাঝেই একটা করে সিকি ক্যাশবাক্স থেকে তুলে নিয়ে নিষ্পাপ মনে বাড়ি ফেরেন—তা হলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? তিনি যে চুরি করছেন এ-বিষয়ে কি আর কিছু সন্দেহ থাকবে? এবং তাঁর অপরাধ যে দণ্ডনীয় অপরাধ, সে বিষয়ে কি আর দ্বিমত থাকতে পারে?

মানুষ কেন যে চুরি করে এ নিয়ে বহুকাল ধরে মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে আসছেন এবং আজ পর্যন্ত যে এ-বিষয়ে জ্ঞাতব্য সব জানা হয়ে গেছে এমন কথা কেউই বলেন না। কেন যে মানুষ চুরি করে সে বিষয়ে অনেক উত্তরের মধ্যে কয়েকটি হলো—

১। লাভ—অর্থাৎ অর্থ বা দ্রব্যপ্রাপ্তিজনিত লাভ।

২। মজা অর্থাৎ লাভ কিছুই নেই তবু চুরি করে থাকে কেউ কেউ (বিশেষ করে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা)।

৩। নিজেকে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করার একটা বিকৃত প্রয়াসবশত।

৪। দলে পড়ে।

৫। সম্পূর্ণ অভাবিত এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় নেহাৎ অবস্থার চাপে (যেমন পরীক্ষার হলে অনেক সময় ঘটে থাকে; কিম্বা ট্রাম-বাস যাত্রীদের মধ্যেও কম হয় না)।

৬। অবচেতন মনের তাগিদ।

বিজ্ঞানীরা এই শেষোক্তদের বলেন ক্লেপ্টোম্যানিয়াক। এই ক্লেপ্টোম্যানিয়া ব্যাধিটি অতি সাংঘাতিক। এই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রায় সময়েই চুরি করে থাকে, এমন কি নিজেরও অজ্ঞাতে। চৌর্যলব্ধ দ্রব্য অনেক সময় এমন কি সে নিজেও ভোগ করে না বা তার বাসনাও থাকে না। কিন্তু তবু চুরি তাকে করতেই হবে। এ যেন তার বিধির নির্দেশ।

সব মিলিয়ে তা' হলে অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে, তা নিশ্চয়ই দুঃখদায়ক—মানুষের নানা অসহায়তারই একটা দিক আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

একটা শেষের কথা আছে, যা অবশ্যই বলা দরকার: চুরি করবো না, কোনমতেই কিছু চুরি করবো না। এ-রকম একটা সজ্ঞান দৃঢ়তা থাকলে এক যারা 'ক্লেপ্টোম্যানিয়াক' তারা ছাড়া আর সবাই চুরি না করেও পারে—শুধুমাত্র তখনই আমরা সৎ এবং 'চোর নয়' আখ্যা যথার্থভাবে দাবী করতে পারি। আর ক্লেপ্টোম্যানিয়ার ঊর্দ্ধে উঠতে হলে, দ্বিতীয় এক ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন—অর্থাৎ ডাক্তার-মনোবিজ্ঞানী।

—তীরন্দাজ

নিজের মনোভাব অন্যকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতা মানুষের যতো নির্ভুল ঠিক এতোটা আর অন্য কোনো প্রাণীরই যে নেই—এ বিষয়ে সব অনুসন্ধানকারীরাই একমত। আর এ একটা এমনই বিষয় যে, সাধারণ যে কোনো বালকেরও বোধ হয় এ সম্পর্কে সন্দেহ [illegible] পারে না। কিন্তু নিজেকে অপরের কাছে ব্যক্ত করবার যোগ্যতা সম্পর্কে মানুষের পরেই দ্বিতীয় স্থান কার প্রাপ্য? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যে, মানুষের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে নিশ্চয়ই এইরকম কোন জীবই এই দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী—যেমন কুকুর, বিড়াল, গরু কিম্বা ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, উট প্রভৃতিদের কেউ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মনে করেন

যে, তা সত্য নয়। নিজেকে স্বশ্রেণীর অন্যদের কাছে নির্ভুলভাবে ব্যক্ত করবার শক্তিসম্পন্ন হিসেবে মানুষের পরেই দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হলো মৌমাছি।

বলাই বাহুল্য, পরস্পরের সঙ্গে খবর বা চিন্তা আদান-প্রদানের জন্যে মানুষকে যতোটা ঘন ঘন এবং যতো বিচিত্র কারণে নিজেকে ব্যক্ত করবার প্রয়োজন দেখা দেয়, ততোটা তো দূরের কথা—এমন কি তার শতাংশও অন্য কোনো জীবের হয় না। মনুষ্যেতর প্রাণীদের প্রধানতম প্রয়োজন খাদ্যসংগ্রহ, আত্মরক্ষা, এবং বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন মেটাবার জন্যে স্বশ্রেণীর অন্যদের কাছে নিজেকে ব্যক্ত করতে হয়। বিশেষজ্ঞগণের মতে—এ কাজটা মৌমাছি যতো নিখুঁতভাবে করতে পারে, ততোটা আর কেউই পারে না।

আসুন এবার মৌমাছিদের ব্যক্ত করবার পদ্ধতি, অর্থাৎ তাদের 'ভাষা' সম্বন্ধে কিছু দেখা যাক। মৌমাছিদের ভাষা মানে হচ্ছে 'নাচ'। অর্থাৎ নেচে নেচে তারা একে অপরকে সংবাদ জানায়; খাবারের সংবাদ, বিপদের সংবাদ, জানায় মিলনের আহ্বান।

আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিজ্ঞানী কয়েক বৎসরের পরিশ্রমের ফলে মৌমাছিদের 'ভাষার' অর্থভেদ করতে সক্ষম হয়েছেন। খাবারের সন্ধান করার দায়িত্ব সাধারণত স্ত্রী-মৌমাছিরাই নিয়ে থাকে। মনে করুন একটা বাগানে একটি মৌমাছি কিছু খাবারের সন্ধান পেয়েছে। তার দলের অন্য সবাই রয়েছে অন্যত্র—ধরুন দু'শো গজ দূরে। এই দলবলের অবস্থিতি যদি ঐ বাগানের সমান 'লেভেল'-এ হয়, তা হলে ঐ সন্ধানরত মৌমাছি সোজা ওপরের দিকে কয়েক ফুট উড়ে যাবে এবং গিয়ে তার বিভিন্ন অঙ্গ এবং পাখনা একটা নির্দিষ্ট তাল বজায় রেখে নাচাতে থাকবে।

এর মানে দাঁড়াবে: তোমরা সোজা আস্তানা ছেড়ে সমান উচ্চতা বজায় রেখে লাইন সাজিয়ে এগোও (মৌমাছিরা সাধারণত লাইন দিয়ে উড়তে পছন্দ করে)। কিন্তু ঐ সন্ধানী মৌমাছিটি যদি প্রথমে উপরে উঠে তারপর আবার কিছুটা নীচের দিকে নেমে নাচতে থাকে তা হলে তার দলবল বুঝবে যে, খাদ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তবে যে দিকে সে নাচছে সে দিকে নয়, তার ঠিক বিপরীত দিকে। যে খাদ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তার পরিমাণ মোটামুটি কতোটা তাও মৌমাছিরা প্রায় সঠিকভাবেই জানাতে পারে—সে জন্যে নাচের ভিন্ন ছন্দ আছে। খাবারের জায়গার গতি নির্দেশ করবার পরেই সাধারণত তারা সেই তালে নেচে নেচে জানায় যে দলবলের কতো সংখ্যক মৌমাছির আস্তানা ছেড়ে আসা দরকার খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যাবার জন্যে।

ভয় পেয়ে গেলে সাধারণত মৌমাছিরা অল্প কিছুক্ষণের জন্যে ঘুরতে থাকে একটা কিছু কেন্দ্র করে। কিন্তু এই ভয়ের কবল থেকে যদি কাছেপিঠের অন্য মৌমাছিদের পালাবার সঙ্কেত জানাবার প্রয়োজন হয়, তা হলে তারা ঘুরতে থাকবে নাচতে নাচতে। অর্থাৎ আগে যেখানে শুধু বোঁ করে উড়ছিল এবার সেখানেই নাচতে নাচতে চক্কর দিয়ে উড়বে; কাজেই তার গতিটা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা কম হবে।

—সুরসিক

কীটের প্রতিরোধ

আজকাল সাধারণ গৃহস্থের ঘরে, দোকান-পসারে এবং বড়ো বড়ো স্টোর বা ফসলের ক্ষেতে পোকামাকড় এবং কীট ধ্বংস করবার জন্যে কত রকম তেলই না ব্যবহার করা হচ্ছে। এই তেলটা যে নেহাৎ জলেই যাচ্ছে তা না, তবে অনেক সময় পোকামারার তেল যে আশানুরূপ ফল দিচ্ছে না, তাও সত্য।

ইয়োরোপ এবং আমেরিকার কয়েকটি দেশে পোকামাকড় ধ্বংসের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর কয়েকজন বিজ্ঞানী নানা পরীক্ষাকার্যের পরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আত্মরক্ষার জাতবৃত্তি ছাড়াও বড়ো বড়ো পোকামাকড়ই শুধু নয়, ছোটো ছোটো কীটেরাও তাদের স্বভাব এবং জীবনধারণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধির বিরুদ্ধে লড়তে পারে। শুধু লড়তে পারে তাই নয়—লড়ে জিততেও

ধরে নিন বিশেষ একটা ব্র্যাণ্ডের কীটনাশক তেল আপনি আপনার ফসলের গুদামে নিয়মিত ব্যবহার করে চলেছেন। তিন কি চার মাস এভাবে করতে থাকলে অবশ্যই দেখা যাবে যে, আপনার গুদাম অবাঞ্ছিত পোকামাকড় এবং কীট-মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তার পর থেকেই আবার ক্রমশ দেখা যাবে যে, ঐ কীটনাশক তেলের ব্যবহার চলা সত্ত্বেও আপনার গুদামে একটি-দু'টি করে আবার কীট এবং পোকার আবির্ভাব ঘটতে আরম্ভ করেছে। এটা যে সম্ভব হচ্ছে তার কারণ, কীটের নবলব্ধ প্রতিরোধের শক্তি। আপনি যখন আপনার গুদামে কীটনাশক তেল নিয়মিত ব্যবহার করে চলেছেন, তখন লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন যে, আপনার গুদামের আশপাশের অঞ্চল থেকে নানা জাতের পোকামাকড় এবং কীট একটি একটি করে [illegible]

ঐ কীটনাশক তেলের সঙ্গে হতে থাকে তাদের পরিচয়। একই সঙ্গে চলতে থাকে জৈবিকক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

কীটনাশক তেলের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর জন্যে কখনো গুদামের খুব কাছে এসে পড়ে, কখনো বা আবার একটু পিছিয়ে যায়। এইভাবে পোকামাকড় এবং কীটেরা ক্রমশ তাদের পক্ষে মারক, মানুষের আবিষ্কৃত অস্ত্রের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে আরম্ভ করে। এবং এভাবে কয়েক সপ্তাহ চলবার পরে, অনেক সময় দেখা গেছে যে, ঐ গুদামঘরে নিয়মিত সেই একটি বিশেষ ব্র্যাণ্ডের কীট-নাশক তেল ব্যবহার করা সত্ত্বেও সেই গুদামে পোকামাকড় এবং কীটদল বেশ বহাল তবিয়তেই ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

অনেক বিজ্ঞানী অবশ্য মনে করেন যে, একটা গুদামে নিয়মিত বিশেষ একটা রকমের কীটনাশক তেল ব্যবহার না করে বরং ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রকমারী তেল ব্যবহার করা উচিত। কারণ তা হলে পোকামাকড় বা কীটেরা কোনও বিশেষ একটা কীটনাশক তেলের রাসায়নিক দ্রব্যগুলির সঙ্গে নিজেদের শরীরের খাপ খাওয়াবার সুযোগ পায় না।

—শ্রীবিজ্ঞানী

হইস্ রক্ত

হইস্ রক্ত! একফোঁটা নজরে এলেই সারা শরীরে যেন একটা নাড়া লাগে, কারো মাথা ঘোরে। কারো বা গা গুলোয়, কারো বা মাথা গরম হয়ে ওঠে। গঙ্গোত্রী থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সবটাই গঙ্গা, যে কোনো জায়গা থেকে একফোঁটা নিলেই গঙ্গাজল নেওয়া হলো। আমাদের শরীরেও তেমনি ৫, ৭ কি ১২ সের রক্ত থাকলেও মাত্র একটি ফোঁটাই যথেষ্ট। ঐ একটি ফোঁটার মধ্যেই রয়েছে শরীরের সমস্ত রক্তের ইতিবৃত্তান্ত, সম্পূর্ণ পরিচয়।

শুধুই কি শরীর, রক্ত যে মানুষের মনের পরিচয় দিতেও সক্ষম। এ ক্ষমতা রক্তের বরাবরই ছিলো, আমরাই জানতুম না কি করে রক্তের কাছ থেকে কথা আদায় করতে হয়। এই শক্তি মানুষ অর্জন করেছে মাত্র বছর দশেক আগে। একবার ভাবুন তো—একফোঁটা রক্ত শুধু স্লাইডের ওপর পেলেই আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা শুধু যে আপনি কি কি রোগে ভুগছেন, সেই কথাই বলে দিতে পারেন তাই নয়। সেই সঙ্গে শতকরা অন্তত পঞ্চাশটি ক্ষেত্রে তাঁরা বলে দিতে পারবেন আপনি বাঙালী না ফরাসী জাপানী না নরওয়েজিয়ান; শতকরা অন্তত পঁচাত্তরটি ক্ষেত্রে তাঁরা বলে দিতে পারবেন, আপনি নারী না পুরুষ; শতকরা প্রায় আশীটি ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবেই বলে দিতে পারবেন—আপনি তরুণ, প্রৌঢ় না বৃদ্ধ। এ সব গেল যেমন-তেমন; আজকের দিনে কিন্তু রক্তের কাছ থেকে বিজ্ঞানীরা আর একটি খবরও আদায় করে নিতে সক্ষম যা হয়তো অনেকের পক্ষে মোটেই ভালো খবর নয়।

একফোঁটা রক্ত পরীক্ষা করে আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা এ কথা বলে দিতে পারেন যে, অদুর অতীতে আপনি কোনো অপরাধ করেছেন কি না। বলাই বাহুল্য, এটা নির্ভর করে সেই বিশেষ অপরাধের সঙ্গে ব্যক্তির মনের যোগাযোগের গভীরতার ওপর। প্রায়ই অপরাধ করতে করতে অপরাধে ধাতস্থ হয়ে গেছে এমন ব্যক্তি যদি কোনো অপরাধ করে তা হলে তার অপরাধও রক্ত-পরীক্ষা করে ধরা যায়, তবে তিন-চার দিনের মধ্যে তার রক্ত বিজ্ঞানীর পরীক্ষার টেবিলে পৌঁছানো দরকার। কিন্তু সেই একই অপরাধ ধরুন যদি কোনো ব্যক্তির সেই প্রথম অপরাধ হয়, তা হলে এমন কি পনেরো দিনের মধ্যে তার রক্ত পরীক্ষা করেও সে অপরাধ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হতে পারেন। অবশ্য অনেক সময় তারও পরে ৬, ৮ কিংবা ১০ সপ্তাহ পরেও এটা সম্ভব হতে পারে—যদি সেই অপরাধ অপরাধীর প্রথম অপরাধ হয় এবং সে কাজটা তার মনে একটু বেশি রকম নাড়াচাড়া দিয়ে থাকে।

রক্তের এই যে গোপনতা ফাঁস করে দেবার ক্ষমতা, এটা জানাজানি হয়ে যাবার পর থেকেই পৃথিবীর অনেক দেশের বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল অপরাধীরা—আজকাল 'ট্রাঙ্কুইলাইজার' খেয়ে অপরাধের কাজে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে—এ রকম কিছু কিছু ঘটনার কথাও পুলিশ এবং বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। অপরাধীদের মধ্যে আবার যারা খুবই 'আধুনিক' স্বভাবের তারা আবার 'ট্রাঙ্কুইলাইজার' খেয়ে যেমন কিছুক্ষণের জন্যে মনটা ঠাণ্ডা করে অপরাধের কাজে নামে, তেমনি আবার রক্ত সব কিছু ফাঁস না করে দেয় সেই জন্যে রক্তের একটি সাময়িক পরিবর্তন ঘটাবার জন্যে এক-আধটা ইনজেকশনও নেয় দেখা গেছে।

কিন্তু, একটা কথা। বিশেষ করে রক্তের বিশুদ্ধতা, রক্তের বৈশিষ্ট্য (বিশুদ্ধ রক্ত বা বিশিষ্ট রক্ত বলে আসলে কিছু নেই) সম্বন্ধে গর্ব করে মনে মনে শান্তি পান যাঁরা, তাঁরা জেনে রাখতে পারেন যে, এতো সব করেও রক্তকে

একেবারে কাবু করা সম্ভব হয় না। এতো সব করেও যদি কেউ অপরাধ করে তা হলেও তার রক্ত পরীক্ষা করলে রক্ত তা ফাঁস করে দিতে পারে। তবে এই সমস্ত বিশেষ ক্ষেত্রে, তিন-চার দিন নয়, তিন-চার ঘণ্টা কি বড়ো জোর পাঁচ-ছয় ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীর রক্ত বিজ্ঞানীর প্রয়োজন হয়।

—নার্স মিত্র

আপনি কি মোটর চালান?

বর্তমানে মোটর গাড়ির প্রচলন খুব বেশি এবং তজ্জনিত দুর্ঘটনাও বড় কম ঘটে না, এর একমাত্র কারণ এই যে, গাড়ি চালাতে হলে যতটা যোগ্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন, অধিকাংশ মোটর-চালকই তা নন।

এক্ষেত্রে অবশ্য শুধু চালকের ব্যক্তিগত যোগ্যতার কথাই ধর্তব্য নয়, যে গাড়িটি তিনি চালাবেন সেটির অবস্থাও হওয়া চাই নির্দোষ।

চালকের কথা বাদ দিয়ে প্রথমত শেষোক্ত বিষয়েই মনোনিবেশ করা যাক; দুর্ঘটনা সম্পর্কীয় সমিতির আইন অনুসারে, কোন গাড়ি রাস্তায় চালু করার আগে সর্বপ্রথম তার ব্রেক বা গতি নিরোধক যন্ত্রটি ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার; আজকাল সব মোটর গাড়িতেই প্রায় হাইড্রলিক ব্রেক ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সতর্ক পর্যবেক্ষণে থাকলে যা নাকি প্রায় ত্রুটিহীন, কিন্তু দেখাশুনো ঠিকমত না হলে এর মাধ্যমেই আসে বিপর্যয়।

একেবারে বিকল না হওয়া পর্যন্ত সচরাচর হাইড্রলিক ব্রেক বিগড়ে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখায় না চালানোর সময় এবং যে কোন অসতর্ক চালক তা থেকেই বিপদে পড়তে পারেন স্বচ্ছন্দে।

এজন্য প্রতিমাসেই গাড়ির ব্রেক ঠিক কাজ করছে কি না তার একটা চেক-আপ হওয়া অবশ্য-প্রয়োজনীয়।

লণ্ডনে সম্প্রতি অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে যে, প্রতিবছর অন্তত চোদ্দশো মোটর চালক ও পঁচাশী হাজার মোটর আরোহী দুর্ঘটনার কবলে পড়ে থাকেন, সংখ্যাটি সত্যই আতঙ্কজনক নয় কি?

আমাদের দেশেও মোটর গাড়ির ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে এবং সঠিক সংখ্যা বলা না গেলেও, এখানেও যে দুর্ঘটনার প্রাবল্য কিছু কম নয় একথা অনস্বীকার্য।

সেফটি স্ট্র্যাপ বা বিপদ নিরোধক স্ট্র্যাপের উদ্ভাবনও হয়েছে ইতিমধ্যে এবং গাড়িতে এর ব্যবহার করেও আশ্চর্য সুফল পাওয়া গেছে; অবশ্য এলোপাতাড়ি গাড়ি চালিয়েও সেফটি স্ট্র্যাপের কল্যাণে অটুট থাকার চিন্তা করাটা বাতুলতা মাত্র, তবে স্বাভাবিক ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, সাধারণত কোন দুর্ঘটনার সময় চালক বা আরোহীর দেহ যদি বাইরে [illegible] বেগ হয় দুর্ঘটনার কালে গাড়ির যে গতি ছিল তারই সঙ্গে সমতা প্রাপ্ত; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিতে গাড়ি চালানোর সময়ে দুর্ঘটনা ঘটান ও তাঁর দেহ উইণ্ডস্ক্রীন বা স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে ধাক্কা খায় বা বাইরে পড়ে তা হলে সে দেহেরও তৎকালীন গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ষাট মাইল হারেই।

সেফটি-স্ট্র্যাপ ব্যবহার করলে অধিকাংশ সময়েই এই ধরণের অনিবার্য পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব, এবং মনে রাখা দরকার যে, গাড়ি চলার সময় সমস্তক্ষণই এটি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

জনাকীর্ণ রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে সহজেই, কাজেই এ ধরণের পথে কর্মব্যস্ত মুহূর্তে গাড়ি চালাতে হলে সেফটি-স্ট্র্যাপের প্রয়োজনীয়তাও সমধিক।

এবার আসছে চালকের পালা, মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে, চালকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও গাড়ির যান্ত্রিক যোগ্যতার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী নয়; দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার না হলে চালকের আসনে বসার যোগ্যতা থাকতেই পারে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বহুজন গাড়ি চালানো শেখার সময়ে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা হেতু যথাবিধি চশমা ব্যবহার করলেও, পাকাপোক্ত চালক বনে যাওয়ার পর অনেক সময়ই অসাবধান হয়ে খালিচোখে গাড়ি চালান, এর থেকে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে—কাজেই এ অভ্যাস সর্বথা বর্জনীয়।

দৃষ্টিশক্তিই মোটর চালানোর পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ভূমিকার অধিকারী, কাজেই এ সম্পর্কে সব ধরণের মোটর-চালকেরই বিশেষভাবে অবহিত থাকা আবশ্যক।

শরীরের সাধারণ অবসাদগ্রস্ত অবস্থাতেও মোটর চালানোর ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। কারণ তাতে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে; অতএব কোনদিন যদি চালাতে চালাতে হঠাৎ ক্লান্তি এসে ছেয়ে ফেলে আপনার শরীর-মন, তা হলে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিন গাড়ির গর্জমান ইঞ্জিনটাকে; পথের ধারে খোলা হাওয়ায় বিশ্রাম নিন একটু, যখন দেখবেন ঘাসের সবুজশিষে হাওয়ার একটু কাঁপন দেখে হঠাৎ ভালো লাগারই খুশিতে ভরে উঠছে হৃদয়-মন, তখন বুঝবেন বিশ্রাম আপনার পক্ষে কার্যকরী হয়েছে; এবার লঘুপায়ে উঠে আসুন ফেলে-রাখা যন্ত্রদানবটির কোলে, [illegible]

—[illegible]

শ্রীঅনিলবরণ রায়

বাংলা দেশে পূজা বলিতে বিশেষ করিয়া শ্রীশ্রী৺দুর্গা পূজাই বুঝায়। এই পূজার মহিমা অসীম। হিন্দু-ধর্ম সাধনা, আধ্যাত্মিক সাধনার সার সঙ্কলন করিয়া যেন এই মহাপূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, পুরাণতন্ত্রের ভিতর দিয়া যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ভারতে হিন্দুর যে সভ্যতা, যে শিক্ষা-দীক্ষা, যে সাধনা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে—সব যেন বাঙালীর এই মাতৃপূজার মধ্যে ধরা দিয়াছে। তাই বাঙালী সম্বৎসর ধরিয়া এই পূজার জন্য দিন গণনা করে, পূজা আসিলে তন্ময় হইয়া তাহাতে লাগিয়া যায়। বাঙালী-জীবনের যাহা কিছু শক্তি, যাহা কিছু প্রতিভা, যাহা কিছু ঐশ্বর্য এই মাতৃপূজা, এই শক্তি-পূজাকে ধরিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।

তিনদিন ধরিয়া ষোড়শোপচারে বিধিমত শ্রীশ্রী৺দুর্গা পূজার যে আয়োজন, তাহাকে ভারতের বৈদিক যাগযজ্ঞাদির আধুনিক সংস্করণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বৈদিক যজ্ঞেরই ন্যায় ইহাতে দেবগণকে আহ্বান আছে, নানা খুঁটিনাটি বিধি অনুসারে নৈবেদ্য, বলিদান, হোম, অর্চনা প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। পূজাতে বর প্রার্থনা আছে,

ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, যশো দেহি—

তাই বলিতেছিলাম, বাঙালীর দুর্গোৎসব বৈদিক-যজ্ঞেরই আধুনিক সংস্করণ। বস্তুত এই পূজা যজ্ঞ নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রমশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মহাভারতে শান্তিপর্বে আমরা দেখিতে পাই—যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—

'আমি শুনিয়াছি, বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কালক্রমে লোপ পাইতেছে। সত্যযুগে ধর্মের এক রূপ, ত্রেতাযুগে আর এক রূপ, দ্বাপর যুগে ভিন্ন রূপ, আবার কলিযুগে অন্য রূপ। বেদবাক্য সনাতন সত্য, বেদ হইতেই নানা শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, দেশকালভেদে অধিকারীভেদে বেদ বিভিন্ন ধর্ম-সাধনার ব্যবস্থা দিয়াছে।'

যুগভেদে ধর্মের রূপও বিভিন্ন হইয়াছে। বেদের পর উপনিষদের যুগে কর্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধ হইল, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবতাগণকে তুষ্ট করিয়া ভোগসুখবাঞ্ছা করা নিন্দনীয় হইল। সাংসারিক ভোগসুখ বর্জন করিয়া জ্ঞানের চর্চা করা, একমাত্র পরমব্রহ্মের সন্ধান করা। পরমব্রহ্মে লীন হওয়াই পুরুষার্থ বলিয়া ঘোষিত হইল।

এই যে সংসারবিমুখতা, কর্মবিমুখতা উপনিষদে প্রচারিত হইল, ইহাই কালক্রমে ভারতের ইতিহাসের গতি ফিরাইয়া দিয়াছে, ভারতবাসী আধ্যাত্মিকতায় গভীর হইতে গভীরতর অনুভূতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা অল্প কয়েকজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে—আপামর জনসাধারণের মধ্যে এই কর্মত্যাগ, ভোগত্যাগের শিক্ষা প্রচারিত হওয়ায় জাতীয় জীবনে ভারতের অশেষ ক্ষতি হইয়াছে। অনধিকার চর্চায় ধর্মসঙ্কর হইয়াছে, সাধারণ লোক সংসার ত্যাগ করিতে পারে নাই, ভোগ ছাড়িতে পারে নাই, অথচ উহাকে মিথ্যা, নীচ, নিন্দনীয় ভাবিয়া আদর্শ বিপর্যয়ে জীবনযাত্রায় বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। গীতা এই সংসার-বিমুখতা, কর্ম-বিমুখতার কুফল সম্যক উপলব্ধি করিয়া মহান কর্মযোগের শিক্ষা প্রচার করে। পৃথিবীকে ভোগ করিবার শিক্ষা প্রচার করে—

ভোক্ষ্যসে মহীম

কিন্তু ঘটনাক্রমে গীতার এই পরম কল্যাণময় শিক্ষা ভারতবাসী স্থায়িভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রথমে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে, পরে শঙ্করাচার্য কর্তৃক মায়াবাদ প্রচারের ফলে গীতার কর্মের শিক্ষা চাপা পড়িয়া যায়। এইভাবে ক্রমশ ভারত শক্তিহীন, প্রাণহীন, ঐশ্বর্যহীন হইয়া পড়ে এবং ইহার চরম ফল হইয়াছিল ভারতের পরাধীনতা।

জীবন মিথ্যা, মায়া, এই যে বৈরাগ্যের শিক্ষা ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আবার বৈদিকযুগের দিব্যভোগের

আদর্শ ফিরাইয়া আনিয়াছে তন্ত্র। তন্ত্রের মতে সংসার মিথ্যা নহে, সংসারে ভগবানেরই লীলার বিকাশ হইতেছে—এই সংসার হইতে সরিয়া যাইতে হইবে না, এই লীলার সাথী হইয়া ইহার পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, মানুষের মধ্যে ভাগবতসত্তা লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহাকে জীবনের ভিতর দিয়াই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, মানবজীবনকে দেবজীবনে পরিণত করিতে হইবে। এই যে যোগ ও ভোগের সমন্বয়, এই যে সংসারের দিব্যলীলা—ইহারই প্রতিমা শ্রীদুর্গা। শত্রুদলনের দিব্যশক্তি চাই, বিদ্যা চাই, সম্পদ, ঐশ্বর্য চাই, সৌন্দর্য চাই, সিদ্ধি চাই। পাশবিক বৃত্তিসমূহ যে উচ্চজীবনের বাধা, তাহাদিগকে বশ করিয়া উচ্চজীবন গঠনেরই কাজে লাগাইতে হইবে, আসুরিক শক্তিসকলকে পরাজিত করিতে হইবে,—অন্তরের মধ্যে দিব্যশক্তিকে আহ্বান করিয়া তাঁহারই সাহায্যে এইরূপ দিব্যজীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। মানবজীবনের এই যে অত্যুচ্চ মহান্ আদর্শ, ইহাই সাধককবি দশভুজা দুর্গা মূর্তিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী, পরিপূর্ণযৌবনা, অপরূপ লাবণ্যময়ী মাতৃমূর্তি, দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, সংসারের কোন দিকই বাদ পড়ে নাই, দক্ষিণে লক্ষ্মী ঐশ্বর্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাদায়িনী, সঙ্গে দিব্য-পুরুষ কার্তিকেয়, সিদ্ধিদাতা গণেশ, বাহনরূপী পশুরাজ শত্রুদলনে নিযুক্ত, অসুর নাগপাশে বন্দী—

জীবনের ইহা অপেক্ষা মহান আদর্শ কে কোথায় কল্পনা করিতে পারিয়াছে? ইহা ত' শুধু মাটির প্রতিমা নহে, ভক্ত-সাধক অন্তরের মধ্যে মায়ের যে রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, ইহা যে তাহারই বাহ্যপ্রতীক!

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'মাটি কি গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।' আর ইহা কেবল মনগড়া কল্পনা নহে। ভক্ত-মনের মাঝে যে মূর্তি গঠন করিয়া ভগবানকে আরাধনা করেন, ভগবান ঠিক সেই মূর্তি গ্রহণ করিয়া ভক্তকে দেখা দেন, তিনি যে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু—

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
>
> —গীতা ৪।১১

অতএব এই মাটির পূজা শুধু মাটি পূজা নহে, অর্থহীন পৌত্তলিকতা নহে, ইহা সেই একব্রহ্ম, একভগবানেরই পূজা—

> আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম
> ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

আমরা দেখিলাম বেদে যে যোগ ও ভোগের আদর্শ ছিল, রূপরসাদি সকল বিষয়ের দিব্যভোগ দেবতার উপাসনা করিয়া লাভ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, তন্ত্র আবার সেই আদর্শকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু তন্ত্র এক নূতন তত্ত্ব দিয়াছে যাহা বেদে পরিস্ফুট হয় নাই—তাহা মাতৃরূপে ভগবৎ উপাসনা। উপনিষদ ও দর্শনশাস্ত্রে আমরা শক্তি, প্রকৃতি, মায়ার কথা পাই; এই বিশ্বলীলা প্রকৃতিই বিকাশ করিতেছে—সাংখ্য বলে এই প্রকৃতি পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। বেদান্ত বলে প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তি, উভয়েরই মতে এই প্রকৃতি বা শক্তি বা মায়াই জগতের মূল। উভয়েরই মতে জগৎ দুঃখময়, সংসার অনিত্য, অতএব এই প্রকৃতির খেলা বন্ধ করিতে হইবে। এইজন্য সাধকগণ প্রকৃতি হইতে, শক্তি হইতে ফিরিয়া পুরুষের, ব্রহ্মের উপাসনা করেন, পুরুষে বা ব্রহ্মে লীন হওয়াই তাঁহাদের আদর্শ। কিন্তু তন্ত্র দেখাইয়াছে, সংসার যে দুঃখময় ইহা প্রকৃতির নীচের খেলা, অবিদ্যা বা অজ্ঞানের খেলা—ইহার উপর জগজ্জননীর দিব্য আনন্দের খেলা আছে, এই মর্ত্যজগতেই সেই আনন্দের বিকাশ করিতে হইবে এবং ইহার জন্য জগন্মাতারই উপাসনা করিতে হইবে। জগন্মাতা তাঁহার স্বামী, প্রভু পরমেশ্বরের ভোগের জন্য এই জগৎ লীলাবিস্তার করিতেছেন, ইহা আনন্দময়, প্রেমময়, সৌন্দর্যময়, মানুষ অজ্ঞান, অপূর্ণ তাই সেই আনন্দলীলার আস্বাদ পায় না, মায়ার অধীনে থাকিয়া অশেষ দুঃখ পায়। এই অজ্ঞান বা মায়াকে অতিক্রম করিয়া দিব্যজীবন লাভ করিতে হইলে জগন্মাতার উপাসনা করিতে হইবে।

এই সাধনার বীজ আমরা গীতাতেই দেখিতে পাই। ভগবানের ভোগের জন্য তাঁহার দিব্যশক্তি পরাপ্রকৃতিই এই বিশ্বলীলার বিকাশ করিতেছেন। ভগবান শুধু ধরিয়া আছেন, দর্শন করিতেছেন, অনুমতি দিতেছেন, ভোগ করিতেছেন,—

> উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ (১৩।২৩)

তাঁহার কর্তৃত্বে প্রকৃতিই সব কিছু করিয়া চলিতেছে,

> ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
> হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥
>
> —গীতা ৯।১০

এই বিশ্বজননী ভাগবতশক্তিই জীবরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, সমস্ত জগতকে ধরিয়া রহিয়াছেন—

> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ

যে জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী বিশ্বলীলায় বিকাশ করিয়া নিজ প্রভুর তৃপ্তি সাধন করিতেছেন, সেই লীলার অংশীদার হইয়া তাহার পূর্ণ আস্বাদন গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আর কি গতি আছে? জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ জগন্মাতারই ভিতর দিয়া, জগন্মাতাই আমাদিগকে ভগবানের নিকট পৌছাইয়া দিতে পারেন, ভাগবতজীবন দান করিতে পারেন। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আমরা নির্বাণ লাভ করিতে পারি, কিন্তু পূর্ণ ভগবানকে, পুরুষোত্তমকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারিব

না, আমাদের জীবনের পূর্ণতম বিকাশও সম্ভব হইবে না। যাঁহারা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে চান, জীবনলীলা পরিত্যাগ করিতে চান, তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করুন, কিন্তু যাঁহারা দেখেন, এই সংসারের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছে, সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া সকল লীলা তিনিই উপভোগ করিতেছেন, যাঁহারা দেখেন এই সংসারই আনন্দ-বাজার, যাঁহারা এই সংসারের মজা লুটিতে চান, তাঁহারা রামপ্রসাদের মত গাহিবেন,—

প্রসাদ বলে ব্রহ্ম-নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥

সংসার লীলার মূলে রহিয়াছে কামিনী। বিশ্বলীলা যেমন বিশ্বজননীকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনই মানুষের সাংসারিক জীবনও নারীশক্তিকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, নারীই সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

এইজন্য যাঁহারা সংসারত্যাগকেই জীবনের উচ্চতম আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, নারী নরকের দ্বারস্বরূপ, কারণ নারীই পুরুষকে সংসারে বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু তান্ত্রিকের কাছে এই সংসারই স্বর্গ, ইহারা জানেন, জগন্মাতার শক্তিই প্রকৃতি এই সংসারলীলার বিস্তার করিয়াছে। সংসারের ভিতর দিয়াই ভগবানকে লাভ করিতে হয়—অতএব, সংসারের মূল কামিনীকে তান্ত্রিক বলিয়াছে স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। তান্ত্রিক বিশ্বজননীর উপাসনা করে এবং দেখে যে, সংসারের প্রত্যেক রমণীই জগন্মাতার প্রতিবিগ্রহ এক একটি রূপ—

স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু —চণ্ডী।

মদ্য, মাংস, কামিনী লইয়া পাশবিকবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া যাহারা পবিত্র তান্ত্রিক সাধনার ব্যভিচার করে, তাহারা নিজেদের জন্য নরকের পথ পরিষ্কার করে, তাহাদের দ্বারা সমাজের যে কত অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু যাহারা প্রত্যেক রমণীতেই জগন্মাতাকে মূর্তিমতী দেখে, স্ত্রীমূর্তি দেখিবামাত্র তাঁহার চরণ উদ্দেশে ভক্তিভাবে প্রণাম করা যাহাদের সাধনার আদর্শ, তাহাদের মধ্যে কামভাবের উদয় হইতে পারে না।

বেদ ও তন্ত্রে যে ভোগের আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে, তা সাধারণ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা নীচের প্রকৃতির ভোগ নহে। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

ইন্দ্রিয় অবশ যার দেবতা কি বশ তার।
রামপ্রসাদ বলে বাবইগাছে আম কি কখনও ফলে?

ইহাই শক্তিসাধনার মূলকথা, ইন্দ্রিয় যাহার অবশ সে দিব্য জীবনের দিব্য আনন্দের আস্বাদ লাভ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়নিচয়কে বশীভূত করিয়া কামক্রোধাদি রিপুর উপরে উঠিয়া জগন্মাতার নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে তিনিই দিব্যজীবন বিকাশ করিয়া দেন, তখন মানুষ এই সংসারেই স্বর্গভোগ লাভ করে। ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয়—ইহাই উপনিষদের সেই মহাবাণী,—

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।'

রামপ্রসাদ সহজ ভাষায় **ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন—**

যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ ভক্তজনে আছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এতদিন শক্তিপূজা করিয়া মায়ের পূজা করিয়া বাঙালী এত শক্তিহীন হইয়া পড়িল কেমন করিয়া? কোথায় তাহার দিব্যজীবন, দিব্য-ভোগ? পুত্র-কন্যার মুখে দুইবেলা দুইমুঠো অন্ন সে দিতে পারিতেছে না। চারিদিকে শত্রু ঘিরিয়া ধরিয়াছে। বাঙালীর বিপদ-বিভ্রাট কোথায় নাই? দুর্গতিহারিণী শ্রীদুর্গার পূজা বৎসর বৎসর ষোড়শোপচারে করিয়াও বাঙালীর আজ এত দুর্গতি কেন? যাঁহার কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় সেই মা যদি বর দিতেন, অভয় দিতেন তাহা হইলে কাহার সাধ্য আজ বাঙালীকে স্পর্শ করে? বাস্তবিকই বাঙালীর মাতৃপূজায় অশেষ গলদ রহিয়াছে, তাই সে মায়ের কৃপালাভ করিতে পারিতেছে না। শুধু মুখে মা-মা বলিয়া কিছু পুষ্প ও নৈবেদ্য মায়ের চরণে উৎসর্গ করিলেই মায়ের কৃপা পাওয়া যায় না। মায়ের চরণে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঐ ফুলের মতই উৎসর্গ করিতে হইবে, নিজের জন্য কোন বাসনা, কোন আকাঙ্ক্ষা রাখা চলিবে না, ধন-জন-পুত্র-পরিবার কিছুই নিজের বলিয়া ভাবা চলিবে না। সব মায়ের কাজে লাগাইতে হইবে, মায়ের ইচ্ছা পূরণে সমস্ত ধনসম্পদ পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিবার সঙ্কল্প করিতে হইবে, কোন কিছু বাকি রাখিলে চলিবে না, কোন কিছু দাবি করিলে চলিবে না। অহঙ্কার, দম্ভ, নীচ ভোগের লালসা, যশ-মান প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার লালসা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে। আমাদের জীবনকে দেখিতে হইবে যে উহা ভাগবতলীলা বিকাশে সহায়তা করিবার জন্য, জগতে মায়ের কাজ সম্পাদন করিবার জন্যই আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ পূর্ণ বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও আত্মসমর্পণ যাহার মধ্যে বিকশিত হইবে—কেবল সেই মায়ের কৃপা লাভ করিতে পারিবে। তখন মায়ের অভয় ছায়া তাহাকে সকল দিক হইতে ঘিরিয়া রক্ষা করিবে, তখন সে হইবে সংসারের অজেয়, তখন তাহার কাজ হইবে অব্যর্থ, কারণ তখন তাহা হইবে তাহার ভিতর দিয়া স্বয়ং জগন্মাতারই কাজ, তখন আর এই জগতের বা অদৃশ্য অন্য কোন জগতের কোন শক্তি হইতেই তাহার ভয় থাকিবে না, কোনকিছুই তখন আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আজ এইরূপ পূর্ণবিশ্বাস ও আন্তরিকতারই হইয়াছে একান্ত অভাব। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরা বক্তার ঐ-সব

অসুর বধের আজগুবি কাহিনীতে বিশ্বাস করিতে পারে না। আর অজ্ঞ-অশিক্ষিতেরা মনে করে জগন্মাতা বুঝি সত্যিই ঐভাবে দশ হস্তে দশ অস্ত্র লইয়া সিংহের পৃষ্ঠে চাপিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এ-সব যে নিছক রূপক স্থূল কাহিনীর ভিতর দিয়া উচ্চতম অধ্যাত্মসত্য সকল প্রচার করা হইয়াছে সে বোধ তাহাদের নাই। আর এইরূপ অজ্ঞান তামসিক পূজায় কোন ফলই হয় না।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥
—গীতা ১৭।২৮

শ্রীশ্রী-দুর্গাপুরাণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে গীতার মধ্যে এবং জগন্মাতার যথার্থ স্বরূপ ও চরিত্র শ্রীঅরবিন্দ দিব্যদৃষ্টি লইয়া অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন 'The Mother' পুস্তকে। এই দুইখানি গ্রন্থের সাহায্যে মাতৃপূজার প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া লইয়া পূজাকে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার দিন আসিয়াছে।

ভাই বাঙালী! তোমরা মায়ের পূজারী বলিয়া এই পতিত অবস্থাতেও তোমাদের মধ্যে যে শক্তি দেখা দিয়াছে, যে প্রাণের স্ফুরণ হইয়াছে, ভারতে আর কোথাও তাহা দেখা যায় না। আজ সমগ্র ভারত তোমাদের মুখ চাহিয়া আছে, তোমরা তাহাদের মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবে, বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে—এই যে মহান কার্যের ভার তোমাদের উপর পড়িয়াছে, তাহার জন্য শক্তি সংগ্রহ কর, তোমার মাতৃপূজাকে সার্থক কর। স্বার্থ ভুলিয়া যাও, আপনাকে ভুলিয়া যাও, মায়ের কাজের জন্য ঐকান্তিকভাবে জীবন মন যথাসর্বস্ব অর্পণ কর, দেখিবে তখন সর্বমঙ্গলা মায়ের কৃপায় তোমার সকল অমঙ্গল দূর হইবে, সকল শত্রু ধ্বংস হইবে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, তোমার সর্বার্থ সাধিত হইবে। সকল হৃদয় লুটাইয়া মাকে প্রণাম কর—

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

বোবা রাতে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বোবা রাতের নরম নিকষ-কালো আঁধারে
শুনেছ কি কোনোদিন কান পেতে
অন্তরের অতল থেকে উৎসারিত
গভীর, নিঃসীম, নিথর শূন্যতার শব্দহীন আর্তনাদ?
গৃহ কপোতের পাখার ঝাপটায়
আর ঝরাপাতার মর্মরে
কোনোদিন—কোনো বিনিদ্র ব্যাকুল মুহূর্তে
জেগে উঠে নি মগ্নচৈতন্যের কেন্দ্রস্থলে
বহিস্রাবী দুর্বার বেদনার নৈর্ব্যক্তিক ধূসর হাহাকার?
জান্তব জীবনের নির্বোধ অর্থহীন অস্তিত্ব,
সৃষ্টির মর্মমূলের অন্তর্লীন কারুণ্য
অতন্দ্র রাতের ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত ক্লান্ত প্রহরে
তোমাকে ক'রে তোলে নি উৎকম্প্র বিবশ বিহ্বল
কোনোদিন—কোনো অলস অসতর্ক মুহূর্তে?
স্খলিত স্ফটিকপাত্রের মতো তোমার কোমল সুষুপ্তি
আর স্বর্ণাভ নৈশ স্বপ্ন ভেঙে হয় নি চুরমার?
নক্ষত্রের অগ্নি-অক্ষরে মেলে নি যার উত্তর,—
যা' শুধু নিশীথের নির্মম নৈঃশব্দ্যের উপর
মাথা কুটে মরেছে—
সেই উতরোল উন্মুখর জীবন-জিজ্ঞাসা
আর দৈবী অতৃপ্তির দুর্নিবার দাহ
তোমাকে ক'রে তোলে নি অস্থির উন্মাদ আকুল চঞ্চল?
ঈশ্বরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—
তবু অন্ধ উদাসীন হৃদয়হীন প্রকৃতির হাতের
অসহায় ক্রীড়া-কন্দুক;—
পশুত্ব আর দেবত্বের অদ্ভুত অপূর্ব সমাবেশ,—
এই তো তুমি আর আমি?
মরণের বেলাবালুকায় ব'সে অবোধ শিশুর মতো
ভাঙা বাঁশি বাজিয়ে চলা;
যৌবনের পুষ্পিত প্রলাপের পাশে জরার মোহমুদ্গর-
আবৃত্তি,—
এই তো দুর্লভ দুঃসহ জীবন?
এই প্রচণ্ড প্রহসন, এই শাশ্বত প্রহেলিকা,
এই অচিন্ত্য অসঙ্গতি
তোমার হৃদয়ের শান্তিকে করে নি বিঘ্নিত ব্যাহত—
কোনোদিন—কোনো নিঝুম নিরন্তর

ভারতে মাতৃসাধনা

অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

মানবশিশু জন্মের পরমুহূর্তেই আশ্রয় লাভ করে মাতৃ-অংকে। তারপর, তাঁরই অসীম স্নেহে এবং অকৃপণ করুণায় জীবনের পথে সে করে শুভযাত্রা। মাতৃপ্রদত্ত শক্তিই তা'র চলার পথের পাথেয়। তাই, মাতৃশক্তির প্রতি আদিমযুগ থেকেই মানুষ নিবেদন করে আসছে শ্রদ্ধা-ভক্তির স্রক্-চন্দন। কালক্রমে পরিণত-বুদ্ধিতে সে আবিষ্কার করে বিশ্বজীবনেরও পশ্চাতে রয়েছে এক মহতী মাতৃশক্তি। সেই মাতৃশক্তির বন্দনায় তাই সুপ্রাচীন কাল হতেই মানব-সন্তানের কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর আদি জ্ঞানসিন্ধু শ্রুতিতেও তাই র'য়েছে মাতৃগীতি।

ভারতের মতো পৃথিবীর আরো বহু দেশে অতীতে মাতৃপূজার প্রচলন ছিল। গ্রীসের রহী দেবী, এশিয়া মাইনরের সিবিলি, মিশরের ইস্তার, আইসিস প্রভৃতি মাতৃদেবী এই প্রসংগে উল্লেখনীয়। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপে একসময়ে সিংহবাহিনী পর্বতবাসিনী এক দেবী পূজিতা হ'তেন। অতীতে এই একই মাতৃচেতনা নিখিলবিশ্বে দেশ-দেশান্তরে বিভিন্নরূপে গণ-মানসকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথাও সেই চেতনা তার ধারাবাহিকতাকে এমনভাবে রক্ষা করতে পারে নি। একমাত্র ভারতেই শুধু বৈদিকযুগ হতে আজ পর্যন্ত এই মাতৃবন্দনার ধারাটি বেগবতীভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বাঙলার শারদোৎসব তথা দুর্গাপূজা তারই এক আনন্দস্যন্দন অভিনব রূপ। এই দুর্গাপূজার উৎস-সন্ধানে যাত্রা করলে আমাদের উপনীত হতে হবে শ্রুতির উত্তুংগ শৈলশীর্ষে।

শ্রুতি ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার প্রথম প্রকাশ। বৈদিকী এবং তান্ত্রিকী—এই দুইভাগে বিভক্ত হচ্ছে শ্রুতি। বেদে এবং তন্ত্রে বহু দেবতার সংগে সংগে বহু দেবীরও উল্লেখ রয়েছে। এই সকল দেবদেবী একই পরব্রহ্মের বিভিন্নরূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সসীম সাকার সাধকের হিতের জন্য অসীম নিরাকার ব্রহ্মের রূপকল্পনা তত্ত্বজ্ঞ ঋষির অনুভূতিলব্ধ সত্য—

'চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্য শরীরিণঃ
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥'

—উপনিষদ

বিভিন্ন দেবীগণ স্থান কাল পাত্রানুসারে আকৃতি ও প্রকৃতিতে পৃথক পৃথক হলেও মূলত এক। একই সনাতনী মহতী দেবী এই বিভিন্ন দেবীমূর্তিতে বিলসিতা হয়ে রয়েছেন।—

'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদংততম্।'—চণ্ডী

যাস্কের 'নিরুক্তে' রয়েছে একই দেবতার বিভিন্ন মহিমার ফলেই বহুবিধ নামের উৎপত্তি।—

'তাসাং মহাভাগ্যাৎ একৈকস্যাপি বহূনি
নামধেয়ানি ভবন্তি।'

—নিরুক্ত ৭।৫

বৃহদ্দেবতায় বলা হয়েছে নিবাস, কর্ম, রূপ, মাংগল্যদান, বাক্য, আশিস, ঘটনা, প্রবৃত্তি, জন্মরহস্য, বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য সাধনাদির জন্যই দেবতার বিভিন্ন নামের উৎপত্তি।—

'নিবাসাৎ কর্মণো রূপান্ মংগলাদ্বাচ আশিষঃ।
যদৃচ্ছয়োপবসনাৎ তথামুষ্যায়ণাচ্চ যৎ ॥
চতুর্ভ্য ইতি তত্রাহুঃ যাস্কগার্গ্যরথীতরাঃ।
আশিষোথার্থ বৈরূপ্যাদ্ বাচঃকর্মণ এব চ ॥
সর্বণ্যেতানি নামানি কর্মতস্ত্বাহ শৌনকঃ।
আশীরূপং চ বাচ্যঞ্চ সর্বংভবতি কর্মতঃ ॥
যদৃচ্ছয়োপবসনাৎ তথামুষ্যায়ণাচ্চ যৎ।
তথা তদপি কর্মৈব তচ্ছ্রদ্ধং চ হেতবঃ ॥'

এইভাবেই সকল প্রকার দুঃখ-দুর্গতি ও দুরিতনাশিনী বলেই মহাশক্তি দুর্গা নামে হন পূজিতা। ঋগ্বেদে দুর্গতি অর্থে দুর্গ শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে। যেমন—

'জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ।
স নঃ পর্ষদতি দুর্গানি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥'

—ঋগ্বেদ ১।৯৯

'জাতবেদা অগ্নির উদ্দেশে আমরা সোম নিবেদন করছি। শত্রুদের নিধন করে তিনি নাবিকের মতো দুঃখদুর্গতিরূপ সমুদ্র আমাদের পার করিয়ে দিন এবং আমাদের সমস্ত পাপ বিনাশ করুন।'

দুর্গ বলতে এখানে দুঃখদুর্গতি এবং দুরিত বলতে পাপকে বুঝিয়েছে। তাই, দুর্গতিনাশিনী যিনি তিনিই 'দুর্গা' নামে আখ্যাতা। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে এবং রাত্রিসূক্তে রয়েছে মহাদেবীর ভাবগম্ভীর বন্দনা-মন্ত্র। এই প্রাচীনতম বেদেরই ১০ম মণ্ডলের ১২৭ সংখ্যক রাত্রিসূক্তের পর 'দুর্গা' নাম উল্লেখ করেই একটি অপূর্ব 'দুর্গাস্তোত্র' রয়েছে—।

'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তী বৈরোচনীং
কর্মফলেষু জুষ্টাং।
দুর্গাংদেবীং শরণমহংপ্রপদ্যে সুতরসে তরসে.
নমঃসুতরসি তরসে নমঃ ॥' (১২)

'হে অগ্নিবর্ণা দুর্গাদেবি, তুমি স্বকীয় তপস্যায় জাজ্বল্যমানা (সায়নাচার্যের মতে স্বীয় তাপে শত্রুদহন-কারিণী), স্বমহিমায় প্রকাশমানা এবং কর্মফলদায়িনী। তাই তোমারই শরণ নিলাম। তুমি সহজে আমাকে দুর্গম ভবসাগরের পারে নিয়ে যাও। তোমায় প্রণাম।'

যাজ্ঞিকী উপনিষদের ১০ম প্রপাঠকে প্রসিদ্ধ দুর্গা-গায়ত্রীর সন্ধান মেলে—।

'কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি।
তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ॥' (১০।১।৩৪)

খৃস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে রচিত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ২।৪ অধ্যায়ে দুর্গনিবেশ প্রসংগে যে অপরাজিতা দেবীর মন্দির নির্মাণের নির্দেশ রয়েছে, তিনিও দেবী দুর্গাই। খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রচিত 'ললিত বিস্তর' নামক গ্রন্থে কাত্যায়নী, দেবী ও মাতৃদেবীর পূজা প্রচলিত রয়েছে জানা যায়। এই কাত্যায়নী হ'চ্ছেন দেবীদুর্গা। খৃস্টীয় ৪র্থ শতকের 'অমরকোষে' স্বর্গবর্গে শিবানী মহাদেবীর বিভিন্ন নামের মধ্যে 'দুর্গা' নামটিও বিধৃত রয়েছে। এইভাবে ভারতে যুগে যুগে দুর্গাদেবী বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ভাবে সেই বৈদিক যুগ হতে আজ পর্যন্ত সম্পূজিত হ'য়ে আসছেন। কালক্রমে ভারতীয় সাধক উপলব্ধি ক'রেছেন যে জন্মদাত্রী মাতা দুগ্ধামৃত দানে মানবশিশুর প্রাণরক্ষয়িত্রী পয়স্বিনী গো এবং দেশমাতৃকা এই পরমাশক্তি মহাদেবীরই রূপবিশেষ।—

'সর্ব প্রসূর্জন্মভূমিঃ জননী গৌঃ পয়স্বিনী।
মহাশক্তের্জগন্মাতুঃ প্রতিরূপা সুশোভনা॥'

তাই, বর্তমান যুগে বংগ-ভারতের নবজাগরণে দেশ-মাতৃকার বন্দনাগানে ধ্বনিত হ'য়েছে দুর্গতিহারিণী মহাশক্তিরই স্তুতিগীতি। ঋষিকল্প ভূদেব তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৭৬) গ্রন্থে জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'আদিভারতী'কে অন্নদানরতা মাতৃমূর্তি এবং দুর্গতিনাশিনী মহাদেবী মূর্তিতে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ ক'রে স্তুতি রচনা ক'রেছেন।—

'মাতর্নমামি ভবতীং সতীদেহরূপাং
মাতর্নমামি বসুধাতলপুণ্যতীর্থাং।
মাতর্নমামি পদযুগ্মধৃতসমুদ্রাং
মাতর্নমামি হিমগৌরীকরীটভূষাম্॥
হেমাভা হরিদম্বরা পদতলে নীলাম্বুলীলাঙ্কিতা
স্নিগ্ধা স্নিগ্ধতরংগিণী সুরধুনী পীযুষনিঃস্যন্দিনী।
সূর্যেন্দু-প্রতিবিম্বিতাম্বরলসৎস্রাগেয়-মৌলিজ্জ্বলা
সৌম্যা 'স্বাদভিভারতী' ভয়হরা নিত্যান্নদা শান্তয়ে॥'

বর্তমান ভারতে মাতৃমন্ত্রের সার্থক উদ্গাতা, ভূদেবের ভাবশিষ্য, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠেও তাই সোচ্চার ধ্বনিত হ'য়েছিল—

'বন্দেমাতরম্'

এই শারদোৎসবে তাঁরই সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও আজ উচ্চারণ করি—

'বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।'
'বন্দেমাতরম্'

ত্রিপর্ণা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

এখানে গহন অরণ্য
শ্বাপদের গর্জন।
এখানে অরাতি অগণ্য
অন্ধ প্রতিটি মন॥

এখানে তোমাকে বলবো না,
'প্রিয়তমা কাছে এসো।'
এ পাপ-চিতায় জ্বলবো না
দূর থেকে ভালবেসো।

নিঝুম রাত
তন্দ্রা নেই
ফুল ফোটে, ফুল ঝরে॥
নীল ছায়া
কাঁপছে নীল
অরণ্যের মর্মরে॥

সংঘাতময় অতীব জটিল
প্রণয়ের দেনা-পাওনা,
গুরুদায়িত্ব পালনের ভয়ে
ধরা দিতে তাই চাও না।
সংসার নয় উদ্যান প্রিয়ে,
প্রেম নয় প্রজাপতি।
বৈধমিলনে পদে পদে আছে

যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

লর্ড কিচনার

বুয়র যুদ্ধের বিজয়ীবীর জেনারেল লর্ড কিচনার ১৯০৪ সালে ভারতের প্রধান সেনাপতিরূপে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের ক্লাইভ-দরজার উপর সুরম্য-সৌধে বাস করিতেছিলেন। বুয়র যুদ্ধের প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সেনাবাহিনীর জেনারেল লর্ড রবার্টস প্রভৃতির পর্যুদস্ত বিবরণ শুনিয়াছিলাম। সেই অভিযানের অন্যতম বীর সেনাপতি লর্ড কিচনার অব খার্টুমেরও নাম শোনা ছিল। ভাবি নাই যে, এই বীরপুরুষের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ হইবে।

যে-সব মনীষী সংস্পর্শে প্রত্যক্ষ মহিমা দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাহারই সম্বন্ধে এই সব অধ্যায় লেখা হইতেছে। এ রচনার মধ্যে তৎকালীন অনেক ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তথ্য ও বিবরণ লিখিতেই হইবে। এইগুলি যদি ভবিষ্যতে বাংলা বা ভারতের ইতিহাস লিখিবার কাজে লাগে—তাহা হইলে শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

১৯০৪ সালে লর্ড কিচনার ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লার দুর্গে তাঁহার আবাস সংস্কার করাইতে ছিলেন। তিনি ভারতের রাজপ্রতিনিধি ভাইসরয় লর্ড কার্জনের পত্নী লেডী কার্জনের কনিষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার চিত্তবিনোদন ও সুখোপবিধানের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের প্রধান সেনাপতির প্রাসাদটি মনোরম করিয়া পুনর্গঠিত হইতেছিল। সেই সংস্কারকার্যের ভার মদীয় খুল্লতাত হৃদয়নাথ ঘোষ এণ্ড সন্স ঠিকাদারের উপর ন্যস্ত হয়। সেনাপতি কিচনার অতি সুগঠিত সমুন্নত বীরকায় পুরুষ। তাঁহার কথাবার্তা ও চালচলন যেমন বীরোচিত তেমনই ভীতি উৎপাদক ছিল এবং তাঁহার ইংরাজী বুলিও সহজে বোধগম্য হইবার নয়। সেইজন্য সদ্য এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পর অবসর সময়ে খুল্লতাত মহাশয় এই দুর্দান্ত বীরপুরুষের সহিত আলোচনা করিবার ও নির্দেশ লইবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করেন।

তখন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটি ভারতের প্রধান বৃটিশ শক্তির পরিচায়করূপে কলিকাতার বুকে অবস্থিত। প্রায় শত বৎসর পূর্বে এই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ বর্তমান জেনারেল পোস্ট অফিস সৌধের স্থানে ছিল। এইখানেই অন্ধকূপ-হত্যা সম্পাদিত হয়। পিতলের ফলকের দ্বারা সে স্থান চিহ্নিত ছিল, তাহা দেখিয়াছি। বর্তমান দুর্গের গঠন-পদ্ধতিও অভিনব। এই দুর্গ মাটির নীচে গভীর পরিখা-বেষ্টিত হইয়া নির্মিত। গোরা সৈন্যে পরিপূর্ণ, যে বৃটিশ রাজ্যে সূর্য অস্ত যাইত না—সেই বৃটিশের রাজ-প্রতীক ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা চারিতলা ডালহাউসি সৈন্য ব্যারাকের উপর সগর্বে উড্ডীন থাকিত। একটি উচ্চ গোলাকার স্তম্ভ ছিল। তাহার উপরে গোলাকার বল ঠিক মধ্যাহ্ন ১টার সময় কিঞ্চিৎ উঠিয়া শব্দ করিয়া পড়িত। তখনই কেল্লার র‍্যামপার্ট হইতে গভীর গর্জনের সহিত তোপধ্বনিতে কলিকাতাবাসীরা শিহরিয়া উঠিত এবং নগরবাসিগণ ঘড়ি মিলাইত। এই কেল্লাটি গড়ের মাঠ হইতে ঢুকিবার তোরণ, ঢালু রাস্তার উপর নির্মিত। তাহারা কলিকাতা, পলাশী, চৌরঙ্গী, ক্লাইভ ও পাণির দরজা বলিয়া অভিহিত হইত।

যদিও লর্ড কিচনার খুব রূঢ় প্রকৃতির বীরপুরুষ, তথাপি মন কুসুমেরই মতই কোমল এবং চারু-সুকুমার শিল্পের বিশেষ সমঝদার ছিলেন। ইহা বলিলে অবান্তর হয় না যে, ইংরাজ সেনাবাহিনীর বীরপুরুষগণই ভারতের অতীত-গৌরব, শিল্প-স্থাপত্যেরই উদ্ধারকর্তা। এই সম্বন্ধে জেনারেল কার্গুসন, জেনারেল কানিংহাম, জেনারেল কিটো, স্যার জন মার্শাল সৈন্যাধ্যক্ষদের নাম চিরস্মরণীয়।

লর্ড কিচনার তাঁহার মধ্যাহ্নভোজের পর প্রতিদিনই তাঁহার প্রাসাদের সংস্কারকার্য পরিদর্শন করিতেন এবং নির্দেশ দিতেন। প্রথম প্রথম ভীতচিত্তে তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিতাম বটে, কিন্তু তাঁহার সরল-সদাশয় সুকুমার-বৃত্তিতে অভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং প্রকৃত শিল্পীর মত তাঁহার জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। তিনি জয়পুরের পঙ্খের কাজ, অম্বরের ময়ূরের পেখম বিস্তার, আগরার ফুল-পাতার সূক্ষ্ম প্রয়োগ অতি নিপুণভাবে দেখাইয়া দিতেন। Art & Architect সম্বন্ধে আমার চেতনা উন্মীলিত হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহারই কৃপায়। তিনিও আমার শিল্পিমনের আদর করিয়াছিলেন এবং একটি প্রশংসাপত্র আমার পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

প্রায় তিন মাস তাঁহার সাহচর্যে আসিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহার এই জঙ্গীশক্তির মধ্যে অনন্ত-অসীমের মহিমা অনুভূতি করিবারও ক্ষমতা আছে। ইহার প্রমাণ পাইলাম যখন ১৯৪১ সালে ভারতভূমির শেষ স্থলবিন্দু কন্যা-কুমারিকায় যাই তখন 'কিচনার রক্' (Kitchener Rock) বিবেকানন্দ রকের পাশে দেখিলাম এবং Empire নামে তদানীন্তন একটি সচিত্র পত্রিকায় এই 'কিচনার' রকের বিষয় পড়িয়াছিলাম। লর্ড কিচনার যখন কন্যা-কুমারিকা ভ্রমণে গিয়াছিলেন তখনই তিনি বিবেকানন্দ নামে রকটির ভারতকূলের দিকে আরেকটি রকের উপর বসিয়া অনন্ত-অসীমের চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া ছিলেন। জানি না কি ভাবিয়া ছিলেন।

সেই অবধি ইহা 'কিচনার' রক নামে বিখ্যাত, তাই কবির কথা মনে হয়—

সীমার মাঝে, অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

স্বামী বিবেকানন্দ

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলার কয়েকজন মহাপুরুষের সংশ্রবে আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের স্বাধীনতা লাভ, বাঙালীর মধ্যে নরনারায়ণের পূজা, বাঙালীকে উন্নত স্বাধীনতাপ্রিয় মন গঠনে বিবেকানন্দই ছিলেন সর্বপ্রধান মহীয়ান ও গরীয়ান নায়ক। সে প্রভাব মদীয় কিশোরমনের উপর পড়িয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের নবভারত গঠনের এবং ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করার যে মহান্ অবদান তাহা বর্ণনা করিবার আমার শক্তি নাই। বহু বহু জ্ঞানী গুণী সাধক স্বামীজীর বিষয় আলোচনা ও বর্ণিত করিয়াছেন। এখানে একটিমাত্র শুভ অনুষ্ঠানের বিবরণ উল্লেখ করিতেছি।

১৯০১ সালে যখন স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় বিদেশ হইতে আগমন করেন। তখন তাঁহাকে কলিকাতা মহানগরীর নরনারীগণ বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বাগবাজার স্ট্রীটের উপর বিশাল নন্দলাল বসুর প্রাসাদ অবস্থিত। তাহার সম্মুখে বিরাট ময়দান। প্রাসাদটি খুবই প্রকাণ্ড এবং সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য। বলিতে গেলে কি তদানীন্তন বড়লাটের ভবন (বর্তমান রাজভবন বা Government House) এই প্রাসাদের তুলনায় মহিমান্বিতও নয়। এই নন্দবসুর বাটীতেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রাখী-পূর্ণিমা প্রভৃতি সকল জাতীয় ও ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইত। প্রায় লক্ষাধিক আকুলিত ও ভক্তি-শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে সেই বিশাল প্রাঙ্গণে সমবেত। প্রাসাদটি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত।

এমন সময়ে চারি ঘোড়ায় টানা খোলা ল্যাণ্ডো—(Lando) গাড়িতে সেই আজানুলম্বিত উন্নতবক্ষ পুরুষসিংহ গেরুয়া-বস্ত্র ও পাগড়িধারী বীরসন্ন্যাসী-প্রকৃতি দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। বিশাল জনতা ভেদ করিয়া সেই ল্যাণ্ডো গাড়ির দিকে দৌড়াইলাম। ঘোড়া খুলিয়া দেওয়া হইল। সেই ল্যাণ্ডো জনগণ টানিয়া প্রাঙ্গণ মধ্য দিয়া প্রাসাদমধ্যে লইয়া গেল। এই অবসরে সেই মহাপুরুষের পাদস্পর্শ করিয়া জন্ম ধন্য করিলাম এবং সেই গাড়ি টানিয়া চলিলাম।

তাহার পর প্রায় ৪০ মিনিট ধরিয়া স্বামীজীর উদাত্তস্বর ও মহাবাণী শুনিয়া কর্ণ তৃপ্ত করিলাম। বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বৎসর। তাঁর সে মহাবাণী শুনিবার ভাগ্য হইলেও গভীর তথ্য বুঝিবার বুদ্ধি ছিল না। তথাপি তাঁহাকে ছুঁইবার বা তাঁহার গাড়ি টানিবার সৌভাগ্যের কথা এখনও আমার প্রাণে প্রদীপ্তমান।

মৃত মন

সুধীরকুমার গংগোপাধ্যায়

মনের নিঃসংগ মূল বিসর্পিত তমসার বুকে—
তাই বুঝি উজ্জ্বল কৌতুকে
বিশ্বকে গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব হল না।
কঠিন আঘাত আর মলিন ছলনা
বিকৃত করেছে চোখ। হাসিমুখে
সবকিছু মেনে নেওয়া পরিপূর্ণ সুখে
মনে হয় কৃত্রিমতা। প্রতি পদক্ষেপে
চিত্ত মোর ভরে আছে নিবিড় আক্ষেপে।

আকাশের আলো সেই মৃত মনে আশ্বাস আনে না,
বসন্তের সত্যরূপ তাই বুঝি হয় নাকো চেনা।
সৌন্দর্যে বিকার আনি, মাধুর্যের তিক্ততায় ভরি
প্রিয়ার নির্মল চোখে অপবিত্র ছায়াপাত করি।
অনুদার অসন্তোষে তাই বুঝি বিসাক্ত বাতাস,
মনে হয় পূতগন্ধ আমারে করিল পরিহাস।

অনেক মিথ্যায় আর ছলনায় জড়ানো পৃথিবী
মলিন করেছে মন। একে একে গেছে নিবি
পবিত্র প্রদীপ শিখা যত।
এবার আনত অন্ধকারে অভিশপ্ত মন;
তির্যক ভংগীতে চাহে সহজ নয়ন।
সত্যের ব্যঞ্জনা নেই, উর্ধ্বমুখী সৃজনের ব্রত
আমার সাধনা হতে হয়েছে বিগত।
আজ শুধু অন্ধকারে মেলে রাখি অবসন্ন চোখ;

আকবরের আমল থেকে রামরাজত্বে

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী

পরাধীন ভারতে গান্ধীজী দেশের স্বাধীনতার পর রামরাজত্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বে কি সুখ-সুবিধা ছিল তা জানি না। তবে এটা বুঝতে পারি, প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য যিনি সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন—তাঁর রাজত্বে প্রজার ষোল আনাই সুবিধা ছিল।

স্বাধীন ভারতের যাঁরা কর্ণধার হ'য়ে বসলেন, তাঁরা দেশবাসীকে উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন—'কি আমাদের ভবিষ্যৎ? কি হবে আমাদের প্রচেষ্টা? সাধারণ কৃষক ও শ্রমিককেও স্বাধীনতার সুযোগ দিতে হবে। দারিদ্র্য, রোগ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তার অবসান ঘটাতে হবে।'

'আমাদের দেশের জাতীয় আয় বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে হবে—যাতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট পরিনাণে বৃদ্ধি পায়।'

বিদেশীর শাসনে নিঃস্ব ভারতবাসী সেদিন এই আশার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে নবজীবনের স্বপ্ন দেখেছিল। তার দুঃস্বপ্নের রাত্রি প্রভাত হল। কিন্তু স্বাধীনতার এক যুগের মধ্যেই ভারতবাসীর সেই স্বপ্নজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর যে হলাহল ও অমৃত উঠেছে তার বণ্টনের অব্যবস্থার ফলে জাতির জীবনে এক চরম সঙ্কট দেখা দিয়েছে। মুষ্টিমেয় শাসকবৃন্দ ও ধনী ব্যবসায়ীর দল আজ দেশের অমৃতভাণ্ডের অধিকারী। আর সমগ্র হলাহল ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবাসীর জনজীবনে। নিঃস্ব, রিক্ত ভারতবাসী সেই হলাহল পান করে আজ নীলকণ্ঠ হ'য়ে উঠেছে।

আজ গোটা ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষ বাঁচবার অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতে চলেছে। বাঁচতে হলে যে খাদ্যের প্রয়োজন, তা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আজ বল্গাহীন অবস্থায় উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে। দেশের যাঁরা কর্ণধার আছেন, তাঁরা যাত্রাদলের ভীমের গদা ঘুরিয়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে চোখ রাঙাচ্ছেন।

বর্তমান বর্ষের ৬ই সেপ্টেম্বরের চাল-গমের বাজার দর লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, চরম দুর্ভিক্ষের মুখে দেশ এগিয়ে চলেছে। অনাহারে মৃত্যুকে সরকারী ব্যাখ্যাতার দল বিভিন্ন রোগে মৃত্যু বলে ঘোষণা করে কংগ্রেস সরকারের মান রক্ষা করছেন। ইংরাজের আমলেও ঠিক এমনটিই দেখেছিলাম। আজকে গমের দর ৩৮৲ মণ, অথচ দু' সপ্তাহ আগে ৩০৲ ছিল। যে চাল ৩৫৲ থেকে ৪২৲ মণ কয়েকদিন আগেও বিক্রি হচ্ছিল, আজ তা ৪৫৲ থেকে ৬০৲। ৪৫৲ চাল যা পাওয়া যাচ্ছে তা পশুর খাদ্য। ছোলা—যা এককালে ঘোড়ার জন্যেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত আজ তার দাম ৪২৲ থেকে ৫০৲ বিক্রি হচ্ছে।

আজকে আমরা যে গণতন্ত্রের যুগে বাস করছি—তার যাঁরা ধারক ও বাহক অম্লানবদনে অনাহারজনিত মৃত্যুর কারণ হিসাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কোন ল্যাটিন অথবা গ্রীক নাম ব্যবহার করবেন। ইংরাজ আমলে সংবাদপত্রকে শাসকদল বেশ ভয় করতেন—আজকের গণতন্ত্রের যুগে তাঁরা সম্পূর্ণ নির্ভয়।

খাদ্যবস্তু ও অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মহার্ঘতা সম্পর্কে নানাজনে নানা প্রকার মতামত প্রকাশ করছেন এবং স্বদেশী সরকারের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র হুংকার ছাড়া এ পর্যন্ত বাস্তবক্ষেত্রে বিশেষ কিছুই করা হয় নি।

বর্তমান এই মহার্ঘতার সঙ্গে মোগলযুগে সম্রাট আকবরের আমলের জিনিসপত্রের দামের একটা তুলনামূলক বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে—দেশের আর্থিক দুর্দশা কয়েক শ' বছরে কোথায় এসে দাঁড়াচ্ছে। ঐ সময়ের প্রামাণ্য কোন গ্রন্থ কিম্বা বিবরণীতে সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে এবং সমসাময়িক বৈদেশিক পর্যটকদের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি—ষোড়শ শতাব্দীতে সাধারণ লোকের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। তাদের যা দৈনন্দিন রোজগার হ'ত, তা দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ হ'তে বিশেষ কষ্ট হ'ত না। তখন ভারতের সর্বত্র প্রচুর আহার্য পাওয়া যেত। সেই সব জিনিসের দামও বেশ সস্তা ছিল এবং লোকের অভাব-অনটনও কম ছিল।

আইন-ই-আকবরীতে এক জায়গায় আবুল ফজল লিখছেন, 'বাংলা দেশে শস্য সব সময়েই ভালরকম জন্মাত।' ভার্লেসা নামে একজন পরিব্রাজক এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ইটালী হ'তে এদেশে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, বাংলা দেশের মত এত অধিক পরিমাণে শস্য, চিনি, আদা এবং তুলা পৃথিবীর অন্য কোথাও তখন পাওয়া যেত না এবং এখানকার মতন ধনী বণিকও তিনি কোথাও দেখেন নি। এই দেশ থেকে প্রতি বছর অনেক জাহাজভর্তি তুলা ও রেশমের জিনিস ভারতের বিভিন্ন স্থানে তুর্কী, সিরিয়া, পারস্য, আরব ও ইথিওপিয়াতে রপ্তানী হত।

বারবোসা নামে একজন পর্তুগীজ ১৫১৪ খৃস্টাব্দে এখানে এসেছিলেন। তিনিও এখানকার তুলা, আখ, আদা, সাদা চিনি, লঙ্কা, কমলালেবু ও মসলিনের বিশেষ উল্লেখ করেছেন। তাঁর লেখা থেকে বোঝা যায়, সিংহল, ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, আরব, পারস্য, আবিসিনিয়া এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে তখন বাংলার বাণিজ্য খুব ভালরকম চলছিল, ভার্লেসা ও বারবোসা উভয়ের বিবরণ হ'তে জানতে পারি খাদ্যদ্রব্যের দাম বেশ সস্তা ছিল।

১৫৫৬ খৃস্টাব্দ হতে ১৬০৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আকবর রাজত্ব করেছিলেন, এই সময়ে ভারতে যে তামার পয়সার প্রচলন তাকে 'ডাম' বলা হত। চল্লিশ 'ডামে' এক টাকা। বর্তমানের ২॥ পয়সায় এক ডাম। এ ছাড়া ছোট ছোট মুদ্রা ও কড়িরও প্রচলন ছিল।

উত্তরপ্রদেশে সেই সময়ে একজন সাধারণ মজুর দিনে রোজগার করত ২ ডাম—অর্থাৎ বর্তমান হিসাবে ৫ পয়সা অথবা পূর্বের ৩ পয়সা। মাটি কাটার মজুরে রোজ মজুরী ছিল ৩ ডাম—অর্থাৎ ৭ পয়সা এবং পূর্বের ৪৮ পয়সা থেকে সাড়ে ৫ পয়সা। একজন ছুতোরের রোজ মজুরী ছিল ২ থেকে ৭ ডাম, অর্থাৎ ৫ পয়সা থেকে ১৭॥ পয়সা এবং পূর্বের ৩ পয়সার কিছু বেশি থেকে ১১ পয়সার কিছু বেশি। একজন রাজমিস্ত্রির দৈনন্দিন বেতন ছিল ৪ ডাম থেকে ৭ ডাম।

আকবরের সমসাময়িক সময়ে যুক্তপ্রদেশে বাজারদর কিরূপ ছিল এবং সাধারণ দিন-মজুরের ক্রয়ক্ষমতা কি ছিল, তা নিম্নের তালিকায় বোঝা যায়। সেই সময় ওজনের পরিমাপ ছিল বর্তমানের ১১ ছটাকে ১ সের। এইরূপ ৪০ সেরে ছিল ১ মণ অর্থাৎ বর্তমান হিসাবে প্রায় ২৭॥ সের।

জিনিসের নাম	তখনকার প্রতি মণের দাম (বর্তমানে প্রায় ২৭॥ সের)	একজন সাধারণ মজুর প্রতিদিন ২ ডাম (বর্তমান ৫ পয়সা অর্থাৎ পূর্বের ৩ পয়সা) রোজগারে কতটা কিনতে পারত
...	...	...
১। গম	১২ ডাম—বর্তমানের ৩০ পয়সা	তখনকার ওজনে ৬ সের ১০ ছটাক বর্তমান ওজনের ৪॥ সেরের বেশি
২। বার্লি	৮ ডাম—বর্তমানের ২০ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ১০ সের (বর্তমান ওজনে প্রায় ৬ সের ১৪ ছটাক)
৩। চাল (সর্বোৎকৃষ্ট)	১১০ ডাম—বর্তমানের ২ টাকা ৭৫ পয়সা	তখনকার ওজনে ৩ পোয়া (বর্তমান ওজনে প্রায় ⁄॥ সের)
৪। চাল (নিকৃষ্ট)	২০ ডাম—বর্তমানের ৫০ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ৪ সের (বর্তমান ওজনে প্রায় ২ সের ১২ ছটাক)
৫। মুগ	১৮ ডাম—বর্তমানের ৪৫ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ৪ সের ১২ ছটাক (বর্তমানে ৩ সের ১ ছটাক)
৬। মাসকলাই	১৬ ডাম—বর্তমানের ৪০ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ৫ সের (বর্তমান ওজনে প্রায় ৩ সের ৭ ছটাক)
৭। ছোলা	১৬॥ ডাম—বর্তমানের প্রায় ৪১ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ৪ সের ১২ ছটাক (বর্তমান ওজনে প্রায় ৩ সের ৫ ছটাকের বেশি)
৮। জোয়ার	১০ ডাম—বর্তমানের ২৫ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ৮ সের (বর্তমান ওজনে ৫॥ সের)
৯। চিনি (সাদা)	১২৮ ডাম—বর্তমানের ৩ টাকা ১৮ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ১০ ছটাক (বর্তমান ওজনে প্রায় ৭ ছটাক)
১০। চিনি (লাল)	৫৬ ডাম—বর্তমানে ১ টাকা ৪০ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ১ সের ৪ ছটাকের অল্প বেশি (বর্তমান ওজনে প্রায় ১ সের)
১১। ঘি	১০৫ ডাম—বর্তমানের ২ টাকা ৬২ পয়সা	তখনকার ওজনে ৩ পোয়ার অল্প বেশি (বর্তমান ⁄॥ সেরের অল্প বেশি)
১২। লবণ	১৬ ডাম—বর্তমানের ৪০ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ৫ সের (বর্তমান ওজনে ৩ সের ৭ ছটাক)
১৩। দুধ	২৫ ডাম—বর্তমান ৬২ পয়সা	তখনকার ওজনে ৩ সের ২ ছটাকের বেশি (বর্তমান ওজনের ২ সের ৩ ছটাকের বেশি)
১৪। মাংস (পাঁঠার)	৫৪ ডাম—বর্তমান ১ টাকা ৩৫ পয়সা	তখনকার ওজনে ⁄॥ সের (বর্তমান ওজনে ১ সেরের অল্প বেশি)
১৫। মাংস (ভেড়ার)	৬৫ ডাম—বর্তমান ১ টাকা ৬২ পয়সা	তখনকার ওজনে ১ সের ১ পোয়ার অল্প

জাহাঙ্গীরের রাজত্বে টেরীসাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেছেন মাছের দাম এত সস্তা ছিল যে, একরকম কোন দামই ছিল না। তিনি আরও বলেছেন যে, রাজ্যের সর্বত্র প্রচুরভাবে জিনিসপত্র পাওয়া যেত।

মোগল সাম্রাজ্যের পরে এল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল। বাজারে আগুন লাগল। জিনিসের দাম ক্রমশ চড়তে লাগল। ১৮৭০ খৃস্টাব্দে ওলচাম সাহেব যুক্তপ্রদেশের গাজিপুর জেলা সম্পর্কে লিখছেন, ঐ সময়ে ১ টাকায় যে ফসল পাওয়া যেত, আকবরের সময়ে কমপক্ষে তার চতুর্গুণ পাওয়া যেত। আকবরের আমলে ১ টাকায় গম পাওয়া যেত ২ মণ ১৪ সের, ১৮৬৬-৭০ খৃঃ ১ টাকায় পাওয়া যেত ১৯ সের। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাঁড়ায় ১৪ সের। ইংরেজ চলে যাবার অব্যবহিতপূর্বে পাওয়া যেত টাকায় ৪ সের। এখন রামরাজত্বে পাওয়া যায় টাকায় ১ সের।

বালি আকবরের সময় পাওয়া যেত ১ টাকায় ৩ মণ ১৬ সের, ১৮৬৬-৭০ সালে দাঁড়ায় প্রায় ২৯ সের, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রায় ২২ সের, ইংরেজ চলে যাবার আগে টাকায় ৬ সের—বর্তমান রামরাজত্বে টাকায় ১॥ সের। ঘি ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে ১ টাকায় ১। পোয়া পাওয়া যেত। সরষের তেল টাকায় ৪ সের—বর্তমান রামরাজত্বে ৪ টাকা সের। গুড় টাকায় ১৬ সের পাওয়া যেত—বর্তমানে টাকায় ১ সের। ইংরেজ আমলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চিনি পাওয়া যেত সাত আনা অর্থাৎ বর্তমান ৪২ পয়সা। রামরাজত্বে রাবণদলের স্পর্শধন্য হয়ে ১২৫ পয়সা সের বিক্রি হচ্ছে সরকারী দোকানে। বাংলা দেশের '৪৩-এর মন্বন্তরে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম কালো বাজারের কথা শোনা যায়। বোকার মতন অনেকেই প্রশ্ন করেছে—কালো বাজার কোথায়? আজ সেই প্রশ্নের আর উত্তর দিতে হবে না—গোটা ভারতবর্ষের বাজার রামরাজত্বে কালো হয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়ে গিয়ে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ গুণ হয়েছিল—কিন্তু লোকের আয় ২৫০ থেকে ৩০০ গুণের বেশি বাড়ে নি। ১৯৩৯ সালে জিনিসপত্রের যা দাম ছিল আজ তা বেড়ে ৬০০গুণ হয়েছে। অথচ সাধারণের আয় সেই তুলনায় কিছুই বাড়ে নি। একজন ২৲ রোজের মজুর তার পরিবারের জন্য কেবল গম আর নুন কিনলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এই রোজগার সকলের নয়।

ডঃ রামমনোহর লোহিয়া বর্তমান রামরাজত্বের অধিনায়কদের প্রশ্ন তুলেছেন ভারতবর্ষের ২৭ কোটি মানুষ দৈনিক ৩ আনা মাত্র রোজগার করে। অর্থাৎ আকবরের আমলের মাত্র ৭ ডাম। বর্তমানে তারা এই রোজগার দিয়ে ৩ ছটাক গম কিনতে পারে।

কিন্তু আমাদের নন্দজী বলছেন ভারতে নিম্নবিত্তদের সংখ্যা শতকরা ৬০ জন গ্রামাঞ্চলে জনপিছু রোজ ৪২ পয়সা খরচ করে ও শহরে ৫৫ পয়সা খরচ করে। কর্জের হিসাব বাদ দিলে দাঁড়ায় গ্রামে ৩৩·৬ পয়সা, শহরে ৪৪ পয়সা।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়-ব্যয়ের আলোচনা করলে দেখা যাবে কিভাবে চরম সঙ্কটের মুখে এগিয়ে চলেছে। গত দশ-বিশ বছরে আয় যা বেড়েছে—জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে বহুগুণ। মুদ্রাস্ফীতি জাতিকে কোথায় নিয়ে চলেছে তার ঠিকানা বোধ হয় বিত্তমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীও জানেন না।

১৯৩৯ সালে খাবার জিনিসের দামের সূচকসংখ্যা যদি ধরা হয় তা হলে দেখা যাবে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, স্বাধীনতার পর বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৩৪৯। ১৯৫৭ সালে জুন মাসে আরও দশ বছর পরে সেটা বেড়ে হল ৪৮৮। ১৯৫৮ সালের জুন মাসে আরও বেড়ে হল ৫০৮ এবং বর্তমানে ৬০০ ওপরে—ঠিক সংখ্যাটা বলা কঠিন। ১৯৩৯ সালে চালের দাম ছিল ৩ আনা সের ১৯৪৭ সালে কনট্রোলে সাড়ে ৬ আনা আর বর্তমানে ৬০ টাকা মণ অর্থাৎ ১॥০ টাকায় ১ সের, ১২৫ পয়সায় যে চাল পাওয়া যাচ্ছে তা পশুর পর্যায়ের মানুষেরা গলাধঃকরণ করতে পারে।

শিক্ষার কথা যদি রামরাজত্বে বলা যায় তা হলে সরকারী শিক্ষানীতির অব্যবস্থিত চিত্ততার কথাই বলতে হয়। সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে ছেলেদের লেখাপড়া শেখান এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠেছে। শহরে সাধারণ মধ্যবিত্তের মোট খরচের শতকরা ১৬ ভাগ খরচ হয় শিক্ষাখাতে। প্রাণান্ত পরিশ্রম করে ছেলেমেয়েদের জন্যে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে তাতে ভবিষ্যৎ জীবনের চলার পক্ষে কতটুকু উপকার হচ্ছে? স্বদেশী শাসক-সম্প্রদায় সর্ব-ভারতীয় ঐক্যতার এক হুজুগ তুলে সকলের ঘাড়ে হিন্দী চাপাবার ব্যবস্থা করেছেন—তাতে ছেলেরা না শিখছে নিজেদের মাতৃভাষা, না শিখছে হিন্দী, না শিখছে ইংরাজী। অথচ যাঁরা আমাদের উপর হিন্দী ভাষা চাপাচ্ছেন তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের Public School-এ ইংরাজী পড়িয়ে মানুষ করার চেষ্টা করছেন। তাই যত হিন্দীর হুজুগ বাড়ছে, তত ইংরেজ আমলের প্রতিষ্ঠিত কনভেন্টের নতুন নতুন বাড়ি উঠছে।

আমরা যতই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলি, যতই কলকারখানা বানাই, জাতীয় আয় বৃদ্ধি করি, এইসব পরিকল্পনার আশীর্বাদ যতদিন পর্যন্ত ওপর থেকে চুইয়ে ভারতবর্ষের দরিদ্রতম মানুষের কাছে গিয়ে না পৌঁছুচ্ছে, নিত্য অনশন-অর্ধাশনের অভিশাপ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুক্ত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই সব উন্নয়নের সংখ্যাতথ্য সব নিরর্থক।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৭৩

ভিতর-প্রকোষ্ঠে—গম্ভীরায়—প্রভু শুয়েছেন। দ্বারপ্রান্তে শুয়েছে গোবিন্দ আর স্বরূপ দামোদর। রোজ রাত্রে কৃষ্ণনামকীর্তন করে জেগে থাকেন প্রভু, আজ নিঃশব্দ কেন? কী হল?

দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে দেখল, প্রভু নেই। ভিতর দিকের তিন দরজা বন্ধ, প্রভু অন্তর্হিত।

মশাল জ্বেলে খুঁজতে বেরুল সকলে। দেখল জগন্নাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণের বাইরে সিংহদ্বারের উত্তরে চৈতন্যগোঁসাই পড়ে আছেন।

কিন্তু এ কী বিস্ময়। প্রভুর দেহ পাঁচ-ছ' হাত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে, প্রত্যেকটি হাত-পাও প্রায় তিন হাত করে লম্বা। সমস্ত অস্থিগ্রন্থি শিথিল, দু' অস্থির মাঝে প্রায় এক বিঘৎ করে ব্যবধান। শুধু পায়ের চামড়াই দুই বিচ্ছিন্ন গ্রন্থির মাঝে সংযোগ রেখেছে। দেহ নিশ্চেতন, নিশ্বাস পড়ছে না। চোখ শিবনেত্র হয়ে আছে, লালা ঝরছে মুখ দিয়ে।

দেখে সকলেই শোকে-দুঃখে বিমূঢ় হয়ে গেল।

স্বরূপ দামোদর প্রভুর কানে কৃষ্ণ-নাম বলতে লাগল। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ—অন্যান্য ভক্তরাও যোগ দিল উচ্চারণে।

ধীরে-ধীরে অনেক পরে কৃষ্ণনাম প্রভুর হৃদয়ে প্রবেশ করল। ফিরে এল বাহ্যজ্ঞান। অমনি 'হরি-বোল' বলে প্রভু গর্জন করে উঠলেন।

কোথায় আর অস্থিসন্ধির ব্যবধান, কোথায় আর অমানুষিক দেহদৈর্ঘ্য? প্রভু স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

'এ আমরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন স্বরূপকে।

'বাড়ি চলো। সব বলছি তোমাকে।'

প্রভুকে ধরাধরি করে সবাই বাড়ি নিয়ে এল। বললে, তাঁর অন্তর্ধানের কথা, দেহবিস্তারের কথা।

'কী আশ্চর্য, আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না।' বললেন প্রভু, 'শুধু এইটুকু মনে আছে, যেন দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বিদ্যুৎপ্রায় দেখলাম। দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেলেন।'

কৃষ্ণ তো প্রেমবিচ্ছেদ রোগ জানে না, জানে না তার কী যন্ত্রণা! আর প্রেমও এমন, তার স্থানাস্থান জ্ঞান নেই। আমরা যে কত দুর্বল কত ভঙ্গুর তা আবার কন্দর্প জানে না। অপর কি অপরের দুঃখ বোঝে? নিজের জীবনকেই বা বিশ্বাস কী। যৌবনের আয়ু তো দু'তিন রাত্রি। হে বিধাতা, আমার কী গতি হবে?

লোচনদাস ঠাকুর বলছে:

'প্রেম দুরাচার না করে বিচার
স্থানাস্থান নাহি জানে।
সে শঠ লম্পট কুটিল কপট
নিশি দিশি পড়ে মনে॥
হাম কুলবতী নবীনা যুবতী
কানুর পীরিতি কাল।
তাহাতে মদন হইয়া দারুণ
হৃদয়ে হানয়ে শাল॥
আনের বেদন নাহি প্রাণে আন
শুনলো পরাণ সখি।
মোর মনোদুঃখে তুমি নাহি দেখ
আনজনে কাঁহা লখি॥
নারীর যৌবন দিন দুই তিন
যেন পদ্মপত্রের জল
বিধি মোরে বাম না হেরিল শ্যাম

মন্দিরের প্রভাতশঙ্খ বেজে উঠল। স্নানান্তে প্রভু চললেন মন্দিরে।

প্রভুর এই শাস্ত্রলোকাতীত লীলা সাক্ষাৎদ্রষ্টা ছাড়া আর কে বিশ্বাস করবে? গৌরে যাদের গাঢ় প্রীতি তারা করবে। অন্য লোকে না করুক কী আসে যায়?

নবজাত প্রেম ভঙ্গের দুঃখ কৃষ্ণ বুঝবে কী করে? বাইরে ভদ্র, ভিতরে বিপ্রিয়, সে শঠের শিরোমণি। 'পরনারী বধে সাবধান।' বাক্যে-ভঙ্গিতে আর ব্যবহারে খুব মধুর—কিন্তু অন্তরে প্রাতি-কূল্য। প্রলুব্ধ করে শেষে প্রত্যাখ্যান করতেই নিপুণ।

সুখের জন্যেই লোকে ভালোবাসে। এ যে বিপরীত হল! প্রেমের গতি স্বভাবকুটিল। সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথই সে বেছে নেয়। সোজা সুখের দিকে না গিয়ে তাই বাঁকা পথে চলল সে দুঃখের দিকে। আর আমার এমন দশা, কৃষ্ণ শঠ কৃষ্ণ নিষ্ঠুর জেনেও তাকে আমি ছাড়তে পারছি না। তার গুণডোরের গ্রন্থি খুলে ফেলে মুক্ত হয়ে যাই তারও সাধ্য নেই। মদন তনুহীন হলে কী হবে, পরদ্রোহে সে প্রবীণ, অন্যকে যন্ত্রণা দিতে পারলেই সে খুশি। দুর্বল জেনেও আমাকে রেহাই দিচ্ছে না। এত দুঃখে ধৈর্য ধরব কী করে, ধরবই বা কতদিন? আমার যৌবনই বা কতক্ষণ থাকবে! নারীর যৌবনধনেই তো কৃষ্ণের আকর্ষণ। তার আয়ু তো দু'চারদিনের। আমার যৌবন চলে যাবার পর যদি কৃষ্ণ আসে তা হলে তাকে আমি কী দিয়ে সেবা করব?

দুঃখের দুয়ার হাট করে দিয়ে প্রভু বিষাদে বিলাপ করছেন।

একদিন প্রভু সমুদ্র স্নানে যাচ্ছেন, চটক পর্বত তাঁর চোখে পড়ল। চটককে ভাবলেন গোবর্ধন বলে। অমনি চটকের দিকে ছুটলেন প্রেমাবেশে।

গোবিন্দ পিছু নিল। কিন্তু সাধ্য কী প্রভুকে ধরে।

সকলে চিৎকার করে উঠল। ছুটলও সঙ্গে-সঙ্গে। স্বরূপ গদাধর জগদানন্দ, রামাই নন্দাই নীলাই শঙ্কর-পণ্ডিত। খোঁড়া ভগবান আচার্য, সেও চলল।

কতদূর যেতেই প্রভুর 'স্তম্ভ' ভাব উদয় হল, শরীরে জাড্য দেখা দিল. দেখা দিল স্বরভঙ্গ। আর দুই চোখে যেন গঙ্গা যমুনা নেমে এসেছে। গাত্রবর্ণ শঙ্খের মত সাদা হয়ে গেল। কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গ। কম্পের ফলে মাটিতে পড়ে গেলেন। গোবিন্দ জল ছিটিয়ে চাইল সুস্থ করতে। প্রভুর অঙ্গে আট-আট সাত্ত্বিক বিকার লক্ষণ ফুটে উঠেছে। আবার কৃষ্ণনামের ধ্বনি তোলো।

হরিবোল বলে প্রভু আবার আচম্বিতে উঠে বসলেন। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। যা দেখছিলেন এতক্ষণ তা যেন আর পাচ্ছেন না দেখতে।

'গোবর্ধন থেকে আমাকে এখানে নিয়ে এল কে?' স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু, 'কৃষ্ণলীলা দেখছিলাম, কিন্তু সাধ মিটিয়ে দেখা হল কই? কৃষ্ণ আর গোচারণ করে কি না দেখবার জন্যেই আমার গোবর্ধন যাওয়া। গোবর্ধনে গিয়ে দেখি পাহাড়ে চড়ে কৃষ্ণ বেণু বাজাচ্ছে আর চারদিকে ধেনু বিচরণ করছে। বেণুনাদ শুনে রাধাঠাকুরাণী এসে উপস্থিত। সখি, রাধার-রূপ আর ভাব বর্ণনা করতে পারি আমার এমন সাধ্য নেই। রাধাকে নিয়ে কৃষ্ণ গোবর্ধনের নিভৃত গহ্বরে প্রবেশ করল। সখিরা আমাকে বললে কিছু ফুল তুলে নিয়ে এস। রাধাগোবিন্দের সেবার জন্যে ফুল তুলতে যাচ্ছি, তোমরা কোলাহল করে উঠলে, আমাকে ধরে নিয়ে এলে এখানে। অনর্থক দুঃখ দেবার জন্যে আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন আমার কৃষ্ণলীলা দেখা শেষ হল না।' কাঁদতে লাগলেন প্রভু।

প্রভু বুঝি এখন গোপীভাবে আবিষ্টা। কিন্তু এই গোপীভাবও রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রাধাও কখনো কখনো নিজেকে ললিতা ও ললিতাকে রাধা বলে ভেবেছে।

পরমানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী এসে হাজির। তাদের দেখে প্রভুর বাহ্যদশা সম্পূর্ণ ফিরে এল। দু'জনে প্রভুকে প্রেমালিঙ্গন করলে। প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা এতদূরে কেন এসেছ?'

'তোমার লীল দেখতে। দিব্যোন্মাদলীলা।'

কৃষ্ণের রূপসেবা ছাড়া আমার ইন্দ্রিয়গুলির কাজ কী! কৃষ্ণরূপ আমার চোখ দ্বারা সেবনীয়, কৃষ্ণকথা আমার জিহ্বা দ্বারা সেবনীয়, কৃষ্ণগাত্রগন্ধ

আমার নাসিকাদ্বারা সেবনীয়, কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শ আমার ত্বক দ্বারা সেবনীয় আর কৃষ্ণ কণ্ঠস্বর ও কৃষ্ণবংশীধ্বনি আমার কান দ্বারা সেবনীয়। এই সেবা ছাড়া আমার ইন্দ্রিয়বর্গ ব্যর্থ। যে পাষাণ ও শুষ্ককাষ্ঠে কাজ হয় না তা আমি সারাজীবন বহন করে মরি কেন।'

যে নয়ন কৃষ্ণের মুখখানি না দেখে তার মাথায় বাজ পড়ুক। যে কান কৃষ্ণকথা শোনে না তা সচ্ছিদ্র কানাকড়ির মতই মূল্যহীন। যে নাক কৃষ্ণাঙ্গ সুবাস পায় না তার সঙ্গে কামারের হাপরের তফাৎ কী। যে জিহ্বায় কৃষ্ণনাম নেই তা তো ভেকজিহ্বা। আর যে কৃষ্ণকরতল বা কৃষ্ণপদতল স্পর্শ করতে পারল না তার শরীর দগ্ধলোহ।

যখন স্বপ্নে বা দৈবাৎ কৃষ্ণকে আমি দেখি আমার দুই শত্রু এসে উপস্থিত হয়। এক শত্রু আনন্দ, আরেক শত্রু মদন। হায় প্রেমানন্দও আমার শত্রু। প্রেমানন্দে যে সেবানন্দে বাধা পড়ে। তারপর মিলনের লালসায় চিত্তে মত্ততা জাগে। দু'য়ে মিলে আমার অভিনিবেশ হরণ করে নিল। নয়ন ভরে আর দেখা হল না।

এইভাবে রাত্রিদিন প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে অবস্থান করছেন। কখনো ভাবে মগ্ন, মানে অন্তর্দশা, কখনো অর্ধবাহ্যদশা, কখনো বাহ্যজ্ঞান। দেহস্বভাবে স্নানাহার ও দর্শন চলছে। একদিন মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথকে দেখতে দেখলেন, ব্রজেন্দ্রনন্দন বসে আছেন। কৃষ্ণের পঞ্চগুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—একসঙ্গে প্রভুর চিত্তে স্ফুরিত হল, পঞ্চ রজ্জু দিয়ে বেঁধে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করল। টানাটানিতে প্রভুর মন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে লাগল—কোন দিকে আগে যায়!

স্বরূপ আর দামোদরের কণ্ঠ ধরে বিলাপ করতে লাগলেন প্রভু।

সখি, যিনি সৌন্দর্যামৃতসিন্ধুর তরঙ্গে ললনাচিত্ত সংপ্লাবিত করেন, যাঁর রম্যবচন পরিহাসসুন্দর ও কর্ণসুখদ, যাঁর অঙ্গ কোটিচন্দ্র থেকেও সুশীতল, যিনি তাঁর গাত্রসৌরভে সমগ্র জগতকে আমোদিত করেন, যাঁর দু'টি অধর পীযূষরমণীয়, তিনি বলপ্রয়োগে আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করছেন।

যার মাধুর্য বলে শেষ করা যায় না সেই কৃষ্ণের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ দেখে আমার পঞ্চজন, মানে

অশ্ব, সে একই সঙ্গে পাঁচ দিকে ধাবমান হয়েছে। আমার পঞ্চেন্দ্রিয় মহালম্পট দস্যু, পরধন হরণেই সুদক্ষ। এ-ক্ষেত্রে কৃষ্ণের পঞ্চরস লুটে নিতেই তারা সমুৎসুক। এক মন কোন দিকে যাবে? সবাই যদি একসঙ্গে টানে ঘোড়া বাঁচে কী করে?

কৃষ্ণের অমৃতসিন্ধুর কথা তোমাকে আর কী বলব! সেই সিন্ধুর একবিন্দু তরঙ্গ সমস্ত জগৎ ভাসিয়ে দিতে পারে। কুলকামিনীরা তাদের পাতিব্রত্যের যে উচ্চ গিরিচূড়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে সেই চূড়াকেই এই তরঙ্গ আগে ডোবায়। কৃষ্ণের বচনমাধুরী নানা রসে পরিহাসময়। সে টানছে কানকে। টানাটানিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। কৃষ্ণের শীতল অঙ্গ নারীর সশৈল-বক্ষকে টেনে বেঁধে আনছে। কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ মৃগমদের অহঙ্কার ম্লান করে দিচ্ছে। তারপর তার অধরামৃতের কথা কে বলে?

'আমাকে উপায় বলে দাও, কী করলে কোথায় গেলে পাবো আমার কৃষ্ণকে?' প্রভু বিলাপ করতে লাগলেন, 'আমার কৃষ্ণ ছাড়া দিন কাটে না।'

আরেকদিন সমুদ্র স্নানে যেতে আচম্বিতে একা একা একটা ফুলবাগান দেখলেন প্রভু। ফুলবাগান দেখে মনে হল এই বুঝি বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, কৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন ব্যাকুল হয়ে। রাসস্থলী থেকে রাধাকে নিয়ে অন্তর্হিত হবার পর গোপবধূরা যেমন বনে বনে ভ্রমণ করেছিল তার তরুলতাকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞেস করেছিল তেমনি এক কৃষ্ণান্বেষণ ও কৃষ্ণজিজ্ঞাসা পেয়ে বসল প্রভুকে। তিনিও বৃক্ষলতাদের সম্বোধন করে জানতে চাইলেন তাঁর কৃষ্ণ কোথায়? কোন পথ ধরে কোন দিকে সে চলে গেল তোমরা কি কিছু দেখেছ? আমাকে পথের হদিস দেবে?

হে তরুগণ, তোমরা পরার্থভব, পরোপকারের জন্যেই তোমাদের জন্ম। নিজের ফুলও তোমরা নাও না, ফলও তোমরা খাও না। পরের জন্যে সমস্ত উৎসর্গ করে যাও। তোমার ছায়ায় দাঁড়িয়ে বা তোমারই শাখায় বসে যদি তোমাকে আঘাতও করে তাকেও কিছু বল না, বরং তোমার ডাল যে ছিন্ন করেছে তাকে সেই কাটা ডালটাও অনায়াসে নিয়ে যেতে দাও। তোমরা পুণ্যাত্মা, সত্যবাদী,

পরোপকার সাধন করাই তোমাদের জীবনের ব্রত। সুতরাং কৃপা করে বল আমার কৃষ্ণ কোথায় হারাল?

বৃক্ষদের নীরব দেখে ক্ষুব্ধ হলেন প্রভু। বললেন, 'এ সব গাছ নিশ্চয়ই পুরুষ, তাই কৃষ্ণের সখাতুল। তারা আমাকে সঠিক খবর দেবে কেন? কিন্তু বৃক্ষলগ্ন এই লতাগুলি তো স্ত্রীজাতি, এরা নিশ্চয়ই আমাদের মনের দুঃখ বুঝবে। তোমরা দেখেছ কৃষ্ণকে, কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে তাই বেঁচে থাকো। তোমাদের আর ভয় কী। তোমরা আমার সখিতুল্য। এবার তবে বলে দেবে আমার কৃষ্ণ কোথায়।'

লতারাও নিরুত্তর। তারা বলবে কেন? তারা যে কৃষ্ণের দাসী। তাদের পত্রপুষ্পে যে কৃষ্ণের অঙ্গভূষণ হয়। তারা তাই কৃষ্ণের লোক, কৃষ্ণের ভয়েই তারা স্তব্ধ হয়ে আছে।

দেখ, কৃষ্ণ-অঙ্গের গন্ধ পেয়ে হরিণী এসেছে। দেখ তার চোখ দু'টি কী উজ্জ্বল আর প্রসন্ন। নিশ্চয়ই সে দেখেছে কৃষ্ণকে। এস তাকে জিজ্ঞেস করি:

হে মৃগপত্নী, তোমরা কি দেখেছ আমার কৃষ্ণবক্ষের কুন্দমালা রাধাবক্ষের কুঙ্কুমে লিপ্ত হয়েছে? তার থেকে গন্ধ উঠেছে অপূর্ব! বলো, আমরা রাধার প্রিয়সখী, আমাদের কাছে তোমার সঙ্কোচের কারণ নেই। তোমায় সুখ দিতে কৃষ্ণ কি রাধাসহ এসেছিল এখানে? ধরেছিল মদনমোহন বেশ? আমরা জানি, বলে দিতে পারি, রাধার কোন অঙ্গের সঙ্গে কৃষ্ণের কোন অঙ্গের সঙ্গ হয়েছে। হ্যাঁ, দূর থেকেই বলে দিতে পারি, আর তা শুধু বাতাসে ভেসে আসা গন্ধের থেকে। আমরা রাধার কুচকুঙ্কুমের গন্ধ জানি। সেই গন্ধের সঙ্গে মিশেছে কুন্দগন্ধ আর কুন্দের মালা কৃষ্ণের গলার। তুমি বলে দাও রাধাসহ তিনি কোথায় অদৃশ্য হলেন।

মৃগী নিজেই হয় তো কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল। তাই আমার কথাই সে শুনছে না। উত্তর দেবে কী!

আর এই গাছগুলোর এমন দশা কেন? ফলপুষ্পভারে নুয়ে পড়ে তারা ভূমি প্রায় স্পর্শ করে আছে। তার মানেই তারা কাউকে নমস্কার করছে। তবে সন্দেহ কী, এখানে এসেছিল কৃষ্ণ, আর—তাকে নমস্কার করবার জন্যেই গাছগুলো ফলেপুষ্পে আভূমি নত হয়ে পড়েছে।

বলো, তোমাদের প্রণাম কি কৃষ্ণ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে অঙ্গীকার করেছে? যখন তোমরা প্রণাম করছিলে তখন হয়তো কৃষ্ণ লীলাপদ্ম সঞ্চালন করে তার প্রেয়সীর মুখ থেকে ভৃঙ্গকে তাড়াবার চেষ্টায় অন্যচিত্ত হয়েছিল, তোমাদের প্রণাম সে দেখতে পায় নি। বলো তোমাদের কি কৃষ্ণ অপমান করেছে?

গাছের মুখেও কথা নেই। তারা বলবে কী, তারা তো নিজেরাই শোককাতর, যেহেতু তারা কৃষ্ণের সেবক। কৃষ্ণের তিরোধানে তারা নিজেরাই হতজ্ঞান।

তারপর প্রভু যমুনা ভাবলেন সমুদ্রকে। সেখানে কদম্বের নিচে দেখলেন কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে—কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন কৃষ্ণ।

আনন্দের আতিশয্যে মূর্ছিত হলেন প্রভু। আবার বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে কাঁদতে বসলেন—এখুনি যে কৃষ্ণকে দেখছিলাম, সে কোথায় গেল? কোথায় লুকাল তার বাঁশি?

নবজলধরের চেয়েও সুন্দর দেহকান্তি, নববিদ্যুতের চেয়েও মনোহর বসন, মুরলীশোভিত মুখখানি যেন অকলঙ্ক শারদ-শশী, কেশকলাপে ময়ূরপুচ্ছ আর তারকার মত উজ্জ্বল মুক্তাহারের শোভা—এমন যে কৃষ্ণ মদনমোহন, সে আমার নেত্রস্পৃহা ক্রমশই বাড়িয়ে চলেছে! [ক্রমশ।

প্রতিধ্বনি

শান্তনু দাস

এত আলোয় পথ চেনা যায়
মুখ চেনা দায় তীব্র আলোর ঝাঁজে,
স্বপ্নেরা রঙিন সড়ক
মনের খেয়া বেয়ে—

অনেক পথ পেরিয়ে এলাম
পেরিয়ে মেঠো সাঁকো,
উষ্ণ ঠোঁটে স্মৃতির চিবুক
অনেক দূরে নদী,
মন্দিরে সেই পরিচিত ঘণ্টাধ্বনি বাজে।

শেষ পর্যন্ত

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সোমেশ দাদা গোমেশ লেনে থাকে,
মোদের মতে যমে সে নিলে তাকে
আমরা তারে বুঝাই নানা মতে,
'রোমিও' সম ভ্রমিয়ো নাকো পথে
করুণ গান গেয়ো না হেঁড়ে সুরে,
সুহৃদগণে ফেলো না ঠেলি দূরে।'

প্রেমে সে পড়ি' গিয়াছে সম্প্রতি
ইহার চেয়ে হ'ত না বেশি ক্ষতি
'না-ফেলা চিঠি জমিয়ো নাকো মিছে
অমিয়প্রিয়া রায়ের পিছে পিছে ;
কমিয়ো নাকো খাওয়া ও ঘুম, দাদা
কানেতে কথা নেয় না বোকা, হাঁদা

অমিত হাতী রোমিওপ্যাথি করে,
নক্স্‌ভমিকা দু' ডোজ খেলে পরে।'
মদীয় গৃহে যদিও স্থানাভাব,
করাই স্নান, খাওয়াই কিনি' ডাব,
বুঝায়ে বলি, মেয়ের ভাবনা কি ?
নাসিকা নাগ, উচ্চকিতা চাকী,

বলে সে, 'সারে বমি ও প্রেমরোগ—
খাবে না, আছে কপালে দুর্ভোগ
নদীও নাই নিকটে, কল খুলে
চালাই ক্ষুর দাড়িতে—কাঁচি চুলে।
কাহারে চাও বলো না খুলি' খালি,—
সোনালি সেন, ঢলঢলিতা ঢালী।

রীটা ঘটক, লতিকা মতিলাল,
উর্বশী ঘোষ, পল্লবিনী পাল,—
ট্রিপল্‌ এম-এ, ডি-ফিল, পি-আর-এস,
প্রেমের দায়ে বিকায়ে গেল শেষ !
বলে সে শুধু, 'আসিয়া মোর প্রিয়া,
থাকো না ডুবি' অপরে করি' বিয়া,—

কোকিলা কর, অরুন্ধতী ধর,
লুফিয়া নেবে যে কেহ হেন বর।'
বাজারে তার হাজার কুড়ি দাম,
ঘরেতে বোন, আমরা ঠকিলাম ;
চাহে না ফিরে।' বুঝাই, 'তার প্রেমে
ক্ষতি কি ? ছবি বাঁধায়ে রেখো ফ্রেমে !'

অস্থানেতে মজেছে হতভাগা,
বাবাটি তার ব্যারিস্টার বাঘা,
সোমেশ তাই অনেক কায়ক্লেশে
ব্যারিস্টার হইয়া অবশেষে
খবর পেল এয়ারোড্রোমে নামি'

অমিয়প্রিয়া হাঁকায় এরোপ্লেন।
ব্যারিস্টার জামাই চেয়েছেন।
বিলাতে গেল করিয়া ধারধোর ;
ফিরিয়া এল না যেতে দু' বছর।
আগের দিনই অমিয়প্রিয়া সেন,—

॥ আট ॥

জার্মানী, জু ও জুজু।

যুদ্ধকালীন অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে গোলামী করার সময় উর্ধ্বশ্বাসে ঘোষণা করতে হয়েছিল যে জার্মানজাতটাই সভ্যতার সঙ্কট ও দেশটা যতদিন আছে জগতে ততদিন শান্তি নেই। বার্লিনে, কেন জানি না ঐ কথাটাই বারবার মনে পড়ে গেল। দূর থেকে জাতের কলঙ্ক শুনেছি, কাছে এসে সেটা যাচাই করতে গিয়ে দেখি, যুদ্ধের পর জার্মানী নিজেকে নিয়ে যতটা বিব্রত হয়েছে, জার্মানীকে নিয়ে আমেরিকা বিব্রত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। হিটলার লাগালো যুদ্ধ, বৃটেন নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে সরাসরি উঠে পড়ল আমেরিকার কাঁধে। সেই কাঁধের ওপর বসে মহানন্দে যুদ্ধজয় করে আমেরিকাকে বৃটেন বলল—'যুদ্ধ জিতেছি, অতএব জার্মানী এখন তোমার।'

সেই জার্মানীই এখন হয়েছে আমেরিকার শাঁখের করাত।

জার্মানীকে ছাড়া চলে না কারণ দোরগোড়ায় রাশিয়া দড়ি নিয়ে বসে আছে। পশ্চিম জার্মানী যাওয়া মানেই সারা য়ুরোপ চলে যাওয়া। ওদিকে, জার্মানীতে থাকতে গেলে পুনর্গঠন অবশ্যম্ভাবী। তার জন্য অবশ্যই চাই মার্শাল-এড। তাতেও নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। জার্মানী অনবরত বলছে আমাদের পুনর্গঠনের প্রথম এবং অপরিহার্য সোপান হল আমাদের ফ্যাক্টরি চালু করা। জার্মান ফ্যাক্টরি মানেই অস্ত্র। উপায়ান্তর না দেখে আমেরিকা যদি বলে 'কর চালু।' তো সারা য়ুরোপ হাঁ হাঁ ক'রে ওঠে—করছ কি! বাধ্য হয়ে এ ব্যাপারে কোন সুনির্ধারিত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত মার্শাল-এডের মোটা অঙ্ক জার্মানীতে ছড়াতে হচ্ছে। তাতে আবার য়ুরোপের ঘোরতর আপত্তি! ওরা বলতে চায়—জার্মানী যুদ্ধ বাধালো, আমরা সর্বস্বপণ করে সাহায্য করলাম, তুমি যুদ্ধ জিতলে অথচ ডলার পাবে ওরা—এ কেমনধারা কথা? মাঝখানে বসে মজা দেখছে রাশিয়া।

ওদিকে আবার সরকারিভাবে না হ'লেও বে-সরকারিভাবে বহু আমেরিকান ব্যবসাদার জার্মানীকে তোয়াজ করতে নারাজ! বৃটেন জার্মানীকে দেখতে পারে না কারণ জার্মানীর স্বভাব যুদ্ধ করা। ফ্রান্স জার্মানীকে দেখতে পারে না কারণ জার্মানী ফ্রান্সের বুকের ওপর বসেছিল দু'বছর। তারপর যুদ্ধে হেরে আমেরিকার ডলার পাচ্ছে ওদের চেয়ে বেশি। আমেরিকানরা জার্মানীকে দেখতে পারে না কারণ জার্মানী জু-দের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। জার্মানীর ছ' কোটি লোক কম করে ৬০ লক্ষ জু মেরেছে, অতএব আমেরিকান জু-দের হিসেবে, গড়পড়তা প্রত্যেক দশজন জার্মানের মধ্যে একজন খুনী! তার চেয়ে বেশি—প্রত্যেক জার্মান কম করে দশ ভাগ খুনী।

আমেরিকার সমস্যা ওদেরই থাক। আমি কেনেডি নই, ক্রুশ্চেভ নই আর মার্শাল-এডের টাকাও আমার পকেটে আসছে না।

এবার জু-সমস্যা ধরা যাক। বে-সরকারি হিসেবে যাই হোক, সরকারি হিসেবে জার্মানী গত মহাযুদ্ধে জু মেরেছে ৬০ লক্ষ। এখন প্রশ্ন হল, কে মেরেছে? জার্মানী, না হিটলার? একটু ভাবলেই বোঝা যাবে জার্মানী মারে নি, মেরেছে হিটলার। হিটলার শুধু জু-ই মারে নি জার্মানীকেও জাতে মেরেছে। হিটলার যদি যুদ্ধ জিততো তো কোন সমস্যাই হত না। হেরেছে বলেই গণ্ডগোল বেঁধেছে। জার্মানী যদি যুদ্ধ জিততো আর চার্চিল, স্ট্যালিন এবং রুজভেল্টকে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

নিয়ে হিটলার নুরেমবর্গে বিচার প্রহসন অনুষ্ঠিত করত তা হলে অবশ্যই দেখা যেত যে বৃটেন, আমেরিকা আর রাশিয়া জার্মানীর চাইতে বড় খুনী। আর নয়ই বা কেন?

জু-হত্যা জার্মানীর একচেটিয়া জাতব্যবসা নয়। অস্ট্রিয়াও জু-হত্যা করেছে। হাঙ্গারি অম্লানবদনে লাখ লাখ জু জার্মানীর হাতে তুলে দিয়েছে তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে জবাই হবার জন্য। রুমানিয়া, বুলগারিয়া, যুদ্ধের সময় জু-হত্যা কম করে নি। পোল্যাণ্ডে যুদ্ধান্তরকালে জু-হত্যার যে পরিকল্পনা, যাকে বলা হয় 'পোগ্রোম'—তার খবর পৃথিবীর কারো অবিদিত নেই। রাশিয়া তো সেই স্ট্যালিনের প্রথম পার্জের সময় থেকে অম্লানবদনে এবং অকাতরে লোক মারছে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে। বৃটেন ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে মেরেছে চার লক্ষ, দক্ষিণ আমেরিকায় নিগ্রো মরেছে হাজারে হাজারে। আজ আফ্রিকায় কি ঘটছে? 'অবসারভার' পত্রিকায় পিটার আব্রাহাম লিখছেন—প্রতি বছর ওখানে গড়পড়তা নিগ্রো মরে দশ হাজার, নিগ্রো রমণীর ওপর পাশবিক অত্যাচার হয় প্রায় ছ' হাজার আর মার খায় প্রায় এক লক্ষ। দেশের কাছে এসে দেখুন পাকিস্তান—সেখানে অমুসলমান হত্যার হিসেব নেই। দেশের মধ্যে এসে দেখা যায় স্বাধীনতার সময় মুসলমান মরেছিল প্রায় চার লক্ষ। এইসব দেশ বিজয়ী দলভুক্ত। হিটলার জিতলে এইসব দেশ একত্রিত করে দেখিয়ে দিতে পারত যে, এদের তুলনায় ওর জু-হত্যার অপরাধ নিতান্তই নগণ্য। শুধু তাই নয়। আরও প্রমাণ করতে পারত সে যে কোন লোক জার্মানীর হাতে মরলে খুশি হত, কারণ জার্মানীর নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হত্যার তুলনায় অন্য যে কোন দেশের লোক মারার পদ্ধতি ক্রূর নৃশংস এবং পাশবিক। ইসরাইল আইকম্যানকে ফাঁসিতে লটকিয়েছে—তার একমাত্র কারণ আইকম্যান ছিল পরাজিত দলে। কৈ পোল্যাণ্ডের 'পোগ্রোম' কর্তাদের দিকে হাত বাড়াক তো! রাশিয়া স্রেফ টুঁটি টিপে ধরবে? হাঙ্গারীর দিকে দৃষ্টি দিক। সেখানেও রাশিয়া!

কাজেই, সারা জগৎ জুড়ে, খানিকটা রাশিয়ার প্ররোচনায়, বেশিটা য়ুরোপের নির্বুদ্ধিতায় এবং অনেকটা ইসরাইলের উৎসাহে, জু-হত্যার অপরাধে জার্মানীকে হীন প্রতিপন্ন করার যে নিখুঁত ষড়যন্ত্র চলছে, সেটা নিতান্তই অনুচিত।

একদল লোক আছেন যাঁরা বলেন হিটলার মানেই তো জার্মানী। জার্মানী যদি হিটলারকে গদিতে না বসাতো তা হলে কি যুদ্ধ লাগত,

না জু মরত ? আপাতদৃষ্টিতে কথাটা যুক্তিসঙ্গত হলেও, এই ধারণার গোড়ায় গলদ আছে। হিটলার কি ক'রে গদিতে বসল সেটা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। তবে এটা ঠিকই যে অর্ধেক জার্মানীর লোক ওকে ভোট দিয়েছিল। তারা কি জু-মারা হবে জেনে দিয়েছিল, না যুদ্ধ করা হবে ভেবে ভোট দিয়েছিল ? স্বাধীনতার আগে যখন আমরা জওহরলাল আর সর্দার প্যাটেলকে দেশের নেতা বলে নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিলাম তখন কি দেশ বিভক্ত হবে বলে মেনেছিলাম, না আমরা জানতাম যে ওঁদের রাজনৈতিক লীলাখেলায় তিন লক্ষ ভারতবাসী খুন হবে পাকিস্তানে ?

হিটলারকে কেউ ভোট দিয়েছিল শ্রদ্ধায়, কেউ ভয়ে, কেউ ভক্তিতে। কেউ ভেবেছিল দেশের ভাল হবে, কেউ মনে করেছিল জীবনের উন্নতি হবে। হিটলার ভুল পথে দেশকে নিয়ে গেছে, সেটা ওদের দুর্ভাগ্য। যুদ্ধে জয়লাভ করলে, এই দুর্ভাগ্যই হয়ে উঠত পরম সৌভাগ্য। ভাগ্যের এমনই ভয়ানক ভাগাভাগি।

প্রথম নির্বাচনে দেশের শাসনভার হিটলারের হাতে যাওয়ার পর দেশ আর ভাববার অবকাশই পায় নি। মানে, হিটলার সে অবকাশ দেয় নি। যারা হিটলারের কাছাকাছি থাকত তারা অবশ্যই মনে করত হিটলার দেবতা। আর ঐ কাছাকাছি ওয়ালাদের আশে পাশে যারা থাকত, তারা ওদের মনে করত উপদেবতা। বাকি জার্মান-জাতটা সুদীর্ঘ বারো বছর এই দেবতা আর উপদেবতাদের ভয়ে এবং ভক্তিতে কিছু ভাববার সুযোগই পায় নি। টানা বারো বছর ধরে ওরা দিনের পর দিন শুনলো যে, জাত হিসেবে জার্মান পৃথিবীতে অনন্য, মানুষ হিসেবে জু-রা জঘন্য। নির্জলা মিথ্যার জাল বুনে আর নির্মম অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে হিটলার সম্প্রদায় সারা দেশকে সহজেই বুঝিয়ে দিল যে, য়ুরোপকে জয় করতে না পারলে জার্মানীর বাঁচবার পথ নেই। আর য়ুরোপ জয়ের একমাত্র পথ হল যুদ্ধ। বাধল যুদ্ধ, বাজল বিজয়ের রণদামামা আর মরল জু।

হিটলারের অগ্রগতি সারা দুনিয়াকে চমকে দিল ; জার্মানী যে চমকে উঠবে এ আর এমন বড় কথা কি ? হঠাৎ একদিন জার্মানী দেখল যে হিটলার ওদের হাজির করেছে বৃটেনের দোরগোড়ায় আর রাশিয়ার রান্নাঘরে। ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড ইতিমধ্যে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যও পালাই পালাই করছে। বৈজয়ন্তী সমারোহে হিটলার হয়ে উঠল অতি-দেবতা আর জার্মান হয়ে উঠল শ্রেষ্ঠ জাত। বিজয়ের আনন্দে ওরা শুধু জানলোই না, বিশ্বাসও করে নিল যে পৃথিবীর প্রভুত্বে ওদেরই একমাত্র অধিকার। এটা ওদের অপরাধ নয়, উপদেবতার অপকীর্তি।

মানুষের মনে মিথ্যা অহঙ্কার জাল ছড়ায় ছড়িয়ে-পড়া জলের ধারার মতন। অহঙ্কারটা মানুষকে এমনই অন্ধ করে দেয় যে, সত্যের স্বরূপ চিনেও সে চিনতে পারে না, জেনেও সে বুঝতে পারে না। জার্মানীর হল ঠিক তাই। প্রথম পরাজয়ের ধাক্কাকে হিটলার বলল—শীতের শয়তানী। দ্বিতীয় পরাজয়ের গ্লানিকে বললো—ভাগ্যের বিড়ম্বনা। তারপর থেকেই অপরাধের বোঝা আর পরাজয়ের কলঙ্ক নির্বিবাদে চাপাতে আরম্ভ করল দেশবাসীর কাঁধে। দেশ দিশে হারিয়ে ভাবল

মায়েরা নামল পথে। ছেলেমেয়েরা পরল উর্দি, বুড়োরা কাঁধে তুলল বন্দুক। যুদ্ধে যাওয়ার উত্তেজনা তখন এমনই প্রবল যে কোথায় যাবে জানল না, কেন যাবে ভাবলে না।

বৃটিশ আর মার্কিনী বোমায় বিধ্বস্ত হয়ে যখন পেছন ফিরে তাকালো তখন দেখল সারা দেশ মাটিতে আর দেশাধিপতি হিটলার মাটির তলায়। আরও দেখল সারা দেশব্যাপী ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়েছে ওদের জাতির ঐতিহ্য, শেষ হয়ে গেছে ওদের বাঁচবার ক্ষীণতম আশাটুকু এবং দেখল একচ্ছত্র প্রভুত্ব পাওয়ার বদলে পেয়েছে চার প্রভু। সেই থেকে ওদের দেশের দুর্দশা আজও ঘুচল না। আমরা অলীক ভয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের বলি জুজু। য়ুরোপ জার্মানীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—জু ! জু !

এবার আপনিই বলুন দোষটা কি আমাদের এবং কতখানি ?

এসবই আমায় বলেছিলেন হের ডক্টর ডক্টর ডোগার্ট। হের ডক্টর পূর্ব-বার্লিনের অধ্যাপক। নামটা বদলেছি তাঁর নিরাপত্তার খাতিরে, নইলে কমা দাঁড়ি পর্যন্ত তাঁরই। উনি পূর্ব বার্লিনে থাকেন সেই নির্জন রাস্তার ওপর ভাঙা ফ্ল্যাটবাড়ির দোতালায় যার নীচে এই দু'দিন আগে আমাদের বাসটা দাঁড়িয়েছিল এক মুহূর্ত। যার রুথ মুছেছিল চোখের জল। হের ডক্টর রুথের বাবা। আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে এক ভরা-সন্ধ্যার প্রাক্কালে। যাওয়ার স্থিরতা অবশ্যই ছিল না। পূর্ব-বার্লিন একটি রবিবার সকালের সঙ্কুচিত অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরব সেটা মন চায় নি। ইচ্ছে ছিল কাজের দিনের পরিপূর্ণতায় পূর্ব-বার্লিনকে আর একবার ভালো করে দেখব। তাই গিয়েছিলাম।

খুব একটা পরিবর্তন কিছু দেখি নি। দোকানপাট খোলা, ট্রাম বাস চলছে, ছোটবড় গাড়িও যে মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছে না তা নয়। কিন্তু প্রাণস্পন্দন অত্যন্ত ক্ষীণ। সবই যেন পুতুলখেলার সাজানো সংসার, দমে চলছে, নিয়মমাফিক নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদ আর হুকুমের তামিলে হাত-পা নাড়ছে। কোনকিছু প্রশ্ন করলে অবাক হয়, সন্দেহ করে, ভয় পায়, কথা বলে না। কারো দিকে চেয়ে হাসলে সে গোমড়া মুখ ঘুরিয়ে ভাবতে বসে কোন নিয়মটা ভাঙল এবং কেউ দেখল কি না। তারপর খানিকটা পথ দূরে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, চারিদিকে কড়া নজর বুলিয়ে, সুযোগ বুঝে ফিক্ করে একটু হাসে আর হন্ হন্ করে ছুটে হারিয়ে যায়।

দোকান আছে। জিনিসের ভালোমন্দ বিচার বাদ দিলেও কিন্তু কেনবার উপায় নেই। জিনিসে হাত দেবার আগেই জবাব দিতে হয় পারমিট আছে কি না। পারমিট মানে জিনিস কেনার সরকারি অনুমোদন। থাকলো তো আমি মানুষটা ভালো। না থাকলে এমনভাবে তাকায় যেন পাগল কিম্বা জেল-পালানো আসামী। অস্পৃশ্য তো বটেই। বিনা পারমিটে কেনা যায় বই, সিনেমার টিকিট, গ্রামোফোন রেকর্ড আর অফিসারের চরিত্র। ব্যস্ আর কিচ্ছু নয়। বই-এর দোকানে বিদেশী রচনা নিষিদ্ধ। ইংরেজি বই যা আছে সবই রাশিয়ার জয়গান। সিনেমাতে

কোরাসের ছন্দালাপ, প্রেমিক প্রেমিকাকে পায় ট্র্যাক্টর চালানোয় বাহাদুরী দেখিয়ে মস্কোতে মেডেল পাবার পর।

বই কেনার প্রয়োজন ছিল না, সিনেমা শেষ পর্যন্ত দেখার ধৈর্যও হারালাম আধঘণ্টার মধ্যে। ট্যাক্সির অভাব নেই বললেই চলে। ট্রামে উঠলেই মনে হয় বাঁধাঘাটে যাচ্ছি। অগত্যা হাঁটতে থাকি। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম রাশিয়ান সৈন্যের স্মৃতিসৌধে।

এটা একটা বাগান। চমৎকার। কার্পেটঘন সবুজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে আর সারি সারি ঝাউগাছের পা ছুঁয়ে লাল কাঁকর বেছানো পথ, নানান প্রান্ত ঘুরে গিয়ে পড়েছে মারবেল-গাঁথা স্মৃতিফলকের তলায়। দু'টি ফলক। দু'টোই কালো মার্বেলের। দু'ধার থেকে প্রায় কুড়ি ফুট ওপরে উঠে পরস্পরের দিকে সামান্য হেলে পড়েছে। তারই তলা দিয়ে এসে দাঁড়ালে দেখা যায় সামনে আরও সবুজ মাঠ, মাঝখানে বাঁধানো লম্বা লম্বা চৌবাচ্চা আর তাদের প্রত্যেকটির মাঝখানে ফোয়ারা। দূরে, প্রকাণ্ড ঝাউগাছগুলো ভিড় করেছে ভরা পাতায়। সামান্য বাতাসেই পাতাগুলো কানাকানি করে।

ভালোই লাগছিল। কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রাশিয়ান প্রহরী বুঝতেই পারি নি। আপাদমস্তক দেখে প্রশ্ন করল ইংরেজের শান বাঁধানো ইংরেজিতে— কেমন দেখছেন?

চমৎকার।

হাসলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন ঔদার্যে অনেক দূরের মানুষকেও কাছের মনে হয়। স্মৃতিফলক দু'টো দেখিয়ে প্রহরী বলল, ইটালীয় মার্বেল।

ও।

হিটলারের প্রাসাদ ভেঙে এখানে আনা হয়েছে। আমাদের দেশের যেসব সৈন্য এ দেশের মাটিতে প্রাণ দিয়েছে তাদের স্মৃতি রক্ষার জন্য এটা।

ও!

ওর সগর্ব উক্তিটা অবশ্যই কানে বাজল। এখানকার সহজ সরল আবহাওয়ায় ওর কথাগুলো বে-মানান। আরও খারাপ লাগল, যখন বলল—লোকটা ইতর ছিল।

সে তো মরেই গেছে।

ইতর ছিল।

তাকালাম। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় বললাম—চমৎকার সবুজ ঘাস!

লোকটা চারিদিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে বলল—এখানকার মাটি, ঘাস, ঐ গাছ স-ব রাশিয়া থেকে আনা।

সত্যিই রাশিয়ার ঘাস।

জুতো-মোজা খুলে ফেললাম। নেমে গেলাম নীচে। খালি পায়ে দাঁড়ালাম ঘাসের ওপর।

আমাদের দেশের ঘাসে আর রাশিয়ার ঘাসে কোথায় তফাৎ?

লোকটা প্রথমে হকচকিয়ে গেল, কি করবে, কি বলবে ঠাওর করতে পারল না। সম্বিৎ ফিরে পেয়েই সহজ মানুষটা হয়ে উঠল সজাগ প্রহরী। কাঁধের সাদা দড়িতে বাঁধা হুইসিল বাগিয়ে এমন জোরে বাজালো যে নিতান্ত মাটিচাপা না থাকলে মৃত সৈনিকরাও নির্ঘাৎ ছুটে এসে সঙ্গীন বাগাতো। এল আরও প্রহরী। আরও অনেক। পুরো একটা প্ল্যাটুন। রাশিয়ান ভাষায় চলল ওদের উত্তেজিত আলাপ—তাও বহুক্ষণ। আমি ঘাসের ওপরই বসে আছি। এক বিরাটাকার দৈত্যাকৃতি সৈনিক এসে বললে—পাসপোর্ট?

দেখালাম। ও দেখল তারপর নিয়ে গিয়ে আবার কনফারেন্স শুরু করে দিল। আমার পা দু'টো ঠাণ্ডায় কনকন করছে; উঠে এসে জুতো-মোজা পরলাম। লোকটা আবার আমার কাছে এসে প্রশ্ন করল—ইণ্ডিয়ান?

সহজ বাংলায় জবাব দিলাম—দেখতেই তো পাচ্ছ বাপু। পাসপোর্ট তো তোমার হাতেই আছে।

আমি কি বললাম ও বুঝল না। ও কি বলল আমিও বুঝলাম না। পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে—গো।

আমি হাসলাম। ও আরও গম্ভীর হল। দেখা হয়েছে, দাঁড়াবার আর দরকার নেই। ফেরার পথে পা বাড়ালাম। আমার দু'ধারে দাঁড়াল বন্দুকধারী। কাঁকর-বেছানো পথ দিয়ে চলেছি। শেষ বিকেলের ফিকে আলোয় ঘাসের রং পালটেছে। ঝাউ-সারির ওপর আলোছায়ার খেলা। সবুজের বহুরূপী সংসার ওদের দৃষ্টি সামনের দিকে। সোজা। একেবারে হুকুমের দড়ি দিয়ে বাঁধা। এসে পৌঁছোলাম দু'তালা উঁচু লোহার গেটে। বললাম—গুড বাই।

প্রহরী গেটটা টেনে বন্ধ করতে করতে বলল—আর কখন এখানে এসো না। তুমি আমার দেশের মাটিকে অপমান করেছ তার ওপর পা দিয়ে!

রাশিয়া দেশটা দেখবার সখ আমার বহুদিনের কিন্তু আমার দেখছি আর যাওয়া হবে না। মাটিতে পা না দিয়ে হাঁটা আমার বাবার বাবাও কখনও পারে নি!

আবার পথ। সারাদিনের ক্লান্তি। চা না হ'লেই নয়। পকেটে পয়সা আছে কিন্তু পারমিট নেই। রুথ আগেই সাবধান করে দিয়েছিল কিন্তু সতর্ক হই নি। সামান্য চায়ের বেলাতেও আইনের বাঁধন এমন শক্ত হবে ভাবিই নি! রুথ বাবার ঠিকানা দিয়েই দিয়েছিল। পা বাড়ালাম। বাড়ি খুঁজে পেতে সময় লাগল না।

হের ডক্টর ডক্টর ডোগার্টের নেমপ্লেটে ঔদাসীন্যের আবর্জনা জমেছে। নামের আগে দু'বার ডক্টর লেখার কারণটা তখন বুঝি নি, পরে জানলাম। জার্মান জাতটা কায়দার কড়া নিয়মে বাঁধা, বিশেষ ক'রে যুদ্ধ-পূর্ব জার্মান।

নামের সঙ্গে যদি কোন বিশেষ সম্মানের যোগাযোগ ঘটল তো ব্যস সেটা আমরণ কায়েমি হয়ে গেল। একবার ডক্টরেট পেলে হের ডক্টর; দু'বার পেলে হের ডক্টর ডক্টর ('হের'টা কেন যে ফের ব্যবহৃত হয় না তার কোন সঙ্গত কারণ আমি পাই নি!)। সারা সন্ধ্যাতে যদি সাত শো বার হের ডক্টর ডক্টরকে সম্বোধন করতে হয় তা হ'লে সেই সাত শো বারই বলতে হবে হের ডক্টর ডক্টর। একবার বাদ দিলেই সব বরবাদ। হের ডক্টর ডক্টরের সম্মানহানি এবং আপনার সমূহ বিপদ!

হের ডক্টর ডক্টর বাড়িতেই ছিলেন। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পরিচর্যার বাহুল্য। চায়ের টেবিলে আমায় বসিয়ে রুথের হাতের লেখা ঠিকানাটায় দেশলাই ধরালেন। ওঁদের জাতীয় আপ্যায়ন কফি। চা-টা ভদ্রতার কৈফিয়ৎ। তবু ভালো লাগল। আর ভালো লাগল রুথের মা'র সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনার বিশেষ ধারা। উনি জার্মান ছাড়া আর কোন ভাষাই জানেন না; আমি তো আকাট মূর্খ। তবুও কথা হল, কখনও আমার অল্প জার্মান ভাষার হাস্যকর অভিব্যক্তিতে, কখন হের ডক্টর ডক্টরের মধ্যস্থতায়, বেশির ভাগ ইসারায় আর প্রায় সবটাই হাসির বাহুল্যে। চা খেলাম, রাত্রে খেয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিলাম। সাদাসিধে মানুষটি অল্পক্ষণ পরেই চলে গেলেন রান্নাঘরে, তাঁর স্নেহাধিক্যের ব্যস্ততায়। বহু ব্যথা ও ব্যর্থতা-চিহ্নিত বার্ধক্যে ওঁদের সন্তানাভাবের হাহাকার একেবারে স্পষ্ট। আসবাববিহীন ঘরে ঘড়ির সশব্দ চলার আওয়াজ ছাড়া আর কোন প্রাণস্পন্দন কান পাতলেও শোনা যায় না। হের ডক্টর ডক্টর থেকে থেকেই তাঁর পাকা চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে বলে ওঠেন 'মাইন গট।' ওটা বাঁচার শব্দ নয়, বেঁচে মরে থাকার মর্মান্তিক প্রকাশ।

একটা নিতান্ত মামুলি চুরুট এগিয়ে দিলেন। মাদ্রাজের কুলিরাও তার চেয়ে ভালো সিগার খায়। বললেন—খেয়ে দেখুন। এ দেশে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট।

বাধ্য হ'য়ে নিতেই হল। দু'টান মেরে বার দশেক কাশলাম। আমার মতন পোক্ত সিগারেট খাইয়েও হার মানল।

প্রশ্ন করলেন—সঙ্গে পাসপোর্ট আছে?

হ্যাঁ।

পারমিট?

না।

বেশ বোঝা গেল উনি খানিকটা বিব্রত বোধ করলেন। কিছু অবশ্য বললেন না। উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে এসে প্রশ্ন করলেন—রুথ কেমন আছে?

ভালো।

কোন চিঠি পাঠিয়েছে?

না।

গুট। বিদেশীদের প্রায়ই ওরা খানাতল্লাসী করে'। পারমিট না থাকলে তো কথাই নেই।

খানিকটা অভিজ্ঞতা আজ আমার হয়েছে।

কোথায়?

শুনে উনি রাগ করলেন। আগুন নিয়ে খেলা করাটা নিতান্তই ছেলেমানুষি। উঠে গিয়ে দরজাটায় চাবি ঘুরিয়ে এলেন। বসেও নিশ্চিন্ত নন। আবার উঠে জানলাটা খুলে চারিদিকে ভালো ক'রে চোখ বুলিয়ে এসে বললেন—ফলো করে নি তোমায় কে বলতে পারে।

থেমে আবার বলেন—ওরা সব পারে।

সেটা অবশ্যই বোঝা গেল। না হ'লে বিদেশী অতিথির সঙ্গে আলাপের আগে এত সতর্কতার আর কোনই কারণ থাকতে পারে না।

বিষাদে বন্দী। কথা যোগায় না, তাই বলি বার্লিনের এই অংশটা খুব চুপচাপ।

চুপচাপ নয়, মৃত।

আবার আমরা চুপচাপ। পাশের ঘর থেকে রুথ-মা'র রান্নার শব্দ আসে। মাঝে মাঝে গ্যাস-উনুনের শব্দটা শোনায় শঙ্কিত টানা দীর্ঘনিশ্বাসের মতন। উনি থেকে থেকে সিগারে টান দেন আর আমি সেই আলোর খেলা দেখি ওঁর কপালে স্পষ্ট দাগগুলোর ওপর।

আমি বোধ হয় আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটালাম।

কি ভাবছিলেন জানি না। চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন, উঁঃ? কি বললেন?

আমি বোধ হয় আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটালাম।

না। আগে ছিল পড়ানো। এখন শুধু পার্টি ডক্ট্রীন (Party doctrine) মাথা লাগে না, মুখস্থ করলেই চলে।

মানে? আপনি তো ইতিহাস পড়ান। রুথ বলছিল।

পড়াতাম। এখানে ইতিহাস তার ঐতিহ্য হারিয়েছে। আমরা রিসার্চ ক'রে ইতিহাসকে খুঁজে বের করতাম। এরা পার্টি অফিসে ইতিহাস লেখে। আমরা মুখস্থ করি আর মুখস্থ করাই।

থেমে আবার বলেন, শুধু পড়ালেই হয় না। সামনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। কে পড়ছে, কে পার্টিকে উপেক্ষা করছে। পেছনের দিকেও মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখতে হয় কে আমায় দেখছে।

রিপোর্ট করতে হয়?

হয়। করি। করলে মনের জাত যায়। না করলে জীবিকা।

একমুহূর্ত থেমে যান হের ডক্টর ডক্টর। সিগারে শেষটান দিয়ে ফেলে দেন। ঘুরে বলেন, কিন্তু কেন? কি হবে এমনি ক'রে লেখাপড়া শিখিয়ে? এমনি ক'রে করে কোন্ পার্টি টিকল? এই ধর জার্মানী···

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন হের ডক্টর ডক্টর আর ব'লে যান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেইসব কথা—যা ইতিহাসের পাতায় নেই, আছে সর্বহারা মানুষের হাহাকারের মধ্যে, সন্তানহারা পিতার দীর্ঘনিশ্বাসে। যা আছে মনের কোণে কোণে পার্টি ডক্ট্রীনের কড়া শাসনকে ব্যঙ্গ করে, ক্রুশ্চেভের হুঙ্কারকেও উপেক্ষা করে। উনি বলে চলেন হিটলারের রাইকস্ট্যাগে আগুন লাগানোর কথা নয়—সেই প্রসঙ্গে বৃটেনের কাপুরুষতার কলঙ্ককাহিনী। বারেবারেই হিটলারকে খুশি করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা।

রাত গভীর হয়। হের ডক্টর ডক্টর ক্লান্ত হ'য়ে থেমে যান। সুদীর্ঘ ষাট বছর ধরে উনি দেখেছেন কেমন নিশ্চিতভাবে সভ্যতা শেষ হয়ে আসছে। মানুষ মরতে বসেছে। কাল হিটলার হুমকি দিয়েছিল, আজ রাশিয়া পার্টি ডক্ট্রীনের চাবুক মারছে, কাল আবার আমেরিকা ডেমোক্রেসির আগুন জ্বালবে। সাধারণ মানুষের দুর্ভাগ্য যে এইসব রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে সেই-ই হয় সবচেয়ে নির্যাতিত। জানলাটা খুলে দেন হের ডক্টর ডক্টর। বাইরে আলো নেই, গোলমালও নেই। আছে জমাটবাঁধা অন্ধকার আর অত্যাচারের ভীতি। কথা শেষ করে উনি ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন—আপনিই বলুন। দোষটা

জবাব দিই নি। দেবার কিছু ছিল না। জানবার কৌতূহল ছিল, বলবার ভাষা নেই। উনি জবাবের আশাও করেন নি। ডাক দিলেন—দেখে যান।

জানলায় ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে নিস্তব্ধ পথ দিয়ে মন্থরগতিতে চলেছে মিলিটারি ট্রাক। তার ওপর জনকুড়ি স-রাইফেল সৈনিক। ট্রাকের হেড-লাইটটা পড়েছে সামনে, পথের মোড়ে অন্ধকার বাড়িটার দেওয়ালে। সেখানেও দু'জন রাইফেলধারী সৈনিক। ট্রাকের আলো পড়তেই তারা সোজা হয়ে দাঁড়াল। হের ডক্টর ডক্টর বললেন—আমরা সভ্যজগতের মানুষ নই। আমরা বন্দী।

রাত বারোটা।

অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজার চাবি খুলে অন্ধকার সিঁড়িটা ভালো ক'রে দেখে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী আমায় বিদায় দিলেন দরজার ভেতর থেকেই। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতেই শুনলাম দরজায় চাবি দেওয়ার শব্দ। মনে হল ওটা ঘরের চাবি নয়, বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সাময়িক আনন্দ।

জনবিরল পথ।

নিজের পায়ের শব্দ ওৎপাতা ভীতিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ত্রাসের সঞ্চার করে। বাঁ দিকে পশ্চিম বার্লিনের আকাশে আলোর আভা কোথাও লাল, কোথাও নীল। আন্দাজে ঠাহর করতে চেষ্টা করি কোনটা কিসের। লালটা বোধ হয় ফ্রীডাম ফ্রন্টের আর নীলটা কুড্যামের। কিম্বা বোধ হয় দু'টোই কুড্যামের। ওরই নীচে আছে স্বাধীন মানুষের আনন্দ-কোলাহল। কানে শোনা যায় না, মনে তার অনুভূতি। ভাষনার যেই হারালো বীভৎস চিৎকারে। ইংরেজি অনুবাদে সেটা হল হল্ট।

দু'জন সৈনিক। হাতে রাইফেল।

পাসপোর্ট ?

দেখলো।

পারমিট ?

দেখলো। রুথের বাবা ওটা আমায় দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য ওটা জাল।

কোথায় গিয়েছিলে এত রাত্রে ?

বেড়াতে।

কোথায় ?

সিনেমায়। মেমোরিয়ালে। তারপর পথে পথে।

কোথায় যাচ্ছ ?

উ বান (মাটির তলার ট্রেন)।

আপোষে ওদের পরামর্শ হল। তারপর একজন রইল, অন্যজন আমার সঙ্গে পা বাড়ালো।

চল

ভালোই হল। পথটা আমার ঠিক জানা ছিল না। সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দি।

নিয়েন (না)।

হাসলাম। ওরা বোধ হয় নিজেরাই নিজেদের বিশ্বাস করে না। বাঁ দিকে মোড় ফিরলাম। সৈনিকটা চট্ ক'রে পেছনটা একবার তাকিয়ে বললে, সিগারেট ?

দিলাম। একটা লম্বা টান দিয়ে বললে, আমারিকান ? গুট।

উ বান বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রাম তো আগেই হয়েছে। ট্যাক্সিও নেই একটা। বাধ্য হয়ে হেঁটেই চলেছি। পথের দু'ধারে ভাঙা ভাঙা বাড়ি। দেওয়ালের মধ্যে থেকে ডাল-পালা গজিয়েছে। পথে জনমানব নেই। কোথাও বেড়ালের চোখ জ্বলছে, কোথাও সৈনিকের পদশব্দ। দৈবাৎ যদি একটা গাড়ি আসে তো মনে হয় আশে পাশের বাড়িগুলো বুঝি উল্টে পড়বে ঐ বিরাট শব্দের ঝাঁকানিতে।

বাঁ দিক সবুজ প্রান্তর। আয়তনে বিঘে দুই কি তিন। মাঝখানে উঁচু ঢিবি। বিক্ষিপ্ত দু-একটা বেঞ্চি। ফুটপাথে যে আলো জ্বলছে তা তেই সেটুকু দেখা যায়। সৈনিক বলে হিটলার কবর।

লোকটা জার্মান। মোড়ের কাছে এসে পেছন ফিরে তাকায়। আর একবার ঐ কবরটা দেখে নেয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলে, হিটলার।

আমি বলি হেইল হিটলার।

হাসে। সৈনিক নয়, ও এখন সহজ মানুষ। বলে সিগারেট ?

দিই ওকে আর একটা। মহানন্দে শিস দিতে দিতে চলে। এসে পড়ি পটসডামের প্ল্যাটজ-এ। তার আগেই ও আধখাওয়া সিগারেটটা নিবিয়ে টুপির মধ্যে লুকিয়ে নেয়। প্ল্যাটজ-এ আরও সৈনিক, সঙ্গীন উঁচিয়ে সজাগ। ও গিয়ে কিছু একটা বলে। সর্দার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে ছাড়পত্র দেয়। গেটের তলায় পৌঁছাই। এইখানেই আমাদের ছাড়াছাড়ি। একটা সিগারেট দি। ও সভয়ে পেছনে তাকায়। আমিও দেখি কম ক'রে আটজোড়া চোখ আমাদের শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ ও টুপিটা খুলে অভিবাদনের ছলে নুইয়ে পড়ে। আমিও। ও ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে সিগারেট ?

পুরো প্যাকেটটাই ওর টুপির মধ্যে ফেলে দিই। ও হেসে টুপিটা মাথায় দিয়ে বলে গুড নাইট।

ও মিশিয়ে গেল রাশিয়ান এলাকার অন্ধকারে। আমি পা বাড়াই স্বাধীনতার আলোর দিকে।

দু' পা গিয়েই দু' সারি ট্যাক্সি। ওরা দাঁড়িয়ে আছে অপেরা ভাঙার অপেক্ষায়। একটাতে উঠতে যাবো, পেছন থেকে চেনা কণ্ঠে শুনি—গুড ইভনিং।

রুথ। অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করি—তুমি ? এখানে ?

শেষ গাড়িটায় এলে না দেখে খানিকটা ভয় পেলাম। ভাবছিলাম কি করি!

ভাবনার কি ছিল ?

ট্যাক্সি আর নেওয়া হল না। হাঁটতে হাঁটতে এসে বসি ছোট রেস্তোরাঁয়। হুকুম হল বীয়ার। তারপর ওর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সোনালী চুলগুলো কাঁধ বদল ক'রে বললে—অনেক।

ও পাড়ায় মেয়ে নেই!

থাকলে ভালো হত। তবু বোঝা যেত যে তোমার মন আছে। তুমিও মানুষ

ওর ভুল বাঙলে দিই।

বোঝা যেত যে আমি পুরুষ।

রুথ সিগারেট ধরাচ্ছিল। জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা একমুহূর্ত স্থির হয়ে যায় সিগারেটের মুখে। নীচু মুখ, তোলা চোখ। বলে—আর যু ?

আমি হাসি। জবাব দিই না। সে ছোট ক'রে সিগারেট ধরায়। বলে—টেল্ মি। আর যু ?

এবার জবাব দিতেই হয়। বলি—এক জায়গায় আমি পুরুষ। এক জায়গায় আমি পিতা। এখানে আমি পথিক।

বৃদ্ধা বীয়ার নিয়ে আসে। অভিবাদন জানায়। রুথ বীয়ারের লম্বা গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে লাগিয়ে, ফেনার ওপর দিয়ে আমায় আড়চোখে দেখে বলে—পথিক তুমি প্রথম নও।

আমি ভারতীয় পথিক।

তাও আগে এসেছে এবং তোমারই দেশ থেকে।

বীয়ারে চুমুক দিয়ে বলে—দিনের বেলায় তিনি থাকতেন দেশের নায়িকার হোটেলে। রাত কাটাতেন গণিকার ঘরে।

তিনি বোধ হয় শুধুই পথিক।

না। পরিচালক। তিনিও ছবি এনেছিলেন। আর—থেমে আবার বলে—সঙ্গে এনেছিলেন পুরুষের ধর্ম।

আমি তা হ'লে অধার্মিক ?

এইবার রুথ হাসে। একেবারে ছেলেমানুষের মতন খিলখিল ক'রে। এদিক-ওদিক থেকে সবাই ঘুরে তাকায়। রুথ উচ্চৈঃস্বরে ক্ষমা চেয়ে নিম্নস্বরে বলে—অধার্মিক নও। একেবারে নাস্তিক।

প্রভেদ কোথায় ?

খুব সোজা। অধার্মিক ধর্ম মানে কিন্তু উপেক্ষা করে। নাস্তিক বিশ্বাসই করে না।

আমি তা হ'লে নাস্তিক।

উৎসুক হ'য়ে প্রশ্ন করে—বট হোয়াই ?

আমার প্রেমের সাধনা।

কার প্রেম ?

একটি মেয়ের।

কে সে ?

এমন একজন যে দেশে আমায় ভালোবাসতো। বিদেশে এসে ভুলেছিল।

বিয়ে করে নি তোমায় ?

তার চেয়ে বড় আঘাত।

কি ?

আমার ভালোবাসাকে সে বিশ্বাস করে নি।

বীয়ার শেষ ক'রে রুথ উঠে দাঁড়ায়—চল।

কোথায় ?

রুথ চারিদিকে দেখে খাটোগলায় বলে—যেখানে ঈর্ষার জ্বলজ্বলে চোখ নেই। গোলমাল নেই। ভিড় নেই।

হোটেলের লবীতে একগাদা লোক। বাজনার তালে তালে সন্ধ্যার এটিকেটের বাঁধ ভেঙেছে। রাত্রির প্রথম প্রহরের ভদ্রতার মুখোসও মুছে গেছে মদের মাদকতায়। এলোমেলো চুল আর খোলা ঝোলা টাই দেখলেই বোঝা যায় নাচের তালে আকাঙ্ক্ষার জট পাকিয়েছে। আমি চাবি নিতে গেলাম রিসেপশন্ কাউণ্টারে, ও থামের গায়ে ভর দিয়ে তালে তালে পা ঠুকল।

নাচবে ?

জানি না।

রুথের বাঁকা ঠোঁটের হাসিতে বেদনার ছায়া আর অবিশ্বাসের ইসারা।

কামরা। সেদিনের মতন ও আজ আর বিছানায় গড়িয়ে পড়ল না। সোফায় বসে সিগারেট ধরালো। আমি পর্দাটা টেনে দিলাম। সারাদিনের পথ চলার যে গভীর অবসাদ এবার ওর তাকে আটকানো যায় না। আমি বিছানায় শুয়ে সিগারেট ধরাই। ও উঠে এল সোফা থেকে, বিছানায়। জুতোটা খুলে কম্বলটা পায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললে—ব্যাখ্যা কর।

কি ?

তোমার প্রেমের সাধনা।

আমার মাথার কাছে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। তারই লাল সেডটা উবছে পড়ছে রঙিন আলো। ওর ধবধবে মুখে আলতো লালের মধুর আবেশ। দিনের আলোয় ওর সৌন্দর্য পরিমিত। আমার সাময়িক বাসভূমির অপরিসীম নির্জনতায় আর নিবিড় নীরবতায় ওর আকর্ষণ অপরিমেয়। লাল আলোটা যে লালসার কটাক্ষ করছে না তাও নয়।

কৈ, বললে না ?

কি চাও ? আলোচনা না তর্ক ?

আমার সন্দেহ হল ও হয়ত তর্কে আমায় হারিয়ে দিয়ে বিশ্বাসের বাঁধ ভাঙবার চেষ্টায় আছে। বললে—কোনটাই নয়। শুধু শুনতে।

কেন ?

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তুমি অবিশ্বাস্য। তাই।

কেন ?

তা হলে তো অনেক কথাই বলতে হয়।

বল।

হাসতে হাসতে রুথ বলে—তুমি ভীতু তাই প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চাইছ।

ঠিক তা নয়।

হেসে বলি—তোমার কথা আগে শুনতে চাইছি কারণ তোমার দিকটা জানলে আমার দিকটা জানানো সহজ হবে

আবার একটা সিগারেট ধরালো রুথ ওর পুরোনো সিগারেটের মুখ থেকে।

আমার কথা বাদ দাও। আমার কিছু নেই।

অর্থাৎ?

যুদ্ধে আমার সব হারিয়েছি। শুধু আমি নয়, আমরা। জাত

আমাদের ঘর বাঁধবার বাসনা নেই কারণ ভাঙনকে আমরা ভয় পাই। এটা কি? বেঁচে থাকা। ঐটুকুই আমাদের একমাত্র আনন্দ।

আজকের মেয়েদের আছে অস্তিত্ববোধ। পুরুষদের আছে পুরুষবোধ। এই নিয়ে আমাদের দ্বন্দ্ব। আমি জানি আমার কি আছে। পুরুষ জানে সেটা পেতে হ'লে কি দিতে হবে।

কি?

কিছু ডিনার, কিছু ডলার। এক-আধ দিন নাইটক্লাব, আর···

আর??

প্রথমটা ও চুপ করে থাকে। ঘরময় আমার প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়ে ছন্নছাড়ার মতন।

আবার বলি—আর???

মাতৃত্ব প্রতিবিধানের প্রতিশ্রুতি।

মাতৃত্ব মানো না?

প্রশ্ন করি নারীত্বের ওটা একটা অঙ্গ—প্রধান অঙ্গ।

ছিল। স্বরে ওর নিবিড় নৈরাশ্য।

কোন একদিন। আজ আর নেই। হিটলার, চার্চিল, ক্রুশ্চেভ আর আমেরিকান সৈন্য সে বিশ্বাস আমাদের ভেঙেচুরে দিয়েছে। আজ আমার ছেলে কাল যে সাইবেরিয়ায় থাকবে না কিম্বা স্টেটের সম্পত্তি হবে না, এমন কথা কে বলতে পারে? আমাদের বুকের ওপর স্ট্যালিন, আমেরিকা আমাদের চারিধারে রাশিয়া।

থেমে প্রশ্ন করে যুদ্ধ কাকে বলে জান?

নিজেই উত্তর দেয় স্পষ্টভাবে; যুদ্ধ আমার মনে নেই তবে দুঃস্বপ্নের মতই মনে আছে নামকরা অধ্যাপকের মেয়ে হয়েও আমাকে আমেরিকান সৈনিকদের ক্যান্টিনের সামনে দাঁড়িয়ে রুটি চাইতে হয়েছিল দিনের পর দিন। পেয়েও ছিলাম। শুধু আমি নয়। আমরা অনেকে। আট থেকে আশী পর্যন্ত সবাই।

থেমে যায়। ওর গলাটা ক্রমশই ভারী হয়ে ওঠে। চোখ দু'টো ভিজে ভিজে।

কি দিয়ে শুনবে? বল।

দেহ। তখন আমার বয়স এগারো।

অখণ্ড নীরবতা। মাঝে মাঝে নীচে থেকে ভেসে আসে মার্কিনী গানের সুর। নিগ্রো ব্যাণ্ড। হোটেলটাও মার্কিনী ডলারের চাকচিক্য দিয়ে মোড়া। সামনের সরানো পর্দার মধ্যে দিয়ে নানান রঙের রামধনু। নিওন বিজ্ঞাপন। কোনোটা নেভে কোনোটা জ্বলে, কোনোটা স্থির হয়ে নিজেকে প্রচার করে। তার মাঝখানে সবচেয়ে বড় যেটা সেটাই সবচেয়ে মিথ্যে মনে হয়। 'ফ্রীডাম ফ্রন্ট।'

আমাদের জন্যেই ফুড প্যাকেট আসত ওদের দেশ থেকে। ওদেরই মা বোন স্ত্রী পাঠাতো আমাদের দুর্দশার কথা ভেবে। ওরাই সেগুলো বিলি করত ঐ দামে।

থেমে থেমে বলে—প্রথম দু-তিন দিন ফিরে এসেছি ঘৃণায়। তারপর দু-তিন দিন গেছি ক্ষিদের জ্বালায়। তারপর যখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখেছি মানের মূল্য নেই, নীতির বালাই নেই, নারীত্বের সম্মান নেই, আছে কেবল ক্ষুধার তাড়না আর বেঁচে থাকার তাগিদ, তখন গেছি আমিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে। শুধু আমি নয় আমরা

আর বাকি?

তারা মরেছে। কেউ অনাহারে, কেউ আত্মহত্যা করে।

থেমে বলে—তখন মরি নি। আজ মরছি। দিনে দিনে। প্রহরে-প্রহরে। প্রতিদিন মরতে হবে সারাজীবনের ব্যাপিতে।

আজ তো তোমাদের অভাব নেই।

স্বভাবও নেই। নষ্ট হ'য়ে গেছে। আমেরিকা আমাদের রাশিয়ার হাত থেকে বাঁচাবে। আমরা বাঁচব। সে বাঁচার মূল্য দিতে হবে না? শুধু আমেরিকা কেন। সবাই মূল্য চায়। যারা আসে। তোমার দেশের লোকও! তাই তো তোমায় মনে হয় অবিশ্বাস্য।···এবার শুনি তোমার প্রেম-সাধনার ব্যাখ্যা।

সেটাও তোমার মনে হবে অবিশ্বাস্য।

তবু শুনি ···আগে বল, তোমার স্ত্রী আছেন?

মেয়েও।

ছবি নেই?

আছে।

দেখি।

দেখালাম। ওর হাসির মানেটা বুঝলাম না।

হাসলে যে?

না, এমনি। হ্যাঁ এবার বল। আমায় বাধা দিয়ে বলে তুমি আরেকটি মেয়ের কথা বলেছিলে।

হ্যাঁ।

তার ছবি আছে?

না।

সঙ্গে রাখো না বুঝি?

না।

কেন?

সে আমার জীবনের বাইরে। অন্তরের বলতে পারো, প্রচারের নয়।

বুঝলাম।

কি বুঝলে?

তোমার জীবনে কিছু জট পাকিয়েছে। যাক্ গে। সাধনা কার জন্যে জানতে চাইবো না কিন্তু শুনতে চাই নিজেকে বঞ্চিত কেন কর?

নিজেকে মানুষ তখনই বঞ্চিত করে যখন সে তার প্রাপ্য অংশ না নেয়।

তোমরা আমার প্রাপ্যের অংশ নও।

হৃদয় তো দিয়েছে, বুঝলাম। দেহ তো তোমার।

দেহের মধ্যেই হৃদয়ের বাসা। বলতে পারো দেহটা ভালোবাসারও ভাষা।

তার বাইরে?

দেহ অপবিত্র হয়। ভালোবাসা ব্যর্থ হয়। আসলে কি জানো। আমার অন্ধবিশ্বাস, যাকে ভালোবাসি আমার সত্তার ওপর একমাত্র শুধু তারই নিঃশেষ অধিকার। ভালোবাসায় বিলুপ্ত হয়, তবেই আমি সার্থক। এইটাই আমার প্রেমের সাধনা।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে রুথ। সিগারেটের ধোঁওয়ায় চক্রাকার

নীচের ব্যাণ্ড থামি থামি করেও থামছে না। মাঝে মাঝে ট্যাক্সি ছোটার শব্দ। থেকে থেকে মত্ত গাছের উন্মত্ত চিৎকার। বাইরে আলোর আর ঔজ্জ্বল্য নেই। জ্বলছে এইটুকুই বোঝা যায়।

তুমি কি মনে কর অশুদ্ধ দেহ নিয়ে প্রেমের সাধনা সম্ভব?

প্রশ্নটা ঠিক বুঝি না। রুথ বলে আমার নিজের কথা বলছি।

এবার বুঝতে পারি ওর প্রশ্নের ধারা। বলি সাধনা মনের। দেহ সাহায্য করে। সায় দেয়।

অর্থাৎ?

মনের মলিনতা যদি মুছে দিতে পারো, দেহ আপনিই পবিত্র হয়ে উঠবে। আলো জ্বাললে অন্ধকার যেমন যায়। দৈহিক আনন্দের শেষে থাকে শিথিলতা। মন ভরে পাওয়ার মধ্যে আছে পরিপূর্ণতা, পরিনির্বাণীয় আনন্দ, পরমতম সৌন্দর্যবোধ। দৈনন্দিন জীবনে সেটাই হল 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।' দি ট্রু, দি সিম্পল, দি বিউটিফুল।

রুথ অবাক হয়ে শোনে। বাইরের আলো আর মনের আলোড়নে ওকে আরও সুন্দর দেখায়। একদম আলাদা মানুষ। বিধ্বস্ত জার্মানীর জরাজীর্ণ নারী নয়, বাঁচার তাগিদে দেহ বিকানো রুথ নয়, দোভাষী রুথ নয়। এ নতুন সূর্যের প্রথম আলোয় উদ্ভাসিত রুথ, পূর্বারুণের পবিত্রতায় পরিপূর্ণ রুথ। এ সেই মেয়ে যে মরে নি, হিটলার যাকে মারতে পারে নি, ক্রুশ্চভের ভয় যাকে জয় করতে পারে নি। আমি বলে যাই—রুথ, আজ এখন এই মুহূর্তে আমি যদি আমার দেহকে হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বিলিয়ে দিই তোমার কাছে, তা হলে কি হয় জানো?

কি?

দেহ আমার ক্ষণিকের আনন্দ পাবে, মন পাবে অপবিত্রতার বোঝা। সব বিষিয়ে দেহকে দূষিত করবে, ভালোবাসার ভবিষ্যৎ হবে কলঙ্কিত। তার চেয়ে এই ভালো। তুমি রইলে আমার জীবনে আমার সাধনার সোপানে আরও একধাপ ওঠার আনন্দ। আমি রইলাম তোমার জীবনে এতটুকু মানসিক আনন্দের স্বাক্ষর।

ওটাকে কি বলে?

কোনটাকে?

তোমার ছবিতে হিরোইন যা করেছিল হিরোর পায়ের কাছে? ঐ যে, যেটাকে তুমি বললে...

প্রণাম।

পা ছুঁয়ে করে, না?

হ্যাঁ, মন যদি মানে।

ও মাথাটা নুইয়ে দিল আমার পায়ের ওপর। আমি পা-টা সরিয়ে নিলাম।

ও বললে, প্লিজ, পা সরিও না। আমার প্রণাম নাও।

উঠে দাঁড়াল প্রণাম সেরে। বললে, আমি যাই। সাতটা বাজে।

চুলটা আয়নায় ঠিক করতে করতে বললে: আমি এসেছিলাম তোমায় জয় করতে।

জানি।

হেসে বলে, একটা কথা কিন্তু জানো না।

কি?

দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়ায়, আমার বেদনার ভার।

আমি ভাবছিলাম, সেটা বুঝি তোমার শেষ হল।

না। বাড়ল।

কেন?

তোমার দেশের মেয়ে হয়ে জন্মায় নি ব'লে।

ভাবছি ঘুমিয়ে নিলে কেমন হয়, দরজায় মৃদু করাঘাত হল। বেল-বয়। কলকাতার চিঠি। হাতের লেখা দেখেই বুঝতে পারি ভাগ্যে কি লেখা আছে। খুলে পড়ি। যা ভেবেছি ঠিক তাই। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। ওই নীচে রুথ যাচ্ছে। ইচ্ছে হল ডেকে বলি আমার দেশের মেয়ে হয়ে জন্মাও নি বলে দুঃখ করার কারণ নেই। তুমি বাঁচার তাগিদে হারিয়েছ। আমার দেশের মেয়ে হারিয়েছে নামের মোহে আর ঐশ্বর্যের প্রলোভনে। ভালোবাসার সাধনাকে তুমি প্রণাম করেছ। সে অপমান করেছে। [ক্রমশ।

শীর্ষবিন্দু

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ কোন শীর্ষ থেকে যায় না দেখা সূর্য
মেঘের পাখি কাজল-শোকে ছড়ায় যদি পাখা—
বুকের মাঝে ব্যথার প্রদীপ এখন কি যায় রাখা?
যন্ত্রণারা হৃদয়পুরে বাজায় শুধু তূর্য।

তা' হলে এই পরম শোকে দু' চোখ বুজে থাকবো
অমল-আলোর মুহূর্তরা কখন ছুটে আসবে
এবং আমায় উজ্জ্বল হয়ে কখন ভালবাসবে
যখন আমি দু'চোখ ভরে জলের ছবি আঁকবো।

বিগতার্তবা

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

দু'চোখে জড়িয়ে এক জরাজীর্ণ অতীতের স্মৃতি
অন্ধকারে ঢেকে মুখ বসে আছো বিগতা-যুবতী
পাথর-নিশ্চুপ। বাইরে সময়-বৃষ্টি, ছাট লাগে শরীরে ও মনে।

জীবনে সন্ধ্যা এলো রোদ-ভরা দুপুর পেরিয়ে—
গ্রীষ্মের নদীর মত স্রোতোহীনা হৃদয়ে দাঁড়িয়ে
আরো বাঁচবার সাধ। ভয়ার্ত বিক্ষুব্ধ মন মৃত্যুর পদশব্দ শোনে।

পাথেয় অনেক ছিল: পথে পথে কোথায় কখন
হারিয়ে ফুরিয়ে গেছে। এ যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ
অসম্ভব। রাত হ'ল। বীরাঙ্গনা-শৌর্য কই? দু'চোখে কাজল

নৈরাশ্যের অন্ধকার। পৃথিবীর পান্থশালায়

হীরা ঝিল

শ্রীকুঞ্জবিহারী সাহা

কল্পনার রঙিন তুলিতে আঁকা। সিরাজের সাধের হীরাঝিল! মধুময় স্বপ্নের অপূর্ব আবেশ জড়ানো তার অলৌকিক রচনায়। মুসলমান আমলের শিল্পজগতে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি বলে একদা স্বীকৃতিলাভ করেছে হীরাঝিল। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার বিস্ময়ের কাহিনী স্পষ্ট হ'য়ে থাকলেও অথবা জনহৃদয়ের স্মৃতিপট থেকে তার করুণ কাহিনী চিরতরে মুছে না গেলেও, তার বিশেষ অস্তিত্ব চোখে পড়ে না আজ আর। যা' চোখে পড়ে,—তা কেবল তার দু-চারটি ভগ্ন-জীর্ণ গৃহতলখণ্ড অথবা ভাগীরথীর খাড়াপাড়ের স্থানে স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাসাদ প্রাচীরের কয়েকটি খণ্ডাংশ মাত্র। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়েও হীরাঝিল পারে নি কালজয়ী হ'তে। এ আর বেশি কি! আশ্চর্যের বিষয়ই বা কি। কিছুই ত' চিরস্থায়ী হয় নি—সে যত মহানই হোক অথবা যত গৌরবময়ই হোক; আর কলঙ্কের স্মৃতির ত' কথাই নেই। তার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য আছে ইতিহাসে। কোথায় গেল ত্রিভুবন-বিজয়ী রাবণের সে স্বর্ণলঙ্কা! কোথায় গেল ভারতত্রাস-দুর্দান্ত কংসের মনোহর প্রাসাদপুরী সে মথুরা নগরী! এমন কি—কোথায় গেল অমরাবতীর গর্ব-খর্বকারিণী যদুপতির সে দ্বারকাপুরী!

বিস্ময়ের রহস্যজালে ঘেরা হীরাঝিলের জন্ম হয় দুই শত বৎসরের কিছু আগে—১৭৫৩-১৭৫৫ খৃস্টাব্দ মধ্যে। এর অবস্থান ছিল মুর্শিদাবাদ শহরস্থ ভাগীরথী তীরবর্তী এক মনোরম স্থানে,—ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলের কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত মনসুরগঞ্জ নামক উপকণ্ঠ শহরের প্রান্তে, জিয়াগঞ্জ নামক প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্রের বিপরীত তটে। ইহা প্রকৃতপক্ষে ভাগীরথী গর্ভ থেকে কাটা এক খাল মাত্র। প্রাকৃতিক না হলেও অপরূপ শোভা সৌন্দর্যময় আঁকা-বাঁকা সুরম্য জলাশয়। যদিও কাটা খাল, তবুও অপূর্ব,—তবুও অতুলনীয়, নয়ন বিমোহন। একদিন ছিল—যখন মনে হত সত্যই ইহা হীরারই ঝিল। একদিন ছিল যখন ভ্রম হত—যেন রাশি রাশি স্বচ্ছ গলিত হীরক ঢেলে অতি সুকৌশলে রূপায়ণ করা হয়েছে এই অপরূপ রমণীয় ঝিল। অপ্রাকৃতিক হ'লেও এমন চিত্তবিমোহন ও শোভা-সৌন্দর্যময় যে, দর্শনমাত্র মুগ্ধ-বিস্মিত করত দর্শককে—অপূর্ব পুলকের শিহরণ বয়ে যেত তার নয়ন-মনে।

প্রথম দর্শনে কেউ ঠাওরই করতে পারত না একে স্বচ্ছ জলপূর্ণ জলাশয় বলে। দেখলে বুঝতে বাকি থাকত না ইহা সৌন্দর্যের ভক্ত পূজারী সিরাজের সুরুচি-সম্পন্ন কলা-প্রীতির অনন্যসাধারণ পরিচায়ক। অপরূপ সৌন্দর্যশালী ঝিলের রমণীয় তীরে রচিত হয়েছিল বহু চত্বর বিশিষ্ট এক বিচিত্র মনোহর প্রমোদভবন। উচ্ছৃঙ্খল তরুণ যুবক সিরাজ অপরূপ সৌন্দর্যময় প্রমোদনিকুঞ্জ রূপায়িত করেন খেয়াল-খুশি পরিতৃপ্ত করবার জন্য, কিন্তু ক্ষোভের বিষয়—অপরিণামদর্শী যুবকের অতৃপ্ত উপভোগস্পৃহা—অনিয়ন্ত্রিত খেয়াল-খুশির অফুরন্ত তৃষা মেটানোর সৌভাগ্য হয় নি খুব বেশি দিন, এই সাধের হীরাঝিল প্রাসাদে। তবুও—স্বল্প সময় মধ্যেই নারী ও সুরার অবাধ স্রোত বইয়েছিলেন খেয়ালী যুবক মনোহর ঝিলের বুকে—রমণীয় বিলাসনিকুঞ্জে—মনের সাধেই। তিনি চেয়েছিলেন মনের সুখে ব্যসন বাসনা পরিতৃপ্ত করতে জীবনভোর, কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা নির্মমভাবে বাদ সাধলেন তাতে।

অপুত্রক আলিবর্দির স্নেহের দুলাল ছিলেন সিরাজ। পুত্রহীন বৃদ্ধ দাদুর আজীবন সঞ্চিত অপরিমেয় বাৎসল্য পেয়েছিলেন তিনি সম্পূর্ণ নিঙড়িয়েই। বলিষ্ঠচরিত্র আলিবর্দি একান্ত ধর্মপরায়ণ, মার্জিত রুচি সম্পন্ন কঠোর নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আদর্শ পুরুষ হ'য়েও পুত্রস্নেহে লালিত দৌহিত্রের সকল রকম আদর-আবদার-অত্যাচার জুলুম সহ্য করতেন শান্তভাবে—স্নেহান্ধ হয়েই। বরং উচ্ছৃঙ্খল দৌহিত্রের অন্যায় নীতিবিগর্হিত আবরণে অযথা প্রশ্রয়ই দিয়ে যেতেন অন্ধ-স্নেহের বশবর্তী হয়ে। ফলে বেড়েই চলেছিল উচ্ছৃঙ্খল যুবকের স্বেচ্ছাচারিতা, ভোগের অতৃপ্ত লালসা। শেষে অনেক ক্ষেত্রে অসহনীয়ও যে না হয়ে পড়েছে এমন নয়। তবুও অশেষ স্নেহপরায়ণ অসহায় দাদু তার আনন্দ উপভোগ করেই অশান্ত মনকে শান্ত হতে বাধ্য করতেন;—না করেই বা উপায় কি।

নিষ্ঠাবান্ দাদু ছিলেন একনারী-নিষ্ঠ। এক নারীতেই ছিলেন তিনি পরিতুষ্ট। একমাত্র প্রিয়তমা পত্নীই ছিলেন তাঁর একমাত্র বেগম। তিনিই ছিলেন তাঁর সারাজীবনের নিষ্ঠাবতী সহচরী, সহধর্মিণী। আলিবর্দি ছিলেন সারাজীবন সুরাবর্জিত। অথচ স্নেহভাজন দৌহিত্র হলেন সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের—বিপরীত ধর্মের। তিনি জীবনের একমাত্র সার করলেন সুরা আর নারী। সুতরাং এটা ঠিক যে, কেল্লা নিজামতের একই পুরীতে—একই প্রাসাদে—সিরাজের উপভোগের উদ্দাম স্রোত বাধাহীন গতিতে মোটেই চলতে পারে না—আর তা ভালও দেখায় না। বিশেষ,—এক-নারীপরায়ণ চরিত্রবান দাদুর পক্ষে নিশ্চয় তা অবাঞ্ছনীয়, এমন কি—অসহনীয় হবার ভয়ও যে না আছে, তাও নয়।

তারপর—বিলাসপরায়ণ দৌহিত্র দিবারাত্র সার করলেন সরাব ও নারী—ক্রমে ক্রমে প্রশ্রয় পেয়ে। দু'য়ের প্রতি—আসক্তি এত বেশি বেড়ে গেল যে, তার জন্যই সিরাজের নিত্য প্রয়োজন হয় অধিকতর মাদক-শক্তিসম্পন্ন সুরা এবং নিত্য নূতন নূতন রূপবতী নারী। কাজেই যেমন আমদানী করা হয় বাছা বাছা সুরূপা সেরা নারী দেশ-বিদেশ থেকে, তেমনি আমদানী করা হয় উৎকৃষ্ট মূল্যবান সুরা সিরাজ থেকে ফ্রান্স থেকে—সুতরাং বিলাস স্রোতে ভাসমান সিরাজের অবশ্য প্রয়োজনীয় হয় একটা পৃথক নিরালা বিলাস ভবন—যেখানে চলতে পারে তাঁর ভোগবিলাসের অবাধ স্রোত বাধাহীন গতিপথে।

এ জন্যই—হয়ত সিরাজ প্রবীণ নবাব নাজিমের অনুমতিও পেয়েছিলেন সহজেই। কিন্তু শুধু এই কারণেই জন্মলাভ করে নি হীরাঝিল বা মনসুরগঞ্জ প্রমোদ-নিকুঞ্জ। আগের একটি অন্তঃসলিলা ধারা, একটি গূঢ় রহস্যও গভীরভাবে নিহিত ছিল হীরাঝিলের রূপায়ণের মূলে। আলিবর্দির অন্যতম জামাতা নোওয়াজেস মহম্মদ খাঁর (সিরাজের মেসোমশায়ের) মতিঝিল ছিল সিরাজের চির-চক্ষুঃশূল। মতিঝিলের চিত্তবিমোহন সৌন্দর্য ছিল যেমন দেশ-বিদেশের দর্শক মাত্রেরই অতিশয় মনলোভা, মতিঝিল প্রাসাদও ছিল তেমনি মুসলমান আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় সৌধ। কিন্তু সিরাজের নিকট মতিঝিলের এ-গৌরব, মতিঝিলের এ খ্যাতি ছিল অত্যন্ত হিংসার বস্তু। বিলাস-ব্যসনাসক্ত, নোওয়াজিসের মতিঝিলের যোড়শোপচার বিলাস সম্ভারও ছিল ততোধিক হিংসার বিষয়। এ জন্যও অনেক দিন থেকেই তিনি দৃঢ়সংকল্প হয়েছেন যে, এমন এক অপরূপ সুন্দর—এমন এক অপূর্ব মনোহর ঝিল আর তার সুশীতল শ্যাম-শোভাময় তীরে এমন এক স্বর্গোদ্যান, এমন এক ইন্দ্রপুরীতুল্য রমণীয় প্রমোদভবন নির্মাণ করবেন, যা ঘৃণাভরে ব্যঙ্গ করবে, উপহাস করবে মতিঝিলকে। নোওয়াজিসের দেশ-বিখ্যাত 'মতিঝিলের সৌন্দর্যখ্যাতিকে করবে খর্ব, করবে হীনপ্রভ। আর হিংসা চরিতার্থতা সার্থক ক'রে সিরাজ তখন স্বপ্নপুরীতে ব'সে মনের সুখে নিবৃত্ত করবেন তাঁর পর্বতপ্রমাণ ভোগস্পৃহা। এমন এক শিল্প-শোভাময় বিচিত্র প্রমোদভবন-সৃজন করবেন, যার নাম হবে 'হীরাঝিল'। আর মতিঝিলকে তখন লজ্জায় ম্লান করবে ধরা-স্বর্গ হীরাঝিল। যার রূপের কাছে, যার খ্যাতির কাছে বাধ্য হয়েই মাথা নত করতে হবে মতিঝিলকে। উক্ত দুই কারণেই হয় হীরাঝিলের জন্ম।

দেশ-বিধ্বংসী মারাঠা আক্রমণের অব্যবহিত পরেই—দারুণ অর্থাভাব যখন,—যখন রাজকোষ শূন্যপ্রায়,—তখন প্রিয় দৌহিত্রের এই অসম্ভব আবদারে সাড়া দিতে হিমশিম খেতে হল স্নেহাতুর দাদুকে। দারুণ বিপর্যয় সব দিকে,—অর্থের স্বচ্ছলতা নেই মোটেই, সৈনিকদের বেতনই দিতে পারছেন না নিয়মিতভাবে, রাজকার্য পরিচালনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে অর্থাভাবে। চারদিক থেকে কেবল 'দেহি দেহি' অথচ নিজের অবস্থা তখন 'নেই-নেই, বর্পদক নেই।' এরূপ দুরবস্থার মধ্যে আদুরে দৌহিত্রের 'চাঁদ ধরার জুলুম' মহা সমস্যার সম্মুখীন ক'রল আলিবর্দিকে।

অবশেষে অনন্যোপায় দাদুকে বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হল স্নেহের দুলাল দৌহিত্রের আর্জি। ভেবে দেখেও কোথাও কোনো অসঙ্গতিও ত' দেখতে পেলেন না সিরাজের আর্জিতে। সত্যই ত' কেল্লা নিজামতের স্বল্পপরিসরে,—একই প্রাসাদের স্বল্প আয়তনে কি তরুণ দৌহিত্র—যিনি বর্তমানে শাহজাদা পদবাচ্য এবং দাদুর অবর্তমানে যিনি সুবে বাংলার গৌরবময় মসনদের উত্তরাধিকারী—এবং মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ দাদুর সঙ্গে একত্রে বাস করতে গেলে কখনো মানায় না সব দিক দিয়ে খাপ খায়? সদ্য-প্রস্ফুটিত সুগন্ধ পুষ্প কি বাসি শুষ্ক পুষ্পের সঙ্গে একপাত্রে শোভা পায়? ঝরে পড়া শুকনো ফুল আলিবর্দির সাথে এক সেকেলে প্রাসাদে বাস বৃদ্ধের পাশে! তাই তিনি বাধ্য হয়েই, তথা সঙ্গত মনে করেও বটে, অজস্র অর্থ মুক্তহস্তে উজাড় ক'রে দিতে সম্মত হ'লেন পরম স্নেহভাজন সিরাজের নিজস্ব প্রমোদ-ভবন নির্মাণের জন্য।

সুপ্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে খুঁজে—তার ভগ্ন, অর্ধভগ্ন বা জীর্ণ ভূপতিত প্রাসাদ অট্টালিকাসমূহের প্রাচীর, ছাদ, দরজা থেকে—এমন কি মেঝে পর্যন্ত খুঁড়ে খুঁড়ে সংগৃহীত করা হল কত রাশি রাশি সৌধ-উপকরণ—কত স্ফটিক, কত স্বচ্ছ মর্মর, কত শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্তনীল, সবুজ রঙের মসৃণ মূল্যবান প্রস্তর,—কত দুষ্প্রাপ্য মনোহর গৃহোপকরণাদি, যার কোন লেখাজোখাই করা হয় নি। সুবে বাংলার নবাবের আদেশে ডাক পড়ল বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সৌধ-শিল্পীদেরই নয় শুধু, বিপুল অর্থব্যয়ে অন্যান্য প্রদেশ থেকেও আনীত হল সেকালের নিপুণ কারিগরগণও! অক্লান্ত শ্রম তথা অফুরন্ত অধ্যবসায়ের ফলে বিচক্ষণ শিল্পিগণ একদিন গড়ে তুললেন এমন এক মনোরম ঝিল এবং তার মনোহর তীরে তীরে এমন এক অপরূপ প্রমোদ-উদ্যানঘেরা চিত্তবিমোহন বিলাসভবন,—যা' মুগ্ধ-বিস্মিত করল জনসাধারণকে।

দেখতে দেখতে মনসুরগঞ্জ সুশোভিত হ'য়ে উঠল এক অভিনব স্বপ্নঘেরা মায়াপুরীতে। মনোহর উপবনশোভিত প্রমোদভবন-সহ স্বচ্ছ ঝিলের নামকরণ হল হীরাঝিল। স্ফটিক-স্বচ্ছ হীরাঝিলের অনির্বচনীয় রমণীয় শোভা সত্যই সেদিন হীনপ্রভ করল অতুলনীয় সৌন্দর্যময় মতিঝিলকে। সেদিন থেকে চিরতরেই যেন খর্ব হল নোওয়াজিস খাঁর সাধের মতিঝিলের খ্যাতি। সত্যই ত' স্বচ্ছ হীরার সমুজ্জ্বল ঝলকের কাছে স্বভাবতই হার মানতে হয় ক্ষীণজ্যোতি মতিকে।

ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ হীরাঝিলের জন্ম সত্যই এক বিস্ময়ের বিষয়। ঠিক যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের যাদুবলে অকস্মাৎ এক অলৌকিক রহস্য-পুরীর আবির্ভাব! সত্যই হীরাঝিল এক ঐতিহাসিক গুরুত্ববহনকারী স্মরণীয় স্মৃতি। এ অবিনশ্বর স্মৃতি স্মরণীয় হ'য়ে আছে জনসাধারণের হৃদয়ে। লোকের মুখে মুখে চলে আসছে হীরাঝিলের কথা, হীরাঝিলের কাহিনী আজো। দেশ-বিদেশ থেকে আহৃত সুন্দর সুন্দর পুষ্প-তারা দিয়ে বিচিত্র মনোহর করে সাজানো এ হীরাঝিল। কত মনোহর লতাবিতান, কত সুদৃশ্য পুষ্প-বীথিকা, কত মনোহর নিকুঞ্জ, কত সুসজ্জিত সমুন্নত মঞ্চ দিয়ে বিচিত্র সুন্দর করে সাজানো এ হীরাঝিল। কত অগণন রমণীয় ফোয়ারা ইতস্তত পরিবেশিত যথাযথ স্থানে। কত বিচিত্রগঠন শ্বেত-কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্মিত বিবিধ দর্শনীয় জীবজন্তুর, জীবন্তবৎ প্রতীয়মান সুন্দর সুন্দর মূর্তি ইতস্তত সুসমঞ্জস করে সাজানো।

বিচিত্র মনোহর উদ্যানময় বিচিত্র পশু-পক্ষীর মনোমুগ্ধকর গুঞ্জনই বা কত! মনোহর কুসুমকহ্লার-শোভিত নানা জাতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ মৎস্যকুলের সানন্দবিহরণ মুখরিত চিত্তাকর্ষক হ্রদতীরে অনির্বচনীয় শোভাময় লোকবিমোহন অপরূপ প্রাসাদ। কত চত্বর, কত মহল তার দিকে দিকে। রঙমহল, 'গোলকধাঁধা', দরবার-মহল ছাড়াও আরো কত মহল রকম রকম। মহলে মহলে কত সুসজ্জিত গৃহ। গৃহে গৃহে কত কক্ষ। কক্ষে কক্ষে কত শোভা, কত সৌন্দর্য, কত সাজ, কত সজ্জা। হর্ম্যমধ্যে কত বিচিত্রিত খিলান। কত রত্নময় স্তম্ভ।
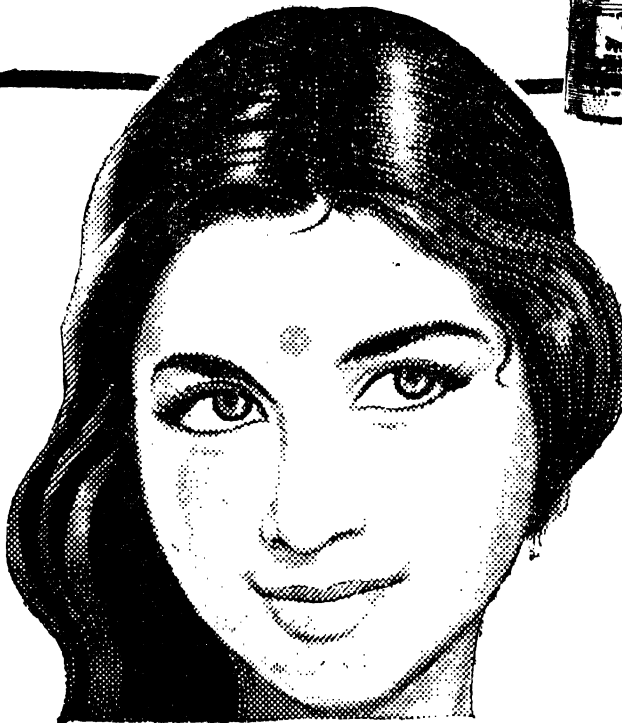
বৃন্ত,—কত লতা-পাতার বিচিত্র চিত্রাঙ্কন। কক্ষের ছাদে ছাদে কত শিল্পকলাসম্ভার। কক্ষতলে কত কাশ্মীরী, কত পারস্য দেশীয় মনোহর গালিচা, কত কারুকার্যখচিত মহার্ঘ গৃহসজ্জা, কত রঙ-বেরঙের দেওয়ালগিরি, কত মহামূল্য আয়না, কত বিচিত্র বেলোয়ারি ঝাড়—শতদল-সহস্রদল। মণিময়কক্ষে বিচিত্র আলোর কি অপরূপ লুকোচুরি,—শ্বেত, লোহিত, সবুজ, নীলাদি বিবিধ আলোতে আলোময়, যেন অপরূপ স্বপ্নময় মায়াপুরী। রঙে, আলোতে, চিত্রে, ছবিতে বিচিত্র সমাবেশ, বিচিত্র-সমারোহ।

হীরাঝিল নির্মাণের শেষ পর্যায়,—যখন অর্থের অভাব-অনটন হেতু নির্মাণকার্য ব্যাহত, তখন এক ফন্দি আঁটলেন চতুর সিরাজ প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করবার উদ্দেশে। বৃদ্ধ দাদুকে ফাঁদে ফেলে উপযুক্ত অর্থ আদায় করা ছাড়া আর উপায় নেই সিরাজের। তাই একদিন ধর্ণা দিলেন দাদুর দ্বারে—হীরাঝিলে পদধূলি দিয়ে স্নেহধন্য দৌহিত্রকে কৃতকৃতার্থ করবার আকুল প্রার্থনা নিয়ে।

স্নেহময় দাদু কি উপেক্ষা করতে পারেন প্রাণাধিকের আমন্ত্রণ। তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন এ-নিমন্ত্রণ। এক শুভদিনে দৌলতখানার পদধূলি পড়ল গরিবখানায়। সপারিষদ দাদুকে পেয়ে মহাখুশি হলেন চতুর সিরাজ। হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছেন অপ্রত্যাশিতরূপে এইরূপ ভাণ দেখালেন প্রতি কাজে, প্রতি কথায়। আমির-ওমরাহগণসহ গোটা হীরাঝিলই দেখলেন তিনি ঘুরে ঘুরে। বিশেষ চমৎকৃত হলেন সব দেখে। বাঃ! কি অপূর্ব; কি অদ্ভুত, কি অবর্ণনীয় সৌন্দর্যময় সব কিছুই,—যেমন চমৎকার ঝিল, তেমনি বিচিত্র উদ্যান,—তেমনি রমণীয় প্রমোদ-ভবন!

এক বিরাট ভোজের আয়োজনও যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মহামান্য দাদুর যোগ্য আপ্যায়নের জন্য গোলকধাঁধার এক সুরম্যকক্ষে। হীরাঝিলের অশেষ প্রশংসা করলেন সৌন্দর্যপ্রিয় আলিবর্দি,—ভূয়ো-ভূয়োঃ বাহবা দিলেন হীরাঝিল পরিকল্পনার। সবিশেষ আপ্যায়িত হয়ে অবশেষে বিদায় চাইলেন তিনি। কৃত-কৃতার্থের মত ভাব দেখালেন যদিও স্নেহভাজন সিরাজ—তবুও এক কৌশল অবলম্বন করে ধূর্ততার সঙ্গে গোলকধাঁধায় কার্যত আটক ক'রলেন সুবে বাংলার নবাব নাজিমকে। মুক্তির জন্য ছটফট করতে লাগলেন প্রবীণ নবাব। কত কাকুতি-মিনতি করলেন সুচতুর সিরাজকে, কক্ষের অভ্যন্তর থেকে। কক্ষপার্শ্বস্থ অলিন্দে দাঁড়িয়ে বাতায়নে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে হর্ষভরে হাততালি দিতে থাকলেন পরম কুতূহলে শঠরাজ। দুষ্ট নাতির কারসাজিটা মন্দ উপভোগ্য হ'ল না যদিও, তবুও বেশ বিব্রত হয়ে পড়তে হল তাঁকে শেষকালে। কত সকাতর অনুনয়-বিনয় ক'রে চললেন অসহায় মাতামহ ভিতর থেকে, আর আনন্দের আতিশয্যে সমধিক উৎফুল্ল হ'লেন খেয়ালি দৌহিত্র বাইরে থেকে জালবদ্ধ শিকারের দুর্দশা দেখে।

দাদু-নাতির রহস্যের পালা চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরেই। বিনা পণে বিব্রত দাদুকে মুক্তি দিতে রাজী হলেন না সিরাজ। একটা মোটা রকমের মুক্তিপণ হেঁকে বসলেন 'শিকারী' সিরাজ। সেই মুহূর্তে,—সেই গোলকধাঁধায় বসে কোথায় পাবেন এ-অসম্ভব মুক্তিপণের বিপুল অর্থ,—কোথায় পাবেন তখনই তা 'বিন্দর' ছুট-ছুটি করতে লাগলেন কোটি কোটি প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েও নবাব আলিবর্দি। কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে গমনই হল সার,—কোন পথেরই নির্দেশ করতে পারলেন না রহস্যময় গোলকধাঁধা থেকে। ঘুরে-ফিরে একই অভ্যর্থনা-কক্ষেই আসতে হচ্ছে বার বার।

অবশেষে পারিষদবর্গ উদ্ধার করলেন তাঁকে মুক্তিপণ হিসাবে স্ব স্ব অঙ্গ থেকে হীরা-মুক্তোর বহুমূল্য অলঙ্কার,—রত্নময় আভরণাদি স্বেচ্ছায় খুলে দিয়ে। কথিত হয়ে থাকে এ সকলের মূল্য থেকেই অভাবগ্রস্ত সিরাজের তৎক্ষণাৎ হস্তগত হয় অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা। এ-ছাড়াও আর দু'টো অধিকার দিয়েও সিরাজকে খুশি করতে বাধ্য হন অসহায় নবাব। তার একটি হ'ল 'মনসুরগঞ্জ' দান (মনসুরগঞ্জ অর্থাৎ বিজয়ীর শস্যাগার) অপরটি হ'ল সুবে বাংলার জমিদারগণের নিকট থেকে একটি আবওয়াব (অতিরিক্ত কর) আদায়ের অধিকার মঞ্জুর।

এমনি রহস্যময় চাল দিয়ে অর্থাভাব দূর করলেন চতুর সিরাজ। তখন থেকে অবাধ বিলাস-ব্যসনের উত্তাল তরঙ্গ—কল্পনাতীত সুরা ও নারী উপভোগের আকাশছোঁয়া তুফান উঠল দিনরাত হীরাঝিলের বুকে। আমদানী হ'তে থাকল নিত্য নূতন-নূতন নারী, নিত্য নূতন-নূতন পানীয়। নিত্য আসতে লাগল লক্ষ্ণৌ দিল্লীর বাছা বাছা নর্তকী। দেশ-বিদেশের অপরূপা 'হুরী-পরী'। বিলাসের উদ্দাম স্রোতে মনের আনন্দে ভাসতে লাগলেন সংযমহীন তরুণ সিরাজ। নিত্য নূতন নূতন সেরা সুন্দরী আউরৎ আমদানি হ'তে থাকল ইরাণ, তুরাণ, ইস্পাহান, আরমানী, কাশ্মীর থেকে।

বহুমূল্য রঙিন সরাবের ঢেউ খেলতে লাগল হীরাঝিল মঞ্জিলে। তবুও মেটে নি সিরাজের নারী-উপভোগ ক্ষুধা। সারা বাংলায় ত্রাসের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল নারীলোলুপ যুবকের উদ্দাম লালসা। একটা চকিত শঙ্কা, একটা অনাগত আতঙ্কের দারুণ দুশ্চিন্তায়, নিদ্রাহীন রজনী যাপন ক'রতে হ'ত সে গৃহীকে, যে গৃহে আছে দুর্ভাগা সুন্দরী নারী। কত নিরীহ কুললক্ষ্মী, কত সরলা অবলা কুলবালা, কত সতী-সাধ্বীকে আসতে হয়েছিল হীরাঝিলের রঙমহালে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে। কাউকে বা আনা হত প্রলোভনে লুব্ধ ক'রে, কাউকে বা জোর জবরদস্তি ক'রে, কাউকে বা অপহরণ করে। ভোগের সীমাহীন সাগরে মনের সাধে লীলা করতে লাগলেন যুবক ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে। কত নিষ্পাপ নারীকে ভোগ ক'রতে হ'ল অকথ্য নিপীড়ন ঘৃণ্য ভোগের হাটে,—জঘন্য পণ্যরূপে আত্ম-বিক্রীত হ'তে অস্বীকৃতিহেতু। কত সতী-সাধ্বীর অমূল্য নারীত্বের হ'ল অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা। নিরীহ-ফৈজীর ন্যায় কত অসহায়া নারীর গগনভেদী করুণ আর্তনাদ ভূমিকম্প সৃষ্টি করল রঙমহালের রুদ্ধ কক্ষতলে, কত ভাগ্যাহতার প্রবল অশ্রু বান শিথিল ক'রে দিল হীরাঝিলের ভিত্তিকে। অবমানিতা, নির্যাতিতা, লাঞ্ছিতার পর্বতপ্রমাণ অভিশাপের গুরুভার পড়ল সাধের হীরাঝিল মঞ্জিলের মস্তকে চেপে। সহ্য ক'রতে পারল না সে গুরুকম্পনের ভয়াবহ ঝাঁকি, সহ্য ক'রতে পারল না সে দুর্বার বান, সহ্য ক'রতে পারল না দুর্বহনীয় ভার। স্বল্পকাল মধ্যেই অবলুপ্তি হ'ল ইন্দ্রপুরীতুল্য—রমণীয় হীরাঝিলের।

শুধু বিস্ময়কর উপবন মঞ্জিলই নয় হীরাঝিল। হীরাঝিলের অপর বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব হ'ল অর্ধশতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ

জড়িয়ে আছে নবাবদুলাল সিরাজউদ্দৌলার উত্থান-পতনের বিস্ময়কর কাহিনী। হীরাঝিলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে অভিশপ্ত বাংলার প্রাণের কথা। হীরাঝিলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত হাসি, কত উৎসব, কত অশ্রু, কত মর্মব্যথা। হীরাঝিলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কলঙ্কিত বাংলার দুর্দিনের ঘনঘটা। হীরাঝিলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক বিদেশী-বণিক দলের অবিশ্বাস্য ভাগ্যোদয়-কাহিনী। হীরাঝিল হল সেকালের বাংলার এক প্রামাণ্য ইতিহাস।

জটিল রাজকার্য ভারাবনত সর্বনাশা মারাঠা সমরক্লান্ত বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি যেদিন মৃত্যুশয্যায় শায়িত,—সেদিন আমির, ওমরাহ, পাত্র, মিত্র—গণ্যমান্য নাগরিকগণের সম্মুখে পরম স্নেহভাজন পুত্রাধিক প্রিয় সিরাজকেই তদীয় উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত পদে মনোনীত করে গৌরবময় সুবে-বাংলার মহান মসনদে বসানোর জন্ত উপস্থিত সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে যান এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পারিষদবর্গের পবিত্র শপথ গ্রহণান্তর যেদিন তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেদিন আশার আনন্দে উৎফুল্ল সিরাজ কত রঙিন স্বপ্নের জাল বুনেছিলেন এই হীরাঝিলে এসে। কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই ছুটে যায় তাঁর স্বপ্নের ঘোর, ছিঁড়ে যায় তাঁর বীণার তার। সহসা একদিন নিভিয়ে দেয় উৎসবের প্রদীপালোক কোথা থেকে এক প্রবল দমকা হাওয়া এসে।

আলিবর্দির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেই নিজামত কেল্লাস্থ পুরাতন প্রাসাদ থেকে হীরাঝিলে চলে এলেন সিরাজ। এই প্রাসাদেই মহা ধূমধামে অনুষ্ঠিত হলো সিরাজের সিংহাসনারোহণ-উৎসব। সে এক দেখবার মত আয়োজন, আনন্দের তুফান উঠেছিল হীরাঝিলের বুকে সেদিন। সারা বাংলা বাহবা না দিয়ে পারে নি সিরাজকে। সজ্জার বাহার, আলোকের সমারোহ, বাঁশীর মোহন সুর আর নাচগান, খানাপিনা সরাবের ছড়াছড়ি। উৎসবের মত একটা উৎসব বটে! সাকুল্য নিজামত দরবারই সেদিন পার করেছিলেন তিনি—কেল্লা নিজামত থেকে হীরাঝিলের প্রমোদ ভবনে। সেদিন এখানেই কত রঙিন আশার অপরূপ জাল বুনেছিলেন সুবে-বাংলার মহিমান্বিত মসনদে বসে। কিন্তু বাদ সাধল তাঁর কাল ভাগ্য। সহসা একদিন ছিঁড়ে গেল তাঁর সাধের জাল।

দুষ্ট-শনিগ্রহরূপে এই সময়ে অবাধ্য ইংরাজ বণিক উদিত হলো সিরাজের ভাগ্যাকাশে। উৎসব শেষ হতে না-হতেই তাই সিরাজকে পরতে হল সামরিক বেশ, উৎসবের সাজসজ্জা ছেড়ে। হীরাঝিল থেকেই সর্বনাশা পলাশী প্রান্তরে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন তিনি দুঃসাহসী বণিকদলের অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য দমনকল্পে। সেদিন বেশ বুঝতে পেরেছিলেন তিনি যে মোটেই শুভযাত্রা হল না—সে যুদ্ধযাত্রা। কি এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় সেদিন কেঁপে উঠেছিল নবীন সুবেদারের উৎফুল্ল হৃদয়। সেই যাত্রাই হল তাঁর কাল। সেইদিনই এক অশুভ দৈববাণী যেন শুনতে পেয়েছিলেন তাঁর অন্তরলোকে, সেইদিনই অলক্ষ্যে কে যেন এক অমঙ্গলসূচক ভবিষ্যবাণী, আসন্ন যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের কথা স্পষ্টরূপে ধ্বনিত করেছিল তাঁর কর্ণমূলে। স্পষ্টই যেন সেদিন শুনতে পেয়েছিলেন—নেই—নেই—কোন আশা নেই সিরাজ! সর্বনাশ এসে ধাক্কা দিচ্ছে তোমার সাধের নিকুঞ্জদ্বারে। অবশ-জড়িত পদেই সেদিন তিনি অশুভযাত্রা করেছিলেন রাক্ষসী পলাশী অভিমুখে—দিগ-দিগন্ত থেকে ধ্বনিত দৈববাণী শুনতে শুনতে সারাটা পথ,—

'কোন আশা নেই তোমার হতভাগ্য নবাব! পতন তোমার অনিবার্য। তোমার জাতির পতন সুনিশ্চিত। তোমার জন্মভূমির সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী!'

পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী অগণিত ভীষণ ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র, অপরিমিত বারুদ-সহ বৃহদাকার ৫০-৬০টি সাক্ষাৎ যমতুল্য —কামান নিয়ে শিবিরস্থাপন করলেন রাঙা পলাশী প্রান্তরে। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল যথাসময়ে। যুদ্ধ নয়ত,—একটা যেন ছেলেখেলা বা যাত্রার দলের যুদ্ধের অভিনয়মাত্র হল বলা চলে। জয়ের সম্ভাবনা নিশ্চিত সত্ত্বেও পরাজয়ের ঘৃণ্য গ্লানি নিয়ে ব্যথা-জর্জর হৃদয়ে ত্যাগ করতে হল তাঁকে যুদ্ধ-শিবির—হঠাৎ দাগাবাজ-সিপাহ্‌শালারের সুপরিকল্পিত কারসাজিতে দ্রুতগামী উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করে অবশেষে প্রত্যাবর্তন করলেন সাধের হীরাঝিলেই।

ভগ্নহৃদয়-সিরাজ সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করলেন মন্ত্রিপরিষদ। কোন সুরাহাই হল না অধিবেশনে, সদুত্তর ত' দূরের কথা, কোন আশাজনক আশা বা ভরসার বাণীও বেরুল না মন্ত্রীদের মুখ থেকে। কাঠের পুতুলের ন্যায় নীরব নিশ্চল হয়ে রইলেন সবাই। সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন তিনি স্বপ্ন-ভাঙা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় টলতে টলতে। সর্বনাশ যে ঘনিয়ে এসেছে ভালরূপেই—বুঝলেন তা স্পষ্ট করেই। চারদিক থেকে করুণধ্বনি এসে বাজতে লাগল যুবকের আনমনা কর্ণমূলে—

'পালাও সিরাজ! পালাও মুর্শিদাবাদ ছেড়ে। কেউ চায় না তোমায়।'

জড়িতপদে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করলেন রঙমহালে। প্রিয়সঙ্গিনী সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী লুৎফান্নেসার হাত ধরে ছদ্মবেশ ধারণ করে ছিন্ন মলিন বস্ত্রে—সামান্য কিছু মণি-রত্ন সঙ্গে নিয়ে এক বিশ্বস্ত খোজাকে সাথে নিয়ে টোপর-ঘেরা গরুর গাড়িতে চড়ে রজনীর অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন প্রিয় হীরাঝিল থেকে। চিরবিদায় নিলেন সাধের হীরাঝিলের কাছে, চোখের জলে ভাসতে-ভাসতে। চিরবিদায় নিলেন প্রাণপ্রিয় মুর্শিদাবাদের কাছে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে অভিভূত হয়ে। প্রাণ ফেটে চৌচির হতে লাগল প্রিয় মনসুরগঞ্জ থেকে চোরের ন্যায় পালাতে। উপায় নেই, তাই বাধ্য হয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের গভীর গহ্বরে।

বিক্ষুব্ধ হৃদয় হতভাগ্য ভুললেন না চিরবিদায় নিতে মাতৃসমা স্নেহময়ী ভাগীরথীর কাছে, যাঁর স্নেহোচ্ছল শান্ত সুশীতল বক্ষে চঞ্চল বালকের ন্যায় কত ছুটাছুটি করেছেন মনের আনন্দে জন্মের দিন থেকে। তাঁর উদ্দেশ্যে অজস্র অশ্রুকণা ঢেলে চিরবিদায় নিলেন এই বলে—

'রইল মা তোমার ধনজনপূর্ণ মুর্শিদাবাদ, রইল মা তোমার পীযূষপুষ্ট সোনার বাংলা। পারল না তা রক্ষা করতে তোমার অযোগ্য অধম সন্তান। তুমি রক্ষা করো মা তাকে—রক্ষা কর মা তাকে তোমার স্নেহশীতল অঞ্চলতলে।'

অবরুদ্ধ হৃদয়ভেদী-মর্ম ব্যথায় ভেঙে পড়লেন তিনি এই ভেবে যে, সিরাজ যদি বিরাগভাজন হয়ে থাকে দেশবাসীর—যদি মন্ত্রঃপূত শাসক

না হয় সে,—তবে কেন উপযুক্ত বিচার করল না দেশবাসীরা মিলে—কেন তারা যোগ্য দণ্ডবিধান করল না তার? কেন এমন করে বিনামূল্যে বিলিয়ে দিল একটি মহাসমৃদ্ধ-সোনার রাজ্যকে বিদেশী সওদাগরের পদতলে? হায়! বুক যে ফেটে যায় অসহ্য মর্মপীড়ায়!

যুগ-পরিবর্তনকারী পলাশীর যুদ্ধাভিনয় হয় ১৭৫৭ খৃস্টাব্দের ২৩শে জুন। পট-পরিবর্তিত হয় কালনিশা পোহাতে না পোহাতেই। কি মর্মান্তিক গ্লানি, কি শোচনীয় দুর্নাম, কি দুর্বহ কলঙ্কের ডালি স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিল বাঙালী জাতি সেদিনে! কি করেছিলেন তখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কি করেছিলেন ধনকুবের জগৎ শেঠ, কি করেছিলেন রাজা রাজবল্লভ, কি করেছিলেন প্রবীণ জানকী রায়, কি করেছিলেন বিচক্ষণ রায়দুর্লভ? মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটেছিল কি সবারই? সারা বাঙলাই কি যাদুবলে মোহাচ্ছন্ন হয়েছিল সেদিন? কি শক্তিবলে জিতেছিলেন একদা এক সামান্য কেরাণী রবার্ট ক্লাইভ ছলনাময়ী পলাশী রণাঙ্গনে? শক্তি ছিল না বাঙলার, জনকতক নিতান্ত গোঁয়ার বিদেশী বণিককে শায়েস্তা করবার মত? নিজ নিজ স্বার্থের বশীভূত হয়েই, জঘন্য ষড়যন্ত্রে সবাই মিলিত হয়েই ত' ঐ সকল হোমরা-চোমরাই করেছিলেন এ-কুকাজ! সবাইকেই তাই বইতে হল এ কলঙ্কের ভারী বোঝা। এতবড় একটা বিরাট বাহিনী বৃথাই জড় করতে হত না বেয়াদপ ইংরাজকে তাড়াতে। 'পলাশী-জয়ী' ক্লাইভ সাহেবই তো নিজমুখে স্বীকার করেছেন যে—

'ইচ্ছা করলে কেবল ইট-পাটকেল লাঠি-শড়কি নিয়েই শুধু মুর্শিদাবাদ শহরবাসীই দূর করে দিতে পারত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নগণ্যসংখ্যক ইংরাজকে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। কোন দরকারই ছিল না কামান বন্দুকের, দরকারই ছিল না গোলাগুলীর।'

পট-পরিবর্তন হলে দেখা গেল বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর আলি দ্রুতগতিতে সদলবলে এসে উঠলেন সিরাজ-পরিত্যক্ত হীরাঝিলে বা মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে। হস্তগত করলেন অরক্ষিত রাজধানী, অরক্ষিত ধনাগার সব কিছুই বিনা বাধায়। পলাশী থেকে ফিরবার পথেই দহরম-মহরম শেষে শলা-পরামর্শও হয়ে গেছে প্রাণের বন্ধু ক্লাইভের সঙ্গে দাদুপুরে। এখন অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বিনিময় হল যথারীতি হীরাঝিলেই দেশীয় বন্ধু ও সহযোগীদের সহিত।

সুচতুর ক্লাইভ সমীচীন মনে করলেন না মিরজাফরের সঙ্গে রাজধানীতে প্রবেশ করা। তিনি অপেক্ষা করে রইলেন মতিঝিলে মিরজাফরের মতিগতি লক্ষ্য করবার উদ্দেশ্যে। গুপ্তচর ছড়িয়ে দিলেন তিনি মুর্শিদাবাদের অলিতে-গলিতে—মিরজাফরের প্রকৃত মনের ভাব জানবার জন্য। নিঃসন্দেহ এবং নিশ্চিন্ত হয়ে অবশেষে কর্তব্য স্থির করলেন সুবে-বাংলার শূন্য মসনদে সর্বাগ্রে মিরজাফরকে প্রতিষ্ঠিত করতে। মসনদদানের দিনস্থির হল—২৯শে জুন এবং স্থান নির্বাচিত হল হীরাঝিলের মনসুরগঞ্জ প্রাসাদস্থ নিজামত দরবার-ঘর। শোকছায়াচ্ছন্ন হীরাঝিলকে সেদিন সাজানো হল নানা সাজে, নানা সজ্জায়। সদ্য-বিধবা হীরাঝিলকে পরানো হল রত্নালঙ্কার ভূষিতা নববধূর বেশ। বিসদৃশ ঠেকেছে [illegible]

সুসজ্জিত দরবার কক্ষে যথাসময়ে সমাসীন হয়েছেন স্বয়ং মিরজাফর আলি সাহেব। রাজা-মহারাজা, পাত্র-মিত্র, আমির-ওমরাহ, বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ সভাস্থ হয়েছেন যথাসময়েই যথাযথ আসনে—মর্যাদার ক্রমহিসাবে। সভাগৃহ উৎসুক আগ্রহে চেয়ে আছে 'মহামান্য' ক্লাইভ সাহেবের আগমন পথের দিকে। অনতিবিলম্বেই প্রতীক্ষিত সভাকক্ষে শুভাগমন হল 'বিশিষ্ট' অতিথির—মিরণ আলি খাঁর সমভিব্যাহারে। উৎফুল্ল হয়ে উঠল সভাস্থ জনগণ, সামরিক বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত হল হীরাঝিলের আকাশ-বাতাস, যথাবিহিত কুর্নিশ সহকারে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন অপেক্ষমাণ মিরজাফর আলির দিকে। সসম্মানে হাত ধরে উঠালেন কম্পিত দেহ আসন্ন নবাব নাজিম সাহেবকে। তারপর তাঁকে শিষ্টাচারানুযায়ী হাত ধরেই বসিয়ে দিলেন সুবে-বাংলার মহামহিমান্বিত মসনদে। সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবলাভের প্রতীকস্বরূপ তিনিই সর্বাগ্রে রজতপাত্র ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা নজরানা রূপে উপহার দিলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবভিষিক্ত নবাবকে।

উল্লেখযোগ্য তথা শ্রেষ্ঠ গৌরব লাভ হল বিদেশী ফিরিঙ্গি বণিক সেনাপতির ভাগ্যেই। সভাস্থ অন্যান্যেরা তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন পদমর্যাদাক্রমানুযায়ী একে একে। নকিব উচ্চৈঃস্বরে হেঁকে চলল—'সুজা উলমুলক হিসামউদ্দৌলা মিরজাফর আলি খাঁ বাহাদুর মহবৎ জঙ্গ'—শাহান শাহের রাজ্যাভিষেক ঘোষণা চিরাচরিত রীতি অনুসারে। সাধারণের নিকট বিশিষ্ট উৎসবের ঘোষণা করা হল প্রচলিত তোপধ্বনি দ্বারা। ১৭৬১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত (অর্থাৎ মিরজাফরের সিংহাসনচ্যুতি পর্যন্ত) হীরাঝিলই ছিল সুবে-বাংলার রাজধানী, হীরাঝিলস্থ মনসুরগঞ্জ প্রাসাদেই প্রতিষ্ঠিত ছিল নিজামত কাছারি।

শেঠগৃহে সম্পাদিত-সন্ধির শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভ মিরজাফরকে মসনদ দান করে। পরে সর্ব প্রথম প্রশ্ন উঠল তাঁর নিজের পাওনা, সঙ্গীদের পাওনা, কোম্পানীর পাওনা নিয়ে। নিজেদের স্বার্থ সব সময়েই মনে আছে হুঁশিয়ার ফিরিঙ্গী ক্লাইভের। বেণের জাত ত'—নির্ভুল তাঁর হিসাব-নিকাশ। কাজেই মিরজাফর বাধ্য হয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন সিরাজের ধনাগারে। সিরাজের ধনাগার—বা বাঙলার ধনাগার। যে-সে ধনাগার নয়; সোনার বাংলার ধনাগার। কত রাশি রাশি ধনরত্ন, মণিমুক্তা, হীরা-জহরৎ স্তূপাকার হয়ে আছে সে ধনাগারে। কত বিপর্যয় গেছে—গেছে কত যুদ্ধ, কত বিপ্লব, কত লুণ্ঠন, কত রাষ্ট্র পরিবর্তন, গেছে মারাঠা আক্রমণের ন্যায় ভয়াবহ বিপদ দেশের উপর দিয়ে। তবুও নিঃশেষ হয় নি এ অফুরন্ত ধনাগার। এ-যে কুবেরের ভাণ্ডার!

এ ধনাগারের অবস্থান হীরাঝিলেরই এক নিভৃত নিরাপদ অংশে—ভূগর্ভস্থ গুপ্তগৃহে। বিস্ময়কর এ ধনাগার। আরব্যোপন্যাসের আজগুবি কাহিনীর ন্যায় নিতান্ত অবিশ্বাস্য এ ধনাগার। অচিন্তিত, কল্পনাতীত এ ধনাগারের কথা। ইংরাজ বণিক সেনাপতি বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ধনাগারে প্রবেশ করে।

'মাননীয় চেয়ারম্যান্ সাহেব! আজ ভেবে আশ্চর্য হই যে, কিরূপ মোহমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম আমি সে স্বপ্নময়কক্ষে প্রবেশমাত্র। বর্ণনার অতীত, কল্পনার অতীত সে অপরিমিত ধনসম্পদপূর্ণ কোষাগার। দর্শনমাত্র বিস্ময়ে জ্ঞানহারা, আত্মহারা এক অভূতপূর্ব ভাবে অভিভূত হয়েছি আমি। এত রাশি-রাশি ধনরত্নের একত্র সমাবেশ,—সে এক অভাবিত দৃশ্য, এক স্বপ্নময় ব্যাপার! সার সার সাজানো আছে উন্মুক্ত দ্বার ঝকঝকে চকচকে বাক্স, পেটিকা, আলমারি অগণন। কত রজতমুদ্রা, কত মোহর, কত মণি—লাল, নীল, সবুজাদি বিবিধ বর্ণের, থরে-থরে সাজানো আধারের থাকে-থাকে। স্বর্ণ-তালেরও লেখাজোখাই নেই। কত বিচিত্র রঙের বিচিত্র প্রতিফলন কক্ষময়, রঙ-বেরঙের আলোয় আলোময়, শত রামধনুর বৈচিত্র্যময় জলুসে ঘেরা সে অনির্বচনীয় স্বপ্নপুরী। কতক্ষণ পরে মনে নেই, তবে কিছুটা আত্মস্থ হয়েছি যখন, তখন দেখি আমি নীরবে দাঁড়িয়ে আছি—ওয়াটস্ (রেসিডেন্ট) ওয়ালস্ (Commissory of the Army), ল্যাসিংটন, আমেন বেগ খাঁ, নবকৃষ্ণ (মুন্সি), রামচাঁদ (কেরাণী) প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গীদের নিয়ে মায়াগৃহের কক্ষতলে মিরজাফর আলির ঠিক পাশে। প্রকৃতিস্থ হয়ে বুঝতে পারলাম, অবাস্তব জগতে নয়—বাস্তব জগতেই এক অপূর্ব ভূগর্ভগৃহে কতক্ষণ মোহাবিষ্টাবস্থায় ছিলাম আমি।'

সের উল মুতাক্ষরিণের অনুবাদক Raymond সাহেব বলেছেন যে সেনাপতি ক্লাইভের উক্তি সর্বৈব সত্য, অতিরঞ্জিত নয় একটুও। তাঁর মতে ধনাগারের ধনরত্নের আনুমানিক পরিমাণ ও বিবরণ সম্বন্ধে তালিকাভুক্ত করা হয়—একটি সুবৃহৎ আধার-রজতমুদ্রাপূর্ণ (১৭৬০০ পাউণ্ড), একপাত্র মোহর (স্বর্ণমুদ্রা ২৩০০০০ পাউণ্ড), দুই সিন্দুক স্বর্ণপিণ্ড (তাল), চার সিন্দুক হীরা, মুক্তা, মতি, মণি-মাণিক্যাদি বহুমূল্য রত্ন, দুই পেটিকা অগণিত চুণি, পান্না, প্রবালাদি, যাহা জগতে দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য। এটাও হল বহিঃ-ধনাগার। আর একটি অধিকতর ধনরত্নপূর্ণ গুপ্ত ধনাগারের অবস্থানের কথাও জেনেছেন তাঁরা। সেটা ছিল রঙমহালের কোন গুপ্তকক্ষে।

কিন্তু আশ্চর্য যে, তার কোনই নিশানা করতে পারেন নি তাঁরা, মিরজাফর আলিও নয়। কে কত ভাগ নিয়েছেন ধনাগার লুণ্ঠনের, কোন তালিকা করা হয় নি তার। তবে স্বয়ং ক্লাইভ সাহেব যে ভাগ পেয়েছিলেন লুণ্ঠনেই, তা বয়ে নিয়ে যেতে অনেক যানবাহন, অনেক পাহারা দরকার হয়েছিল তাঁর। ধনাগারের ধনের যে পরিমাণ দিয়েছেন তাঁরা তাও মনে হয় সঠিক নয়। কারণ কোন অভিজ্ঞ জহুরী ছিল না তাঁদের সাথে। যে মূল্য অবধারণ করেছেন তাঁরা দুর্লভ মণি-রত্নের—তা কেবল বামনের হস্তীর আকার বিষয়ে ধারণা মাত্র। ধনের পরিমাণ যে অনেক বেশি ছিল তার সত্যতা নির্ণীত হবে একটি দৃষ্টান্ত থেকেই। ধনাগার লুণ্ঠনের কিছু না কিছু অংশ পেয়েছেন সব সাথীই। ভাগ্যবান কেরাণী রামনাথও পেয়েছিলেন দেবতার প্রসাদের কণিকা ভাগ। পলাশী যুদ্ধের দশ বৎসর পর অর্থাৎ ১৭৬৭ খৃস্টাব্দে মৃত্যুকালে তিনি ধনসম্পত্তি যা রেখে যান, তার পরিমাণ করা হয়েছে এইরূপ:—১২০০০ পাউণ্ড নগদ ও বিল, ধনরত্নপূর্ণ ৪শত বড় বড় সিন্দুক—তার মধ্যে ৮০টি সিন্দুক পরিপূর্ণ স্বর্ণপিণ্ড, অবশিষ্ট ৩২০টি সিন্দুকভর্তি রৌপ্যপিণ্ড, ভূ-সম্পত্তি ও মণি-মাণিক্যের পরিমাণ ২০০০০০ পাউণ্ড, স্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ডের আনুমানিক মূল্য পরিমিত হয়েছে ১৮০০০০ পাউণ্ড ব'লে।

রাজধানী মুর্শিদাবাদের গৌরবের যুগ স্বল্প—মাত্র অর্ধশতাব্দীর। এই অত্যল্পকাল মধ্যে যেসব গর্বের কিছু গড়ে উঠেছিল বিরাট শহরময়, তার মধ্যে হীরাঝিল অন্যতম। হীরাঝিল নিজেও বিস্ময়কর—তার কথা, তার কাহিনী, তার ইতিহাসও বিচিত্র। দুঃখের বিষয়, আজ আর কিছু অবশেষই নেই সিরাজের সাধের হীরাঝিলের। অনেক গৌরবের দ্রষ্টব্যই হারা হয়েছে মুর্শিদাবাদ দিনে দিনে। মুর্শিদাবাদ ছিল বিশ্ব জুড়ে গৌরবময়, আজ সে অভিশপ্ত। হায়! কালের কি গতি!

দেবতার সান্নিধ্যে

(স্ট্যান্লি কুনিটজ্)

বিক্ষুব্ধ চোখের কারাগারে,
ধূসর, রুক্ষ, বন্ধ্যা কাঁটাগাছের
আড়ালে বৃদ্ধ দেবতারা বসে আছেন।
যেন স্বর্গের বিগত শ্রমশিল্পের ব্যঞ্জনা,
তাঁদের দৃষ্টিতে এক সুপ্ত বজ্রের কাঠিন্য।

ভাষার কঠিন অবরোধ—সমাধিস্থ আমার প্রেম।
অনর্গল কবিতায় নয়, সময়স্থ জিনিসের আকৃতি
নিয়ে তাঁরা সত্যতা বিচার করেন
আর শুভ্রতাকে ছিন্নভিন্ন করেন
যখন শুভ্রতা সমতলে নেমে আসে।

ভগিনী আর আমার বাগদত্তা,
তোমরা দু'জনেই মেঘ আর পাখি ছিলে।
যখন জৈবিক স্বর্ণবৃষ্টির সঙ্গে জিউস্ নেমে এলেন,
শোন, আমরা এই পৃথিবীটা তৈরি করলাম।
আর আমি শুনতে পেলুম সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ
অনন্ত আধারের মধ্যে দিয়ে এসে সেখানে সঞ্চিত হল।

কুলু রমণী

তালতলা —প্রভাতকান্তি ঘোষ

রহস্যের জাল —শান্তিময় সান্যাল

পাঠিকা —বিভূতিভূষণ রায়

সপরিবারে
—রাণী স্টুডিও (কলিকাতা)

মিষ্টি হাসি

ভারতীয় কলা
—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
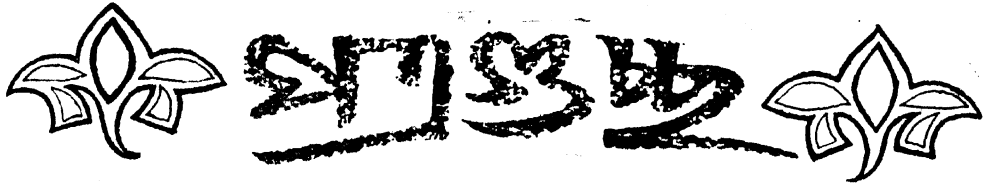
মহাকবি কীট্‌সের পত্রাবলী

[সত্যের মধ্যে যিনি সুন্দরকে দেখেছিলেন এবং সুন্দরের আধারে যিনি করেছিলেন সত্যের প্রতিষ্ঠা, সেই মহাকবির নাম জন কীট্‌স (১৭৯৫–১৮২১)। পৃথিবীর সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্বসমাজের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম কীট্‌সের কয়েকটি পত্র মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যার 'পত্রগুচ্ছ' বিভাগে প্রকাশ করা হল। পত্রগুলির মধ্যে কীট্‌সের কল্পনার অগাধতা এবং সূক্ষ্ম জীবনবোধ এক অনবদ্য কাব্যধর্মী ও লালিত্যপূর্ণ ভাষায় প্রকট হয়ে উঠেছে। পত্রগুলি বাঙলায় অনুবাদ করেছেন শ্রীসন্তোষকুমার পাল। —স।]

জর্জ কীট্‌সকে লেখা

আগস্ট, ১৮১৬

প্রিয় জর্জ,

জীবনে এমন অনেক দুঃসময় কাটিয়েছি, যখন আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি, যখন আমার মন চিন্তার ভারে নেতিয়ে পড়েছে। এই সময়ে আমার মনে হয়েছে যে, আমার পক্ষে নীল আকাশের সৌন্দর্যের মধ্যে কাব্যের সুর শুনতে পাওয়া সম্ভব নয়; যদিও তখন আমি আকাশের যে সুদূর প্রান্তে বিদ্যুতের খেলা চলছে, সেই প্রান্তের দিকে বিস্ময়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখেছি; নীচে সুদূরপ্রসারী ঢেউ-খেলানো ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশে স্বর্গীয় সৌন্দর্য অনুভব করতে পেরেছি। তখন আমার যেন মনে হয়েছে, এ্যাপোলোর সঙ্গীত আমি আর কোনদিন শুনতে পাব না, যদিও ছন্নছাড়া মেঘ অস্তায়মান সূর্যের রশ্মিতে স্নান করা পশ্চিম আকাশের আগে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং ঢুকলি মেঘের মধ্যে সোনালী বীণা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয়েছে যে, মৌমাছির একটানা গুন্‌গুনানীর মধ্যে আমি আর গ্রাম্য-সঙ্গীতের সুর শুনতে পাব না; সুন্দর চোখের বাঁকা চাহনি আর আমার মনে কাব্যের সুর জাগিয়ে তুলবে না, আমার হৃদয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগাবে না, জাগাবে না আমার মনে প্রেমের কথা বলার ও আলিঙ্গনের তীব্র কামনা।

কিন্তু এমনও সময় আসে যখন প্রকৃতির পূজারী জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায়; যেন হঠাৎ এক আলোকের সন্ধান পায়; জলে, স্থলে, বাতাসে কাব্যের ধ্বনি শুনতে পায়। প্রিয় জর্জ, একটা কথা শুনতে পাওয়া যায়, যে কথা আমি নিজে বিশ্বাস করি এবং কবি স্পেন্সারও (Spenser) বিশ্বাস করতো; কথাটা এই যে, কবি যখন প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়ে তখন বাতাসে সে শ্বেত অশ্বারোহীর অশ্বের পদধ্বনি শুনতে পায়; হর্ষোৎফুল্ল নাইটদের দ্বৈরথ সমর দেখতে পায়; সাধারণ মানুষ ভুলের বশে যাকে বিদ্যুৎ চমকানি বলে মনে করে, তা আসলে দুর্গের প্রবেশদ্বার হঠাৎ উন্মুক্ত হওয়া; প্রতিহারীর শিঙার শব্দ পৃথিবীতে পৌঁছয় না; তা শুধু কবির কানে পৌঁছয়; অশ্বারোহীরা প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং বিরাট হলঘরে পান-ভোজনে মত্ত হয়; তাদের এই উৎসবমুখর দৃশ্য শুধু কবিই দেখতে পায়; দূর থেকে মনে হয়, নাইটদের অনুরাগিণীরা যেন দেবদূতের চোখেও স্বপ্নের আবেশ নামিয়ে আনে; তাদের পানপাত্র একহাত থেকে অন্যহাতে ঘুরতে থাকে; যে পানপাত্র থেকে যখন সুরা ঢালা হয়

জন. কীট্‌স

তখন যেন মনে হয় আকাশ থেকে তারা খসে পড়ছে; আরও দূরে কুঞ্জবন অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ততদূরে পৌঁছয় না। এ্যাপোলো একথা ঠিকই বুঝেছে যে, ঐ কুঞ্জবন যদি সম্পূর্ণই দৃষ্টিগোচর হয়, তা হলে কবি ঐ কুঞ্জবনের গোলাপের সৌন্দর্য দেখে চরম অস্বস্তি বোধ করবে; তাই ঐ কুঞ্জবনের সবটা কবি দেখতে পায় না; দেখা যায় শুধু ফোয়ারার জলধারা, সে জলধারা যেন নানাদিক থেকে এসে পরস্পরকে চুম্বন করছে, সে জলধারা যেন ডলফিনের পুচ্ছের আলোড়ন।

যার মন কাব্যরসে ভরপুর, সেই শুধু এই অনির্বচনীয় দৃশ্য দেখতে পায়। সন্ধ্যায় উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রাণ-শীতল-করা মৃদুমন্দ বাতাসে সে স্তব্ধ নীল আকাশকে রত্নশোভিত দেখতে পায়; ছন্নছাড়া মেঘের মধ্য দিয়ে চাঁদ যখন ক্রমশ উপরে উঠতে থাকে তখন চাঁদকে যেন মনে হয় ঠিক শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা কোন পূজারিণীর মতো। কবি প্রকৃতির আনন্দ কোলাহল শুনতে পায়, অমানিশার রহস্য অনুভব করে। আমিও যদি কোনদিন অনুভব করি তোমাকে বলবো, ভাই।

বর্তমানের এই আনন্দ নিয়েই কবির জীবন; কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদের পাওনা অনেক বেশি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গর্বভরে সে এই কথাই বলে, 'নীরস পার্থিব জীবন আমি ছেড়ে যাচ্ছি, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আমার আত্মা ভবিষ্যতের মানুষের কাছে জীবনের মহান বার্তা বয়ে নিয়ে যাবে। আমার ডাকে দেশপ্রেমিক সাড়া দেবে, তরবারী খুলে দাঁড়াবে কর্তব্যের আহ্বানে। রাজসভায় আমার কাব্যের ছন্দ রাজপুত্রকে জাগিয়ে তুলবে তার তন্দ্রা থেকে। আমার মধুময় বাণী ঋষির মন্ত্রে লীন হয়ে যাবে। আমার কাব্য ঋষির মনে উন্মাদনা এনে দেবে, তখন আমি স্বর্গ থেকে তাকে উৎসাহিত ক'রে তুলবো। আনন্দ-ভরা আমার কাব্য তরুণীর কণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীতের রূপ লাভ করবে বিবাহের মধুযামিনীতে। মে মাসের ভোরবেলায় আনন্দমুখর গ্রামের মানুষ ক্রীড়া-কৌতুকের শেষে ক্লান্ত হয়ে বৃত্তাকারে বসবে ঘাসের উপরে; তাদের মাঝখানে বসবে লাস্যময়ী এক তরুণী—যাকে তারা ধরে নেবে তাদের রাণী; তার মাথায় থাকবে লালাভ, সাদা, লাল প্রভৃতি নানা রং-এর ফুলের তৈরি মুকুট। সে মুকুটের ফুলগুলো যেন অতৃপ্ত প্রেমিকের প্রতিচ্ছবি। তার কণ্ঠের ছোঁয়া-না-পাওয়া বুকের মাঝে থাকবে একটি সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ। এই রাণী যুবকের প্রাণে জাগাবে শিহরণ; সে শিহরণ যুবককে করে তুলবে অস্থির; আশা ও ভয়ের মাঝে দুলবে তার মন। এরকম অনুভূতি আমার যৌবনেও এসেছিল। যুবতীর মুক্তোখচিত কণ্ঠের সামান্য উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠহারের মুক্তোগুলো ঝলমলিয়ে ওঠে। আমার গানের সুর মা'র বুকে শিশুর চোখে ঘুমের মধুর আবেশ টেনে আনে। সুন্দর পৃথিবী, বিদায়! তোমার বুকের পাহাড় ও উপত্যকা আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, তোমার ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে আমি মহাশূন্যে ক্রমশ লীন হয়ে যাই। এ-কথা ভেবে আমি পরিতৃপ্ত যে, আমার কাব্য তোমার সুন্দর সন্তান-সন্ততির প্রাণ-মন সঞ্জীবিত রাখবে।'

ভাই, একাধারে তুমি প্রিয়বন্ধু। আমার তীব্র বাসনা জাগে, আমিও যদি এই আনন্দ উপভোগ করতে পারতাম! আমি অনেক সুখী হ'তাম; সমাজ আমাকে সাদরে গ্রহণ করতো। যখন আমার মনে কোন মহৎ চিন্তার উদয় হয়েছে, তখন আমি জীবনের দুঃখ-কষ্ট অনেক পরিমাণে ভুলতে পেরেছি। সেদিন আমি এতো আনন্দ পেয়েছি, যে আনন্দ মহামূল্যবান কোন গুপ্তধন আবিষ্কারেও নেই। যেমন ধরো আমার সনেট। আমি জানি অন্য কেউ তা পড়বে না। কিন্তু আমার সান্ত্বনা এই যে, তুমি অন্তত আমার সনেটগুলো পড়বে। একদিন ঘাসের উপরে পা ছড়িয়ে বসে ওগুলো আমি তোমার জন্যেই লিখেছি। আমি ভেবেছি আর লিখেছি, মৃদুমন্দ বাতাস আমার চোখে-মুখে স্পর্শ বুলিয়ে গিয়েছে। এখনও আমি রাশি রাশি ফুলের উপর হেলান দিয়ে শুয়ে আছি: ফুলগুলো সমুদ্রের ধারে ছোট পাহাড়ের চূড়া সুন্দর করে ঢেকে রেখেছে। ফুলের ডাঁটা ও পাপড়িগুলো মিলিয়ে কি সুন্দর আচ্ছাদন; ওই গাছে ঢাকা মাঠ; মাঝে মাঝে পপিগাছও মাথাচাড়া দিয়েছে; এ মাঠ দিয়ে চলতে মানুষের অনেক অসুবিধে হয়, কারণ আগাছাগুলো পোষাক আটকে ধরে। অন্যদিকে, সুদূরপ্রসারী নীল সমুদ্র; কখনও দেখতে পাই জাহাজ এগিয়ে আসছে, জাহাজের সম্মুখভাগ রূপালী আবরণে ঢাকা; আবার দেখি, লার্ক পাখি বাসায় ফিরছে; আবার দেখি, বিরাট সামুদ্রিক পাখি অস্থিরভাবে উড়ছে; যখন সে পাখা মেলে না, তখনও যেন মনে হয়—অশান্ত সমুদ্রের তালে তালে তার হৃদয় নাচছে। আমি পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাই, দেখি পশ্চিম আকাশে অস্তায়মান সূর্যের সোনালী কিরণে ছেয়ে গিয়েছে; কিন্তু কেন পশ্চিমদিকে তাকাই? তাকাই, বিদায় জানাবার জন্যে; আমার মন চায় তুমি আমার হাত তুলে নিয়ে চুম্বন করবে, ভাই জর্জ!

জন হ্যামিল্টন রেনল্ডস্‌কে লেখা

রবিবার, ৯ই মার্চ, ১৮১৭

সুপ্রিয় রেনল্ডস্‌,

তোমার সহমর্মিতা আমাকে এতো মুগ্ধ করেছে যে, আমি

ছোট ছোট বাক্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তোমার সমালোচনা আমাকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছে; আমি যেন তোমাকে প্রতারণা না করি।

হ্যাজলিট বলবে, এটা ভগবানের মহৎ সৃষ্টি। যা হোক, আমি আশা করি তোমাকে প্রতারণা করবো না। আমার কিছু পরিচিত মানুষ রয়েছে, যারা দাড়ি চুলকাবে; আমার মনে হয়, তাদের উপরে আমার কোন আক্রোশ নেই; তবু, আমি প্রার্থনা করি তাদের যেন নখগুলো বড় বড় হয়। তোমার সুসমাচার জানবার জন্য তৈরি থাকব।

খবর পেলাম, একজন ষোড়শী নতুন বিয়োগান্ত নাটক লিখেছে; ভগবান তার মঙ্গল করুন; আমি এক সপ্তাহের মধ্যে যেমন ক'রে হোক তার সঙ্গে পরিচিত হবো; তোমার বোনেরা আশা করি ভাই-এর ও আমার কথা মনে রাখবে।

ভবদীয়
জন কীট্‌স

সোমবার, ১৭ই মার্চ, ১৮১৭

সুপ্রিয় রেনল্ডস্,

আমি একাই গ্রামে যাব; একথা শুনে আমার ভাইয়েরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে; তারা আমার ভীষণ ভক্ত। হেডন বলেছে, আমার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমার একাই যাওয়া উচিত; কাজেই আমার সঙ্গে বেশ কিছুদিন থাকবার আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে; তবে আশা করছি পরে তারা এ আনন্দ পাবে। শীগ্‌গিরই আমি শহর ছেড়ে যাব। তুমি তাড়াতাড়ি সমস্ত ঝামেলা চুকিয়ে ফেলবে। আমিও তাই করবো; কিন্তু খেঁকশিয়ালের মতো, নতুন মাছির ঝাঁকের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে! অর্থ, জীবনের আরাম-আয়েস, মদ, সঙ্গীত—সবই ত্যাগ করা যায়; কিন্তু স্বাস্থ্য রইল না তো পৃথিবীতে কিছুই রইল না।···আমি তাদের কাছে ক্ষমা চাইব এবং আমার ভাই-এর মাধ্যমে মিসেস ডিল্‌কির কাছে ক্ষমা চেয়ে পাঠাব।

প্রীত্যর্থী
জন কীট্‌স

চার্লস্ কাউডেন ক্লার্ককে লেখা

বুধবার, ৯ই অক্টোবর, ১৮১৬

সুপ্রীতিভাজনেষু,

কর্মব্যস্ততা শেষ হয়েছে, তাই এখন তোমার নির্দেশ অনুযায়ী হাণ্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পারব। তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমার জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই হবে। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি যথেষ্ট উদ্‌গ্রীব। কারণটা এই যে, কাব্যের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে যাঁরা শেক্সপীয়ার এবং ডারউইনকে মিলিয়ে জগাখিচুড়ি পাকান না, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া কম আনন্দের কথা নয়। কিছুদিন আগে কয়েক লাইন কবিতা লিখেছিলাম, তা থেকে কিছু নকল করেছি। কিন্তু ঐ কয় লাইন কবিতা আমার এতো খারাপ লেগেছে যে, আমার মনে হয় তার ভাল অংশও আগুনে নিক্ষেপ করতে হবে। যদিও 'ম্যাথিউ'-এর উদ্দেশ্যে ঐ লাইন কয়টি লিখেছিলাম, কিন্তু কাব্যদেবীর কথা বার বার উচ্চারণ করা সত্ত্বেও 'হাণ্ট সাহেব বাধা পাবেন। 'হোরেস্' (Herace) বলেছেন, ভগবানের উপযুক্ত নয় এমন কোন কাজ ভগবানের নামে চালিও না।' হোরেসের উপদেশ স্মরণ রেখেও আমি পাপের কাজ ক'রে ফেলেছি। শেষবার যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তখন তোমার কয়েকটা কথা থেকে আমার মনে হয়েছে যে, তোমার কাছে এমন কিছু আছে যা আমি অবশ্যই দেখব। তোমাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেব। শহরের উপকণ্ঠ পশুর বসবাসের উপযুক্ত সন্দেহ নেই; চারদিকে এলোমেলো রাস্তা; তবুও ৮নং ডিন স্ট্রীট খুঁজে বের করা কঠিন নয়; লণ্ডন ব্রীজ পেরিয়ে প্রথমে বাঁদিকে ঘুরবে, তারপরে ডানদিকে ঘুরে আমার বাড়ি আসবে; আমার বাড়ি আসা তোমার পক্ষে মহানুভবতার পরিচায়ক হবে। সেণ্ট পল বলেছেন, মহানুভবতা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। যেমন করে হোক তাড়াতাড়ি উত্তর দেবে, যদি তোমার হাতের আঙুল বাতে টন টন করে তবুও।

তোমার জন কীট্‌স

বৃহস্পতিবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৮১৬

সুপ্রিয় ডেভি,

ক্লোভার থেকে মধু আহরণের জন্যে মৌমাছি যেমন ঠিক সময়মতো হাজির হয়, আমিও তেমনি ঠিক সময়মতো উপস্থিত হবো। আমি খুবই আনন্দিত যে, আমি এতো তাড়াতাড়ি লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'হেডন'কে এবং তাঁর সৃষ্টি চাক্ষুষ দেখতে পাব। আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম; 'ওলিয়ার'-এর সঙ্গে কবে দেখা করবে এবং ওলিয়ার কোথায় থাকে—আমার অনুরোধ আমাকে জানাবে। সেই সঙ্গে আমাকে আরও জানাবে কবে তুমি আমাকে একটা নিরানন্দ দিন অকারণে নষ্ট করতে সাহায্য করবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

জন কীট্‌স

মঙ্গলবার, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮১৬

সুপ্রিয় চার্লস্,

তুমি এখন নির্ভয়ে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিনার্ভার ছত্রছায়ায় নির্ভর করতে পার। আমি দেখতে পাচ্ছি,

আমার ভয় ও বিস্ময় জাগানো প্রতিচ্ছবি তোমাকে জন ডোরির মতো করে তোলে নি। হয়তই তুমি ঐ প্রতিচ্ছবির একখানা কপি পাবে। আমি তোমার জন্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবো। হেডনের বাড়িতে রেনল্ডস্‌-এর সঙ্গে কয়েকদিন ভোরবেলা দেখা হয়েছে; সে কথা দিয়েছিল আজ বিকেলে আমার কাছে আসবে এবং সেভার্নও আসবে ব'লে গতকাল জানিয়েছে; তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তুমিও কথা দিয়েছিলে তুমি আজ বিকেলে আমার কাছে আসবে; কাজেই অবশ্যই আসবে। 'এণ্ডিমাইয়ন' কবিতাটা নিয়ে সম্প্রতি বিশেষ কিছু করি নি; আশা করছি, আর একবার বসেই কবিতাটা শেষ করবো; মনে হয় তুমি জানো যে, আমি 'রিচার্ড'-এর বাড়িতে গিয়েছিলাম; সে রাত্রিটা এতো দুর্যোগময় ছিল যে, পরের দিন সারাক্ষণই আমাকে সেখানে থাকতে হয়েছিল। সে তোমার কথা স্মরণ রেখেছে।...

চিরদিন তোমাকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেই জানব। আমার আন্তরিকতায় সন্দিগ্ধ হও না; ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

জন কীট্‌স

প্রিয় চার্লস্‌, • মঙ্গলবার, ২৫শে মার্চ, ১৮১৭

আবার আমাদের কখন দেখা হবে, কে জানে? স্বর্গে, না নরকে, না কোন গভীর প্রদেশে? সাত পাক খাওয়া ছোট গলিতে, নাকি সোলসবারির সমতল প্রান্তরে আবার আমাদের দেখা হবে? নাকি, ড্রুরি লেনে আবার আমরা ভিড় করবো? আমার কথা যদি বলো, তা হলে বলবো, আমি জানি না কোথায় দেখা হবে, শুধু এইটুকু বলতে পারি, আগামীকাল সন্ধ্যাবেলায় মিঃ নোভেলোর ওখানে দেখা হতে পারে; সেখানেই মিঃ হাণ্ট এবং আমি যাচ্ছি? মিঃ নোভেলো মিঃ হাণ্টকে অনুরোধ করেছেন তোমাকে চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রণ করতে সেখানে যাবার জন্যে, নিমন্ত্রণ করবার ভার আমিই নিয়েছি। কাজেই আশা করি, আগামীকাল সন্ধ্যায় সেখানে তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছে; মিঃ হাণ্ট একটা কবিতা নিয়ে অনেকদূর এগিয়েছে; কবিতাটা জলপরীদের নিয়ে; এ ব্যাপারে সে বেশ ভালভাল কথা বলেছে; 'রিমিনি' কবিতার উপরে আমি একটি সনেট ও এমনি কয়েক লাইন মন্তব্যও লিখেছি; আমি আগামীকাল সনেটটির একটি অনুলিপি তোমাকে দেব; মিঃ হাণ্টের ইচ্ছা, তুমি তাকে ভুলে না যাও।

প্রীত্যর্থী—জন কীট্‌স

বিগত

শ্রীনিখিলরঞ্জন মাইতি

বিগত দিনের স্মৃতি
লুপ্তপ্রায়।
যন্ত্রীহীন যন্ত্রের মতন।
সমুদ্রের বন্য গর্জনের—
উন্মত্ততায়—প্রশ্ন করেছি তাকে
বার বার!
কি পেলাম?
মুক্তজীবনের সুশান্ত পল্লবে—
কেন তার আগমন—
প্রথম দর্শনের—
লজ্জাবতী ফণিনীর মত?
অন্তরের নিগূঢ় চত্বরে—
বিস্ময়ের দেশে—
কেন সে আসন পাতে
পসারিণী মালিনীর মত

পুষ্পের পরাগলোভী
ভ্রমরের মত—ভুল নয়
প্রীতির বন্ধন; মিছে নয়
স্মৃতির—ক্রন্দন।
চেতনার কারাগারে আমার
ভুবন; বিস্মৃতির পরপারে
আমার পতন।—
উত্তুঙ্গ ঘূর্ণির বুকে ধৈর্যশীল
নাবিকের—আশ্বাস।
তাই মোর অভিসার
অতি চুপে চুপে
স্থির-স্থাণু জীবনেরে

মেজর জেনারেল প্রমথনাথ বর্ধন

[পুণা আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ]

বহির্বঙ্গে আপন আপন কর্মক্ষেত্রে বাঙলার যে সুসন্তানের দল যথেষ্ট যোগ্যতা ও অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়ে দেশজননীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, এবং জাতীয় গর্ব বৃদ্ধি করেছেন পুণা আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল প্রমথনাথ বর্ধনের নাম সেই তালিকায় অনায়াসে লিপিবদ্ধ করা যায়।

সৌম্যদর্শন, সদালাপী অধ্যক্ষ বর্ধনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর বার বার যে কথাটি মনে হয় তা হ'ল যে, প্রতিভার সর্বতোমুখী বিকাশ রেনেসাঁর জীবনাদর্শের নামান্তর যাকে বলা চলে, প্রমথনাথ নিজের জীবনে সেই আদর্শেরই সার্থক রূপায়ণ সম্ভবপর করেছেন।

বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং প্রখর রসবোধদীপ্ত এই মানুষটির পিতৃভূমি বামুনবাইড়া এবং মাতুলালয় কিশোরগঞ্জ। পিতৃদেব সরোজিনী বর্ধন সিঙ্গাপুরে চিকিৎসক হিসাবে ছিলেন যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী। ১৯০৬ সালে প্রমথনাথের জন্ম। ময়মনসিংহের জাতীয় বিদ্যায়তনের প্রথম ছাত্র হিসাবে তাঁর ছাত্রজীবনের সূচনা এবং সিঙ্গাপুর কিং এডোয়ার্ড মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র হিসাবে সেই ছাত্রজীবনের সার্থক পরিণতি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, পিতৃদেব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। পিতৃ পদাঙ্কই অনুসরণ করলেন প্রমথনাথ। সিঙ্গাপুরের পাঠ সম্পূর্ণ করে ১৯৩২ সালে বিলেত অভিমুখে পাড়ি জমালেন প্রমথনাথ। বিদেশে এল, এম, ডি, পি, এইচ; ডি, আর, সি, ও, জি; এম, আর, সি, পি; প্রমুখ

প্রমথনাথ বর্ধন

চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন প্রমথনাথ। ১৯৩৭ সালে প্রমথনাথ যোগ দিলেন ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের সামরিক শাখায়। তারপর তাঁকে দেখা গেছে চর্মরোগ-বিশারদ মেডিক্যাল স্পেশালিষ্ট ধাত্রীবিদ্যাবিশেষজ্ঞ এবং আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজির অধ্যাপক হিসাবে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের এতগুলি বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকার মধ্যেই তাঁর দক্ষতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে এবং সূর্যের আলোর মত তা স্পষ্ট বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

১৯৬২ সালে মেজর জেনারেল বর্ধন তাঁর বর্তমান পদে সসম্মানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং আশার ও আনন্দের কথা কৃতিত্বের সঙ্গেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

স্নাতকোত্তর পরীক্ষক হিসাবে তিনি কলকাতা, বোম্বাই এবং পুণা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

ফরাসী ভাষায় তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিবান। পুণা কুষ্ঠ নিবারণী সমিতির সভাপতির আসন তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। এ ছাড়াও আরও বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত। তন্মধ্যে রোটারি ক্লাব, বয়েজ স্কাউটস, মনোবিজ্ঞানী সংস্থা ইত্যাদির নাম উল্লেখনীয়। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির মুখপত্রের সম্পাদক এবং সংস্থার সভাপতির দায়িত্বও তিনি সগৌরবে পালন করেছেন।

ভুবনমোহন মজুমদার

[বিখ্যাত প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী]

বৃহৎ সাহিত্যের ব্যাপক প্রসারে এবং সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অকুণ্ঠ সহযোগিতায় প্রকাশক সম্প্রদায়ের ভূমিকা যথেষ্ট উল্লেখের দাবীদার। এ দিক দিয়ে বাঙলা দেশের গর্ব ও গৌরবের অন্ত নেই। সাহিত্যের লীলাভূমি বাঙলাদেশের প্রথম শ্রেণীর প্রকাশকদের মধ্যে শ্রীগুরু লাইব্রেরী অন্যতম। যে মানুষটির সাধনা, কর্মদক্ষতা

ও ঐকান্তিকতা সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে তার আজকের এই বিরাট ও ব্যাপক রূপদান করেছে তাঁর নাম শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মজুমদার।

কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর সাবডিভিশনের বাখরাবাজার গ্রামের জমিদার বংশোদ্ভূত স্বর্গীয় দীনবন্ধু মজুমদারের পুত্র ভুবনমোহনের জন্ম হয় ১৩০৯ সালের ২৫ এ ভাদ্র

ভুবনমোহন মজুমদার

(সেপ্টেম্বার ১৯০২)। দেশেই তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়। ১৯২১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। ঢাকা থেকে পাশ করলেন আই, এস, সি। ১৯২৫ সালে বি, এস, সি, পাশ করলেন বহরমপুর কলেজ থেকে।

বি, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাজধানী কলকাতায় এলেন ভুবনমোহন। আরম্ভ হল এম, এস, সি, পড়া। এম, এস, সি, অধ্যয়নকালেই ভুবনমোহন চলে যান কুম্ভমেলায়। দীর্ঘ মেয়াদেই বেশ কয়েকমাস সেখানে ছিলেন। কুম্ভমেলা উপলক্ষ্যে তাঁর হরিদ্বারে যাওয়ার উদ্দেশ্য, ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করা। তিন মাস তিনি হরিদ্বারেই রইলেন আরও তিনমাস দিল্লী প্রমুখ আরও নানাস্থানে অতিবাহিত করে কলকাতায় ফিরে এলেন। স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল ভুবনমোহনের। মাত্র সতের বছর যখন বয়স, জীবনের সেই ভোরের লগ্নেই জীবনাতীতের আহ্বান শুনতে পেয়েছিলেন ভুবনমোহন। সীমার জগতের মাটিতে দাঁড়িয়ে অসীমের হাতছানি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৯১৯ সালের একদিন তিনি আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করলেন ভোলা গিরির

বিখ্যাত শ্রীগুরু লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করলেন ভুবনমোহন ১৯২৭ সালে। আজকের দিনের অন্যতম অগ্রবর্তী পুস্তক প্রতিষ্ঠানের অপ্রতিহত জয়যাত্রার শুভসূচনা হল। অর্ডার সরবরাহের কাজও করতেন ভুবনমোহন। বসুমতী এবং প্রবাসীর গ্রন্থাদির অর্ডার তিনি সংগ্রহ করে সরবরাহ করতেন। ১৯৩০ সালে শ্রীগুরু লাইব্রেরী তার বর্তমান গৃহে স্থানান্তরিত হয়। ধর্মপ্রাণ ভুবনমোহনকে ভোলা গিরির আশ্রমের সচিবের আসনে দশ বছর সমাসীন থাকতে দেখা গেছে।

শ্রীগুরু লাইব্রেরীর বিরাট এবং ব্যাপক কৃতিত্ব সম্বন্ধে এই অল্পপরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। সকল বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশেই এঁরা যথেষ্ট নৈপুণ্য ও সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। বলা বাহুল্য, এই বিরাট সাফল্যের মূলে ভুবনমোহনের একক অবদান অনস্বীকার্য।

দাবাখেলা তাঁর এক বিশেষ সখ। দেশভ্রমণও। তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে কলকাতার বাইরে তিনি বেরিয়ে পড়েন অবকাশ এবং দেশ দর্শনের বাসনায়।

ভোর চারটেয় ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি শয্যাত্যাগ করেন। তাঁর চরিত্রের নানাদিকের মধ্যে তাঁর আত্মীয়সুলভ অমায়িক আচরণ নিরহঙ্কারিতা এবং বন্ধুবাৎসল্য, সারল্য ও বিনয়গুণ বিশেষভাবে মনের মধ্যে রেখাপাত করে যায়।

মন্দার মল্লিক

[ব্যঙ্গ ছায়াচিত্রের পথিকৃৎ]

বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের অবদান এবং জাতীয়-জীবনে তার গুরুত্ব সর্বতোভাবেই অনস্বীকার্য। বাঙলা ছায়াছবির একটি বিশেষ বিভাগের পথিকৃৎ হিসাবে যাঁকে অনায়াসে অভিহিত করা চলে, তাঁর নাম শ্রীযুক্ত মন্দার মল্লিক। বাঙলা দেশে দর্শকসাধারণকে প্রথম কার্টুন চিত্র উপহার দেওয়ার গৌরব নিঃসন্দেহে তাঁরই প্রাপ্য। একাধিক কার্টুন চিত্র নির্মাণে চিত্রজগৎকে তিনি যে-ভাবে সমৃদ্ধ ও শ্রীসম্পন্ন করে তুলেছেন, সে সম্বন্ধেও কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

১৯০৭ সালের শুভ বড়দিনে বহরমপুরে তাঁর জন্ম। বহরমপুরের প্রখ্যাতনামা নাগরিক স্বনামধন্য আইনজীবী স্বর্গীয় জ্ঞানউপেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র। বাঙলার সাংবাদিক-জগতে একটি উজ্জ্বল নাম ও দেশের মুক্তিসাধনার অন্যতম মহান্ সৈনিক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ছিলেন শ্রীযুক্ত মল্লিকের জননীর একমাত্র সহোদর। শ্রীযুক্ত মন্দার মল্লিকের শিক্ষারম্ভ বহরমপুরেই হয়। স্কুলজীবন থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে

গ্রাস থেকে দেশের মুক্তির জন্য মরণপণ সংগ্রাম ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর, দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর, তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করেছে।

গৌরাঙ্গ প্রেসে যোগ দিলেন শিক্ষানবীশ হিসাবে। ছাপাখানার যাবতীয় কাজ তাঁর আয়ত্তে এল গৌরাঙ্গ প্রেসের মাধ্যমে। আলোকচিত্রের চর্চা শুরু হল ১৯২৮-২৯ সাল থেকে। আনুমানিক ১৯৩০-৩১ সালে একদিন একটি কার্টুন ছবি দেখে ভয়ানক প্রভাবিত হয়ে পড়লেন তার দ্বারা। তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরে বিস্তৃত প্রসারিত হল এই ছবিটির প্রভাব। এ ছবিটি এমন এক আবেদন তাঁর মনে জাগিয়ে তুলল—যা হয়ে উঠল তাঁর কাছে অনতিক্রম্য। তাঁর চোখের সামনে এই ছবিটিই তুলে ধরল এক অফুরন্ত সম্ভাবনার পথনির্দেশ।

এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করলেন, অনেক কিছুই তখন তিনি এ সম্বন্ধে জানতে চান, চান বুঝতে। কিন্তু প্রতিবারই তাঁকে মুখোমুখি হতে হয় নৈরাশ্যের সঙ্গে। যাঁদের কাছেই এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কেউই কোন উত্তর দিতে পারেন না। কিন্তু কেউ না পারলেও দু'জন পেরেছিলেন তাঁর জিজ্ঞাসু মনকে তৃপ্ত করতে। এই দু'জন—শ্রীযুক্ত জ্ঞান রায় এবং সুবিখ্যাত কথাশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায়ের অনুজ শ্রীযুক্ত অজয়শঙ্কর রায়। শ্রীযুক্ত জ্ঞান রায় স্বর্গীয় নির্মল পালের সঙ্গে মিলিতভাবে এ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করলেন। তারপর 'গেম' নাম দিয়ে পরীক্ষামূলক-ভাবে এঁরা একটি ছবি নির্মাণ করলেন। পাঁচশ' ফুট দীর্ঘ এই ছবিটির মুক্তির ভার গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন চিত্রবিদ্ স্বর্গীয় প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু আলোকচিত্রকর্মে ত্রুটি ছিল। এঁরা ছবিটির মুক্তি দিলেন না। ছবিটি দেখেছিলেন নিউ থিয়েটার্সের শ্রীযতীন মিত্র। ছবিটি দেখে তিনি শ্রীযুক্ত মল্লিককে অনুরোধ করেন নিউ থিয়েটার্সের শিরোনামায় একটি ছবি করে দিতে। পরিকল্পিত ছবিটির গল্পাংশ মন্দার মল্লিক বলে যান। তার চিত্রনাট্য রচনা করলেন খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু শেষ অবধি এ ছবিটিও সাধারণ্যে মুক্তিলাভ করে নি। শ্রীযুক্ত মল্লিকের পরবর্তী প্রয়াস 'আকাশ-পাতাল'। প্রাইমা ফিল্মসের শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র নানের উদ্যোগে ছবিটি নির্মিত হয়ে মুক্তিলাভ করল ১৯৩৮ সালে। ১৯৪২ সালে মুক্তি পেল অমরলিপি (শ্রী পি এম বাগচীর সহযোগিতায়)। পরবর্তী ছবি কুইন এ্যানোফিলিস (ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত)।

জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেটের উপর 'সঞ্চয়িতা' নামে একটি ছবি তিনি করেছিলেন, তবে এটি পুরো কার্টুন নয়। বর্তমানে তিনি আবার একটি বিদ্রূপাত্মক কাহিনীকে ব্যঙ্গচিত্রে রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন।

মন্দার মল্লিক

বিখ্যাত চিত্র-সাংবাদিক শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ পরিচালিত 'মৌচাকে ঢিল' ছবিটির টাইটেল তিনি করেছিলেন। একটি ব্লক নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের তিনি স্বত্বাধিকারী। 'মন্দার স্টুডিও' তাঁর কুশলতার অন্যতম প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

মন্দার মল্লিক যে-সময়ে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কার্যসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল না। বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে, সংগ্রাম করতে হয়েছে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে। পরিণামে এসেছে জয়, এসেছে সাফল্য। প্রমাণিত হয়েছে মহৎ প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা ব্যর্থ হওয়ার নয়। মন্দার মল্লিকরা যখন কাজ শুরু করেন তখন যন্ত্রপাতি পর্যন্তও তাঁদের তৈরি করে নিতে হয়েছিল—এ প্রসঙ্গে এ কথাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর আগামী প্রচেষ্টা সর্বাংশে জয়যুক্ত হোক, সর্বান্তঃকরণে এই কামনাই করি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

[প্রখ্যাত কথাশিল্পী]

সাহিত্যের পাতায় জীবনের সার্থক প্রতিষ্ঠায় জনপ্রিয়তার সমুন্নত শীর্ষে যাঁদের আসন সগৌরবে নির্ধারিত, বলিষ্ঠ সৃজনধর্মী রচনা যাঁদের প্রতিষ্ঠিত করেছে অফুরন্ত যশের জগতে, যাঁদের তীক্ষ্ণ লেখনী ভরিয়ে তুলে চলেছে অগণিত পাঠক-পাঠিকার পিপাসু মন—কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁদের অন্যতম। আজকের দিনের বিদগ্ধ কথাশিল্পীর তালিকায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র একটি বিশেষ নাম।

জীবনের একটি শতাব্দীর অর্ধাংশ এখনও অতিক্রান্ত

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

হয় নি। ১৯১৬ সালের ৩০শে জানুয়ারী স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ মিত্র ও স্বর্গীয়া ধীরাজবালা মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের আদি নিবাস ফরিদপুরের অন্তর্গত সদরদিতে।

সদরদি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষার সূচনা। ভাঙা হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যোগ দিলেন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে। এখানেই সহপাঠী হিসাবে লাভ করলেন এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। সেদিক দিয়েও রাজেন্দ্র কলেজ তাঁর মনে একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। কলেজজীবনের সেই পরিচয় উত্তরোত্তর দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উভয়কে ঘনিষ্ঠ এবং অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে তুলল। ১৯৩৫ সালে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এলেন কলকাতায়। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় সফলকাম হলেন ১৯৩৯ সালে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল সেই বছর।

স্কুলজীবনে হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ, সাহিত্য-সভা আহ্বান, গ্রন্থাগার গঠন প্রভৃতিতে নরেন্দ্রনাথকে দেখা যেত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে। কলেজজীবনে সতীর্থ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'জয়যাত্রা' নামে একটি

নরেন্দ্রনাথকে পাঠকসমাজ সাধারণত গল্পকার, ঔপন্যাসিক হিসাবে চিনলেও কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট শক্তিমান। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা কবিতাই। 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম 'মূক'। প্রথম গল্পও প্রকাশিত হয় 'দেশ'-এই। গল্পটির নাম 'মৃত্যু ও জীবন' (১৯৩৬)। তারপর প্রবাসী, বিচিত্রা, পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকাদিতে তাঁর লেখা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। নরেন্দ্রনাথের লেখা যে সময়ে 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হচ্ছে, তখন পরিচয় সম্পাদনা করতেন কবি মনস্বী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। নরেন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস দ্বীপপুঞ্জ ('দেশ' পত্রিকায় এই উপন্যাসটিই 'হরিবংশ' নামে ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে।) ১৯৪৬ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হল। গ্রন্থটি অসমতল (গল্প সংগ্রহ) তারপর অসংখ্য সার্থক, জনপ্রিয় এবং বহুজনসমাদৃত গ্রন্থ তাঁর লেখনী থেকে রূপ নিয়েছে। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা বর্তমানে পঞ্চান্ন।

ছায়াচিত্রেও তাঁর কয়েকটি কাহিনী রূপায়িত হয়েছে। 'গোধূলি' তাঁর রচনার প্রথম চিত্ররূপ। অসবর্ণা, হেডমাস্টার, শান্তি ছবি তিনখানি তাঁরই কাহিনী অনুসরণে গড়ে উঠেছে। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'মহানগর' ছবিটির কাহিনী তাঁরই রচনা। রঙমহলে অভিনীত 'দূরভাষিণী' নাটকটির কাহিনীকার তিনিই। ১৯৫১ সালে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেন। তার পূর্বে স্বরাজ ও সত্যযুগ প্রভৃতি পত্রিকাদির সঙ্গে তিনি কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন।

পিতৃদেব মহেন্দ্রনাথ ছিলেন রসগ্রাহী পুরুষ, সাংস্কৃতিক অনুশীলনে মগ্নচিত্ত। অভিনয়ে ছিল তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা, সঙ্গীতে ছিল যথেষ্ট দখল আর ছিল প্রগাঢ় শিল্পানুরাগ। সব মিলিয়ে তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ হয়ে উঠেছিল সর্বতোভাবে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতের স্পর্শসমৃদ্ধ। সেই পরিবেশেই মানুষ হয়েছেন নরেন্দ্রনাথ, তাঁর জীবনে বাবার প্রভাব তাই এত অসামান্য। বাবার প্রেরণাই তাঁর জীবনের যাত্রাপথে এক মহামূল্য পাথেয়।

নরেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী শ্রীমতী শোভনা মিত্র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যথেষ্ট অনুরাগিণী এবং সুলেখক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র নরেন্দ্রনাথের অনুজ। অনুজ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত—'ওতো শুধু আমার ভাই-ই নয়, ও একাধারে আমার ভাই, বন্ধু, সহায়ক'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও তাঁর অন্তরঙ্গ লেখকবন্ধুদের মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষ এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নাম উল্লেখযোগ্য।

নরেন্দ্রনাথ সাধারণত সকালেই লেখেন। লেখার আগে একবার পার্কে একটু বেড়িয়ে আসেন। চিঠি

স্থনীলকুমার নাগ

বিংশ শতাব্দীতে গোটা পৃথিবীর সব দেশেই সাহিত্যের উন্নতি হয়েছে বিস্ময়করভাবে। এমন কোনো দেশ বা ভাষা-গোষ্ঠী পাওয়া যায় না যেখানে কিছু না-কিছু কালজয়ী সৃষ্টি না হয়েছে বা নতুন ধরণের সৃষ্টি না হয়েছে। সাধারণভাবে এ কথাটা পৃথিবীর সব দেশের পক্ষে কমবেশি সত্য। কিন্তু কতকগুলি আবার এমন দেশ রয়েছে মৌলিকতার দাবীতে যে সমস্ত দেশের সাহিত্যিকদের সৃষ্টি অগ্রগণ্য।

নরওয়ে, স্থইডেন, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং আইসল্যাণ্ড রাজনৈতিক ব্যাপারে আজকের দিনে আলাদা আলাদা পাঁচটি দেশ হলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বলতে গেলে প্রায় এক। সেইজন্যেই দেখা গেছে বিগত দেড় শ' কি ছু'শো বছরে এখানকার রাজনৈতিক মানচিত্রে বহুবার পরিবর্তন হয়ে গেছে। কখনো ছু'টো কখনো বা তিনটে দেশ মিলে একটি রাষ্ট্রের পত্তন করেছে, কখনো বা আবার সম্পূর্ণ পৃথক হয়েই গেছে। যেমন এখন হয়ে রয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলে কারোই বুঝতে বাকি থাকে না যে, একত্র যখনই হয়েছে জনগণের ইচ্ছাতেই হয়েছে, কারণ সহজ-সরল পথে চলবার জন্যে সাধারণ মানুষের মধ্যেই সবসময়েই একটা স্বতঃপ্রবৃত্ত আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু পৃথক যখনই হয়েছে প্রত্যেকবারই সমাজের উর্ধ্বতন শ্রেণী, তথা শাসনযন্ত্রের ক্ষমতাপ্রিয় ছোটো ছোটো দলের প্রচার ও প্ররোচনায় বিষেই হয়েছে। কারণ একটা কি ছু'টো সরকার ভেঙে চারটি কি পাঁচটি করতে পারলে একদিকে যেমন শাসিতেরা থাকে দুর্বল হয়ে, তেমনি বড়ো বড়ো পদের

যাই হোক, নরওয়ে, স্থইডেন, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং আইসল্যাণ্ড এই যে পাঁচটি দেশ, সাংস্কৃতিক দিক থেকে এরা এক। এদের সবাইকে নিয়ে যদি একটি গোষ্ঠী ধরা যায়, তা হলে দেখা যাবে পৃথিবীর যে কোনো দেশ বা ভাষা গোষ্ঠীর চাইতে এই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান গোষ্ঠীর সৃষ্ট সাহিত্য বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে আছে। ইংরেজী (আমেরিকানসহ), ফরাসী বা রুশ সাহিত্য পরিমাণের দিক থেকে অনেক বেশি সন্দেহ নেই, কিন্তু গুণগতভাবে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সাহিত্য অদ্বিতীয় বললেই চলে। এই শ্রেষ্ঠতার কারণ শুধু নোবেল প্রাইজ পাবার জন্যেই নয়, (এই অঞ্চলের নয়জন এখন পর্যন্ত সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, যদিও যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ইবসেন, তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নি); বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গী তথা শিল্পানুভূতির মৌলিকতাই এই অঞ্চলটিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছে। ইবসেন, বয়ার, হামস্থন, বিয়র্নসন, লেগারলফ, উনসেট, সিলানপা, নেক্সো, জেনসেন, লী, কেলান, ল্যাক্সনেস—এঁদের প্রভাবের বাইরে আজকের পৃথিবীর খুব বেশি লেখক রয়েছেন কি? কোথাও এঁরা সরাসরি অন্য লেখককে প্রভাবিত করেছেন, কোথাও বা অন্য কোনো লেখকের মাধ্যমে।

আমাদের বর্তমানের আলোচ্য নুট (কনুট) হামস্থন ছিলেন নরওয়ের লোক। বাস্তবধর্মী সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবে হামস্থনের সমকক্ষ কাউকে আজ পর্যন্ত খুব বেশি দেখা যায় নি। তাঁর আগে ত' নয়ই,

হামসুনের সাহিত্য আলোচনার পূর্বে তাঁর জীবনের কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করা দরকার। কারণ, ব্যক্তিকে কিছুটা জানা থাকলে তাঁর সৃষ্টির রসগ্রহণে সুবিধে হয়।

জীবন—নুট (কনুট পেডারসেন) হামসুন (৪।৮।১৮৫৯—১৯।২।৫২) ছিলেন একটি কৃষক-পরিবারের ছেলে। এই পরিবারটির কয়েক পুরুষের কুলপঞ্জী আছে। শতাধিক বছর ধরে কৃষিকর্ম ছিলো এই পরিবারের একমাত্র উপজীবিকা। কাজেই মাটির সঙ্গে যোগটা যে এদের কতো গভীর ছিলো তা সহজেই অনুমেয়।

অল্পবয়সে পিতৃহীন হয়ে পড়বার ফলে হামসুনের দেখাশুনো এবং তাকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব এসে পড়ে এক কাকার ওপর। এদের পদবী ছিলো পেডারসেন। 'হামসুন' ছিলো ওদের খামারটার নাম। কিশোর বয়স থেকেই নুট খামারটার নামই নিজের পদবী হিসেবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। প্রথমে কেউ ব্যাপারটাকে বালকের খেয়াল বলে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নি; কিন্তু পরে এইটেই স্থায়িভাবে তাঁর পদবী হয়ে পড়ে।

লেখাপড়ার দিকে পেডারসেন পরিবারের কারোই বিশেষ আগ্রহ ছিলো না। ছেলেরা সবাই যাতে গায়ে-পায়ে খেটে খেতে পারে বড়োরা সেইদিকটাতেই লক্ষ্য রাখতেন। হামসুনও স্কুলে পড়াশুনো করবার সুযোগ পান নি কোনোদিন। ওঁর কাকা একেবারে বালক বয়সেই হামসুনকে এক মুচির কাছে দিলেন কাজ শেখবার জন্যে। এই মুচিটি ছিলো বিশেষ অবস্থাপন্ন এবং কারিগর হিসেবেও নিপুণ। শহরের জ্ঞানী, গুণী এবং অবস্থাপন্নদের অনেকেই মাঝে মাঝে আসতেন জুতো এবং চামড়ার তৈরি বিভিন্ন জিনিসের অর্ডার দিতে। তাঁদের পোষাক-আশাক, তথা মার্জিত কথাবার্তা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতো হামসুনকে। বিশেষ করে এঁদের সান্নিধ্যে এসেই হামসুনের মনে বাসনা জাগে কিছু লেখাপড়া করবার। অক্ষর পরিচয়টা অবশ্য আগেই হয়েছিলো।

এবার প্রথম কিছুদিন চললো এলোপাতাড়িভাবে পড়াশুনো। হাতের কাছে যা পেতেন তাই পড়তে আরম্ভ করতেন। মাসকয়েক এইভাবে কাটবার পরেই হামসুন নিজেই বুঝতে পারলেন যে মোটেই এগোনো যাচ্ছে না। কারণ যা পড়ছেন তার বেশিরভাগই বুঝতে পারছেন না। তারপর একটা স্কুলের সিলেবাস সংগ্রহ করে তার নির্দেশ অনুসারে পড়াশুনো আরম্ভ করলেন। এতে আশ্চর্য ফল দেখা গেল। প্রতি বছর অন্তত তিন বছরের পঠনীয় বই পড়ে শেষ করতে লাগলেন হামসুন। সতেরো বছর বয়সের সময় দেখা যায় হামসুন একটা দোকানের কেরাণীর কাজ করছেন এবং বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই করছেন। কিছুদিন এই চাকুরীটা করবার পরে হামসুন ব্যবসা করবার ধান্ধায় কয়েকটা মাস নষ্ট করলেন। তারপরেই দেখা যায় ওঁকে একটা স্কুলে শিক্ষক হিসেবে। স্কুলের পাঠ্যসূচী অনুসারে পড়াশুনো শেষ করবার পর থেকেই বিশেষ করে সাহিত্যবিষয়ক বইপত্র পড়তে আরম্ভ করেন হামসুন। ক্রমশ এই পড়ার দিকেই ঝুঁকে পড়লেন উনি। প্রায় এক বছর শিক্ষকতার পরেই দেখা যায় হামসুন আবার অন্য একটা চাকুরীতে ঢুকেছেন এবং দু-একটা সাময়িক পত্রিকায় কিছু কিছু লেখা, প্রধানত কবিতা পাঠাচ্ছেন: এর মধ্যে করবেন। এতদিন নরওয়ের উত্তরাঞ্চলে ছোটো একটা শহরে ছিলেন উনি, এবার তাই দক্ষিণে চলে এলেন। রাজধানী অস্লো এবং ক্রিশ্চিয়ানা প্রভৃতি সব বড়ো বড়ো শহরই দেশের দক্ষিণ দিকে।

কিন্তু বড়ো শহরে এসেও আলোর মুখ দেখতে পেলেন না হামসুন। কোনো কাগজে চাকুরীও জুটলো না বা লিখেও তেমন কিছু রোজগারের সম্ভাবনা দেখা গেল না। তাই আবার কিছুদিন ছোটোখাটো কাজ করেই জীবিকা অর্জন করতে হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এভাবে চলতে চলতে সত্যি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন হামসুন। স্বদেশে থেকে নিজের স্বপ্নকে কোনোদিনই সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা যাবে না মনে হলো হামসুনের। তাই ভাগ্য-পরীক্ষার জন্যে হামসুন সাগরপাড়ি দিলেন, চলে এলেন আমেরিকায়। আমেরিকায় এসেও জীবিকা অর্জন করতেই হামসুনকে এতটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো যে, সাহিত্য-সাধনা প্রায় বন্ধ হয়ে যাবারই উপক্রম হলো। কখনো ফলের বাগানের মজুর, কখনো গমের খেতের মজুর, কখনো বা ট্রামের কণ্ডাক্টরের কাজ করতে হয়েছে হামসুনকে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে কিছুদিন জেলের কাজও করেছেন উনি।

ট্রাম-কণ্ডাক্টরের কাজ থেকে হামসুন যেভাবে বরখাস্ত হয়েছিলেন, তাই থেকেই বোঝা যায় স্কুল-কলেজের লেখাপড়ায় বঞ্চিত হলেও হামসুন কতো নিরলসভাবে পরিশ্রম করতেন নিজেকে শিক্ষিত করে তুলবার জন্যে। একখানা বই ওঁর পকেটে সব সময়েই থাকতো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কখনো পাঁচ মিনিট ফুরসৎ এসে গেলেও হামসুন সেই সময়টায়, একপৃষ্ঠা কি দু' পৃষ্ঠা, নিদেন কয়েকটা লাইন হলেও একটু পড়ে নিতেন। গ্রীসের প্রাচীন কাব্য, নাটক এবং ইতিহাস হামসুন এইভাবেই পড়ে শেষ করেছিলেন।

একদিনের কথা বলি। ট্রাম চলছে, চলন্ত ট্রামের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে বই পড়ছেন হামসুন। একটা স্টপে এসে থামলো ট্রামটা। একজন যাত্রী ওঠবার সময়ে বাধা পেলেন হামসুন দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে। একটা ধমক দিয়ে ভদ্রলোক সীটে গিয়ে বসলেন। হামসুন নিজের ত্রুটির জন্যে মার্জনা চাইলেন। সেইদিনই ডিউটির শেষে টাকাকড়ি জমা দেবার জন্যে অফিসে গিয়ে শুনতে পেলেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা। সেদিনের যাত্রীটি তো নালিশ করেছেনই তাঁর আগে আরো কয়েকজন একই নালিশ জানিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে—ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে থেকে প্রায় সময়ই বই পড়ে কণ্ডাক্টর হামসুন। আর তারই ফলে যাত্রীদের ওঠা-নামায় বাধা সৃষ্টি হয়।

ট্রাম কোম্পানীর অফিসার বললেন—কি পড়ছিলে তুমি অতো তন্ময় হয়ে?

—আজ্ঞে মিডিয়া।

—মিডিয়া? সে আবার কি বাপু?

—মিডিয়া, মিডিয়া, মিডিয়া জানেন না? ইউরিপিদেসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক, অবশ্য অলকেশটিসও কম যায় না, তবে মিডিয়ার মতো অতোটা······।

—চোপ রও ছোকরা, এটা অফিস, তোমার নাটকের কথা বলবার জায়গা নয়: ঠিক আছে, কাল থেকে [illegible]

এটা কখনো সেটা করে বছর দুই আমেরিকায় কাটিয়ে দেশে ফিরে এলেন হামসুন। কিন্তু দেশেও ভাগ্য ফেরাবার কোনো কৌশল উদ্ভাবন করতে পারলেন না হামসুন। তাই আবার বছর দুই বাদে আমেরিকাতেই এলেন। এবারও কাটলো দু' বছর আমেরিকাতে, তারপর আবার দেশে ফিরলেন।

এটা ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের কথা। উনিশ বছর থেকে আরম্ভ করে এই দশটা বছর বলতে গেলে একটানা অনিশ্চিত অবস্থার নিদারুণ কষ্টের মধ্যে কাটলো হামসুনের।

ছাপার অক্ষরে প্রথম বই অবশ্য এর আগেই প্রকাশ করেছিলেন হামসুন; একখানি ছোট্ট উপন্যাসিকা; কিন্তু সে বই প্রকাশ করে প্রকাশকের গিয়েছিলো লোকসান হয়ে, তাই সহসা আর কিছু প্রকাশ করবার সুযোগ-সুবিধেও করে উঠতে পারছিলেন না, যদিও একাধিক পাণ্ডুলিপি তাঁর তৈরি ছিলো। দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফিরে হামসুন তাই আর গোটা বই ছাপাবার চেষ্টা না করে একখানা উপন্যাসের কাহিনীকে সংক্ষেপিত আকারে লিখে ডেনমার্কের একটি মাসিক পত্রিকায় ছাপবার জন্যে পাঠালেন। এই রচনাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় হামসুন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। এই রচনাটি বিখ্যাত 'হাঙ্গার'-এর সংক্ষিপ্তরূপ। এটা ১৮৮৯ খৃঃ অব্দের কথা। এর পর থেকে জীবিকার জন্যে লেখা ছাড়া কখনো আর কিছু করতে হয় নি হামসুনকে। পরিণত বয়সে, ষাটের কোঠায় পা দিয়ে (অর্থাৎ নোবেল প্রাইজ পাবার পরে) পৈতৃকবৃত্তি কৃষিকর্মের দিকে হামসুন একবার মন দিয়েছিলেন বটে, তবে সে নেহাৎ খেয়ালের বশে; প্রয়োজনের তাগিদে নয়।

সাহিত্য—হামসুনের রচনাবলীর মধ্যে প্রধান হচ্ছে তেরোখানি উপন্যাস—হাঙ্গার, শ্যালো সয়েল, গ্রোথ অব দি সয়েল, প্যান, ড্রিমার্স, মিস্ট্রিজ, দি উওম্যান অ্যাট দি পাম্প, চ্যাপ্টার দি লাস্ট, ভ্যাগাবণ্ডস্, অগাস্ট, দি রোড লীডস্ অন, দি রিং ইজ্ ক্লোজ্ড এবং লুক ব্যাক অন হ্যাপিনেস।

হামসুনের সাহিত্যের মধ্য থেকে প্রধানত দুই জাতীয় চরিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। প্রথমত যে জাতীয় জীবনধারার সঙ্গে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে তার ফলস্বরূপ অতিমাত্রায় সংবেদনশীল, জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত কিছুটা অসামাজিক বা সমাজ-বিরোধী টাইপ, এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনিশ্চিত অবস্থায় বেঁচে থাকে, ভবঘুরের জীবনে বাধ্য হয়ে অভ্যস্ত হয়ে-পড়া অপরের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিটমাট করে চলতে অনভ্যস্ত, যেমন দেখা যায় হাঙ্গার, ভ্যাগাবণ্ডস্ প্রভৃতি উপন্যাসে: আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আর একজাতীয় চরিত্র যারা সমাজের আর পাঁচজনের সঙ্গে মানিয়ে চলবার জন্যে সদাই আগ্রহশীল। জীবনের পরিস্থিতির সঙ্গে আপোষ করে চলাই যাদের প্রকৃতি—অর্থাৎ সাধারণ মানুষ। এ জাতীয় চরিত্র হামসুনের লেখায় সবচাইতে ভালোভাবে ফুটেছে 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এ। আমরা তাই হামসুনকে বোঝবার সবচাইতে নিশ্চিত উপায় হিসেবে দুই জাতীয় দু'খানা বই হাঙ্গার এবং গ্রোথ অব দি সয়েল নিয়ে আলোচনা করবো।

হামসুনের জীবনের মোটামুটি যে আভাসটুকু আমরা পেয়েছি, তা থেকেই বোঝা যাবে যে, 'হাঙ্গার'-এর কাহিনীভাগ হামসুনের নিজেরই আমেরিকা যাবার পূর্বে অসলো এবং ক্রিশ্চিয়ানাতে লিখে জীবনে দাঁড়াবার চেষ্টায় যে মারাত্মক এক্সপেরিমেণ্ট করতে হয়েছিল হাঙ্গার যে তারই অশ্রুসজল বেদনাবিক্ষুব্ধ বাস্তব কাহিনী—এ কথা মনে করবার একাধিক কারণ আছে।

হাঙ্গার-এর কাহিনী 'আই' অর্থাৎ আমির জবানীতে লেখা। আলোচনার প্রয়োজনে এই 'আমি'কে আমরা হামসুনই বলবো।

কাহিনীর সুরুতে একেবারে প্রথম তিন লাইনেই হামসুন বলছেন:

'...সেই সময়কার কথা বলছি যখন আমি ক্রিশ্চিয়ানাতে অনশনক্লিষ্ট ছন্নছাড়ার মতো অনিশ্চিতভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম; ক্রিশ্চিয়ানা, ওঃ কি অদ্বিতীয় এক নগরী! যে কেউ একবার এ নগরীতে এসে পড়েছে, সেই দেখবে যাবার সময় এ নগরী তার মনে কি ক্ষত সৃষ্টি করেছে!'

ভোর হয়েছে। চাই কি বেশ একটু বেলাই হয়েছে। হামসুন বুঝতে পারছেন বিশ্বজগৎ কোলাহলমুখর হয়ে উঠেছে; সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। শুধু ওঁরই কোনো কাজ নেই। হামসুন বেকার যুবক। দীর্ঘদিন বেকার। তাই জেগেও শুয়ে রয়েছেন বিছানায়। আর মনে হচ্ছে, আগামী দিনের জন্যে উৎফুল্ল হবার কোনো কারণ আছে কি? সহস্র প্রশ্নেও সম্মতিসূচক কোনো জবাব আসে না ভেতর থেকে।

'...বিছানা ছেড়ে উঠলাম, বিছানার এককোণার দিকে একটা বাণ্ডিল পড়েছিলো, খাবার মতো যদি কিছু পড়ে থাকে ওর মধ্যে এই আশায় হাত বাড়ালাম। কিন্তু না: কিছু নেই!'

অসংখ্য জায়গায় চাকুরীর জন্যে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন হামসুন—কোথাও সরাসরি এবং স্পষ্ট না শুনেছেন, কোথাও বৃথা আশ্বাস দিয়ে লোকে হয়রান করেছে; কোথাও বা চাকুরী একটা হতে পারতো এক ঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা আগে গিয়ে পৌঁছতে পারলে। কোথাও নগদ সিকিউরিটি রাখবার অক্ষমতার জন্যে চাকুরী জোগাড় হলো না—এই রকম সব। শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে ফায়ার ব্রিগেডের কর্মী হবার জন্যে আরো অনেকের পাশে বুক ফুলিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও হলো না কিছু। অফিসার জানালেন তোমার যে চোখ খারাপ। পরদিন হামসুন চশমাটা পকেটে পুরে আবার এসে লাইনে দাঁড়ালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অফিসারই আজো এলো এবং একনজরে দেখেই চিনতে পারলো; সে আগের দিনই জেনেছে যে হামসুনের চোখ খারাপ, কাজেই কিছুই হলো না।

সর্বত্র এইভাবে ব্যর্থমনোরথ হতে হতে শেষ অবধি হামসুন নিজেই বুঝতে পারলেন যে, বুকের সাহস আর মনের বল কি ভীষণভাবে কমে গিয়েছে; তা ছাড়া ভদ্রভাবে কারো সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মতো জামা-কাপড়েরও অভাব দেখা দিলো।

'...রাস্তায় রাস্তায় অনিশ্চিতভাবে ঘুরতে লাগলাম, কখনো একটানা চলছি, কখনো বা এখানে-সেখানে থামছি একবার, দেখছি একবার এদিক-ওদিক, আবার চলছি...মহাশূন্যটা স্বচ্ছ এবং উজ্জ্বল, আমার মাথার মধ্যেটাও যেন অমনি ফাঁকা হয়ে গেছে।'

সেদিন হামসুন ওঁর ওয়েস্টকোটটা এক মহাজনের কাছে বন্ধক

'...আমার কেবলই মনে হতে লাগলো যে স্বয়ং ভগবান আমার পেছনে লেগেছেন,...যখন যেখানে যাই শুধুই হতাশা আর হতাশা।'

ওয়েস্টকোট বেচা টাকা ক'টি সম্বল করে একটি প্রবন্ধ রচনার কাজে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন হামসুন। একটা কাগজের সম্পাদকের খুবই ভালো লাগলো রচনাটি। তাই নগদ কয়েকটি টাকা দক্ষিণাও দিলেন। কিন্তু তারপরে বেশ কিছুদিন চেষ্টা করেও আর যেন মনের মতো লেখা তৈরি হচ্ছে না দেখা গেলো। তবু বারকয়েক ঘোরা-ফেরা করলেন সম্পাদকের কাছে। এই সম্পাদকমশাই তরুণের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল, নানাভাবে অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করেন ওঁকে। ওঁর ব্যবহার এতই ভদ্র এবং শিষ্ট যে, তার কাছে হাত পেতে সাহায্য চাইতেও বাধে হামসুনের। এদিকে অন্য দু-একটি কাজের সম্ভাবনা দেখা দিয়েও শেষ পর্যন্ত জুটলো না। কাজেই আবার শুরু হলো অনশন। দিনের পর দিন চলতে লাগলো একইভাবে।

এদিকে যে ঘরটায় রাত কাটাতেন হামসুন—এক বাড়িওয়ালীর ভাঙা-চোরা পরিত্যক্ত একখানা ঘর, তারও ভাড়া বাকি পড়ে গিয়েছিল বেশ কিছুদিন ধরে। বাড়িওয়ালী ছিলো কিছুটা ভদ্র প্রকৃতির। শিক্ষিত বেকার যুবকের দুর্দশাটা যে কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেচে তা বুঝতেন। তাই বড়ো একটা তাগাদা দিতেন না। কিন্তু হামসুনের বিবেক এবং বিচারবোধ এখনো যথেষ্ট শক্তিশালী রয়েছে। ক্ষুধার তাড়না মাঝে মাঝে তাঁকে উন্মাদপ্রায় করে তুললেও এখনো বেশিরভাগ সময়েই তিনি সৎ এবং স্বাভাবিক চিন্তাই করে থাকেন। কোথাও কিছু পাবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই বাড়িওয়ালীকে কিছু দেবার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বসেন। বাড়িওয়ালী বুঝতে পারে যুবকের বাস্তবজ্ঞানের অভাবের কথা। কাজেই কথামতো টাকা না পেলেও কিছু বলে না। বাড়িওয়ালীর এই ভদ্রব্যবহারের ফলে হামসুনের মনে দেখা দেয় আরো লজ্জা। লজ্জা এবং ধিক্কার। নিজের কাছে মরমে মরে যান হামসুন। কখনো মনে হয় নিজেকে অযোগ্য বলে, কখনো মনে হয় যেন গোটা দুনিয়াটা, ভগবান পর্যন্ত যেন ষড়যন্ত্র করেছেন ওঁকে তিলে তিলে মেরে ফেলবার জন্যে।

একবার কথামতো বাড়িভাড়া না দিতে পারার লজ্জায় হামসুন আর বাড়িতেই ফিরবেন না ঠিক করলেন। কিন্তু দারুণ শীতের তাড়নায় বাইরে টিকতে না পেরে যদিও ফিরলেন কিন্তু দেখা গেলো চাবিটা হারিয়ে গেছে। এতো রাতে দরজা ভাঙা ঠিক হবে না মনে করে শুয়ে রইলেন এক পার্কে। কিন্তু এখানেও স্বস্তি নেই। পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেলো থানায়; ওঁকে গৃহহীনদের একজন মনে করে। কিন্তু হামসুন নিজেকে এখনো গৃহহীনদের সামিল মনে করতে পারেন না। এখনো জীবন সম্পর্কে তিনি একেবার হতাশ হন নি। তাই থানার অফিসারের কাছে নিজেকে একজন সাংবাদিক বলে মিথ্যে পরিচয় দিলেন।

সাংবাদিক শুনেই রাতের মতো ভালো শোবার বন্দোবস্ত হলো কিন্তু খাবার কিছু পাওয়া গেলো না—কারণ, অফিসার মনে করলো উনি তো আর প্রকৃত অভাবগ্রস্ত নন; কোনো কারণে সময়মতো পেলো হামসুন বাসে। হামসুন বোধ করতে লাগলেন শরীরের ভেতরটা যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে—একটু একটু করে পুড়ে নিঃশেষ হচ্ছে।

আবার রাস্তা। এ রাস্তা যেন অফুরান।

'...বেঁচে থাকবার জন্যে অর্থসংগ্রহের সমস্তরকম পরিচিত উপায়েই আমার চেষ্টা করা হয়ে গেছে। সব দিকেই অসাফল্য। কে যেন আমার বুকের ভেতর বলতে শুরু করলো: আরে নির্বোধ, তুমি যে মরতে শুরু করছো।...'

'...পথ চলতে চলতে কুড়িয়ে পেলাম একখানা ছোট্ট নুড়ি পাথর। সেখানা কুড়িয়ে নিলাম। কোটের ওপর একটু বুলিয়ে সাফ করে নিয়ে পুরলাম মুখে—কিছু একটা না চুষতে পারলে গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছিলো।...'

'...বুঝতে পারছিলাম আমার চোখ দু'টো ক্রমশ মাথার মধ্যে বসে যাচ্ছিলো।...'

কিছুদিন আগে একটি মেয়েকে পথ চলতে দেখে ভালো লেগেছিলো হামসুনের। একদিন আবার দেখা হয়ে গেলো তার সঙ্গে। হামসুন বুঝতে পারলেন যে মেয়েটিও চায় ওঁকে, কিন্তু নিজের সীমাহীন দারিদ্র্যের জন্যে পিছিয়ে আসেন।

এক কসাইয়ের দোকানের কাছে এসে থামলেন হামসুন।

'...একখানা হাড় দিতে পারেন, দয়া করে? আমার কুকুরটার জন্যে, শুধু একখানা হাড় হলেই চলবে...'

কসাই দিলে একখানা হাড়। হাড়ের গায়ে কিছুটা মাংসও লেগেছিলো।

'...আমার বুকের ভেতরটা সজোরে দপ্‌দপ্‌ করতে লাগলো। হাড়খানা কোটের তলায় লুকিয়ে নিয়ে একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লাম '...কোনো আস্বাদ পেলাম না। কাঁচা রক্তের গন্ধে গা গুলিয়ে উঠলো। তারপরই মুহুর্মুহুঃ বমি।...'

একদিন পথে এক জাহাজীর সঙ্গে আলাপ হলো হামসুনের। না চাইতেও ওঁর অবস্থা বুঝে কয়েকটা টাকা গুঁজে দিলো হামসুনকে। সেই টাকা সম্বল করে উঠলেন গিয়ে এক পান্থশালায়। এবার একটা কিছু লিখে ফেলতেই হবে মনস্থ করলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন দুঃখকষ্টের ফলে মগজে যেন আর কিছু নেই। লেখা বেরুতেই চায় না। এদিকে টাকাও ফুরিয়ে আসতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত আবার রাস্তা।

এমনিধারা একটানা সংগ্রাম করতে করতে শেষ পর্যন্ত জাহাজঘাটায় এক ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরিচয় হলো হামসুনের। এই ক্যাপ্টেন রাজী হলো তার জাহাজে ওঁকে কাজে নিতে। এইভাবে আপাতত রক্ষা পেলেন হামসুন।

'হাঙ্গার' যেমন মানুষের দুঃখকষ্ট আর ব্যর্থতার কাহিনী, 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এ আমরা তেমনি সুখসমৃদ্ধি এবং মানুষের সমাজবদ্ধ মানুষের সংগঠনী শক্তি এবং সৃজনী-প্রতিভার সাফল্যের স্বাদ পাই—

আইজাক একজন শ্রমজীবী কৃষক। নগরসভ্যতায় বিরক্ত হয়ে চলে যায় প্রায় নির্জন একটা গ্রামে। সেখানে গিয়ে শুরু করে চাষ-আবাদ। ক্রমে সম্পূর্ণ নিজের কায়িকশ্রমের ওপর নির্ভর করে ওর

আইজাকের সঙ্গী বলতে শুধু তিনটি ছাগল। বসন্তকালে আইজাকের একজন সঙ্গী জুটলো। পাশের একটা গ্রামে বেড়াতে গিয়ে নিয়ে এলো একটি মেয়েকে। নাম তার ইঙ্গার। ইঙ্গার তরুণী, কিন্তু তবু তখন পর্যন্ত সে ছিলো অবিবাহিত। বিয়ের তার কোনো সম্ভাবনাও ছিলো না। কারণ তার মুখে ছিলো একটা খুঁত। ওপরের ঠোঁটখানি ঠিক নাকের তলার দিকে ছিলো চেরা—অনেকটা খরগোসের মতো। এ রকম মেয়েকে আর কে বিয়ে করবে? ইঙ্গার চলে এলো আইজাকের সঙ্গে। দু'জনে মিলে নতুন উদ্যমে ঘর বাঁধলো ওরা। ইঙ্গারের ঠোঁটের খুঁতটা সবাই পরিহাসের দৃষ্টিতে দেখলেও আইজাক সহানুভূতির সঙ্গেই দেখতে আরম্ভ করেছিলো একেবারে প্রথম থেকে। স্বাভাবিক-ভাবেই আইজাক কিছুটা সদয় প্রকৃতির মানুষ। ক্রমে গভীরভাবে ওরা পরস্পরকে ভালোবাসতে লাগলো। ওরা দু'জনে মিলে অবিশ্রান্ত-ভাবে পরিশ্রম করে সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা আনলো। যথাসময়ে ওদের প্রথম সন্তান হলো—একটি ছেলে। ছেলেটির বয়স যখন একবছর পূর্ণ হলো তখন ওরা একদিন পাশের গ্রামের গির্জায় এলো। ছেলের নামকরণের জন্যেও বটে, আবার আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের বিয়েটাও করা দরকার।

এ গ্রামে এসেই ওদের সংসারের ওপর যেন শনির দৃষ্টি পড়লো। ইঙ্গারের এক বর্ষীয়সী বিধবা আত্মীয়া ওদের সুখ-সমৃদ্ধি দেখে ঈর্ষায় জ্বলে উঠলো। ইঙ্গার নিজের মুখের খুঁত সম্বন্ধে সবসময়েই সচেতন। প্রতিটি সন্তানের জন্মের পরে ও সতর্ক দৃষ্টি রাখে ওর খুঁতটা তাদের কারো মধ্যে রয়েছে কি না দেখবার জন্যে। প্রথম দু'টি সন্তান নিখুঁতই হলো। কিন্তু তৃতীয় সন্তানটি জন্মের সময় ঐ বিধবা আত্মীয়া ইঙ্গারের মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করলো, তার মধ্যে মায়ের খুঁত দেখা দিলো, সারাজীবন ধরে মানুষের উপহাসের পাত্র যাতে না হয়ে থাকতে হয়, সেইজন্যেই ইঙ্গার তার শিশুকে নষ্ট করবে মনস্থ করে বেরিয়ে গেলো ঘর ছেড়ে। অলিভ নামে ঈর্ষাকাতর আর একটি লোক ব্যাপারটা সবাইকে জানিয়ে দেয়। ইঙ্গারকে আইজাক মার্জনা করলো বটে, কিন্তু দেশের আইন মার্জনা করলো না। আট বছরের জন্যে জেলের হুকুম হলো তার। কিন্তু আইজাক-পরিবারের একজন প্রকৃত বন্ধু গেইসলারের তদ্বিরের ফলে বছরখানেক বাদেই ইঙ্গার ছাড়া পেলো। জেলে যাবার সময় ও ছিলো অন্তঃসত্ত্বা। জেল থেকে ফিরলো একটি নবজাত শিশু নিয়ে। এটি একটি মেয়ে। ঐ বিধবা আত্মীয়ার প্রভাবটা এক্ষেত্রেও কাজ করেছিলো। মেয়েটিরও ওপরের ঠোঁট দু'খানি খরগোসের মতো কাটা। কিন্তু এবার বিজ্ঞান এগিয়ে এলো ওদের সাহায্য করবার জন্যে। একটা অপারেশন করে কাঁটা ঠোঁট জোড়া লাগানো হলো।

জেলে কিছুকাল থাকবার ফলে ইঙ্গারের মধ্যে অবশ্য কয়েকটি পরিবর্তন দেখা দিলো। চাষবাস এবং পাড়াগাঁয়ের ঘর গৃহস্থালী এখন তার আর ভালো লাগে না।

আইজাকের বড়ো ছেলে এলিসিয়ুস এক এঞ্জিনীয়ারের নজরে পড়ে গাঁ ছেড়ে চলে এলো শহরে। চাষবাস তারও ভালো লাগে না। শেষ পর্যন্ত ও আমেরিকা চলে গেলো এবং সেখানেই

এদিকে আইজাকের জমির তলায় তামার খনি আবিষ্কৃত হলো। তার ফলে আর্থিক অবস্থা গেলো আরো ভালো হয়ে। ক্রমে এ গ্রামে অন্যান্য লোকজনও এসে জুটলো বসবাসের উদ্দেশ্যে। আইজাক এ-অঞ্চলের মধ্যমণি হয়ে উঠেছে। নতুন যারা এসে ক্ষেতখামার পত্তন করলো তাদের একজনের নাম এক্সেল। এক্সেল বারব্রো নামে একটি তরুণীকে নিয়ে এলো কাজকর্মের সাহায্যের জন্যে। ওরাও স্বামী-স্ত্রীর মতোই চলতে লাগলো। বারব্রোর ছেলে হলো যথাসময়ে। বারব্রো হলো শহর ঘেঁষা মেয়ে। শহরের এক বাড়িতে একসময়ে কাজও করেছে ও. কাজেই কোনোরকম ভারবোঝা বাড়াতে ও রাজী নয়। সেই জন্যেই দেখা যায় নিজের শিশুকে ডুবিয়ে মারে। কিন্তু ভাণ করে যেন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। পুলিস হেফাজতে বারব্রো চলে যাবার পরে মামলা সুরু হলো শিশু হত্যার জন্যে। কিন্তু মহিলা নেতা মিসেস হেয়ারফসের নিপুণ ওকালতির জন্যে বারব্রো বেকসুর খালাস পেলো। বারব্রোকে তিনি নিজের কাছে নিয়ে যেতেও চাইলেন। কিন্তু বারব্রো গেলো না। সে যে আবার সন্তানসম্ভবা।

এক্সেল কিছুটা নিস্পৃহের মতোই গ্রহণ করলো বারব্রোকে। ওর শুধু দুশ্চিন্তা একটা ব্যাপারে। সে পারিবারিক, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর কোনো সমস্যা নয়, বারব্রো যদি আবার মারে তার সন্তানকে—তাও নয়। এক্সেল একান্তভাবেই অর্থ-সম্পদের শক্তিতে বিশ্বাসী। ওর শুধু চিন্তা এবার ফসলের কাজে আর স্ত্রীর সাহায্য পাওয়া যাবে না। একাই করতে হবে সব কিছু।

হাঙ্গার এবং গ্রোথ অব দি সয়েল স্পষ্টতই ভিন্নমুখী দু'টি রচনা। দু'টি পৃথক জগৎ। একটি নগরসভ্যতার নানা সমস্যায় জর্জরিত অসহায় মানুষের ছবি; অন্যটি প্রাকৃতিক পরিবেশে সবল, বলিষ্ঠ মানুষের বিজয়গাথা।

হাঙ্গারে নায়ক ব্যতীত আরো বারো-চৌদ্দটি চরিত্র আছে। তাদের মধ্যে দু'জন বাদে আর প্রায় সকলেই যেন একটা মিছিলে চলছে, একবার দেখা দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে। নায়কের সমস্যাটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়ে বা একটু অন্যদিকে মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গ্রোথ অব দি সয়েল-এ তা নয়। প্রতিটি চরিত্র তিনটি বাক্সে আসছে যেমন শ্লথগতিতে, সরেও যাচ্ছে ঠিক তেমনি। এ যেন সভ্যজগতের একেবারে বাইরে কোনো জায়গা—কিম্বা বলা চলে আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টির পূর্বের কোনো কাহিনী।

এই দু'খানা উপন্যাসেই হামসুন তাঁর বাস্তববাদকে এমন প্রকট করে এঁকেছেন যে পাঠকমাত্রেরই মনে একটা স্থায়ী ছাপ থেকে যায়। এ দু'খানা বইতেই সাধারণত যাকে 'নগ্নতা' বলা হয় তা বহু ক্ষেত্রেই রয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত নগ্নতাও হামসুনের সংবেদনশীল শিল্পবোধের জন্যে শিল্পই হয়েছে—নগ্নতা হয় নি। আইজাক এবং ইঙ্গার; এক্সেল এবং বারব্রো যে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে যাবার পর থেকেই সামাজিক রীতিনীতির কথা ভুলে গিয়ে একসঙ্গে বাস করতে আরম্ভ করলো—বা তাদের সন্তান হতে লাগলো, এগুলি আপাতদৃষ্টিতে নগ্নতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মনোযোগী পাঠক বুঝতে পারেন এবং

যেন কেমন উর্ধ্বলোকে উঠে যাচ্ছে। এ ঠিক স্বর্গীয় প্রেম নয়, অথচ সমাজবিরোধীও কিছু নয় (তারাই যে সমাজপ্রতিষ্ঠার বীজ বপন করছে) বরং বলা চলে যেন কিছুটা বুনো। আদম এবং ঈভের নগ্নতা যেমন একটা প্রাকৃতিক সুষমায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো, এও যেন অনেকটা তাই। নগ্ন কিন্তু অশ্লীল নয়।

ঠিক তেমনি হাঙ্গারেও অন্তত দু'টি জায়গা আছে যা চূড়ান্ত অশ্লীল হতে পারতো, কিন্তু হামসুন তাঁর শিল্পগুণ দিয়ে সবকিছু ঢেকে ফেলতে পেরেছেন।

দু'টি নর-নারী পরস্পরের প্রতি যখন এমনভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য বেশ কিছুটা পরিবেশের চেতনাহীন হয়ে পড়ে, তখন যা ঘটে তা প্রাকৃতিক নির্দেশেই ঘটে ; মানুষ সেখানে অসহায় যন্ত্র মাত্র। তাই দেখা যায়, হামসুন যেদিন ইলাজালির ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, শরীরটা তাঁর ক্ষুধাজর্জর হলেও মনে তাঁর মুক্তির আস্বাদ।

হাঙ্গারের অন্য একটি জায়গাতে দেখা যায়, যে পান্থশালায় হামসুন আশ্রয় নিয়েছিলেন তার কর্ত্রী একজন বোর্ডারের সঙ্গে পৈশাচিক আনন্দে লিপ্ত। ঐ কর্ত্রীর স্বামী নিজেই হামসুনকে ডেকে দেখালো দৃশ্যটা দরজার একটা ফুটো দিয়ে। হামসুন দেখলেন বদ্ধ ঘরটার মধ্যে একদিকে বসে আছে কর্ত্রীর পঙ্গু এবং বুড়ো বাপ। আর একেবারে তার চোখেরই সামনে ঘটছে ব্যাপারটা। এ যে শুধু অর্থকষ্টের ফল নয় তা হামসুন বুঝছেন, এ হচ্ছে আরো অর্থের নেশা। এ যে নরকের চাইতেও ঘৃণ্য। হামসুন ঘৃণায় শিউরে উঠে চোখ সরিয়ে নিলেন। মনে মনে শুধু প্রার্থনা করলেন যেন বুড়োটা এখুনি মারা যায়। হাঁ, এখুনি।

চরম বাস্তবচিত্র এঁকেও হামসুন তাঁর এই ধরণের সূক্ষ্ম শিল্পবোধের জন্যেই সাহিত্যে অমরত্বের অধিকারী।

আলপনা—শিল্পী—রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

বাতাসী মঞ্জিল
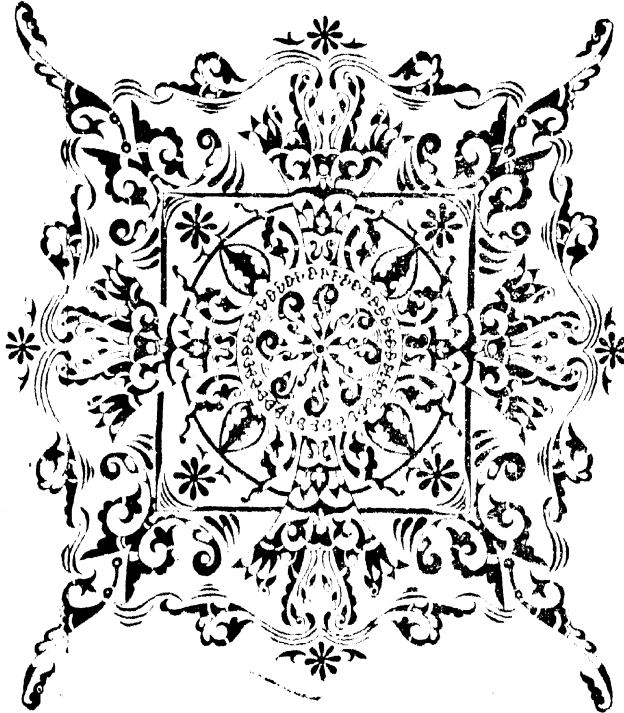
অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

'কাল বরং একটু আগেই চলে আসবেন, রোদটা ঝিমিয়ে পড়লেই।' বলেছিলেন ভূতপূর্ব অ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির।

রোদটা ঝিমিয়ে পড়বার একটু পরেই গিয়ে দাঁড়ালাম অ্যাটর্নী বাড়ির গেটের মুখোমুখি উল্টো দিকের ফুটপাথে। আমার পিছনে অনতিদূরেই বুড়ো সুলতান মিয়ার 'আদি ও অকৃত্রিম' অম্বুরী তামাকের দোকান।

হ্যাঁ, তখনো ও বাড়িটা অ্যাটর্নী বাড়ি। 'দিনের শেষে যখন সন্ধ্যা নামে, তখন এ বাড়ি হয়ে যায় বাতাসী মঞ্জিল।' বলেছিলেন নিমাই মিত্তির। 'তারপর সারারাত বাতাসী মঞ্জিল। তারপর রাত ভোর হয়, রোদ ওঠে, তখন ফের অ্যাটর্নী বাড়ি।'

এখনই যাবো, কি একটু পরেই যাবো তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে ভাবছিলাম।

সহসা স্বপ্নভঙ্গ হল যেন। পিছনে শুনলাম বুড়ো সুলতান মিয়ার কণ্ঠস্বর: 'সালাম আলায়কুম, বাবুসাহেব।'

পিছন ফিরে সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধের মুখখানা দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল। বললাম: 'আলায়কুম সালাম, সুলতান মিয়া।'

'আপনাকে দেখতে পেয়ে দোকান থেকে উঠে এলাম, বাবুসাহেব। বড়বাবুর কাছে যাবেন তো?'

'হ্যাঁ, সুলতান মিয়া।'

'তেনার সবুজ কেডিলেক গাড়িখানা এই একটু আগেই বেরিয়ে যেতে দেখলাম, বাবুসাহেব।'

'গাড়িতে কি তিনি ছিলেন? রোদ ঝিমিয়ে পড়লেই আমাকে

একটু ক্ষুন্ন স্বরেই বললাম কথাটা। আমাকে কাল সুস্পষ্ট ভাষায় একটু আগেই আসতে বলে তিনি আজ একটু আগেই বেরিয়ে যাবেন, এটা ভাবতেও দুঃখ হলো।

'গাড়িতে বড়বাবু ছিলেন কি না সেটা ঠিক নজর করে দেখতে পারি নি বাবুসাহেব। আপনি যে আজ আসবেন। তা তো জানা ছিল না। অবিশ্যি উনি গিয়ে থাকলেও এমন হতে পারে যে খানিকবাদেই ফিরবেন। ততক্ষণ আপনি বরং মেহেরবানি করে বান্দার দোকানঘরে এসে একটু বসুন না।'

'বসব?'

'আপনার মেহেরবানি। অবিশ্যি ও বাড়িতে ঢুকে গেলেও আপনার খাতিরের কোনো কমতি হবে না, বড়বাবু থাকুন চাই না থাকুন। ছোটবাবু, মানে এখন যিনি অ্যাটর্নী, ভারি ভদ্দর-লোক কিনা—ইদিক দিয়ে বাপ-ব্যাটায় দুজনে সমান। ঝি, চাকর, ডেরাইভার, দারোয়ানগুলো সবাই ভদ্দরলোক, নইলে ও বাড়িতে চাকরি থাকবে না কারুর কি!'

ভাবলাম নিমাই মিত্তির বাড়িতে আছেন কি না সেটা যখন নিশ্চিত জানা নেই, তখন বরং নিমাই মিত্তিরের সবুজ ক্যাডিল্যাক গাড়িখানার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষাই করা যাক সহৃদয় সুলতান মিয়ার দোকানে বসে বসে। অন্তত অ্যাটর্নী-বাড়ির বাতাসী মঞ্জিলরূপে পরিণতি পর্যন্ত। বিশেষ করে যখন তাতে সহজেই খুশি হবে বুড়ো সুলতান মিয়া, ঐ অ্যাটর্নী বাড়ি তথা বাতাসী মঞ্জিলে প্রবেশের সুযোগলাভের জন্য আমি যার কাছে ঋণী।

দোকানের অম্বুরী তামাক বিভাগে। দোকানের ওদিকের বিভাগে বসে বুড়োর পুত্র ইউসুফ আর পৌত্র জুলফিকার আধুনিক খদ্দেরদের সিগারেট, চুরুট, পাইপ টুব্যাকোর চাহিদা মেটাচ্ছে, বিড়ি রসিকরাও অবহেলিত হচ্ছে না। ধূমপায়ীদের সেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করে দোকানের একধারে ঝুলানো একফালি একআঙুল পুরু দড়ি ধিকি ধিকি আগুনে পুড়তে পুড়তে তলার দিক থেকে ক্রমেই ওপর দিকে ছোট হচ্ছে।

সুলতান মিয়ার চোখের দৃষ্টি বার্ধক্যে ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে, কিন্তু আমার পাঞ্জাবির পকেটে কাগজের তাড়া এড়াল না তার নজর।

'আপনার লেখা পড়িয়ে শোনাতে নিয়ে চলেছেন বুঝি বড়বাবুকে, বাবুসাহেব?' প্রশ্ন করল সুলতান মিয়া।

'পড়িয়ে শোনাতে নয়, মিয়াসাহেব। ফেরৎ দিতে। আমার লেখাও নয়, বড়বাবুরই হাতের লেখা, পড়তে দিয়েছিলেন আমাকে। ওঁর বাবার রোজনামচা থেকে নকল করা।'

'ও।' বলল বুড়ো সুলতান মিয়া। অশোভন, অবাঞ্ছনীয় প্রশ্ন করল না এই লেখার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে। হয় তো ভাবল সে আদার ব্যাপারী মাত্র, এই জাহাজের খবরে তার দরকার নেই। শুধু বলল, 'কাল যেতে দেখেছিলুম আপনাকে; কখন ফিরেছিলেন জানি নে, ফেরাটা দেখতে পাই নি। কেমন দেখলেন অ্যাটর্নী নেমাই মিত্তির মশাইকে, সেইটে বলুন একবার। দেবতুল্য মানুষটি কি না।'

সুলতান মিয়ার মুখে 'দেবতুল্য' বিশেষণটির উচ্চারণ বড় মিঠে লাগল। আর মনে হলো ঠিক ঐ বিশেষণটাই নিমাই মিত্তিরের সবচেয়ে যোগ্য বিশেষণ। বললাম, 'সত্যিই বড় চমৎকার মানুষ তিনি, সুলতান মিয়া। কালই তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ, অথচ মনেই হয় না তাঁর সঙ্গে আগে কখনো আলাপ ছিল না।'

'ছোটবাবুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে কি, বাবুসাহেব?'

'না মিয়াসাহেব।'

'হলে বুঝতেন।'

'কি বুঝতাম, সুলতান মিয়া?'

'এদিক দিয়ে বাপে-ছাওয়ালে কোনো তফাৎ নেই। আলাপ করলে মনে হতো যেন আপনার অনেক দিনের জানাশোনা অ্যাটর্নী কানাই মিত্তিরের সঙ্গে। অবিশ্যি তার কারণ আছে।'

'কি কারণ, সুলতান মিয়া?'

'সব কারণ তো বলতে পারব না বাবুসাহেব, একটি শুধু বলতে পারি। সেটি হচ্ছে এ বাড়ির গেটের ভেতর দিয়ে কেউ বড় একটা ঢোকেন না—না আত্মীয়-স্বজন, না বন্ধু বান্ধব, না অপর কেউ—অবিশ্যি নিছক কাজের তাড়ায় যাঁদের আসতেই হয় তাঁরা ছাড়া, যেমন মক্কেল, দর্জি, দোকানদার, ধোপা। এ বাড়ি যেন কেমন কেমন ছাড়া ছাড়া একঘরে গোছের, চারধারের মস্ত দেয়ালের বাইরের দুনিয়া থেকে আলাদা।'

সুলতান মিয়ার কথা শুনে কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করে আগন্তুক-সঙ্গ তৃষ্ণার্ত করে রেখেছে। আগন্তুক এ বাড়িতে দুর্লভ বলেই, দুর্লভ আগন্তুকরূপে আমি এমনভাবে সমাদৃত হয়েছি।

'কিন্তু এরকম কেন হয়, সুলতান মিয়া?' শুধালাম আমি। 'এঁরা তো মানুষ খুবই ভালো, তাই না?'

'ভালো বৈ কি! দেবতুল্য, বললাম তো আপনাকে।' বলল সুলতান মিয়া। 'তবে কি না একটু আলাদা ধরণের, দুনিয়ার আর পাঁচজনের মতন নন। নন বলেই আর পাঁচজনের মতন যাঁরা তাঁরা এনাদের সঙ্গে তেমন খাপ খান না। একটু কেমন কেমন অসোয়াস্তির চোখে দেখেন। একটু হয় তো ভয় ভয়ও করেন। এনাদের কেউ বলেন দেমাকী, কেউ বলেন খামখেয়ালী, কেউ বলেন মাথা-খারাপ, কেউ বলেন ভূতে পাওয়া—আরো কত কি সব। তার ওপর, বাবুসাহেব, এই বাড়িটার ওপরও নাকি অনেকের কি রকম ইস্টিশান আছে শুনছিলাম।'

'ইস্টিশান?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'ইস্টিশান কিসের?'

দোকানের ওদিকে আওয়াজ ছুড়ে দিয়ে ছেলেকে লক্ষ্য করে সুলতান মিয়া বলল, 'ওরে ইউসুফ, বল না বাবুকে, কিসের ইস্টিশান।'

ইউসুফ বসে বসে বিড়ি বানাচ্ছিল—এ দোকানের বিড়ি সারা শহরে, এমন কি শহরের বাইরেও বিখ্যাত। পিতার হুকুমের জবাবে সে বলল, 'আজ্ঞে ও একটা ইংরিজি কথা। এক বাবু বলছিলেন সেদিন—সুপুরিস্টিশান।'

ব্যাপারটা এইবার পরিষ্কার হল। বললাম: 'সুপারস্টিশন (Superstition)?'

বুড়ো সুলতান মিয়া খুশি হয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ বাবুসাহেব, এইবার ঠিক মনে পড়েছে। সুপুরিস্টিশান।'

বললাম, 'এই বাড়িটি সম্পর্কে অনেকের মনে অনেক রকম সুপুরিস্টিশান আছে। এই তো ব্যাপার?'

'হ্যাঁ, বাবুসাহেব।'

'কি সেই সুপুরিস্টিশান, সুলতান মিয়া?'

'বাতাসী বিবির নজর এখনো ছেড়ে যায় নি এ বাড়ির ওপর থেকে।'

বাতাসী বিবির নজর! বিদেহিনী বাতাসীর নজর! ব্যাপারটা যেন রোমাঞ্চকর হয়ে উঠল। বিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্ত মানুষের মনেও এ-হেন কুসংস্কার? বহু বছর আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে যে বাতাসী বিবি, সে এখনো তার পিছনে ফেলে-যাওয়া বাতাসী মঞ্জিলের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারে নি?

কুসংস্কারগ্রস্তদের কল্পনাপ্রবণ মনের ধারণাগুলোকে বিশ্লেষণ করে করে সুলতান মিয়া বলতে লাগল বাতাসী বিবি অশরীরে এখনো নাকি অনেক সময় পায়চারি করে বেড়ায় বাতাসী মঞ্জিলের দালানের মস্ত ছাদে, ফুলের বাগানে, সবুজ ঘাসে ঘাসে, পুকুরের কিনারে-কিনারে; মৃদু ওঠা-নামা করে সিঁড়ি বেয়ে; পুকুরের ধারে শ্বেতপাথরে বাঁধানো স্নানের ঘাটে বসে থাকে জলে পা ডুবিয়ে। শুধু এই নয়, আরো নানারকম গা-ছমছম-করানো কিম্বদন্তী। বাতাসী

শিগগীর চুল আঁচড়ে দাও খেলতে যাব
–এখন হবেনা, দেখছ না ব্যস্ত আছি!
ছোট্ট মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে মাকে চুল আঁচড়ে দিতে অনুরোধ করে কিন্তু মায়ের সময় হয় না কারণ সংসারের নানান খুঁটিনাটি আর পর্বতপ্রমাণ কাজ। চুল সময়মত আঁচড়ানো হয় না তার ফলে চুলের সৌন্দর্য প্রতিদিনই ম্লান হ'তে সুরু করে। ধুলো ময়লা আর খুস্কী জমে চুলের গোড়াগুলির মুখ বন্ধ করে দেয়। মেয়ে বড় হ'য়ে ওঠে কিন্তু তার মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য অযত্নে বর্দ্ধিত চুলের রুক্ষ প্রকাশে অনেকখানি ঢাকা পড়ে যায়। এমনি ঘটনা প্রতিদিন প্রতি ঘরেই ঘটছে। চুল মানুষের সৌন্দর্যের একটা স্বাভাবিক প্রকাশ তাই তার যত্ন সর্বপ্রযত্নে নেওয়া উচিত। ছোট মেয়েদের চুল দিনে অন্ততঃ দু'বার ভাল করে আঁচড়ে পরিষ্কার করা উচিত। স্নানের আগে কয়েক ফোঁটা জবাকুসুম বেশ করে চুলের গোড়াগুলিতে ঘসে দিন। জবাকুসুম চুলের খাদ্য জুগিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।
জবাকুসুম
কেশ তৈল
সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
KALPANA JK 62

পরিকল্পনা অনুসারে—বিদেহিনী বাতাসী বিবি সম্পর্কেও তেমনি কিম্বদন্তী ছড়িয়েছে কিছু কিছু।

কিম্বদন্তীর সত্যতায় সুলতান মিয়া বিশ্বাসী কি না জানবার কৌতূহল হল। বললাম: 'এসব কি সমস্ত গাঁজাখুরি কথা, না সত্যি, সুলতান মিয়া?

'আমি সত্যি বলেই মানতে চাই, বাবুসাহেব।' বলল ব্যাকুলকণ্ঠ বৃদ্ধ সুলতান মিয়া। 'আর একবার, শুধু আর একবার দেখতে চাই বাতাসী বিবিকে।'

মর্মান্তিক আকুলতা ধ্বনিত হয়ে উঠল সুলতান মিয়ার কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, সব সত্যি বাবুসাহেব।' বলতে লাগল সুলতান মিয়া। 'আমার দিল বলছে পর পর ক'টা রাত্তির যদি বাতাসী মঞ্জিলের ছাদে, পুকুরপাড়ে, বাগানে বা মাঠে ঘুর ঘুর করতে পারি, তা হলে একবার না-একবার মোলাকাত হয়ে যাবেই বাতাসী বিবির সঙ্গে। কিন্তু তার তো উপায় নেই বাবুসাহেব।'

'কেন, সুলতান মিয়া?'

'বললে ওঁরা নারাজি হবেন না জানি বাবুসাহেব, কিন্তু ওঁদের গিয়ে কিছুতেই বলতে পারব না আমাকে রেতের বেলায় আপনাদের ছাদে, বাগানে, পুকুরপাড়ে, মাঠে ঘুর ঘুর করতে দিন। এ কি কখনো বলা যায়, না বলা উচিত? আপনিই বলুন।'

স্বীকার করলাম অমন অনুরোধ অশোভনই হবে বটে এবং প্রত্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনাও যে তাতে একেবারে নেই, তাও নয়।

আরেকটা কথাও ভাবলাম। ওভাবে ঘুর ঘুর করে না দেখা পর্যন্ত সুলতান মিয়ার মনে এই আশার আলোটুকু ক্ষীণভাবে হলেও জ্বলছে যে, বাতাসী বিবিকে আবার দেখতে পাবার অন্তত একটি উপায় তার হাতে আছে। কিন্তু উপায়টি অবলম্বিত হয়ে ব্যর্থ প্রমাণিত হলে সেই শেষ আশার আলোটুকু নিবে যাওয়ার ব্যথা সুলতান মিয়া সইবে কি করে?

'তা ছাড়া আরেকটা কথাও ভেবে দেখলাম, বাবুসাহেব। সে হলো যাকে বলে আপনার গিয়ে—যার ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। সেদিন মুশায়রায় বসে হাফেজ সাহেব একখানা শের শুনিয়ে গেলেন, যার মানে এ চাকা কেবল সামনের দিকেই ঘোরে, পেছন দিকে ঘোরানো যায় না।'

বুঝলাম সম্প্রতি কোনো উর্দু কবি-সম্মেলনে উর্দু কবি হাফেজ সাহেবের টুকরো কবিতা মনে লেগেছে অম্বুরী তামাকের বনেদী দোকানদার সুলতান মিয়ার।

শুধালাম, 'এ চাকা কিসের চাকা। সুলতান মিয়া?'

'আজ্ঞে, বয়সের চাকা।' বলল বুড়ো সুলতান মিয়া, সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে। 'বাতাসী বিবির সাথে যখন শেষ দেখা হয়েছিল, তখন আমি দশ-পনেরো বছরের ছোকরা। আমার মতো ভালো বেসেছিলাম বাতাসী বিবিকে। তারপর তো অনেক সালের পর অনেক সাল কাবার হয়ে গেল, কোথায় আজ সেই ছোট্ট সুলতান? বাতাসী মঞ্জিলের পুকুরঘাটে যদি কেমন করে বলব: 'আমি তোমার ছোট্ট সুলতান, বাতাসী বিবি?'

খুশি হলাম এই কথা ভেবে যে, সুলতান মিয়া শুধু যে অম্বুরী তামাক বেচে তাই নয় তার কল্পনাশক্তিও একেবারে অপূর্ব নয়।

সুলতান মিয়ার বোধ করি হঠাৎ খেয়াল হল সে তার নিজের কথাই বড় বেশি বলছে এবং সেটা শোভন নয়। তাই হঠাৎ সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল: 'ও-বাড়ির ছোটবাবুর কথা বলছিলাম আপনাকে, মানে অ্যাটর্নী কানাই মিত্তির। মানুষটা একটু অদ্ভুত বলে পয়লা পয়লা মনে হতে পারে বটে, কিন্তু ঐ অদ্ভুতের পয়লা ধাক্কাটা সামলে নিতে পারলে দেখবেন দিল তো নয় যেন হীরের টুকরো। দু'হাতে টাকা কামাচ্ছেন, কিন্তু যকের মতো টাকা আগলাবার নামটি নেই, দু'হাতে টাকা ওড়াতে এতটুকু পরোয়া করেন না। ফুর্তি বলুন, চাঁদা বলুন, খয়রাত বলুন, জিনিসপত্তর কেনাকাটা বলুন—কঞ্জুষি নেই কিছুতে। তবে কি না এখনতক ছাওয়াল পয়দা হল না ছোটবাবুর, এইজন্যে বড়বাবুর বড্ড মন খারাপ। দুঃখু করেন। অম্বুরী তামাক নিজের হাতে পৌঁছতে যাই যখন, তখন সুখ-দুঃখের অনেক কথাই হয়। একবার নাকি নাতির মুখ দেখাবার জন্যে বলেছিলেন ছোটবাবুকে, কিন্তু বলে কোনো ফয়দা হয় নি। তারপর থেকে আর কিছু বলেন না বড়বাবু। কি আফসোসের ব্যাপার ভেবে দেখুন আপনি।'

তামাকের দোকানদার অ্যাটর্নীবাড়ির ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে দেখে বিরক্তি বোধ হবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বুড়ো মিয়ার কণ্ঠে যে অসামান্য দরদ ধ্বনিত হয়ে উঠল তাতে সে সম্ভাবনা দূর হয়ে গেল। নিঃসংশয়ে অনুভব করলাম এই অ্যাটর্নী-পরিবারটিকে সত্যিকারের দরদ দিয়ে ভালোবেসেছে সুলতান মিয়া।

বললাম, 'সে দুঃখ আমার কাছেও প্রকাশ করেছেন নিমাই মিত্তির।'

সুলতান মিয়া বলল, 'করবেন বৈ কি। আমাকে উনি বড্ড নেকনজরে দেখেন কি না। সুলতান মিয়া বলতে একেবারে অজ্ঞান।'

সুলতান মিয়াকে খুব স্নেহের চোখে দেখেন বলে নিমাই মিত্তির দাদু হতে না পারার দুঃখ আমার কাছে কেন প্রকাশ করবেন সেটা প্রথমে একটু হেঁয়ালির মতো মনে হলো। একটু পরেই বুঝলাম সুলতান মিয়ার সুপারিশপ্রাপ্ত বলেই আমাকে এত সহজে এবং এত শীঘ্র অন্তরঙ্গ করে নিয়ে নিমাই মিত্তির আমার সাম'ন খুলে দিয়েছেন তাঁর অন্তরের দুয়ার—বিনা দ্বিধায়, বিনা সংশয়ে, বিনা সংকোচে।

'বড়বাবু আর আমি বয়সে কাছাকাছিই হবো, দু'চার বছরের ইদিক-উদিক।' বলল সুলতান মিয়া। 'বড়বাবু আমার চাইতে বড়ই হবেন হয় তো। কিন্তু ঐ দেখুন আমার নাতি জুলফিকার, লায়েক হয়ে ওর বাপের সাথে বসে বিড়ি বানাচ্ছে। চোখে দেখে গেলাম আমি, এখন চোখ বুজলে কোনো দুঃখু নেই। কিন্তু বড়বাবুর কথা ভাবুন একবার। আজতক

সুলতান মিয়ার কথায়। বিখ্যাত একটা অ্যাটর্নী-পরিবার নির্বংশ হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে কানাই মিত্তিরের সঙ্গে সঙ্গে, এই দুঃখে হাহাকার করছে নাতি-সৌভাগ্যবান সুলতান মিয়ার হৃদয়।

কথাটা যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এইভাবে সুলতান মিয়া হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করল: 'অ্যাটর্নীবাবুর বিবিকে দেখেছেন বাবুসাহেব? মানে, বড়বাবুর বৌমাকে?'

'না।'

'বেহেস্তের হুরী। আপনাদের জবানে লক্ষ্মী পির্‌তিমে। ছোটবাবুকে দেখেছেন?'

'না।'

'আপনাদের জবানে কার্তিক ঠাকুর। এদের দু'জনায় খোদা যে জোড় মিলিয়েছেন তার জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু বিলকুল বেকার হলো এই জোড় মেলানো। শাদীর পর পাঁচ-পাঁচটা বছর পার হয়ে গেল, একটা ছাওয়াল এলো না বৌমার কোলে। বড়বাবুকে বলি বলি করেও বলতে ভরসা পাই নে—কে জানে বলতে গেলে উনি কি মনে করবেন?—কিন্তু আমার কি সন্দ হয় জানেন?'

প্রশ্নের ভঙ্গি থেকে মনে হলো কানাই মিত্তিরের সন্তানহীনতার পিছনে কোনোরকম রহস্য আছে। প্রশ্ন করলাম, 'কি সন্দেহ হয়, সুলতান মিয়া?'

সুলতান মিয়া আমার কানের কাছাকাছি মুখ এনে বলল, 'কেউ তুকতাক কিছু একটা করেছে।'

মারণ, উচাটন প্রভৃতি নানারকম তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা শুনেছি, কিন্তু তার কোনো উদাহরণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি নি। এ সবে আমার বিশ্বাসও নেই; আমার বিশ্বাস এগুলো সব গাঁজাখুরি গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

বললাম, 'এ আমি বিশ্বাস করি না, সুলতান মিয়া।'

বিস্মিতকণ্ঠে সুলতান মিয়া বলল, 'হিঁদু হয়ে আপনি তুকতাক বিশ্বাস করেন না, বাবুসাহেব?'

আমি বললাম, 'ওসব হচ্ছে সরল বিশ্বাসী, অশিক্ষিত বা কুসংস্কারগ্রস্ত বোকা লোকদের ভাঁওতা দেবার জন্য কারসাজি। ও সবে সত্যি সত্যি কিছু হয় না, সুলতান মিয়া।'

আমার অনভিজ্ঞতাপ্রসূত অবজ্ঞা দেখে দুঃখিত হয়ে সুলতান মিয়া বলল: 'সত্যি সত্যি হয় বাবুসাহেব। আপনি দেখেন নি, তাই জানেন না। আমি নিজের চোখে দেখেছি। মন্তর-তন্তর, তুক-তাক, বাণ-মারা দিয়ে ভালো আর মন্দ দুই-ই করতে দেখেছি। আর ভালোর চাইতে মন্দটাই সহজে হয় বাবুসাহেব। পাকা গুণিন লাগিয়ে আড়াল থেকেই তুকতাক করে, বাণ মেরে মেয়েমানুষকে বাঁজা আর জোয়ান পুরুষমানুষকে না-মরদ বানিয়ে দেওয়া যায়।'

আমি বললাম, 'তা যদি সত্যিও হয়, সুলতান মিয়া, তা হলেও

অ্যাটর্নী বাড়ির ওপর অমন তুকতাক কে করবে, আর কেন করবে? মিত্তিরদের এমন কোনো শত্রু আছে কি?'

'অসম্ভব নয়, বাবুসাহেব। ভালো মানুষের তো আজকাল শত্তুরের অভাব হয় না। তা ছাড়া শত্তুর না থাকলেও এমন আপনজন থাকতে পারেন, ছোটবাবু নির্বংশ হয়ে গেলে অ্যাটর্নী-বাড়ির এন্তার সম্পত্তি—টাকা-কড়ি, জমিন-জায়দাদ যাদের হাতে চলে যাবে। ছোট মুখে বড় কথা ভালো দেখায় না তো, তাই বড়বাবুকে বলতে ভরসা পাই নে। দু'চার দিন যাক, আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়টা আরেকটু ভালো করে জমুক, কথাটা মওকামতো একবার বড়বাবুর কাছে পাড়বেন মেহেরবানি করে। এমন ভালো একটা পরিবার নির্বংশ হয়ে মিত্তিরদের সম্পত্তি অন্য হাতে চলে যাবে, ভাবতেও বুকটা ফেটে যায়।'

বৃদ্ধ সুলতান মিয়ার এ উদ্বেগটাও আন্তরিক, এ বিষয়েও আমার সন্দেহ রইল না, তুকতাকের ব্যাপারটা সত্য হোক বা নাই হোক।

কথাটা মওকামতো নিমাই মিত্তিরের কাছে পাড়ব, একথা জানিয়ে প্রশ্ন করলাম: 'অ্যাটর্নী কানাই মিত্তিরের বিয়ে হয়েছে আজ পাঁচ বছর হল?'

'আজ্ঞে হাঁ, তার মাসকয়েক বেশিই হবে।' বলল সুলতান মিয়া। 'অম্বুরী তামাক দেবার পুড়েছিল বিয়ের মজলিশে অ্যাটর্নী-বাড়িতে, আর অঢেল সিগ্রেট আর চুরুট—সমস্ত যোগান গিয়েছিল আমাদের এই দোকান থেকেই। আঃ, সেই ক'টা দিন আর রাতের কথা কি আর ভুলতে পারি, বাবুসাহেব? আজো যেন চোখের সামনে ভাসছে জ্বলজ্বল করে।'

'তারপর, সুলতান মিয়া?' বললাম আমি। অর্থাৎ আরো শুনতে চাই সেই ক'টা দিন আর রাতের কথা। ভালো লাগছে শুনতে।

রাস্তার ওপারে অ্যাটর্নী-বাড়ির গেটের দিকে তাকাল সুলতান মিয়া। বলল: 'ঐ দু'টো গেটের মাথার ওপর মন্দিরের মতো করে মাচা বেঁধে নহবৎ বসানো হয়েছিল। সানাই বাজাচ্ছিল সানাইয়ের বাদশা দিলওয়ার হোসেন। ভোরবেলা থেকে। আঃ, সে কি সানাই! ওর সুর শুনে দর দর করে দু'চোখ থেকে আঁসু ঝরছিল সবার। তারপর শাদী করে বিবি নিয়ে ফুল দিয়ে সাজানো ময়ূরপঙ্খী মোটর গাড়িতে চড়ে ফিরে এলেন ছোটবাবু, অ্যাটর্নী কানাই মিত্তির। নহবৎ-মন্দিরে বেজে উঠল নহবৎ। গেটের দু'ধারে রাস্তার ওপর জমে গেল মানুষের ভিড়, অ্যাটর্নী-বাড়ির নতুন বৌ দেখবে বলে। বৌর নাম মৃণালিনী।

'তারপর?'

'আমি তখন এই দোকানে বসে। আমার মনে পড়ে গেল প্রায় পৌনে তিন কুড়ি বছর আগেকার একদিনের কথা, যেদিন বাতাসী বিবি প্রথম এসেছিল এই বাতাসী মঞ্জিলে, তার মেটিয়াবুরুজের ডেরা ছেড়ে, দুটি মস্ত টগবগে শাদা ঘোড়ায়-টানা জুড়িগাড়িতে চড়ে। আর সে গাড়ি চালিয়ে আনছিল আমার আব্বাজান, ইমান আলি। আমি ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম

'বুড়ো আমি' সুলতান মিয়া, দোকান ছেড়ে উঠে গেলাম ঐ গেটের সামনে, ময়ূরপঙ্খী মোটরগাড়ির মুখোমুখি। খোলা মোটরগাড়ি। নতুন বৌ মৃণালিনী বসে আছে নতুন বর কানাই মিত্তিরের বাঁ পাশে। মাথার চুলের ওপর খানিকটা কাপড় টানা।

'তারপর?'

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম ময়ূরপঙ্খী গাড়িতে বসা অ্যাটর্নী বাড়ির বৌর মুখের পানে। অমনি এক অদ্ভুত কাণ্ড।'

'কি কাণ্ড, সুলতান মিয়া!'

'মিত্তির বাড়ির নতুন বৌর মুখের দিকে তাকিয়েই সেই পৌনে তিন কুড়ি বছর আগেকার বাতাসী বিবির মুখের সঙ্গে যেন হুবহু মিলে গেছে মনে হল। আরেকটু হলেই চীৎকার করে উঠতাম বাতাসী বিবি! অনেক কষ্টে সামলে নিলাম। তারপর ময়ূরপঙ্খী মোটরগাড়ি ঢুকে গেল ঐ গেটের ভেতর দিয়ে। মনে হল সেই পুরোনো বাতাসী বিবি যেন আবার অনেকদিন বাদে নতুন সাজে এসে ঢুকল বাতাসী মঞ্জিলে। শুনে আপনার হয় তো ভারি তাজ্জব মালুম হবে বাবুসাহেব, কিন্তু সেদিন আমার ঠিক ঐরকম মনে হয়েছিল, আল্লার কসম বলছি আপনাকে।'

সত্যিই ভারি অদ্ভুত লাগল সুলতান মিয়ার কথা শুনে! নিমাই মিত্তিরের পুত্রবধূ মৃণালিনীর চেহারায় সুলতান মিয়া বহু বছর আগে শেষ দেখা বাতাসী বিবির মুখের আদল দেখতে পেয়েছিল! তবে কি তার ধারণা বাতাসী বিবি নতুন জন্ম নিয়ে আবার তার পরম প্রিয় বাতাসী মঞ্জিলে ফিরে এসেছে মিত্তির বাড়ির পুত্রবধূ হয়ে? তবে কি পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করে সুলতান মিয়া? না এ তার বৃদ্ধ মগজের উদ্ভট সৃষ্টিছাড়া কল্পনা? অথবা ইংরেজিতে যাকে বলে 'উইশফুল থিংকিং' (Wishful thinking)?

আমাকে নীরবে ভাবতে দেখে সুলতান মিয়া কি ভাবল যেন। তারপর ধীরে ধীরে বলল, বাবুসাহেব, আপনি হয় তো ভাবছেন বুড়ো সুলতানের বুঝি মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। মাথা আমার খারাপ না ভালো জানি নে, তবে মনে হয় বুড়ো বয়সে হয় তো মনের ভেতর হরেকরকমের ভাবনা, হরেকরকম খেয়াল আনাগোনা করে। আপনাদের মতো জোয়ান বয়সে যেমনটি হয় না। আমি না হয় মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া না-জানা তামাকের দোকানদার সুলতান আলি, কিন্তু বড়বাবুর কথাটা একবার ধরুন আপনি। ডাকসাইটে অ্যাটর্নী ছিলেন এই মাসকয়েক আগেও বিদ্যেবুদ্ধির জাহাজ—আমাদের মতো মুখ্যু নন। তিনি কি বলেন জানেন?'

অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কি বলেন তিনি?'

কথাটা আমাকে বলা উচিত হবে কি হবে না ভেবে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে তারপর সুলতান মিয়া বলল: 'একদিন অম্বুরী তামাকের যোগান দিতে গেছি। গিয়ে বললাম এবারকার মালটা বড় খাসা তৈরি হয়েছে বড়বাবু, খুশবু যা হয়েছে তার আর জুড়ি নেই। মন

হাতের তৈরি অম্বুরী তামাক তোমার আপনার হাতের সাজা ছিলিমে খাব, সে তো বড় খুশির বাত।

সেজে দিলাম। ধোঁয়া টানতে-টানতে নানান কথা কইতে লাগলেন বড়বাবু—সুখের কথা, দুঃখের কথা, আরো কত সব কথা। কথায় কথায় উঠে পড়ল ছোটবাবুর কথা—অ্যাটর্নী কানাই মিত্তির।'

'তাঁর কথা কি বললেন নিমাই মিত্তির?'

'বললেন, সুলতান মিয়া, আমার বাবা আমাকে ভালোবাসতেন খুবই, সেদিকে একতিল কমতি ছিল না, কিন্তু হুকুমের সময় কড়া হুকুম চালাতেন আমার ওপর, সে হুকুম কড়ায়-ক্রান্তিতে তামিল করতে হত, তা থেকে রেহাই ছিল না। আমি ভালোবাসি আমার ছেলে কানাই মিত্তিরকে, কিন্তু ওর ওপর কোনোদিন এতটুকু হুকুম চালাতে পারি নি, পারি নে, পারব না। হুকুম করলে সে নিশ্চয় তামিল করবে জানি। কিন্তু হুকুম ওকে আমি কিছুতেই করতে পারব না।'

'শুনে আমি বললাম, কেন পারবেন না, বড়বাবু?'

'বড়বাবু বললেন, সুলতান মিয়া। ওর মুখের দিকে তাকালেই আমার মনে হয় আমি আমার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। নাতির মুখ দেখে যেতে পারেন নি তিনি। কাটাতে পারেন নি মিত্তির বংশের মায়া, তাই আবার এ বাড়িতেই ফিরে এসেছেন নিজেরই নাতি হয়ে।—এই আমাকে বললেন বড়বাবু।'

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এল। আলো জ্বলে উঠল রাস্তায়, ওপাশের অ্যাটর্নী-বাড়ি হয়ে উঠল, 'বাতাসী মঞ্জিল।' [ক্রমশঃ।

টু-ফু-র দু'টি কবিতা

[টু-ফু (খৃঃ ৭১২-৭৭০) প্রাচীন চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কারও কারও মতে সবশ্রেষ্ঠ কবি। এঁর কবিতায় অভাবনীয় ইন্দ্রিয়ঘনতা, বিশেষ ক'রে পীড়া-র বিরুদ্ধে উচ্চারিত বেদনাময়তা এবং মহান সৌন্দর্যান্বিত গুরুভার মোহাবেশ ইত্যাদি গুণের জন্য কেউ কেউ ইউরোপের কবি শার্ল বোদলেয়ারের সঙ্গে টু-ফু-র তুলনা করে থাকেন।]

রাত্রির বৃষ্টি

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি জানে কখন পড়তে হয়
এসেছে এই বসন্তে বাজের গোড়ায় জল ঢালতে
পছন্দ তার রাত্রি বাতাসে পড়ে এলিয়ে
চুপ চুপ ভিজিয়ে দেয় সমস্ত পৃথিবীটা
কালো মেঘ মাথায় বুনো নির্জন রাত্রি
একটি মাত্র দীপ জল জল করছে নৌকোয়
লাল আর সজল দেখাবে সবই কাল সকালে
আর এই উপত্যকা ভ'রে যাবে গুচ্ছ গুচ্ছ ফোটা ফুলে॥

সাক্ষাৎ

মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন হ'তাম
সপ্তর্ষি আর শুকতারার মতো
কোন রাত্রি আজকে
দীপালোকে আমরা মিলেছি।

যৌবন আর কতোদিন থাকে
আমাদের এখন পাকা চুল সকলের
বন্ধুদের অর্ধেক মৃত
এই সাক্ষাৎ আমাদের দু'জনকেই অবাক ক'রেছে।

কে জানে হয় তো বিশ বছর পর
দেখা করতে যাবো
তোমার কক্ষে তোমার সঙ্গে কথা কইতে
তোমার সঙ্গে শেষ দেখা যখন তখন তুমি বিবাহিত ছিলে না
আর এখন তোমার পুত্র হ'য়েছে কন্যা হ'য়েছে
তারা তাদের পিতার বন্ধুটিকে ভব্যতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করছে
আর জিগ্যেস করছে কোত্থেকে আমি এসেছি।

যখন আমরা পরস্পরকে অভিবাদন করছি
তোমার পুত্র কন্যারা পানীয় তৈরি করতে সুরু ক'রেছে
এই বৃষ্টির রাত্রিতে তারা সংগ্রহ করেছে বসন্তের পালং
ভোজের জন্যে রেখেছে রেঁধে যত্ন ক'রে।

তুমি বললে, এ এক স্বর্গীয় সুযোগ যে আমাদের
দেখা হ'লো
এক নিশ্বাসে আমরা দশ পাত্র পান করলাম
আমি মাতাল নই, যদিও সব মদ আমি শেষ করেছি
তোমাকে বাহবা দিই তোমার এই ভব্য বন্ধুতার জন্যে
আগামীকাল দেখা দেবে পর্বত ব্যবধান আমাদের মধ্যে
না জানো তুমি না জানি আমি যে সেদিন আসবে॥

অনুবাদক : পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

বিজ্ঞান বার্তা
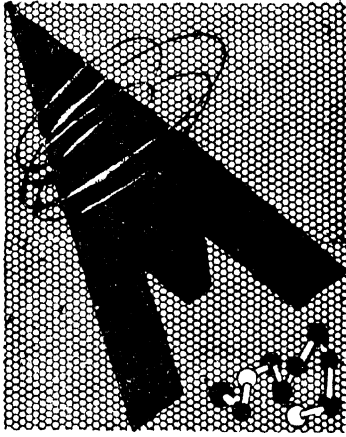
ডেল্টা রকেটের সাহায্যে সিনকম কক্ষপথে স্থাপন

অনুসন্ধানী

সিনকম এ নামে মহাকাশে নূতন মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহটি উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। তিনটি কারণের জন্য এটি মহাকাশে স্থির বলে প্রতিভাত হবে। এই তিনটি হচ্ছে: এটিকে পূর্বাভিমুখী হতে হবে, সরাসরি বিষুবরেখার উপরে থাকবে। আর পৃথিবী থেকে থাকবে প্রায় বাইশ হাজার তিনশ' মাইল উপরে। এই উপগ্রহের পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে লাগবে চব্বিশ ঘণ্টা এবং পৃথিবীরও আপন মেরুদণ্ডে ভর করে একবার প্রদক্ষিণ করতে লাগবে চব্বিশ ঘণ্টা। এইজন্য এদের আপেক্ষিক অবস্থান একই থাকবে। তারই জন্যে পৃথিবী থেকে উপগ্রহটি স্থির বলে প্রতিভাত হবে, মনে হবে যেন এটি মহাকাশে ঝুলে রয়েছে।

এর আগে সিনকম শ্রেণীর যে দু'টি উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে বার্তাবহ উপগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সর্ত পূরণ করা হলেও একটি সর্ত পূরণ করা সম্ভব হয় নি। তাদের ঠিক বিষুবরেখার উপরে স্থাপন করা যায় নি।

ঠিক বিষুবরেখার উপরে কোন উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র থাকলে এ বিষয়ে সুবিধা হতো। কিন্তু সেখানে কোন কেন্দ্র নেই। তাই এটি ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি কেন্দ্র থেকে চার-পর্যায়ী অতি শক্তিশালী ডেল্টা রকেটের সাহায্যে বিষুবরেখার সঙ্গে ২৮ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় এই রকেটটি ৩,৩৪,০০০ পাউণ্ড ধাক্কা সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ী রকেটটি ছাড়বার পর এটি ২০ মিনিট ঊর্ধ্বাকাশে চলে। তারপর তৃতীয় পর্যায়ী রকেটটি চালু হয়। এই সময়ে এর কক্ষপথে হয় বৃত্তায়ত অপভূ দাঁড়ায় ২২ হাজার ৩০০ মাইল এবং অনুভূ ১০০ মাইলের কিছু বেশি, অপভূ পৃথিবী থেকে সর্বাধিক দূরত্ব; অনুভূ সর্বনিম্ন দূরত্ব। চতুর্থ পর্যায়ী রকেট এটিকে চক্রাকার কক্ষপথে এনে স্থাপন করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানসবার্গ এবং অস্ট্রেলিয়ার উমেরার তথ্য-সন্ধানী কেন্দ্র কর্তৃক ওয়াশিংটনের নিকটবর্তী জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার গোডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেণ্টারে প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতেই সেণ্টারের বিজ্ঞানীগণ এর গতিপথ নির্ধারণ করে থাকেন ও নির্দেশ দিয়ে যাবেন।

চতুর্থ পর্যায়ী রকেট এটিকে চক্রাকার কক্ষপথে স্থাপন করায় বিষুবরেখার সঙ্গে এই উপগ্রহের যে ১০ ডিগ্রী কোণ ছিল সেই কোণ শূন্যতে এসে দাঁড়ায়। তবে এটিকে বিষুবরেখার এবং আন্তর্জাতিক সময়রেখা যেখানে পরস্পর ছেদ করেছে, পৃথিবী থেকে ২২ হাজার ৩০০ মাইল উপরে সেখানে স্থাপন করার জন্য আর একটু কলকৌশলের প্রয়োজন। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে যাতে চলে না যায়, তারই ব্যবস্থা করবে এরই মধ্যে যে জেট ব্যবস্থা রয়েছে তাই।

একটি সাক্ষাৎকার

হেনরী ব্রাণ্ডন

ইতিহাসের এক কঠোর পরিক্ষামূলকক্ষণে আমি ডাঃ রবি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথম স্পুটনিক মহাশূন্যে প্রেরণ করেছে এবং এতে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবাদী নেতৃত্বে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান রয়েছে, তা যেন হঠাৎ আমেরিকাবাসীদের প্রতিশোধে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। তারা বিস্মিত, ক্রুদ্ধ, প্রজ্জ্বলিত। দেশের সর্বকোণে ক্রোধের আভাস, কি করে রাশিয়া আমাদের আগে যেতে পারলো! সকলের মুখে এই এক প্রশ্ন। এবং সবাই এর জন্য কৈফিয়ৎ, নির্দিষ্ট অপরাধীর বিচার ও প্রতিকার চাইছিল।

ডাঃ রবি তখনও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা সমিতির চেয়ারম্যান এবং আমার মনে হয়েছিল যে, তিনি-ই আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার উপযুক্ত ব্যক্তি। বিরাট বৈজ্ঞানিক, ১৯৪৪ সালের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত, অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং সরকারের কঠোর সমস্যামূলক সিদ্ধান্তের সর্বাপেক্ষা নিকটতম ব্যক্তি। প্রশ্ন শুধু এই নয় যে, মহাশূন্যে রাশিয়ার এই বিজয়ে আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে কি বিপদ—প্রশ্ন এই যে, আমেরিকার শিক্ষা নিয়মে এ থেকে কি দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন হতে পারে, এই পিছিয়ে পড়ে থাকবার জন্য যা অনেক পরিমাণে দায়ী হয়েছে।

২৪ ঘণ্টায় নোটিশে ডাঃ রবি তাঁর কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি শান্তভাবে আমাকে এক স্বাগত জানালেন। ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যিনি কি বলতে চান তা জানেন—খর্ব কৃশ দেহ, ছোট পা এবং দৃঢ় স্কন্ধ তিনি 'বলতে গেলে পৃথিবীটা কাঁধে বহন করতে সক্ষম।

ও সামাজিক সম্প্রেষে ও ভবিষ্যৎ সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গীতে তাদের প্রভাব তাঁকে সর্বাপেক্ষা কৌতূহলী করে তোলে।

তিন বৎসর বয়সে ডাঃ রবি অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা থেকে এখানে এসেছিলেন। নিউইয়র্কে তাঁর পিতার মুদির দোকান ছিল এবং তরুণ রবি'র ছাত্রজীবন সুখের ছিল না। কিন্তু এ দেশে আসবার তেত্তাল্লিশ বৎসর পরে মোলক্যুলার রশ্মি আবিষ্কারের জন্য তিনি রসায়নে নোবল প্রাইজ পান। তিনি ১৯৫০ সাল থেকে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটার রসায়নের হিগিন্স অধ্যাপক এবং যুদ্ধের পর থেকে তিনি আমেরিকার নিউক্লিয়ার প্রতিরক্ষা কর্মসূচীতে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি ৩০ 'এটমিক এনার্জী কমিশনের সাধারণ উপদেষ্টা সমিতি'র সভ্য এবং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন—যতদিন না ডাঃ কিলনে প্রেসিডেন্টের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হন।

হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কালে ডাঃ রবি ঐতিহাসিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন—যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল হাইড্রোজেন বোমার সম্প্রসারণ বন্ধ করা উচিত কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া। ট্রুম্যানের শাসনতন্ত্রে তখন পরস্পরবিরোধী মতে পূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিকরা কোন মিলিত মত নিয়ে যেতে পারেন নি।

মিঃ ট্রুম্যান সেই সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টাকে প্রশ্ন করেন, যদি আমরা না করি, তা হলেও কি রাশিয়া এটা প্রস্তুত করতে পারবে?

সোজা উত্তর তিনি পেলেন, হ্যাঁ, পারবে।

মিঃ ট্রুম্যানের সরল সিদ্ধান্ত, বেশ তা হলে, আমরা চালিয়ে যাব। এবং তাই স্থির হলো।

ব্রাওন। রাশিয়ার দু'টি উপগ্রহ পশ্চিম জগতকে চমকে দিয়েছে। রাশিয়ার এই অগ্রগতির জন্য আমেরিকার বৈজ্ঞানিক অথবা জাতীয় সরকারকে দায়ী বলে আপনার মনে হয়।

রবি। স্পুটনিক এমন কিছু সাংঘাতিক বৈজ্ঞানিক অবদান নয়। এ প্রধানত কল-কব্জার ব্যাপার। আমাদের খুব দ্রুত নূতন জ্বালানী খুঁজে বের করতে হবে এবং ইলেকট্রনিক চালক নিয়ম ও ইঞ্জিনের নমুনা পরিবর্তিত করতে হবে। এ সব কিছুই মৌলিক বিজ্ঞান নয়। এর অর্থ এই নয় যে, রাশিয়া মৌলিক বিজ্ঞানে এগিয়ে গেছে—তারা হয় তো রকেটের ব্যাপারে কিছুটা আগে আছে। আমাদের প্রগতি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের ওপরে নয়—আরও অর্থ ও লোক নিয়োগ করা হবে কি না তার ওপরে নির্ভর করে। এটা সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়। আরও অর্থ ও অধিকতর চেষ্টায় আমরা অনেক দ্রুত অগ্রসর হতে পারি। অবশ্য, এর জন্য অন্য দিকে—শিক্ষা ও গবেষণা বাধাপ্রাপ্ত হবে—কিন্তু আমরা তা করতে পারি।

ব্রাওন। আমি এ রকম শুনেছি যে যুক্তরাজ্যে মহাশূন্য পরিকল্পনার প্রতিচিত্র অনেক আছে কিন্তু প্রধান সমস্যা মহাকাশ ইঞ্জিনীয়ারের।

রবি। এ কথা এখনও প্রমাণ হয় নি কিন্তু আমার মনে হয় যদি আমরা আমাদের প্রচেষ্টা একই স্থানে প্রতিফলিত করি তা হলে আমাদের অনেক লোক আছে।

ব্রাওন। যুক্তরাজ্যে ইউনিভার্সিটিতে কি মহাশূন্য শিক্ষাবিভাগ আছে? রাশিয়ায় আছে কি?

রবি। এখানে সে-রকম কিছু আছে বলে জানা নেই কিন্তু রাশিয়ায় এই রকম সব আছে। কয়েকজন রুশীয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তারা টেলিভিশনের অধ্যাপক। আমেরিকা অথবা ইংলণ্ড অপেক্ষা রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকরা আরও বেশি শিক্ষাপ্রাপ্ত।

ব্রাওন। রাশিয়ার সঙ্গে বিজ্ঞানের দৌড়ে পশ্চিমকে কি করতে হবে।

রবি। মূলগতভাবে জনসাধারণকে প্রথমত বিজ্ঞানকে সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে নিতে হবে। যদি তা ঘটে তা হলে সেকেণ্ডারী স্কুলে এবং আপনার দেশের পাবলিক ও প্রাইমারি স্কুলের পাঠ্যক্রম বদলাতে হবে। গণিত ও বিজ্ঞানে আরও অনেক সময় দিতে হবে। যখন বিজ্ঞানকেও আমাদের সাধারণ শিক্ষায় মাতৃভাষার মতো মূল্যবান মনে করা হবে, তখনই সব বিপদ কেটে যাবে। আমরা অবশ্যই বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি শুধু না শিখিয়ে—ঐতিহাসিক পটভূমিকায় মানব-প্রচেষ্টা—প্রত্যেক চিন্তাধারাতেই বিজ্ঞানের প্রভাব হিসেবে দেখাবো। এই বিষয়কে কতকগুলি চাতুর্যের সমষ্টি হিসেবে না দেখিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কাজ দেখাতে হবে।

রাশিয়াতে বিজ্ঞান সাধারণ শিক্ষাতেই অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। যতটা দেখতে পাচ্ছি, তাতে রাশিয়া বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা পাচ্ছে—আর যুক্তরাজ্যেও ইংলণ্ড মধ্য-উনবিংশীয় শিক্ষা পাচ্ছে।

ব্রাওন। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকরা শিল্প-ম্যানেজার, পরিচালক সাধারণ কাজের লোকের মধ্য থেকেই আসে।

রবি। হ্যাঁ, রাশিয়া তাদের বিপ্লবকে বিজ্ঞানের দিকে ঠেলে দিয়েছে—যদিও অনেক সময়ে তা শুধু বিজ্ঞান-নামধেয়। যাই হোক না কেন তা তরুণমনের পক্ষে আন্দোলনকারী মূর্তি। পশ্চিমে বৈজ্ঞানিকরা বিলম্বিত আগত এবং সমাজ দ্বারাও ওভাবে গৃহীত হয় নি। দিন দিন-ই অবশ্য গ্রহণ বাড়ছে। বর্তমানে কোন ব্যক্তির যদি কলাশিল্পে রুচি না থাকে তাকে সঙ্কীর্ণমনা বলা হয়। কিন্তু যদি তার বিজ্ঞানে রুচি না থাকে তবুও সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমাদের সভ্যতার এই মূলগত দুর্বলতা। বর্তমানে এতেই ধ্বংস আসতে পারে।

ব্রাওন। অনেক সময় শুনেছি যে, বৈজ্ঞানিকরা এই দেশের চিরাচরিত বুদ্ধিবাদহীনতা তাঁদের স্বীকৃতি'র পথে বাধা ভাবেন।

রবি। হ্যাঁ, আমরা অত্যন্ত ধনী এবং ধনবানরা প্রায়ই বুদ্ধিবাদী হয় না। যা হোক, বর্তমানে যুক্তরাজ্যে অধ্যাপকদের অত্যন্ত উচ্চস্থান। তারা সম্প্রদায়ে ও সরকারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি—অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু জনসাধারণের সেই মনোভাব থেকেই গেছে—এবং বৈজ্ঞানিক হবার পক্ষে এই জন-মনোভাব-ই এখনও তরুণদের মনে দ্বিধা

ব্রাণ্ডন। এই জন-মনোভাব কি ম্যাকার্থিবাদের ও অধ্যাপক ওপেনহায়মারের বহিষ্কার দ্বারা প্রভাবিত ?

রবি। এত শীঘ্র ম্যাকার্থির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা যায় না। কিন্তু অধ্যাপক ওপেনহায়মারের বহিষ্কার যিনি দেশের জন্য কত করেছেন দেশ ও কর্তৃপক্ষের এই প্রচার দানে বুদ্ধিগত ও বস্তুগত মূল্যায়নের ব্যর্থতার ইঙ্গিত বহন করে যখন তিনি জাতীয় সরকারের কর্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবেন—তখনই শুধু প্রমাণ হবে যে হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে। সমগ্র বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে সে ঘটনা উৎসাহের উৎস হয়ে উঠবে। যা হোক না কেন, আমেরিকার বিজ্ঞানে সৎসাহস অত্যন্ত বেশিরকম বেড়ে গিয়েছে আমার আগ্রহের অভাবে রাশিয়ার উন্নতির নিকট হেরে যাই নি। আমার মনে হয়, প্রধান সমালোচনা এই নয় যে, আমরা বিরাট মূলধন নিয়োগ করছি না—কথা হচ্ছে যতটা পারি এবং যতটা পারা উচিত, তা করছি না।

ব্রাণ্ডন। স্বাধীন-ব্যবসা-রীতির দ্বারা কি পশ্চিম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ? আমাদের বৈজ্ঞানিকরা—ফল, সার্থকতা দেখাবার জন্য অত্যন্ত বেশি চাপগ্রস্ত হয়—যা খাঁটি বৈজ্ঞানিকের পক্ষে করা কঠিন।

রবি। আমার মনে হয়, একথা ইংলণ্ড ও কন্টিনেন্ট সম্পর্কে সত্য। কিন্তু যুক্তরাজ্যে জাতীয় সরকার, বে-সরকারী শিল্প এবং দান থেকে অত্যন্ত বেশি সাহায্য পাওয়া যায়। অবশ্য, তার অর্থ এই নয় যে, আমরা আর মূলধন নিয়োগ বা পেশা হিসেবে বিজ্ঞান চিত্তাকর্ষক করতে পারব না। আর একটা বড় ভুল এই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধ্যাপকদের খরচে বিস্তৃতি লাভ করছে, কিন্তু, তাঁদের জমানো টাকা অধ্যাপকদের বেতনে না গিয়ে ছাত্রসংখ্যা বাড়ানোর জন্য অট্টালিকা সম্প্রসারণে ব্যয়িত হয়েছে।

ব্রাণ্ডন। দু'টি উপগ্রহ থেকে রাশিয়া কি রকম সুবিধে পেয়েছে ?

রবি। বৈজ্ঞানিক হিসেবে, অন্তত আমার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমি বলব, বিজ্ঞান নিজেই নিজের পুরস্কার—আমাদের এই পৃথিবী, বিরাট বিশ্ব, বিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়ম ইত্যাদির অভিযানে মনে অপূর্ব জ্ঞান ও আনন্দ হয়। কাজেই, তারা যে সুবিধে পাচ্ছে তা হচ্ছে যে, তারা মনুষ্যোচিত ব্যবহার করছে এবং বিশ্ব সম্বন্ধে জানছে এবং আমি নিশ্চিত জানি যে, অধিকাংশ রুশ-বৈজ্ঞানিক এইভাবে ব্যাপারটা নিচ্ছে। এর যদি আর কোন সুবিধে—যেমন সামরিক গুরুত্ব থাকতে পারে এবং তা ছাড়া সাধারণভাবে মর্যাদাবৃদ্ধি তো আছেই। কিন্তু, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে মহাশূন্য আছে এবং আমরা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে জানবো।

ব্রাণ্ডন। এতে কি রাশিয়া আমাদের আগে চাঁদে পৌঁছতে পারবে ?

রবি। নিশ্চয়ই। যখন ছোট ছিলাম, তখন যেমন দক্ষিণ ও উত্তরমেরুতে পৌঁছবার চেষ্টা হয়েছিল, তেমনি চাঁদে পৌঁছবারও বাস্তবসম্মত চেষ্টা হচ্ছে।

ব্রাণ্ডন। আপনার মনে কি চাঁদে যাবার কোন আকাঙ্ক্ষা আছে ?

ব্রাণ্ডন। চাঁদে রকেট অথবা ব্যক্তি পাঠানোর কি সুবিধে ? একটি চমকপ্রদ সিদ্ধিপ্রাপ্তি ?

রবি। হ্যাঁ, এতে মনে আনন্দ হয়।

ব্রাণ্ডন। এতে বৈজ্ঞানিকদের মনে আনন্দ হয় ?

রবি। সমগ্র জগতের। আমার মনে হয়, রাশিয়ার সিদ্ধিলাভে সমগ্র জগৎ উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। এটা খুবই সার্থক ব্যাপার।

ব্রাণ্ডন। আমি এ ছাড়াও চলতে পারতাম। এই রকম ব্যাপারে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি না।

রবি। কথা হচ্ছে এই যে, আমরা সভ্যতা ছাড়াও বাঁচতে পারি। দশ হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষরা অনেক কিছু ছাড়াই চালিয়েছেন—তাঁরা জীবন কাটিয়েছেন ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। টি এস ইলিয়টের কবিতা ছাড়াও আপনার চলতে পারে...

ব্রাণ্ডন। আমার মনে হয়, উৎসাহিত না হয়ে বরং এই দেশ রাশিয়ার সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য নিজেদের চেষ্টা দ্বিগুণ করতে প্রস্তুত। আমার মনে হয়, এখনই আত্মোৎসর্গের ডাকে সাড়া দেবার সময়।

রবি। স্বীকার করছি। বিলম্বের চেয়ে এখনই হওয়া ভালো। কিন্তু, এ কথাও মনে হচ্ছে যে, এতে আত্মোৎসর্গের ওপরেও কিছু প্রয়োজন। এতে কিছুটা বুদ্ধি চাতুর্যের প্রয়োজন।

ব্রাণ্ডন। আপনি কি বলতে চাইছেন ?

রবি। আমি বলছি যে, একটা নীতি গত দশ বৎসর থেকে অনুসরণ করা হচ্ছে যা সমগ্র দেশের নীতি নয়—সামরিক নীতি। এটি প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্য হয়ে উঠেছে যে, আমরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু, পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞানী রাজনীতিবিদগণ সেদিকে এগিয়েই চলেছেন।

ব্রাণ্ডন। আপনি কি এই অস্ত্রসমূহের প্রতিরোধের কথা বিশ্বাস করেন না ?

রবি। ওঃ, আমি ভাবি বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের নিকট এরা প্রতিরোধমূলক কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা কি যুদ্ধ সংঘটন করেন ? সর্বাপেক্ষা অসুবিধা এই যে, যতই প্রতিরোধ বেড়ে ওঠে—ততই একটা সামান্য ভুলের ফল সাংঘাতিক হয়ে ওঠে—প্রতিরোধ মনস্তত্ত্বমূলক ভিন্ন কিছুই না এবং আমি জানি না যে, কেউ মানব-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট ও বিশ্বাস রাখবার মতো জ্ঞান আছে কি না ? এই প্রকার মৌলিক প্রতিরোধ গড়ে উঠতে উঠতে বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে—কিন্তু এটি আমার মত।

ব্রাণ্ডন। আপনার সমিতি কি আইসেনহাওয়ারের নিকট আমেরিকা ও বৃটিশ বৈজ্ঞানিকদের গভীরতর সংযোগের প্রয়োজন জানিয়েছেন এবং আপনার কি মনে হয় আণবিক আইন ?

রবি। নিশ্চয়ই এবং প্রেসিডেন্ট এই সংযোগের অত্যন্ত পক্ষপাতী। এতে আমাদের প্রচেষ্টা দৃঢ়তর হবে। আণবিক শক্তি নিয়ম অনুসারে আমার মনে হয় এটা পরিবর্তন করতে হবে। এখনও রক্ষণমূলক আইন আমাদের পক্ষে প্রয়োজন—যেমন মাদকদ্রব্যের

মিলন

—রাণী চন্দ (?) অঙ্কিত

চিত্র-পরিচিতি দ্রষ্টব্য)

(জলরঙ)

নীলার স্বপ্ন

অমিতা পালিত

যেদিন সুধীরা দেবী নীলাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাঁদের বংশাবলী প্রথা অনুযায়ী শাশুড়ীর দেওয়া হারটি তার গলায় পরিয়ে দিলেন—সেদিন নীলার মাথাটা যেন কিরকম ঘুরে গেল। ঠোঁট দুটি অসম্ভব রকম ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। মনে হল, একনিমেষে কে যেন মুখের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে। আপনা থেকেই মাথাটা নত হয়ে গেল।

নীলার এই ভাব দেখে সুব্রত তাকে জোর করে নিয়ে গেল ময়দানে, নিয়ে গেল গঙ্গার ঘাটে। জলোহাওয়ার নীলা ফিরে পেল নিজেকে।

তোমার মা এ কি করলেন? সোজাসুজি প্রশ্ন করেছে সুব্রতকে।

বিস্ময় প্রকাশ করেছে সুব্রত—কেন মা কি কিছ অন্যায় করেছেন নীলা?

সুব্রত, তোমরা জান না আমার অতীত জীবন।

প্রয়োজন কি নীলা? তোমার-আমার বর্তমানই থাক, ভবিষ্যৎ থাক, কিন্তু হঠাৎ তুমি এত উতলা হয়েছ কেন?

বারবার চেষ্টা করছি সুব্রত, তোমার সব কথা খুলে বলব—কিন্তু প্রতিবারই তুমি দিয়েছ বাধা।

তুমি তোমার কাজের কথা মনে করে বলছ? তোমার ব্রত 'সেবা'-এর চেয়ে মহান ধর্ম আর কি আছে নীলা?

না-না তুমি জান না সুব্রত কত আঘাত আমি পেয়েছি। জীবনে কত ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে পার হতে হয়েছে। সে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস—আমি বলতে চাই—শোন।

আউটরাম ঘাটে জাহাজগুলোয় জলের ধাক্কা লাগছে। জলের আওয়াজে সুব্রত সম্বিৎ ফিরে পেলো।

চল নীলা বাড়ি ফেরা যাক।

নীলা ফিরে এলো নিজের কোয়ার্টারে। কোন সত্যই আজ সে গোপন করে নি সুব্রতের কাছে। কতদিনের কথা তবু মনে হয় যেন সেদিন।

অন্ধকার ঘর। আলোটা ইচ্ছে করেই জ্বালে নি। নীলাদি' আছেন?—

এস কুহু।

বা, বেশ লোক আপনি—চলুন আপনার জন্যে সকলে খাওয়ার টেবিলে হাতগুটিয়ে বসে আছেন, আর আপনি—

আজ শরীরটা ভাল নেই ভাই। ওঁদের খেতে বলো।

একটু দুধ খাবেন—নিয়ে আসি?

তোমার খাওয়া হলে এনো।

এই কুহু মেয়েটিকে তার খুব ভাল লাগে।

দশ বছর আগের নীলাকে সে খুঁজে পায় ওর মাঝে।

আর পাঁচজনের মত ওদেরও ছিল সুখের সংসার। বাইরে গানের মাস্টারী করেও অরুণের আশ মিটতো না—ঘরে নীলাকে রোজ গান শেখার তাগাদা দিত। শাশুড়ী রাগ করতেন—সংসারের কাজকর্ম নেই কেবল তোর মত গান-বাজনা নিয়ে থাকলে চলবে!

বাড়ির বৌ কি চাকরী করতে যাবে?

সেই চাকরী—চাকরীর চেষ্টায় একদিন তাকে ঘুরে বেড়াতে হলো।

কোথায় চলে গেল অরুণ? কেন গেল?

আজ কোথায় কে জানে—। ভুলে গেল মাকে-বাবাকে, ভুলে গেল নীলাকে। কাগজে কাগজে কত বিজ্ঞাপন কিন্তু কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

সেদিন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল।

বৌমা কি হবে? ভরসা দিয়েছিল সেদিন ষোল বছরের নীলা।

চাকরী সে পেলো না—সামান্য ম্যাট্রিক পাশ ট্রেনিং চাই। পড়তে চলল নার্সিং।

সামান্য যা পুঁজি সব শেষ হল একে একে।

শেষ হল ট্রেনিং, ফিরে এলো দিল্লী থেকে—সেদিন বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীর কি কান্না।

বেশিদিন বাঁচেন নি তাঁরা। ছেলের অবহেলা দিন-রাত কাঁটার মত বিঁধতো। একদিন শ্বশুর তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—নীলা তুমি আবার বিয়ে করো।

শাশুড়ীর উদাস দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই নীলা ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

মনে হল ধরণী দ্বিধা হও।

দেওয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি টক্‌টক্‌ করে উঠলো। নীলা চমকে উঠলো।

তারপর সে আর বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে টিকতে পারে নি। শূন্য বাড়িটা মনে হতো যেন সব সময় হাঁ করে গিলতে আসতো।

এখানে এসে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

কুহু কি সুন্দর দুধটা লাগছে।

আপনার খাওয়ার ইচ্ছে নেই বলে ফ্রিজিডের দুধে কোকো দিয়ে নিয়ে এলাম।

তুমি গতজন্মে আমার কেউ ছিলে কুহু।

আপনাকে ভালবাসে। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাই নীলাদি' ঘুমোতে চেষ্টা করুন।

হ্যাঁ সে ঘুমোবে।

আজ বেশ ভাল করেই ঘুমোবে আর দেখবে স্বপ্ন।

নতুন এক স্বপ্ন। সে আর সুব্রত। ভুলে যাবে তার পিছনে ফেলে-আসা অন্ধকার-তমসাচ্ছন্ন দিনগুলো।

সে বাঁচবে। আর পাঁচজনের মত বাঁচবে।

সেবা দিয়ে, শুশ্রূষা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে সে ভরে তুলবে সকলের জীবন। যেমন করে রোগীদের সে এখান থেকে হাসিমুখে বিদায় দেয়। যেমন ভাবে একদিন ফিরিয়ে দিয়েছিল অসীমাকে তার মা'র হাতে।

অসীমা এসেছিল তাদের নার্সিংহোমে। অনেকদিন ছিল। সুধীরা দেবীর প্রতিনিয়ত কি ব্যাকুলতা। আশ্বাস দিয়েছেন ডাক্তার—সান্ত্বনা দিয়েছে নীলা—আজকাল এই টিউমার অপারেশন কিছুই নয়। অসীমার বাড়ি ফেরার দিন ডাক্তার সুধীরা দেবীকে বলেন—মিসেস মিত্র,—আমরা আমাদের সাধ্যমত করেছি কিন্তু আপনার মেয়ে সুস্থ হয়েছে একমাত্র নীলার সেবা-শুশ্রূষার গুণে।

তারপর থেকেই নীলা অসীমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেছে।

সুব্রত অসীমার দাদা, প্রতিদিন নার্সিংহোমে এই মেয়েটির মধ্যে নারীর কল্যাণী মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গেছে। মাকেও বলতে শুনেছে কেউ যে এত দরদ দিয়ে সেবা করতে পারে তা আগে জানতাম না। নীলা আমার আর এক মেয়ে। জীবনে দুঃখ, কষ্ট, আঘাতের পর আঘাতে মন যখন অসাড় হয়ে গিয়েছিল, সে সময় সে পেলো সুব্রতের আহ্বান—পেলো মায়ের স্নেহ-ভালবাসা, মনের গভীরে প্রতিনিয়ত উঠলো আলোড়ন। দ্বন্দ্বে-দ্বন্দ্বে হলো ক্ষত-বিক্ষত।

আজ সেই ঝড়ের রাতের হ'ল অবসান—হ'ল পরাজয়।

ইস্ ঘরের মধ্যে কত রোদ এসে গেছে।

এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে আছে? গতরাত্রের কথা মনে হ'ল। হ্যাঁ অনেক রাত পর্যন্ত সে ঘুমোতে পারেনি। মাথায় জল দিয়েছে অনেকটা, তারপর ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। যাক আজ সকালে তার ডিউটি নেই এই রক্ষে।

স্নান সেরে এলো নীলা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে নিজেকে ভাল করে দেখল—দেখে অবাক হয়ে গেল—না কোন ক্লান্তির ছাপ নেই। মনটা বেশ হাল্কা হয়ে গেছে।

৫।৭ মিনিট লাগে যেতে, তবু সন্ধ্যে ছ'টার পর থেকেই নীলা হাতের টুকিটাকি কাজ সেরে নিয়ে প্রস্তুত হ'তে থাকে।

আয়া কফি ও টোস্ট দিয়ে গেল। যেদিন নাইট ডিউটি থাকে, সেদিন এর বেশি সে খেতে পারে না।

নীলা নার্সিংহোমের দিকে এগিয়ে চলল। স্টাফ-রুমে নীলা হাতের ব্যাগটা টেবিলে রেখে বসার উপক্রম করছে এমন সময়—দিদিমণি আপনাকে কর্নেল সাহেব ডাকছেন, বেয়ারা জানিয়ে গেল।

আসব?

এস।

এস বলেই কর্নেল ভট্টাচার্য হাতের কাজে আবার মন দিলেন।

এই একটি লোক, যিনি ঘড়ির কাঁটার তালে তালে চলেন। নীলার মনে পড়ে না কখনও এঁকে চুপ করে বসে থাকতে দেখেছে। এই সৌম্যমূর্তির সামনে সকলের মাথা সম্ভ্রমে নত হয়ে যায়।—শোন নীলা, দু' নম্বর কেবিনের একটি রুগীকে তোমায় দেখতে হবে। ব্রেনে আঘাত লেগেছে একটু বেশিরকম সেজন্যে ভালভাবে আজ রাতটা 'ওয়াচ' করতে হবে। প্রয়োজন বোধ করলে আমায় ডেকো।

এই রুগী আজ ভর্তি করা হয়েছে স্যার?

হ্যাঁ, আজ রাতটা একটু ভয়ের। নীলা, তোমার উপর ভরসা রাখি। এই নাও রিপোর্ট ও টেম্পারেচার চার্টের সীট।

নীলার অস্ফুট স্বর শোনা যায়—'অরুণ রায়।'

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় নীলা।

কে এই অরুণ রায়?

কি হ'ল পা দু'টো এর মধ্যে যেন অসাড় হয়ে গেল? একটু আগে যখন কোয়ার্টার্স থেকে হোমের দিকে সবুজ ঘাসের 'লনে'র উপর দিয়ে আসছিল, মনে হয়েছিল সব মাটি মাড়িয়ে সে যেন চলছে না।

ফিকে নীল আলোয় কেবিনটা যেন কিরকম হয়ে আছে। রুগীর জ্ঞান নেই। মাথায় ব্যাণ্ডেজ করা। মুখের কিছু অংশ ঢাকা পড়েছে। মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় না। খোচা খোচা গোঁফ-দাড়িতে সারা মুখ ভর্তি।

নীলা নিজের বুকের স্পন্দন যেন নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছে। না না, নার্ভাস হলে চলবে না। তার সামনে রুগীর জীবন-মরণ সমস্যা।

আজ রাতটা কাটলে আশা হবে।

ডাঃ ভট্টাচার্যের কথা মনে হল—নীলা, তোমার উপর আশা রাখি।

নীলা তো কোনদিনই কাজে অবহেলা করে নি। এই

রুগীর টেম্পারেচার নিয়েছে—না, আর বরফ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ভালই মনে হচ্ছে।

বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে জলের ট্যাপ খুলে নীলা চোখে-মুখে জল দেয়।

সামনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এই কি অরুণ? এই দশ বছর সে কোথায় ছিল?

হঠাৎ এল কোথা থেকে?

অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে নার্সিংহোমের ঘড়িতে দুটো বাজল। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। দূরে রাস্তায় একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে।

উঃ মা—গো।

নীলা ছুটে এল।

না—পালস ভাল। বোধ হয় বিপদ কেটে গেল। আর কোন সাড়া নেই। সম্পূর্ণ জ্ঞান এখনও ফেরে নি। পাশেই ইজিচেয়ারটায় বসল নীলা। অন্যদিন রুগী ঘুমোলে নীলা এখানে বসে বই পড়েছে, আর আজ?

আজ সকালেই সুব্রতর কথামত—সে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়েছে। খুব সম্ভব দু'একদিনের মধ্যে ছুটি মঞ্জুর হয়ে যাবে।

একদিন এই অরুণ তাদের কত অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে চলে যায়। নীলার প্রতি অরুণ কি কর্তব্য করেছে?

অরুণ তার জীবনে বিভীষিকা। অরুণকে কে চেনে? নীলা যদি অস্বীকার করে?

দশ বছর আগের নীলা আর নেই। নতুন করে তার জন্ম হয়েছে।

না—না সুব্রত তার বন্ধু। সুব্রত তার সব। সে এনে দিয়েছে শান্তি। তারা দেখেছে স্বপ্ন। সে স্বপ্ন চলেছে সত্যি হতে, বাস্তবে রূপায়িত হতে। নীলা সুব্রতকে ভুলতে পারে না—তাকে অস্বীকার করতে পারে না।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। আস্তে আস্তে রুগীর জ্ঞান ফিরে আসছে।

নীলা ফিডিং কাপে জল ধরে রুগীর মুখে।

অরুণের বিস্ফারিত চোখ দু'টি নীলার মুখের 'পরে স্থির হয়ে যায়।

ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে—নী-লা।

দশ-দশ বছর পরে।

চোখের কোলে জল গড়িয়ে যায়।

নীলার রাতের স্বপ্ন নিমেষে টুটে যায়।

পাশাপাশি

লাবণ্য পালিত

রাতের তারা তুমি
আকাশ হ'ব আমি,
সাজাবে নানা সাজে সোনালী ফুল।
আমার এলোচুলে, সাজাবে ফুলে ফুলে,
গলায় দোলাবে হার কানেতে দুল॥

বাতাস তুমি হও···
ধীরে সে কথা কও,
চাঁপার গন্ধটুকু বুকেতে নাও···।
রাতের সমীরণে—
ডেকো গো বাতায়নে···
মধুর পরশেতে ভরিয়ে দাও॥

তুমি গো হও নদী
দেখিব নিরবধি···
তরীটি আমি হব তোমার কূলে।
গাহিবে মিঠে গান···
শুনিব সুর তান···,
ছন্দে ছন্দে তালে রহিব দুলে॥

আনন্দমুখর আটটি দিন

বন্দনা মুখোপাধ্যায়

গত মার্চ মাসে বাইরে যাওয়া ঠিক হোল। এবারকার বেরোনোর মধ্যে কিন্তু একটু বৈচিত্র্য ছিল, কারণ সমস্ত ভ্রমণটাই করেছিলাম মোটরে। এটা সম্ভব হয়েছিল অবশ্য আমার স্বামীর এক বাল্যবন্ধুর জন্যে, তাই ভ্রমণকাহিনী আরম্ভ করার আগেই তাঁর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একটি নামকরা চা-বাগানের এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার আমার স্বামীর এই বন্ধুটি এবারকার ছুটিতে তাঁর নতুন গাড়ি নিয়ে আসাম থেকে কোলকাতায় এসেছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হোল রাঁচীতে কিছুটা জমি কিনবেন।

তাই তাঁরই উৎসাহে আমরা ১লা মার্চ সকাল সাতটায় কোলকাতা ছাড়লাম। যাত্রীর মধ্যে আমরা দু'জন, আমার স্বামীর বন্ধুরা—স্বামী, স্ত্রী—রঞ্জন, বীণা, তাদের ছোট্ট মেয়ে রঞ্জনা আর তার প্রাণের বন্ধু 'বউ-বউ'—একটি

বি-টি রোড ধরে বিবেকানন্দ ব্রীজ পেরিয়ে এলাম। ক্রমশই মিলিয়ে এল কর্মব্যস্ত মহানগরীর কোলাহল। ব্যাণ্ডেল ছাড়িয়ে কিছুটা আসার পর লোকের ভিড় কাটিয়ে ফাঁকা রাস্তায় পড়া গেল। সকালবেলার রোদে চারিদিক ঝলমল করছে, একঘেয়ে জীবনযাত্রার থেকে ছুটি পেয়ে সকলের মনই তখন খুশিতে ভরা। বীণা ধরে বসল গান গাইতে হবে। প্রথম শুরু করেছিলাম—

'আজ কি তাহার বারতা পেল রে'

তারপর সারা রাস্তাই আমায় গান গাইতে হয়েছে। ঘণ্টা তিনেক ড্রাইভ করার পর গাছের ছায়ায় কিছুটা বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তারপর সেখান থেকে সোজা এসে থেমেছি 'বর্ধমান' রেলওয়ে স্টেশনে। খেতে বসেছিলাম সকলে, কর্তা বললেন যে তিনি কষ্ট করে খবর নিয়ে এসেছেন দুর্গাপুরে নতুন 'ট্যুরিস্ট লজ' খুলেছে, রাত্তিরটা সেখানেই কাটান যাবে। তারপর দুর্গাপুর ব্যারেজের ওপরকার সংক্ষিপ্ত রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি রাঁচী পৌঁছান যাবে। কাজেই খাওয়া এবং বিশ্রামের পালা শেষ করে আমরা দুর্গাপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম এবং খুঁজে-পেতে 'ট্যুরিস্ট লজ'-ও বের করা গেল। কিন্তু হলে কি হবে, কর্তা মশায়ের খবর নেওয়ার চেষ্টায় তিনি নিজে এবং আমরা সকলেই একমাস আগে থাকতে 'এপ্রিল ফুল' হয়ে গেলাম। খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে সেটা খোলা হবে আট তারিখে। তখনও তার ভেতরে মিস্ত্রীরা তাদের কাজের শেষ ছোঁয়া দিচ্ছিল।

রঞ্জনবাবু বললেন, যা 'ট্যুরিস্ট লজ' দেখালে বাবা, না-জানি আরও কত কিছু দেখাবে।

'ট্যুরিস্ট লজে'র বহির্দৃশ্য দেখে কিন্তু চোখ জুড়িয়ে গেল। সামনে দিয়েই বয়ে চলেছে দামোদর। বিকেলের আবহাওয়ায় তার শান্ত রূপ দেখে ভাবলাম, এই কি সেই রুদ্রমূর্তি দামোদর, যার বন্যা রোধ করবার জন্যে এত মানুষের এত প্রচেষ্টা? জায়গাটায় থাকতে ভারি ভালো লাগছিল, তাই ঠিক করা গেল ভেতরে থাকতে না পারলেও বাইরেই কিছুক্ষণ কাটিয়ে যাওয়া যাক। রঞ্জনাও গাড়ির মধ্যের বন্দীদশা থেকে ছাড়া পেয়ে মহা উৎসাহে লজের সামনে বিছানো নুড়ি নিয়ে খেলা আরম্ভ করে দিয়েছিল। কর্তারা বললেন, থামাই যখন হোল, কফি তৈরি কর।

সেখান থেকে বেরিয়ে আসানসোলের পথ ধরলাম। রাতের একটা আস্তানা খুঁজে বের করতে হবে, কিন্তু কোথায় তা জানি না। সূর্যদেব তখন পাটে বসেছেন। চারিদিকে সন্ধ্যার আয়োজন চলেছে। সারাদিন গরম ভোগ করার পর তখনকার আবহাওয়াটা বড় সুন্দর লাগছিল তাই নিজের মনেই গান ধরেছিলাম—

আমাদের মনেও তখন কবির সেই ছন্দ বাজছে—

'এখন আকাশ ম্লান হল, ক্লান্ত দিবা চক্ষু বোজে—
পথে পথে ফেরাও যদি মরব তবে মিথ্যা খোঁজে।'

কিন্তু খোঁজা আমাদের মিথ্যা হয় নি। শেষ পর্যন্ত 'কুন্টি'তে এসে 'কুন্টি হোটেলে' জায়গা পেয়ে গেলাম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চমৎকার হোটেল।

২রা মার্চ। সকালে স্নান ও প্রাতরাশের পালা শেষ করে আবার সুরু হোল আমাদের পথ চলা। চলার পথে বৈচিত্র্যের স্বাদ গ্রহণ করলাম 'মাইথন' ড্যাম দেখে। মাইথনে অবশ্য আমরা নামি নি, গাড়ি থেকেই উপভোগ করেছি সেখানকার অপূর্ব দৃশ্য। তার পাথর-কাটা আঁকাবাঁকা পথ ধরে গাড়ি চালান রঞ্জনবাবু খুব উপভোগ করছিলেন আর আমরাও প্রাণভরে মিটিয়ে নিচ্ছিলাম দৃষ্টির ক্ষুধা, কাজেই মাইথন ড্যামের ওপরকার পথ ধরে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আবার গাড়ি ঘুরিয়ে ধানবাদের পথ ধরলাম। ধানবাদ পেরিয়ে 'চাস' রোড ধরে মুরী পৌঁছতে প্রায় বেলা ১টা বাজল। মুরী ছাড়ার পর সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ রাঁচী পৌঁছলাম।

কালের গতির সঙ্গে সবকিছুর ভেতরেই আসছে পরিবর্তন। রাঁচীর রূপটাকেও চোখের সামনে বদলে যেতে দেখলাম। আমাদের ছোটবেলাকার সে শান্ত ছবি আর নেই। চারিদিকে শ্রমশিল্পের বিকাশ তাকে যেন ক্রমশই যন্ত্রিত করে তুলছে। আসলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে রঞ্জনবাবু রাঁচীতে এসেছিলেন তার কিন্তু কিছুই হোল না। রাঁচীর বর্তমান অবস্থা দেখে তিনি সেদিক দিয়েও গেলেন না। এর আগেও তাঁরা এখানে এসেছেন, কাজেই দেখার আকর্ষণ বিশেষ কিছু ছিল না।

৩রা মার্চ। এদিন গেলাম 'দশনঘাঘ' ঝর্ণা দেখতে। 'দশনঘাঘে'র পথ ধরেই তৈরি হচ্ছে রাঁচী-জামসেদপুরের হাইওয়ে। তাই বেশ কয়েক মাইল, প্রধান রাস্তার থেকে বিচ্ছিন্ন করা উঁচুনীচু রাস্তার ভেতর দিয়ে খুব কষ্ট করে ড্রাইভ করার পর আমরা একটা বাঁকের মুখে এসে পড়লাম। সেখান থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে 'দশনঘাঘে'র পথ বেঁকে গেছে সাঁওতাল বস্তির ভেতর দিয়ে। দশটা ধারা থাকার জন্যে ঝর্ণাটার নাম হয়েছিল 'দশনঘাঘ'। কিন্তু তার সবগুলো এখন আর নেই। আমরা ছ'টা ধারা দেখতে পেলাম। যাত্রীদের সুবিধার জন্যে পাহাড়ের গা কেটে তৈরি হয়েছে সিঁড়ি আর জায়গায় জায়গায় একেকটা রেলিংঘেরা চত্বর—সেখানে থেকে ঝর্ণার দৃশ্য উপভোগ করা যায়। ওপরে একটি ছোট রেস্ট হাউসও আছে।

৪ঠা মার্চ। এ তারিখটাও আমরা রাঁচীতে কাটালাম। সেদিন গিয়েছিলাম 'হাতীয়া' দেখতে। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না জঙ্গল কেটে কি চমৎকার একটা শহর গড়ে উঠতে চলেছে। সব কাজ শেষ হয়ে গেলে জায়গাটার নাম রাখা হবে 'জগন্নাথ নগর'। নামটা রাখার একটা তাৎপর্য আছে। কারণ জগন্নাথ পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠছে এই শহর, যার তলায় প্রতিবছর রাঁচীর বিখ্যাত রথের মেলা বসে।

৫ই মার্চ। রাঁচীতে আর ভালো লাগছে না, সকাল আটটায় তাকে বিদায় জানিয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। এবারকার লক্ষ্য হোল রাজগীর আর নালন্দা। রাঁচী থেকে হাজারিবাগের পথে পড়ে 'চুটুবালুর' ঘাট। আগেও বহুবার এই ঘাট পেরিয়েছি কিন্তু পাহাড়-কাটা উঁচু রাস্তার ওপর থেকে সুদূর বিস্তৃত উপত্যকার শোভা আমার কাছে কোনদিনই পুরোন হয় নি। আবার নতুন করে তাকে উপভোগ করলাম। গাছে গাছে পলাশের সমারোহ যেন বনের মাঝে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। রামগড় পেরিয়ে আসার পর অল্পক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম হাজারিবাগে, তারপর একেবারে এসে থেমেছি তিলাইয়া ড্যামে। এতক্ষণ ড্রাইভ করার পর বড় সুন্দর লাগল তিলাইয়ার সুন্দর শান্ত পরিবেশ। তার ছবির মত দৃশ্যকে সামনে রেখে আমরা রেস্ট হাউসের বারান্দায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম।

তারপর আবার যাত্রা শুরু। দু'পাশে কোডারমার গভীর জঙ্গল, তার মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সুন্দর পিচঢালা রাস্তা। রঞ্জনবাবু বললেন, এরকম রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে ভারি আনন্দ পাওয়া যায়। ফেরবার সময়ও আমরা এই পথেই ফিরব।

কিন্তু তখনও জানি না কি বিপদ আমাদের কপালে লেখা আছে। গয়া জেলায় পড়বার পর থেকেই শুরু হোল অসম্ভব গরম ধুলোর ঝড়। গাছপালার সংখ্যা খুবই কম, দু'দিকে ধু-ধু করছে শুধু শুকনো প্রান্তর। তার মার্চ মাসের রুদ্র রূপ দেখে এপ্রিল-মে'র কথা কল্পনা করতেও ভয় হচ্ছিল। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিলাম কেন এখানে গরমের দিনে লোক মারা যায়। রাজৌলি পেরিয়ে নওয়াদার আগে আমরা বাঁ-দিকের রাস্তা ধরলাম। কারণ এটাই গয়া জেলার ভেতর দিয়ে রাজগীর যাবার সংক্ষিপ্ত পথ।

তিনটে নাগাদ রাজগীর পৌঁছলাম। এবারে রাঁচী থেকেই সার্কিট হাউসে থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, কাজেই সোজা সেখানে এসেই নামলাম। রাজগীর পৌঁছানর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা নালন্দা দেখব বলে বেরিয়ে পড়লাম। নালন্দার পথে কিছুদূর এগিয়ে দেখা গেল যে পেট্রল যতটা রয়েছে তাতে ফিরে আসা যাবে না। কিন্তু ধারে-কাছে কোথাও পেট্রল স্টেশন না থাকায় আমাদের বিহারশরিফ পর্যন্ত যেতে হোল। পেট্রল নিয়ে আবার নালন্দার পথ ধরলাম। কিছুদূর

আসার পর রঞ্জনা হঠাৎ 'বউ-বউ, বউ-বউ' করে কান্না জুড়ে দিল। খুঁজে-পেতে দেখি তার 'বউ-বউ' গাড়ির ভেতর নেই। আমি আর রীণা একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, সেই ফাঁকে কখন সে তাকে ফেলে দিয়েছে। তক্ষুণি গাড়ি থামান হোল। সকলেই মহা ভাবনায় পড়েছি, কারণ 'বউ-বউ' ছাড়া তাকে ভোলান অসম্ভব। কিন্তু একটু পিছিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম বেচারা 'বউ-বউ' তখন একটি ছোট ছেলের পায়ের লাথি খেতে খেতে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। তাকে ফিরে পেয়ে রঞ্জনার সে কি আনন্দ।

কিন্তু সবকিছুর পালা শেষ করে নালন্দায় পৌঁছে দেখি সেদিনকার মত তার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। অগত্যা ফিরে আসা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। রাজগীরে ফিরে স্নানের জন্যে কুণ্ডতে গেলাম, কিন্তু সেখানেও দেখি অসম্ভব তীর্থযাত্রীর ভিড়। সারাদিনের ক্লান্তির পর আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই সার্কিট হাউসে ফিরে স্নান করাই ঠিক করলাম।

৬ই মার্চ। সকাল আটটা নাগাদ আবার গেলাম নালন্দা দেখতে। যাত্রীদের দেখবার জন্যে ন'টার সময় গেট খুলে দেওয়া হয়। একটি গাইড সঙ্গে নিয়ে আমরা দেখা আরম্ভ করলাম।

ভূগর্ভস্থিত মহাবিহারের একটি পুরাতন প্রবেশ পথই এখন যাত্রীদের প্রধান প্রবেশ পথ। তার দু'দিকে মঠের প্রাচীর। প্রধান প্রবেশ পথের ভেতরকার আরেকটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে খানিকটা আসার পর আমরা একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পড়লাম। তার পশ্চিমদিক দিয়ে মন্দিরের এবং পূর্বদিক দিয়ে মঠের সারি চলে গেছে। কিন্তু প্রধান মন্দিরটিকে দেখা যায় তার বিশিষ্টতা বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণদিকের একপ্রান্তে। গঠনের দিক দিয়ে এইটিই সব থেকে বড় এবং দৃষ্টি আকর্ষক।

পরিকল্পনা এবং সাধারণ আকৃতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে সমস্ত মঠগুলি মোটামুটি প্রায় একইভাবে তৈরি। একটি টানা বারান্দার কোণ ঘেঁষে রয়েছে ছোট ছোট কক্ষের সারি। বারান্দাটির সম্মুখভাগ প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভের ওপর স্থাপিত। কক্ষগুলির ভেতরে প্রবেশ করলে একপাশে দেখা যাবে আরেকটি করে গুপ্ত প্রকোষ্ঠ। কক্ষগাত্রের একটি সরু এবং নীচু প্রবেশ পথ দিয়ে এই প্রকোষ্ঠে যাওয়া যায়। গাইডের মুখে শুনলাম তখনকার দিনে জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া মূল্যবান জিনিসপত্র তাঁরা এই প্রকোষ্ঠে রাখতেন। কোন এক সময় মঠে আগুন লেগে যাওয়ার ফলে সন্ন্যাসী এবং ছাত্রগণ কিছু সময়ের জন্যে মঠ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। পুড়ে যাওয়া কাঠের কড়ি-বরগা, দরজা, মূর্তি এবং শস্যের ধ্বংসস্তূপের ভেতর এখনও তার

মঠ দেখা শেষ করে আমরা মন্দিরগুলি দেখলাম। প্রধান মন্দিরটি একটি দৃঢ় এবং বিশাল স্থাপত্যের নিদর্শন। তার চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে বহু ছোট ছোট স্তূপ। গাইডের কাছে শুনলাম অনেকগুলি মন্দিরকে একই জায়গায় দু-তিনবার করে গড়ে তোলা হয়েছে। খনন কার্যের দ্বারা দেখা গেছে যে, অতি ক্ষুদ্র মূল মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ওপর পরবর্তীকালে বর্দ্ধিত আকারে মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে এবং এইভাবেই তার আকার ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে একটি পর্যায়ের মন্দির খুবই চিত্তাকর্ষক এবং সযত্ন রক্ষিত। গাইডের কাছে জানতে পারলাম সেটি নাকি পঞ্চম পর্যায়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। এর চারদিকে চারটি স্তম্ভের ভেতর এখন তিনটিকে দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের সিঁড়ির পার্শ্বস্থ প্রাচীর গাত্র ও স্তম্ভগুলি সারিবন্দী কুলুঙ্গির দ্বারা শোভিত। আর তাদের মধ্যভাগে দেখা যায় অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের চিত্র। ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধিই এখন এখানকার প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু মন্দিরগুলি দেখতে দেখতে মনে হোল এক সময় হয়ত এর আকাশ-বাতাস মুখরিত করে বেজে উঠত সেই মহান মন্ত্র—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধর্মং শরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

খনিত স্থান দেখা শেষ করে আমরা সংগ্রহশালায় এলাম। এখানকার সংগৃহীত বস্তুর মধ্যে রয়েছে বহুসংখ্যক প্রস্তর আর ব্রোঞ্জ-এর তৈরি নানান দেব-দেবীর মূর্তি। বলা বাহুল্য তার মধ্যে বুদ্ধমূর্তিই বেশি। তা ছাড়া পাথর, তামা আর ইটের ওপর খোদাই করা বহু লিপি, কারুকার্য-খচিত ধাতু ও মাটির ফলক, কার্যক্ষেত্রে হিসাবে ব্যবহৃত নানারকম সীলমোহর আর মাটির বাসন-কোসন ইত্যাদি। মাটির বাসনের মধ্যে অনেকগুলি বিস্তৃত মুখ পাত্রের গায়ে দেখা যায় নানারকম জন্তু-জানোয়ার, ফুল ইত্যাদির কারুকার্য করা। আবার কতকগুলির ওপর চিক্ চিক্ করছে অভ্রচূর্ণ। সংগ্রহশালাটি দেখতে দেখতে ভেবে অবাক হতে হয় যে, কত যুগ আগেও ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতা কত উন্নত ছিল। নানান ভঙ্গিমায় ও নানান আসনে অধিষ্ঠিত মূর্তিগুলি ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। বুদ্ধমূর্তিগুলির বিভিন্ন মুদ্রার ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি।

হোস্টেলের চিঠি

স্বপ্না লাহিড়ী

মা—

শীতের আমেজ লেগেছে রোদ্দুরে,
তেরচা করে রোদ এসে পড়েছে,
পশ্চিমের ঝুল-বারান্দায়।
আমি জানি তোমার ওখানে
তুমি এখন বসে আছ কোচে।
তোমার কাঁচা-পাকা চুল খোলা,
ছড়ানো রয়েছে পিঠের ওপরে
হাতে রয়েছে, বই কিংবা পশম-কাঠি।
পায়ের কাছে শুয়ে প্যাঞ্জি, মাঝে মাঝে
পিট পিট করে দেখছে তোমার মুখের দিকে।
ধারের কোচে বাপি রয়েছে বসে, পাশে য়্যাশ্‌ট্রেতে
আধখানা সিগারেট জ্বলা।
বাপির কোলে খোলা রয়েছে,
আজকের আসা বাংলা কাগজের যাদুকর ম্যানড্রেক।
দরজার পাশের চেয়ারে বসে দিদি,
ধৈর্য ধরে পড়ছে, শহর কলিকাতার আদি-পর্ব-আর
মাঝে মাঝে দেখছে তেরচা চোখে প্যাঞ্জিকে
প্যাঞ্জি নির্বিকার।
কোণের রেডিও থেকে ভেসে আসছে বিলিতি সুর
তোমার কানে তখন বাজছে—তিনটি গলার কলরোল
বকতে গিয়েই নিজের মনেই হয় তো
হেসে ফেললে! দেখ তো কাণ্ড?
ওরা তো এখানে নেই—ঝগড়া করবে কারা—
বকব কাকে?
বাপি, কাগজ পড়তে পড়তে,
পাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখেন
টোব্যাকো পার্চ খালি।
আনমনা বাপি বলতে গেলেন—চিনার, তামাকটা
নিয়ে এসো তো বেটা।
তখনই মনে পড়লো—আরে! চিনার তো
বসে রয়েছে ন'শ মাইল দূরে!
তামাক খাওয়া হল না বাপির, কাগজ রেখে,
উঠে দাঁড়ালেন! অফিস যাবার সময় হলো!
প্যাটবুন নামটা কানে যেতেই—চমকে উঠলো দিদি
বলতে গেল, ওরে জয়—তোর প্যাটবুন।
বই রেখে উঠে দাঁড়ালো দিদি
জয়কে একটা চিঠি লিখতে হবে।
তোমাদের স্তব্ধ, সুষম ছন্দে ভরা দিনগুলি
উৎপাতে ভরে দিচ্ছে না সেই তিনটে ভূত
যারা আজ এই মুহূর্তে এম স্মি হোস্টেলের
এই ছোট্ট ঘরের দু'টো খাটে

বস্টন প্রবাসের দিন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণা বসু

ওয়াশিংটনে ছুটি

ওয়াশিংটনে যদি যেতেই হয় তবে চেরী-ব্লসম টাইমে যাও, বন্ধুবান্ধব সকলের মুখেই এক কথা। বসন্তকালেই ওয়াশিংটন রমণীয় হয়ে ওঠে। এপ্রিলের গোড়ায় 'শ' ঠিক করলে 'ভেকেশন' নেবে। আমেরিকানরা খুব ভেকেশন বিলাসী জাত। এরা খাটেও যেমন আসুরিক, তেমনি ছুটি উপভোগ করতেও জানে। সারা সপ্তাহ প্রাণান্ত পরিশ্রম করবে তারপরই বেরিয়ে পড়বে উইক-এণ্ড করতে, মোটরগাড়িতে পিকনিক বাস্কেট তুলে সপরিবারে চলল হয়ত বা সমুদ্রের ধারে। কিন্তু উইক-এণ্ড ছাড়াও বছরভোর পালা করে ঘুরে ঘুরে ভেকেশন নেয় সবাই, তখন পাড়ি দেবে দূরে, তেমন তেমন সংগতি থাকলে হয়ত যাবে য়ুরোপে।

আমাদের ভেকেশন আমরা ওয়াশিংটনে কাটাব স্থির করলাম। এপ্রিলের প্রথমে ওয়াশিংটনে চেরীফুল ফোটে, চেরীফুলের সৌন্দর্য ক্ষণিক। কিন্তু যে দশ-বারোদিন ফুলের বাহার থাকে ওয়াশিংটনের পথঘাট, ঘরবাড়ি, পাবলিক মনুমেন্টের আলাদা শ্রী দেখা দেয়। তা ছাড়া আবহাওয়ার দিক থেকেও চেরীফুল ফোটার এই দিন ক'টি চমৎকার। ওয়াশিংটনের নাগরিকেরা এইসময় আয়োজন করে চেরী-ব্লসম ফেস্টিভ্যাল বা চেরীফুলের উৎসব।

অতএব এপ্রিলের গোড়ায় একদিন বস্টন থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। বস্টন তখনো শীতে কাতর গাছপালা রিক্ত ফুলপাতার চিহ্নহীন। টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টির মধ্যে শীতে কাঁপতে কাঁপতে সাউথ স্টেশনে এসে বেশি রাত্রের দিকে একটা ট্রেনে চেপে পড়লাম।

রাত্রির অন্ধকার ট্রেনে পার হয়ে সকালবেলা ওয়াশিংটনে নেমেই মনে খুশির চমক লাগল। চারিদিকে গাছপালা স্নিগ্ধ, সবুজ যে কোন ভারতীয়ের চোখ জুড়িয়ে যাবার কথা। বিশেষ করে সে যদি বস্টনের তীব্র শীত আর রুক্ষ ল্যাণ্ডস্কেপ থেকে সবেমাত্র এসে থাকে। কোন শহরকে প্রথম ধাক্কায় ভাল লেগে গেলে তার সবকিছুই ভাল মনে হয়। ১৬নং স্ট্রীটের ওপর যে হোটেলে উঠলাম তার ঘরখানা ভাল লাগল, ছিমছাম করে সাজানো। দেয়ালের গায়ে উত্রিলোর দু'খানা ছবি। হোটেল রুজভেল্ট—নামটাও যেন মনে হল বেশ।

স্টেশন থেকে আসবার সময় এক দীর্ঘকায় নিগ্রো ট্যাক্সি ড্রাইভারের ট্যাক্সিতে চড়ে আমি সারাটা পথ একটু সশঙ্কিত হয়ে বসেছিলাম। নিকষ কালো রং, পুরু ঠোঁট, গোল চোখ, কদমছাঁট চুল, পেশীবহুল চেহারা। আমার দিক থেকে দু-একটা আড়ষ্টমত হুঁ-হাঁ জবাব পেলেও নিরুৎসাহ না হয়ে সারা পথ মিঃ মূর আপনমনে বক্‌বক্ করে চলেছিল। একসময় হঠাৎ ফস্ করে একটা পকেটবই অর্থাৎ কি না

মনিব্যাগ বার করে একটি ক্ষুদ্র ছবি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে সলজ্জভাবে বললে, আমার মেয়ের ছবি—মাসখানেক বয়স হল। কোন ভীষণ-দর্শন ব্যক্তির চেহারায় যে এমন আশ্চর্য কমনীয়তা ফুটে উঠতে পারে, মিঃ মূরকে না দেখলে আমার জানা হত না। ঠিক সেই মুহূর্তে তার কালো চেহারা আলো করে ফুটে উঠল এক কোমল, স্নেহশীল পিতৃহৃদয়। ওয়াশিংটনের রাজপথে দেখা পেলাম যেন কাবুলিওয়ালার আমেরিকান সংস্করণ।

সেই থেকে মিঃ মূর আমাদের বেজায় বন্ধু হয়ে পড়ল। কোথায় কোথায় যাবে তোমরা, কি দেখবে ওয়াশিংটনের বলো—আমিই নিয়ে যাব। ঘন ঘন টেলিফোন করে, আজ কি প্রোগ্রাম? আমার ক্যাব নিয়ে আসব কি?

বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস যে আমাদের ভারতীয়দের মন স্পর্শ করে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? বস্টনের পথে-ঘাটে এ সংগ্রামের অনেক চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। বস্টন ছাড়া আর যে দু'টি শহরে গিয়ে ওদের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনগুলি বিশেষভাবে মনে পড়েছিল তার একটি হল ফিলাডেলফিয়া অন্যটি এই ওয়াশিংটন।

লিঙ্কন মেমোরিয়ল পিছনে ফেলে পোটোম্যাক নদীর ওপর সেতু পার হয়ে মিঃ মূর তার ক্যাব হু-হু করে ছুটিয়ে দিলে। চলেছি মাউণ্ট ভেরনন্, জর্জ ওয়াশিংটনের বাসগৃহ দেখতে। ওয়াশিংটন থেকে মাউণ্ট ভেরনন্ রাজ-পথের দু'পাশে প্রাকৃতিক দৃশ্য বাস্তবিক সুন্দর। পথের মধ্যে ম্যারিন মেমোরিয়ালের সামনে গাড়ি দাঁড় করালো মূর সাহেব। আমেরিকার নৌবহরের সম্মানে উৎসর্গীকৃত বিরাট ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য। কয়েকটি নাবিকের মূর্তি, আমেরিকার জাতীয় পতাকা স্থাপন করার ভঙ্গিতে। আশ্চর্য বলিষ্ঠ ও জীবন্ত শিল্পকীর্তি।

মাউণ্ট ভেরননে ওয়াশিংটনের এস্টেট অনেকটা আমাদের দেশ-গাঁয়ের জমিদার বাড়ি আর কি। অনেকখানি জমিজমার মাঝখানে দোতলা বাসগৃহ। ঘরগুলি সব সযত্নে রক্ষিত। জর্জ ওয়াশিংটনের নিজের শোবার ঘর, মার্থা ওয়াশিংটনের আগের পক্ষের নাতি-নাতনীদের জন্য বাচ্চাদের ঘরে পাতা ছোট খাট, ওয়াশিংটনের লাইব্রেরী সেখানে তার ব্যবহৃত ডেস্ক ও চেয়ার, বসবার ঘর, খাবার ঘরে টেবিলপাতা, প্যান্ট্রিতে মার্থার প্রিয় নীল ও সাদা কাচের বাসনের সেট। মনে হয় বাড়ির কর্তা-গিন্নি-ছেলেমেয়ে বাইরে গেছে এখুনি ফিরবে। বাইরে আলাদা রান্নাবাড়ি, এ কিছু মডার্ন আমেরিকান কিচেন নয়—বেশ এলাহি ব্যাপারের ব্যবস্থা।

অবশেষে একপাশে ছোট সমাধি মন্দির' জর্জ ও মার্থার দেহাবশেষ বহন করে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুরে ঘুরে সবটা দেখতে সময় মন্দ লাগে না। কিন্তু সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পেলাম না। মনে হল আমেরিকার ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের পাতা উল্টে যাচ্ছিলাম এতক্ষণ।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৭৫ খৃস্টাব্দে। আট বছর পর সেনাপতি পদে অবসর গ্রহণ করে মাউন্ট ভেরননের নির্জনতায় ফিরে এলেন। কিন্তু আবার ডাক পড়ল ফিলাডেলফিয়াতে কয়েক বছরের মধ্যে। এরপর ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্টের পদে বৃত হলেন জর্জ ওয়াশিংটন। ইচ্ছা করলেই তিনি যাবজ্জীবন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন। কিন্তু দু'টো টার্ম-এর বেশি প্রেসিডেন্ট পদে থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি এই নির্লোভ ও মহৎ মানুষটি। তাই ১৭৯৭ খৃস্টাব্দে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে আবার এলেন তাঁর প্রিয় বাসগৃহ মাউন্ট ভেরননে। এখানেই মৃত্যু পরের বছর।

শোনা যায় ১৭৯১ খৃস্টাব্দে নতুন রাজধানী হিসেবে ওয়াশিংটন শহরের পত্তন করা হবে বলে যখন স্থির হল তখন এই শহরের নাম 'ওয়াশিংটন' রাখা নিয়ে প্রবল আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

মাউন্ট ভেরননের ঠিক বাইরেই কাফেতে বসে কফি ও স্ন্যাক্স অর্ডার দিলাম। পরিচারিকাদের পরনে ওয়াশিংটনের আমলের সুদীর্ঘ ঝুলওয়ালা পোষাক। কফির অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে আমরা বলাবলি করছিলাম, হেনরি লীর কথাগুলো খুবই সত্য—

'যুদ্ধেও প্রথম, শান্তিতেও প্রথম, তাঁর দেশবাসীর হৃদয়েও প্রথমতম, ব্যক্তিগত জীবনের ছোটখাট, স্নেহবৎসল মুহূর্তগুলিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।'

ফিরতি পথে আরলিংটন সমাধিক্ষেত্রে অজ্ঞাতনামা সৈনিকের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম আমরা। প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও কোরিয়ার যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এটি নিবেদিত।

উৎকীর্ণ করা আছে সমাধির গায়ে—

'এখানে শায়িত রয়েছে এক আমেরিকান সৈনিক যার পরিচয় একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।'

একজন শান্ত্রী দিনরাত্রি পাহারা দিচ্ছে এখানে, শান্ত্রী বদল হয় থেকে থেকে। নীরব দর্শকের ভিড় গাম্ভীর্যপূর্ণ শান্ত্রী বদলের অনুষ্ঠান দেখে দাঁড়িয়ে।

ওয়াশিংটনের স্মৃতিপূত মাউন্ট ভেরননের পরেই যেখানে গিয়ে আমেরিকার জনসাধারণের ইতিহাস-সচেতন মনের পরিচয় আবার পেয়েছিলাম তা হল লিঙ্কন মেমোরিয়াল ও লিঙ্কন মিউজিয়াম। সার-সার স্তম্ভে ঘেরা লিঙ্কনের স্মৃতিসৌধের স্থাপত্যের মধ্যে এমনিতেই একটা অনাড়ম্বর গাম্ভীর্য ও বলিষ্ঠতা আছে। সেটা আরো বেশি অনুভবে আসে স্মৃতিমন্দিরের ভেতর দাঁড়িয়ে চেয়ারে-বসা লিঙ্কনের বিরাট মূর্তির সামনে দাঁড়ালে। উনিশ ফিট দীর্ঘ এই মার্বেলের মূর্তিটি ভাস্কর ডেনিয়েল চেস্টার ফ্রেঞ্চের এক অবিস্মরণীয় মাস্টার-পিস্। সুতীক্ষ্ণ নাক, কোটরগত জ্বল-জ্বল চোখ, দাড়ি, লম্বাটে কৃশমুখে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ—মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল এ চেহারা ভাস্কর্যে খোলেও ভাল।

১০ নং স্ট্রীটের ওপর সাদাসিধে দেখতে বাড়ি লিঙ্কন মিউজিয়াম। ১৮৬৫ সালের ১৪ই এপ্রিল কিন্তু এই সাধারণ বাড়িটি ছিল ফ্যাসনেবল ফোর্ড থিয়েটার। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন ও তাঁর পত্নী এসেছেন থিয়েটার দেখতে। তৃতীয় অঙ্ক চলছে, সকলের চোখ স্টেজের ওপর এমন সময় প্রেসিডেন্টের বক্সে জন বুথ নামে এক অভিনেতা সন্তর্পণে প্রবেশ করল, পরমুহূর্তে একটা গুলীর আওয়াজ হল, প্রেসিডেন্ট তাঁর চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন।

নাটকীয়ভাবে আততায়ীর হাতে লিঙ্কন যেখানে প্রাণ হারালেন সেই ফোর্ড থিয়েটার আজ লিঙ্কন মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে। সেখানে লিঙ্কনের জীবনের সঙ্গে যুক্ত নানা দলিল, চিঠিপত্র, ছবি সব রয়েছে। রয়েছে সেই ভয়ঙ্কর পিস্তল, বুথ পালাবার সময় স্টেজে লাফিয়ে পড়ে যখন তখন তার বুটের সঙ্গে জড়িয়ে যায় বক্সের মাঝখানের পতাকা, সেটাও রয়েছে। বুথ কোন্ পথে গিয়েছিল পায়ের দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা আছে দর্শকের জন্য।
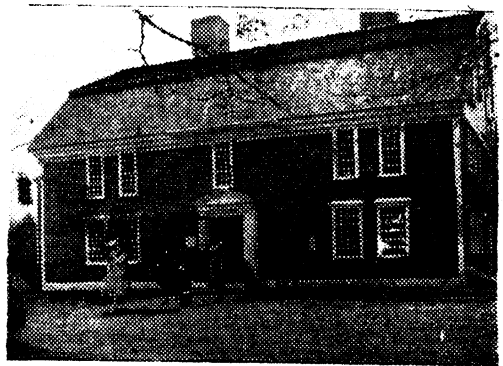
● লংফেলোর কবিতায় অমর হয়ে আছে ওয়েসাইড-ইন

লিঙ্কন মিউজিয়ামের ঠিক সামনের বাড়িটিও ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে রক্ষিত আছে। ১৪ই এপ্রিলের সেই রাত্রেই এই বাড়ি ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করে। আহত প্রেসিডেণ্টকে হোয়াইট হাউসে নেবার চেষ্টা বৃথা জেনে ডাক্তাররা কোনমতে তাঁকে সামনের বাড়ির একতলার শোবার ঘরে নিয়ে এলেন। যেখানে মৃত্যুশয্যায় প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন, সামনের ঘরে শোকাতুরা প্রেসিডেণ্ট পত্নী আর পিছনের ঘরে চলছে ক্যাবিনেটের জরুরী মিটিং। পরদিন সকালে সব শেষ হয়ে গেল। মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করে যুদ্ধ সেক্রেটারী স্ট্যানটন্ বললেন—

Now he belongs to the ages

ওয়াশিংটনে আমরা পুরোপুরি ট্যুরিস্ট জীবন যাপন করতে সুরু করেছিলাম। কোনদিন যাই ক্যাপিটল দেখতে, কোনদিন হয়ত হোয়াইট হাউসের দর্শকদের ভিড়ে ঢুকে ঘুরে আসি ভেতরকার বিখ্যাত ঘরগুলোতে ব্লু, গ্রীন বা রেড রুম-এ। অবশ্য ওয়াশিংটনে আমার সবচাইতে প্রিয় যাবার জায়গা দাঁড়িয়েছিল ন্যাশনেল গ্যালারি অফ আর্ট। খুব সুন্দর গুছিয়ে সাজানো, তুলনায় বস্টন মিউজিয়াম মনে হল একটু এলোমেলো। একদিন যাওয়া হল জেফারসন মেমোরিয়াল, চারদিকে চেরীফুলের বাহার মাঝখানে সুদৃশ্য স্মৃতিসৌধ। আর পাঁচশ' পঞ্চান্ন ফিট দীর্ঘ ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল তো এড়িয়ে চলার উপায় নেই। আসতে-যেতে সবদিক থেকেই চোখে পড়ছে।

হয়ত ওয়াশিংটনে আমাদের শুধু ট্যুরিস্ট ভ্রমণের স্মৃতিই থেকে যেত। কিন্তু তা হতে দিল না মার্গারেট গ্রীয়ার। গ্রীয়াররা আমাদের এক বস্টনিয়ান বন্ধু-পরিবারের বন্ধু। মিঃ গ্রীয়ার একজন আইনজীবী, মার্গারেটদের বেশ স্বচ্ছল পরিবার। দু'টি শিশু-কন্যা ও দু'টি নিগ্রো পরিচারিকা নিয়ে ওদের সংসার। এই প্রথম সাধারণ আমেরিকান পরিবারের পরিচারিকা দেখলাম, তাও একটা নয় দু' দু'টো। একজন রাঁধে, আর একজন বাচ্চাদের দেখে। বস্টনে বড়জোর দেখেছি সপ্তাহে এক-আধবার আসে ক্লিনিং উওম্যান—ঘর-দোর পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যায়। মার্গারেট আমাকে বললে ওদিককার চেয়ে এদিকে ডোমেস্টিক হেল্প পাওয়া সহজ এবং সস্তাও।

মার্গারেট আমাদের ঘুরিয়ে দেখালো শহরের স্থানীয় বাসিন্দাদের পাড়া, তারপর পুরোন শহর জর্জ টাউন যেখানে ছোট ছোট খেলনা বাড়ির মত দেখতে বাড়ি, ছবির মত দেখায়। চলে আসার আগে একটা ভাল ডিনারের আয়োজন করলে মার্গারেট, রূপোর বাতিদানে মোমবাতি জ্বালিয়ে, টেবিল সাজিয়ে বেশ সমারোহ করে ক্যাণ্ডেল এক পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে যাওয়ায় আমাদের খুবই ভাল লাগল।

দেখতে দেখতে চেরী-ব্লসম ফেস্টিভ্যালের দিন এসে গেল। বিকেলে মহাসমারোহে শোভাযাত্রা বেরোবার কথা। এদিকে সকাল থেকে আকাশের অবস্থা সঙ্গীন। প্রথমে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত, তারপর সুরু হল স্লিট-বর্ষণ আর বিকেল বেলায় হয়ে গেল একচোট স্নো-ফল্। এসময় এরকম তুষারপাত অপ্রত্যাশিত। বহুদিন পর নাকি এইভাবে স্নো-ফল হয়ে চেরী ব্লসম ফেস্টিভ্যাল মাটি হল।

সেজন্য আমাদের মনে বিশেষ ক্ষোভ ছিল না অবশ্য। পরদিন দেখলাম তুষারের আঘাতে ম্লান হয়ে গেছে চেরীফুলের ক্ষণভঙ্গুর সৌন্দর্য। কিন্তু আমাদের বস্টন ফিরবার দিন এসে গেছে। ইউনিয়ন রেলওয়ে টার্মিনাল থেকে ছাড়ল আমাদের বস্টনগামী ট্রেন।

[আগামীবারে ওয়েলকাম হোম]

একান্ত

অমিতা ঘোষাল

বিদ্রোহী মন উধাও যে আজ কোনখানে
জানলো না কেউ গোপন মায়ায় কে টানে
ইন্দ্রনীল ঐ আকাশ পারের নন্দনে
সপ্তগ্রহের গভীর সুরের বন্ধনে।

জানলো না কেউ তোদের মাঝে এই আমি
স্তব্ধনিথর ক্ষণে ক্ষণে যাই থামি
বিদ্রূপ আর ভৎর্সনাতে দুর্বহ—
যতই আঘাত হানিস জীবন দুঃসহ।

জানি বৃথা বিফলতায় লজ্জাময়,
এই যে হৃদয় অত্যাচারে দুঃখে ক্ষয়।
যার বেদনার হিসাব কোথাও নেই ধরা
তারি লাগি আজকে আকাশ গান ভরা।

তারি লাগি বকুলশাখে ফুল জাগে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুলেখা দাশগুপ্ত

মা তুমি না খাবে বলছিলে। কাচ্চি বলল শিবানীর অন্যমনস্ক মুখের দিকে তাকিয়ে।

খাবো।

খাবার দেওয়া হয়েছে।

শিবানী উঠে দাঁড়াল।

মাথার কাঁটাগুলি টেনে টেনে ড্রেসিং-টেবিলের উপর ছুড়ে ফেলে খোঁপাটা খুলে ফেলল। বোধ হয় কাঁটাগুলি আলগা হয়ে গিয়ে ঘাড়ে-মাথায় ফুটছিল। নইলে খোঁপা খুলবার কোন দরকার ছিল না। খোলা খোঁপা ফের হাতে জড়িয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাচ্চি দেখল শিবানী ছাদের দিকে যাচ্ছে। বুঝল ওর কথা শিবানীর কিছুই কানে যায় নি। খাবো—উত্তরটা একটা যান্ত্রিক উত্তর মাত্র।

শিবানী ছাদে উঠে গেছে নিশিতে-পাওয়া লোকের মতো। তার মাথা এখন চিন্তা দিয়ে ঠাসা। সেখানে কোন কথা ঢুকছে না। কাচ্চি জানে আরো বহুক্ষণ ঢুকবে না। ফের ছাদে গিয়ে শিবানীকে খাবার তাগিদ দিয়ে লাভ নেই। যখন নেমে আসবার তখন সে আপনি নেমে আসবে। এখন ওকে অপেক্ষা করতে হবে।

এই এখনটা যে কতক্ষণ তা বলা কঠিন। হতে পারে দু'ঘণ্টা। হতে পারে একঘণ্টা। হতে পারে রাত তিনটে—হ্যাঁ, রাত তিনটেও হতে পারে।

এমন অনেক হয় শিবানীর। কখন হবে এ রকম—ডাক্তার যেমন রোগীর চোখের ঘোর থেকে জ্বর কত উঠবে বুঝতে পারে—কাচ্চি তেমনি শিবানীর চোখের রং দেখলে বুঝতে পারে। আজ তার বোঝা উচিত ছিল। অবশ্যি তা হলে কাচ্চি তার অনেক আগেই ছাদে উঠে যাবে। বসে থাকবে শিবানীর পেছনটিতে, নয় তো আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে তার কাছে-ধারে।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। বর্তমানে কাচ্চির অনেক কাজ। রাত দশটা বেজে গেছে। বাবুর্চি খানসামার হাজিরার কাজ। সকাল ছ'টায় আসে রাত দশটায় চলে যায় তারা। তারপর ইন্দ্রনাথের খাবার তদারক করে আবদুল। শিবানীর কাচ্চি।

শিবানীর খাবার টেবিলে সাজানো রয়েছে। সেগুলি তুলে রাখতে হবে। যখন শিবানী নেমে আসবে, ফের গরম করে পরিবেশন করবে। সাহেব আজ আর খাবেন বলে মনে হয় না। তবু আবদুল কিছু ফ্রাই ফ্রিজে রেখে গেছে তুলে। যদি হঠাৎ সাহেব রাতে-বেরাতে ফিরে খাবার চেয়ে বসে তবে যেন অসহায় বোধ না করে—আবদুল সে বিষয়ে দু-একবার ঠেকে গিয়ে এখন খুব সচেতন। ডিনারের নেমন্তন্ন আছে, খাবো না বলে গিয়েও সাহেব—রাতে-বেরাতে খাবার চেয়ে বসেন, এমনও হামেশাই ঘটে। তাই আবদুল কিছু না কিছু খাবার তুলে রাখেই।

টেবিলের সাজানো খাবার তুলে রাখতে রাখতে কাচ্চির এতো দুঃখ হতে লাগলো! আজ সে বড় আহ্লাদ করে মেনু করে দিয়েছিল। কত মাথা খাটিয়েছিল। কচি আমের অম্বল খেলে শরীর ঠাণ্ডা হয়।

তাই সে গ্রীষ্মের দাপট দেখে কচি আমের অম্বল

করতে দিয়েছিল। বাটিভরা অম্বল তেমনি পড়ে রইল। কাল বাবুর্চি মোছের তলায় হাসবে। বলবে, তুমি খেয়ে ফেল আম্মা। শরীর এমন ঠাণ্ডা হবে যে, তোমায় লেপ গায়ে চাপাতে হবে। ম্লেচ্ছজাত কি সাধে বলে! শরীরকে কেবল তাতাতেই জানে—আর তাতাতেই চায়। ঠাণ্ডা রাখতে, ঠাণ্ডা করতে জানেও না, চায়ও না। কাঁচা আমের অম্বল, সুক্তোর ঝোল তিতে ঝোল রাঁধতে বললে প্রথম হঠিয়ে দিতে চায়। তারপর অবহেলা করে রাঁধে। তারপর যখন সাহেব মুখে তোলে না, শিবানী কাচ্চির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু খায়, বাকি সব পড়ে থাকে তখন মোছের তলায় হাসে। কালকেও হাসবে অম্বলের বাটি হাতে নিয়ে। টক করে বাটিভরা অম্বল কাচ্চি বেসিনের ভেতর ঢেলে দিল। আমের ঝোলটা পড়ে গেল। আমের টুকরো আটকে রইল বেসিনের মুখে। সেগুলি তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে কাচ্চি যেন আরামবোধ করলে। তারপর তার যা কাজ বাকি ছিল একে একে সারলে।

শিবানীর খাবার ইলেকট্রিক-রেঞ্জের ভেতর ঢুকিয়ে মৃদু তাপের চাবি ঘুরিয়ে খাবার গরম থাকার ব্যবস্থা করলে। নিজের খাওয়ার কথা ভাবলে। সবাই খেয়ে নিয়েছে। আবদুলও খেয়ে নিয়ে সাহেবের অপেক্ষায় বসে আছে সিঁড়িতে। সেও খেয়ে নিতে পারতো। কিন্তু শিবানী যতক্ষণ না খাচ্ছে ততক্ষণ সে খায় কি করে। যদি সাহেবের মতো শিবানী বাইরে থাকত; তার বাইরে খেয়ে আসার সম্ভাবনা থাকত, না খেয়ে এলে বাড়ি এসে খেতো, তবে কাচ্চিও আবদুলের মতো খেয়ে নিতে পারতো। কিন্তু এ যে শিবানী না খেয়ে রয়েছে। সে খায় কি করে।

কিংবা হয় তো এ জন্যেও নয়। আবদুলের সাহেব ডাকার মতো সেও যদি শিবানীকে মেমসাব ডাকতো শিবানীও ইন্দ্রনাথের মতো সাহেব হতো—তবে ভাত গলা দিয়ে নামতো, সেও খেয়ে নিতে পারতো। এখন যতক্ষণ শিবানী উপোস থাকছে ততক্ষণ ভাত তার গলা দিয়ে নামতে চাইবে না—তাই সে চেষ্টা করে লাভ নেই। একগ্লাস জল খেয়ে এসে সে শোবার ঘরে ঢুকল শিবানীর। বিছানার বেডকভার তুলে শয্যা প্রস্তুত করলে পরিপাটি করে। ড্রেসিং-টেবিলের উপর চুলের কাঁটাগুলি ছিটিয়ে-ছড়িয়ে ফেলেছিল শিবানী। সেগুলি এদিক-ওদিক থেকে তুলে কাঁটা-ক্লিপ সেপ্টিপিনের ছোট্ট ট্রেটাতে গুছিয়ে রাখলে। ঘরের আরো যা একটু-আধটু গোছগাছ করার ছিল তা করে ঘরের উঁচু পাওয়ারের বাতিটা নিভিয়ে নীচু পাওয়ারের সবুজ বাতিটা জেলে দিলে। তারপর কি ভেবে কে জানে কাচ্চি শিবানীর আর ইন্দ্রনাথের ঘরের মধ্যিখানের ভারী ভেলভেটের পর্দাটা একটু সরিয়ে ইন্দ্রনাথের ঘরটার দিকে

এই শূন্যঘরটার দিকে তাকিয়ে কেন যে সে দাঁড়িয়ে রইল তা সে জানে না। হয় তো শূন্য ঘরটাকে নয়, এ ক'দিনের কথায় মুখরিত ঘরটাই সে দেখছিল ঈষৎ চোখের জলের ঝাপসা অস্পষ্টতার ভেতর দিয়ে। সে বুঝছিল এ ঘর আর শীগগির মুখরিত হবে না। এ ক'দিনের মধ্যে কতবার তাকে ট্রেতে সাজিয়ে দু'জনার খাবার এখানে বয়ে আনতে হয়েছে। শিবানীর কত ছোটবড় ডাকে বার বার ছুটে আসতে হয়েছে। সাহেবের কত অনুরাগ আর আনুগত্যের প্রকাশ হঠাৎ চোখে পড়ে গেছে আর শিবানীর চোখে-মুখে লজ্জার আভা খেলে যেতে দেখেছে।

কি সুখের হাওয়াই না বইতে শুরু করেছিল।

সেই সুখের হাওয়ায় সেও ভেসে বেড়াচ্ছিল। শিবানী ওর কাছে শুধু মনিব নয়, শুধু মানবী নয়, শিবানী ওর কাছে দেবী। শিবানীর দু'চোখের দৃষ্টিতে বরাভয়। তাই শিবানী তার গায়ের কালো রং-এর উল্লেখ করে কিছু বললে, সে আঁতকে ওঠে। সে গান শুনেছে,—

> কালো মেয়ে পায়ের তলায়—
> দেখে যা আলোর নাচন।
> রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব—
> যার হাতে মরণ বাঁচন—।

শিবানীর মুখের ওপরও এমনি আলোর নাচ কি দেখতে পায় না সাহেব?

কি করে পাবে।

সাহেব তো শিব নয়।

তাই শিবানীর রূপ সাহেব দেখতে পায় না।

সাহেবকে ক্ষমা করে ফেলে কাচ্চি সে মুহূর্তে আর দায়িত্ব গিয়ে চাপে আরও বেশি করে শিবানীর ওপর। তুমি দেবী।

তুমি ক্ষমা করো মা সাহেবকে।

আজও ক্ষমা করো।

শিবানী যেন ক্ষমা করলো। সঙ্গে সঙ্গে শূন্যঘরটা যেন মুহূর্তে কাচ্চির চোখে ভরে উঠল। হেসে উঠল। গেয়ে উঠল শিবানীর কণ্ঠের গুনগুন গান—

> আমার মনে নবীন মেঘের সুর লেগেছে—

সিঁড়ির মুখে সাহেবের প্রতীক্ষারত উপবিষ্ট আবদুলকে —মেমসা'ব ছাদে গেছেন তাই সে ছাদে যাচ্ছে জানিয়ে ছাদে উঠে এলো কাচ্চি।

শহরের দালান-কোঠা মানুষ-ঠাসা বাড়িগুলির মাথার ওপর একটুকরো রেলিং ঘেরা বাঁধানো জমি—যার বুক বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খর রোদে তেতে-পুড়ে ফেটে ওঠে। বর্ষায়

স্যাঁৎসেতে হয়—ছাদ বলতে এই যে ছবিটা চোখের উপর ভেসে ওঠে, এ ছাদ তা নয়।

কর্পোরেশনের আইন মানা কোনমতে চার হাত জমি ছেড়ে দেওয়া মধ্যবিত্ত পাড়ার ঘিঞ্জি বাড়ি—এগুলি নয়। এগুলি অভিজাত পল্লীর প্রচুর জমি ছেড়ে দেওয়া বাগানওলা বাড়ি। এখানে খোলা ছাদেও আশে-পাশের খোলাদৃষ্টি এসে পড়তে পারে না গায়ের উপর। পাড়া নির্জন। বাড়িগুলি শান্ত। ছাদগুলি আরো। এ সব পল্লীর ছাদে এসে বসলে এই কলকাতা শহরের বুক ঠাসা মানুষের মাথার উপর বসেও কিছু নির্জনতার স্বাদ উপভোগ করা সম্ভব। শিবানী প্রাণ ঢেলে জায়গাটাকে তৈরি করে নিয়েছে। রোদ বৃষ্টি কোনটাই যেন তার ছাদে এসে বসা বন্ধ করতে না পারে সেজন্য ছাদের পূব কোণ উঁচু করে বাঁধিয়ে নিয়ে তার উপর বসিয়েছে এক মস্ত জাপানী ছাতা। ছাতার মাথার উপর লতিয়ে দিয়েছে চামেলি যুঁই আর সন্ধ্যামালতী লতা। সমস্ত ছাদ ঘিরে নানা দেশী-বিলেতি ফুলের টব। ছাতার তলায় আছে আরামকেদারা, টেবিল দু-চারখানা বইরাখার সেলফ। আছে আলোর ব্যবস্থা। এমন কি যদি গুমট গরম পড়ে। বাতাস না থাকে ছাদেও। তাই আছে লম্বা স্ট্যাণ্ডে বসানো পাখা। ড্রইং-রুম সবার বসবার ঘর। এটা শিবানীর একার বসবার জায়গা। এটা ওর চুপ করে বসে থাকবার জায়গা। আকাশ দেখবার জায়গা। বৃষ্টি দেখবার জায়গা।

যে চাঁদটা সন্ধ্যাবেলা ললিতাদের বাড়ির জানালা দিয়ে একটুকরো ক্ষীণ আলো পায়ের কাছে ফেলেছিল, সে চাঁদটা এখন গোল হয়ে মাথার উপর উঠে এসেছে। চাঁদের সাদা আলোটাকে সকাল ভেবে কাকগুলি বাড়ির নিমগাছটা থেকে এক একবার কা-কা করে ডেকে উঠছে। পাখা ঝাপটে বের হয়ে এসে এ-ডাল ও-ডাল করছে কিন্তু তারপরই ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে যাচ্ছে। শিবানীর ছাদের নিঃশব্দের জগতে মাঝে মাঝে এই ভ্রান্ত কাকের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ উঠছে না। এসে পৌছোবার মতো শব্দ এখন এ পল্লীর কোথাও হচ্ছেও না। অভিজাত পল্লী এটা। শিবানীর কানকে উত্যক্ত করে না এরা। করাটাকে বর্বরতা জ্ঞান করে। রেডিও ছাড়ে নিজেদের কানের মতো করে—পড়শীদের ক্ষিপ্ত করে তুলবার মতো করো নয়। যদিও বা দিনের বেলা বা সন্ধ্যারাতে উচ্চগ্রামে দু'টো ডাক হাঁক আর রেডিওগ্রামের বাজনা কানে আসে আটটার পর আর তাও আসবে না। হাসি-গল্প-গানের চৌহদ্দি তারা নিজেদের চারদেয়ালের গণ্ডির বাইরে তো যেতে দেবেই না, দুর্দান্ত রাগ, কথা কাটাকাটি ঝগড়াও নীচু গলায়, কথা দাঁতের তলায় চেপে করে। সভ্য নাগরিকের দায়িত্ব সম্বন্ধে এরা সচেতন।

শিবানী টের পেলো কাচ্চির এসে পেছনে বসা।—বসে বসে হাই তোলা। শুয়ে পড়া। ঘুমিয়ে পড়াটা আর আগের গুলির মতো—অনুভবে বুঝতে হলো না। কাচ্চির গভীর নিঃশ্বাসের মৃদুমন্দ ফোঁসফাঁস্ ধ্বনিই তা ঘোষণা করতে লাগলো।...কাচ্চি অদ্ভুত বুদ্ধিমতী। ও যদি ওদের মতো লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পেতো তবে নিশ্চয় কিছু করতো। গাছের মাটি থেকে রস টেনে নেবার মতো মেয়েটা যেন শিবানীর শিক্ষা-দীক্ষা থেকে আলো টেনে নেয়। এক-এক সময় বিস্মিত করে দেয় কাচ্চি ওকে তার বোঝার এবং তা প্রকাশ করার ক্ষমতা দিয়ে।

কাচ্চির ঘুম দেখে শিবানীর ইচ্ছে করতে লাগল এই যে শুয়ে-পড়া মাত্র ঘুম—এই ঘুমটার জন্য দু'হাত জোড় করে সে ঈশ্বরের দরবারে প্রার্থনা করে।

এখন যদি শোবামাত্র কাচ্চির মধ্যে ওর দু'চোখে ঘুম নেমে আসত, তবে সে নিশ্চয়ই গিয়ে শুয়ে পড়ত।

দু' চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে শুয়েই হোক আর এখানে ওখানে যেখানে বসে চোখ মেলেই হোক আজকের রাত ওকে জেগে কাটাতে হবে জানে বলেই বসে রয়েছে। নইলে ঘুমের মতো শান্তিকে ঠেলে রেখে ও কি অশান্তচিত্ত নিয়ে এখানে বিলাস করবার জন্য বসে থাকত। ঘুম না এলে রাতে বিছানায় শুয়ে সে এপাশ-ওপাশ করতে পারে না। তার চাইতে বই পড়ে, আকাশটাকে সমুদ্র কল্পনা করে তাই নিয়ে তীরে বসে সুন্দর কাটিয়ে দিতে পারে।

দেয়ও। আজ বলে নয়। অনেক রাতই অনেক সময় শিবানীকে জেগে পার করতে হয়। মন নাড়া খেলে ঢেউ উঠল আর ঘুম গেল। মনটিও খাসা—যেন অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর! ঢেউ-এর নৃত্য লেগে আছেই। কোথাও এককণা প্রশান্তি নেই। কোনদিক থেকে একটুখানি হাওয়া লাগল কি অমনি উদ্দাম ঝড় উঠল। আজ ওর এতো উত্তাল হয়ে উঠবার কি কোন যুক্তি আছে?

ও কি একদিনের তরেও ইন্দ্রনাথের উপর ভুলেও আস্থা স্থাপন করেছিল?

না।

একবারও কি ভেবেছিল সত্যকে পেলাম?

না।

তবে কি ইন্দ্রনাথ মিথ্যা দিয়ে ভুলাচ্ছে ভেবেছিল?

না, তাও ভাবে নি।

সত্য আর মিথ্যা দু'টো দু' প্রান্তের শেষ কথা। মাঝখানে আরো কিছু কথা থাকে যা সত্য নয় বলেই মিথ্যা হয় না। মিথ্যা নয় বলেই সত্য হয় না। এটা ইন্দ্রনাথের

ইন্দ্রনাথের সত্য চেষ্টাটাকে সম্মান দিচ্ছিল সে। আর এ তো বাইরের সম্মান দেওয়া নয়। এর ভেতরই তো তার প্রাণ। তাই সে ইন্দ্রনাথের হয়ে ওঠার ইচ্ছাটাকে দু' হাত আঁকড়ে ধরেছিল······

না, ওর আজকের এই তীব্র অশান্তপনার ভেতর ওর নিজের দিকে পা রেখে দাঁড়াবার মতো কিছু যুক্তি আছে। এ কেবল তার ভাবপ্রবণ মনের—যে মন তাকে ব্যাধির মতো জোগায় তারই প্রকাশ নয়। যে মাটিটুকুর উপর দু'পা রেখে দাঁড়াতে চাচ্ছি। যে খুঁটিটাকে জীবন বলে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছি—হঠাৎ যদি দেখা যায় পায়ের তলার সেই মাটি, হাতের মুঠোর সেই খুঁটি দু'টোই ভুয়া তবে কিছুটা ছটফটানি প্রথম ধাক্কায় ক্ষমার্হ।

ক্ষমা করা গেল তোমায় শিবানী।

নিজেকে মার্জনা করে দিলো শিবানী।

কিন্তু তারপর শিবানী? স্বভাবটা তো রয়েই গেল তোমার। আজকের ক্ষমা দিয়ে কি তার কিছু সংশোধন হলো? স্বভাবকে সংশোধন করো শিবানী। নিজের ভেতর সমাহিত হও। নিজের মধ্যে নিজের সম্পদ লাভ করার সাধনা করো। তবেই আর বাইরের জন্যে ছটফট করতে হবে না। বাইরের কাছে কাঙালপনা করে সুখ চাইতে গেলে সে পেয়ে বসে। তার দৌরাত্ম্যের অন্ত থাকে না।

'বাণী বাজাও মম অন্তরে'—

অন্তরের বীণা বাজিয়ে তোল শিবানী তবেই আর বাইরের তুফান তোমাকে নাড়া দিতে পারবে না। নিজের ভরা মনটির মাঝখানে নিবিড় হয়ে বসে বাইরের সমস্ত যাওয়া-আসার উপরে স্থির হয়ে থাকতে পারবে।

চোখ বুজে স্মরণ করলো শিবানী—ঠোঁট নেড়ে মন্ত্রের মতো বলতে লাগল, আমাদের যা কিছু সবচেয়ে বড়ো সম্পদ, সবচেয়ে বড় আনন্দ—তার ভাণ্ডার যদি বাইরে থাকে তা হলে আমাদের ভারি মুশকিল, কেন না, বাইরের পথে বাধা ঘটবেই, বাইরের দরজা মাঝে মাঝে বন্ধ হবেই। বাইরের কাছে থেকে ভিক্ষে চাওয়ার অভ্যাস আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের ইচ্ছা বাইরের দিকে বাধা পেলেও আমরা যেন অন্তরের মধ্যে পূর্ণতা অনুভব করে শান্তি পেতে পারি। নইলে নিজেও অশান্ত হই চারিদিককেও অশান্ত করে তুলি। এই সংসার থেকে যে-প্রীতি, যে কল্যাণ আমরা অন্তরের মধ্যে পেয়েছি সেই আমাদের অন্তরতম লাভের জন্যে যেন আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হই। বাইরের দিকে যে কিছু জিনিস পাই নি, সেদিক থেকে যা কিছু বাধা আসছে, তারই ফর্দটাকে লম্বা করে তুলে যদি খুঁত খুঁত করি, ছটফট করতে

থাকি তা হলে অকৃতজ্ঞতা হয় এবং সেই চঞ্চলতা নিতান্তই বৃথা নিজের অন্তর-বাহিরকে আবৃত করে মাত্র।

স্থির হব, প্রসন্ন রাখব তা হলেই আমাদের মন এমন একটি স্বচ্ছ আকাশে বাস করবে যাতে করে অমৃতলোক থেকে আনন্দ-জ্যোতি আমাদের মনকে স্পর্শ করতে বাধা পাবে না।

অনেকটা সময় চোখ বুজে রইল শিবানী।

রাত বাড়তে লাগল। সব বাড়ির বাতি নিভে গেছে। কেবল দু-একটা গাড়ি বারান্দায় অথবা গেটের মাথায় বাতি জ্বলছে।

কাচ্চি একবার জেগে ধ্যানস্থ শিবানীকে দেখে নিয়ে আবার চোখ বুজল।

একসময় ঝকঝকে আকাশের দিকে ঝকঝকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল শিবানী। সাদা সাদা তুলো পেঁজা মেঘ ধীরমন্থর গতিতে ভেসে চলেছে। ওর আরাম কেদারায় বসা গা-ছাড়া ভাবের মতই তাদের চলায়ও একটা গা-ছাড়া ভাব। যেন চলছে বলেই চলছে। থামতে হলেই থামবে। চাঁদের আলোটাকেও ভীষণ মৃত লাগতে লাগল শিবানীর। যেন কোন সুন্দরী নারীর রক্তশূন্য মৃত মুখের সাদা ফ্যাকাশে রং আলোটার। কথাটা মনে হতেই পিঠটা কেমন শিরশির করে উঠল—

বাজে মিল যত!

মন যখন বাজে হয়ে থাকে তখন এমনি সব বাজে মিল মনে আসে।

মন যদি এমনি বাজে হয়েই থাকবে তবে চোখ বন্ধ করে বলল কি সে? কিই-বা মন্ত্রের মতো করে বলল?

আরামকেদারা থেকে পিঠ তুলে সোজা হয়ে বসল শিবানী—ভাবতে লাগল—

বেশ লাগছে—

অপূর্ব লাগছে—

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে যেন আনন্দের সাড়া পেলো শিবানী। ভারি আশ্চর্য তো। আনন্দ যেন ঘুমিয়েছিল, ডাক শুনে সাড়া দিচ্ছে। না ডাকলে বুঝি তারও সাড়া পাওয়া যায় না। আবার ভাবলে সে—

বেশ লাগছে—

অপূর্ব লাগছে—

এই ঝকঝকে চাঁদ, তারাভরা আকাশ, আলোভরা ছাদ, ঝিরঝিরে হাওয়া, টবে টবে রং-বেরং-এর হাওয়ায় আন্দোলিত ফুল, জাপানী ছাতার চারপাশে ঝুলেপড়া দোদুল্যমান থোকা থোকা যুঁই, চামেলী, সন্ধ্যামালতীর গুচ্ছ, তাদের সুমিষ্ট আঘ্রাণ, সব কিছু—সব কিছু অপূর্বরমণীয়। আঃ,

> আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
> তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
> বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
> কান পেতেছি, চোখ মেলেছি,
> ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
> জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
> বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান—

কে ইন্দ্রনাথ? ওর জীবনে তার এতো কি মূল্য? কেনই বা সে এতো মূল্য দিয়ে রেখেছে? একটা লোকের ওপর বাড়তি মূল্য চাপিয়েই যত অ-সুখ জীবনে সেধে ডেকে আনে মেয়েরা। মেয়েদের এ এক আশ্চর্য আত্ম-নিপীড়ন প্রীতি! এ থেকে ওদের উঠে আসতে হবে।

কি আসে-যায় ইন্দ্রনাথ না ফিরলে? মদ খেয়ে ফিরলে? মাতাল হয়ে অন্য কোথাও পড়ে থাকলে? কিম্বা একেবারেই তার জীবনে অনুপস্থিত থাকলে?

> আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
> তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
> বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান—

গান শুনে দু'চোখ কচলে কাচ্চি উঠে বসল। কান পেতে গান শুনতে লাগল। ওর দিকে নজর পড়লে শিবানী উৎফুল্ল-কণ্ঠে বলে উঠল, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। চল খেতে দিবি।

নীচে নেমেই দেখতে পেলো, ইন্দ্রনাথ মাতাল পায়ে বারান্দা পার হচ্ছে। আবদুল তার পেছন পেছন চলছে।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে শিবানী আওড়ালো—

> আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
> তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
> বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান— [ক্রমশ।

অনায়ত্ত উপকূল

রূপশ্রী ঘোষ

> বহুদূর বিস্তৃত রহে আমার অনায়ত্ত উপকূল
> মেঘে আর জলে মিশে নিত্য তার ঘননীয় রঙ—
> তারে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় নিত্য কোন্ পাখিরা বেভুল,
> পালকেতে সূর্যস্নান, আকাশেতে গৌড়সারঙ
>
> দিন দিন বেড়ে যায় উপকূল বিস্তৃত নিঃসীম,
> আরো কত বেড়ে যাবে—ছড়াবে ধূসর অগ্নিকণা—
> মনে মনে ধিকিধিকি। গ্রস্ত হবে আকাশ নীলিম,
> মেঘ আর জল রঙ। লাল রঙে প্রলয়-ভাবনা।
>
> সেইক্ষণে মনে হবে ফিরিয়ে দাও শান্ত উপকূল.

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ক্যাথরিন হিউম্
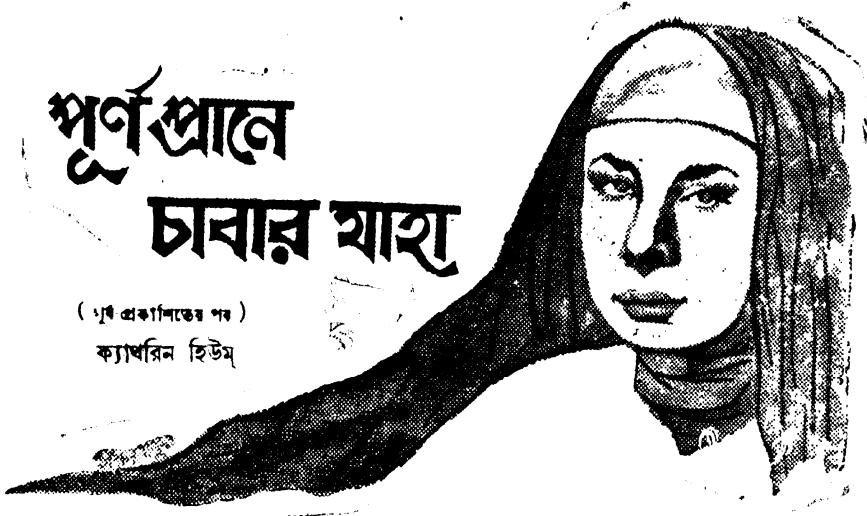
সিস্টার লুক চোখ মেলে চাইল। ব্রাসেলস্ কনভেন্ট সেলের ধূসর পর্দাটা বাতাসে দুলছে অল্প-অল্প। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল স্পেনীয় শেওলার মত দেখাচ্ছে ওগুলোকে।···নদীপথে যাচ্ছে মাদার ম্যাথিল্ডার সংগে। ফ্লেমিসে প্রশ্ন করেছেন তিনি, দাঁড়িরা বুঝতে পারবে না।

—কেন না, তুমি যদি প্রেমে পড়ে থাক আর সে কথা না বলে থাক আমায়, মাই চাইল্ড, বেদনায় মন ভেঙে যাবে আমার।

—ও না, মাই মাদার। ত্রিভুবন যেন মুহূর্তের জন্য দুলে উঠল তার চোখের সামনে। উপলব্ধি করতে পারছে এ প্রশ্ন করার আগে পুরো একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করেছেন সুপিরিয়র সে কিছু বলে কি না দেখতে। পূর্ণ একটা সপ্তাহ—উৎকণ্ঠায় আর প্রার্থনায় ভরা। একই প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করেছেন নিজেকে—নিজের অমনোযোগিতায় একটি আত্মা তিনি হারালেন কি না।—প্রেমে আমি কখনই পড়ি নি। আমি কেবল ওঁকে শ্রদ্ধা করি মাই মাদার, গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। কোন জীবন বাঁচানোর প্রশ্ন যখন থাকে যে স্বার্থহীন দক্ষতার প্রকাশ দেখি ওঁর মধ্যে তারই জন্যে শ্রদ্ধা করি ওঁকে। আমার সবসময় মনে হয় অপরেশনের ছুরি ওঁর হাতে থাকে যখন সেই অপার্থিব সময়ে ভগবানের খুব কাছাকাছি থাকেন উনি।

নৌকোর সামনের দিকটা জলের ওপর উঁচু হয়ে উঠেছে ···সামনের বেদীর মত আসনটার ওপর মাদার ম্যাথিল্ডা দাঁড়িয়ে আছেন···জাহাজে ঝোলানো পুতুলের মত দেখাচ্ছে।

সহজ সুরে বললেন, ভারি খুশি হলাম সিস্টার যে তুমি সব খুলে বললে আমায়।

খানিক পরে কল্পনার ছবিগুলো মিলিয়ে গেল। সেলের পর্দাটার দিকে চেয়ে এখন কেবল দেখতে পাচ্ছে জায়গায় জায়গায় ছাই-রঙা উল দিয়ে নিপুণ হাতে রিপু করা।···শীত আর করছে না, শুধু বুকের কাছটায় কেমন একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু উদ্দীপক ঐ ওষুধটার সংগে তার কোন যোগ থাকবার কথা নয়।

ভেস্পারে যাবার পথে অবশিষ্ট ক্যাফাইন ক্যাপসুলগুলো করিডরের ধারে একটা ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলে দিল। পরিচ্ছন্ন হাউসটিতে এদিক-ওদিক যেতে-আসতে যেরকম কাগজ নানরা সবসময়ই নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছে বাস্কেটে ফেলে দেবে বলে তেমনই একটা কাগজে বুদ্ধি করে মুড়ে নিয়েছিল।

নিজের পিউতে নতজানু হয়ে হাতজোড় করল।

—হে প্রভু, ঐ সব স্মৃতি থেকে মুক্তি দাও আমায়, আমায় সাহায্য কর। অর্ধেক পথ তো আমি এগিয়েই এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে—ক্যাফাইনগুলো ফেলে দিয়ে এলাম···স্মৃতিকে ওরা আরও ধারালো করে তোলে। তার বদলে সব সময় কাঁপতে হবে অবশ্য, তাই ভাল। কি করে মেরী হব প্রভু, কংগো যদি এমন করে আমার রক্তে মিশে থাকে? তাঁর মত যেন হতে পারি, এই তুমি কর। যেন তাঁরই মত পূর্ণ মাধুর্যে বলতে পারি, 'তোমার ইচ্ছা'।

প্রার্থনা করছে আর লিটল্ অফিসের পাতা ওল্টাচ্ছে যথাযথ, ঠোঁট নাড়ছে···সিস্টারদের সংগে স্তবগানই করছে যেন।

—এখনও অবাক লাগছে ব্লেসেড লর্ড, এই অফিস গাইতে গাইতে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনতে পাচ্ছি

না। কংগোয় ভেস্পার শুরু হয় যখন তোমার ইন্দ্রজাল বিছানোর সময় হয়ে আসে। আগতপ্রায় সন্ধ্যা··· অরণ্যে তোমার সৃষ্টি ইতোমধ্যেই ঘুম ভেঙে সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে, ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে—রাতের শিকারের জন্য শাণ দিয়ে নিচ্ছে ঠোঁটে-থাবায়··· প্রার্থনার শেষ পর্যায়ে আমরা এসে পৌঁছতাম যখন, রাত্রির আঁধার-সমুদ্র দিগন্ত-সীমার ঠিক নীচে তখন।

প্রার্থনা সত্ত্বেও স্মৃতিগুলো জড়িয়ে ধরে আছে।

অনভ্যস্ত অবসর বড় বেশি গুরুভার হয়ে চেপে বসল যখন, একদিন মাদার হাউস হাসপাতালের ক্যানসার-ওয়ার্ড দেখতে যাবার অনুমতি চেয়ে নিল সিস্টার লুক।

পুরোনো অসাধ্য রোগী সব। ওরা জানে না, যে ও একজন সম্প্রতি কংগো-প্রত্যাগত সিস্টার। কিন্তু বহু বছর এই দুঃসহ রোগভোগের বিচিত্র অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা এটা ঠিক জানতে পেরেছে মিশনারীরা কেউ ফিরে এসেছেন। কারণ সব ব্যাণ্ডেজের চেয়ে যেগুলো প্রিয় তাদের সেই ব্যাণ্ডেজগুলো আবার দেখা যাচ্ছে ড্রেসিং কার্টে। সিস্টার লুকের টিনের ট্রাঙ্কে ট্রপিক্যাল হ্যাবিটের ছেঁড়া টুকরোগুলো এসেছে ওদের বীভৎস ক্ষতগুলো এখন তাই দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা।

ছেঁড়া হ্যাবিটগুলো সিস্টার ইউডোক্সি বেছে নিয়েছেন সর্বদা ব্যবহারের জন্য। যে অংশগুলোয় সুতো ঠাস আছে এখনও ঠাস আছে সেগুলো কেটে নিয়ে মেটারনিটি ওয়ার্ডের তোয়ালে হয়। আর যে জায়গাগুলো একেবারেই পিঁজে গেছে—সাধারণতই স্কার্টের রিপু করা সামনের দিকটা, যেখানটায় প্রার্থনার সময় হাঁটুর চাপ পড়ে···পুড়িয়ে ফেলবার আগে শেষবার নরম ড্রেসিং হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভাঁজ করে রাখা হয়। ক্যানসার রোগীদের ধারণা এগুলো বিশেষ উপশম এনে দেবে।

রোগ-পাণ্ডুর হাতে ওরা ঐ ভাঁজকরা জীর্ণ কাপড়গুলো চাপড়াচ্ছে দেখলে ওর মধ্যে কি একটা অনুভূতি ঠেলে ওঠে বুকের কাছে। ওদের বলতে ইচ্ছে করে, ঐ জরাজীর্ণ সুতোগুলোর ভাঁজে বহু বছরের প্রার্থনা লুকিয়ে আছে। এই দীর্ঘদিনের সংগ্রাম আর হৃদয়-বেদনাও। আর যে পবিত্রতা তোমরা কল্পনা কর, তাও।

সংগিনী নানটি ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল, এই ড্রেসিংগুলো পুড়িয়ে ফেলার জন্যে সরিয়ে নেওয়া হয় যখন, ওরা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ভারি অবাক লাগে ভাবতে ওরা কি করে জানল আপনাদের মিশনারী সিস্টারদের এই

এমন জায়গা কোথাও নেই মাদার হাউসে সিস্টার লুক যেখানে স্মৃতির টানা-পোড়েন থেকে রেহাই পেতে পারে। অস্বস্তি লেগে থাকে তাই সর্বদা—চলতি জীবনটা বুঝি আর তার কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত নয়। সে যেন একটা প্রেত-দর্শক···খুশিমত আসতে-যেতে পারে···আর হাতে তার বড্ড বেশি সময়।

যখন-তখন শোনে, ডাঃ ফরচুন্যাটি বলছেন, ধরুন যদি অনিশ্চিত কালের জন্যে আটকে থাকতে হয় আপনায়··· শক্তিটা যথেষ্ট মনে হবে তো তখন?

সেই শাণিত ছুরির মত চোখ দু'টোর সামনে যেমন উত্তর দিত এখন এই বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বরের উত্তর আরও খোলাখুলিই দেয়। বলে, তাতে একেবারে কোন সন্দেহ নেই ডক্টর। এখন আমার মধ্যে এই যে অস্থিরতা এসেছে এ কেবল আমার কাজ নেই বলে। কাজে ফিরে যাওয়াটা প্রয়োজন মনে করি আমি, এই পর্যন্ত।

বুলেটিন বোর্ডের বদলি আর পুনর্নিয়োগের তালিকাগুলো মনোযোগে দেখে রোজ। বারবার করে দেখে।

মাদার হাউসে তখন তার প্রায় মাসখানেক কেটেছে, ভাইদের নিয়ে পিসিমা এলেন দেখা করতে। যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হ'ল ক'জনে। বাবা দেখা করে যাবার পর যুদ্ধ আরও নিকটবর্তী হয়েছে।

সিস্টার লুক বলছিল, আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না।

পিসিমা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, এরকম জায়গায় তাই স্বাভাবিক। রেডিও নেই, খবরের কাগজ নেই, কোন আলোচনা নেই···কিন্তু বাইরে গ্যাবি এখন অবস্থাটা ঠিক '১৪-'১৮র মত। তোমার অবাক লাগবে—কত লোক যে এর মধ্যেই পাসপোর্টে স্পেনের ভিসাও জুড়ে নিয়েছে! মুখ বেঁকিয়ে হাসলেন একটু।—গত যুদ্ধে যে পরিবারগুলো দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল ঠিক তারাই।

—আর আমরা যারা থাকব···আবারও সেই একই অবস্থা হবে তো?

—সম্ভবত। ছোটখাট যুদ্ধ হবে, আর তারপরই দখল।

এন্টোনি লম্বা হয়েছে খুব, সুন্দর চেহারাটি। তর্ক করছে পিসিমার সংগে। আত্মরক্ষার বিশাল আয়োজনের বর্ণনা দিয়ে সগর্বে বলছে দ্বিতীয় দফায় আর কখনই হেরে যাবে না বেলজিয়াম। পিসিমা ভাইপোর দিকে বিষণ্ণ সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

সিস্টার লুক চুপচাপ শুনছে কেবল। ভাবছে যুদ্ধ যদি সত্যই শুরু হয়, এইখানেই দুঃখ-দুর্দশার শেষ থাকবে না,

…শক্তি দিয়েছেন কেবল আমার জিভটায় লাগাম টেনে রাখতে…যাতে জিজ্ঞাসা করে না ফেলি…

পিসিমা উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন !—তুমি হয় তো এটাকে ছেলেখেলা ভাবছ এন্টোনি—টিনের সৈন্য আর খেলাঘরের দুর্গ ! তুমি জান না, গতবারের দখলের দুর্ভোগ যখন ভুগেছি তুমি একেবারে বাচ্চা ছিলে। বাড়ি অবধি ওদের দখলে আর তোমার বাবা লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে… তার মাথার দাম ঘোষণা হয়ে গেছে তখন ! গুপ্তচরগিরির অপরাধ !…আমার দিকে অমন একদৃষ্টে তাকিয়ে থেক না, তাকেই জিজ্ঞাসা কোর। নাক ঝেড়ে চোখের জল মুছলেন পিসিমা।—কাজেই যে মুহূর্তে ঐ জার্মানরা এদেশের মাটিতে পা দেবে আবার এদেশ ছেড়ে যেতে হবে ওকে।

সিস্টার লুক এবার সবিস্ময়ে বলল, এখানে থাকতে তো কোনদিন একথা বলে নি আমায়।

—কাউকেই কখনও বলে না। রাগতস্বরে উত্তর দিলেন পিসিমা। বলার মধ্যে একটু গর্বও মেশানো ছিল।

যতই অবিশ্বাস্য হোক, যুদ্ধের আলোচনা সিস্টার লুকের মন থেকে কিন্তু কংগোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে একটু পিছনে। তাড়াতাড়ি কংগোয় ফিরে যাবার যে বাসনাটা সবসময় জড়িয়ে ছিল, তার বাঁধন শিথিল হয়েছে কিছুটা। অনুভব করেছে এখন আর সেই জ্বলন্ত ইচ্ছেটা চোখ দিয়ে উপচে পড়বে না, অনুক্ত বক্তব্যটা কাঁপবে না জিহ্বাগ্রে। অনুভূতিটা সাহস দিল রেভারেণ্ড মাদার ইমান্যুয়েলের কাছে যেতে।

—আমি কাজের মধ্যে ফিরে যেতে চাই রেভারেণ্ড মাদার—যেখানে হোক। আপনারও আশংকা ছিল অবসর কিছুটা উত্তেজিত করবে আমায়, করেছেও। খাঁটি মেরী হতে পারছি না আমি, হাত দু'টো অস্থির হয়ে উঠছে। স্মিত হাসিতে তার সনির্বন্ধ মিনতির আভাস পাওয়া গেল। —এই হাত দু'খানার জন্যে যে কোন কাজ একটা খুঁজে দিতে পারেন না রেভারেণ্ড মাদার ?

রেভারেণ্ড মাদার বিস্ময় প্রকাশ করলেন না একটুও। এই অর্ডারের অফিসে বসে কাটল বহুদিন—এর আদর্শই হ'ল প্রার্থনা আর কাজে ডুবে থাক। এমন মিশনারী পেয়েছেন কি না সন্দেহ প্রাপ্য বিশ্রাম সময়টা পুরো নিশ্চিন্তে শুয়ে-বসে কাটাতে পেরেছেন যিনি।

—ঠিক জান এত তাড়াতাড়ি কাজের উপযুক্ত হয়ে গেছ তুমি মাই চাইল্ড ? ট্রপিকে যে পরিশ্রম করে ফিরেছ, দীর্ঘতর বিশ্রামের অধিকার আছে তোমার।

—গত মাসে দু'কিলো ওজন বেড়েছে আমার রেভারেণ্ড মাদার। এই ক'বছরের কম ঘুমও পূরণ হয়ে গেছে। জীবনটাকে বারবার বিশ্লেষণ করে দেখেছি—ভগবানের দয়ায় আধ্যাত্মিক দিকটাকে শৃংখলাবদ্ধ করতে পেরেছি। কিন্তু এখন এই হাত দু'টো…

বাসনাটুকু সোজাসুজি চোখের তারায় প্রকাশ পেতে দিল।

—কি ধরণের নার্সিংয়ের কথা ভেবেছ, সিস্টার ?

—টি বি নার্সিংয়ের কথা ভাবছিলাম রেভারেণ্ড মাদার। অসুখটা আমার নিজেরই হয়েছিল, কাজেই প্রতিরোধ-ক্ষমতাটা বিশেষভাবে রয়েছে। টি বি রোগীদের ওপর বিশেষ একটা সহানুভূতি আছে আমার চিরদিন…ওদের ঐ অনন্ত আশা আর সাহস ! আমার কেমন মনে হয় ওরা ভগবানের অন্তরংগ সান্নিধ্য পায়।

সুপিরিয়র জেনারেল তাঁর নোটবইটা দেখছেন।

অনিচ্ছাভরে বললেন, দেখছি সত্যই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ খালি আছে এখন। খুব কঠিন কাজ। অবশ্য তোমাকে এ দায়িত্ব দেওয়ার আগে আমাদের ডাক্তারের মতামত নেব আমি। নোটবই থেকে মুখ তুলে তাকালেন।—কাজটা হল্যাণ্ড বর্ডারে আমাদের হাসপাতালের পালম্যানারি সার্জারির এ্যাসিসট্যাণ্টের।

পালম্যানারি সার্জারির কাজ খালি থাকবে স্বপ্নেও ভাবি নি আমি। এই তো আসল নার্সিং রেভারেণ্ড মাদার।

—আর সবচেয়ে কঠিনও। চকিত একটু হাসি খেলে গেল সুপিরিয়র জেনারেলের মুখে। তারপর চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, কিন্তু আর একটা কারণেও ইতস্তত করছি আমি। ওখানকার সুপিরিয়র মাদার ডিডাইমা মনে-প্রাণে মিশনারী সিস্টার, অথচ সেই মিশনের স্বপ্ন ওঁকে ছাড়তে হয়েছে। পারিচালনদক্ষতার গুণে তবে এত বেশি প্রয়োজনীয় উনি এখানে যে, কোনদিন ওঁকে আমরা মিশনের কাজে ছেড়ে দিতে পারি নি। সে হতাশা খুব সাহসের সংগেই জয় করে ফেলেছেন তিনি, কিন্তু কোন মিশনারী সিস্টারকে তাঁর কাছে যখনই পাঠাই, আমি জানি সেই পুরোনো আকাঙ্ক্ষাগুলো নতুন করে বেদনা দেয় তাঁকে। তোমার এই তামাটে মুখখানা তিনি দেখবেন যখন…

রেভারেণ্ড মাদারের শক্তিময় চোখে সাবধানবাণী প্রকাশ পেল।

গলার স্বরটা রুদ্ধ হয়ে আসতে চাইছে, ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব দৃঢ়স্বরে সিস্টার লুক বলল, ভগবানের কৃপায় আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন আপনি, রেভারেণ্ড মাদার।

…ব্যাহত মিশনারী…এ গোপন বেদনার কথা আমিও জানি কিছুটা…

—খুব ভাল কথা তা হলে সিস্টার। দেখি কি করতে

পারি। রেভারেণ্ড মাদার আশীর্বাদ করতে হাত তুললেন।

দেখি কি করতে পারি···দেখি কি করতে পারি··· ক'টি মাত্র কথা—কিন্তু বিচার-বিবেচনার স্তূপ তার পিছনে। কোন ডাক্তারের খানকয়েক হেলথ্ চার্টের চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্ম আর নির্ভুল। সিস্টার লুক জানে তার মনের অবস্থা সুপিরিয়র জেনারেলের মনে সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে যাচাই হবে। তারই ফলাফলের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। মাদার হাউস থেকে ছাড়া পেয়ে কাজে যোগ দেওয়া, আর সেটা এমন একজন সুপিরিয়রের অধীনে, তার উপস্থিতি বেদনা দেবে যাঁকে।

পরের দিনগুলো অধিকাংশ সময়ই চ্যাপেলে কাটল। বার বছরের অভ্যাসে দু'হাঁটুতে শক্ত কড়া পড়ে গেছে, পাথরের মেঝের ঘর্ষণে ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে গেছে পায়ের পাতা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির হয়ে বসে নতজানু-প্রার্থনা করতে পারে। সুদৃঢ় বিশ্বাসে। প্রার্থনার প্রত্যুত্তর সে পাবে।

পাঁচদিন পরে বুলেটিন বোর্ডে নিজের নাম দেখতে পেল। হল্যাণ্ড বর্ডারের হাসপাতালে বদলি করা হয়েছে তাকে।

নোটিশটার তলাতেই চলতি ঘটনাবলী আটকানো আছে—তারিখ ২২শে মে, ১৯৩৯। উক্ত দিনে জার্মানি আর ইটালি বার্লিনে এক দশবছর মেয়াদী সামরিক ও রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করেছে। একটুকরো জাগতিক খবরই আটকানো সন্দেহ নেই—যে শান্তির জন্য অবিরত প্রার্থনা করছে নানরা এটা তারই প্রতিপাদন বলে তারা বুঝতে পারে যাতে, তাই।

নিছক কর্তব্যবোধে চোখ বুলিয়ে গেল সিস্টার লুক। এর সংগে তার নিয়োগের যে কোন সংযোগ থাকতে পারে স্বপ্নেও ভাবল না। ভবিতব্যের ইসারায় যে যোগাযোগ ঘটল তা একেবারেই তার চোখ এড়িয়ে গেল।

বছর ঘুরে না আসতেই কথাটা স্মরণ করতে হয়েছিল তাকে—যখন দেখতে হ'ত আকাশ থেকে ছোট ছোট সাদা কুণ্ডলীর মত কিছু নেমে আসছে নীচে, প্রথমে সেগুলোকে মেঘের মত লাগত, তারপর মাটির কাছাকাছি চলে এলে প্যারাস্যুট হয়ে যেত···অদৃশ্য সুতো ধরে নাৎসি সৈন্য ঝুলে থাকত তাতে।

[ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

যতদূর মনে পড়ে

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত (বার-এ্যাট্-ল)

[বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত আইনজগতে মিঃ এন আর দাশগুপ্ত নামে সমধিক পরিচিত। ব্যারিস্টার হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি সর্বজনবিদিত। বহু জটিল ও দুরূহ ফৌজদারী মামলার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অকাট্য যুক্তির সাহায্যে প্রাঞ্জল সমাধান করে ও দুর্ভেদ্য রহস্যের জাল উন্মোচন ক'রে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই রচনাটিতে লেখক তাঁর আইনজ্ঞ জীবনের বহু ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর ও বিচিত্র কাহিনী পরিবেশন করেছেন। স্মৃতিকথামূলক ধারাবাহিক এই লেখাটি পাঠক-পাঠিকার সামনে অতীতের বহু পরিচিত সত্য ঘটনা নতুন ক'রে তুলে ধরবে।—স]

দেশে-বিলেতে

মানুষের জীবনধারা কোনদিক দিয়ে কোথায় গিয়ে কিভাবে পরিণতি লাভ করে—সে মানুষের ইচ্ছা সাপেক্ষ ত' একেবারেই নয়, এমন কি কল্পনা সাপেক্ষও নয়। কোন অদৃশ্য মহাশক্তির সূক্ষ্ম অনুপ্রেরণায় সে ধারা আপন গতিতে বেয়ে চলে—তা সে নিজেই কি জানে? যদি পরিণত বয়সে অতীতের দিকে তাকাই, অবাক হয়ে এই সত্যটুকু হয় তো বা কতকটা উপলব্ধি করি।

ব্যারিস্টার হব—একথা ছেলেবেলা থেকে কখনও ভাবি নি, কল্পনাও করি নি।

পূজনীয় পিতৃদেব ছিলেন সে-যুগের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরেছি এবং বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষালাভ করেছি। পরে তিনি যখন কলকাতায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন—প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই-এ, বি-এ, এম-এ পাশ করেছি। কিন্তু বরাবরই ভেবেছি—পিতৃদেব বড় সরকারী চাকুরী করেন—আমিও যা হয় একটা কিছু ভাল সরকারী চাকুরী পাব। এর বেশি উচ্চাশা আমার কিছু ছিল না।

তবে হ্যাঁ। একটা দিক দিয়ে আমার মনের বাসনা প্রবল ছিল—আমি নামজাদা সাহিত্যিক হব। প্রথম যৌবনে অনেক কবিতা অনেক নাটকও লিখেছি। বন্ধু-বান্ধবদের পড়ে শুনিয়েছি তাঁরাও বাহবা দিয়েছেন—এদিক দিয়ে আমার মনের বাসনা বেড়েই চলেছিল।

সে যাই হোক, তেমন ভাল চাকুরী কিন্তু আমার জুটল না। ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বা ঐ ধরণের চাকুরীর অনেক চেষ্টা করলাম, কিছুই হল না। পেয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত একটা সাব-ডেপুটীর চাকুরী—সে-যুগে সাব-ডেপুটীর মাহিনা খুব কম ছিল—পিতৃদেবের মনও তত সায় দেয় নি—চাকুরীটা নিলাম না।

[illegible] কথা লিখতে বসেছি—আত্মজীবনী নয়। তাই এসব কথা অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু কি করে, কি মনোভাব নিয়ে আমি শেষ পর্যন্ত আইন-আদালতের প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ালাম, কেন যে আইনসঙ্কুল বড় বড় দেওয়ানী মামলার ধার দিয়েও ঘেঁষি নি, ফৌজদারী মামলা নিয়েই জীবন কাটিয়েছি—আইন-আদালতের এই কাহিনীর দিক দিয়ে এসব কথার কিছু সার্থকতা হয় তো আছে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত E. D. Sassom & Co বলে তখনকার দিনের একটা নামজাদা ব্যবসা-বাণিজ্যের আপিসে একটা চাকুরী জুটল। চাকুরীটি অবশ্য জুটল কলকাতায়, আমার পিতৃদেবেরই প্রতিপত্তিতে। চাকুরীটি মন্দ ছিল না। ভবিষ্যতে উন্নতির আশাও যথেষ্ট ছিল। প্রথম বৎসরটা শিক্ষানবিশীর সময় তারা আমাকে একশত টাকা করে মাসে মাহিনা দিত। এক বৎসর পরে পাকা হলে দু'শো-আড়াইশো টাকায় মাহিনা সুরু হবে—ক্রমে বাড়বে, এই ছিল কথা। সেকালের পক্ষে বেশ ভালই।

কিন্তু মাস ছ'য়েক চাকুরী করতে না করতে ক্রমে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগতে লাগল। টাকাকড়ির হিসেব, আমদানি-রপ্তানি, ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা খুঁটিনাটি আমার মোটেই ভাল লাগত না। এসব কাজে কোনও উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা একেবারেই পেতাম না। অথচ পিতৃদেবকেও কিছু বলতে পারি না—কি-ই বা বলব!

বছরখানেক যেতে না যেতে, যখন পাকা হয়ে মাইনে বাড়ার সময় এসেছে—আমার মন ক্রমে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। অথচ উপায়ই বা কি?

এমন সময় একদিন আমার জ্বর হল—অল্প জ্বর। বেশ মনে আছে, সমস্ত রাত জ্বরের নেশায় ছটফট করতে করতে খালি এই কথাটিই মনে হতে লাগল—আমার জীবনে কিছুই হল না।

এ চাকুরীতেও শান্তি পাচ্ছি না, অথচ অন্য কোনও ভাল চাকরী পাওয়ার আর কোনও আশাও নেই।

ছট্‌ফট্‌ করতে করতে শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়লাম এবং ভোর হতে না হতে ঘুম ভেঙে গিয়ে চট্‌ করে একটা কথা মনে এল—আমি ব্যারিস্টার হই না কেন? কথাটা মনে হতেই মনটা যেন একেবারে শান্ত হয়ে গেল। কোথা থেকে হঠাৎ এই অনুপ্রেরণা এল জানি না। আমাদের এক নিকট আত্মীয় মিঃ এস্ কে সেন ব্যারিস্টার ছিলেন। যদিও খুব বেশি দিন তিনি ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেন নি—তবুও ইতিমধ্যেই তিনি বেশ নাম করেছিলেন এবং রোজগারও করতেন প্রচুর। চোখের সামনে তাঁরই আদর্শ কি আমার অন্তরতম অন্তরকে অনুপ্রাণিত করেছিল?

সকালবেলা জর ছেড়ে গেছে। বিছানা থেকে উঠে বাইরে এসে মনটা আমার অবসাদে ভরে গেল। পিতৃদেব কি আমাকে বিলেত পাঠাতে রাজী হবেন? বিলেত যেতে ত' অনেক টাকা লাগে শুনি। পিতৃদেব কি অত টাকা দিতে পারবেন? ধীরে ধীরে পিতৃদেবের কাছে গিয়ে বসলাম।

একথা-সেকথার পর কথাটা বললাম তাঁকে। বললাম—এ চাকুরী আমার মোটেই ভাল লাগছে না, আমি বিলেত যাব ব্যারিস্টার হতে। তিনি খুব বেশি কথা বলতেন না। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বেশ তাই হবে। আমার মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

পিতৃদেব তখন কি ভেবেছিলেন জানি না। সাধারণ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ থেকে উন্নতি করে তিনি তখন কলকাতার অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন কি—তাঁর প্রতিপত্তিতে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এলে ফৌজদারী আদালতে কিছু কিছু টাকা আমি পাবই এবং তার ফলে রোজগার চাকুরীর রোজগারের চেয়ে অনেক বেশি হবে; তারপর যদি আমি কাজে দক্ষতা দেখাতে পারি—ইত্যাদি?

সাহিত্য-সাধনার কথা আমি ভুলি নি। ভেবেছিলাম—ভালই হবে, আইন-আদালতে বিচিত্র জীবনের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হলে সাহিত্যের খোরাক পাব আরও বেশি। কি ভুলই ভেবেছিলাম। খোরাকের অভাব হয় নি কিন্তু আইন-আদালতের মধ্যে তলিয়ে গেলে সাহিত্য-সাধনার সময় কোথায়? সত্যিকারের সাহিত্য যে কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। আইন-আদালতের সার্থকতাও বিনা সাধনায় অর্জন করা যায় না। বিলেতে একটা চলতি কথা আছে—

Bar is a jealous mistress.

বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়বার চারটি প্রতিষ্ঠান—Inner Temple, Middle Temple, Lincolns Inn, Grcys Inn. অনেক ভাল। তাই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত আমি Middle Temple-ই বেছে নিলাম।

এইসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ক্লাশ হত এবং সেইসব ক্লাশে বিলেতের বড় বড় আইনজ্ঞেরা পড়াতেন অর্থাৎ লেকচার দিতেন। কিন্তু এসব লেকচার শোনা মোটেই বাধ্যতামূলক ছিল না। Percentage বলে কিছু ছিল না এইসব ক্লাশে। তাই প্রথম প্রথম দু-চার দিন ক্লাশে গেলেও—ক্রমে ক্লাশে যাওয়ার উৎসাহ নিভে গেল। থাকতাম অনেক দূরে। তাই বোধ হয় ঐ শীতে সকাল সকাল উঠে তৈরি হয়ে, বাসে করে ক্লাশে যাওয়ার উদ্যম আর রইল না। শেষ পর্যন্ত ক্লাশ করা একেবারেই ছেড়ে দিলাম। পড়াশুনা যা একটু-আধটু করতাম, তা বাড়িতেই। বন্ধু-বান্ধবীও ত' ক্রমে অনেক জুটে গেল। তবে হ্যাঁ, প্রত্যেক Term-এ অন্তত ৬টা করে সান্ধ্যভোজনে (Dinner) উপস্থিত থাকতেই হত। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের এইসব সান্ধ্যভোজনে, প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বড় বড় আইনবিদগণও উপস্থিত থাকতেন। হয় তো ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে এবং কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগের দিক দিয়ে এইসব সান্ধ্যভোজনের কতকটা সার্থকতা ছিল। তাই এগুলিকে খানিকটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

বিলেতে আইনের ছাত্র হিসাবে দু'টি ব্যাপার আজও আমার কাছে রহস্য হয়েই আছে—তার কোনও সমাধান আজও করতে পারি নি। আমি এদেশ থেকেই বি এল পাশ করে গিয়েছিলাম। তাই বোধ হয়—যতদূর মনে পড়ে—যাওয়ার মাস তিনেকের মধ্যে আমি পরীক্ষার প্রথমভাগ (Preleminary) দেওয়ার অধিকার পেলাম এবং ফেলে না রেখে পরীক্ষা দিলামও। তিনটি বিষয় পরীক্ষা দিয়েছিলাম—Hindu Law, Constitutional Law এবং Criminal Law. পড়াশুনা, আগেই বলেছি, সামান্য কিছু কিছু করেছিলাম—এমন বিশেষ কিছু নয়।

যাই হোক, Hindu Law এবং Constitutiaonl Law-এর পরীক্ষা মোটামুটি দিলাম—নেহাৎ মন্দ হল না। কিন্তু Criminal Law-এর পরীক্ষা দিতে বসে প্রশ্নের কাগজ দেখে আমি ত' অবাক। একটুও বাড়িয়ে বলছি না, একটা প্রশ্নেরও সঠিক উত্তর আমি জানতাম না। আর সবই ইংরাজীতে যাকে বলে Problem—অর্থাৎ এই এই ঘটনা ঘটেছে, অমুক পক্ষ তোমার কাছে এসেছে তোমাকে দিয়ে আদালতে তার পক্ষ সমর্থন করাবার জন্য—আইনের দিক দিয়ে কোন ধারার অপরাধ হল এবং তুমি তার জন্য কি করতে পার? এই ধরণের সব প্রশ্ন।

একবার ভাবলাম উঠে যাই—এই Criminal Law-

যখন বসেছি পরীক্ষা দিতে, আন্দাজে যা' হয় কিছু কিছু লিখে যাই। ক্ষতি ত' নেই।

বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা লিখলাম—মনে আছে। অর্থাৎ—এরকম লোক আমার কাছে এলে সম্ভাষণ করে তাকে আমি বসাব, ধীরভাবে তার কথা আমি শুনব, তারপর আইনের বই দেখে আইনের সঙ্গে ঘটনা মিলিয়ে নেব। তারপর আদালতে গিয়ে—ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব নানারকম করে ফেনিয়ে ফেনিয়ে আজে-বাজে কথা লিখে একখানা খাতা ভরিয়ে দিয়ে বোধ হয় আর একখানা খাতা চেয়ে নিয়েও কিছু কিছু লিখলাম।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রথিতযশা অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র, এইসময় বিলেতে আমার সঙ্গে ছিল। আমরা একসঙ্গেই বিলেত গিয়েছিলাম। সোমনাথও ব্যারিস্টারী পড়তেই গিয়েছিল, যদিও সে শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টারী পড়ে নি। আমরা তখন এক বাড়িতেই ছিলাম। সে-ও পরীক্ষা দিয়েছিল, তবে মাত্র একটা বিষয়—Criminal Law. সে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী কৃতী ছাত্র, ভাল করে পড়াশুনা করেই পরীক্ষা দিয়েছিল। বাড়ি এসে যখন তার সঙ্গে আলোচনা হল, আমার প্রশ্নোত্তরের কথা শুনে সে ত' হেসেই অস্থির। বুঝিয়ে দিল কোন প্রশ্নের কি জবাব। আমি ধরেই নিলাম—Criminal Law-র পরীক্ষা আমাকে আবার দিতেই হবে।

মাসখানেক পরে পরীক্ষার ফল বেরুল। তখন Times পত্রিকায় পরীক্ষার খবর বেরুত। আমার মনে আছে—সকালবেলা সেদিন সূর্য উঠেছিল এবং পরিষ্কার সূর্যের আলোয় চারিদিক ঝক্‌ঝক্ করছিল,—আমি একখানা Times পত্রিকা কিনে Middle Temple-এর পিছনে, টেমস্ নদীর ধারে ছোট একটি পার্কে একটি বেঞ্চর উপর বসলাম। Times খুলে পরীক্ষার ফল দেখতে সুরু করলাম। প্রথম দেখলাম—Constitutional Law কোনও-রকমে তৃতীয় বিভাগে পাশ করবার চেয়ে বেশি কিছুই আশা করি নি। দেখলাম তৃতীয় বিভাগেই আমার নাম রয়েছে। মনটা একটু খুশি হল, তবে পাশ করব আশাই ত' করেছিলাম। তারপর দেখলাম—Hindu Law. তাতেও তৃতীয় বিভাগে পাশের তালিকায় আমার নাম। তারপর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আর কে কে পাশ করেছে—তাদেরও নাম দেখলাম। তারপর Criminal

Law-এর ফলাফল দেখতে সুরু করলাম। পাশের তালিকায় তৃতীয় বিভাগে দু-একজন বন্ধুর নাম দেখলাম—কিন্তু আমার নাম ছিল না। মন একটুও খারাপ হল না—কেন না এরজন্য আমার মন ত' প্রস্তুতই ছিল।

তারপর প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে ভারতীয় ছাত্রেরা কেউ পাশ করেছে কি না দেখতে লাগলাম। সে-যুগে প্রথম বিভাগে পাশ করা খুবই কঠিন ছিল, দ্বিতীয় বিভাগেও প্রায় তাই। আমার জানা-শোনা ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে কারও নাম পাব বিশেষ আশা করি নি। হঠাৎ চমকে উঠলাম—আজও মনে আছে। Criminal Law-এর দ্বিতীয় বিভাগে আমার নাম—গুপ্ত নীরদরঞ্জন দাশ। অবাক হয়ে টেমসের দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

কি করে যে এ সম্ভব হল, এ রহস্য আমার কাছে আজও পরিষ্কার হয় নি। আমার হাতের লেখা খুব পরিষ্কার ছিল না। খারাপই ছিল বলতে হবে। তাই সোমনাথ ঠাট্টা করে বলেছিল—অনেকটা লিখেছ অথচ পরীক্ষক তোমার হাতের লেখা একবর্ণও পড়তে পারে নি, তাই এমন হল। পরীক্ষক ছিলেন—যতদূর মনে পড়ে সার, ব্লেক অজার্স (Sir Blake Odgers) সে-যুগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ও আইনবিদ্। যাই হোক পরে ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি। মনে হয়েছে—এ বোধ হয় সেই অদৃশ্য মহাশক্তির একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। ফৌজদারী আইনের ভিতর দিয়েই আমার ব্যারিস্টারী জীবনের পথ।

এই আইন পরীক্ষার দিক দিয়ে আরও একটা ব্যাপার ঘটেছিল—সেটাও কম আশ্চর্য নয়। সেটা ঘটল শেষ (Final) আইন পরীক্ষার বেলায়। আগেই বলেছি আমি কোনদিনই বড় একটা ক্লাশের লেকচারে যেতাম না। প্রথম প্রথম দু-চার দিন গেলেও শেষ পরীক্ষার বেশ কিছু দিন আগে থেকে একেবারেই যাই নি। বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে গল্পগুজব, হাইডপার্ক প্রভৃতি স্থানে বেড়ান, সারপেণ্টাইনে নৌকা বাওয়া, এইসব নিয়ে সময় কেটে যেত—লেখাপড়াটা হয়ে গেল গৌণ। কিন্তু যখন পরীক্ষা প্রায় এসে পড়ল, মনের অস্বস্তিতে সমস্ত দিনের পর রাত জেগে পড়াশুনা করতে আরম্ভ করেছিলাম। মনে বিশ্বাস ছিল—আমি ত' দেশে আইন পাশ করেই এসেছি, একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই হবে।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা আরম্ভ হল, কিন্তু Civil Procedure Code-টা আমার একেবারেই পড়া হয়ে উঠল না। শেষদিনের পরীক্ষার বিষয় ছিল—Civil procedure Code. Civil Procedure Code-এর একখানা চটি বই আমার ছিল। ভেবেছিলাম—পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে সন্ধ্যাবেলা আমার এক বন্ধু নাম শ্রীসুরেন লাহিড়ী আমাকে বলল, 'এক পেয়ালা কফি খেয়ে নাও, রাত জাগতে সুবিধা হবে।' সন্ধ্যাবেলা তারই বাড়িতে এসে গল্প-গুজব চলছিল। সে আমাকে এক পেয়ালা কফি করে এনে দিল। কফি আমি কোনদিনই খাই না।—ভালও লাগে না। রাত জাগতে ত' হবেই। ওষুধের মতন এক পেয়ালা কফি শেষ করলাম।

রাত্রে বাড়িতে এসে খেয়েদেয়ে Civil Procedure Code-টা নিয়ে পড়তে বসলাম। কিন্তু পড়তে আরম্ভ করার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বইটা দারুণ কঠিন বলে মনে হতে লাগল—অর্থাৎ সহজে আয়ত্ত করা যায় না। কিন্তু করতেই ত' হবে—প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত বইটা যখন প্রায় শেষ হয়েছে—তখন জানালায় ভোরের আভাষ দেখা দিয়েছে। ওদেশে তখন ভোর হত—যতদূর মনে পড়ে—সাড়ে সাতটা-আটটার সময়।

তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে, দশটা কি সাড়ে দশটায় পরীক্ষার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। পরীক্ষা হয়েছিল—যতদূর মনে পড়ে—Greys Inn-এর একটা হলে।—আমি যেখানে ছিলাম—Powis Garden's—সেখান থেকে ওখানে পৌছতে অন্তত তিন কোয়ার্টার সময় লাগত। বাসে যেতে যেতে শরীরটা একটু খারাপ বোধ করতে লাগলাম। ঢেকুরে আগের দিন সন্ধ্যার সেই কফির গন্ধ পেলাম।

পরীক্ষার হলে বসে, প্রশ্নপত্র যখন আমার সামনে দেওয়া হল, দেখলাম প্রশ্নপত্রের কিছুই বুঝতে পারছি না। সব কেমন যেন ফাঁকা মনে হচ্ছে—আগের দিন রাত্রে যে কি সব পড়েছি কিছুই মনে নেই।—অনেকক্ষণ প্রশ্নগুলো ভাল করে পড়তে পড়তে মনে হল—একটা প্রশ্নের খানিকটা জবাব হয় তো বা লিখতে পারি। সেইটুকুই লিখতে সুরু করলাম। কিন্তু কি হবে—মন দুশ্চিন্তায় ভরে গেল।

একপাতা আন্দাজ লিখেছি—হঠাৎ আমার শরীর দারু খারাপ বোধ হতে লাগল—সমস্ত শরীর অস্থির করে একটা বমি বমি ভাব। গার্ডের অনুমতি নিয়ে, উঠে গিয়ে বাথরুমে খুব খানিকটা বমি করলাম। মুখ-হাত ধুয়ে এক সুস্থ বোধ করলে, আবার এসে লিখতে বসলাম।

লিখব কি ছাই। ঐ একটি প্রশ্ন ছাড়া কোনও প্রশ্নে ত' জবাব কিছু মনে আসছে না। প্রশ্নপত্রের উপরে নির্দে ছিল—অন্তত পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। কি আমার একটি প্রশ্নেরও উত্তর ভালভাবে লেখা হল না।

হঠাৎ শরীর আবার খারাপ বোধ হতে লাগল—আবা সেই বমি বমি ভাব ও কফির ঢেকুর। মাথায় একটা বু

—কাজ্রার ছাদও ত' বয়স তখন কম ছিল। খা

বসে লিখতে পারছি না, আশা করি পরীক্ষক মহাশয় আমাকে মার্জনা করবেন। খাতায় সব মিলিয়ে এক পাতার বেশি বোধ হয় লিখি নি। খাতা দিয়ে চলে এলাম।

বাইরে বেরিয়ে এসে, প্রাঙ্গণে শ্রী জে এন মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হল। তিনিও ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে পরে কিছুদিনের জন্য হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। তিনি অত সকাল সকাল আমাকে পরীক্ষার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? চলে এলে যে?' বললাম, 'কি জানি—কি সব প্রশ্ন দিয়েছে। Summons for dıscretion না কি, কিছুই বুঝতে পারলাম না।' তিনি আমার কথা শুনে হেসে উঠলেন। আসল কথাটা 'Summons for Directions'—আইনের একটা সোজা কথা—সবাই জানে। পরে কলকাতায় হাইকোর্টের ব্যারিস্টারদের লাইব্রেরীতে এই গল্পটি সকলের কাছে শ্রীমজুমদার কতবার যে মজা করে বলেছেন তার ঠিক নেই।

যাই হোক তারপর একমাস মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে রইল—অনুশোচনায় ভরা। ছিঃ ছিঃ—এ কি হল। পিতৃদেব আমাকে বিলেতে পাঠিয়েছেন, কত আশা করে, মাসে মাসে বিলেতে আমাকে মোটা টাকা পাঠাতে হয় তো আর্থিক দিক দিয়ে কষ্ট হয় তাঁর। আর আমি কিনা পড়াশুনা না করে আড্ডা দিয়ে সময় কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টারীর শেষ (Final) পরীক্ষায় ফেল করে বসলাম! শেষ (Final) পরীক্ষা ঠিক প্রাথমিক (Preliminary) পরীক্ষার মতন নয়। এ দেশের মতন সবগুলি বিষয় পাশ না করলে পাশ হওয়া যায় না।

সে-যুগে ব্যারিস্টারী পাশ করা যে খুব সহজ ব্যাপার ছিল—তা নয়। ভারতীয় ছাত্রেরা অনেকেই দু-একবার ফেল হতেন। আমার এই অবস্থায় অনেকেই আমাকে বললেন—ক্লাশে গিয়ে লেকচার শুনতে হয়, যাঁরা লেকচার দেন তাঁরাই ত' পরীক্ষক; তাই তাঁদের লেকচার শুনলে বোঝা যায়, কি ধরণের প্রশ্ন আসবে; কোন বিষয়ের কোন দিকটা তাঁরা জোর দিচ্ছেন; ক্লাশে গিয়ে লেকচার না শুনলে পরীক্ষা পাশ করা কঠিন।

এসব বুদ্ধি পরীক্ষার আগে ত' কেউ আমাকে দেয় নি।

ফলে, শেষ-পরীক্ষা দেওয়ার পর আমি রীতিমত রোজই ক্লাশে গিয়ে লেকচার শুনতে এবং নোট নিতে সুরু করলাম। তখন শীতকাল—থাকতাম আমি Powis Gardens-এ, লেকচারের হল থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল দূর। ঐ শীতে, রাত থাকতে উঠে তৈরি হয়ে কাঁপতে

কাঁপতে বাসে উঠে রোজ লেকচার শুনতে যেতে যে কি কষ্ট হত—তা এখনও ভুলি নি। আমার নিজের পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে—মনকে বোঝাতাম।

এইভাবে পুরো একমাস কি আরও কিছু বেশি সময় কাটল। আগেই বলেছি—আমি তখন থাকতাম Powis Gardens-এ। সেই সময় কিছুদিন আমার বন্ধু শ্রীসুরেন লাহিড়ী (পরে ইনি ডাক্তারী পাশ করে এসে রেলওয়েতে বড় চাকুরী করতেন) আমার সঙ্গে থাকত একই ঘরে। একদিন ভোরবেলা আমি লেকচার শুনতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি, সুরেন ঘরে ছিল না, কোথায় বেরিয়ে গেছে। আমাদের ঘরটা ছিল দোতালায়—হঠাৎ সিঁড়িতে দুপদাপ পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম এবং পরক্ষণেই সুরেন ঘরে এসে ঢুকল, হাতে একখানা Times পত্রিকা।

পত্রিকাখানি আমার সামনে একটা ছোট টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে চীৎকার করে বলল, 'এই নাও, পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে—গুপ্ত নীরদরঞ্জন দাশ।'

চমকে উঠে কাগজখানি তুলে নিয়ে দেখলাম, সত্যিই আমি পাশ করেছি। অবাক হয়ে সুরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে, শুধালাম, 'কি করে হল?'

কি করে হল—আজও ঠিক জানি না। তবে এখন আমার মনে হয়—ওদের দেশে প্রশ্নের উত্তরের কাগজ পরীক্ষা করার রীতি-নীতি ঠিক আমাদের দেশের মতন নয়। হয় তো বা আমি যে লিখেছিলাম—আমি অসুস্থ ইত্যাদি—পরীক্ষক মেনে নিয়েছিলেন। হয় তো বা অন্য অন্য বিষয়ের প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে পরীক্ষকগণ সিদ্ধান্ত করেছিলেন—এ ছাত্রটির পাশ করাই উচিত। আমাদের দেশে পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই সহৃদয়তাটুকুর পরিচয় কি পাওয়া যায়?

ছাত্রজীবনে বিলেতে থাকার সময় একটা ঘটনা আমার মনকে খুবই প্রভাবান্বিত করেছিল—সেইটে বলি। সে সময় একটা বিখ্যাত মামলা হয়েছিল—Greenwood Trial (গ্রীনউডের বিচার)। গ্রীনউড বলে একটি সলিসিটার নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছিল—যতদূর মনে পড়ে। আর্সনিক বিষ খাইয়ে—এই ছিল অভিযোগ। গ্রীনউড একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আইন-আদালতের সঙ্গেই তাঁর কারবার, তাঁর বিরুদ্ধে এইরকম গুরুতর অভিযোগ—কাজেই মামলাটা ইংল্যাণ্ডে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এই চাঞ্চল্য আরও ঘনীভূত হল, যখন খবরের কাগজে বড় বড় করে বেরুল যে, স্বয়ং সার এডওয়ার্ড মার্শাল হল্ (Sir Edward Marshal Hall) বিচারে গ্রীনউডের পক্ষ সমর্থন করবেন। ফৌজদারী ব্যারিস্টার। আজও তাঁর নাম অনেকেই জানেন। তিনি তখন কাজ থেকে প্রায় অবসর গ্রহণই করেছিলেন—আইল অফ ওয়াইটে একটি বাড়ি করে সেইখানেই প্রায় থাকতেন। খুব বড় বড় মামলায়, ধনী ব্যক্তিরাই মাঝে মাঝে তাঁকে কোর্টে নিয়ে আসত।

যাই হোক, তখন প্রায় রোজই খবরের কাগজে এই মামলা-সংক্রান্ত কিছু না কিছু খবর থাকতই। গ্রীনউডের ছবিও কাগজে বেরিয়েছিল এবং নানাভাবে মার্শাল হলের ছবিও বেরুত প্রায়ই—হয় তো বা তিনি তাঁর ঘরে বসে মামলার বিষয় আলোচনা করছেন অথবা তিনি গাড়ি থেকে নামছেন, কোর্টে যাওয়ার জন্যে ইত্যাদি।

আমার প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের আইন-আদালতের অভিজ্ঞতার ফলে এইটুকু দেখেছি যে, এদেশে কোনও মামলাই—যতই গুরুতর হোক না কেন—অতটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না। আমাদের দেশে অনেক মামলার খবরই খবরের কাগজে বিস্তারিত বেরোয় বটে, কিন্তু কাগজের প্রধান খবর হিসাবে প্রথম পাতায়ই বড় বড় হরফে তার স্থান হয় না।—কারও ছবি ত' বেরোয়ই না, এমন কি আলীপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দর ছবিও কাগজে বেরিয়েছিল কি না সন্দেহ।

আমি Daily Express নিতাম এবং Daily Express বেশ নামজাদা কাগজই ছিল। একদিন কাগজে দেখলাম লিখেছে—আদালতে গ্রীনউডের বিচারের সময় অত্যন্ত ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা। তাই কর্তৃপক্ষ টিকিটের ব্যবস্থা করেছেন, অমুক জায়গায় গেলে টিকিট পাওয়া যাবে ইত্যাদি। আরও লিখেছে—কোর্টে সার এডওয়ার্ড মার্শাল হলের জেরা, ভাষণ, ইত্যাদি শোনা কোনও থিয়েটারে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার অভিনয় দেখার চেয়ে কোনও অংশে কম চিত্তাকর্ষক নয়। বিচারটি দেখবার খুব আগ্রহ হল এবং টিকিট পাওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলাম; কিন্তু টিকিট জোগাড় করা হল না। কাজেই রোজ সকালবেলা খবরের কাগজে মামলার বৃত্তান্ত পড়া ছাড়া আর উপায় বা কি ছিল।

কোর্টে মামলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—এইবার মার্শাল হল্ জুরীদের নিজের ভাষণ শোনাবেন। আমি অপরাহ্নে, চেয়ারিং ক্রশ স্টেশনের কাছে লায়ন্স কর্নার হাউস বলে একটা চা-জলখাবারের দোকানে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় বাইরে খবরের কাগজের ফেরীওয়ালাদের চীৎকার শোনা গেল—Marshal Hall faints addressing the Jury (মার্শাল হল্ জুরীর ভাষণ দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন) বা ঐ ধরণের একটা কিছু। খুবই কৌতূহল হল। কর্নার হাউস

পড়ে দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে—মার্শাল হল্ জুরীর ভাষণ দিতে দিতে মনের আবেগে এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না, অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পরের দিন খবরের কাগজে মামলার ফল বেরুল—জুরী দোষী বলেছে। মার্শাল হলের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার বিষয়ও কাগজে লিখেছিল। জুরীর ভাষণ শেষ হওয়ার পর কাগজের রিপোর্টারেরা তাঁকে নানা প্রশ্ন করেছিল। তার মধ্যে একটি রিপোর্টার একটু হেসে প্রশ্ন করেছিল—আচ্ছা, একটা কথা সত্যি বলবেন? আপনি কি সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন না ওটাও জুরী ভোলাবার একটা কৌশল? মার্শাল হল্ একটু মৃদু হেসে চলে গিয়েছিলেন, কোনও জবাব দেন নি।

পরে রিপোর্টারদের সঙ্গে কথাবার্তার বিস্তারিত খবর বেরুল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—ভাল ফৌজদারী ব্যারিস্টার হতে হলে কি কি গুণ থাকা দরকার। তিনি সংক্ষেপে গোটাকতক কথা বলেছিলেন—সে কথাগুলি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল—তাই মোটামুটি আজও মনে আছে। তিনি বলেছিলেন—

১। ফৌজদারী আইনটার মোটামুটি একটা জ্ঞান থাকা দরকার—কিন্তু আইনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কংবা কূট তর্কের মধ্যে হারিয়ে না যাওয়াই ভাল।

২। মামলার বৃত্তান্তটির উপর সর্বাঙ্গীণভাবে একটা দখল থাকা উচিত—কিন্তু তার খুঁটিনাটির মধ্যে তলিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

৩। ফৌজদারী ব্যারিস্টারের কৃতিত্ব যে গুণটার উপর বিশেষকরে নির্ভর করে, সেটা হচ্ছে—Sense of Drama. (সূক্ষ্ম নাট্যবোধ)।

পরে ইংল্যাণ্ডের আর একজন সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার সার প্যাট্রিক হেস্টিংস্ (Sir Patrick Hastings)এর লেখা একখানা বইতে পড়েছিলাম, তিনি মার্শাল হল সম্বন্ধে বলেছেন—'মার্শাল হল কোনও ফৌজদারী মামলায় আসামীপক্ষ সমর্থন করার জন্য কোর্টে ঢুকলেই নাটক হত সুরু এবং শেষ পর্যন্ত তিনি অবসন্ন হয়ে বসে পড়লে নাটক হত শেষ।'

লেখা পড়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। আজও মনে আছে। মার্শাল হলের কথাগুলি যেন আমার মনের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল। দেওয়ানী মামলার পুরানো দলিলপত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বা আইনের কুটিল ব্যাখ্যা নিয়ে মাথা ঘামানো—কোনকালেই আমার ভাল লাগে নি। আর Sense of Drama—সরলভাবেই বলি—আমার বিশ্বাস ছিল আমি ভাল অভিনয় করি। কেন না ইতিমধ্যেই বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে অনেক অভিনয় করেছিলাম এবং সবসময়ই সবচেয়ে বড় ভূমিকা আমাকেই দেওয়া হত। এবং অভিনয়ের সময় বাহবাও পেতাম যথেষ্ট। অভিনয় করতে সত্যই আমি খুব ভালোবাসতাম এবং এ-যুগের মতন সে যুগে যদি অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও ঘৃণা না থাকতো, হয় তো আমি অভিনেতাদের দলেই যোগ দিতাম। মার্শাল হলের কথাগুলি পড়ে তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেললাম—দেশে ফিরে গিয়ে ফৌজদারী ব্যারিস্টারই হব।

আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে অনেক বড় বড় ফৌজদারী মামলার অভিজ্ঞতার ফলে, মার্শাল হলের কথাগুলি যে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ—সমস্ত মন দিয়ে উপলব্ধি করেছি।

[ক্রমশ।

খগেন্দ্র দত্ত

অবশেষে নতুন প্রস্তাব এল। নতুন পরামর্শ। প্রতিবেশী রামুকাকাই দিলেন পরামর্শটা। কেমন এক ভক্তিগদগদ গলায়। কিছুটা শঙ্কা, কতকটা শ্রদ্ধা-মেশানো স্বরে বললেন: বাঁচতে চাও তো পাশের গাঁয়ে যাও। বুড়োশিবতলায় বটগাছের নীচে হত্যে দাও গিয়ে।

আশ্চর্য হয়ে রামুকাকার কথাটা শুনলো বিপিন। শুনলো মুগ্ধ তন্ময়তায় উৎকর্ণ হয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখের সামনে একটা আলোর রেখা দেখতে পেল। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে ওর চেতনার পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়লো অনাবিল আনন্দের একটা শিহরণ।

নিষ্পলক দু'টো চোখ তুলে তাকিয়ে রইলো বিপিন। রামুকাকার দু'টো চোখের তারায়, মুখের রেখায় রেখায় অবিশ্বাসের কোন চিহ্নই নেই। বরং বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক বলেই মনে হচ্ছে। এতদিন পর তা হলে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন? দীর্ঘদিনের অসুখের একটা কিনারা হল তা হলে। তাই তো হয়েছে। রামুকাকা এসব দেখে-শুনে চুল-দাড়ি পাকিয়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার পুঁজি অনেক। তাঁর কথা শুনলে, পরামর্শমতো কাজ করলে, হয় তো ভালো হয়ে যাবে বিপিন। সেরে যাবে অসুখ।

এ অসুখে আক্রান্ত হবার পর বছর শেষ হয়ে এল প্রায়। অসুখ ওর কিছুতেই সারে নি। অসুখটাও বিদঘুটে। কেমন যেন অস্বাভাবিক। বিকেলের দিকে ঘুষঘুষে জর।

নয়। চিকিৎসা করালেই সেরে যাবে, ভালো হয়ে যাবে বিপিন।

সে আশ্বাসেই চিকিৎসা করিয়েছে বিপিন। যখন যেদিকে সুযোগ পেয়েছে, তখন সেদিকেই চিকিৎসা করিয়েছে। প্রথম দেড়মাস হোমিওপ্যাথি খেয়েছে, তাতে কাজ হয় নি দেখে কবিরাজির আশ্রয় নিয়েছিল। সে আশ্রয়ে প্রায় মাস তিন কাটিয়েছে। কিন্তু ফল হয় নি কিছুই। দু'টোর কোনটাতেই সারে নি অসুখ। ভালো হয় নি বিপিন। বরং খারাপের পথেই এগিয়েছে দিন দিন। শরীর ভেঙেছে ক্রমে ক্রমে। ক্ষয় হয়েছে দিনে দিনে। দেহ দুর্বল হয়েছে, মনোবল হারিয়েছে। টাকা-পয়সা খরচা হয়েছে, আস্তে আস্তে সংসার হয়েছে অচল। রোজগেরে বলতে তো বিপিন একাই। সংসারও ছোট নয়। মাথাগুণতি পাঁচজনের সংসার। তিন তিনটে ছেলেমেয়ে আর ওরা দু'জন। দু-দু'টো পুরো আর তিনটে অর্ধেক। এদিকে বাজারের হাল-চাল তো খুবই খারাপ।

দুর্দিনের বাজারে পেট চালানোই যেখানে কষ্টসাধ্য, সেখানে অসুখের চিকিৎসা তো একধরণের বিলাস। বিশেষকরে বিপিনের যা অসুখ—তাতে টাকার শ্রাদ্ধ না হলে অসুখ সারানোর কথা কল্পনাও করা যায় না। সে টাকা কোথায় বিপিনের, কোথায় ওর সে সঙ্গতি?

কাজ না করে ওর তো উপায় নেই। খাবে কি পাঁচ-পাঁচটি প্রাণী? তাই এ দুর্বল শরীর নিয়েও কাজে বেরুতে হচ্ছে মাঝে-মধ্যে। অসুখে আক্রান্ত হবার আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। তখন রোজ কাজে বেরুতো বিপিন, রোজ কাজ করতো। পয়সা উপায় করতো। একটু একটু জর যখন সবে দেখা দিচ্ছে তখনও ও কাজে বেরুতো, জর গায়েও দিনমজুরী করতো। মাঠ থেকে ধান বয়ে আনতো চাষীর বাড়ি, মুদির দোকানের সওদা বয়ে আনতো নদীপার থেকে। তখনও দেহে বল, মনে অসাধারণ জোর।

সে বল, সে মনের জোর হারিয়ে ফেললো বিপিন। ঘুসঘুসে জর নিয়ে বেশিদিন কাজ করতে পারলো না। আগের মতো ভারী বোঝা বইতে পারলো না। ওভাবে শরীরও টানতে পারলো না বেশিদিন। দুর্বল হয়ে পড়লো, শক্তি-সামর্থ্য হারালো। শারীরিক অক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে মনের অক্ষমতাও ঘিরে ধরলো ওর দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে।

আত্মীয়-স্বজনরা ডাক্তার দেখাবার পরামর্শ দিল। কবিরাজির কথা উঠতে ওরা বলেছিল: কবিরাজিতে হবে না, ঐ দুরন্ত রোগ সারানো হোমিওপ্যাথিরও কাজ নয়।

প্রথম প্রথম বিপিন কারও কথাই শোনে নি, কারও পরামর্শই নেয় নি। মাস পাঁচ-ছয় গত করেছে কবিরাজি আর হোমিওপ্যাথির উপর নির্ভর করে। ভেবেছিল, তাতেই সেরে যাবে। কিন্তু নিরাশ হতে হল শেষ পর্যন্ত। কোন ফলই পাওয়া গেল না।

নিরাশ হয়েই বড় ডাক্তার দেখাতে যাবার কথা ভাবছিল। কিন্তু ডাক্তারবাবুর ফি-এর অঙ্কটা শুনে চোখ কপালে উঠেছিল। মফস্বল শহরের ডাক্তার। নামডাক আছে। যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। তাই বলে এতগুলো টাকা ফি? দু'টাকা নয়, চার টাকা নয়, পনের টাকা ফি! কোথায় পাবে এতগুলো টাকা? তাও আবার একসঙ্গে, একই দিনে। দশ-বিশ যা হাতে ছিল, তাও তো হোমিও- আর কবিরাজ দেখাতেই শেষ। এখন উপায় কি হবে? ডাক্তার না দেখিয়েই বা কি করবে? আবার ঐ ভালো ডাক্তারের কাছে যেতে গেলে যে টাকার প্রয়োজন সে টাকাই বা কোথা থেকে আসবে? বিপিন মনে-প্রাণে ভেঙে পড়েছিল।

চোখের সামনে অন্ধকার জমাট বেঁধেছিল, চাপচাপ অন্ধকারের স্রোত। দু'টো কানের কাছে অবিশ্রান্ত ভ্রমর-গুঞ্জন।

রাধা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ওর সামনে গুটি গুটি পায়ে। এসে তাকিয়ে থেকেছিল কয়েকটি পলক বিপিনের দুশ্চিন্তা-ম্লান মুখের দিকে। নির্বাক। এক সময় বলেছিল: তুমি অত মুষড়ে পড়েছ কেন? ডাক্তার দেখাবার টাকা দরকার? টাকার ব্যবস্থা আমিই করছি।

বিপিন অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলেছিল: টাকার ব্যবস্থা তুমি করবে? কি করে, কোথায় পাবে এতগুলো টাকা?

- কেন? আমার কানপাশা আর ছ'গাছা হাতের চুড়ি ঘরেই তো রয়েছে।

ও!

ক্লান্ত বিষণ্ণ দু'টো চোখ ধীরে ধীরে রাধার মুখ থেকে নামিয়ে এনেছিল বিপিন। স্থির রেখেছিল ঘরের মেঝেতে। কানপাশা আর চুড়ি ছ'গাছা আছে, সেও জানে। বিয়ের সময় রাধার বাপের বাড়ি থেকেই পেয়েছিল। তাও ঘর থেকে বের করে দেবে ওরই প্রয়োজনে, ওরই অসুখ সারাতে? নিজে রোজগার করে একরতি সোনার কোন একটা কিছু গড়িয়ে দিতে পারে নি আর ওর নিজের অসুখের মাশুল জোগাতে হাত পেতে নেবে রাধার বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া সেই সামান্য সোনার গয়না?

রাধা ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলেছিল: মানুষ বাঁচলে তবে তো গয়না, আগে তুমি, তারপর তো অন্য সব, তুমি প্রাণে বেঁচে থাকলে অমন কত গয়না হবে।

আমতা-আমতা করেও রাধার কথা শুনেছিল বিপিন, দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে কানপাশা জোড়া হাতে নিয়ে উঠোনে নেমেছিল। মনে মনে ঠিক করেছিল ওর অসুখ সেরে গেলে, আবার কাজ-কর্ম শুরু করলে কিছু কিছু সঞ্চয় করবে, আর সে সঞ্চিত টাকা দিয়ে রাধাকে একখানা সোনার হার গড়িয়ে দেবে।

উঠোন পার হয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিল বিপিন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছিল কানপাশাজোড়া নিয়ে কি করা যায়? বিক্রি করে দিলে কেমন হয়—এ কথাটাও মনে এসেছিল সে-মুহূর্তে। আবার পরমুহূর্তে মনে হয়েছিল, বিক্রি করে দেওয়া ঠিক হবে না। তাহলে? বন্ধক রাখবে জানাশোনা কোন লোকের কাছে?

রাধা বিক্রি করে দেবার পক্ষেই মত দিয়েছে। তা হলে ডাক্তারের ফি-এর উপরেও কয়েকটা টাকা বেশি পাওয়া যাবে, সে টাকা দিয়ে ওষুধ-পত্র বিক্রি করা মানে জিনিসটা হাত ছাড়া হয়ে যাবে। পরের হাতে চলে যাবে চিরকালের মতো, তার চেয়ে বন্ধক রাখা ভালো। একদিন না একদিন নিজেদের হবে, নিজের হাতে নিয়ে আসা যাবে। অসুখ যখন সারবে, আবার যখন রোজগার করবে তখন—হ্যাঁ, তখনই কানপাশাজোড়া ছাড়িয়ে আনবে। সুদটা দিতে হবে, এই যা। তবু ভালো। ঘরে জিনিস বলতে তো এই। অথচ দুর্দিনের বন্ধু। বিপদে-আপদে বাঁচিয়ে দেবে।

ফি দেওয়ার মতন টাকা নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়েছিল বিপিন। ডাক্তারবাবু অনেক সময় ওকে দেখেছিলেন। ওর দেহ পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে খুঁটিনাটি প্রশ্নও—। তারপর একটুক্ষণ চিন্তা করেছিলেন, কি যেন ভেবেছিলেন গম্ভীর মুখে। আবার দু'একটা প্রশ্ন। তারপর আস্তে আস্তে আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, রোগ এখনও সারানো যায়! এখনও আয়ত্তের বাইরে যায় নি অসুখ।

ডাক্তারবাবু! উল্লসিত বিপিন আর কিছু বলতে পারে নি।

বল···

সত্যি বলছেন ডাক্তারবাবু আমার অসুখ সারবে?

সারবে। তবে···

মাথা নীচু করে প্রেসক্রিপসন লিখতে শুরু করছিলেন ডাক্তার বাসু।

তবে—কি ডাক্তারবাবু?

টাকা ঢালতে হবে, অনেক টাকা খরচা করতে হবে, রোজ ইনজেকশন, সঙ্গে ভালো ভালো খাবার। তাজা মাছ, মাংস, ডিম, আপেল এসব খেলে অসুখ নিশ্চয় সেরে যাবে। ঘুসঘুসে জ্বর বন্ধ হবে, কাশিও সেরে যাবে।

কথা শেষ করতে গিয়ে স্টেথিস্‌কোপটা জড়িয়ে নিয়েছিলেন গলায়। মণিবন্ধে আঁটা ঘড়িটার উপর দৃষ্টি ফেলেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সামনের প্যাড টেনে নিয়ে খসখস করে প্রেসক্রিপসন লেখা শেষ করেছিলেন। তাঁর নিজের প্যাডের পাতায় লিখে দিয়েছিলেন রাজসূয় চিকিৎসার ব্যবস্থা।

প্রেসক্রিপসন হাতে নিশ্চুপ বেরিয়ে এসেছিল বিপিন, রোজ ইনজেকশনের কথা শুনে ওর মুখের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার উপর খাবারের ফিরিস্তি শুনে নিশ্বাসও বন্ধ হবার জো। বাইরে এসে দু-একজন জানাশোনা লোককে প্রেসক্রিপসনটা দেখিয়েছিল, তারাও ওষুধ আর

হিতাকাঙ্ক্ষীরা শুনে থ হয়ে গিয়েছিল। ওরাও কোন কথা বলতে পারে নি। কোন কথা জোগায় নি ওদের মুখে। নির্বাক নিষ্পলক তাকিয়ে থেকেছে বিপিনের মুখে। রাস্তার ধারের গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অবশেষে বলেছে: এ তো জমিদারবাড়ির চিকিৎসা, রোজ ইনজেকশন, ডিম, মাছ, মাংস আর ফল? রাজা-বাদশার কারবার আর কি! মুঠোমুঠো টাকার খেলা!

বিপিনের মুখে কোন উত্তর জোগায় নি। ধীরে ধীরে বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছে।

বাড়ির সীমানায় পা রাখতেই কাছে ছুটে এসেছিল রাধা। এতক্ষণ যে ও উদ্বেগ এবং ব্যাকুলতা নিয়ে ঘরবার করেছে, তা ওর চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পারলো বিপিন। ওর কাছে এসেও কোন কথা বললো না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধু একটা সুখবরের প্রত্যাশায় অধৈর্য মুহূর্ত গুণতে শুরু করেছিল রাধা। ওর দু'টো চোখও ছিল নিষ্পলক। সেই নিষ্পলক চোখ দু'টো স্বামীর দীর্ঘ কাঠামো, অবসন্ন মুখের রেখায় আর ক্লান্ত দু'টো ঠোঁটের ফাঁকে কি যেন খুঁজে বেড়িয়েছিল। একসময় নিজে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, হতাশ হয়েছিল, স্বামীর দু'টো চোখের তারায়, মুখের রেখায় কোন আশ্বাস নেই। নেই কোন আলোর নিশানা। বিবর্ণ কালো মুখের প্রচ্ছদপটে রাজ্যের সব নৈরাশ্যই যেন পুঞ্জীভূত। ডুকরে কেঁদে উঠেছিল রাধা। দু'টো চোখের কোল কান্নার ফোঁটায় ভিজে উঠেছিল। বলেছিল: কি বললেন ডাক্তারবাবু? অসুখ কি সারবে না তোমার?

কয়েকটি মুহূর্ত নীরবে পার হয়ে যেতে দিয়েছিল বিপিন। ব্যাকুলতা উপচেপড়া রাধার দু'টো চোখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়েছিল। পাঁজর-কাঁপানো সেই দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল: অসুখ সারবে রাধা, অসুখ নিশ্চয় সারবে। আজকাল অনেকরকম নতুন ওষুধ বেরিয়েছে। সে ওষুধে কতো শক্ত শক্ত অসুখ সেরে যাচ্ছে, আমার এ অসুখ তো কোন ছার···

সারবে তোমার অসুখ, সত্যি বলছো তুমি? দু'টো ঠোঁটে হাসির আভা ফুটে উঠেছিল, মনে জেগেছিল খুশির প্লাবন। সে-মুহূর্তে ওর মনে হয়েছিল—অফুরন্ত আলো বাতাসে ওদের ছোট্ট ঘর ভরে উঠেছে, শুধু ঘরই নয়—সামনে যতটা পথ দেখা যায়—সমস্ত পথটাই আলোয় আলোময়। কোথাও এতটুকু অন্ধকার নেই। এতটুকু আবছা নয়—অনাগত দিনগুলো।

বিপিন তখন বলেছিল: সারবে আমার অসুখ। ডাক্তারবাবু বলেছেন আমার অসুখ এখনও চিকিৎসার বাইরে নয়। এখনও চিকিৎসা চালালে সেরে উঠবো। তবে অনেক টাকার দরকার। অনেক সময়ও।

অনেক টাকা? কি হবে অত টাকা দিয়ে?

টাকার দরকার নেই? রোজ ইনজেকশন, দুধ, মাছ, মাংস, ফল খেতে হলে টাকার দরকার আছে বৈকি!

বিপিনের শেষ কথায় আবার অন্ধকারের অথৈ সমুদ্রে সাঁতার কেটেছিল রাধা। আর মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরেছিল কয়েকটি শব্দ—রোজ ইনজেকশন, ডিম, মাছ, মাংস, ফল। বারেবারে অস্ফুট উচ্চারণও করেছে শব্দগুলো। আর কিছু বলতে পারে নি। আর কিছু বলবার ভাষা খুঁজে পায় নি। মনে হয়েছিল, ওর পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেছে। শুধু পায়ের তলা থেকেই নয়, চোখের সামনে থেকেও যেন সব সরে যাচ্ছে। বাড়ি, ঘর, উঠোন—উঠোনের পর আম-জামের গাছগুলো, তারও পরে পুকুর এবং সে পুকুরের জলসমেত সব যেন ঘুরছে, পাক খাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রাধার মাথাটাও ঘুরে গেল। ঘরের দরজার পাল্লা ধরে কোনরকমে টাল সামলে নিয়েছে রাধা।

আর দিশেহারার মতো ঘুরেছে বিপিন। এর-ওর কাছে টাকা ধার চেয়েছে। হাত পেতেছে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে ওর চাওয়া, হতাশ হয়েছে ওর মন। শুধুহাতে ফিরেছে সকলের কাছ থেকে। কে দেবে টাকা? কার ক্ষমতা আছে এ-দুর্দিনে টাকা ধার দেবার? অধিকাংশ লোকই তো দিন আনে দিন খায়। আত্মীয়-স্বজনরাও গরীব, অভাবগ্রস্ত। তা ছাড়া চিকিৎসার ফিরিস্তি শুনে ভয় পেয়ে গেছে সবাই।

নিকট আত্মীয়রা বলেছে: এ কি রোগ রে বাবা! এ রোগের চিকিৎসা করানো কি আমাদের কর্ম নাকি! দু-দশ টাকা হলে তবু দেওয়া যায়। এ তো আর দু-দশ টাকার ব্যাপার নয়, দু-চারহাজার টাকার ব্যাপার। সে টাকা তোমায় জোগাবে কে?

এ কথার জবাব দিতে পারে নি বিপিন। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে শুনেছে শুধু। আর একসময় আস্তে পা টেনে টেনে সরে এসেছে সেই আত্মীয়দের সামনে থেকে।

ঘরে বসে চারিদিকের ব্যর্থতার কথাগুলো শুনেছে রাধা। শুনে বোবা হয়ে থেকেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়েছে ঘরের ভেতর। শক্ত ঘরের দেওয়াল, তার চেয়েও শক্ত ছাদ। কঠিন ঘরের ভিত। তার চেয়েও কঠিন এ সংসার। আশার সামান্য আলোকরেখা কোথাও নেই।

আঁচলে মুখ ঢেকে মেঝের উপরই বসে পড়েছিল রাধা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে মন হাল্কা করতে চেয়েছিল। কান্নার বন্যায় ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিল মনের সব ক্ষোভ, সব গ্লানি। চোখের কোল, দু'টো গাল প্লাবিত ক'রে দিনরাত চোখের জল ঝরিয়েছিল।

ডাক্তারবাবুর ফি দিয়ে যে কয়েকটি টাকা হাতে ছিল, তা নিয়ে আবার নতুন কবিরাজের কাছে ছুটল বিপিন। কবিরাজের কাছ থেকে আবার ওষুধ নিয়ে এসেছিল। সে ওষুধ শেষ হলে আবার এনেছিল।

এ ছাড়া অন্য কাজও করেছে। পয়সা খরচ করতে হবে না এমন পরামর্শ পেলেই গ্রহণ করেছে। কেউ পরামর্শ দিয়েছে—মাদুলি নাও। তাই নিয়েছে বিপিন। মাদুলি এনে হাতে বেঁধেছে। কেউ বলেছে দক্ষিণপাড়ার ঘোষেদের বাড়িতে দৈব ওষুধ পাওয়া যায়। যে কোন অসুখে অব্যর্থ। নিয়ে এস, ভালো হয়ে যাবে।

তাই এনেছে বিপিন। ছুটে গেছে ঘোষেদের বাড়ি। পান আর সুপুরির বিনিময়ে নিয়ে এসেছে দৈব ওষুধ। ধারণ করেছে কবচ করে। তারপর আশায় আশায় দিন গুণেছে—একদিন সুন্দর প্রভাতে ওর অসুখ ঠিক সেরে যাবে।

কিন্তু তা হয় নি। সে দৈব ওষুধেও অসুখ সারে নি। কোন ভালো ফল পাওয়া গেল না। জ্বর কমলো না। কমলো না কাশি। বরং শরীর আরও দুর্বল হয়েছে, কাশিও বেড়েছে। কাশির সঙ্গে রক্তও ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা।

দিশেহারার মতো ছোটাছুটি করল বিপিন। কি করবে ভেবে পেল না। যে যা বলল তাই শুনল। যা খেতে বলল তাই খেল, যা করতে বলল তাই করল। কিন্তু অসুখ সারল কোথায়! পাড়া-প্রতিবেশীরা যেমন পরামর্শ দিল তাই শুনলো, তাই করল।

এদিকে সংসার অচল। যৎকিঞ্চিৎ ধারও মিলেছে এতদিন। কেউ চাল দিয়েছে, কেউ দিয়েছে ডাল, টাকা-পয়সাও দিয়েছে কিছু কিছু। ইদানীং তাও মিলছে না। দিতে চাইছে না কেউ। রাধা বসে বসে চোখের জল ফেলছে। কাঁদছে ছেলেমেয়েরা। বিপিনও ভেঙে পড়লো। এমন সময়ে রামুকাকা এসে দাঁড়ালেন সামনে। তিনিই দিলেন নতুন পরামর্শ। তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া গেল শেষ আশ্বাস। পাশের গাঁয়ে বুড়োশিবতলায় যাবার পরামর্শ দিলেন।

রাধাও শুনলো প্রস্তাবটা। শুনে অস্থির হলো। চঞ্চল হলো। অধৈর্য হয়ে পায়চারি করল ঘরময়। উতলা হয়ে উঠল ওর মন। বলল: যাও, আজই যাও তুমি। রামুকাকার পরামর্শটা শোন।

হ্যাঁ, আমিও বলছি। তুমি কথাটা শোন। যাও বড়োশিবতলায়।

বিপিন আর দ্বিরুক্তি করল না। দেরিও করল না। ছেলেমেয়েদের কাছে ডাকল। তাদের বুকে জড়িয়ে আদর করল, কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াল ঘরের ভেতর। গালে চুমো খেল। মাথায় পিঠে হাত বুললো। তারপর হাসিমুখে বিদায় নিয়ে পাশের গাঁয়ের দিকে পা বাড়াল। রাধাও গেল সঙ্গে বেশ খানিকটা পথ।

কতকটা পথ এগিয়ে দিয়ে আবার নিজের আস্তানায় ফিরে এল রাধা। দুটো হাত আড়াআড়িভাবে বুকে চেপে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ওপরের দিকে মুখ করে বললো: আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ভগবান! অনেকক্ষণ ধরে আপনমনে গুনগুন করলো। তার মর্মার্থ হল—এ ক'দিন যে কামনা মনের মধ্যে বুকের রক্ত দিয়ে লালন করেছে তা সত্যি হোক।

এদিকে বড়োশিবতলা খুঁজে নিতে বেগ পেতে হয় নি বিপিনকে। লোকজন আছে, দোকানপাটও আছে। পাত্যক্ষ দেবতা বলে নাম-ডাক বুড়োশিবের।

রামুকাকার পরামর্শমতো পাশের পুকুরে ডুব দিয়ে বটগাছের নীচে এল বিপিন, শুচিস্নাত মন নিয়ে এসে বসল। চোখের সামনে নতুন স্বপ্ন। মনের মধ্যে আশার তরঙ্গমালা। রামুকাকা বলেছেন হত্যে দিতে হবে। চুপচাপ বসে থাকতে হবে। অথবা শুয়ে শুয়ে কাটাতে হবে সময়। আর বাকি সময় মনের সামনে রাখতে হবে একটি নাম। স্মরণ করতে হবে। ক'টা আর দিন? পাচ-সাতটা দিন বড়জোর। পাঁচ-সাতদিনের কষ্ট আর এমন কি? তারপরই তো সেরে উঠবে। সুস্থ হবে, সবল হবে দেহ।

সেরে উঠলে ওর অনেক কাজ। দিনমজুরী করতে বেরুবে। মাস-দেড়মাস কাজ করতে পারলে রাধার কানপাশা-জোড়া নিশ্চয় ছাড়িয়ে আনতে পারবে। তারপরও কাজ থাকবে। ছোট-খাট অঙ্কের দেনাগুলো পরিশোধ করতে হবে। ঋণমুক্ত হয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে হবে।

কানপাশা বন্ধকের যে ঋণ তার জন্য কত দিতে হবে ভাবতে চেষ্টা করলো বিপিন। সুদে-আসলে কত দাঁড়াবে মনে মনে একবার হিসেব করে দেখল। হিসেব করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। একেবারে নাগালের বাইরে যায় নি। যাবেও না। কাজ করবার শক্তি-সামর্থ্য ফিরে এলে, কাজ শুরু করলে ঐ টাকা রোজগার করতে ক'দিন? কে না ভালোবাসে ওকে? কাজে ফাঁকি দেওয়া স্বভাব ওর নয় বলেই সবাই ওকে ভালোবাসে। কাজের জন্য

ডাকে। বসে থাকতে হয় না, বসে খেতে হয় না কোনদিন। বাড়ি এসে নিয়ে গিয়ে কাজ দেয় প্রতিবেশীরা।

আজ কত কষ্টই না করছে ছেলেমেয়েরা। দিনান্তে একবেলাও হয় তো মুখে তুলে দিতে পারছে না রাধা।

এবার আর অত কষ্ট থাকবে না। কোনরকমে পাঁচ-সাতটা দিন। তারপরেই তো আবার আগের দিনে, আগের জীবনে ফিরে যাবে বিপিন। শক্ত-সমর্থ পুরুষ, অসুরের মতো খাটতে শুরু করবে। খেটে রোজগার করবে। ছেলেমেয়েদের আর রাধাকে যতটা সম্ভব সুখে রাখবার চেষ্টা করবে। এ ক'মাসের দুঃখ-কষ্টকে সুখের মধ্যে রেখে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলো বিপিন। এ সব কি ভাবছে ও? মনের সব ভাবনাকে দু'হাতে দূরে ঠেলে দিয়ে বুড়োশিবঠাকুরের নাম জপ করতে লাগলো বিপিন। কিন্তু একাগ্রমনে ঠাকুরকে ডাকতে পারে কোথায়? মাঝে মাঝে নিজের মনের অগোচরে অন্য ভাবনাগুলোও ভিড় করে আসে মনের সামনে। এলোমেলো অসংলগ্ন অনেক রকমের ভাবনা। অসংখ্য অপ্রান্ত। সে ভাবনার জোয়ারকে ও মানসিক দৃঢ়তায় প্রতিরোধ করে বুড়োশিবঠাকুরকে মনের সামনে রাখার সাধনা শুরু করলো ও। ঝুরিনামা বুড়ো বটগাছটার নীচে ও একা নয়। আরও আছে কেউ কেউ। সকলেই কোন না কোন রোগে আক্রান্ত। তাদের আত্মীয়-পরিজনরা আসে সকাল-বিকেল। খোঁজ-খবর নেয়। পুজো দেয়। মানৎ করে নতুন করে। এমনি করে দিন গত হয়, রাত আসে। রাত গত হয়ে দিন। এক-এক করে তিন দিন, তিন রাত গত করেছে বিপিন। তবু মনের বিশ্বাস হারায় নি। আশে-পাশে তিন-চারজন লোক হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। কারও সাত, কারও আট দিন। মুখে একটুও জল নেই, পেটে নেই দানাপানি। কষ্ট হচ্ছে, অসহ্য জ্বালা। তবু পড়ে আছে ওরা। ওদের দিকে তাকায় বিপিন আর নিজের মনে বলসঞ্চয় করে।

তৃতীয় দিনে একবার রাধা এসে দেখে গেল, সাহস দিয়ে গেল। ধৈর্য ধরে থাক, সুফল নিশ্চয় পাওয়া যাবে। বুড়োশিবের কাছে এসে যে লোক ফিরে যায়—তার অসুখ সারে না, ধৈর্যের পরীক্ষায় পাশ করলেই তিনি মুখ তুলে চাইবেন। সেই আশ্বাসেই চারটে দিন কাটিয়ে দিল বিপিন, বসে আর শুয়ে অতিবাহিত করলো চার-চারটে রাতও। তারপর আর পারলো না। সারা শরীরে অবসাদ, অপরিসীম ক্লান্তি। দেহের ভার যেন আর সইতে পারছে না। শুয়ে শুয়ে আরও দু'টো দিন, দু'টো রাত। প্রতি মুহূর্তে ওর চেতনায় একটি আশ্বাসই কাজ করল—আজকের দিনই হয় তো শেষ দিন। আজকের রাতে ঘুমের ঘোরে নিশ্চয় দেখা দেবেন বুড়োশিবঠাকুর। হাত বুলিয়ে দিয়ে যাবেন মাথায়। কিংবা কোন গাছের শিকড় ধারণ করতে বলে যাবেন। আর তাঁর হাতের ছোঁয়ায় কিংবা সেই শিকড় ধারণ করে বিপিন সুস্থ-সবল মানুষ হয়ে উঠবে। ফিরে পাবে আঠাস বছরের টগবগিয়ে-ওঠা যৌবন। কিন্তু কোথায়? দিন যায় রাত আসে। রাতও গত হয়। কেউ আসে না ঘুমের ঘোরে। কারও হাতের ছোঁয়া লাগে না মাথায়। বড় দুর্বল হয়ে পড়ে বিপিন। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। বড় ক্লান্ত। এ ক'দিন এক ফোঁটাও জল পড়ে নি পেটে। ক্ষুধায় অবসাদে ক্লান্তিতে মাথা তুলতে পারছে না বিপিন।

তবু দৃঢ়বিশ্বাসে মন বাঁধে ও। এ-রাতই বুঝি ওর শেষ রাত। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাড়ি যাবে। বৌ-ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসবে, কথা বলবে, আদরে সোহাগে ভরে দেবে ছেলেমেয়েদের মন।

কিন্তু বৃথা হয়ে গেল দীর্ঘ আট দিন, আট রাতের প্রতীক্ষা। আর পারে না বিপিন। ক্লান্তি আর অবসাদে ওর অনুভূতি পর্যন্ত ভোঁতা হয়ে গেছে। ভাবনার প্রসারতা হয়েছে স্তিমিত। তবু অন্তিম আশ্বাসে শুয়ে রইলো। ওর পাশের দু'টো লোকও চলে গেছে। ধৈর্যের পরীক্ষায় হেরে গেছে ওরা। সাধনায় সফল হতে পারে নি। বুড়োশিবের আশীর্বাদ থেকেও বঞ্চিত হয়েছে।

বিপিন হারবে না। উঠবে না ওখান থেকে। উঠলেই বা যাবে কি করে? উঠে দাঁড়াবার শক্তি কোথায় তার? হাত-পা অসাড়। চোখ খুলতেও কষ্ট হচ্ছে।

নয় দিনের দিন খোঁজ নিতে এল রাধা। এসে দেখল বিপিন শুয়ে আছে। তরতর করে এগিয়ে এল ওর কাছে। এসে বসল বিপিনের মাথার কাছে। গায়ে হাত রেখে বলল: কেমন আছ? কোন জবাব নেই।

রাধা ভাবলো, লোকটা ঘুমোচ্ছে। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন। ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ওর চেতনা। ধাক্কা দিল একটা আস্তে করে। তবু নড়ল না বিপিন। কোন সাড়া দিল না, নিথর-নিষ্পন্দ পড়ে আছে।

এ কি! রাধা চমকে উঠলো। মুখের কাছে মাটিতে জমাট বেঁধে আছে একথালা রক্ত। মাছি উড়ছে, বারবার বসছে মুখের কাছটাতেই।

আবার ধাক্কা দিল। এবারও নড়ল না বিপিন। কোন সাড়া দিল না, কোন শব্দ করলো না। আশ-পাশের লোকজনও এগিয়ে এলো। হায় হায় করলো সবাই। কেউ কেউ বললো: মুক্তি পেয়েছে। বুড়োশিবের পায়ে মাথা রেখে ধন্য হয়েছে। আর সকলের কানাকানি, ফিসফিসানিকে ছাপিয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো রাধা—লুটিয়ে পড়লো বিপিনের হিমশীতল দেহের উপর।

আজ আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলবো। এই আমার প্রথম ও একতম চিঠি—কারণ এই আমার শেষ চিঠি। দুঃখ রইলো যে, এ-চিঠিতে আমি তোমাকে কোন সম্বোধন করতে পারি নি।

যে ডাক মনের মধ্যে গুমরে উঠছে—সেই ডাকে ডাকবার অধিকার কি আমার আছে? জানি তুমি আমাকে সব অধিকার দিয়েছো কিন্তু তবু···। অধিকার কি দিলেই পাওয়া যায়? অধিকার অর্জন করতে হয়।

দুই বৎসর হলো আমি তোমার স্ত্রী। এ-বাড়িতে আমি এভাবে ঘুরবো—এ স্বপ্ন তো আমার আজকের নয়, একযুগ আগের। কিন্তু এই ঘর, এই খাট, এই আসবাবের স্বপ্ন আমি দেখি নি। আমার স্বপ্ন···

সাত বৎসর আগে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। দৈবাৎ নয়, চাকরির ক্ষেত্রে। তব আজ মনে হয় তা নিতান্তই দৈব।

দৈব! দেবতার অভিপ্রায় তাই দৈব। দেবতা অর্থই তো শুভবুদ্ধি। সেই শুভবুদ্ধির অভিপ্রায়ে আমি তোমার দেওয়া দান গ্রহণ করেছিলাম। তাই তো, আজ আমার জীবন এমনিভাবে ভরে উঠেছে।

ভরে উঠেছে। আয়নার ছায়াটা একটু হাসে। আজ যখন জীবনকে শেস করতে যাচ্ছি তখনই মনে হলো পূর্ণতার কথা।

কিংবা, আজ জীবনে পূর্ণতা এসেছে বলেই মরণকে ভয় পাচ্ছি না। এতদিন দুঃখ, কষ্ট, অপমান, লাঞ্ছনা কম ভোগ করি নি—ঝাঁপিয়ে পড়েছি অল্প স্রোত থেকে খরস্রোতে। একের পর এক ঘূর্ণিতে ঘুরে ঘুরে তলিয়েছি, আবার সোজা ভেসে উঠেছি। কতদিন মনে হয়েছে মরে যাচ্ছি—শেষ হয়ে যাব এই মুহূর্তে কিন্তু কখনও আত্মহত্যার কথা মনে হয় নি।

কলকাতা থেকে অনেক দূরে ছোট শহর—হাসপাতালে তুমি ছিলে ডাক্তার—আর আমি নার্স। লোকে জানতো তুমি রুক্ষ, সদা বিরক্ত, অসামাজিক। তুমি রোগ ভালোবাসো রোগীকে নয়। দিনের পর দিন আশ্চর্য যত্নে তুমি রোগীকে ভালো করে তুলতে—তারপরে সুস্থ হয়ে সে যদি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধন্যবাদ দিতো, তুমি মুখ ফিরিয়ে নিতে—বলতে শুধুমাত্র চারটে অক্ষরে মূল্য শোধ করা যায় এত কম কাজ আমি করি নি।

অপ্রতিভ হয়ে ওরা বলতো, না, না সে কি বাবাজি?

তুমি আর কিছু বলতে না।

তারপরে হয় তো পথে দেখা হলো। বিনয়ে গলে গিয়ে ওরা নমস্কার করতো।

—আপনাকে আমি চিনি না। গম্ভীর মুখে তুমি বলতে।

ওরা অবাক চোখে তাকাতো।

—আমি অসুস্থকে চিনি—সুস্থকে নয়।

ওখানে প্রবাদ-গল্পের মতো চলতি হয়ে গিয়েছিল তোমার কথাগুলি। তুমি ছিলে ওখানকার সকলেরই পরিচিত ও প্রিয়। তাই ডাক্তারবাবুর এই কথাগুলি সস্নেহ পরিহাসে বলতো তারা পরস্পরকে।

কিন্তু, যারা তোমাকে শুধু চিনতো না জানতো, তারা অনুভব করতো তুমি কত মহৎ। হিমালয় পাহাড়ের মতো। ওঠা কঠিন। কিন্তু, কেউ যদি অধ্যবসায় ও চেষ্টায় সেখানে উঠতে পারে, তবে দেখবে আকাশের কোলে দাঁড়িয়ে আছে।

রাণু ভৌমিক

যাকে সাধুভাষায় বলে চটুলা, ইংরেজীতে ফ্লার্ট, বাংলায় ঢলানি ওদের মতে আমি ছিলাম তাই। ঠিক কথা, জন্মগত স্বভাবে কি ছিলাম জানি না, কিন্তু সচেতন প্রয়াসে তাই হতে চেয়েছিলাম। প্রেম করবো কিন্তু প্রেমে পড়বো না—এই ছিল আমার লক্ষ্য। তাই আমি সবাইকে দেখে হাসতাম—একটু পরিচয়ে কটাক্ষ করতাম।

ঠিক তেমনি অভ্যাসগত-ভাবে তোমাকে কটাক্ষ করতে গিয়ে অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিলাম। দেখলাম, তুমি আমার
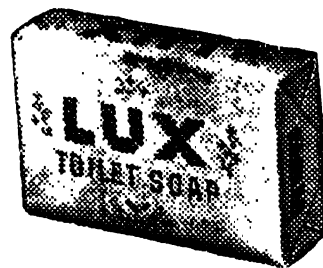
দিকেই তাকিয়ে আছ। কেউ যে ওভাবে তাকাতে পারে সে ধারণা ছিল না আমার।

অপ্রতিভ হয়েছিলাম—চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম—সরে গিয়েছিলাম। নিজের চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ ভেবেছিলাম তোমার কথা। কি ছিল তোমার চোখে? কি চেয়েছিলে তুমি?

আজ পর্যন্ত হাজার হাজার দৃষ্টির সার্চলাইট আমার মুখে পড়েছে—তাতে দু'টো মাত্র রং আমি দেখেছি—কিংবা একই রংয়ের একটু রকমফের। কামনা আর প্রশংসা—আর এই দু'টো রং এমনভাবে মিশে থাকতো যে, তাদের মধ্যে তফাৎ আমিও অনেক সময়ে করতে পারতাম না।

কিন্তু, তোমার দৃষ্টিতে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন আলো দেখলাম। সেখানে ঔদাসীন্য ছিল, অনুসন্ধিৎসা ছিল, একাগ্রতা ছিল। কিন্তু একটি পূর্ণ-যৌবনা সুন্দরী নারীর দিকে অবিবাহিত প্রৌঢ় (তোমার বয়স তখন প্রায় চল্লিশ) ভদ্রলোক যেভাবে তাকায় তার কিছুই ছিল না।

কেন ছিল না? আর যদি নেই-ই তবে কেন তুমি তাকালে? অনেকক্ষণ ভাবলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আরও অবাক হলাম, যখন এক বৎসর পরে তোমার কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলো। প্রস্তাব রীতিমতো দেশীয় রীতিতে। ঘটক পাঠিয়ে আমার বিধবা মা'র কাছে। মা হাতে স্বর্গ পেলেন। আমার পাঁচ বৎসর বয়স হতে না-হতে তিনি আমাকে বিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিলেন—আর এমন পাত্র। যখন আমি হেসে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলাম—তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন।

তা, উনি কাঁদুন। বিয়ের প্রস্তাব তো আর আমার এই পঁচিশ বৎসর জীবনে কম আসে নি—শুধু যার কাছ থেকে এই প্রস্তাবের কল্পনায় একদা আমার রাতের স্বপ্ন মধুর হয়ে উঠেছিল—তার কাছ থেকেই···

ডাঃ জ্যোতির্ময় রায়ের প্রস্তাব এক কথায় নাকচ করে দেবার পক্ষে কোন দ্বিধা ছিল না। শুধু একবার একটু কৌতূহল হয়েছিল। জানতে ইচ্ছে হয়েছিল, যিনি একবারও আমার দিকে সানুরাগ দৃষ্টিপাত করেন নি, নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কথা বলেন নি, তিনি হঠাৎ কেন আমাকে বিয়ে করতে চাইলেন! কিছুদিন ভাবলাম—তারপরে সব ভুলে গেলাম।

ভুললাম বলেই বোধ হয় নূতন করে জানতে পারলাম। হঠাৎ-ই একদিন জানলাম জ্যোতির্ময় রায়···আর তখনই রাজী হয়ে গেলাম। শুধু রাজী হওয়া নয়—নিজেই এগিয়ে গেলাম।

ফুলশয্যার রাতটার জন্যই আমার সবচেয়ে ভয় ছিল। কিন্তু [illegible]

অনেক রাতে তুমি ঘরে ঢুকলে। আমি খাটের এককোণে বসেছিলাম আর ভাবছিলাম আসন্ন যন্ত্রণার কথা। তুমি কিন্তু আমার দিকে তাকালে না—একটি কথাও বললে না। কোণের টেবিলে বসে টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে বই পড়তে আরম্ভ করলে।

মুক্তির আনন্দে এতো উল্লসিত হয়ে উঠলাম যে তোমার এই অদ্ভুত ব্যবহারে আমার মনে কোন প্রশ্ন উঠলো না। আমি শুধু ভাবছিলাম·····

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরবেলায় জেগে দেখি তুমি ওপাশে আর মাঝখানে একটা পাশবালিশ।

সেদিন আমার ভাববার সময় ছিল না—আজ ভেবে অবাক হচ্ছি, কেন তোমার ব্যবহার আমার চোখে ঠেকে নি। আর একটি প্রশ্ন সর্বদা আমার মন তোলপাড় করে তুলেছে—কেন তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে?

তোমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। তোমার চেহারা ভালো নয়। কঠিন পরিশ্রমে, অযত্নে, রুক্ষ আবহাওয়াতে সে চেহারা আরও খারাপ হয়ে গেছে—তবুও তুমি কুৎসিত নও। কিসের ছায়া—সে কি একটা ব্যথা, অনির্দেশ বেদনা—যা তোমার অসুন্দর দেহে এনে দিয়েছে অপরূপ মহিমা।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দ পেলাম। আর বিদ্যুদ্দীপ্তির মতো একটি কথা আমার পা থেকে মাথা—মাথা থেকে হৃদয় পর্যন্ত জ্বালা ধরিয়ে দিল—এসেছে—সেই মুহূর্ত এসেছে। যে মুহূর্তের জন্য এতদিন অপেক্ষা করেছি—সেই মুহূর্ত এসেছে।

গাড়ির শব্দে বাড়ির সবাই উঠে পড়েছে। একটা আনন্দ কোলাহল। বাড়ির মেজছেলে সস্ত্রীক ছেলেমেয়ে নিয়ে বাইরে গিয়েছিল। বড়ভাইয়ের বিয়ের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে।

পাশের একটা ঘরে চুপ করে ব্যস্তভাবে দাঁড়িয়েছিলাম যেন কি একটা করতে ঢুকেছি—ঢুকে ভুলে গেছি।

—বৌদি। উল্লাসভরা কণ্ঠে চেঁচিয়ে ঘরে ঢুকতেই আমি মুখ ফেরালাম। একসেকেণ্ড দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলাম! আমার চোখে আত্মস্থ ঘৃণার হাসি। ওর মুখ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ।

—তু···তুমি·····

ওর স্ত্রী এসে ঘরে ঢোকে।

—বৌদিকে আধুনিক কায়দায় 'তুমি' করে বলবার রীতি থাকলেও আমি কিন্তু 'আপনি' বলাই পছন্দ করি, ঠাকুরপো, হেসে হেসে উত্তর দিই।

—আমিও। ওর স্ত্রী উত্তর দিল, অত আধুনিক [illegible]

ওর মুখে-চোখে অদৃশ্য আগুনের জ্বালা। আমি একটু হাসলাম। এই জ্বালা জ্বালাতেই তো এসেছি।

ফুলশয্যার পরদিনই তুমি চলে গিয়েছিলে। তোমার চরিত্রে অস্বাভাবিকতা ও উদারতার এমন আশ্চর্য সমন্বয় যে, বাড়ির লোকরা তোমার কোন কাজে বিস্মিত হতেন না বা সমালোচনা করতেন না। তখন খেয়াল করি নি কিন্তু আজ আমার জানতে ইচ্ছে করছে, সেদিন কেন তুমি একটি কথাও না বলে চলে গিয়েছিলে?

হাসিতে, গানে, গল্পে হিরণ্ময়কে যেন পাগল করে তুললাম। আমার প্রশংসায় সমস্ত বাড়ি মুখর। বাড়িতে দুটি মাত্র বধূ—ওর স্ত্রী বেলা ও আমি। যদিও সম্পর্কে আমি-ই বড় তবুও বড়ভাই পরে বিয়ে করেছে—কাজেই আমি বয়সে ছোট ও নবাগতা।

নূতন হওয়া মানেই খানিকটা সুবিধে পাওয়া। তাছাড়া আমার সচেতন প্রয়াসের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া দুটি ছেলে মেয়ে নিয়ে বেলার পক্ষে ছিল অসম্ভব।

হিরণ্ময়ের মুখের হাসি ঘুচে যায়—হয়তো রাতের ঘুমও, বাড়ির কারো সঙ্গে ও কথা বলে না। আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

তবু বুঝতে পারি যাকে ও একদা হেলায় ত্যাগ করেছে তাকে পাবার জন্যে আজ ওর অসীম আকুতি। এমনিই তো হয়। কত না জিনিস আমরা রাস্তায় ফেলে দিতাম যদি না জানতাম অন্য কেউ তা কুড়িয়ে নেবে।

সেদিন দুপুর রাতে হঠাৎ জেগে গেলাম। এর আগেও অনেক রাত জেগেছি, কিন্তু এরকম অনুভূতি আর কখনও হয় নি।

ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আর রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবী একটা আবছা পর্দায় ঢাকা—সেখানে দেখতে পেলাম একটি মেয়েকে—চোখে তার সাগরের গভীরতা, সেই অসীম, অতল গভীরতায় সে ভালো বেসেছিল একজনকে। শুধু ভালোবাসে নি—উচ্ছ্বসিত বন্যাধারায় কুল হারিয়েছিল।

ওদের দুজনকে দেখলাম অনেক জায়গায়—রেষ্টুরেণ্টে, গঙ্গার ধারে, ট্যাক্সীতে।

দেখলাম মেয়েটি কাঁদছে। চোখের জলে বৃষ্টিধারা মোটা হয়ে গেল।

অনেক কাঁদলো সে। তারপরে ওর চোখে দেখলাম সেই আলো—যে আলো জ্বলেছিল প্রতিহিংসাপরায়ণা দ্রৌপদীর চোখে।

যে মেয়ে সৃষ্টি হয়েছিল নিতান্তই ঘরোয়া-ভাবে সেই হল বাইরের। একজনের সেবায় যার জীবন কেটে যেতো সে হলো অগণিত লোকের সেবিকা।

শুধু সেবিকা নয়—যেন আরও কিছু। আকর্ষণ করবার মতো রূপ ওর ছিল—পাদপ্রদীপের আলোয় তা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রূপের দুয়ারের সবগুলি দরজা খুলে দিল—আর হৃদয়ের দুয়ার দিল একদম বন্ধ করে।

সে মেয়ের হৃদয় ছিল না বলেই জানতাম, কিন্তু—

কিন্তু, আজ এই ঝিরঝিরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের একটু একটু মুচকি হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে হঠাৎ তোমার ছবির দিকে চোখ পড়লো ওর—আর···

আর ও কেঁদে ফেলে। কি আশ্চর্যভাবে তাকিয়ে আছে তোমার ছবির চোখ দুটি!

তারপর থেকে প্রতি রাত্রে শোবার সময়ে ঐ চোখ দুটি দেখতাম—আর দিনেও মাঝে মাঝে। শেষটি কিছুই ভালো লাগতো না—সব সময়ে ঐ চোখ দুটি-ই ভাসতো।

আজ সকাল থেকেই আবার সেই টিপি-টিপি বৃষ্টি। বর্ষাকাল। বৃষ্টি তো হবে-ই। কিন্তু এই বৃষ্টি যেন মনের সব তন্তু আলগা করে দেয়।

দুপুরে আমি জানালার কাছে চুপ করে বসেছিলাম। ভেজানো দরজা খুলে ও এসে দাঁড়ালো।

বাড়ির সবাই নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছে। আমার মনে হয়েছিল ও আজ আসবে এই ঘরে। এই নির্জনতার সুযোগ নিয়ে দাঁড়াবে আমার মুখোমুখী। এই প্রথম ওর বিষয়ে আমার হিসেব মিলে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। যা দেখতে চেয়েছিলাম—তাই।

কিন্তু, আমার আনন্দ হলো না, দুঃখ হলো, করুণা হলো।

—দীপিকা! তুমি কি চাও?

—কিছুই না। শান্তকণ্ঠে বলি।

ব্যঙ্গে নয়, বিদ্রূপে নয়, মনের সত্য কথাটাই বললাম। হঠাৎ আমার মনে হোল এর কাছে আমি কিছুই চাই না, কিছুই চাইবার নেই।

—তবে, তুমি এসব করেছ কেন?

চুপ করে রইলাম। সত্যই তো, অনেক কিছু করেছি। অনেক আয়োজন অনেক অনুষ্ঠান, অনেক ছলনা এই দিনটির জন্য। কিন্তু জয় যখন করায়ত্ত তখন কেন এই ক্লান্তি?

—আর করবো না। শান্ত, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলি। মুছে নিতে চাই সমস্ত দাহ, জ্বালা।

কিন্তু, মুছতে চাইলেই কি মোছা যায়? তাহলেই পৃথিবীর ইতিহাস যে অন্যরকম হোত।

এই কথার পরে ওর চলে যাওয়া উচিত। আমি ওকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু তা ও গেল না। অবাক মুখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলে, কেন?

কেন? কি উত্তর দেব? সচেতন মনে যাই ভাবি না কেন—প্রতিশোধ—প্রতিহিংসা—আরও কত বড় বড় কথা—কিন্তু, আমার অবচেতন মন তো স্পষ্টভাবে জানে—ওকে দেখবার জন্য—ওর সান্নিধ্য পাবার জন্যই আমার এই দুরন্ত প্রয়াস।

—আমি ক্লান্ত। ধীরে ধীরে, বলি।

—ক্লান্ত! ও চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দেয়, আগুন জ্বালিয়ে এখন ক্লান্ত হলে চলবে কেন সুন্দরী?

নীরবে মেনে নিই ওর বিদ্রূপবাক্য। সত্যই তো, যে নরকের আগুন জ্বালিয়েছি তা থেকে কি করে পালাব?

—আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

চমকে উঠলাম। এই ক'টি কথা শোনবার জন্যই কি এতদিনের এই যন্ত্রণা ভোগ! তাই এই পরিবেশে সম্পূর্ণ নিজের অগোচরেই বোধ হয় মুখে ফুটে ওঠে কোমল আভা।

আমার দিকে তাকিয়ে ও এবারে খুশি হল। এতক্ষণ, আমার ঔদাসীন্য ওর আত্মসম্মানবোধকে পীড়া দিচ্ছিল।

—হ্যাঁ, তাই হবে। তৃপ্তমুখে ও বলে। এখন ডিভোর্স বিল পাশ হয়ে গেছে—আর কোন অসুবিধে নেই।

যেন সব কথা শেষ হয়ে গিয়েছে এভাবে ও চলে গেল। আমি একাই বসে রইলাম। সন্ধ্যার পরে ধীরে ধীরে বৃষ্টি থেমে গেল, আর চারিদিকে ফুটে ওঠে চাপা আলোর আভা। যে আলো বর্ষাক্লান্ত আকাশ ভিন্ন অন্য কোথাও দেখা যায় না।

সেই আলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার সমগ্র মন ঘৃণায় আমারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই কি চেয়েছিলাম? একেই কি বলে প্রেম? প্রেম—যা থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এতদিনের আনন্দ, উল্লাস, জ্বালা, যন্ত্রণা রাগ, বিদ্বেষ, তিক্ততার এই পরিণতি। একটি অসহায় নারী ও দু'টি শিশুকে ভাসিয়ে দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি।

না, না, না। এ তো আমি চাই নি। আমি বিসর্জন দিতে চাই নি দুইটি কিশোর-প্রভাত। আমি ছায়ায় ঢেকে দিতে চাই নি একটি যৌবন-মধ্যাহ্ন।

আনন্দে যার জন্ম হয়েছিল তার সমাপ্তি এতো বীভৎস কেন?

তারপরে আমি সব-ই বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম আমি এতদিন যা চাইছিলাম তা কাম—কামনা করি তাই দুঃখ পাই। শ্রদ্ধা ছাড়া প্রেমের জন্ম হতে পারে না। আজ আমার মনে যে গোপন পদ্ম ফুটে উঠেছে—তাই প্রেম। পাঁকে ফুটে উঠেছে এই পঙ্কজ।

অনেকক্ষণ ভাবলাম। কামের সেবা এতদিন করেছি কাম-ই আমাকে টানছে। কিন্তু আমি যে বদলে গেছি আমি যে ভালোবেসে ফেলেছি। ইতি

দীপিকা।

চিঠি শেষ করে দীপিকা উঠে দাঁড়ায়। পাখা টানবার হুকটাই সবচেয়ে সুবিধেজনক। চিঠিটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ঠিকানা লিখে একটা খামে ভরে টিকিট এঁটে দিল।

তারপরে, জ্যোতির্ময়ের ছবিটা টেবিল থেকে তুলে ধরে···আশ্চর্য! ঠক্ করে টেবিলের ওপরে পড়ে একটি ছোট্ট খাম। ওপরে তার নাম লেখা।

দীপিকা অবাক হয়ে যায়। একটানে খুলে ফেলে খামটা। ছোট একটি চিঠি।

প্রিয়তমাসু,

জানি, যেদিন তুমি আমাকে ভালোবাসবে সেদিনই এই চিঠির খোঁজ করবে। তাই নিশ্চিন্তমনে তোমাকে প্রিয়তমা সম্বোধন করলাম। আমার ব্যবহারের ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু, উপযুক্ত সময় ছাড়া তা দিলে তুমি তা শুনতে না। আজই ঠিক সময়।

তোমার মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম সুস্থ দেহে একটি অসুস্থ মন। পরে আমি জানতে পারলাম এই অসুস্থতার জন্য দায়ী আমারই আত্মীয়।

আমি জানতাম ওর সংস্পর্শে এলেই তোমার মোহ ভেঙে যাবে। তুমি নিজেই ফিরবে। কারণ, তুমি সুন্দর এবং সৌন্দর্য কখনও কোন কুৎসিত কাজ করতে পারে না। ইতি

জ্যোতির্ময়।

চিঠিটা পড়ে দীপিকা একটু হাসে। নিজের লেখা চিঠিটা বার করে সম্বোধন লেখে—প্রিয়তম আমার।

তারপরে, নিশ্চিন্তমনে অনেকদিন পরে ঘুমিয়ে পড়ে।

রেলপথের প্রধান সমস্যা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিনা-টিকিটের যাত্রী সুস্থ সমাজজীবনে এক দুষ্টক্ষত। যারা অকারণে বিপদজ্ঞাপক শিকল টানে—আর যারা রেলের সম্পত্তি বেপরোয়া ক্ষতি করে এরা তাদেরই সগোত্র। এই তিনের পাপচক্র আমাদের সমাজের এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে, আজ এর মূলোচ্ছেদ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। এই সমস্যা সমাধানের কাজ রেলওয়ের ঠিকই। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়েও এইসব সমাজবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করতে পূর্ব রেলওয়েকে হিমসিম খেতে হচ্ছে।

ধরুন বেকার যুবক চলেছে বহুকষ্টে জোগাড়-করা একটা চাকরীর ইণ্টারভিউ দিতে। হঠাৎ তার ট্রেনের চাকা থেমে গেল মাঝপথে। নিশ্চয়ই কেউ শিকল টেনে থামিয়ে দিয়েছে। যথাসময়ে পৌঁছুতে না পেরে তার আর ইণ্টারভিউ দেওয়া হ'ল না। বেচারার অবস্থাটা বুঝুন। আবার দেখবেন, দরিদ্র বিধবার একমাত্র আশা-ভরসা পুত্র চলেছে পরীক্ষা দিতে। একই কারণে সেও নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে হাজির হতে পারলো না। তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এই ধরণের ঘটনা তো নিত্য-নৈমিত্তিক।

বিপদজ্ঞাপক শিকল রাখা হয়েছে, জরুরী নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য। কাজেই খুব সাবধানে একে ব্যবহার করা উচিত। অথচ যখন তখন অকারণে অথবা তুচ্ছ কারণে যথেচ্ছ শিকল টানা হচ্ছে। এটা যে কোন বিশেষ একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ বা সবযাত্রীই শিকল টানেন তা নয়। সব রেলপথেই নির্দিষ্ট এক ধরণের যাত্রী আছে, তারাই এ কাজ করে থাকে। এক-এক ডিভিসনে এদের কার্যকলাপ এক-এক রকমের হতে পারে, কিন্তু এদের ধরা মুস্কিল। অজ্ঞ-গ্রামীণ মানুষ অথবা শ্রান্ত-ক্লান্ত নিত্য যাত্রী ট্রেন তাদের গন্তব্যস্থল ছাড়িয়ে গেলেও কখনো শিকল টানতে সাহস করবেন না। এক শ্রেণীর ছাত্র আছে তারা তাদের স্কুলের কাছাকাছি লেভেল ক্রশিং-এ শিকল টেনে ট্রেন থামিয়ে নেমে পড়ে। আবার ছুটির দিনে হৈ-হুল্লোড় করে ঘুরে বেড়াবার জন্যেও এক শ্রেণীর লোক দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। এরা যদি দেখে খেলার মাঠ বা সার্কাসে যেতে ষ্টেশন থেকে যতটা হাঁটতে হবে লেভেল ক্রশিং-এ নামলে তার থেকে এক ফার্লংও কম হাঁটতে হবে তা হলেই আর কোন বিচার-বিবেচনা না করে শিকল টেনে দেয়। এতে অন্যান্য যাত্রীদের কত অসুবিধা কত ক্ষতি হয় তা যে তারা জানে না তা নয়, তবুও এই অসৎ আচরণ তারা করবেই। ওদের নিরস্ত করার জন্যই পূর্ব রেলওয়ে প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করেছেন, এতে বেশ কিছু কাজও হয়েছে। গত মে মাসে যেখানে ১০৭৬ বার শিকল টানা হয়েছিল জুনে ৯৭৯ বারে নেমে এসেছে।

টিকিট ফাঁকি দিয়ে ভ্রমণের সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কারণ শিকল টানার ঘটনা বিশেষ একটি শ্রেণীর যাত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিন্তু বিনা টিকিটের যাত্রী তো সব শ্রেণীর মধ্যেই রয়েছে। ছাত্র, অফিস কর্মচারী, ছোটবড় ব্যবসায়ী আর যাঁরা নানান কারণে মাঝে মাঝে ট্রেনে চড়েন তাঁরাও টিকিট ফাঁকি দেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে সমাজের সর্বস্তরেই এই পাপ বাসা বেঁধেছে। এমন ঘটনাও ঘটেছে, শিক্ষক তথা বিধানমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যকেও টিকিট ফাঁকি দেবার অপরাধে আটক করা হয়েছে। আবার বড় বড় দল বেঁধে টিকিট না করে যাতায়াতের ঘটনাও অনেক, এরা গায়ের জোরে চলে। টিকিট চেয়ে চেকাররা অথবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত কর্মচারীরা এদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন এ-রকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। এই কিছুদিন আগেই তো বনগাঁ সেক্সনের এক ট্রেনে একদল ছাত্র টিকিট ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছিল চেকার তাদের ধরেছিলেন। ফলে, তাঁকে বেদম প্রহার করা হয় শেষে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়, বিশ্বাস করুন আর না করুন এর পাণ্ডা হলেন এদেরই এক শিক্ষক।

সত্যি বলতে কি, বিনা টিকিটে ভ্রমণ আমাদের সমাজ জীবনকে এমনভাবে কলুষিত করে দিয়েছে যে, এখন লোকে ভেজাল খাদ্যশস্য বা কালো টাকার মতো একে স্বাভাবিক বলে মেনে নিচ্ছে। এই অভ্যাস এত ব্যাপক হয়ে উঠেছে যে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার চেষ্টা করেও কি করে যে একে বন্ধ করা যাবে তা ভেবে ঠিক করতে পারছে না। বিনা টিকিটের যাত্রীদের ধরা সত্যিই কঠিন, গণতন্ত্রী দেশের জনগণের মর্যাদা আছে, তাই একটা বিরাট টিকিট পরীক্ষা বাহিনী পুষে রাখা অথবা প্রত্যেকটি ষ্টেশনকে এক-একটি দুর্গ বানিয়ে গোটা দেশটাকে কার্যত পুলিস রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা যায় না। ফলে বিনা টিকিটের যাত্রীদের শতকরা সামান্য অংশই ধরা পড়ে। তা ছাড়া ওদের সংগঠন ব্যবস্থাও চমৎকার! কোথায় কখন বিশেষ পরীক্ষার ফাঁদ পাতা হবে আগে থেকেই ওরা জেনে ফেলে এবং যথা সময়ে সঙ্গীদের হুঁশিয়ার করে দেয়। তা সত্ত্বেও গত মার্চ মাসে ৭৩,২০৫ জন ধরা পড়েছিল। তাদের কাছ থেকে ভাড়া আর জরিমানা বাবদে মোট ১,৮৫,৬৬৩ টাকা আদায় করা হয়েছে।

পাটনা-গয়া ও কিউল-গয়া সেক্সন এ ব্যাপারে কুখ্যাত। গত জুলাই মাসে এই দুই সেক্সনে জোর পরীক্ষা চালান হয়েছিল। তাতে ১৮,০২২ টি ঘটনায় মোট ৪৬,৬৩৪ টাকা রোজগার হয়। গত ২৫ শে আগষ্টও হাওড়া ষ্টেশনে ৮৯২টি ক্ষেত্রে ৪,২২৫ টাকা আদায় করা হয়েছে।

১৯৬৩-৬৪ সালে রেলের ফিটিংস এবং যাত্রীবাহী ট্রেনের কামরা ও ওয়াগনের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম চুরি ও ক্ষয়-ক্ষতির বাবদ পূর্ব রেলওয়ের ৪,৭২,৬১৬ টাকা ক্ষতি হয়েছে। এই গত এপ্রিল মাসে পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ, হাওড়া, আসানসোল, ধানবাদ ও দানাপুর এই ৫টি ডিভিসনে কয়লার ইঞ্জিন চালিত ট্রেনের সরঞ্জাম চুরি ও ক্ষয়-ক্ষতির জন্য মোট ৬৮,৬০০ টাকা লোকসান দিতে হয়েছে।

কিন্তু এই সব ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিসনে চালু নূতন সুবার্বন বৈদ্যুতিক ট্রেনের যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র এবং বস্তুগুলির ক্ষতির তুলনায় নগণ্য। গত ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শিয়ালদহ ডিভিসনে যে ২৫ KVAC বৈদ্যুতিক ট্রেন-গুলি চালু করা হয়েছে সেগুলি আজ উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপক লীলাক্ষেত্রে পরিণত। গত এপ্রিল মাসে উন্মত্তের মত ধ্বংসসাধনের ফলে শিয়ালদহ ডিভিসনকেই ৬০,০০০ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। মে মাসে এই অঙ্ক আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

শুধু একটা বীভৎস আনন্দ উপভোগের জন্যই সমাজ-বিরোধীরা সুন্দর ও সুদৃশ্য কোচগুলি যেভাবে তচনছ করে ফেলে তা ভাবলে বেদনার অন্ত থাকে না। এদের হাত থেকে কোন কিছুরই অব্যাহতি নেই। ধ্বংসকর্মে এরা সম্পূর্ণ জড়তামুক্ত, রবারের আসন, রেক্সিন কাপড় এবং পাটের ক্যানভাস ও ব্যয়বহুল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এরা ছিন্নভিন্ন ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে ফেলে।

গত মে মাসে ট্রেন থেকে ৪১,২৩৫ টাকা মূল্যের আলোর সরঞ্জাম এবং ৮৯,১২১ টাকা মূল্যের রোলিং স্টকের জিনিস-পত্র চুরি গেছে। স্টেশন ইয়ার্ডে পড়ে থাকাকালেই নয় চলন্ত ট্রেন থেকেও চুরি হয়, পুলিশ এই সব অপরাধী[illegible] ধরতে গাফিলতী করে না। কিন্তু দলবদ্ধভাবে এরা যখ[illegible] হানা দেয় তখন ধরা কঠিন।

এই দুর্নীতি আমাদের সমাজজীবনের গভীরে এত দৃঢ়মূল হয়ে গেছে যে, এই পাপচক্রের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি নাগরিকের একযোগে রুখে দাঁড়ানো দরকার। রেল কর্তৃপক্ষ তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেইসঙ্গে যেখানে স্বাধীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের জনমতকে এত মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে সেখানে এই সমস্যাকে নিজস্ব বলে মনে করতে হবে। তাই সমাজজীবন থেকে এই পাপচক্রের মূলোচ্ছেদের কাজে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন।

স্বর্ণ অলক

[*Edmund Spencer*-এর Amoritti Sonnet XXXVII-এর অনুবাদ]

কি সে মায়া জাগে ঐ সোনালী অলকে
(যারে) ঢেকেছে সোনার জালে চতুরা ললনা
(কত) নিপুণ চাতুরীভরে? জ্যোতির চমকে
(যার) আঁখি করে ভুল! কেবা চুল কেবা সোনা
(কেহ) না পারে বুঝিতে? এই সোনার শিকলে
(যবে) পুরুষের ভোলা আঁখি পড়ে রে লুটায়ে
(তার) যতই গরব থাক্ এ ফাঁদে পড়িলে
(তার) দুর্বল হিয়া বাঁধা পড়ে রে প্রণয়ে
(হায়) নাহি যদি রয় তারা অতি সাবধান!
(ঐ) সোনার কবরী পানে তাকাস নে আর
(বলি) ওরে মোর আঁখি তোরা হারাবি পরাণ
(যদি) যদি পড়িস ও মায়াজালে নাহি উদ্ধার
(সে যে) সোনার শিকল ওরে হোক্ না সোনার
(শুধু) স্বাধীনতা চাই, নয় বন্ধনভার॥

পুষ্পধনু

বন্দে আলী মিয়া

একটি কবিতা কি গো রূপ ধরে এসেছিলো পাশে।
এসেছিলো হেথা যেন নীড়হারা একটি চাতকী।
একটি গানের ছবি আঁকি নাই তাহার লাগিয়া
এসেছিলো তাই কি সে বুদ্ধদাসী সুজাতার সম!

শর্বরী কি চেয়ে আছে দু'টি আঁখি মিনতি কাতর—
একটি উদয় তারা হেরেছিনু প্রদোষের বেলা।
সেদিনের পটভূমি মুছে গেছে ইতিহাস হতে
কালের পাতায় র'লো হৃদয়ের একটি পরশ।

আজি কি তোমার মনে আছে আর এতটুকু স্বর!
জনতা অরণ্যে মোরা খুঁজেছিনু দু'জনে সেদিন—
নয়নে আছিলো কথা—অচেনারে ছিলো সংশয়,
ছিলো না নিরালা কোণ—ছিলো নাকো ক্ষীণ অবকাশ

সেদিন আকাশ ছিলো মেঘ-ভার বাষ্প মলিন
গৃধিনীরা দল বেঁধে চলেছিলো সান্ধ্য-কুলায়।
আমার জীবন-স্বপ্ন শেষ হলো উদয় লগনে—

ক'দিন জ্বরের পর আজই প্রথম মহুয়া স্কুলে যাবে। সকাল থেকে মা রান্নাঘরে। কি নাকি সুজি রুটি আর মশলা ছাড়া মাছের ঝোল রান্না হচ্ছে, মা নিজেই করছেন, নতুন বাবুর্চি এ সব জানে না, রান্নার ফাঁকে ফাঁকেই মা এসে তাড়া দিয়ে যাচ্ছেন—

মৌ, তোমার স্কুলের ব্যাগ গোছানো হয়েছে?

আয়া, মৌ বাবা কা কাপড়া ঠিক হ্যায়? জলদি করো।

আবার চলে যাচ্ছেন রান্নাঘরে।

মৌ ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে আর পেছন ফিরে ফিরে মাকে দেখছে; মাকে দেখতে তার ভীষণ, ভী-ষ-ণ ভালো লাগে, মার মুখটা কি সাদা, আর গালের কাছটা কি লাল দেখাচ্ছে এখন। মৌ জানে রান্না করলেই মার মুখটা এরকম লাল দেখায়। আর মার মুখটা যখন বাগানের গোলাপ ফুলের মত এরকম রঙিন দেখায় তখন কিছুতেই মৌ-এর মাকে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না—

খালি ইচ্ছে করে মার কোলের কাছে ঘেঁষে বসতে, মার মুখ থেকে সেই গল্পটা শুনতে; সেই যে গল্পে—

রাজপুত্র সাদা ঘোড়া জোরে ছুটিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গিয়ে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনল।

এই গল্পটা অনেকবার শোনা হলেও মার মুখ থেকে বার বার শুনতে ইচ্ছে করে তার। আচ্ছা, বন্দিনী রাজকন্যাটা কে! মহুয়ার কেমন যেন মনে হয়, মা-ই সেই রাজকন্যা, আর মাকে উদ্ধার করতেই···

স্বর্গ খেলনা

সুজাতা

মৌ!

মা এসে মহুয়ার পিঠে হাত রাখলেন, খাবে চল।

তুমি কিন্তু আজ আমায় খাইয়ে দেবে বলেছ।

দেখ, এস।

মার সঙ্গে সঙ্গে মহুয়া এসে খাবার ঘরে ঢুকল।

বাবা এখনও সামনের বারান্দায় বসে বন্দুক সাফ করছেন, মহুয়াকে দেখে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার? মৌ এত সাজগোজ করে সাত সকালে কোথায় চলেছে!

স-স্কুল।

মুখ ফুলিয়ে মৌ বলল।

হো হো করে মৌ-এর বাবা হেসে উঠলেন।

খুব অনিচ্ছা মনে হচ্ছে?

তারপর মার দিকে ফিরে বললেন, ওর না জ্বর হয়েছিল। সেরে গেছে।

— ——— কাঁটা আনতে আচ্ছতে মা বলেন।

একটু ভাল করে সারলেই না হয় পাঠাতে। বন্দুকের মধ্যে এক চোখ রেখে বাবা আবার বলেন—

এত তাড়া কিসের।

হ্যাঁ মা। বাবা ঠিক বলেছে, আমি কাল স্কুলে যাবো, আজ না।

মৌ চেয়ারের ওপরেই এঁকে বেঁকে সরে গেল।

মৌ!

মার সেইরকম ঠাণ্ডা গলা, যে স্বর শুনে মৌ-এর আদর আব্দার সব বন্ধ হয়ে যায়, আর বুকের মধ্যে কেমন একটা হয়, সেটা হলে মৌ-এর মোটেই ভাল লাগে না। মৌ এগিয়ে এসে মার হাত থেকে রুটির টুকরো মুখে নিল।

কেমন লাগছে সুজির রুটি?

ভাল!

মৌ একচুমুক জল খেল।

আঃ মৌ, খেতে বসে আগেই ঢকঢক্ করে জল খেয়ো না তো।

মার হাত আবার এগিয়ে এল মৌ-এর মুখের কাছে।

আর খেতে পারছি না।

আঃ! মৌ! আবার দুষ্টুমী।

পেট ভরে গেছে।

চুপ করে খেয়ে নাও।

মা মৌ-এর মুখের মধ্যে গুঁজে দিলেন মাছের টুকরো আর রুটি।

খেতে যদি না চায় জোর করছ কেন? হয়ত এখনও শরীর ভাল হয় নি; জোর করে খাওয়ানো ঠিক নয়।

এইজন্যেই মৌ-এর বাবাকে এত ভাল লাগে; বাবা কখনও জোর করে রুটি-ভাত খেতে বলেন না, আর স্কুলে যাবার অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও বকেন না। বলেন—থাক, থাক! একদিন স্কুলে না গেলে কি আর হবে! কিন্তু মা! ওরে বাবা! আজও মা তেমনি করে বাবাকে বকে উঠলেন।

তুমি থামো তো! দু'টুকরো রুটি খেয়েই ওর পেট ভরে গেল। আমি জানি কতটা খেলে ওর পেট ভরে।

মা আবার মুখে গুঁজে দিলেন একটুকরো রুটি। তাড়াতাড়ি কর মৌ; স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে; বাবা ঘাড় ফিরিয়ে মৌ-এর দিকে চেয়ে হাত উল্টোলেন; অর্থাৎ হোল না বাবা আজ মৌকে বাঁচাতে পারলেন না। আজ মৌকে স্কুলে যেতেই হবে।

আরো কয়েকটুকরো রুটি খেতে হোল মহুয়াকে তারপর সুন্দর লেবুর গন্ধ দেওয়া একগ্লাস ঘোল; এই ঘোলটা খেতে মহুয়ার খুব ভাল লাগে।

খাওয়া! ঘোল খাওয়া যায় না, ঘোল ত' 'লিকুইড' তাকে ত' 'ড্রিঙ্ক' করতে হয়, মাদার বলেছেন, বুঝিয়ে

দিয়েছেন 'ইট' আর 'ড্রিঙ্ক'-এর তফাৎটা কোথায়, আর তাই ত' মহুয়ার জল খাওয়া ঘোল খাওয়া শুনলেই আজকাল হাসি পায়।

মাদার জেরোম! ঘোল 'পান' করতে করতে মহুয়া বলল।

গ্লাস মুখে নিয়ে কি বিড়-বিড় করছ?

মা আবার বকে উঠলেন।

তাড়াতাড়ি কর, দেরি হয়ে যাচ্ছে মৌ!

মার গলাটা শেষের দিকে ঠিক যেন মাদার জেরোমের মত শোনালো। উনি যখন ডাকেন মা-হু-য়া, মার মৌ ডাকটাও ঠিক তেমনি শোনালো মৌ-এর কানে। স্কুলের মধ্যে মাদার জেরোমকে মহুয়ার সবচেয়ে ভাল লাগে। উনিও কি সাদা! সব মাদাররাই সাদা কিন্তু মাদার জেরোমের মত এত ভাল সাদা আর কেউ নয়। মাদার সুপিরিয়রের মুখটা ত' সাদা নয় টকটকে লাল। ভয় করে দেখলে। উনি কিন্তু মোটেই বকেন না। আর মহুয়াদের ত' উনি পড়ানই না, খালি পিয়ানো বাজান আর বলেন, মহুয়া খুব ভাল পিয়ানো বাজাতে শিখবে। এই যাঃ। আর একটা কাজ করতে বলে দিয়েছেন যে উনি। কি ভুল হয়ে গ্যাল, ইস্!

তাড়াতাড়ি ঘোলের গ্লাস নামিয়ে মহুয়া মাকে ডাকল--

মা, মা!

কি রে?

মহুয়ার টিফিনের বাক্স গোছাতে গোছাতে মা বললেন—কি হোল?

কি সব্বনাশ হোয়ে গেল!

সে কি রে?

মা অবাক চোখে তাকালেন।

আর বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন, সব্বনাশ হয়ে গেল একদম মৌরাণী!

প্রেয়ার করতে ভুলে গেলাম যে খাবার আগে। মাদার সুপিরিয়র বলে দিয়েছেন, সব সময় প্রেয়ার করবে খেতে বসার আগে। জিসাস ক্রাইস্ট যে রাগ কর'বন!

বাবা এবার হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হাসলেন, সত্যিই তো! সাংঘাতিক সব্বনাশ হয়ে গেল মহুয়া রাণীর

বাবা হাসলেন, আর মার হাসি হাসি মুখটা কিন্তু কেমন যেন হয়ে গেল ; মহুয়ার মনে হল মার সাদা রংটা হঠাৎ যেন কেমন কালো দেখালো। বাগানের ফুলগাছের ওপর দুপুরে হঠাৎ বাড়ির ছায়া পড়ে যেমন কালো কালো দেখায় লাল লাল ফুলগুলোকে, তেমনি দেখালো মার মুখটা।

তুমি হাসছো ?

মার গলাটা কেমন অন্যরকম শোনাচ্ছে। আমার কিন্তু হাসি আসছে না। তখনই তোমায় বারণ করেছিলাম মিশনারী স্কুলে মেয়ে দিতে, তুমি তো আমার কোন কথা শুনবে না।

মার গলাটা ধরে এল। বাবা বন্দুক ছেড়ে মার কাছে উঠে এলেন, পিঠে হাত রেখে বললেন—আচ্ছা! তুমিই বলো, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে মেয়েদের ভালো স্কুল আর কোথায় আছে, আর ওদের শিক্ষা দেওয়াটা যে ভালো এটা ত' মানবে!

হয়ত ভালো, কিন্তু আমাদের দেশের রীতিনীতি আচার-ব্যবহারকে ত' ওরা শ্রদ্ধা করতে শেখায় না।

তার জন্যে বাড়িতে তুমিই আছ।

বাবা হাত বাড়িয়ে মার গালে একটু ছোঁয়ালেন। মা তাড়াতাড়ি গম্ভীর হয়ে সরে এলেন, আঃ কি কর!

মহুয়া তাড়াতাড়ি ঘোলের গ্লাসে মুখ নামাল, ও জানে, বুঝতে পেরেছে, এখন যদি ও এখানে না থাকত তা হলে বাবা নিশ্চয়ই মার ঐ ফরসা সাদা গালে চুমো খেতেন। যেমন একদিন খেয়েছিলেন সেই বাগানে বেড়াতে বেড়াতে। মহুয়া হঠাৎ ছুটে এসেই থমকে দাঁড়িয়েছিল আর মার মুখটা কি লাল হয়ে গিয়েছিল। মা তাড়াতাড়ি কত কথা বলেছিলেন মহুয়াকে। ছোট বোনটিকে কোথায় ফেলে এলে! আয়া আছে ত' ওর কাছে। মহুয়ার চুলের রিবন কোথায় গেল। এই সব আরও কত কি!

মহুয়া কিন্তু ঠিক বুঝতে পেরেছিল মা লজ্জা পেয়েছেন। আচ্ছা! চুমু খেলে মা এত লজ্জা পান কেন ? বাবা ত' মহুয়াকে ছোট বোনটি তুলতুলিকে সবসময়ই চুমু খান, কোলে নেন। কই! মহুয়ার ত' কখনও লজ্জা করে না, খুব ভাল লাগে। মা যেন কি! মহুয়া যখন মাকে চুমু খায়, মা কিন্তু তখন একটুও লজ্জা পান না। আঃ! কি হচ্ছে বলে সরেও দাঁড়ান না, বরং মহুয়াকে কেমন কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে ওর কপালে গালে সারা মুখে চুমো খান আর তখন মহুয়ার খু-উ-ব ভাল লাগে, মাকে আরো ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

মৌ! হোলো তোমার ?

মা এগিয়ে এলেন।

হুঁ।

মা এসে আমার হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে টিফিনের বাক্স গুঁজে দিলেন ভেতরে। এগারটার সময় কফি ব্রেকে বাড়িতে তৈরি এই ছানার সন্দেশ আর পেঁপের টুকরো খাবে মহুয়া, আবার খেতে হবে দুপুরে, গিরিধারী ঠিক একটার সময় হাজির হবে সেই বেতের বাস্কেটটা নিয়ে ; যা রাগ লাগে মহুয়ার গিরিধারীটাকে দেখলে। খেলা হয় না কিছু না, খেতে খেতেই সব সময় কেটে যায় টিফিনে। কিন্তু আজ বোধ হয় আর মহুয়াকে দুপুরে ঐ সব মাছ, মাংস, ভাত, তরকারী খেতে হবে না, আজ ত' খেয়েই গেল, অন্য দিনের মত ডিম সেদ্ধ আর মাখন রুটি খায় নি ত' আজ সকালে।

কি খেয়েছে আজ ? সুজির রুটি! যা খুব সহজে হজম হয়, হ্যাঁ! মা কাল সন্ধ্যেবেলায় বলছিলেন আয়াকে, আচ্ছা হজম কথাটা কি মজার না ? হ-জ-ম। আর সেই যে হজমিগুলি পাওয়া যায় স্কুলে। কি ফাইন খেতে, ইস! আবার একটা ভুল হল ; ফাইন কথাটা খাওয়ার সঙ্গে ঠিক কি যায় ? কি যেন শব্দটা···।

চল খোকী। গিরিধারী এসে হাত ধরল।

আঃ! মহুয়া আবার এঁকেবেঁকে হাত ছাড়িয়ে নিল।

কি হচ্ছে মৌ ? গিরিধারীকে হাত ধরতে দাও, দুষ্টুমী করো না।

মা ঠিক দেখতে পেয়েছেন ; কি করে যে মা সব দেখতে পান।

জোরে চল খোকী কদম বাড়াও, দেরি হচ্ছে, স্কুল বসে যাবে।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বারবার গিরিধারী মহুয়াকে তাড়া দিল, আর স্কুলের কাছাকাছি এসে মহুয়া সেই

মজাটা করল। গিরিধারীর ধরা হাতসুদ্ধ বোঁ করে ঘুরে গেল পিছন দিকে, হাত খুলে গেল আর ছুট, ছুট, ছুট।

গিরিধারীর চীৎকার শোনা যাচ্ছে, খোকী মৌ-বাবা, পড়িয়ে যাবে, ছুটো না, আস্তে চল, ছুটো না।

কিন্তু মহুয়া তো ছুটবেই ; কেন আস্তে যাবে ; কেন ? এখন কেন ? এতক্ষণ ধরে যে মহুয়াকে জোরে যেতে বলা হচ্ছিল ; তার বেলা !

ছুটতে ছুটতেই মহুয়া স্কুলের কাছে এসে পড়ল। গিরিধারীকে আর দেখা যাচ্ছে না, দূরে পড়ে আছে গিরিধারীটা ; বেশ হয়েছে ; মহুয়া আর একটু জোরে দৌড় দিল, আর রাস্তার মোড় পেরিয়ে স্কুলের সামনের রাস্তায় আসতেই—এই রে ! গিরিধারীটা ঠিক পেছনে এসে গেছে।

খোকী কি হচ্ছে ! ছুটো না, মাকে বলিয়ে দেবে।

উত্তরে মহুয়া পেছন ফিরে জিভ বার করে ভেংচি কাটল গিরিধারীকে ; ছোটা থামাল না, গিরিধারীর আগেই এসে পড়ল স্কুলের কাছে ; আর গেটে ঢোকবার আগেই কেমন যেন একটু অন্যরকম মনে হল স্কুলটাকে। স্কুলের বাগানে অনেক লোকের ভিড়, স্কুলের মেয়েরাও তার মধ্যে দু-একজন আছে, এই নতুন লোকেরা, মেয়েরা সব মিলে কেমন একটা আওয়াজ ভেসে আসছে, যেটা একটুও অন্যদিনের মত নয়।

খোকী !

মৌ পেছন ফিরে দেখল, গিরিধারী হাঁফাতে হাঁফাতে এসে উপস্থিত হয়েছে ; গিরিধারী মৌ-এর হাত ধরল।

খোকী ? ঘর চল ; ইধার গোলমাল লাগছে।

ধ্যাৎ ! স্কুল না গেলে মা বকবেন।

মৌ আবার গিরিধারীর হাত ছাড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল।

অনেক লোক, সব বাঙালী। মৌ নিজের মনেই বলল, এতসব ধুতিপরা বাঙালী, কি করছে এরা এখানে ? মৌদের স্কুলে কেন এসেছে ! এত বাঙালী এক দুর্গাপুজোর সময় কালীবাড়িতে দেখেছে মৌ, আর কখনও দেখে নি। ইস কত, কত বাঙালী। হঠাৎ একজন বাঙালী হাত ধরলেন মহুয়ার।

খুকুমণি !

মহুয়া অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকাল। আমার নাম মহুয়া। মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়।

ও তাই নাকি ? আচ্ছা শোন মহুয়া, আজ স্কুলে যেতে হবে না, বাড়ি ফিরে যাও ; আজ হরতাল।

মহুয়া ভাল বুঝতে পারল না কি [illegible]

না, তার আগেই তিনি আবার বললেন, যাও মহুয়া, আজ চলে যাও।

স্কুলে না গেলে মা বকবেন।

না আজ বকবেন না, বোল—

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে পেল না, কিরকম একটা হৈ-হৈ উঠল গেটের কাছে, আর একটা হিসহিস শব্দ বাগানের এধার থেকে ওধারে ছুটে গেল, পুলিশ, পুলিশ।

ভদ্রলোক আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যাও, খুকু যাও, শীগগির বেরিয়ে যাও, হাত দিয়ে তিনি মহুয়াকে ঠেলে দিলেন গিরিধারীর দিকে—

লে যাও খোকী কো।

গিরিধারী মহুয়ার হাত ধরে টানল, আও খোকী।

মহুয়া পা বাড়াল, আর তখুনি কানে এল সেই পরিচিত কঠিন কণ্ঠস্বর—

মহুয়া ! কোথায় যাচ্ছ ? চলে এসো।

মহুয়ার সামনে যেন বাজ পড়ল। মিসেস দে। মহুয়াদের অঙ্ক শেখান আর ড্রিল করান। মহুয়ার যা ভয় করে মিসেস দে'কে। মহুয়ার পা আটকে গেল ; গিরিধারীও ভয় পেয়েছে মনে হোল মিসেস দে'কে দেখে।

ফিরে এসো বলছি। ঐ দুষ্টু লোকগুলোর কথা শুনো না।

দুষ্টু লোক ! এমন সুন্দর চেহারা যার, একটু আগেই যিনি খুকুমণি বলে ডেকে মহুয়ার হাত ধরেছিলেন তিনি ভালো নয় ? মহুয়ার বলতে ইচ্ছে করল না উনি দুষ্টু নন, খারাপ নন, আমি ওঁর কথাই শুনব, বাড়ি যাব।

কিন্তু মহুয়া মুখ খোলবার আগেই ভদ্রলোক মিসেস দে'র দিকে এগিয়ে গেলেন। আজ স্কুল হতে পারে না মা ; জানেন ত' আজ বাংলার প্রিয় সন্তান…

ভদ্রলোকের মুখের কথা শেষ হোল না, মিসেস দে যেন ছিটকে বেরিয়ে এলেন।

বাজে বকবেন না ! ট্রেচারের দল ! পথ ছাড়ুন !

ভদ্রলোক দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়ালেন দরজার ওপর, মা আজ বড় দুর্দিন !

তবে রে ! গায়ের জোর !

মিসেস দে ভদ্রলোকের হাতের তলা দিয়ে গলে যাবার চেষ্টা করলেন। বিশাল বপু যথেষ্ট ফাঁক পেল না যাবার— আর ভদ্রলোক সেই মুহূর্তে এক আশ্চর্য কাণ্ড করলেন ; সটান শুয়ে পড়লেন মাটিতে, দরজা আগলে চৌকাঠের উপর।

তাঁর ধবধবে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী ধুলোয় মাখামাখি, মুখে সেই সকরুণ মিনতি।
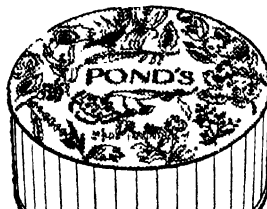
একমুখ হাসি নিয়ে বিজয়িনীর মত তাঁর হিল-পরা এক পা রেখেছেন ভদ্রলোকের বুকের ওপর, আর এক পা চলে গেলো ভেতরে। ঐ, ঐ পার হয়ে গেলেন মিসেস দে,—স্বচ্ছন্দে ঢুকলেন ভেতরে।

মহুয়া স্পষ্ট দেখতে পেল, ভদ্রলোকের সুন্দর হাসিমাখা মুখটা যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠল, চোখের কোণে দেখা দিল জলের ফোঁটা, আর সেই মুহূর্তে মহুয়ার মনে হল এক ধাক্কা দিয়ে মিসেস দে'কে ফেলে দেয়।

মিসেস দে'র হুঙ্কার আবার শোনা গেল।

কি হল? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলে এস ভেতরে; দেখলে না আমি কেমন করে এলাম!

না!

হঠাৎ প্রবল বেগে চীৎকার করে উঠল মহুয়া, না।

চোখের জলে সমস্ত অন্ধকার; বুকের মধ্যে কিসের আওয়াজ। মিসেস দে'র উপর যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে, কামড় দিতে পারত মহুয়া, কিন্তু কিছু করা গেল না। তাঁর নির্দয় আচরণের প্রতিবাদে একটি শব্দই বেরুলো মহুয়ার মুখ থেকে।

না।

আর তারপরেই আবার ছুটতে আরম্ভ করল মহুয়া। ছুটতেই ছুটতেই শুনতে পেল অনেক লাঠির আওয়াজ; হৈ, হৈ; ওর বুকের মধ্যে কেমন একটা হতে থাকল।

মা, মা কই? বাবা!

মহুয়া প্রাণপণে ছুটতে লাগল, আর ছুটতে ছুটতেই দেখল কম্পাউণ্ডের বাইরে গেটের পাশে গম্ভীর সজলমুখে দাঁড়িয়ে মাদার জেরোম; কই উনি ত' ঢোকেন নি মিসেস দে'র মত ওদের বুক পায়ে মাড়িয়ে; মহুয়া আবার পেছন ফিরল, স্কুলবাড়ির সব দরজাতেই একজন করে সাদা ধুতি-পরা লোক শুয়ে, আর কত কত পুলিশ; ফটাফট কিসের আওয়াজ, কি গোলমাল, কি হৈ-হৈ, মহুয়া ভয়ে দু'হাতে কান চাপা দিয়ে আরো জোরে ছুটল।

আশ্চর্য। মা কিন্তু একটুও বকলেন না মহুয়া স্কুল যায় নি শুনে। মহুয়াকে কাছে বসিয়ে সব শুনলেন, তারপর আদর করে কপালে চুমো খেলেন আর বললেন, বেশ করেছ স্কুলে না ঢুকে; ওরকম করে কি যেতে আছে।

মিসেস দে কেন গেলেন?

উনি···

কি যেন বলতে গিয়ে মা সামলে নিলেন, শুধু বললেন, তুমি অমন করে মানুষের ওপর দিয়ে হেঁটে যাও নি বলে আমি খুব খুশি হয়েছি মৌ।

ম্যা, ওঁরা কারা মা? ঐ সব বাঙালী? কেন ওঁরা ওঁরা দেশের সুসন্তান। মার মুখটা উজ্জ্বল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। দেশকে স্বাধীন করার পণ ওঁদের, ওঁরা···

স্বাধীন কি মা? দেশ কে?

মা কেমন একরকম করে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন মহুয়ার মুখের দিকে, তারপর হাত বাড়িয়ে মহুয়াকে বুকের আরো কাছে টেনে আনলেন, শোন তবে।

মহুয়াকে কোলে বসিয়ে মা অনেকক্ষণ ধরে বলে গেলেন অনেক কথা; আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ আমরা এদেশে জন্মেছি, কত সুন্দর কত ভাল দেশ আমাদের, সেই দেশে এল বিদেশী রাজা···।

শুনতে শুনতে মহুয়ার মনে হল এমন আশ্চর্য রূপকথা সে আর শোনে নি। দেশ কে? মহুয়ার আবছা আবছা মনে হল গল্পের সেই বন্দিনী রাজকন্যাই যেন এই দেশ, আর সেই রাজকন্যা তো মা-ই; মহুয়া কতদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্পষ্ট দেখেছে, মা সেই সাতশ' রাক্ষস-ঘেরা পাষাণপুরীতে বন্দিনী। মা, রাজকন্যা, দেশ সবই তো একজন, আর সেই একজনের, সেই সুন্দরী রাজকন্যার কি গভীর দুঃখ, কি নিদারুণ কষ্ট, দুশ' বছর ধরে সে বন্দিনী হয়ে আছে, মা বললেন, তাকে মুক্ত করতে হবে—স্বাধীন হতে হবে, আর তাই নাকি ঐ সব খদ্দর-পরা লোকেরা, আজ সকালে যাঁরা মহুয়াদের স্কুলে গিয়েছিলেন, তাঁরা আর তাঁদের মত আরো অনেকে যুদ্ধ করছে; কিন্তু যুদ্ধ যদি, তা হলে তলোয়ার কই? বর্শা কই? মহুয়া কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু মার চকচকে চোখ আর ঘামে-ভেজা লাল হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতেও ওর কেমন যেন সাহস হল না। মার এমন মুখ মহুয়া কখনও দেখে নি; মহুয়া মার সব কথা বুঝল না, কিন্তু একটা সত্য স্পষ্ট হয়ে গেল ওর কাছে; খদ্দর-পরা লোকেরা খুব ভাল, সায়েবরা দুষ্টু (মাদার জেরোমও ত' সাহেব!) আর দেশ বলে কি যেন আছে, (সেই ত' মার মত দেখতে বন্দিনী রাজকন্যা) যার জন্য হাসতে হাসতে মরা যায়।

সেদিনের সন্ধ্যাটাও মহুয়া জীবনে ভুলবে না, বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই মাকে ডেকে কি সব বলতে লাগলেন, আর মার মুখটা ক্ষণে ক্ষণে তেমনি লাল হয়ে উঠতে থাকলো, মার সেই সুন্দর বাদামী চোখ যেন জ্বলতে লাগল আর বারবারই মহুয়ার কানে এল দু'টো শব্দ—দেশ, স্বাধীনতা।

বাবা বললেন, অমরেশবাবুর ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে, ওদের সব নাকি জেলে রেখে দেবে।

আচ্ছা! চুরি করলে তবে ত' জেলে যায়,—আয়া বলেছে। সেই যখন মহুয়া পেটমোটা লালাজীর বাগানে

যখন আয়া বকেছিল—বলেছিল, লালাজী নাকি মুন্নাকে জেলে দেবেন। সব চোরেরাই নাকি জেলে যায়। তবে! অমরেশবাবুর ছেলে সুনীলদা' কি চোর? তিনিও কত ভাল, দেখা হলেই মহুয়াকে লজেন্স-টফি দেন, কতদিন মহুয়াকে সাইকেলের পেছনে চড়িয়ে ঘুরিয়ে এনেছেন। সেই সুনীলদা' চোর?

না স্বদেশী। আয়া বলল; ও লোগ স্বদেশী হ্যায়, ইসিলিয়ে জেল জানা পড়া।

স্বদেশী হলে জেলে যেতে হবে কেন, মহুয়া ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু স্বদেশী আর চোর যে এক নয় এ সম্বন্ধে মহুয়ার সন্দেহ নেই; সন্ধ্যেবেলা মাও আবার সেই কথাই বললেন,—এ জেল খাটা নাকি গৌরবের, ভারি সম্মানের; বলতে বলতে মা কেমন অস্থির হয়ে উঠলেন; কাপড়ের কোণ দিয়ে চোখের জল মুছলেন বারবার, বললেন মার কোন পিসতুত দাদাও স্বদেশী আর তিনিও অনেকদিন ধরে জেলে আছেন। মার কোন কাকাও নাকি জেলে ছিলেন—জেলেই মারা গেছেন, তাঁরা নাকি বোমা তৈরি করেছিলেন; সারা সন্ধ্যেটা মা কেমন যেন হয়ে থাকলেন। সন্ধ্যেবেলা কত লোক এল বাড়িতে, কত চেনা-অচেনা সব লোক; মা ছুটোছুটি করে তাদের চা-খাবারের ব্যবস্থা করতে লাগলেন, আর আয়াকে ডেকে বললেন মহুয়া আর তুলতুলিকে খাইয়ে দিতে।

এরকম কখনও হয় নি: মহুয়া অবাক হয়ে গেল; মার যতই কাজ থাকে, যতই ব্যস্ত থাকুন, মহুয়াদের খাবার সময় ঠিক কাছে এসে বসেন, তুলতুলিকে খাইয়ে দেন আর মহুয়াকে গল্প বলেন; মার মুখের সেই অপরূপ রূপকথা শুনতে শুনতে কখন যে মহুয়ার খাওয়া হয়ে যায় মহুয়া বুঝতেও পারে না।

এমনি রোজ হয়। কখনও এর ব্যতিক্রম হয় নি; এমন কি দাদা যেদিন হোস্টেলে চলে গেল দেরাডুনে, সেদিনও মা অত তাড়াহুড়োর মধ্যেও ঠিকই তুলতুলিকে খাইয়ে দিয়েছেন নিজের হাতে; মহুয়াকে খাওয়ান নি যদিও কিন্তু গল্প করেছেন মহুয়ার সঙ্গে। সেদিনও মা বারবার আঁচলে চোখের জল মুছছিলেন, মহুয়াও সেদিন খুব কেঁদেছিল; দাদা চলে গেল; ট্রেনে করে দেরাডুনে চলে গেল, সেখানেই থাকবে; খাবে, শোবে, ওখানেই থাকবে রোজ রোজ।

সেও ত' কতদিন হয়ে গেল; দাদার কথা মনে হলে মহুয়ার এমন কান্না পায়; দাদা নেই, কার সঙ্গেই বা সকালে ও শিকারে বেরুবে। মহুয়া দেয়ালে ঝোলানো এয়ার-গানটার দিকে তাকাল। দাদার এয়ার-গানটা মহুয়া কাউকে ছুঁতে দেয় না, লছমনকেও নয়; মহুয়া এয়ার-গানটা নিজেই ঝাড়ে, মোছে; আবার টাঙিয়ে দেয় দেয়ালে; দাদা এলে আবার ভোরবেলা বেরুবে মহুয়া আর মহুয়ার দাদা। দাদার কাঁধে এয়ার-গান আর মহুয়ার পিঠে সেই হাণ্ডার স্যাকব্যাগ। ভোরে উঠেই পাখি মারতে বেরোবে ওরা; পাখি অবশ্য এখন পর্যন্ত একটাও মারা যায় নি, যা দুষ্টু ওরা, দাদা টিপ করতে করতেই ওরা উড়ে পালায়, কিন্তু একদিন একটা মস্তবড় টিকটিকি মেরেছিল দাদা। অবশ্য শিকার থেকে ফেরার সময় তাই বলে খালি ব্যাগ নিয়ে কখনও ফেরে নি মহুয়া, কাঁচা পেয়ারা, পাকা কুল আর বুনো ফুলে সব সময়ই ব্যাগ বোঝাই থাকত তার।

মৌ বাবা! খা লেও জলদি; কেয়া চুপসে ব্যঠ্ গিয়া।

খাচ্ছি ত'! কান্নায় মহুয়ার গলা বুজে এল; মা কাছে না থাকলে কখনও খাওয়া যায়? তুলতুলিটা কিন্তু বেশ খাচ্ছে আয়ার হাত থেকে। হঠাৎ মহুয়ার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ল। মহুয়া হাত গুটিয়ে বসল। আর ঠিক সেই সময়ই মা ঘরে ঢুকলেন।

মৌ। কি হল মা! কাঁদছ কেন?

মৌ হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দু'হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল।

মা—আ—

মাকে জড়িয়ে ধরে মৌ-এর কান্না আর থামতেই চায় না।

কি রে, কি হোল কি?

মা বারবার জিজ্ঞেস করলেন, আর মৌ মার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে চলল।

কেন কাঁদছে মৌ তার কি জবাব দেবে, কেন কান্না পাচ্ছে মৌ নিজেই কি জানে, হঠাৎ কেন দুঃখে ভরে উঠল ওর মন; মনে পড়ল সকালবেলায় সেই খদ্দর-পরা সুন্দর ভদ্রলোকের মুখটা কেমন কালো হয়ে গিয়েছিল মিসেস দে যখন উঁচু হিল দিয়ে তাঁকে মাড়িয়ে ভেতরে চলে গেলেন; মনে পড়ল মা আজ মহুয়ার খাওয়া দেখছেন না ওর সামনে বসে, সেই সঙ্গে মার শূন্য চেয়ারটা দেখে বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন করে উঠল—আর অমনি কোথা থেকে চোখে এসে গেল জল।

চল, শুবি চল; খুব সুন্দর গল্প বলব আজ একটা।

মা হাত দিয়ে মহুয়ার কান্নাভেজা মুখটা বুকের ওপর চেপে ধরলেন। এতক্ষণে মহুয়া শান্ত হোল, আর মার বুকে মাথা রেখে মহুয়ার মনে পড়ল, সেই সুন্দরী রাজকন্যাকে, শো বছর ধরে বন্দী হয়ে আছেন যিনি।

ঢং-ঢং করে সিঁড়ির বড় ঘড়িতে চারটে বাজল; ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল মহুয়া।

ইস! এর মধ্যেই চারটে বেজে গেল, এই ত' মোটে শুল গে বিছানায়, এরই মধ্যে হয়ে গেল ছ' ঘণ্টা!

বাব্বাঃ! বিছানা থেকে নেমে চটির মধ্যে পা গলাতে গলাতে ভাবল মহুয়া।

কবে যে পরীক্ষাটা শেষ হবে, ঘুমিয়ে বাঁচব একটু।

কোনো মানে হয় য়ুনিভার্সিটির এরকম শীতের পরে পরীক্ষা নেবার।

পাশের চেয়ার থেকে হাল্কা কাশ্মীরী কোটটা নিয়ে গায়ে দিয়ে মহুয়া দরজা খুলে বেরিয়ে এল; পূব আকাশে এখনও শুকতারাটা দপদপ্ করছে, একটু পরেই ভোরের নরম আলোয় ছেয়ে যাবে সমস্ত আকাশ, পাখিরা ডাকাডাকি শুরু করবে, ঠিক সেই সময় মহুয়া লজিকের নোট ছেড়ে আর একবার বেরিয়ে আসবে বারান্দায়, চোখ ভরে দেখে নেবে সবার আকাশ আর গা পেতে দেবে ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়ায়।

আপাতত লজিকের নোটে মন দেওয়া যাক, ঘণ্টা অনেকের মত।

টেবিলের চেয়ার এখনও খালি; দাদা এখনও পড়তে বসে নি, ডাকবে নাকি দাদাকে? না থাক! আহা বেচারা, ঘুমোক একটু; মহুয়ার মত ও ত' শুতে যায় নি রাত দশটায় সময়, দাদা রাত জেগে পড়ে, ভোরে উঠবে কি করে। মহুয়া চেয়ারে হেলে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিল; তারপর দুলে দুলে পড়তে লাগল—

পারফেক্ট ফিগার—বারবারা ভেরিয়াই, সেলারেণ্ট ফেরিও···মৌ!

বাবা মহুয়ার কাঁধে হাত দিলেন।

কি বাবা? বাবা! তুমি এত ভোরে উঠেছ কেন?

তোরা উঠেছিস আর আমি পারি না! নে এটা খেয়ে নে।

হাতেধরা কমলালেবুর রসের গ্লাসটা বাবা এগিয়ে দিলেন।

কেন বাবা, তুমি আবার ভোরে উঠে কষ্ট করতে গেলে?

না রে, কষ্ট আবার কি? নে খেয়ে নে।

বাবার হাত থেকে কমলালেবুর রসের গ্লাসটা নিয়ে মহুয়ার মন বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতায়, ভালবাসায় ভরে গেল। বেচারা বাবা! এত কোমল মন বাবার, মেয়েদের মত। বাবা বিছানা থেকে কম্বল টেনে মহুয়ার পায়ের ওপর বিছিয়ে দিলেন, আরাম করে বোস, ঠাণ্ডা লাগাস না।

না বাবা, কোথায় ঠাণ্ডা? তুমি দিন দিন বুড়ো হচ্ছ বলে···

তাই না কি?

বাবা মহুয়ার মাথায় আস্তে আস্তে একটু হাত ছোঁয়ালেন।

আর তোমার দাদাভাই গেলেন কোথায়? তাঁরও তো একজামিন; না কি?

দাদা অনেক রাত অবধি পড়ে কি না বাবা, তাই একটু দেরিতে ওঠে।

মহুয়া তাড়াতাড়ি দাদার পক্ষ নিল।

হুঁ, রইল ওর লেবুর রস এইখানে—দিয়ে দিস। বাবা বারান্দার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন; নাঃ, দাদাটার এবার ওঠা উচিৎ, আর সত্যি দাদা যেন তেমন সিরিয়াস নয় পরীক্ষার ব্যাপারে। এই তো কালই সারাদিন বালিগঞ্জের মাঠে গিয়ে ক্রিকেট খেলল, পরীক্ষা এসে গেছে এখন কি এভাবে সময় নষ্ট করা ভাল? অবশ্য বি এস সি পরীক্ষার দেরি আছে এখনও; কিন্তু তা হলেও; কলম কামড়ে ভাবল মহুয়া, দাদাটা বড্ড ফাঁকি দেয়, একটুও পড়াশোনা করে না, আর ও তো এই রকমই চিরকাল! হ্যাঁ সেই ছোটবেলা থেকেই. সেই যখন ওরা

ছিল না বলে দাদাকে বাড়িতে পড়াতেন দু'জন টিচার, তাঁরা কিন্তু প্রায়ই নালিশ জানাতেন বাবাকে—

সঞ্জয় বড্ড ফাঁকিবাজ; বড় দুষ্টু; কিছুতে পড়ায় মন দেয় না।

তারপরেই বাবা হঠাৎ দাদাকে পাঠিয়ে দিলেন দেরাদুন; মার খুব ইচ্ছে ছিল না, বাবা একরকম জোর করেই দাদাকে নিজে গিয়ে রেখে এসেছিলেন দেরাদুন স্কুলে; আর দাদার যাবার দিন মহুয়া যা কেঁদেছিল; দাদা চলে যাবার অনেক অনেক দিন পর পর্যন্ত মহুয়া রোজ কাঁদত দাদার জন্যে। পেয়ারা বাগানে মালী যখন কাঁচা পেয়ারা তুলে দিত মহুয়ার হাতে, আর একগাল হেসে বলত—আচ্ছা আমরুদ, খোকী, খা লে।

তখন সেই টসটসে সবুজ কাঁচা পেয়ারার দিকে চেয়ে দাদার জন্যে মহুয়ার চোখে জল আসত; আর বিকেলে যখন টেনিস লনে বাবার বন্ধুরা এসে টেনিস খেলতেন, আর মহুয়া গিয়ে দাঁড়াত বড় গাছটার তলায় তখন দাদার জন্যে মহুয়ার বুকের মধ্যে কি যে একরকম হতে থাকত, সে কষ্ট মহুয়া আজও ভোলে নি।

আর তারপর সেই স্বদেশী আন্দোলন, কয়েকটা দিন, প্রায় একবছর, তাদের বাড়িতে সেই সব খদ্দর-পরা লোকজনের আসা-যাওয়া, মার থেকে থেকে উত্তেজিত হয়ে ওঠা, আর সন্ধ্যেবেলায় মার কাছে বসে, মার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাওয়া—'বল বল বল সবে' আর নয়ত 'দেশ দেশ নন্দিত করি,' 'বঙ্গ আমার জননী আমার,' 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা,' এসব গানই মহুয়া কতবার মার সঙ্গে গেয়েছে, মার কাছ থেকেই বাংলা গান শেখার ওর হাতেখড়ি।

সেই একটা বছরে মহুয়া অনেক কিছু শুনেছে, বুঝেছে, শিখেছে। আর আজ মনে হয় সেই একটা বছরেই মহুয়া যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। মনে আছে মীরাটে শেষের দিকে মা কি রকম অস্থির হয়ে উঠেছিলেন দেশে, মানে বাংলা দেশে চলে আসবার জন্যে—

প্রায়ই বাবাকে বলতেন—

কবে ট্রান্সফার হবে!

সে কি আমার হাত?

তুমি ভাল করে চেষ্টা করছ না—

বাবা হাসতেন।

এখানে কিছু খারাপ আছ রাণী।

মার নাম ধরে বড় একটা বাবাকে ডাকতে শোনে নি মহুয়া, কিন্তু কখনও কখনও, যখন বাবা রাত্রে বড় শেজ বাতিটা জেলে আরামকেদারায় শুয়ে কাগজ পড়তেন, আর মা কাছের সোফাটায় বসে মহুয়ার জামার লেস বুনতেন কি কার্পেটে পশম দিয়ে ফুটিয়ে তুলতেন প্রকাণ্ড বাঘ কি পেখম তোলা ময়ূর, তখন বাবা এক একদিন হঠাৎ মার ডাকনাম ধরে কথা বলতেন।

এখানে কিছু খারাপ আছ রাণী?

কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো যে সব হিন্দুস্থানী হয়ে গেল।

ও দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। দু'মাস একটানা বাংলা দেশে থাকলেই দেখবে আবার ওরাই হিন্দী বেমালুম ভুলে যাবে।

মা তখনকার মত চুপ করতেন, আবার কয়েকদিন বাদে বলতেন একই কথা।

কি হোল তোমার ট্রান্সফারের?

বাবা হাসতেন, আর জোরে জোরে চুরুটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিতেন মার মুখের ওপর।

আঃ কি যে ছেলেমানুষী কর; বুদ্ধি আর তোমার হল না।

মা রাগ করে সেলাই-এর বাক্স নিয়ে পাশের ঘরে উঠে যেতেন। একদিন বাবা হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছিলেন

মার আঁচলটা, আর মহুয়া খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। মা কি রেগে গিয়েছিলেন বাবার ওপর; বয়স দিন দিন বাড়ছে না কমছে?

মা রাগ করলেও মহুয়ার সেদিন মনে হয়েছিল মা যেন সত্যি রাগ করেন নি। যেন রাগ-রাগ খেলা করছিলেন মহুয়াদের সামনে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহুয়াদের কলকাতায় আসা হোল। সেই যে মহুয়াদের নতুন ভাইটি হয়েই দু'মাস পরে মারা গেল আর মা দিনরাত কাঁদতে লাগলেন, সেই সময়ই একদিন বাবা এসে বললেন—হয়ে গেল, কলকাতায় ট্রান্সফার হয়ে গেল—

খুশিতে মার মুখটা যেন দপ করে জ্বলে উঠেছিল। সত্যি।

সেদিন অনেকদিন পরে মাকে হাসতে দেখেছিল মহুয়া। আর সারা সন্ধ্যা সেদিন মাকে গুন্‌গুন্ করতে শুনেছিল।

অত খুশি হয়েছিলেন কলকাতা আসবেন বলে, তবু আসার দিন কি কান্নাটাই কাঁদলেন মা। মহুয়ার কিন্তু খুব মজা লেগেছিল। নতুন জায়গায় যাব, দাদাও ত' সঙ্গে যাবে। মা বলেছেন আর দাদা দেরাদুনে হোস্টেলে থাকবে না, কলকাতায় সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল আছে সেখানে পড়বে। সবাই আবার ওরা একসঙ্গেই থাকবে, কি মজা।

এই মৌ! এর নাম পড়া!

সঞ্জয় এসে কখন মৌ-এর পাশে দাঁড়িয়েছে। কার ধ্যান করা হচ্ছিল শুনি! চোখের সামনে বই খুলে রেখে।

ভাগ্, ধ্যান আবার কার করব। মনে মনে মুখস্থ বলছিলাম।

আমি জানি না, কোনটা তোর ধ্যান আর কোনটা মুখস্থ বলা!

সঞ্জয় মহুয়ার সামনের টেবিলে বসল।

এই মৌ কি দিন-রাত্তির গাধার মত পড়িস মুখ বুজে।

কি যে বলিস! একমাস বাদে ফাইন্যাল আমার।

তোর সেই ভোরের আলো দেখার কি হল? ক'দিন থেকে দেখছি, তোর চিরদিনের মর্নিং ওয়াকও বন্ধ হয়ে গেছে ব্যাপার কি?

ব্যাপার আবার কি, সময় নেই, আবার সব হবে মার্চ থেকে; এখন ওঠ তো, পড়তে দে আমায়।

মর তুই গাধার মত মুখস্থ করে; যেমন গাধার মত

এই দাদা! তোর লেবুর রস!

বাব্বাঃ! আয়াটা এত ভোরে উঠতে আরম্ভ করেছে—

আয়া কোথায়? বাবা!

সত্যি! গশ্!

সঞ্জয় ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

এই দাদা! তুই সিগারেট খাচ্ছিস?

হুঁ স্মোক করছি, করি, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

দাদা! মা শুনলে মরে যাবে।

শুনবে কেন? তুই বলে দিবি?

বলাই উচিৎ! তাতে যদি তোর শিক্ষা হয়।

দেখ মৌ!

সঞ্জয় আবার এসে টেবিলে বসল পা ঝুলিয়ে।

তোর কিস্-স্যু হবে না।

তার মানে?

তুই শুধু ঐ মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশই করবি। আর কিছু হবে না তোর দ্বারা।

পাণ্ডিত্য সেই আমার একমাত্র লক্ষ্য, সুতরাং তাতে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে দয়া করে উঠে পড় ত'!

মহুয়া দাদাকে ঈষৎ ঠ্যালা দিল। ফেল করে মরবি তুই বলে দিলাম।

সঞ্জয় উঠে পড়ল, শিস দিতে দিতে চলে গেল নিজের টেবিলে, আর মহুয়ার মনটা হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে গেল; সত্যিই কি শুধু পরীক্ষা পাশই তার একমাত্র লক্ষ্য! তার আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন সবই কি চরম পরিণতি—পরম সার্থকতা পাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায়?

মহুয়া টেবিলের সামনে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের বড় ছবিটার দিকে তাকাল।

না, অনেক বড় লক্ষ্য, অনেক উঁচু আশা, সুন্দর স্বপ্ন—সব তাকে সত্য করতে হবে, সফল করতে হবে চিরদিনের বাসনা, সেই নিতান্ত শিশুকাল থেকে মীরাটের বাগানে পাতাকাঁপা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছোট্ট মহুয়া কত যে স্বপ্ন দেখেছে; কত আশা, কত কল্পনা···।

মৌ, মৌ বাবা! আয়া হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে এল। জলদি আ যাও, মাইজি কা তবিয়ৎ বহুৎ খারাব হায়!

সে কি! মহুয়া চীৎকার করে উঠল;

দাদা!

কি রে?

মার শরীর···

মহুয়া কথাটা শেষ করতে পারল না, চটির মধ্যে পা গলাতেও সময় পেল না। ছুটে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে

আর মুখটা অসম্ভব সাদা। বাবা মাথায় হাওয়া করছেন আর পাশে রাখা পেয়ালা থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন চোখে-মুখে।

কি হয়েছে বাবা ?

কান্নাভেজা গলায় মহুয়া বলে উঠল ; অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

মা ! মা !

মহুয়া মার বুকের ওপর ঝুঁকে ডাকল—মা।

মৌ একটা চামচ আর ব্র্যাণ্ডির শিশিটা।

মৌ উঠল। পেছন ফিরে দেখল দাদা নেই। আশ্চর্য ! এমন সময় গেল কোথায়। দাদাটা যেন কি ! তুলতুলিরও দাদার চেয়ে বেশি কাণ্ডজ্ঞান আছে।

বাবা চামচ দিয়ে মার দাঁত ফাঁক করে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিলেন। একফোঁটা, দু'ফোঁটা, তিনফোঁটা। আঃ ! বলে মা চোখ খুললেন, আর এই সময়ই দাদা ঘরে ঢুকল এক ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে।

ও, দাদা তা হলে ডাক্তার আনতেই ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। ছি, ছি, একটু আগেই মহুয়া কি ভুলই না ভেবেছিল দাদাকে।

মা চোখ খুললেন। ডাক্তার মাকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, সাবধানে থাকতে হবে, রক্ত নেই একদম, আর পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন।

একরাশ ওষুধ-ইনজেকশানের ব্যবস্থা করে চলে গেলেন ডাক্তার। মহুয়া আর সঞ্জয় মার দু'পাশে বসল, বাবা বিছানার পাশে রাখা মোড়াটায় বসে মার একটা হাত টেনে নিলেন—নিজের হাতে।

রাণী ! এবার একটু যত্ন নাও নিজের প্রতি।

ক্লান্ত পাণ্ডুর মুখে মা সুন্দর করে হাসলেন, কেন ব্যস্ত হচ্ছ বল ত' ? আমি ঠিক আছি।

না, তুমি ঠিক নেই।

ওরা তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল।

মা ! তুমি একদম আর বিছানা থেকে উঠতে পারবে না ; যা করবার আমরা করব, তাতে সংসারের যা হয় হবে, আমি দেখব সব।

মা মহুয়ার দিকে ফিরে আবার হাসলেন, ওরে মৌ ! তোর যে পরীক্ষা।

দেব না পরীক্ষা ! তোমার চেয়ে কি আমার পরীক্ষা বড় ?

মহুয়ার গলা বুজে এল কান্নায়।

বাবা আবার কথা বললেন, না না, কাউকে কিছু করতে হবে না, আমিই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি দেখ না।

হো হো করে হেসে উঠল সবাই। ব্যবস্থা করবেন হীরেন্দ্রনাথ ! যাঁর চশমা, চুরুটের বাক্সটি পর্যন্ত রাধারাণীকে হাতে তুলে দিতে হয় !

হীরেন্দ্রনাথ অপ্রস্তুত হলেন। আহা, আমি কি আর নিজের হাতে কিছু করব, একজন ভদ্রমহিলাকে আনাচ্ছি।

আমাদের অফিসের যতীনবাবু বলছিলেন তাঁর এক দূর সম্পর্কের দুস্থ আত্মীয়া কোন ভদ্রবাড়িতে কাজ করতে চান, মানে রান্নার কাজ করতে চান আর কি।

বাবুর্চি না হলে তোমার চলবে ! মার ক্লান্তস্বর শোনা গেল।

বাবুর্চি থাক না।

তবে।

তিনি করবেন সংসার দেখাশোনা, মানে এই যেসব নিয়ে তুমি সকাল থেকে খেটে মর।

তিনি সব দেখবেন, আর আমি করব কি।

আপাতত বিশ্রাম। আবার সঞ্জয় আর হীরেন্দ্রনাথ একই সঙ্গে বলে উঠলেন।

যা হয় করো।

রাধারাণী ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন। [ক্রমশ।

সমুদ্রের বিভীষিকা—হাঙর

রাণী মজুমদার

ভগবান জেলের কথা হয় তো অনেকের মনে আছে। কয়েক বছর আগে সে পরপর দু'দিন কি তিনদিনে কলকাতার গঙ্গা থেকে কয়েকটা হাঙর ধরে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। গঙ্গায় হাঙর শুনলেই আমরা চমকে উঠি! লোকের ধারণা হাঙর থাকে সাগরে। কিন্তু Carcharias Ganglticus নামে একজাতের হাঙর গঙ্গা নদীতেও দেখা যায়। গঙ্গায় স্নানার্থীদের হাঙরের আক্রমণে আহত বা নিহত হবার সংবাদও শোনা গেছে।

মিষ্টি কথায় লোক তুষ্ট হয়—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা হাঙরদের নানারকম মন-ভোলানো নামে অভিহিত করতো। প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপের বাসিন্দারা তো এদের কোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এদেরকে পূজা করতো। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়—বাগে পেলে এরা কাউকে রেহাই দেয় না।

বিজ্ঞানীদের ভাষায়—হাঙরও একজাতের মাছ আর এদের জাতও অনেকরকমের প্রায় তুইশ পঞ্চাশ থেকে তিনশ পঁচিশ। এর মধ্যে মাত্র কয়েক জাতের হাঙরই হচ্ছে সাংঘাতিক মানুষ-খেকো। সাদা হাঙর, বাঘ হাঙর, বালি হাঙর, হাতুড়িমাথা হাঙর, গ্রেনার্স হাঙর, ম্যাকো হাঙর এবং ম্যাকারেল হাঙর সাংঘাতিক মানুষ-খেকো। এ ছাড়াও অবশ্য আরও কয়েক জাতের মানুষ-খেকো হাঙর আছে।

প্রাচীনত্বের দিক থেকে হাঙরও কম যায় না। বিজ্ঞানীদের ধারণা দশকোটি বছর আগে হাঙর পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত আকৃতিগত পরিবর্তন ছাড়া এদের অন্য কোন পরিবর্তন বিশেষ কিছু হয় নি।

বিভিন্ন জাতের হাঙরের দৈর্ঘ্যও বিভিন্ন রকম। তবে সবচেয়ে বড় জাতের হাঙররা লম্বায় সাধারণত চল্লিশ থেকে ষাট ফুট পর্যন্ত হয়। বেশির ভাগ হাঙরই ছোট জাতের।

শুনতে অদ্ভুত লাগে যে—প্রাচীনকালের যেসব হাঙরের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে—তা লম্বায় ছিল একশ ফুট। আর তাদের চোয়াল এতই বড় ছিল যে, ছ'জন মানুষ অনায়াসে তাদের মুখের ভিতর চোয়ালের উপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো। এ থেকেই বুঝতে পারছেন সে-যুগের হাঙরদের কি ভীষণ দানবাকৃতির চেহারা ছিল।

হাঙরদের আমরা যত হিংস্র বলে মনে করি আসলে কি এরা তত হিংস্র? এই সম্বন্ধে কোন কোন হাঙর বিশেষজ্ঞের মত হচ্ছে—অধিকাংশ জাতের হাঙরই খুব নিরীহ এবং ভীতু প্রকৃতির। খুব ক্ষুধার্ত না হলে বা বেকায়দায় না পড়লে এরা মানুষকে পারতপক্ষে আক্রমণ করে না। আবার সংখ্যায় অল্প হলেও কোন কোন জাতের হাঙরের মেজাজ সর্বদাই উগ্র এবং স্বভাবও ভীষণ হিংস্র। কারণে-অকারণে সুযোগ পেলেই মানুষকে আক্রমণ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না। হাঙরদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জাতের হাঙর হলো—তিমি হাঙর, রোদ-পোহানো হাঙর এবং ঘুমন্ত হাঙর। এদের মেজাজও খুব ঠাণ্ডা।

মানুষ-খেকো সাদা হাঙর ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির। এদের দেহ সুগঠিত। দ্রুত সাঁতার কাটতেও এরা ওস্তাদ। মেজাজও এদের ভীষণ কড়া। আর নর-মাংসের প্রতি লোভও খুব। সময় সময় ভেলা, নৌকা প্রভৃতি আক্রমণ করতে পিছপা হয় না। এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অনেক মানুষ অকালে প্রাণ হারিয়েছে।

মানুষ-খেকো ম্যাকো হাঙরের কবলে পড়েও অনেকে মারা গেছে। এরা অনেক জোরে লাফাতে পারে। সেজন্যে এদেরকে হাঙরদের মধ্যে লম্ফবীর আখ্যা দেওয়া যায়।
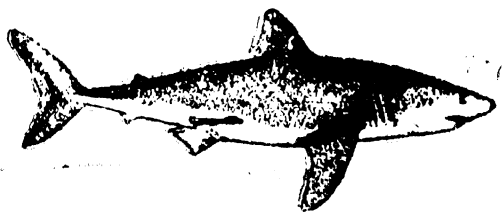
সাদা হাঙর বা হোয়াইট শার্ক

অস্ট্রেলিয়ার মুক্তা-সন্ধানী ডুবুরীদের কাছে বাঘ-হাঙর ভীষণ আতঙ্কের কারণ! পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এদের অত্যাচার বড় কম নয়। এরা জলের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকে। সুযোগ পেলেই মানুষ বা অন্য কোন শিকারকে আক্রমণ করে অগভীর জলাংশে টেনে নিয়ে গিয়ে উদরসাৎ করে। এরা সর্বভক—[illegible]

লেমন-শার্ক বা লেবু-হাঙর সমুদ্রোপকূলে ওৎ পেতে থাকে শিকারের আশায়। অবশ্য এরা সত্যই মানুষকে আক্রমণ করে কি না সে সম্বন্ধে দ্বিমত আছে। তবে ১৯১৯ সাল এবং ১৯৩৩ সালে দক্ষিণ-ক্যারোলিনা সমুদ্রোপকূলে স্নান করবার সময় অনেকে লেমন-শার্কের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা।
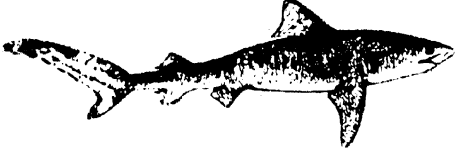
বাঘ হাঙর বা টাইগার শার্ক

নীল-হাঙর গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমুদ্র-যাত্রীদের মধ্যে দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। সে সময় জীবন-তরীতে ভাসমান বহু অসহায় যাত্রী নীল-হাঙরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। হাঙর কর্তৃক পাইকারীহারে মানুষ হত্যার ইতিহাসে সম্ভবত 'নোভা স্কোসিয়া' জাহাজের কাহিনী সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং করুণ। এরকম ব্যাপকভাবে হাঙর কর্তৃক মানুষ হত্যার কাহিনী এর আগে আর শোনা যায় নি।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রণতরী 'নোভা স্কোসিয়া' দক্ষিণ-আফ্রিকার কিছুদূরে রাত্রিতে শত্রুপক্ষের টর্পেডো দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। ফলে ১০০০-এরও বেশি ব্যক্তি প্রাণ হারায় হাঙরের আক্রমণে। পরের দিন সকালবেলা দেখা গেল—লাইফ-বেল্টে বাঁধা বহু পা-হীন মৃতদেহ সমুদ্রের বুকে ভাসছে।

স্যাণ্ড-শার্ক বা বালি-হাঙরও মানুষ খায়। এদের দেহাকৃতি বেশ বড়। সুযোগ পেলেই এরা মানুষকে আক্রমণ করতে তেড়ে যায়।

ম্যাকো হাঙর

হামার হেডেড শার্ক বা হাতুড়ী মাথা হাঙর সুযোগ পেলেই মানুষ আক্রমণ করবার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। হাতুড়ী মাথা হাঙরের মাথাটা দেখায় ঠিক হাতুড়ী বা নৌকার হালের মত। এরা দক্ষ সাঁতারু। সমুদ্রের তীরের

জলের উষ্ণতা হাঙরের আক্রমণাত্মক স্বভাবের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে কি না—এই বিষয়ে গবেষণা করে হাঙর-বিশেষজ্ঞগণ কয়েকটি বিশেষত্ব দেখতে পেয়েছেন। গ্রীষ্মমণ্ডল অঞ্চলের সমুদ্রোপকূলেই হাঙরের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। বিষুবরেখার ৩০ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণস্থিত সমুদ্রেই আক্রমণের কথা সবচেয়ে বেশি শোনা যায়।

অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত হাঙর-বিশেষজ্ঞ ভি এম কোপলসনের মতে—জলের উষ্ণতা যখন ৭০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তারও বেশি থাকে—তখনই হাঙর বেশি আক্রমণ করে থাকে। এই সিদ্ধান্ত অবশ্য সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়। দেখা গেছে—জলের উষ্ণতা ৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তারও কম থাকলে—হাঙর আক্রমণ করে।

হাঙর সামুদ্রিক প্রাণী হলেও—অনেক সময় এরা উজান স্রোতে ভেসে নদীতে চলে আসে। অ্যামাজন, আফ্রিকার সেনেগ্যাল ও জামবেজি, এশিয়ার গঙ্গা, ইউফ্রেটিশ ও টাইগ্রিস, মালয় ও শ্যাম দেশের নদী বোর্নিওর উত্তর সারওয়াক এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট ও ফিৎসরয়
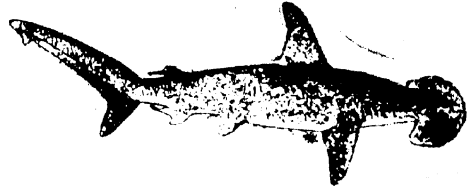
হাতুড়ীমাথা হাঙর বা হামার হেডেড শার্ক

প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের নদীতে হাঙর থাকে। এ ছাড়া পারস্য উপসাগর থেকে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত আহওয়াজ শহরের নিকট করূণ নদীতেও ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে ২৭ জন হাঙরের কবলে পড়েছিল।

সমুদ্রে বা নদীতে হাঁটু-জলে দাঁড়ানো অবস্থায় মানুষ সাধারণত হাঙর কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল হচ্ছে পায়ের গোড়ালী ও পা। কিন্তু এদের সঙ্গে পাল্টা ধস্তাধস্তি করলে—এরা মানুষের হাত এবং শরীরের অন্যান্য অংশেও আক্রমণ করে। হাঙরের কামড়াবার সময় নাকি কোন জ্বালা-যন্ত্রণা টের পাওয়া যায় না। চুপি চুপি এসে কাজ হাসিল করে চলে যায়।

হাঙরের কামড়ে মানুষের শরীরের ধমনী ছিঁড়ে যায় এবং তীরে পৌঁছবার আগেই প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে। আর এজন্যেই এদের আক্রমণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ প্রচুর রক্তপাত ও 'শক'-এর ফলে মারা যায়। এরা যে

টের পাওয়া খুবই কঠিন। মানুষ-খেকো হাঙ্গরের সঙ্গে মানুষ-খেকো বাঘের খুব মিতালী। একবার যদি এরা সমুদ্রের কোন অংশে মানুষ শিকার করে—তবে সেখান সহজে এরা ছেড়ে যেতে চায় না। বছরের পর বছর সেখানেই ঘোরাঘুরি করে শিকারের আশায়।

পেটের চিন্তাতেই এদের সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়। খাওয়ার কোন বিরাম নেই। যখন যা পায়—তখনই তা পেটুকের মত উদরসাৎ করে। তবে রাত্রিতেই বোধ হয় এদের উদরের জ্বালা প্রবল হয়। শিকারের সন্ধানে তখন তীরের কাছাকাছি বিচরণ করে।

দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তির তুলনায় হাঙ্গরের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রখর। শিকারী কুকুরের মত এরা জলের মধ্যে সামান্য গন্ধ শুঁকেও নির্দিষ্ট বস্তুর কাছে ঠিক যেতে পারে। হাঙ্গরের কামড়ের চিহ্ন পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। ক্ষতস্থানে একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতির মত দাগ দেখা যায়। ক্ষত গভীর হলে সেখানেও দাঁতের দাগ থাকে। অনেক সময় ক্ষতের মধ্যে দাঁতের ভাঙ্গা টুক্‌রাও পাওয়া গেছে।

নীল-হাঙ্গর বা ব্লু-শার্ক
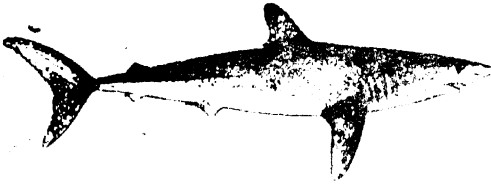
নৌকা, দাঁড়, ভেলা ইত্যাদি যা সামনে পড়ে তাই হাঙ্গর ভীষণ বিক্রমে আক্রমণ করে—কোন বাছ-বিচার নেই। প্রতিপক্ষের আক্রমণে হাঙ্গরের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে—শক্তি থাকা পর্যন্ত সমানে আক্রমণ চালাতে থাকে।

শুধু যে এরা দাঁতের সাহায্যেই শিকারকে ঘায়েল করে তা নয়—হাঙ্গরের গায়ের খসখসে চামড়াও শিকারকে কাবু করতে সাহায্য করে। যখন এরা শিকারকে টেনে নিয়ে যায় তখন খসখসে চামড়ার ঘষায় শিকারের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়। ডুবুরীরা সমুদ্রের তলদেশে হাঙ্গরের আক্রমণের আশঙ্কায় সর্বদাই সতর্ক থাকে। তৎসত্ত্বেও অনেক ডুবুরী এদের মারাত্মক আক্রমণে শোচনীয়ভাবে আহত বা নিহত হয়েছে।

সত্য হোক বা মিথ্যা হোক—আমাদের শোনা আছে সাপ নাকি তার অনিষ্টকারীকে অন্য পাঁচজনের মধ্য থেকে ঠিক খুঁজে বের করে এবং তাকে দংশন করে প্রতিশোধ গ্রহণ ভিড়ের মধ্য থেকে বের করতে পারে। এই বিষয়ে হাঙ্গরের নাকি কোন ভুল হয় না।

হাঙ্গর মানুষের নানা কাজে আসে। পৃথিবীর কোন কোন দেশে হাঙ্গরের মাংস মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হাঙ্গরের শুকনো মাংস কুকুরের খাদ্য হিসাবে বিক্রি হয়। হাঙ্গরের শিরদাঁড়ায় ছড়ি তৈরি হয়। এদের যকৃৎ থেকে তৈরি হয় শিরীষ এবং পাখনা থেকে প্রস্তুত হয় এক প্রকার মূল্যবান তেল।

মহাভারতের গল্প

সুলতা কর

তোমরা নিশ্চয় সবাই মহাভারত পড়েছ। মহাবীর ভীমসেনের গল্প কেই বা না জান। ভীমসেনের মত শরীরের শক্তি কারো ছিল না, সেকথাও জান। ভীমসেন নিজেও জানতেন তাঁর তুল্য শরীরের শক্তি ত্রিভুবনে কারো নেই। দেবতা, মানুষ, যক্ষ, রক্ষ কেউ তাঁর সঙ্গে গদাযুদ্ধে পারবে না। আর এই কথা ভাল করে জানতেন বলেই মনে মনে খুব অহঙ্কার ছিল। এখন আমাদের দেশের ধর্মশাস্ত্রে লেখা আছে দর্পহারী মধুসূদন। অর্থাৎ অহঙ্কার বেশি বাড়লেই শ্রীকৃষ্ণ অহঙ্কার চূর্ণ করবেন। ভীমসেন সব সময় সবার কাছে নিজের শক্তির অহঙ্কার করেন। অহঙ্কারে বুক ফুলিয়ে সবাইকে তাচ্ছিল্য করেন, এ-সব কথাই শ্রীকৃষ্ণ জানতেন আর মনে মনে ভাবতেন ভীমসেনের এই শরীরের শক্তির অহঙ্কার ঠিক সময় এলেই চূর্ণ করতে হবে। কি করে দর্পহারী মধুসূদন ভীমসেনের দর্প চূর্ণ করলেন তাই নিয়ে মহাভারতে একটি মজার গল্প আছে। সেই গল্পটি শোন—

তোমরা জান যে দুর্যোধনের সভায় বসে কূটবুদ্ধি শকুনির সঙ্গে পণ রেখে পাশা খেলে যুধিষ্ঠির যথাসর্বস্ব হারালেন। সমস্ত রাজ্য হারালেন। শেষে পাঁচ ভাই আর দ্রৌপদীকে বনবাস আর অজ্ঞাতবাস করতে হল। রাজবেশ ছেড়ে সামান্য বল্কল পরে দীনদুঃখী বনবাসীদের মত দুর্গম বনে বনে তাঁরা ঘুরতে লাগলেন। এমনি এক সময় কিছুদিন তাঁরা বদরিকাশ্রমে এক ঋষির অতি সুন্দর আশ্রমে আতিথ্য নিয়েছিলেন। সেখানে থাকবার সময় একদিন ভোরে দ্রৌপদী একা একটি নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন একটি সহস্রদল পদ্ম কে জানে কোথা থেকে ভেসে এল। হাজার হাজার ক্রোশ সেই পদ্মের সুগন্ধে ভরে উঠল। পদ্মটি হাতে করে নিয়ে তার গন্ধ শুঁকে দ্রৌপদী বিহ্বল হয়ে গেলেন। জীবনে এমন ফুল তিনি দেখেন নি।

ালোকচিত্র

াসিক
বসুমতী
ান / '৭১

ন্দ্রনাথ
সন্দর্শনে
পণ্ডিতজী

মানা চৌধুরী

লিখন পঠন

—অনিলকুমার মাইতি

কুম্ভকার
—নৃপেন দত্ত
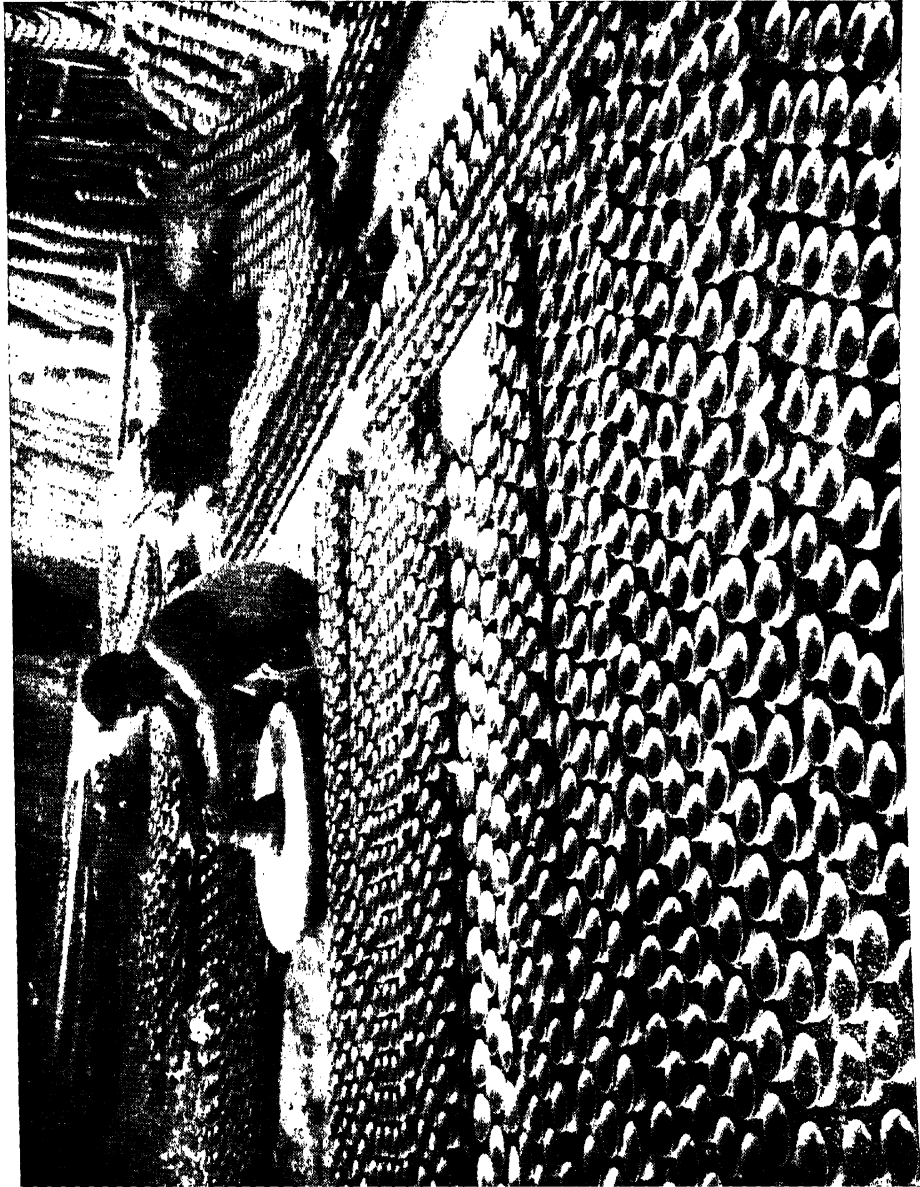
কতক্ষণ বাদে যন্ত্রণা একটু কমল, তখন ভীমসেন স্থির হয়ে উঠে বসলেন। তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হাতজোড় করে বলতে লাগলেন—প্রভু, আপনি নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী দেবতা। আমার শরীরের শক্তির অহঙ্কার চূর্ণ করবার জন্যই বাঁদরের রূপ নিয়েছেন। বুঝতেই পারছেন শরীরের শক্তির অহঙ্কার করবার মত দম্ভ আর আমার নেই। এখন দয়া করে বলুন আপনি কে?

ভীমসেনের স্তুতি শুনে সেই বাঁদর অতি অপূর্ব, কান্তিমান বীর হনুমান মূর্তি ধারণ করে বলতে লাগলেন—ভীমসেন, সত্যই আমি বুড়ো বাঁদর নই। আমি কে বলছি। আমি হলাম শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত বীর হনুমান। সীতা দেবীর বরে অমর। সেজন্যই আমি এতদিন বেঁচে রয়েছি। আমি তোমার বড় ভাই। এই কলার বনে এসে কি ভীষণ বিপদে তুমি পড়েছিলে, তা তুমি নিজেই জান না। ভাগ্যক্রমে আমি এখানে এসে বিশ্রাম করছিলাম। তা না হলে তোমার প্রাণ বাঁচত না, তোমার জীবন সংশয় হয়ে উঠেছিল। শোন তবে বলি তোমার বিপদের কথা।

এই কলাবনের সীমানা পেরোলেই মর্ত্যের সীমানা পার হয়ে স্বর্গে পৌঁছান যায়। কিন্তু বিধির বিধানে কোন মানুষ তার নরদেহ নিয়ে স্বর্গে যেতে পারবে না। যে মুহূর্তে তুমি কলাবনের সীমানা পার হতে সেই মুহূর্তে তোমার মৃত্যু হত। সেই মৃত্যুর হাত থেকে তোমাকে বাঁচালাম। আমি তোমার বড় ভাই, এ ত' আমার কর্তব্য। আর আমি জানি কেন তুমি এখানে এসেছ। দ্রৌপদীর জন্য সহস্রদলপদ্ম নিতে এসেছ। কিন্তু ওই পদ্ম ত' এই পথে পাবে না। এই পথ ছেড়ে ওই যে দক্ষিণ দিকে পথ দেখা যাচ্ছে সেই পথে তুমি যাও। একটু গেলেই যক্ষরাজ কুবেরের রাজপ্রাসাদ। তাঁর রাজপ্রাসাদের সামনের এক সরোবরে রাশি রাশি সহস্রদল পদ্ম ফুটে আছে। কুবেরের যক্ষ, রক্ষ প্রহরীরা ওই সরোবর পাহারা দিচ্ছে। সহস্রদল পদ্ম কাকেও তারা বিনা যুদ্ধে নিতে দেয় না। কিন্তু আমি তোমার পরিচয় যক্ষরাজ কুবেরকে দিয়েছি। তিনি তোমার মত মহামান্য অতিথিকে পেয়ে ধন্য হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন তুমি যত ইচ্ছা সহস্রদলপদ্ম নাও; রক্ষীরা তোমাকে বাধা দেবে না।

বীর হনুমানের কথা শুনে ভীমসেন মাটিতে লুটিয়ে আবার তাঁকে প্রণাম করলেন। বললেন—মহাবীর, আপনি আমার বড় ভাইয়ের উপযুক্ত কর্তব্য পালন করেছেন। ছোট ভায়ের জীবন রক্ষা করেছেন। সহস্রদলপদ্ম জোগাড় করে দিয়েছেন, আর সবচেয়ে যে ভাল কাজ করেছেন,

বীর হনুমান হাসতে হাসতে বললেন—ভাই, তুমি কখনও অহঙ্কার করো না। কি শক্তির অহঙ্কার, কি বিদ্যার অহঙ্কার, কি ধনের অহঙ্কার, সব অহঙ্কারই পাপ। প্রভু শ্রীরামের কৃপা হলে তবেই মানুষ ক্ষমতা পায়। সব সময় এই কথা মনে রেখ। অহঙ্কার ছেড়ে বিনয়ী হয়ো।

এইভাবে মহাবীর ভীমসেনের একদিন শরীরের শক্তির দর্পচূর্ণ হয়েছিল।

মহাভারতে এই মজার গল্পটি লেখা আছে।

বাদল এলো

শুক্লা গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশ পথে হাওয়ার রথে,
বাদল এলো বর্ষপরে,
কমল কুমুদ ঢেউয়ের তালে
লুকিয়ে হাসে হর্ষভরে
মেঘের ফাঁকে কিরণরাশি,
তরুর শিরে ফোটায় হাসি,
চাতক শিশুর আনন্দস্বর
মর্ম সবার স্পর্শ করে॥
কৃষক বধূর ঠোঁটের কোণে
চাপা হাসির লহর খেলে
বিলের বুকে সাঁতার কাটে
পাড়ার যত দুষ্টু ছেলে।
বিজলী ছটায় স্বরূপ ঢেকে,
ফিরছে দেয়া দমক্ হেঁকে,
দেবের আশীষ পল্লীবুকে
ঝরনা ধারায় দিচ্ছে ঢেলে॥
মেঘ বাদলের উৎসবে আজ
বিশ্ব নিখিল আত্মহারা,
আনন্দেরই জোয়ার ছোটে
বাঁধন টুটে পাগলপারা।
বিরহীদের মনের মাঝে,
বীণার তারে বেদন বাজে
উষ্ণ ভুবন শীতল করে
কালো মেঘের নয়নধারা॥

কবি জয়দেব

শ্রীনিরঞ্জন সেন

মধুর গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা কবি জয়দেবের নাম তোমরা সবাই জান।—কেমন?

গ্রামটি! ভক্তকবির পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত মহাতীর্থ স্থান। কবির পবিত্র সত্তার উপলব্ধির উৎস এই পল্লী-নিকেতন!

কথিত আছে,—বঙ্গদেশের মহারাজা আদিশূর পুত্র কামনায় এক যজ্ঞ করেন তাই তিনি (আদিশূর) কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনেন। কবির পিতা ভোজদেব মুখোপাধ্যায় ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণের একজন।

শোন এবার,—

ছোটবেলায় জয়দেব খুব আপনভোলা ছিলেন। হরিনাম করতে করতে গ্রামের পথে-পথে ঘুরে বেড়াতেন। সমগ্র সত্তাই যেন কবির সার্থকতার কাছে যেতে চাইত—ধর্মময় তাঁর পথ। তাঁর ধর্মীয় সত্তার প্রকাশ—নবরূপে,—নবভাবে,—নবভক্তিতে—তাই গ্রামবাসীরা অনেকেই পাগল ভাবতো।

আসলে সবই ভগবানের লীলা তখনকার সেই কিশোর ভক্তের মাধ্যমে।

জয়দেব তখন বেশির ভাগ সময়ে 'কদমখণ্ডী'র ঘাটে ধ্যান করতেন বলে জানা গেছে। ঐ ঘাটের কাছে এক শিবমন্দির আছে। শিবের নাম 'কুশেশ্বরশিব'। 'কদমখণ্ডীর' ঘাট মহা পবিত্র তীর্থস্থান—। হাজার হাজার পুণ্যার্থী নরনারী মকর সংক্রান্তিতে (বা উত্তরায়ণ—সংক্রান্তি) 'কদমখণ্ডীর' ঘাটে স্নান করেন।

ভক্ত জয়দেব রাধামাধবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন অজয়ের বক্ষ থেকে তুলে এনে—অবশ্য এ আদেশ ভক্ত জয়দেবকে দেন স্বপ্নে জগন্নাথ দেব, ঐসঙ্গে আরও আদেশ দেন পদ্মাবতীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে।

ভক্তকবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' লিখে চলেছেন—লিখতে লিখতে—

'স্মরগরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং'···

এই পর্যন্ত লিখে আর পারছেন না লিখতে ভাবসাগরে সাঁতার দিয়েও। শেষে তিনি স্নান করতে বেরিয়ে পড়েন।

সেই সুযোগে শ্রীহরি ভক্তকবি জয়দেবের বেশ ধারণ করে এসে সহস্তে লিখে দেন অসমাপ্ত কলিটি···

···'দেহি পদপল্লব মুদারম্'।—

—তারপরে 'রাধামাধবের' পূজা করেন এবং পদ্মাবতীর (কবিপত্নী) হাতের রান্না ভাত-তরকারী ইত্যাদি খেয়ে চলে আসেন···।

তারপরে সেই থালাতে পদ্মাবতীও খেতে বসে খেয়ে চলেছেন এমন সময়ে অভুক্তস্বামীকে দেখে লজ্জারুণ মুখখানি তুলে বিস্ময়ব্যাকুলা পতিব্রতা নারী স্বামীকে সব ঘটনাই বলে গেলেন

তা হলে তোমরা বুঝে দেখ ভক্তের প্রতি ভগবানের মহিমা।

লক্ষণ সেন তাঁর পঞ্চরত্ন সভার শ্রেষ্ঠরূপে গ্রহণ করেন কবি জয়দেবকে। তিনি প্রমাণ করে দেন তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেবই! কবির কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত সুমধুর। তাঁর সুরেলা মধুঝরা কণ্ঠের জন্য তাঁকে বলা হতো বাংলার কোকিল।

দু'টি ঘটনা শোনা যায়—কি দু'টি ঘটনা তা তোমাদের বলছি শোন। তবে কি জান—অনেকে বিশ্বাস করেন, আবার অনেকে বিশ্বাস করেন না। তবু তোমরা দু'টি ঘটনাই জেনে রাখ। কেমন।

কবি রোজ আঠারো ক্রোশ পথ পেরিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন। কবির বয়স যখন বেশ বাড়ল তখন আর গঙ্গায় স্নান করতে যেতে পারতেন না, তখন তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না। তখন গঙ্গাদেবী ভক্ত জয়দেবকে স্বপ্ন দেন আমি অজয় যেয়ে মিশব।

ভক্তের আকুলতায় ভগবান সাড়া দেন—এ তো তোমরা জান।

না কি বল?

ঐ তো গেল একটি ঘটনা—আর একটি ঘটনাও শোন,—

কবি জয়দেবের মা বামা দেবীও নাকি গঙ্গায় স্নান করতেন। তিনি ছিলেন পুণ্যবতী নারী। গঙ্গার পুণ্য সলিলে স্নান না করলে সবই তাঁর বৃথা মনে হতো! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বামা দেবীরও গঙ্গাস্নান বন্ধ হলো!

তাই মাতৃভক্ত জয়দেব গঙ্গার ধারা অজয়ে এনে ফেলে ছিলেন।

বর্তমানে জয়দেবের মন্দিরে যে রাধাবিনোদের মূর্তি আছে তা জয়দেব প্রতিষ্ঠিত নয় বলে পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন,—বর্তমানে পূজিত মূর্তি শ্যাম-রূপার গড় থেকে আনা! ঐ সঙ্গে তাঁরা আরও বলেছেন,—

বর্তমান মন্দিরটিও আগেকার নয়। বর্তমান মন্দিরটি বর্ধমানের মহারাণী নৈরাণী দেবী তৈরি করান আনুমানিক ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে।

ভক্ত জয়দেব প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের মূর্তির কি হলো তাই বলছি শোন, পণ্ডিতগণ যা বলেছেন।—

কবি জয়দেব ও পদ্মাবতী দু'জনের শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র, শ্রীবৃন্দাবনে আসবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু রাধামাধবের ব্রজ আসতে ওঁরা পারেন নি—তা ছাড়া রাধামাধবকে ছেড়ে থাকতেও পারবেন না।

তাই রাধামাধব স্বপ্নে ওঁদের বলেন—আমি শালগ্রামশিলা হয়ে যাব তোমাদের সঙ্গে!

তারপরে জয়দেব পদ্মাবতীর সঙ্গে শালগ্রামশিলা হয়ে কেন্দুবিল্ব ত্যাগ করেছিলেন জয়দেব প্রতিষ্ঠিত রাধামাধব···!

ওপরে ঘটনাটিও না কি কিংবদন্তী—এও জেনেছি নানান আলোচনা পড়ে।

কবি জয়দেব আজ আর নেই। আছে তাঁর পবিত্র

স্মৃতি নিয়ে মহা তীর্থস্থান হয়ে কেন্দুবিল্ব। আছে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর গীতগোবিন্দ।

গীতগোবিন্দ এখন অনেক ভাষাতেই অনূদিত।

তোমরা বড় হয়ে কেন্দুবিল্ব যেও। প্রতি বছর মকর-সংক্রান্তিতে (উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি) মেলা বসে—

মস্তবড় মেলা। বহুদেশ থেকে বহু তীর্থযাত্রী আসেন। ব্রাহ্ম মুহূর্তে তাঁরা স্নান করেন কদমখণ্ডীর ঘাটে। তোমরাও ঐ সময় যাবার চেষ্টা করবে এবং কদমখণ্ডীর ঘাটের পুণ্য সলিল স্নান করবে। ভক্ত কবি জয়দেবের পবিত্র লীলা-নিকেতন ও তাঁর মহা সৃষ্টির স্পর্শে তোমাদের তীর্থ পরিক্রমা সার্থক হয়ে উঠবে নিশ্চয়।
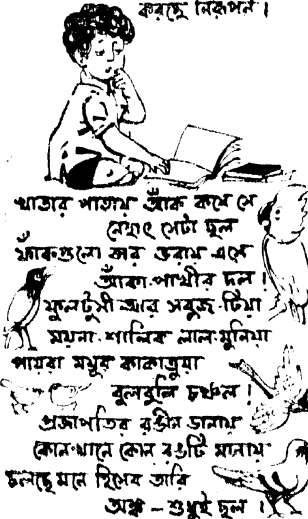
এগিয়ে যাও

(একটি উড়িয়া রূপকথা)

ছবি বসু

এক গ্রামে এক গরীব কাঠুরে বাস করত। সে সারাদিন বনে কাঠ কাটত আর সন্ধ্যার সময় সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই তাকে বনে যেতে হ'ত কাঠ কাটবার জন্য। বেচারাকে এজন্য অনেক কষ্ট সহ্য করতে হ'ত। প্রচণ্ড শীতে তার শরীরে কাঁপুনি ধরত। প্রখর রোদে মাথার চাঁদি ফেটে যাবার মত হ'ত আবার সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি-কাশিতে ভুগত। যা সামান্য উপার্জন করত তাতে তার সংসার চলত না। দু'বেলা দু'মুঠো ভাতও সে পেটপুরে খেতে পেত না। খাটতে খাটতে সে বড় কাহিল হয়ে পড়ল। শরীরে হাড় ক'খানা ছাড়া আর কিছুই রইল না।

একদিন কাঠুরে তার কুড়ুলখানা কাঁধে নিয়ে বনের দিকে চলেছে। পথে দেখা হ'ল এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। কাঠুরে তাঁকে প্রণাম করল।

তার অবস্থা দেখে সন্ন্যাসীর মনে দয়া হ'ল। তিনি তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, বাবা, আরও এগিয়ে যাও।

কাঠুরে ভাবল, সন্ন্যাসী কেন আমাকে আরও এগিয়ে যেতে বললেন? আচ্ছা, ওঁর কথামত এগিয়ে গিয়ে দেখি কি হয়।

এই ভেবে সে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেখানে ছিল এক বিশাল চন্দন বন। মনের আনন্দে কাঠুরে চন্দন কাঠ কেটে বাজারে এনে বিক্রি করল। সাধারণ কাঠ অপেক্ষা চন্দন কাঠের দাম বেশি। তাই সেদিন সে অনেক টাকা উপার্জন করল, এর পর সে প্রত্যেকদিন বাজারে চন্দন কাঠ বিক্রি করতে লাগল। ফলে তার সংসারে আর অভাব রইল না।

একদিন চন্দন বনে গিয়ে যেই সে কাঠ কাটতে যাবে অমনি তার মনে পড়ে গেল সন্ন্যাসীর কথা—বাবা, আরও এগিয়ে যাও।

সে কাঠ না কেটে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেল। হঠাৎ এক জায়গায় দেখল এক প্রকাণ্ড তামার খনি। কাঠুরের আনন্দ তো আর ধরে না। কোমরে বাঁধা চাদরটায় যত পারল তামা বেঁধে এনে বাজারে বিক্রি করল এবার আরও বেশি টাকা রোজগার হ'ল।

এমনিভাবে কিছুদিন গেল। হঠাৎ একদিন আবার তার সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। বনের ভেতর সে আরও

রূপার খনি। কাঠুরের মন খুশিতে ভরে গেল, বাজারে রূপা বিক্রি করে সে অনেক টাকা উপার্জন করল।

এইভাবে কিছুদিন যাবার পর আবার সন্ন্যাসীর কথা তার মনে পড়ল—বাবা, আরও এগিয়ে যাও।

সে বনের মধ্যে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেল। সামনে পড়ল এক সোনার খনি। বুঝতেই তো পারছ সোনা বিক্রি করে সে মস্ত বড়লোক হয়ে গেল। সে দেশে তার মত ধনী আর কেউ ছিল না। কাঠুরে ভাবল, আমার তো আর অভাব নেই। এখন বনে না গেলেও চলে।

কিন্তু সন্ন্যাসীর কথা তার মনে পড়ে গেল। তাই সে প্রত্যেকদিন বনের মধ্যে কিছুদূর এগিয়ে যায় আর একে একে তার সামনে পড়ে হীরা, নীলা, মণি-মাণিক্যের খনি। শেষে সে এমন ধনশালী হ'ল যে সকলে তাকে হিংসা করতে লাগল।

উল্টোরাজার দেশে

গৌর মোদক

কালকে আমি গিয়েছিলাম উল্টোরাজার দেশে,
তেরো নদীর ঘাট পেরিয়ে, সাত সমুদ্রের শেষে।
গোবর গণেশ রাজা সেথায় মন্ত্রী হাঁদারাম,
রাজা যোগায় প্রজাদের খাজনা অবিরাম।
জিনিসপত্তর বেচে সেথায় পয়সা দিয়ে লোকে,
ওষুধ কভু খায় না তারা পাছে রোগে ভোগে।
হাঁটতে গেলে টিকিট লাগে কাশতে গেলে ট্যাক্স,
দিনের বেলায় জ্বালায় লোকে হাজার পেট্রোম্যাক্স।
সারা বছর সেথায় বন্ধ থাকে অফিস আদালত,
পুলিশকে চোর খুঁজে বেড়ায় চোরেরা সবাই সৎ।
চুরি করলে হয় না সাজা, সাধুরা যায় জেলে,
স্কুলে যায় না ছেলেরা সেথায় বেড়ায় কেবল খেলে।
গণ্ডগোলে প্রথম হলে, মেলে দামী পুরস্কার,
করলে পড়া ছেলেরা সব কেবল খায় মার।
উল্টো দেশে উল্টো ব্যাপার চলছে দিনরাত,
দেখতে পাবে তুমিও ভাই মুদলে আঁখিপাত।

পরিসংখ্যানের আলোকে সোভিয়েট নারী

জনসংখ্যার সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে মোট নারীসংখ্যা ১২ কোটি ১৬ লক্ষ। সাম্প্রতিক লোক-গণনার তথ্যাদি হইতে জানা যায়—রাশিয়ার সুপ্রিম সোভিয়েটে ৩৯০ জন নারী ডেপুটি আছেন। অর্থাৎ সুপ্রিম সোভিয়েটের মোট ডেপুটির শতকরা তিরিশ জন মহিলা। এই সূত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে বৃটিশ পার্লামেন্টে মোট মহিলা-সদস্যার সংখ্যা ৩২, যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে ১৭ এবং ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ ও সেনেটে ১৩। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ বিভাগীয় দপ্তর, কমিটী, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে অন্যূন ৬৯,৬০০০ মহিলা কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিতা আছেন। বিভিন্ন ইন্‌স্টিটিউট, গবেষণাগার, কল-কারখানা, থিয়েটার ও সিনেমা হাউস ও বিক্রয়কেন্দ্রের ডিরেক্টর পদে এবং রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারের চেয়ারম্যানের পদে অর্ধলক্ষেরও অধিক মহিলা রহিয়াছেন। প্রায় ২২০ জন মহিলা ভূতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ আসনে আছেন। সেখানে দশ হাজার মহিলা আইনজীবী, মোক্তার ও জজ রহিয়াছেন। জাতীয় অর্থনীতিতে রাশিয়ার মেয়েরা কার্যকরী অংশগ্রহণ করিতেছেন। দশ লক্ষাধিক নারী কৃষি-বিশেষজ্ঞ রহিয়াছেন সেখানে, নারী পশু-বিশেষজ্ঞ ও পশু-সার্জেন রহিয়াছেন ৬৯,৬০০ জন। উদ্ভিদ্‌বিদ রহিয়াছেন ৬৭,৭০০ জন। শুধুমাত্র সোভিয়েট রসায়নশিল্পে ২২৬,৬০০ জন মহিলাকর্মী আছেন। শিক্ষকতার ক্ষেত্রেই মেয়েদের স্থান সর্বাগ্রগণ্য। জনশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট আছেন ৩৬ লক্ষ ৭ হাজার মহিলা। সোভিয়েট রাশিয়ায় বিদুষী, অধ্যাপিকা, এম এস সি ও বিজ্ঞানে ডক্টর মহিলার সংখ্যা ৩১,০০০। মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৪৩ ভাগ—১০ লক্ষ ৪২০০০ তরুণী বর্তমানে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করিতেছেন। সোভিয়েট রাশিয়ায় মহিলা ডাক্তারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিশ্বের অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। ৪৪৮,০০০ জন মহিলা চিকিৎসক আছেন সেখানে, মোট ডাক্তারদের ইঁহারা শতকরা ৭৫ ভাগ। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ২৫,৬০০ জন লেখিকা, মহিলা-সাংবাদিক, প্রেস ও রেডিও-কর্মী আছেন। মহিলা-শিল্পী ও মহিলা-স্থপতি আছেন ১৫,৬০০ জন। পরিসংখ্যান অনুসারে সোভিয়েট মেয়েদের বিবাহের গড় বয়স ২২ বৎসর হইতে ২৪ বৎসর। মেয়েরা কেহই যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিবার পূর্বে বিবাহের কথা ভাবে না। যুদ্ধোত্তর রাশিয়ায় ১৬,৭১৫,০০০টি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বর্তমানে ৬৯,০০০ জন রাশিয়ান মেয়ে দশটি সন্তানের জননী। সন্তান গড়িয়া তুলিবার জন্য তাঁহারা রাষ্ট্রীয় সাহায্য পান। সাধারণত রাশিয়ার মেয়েরা একটি বা দু'টি সন্তানের জননী। তিনটি সন্তানও অল্পই দেখা যায়। রাশিয়ার পরিবারের সাধারণ আকার বর্তমানে শহরে ৩'৫ জন ও মফস্বলে ৩'৯ জন। রাশিয়ান মেয়েদের সাধারণ আয়ু ৭০-৭৫ বৎসর। ১৬,২৭৬ জন মহিলা আছেন যাঁহাদের বয়স ১০০-১০৪ বৎসর।

নতুন ফরমুলার

সানলাইটে

আরও ঝলমলে কাচা হয়!

নতুন ফরমুলার সানলাইট — কী চমৎকার নতুন মোড়ক, কী সুন্দর নতুন গড়ন! আর সেইসঙ্গে আরও ঝলমলে ক'রে কাচার কী আশ্চর্য্য নতুন শক্তি! প্রতি ধোপ কাচবার পরে দেখবেন আপনার কাপড়জামা **আরও ধবধবে, আরও ঝলমলে হয়ে উঠছে!**

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

S. 52-140 BG

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নমিতা চক্রবর্তী

না, না। লিলি কষ্ট পাবে কেন? তপতী কি কষ্ট পেতো উল্টো ব্যাপারটা হলে? পেতো না? চমকে গেল তপতী। বুক ফেটে যেত তার, পড়া হোত না, কিচ্ছু না। কিন্তু লিলি কি ভাস্করকে ভালবাসে? ভালবাসে তার মত? ভাস্কর কি লিলির কাছেও দিনের আলো আর রাতের আকাশ হয়ে গিয়েছে? মুছে যাবে সব আলো, ঘুচে যাবে আকাশের সীমাহীনতা! তবে? তা হলে কি হবে? ভয়ে বড় বড় চোখ করে তাকাল তপতী।

—'মীরা! জয়াদি'কে কি বলেছে প্রবীর?'

—'কে জানে। দিদি বলল—মীরু, ছুটির অ্যাপ্লিকেশন কর। বন্ধুর বিয়ে যে ভাস্করের সঙ্গে তাতে সন্দেহ নেই। সব জায়গায় তপতীর বডি-গার্ড ভাস্কর মিত্র।'

প্রবীর কিছু বলে নি। হয় তো সে জানেই না লিলির মনের কোন খবর। ভাবল তপতী।

—'লিলি কি করছে রে?'

—'ও মা! জানিস না তুই? লিলি বোস? মস্ত একটা সাংস্কৃতিক কাজ ধরেছে। আর্ট একজিবিশন। ঠোঁট বাঁকালো মীরা।

—'বা! ওরকম করছিস কেন? আর্ট একজিবিশন তো ভাল।'

—'ছবে। তবে কি জানিস ওসব বড়লোকদেরই মানায়। ফুল, ছবি, পাখি, টাকা, বাড়ি, গাড়ি—দেখছিস কেমন মিল খেস ছন্দে?'

তপতী দুঃখিত হল একটু। মীরার সর্বদা এক কথা। কিছু বলবার আগেই ভয় পেতে হয়—বুঝি এক্ষুণি গরীব আর টাকার কথা উঠে পড়বে।

বেশিক্ষণ মন খারাপ করবার সময় পেল না তপতী। মীরার উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাদ্রের শেষবেলার আকাশ খোলা জানালার পথে হাতছানি দিল তাকে। ঝাপসা দু'একটা তারা, আলোর ভয়ে আকাশের নীলে গা ডুবিয়ে চেয়ে আছে একফালি চাঁদ। কখন ভালোবাসল তপতী ভাস্করকে? আর ভাস্কর?

মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে ঘুরছিল তপতী, মীরা আর জয়ন্তী। চমৎকার ডালমুট মার্কেটের, ফুলের দোকানগুলি অপূর্ব। আর ফলের দোকানও কি কম দ্রষ্টব্য নাকি? তাজা তরতরে আপেল—লালে ফেটে পড়ছে গাল, আঙুরের টসটসে রূপ! কিনবে? দূর! ও বুঝি খেতে ভাল! তা ছাড়া কি হবে কিনে—ওদের সঙ্গচ্যুত করে? একসঙ্গে আছে বলেই না এত বাহার। সুতরাং ডালমুট মুখে পুরতে পুরতে, দেশভ্রমণ সারছিল তিন মেয়ে মার্কেট ঘুরে।

—'তপতী মীরা! মরেছি।' জয়ন্তীর আর্তনাদে চমকে উঠল কাশ্মীর-গালিচার কারুকার্য দর্শনে মগ্ন দুই সখী।

—'কি হল?' কথাটা ভাল করে উচ্চারণ করবার আগেই বোনের হাত ধরে পাশের দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ল জয়া। হতভম্ব তপতী দেখল—সামনে দাঁড়িয়ে লিলি। লিলিকে দেখে ভয় কেন? প্রবীর ওর দাদা তাই? তাই, লিলিকে ভয় পায় জয়াদি'! আচ্ছা মেয়ে জয়ন্তী! লিলি ওকে খেয়ে ফেলবে নাকি? বেশ ভাল, মিশুক মেয়ে লিলি। ভয়ানক হাসি পেল তপতীর। মুখে কি বড় বড় কথা! যেন ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ জন্মেছে বাংলা দেশে ভুল করে। এদিকে হবু ননদিনীকে দেখে পালাবার তাড়া দেখ!

—'কি কিনলে তপতী?' লিলি জিজ্ঞেস করল।

—'ডালমুট।'

—'ডালমুট কিনতে এতদূর? আর কিছু কেনো। সুন্দর এই ক্রেনটা, কি বল?'

—'ভারি সুন্দর।'

—'বেশ। আমিই তোমায় প্রেজেণ্ট করলাম এটা।'

—'উপলক্ষ?'

—'বানিয়ে নাও একটা। ধরে নাও আজ আমার জন্মদিন।'

—'জন্মদিনে তো উপহার পাবে! দেবার কথা নয়।'

— জানো না, আমি আর জন্মে মহারাণী ছিলাম? রাজকোষ খুলে যেত আমার জন্মদিনের দাক্ষিণ্যে। এবার হয়েছি, লিলি বোস, প্রজার বদলে বন্ধুদের উপহার দেই এটা-ওটা।'

লিলির কথায় একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল তপতী। ইস্! কি ধার, কি ঝলক!

—'চলো আমাদের বাড়ি।'

—'তোমাদের বাড়ি?'

—'আপত্তি আছে?'

—'বা! আপত্তি কিসের'? পাশের দোকানে উঁকি দিল

— 'এই মীরা। জয়াদি'। আমি লিলির সঙ্গে যাচ্ছি।'

তপতীকে নিয়ে লিলি গাড়িতে উঠে বসল. গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—'ওদের সঙ্গে তোমার এত বন্ধুত্ব কিসের তপতী ? ওরা আর তুমি কি এক স্তরের ?'

—'তুমি বুঝি আর্কিওলজিস্ট ? বুঝেছ পরীক্ষা করে আমি প্রাগৈতিহাসিক আর জয়াদি', মীরা মধ্যযুগীয় ?'

হেসে ফেলল লিলি—'দেখতে নিপাট ভাল, দুষ্টুতো কম নও তুমি। মহাবীর গাড়ি তোল।'

নিজের ঘরে তপতীকে নিয়ে এল লিলি। পাখা, ফ্রিজিডেয়ারের ঠাণ্ডা লেমনস্কোয়াস।

—'লিলি !' একটু পানীর চোখে ডাকল তপতী।

—'জয়াদি' তোমার দাদার বৌ হবে, এ-কথা তুমি সহ্য করতে পারছ না, কেমন ?'

চুপ করে রইল লিলি।

—'কেন পার না লিলি ? - ওরা গরীব বলে ?'

আশ্চর্য এবার অসহিষ্ণু হল লিলি। ভাস্করও ঠিক এই প্রশ্নই করে। যেন দারিদ্র্য ছাড়া আর কোন ত্রুটিই নেই জয়ন্তীর। গম্ভীর মুখে বলল—'গরীব তো বটেই, কিন্তু দাদার বৌ হবার মত কি যোগ্যতা আছে ওর বল ? কালো, রোগা, ছবি বিক্রি করে খায়, কালচার নেই, কানেকসন নেই, সম্মানবোধও নেই।'

হাসল তপতী।—'তোমার কথাগুলো যদি একটু অদল বদল করে নাও, দেখবে জয়াদি'র রূপান্তর ঘটেছে। বল—তন্বী, শ্যামা, শিল্পী নিজের পরিচয় বহন করছে ও নিজে, আর অসম্মান ওকে স্পর্শ করতে পারে না বলেই সম্মান যাবার ভয়ে বিপর্যস্ত নয়। লিলি ! আমরা মনকে যখন বিরূপ করি ভাই, কারোর কোন গুণ চোখে পড়ে না। তুমি জয়াদি'র উপর বিরূপ, তাই ওর সব-কিছু তোমার কাছে কুৎসিত হয়ে গিয়েছে। না হলে দেখতে এক টাকার অভাব ছাড়া ওদের মধ্যে আর কোন গুণের অভাব নেই। তুমি যদি ভেবে দেখ যে, এই জন্যই শুধু, তুমি একটি ভাল মেয়েকে মেনে নিতে পারছো না, তা' হলে কিন্তু তোমায় নিজের কাছেই লজ্জা পেতে হবে।'

লিলি স্তব্ধ হয়ে রইল। সত্যি কি তপতীর কথাগুলো ? শুধু গরীব বলেই তার এত বিদ্বেষ জয়ন্তীর প্রতি ? দারিদ্র্য লিলি ভয় করে, ঘৃণা করে দারিদ্র্যকে, কিন্তু তা বলে নিশ্চয়ই সে এত ভেইন নয় যে, কেবল অর্থকেই সবার উপরে স্থান দেবে। তা যদি হোত, চব্বিশ বছরেও পিতৃভবন আলো করে থাকত না। কতজন ধরা দিচ্ছে ঐশ্বর্য আর উপাধি নিয়ে, লিলি তবে ধরা দেয় না কেন ? ধন-মানের চেয়ে তার কাছেও কি বড় মানুষ নয় ? ধন লিলি চায়, মানও, কিন্তু মানুষ বাদ দিয়ে নয়।

—'লিলি !' লিলির হাত ধরল তপতী—'রাগ করলে আমার উপর ?'

একটু হেসে তপতীর হাত নেড়ে দিল লিলি। মনে মনে বলল—তুমি এমন মেয়ে তপতী যে, তোমার উপর রাগ করা যায় না।

এনে, বিলেত পাঠিয়ে দিলেন। কত কেলেঙ্কারী সেখানে। বাবার দু' লাখ টাকা তো গেছেই, ভাস্কর না থাকলে জেল হত দাদার। এখানে এসে ছ'মাস চুপচাপ ছিল ; আবার শুরু করেছে। জেনো, বিয়ে করলেও বিবাহিত-জীবন কখনো দাদা বেশিদিন বরদাস্ত করতে পারবে না। আবার হবে নূতন কেলেঙ্কারী। কি যে হবে, ভাবতে পারি না ভাই। আমার মাকে দেখলে মায়া হবে তোমার। প্রায় পাগল হয়ে উঠেছেন দাদার জ্বালায়।'

—'এখন তো ভালই আছেন, কাজকর্ম শুরু করেছেন।'

—'হ্যাঁ। চাকরী করবে গোঁ ধরেছিল, মান বাঁচাতে বাবা কানেরিয়ার সঙ্গে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।'

—'তুমি জয়াদি'র সঙ্গে আলাপ করবে লিলি ?'

—'না।'

—'না, কেন ? ভয় করে।'

—'বা ! ভয় কিসের ?'

—'ওরা নাকি কথায় কথায় অভিশাপ দেয়, যা তা কথা উচ্চারণ করে।'

—'কিচ্ছু জান না তুমি লিলি। যত বাজে ধারণা করে রেখেছ। সব ভদ্র শিক্ষিত মেয়ে। খোঁজ করলে মিলবে তোমার পিতৃ-পিতামহের পরিচয় ওদেরই সমাজে। একবার তোমার জর্জেট সিফন ছেড়ে নেমে এস দেখি, চল আমার সঙ্গে—মিলে যাবে একেবারে জয়াদি'র ফর্সা বোন রুণুর সঙ্গে।

আরো হয় তো চলত কথা। লিলির মা এসে ঢুকলেন ঘরে। গৌরবরণ, মহিলার সব মর্যাদা মুখে-চোখে।

—'তপতী এলো তোর সঙ্গে ?'

—'হ্যাঁ মা। মার্কেট হতে ধরে এনেছি।'

—'বেশ করেছিস।'

মস্তবড় কেক আনালেন লিলির মা।

—'উঃ ! এত খেতে পারবো না মাসীমা।'

—'খাও। আজ লিলির জন্মদিন, কাউকে বলতে দিল না। তুমি এলে, বড় ভাল লাগল।'

মা চলে যেতে, লিলির দিকে চাইলো তপতী।

—'সত্যি তোমার জন্মদিন ?' আঙুলে ছিল মুক্তার আংটি, পরিয়ে দিল লিলির অনামিকায়। বাধা দেবার সময় পেল না লিলি।

—'কি পাগলামি করছ তপতী ?'

—পাগলামি কেন ভাই ? মেয়েরা কত কি পাতায়, জন্মদিনে আংটি দিয়ে, বোন পাতালাম তোমার সঙ্গে। আলিঙ্গনে বদ্ধ হল দু'টি তরুণ দেহ।

তপতীকে পৌঁছে দেবার পথে আবার কথা তুলল লিলি—'তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি তপতী, জয়ন্তী, আফটার অল—একটি মেয়ে। তাকে বিয়ে করা চলে দাদার। কিন্তু জয়ন্তীর কি ভয় নেই ? কোন সাহসে সব জেনে বিপদের মুখে পা বাড়িয়েছে ও ? এতে কি মনে করা অন্যায় যে জয়ন্তী অ্যাম্বিসাস্ ? দাদার টাকার

—'তবে ?'

—'তবে আবার কি ? দেখছ না জয়াদি' ভালবেসেছে তোমার দাদাকে তাই তো যা সবাই ভাববে বলে ভয় পায়, নিজে সে কথা সে বেড়াচ্ছে। ওর ভালবাসাকে লোকের বাঁকাচোখের সামনে আনতে চায় না।'

—'ভালবাসা ? দাদাকে ভালবেসে কি হবে ? কোনদিন দাদা ন ভালবাসার মর্যাদা দিতে পারবে ? দু'দিনের রামধনু, তারপর পড়ে থাকবে ঘোলাটে আকাশ। ইচ্ছে করে নিজেকে ঠকাতে দেয় কন জয়ন্তী ?'

বোন পাতালাম তোমার সংগে। আলিঙ্গনে···

—'না, লিলি না। ভালবেসে কেউ কখনো ঠকে না। ওর মন আলো হয়ে গেছে। কাছে গেলে টের পেতে, জয়াদি'কে ছুঁলে আনন্দের শক লাগে।'

হাসল লিলি।—'কান্না নেই শক লেগে। কান্নার সমুদ্র রয়েছে সামনে, সে আর শক দেয় না। ডুবিয়ে মারে।'

—'তাতেও ভয় নেই লিলি—It is better to love and lost. Than never to have love at all'.

লিলি স্তব্ধ হল।

প্রেমহীন হৃদয়ের চেয়ে ভাল প্রিয়কে-হারানো জীবন, কিন্তু প্রেম বা প্রিয়তম কথাটাই যে ব্যাক ডেটেড। যখন ইংলণ্ডে রাজত্ব করতেন জর্জ দি ফিফথ, এদেশের মেয়েরা কনুই-ঢাকা ব্লাউজ আর উঁচু হিল জুতো পরে কলেজে যেত, তখন খুব প্রেমে পড়ত মেয়েরা—ছেলেরাও। শোকের জলে ডুবছে, বিয়ে করে নি সমস্ত জীবনে এমন ঘটনা মোটেই বিরল ছিল না। এখন ? এই বিশ শতকের প্রায় শেষের ধাপে পা দিয়ে কি সেণ্টিমেণ্টালিটির স্থান আছে না সময় আছে মানুষের জীবনে ? একমাত্র বিশ্বাস্য—গতি। সেই গতির সঙ্গে পা মেলাতে যে না পারবে, মহাকালের রথ তাকে চূর্ণ করে দেবে। একটা মহাপ্রলয় বয়ে যাচ্ছে না পৃথিবীর উপর দিয়ে ? আণবিক মহাস্ত্র, ক্ষুধার মিছিল, প্রতিবাদের বদলে বুলেট। এর মধ্যে ভালবাসার সময় কই ? বরং মনকে ডুবিয়ে দেওয়া চলে, ভুলে থাকা যায় বাজনার গোলমালে, নাচের ঘূর্ণিতে আর সফেন পানীয়।

ভালবাসা কি তবে মরে গেছে ? মরবে কেন ? সব তরুণ-তরুণী—দেবকী, রমলা, বেণু, বঙ্কত গৌতম সবাই তো পেতেছে ভালবাসার খেলা। লিলি ? লিলিও বৈ কি। নানা রং-এ, নানা কথায়, বেড়ে চলেছে খেলা। শান্তি জাগে কিন্তু গল-পাণি তুলবার কথা ভাবতে সাহস নেই কারোর। তারপরেই সে ঘর, জীবন, বান্ধব ; ওপারে আছে ঠকবার ভয় হারাবার—হারবার গ্লানি।

ভাস্কর এসে যোগ দিয়েছিল এই খেলাতেই, জুটি করেছিল লিলিকে। নেশা যখন ধরবে ধরবে, তখন চোখে পড়ল আশ্চর্য ব্যাপার। আছে তো, এখনো বেঁচে আছে সত্যিকারের যূথীর লতা শতগুচ্ছ হয়ে। অফুরন্ত তাদের প্রাণ-প্রাচুর্য। তাতে ভরে দেয় ফুলে, মন ভরে গন্ধে। ভাস্কর পালিয়ে এল। পালিয়ে এল বিশ শতকের পশ্চিমী হেউয়ের দোলায় যেখানে দুলতে লেগেছে সবুর,—সেই আধুনিকতম যুগ হতে। পালিয়ে বাঁচল সে। নাচের নেশায় লিলি লক্ষ্য করল না তার জুটি হারিয়ে গেল, পালিয়ে গেল। কাড়া দাঁড়া আর বিলেতি সরবতের বুদ্বুদে ঝাপসা হয়ে গেল ভাস্করের মুখ। চোখ ফেরাতে তাকে খুঁজতে সময় পেল না লিলি।

ভাস্কর খুঁজে পেল একটি বিশ্বস্ত হৃদয় মার্জিত বুদ্ধি—সজ্জ-গৃহ অনুরাগের কুঁড়ি। তাতেই ভর দিয়ে মহাকাশে উড়লো ঈগল গৃহ-নীড়ের খোঁজে।

কাজ, কাজ, কাজ। কাজে ডুবে গেল ভাস্কর। ক্লাবে যাচ্ছে কদাচিৎ—মাসে বোধ হয় দু'দিনও নয়। সম্প্রতি দিল্লীর বড় কাজ পাওয়া গেল। সুনাম বাড়ল মিত্র কোম্পানীর !

সুমোহন মিত্র চাইলেন স্ত্রীর দিকে।

—'দেখছ ভাস্করের কাণ্ড ?'

চোখ টান করে রইল সুকল্যাণী। ভাবটা—এ আর বেশি কথা কি। তুমি বরং দেখ, কেমন ছেলে আমার !

—'এবার বিয়ের যোগাড় করা যাক। আজই তুমি ফোন কর মিনুকে।' স্বামী বললেন।

—'এম-এ পরীক্ষা শেষ হোক রূপালীর।' উলের বলটা সরিয়ে রেখে উত্তর দিল সুকল্যাণী।

—'আর পড়ে দরকার কি ?'

—'তোমার ছেলের ইচ্ছেই তো বেশি। রোজ লাইব্রেরীতে নিয়ে যাচ্ছে।'

—'হতে পারে—হতে পারে। আমিও তোমার বি-এ পরীক্ষার জন্য কি জেদ ধরেছিলাম মনে নেই?'

—'নেই আবার মনে!' সেদিনের স্মৃতি একটুক্ষণ উপভোগ করলেন পরিণত বয়সের দম্পতি।

—'ওরা এ বাড়িতেই থাকবে তো।' নীরবতা ভাঙলেন সুমোহন।

—'কি যে বল! যাবে কোথায় আবার? যে হাবলা মেয়ে এপাব! বই আর লেখার ছাড়া জানে না কি কিছু?'

—'এখন বুঝি জানছে কেবল ভাস্করকে?' খুশির হাসি হাসলেন স্বামী-স্ত্রী।

—'কত দেরি পরীক্ষার?'

—'দেরি কই নভেম্বরে তো।'

—'আজ তোদের কিসের মিটিং ছিল খোকা?'

—'জেনারেল। বাবা বলেন নি?'

চেয়ারে এসে বসল গেঞ্জি-পাজামার ঘরোয়া ভাস্কর। মুখে পুরে দিল আস্ত ডিম।

—'দেখ, ছেলের কাণ্ড! গলায় লাগবে না? খুব খিদে পেয়েছে বুঝি?'

—'খুব? ভীষণ।'

—'তপতীর পরীক্ষা কবে?' জিজ্ঞেস করলেন সুমোহন মিত্র।

—'ছাব্বিশে নভেম্বর।'

—'খাটছে-টাটছে তো, না সখের পড়া?'

—'নিজে তো খাটছেই, খাটিয়ে মারছে আমাকেও। তোমার বন্ধু—সেই রাগী দাশগুপ্ত? তাঁর খোসামোদ করতে হল বইয়ের জন্য। রাজী কি হন? নেহাৎ তোমার রেফারেন্স ঠেলতে পারে না তাই। প্রথম প্রথম পাহারা থাকত ঘরে। এখন অবশ্য খুব খুশি, নিজেই নোট দিচ্ছেন তপতীকে। মা আরেকটা আলু দাও।'

—'ওকে নিয়ে আসিস একদিন।' মা বলল।

—'ও রে বাবা! কোথাও যাবার কথা বললে মারতে আসে। সেদিন বললাম—মেট্রোতে 'গন উইথ দি উইণ্ড' অনেকদিন পর আবার এসেছে, চল দেখে আসি। চোখ-মুখ কুঁচকে একেবারে শিম্পাঞ্জীর মত ভেংচি কাটল।'

—'দাঁড়া! বলব তোর এসব কথা তপতীকে।'

—'অনায়াসে। আমি সামনেই বলেছি।'

স্বামী চোখ দিয়ে উৎসাহ দিলেন স্ত্রীকে আরো কিছু জিজ্ঞেস করতে। সুকল্যাণী প্রশ্ন করল—'রাগ করে নি?'

—'রাগ? যা রাগী মেয়ে—'

তপতীর রাগের বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাস্করের হুঁশ হল—অনেকটাই বলেছে সে। ইস্! কি ভাবলেন বাবা! ইঃ! হাসছেন দু'জনেই—

—'চা দাও, চা দাও শীগ্‌গির, গলা বন্ধ হয়ে গেছে।'

গোলমাল করে উঠলো ভাস্কর।

প্রবীর কিন্তু সত্যি শান্ত, সংযত, ভদ্র হয়েছে। পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে মস্তবড় একটা। এ কি বিলেতি পরিষ্কারের শিক্ষা না জয়ন্তীর ভালবাসা? লিলি জিজ্ঞেস করল নিজেকে, উত্তর চাইল ভাস্করের কাছে। ভাস্কর কই? খোঁজ নিল দেবকীর কাছে—

—'ভাস্কর ক্লাবে আসে নি দেবী?'

—'ভাস্কর? সে তো দুর্লভ আজকাল ক্লাবে। দেখেছ ওকে শীগ্‌গির?'

—'কেন? কি হয়েছে ওর?'

কি হয়েছে। চোখ টেপাটেপি হল সখীদলের মধ্যে। এতদিনে ঘুম ভাঙল গরবিনীর। ভাস্কর চলে গেছে হাতছাড়া হয়ে।

—'ভাস্কর এখন প্রি-হিস্টরিক এজের একসাভেকেট করছে।' উত্তর দিল বেণু হালদার। কথাটা রহস্যগন্ধী। উৎসুক হল লিলি।

—'তপতীর সঙ্গে ঘুরছে বুঝি খুব?'

—'ঘোরা? ভাস্কর একেবারে ডুব দিয়েছে। ডুবুরী নামালেও উদ্ধার করতে পারবে না তাকে। অবশ্য নিজে চেষ্টা করলে এখনো কি হয়, বলা যায় না।' বললো রমলা।

—'সে কি! আমি তো জানতাম তপতী ইতিহাস পড়ছে। প্রেম আরম্ভ করল কবে হতে?'

—'যবে পেল অরক্ষিত দুর্গ। ইতিহাস পড়ছে! হুঃ। পড়াটাই তো ওর কৌশল। জানাতে চায়—ছাত্রী জীবনই কাটে নি এখনো। মৈত্রেয়ী। ভাস্করের কাছে আংটির বদলে ব্রহ্মবিদ্যা চাইছে।' উদ্ধত কণ্ঠ বেণুর।

কল কল, খল খল করে হেসে উঠলো সবাই।

—'এনগেজমেণ্ট হয়ে গেছে নাকি? কই সে রকম তো শুনি নি কিছু। দাদাও বলে নি।' বললো লিলি।

—'বলবার আর শুনবার সময় কই তোমার? দিন কাটালে আর্টগ্যালারী সাজাতে—আর্ট একজিবিশন হবে।'

প্রায় এক বছর ধরে লিলি ব্যস্ত ছিল একটা আর্ট একজিবিশনের ব্যবস্থায়। মস্ত খরচ আর ঝামেলার কাজ। এত টাকার দরকার যে কোন বাঙালী নন্দনই একেবারে হাঁকিয়ে না পড়ে সম্পূর্ণ সাহায্য করতে পারবে না। সুতরাং লিলি শরণাপন্ন হয়েছিল চাওলা আর দিল্লীলালের। ওদের সঙ্গে ঘুরেছে, নানা জায়গায় গিয়েছে। এর মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেছে! মনে পড়ল কিছুদিন আগে দেখা তপতীকে। কি সুন্দর হয়ে উঠেছে ও! বুকের মধ্যে জ্বালা ধরতেই চোখ গেল হাতের ঠাণ্ডা মুক্তাটির প্রতি। নিজেকে সংযত করল লিলি। একটু বেসামাল হলেই লিলি বোসের হৃদয় ভঙ্গের কাহিনীতে মেতে উঠবে সবাই। শক্ত হোল, হাসলো তার ধারাল হাসি।

—'ইস্! কি দুঃসংবাদ দিলে। আমি না হয় ব্যস্ত ছিলাম, তোমরা কি করছিলে? উড়বার উপক্রম দেখেই পক্ষচ্ছেদ কর নি কেন বিশ্বাসঘাতকের? দেবকীর গানে তো মুগ্ধ ভাস্কর।'

—'আর দেবকী! চেয়ে দেখ, হাতে পরেছে রক্তের আংটি। [illegible]'

—'আরে! কবে? কিছু বল নি দেবকী। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি রঞ্জতকে।'

হেসে, নেচে, গান গেয়ে উপচে পড়ল লিলি।

—'কি! বলেছিলাম না! ও আবার ভালবাসবে কাউকে—!' প্রতিধ্বনি করল রমলা, বেণু।

বাড়ি ফিরে একলা ঘরে নিজেকে দেখল লিলি। এতক্ষণের সব ধৈর্য ফেলে এল সে দরজার বাইরে। বন্ধঘরে যে মেয়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, সে বন্ধু মনের আকাঙ্ক্ষা-গর্বিত লিলি নয়। যে মেয়ে ভালবেসেছে, আর ফিরে পায় নি তার প্রতিদান—তারই মত কাঁদল লিলি। কান্না যত বাড়তে লাগল, তত কান্নার সুখ লাগল তার বুকে। ভাস্করের জন্য কেঁদেও আনন্দ? কই এত সুখ তো পায় নি যখন কাছে ছিল, পাশে ছিল সে! বুঝল লিলি—ভাস্করকে পেল না সে, কিন্তু ভালবাসা তার নিজের। কে বাধা দেবে তাকে ভালবাসতে—সুখ পেতে, দুঃখ নিতে? বুঝলো—ভালবেসেছে তপতী, তাই সেদিন বলেছিল—

'It is better to love and lost,
Than never to have love at all.'

ভাস্কর হারিয়ে গেলো জীবন হতে, কিন্তু ভালবাসা কখনো হারাবে না, মরবে না—সে থাকবে জীবনভরে। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়িয়ে এল লিলির উত্তপ্ত কপাল। ভাবনার সময় পেল। এখন কর্তব্যটা কি? রাতারাতি ভোল বদলে বিরহিণী সাজবে? পুরোহাত জামা, সাদা শাড়ি আর সেন্টাল-ওয়ার্ক? পারবে না। পারবে না লিলি আধা-বিধবা সেজে, সবার করুণা কুড়োতে। অতএব, ওঠো লিলি বোস। সাজো জর্জেট-সিফনে-কণ্ঠমালায়। হাস্য-লাস্যে বিভ্রম আনো ভক্তমনে।

স্নানঘরে অবিশ্রান্ত ঝরনা-ধারে স্নান করলো লিলি। তপতী পেয়েছে কোহিনুর। লিলিরও আছে কিছু—ব্যথার বিষে নীল হীরের করোটি পড়েছে তার ভাগে। থাকুক বন্ধ বুকের কৌটোয়, নীলার দাম কম না কি! পাউডারে ফ্যাকাশে হয়ে লিলি চলে এলো খাবার-টেবিলে।

—'মা, ভাস্করের না কি বিয়ে তপতীর সঙ্গে?'

মা বিস্মিত হলেন মেয়ের হাসিখুশি দেখে। তবে কি ভুল বুঝেছেন এতদিন! তাঁর মনে শান্তি ছিল না, ভাস্কর-তপতীর বিয়ের কথা শুনে। লিলি প্রবীরের মত নয় ঠোঁট কামড়ে সে নিজের অঙ্গচ্ছেদ সইতে পারে, কিন্তু নিজের অসম্মান ঘটাবে না কখনো অবাঞ্ছিত হয়ে ভাস্করের পথ আগলাবে না সে, কিন্তু চিরদিনের মত খান-খান হয়ে যাবে। একটু স্বস্তি পেল মেয়ের কথায়। মুখে বললেন—'সেই রকম তো শুনছি, স্পষ্ট বোধ হয় কোন কথা হয় নি এখনো। কেন, তুই জানিস না? তোর বন্ধু তো ভাস্কর।'

—'তপতীও।' মাছের টুকরো মুখে দিল লিলি।

—'যা মুস্কিলে পড়েছিলাম একজিবিশনের ঝামেলা নিয়ে। সব স্পয়েল হোত। বাঁচিয়ে দিয়েছে চাওলা আর দিল্লীলাল। দাদা কই? এখনো ওর ঘরে বসেই খাচ্ছে না কি? শোন মা, তোমায় বলতে ভুলে গেছি—সেদিন মার্কেটে মুখোমুখি দেখা জয়ন্তীর সঙ্গে। আমাকে দেখে কি দৌড়!'

খুব হাসল লিলি।

—'ভাস্কর আর তপতীর নাকি বিয়ে। শুনেছিস তুই?'

ভাইয়ের একটু উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল লিলি। অবশেষে দাদাও বক্তৃতা করবার চেষ্টা করছে নাকি! হাসল লিলি। 'শুনেছি। তোমরাও করে ফেল।'

—'আমরাও?'

—'হ্যাঁ, তুমি আর জয়ন্তী। আর কত কোর্টশিপ চালাবে? তিন বছর হয়ে গেছে।'

বোনের কথায় হাসলো প্রবীর।—'জয়ন্তী যে রাজী হচ্ছে না। সে ভেবে দেখেছে, তার নাকি বিয়ের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তার কারণ আছে। সুতরাং চুক্তি সাপেক্ষে কাটাতে হবে কিছুদিন আরো।'

—'চুক্তিটা কি?' ভ্রূ বাঁকাল লিলি।

—'বেণু হালদারের দিকে তাকাব না, দাস্তানীর সঙ্গে নাচ বন্ধ। অর্থাৎ এক জয়ন্তী ছাড়া অন্য সব স্ত্রী-জাতীয় বস্তু বর্জনীয়।'

ভাইয়ের কথায় লিলি আমোদ পেল, স্বস্তিও। হৃদয় যখন রক্তক্ষরণ করছে, বাইরে তখন হৈ-চৈ করে কাটানো বড় সহিষ্ণুতার পরীক্ষা। সোফায় নিজেকে ছেড়ে দিল লিলি।

—'দাদা, বোস না। তোমার সঙ্গে তো দেখাই হয় না। তোমার জয়ন্তীর গল্প কর একটু।'

প্রবীর চাইলো বোনের দিকে। মনে মনে বুঝলো কিসে এতটাই দুর্বল হোল লিলি যে, ধনুকের সব গুণ খুলে আজ অন্তরঙ্গতায় নমনীয় হয়ে উঠেছে। বুকের মধ্যে ব্যথা করে উঠলো, কিন্তু জানে বোনের স্বভাব—একটুকু সহানুভূতি দেখালেও দপ করে জ্বলে উঠবে। তা ছাড়া,—ভাবল প্রবীর, এ সব ডেলিকেট ব্যাপার নিজে নিজেই সেট্‌ল করা ভাল।

—'জয়ন্তীকে একদিন দেখ না।'

—'ওকে তো সেদিন দেখলাম একেবারে মুখোমুখি তপতীর সঙ্গে মার্কেটে। তবে আলাপ আর হতে পারল না, দৌড়ে পালাল তোমার ব্রাইড।'

সেদিনের ঘটনা শুনেছিল প্রবীর হাসলো।

—'জয়ন্তী অমনি। মুখে খুব সাহস—কাজের বেলা ভীতুর একশেষ।'

—'ভয় কিসের?'

—'ওরা যে ভয় পেয়েই জন্মায় খবার চাইতে ভয় আনন্দে ভয়, ভালবাসতেও ভয়ের জুজু ঘিরে থাকে ওদের।'

—'তপতী তো খুব হাই সার্টিফিকেট দিচ্ছে জয়ন্তীর। অমন মেয়ে নাকি দু'টি মেলা ভার। তুমি কি বল?'

—'আমি?' আবার বোনের দিকে চাইলো প্রবীর। একটু ক্লান্ত অবসন্ন যেন। নিজের কথা ভাবতে ভাল লাগছে না, তাই শুনতে চায় অপরের কথা।

—'তোমার লাগছে কেমন? শুধুই ভাল না ত্রুটিও আছে কিছু কিছু?'

—'ত্রুটি তো প্রচুর—অন্তত আমাদের পক্ষে। ও এমন ঘরের মেয়ে, যেখানে অভাব হচ্ছে দিনের প্রথম কথা। সুতরাং কৃপণ। আমি কখনো ওর সঙ্গে বেরিয়ে কুড়ি টাকার বেশি একবারে খরচ করতে পেরেছি বলে মনে পড়ে না। আর—'

হেসে ফেলল প্রবীর। শেষ টুকরোটি পর্যন্ত খাবে, অবেয়ারাদের তুলানী। টিপস্ দিতে যাবার আগেই পয়সা তুলে নেবে। তবে, ভালো হচ্ছে কি জানিস—প্রেজেন্ট দেবার দায় নেই। দখল করবার, আমার মনিটারি স্ট্যাটাস জানবার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। কেবল—' একটু থমকাল প্রবীর। —'এই আগের ব্যাপারগুলো জানলে-টানলে চায় আর কি!'

—'বা দাদা! বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা বলছ তো। নাঃ, এ বিয়ে তোমার টিকবে। করে ফেল।'

—'তুইও এবার বিয়ে কর না!'

—'কাকে করি বল তো? এত প্রার্থীর ভিড় যে, বুঝতেই পারছি না যথার্থ কৃপার পাত্রটি কে হতে পারে।'

ভাইবোন বহুদিন পর হাসল শৈশবের হাসি।

—'অরুণাংশু তো বেশ।'

—'খুব বেশ। কোঁকড়া চুল, পালিশ মুখ।'

—'চাওলা? দিল্লীলাল?'

—'বাঙালী নয় যে, অবশ্য দু'জনে একসঙ্গে হলে বেশ হত—কি টাকাটা।' হুস করে নিঃশ্বাস ফেললো লিলি।

—'তুমি করিস নে। মন ঠিক করে এবার বিয়েটা করে ফেল।'

—'না হলে? বয়স বেড়ে যাচ্ছে? এর পর বর জুটবে না?'

—'না রে লিলি। আমার জন্য বাবা-মার দুঃখের শেষ নেই, সোসাইটিতে মুখ নষ্ট। দেখিস না, মা কোন নিমন্ত্রণে যান না। তোর ভাল বিয়ে হলে—'

—'ওদের অবস্থার উন্নতি হবে? জামাইয়ের গুণে ঢাকবে ছেলের দোষ? তার চেয়ে তুমি জয়ন্তীকে বিয়ে করে নিয়ে এস। বাবাকে রাজী করিয়ে দিচ্ছি।'

—'থাক কিছুদিন। মাত্র ব্যবসাটা আরম্ভ করেছি। একটা বছর তো দেখি।'

আশ্চর্য হল লিলি ভাইয়ের কথায়। এতটাই উন্নতি হয়েছে নাকি দাদার। মুখে বলল—'তোমার বিয়েতে টাকার প্রশ্ন ওঠে কোথা হতে?'

—'তার মানে বাবার টাকা আছে তাই বলছিস? আমিও একদিন সে কথা ভাবতাম, ভাস্করকে দেখে ভুল ভাঙল। ওর বাবারও টাকা কিছু কম নেই, কিন্তু খাটছে দেখ রাতদিন।

লিলি খুশি হোল।—'বেশ তো দাদা! বছরখানেক দেখ। তোমার বিজনেস দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর দু'জনেই বিয়ে করব। তার আগে তুমিও আমাকে তাড়া দেবে না, আমিও কিছু বলব না তোমাকে।'

কিছু বললো ভাস্করকে লিলি। রবিবার ধরল তাকে ক্লাবে—।

নীল শাড়ি সাদা পাথরে লিলিকে লাগছিল সমুদ্রকন্যার মত—হাসিখুশি লিলি।

—'করতে পার। মেয়ে ভাল তপতী।'

—'কিন্তু মেয়ে ভাল হলেই সে যে পাত্রী ভাল হয় না এ তো তোমারি কথা।'

—'ধারণা বদল। সে ধারণা আর নেই।'

—'কে ঘোচাল? তপতী? তপতীর সঙ্গে এত ভাব হোল কি করে?'

—'ভাব তো ছিলই। বন্ধুত্ব ঘনীভূত হয়েছে সম্প্রতি।' আঙুল তুলে আংটি দেখাল লিলি।

—'এমন মেয়ে! কাউকে বশ না করে ছাড়বে না। আমার বার্থ-ডেতে বাড়ি এনেছিলাম ওকে। আংটি দিয়ে, বোন-টোন পাতিয়ে একাকার।'

লিলির হাসিতে প্রীতি ঝরলো। আরামের নিঃশ্বাস ছাড়ল ভাস্কর। তপতী তার সব মন ভরে দিয়েছে, তবু কোথায় যেন ছিল একটু বাধা, একটু অস্বাচ্ছন্দ্য আজকের আগে।

—'তোমার আর্ট একজিবিশনের কি হোল?'

—'ও তো জানুয়ারীতে। উঃ! যা খেটেছে দিল্লীলাল আর চাওলা।'

—'বরদান করবে তো?'

—'কাকে যে করি সে এক ভাবনা।' দাদার কথা শুনেছ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইল লিলি।

—'প্রবীর? কেন? প্রবীর তো ভালই। কাজকর্মে মন দিয়েছে।'

—'বেশি রকম ভালভাবে দিয়েছে। জয়ন্তী ওকে মানুষ করে ছেড়েছে। মা খুব খুশি, বাবাও।'

—'তবে আর কি! লাগাও বিয়ে।'

—'ওরা নিজেরা প্রস্তুত নয় যে এখনো।'

—তুমি? তোমার ব্যাপারটা কি?' অরুণ কি বলে?'

—'দাঁড়াও। একজিবিশানটা হোক আগে। একা অরুণ কেন? সব ক্যাণ্ডিডেটদেরই আর্নেস্টনেসটা বুঝি। জয়ন্তী সোমের একটা ছবি রাখব ভাবছি, কি বল?'

—'রেখো।' খুশি হল ভাস্কর। 'দেখেছ নাকি ওর ছবি?'

—'সেই বিখ্যাত ছবিটাই দেখেছি—যেটাতে দাদা মুগ্ধ।'

—'ও! নদীর ছবি।'

—'বোরিং।' বেণু ভ্রূকুঞ্চিত করল।—'দেখছ সীমা! লিলির কাণ্ড! কি যে আন-ইন্টারেস্টিং কথাতে চমক লাগাতে ওস্তাদ ও।'

—'ঐ জন্যই তো মুগ্ধ অরুণাংশু। ভাবছে—এমন উৎকট বাংলা দেশে জন্মায় নি, জন্মাবে না।' বললো রমলা।

—'কি বলছ আমার কথা?' এগিয়ে এল নিপুণ টাইবাঁধা অরুণাংশু।

—ভাস্কর যে। কতদিন পর? খুব ব্যস্ত বুঝি।'

—'ভয়ানক।' হাসি চমকাল লিলির চোখে।

—'তপতী রায়কে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে সারাক্ষণ ভাস্করকে।'

তপতী রায়। তপতী? কোন্? কোন্ মেয়েটি? অনেকেই দেখে নি তপতীকে। বাবা দেখেছে, বিশদ বর্ণনা দিল তার। সুন্দর। সুন্দর মেয়ে। ভাল্ সেতার বাজায়। এম-এ পড়ছে। ভাগ্যবান ভাস্কর। কন্‌গ্রাচুলেশন?

—'কি দেখল ভাস্কর তপতীর মধ্যে যে একেবারে মুগ্ধ না হয়ে পারল না?' রমলা বলল লিলিকে। একটু খুশি, অনেকটা ঈর্ষা। লিলির মত চমক তাদের হয়ত নেই, তা বলে তপতী! আশ্চর্য পছন্দ!

লিলি হাসল —'হাসছ কি? কি বল অরুণ। এমন কিছু একস্ট্রা চার্ম্ আছে তপতী রায়ের?'

—'আমি তো দেখছি না।' উত্তর দিল অরুণাংশু।

—'তুমি দেখতে পাচ্ছ না বলেই তো চার্ম্ দ হলো না।' বলল লিলি তার স্বভাবসিদ্ধ ধারাল কথায়।

—'বেশ তো! তুমি তো একজন বিশেষজ্ঞা, তুমিই বল না কি আছে তপতীতে?' ভ্রূ ভঙ্গিমা করল রমলা।

—'অন্তত জল লাগলে সৌন্দর্য গলে যাবার আশঙ্কা নেই তপতীর। আর—ও কারো নকল নয়, একেবারে নিজস্ব।'

রাজহংসীর ছন্দে লিলি চলে গেল হলের ওদিকে।

উত্তেজিত তপতী এসে দাঁড়াল ভাস্করের অফিসের সামনে। এক্ষুণি তাকে ভাস্করের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ইতস্তত করবার কথা মনেও এল না, সোজা রিসেপশনে গিয়ে জানাল—দেখা করবে ভাস্কর মিত্রের সঙ্গে। রিসেপশনিস্ট আসে নি সেদিন। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, না কি মাথাব্যথা। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলাও হতে পারে। কাজ চালাচ্ছিল চাপরাশি তারাপদ। গম্ভীরভাবে সে তপতীর দরকার জানতে চাইলো।

এবার থমকালো তপতী। বাধো-বাধো গলায় বললো—মিঃ মিত্রকেই বলবে দরকার, তিনি তাকে জানেন। অগত্যা উঠল তারাপদ।

ভাস্কর তখন একটা টেণ্ডার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। কামু এণ্ড কোং টেণ্ডার দিয়েছে। তাদের চেয়ে বেশি হলে, ভাস্কর কাজ পাবে না। আবার বেশি-কম হলে, কাজ তোলাই হবে মুস্কিল।

তারাপদ জানাল একটি মেয়ে দেখা করতে চায়।

—'মেয়ে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।' তারাপদ নিঃসন্দেহ ছিল যে, তপতী মেমসাহেব নয়। টাইপ-দিদিদের মতই মেয়ে।

ভাস্কর ভাবল একটু। কে মেয়ে হতে পারে? ও! সম্প্রতি তো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে স্টেনো-টাইপিস্ট এর জন্য।

—'নিয়ে যা সুরেনবাবুর কাছে।'

এস্টাব্লিশমেণ্ট অফিসার সুরেনবাবুর ঘরে সোজা তপতীকে পৌঁছে দিল তারাপদ।

বুড়ো মানুষ সুরেনবাবু বুঝলেন নূতন মানুষ চাকরীর বাজারে বেরিয়েছে।

—'বসুন বসুন। লজ্জা কি। কত মেয়ে চাকরী করছে আজকাল। দেশের অবস্থাই বদলে গেছে, মেয়েরাও চাকরী না করলে চলে না। তা—স্পীড কত আপনার? স্টেনোগ্রাফী শিখেছেন কোথা হতে? একটু পরীক্ষা করে নিতে হবে যে। আগে কাজ করেছেন? সার্টিফিকেট আছে?'

ফাইল ওল্টাতে ওল্টাতে ঝড় ছোটালেন সুরেনবাবু।—'দরখাস্ত কই।'

চোখে অন্ধকার দেখল তপতী। টাইপ, স্টেনোগ্রাফী, স্পীড—এসব কি রে বাবা! অনেক কষ্টে জিজ্ঞেস করল—'ভাস্কর মিত্র আসেন নি অফিসে?'

—'কে? ছোট সাহেব? নিশ্চয়! তিনি না এলে চলে কখনো? না, এসব অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের কাজে তিনি তো আসেন না—তবে—।' তপতীর দিকে চাইল সুরেন হালদার—বড়ঘরের মেয়ে—সাক্ষ্য দিচ্ছে আচার, আচরণ চেহারা।—'আছে নাকি সাহেবের নামে কোন রেকমেণ্ডেশন লেটার?'

—'একটু খবর দিন ওঁকে—তপতী রায় দেখা করবে।'

মরিয়া হয়ে বললো তপতী।

তপতী অফিসে? সুরেন হালদারের ঘরে? হে ভগবান! তাকেই বাবা পাঠিয়েছে ভাস্কর স্টেনো ভেবে! ছুটে এল নিজে, নিজের ঘরে নিয়ে বসাল চেয়ারে।

—'ব্যাপার কি?' আর ব্যাপার! ততক্ষণে চোখে জল এসে গেছে তপতীর, থর-থর ওষ্ঠ-অধর।

—'ইস! কি ভুল। আরে ছি ছি, এত বড় মেয়ে কাঁদে নাকি। শোন, শোন তপতী! আমি কি বুঝেছি, তুমি এসেছ?'

প্রায় পিঠে হাত বোলাল ভাস্কর। শান্ত হয়ে এল তপতী।

—'বল কি খবর।'

—'এক্ষুণি দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং হতে এসেছি। রেজাল্ট আউট হয়েছে।'

—'হয়েছে? গুড, গুড। তবে যে বলেছিলে আগামী সোমবার বেরুবে? কি? কি?'

—'সেকেণ্ড ক্লাশ—ফার্স্ট।'

—'বা, বা। দিনটা তো সেলিব্রেট করতে হয় তা হলে। বাবা কি বললেন? মা খুশি?'

মুখ-চোখ উজ্জ্বল তপতীর—'কেউ জানে না। আমি একা একা ট্রামে চলে গিয়েছিলাম, এইমাত্র ফিরেছি। সব প্রথমেই—'

মুখ নত করল তপতী। স্তব্ধ হল ভাস্কর। সবার আগে পুরস্কারের ফুলটি তাকে দিতে এসেছে তপতী। সেই মুহূর্তে, শুকনো চুল, রোদলাগা মুখের সদ্য এম-এ পাস করা বাইশ বছরের মেয়েটির মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করল চিরদিনের নব অনুরাগিণীকে। ভালবাসার উদ্বেল হল পুরুষের বুক। মনের কথা কিন্তু প্রকাশ পেল না মুখে। উঠে স্ট্যাণ্ড হতে কোট তুলে নিল ভাস্কর—

—'চল বাড়িতে সুখবরটা পৌঁছে দেওয়া যাক। তারপর আজকের প্রোগ্রাম ঠিক হবে, কি বল?'

এতক্ষণে হাসি ফুটল তপতীর মুখে। উঠে দাঁড়াল, বেরিয়ে এল চেয়ারের মধ্য হতে, ভাস্করের হাত ধরল।

—'আর অফিসে কাজ নেই?'

—'আরো কাজ? পাগল! আজ আর কাজ নয়—শুধু 'ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থগীত, এসো তুমি প্রিয়ে।'

ভাস্করের বলিষ্ঠ দুই বাহুর মধ্যে চোখের নিমেষে পিষ্ট হয়ে গেল তপতী। দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো সে ভাস্করের গলা। উর্ধ্ব মুখটি তুলে নিঃশেষে নিবেদন করল নিজেকে। কতক্ষণ বহুক্ষণ! বোধ হয় একযুগ পার হয়ে সম্বুদ্ধ হোল দু'জনেই।

—'তপতী!' নাড়া দিল ভাস্কর বক্ষলগ্নাকে—। 'কি হোল?'

—'যাও।' মৃদু টোকা দিল ভাস্করের বুকে তপতী।

—'যাও তো বুঝলাম, এখন লিলি যদি ড্যামেজস্যুট আনে?'

—'ইস! তার আগেই নিজের নামে ডেলিভারি নিয়ে ফেলবো।'

—'বটে রে দুষ্টু মেয়ে! আমি বস্তাপচা মাল?' আবার, বার বার, ভাস্কর চুম্বন করল ঈষৎ বিভক্ত ওষ্ঠাধরে।

বাড়ি পৌঁছবার জন্য তাড়াতাড়ি করলেও দেরি হয়ে গেল তাদের। অভুক্ত তপতী একপ্লেট চিপ্‌স আর মাছভাজা খেল।

—'দুপুরের রেস্টুরেন্ট খুব ভাল। কেমন কম কম লোক। মা ভারি খুশি হবেন, বাবাও—।'

—'ভাল পাস করেছে বলে না?'

—'ধেৎ! বুদ্ধু কোথাকার! পাস করে যে প্রাইজ নিয়ে যাচ্ছি তার জন্য।'

—'অতটা স্যাঙ্গুইন হওয়া কিন্তু ভাল নয়। আমি মত বদলেও

—'বদলেও ফেরাতে পারি?' ছোট ভেংচি কাটলো তপতী—। 'কিছু বুঝি না আমি! বোকা, না?'

—'খুব বুদ্ধি বুঝি? তবে তো ভারি ঠকেছি। ভেবেছিলাম সরল, ইনোসেন্ট—Sweet sixteen still unkissed।'

—'ভেবেছিলে? ভেবেছিলে একথা? ষোলো বছরে কেউ এম-এ পাস করে?'

ভাস্করের কোলের উপর ভেঙে পড়লো তপতী। নিরুদ্ধ আবেগ ছাড়া পেয়েছে। লজ্জা করবার, লজ্জা পাবার কিছু হাতে না রেখেই নিজেকে বিলিয়েছে সে ভাস্করের কাছে।

—'চল বাড়ি চল। মাকে সব বলবে। তোমার মা অমত করবেন না তো।' শঙ্কা ফুটলো তপতীর চোখে।

—'পাগল! মা অস্থির হয়ে আছেন তোমার জন্য। পরীক্ষাই শেষ হয় না।'

—'সত্যি! বিশ্রী পরীক্ষা। শেষের দিকে তো দিতেই ইচ্ছা করছিল না। এইটথ পেপারটা যা লিখেছি—'

—'সর্বনাশ! ফেল করতে যদি?'

—'আহা! এম-এ ফেল যেন করতে নেই। আর একটু দিতে বল না চিপ্‌স।' প্লেট হতে একটু আলুর কুচি মুখে ফেলল তপতী।

—'আর না। এবার বাড়ি গিয়ে স্নান সেরে, ভাল করে খাবে।'

—'আবার? এই বলে চিস্ চিস্ করছে।' খুঁটে নিল ছোট আর একটু কুচি তপতী।

—'ওঠো তপতী। বাড়িতে সবাই খুব ভাবছেন নিশ্চয়।'

ভাবছিল সবাই। সেই ভোরবেলা বেরিয়েছে তপতী! পাঁচটার সময়ও ফিরছে না দেখে প্রিয়বালা ব্যাপারটা মীনাক্ষীর গোচরে আনল।

বিরক্ত হল মীনাক্ষী।—'এ রকম হয় নাকি মাঝে মাঝে? আমায় কখনো বল না কেন?'

ভয় পেল প্রিয়বালা। 'ঐ মীরাদি'দের বাড়ি যায় তো,—তাই আপনাকে আর—'

—'হয়েছে, হয়েছে। সর্দারী সবটাতে।' গিয়েছে মীরার কাছেই। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে! এখানো বাড়ি ফিরবার সময় হোল না। মনে মনে ভাবল মীনাক্ষী।

আবোল তাবোল অনেক ঘুরে, ঝড়ো কাকের মূর্তি মেয়ে এসে পৌঁছাল বাড়ি, সঙ্গে ভাস্কর। হতবাক মীনাক্ষী। এই চেহারা আর পোশাকে ভাস্করের সঙ্গে বেড়ানো! রাগে চোখ লাল, কিন্তু ভদ্রতা বজায় রাখতে হাসতে হোল। জীবনে প্রথম মা বলে মীনাক্ষীকে ডাকল তপতী—

—'মা, দেখো, ভাস্কর দিয়েছে।' পান্নার আংটিটা গুঁজে দিল মীনাক্ষীর হাতে।—'বাবা, আমি পাস করে'ছ। সেকেণ্ড ক্লাস—ফার্স্ট।'

তারপরই চাওয়া। [illegible]

পড়লো লোকান্তরিতা বোনকে। তপতী? তপতী কই? বাথরুমে দরজা বন্ধ, জল পড়ছে ঝরঝর—ও কি বেরুবে আজ সহজে।

মীনাক্ষী আশ্চর্য হল। ভাস্কর! সবার এত কামনার ভাস্কর—সে কি দেখে, কিসে মুগ্ধ হোল? একটুও চেষ্টা না করে, তপতী হেলায় হারিয়ে দিল লিলিকে! মনে মনে নিজেকে প্রশংসা করতে চাইলে, মীনাক্ষী—তার পরিপাটী আয়োজন-ব্যবস্থার কথা স্মরণ করে. কিন্তু বেশিক্ষণ পালন করতে পারল না সে গর্ব। চাইলো তপতীর দিকে। প্রসাধন-চতুরা মেয়েগুলির কাছে কি নিষ্প্রভ তপতী! নিষ্প্রভ? চোখে সুখের আলো কপাল গাল সব আলো। তপতী যেন আকাশ হয়ে গেছে—শিশির-ধোয়া আশ্বিনের আকাশ।

নিজেকে—অল্পবয়সের নিজেকে মনে পড়লো মীনাক্ষীর। প্রায় লিলির মতই প্রাচুর্য ছিল তারও। মনে মনে সে করুণা করত দিদিকে। জানতো শৈলেনের দোষ নেই, তার সঙ্গে তুলনায় দিদি কিছু না হয়ে গিয়েছে সেই ধারণা নিয়েই তপতীর সম্বন্ধেও হতাশ হয়ে পড়েছিল সে। একটু ভাবলো মীনাক্ষী। তবে কি শৈলেনই সেদিন এণাক্ষীর—সেই শ্যামলা শ্রীময়ীর মূল্য বুঝতে পারে নি?

হঠাৎ যেন নিজেকে একটু সস্তা আর খেলো মনে হল মীনাক্ষীর। মনে হল—লাভ কি টুটুনকে ইংরেজী স্কুলে আর্টি, মিস্‌দের কাছে পড়িয়ে? সুন্দর অ্যাকসেন্ট দিয়ে ইংরেজী বলে কিন্তু বাংলা লিখতে গোলমাল। খাটো ফ্রক, ছাঁটা চুলের মেয়ের মধ্যে ভবিষ্যৎ লিলিকে যেন দেখতে পেল মা, আর তাতে একটুও খুশি হোল না। লিলি! ইস! লিলি পারল না ভাস্করকে জয় করতে! নিজের ভাবনায় চমকাল মীনাক্ষী। সে কি তবে মনে মনে তপতীর হারই চাইছিল নাকি? না, না কক্ষণো না। তপতী! খুকু! গালে রং লাগল মীনাক্ষীর চঞ্চল পায়ে সে গিয়ে ঢুকল তপতীর ঘরে।

জানালার পাশে, ছোট টেবিলেতে হাতের উপর মাথা রেখে তপতী পড়ছে বই—গল্পের বই। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'। বড় সেকেলে পছন্দ মেয়েটার। কি, কি জানি! সেকেলে হওয়াই বুঝি আজকালে আধুনিকতার পরিচয়।

—'খুকু!' মেয়ের সামনে এসে বসল মা।

—'কি চাই বল।'

—'কিসের?' অবাক চোখে তাকাল তপতী। চোখে তার নৌকাডুবির কমলার কান্না।

—'এই গয়না-টয়না আর কি?'

—'গয়না? ও।' একটু ছায়া ছায়া হোল তপতীর মুখ।

—'ওসব আমি জানি না কিছু।'

—'না জানলে চলে বুঝি? মুক্তো তো ভালবাসিস তুই?'

—'ভালবাসি। মা, শোন—' একটু ভেবে নিল তপতী, চাইল মীনাক্ষীর উৎসুক মুখের দিকে। সে ভেবেছিল কথাটা বলবে বাবাকেই, কিন্তু মায়ের চেয়ে বাবা যে আরো অচেনা।

—'কি বলছিস?' মেয়ের কথা শুনতে ব্যাকুল হোল মা। সেই মুখের দিকে চেয়ে—ব্যাকুল আর মমতামাখা মুখ, তপতী তার ক'দিনের ভাবনাটা গিলে ফেলল। মিথ্যে বানাতে হত নিশ্চয়, রক্ষা করল টুটুন।

—'মা, চল, চল। দরজী এসেছে।' টানতে টানতে মীনাক্ষীকে নিয়ে গেল টুটুন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তপতী। সে ভাবছিল, মায়ের একখানা ছবি নিয়ে যাবে তার সঙ্গে—যে মা বড় হন নি, একটুও বদলান নি—সেই তার তরুণী মায়ের ছবি। ছবি আছে, জানে তপতী, মায়ের কম বয়স ধরে রাখা ফটো। ঢাকাই শাড়ির পাড় জড়িয়ে গেছে হাতের উপর দিয়ে, ঘোমটার ছায়া মুখে সেই ফটো আছে বাক্সবন্দী হয়ে বক্সরুমে। কিন্তু মীনাক্ষীকে কি বলা যায় সে কথা? বলা যায়—আমার সেই এণা-মার ছবি নিয়ে যেতে চাই আমি।

—'খুকু!'

অসম্ভব চমকে উঠে দাঁড়ালো তপতী। বাবা! জীবনে বোধ হয় প্রথম এসে মেয়ের ঘরে ঢুকলেন শৈলেন রায়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন চারদিকে। এই খাটে একদিন বিশ্রাম নিয়েছেন তিনি। এণাক্ষীর শেষ নিশ্বাস পড়েছিল এই ঘরে। হাতের ব্রাউন কাগজে মোড়া একটা কিছু এগিয়ে দিলেন মেয়ের দিকে।

—'তোমার—এই তোমার মায়ের ছবি আর কি। তোমার সঙ্গেই থাকুক।'

এক মিনিটের জন্য চোখে ঝাপসা দেখলো তপতী। বাবা? বাবাকে ঠিক ভাস্করের মত লাগছে যেন দেখতে।

কাগজের আবরণ সরাতে দেখা দিল অষ্টাদশী এণাক্ষী। তপতীর তারা হওয়া, বাতাস হওয়া মা চলে এসেছে ছবি হয়ে, বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে মেয়ের দিকে। কোথায় ছিল? কোথায় ছিল এণাক্ষী? কাঠের ফ্রেমে বন্দী, বাক্সের মধ্যে কোণের ঘরে? শৈলেন রায়ের নিজেরও অজানা মনের একটি খোপে? চোখের জল মুছে ফেললো তপতী। এক্ষুণি আসবে মীনাক্ষী তাকে কি দেখানো যায় চোখের জল আর বাবার উপহার—এই ফটো।

তার চেয়ে খোঁজ নেওয়া যাক ভাস্করের পাত্তা নেই কেন সাতদিন ধরে। ভুলে গেছে? ভুলে গেছে তপতীকে? তবে কি হবে! আলনায় হাত বাড়াল তপতী। চুলে চিরুণী, খুচরো পয়সা ব্যাগে, ট্রাম।

ক্লাবের দরজা। কোনদিন এখানে একা আসে নি তপতী। অবশ্য আসাটাই ঘটেছে কদাচিৎ। এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, গ্লাস-ডোর একটু ঠেলে দিলেই একেবারে আলোয়, সাজে, নাচে, গানে পরীরাজ্য দেখা দেবে। বয় বেরিয়ে এল আইসক্রীমের শূন্যপাত্র নিয়ে। এ কি! তাড়াতাড়ি দরজা টেনে ধরল, তপতী পৌঁছালো গিয়ে আনন্দের অন্দরমহলে।

হৈ-চৈ উঠল একটা। আরে! তপতী! মিস রায়! তপতী রায় এসেছে। ভাস্কর? ভাস্কর কই? পালিয়েছে? গ্রেপ্তার করতে শ্রীমতীর আগমন?

হাসি, উচ্ছ্বাসে বিপর্যস্ত হল তপতী। অবস্থা বুঝে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো লিলি—'এসো, এসো তপতী। বাড়ি গিয়েছিলে বুঝি? পাও নি আমায়? আমি কি এখন বাড়ি থাকি?'

এক নিমেষে সব প্রশ্ন থামিয়ে দিল লিলি। ও! লিলির খোঁজে এসেছে তপতী। মেয়েদের উৎসাহ বাড়ল—কেন? কেন? শাড়ির, রং, নেকলেসের স্টোন? দেখি দেখি,—পান্না! পান্না কেন দিল ভাস্কর? খুব ফর্সা না হলে পান্না মানায় না তেমন!

হাঁফ ধরলো তপতীর। সে চমকেছিল লিলির সাহায্য করবার তৎপরতা দেখে, কৃতজ্ঞ হয়েছিল, কিন্তু এখন? এখন কি উত্তর দেবে? তাসলো কেবল দেবকাদের দিকে চেয়ে করুণ করুণ।

অরেঞ্জস্কোয়াসের গ্লাস ঠেলে দিল তপতীর দিকে। 'খাও। না, স্টোন-ফোন নয় বেণু। আমিই খুঁজছিলাম তপতীকে—একটা কানেকশন করাবার জন্য। ওর বন্ধু জয়ন্তী সোম—আর্টিস্ট। নিজস্ব একটা ভঙ্গী আছে জয়ন্তীর। তার দু' একটা ছবি রাখবো একজিবিশনে—নূতন প্রতিভার আবিষ্কার।'

—'ওঃ! একজিবিশন! বোরিং! যত সব— মেয়েরা ফিরে গেল নিজের জায়গায়—লাগল কাকলী বিস্তারে, তপতীকে নিয়ে বেরিয়ে এল লিলি।

—'ভাস্করের সঙ্গে দেখা হয় নি আজ, না?'

—'সাতদিন'। চোখে জল এসে গেল তপতীর।

—'একেবারে পাগল তুমি।' দু'হাতে তপতীর মুখ তুলে ধরলো লিলি।

—'হয় তো কোন কাজে পড়ে গেছে। জান তো মস্তবড় অর্ডার পেয়েছে, হারিয়ে দিয়েছে কাঞ্চিলালকে?

—'জানি।'

—'তবে? বোকা মেয়ে!' লিলি বোসের এমন স্নেহভরা গলা শুনলে অবাক হোত তার আলাপী যে কেউ।

—'তোমার গাড়ি কই।'

—'গাড়িতে আসি নি। ট্রামে।'

—'আচ্ছা কাণ্ড! এমন উতলা হয় নাকি এম-এ পাস একটা মেয়ে? মহাবীর'—নিজের ড্রাইভারকে ডাকল লিলি—'মিসিবাবাকে আপনা কোঠীমে ছোড় দেনা'—এই তো ভাস্কর। কোথায় ডুব মেরেছিলে সাতদিন? তপতী চিন্তায় ক্লাবে চলে এসেছে। জান তো এখানকার ব্যাপার!'

তপতী ক্লাবে? কি আশ্চর্য! অবাক হোল ভাস্কর। কাজের চাপে সাতদিন মাথা তুলবার সময় পায় নি সে। ক্লাবের সাবস্ক্রিপসনটা দিয়ে যেত তপতীর ওখানে। এত চিন্তার কি আছে!

—'আছে, আছে। ওসব বুঝবে না তুমি। আজ আর ঢুকতে হবে না ক্লাবে। ভাগো। বেড়িয়ে এস গে দু'জনে। আমি? খেয়ে ফেলবে অরুণ।'

হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল লিলি।

গঙ্গার ধারে নিরালা দেখে তপতীকে নিয়ে বসলো ভাস্কর। জলে চাঁদের বাঁকা ছায়া, দূরে দূরে একটা-দু'টো নৌকো।

—'খুব মন কেমন করছিল বুঝি?' তপতীর হাত মুঠোয় ভরলো ভাস্কর।

—'তোমার তো আর করে নি!' ধরা গলা তপতীর।

—'করে নি? ভীষণ খারাপ লাগছে ক'দিন ধরে। স্বাদ পাচ্ছি না মায়ের রান্না ডিমের দমে পর্যন্ত।'

—'যাঃ। জান ভাস্কর, ওরা বলছিল—পান্না আমাকে মানায় না। ফর্সা নই তো আমি।'

—'কে বলেছে? দেবকী রমলারা তো?'

—'হুঁ। বলছিল খুব ফর্সা হাত না হলে পান্না ভাল লাগে না দেখতে।'

—'আমার ভাল লাগে পান্না তোমার আঙুলে। তপতীর বাঁ হাতটি মেলে ধরল ভাস্কর, অন্ধকারে ঝকঝক ক'রে উঠলো পান্নার সবুজ চোখ। শান্ত সন্ধ্যের বয়স বাড়ল দু' ঘণ্টা। কদাচিৎ ছোট ছোট কথার ঢেউ, আর চুপচাপ। দু'টি ভরা মন কাছাকাছি—কথার অবকাশ কই। পুরুষের দু' একবার মনে পড়ল টেবিলের ফাইলগুলি। মেয়ের মনে গত আর আগামী কোন ভাবনা নেই—কেবল বর্তমান। আকাশ তার হীরের চোখ মেলে দেখতে লাগলো সংসার-পালানো জুটিকে। এমনি দেখে আসছে বুঝি সৃষ্টির প্রথম দিনটি হতে, আর দেখে দেখে দেখাটা পুরাণো হচ্ছে না একটুও। সংসার-পালানোদের জন্যই তো চাঁদ নদীর জলে চুণি-মাণিকের বাতি জ্বালায়, রাত ঘন করে নিরালা রচনা করে রাখে।

[ক্রমশ।

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন

শিল্পী—সুধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

● নৃত্যগীতের আসরে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশেভ ও বিখ্যাত লেখক শলোকভ

শলোকভের সান্নিধ্যে

পরনে ছোটহাতা সাদা সার্ট আর প্যান্ট···নির্মল হাসিতে ভরা মুখ···বাতাসের ঝাপটায় রেশমের মত শুভ্র চুলগুলি এলোমেলো···রাশিয়ার মানুষ তাঁর চেহারার আভাসমাত্রে চিনতে পারে তাঁকে, একডাকে চেনে তাঁর নাম—শলোকভ। রাশিয়াবাসী ভালবাসে তাঁকে, ভালবাসে তাঁর সৃষ্টিকে। শলোকভ শুধু রুশ সাহিত্য-জগতে বরেণ্য একটি নামমাত্র নয়, শলোকভ বিশ্ব-সাহিত্যে অতি পরিচিত একটি নাম।

শলোকভ মানব-জীবনালেখ্য শিল্পী। মানব-জীবনটাকে আকণ্ঠ পান করেছেন তিনি—তার ক্ষীরটুকু থেকে বিষটুকু—সব। কলম ধরেছেন তারপর। আর তাঁর হাতে-ধরা সেই কলম সৃষ্টি করেছে অনুপম চরিত্ররাজি—বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি তারা, তাদের জীবনের মাধ্যমে রুশ-ইতিহাসের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পথের বাঁক প্রতিফলিত হয়েছে। ঐতিহাসিক এই বাঁকগুলোকে গণজীবন দিয়ে দেখতে চাইবে যে শলোকভ-সাহিত্য বিস্তারিত পাঠ করতেই হবে তাকে, সমনোযোগে, সনিষ্ঠায়।

স্বদেশে শলোকভ একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক—এটা অতি তুচ্ছ কথা। জনপ্রিয়তা তাঁর সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। আমেরিকা, ভারতবর্ষ, জাপান, আইসল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ও বহুতর অন্যান্য দেশে মানুষ সাগ্রহে জানতে চায় কি লিখছেন শলোকভ, কি ভাবছেন, কবে প্রকাশিত হবে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস।

শলোকভ-সৃষ্টির অন্তর-ঐশ্বর্য এই ভালবাসা এনে দেয় তাঁকে বিশ্ববাসীর কাছ থেকে। এ ঐশ্বর্যের প্রভা দীপ্ত করে সর্বদেশের সর্বকালের পাঠকমন। আশ্চর্য এই, শলোকভ-সাহিত্যের পটভূমিকা তাঁরই দেশ, তাঁরই কালের গণ্ডীতে সীমিত, শলোকভ-সাহিত্যের চরিত্রগুলি একান্তভাবে তাঁরই দেশের মাটি দিয়ে গড়া—ডন নদীর তীরের মাটি। তবু এতটুকুও অসুবিধা কোথাও বোধ করে না বিদেশী পাঠক, সুর কাটে না কোনখানে, রসের উৎসে কখনও কোন দৈন্য বোধ করে না। 'And Quiet Flows the Don,' 'The Virgin Soil Upturned,' 'Fate of a Man', 'Azure' তৃণভূমি'-র গল্পরাজি সব মানুষেরই বড় আপন তাই, দেশ-কালের

সীমারেখাকে অতিক্রম করে লোকে লোকে বিজয়যাত্রা তাদের।

যুদ্ধ শুরু হয় নি তখনও—শলোকভের বয়স তিরিশের সীমানা পেরিয়েছে সেই সবে। কিন্তু তাঁর খ্যাতি তখনই তাঁর গ্রামখানির ক্ষুদ্রগণ্ডী ছাড়িয়ে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছে। ডন নদীর কূলে কূলে ছড়িয়ে পড়েছে কত কাহিনী তাঁর—শলোকভ তখনই কিম্বদন্তীর নায়ক।

ঐ নদীর কূলে কূলে আজও শলোকভের পাঠক খুঁজে পাবে তাঁর চিত্রগুলোকে—একেবারে বাস্তব তারা জীবন্ত। চারপাশের জনজীবন থেকেই সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন সাহিত্যিক—দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না থেকে যুদ্ধের করাল কবলে পতিত মানুষের ভয়াল অভিজ্ঞতা অবধি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সাহিত্যে, অমৃত-সিঞ্চনে চিরন্তন করেছেন, তাদের অমর করেছেন।

যে সব বাস্তবজীবনকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন শলোকভ, তাঁর গ্রামের আশে-পাশে এখানে-ওখানে অনেক সময়ই সন্ধান মেলে তাদের দেখা হয়ে যায় কারো কারো সংগে। শলোকভের গ্রামের কাছাকাছি এক গোলাবাড়িতে পাঠক বুড়ো সেই মানুষটিকে দেখতে পাবে—শচুকার নাকি সে-ই। প্রমাণ-স্বরূপ নিজের ঠোঁটটা দেখাবে সে—একবার একটা বঁড়শি গেঁথে গিয়েছিল তারও ঠোঁটে। নিরক্ষর মানুষটি, তবু 'The Virgin Soil Upturned' গ্রন্থের শচুকারের সব কথা জানে সে, সব কথা। আর এক কোজাক আছে, তার কাহিনী শুনলে গ্রিগরি মেলেকভকে মনে পড়বে। এমনি আরও কত।

'And Quiet Flows the Don'-এর সংগে সমগ্র ভেশেংস্কায়া জেলাটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যেন। শলোকভ তাঁর গোটা দেশটাই বেঁধে ফেলেছেন তাঁর উপন্যাসে। এখানে নতুন আগন্তুক যারা আসে, খুঁটিনাটি নানা চেনা জিনিস খুঁজে পায় তারা, চেনা ছবি দেখে। পথে যখন প্রথমে চোখে পড়ে সূর্যালোকে ঝিকমিক করছে নীল ডনের ধ্যানগম্ভীর রূপ তখনই কে জানে কোন অমোঘ প্রভাবে দর্শকদের পাঠকসত্তা রূশ কথাশিল্পীর অনবদ্য উপন্যাসখানির কথা ভাবে।

মিখাইল আলেকজানড্রোভিচ শলোকভ—নামটা যত বড়, হৃদয়টা অনেক গুণ বড় তার চেয়ে। সবারই জন্য অবারিত তাঁর গৃহদ্বার, সবারই জন্য তাঁর হাসিভরা প্রাণবন্ত মুখ—সেই যে মানুষটির জীবনের ঝুলি অতিবিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা, সেই যে মানুষটি মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ এসে দাঁড়াতে দেখেছেন সামনে একাধিকবার—ভীষণ হতে ভীষণতর পরিবেশে।...আজ তাঁর মাছ ধরার নিমন্ত্রণ রাখতে এসে ধন্য হল কত তরুণ লেখক, কবি।

—এসো, কোপার নদীতে মাছ ধরবে—চমৎকার মাছের স্যুপ খাওয়া যাবে।

আন্তরিকতার উষ্ণ গৃহ সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। জীবন-শিল্পী সংগে নিয়ে বেরোবেন বেড়াতে আর দেখাতে। মুখে-মুখে চলবে স্মৃতিচারণ—অতীত দিনের স্মৃতি, কত ভয়ানক দিনের স্মৃতি, মৃত্যুর তুহিন-শ্বাস চোখে-মুখে এসে লেগেছিল যেদিন!...নদীর তীর...শস্যক্ষেত্র...অপ্রশস্ত মেঠো রাস্তা...সুবিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে বন হয়ে আছে পথের দু'পাশ...গিরিখাত মাঝে মাঝে।

সেই পথেরই একস্থানে গাড়ি এসে থামবে।

সাহিত্যিক তাঁর অতিথিদের চিনিয়ে দেবেন জায়গাটা, এখানে এই টিলাগুলোর তলায় আমার বন্ধুরা ঘুমিয়ে আছে, আমার কমরেডরা।

অতিথিরা স্থির হয়ে দাঁড়াবে মাথা নীচু করে।

জীবনের দক্ষ রূপকার নীচু হয়ে একগোছা বুনো ফুল তুলবেন নিজে হাতে, প্রত্যেকের হাতে দেবেন একটা করে।

—এ ফুল শুকোয় না কোনদিন। নিস্তব্ধ সেই প্রকৃতির রাজ্যে ধীর শান্ত কণ্ঠ আবার শোনা যাবে, ধীরপ্রবাহিনী ডনের গভীরতার স্পর্শ বুঝি তাতে।—প্রয়াসী

সাহিত্য পরিচয়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত / ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—গদ্য সংস্করণ মধ্যলীলা (১) ও (২) ও অন্ত্যলীলা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রী— একটি বিখ্যাত গ্রন্থ, বস্তুত ভক্ত বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত এই উভয়বিধ পাঠকের কাছেই এ গ্রন্থের মূল্য অসীম, এই গ্রন্থের সর্বজনবোধ্য ভাষায় সরল গদ্যানুবাদ করে অনুবাদক বহুজনের কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেন। মূলগ্রন্থ পয়ার ছন্দে লিখিত বলে তার মাঝে কিছু কিছু দুর্বোধ্যতা আছে

প্রকাশ করেছেন, পয়ারগুলিকে সাবলীল বাংলা গদ্যে অনুবাদ করে তৎসহ টীকা-টিপ্পনী। যোগ করে মনোরম করে তুলেছেন, তাঁর শৈলী এতই স্বচ্ছন্দ যে, অতি সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী পাঠকও অবলীলাক্রমে এই মহৎ গ্রন্থের রসগ্রহণ করতে সক্ষম হন। শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রাক্-সন্ন্যাস-গৃহজীবনকে আদিলীলা ও উত্তর-সন্ন্যাস-জীবনকে শেষলীলা বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, শেষলীলা আবার দুই ভাগে বিভক্ত মধ্য ও অন্ত্য, বর্তমান গ্রন্থগুলি এই মধ্য ও অন্ত্যলীলার পর্যায়ভুক্ত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু চব্বিশ বছর প্রকট ছিলেন, এর প্রথম ছয় বৎসর কালকে মধ্যলীলা কাল ও বাকি আঠারো বৎসরকে অন্ত্যলীলা কাল বলে অভিহিত করা হয়; এই চব্বিশ বছর শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যেভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন, যেভাবে ধর্মশিক্ষা প্রদান করেছেন, তার মধুর ও পূত কাহিনী অনুবাদকের আন্তরিকতায় যেন জীবন্ত হয়ে ধরা দেয় পাঠকের মননে। মহাপ্রভুর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের জীবনকথা ও কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশিত; সেইসঙ্গে রয়েছে বহু কৌতূহলোদ্দীপক লোকশ্রুতি ও গাথা। একদিন যাঁর কল্যাণে সমগ্র বাংলায় ভক্তি ও প্রেমরসের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল তাঁর অপূর্ব দিব্যজীবন-কথাকে সাধারণ বাঙালীর আঙিনায় পৌঁছে দিয়ে অনুবাদক এক পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনের পুণ্য লাভ করলেন। যাতে 'শান্তিপুর ডুব ডুবু, নদে ভেসে যায়' তার মহিমা বাঙালী পাঠক অতি সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে সত্যই ধন্য হলেন। এই গ্রন্থাবলীর প্রকাশক ও অনুবাদক উভয়ত আমাদের তথা সমগ্র বাঙালী ভক্তজনের প্রভূত সাধুবাদের অধিকারী; আমরা এই মহৎ অনুবাদকর্মের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। গ্রন্থগুলির প্রচ্ছদ সজ্জা অতি মনোরম, অপরাপর আঙ্গিকও ত্রুটিহীন। মূল লেখক—শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ, অনুবাদক—শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রকাশক—শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুপ্রীতি ভবন, রিলবং, শিলং সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং, দাম—যথাক্রমে মধ্যলীলা (১)—সাত টাকা; মধ্যলীলা (২)—ছয় টাকা ও অন্ত্যলীলা—সাত টাকা।

বাংলা কাব্যপ্রবাহ / রূপা অ্যাণ্ড কোং

বাংলা কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে আজ অবধি যথেষ্ট গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে বটে কিন্তু ঠিক এ ধরণের সর্বাঙ্গসুন্দর কোন সমালোচন গ্রন্থ লেখবার প্রচেষ্টা বিরল, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে গ্রন্থকার একটি বিশেষ অভাব মোচন করেছেন।—প্রাচীন বাংলায় প্রথম কাব্য-সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে চর্যাপদের মাধ্যমে। এ গ্রন্থে সেই যুগ থেকে কবি ভারতচন্দ্র অবধি যে কাব্যযুগ, তারই এক ধারাবাহিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে।—প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল সীমা পর্যন্ত যে যুগ বাংলা কাব্য-সাহিত্যের এ ইতিহাস তার মধ্যেই সীমিত, বলা বাহুল্য আধুনিক কালের কাব্য-সাহিত্য এই পরিক্রমার অন্তর্গত নয়, যার জন্য এ রচনাকে সামগ্রিকভাবে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস বলা সম্ভব নয়।—লেখক যে যুগের কাব্যধারাকে বিশ্লেষণ করেছেন, তার মধ্যে এমন সব রচনাকেই বেছে নিয়েছেন—যার মধ্যে বিশেষভাবে বাঙলারই বৈশিষ্ট্য প্রকট এবং সেজন্যই তাঁর রচনা সর্বতোভাবেই বাংলা ও বাঙালীর নিজস্ব পটভূমিকেই প্রকাশ করে।—আলোচ্য কাব্য-সমালোচনা গ্রন্থটিকেও সেজন্যই বাংলার কাব্য-প্রবাহের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভূমিকাস্বরূপই উল্লেখ করা চলে।—বাংলার কাব্য-সাহিত্যে বাঙালীর যে প্রাণসত্তা নিত্য প্রবহমান, নিপুণ বিশ্লেষণে সেটাকেই যেন তুলে ধরেছেন লেখক পাঠক মননে।—সাহিত্য-জিজ্ঞাসু ও সাহিত্য-শিক্ষার্থী এই উভয়বিধ পাঠকই বর্তমান গ্রন্থটি পাঠে উপকৃত হবেন।—বাংলা প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন।—প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ।—লেখক—চিত্তরঞ্জন মাইতি, প্রকাশনায়—রূপা অ্যাণ্ড কোং, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দশ টাকা।

গুরুদেবের শান্তিনিকেতন / বুক্‌ল্যাণ্ড

বর্তমান গ্রন্থটিতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে সেকালের শান্তিনিকেতন ও তার পরিবেশ।—শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মৌলিক আদর্শ ছিল, তার যথাযথ রূপায়ণ ঘটে শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে। লেখক কর্মসূত্রে বহুদিন কাটিয়েছেন সেকালের শান্তিনিকেতনে, প্রত্যক্ষ করেছেন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে, উপলব্ধি করেছেন তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথাটিকে। এজন্যই তাঁর রচনা হয়ে উঠতে পেরেছে একাধারে প্রামাণ্য ও চিত্তাকর্ষক। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন এ দু'য়েরই একটি ছবি তুলে ধরতে পেরেছেন তিনি পাঠকের চোখে।—শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারত, যদি লেখক শৈলী সম্বন্ধে আর একটু সাবধান হতেন। ভাষার প্রসাদগুণে বঞ্চিত হওয়ার জন্যই যেন তাঁর বক্তব্য মাঝে মাঝে বেশ দুর্বল ঠেকে।—আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ।—লেখক—প্রফুল্লকুমার সরকার, প্রকাশক—বুক্‌ল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। দাম—তিন টাকা।

The Conscience of A Liberal / আত্মারাম অ্যাণ্ড সন্স

আলোচ্য গ্রন্থ শুধু এক বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরই স্বাক্ষর বহন করছে না; জাতির আদর্শ ও রাজনৈতিক চেতনায় লেখকের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাকেও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে। আজকের দুনিয়ায় বুদ্ধিবাদী ও চিন্তাশীল গণনায়করা যে পথ অবলম্বন করতে চাইছেন, তার আভাস বহুদিন পূর্বেই লেখকের মননে উঁকি দিয়েছিল আর সেই পথেই তিনি আজ পর্যন্ত সন্ধানকার্য চালিয়ে এসেছেন। কাজেই এ গ্রন্থে শুধু একটিমাত্র মানুষেরই রাজনৈতিক মতামত প্রতিফলিত হয় নি সমস্ত যুগচেতনাকেই মূর্ত করে তোলা হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে বর্ণবৈষম্য পর্যন্ত বহুবিধ সমস্যাকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখেছেন লেখক। মানুষের অগ্রগমনের পথে আজও যা বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে তার সবগুলির সম্বন্ধেই তিনি চিন্তা করেছেন, আর শুধু চিন্তা করেই নিরস্ত হন নি, সমাধানের পথও খুঁজেছেন। আজকের দুনিয়ার এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার অভিমতের সুস্পষ্ট দলিল স্বরূপ এই গ্রন্থ, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কাছে আদৃত; প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ গ্রন্থ শ্রীচেস্টার বোলসের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাসমূহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাবলী থেকে সঙ্কলিত এক সংগ্রহ, যাকে একটা অখণ্ড ও ধারাবাহিক পূর্ণতায় গ্রথিত করা হয়েছে। প্রচ্ছদ মনোরম, অপরাপর আঙ্গিক ত্রুটিহীন, লেখক চেস্টার বোলস্। সম্পাদক—হেনরী স্টীল কম্যাজর, প্রকাশনায়—আত্মারাম অ্যাণ্ড সন্স, বুকসেলার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, কাশ্মীরী গেট, দিল্লী—৬। দাম—নয় টাকা।

ভ্রাম্যমাণ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড

আলোচ্য গ্রন্থ দিলীপকুমারের বহুপূর্বে প্রকাশিত আর একটি রচনা 'ভ্রাম্যমাণের দিন পঞ্জিকা'র নবতম পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। লেখকের অধিকাংশ রচনার মতই এ রচনাও স্মৃতিচারণের ঢং-এ লেখা। বাংলা দেশে বর্তমানে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের যে জনপ্রিয়তা সর্বত্রেই চোখে পড়ে, পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে তা একরকম অভাবনীয়ই ছিল। মার্গসঙ্গীত তখনও সাধারণ বাঙালীর মনে কোন সাড়া জাগাতে পারে নি। মুষ্টিমেয় ধনী ও সৌখীন ব্যক্তির কাছেই তার তখন যা কিছু আদর-কদর। গৃহস্থ ভদ্রসন্তান যে আবার রাগসঙ্গীতকে জীবিকাস্বরূপও বরণ করতে পারে, একথা তখনও অকল্পনীয় সাধারণের পক্ষে। সেইসময় লেখক পরিব্রাজক হয়েছেন রাগসঙ্গীত শোনা ও

শেখার নেশায় ... হয়েছেন ভারতীয় রাগসঙ্গীতের প্রাণসত্তার সঙ্গে, কত বড় বড় গুণীর সংস্পর্শে এসেছেন, গান শুনেছেন প্রাণভরে। কলঙ্কের ভয় তুচ্ছ করে এমন সব স্থানে পদার্পণ করেছেন, যাতে অপযশ অর্জিত হয়েছে। কিন্তু গান তিনি শুনেছেন, শিখেছেন; কাঁটার ঘা খেয়ে সঙ্গীতের রক্তগোলাপ তাঁর মুঠোয় এসেছে, আঘ্রাণে ভরে গেছে চিত্ত, পূর্ণ হয়ে উঠেছে হৃদয়। আলোচ্য রচনা এরই স্মৃতিচারণ সঙ্গীতানুরাগী পাঠকমাত্রই যে এ রচনাকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। দিলীপকুমারের শৈলী স্বভাবতই আবেগপ্রবণ হলেও, তার এক অনুপম মাধুর্য আছে, সুন্দর সুন্দর শব্দচয়ন করে তিনি ভাষার মালা গাঁথেন; কাব্য ঝঙ্কৃত মধুস্বনা এই ভাষার প্রসাদে তাঁর বক্তব্যও হয়ে ওঠে রূপকথারই মত অপরূপ। আলোচ্য গ্রন্থেও এর স্বাক্ষর মিলবে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—দিলীপকুমার রায়। প্রকাশনায়—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম—সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক / পূর্বাচল প্রকাশনী

শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষের ক'দিনের এক আকর্ষণীয় রোজনামচা এই গ্রন্থ। লেখক শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এই দিকপাল কথা-সাহিত্যিকের জীবনের শেষ ক'টা দিন তাঁর সান্নিধ্যে কাটানোর সুযোগ পেয়েছিলেন লেখক। আলোচ্য রচনায় তারই স্মৃতিচারণ করেছেন। লেখকের শৈলী এতই সাবলীল যে, ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের এক পরিচ্ছন্ন পরিচয় বিধৃত হয়েছে তাঁর রচনায়। শরৎচন্দ্রের খেয়ালী ও উদাসীন মানসিকতা বড় সুন্দরভাবেই প্রকাশ পেয়েছে টুকরো টুকরো কথা ও দৈনন্দিন ছোট-খাট ঘটনার মাধ্যমে। মানুষ শরৎচন্দ্র যেন একেবারে কাছটিতে এসে ধরা দেন। রোগযন্ত্রণার যে বিবরণ লেখক দিয়েছেন, তাতে হৃদয় বেদনা-বিধুর হয়ে ওঠে, সব মিলিয়ে যে ছবিটি তিনি এঁকেছেন, তা যেমন মর্মস্পর্শী তেমনই প্রাণবন্ত। অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিকের জীবনের শেষ ক'টা দিনের এই ছবি তাঁর অনুরাগী পাঠকবৃন্দকে একাধারে অভিভূত ও আনন্দিত করে তুলবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—পূর্বাচল প্রকাশনী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

রম্যাণি বীক্ষ্য / হিমাচল পর্ব (এ মুখার্জী)

আলোচ্য গ্রন্থ লেখকের এই পর্যায়ের ...

মহাভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্তে, আর ভ্রমণের সেই অভিজ্ঞতাকেই উপস্থিত করেছেন রেখার বাঁধনে বেঁধে। এই পর্বে পূর্ব পাঞ্জাবের কাহিনী বিবৃত হয়েছে, সেইসঙ্গে হিমালয় উপত্যকারও। বস্তুত হিমাচল প্রদেশের কাহিনীই প্রধান ভূমিকার অধিকারী ব'লে এর নাম হিমাচল পর্ব। লেখক দেশভ্রমণ করেছেন, ট্যুরিস্টের সন্ধানী চোখ নিয়ে নয়, দার্শনিকের মেজাজ নিয়ে। তাই তাঁর বিষয়বস্তুতেও নেই গতানুগতিক ভ্রমণকারীর বৈশিষ্ট্যহীনতা। ভারতের জলবায়ুর বিশ্লেষণ না করে তিনি চেয়েছেন ভারত আত্মার মর্মোদ্ধার করতে, সেইসঙ্গে মানুষের ইতিকথা প্রণয়ন করতে, তাই তাঁর কাহিনী এত বিচিত্র, এত জীবন্ত। এক অদম্য কৌতূহল পাঠককে টেনে নিয়ে যায় গ্রন্থসমাপ্তির মুহূর্ত পর্যন্ত, ভাল রচনা বললেই তাই শুধু এ রচনার পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নয়, ভালোলাগার মত রচনা হয়েই এর সার্থকতা। লেখকের শৈলী অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সাবলীল। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী, প্রকাশক—এ, মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—আট টাকা।

কণ্ঠস্বর / গ্রন্থজগৎ

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য-সংকলন। কবির স্বরচিত মোট সাতান্নটি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে এই সংকলনে। বেশ একটা সহজ অথচ সাবলীল সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায় কবিতাগুলির মাঝে। কয়েকটি কবিতার মাঝে লিরিকের ব্যঞ্জনা খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত 'তুমি এলে' কবিতাটি উল্লেখ্য বিশেষভাবেই। কয়েকটি কবিতার ভাব কঠিন শব্দের প্রাচীরে বাধাপ্রাপ্ত। এসব ক্ষেত্রে কবি শব্দচয়নে আর একটু সাবধান হতে পারতেন। সে যাই হোক আধুনিক কবিতাপ্রিয় পাঠক এ কাব্য-সংকলনটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই মনে হয়। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—মুকুল গুহ। প্রকাশক—গ্রন্থজগৎ, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

রাধা-মদনমোহন / আর কে পাবলিশিং কোং

আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনী কিম্বদন্তীমূলক। বেশিদূর নয়, এই শহর কলকাতারই এক অঞ্চল বাগবাজার, যেখানে আজও সগৌরবে বিরাজিত, বাগবাজারের বিখ্যাত মিত্র-বংশের কুলদেবতা 'মদনমোহন'। বর্তমান গ্রন্থেরও মূল উপজীব্য এই বিগ্রহ। প্রায় আড়াইশো বছর আগে, বাগবাজারের স্বনামধন্য ৺শ্রীগোকুল মিত্র প্রতিষ্ঠা করলেন মদনমোহনকে বিশাল মন্দির নির্মাণ করে। তার আগে এ বিগ্রহ ছিলেন বিষ্ণুপুরে। সে যাই হোক, কিম্বদন্তী আজও হন ৺গোকুল মিত্রের সেবায় তুষ্ট হয়ে ও লীলাসঙ্গিনীরূপে বেছে নেন মিত্রজার অনিন্দ্য-সুন্দরী বিধবা কন্যা রাধাকে। এই রাধাই সেই রাধা, যিনি আজ বিরাজ করছেন শ্রীবিগ্রহের পাশে, স্বপ্নে আদেশ পেয়েই নাকি ৺গোকুল মিত্র স্বীয় কন্যার অনুরূপ মূর্তিরূপে রাধারাণীর মূর্তিটি প্রস্তুত করান। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কাহিনীটি সবিস্তারে বিবৃত করেছেন, লেখক নিজে মিত্র বংশজ ও বর্তমানে রাধা-মদনমোহনের সেবায়েত সেজন্যই তাঁর রচনা তথ্যনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে, সেই সঙ্গে রয়েছে সেকালের কলকাতার সাহিত্য তথা কবিওয়ালা, পক্ষীর লড়াই, হাফ্-আখড়াই প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সন্ধানী ও ধর্মপ্রাণ এই উভয়বিধ পাঠকের কাছেই আলোচ্য রচনাটি মূল্যবান বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। আমরা এ বই পড়ে সত্যই আনন্দিত হয়েছি। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র। প্রকাশনায়—আর কে পাবলিশিং কোং। ১১-এ, গোকুল মিত্র লেন, মদনমোহনতলা, কলিকাতা-৫। দাম—পাঁচ টাকা।

Chandi's The Third Eye View / ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়

কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনে আলোচ্য গ্রন্থ লেখকের দক্ষতা সর্বত্র স্বীকৃত, শুধু এদেশেই নয় বিদেশেও তাঁহার নাম সুপরিচিত। বর্তমান গ্রন্থ নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার কার্টুন সমূহের এক সুন্দর সঙ্কলন। আলোচ্য কার্টুনগুলি শুধু চিত্রধর্মীই নয় সম্পূর্ণরূপেই সমান সচেতন, অর্থাৎ সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের এক পরিচ্ছন্ন আভাসে সমুজ্জ্বল, আর সে জন্যই এই ব্যঙ্গচিত্র সংকলনটিকে শুধু উপভোগ্য না বলে মূল্যবান বলাই সঙ্গত। আমরা এ গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। গ্রন্থটির আঙ্গিক মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী, প্রকাশক—ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ৬/১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২। দাম—পাঁচ টাকা।

New Steps / শিশুসাহিত্য সংসদ

আলোচ্য রচনাটি শিশুপাঠ্য, শিশুদের উপযোগী ইংরাজী বর্ণমালার অবশ্য অভাব নেই কিন্তু ঠিক এই ধরণের একটি সচিত্র বর্ণপরিচয় বড় একটা চোখে পড়ে না। এতে শুধু ইংরাজী বর্ণমালারই পরিচয় প্রদত্ত হয় নি, তাদের নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করতেও শেখানো হয়েছে।—বিদেশী ভাষায় ঘরের ছেলেমেয়েদের হাতেখড়ি দিতে বর্তমান পুস্তকটি বিশেষ সহায়তা করবে বলেই মনে হয়।—বইটির আঙ্গিকও আকর্ষণীয়।—লেখিকা—সুখলতা রাও, প্রকাশনায়—শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

● নিকোলাস-পুত্র বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী স্ভেটোস্লাভ রোয়েরিক

শিল্পী ও দার্শনিক নিকোলাস রোয়েরিক

[৯ই অক্টোবর অধ্যাপক নিকোলাস রোয়েরিকের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্ভেটোস্লাভ রোয়েরিকের বেতার ভাষণ]
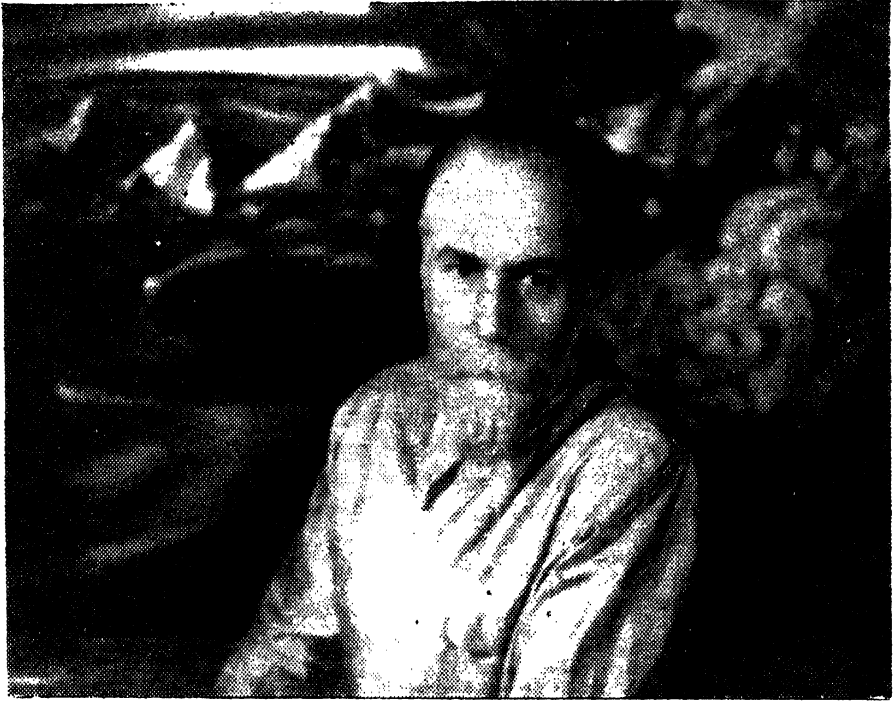
কুলু উপত্যকার প্রাচীন নাম কুলুতা, এই উপত্যকার শ্যামলাঞ্চলে অবস্থিত নাগর একটি ছোট্ট গ্রাম। সম্মুখে ধ্যানমগ্ন তুষারমৌলি গিরিশৃঙ্গ, এখানে দেওদার ও ঘন পাইনবনের আড়ালে একটি বড় চতুষ্কোণ স্মৃতিস্তম্ভ চোখে পড়ে। তাতে লেখা—

—'১৯৪৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর এখানে ভারতের মহান রুশীবন্ধু নিকোলাস রোয়েরিকের নশ্বরদেহ সমাহিত হয়েছে—এখানে শান্তি বিরাজ করুক।'

খেয়ালি প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া প্রায় চতুষ্কোণাকৃতি এই স্মৃতিস্তম্ভ এক পুণ্যপীঠরূপে বন্দিত। মনে হয় নিকটস্থ গিরিগাত্রচ্যুত এই প্রস্তরখণ্ড যেখানে হিমালয়ের চারণকবি মহানিদ্রাবৃত যেখানে তাঁর নশ্বরদেহ

আজ ৯ই অক্টোবর আমার স্বর্গত পিতা নিকোলাস রোয়েরিকের ৯০তম জন্মদিবস, এই পুণ্যদিনে আমি তাঁর সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলতে চাই।

পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আমার পিতৃদেবের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করে বলেছিলেন—

'যখন আমি নিকোলাস রোয়েরিকের কথা ভাবি, তাঁর বহুমুখী কার্যকলাপ এবং বিচিত্র সৃজনী প্রতিভা আমাকে বিস্ময়াভিভূত করে। মহানশিল্পী মনীষী ও লেখক, খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক ও আবিষ্কারক হিসাবে তিনি তাঁর মনীষার দীপ্তিতে মানুষের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টাকে আলোকিত করে গেছেন। তাঁর শিল্পকর্ম সংখ্যায় বিপুল। হাজার হাজার ছবি তিনি এঁকেছেন এবং প্রত্যেকটিই অনবদ্য।

পর্বতমালার আত্মিক রূপটি সুপরিস্ফুট, আমাদের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মূল বিষয়বস্তু যে নিপুণ তুলিকায় নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে তা শুধু অতীতের নয়, ভারতের চিরকালীন শাশ্বত সম্পদের কথা স্মরণে থাকে। নিকোলাস রোয়েরিক তাঁর চিত্রকলায় এই মহৎ ভাবটি সুন্দর করে পরিস্ফুট করেছেন, তাই তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারি না।

যে মানুষ এমনি এক লোকোত্তর জীবনযাপন করে গেছেন এবং একটি বিরাট উত্তরাধিকার রেখে গেছেন—এই সংক্ষিপ্ত বেতার ভাষণে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য, তাই আমি শুধু তাঁর জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করবো।

আমার পিতৃদেবের কথা যখনই মনে পড়ে তাঁর শুধু স্মিত প্রশান্ত মুখখানি···সর্বাগে আমার সামনে ভেসে ওঠে। তাঁর জ্ঞানদীপ্ত চক্ষু, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। তাঁর স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজে, আমি একদিনও তাঁকে কড়া কথা বলতে শুনি নি। তাঁর প্রসন্ন মুখ মানসিক শান্তি ও চারিত্রিক আদর্শের প্রতিচ্ছবি। পিতৃদেবের কঠোরে কোমলে মিশ্রিত ব্যক্তিত্ব, রস-স্নিগ্ধ মননশীলতা তাঁকে উন্নত জীবনবোধে প্রদীপ্ত করেছিল। তাঁর আবার আবরণেও একটা সুঠাম সামঞ্জস্য ছিল। কখনও কোন বিষয়ে তিনি তাড়াহুড়ো করেন নি। তবু তাঁর সৃষ্টিসংখ্যা বিপুল, যখন তিনি ছবি আঁকতে বা লিখতে বসছেন বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়েই তিনি বসছেন। গোটা গোটা করে বড় বড় অক্ষরে তাঁর লেখা কোনদিন তিনি কাটতেন না বা কোন অংশ তিনি সংশোধন করতেন না, তাঁর সমস্ত সৃষ্টি এবং ভাবধারা যেন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন ধারায় উৎসরিত ছিল, পিতৃদেবকে কখনও ধৈর্যচ্যুত হতে দেখা যায় নি, চরম বিপদের মুহূর্তেও তিনি অবিচলিত থাকতেন।

ছাত্র-জীবনের শুরু থেকেই তিনি ইতালীর নব জাগরণের মহানায়ক লিওনার্ড দ্য ভিঞ্চি ও মাইকেল এঞ্জেলোর মতবাদের সাথে পরিচিত হন, সত্য ও সুন্দরের সাধনা ও সেবাবলে অনুপ্রাণিত হয়ে তরুণ রোয়েরিক এই মহানায়কদের চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে লিখতে আরম্ভ করেন।

১৮৭৫ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ-এর এক বনেদী স্কেণ্ডিনেভীয় পরিবারে রোয়েরিকের জন্ম। একই সঙ্গে তিনি ললিতকলা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগীয় বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। এমন কি পিতার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি আইন অধ্যয়ন করেন। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ছিল অদম্য এবং স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে একবার যা শুনতেন তা কোনদিন ভুলতেন না।

● স্বর্গত নেহরু এবং শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক
(কুলু, মে ১৯৪২)

মাত্র আঠারো বছর বয়সেই তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধান শুরু করেন। যে ৪৩ বছর তিনি রাশিয়ায় ছিলেন তা তাঁর অসামান্য ত্যাগ ও কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। শিল্পকলা ও অন্যান্য বিষয়ের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব তাঁকে বহন করতে হয়েছিল। এ ছাড়া নানান ধরণের সংস্থা ও সংগঠন তিনি গড়ে তুলেছিলেন এবং নানা রকমের কাজ-কর্মে তাঁকে জড়িত থাকতে হয়েছিল। এত সমস্ত করেও তিনি হাজার হাজার ছবি এঁকেছেন। বহু জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের ও গীর্জার প্রাচীর-গাত্রের নক্সা ও মেজের অলঙ্করণ, এমন কি অনেক অভিনয় মঞ্চ ও কক্ষের নক্সা ও সাজসজ্জা পর্যন্ত তাঁকে করে দিতে হয়েছে, পিতৃদেব শিল্পকলা ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধ, ছোট গল্প, রূপকথা ও কবিতা তিনি লিখতেন, আবার গবেষণাও করতেন প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস আর শিল্পকলা সম্পর্কে। এ-সব বাদে

আবার মূল্যবান চিত্র ও শিল্পকলা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য তাঁকে অনেক সময় দিতে হ'তো। রোয়েরিকের আঁকা প্যারিসের কয়েকটি বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চের নক্সা আজ 'ক্লাসিকের' পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

দুঃখের কথা, প্রাচীরগাত্রে ও দেওয়ালে তাঁর আঁকা নক্সাগুলির অধিকাংশই যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। কোন রকমে যে ক'টি টিকে গেছল সেগুলির পুনঃ-সংস্কার করা হয়েছে, আমার পিতার খ্যাতি অল্পবয়স থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল, ফলে তিনি যখন বিশ্বভ্রমণে বেরুলেন তখন সর্বত্রই তিনি সমাদৃত হয়েছিলেন।

প্রাচ্য-দর্শনের প্রতি পিতৃদেবের আকর্ষণ আশৈশব। এই শতাব্দীর প্রথম দিকেই রাশিয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ হয়। লিথুয়ানিয়ান কবি বালটিক সাইকিয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন, এই সময় খ্যাতনামা রুশ-শিল্পী পলুবেভের উদ্যোগে প্যারিসে ভারতীয় চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ঐ প্রদর্শনীতে পিতৃদেব একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান। তার শেষে তিনি লিখেছিলেন :—

'Beauty still lives in India.
Beckons to us.
The great Indian path.'

পরবর্তীকালে এই 'পথ'ই আমার পিতাকে ও তাঁর মাধ্যমে অন্যান্য শিল্পরসিকদের সুন্দর দেশ ও এর হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ছবি আঁকবার দুর্বার আকর্ষণে আমার পিতৃদেবের মনকে টেনেছিল। তাঁর আত্মানুসন্ধানের যে নিরবচ্ছিন্ন পটভূমিকা গড়ে উঠেছিল সে তাঁর প্রাচ্য-দর্শন অনুশীলনের ফল। এই আত্মানুসন্ধান পিতৃদেবের সমগ্র জীবন একটি স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছিল।

এখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তিনি যা খুঁজেছিলেন তা পেয়েছিলেন কি? হ্যাঁ, হাজার বার বলবো হ্যাঁ। জীবনের অন্তরলোকে যে রসরূপকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তা তাঁকে অনির্বচনীয় আনন্দলোকে উত্তরণ করেছিল।

কেবল রাশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা নয়, এশিয়া এমন কি মধ্য এশিয়া অতিক্রম করে তিনি মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, চীন ও জাপান পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। এজন্য বহু দুঃখ-কষ্ট তাঁকে বরণ করতে হয়েছে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে, একবার একটি পার্বত্য পথ অতিক্রম করতে গিয়ে সরকারী কর্মচারীদের হাতে তাঁকে ভীষণ দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল। মাঝপথে তারা এই যাত্রীদলকে আটকিয়ে রাখে। ১৬ হাজার ফুট উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে তাঁকে শীতবস্ত্র ছাড়া সারা শীতকালটা কাটাতে হয় প্রচণ্ড শীতে আর খাদ্যাভাবে তাঁদের সঙ্গের ভারবাহী পশুগুলি সব ক'টিই মারা যায়। এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও আমার পিতা তাঁর গবেষণা চালিয়ে গেছেন। সুন্দর সুন্দর ছবিও এঁকেছেন।

আমার মা ছিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গিনী। তিনিও ছিলেন দর্শনের ছাত্রী। অনেক বইও তিনি লিখেছেন। পিতৃদেবের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার তিনি অংশভাগিনী ছিলেন। তাঁর অনেক ভাবকল্পনা পিতার তুলির টানে অমর হয়ে আছে। পিতৃদেব তাঁর অনেকগুলি বইও মার নামে উৎসর্গ করেছেন।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার মূল উৎসের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটেছিল। সারা ভারতবর্ষ এবং হিমালয়ের সমস্ত অঞ্চল তিনি ঘুরে দেখার পর কুলু উপত্যকায় বসবাসের সিদ্ধান্ত করেন। ১৯৪৭ সালে জীবনের অন্তিমমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এখানেই কাটিয়েছেন। রুশ-ভারত সম্পর্ক কি করে ঘনিষ্ঠতর করে তোলা যায় এই চিন্তাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড়। মঙ্গোলিয়া সফরের সময় ভারত সম্পর্কে এক প্রবন্ধের শেষে তিনি লিখেছিলেন :—

'হে সুন্দরী ভারত, তোমার প্রাচীন নগর মন্দির, পথ-প্রান্তর, তোমার পবিত্র নদ-নদী ও হিমগিরি তুমি যে উদার মহত্বে সঞ্জীবিত করে রেখেছ সেজন্য তোমায় জানাই আমার আন্তর প্রণতি।'

শিল্পী হিসাবে রোয়েরিকের একটি নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গী রয়েছে। তিনি ছিলেন রংয়ের যাদুকর। তাঁর মন যে বিচিত্রচিত্র কল্পনার জাল বুনে চলতো তার ওপর বিচিত্র রং ফলিয়ে তিনি ছবি এঁকে চলতেন। বিখ্যাত রূপ-সাহিত্যিক গোর্কি তাঁকে 'সেরা সহজদ্রষ্টা' বলে ডাকতেন, লিওনিড এণ্ডরুজ তাঁর চিত্রকলাকে 'রোয়েরিকের বাস্তব দর্শন' বলে অভিহিত করেছেন।

১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতৃদেবকে লিখেছিলেন, 'আপনার আঁকা ছবিগুলি আমাকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে, একটা জিনিস আমি এগুলির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যা সুস্পষ্ট হলেও বারম্বার উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। সে হচ্ছে—সত্য, অসীম ও অনন্ত। আপনার ছবিগুলি নিখুঁত, কিন্তু ভাষায় তার ব্যাখ্যা চলে না। আপনার শিল্পকলা তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল।'

যুদ্ধের ধ্বংসলীলার হাত থেকে সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ যাতে রক্ষা পায় সেজন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে রোয়েরিকের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই চুক্তি পিতার জীবিত থাকার সময়েই 'রোয়েরিক চুক্তি' খ্যাতিলাভ করেছিল। ১৯৫৪ সালে হেগ-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যে চুক্তি

স্বাক্ষরিত হয় সেটি মূলত ঐ রোয়েরিক-চুক্তির ভিত্তিতেই রচিত।

পিতৃদেবের গ্রন্থাবলীর একটি বিরাট তালিকা রয়েছে। এক ডজনের বেশি মনোগ্রাফও হয়েছে। এ ছাড়া বহু খ্যাতনামা লেখক, সাহিত্যিক, সমালোচক পিতৃদেবের চিত্রকলা ও রচনার উপর শত শত প্রবন্ধ লিখেছেন। পিতৃদেবের অপ্রকাশিত অনেক পুস্তক প্রকাশনের তোড়জোড়ও চলছে। একটি সংকলন সোভিয়েট ইউনিয়নে সদ্য প্রকাশিত হয়েছে।

জীবদ্দশাতেই তাঁকে বহু দেশ সম্মানিত করেছে। কয়েকটি দেশের সর্বোচ্চ সম্মানেও তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে। প্রায় ছয়টিরও অধিক একাডেমীর তিনি 'ফেলো' ছিলেন। এ ছাড়া নানা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, প্রেসিডেন্ট ও সদস্য ছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে তাঁর চিত্রকলা ও রচনা। তাঁর রচনা ২৭টি খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বহু রচনা এখনও অপ্রকাশিত থেকে গেছে। তাঁর বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে :—Collected Works,' 'Flame in Chalice,' 'Altai Himalaya,' 'Heart of Asia,' Realm of Light,' 'Fiery Stronghold' 'Shambhala' 'Paths of Blessings,' Gates into the Future,' 'Himalayas—Abode of Light.

রোয়েরিকের ৭ হাজারেরও বেশি ছবি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যাদুঘরে এবং শিল্পরসিক লোকের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে আছে। ভারতেও তাঁর অনেক ছবি আছে। কাশী, ত্রিবান্দ্রম ও এলাহাবাদের যাদুঘরে স্বতন্ত্র কক্ষে তাঁর ছবি সংরক্ষিত হয়েছে। চণ্ডীগড় যাদুঘরেও স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

পিতৃদেবের সমগ্র জীবনকে একটি 'নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধিৎসা' বলা যায়, এই অনুসন্ধিৎসার মূল লক্ষ্য ছিল জ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি, সৃজনধর্মী কার্যকলাপ ও সেবার মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন।

শৈশবেই তিনি এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শ্রমের মাধ্যমে পবিত্রতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন করা যায়। সচেতন কর্মের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাঁর মতে কোন কাজকে সুন্দরতর ও নিখুঁত করে তোলার ইচ্ছা ও একাগ্রতা আমাদের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে। এই পূর্ণতার সন্ধান, নিখুঁত প্রকাশের আকুলতা, কর্মসাধনার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ—এই সব মিলিয়াই আমার পিতৃদেবের জীবনদর্শন। 'কর্ম ব্যতীত বিশ্বাস প্রাণহীন'। হাতুড়ির ক্রমাগত আঘাতে জড় ধাতুকেও ইচ্ছানুযায়ী রূপ দেওয়া যায়। নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, কর্ম ও ধৈর্য এই কয়টি গুণ আমার পিতা শিশুকাল থেকেই অনুশীলন শুরু করেন, ফলে প্রত্যেকটি কাজে তিনি দৃঢ় মনোবল ও বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতেন এবং সাফল্যও অর্জন করতেন।

'সৌন্দর্যে আমরা এক
আমরা উপাসনা করি সুন্দরের
জয়ী হই সৌন্দর্যে।'

ওগো মানস-কন্যা

সাধন চৌধুরী

মুকুলের মতো মুদিয়া নয়নতারা—
নির্ঝর সম কেন ফেল শুধু অজস্র অশ্রুধারা ?
দীর্ঘশ্বাসে দিন যদি হয় শেষ,
অনুরাগে যদি না রচ স্বর্গ প্রিয়তর পরিবেশ—
মৌমাছির মতো মধু খুঁজে খুঁজে আমি আর কতকাল
মন-মৌচাকে রচিব স্বপ্নজাল !
তুমি সোহাগের স্বর্ণচাঁপা বাসনায় কর বাস ;
আমার ললাটে তোমার উষ্ণশ্বাস
প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি অনুভূতি-উত্তাপে,—
উন্মনা মন মুখোমুখি হলে মধু-মর্মরে কাঁপে !
ওগো স্বপ্নের সঙ্গিনী,
তব করতলে কামনার কিঙ্কিণী
কেবল বুঝি ললিত লগ্নে বাজে—
সুখ-তৃষ্ণার সফল সাধনা মাঝে।
আঁখির অতলে ক্ষণ-বেদনার রক্তিম মধুরিমা
তপ্ত তনুর তরঙ্গ-ভঙ্গিমা—
থরো থরো কাঁপে আজিকে অলকে-আড়ালে।
কেবল তোমায় বুঝি দেখা যায় বিলাস-বাসরে দাঁড়ালে।
আগুনের মতো দহন জ্বালায় আমি করি হাহাকার ;
ঝঞ্ঝার মতো আবেগের বেগে ভাঙ্গিয়া তোমার দ্বার—
ওগো মানস-কন্যা,
তটিনীর মতো পাঠাবারে চাই মোর অনুরাগ-বন্যা।

রুদ্রবীণা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রভাকর সেন

বীণ্-এ প্রায় পঞ্চাশৎ বিভক্ত অংশ থাকে, এই সমস্ত অংশ যুক্ত হলে বীণ্-এর আকৃতি পূর্ণরূপ ধারণ করে। রুদ্রবীণার দণ্ডটি প্রায় দুইহাত কিংবা আড়াইহাত লম্বা। দণ্ডটি উৎকৃষ্ট বংশ-নির্মিত। উত্তম বংশের অভাবে উৎকৃষ্ট কাঠও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দণ্ডের দুইপাশে দু'টি বৃহৎ লাউ (লাউয়ের খোল) থাকে। সাধারণত লাউ দু'টি কারুকার্যমণ্ডিত থাকে। দণ্ডের নিম্নাংশে ময়ূরের ঊর্ধ্বাংশের প্রতিমূর্তি এবং দণ্ডের উপরিভাগে বীণ্-এর তারের কানগুলি অবস্থিত। কোন কোন বীণ্-এ ময়ূরের প্রতিমূর্তি সোনা বা রূপা-নির্মিত হয়। আবার বংশ-নির্মিত বা কাষ্ঠ-নির্মিত ময়ূরমূর্তিও কোন কোন বীণ্-এ থাকে। দণ্ডের সম্মুখভাগে প্রায় দ্বাবিংশতি সংখ্যক ঘাট বা সারিকা বা পর্দা থাকে। সারিকগুলি প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা। পর্দাগুলি কালো মোম দিয়ে দণ্ডের সঙ্গে লাগানো থাকে। দণ্ডের উপরের ভাগে পাচটি কান থাকে। ঐ কানগুলির তার নিম্নের ময়ূর প্রতিমূর্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে। দণ্ডের একপাশে কিছু ব্যবধানে দু'টি কান থাকে : এই তারগুলির নাম 'চিকারী।' বীণ্-এর তার সাধারণত পিতল, লোহা বা ইস্পাত ও অস্ত্র নির্মিত হয়।

রুদ্রবীণা যন্ত্রের বাদনপদ্ধতি অতি কঠিন। সঙ্গীত শাস্ত্রমতে বীণ্ বাদনে জীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। দক্ষিণহস্তের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দু'টিতে মিজ্রাব পরা হয় এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দু'টিতে নখ বৃদ্ধি করে, তার সাহায্যে চিকারীতে ঝঙ্কার সৃষ্টি করা হয়। শোনা যায়—পূর্বকালে আচার্যেরা মিজ্রাব ব্যবহার না করেই মাত্র অঙ্গুলির নখের সাহায্যে বীণ্ বাজাতেন। বামহস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিত্রয়ের ব্যবহার হয় স্বর উৎপন্ন করার জন্য। সারিকার উপর উক্ত অঙ্গুলির স্পর্শে সুর উৎপাদন করা হয়। এ ছাড়া বামহাতের বৃদ্ধ অঙ্গুলি বা অঙ্গুষ্ঠ অথবা কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দ্বারা ছড়ের তারে ঝঙ্কার উৎপন্ন করা হয়।

প্রথমে বীণ্-এর নিম্নস্থিত লাউটি ক্রোড়দেশে এবং উপরিস্থিত অপর লাউটি বামস্কন্ধে স্থাপন করতে হয়। ডান হাতের অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলির নখ দিয়ে চিকারীতে ঝঙ্কার দিতে হয়। বামহাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির সাহায্যে সারিকা বা ঘাটের উপর স্পর্শে, ঘর্ষণে, তার টেনে সুর উৎপন্ন করা হয়। পরন্তু, বাম-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কিংবা কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দিয়ে ছড়ের তারে ঝঙ্কার সৃষ্টি করা হয়।

রুদ্রবীণার চিকারীর তার যথাক্রমে মধ্য ও তার সপ্তকের ষড়জ সুরে বাঁধা থাকে এবং ছড়ের তারটিও মন্দ্রসপ্তকের ষড়জ সুরে বাঁধা থাকে। চিকারীর পরবর্তী তার মধ্য-সপ্তকের মধ্যম সুরে, পরবর্তী তার মন্দ্রসপ্তকের ষড়জ সুরে, তার পরেরটি অতিমন্দ্রপঞ্চম বা মধ্যম সুরে, পরবর্তী তার অতিমন্দ্রষড়জ সুরে বাঁধা থাকে। সব শেষেরটি ছড়ের তার। বীণ্-এ মোট চারটি তারে সুরঝঙ্কার ও তিনটি তারে কেবল ঝঙ্কার সৃষ্টি হয়। সরল কথায়, চিকারী ও ছড়ের তার ঝঙ্কারের তার ও অপর সকল তার বাজাবার তার।

বীণ্-এ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চার অংশে আলাপ বাজানোর পর মধ্য জোর (মাধ্), ঠৌক্, ঝালা, বোল্, পরণ্ বাজানো হয়। পরণ্ বাজাবার সময় পাখোয়াজ সঙ্গত করা হয়। বীণ্‌বাদন পদ্ধতি অত্যন্ত প্রণালীবদ্ধ।

স্মরণীয় বীণ্‌কারদের মধ্যে স্বামী হরিদাস, নায়ক বৈজু বাউরা, মহারাজা সমোখন সিংহ (সিংহলগড়), মিশ্র সিংহ (পরবর্তীকালে নবৎ খান নামে পরিচিত), নিয়ামৎ খান (শাহ সদারঙ্গ), শাহ নির্মল খান, ফিরোজ খান, জীবন শাহ,

লছমী প্রসাদ, মহম্মদ খান, ওয়ারিস্ আলি খান, মুশারফ্ আলি খান, উজীর খান প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য।

বীণ বাদনের উৎকর্ষসাধনে রাজা সমোখন সিংহ ও তস্য পুত্র মিশ্র সিংহ (নবৎ খান), নিয়ামৎ খান, শাহ নির্মল খান, ফিরোজ খান, মুশারফ্ আলি খান, উজীর খান প্রমুখ সঙ্গীত নায়কদের অবদান চিরস্মরণীয়।

হিন্দুযুগে বীণ্ (রুদ্রবীণা) ও বীণা (সরস্বতী বীণা) বাদন পদ্ধতিতে বহুল সাদৃশ্য ছিল। কণ্ঠসঙ্গীতকে মাত্র অনুসরণ করাই বীণ-এর কাজ ছিল। কিন্তু সঙ্গীতসিদ্ধ মহাপুরুষ স্বামী হরিদাস উত্তরভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষ আলোড়ন আনেন। তাঁর অনবদ্য অবদানে সঙ্গীতে শব্দ, ছন্দ ইত্যাদির বাহুল্যের পরিবর্তে স্বর-মাধুর্যের বিকাশ বিশেষরূপে বিকশিত হয়। তাঁর কৃপায় সুরলহরী অদ্ভুত আবহাওয়া সৃষ্টি করে জীবকুলকে বিশেষ মোহিত করে। তাঁর শিষ্যবৃন্দ তাঁর সৃষ্ট পথ অবলম্বন করে ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষ অধ্যায় যোজনা করেছেন। উপযুক্ত সঙ্গীত নায়কেরা নানাপ্রকার সুরের অলঙ্কার ও ছন্দ প্রকাশের অনুপম শৈলী উদ্ভাবন করে সেগুলি বীণযন্ত্রে প্রয়োগ করেন। ফলত বীণযন্ত্র স্বকীয়তায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু বীণা (সরস্বতী বীণা) সেই আদিকালের ঐতিহ্য রক্ষা করে আসছে।

সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, আদর্শ যন্ত্র রুদ্রবীণা যখন বাজে, তখন একটি গভীর গম্ভীর ভাব বিরাজ করে। বীণ শ্রোতাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্র মতে বীণ্ যদি নিখুঁতভাবে বাজানো যায়, তবে তাতে অনেক অলৌকিক ফল পাওয়া যায়। কথিত আছে—রামপুরের কোন নবাব পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর রাজবীণকার (court veenkar) দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়মিত জয়জয়ন্তী রাগ বাজিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলেন। নায়ক বৈজু বাউরা বনমধ্যে একান্তে বসে প্রদীপ রাগ বাজিয়ে হরিণ, শশক, পক্ষী ইত্যাদি প্রাণীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে আপনার সন্নিকটে রাখতেন। এ ছাড়া মেঘমল্লার বাদনে গগনে পুঞ্জীভূত মেঘ আনয়ন করে বৃষ্টি নামানোর কাহিনী ত' বহুপ্রচলিত।

বীণ বাদনে এই সব অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভব। এই ক্রিয়ার জন্য বিশেষ বিদ্যার প্রয়োজন। গুরু থেকে—শিষ্য, এইভাবে বিদ্যা দান করা হত। গুরু শিষ্য ভিন্ন অপর কাউকে এ বিশেষ বিদ্যা দিতেন না। সঙ্গীতসম্রাট মিঞা তানসেনের দৌহিত্রবংশ বীণ যন্ত্র বিশেষ চর্চা করেন ও উন্নতি সাধন করেন—এ সম্পর্কে আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বীণ্ বাদনের অধিকার একমাত্র তাঁদেরই পক্ষে বলবৎ হয়ে যায়। একমাত্র তানসেনজীর কন্যা বা দৌহিত্র বংশধর ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির বীণ্ বাদনের অধিকার নাই। পিতা

বি বি সি ইণ্ডিয়ান সার্ভিসের সদস্যবর্গ দণ্ডায়মান (বাম থেকে দক্ষিণে) বি রায়, এ হাসান, আর ভারতীয়, পি এল পাওহা, এ রামপাল। উপবিষ্ট (বাম থেকে দক্ষিণে) ভি আর কৃষ্ণমূর্তি, এম এন কাউল, ডি এইচ এ স্ট্রাইড, জি এস যোশী, জি সি কৌশিক।

এখানে গুরু এবং পুত্র এখানে শিষ্য। পিতা সমস্ত বিদ্যা পুত্রকে দিতেন। ফলাফল বিবেচনা করলে বলতে হবে—এই প্রথা ক্ষতিকারক। কারণ, পিতা তাঁর পুত্রকে সব বিদ্যা দান করবেন সত্য, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে পুত্র উপযুক্ত না হওয়ার দরুণ বিদ্যার অপব্যবহার হয়েছে। এক পিতার হয় তো চার পুত্র আছে, এমনও দেখা গিয়েছে যে, চার পুত্রই উপযুক্ত না-হওয়ায় যথাযথভাবে বিদ্যার সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। কিন্তু সে তুলনায় গুরু-শিষ্য প্রথা অনেক সফল বা উপকারী। গুরুর এক শিষ্য থাকত না; তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কোন একজন উপযুক্তকে প্রধান শিষ্যরূপে নির্বাচন করতেন। এক গুরুর শত শিষ্যের মধ্যে কোন না কোন শিষ্য উপযুক্ত থাকতই—এ ত' অতি স্বাভাবিক। কাজেই তাকেই সব বিদ্যা দান করাতে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এক পিতার অগণিত পুত্র থাকা সম্ভব নয়। অতএব সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করাতে সঙ্গীতের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সেই মহাবিদ্যা আজ লুপ্ত!

রেকর্ড-পরিচয়

এবার পূজায় হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও কলাম্বিয়া রেকর্ডে অনেক ভালো ভালো গান বেরিয়েছে, এখানে আমরা তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি:

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

এন্ ৮৩০৮৩—শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে দু'খানা দরদভরা আধুনিক গান—'কেন ডাকো তুমি মোরে' ও 'কী ভেবে আজ বলো না রঙ্গিণী।'

এন্ ৮৩০৮৪—'দুটি জলে ভেজা চোখ' ও 'আজ মনে হয়'

দু'খানি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

এন্ ৮৩০৮৬—'ঐ প্রজাপতি মন' এবং 'কত কাল আর কতদিন'—উৎপলা সেনের গাওয়া দু'খানি নতুন ধরণের আধুনিক গান।

এন্ ৮৩০৮৭—নির্মলেন্দু চৌধুরীর গাওয়া দু'খানি চমৎকার পল্লীগীতি—'আয়না দিয়ে দেখলাম রে' ও 'আমার ননদীরা কয়।'

এন্ ৮৩০৮৮—'হাতে হাতে সব হাতঘড়ি বাঁধা' ও 'সিঁড়ি উঠে গেছে ধাপে ধাপে'—অভিনব আঙ্গিকে রচিত আধুনিক গান দু'খানি গেয়েছেন—সুবীর সেন।

গান দু'খানি সন্তোষকুমার দে রচিত, উভয় গানই মাসিক বসুমতীতে পূর্বে কবিতা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

কলম্বিয়া

জীঈ ২৫১৮৭—'এমন মধুর ধ্বনি' ও 'ফুলেরই সাজ পরেছ আজ'—রাগপ্রধান ও আধুনিক গান—পরিবেশন করেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

জীঈ ২৫১৮৯—পান্নালাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে কান্তকবির দু'খানি বহুপ্রচলিত গান—'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছো' এবং 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব'—ভাব-ব্যঞ্জনায় অনবদ্য।

জীঈ ২৫১৯০—চাল তেল মাছের কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত 'প্রিয়া তোমায় কি লিখি' এবং বাপের মৃত্যুতে হঠাৎ বড়লোকের ফিল্ম ব্যবসার ভিত্তিতে 'হায় মোটা টাকা রেখে'—দু'খানি জনপ্রিয় গানের সুরে রচিত কৌতুক-গীতি দু'টি গেয়েছেন—মিণ্টু দাশগুপ্ত।

জীঈ ২৫১৯১—কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—'ঘোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর' ও 'আমি দ্বার খুলে আর রাখবো না'—একদা বহুলপ্রচারিত দু'খানি নজরুলগীতির সার্থক রূপায়ণ।

জীঈ ২৫১৯২—'পথে যেতে যেতে দেখেছি' ও 'পথ নির্জন চলো না এখন'—আধুনিক দু'খানি গান—গেয়েছেন মৃণাল চক্রবর্তী।

আমার কথা (১১৫)

প্রফুল্লকুমার দাস

রবীন্দ্রসঙ্গীতের দেশব্যাপী অনুশীলন ও সাধনার ইতিহাসে যে নেপথ্যচারীদের নাম বিশেষ উল্লেখ ও অকুণ্ঠ স্বীকৃতির সুযোগ্য দাবীদার—সেই গুণী ও কুশলীদের মধ্যে সঙ্গীতবিদ্ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাস অন্যতম।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ (জুন ১৯২২) সালে নোয়াখালিতে প্রফুল্লকুমারের জন্ম। আদিনিবাস ঢাকা। পিতৃদেবের নাম শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস। নোয়াখালিতেই বিদ্যালয়-জীবন অতিবাহিত হয়। ষোল বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু, ভাগ্য-দেবতা তাঁর ললাটে লিখে রেখেছেন অন্য লিখন। তাঁর জীবন-নদীর স্রোত অন্য ধারায় প্রবাহিত হবে তাঁর অবলম্বিত পথে। জীবনের পূর্ণতা নির্দিষ্ট নয়—তাই শেষ অবধি কলেজীপড়া অসমাপ্ত রেখেই এলেন শান্তিনিকেতনে, যোগ দিলেন সঙ্গীতভবনে। তাঁর জীবনের যাত্রাপথ এভাবে যদি পরিবর্তিত না হোত, তা হলে হয় তো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা যেমন বিরাট কোন শক্তির পরিচয় পেতাম তেমনই একজন সুদক্ষ, নিষ্ঠাবান ও দরদী সঙ্গীতশিক্ষককে এবং সঙ্গীতবিশারদকে পেতাম না।

প্রফুল্লকুমর দাস

প্রফুল্লকুমার নিজেও হয় তো কলেজে প্রবেশ করার পরও ভাবতে পারেন নি যে, অল্পকালের মধ্যেই এক বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হবে। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, প্রফুল্লকুমারের জীবনের মধ্যেই এই শাশ্বত মহান সত্যটি আর একবার প্রকটিত হল।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনে এলেন প্রফুল্লকুমার। চার বছর পরে রবীন্দ্রসঙ্গীতে পেলেন ডিপ্লোমা। পঞ্চম বর্ষান্তে এবং ষষ্ঠ বর্ষান্তে ডিপ্লোমা লাভ করলেন, যথাক্রমে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে এবং এস্রাজে পঞ্চম বর্ষে যোগদান করার সময় থেকেই তাঁর শিক্ষক-জীবনের সূচনা। তখন থেকেই তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন। ১৯৪৮ সালের শেষভাগে কলকাতায় এলেন প্রফুল্লকুমার। যোগ দিলেন বিশ্বভারতীর সঙ্গীতবিভাগে

স্বরলিপি বিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত হয়ে। সহকারী হলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় নাম শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দস্তিদারের। আজও ঐ কর্মে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতা ও কর্মশক্তির পরিচয় দিয়ে চলেছেন।

বিশ্বভারতীতে যোগদানের অল্পকাল পরেই গীতবিতানের অন্যতম শিক্ষক হিসাবে তিনি যোগ দিলেন। ১৯৫৫ পর্যন্ত গীতবিতানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বর্তমানে সুরঙ্গমার সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়াও দিনেন্দ্র সঙ্গীতায়তন, ব্রাহ্মবালিকা গীতসদন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলিও তাঁকে লাভ করেছেন শিক্ষক হিসাবে।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি তাঁর বাল্যকাল থেকেই এক সহজাত আকর্ষণ ছিল। ছাত্রজীবনে গুরুরূপে তিনি পেয়েছেন শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ প্রভৃতিকে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখেছেন ভি ভি ওজালভারের কাছে, এস্রাজের শিক্ষা নিয়েছেন সঙ্গীত-নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনামধন্য ভ্রাতুষ্পুত্র অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি মিউস এবং গীতবিতানের ডিগ্রী পরীক্ষার পরীক্ষকদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

প্রত্যহ সকালে তিনি নিয়মিতরূপে রেওয়াজ ও ব্যায়াম করে কর্মময় জীবনযাত্রা শুরু করেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি দিয়েছেন যথেষ্ট আন্তরিকতা ও যত্নের পরিচয়। লাভ করেছেন অগণিত ছাত্রছাত্রীর শ্রদ্ধা ও রসিকসমাজের অকৃত্রিম স্বীকৃতি ও প্রীতি।

তাঁর লেখনীও তাঁর দক্ষতার পরিচয় বহন করে চলেছে। তাঁর লেখা রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ গ্রন্থটির দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়ে রসিকসমাজের অভিনন্দনে ভরে উঠেছে। এই গ্রন্থের আরও দুটি খণ্ড প্রকাশিত হবে। তাঁর রাগাঙ্কুর গ্রন্থটিও প্রকাশের প্রতীক্ষায়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস গ্রন্থটি এখনও মুদ্রাযন্ত্রের আলিঙ্গনে আবদ্ধ আছে। শেষোক্ত গ্রন্থটির লেখক হচ্ছেন সঙ্গীতজগতের এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

খেলার মাঠে হট্টগোলের মনস্তত্ত্ব

এক জায়গায় অনেক মানুষ একসঙ্গে জড় হলে কেন তারা শাসনের বাইরে চলে যায়, এ নিয়ে বিস্তর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়েছে। দেখা গেছে সমস্বরে চীৎকার করা বা সকলের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করা জনতার মনস্তত্ত্বের আসল রূপ নয়, আসল ব্যাপার হ'ল জনতার মধ্যে ব্যক্তি তার সত্তা ও ইচ্ছা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কেন হারায়, এ সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা সত্ত্বেও, এর মূল কারণ এখনও আবিষ্কার হয় নি। এ সম্বন্ধে যেকথা প্রায় শোনা যায়, তা হ'ল, জনতার মতামতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে আদিম মানব আছে, তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং মানুষ তার বিবেক হারিয়ে নিম্নস্তরের জীবের মত ব্যবহার করে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়। জনতার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর পুলিসের পত্রিকায় একটি লক্ষণীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পুলিসের সঙ্গে কাজ করেছেন, এ রকম বহু অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীরা ফুটবল খেলার মাঠে যেসব অসঙ্গত, অভদ্র আচরণ লক্ষ্য করেছেন সে সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। তাঁরা সকলেই একমত যে ফুটবল খেলার মাঠে যেসব মারামারি হয়ে থাকে, তার মূলে সর্বদাই একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় কাজ করে। এরাই বৃহৎ জনতার মনে আগুন জ্বালায়। এই সম্প্রদায় সাধারণত ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে গঠিত যাদের মধ্যে খেলাধূলার তাৎপর্য বোঝার বিশেষ অভাব দেখা যায়। স্রেফ গালাগালি কিম্বা হাতাহাতি করার উদ্দেশ্যেই এরা খেলার মাঠে জড় হয় এবং খেলার মাঠকেই তারা তাদের অবদমিত শক্তি ও আবেগ উজাড় করার প্রকৃত স্থান মনে করে। অপর একজন মনোবিজ্ঞানী লিখেছেন যে, আজকাল ফুটবল খেলার মাঠে তিন শ্রেণীর দর্শক আসে। একশ্রেণীর দর্শকরা খেলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ একসময়ে যারা নিজেরাই ফুটবল খেলোয়াড় ছিল। এরা জনতার মনস্তত্ত্বে সাড়া দেয় না। দ্বিতীয় শ্রেণী হ'ল প্রথমের ঠিক উল্টো, এরা সব ছেলে-ছোকরার দল, এরা আসে খেলার মাঠে তাদের বেপরোয়া মনের উদ্দাম পরিচয় দিতে। সারা দুনিয়ার খেলাধূলা পণ্ড করতে এরাই যত নষ্টের গোড়া। তবে দর্শক হিসেবে সবচেয়ে বড় দল হল সব বয়সের, সমাজের সব শ্রেণীর, সব পেশার এবং শিক্ষা-দীক্ষাসম্পন্ন অগণিত মানুষ যাদের ওপর নির্ভর করে খেলার মাঠের প্রকৃত আবহাওয়া। এরা কেন খেলা দেখতে আসে তা তারা নিজেরাই জানে না। একজন মনোবিজ্ঞানী বলেছেন যে, মনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যেই এরা খেলা দেখে। জীবনটা দিন দিন যত একঘেয়ে হয়ে উঠছে, মানুষ তত ব্যক্তিগত উত্তেজনা খুঁজছে। আর খেলাধুলার প্রতিযোগিতা এমন একটা জিনিস যা আমাদের সুপ্ত ও অবদমিত মনোভাবকে নাড়া দিয়ে জীবনটাকে পরিপূর্ণ উপভোগ করার একটা সুযোগ এনে দেয়। সেদিক দিয়ে খেলার মাঠে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ আমাদের অবদমিত মনের আগল ভেঙ্গে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

—ডাঃ জোহান মাউথনের

বার্ধক্যে বারানসী

নীলকণ্ঠ

আটচল্লিশ

আলিপুর চিড়িয়াখানায় বাঘ বসেছিলো ঘরের মধ্যে যে ছোট ঘুপচি, সেখানে ঘাপটি মেরে। যারা এসেছিলো বাঘ দেখতে তারা মনঃক্ষুণ্ণ। বাঘের ফুল পোর্ট্রেইট্ না দেখা গেলে আর কি দেখতে আসা গেল চিড়িয়াখানায়। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে শোনা গেল আশ্বাসবাণী। কে যেন কাকে জিজ্ঞেস করছে: বাঘ দেখবি? যেন দেখতে ইচ্ছে করলেই বাঘকে তুড়ি দিয়ে টেনে এনে হাজির করবে, গরাদের ওপারে, তার পূর্ণ ম্যাজেস্টিতে খাড়া বাঘকে এনে দাঁড় করাবে মুখোমুখি। যাকে জিজ্ঞেস করা তার সানন্দ সম্মতির আগেই, আশ্বাসদাতার চোখ বাঘের চোখের ওপর গিয়ে পড়েছে। মনুষ্য ও ব্যাঘ্রের শুভ ও অশুভ দৃষ্টি বিনিময়। হুংকার দিয়ে বাঘ এসে লাফ দিয়ে পড়েছে লোহার গরাদের ওপর। মাঝখানে লোহার গরাদ, তবু ভরসা হয় না যেন। আরেকবার চোখে চোখ পড়ে গেলে, এ গরাদের বাধা বাঘ আর মানবে বলে মনে হয় না। যে ব্যক্তি বাঘ দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে ব্যক্তি ভিড়ের মধ্যে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সরে গেছেন অন্যত্র।

সে লোক কে? সে লোক শক্তিপদ বসুরায়, যার দু'চোখের দীপে নিরন্তর জ্বলছে একটি আলোক: মানুষের ভালো হোক!

য়্যাটম-হাইড্রোজেন-নিউট্রন, মনার্কি-ডিক্টেটারশিপ-সোশ্যালিসম-কম্যুনিসম,—এসবই মন্ত্রণা; মন্ত্র কেবল ওই একটিই,—মানুষের ভালো হোক! অন্তর থেকে নিরন্তর উত্থিত এই একটি মন্ত্রধ্বনি, মৃত্যু থেকে অমৃতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, অসৎ থেকে সৎ-এ নিয়ে যেতে পারে কোটি কোটি মানুষকে। এই বিশ্বাস মূর্ত করে তোলাই হচ্ছে মূর্তি-পূজা! মূর্তি-পূজাই মুক্তি দিতে পারে লোককে, সীমার বন্ধন মোচন করে দিতে পারে মুহূর্তে, মানুষের চেয়ে অনেক বড় করে দিতে পারে মানুষকে।

দস্তয়ভস্কি যখন বলেন, একটি মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যতক্ষণ না সমস্ত মানুষ মিলে করছে, ততক্ষণ দেখা নেই তাঁর সে নবজাতকের উদ্দেশে এই জয়ধ্বনি অমরাবতীর দিকে উঠে গেছে: জয় হোক মানুষের, জয় হোক চিরজীবিতের, তখন এই মন্ত্রই উচ্চারিত: মানুষের ভালো হোক!

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন: 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ',—তখন যে মন্ত্রে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তা ওই অমোঘ অব্যর্থ বাণী: 'মানুষের ভালো হোক—'। জিসাস ক্রাইস্ট যখন সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত একা করবার জন্যে ক্রুসবিদ্ধ, তখনও যখন বলেন: ওরা জানে না ওরা কি করছে, তুমি ওদের ক্ষমা কর,—তখন এই মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রর কাছে দানবের মন্ত্রণা হার মানে।

যে কোনও লোক যদি তার জীবন দিয়ে জ্বালতে পারে এই আলোক: মানুষের ভালো হোক, তা হলে তার ওপর আক্রমণ আসবে দেবলোক থেকে। ইন্দ্রের আসন ঈর্ষায় চঞ্চল হবে। ভয় নয়, নয় লোভে, শক্তি কামনা করে নয়, রূপ-জয়-যশ প্রার্থনার কারণে নয়, শত্রুর নিধন চাই,—এই রক্তিম বাসনাতেও নয়, একটি মানুষের প্রতি নিঃশ্বাসে যদি এই মন্ত্র নির্গত হয়, যে, মানুষের ভালো হোক, তা হলে, 'মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে জাগে রোমাঞ্চ, ওই মহামানব আসে।'

ম্যান থেকে সুপারম্যান জন্মায় মন্ত্রণা করে নয়; মন্ত্র থেকে,—মানবজীবনের সে একমাত্র মন্ত্র আজও উচ্চারিত হবার অপেক্ষায়: মানুষের ভালো হোক!

ভারতবর্ষের তপোবনে তাই এ বাণী একদিন প্রাণ পেয়েছিলো কয়েকটি মহৎ মানুষের জীবনে: এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি। শ্রাদ্ধের মন্ত্রেও তার প্রতিধ্বনি। যদি এমন কেউ কোথাও থাকে, অপুত্রক কোনও হতভাগ্য, তা হলে তাঁর অতৃপ্তি মোচনের উদ্দেশে এই অঞ্জলি উৎসর্গ করি। কোনও মানুষের মুখে এর চেয়ে মহত্তর কথা কোনও দেশে কোনও কালে কেউ উচ্চারণ করেছেন বলে আমি জানি না। তমো থেকে মহত্তমে পৌঁছনর পথ একটিই। ভালোবাসা। কোনও জাতি, কোনও দেশের প্রতি বিদ্বেষের মধ্যে দিয়ে মানুষ আজও পর্যন্ত কোথাও পৌঁছয় নি। কোনও যোগ, কোনও যজ্ঞ,

তন্ত্র-মন্ত্রণা, কোনও সিদ্ধাই, সাধনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-শিল্প, এই একটি জীবন-মন্ত্রের কাছে কিছু না। মানুষের ভালো হোক। সকল দেশের সকল মানুষের ভালো হোক,—এই সার ; আর সবই অসার।

ঋষিরা জানতেন এ সত্য। তাই তাঁরা বলেছেন : মধুবাতা ঋতায়তে। ঋষিদের চেয়ে নতুন কথা কেউ কোনও কালে বলে নি। কারণ নতুন কথা কিছু নেই। চিরপুরাতনই, চিরনবীন।

কার্ল মার্ক্স কোনও দর্শন নয় ; অর্থনৈতিক তত্ত্বমাত্র। ওপরের লোককে নীচে নামিয়ে আনলে, নীচের লোক ওপরে উঠবে। তাতে সমস্যার সমাধান হবে না কখনও। কম্যুনিসমের পর আসবে নতুন ইসম। মানুষ যে অরণ্যে ছিলো একদিন, সেই অন্ধকারেই বাস করবে। অর্থনৈতিক সাম্য, রাজনৈতিক অধিকার, এর চেয়েও বড় স্বপ্ন হচ্ছে মানুষের ভালো হোক, এই মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। রুটির সমস্যা সবচেয়ে বড় সমস্যা, একথা ঠিক। সে সমস্যা মিটে গেলে মানুষের সব সমস্যা যদি মিটে যেত, তা হলে শবের সঙ্গে মানুষের কোনও তফাৎ থাকত না। কারণ, শবের সব আছে, ক্ষুধা নেই।

দেশের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে, মানুষের বিরুদ্ধে, মানুষের রাগের বদলে অনুরাগের জন্মের মধ্যেই রয়েছে সেই 'নবজাতক', যার উদ্দেশে সকল দেশে উঠছে জয়ধ্বনি : জয় হোক মানুষের, চিরজীবিতের।

শক্তিপদ বসুরায়ের সমস্ত শক্তির উৎস ওই এক মন্ত্র : মানুষের ভালো হোক !

ঋষিদের অলৌকিক জীবন ও বাণীতে ঘোরতর অবিশ্বাসী এক মানুষকে গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে শক্তিপদ বুদ্ধির অতীত এমন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করান, যার ফলে আমূল রূপান্তর ঘটে তার,—এমন ঘটনা আমার জানা। কেবল বুদ্ধ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণরাই যে রূপান্তর ঘটান তা নয়, আমাদের অজানা এমন মহৎ-প্রাণ ব্যক্তি আছেন, দানবকে যাঁরা দেবতা করবার মন্ত্র জানেন। সে মন্ত্র কাগজে বিজ্ঞাপিত নয়। স্বপ্নে তাকে পাওয়া যায় না। সে আরোগ্য কোটিতে গোটিক। তবুও তা যে সম্ভব তার প্রমাণ কেবল শক্তিপদ বসুরায় নন ; আরও কেউ কেউ নিশ্চয়ই আছেন।

কিন্তু আমার কাছে আরোগ্যকারের চেয়ে আরোগ্যমন্ত্রের আকর্ষণই বেশি। সে মন্ত্র ওই,—মানুষের ভালো হোক। সমস্ত শক্তির চেয়ে, নিরাসক্তির আধার এই উজ্জীবন-মন্ত্র,—মানুষের মনের আঁধার দূর করে অনেক দ্রুত।

একজন লোক শক্তিপদ বসুরায়কে এসে ধরে, তার মরা মা'কে দেখাতে হবে। শক্তিপদর পরিচিত এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পরলোকগতকে এনে হাজির করাতে পারতেন সশরীরে। তিনি প্রথমে আপত্তি করলেও পরে রাজী হন। যখন ঘরের মধ্যে পরলোকগতা মহিলা তাঁর পুত্র এবং সেই যোগীর সাক্ষাৎকার ঘটেছে, তখন শক্তিপদ সেখানে ছিলেন না। সিগারেট কেনবার জন্যে বাড়ির বাইরে গেছিলেন। ফিরে এসে শোনেন, লোকটির মৃতা মা সশরীরে উপস্থিত হয়ে বলে গেছেন, যে ঐ লোক তার ভাইকে ঠকিয়েছে সম্পত্তির ব্যাপারে। যিনি পরলোকগতাকে নামিয়ে এনেছিলেন তিনি শক্তিপদকে বলেন, এ-ধরণের লোকের জন্যে কোনও কাজ তিনি কেন করতে নারাজ ছিলেন, এখন তা শক্তিপদরও নিশ্চয়ই মর্মগত হয়েছে। শক্তিপদ লোকটিকে ছাড়েন না ; বরং তাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে ছাড়েন যে তার ভাইকে সে তার ন্যায্য প্রাপ্য ফিরিয়ে দেবে।

লোকটি কথা দিলেও তার কথা রাখে না, গড়িমসি করে। আসল কারণ তার অনিচ্ছা নয় ; স্ত্রীর ভয়। জমির ব্যাপারে সে ভাইকে ফাঁকি দিয়েছিলো। সে দলিল ছিলো শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর কবলে। সে প্রস্তাব করে, যে জমির বদলে ভাইকে দাম ধরে দেবে তার। শক্তিপদ তাতে রাজী হন না। বলেন মা-কে কথা দিয়েছ, যা নিয়েছ তাই-ই ফেরৎ দেবে। যদি না দাও তাহলে জেনো আমি সাধু-

পুরুষ নই, এক সময়ে বাঙলা দেশের বিপ্লবীদের সংগে কাজ করেছি। এমন শাস্তি তুমি পাবে যার চেয়ে জমির দাম অথবা স্ত্রীর ভয়, দুটোই তুচ্ছ। শেষ পর্যন্ত এই কথাতেই কাজ হয়।

শক্তিপদ কেবল নামে নয়, কাজেও শক্তিমান পুরুষ।

এ ঘটনা পড়তে পড়তেই কোনও কোনও ধূর্তবুদ্ধি পাঠকের ঠোঁটে বিদ্যুতের মতো হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাবে। মানুষের ভালো হোক, যার মন্ত্র, সে কেন মানুষকে এমন ভয় দেখাবে?—এই হচ্ছে সেই বুদ্ধির বিদ্যুত-ঝিলিক জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার উত্তর হচ্ছে এই যে, ওতেই ওই মানুষের ভালো হবে জানেন বলেই শক্তিপদ,—শক্তিপদ এবং আমরা তিন-চতুর্থাংশ মানুষ দ্বিপদ হয়েও আসলে চতুষ্পদ। লোকে মনে করে, এই ব্যবহার এবং ওই মন্ত্র বুঝি শক্তিপদর চরিত্রে একটি আপত্তিযোগ্য কন্ট্রাডিকসান। না। কন্ট্রাডিকসান নয়। মহৎ মানুষের চরিত্রের এই হচ্ছে প্রপার ডিকসান; হার্মানি। কী রকম, জানতে চাইছেন। জবাব দিচ্ছি।

যে লোকটি তার ভাইকে ঠকিয়েছি মনে করছে, আসলে ঠকেছে সেই। শক্তিপদ জানেন যে লোকটিকে এই সামান্য প্রতারণার জন্যে কি অসামান্য শাস্তি পেতে হবে। তাই ভয় দেখিয়েই তিনি আসলে অভয় দেন। পাপ ও শাস্তির হাত থেকে লোকটিকে বাঁচানোর জন্যেই অভয়ংকর শক্তিপদ ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। মানুষকে ভালোবাসেন বলেই তাকে শাসন করেন। সে লোকটি কোনওদিন জানবে না যে, কি 'লোক' সে পাবে মৃত্যুর পর। সেই অন্ধকার-লোক থেকে ঈষৎ আলোকে তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যেই, জমি ফিরিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন শক্তিপদ। না দিলে, মৃত্যুভয় দেখিয়েছিলেন। না দেখালে স্ত্রীর ভয় থেকে মুক্ত হতো না সে লোক। এর পরেও কি বলা যাবে, মানুষকে ভালোবাসার সংগে এই ভয় দেখানোর কোনও বিরোধ আছে?

আরও এক জায়গায় লোকের সাংঘাতিক গুলিয়ে যায়। হিন্দুশাস্ত্র বলে, সব, যা কিছু ঘটবে, সব ঠিক হয়ে আছে আগে থেকে। সব—প্রিডেস্টিনড্। আবার সেই শাস্ত্রই বারণ করে অন্যায় করতে; উপদেশ দেয়,—সৎকর্ম করবার। একমুখে এমন উল্টো-পাল্টা কথায়, কোথায় না লোক বিভ্রান্ত বোধ করবে। যদি সব ঠিকই হয়ে থাকে আগে থেকে, তাহলে আবার অন্যায়ের জন্যে শাস্তি এবং সৎকাজের জন্যে পুরস্কার কেন? যে অন্যায় করছে সে তো অন্যায় করবে বলেই ঠিক হয়ে আছে। তাহলে তার অপরাধই বা কি এবং সে দায়ীই বা হবে কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর কেবল হিন্দুরাই দিয়েছে; দিতে পেরেছে। কারণ হিন্দু আচার্যদের মতো জীবনের এমন গভীরে আর কোন্ দেশে কোন্ কালে আর কেউ প্রবেশ করেছে? মানব-জীবনে অতল রহস্যের তল তাঁরা খুঁজেছেন। তাঁরা কনট্রাডিকসান থেকে হার্মনিতে, বিরোধ থেকে মিলনে, অসৎ থেকে সতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে যাত্রার পাথেয় জুগিয়েছেন চিরকাল। তাঁরা কখনও এমন কথা বলতে পারেন যার মধ্যে মিল নেই?

'এ দুয়ের মাঝখানে আছে কোন মিল, নাহিলে নিখিল, এত বড় প্রবঞ্চনা, কখনও সহিত না',—

প্রিডেস্টিনড একথাও ঠিক, আবার, 'অন্যায় কোরো না,' —একথাও বেঠিক নয়। কি রকম? না, ততক্ষণ পাপ-পুণ্য, অন্যায়-ন্যায় ভেদবুদ্ধি থাকছে, যতক্ষণ তোমার এ বোধ না জাগ্রত হচ্ছে যে শুভ-অশুভ, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সবই 'সে' যে 'এক' বহু হয়েছেন। যার এ জ্ঞান হয়েছে, তার জন্যে কোনও বারণ নেই। ত্রৈলংগ স্বামীর—মূত্র আর গংগাজলে কোনও পার্থক্য নেই। মল ও পরিমল তুল্যমূল্য। তাই মূত্র ছিটিয়ে মায়ের গায়ে ত্রৈলংগ বলতে পারেন, 'গংগোদকং।'

ত্রৈলংগর যা সাজে তা সকলের সাজে না। এমন কি অর্জুনেরও,—না। [ক্রমশ।

বিষাদপুর

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

তুমি বলেছিলে দেখো না পিছনে
হেঁটে যাও শুধু সমুখে বিজনে
ভারপরে পাবে দেখা—

সমস্ত দিকে হয়তো দুঃখ
ভঙ্গুর পথ হয়তো রুক্ষ
তবু অস্তিমে রয়েছে সূক্ষ্ম
একটি আলোক রেখা।

হঠাৎ পিছনে শাড়ির গন্ধ
পায়ে নূপুরের নিবিড় ছন্দ—
তার অধরে কি ঘন আনন্দ
রহস্য কালো চুলে?

জলধারা ঝরে সুরের নদীর
তারি কল্লোল করেছে বধির
কোন্ অনুভূতি কাঁপায় শরীর!
নির্দেশ গেছি ভুলে।

যেই ফিরিয়েছি দু' চোখ আমার
ঝরে পড়ে যেন আঁধারের ভার
আমার পিছনে যার অভিসার
পলকে মিলায় দূরে।

তাই পড়ে আছি অভিশাপ বুকে
বহু বেদনার গভীর অসুখে
আঁধারে বিষাদপুরে।

নিউ ইয়র্কের নাট্যজগৎ

নিউ ইয়র্কের মঞ্চজগতে হাল-আমলে যে এক অভূতপূর্ব নবজীবনের জোয়ার এসেছে, রসিক সমাজ এ সম্বন্ধে আর দ্বিমত নন।

নাট্যানুশীলনের ক্ষেত্রে, এ কথা বলাই বাহুল্য যে, নিউ ইয়র্ক এক বিশেষ উল্লেখের অধিকারী। শুধু বিশেষ উল্লেখেরই নয়, বিশেষ বৈশিষ্ট্যেরও। তবু, উপরোক্ত সংবাদ রসিক-সমাজে শুধু আনন্দেরই স্পর্শ আনে নি, আনন্দের সঙ্গে সমপরিমাণে বহন করে এনেছে আশ্চর্যেরও স্বাদ। প্রশ্ন আসতে পারে যে, নাট্যানুশীলনে যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী নিউ ইয়র্কের মঞ্চজগতে প্রাণচাঞ্চল্যের জোয়ার আসায় আশ্চর্য হওয়ার কি থাকতে পারে?—এর উত্তর খুঁজতে গেলে নিউ ইয়র্কের রঙ্গমঞ্চগুলির গত বছরের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হয়।

গত বছর নিউ ইয়র্কের নাট্যামোদীদের কাছে যথেষ্ট সহযোগিতা লাভ করেছে সেখানকার নাট্য-প্রচেষ্টাগুলি। কিন্তু, এ বছর দেখা যাচ্ছে জনসাধারণ নাটক সম্বন্ধে যেন সচেতন হয়ে উঠেছেন আরও অনেক বেশি। নতুন নতুন নাটকের প্রতি তাঁদের আগ্রহও বেড়েছে যেন যথেষ্ট। নাট্য-জগতের উন্নয়নের ও সর্বৈব প্রগতির দিকে তাঁরা যেন আরও যত্নবান হয়েছেন। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী নাট্যজগতকে পতন-উত্থানেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা যে, নিউ ইয়র্কবাসী রঙ্গমঞ্চকে শুধু প্রমোদকেন্দ্র হিসাবেই দেখছেন না, রঙ্গমঞ্চকে শিল্পসংস্কৃতির এক মহান তীর্থ হিসাবে বিবেচনা করছেন। এর মধ্যেই তাঁদের প্রখর শিল্পচেতনার এক প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ব্রডওয়েতে ১৯৫১-৫২ সালের পর গত বছরের তুলনায় এত অধিকসংখ্যক নাটক অন্য কোন বছর মঞ্চস্থ হয় নি।

চেকভের 'সি গাল' নাটকের একটি দৃশ্যে নাটারূপদাত্রী পরিচালিকা ইভা-লে-গ্যালিয়েন ও ডেনহম ইলিয়ট

'রাইট ইউ আর' নাটকের এক দৃশ্যে কীনি কার্টিস, জাঁ ফারাঁ, রিচার্ড উডস এবং ন্যান্সি মারসাঁ

১লা জুন ১৯৬৩ থেকে তা এসে ১৯৬৪ পর্যন্ত এই সময়সীমার মধ্যে ব্রডওয়েতে অভিনীত হয়েছে একাত্তরটি নাটক অথচ তার পূর্ববর্তী এক বছরে ব্রডওয়েতে অভিনীত নাটকের সংখ্যা ছিল সাতান্ন। অতএব এক বছরে চোদ্দটি বেশি নাটক দর্শক-সাধারণ দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এ-তো খাস ব্রডওয়ের খবর। ব্রডওয়ের বাইরে ছোট ছোট থিয়েটারগুলিতে গত বছর যতগুলি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, তার মোট সংখ্যা একশো' সাত। জনপ্রিয়তা বা উৎকর্ষের দিক দিয়ে সবগুলি নাটকই সমানভাবে উল্লিখিত হওয়ার দাবীদার অবশ্যই নয়। কতকগুলি দর্শকের হৃদয়ের গভীরে

রেখে গেছে ছাপ, আবার কতকগুলি মানুষের মনে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারে নি। দেখা গেছে, প্রতি বাইশটি নাটকের মধ্যে আটটি উপনীত হতে পেরেছে সাফল্যের সপ্তস্বর্গে। এই সময়ে প্রযোজিত নাটকগুলির মধ্যে একদিন মাত্র অভিনীত হয়েই যারা লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেল, সে ধরণের নাটকও বিরলদৃষ্টান্ত নয়, গত এক বছরের মধ্যে এই জাতীয় নাটক ছ'খানি প্রযোজিত হয়েছে।

এবার নাটকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। বছরে অভিনীত মার্কিন নাটকগুলির প্রত্যেকটিই যে প্রথম শ্রেণীর এবং রসোত্তীর্ণ তা অবশ্য বলা চলে না। কিন্তু তা হলেও এ-কথা অনস্বীকার্য যে, দর্শক-সাধারণ অনেকগুলি উপভোগ্য এবং বলিষ্ঠ নাটকের রসাস্বাদন করার সুযোগ পেয়েছেন। এই উপভোগ্য নাটকগুলি এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ-যোগ্য, বিদেশী মাটির ফসল। তাদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের 'লুথার,' 'জার্মান ডেপুটি', সাউথ আফ্রিকার 'ব্লাড নট' উল্লেখযোগ্য। 'হ্যামলেট'-এর নামও এই তালিকায় প্রণিধানযোগ্য। হ্যামলেটের প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন রিচার্ড বার্টন, ভূমিকালিপিতে বৃটিশ এবং আমেরিকান শিল্পীদের এক অভূতপূর্ব সম্মেলন ঘটেছিল।

অমল দত্ত পরিচালিত 'অশ্রু দিয়ে লেখা' চিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস

বিজয় বসু পরিচালিত 'রাজা রামমোহন' চিত্রের নাম-ভূমিকায় খ্যাতিমান অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী

ইউরিপিডিসের 'ট্রোজান উওমেন' নামক বিখ্যাত নাটকটির অভিনয় বহির্ব্রডওয়েতে বিপুল জনপ্রিয়তায় বিভূষিত হয়ে ছ'টি পুরস্কার লাভ করে, তার প্রয়োগনৈপুণ্য ও অভিনয় উৎকর্ষের স্বীকৃতিস্বরূপ।

মার্কিন নাটকগুলির মধ্যেও এডোয়ার্ড এ্যালবির 'ব্যালার্ড অফ দ্য স্যাড কাফে' (কার্সন ম্যাককালসের উপন্যাসের ভাবাবলম্বনে রচিত), 'স্পুন রিভার' বিচারশালা কেন্দ্রিক নাটক 'এ কেস অফ লাইবেল' প্রভৃতি নাটকগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সমাদৃত হয়েছে। প্রায় তিন যুগ পূর্বের ম্যারাথন নাচে আবহাওয়া যুগের গণ্ডী অতিক্রমে একালের আঙ্গিনায় আবার গড়ে উঠেছিল অভিনেত্রী জুন হ্যাভকের 'ম্যারাথন ৩৩'-এর মাধ্যমে। সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে মনে দাগ রেখে গেছে জেমস বল্ডুইনের বিতর্কমূলক 'ব্লুস ফর মিঃ চার্লি' এবং 'ইন হোয়াইট এ্যামেরিকা'। এই দু'টি নাটকের মধ্যে জনগণের মতে সমাজজীবনের এক প্রামাণ্য চিত্র ফুটে উঠেছে।

দু'টি নাটক স্মরণীয় হয়ে আছে শিল্পীর গুণে। 'দ্য
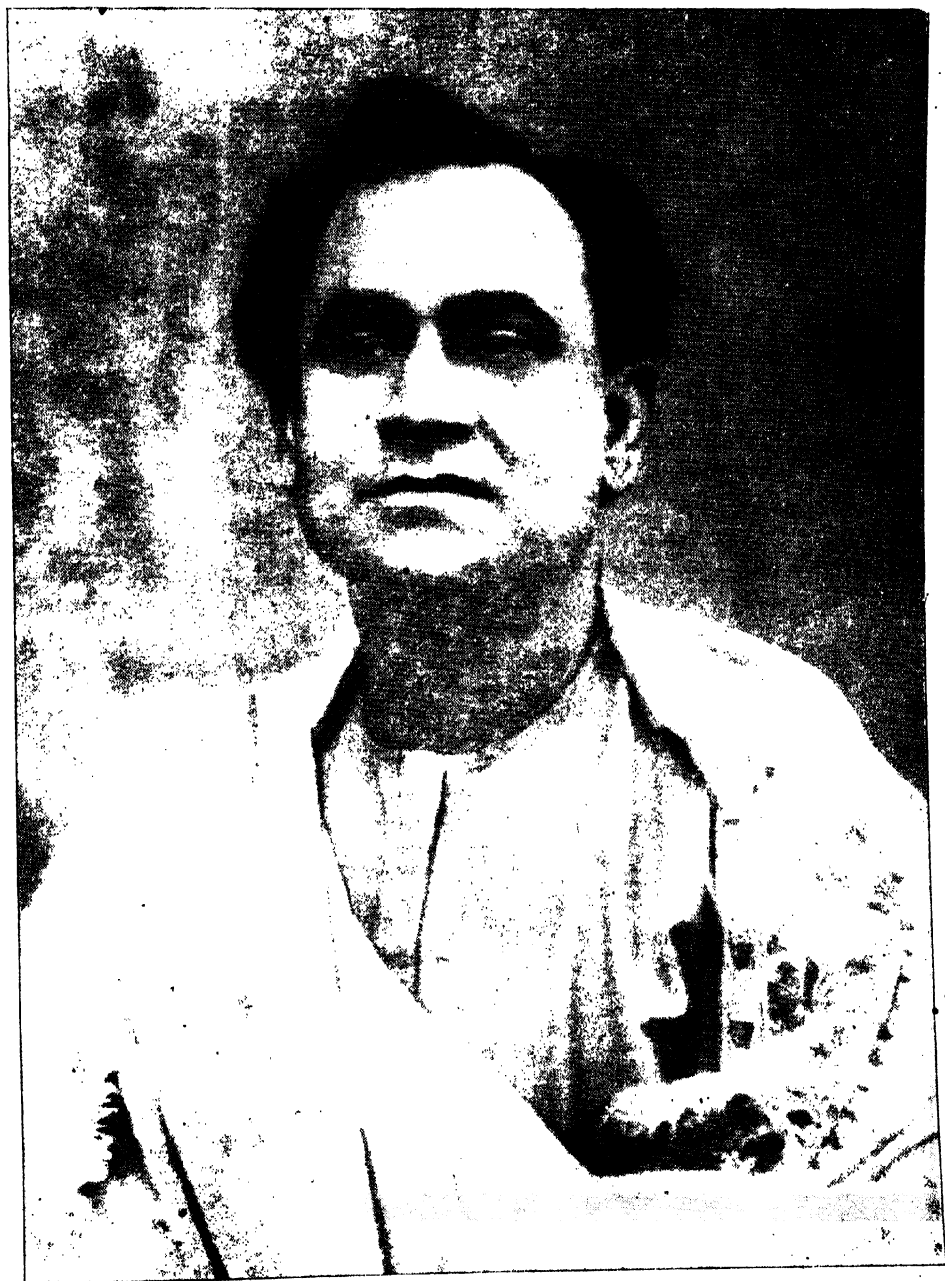
● নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের একটি অপ্রকাশিত চিত্র

হোয়াইট হাউস' এবং 'ডিলান' নাটক দু'টিকে সাধারণের মনে উজ্জ্বল করে রেখেছে—যথাক্রমে হেলেন হেস ও স্যার আলেক গিনেসের অনন্যসাধারণ অভিনয়। প্রথম নাটকটিতে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ও তাঁদের সহধর্মিণীদের কাহিনী এবং দ্বিতীয় নাটকটিতে ওয়েলসের কবি ও পৃথিবীর কাব্যজগতের অন্যতম উজ্জ্বল তারা টমাস ডিলানের শেষজীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তরুণ নাট্যকার ফ্র্যাঙ্ক ডি গিলরয় কয়েক বছর পূর্বে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার স্বাক্ষর 'হু উইল সেভ দ্য প্লোবয়'-এর মাধ্যমে জনগণের হৃদয়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হন, গত বছরের শেষাংশে তাঁর 'দ্য সাবজেক্ট অফ রোসেস' নাটকটি জনসাধারণের মধ্যে এক আলোড়ন এনে তাঁর দীর্ঘকাল পরে প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত অভিনন্দনে ভরে দেয়। গৃহে প্রত্যাগত এক সৈনিক এই নাটকের নায়ক। এই নাটকটির সারবস্তু ও জীবনবোধ নাট্যজগতে নাট্যকারের মর্যাদা আরও বর্ধিত করে তোলে।

হাস্যরসাশ্রয়ী নাটকগুলির মধ্যে তিনটি নাটক বিশেষ উৎকর্ষ ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে। রোনাল্ড আলেকজাণ্ডারের 'নো বডি লাভস এ্যান এ্যালবাট্রস'-এ এক প্রতিভাহীন অথচ সুদর্শন টেলিভিসন প্রযোজকের কাহিনী, নীল সাইমনের 'বেয়ারফুট ইন দ্য পার্ক'-এ এক নববিবাহিত দম্পতির বিচারের কাহিনী এবং মুরিয়েল রেসনিকের 'এনি ওয়েডনেসডে'তে একটি মেয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

সঙ্গীতপ্রধান নাটকগুলিও আলোচনার প্রসঙ্গে যথেষ্ট উল্লেখের দাবী রাখে। এ প্রসঙ্গেও শিল্পীদের অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখনীয়। থর্নটন ওয়াইল্ডারের নাটক 'ম্যাচমেকার' অবলম্বনে 'হ্যালো ডলি' ক্যারল চ্যানিঙের, ফ্যানি ব্রাইসের জীবনী অবলম্বনে রচিত 'ফানি গার্ল' বার্ব্রা স্ট্রেস্যাণ্ডের বাড স্যুলবার্গের উপন্যাস অবলম্বনে রচিত 'হোয়াট মেকস স্যামি রান ?' এ স্টিভ লরেন্সের, ১৯৩০ সালের হলিউডকে কেন্দ্র করে রচিত বিদ্রূপাত্মক 'ফেড আউট ফেড ইন'-এ ক্যারল বার্নেটের, নোয়েল কাওয়ার্ডের প্রেততাত্ত্বিক রচনা 'ব্লাইদ স্পিরিটস' অবলম্বনে 'হাই স্পিরিট'-এ বৃটিশ লিলির অভাবনীয় অভিনয়সৌকর্য সমগ্র প্রচেষ্টাকে সফলতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

এই সকল নাট্যপ্রচেষ্টাগুলির সফলতা সত্ত্বেও বা সামগ্রিক খ্যাতি সত্ত্বেও নিউ ইয়র্কের নাট্যামোদীরা এতাবৎ একটি অভাববোধ করে আসছিলেন একটি স্থায়ী নাট্যভাণ্ডারের। বহু যুগের পর সম্প্রতি এই শূন্যতার অবসান ঘটেছে। এই ব্যবস্থায় একটি স্থায়ী নাট্যপ্রতিষ্ঠান

কার্লোভি ভেরী ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে একটি চিত্রের অপরূপ দৃশ্য

অর্ধেন্দু সেন পরিচালিত 'প্রশান্ত মা' চিত্রের একটি বিশিষ্ট চরিত্রে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

গড়ে উঠেছে প্রতি সপ্তাহে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। এই শুভপ্রচেষ্টা নিউ ইয়র্কবাসী বলা বাহুল্য সাদরেই গ্রহণ করেছে। এই ধরণের নাট্যভাণ্ডার শুধু একটিই নয়, তিনটি রূপ নিল নিউ ইয়র্কের বুকে। এর ফলে নাট্যানুশীলন যে আরও কত লাভবান হল তা সহজেই অনুমেয়। এই তিনটির নাম—রিপার্টারি থিয়েটার অফ লিঙ্কন সেণ্টার, ন্যাশনাল রিপার্টারি থিয়েটার এবং এ্যাসোসিয়েসন অফ প্রোডিউসের আর্টিস্ট।

প্রথমটি অনেক বাদ-প্রতিবাদ, তর্ক-বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। গত জানুয়ারী মাসে আর্থার মিলারের নতুন নাটক 'আফটার দ্য ফল'-এর দ্বারা তার যাত্রারম্ভ। তারপরই বাদানুবাদের ঝড় বইতে আরম্ভ হল। কেউ বললেন নাটকটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং হৃদয়স্পর্শী, আবার কেউ বললেন না তা নয়। পরবর্তী নাটক ইউজিন ও' নিলের বিদ্রূপাত্মক নাটক মার্কো মিলিয়ান্স, এস এন বারমানের হাস্যরসাত্মক নাটক 'বাট ফর হুম চার্লি' এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে বার্ত্রা লোডেন, জেসন রবার্ডস জুনিয়ার এবং ডেভিড হোয়েনের অভিনয় কৃতিত্ব অভিনন্দনীয়। শেষোক্তজন এর পূর্বে খ্যাত ছিলেন হাল্কা আনন্দরসের পরিবেশক হিসাবে।

দ্বিতীয়টির উদ্ভব ১৯৬১ সালে বিখ্যাতা অভিনেত্রী পরিচালিকা ইভা-লি-গ্যালিয়েনের দ্বারা। এই প্রতিষ্ঠানের নামে ন্যাশনাল শব্দটির প্রয়োগ সার্থক। স্থানে স্থানে কলেজে কলেজে, বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে এঁরা পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাট্যসেবার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল আর্থার মিলারের ক্রুশিবল, আয়ুইলের 'রিং এ্যারাউণ্ড দ্য মুন' এবং স্বয়ং পরিচালিকা অনূদিত চেকভের 'সি গাল' প্রভৃতি। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির জন্ম চার বছর আগে। কয়েকজন উদ্যমী অভিনেতারা এর রূপদাতা।

নটগুরুর জন্মদিনে

১৬ই আশ্বিন (২রা অক্টোবর) তারিখটি নটগুরু শিশিরকুমারের জন্মদিন। আজ যদি আমাদের মধ্যে তিনি বর্তমান থাকতেন তা হলে এই তারিখটিতে তাঁর জীবনের পচাত্তর বছর পূর্ণ হোত।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পূতপবিত্র পদরজধন্য বাঙলার নাট্যশালার এক দুর্যোগঘন ত্রিযামরজনীতে শিশিরকুমারের আবির্ভাব। সেই সঙ্কটসঙ্কুল ক্ষণমুহূর্তে শিশিরকুমারই প্রভাতসূর্য, সম্ভাবনার আকর, সৃজনীশক্তিতে ভরপুর, অফুরন্ত রশ্মিমান। বাঙলার রঙ্গমঞ্চে নতুন যুগের পত্তন হল।

বাঙলা দেশের দুর্ভাগ্য আর বেদনার তো অন্ত নেই, তবু তারই মধ্যে আমাদের গর্ব ও গৌরবের ঝুলিও পরিপূর্ণ যে জন্যে যাঁরা দায়ী নাট্যাচার্য শিশিরকুমার সেই তালিকারই একটি উজ্জ্বল নাম। রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছিল তাঁর যে মানসপুত্রদের মধ্যে শিশিরকুমার তাঁদেরই অন্যতম।

শিশিরকুমার যেদিন নবযুগের বারতা বহন করে পাদপ্রদীপের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেদিন

সুস্মিতা সান্যাল—ছায়াছবির বাইরে

নাট্যজগতের একে তো সঙ্কটকাল তার উপর সমাজজীবনে নটবৃত্তির মূল্য, গুরুত্ব, সম্মান কতটুকু ছিল সে বিষয়েও কারো অজানা নয়। সেই সন্ধিক্ষণে যে নিদারুণ অগ্নি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন শিশিরকুমার তা শুধু তাঁর স্রষ্টামনেরই পরিচয় বহন করে না, করে বিদ্রোহীমনেরও। সুনিশ্চিত অধ্যাপনা ছেড়ে অনিশ্চিত উদ্ভট ভবিষ্যতের হাতে হাত মেলানো তাঁর পক্ষেই সম্ভব যাঁর জন্মপত্রিকায় সপ্তম লগ্নে রবির স্বাক্ষর মিশে আছে।

শুধু ভৌগোলিক নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ রঙ্গমঞ্চ নয়। জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে বেদনাহত মন নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন অভিমানী স্রষ্টা। নিজের জন্যে তিনি কিছু চান নি, চেয়েছেন নাট্যশালার জন্যে। সেই চাওয়া তাঁর ফলপ্রসূ

সন্ধ্যা দীপের শিখা চিত্রের নায়িকা সুচিত্রা সেন
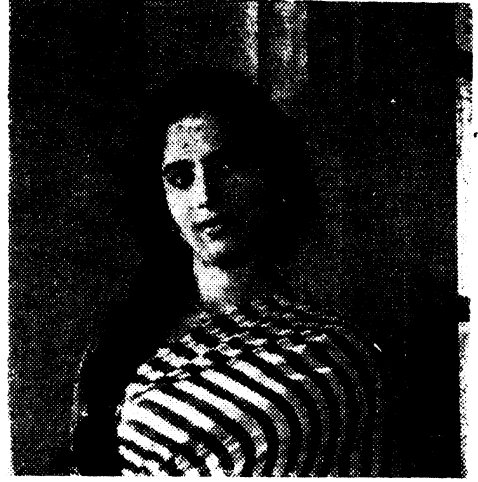
'শেষ তিন দিন' চিত্রের নায়িকা সুমিতা সান্যাল

হয় নি। ব্যক্তিস্বার্থ তাঁর উপাস্য হলে সরকারী খেতাব তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন না, প্রয়োজনের মুহূর্তে লোভনীয় অঙ্কের সরকারী উচ্চপদ গ্রহণ করার প্রস্তাব দিতেন না ফিরিয়ে। অথচ তাঁর স্বপ্নের তাঁর সাধনার সেই জাতীয় নাট্যশালা আজও গড়ে উঠল না, ব্যবস্থা হল না তাঁর কোন উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার, এমন কি ভাবগম্ভীর পরিবেশে সুধীজন সমাবেশে তাঁর জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পর্যন্ত উদ্‌যাপনের সময় হয় না। তাঁর শুভজন্মদিনে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার অঞ্জলি উৎসর্গ করে তাঁর আদর্শ, তাঁর ভাবধারা, তাঁর প্রদর্শিত পন্থার দিকে দেশবাসীর সচেতনতা আমরা আকর্ষণ করি।

এই সংখ্যায় নটগুরুর যৌবনকালের একটি অপ্রকাশিত আলোকচিত্র প্রকাশ করা হল।

সংবাদ বিচিত্রা

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৩-৬৪ সালের গিরিশ অধ্যাপক নিযুক্ত করে সম্মানিত করেছেন। এই বক্তৃতামালার বিষয়বস্তু হবে—স্বাধীনতা আন্দোলনে নাটক ও নাট্যশালার অবদান। বাংলা দেশের নাট্যকলার সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি ও অপ্রতিহত জয়যাত্রার মূলে মন্মথ রায়ের বিপুল অবদানও প্রসঙ্গক্রমে বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য কর্মপরিষদের অন্যতম সদস্য হিসাবে মনোনীত করেছেন স্বনামধন্য অভিনেতা শ্রীযুক্ত রাধামোহন ভট্টাচার্যকে। পশ্চিমবঙ্গ [illegible]

'নিশাচর' চিত্রের দৃশ্যে শম্ভু মিত্র ও মুকুন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি, সংগ্রামী জননায়ক ও বিশিষ্ট সুধী স্বর্গত ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের (১৮৮৪-১৯৬৩) একটি জীবনীচিত্র নির্মাণের আয়োজন চলছে। পরিকল্পিত ছবিটিতে তাঁর কর্মময় ঘটনাবহুল জীবনের নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলির প্রতি আলোকপাত করা হবে। দেশের মুক্তিযুদ্ধে ও নবভারত গঠনে তাঁর বিরাট অবদানই হবে ছবিটির প্রধান উপজীব্য। এ উপলক্ষে রাজেন্দ্র প্রসাদ মেমোরিয়াল ফিল্ম কমিটী গঠিত হয়েছে। দীপনারায়ণ সিংহ হয়েছেন তার আহ্বায়ক। এই কমিটার অধিকাংশ সদস্যই ডক্টর প্রসাদের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই ছবিটি থেকে সংগৃহীত অর্থ ডক্টর প্রসাদের উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার কাজেই ব্যয় করা হবে। এই পরিকল্পনায় সহায়তা করার জন্য ফিল্ম ফাইন্যান্স করপোরেশান ও কয়েকটি রাজ্য সরকারকে আবেদন জানানো হয়েছে।

সদস্য নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিষদ গঠিত। তন্মধ্যে কুড়িজন পদাধিকার বলে সদস্যশ্রেণিভুক্ত। অবশিষ্ট পাঁচজন মনোনীত হন সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-কলা-অভিনয়-সঙ্গীত-শিল্পের জগৎ থেকে। সেই বিচারে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের এই মনোনয়ন সমগ্র অভিনয়জগতের পক্ষে পরম গৌরবের কথা সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় অভিনেতা হিসাবে খ্যাত হলেও রাধামোহন ভট্টাচার্য আইনের ডিগ্রীধারী এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও পরিচয় দিয়েছেন যথেষ্ট পারদর্শিতার।

ভারতের সাংস্কৃতিক গগন থেকে একটি অত্যুজ্জল নক্ষত্র অপসৃত হলেন। সম্প্রতি লোকান্তযাত্রা করেছেন লব্ধকীর্তি বিঠল ভগবান ওয়ারেরকার (মামা ওয়ারেরকার নামে সমধিক প্রসিদ্ধ) একাশী বছর বয়সে তাঁর তিরোধান ঘটেছে। আধুনিক মারাঠী সাহিত্যের তিনি জনক। মহারাষ্ট্রের এ যুগের সাহিত্য ও নাট্যকলার ক্ষেত্রে তিনি নবযুগের বরণীয় প্রবর্তক। নির্বাক যুগে চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যে তিনি অর্জন করেছিলেন যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। নাট্যরচনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর আসন পুরোভাগে। বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে ছিল তাঁর পরম নৈকট্য। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের বহু রচনা তিনি অনুবাদ করেছেন মারাঠী ভাষায়। শিবাজী, তিলক ও বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম গ ীর প্রভাব বিস্তার করে তাঁর মনে, তারই প্রমাণ মেলে তাঁর জাতীয়তাউদ্দীপক রচনাগুলির মধ্যে। বর্তমানকালে তাঁরই প্রবর্তিত ধারা অনুসরণ করে মারাঠী সাহিত্যিক ও নাট্যকারগণ আপন আপন লক্ষ্য অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন। লোকান্তরিত স্রষ্টার আত্মার আমরা সদ্গতি কামনা করি।

শিল্পীচক্রের 'ঝুমুর' নাটকের একটি দৃশ্যে বেলা রায় ও নিতাই রায়

'প্রথম প্রেম' চিত্রের একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

কোন একটি পত্রিকায় এই মর্মে এক সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে রাজকাপুর ও বৈজয়ন্তীমালা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন। এই ধরণের সংবাদ নাকি চলচ্চিত্রমহলে ছড়িয়ে পড়েছে। পত্রিকাটি আরও জানিয়েছে যে, শোনা যাচ্ছে সহধর্মিণী কৃষ্ণার সঙ্গে রাজকাপুরের সম্পর্ক এখন প্রেমমধুর নয় এবং কৃষ্ণা নাকি স্বামিগৃহ ত্যাগ করে বর্তমানে বোম্বাইয়ের একটি বিলাসবহুল প্রথম শ্রেণীর হোটেলে বাস করছেন।

বর্তমান ভারতের চলচ্চিত্র দর্শকসমাজে যে শিল্পীরা জনপ্রিয়তার শিখরে আসন লাভ করেছেন কিশোরকুমার তাঁদের অন্যতম। বাঙলার এই কীর্তিমান সন্তান বাঙলার বাইরে চিত্রজগতে আপন প্রতিভায় তাঁর স্বনামধন্য অগ্রজের মতই এক প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসাবে আজ সমাদৃত।

ক্যালকাটা ফ্রেমস ব্যুরো নিবেদিত 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় পরিচালক তরুণ লাহিড়ী ও জ্ঞানদার ভূমিকায় কেতকী দত্ত

'দূর গগন কি ছাওমে' ছবিটি তাঁর সাম্প্রতিক সৃষ্টির একটি নিদর্শন। এই ছবিটি প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সংবাদটি হল যে এই ছবিতে কিশোরকুমারের প্রযোজক, পরিচালক, লেখক, শিল্পী, গায়ক এবং সঙ্গীত পরিচালক-রূপে পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভার আধার এই একটি ছবি। একটি ছবির এতগুলি বিভাগের দায়িত্ব সগৌরবে একজনের দ্বারা পালনের নজীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আমরা যতদূর জানি বিরল। বাঙালী কিশোর-কুমারের এই সাফল্যে আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করি।

'মেরী দত্তের ফ্ল্যাট' চিত্রে নবাগতা আরতি দাস

বোম্বাইয়ের মফস্বল মালাড অঞ্চলের গাগকান রোডটির নাম সম্প্রতি স্বর্গত শিল্পী পান্নালাল ঘোষের নামে পরিবর্তিত করা হয়েছে। সুবিখ্যাত এই শিল্পীর বাসগৃহ এই পথেই অবস্থিত। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বোম্বাইয়ের মেয়র ডাঃ বি পি ডিবগী। পৃথ্বীরাজ কাপুর, ফণী মজুমদার, নবেন্দু ঘোষ, কানু রায় এবং আরো অনেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি লোকসভায় জানিয়েছেন যে, ভারতে টেলিভিসন যন্ত্রের আমদানির বিষয়টি চতুর্থ পরিকল্পনায় বিবেচনাধীন অবস্থায় আছে। শ্রীমতী গান্ধীর অভিমতে টেলিভিসন শুধু নিছক প্রমোদেরই উপকরণ নয়, লোক-

শিক্ষারও অন্যতম মাধ্যম। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে, শোনা গেছে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী। ভারতে টেলিভিসন-স্টেশানের প্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় কুশলীদের ঐ বিষয়ে যথাযথ শিক্ষাদানে সহায়তা করার জন্য ইতোমধ্যেই কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রক পূর্ব ও পশ্চিম ইয়োরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র সরকারের ইচ্ছার আভাস পেয়েছেন।

জাপানের চিত্ররাজ্যের বাতাস এখন প্রতিকূলে বইছে। নিউ ইয়র্ক থেকে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে জাপানের চিত্ররাজ্য এখন এক বিরাট প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন। তার দর্শকসংখ্যা ক্রমশই নিম্নগামী। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে এক বছরে জাপানের চিত্রদর্শকসংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে। অভিজ্ঞ মহল টেলিভিসনের ব্যাপক প্রসারকেই এ জন্য দায়ী মনে করছেন। কোন কোন বিদগ্ধ চিত্রনির্মাতা এই পরিস্থিতিতে আপন ব্যবসায় ছেড়ে হোটেল ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছেন বলে জানা গেল।

সমকালীন পৃথিবীর ইতিহাসে উইণ্ডসরের ডিউক একটি বরণীয় মানুষ, একটি স্মরণীয় নাম। মানবজীবনে প্রেমের এক অভিনব ভাষ্যকারের গৌরব তাঁর প্রাপ্য। একাত্তর বছর বয়স্ক জনগণপ্রিয় এই সাম্রাজ্যত্যাগী প্রেমিক পুরুষের বিচিত্র জীবন চলচ্চিত্রে রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন ছেচল্লিশ বছর বয়স্ক জ্যাক লা ভিঁয়ে। ডিউকের আত্মজীবনী অনুসরণ করে ছবিটির চিত্রনাট্য পরিকল্পিত হয়েছে। ছবিটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত একটি ঘোষণায় স্বয়ং ডিউকের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। বর্তমানে ফ্রান্সের অধিবাসী ভূতপূর্ব ভারত-সম্রাটের এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ওয়ালিসের কয়েকটি চিত্র তাঁদের বাসভবনে গৃহীত হয়ে ছায়াচিত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

সুশান্ত সা

বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত। (মিঃ এন আর দাশগুপ্ত নামে সমধিক খ্যাত) রচিত সুশান্ত সা গ্রন্থটি একদা আলোড়ন এনেছিল বাঙলার পাঠকসমাজে। তাঁর এই জনপ্রিয় রচনাটির বর্তমানে চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে অর্ধেন্দু সেনের পরিচালনায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন কমল মিত্র, বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরী, অসিতবরণ, জহর রায়, মলিনা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী প্রভৃতি।

দোলনা

সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে দোলনা চিত্রটি রূপ নিচ্ছে তরুণতম পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরীর নির্দেশনায়। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, নির্মলকুমার, বিশ্বনাথন, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (অতিথি), নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, মঞ্জু দে, আরতি মজুমদার, রেণুকা রায়, শর্মিলা ঠাকুর (অতিথি) প্রভৃতি। বিশিষ্ট সুরশিল্পী অসীমা ভট্টাচার্য ছবিটির প্রযোজিকা। বোম্বাইয়ের শ্রীমতী তনুজাও এই ছবিটির একটি বিশেষ চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করছেন।

থানা থেকে আসছি

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'থানা থেকে আসছি' কাহিনীটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন কমল মিত্র, উত্তমকুমার, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, পশুপতিকুমার, জহর রায়, ছায়া দেবী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক প্রভৃতি।

'একটুকু বাসা' চিত্রের একটি দৃশ্যে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যারাণী।

সৌখীন সমাচার

প্রফুল্ল

ক্যালকাটা ক্লেমস ব্যুরো রিক্রিয়েশান ক্লাবের সদস্যবৃন্দ মঞ্চস্থ করলেন মহাকবি গিরিশচন্দ্রের কালজয়ী নাটক প্রফুল্ল। যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নাট্যপরিচালক তরুণ লাহিড়ী (নটগুরু শিশিরকুমারের ভাগিনেয়)। অন্যান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অঞ্জন সেনচৌধুরী, রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন বসু, রঞ্জিত রায়, সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিভাননী দেবী, কেতকী দত্ত, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, লীলাবতী (করালী) দেবী, বীণা গঙ্গোপাধ্যায়, অঞ্জুলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মিশরের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকারিণী

সম্পত্তি সমর্পণ

শিল্পী যাযাবর সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পের নাট্যরূপ। পরিচালনভার গ্রহণ করেন বিনোদ দে ও জগন্নাথ বসু। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন হীরক মুখোপাধ্যায়, বিনোদ দে, জগন্নাথ বসু, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অজিত মিত্র, সুভাষ দাস, সন্দীপ ঘোষ, বলরাম বসু, অভিনন্দন ঠাকুর, প্রলয় ঘোষ, শ্রীমান তরুণ ও শ্রীমতী সাধনা পাইন।

আনন্দমঠ

পথিক সম্প্রদায় দর্শকসমক্ষে নিবেদন করলেন ঋষি বঙ্কিমের অমর রচনা আনন্দমঠ। 'আনন্দমঠ'কে নাটকে রূপায়িত করেছেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ণের ভার নেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন মিত্র, জ্যোতিপ্রকাশ (নাট্যনির্দেশক), সনৎ বসু, মণি শ্রীমানী, দিগ্বিজয়, সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, নবকুমার গুপ্ত, শেফালি দে, শবরী চক্রবর্তী, রীণা ঘোষ, প্রার্থনা ঘোষ প্রভৃতি।

আনন্দময়ীর আগমনে

'আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে'

রবীন্দ্রনাথের প্রথমজীবনের লিখিত একটি বিখ্যাত কবিতার এই প্রথম দু'টি লাইনে বাঙলা দেশের জাতীয়-জীবনের একটি অবিস্মরণীয় লগ্নের এক অত্যুজ্জ্বল আলেখ্য প্রস্ফুটিত হইতেছে। শারদীয়া মহাপূজা আমাদের জাতীয়-জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ। এক পরম প্রতীক্ষিত লগ্ন। জীবনেতিহাসের বর্ষপরিক্রমার একটি উজ্জ্বল মুহূর্ত। দুর্গাপূজা বাঙালীর প্রাণের উৎসব। মায়ের আবির্ভাবে বিবাদ-বিসম্বাদ, কলহ যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া ক্ষণকালের জন্য মানুষকে মিলন ও প্রীতির রাখীবন্ধনে একত্র করিয়া দেয় তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে পুলকানুভূতির সীমা থাকে না! মহাপূজা শুধু নগরেরই নয়, মফস্বলে গ্রাম, গ্রামান্তরেও সমান সাড়া জাগাইয়া তোলে মৃতপ্রায়, মুমূর্ষু, স্পন্দনহীন পরিবেশেও এই সময় এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

পূজার্চনার ক্ষেত্রে বাঙালীর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। দেব-দেবীর সহিত আমাদের কেবল ভয়-ভক্তির সম্পর্ক নয়, আমাদের অন্তরের সমগ্র নির্ভর আমরা ঐ পদপ্রান্তে মিশাইয়া দিয়াছি। জগজ্জননীকে আমরা দেবীর তুলনায় জননী হিসাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বাঙলা দেশে যে শাক্ত-সাহিত্যের উদ্ভব হয়, তাহার মাধ্যমে শাক্তগীতিকারগণ দেবী দুর্গাকে সম্পূর্ণ মানবীতে পরিণত করিয়াছেন। পৌরাণিক আধারে যে সমাজচিত্র, গার্হস্থ্য জীবনের আলেখ্য জীবনের সুখ, দুঃখ, বেদনা, অনুভূতির ইতিবৃত্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের সামাজিক জীবনের অবিকল প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়। স্বর্গের দেব-দেবীর ও মর্ত্যের বাঙালীর মধ্যে এই নৈকট্যসাধনে শাক্ত গীতিকার, সাধক সম্প্রদায় এবং কবিকুলের অবদান অনস্বীকার্য।

'দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি'—

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই রচনাংশটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখনীয়।

কিন্তু আজ, বাঙলা দেশের সে চিত্র অনুপস্থিত। দুর্ভাগ্য প্রপীড়িত লাঞ্ছনায় নিপীড়িত, সর্বস্ব-শোষিত, বাঙলা দেশের ভয়াবহ চিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার কিছু নাই, দেশের রাজনৈতিক চিত্রও উজ্জ্বল নয়। চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের ভারতের প্রতি আচরণও রীতিমত আশঙ্কাজনক। চীনের সমরসজ্জা সারা ভারতবাসীর মনকে অনিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। বাজারে প্রতিটি জিনিস শুধু মহার্ঘই নয়, দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমতাবস্থায় মানুষের মনে আনন্দের উৎসের স্রোতোমুখ বন্ধ হইয়া যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

তবু, মায়ের আগমনে বাঙালী তার যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহার দ্বারাই—ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার দ্বারা মায়ের চরণে প্রণাম নিবেদন করিতেছে। জননীর নিকট আমাদের প্রার্থনা তিনি আমাদের শক্তি দান করুন অন্যায়, অসুন্দর, অসত্যের সঙ্গে সংগ্রাম করার। তিনি আমাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শুভবুদ্ধি, অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস দান করুন। তাঁহার কৃপায় দেশের অচলাবস্থা দূর হোক, দেশে শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য ফিরিয়া আসুক। মানুষের জীবন পুনরায় ছন্দময়, মধুময়, লালিত্যপূর্ণ, সৌন্দর্যবিমণ্ডিত হউক, মানুষ অন্ধকার হইতে আলোয়, অজ্ঞানতা হইতে জ্ঞানে, অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাসে, অসুন্দর হইতে সুন্দরে, অসংহতি হইতে সংহতিতে উপনীত হউক।

সমাজের রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও পরিবর্তিত হইতেছে। শরৎকালের সেই প্রাকৃতিক আবেষ্টনী আজ চোখের আড়ালে। সেই প্রাকৃতিক মাধুর্যমণ্ডিত চিত্তহারী শোভা আজ কোথায়? শরৎ শেষ হইতে চলিল, তারিখ হিসাবে হেমন্ত দুয়ারে সমাগত, কিন্তু বর্ষার অভিসার এখনো অব্যাহত—আকাশে মেঘের ঘনঘোর, অবিরাম বর্ষণের ধারা। জিজ্ঞাসা এই বৃষ্টি কি শুধু প্রকৃতিরই বিচিত্র লীলার পরিচায়ক, না লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের অব্যক্ত কান্নার ঐ একটি সামগ্রিক নিদর্শন?

সব ঠিক হ্যায় ঃ খাদ্যমন্ত্রীর মতে

একুশ বৎসর পর দেশে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। চতুর্দিকে শুধু নাই-নাই রব। ঘরে ঘরে অন্নাভাবের হাহাকার। পথিপার্শ্বে কেবল বঞ্চনার মিছিল, বেদনার সমারোহ আর শূন্যতার অভিসার। খাদ্যদ্রব্যের অভাব যেভাবে দিনের পর দিন প্রকট হইয়া দেখা দিতেছে ইহার ফলে উপবাসের শেষ সীমায় উপনীত হওয়ার সেই সাঙ্ঘাতিক মুহূর্তটি দুয়ার হইতে অদূরেই। দেশের খাদ্যাবস্থার শোচনীয় চিত্রের আজ আর রচনার মাধ্যমে ভাষার প্রলেপে উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজন নাই, সে চিত্র মানুষের চোখের জলে আরও সজীব হইয়া উঠিয়াছে, সে অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রতিটি দেশবাসীর। এমতাবস্থায় যদি কেহ উক্তি করেন যে 'দেশের খাদ্যাবস্থা সন্তোষজনক' তাহা হইলে হয় তাঁহার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়, নতুবা তাঁহার চরিত্রের মধ্যে মনুষ্যত্বের অবশিষ্টটুকুও যে লোপ পাইয়াছে সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার সংশয়ই থাকে না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই উক্তি করিয়াছেন স্বয়ং খাদ্যমন্ত্রী। কোন প্রদেশের নয়, খোদ কেন্দ্রের। মাদ্রাজে তিনি সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে দেশের খাদ্যাবস্থা ভালই। ১৫ই অক্টোবর হইতে মাঠ হইতে ধান্যশস্য সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হইলে খাদ্যাবস্থা ভাল হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়। মহাভারতের দ্রোণপর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি উক্তির সহিত এই কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্বোধের ন্যায় উক্তি তুলনীয়। অশ্বত্থামা হত 'ইতি গজ'র ন্যায় একটি প্যাঁচ তিনি মারিয়া রাখিয়াছেন 'আশা করা যায়' বলিয়া। খাদ্যাবস্থা যে ভাল হইবে—এই কথাটুকুও জোর দিয়া তিনি বলিতে পারেন নাই। মন্ত্রী মহোদয় জানাইয়াছেন যে, অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যমান নির্দিষ্টকরণ সম্পর্কে পরে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

● সুব্রহ্মণ্যম

আমাদের বক্তব্য, যে ধানের সম্বন্ধে তিনি তো একটি ধোঁয়াটে আশ্বাস দিলেন কিন্তু অন্য যেগুলির ব্যবস্থা পরে করিবেন বলিতেছেন—এই পরে আর কবে আসিবে? সমগ্র দেশ শ্মশান হইবার পর। সমগ্র রোম যেদিন ভস্মীভূত হইতেছিল নীরো সেদিন বংশীবাদনে রত ছিলেন, সমগ্র দেশ যেদিন শ্মশানে পরিণত হইবে খাদ্যমন্ত্রী কি তখনও দিল্লীর উপভোগ্য মসনদে পারিষদ-পরিবৃত হইয়া আরামে দিন কাটাইতে কাটাইতে স্বপ্নের ঘোরে বলিবেন—'সব ঠিক হ্যায়?'

কাজের চাপে ভুল হওয়া অস্বাভাবিকও নয়, বিরল দৃষ্টান্তও নয়। মন্ত্রী মহোদয়ও তারী শিল্পদপ্তর হইতে যখন খাদ্যদপ্তরের ভার গ্রহণ করেন তখন জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যে 'হয় কালোবাজারী নয় আমি'—বোধ করি কাজের চাপেই স্বীয় প্রতিশ্রুতি তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন, নতুবা দেশে মন্ত্রী হিসাবে তিনি এবং কালোবাজারী সম্প্রদায় যুগপৎ আজো বিরাজিত কেমন করিয়া?

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম হয় তো অনেক খবর রাখেন বলিয়াই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ বিশেষ খবর রাখিবার তাঁহার অবকাশ হয় না। কিন্তু দেশের বিরাট সংখ্যক জনগণ এই সকল সংবাদ সম্বন্ধে অনবহিত নন এবং এই সংবাদগুলি তাঁহাদেরই কেন্দ্র করিয়া। প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য তিনগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। মূল্য বাড়িয়াও সমস্যার শেষ হয় না, জিনিসই দুষ্প্রাপ্য। সম্বল উজাড় করিয়াও মানুষ দিনের অন্ন সংগ্রহে প্রস্তুত, কিন্তু জিনিস দোকান-বাজারে অদৃশ্য। আটা কিনিবার জন্য যা লাইন হয় তাহা বোধ করি সিনেমার লাইনের দৈর্ঘ্যকেও ম্লান করে। সামান্য মূল্যের আনাজ-তরকারীর যা মূল্য তাহা শুনিলে সাধারণ মধ্যবিত্তকে হৃদরোগে আক্রান্ত হইতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল তথ্যগুলিই কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর কর্ণগোচর হয় না। আর যদি এই সকল বিষয়ে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঐ উক্তি করেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আমরা এই রচনার প্রারম্ভেই যে মন্তব্য করিয়াছি তাহাই যথার্থ প্রতিপন্ন হইতে বাধা থাকে না।

সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য-ভাণ্ডার, শস্যভাণ্ডার লুঠ হইতেছে, ইতিহাসের আলোকে আমরা দেখিয়াছি এই জাতীয় অযোগ্যতা এবং বিবেচনা-শূন্যতার ইহাই নির্দিষ্ট পরিণতি।

বিলাসদ্রব্য বাদ দিতেছি, দিনের প্রয়োজনের দ্রব্য, দিনের অন্ন যদি তিনগুণ মূল্য দিয়াও মানুষ সংগ্রহ করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার যে কি পরিণাম, পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস তো [illegible]

তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে। আইনের মুদ্রিত বিধি-বিধানের দ্বারা আমরা যতই খণ্ডন করি তথাপি ইহা কি সত্যই অস্বীকার করা চলে যে—অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। এই অবস্থার আরও প্রসার ঘটিলে সারা দেশের দুর্নীতিও যে কতক্ষণ বিবর্ধিত হইবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তার সময় আসিয়াছে। একে অভাব অন্নহীনতা তদুপরি রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির ব্যাপ্তি এবং তার পরিণতি জনজীবনে ব্যাপক অশান্তি। সারা ভারতবর্ষের যে কি অবস্থা ঘটাইবে সে বিষয়ে কে দায়ী থাকিবেন?

বিধানসভা বনাম বিচারসভা

ভারত রাষ্ট্রের আইন ও সংবিধান জগতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত যে সকল ঘটনা সাধারণ্যে যথেষ্ট আলোচনার সৃষ্টি করিয়াছে এবং যাহার দ্বারা নানা প্রকার বাদ-বিসম্বাদ তর্ক-বিতর্ক সূচিত হওয়ার ফলে সবসাধারণের দৃষ্টি যাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, উত্তর প্রদেশের ঘটনাবলীর স্থান তাহাদের পুরোভাগে। উত্তর প্রদেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আজ কেবল সমস্যার ভিড়। জটিলতা, দলীয় স্বার্থসিদ্ধি, ঈর্ষান্বিত পরিবেশ আজ সেখানে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। উত্তর প্রদেশের ঘটনাবলীর মধ্যে উত্তর প্রদেশ বিধানসভা এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের ক্ষমতা কেন্দ্রিক বিরোধের ও তাহার সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়দান এই রচনার প্রধান আলোচ্য। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বিধানসভার অধিকার ভঙ্গের অভিযোগে গোরক্ষপুরের সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম নায়ক কেশব সিংকে স্পীকার গ্রেপ্তারের আদেশ জারী করেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইলে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে হেবিয়াস কার্পাসের দরখাস্ত করেন। বিচারপতি বেগ ও বিচারপতি সেহগাল কেশব সিংকে জামিনে মুক্তির আদেশ দেন। এই মুক্তি আজ্ঞা বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। তাঁহারা চটিয়া আগুন হইলেন, এই লইয়া বাদ-প্রতিবাদ তর্ক-বিতর্কের ঝড় বহিয়া গেল, শেষে স্থির হইল কেশব সিং তো নিশ্চয়ই, তাঁহার উকীল ও বিচারপতিদ্বয় ও সমান অপরাধে অপরাধী, অতএব সকলকেই গ্রেপ্তার করা সমীচীন। বিচারপতিদ্বয় ও উকীল শ্রীসলোমন বিধানসভার নির্দেশ কার্যকরী না করার জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন দাখিল করিলেন। হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ স্পীকারের উপর এই মর্মে আদেশ জারি করিলেন, অবস্থা যখন শেষ সীমায় উপনীত হয়-হয় তখন সমগ্র বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ও বিরোধের আশু সন্তোষজনক সমাধানের জন্য রাষ্ট্রপতি বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টে পাঠাইলেন। সুপ্রীম কোর্টে ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিচারকদের লইয়া বিশেষ বেঞ্চটি বসিল তাহার মধ্যে স্বয়ং প্রধান বিচারপতি শ্রীগজেন্দ্র গদকার অন্যতম। বিচারপতি সরকারও এই তালিকায় অন্যতম নাম।

সুপ্রীম কোর্ট সমগ্র বিষয়টি গভীরভাবে অনুশীলন ও পর্যালোচনা করিয়া কি অভিমত দেন তাহা জানিবার জন্য সারা দেশবাসীর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। ব্যাকুল প্রতীক্ষায় আগ্রহী জনসাধারণ প্রহর গুণিতেছিলেন। অবশেষে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য, উহা প্রকাশিত হইয়া এক ইতিহাসের সৃষ্টি করিল।

উত্তরপ্রদেশ হয় তো বিস্মৃত হইয়াছিলো যে গণতন্ত্রের আইন, শাসক ও বিচার এই প্রতিটি বিভাগই নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহাদের অধিকারের সীমানা গণতন্ত্রেই সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে। এমতাবস্থায় একে অপরের অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করিলে গণতন্ত্রকে যথেষ্ট দুর্যোগের সম্মুখীন হইতে হয়। বিশদ করিয়া বলার প্রয়োজন হয় না যে, গণতন্ত্রের দুর্যোগ ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্কটেরই নামান্তর মাত্র। অথচ উত্তর প্রদেশের বিধানসভা কেন যে মনে করিয়া বসিলেন যে তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিবেন, খেয়ালখুশি মাফিক কাজ করিবেন, নিজেদের অধিকারগত গণ্ডীর বাইরে যথেচ্ছ বিচরণ করিবেন ও সম্মানিত বিচারপতিদের যথেষ্ট অপমান করিবেন—তাহার কোন সদুত্তর কোন বুদ্ধিজীবী-চিন্তাশীল মস্তিষ্কে উদিত হয় না। আনন্দের বিষয়, সুপ্রীম কোর্টের রায়ে ঘোষিত হইয়াছে যে, ভারতীয় সংবিধানের কোন অংশে বিধানসভার এই জাতীয় কার্যকলাপ সমর্থিত নয়। কোথাও এ জাতীয় কার্যাদি করিবার অনুমতি বিধানসভাগুলিকে দেওয়া হয় নাই।

● অশোককুমার সেন

ভারতের ন্যায় একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের বিধান সভাগুলির ভূমিকা যদি তাহারা সদস্যগণ বিস্মৃত হইয়া সেখানে বিশৃঙ্খলার এবং নীতি-বিরোধী কার্যাদি করিতে আরম্ভ করিয়া তাহার গৌরবে মসিলেপন করেন, তাহা হইলে বিধানসভার আসল দায়িত্বগুলি কিভাবে এবং কাহার দ্বারা পালিত হইবে সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

রচনার পরিশেষে আমরা এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন মহাশয়ের অভিমতের দিকে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিচারপতিদ্বয়কে এইভাবে লাঞ্ছিত করিবার অধিকার আইনসভার নাই—এই মতটি তাঁহার দ্বারাও ব্যক্ত হইয়াছে। ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে তাঁহার ন্যায় একজন ধুরন্ধর আইনবেত্তার অভিমত যে সর্বতোভাবে গ্রহণীয় এবং যথেষ্ট মূল্যবান তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র।

শোক-সংবাদ

বর্ষীয়ান সাহিত্যিক এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গত ৩রা আশ্বিন ৮৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনে এবং সেবায় তাঁর অবদান ও দক্ষতা অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাঙলার সাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি এক স্মরণীয় নাম। অসংখ্য সার্থক উপন্যাসের তিনি জন্মদাতা। তাঁর রচনা একদা বাঙলার সাহিত্য-সমাজে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন এনেছিল তা এক কথায় অবিস্মরণীয়।

পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী ও বিশিষ্ট জননেতা এবং সমাজ সংগঠক অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী গত ৩০-এ ভাদ্র ৬৯ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কংগ্রেস ত্যাগ করার পর কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি ও প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রাজ্যবিধান পরিষদের সদস্যপদে তিনি দীর্ঘদিন এবং সর্বভারতীয় খাদি বোর্ড ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য খাদি বোর্ডের সদস্যপদে তিনি আমৃত্যু সমাসীন ছিলেন।

দীঘাপাতিয়ার রাজা প্রতিভানাথ রায়ের গত ১৮ই আশ্বিন ৭০ বছর বয়সে জীবনাবসান হয়েছে। ক্রীড়াবিদ হিসাবে ইনি একদা বাঙলা দেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

বিদগ্ধ সাহিত্যসেবী ও শিক্ষাবিদ সোমনাথ মৈত্র গত ১২ই আশ্বিন ৭০ বছর বয়সে লোকান্তরযাত্রা করেছেন। দীর্ঘদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে ইংরাজী ভাষার অধ্যাপকরূপে তিনি যুক্ত ছিলেন ও ১৯৪৯ সালে উক্ত বিভাগীয় প্রধান হিসাবে অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনা তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন।

কলকাতা আরক্ষাবাহিনীর প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১২ই আশ্বিন পোর্টব্লেয়ারে ৬৮ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। ১৯১৯ সালে পুলিশবাহিনীতে যোগ দেন এবং লণ্ডন, স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেন।

মহাত্মা শিবনাথ শাস্ত্রীর পুত্রবধূ ও উড়িষ্যার প্রখ্যাত কবি মধুসূদন রাওয়ের কন্যা অবন্তী দেবী ৮৩ বছর বয়সে গত ১২ই আশ্বিন গতায়ু হয়েছেন। বহু লোকহিতকর কাজে এবং সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর ইংল্যাণ্ডের ডায়েরি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য ও ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ঘোষের সহধর্মিণী মায়ারাণী ঘোষ গত ১৭ই ভাদ্র মাত্র ৫১ বছর বয়সে পরলোকযাত্রা করেছেন। সমাজ সেবার ক্ষেত্রে ইনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। জনকল্যাণকর কার্যাদিতেও এঁর উৎসাহ এবং সহযোগিতা ছিল অফুরন্ত। ইনি মেদিনীপুরের স্বর্গত রায় মন্মথনাথ বসু বাহাদুরের একমাত্র কন্যা ছিলেন।

মায়ারাণী ঘোষ

বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী মনোরঞ্জন গুপ্ত গত ২৩-এ ভাদ্র দেহরক্ষা করেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গত রামপ্রাণ গুপ্তের পুত্র মনোরঞ্জন জীবনীকার হিসাবে এবং তথ্যবহুল প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

বর্ষীয়ান বিপ্লবকর্মী ও শোভাবাজার গুলীচালনার (১৯১৪) অন্যতম নায়ক নির্মলকান্ত রায়ের গত ১৯শে ভাদ্র ৭০ বছর বয়সে প্রাণবিয়োগ ঘটেছে। পরবর্তীকালে কর্মসূত্রে ইনি ভারতীয় রেলবিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কর্মজীবনেও ইনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করে গেছেন।

পাঠক পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা-সমালোচনা

শাশ্বতী

মহাশয়,

বহুল-প্রচারিত পত্র-পত্রিকায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-লেখিকার রচনা প্রকাশিত হবার মধ্যে সম্পাদকের কৃতিত্ব খুবই কম, কারণ নামী সাহিত্যিকেরা সাধারণত নিজেরাই এ-জাতীয় পত্র-পত্রিকায় লিখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এই সব প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকদের লেখাও যখন অনেক ক্ষেত্রে লেখার ধারে না কেটে তাঁদের নামের ভারেই কাটতে চায়, সাহিত্য রস-পিপাসু পাঠক-পাঠিকারা তখন তাঁদের প্রিয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নতুন লেখক-লেখিকার সত্যিকারের রসোত্তীর্ণ রচনার সন্ধান পেতে চান। আর যে সম্পাদক এ-ধরণের নতুন সাহিত্যিককে সাহিত্যের আসরে হাজির করতে পারেন তিনিই প্রকৃত সম্পাদক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এ-জাতীয় সম্পাদক বাংলা পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছেন বললেই চলে। মুষ্টিমেয় দু'একজন সম্পাদক, আজও যাঁরা সাহিত্যরসিক পাঠক-পাঠিকার পরম ভরসার স্থল, মাসিক বসুমতীর সম্পাদক হিসাবে নিঃসন্দেহে আপনি তাঁদেরই একজন। অতীতে কয়েকজন সাহিত্যিককে আপনি আবিষ্কার করেছেন যাঁরা আজ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। এবার কিন্তু আপনার টেলিস্কোপে সাহিত্যাকাশের এমন একটি অজানা জ্যোতিষ্ক ধরা পড়েছে যার আংশিক দীপ্তিতেই মাসিক বসুমতীর বহু পাঠক-পাঠিকার মত আমিও বিস্মিত। হাঁ, আমি 'শাশ্বতী' ধারাবাহিক উপন্যাসের লেখিকা নমিতা চক্রবর্তীর কথাই বলছি। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আপনার এই নতুন আবিষ্কারটির জন্য। আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত শাশ্বতী উপন্যাসের প্রথমাংশ পড়ে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল তাঁর চিঠিতে যা লিখেছিলেন, সে সম্বন্ধে আমি একমত হলেও মনে তখনও আমার কিঞ্চিৎ সংশয় ছিল যে, হয়তো পরবর্তী সংখ্যা থেকে লেখিকার লেখার standard-এর অবনতি ঘটবে। কারণ, দু' একটি সংখ্যা পড়েই বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের রচনা পর্যন্ত পাঠক-পাঠিকাকে অনেকক্ষেত্রে হতাশ করে বসে। কিন্তু পর পর তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত শাশ্বতীর অনেকখানি অংশ পড়বার পর আমার সমস্ত সংশয় কেটে গেছে। লেখিকার অননুকরণীয় ভাষা, অভিনব প্রকাশভঙ্গী, আশ্চর্য পরিমিতিবোধ আর সর্বোপরি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করবার অদ্ভুত ক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে। বহুদিনের বহু সাধনাতে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের পক্ষেও যা আয়ত্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, একজন নতুন লেখিকার পক্ষে কি করে তা এত অনায়াসে সম্ভব হ'ল, তা ভাবতে বসে শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে যে, নমিতা চক্রবর্তী হচ্ছেন সেই জাতের লেখিকা যাঁদের আমরা আখ্যা দিয়ে থাকি স্বভাব-শিল্পী বলে। তাই বহুদিন ধরে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর তাঁকে এ দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারিণী হতে হয় নি। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমরা নতুন ঘরাণা সৃষ্টি হবার কথা শুনেছি। বলতে একটুও দ্বিধা নেই যে, বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীমতী চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে এক নতুন ঘরাণা সৃষ্টি করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছেন। প্রাণতোষবাবু! আপনার এই নতুন ও সার্থক আবিষ্কারটির জন্য আবার আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। —শ্রীশম্ভু মুখোপাধ্যায়, ৪।১৬, চিত্তরঞ্জন কলোনী, কলিকাতা-৩২।

পত্রিকার আলোকচিত্র

মহাশয়, আমি গত এক বৎসর ধরিয়া মাসিক বসুমতী পাঠ করিতেছি। আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত নূতন প্রবন্ধ বা ধারাবাহিক উপন্যাস সম্পর্কে আমার কৌতুহলের সীমা নাই। বিশেষ করিয়া আপনার পত্রিকার আলোকচিত্র বিভাগটি মাসিক বসুমতীর যথেষ্ট শোভাবর্দ্ধন করে। আমি একজন আলোকচিত্র-শিল্পী। (Amateur Photographer)। বহুদিন যাবৎ আমি আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া বেড়াইতেছি। আপনার পত্রিকায় পূর্ব সংখ্যাগুলিতে পি সাহানার গৃহীত আলোকচিত্রগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এ জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ও পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে আশা করি যেন তাঁহার গৃহীত আলোকচিত্র স্থান পায়। পত্রিকায় এই ধরণের নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গিপূর্ণ আলোকচিত্র থাকায় আমি আপনাকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার সম্পাদনায় মাসিক বসুমতী তার জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলুক। ইতি—অশোক গুপ্ত, অবধারক কে কে গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স, টিম্বার মার্চেন্টস্, পোঃ রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান।